



প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্তিক, ১৩৩০

১ম সংখ্যা

দাদুর সেবা-যোগ

১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দাদুর জন্ম, ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। চাম্‌ডার “মোট” (কূপ হইতে জল তুলিবাব পাত্র) সেলাই কবিতা ইনি জীবিকানির্ভার করিতেন। এমন সময় মাদু সুন্দরদাসের কাছে ইহার ভাগবত জীবনেব দীক্ষা হয়। ইহার গুরুদত্ত নাম কি তাহা জানা যায় না। পিতৃদত্ত নামও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সকলকে ইনি ভাই অর্থাৎ “দাদা”, “দাদু” বলিতেন। সকলে আবার আদর করিয়া ইহাকে “দাদু” বলিত। সেই “দাদু দয়াল” নামই ইহার রহিয়া গেছে।

লেখাপড়া জানিতেন না, তবে স্বাভাবিক প্রতিভা গুণে ও সাধনাব দৃষ্টিতে ইনি অসাধারণ সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন।

সেবার একটা দিক আছে যেটা সামাজিক ও নৈতিক (social, ethical)। কিন্তু যে সেবার পন্থা তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা আধ্যাত্মিক (spiritual)। অর্থাৎ তাহা তাঁহার ভগবৎ-প্রেমের বাহ্য প্রকাশ। আধ্যাত্মিক ভাবাবেশের (Spiritual Emotion) কলাসম্মত আত্ম-প্রকাশ (artistic expression) আমরা মন্দির স্থাপত্য ও নানা অনুষ্ঠান পদ্ধতির (Ceremonialism) মধ্যে

পাই। সেবার আধ্যাত্মিক (spiritual) আবেগেব বাহ্য প্রকাশ কল্পে। ইহার মূল উৎস কর্তব্যবুদ্ধি নহে, ভগবৎ-প্রেম! এইজন্য সেই প্রেমের যে প্রকাশ তাহা কাব্যের গায়, মঙ্গীতের গায় সুন্দর, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous)। তাহা প্রয়োজন সাধনের প্রয়াস নয়, তাহা অন্তর্গত পূর্ণতার বাহ্য পরিণতি। এই কারণে আধ্যাত্মিক (spiritual) সেবকের প্রকৃতি কলাসম্মত বা আর্টিষ্টের প্রকৃতি, কবির প্রকৃতি। তাহার প্রেরণা (inspiration) হইতেছে পূর্ণতার (perfection) ক্ষুধায়।

অনুনিহিত সৌন্দর্য্য-বোধ নানা উপাদানকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। বর্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহা চিত্র হয়। পাষাণকে আশ্রয় করিয়া তাহাই মূর্তি হয়। মানব-জীবনও তেমনি একটি উপাদান। এই উপাদান লইয়া সেবারূপে আমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির সেবায় বিধাতা আপনার অন্তরের রসকে মূর্তিমন্ড করিতেছেন। এই রস-সৃষ্টি হৃদয়ের প্রকাশ, ইহা প্রয়োজনাতীত। , কাছেই তিনি কবি, তিনি শিল্পী।

প্রয়োজনে যদি ইহা সমাপ্ত হইয়া যাউত তবে ইহাতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইত না।

আমরা যেখানে আমাদের অন্তরের প্রয়োজনাতীত প্রেমরসকে সেবায় মূর্ত্তিমান্ করি সেখানে আমরা শিল্পী, স্রষ্টা এবং বিধাতার সমানধর্ম্মা। তাই দাদু সেবাকে সৃষ্টির একটি ক্ষেত্র বলিয়াছেন এবং এই পথেও বিধাতার সঙ্গে যোগ হয় ইহা বুঝাইয়াছেন। বিশ্বজগতে যেমন বিধাতার সৃষ্টি আজও চলিয়াছে, কোথাও তাহার সমাপ্তি হইবার ভয় নাই, সেবার ক্ষেত্রেও তেমনি মানবের সৃষ্টি নিত্য কাল চলিবে। রসের ও প্রেমের অসীমতার দ্বারা এই রস লোকও অপার অগাধ।

মধ্যযুগের সাধকেরা কেহই পণ্ডিত ছিলেন না। কাজেই তাঁরা আমাদের শাস্ত্রের প্রচলিত শব্দগুলির পাবিভাষিক অর্থ জানিতেন না বলিয়াই হউক অথবা নিজেদের সাধনালক্ষ্য সত্য-দৃষ্টি বা প্রতিভার বলেই হউক, ইহারা সেই-সব কথা একেবারে নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। নিজেদের সত্য-উপলক্ষি প্রকাশ করিবার জগুও অনেক সময় বাধ্য হইয়া পুৰাতন কথাকে নূতনভাবে ব্যবহার করিতে ইহারা বাধ্য হইয়াছেন।

“দ্বৈত” ও “অদ্বৈত” এই কথা দুইটি বিশ্ব ও ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দাদু এই কথা দুইটি সাধনার ও যোগের প্রকার-ভেদ বুঝাইবার জগু ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাব পূর্বে সাধক রবিদাসও এইভাবে সত্য-প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের দুই প্রকার যোগ। একপ্রকার যোগ দ্বৈত। সেখানে আমরা কিছু প্রার্থনা করি। সেখানে আমরা কিছু দিই না এবং সৃষ্টিও করি না। সেই মিলনের ক্ষেত্র—প্রয়োজনেব ক্ষেত্র, রসের ক্ষেত্র নয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না। সেখানে সাধক ও ঈশ্বর পবস্পরের পবিপূরক (Complementary) মাত্র। আমরা সেখানে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সাধন্য অন্বেষণ কবি না। এই দ্বৈত যোগের মধ্যে নিত্যতা নাই। যেই আমার অভীষ্ট পাইলাম অমনি আমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে আমার ভোগ-লোকে নাগিয়া আসিতে হইবে। নিত্য-যোগ হয় রস-লোকে যেখানে আমার

সঙ্গে তাঁর-সাদর্ম্ম্য আছে, যেখানে আমার মধ্যে কোনে দৈন্ত নাই। কিন্তু যেখানে আমার প্রার্থনা, সেখানে সিদ্ধিলাভের পরই আমার বিচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী।

আর-এক যোগ অদ্বৈত-যোগ, যেখানে আমি আপনাকে দিতে চাই। যেখানে আমার কিছুই প্রার্থনী নাই, সেই রস-লোকে আমি তাঁর সমানধর্ম্মা। এই ক্ষেত্রে তিনিও যেমন সেবক আমিও তেমনি সেবক—উভয়েই সেবার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। এখানে তাঁহার সঙ্গ আমার নিত্য সাহচর্য্য ঘটে।

নারী যেখানে তাঁর সেবার মূল্য চায় সেখানে সে দাসী মাত্র। কাজেই দ্বৈত যোগের ক্ষেত্রে প্রেম নাই, দাস্য মাত্র আছে, তাও প্রেমের নিষ্কাম দাস্য নয়। নিষ্কাম দাস্য খুব গভীর কথা। অদ্বৈত-যোগের ক্ষেত্রে, রস-লোকে, নারী আপনাকে পতির সহচারিণী বলিয়া জানেন। এই প্রেম-লোকে তিনি পত্নী, দাসী নন, তিনি লইতে চাহেন না, দিতে চাহেন। এই ক্ষেত্র যে অভাবের নয়। এখানে নিত্য প্রয়োজনেব অতীত রস ও ঐশ্বর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এখানে পত্নীকপে তিনি স্রষ্টা, তিনি অল্পবেব প্রেমকে নিজের জীবনে নিজের সংসাবে সন্মব আকাব দান করেন।

এইপ্রকার যে সেবা তাতে প্রেমের ও রসের মধ্যে অসীমতার বোধ আছে। কারণ এখানে সাধক যেমন-তেমন-ভাবে সেবা করিতেছেন না, তিনি ঈশ্বরের সমধর্ম্মা হইয়া তাঁরই “সদৃশ” (সরীথা) হইয়া সেবা করিতেছেন। এখানে সাধক সেবার মধ্যেই ব্রহ্মকে উপলক্ষি করেন। যদি সেবার ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা বা কোনো প্রকাবের সাম্প্রদায়িক বা অগ্র কোনো সীমার বোধ আসে তবে ব্রহ্ম-বোধই আহৃত হয়। আমরা ব্রহ্মকে যদি জীবন্ত মনে কবি তবে কি আর তাঁকে লইয়া ভাগাভাগি করিতে পারি? প্রেম থাকিলে, দরদ থাকিলে জীবন্ত ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করা অসম্ভব।

আমরা যখন ব্রহ্মকে ও সাধনাকে জীবন্ত মনে না করি তখন “খণ্ড খণ্ড করিয়া” কাজ সহজ করার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু এই ভাবে রস-লোকটি সৃষ্টি করা যায় না। জীবন্ত ব্রহ্মকে যে খণ্ড করিয়া সহজ

করিবার চেষ্টা করি এ এক “ভ্রমের গাঁঠ”, এই গাঁঠ ছাড়ানো বড় কঠিন, অথচ এই গাঁঠ না ছাড়িলে কোনো সৃষ্টিই সত্য হইয়া উঠে না।

“খণ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকে পছ পছ লিয়া বাঁট।

দাদু জীরত ব্রহ্ম তেজি বাঁধে ভরমকী গাঁঠ।”

[হে দাদু, যে ব্রহ্ম সকল খণ্ডিতকে মিলিত করিবেন তাঁকেই এরা এদলে ওদলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছে, জীবন্ত ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সবাই ভ্রমের গাঁঠ বাঁধিয়াছে।]

কিন্তু এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া প্রথমে মনে হয় যে কাজ বুঝি সহজ হইল, কিন্তু আসলে তা হয় না। যতক্ষণ তাঁকে জীবন্ত না দেখি, যতক্ষণ সমগ্রতার বোধ না হয়, ততক্ষণ হৃদয় ভরে না, আনন্দ জাগে না। কাজেই আমি যে “রান্বেব” সঙ্গে সঙ্গে সেবা করিতে চাই তাঁর সঙ্গে সেবা করা সম্ভব হয় না, বস-লোক সৃষ্ট হয় না।

অর্পনী অপনী জাতিসে। সবকোই বৈসখ পাঁতী।

দাদু সেবক বামকা ঠাকো নহি ভরাতী।

[আপন আপন জাতি লইয়াই সবাই নিজ নিজ পংক্তি রচনা করিয়াছে। দাদু যে প্রেমময় বাম্বেব সেবক, তাই হৃদয় এমন ক্ষুদ্র সীমাব মধ্যে ভবিয়া উঠে না।]

অথচ দাদু ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষা-হীন সরল-হৃদয় সাধক মাত্র। তাঁকে সবাই প্রশ্ন কবিল—“এমন বিচার ধারণা কি সহজ?” তখন দাদু বলিলেন—“বহু ভেদবুদ্ধি মনে ধারণ করিয়া রাখিতে বহু বুদ্ধিব প্রয়োজন হয়। আমি পাণ্ডিত্য-হীন সরল লোক। আমি নানান-খানা করিয়া দেখিতে জানি না—আমি যেখানে এক সেখানে সহজে বুঝিতে পারি। কাজেই আমি কায়ার বা বর্ণের দিক্ দিয়া দেখি না, আমি আত্মার দিক্ দিয়া দেখি। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে ভাগের আর অন্ত নাই, অত বুঝিয়া ওঠা কি আমার চলে? আমি তাই অন্তরের দিক্ দিয়া পূর্ণব্রহ্মের দিক্ দিয়া দেখি, যেখানে সবাই এক।

“পূর্ণ ব্রহ্ম বিচারিয়ে সকল আয়া এক।

কায়াকে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক।”

[পূর্ণ ব্রহ্মের দিক্ দিয়া দেখিলে সকল আত্মাই এক, কায়ার গুণের দিক্ দিয়া দেখিলে অনেক বর্ণ, অনেক ভেদ।]

অথচ সমগ্রকে পাইবার পক্ষে যতগুলি বাধা আছে তার মধ্যে সীমা-বিশেষে বহু হওয়াটাই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। কারণ তখন আমরা ঐ খণ্ড সত্যকেই যথার্থ সত্য মনে

করি এবং আমাদের জীবনের ব্যর্থতা আমাদের কাছে ধরাই পড়ে না।

সাঁচ ন স্বকই জবলগা তবলগ লোচন নাহি।

দাদু নিহবন্ধ ছাড়ি করি বন্ধা হোই পথ মাই।

[যে পয়ান্ত সেই পবিপূর্ণ সত্য দৃষ্ট না হয় সে পয়ান্ত আমাদের লোচনই নাই। হে দাদু, তখন বন্ধনাশীতকে ছাড়িয়া আমবা কোন না কোনো দলে বন্ধ হইয়া পড়ি।]

কাজেই সাধনার এক মাত্র লক্ষ্য যে মুক্তি, তাহাই আমাদের সুদূরপর্যন্ত হইয়া উঠে।

যখন সবাই দাদুকে বলিলেন যে কোনো না কোনো “পন্থে” থাকিয়াই সবাই সেবা করে, ভেদবুদ্ধিহীন “বিশ্বপন্থে” থাকিয়া সেবা করার দৃষ্টান্ত কই? তখন দাদু বলিলেন, জগতের সব মহাপ্রকৃতি এবং সব মহাপুরুষ সবাই “বিশ্বপন্থের” দলে।

“যে সব হোই কিস পন্থে” ধবতী অরু অসমান।

পানি পবন দিন বাতকা চন্দ্র সূর্য রহিমান।

[আমার অন্তবেব কথা তুমিই বুঝিবে, এক তোমার কথাই আমি বুঝি, এদের কথা আমার বুঝি কঠিন। হে দয়াময়, ধবিতী ও আকাশ, জল ও পবন, দিন ও রাত্রি, চন্দ্র ও সূর্য এরা সবাই যে নিত্যনিবস্তর জগতের সেবা করিতেছে, তুমিই বলো তো এরা সব কোন্ সম্প্রদায়ের লোক?]

মহাপুরুষদের নামে না হয় সব লোকে দল বাঁধিয়াছে, কিন্তু তাঁরা কার দলে ছিলেন? তাঁদের সকলের আশ্রয় তো তুমিই।

মহম্মদ থে কিস পন্থে, জিববহল কিম রাহ।

ইনকে মুবসিদ পীব কো কহিয়ে এক অলাচ।

যে সব কিসকে হোই রহে য়হ মেবে মন মাই।

অলখ ইলাহী জগতগুণ দুজা কোই নাহি।

[মহম্মদ কার সম্প্রদায়ে ছিলেন, ধর্গ১৩ জিবরেইল (Gabriel) কোন পন্থায় ছিলেন? এঁদের গুরু বা পীর কে? হে ভগবান্ তুমিই ইহা বুঝাইয়া বল। এঁরা সব কার দলেব হইয়া কাজ করিয়াছেন? হে অলখ ইলাহী, হে জগদগুরু, তুমিই তাঁদের একমাত্র গুরু ও আশ্রয়, ইহা ছাড়া আর কেহ নহে।]

ভগবানের অসীম প্রেমরসে “অহং” গলিয়া যায় এবং যথার্থ সেবা জাগ্রত হয়। গৃহের পত্নী আপন প্রেমরসে সকল গৃহখানি প্রাণময় ও পরিপূর্ণ করিয়া আপনাকে সকলের দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। ঈশ্বরের সেবাও এমন ভরপুর যে তিনি আপনার শিশির-বিষ্কুটির পিছনেও আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। বৃক্ষের প্রাণের পিছনে যেমন মূল, কায়ার পিছনে যেমন প্রাণ, তেমনি ঐষ্ট বিশ্ব-সেবার পিছনে বিশ্ব-প্রেমময় ভগবান্ আপনাকে নিরন্তর

লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি মূল্যধার, তিনি যদি আপন সেবায় আপনাকে গলাইয়া নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতে না পারিতেন তবে যে বিশ্বে প্রলয় লাগিয়া যাইত। আপনাকে পিছনে রাখিয়া আপনার সাধনাকে, আপনার সেবাকে, সামনে রাখাই সৃষ্টি। ইহার উল্টাই প্রলয়। সেবা যে প্রেমের আরতি। আরতি-প্রদীপের পরিপূর্ণ আলো পড়িবে অর্চনায়ের মুখের উপর, অর্চক দীপের ছায়াতে আপন কায়া লুকাইয়া রাখিবেন। তা নহিলে আরতি কি?

এই জগৎ তাঁর পরিপূর্ণ আরতি। তিনি তাই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়াছেন। সেবার দীক্ষা লইতে হইলে তাঁর কাছেই লইতে হইবে। এমন সেবক আর নাই। এমন করিয়া আপনাকে কে সেবার রসে গলাইয়া দিয়াছে?

সেবক বিসর্জ্য আপনাকে সেবা বিসর্জী ন জাতি।

দাদু পুছই রামকো নো তত্ত্ব কহো সমুঝাতি ॥

[সেবক আপনাকে মুচিয়া ফেলিবে, অথচ সেবা নিত্যসঙ্গীত থাকিবে; এই পবন সেবার তত্ত্ব, হেরাম, আমাকে বুঝাইয়া বল। তোমার কাছে দাদু সেবাব এই রহস্যই জিজ্ঞাসা করিতেছে।]

আমাতে তাঁর আনন্দ (“রাম”), তাই তিনি সেবক হইয়াছেন। অর্থগুণত সেবা সেই এক রসের প্রকাশ, সেই জন্মই তো তিনি সেবক।

দাদু জ্বলগ রাম হৈ তবলগ সেবক হোই।

অর্থগুণত সেবা এক বস দাদু সেবক নোই।

এই সেবাতে, এই প্রেমুতে যদি মিলিতে পাবো তবেই তাঁর নিত্য সাহচর্য পাইবে। অদ্বৈত-যোগ সত্য হইবে। এবং সৃষ্টিবর্ষে তাঁর পাশে পাশে তোমার সৃষ্টিও চলিতে থাকিবে। যখন তুমি তোমার সাধনায় সকল পরিবার দুঃখিয়া দিয়া সেবক হইবে তখন সেই মহাসেবক আপনিই তোমার বশ হইবেন এবং তোমার “দরবারে” আসিয়া তিনি তোমার কাছে উপস্থিত থাকিবেন। সেই রসের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তুমি ত দীন নও। তুমি সেখানে কিছু চাও না বলিয়াই তোমার ঐশ্বর্য বাজার সমান এবং তোমার সেবার ক্ষেত্রটি বাজ-দরবারের মতই ঐশ্বর্যশালী।

“সেবক সাক্ষী বস কিয়া সঁউপা সব পরিবার।

তব সাহিব সেবা করই সেবককে দরবার ॥”

এতবড় কথা ভাবিতে তোমার ভয় হয়? ভয় নাই। তোমার যা আছে তাই দিয়াই তোমার সেবা। তোমার যা আছে তাতেই তোমার রাজ-ঐশ্বর্য। লক্ষ্য ছোট করিও না, প্রেমকে বড় রাখ। আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করো, তবেই তুমি তাঁর সমদক্ষ্য হইবে, তাঁর “সরীথা” (সঙ্গ) হইবে। তুমি বৃহৎ হইয়া তাঁর সমান হইবে না, তাঁর সমদক্ষ্য হইয়া তাঁর সমান হইবে।

“সেবক সেবা করি ডরই হমতে কছ ন হোই।

তু হৈ তৈসী বন্দগী করি তঁর ন জানই কোই ॥”

[সে সেবক, ‘ভয় পাইতেছ? তোমার দ্বারা কিছুই হইবে না মনে করিতেছ? তুমি যতটুকু, ততটুকুই তোমার প্রণতি হউক, তোমার সন্তার সমানে সমান তোমার প্রণতিটি হউক, আর কিছুই দেখিবার দরকার নাই।]

তুমিই তাঁর সমান হইবে। তাঁর সমান হইয়া সেবা না কবিলে সুখ নাই। তাঁর সঙ্গী হইয়া সেবাই একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত, তাঁর সঙ্গী হইয়া সেবাই পরম আনন্দ।

সাক্ষী সরীথা সুমিবন কীজন্ত সাক্ষী সরীথা গারুই।

সাক্ষী সরীথা সেবা কীজন্ত তব দেবক সুখ পারই ॥

[স্বামীসঙ্গ সঙ্গ সঙ্গ তাঁর সমানে সমান সাধনা কব, তবেই তাঁর গানের সঙ্গ তোমার গান মিলিবে। তাঁর সঙ্গ সঙ্গ সমানে সমান সেবা কর, তবেই আনন্দ পাইবে।]

কারণ তাঁর সুরে সুর মিলানই সাধকের চরম লক্ষ্য, চরম সাধনা। সেই পরম আনন্দ তোমার আনন্দ মিলিবে যদি সেবায় সৃষ্টিতে প্রেমে রসে অসীম হইয়া তাঁর সঙ্গ মিলিতে পার। তবে তুমি আপনাকে লইয়া আর প্রকাশ করিতে চাহিবে না, আপনাকে তাঁর মত সেবায় প্রেমে গলাইয়া দিবে। তবেই সেবায় কৰ্মে নিত্য নূতন সৃষ্টিতে নিত্য নিয়ত তোমার স্বামীর সঙ্গ পাইবে। এইখানেই তোমার পত্নীত্ব, সহধর্মিণীত্ব। নহিলে দাসী হইয়া একটু একটু টুকুণা টুকুরো কাজ করিয়া বিছু লাভ মিলিতে পারে বটে, কিন্তু মানবজন্মের এত-বড় অপমান আর নাই।

শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন



পাখা পাখা

চিত্রকর শিবমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

U. Ray & Sons, Calcutta

রাজপথ

[১২]

বস্ত্র পরিবর্তন করিবার নামে জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্ন করিয়া স্মিত্রা একেবারে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইল। প্রমদাচরণ তখন নিজ কক্ষে একটা আরাম-কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া ছিলেন। পদশব্দে চাহিয়া স্মিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন—
“কি মা ? কিছু বলবার আছে ?”

স্মিত্রা পিতার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—“বাবা, আজ আমাকে একটা খদ্দেরের সূট উপহার দেবে ? দাম বেশী নয় বাবা ; শাড়ী আর ব্লাউস্, দুইয়ে টাকা সাত-আটের মধ্যে হবে।”

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন,—“টাকার জ্ঞে কিছু ত নয়, কিন্তু তোমার মা খদ্দেরের সূট পছন্দ করবেন কি ?”

স্মিত্রা কহিল,—“মা নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছা হয়েছে বাবা ! খদ্দেরের শাড়ী পবা কি এমনই অপরাধ, যে, তোমাকে এ অস্বরোধ করা আমার অন্তায় হচ্ছে ? তা যদি হয় তা হ'লে অবশ্য আমি অস্বরোধ করব না।”

প্রমদাচরণ মৃদু হাসিয়া স্নেহভরে কহিলেন,—“এ তোমার একটুও অন্তায় অস্বরোধ নয় স্মিত্রা। নিজের দেশের তৈরী কাপড় পরলে যদি অন্তায় হয় তা হ'লে পরের দেশের কাপড় পরার মত পাপ আর কি হ'তে পারে ? কিন্তু তোমার মা ও-সব বিষয়ে বিচার করে' ত কিছু দেখতে চান না—এই হয়েছে বিপদ !” বলিয়া প্রমদাচরণ চিন্তা করিতে লাগিল।

স্মিত্রা ক্ষণকাল নীববে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল,—
“তা হ'লে না হয় থাক, বাবা। খদ্দেরের কাপড় এনে বাড়ীতে যদি একটা অশাস্তি হয় তা হ'লে কাজ নেই ; থাক।”

প্রমদাচরণ মনে-মনে জয়ন্তীর সহিত কাল্পনিক বিতর্ক করিতেছিলেন। খদ্দের ব্যবহারে সপক্ষে প্রমদা-

চরণের প্রযুক্ত সমস্ত যুক্তি ও তর্ক জয়ন্তী যতই অবহেলার সহিত অগ্রাহ্য করিতেছিলেন প্রমদাচরণ ততই অবুঝ জয়ন্তীর প্রতি মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময়ে স্মিত্রার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“না, না, থাকবে কেন ?—এ যে জয়ন্তীর অন্তায় কথা !”

জয়ন্তীর প্রতি এই অকারণ ক্রোধ প্রকাশ হইতে দেখিয়া স্মিত্রা হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—“মা ত এখনও কোনো কথা বলেননি বাবা !”

প্রমদাচরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাসি মুখে কহিলেন,—
“বলেন নি, কিন্তু আমি ত তাকে জানি, নিশ্চয়ই বলবেন। যা হোক সে পরের কথা পরে হবে, কিন্তু, রাত হ'য়ে গেল, এখন কি খদ্দেরের সূট পাওয়া যাবে ?”

স্মিত্রা কহিল,—“তা পাওয়া যাবে। এখন পূজার সময়ে অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। আমাদের বাড়ীর কাছেই কলেজ-স্ট্রীট্ মার্কেটে অনেক দোকানে খদ্দেরের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। দশ পনের মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।”

তখন প্রমদাচরণ তাঁহার বাজার-সরকার বিপিনকে ডাকাইয়া খদ্দেরের শাড়ী ও ব্লাউস্ কিনিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

স্মিত্রা কহিল,—“খুব শীঘ্র বিপিন-বাবু, পনের মিনিটের মধ্যে আপনার আসা চাই। আর দেখুন, জমি সাদা হবে ; নক্সা-করা বা রং-করা হ'লে চলবে না। দেখে' যেন জিনিসটা খদ্দের বলে'ই মনে হয়, বেনারসী বা অন্য কোনো রকম কাপড় বলে' তুল হ'লে চলবে না।”

বিপিন প্রশ্ন করিলে প্রমদাচরণ একবার স্মিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার পর অন্তদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন,—“সুরেশ্বর কি এসেছেন স্মিত্রা ?”

খদ্দেরের প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই সুরেশ্বরের বিষয়ে এই অনুসন্ধানে স্মিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। খদ্দেরের প্রসঙ্গ হইতেই সুরেশ্বরকে প্রমদাচরণের মনে

পড়িয়াছে এবং তাহার খন্দর পরিবার আগ্রহের সহিত প্রমদাচরণ স্বরেশ্বরকে কোনও প্রকারে যুক্ত মনে করিতেছেন এই চেতনা স্মিত্রার মনে অপরিহার্য সঙ্কোচ লইয়া আসিল। সে মুঢ়কণ্ঠে কহিল,—“হ্যাঁ, এসেছেন।” তাহার পর আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্ত অপেক্ষা না করিয়া দীরে দীরে প্রস্থান করিল।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি শুনিয়া প্রমদাচরণ ঈষৎ চিন্তাগ্রিত হইয়া উঠিলেন। স্বরেশ্বরের আসিবারই কথা ছিল, তন্মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর কিছুই ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কাণ্ড-কারণেব যোগ কল্পনা করিয়া পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিবার পর সংশয়িত উত্তর লাভ করিয়া তাঁহার কল্পিত আশঙ্কা যেন ভিত্তি গাড়িয়া বসিল। মনে হইল ঈশান-কোণে এক খণ্ড মেঘেব মত সংসারে এই খন্দর এবং স্বরেশ্বরের আবির্ভাব শুভচিহ্ন নহে, হয়ত একটা অদূরবর্তী ঝটিকারই সূচনা।

বিপিনের অপেক্ষায় স্মিত্রা নিছ কক্ষে গিয়া বসিল। প্রমদাচরণের প্রশ্নে তাহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের কপে যাহা উপস্থিত হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিরক্তি ও অসুস্থতাপের আকার ধারণ করিতে লাগিল। জননীৰ অসুস্থতা লঙ্ঘন করিয়া খন্দর কিনিয়া পরা স্বরেশ্বরের প্রভাবের নিকট এক-প্রকারের বশুতা স্বীকার হইতেছে মনে হইবামাত্র তাহার অর্ধীৰ ভাব-প্রবণ চিত্ত সহসা স্বরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, এত অল্পকালবে উত্তেজিত হইয়া খন্দরবেব ব্যবস্থা করা দুৰ্দলতা প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং সে যখন সকলেব বিস্ময়োৎপাদন করিয়া খন্দরে আচ্ছাদিত হইয়া ড্রয়িং-রুমে গিয়া দাঁড়াইবে তখন কিরূপে স্বরেশ্বরের বিজয়দীপ মুখে সন্তোষেব নিঃশব্দ করণ মুহূ হান্য ফুটিয়া উঠিবে মনে হইবা মাত্র কল্পিত দুৰ্দলতাকে অতিক্রম করিবার সঙ্কল্পে সে আল্‌মাবী খুলিয়া তাহার মত্‌ক্রেপের সূটটি বাহিব করিল, এবং কিছুমাত্র স্থিরা চিন্তা বা বিলম্ব না করিয়া তাহা পরিধান করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিজের সজ্জিত আকৃতি একবার দেখিয়া লইবার জন্ত যখন সে দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পবিচ্ছদের অহেতুক আড়ম্বর দেখিয়া

বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার উদ্ধত চিত্ত একেবারে শ্লথ হইয়া পড়িল; মনে হইল, নিজগৃহে পারিবারিক সন্মিলনে বেশভূষার এতটা আতিশয্য ও পারিপাট্য নিতান্তই সুরূচি-বিরুদ্ধ হইতেছে। তখন সে দীরে দীরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; গভীর-চিন্তিত মনে কথাটাকে চতুর্দিক হইতে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

স্বরেশ্বরের দিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া এবার তাহার মনে হইল, যে, এই খন্দর কিনিয়া পরিবার মূলে নিমন্ত্রিত স্বরেশ্বরের প্রতি শিষ্টাচার ভিন্ন অণ্ড কোন কথাই নাই। স্বরেশ্বর একজন গোঁড়া স্বদেশী, বহু যত্নে প্রস্তুত করাইয়া স্বদেশী রুমাল তাহাকে উপহার দিয়াছে, সে আজ তাহাদের গৃহে অভ্যাগত নিমন্ত্রিত, অতএব বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার চিত্তে আঘাত না দিয়া স্বদেশী বস্ত্র পরিয়া তাহাকে একটু সন্তুষ্ট কবা সহজ ভদ্রতা-প্রকাশ ভিন্ন অণ্ড কিছুই নহে। কোথায়ই বা তাহার মধ্যে স্বরেশ্বরের প্রভাব-বিস্তার আর কোথায়ই বা তাহার মধ্যে তাহার বশুতা-স্বীকাৰ।

তাহার পব মনে পড়িল পূর্কদিনে সিঁড়ির প্রান্তে স্বরেশ্বরের সহিত তাহার কথোপকথন, এবং তৎকালে স্বরেশ্বরের প্রসন্ন ভূপ্ত মূর্তি। স্মিত্রা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল তন্মধ্যে স্বরেশ্বরের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন দর্প ও দম্ভেব লেশ মাত্র ছিল না। সেই অল্প-কালবে হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্র আজ তাহান সমগ দেহ খন্দর-পরিবৃত দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এমন কথাও অস্পষ্ট আকারে তাহার মনের কোলে দীরে দীরে দেখা দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল,—“মেজ্‌দিদিমণি, সরকার-মশায় এই বাণ্ডিলটা দিলেন।”

স্মিত্রা বাণ্ডিলটা লইয়া খুলিয়া দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া তাহার সহজ সুন্দর বেশ দেখিয়া প্রীত হইল। তৎপরে মত্‌ক্রেপের সূট আল্‌মারীর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া ক্ষিপ্ৰপদে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার

পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রমদাচরণ দুই হস্তের মধ্যে স্মিত্রার মস্তক ধারণ করিয়া সর্কাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করিলেন।

স্মিত্রা কহিল,—“বাবা, আমি ড্রয়িংক্রমে চললাম; তুমিও এস, দেৱী কোরো না। সকলেই বোধ হয় এসেছেন।” বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

স্মিত্রা প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ কিছুকাল অশ্রু-মনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মনে পড়িল যে জয়ন্তী এবং অশ্রু সাকলের আক্রমণ হইতে স্মিত্রাকে রক্ষা করিতে হইবে। একথা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি ড্রয়িংক্রমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

[১৩]

নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্মিত্রা ড্রয়িংক্রমে প্রবেশ করিলে তাহাকে দেখিয়া জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের বিস্ময়ের কারণ সজ্জনীকান্ত প্রথমে বুঝিতে পাবে নাই, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাব সজ্জাব প্রতি লক্ষ্য পড়ায় উঠিয়া আসিয়া স্মিত্রাব বস্ত্রাংশ পরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল,—“তাই ত, এ যে দেখছি খন্দর!”

স্মিত্রা হাসিমুখে বলিল,—“হ্যাঁ, দেশী কাপড়।”

সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজ্জনীকান্ত কহিল,—“এও তোমার তাঁতে বোনা নাকি হে?”

সুরেশ্বর কোনও উত্তর দিবার পূর্বে স্মিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল,—“না না, এ গুঁর তাঁতে বোনা হবে কেন? এ বাবা আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন।”

স্মিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তী বিস্ময় ও বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—“তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছেন? কখন তিনি আনলেন?—স্মার কখনই বা তোমাকে দিলেন?”

স্মিত্রা একবার মনে করিল এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এ প্রশ্ন এইখানেই বন্ধ করিবে, কিন্তু প্রমদাচরণ আসিলে যাহাতে কথাটা নূতন করিয়া উখিত না হয় তদুদ্দেশ্যে সে কথাটা খুলিয়াই বলিল। কহিল,—“এখান থেকে গিয়ে একটা খন্দরের সূট উপহারের জন্ত আমি বাবাকে অসুরোধ করি। তাইতে বাবা এই সূট আনিয়া দিয়েছেন।”

স্মিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চিত্ত জলিয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল অবাধ্য দুর্ভিনীত কন্যাকে তখনই বিশেষভাবে তিরস্কার করেন, কিন্তু অতগুলি ব্যক্তির সম্মুখে, বিশেষতঃ বিমানবিহারীর সন্নিধানে, একটা কলহের দৃশ্য করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, উদ্যত ক্রোধকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিলেন,—“আমার কথাটাকে এর চেয়ে ভাল করে অমান্য করবার আর কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না বুঝি?”

জয়ন্তীর নিকট হইতে তিরস্কার সহ্য করিবার জন্ত স্মিত্রা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই অভিমান-পীড়িত গভীর বাণীর জন্ত সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই জননী এই আর্ন্ত বাক্যের উত্তরে সে আর্ন্ত হইয়া কহিল,—“তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনি তোমার আদেশ পালন কবে' আসুছি; কিন্তু আজকের দিনে এ নূতন কাপড়ই বা মন্দ কি?”

জয়ন্তী ফিকা হাসি হাসিয়া কহিলেন—“তাই ভাল; আব গরু মেরে জুতো দান কবে' কাজ নেই।”

সজ্জনীকান্ত সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—“তোমার তিল তাল হ'লে দাঁড়াল সুরেশ্বর!”

সুরেশ্বর মূঢ় হাসিয়া কহিল,—“তা হ'লে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার বলতে হবে! তিল তাল হওয়া অনৈসর্গিক ঘটনা!”

সুরেশ্বরের মস্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া সজ্জনীকান্ত কহিল,—“একটি দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়েছ, তা থেকে ক্রমশঃ লক্ষাকাণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।”

সুরেশ্বর তেমনি অবিচলিতভাবে বলিল,—“শুধু দেশলাইয়ের কাঠি থেকে ত লক্ষাকাণ্ড হয় না, কাঠিটি এমন জায়গায় পড়া চাই যেখানে জলে' ওঠবার উপযোগী মশলা আছে।”

সজ্জনীকান্ত ক্ষণকাল সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—“মশলার দরকার কি? তুমি ত জলস্ত কাঠি ফেলেছ হে!”

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল,—“তা হ'লেও জলে ত ফেলিনি?”

বিমানবিহারীর চিত্ত সুরেশ্বরের প্রতি এমনই একটু বিরূপ হইয়া ছিল ; তাহার উপর স্মিত্রার খদ্দর পরিধান ও তৎসংক্রান্ত সুরেশ্বরের এই মোল্লাস কথোপকথন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ বিরক্তিকটু কণ্ঠে কহিল,—“কিন্তু দেশলায়ের কাঠি জলে না পড়ে’ বাকুদের স্তূপে পড়লে কি পরমার্থ লাভ হয় তা ত বুঝতে পারছিনে সুরেশ্বর-বাবু !”

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে বলিল,—“নিভে যায় না। দেশলায়ের কাঠি পক্ষে জলে পড়ার মত দুর্গতি আর নেই তা মানেন ত ?”

বিমান একটু উদ্বেজনার সহিত কহিল,—“কিন্তু ত ই বলে’ কি বাকুদের স্তূপে পড়াই তার চরম সার্থকতা ?”

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল,—“নয় ? যার কর্ম জ্বালানো আর যার ধর্ম জ্বলা, তাদের সংযোগই ত পরম্পরের সার্থকতা। আগুন া থাকলে বাকুদের সার্থকতাই থাকত না। ধরুন আপনি একজন গুরু, আপনার জ্ঞানের শিখাটি তা হ’লেই সার্থক হয়, যদি, আপনার শিষ্যের মধ্যে সেই শিখাটি থেকে ধরিয়ে নেবার মত কোনো দাহ্য পদার্থ থাকে।

বিমান এ কথা আর কোনও উত্তর দিবার পূর্বেই জয়ন্তী কহিলেন,—“না, না, বিমান, তুমি একজন গবমেণ্ট-অফিসার, এ-রকম করে’ আগুন আর বাকুদের কথা নিয়ে তোমার থাকা উচিত নয়। তোমার যতটা সাবধান হ’য়ে চলা দরকার তার চেয়ে তুমি অনেক অসাবধানী।”

কণ্ঠাকে প্রহার করিয়া বধুকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা বুদ্ধিতে সুরেশ্বরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাহার চিত্তের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের যে বিপুল প্রবাহ বহিতেছিল তন্মধ্যে এইটুকু মালিগা কিছুমাত্র রেখাপাত করিল না। তাহার মনে হইতেছিল সে আজ সফল-কাম, সে আজ বিজয়ী, তাই পরাজিতের কটুক্তিকে জয়লাভের অপরিহার্য অংশ বিবেচনা করিয়া সে অতি সহজেই তাহা উপেক্ষা করিল। বিমান কোনও কথা কহিবার পূর্বেই সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল,—“সত্যি ! আপনি আমার বন্ধু, তা ছাড়াও যে আপনার অন্যরকম সন্তা আছে তা প্রায়ই ভুলে’ যাই।”

বিমান হাসিয়া কহিল,—“সে সন্তায় আমি কি আপনার শত্রু ?”

সুরেশ্বর কোন উত্তর দিবার পূর্বেই প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রমদাচরণ আসিবার পরে প্রমত্তক্রমে খদ্দরের কথাটা পুনরায় উঠিল। প্রমদাচরণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে আসিয়া জয়ন্তীর বিদ্রোহমূর্তি দেখিবেন এবং অবশ্যস্তাবী সংগ্রামেব বিরুদ্ধে প্রয়োগেব জ্ঞান মনে মনে কতকগুলি যুক্তি এবং তর্ক স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আন্দোলনকালে জয়ন্তীর শান্ত স্বক ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মানসিক ভাব জয়ন্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। জয়ন্তীর সৌজন্তের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্তই তিনি খদ্দরের প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন গ্রহণ করিলেন।

তখন বিমানের তর্কেব উত্তরে সুরেশ্বর বলিতেছিল,—“কিন্তু যাই বলুন, খদ্দরের প্রতি গবমেণ্টেব বিরুদ্ধাচরণ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।”

বিমান কহিল,—“যায়। গঙ্গা আর গঙ্গাজল হিন্দু-মাত্রেই পবিত্র জিনিস। কিন্তু তাই বলে’ কোনো হিন্দুই ধরের মধ্যে গঙ্গাজলের বণ্ডা কিছুতেই পছন্দ করে না। খদ্দর আসলে মন্দ জিনিস কোন মতেই নয় ; গবমেণ্ট ও তা মনে করেন না। কিন্তু খদ্দরকে যদি গবমেণ্টকে বিপন্ন করবার একটা উপায় করে’ তোলা হয়, তা হ’লে, গবমেণ্ট খদ্দরকে ঠিক তেমনি করে’ রোধ করতে পারেন যেমন করে’ হিন্দু গঙ্গাজলের বণ্ডাকে রোধ করে।”

বিমানের যুক্তি পছন্দ করিয়া প্রমদাচরণ খুসী হইয়া হুলিয়া উঠিলেন, তাহার পর কহিলেন,—“ঠিক কথা, ভাল জিনিসের ক্রিয়া যদি মন্দ হ’য়ে ওঠে তা হ’লে সে জিনিসটাকে আর ভাল বলা চলে না। সে হিসাবে গবমেণ্টের খদ্দর-বিদ্বেষ অণ্যায় বলা যায় না।”

কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে অভীষ্ট ফল ফলিল না। এতক্ষণ জয়ন্তী বিরক্ত হইয়া নির্দাক ছিলেন, কিন্তু অপরাধী স্বামীর মুখে এই বিপরীত উক্তি শুনিয়া তাহার অসহ্য বোধ হইল। ঈষৎ ত্যক্তভরে কহিলেন,—

“কিন্তু তা হ’লে কোন্ হিসাবে একজন গবমেণ্ট অফিসারের পক্ষে খদ্দর ব্যবহার করা অশাস্য নয় তা’ ত বুঝতে পারছিলেন!”

উৎসাহের মুখে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া প্রমদাচরণ একেবারে সঙ্কচিত হইয়া গেলেন। কি বলিবেন প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না, তাহার পর মুছ সঙ্কোচ-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—“না, না, কথাটার এক দিক্ দেখলেই চলবে না ত! এর মধ্যে যে অনেক কথা আছে।”

কিন্তু এ কথা জয়ন্তীর মনে কিছুমাত্র কৌতূহল সঞ্চার করিল না। এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা না করিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—“বিমান তোমাব জন্মে উপহার এনেছেন; তেপায়ার ওপব রয়েছে; খুলে’ দেখ।”

জননীর্ নির্দেশে সুমিত্রা চাহিয়া দেখিল টেবিল-হার্মোনিয়ামের পাশ্বে আব্লুস-কাঠের ত্রিপদের উপর রঙীন কার্ডবোর্ডের একটি স্বদৃশ্য বাক্স রহিয়াছে। বাক্সটি লইয়া উন্মোচিত করিয়া সুমিত্রা দেখিল তন্মধ্যে একটি উজ্জল পালিশ-করা রৌপ্য-নির্মিত বাক্স; তাহার পর সে বাক্সটি উন্মোচিত করিয়া দেখিল তিন প্রকার এসেম্লে পূর্ণ রূপার তারের বন্ধনীতে আবদ্ধ পলকাটা কাচের তিনটি বড় বড় শিশি।

আসিবার সময়ে এই সামগ্রীটি সঙ্গে আনিয়া বিমান সকলের অগোচরে ত্রিপদেব উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু কিছু পবে তাহা সজ্জনীকান্তব দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে তাহার তথ্য জানিতে পারে। সুমিত্রার উপহার সুমিত্রা আসিয়া প্রথম খুলিবে, তাই বাক্সের মধ্যে কি আছে তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিত না।

একটি শিশি খুলিয়া আত্মাণ লইয়া সুমিত্রা মুছস্বরে বলিল,—“চমৎকার গন্ধ!” তাহার পর বিমানের দিকে একবার চাহিয়া মুছস্বিতমুখে তাহাকে নিঃশব্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে লাগিল।

সজ্জনীকান্ত ব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইয়া কহিল,—“দাও, দাও, আমরা দেখি। তুমি খুলবে বলে’ আমরা ত এ-পর্য্যন্ত জানিও না ফে কি পদার্থ ওর মধ্যে আছে।”

বাক্সটি হস্তে লইয়া সজ্জনীকান্ত একে একে তিনটি শিশিরই আত্মাণ লইয়া দেখিল। তাহার পর বাক্সের ঢাকার উপর লেবেল পড়িয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—“তাই ত বলি এ কি করে’ হ’ল! স্প্রীং টিপ্লে আটকে যায় না, বাক্সের পালিশ চারদিকে চার রকমের নয়, তিনটি শিশিই সমান এক ছাঁচের, সমস্ত জিনিসটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! এ কি করে’ হয়! এ যে দেখছি সমুদ্র-পারের জিনিস, একেবারে খাস মেড্ ইন্ ইংল্যান্ড!” তাহার পর কাগজের বাক্সের একদিকে দেখিয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,—“ঈশ! এ যে দামী জিনিস দেখছি, পয়ষটি টাকা পনের আনা!” বলিয়া বিস্ময়বিমূঢ়মুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়ন্তী গভীর ভঙ্গীর সহিত কহিলেন,—“উনি যখন যা দেন, দামী জিনিসই দেন।” তাহার পর বিমানের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—“এতটা হাত-খোলা কিন্তু ভাল নয় বিমান।”

বিমান এ কথাই কোনও উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিল। সুবেশ্বর তিনখানি রুমাল উপহার দিয়াছে, মূল্য হিসাবে তাহা বিমানের উপহারের নিকট নিশ্চয়ই নগণ্য, অতএব সুবেশ্বরের সম্মুখে এ কথাটা এমন করিয়া বলা উচিত হয় নাই। অত্র দিন হইলে বিমান কোন-না-কোনপ্রকারে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিত। কিন্তু আজ তাহার মনটা এমন বিমুখ হইয়া ছিল যে জয়ন্তীর আঘাত হইতে সুবেশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্ম তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না।

কিন্তু আগ্রহ না হউক, সুবেশ্বরকে রক্ষা করিবার আজ কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাহার মনের মধ্যে সঞ্জাত নিবিড় আনন্দ আঘাতের সকল পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। লটারী টিকিটে দশ টাকা ব্যয় করিয়া লক্ষ টাকা পাওয়ার উল্লাসের মত একটা বিপুল উল্লাস তাহার চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। সজ্জনীকান্তের কথাটা তাহার বারম্বার মনে পড়িতেছিল—বাস্তবিকই তিল তাল হইয়াছে!

সমগ্র ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে একটি

মাত্র নারীর বিমুগ্ধ চিত্তকে প্রকৃত পথে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনে হইতেছিল তাহার সব সাধনা সফল হইয়াছে; তাহার কার্পাস চরকা সূতা তাঁত কিছুই বিফল হয় নাই!

কিন্তু সে কিছুমাত্র জানিত না যে বৈদ্যাতিকবিপ্রবাহত কম্পাসের কাঁটার মত স্মিত্রার চকিত-চেতন চিত্ত ইহারই মধ্যে অন্ধ দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সজনীকান্ত এবং বিমানের সহিত সুরেশ্বরের কথোপকথনেব সময় সুরেশ্বরের উৎসাহ ও উল্লাস উপলব্ধি করিয়া স্মিত্রার মন ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সুরেশ্বরের কৰ্ম জ্বালানো এবং স্মিত্রার ধর্ম জ্বলা এইরূপ একটা কথা যখন সুরেশ্বরের প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন স্মিত্রার মন সুরেশ্বরের দম্ব দেখিয়া জলিয়া উঠিবারই উপক্রম করিয়াছিল, শুধু স্থান এবং পাত্রের কথা স্মরণ করিয়া সে নিজকে দমন করিতে পারিয়াছিল।

কয়েকজন দেখাব পন বিমানবিহারীর উপহাস যখন স্মিত্রার হস্তে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত কম্পাসের উত্যক্ত কাঁটারই মত ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছিল। সে কটিদেশ হইতে রুমাল বাহির করিয়া একটা শিশি হইতে পানিকটা এসেস ঢালিয়া লইয়া ঘন-ঘন আশ্রয় লইতে লাগিল।

সজনীকান্ত কহিল,—“ও রুমালটা সুরেশ্বরের দেওয়া রুমাল না কি?”

সজনীকান্ত প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই স্মিত্রা কহিল,—“হ্যাঁ।”

সুরমা হাসিয়া বলিল,—“বেশ হয়েছে ত! দেশী রুমালে বিলাতী এসেস্।”

প্রমদাচরণ ঈষৎ ছলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—“এটা কিন্তু একটা শুভলক্ষণের মত মনে করা যেতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্বের সঙ্গে যেদিন বিলাতের সার পদার্থ মিলিত হবে সেদিন বাস্তবিকই শুভদিন হবে।” বলিয়া তিনি পুনর্বার ছলিতে লাগিলেন।

জয়ন্তী ঈষৎ ব্যঙ্গভরে বলিলেন,—“সে শুভদিনেব এখনও অনেকদিন দেরী আছে।”

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—“আমাবও মনে হয়

অনেক দেরী আছে। তার আগে ভারতবর্ষের বিশেষত্বকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা না হ'লে যা হবে তা মিলনও হবে না, শুভও হবে না।”

বিমান কহিল,—“তা হ'লে কি আপনার দেশী রুমাল আর আমার বিলাতী এসেসের এই যোগটাকে আপনি অশুভ বলতে চাচ্ছেন?”

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—“অশুভ বলি আর নাই বলি, কিন্তু এ যোগটাকে মিলন বলতে পারিনে, যখন দুটোর মধ্যে একটা ভাবগত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু এ-সব তর্ক আজকের মত থাক, এখন এ ঠু গান হোক।” বলিয়া স্মিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, “আমরা সকলে আপনার গানের জগ্গেই অপেক্ষা করে' ছিলাম। আপনি দয়া করে' একটু গান করুন।”

গান হইল, কিন্তু জমিল না। বেসুবাব আবহাওয়ার মধ্যে সর্ব কোনপ্রকাবেই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না।

আহারে বসিয়া সজনীকান্ত কহিল, “ওহে সুরেশ্বর, কুম্ভের ছোকাটা তোমার ত চলবে না।”

সুরেশ্বর সর্কৌতুহলে বলিল,—“কেন?”

সজনীকান্ত হাসিয়া কহিল,—“বিলাতী কুম্ভে যে! তোমরা ত বিলাতী জিনিস সব বয়কট কবেছ?”

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বিমলা মৃদুস্বরে কহিল, ‘তা হ'লে চাটনিটাও চলবে না; সেটাও বিলাতী আমড়া দিয়ে হয়েছে।’

পুনরায় একটা হাসির হিলোল বহিয়া গেল।

সুরেশ্বর হাসিমুখে কহিল,—“কতকগুলি বিলাতী জিনিস নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে' আমরা বর্জন করিনি। এ দুটিকেও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে' নেওয়া গেল।”

আহারান্তে বিদায়কালে স্মিত্রাকে একান্তে পাইয়া সুরেশ্বর কহিল,—“বড় খুসী হ'য়ে আজ যাচ্ছি।”

স্মিত্রা আরক্ত-মুখে কহিল,—“কেন? আমাব এই খদ্বেব কাপড় পবা দেখে নাকি?”

সুরেশ্বর পবিত্রমুখে কহিল,—“হ্যাঁ, ঠিক সেই বারণে।”

স্মিত্রা কঠিনভাবে কহিল,—“কিন্তু এব মধ্যে খুসী

হবার কিছু নেই ত! এ আমার একেবারেই খামখেয়ালী ব্যাপার। আর হয়ত কোন দিনই আমাকে খন্দর পরতে দেখতে পাবেন না।”

স্বরেশ্বর তেমনি প্রফুল্লমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল,—“তাবলতে পারিনে। কিন্তু আজ যে আপনি খন্দর পরেছেন, আর ভবিষ্যতের বিষয়ে যে ‘হয়ত’ কথাটা ব্যবহার করলেন, এই দুটো জিনিসই আমাকে খসী করে রাখবে। তা ছাড়া দেখুন, খামখেয়ালীর মধ্যেও একটা খেয়াল আছে। সেই সদয় খেয়ালটুকুর জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চললাম।”

বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া স্বরেশ্বর প্রস্থান করিল। গতিহারা হইয়া স্মিত্রা ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে ধীবে ধীবে প্রস্থান করিল।

বিদায়ের পূর্বে বিমানবিহারীরও স্মিত্রাকে একান্তে

পাইবার সুযোগ ঘটিল। রুষ্ঠ-স্মিতমুখে বিমানবিহারী কহিল,—“বিলিতী কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্বে বলে’ও স্থির করছ নাকি?”

স্মিত্রা আবক্তমুখে কহিল,—“এখনও তা স্থির করিনি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।”

মুখখানা কালো করিয়া বিমান কহিল,—“স্বরেশ্বর-বাবু সে বিষয়ে কোনো উপদেশ দিয়ে যাননি?”

স্মিত্রা কঠিনস্বরে কহিল,—“এপ্যাস্তও দেননি; পরে হয়ত দিতে পারেন।”

সে-রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত বিনিস্ত হইয়া স্মিত্রা অসংলগ্নভাবে বহু বিষয়ে চিন্তা করিল। তাহার ব্লাউসটা খুলিয়া রাখিয়া খন্দরের শাড়ী পরিয়াই শয়ন করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মুখোস-পরা নাচের মজলিস

(আলেকজান্দ্র দূম)

আমি বলিয়াছিলাম, আমি কাহাকেও দেখা দিই না, তবু আমাব এক বন্ধু বলপূর্বক আমাব ঘবে প্রবেশ করিল। আমার ভৃত্য খবর দিল,—গাণ্ডনি ব। আমাব চাকরের উর্দি পোষাকেব পিছনে, একটা কালো রং-এব বড়-কোঠা দেখিতে পাইলাম। খুব সম্ভব ঐ বড় কোঠাখানী ব্যক্তিও আমাব ড্রেসিং-গোনের একটা আঁচলা দেখিতে পাঠিয়াছিল। আমার পক্ষে লুকাইয়া থাকা অসম্ভব। আমি টেচাইয়া বলিলামঃ “আচ্ছা ঘরে প্রবেশ কব্তে দেও।” মনে মনে বলিলাম, “লোকটা জাহান্নমে যাক।”

যখন কোন কাজে ব্যাপৃত থাকা যায়, তখন শুধু কোন স্ত্রীলোকই তাহাতে ব্যাপাত দিয়া পার পাইতে পারে, কেন না, তোমার কাজে হয়ত তাহার আন্তরিক একটা দরদ আছে।

আমি তাই, একটু বিবক্তির ভাবে, সেই বন্ধুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাকে এমন ফাঁকাশে ও চিন্তা-বিস্ত্র দেখিলাম, যে, প্রথমেই এই কথাগুলি আমার মুখ দিয়া বাহির হইলঃ—

“ব্যাপারখানা কি? তোমার হয়েছে কি?”

সে বলিল—“বোসো, আমি একটু ঠাঁপ হেড়ে নিই। এখন সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে বল্ছি। হয়ত সেটা স্বপ্ন, কিংবা হয়ত আমি পাগল হয়েছি।”

সে এই কথা বলিয়া একটা আগ্রাস-কেদারায় বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মাথা চাপিয়া রহিল। আমি আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বসিলাম। তাহার চুল হস্ত রুটি জন্ম টস টস বাধিয়া

গড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাব জুতা, তাহাব ঠাটু, এবং তাহার পাজামীর নিয়মদেশ কাদাষ গাচ্ছন্ন। আমি জানলার কাছে গেলাম। দেখিলাম—দবজাব কাছে তাহার ভৃত্য ও তাহার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ইহা হইতে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সে আমার বিষয়টা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—“আমি ‘পেয়ারলাশেজের’ গোরস্থানে গিয়েছিলাম।”

“সকাল বেলা দশটার সময়।”

“৭টার সময় গিয়েছিলাম—একটা লক্ষ্মীছাড়া মুখোস-নাচের মজলিসে!”

মুখোস-নাচের মজলিস ও পেয়ার-লাশেজ এই উভয়ের মধ্যে কি নিকট সংঘর্ষ আমি তা কিছুই ভাবিয়া পাঠিলাম না। আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম। “চিম্নী”-স্থানের দিকে পিছন করিয়া, স্পেনবাসী-মূলত নির্দীক্য ভাব ও দৈব্য সহকারে আঙ্গুলের ভিত্তর দিয়া একটা সিগারেট পাকাইতে লাগিলাম।

তিনি আসল কথাটা বলতে আরম্ভ করিলে, আমি বলিলাম—“এই-সব কথা আমি পূর্ব মনোযোগ দিয়েই শুনে থাকি।”

ধম্বনাদের উদ্ভিত করিয়া তিনি আমাব হাতটা ঠেলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু গাভার আমি সিগারেট জ্বালাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি আমাকে নিবারণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেনঃ—

“আলেকজান্দ্র, দোহাই তোমাব, আমাব কথাটা মন দিয়ে শোনো।”

“কিন্তু তুমি ত এখানে নোয়া ঘন্টা কাল এসেছ—কে আমাকে ত এখানে কিছুই বললে না।”

“দেখ, ঘন্টাটা ভারী অদ্ভুত।”

আমি উঠিয়া পড়িলাম। নিগাবোটটা চিম্নী-বেদিকার উপর রাখিয়া অনন্তগতি নিরুপায় লোকের মত বৃক্কে উপর বাত আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিলাম। আমারও মনে হইতেছিল, যেন লোকটা শীঘ্রই উন্মাদ হইবে।

একটু খামিয়া সে আমাকে বলিল,—“যে অপেরায় তোমার সহিত আমার দেখা হয়েছিল, সেটা মনে আছে ত?”

“সব শেষে যে অভিনয়টা হয়েছিল সেখানে অদ্ভুতঃ ২০০ লোক জমা হয়েছিল, তারই কথা ত বলছ?”

“হ্যাঁ সেই অপেরা। আরও একটা অদ্ভুত নাট্যশালা দেখবার আছে শুনে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে বাধা করলে। কিন্তু আমি তোমার কথা শুনলাম না। নিয়তি যেন আমাকে চেঁচিয়ে নিয়ে গেল। তুমি আমার সঙ্গে কেন গেলে না; তোমার পুত্র পর্যায়েক শক্তি আছে, তুমি তা হ’লে সেই অদ্ভুত নাট্যটা তন্ন তন্ন করে’ টুকে আনতে পারত। আমি বিগ্ন-ভাবে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপেরা-গৃহ থেকে চলে’ এলাম। কিয়ৎকাল পরেই একটা নাট্যশালায় এসে উপস্থিত হলাম। খবটা লোকে লোকাকীর্ণ, লোকদের স্তুতিও খুব। ঢাকা-বাবাণ্ডা, ‘বক্স’, ‘পিট’ সব ভরপুর। আমি সেই নীচের খবটায় একবার ঘূব-পাক দিলাম। ২০ জন মুখোমুখি লোক আমার নাম ধরে’ ডাকলে, তাদেরও নাম আমাকে বললে।

“এরা সব সমাজপতি, আমীর-ওমবাও, বড় সওদাগর; এরা মহিস, হুকরা, সাকাসের সং, মেছুনী—এইরকম নিম্নশ্রেণীর লোকের হীন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এরা সবাই তরণবয়স্ক, সন্দ্বংশীয়, কৃতবিদ্যা, গুণী লোক। এরা নিজের বংশনামা, বিদ্যা বৃদ্ধি শিষ্টতা সব ভুলে গিয়ে আমাদের এই গুরুগম্ভীর কালে, নিতান্ত ছিব্লেমি বেহায়া কাণ্ড আরম্ভ করেছে। আমি পূর্বে একথা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। দুইচার ধাপ উপরে উঠে’ একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে অর্ধপ্রচ্ছন্ন হ’য়ে আমি নীচের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সাগর-তরঙ্গের মত মানুষের জনতা যেন উথলে উঠছে। নানা রংএব মুখোমুখি, নানা রংএব কাপড়-পরা’ লোক, গুড্ডুবকমেব ছদ্মবেশ করেছে, তাদের মানুষ বলে’ চেনা যায় না। চাবিদিকে চীৎকার, হাসি, ঠাটা তামাসা, তার মধ্য থেকে একটা ঐক্যান বাত বেজে উঠল, জম্মি সেই জনতার মধ্যে একটা চাকলা উপস্থিত হব। তারা পবস্পরে হাত-ধবাধবি করে’, বাত-ধবাধবি করে’, গলা জড়া জড়ি করে’ মণ্ডলাকাবে নাচতে আবস্ত কবে’ দিলে, মেকের উপর মজ্জাবে পা ফেলতে লাগল—ধড়াস ধড়াস শব্দ হতে লাগল—বুলো উড়তে লাগল, ঝাড় লগ্নেব মুছ আলোকে সব দগা যাচ্ছিল—ক্রমেই গাত-দ্রুত কবে’ কতরকমের ভঙ্গী করছে, মাতালের মত চলতে চলতে চলেছে—মেয়েগুলো চীৎকার কবে—পলাপ বকে। সবই যেন নবকের বীভৎস কাণ্ড।

“আমার চোখেব নীচে, আমার পায়ে নীচে এইনব ব্যাপাব চলছিল। তাবা যখন নাচতে নাচতে ঘূবে’ ঘূবে’ যাচ্ছিল তাদের হাওয়া আমার গায়ে লাগছিল। আমার কোন পবিচিত লোক আমার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এমন এক একটা কুৎসিত কথা বলছিল যে লজ্জায় মরে’ যেতে হয়। এইসমস্ত তুমুল শব্দ, এইসমস্ত গুঞ্জন, এই-সমস্ত গোলমাল, এই বাত-বাবাদিা যেনন যবেব মধো, তেমন আমার মাথার মবোও চলছিল। শেষে এমন হ’ল, আমি মনে ভাবলাম,

এসমস্ত সত্য, না স্বপ্ন? এরাই আসলে প্রকৃতস্থ আর আমিই বিকৃতমস্তিষ্ক নয় ত? আমার ভয় হ’ল। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা পর্যন্ত এলাম। সেখানেও সেই বীভৎস আবেগের কণ্ঠধ্বনি ও চীৎকার আমাকে অনুসরণ করতে লাগল।

“আপনাকে সামলাবার জন্ত, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করবার জন্ত, গাড়ীবাবাণ্ডায় এসে দাঁড়িলাম। আমার রাস্তায় বেতে সাহস হ’ল না। আমার মাথার ভিতর ঘেরকম গোলমাল চলছিল, তাতে বোধ হয় আমি যাবাব পথ খুঁজে’ পেতাম না। হয়ত আমি গাড়ী-চাপা পড়তাম।

“টিক এই মুহূর্তে একটা গাড়ী দরজাব কাছে এসে দাঁড়াল। একজন স্ত্রীলোক গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। তার কালো ছদ্মবেশ, মুখে মগ্নমলের একটা মুখোমুখি। সে দরজার কাছে এল।

“দ্বাববদ্বী বললে—‘আপনার টিকিট?’ রমণী উত্তর কবে :—‘আমার টিকিট? আমার টিকিট-মিকিট কিছুই নেই।’

“‘তবে বয়ে গিয়ে একটা টিকিট নিয়ে আসুন।’

“মুখোমুখি আবার থামেবা চকের কাছে ফিরে এসে নিজের পকেট হাতুড়িতে লাগল। তার পর বলে’ উঠল :—

“‘পয়সা নেই। আঃ! এই আংটি আছে, এই আংটিব বদলে একটা প্রবেশ-টিকিট—’

“যে রমণী টিকিট বটন করছিল সে উত্তর কবে :—‘অসম্ভব, আমবা ওবকমেব খবিদবিদ্বী কবিনে।’ এই কথা বলে’ সে হীরের আংটিটা ঠেলে’ ফেললে; আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেইখানে আংটিটা পড়ে’ গেল।

“ছদ্মবেশিনী, আংটিব কথা ভুলে’ গিয়ে, চিত্তানগ্র হ’য়ে সেইখানেই নিশ্চল হ’য়ে দাঁড়িয়ে বইল।

“আমি আংটিটা কুড়িয়ে তাব হাতে দিলাম। দেখলাম, মুখোমুখি ভিতর দিয়ে তাব চোখের দৃষ্টি আমার চোখেব উপর নিবন্ধ। সে আমাকে বললে :—‘যাতে আমি ভিতরে যেতে পারি তাব জন্ত আমাকে একটু সাহায্য কবন। দোহাই আপনার, আমাকে সাহায্য কবতেই হবে।’

“আমি বললাম :—‘কিন্তু মাদাম আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি।’

“‘তবে আমাকে এই আংটিব বদলে তিনটে টাকা দিন। আমি এত দানের জন্ত আপনাকে চিরজীবন অশীর্ষাদ কব্ব।’

“আমি সেই আংটিটা তার আঙ্গুলে আবাব পবিয়ে দিলাম। তার পর বক্স-আফিসে গিয়ে দুটো টিকিট কিনে’ আমবা দুগনে একমাত্র প্রবেশ কব্বলাম।

“যখন ঢাকা-বাবাণ্ডায় পৌঁছলাম, তখন দেখি তাব পা টলুচে। সে তার জন্ত হাতে আমার বাত জড়িয়ে ধবলে। আমি জিজ্ঞাসা কব্বলাম :—‘আপনাব কি কোন কষ্ট হচ্ছে।’

“সে উত্তর কবে :—‘না না, ও কিছু না, আমার একটু মাথা ঘূবছিল, আব কিছু না।’

“সেই প্রমত্ত পাগ্লাদের আডডায় আবার আমরা প্রবেশ কব্বলাম।

“তিনবাব আমরা ঘূব-পাক দিয়ে এলাম—মুখোমুখিব বিগ্নুক্র তবঙ্গের ভিতর দিয়ে পথ চলা বড়ই কষ্টিন;—ঠেলাঠেলি করে’ এ ওব খাড়ে পড়ছে, এক-একটা অশোভন কথা চীৎকার করে’ বলে’ উঠছে। যে মহিলা আমার বাত অবলম্বন করে’ আমার সঙ্গে চলছিল এইসব অদ্ভুত কথা তাব কানে আসতে মনে কবে’ আমি লজ্জায় মরে’ যাচ্ছিলাম। আবাব আমবা প্রবেশ দালানের শেষ প্রান্তে ফিবে’ এলাম।

“রমণী একটা কোঁচের উপর বসে’ পড়ল। আমি কোঁচের পিঠে হাতটা ভব দিলে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বললে,—

‘নিশ্চয়ই তোমার খুব অদ্ভুত বলে’ মনে হচ্ছে? এটা আমারও খুব অদ্ভুত ঠেকেছে। এরকম জিনিষের কোন ধারণাই আমার ছিল না, এমন জিনিষ স্বপ্নেও কখনও মনে করতে পারতাম না। কিন্তু দেখুন, তাবা আমাকে লিখলে,—সে লোকটি এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখানে আসবে, আর, এরকম জায়গায় যে আসতে পারে, না জানি সে কিরকম স্ত্রীলোক।’

“আমি বিশ্বাসই স্থিত করলাম, সে বুঝতে পারবে। ‘আমিও ত এইখানে এসেছি, কেন এসেছি শোধ হয় আপনি জিজ্ঞাসা করবেন। আমার কথা স্বতন্ত্র; আমি তাকে বুঝতে এসেছি। আমি তার স্ত্রী। আর এইনব লোক যারা এখানে এসেছে এরা এসেছে মন্ত্রতার তাগিদে, বদ্ব্যয়ালের তাগিদে। কিন্তু আমার এখানে এনেছে একটা দারুণ মর্মান্বিতিক ঈশা। আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমি সমস্ত রাত একটা গোরস্থানে ছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে শপথ করে বলছি, মাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি এপধ্যস্ত কখনও একলা বাস্তায় বেরইনি। আমি যেখানেই গিয়েছি আমার সঙ্গে একজন রক্ষী গিয়েছে। তাবু দেখুন, যে সব স্ত্রীলোক অন্য পথেব পথিক আমি তাদেরই মত এখানে রয়েছি। একজন অপরিচিত পনপুণ্যের হাত ধরে চলেছি। না জানি তিনি আমার সখকে কি ভাবছেন। কি লজ্জাব কথা। সমস্তই আমি বুঝি। কিন্তু এসব সংগ্রহ—আচ্ছা আপনার কি কখনও ঈর্ষা হয়েছে।’ আমি উত্তর কবলাম—‘ছুভাগ্যকমে হয়েছে।’

“তা হলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কেননা আপনি মূব বোঝেন।’

“কোন উন্মাদেব কানে যে কণ্ঠস্ব এই কথা সজোবে বলে—‘কব এই কাজ’ সে কণ্ঠস্ব নিশ্চয়ই আপনি তবে জানেন। নিষিদ্ধর বাতব মত যে বাত ঠেলা মেবে পাপের প.থ, নবকেব পথে কাটিকে নিয়ে যায় সে বাত যে কি প্রবল তা আপনি হয়ত জানেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এইরকম কোন মহন্তে, একজন লোক না কবতে পারে এমন কাজ নেই; সে শুধু প্রতিশোধ চায়, আপ কিছু চায় না।’

“আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম এমন সময়, সে উঠে পড়ল। সেই সময় যে দুজন মুখোসধারী আমাদের সখ দিবে যাচ্ছিল, তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বইল। সে বললে,—

“‘চুপ!’ এই বলে তাদের পিছনে পিছনে আমাকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল; আমি কিছুই বুঝিনে—এমন একটা পাপচক্রেব মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম, সমস্ত তন্ত্রগুলাব স্পন্দন আমি বেশ অনুভব করতে পারছি অথচ কোন তন্ত্রই ঠিক ধরতে পারিনি।

“আমার সঙ্গিনীর ব্যাকুলতা দেখে আমার গুৎস্বক্য বেড়ে গেল। কোন বাস্তব অনুভূতিব এমনি পবাকমে যে আমি শিশুব মত আত্মাবহ হয়ে পড়লাম এবং আমার ঐ দুই মুখোসধারীর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। ওর মধ্যে একজন পুরুষ, ও আব-একজন রমণী। তারা মৃদুস্ববে কথা কচ্ছিল; কথাব শব্দ অতি কষ্টে আমাদের কানে এসে পৌঁছেছিল। আমার সঙ্গিনী বলে উঠল :—

“এ সেই! তাবই কণ্ঠস্ব; ঠা, ঠা তাবই মত শরীরেব গডন—’

“দ্বিতীয় মুখোসধারী হাসতে লাগল। আমার সঙ্গিনী বললে,—‘এ তাবই হাসি; ওগো, এ সেই—এ সেই বটে। পত্রটা তা হলে ঠিকই বলেছে—ওমা আমার কি হবে।’

“আমরা সেই দুই মুখোসধারীর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তাবা প্রবেশ-দালানেব বাইরে গেল, তাদের পিছনে পিছনে আমরাও গেলাম। তাবা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ‘বসে’ গেল; আমরাও উপবে উঠলাম। একটা মাঝখানেব ‘বসে’ এসে তাবা থামল—আমরা ছায়াব মত তাদের পিছনে বইলাম। একটা বন্ধু-করা বসেব দরজা

খুলে গেল। তাবা তাব ভিতর প্রবেশ কবলে। তার পর বসেব দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

“আমার বাত অবলম্বনা রমণীর বিষয় উত্তেজিত ভাব দেখে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। আমি তাব মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না; কিন্তু সে এতটা আমার গা ঠেসে’ ছিল যে তাব স্রুপিণ্ডের স্পন্দন, তার গাত্রশিহরণ, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন আমি বেশ অনুভব কবতে পারছিলাম। একরূপ অদ্ভুতপূর্ব তীব্র যন্ত্রণা আমি কখন পূর্বে দেখিনি। এ একটা অমানুষি ব্যাপাব। এই রমণী সখকে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে কেমন লোক আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু তাব এই অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যেতেও পারিনে।

“তখন দেখলে ঐ দুই মুখোসধারী বসেব মধ্যে ঢুকে বাক্স বন্ধ করে দিলে তখন সে নিশ্চয়ভাবে একটু দাঁড়িয়ে বইল—যেন একেবারে অভিভূত হয়ে। তাব পবে চট কবে উঠে, তাদের কথা শোনার জন্ত দরজার কাছে এল। খেবকম জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, একটু নড়াচড়া হলেই সে ধবা পড়তে পারত, তা হলে তাব সর্বনাশ হত; তাই আমি তাকে জোব কবে টেনে এনে পাশেব বসেব দরজা খুলে তার প্রিতর প্রবেশ কবলাম। তাব পব দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সে একটা ধাঁচু উপা ভব দিয়ে বসে ওদের বসেব পদ্মা-আড়ালেব গায়ে কান পেতে বইল। আমি তাব উটা দিকে মাথা নীচু করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

“আমি যা দেখলাম, তাতে মনে হ’ল, আমার এই সঙ্গিনীর রূপ একটা বিশেষ ছাঁচেব। মুখেব যে অংশটা মুখোসে ঢাকা ছিল না—সেই মুখেব নীচেব অংশটা বেশ তরুণ, মখমলেব মত পেলব, বেশ গোলগাল। ঠোঁট দুটো চুপুটুকে লাল ও অতি সুকুমার, তার মুক্তার মত ছোট ছোট সাদা দন্তপাংক্তি ঝিকুঝিকু কবচে—তার হাত দুখানি প্রতিমাব হাতেব মত, তাব মাজাটা বেন আঙ্গুলের মধ্যে সাপটে-ধরা যায়, তাব কানো রেশমি ঢুল, তার মুখোস-চুপিপির ভিতর থেকে প্রচুর কেশ-গুচ্ছ বেরিয়ে এসেছে—আর তাব পা দুখানি কি সুন্দর, কি হালুকা—তাব সমস্ত গডনটাই ছিপছিপে ও হালুকা ধরণেব।

“নিশ্চয়ই এই রমণী অলোকসামান্য রূপসী। আমি এর স্রুপিণ্ডের স্পন্দন, সমস্ত শরীরেব শিহরণ ও কম্পন অনুভব কবছি—এসমস্ত যদি ভালবাসার দবন্ হয়—আমাকে ভালবাসার দবন্ হয়—এই ধর্গেব পবাকে যদি বিধাতা আমার জন্তই বেখে থাকেন—তা হলে আমার কি সৌভাগ্য—আমার কি সৌভাগ্য।

“এইরকম আমি ভাবছি এমন সময়, হঠাৎ দেখি ঐ রমণী উঠে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সবে এই কথাগুলি বললে—

“‘দেখুন আপনার কাছে আমি শপথ করে বলছি—আমি সুন্দরী, আমি নবদেবীনা, আমার বয়স সবেমাত্র উনিশ। এব আগে আমি ধর্গেব দেবতাব মত নিষ্কলঙ্ক শুভ ছিলাম—এখন—এখন—’ দুই হাতে আমার গলা ছাড়িয়ে ববে সে বললে :—‘এখন আমি আপনারই আমাকে গ্রহণ করন।’

“এই কথা বলে সে একরূপ তার আবেগেব সঙ্গে আমাকে চুষন কবলে—চুষন কি দংশন ঠিক বুঝা গেল না—সেই চুষনে আমার সমস্ত শরীর শিউবে উঠল—কেপে উঠল।

“একটা আগুনের হালুকা আমার চোখেব উপর দিয়ে চলে গেল।

“দশমিনিটি পবে দেখি, আমি তাকে বাতপাশে ধরে আছি, সে মুচ্ছি হা, অক্ষয়তা—ফুপিষে ফুপিষে কাঁদছে।

“আস্তে আস্তে আবার তার চোখ হ’ল; তার মুখোসের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম—তাব চোখ কোটরে বসে গেছে। আমি তাব পাণ্ড মুখেব নাচের অংশটা দেখতে পেলাম, বেন ঘবের নীচে তাব

দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি তচ্ছে—সেইসমস্ত দৃশ্য আবার যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

“যা যা ঘটেছিল সে-সমস্তই তাব স্বপ্নে ছিল। সে আমার পায়ের তলায় এসে বসে’ পড়ল। তাব পূর্ব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল

“আমাব উপর যদি আপনার কিছুমাত্র দয়া থাকে, আমা থেকে আপনার চোখ ফিবিয়া নিন, আমাকে ভান্তে চেষ্টা কববেন না। আমাকে বেতে দিন—আমাকে দু’ল মান। তবে—আমি আপনাকে ভুলব না।”

“এই কথা বলে’ সে আবার উঠে পড়ল ; চটকবে’ দরজার কাছে ছুটে’ গেল, দরজাটা খুলে’ আবার ফিরে এল। ফিরে এসে বললে—‘দোহাই আপনার, আমাব পিছনে আর আসবেন না।’

“হাতের সৈল্য ধড়াস কবে’ দরজা খুলে’ গেল, আবার বন্ধ হ’ল। সে একটা উপহার মত আমার দৃষ্টি থেকে গম্ভীর হ’ল। সেই অবধি আব আমি তাকে দেখিনি।

“তার সঙ্গে আমার আব দেখা হয়নি। সেই অবধি—সেই ছয় মাস থেকে আমি তাকে সর্বত্র খুঁজছি—নাচের মজলিসে, থিয়েটারে, বেড়াবার জায়গায়। দূর থেকে, ছিপ ছিপে, শিশুর মত ছোট পালুপানি—কালো চুল—কোন তরুণী দেখলেই আমি তার অনুসরণ কবতাম, কাছে যেতাম, মুখখানা ভাল করে দেখতাম—মনে কবতাম, আমাকে দেখে’ সে লজ্জায় লাল হ’য়ে উঠবে, তা হলেই বরা পড়বে। কিন্তু তাকে আর পেলাম না—কোথাও পেলাম না, কেবল পেতাম তাকে বাক্যে—শুধু আমাব স্বপ্নে ভিতর। নানা শাকাবে তাকে দেখতে পেতাম।

“মোট কথা, সেই বাস্তব থেকে আমি যেন আর আমি নেই। এক জন অপরিচিতা বসণী’র পোমে উন্মত্ত হ’য়ে, সকলদাই আশায় আশায় থাকছি—আর সকলদাই হতাশ হ’য়ে পড়ছি। উন্মত্ত হচ্ছি অথচ শ্রমা বব্বাব আমাব অধিকার নেই, জানিনে কাব উপর শ্রমা কবতে হবে। এই পাগলামির কথা কারও কাছে প্রকাশ কবতেও পারিনি কেবল আমি আমার অন্তরেই দক্ষ হচ্ছি, সেই মায়াবিনাই আমাকে পুড়িয়ে মারছে।”

এই কথাগুলি বলিয়াই, সে একটা পথ তাহার বুকের পকেট থেকে বাহির কবিল। তার পব নে আমাকে বলিল :—

‘আমি সবই ত তোমাকে বলেছি, এখন এই পত্রখানা পড়ে’ দেখো।’

“সে রমণী বিছুই ভোলেনি, এবং ভুলতে পারে না বলেই মরতে যাচ্ছে, সেই হতভাগিনীকে বোধ হয় আপনি ভুলে’ গেছেন ?

“আপনি যখন এই পত্রখানা পাবেন, আমি তখন আর থাকব না। এখন আপনি পেয়ার-লাশেজের গোরস্থানে যাবেন, সেখানকার দ্বার-বন্ধককে বলবেন, সে-পাথরের উপর শুধু ‘মেরি’ এই নাম লেখা আছে, সেই নতুন সমাধি-প্রস্তরটি যেন আপনাকে দেখিয়ে দেয়। তার পর সেই সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ’য়ে, নতজানু হ’য়ে প্রার্থনা কববেন।”

আন্তুনি বলিল :—

“আমি সব কাল এই পত্রখানি পেয়েছি ; আর ঐ পত্র পেয়ে আজ সকালে আমি সেখানে গিয়েছিল’ম। দ্বারবন্ধক সেই সমাধিস্তম্ভের কাছে আমাকে নিষে গেল ; আমি সেইখানে ছুই পটা ধবে’ নতজানু হ’য়ে প্রার্থনা করলাম, কাদলাম। বুলতে পারচ ? সেই রমণী সেইখানেই ছিল। কেবল তাব জলন্ত আত্মাপূরণ পালিয়ে গিয়েছিল ; অমৃদাহে দক্ষ-ঋষা ও অনুতাপের ভাবে ভারাক্রান্ত তার শবীণটা ভেঙ্গে পড়েছিল। সে ছিল সেইখানেই—আমার পায়ের নীচে—তাব জীবন মরণ সবই আমার অজ্ঞাত। অজ্ঞাত ? তবু, যেমন গোবেব ভিতর, সেইরকম আমার জীবনের মধ্যেও সে একটা স্থান অধিকার কবে’ রয়েছে। এককম কোন কিছু তুমি জান কি ?—একপ ভীষণ ঘটনার কথা তুমি কখনো শুনেছ কি ? তাই আব কোন আশা কোবো না। আমি আবার তাকে দেখতে পাব মনে কর ?—কখনই না। আমার ইচ্ছা, তার গোরটা খুঁড়ে’ যদি তাব কোন চিহ্ন পাউ তা হ’লে, তা দিয় তার মুখখানি আবার গড়ে’ তুলি। আমি তাকে সতাই ভালবাসি, বুলতে পারচ, আলেক্সান্ডার / আমি পাগলের মত তাকে ভালবাসি, যদি আমি জানতে পারি,—এ লোকে তাব পরিচয় না পেলেও পবলোকে তার পরিচয় পাব—তা হ’লে আমি এই মৃত্তক্টে আগ্রহ ত্যা কবি।”

এই কথাগুলি বলিয়া সে আমাব হস্ত হস্তে পত্রখানা ছিনাইয়া নেইল, পত্রখানা বাবখাব চূপন কবিতে লাগিল, এবং শিশুর মত কাদিতে লাগিল।

আমি তাকে আমাব বাতর মধ্যে গ্রহণ করিলাম, কি বলিব বুলিতে পারিলাম না—আমিও তাব সঙ্গে কাদিতে লাগিলাম।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীর আত্মকথা

১৩

স্বপ্নের শানেব উপর দিয়া চেঁচুড়িয়া চলিবাব শব্দ—একটা ফোঁপানির শব্দ।—এই মন্দিবেব একটা আবার কোণে অনেকগণ ধদিয়া শাস্ত ভাবে ছিলাম ; খিলান মগুপেব গায়ে যে সব বিরাট মূর্তি, কাল্পনিক মূর্তি ছিল তাহাবই ছবি আঁকিতেই ব্যাপ্ত ছিলাম,—এমন সময় ঐ শব্দ শ্রুতিতে পাইয়া, কে প্রবেশ কবিতেছে জানিবাব গুচ্ছ দবজার দিকে মুখ ফিরাইলাম।

একটি বুদ্ধা বসণী দীনদশাপন্ন ও প্রায় উলঙ্গ। তাহার হাতে আছে চাউল ও মংস্পূর্ণ ছোট তিনটা কটোবা এবং ছোট তিনটা গোলাপী রংযেব মোমবার্তা। নিশ্চয়ই দূব হইতে আসিয়াছে ; দেখ যেন শান্তিতে প্রাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মনে হইল, কি একটা দাবণ ছবে অভিভূত।

এক পক্ষদণ্ডবিশিষ্টা বোকাবা বুদ্ধা তাহার শাস্ত্রাব বনাদকম্ব বেচিয়া

এই নৈবেদ্য-সামগ্ৰী,—এই হস্তময়, প্রকাণ্ডকায়, সোনা-বন্ধকি দেবতার সম্মুখে যজ্ঞ-বেদির উপর অর্পণ কবিতে আসিয়াছে। তাহার পরেই সে কাসর পিটিতে লাগিল, এবং প্রেতযোনিদিগকে ডাকিবাব দটা বাজাইতে লাগিল। যেন সে এই কথা বলিতে চাহে,—বাবা বুদ্ধ। তুমি এখানে একবার এসে দেখো, তোমাব জন্ত আমি কি জিনিস নিয়ে এসেছি ; আমাব যথাসাধ্য এই উপহাব সংগ্রহ করেছি ; আমার উপর দয়া করো, কৃপা করো, আমি যা প্রার্থনা করছি তা আমাকে দাও ...”

ছোট মোমবার্তিগুলো পুড়িয়া গেল ; মাছির ছোট তিনটা বাটির উপর নামিয়া নৈবেদ্য সামগ্ৰী খাইতে লাগিল ;—বোকাবা বুদ্ধা চলিয়া গেল।

একটা ময়ূরভদ্র চৌকর কবিয়া বুদ্ধা হুংস আমাব সেফ বেগী

নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহার অন্তরে কে যেন বলিল, এখনও তার “ভূত” ছাড়ে নাই; অথচ সে যথাসাধ্য দেবতাকে উপহার দিয়াছে। তাই সে ছুটিয়া আসিয়া কোঁপাইতে কোঁপাইতে আর্তরব করিতে করিতে আবার প্রচণ্ডভাবে “গং” পিটিতে লাগিল, ঘটা বাজাইতে লাগিল;—বুম্! বুম্! বুম্! ডিং! ডিং! ডিং! তাহার তাৎপর্য এই:—

“বাবা বুদ্ধ! তুমি আমার কথা শুনলে না, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না; আমি যে একজন গরিব বুদ্ধা রমণী—অতি অভাগিনী—তুমি কি এত নিষ্ঠুর হবে,—আমার কথায় কর্ণপাতও কবে না—এ কখনই সম্ভব নয়।”—তাহার পর, হৃদে পাচ মেন্টের মত তাহার মুখের উপর দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

সিলভেষ্টার,—ব্রেতাঙ্গ-প্রদেশে যাহার খুব-গরিব এক বুদ্ধা পিতামহী আছে—সেই সর্বপ্রথমে উঠিয়া তাহার কাছে যাহা ছিল—৫ ফাঙ্ক মূল্যের “সাপেক” মুদ্রা—সমস্তই তাহাকে দিল। আমিও আমার খলে ঝাড়িয়া তাহাকে সমস্তই দিলাম। সে ভ্যাভাচাকা খাটয়া, খুব নতশিরে “চিন্ চিন্” করিতে করিতে আমাদিগকে ধন্যবাদ জানাইল। এই অনপেক্ষিত ধনলাভ করিয়া নিশ্চয়ই তার বেশ একটু উপকার হইল। সে ইসারা সঙ্কেতের দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিল:—সে আব-একটা ভিক্ষার জন্ত এখানে এসেছিল—সে ভিক্ষা দেওয়া মানব-দয়ার সাধ্যাতীত...

১৪

আজ দিনটা খুবই বিস্ময়। পূবেব জোব বাতাস, আকাশ অন্ধকার, দুই দিন ধবিয়া আমবা খুয়ান্-আনেব সম্মুখে আছি। আজ প্রাতে সূর্যোদয়-কালে, জাহাজ আব নোঙ্গর মানিতেছে না; কাজেই নোঙ্গরটা মাট হইতে একটু উপরে উঠানো গেল (এই কোশলটা বিপদজনক); তাহার পর, আমরা আমাদের অত্যন্ত আশ্রয়স্থান ত্বানে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

আব আমি,—নির্দিষ্ট পোয়া দটা কালের পাহারার কাজে নিযুক্ত হইলাম—বেশ একটু কড়া পাহারা, কিন্তু সেই-সঙ্গে একটু বাৎসল্য ভাবও ছিল এবং সচরাচরই চেয়েও বেশী। আমি বিষয়টিতে মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এই পাহারাটা কি আমার শেষ পাহারা হইবে?

গতকাল একটা ডাকেব জাহাজ যখন এখানে দিয়া চলিয়া যায়,—তখন একটা ভকুমনামা আমাকে দিয়া গিয়াছিল। এই ভকুমটা একেবারেই অনপেক্ষিত; পারীতে ফিরিয়া যাইতে ভকুম হইয়াছে। সেইবাহী “করেজ” নামক জাহাজে আমাকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবে। হা-লং হইতে ফিরিয়া আমাকে লইবার জন্ত জাহাজটা তুরানে আসিয়া থামিবে—আব কাল আমাদের যাত্রাকাল জানানো হইবে। সকল সময়েই এই নো-বিভাগের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ও ভরস্কুম!

দুইটার সময় আমাদের সেই তুরানের উপসাগরে প্রবেশ করিলাম—সেখানে সমুদ্র বেশ শান্ত। এখন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের তোরঙ্গ-গুলি গুছাইয়া লইতে হইবে। আমার কামরায় সমস্তই বিশৃঙ্খল ও ওলটপালট হইয়া রহিয়াছে। যে-সকল বাক্সো তাড়াতাড়ি “সবুজ চীনা”কে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল তাহা একটা “সাপান” নৌকা করিয়া অ’গিয়া পৌঁছিয়াছে। যে গবম,—সিলভেষ্টার ইসফান্ করিতে করিতে কাজে চলিয়া গেল। এই জটিল গাঁঠরি বাধা কাজে আরও তিন জন সিলভেষ্টারের ভাবে খাটিতে লাগিল। আরামে কাজ করিবার জন্ত সকলেই বিবস্ত্র হইল।

রাত্রি হইল। আমিও প্রস্তুত হইলাম। আমার গম্যস্থানের অনুসরণ কবিত্তে বেচারী প্রথমসঙ্গীদিগের সহিত বিদায়-সম্বাধন কবিত্তে প্রস্তুত হইলাম। আমার সকলেব জন্তই কষ্ট হইতে লাগিল...

আমার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে এতই বিপর্যাস হইয়া পড়িয়াছিল যে আজ ঘুমাইতে বেশ একটু দেবী হইয়া গেল।

একজন উচ্চমানুষের নাবিক, আমার কামরার পোত ছিন্নের নীচে সেকালের বিষাদময় খুব একবেয়ে একটা বেতাঙ্গ প্রদেশের সুর গাহিতেছিল, তাহা শুনিয়া খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিনটা শান্ত নির্মল, সুন্দর;—এই মেঘ-বৃষ্টির দেশে, এই ঋতুতে এইরূপ দিন খুবই বিরল। পাহাড়গুলি রামধনু মত বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত; সমুদ্র গাট নীলবর্ণ; একটা স্নানমধুব দীপ্তিচ্ছটা, গ্রীষ্মমণ্ডলমূলভ একটা গভীর স্বচ্ছতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছে; এই সব তুমুল ঝড়-বৃষ্টির পর, সমস্ত প্রকৃতি যেন আরামে বিশ্রাম করিতেছে। আর কিছুই করিবার নাই; আমাব কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার তোরঙ্গগুলি বন্ধ রাখা হইয়াছে। সিলভেষ্টার আমার বুদ্ধমূর্তি ও আমার পতুলগুলোকে এইমাত্র কাপড়ে জড়াইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে;—ইহারা আমার সহযাত্রী।

আমার বিশ্বাস,—আমার শ্রমক্রান্ত জীবনে, কোন স্থান হইতে এমন শান্তভাবে প্রস্থান করা কখনও ঘটে নাই। স: স্ত দিন আমি দিগন্তেব পানে চাহিয়া আছি, সমুদ্রেব উপর চাহিয়া আছি—“কবেজ” জাহাজখানা কখন না জানি আমাকে লইতে আসিবে। কিন্তু সাদা পাল-ওয়াল কতকগুলো “জোক” নৌকা ছাড়া আব কিছুই নেত্রগোচর হয় না।

সেই “সবুজ চীনা” শান্ত ফুল-কাটা বেশমেব একটা জাঁকালো পোয়াক পরিষা, সন্ধ্যার সময় আমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিল। শীত ঋতুর জন্ত এই পোয়াক সে কাটন হইতে আনাইয়াছে।

সন্ধ্যাস্ত সময়ে প্রায় শীতকালের মত ঠাণ্ডা; মনে হয় যেন ডিসেম্বর মাস। কে, “কবেজ”-জাহাজের ত দেখা নাই; আর-এক রাত্রি এই উপসাগরে, এই অন্ধকারময় পাহাড়গুলির মধ্যে কাটাইতে হইবে। পাঁচমাস কাল উহাদের মধ্যে আমি বন্দী ছিলাম। আবার উহাদিগকে দেখিতে আসিব না ইহা নিশ্চয়। আজ শেষ-রাত্রি, তাই আজ রাত্রে উহাদিগকে একটু বিষয়টিতে দেখিতেছি...কি অদ্ভুত, শেষে সকলেবই প্রতি কেমন একটু মমতা ভয়ে...সন্ধ্যাস্তের স্নান পীত-আভাব উপর এই-সব পাহাড়—এমন কি দুঃস্থ পাহাড়-গুলিও নিছক কালো বলিয়া মনে হইতেছে; আর দুবন্ধের ব্যবধান অনুভূত হয় না; মনে হয় যেন একটা মাজ গ্রেট-পাথরের খাঁজ-কাটা দেওয়াল, শীত-আকাশের নীহারশীতল গায়ে ছায়াচিত্রের আকারে খাড়া হইয়া আছে।

এই “কবেজ” জাহাজখানা, আমাদের গণনানুসারে, অস্তিত আজ পৌঁছনো উচিত ছিল; উহাব আসিতে খুবই বিলম্ব হইয়াছে। কাল প্রাতে নিশ্চয়ই আসিয়া পৌঁছিবে।

সন্ধ্যার “ডেক পরিষ্কার”-এর পর, আমার “পাহারা ঘরে”র বন্ধুবা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আমার কামরায় আসিল;—তাহাবা নানাপ্রকার কমাণ করিল, বিদায়-সম্বাধন করিল।—সবশেষে যে আসিল সে হইতেছে সিলভেষ্টার—কিছু গুছাইবার আছে কি না তাহাই দেখিবার জন্ত সে স্বতই আসিয়াছে। সে ভয়ে-ভয়ে একটা ক্ষুদ্র মুক্তি আমাকে দিল। এই মুক্তিটি সে তার প্রথম “Communion” অনুষ্ঠানের সময় পাইয়াছিল। এটি কতকটা তাহার রক্ষাকবচের মত:—“স্মৃতিচিহ্নরূপে এটি কি নিয়ে যাবে কাপ্তেন?”—সে আরও মনে কবে—এটি আমাকে আগদে বিপদে রক্ষা করিবে।

আমাকে কেন আবার ফ্রান্সে তলব হইল, একথা আমার নাবিকেবা ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; তাহার কল্পনা করিতেছে,—আমাব কি দশা হইবে, আমার প্রতি কর্তৃপক্ষেরা কি কণ খাটাই কবিলে, আমি যেন তাহা নিশ্চয়ই জানি ন...

উহার এই ক্ষুদ্র উপহারটি বহুমূল্য জানে বৃকে চাপিয়া ধরলাম। মূর্তির বিষয়টি এই :- ঘোর তমসাচ্ছন্ন ঝটিবাব মধো একটি শিশু নতজানু হইয়া আছে। তাহাব সহিত এই পৌরাণিক কাহিনীটি আছে :- “বিপুল জলরাশি আমাকে গিরিয়া ছিল, কিন্তু হে ভগবান, তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ।”

তাহার পর, নিল্ভেস্তোরও যেন আমার সহিত দম্ভমত মূল্যকাৎ করিতে আসিয়াছে—এই ভাবে থাকেও গ্রামাব কাছে একটু বসাইলাম; এং ব্রেতাঞ্চ সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিলাম। তাহার গোয়েলো প্রদেশে আমার কখন কখন কাজ পড়ে, সেই সময় তাহাব পিতামহীর কুটারে গিয়া তাহাব সহিত মাঝাং কবিব—এইরূপ স্থিব হইল।

তখন, সে যেন কি-একটা চিন্তাষ বিভোব হইল :- এই ব্রেতাঞ্চ এখান হইতে কত কত মোগন দূবে... তাহাব গ্রামে ফিরিয়া গিয়া আবার কি আমার সহিত তাহাব মাঝাং হইবে?— তাহা কি কখনও হইবে? এত আননে বসিয়া তাহা কল্পনা কাই যায় না—তাহার মাধেব দেশেব সম্মুখ যেন একটা ছেভদা যবনিকা রহিয়াছে...

তাহার পর, তাহাব ভাবনা হইল, তাহাদেব কুটারে গেলে কি করিয়া আমার যথাসোগা আদর অভ্যর্থনা কবিবে। সে মাথা নীচু করিয়া আমাকে বলিল :- “জানেন, আমাদের বাড়ী... সেটা একটা পোড়ো চালাখব”—বেচাবী নেহাং শিশু। পোড়ো চালা-খবেব কথা বলিবার পর, আমি তাহাব হস্তমর্দন করিয়া তাহাকে শুইতে যাইতে বলিলাম। সে যদি জানিত, এইনব পোড়ো চালাখব— ব্রেতাঞ্চ-প্রদেশেব এইনব পুাতন চালা-খব আমি কত ভালবাসি...

আজ বাক্ত “কবেজ” জাজ্ঞা গামিয়া পৌচ্ছিয়াছে। আমাদের জাহাজেব পাশ দিয়া যাইবার সময় বেকপ কোণাতন উঠাইয়া বেকপ জল মাপিবার বলি বলিতে লাগিল, তাহাতে আমি জাগিয়া পড়িলাম। যাক্—এইবার তবে প্রস্থানেব সময় আসিয়াছে, আমার জীবন পথেব এই শেষ যাত্রা, সব অবসানই বিনাদনয়—এখন দেখা যাইতেছে এই অবাসের অবসানটাও বিনাদনয়।

আজিকার দিনটাও বেশ উজ্জল মনোবন। প্রাক্কাকস হইতেই যাত্রার জঞ্জ শেস-উদ্যোগ-আয়োজনেব চিন্তা দেখা দিয়াছে, ৯ টাব সময় “করেজ”কে সজ্জিত হইতে হইবে। আমার অন্তঃসত্ত-ভক্ত মিল্ভেস্তোর ও অন্যান্য নাবিকেব আমার গোট কাবুচুকি বাধিবার জঞ্জ, ঐখানে জমা হইয়া পবম্পবেব মায়ে চেনাচেনা করিতেছে।

তাহাব পব বিদায় লইবার জঞ্জ এক-লাইন হইয়া উহার আমার কাম্বাব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সকল সরলমতি নাবিকদের বিনায়সম্ভাষণ বাস্তবিকই মধ্মম্পর্শ।

আমার “পাতারা-খবে”র সহচরেরা আসিয়া আমাকে বিদায়-চুম্বন কবিল; স্মৃতি-বিবহিত—যা-তা কাপড় পরা—এইরূপ কতকগুলো নাবিক আমাকে তাহাদেব জাহাজে লইতে আসিল। একটা ডিজি আমার জঞ্জ অপেক্ষা কবিত্তেছিল—আমাদের জাহাজ হইতে এই ডিজিতে নামিবার সময় আমার বৃক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

“কবেজ” সজ্জিত হইয়াছে, যত্রা করিতে উদাত, এমন সময় একটা জোঙ্ক-নৌকা—মাণ্ডারীনেব—নানা-রকম ইসারা-সঙ্কেত করিয়া হাডাতাড়ি আমাদের নিকট আসিল।—সেই “সবুজ চীনা,” আমার যাতাপথেব জঞ্জ একরকম পূব মিহি চা বাজোবন্দী করিয়া পাঠাইয়াছে।

আমাদের জাহাজেব পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—রবিবাবের প্রাণতিক পবিদর্শনেব জঞ্জ, জাহাজেব সরঞ্জামসকল ডেকের উপব দম্ভমত সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আমাকে বিদায়সম্ভাষণ কবিবার জঞ্জ উপরিতন কর্মচাবীবা শিরস্ত্রাণ এবং চুপি নাড়িতে লাগিল। যখন সব দূর সবিয়া গেল—যখন সেই-সব পবিচিত গিরি-মালাব গিছনে ডুবানের উপনাগর ধীরে ধীরে আবার বন্ধ হইয়া পড়িল—যখন আমাদের পূর্বেজাহাজেব মাস্তুলগুলো একেবাবে দৃষ্টিব বহিভূত হইল, তখন আমি আব চোখেব জল রাখিতে পাবিলাম না।

১৫

সমস্তই যেন ছুটিয়া পলাইল, নীলিমাৰ মধ্যে বিলীন হইল। মধ্যবাত্রিব পূর্বেই আমরা “বাব দবিয়া”য় আসিয়া পড়িয়াছি।

তখন সেই সমুদ্রব শান্তি আবিভূত হইল—সেই সমুদ্র তাহাব দ্বাবা সমস্তই পবিবর্তিত ও বিদ্যস্ত হইয়া থাকে। একটা সময়েব অবসানে, টিংকালব মত যেন একটা দাঁড়ি পড়িয়া গেল। এবং এই শান্তি মধো, আমাদের পূর্বে জাহাজ ও তুরানের উপনাগর চটু করিয়া যেন দ্রবীভূত হইল।—কোন্ সূদূবে যেন বিলীন হইল—আমাব মনে একটা স্মৃতিও বাগিয়া গেল না। আমি জানিতাম, উহার স্মৃতি চলিয়া যাইবে, কিন্তু এত শীঘ্র যাইবে বলিয়া মনে কবি নাই—আমি ইহাতে বিশ্বয়বিপ্লব হইলাম। মোট কথা, প্রেমের বন্ধন ছাড়া আব কোন বন্ধন পৃথিবীর কোন স্থানেই আমাকে বাধিয়া রাখিতে পাবে নাই।

(সমাপ্ত)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(মত) কবাব মানী)

কোথায় থেকে আসলে তুমি,
শুধাই তোমায় তাই,—
তোমার জাতি?—নাম কি স্বামীর?—
কোথায় তোমার ঠাই?

“অমর-লোকের থেকে এলাম,
স্বথ-সাগরে আমার হে ধাম,

জাতি আমার অজাতি,— আর
অগম-পুরুষ ‘মাই’!”

“জাতি আমার আত্মা, ওগো, পরাণ আমার নাম,
অলখ আমার ইষ্ট সে,— ঐ গগন আমার গ্রাম!”

শ্রী রুধাচরণ চক্রবর্তী

বেনো-জল

বারো

সেদিনকার সেই মারামারির পর থেকে, কুমার-বাহাদুরের অবস্থাটা হ'য়ে উঠল দস্তুরমত অসহনীয়। বিনয়-বাবুদের কেউ মুখে বা ব্যবহারে তাঁর প্রতি কিছুমাত্র অনাদর প্রকাশ না করলেও, কুমার-বাহাদুর মনে-মনে এটা বেশ অন্তর্ভব করতে লাগলেন যে, সকলের চোখে অকস্মাৎ তিনি অনেকটা নীচে নেমে পড়েছেন! যে চায়ের আসরে ব'সে প্রতিদিন সকলে অবাক হ'য়ে তাঁর স্বমুখে-কথিত পল্লবিত বীরত্ব-কাহিনী শুনত আর বাহবা দিত, আজ সেখানে শুধু রতনের নামেই বাহবা শোনা যায়,—আর সব-চেয়ে যা অসহ ব্যাপার, সেই বাহবা চক্ষুসজ্জার খাতিরে তিনি কোন আপত্তি পর্য্যন্ত করতে পারেন না! রতনকে আগে তিনি গরীব ব'লে ঘৃণা ও উপেক্ষা করতেন, আজকাল তাকে পরম শত্রু ব'লে মনে করতে লাগলেন।

সেন-গিন্নী এখন রতনকে ছেলের মতন আদর-যত্ন করেন। তিনি যখন-তখন বলেন, “ভাগ্যে সেদিন রতন ছিল! নইলে আমার সন্তোষকে সায়েবরা হয়ত মেরেই ফেলত!”

সন্তোষ পর্য্যন্ত রতনের মোসাহেব হ'য়ে পড়েছে দেখে কুমার-বাহাদুরের মনে ছুঃখের আর অবধি ছিল না! সন্তোষ এখন প্রায়ই রতনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, রতন সম্বন্ধে তার মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। আজকাল সে আবার রতনের কাছ থেকে মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসুর কসরৎ শিক্ষা করছে।

অথচ এই ভাবান্তরের কোনই সঙ্গত কারণ নেই! সেদিন কুমার-বাহাদুর যে ব্যবহার করেছিলেন, সেইটেই তো স্বাভাবিক! তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহিলা, আর বিরুদ্ধে অতগুলো অভদ্র সাহেব। অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে সেদিন পূর্ণিমার উপরে অত্যাচার হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। রতন যা করেছে, সে তো

পাগলের আচরণ! আজ যারা তাঁকে কাপুরুষ ব'লে ভাবছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে তারা কি করত? নিশ্চয়ই তিনি যা করেছেন, তাই! তবে?

সব-চেয়ে অসহ এই স্মিত্রা! আজ সকালে সে তাঁকে মুখের উপরে একরকম অপমান পর্য্যন্ত করতেও লজ্জিত হয়নি। সে হঠাৎ এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসল—“কুমার-বাহাদুর, আজকাল আপনি এমন-ধারা মন-মরা হ'য়ে থাকেন কেন?”

তিনি বললেন, “তার মানে?”

স্মিত্রা বললে, “আগে আপনি আমাদের সঙ্গে কত গল্প করতেন, কত কথা কইতেন, কিন্তু আজকাল যে হিমালয়ের চেয়েও গম্ভীর হ'য়ে উঠেছেন!”

তিনি বললেন, “গম্ভীর হ'য়ে উঠেছি? কৈ, না তো! কি গল্প শুনতে চান, বলুন!”

স্মিত্রা ঠোঁট-টেপা হাসি হেসে বললে, “সেই লাঠি মেরে ব্যাঘ্র-বধের গল্পটা! সে-গল্পটা আমার ভারি ভালো লেগেছিল, আর একবার শুনতে বড় সাধ হচ্ছে!”

কুমার-বাহাদুরের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল! স্মিত্রা সামনে ব'সে কার্পেটের উপরে ফল তুলেছিল, সে ধমক দিয়ে বললে, “স্মি, তোর বড় বাড় হয়েচে দেখুচি!”

স্মিত্রা বললে, “ই্যা দিদি, কুমার-বাহাদুর কি আমাদের পর গা? তাঁর বীরত্বের গল্প আমার ভালো লাগে, সেজন্যে তুমি ধমক দিচ্ছ কেন বল দেখি?”

স্মিত্রা রেগে বললে, “স্মি, ফের যদি তুই একটা কথা বলিস, তোর সঙ্গে আমি কখনো কথা কইব না!”

স্মিত্রা বললে, “বেশ দিদি, বেশ! তুমি যখন এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা ক'বে বসলে, তখন দরকার নেই আমার আর বাঘ-মারার গল্প শুনতে।” ব'লেই সে ভঙ্গীভরে হাত-হাত তুলিয়ে চলে গেল।

কুমার-বাহাদুর ছুঃখিতের মতন চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। স্মিত্রা বললে, “স্মি'র কথায় আপনি যেন রাগ করবেন না, সকলের পেছনে লাগাই ওর স্বভাব।”

কুমার-বাহাদুর ভারী-ভারী গলায় বললেন, “রাগ আর কার ওপরে করব বলুন! আমার অপরাধ, সেদিন আমি গোয়াতুর্গি ক’রে আত্মহত্যা করতে চাইনি। তাই আজ এই অপমানও সহ্য করতে হচ্ছে!”

স্বনীতি ব্যস্ত ভাবে বললে, “না, না, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে অপমান করবাব জন্তে এ-কথা বলেনি, এত সাহস ওর হবে না!”

কুমার-বাহাদুর বললেন, “শুক, এ-কথা নিয়ে আব আলোচনার দরকার নেই।...আমার আর পুনীতে থাকতে ভালো লাগে না, তাই চ ছ চার দিনের মধ্যেই কলকাতায় চ’লে যাব।”

স্বনীতি বললে, “যখন এসেছেন, আরো কিছুদিন থেকে যান না! এখানকার হাওয়া খুব ভালো।”

—“তা আমি জানি। কিন্তু হাওয়া খেতে আমি তো এখানে আসিনি!”

—“তবে কি জন্তে এসেছেন?”

—“তা কি আপনি জানেন না?”

—“আমি? আমি কি ক’বে জানব?”

—“আপনি কি জানেন না যে, কি সম্পর্কে আমি আপনাদের সঙ্গে গমনভাবে মেলামেশা করি?”

এতক্ষণে স্বনীতি বুঝতে পারলে। সে শুনেছে বটে। কিন্তু কুমার-বাহাদুরের মুখে এমন ইঙ্গিত এবং আগে সে আর-কখনো শোনেনি। লক্ষ্য রাখা মূখ্য লাল হ’য়ে উঠল, সে কোন জবাব দিতে পারলে না।

কুমার-বাহাদুরও আত্মপ্রকাশের এই প্রথম সুযোগটা ছাড়তে পারলেন না, এর জন্তে অনেক দিন ধ’রেই তিনি যে অপেক্ষা ক’রে আছেন! চেয়াবখানা স্বনীতির আরো কাছে টেনে এনে তিনি বসলেন: তার পব সাম্নেব দিকে হেঁট হ’য়ে, কোমল-স্বরে দীর্ঘে দীর্ঘে বললেন, “তোমার কাছে কাছে থাকতে পাব ব’লেই আমি পুনীতে এসেছি। আজ যে এত অপমান স’য়েও এখান থেকে যেতে আমার মন উঠে না, সে কেবল তোমার জন্তেই। এ-কথা কি তুমি জানো না স্বনীতি?”

স্বনীতির বুকের ভিতরটা কাপ্তে লাগল, সে যেন তখন স্বেদান থেকে একছুটে পালিয়ে যেতে পারলেই বাচে!

কুমার-বাহাদুর বললেন, “এতে তোমার বাবা আর মায়েরও মত আছে—অন্যতঃ আমি এঁইরকমই শুনেছি। এখন কেবল তোমার মতের অপেক্ষা। তোমার মত পেলেই আমি নিশ্চিত হ’তে পারি। তা হ’লে—”

—“দিদি, তোমাকে আর কুমার-বাহাদুরকে বাবা ডাকছেন” বলতে বলতে স্বমিত্রা এসে আবার সে ঘরে ঢুকল।

কুমার-বাহাদুর তাড়াতাড়ি সোজা হ’য়ে ব’সে ছ-চার-বাব কেশে বললেন, “বিনয় বাব আমাকে ডাকছেন? কেন, কি দরকার?”

—“আনন্দ-বাবু এসেছেন আমাদের নৈমস্ত্র করতে।”

—“আচ্ছা, যাচ্ছি” ব’লে কুমার-বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। তার পর এমন সুযোগটা নষ্ট ক’রে দিলে ব’লে মনে-মনে স্বমিত্রার উপরে আরো-বেশী চ’টে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

স্বমিত্রা জুই-ভরা হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে, “দিদি, কুমার-বাহাদুর প্রস্থান করেছেন, সত্বাৎ এখন তোমার সঙ্গে নিভয়ে কথা কইতে পারি?”

স্বনীতি ভয়ে-ভয়ে সন্দেহপূর্ণ স্বরে বললে, “তোমার আবার কি কথা আছে?”

স্বমিত্রা চোখ ঘুরিয়ে বললে, “বাবু, কুমার-বাহাদুরের তোমার সঙ্গে কথা থাকতে পারে, আব আমার নেই বুঝি?”

স্বনীতি বুঝলে স্বমিত্রা কিছু সন্দেহ করেছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে প’ড়ে বললে, “সব, সব, বাবা কেন ডাকছেন শুনে আসি।”

স্বমিত্রা দিদিব একখানা হাত ধ’রে বললে, “আহা, অত তাড়াতাড়ি কিসেব, আগে আমার কথাটাই শুনে যাও না!”

বেকায়দায় প’ড়ে স্বনীতি বললে, “আচ্ছা, কি বলবি বল!”

খুব চুপিচুপি স্বমিত্রা বললে, “লক্ষ্মী দিদিটি আমার! কুমার-বাহাদুর অমন ভিথিরির মতন মুখ ক’রে তোমাকে কি বলছিলেন, আমাকে তা বলতেই হবে!”

—“সে একটা বাজে কথা!”

—“উঁহ! কুমার-বাহাদুর নিশ্চয়ই জানতে চাইছিলেন, তাঁর গলায় তুমি মালা দিতে রাজি আছ কি না!”

স্বমিত্রার গালে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে স্ননীতি সে ঘর থেকে চলে গেল!

স্বমিত্রা তবু ছাড়লে না—সঙ্গে-সঙ্গে যেতে-যেতে বললে, “তুমি কি জবাব দিলে দিদি, বলোনা!”

তেরো

আজ সকালে এক নতুন বিষয়! হাঁজ-চেয়ারে বসতে গিয়ে একটা ছারপোকাব কামড় খেয়ে বিনয়-বাবু বেয়ারাকে মৌখিক শাসনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাব যুক্তি এই, কলকাতার পলো-ধোয়া হট্টগোল যখন এখানে নেই, তখন কলকাতার ছারপোকাই বা এখানে এসে কোন্ অধিকাবে তাঁকে দংশন করবে? বেয়ারা এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে না পেরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাথা চুল্কোচ্ছে, এমন-সময় হঠাৎ বাড়ীর আঙিনার উপরে দেখা গেল, বলকাতার আরো দুটি মৃতিমান বিশেষত্বকে!

বিনয়-বাবু আশ্চর্য হয়ে হিংরেজীতে ব'লে উঠলেন, “অ্যা, মিঃ চ্যাটো! মিঃ বাসু! আপনারা এখনো জীবিত আছেন?”

—“অত্যন্ত! কলকাতায় আপনাদের মত বিখ্যাত ডাক্তারের অভাবে আমরা কিছুতেই মরতে পারিনি!”— এই ব'লে মিঃ চ্যাটো এসে বিনয়-বাবুব করমর্দন করলেন।

মিঃ বাসুর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বিনয়-বাবু বললেন, “কবে এলেন? কোথায় আছেন?”

মিঃ বাসু বললেন, “এসেছি কাল সন্ধ্যায়। আছি হোটেলের। বড়দিনের ছুটিটা এইখানেই কাটিয়ে যাব।”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “আপনারা কলকাতা অক্ষকার করে এসেছেন—আমরাও তাই আলোকের সন্ধানে পুরীতে এসেছি।”

—“কিন্তু ইলেকট্রিকের আলোর অভাব এখানে অত্যন্ত। আপনাদের মন উঠবে কি?”

—“সেই পরীক্ষাই তো করতে চাই!”

তার পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বিনয়-বাবু বেয়ারাকে চা আনবার হুকুম দিলেন।... *... ..

মিঃ চ্যাটোকে পেয়ে কুমার-বাহাদুরও যেন বর্ত্তে গেলেন। তিনি বেশ বুকুলেন, এইবার তাঁর দল ভারি হোলো—আর তাঁকে কোণঠাসা হ'য়ে থাকতে হবে না। ক'জনের হিংরেজী বুকুনিতে অকস্মাৎ বিনয়-বাবুর বাড়ী মুখারত হ'য়ে উঠল,—আমরা কিন্তু ভবিষ্যতের কথোপ-কথনের ভাষা থেকে সে বুকুনিগুলি বাদ দিয়েই লিখব।

সন্ধ্যার মুখে মিঃ চ্যাটো কুমার-বাহাদুরকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। তিনি ক্রমেই সমুদ্রতীরের নিজ্জন অংশের দিকে যাচ্ছেন দেখে কুমার-বাহাদুর বললেন, “এদিকে কেন?”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে।...এস, এইখানে বোসো।”

কুমার-বাহাদুর কলের পুতুলের মতন মিঃ চ্যাটোর সঙ্গে এগিয়ে, সমুদ্রের ধারে একখানা উল্টানো ডিঙির উপরে গিয়ে বসলেন।

মিঃ চ্যাটো বললেন, “তার পর? আসল খবর কি?”

কুমার-বাহাদুর স্নিয়মাণ স্বরে বললেন, “বিশেষ কিছু স্বাধিধে ক'রে উঠতে পারিনি।”

—“অর্থাৎ?”

—“এখানে এসে পথ্যাহ বিবাহের কথা আর শুঠিনি।”

মিঃ চ্যাটো ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, “নরেন, তুমি একটি গণ্ডমুখ! তোমার জন্মে আমার যা কব্বার, প্রাণপণে করেছি। তোমাকে পাছের উপরে তুলে দিয়েছি, তবু তুমি ফল পাড়তে পারচ না? এমন মূর্খের সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই নে!”

কুমার-বাহাদুর কাতরভাবে বললেন, “আপনি যদি আমার অবস্থা বুঝতেন, তা হ'লে আমার উপরে কখনই রাগ করতেন না!”

কুমার-বাহাদুরের কাতর মিনতিতে কণপাত না ক'রে তেমন উগ্রভাবেই মিঃ চ্যাটো বললেন, “জানো, আজ পয়স্ব তোমার পিছনে আমার কত টাকা খরচ হয়েছে? আট হাজার টাকা! পুরী থেকে বার-বার তুমি আরো টাকা চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচ! আমি কি টাকার পাহাড়? এ হুকুমের চিবকাল যদি আমার খাড়ে চাপিয়ে

রাখতে চাও, তা হ'লে স'রে দাঁড়ানো ছাড়া আমার আর উপায় নেই।”

—“কিন্তু আমার দশা কি হবে তা হ'লে?”

—“সে ভাবনা তুমি ভেব। হয় আত্মহত্যা, নয় ভিক্ষা—এই তোমার শেষ পরিণাম।”

—“আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর কিছু দিন সাহায্য করুন।”

—“অর্থাৎ, আমাকে আরো টাকা দিতে হবে—তোমার বিলাসী জীবনকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে! কেমন, তুমি এই বলতে চাও তো? কিন্তু তার পর তুমি যদি বিফল হও, আমার টাকা কে দেবে? একটা মাটির ভাঁড়ের যে দাম, তোমাকে বেচলেও তো সে দাম আদায় হবে না।”

—“মিঃ চ্যাটো, আমি এত দিনে নিশ্চয় কৃতকায্য হতুম, কিন্তু ঐ রতন ছোড়াই মাঝে থেকে আমার সাধে বাদ সাধছে।”

মিঃ চ্যাটো অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বললেন, “সে কি! এরা কি রতনের সঙ্গে স্ননীতির বিবাহ দিতে চায়?”

—“না, না, তা কেন?”

—“রতন কি তবে তোমার গুপ্তকথা জানতে পেরেছে?”

—“না, তাও নয়। আসল কথা কি জানেন? এখানে রতন ক্রমেই দেবতার মত হ'য়ে উঠছে, আর আমি ক্রমেই পিছনে স'রে যাচ্ছি।”

—“তার মানে, তোমাকে ঠেলে' ফেলে' রতন তোমার শূণ্য আসনে উঠে বসবার চেষ্টা করছে?”

—“আমার তো সেই সন্দেহ হয়!”

—“এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে রতন তোমার চেয়ে শুদ্ধিমান!”

—“না, তা আমি মানি না। দৈব তার সহায়।”—এই ব'লে কুমার-বাহাদুর বিশেষ ক'রে যে-ঘটনার জন্তে রতনের আদর বেড়ে উঠেছে, আছোপাস্ত তা বর্ণনা করলেন। তার পর স্ননীতির কাছে কাল যে-ভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এই-সঙ্গে সেটাও মিঃ চ্যাটোকে জানিয়ে দিলেন।

মিঃ চ্যাটো সমস্ত শুনে' চিস্তিতমুখে অনেকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে রইলেন। কুমার-বাহাদুরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, “আজ আবার মিঃ ঘোষ রতনের জন্তে এক সম্মান-ভোজের আয়োজন করেচেন, আমারও নিমন্ত্রণ আছে।”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “তাই তো, পথ-থেকে-কুড়িয়ে-আনা একটা কাঙালকে নিয়ে তো বড় মুষ্কিলে পড়তে হ'ল দেখ'চি!”

কুমার-বাহাদুর হতাশভাবে বললেন, “ওর জন্তে আমি হ'য়ে আছি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন। ওকে না সরাতে পারলে আর উপায় নেই!”

মিঃ চ্যাটোর মুখ হঠাৎ উজ্জল হ'য়ে উঠল! তিনি বললেন, “ইতিমধ্যে কলকাতায় থাকতে রতনের এক গুপ্তকথা আমি আবিষ্কার করেছি। একদিন স্নবিধে বুঝে সেইটেকেই কাজে লাগাতে হবে!”

কুমার-বাহাদুর সাগ্রহে ব'লে উঠলেন, “কি, কি গুপ্তকথা?”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “যথাসময়ে শুন্তে পাবে। আপাততঃ তোমার কর্তব্য শোনো। রতনের সঙ্গে তুমি সন্ধি স্থাপন কর। সে যাতে তোমাকে বন্ধুভাবে নেয়, সেই চেষ্টায় থাক। তার মনের কথা যত জানতে পার ততই ভালো। কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার, তোমাকে স্ননীতি ভালোবাসে কি না সেইটে জানতে পারা।”

—“বোধ হয় বাসে।”

—“বোধ হয় বললে চলবে না—আগে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে হবে। কারণ স্ননীতির মত থাকলে তার বাপ-মায়েরও অমত হবে না, এ আমি ঠিক জানি। তুমি একবার যখন কথা তুলেচ, তখন দ্বিতীয়বার কথা তোলা বেশ সহজই হবে ব'লে মনে করি!”

—“কিন্তু আমার পকেট যে একেবারে খালি! হাত-খরচও করতে পার'চি না!”

—“আচ্ছা, আরো মাস-দুয়েক আমি তোমার খরচ চালাব—তার পর আর আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, এটা কিন্তু সর্বদাই মনে রেখো!”

—“মিঃ চ্যাটো, এ-জগতে আপনিই আমার

শ্রেষ্ঠ বন্ধু! আপনার ঋণ এ-জীবনে আমি পরিশোধ করতে পারব না!”

কিন্তু মিঃ চ্যাটো এ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ভুল্লেন না। পাকা সওদাগরের মত শুষ্ক ওজন-করা ভাষায় বল্লেন, “পরিশোধ করতে পারবে না কি? পরিশোধ করতেই হবে! তুমি বেশ জেনো, মনে-মনে আমরা কেউ কারুর বন্ধু নই—স্বার্থই আমাদের এক ক’রে রেখেছে। আমি কল্‌কাতার সম্ভ্রান্ত ধনী-সমাজে শিকার খুঁজে বেড়াই—এই আমার ব্যবসা। তুমি আমার পণ্যের মতন। এমন পণ্য আমি আরো বিকিয়েচি। আমি জানি, মিঃ সেন একজন খুব ধনবান্ লোক। ডাক্তারিতে আর নানা ব্যবসায়ে অংশীদার হ’য়ে তিনি অনেক টাকা জমিয়েছেন। তিনি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করেন। তাঁর এই দুর্বলতাই আমার সহায়। আমি আরো জানি, মিঃ সেনের মত নির্কোষের মতন উদার। তিনি মেয়ে আর ছেলের দাবি সমান ব’লে ভাবেন। স্ত্রীতির বিবাহে তিনি যৌতুক-রূপে যে সম্পত্তি দেবেন, তার অর্ধেক আমার, অর্ধেক তোমার। এই আমার সর্ভ। এই সর্ভের একটু এদিক-ওদিক হ’লে বিবাহের পরেও তোমার স্বখস্বপ্ন আমি ভেঙে দিতে পারব। বুঝেচ নরেন? পাছে তুমি ভুলে’ যাও, তাই সমস্ত ব্যাপারটা আর-একবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। আমি তোমাকে মাথায় তুলেচি, আবার দরকার হ’লে আমিই তোমাকে পায়ের তলায় ফেলতে পারি!”

কুমার-বাহাদুর দুঃখিতভাবে বল্লেন, “মিঃ চ্যাটো, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ঠকাব না, কিন্তু আপনি বড় হৃদয়হীনের মত কথা কইছেন! আমি সত্যিই আপনার উপকৃত বন্ধু,—আমাকে বিশ্বাস করুন!”

মিঃ চ্যাটো কঠিন হাস্য ক’রে বল্লেন, “প্রেম, বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা—ও-সব কাব্যের কথা, ব্যবসা-ক্ষেত্রে একেবারে অকেজো! সংসারটা হচ্ছে মস্ত এক ব্যবসা-ক্ষেত্র—এখানে সব-চেয়ে যা উচ্চ, সেই মাতৃস্নেহই নিঃস্বার্থ নয়! মাও নিজের রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানের কাছ থেকে প্রতিদানের আশা রাখেন। যে স্বার্থহীন প্রেমের কথা বলে, আমার মতে সে হয় কপট, নয় নির্কোষ। তোমাকে

আমি বিশ্বাস করি না—খালি তোমাকে কেন, কারকেই না! বিশ্বাস করলেই আমি ঠকব। ততক্ষণই বন্ধুত্বের প্রাণ, যতক্ষণ দুই পক্ষের কেউ কারুর স্বার্থে বাধা না দেয়! তুমি আমাকে বন্ধুত্বের কথা শোনাচ্ছ? হা, হা, হা, হা!” মিঃ চ্যাটো উচ্চস্বরে উপহাসের হাসি হাসতে লাগলেন!

কুমার-বাহাদুর অবাক হ’য়ে মিঃ চ্যাটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর নিম্নমুখী মনের গতিও এই অদ্ভুত ও কুৎসিত যুক্তি শুনে’ যেন স্তম্ভিত হ’য়ে গেল!

চৌদ্দ

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সামনের চাতালে, চেয়ারের উপরে ব’সে ব’সে সবাই কথাবার্তা কইছেন।

একদিকে বিনয়-বাবু ও সেন-গিন্নী পাশাপাশি ব’সে আছেন, তাঁদের সামনে একটা বেতের টেবিল,—পূর্ণিমার হাতে-বোনা কারুকার্য-করা প্রচ্ছাদনীতে ঢাকা। টেবিলের ও-ধারে আনন্দ-বাবু, তাঁর ছুপাশে রতন ও সস্তোষ। কুমার-বাহাদুর একটু তফাতে একখানা ইঞ্জি-চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় আছেন। স্ত্রীতি ও স্ত্রীমিত্রা বাড়ীর ভিতরে—পূর্ণিমা যেখানে রান্নাঘরে ব্যস্ত হ’য়ে আছে, সেখানে সাহায্য করতে গেছে।

সামনেই সমুদ্র—সীমা থেকে অসীমে, অসীম থেকে সীমায় ক্রমাগত ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে—তালে তালে, গতি-লীলার ছন্দে উচ্ছ্বসিত হ’য়ে! আজ পূর্ণিমা তিথি, সাগরের কালো বুকে আলোর দোলা ছুলিয়ে আকাশ-সায়রে চাঁদ স্থির হ’য়ে আছে।

কথা হচ্ছিল সাহসের। কুমার-বাহাদুর একটু আগেই মতপ্রকাশ করেছিলেন, “সাধারণতঃ ইংরেজেরা দেশী লোকের চেয়ে সাহসী।”

রতন বললে, “আমার তাতে সন্দেহ আছে। কোন যুক্তিতে আপনি এ মত প্রকাশ করলেন?”

—“দেখুন, পথে-ঘাটে ইংরেজ কথায়-কথায় দেশী লোককে আক্রমণ করে। প্রায়ই সে মারে, কিন্তু মার খায় না। কল্‌কাতার গড়ের মাঠে ফুটবল খেলায় জ্বন-

কতক ইংরেজের ভয়ে আমি হাজার হাজার দেশী লোককে পালাতে দেখেছি। এথেকে কি প্রমাণিত হয়?”

—“কিছুই প্রমাণিত হয় না। একজন মাত্র ইংরেজকেও আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখি না, দেখি সমগ্র রাজশক্তির মূর্তিমূহুর্তি প্রকাশের মতন। কারণ এটা প্রায়ই দেখা গেছে যে, একজন মাত্র ইংরেজকে আঘাত ক’রে অনেককে বিরাট রাজশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে—অর্থাৎ নিষ্পেষিত হ’তে হয়েছে। প্রত্যেক ইংরেজও আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখে না, সেও জানে যে, নামেই সে একা, আসলে তার পিছনে দেহ-রক্ষীর মত সমগ্র রাজশক্তি সতর্কভাবে জেগে আছে। সে ‘নেটিভ’কে খুন করলেও তার ফাঁশি হবে না—এই দীর্ঘকালের ব্রিটিশ রাজত্বে আজ পর্যন্ত তা হয়নি। এই সচেতনতাই তাকে সাহায্য করে, আর আমাদের পিছনে হটিয়ে দেয়। আমাদের স্বদেশেও স্বজাতির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য। বলবান্ ভৃত্যও দুর্বল প্রভুর হাতের মার নীরবে হজম করে, শত শত গরীব প্রজাকে জমিদার-পক্ষের একজন মাত্র কাম্যচারী অর্থাৎ নিযাতন ক’রে আসে,—কিন্তু এ-সব কি সাহসেব পারচয়, না কাপুরুষতার অভিনয়?”

কুমার-বাহাদুর বললেন, “কিন্তু আমার মতে, আমরা যদি প্রকৃত সাহসী হতুম, তা হলে এত ভেবে চিন্তে কাজ করতে পারতুম না। মিং দোম সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন।.....বেশী বুদ্ধিমান হ’য়েই আমরা নিজেদের সর্বনাশ করেছি। এই ধরন, আপনার কথাই। আমি ভীক নই, কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে তব তো সেদিন আমিও ক’রে দাঁড়াতে পারতুম না! আপনি কিন্তু প্রকৃত সাহসী, তাই একলা অতগুলো ইংরেজকেও বিরুদ্ধে দেখে’ ভয় পেলেন না! হা, একেই বলি সাহস!”

আনন্দ-বাবু ও বিনয়-বাবু অবাক হ’য়ে কুমার-বাহাদুরের মুখের দিকে তাকালেন এবং সব-চেয়ে বিস্মিত হ’ল সন্তোষ—কারণ রতন সম্বন্ধে তার মত সেইই বেশীকম জানত। তারই মুখে আজ রতনের সখ্যাতি!

রতন কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হ’ল না, সে বললে,

“মাপ করবেন কুমার-বাহাদুর, আলোচনায় যখন নিজেদের কথা ওঠে, তখন তা বন্ধ করাই উচিত।”

কুমার-বাহাদুর বললেন, “আমি সত্য কথাই বলছি, আপনাকে লজ্জিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা—”

রতন বাধা দিয়ে বললে, “আমার সম্বন্ধে আপনার এই উচ্চ ধারণার জন্মে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু দয়া ক’বে অগ্র প্রসঙ্গ তুলুন—সখ্যাতি শুনে’ শুনে’ আমি শ্রান্ত হ’য়ে পড়েছি!”

এমন সময়ে সুনীতি ও স্মিত্রাকে নিয়ে পূর্ণিমা সেখানে এসে দাঁড়াল।

আনন্দ-বাবু একবার সমুদ্র ও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি চমৎকার রাত্রি! রতন, এখন কথা বন্ধ ক’রে একটি গান গাও।”

রতন বললে, “তাতে আমি নাবাজ নই! আজ আমারও গান গাইতে সাধ হচ্ছে!”

—“পূর্ণিমা, হামোনিয়ামটা আন্তে ব’লে দে তো মা!”

—“না, না, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক উৎসব-সমারোহের মধ্যে একটা কৃত্রিম যন্ত্রের আওয়াজ সব মানুষ্য নষ্ট ক’রে দেবে! তার চেয়ে এই পরিপূর্ণ পূর্ণিমাতে যদি পূর্ণিমা দেবীও আমার সঙ্গে তার মধুর কর্ণ মেলান, তবে গানটি যথার্থই সকলের ভালো লাগবে!”

আনন্দবাবু বার বার মাথা নেড়ে বললেন, “অবশ্য, অবশ্য!”

বিনয়-বাবু উৎসাহিত হ’য়ে বললেন, “চমৎকার প্রস্তাব!”

পূর্ণিমা কিন্তু লজ্জিত-মুখে নাবাজ হ’য়ে বললে, “আমি পারব না!”

সেনগিনী বললেন, “গাও না মা পূর্ণিমা, লজ্জা কি?”

পূর্ণিমা বললে, “উনি একে গাইয়ে মাতুষ, তার ওপরে কি গান ধরবেন, আমি পারব কেন?”

রতন বললে, “আমি আপনার জানা-গানই গাইব। আমার গান তো এখানে সবাই শুনেছেন, আজ আপনিও প্রমাণ ক’রে দিন যে, ও-বিছাটি এখানে থালি আমারই একচেটে নয়!”

আনন্দ-বাবু বললেন, “বাজে তর্কে চাঁদের আলো ব'য়ে যাচ্ছে—পূর্ণিমা, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না!”

অগত্যা বাধ্য হ'য়ে রতনের সঙ্গে পূর্ণিমা গান ধরলে—

“ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মরু ফিরে.....”

যুক্ত কণ্ঠেব মুক্ত সুরের কুহক-মঞ্চে আকাশে বাতাসে সাগরে ও চাঁদের আলোতে যেন এক স্বপ্নলোকের কল্পনা পূনক জেগে উঠল—সামনেব ঐ শত ওরফের হিন্দোলায় যেন সেই পূনকই বিশ্ব-কবিব ভাসায় আপনার প্রাণের কথা বলছে আর বলছে!সকলেই শুক হ'য়ে ব'সে রইলেন।

পূর্ণিমা বললে, “বাবা, সেই বিকেল থেকে রান্না-ঘরের গরমে ব'সে আছি, মাথাটা বড় ধরেচে, একবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেড়িয়ে আসব?”

—“একলা?”

—“একলা না যেতে দাও, রতন-বাবু আমার সঙ্গে চলুন।”

—“বেশী দূরে যাসনে যেন!”

—“না, এখনি ফিরে আসছি! আসুন রতন-বাবু!”

পূর্ণিমা ও রতন চ'লে গেল। স্মিতা নীরবে তাদের দিকে চেয়ে রইল!

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা বিনয়, রতনের মনন ছেলেকে তোমাব জামাই করতে সাধ যায় কি না?”

বিনয়-বাবু বিস্ময়-ভরে বললেন, “হঠাৎ তোমাব এ প্রশ্ন কেন?”

—“যা জিজ্ঞাসা করলুম আগে তার জবাব দাও।”

—“এ-কথা তো আমি কখনো ভেবে দেখিনি, এক কথায় কি ক'রে জবাব দিই? তবে রতন যে স্পাত্র, তাতে আর সন্দেহ নেই।”

—“শুধু স্পাত্র নয় বন্ধু, ছলভ পাত্র! রূপে-গুণে প্রায় অদ্বিতীয়!”

সেনগিনী বললেন, “কিন্তু বংশগৌরব নেই, আব বড় গরীব। স্ত্রীকে পালন করতে পারবে না।”

কুমার-বাহাদুর আগ্রহের সঙ্গে উৎকর্ষ হ'য়ে সব কথা শুন্ডিলেন। এখন সেনগিনীর মত জেনে তাঁর ঠোঁটের কোণে সকলের অগোচরে আশ্বস্তির একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল! তার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। রতন তা হ'লে তাঁব প্রতিদ্বন্দী হ'তে পারবে না।

আনন্দ-বাবু বললেন, “বেশী টাকা আব বেশী গরীবানা এই দুইই মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে। কিন্তু দারিদ্র্যের নিম্ন-স্তরে নেমেও রতন তার চরিত্র হারায়নি, স্তত্রাং দাবিদ্র্য তার পক্ষে সম্মানের।...সে গরীব কি বনী আমাদের তা দেখবার দরকার নেই। আমার তো মনে হয়, রতনের যখন চরিত্র আব মনুষ্যত্ব আছে, আমি অনায়াসে তাব হাতে কণ্ঠা সম্প্রদান করতে পারি। তার যদি পয়সার অভাব থাকে, আমি যা যৌতুক দেব তাইতেই তার সে অভাব মিটে যাবে।”

সকলের মধ্যেই বেশ-একটু উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল—আনন্দ-বাবু রতনের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ দিবেন! .. স্মিতা ফিবে তাকিয়ে দেখলে, দূরে চন্দ্রকরোজ্জল সাগর-সৈকতে রতন ও পূর্ণিমা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে!

বিনয়-বাবু বললেন, “কিন্তু রতনের আত্মসম্মানবোধ কি রকম জান তো? তোমার দেওয়া যৌতুকের টাকার উপর নির্ভর ক'বে সে যে পূর্ণিমাকে বিবাহ করতে রাজি হবে, আমার তো তা বিশ্বাস হয় না।”

—“আমিও অবশ্য তাই মনে করি। সে-ক্ষেত্রে আমি তাকে সাহায্য করব। তার প্রতিভা আছে, পুষ্টি-পোষকের অভাবেই সে খালি বোজগার করতে পার্চে না। আমি তার পুষ্টিপোষক হব।”

—“তুমি কি সত্যিই রতনকেই তোমার জামাই করবে ব'লে স্থির কবেচ?”

আনন্দ-বাবু মস্তক আন্দোলন করতে করতে বললেন, “স্থির আমি কিছুই করিনি,—যা বললুম কথাব কথা মায়! আমি খালি বলতে চাই, রতন আমার জামাই হ'লে আমি খুব স্ত্রী হব। এ কথা রতন বা পূর্ণিমা কেউই জানে না। বিশেষ, রতন আর পূর্ণিমা দুজনেই দুজনের বন্ধু বটে, কিন্তু তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে

রাজি হবে কি না, আমিও তা জানি না—অথচ, তাদের সম্মতি আগে দরকার। তবে, তারা রাজি হ'লে আমি বাধা দেব না। এ প্রসঙ্গ আর নয়—ঐ ওরা আস্চে!”

রতন ও পূর্ণিমা সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে এল। সকলেই তাদের দিকে কেমন এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বারংবার তাকিয়ে দেখতে লাগল। রতন তা লক্ষ্য করলে, কিন্তু কারণ বুঝতে পারলে না।

কুমার-বাহাদুর হতাশভাবে ভাবতে লাগলেন, আমি এখনো অগাধ জলে তলিয়ে আছি, কিন্তু এই রতন লোকটা কি ভাগ্যবান! এখনো এ জানে না, কি

সৌভাগ্য এর জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে! মিঃ ঘোষের সমস্ত সম্পত্তি, আর পূর্ণিমার মত সুন্দরী! এ পেলে আমি এখনি সুনীতিকে ছাড়তে রাজি আছি!—ভগবানের অন্তায় পক্ষপাতিতা দেখে' কুমার-বাহাদুর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রতনের হঠাৎ স্মিত্রার কথা মনে পড়ল। কিন্তু এদিকে ওদিকে চেয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেলে না। রতন ও পূর্ণিমা ফিরে আস্বা মাত্র, সকলের অজান্তে স্মিত্রা সেখান থেকে উঠে' গেছে!

ক্রমশঃ

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

কবি

চল্‌রে কবি চল্‌,
ঐ মাঝ-আঁধিয়ার আস্‌ছে নেমে,
উঠ'বি কিনা বল্‌ ?
ঐ চেয়ে ছাখ্‌ পূব-কিনারে
মেঘ জমেছে গগন-ধারে,—
শাওন-মাঝের অন্ধকারে
ঝরতে পারে জল ;
বর্ষা-মাঝে ভরসা কিসেব ?—
চল্‌রে কবি চল্‌ ।

কোন্‌ নীরব কবি রে,—
অতল-তলে তলিয়ে গেছে
বিরাট্‌-গভীরে,—
চাকল গগন গহন মেঘে,
ঝড়ের হাওয়া উঠ'ল বেগে,

আমি তারে শুধাই রেগে—
ভেজায় কিবা ফল ?
বাদল মেঘে মাদল বাজে
চল্‌ রে কবি চল্‌ ।
উঠ'ল কবিবর,
আমায় বলে—“চলো, চলো”—
ভাঙা গলার স্বর ।
আধার নামে ভুবন ঘেরি'—
বৃষ্টি ঝরার নাইক দেরি,
বিদ্যুতেরই আলোয় হেরি—
চোখ্‌ দুটি ছল্‌ছল্‌—,
এবার বলি—“কবি, কবি—
কি হয়েছে বল্‌ !”

শ্রী সুনীমল বসু

মহীশূরে কফি-চাষ

দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশে চা রবার এবং কফির চাষের বহুল-প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক বিদেশী চা-কর রবারওয়াল এবং কফি-ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যেই ইহার এই-সব ব্যবসায়ের বহু অর্থ পাটাই হইতেছে এবং ইহাদের চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে অনেক পতিত জমিতে বেশ ভাল ফসল হইতেছে। মহীশূর প্রদেশে কফি-চাষের প্রথম অবস্থা হইতেই, অনেকে, ইহা যে কফির উৎপাদনের একটি কেন্দ্রস্থল হইবে, তাহা বিশ্বাসে পাবিয়াছিলেন। এবং কফি-চাষের ব্যাপন হইতেই অনেক ইংরেজ যুবক এখানে এই কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। প্রথমে যদিও, সময় সময়, কফি-ফসলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ এবং নিবানাব সন্দেহ হইয়াছিল, তবুও মোটের উপর কফি-ফসলের অবস্থা বদলাই বৈশিষ্ট্য ভালই চলিতেছে। প্রথম দিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মালিক ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু বদলাই এবং চা-এর চাষের জন্ম প্রায়ই কফি-ক্ষেত্রে কাজ করিবার লোকাভাব ঘটিতে লাগিল। এই কারণে এখন মহীশূরে কফি চাষ একরূপ সমবায় পদ্ধতিতে হইতেছে। এক এক জন লোক অনেকগুলি ক্ষেত্রের ম্যানেজার হইয়া কাজ চালাইতেছে। প্রথম প্রথম মাসিক ৬০ হইতে ১০০ টাকা বেতনে কফি চাষের জন্ম ম্যানেজার পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্তমান কালে এই সামান্য বেতনে লোক পাওয়া একরকম অসম্ভব, কারণ একই স্থানে রবার বা চা-এর কাজে ম্যানেজারীর বেতন অনেক বেশী।

মহীশূরে কফি-চাষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে মিঃ আর এইচ্ ইলিয়ট লিখিত "Gold, Sport and Coffee Planting in Mysore" নামক পুস্তকের উল্লেখ করিতে হয়। এই পুস্তকে কফি-ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা বহুমূল্য তথ্য আছে, তবে ইহার কতক অংশ সাধারণ পাঠকের ভাল লাগে না, তাহা কেবল ব্যবসায়ীদের উপযোগী। ইহার আর কতক অংশ সাধারণ পাঠকেরও পড়িতে বেশ ভাল লাগে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কফি-

চাষ সম্বন্ধে কোন সরকারী কেতাব বা খাতাপত্র নাই। কথিত আছে যে একজন আবব সন্ন্যাসী, আরবদেশ হইতে ২০০ বৎসর পূর্বে কফি-বীজ আনিয়া, বাবাবুদান পাহাড়ে উপর তাঁহার মন্দিরের চাষিদিকে বপন করেন। মিঃ ইলিয়ট বলেন :—

"কফি-বীজ যতদিন পূর্বেই মহীশূর প্রদেশে আনা হোক না কেন, ইহার বীজিত চাষ আবাদ কিন্তু গত শতাব্দীর (১৮) শেষ ভাগের পূর্বে হয় নাই। কফি-গাছের পরিচয় যদিও লোকে বা বহুকাল হইতেই জানিত, তথাপি ইহার ব্যবহার বেশীদিন হয় নাই।..."



একটি কফি-উৎপাদক প্রদেশ

এইসময় হইতেই কফির প্রচলন বহুলভাবে আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী হইতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ভোর বেলায় কফি তৈয়ার হয়, এবং ইহা পানে লোকদের স্বাস্থ্যও নাকি ভাল থাকে।

ভারতবর্ষের ঐ-অঞ্চলের জনহাওয়ার পক্ষে কফি অত্যন্ত উপকারী, অনেকেই এই কথা বলেন। চায়ের প্রতি যোগিতার জ্ঞাত কফির প্রচলন এখনো তেমনভাবে হইতেছে না, কিন্তু কফির ব্যবহার দিন দিন যেমনভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লোকেরা যেমন আদরের সহিত ইহার অভ্যর্থনা করিতেছে তাহাতে মনে হয় কিছুকালের মধ্যেই কফির প্রচলন সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে। বর্তমান সময়ে মহীশূরে যে কফি উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতবর্ষেই বিক্রয় হইয়া যায়, পূর্বে ইহা বিদেশে বপ্তানি হইত।



মহীশূর বাজার প্রাচীনতম কফি-বাগানের ভিতরকার বাঙ্গলো

প্রথম যে কফি মহীশূরে পাওয়া যায়, তাহাও উৎপত্তি কোথা হইয়াছে, তাহা ঠিক-মত জানা যায় না। এই কফি “চিকু” নামে পরিচিত। “চিকুমাগালুব” সহরের একটি ইহার চাষ-আবাদ হয় বলিয়াই ইহার এই নাম। ইলিয়টের পুস্তকে এই চিকু কফির বিষয় লিখিত আছে:—

“এই কফির অবস্থা গোড়াতেই বেশ আশাপ্রদ ছিল, এবং ইহার ফসল যে বছরকাল পর্যন্ত বেশ ভালই হইবে, এমন আশাও অনেকে করিতেন, কিন্তু তাহার পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিন বছর অনাবৃষ্টি-জনিত গরম ভয়ানক হওয়ায়, পোকা কফির ক্ষেত আক্রমণ করিতে আরম্ভ কবে। এইসময় এই কফি গাছের

বাড়নের অবনতি হইতে থাকে। এই অবনতি এত ভয়ানক হয় যে, যদি চাষীরা কেবলমাত্র এই চিকু কফির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত তাহা হইলে এইখানেই কফি-চাষে শেষ হইত। বাবাবুদান পাহাড়ের উপর উচ্চ জমিতে কেবল কয়েকটি ক্ষেতে কফি-চাষ ভাল করিয়া হইতে পারিত।”

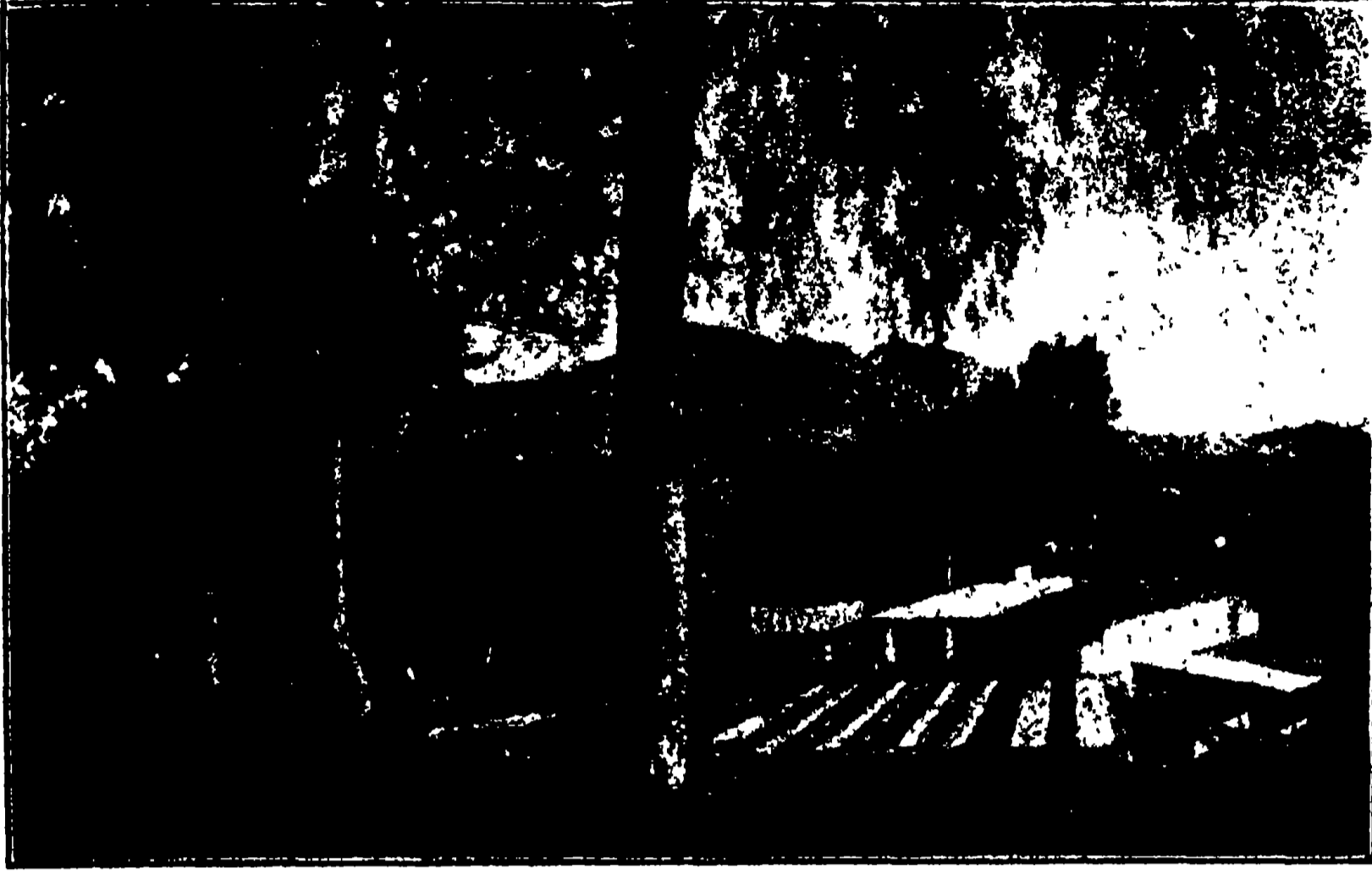
এই বিপদ এড়াইবার জ্ঞাত কুরুগু হইতে অল্প এক-প্রকাব কফির বীজ আনা হইল এবং মহীশূরের জমিতে ইহা বেশ ভালরূপে জন্মিতে লাগিল। পরীক্ষার দ্বারা যখন দেখা গেল যে কুরুগেব কফি মহীশূরের জমিতে

বেশ ভাল করিয়াই গজাইবে তখন পুরানো সব জমিতেই আবার পূর্ণ উদ্যমে কফি চাষ আরম্ভ হইল। যেখানে খালি জমি পাওয়া গেল, তাহাই খুব চড়া দবে ক্রয় করিয়া তাহাতে কফির চাষ আরম্ভ করা হইল। দিনান্তের কফিব্যবসায়ীরা এই নূতন কফি সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান বলিয়া মনে হইল না, কারণ তাহারা বলিল যে, কুরুগের কফি তাহারা মহীশূরের কফির দামে কিনিতে পারিবে না।

“কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, যে,

কুরুগের বীজ হইতে উৎপন্ন কফি-গাছগুলি যত বাড়িতে লাগিল ততই তাহাদের ফলগুলি মহীশূরের কফি-ফলের মত সমান দবের হইতে লাগিল। এবং ক্রমে এই নূতন কফি লগুনের বাজারে পুরানো মহীশূর-কফি অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রি হইতে লাগিল।”

মহীশূর-কফির দাম বেশী হইবার কারণ মহীশূরের আবহাওয়া এবং জমি খুব চমৎকার এবং কফির বীজ ছায়াতে ধীরে ধীরে পাকান হয়। ইলিয়ট সাহেব এই ছায়াতে “কফি-ফল ক্রমে ক্রমে পাকান” সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। রৌদ্র আটকাইবার জ্ঞাতই যে ছায়ায় প্রয়োজন তাহা নহে—কফিক্ষেত্রের উপর দিয়া শুষ্ক বায়ু বহিয়া যায়, তাহা রোধ করিবার



কফি-কাবুখানার একটি দৃশ্য

জন্মও বৃক্ষের ছায়ার প্রয়োজন। এই শুকনো হাওয়া যদি কোন ভিজে জমির উপর দিয়া যাওয়া-আসা করে, তবে তাহা অর্চিরেই কেঠো জমিতে পরিণত হইবে। কেঠো জমিতে কেবল কফি নয়, প্রায় কোন ফসলই ভাল হয় না। এই ছায়া রচনা করিবার দুটি উপায় আছে। প্রথম—ক্ষেত্রের উপর সমস্ত গাছ পোড়াইয়া দিয়া পুনর্বার নির্দিষ্ট স্থানে কিছুদূর অন্তর অন্তর করিয়া বৃক্ষ লাগানো। দ্বিতীয়—জঙ্গলের সমস্ত আগাছা পোড়াইয়া দিয়া, তার পর মাঝে মাঝে বড় বড় গাছও নষ্ট করা। অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে তাহাতে কফি গাছেরা যথেষ্ট পরিমাণে ছায়া হইবে এবং শুকনো হাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে। মিঃ ইলিসট এই বিষয়ে বলেন :—

“যতদূর সম্ভব পূর্বের বৃক্ষদের ছায়াদানের জন্ত রক্ষা করা উচিত, কারণ জমির উপর বৃক্ষাদি পোড়ান হইলে তাহা বৃক্ষাদি-না-পোড়ান জমি অপেক্ষা অনেক কম দিনে ভাল ফসল দেয়।”

ছায়াদানের জন্ত নানা প্রকার বৃক্ষের ব্যবহার আছে,

তবে মহীশূর প্রদেশে রূপালি ওক নামক বৃক্ষের ব্যবহার খুব বেশী হয়।

প্রথম জমি নির্বাচন করিবার সময় চাষীকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কারণ সে যদি প্রথমেই স্বাভাবিকভাবে, অথবা রৌদ্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অথবা পূর্বে হাওয়া হইতে রক্ষিত জমি পায় তবে তাহার ফসল ভাল হইবে। এই জমি যদি উত্তর, উত্তর-পূর্ব, অথবা উত্তর-পশ্চিমমুখী হয় এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসেব বৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে পায় অথচ দরকারের বেশী বৃষ্টি না পায়



কফি-বাগানের একদল কুলী-রমণা

তাহা হইলে কফির ফসলের পক্ষে আরো ভাল। প্রত্যেক দেশেই, যেখানে কফির চাষ হয়, সেখানেই একটি করিয়া কফি-চাষের উপযোগী নির্দিষ্ট সীমা (a line of coffee zone) আছে। এই সীমা বা zoneএর একমাইল এদিকে বা ওদিকে কফি জন্মিবে না। মহীশূরে ইহা বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়। কফি-গাছ স্যাংসেতে এবং গরম স্থানে ভাল হয়। কফির ক্ষেত যে-কোন রকমের বাদাটে জমিতে করা যায়। তবে



কফির বস্তাবাগী পুন

জমির উপরে গাছগাছড়াব সার উপযুক্ত পরিমাণে থাকে চাই এবং জমির নীচে বেশী পানিব না থাকেই ভাল। অনেক রকম জমিতে কফির চাষ হয়। ঘন-বৃক্ষাচ্ছাদিত জমিতে, বেশী জমিতে, কেঠো জমিতে, ইত্যাদি নানা প্রকার জমিতে কফির চাষ হয়। তবে যে-সব জমিতে গাছপালা পচিয়া সার হইয়া থাকে এবং বেশী রোদ হাওয়াও পায় না, সেইসব জমিতেই কফি সন্দাপেক্ষা উত্তমরূপে হয়। জমি স্থির করা হইয়া গেলে পর, জমির উপরেব আগাছা এবং

অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে হইতে যেমন করিয়াই হোক সরাইয়া ফেলিতে হয়। গরম কালে যে-সমস্ত গাছ বেশ ঘন ছায়া দেয় কিন্তু বন্যাব সময় বিশেষ ছায়াদান করে না, কেবল, সেই সমস্ত বৃক্ষই কিছুদূর অন্তর অন্তর রক্ষা করিতে হইবে। এই-সমস্ত কাৰ্য্য হইয়া গেলে পর সারি সারি খোটা পতিয়া ছয় ফুট লম্বা ছয় ফুট চওড়া ক্ষেত্র তৈরী

করা হয় ও তাহার মধ্যে এক ফুট চওড়া দুই ফুট গভীর করিয়া গর্ত খোঁড়া হয়। এইগর্তে কচি চারা বসাইয়া দেওয়া হয়।

কফির চারা যেখানে প্রথম গজান হয়, সেই স্থানটি ভারি চমৎকার। যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়, এমন একটি পরিষ্কার জায়গা স্থির করা হয়। ঐ জমিটি দুই ফুট গভীর করিয়া খনন করিয়া পাথরশূন্য করা হয়। তার পর জমিটিকে বেশ পরিষ্কার করিয়া এবং সার ঢালিয়া বীজ লাগাইবার উপযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক চারফুট অন্তর জমির মধ্যে চলাফেরা করিবার জন্য পথ রাখা



কফির গুঁটি বাছাই করা হইতেছে

হয়। বীজ লাগাইবার ছয় সপ্তাহ পরে অঙ্কুর দেখা দেয় এবং অঙ্কুর আট ইঞ্চি লম্বা হইলে পর দুইটি ডিম্বাকৃতি পাতা তাহাতে গজায়। তাহার পর দশ মাস এই শিশু-কফিগাছকে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। দশ মাস পরে শিশু-গাছগুলিতে ৬৭টি করিয়া কচি-কচি ডাল গজায়। তার পর বসাকালে বৃষ্টিপাতের আরম্ভের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ক্ষেত্রে কফি-গাছগুলিকে লাগাইয়া দেওয়া



কফি খাবাপ গুঁটি বাছাই করা হইতেছে

হয়। অনেকে, বীজ হইতে অঙ্কুর
গলাইবার পর তাহাতে এক জোড়া
পাতা যখন ফুটিয়া উঠে তখন,
প্রত্যেকটি চারা-গাছকে এক-একটি
ছোট ঝুড়িতে করিয়া রাখে। ক্ষেতে
লাগাইবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে
হয় যেন চারার প্রধান শিকড় কোন
রকমে ঝাঁকিয়া না যায়। চারাকে
বেশ শক্ত করিয়া লাগাইতে হয়।
চারা লাগাইবার দ্বিতীয় বৎসরে
গাছের মাথা ছাঁটাই করা হয়। গড়ে
তিন ফুট করিয়াই ছাঁটিতে হয়।
কেহ কেহ অবশ্য দুই ফুট বা চার
ফুট
করিয়া ও গাছ ছাঁটে।



কফি শাস ছাড়ান

তৃতীয় বৎসরে গাছে ফল ধরা আরম্ভ হয়। কিন্তু সপ্তম
বৎসর না আসা পর্যন্ত চাষী পূর্ণ ফসলের আশা করিতে
পারে না। এই সময় চাষীর সবচেয়ে চিন্তা এবং
উদ্বেগের সময়। এপ্রিল মাসের বৃষ্টি পাওয়ার পর কফির
ফুল হয়। এই সময় যদি বৃষ্টি সামান্য কয়েক বিন্দু কম
হয়, তবে চাষীর সমস্ত আশা ভরসা চলিয়া যায়। তাহার
হাজার হাজার টাকার লোকমান হয়। এপ্রিল মাসে
জল-হাওয়া নিয়ম মত পাইলে ডিসেম্বর নাগাদ ফল ঝাড়াই
হইতে পারে। প্রথমে লাল ফলগুলিকে তুলিয়া ঝুড়িতে
করিয়া ওজন করিবাব এবং দুইবার স্থানে লইয়া আসা
হয়। জলের বেগে ফলেব উপরেব পাতলা খোসা
ছাড়িয়া যায়। তাব পব ২৪ ঘণ্টা কাল ফলগুলিকে জল
হইতে ছাঁকিয়া গাজিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ফলের
উপব যে সামান্য শকরা থাকে তাহা দূত হয়।
হাল্কা ফলগুলিকে বাছিয়া ফেলা হয় এবং অবশিষ্ট ভাল
ফলগুলিকে শুকাইবাব জগ ম'ড়নের উপর ছড়াইয়া
দেওয়া হয়। মারো মারো ফলগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া
দিতে হয় এবং শুকাইতে প্রায় একদিন সময় লাগে।
মাতরে একদিন থাকিবাব পব ফলগুলিকে দীবে দীবে
শুকাইবার জগ নির্দিষ্ট ভূমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।
কফি ফল বেশ ভাল করিয়া শুকাইয়া গেলে পর

তাহা বাজারে পাঠাইবার বা চালান দিবার উপযুক্ত হয়।

কফি-চাষের বিষয় সামান্য একটু বলা হইল। এই কার্য্য বাহির হইতে সঙ্গ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক

তাহা নয়। তবে একদল লোকের কাছে কফি-চাষ বিশেষ ভাল লাগিবে, কারণ এই কার্য্যে জঙ্গলের খোলা হাওয়াতেই বেশীর ভাগ সময় যাপন করিতে হয়। শিকার ইত্যাদির আনন্দও যথেষ্ট পরিমাণে ইহাতে আছে।

ব

ডঙ্কা-নিশান

নবম পরিচ্ছেদ

বঙ্কক-পুরুষ

কিরাতগ্রাম থেকে কুমার চন্দ্রগুপ্ত বৈশালীর দ্বারগ্রামে পৌঁছে, মন্ত্রী শকটারের মুখে শুনলেন—বৈশালীর সাত্ত্বম মহামাণ্ড্য নগর-জ্যেষ্ঠ গলায় কুঠার বেঁধে এবং দাঁতে তৃণ ক'রে মগধের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গলায় কুঠার বাঁধার অর্থ এই যে, জয়ী মগধ ইচ্ছা করলে ঐ কুঠারেই তাদের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচ্যুত করতে পারেন, তার জন্তে অস্ত্র অস্ত্র খ'জতে যেতে হবে না। আর দাঁতে তৃণ করার উদ্দেশ্য, মগধের তুলনায় যারা তৃণভোজী জীবের সামিল, গোবেচারী ব'লে মগধ তাদের মার্জনা করলে গোহত্যাটা আর ঘটতে পায় না। মোট কথা বঙ্কক-দুর্গ এখন মগধ-সেনার ক্রপার অধীন। সমস্ত শুনে চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন—“হঠাৎ এদের মতি-পরিবর্তনের কারণ?”

“শুনলুম 'শ্রী'-মহাদেবীর উৎসব উপলক্ষে পণ্য-বোধিকার বেনেরা আলোর মালায় নগর সাজিয়েছিল। ঘি-মাখা সলতের ঘিয়ের লোভে ইঁদুরে নাকি একটা প্রদীপ উল্টে ছাড়, তাইতে বাজাবে অগ্নি-কাণ্ড হ'য়ে শস্তাগার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে; বৈশালীর হঠাৎ আত্ম-সমর্পণের এই হ'ল মুখ্য কারণ।”

“এখন ক'রব?”

“সেইজন্তেই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে এখানে আনানো। বর্তমানে আমাদের ক'রব্য কি, সে-বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ ক'বা প্রয়োজন মনে ক'রেই তো

আপনাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মগধ থেকে সেনা-ভোজ্য ঠিকমত আসছিল না। তার উপর স্নানকত্রের চিঠিতে জানলুম, মহারাজের শারীরিক অবস্থাও তেমন ভালো নয়। এঅবস্থায় আমাদের এখানে আর বেশী দিন থাকা সম্ভবও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। সুতরাং বৈশালী যে আত্মসমর্পণ করেছে, সেটা আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে।”

“কিন্তু বৈশালী পূর্বেও অমন অনেকবার আত্মসমর্পণ ক'রে, পরে, মগধের পল্টন পিছন ফিবলেই নিজমূর্তি ধারণ করতে বিলম্ব করে নি। সুতরাং এবার এদের একটু কায়দায় ফেলতে চাই। সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের কুলপুত্রদের ভিতর থেকে জনকয়েক বঙ্কক-প্রতিভু নিতে চাই, তা হ'লে সন্ধি-বন্ধন অটুট রাখতে এরা বাধ্য হবে, কারণ অগ্রথা করলে বঙ্কক-প্রতিভুদের প্রাণ যাবে। সন্ধি পাকা করবার এই এক পন্থা আছে, অগ্র পন্থা অবশ্য বৈশালীদুর্গের উচ্ছেদ-সাধন।”

প্রথম শকটার স্মিতমুখে বললেন—“আপনি প্রবীণের মতন কথা বলেছেন। আমি ইতিমধ্যে সন্ধিপত্রের একটা খসড়া প্রস্তুত করেছি। আমার প্রথম প্রস্তাব হ'চ্ছে—মগধের রাজকুমারের হস্তে বৈশালীর মহাসম্মতের কণ্ঠ্য-সমর্পণ। দ্বিতীয় প্রস্তাব, বৈশালীর কুলসজ্জের শ্রেষ্ঠ কুলের অন্ততঃ দশজন কুলপুত্রকে সন্ধি-বন্ধনের বঙ্কক-প্রতিভু স্বরূপ পাটলিপুত্রে অবস্থানের জন্তে প্রেরণ। আর তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বৈশালীর পাঁচখানি দ্বার-গ্রাম মগধকে দান। তৃতীয় প্রস্তাবে সম্মত না হ'লে, অকারণ যুদ্ধ বাধানোব দণ্ড স্বরূপ

দশ কোটি মুদ্রা দণ্ডকর দিতে হবে, তা নইলে বৈশালীর সমস্ত অধিকারে, মগধের নির্দিষ্ট রাজপুরুষ অর্থাৎ মগধের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।... অবশ্য যতদিন দণ্ডকরের টাকা শোধ না হয় এ শাসন-প্রতিষ্ঠা ততদিনই বলবৎ থাকবে।”

চন্দ্রগুপ্ত ঘাড় নেড়ে বললেন—“শেষের সর্ভে বৈশালী সম্মত হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আমি উচ্চিন্ন সন্ধির পক্ষপাতী নই।”

শকটার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—“কুটুপিতা না হ’তেই কুটুপ-প্ৰীতির উদয় হ’ল নাকি?”

চন্দ্রগুপ্তের মুখ লাল হ’য়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ ‘আত্মসংবরণ ক’রে বললেন—“আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না, আমার বক্তব্য এই, যে, রাজধানী থেকে যখন নিয়মিত সৈন্যভোজ্য আসছে না, তার মানে ইন্দ্রমুর্তির দল প্রবল হয়েছে। মহারাজের অস্থখ দেখে এসেছি, সম্ভবতঃ তাঁর পীড়ার বৃদ্ধি ঘটেছে, আর আপনি এইমাত্র বললেন স্নানক্ষত্রও তাই লিখেছেন। আর স্নানক্ষত্র না লিখলেও এটা অনুমান করা কঠিন নয়, কারণ, তিনি স্নান থাকলে সৈন্য-ভোজ্য একপ অব্যবস্থা ঘটত না। তদ্ভিন্ন কিরাত-গ্রামে যাবার ঠিক আগে পার্টিলিপুত্র থেকে কিছু সৈন্য প্রার্থনা করেছিলাম। এপর্যন্ত সৈন্যও পাই নি, চিঠির উত্তরও পাই নি। মহারাজের পীড়া সত্যিই বৃদ্ধি হয়েছে; সুতরাং আমাদের চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। এ অবস্থায়, শত্রু যখন নিজে থেকেই শরণাপন্ন হয়েছে, তখন তার গলায় পা না দিয়ে একটু উদারতা দেখালে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। সন্ধির সর্ভ নিয়ে তর্ক ক’রে দিন কাটাতে মতন দীর্ঘ সময় আমাদের হাতে নেই। রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে, মহারাজের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকা পুত্র হিসাবে আমার কর্তব্য, এবং উত্তরাধিকার হিসাবে আবশ্যিক।”

“কিন্তু বৈশালী যদি এরূপ আপনা থেকে আত্মসমর্পণ না করত? তা হ’লে তো বিলম্ব করতেই হ’ত।”

“রাজনীতিতে ‘হ’তে পারত’র জায়গা নেই। যা হয়েছে বা যা হ’তে পারে, শুধু তাই নিয়েই আমাদের

কার্যবার। মগধের বিচক্ষণ মহামাত্যকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য বলে বিবেচনা করি।”

“আপনি রুষ্ট হবেন না, আমি আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম।”

“আপনি আমার হিতৈষী, আমি আপনার উপর রাগ করতে পারিনে। যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করি দমন করবেন।”

শকটার প্রসন্নমুখে বললেন—“কুমার, আমি আপনাকে মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাট বলেই মনে করি। তা ছাড়া এ অভিযানেব আপনি সেনাপতি। সেইজন্মে আপনার সঙ্গে পরামর্শ অবশ্য-করণীয় বলে মনে করি।”

চন্দ্রগুপ্ত বললেন—“আমার মতামতের খুব বেশী মূল্য আছে বলে আমি মনে করিনে। কারণ, আমি জানি আপনাদের কাছে আমি বালক। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাই বললাম। বললাম বলেই যে সে মত গ্রহণ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আপনি বহুদর্শী, বিচক্ষণ; বর্তমান ক্ষেত্রে আপনি যা শ্রেয় মনে করেন তাই করবেন। যুদ্ধেব প্রয়োজন হয়, আদেশ করবেন, আমি যথাসাধ্য করতে ক্রটি করব না। কিন্তু রাজনীতির পাকা চাল চালা কাঁচা মস্তিষ্কের কর্ম নয়।”

“তা হ’লে সন্ধির সর্ভ এখন লিখে পাঠানো যাক?”

“ক্ষতি কি?... ভালো কথা, বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে মহারাজকে না জানিয়ে পাকা করা উচিত হবে কি?”

“সময় অল্প, নইলে নিশ্চয়ই জানাতাম। আর তা ছাড়া বীরপুরুষেরা বলেন,—শত্রুর দুর্গ দখল করতে বা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করতে দিনক্ষণ দেখবারও অবকাশ নেই; আর অন্নের মতামত নেবারও অবসর নেই; ও ভগবানের নাম ক’রে নিয়ে ফেলতে হয়। তাব পর তিনি যা করেন।”

দশম পরিচ্ছেদ

সীমা-সাক্ষী

শকটার বিদায় হ’য়ে নিজের শিবিরে চ’লে গেলে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁর একজন বাহুৎসার বা শরীর-রক্ষীকে ডেকে মসীপাত্র ও লেখনী চাইলেন। অনেক দিন

মাঘের খবর পান নি, তাই মাকে চিঠি লিখবেন। তাছাড়া মহারাজকেও লিখতে হবে। মসীপাত্রে কজল নেই দেখে বাহুসারকে কাঁজলের চেষ্ঠায় শিবিবাস্তুরে পাঠিয়ে কুমার নিজের বিয়ের প্রসঙ্গটা কিভাবে চিঠিতে প্রথমে উত্থাপন করবেন তাই মনে মনে ভাবছিলেন। বাহুসারের বিলম্ব দেখে হঠাৎ মাথা তুলে তাঁবু দরজার দিকে চাইতেই বিস্ময়ে তাঁর মন ভরে উঠল। আপাদ-মস্তক ধলোয় আচ্ছন্ন একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরই তাঁবু দিকে আসছে। কাছে এসে লোকটা ঘোড়া থেকে নেবে কবজোড়ে চক্রগুপ্তকে নমস্কার করলে।

“একি! গোপক তুমি! হঠাৎ এখানে?”

“আজ্ঞে হ্যা! বড়ো পাঠিয়ে দিলে।”

“বড়ো? বন্ধগোপ?”

“আজ্ঞে।”

“সে কি? কোনো বিপদ হয় নি তো? পাহাড়ীগুলো সন্ধি ভঙ্গ করে সেনাগুলে হানা দিয়েছে নাকি?”

“আজ্ঞে না, সন্ধি বরং আবার পাকাই হয়েছে। সীমাসাক্ষী পাওয়া গেছে।”

“পাওয়া গেছে?...আমি যে বারণ করেছিলুম... তোমার ভাই কি কাউকে হত্যা করলে নাকি?”

“আজ্ঞে, না। আপনি চ’লে আসার পর, ক’দিন ধ’রে উৎসবই চলছিল। শেষদিনে আমাদের গোয়ালার হুখামত মহিষের দঙ্গলে শকর ছেড়ে দিয়ে শিঙের গুঁতোয় শকর বলির আয়োজন করা হয়। কিন্তু মহিষ ওখানে বেশী পাওয়া গেল না। তাই চমবীর দঙ্গলেই শকর ছাড়া হয়। চমবীরীগুলো একাজে অভ্যস্ত নয়, শকর দেখে কেমন ভড়কে গেল। শকরটা পালাচ্ছিল; আমাদের মেজো তাকে আটকাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়; তাতে শকরটা দাঁত দিয়ে তাঁর পেট চিরে দ্বায়। সমস্ত নাড়ীভূঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। জানাশুনা গাছগাছড়াও পাওয়া গেল না। পাহাড়ীবা বললে—বাঁচবে না। তাই শুনে’ মেজো বললে, যখন বাঁচবেই না তখন আমাকেই সীমা-সাক্ষী করা হোক। বড়ো বারণ কবেছিল, কিন্তু মেজো কিছুতেই শুনলে না। সেপাইদের সঙ্গে

যুক্তি ক’রে নিশী’-রাতে কখন যে সে সীমান্তে গিয়ে হাজির হয়েছে তা কেউ জানতে পারে নি। তার পরদিন সকালে যখন খোঁজ পড়ল, এবং অনেক আতিপাতি ক’রেও মেজোকে পাওয়া গেল না, তখন বড়ো বললে— ‘তাই’লে সর্কনাশ হয়েছে, সে সীমা-সাক্ষী হ’তে সীমান্তে গেছে। বড় একগুঁয়ে সে, কাল বলেছিল আমি কান দিই নি। ..বোধ হয় সর্কনাশ হয়েছে।’

“তখন সীমান্তের দিকে যাওয়া হ’ল। রোহিণী নদীর উৎসেব কাছে পৌঁছে দ্যাখা গেল বড়ো যা বলেছিল তাই,—গলা পর্যন্ত মাটিতে পোতা আমাদের মেজো, খালি মাথা বেরিয়ে আছে; আর তার পিঠে পিঠ দিয়ে একটা পাহাড়ী,—তারও গলা পর্যন্ত পোতা! লোকটা দিন দুই আগে আমাদের একজন সেপাইকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে, সেপাইবাই তাকে গ্রেপ্তার করে; সেপাইবাই তাকে মেজোর কথায় এনে, মেজোর সঙ্গে জীবন সমাপ্তি করে। আমরা যখন গেলুম, তখনো মেজোর দেহে প্রাণ ছিল। বড়োকে দেখেই ক্ষীণ স্বরে বললে—‘বড়ো, মগধের সীমা এইবার পাকা হ’ল।’ তার পরেই শিবনেত্র হ’য়ে গেল। ..বড়ো পাগলের মতন হু’হাতের দশটা আঙুল বঁড়শীর মতন শক্ত ক’রে মাটি আঁচড়ে তুলে ফেলছিল...হঠাৎ মেজোর মরা মুখের পানে চেয়ে বিভবিড় ক’বে কি বলে, শেষে চোঁচিয়ে বলে উঠল—না, ভাই, তোর শেষ ইচ্ছে আমি পূর্ণ করব না। গ্রামে যখন ফিরিয়ে নিখে যেতে পারলাম না, তখন তুই যেখানে থাকতে ইচ্ছে করেছিলি সেইখানেই তোকে রেখে যেতে হবে। তোর মুমুক্ষু মুখের সত্যপালনই তোর সংকার।... অল্পকম সংকারের চেষ্টা ক’রে তোর আত্মাকে আর কষ্ট দেব না। থাক, ভাই, এইখানেই থাক, এই তোর কামনার স্বর্গ, এইখানেই তোর চৈতন্য নিষ্কাশন ক’রে দেব।... সীমা-সাক্ষীর কথা শুনে পর্যন্ত তুই সাক্ষী-প্রতিষ্ঠার জন্তে ব্যস্ত হয়েছিলি। জানিনে সীমাসাক্ষী হবার লোভে এ তোর ইচ্ছামৃত্যু কি না।”

এই পর্যন্ত বলে গোপক ঝরঝর ক’রে কঁদে ফেললে। তরুণ চক্রগুপ্ত শোকাক্ত এই গোয়ালার ছেলের হাত ছুটো নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ’রে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে

রইলেন। তাঁর কপালের শিরগুলো দেখতে দেখতে ফুলে উঠল। তার পর একটা অসহ ব্যথাকে যেন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্তে বেগে দুই-একবার মাথা নাড়া দিলেন। তার পর ভাই-হারা রাখাল-ছেলের হুঃখে, সমবেদনায়, মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাটের পাথরের

মতন নিশ্চল মূর্তির দুই চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। বকুগোপের মৃত্যুজয়ী ভাইয়েব শেষ তর্পণ রাজপুত্রের চোখের জলে সমাপ্ত হ'ল।

(অসম্পূর্ণ)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলসূত্র

(১)

একজন লোককে যদি অল্প একটু জল দেওয়া যায়, তা হ'লে সে সম্ভবতঃ সেটুকু খাবে—তা দিয়ে পা ধোবে না। জলের পরিমাণ যদি একটু বাড়ান যায়, তা হলে হয়ত খাওয়া ছাড়া, রান্না বা অপর কোন খুব দরকারি কাজে সে কিছু জল ব্যবহার করবে। যদি একটু একটু করে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে চলা যায়, তা হলে দেখা যাবে, যে, সে ক্রমে ক্রমে কম প্রয়োজনীয় ব্যবহারেও জল খরচ করবে। অর্থাৎ পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে কমে যাবে। এর থেকে একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে, যে, কোন ভোগ্যের, ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘকে, তৃপ্তিদানের ক্ষমতা, সেই ভোগ্য ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘের দ্বারা কি পরিমাণে ভুক্ত হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে, এবং পূর্কভুক্ত ভোগ্যের পরিমাণ যতই বেশী হয়, ততই, নূতন করে যা আসে, তাব প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এমন কি, এমন সময় আসতে পারে, যখন ভোগ্যের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে তার প্রয়োজনীয়তা বা তৃপ্তিদানের ক্ষমতা লোপ পেয়ে তার একটা অপ্রয়োজনীয়তা বা অতৃপ্তিদানের ক্ষমতা ধ্বংসগ্রহণ করে। যথা, যদি পূর্কোক্ত লোকটিকে তিরিশ কোটি ঘড়া জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে তার তৃপ্তিলাভের পথে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হবে। এর থেকে একটি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে। সেটি এই, যে, ভোগ্যের প্রয়োজনীয়তা (তৃপ্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যদানের ক্ষমতা) ক্রমশঃ বিলীয়মান। এক কথায়, একে ভোগ্যের ক্রমশঃ

বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা বলা যায়। এক গেলাস জল যদি এক ব্যক্তিকে ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, দুই গেলাস জল তাকে ২ ক অপেক্ষা কম স্বাচ্ছন্দ্য দান করবে, দশ গেলাস জল হয়ত তাকে সব শুদ্ধ ৬ ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করবে। দশ গেলাস জল যদি একব্যক্তিকে না দিয়ে দশ ব্যক্তিকে এক গেলাস করে বা ৫ গেলাস করে দুই ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তা হলে সেই একই দশ গেলাস জল থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কি না ভোগ্যসমষ্টি ভোগ্যসমষ্টির মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করা হবে, তার উপর ভোগ্যের স্বাচ্ছন্দ্যদান-ক্ষমতা নির্ভর করে। কেন না, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ্যের মনের একটা অবস্থা মাত্র, ভোগ্যী ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অর্থ হয় না। একজনকে যদি অতি-ভোজন করান যায়, আর দুইজনকে অর্ধভোজনে রাখা যায়, তা হলে যে-পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে, তার চেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে যদি তিনজনকেই পরিমিত ভোজন করান হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, একই পরিমাণ ভোগ্যের নানান পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ক্ষমতা আছে এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য তা হতে পাওয়া যাবে, তা ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর নির্ভর করবে। এ-বিষয়ে কেহী কিছু বলার আগে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুটি কথা বলা দরকার।

প্রথম কথা হচ্ছে এই, যে, কোন ভোগ্যের থেকে তৃপ্তি আহরণ করতে হলে সেই ভোগ্য বস্তু অন্তত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। তার চেয়ে কম পরিমাণ থাকলে কিছুমাত্রও তৃপ্তি তা হতে পাওয়া

যায় না। যথা, দশ ফোঁটা জলকে সেই তৃপ্তি-দানারস্তের সীমালক্ষ্য ফোঁটা, অর্থাৎ দশ ফোঁটার কম জল থেকে কেউ কোন তৃপ্তি পেতে পাবে না। তৃষ্ণার্তকে দশ ফোঁটার কম জল দিলে তার তৃপ্তির পরিবর্তে অতৃপ্তিই হবে। দশ ফোঁটার থেকে যদি জলের পরিমাণ এক এক ফোঁটামাত্র করে ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তা হলে কিছুদূর অবধি তার তৃপ্তিদান-ক্ষমতা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল থাকে এবং তার পবে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে তার তৃপ্তিদান-ক্ষমতা কমতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে, কোন ভোগ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত কম হলে ভোগ্যের প্রথমে অতৃপ্তিলাভ হয় (যখন তার পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে অর্থাৎ আশ্রয়দান দিয়ে শুধু ভোগের ইচ্ছা বাড়িয়ে এবং অভাবটা ভাল করে' বুঝিয়ে দেয়), তার পবে হয় (অল্পদূর অবধি) ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীল ভাবে তৃপ্তিলাভ, তারপবে সম্ভবত কিছুদূর তৃপ্তিলাভ অপরিবর্দ্ধনশীল থাকে, অতঃপবে তৃপ্তিলাভ বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে হয় এবং অত্যধিক পরিমাণে ভোগ্যের মাধ্যমে বাড়াতে পুনর্বার অতৃপ্তির সূত্রপাত হয়। (আমাদের দেশে জলকষ্ট দিয়ে শুরু করে' বগা অবধি এলে এই সত্যের একটা উদাহরণ পাওয়া যায়।) দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, যে, কোন কোন স্থলে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম খাটে না। যেমন মাতালের মদ খাওয়া। মদের নুমাত্রা বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে মাতাল আরও খেতে চায়। তার তৃপ্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলে (এক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায়, যে, ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বা তৃপ্তিদান-ক্ষমতার ক্ষেত্রে অল্পদূর অবধি না থেকে এত বেশীদূর অবধি চলে, যে, তা শেষ হবার আগেই মাতাল ভোগশক্তি রহিত হয়ে পড়ে)। অথবা ডাকটিকিট-সংগ্রাহকের টিকিটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তিও বেড়ে চলে। (অবশ্য এস্থলে টিকিটগুলিকে এক নামে চালালেও সেগুলি সব বিভিন্ন প্রকার, সুতরাং সবগুলি একজাতীয় ভোগ্য নয়। যদি কোন সংগ্রাহক ভারতবর্ষের পঞ্চম জর্জের মুখ ছাপা এক আনা দামের টিকিটই শুধু সংগ্রহ করে, তা হলে টিকিটের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তি বেড়ে

চলে কি না সন্দেহ)। আর আছে রূপণ। সে যতই জমায়, তার জমাবার ইচ্ছা ততই বেড়ে চলে। (এস্থলে অবশ্য প্রথমতঃ বলা যায়, যে, রূপণতা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার প্রকাশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, যে, এক্ষেত্রেও ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বহুদূরব্যাপী হয়ে রয়েছে। তৃতীয়তঃ বলা যায়, যে, রূপণ ত ভোগ্য-বিশেষ জমায় না, সে জমায় টাকা, অর্থাৎ কি না, সাধারণ ভাবে কিনবার ক্ষমতা। এসব ছাড়া কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ক্রমাগত জমিয়ে যাবার ইচ্ছা বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করছে বলা শক্ত। 'আরও চাই' বলার মানে এ নয়, যে, 'আগে যা পেয়েছি তাতে যে অন্তপাতে তৃপ্তিলাভ করেছি পরে যা পাব তা থেকেও সেই অন্তপাতে বা তার চেয়ে বেশী অন্তপাতে তৃপ্তি পাব'। চতুর্থ গেলাম জল যদি কেউ চায়, তার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, তার কাছে প্রথম তিন গেলামের প্রয়োজনীয়তা চতুর্থ গেলামের তুলনায় কম। অসাধারণ উদাহরণগুলি নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু শুধু ক্র-বিসয়টি নিয়েই তা হলে অনেক লিখতে হয়। এইসব উদাহরণের অস্তিত্বের জন্য আমাদের মূল বিষয়ের বিচার আটকায় না।

বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা একটা সাধারণ নিয়ম। বিশেষ বিশেষ স্থলে বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বহুদূরব্যাপী স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুই কারণেই হতে পারে। তাতে কিছু যায়-আসে না।

আগেই বলা হয়েছে যে একই পরিমাণ ভোগ্য বা ভোগ্যসমষ্টির বিভিন্ন পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যদান করার ক্ষমতা আছে, এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে, তা নিতর করে ভোগ্যসমষ্টি বণ্টন কি ভাবে হয়, তার উপর। এই সত্যের মূলে রয়েছে ভোগ্যের বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা। সামাজিক আয় একটি ভোগ্যসমষ্টি এবং সে-ভোগ্যসমষ্টি ভোগ করে সমাজভুক্ত ব্যক্তির। এখন, সামাজিক আয়টি কি অন্তপাতে এই ব্যক্তির পায়, তার উপর, সেই আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে, তা নিতর করে। এক ব্যক্তি সমগ্র সামাজিক আয়ের অর্ধেক এবং আরও দশজনে বাকি অর্ধেকের

ছয় আনা পরিমাণ পেতে পারে। হয় ত দশ হাজার লোক পাবে দুই আনা পরিমাণ। এটা মোটেই উৎকৃষ্ট রকমের বিভাগ হল না। বণ্টনপ্রণালী পরিবর্তন কবে' স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির ক্ষেত্র এখানে খুবই রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে, একই পরিমাণ সামাজিক আয় বণ্টন-প্রণালী পরিবর্তনের ফলে * বিভিন্ন প্রকার সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারে।

যদি কোন ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগান যায়, তা হলে সেই ভোগ্যের পরিমাণ বলে একটা কিছু থাকবে নিশ্চয়ই। পরিমাণ কি ভাবে ভাষায় প্রকাশিত হবে, তা, ভোগ্যটি কি এবং কোন সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা উপর নির্ভর করে। যেমন, কখন সের, পাউণ্ড বা কিলোগ্রাম হিসাবে তা প্রকাশিত হবে, কখন গজ বা মিটার হিসাবে, কখন দণ্ডা হিসাবে (সময় হিসাবে, যেমন গাড়ীভাড়া, চাকরের মাইনে, মাষ্টারের বেতন, ইত্যাদি), কখন সংখ্যা হিসাবে, কখন ও বা শক্তি, পরিধি বা পন্থ পরিমাপক অথবা কোন ভাষায় * আমরা সাধারণতঃ বিশেষণের সন্নিহিত জন্ত সব ভোগ্যের পরিমাণকে মাত্রায় প্রকাশ করব। যেমন এক মাত্রা কাপড় বা তৃতীয় মাত্রা চাল। আমাদের শুধু কয়েকটি সহজ বুদ্ধির কথা মনে রাখতে হবে। যেমন :- দুই মাত্রা এক মাত্রার চেয়ে বেশী, দশ মাত্রা কুড়ি মাত্রার চেয়ে কম, তৃতীয় মাত্রার কথা বলে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রা যে আছে, এটা ঠিক। বিশেষ বিশেষ স্থলে সব-কিছু বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হবে, কিন্তু সাধারণ ভাবে 'মাত্রা' কথাটাই চলবে।

কয়েক মাত্রা ভোগ্য যদি কারুর থাকে, তা হলে কোন ব্যবহারে তাকে লাগালে যেমন মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া যাবে, তেমন বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে পরের মাত্রাগুলি আগের গুলির চেয়ে কম স্বাচ্ছন্দ্য দেবে। কাজেই একই ভোগ্যে যদি একের বেশী ব্যবহারে লাগান যায়, তা হলে, কোন ব্যবহার বিশেষে অতিরিক্ত মাত্রায় সেই ভোগ্যটি না লাগিয়ে,

সব ব্যবহারে হিসাব করে' লাগালে একই পরিমাণ ভোগ্যের থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্তি লাভ হবে। কেউ যদি একশ মাত্রা সূতা কেটে থাকে, সে-সূতা দিয়ে ধুতি, গামছা, বিছানার চাদর, উড়ানি প্রভৃতি অনেক-কিছু প্রস্তুত করতে পারে (অর্থাৎ সূতার অনেকগুলি ব্যবহার আছে)। সে যদি শুধু ধুতিই প্রস্তুত করে তা হলে প্রয়োজনাত্মিক পুঁতি দিয়ে তাব স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি খুব হবে না। পুঁতি প্রস্তুতে দশম মাত্রা সূতা লাগালে তার যদি ক পরিমাণ তৃপ্তি লাভ হয়, একাদশ মাত্রা ঐ একই ব্যবহারে লাগালে যদি তা থেকে ১ ক পরিমাণ তৃপ্তি লাভ হয় এবং গামছা প্রস্তুতে প্রথম মাত্রা সূতার তৃপ্তিদান ক্ষমতা যদি ২ ক পরিমাণ হয়, তা হলে পুঁতি তৈরীতে দশম মাত্রার পর আর একাদশ মাত্রা সূতা ব্যবহার না করে' সেই সূতাটুকু প্রথম মাত্রা রূপে গামছা তৈরীতে লাগালে ১ ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওয়া যাবে। সুতরাং কোন মাত্রা ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগানোর পক্ষে দেখা উচিত, যে, অথবা কোনো ব্যবহারে লাগিয়ে তা থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় কি না।

যে-মাত্রার ব্যবহারে কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক কম প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি হয়, সেই মাত্রা সেই ক্ষেত্রের (ব্যবহারের) সীমাস্থিত মাত্রা (marginal dose) এবং সেই মাত্রা সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার কবে' যে-টুকু প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়, সেই প্রয়োজনীয়তাটুকু হচ্ছে সেই ভোগ্যের সেই ক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা (marginal utility)। একটি ভোগ্যের যদি চার রকম ব্যবহার থাকে, তা হলে, যে পরিমাণ ভোগ্য আছে, তা এমন ভাবে ঐ চার ব্যবহারের মধ্যে ভাগ কবে' দিতে হবে, যে, সব ক্ষেত্রেই যেন সেই ভোগ্যের সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হয়, অর্থাৎ যেন কোন ক্ষেত্রেই সেই ভোগ্যের সীমাস্থিত মাত্রা অথবা ক্ষেত্রের সীমাস্থিত মাত্রার চেয়ে কম প্রয়োজনীয়তা নী দেয়। কেন না সে রকম স্থলে যে ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়, সেখানেই ভোগ্যটুকু ব্যবহৃত হলে স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওয়া যাবে! সর্বাধিক সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হলে তা থেকে মোটে সর্বাধিক বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যাবে এবং

* যেমন Horse power, candle power, foot pound, calory grammes, acres, sq. feet, cubic feet, ইত্যাদি।

সমান হওয়া সম্ভব না হলে যত বেশী সমতার দিকে যাবে ততই প্রয়োজনীয়তা বেশী পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ

মাত্রা	প্রথম ব্যবহারে	দ্বিতীয় ব্যবহারে	তৃতীয় ব্যবহারে	চতুর্থ ব্যবহারে
১ম	১০ ক পরিমাণ	৯ ক পরিমাণ	৮ ক পরিমাণ	৭ ক পরিমাণ
২য়	৯ ক "	৮ ক "	৭ ক "	৬ ক "
৩য়	৮ ক "	৭ ক "	৬ ক "	৫ ক "
৪র্থ	৭ ক "	৬ ক "	৫ ক "	৪ ক "
৫ম	৬ ক "	৫ ক "	৪ ক "	৩ ক "
৬ষ্ঠ	৫ ক "	৪ ক "	৩ ক "	২ ক "
৭ম	৪ ক "	৩ ক "	২ ক "	১ ক "
৮ম	৩ ক "	২ ক "	১ ক "	০ ক "
৯ম	২ ক "	১ ক "	০ ক "	০ ক "
১০ম	১ ক "	০ ক "	০ ক "	০ ক "

উপরের তালিকা মত যদি কোন ভোগ্য থেকে প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়, তা হলে প্রথম ব্যবহারে দ্বিতীয় মাত্রা ভোগ্য লাগানর পূর্বে দ্বিতীয় ব্যবহারে প্রথম মাত্রা লাগান স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবে না। প্রথম ব্যবহারে দ্বিতীয় মাত্রা লাগানও অপচয় হবে। দ্বিতীয় ব্যবহারে দ্বিতীয় মাত্রা লাগানর পূর্বে চতুর্থ ব্যবহারে প্রথম মাত্রা লাগানও অপচয় হবে। যদি ভোগ্য শুধু বার মাত্রা পরিমাণ থাকে, তা হলে চারটি ব্যবহারে তিন তিন মাত্রা লাগালে সবশুদ্ধ প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যাবে $(১০ + ৯ + ৮) + (৯ + ৮ + ৭) + (৮ + ৭ + ৬) + (৭ + ৬ + ৫) = ২৭ + ২৪ + ২১ + ১৮ = ৯০$ ক পরিমাণ।

এইরূপ করিলে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা প্রথম ক্ষেত্রে হচ্ছে ৮ক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৭ক, তৃতীয় ক্ষেত্রে ৬ক ও চতুর্থ ক্ষেত্রে ৫ক, অর্থাৎ কি না অসমান। আগেই বলা হয়েছে, যে, সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সকল ক্ষেত্রে সমতা যত বাড়বে ততই প্রয়োজনীয়তা বেশী পাওয়া যাবে। এখন উপরের তালিকা মত অবস্থাতে (মাত্রাব ভগ্নাংশ ছেড়ে দিলে) সর্কোপেক্ষা সমতাবক্ষা হয় প্রথম ব্যবহারে পাঁচ মাত্রা, দ্বিতীয় ব্যবহারে চার মাত্রা, তৃতীয় ব্যবহারে তুই মাত্রা ও চতুর্থ ব্যবহারে এক মাত্রা লাগালে; তাতে পাওয়া যাবে— $(১০ + ৯ + ৮ + ৭ + ৬) + (৯ + ৮ + ৭ + ৬) + (৮ + ৭) + (৭) = ৬০ + ৩০ + ১৫ + ৭ = ১১২$ ক পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা, অর্থাৎ সর্কোপেক্ষা ২ক বেশী।

এর থেকে আমরা একটি সাধারণ নিয়ম পাচ্ছি।

সেটিকে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সাম্য বা অধিকতম প্রয়োজনীয়তা লাভের উপায় বলা যেতে পারে।

ব্যবহারকে ব্যক্তির স্থান দিলে এর সঙ্গে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়মের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যবহারের বাছে ভোগ্যের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বিলীয়মান। এবং বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর তার প্রয়োজনীয়তা-দানক্ষমতা নির্ভর করছে।

(২)

ভোগ্য উৎপাদন কি ভাবে হয়, এখন তা দেখতে হবে। ভোগ্য উৎপাদনের প্রধান উপকরণ তিনটি প্রকৃতি (nature), মানুষ (labour) ও মূলধন (capital)। প্রকৃতি আমাদের যা কিছু ভোগ্য বা তার উপকরণ দেয়, তাকে প্রকৃতি বলা হচ্ছে। যথা জমি, জল, বায়ু, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। মানুষকে প্রকৃতির থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ মানুষের বিশিষ্টতা এই যে, সে শুধু ভোগ্য উৎপাদনের একটা উপায় মাত্র নয়; সে ভোগ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যও বটে। মানুষের দ্বারা এবং মানুষের জন্ম ভোগ্য উৎপাদিত হয়। প্রকৃতিদত্ত উপকরণগুলির জন্ম মানুষকে কোনো শ্রম করতে হয় না। অবশ্য এদের ভোগযোগ্য করে তুলবার জন্ম শ্রম অনেক ক্ষেত্রেই করতে হয়; কিন্তু সে অন্য কথা। এরা যে আছে, সে মানুষ থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। যে-ক্ষেত্রে মানুষের শ্রমের সাহায্য ছাড়া প্রকৃতি উপভোগ্য হয় না, সে-ক্ষেত্রে প্রকৃতি শুধু উপকরণ রূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

মানুষ বলতে মানুষের শ্রমই বুঝায়। প্রকৃতির কাছ থেকে ভোগ্য আদায় করে নিতে শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। ধরা যাক, সমুদ্রে অনেক মাছ আছে। মানুষ যদি নিজের শ্রমে সেই মাছ ধরে আনে, তা হলে তাকে কি শুধু প্রকৃতির দান বলা চলে? মাছের যে তৃপ্তিদানের ক্ষমতা, সে শুধু মাছের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। অতল জলের তলায় যে মাছ রয়েছে, তাকে কি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে ভোগ্য বলা যায়? সুবিধা মত স্থানে মাছের স্থিতি না হলে তার তৃপ্তিদানক্ষমতা থাকে না। এবং ভোগ্যের স্থিতি মানুষের দিক থেকে যত বেশী সুবিধামত স্থানে হবে, ততই তার তৃপ্তিদানক্ষমতা বেশী। যেমন,

ব্যাপারী মাছ গৃহস্থের দরজায় এনে দিচ্ছে, সেইজন্যই ব্যাপারীর শ্রমের একটা মূল্য আছে। সে মাছের তৃপ্তি-দানক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে, বলা যায়। জ্বলে কাঠ আছে বলে' দিলে, ত, গৃহস্থের উত্তন জ্বলে না; কাজেই কাঠের শ্রমের একটা মূল্য আছে। সে, কাঠ যে-খানে কাজে লাগবে, সেইখানে এনে দিচ্ছে, অর্থাৎ কিনা কাঠের তৃপ্তিদানক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অল্প ভাষায় বলা যায়, যে, কাঠের প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জ্বলের কাঠ, আর নিজের শ্রমে তাকে করে' তুলছে উত্তনের কাঠ। কয়লার খনির কুলি প্রকৃতির কাছে পায় মাটির তলার কয়লা, আর নিজের শ্রমে তাকে করে' তুলছে মাটির উপরের কয়লা। মুক্তা-উত্তোলক প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জলের তায় শুষ্কি, আর নিজের শ্রমে তাকে করে' তুলছে গলার হারের মুক্তা। জ্বলের কাঠ ও উত্তনের গোড়ার কাঠ, মাটির তলার কয়লা ও মাটির উপরের কয়লা, জলের তলার শুষ্কি ও গলার হারের মুক্তা, এসবের কি প্রয়োজনীয়তাসিদ্ধির ক্ষমতা বা প্রয়োজনীয়তা সমান? দ্বিতীয় গুলির যদি প্রয়োজনীয়তা বেশী থাকে, ত, বেশীভাগটা আসছে কোথা থেকে? উত্তর :- মানুষের শ্রমশক্তি থেকে।

প্রাকৃতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন করে' কেমন করে' মানুষের শ্রম তার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে, তা আমরা দেখলাম। এখন দেখব, কি করে' বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিষ মিলিয়ে বা প্রাকৃতিক জিনিষের আকৃতি পরিবর্তন করে' শুধু শ্রম-সাহায্যে (বা অল্প কোন প্রাকৃতিক জিনিষের সাহায্যে) মানুষ ভোগ্য উৎপাদন করে। রন্ধন, নানা জিনিষ মিলিয়ে ভোগ্য উৎপাদনের একটি উদাহরণ। তাপের ও জলের সাহায্যে মাটি থেকে ইট তৈরী করা আর-একটি উদাহরণ। মানুষের শ্রম কেমন করে' প্রকৃতিকে ভোগযোগ্য করে' তোলে এর দ্বারা বোঝা যায়।

নানা জিনিষ মিলিয়ে দেওয়া বা একটার সাহায্যে আর-একটিকে বদলান, বিশ্লেষণের দিক থেকে জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। আলুর স্থিতি ক্ষেত থেকে কড়ায়, এনে ফেলা এবং সেট একই কড়ায়

পটল, মশলা, মুন ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে এনে ফেলা ও কড়ার তলায় তাপের সংস্থান দ্বারা রন্ধন হয়। একে প্রাকৃতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন ছাড়া আর কি বলা যায়?

মাছের গুঁড়ি কেটে চেঁচে টেবিল তৈরী করা শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক জিনিষকে নতুন আকৃতি দেওয়ার উদাহরণ। বড় জোর অল্প কিছু মিশ্রণে তাকে পালিশ করে' তোলা হয় বা তার অংশগুলিকে একত্র রাখা হয়। কাঠ ও পালিশ একত্র স্থাপন, কাঠ ও পালিশের স্থিতি পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। কাঠকে টেবিলের আকৃতি দান করাও কাঠের নানা অংশ বাদ দিয়ে বাকি-টুকু রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, যে, মানুষ নিজস্ব শ্রমে বাদ দেওয়া অংশগুলির স্থিতি পরিবর্তন করল।

এখন দেখতে হবে মূলধন কি। মূলধন সেই ধন, যা অল্প ধন উৎপাদনের মূল। যে-ধনের সাহায্যে নতুন ধন উৎপন্ন হয়, তাই মূলধন। কিন্তু তা হলেও মূলধন ধন ছাড়া আর কিছু নয়। অল্প সব ধনেব মত প্রকৃতি ও মানুষের সাহায্যেই মূলধন উৎপন্ন হয়। কেবল ভোগের উদ্দেশ্যে মূলধন উৎপাদন করা হয় না, ভোগ্য উৎপাদনের সহায়তার জন্যই মূলধন উৎপাদিত হয়। অবশ্য ভোগের জন্য যা উৎপাদন করা হয়, তাকেও মূলধনরূপে অনেক সময় ব্যবহার করা যায়। মূলধনকেও ভোগ্য বলা চলে, যদিও তার ভোগ অল্প ভোগের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কাল ধরে' হয়।

প্রকৃতির থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে' মানুষ একটি জাহাজ তৈরী করল। আর করল লোহার ঝড়শী ও তাঁতের দড়ী এবং মাছ ধরার জাল। এগুলি মানুষ অবিলম্বে ভোগ করতে পারবে, এ-আশায় উৎপাদন করেনি। আশা এই, যে, বহুকাল ধরে' এরই সাহায্যে সমুদ্রের মাছ ধরা যাবে। এখন এই জাহাজ ও মাছ ধরার সরঞ্জাম হচ্ছে মূলধন। মূলধন ভোগ্য হলেও সাক্ষাৎ ভাবে নয়। কেউ কেউ মূলধনের কোন কোন শ্রেণীকে যন্ত্রজাতীয় ভোগ্য নাম দেন।

কিন্তু একথা বলে' রাখা দরকার, যে, মূলধন হলেই

যে তা অবিলম্বে ভোগ্য হবে না, তা নয়। যেমন, একখানা নৌকা। মাছ ধরার জন্ত ব্যবহৃত হ'ল এটা মূলধন; আবার বেড়িয়ে বেড়ানোর জন্তে ব্যবহৃত হলে তা নয়। কেননা, ব্যবহারক তার সাহায্যে কিছু উৎপাদন করছেন না, তা থেকে তৃপ্তিই আহরণ করছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে, ভোগ্যটি মূলধন কিনা তার বিচার হয়, সেটি কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দিয়ে। মূলধন কি এবং কি মূলধন নয়, এ নিয়ে অনেক কট তর্ক চলে। সে সব বাদ দিয়ে আমরা শুধু বলে নিচ্ছি, যে, যে মূল

সাক্ষাৎভাবে ভোগ্য উৎপাদনের সহায়ক রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই মূলধন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, প্রধানতঃ প্রকৃতি ও মানুষ এই দুয়ের সাহায্যেই ভোগ্য উৎপাদন হয়। এবং কোন কোন ভোগ্য ভবিষ্যতে ভোগ্য উৎপাদনে সহায়তা করবে, এই উদ্দেশ্যে উৎপাদিত, রক্ষিত এবং ব্যবহৃত হয় (যথা, মনুষ্য ইত্যাদি)। এদের নাম মূলধন। সুতরাং মূলধনকে আশ্রয় করে মূলধন ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণ তিনটি—প্রকৃতি, মানুষের শ্রম, ও মূলধন।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

বিদ্রোহী

সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই। কিন্তু বেশ মনে আছে, টিয়ে-পাগীর পালকেব মত গাছের পাতাগুলির উপর জ্যোৎস্নার দারা সেদিন একেবারে ঢলের মত ক'রে নেমে এসেছিল। আর সেই জ্যোৎস্নায় বাগানের শ্বেত-পাথরের মূর্তিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, যুগের দেশের রাজকন্তেরা জ্যোৎস্নার দাবা ব'য়ে নেমে এসে কোন রূপকথাব রাজপুত্রের জীয়নকাঠির স্পর্শে অপেক্ষা ক'বে দাড়িয়ে আছে। কাঁচ দিয়ে সমান ক'বে ছাঁটা মেহেদি-গাছের বেড়াটাকেও সেদিন আব বেড়াব মত দেখাচ্ছিল না—দেখাচ্ছিল একটা মায়াপুরীর দেয়ালের মত যার ভিতরে চোকুঁবাব পথের সন্ধান কেউ কখনো পায়নি।

সেই নিস্তরতা ও রহস্যের বাণীতে শ্বেত জ্যোৎস্নার মাঝখানে একটা বেঞ্চে পাশাপাশি এসে বসলুম—আমি আর নীলা। আমার বকের ভিতর তখন যে হাতুড়ীর আঘাত ছুপদাপ ক'রে পড়ছিল তার বাস্তা, প্রাণগণ চেষ্টাতেও নীলাব কাছ থেকে গোপন করতে পেরেছিলুম কি না সে কথা আজ হলপ ক'বে বলতে পারি নে।

বেঞ্চেব উপর ব'সেই নীলা আমার একটা হাত তার পদ্মফুলের দলের মত হাত দুটোর ভিতর তুলে নিয়ে বলল—তোমাকে যে ফিরতে হবে শরৎ-দা।

শরৎ-দার হঠাৎ যে কেন শরৎ-দার পদবীটা লাভ করল তার কারণ ঠিক ধরতে না পেরে তার দিকে বিস্মিত বিস্মল চোখ তুলে চাইতেই সে আবার বলল—অস্বীকার করো না শরৎ-দা, তোমার সমস্ত দেহটা আমাকে ব'লে দিচ্ছে এই হত ভোগ্য দেহটার প্রলোভন তুমি জয় করতে পারছ না। কিন্তু জয় যে তোমাকে করতেই হবে। যে রূপটার দিকে তাকিয়ে তুমি আমাকে লাভ করবার জন্ত ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছ, সেটা যে আজো এমন অটুট আছে তার কারণ, ও-জিনিষটা আমার পাথর হ'য়ে গেছে। যে জিনিষ পাথর হ'য়ে যায়, চোখের মাপ-কাঠিতে তার পরিবর্তন দর পড়ে না। কুৎসিত কদাকার ছাইগুলোও যে পাথরের চাইতে কত ভালো তা তুমি বুঝবে না—কিন্তু আমি তা বুঝি। আমার অভিলাষ এইজন্যই অহল্যাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে নি—তাকে পাথর ক'রে রেখেছিল।

আমার হাতটা হাতের ভিতর চেপে ধ'রেই নীলার কণ্ঠস্বর বেদনায় ভাবী হ'য়ে খেঁচো গেল। তার স্পর্শ আমার বকের ভিতর দিয়ে মদের নেশার মত সঞ্চারিত হ'য়ে ফিরতে লাগল।

আমি বললুম—নীলা, মনের তুকুম মেনেই আমি দরিদ্র্য তরী ভাসিয়েছি। জানি নে কূল কখনো মিলবে

কি না—মেনে ভালোই, না মেনে তা নিয়েও জোর-জবাবদস্তি কখনো করতে যাব না। মনকে যারা হুকুমে ফেরাতে পারে তাদের সাধনা আমার নেই এবং সে সাধনার জন্ত আমি লোভও কখনো করি নে। আমাকে গ্রহণ কবা না-করা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু ঐ ফেরবার হুকুমটা না দিলেও চলত।

আমাতটা হয়তো একটু বেশী বকমের কড়া হয়েছিল। নীলাব চোখেব জল আমার হাতের উপর শরৎ-প্রভাতের দম্কা হাওয়ায় খসে-পড়া শেফালী-দলের মত ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে সে বললে না, না, এ হুকুম নয় শরৎ-দা—এ আমার মিনতি,—আমার প্রার্থনা—আমার ভিক্ষা। একটা জীবন ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জুংগ যে কত তা জেনেছি ব'লেই আর কোনো জীবন নিয়ে খেলবাব সাহস আর আমাব নেই। আমার জীবনের ইতিহাসটা আগে শোনো, তার পরে আমাব বিচার ক'রো।

* * * * *

নরেশ রাযকে তোমাব মনে আছে কি না জানিনে। কিন্তু মনে থাকাব কথা। কাবণ, তুমি এসে আমাদের মজলিসে যোগ দেওয়ার পরেও কিছুদিন সে ছিল। ঝাব, যে তাকে একবার দেখেছে তার পক্ষে তাকে একে-বাবে ভুলে যাওয়া আমি তো অসম্ভব ব'লে মনে করিনে। সে ছিল একটা type, তার পায়ের গোড়ালি থেকে চুলের ডগাটি পয্যন্ত ছিল বৈশিষ্ট্য ভরা। লম্বা, বাতাসে হেলে-পড়া মত চেহারা। অথচ তাকে দেখলেই মনে হ'ত ঝড়ের সম্মুখে পথ রোধ ক'বে দাঁড়াবার জন্তই সে মরিখা হয়ে বয়েছে, ঝড় তাকে ভেঙে না ফেলে হেলিয়ে দিয়ে যেতে পারবে না। রংটা তার আগুনের মত দপ্ দপ ক'রে জলত। বাঙালীর ভিতর ও-রকমের ঞং বড় বেশী দেখা যায় না। সবচেয়ে সুন্দর ছিল তার চোখ। সে যখন চোখ তুলে তাকাত তখন মনে হ'ত, অকুল পাথার জলের ভিতর দুটি নীলোৎপল সৃষ্টির প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে যেন ফুটে উঠেছে।

ইংরেজীতে কাঙ্ক্ষা কাঙ্ক্ষ হয়ে সে যেদিন কলেজ

হতে বেরিয়ে এল, সেই দিনই বাবা তাকে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ীতে আমার সঙ্গে তার পরিচয় কবিযে দেবার জন্তে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে সে আমার অভ্যর্থনা করতে কিছু মাত্র কৃপা বোধ কবেনি।

আমি তাকে কতটা ভাল বেসেছিলুম জানিনে, কিন্তু তার প্রতি হিংসেয় আমার মন যে ভ'রে গিয়েছিল তা আমি ভাল ক'বেই জানতুম। পুরুষের অত সৌন্দর্য্য আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতিলুম না। কেমন একটা ছেদ চ'ড়ে গেল আমাব তাকে জয় ক'রবার জন্ত এবং জয় ক'রে জয় ক'রবার জন্ত। তার স্বযোগ উপস্থিত হলে সে-স্বযোগকে আমি কখনো ব্যর্থ হতে দেইনি।

সেদিন বসাব বাদল আকাশের কানায় কানায় নিকম-কালো কেশের বাণি এলিয়ে দিয়েছে। আর তার কাজল-আঁকা চোখ দুটি ছাপিয়ে যে-জলের দারা উপ্চে পড়ছে তাবই ঝাপ্টায় দবণী ভিজে একেবারে তরুণ হয়ে উঠেছে। মেঘের মায়া-লোকের ভিতর মানুষের মন যে হঠাৎ হাবিয়ে নিকদেশ হয়ে যেতে পারে সে-কথাটা সেই দিন প্রথম আমার কাছে বরা পড়েছিল। এই হারিয়ে-যাওয়া মন নিয়ে আমি জানালার দারে ব'সে আছি, নরেশ-বায় এসে ঘরের ভেতর ঢুকেই একখনা চেয়ার টেনে প্রায় আমার গা ঘেঁষেই ব'সে পড়ল। আমি কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে বিদ্রূপের ঝালটা ঝাঁঝিয়ে তুলে বললুম—কি নরেশ-বাবু,—এই বাদলায় অভিসারে বেরিয়েছেন বুঝি ?

নরেশ আমার মুখের দিকে তার তারার মত জল্জলে চোখ দুটি তুলে দ'রে বলল—অভিসারেই বেরিয়েছি বটে, কিন্তু সে-অভিসার তোমারকাছেই নীলা, আর কারো কাছে নয়। আমি আজ তোমার পায়ের তলায় নিজেকে নিবেদন ক'রে দিতে বেরিয়েছি।

আমি হেসে উঠে বললুম—আপনি বুঝি সবে মাত্র রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতাগুলো প'ড়ে এসেছেন, আর তার ঘোর এখনও কাটেনি! কিন্তু বাস্তব জীবনের ভিতর নরেশ-বাবু যেখানে-সেখানে কবিতা টেনে আনবার চেষ্টা করলে তাতে সামাজিক আইন-কানুন বিধি-

নিষেধগুলোর প্রতি বিশেষ স্মৃতিচারণ করা হয় না, এটা বোঝবার বয়স আপনার হয়েছে। একলা পেয়ে আমাকে অপমান করবেন না আপনি!

আমার কথার ভিতর যে জ্বালা ছিল,—বুঝতে পারলুম তা চাবুকের মত নরেশকে স্পর্শ করল। সে বিশ্বয়ে ব্যথায় গুম্বরে উঠে বলল—অপমান,—একে তুমি অপমান মনে করছ নীলা! না না, এ যে আমার কেবল মুখের কথা মাত্র নয়! কথার ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত হৃদয় যে আজ বেরিয়ে এসেছে, আমার সমস্ত মন যে তোমার পায়ের কাছে আপনাকে বহন ক'রে এনেছে আপনাকে বিকিয়ে দেবাব জগে—কেন এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না?

তার কান্নার মত আর্তি করণ স্বর আমার কানে পৌঁছালেও মনের দোরে ঘা দিতে পারলে না। আঘাতের বেতটা সমান জ্বারের সঙ্গেই নিষ্ফেপ ক'রে আমি বললুম—আপনার হৃদয়টাকে আপনি যত বড় একটা চিহ্ন ব'লে মনে করেন, নরেশ-বাবু, সকলে যদি তা মনে করতে না পারে, তবে সম্ভবতঃ সেটা 'পেনাল কোডের' কোন ধারার ভিতর পড়বে না। কিন্তু আপনি বার বার আমাকে নাম ধ'রে ডাকছেন কেন বলুন তো? সে অধিকার তো আমি আপনাকে কোন দিন দিইনি।

হঠাৎ বিদ্যুতের 'শক' লাগলে মানুষের সব দেহ যেমন এক মুহূর্তে শিথিল হ'য়ে এলিটুয়ে পড়ে, আমার কথার আঘাতে তার দেহটাও তেমনি প্রথমে চেয়ারের উপর এলিয়ে পড়ল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে সোজা হয়ে পায়ের উপরে ঠাঁড়িয়ে বলল—Alright নীল-, adieu! তার পর আর একটি কথাও না ব'লে সে ঘর হতে বেরিয়ে গেল। চেয়ে দেখলুম আমি—তার মুখের ভিতর কোথাও এতটুকু বক্ত নেই। বাহিরে মেঘের বুকে যে হাহাকারটা জ্বগে উঠেছে সেই হাহাকারটা যেন মূর্তি নিয়ে তার চারিপাশেও জ্বগে উঠেছে, সে চলছে কিন্তু পা সে ঠিক রাখতে পারছে না,—বহুকালের রক্ত রক্তহীন দুর্বলের মত থর থর ক'রে তার দেহ টলছে। নিজের নিষ্ঠুরতায় শিউরে উঠে আমি, ডাকলুম—নরেশ-বাবু—নরেশ!—কিন্তু সে-ডাক তার কানে পৌঁছাল না।

* * *

হঠাৎ নীলা শুরু হয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম নীলা তো নয়—অবিকল শ্বেত-পাথরে খোদাই-করা শোকের একটি করুণ মূর্তি।

চোখভরা এক কলস জল নিয়ে আমি বললুম—থাক নীলা,—আমি আর শুন্তে চাইনে।

রোদের-আঁচে-শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের মত একটু ম্লান হাসি হেসে নীলা বলল—এর পরের কথাগুলো আর আমাকে বলতে হবে না ভাই! নরেশের তিনখানা চিঠির ভিতর দিয়েই তার ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে। এ-চিঠিগুলো বাক্সে রেখে আমি সোয়াস্তি পাইনে। আমার বুকের কাছে যে জায়গাটাতে কলিজার ভিতর প্রাণের ইঞ্জিনটা দাপাদাপি করছে তারি একান্ত নিকটে এগুলোকে রেখে দিচ্ছি। সেইখানে জ্বগে থেকে এরা রাত্রি দিন আমাকে পাহারা দিচ্ছে। নরেশের দেহের স্পর্শ আমি কখনো পাইনি। কিন্তু তার মনের মদে যে লেখাগুলো মাতাল হয়ে উঠেছে তারি স্পর্শ ফুলের বনের বুকের গন্ধ যেমন বাতাসকে ঘিরে রাখে তেমনি ক'রে আমাকে ঘিরে রেখেছে।

বুকের ভিতর হ'তে গাটাপার্চারের স্বচ্ছ পাতলা খাম-খানি খুলে নিয়ে চিঠি ক'খানা আমার হাতের ভিতর গুঁজে দিয়ে নীলা বলল—টেঁচিয়ে পড়।

চিঠিগুলোর গায়ে নম্বর আঁকা—এক, দুই, তিন। প্রথম নম্বরের চিঠিখানা খুলে নিয়ে আমি পড়লুম—

ইয়োরোপের পথে—

তারিখ—খোজ রাখিনে।

নীলা,—ঘরের মানুষকে তুমি পথের উপর এনে দাঁড় করিয়েছ—পথ—যার শেষ নেই—সীমা নেই—যে মনের ইচ্ছার মতই অফুরন্ত। বেহুইনের মত অগাধ অবাধ জীবন—ঝড়ের হওয়ার মত দিগ্বিদিকে ছুটে চলেছে—কখনো দিগন্তবিলীন মরুবালুকার বুকের রেণুগুলো উড়িয়ে ছড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে, আবার কখনো বা ধরণীর কটিতটের অঞ্চলের মত নীলের ছোপে ভরা প্রান্তরের বুকের উপর দেহভারটাকে এলিয়ে দিয়ে। পাহাড় তার উদ্ধত মাথা তুলে আমাকে ডাকছে, সহর তার কল-কোলাহলের স্তুতি-গান দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করছে!—

আজ আমার আচ্ছাদনহীন মাথার উপর মেঘের মাদল বেজে উঠেছে। তার গর্জ্জানিতে ধরণীর মূর্ছাহত বুকটা 'তুলে' 'তুলে' কাঁপছে।

মেঘের বৃকের এই যে গর্জ্জন—এর সঙ্গে আমার মনের গর্জ্জানির কিছু মাত্র তফাৎ নেই! ওর বৃকে যে ক্ষুধা থেকে থেকে খরখরিয়ে উঠছে, সে ক্ষুধায় আমার অন্তর ভরে গেছে। ওর ক্ষুধার হাহাকারের আকাশ-ভাঙার কান্নার সুরে ছুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ভোলপাড় পড়ে' গেছে, কিন্তু আমার এ বুক-ভাঙা কান্নার হাহাকার বারো কানে পৌঁছচ্ছে না। অত বড় আকাশের বুকটাতে মেঘের এ ক্ষুধা কে জাগিয়ে দিয়েছে জানিনে, কিন্তু আমার বৃকের ক্ষুধা কার চারিপাশ ঘিরে হাহাকারে ফেটে পড়ছে তা তুমিও জান—আমিও জানি।

না গো!—না—না। আমি ভিক্ষার আজ্ঞে নিয়ে তোমার কাছে দরবার করতে আসিনি। ক্ষুধা আমার যেমন তীব্র, ভিক্ষা আমার তেমনি অদৃশ্য। তাই মাঝামাঝি রফার ধার আমি ধারিনে। আমার পণ—হয় জয় করব, না হয় জয়ের যুদ্ধে মরণকে বরণ ক'রে নেব। জয় করতে পারিনি, তাই ছুটে' চলেছি মরণের পথে। এ পথ কোথায় শেষ হবে কেউ তা জানে না। তবুও এই নিরুদ্ধেশ যাত্রার পথটা অভিসার-যাত্রার ভয়াকুল আনন্দের মতই আমাকে পেয়ে বসেছে। মৃত্যু-বধুর মুখের ঘোমটা খুলে' তার রূপটা দেখে' নেবার জন্যে আমার মনটা আজ মেতে উঠেছে—তোমাকে পাবার জন্যে সেদিন আমার মনটা যেমন ক'রে মেতে উঠেছিল ঠিক তেমনি ক'রে।

সমুদ্রের লীলা, তরঙ্গের দোলায় তুলে ফেনায় ফেনায় ফুলে' উঠে, আমার পায়ের তলায় বেলা-তটের বৃকের উপব আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র, নীলা, ঠিক তোমার নীল চোখ-ছুটোর মত—তেমনি নীল—তেমনি উজ্জল—তেমনি অথই পাথার। তোমার চোখের চেহারা যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যা', এর চেহারাও তেমনি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ছুটে' চলেছে। এই মুহূর্তে হাসির তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে, পর মুহূর্তেই আবার বিদ্রূপের অট্টহাস্তে চারিদিকে ফেনার বৃদ্বুদ ছড়িয়ে ফেটে পড়ছে। তোমার খেয়ালী চোখছুটোর মতই এরও

খেয়ালের অন্ত নেই। এই মুহূর্তে এ যাকে মাথায় তুলে' নাচাচ্ছে, পর মুহূর্তেই নাগিয়ে দিচ্ছে কোথায় কোন্ অন্ধকার আবর্তের আর্তনাদের মাঝখানে।

ইঠাৎ কেন জানিনে, ঘুরে' ঘুরে' সেই দিনের কথাই আজ মনে পড়ছে,—যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম—যে দিনের প্রভাত আমার জীবনে যা বহন ক'রে এনেছে তার চাইতে বড় সুখও কেউ আমাকে কখনো দেয়নি, তার চাইতে বড় দুঃখও কেউ আমাকে কখনো দিতে পারবে না। তোমাকে দেখে সেদিন আমার মনের ভিতর কোন্ প্রসঙ্গটা অকস্মাৎ আনমনে জেগে উঠেছিল জান?—

“বৃন্থহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি'

কবে তুমি ফুটিলে উর্ধ্বশী!”

তোমার ডান হাতে সূদাপাত্র আর বাম হাতে বে বিঘ-ভাণ্ড সেই প্রথম দেখার দিনেও আমার মনের অন্তর্যামী দেবতার কাছে সে খবরটা ছাপা ছিল না। হয়ত মনের এক কোণে তখনি পিছিয়ে পড়'বাব ইচ্ছাও জেগে উঠেছিল। কিন্তু পারিনি গো—তা পাবিনি। তুমি জান কি না জানিনে, এক রকমে সাপ আছে যার দৃষ্টির খপ্পরে পড়লে কোন জানোয়ার আপনাকে সবিয়ে আনতে পারে না। তোমার চোখেও যে সেই সাপের চোখের মায়াকাজল কতটা ঘনীভূত হয়েছিল—আজ তা বুঝতে পারছি, আর তোমাব উপব স্নগায় আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠছে। তোমার স্পর্শ—তোমার বিদ্রূপ আমাকে কতবার আঘাত করেছে, আর তাবি সঙ্গে-সঙ্গে কালো মেঘের ঢেউ কতদিন আমার ননব আকাশ নিবিড় ক'বে দিয়ে গেছে। ঐ বুকটার ভিতর যে উদ্ভত স্পর্শা ফণীর মত ফণা 'তুলে' ফোঁস ফোঁস করছে তাকে টেনে বের ক'রে এনে কেটে টুক'বো টুক'বো ক'রে ফেল'বার জন্যে, তাব রক্তাক্ত স্নপিণ্ডটা পায়ের তলায় থেংলিয়ে দেবার জন্যে একটা দারুণ ইচ্ছা সময়ে সময়ে আমার মাথায় অন্ধুরের আঘাত ঠেকেছে। কিন্তু তোমার ঐ বিদ্রূপের প্রলয়-ঝঞ্ঝার পিছনে যে অপরূপ সৌন্দর্য ছিল, তার মোহ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তোমার সেই মায়াবী চোখের আকর্ষণের খপ্পর হ'তে আমি বে' আমাকে মুক্ত ক'রে আনতে

পেরেছি—এ আমি আমার বহু সৌভাগ্যের ফল বলে মনে করি। এ মুক্তি তুমি আমাকে দাওনি—এ আমি অর্জন করেছি আমার নিজের সামর্থ্যের জ্বারে। আমার এ শক্তির বহর—এ স্বাধীনতার আনন্দ তুমি বুঝবে না, কিন্তু যদি আবার কাউকে খপ্পরে ফেলতে পার এবং সে যদি এমনি করে মুক্তিলাভ করতে পাবে তবে সে বুঝবে। আর যে পলে পলে তোমার পেয়ালের আগুনে আপনাকে আহুতি দিতে থাকবে সেও বুঝবে।

এর পরেও যদি আমি তোমার কাছে থাকতুম নীলা, — তবে কি করতুম জান? ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাবুকে আর-একবার তোমাকে মাযেস্তা করতে চেষ্টা করতুম—পাকা ঘোড়ামোয়ারেবা যেমন করে বদমাইস ঘোড়াকে চাবুকের চোটে মাযেস্তা ক'বে তোলে।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে—এ চিঠি তোমাকে কেন লিখছি? তাব কোনো কৈফিয়ৎ নেই। লিখেছি পেয়ালের বোঁকে, ডাকেও দিলম পেয়ালেব বোঁকেই। তোমাব পেয়াল হ'ব পোডো—না হ'ব পায়ের তলায় মাড়িয়ে মেয়ো।

নবেশ

দ্বিতীয় পদ

প্যারিস
তারিখ—১০ই মে

ফের প্যারিসে ফিরে এসেছি। লগুনে আমার মন টিকল না। লগুনেব সেই গস্তীব অতিব্যস্ত ধোঁয়াব কুণ্ডলীর ভিতর আমার মন হাঁপিয়ে উঠছিল—নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল। এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে নৈচেছি।

ফরাসী জাতটার দিকে যতই তাকাচ্ছি ততই এদের উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এরা কাজকে গ্রহণ করে গস্তীব মুখে নয়—হাসি দিয়ে। জীবন ভারী পাথরের মত এদের বৃকে চেপে বসে না, হাওয়ার মত হালকা পাকলে' এদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। লঘু হাত দিয়ে এরা তাকে তুলে' নেয়, স্নিগ্ধ হাস্য শেষ ক'রে নামিয়ে রাখে।

অথচ ছুনিয়াকে ফরাসী জাতটা কি দেয়নি? ছুনিয়ার সাহিত্যের ধনভাণ্ডার ফরাসীর জহরতে ভরপুর, শিল্পকে এরা নতুন ক'রে মূর্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে, যে 'ডিগো-ক্রেসির' হাওয়া ছুনিয়ার দস্ত ও স্পর্কার উকত মাথাকে ঠুইয়ে দিয়ে সকলে সঙ্কে মিশিয়ে দিয়েছে এই ফরাসীব মন থেকেই তার উদ্ভব। এরা রক্কে-রাঙা মাটির উপর 'দিয়ে হাসির হাওয়া ছড়িয়ে চ'লে যায়, তাতে এদের লঘু নৃত্যের তালভঙ্গ হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

'কাকো'তে ব'সে আছি। হঠাৎ আমার চাবিদিঙ্ক কলহাস্তে মুখরিত হয়ে উঠল। বাতাসে মদের ফেনাব মত নেশার আমেজ চারিয়ে গেল। সদ্য-ফোটা হেনার মিষ্ট উগ্র গন্ধ ফোষাবার মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়ল। চোখ ফিবিযে নিয়ে দেখি—সুর-সভাতলে অপ্সরীব নৃত্য শুরু হ'য়ে গেছে, অপ্সরীদের বসনাঞ্চল খ'সে পড়েছে, কবনী টুটে' বেণী এলিয়ে গেছে, হস্ত হাদেব লীলায়িত। নতোনত দেহটাকে ছাপিয়ে তাদের অপূর্ণ গতিভঙ্গী লীলার স্বর্ণা ন্যবিয়ে দিয়ে চলেছে।

ভোগ করছি—জীবনেব পানপাত্র পূর্ণ ক'রে আমার এ উৎসবের মদ উপ'ড়ে পড়'ছে। বৈচে গেছি নীলা,—বৈচে গেছি, যে, তুমি আমাকে বাধ'তে চাওনি! কি সম্পদ ছিল তোমার ঐ দেহটার উপকর্থে?—যার গর্ভে পরাটাকে সবার মত পাখে মাড়িয়ে চলেছিল; আমাব সূর্যের মত দীপ্ত প্রেম উপেক্ষার মেঘে ঢেকে দিতে কুণ্ঠা বোধ করনি! একবার সত্যিই মনে হ'য়েছিল, আমি দেউলিয়ে হ'য়ে গেছি তাই তোমাকে জয় করতে পারলুম না। কিন্তু এখানে এসে সে হুল আমার ভেঙে গেছে। বাদের পায়ের কাছেও তুমি দাঁড়াতে পার না এমন হাজার নারী তাদের অন্তরের পানপাত্র পূর্ণ ক'বে করণ নেত্র আমার দিকে চেয়ে আছে, যাব পানপাত্রটা আমি গ্রহণ করব সেই আপনাকে সার্থক মনে করবে। এই তো জীবন! এর আকাশ নীলের ছোপে ভরা—তাজা তরুণ—তারায় তারায় আলোময়। সমুদ্রের দোলার মত এর অশান্ত অরাস্ত দোলা শিরায় উপশিরায় রক্তের কণাগুলি নাচিয়ে দিয়ে যায়। সৌন্দর্য্য এদের পায়ের

ধুলোয় প'ড়ে ফুল হ'য়ে ফুটে' ওঠে, আনন্দ এদের গায়ের বাতাসে জন্ম নেয়। এদের বৃকের বাসনার ভিতরে বসন্তের সম্ভাবনা গোপন হ'য়ে আছে।

কেটি, ক্যাথারাইন, জুলি, জেসমিন, নাইনী, রেনী—অন্ত নেই গো অন্ত নেই। কারো রূপ তরল চপল বিহ্যতের লতার মত। আগুন'র শিখার মত আবার কেউ বা জলছে—কখনো প্রদীপের মত আলো করে, কখনো বা দিক্টাকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দ্যায়। এদের সব চাইতে কাকে আমার ভাল লাগে জান? গ্রান্সিকে। তার রূপের ভিতর জ্বালা আছে, কিন্তু জ্বালাব চাইতে ঢের বেশী রয়েছে শরতের জ্যোৎস্নার করুণ স্নিগ্ধতা। সময় সময় ধরণার ধুলো-মাটি ছাড়িয়ে সে যে কোন্ জ্যোতিলোকের মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়! তখন তাকে দেখলে আমার বাংলা মায়ের শ্যামল শীব কথা মনে পড়ে। চোখে তার বাতাসের বৃকে দিশেহারা মেঘের মত দৃষ্টি, বৃক তার ছলে' ওঠে জ্যোৎস্নার স্পর্শে সমুদ্রের বৃকের মত।

তাকে প্রথম আমি দেখেছিলুম প্যাৰিসের ফুলের একটা 'একজিবিশনে'। প্যাৰিসের ফুলের এই একজিবিশনগুলো এমন একটা জিনিষ—যা দেখে' চোখ জুড়িয়ে যায়—বৃক ভ'রে ওঠে—কেবল ফুলের সৌন্দর্যে নয়—যারা ফুলের মতই সুন্দর তাদের রূপের আবহাওয়ায়। ক্রেমান্থেমামের খোকায় মত কারো রূপ যেন দেহের বোটাটার উপরে আলগোছে ফুটে উঠেছে, কারো 'ডালিয়ার' মত লাল টক্টকে ঠোটের উপর 'প্যান্সির' হাসির মত মিষ্টি হাসি দপদপ ক'বে জলছে। প্রজাপতি ও ভ্রমরগুলোর আনাগোনা অচল ফুলের কাছে বেশী কি সচল ফুলের কাছে বেশী সে কথাটা ঠিক ক'রে বলবার জো নেই। এক গাদা আধ-ফুটন্ত গোলাপের দিকে বুকে প'ড়ে গ্রান্সি অন্তমনস্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সম্মুখেই আর-এক খোকা বসবাই গোলাপ জল জল ক'রে জলছিল। সেই খোকাটা তুলে নিয়ে গ্রান্সি হাতের কাছে তুলে' ধ'রে আমি ফরাসীতে বললুম— উপহার তাকে, যে রূপে বসবাই গোলাপকেও হার মানিয়েছে।

স্বপ্ন হ'তে জেগে উঠে' আমার মুখের দিকে তাকিয়েই গ্রান্সি আমার গোলাপের খোকায় ভবা হাত ছুটো. তার হাতের ভিতর টেনে নিয়ে বললে—বিদেশী বন্ধু, তোমাকে কাকেতে দেখেছিলুম—তার পর তোমাকে কত খুঁজেছি!

* * *

গ্রান্সি বলছে সে আমাকে নিয়ে শীগ্গির ইটালিতে বেড়াতে যাবে। সেখানে হৃদেব জলে গণ্ডলার তালে তালে তার বৃক যখন ছলে উঠবে সেই বৃকের উপর মাথা রেখে ঘুমোব—না, না, মারা রাত জেগে কাটাও। হৃদেব আমার মন তখন কীটসের ভাষায় গেয়ে উঠবে—

“Bright star! would I were
steadfast as thou art—”

নরেশ—

তৃতীয় পত্র

ভেনিস—

তারিখ—শেষের দিন।

নীলা,—

বেশ বৃকতে পারছি জীবনের খোলা খাতাটা এবার গুটিয়ে নেবার দিন একান্ত আকস্মিকভাবেই ঘনিয়ে এসেছে। হৃদেব আজকের বেলা-শেষের আলোর পর এ ছুনিয়ার আলোর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক থাকবে না আর আমার! এই সুন্দর ধরণীটাকে ছেড়ে যেতে মায়া হচ্ছে, কিন্তু ভয় করছে না এতটুকুও। পরপারের মোহ আমাকে টানছে—কিন্তু ধবিত্রীর আলো, তার হাসি, তাব কান্না—এগুলোর মায়াও ত কম নয়! ও গো, আজ তোমাব কথাই বা এমন ক'রে আমার মনে পড়ছে কেন বলতে পার? আর মনে পড়ছে আমার বাংলা-মায়ের কথা। বাংলা, আমার সোনার বাংলা, শেষ বিদায়ের দিনটাতে তোমার বৃকে মাথা রাখতে পারলুম না মা! বাঙালী তার দেশকে কত ভালবাসে মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ তা বেশ ক'রে বৃকতে পারছি। চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে অন্ধকারের যবনিকা নেমে আসছে—পবপারের অন্ধকার—নিবিড় ঘন—নিকষ-

কালো! তার কূল নেই—শেষ নেই—সীমা নেই। যে দিন প্রথম দরিয়ায় ভেসেছিলুম সে দিন যেমন মনে হয়েছিল, এ অন্ধকারও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। আজ আবার যদি আমার বাংলা-মায়ের বুকে ফিরে যেতে পারতুম!

ইয়োরোপের সব দেশের সেরা দেশ এই ইটালি। এর পত্র-পল্লবে আমার বাংলা-মার শ্যামল শোভার আমেজ আছে, এর নারীর চোখে আমার সোনার বাংলার করুণ কোমল স্নিগ্ধ শ্রী আছে। এর সূর্যের আলো বিকাশের জন্ম মেঘের অন্তর্গ্রহের ভিখারী হ'য়ে ব'সে থাকে না, এর চাঁদের আলো নায়েগ্রার প্রপাতের মত অজস্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়ে।

গ্রান্সিকে বল্লুম মাথার সামনের জানালাটা খুলে দিতে। জানালার ভিতর দিঘে আদ্রিয়াতিকে নীল জল দেখা যাচ্ছে। নৌকোগুলোব চারি পাশ ঘিরে দাঁড়ের বঠের ছপ্ছপানির আওয়াজ কার বুকের করুণ কান্নার মত শোনা যাচ্ছে! দাঁড়ের ঘায়ে উছলে ওঠা জলের কণাগুলো সূর্যের আলোতে জলুছে।

শিয়রে এসে গ্রান্সি দাঁড়াল। পশ্চিমের গায়ে ঢ'লে-পড়া সূর্যের এক খোকা আলো তার বাম্পেভরা করুণ মুখখানির উপর পড়ে তারার বুকে আলোর বিন্দুর মত জলুছে। আমি ছুই হাতে ধীরে ধীরে তার মুখখানিকে কপালের উপর টেনে নিয়ে বল্লুম—জলের বুকে বেলা-শেষের আলোটা আজ ঠিক চাঁদের আলোর মত দেখাচ্ছে। এই চাঁদের আলোতে 'গণ্ডোলায়' ভাসার কথা তোমার মনে পড়ে গ্রান্সি। তার আন্তরিক গুন্ডে উঠে বললে—ওগো থাম থাম। তার পর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে লুটিয়ে পড়ল আমার বুকের উপর।

কতক্ষণ সংজ্ঞা-হাবার মত প'ড়ে ছিলুম মনে নেই। হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ডাকলুম—নীলা—নীলা—নীলা!—

গ্রান্সি বুকের উপর হ'তে মুখখানি সরিয়ে নিয়ে চোখ দুটোর উদ্ধত অশ্রুর ধারা সংযত ক'রে জিজ্ঞেস করলে—ও কী নাম? ও কার নাম? ও কে?

নীলা যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়—সে যে পুরুষ

হ'তে পারে না এরি ভিতর সে কথাটা বুঝে নিয়েছে গ্রান্সি! আমি তাকে বল্লুম—তোমাকেই ডাকছি গ্রান্সি আমাদের ভাষায় নীলের অর্থ নীলকান্ত মণি। তোমার চোখ দুটো ঠিক নীলকান্তমণির মত কিনা!

হতভাগিনীর মুখখানি একটা আকস্মিক আনন্দের আলোকে নবাকর্ণের মত রাঙা হ'য়ে উঠল। পরপারের যাত্রী প্রিয়তমের এই মিথ্যে আদরে হয়ত তার বাকী জীবনের অনেকগুলো দিনের পাথেয় সঞ্চিত হ'য়ে রইল।—কিন্তু বুকের ভিতর এ আমার কিসের ধস্তাধস্তি চলছে—দেহের সমস্ত রক্ত মিংড়ে বের ক'রে ফেলবার জন্ম এ কারা মাতামাতি স্বরূপ ক'রে দিয়েছে—একি গো—একি! * * *

চেয়ে দেখি গ্রান্সি বড় একটা গেলাস ভ'রে নিয়ে যাচ্ছে আমার তরুণ বুকের তাজা তপ্ত রক্তে। বুকের কোন্ নাড়ীটা কোন্ ব্যথার টানে ছিঁড়ে গেল গো!

গ্রান্সিকে কতবার বলেছি—রোগটা বড় ছোঁয়াচে, আমার এত কাছে সে যেন না ঘেসে! কিন্তু কই, সে ত শুন্লে না, সে তো মেরি, মরিয়ম, মার্গারেটের মত আনন্দের পান-পাত্র নিঃশেষ ক'রে বসন্তের পিকের মত আনন্দের গান শেষ করেনি! কি পেয়েছে সে আমার ভিতর? বসন্তেব আমেজ আমার জীবনের বেলাতট হ'তে যতই স'রে পড়ছে সে যে ততই আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিচ্ছে—মা যেমন রুগ্ন মরণোন্মুখ ছেলেটিকে বুকের ভেতর টেনে রাখতে চায়। আমার গ্রান্সি ঠিক আমার বাংলার মেয়েদের মত!

* * * *

গ্রান্সি আমার মাথায় চুমো খেলে—'রুবির' মত তার লাল ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের উপর এলিয়ে পড়েছে—ঠিক বর্ষার প্রথম মেঘ যেমন ক'রে ধরণীর বুকের উপর এলিয়ে পড়ে। চুমোর পুলকে আমার সারা দেহ শিউরে উঠছে—এ শিহরণ যে থামছে না গো—থামছে না—

হাত হ'তে আমার কলম খ'সে পড়ছে—আবার চোখের পাতা ছেয়ে অন্ধকার নেমে আসছে—অন্ধকার—অন্ধকার—মোলা রাত্রির অন্ধকার হ'তেও গাঢ়—সমুদ্রের

বুকের ভিতরকার অঙ্ককার হ'তেও নিবিড়। কানে
শ্রীম্মির বুকফাটা আর্ন্তনাদের ধ্বনিটা তটের উপর সমুদ্রের
টেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে—নীলা—নীলা—

* * * * *

এর পর আর পাঁচ ছয় দিন নীলার কাছে যেতে
পারিনি। অসহ মাথার যন্ত্রণায় ঘরের ভিতর আটকে
প'ড়ে ছিলাম—সবে সেদিন একটু ভাল আছি। পিয়ন এক-
গোছা চিঠি এনে সম্মুখে ফেলে' দিয়ে গেল। একখানি
নীল রঙের খামের উপর মুক্তোর মত হাতের লেখাটা
আমাকে চঞ্চল ক'রে তুললে। চিঠিখানা খুলে দেখি নীলা
লিখেছে—“দেখা করবার ফুরসৎ পেলাম না বন্ধু, মাফ
কোরো। জীবনে নরেশের দেহের স্পর্শ পাইনি, তাই
ইটালির যে মাটি তার দেহটাকে স্পর্শ ক'বে আছে, তারি
কাছ থেকে আমার আস্থান এসেছে—সে আস্থান

উপেক্ষা করতে পারলুম না। আর যদি পাই ত্রাসিকে—
তাব দেহে হস্ত নরেশের স্পর্শ এখনো লেগে আছে !
বন্ধু, সে আমার চাইতেও হতভাগিনী—কারণ সে পেয়ে
হারিয়েছে!—না পাওয়ার যে দুঃখটা আমার কাছে এত
অসহ হ'য়ে উঠেছে, যে পেয়ে হারিয়েছে তার দুঃখ সে কি
ক'রে সহ করছে?—

কালো মেঘের মত বুকটাকে আলো ক'রে যে নীলা
ফুটে' উঠেছিল—কালো মেঘের মতই নীল সমুদ্রের ভিতর
সে হারিয়ে গেছে! সে আজ দশ বছরের কথা!—তবু সে
নীলেব আলো আজো নিভে যায়নি! পরপারের উপকূল
থেকে তার জ্যোতির রেখাটা বুকের নিতল অঙ্ককারকেও
আলোর প্রতীক্ষায় ভ'রে রেখেছে—যেমন ক'রে সূর্যের
আলোকধারা রজনীর অঙ্ককার-গহন বুকটাকেও আলোর
আশ্রয়ের প্রতীক্ষায় উগ্ৰ ক'রে রাখে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

অশোক

অশোকের কথা

আমি আর রিভল্ভারটা পাশাপাশি শুদ্ধ হ'য়ে বসে'
আছি। ভাবছি,—রিভল্ভারটা বন্ধে—আর কেন বন্ধ,
বল এক নিমেষে তোমার সব ভাবনার শেষ কবে' দিই।
হাঁ, বন্ধু, তোমাব একটি অগ্নিচূপন দিয়ে আমাকে সব
বোঝা হ'তে মুক্তি দেবে জানি, কিন্তু মুক্তি কি সত্যই
দিতে পারবে—in that sleep of death what
dreams may come!

পুলিসকমিশনারের কাছে চিঠিটা তাকিয়ে খেন
বন্ধে,—না, যেয়ো নাক। ওতে লিখলুম, তোমবা যে
অ্যানার্কিস্টকে ধরবার জন্তে কত কাণ্ডই না করেছ,
কাবুল পর্য্যন্ত ডিটেক্টিভ পাঠিয়েছ, তার মৃতদেহ কাল
সকালে এখানে দেখলে, নিশ্চয় খুব খুসি হবে না,
পুরস্কারের মোটা টাকাটা ভাগ্যে জুটল না। আমি
স্ব-ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকে বিনাশ করছি, নিজেব
দলের ষড়যন্ত্রে বহু-প্রতিহিংসায় কেউ আমায় মারেনি।

আর একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখলে হয়, দাদাকে।
তাকে ত আমার জমিদারির সব অংশ দিয়ে এসেছি,—শুধু
যদি তিনি কয়েকহাজাব টাকা পাশের ঘরের তরুণ
কবিটিকে দেন। সেই সাতমহল জমিদার-বাড়ী,—এক
ঝিল্লীরব-আকম্পিত তারাভরা নিশীথে সেই বাড়ীর
ছোট ছেলেটি যখন স্মরণসম্পদ ছেড়ে এই বিপ্লবের দুঃসহ
পথে প্রলয়ের শঙ্খ শুনে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই রাতে
বাড়ীখানি নদীর কলকলে আশ্রবনের মন্ত্রে যেমন করে'
ডেকে চেয়েছিল, সেই ছবিখানি মনের সামনে ভেসে
উঠছে। বায়পোপের দীর্ঘ ফিল্ম হ'তে মাঝে মাঝে কাটা
অসংলগ্ন টুকরো ঘটনার ছবির মত, শৈশব-জীবনের কত
হারান ক্ষণ, কত ভুলে-যাওয়া ঘটনা, কত টুকরো কথা,
ছড়ান হাসি চোখের উপর নিমেষে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে,
—আমের মুকুলের মত সেই যে ছেলেটি গ্রীষ্মের ছপুবে
খেয়াঘাটের বটচ্ছায়ায় বসে' পাশাপাশি দেখত; বর্ষাবাতে

বিছ্যাৎ-চমকে কেঁপে মায়ের কোলে লুকিয়ে তেপান্তরের মাঠ পার হ'ত;—সেই পূজোর সময় একবার বলির ছাগল লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম, সেই যে বল লেগে কপালটা কেটে গিয়েছিল, রক্ত দেখে আমার হরিণটা কি সজল চোখে চেয়েছিল, হেমন্তেব ছপুবে অঙ্কের পরীক্ষার দিনে স্কুলের ঘর থেকে জ্যোৎস্নার প্রথম-দেখা মুখখানি,—শিরীষফুলের মত সে সামনের পথ দিয়ে চলে' গেল, আমার চোখে সোনার কাঠি বুলিয়ে, সারা ছপুর গাছপালার ঝঙ্কারানিতে আকাশ-আলোর কাঁপনে কিশোর মন বীণার মত বাজতে লাগল, সে পরীক্ষায় ফেল হয়েছিলুম—ব্যর্থ হওয়ার পরম আনন্দ এমন করে' কোনদিন অল্পভব করিনি।

ঠিক ভাবতে পারছি না, টুকুরো ঘটনাগুলো এলোমেলো আসছে, মাথাটা হয়ত একটু বিকল হয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার মধ্যব instinet of self preservation সহজে হাব মানতে চাচ্ছে না, অতীত জীবনের রঙীন মধুর স্মৃতি দিয়ে ভুলিয়ে বাপ্তে চাচ্ছে। আচ্ছা, বেশ।

ভাল লাগে না ভাবতে। সুন্দরী পৃথিবী তাব ছয় ঋতুর সুখাপাত্র দিয়ে একদিন আমায় ভুলিয়েছিল। হৃদয়ের পেয়লা যখন প্রেমে মৌন্দয্যে কানায়-কানায় ভরে' উঠেছে, তৃষ্ণিত তপ্ত গুঠ দিয়ে পান করতে গেলুম, নিমেষে পেয়লা খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল, স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তার পব স্বাধীনতা! অগ্নিনেত্রী দীক্ষা নিয়ে দিকে দিকে বিদ্রোহেব আগুন জালিয়ে পরসেব লীলায় মাংলুম, হৃদয় পুড়ে' গেল, জাগল না—কেউ জাগল না। মৃত্যুর বাঁশি শুনে আমরা কয়েক যে ফ্যাপাদল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম, সেই সঙ্গীদের কেউ মরেছে, কেউ জেলে, কাবো বিচার হচ্ছে, কেউ বন-জঙ্গলে লুকিয়ে।

বুঝলুম না, কেন জীবনের এ অগ্নিছালা, ছ'খসুখেব মায়াচক্র, সৃষ্টির ভাঙাগড়া খেলা। বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

নৃত্যময়ী মোহিনীর মত পূর্ণচন্দ্র সুখাভাণ্ড বুকে করে' দিকে দিকে মদিরাধারা প্রবাহিত করে' চলেছে। প্রথম

যৌবনের বসন্তের জ্যোৎস্নাধাবাতপ্ত কত রাত্রি গানের সুরে ফেনিয়ে উপচে উঠেছে। এই চাঁদের আলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আমায় মাতাল করে' তুলত! আজ এ জ্যোৎস্না চোখে একটু মায়ী লাগায় না, মনে হয় এ যেন বিশ্বমাতার 'অশ্রুজল গলে' ঝরে' পড়ছে। কাল সারারাত ওই বসন্ত হ'তে যে পুত্রহীনা কুলীনারীর গুম্বে গুম্বে কান্না শুনেছি, তাই এ আলোয় মিশে গেছে।

জ্যোৎস্না! এই কথাটি আমার বুকের সমস্ত রক্ত ছুলিয়ে দিলে। আমার শৈশবের রূপকথার রাজকন্যা আজ কোথায় আছে জানি না। শুধু যদি তাব মন-জাগানো মুখের মিষ্টি হাসিটি, মন-মাতানো চোখের স্বপ্নের চাউনি একবার দেখতে পেতুম তবে যাবার এ ক্লান্তক্ষণ পূর্ণিমা-বাত্রির মত মধুর হ'ত। তার কতদিনের কত রূপে দেখা কত মৃতি চোখের সামনে এলোমেলো ভেসে নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। বকুলগাছেব দোলনায় তুলতে তুলতে কি জুড়ুটি করে' সে চেয়েছিল! তাব জন্মদিনে আমার জনমাবারের পয়সা জমিয়ে যে সেফটিপিন দিয়েছিলুম কি মিষ্টি হেসে নিয়েছিল।

সতেরো আঠারো বছরের আমি এই উন্নিত্রিশ বছরের আমিকে হাতছানি দিয়ে ডাকুছে,—আনন্দ কি পাওনি? জীবনের সে দুটি বছর প্রেমস্বপ্নে যৌবনেব উদামতায় ভরপূব ছিল। জমিদারের ছেলে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, আমার মত সৌখীন সুন্দর ছেলে ক্লাসে কেউ ছিল না। জ্যোৎস্নারা তখন কল্কাভায় এসেছে,—সে চঞ্চলা বালিকা নয়, সলজ্জা কিশোরী। তাব একটি মিষ্টি কথা মনেব মনে মারাক্ষণ কুম্ভুর্গির মত বাজতে, তার একটুক্ষণ গল্প করায় আমি সাতরাজ্যব ধন মারিক কুড়িয়ে পেতুম, আমার মত ভাগ্যবান কে? তখন আমার জীবনে শেলীর যুগ, অ্যানাষ্টোরের কবির মত কোন বিশ্বউর্কশীর সন্ধানে মন উদাস, জ্যোৎস্না, সে ত বিশ্বমৌন্দয্যলক্ষীর প্রতীক মাত্র, - গন রূপ ও রূপকে ভেদাভেদ নেই, তারি চোখের চাওয়ায় ভুবনউর্কশী জেগে উঠেছে।

অন্ধকার রাতে যখন ডিনেমাইট দিয়ে ট্রেন উড়োতে গেছি, ভিড়ের মধ্যে যখন কাউকে মারতে বোমা হাতে ছপ করে' দাড়িয়ে আছি, পুলিশের হস্ত থেকে পালিয়ে

যখন আমাদের জঙ্গলে ঘুরেছি, আফগানিস্থানের গোলাপকুঞ্জে জাঙ্গারস পান কবে' যখন লুটিয়ে পড়েছি, আমার জীবনের এই চিরন্তনী চিরতরুণী আমার সামনে জেগে উঠে' বারবার কি বলতে চেয়েছে! আজও সে আমায় চঞ্চল করে' তুললে।

কিন্তু, শোন জ্যোৎস্না, আমি যদি কাপুরুষের মত আপনাকে বিনাশ করতে যেতুম, তা হলে' কথা ছিল। লোকে বার্থপ্রেমে, অর্থাভাবে, সমাজেব লোকনিন্দায়, সংসারের দুঃখভাবে আত্মহত্যা করতে যায়। কোন দুঃখকে সংগ্রামকে আমি জীবনে ডরাই না। কিন্তু, কিছু ভাল লাগে না যে,—এই জীবনভবা শৃঙ্খতায়, এই পৃথিবীর অর্থহীন কস্মচক্রে, বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পাই না।

এখন বুঝছি কেন স্বর্ণ বলত—দাদা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে কবে' একটা দড়ি এনে গলায় দিয়ে ঝুলে' পড়ি, একদিন সকালে উঠে দেখবে আমি মবে' আছি। যতক্ষণ খিঘাটার করি বেশ থাকি, কোন রাতে রাজবাণী, কোন রাতে ভিখারিণী, কোন রাতে আঘেসা, কোন রাতে মজ্জিনা, কোন রাতে কপালকপুঞ্জা—খিঘাটারেব ওই বড়ান মিনে কাল্পনিক জগতে অবাস্তব জীবনে সব ভুলে' থাকি। কিন্তু তার পব, উঃ, দিনের বেলাটা, একটু বাঁচতে ইচ্ছে কবে না; তবু তোমরা যে ক'দিন আছ, তোমাদের সেবা কবে' একটু পুণ্য করছি। পুলিশের চোখ এড়াবার জন্তে আমরা যে ক'জন ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ওই সমাজপরিভ্রাতার ঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম, তাদের সেবা করে' সে যে স্বর্ণস্থল পেয়েছিল। সে শুধু খিঘাটার কবে' জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু পক্ষের মধ্যে সে পদ্মটি কি এতদিন নিশ্চল আছে? কত পুরুষের মন্ত লালসায় সে পদ্মেব সব পাপুড়ি পক্ষের তলে ভিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে তলিয়ে গেছে।

নারীর ও মোহিনীরূপ আমার ভুলোয় না। যে রূপে সে গানের স্বর, ফুলের পাপুড়ি, আলোর আলো, স্বর্ণমুগ হ'য়ে সংসারের মরীচিকায় ঘোরায়, সে প্রিয়ার রূপ নয়,—নিপীড়িতা মাতা যখন দুঃখের ত্যাগের দুর্গম পথে ডাক দেন,—তার বন্ধনশৃঙ্খল ভঙ'বার জন্তে

প্রলয়ান্ন জেলে মৃত্যুর মধ্যে ছুটে যেতে হয়, সেই বন্দিনী মায়ের পায়ে আমি জীবনের বরণমালা দিয়েছি—এই অত্যাচারনিপীড়িতা দুঃখিনী দেশ মা, এই যুদ্ধান্নদন্ধা আপন সন্তানরক্তকলুষিতা শক্তিহীনপীড়িতা পৃথিবী-মা, মা গো, তোমার ওই ব্যথাভরা অশ্রুমাখা মুখ আমাকে ঘবছাড়া কবেছে।

কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়েছে, একটা ঝড় উঠছে, কৃষ্ণচূড়া গাছটা মন্ত দৈত্যের মত বাতাসে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। জ্যোৎস্না নয়, এই ঝঞ্ঝা চাই। এই বিদ্যুতের ঝিকমিকিতে বজ্রেব গজ্জনে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে কণ্ঠে কদের আশ্রয় জেগে ওঠে, দেহের রক্ত ঝিলঝিল করে, শ্মশুণ্ডলো নাচতে থাকে, এই গজ্জমান বজ্রান্নিশিখায় নবজীবনের অভিসাবে মৃত্যুর বাঁশি বাজে।

ঘর ছেড়ে' পথে বেরিয়ে পড়লুম। অন্ধকারের গর্ভ হ'তে ঝেড়ে' হাওয়া পীড়িত পৃথিবীর বুকের কান্নার মত ছুটে' আসছে। সত্যিই একটা কান্নার শব্দ—মা, মা! কে গুম্বে গুম্বে কাচ্ছে—পৃথিবীর বুকেব ব্যথায় গুরু গুরু দাঁঘশ্বাসের মত। চারিদিকে বিদ্যুৎ জলে' উঠল, সেই আলোয় দেখতে পেলুম, রাস্তার মাঝখানে একটি ছোট খুকী লুটিয়ে পড়ে' আছে, তার কালো কঁকড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ে' খোয়ায় লুটিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে' নিলুম, শক্তি ক্লান্ত মুখখানি শিশিরসিক্ত শেফালির মত, মুদিত কমলের মত চোখ বোজা, জামার বোতাম কয়েকটা খুলে' গেছে, গো গো কবে' মুছ আঁর্ভনাদ করছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধীরে বললুম,—কি হবেছে খুকী? ঘাড়ে মাথা রেখে শান্ত হ'য়ে সে নেতিয়ে পড়ল। গজ্জমান অন্ধকারটা টুকবো টুকবো কবে' বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত চিরে গেল। কন্যাহীনা মাতার অশ্রুজলের মত বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল, বাতাস মন্ত হ'য়ে উঠল। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে মাত'বার জন্তে পথে বেরলুম, কোথা থেকে এ ফুলের পাপুড়ি আমার বুকে পড়ে' ঘবে ফেরালে।

তাড়াতাড়ি খুকীকে বুকে করে' ঘরে ফিরলুম।

বিছানাটা পাততে হ'ল, বাক্স হ'তে ফরসা চাদর বের করতে হ'ল, বালিশটা কি শক্ত—কচি মাথায় লাগবে। ধুলো-লাগা জামা পাজামা ঝেড়ে দিলুম, ছাড়ান হ'ল না, ছাড়াতে গেলে হয়ত ধুম ভেঙে যাবে, কেঁদে উঠবে, আর ছাড়িয়ে পরাব কি! কোনমতে খুকীকে শুইয়ে জান্না বন্ধ করে' তার পাশে বিছানার ধারে বসলুম। ছোট সুন্দর নাকে নোলকটা কি সুন্দর, কচি হাতে সফ্র বালাগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি মিষ্টি ছোট পা ছুটো, কি মিষ্টি মুখখানা। তার গালে—পা ছুটোতে চুমো খেলুম। রিভলভারটা হেসে উঠল।

ধুমস্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে চঞ্চল হ'য়ে নড়ে' উঠল। নিশ্চয় গবম হচ্ছে। খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস করতে লাগলুম। অস্থির হ'য়ে সে কেঁদে উঠছে,—মা, মা। এ ত ভারি মুশ্কিল, ছোট মেয়েদের ভোলাবার মস্ত ত আমার জানা নেই, ধুমস্ত খুকীকে মা ভিন্ন কে শাস্ত করতে পারে। ধীবে বুকে তুলে' নিয়ে মৃদু মৃদু দোলাতে দোলাতে মুখে আঙুল পুরে দিলুম। আঙুল চুমতে চুমতে একটু শান্ত হ'ল। শুইয়ে দিতেই আবার ছটফট করছে, কেঁদে উঠছে—মা, মা। চোখ খুলে' আসছে, যদি জাগে ত ভয়জন্য কাঁদবে—হয়ত দুধ খেতে চাইবে, আমার ধরে দুধ কোথায়!

রিভলভারটা হেসে উঠল,—কি বন্ধু বড় মুশ্কিল! ঘরের কোণে বেহালাটা খুঁসি হ'য়ে চাইল, বেশ হয়েছে! বেহালাটা তুলে' নিয়ে এলুম, ধুলো জমেছে, তাঁতগুলোর ছাতা পড়ে' রয়েছে, অভিম্যানিনী নাটিকাও মত সে কোন কথা কইতেই চায় না। বললুম, বন্ধু পূর্ব বন্ধু স্মরণ করে' একটু সাহায্য কর। বেহালায় ঝঙ্কার উঠতেই খুকীর কান্না থামতে লাগল, গানের সুরে সুরে সে ধীবে ধুমিয়ে পড়ল।

বাইরে ঝড় থেমে গেছে। জান্না খুলে' দিলুম। কচি-শিশুর আঁখির মত তারারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, খুকীর মুখের দিকে চেয়ে বেহালা বাজাচ্ছি। হঠাৎ এক কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ বেহালার গানের উপর কমলবনে মত্তহস্তীর মত এল। সশব্দে দরজা খুলে' একটা বড় কালো কুকুর ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানায় লাফিয়ে উঠল, তার পর

ধুমস্ত খুকীর দিকে চেয়ে তার কি আনন্দনৃত্য। বেহালা রেখে দাঁড়িয়ে উঠতেই এক বয়স্ক যুবক আর বিছানার মত এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকলেন। তরুণীটির এলোচুল জড়ানয়, লুটান শাড়ীর টানে, চোপের ইসারায় বোঝা যাচ্ছে বিছানা থেকে অতি ব্যস্ত শক্তিতভাবে উঠে এসেছে। তার চোখ দুটি আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠল, বিছানা হ'তে খুকীকে তুলে' বুকে জড়িয়ে 'এই যে রেণু, এই যে রেণু' বলে' আনন্দে চুমো খেতে আরম্ভ করে' দিলে, আমার দিকে ক্রক্ষেপই নেই। যুবকটি একটু বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বিনীতস্বরে বললে,—ক্ষমা করবেন—

আর একটু এগিয়ে আসাতে আলোটা তার মুখে পড়ল, আমি নিমেষে চিন্লেম, আনন্দের সঙ্গে বলে' উঠলুম—আরে তুমি, স্বরেশ!

কলেজে স্বরেশ ও আমার ভাব বন্ধুত্বের একটা উপহার বস্তু ছিল। একটু এগিয়ে এসে সে অবাক হ'য়ে একটু ব্যথার সঙ্গে বললে,—তুমি! কি চেহারা তোমার হয়েছে! কলেজে তোমার মত কেউ সুন্দর ছিল না, এ যে Asoke's ghost! এটি ভাই আমার মেয়ে, কোথায় পেলো? হেসে বললুম,—রাত ছুপুরে কি মেয়েটিকে রাস্তায় হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলে? মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে স্বরেশ বললে,—ওর ভাই ওরকম ধুমস্ত উঠে বেড়ান রোগ হয়েছে, আজ আবার দরজাটা খোলা ছিল,—উনি হচ্ছেন আমার শালিকা।

শিবীষ-ফুলের মত স্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা তরুণীর দিকে চাইলুম। খুকীকে কোলে করে' আমার অগোছান ধর আর বই-খাতা-গাদা-করা টেবিলটি দেখছিল। স্বরেশ ধীরে বললে,—তুমি এত কাছে আছ, জানতুম না। আমি ওই সামনের গলিতে দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকি। এটা বুঝি মেস, না হলে' এত অপরিষ্কার,—কি দৌগীন তুমি ছিলে!

তরুণীর মুখটি একটু করণ হ'য়ে উঠল, সে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার টেবিলের বই-কাগজগুলো ঘাঁটছে, এই অগোছাল ঘরটা নিমেষে গুছিয়ে দিতে পারলে সে যেন কি আনন্দ পায়। ধীরে সে বললে,—দাদা, দিদি হয়ত বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।

সুরেশ বললে,—হাঁ ভাই, রেণুর মা, বুঝতেই পারছ, কি রকম ছটফট করছে। এখন যাই, কাল সকালে আসব 'খন। অতসী, বই ঘাঁটতে আরম্ভ করেছ ত! শ্যালিকার বই কিনে কিনে আমি গেলুম। এস এখন, কাল আলাপ হবে 'খন।

দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এলুম। যাবার সময় অতসী বিছু বললে না, শুধু রঙীন চোখে চেয়ে ধীরে একটা নমস্কার করলে। কুকুরটাও আমার দিকে চেয়ে একবার লাজ নাড়লে।

চপ করে' একা ঘরে বসে' আছি। ঠান্ড পশ্চিমাকাশে ঢলে' পড়েছে, পূর্বাকাশের তাবাতুলো দপ্‌দপ্‌ করছে। বিভলভারটা কোথায় রাখলুম, মনে পড়েছে না। ইঞ্জিচেয়ারে বসে' নীলাকাশের দিকে চেয়ে ভাঙা বেহালার মানভঙ্গন করতে বসলুম।

পৃথিবী-মা গো, এটি ছুরস্তু ক্ষাপা ছেলেটাকে তুমি বুঝি বড় ভালবাস, তাই দুটো স্বকোমল সুন্দর বাত্ন দিয়ে বেধে রাখবার জন্তে এ বাড়ির রাতে এমনি ছোট-মা হ'য়ে এলে।

এই ছোট খুকীটি তার দুখানি কচি হাত দিয়ে আমায় ধাক্কা দেয়। তাই সকাল-বেলা সুরেশ যখন এসে বললে—চল, শুধু তখন তার ফলের মত কচি মুখখানি দেখবার জন্যে ছুটে' চললুম।

সুরেশ এখন হাইকোর্টের উকীল। সুন্দর বাড়ীখানি। আমাকে বাড়ীর ভিতর একেবারে তাব ঘবে নিয়ে গেল। অতসী অভ্যর্থনা করে' বসালে, কুকুরটাও একবার লাজ নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। সুরেশ বাইরে মকেলদের কাছে চলে' গেলে অতসী মুচ্কে হেসে বললে,—কাল আপনার রিভলভারটা নিয়ে এসেছি।

আশ্চর্য হ'য়ে বললুম,—খুঁজে' পাচ্ছিলুম না বটে। আর চিঠিটা?

চোখে বিহ্বল ঠিকরে সে বললে,—সেটাও। ভয় নেই, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিস্মিত-মুগ্ধ-নেত্রে তার দিকে চাইলুম। যুহু হেসে সে বললে,—রিভলভারটা আর পাচ্ছেন না, আর অমন করতে যাবেন না, কিম্ব—

এ যেন তার হুকুম।

সুরেশের মা রেণুর হাত ধরে' ঘরে এলেন। ছোটবেলায় তাঁকে যেমন দেখেছিলুম, সেই দিব্যস্নিগ্ধ স্নেহ-কল্যাণমণ্ডিত মর্ত্তি, কাঁচাসোনার মত দেহের আভা সাদা খান ফুটে' বেরুচ্ছে, তাঁকে দেখলেই পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে। প্রণাম করে' উঠে' দাঁড়াতে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—কি বে তুই এত কাছে আছিস, এতদিন দেখা হয়নি।

হেসে বললুম,—মাব দেখা পেতে অনেক পুণ্যের দরকার যে মা।

স্নেহনয়নে চেয়ে বললেন,—কি রোগা হ'য়ে গেছিস! মেসে আছিস বুঝি!

অতসী ফোড়ং দিলে,—হ্যাঁ মা, যেমন নোংবা তেমনি অক্ষকার।

মা বললেন,—মা চেহারা হয়েছে। মেস ছেড়ে আয়, আমাদের এখানে থাকবি।

বললুম—সে ভাগ্যি কি আছে মা যে তোমার প্রসাদ পাব। এ লক্ষ্মীছাড়া ডাদে' ও-স্বভাবটা খুব আছে, যেখানেই বলো মা নিজের খর করে' জমিয়ে বসতে পারি।

রেণু মার পাশে মলঞ্জভাবে দাড়িয়ে আমাকে বার বার দেখছিল। তাব দিকে অগ্রসর হ'য়ে বললুম,—এ মা-টি যে কিছু বলে না।

মা হেসে বললেন,—ওবে রেণু, চিন্তে পারছিস না, ও যে তোকে কাল চুরি করে' নিয়ে গেছে।

রেণু একটু ভীত হ'য়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে। মা হেসে উঠে' বললেন,—না বে না, ও হোর কাকা, প্রণাম কর। আজ রেণুর জন্মদিন।

রেণু তাড়াতাড়ি প্রণামটা দেবে অতসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি তাঁকে টেনে নিয়ে বললুম,—না মা, কাকা নয়, আমার এখন মায়ের দরকার, আমার নাম অশোক, একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বুঝলে মা?

মা চলে' গেলেন। রেণু অতসীর কানের কাছে গিয়ে কি বলছে। আমি বললুম,—কি বলছে?

অতসী হেসে বললে,—বলছে, চুলগুলো কি বিচ্ছিরি হ'য়ে রয়েছে! ওর কি কেউ নেই যে চুল আঁচড়ে দেবে?

রেণুর দিকে চেয়ে বল্লুম,—আমার ত আবার মা নেই !

বা, আমি ত হলুম,—বলেই সে রাঙা মুখখানি টেবিলের আড়ালে লুকোলে। একটু পরে এক ভাঙা চিরুণী এনে আনাব চুলের সংস্কার করতে বসল।

কাল রাতে জীবনটা একেবারে দেউলে হ'য়ে গিয়েছিল, আজ এই অতসীব-হাতে-গোছান ঘবে বসে' ভাবছি, রাতারাতি পথেব ভিখারী কেমন করে' লাগপতি হ'য়ে ওঠে। আমাকে একেবারে দীন করে' তাব পর এ কি ঐশ্বর্য দেওয়া !

যে মাকে আবার পেলুম, এমন মা কার আছে। তাব কাছে গিয়ে বসলে মনের সব তাপ জুড়িয়ে যায়। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিদবা উনি, ছোট বেল্লা হ'তে পিতৃদীন সুরেশকে কি স্নেহময় শাসন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মালুম করেছেন। সুরেশ যখন ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে করতে চাইলে, বাড়ীর সবাই কি আপত্তি করলে, কিন্তু ইনি নিজে গিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে' এলেন। এ মায়েব আশীর্বাদেব প্রসাদে এক দিনেই যেন সেরে গেছি।

আব এই বেণু-মাটিকে পেলুম, ছেলেবেলার সেই চিরআনন্দময় সবল শিশু আমি আমার মনো মরেনি দেখছি, আর-এক শিশুর কলহাশে সে জেগে উঠল। প্রতিবংশের আশা স্বপ্ন যতবাব বিফল হচ্ছে, সৃষ্টি আবার নতুন উদ্যমে ছোট শিশু দিবে সে স্বপ্নেব সাধনা শুরু করছে!—বেণু সৃষ্টিব চিরনবীন স্নানী আমাব জীবনে নিয়ে এল।

আর অতসী ? এই মিষ্টি মেখেটি যেন কত দিনের বন্ধু। সারা ছুপুর তার লাইব্রেরীটা খুব উৎসাহেব সঙ্গে আমায় দেখিয়ে কি করণ মধুর হেসে চাইলে। কত বই সে পড়েছে, সে কত ভাবে, মগ্ন দেখে, কিছুই সে করতে পারছে না—দেশের কাঙ্গ করতে এত তাব ইচ্ছে করে। কতকগুলো রাজনীতি-সমাজনীতির বই দেখিয়ে সে বললে,—দেখুন এসব ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু যখন দেখি এরা মা বলছে তার সঙ্গে আমাব মনের কথা মিল হ'য়ে যায়, এত আনন্দ হয়। কিন্তু শুধু রাশ-রাশ বই পড়ে' কি হবে বলুন, আমারও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে।

বল্লুম,—কেন, তোমরা ত ব্রাহ্ম, তোমাদের কত স্বাধীনতা।

সে বললে,—কি আর স্বাধীনতা আছে, এই যা বি-এ পঞ্চাঙ্গ পড়েছি, আর জোর করে' এখনও বিয়ে দেয় নি।

হেসে বল্লুম,—আমার মত ঘরছাড়া বিদ্রোহী তোমাকে ঘরকন্না করবার উপদেশ দেবে না। তবে কি জ্ঞান, শাস্তি যদি চাও, তবে এই ঘরকন্নাতেই পাবে।

না, আমি জীবনটাকে সব দিকে পরিপূর্ণ করে' অনুভব করতে চাই,—কথাগুলো বলেই সে একটু লজ্জিত হ'য়ে চুপ করলে।

আমাব জীবনের এক নিগূঢ় গভীর বেদনার পথে তার সঙ্গে জানা হ'ল বলে' সে একদিনেই আমাব পরম বন্ধু হ'য়ে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলায় সে বলছিল,—চুপচাপ বসে' ভাববেন না বেশী। আপনার মনটা একটু অস্থির আছে, শব্দবর্টা সারিয়ে নিন ভাল করে'। আপনাবা নিবাণ হ'লে কি হবে ?

বল্লুম,—তুমি কি ভাব আমাদেব দিয়ে দেশেব কোন মঙ্গল হবে ?

সে বললে,—আমি কি জানি বলুন, তবে আমি যদি ছেলে হ'য়ে জন্মাতুম, আমিও অ্যানার্কিষ্ট হতুম। আপনাব বেহালাটা বাজান, চুপচাপ বসে' থাকলেই মন খারাপ হবে।

মেয়েবা চিবকাল আমাব কাছে রহস্য, তাদের বুঝতে চাইনি, শুধু তাদের প্রেমের স্পর্শে জীবনটাকে বাজিয়ে চলেছি।

(৩)

ধীরে ধীরে মনটা দেখছি স্থস্থ হ'য়ে উঠছে, অবসাদ কেটে যাচ্ছে, নবজীবন পাচ্ছি। আমাকে ভাজা করে' তোলবার জগে অতসীর চেঁচার অন্ত নেই।

ছোট ঘরের গারদে পোরা এই বাঙালীর মেয়েটি। কিন্তু তার মন দেখি পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর কত ঘরের হাসিকান্না, কত জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদিনের স্বখদুঃখ জড়িয়ে আছে। তার জগে সুরেশ সব দৈনিক সংবাদপত্রগুলো নেয়, তার পর কত ইংরেজী ফরাসী মাসিক পত্রিকা, আর বই কেনার ত শেষ নেই। সুরেশ সেদিন বললে,

—দেখ, শ্যালিকার কি expensive hobby ! ওর কাছে অতসীর বই-পড়াটা একটা সখ মাত্র। কিন্তু আমি দেখছি, ওটা ওর জীবনের ক্ষুধা, চিন্তের বিকাশ।

‘রোজ সকালে অতসী আমাকে ধরে’ তার খবরের কাগজের রাজহে নিয়ে যায়, মানবসভ্যতাচক্রের গুরুগুরু ধ্বনি, পৃথিবী-মার জ্বপিণ্ডের শব্দ যেন শুনতে পাই। প্রথমে দেশের সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া,—কোথায় বোমা ফাটল, কার কারাদণ্ড হ’ল, কোন কলের আগুনে কত কুলী ম’ল, ইত্যাদি। তার পর বিদেশের আয়ল্যাণ্ড থেকে হনলুলু সব দেশের খবর চাই, জারের সঙ্গে আমীরের কি গুপ্তমন্ত্রণা হচ্ছে, বন্কানে অশান্তির রূপ কি দাঁড়াচ্ছে। কোন নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কোন প্রেসি-ডেন্টের বক্তৃতা, কোন রাজবিদ্রোহীর বিচার, প্রতি-বিষয়ে তার মন সজাগ, উৎসুক।

তুপুরে কোন দিন কোন দবদেশের ভ্রমণকাহিনী বা জাতির বিবরণ নিয়ে বসে, কোন দিন কোন দেশের ইতিহাস নিয়ে বসে; বেতুইন্বা কিভাবে জীবন চালায়, ফার্সী-বিপ্লবের বাতে কি হয়েছিল, ল্যাপ্লাণ্ডের জীবন-ধারা কি রকম, সাহারা-র মরুভূমে কি সভ্যতা চাপা পড়েছে—সব পড়ে’ শুনিয়ে আলোচনা করে’ আমার এ মনকে পৃথিবীর মানবসভ্যতার ইতিহাসধারার সঙ্গে যুক্ত করে’ দিতে চায়।

প্রথম কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়তে মন লাগত না, কিন্তু এখন এ নেশার মত লেগে গেছে,—হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে যায়, ভাবি সকালে আয়ল্যাণ্ড সন্মুখে কাগজে কি লেখা থাকবে, অমুক বিচারের রায় কি বের হবে,—বুহৎ মানবসমাজের জীবনস্পন্দন আপন নাড়ীতে অনুভব করি।

কিন্তু মনটা এতে ঠিক সারেনি, মেরেছে অতসীর গানের সুরে। সন্ধ্যাবেলায় সে রেণুকে নিয়ে গান গাইতে বসে, আমাকেও সেসে ভাড়া বেহালায় নতুন তাঁত লাগিয়ে বাজাতে বসতে হয়। গানের সুর এক দিন আলো-বাতাসের মত আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল, শান্তিহারা জীবনটা আবার সুরে বাধে।

আশ্চর্য অতসীর গলাটা ! এ যেন কোন সঙ্গীতযন্ত্র হ’তে সুর করে’ পড়ছে, গান যখন থেমে যায়, নৃত্যময়ী সুরপরীদের শিঞ্জিনীধ্বনি রিনিঝিনি বাজে, মন ভরে’ ধর ভরে’ কাঁপে, ধুরে’ বেডায়। তার সঙ্কায় গাওয়া গানের সুর এখনও কানে বাজছে,—

গানের সুরের ভিতর এখন দেখি ভুবনখানি।

আমি তখন তাকে চিনি, আমি তখন তাকে জানি।

পৃথিবীকে জীবনকে গানের সুরেব ভিতর দিয়ে দেখা, এই পরম দৃষ্টি সে আমায় দিলে।

আজ বেহালা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে গেলুম, দেখে’ সে বললে,—কি হ’ল আপনার ?

বেহালায় এক পুবানো সুর বাজাতে বাজাতে মনে হ’ল, যেন আমি আমার সতেবো বছরের আমিতে ফিরে’ এসেছি, জ্যেৎস্না আমার সামনে বসে’ গান গাইছে। এমনি এক শুক্লা একাদশী-র হাবান সঙ্ক্যা চোখের উপর চমকে উঠল।

মনের সব অন্ধকার বন্ধ ধরগুলো খুলে’ যাচ্ছে, গানের সুরেব আলোয় ভরে’ উঠছে। রাতে এক ছাদের কোণে দাড়িয়ে সে যে গান গাইছিল, সেই মালশ্রী রাগিণী তারায় তারায় কেঁপে বাজছে—

অমি হাত দিয়ে দ্বাব খুলব না গো,

গান দিয়ে দ্বাব খোলাব।

(৩)

অতসী আমার চাবিদিকে যেন একটা মায়ার জাল রচনা করছিল। মাঝে মাঝে তার কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হয়, কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না, শুধু সুরেব মত বাজছে, তার সুরের ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গীটা এক শিল্পকাষ্যের মত উপভোগ করি, রহস্যময় মধুর চোখের দিকে চেয়ে থাকি। কাল যখন সে সঙ্ক্যাব অন্ধকারে জানলার সুরেব দিকে থাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমার মনে হ’ল, সে যেন কদম নগ্ন— একটা কপক, চিরস্বনী বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকলতার মর্নি, তারাব আলোয় চিববাণি চেয়ে কার পতীক্ষা করছে।

কিন্তু অতসী মায়াময় পড়ে’ সে সৌন্দর্য-আনন্দের

রূপজাল দিয়ে আমায় ঘিরেছিল তা টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে' ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় বেণুব সঙ্গে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছি, রেণু বললে—এই টবটায় বেশী জল দাও না, আমি আর পারছি না।

বললুম, কৈ টবে গাছ কৈ ?

সে অবাক হ'য়ে বললে,—বা, তুমি যে টাকাটা দিয়েছিলে, সেটা ওতে ত পুঁতে' বেখেছি, দেখবে পরশুদিন কেমন টাকার গাছ হবে।

মা গল্প করতে ধরে' নিয়ে গেলেন। কথায় কথায় অতসীর কথা উঠল। মা বললেন,—দেখ, ওর মা মরার সময় ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন বললেন—দিদি, সরসীকে তোমার হাতে দিয়েছি, অতসীকে তোমার কাছে দিয়ে নিশ্চিত হ'য়ে মর্চি, তুমি ওকে ঠিক পাত্রেই দেবে জানি। তা দেখ, এতদিন ও বিয়েব কথা বললে হাড়ে জলে' উঠত, এখন তোব উপর একটু টান হয়েছে দেখছি। তুই কি বলিস বল ?

হেসে বললুম,—একটু টান হয়েছে ? আমার মত লক্ষীছাড়া !

মা বললেন,—চূপ কর হতভাগা। স্বরেশ বলছে, তোরা ছুঁজনে মিলে একটা কাগজ বেব কর, ও তার টাকা দেবে।

ধীবে বললুম—মা, তুমি ত জান সব কেন এ কথা তুললে ?

বললুম, মাব মনে বেদনা লাগল। ধীবে তার হাতখানি ধবে' আদব করতে লাগলুম। তাব পর জানি না কেমন কবে' জ্যোৎস্নাব কথা উঠল, আমি দেড় বছর বাৎনায় নেই তাদের কথা কিছুই জানি না। মা বললেন, জ্যোৎস্নার স্বামী গেল বছর মারা গেছে, জমিদাবেব ছেলে মদ খেয়ে লিভারের অসুখ করলে, বুকটাও খাবাপ ছিল।

আন্তনাদ কবে' উঠলুম—সে কেমন আছে মা ?

মা ধীবে বললেন,—তোরা কথা ভেবে তাকে একবার দেখতে গিয়েছিলুম, যখন এসে দাঁড়াল, বুকটা ফেটে গেল রে ! একটু কাপলে না, শুণু মুখটা বৃকে গুঁজে' পড়ে' রইল।

তার পর মা যে কত কি বলে' যেতে লাগলেন কিছুই আমার কানে এল না।

অনেক রাত পর্যন্ত মার কাছে জ্যোৎস্নার সব কথা শুন্তে লাগলুম। সেই আমার চিরতরুণী জ্যোৎস্না—বিয়ের রাতে লালচেলীপরা তার প্রতিমার মত মূর্তিটি চোখে আঁকা রয়েছে। এখন সে বৃহৎ জমিদার-পরিবারের কন্যা, এখনও সে তেমনি স্নিগ্ধ মধুর দিব্যশ্রী। মার কথা শুন্তে শুন্তে সেই শুভ্রবসনপরিহিতা কল্যাণী লক্ষীর ছবিটি ভাবছিলুম, ভেনাসের মত মুখখানি এখন ম্যাডোনার মত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম—তার ছেলেটি কেমন হয়েছে মা ?

মা বললেন,—কি সুন্দর হয়েছে রে, কি শাস্ত, নম্র, আমায় প্রণাম কবে' এমন সুন্দরমুখে দাঁড়াল !

বৃকে কি একটা বেদনা হচ্ছে, উঃ, সেই মাতালটা !

ভাবছি জীবনটা কি ? আমাকে দিয়ে বিশ্বশক্তি কি করতে চায়। ধরো, এই স্বরেশ, তার হাইকোর্ট, মক্কেল, মোটর, স্ট্রীকট্রা নিয়ে বেশ সখে আছে, কিন্তু আমি ত এমনি করে' শাস্ত হ'য়ে থাকতে পারি না।

আমার হাতে তোমার ঠাশিকে দিলে না প্রভু, তোমার বজ্রকে দিলে, আমাব কপালে তোমার ছুঃখের অগ্নিতিলক জ্বালিয়ে দিলে ! উচ্ছে করছে, একটা ধমকেতুর মত পৃথিবীব এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে' যাই, অগ্নিপুচ্ছ দিয়ে সব অত্যাচারীদের দন্ধ করে', রাজার মুকুট খসিয়ে, ধরণীর প্রাসাদ জ্বালিয়ে, শক্তিব দণ্ড ধূলায় লুটিয়ে, এই সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র চূর্ণকার করে'।

(৫)

অতসী ধরে' ফেলেছে আবার আমার মনটা বিকল হয়েছে। ছপূরে রেণুর সঙ্গে খেলায় বেশ মন দিতে পারছিলুম না, সে রেগে আমার সঙ্গে আড়ি করে' চলে' গেল। এবার বুঝি এখন থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এসেছে।

অতসী আমাকে লাইব্রেরীতে ধরে' নিয়ে গেল, বললে—আবার কি ভাবচ ? কাল সারারাত ঘুমাওনি—ছাদে ঘুরেচ।

বল্লুম আজ সহজে সে ছাড়বে না। ভালবাসার ছুঃখ তাকে আর দিতে চাই না, খোলাখুলি সব বুঝিয়ে দিই।

হেসে বল্লুম,—আমি হচ্ছি একটা অ্যানাকিষ্ট, মৃত্যুর দোসর আমার জন্ম ভাব কেন ?

কি করণমুখে সে আশাব দিকে চাইলে। কতরূপে নারীকে পেলুম,—কেউ বুকে আগুন জ্বালায়, কেউ চন্দনের প্রলেপ বুলোয়, কেউ আলেয়ার আলো হ'য়ে দিশাহারা করে' ঘোরায়, কেউ স্নিগ্ধ গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সারারাত প্রতীক্ষা করে।

ধীরে বল্লুম,—দেখ, তোমার কথা দিয়ে গান দিয়ে আমার এ ভাঙা মন তুমি সারিয়ে তুলেছ, তোমার ঋণ কোন দিন শুধতে পারব না বন্ধ, কিন্তু এর উপর কোন লোভ কোরো না।

তার বৃকের রক্ত রিম্বিম্ব করছে, চোখ জ্বলছে হ'য়ে উঠল, বললে,—আমাকে শুধু তোমাব বন্ধুব কাজই করতে দাও,—তোমাব মনো মে শক্তি আছে, তাকে ব্যর্থ কোরো না।

ধীরে বল্লুম,—সেই শক্তিকেই সাথক করবাব জন্মে আশায় চলে' যেতে হবে।

সে ভাঙা-গলায় বললে,—আবাব তুমি ওই পথে যাবে ?

বল্লুম,—ঠিক ওপথে নয়। দেখ, তুমি ঘরে বসে' কাগজ পড়, অত্যাচার-অবিচারের কথা, আমি তা পারি না, আমার গা জলে, ইচ্ছে কবে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে' ধরিগে। রিভলভার আমি ফেরৎ চাইছি না, এবার প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বালাব, ওই নিপীড়িত পদদলিতদের জাগাতে হবে, তাদের প্রাণের বারুদে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বালিয়ে অবিচারের মরণোৎসব হবে। তুমি কি ভাব, এই যে অমিকের রক্তে রাঙান, নারীর অশ্রুতে ভেজান ধনীর স্বর্ণ স্তূপীকৃত হচ্ছে, শক্তিগদমত্ত রাষ্ট্রশক্তির শাসন-পেয়লা অত্যাচারের বিষে ভরে' উঠছে, এই রাজ্য নিগে রাজনীতিবিদদের জুয়াখেলা, মানবাত্মা নিয়ে পুরোহিতদের ধাক্কাবাজি, এই প্রবলজাতির নিষ্ঠুর, লোভ অভিমান, শক্তির ক্রুর অত্যাচার চিরকাল টিকবে ? এই যন্ত্রশক্তি অধিষ্ঠিত বণিক-স্বত্বতা চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাবে, আমরা সেই

ধ্বংসের যুগের অগ্রদূত, নটবর রক্ত আমাদের হাতে তাঁর বজ্র দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে স্বাধীনতার মস্তক পিনাকধ্বনি করে' সবাইকে জাগাতে হবে।

অতসীর মথ অগ্নিশিখাব মত রাঙা হ'য়ে উঠল, চোখে স্বপ্নের গোলাপী আভা জড়াল, চুল ফুলে' উঠল, বুক ছুলতে লাগল।

দীপ্তকণ্ঠে বলে' উঠলুম,

“হায় সে কি স্থখ এই গৃহ ছাড়ি

হাতে লয়ে' জয়তুরী

জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে

বাজ্য ও বাজা ভাঙিতে গড়িতে

অত্যাচারের বক্ষে বসিয়া

হানিতে তীক্ষ্ণ ছবি।”

অতসী বলে' উঠল,—আর আমরা !

বল্লুম,—বাংলাবও সেদিন আসবে, তোমাদের পক্ষা চিড়ে' যাবে, গারদ ভেঙে যাবে, অবগুণ্ঠন খসে' যাবে। আজ বাংলার এ কোণে যে প্রাণেব আগুন জ্বলে' নিভে যাচ্ছে দেখছ, ভাবছ ওরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে জেলে পূবে' সে প্রাণকে মারবে ?—আজ শুধু পূর্বাভাসনা। ভাবতেব এ যুগেব গুরুগোবিন্দ কোথায় রুচ্ছ তপস্বী করছেন জানি না, কিন্তু তিনি ছুঃখেব সাধনা আরম্ভ করেছেন—তিনি আসছেন, তিনি আসছেন, তাঁর আগমনের জন্মে আমাদের আয়োজন করতে হবে।

(৬)

আজ নিশীথরাতে আবার ঝড় ধনিয়ে এসেছে। ওই অন্ধকার শূন্য হ'তে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে প্রলয়পথে যাত্রার আহ্বান আবার এল। ভাঙা দেহমন ত সারান হ'ল, শান্তিনীড় ছেড়ে' আবার ছুঃখের পথে বেরুতে হবে। তরুণী বন্ধুব করণ চোখের চাওয়া কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

পৃথিবীর নাড়াতে নাড়াতে কি ব্যথার টান পড়েছে, এই আকাশ-ছোড়া হাহাকারে গাছপালার করণ মর্ম্মরে বৃকের দীর্ঘশ্বাসে তারি বেদনা পাচ্ছি। আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ি, এদের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারব না।

মাগো! কতরূপে তুমি আমার সঙ্গে কত লীলা করবে। এক ঝড়ের রাতে তুমি ছোট মা হ'য়ে কচি হাতের বাঁধনে বেঁধে ঘরে ফিরিয়ে আনলে, আর এক রাতে এক প্রলয়ধরীরূপে ডাক দিয়ে ঘরছাড়া করছ।

দীক্ষার রাতের কথা মনে পড়ছে। এমনি এক ঝড়ের রাতে বহু পুরাতন বট-গাছেব তলায় ভাঙা মন্দিরে কালীমূর্তির সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এ জীবন মা'র কাজে উৎসর্গ করব। গৃহ ছাড়লুম, সব স্নেহবন্ধন ছিন্ন করলুম, অর্থ মান স্থপলোভ ত্যাগ করলুম। আছে শুধু শাণিত খড়্গা, অত্যাচারীর মুণ্ড, রক্তের স্রোত। এই ঝড়ের আকাশে কালীর বিশ্বরূপ দেখছি নির্বিড়-তিমির-ঘন কেশরাশি আকাশে ছেয়ে গেছে, বক্তান্ত খড়্গের আভা নৃত্য কবে' বেড়াচ্ছে, প্রলয়-উৎসবেব অট্টমস্যের স্রোতে রাজ্য-সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে।

বিছাতের চিকিমিকিতে অতসীর চোখের চাউনি জেগে উঠল।

বাতাসে লাইব্রেরী-ঘরের জান্নাগুলো মশকদে বাব বার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। দরজা ঠেলে লাইব্রেরীতে ঢুকলুম, অন্ধকারে আলোর স্নাইচটা খুঁজতে গিয়ে কার গায়ে হাত পড়ল,—শাডীব খসখসে—চুড়ির টং টাং-এ অন্ধকার কেঁপে উঠল, কেশের মন্দির গন্ধ, বিছাতের মত স্পর্শ! জান্না দিয়ে বিছাতের আলো চমকে গেল। দেখলুম অতসীর অনির্কীচনীয় মুখ।

তুমি?

হ্যাঁ, আমি।

সমস্ত অন্ধকার তাব গলার সুবে বেজে আমায় ঘিরে' ধরলে।

হু'জনে ছাদে বেরিয়ে এলুম,—আজ ঝড়-জলে ওই বইয়ের গাদা ভেসে গেলে কিছুই যায় আসে না। কতক্ষণ হু'জনে গুরু দাঁড়িয়ে রইলুম।

বললুম,—ওই যে ঈশান কোণে কালো মেদে বিছাত জলে' উঠেছে,—তুমি দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু আমি পাচ্ছি,—পৃথিবী পুড়ে' বিদ্রোহের আগুন জলে' উঠেছে, নটরাজ তাঁর ধ্বংসের লীলা শুরু করলেন বলে'। এক-এক

দেশে তিনি তাঁর পু ছুঁইয়ে যাচ্ছেন, রাজসিংহাসন ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে,—একবার কুশিয়ায়, একবার চীনে, একবার আয়ল্যান্ডে, একবার তুবস্কে—রুদ্রের চরণ-চিহ্ন দেশে দেশে পড়ছে। যেখানে জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ অত্যাগ হ'য়ে উঠেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী নিপীড়িতের নিরুদ্ধ রোম জমে' উঠেছে,—ওই ইয়োরোপের অন্তঃস্থলে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মত যুদ্ধাগ্নি জ্বলে' উঠেছে, ক্ষুদ্র জনসংঘের বিদ্রোহের ভূমিকম্প বর্তমান বণিক-সভ্যতা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে সে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজ ঝড়ে রুদ্রের আগমনী বাজছে।

আকুল দারায় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। দু'জনে বারান্দার কোণে সরে' পাশাপাশি দাঁড়ালুম। আমার দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু বললে,—তুমি কি সত্যি যাবে? শুধু তার মুখের দিকে চাইলুম।

—তোমাকে আমি বাধা দেব না, আমাকে যখন দরকার হবে ডাক দিও।

আমাদের ঘিরে ঝড়জল উদাম হ'য়ে উঠল। মাতার অশ্রুজল, প্রিয়ার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের হাহাকারেব মাঝে প্রলয়-পথিককে চলে যেতে হবে।

অতসীর কথা

সেই ঝড়ের রাতে বন্ধ যে চলে' গেল তার পর কত বছর কেটে গেল। প্রতিবছর একবার করে' তার খবর পেতুম, রেণুর প্রতি-জন্মদিনে পৃথিবীর যে কোণেই সে থাকুক তার বিদ্রোহীচেলের একটা উপহার এসে পৌঁছত। কোন বৎসর নিউইয়র্ক থেকে, কোন বার প্যারিস থেকে, কোন বার বাগদাদ থেকে। বর্তমান ধনিক-সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রেব ধ্বংসেচ্ছুক যে পৃথিবী-জোড়া বিপ্লবকারীর দল আছে, সে তাতে গিয়ে যোগ দিয়েছে। বন্ধ যখন ধুমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত ঘুরে' বেড়িয়েছে, আমি ধুলে গিয়ে মেয়েদের পড়িয়েছি, ঘরে বসে' কাগজ পড়েছি, নভেল পড়েছি, রান্না করোঁছি, সব ঝাট দিয়েছি, আর প্রতিদিন সেই ঝড়ের রাতে-দেখা জ্যোতিষ্ময় মূর্তিখানি ভেবোঁছি। সেই মন-ভোলান খব-ছাড়ান প্রাণ-মাতান দীপ্ত মুখ।

তার পর ভারতের মহা দিন এল। মহাত্মা গান্ধী

সত্যগ্রহের পাকজন্তু বাজিয়ে অক্ষপ্রথা-ও প্রভুত্ব-পীড়িত ভারতের ধূলিলুপ্তিত আত্মাকে মুক্তির দুর্গম পথে আহ্বান করলেন, এ নব ভগীবথ স্বাধীনতার শঙ্খ বাজিয়ে চিরঅপরাজিত মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার অমৃত-লোক হ'তে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন করলেন--মৃত মুক জনসংঘ এ সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে জেগে উঠল।

বেণুব জন্মদিন। তাকে ধবে' চরুকার স্মৃতি কাটাতে বসেছি। সহসা পেছনে পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে অবাক হ'য়ে দাঁড়ালুম, অশোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা চরুকা। কি সৌম্য স্নিগ্ধ মন্দি, কাঁচাপানি-দাঁড়িভরা মুখখানি যেন মিশুগুপ্তের মত।

আমার হাত জড়িয়ে ধবে' সে বললে,—ফিবে' এলুম, আবার নতুন খেলায় মাংতে।

বললুম,—কি আশ্চর্য! তোমার কথাই ভাবছিলুম, আজ বেণুব জন্মদিন, এখনও তোমার উপহার এল না।

এই যে, বলে' সে চরুকাটা বেণুকে দিলে। বেণু অতি স্নেহভাবে তাকে প্রণাম করে' উঠে' দাঁড়াল।

আবার মায়ের ডাকে ফিবে' এলুম,—বলে' সে বেণুকে আদব করলে।

বলে' গিয়েছিলুম, ভারতের দুদিন দব করুবাব জন্তে ধীর সাধক আসবেন, তিনি এসেছেন। কিন্তু মা কৈ ?

চোখে অশ্রুব বান ডেকে এল, কোনমতে বললুম,—গেল বছর তিনি স্বর্গে গেছেন।

বন্ধু সামনের চেয়ারে বসে' পড়ল, ভাঙা গলায় বললে,—আমায় কিছু বলে' গেছেন।

আমার সনস্ত মুখ বাড়া হ'য়ে উঠল, তাঁর মৃত্যুদিনের কথাগুলো কানে বাজতে লাগল, তিনি বলেছিলেন, সেই লক্ষীছাড়া ছেলেটা যদি আবার ফিবে আসে মা, বলিস, আমি তাকে প্রতিদিন আশীর্বাদ করেছি, তার হাতে তোকে দিয়ে যেতে পারলে আমি খুব আনন্দে মরতুম। বন্ধুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে ধীরে বললুম,—তোমাকে তিনি প্রতিদিন আশীর্বাদ করে' গেছেন।

অশুটস্বরে মাথা নত করে' সে বললে,—বুঝেছি।

দাদা এলে অশোক বললে,—ওহে, মর্নে আছে বলে-

ছিলে, যদি কাগজ বেব করতে চাও ত টাকা দেব, এখন সে কথাটা রাখ দেখি।

দাদা রাজী হলেন।

তার পরের দিনগুলো লেখায় পড়ায় কাজে কি উৎসাহ-আবেগের সঙ্গে কেটে যেতে লাগল। সভা করে' সমিতি গড়ে' প্রবন্ধ লিখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে' দিনরাত গান্ধীর বাণী প্রচারে অশোক উদ্যম হ'য়ে উঠল।

একদিন বিকেলে দাদা শুকনো মুখে এসে বললেন,—ওবে, অশোককে পুলিশে ধবে' নিয়ে গেছে, কোথায় বিদ্রোহচক বক্তৃতা দিচ্ছেছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে জানি, তবু চোখে জল এল। দাদা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—এই বুঝি বাঙালীর বীর মেয়ে।

শুধু বললুম, ওর কি ভাঙা শরীর জান ত।

দাদা ধীরে বললেন,—দেখ, কাল থেকে আমি আর কোটে যাব না।

উৎসাহেব সঙ্গে বললুম,—সত্যি, যাবে না!

দাদা হেসে বললেন,—হ্যারে, আর ভাল লাগে না।

দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে' দাঁড়ালুম।

জেল থেকে বন্ধু যখন ফিবে এল তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। কিন্তু খদ্দরপরা সেই বোকা লক্ষী শরীবে কি তেজ! সোনার আভাব মত দেহের রংএ অস্তুরাত্মার দীপ্যমান সত্য প্রকৃষ্টিব রূপ দেখা যাচ্ছে, জেলবাসশীর্ণ তপঃক্রিষ্ট মুখে কি অপকৃপ মহিমা জড়ান, অহমিণি দেখে'ও চোখ তৃপ্ত হয় না।

অশোকের সঙ্গে জেল হৃৎকে একটি তরুণ স্নন্দর যুবক এল। তাঁর স্নিগ্ধ তেজোমণ্ডিত মুখখানির দিকে চেয়ে বললুম,—এ কে ?

অশোক তাঁর পিঠ চাপড়ে বললে,—দেখ, জেলে গিয়েছিলুম তবেই ত এটিকে পেলাম, এ হচ্ছে জ্যোৎস্নার ছেলে, আমরা এক জেলেই ছিলাম।

বললুম,—আহা গেল বছর ত ও মা হারিয়েছে।

কি করুণ হেসে বন্ধু বললে,—হাঁ, তাই ত মার কাজে এমন করে' লেগেছে। ওরে বেণু, স্মৃতি-কাটা বন্ধ

করে' পালাচ্ছি'স কেন, আয়। এটি আমার ছোট-মা।
অতু, জান, এর নামও অশোক।

সেই ভাঙা শরীর নিয়ে বন্ধু আবার কাজে লাগল।
দেহটা প্রতিদিন খুব-শান-দেওয়া ছুরিব মত স্পষ্ট হ'তে
লাগল, স্নান করা, খাওয়া, ঘুমান, কিছুই হ'ল থাকে
না। কোনো বাবণ মানে না। আমি যখন ঠেকাতে
পারতুম না, রেণুকে পাঠাতুম। বেণু জোব করলে, তবে
লেখা বন্ধ হ'ত, ঘুমোতে যেত।

একটু শরীর মারতেই অশোক আবার কলকাতা ছেড়ে
বেরিয়ে পড়ল। বেণুও তাকে বেরে' বাখতে পারলে না।
বললে, সত্যিকার দেশ যেখানে, সেই নিবন্ন নিপীড়িত
অন্ধ মুক ভীত গামবাসীদের জাগাতে হবে, গ্রামেই
আমার কাজ।

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এক গ্রাম থেকে দাদার কাছে
টেলিগ্রাম এল,—অশোকের ভয়ানক অসুখ। সেই
রাতেই সবাই কলকাতা ছেড়ে বেরলুম। গিয়ে দেখি সহর
থেকে অনেক দূরে এক শীর্ণ নদীর তীরে এক প্রাচীন ভগ্ন
গ্রামে পচা পুকুরের ধারে এক কঁড়ে-ঘরে অশোক
ইন্ফুয়েঞ্জায় পড়ে' রয়েছে। নীলার মত স্নিগ্ধ চোখে
চেয়ে বললে,—এসেছ ভাই, ভাবছিলুম আব বুঝি দেখা
হবে না।

দাদাকে বললুম,—এ কি কাণ্ড দাদা! এত অসুখ,
ওই চায়ার কঁড়েতে পড়ে'!

দাদা বললেন,—এ গ্রাম ওদের জমিদারীর মধ্যে, অসুখ
শুনে' ওর দাদা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সহরে নিয়ে
যেতে, অবশ্য নিজের বাড়ীতে রাখতে না, কোন বন্দো-
বস্ত করে' দিতেন, কিন্তু অশোক কিছুতেই গেল না।

রেণুর অনেক কাম্বাকাটির পর অশোক পাশেই এক
পাকা-বাড়ীতে যেতে রাজী হ'ল।

তার পর সাতদিন মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সেবা করে'
ধন্য হয়েছি। আমার জীবনের এই সাতটি দিন-রাত
আমি কত জন্মের কত পুণ্যফলে পেয়েছিলুম। এ
দিন-রাতের প্রতিফল আমার মনে গাঁথা রয়েছে।
জীবনপ্রদীপ নিভ্বার আগে কি জ্বলজ্বলে হ'য়ে উঠল।
সে রাতে বন্ধু অতি শাস্ত হ'য়ে শুয়ে ছিল, জ্যোৎস্নার

আলো বিছানায় এসে পড়েছে, বাগান থেকে আমার
মুকুলের গন্ধওরা হাওয়া আসছে, কচিপাতা-ভরা গাছ
থেকে একটা বউ-কথা-কণ্ড পাখী মাঝে মাঝে
ডেকে উঠছে, নিব্বন্ন ঘুমন্ত গ্রাম, শুধু আমরা দুজন
জেগে আছি। দীরে সে বললে—তুমি শুতে যাও, আমি ত
ভালই আছি।

—তুমি একটু ঘুমোও না।

—ঘুম কি চোখে আসবে।

—আমারও ত আসবে না।

—বেণু ঘুমোতে গেছে, ছোট মা?

—হ্যাঁ, ওর আর অশোককে এতক্ষণ ঝগড়া করছিল,
কে রাত জাগবে। আমি দুজনকেই জোর করে' ঘুমোতে
পাঠিয়েছি।

—দেখ, ওদের যদি বেশ ভাব হয়, ওদের বিয়ে
দিও।

—হ্যাঁ, সে আমি ভেবেছি, তোমাকে সেবা করা
মন্দো ওদের মিলন হ'য়ে গেছে।

—জান্নাটা খুলে দাও ত। কি সুন্দর জ্যোৎস্না!
এমনি এক জ্যোৎস্না-রাতে আমি মরতে গিয়েছিলুম! সে
মৃত্যু থেকে কে বাচিয়েছিল! জীবন কি পরমাশ্চর্য
রহস্য, সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝলুম না, শুধু জানলুম
কোন আনন্দময় বিশ্বশক্তি আমাকে সৃষ্টি করে' তার কাজ
করিয়ে আবার ছুটি দিচ্ছে। জীবনের সত্যি কাজটা এতদিন
পরে খুঁজে' পেলুম মনে হচ্ছিল। এক মাস গ্রামে গ্রামে
পীড়িতদের সেবা করে' যে কি আনন্দ পেয়েছি, তার
তুলনা নেই। দেখ, মহাপুরুষদের সেই কথাই সত্যি—
শক্তি দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে,—লোভ দিয়ে নয়, ত্যাগ
দিয়ে,—জীবনকে ধ্বংস করে' নয়, আপন জীবন উৎসর্গ
করে' আত্মার আনন্দ খুঁজে' পাওয়া যায়।

পাখার বাতাস করতে করতে বললুম,—একটু
ঘুমোতে চেষ্টা কর না।

ভোরের শুকতারার মত কোন্ জাগরণের আলো তার
চোখে জলে উঠল, আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে
সে বললে,—না, আজ আমায় বলতে দাও। বিশ্বের সৃষ্টির
কাজে ব্রহ্মার সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছি, ক্রমের বন্ধ হ'য়ে

ভাঙার খেলাটাই সারাজীবন খেললুম, গড়ার খেলাটা আর খেলা হল না। আমি এ ছোট মাটির পৃথিবীর বিশ্বের সঙ্গে আনন্দের সৃষ্টি-সাথী হয়ে জন্মেছিলুম, পৃথিবীর কোন্ অনাগত যুগের স্বপ্ন আমায় মাতাল করেছিল জান, পৃথিবীতে এক ধর্ম—প্রেমধর্ম, এক জাতি—মানব জাতি, এক দেশ—এই পৃথিবী মা। কোন্ মহামিলনের দিকে জগৎ চলেছে, ইংরেজ, জার্মান, কাফ্রী, জুলু, বাঙালী, চীন, যে লাঙ্গল ঠেলেছে, যে লোহা পিটেছে, যে লিখেছে, যে জাহাজ চালাচ্ছে, সবাই সভ্যতার বিপুল রথচক্রের এক-একটি চাকা, শক্তির রথে চড়ে' শতাব্দীর পর শতাব্দী নর-নারায়ণ চলেছেন, কোন্ শাস্ত্রের আনন্দের মিলনের যুগের দিকে, কত কোটি তাঁহার বাছ, বিপুল তাঁহার শক্তি, দুঃখদ্বন্দ্বময় ইতিহাস-পথ দিয়ে নব নব ধর্ম, জাতি, রাজ্য ভেঙে গড়ে' কতরূপে ভিন্নি চলেছেন, কখনও নরমুণ্ডের পাহাড় তুলে বাজ্য পুড়িয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে—আলেকজান্দার, চেঙ্গিস, নাদির, নেপোলিয়ান; কখন আত্মাব জ্ঞান-শিখা জালিয়ে প্রেমের স্রোত বইয়ে—বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, গান্ধী। সে যুগে ইংরেজ বাঙালী কাফ্রীতে প্রভেদ থাকবে না, পুরুষ ও নারীর অধিকাংশে ভেদ থাকবে না, লোকে লোকে জাতিতে জাতিতে শক্তির জন্ত অর্থের জন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর সংগ্রাম নেই, ধনীর ধনঝঞ্ঝার, শক্তিমত্তের রণজঙ্ঘার থেমে গেছে,—মানব-ইতিহাসের সেই অনাগত যুগের প্রতীক্ষায় ভারত, আমার ভারত, বিশ্বমানবের এই মিলনভূমি, এই বন্দিনী দুঃখিনী ভাবত, তার বুকের ধর্মের আরাতি-প্রদীপ ছিন্নমলিন অঞ্চলে ঢেকে পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়াব মুখে তপস্বিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে,—

শ্রান্ত হয়ে সে চূপ করল। তাকে হাওয়া করতে লাগলুম। সে ধীরে বললে,—একটা গান গাও, বন্দে মাতরম্।

বলুম,—না, তা শুনে তুমি আরও উত্তেজিত হবে। আর, যে স্বর তুমি শুনেছিলে, সে স্বর আমার গলায় নেই, আমার গলায় যে ঘা হয়েছিল, এখন আর কিছুই গাইতে পারি না।

আবার বন্ধ উত্তেজিত হয়ে বলে' উঠল—দেখ চ কি

নির্মম প্রকৃতি!—কাউকে সে রেহাই দেয় না। ডাক্তার বলছিল, আমি বাঁচতে পারতুম, কিন্তু যৌবনে যে উচ্ছ্বল জীবন যাপন করেছি, প্রকৃতি তার হিসেব রেখেছে, আজ কড়ায় গণ্ডায় বন্ধে নিচ্ছে। একটু গাও, স্বরের সুধার জন্তে প্রাণটা ত্যজিত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে মিষ্টি স্বরের কয়েকটা হিন্দি গান গাইলুম। বন্ধ একটু শান্ত হল। ছোট শিশুর মত গানের স্বরে স্বরে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত গভীর হয়ে এল, বিল্লীর ববে পাণ্ডুবর্ণ আকাশ ঝিমঝিম করছে রাতেব বুকের দীপঙ্খাসের মত, মাঝে মাঝে অন্ধকার বাগানে মম্ববধনি। বন্ধুর বোগশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এল! ভাবছিলুম, বৌদ্ধযুগে সেই বাজা অশোকের সময় পৃথিবীতে যে দুঃখ দারিদ্র্য পাপ ছিল, সেই স্বার্থ দম্ব শক্তির হানাহানি কিছু কমেছে কি? এখনও সেই জীর্ণ ভূগকুটীর, সেই অস্বস্ততা, ভীকৃত্য, অত্যাচার! এ অশোক চলে' যাবে, ওই তরুণ অশোকও চলে' যাবে, মানবজাতি প্রেমশাস্ত্রের যুগের দিকে একটু এগোবে কি?

তীব্রবালো মাথার খব কাছে প্রদীপশিখার মত দপদপ করতে লাগল। মনে হল—যুগে যুগে দেশে দেশে যাবা স্বাধীনতার জন্তে প্রাণ দিয়ে এসেছে, তারাই অনিমেষ নয়নে এ বর্তমান পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, আমাদের স্বপ্ন তোমরা কি সফল করলে, আমাদের মৃত্যু কি সার্থক হল?

এর পরের রাতে অশোক বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। শুধু যদি একবারের জন্ত আমায় আগের গলাটা পেতুম, গানের স্বরে ভিজিয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে' দিতুম। সে রাতে তার বিদ্রোহী মাতৃময় নয়, কবি-মাতৃময়টি জেগে উঠেছে। চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে সে যেন মাতাল হয়ে উঠল,—আহা! কি মধুর জ্যোৎস্না! সমস্ত সৃষ্টি ফুটে এ কার হাসি, এ ভুবনলক্ষ্মীর অঙ্গের লাবণ্য, দেখ, দেখ। পৃথিবী-মা এতদিন তার সাত রু'এর আঁচল উড়িয়ে আমায় ধুবিয়েছে—এই রক্তের লাল, আকাশের নীল, গাছপালার সবুজ, আলোর সৌম্যহীন শুভ্রতা,—আজ পৃথিবী-মা তার কোন সৌন্দর্য-অবগুণন খলে

আমায় ডেকে নিচ্ছে,—সেখানে সব ঝাঝা পাতা, শুকনো ফুল, মরুহারী নদী, মরা পাখীরা জমে। দেখ, দেখ, কে ওখানে দাঁড়িয়ে, ও জ্যোৎস্না, মোনালিসার মত অপূর্ণ হেসে আমায় ডাকছে—

শেষরাতে আবেগের প্রতিক্রিয়া হল, সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। বীরে একবার জিজ্ঞাসা করলে,—গান্ধী কেমন আছেন? মহাত্মাজী?

গান্ধীর উদ্দেশ্যে সে বারবার প্রণাম করল।

বীরে বলল—তিনি ভালই আছেন।

গান্ধী যে দুদিন হল ইংরেজের কাবাগারে বন্দী, একথা ওই মৃত্যুশয্যাকে বলতে পারলুম না।

ইঠাং বন্ধুর চোখ বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠল, সে বলে উঠল,—না, ওরা ওঁকে বন্দী করবে, জেলে পুর্বে; যীশুকে কি ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হয় নি? এ যে অনেক দিনের জমা পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভাবলুম, সত্যই ত—এ ত আমাদের পাপের ফল। এতক্ষণ ভাবছিলুম, পশ্চিমদেশের বর্তমান সভ্যতার ব্যর্থতার কথা, এ সভ্যতা ইঞ্জিন তৈরী করেছে, এয়ারোপ্লেন তৈরী করেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, বাজ্য জয় করেছে, কিন্তু মানবাত্মার স্বাধীনতা দিতে পারলে না,—শুধু শক্তি দিলে, কল্যাণ দিলে না। নিজেদের হীনতা ভীকতার কথা ত ভাবিনি।

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে মনে হল, এ যেন একটা বড় জাহাজ চির-অন্ধকারের জোয়ার ঠেলে চলেছে, যাত্রীরা জাহাজের জায়গার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি করে' চলেছে; জাহাজের উপরে কি আছে, তলায় কি আছে, কোথায় চলেছে তা কেউ জানে না। কোন্ প্রবলজাতি কাপ্তান হয়ে জাহাজের হাল ধরে' চালাবে এই নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্তের স্রোত বয়ে

চলেছে। আমার বন্ধু এ জাহাজের প্রান্ত হতে খসে মৃত্যুর অন্ধকার সাগরে কোথায় তলিয়ে যাবে তা ত দেখতে পাচ্ছি না। বীরে বন্ধুর পাণ্ডুর মুখে চোখের-জ্বলে-ভেজা একটি চুমো দিলুম।

শেষের রাতে বন্ধু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল, বিকারে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে ছ'চারটি কথা অগ্নিস্কুলিঙ্গের মত—liberty equality—গান্ধী—অত্যাচারীর মুণ্ড—নরমণ্ডের পাহাড়—নাদির চাই—রক্তের স্রোত—অতমী—বেহালা নয় রিভলভার—কে জ্যোৎস্না—বাচ্ছি—পৃথিবী-মা—জালাও আগুন—জাগো, জাগো—liberty—

ভোরবেলায় সপ্তদশমণ্ডল মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু চলে' গেলেন।

আজ রেণুর জন্মদিন। বন্ধুর দেওয়া চরকাটা সে আজ ফুল দিয়ে এতক্ষণ সাজাচ্ছিল, আর পারলে না, ছাদের কোণে কাঁদতে গেল। অশোক পাশের ঘরে বসে' কাগজের জন্ম লিখছিল, স্বাধীনতার অগ্নিপ্রদীপখানি বন্ধু তাব হাতে দিয়ে গেছেন! সেও আর লিখতে পারলে না, রেণুর পাশে গিয়ে ছাদে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে, টাকা-পোতা টবটাব পাশে।

আজ অবিরল ধাবায় চোখের জল ঝরছে, ঝরুক, প্রতিদিনই চোখের জল ঝরবে।

আজ আকাশের এ উদার আলোর দিকে চেয়ে ভাবছি, রাঙা চলীর ঘোমটার নীচে সাহানার তানে আমাদের শুভদৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্তু মৃত্যুর অবগুণ্ঠন-তলে তারার আলোয় জ্যোতিষ্ময় অমৃতময় আত্মার সঙ্গে আমার মিলন হয়ে গেছে, আমার নারীজন্ম সার্থক হয়েছে, আমি ধন্য হলাম।

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

দক্ষিণ কানাড়ায় বন্যা

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণে ও মালাবারের উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া জেলা অবস্থিত। দক্ষিণ কানাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী এই জেলাটির সৌন্দর্য্য বন্ধিত করিয়া প্রবাহিত। এই নদীগুলি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। বর্ষাকালে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জলরাশি এই নদী-

পরিমাণ বৃষ্টি হইলে গ্রাহ্য করে না ও তাহাদের ক্ষেত্র-গুলিকে সামান্য বান হইতে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করে না।

অপেক্ষাকৃত বড় নদীগুলিতে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলিকে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 'কুহুর' বলে। এ-সকল দ্বীপে লোকের বসতি আছে



বন্যা-পৌড়িত প্যানেম্যাঙ্গালোরের দৃশ্য

গুলিতে আসিয়া পতিত হওয়ায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীগুলি স্ফীত ও বেগবতী হইয়া উঠে। এই সময় একটু বৃষ্টি হইলেই নদীর জল কূল প্লাবিত করিয়া শস্যক্ষেত্রগুলিকে ধৌত করে। সুতরাং এখানকার শস্যক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত

ও চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। এ দ্বীপগুলিতে সাধারণত নারিকেল বৃক্ষই জন্মায়—২।১ টি শস্যক্ষেত্রও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। এইসকল স্থানে ফলন খুব ভাল হয়। সেই কারণেই মধ্যবিত্ত কৃষকেরা স্বচ্ছলতার প্রলোভনে



দক্ষিণ কানাডা গেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে এই সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ উদিপী তাগুকে সেবা-কার্য করিতেছেন
[সাইমনস্ট্রিডিও কল্লুক গৃহীত আলোক চিত্র হইতে]



বগ্না-বিনষ্ট বনতোয়ালের একটি দৃশ্য



বন্যা-বিনষ্ট বানতোয়ালেরে অপব একট দৃশ্য

[ছবির মধ্যস্থলে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত অক্ষয় দত্ত দণ্ডায়মান । ইনি ৫২টি বালকবালিকাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন ।]

অন্যত্র বাস করে না। অনেকে বেশ পয়সা খরচ করিয়া ধরবাড়ী নিৰ্মাণ করিয়া 'কুছুবে' বাস করে।

গত ২ই ও ১০ই জুলাই হঠাৎ এখানকার স্থায়ী কৃষকগণের উপর বরুণদেবের কোপ পড়িল। ২ই তারিখের রাত্রি হইতে কল্যাণপুর 'কুছুবে' নিকটস্থ নদীর জল কূল প্লাবিত করিয়া বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখানকার লোক সামান্য বানে অভ্যস্ত— কাজেই ইহাকে তাহারা বামিক বান বলিয়া মনে করিল। কিন্তু পরদিন ছিপ্রহরে নদীর জল ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইল। কৃষকগণ ইহাতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। কয়েকখানি কুঁড়েঘর পতিত হওয়ায় দরিদ্র অধিবাসীগণ তাহাদের মূল্যবান্ জব্যসামগ্রী লইয়া গ্রামস্থ জমীদারের আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সন্ধ্যার অনতিপূর্বে

জমীদারের আশ্রয় পতিত হইল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাধিক নরনারী গৃহহারা হইল। অনেক কষ্টে নরনারীরা নিজেদের জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তু ও অন্যান্য দ্রব্য সমস্তই ভাসিয়া গেল। এই বিপন্ন নরনারীকে সমদ্র-মত সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয় নাই। নিকটস্থ গাজ্জায় ও পাহাড়ে বন্যাক্রিষ্ট নরনারীকে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়। উদীপীর জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া বন্যাপীড়িত স্থানে সাহায্য প্রদান করেন।

সেই দিনই অন্যত্র হইতেও বন্যার সংবাদ পৌছিল। কুণ্ডপুর, বানতোয়াল, প্যানেম্যাঙ্গালোর, কুলুর, উপীনা-গদী, বেলতানগদী প্রভৃতি স্থান হইতেও বন্যার সংবাদ

পাওয়া গেল। নদীর উভয় পার্শ্বের প্রায় সমস্ত গ্রামেই বন্যার প্রকোপ হইয়াছিল। নদীর খাতটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া উপ্চানো জলের বেগে নদীতীরস্থ একটি গ্রামও বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইল না। এইরূপে সহস্র সহস্র নরনারী গৃহহীন ও সম্বলহীন হইয়া পড়িল।

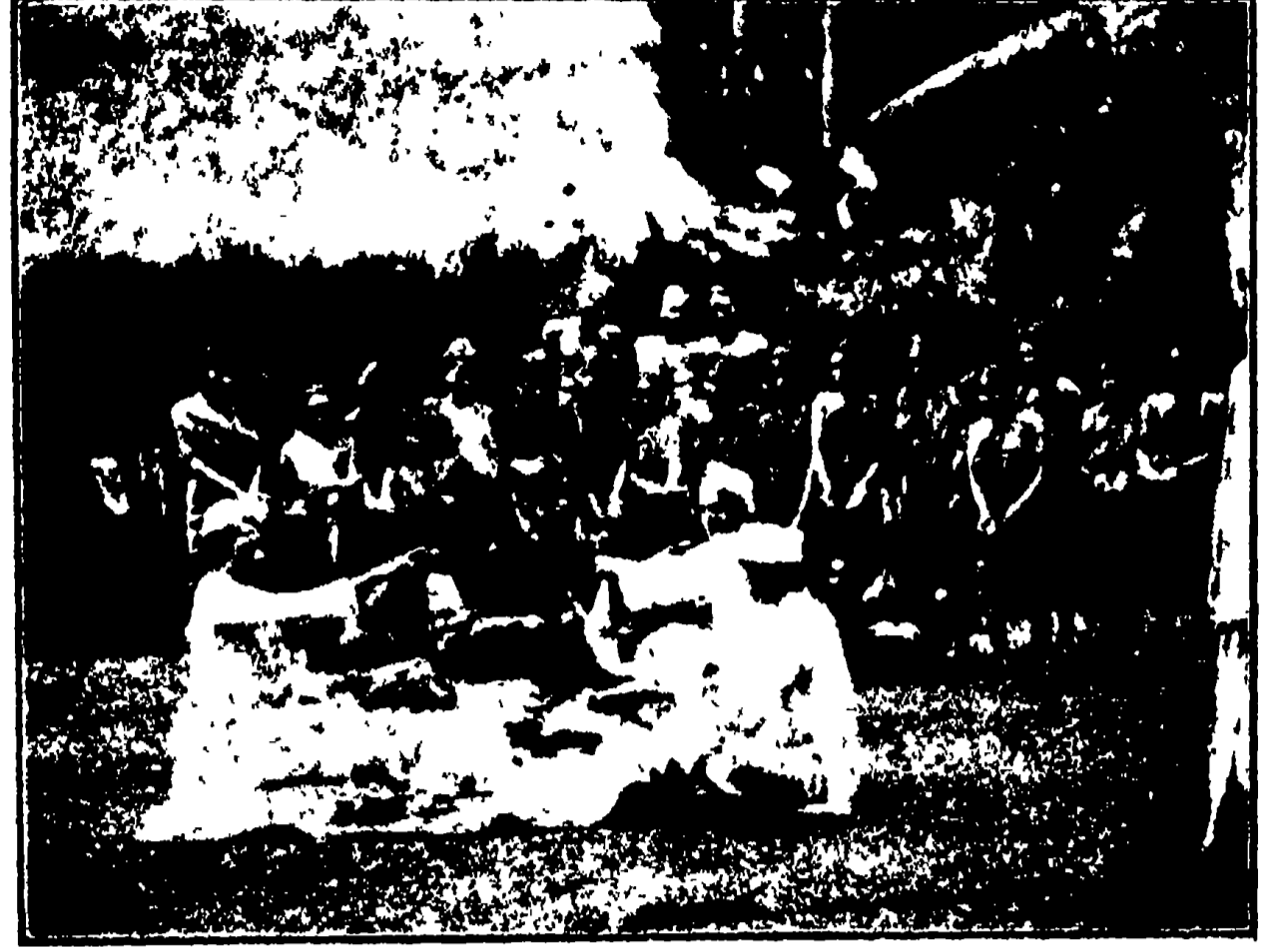


কল্যাণপুরের খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগকে বস্ত্র বিতরণ



কল্যাণপুরে সাধারণের ভিত্তর বস্ত্র বিতরণ

স্বৈচ্ছামেবকেরা সাধামত সাহায্যদানে ক্রটি করেন নাই। প্রয়োজন অনুসারে তাঁহারা চাউল, বস্ত্র, ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিয়াছেন। উদিপী তালুকের অন্তর্গত আকুর নামক একটি গ্রামে রক্ষনের জন্ত শুষ্ক স্থান না পাইয়া ভিজা চাউল ভক্ষণ করিয়া প্রায় চারিশত লোক একই সময়ে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়। এই-সকল ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জন্ত একটি অস্থায়ী দাতব্য



কল্যাণপুরের ছুর্দশাগ্রস্ত পক্ষ্মাদিগকে বস্ত্র বিতরণ



কেশ্মান্ন গ্রামের অধিবাসীদিগকে বস্ত্র বিতরণ



কেশ্মান্ন গ্রামের বন্যাপীড়িত মুসলমানদিগকে বস্ত্র দান

চিকিৎসালয়ও স্থাপন করা হইয়াছে। সুস্থ ও সবল লোকদিগকে চরকা ও তাঁতের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় সরকারী সাহায্যও উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় নাই।

গত ৬ই ও ৭ই আগষ্ট তারিখে আবার একটি ভয়াবহ বন্যার সংবাদ পাওয়া যায়। নেত্রবতী নদীর জল বেগে বৃদ্ধি পাওয়ায় বানতোয়াল, প্যানেম্যাঙ্গালোর, উপীমানগদী ও ভেহুর গ্রামগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলির কতকগুলি ছবি প্রদত্ত হইল।

বানতোয়াল গ্রামে প্রায় এক হাজার ঘর লোকের বসতি আছে। এই গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। কিন্তু এই প্রবল বন্যা এই শান্তিপূর্ণ গ্রামটির সকল সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে। সেখানে মুাসাধিককাল পূর্বে সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী গ্রামের শোভা বর্ধন করিত, সেখানে আজ চারিদিকে শুধু ধ্বংসের লীলা। ৭ই আগষ্ট তারিখে নেত্রবতী নদীর জল হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। গ্রামের অধিবাসীরা কোনক্রমে পরিত্যক্ত চালার উপর ও অন্যান্য উঁচু স্থানে যাইয়া নিজেদের জীবন রক্ষা করে। কিন্তু গো-মহিমাди গৃহপালিত পশুগুলি সমস্তই ভাসিয়া যায়। দুইদিন পরে সাতটি মানুষের মৃতদেহও এই ধ্বংসস্থলপেব ভিতব হইতে উদ্ধার করা হয়। গ্রামটির চতুর্দিক্ জলে বেষ্টিত হওয়ায় অল্প স্থান হইতে সাহায্য পাইতে বিলম্ব ঘটে। গ্রামে যাইবার রাস্তাগুলি সমস্তই ডুবিয়া যাওয়ায় লোক-চলাচলের পথ বন্ধ হয়।

প্যানেম্যাঙ্গালোর গ্রাম নেত্রবতী নদীর অপর পাশে অবস্থিত। উভয় গ্রামের মধ্যে নদীর উপরে একটি সেতু আছে। দিবাভাগে এইগ্রামে বান ডাকে। সুতরাং এখানকার অধিবাসীরা সকলেই কোনপ্রকারে

প্রাণে বাঁচিয়াছে। মিঃ আচ্চায়া নামক একজন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ৫২ জন নিরাশ্রয় রমণীর ও বালকবালিকার প্রাণ রক্ষা করেন। অগ্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরাও এই বিপন্ন নরনারায়ণের জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন।

উপীমানগদী ও ভেহুর গ্রামের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এখানকার নরনারীর দুর্দশার কথাও বর্ণনাশীত। ম্যাঙ্গালোর সহর এবং চতুর্দিকস্থ গ্রাম-গুলিও এই প্রবল বন্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

এ পর্য্যন্ত এই বন্যাক্রান্ত জেলাতে ২৬টি সাহায্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ ১২ হাজার নরনারীকে সাহায্য করা হইতেছে। অন্ন বস্ত্র ঔষধ ও পথ্য ইত্যাদিতে দৈনিক প্রায় আটশত টাকা খরচ হইতেছে। কিন্তু বর্তমানে আরও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এখনও ৪৮ হাজার লোকের ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিতে সাহায্য করা দরকার। কৃষকদিগকে ফসলের বীজ ক্রয় করিবার জন্যও অর্থসাহায্য করিতে হইবে। যাহাতে এইসকল নদীমাতৃক গ্রামে ভবিষ্যতে বন্যা না হয় সে-বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হইবে। স্থায়ীভাবে এই দৈব উপদ্রবের প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলা, বোম্বাই, মহীশূর, বিহার ও ব্রহ্মদেশ হইতেও বন্যার সংবাদ আসিয়াছে। গত বৎসরের উত্তর-বঙ্গের ভীষণ বন্যার কথা এখনও কেহ ভুলিতে পারে নাই। সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ ভাবে বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য করিয়াছিল, আশা করা যায়, বর্তমান ক্ষেত্রেও সকলেই এই দুর্দশাগস্ত নরনারীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ভুলিবেন না।

শ্রী প্রভাত মান্নাল

ভাস্কর-শিল্পে জার্মানি

(১)

দেবদেবীর প্রতিমাগড়া ছাড়া বর্তমান ভারতে ভাস্কর-শিল্পের পরিচয় একদম পাই না বলিলেই চলে। আজকাল কয়েকজন মারাঠা এবং বাঙ্গালী শিল্পী ভাস্কর্যে হাত দেখাইতে শুরু করিয়াছেন মাত্র।

এমন কি মধ্যযুগের ভারতেও মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের আওতার বাহিরে কোন স্থপতি তাঁহার শিল্পক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্র দেশেব মালবান নগরে সম্রাট শিবাজীর এক প্রস্তরমূর্তি সাবেক কাল হইতেই দাঁড়াইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্তু এই ধরণের কাজে বোধ হয় এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আরও প্রাচীনতর যুগের সাক্ষী স্বরূপ মহারাজ কণিকের মূর্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরাব সরকারী সংগ্রহালয়ে অনেকেই এটা দেখিয়া থাকিবেন।

ইয়োৰোপ ও আমেরিকার যে-কোনো দেশেই যাই, দেখিতে পাই যে, ভাস্কর্য আজকাল একমাত্র মন্দির গির্জা বা ধর্মগৃহেরই একচেটিয়া শিল্প নয়। প্রত্যেক বড় বড় শহরের রাস্তায় বাগিচায় পৌরভবনে নানা প্রকার মূর্তি বিরাজ করিতেছে। এইগুলি গড়িবার জন্য শিল্পী ও সকল দেশেই বিস্তর।

মূর্তিগড়া শিল্পীর একটা সখ মাত্র নয়। ইহা একটা ব্যবসাও বটে। মূর্তি গড়িয়া শিল্পীরা অন্নসংস্থান করিয়া থাকেন। কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি শ্রেণীর স্বধীদেব মতন স্থপতিরও জনগণের “পূজাস্থান” বিবেচিত হন।

(২)

বর্তমান ভারতের বাগ-বাগিচা, সরকারী বাড়ী, পাঠশালা, সংগ্রহালয় সবই বিদেশীর হাতে। কাজেই এইগুলোকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য যে-সকল শিল্প আবশ্যিক সবই বিদেশীরা স্বজাতীয় ওস্তাদগণের হাতে গড়াইয়া থাকেন। কি নগর-নির্মাণ, কি রাস্তা-নির্মাণ, বর্তমান ভারতের প্রত্যেক গঠনকার্যেই বিদেশীয় শিল্পী ও

কারিগরেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছেন। ভারতীয় দেবদেবী এবং মন্দিরগুলা যদি ভারতবাসীর হাতে না থাকিত তাহা হইলে ধর্মসংক্রান্ত ভাস্কর-শিল্পও এতদিনে ভারতীয় শিল্পীর আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইত।

পবাদীনতার ফলে ভারতবাসী যতগুলি ক্ষমতা হারাইয়া বসিয়াছে তাহাব ভিতর ভাস্কর্যের শিল্পক্ষমতা অন্যতম। স্বাধীন দেশে বেড়াইতে আসিলে ভারতীয় পর্যটক মাঝেই শিল্পের তরফ হইতে স্বদেশের দুর্গতি প্রতি পদবিক্ষেপে বুঝিতে পারেন। স্বরাজ স্থাপিত না হইলে ভারতে স্থপতি-বিদ্যা উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

শিল্পের উন্নতি ও প্রসার পয়সা-সাপেক্ষ। গরীব লোকেরা কুঁড়েঘরে প্রিয়তম বস্তুও আনিয়া মজুদ করিয়া রাখিতে পারে না। নগর-পল্লীর কর্তারা পৌরভবনের কর্তারা সংগ্রহালয়ের কর্তারা সরকারী টাকা খরচ করিতে রাজি থাকিলেই দেশের পল্লীশহরের শিল্পীরা নিজ নিজ ওস্তাদি দেখাইবার জন্য ঝুঁকিতে পারে। ইয়োৰোপ-আমেরিকায় ভাস্করশিল্প এইরূপ সরকারী অর্ডারের সাহায্যেই নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

(৩)

পশ্চিম মুল্লকের লোকেরা জার্মানদিগকে মূর্তিশিল্পে পাকা কারিগর বিবেচনা করে না। জার্মানরা বিজ্ঞানে ওস্তাদ, দর্শনে ওস্তাদ, ব্যবসায়ে ওস্তাদ, লড়াইয়ে ওস্তাদ এবং সঙ্গীতে ওস্তাদ। এই-সকল দিকে জার্মানির খ্যাতি ইয়োৰোপ ও আমেরিকার সর্বত্রই রটিয়াছে। কিন্তু সুকুমার শিল্পের আসরে জার্মান জাতিকে পশ্চিমারা আজও সম্মান করে না। পশ্চিমাদের এই বিচার যুক্তি-সঙ্গত নয়। কি মধ্যযুগে, কি বর্তমান কালে জার্মানরা সুকুমার শিল্পে অনেক উঁচুদের সৃষ্টি সাধন করিয়াছে। সেইগুলো কোন হিসাবেই অগ্ন্যাগ্ন পশ্চিমাশিল্পের তুলনায় খাটো নয়। ভাবতীয় পর্যটকেরা জার্মানিতে আসিলে

ফ্যাক্টোরিগুলো দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান স্থাপত্যের সংগ্রহগুলো দেখিতে ভুলিলে অনেক বিষয়ে দরিদ্র থাকিয়া যাইবেন।

ভারতীয় শিল্পীদের সংসারে ইতালীর নাম আছে এবং ফ্রান্সেরও নাম আছে। • কিন্তু আমাদের বিদেশ-প্রীতি বা “বিদেশী-আন্দোলন”কে এই দুই দেশের স্কুমার কলার অথবা প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতেই আটক রাখা ঠিক নয়। রূপের রসে জার্মানরা কোনো দিনই বঞ্চিত ছিল না। আজও ইহারা এই রসে বঞ্চিত নয়—এই ধারণা ভারতের জ্ঞানমণ্ডলে প্রচারিত হওয়া উচিত।

(৪)

ফরাসী স্থপতি রোদ্যার সমসাময়িক জার্মান ওস্তাদের নাম হিল্‌ডেব্রাণ্ড। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিউনিক শহরে ইহার কাজের এক বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে জার্মানিতে রোদ্যার প্রভাব কমিতে থাকে। বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জার্মানির ভাস্করেরা অনেকেই কিছু না কিছু হিল্‌ডেব্রাণ্ডের শিল্প হইতে শক্তি লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যে হাউপ্টম্যানের যে স্থান, ভাস্কর্য্যে হিল্‌ডেব্রাণ্ডের সেই স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

হিল্‌ডেব্রাণ্ড মিউনিক শহরেই শেষ পর্য্যন্ত আড্ডা গাড়িয়া ছিলেন। এই শহরের “ম্যাক্সিমিলিয়ান প্লাট্‌স্” নামক চৌরাস্তার উপর এক কূআ আছে। নিয়র্বার্গ, ইত্যাদি শহরের মধ্যযুগের কূআগুলো জার্মানিতে এবং ইরোপে প্রসিদ্ধ। এই পৌর-কূপসমূহ একসঙ্গে বাস্তুশিল্প এবং ভাস্করশিল্পের কেন্দ্র-স্বরূপ। ম্যাক্সিমিলিয়ান প্লাট্‌সের পৌর-কূপের আবেষ্টনকে ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত করিবার ভার হিল্‌ডেব্রাণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। জার্মানরা তাঁহার নিষ্পন্ন শিল্পের তারিফ করিয়া থাকে। ফ্রান্সেও বহু স্থপতি শড়কের চৌমাথায় স্থিত জলের ফোয়ারায় মূর্তি বসাইয়া নামজাদা হইয়াছেন।

ঘরবাড়ী তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগড়ার কাজ চালাইতে হয়। কাজেই স্থপতির পক্ষে মূর্তিটার রূপ-কল্পনায় আশেপাশের আস্বাব সরঞ্জামগুলো বিশেষ-

শিল্পীর হাত কিরূপ তাহা এই আবেষ্টনের—আকাশের চতুঃসীমার সন্ধ্যাবহার করিবার কৌশলে ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য এই কৌশল সন্ধ্যা নানা স্থপতি নানাপ্রকার রূপ-বৈচিত্র্যের পথ বাছিয়া লইয়াছেন।

অনেক সময়ে খোলামাঠে—আকাশের তলে—বাগানে—অথবা শড়কের ধারে মূর্তি গড়িবার ফরমায়েস আসে। শিল্পীকে তখন আবার এক নয়া সমস্যায় পড়িতে হয়। মূর্তিটা খাড়া করিয়া তোলাই স্থপতির একমাত্র কাজ নয়। রূপের সঙ্গে আকাশের বা আবেষ্টনের কি সন্ধ্য তাহা তলাইয়া মাজাইয়া বুঝাই প্রত্যেক ভাস্কর-শিল্পের ওস্তাদপদবাচ্য গুণীর প্রধান কৃতিত্ব।

এইসকল বিষয় আলোচনা করিয়া হিল্‌ডেব্রাণ্ড “ডাস্ প্রোব্লেম্ ডার ফর্ম্” (অর্থাৎ “রূপ-সমস্যা”) নামক একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ফরাসী ওস্তাদ রোদ্যার চিন্তাও ভাস্কর-সাহিত্যে আদৃত হইতেছে।

(৫)

বার্লিনের গ্রাণ্ডাল গ্যালারির ময়দানে একটা সিংহমূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটা গড়িয়াছিলেন গার্ডল। গতবৎসর (১৯২২) এই শিল্পীর মৃত্যু হইয়াছে। জানোআর গড়িয়া তিনি প্রসিদ্ধ।

এক-একটা জানোআর আল্‌গা-আল্‌গাভাবে গড়িবার দিকে তাঁর ঝোক ছিল বেশী। পশুগুলোকে বহু দুর্দান্ত অবস্থায় দেখানো তাঁহার শিল্পের লক্ষ্য নয়। উন্মাদনা, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির প্রভাব গার্ডলের জানোআরে দেখা যায় না।

আবার পশুচিত্ত, জানোআর-হৃদয় ইত্যাদি বিশ্লেষণের দিকেও গার্ডল মাথা খেলান নাই। জীবজন্তুর যথাসম্ভব প্রাকৃতিক আকৃতি রক্ষা করাই ছিল তাঁহার স্থাপত্যের বিশেষত্ব। জুঅলজি বিদ্যার পণ্ডিতেরা গার্ডলের হাতের সাফাই প্রশংসা করিবেন। জ্যাস্ত জানোআর স্থির-ধীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এই দৃশ্য শিল্পে দেখিতে হইলে গার্ডলের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে হইবে।

এই হিসাবে তাঁহার বনমাছুষ বা মাছুষ-বানর জীবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। এইটাই

ভার ক্যান্টে” ভবনে এই মূর্তি দেখানো হইয়াছিল। দর্শকেরা একটা জ্যাস্ত নরবানরের হাত পা মুখভঙ্গী পাথরের শিল্পে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। অনেকদিন ধরিয়া গার্ডল এইটার জন্ত ষাটিয়াছিলেন।

(৬)

প্যারিসের মতন বার্লিনেও বে-সরকারী প্রদর্শনী-ভবন অনেক আছে। এই-সকল ঘরে শিল্পদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা চিত্রকর ও ভাস্করদের কাজ দেখাইয়া থাকে। কেনা-বেচার ব্যবস্থাও থাকে, বলাই বাহুল্য। স্বালাষ্টাইন কুলিট ইত্যাদি নানা কোম্পানীর আশ্রয়ে এইরূপ শিল্প-বাজার বসে। এই-সকল বাজারে দুই মহিলা শিল্পীর কাজ দেখা গিয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই নারী-মূর্তি গড়িয়াছেন। মূর্তিগুলো সবই দুঃখ-দারিদ্র্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। কোনো গড়নেই প্রাণ নাই, শক্তি বা স্বাস্থ্যও নাই। চোখমুখের ভিতর দিয়া হাহুতাশ বাহির হইতেছে। কতকগুলো শিশু লইয়া এক জননী বিব্রত, দুর্ভিক্ষ এবং নৈরাশ্যের আবহাওয়া। আর-এক

মূর্তির লম্বা লম্বা মোচড়ানো হাত-পার আবেষ্টনে অশান্তি উদ্বেগ এবং ব্যাধির উৎপীড়ন পরিস্ফুট।

জীবনে আনন্দের অভাব দেখাইবার জন্তও জার্মান শিল্পীরা বাটালি ধরে। দেখিবামাত্র মনে পড়বে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অনাহার-প্রপীড়িত হাশুবিহীন মরণ-মাত্র-প্রত্যাশী ভারতীয় নরনারীর জীবন। এইগুলো কি জার্মানির বর্তমান রাষ্ট্রীয় দৈন্তের সাক্ষী? না বোল-শেভিক বিপ্লবের অশান্তি বঙ্গনা করিয়া মহিলা স্থপতি উদ্ভট সৃষ্টি করিয়াছেন?

চিত্রশিল্পেও জার্মানরা এই ধরণের দৈন্ত এবং অশান্তিকে রূপ দিতেছেন। কোনো কোনো সমজ্জদার বলিতেছেন—“এই ধরণের দুঃখ-কষ্টের মূর্তিকে রুশ সাহিত্যবীর দস্তয়েব্‌স্কির প্রভাব বিরাজ করিতেছে।”

ভারতীয় দর্শক সহজেই অহুমান করিবেন,— জার্মানিতে কোনো এক গড়ন-রীতি অথবা শিল্পাদর্শ প্রভাবশালী নয়। এখানকার শিল্পসংসারে একসঙ্গে বহুবিধ রসের রূপের ও রীতির সৃষ্টি এবং প্রচার চলিতেছে।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

বাদল-বিদায়

ওগো বাদল, তোমার বিদায় বাজে, বাজে,
মোর চেতনায় আঘাত হৈনে, বুকের মাঝে !
তোমার চোখের জলে পুষে
যে-বাণী হায় গেলে খুয়ে,—
তারি আকুল বিলাপ-ধ্বনি খামে না যে,
আমার গোপন বুকের মাঝে !

সেই রাগিণী ফিরছে যে গো কেঁদে কেঁদে
কি-যেন তার ছিল বলার, গেছে বেধে ;
না-বলা সেই বাণীর আভাস
ছেয়েছে আজ সারা আকাশ,—
মানস-লোকের দ্বারে-দ্বারে সেধে সেধে
সেই রাগিণী ফিরছে কেঁদে ।

কত কথাই সেই-কাদনে রইল গাঁথা,
কত হারা-স্মৃতির ব্যথা—আকুলতা !
কত প্রেমের বাহিনী যে
ঐ কাদনে গেল ভিজে,
আজ বাদলে তারি করুণ সজলতা,
হারা-স্মৃতির আকুলতা !

বিদায়-পথের ওগো বাদল, তোমার বাণী
হারা-দিনের কোন্ বারতা দিল আনি’ ;
নাম-হারা কোন্ সুরের স্মৃতি
মনের মীড়ে জাগায় গীতি,
অনেক-কালের ভুলে-যাওয়া বেদন হানি’
ওগো বাদল, তোমার বাণী ।

শ্রী হৃষীকেশ চৌধুরী



পাতালে স্বর্গ—

আমরা পৃথিবীর উপরে কত স্নহর স্নহর দৃশ্য দেখিতে পাই—কত নদ নদী গিরি পর্বত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের সারি আমাদের এই স্নেহময়ী ধরার বুকে কত বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই পৃথিবীর তলায়, মাটির মধ্যে কত বিচিত্র দৃশ্য আমাদের চক্ষুর এবং মনের আড়ালে গোপন রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। এইসমস্ত দৃশ্যের কয়েকটি সম্বন্ধ এখন কিছু-কিছু জানা গিয়াছে। এডওয়ার্ড এলফ্রেড হার্টেল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গুপ্ত চল্লিশ বৎসব ধরিয়া, মাটির নীচে কোথায় কি আছে তাহার সন্ধানে ফিরিতেছেন—তাঁহারই অক্লান্ত এবং প্রাণ-তুচ্ছ করা চেষ্টার ফলে আমরা দার্গিলান এবং প্যাডিরাক গহ্বরের মধ্যের রম্য দৃশ্যের খবর জানিতে পারিয়াছি। এই গহ্বরের কাছাকাছি স্থানের বাসিন্দারা মনে করে যে এইসব গহ্বরে দৈত্যদানী ভূতপ্রেত বাস করে এবং ইহার তলায় নরক নামক ভীষণ স্থান অবস্থিত। দার্গিলান এবং প্যাডিরাক গহ্বরে অবতরণের পর তিনি কয়েক মাসের মাঝে ১৭টি পর্বতগাত্রের ফাটলে প্রবেশ করেন। ইহার পূর্বে কোন লোক এইসমস্ত পর্বতগুহায় প্রবেশ করে নাই। অনেকে বলে যে এইসব গুহার মধ্যে যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহারা আর কোন দিন ফিরিয়া আসে নাই। সাহসী হার্টেল, ফ্রান্সের রাবুয়েল গুহার মধ্যে অবতরণ করেন—এই স্থানটাকে লোকেরা এতই ভয় করিত যে ইহার পাশ দিয়া ঠাট্টিবার সময়েও তাহাদের গা ছম্ ছম্ করিত। ইহার মধ্যে প্রবেশ করার কথা লোকের স্বপ্নেরও বাহিরে ছিল। ইহার পরে তিনি সার্বজ্ঞানের নিকটবর্তী মাটির নীচে প্রবাহমান নদী সর্গনসের একটি ম্যাপ তৈয়ার করেন। মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নদীটি দেখিয়া তার পর এই ম্যাপ তৈয়ার হয়।

এই-সমস্ত অভিযানের মধ্যে একটিকে তিনি এক অগ্নিহৃদ আবিষ্কার করেন। দড়ির সিঁড়ি, কোমরবাঁধা দড়ি, মোমবাতি, ম্যাগনেসিয়াম ফিতা, দিয়াশালাই, হাতুড়ি, ছুরি, খারমোমিটার, ব্যারোমিটার, গ্যাস-মাস্ক (মুখোস) এবং অস্ত্রাদি দরকারী তোড়-গোড়ে সজ্জিত হইয়া তিনি অবতরণ শুরু করিলেন। তাঁহার মুখের সামনে একটি টেলিফোন ঘাড়ে বাঁধা ছিল—এই টেলিফোনের তার তাঁহার কোমরে বাঁধা দড়ির মধ্য দিয়া গহ্বরের উপর পর্যন্ত ছিল। তাহাতে উপস্থিত লোকদের সহিত কথাবার্তা বলিবার বেশ সুবিধা হইত। গুহার নামিবার পূর্বে, দড়িতে বাঁধিয়া একটা খারমোমিটার গুহার মধ্যে একেবারে নীচে নামাইয়া গুহার মধ্যের টেম্পারেচার লওয়া হয়, এই-সঙ্গে গুহার গভীরতারও মাপ লওয়া হয়। তার পর ছয় জন লোক মিঃ হার্টেলকে দড়ির সাহায্যে আস্তে আস্তে নামাইতে থাকে—গুহার গায়ে কোথায় কি আছে না জানার জন্য তাঁহাকে অতি ধীরে ধীরে নামান হয়। কিছুক্ষণ পরে টেলিফোনে খবর আসিল—“দড়ি ছাড়িয়া দাও।” তাহারা অবশ্য দড়ির সিঁড়ি উপরেই বাঁধিয়া রাখিল, কারণ আবার তাঁহাকে সেই সিঁড়ি বাহিয়া

লোকেরা কান খাড়া করিয়া রহিল, কখন কি খবর আসে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ—তার পর টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং নীচ হইতে শব্দ আসিল “শব্দ করিয়া ধর—খুব জোর করিয়া দড়ি ধর, একটা ভয়ানক খারাপ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।” আবার পানিক ক্ষণ সব চুপচাপ, তার পর আবার খবর আসিল,—“আমি গ্যাস-মাস্ক মুখে ঠিক করিয়া লাগাইতেছি, এখানে ভয়ানক খারাপ গরম।” তাব পব দশ মিনিট নিস্তরুতার পর উপরের লোকেরা খবর পাইল—“দড়ি বঁধি হারাইয়া ফেলিয়াছি, মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে, প্রথম গহ্বরের তলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।”



পাতালে আগুনের হৃদ—নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া মিঃ হার্টেল দড়ির সিঁড়িতে অবতরণ করিতেছেন

আবার একটু পবেই খবর আসিল—“বাতি জ্বলিয়াছে, নতুন-মরা ভস্তুর দেহের উপর দিয়া ঠাট্টিতেছি, এইসমস্ত মরা জস্তদের দেহ চাবিদিকে পাঁচ ফুট উঁচু হইয়া ছড়াইয়া আছে।” ইহার একটু



পাতালে মৃত জন্তুদের কঙ্কালস্তুপের উপর দাঁড়াইয়া হার্টেল
টেলিফোনে কথা বলিতেছেন

পাইয়াছেন। এইরকম করিতে করিতে তিনি মাটির নীচে ১৫০০ ফুট নামিয়া গেলেন। এই সময় টেলিফোন বলিতে লাগিল—“এখানে বেজায় শীত, চারিদিক সঁয়াতসেঁতে, আর কুয়াসা। দ্বিতীয় গুহাতে প্রবেশ করিলাম। ১৮০০ ফুট। প্রকৃৎ হৃদ দেখিতে পাইতেছি—অদ্ভুত সমস্ত দৃশ্য—নানারকম গন্ধম্বা পুড়িতেছে—একটা খারাপ গন্ধ ক্রমশ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।” এইসমস্ত অদ্ভুত এবং মনুষ্যচক্ষুর অ-দৃষ্ট দৃশ্যাদি দেখিয়া বৈজ্ঞানিক হার্টেল সাহেব দড়িতে ঝাঁকানি দিয়া বুঝাইলেন—“এবার উপরে হোল।”

তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, পাতালপুরী হইতে পুনরায় পৃথিবীর উপরে নীল আকাশের তলায় এবং নিম্নল বায়ুর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। উপরে আসিয়া পরদিন সকালে গুহায় অবতরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। সর্বপ্রথমে একটি ছোট নৌকার বন্দোবস্ত হইল—গুহার মধ্যের নদী পার হইবার জন্ত ইহা কাজে লাগিবে।

পরদিন অবতরণ করিবার বিশেষ কষ্ট হইল না, কারণ কষ্টের ভার সমস্ত মিঃ হার্টেল দূর করিয়াছিলেন। সকলে নীচে নামিবার পর নৌকাখানিকে নামাইয়া দেওয়া হইল। তার পর সকলে মিলিয়া গুহার পর গুহার মধ্যে ভ্রমণ করিলেন।

অনেক সময় এইসমস্ত কাণ্ডে মিঃ হার্টেলের ঘোর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে—প্রাণ যাইবার মতও অনেক সময় হইয়াছিল। একবার তিনি এবং তাঁহার দুইজন সহকর্মী মাটির তলায় প্যাডরিয়াক



মাটির নীচে, পাতালের নদীতে মিঃ হার্টেলের নে কা-বিহার নদীতে নৌকায় করিয়া জরীপ করিতেছিলেন। নৌকা ছাড়িয়া একটু-ক্ষণের জন্ত তীরে আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন নৌকা ভাসিয়া গিয়াছে। কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহাদের মোমবাতি জলে পড়িয়া নিবিয়া গেল। চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। কত বিপদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে আবার সূর্যের আলো দেখিতে পাইলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইংলণ্ডে ইয়ক্‌শায়ার প্রদেশে হাঁকরা মিল গুহাতেও তিনি অবতরণ করেন। অস্ত্র কোন সাধী না পাইয়া তিনি একলাই নামিবেন স্থির করিলেন। গুহাব মুখে তাঁহার স্ত্রী উপরে থাকিয়া টেলিফোন ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। নামিবার সময় তাঁহাকে বেশ কয়েকবার স্নান করিতে হইল। গুহার নীচে নামিয়া চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া টেলিফোনে উপরের লোকদের ডাকিতে শুরু করিলেন—কোন সাড়া নাই। জলে টেলিফোনের কল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধ ঘণ্টা ধরিয়া তিনি ক্রমাগত তাঁহার স্ত্রী এবং অস্ত্রাস্ত্র লোকদের চীংকার করিয়া ডাকিবার পর তাহারা শুনিতে পাইল এবং তাঁহাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় টানিয়া তুলিল।

রাশিয়ান গবর্নমেন্টের নিমন্ত্রণে মিঃ হার্টেল ককেশাস পাহাড়ের মাটির তলায় একটা গরম-জলওয়ালা নদীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে নদী-গহ্বর হইতে অর্ধেক বল্পানো এবং অর্ধ-মৃত অবস্থায় উপরে তোলা হয়। পাহাড়ের ভিতরে সাল্ফিউরিক অ্যাসিডের ধোঁয়াতে এই কাণ্ড হয়।



পাতাল ভ্রমণকারী এডওয়ার্ড এ্যালেক্সেড হার্টেল

পন্ডোয়াজ্‌ সহরে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মিঃ হার্টেলের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর নানা বিখ্যাত স্থানে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই, মানুষের অ-দৃষ্ট স্থানগুলিতে কি আছে তাহা দেখিবার ইঁহার প্রবল অনুরাগ।

কোন গহ্বরে নামিবার পূর্বে, গহ্বরের মুখের চারিদিকের অন্তত ৬৫০ ফুট স্থান, ভূতত্ত্ব এবং স্থানিক (Topographical and geological survey) জরিপ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। গুহার মধ্যে নানা স্থানে শব্দ উৎপাদন করিয়া তাহার গভীরতা জানিতে পারা যায়। দড়িতে তাপজ্যাপক যন্ত্র বাঁধিয়া গুহার ভিতরের টেম্পারেচার লইতে হয়। যে-সমস্ত লোকেরা নীচে নামিবে তাহারা নিম্নলিখিত জরুরি সামগ্রী লইবে—অনেক পরিমাণে দড়ি, মই, বড় বড় মোমবাতি, দিয়াশালাই হাতুড়ি, শিঙা, ছুরি ষার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, কম্পাস, গ্যাসমাস্ক, first-aid packs, খাদ্য দ্রব্য। কিছু রুম (rum) সঙ্গে রাখাও বিশেষ দরকার।

যাহারা নীচে নামিবে তাহারা পরিবে—শক্ত-ফিতা-বাঁধা জুতা, গেটার, পশমের জামা (তাহাতে অনেক পকেট থাকি চাই), ঢোল। প্যাণ্ট, একটা শক্ত কাপড়ের ব্লাউস, যাহাতে পাথরে ঘষিয়া ছিঁড়িয়া না যায়, সিল্ক চামড়ার টুপি (ইহাতে পাথর পড়ার শব্দ কানে লাগে না) এবং একটা পিঠে বাঁধিবার ঝোলা।

অসীম সাহস এবং ধৈর্য্য লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের জ্ঞান পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার নূতন নূতন রত্নে পূর্ণ করিতেছেন। মিঃ হার্টেলের জন্মই আমরা জানিতে পারিলাম যে মাটির তলায় এত সুন্দর সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য আছে—যে তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব!

বায়স্কোপের ছবি তোলা—

বায়স্কোপে আমরা নানারকম ছবি দেখি, তাহার মধ্যে কতকগুলি দেখিলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাধ হইয়া যাইতে হয়। এইসমস্ত ছবি যে সব সময়ে সত্যিকার ঘটনা হইতে তোলা হয়, তা নয়। তবে ইহাও সকলের জানা উচিত যে সবই একেবারে ফাঁকি নয়। কতকগুলি ছবি তোলাইবার সময় অভিনেতার। এবং অভিনেত্রীরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন।

কয়েকবছর আগেও যত সব ডাংপিটে কাণ্ডের ছবি তোলা হইত, সবগুলির মধ্যেই কিছু-না-কিছু চালাকি থাকিত, যাহাতে দর্শকেরা প্রতারণিত ১১ হইত কি



বায়স্কোপে অভিনেতার চমৎকার অবস্থা দেখুন—মুখের ভাব কৃত্রিম নয়, চিলের ঠোঁকর পাইয়া হইয়াছে



(১) দোতারা হইতে নীচের মোটরে লাফ

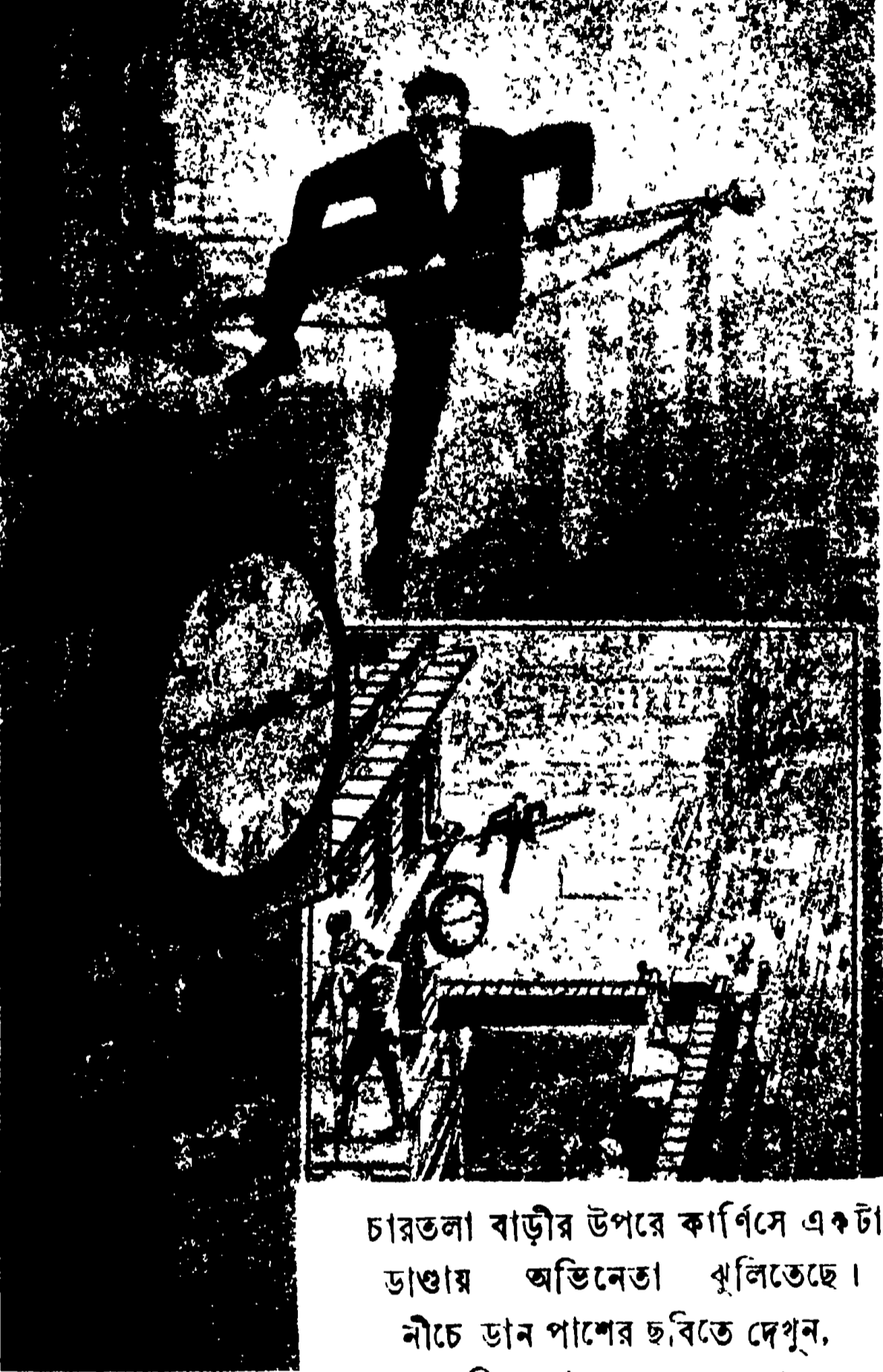
(২) পাহাড় ডিঙ্গান

দুইজনেই বায়স্কোপের অভিনেতা

হইতেছে, ততই, দর্শকেরা সত্যিকার ঘটনার ছবি দেখিতে চাহিতেছে। নকলে আর তাহাদের মন ভরে না। দর্শকদের চক্ষুর গুণা মিটাইবার জন্ম অভিনেতার। তাহাদের সাহসের এবং অভিনয়ের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশে যে দু-একটি বায়স্কোপ কোম্পানী চলন্ত ছবি তুলিতেছে, তাহারা আমেরিকা এবং ইউরোপে বায়স্কোপওয়ালাদের

চলন্ত চিত্রের নূতন অভিনেতারা (অবশ্য সকলেই নূতন) নিজেদের মহা পণ্ডিত (ডুইফোড়) বলিয়া মনে করেন এবং জিনিষটার মধ্যে যে কতপানি শিথিব্য আছে তাহা একবার ভাবিয়াও দেখেন না।

উচ্চদের অভিনেতাদের (stars) বিশেষ বিপদজনক অভিনয়ে নামান হয় না। সেইসমস্ত দৃশ্যে তাহাদেরই মত দেখিতে শুনিতে অশ্রু একজনকে নামাইয়া দেওয়া হয়। অভিনয় ভাল হইলে অবশ্য দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন যশ বা খ্যাতি হয় না—তবে তাহার জন্ম নে যথেষ্ট অর্থ পায়। বর্তমানে কিন্তু অনেক “ষ্টার” অভিনেতাও বিপদ-জনক দৃশ্যেও নিজেই নামিতেছে। একবার একজন উচ্চদের



চারতলা বাড়ীর উপরে কার্ণিসে একটা
ডাঙায় অভিনেতা ঝুলিতেছে।
নীচে ডান পাশের ছবিতে দেখুন,
অভিনেতা যত শক্ত কাজ

করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়।
অভিনেতা হঠাৎ পড়িয়া গেলে নীচের টাঙ্গানো তারের
জালে আটকাইয়া যাইবে। দর্শকেরা এই জাল
ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পায় না।

অভিনেত্রীকে প্রথমে স্রোতের জলে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইল।
পিছনে নৌকায় করিয়া ক্যামেরাম্যান ছবি তুলিতে তুলিতে চলিল।
নদীটি খানিক দূর গিয়া স্বর্ণগার মত হইয়া অনেক নীচে পড়িয়াছে।
কথা ছিল এইখানে আসিবার পূর্বেই অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিয়া
লওয়া হইবে। কিন্তু ঝোরার কাঁচাকাছি আসিলেও কেহ আর
অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিতে পারিল না—হঠাৎ অভিনেত্রীর
সেক্রেটারী তাহাকে একটা চড়ায় তুলিয়া কোন রকমে রক্ষা করিল।
নির্দিষ্ট স্থান পার হইবার পর অভিনেত্রীকে কেহ যখন জল
হইতে তুলিতে পারিল না, তখন তাহার মুখে ভয়ের ভাব ভয়ানক

সত্যি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ছবিতেও তাহা বেশ উপভোগ্য (!)
হইয়াছে।

অনেক সময় অভিনেতাদের বিপদজনক উঁচু স্থানে অদৃশ্য
শক্ত তাব দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে অভিনেতা নির্ভয়ে
বেশ ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারে—দর্শকেরাও পর্দার উপর
তার দেখিতে পায় না, সেইজন্য তাহারাও চিত্র বেশ উপভোগ
করে।

অনেক সময়, বিপদ-জনক ভয়ানক উঁচুস্থানে যখন অভিনেতারা
অভিনয় করে, তখন অভিনয়-স্থানের কিছু নিম্নে শক্ত তারের জাল
খাটাইয়া দেওয়া হয়। অভিনেতা যদি হঠাৎ পড়িয়াও যায়, তবুও
সে কোনপ্রকার আঘাত পাইবে না।



জলের মধ্যে অভিনয়। বিদ্যুতের বাতির সাহায্যে জলের মধ্যে
আলোক ছড়ান হয় এবং লোহার মোটা নলের মধ্যে
বসিয়া ফটোগ্রাফার ছবি তুলিতে থাকে

চলন্তচিত্র দেখিতে দেখিতে আমরা সকলে অভিনেতা-
দেরই দেখি এবং তাহাদেরই প্রশংসা করি, কিন্তু চলন্তচিত্রের
ছবি যাহারা তোলে তাহাদের কথা কেহ একবারও ভাবিয়া দেখে
না। তাহাদের উপরেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব নির্ভর করে।
অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সকলরকম কষ্ট ভোগ করিয়া
ছবিটিকে যদি নিখুঁত করিয়া না তুলিত তবে ছবিটি দেখিবার
কোন আশাই আমাদের থাকিত না। অভিনেতারা গালি চাতে চলে



হাঁটু-জলে ওমা কাপড় ভিজাইয়া ক্যামেরাম্যান বায়স্কোপের ছবি তুলিতেছে

ফটোগ্রাফারকে কিন্তু তহর ছবি তুলিবার সমস্ত সরঞ্জাম ঘাড়ে করিয়া দৌড়াইতে হয়।

এশিয়ার পথে বিপথে—

[ডাঃ স্ভেন হেডিন স্বেডেন দেশেব একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি এশিয়ার লোকের ডানা এবং অজানা প্রায় সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করিয়াছেন। তিস্ত, তুর্কিস্তান, মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য-এশিয়াব সমস্ত অজানা স্থানে বেশী ভ্রমণ করিয়াছে বা স্থান সম্বন্ধে



উহার অপেক্ষা বেশী জানে এমন কেহ বোধ হয় এখন পৃথিবীতে নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক, অসম-সাহসী, স্বেডেনের সম্রাট বংশের লোক এবং প্রচুর অমূল্য গ্রন্থের লেখক। তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল বৈজ্ঞানিক সম্ভার কোন-না-কোন-প্রকারের সম্ভ্য। উহার ভ্রমণগুলি কোন সময়েই বিশেষ নিরাপদ হয় না— মাঝে মাঝে উহাকে অনাহারে ঝড়বৃষ্টির মধ্য দিয়া, কখনো বা মরভূমির মাঝপান দিয়া এবলা ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। পথে চোর-ডাকাতির ভয়ও বড় কম ছিল না। আমরা উহার নিজের কথায় উহার ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।]

আমি এশিয়ার পথে বিপথে ২৪০০০ মাইলেরও বেশী ভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণ-কালে আমার মাথার উপর দিয়া কত বিপদ চলিয়া গিয়াছে এবং কতবার আমি মৃত্যুর অতি নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই।

আমি একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিব। অনেক বৎসর পূর্বে আমি প্রথম এশিয়ায় প্রবেশ করি। তখন গরম কাল। ভাডিকাঙ্কারী হইতে টিবলিস্ যাইবার জন্ত আমি একটা গাড়ী ভাড়া করিলাম। এই গাড়ী 'টয়কা' (তিন ঘোড়ায়) টানে। প্রথম দিকে রাস্তা খুবই চমৎকার। গোড়ারা তালে তালে প্যাফেলিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তার দুধারে গাছের সারি—রাস্তার চারিদিকে অনন্ত সবুজ মাঠ। এই সময় ঘোড়ার গলায় ঘণ্টার শব্দ বেশ মধুর লাগিতেছিল। কিন্তু ক্রমশ রাস্তা ধারাপ হইতে লাগিল এবং চড়াই হইতে লাগিল। ক্রমশ পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। রাস্তার দুইপাশের ঘন কৃষ্ণ পাথরের দেওয়াল মনে ভয়ের সঞ্চার করে, পাহাড়ের উপর দিয়া এই রাস্তা খুব শক্ত করিয়া পাকা তৈরী। ইহাতে অনেক অর্থ ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা ককেশিয়ান প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার নাম সামরিক সর্ণি। এই রাস্তা হইবার পর কশিয়ার জার বলিয়াছিলেন—“আমার ধারণা ছিল যে আমি সোনা-বাধান রাস্তার উপর দিয়া চলিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি কেবল কালো এবং ধূসর পাথরের উপর দিয়া চলিয়াছি।”

রাস্তা যে কেমনভাবে চলিয়াছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সোজা চলিয়াছে, হঠাৎ ডানদিকে ঘুরিয়া গেল, তার পর হঠাৎ বাঁ দিকে। চড়াই চলিয়াছে, হঠাৎ কথা-নাই বাস্তা-নাই উৎরাই সুর হইয়া গেল। রাস্তা মাঝে মাঝে এমন ঢালু যে গড়াইয়া যাইবার যথেষ্ট ভয় আছে। রাস্তাব পাশে পাশে খাদ, তাহার তল দেখা যায় না। তাহার মধ্যে পড়িলে সমস্ত চূব হইয়া যাইবে। একবার আমার গাড়ীর এক পাশের দুখানা চাকা রাস্তা হইতে হঠাৎ ছিটকাইয়া গেল—তবে ভাগ্যক্রমে অন্য পাশের দুখানা চাকা কোন প্রকারে রাস্তায় আটকাইয়া রহিল। কোন রকমে বাঁচিয়া পেশাম। শীতকালে এই পথ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন স্বেজ ব্যবহার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। শীতকালে আরো একটা ভয়ানক বিপদ হয়, মাঝে মাঝে উপর হইতে বরফের চাপ ধসিয়া আসে। সেইজন্য রাস্তার যে-সব অংশ দিয়া বরফের চাপ বেশী ভাগ য়, সেইসমস্ত অংশের উপর পাথর দিয়া খিলানের মত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে রাস্তাব লোকেরা রক্ষা পায়।

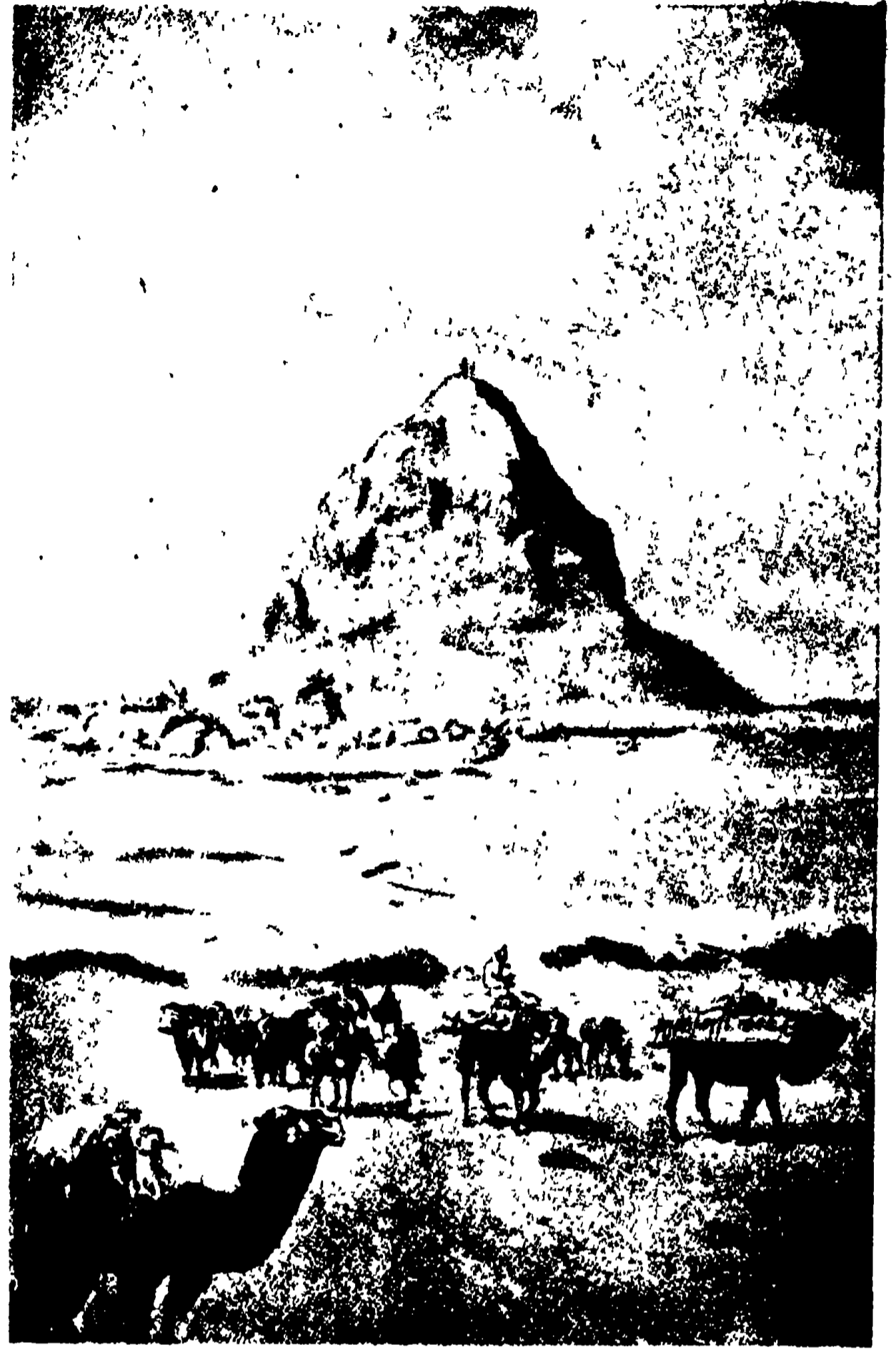
একবার ছাত্রাবস্থায় আমি বাগদাদ হইতে পারস্যের কাবমান্দা সহর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমি একলা ছিলাম, সঙ্গে কোন চাকর বাকর ছিল না। হাতে তখন আমার মাত্র ২০০ ফ্রেন্স (প্রায় ১৫৬ টাকা) ছিল। কাহারো কাছে কিছু ধার করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না—মনে করিলাম যাহা আছে তাহাতেই কুলাইবে। বাগারে একদল আরব বণিকের খোঁজ পাউলাম—তাহারা কাবমান্দা পর্যন্ত মাল রতন



হিমালয়ের একটা উপত্যকায় ডাঃ হেডিনের দল। ভারবাহী পশুবা
কাটা পথ অপেক্ষা অসমান জমীতে ভাল চলিতে পারে

তাহাতে আমার হাতের টাকার সিকি খুরচ হইয়া গেল। জুন মাসে
গরম অসহ্য বলিয়া দিনে চলা বন্ধ থাকিত। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িলে
আবার যাত্রা শুরু হইত। আমি আমার খচ্চরের পিঠে
বসিয়া ভারবাহী জন্তুদের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনিতো শুনিতো
ঘুমাইয়া পড়িতাম। রাত্রে ভ্রমণ করা হইত বলিয়া আশে-পাশের
কোন স্থান দেখা হইত না। সমস্ত স্থান ভাল করিয়া দেখিব স্থির
করিয়া একজন বৃদ্ধ আরবকে সঙ্গী হইবার জন্ত রাজি করাইলাম।
কিন্তু বণিকদের দল আমাদের কথার রাজি হইল না। তখন এক
অন্ধকার রাত্রে আমরা আমাদের খচ্চব লইয়া দল ছাড়িয়া পলায়ন
করিলাম। একটু দূরে গিয়া জোবে জোবে চলিতে লাগিলাম। খচ্চরের
গলার ঘণ্টার শব্দ আকাশে মিশাইয়া গেল।

কিছুদূর খুব দ্রুত চলিয়া গতির বেগ কমাইয়া দিলাম, কারণ
তখন আর ধরা পড়িবার ভয় রহিল না। ভোরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম
করিয়া সকাল হইতেই আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে
ছোট ছোট অনেক যাত্রীদল দেখিলাম। তাহারা প্রায় সকলেই তীর্থ-
যাত্রী। তাহাদের সঙ্গে অনেক মৃতদেহও ছিল। তাহারা সকলে
ব্যাঝিলোনের নিকট কার্বালায় হোসেনের কবরস্থানে যাইতেছে।
পুরুষেরা চলিয়াছে ঘোড়ার এবং নারীরা খচ্চর বা উটের পিঠে ঝুড়িতে
বসিয়া চলিয়াছে। পিঠের দুইপাশে দুইটি ঝুড়ি ঝুলান থাকে।
তাহাদের দলই আমাদের সঙ্গী হইতে পারে। এই যাত্রীদল



ডাঃ হেডিন যাত্রীদলের সঙ্গে চলিয়াছেন। উপবে যে স্তূপ
দেখা যাইতেছে, উহা পথিকদিগকে মরুভূমির ডাকাত
হইতে সতর্ক করিবার জন্ত

হুড় বলে। ঝুড়ির উপরে শাদা কাপড়ের ছাদ থাকে—তাহাতে, কেহ
ইচ্ছা করিলে পুরুষদের তীব্র দৃষ্টি হইতে মুখ লুকাইতে পারে। বড়
লোকের বাড়ীর মেয়েরা এরকমভাবে ভ্রমণ করে না। তাহারা
দুইটি খচ্চরের উপর বসানো দোলায় করিয়া যায়। ইহা বেশ
আরামের আসন, ইচ্ছা করিলে ইহাতে শোয়াও যায়। পারস্যের
ধনী লোকেরা কিছু টাকা তাহাদের দেহ-সংস্কারের জন্ত রাখিয়া
দেয়। মরিবার পূর্বে তাহাদের দেহ কার্বালাতে গোর দেওয়া হয়।
দেহকে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া, রঙীন কবলে জড়াইয়া কার্বালায়
বহন করিয়া লওয়া হয়। একটা খচ্চরে একটা দেহ বহন করায় অসুবিধা
হয় বলিয়া দুইটি দেহকে একত্রে বহন করা হইয়া থাকে। সেই জন্ত
কোন স্থানে একজন থাকিলে পর, তাহার দেহ, অস্ত্র কেহ মরা পর্য্যন্ত
অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় বহুসংখ্যক দেহও এক-সঙ্গে
লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় অনেক দূর হইতেও অনুকূল বায়ুতে মৃত
দেহের বদ গন্ধ নাকে আসে।

পারস্যের রাস্তায় চণ্ডিবার সময় এইসমস্ত গন্ধ এবং ঘোড়া উট
খচ্চর ইত্যাদির মৃতদেহের পচা গন্ধের সহিত অভ্যস্ত হওয়া একান্ত
দরকার।

কারমানসাহে পৌছিয়া আমি আমার সঙ্গী বৃদ্ধ আরবকে তাহার

সেখানে কোন পরিচিত লোক নাই, কোন ইয়োরোপীয় নাই। তবে এইটুকু জানিলাম, যে, সেখানে মুহাম্মেদ হাসান নামে একজন ধনী বণিক বাস করেন, তিনি ইউরোপের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তেব অনেক স্থানে ব্যবসা করেন। আমি তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি দামী কার্পেট এবং কস্মলের উপর বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছিলেন। আমি কোন রকমেই তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে আমি কোথা হইতে আসিতেছি। কিন্তু যেই আমি বলিলাম যে আমি দ্বাদশ চালসের রাজা হইতে আসিতেছি, তিনি বলিলেন—“তবে আপনি এখানে ছয় মাস আমার অতিথি হইয়া থাকিবেন।” আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমার অত সময় নাই, আমাকে আবার ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। একটি চমৎকার বাড়ী আমার জন্ম দেওয়া হইল। খাওয়াদাওয়া চাকরবাকর, সবরকমের সুবন্দোবস্ত ছিল। কতরকম ফল যে খাইতাম তাহা মনে নাই। রসেভবা আস্ত্রুব, সুমিষ্ট তরমুজ প্রভৃতি ছিল। আস্ত্রাবলে আমার জন্ম চমৎকার আনন্দ গোড়া সব সময় মজুত থাকিত। তাহাতে চড়িয়া আমি আশে-পাশের নানা বিখ্যাত স্থান এবং দ্রব্যাদি দেখিতাম। আমার সবই ছিল কিন্তু হাতে একটা পয়সাও ছিল না। আমার অবস্থা ভিক্ষকের মতনই পাপ ছিল। সেইজন্য মন বড় খাবাপ ছিল। আমি এক দিন আমার একজন ভদ্রলোক পরিচারককে বলিলাম—আমি বড় গীব আমার হাতে একটাও পয়সা নাই—সে অথাক্ হইয়া বলিল—পয়সা? পয়সার অভাব কি? যত চাও, হানান সাহেবেব কাছে পাবে—”। বিদায়ের সময় আগা হাসান আমাকে একটি বোপামুদ্রাপূর্ণ খলিয়া দান করিলেন। এখান হইতে আমি পাবস্যের রাজধানী তেহারানের দিকে বোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলাম। এইসময় প্রত্যহ প্রায় ২০ মাইল কথিয়া পথ চলিতাম। এত দ্রুত আন কখনো ভ্রমণ করি নাই। পথে আমায় পাঁচবার গোড়া বদল করিতে হয়।

১২০৬ সালে আমি একটা ব্যাকটিয়ান উটের পিঠে চড়িয়া ১৪০০ মাইল, পূর্ব-পাবস্যা হইতে বেলুচিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত, ভ্রমণ করি। আমার সঙ্গে ১৪টি উট এবং চার জন পাবনীক ভৃত্য ছিল। এই দেশের পূর্ব দিকে প্রকাণ্ড মরুভূমি (কাভির) অবস্থিত। ইহার বেশীভাগ স্থানই নোনা এবং পলি মাটিতে পূর্ণ। জায়গাটা বেশীভাগই সমতল কিন্তু বেনানে পলিমাটি সেইখানে বেশ ঢালু। শীতকালে এইখানে প্রায়ই বৃষ্টি হয় এবং কাদা এত নরম হয় যে উটের পা তাহার মধ্যে সোজা ঢুকিয়া যায়। ক্রমশ উট বসিয়া পড়ে এবং আর তাহার উঠিবার কোন আশা থাকে না। এইস্থানে অনেক যাত্রীদল এমনভাবে মরিয়াছে। আমি সমস্ত জানিয়াও কাভির মরুভূমি পার হইব স্থির করিলাম। দুইজন ভৃত্য এবং ৪টি উট লইয়া যাত্রা করিব স্থির হইল। হঠাৎ পানিকটা বৃষ্টি হইয়া গেল। কাদা শুকাইবাব জন্ম অপেক্ষা করিলাম। এই সময় অল্প একটা যাত্রীদল আমাদের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। আমরা তাহাদের পিছনে চলিলাম। আমাদের ৮৪ মাইল পথ না-গামিয়া চলিতে হইবে। পথে কোথাও জনমানব নাই, গাছ পালা নাই, জল নাই। অর্ধেক পথ আসিবার পর আবার আকাশে মেঘ দেখা দিল—আমরাও তাড়াতাড়ি চলিতে শুরু করিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথের চিহ্নও লোপ হইয়া গেল। কাদাও ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। বিকাল বেলায় পশ্চিম আকাশ অন্তগামী সূর্যের রঙে রাঙা হইয়া উঠিল। আমরা সামনে অগ্রগামী যাত্রীদলের উটের দলকে মাঝেমাঝে দেখিতে পাইতেছিলাম। আমরা উত্তর দিকে প্রাণপণ জোরে চলিতে লাগিলাম। সূর্য ডুবিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল। চোখের সামনে হইতে আলোর

ঘটা শুনিতে পাইলাম। এইসময় এই স্থানের সম্বন্ধে একটা চলিত গল্পের কথা মনে পড়িতে লাগিল। কাভির মরুভূমিতে নানাপ্রকার ভূত-প্রেত বাস করে। অন্ধকারে তাহারা বিপন্ন পথিকদের পথ ভুলাইয়া হত্যা করে। এখানে অন্ধকারে ভূতেরা ঘটা বাজাইয়া পথিকদের বিপথে চালিত করে। যে পিছনে পড়িয়া থাকিবে তাহার মরণ স্থির নিশ্চয়।



ডাঃ হেডিনেব দল হিমালয়ের অসম্ভব বরফ বৃষ্টিব মধ্যে চলিয়াছেন

বৃষ্টি বাড়িয়া চলিয়াছে। আরো কিছুক্ষণ এমনিভাবে বৃষ্টি হইলে সব আশা শেষ হইবে। উটের পা কাদায় বসিয়া যাইবে—আমাদিগকে উট ত্যাগ করিয়া পায়ে চলিতে হইবে। একবার ভাবিলাম উটের পিঠের বোঝা ফেলিয়া দিই তাহাতে উহার একটু হাল্কা বোধ করিবে। কি করি ভাবিতেছি—এমন সময় হঠাৎ উটের দল আসিয়া গেল। ব্যাপার কি, খোঁজ করিয়া জানিলাম যে, কাদার মাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে—শক্ত ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছি, আর ভয় নাই—সকল বিপদ পার হইয়া আসিয়াছি। পূর্বদিকের অন্ধকার দূর হইয়া গেল—আলোক দেখিতে পাইলাম।

যাদুঘরের পিছনে—

যাদুঘরে আমরা হাজারো রকমের মৃত জন্তুর দেহ দেখিতে পাই। সেগুলি এমনভাবে রক্ষিত আছে যে তাহাদের দেখিলে একেবারে



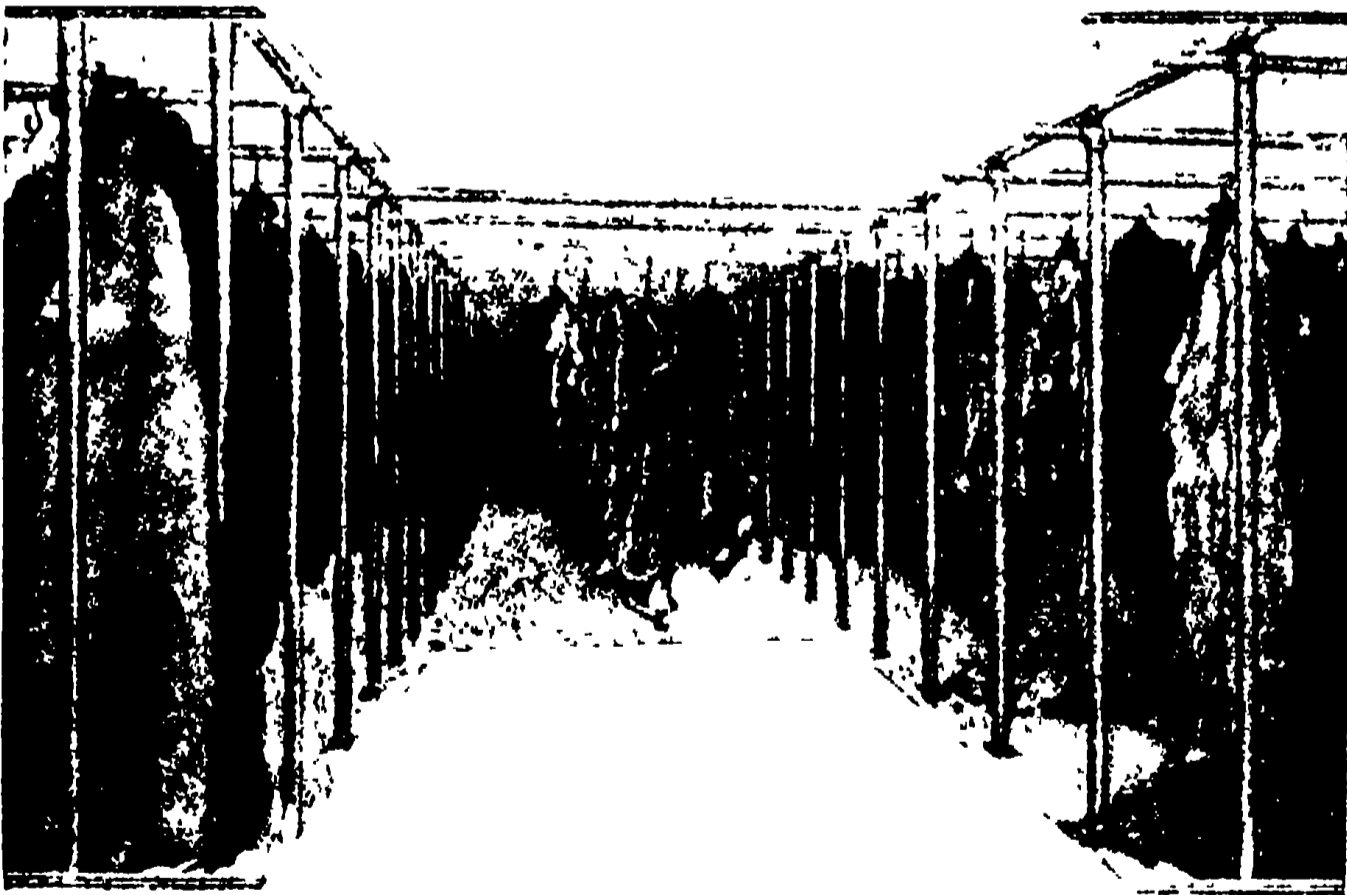
শিল্পির হাতে তৈরী ব্যাঘ্র পূর্নজীবন লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয়

হাড়, বা মাথার গুলি বা অথকিছু চিঙ্গ পাইয়া শিল্পী তাহার একটা সজীব প্রতিমূর্তি পাড়া করিয়া তোলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুদেহ দেহ এমনভাবে তৈরী এবং এমনভাবে চামড়ায় মোড়া হয়, যে, তাহা দেখিলে নকল বলিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারে না।

চিড়িয়াখানাবন্দী জন্তুদের দেখিলে কষ্ট হয় তাহা বা মরাব মত কোনরকমে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু যাদুঘরের জন্তুগুলিকে তাহাদের বস্ত্র মূর্তিতে এবং হাব-ভাবে দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয় এবং দে-সব শিল্পীরা এই মৃতজন্তুদের নূতন প্রাণ দান করেন তাহাদের প্রশংসা করিবার উপযুক্ত বাক্য পাওয়া যায় না।

এই কাজের শিল্পীকে যাদুকর, শিল্পীমিস্ত্রী এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ, একাধারে সবই হইতে হয়। কারণ, কেবল জন্তুটিকে তৈরী করিলেই তাহার কার্য শেষ হয় না—কেমন জায়গায় বসাইতে হইবে, কেমনভাবে বসাইতে হইবে, দেহের ভঙ্গী এবং চোখের ভাব ইত্যাদি কেমনধারা হইবে, সবই তাহাকে নিপুণভাবে করিতে হয়। এইখানেই কার্য সমাপ্তি নয়—তাহাদের পোকামাকড়ের হাত হইতে বক্ষাব জন্তু রাসায়নিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমে মরা জন্তুর দেহ হইতে চামড়া ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে লোম সমেত ট্যান করিতে হয়। এই কার্য যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে করিতে হয়—কারণ সামান্য ভুলে একটি বহুমুলা চামড়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।



মৃত জন্তুদের ছাল টাঙান রহিয়াছে

তার পর এই চামড়াকে “কিকার” নামক কলে বিদ্যুতের সাহায্যে নরম করিয়া লইতে হয়। এই চামড়াকে বিশেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়।

পূর্নকালে লোকে মৃতজন্তুর দেহের মাংস বাহির করিয়া ফেলিত—

এবং তাহার মধ্যে যা-তা ভরিয়া তাহাকে কোনরকমে খাড়া করিয়া রাখা হইত—তাহাতে খরচ কম হইত বটে কিন্তু জিনিষটা অল্পকালেই নষ্ট হইত, এবং তাহা দেখিতেও বিশেষ সুখী হইত না। বর্তমান সময়ে প্যাষ্টার দিয়া মৃত জন্তুর মাপের একটি মডেল তৈরী করা হয়। এই মডেলটিকে তৈরী করিবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়—কারণ জন্তুর দেহ ভাব ভঙ্গী অনেকটা এই মডেলের উপরেই নির্ভর করে। জন্তুর একটা বিশেষ ভঙ্গীকে আদর্শ ধরিয়া শিল্পী এই মডেল তৈরী করেন। মডেল তৈরী হইয়া গেলে পর জন্তুর চামড়াকে তাহার উপর আন্তে আন্তে পরাইয়া দেওয়া হয়। জিনিষটিকে শক্ত করিতে হইলে মডেলের ছাপ লইয়া কোন শক্ত এবং কঠিন দ্রব্য দিয়া জন্তুটির দেহ তৈরী করিয়া লওয়া হয়—তাহার পর চামড়া পরাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে জন্তুটির নাক মুখ এবং চোখ তৈরী করা হয়। এইরূপে জন্তুটি তৈরী করা শেষ হইয়া থাকে।



প্যাষ্টারের তৈরী জন্তুদের মডেল

ইগাকে বক্ষা করিবার উপযোগী দৃশ্য এবং স্থানও তৈরী করিতে হইবে। কৃত্রিম গাছপালা ইত্যাদির দ্বারা জন্তুটির বনের সত্যিকার ঘরবাড়ীর মত একটি স্থান, (অবশ্য অনেক ছোট করিয়া) তৈরী করা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে জন্তুটিকে দেখিলে একেবারে বনের জন্তু বলিয়া মনে হয়। সমস্ত জন্তুটিকে দৃশ্য সমেত একটি কাঁচের কেসে আবদ্ধ করিয়া হলে রক্ষা করা হয়।

পাখীদের গ্রহণে তৈরী করা খুব বাহাদুরির কাজ। প্রথমে মৃত পাখীর পালক সাবধানে, একটিও না ভাঙিয়া, তুলিয়া লইতে হয়। তার পর চামড়া। কক বা অশ্ব কোন এমন-প্রকার দ্রব্যের একটি সমান মাপের মডেল তৈরী করিয়া তাহার উপর চামড়া পরাইয়া দিয়া—পাখীর পা গঙ্গা এবং ডানা ঠিকমত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। তার পর পালক পরাইবার পালা। এই কাজটি সর্বাপেক্ষা কঠিন।

সরীসৃপ ইত্যাদির দেহ রক্ষা করিবার জন্তু সেলুলয়েডের ব্যবহার হয়। কেমন করিয়া ইহা তৈরী করিতে হয়, তাহা শিল্পীরা গোপন রাখেন—কেবল এইটুকু জানা যায় যে প্যাষ্টার দিয়া প্রথমে মডেল গড়িয়া লইতে হয়।

এইসমস্ত দ্রব্য তৈরী হইয়া গেলে পর তাহাদের যাদুঘরে স্থাপন করিয়া বহুমূল্য রত্নাদির মতন যত্নে রক্ষা করা হয়। অনেক সময় তাহাদের কৃত্রিম আলোতে রক্ষা করা হয়, কারণ, দেখা গিয়াছে, যে, সূর্যের কিরণে অনেক সময় তাহারা নষ্ট হইয়া যায়।

এক-একটি জন্তুর চামড়ার মলা যে কত তাহা বলা যায় না। সেইজন্তু



যাহুথরের জন্তুদের দেখিলে সত্যিকার বনের জন্তু বলিয়া ভ্রম হয়

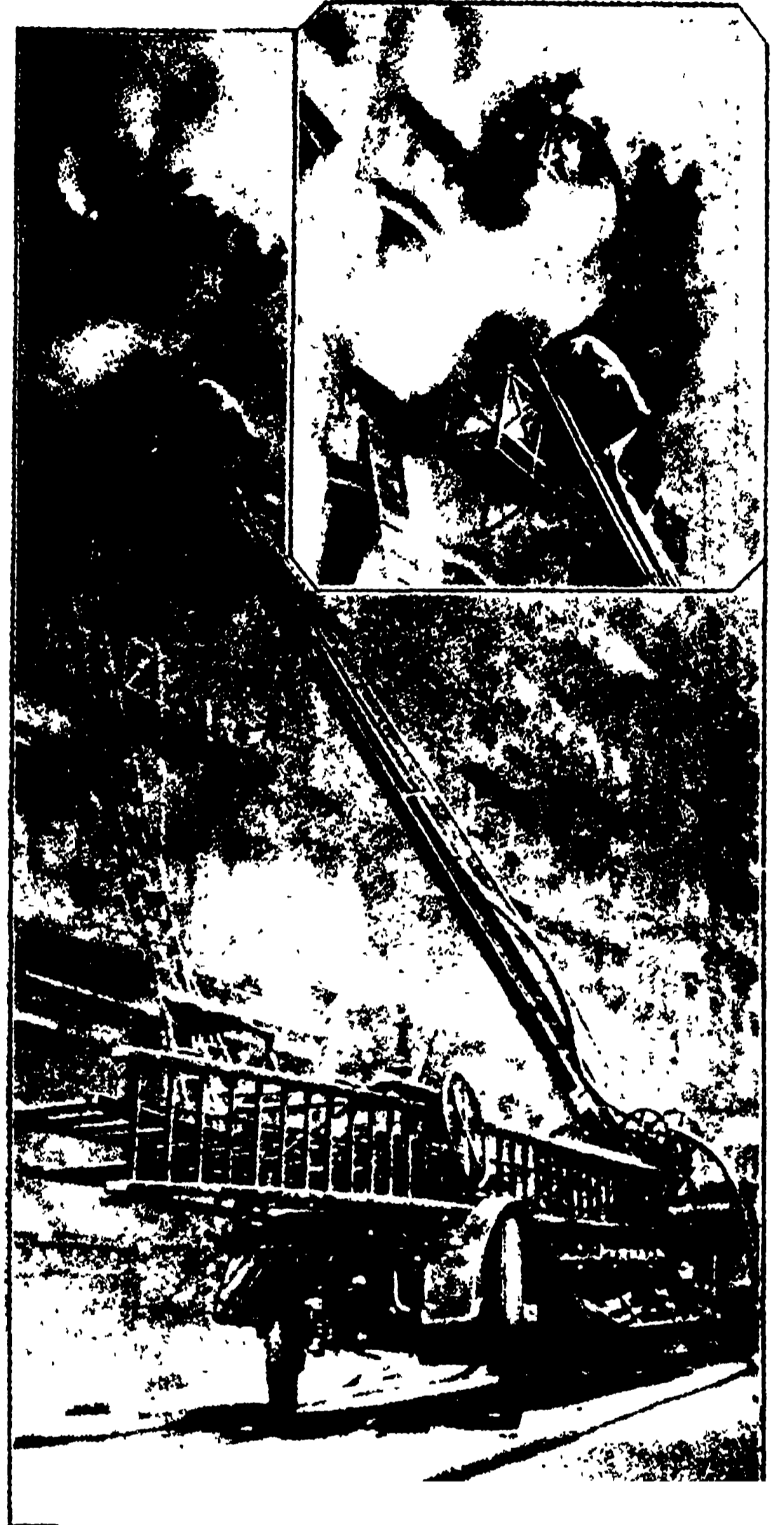
যে সমস্ত গ্লাস-কেসে এইসব থাকে—তাহা চোরডাকাত পোকামাকড় এবং আগুনের হাত হইতে সব সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করা হয়।

কাচের কেসের মধ্যে রক্ষিত জন্তুদের নমুনাগুলিকে দেখিলে এত সজীব এমন সত্য বলিয়া মনে হয় যে দর্শকেবা অনেক সময় তাহাদের চলাফেরা এবং লাফঝাঁপ দেখিবার জন্তু অপেক্ষা করে।

অগ্নির সহিত যুদ্ধ—

বর্তমান কালে যে প্রথমে আগুনের সঙ্গে সত্ৰ্য দেশেব লোকেরা যুদ্ধ করে, তাহাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞান বলিলেও চলে। চিকিৎসা শাস্ত্রের মত ইহাকে অগ্নিনিবারক শাস্ত্র বলিলেও কোন ভুল হয় না।

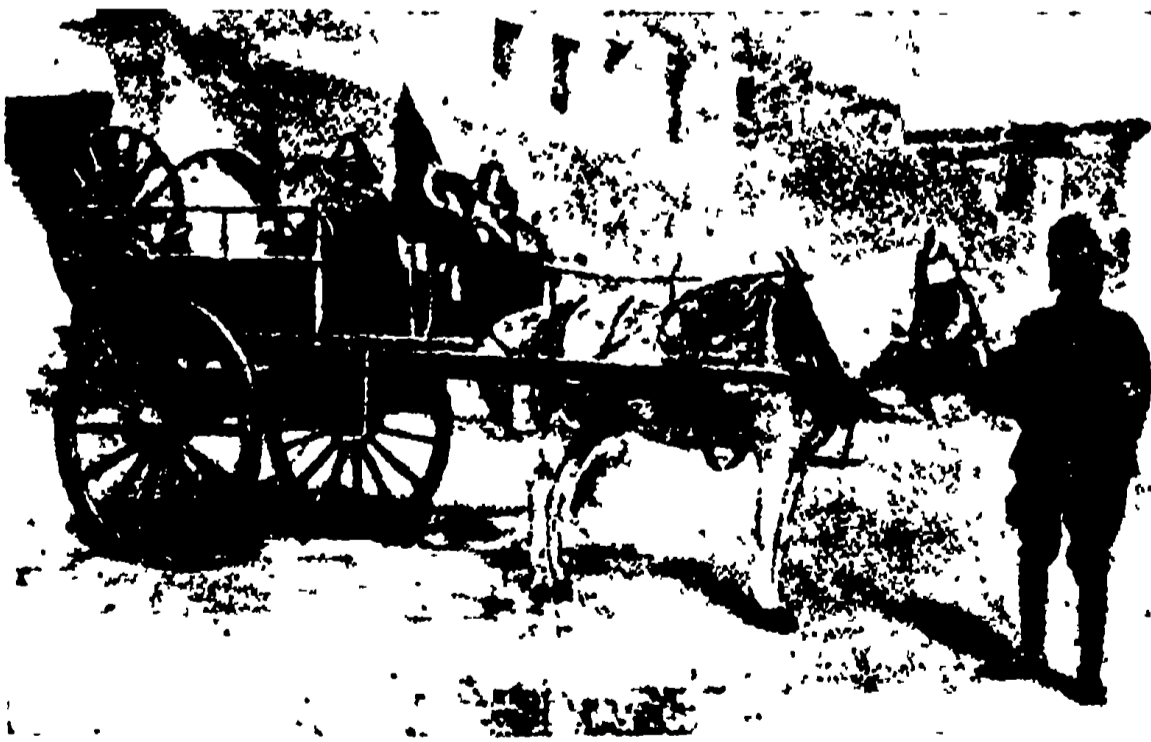
আগুন জিনিষটির কয়েকটি বিশেষ বস্তু আছে। তাহা সকল সময়ে এবং সকল স্থানের সকলপ্রকারের আগুনে বর্তমান থাকিবে—মেইজন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আগুন নিবাইবার সময়ে কয়েকটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন। বর্তমান চিকিৎসকেরা যেমন রোগকে তাড়াইবার জন্তু অপেক্ষা না করিয়া রোগের মূলকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তেমনি বর্তমান 'অগ্নি যোদ্ধারা'ও আগুন লাগিলে তাহাকে নিবানো অপেক্ষা আগুন যাহাতে না লাগে তাহার চেষ্টাই বিশেষ করিয়া করেন।



খুব দ্রুত বাড়ীতে আগুন নিবান—অগ্নি-যোদ্ধাদের অসীম সাহস দেখিবার জিনিষ। ফায়ার ইঞ্জিনের মই কলের সাহায্যে খোলে এবং বন্ধ হয়

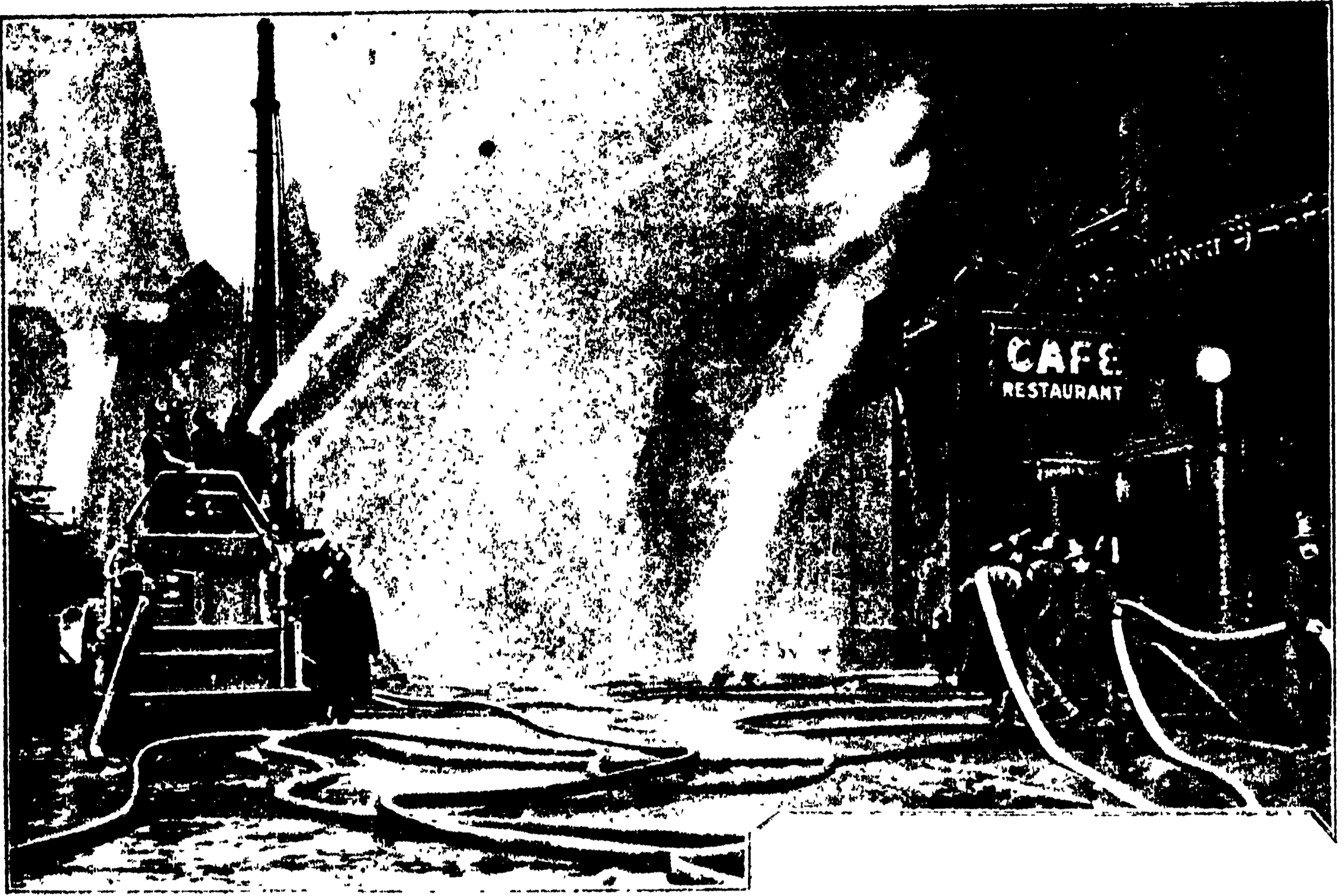
মরে, তাহাব সংখ্যা নাই—অথচ এইসব ক্ষেত্রে সাধারণের সামান্য একটু সাবধানতার ফলে অনেক প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আমেরিকাতে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ২০৮৪৪৪০০০০ টাকা আগুনে নষ্ট করে। আমাদের দেশের ক্ষতির পরিমাণও খুবই বেশী। আমেরিকা ধনী, আমরা গরীব; আমেরিকার ক্ষতি হইলে তাহা সে অল্প সময়ে পূর্ণ করিতে পাবে—আমাদের প্রায় ক্ষতি চিরস্থায়ী হইয়া যায়।

বর্তমান সময়ে আগুন নিবাইবার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারে আমেরিকা অগ্রণী। আমেরিকার প্রত্যেক সহরের মিউনিসিপ্যালিটির ফায়ার-ব্রিগেড আছে। ফায়ার-ব্রিগেডের লোকেরা এই কাজের জন্তু বিশেষভাবে শিক্ষিত হয়—তাহারা কালের মতন নিপাত এবং সক্ষম-



আদিম ফায়ার-ব্রিগেড গাড়ী

কিন্তু এই কার্যে, সাধারণের যথেষ্ট দায়িত্ব বোধ এবং তৎপরতা না থাকার জন্তু, অগ্নি-যোদ্ধারা সকল সময়ে তাহাদের কার্যে সাফল্য লাভ



ফায়ার-ব্রিগেডের পাম্পে জল যোগাইবার মোটা মোটা পাইপ—এই পাম্পের সাহায্যে জন দশতলা পর্যন্ত ওঠে

আগুন লাগিবার সর্বপ্রধান কারণ অসাবধানতা। সিগারেটের আগুন হইতে যে কত বাড়ী গর দুয়ারে আগুন লাগে তাহার সংখ্যা নাই। অথচ জলস্ত সিগারেট মাটিতে ফেলিয়া তাহা জুতা দিয়া চাপিয়া নিবাইয়া দেওয়া বিশেষ শক্ত কাজ নয় বলিয়া মনে হয়। গিয়েটার, আপিস, বাড়ী, কলগর ইত্যাদিতে অনেক সময় ইলেকট্রিকের তার জ্বলিয়া গিয়া আগুন লাগে। যদি মাঝে-মাঝে সমস্ত তার ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হয় তবে এই ভয় বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। একজন একটা জলস্ত সিগারেট, নিউইয়র্কের Asch Building এর কাছে ফেলিয়া দেয়, হাওয়াতে সেই সিগারেট বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়ে এবং আগুন লাগে। সেই আগুনে ১৪৫ জন বালিকা-কর্মচারী পুড়িয়া মরে। ১৯১১ সালে এই ব্যাপার হয়। শিকাগোতেও এইরকমে Iroquois Theatre এ ৬০০ লোক পুড়িয়া মরে।

কোন বাড়ীর ভিতরে আগুন নিবাইবার একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক পন্থা আছে। একটি কল আছে—তাহার নাম স্বয়ংবধী যন্ত্র। বাড়ীর মধ্যের তাপ ১৫৫০ ডিগ্রির বেশী হইলেই এই কল হইতে চারিদিকে জল ছড়াইয়া পড়িবে—তাহাতে আগুন একেবারে না নিবিলেও ফায়ার-ব্রিগেড না আসা পর্যন্ত আগুন বেশী ছড়াইতে পারিবে না। জল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঘ-টাও বাজিবে।

একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় দরজাও আছে। উত্তাপ বাড়িলেই তাহা আপনা-আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে বাহিরের হাওয়া আর ধরে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া আগুন একই স্থানে আবদ্ধ থাকে—চারিদিকে ছড়াইতে পারে না।

কোথাও আগুন লাগিলে এই কয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত।

(১) সর্বপ্রথমে আগুন বেখানে লাগিয়াছে সেইখানেই যেন আবদ্ধ থাকে, এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে।

(২) সহজ-দাঙ্গা দ্রব্যাদি যেমন করিয়া হোক সরাইয়া ফেলিয়া রাখা করিতে হইবে।



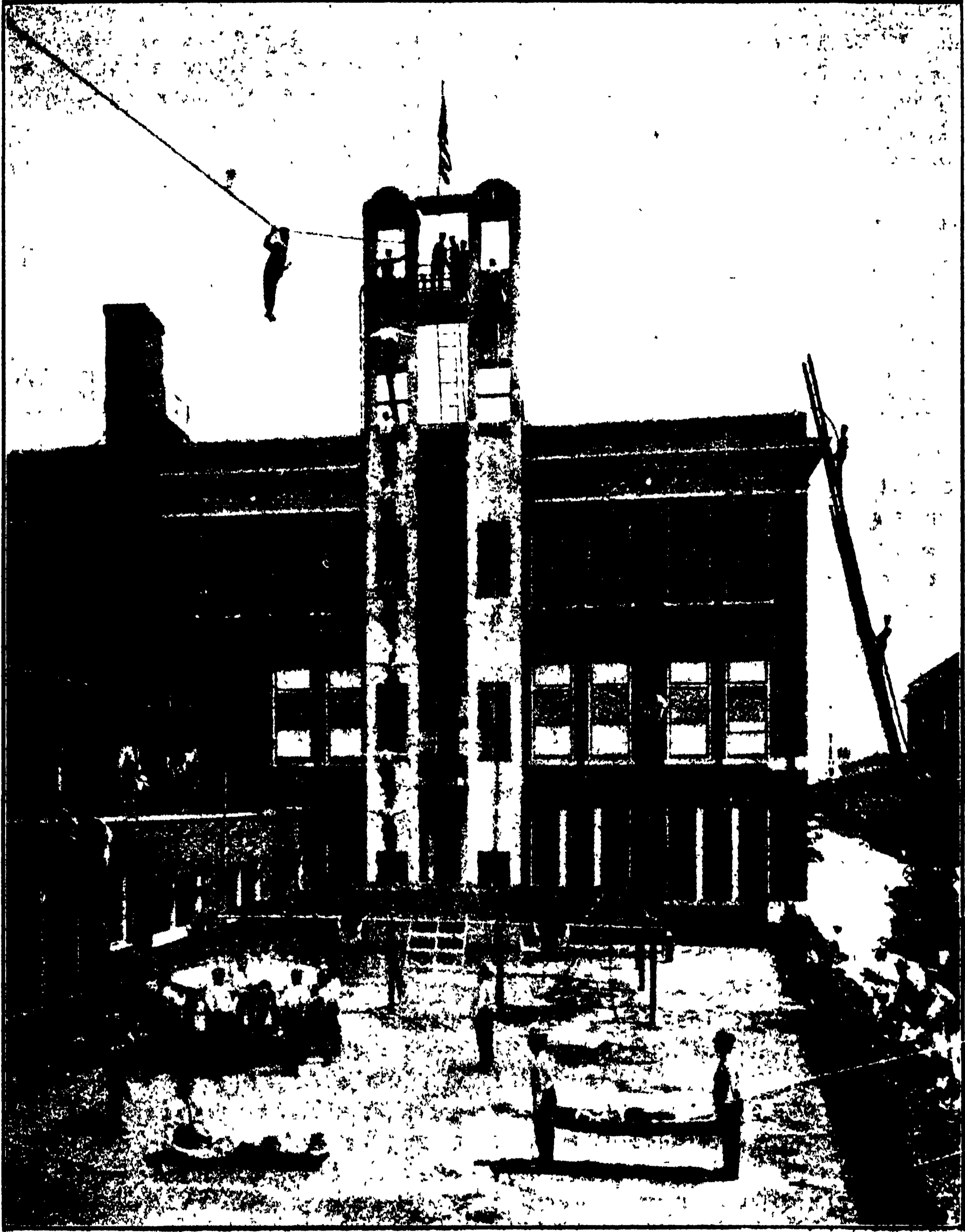
সহরের কোথাও আগুন লাগিলে এইখানে ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে।

সহরের—এমন কি সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে এই সেন্ট্রাল ফায়ার-ব্রিগেড আপিসের যোগ আছে

(৩) প্রাণ-রক্ষার উপায় প্রাণপণ করিয়া করিতে হইবে।

(৪) যেখানে সবচেয়ে বেশী বিপদ সেইখানেই সবচেয়ে বেশী জোর দিয়া কাজ করিতে হইবে।

(৫) হটুখোল না করিয়া বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ফায়ার-ব্রিগেডের কর্মীর আশ্রয়িত কাজ করিতে হইবে।



নিউইয়র্কের ফায়ার ব্রিগেডের লোকেদের শিক্ষালয়। আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যাহা কিছু শিখিবার দ্বারা সবই এখানে দেখান হয়
(ছবিখানি ১৩২৯এর পোস্ট মানের প্রবাসী হইতে দেওয়া হইল)

আগুনের মত শত্রু আর নাই। এই শত্রু মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে কাহাকেও বন্দী করে না, যাহা পাশ সব পরাস করিয়া যায়। আগুন নিবাইবার বৈজ্ঞানিক উপায়ও যেমন দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, সহজে আগুন লাগিবার কারণও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। আজকাল থিয়েটার ইত্যাদিতে যেমন আগুন নিবাইবার সকলপ্রকার বৈজ্ঞানিক

তাহার মধ্যে একটি সেলুলয়েড ফিল্ম। ফিল্মে নিয়ম হইয়াছে যে ১৯২৫ সালের পর কোন বায়োস্কোপ কোম্পানি অ-দাং ফিল্ম ছাড়া অন্য কোনপ্রকার ফিল্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না।

রসায়নাগার এবং রাসায়নিক কারখানায় হঠাৎ আগুন লাগে এবং এইসব আগুন নোবান ভয়ানক শত্রু ব্যাপার।

লাগিলে তাহা সবচেয়ে ভয়ানক হয়। এইসমস্ত স্থানে খাদ্য-দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার কলে অ্যামোনিয়া ব্যবহার হয়। আগুন লাগিলে অ্যামোনিয়ার গ্যাসে লোকে অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় মরিয়াও যায়। নাইট্রিক অ্যাসিড যেসমস্ত কারখানায় ব্যবহার হয়, সেখানে আগুন লাগিলে আরো মুশকিল। নাইট্রিক অ্যাসিড গ্যাসের গন্ধ নাই কাজেই প্রথমে বুঝিতে পারা যায় না। যে মুহূর্তে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা নাইট্রিক অ্যাসিড আগুন-লাগা-স্থানে আছে বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই মুহূর্তেই তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। গ্যাস বাহির করিয়া দিবার নলের বন্দোবস্ত আজকাল অনেক কারখানাতে হইয়াছে।

নিউইয়র্ক সহরে ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে অগ্নিসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার পাঠ করিতে হয়। যন্ত্রাদি ব্যবহার, ইঞ্জিন চালান, প্রাথমিক সাহায্য-দান, বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, সহজদাহ এবং কঠিনদাহ দ্রব্যাদি, মোটর, ড্রিল, বাধ্যতা এবং অবিলম্বে নাগকের আদেশ প্রতিপালন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার সুচারুরূপে অগ্নিযোদ্ধাকে শিক্ষা করিতে হয়।

যদিও অগ্নি-যোদ্ধারা কোথাও আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তথাপি তাহারা কোথাও যাহাতে আগুন না লাগে তাহার চেষ্টাই বিশেষভাবে করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

“ডেঙ্গু-জ্বর” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কলিকাতা ও তাহার চতুর্পার্শ্বস্থ স্থানে এবার ডেঙ্গুজ্বরের ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই এক বা ততোধিক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হইয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যেও বোধ হয় কেহ-কেহ এই জ্বরের হাড়ভাঙ্গা প্রকোপ সহ্য করিয়াছেন। তাই আশা করি আমাদের এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

“ডেঙ্গু” শব্দটি নাকি হিন্দুস্থানী “ডাণ্ডি” বা একই অর্থবাচক স্পেনদেশীয় “ডেঙ্গুরো” শব্দ হইতে আসিয়াছে। ডেঙ্গুরোগীর চলা ফেরা বেদনাক্রান্ত বলিয়া অনেকটা শক্ত ও সোজা ডাঙার মত হয়, তাই এই নাম। এই জ্বরের নিয়মই এই যে বর্তমানে এক সময়ে আক্রান্ত হয়। ‘গ্যালুভেটন’ নামক আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র সহরে একবার প্রায় ২০,০০০ লোকের এই পীড়া হইয়াছিল। ‘ব্রাউন্সভাইল’ নামে আর-একটি ক্ষুদ্র স্থানের ৮,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ১,০০০ লোকেরই ডেঙ্গু হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে এবার যে রূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে খুব কম পক্ষে প্রায় লক্ষ লোকের ডেঙ্গু হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম আমদানী হয় এবং ইহার দুই তিন বৎসর পরে ইহা ‘ওয়েস্ট ইণ্ডিজ’ এ ছড়াইয়া পড়ে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ডেঙ্গুজ্বর কেহ চিনিত না। স্পেন দেশের সেভিল নামক স্থানে এই রোগ প্রথম ধরা পড়ে। ইহার পর পৃথিবীর বহু স্থানের উপর দিয়া এই জ্বরের ঢেউ চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশই এই জ্বরের প্রকোপ সহ্য করিয়াছে। স্পেনদেশে প্রথম আবির্ভাবের দশ বৎসর পরেই ডেঙ্গুজ্বর পারস্য, মিশর ও উত্তর-আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা দক্ষিণ-আমেরিকার পেক প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব-আফ্রিকা, মিশর, আরবদেশ, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও চীন এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া ডেঙ্গুর প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এবং এই সময়েই ইহা হংকং, সিঙ্গাপুর, কিজি, ভূমধ্যসাগরের কয়েকস্থানে, গ্রীস ও এশিয়া মাইনরে ছড়াইয়া পড়ে। বিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহা পেনাং, সিঙ্গাপুর, সিংহল, উত্তর-ব্রহ্মদেশ, এমন কি সুদূর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। একস্থানে একবার ডেঙ্গুজ্বরের আবির্ভাব হইলে, সেইস্থানে মাঝে মাঝে পুনরায় ইহার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যানসন্ সাহেবের মতে প্রত্যেক ২০ বৎসর অন্তর ডেঙ্গুজ্বরের এইরূপ

যাবতীয় সমুদ্রতীরবর্তী বৃহৎ বন্দরগুলিতে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই এই ঢেউ আসিয়া লাগে বলিয়া আমার মনে হয়। কলিকাতা, বোম্বে, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, পেনাং, কলম্বো, হংকং, রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ দেখা গিয়াছে। ডেঙ্গুজ্বরের বাহন “স্টেগোমাইয়া” (stegomyia) মশক বাণিজ্যপোতের ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাধারগুলিতে অনায়াসে বাঁচিতে পারে ও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা সুপরিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং জাহাজে একটিমাত্রিও রোগী থাকিলে তাহার দ্বারা কতকগুলি সহযাত্রীর রোগের সম্ভাবনা থাকে এবং তাহারা যখন কোন বন্দরে নামিবে সেখানেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে কিরূপভাবে রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। বশ্যকালে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুবই অনুকূল থাকে সন্দেহ নাই। তাই এখন কলিকাতার ডেঙ্গুজ্বরের ঢেউ গিয়া সুদূর হংকংএর তীরে লাগিতে পারে। দুনিয়ার আবহাওয়ার সহিত আজকালকার নিকট সম্পর্কের এই একটি বিষয় ফল।

স্বথের বিষয় এ জ্বরটা মারাত্মক হয় না। কেহ কেহ বলেন যে একবার এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে ভবিষ্যতে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। উচ্চ পার্বত্য প্রদেশে এবং শীতপ্রধান দেশে ও শীতকালে এ জ্বর হয় না। গরম ও নীচ জায়গাই ইহার প্রিয় ক্ষেত্র। সমুদ্রতীরবর্তী স্থান বা নিম্ন বারিবিধোত প্রদেশই ইহার প্রকৃষ্ট স্থান। এই রোগের বীজাণু এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। যদিও রক্তকণিকার ভিতরে অনেকে এই বীজাণুর অনেকপ্রকার সূক্ষ্মশরীর দেখিতেছেন! তবে এক বিষয়ে কাহারও মতবৈধ নাই,—মশকই যে ডেঙ্গুজ্বরের বাহন তাহা সুনিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। ম্যালেরিয়া-জ্বর মশক দ্বারা সংক্রামিত হয়, একথা সকলেই জানেন। এই মশককেই যখন আবার ডেঙ্গুজ্বরের বাহন বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করা হইতেছে, তখন বোধ হয় অনেকেই এটা ডাক্তারদের আজ্ঞাবি কণা বলিয়া মনে করেন। যদিও এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে “অ্যানোফেলিস্” নামক মশক যাহা সাধারণতঃ ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রামিত করে, তাহা ডেঙ্গুজ্বরের বাহন নহে। যাহা হটক, মশক ডেঙ্গুজ্বরের বাহন কি না সে সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। তাহা হইতেই পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের মতামত ঠিক করিয়া লইবেন।

স্থানে ডেঙ্গুজ্বরের খুব প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সময় আমেরিকার দুই দল সৈন্য একটি পার্শ্বভূমিতে পরস্পরের সান্নিধ্যে বাস করিত। একদল পর্বতের শীর্ষ দেশে উচ্চভূমিতে ছিল, আর একদল পর্বতের সাধুদেশে নিম্নভূমিতে ছাউনি করিয়া ছিল। তখন বর্ষাকাল, নিম্নভূমিতে ভয়ানক মশার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। যদিও সেই স্থানের কোথাও জল জমিয়া থাকিতে পারিত না তবুও বহুসংখ্যক মশার আবির্ভাব হইল। উচ্চভূমিতে মশা ছিল না এবং সেখানে কাহারও ডেঙ্গুজ্বর হইল না। নিম্নভূমিতে কয়েকজনের ডেঙ্গুজ্বর হইল। এই রোগী দর তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র করিয়া সর্বদা মশারীর ভিতর রাখা হইল। যাহারা সুস্থ ছিল তাহাদের প্রতিও সন্ধ্যার পূর্বে হইতেই মশারীর ভিতর থাকিবার আদেশ হইল। তাহা ছাড়া সেনানিবাসের জানালা ও দরজাগুলি একপ্রকার স্পঞ্জজালে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। এই-প্রকারে সেনানিবাসে ডেঙ্গুজ্বর বন্ধ হইল। মাত্র একজন সৈনিক এক রাত্রে তাহার সৈন্যব্যঞ্জনর বাড়ীতে বিনা মশারীতে শুইয়াছিল তাহারই ডেঙ্গু হইল। অথচ তাহাব ঠিক পার্শ্বেই এক ব্যক্তি মশারী খাটাইয়া শুইত তাহার কিছুই হইল না। সুয়েজ কেনালের ‘পোর্ট সৈয়দ’ বন্দরে ম্যালেরিয়া হইত বলিয়া ১৯০৬ খৃঃ সেখানে মৎস-কুল ধ্বংস করিবার আয়োজন হয়। তাহাতে মশা প্রায় নির্মূল হইল। এই বৎসরের শেষভাগে ও তাহার পরের বৎসর ঐ বন্দরের পার্শ্ববর্তী সমুদায় স্থানেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব হইল, —কিন্তু এইস্থানে হইল না। আমেরিকার লাজাম্ ও ‘সেন্ট ডমিঙ্গো’ নামক দুইটি স্থান সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ২০ কোশ দূরে। তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময়ই প্রচুব পরিমাণে মশা হয়। একবার সেখানে দুইটি নাবিকদলেব ভিতর ডেঙ্গুজ্বরের আবির্ভাব হয়। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ তাহাদের অস্ত্র সকলের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন ও তাহাদের সর্বদা মশারীর ভিতর রাখিয়া মশা মারিবার নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন। ইহাতে অতিশীঘ্রই ডেঙ্গুজ্বর বন্ধ হইয়া গেল। সিরিয়া প্রদেশেব বেরখ নামক স্থানে গ্রাহাম নামক একজন ডাক্তার পবীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ডেঙ্গুবোগীকে কামড়াইয়াছে একরূপ মশা ধরিয়া লইয়া পার্শ্ববর্তী স্থস্থগ্রামের দুইটি লোকের দেহে বসাইয়া দেওয়াতে উভয়েই ৪৫ দিন পরে ডেঙ্গুজ্বর হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কোন কোন ডাক্তার দেখিয়াছেন যে ডেঙ্গুরোগীর শরীর হইতে কিছু রক্ত স্বেদ লোকের দেহেব শিরার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেও ডেঙ্গুজ্বর হয়।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেব মতে দুইপ্রকার মশা ডেঙ্গুজ্বরের বাহন—কিউলেক্স ফ্যাটিগ্রেস (Culex fatigans) ও স্টেগোমাইয়া ক্যালোপাস (Stegomyia Calopus)। প্রথমোক্তটি গ্রীষ্মপ্রধান সর্বদেশেই খুব প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রং পাটকিলে, বৃকের দিকে দুইটি কাল দাগ আছে ও পেটের দিক্‌টায় ধূসর বর্ণের কয়েকটি রেখা আছে। পুরাতন পুষ্করিণী, ডোবা, গর্ভ প্রভৃতি বন্ধ জলাশয়ে এই মশা জন্মে। ‘স্টেগোমাইয়া’ মশক মানুষের বাসস্থানেই চৌবাচ্ছা, পুরাতন টিনের কোটা, বৃষ্টিজলের পাইপ, হাড়ি কলসী প্রভৃতি গৃহের নানাবিধ অব্যবহার্য জলপূর্ণ পাত্রেই বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। এই হিসাবে ইহার অধিক বিপদজনক। স্ত্রী-স্টেগোমাইয়া একসঙ্গে ২০টা হইতে ৭৫টা ডিম জলের উপর পাড়ে। এগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র, কাল, সিগারের মত এবং সহজে মরে না। বাচ্ছাগুলি ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার সপ্তাহ মধ্যে নিজেরাই পুনরায় ডিম পাড়িবার উপযুক্ত হইয়া উঠে; স্ত্রীমশক বৎসরের বহুবার ডিম পাড়ে, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই অধিক। শীতকালে ডিম

শীতকালটা কাটাইয়া পুনরায় গ্রীষ্মকালে খুব সজাগ হইয়া উঠে। পেটের দিক্‌টায় সাদা ও কাল ডোরা-ডোরা দেখিয়াই ‘স্টেগোমাইয়া’ মশক চিনিতে পারা যায়। এই-সব ডোরা-ডোরা দাগ থাকে বলিয়া ইহার আর-এক নাম ‘বাঘা-মশক’ (tiger-mosquito)। এই জাতীয় মশা দিনে রাত্রে সর্বদাই কামড়ায়। মশাব ভিতর স্ত্রীমশকই মানুষের অধিক শত্রু, কারণ ইহারাই মানুষের রক্ত খায় ও নানাপ্রকার রোগের বীজাণু বহন করিয়া বেড়ায়। পুরুষমশকগুলি অপেক্ষাকৃত ভদ্র এবং মানুষের বিশেষ ক্ষতি করে না।

এইবার ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণগুলি ও ইহার প্রতিকারের কয়েকটি সহজ উপায় বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই বোগে যে ভীষণ গাত্রবেদনা হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ যাহারা একবার ভুগিয়াছেন তাহারা ত বিশেষভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। ইহাতে শরীরের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থি, মাংসপেশী, ও মাংসপেশীর বন্ধনীতে এত বেদনা হয় যে এই জ্বরের আর-একটি নাম হইয়াছে ‘breakbone fever’ বা হাড়ভাঙ্গা জ্বর। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, চোখের পিছন দিকে ব্যথা,—এমন কি চোখ এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইতেও লাগে, রাত্রে অনিদ্রা, জ্বরের সঙ্গে অক্ষুধা, পেটের পীড়া, বা বমি কাহারও কাহারও হয়। ছেলেপিলেদের কখনও কখনও প্রলাপ-বকা বা তড়কা হয় বা হয়ত জ্বরের সময় বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকে। জ্বট্টা তিন-চার দিনেই ছাড়িয়া যায়, জ্বর ছাড়ার সময় প্রায়ই খুব ঘাম হয়, কাহারও কাহারও এই সময় পেটেব পীড়াও হয়। জ্বট্টা ছাড়িয়া গিয়া দুই-এক দিন রোগী ভাল থাকে। সেই সময় গায়ে হামের মত rash বা গোটা বাহির হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই শেষেব জ্বরটা প্রথম জ্বরের চাইতে গুরুতর হয়। জ্বরটা সারিয়া গেলেও শরীরের দুর্বলতা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। কদাচিৎ কাহারও দুইতিন বারও জ্বরটা ফিরিয়া আসে ও গাত্রবেদনা হয়। কিন্তু একরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

ডেঙ্গুজ্বর নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে :—(১) বাটীতে কোথাও জল জমিয়া না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। (২) যেখানে জল জমিয়া থাকা নিবারণ করা যায় না (যেমন কলিকাতায় পাথখানার টাঙ্ক ইত্যাদি) সেই-সব স্থানে জলের কিনারায় প্রতি দশ দিন অন্তর কেরোসিন তেল কিছু সাবান-কুলেব সহিত মিশাইয়া ঢাকিয়া দেওয়া। প্রতি ১৬ ‘কিউবিক্’ ফুটে ১ আউন্স্ কান্টালিক অ্যাডিড দিলেও চলে। পেট্টারিন (pesterine or crude petroleum) ছড়াইয়া দিলেও চলে। পেট্টারিন ও কেরোসিন-তেল একসঙ্গে সমান ভাগে মিশাইয়া জলের কিনারায় ছড়াইয়া দেওয়াই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। পানামা, কাইরো প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এই দুইটিই খুব অধিক ব্যবহার হইয়াছে। পুষ্করিণী বা বড় জলাশয়ে দিতে হইলে টিনের বড় একটা পিচ্কারী দিয়া ছিটাইয়া দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। (৩) ডেঙ্গু-রোগীকে সর্বদা মশারীর ভিতর রাখা উচিত ও বাড়ীর অন্য সমস্ত স্থস্থ ব্যক্তিদের মশারী ব্যবহার করা উচিত। (৪) কেহ কেহ বলেন ডেঙ্গুজ্বরের সময় প্রত্যহ কিছু কিছু কুইনিন খাইলে এই জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ডেঙ্গুজ্বরের ভীষণ গাত্রবেদনায় একটু ‘কুইনিন ম্যালিসাইলাস্’ (৫ গ্রেন), ‘এম্পিরিন্’ (৫ গ্রেন) ‘ক্যাফিন সাইট্রাস্’ (৩ গ্রেন) একসঙ্গে মিশাইয়া একটি বা দুইটি পুরিয়া খাইলে গাত্রবেদনা ও মাথাধরার অনেকটা উপশম হয়।



কুল-প্রদীপ

(গুজরাটি উপকথা)

এক গরীব ব্রাহ্মণের একটিমাত্র ছেলে। ছেলেটির যেমন বুদ্ধি তেমনি লেখাপড়ায় মন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট খারাপ, তিনি পয়সার অভাবে ছেলেকে একটু আদর করতে পারেন না, ভাল করে খেতে দিতে পাবেন না। এইজন্তে তাঁর মনে বড় দুঃখ। একদিন ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন, “তোমার নাম রেখেছি কুল-প্রদীপ, আমার আশা আছে ভবিষ্যতে আমার বংশ তুমি উজ্জ্বল করবে। কিন্তু এখন যে তোমায় খেতে দিতে পারছি না, তাব কি?”

কুল-প্রদীপ ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, বাপের কষ্ট সে খুব বুঝত। সে বললে, “বাবা তুমি কিছু ভেব না, আমি এবার নিজে রোজগার করতে চলুম।”

ব'লে ত সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চ'লে গেল। সেখানে গিয়ে বাজারের মাঝখানে এক দোকান খুলে বসল। দোকানে জিনিষের মধ্যে ছিল, একটা খানি বাক্স, খানকতক সাদা কাগজ, আর দোয়াত-কলম। তার পব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত দিন ধ'রে চোঁচাতে লাগল, “এখানে বুদ্ধি বিক্রী আছে, যে দামের চাও সেই দামের পাবে। কে নেবে গো চ'লে এস।” তাই না শুনে কত লোক ভিড় করতে লাগল, কিন্তু অতটুকু ছেলের কাছ থেকে কে আর বুদ্ধি নিতে যাবে? যে আসে সেই একটু দাঁড়িয়ে দেখে চ'লে যায়, খন্দের আর জোটে না।

শেষটা সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, তখন গোবর-গণেশ ব'লে একটা হাঁদা ছেলে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, সে কিসের গোলমাল হচ্ছে, এগিয়ে দেখতে এল। “বুদ্ধি চাই, বুদ্ধি চাই” তাই সে যখন কাগজের বাক্স কোণের কোণে পাবার

জিনিষ বিক্রী হচ্ছে, তাই সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে, “কত ক'রে মের দিচ্ছ?”

কুল-প্রদীপ তখনি জবাব দিলে, “ওজন ক'রে বিক্রী করি না, যেমন পয়সা দেবে, ঠিক তেমনি জিনিষ পাবে।”

গোবর-গণেশ বললে, “তবে দাও ত দেখি ছুপয়সার!”

তার হাত থেকে দুটো পয়সা নিয়ে কুল-প্রদীপ এক টুকুরো কাগজে লিখলে, “ছদ্মন লোক যেখানে ঝগড়া করবে, সেখানে কখনো দাঁড়িও না।” লিখে সে গোবরগণেশের কোঁচার খুঁটে কাগজটা বেশ ক'রে বেঁধে দিলে।

তাই নিয়ে ত গোবরগণেশ বাড়ী চলল। বাড়ী গিয়ে তার বাবাকে বললে, “আমি ছুপয়সায় বুদ্ধি কিনে এনেছি!”

তাব বাবার নাম ছিল ধনুর্ধর। তাঁর টাকাকড়ি ছিল অনেক হাজার, কিন্তু কানাকড়ির বুদ্ধি ছিল না। তিনি ত শুনেই দেখতে চাইলেন, কিরকম বুদ্ধি কেনা হয়েছে। দেখেই মহাখাপ্পা! বললেন, “সকলেই জানে যে ঝগড়ার কাছে দাঁড়াতে নেই, খালি তুই জানিস না। তাই ব'লে এই ছুলাইনের জন্তে দু-দুটো পয়সা খরচ করলি?” তখনি তিনি বুদ্ধির দোকানে গিয়ে হাজির হলেন, তার পর কুলপ্রদীপকে যা-নয় তাই ব'লে গালাগালি দিতে লাগলেন। সে চুপ'টি ক'রে শুনতে লাগল, শেষটা যখন তিনি বললেন, “তুমি আমার ছেলেকে বোকা পেয়ে পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছ, এখনি ফিরিয়ে দাও, নইলে চৌকিদার ডাকব!”—তখন কুলপ্রদীপ বললে, “ও কিন্তে এসেছিল তাই বিক্রী করেছি। এখন ও যদি আমার বুদ্ধি ফেরৎ দেয়, তা হ'লে আমিও পয়সা ফিরিয়ে দেব।”

ধনুর্ধর কাগজখানা দোকানের বাকের উপর রেখে দিলেন। কুলপ্রদীপ মাথা নেড়ে বললে, “উচ্চ কাগজ

ফেরৎ চাই না, বুদ্ধি ফেরৎ চাই। যদি তোমরা পয়সা ফিরিয়ে নিতে চাও তা হ'লে এত লোকের সামনে একখানা কাগজে নিজের হাতে লিখে' দিতে হবে, যে, ও আমার বুদ্ধি শুনে' কখনও চলবে না। যেখানে ঝগড়া হবে, সেইখানেই দাঁড়িয়ে দেখবে।”

চার পাশে যারা ভিড় করেছিল, তারা সবাই তার কথায় সায় দিলে। কাছেকাছেই ধনুর্ধর একখানা কাগজে, যেমন বলা হ'ল, তেমন লিখে নাম সই ক'রে দিলেন। তার পর ছুটো পয়সা হাতে পেয়ে মনে করলেন, খুব সহজে কাজ হাসিল করা গেল।

পরের দিন সকালবেলা, সেই দেশের রাজার দুই রাণী, দুই সখীকে বাজারে পাঠিয়েছেন আতরের নমুনা আনতে। দুই সখী এক দোকানে এসে উঠল। হুজনে দু শিশি আতর দেখতে চাইলে। দোকানীর কাছে তখন একটিমাত্র শিশি ছিল। কাছেই কে সেটা নিয়ে যাবে এই নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। সেই সময়ে গোবরগণেশ সেখানে এসে পড়েছে, আর দূর থেকে কুলপ্রদীপকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে যাবে মনে করেছিল, কিন্তু আর পালাবার উপায় নেই! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। গোবরগণেশকে একলা সামনে পেয়ে রাণীর সখীরা হুজনেই তাকে সাক্ষী মেনে বসল। তার পর তারা বাড়ী গিয়ে দুই রাণীর কাছে পরস্পরের নামে নালিশ করলে, আর প্রত্যেকেই বললে, তার যে কোন দোষ নেই একটি ছেলে তার সাক্ষী আছে। রাজার কাছে তাদের বিচারের জন্তে পাঠিয়ে দিয়ে দুই রাণী গোবরগণেশকে ব'লে পাঠালেন যে অপরের সখীর হ'য়ে কোন কথা বললে তার মাথাটি কাটা যাবে! গোবরগণেশ ভয় পেয়ে তার বাপের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললে। তিনি সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভেবেও কোন উপায় বার করতে পারলেন না। তখন স্থির হ'ল সেই বুদ্ধিওয়ালার কাছে যাওয়া যাক, সে যদি কিছু বুদ্ধি দেয়।

তার পর হুজনে কুলপ্রদীপের কাছে যেতেই সে চেয়ে বসল পাঁচশো টাকা। প্রাণের দায়ে ধনুর্ধর তাকে তাই দিলেন। টাকা হাতে নিয়ে সে বললে, “রাজার কাছে

গিয়ে একটি কথারও জবাব দিও না, কেবল পাগলের ভাণ করবে।”

রাজসভায় গিয়ে গোবরগণেশ তাই করলে। যা জিজ্ঞেস করা হয় তার কিছু জবাব দেয় না, শেষটা ঘোড়ার ডাক, কুকুরের ডাক ডাকতে আরম্ভ করলে। রাজা তখন চ'টে গিয়ে বললেন, “দাও ওটাকে রাস্তায় বার ক'রে!”

রাস্তায় না বেরিয়ে গোবরগণেশ চোঁচা দৌড় দিলে। দিন কতক যায়। একদিন ধনুর্ধরের ভয় হ'ল, রাজা যদি কোন সূত্রে জানতে পারেন, যে গোবরগণেশ সত্যি সত্যি পাগল নয়, তা হ'লে ত তার ভয়ানক শাস্তি হবে! এর প্রতিকার কি, জানতে গেল বুদ্ধির দোকানে। কুল-প্রদীপ বললে, “পঞ্চাশ টাকা না নিয়ে ত কথা কইব না!”

তাই দিতে, বললে, “রাজার মেজাজ যখন ভালো থাকবে, তখন গিয়ে সব কথা খুলে' ব'লে মাপ চাইলেই হবে।”

গোবরগণেশ একদিন তাই করলে। রাজা ত ব্যাপারটা শুনে ভারি খুসি হলেন! তিনি তখন কুল-প্রদীপের কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিলেন, “আমাকে একটা বুদ্ধি দাও, যা দাম লাগে, দেব।”

কুলপ্রদীপ ব'লে পাঠালে, “আপনাকে একটা খুব ভাল বুদ্ধি দেব, তাব দাম বেশী নয়, একহাজার টাকা।”

রাজা কুলপ্রদীপের কথা সব শুনেই বুঝেছিলেন, ছেলেটির বুদ্ধি বড় কম নয়। তাই তাকে একহাজার টাকাই দিলেন। কুলপ্রদীপ শুধু এই কথাটি লিখে দিলে, “খাবার আগে দেখে' নেওয়া উচিত।”

কথাটি খুব সুন্দর দেখে', রাজা সমস্ত খাবার পাত্রে এটি লিখিয়ে রাখলেন।

দিনকতক পরে হঠাৎ একদিন তাঁর খুব অসুখ হ'ল। মন্ত্রী তাঁকে মেরে ফেলবার মতলব ক'রে কবিরাজকে ব'লে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলে। সোনার বাটিতে সেই ওষুধটা ঢেলে রাজার হাতে যখন তুলে' দেওয়া হ'ল, তখন তাঁর নজরে পড়ল সেই লেখাটি,—“খাবার আগে দেখে' নেওয়া উচিত।

তিনি ওষুধটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। দেখে' কবিরাজের ভয় হ'য়ে গেল। সে ভাবলে, ওষুধ খাবার সময়ে রাজা ত কোনদিন দেখেন না! আজ কেন দেখছেন? তবে নিশ্চয় জানতে পেরেছেন! তখন সে রাজার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। রাজা ত কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাই প্রহরীকে দিয়ে মন্ত্রীকে তখনি ডাকতে পাঠালেন।

মন্ত্রীর ত চক্ষু স্থির! সে এসেই জোড়হাত ক'রে বললে, "মহারাজ ত সবই টের পেয়েছেন, আমাদের মাপ করুন!"

রাজা তখনো কিছুই জানতে পারেননি, ক্রমে জেরা ক'রে সব ঘটনাটা যখন স্পষ্ট হ'য়ে উঠল, তখন বিয়ের পাত্রটা ছুড়ে' ফেলে দিয়ে দুজনকে রাজ্য থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

তার পর? তার পর সেই বুদ্ধিমান ছেলে কুল-প্রদীপকে এ'ন মন্ত্রীর আসনে বসালেন। কুল-প্রদীপ আর তার বাবা, গরীব ব্রাহ্মণের সমস্ত ভংগ চ'লে গেল।

শ্রী প্রভাতকিরণ বহু

ফুলের রেণু

ফুলের মধ্যে নানাবর্ণের ধূলীর মত ফুলের রেণু থাকে। ফুলের প্রধান উদ্দেশ্য এই রেণু-ধারণ। গভকেশরের ভিতর ছোট ছোট অপরিপুষ্ট বীজ থাকে, রেণু বা পরাগ গভকেশরে পড়িলে তবে বীজ জন্মে। বীজই বৃক্ষাদির বংশ-রক্ষক বা 'পিণ্ডদাতা'। অবশ্য অনেক গাছের বীজ জন্মে না, কলম করিয়া বা 'তেউড়' দ্বারা তাহাদের বংশ রক্ষা হয়। কোন কোন দেশে হিম ঋতু প্রায় ১২ মাসই থাকে, বরফও একেবারে গলিয়া যায় না, তথায় অনেক গাছ এইরূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া বংশ-রক্ষা করিতেছে—যেমন সাইবেরিয়া দেশের তৃণবর্গ। আমাদের বাঁশ বংশবর্গ কয়েক রকম তালীবর্গ, কয়েকপ্রকার কদলী এইরূপে বংশরক্ষা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য বীজ দ্বারা বংশ-রক্ষা করা। অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন যে

বাঁশ-গাছে ৫০।৬০ বৎসর অক্ষুর ধানের মত বীজ হয়। অনেক তালী-শ্রেণীর জীবনে একবার মাত্র ফল হয় ও তাহার পরেই তাহারা মরিয়া যায়। কদলীরও বীজ হয় ও তাহাতে গাছও হইয়া থাকে। তবে সৌখিন কলার বীজ হয় না বটে। মানব নিজেব সৃষ্টির জন্তু কত ফলকে যে বীজশক্তি করিয়াছে, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া।

সাদারণতঃ সকল সৃষ্টিরই বীজ আবশ্যিক ও বীজ জন্মিতে রেণু আবশ্যিক। স্তরাং রেণুই ফলের চরম লক্ষ্য।

আবার পরাগ কীটেরও অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। মৌমাছি কেবল মধু লুটিতে আসে না, রেণুর লোভও তাহাব কম নহে। ভ্রমর কেতকীফুলে পরাগের লোভে আসিয়া কিরূপ অন্ধ হয় প্রাচীন কবিগণ তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

পুরাকালে বিলাসী রমণীগণ ফুলের রেণু মুখে মাখিতেন, শস্যায় ছড়াইতেন ও তাহা দিয়া কেশ সংস্কার করিতেন। এখন যে 'পাউডার' দেখিতে পাই, তাহাও ঐ রেণুর মত, ও তাহারই স্থলাভিষিক্ত। বিলাসীদের আর-একটি দ্রব্য জাক্রান-ফুলের কেশর।

একটি ফুলে অনেক রেণু জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুই একটির প্রয়োজন, বাকি সব মাঠে মারা যায়। পূর্বে যখন পরাগ বায়ু দ্বারা গভকেশরে আসিতে পাইত—এখনও এরূপ ফুল অনেক আছে—তখন পুষ্পের রেণু পর্যাপ্ত জন্মিত। কারণ অনেক রেণু বাতাসে উড়িতে উড়িতে কচিং দুই একটি গভকেশরে পৌঁছিত। পরে যখন কীট রেণু বহন করিতে আরম্ভ করিল, তখন রেণুর অপব্যয় কমিয়া গেল, কারণ কীট কেবল ফুল হইতে ফুলেই বসিত, স্তরাং অল্প রেণুতেই কাজ হইতে লাগিল। গাছেরও সৃষ্টি হইল। পর্যাপ্ত রেণু সৃষ্টিতে তাহার যে শক্তি লাগিত তাহা হইতে অনেকটা বর্গ গন্ধ ও মধু গ্রহণ করিতে ব্যয় করিতে পারিল।

আবার বায়ু-বাহিত রেণুগুলি ছোট হালকা ও শুষ্ক হয় এবং সহজে বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় অমুক স্থানে 'চন্দন' বৃষ্টি' বা রক্তবৃষ্টি

হইয়াছে। তাহা আর কিছুই নহে পরাগ-বৃষ্টি! অর্থাৎ বাতাসে সাদা ও লাল বর্ণের বেগু উড়িতেছিল, বৃষ্টির সহিত বর্ষিত হইয়াছে।

কীট-বাহিত বেগুগুলি—বড়, গুঁয়াযুক্ত বা আঠাল হয়, কীট-পতঙ্গের স্পর্শে আসিলে তাহাদের গায়ে লাগিয়া যায়।

পুষ্পের বীজ গভকেশরে বন্ধ থাকে, বাহিরে আসিতে পারে না—সুতরাং ফুলের অবরোধ-প্রথা আমাদের অপেক্ষা কম নহে। এই বীজই রূপান্তরিত হইয়া ভবিষ্যতে বংশরক্ষা করে। ইহাদেরও আকার-প্রকার-ভেদ আছে।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ফেরিওয়াল

ফেরিওয়াল থেকে যাচ্ছিল—“চাই আম—পাকা আউম্”!

রাস্তার ধাবে বাবান্দায় জমিদার-বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন—ডাক পড়ল ফেরিওয়ালকে। দর-দস্তুর হ’ল। ফেরিওয়াল বলে ১২টা, বাবু বলেন ১০টা। ক্রমে বাবু ১৮টা ক’বে নিতে স্বীকার করলেন। ফেরিওয়াল অনেক অম্মনয়-বিনয় কবে’ জানালে ১২টার বেশী সে দিতে পারবে না। গরীব লোক—বেশী লাভ নেই—কয়েকটি পোষা আছে, ইত্যাদি। বাবু তবু দর করতে ছাড়লেন না। তিনি ১৬টা পণ্যস্ত নিতে পারেন। তখন ফেরিওয়াল ফলের চ্যাঙারিটা মাথায় তুলে’ নিয়ে বললে, “আমি গরীব মানুষ, পাঁচ জায়গায় ফেবি করতে হবে—আমায় বিদায় দিন—আমি ১২টার বেশী দিতে পারব না। আমি দর-দস্তুর করি নে।” বাবু রেগে বললেন, “ব্যাটা ধম্মপুত্রুর যুধিষ্ঠির! ব্যাটা ফেরিওয়াল বলে কিনা দর-দস্তুর করি নে!” সময়ের বৈগুণ্যে সে আজ ফেরিওয়াল—গাল্টি তার পচ্ছন্দ হ’ল না—সে ক্রুদ্ধ-ভাবে উত্তর দিল, “বাবু, আপনি বড়লোক, আমি গরীব ফেরিওয়াল, তাই বলে’ আমাকে গালাগালি করা

সামান্য ফেরিওয়াল অত বড় একটা জমিদারকে অপমান কবে—তাকে কিনা প্রকারান্তরে অভদ্র বলে! বাবু ভয়ানক রাগলেন—পেয়াদা ডাকলেন, গরীবকে ছুচার ঘা প্রহার দিয়ে তার ফলগুলো সব পথে ফেলিয়ে দিলেন। বেচারির সামান্য পুঁজিটুকু নষ্ট হ’ল। পথে দাঁড়িয়ে সে এই অত্যাচার সহ করলে—তার মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটল না। যখন ফলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—তখন সে নির্দীক গুস্তিত হ’য়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে’ পড়ল—ফলগুলো লোক ও খান-বাহনের চলা-ফেরাতে সব ছড়িয়ে নষ্ট হ’য়ে যেতে লাগল—শুধু চেয়ে ফ্যাল-ফেলিয়ে দেখতে লাগল। তার ক্ষতি যে কতটা হ’ল জানলেন শুধু সেই অজ্ঞানামী। এক অব্যক্ত ব্যথায় উপর দিকে চেয়ে “হা ভগবান্!” বলে’ উঠে’ দাঁড়াতেই তার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, নিজেকে সামলাতে না পেরে দ্রুতগামী একটা গাড়ীর আঘাতে সে পড়ে’ গিয়ে—অজ্ঞান হ’য়ে গেল। বাবু তখন তাঁব “বৈঠকে” বসে’ রাগের জেরটুকু অম্বরী তামাকের ধোয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

এই ঘটনার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। একটি আট বছরের ছেলে সেদিন সকাল-সকাল স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিল। ছেলেটি বড়লোকের—বোজ্জ দ্বারবান্ সঙ্গে করে’ আনে—আজ একটা অজ্ঞানিত কারণে আগেই ছুটি হওয়াতে দ্বারবান্ আসেনি। বালক অপেক্ষা না করে’ পাড়ার ছজন ছেলের সঙ্গে বাড়ী ফিরছিল। ছেলে ছুটি তাব চেয়ে বয়সে বড়। পথের বাঁক ফিরতেই হঠাৎ একটা জুড়ী গাড়ী তাদের সামনে এসে পড়ল। কোচম্যান প্রাণপণে লাগামে টান দিলে। বড় ছেলে ছুটি ছুটে ছুদিকে সরে’ গেল—তারা রোজ হেঁটেই যাওয়া-আসা কবে, কিন্তু ছোটটি পথ চলতে অনভ্যস্ত, ভয়ে কি রকম হতবুদ্ধি হ’য়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। পলক ফেলতে না ফেলতে বেগে জুড়ীটা একেবারে ছেলেটির একহাত তফাতে এসে পড়ল। কোচম্যান বহু যত্নে গাড়ীর বেগটা হঠাৎ সংযত করতে পারলে না। চারিদিক থেকে একটা হাহাকার রব উঠল।

থেকে পড়ে' গেছে—ভয়ে মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে—কিন্তু তবু সে সেখান থেকে নড়তে পারছে না। এইবার তার শব্দীরাটা বুঝি ঘোড়ার পায়ের তলায় চূর্ণ হয়! ছুটে' এসে কোথা থেকে একটা খোঁড়া ছেলেটাকে এক দাক্ষিণ্য দিয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে দূরে ছুড়ে' ফেলে' দিলে, সঙ্গে সঙ্গে জুড়ীটা সেই খোঁড়ার ঘাড়ে এসে পড়ল। হঠাৎ গাড়ীটাও থেমে গেল। চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে এই-সকল ঘটনা হ'য়ে গেল। খোঁড়াকে যখন ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে টেনে বার করা হ'ল তখন সে উত্থানশক্তিহীন।

সংবাদ পাবা মাত্র বালকের পিতা ঘটনাস্থলে এসে খোঁড়াকে দেখলেন, তাব চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা করলেন। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ধনী পিতা উপকারীকে জানালেন যে প্রত্যুপকারে খজকে তিনি মাসিক বৃত্তি দেবেন এবং তার চিকিৎসার সকল ভার বহন করবেন। খজ তখন কিছু স্বস্থ হয়েছিল, সে উত্তর দিলে, “বাবু, আমরা গরীব লোক, কিন্তু উপকার করে' দাম নিই নে। প্রাণের আবেগে ছেলেটিকে বাঁচিয়েছি, বড়লোকের ছেলে বলে' নয়। ক' বছর আগে ঐ রকম একটি ছেলে আমি হারিয়েছি—তার মা আর সে এক সময়েই আমাকে ছেড়ে চলে' যায়—সে বড় দুঃখের কাহিনী, কি আর বলব—আপনারই মত এক ধনীর দয়াতে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি—নিজে পঙ্গু হয়েছি—প্রাণাধিক প্রিয়জনকে দারিদ্র্যের তাড়নায় অনাহারে মরতে দেখেছি—আমার প্রাণ বড় কঠিন, তাই এখনও ভেঙে চুব হ'য়ে যায়নি।”

কথা কয়টার ব্যথা দুজনকেই অনেকক্ষণ গুরু করে' রাখলে। কিছু পরে ধনী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কেমন করে' জীবিকা নির্বাহ কর?"

খজ —“সে অনেক কথা। অবস্থা-চক্রে সব খুইয়ে আমি এখানে ফেরিওয়ালা হয়েছিলাম...”

বাবু—“কি হয়েছিলে?"

খজ—“ফেরিওয়ালা হয়েছিলাম। এক ধনী বাবুর বাড়ীতে আমি বিক্রী করতে যাই—তারই রূপায় আমি সব হারিয়েছি—আজ আমি খজ, সর্বস্বান্ত, সংসারে একা।

কিন্তু দয়ালের বড় দয়া, যে, তিনি আজ আমার এই অসহায় অবস্থাতেও একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করবার ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন। আমি প্রাণের আবেগে—আমার সেই মৃত সন্তানকে মনে করে'ই বাছাকে বাঁচিয়েছি। আশা করি বালকের পিতা হ'য়ে আজ আমার এই অসহায় অবস্থায় উপকারের কথা তুলে' আমাকে অপমান করবেন না।”

ধনী কতক্ষণ যে তার পর স্তব্ধ হ'য়ে বসে' ছিলেন কারও খেয়াল ছিল না যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন চোখে তাঁর জল—প্রাণে তাঁর বুকজোড়া একটা দারুণ ব্যথা। মৃত্যুশয্যা শেষের দিন ক'টা বালক গোপালের নিত্য সঙ্গ পেয়ে খজের যা উপকার হয়েছিল তার ধনী শত শত চেষ্টা করলেও বোধ হয় তার শতাংশের একাংশও হ'ত না। পিতার আজ্ঞায় বালক প্রত্যহ স্কুলের পথে ও বাড়ী ফেরবার সময় নিঃসঙ্গ সেই খোঁড়াকে যে নির্মল সাহচর্য-টুকু দিত—তা'তে তার শেষ দিন ক'টা যে বড়ই মধুময় হ'য়ে উঠেছিল তা' তার মুখ দেখেই বুঝা যেত।

সেদিন দুঃখ্যাগের সম্ভাবনা দেখে' দ্বারবানের ইচ্ছা ছিল না গোপাল পথে দেবী করে। গোপাল স্কুল থেকে একেবারে বাড়ীতেই ফিরে এল। সন্ধ্যায় বড় দুঃখ্যাগ হওয়াতে সে সময়ও খজকে দেখতে যেতে পারলে না। মনটা কিন্তু তার বড়ই অস্থির হ'য়ে পড়েছিল। সমস্ত রাত সে ভাল করে' ঘুমোতে পারেনি। সকালে উঠে' যখন “থোকা বাবু”কে দেখতে পাওয়া গেল না, তখন একটা হৈ চৈ পড়ে' গেল। চারি দিকে খোঁজা হ'ল, কোথাও পাওয়া গেল না। বাবু নিজে গাড়ী করে' ছেলে খুঁজতে বার হলেন। কি মনে হওয়াতে আগেই খজের বাড়ীতে গেলেন—সেখানে গিয়ে দেখেন এক অপূর্ব দৃশ্য—! বৃকের উপর নিদ্রিত গোপালকে নিয়ে খজ চিরনিদ্রায় বিশ্রাম করছে!

আচার্য্য শ্রী শ্যাম ভট্ট

চীনে গল্প

চীনদেশের মন্ত সদাগর চাও-সি। সদাগরের মাথায় বেণী হাঁটার তাঁলে হাঁটুর পেছনে দোল খায়। চীন-মুল্লুকে



কাশ্মীরের পণ্ডিতানী
চিত্রকর শ্রীসারদাচরণ উকিল

এ বেণীর জুড়ি নেই। রাজা মহাখুসি হ'য়ে সদাগরকে বখশিশ দিলেন—সোনার-পাতে-মোড়া মৌতাতের এক নল ; আর তার সাথে 'চিয়েন্'-এর এক পত্র, তার মানে চাও-সির শীগ্গির মরণ নেই।

সদাগরের মাথার বেণী আড়াই হাত। সদাগরের বৌ টিয়ানের পা দুখানি আড়াই আঙুল ; রাজ্যের মধ্যে এমন সুন্দর পা আর নেই ?—রাণী আদর ক'রে টিয়ানকে ইনাম দিলেন—মুক্তা-ঝিনুর তৈরী কচি পায়ের জুতো।

সংসারে চাও-সি আর টিয়ানের কোন দুঃখ কষ্ট নেই, কিন্তু মনে ভারি আপশোষ—একমাত্র ঘরের ছেলে মাকুষ হ'ল না ! বেণী দূরে থাক, ছেলে টেকুর মাথায় টিকিটিও নেই ! তার উপর আবার সর্ব্বনেশে কথা শোনো,— বলে কিনা, মোল আঙুল পা না হ'লে সে মেয়েকে বিয়ে করে কে ?... ছিঃ ছিঃ ! টেকু হ'ল কি !

সকলে বললে—দেশের শত্রুরা...বেনেব পো, সময় থাকতে অমন ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করো।

পাড়াপড়শী সাথ দিলে—ঠিক কথা। ..আর, চাও তো, আমাদের ঘরের ছেলেকে পুষিপুত্র দিতেও আমরা রাজী।

উঠানে দাঁড়িয়ে জাতিকুটুম চ্যাচাতে লাগল— 'তা তো যেন হ'ল। কিন্তু কুপুষ্য ছেলে যে বাপ-পিতাম'র আইন না মেনে দেশের মুখে কালী দিয়েচে, তার পেরাচিতির কি ? দেশ যে রসাতলে যাবে,— চাও-সি, ভাল চাও তো হারাকিরি করো। তুমিই ঘরের কত্তা, তোমারই এ পেরাচিতির করতে হয়। পেটে ছোরা চালাতে ভয় হয় ত, নাও—এ রেশমী ফিতে, গলায় ফাঁশি দিয়ে কুলের কালী খুচোও।

শুনে' চাও-সির মহাচিন্তা—সে কি ! তোবঙ্গে আমার রাজার নিজের হাতের লেখা চিয়েন্ তার মানে শীগ্গির আমার মরণ নেই, আমি ম'রে কি রাজার অপমান করতে পারি ?

(২)

চাও-সি টিয়ানকে বললে—রাডা বৌ, তুমিও যে আমিও সে—শাস্তরেরই কথা। বাপ-পিতাম'র আইন

মানে না—ছেলে, না দেশের শত্রুর। ছেলের জন্তে দেশ ত রসাতলে যায় !—এর পেরাচিতির এখন হারাকিরি। কিন্তু তোবঙ্গে আমার রাজার নিজের হাতের লেখা 'চিয়েন্', তার মানে শীগ্গির আমার মরণ নেই ; তুমিই এ রেশমী ফাঁশি গলায় দিয়ে কুলের মান রাখো।

আড়াই আঙুল কচি পা দুটি নাচিয়ে নাচিয়ে টিয়ান বললে—সে কি কথা ; পায়ের আমার রাণীর দেওয়া মুক্তা-ঝিনুর জুতো,—আমি ম'লে এ জুতোর মান রাখি কে ?

সদাগর বললে—তাও তো বটে !...আচ্ছা, তবে দেখ, কোথায় আছে মালীর বেটা চৌ-চৌ ; তারই গলায় রেশমী ফাঁশি দিয়ে বংশের ইজ্জত রাখা যাক।

(৩)

আফিং খেয়ে চৌ-চৌ ঘরের কোণে ঝিমুচ্ছিল। টিয়ান তাকে জাগিয়ে তুললে, বললে—আহা, চৌ-চৌ, চিরদিনটা খেটে খেটে খেটেই ম'লে ! এখনও কি জিরোবে না ?

মিট মিট ক'রে তাকিয়ে চৌ-চৌ বললে—মা ঠাকুরণ, জিরেন কি আর চাই নে, কিন্তু পাই কই ? কত্তা-মশা'র কড়ি হজম ক'বে ব'সে থাকবে, কার ঘাড়ে ছটো মাথা !

টিয়ান বললে—তাই তো বলি, বাছা,—এদিন শুধু ভূতের মতন খেটেই ম'লে ; তবু কেউ কদর বুঝলে না, সেইটেই তো আরো দুঃখ !

টিয়ানের আদরে চৌ-চৌ গ'লে গেল। আঠারবার মাজা গুইয়ে তালে তালে সে টিয়ানকে সেলাম ঠুকতে লাগল।

টিয়ান বললে—আর খাটুনীতে তোমার কাজ নেই, বাপু ; এখন একটু জিরোও। ধরো, নাও এ রেশমী ফিতেটি—গলায় ক'সে গিরে দিয়ে একবার বুলে'ই দেখো, কত আয়েসের জিরেন মিলবে !—এই-না ব'লে টিয়ান চৌ-চৌর গলায় বেশমী ফাঁশি পরিয়ে দিলে।

ওমাঃ !—ব'লে চৌ-চৌ লাফিয়ে উঠল। টিয়ান ম'রে যেতেই সে দুহাতে গলার ফাঁশি টেনে খুলে ফেললে। ভাবলে—জুতোর জিরেন ! এ কেমন জিরেন রে !... মৌতাতের আয়েসটাই মাটি হ'ল।

(৪)

টেকু বাপের বাস্তু খুলে' টাকাকড়ি বিলিয়ে দিচ্ছিল—
জান্না গলিয়ে রাজ্যের যত কাঙালীকে। চৌ-চৌ চৌকাঠ
ডিঙিয়েই পেছন হ'তে রেশমী ফাঁশি তার গলায়
পরিয়ে দিলে। বললে—টেকু কত্না, ভারি যে পরের ধনে
পোন্দারী হচ্ছে! চুরি ক'রে অত জোরসে খয়রাৎ
চালাবেম না, এখন একটু জিরোন। এ জিরেন-ফিতে
খোদ মাঠাকরণেরই দেওয়া। মা-ঠাকরণ আমাকেই
দিয়েছিলেন; কিন্তু জিরেন আমার কপালে নেই, তাই
আপনাকে খয়রাৎ করতে এলুম।

চৌ-চৌর হাতের হেচকা টানে টেকুর দম আটকে
জিভ্ বেরোবার জো হচ্ছিল। দুচারবার গৌ গৌ
ক'রে সে মুখ খুবড়ে ভুঁয়ে প'ড়ে গেল। হাফ চেড়ে
চৌ-চৌ ঘরের কোণে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে নতুন
ক'রে আফিংএর ডেলা মুখে খুঁজে' ঝিমুতে লাগল।

ছ'স হ'য়ে টেকু ছহাতে গলার ফাঁশি খুলে' ফেললে।
তার পর বাগান হ'তে শিকলি-বাঁধা বুড়ো বাদরটাকে
টেনে আনলে; আর তাব গলায় ফাঁশি দিয়ে গাছের
ডালে ঝুলিয়ে রেখে, নিজে খিড়কির পথে চম্পট দিলে।

(৫)

কুটুমের বাড়ী 'হারাকিরি' হয়েছে,—ভোর বেলা
শোক করতে জ্ঞাতিকুটুম সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে
সদাগরের বাড়ীতে এসে হাজির।

উঠানে পা দিলেই তারা দেখে—চাও-সি রাজাব
দেওয়া সোনার পাতে মোড়া মৌতাতের নল টান্ছে।

দেখে' জ্ঞাতিকুটুম চ'টেই লাল—বটে! চাও-সি,
তুমিও দেখ'চি দেশের শত্রু;—নইলে 'হারাকিরি'
কবলে না?

ভয়ে-ভয়ে চাও-সি বললে—রাঙাবো মালী-বেটার
আক্কেল দেখলে!

টিয়ানু বললে—তাইত! চৌ-চৌ, জিরেনেব কথাটা
তুলে' গেলি!

চৌ-চৌ বললে—মা ঠাকরণ, ভয় নেই,—টেকু-কত্নাকে
দিয়ে আমি সে কাজ সেরেছি।

চৌ-চৌর কথা শুনে' সকলে উঠে' পড়ে' ছুটে' গিয়ে

দেখে বটেই তো!...কিন্তু এ কি টেকু?—বাগানে
গাছের ডালে জিভ্ বের ক'রে ঝুলছে—চাও-সির বুড়ো
বাদরটা না?

জ্ঞাতিকুটুম বললে—বুঝেছি,—এ-ও চাও-সির
চালাকি। ম'রেও টেকু সবার উপর টেকা দিতে চায়,
তাই মুখোস বদলে গাছে ঝুলছে! কিন্তু চোদ্দপুরুষের
অপমান ক'রে বেণী রাখেনি, তাই মরার সঙ্গে সঙ্গে
দেবতা তাকে বেণীর মত লেজ দিয়ে দেশের মান
রেখেছেন। আমরা হলুম জ্ঞাতিকুটুম, আমাদের চোখে
ফাঁকি?—রেশমী ফাঁশি গাছে ঝুলছে—ওতো টেকুই!

সবাই বললে—ঠিক ঠিক, ছবছ টেকুই।

দেশের বালাই দূর হ'ল, মনে ক'বে সবাই
নিশ্চিন্ত।

(৬)

দশপনের দিন যেতে না-যেতে চাও-সি রাজাব-
নিজের-হাতে-লেখা 'চিয়েন্'-এর মান না রেখে' চোখ
শুলটালে। জ্ঞাতিকুটুম নতুন ক'রে শোক করতে সাদা
কাপড় মুড়ি দিয়ে আবার সদাগরের বাড়ীতে এসে
হাজির। এমেরি তারা চাও-সির টাকার সিন্দুকের উপর
আসন গেড়ে বসল।

এদিকে খবর পেয়ে টেকুও বাড়ীতে এসে উপস্থিত।

জ্ঞাতিকুটুম বললে—কে হে, বাপু, তুমি?

টেকু বললে—আমায় চেন না কি?—আমি টেকু,
চাও-সি-সদাগরের ছেলে।

'টেকু?'—সবাই বললে—'মিছে কথা। টেকু তো
কবেই মরেছে।'

গাঁয়ের মোড়লরাও বিচার ক'রে বললে—ঠিকই
ত। টেকু ত মরেছেই। বলুক দেখি কেউ—মরেনি;
তা হ'লে টেকুকে এখনই ধ'রে এ রেশমী ফিতে
দিয়ে ফাঁশি দেওয়া যাবে। আর টেকু যখন আগেই
মরেছে, তখন এ আর কে হবে?—চাও-সি সদাগরের যে
বুড়ো বাদরটাকে খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছিল না, ছবছ সে-ই।

মোড়লদের এ বিচারে দেশজুক লোক ধন্তি ধন্তি
করতে লাগল।

জ্ঞাতিকুটুমরা টেকুকে ধ'রে এক বাদর-নাচ-

ওয়ালাকে বিলিয়ে দিলে। বাঁদরওয়ালা তাকে দিয়ে 'বুড়ো শঙ্করবাড়ী যায়', 'বুড়ো রাগ করেছে'—এ-সব খেলা দেখায়। মনিবের কথায় তাকে উঠতে বসতে হয়, তাই তার মাথায় এখন আড়াই হাত বেণী। নাচনার

তালে আড়াই হাত বেণী যখন হাঁটুর পেছনে দোল খায়, তখন সবাই বলে—টেকু যে পাপ করেছে, দেবতা তার শোধ তুলেছেন। দেখছ না, বাঁদরটার লেজটা যেন চাও-সিরই মাথাব বেণীটি!

শ্রী কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

বিক্রমশিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

মহারাজা ধর্মপাল যখন বাংলা ও মগধে রাজত্ব করছিলেন, সে-সময় দেশে শান্তি ফিরে এসেছিল। যে "মাংসভোজ" দেশে অশান্তি সৃষ্টি কবেছিল, গোপালের নির্দোষতাব সঙ্কে সঙ্কে তার লোপ হয়। দেশে শান্তি ফিরে এসেছিল বলে ধর্মপাল যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অস্ত্র কাছ হাত দিতে পেরেছিলেন। পালবাজাবা বৌদ্ধ ছিলেন, তাই ধর্মপাল একটি নতুন বিহার স্থাপন করেন ভিক্ষুদের জন্যে। সেটি হচ্ছে—বিক্রমশিলা বিহার। যদিও সে সময় নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল, তবু এই নতুন মঠটি খুব শীঘ্র একটি বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

আজকাল একটা প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে বিক্রমশিলা বিহার কোথায় ছিল? কেহ কেহ বিক্রমশিলাকে বিক্রমপুরের সঙ্গে জড়িত করেছেন, তাঁরা বলতে চান যে বিক্রমপুরেই বিক্রমশিলা মঠ ছিল। এখানে নামেব সামঞ্জস্য খুব আছে বটে, কিন্তু সেইটেই মুখ্য প্রমাণ হতে পারে না। এবিষয়ে লামা তারানাথের কথা আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি। লামা তারানাথ তাঁর ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই বিক্রমশিলা মঠকে মগধে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নির্দেশ করেন। (জার্মান পণ্ডিত Schiefnerএর অনুবাদ Taranath পৃঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য।) এই প্রমাণ অগ্রাহ্য করে আমরা বিক্রমশিলাকে বিক্রমপুরে নিয়ে যেতে পারি নে। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, এটি ভাগলপুরের পাথরঘাটার কাছে গঙ্গার তীরে স্থাপিত ছিল। (J.A.S.B. 1910 পৃঃ ১, শ্রীমন্দলাল দেব

প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যতদিন না এই স্থানটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খনন করা হচ্ছে, ততদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা হবে না। যদি সরকার বা সাধারণের চেষ্টায় এটি খনন করা হয়, তবে এখান থেকে এমন শিলালিপি বা শীল আবিষ্কৃত হ'তে পারে যার দ্বারা আমরা বলতে পারব যে এইটিই বিক্রমশিলা মঠ ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজা ধর্মপাল শুধু এই মঠটির প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হননি, যাতে এটি একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'তে পারে তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রথম, তিনি এর বাহ্যসম্পদের দিকে মন দেন, যাতে ভিক্ষুরা শান্তিতে এখানে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেন। ভিক্ষুদের পূজার জন্য অনেক মন্দির তৈরী করে দেন। লামা তারানাথ বলেন—এই মঠে ১০৮টি মন্দির ছিল। মঠের ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল—তাতে মহাবোধি-মূর্তি ছিল। এ-ছাড়া আরও ৫৩ টি ছোট মন্দির ও ৫৪ টি সাধারণ মন্দির ছিল। বলা বাহুল্য এ-সব মন্দির মহাযান বৌদ্ধ মন্দির। এ ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকের বাসের জন্য যথাযোগ্য ঘর তৈরী করে দেন।

যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের ও বিচার গৌরব বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপকদের জন্য ব্যবস্থা করে দেন। লামা তারানাথের মতে এই-রকম বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন—১০৮ জন। এঁরা ছাড়া আরও ৬ জন আচার্য্য ছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল প্রধানত: পূজাদি করা ও মঠের রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাজা ধর্মপাল ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে এই ১১৪ জন

পণ্ডিতের সমস্ত খরচ রাজকোষ থেকে আসে। একজন সাধারণ লোকের যা খরচ, তার চারগুণ খরচ এক- একজন পণ্ডিতের জন্ত বরাদ্দ ছিল।

পাঠ্যবিষয় কি হওয়া উচিত ও অধ্যাপনা কিরকম হবে, সে-সব বিষয়ের আলোচনার জন্ত একটি সমিতি ছিল। লামা তারানাথ এই সমিতির কার্যক্ষেত্র সম্বন্ধে বলেন যে এর দৃষ্টি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও ছিল (Schiefner এর Taranath, p. 218)। এর মানে কি বোঝা শক্ত। লামা তারানাথ কি বলতে চান যে— নালন্দা গঠ বিক্রমশিলার অধীনে ছিল? না, দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যের সহযোগ ছিল? তবে এমন দেখা যায় যে একই পণ্ডিত দু-জায়গায় বাঁসে কাজ করেছেন। যেমন পণ্ডিত অভয়কর গুপ্ত ও দীপকর

দু-জায়গায়ই নানা বই রচনা করেছিলেন। সে সময় যে-সব পণ্ডিত জীবিত ছিলেন, তারানাথ তার একটা তালিকা দিয়েছেন :—

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| (১) কল্যাণ গুপ্ত | (৭) বুদ্ধগুহ |
| (২) সিংহভদ্র | (৮) বুদ্ধশান্তি |
| (৩) সাগর মেঘ | (৯) সিংহমুখ |
| (৪) প্রভাকর | (১০) ধর্মাকর দত্ত |
| (৫) পূর্ণবর্দ্ধন | (১১) আচার্য্য পদ্মাকর |
| (৬) বুদ্ধজ্ঞানপাদ | ঘোষ (কাশ্মীরবাসী)। |

বোধ হয় এ-ব মধ্যে অনেক পণ্ডিত বিক্রমশিলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আচার্য্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ দীক্ষাপুরোহিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত সিংহভদ্রের শিষ্য ছিলেন।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

দৈত্যের দুঃখ

গিরিচূড়া ভাঙি আমি, গিরি দবী লজ্জি,
ধ্বংসের আমি চিরসঙ্গী,
লালসের বিলাসের লীলা আমি জানি চেব—
নিতি মোর নব নব ভঙ্গী।

মস্থনে বাসুকীর ফণা ধরি জাপটি'
বুকে সহি সাহারার তাপটি,
নাচি সুরাপান করি', ঝঙ্কার গান করি,
মানিনাক পুণ্য কি পাপটি।

ঘরে-ঘরে বাজে মোর বিজয়ের ডঙ্কা,
ভাঙি গড়ি কনকের লঙ্কা,
গ্রাস করি চন্দ্রে, ডাক দিই মন্দ্রে,
নাই আশা-নিবাশার শঙ্কা।

নন্দনে হানা দিই—লুটে নিই স্বর্গ,
হানি গজতুণ্ডেতে খড়্গা,
জ্বরে আমি ভোগ করি,—দাস নহি যক্ষেরি,
মৃত্যু ত প্রলয়ের চর গো।

জ্বরে করে' কেড়ে লই অমিয়ার অংশ,
নিজে করি নিজ কুল ধ্বংস,
কৈলাসে টান দিই, প্রাণ নিতে প্রাণ দিই—
নির্দয় আমি যে নৃশংস।

চণ্ডীর সাথে আমি একা করি যুদ্ধ,
জানকীরে বনে করি রুদ্ধ,
জীবনের ভীতি আমি, মরণের প্রীতি আমি,
আমি চিব হিংস্রক ক্রুদ্ধ।

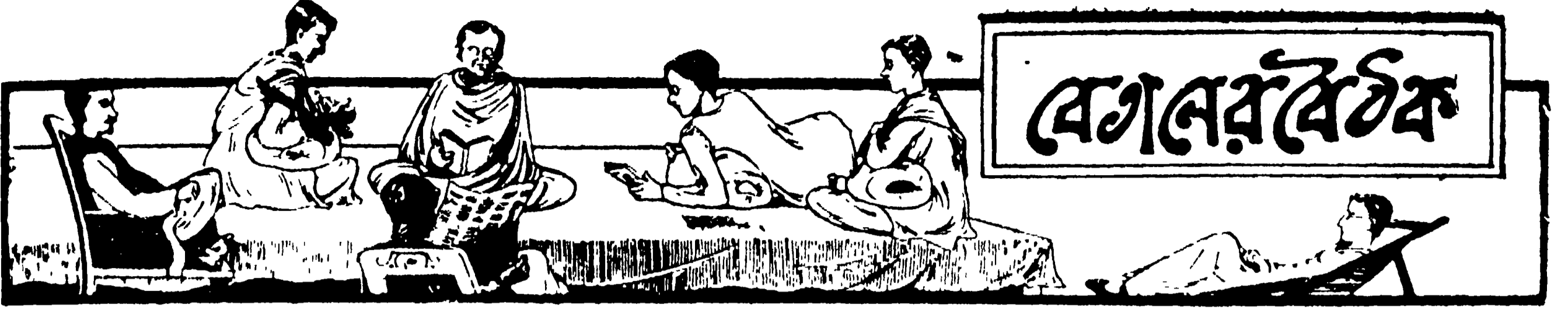
আমি ক্রুর নিষ্ঠুর, আমি ভীম মদ্র,
কিছু নাই কিছু নাই ছদ্ম,
ভগবান্ সাথে লড়ি' জ্বরে করে' বুকে ধরি
বাস্তিত রাঙা পাদপদ্ম।

নিয়তির ক্রীড়নক অবিবেকী অন্ধ
কংস ও আমি জরাসন্ধ,
যেই পথ দিয়ে যাই রয়ে যায় শুধু ছাই—
ভাঙতেই লভি যে আনন্দ।

ভাঙতেই পারি শুধু, পারিনাক গড়তে,—
মরতেই এসেছি যে মর্তে,
স্বপ্নমার ঘটগুলি খালি করে' পদে দলি—
স্বধা দিয়ে পারিনেক ভরতে।

চলে' যাই হাসে লোকে বামে আর ডাইনে,—
বোঁকে আর কোন দিকে চাইনে,
ভয়ে লোকে দেয় পূজা, ঘৃণা করে যায় বুঝা,
সবই পাই, ভালবাসা পাইনে!

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সম্মেহ-নিরসনের দিগদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা একরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসা বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাহ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহারা কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহা উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১২১)

বাংলার স্বাধীন হিন্দুরাজা

বাংলা দেশের স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজা প্রথম কে ছিলেন? তাহার নাম কি এবং বাজহু কোথায় ছিল?

শ্রী শোভাবর্ণী রায়

(১২২)

ভূ-পথ্যটক মাটিনেট্

ভূ-পথ্যটক মাটিনেট্ কত সালে পথ্যটন আবিস্কৃত করেন এবং কোন্ কোন্ জেলার মধ্য দিয়া ভারতে আসেন তাহার বিবরণ কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

প. স.

(১২৩)

মেয়িকোতে মঠ প্রতিষ্ঠা

“—মেয়িকোতে হ'ল যেদিন মঠ প্রতিষ্ঠা বামসীতাব—বিধান দিল কোন্ মনীষা কোজ রূপে কি পুরাণ তার?”

৩ মতেন্দ্রনাথ।

মেয়িকোতে কাহার দ্বারা এবং কত খৃষ্টাব্দে বামসীতাব মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? তাহা আজও বিদ্যমান আছে কি?

শ্রী দুর্গাচরণ বায় চৌধুরী

(১২৪)

কলার চাম

কলার চাম এবং কলা রক্ষা করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার কোন পুস্তক আছে কি? থাকিলে কোন্ ঠিকানায় ইহা পাওয়া যায়?

গাচিহাটা পাব্লিক-লাইব্রেরীর মেম্বারগণ

(১২৫)

স্বধর্ম নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ

ইহার অর্থ নানা মনে নানারূপ করেন। ইহার বাস্তবিক অর্থ কি ও কোথায় প্রয়োগ হইয়া ছল।

শ্রী বিষ্ণুচরণ শাস্ত্রী

(১২৬)

নারিকেল-গাছ-ধ্বংসকারী পোকা

ঢাকা জেলায় যে নারিকেল-গাছ হয়, তাহা প্রায়ই গুবরে পোকায় মত এককপ পোকায় উৎপাতে নষ্ট হইয়া যায়। এই পোকায় উৎপাত হইতে গাছ বক্ষা কবাব উপায় কি?

শ্রীমতী সরণবালা দেবী

(১২৭)

মাটির জিনিসে এনামেল

বিলাতে তৈরি মাটির জিনিসের (বৈয়ান, পিপা, চীনা বাসন ইত্যাদির) উপর কাঁচের মত, পাংলা একপ্রকার এনামেল করা হয়; এই এনামেল প্রস্তুত করিয়া এদেশীয় মাটির জিনিসে ব্যবহার করা যায় কি না? এবং ইহা প্রস্তুত করিতে কি কি জিনিস লাগিয়া থাকে ও কেমন খরচের সম্ভাবনা? ভারতের কোন স্থানে ইহার কাবাখানা আছে কি?

শ্রী তীর্গবাসী পাল

(১২৮)

মীমাংসা প্রদেশে হিন্দু

ভারতের উত্তরপাশ্চিম সীমান্তে, খাফ্‌গানিস্থানে ও বেণুচিস্থানে যে-সব হিন্দু আছে, উহাদের আচার-ব্যবহার কিরূপ? উহাদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা বর্তমান আছে কি? এবং উহারা ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে শ্রদ্ধা করে কি?

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১২৯)

বিধবা-বিবাহ-সভা

লাহোরে বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের অন্য কোনও স্থানে এইরূপ অনুষ্ঠান থাকিলে তাহার ঠিকানা কি? লাহোরের বিধবা-বিবাহের মধ্যে অসবর্ণ বিধবা-বিবাহ থাকিলে সংগায় কত?

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য

(১৩০)

কবি হরিশ্চন্দ্র সাহু

উত্তর ভারতে হরিশ্চন্দ্র সাহু নামে এক কবির নাম শুনিত্তে পাওয়া যায়। ইহার আদি নিবাস, জীবিত কাল, জাতি ও রচিত কাব্য কি ?

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(১৩১)

জাফানের চাম

দ্বারতর্ঘে কাশ্মীর ত্রিগ্ন আর কোন জায়গায় জাফানের চাম হয় কি না।

শ্রী কুমসিকা মেন

(১৩২)

চীনা-বাদামের চাম

চীনা-বাদামের চাম সম্বন্ধে কোন ইংরেজী বা বাংলা বই আছে কি ? কোথায় পাওয়া যায়, দাম কত ? আনাদের দেশে কোথায় কোথায় চীনে-বাদামের চাম আছে ?

মহম্মদ মনসুব উদ্দীন শাহজাদপুৰী

(১৩৩)

ভারতে লবণ-উৎপাদন

পূর্বে আমাদের দেশে লবণ উৎপাদন করা হইত ; এখন হইতে, কি জল ও কাহাদের দ্বারা উহার উৎপাদন রহিত হইল ? কোন্ গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে ?

শ্রী জ্যোৎস্নারাগী দেবী

(১৩৪)

জাভায় চিনি প্রস্তুত করা শিক্ষা

“জাভাতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী” শিখিতে হইলে কিরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া যাইতে হয় ? সেখানে মাসিক খরচ কত ?

বাঞ্ছন রায়

(১৩৫)

উই পোকা নিবারণের উপায়

অনেক ভদ্রলোক পোকা বাড়ী নিষ্কাশন করিয়াও “উই”-পোকায় যন্ত্রণায় নিশ্চিন্তমনে বাস করিতে পারিতেছেন না। ঐ পোকা ধ্বংস করিবার কোন উপায় আছে কি ?

শ্রী সুকুমার পৈত

(১৩৬)

অশুবাচীর মধ্যে অগ্নিপক খাদ্য পাওয়া নিষিদ্ধ কেন ?

বিধবাগণ অশুবাচীর মধ্যে অগ্নিপক খাদ্য ভোজন কবেন না। ইহা কোনও শাস্ত্রসম্মত কারণ আছে কি ?

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

মীমাংসা

(৩০)

নোবেল পুরস্কার

বিগত শ্রাবণ-সংখ্যা “প্রবাসী”তে শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। রসায়নবিদ পণ্ডিত জ্যাট্-হফ্ জাতিতে জার্মান নহেন, ওলন্দাজ। ইনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হল্যান্ডের অন্তঃপাতী রটারডাম সহরে জন্মগ্রহণ

করেন এবং লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বহুদিন অ্যাম্‌ষ্টার্ডাম সহরে শিক্ষকতা করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বের্লিন প্রশাসন আকাডেমী অব্ সায়ন্সের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া জার্মানীতে আসেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মসংহাশয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিবরণ দিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে নোবেল পুরস্কার ইহার নামে দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১৯০৫

পদার্থবিজ্ঞান	পি, লেনার্ড্	জার্মানী
রসায়ন	সি, ফন, বেয়ার	জার্মানী
ভেষজবিজ্ঞান	আর, কক	জার্মানী
সাহিত্য	দিস্কেন্ডিচ	পোল
শাস্ত্র	কাট্টেস বার্থা ফন স্ট্রনার	অস্ট্রিয়া

১৯০৬

পদার্থবিজ্ঞান	জে, জে, উমসন্	ইংল্যান্ড
রসায়ন	আঁরি মোসাঁ (Mossain)	ফ্রান্স
ভেষজবিজ্ঞান	{ রামন কাজাল	স্পেন
	{ গল্‌গি	ইতালী
সাহিত্য	জিয়োস্‌য়ে কার্‌লুচি	ইতালী
শাস্ত্র	থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট্	আমেরিকার যুক্তরাজ্য

১৯০৭

পদার্থবিজ্ঞান	এ, এ, মিকেলসেন	আমেরিকার যুক্তরাজ্য
রসায়ন	ই, বুকনার	জার্মানী
ভেষজবিজ্ঞান	এ, ল্যাভার্গ	ফ্রান্স
সাহিত্য	রাড্‌ফোর্ড্, কিপলিং	ইংল্যান্ড
শাস্ত্র	{ ই, টি, মনেটা	ইতালী
	{ এ, বেনো (Renault)	ফ্রান্স

১৯০৮

পদার্থবিজ্ঞান	জি, লিপ্‌মান	জার্মানী
রসায়ন	ডাক্তার রাদারফোর্ড্	নিউজিল্যান্ড
ভেষজবিজ্ঞান	{ এলি মেচ্‌নিকফ্	রাশিয়া
	{ পল্‌ এহাবলিক্	জার্মানী
সাহিত্য	রুডল্‌ফ্ অয়্‌কেন্	জার্মানী
শাস্ত্র	{ কে, পি, আবনগ্‌সন্	সুইডেন
	{ ফেডারিক বাইয়েব (Beijer)	ডেনমার্ক

১৯০৯

পদার্থবিজ্ঞান	{ জি, মার্কনি	ইতালী
	{ সি, ন্, ব্রাউম	জার্মানী
রসায়ন	ভিল্‌হেল্ম্ অষ্ট্‌ওয়াল্ড্	জার্মানী
ভেষজবিজ্ঞান	থিয়োডোর কসের (Kocher)	অস্ট্রিয়া
সাহিত্য	সেল্‌মা লাগের্লফ্	সুইডেন
শাস্ত্র	{ অগষ্টাস বিয়ার্নারেট্	হল্যান্ড
	{ দ্' এস্তব্‌নল্‌ দ্য কনস্টান্ট (D' Estournelle de constant)	ফ্রান্স

১৯১০

পদার্থবিজ্ঞান	জে ড্যান্ ডার ওয়ালস	হল্যান্ড
রসায়ন	ও, ওয়ালাক	জার্মানী
ভেষজবিজ্ঞান	এ, কসেল	জার্মানী
সাহিত্য	পাউল হেইসি	জার্মানী
শান্তি	বার্ণহইট্টারশাখালা পিস্ বুরো নামক সুইস্ শান্তিসভা	সুইডেন

১৯১১

পদার্থবিজ্ঞান	ভিয়েন্ (Wien)	জার্মানী
রসায়ন	মাদাম কুরি (দ্বিতীয়বার)	পোল্যান্ড
ভেষজবিজ্ঞান	গুল্‌স্ট্রা (Gulstrand)	ফ্রান্স
সাহিত্য	মরিস মেটাব্লিঙ্ক্	ফ্রান্স
শান্তি	{ আসের শ্রিড	

১৯১২

পদার্থবিজ্ঞান	জি ডালেন (G. Dalen)	
রসায়ন	{ ভি গ্রিগুয়ার্ড্ (V. Griguard) পি সালালিয়্যার (P. Salaber)	
ভেষজবিজ্ঞান	আলেক্সিস কাবেল	আমেরিকার যুক্তরাজ্য
সাহিত্য	গেব্‌হার্ট্ হাউপ্টম্যান্	জার্মানী
শান্তি	ইলিও, রুট	আমেরিকার যুক্তরাজ্য

১৯১৩

পদার্থবিজ্ঞান	ওনেস (H. K. Onnes)	
রসায়ন	ভ্যারনার (W. Werner)	জার্মানী
ভেষজবিজ্ঞান	সি, রিশে (Richet)	ফ্রান্স
সাহিত্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা
শান্তি	লা ফন্টেন্ (H. La Fontaine)	ফ্রান্স

১৯১৪

পদার্থবিজ্ঞান	এইচ, ফন্ লাউই	জার্মানী
রসায়ন	টমাস, ডব্লু. বিচার্ড্‌স্	
ভেষজবিজ্ঞান	আব, বাবেনি	
সাহিত্য	দেওয়া হয় নাই	
শান্তি	দেওয়া হয় নাই	

১৯১৫

পদার্থবিজ্ঞান	{ ডব্লু. এইচ, ব্রাগ ডব্লু. এল ব্রাগ	ইংলণ্ড
রসায়ন	ভিল্‌স্টাট্টে (R. Willstatter)	ইংলণ্ড
ভেষজবিজ্ঞান	দেওয়া হয় নাই	
সাহিত্য	রোম্যাঁ রোলঁ	ফ্রান্স
শান্তি	দেওয়া হয় নাই	

১৯১৬

সাহিত্য	ডি, ফল্ হাইডেট্টাম,	
	অন্য কোনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	

১৯১৭

পদার্থবিজ্ঞান	বার্‌ক্লা (Ch. G. Barkla)	
---------------	-----------------------------	--

সাহিত্য কার্ল জিয়েল্‌রুপ ও এইচ, পট্টোপ্লিড্যান
শান্তি Comite Internationale de la Paix নামক সভা
অন্য বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

১৯১৮

পদার্থবিজ্ঞান	এম, হাবার্	
রসায়ন	হাবের (F. Haber)	
	অন্য কোনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	

১৯১৯

পদার্থবিজ্ঞান	(J. Stark.)	
রসায়ন	দেওয়া হয় নাই	
ভেষজবিজ্ঞান	বোর্দে (J. Bordet)	ফ্রান্স
সাহিত্য	স্পিট্‌লাভ্ (C. Spittler)	
শান্তি	উইল্‌ উইল্‌সন্	আমেরিকার যুক্তরাজ্য

১৯২০

পদার্থবিজ্ঞান	গুইল্‌মে (Ch. E. Guilleme)	ফ্রান্স
রসায়ন	নেয়ার্‌নস্ট্ (W. Nernst)	জার্মানী
ভেষজবিজ্ঞান	ক্রোপ (A. Krogh)	
সাহিত্য	রুট্ হাম্‌সন্	নরওয়ে
শান্তি	লেওঁ বুর্‌জোয়া (Leon Bourgeois)	ফ্রান্স

১৯২১

পদার্থবিজ্ঞান	আলবার্ট আইনষ্টাইন্	জার্মানী
রসায়ন	ফেডারিক সডি	ইংলণ্ড
সাহিত্য	আনাটোল ফ্রান্স্	ফ্রান্স
শান্তি	{ কে, এইচ, ব্যাণ্ডিং লাঞ্চে (Cler. L. Lange)	সুইডেন

১৯২২

পদার্থবিজ্ঞান	বিলসবোর	ডেনমার্ক
রসায়ন	এফ, ডব্লু. অ্যাষ্টল	ইংলণ্ড
সাহিত্য	জাসিন্টো বেনাভেঁ	স্পেন

মান্য সংবাদ আসিয়াছিল যে রক্‌ফেলার ইন্‌স্টিটিউট্‌এর ডাক্তার নোণ্ডি (জাপান) ভেষজবিজ্ঞানে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। সংবাদটি সত্য কি না তাহা আমার সঠিক জানা নাই।
শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(৫৪)

গাজমহল নির্মাণ করিতে যে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহা এখন স্থিরীকৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকের ভিন্ন ভিন্ন মত,—ইহার মধ্যে কোনটি যে অস্বীকৃত 'হলপ্' করিয়া বলা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Vincent A. Smith তাঁহার A History of Fine Art in India and Ceylon নামক গ্রন্থে গাজমহল নির্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে স্বীয় মত এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"The statements of cost recorded by writers in Persian vary enormously. The Badshah-namah gives Rs. 50,00,000 (50 lakhs) as the cost of the mausoleum itself. The highest estimate of the cost of the whole amounts to the huge sum of Rs. 411, 48, 826 . 7 0 (411 lakhs, 48 thousand, 826 rupees, seven annas, six pies), as stated with curious minuteness

equivalent at the rate of 2s. 3d. to the rupee, in round numbers to four and a half million pounds sterling. Intermediate estimates put the expense at three millions sterling, said to have been about the sum which Shahjahan resolved to spend. If the full value of materials be included, the highest figure is not excessive and may be considered as approximately correct."

ইহা হইতে ব্যয়েব মোটামুটি একটি ধারণা করা যাইতে পারে। V. A. Smith এক জায়গায় ইহাও বলিয়াছেন যে—

"Much of the more costly material was presented by tributary princes, and its value probably was excluded from the lower estimates."

উক্ত কথাগুলি হইতে তাজমহল নির্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে মতের এত বিভিন্নতা হওয়াব একটি সম্ভ্রাসজনক কারণ পাওয়া যায়।

শ্রী তপোধীরকৃষ্ণ বায় দস্তিদার

(৭০)

"মহাস্থান গড়"

অতি প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গ কতকগুলি খণ্ডবাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং করতোয়া নদী-তীরস্থ পৌণ্ডবর্ধন পৌণ্ডরাজ্যের রাজধানী ছিল। সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক "ইয়ন চাং" খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে তাঁহার ভারত-ভ্রমণকালে উক্ত রাজধানী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজাও খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ডবর্ধন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজগণের তাম্রলিপিতেও পৌণ্ডবর্ধনের উল্লেখ দেয়া যায়। অতএব পৌণ্ডরাজ্য যে খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর এ, কানিংহাম বহু গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বগুড়ার প্রায় ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থান-গড়ের যে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই প্রাচীন পৌণ্ডরাজধানী পৌণ্ডবর্ধনের স্থতিস্থল।

আধুনিক গবেষণায় মহাস্থান-গড়ের ভিত্তব একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধমন্দির পাওয়া গিয়াছে। বগুড়ার ভূতপূর্ব কালেক্টার—সুশিখি ৩ পুণ্ডিতবিদ বটব্যাল মহাশয় বলিয়াছেন যে মহাস্থানের পুণ্ডিতত্বের মধ্যে বৌদ্ধত্বই শ্রেষ্ঠতম। বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার নন্দী, ১৯০৭ খৃঃ অঙ্কে মহাস্থানের অনেকগুলি স্থাপত্যন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গবেষণার পর্যালোচনায় মহাস্থানে বৌদ্ধত্বের প্রাধান্যই উপলক্ষিত হয়। বর্তমানে যাহা "মহাস্থান-গড়" নামে অভিহিত, তাহাই যে প্রাচীন পৌণ্ডবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

মহাভারত ও পুরাণে দেখা যায় যে, বাহুদেব নামে এক ক্ষমতাশীল পৌণ্ডরাজ্য ১২৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পৌণ্ডবর্ধনে রাজত্ব করিতেন। 'ইয়ন চাং'—যখন পৌণ্ডবর্ধনে আসিয়াছিলেন তখন সেখানে কোন বাজা ছিল না—সকলেই স্বাধীন ছিল এবং নানা স্থানে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ডবর্ধনে জয়ন্ত নামে এক রাজা ছিলেন এবং নবম শতাব্দীতে তাঁহার রাজ্য পালরাজাদের হস্তগত হয়। পাল-রাজাদের রাজধানীও পৌণ্ডবর্ধনে ছিল। কিন্তু পালরাজা যখন সেনরাজাদের হস্তগত হয় তখন তাঁহারা গোড়ে রাজধানী লইয়া যান।

কথিত আছে যে ইহার পব পরশুরাম নামক এক ক্ষত্রিয় রাজার সময়ও উক্ত পৌণ্ডবর্ধনই তাঁহার রাজধানী ছিল। অনন্তর শা সুলতান নামক এক মুসলমান ফকির তাঁহাকে পবাস্ত করিয়া ঐ স্থানে মুসলমান শাসনের বিস্তার করেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে মহাস্থান প্রাচীন বিজেতারের "রাজধানী" ও "গড়" অর্থাৎ দুর্গ ছিল এবং তাহা হইতেই "মহাস্থান গড়ের" উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

"শীলাদেবীর ঘাট"

"মহাস্থান-গড়ের" চারিটি তোরণ ছিল, কথিত আছে যে শীলাদেবীর ঘাট তন্মধ্যে একটি। এখন যাহা শীলাদেবীর ঘাট নামে অভিহিত হয় সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাই "শীত-দ্বীপ" নামে পরিচিত। বটব্যাল মহাশয় বলেন যে, মহাস্থানের নিকট করতোয়া নদী ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পুনরায় বগুড়ার প্রায় এক মাইল উত্তরে সংমিলিত হইয়াছে এবং মধ্যবর্তী স্থান "শীতদ্বীপ" বলিয়া কথিত হয়। তিনি আরো বলেন যে,—"শীত"—বৌদ্ধ শীল শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, সুতরাং শীত দ্বীপ বা "শীত দ্বীপ" অর্থে বৌদ্ধদের একটি ধর্মস্থান বুঝায়। এ সম্বন্ধে আবার মতভেদও দেয়া যায়। মিষ্টার ও'ডনেলের মতে গোবিন্দ দ্বীপের নিকট পাথর-ঘাটাই "শীলা দেবীর ঘাট" এবং কানিংহাম সাহেব উক্ত মত সমর্থন করেন। আবার মিষ্টার বিভারিজ বলেন যে, "শীতদ্বীপকেই" স্থানীয় লোকে "শীলাদেবী" বলিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ করে।

একজন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মতে "শীলাদেবী" রাজা পরশুরামের একমাত্র কন্যা। তিনি পবমা সুলতানী ও অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি কুমারীত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সর্বদা বাগযন্ত্র লইয়া থাকিতেন। শা সুলতানের সৈন্যরা যখন মহাস্থান-গড় আক্রমণ করিয়াছিল, তখন পরশুরাম বৃদ্ধ ছিলেন এবং যুদ্ধ-কার্যে অপারগ ছিলেন এবং কন্যার মর্যাদা রক্ষা কবিতে পারিলেন না ভাবিয়া ক্ষোভে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর তাঁহার সেনাপতি নিহত হইলেন এবং শত্রুরা গড়ে প্রবেশ করিলে শীলাদেবী তাহাদের হস্ত হইতে স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করার জন্ত গড়ের প্রাচীর হইতে করতোয়া নদীতে লক্ষ প্রদানপূর্বক আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিলেন এবং সেই হইতে উক্ত স্থান "শীলাদেবীর ঘাট" বলিয়া অভিহিত হইতেছে। উক্ত স্থানে প্রতিবৎসব যোগেব সময় স্নান করার জন্ত বহুলোক সমবেত হয়।

স্রষ্টব্য—

(1) Archaeological Survey of India, Vol. XV, 1879—So—by Sir A. Cunningham.

(2) Antiquities of Bagura—by H. Beveridge, C. S.

(3) Notes on Mahasthan near Bagura,—Eastern Bengal,—Journal of Asiatic Society Bengal—Part 1, No 3, 1875.

(4) Report on Antiquities of Bogra, 1895—U.C. Batabyal, I. C. S.

(5) District Gazetteer—Bogra,—J. N. Gupta, M.A., I. C. S.

(6) Paundrabardhana and Karatoa—Harogopal Das Kundu.

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

(৭২)

"পঞ্চসাগরে বারাহী দেবী"

পঞ্চসাগরের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। পীঠমালা বা অষ্ট কোথায়ও ইহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ভারতের মধ্যে নোয়াখালী জিলাতে ৬বারাহী দেবীর প্রতিমা বিদ্যমান আছে এবং এই স্থানেই ভৈরব মহারাজ ও দেবী বারাহী পূজা হইয়া



“বেলা অবসান হল”

চিত্রকর শ্রীপর্ণচন্দ্র সিংহ ।

থাকে। চণ্ডীতে ৮বারাহী সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে তিনি অষ্ট শক্তির অষ্টতম। অষ্ট কোথাও এই মূর্তির পূজা হয় বলিয়া জানা যায় না। দেবীর ধ্যান পাঠে দেবীমূর্তির স্বরূপ জানা যায়। দেবীর ধ্যান,

“ঔ বারাহীম্ অষ্টক-ভূজাং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকাং
পাশাক শধনুর্কাণং মধ্যে শ্রীন্দনাস্তোজাং
দক্ষ কর্ণে মুগং দুর্গং বামকর্ণে বরাহকং
বরাহবাহিনীম্ আদ্যাং মূর্তিকাং মার্থসিদ্ধয়ে” ॥ (?)

নোয়াখালী জিলা পূর্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিথিলায় রাজপুত্র বিশ্বস্তর শূর চন্দ্রনাথ-দর্শন-মানসে জলযানে চট্টগ্রাম জিলায় আগমন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন-সময়ে নাবিকগণ দিগ্ভ্রান্ত হইয়া চট্টগ্রামের পঞ্চাশৎ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে সমুদ্রে নৌকা নঙ্গর করিয়া একরাত্রি যাপন করেন। সেই রাত্রিতে সমুদ্রগর্ভস্থ বারাহীদেবী রাজা বিশ্বস্তর শূকে প্রত্যাদেশ করেন যে তিনি যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে সেই মূর্তিব উদ্ধার করিয়া সেস্থানে দেবী স্থাপনা করেন ও একটি নূতন রাজ্যের পত্তন করেন। অবশ্যই দেবীর কৃপায় যে সেস্থানে একটি নূতন দ্বীপের সৃষ্টি হইবে দেবী তাহাও আশ্বাস দিয়াছিলেন। প্রভাতে দেখা যায় যে নৌকা একটি দ্বীপে আবদ্ধ হইয়া আছে ও নৌকায় নিকটেই দেবীমূর্তি পাওয়া যায়। দেবীকে তথায় স্থাপনা করিয়া যথাবিহিত পূজা করা হয়। সেই প্রাতঃকাল কুঙ্গাটিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া দেবীকে পূর্বাস্য করিয়া স্থাপন করা হয়। কুঙ্গাটিকা অপসারিত হইলে মহারাজ বিশ্বস্তর তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন এবং সকলেই একযোগে “ভুল ভয়া, ভুল ভয়া” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম “ভুবুয়া” হয়। যেস্থানে মূর্তিব আবিষ্কার হয়, তাহা এ বি রেলওয়ের নোয়াখালী শাখার সোনামুড়ী স্টেশনের অতি নিকটে ও ভানুয়াই নামে প্রসিদ্ধ। তথায় বারাহী গাছ নামে একটি বৃক্ষ ও একখানা প্রস্তব-বেদী আছে। প্রতি-বৎসর এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। পূর্বে নোয়াখালী জিলাকে ভুবুয়া বলা হইত এবং এই স্থানেই দ্বাদশ ভূঞার অষ্টতম নৃপতি রাজা লক্ষণমাণিক্য রাজত্ব করিতেন। উক্ত শূর বংশ পুরুষানুক্রমে এখানে রাজত্ব করেন ও দেবীর যথাবিহিত পূজা কবেন। দেবীর জন্ম কয়েক জ্যোৎস্না জমি বৃদ্ধিস্বরূপ আছে। বিধবা নিঃসন্তান রাণী শশিমুখী ৮কাণী যাওয়ার সময়ে তাঁহার কুলপুরোহিত আমিয়াপাড়া-নিবাসী রাধাকান্ত চক্রবর্তীর নিকটে দেবীকে বাখিয়া যান ও দেবীর চণ্ডী একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি দেবী-প্রতিমা আমিয়াপাড়াতেই আছে। দেবীর সেবার জন্ম যে নির্দিষ্ট জমি আছে, তাহার অধিকাংশ নদীগর্ভস্থ ও পরহস্তগত। অবশিষ্ট জমির আয় দ্বারা দেবীর সেবাকার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরের অবস্থাও চব্ব মীমায় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাব-প্রযুক্ত মন্দিরের সংস্কার করা হইতেছে না। ভুবুয়া যে পঞ্চমাগরে অবস্থিত তাহার কিছু আনুমানিক বিবরণ দিতেছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নোয়াখালী জিলা সমুদ্রগর্ভে ছিল এবং বর্তমান নোয়াখালী জেলা ভুবুয়াই অধিকাংশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরে মেহার ও ত্রিপুরা, পূর্বে চট্টল ও ত্রিপুরা, দক্ষিণে সন্দীপ, পশ্চিমে চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা বরিশাল—এই পঞ্চ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমুদ্রকেই সম্ভবতঃ পঞ্চমাগর বলা হইত। এই যুক্তির মৌলিকতা কতদূর আছে, তাহা কোন প্রাচীন ভূগোলবিদ পণ্ডিত দিতে পারিলে বিশেষ সুখী হইত। ৮বারাহী দেবী সম্বন্ধে ত্রিপুরার রাজমালায়, প্যারীমোহন সেন প্রণীত নোয়াখালীর ইতিহাসে ও নোয়াখালী পত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আনন্দ রায় প্রণীত বাব-ভূঞাতেও তাঁহার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। তাঁহার বিবরণে দেখা যায় দেবী চতুভূজা ;

কিছু প্রকৃত পক্ষে দেবী অষ্টভূজা। এই দেবী সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে দেবীর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন চট্টো-পাধ্যায়ের নিকট লিখিলেই জানিতে পারিবেন। তাঁহার ঠিকানা পোঃ আমিয়াপাড়া, জিঃ নোয়াখালী।

শ্রী সুধাংশুচরণ চক্রবর্তী

(৭৩)

খেতপাথরের বাসন সাফ করা

১ম প্রকরণ,—কতকগুলি বামা-পাথরকে ভালরকমে গুঁড়া করিয়া চালিয়া লইবার পর তাহাতে পরিমাণ মত ভিনিগার মিশাইতে হইবে। তৎপরে ঐ মিশ্রিত জল দ্বারা খেতপাথরখানি উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত। কিছু পরে চামড়া দ্বারা পাথরখানির উপর ‘হোয়াইটাং’ ঘর্ষণ করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই পাথরখানি বেশ পরিষ্কার হইবে।

২য় প্রকরণ,—সমপরিমাণ বামাপাথরগুঁড়া ও চা-খড়ির গুঁড়া পরিষ্কার করিয়া চালিয়া লইয়া উভয়ের সমপরিমাণ কার্বনেট অম্ল সোডার সহিত জল দ্বারা মিশাইয়া আঠা-আঠা করা উচিত। তার পর শক্ত কশ দিয়া ঐগুলি খেতপাথরের উপর মাখাইয়া তিনদিন রাখিয়া দাও। তৎপরে জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলিলেই পাথরখানি নূতনের স্থায় হইবে।

৩য় প্রকরণ,—কুইক্-লাইম, সমপরিমাণ কষ্টিক পটাশ ও নরম সাবান মিশ্রিত করতঃ জল দিয়া আঠা-আঠা করা উচিত। তার পর উহা শক্ত কশের দ্বারা খেতপাথরের উপর মাখাইয়া সাতদিন ঐভাবে রাখিয়া দিবে। তার পর জল দিয়া পরিষ্কার করিলেই পাথরখানি নির্মূল হইবে। পাথরখানি বেশী ময়লা হইলে এক বারে নাও পরিষ্কার হইতে পারে, সেইজন্য পুনরায় উক্ত প্রক্রিয়া করিবে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ-রূপে পরিষ্কৃত হইবে।

৪র্থ প্রকরণ,—খেত-পাথরের উপর প্রথমে সোড়া ও গরম জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। তার পর এক টুকরা কাপড় অক্স্যালিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া লইয়া পাথরখানির উপর চাপা দিয়া রাখ। তিন দিন পবে কাপড়খানি তুলিয়া লইয়া সোড়া ও জল দিয়া পুনরায় ধুইয়া ফেলিবে। একবারে পরিষ্কৃত না হইলে ২৩ বার উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিলেই আব অপরিষ্কার থাকিবে না।

শ্রী ধীরাজমে'হন কয়াল কাব্যবিনোদ

(৭৪)

আলু রক্ষা

কুড়ি ভাগ জল ও একভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড একত্রে মিশ্রিত করিয়া আলুগুলি গটা দুইতিন এই সলিউশনে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর বোঁদে শুকাইয়া বালির উপর রাখিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ছয় মাস পর্যন্ত আলু ঠিক থাকে। এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাজাবীবাগ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মহাশয়কে পত্র লিখিবেন।

শ্রী যোহিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৮২)

“পাতকুরার জলে কয়াল স্বাদ”

কুপ-খননকালে যে কুপের নীচে বালি থাকে তাহার জল সাধারণতঃ কয়াল লাগে না এবং পরিষ্কার হয়। আর বালিশূন্য কুপের জল কয়াল এবং অপরিষ্কৃত হয়। যে কুপের জল কয়াল লাগে তাহাতে চূণ ও ফটকিনী দিলে কয়াল স্বাদ লাগে না, ইহা পরীক্ষিত।

কুপ যদি গাছের নীচে অথবা ছায়ার খনন করা হয় তাব ঐ কয়াল স্বাদ সম্পূর্ণরূপে দূর করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না।

শ্রী পুলদাচরণ রায় ও শ্রী হরেশচন্দ্র রায়

জলের ভাল-মন্দ মাটির উপর নির্ভর করে। যে মাটিতে কোনরূপ জাস্তব বা পনিজ পদার্থ নাই তাহা ভাল মাটি। পরন্তু যে মাটিতে উচা মিশ্রিত থাকে, তাহাই খারাপ মাটি বলিয়া পরিগণিত। মাটি ভাল হইলে জলও ভাল হইয়া থাকে। পশুপক্ষীর মাটি খাবাপ হইলে জলও খারাপ হয়। বোধ হয় ঢাকা জেলার মাটিতে জাস্তব বা পনিজ পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়াই জলে কষায় স্বাদ হইয়া থাকে। আমি উক্তবন্ধে ও কোন কোন স্থানে জলের নৈসর্গিক স্বাদ হইতে দেখিয়াছি। মাটির কারণেই এইরকম হয়।

প্রতিকারের উপায়—জল কষায়স্বাদ হইলেই কয়েক মের পাখুরিবা চূর্ণ বা তদভাবে অধিক মাত্রায় পান-বাওয়া চূর্ণ দেই জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলে, ৬৭ দিন পর (একদিন জল-বাবচাপ এক বাপিবেন) দোপথে পাইবেন, সেই কষায় স্বাদ থাকে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(৮৩)

রাজিয়া ও উদ্ভিদজগতের জীবনী।

লক্ষ-প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বঙ্গেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “দিল্লীখবরী” নামক গ্রন্থে সম্রাট বাজিয়াব (১৬৫৬-১৬৫৭) নূর জাহানের ইতিহাসও আছে। সম্পূর্ণ ও সমস্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। বাজিয়া মন্থকে অনেক নাটক-মহেন বাহির হইয়াছে সম্রাট, কিন্তু ঐগুলিকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না। তদ্বিন্ন আমার যতদূর মনে পড়ে, গুহ বঙ্গবন্দে “ভাবতবন্দে” কোন কোন সংস্কায় রাজিয়া মন্থকে বঙ্গেন্দ্রনাথ লেখা বাহির হইয়াছিল।

“দিল্লীখবরী” গণেশ্বর প্রাপ্তিস্থান—বুধদাস চন্দ্রগোপাল এণ্ড সন্স, ২০৩১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩ পানা।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(৮৪)

হিন্দুটিজম শিখা।

শিক্ষাভিলাষিগণকে আমি হিন্দুটিজম ও মেনমেসিজম ইত্যাদি গুপ্তবিজ্ঞানগুলি তাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া থাকি।

(প্রফেসার) আব এন বন্দ্র
আবদুলগণ্ডার গো ; বংপুব

প্রফেসার আব এন বন্দ্র মহাশয় ছাত্র কলিকাতায় ৮৬ নং বিটন স্ট্রীটে শ্রীবামচন্দ্র উদ্ভাচায়া মহাশয় সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি বাংলা ভাষায় একখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন, মল্লিকা খান্না মন্ত্র।

শ্রী বন্যাকিকর মববার

সর্বপ্রথমে Dr. Friedrich Anton Mesmer এই বিজ্ঞান (Mesmerism and Hypnotism) আমেরিকায় আবিষ্কার করেন। ক্রমে তথা হইতে প্রায় শৃঙ্খলিত সমস্ত সভ্যদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

Prof. R. N. Rudra বংপুব এবং Dr. T. R. Saniv, M. A., Ph. D., Litt. D, টিনেভেলী (“Latent Light Culture.” Tinnevely, S. India) হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

আজকাল প্রায় সকল দেশেই এই বিদ্যা বিস্তারিত লাভ করিয়াছে।

বহমান খান
তরুণ ঘোষাল

ভাষ্যের “ভাবতবন্দে” শ্রীযুক্তনাথ দে মহাশয়ের মেনমেসিজম মন্থকে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

পুস্তকের নাম

- (১) Stage Hypnotism by Prof. Leonidas.
- (২) Human Magnetism by Prof. James Coates.

শ্রী গমোদচন্দ্র সরকার

(৮৫)

বঙ্গলিপির উৎপত্তি।

বঙ্গীয় বর্ণমালার উৎপত্তির বিবরণটি নিতান্ত দুষ্কর। এক মাত্র প্রাচীন গ্রন্থই এসমুদয় বিষয় নির্ণয়ের প্রধান উপায়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র অত্যন্তম। উক্ত গ্রন্থে বঙ্গলিপির বর্ণনা আছে। যথা—

“অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্বমন্তমং।
বায়ব্রথা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিবর্দ্ধশিববেথিকা ॥
অবোধেথা ভবেদ ব্রহ্মা মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী ॥
বুঙলী অক্ষয়াকারী মধ্যে শৃংখলঃ সদাশিবঃ ॥”

সার্থ— “এখানে আমি ককারতত্ত্ব বলিব। উহার বায়বেথা একা, দক্ষিণবেথা বিষ্ণু, অবোধেথা শিব, মাত্রা সরস্বতী, অক্ষয়াকারী বুঙলী দেবতা ও মধ্যে ব্রহ্ম সদাশিব।” তন্ত্রশাস্ত্রে অষ্টাঙ্ক বঙ্গলিপির বর্ণনা বিবরণ আছে। হুতবাং তন্ত্রশাস্ত্রের কাল নিকর্পিত হইলেই বঙ্গলিপির উৎপত্তি বিবরণ নির্ণীত হইবে।

তন্ত্রশাস্ত্রেরই অধি প্রাচীন বর্ণনা লোকেই বিদ্যমান। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সকল তন্ত্রই অধি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কতকগুলি তন্ত্র অতীত আধুনিক। এসকল আধুনিক গ্রন্থের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের বয়স ২৫০, ৩০০ বৎসরের বেশী নহে। কলকথা তন্ত্রমাত্রই আধুনিক নহে। অথর্ববেদ, গোপথ-বাক্য প্রভৃতি গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ভিত্তবীর পানিপাত্রে সম্রাট সন্দগুপ্ত মন্থকে তন্ত্রের বিবরণ খোদিত আছে। সন্দগুপ্ত ২০০ খৃঃ পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। তদ্বিন্ন “ললিত-বিস্তার” গ্রন্থ উক্ত আছে, “বুদ্ধদেব বিখ্যাতের নিকটে অক্ষ, বঙ্গ, মগধ, দ্রাবিড় প্রভৃতি বর্ণমালা লিপিতে আবিষ্কৃত করেন।” ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বুদ্ধদেবের সময়েও (খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন) বঙ্গলিপি বিদ্যমান ছিল। অতএব বঙ্গলিপি যে বহু পুরাতন, তদ্বিনয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জয়নগরের রাজা সুন্দরবনের মধ্যে একখানি তাম্রলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহা লক্ষণমেনের রাজ্যধিকার সময়ে জনৈক সাক্ষকে ভূমির সন্দর্ভরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত সন্দ লিপির কতকগুলি অক্ষর বাঙ্গালার সদৃশ। পণ্ডিতপ্রবর বামগতি আয়বত্র মহাশয় বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এসকল অক্ষর বর্তমান-রূপে বঙ্গাক্ষর সৃষ্টি হইবার কালে খোদিত হইয়া থাকিবে। হুতবাং ভাষার বঙ্গবন্দে পুস্তক (লক্ষণমেন হাজার বৎসর হইল রাষ্ট্রচ্যুত হইয়াছেন) যে বঙ্গলিপির বিদ্যমানতা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গলিপির উৎপত্তিকাল মন্থকে ইহা অপেক্ষা অধিক এবং প্রশ্ন প্রশ্ন করা সম্ভব। প্রিন্সেপ্ সাহেব যুগ-যুগান্তরের সমুদয় অক্ষর অধ্যয়ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ের দেবনাগর অক্ষর বঙ্গাক্ষরের পূর্ব উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত-অনুসারে পুরাতন বঙ্গলিপি বর্তমান দেবনাগর অক্ষর হইতে প্রাচীন।

উড়িয়া, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার মধ্যে দ্রাবিড়ী বর্ণমালাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ আর্য্যদের ভারতগমনের সময় দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষাভাষিগণই সন্দেহ ছিল। (এসম্বন্ধে মতবৈত

আছে।) কোন এক সভ্যতা অনেকটা সেই জাতির ভাষার উপরই নির্ভর করে।

ভাষার ক্রম এইরূপ—সংস্কৃত নামক গাথা-ভাষা, পালী ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি। ছবচ্চাব সংস্কৃত ভাষার কোমলতা সাধনের জন্মই গাথাভাষার উৎপত্তি হয়। উহা বুদ্ধদেবের পবকালে প্রচলিত ছিল। এই ভাষা ১৫০ বৎসর-কালে পরিবর্তিত হইয়া অশোক রাজার সময় পালী ভাষা নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভ্য-পাণ্ডিত বৎকটি প্রাচীন ভাষার একখানি ব্যাকরণ লিখেন। তাঁহার সময়ে উক্ত ভাষার বিলক্ষণ প্রচার না থাকিলে তৎকর্তৃক কখনই উক্ত ব্যাকরণ রচিত হইত না। এইরূপেই ক্রমে ভাষার বিকাশ হয়।

আগাদেব যে সংস্কৃত ভাষা, তাহা মন্দা এককণ্ঠে ব্যবহৃত হয় নাই; ক্রমশঃ উহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ঐ পরিবর্তন হেতু সংস্কৃত ভাষা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। যথা— বৈদিক (এই ভাষায় বেদমন্ত্র-সকল রচিত হয়), মানবিক (বৈদিক ভাষা নিতান্ত দুর্কচ্চবৎসংস্কৃত বলিয়া ক্রমশঃ উহার সংলভা সাধিত হইলে, মানবিক ভাষায় মনুসংহিতা ও নামায়ণ রচিত হয়), কালিদাসিক ও পৌরাণিক। কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের সংস্কৃতের পরিবর্তনে পৌরাণিক সংস্কৃতের সৃষ্টি। প্রকাবাস্তবে ঐমকল ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন বর্ণমালা শিক্ষা করিতে হইত।

শ্রী বনেশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীমুক্ত বাগ্যদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত The Origin of Bengali Alphabet নামক পুস্তক উদ্ধৃত।

চক্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮৭)

দিল্লীধরো বা জগদীধরো বা

মুসলমান সম্রাট দিগেব মনো আশার বাদশাহ মর্কপ্রকাবৈই আদশ নবপতি ছিলেন। সম্রাট আকবরের এই গুণের জন্মই হিন্দু প্রজাগণ তাঁহাকে পবসেখব-স্থানীয় মনে করিয়া সমস্তবে “দিল্লীধরো বা জগদীধরো বা” বলিয়া স্তব করিতেন।

শ্রী বনেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৩২৮ সালের নিদায় সংখ্যা “প্রভাতীতে” প্রাক্কয় ঐতিহাসিক শ্রীমুক্ত যত্ননাথ সবকাব মহাশয়েব “দিল্লীধরো বা জগদীধরো বা” শ্লোক একটি সুবচিত প্রবন্ধ বাহিব হইয়াছিল। তাহা হইতে কোন কোন অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“প্রাচ্য ইতিহাসে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা নিজেকে প্রজাগণের ধর্ম্মনেতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাব কারণ মানু্যের স্বাভাবিক আয়গোবব হইতে পারে, অথবা গভীর বাচনৈতিক ফল্য। রাজা যদি অস্বব এবং বহির্ভগৎ এই উভয় ক্ষেত্রেই কর্ত্তা হইতে পারেন, তবে দেশে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর কোন শক্তি থাকিতে পারেন না, জগতে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত, দন্দতীন একক। নয লক্ষ অখারোহীর প্রভু, দিল্লীর বাদশাহও এই ভাবিয়া স্থগ পাইতেন যে তিনি কোটি কোটি মানবেব স্বেচ্ছাভক্তি এবং আস্থবিক প্রেম লাভ করিতেছেন। তিনি অল্প মানবেব সন্ত নহেন, দেবতাব অবতার অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন।

“মুসলমান রাজ্যে রাজার দৈবভাব হওয়া অতি সহজ। ইসলামেব বিধি অনুসাবে দেশশাসক প্রকৃত বিখাসীগণের সেনাপতি (আমিব উল্ মুমুনীন) এবং সমবেত প্রার্থনার (কমাএৎ নমাজ) নেতা অর্থাৎ ইমাম। তিনিই একমাত্র খলিফা এবং সন্দি তিনি নিজ পাদব

উপযুক্ত হন, তবে প্রেরিত পুরু্যের (মুহম্মদের) গুণ ও শক্তি তাঁহাতেও বর্ধিত্যাছে, এবং তিনি একাবারে ইসলামীয় সৈন্তের নায়ক ও ধর্ম্ম-গ্রন্থেব সর্বাধ বাখ্যা-কারক (মুজ তাহিদ)।

“আর হিন্দুবা ত প্রভাহই অবতারকে পূজা করিবার জন্ম, স্বীকার করিবার জন্ম প্রসূত আছে। তাহাদের বিশ্বাস যে একরূপ অবতার কোটি কোটি বাব অধীতে দেখা দিচ্ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও দেখা দিবেনঃ—হে ভবত বংশজ! যখনই ধর্ম্মের গ্রাণি এবং অধর্ম্মেব অভুত্থান হইবে তখনই আমি নিজেকে (অবতার রূপে জগতে) সৃষ্টি করিব (গীতা)। স্মৃতবাং দেখা যাইতেছে যে মুঘল যুগেব ভারতে কি হিন্দু কি মুসলমান অবতারের প্রতীক্ষায় জনয পাতিয়া ছিল। রাজার পক্ষে এ মহা সুযোগ।

“ঠিক এই সুযোগে বাদশাহ আদবর নিজেকে ইন্সান্-ই-কামিল বা সাহিব-ই-জমান (অর্থাৎ সুখাবতাব) বলিয়া স্থাপিত করিলেন। যদিও তিনি লিপিতে পড়িত জানিতেন না, তথাপি দব্বারে মুল্লাগণ লোভে ও ভয়ে এক পাতি কতাওয়া) সর্ভ কবিয়া দিল যে বাদশাহই কবানেব সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিভুল বাখ্যাকাবক এবং ধর্ম্ম সখকীয় সমস্ত প্রণের শেব বিচাবক (মুজ তাহিদ)। এদিকে হিন্দুবা তাঁহার গুণে মুর্ধ হইয়া এবং তাহার হাতে নিজেদেব ধর্ম্মেব প্রস্রব এবং সাবু সন্নাসী গণেব আদব দেখিয়া তাহাকে ‘জগৎগুরু’ উপাধি দিল।

“মুসলমানদেব মনো প্রকৃত ভক্তগৎ এবং ভগৎ গর্খলোভী চাটুকারগৎ তাঁহাকে “সাহিব-ই-আমান্” অর্থাৎ বর্ধমান যুগেব প্রভু বা গুরু বলিতে লাগিল।

“এই ভক্তগণেব অধিকাংশই পার মক ছিল। পাবস্ত্র জাতি আর্ধ্য, মুসলমান হইবাব গবও নবপূজাব আকাঙ্ক্ষা তাহাদেব মজাগত ছিল।

“আকবরের পাবনিক শিয়া কাম্মচাবী ও সভাসদগৎ তাঁহাকে অবতার বলিয়া ঘোষণাব করিতে লাগিল। তিনি তাহাই বিশ্বাস করিলেন। এবং প্রথমে ঘোষণে, পরে অনেকটা প্রকাণ্যে নিজেতে মুহম্মদের অনেকগুলি গুণ ও শক্তি আবেপ করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে আবও উচ্চতর সৃষ্টিয়া পদব বা অবতাবদ্ব দাবি কবিলেন।”

এই কয়েকটি অংশ পড়িলেই বুঝা যায়, “দিল্লীধরো বা জগদীধরো বা” কোন স্বে.এ. কি কাবনে প্রয়োগ হইয়াছিল।

শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরাণী

প্রভাতী ছাড়া যতবাবব একটি ইংবেজী প্রবন্ধেও ইহাব বিবরণ পাওয়া যাইবে—The Sovereign as the Head of Religion in the Mughal Empire, *Modern Review*, August, 1922.

শ্রী—

(৮৮)

হিন্দুদিগেব দেবতা

‘সদাবা বিবুদা’ সর্বে স্বাশাং স্নানাং গর্ভেঃ সহ ;

ত্রৈলোক্যে তে ত্রযন্ত্রিংশংকোটি-সংখ্যাতয়াভবন ॥’

পদ্মপুরাণেব এই শ্লোক দৃষ্টে দেখা যায় যে, উক্ত পদ্মপুরাণেই হিন্দুদের দেবতাব সংখ্যা ৩৩ কোটি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুবাণোক্ত এই দেবতাব সংখ্যা পুখ্যানুপুখ্যকণে গণনা কবিলে কি হয়, তাহা ঠিক বঙ্গা যায় না।

অতএব একমাত্র পদ্মপুরাণেই (পদ্মপুরাণ সূবুহৎগ্রন্থ; উক্ত গ্রন্থ মান খণ্ডে বিভক্ত—সৃষ্টিখণ্ড, উববপণ্ড, পাতালখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, ভূমিখণ্ড, ত্রুক্ষণ্ড ও বিয়াযোগসাব) হিন্দুদেব ৩৩ কোটি দেবতাব বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। পদ্মপুরাণের প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাসী কাগ্যালয়; ৩৮,৩ নং ভবানীচরণ দস্তেব স্ট্রিট, কলিকাতা।

শ্রী বাগ্যদাস চক্রবর্তী

(৯০)

আবিরের লাল-রং

আবি়র প্রস্তুত করার প্রণালী :—খেতসার জাতীয় পদার্থের সহিত (শঠিগাছের মূল, চূপড়ি ও খাম আলু, বুনো ওল ও কচু হইতে খেতসার পাওয়া যায়) লাল-রং মিশ্রিত করিলেই আবি়র প্রস্তুত হয় ।

শঠি-পালো প্রস্তুত করিবার (বাঙ্গালী-ঘরের নরনারীগণ অনেক স্থলে শঠিপালো প্রস্তুত করার প্রণালী জানেন বলিয়া এস্থলে আর তৎসম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিলাম না) পর আঠাবৎ অবশিষ্ট যে পদার্থ থাকে, তাহা ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লউন । এই গুঁড়ার সহিত মেজেটা বা খুনখারাপী-রং উত্তমরূপে বাটিয়া মিশাইয়া লইলেই আবি়রের লাল-রং প্রস্তুত হইল ।

তন্মিত্র আমাদের দেশী অনেক রঞ্জক পদার্থ হইতেও (যেমন পলাশ-ফুল, কুমুম-ফুল, চে-মূল, মঞ্জিষ্ঠা-ছাল ও মূল প্রভৃতি) আবি়রের লাল-রং প্রস্তুত হইতে পারে । টাটকা পলাশ ফুলের রসের সহিত (যদি শুকনা হয়, তবে কাথ করিয়া লইতে হইবে) ক্ষার মিশ্রিত করিলে, সুন্দর লাল-রং পাওয়া যায় । এই লাল-রঙেব সঙ্গে খেতসার-পদার্থ মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই আবি়র লাল-রঙে রঞ্জিত হইয়া যাইবে ।

পার্কিত্য-চট্টগ্রাম-অঞ্চলে একপ্রকার বৃক্ষ আছে । সেই গাছ মূল সহ জলে সিদ্ধ করিলে, অতি সুন্দর লাল-রং পাওয়া যায় । উহার সহিত খেতসার মিশাইলেও আবি়র লাল-বর্ণ ধারণ করে ।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী

(৯০)

কলিকাতা বড়বাজারে আরাবুটের সহিত জার্মানি রং মিশ্রিত করিয়া আবি়র তৈয়ারি হয় । কোন ছাদে উপরে বস্তা বস্তা আরাবুট ঢালিয়া গাদা করা হয় । কটাহে জল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে বিলাতী রং ঢালা হয় । এই গরম লাল জল আরাবুটের গাদায় ঢালিয়া ময়দা ভিজানর মত ভিজান হয় । সমস্ত আরাবুট লাল জলে ভিজিলে মেলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয় । ইহা রৌদ্রে শুক হইয়া ধুলার মত হয় । এইগুলি বস্তায় পুরিয়া বাজাবে আবি়র বলিয়া বিক্রি হয় এবং বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে রপ্তানি হয় ।

শ্রী বামাজুজ কব

(৯২)

বঙ্গভাষায় পশুপালন সম্বন্ধীয় পুস্তক
গিরিশ চক্রবর্তী—গোধন
বঙ্কুবিহারী ধর—গে'-চিকিৎসা
বঙ্কুমতী আকিস—পশু-চিকিৎসা
ভেটেরেনাবি সার্জেন
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত—পশুচিকিৎসা
জুবদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায় ।

শরৎ ব্রহ্ম

(৯৩)

মুর্শিদ কুলী খাঁ

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত
“বিন্নাজ উন্-সালাতিন” গ্রন্থের তৃতীয় উদ্যান ২৪০ এবং ২৬৯ পৃষ্ঠা

পাঠে জানা যায় যে “নবাব বিচারের সময় কোন পক্ষ সমর্থন না করিয়া ধনী ও দরিদ্র নির্কিংশে স্ত্রাববিচার করিতেন । একদা কোন একটি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারেন যে তদীয় পুত্রই হত্যাকারী, এজ্ঞ তিনি আপন পুত্রের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া মুখ্য্যতি লাভ করেন ।” মুর্শিদ কুলী খাঁর সুবিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, তন্মধ্যে তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের গল্পটিও অস্মতম । “এই ঘটনার কোন বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই” শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ বাবু ঐ পুস্তকের-ফুটনোটে ইহাই লিখিয়াছেন ।

শ্রী শ্যামাশঙ্কর মৈত্রেয়

মুর্শিদকুলী খাঁ যে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া-ছিলেন ইহার বৃন্তান্ত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ‘বঙ্গের ইতিহাস, ৩২৯ পৃষ্ঠায় আছে ।

শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী

(৯৪)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের রাজ্যী এলিজাবেথের নিকট চাটার গ্রহণ করেন—একথা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “ভারত-পরিচয়” ঠিকই লিপিয়াছেন । আবার যে-সমস্ত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডে গঠিত হয় তাঁহারাও ভুল বলেন নাই । উভয় মতই ঠিক । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডে গঠিত হইবার এক বৎসর পরে রাণী এলিজাবেথ ঐ-কোম্পানীকে চাটার প্রদান করেন । প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

1. Mediaeval India—Stanley Lane-poole, M.A., Litt. D.—p. 294.

“In 1597 the Dutch appeared in the Indies and a few years later they were joined by the English upon the incorporation of the first East India Company on the 31st of December, 1600.”

2. History of England—David Hume—p. 370.

“On the 31st Dec. 1600, the East India Company was established by a charter of Elizabeth for 15 years.

3. John Clark Marshman—History of India, p. 202.

“An association was at length formed in London in 1599. * * In the following year they obtained a charter of incorporation from Queen Elizabeth.”

4. Wheeler's History of India—p. 142 (Maham- medan period, part ii).

“The East India Company had been formed in 1599 in the life-time of Akbar. It obtained its first Charter from Queen Elizabeth in 1600.”

5. An advanced History of England by T. F. Tout, M. A.—p. 424.

“In 1600 Elizabeth gave a Charter to the East India Company.”

6. History of India—Meadows Taylor—p. 287

“ * * * and the Company was finally embodied by a Charter in 1600, under the title of ‘The Governor

and Company of Merchants of London, trading to the East Indies'."

7. Jack's Reference Book, p. 882.

"The East India Company received its first charter from Queen Elizabeth in 1600."

শ্রী শ্যামাশঙ্কর মৈত্রেয়

১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী য় রাণী এলিজাবেথের নিকট চার্টার গ্রহণ করেন তাহার প্রমাণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্ত-লেখক জন ক্রসেব "Annals of the Honourable East India Company" গ্রন্থগানি পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর বর্ষপ্রথম এই কোম্পানী গঠন করিবার জন্ত লণ্ডনে আন্দোলন উপস্থিত হয়। পরদিন ২৫ শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন সহবে এই বিষয় নর্দারনের জন্ত একটি সভা হয় এবং ঐ-সভা হইতেই রাণী এলিজাবেথের নিকট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের অনুমতির জন্ত একখানি আর্জি পেশ করা হয়। ১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর এলিজাবেথ ঐ চার্টার প্রদান করেন।

"The Charter of Queen Elizabeth to the London East India Company is dated 31st December, in the forty-third year of her reign, or 1600, and in its preamble, proceeded on the petition of a numerous body of noblemen, gentlemen and citizens for license to trade to the East Indies." ('Annals of the Honourable East India Company', Vol. I. chap. I, page 136)

শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী

লণ্ডন ও আমস্টারডামের বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।

১৫৮৮ খৃঃ অব্দে স্প্যানিস আমস্টারডাম যুদ্ধে জয়লাভ করার পূর্বে হইতে ভারতবর্ষে সহিত বাণিজ্য করার জন্ত ইংরেজ বণিকদের প্রবল ইচ্ছা হয়, এবং ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে ওলন্দাজগণ (the Dutch) ইংরেজদের উপর মরিচের দর প্রতি পাউণ্ডে ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং এবং ক্রমে ৮ শিলিং করাতে ইংরেজ বণিকগণ এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে ভারতের সহিত বাণিজ্য করার সঙ্কল্প স্থির করেন। মহারাণী এলিজাবেথ ১৬০০ খৃঃ অব্দের শেষ তারিখে অর্থাৎ ৩১ শে ডিসেম্বর উক্ত বণিক সম্প্রদায়কে ভারতের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য এক সনন্দ (Charter) প্রদান করেন।

Vide : (1) Vincent A. Smith's Oxford History of India, Part II, page 337.

(2) Ransome's History of England, Elizabethan period.

(3) The Indian Mirror—

Prof. Jogindra Ch. Chattoraj,

উক্ত সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে হয় না—সুতরাং প্রভাত-বাবুর "ভারত-পরিচয়ে" লিখিত ১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এলিজাবেথ চার্টার দেওয়ার প্রকৃত তারিখ বলিয়া মনে হয়।

শ্রী যশোদাকিন্দব ঘোষ

"Auber" এর মতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ রাণী এলিজাবেথ ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে দান করেন। "Grant" এর মতে ১৬ শতাব্দীর শেষ দিনে রাণী উহা দান করেন। "Hunter" এর মতে লণ্ডনের ১০১ জন বণিক ও নাগরিক (Citizen) ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখে Lord Mayor এর সভাপতিত্বে Founders' Hall এ সভা করিয়া London East India Company প্রতিষ্ঠা করিয়া রাণীর নিকটে সনন্দ প্রার্থনা করেন : রাণী তখনই উক্ত সনন্দ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার Privy Council তাহাকে তখন সনন্দ দান করিতে নিষেধ করেন ; কারণ স্পেনের সহিত তখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। অবশেষে সন্ধি না হওয়াতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তিনি Royal Charter বা সনন্দ দান করেন।

শ্রী কালীপদ বিশ্বাস

(১৬)

ভারতবর্ষে কৃষিবিদ্যালয়

পুনা এগ্রিকালচারাল কলেজ, বিহার—বি, এস, সি, পাস দরকার—

মাসিক খরচ ৩০ হইতে ৩৫ টাকা।

পুনা কৃষি কলেজ	বর্ষ	আই, এস-সি	৪৫—৫০ টাকা
কয়েমবাটুর্	"	মাস্টার	ম্যাট্রিক ৩৫—৪০ টাকা
নাগপুর	"	মধ্যপ্রদেশ	ঐ ৩৫—৪০ টাকা
কানপুর	"	মুক্তপ্রদেশ	ঐ ৩৫—৪০ টাকা
লায়েলপুর	"	পাঞ্জাব	আই, এস-সি ৪০—৪৫ টাকা
মুল্ল (বিখ্যাত)	"	বাংলা	ম্যাট্রিক ৩০—৪০ টাকা

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশেই ৪ অথবা ৫ টি করিয়া নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, যাহাতে অতি অল্পদিনের জন্ত চাষীদের সেই প্রদেশের ভাষায় কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয়।

বঙ্গদেশে মণিপুর (ঢাকা) অমরপুর (বর্ধমান) দুর্গাপুর (চট্টগ্রাম) চুঁচড়া (ভগলী) প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় আছে। এখানে কোনও পাঠের আবশ্যিক হয় না। খরচ ২০ হইতে ২৫ টাকা পড়ে। বর্ধমান বর্ষে সাব্বোর কৃষি কলেজ উঠিয়া গিয়াছে।

শিবগঞ্জ শীকদার, শ্রী ইন্দিরা দেবী, শ্রী শবৎ রক্ষা, শ্রী তরুণ দোসাল ও শ্রী ভূপ্তিবাবা রায়

(১০৬)

'দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ'

মমুসংহিতা-রচনা-কালে বঙ্গভূমি আর্ধ্যবাসের অযোগ্য ছিল ; পরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই উহা 'সতত-দ্বিজ-সেবিতম্'। জন্মেজয় যজ্ঞার্থ গোড়াদেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছিলেন। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ ; Census of the N. W. P., 1865 ; বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী দ্রষ্টব্য)। কোটিল্য সম্ভবতঃ এই ব্রাহ্মণবংশসত্ত্ব। বগুড়া দিনাজপুরের সীমান্ত-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত গরুডস্ত্রে পালরাজদিগের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীগণের উৎকীর্ণ কীর্তিকাহিনী এসিয়াটিক বিসার্চের ১ম ভলুমে ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। ইহার বঙ্গের আদি বৈদিক।

ইহার আচারভ্রষ্ট হইলে আদিগুব্ব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে কাম্বুকুজ হইতে আনয়ন করেন। কিছু দিন পরে বারেন্দ্রগণও এদেশে আসেন। ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে শ্যামল বর্মাণদেব কর্তৃক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আনীত হন। দ্রাবিড় কাহার ? সন্দেহ পূর্বাণে দেখা যায়—'কর্ণাটাইশ্চ ব তৈলঙ্গা গর্জররাষ্ট্রবাসিনঃ। অক্ষাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিষ্ণা-দক্ষিণ-বাসিনঃ।' কর্ণাট তৈলঙ্গ গুজরাট অক্ষু দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড়।

গদাধর ভট্টের কুলজীর ১৭৪ হইতে ১৮৪ শ্লোকে দেখা যায় মেদিনী-পুরের ময়নাগড়-বিজয়ী রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজ্যাভিষেক-হেতু দ্রাবিড় দেশ হইতে পাঁচজন-সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। মাজাজের বৈদিকধর্ম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পার্শ্ব-সারথি আরাজারের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল, মহাশয়, সংগ্রহ করিয়া কুলজী মুদ্রিত করিয়াছেন। হাট্টার স্বীয় ষ্টাটিষ্টিকেল একাউন্ট-এ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে উহার ১৯৯ শ্লোকে দেখা যায় উৎকল-প্রান্তে কাশীজোড়াস্তরালে জানুখণ্ডী নামে একব্যক্তি সরোবর প্রতিষ্ঠার্থে দ্রাবিড় হইতে সপ্তজ পঞ্চানন নামক এক-সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ২১১ শ্লোকে দেখা যায় দ্রাবিড়গত ব্রাহ্মণগণ উক্ত আদিবৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই মিলিত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে ‘দ্রাবিড় বৈদিক’ ব্রাহ্মণ নামে আপ্যাত। (জাতিবিজয়—শ্রী হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত)

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

পশ্চিম বঙ্গের “দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ” আখ্যায় আখ্যাত ব্রাহ্মণগণ পূর্ববঙ্গে “পরশর”, মধ্যবঙ্গে “গোড়ার্য বৈদিক” ও দক্ষিণ বঙ্গে “ব্যাসোক্ত” ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। বাংলা দেশে মনুসংহিতার যুগে ব্রাহ্মণ ছিল না। উক্ত সংহিতায় আছে পুণ্ড্র দেশের (গোড়) ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ অভাবে উপনয়নাদি সংস্কারচ্যুত হইয়া পতিত হইয়াছেন। মহাভারতের যুগে পুণ্ড্রদেশে (গোড়), কলিঙ্গ দেশে (মেদিনীপুর পর্য্যন্ত এক সীমা), তাম্রলিপ্ত (তমলুকে) আখ্য ব্রাহ্মণ ও আখ্য ক্ষত্রিয়ের বসতি ছিল। মহাভারতের যুগে যে ব্রাহ্মণগণ বাংলাদেশে ছিলেন তাঁহারাষ্ট বাংলার আদিব্রাহ্মণ। তার পর—“মহাভারতীয় যুগে অবসানে মাহিষ্য বীববাচিনী নর্মদা নদী তীরবর্তী প্রদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত রাজ্যস্থাপন করেন। কালক্রমে

সমস্ত দক্ষিণ বাংলা, উত্তর বাংলা ও নদীয়া জেলার মেহেরপুর হইতে ফরিদপুরের পূর্ব সীমা পর্য্যন্ত বিশাল ভূমিখণ্ডের উত্তরাংশের প্রায় বার আনা ভূমি মাহিষ্য-রাজ্যভুক্ত হয়। উক্ত মাহিষ্য রাজ্যগণ এদেশে আসিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে একদল ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) আনিয়া ছিলেন।”—“তমলুকের ইতিহাস”। বৌদ্ধযুগে ৬৩২ খৃঃ অব্দে গোড় সম্রাট রাজা শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) মুলস্থান (মুলতান) হইতে আর-এক দল বিষ্ণুজ্ঞ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইঁহারাও পরে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও পাল রাজবংশের মন্ত্রি ও পুরোহিত্য করিতে থাকেন। ঠিক এই সময় মাহিষ্য ব্রাহ্মণগণ এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রতি-ষ্পন্দিতা করিতে আসিয়া রাজরোমে পতিত হন ও ধীরে ধীরে সমাজেও সম্মান হারাইতে থাকেন। বলাই বাহুল্য তখন মাহিষ্য রাজ্যগণের রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে, সহায়ত্বুতি দেখাইবার তেমন আর কেহই নাই। তার পর যখন ৮৯১ বৎসর পূর্বে ৯৫৪ শকে রাজা আদিশুর বর্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কাম্বুকুজ হইতে আনয়ন করেন তখন হইতে কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই মাহিষ্য ব্রাহ্মণগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু যখন ১১০৩ শকে রাজা শ্যামলবর্ষদেব দ্রাবিড় হইতে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তখন হইতেই ধীরে ধীরে ইঁহারা উক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈদিক সমাজে মিশিতে পারেন নাই এমন এক দল এখনও বাংলা দেশে স্থানে স্থানে দেখা যায়, ইঁহারাষ্ট পশ্চিমবঙ্গে “দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ” নামে অভিহিত।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গোবহরি আচার্য্য

মানসী

তোমার গণ্ডের

বসোবা-গুল-বাগে

আমার মস্তে

কামনা ফল হাগে।

নাড়-চপের

সঙ্গল চলছিলে

উল বগের

বেদনা উচ্চলে!

কোমল চরণের

নূপুরে প্রাণ দিয়া

আমার বন্দনা

উঠিছে ছন্দিয়া!

তোমার কণ্ঠের

করণ সুর ছাপি'

আমার কণ্ঠিত

ভায়া সে যায় কাঁপি'!

ললিত অঙ্গের

মাধুরী-হিন্দোলে

আবেশ-বিহ্বল

দোহুল মন দোলে!

তোমার সঙ্গীত,

উছল রূপরাশি,

আমার প্রাণ সে যে,

আমার গান হাসি!

শ্রী পরিমলকুমার ঘোষ

কণ্ঠ পাথর



গান

আবার আঁধার ভাল,—আলোর কাছে
বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
আলোরে যে লোপ করে' পায়
সেই কুয়াসা সর্ব্বশেষে।
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে,
গভিমানী জানী তোমার
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে ॥

তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়,
তাই বেয়ে, মা, চলব সোজা।
যাবা পথ দেখাবার ভিড় করে গো
তারি শুধু বাড়ায় খোঁজা।
ওরা ডেকে আনে পূজার ছলে—
এসে দেপি দেউল-তলে
আপন মনের বিকারটাকে
মাজিয়ে রাখে চন্দ্রবেশে ॥

২

কোন ভীষণে ভয় দেখাবি
আঁধার তোমার সবট মিলে ॥
ভরসা কি তোর সামনে শুধু ?
না হয় আমায় রাখ বি পিছে ॥
আমায় দূরে যেই তাড়াবি,
সেই ত রে তোর কাজ বাড়াবি,
তোমায় নীচে নামতে হবে
আমায় যদি ফেলিস নাচে ॥
বাচাই করে' নিবি মোরে
এই খেলা কি খেলবি ওরে ?
যে তোর হাত জানে না মারকে জানে
ভয় জেগে রয় তাহার প্রাণে,
যে তোর হাত জানে না মারকে জানে
ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে,
যে তোর মারকে ছেড়ে হাতকে দেখে
আসল জানা সেই জানিছে ॥

(উপাসনা, ভাদ্র) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয়, আয়, আয়,
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।

উড়ে-যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়।
নদীর ধারে বাবে বারে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয়, আয়, আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাথায়।

(প্রাচী, ভাদ্র)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

কদম্বের কানন বেবি'
আঘাট মেঘের ছায়া খেলে।
পিয়ালগুলি নাচের ঠাটে হাওয়ায় ছেলে।
বরষণের পরশনে
শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন যে আনার
সদুব পানে পাখা মেলে।
আকাশপথে বলাকা দায়
কোন সে অকারণের বেগে,
পুব হাওয়াতে চেঁটে খেলে যায়
ডানার শানের তুফান বেগে।
নির্ম্মলমুখব বাদল-সাঁঝে,
কে দেখা দেয় সদয় মাঝে,
সপনরূপে চুপে চুপে
বাথায় আমাব চরণ ফেলে।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ভাদ্র)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

অগ্নিশিখা এস এস, আনো আনো আনো।
ছুখে গুণে ঘরে ঘরে গৃহদীপ আলো।
আনো শক্তি আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো চুপ্তি,
আনো শিষ্ণু ভাষোবাসা, আনো নিতা ভানো।
এস পূণ্যপথ বেয়ে এস হে কল্যাণী।
শুভ সৃষ্টি শুভ জাগরণ দেহ আনি'।
চুপ্তরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নিগিমেমে,
গানন্দ-উৎসবে তব শুভ হাসি চালো ॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ভাদ্র)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি বাঙ্গলা ও মিথিলার একজন আদিকবি।...সমস্ত আখ্যায়িক্ত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল।...বিদ্যাপতির নকলে বাঙ্গলায় যে ভাষা হয়, তাহার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজ বা মথুরার সঙ্গে সে ভাষার কোন সম্পর্ক নাই। সেটা সে-কালের মৈথিলী ভাষার অনুল্লরণ মাত্র।...

চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্মে গোড়া হইতেই দুইটি দল হয়। একটির নাম গোস্বামীমত, অপরটির নাম সহজিয়া। গোস্বামীমতের লোকেরা মূখে বেদ মানিত কিন্তু কখনও পাড়িত না, যাহারা বড় পণ্ডিত হইত তাহারা গীতা ও ব্রহ্মসূত্র পাড়িত। কিন্তু ভাগবতই তাহাদের প্রধান পুঁথি।...সহজিয়াবা সংস্কৃত পুঁথিব দিক্ দিয়া বড় যাইত না, তাহারা মনে করিত নিজের বেহেতেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, দেহেব সেবাই তাহাদের পরমার্থ। শ্রীলোকের প্রেম হইতেই তাহারা বিশ্বপ্রেমে যাইতে চেষ্টা করিত।...বিদ্যাপতিকে সহজিয়ারা সহজিয়া ভাব হইতেই দেখিত। তাহারা উঁহাকে সাতজন রসিক ভক্তের একজন বলিয়া মনে কবিত।...

বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়াও ছিলেন না, বৈষ্ণবও ছিলেন না। তিনি মিথিলা বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশেব ব্রাহ্মণের ছায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন—অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ সূর্য শিব বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা কবিতেন। তাহাদের পুস্তকসেবা অনেকেই শিবের মন্দির দিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও নিজের গ্রাম বিসর্পাতে শিবের মন্দির দিয়া-ছিলেন।...গঙ্গার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাহাব আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পান্ডী কবিতা গঙ্গার তীরে বাঁধিতেছিলেন, পথে আর সময় নাই, অস্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পান্ডী নামাঙ্কিতে বলিলেন এবং মাটিতে বিছানা করিয়া শুইলেন। এমন সময় দূরে একটা জলস্রোতের শব্দ হইল; দেখা গেল, গঙ্গা স্রোতধিনী হইয়া বেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই জলেই তাহাব অন্তর্জালী হইল। তিনি যেমন কৃষ্ণরাধাব প্রেমের অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়ে অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শৈবসকলধর্মের নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহাতে স্মৃতির মতে শিবপূজার যত বিধান আছে সব দেওয়া আছে। গঙ্গাবাকাবলী নামে আর-একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে হবিষ্যাব হইতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার কোন তীর্থে কোন তীর্থযাত্রা করিতে হয় তাহাব বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালে নানাপ্রকার দান চলিত ছিল। তাহার মধ্যে মোড়গ দান অতি প্রসিদ্ধ। এই মোড়গ দানের মধ্যে আবার তুলাপুস্তক দান সর্বপ্রধান। বিদ্যাপতিও দানবাকাবলী নামে এক স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া এই সকল দানের তত্ত্বিক্তব্যতা নিবয় করিয়া যান। বাবমাসে তের পার্বণ সকলেই জানেন। তিনি এই তের পার্বণের এক বই লেখেন, তাহাব নাম বসক্রিয়া। দায়ভাগেরও তাহাব এক বই আছে, নাম “বিভাগনাব”।

পুরাণেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যখন শিবসিংহের পিত্র দেবীসিংহের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন সেই সময় কোশল মিথিলা কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও নগরগুলির একটি বিবরণ লিখিয়া যান। উহার নাম ভূপরিভ্রম। উহা এখনকার গেজেটিয়ারের মত। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে না মিলাইলে ত উহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না, তাই তিনি লিখিয়াছেন যে বলরাম শাপগ্রস্ত হইলে শাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত সে-সকল

দেশে ও যে সকল তীর্থে গমন করেন তাহারই বিবরণ লইয়া তিনি লিখিতেছেন।

তাঁহার নিজের সময়েরও অনেক ঘটনা তিনি তাঁহার পুরুষপরীক্ষায় লিখিয়া গিয়াছেন। পুরুষপরীক্ষা একরকম গল্পগুচ্ছ বলিলেও হয়।... উহাতে মানুদগল্পনীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির সময় পর্যন্ত অনেক সত্য ঘটনা পাওয়া যায়। যাহারা পুরুষ, যাহাদের পুত্রের মত সদ্গুণ ছিল, তাহাদেরই গল্প পুরুষপরীক্ষায় পাওয়া যায়। মুসলমানেরা এদেশ জয় করিলে তাঁহার হিন্দুদের সঙ্গে—বিশেষ হিন্দু বীরপুরুষদের সঙ্গে—কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্ত উহাতে পাওয়া যায়। যাহারা এই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে চান, পুরুষপরীক্ষা তাঁহাদের পক্ষে বড় দরকার।

বিদ্যাপতির আর-একখানি গতি স্মরণ বই লিখনাবলী অর্থাৎ পত্র লিখিবাব ধারা। কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিরূপ পাঠ দেওয়া দরকার, তাহা এই পুস্তকে খুব ভাল করিয়া দেওয়া আছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সে-কালের অনেক রাজারাঞ্জড়া ও বড় বড় লোকের নাম আছে।

তখন ভারতবর্ষেব পুস্তাকলে দুগাপূজাটা খুব চলিয়া গাঢ়িতেছিল। আমাদেব দেশেব সাহজিয়া গাঞীয়েব মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি দুগোৎসব-বিবেক নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উড়িষ্যার রাজা পুষ্কোত্তম দেব দুগাপূজার আবে-একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির দুগাভক্তিবিশ্বিনী প্রমাণে ও প্রয়োগে এই দুই পুস্তক অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এইসকল স্মৃতির গ্রন্থ লিখিতে বিদ্যাপতিকে সমস্ত বেদ পুবাণ স্মৃতি পাড়িতে হইয়াছিল, কেননা তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন সকলেরই প্রমাণ দিয়াছেন।...

প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়া যুক্তবেণী হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তগ্রামে গিয়া আবার তিনটি নদী যে মুক্তবেণী হইলেন সে-কথা বিদ্যাপতি প্রথম প্রচার করিয়া যান। প্রথম মুসলমান আক্রমণের অবলম্বিতে হিন্দুদিগের ধর্ম কর্ম একপ্রকার লোপ হইয়া আসে। মৈথিল পাণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ রচনা কবিতা আবার হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করেন। বিদ্যাপতি এই সকল মৈথিল পাণ্ডিতদেব একজন প্রধান।...

যে সময় মুসলমানেরা কুব্বেত্র, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, এনন কি কাশী পর্যন্ত লোপ কবিতা তুলিয়াছিল, সেই সময় বিদ্যাপতি প্রাহুভূত হইয়া নানা গ্রন্থ লিখিয়া অনেক তীর্থেব পুনঃস্থাপন ও অনেক হিন্দু সংকল্পের পুনঃপ্রচলন করেন। তিনি ও তাহাব সহযোগী মৈথিল পাণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দু-সমাজ চিরদিন ঋণী থাকিবে। পরবর্তী পাণ্ডিতেরা হিন্দুদিগের এয়াকাত ও তীর্থ সম্বন্ধে বই লিখিতে গেলেই তাঁহাদিগকে বিদ্যাপতির দোহাই দিতে হইয়াছে।...

বিদ্যাপতির বংশ পাণ্ডিতের বংশ।...বিদ্যাপতির অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কাম্বাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইরূপ পাওয়া যায়—গড়বিসপী-নিবাসী কাম্বাদিত্য জিপাসী; মিথিলায় তিলকেখন নামক শিব-মঠে কীর্তিশিলায় কাম্বাদিত্যের নাম উৎকর্ণ আছে। কাল—অদে নেত্র শশাক পক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষণ-স্বাপাতে অর্থাৎ ২:৩ লসং [ইসবী ১৩২৯ সাল]। কাম্বাদিত্যের পুত্র সাক্ষি-বিগ্রহিক অর্থাৎ সাক্ষি বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত মন্ত্রী দেবাদিত্য বিদ্যাপতির পিতামহের সম্বন্ধে ভ্রাতা জ্যোতি-রীপন্ন কবিশেখরাচার্য্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চমায়কগ্রন্থকর্তা ও বৃহৎসমাগম প্রহসন কর্তা এবং মিথিলার ভাষায় বর্ণন-রত্নাকর নামক প্রথম গদ্যগ্রন্থ-রচয়িতা। প্রপিতামহের ভ্রাতা দশকর্মপঞ্জি-কর্তা মহামহত্ত্বক বীরেখন ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেখনের পুত্র

সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্বক সাক্ষিগিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্তবন্ধাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।...

চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করিয়া সংসারাত্মক ত্যাগ করেন একপ প্রবাদ আছে। বন্ধাকর সপ্ত—কৃত্য, দান, ব্যবহার, শুদ্ধি, পূজা, বিবাদ, গৃহস্থ; তন্মধ্যে বিবাদ-রন্ধাকর আমাদের দেশের প্রামাণিক গ্রন্থ এবং ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

বীরেশ্বরের আর-এক ভ্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কল্পপদ্ধতিকর্ত্তা। দুইজনের গ্রন্থ একত্র মিথিলায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিতার অগ্রজ রাজা ত্রীগণেশ্বরের নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।...

মিথিলায় তখন ব্রাহ্মণ রাজা। ইঁহার এককালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গুরু ছিলেন। পরে ইঁহারাই ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পূর্ব-পুরুষেরা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-বংশেরও ইঁহার দক্ষিণ হস্তই ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজেও অনেক রাজার অধীনে কাৰ্য্য করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্ত্তিসিংহ, তার পর দেবসিংহ, তার পর শিবসিংহ, তার পর পদ্মসিংহ, তার পর হরসিংহ, তার পর নরসিংহদেব। তার পর ধীরসিংহ। বিদ্যাপতি ইঁহাদের সকলেরই রাজ সভাসদ ও পণ্ডিত ছিলেন।

কীর্ত্তিসিংহের রাজত্বের ঠিক পূর্বেই মুসলমানেরা তিরহত দখল করিয়া লয় এবং তিবহতে অরাজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দু সমাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। কীর্ত্তিসিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং আবার হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করিতে আরম্ভ করেন।...সমাজ-গঠনের ভারটা দীর্ঘজীবী বিদ্যাপতির উপরই পড়িয়াছিল।...

বিদ্যাপতির শেষ সংস্কৃত গ্রন্থ “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী” তিবহতের রাজা বীরসিংহের সময় লেখা হয়। সেটি ১৫ শতকের মানামানি অর্থাৎ প্রায় ১৪৫০ সালের।...বিদ্যাপতি প্রায় ১০০ শত বৎসর বয়সে ঐ পুস্তক লেখেন।...

সহজিয়ারা যে বলিয়া থাকে বিদ্যাপতি রসিক ভক্ত ছিলেন, লগিমাদেবী তাঁহার প্রেমপানী, একথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কাবণ বিদ্যাপতি শুধু শিবসিংহ ও লগিমাদেবীরই ভণিতা দেন নাই, ভোগীশ্বর ও তাঁহার রাণীব ভণিতা দিয়াছেন; দেবসিংহ ও তাঁহার রাণীব ভণিতা দিয়াছেন; শিবসিংহ ও তাঁহার অগ্ন্যাশ্ব রাণীব ভণিতা দিয়াছেন; তিরহতের অনেক বড় বড় রাজকর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারের নামে ভণিতা দিয়াছেন; এমন কি হুসেন শাহের নামেও ভণিতা দিয়াছেন। সুতরাং ভণিতায় রাণীদের নাম দেখিয়া বিদ্যাপতিকে সহজিয়া ঠাওরান যুক্তিযুক্ত নয়।...বিদ্যাপতির পুত্রপৌত্রেরা বেশ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্রবধুও গান লিখিয়াছেন শুনা যায়।

বিদ্যাপতি পণ্ডিত।...তিবহতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ এবং হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প।...তিনি কবি।...তিনি ইতিহাস লিপিতেছেন। কীর্ত্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরীনাশ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্য লাভ করিলেন, তাহার ইতিহাসের গান-গুলি তাঁহার কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তি-পতাকা তাঁহাকে ভারতবর্ষের একজন প্রধান ইতিহাস-লেখক করিয়া তুলিয়াছে।...একটা জিনিষ কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য—বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্রুতি অর্থাৎ হিঁছুয়ানী ত আছেই, তার উপর শিব আছে, দুর্গা আছে, গঙ্গা আছে; কৃষ্ণ বা বিষ্ণু একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে গান লিখিয়াছেন তাহাতে শিবও আছে, সেই সঙ্গে দুর্গাও আছে,

গঙ্গাও আছে, বেশীর ভাগ কৃষ্ণরাধা আছে! ইঁহার অর্থ কি? যখন পণ্ডিত হইয়া সংস্কৃত লিপিতেছেন তখন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর নামও করেন নাই, কিন্তু যখন মৈথিলী ভাষায় লিপিতেছেন তখন রাধা ও মাধবে ভরপুর। ইঁহার অর্থ ঠিক বোঝা যায় না।...

কীর্ত্তনের গান বিদ্যাপতির সময় হয় নাই। উজ্জলনীলমণি ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি রসশাস্ত্রের বই পুঁব প্রচলিত হইয়া গেলেই বৈষ্ণব-সমাজে ইঁদানীশুন কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়।...বিদ্যাপতির অন্ততঃ দুইশত বৎসর পরে।...বিদ্যাপতির অনেক গানে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গঙ্গাও নাই।...মিথিলায় প্রবাদ আছে, কামিনী করএ সনানে গানটি কোন বাদসাহের ফরমাময়েসী।...

বেফরমাময়েসী গান বিদ্যাপতি নিজেও যে সকল লিখিয়াছেন তাহার অনেকই মাত্র আদি রসের, রাধাকৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের পদ নয়।...

সংস্কৃত অলঙ্কারে যত কিছু কবিত্রৌটোত্তি আছে, যত চলিত উপমা আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার গানগুলিতে সেগুলির প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। হালাসপ্তমতী, আর্ধ্যাসপ্তমতী, অমরশতক, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুলি হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ে।...শুধুই যে সংস্কৃত উপমা বিদ্যাপতির সম্বল, তাহা নহে, তাঁহাব নিজের উপমাও আছে।...বিদ্যাপতির নিজস্ব কিন্তু সাজানর তারিফ। তাহাতে একটা নূতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়।...গানের শ্রুতির ভাবগুলিসমাজান বিদ্যাপতির নিজেরই। সে অতি সুন্দর। বিদ্যাপতি বহিজ গতেই হউক, আর অশ্রুজ গতেই হউক, সুন্দর সুন্দর জিনিষগুলি বাছিয়া লইয়া সাজাইবার সময় সুন্দরতর সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছেন।...

বিদ্যাপতি অনেক জায়গায় ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা অতি মিষ্ট, সুব অতি মিষ্ট, সংস্কৃত ঋতু বর্ণনার যা কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া এক করা হইয়াছে। গানগুলি কিন্তু ছোট। একটা পূরা কিছুর বর্ণনা ভাল করিয়া করিতে গেলে যতটুকু জায়গা চাই, গানে ততটুকু জায়গা পাওয়া যায় না। সুতরাং দু'চারিটি অতি মিষ্ট জিনিষ একত্র করিয়া গানটি শেষ করিতে হইয়াছে। বেশী কথা বলিবার জায়গা নাই, সুতরাং যাহারা সংস্কৃত পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে হর আঁব ভাষা ছাড়া নূতন জিনিষ কিছুই নাই। কেবল সেই সংস্কৃত কবিতার শ্রুতি জাগাইয়া দিয়াই গান খামিয়া যায়।...

তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

(প্রাচী, ভাদ্র)

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পল্টুদাস

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে যখন অযোধ্যায় নবাব শুজা-উদ্দৌলা ও দিল্লীতে সাহ-আলম বিরাজ করিতেছিলেন, তখন অযোধ্যার ভক্ত সাধকগণের সদয়-সিংহাসনে এক মহাভক্তের রাজত্ব চলিতেছিল। ইনিই ভক্ত পল্টুদাস।...

পল্টু অযোধ্যার নংগাজলালপুর গ্রামের কান্দু বাণিয়া নামে এক গ্রাম্য দোকানীর ছেলে।...

অযোধ্যাবাসী ভক্ত গোবিন্দদাসের কাছে পল্টু উপদেশ লাভ করেন।...তিনি

“চারবরণ-কো মেটি কে ভক্তি চলাশ্র মূল।

গোবিন্দ গুরুকে বাগমে পল্টু ফলে ফল ॥

সহর জলালপুর মুড় মুড়িয়া অরধ তুড়া করধনিয়া ।
সহজ করৈ ব্যাপার ঘটমৈ পল্টু নিগুণ বণিয়া ॥”

“তিনি ধর্ম-সাধনাতে জাতি-ভেদকে মিটাইয়া ভক্তিকেই মূল বলিয়া চালাইলেন, শুক গোবিন্দের সাধনার উদ্যানে পল্টু-ফুলটি বিকশিত হইল। জালালপুর সহরে ইনি মাথা মুড়াইয়া অযোধ্যাতে কোমরের যুনসী ছিঁড়িয়া সাধনা গ্রহণ করিলেন। পল্টু জাতে বেণে গুণহীন, সে আপন দেহের মধ্যেই সাধনা করিতে লাগিল। আর সহজ-সাধনাতেই সে সিদ্ধি পাইল ও সংসারে সহজ-ভাবেই সে চলিতে লাগিল।”

সাধক মধ্যযুগে নিজ দেহকে মন্দির ও সাধনার ক্ষেত্র মনে করিয়া দেহের মধ্যেই সব সাধনা করিতেন। ধর্ম যে একটা আশ্রমার্ণী বস্ত্র নয়, এই দেহেই তাহার সহজ ক্ষেত্র ও ক্রমবিকাশের সব “বাট” আছে, ইহা বুঝিতে পারাতে ধর্ম অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক হইয়া আসিল।...তখন প্রায় সব সাধকই অতিহীন বা অস্পৃশ্য কলের—তাঁহার দেহ কেহ ছোঁয় না। দেহটার অপমান যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন দেহেই তাঁহারা তীর্থকে পাইয়া একেবারে দগ্ধ হইয়া গেলেন, মানুষ যাহা ছুঁইতে চায় না সেখানে ব্রহ্মসোণের সাধন-কমল ফুটাইলেন। সব অপমান দগ্ধ হইয়া গেল।

ইনি সাধক হইলেন, তবু কবীর প্রভৃতির মত গৃহস্থও রহিলেন। গৃহ ও সাধনার মধ্যে যে কোনো নিত্য-বিষয় আছে তাহা তিনি মানিতেন না। “ঘটের মধ্যে সহজ সাধনা” করার সঙ্গে বাস্তবেরও সহজ-ভাবে সংসারী রহিলেন। সংসার ছাড়িয়া সংসারকে অপমান করিয়া কোনো উৎকট বৈরাগ্যে আপনাকে ভুলাইলেন না—তাঁই ভজনাবলীতে আছে “সহজ করে বৈরাগ্য”।

এখনও নগপুরজলালপুর গ্রামে তাঁর বংশধরেরা বাস করেন।

পল্টুর নিজের লেখাতে তাঁর কিছু কিছু আত্ম-পরিচয় মেলে—...

“পল্টু দাস ইক বাণিয়া রই অরধ-কে বীচ”

“পল্টু দাস তো অযোধ্যাবাসী এক বেণেব ছেলে মাত্র”।

“পল্টু জাতি ন নীচ মোসম গুণকী খান।

নামকেরে প্রতাপসে। ভাঙ্গি আনকী আন।”

“আমি পল্টু, আমার সমান নীচ জাতি আর কে? সকল অ-গুণের আধার আমি, কেবল নামের প্রতাপেই আমি বা-কিছু মনুষ্য হইয়াছি।”...

বাল্যকালে বসন্ত-রোগে তাঁর মুখপানা একেবারে শীতল হইয়া যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

“শকলদার মে নষ্টী নীচ ফিব জাতি হমাবা”—

“আমি মোটেই সুন্দর নই, তার উপর জাতিও আমার নীচ।” কেবল... “সন্তনামকে লিহেসে পল্টু ভয়া-গংভীর”—“সত্য নামের প্রতাপে আমার রূপেব মধ্যে একটি গভীরতা তোমরা দেখিতে পাইতেছ।” তাঁহার মৌল্য না থাকিলেও একটি বড় পবিত্র মাধুর্য ও গভীরতা তাঁর রূপে ছিল।

তিনি বিবাহিত গৃহস্থ হইয়া খুব শাস্ত্র পবিত্র ও সাদাসিধা ভাবে সংসার করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

“ভীখ ন মাংগৈ সংতজন কই পল্টু দাস”

পল্টু দাস বলেন, সাধক কখনও ভিখারী বৈরাগী হইবেন না। তিনি আপন অন্ন আপনিই করিয়া পাইবেন। বিনা প্রয়োজনে কেন অন্নের বোঝা হইবেন?

আর পেশাদার ধার্মিক হইলেই নানা কু আসিয়া জ্বাটে। এজন্য তিনি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিলেও তখনকার ধর্ম-ব্যবসায়ী

পুরোহিত মূলা বা প্পাদবীদের দেখিতে পারিতেন না। তাই তিনি আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

“মন সব-কো হরি লেয় সন্তন-কো রাইখ রাজী

তীন না দেখ দেখ সঠৈ বৈরাগী পংডিভ কাণী।”

“সবার মনই পল্টু হরিতে পারিল, সবাইকে সে প্রশন্ন করিতে পারিল, কেবল এই তিনটি সে দেখিতে পারে না—বৈরাগী, পণ্ডিত আর কাজী।”

নিন্দা তাঁহাকে অনেক সহিতে হইয়াছে, কিন্তু নিন্দকদের উপর তাঁর একটুও রাগ ছিল না।

“ধর-কো মৈ নষ্টী জান্তা হু” নিন্দক সাহব মেরা হৈ জী”।

“গুণদের কথা বলিতে পারি না—তবে নিন্দক মহাশয় আমার বড় আপন্যার লোক—সবাই আমাকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি আমাকে ছাড়িবেন না।”

“দেখিকে নিন্দকটি করে পন্নাম মৈ,

ধন্য মহারাজ তুম ভক্তি ধোয়া।

কিহা নিস্তার তুম আয় সংসারমে

ভক্তকে মৈল বিনদাম ধোয়া ॥”

“নিন্দককে দেখিলেই আমি শ্রণাম করি। হে মহাশয়, তুমি ধন্য, তুমিই জগতের ভক্তি বৃষ্টি পবিত্র কব। সংসাবে আমিও তুমি সাধকের নিস্তার করিয়াছ, ভক্তের ময়লা বিনা পয়সায় তুমি ধুইলে।”

“নিন্দক জীঠৈ জুগন জুগ কাম হমাবা হোয়—

কাম হমাবা হোয় বিনা কোড়ীকা চাকব।

কমর বাধকে ফিঠৈ কর তিহ লোক উজাগব।

উসে হমাবী সোচ পলক ভর নাঈ বিসারী

লগী রহে দিন রাত প্রেমসে দেতা গরী ॥

সন্তনকো দৃঢ় করৈ জগতকো ভরম ছুড়ারৈ।

নিন্দক গুণ হমাব নামকো রহী মিলারৈ ॥”

“নিন্দক যুগের পর যুগ বাঁচিয়া থাকুক, তবেই আমার কাম সিদ্ধ হইবে। আমারই কাজ সে সিদ্ধ করে—সে বিনা পয়সাব চাকর, কোমর বাঁধিয়া সে নিত্য জাগ্রত থাকিয়া তিনলোককে জাগ্রত রাখে। আবাব এক পলকও তাব সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, দিন রাত আমার সঙ্গে-সঙ্গেই সে আছে। কত প্রেম-ভরেই সে গালি দেয়। সে ই সাধকদের দৃঢ় করিয়া তোলে, জগতের ভ্রম ও জগতের কাছে সম্মান পাইয়া সাধকেব যে মোহ ও নেশা জন্মে তাহা দূর করিয়া দেয়। নিন্দক তো আমার গুণ। তাঁব কৃপাতেই তো নাম মেলে।”

“পল্টু রে পরস্বরথী নিন্দক নক ন জাহি।

নিন্দক রই জো কুসল হমকো জোরখী নাহি ॥”

“হে পল্টু, নিন্দক বড়ই নিঃস্বার্থ, তারা কি কখনো নরকে যাইতে পারে? নিন্দক যদি কুশলে থাকে তবে আব আমার সাধনায় কোন আশঙ্কা নাই।”

তখন অনেকে পেটের দায়ে সন্ন্যাসী হইত —

“গিরহস্তী মে জব রংহ পেট কো রহে হৈরান।

পল্টু হরিকী সরনমে হাজির সব পকবান ॥”

“গৃহস্থ-জীবনে যখন ছিলাম তখন পেটের দায়ে হেরান ছিলাম, অন্ন জুটত না। পল্টু বলেন, হরির শরণে আসিয়া দেখি সব মিষ্টান্ন হাজির হইল।” পূর্বে “মাগ মিলো বিন লোন রহী” একটু শাক মিলিলেও লুনটুকু জুটত না।

আবার অনেক বৈরাগী ভিক্ষাও করিত আর ব্যবসাও চালাইত —

“নস্তে নইহে অমাজ পরীদ কে রাখতে।

মহংগী-মে ডারৈ চোঙ্কনা চাহতে ।

দেখো রহ বৈরাগ ॥”

“শস্তার সময় শস্ত কিনিয়া মহার্ব হইলে চারগুণ দাম আদায় করেন ! দেখনা কেমন চমৎকার বৈরাগ্য !”

তারা “টকা ছঃ সাতকা” পাগড়ী পরিয়া “হুশালা কুপৈয়া ষাঠকা” গায়ে দিতেন ! আবার “গোড় ধরা” অর্থাৎ পা পুমা করাইয়া দীক্ষা দিয়া বিলক্ষণ রোজ্জগার করিতেন ।

পল্টু তাদের সোজাসুজি “মাচ্চা” কথা শুনাইয়া দিতেন । কাজেই “সব বৈরাগী বটুরকে পল্টু কিয়া খজাত”

“সব বৈরাগী মিলিয়া পল্টুকে পংক্তি ও জাতির বাতির কবিয়া দিল ।”

“হম সব রহে মহন্ত তাহিকো কোউ ন মানৈ ।

বনিয়া কালহিকা শুভ তাহি-বে। সব কোই মানৈ ॥”

“আমরা সব মহন্ত আছি, আমাদের কেহ মানে না । পল্টু হইল বেনে, সে কালকার ভক্ত । সেই অর্কাটীনকে সবাই কিনা মানে !”

পল্টু কিছুই উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন—

“পল্টু হমসে লড়ন-কো আটৈ সব সংসার ।

বে বোলে হম চুপ রঠৌ আপুই জাতে হার ॥”

“পল্টু বলেন, সবাই আমার সঙ্গে আসেন ঝগড়া করিতে, আমি কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া থাকি বলিয়া সবাই হারিয়া যায় ।”

কিন্তু ইহাতেও তিনি নিষ্ফলিত পাইলেন না । তিনি রাত্রি নিদ্রিত আছেন এমন সময় তাঁর কুটীবে আগুন লাগিল । যারা উত্তর না পাইয়া বিফল-মনোবশ হইয়া যাইতেন তাঁরাই তাঁর উপর এই শোধ তুলিলেন । পল্টু কোনমতে রক্ষা পাইলেন । তাঁর সম্প্রদায়েব উত্তরকালের লোকেরা কেহ কেহ মনে করেন তিনি তাঁর সিদ্ধিব গুণে নুতন দেহ লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন । এই বিশ্বাসটি হওয়ার একটি হেতু পল্টুর লেখাতেই আছে । পল্টু লিখিয়াছেন “সুখের সব আগুন লাগিয়া যে ভস্ম হইল ইহাতেই তোমাকে দণ্ড বলি আমার প্রভু । তুমি আমাব প্ৰবাতন জীর্ণ স্বরূপ—মলিন স্বরূপ—দক্ষ করিয়া নুতন স্বরূপ দিলে । নমস্কাব, তোমাব দয়ায় নমস্কারা” ইহা আধ্যাত্মিক জীবনের কথা । তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তরকালের লোকেরা ইহা ভুল বুঝিয়া, তাঁর ঘর পুড়িয়া গেলে তাঁর দেহ ভস্ম হইয়া নুতন দেহ হইয়াছিল, ইহাই বুঝাইলেন । ভাব-রসিকদের কথা সুল-বাদীদের হাতে পড়িয়া এমন বিড়ম্বনাই লাভ করে । কিন্তু পল্টু এ সব কোনো দাবীই করেন নাই । তিনি দেখিলেন কিছুকাল তাঁর দূবে থাকাই উচিত । তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

“পল্টু ঐমন বৃক্ষকে টারদিয়া সব ভার ।

লেভ পরোসিন ঝোপড়া নিত উঠি বাচত রার ॥”

“পল্টু এমন বুঝিয়াই মাথার সব বোঝা নামাইয়া কহিল—হে প্রতিবেশী ভাইরা, তোমরাই আমার এই কুটীবখানি লও, কারণ দেখি-তেছ ঝগড়া রোজ্জই বাড়িয়া চলিতেছে ।”

“পল্টু কিছুকাল জগরণ প্রভৃতি তাঁর ও নানা দেশ ভ্রমণ কবিত্তে লাগিলেন । তখন তাঁর শত্রুরা বলিতে লাগিল—“দেখিলে ! পল্টুর নিজ দেশের প্রতি মমতা নাই । দেশে দেশে পূজা ও সম্মান কুড়াইতেছেন, অথচ নিজ দেশ অযোধ্যায় কত দুঃখ কত দুর্দশা রহিয়াছে । অযোধ্যায় প্রতি তাঁর দেখিতেছি কোনো মমতাই নাই । যেন অযোধ্যা ছাড়িতে পারাটাই সাধনা ।”

আসল কথা, তারা পল্টুকে দূরে যাইতে দিবে না । সামনে রাখিয়া দক্ষাইয়া দক্ষাইয়া মারিবে ।

যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে উনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার ধীর ভাবে কাজ করিতে লাগিলেন । অযোধ্যায় আসিয়া তিনি তাঁর কাজ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন । সেখানে এখনও তাঁর সমাধিস্থান ও ভক্তসম্প্রদায় আছে ।

ইহার ধর্মসাধন ও ধর্মমত ও প্রেম প্রভৃতির উপদেশ অতি গভীর ও মধুর । যাহারা তাহা আলোচনা করিবেন তাঁহারা ই তৃপ্ত হইবেন । এই জন্ত ই হাকে কেহ কেহ দ্বিতীয় কবীর বলেন ।

(প্র চী, ভাদ্র)

শ্রী ক্ষিত্তিমোহন সেন

রামায়ণী যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প

মৌলিক ধাতুগুলির ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল । ধাতু গলাইয়া প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহারের উল্লেখ বেদে আছে । বেদে ধাতু গলান, মুদ্রা প্রস্তুত করণ, লৌহ কলস নির্মাণ প্রভৃতির কথা আছে । (ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল—১২, ২৭, ৩০, ৩৩, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭ সূক্ত ও ৬ মণ্ডলের ২, ২৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮ সূক্ত ব্রহ্মব্য ।) শুক্র যজুর্বেদেও কতকগুলি ধাতুর কথা আছে । যথা—হিরণ্য চমে ; অয়শ্চমে ; গ্লামং চমে ; লৌহং চমে ; সীসং চমে ; ত্রপু চমে ; যজ্ঞেন কল্পস্তাম । (১৮।১৩)

রামায়ণে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র লৌহ সীসক পাতদ ত্রপু প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । ভারতীয় সমাজ যে বহু প্রাচীন কাল হইতে এই-সকল ধাতুর বিষয় জানিত, তাহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষে এই-সকল ধাতুর অধিকাংশেরই আকর বিদ্যমান ছিল ।

দাক্ষিণাত্যের চিত্রকট, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অরণ্য প্রদেশের বর্ণনায় জানিতে পারা যায়—

খেতাভিঃ কুম্ভতাম্রাভিঃ শিলাভিরূপশোভিতম্ । ৭

নানা-ধাতু-সমাকীর্ণং নদী-দর্দীব সংযুতম্ । কি—২৭ ।

অম্বজ —“বিরাজন্তে চলেদ্রস্ত দেশাধাতুবিভূষিতাঃ । ৬।২।৯৪

এই-সকল অঞ্চল ধাতু আকরসমূহে পূর্ণ ছিল ।

অযোধ্যাব উত্তর প্রদেশেও ধাতুর আকর ছিল বলিয়া জানা যায় । ঐতিহাসিক যুগের বৈদেশিক ইতিহাসলেখকদিগের গ্রন্থে এবং মেগাস্থানিস প্রভৃতি প্রাচীন ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ-কাহিনীতেও এই-সকল ভারতীয় সম্পদের বিবরণ অবগত হওয়া যায় ।

ঐতিহাসিক গ্রন্থি লিখিয়াছেন—সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি ছিল । ইহা খৃঃ ১ম শতাব্দীর কথা । মেগাস্থানিস তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র লৌহ প্রভৃতির আকরের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর কথা । আধুনিক মেগাল-ইতিহাস আইন-ই-আক্বারিতেও ভারতবর্ষের ধাতুখনিসমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । অবশ্য এই-সকল বর্ণনা আধুনিক ।

রামায়ণী যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক ছিল । সামান্য লোকের গৃহেও তখন কনক-ও রজত-নির্মিত তৈজসপত্র ছিল । বিশিষ্ট প্রাসাদাদি নির্মাণে বর্তমান সময়ে যেমন মন্দির-প্রস্তরাদির বাহুল্য ব্যবহার দেখা যায়, সে-কালের রাজগৃহাদিতেও সেইরূপ জাঁকজমকের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহৃত হইত ।

অযোধ্যায় রাম-ভবনের বহিরাঙ্গণে বেদিকাসমূহে স্বর্ণমূর্তিসমূহ অবস্থিত ছিল ।

স্বর্ণের বাহুল্য-ব্যবহারে রাক্ষসপুরী লক্ষা ছিল কনক-লক্ষা—স্বর্ণ-কিরীটিনী লক্ষা । লক্ষার চতুর্দিকের প্রাচীর, গৃহ, গৃহের ছাদ, কুটুম (মেজে), এমন কি সোপানগুলি পর্য্যন্ত স্বর্ণময় ছিল । রাবণ সীতাকে

লইয়া সর্বপ্রথমে লঙ্কার যে গৃহে যাইয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে ধাতব শিল্পের এবং মণি মাণিক্য ও স্ফটিক সমাবেশের বিশেষ বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়াছিল। ‘রাবণ শোকদীনা বিবশা সীতাকে বলপূর্বক লইয়া হস্তামালাসম্বিত অস্ত্রপুরের ছন্দুভি-শব্দে মুখরিত কনক-নির্মিত সোপান-পথে আরোহণ করিল। সেই কনক-সোপান হস্তীদন্ত স্বর্ণ রজত ও স্ফটিকে নির্মিত মনোহর স্তম্ভমালার উপর স্থাপিত। সেই স্তম্ভগুলিব গাজও আবার বজ্রমণি ও বৈদ্যু্যমণিতে পচিত। সেই গৃহের গজদন্ত ও রজতে নির্মিত গবাক্ষগুলি স্বর্ণজালে নিমগ্নিত ছিল।’

লঙ্কার বর্ণনার প্রায় সর্বত্রই স্বর্ণ-ও রৌপ্য-শিল্পের এইরূপ উচ্চ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তখন সাধারণের ব্যবহায়া অনেক জিনিষ এবং যুদ্ধাস্ত্রগুলি লৌহ-নির্মিত ছিল।

শকটের উল্লেখ বামায়েণে আছে। যথা—শকটী শতমাত্রস্ত (বালকাণ্ড ৩১ সর্গ)। শকট বধ প্রভৃতি বানগুলি লৌহ কীলকেব সাহায্যে প্রস্তুত হইত।

ধাতুনির্মিত যে-সকল দ্রব্যের নাম বামায়েণে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদান করা গেল।

ধাতুনির্মিত পশুমূষ্টি (অ ১৫), কনকনির্মিত মষ্টি (অ ১৪), কাঞ্চন-নির্মিত মণি-খচিত সিংহাসন (অ ৩), স্বর্ণ ও রৌপ্য বৈদিকা (অ ১০), স্বর্ণের ভদ্রাসন (অ ২৬), স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ স্ফটিক-বল চামর (ল ১১), (অ ২৬), স্বর্ণময় বধ (বা ৫৩), হস্তী ও অশ্বের লৌহ বশ্ম (ল ৭৪), স্বর্ণরজ্জু (ল ১০৮), কাঞ্চন কবচ (শ্রী ৬৪), স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ (শ্রী ৪৩), স্বর্ণ কিরাট (শ্র ১০), স্বর্ণ ও রজত মৃদ্রা (অ ৩০), স্বর্ণ কমণ্ডলু (শ্র ১), স্বর্ণ কলসী (শ্র ১১), স্বর্ণ পত্র (শ্র ১) স্বর্ণ প্রদীপ (শ্র ১১), স্বর্ণখট্টা (শ্র ২০), স্বর্ণময় হস্তপ্রক্ষালন-পাত্র (অ ২১), বজ্রনির্মিত ভোজন-পাত্র (বা ৫৩), কাংশ্রময় দোহন-পাত্র (বা ৭২), স্বর্ণাসন (শ্র ১), ভৃঙ্গার (শ্র ১৪), রৌপ্য পঞ্জব (ল ৬৫), ইত্যাদি।

স্বর্ণ-ও রৌপ্যনির্মিত দ্রব্যাদির উল্লেখ ব্যতীত বামায়েণে অশ্ব হীন ধাতু-দ্রব্যের উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাব প্রদান কাবণ এই যে বামায়েণ রাজপরিবারেই ইতিহাস। অযোধ্যা, লঙ্কা ও কিম্বিক্যার বিভব বর্ণনায়ই বামায়েণ পূর্ণ; দরিদ্র-জীবনের কথা ইহাতে নাই। যুদ্ধাস্ত্রগুলি বোধ হয় সকলি লৌহ-নির্মিত ছিল।

বামায়েণী যুগে এক ধাতুর সহিত অশ্ব ধাতুর মিশ্রণ দ্বারা যৌগিক ধাতু প্রস্তুত করিবার বীতি প্রচলিত ছিল কি না তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না। আমবা উপরে যে-সকল ধাতু-নির্মিত দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কাংশ্রদোহনার উল্লেখ আছে। কাংশ্র একটি যৌগিক ধাতু। বালকাণ্ডের ৭২ সর্গে আছে—পুত্রাদিব বিবাহ অশ্ব গৃহে যাইয়া রাজা দশরথ চাবিজন ব্রাহ্মণকে বৎস ও কাংশ্র দোহনভাও সহ গাভী দান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই যৌগিকধাতুটির কথা আমরা বামায়েণে পাই।

কোন বৈদিক সাহিত্যে কাংশ্রের উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক স্মৃতির নামে যে আয়ুর্বেদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সেই স্মৃতিপ্রাচীন “স্মৃতিতে” কাংশ্রের উল্লেখ আছে। (স্মৃতিতে, স্মৃতিস্তান, ৪৬ অঃ ৩৬৩ শ্লোক।)

প্রাচীন ভারতে তামা ও টিন (ত্রপু) পরিচিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে এই দুটি ধাতুর পরস্পর যোগে যে কাংশ্র উৎপন্ন হয় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—ত্রপুস্তাত্রয়োঃ সংযোগে ধাত্বস্বরশ্চ কাংশ্রশ্চোৎপত্তি।

পিত্তল আর-একটি যৌগিক ধাতু। তাহা দস্তা ও তামার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। আবণা কাণ্ডের ২২ সর্গে রূপক ভাবে পিত্তলেব উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়। নিশাচর খর ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে যে প্রতাস্তর দিয়াছিল, তাহার এক অংশে আছে :—তুয়াগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ-প্রতিক্রম পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আশ্রম্মাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে।’ স্বর্ণপ্রতিক্রম অর্থে তান্ত্রিক যুগে আধুনিক পিত্তলকে বুঝাইত।

বামায়েণে পারদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় না। পারার সংযোগে আধুনিক কালে সিন্দূব প্রস্তুত হয়; বামায়েণে সিন্দূবের উল্লেখ নাই। তখন মহিলারা সিন্দূব ব্যবহার করিত না; আধুনিক যাত্রাগানের শ্রীকৃষ্ণের মত গণ্ড পার্শে বস্ত্রবর্ণ মনঃশিলায় তিলক ব্যবহার করিত। সীতা হনুমানকে বলিতেছেন (৫। স্ত ৪০) :—রাম মে মনঃশিলা দিয়া আমাব গণ্ডপার্শে তিলক করিয়া দিয়াছিলেন এই কথাটি রামকে স্বর্ণ কবাইয়া দিও। মনঃশিলাও একটি রক্তবর্ণ গিরিজ-ধাতু বিশেষ।

পাবদ হইতে সিন্দূবের উৎপত্তি স্মৃতিতেব যুগে হইয়াছিল। বাঁচের উল্লেখও স্মৃতিতে আছে (স্মৃতিতে—স্মৃতিস্তান, ৪৬ অঃ ৫০৪ শ্লোক)। কিন্তু বামায়েণে নাই।

বামায়েণে দর্পণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ধাতু-নির্মিত কি স্ফটিক-নির্মিত—তাহাব আভাস কোন স্থানেই নাই। (বঙ্গীয় সমাজে বিবাহাদি কিষাণ এখনও বব-কন্ঠাবা নবহৃন্দরের প্রদত্ত ধাতু-নির্মিত দর্পণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ববাজারার কুমারী কন্ঠারা মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল পূজিতে যাইয়া চিত্রিত দর্পণ পূজা করে ও মন্ত্র জপে—

আমি পূজিতেছি গুণ্ডির আয়না।

আমার জন্মে যেন হয় অল্বেব আয়না ॥

প্রাচীন দর্পণের কথা চিন্তা করিতে পারিলে এই দুটি কথাও একটু ভাবিবেন।)

কাচ ও স্ফটিক এক নহে। স্ফটিক আকরিক মহামূল্য প্রস্তুত : বালি ও ক্ষাবে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থ কাচ। কাচকে দর্পণে পরিণত করিতে পারদের প্রয়োজন। পাবদেব উল্লেখ বামায়েণে থাকিলেও পারদের যৌগিক বা রাসায়নিক বিধা স্মৃতিতেব পূর্বে পরিচিত হয় নাই। (ডাঃ পি. সি. বাঘ তাঁহাব ‘হিন্দু বসায়নের ইতিহাসে’ লিখিয়াছেন—পাবদ স্মৃতিতেব সময় ভারতীয় সমাজে পরিচিত হইয়াছিল। স্মৃতিতে ১ম শতাব্দীর আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। স্মৃতিতে কাশীরাজ দিবোদাসেব সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচিত “স্মৃতিতে” গ্রন্থে প্রকাশ। কাশীরাজ দিবোদাস ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তবে স্মৃতিতেব যে প্রতিসংস্কার হইয়াছিল এবং বর্তমান স্মৃতিতে যে সেই প্রতিসংস্কারেই ফল তাহা বলা যাইতে পারে।)

কোন ধাতুকে রূপান্তরিত করিয়া কাংশ্র ও পিত্তলে পরিণত করা ব্যতীত উচ্চ ধাতুতে অর্থাৎ স্বর্ণে বা বৌপো পরিণত করিবার কোন চিন্তা বা কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন মিসরীয়রাই নীচ ধাতুকে উচ্চধাতুতে পরিণত করিবার জ্ঞান সর্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের এই বিদ্যার নাম ছিল ‘কিমিয়া বিদ্যা’। (মিসরীয়রা কিমিয়া বিদ্যার সাধনে বহু শক্তি ব্যয় করিয়াছিল। শোনা যায়, তাহারা কিমিয়া-প্রভাবে নীচ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারিত। এই বিদ্যা ক্রমে “এলকোম” নামে পরিচিত হয়। এখন ‘এলকেমিই’ কেমিষ্ট্রী নামে পরিচিত।)

বামায়েণে নীচ ধাতুকে উচ্চ ধাতুতে পরিণত করিবার কোন উল্লেখ নাই।

কিন্তু বালকাণ্ডের ৩৭ সর্গে ধাতু উৎপত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এক পদার্থের সংস্পর্শে অল্প পদার্থ—অর্থাৎ কাঞ্চন, রজত, লৌহ, ত্রপু ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল—বলা হইয়াছে। এই রচনা তান্ত্রিক যুগের প্রসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিংকর্যা কাণ্ডের একস্থানে আছে “স্বমেরু পর্বতে যাহা থাকিত, তাহা সমস্তই

স্বর্গে পরিণত হইত।” (কি ৪২ সর্গ।) এই কল্পনাও তান্ত্রিক যুগের “পরশ পাথর” সাধনার পরে কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রামায়ণে গৈবিক, জাম্ববদ, সূধা (চূন) প্রভৃতি আৰ্য কতগুলি আকবিক পদার্থের নাম আছে।

(সৌরভ, ভাদ্র)

পল্লী-মা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে' প্রবাস-পথে—
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাস্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্রামল মুখের পানে,
বিদায়-বেলায় বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে
নূতন করে' দেখা হ'ল অনাদৃত মায়েব মাথে,
ভক্তি-পূজা দিইনি যারে ভুলেও বাহার বক্ষে থেকে,—
নম্রশিরে প্রণাম কবি দূর হ'তে তার মূর্তি দেখে'!

স্নেহময়ীর রূপ ধরে' মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠেব'পবে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিকু হ'তে ওই দিগন্তরে!
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আধিনাতে,
দেখে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিনাতে।

ওই যে মাঠে গরু চবে ল্যাজ ছলিয়ে মনের স্মৃতি,
ওই যে পাখীর গানের সুরে কাঁপন জাগে বনের বৃকে,
'মাথাল'-মাথায়, কাস্তে-হাতে, ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে-ওরাই মায়ের ভালোবাসা!

ওবা কত ভোগ করে না অন্ন জলেব বিষম জালা,
মায়ের বৃকের পীযুষ-ধারা ওদের তরে নিত্য-ঢালা,
মাঠ-ভরা ধান, গাছ ওরা ফল, যার খুসী সে যাচ্ছে খেয়ে,
মুক্ত মায়ের অন্নশালা,—হয় না নিতে কিছুই চেয়ে!

সহজভাবে ওরা সবাই ঠাই পেয়েছে মায়ের কোলে,
শান্তি-সুখে বাস করে সব, কাটায় না দিন গুণগোলে,
গরু যেথায় চরে' বেড়ায়, শালিক তাহার পাশেই চরে,
কখনো বা পৃষ্ঠে চড়ে, কখনো বা নৃত্য করে!

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, বাজায় বেণু অশখ-মূলে,
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠল ছলে',
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাধন কুটে'
মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠল ফুটে'!

দুপুর-বেলায় রৌদ্র-তাপে ক্রান্ত হ'য়ে কৃষক-ভায়া
বসল এসে গাছেব তলে ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ ছায়া,
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি-কচি ওই যে পাতা—
ও যেন মা'র আপন হাতে তৈরী-কবা মাঠের ছাতা!

দাম-ভেজা তাব ক্রান্ত দেহে শীতল সমীর যেমনি চাওয়া—
পাঠিয়ে দিল অমনি মা তার স্নিগ্ধ-শীতল আঁচল-হাওয়া!
কালো দীঘিব কাজল-জলে মিটাল তা'র তৃষ্ণা জালা,—
কোনু সে আদি কাল হ'তে মা রেখেছে এই জলের জালা!

সবুজ ধানে মাঠ চেয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে—
রঙীন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নেব আকাশ চেয়ে!
ওদেরই ও ঘরের জিনিস, আমরা যেন পনের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে!

ওই যে লাউএব 'জাংলা' পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূবে—
কৃষক-বালা আসছে ফিরে' পুকুর হ'তে বসুঁ পূরে,'
ওই কঁড়েধর—উহার মাঝেই যে চির-সুখ বিরাজ করে
নাই রে সে সুখ অটালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে।

কত গভীর ভূপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ, নাই বা জানুক,—সে কথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তা'র খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মত তাই ওরা আর ছুটে নাকো মোহের পিছু!

আজকে আমার মন ভুলেছে মাটির মায়ের এই এ রূপে,
আপন মনে আপশোযেতে কাঁদছি যে তাই চুপে চুপে!
বাস্প-শকট,—সে যেন এক অসৎ ছেলের মূর্তি ধরে'
ফুসলে আমার যাচ্ছে নিখে শিশু দিয়ে আর কৃতি করে'!

তাই যেন মা দেখেছে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে'—
যেমন করে' দেখে মা তা'র স্বপ্ন-পথের-পথিক ছেলে!
প্রণাম করি তোমায় মাগো, ভক্তি-ভরে নম্রশিরে,
ক্ষমা কণো—আবার আমি তোমার বৃকে আসব ফিরে'!

গোলাম মোস্তফা



বিদেশ

ইউরোপে শক্তিতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—

যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে গণমতের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। কর্মনৈপুণ্য শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্ত গণপ্রভাবকে থর্ক করিয়া সুদক্ষ ও কর্মকুশল একদল লোকের উপর শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি এখন ইউরোপে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জার্মানী ও কশিয়াতে জননায়কগণ বিনা বাধ্য বৈরুপ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায় যে শক্তির নিকট মানুষ কত সহজেই মস্তক অবনত কবে। জার্মানী ও কশিয়ার রাষ্ট্রীয় নেতারা আপনাদের ক্ষমতার যথেষ্ট ব্যবহার কবিলেও গণপ্রাধিক্যকে তাঁহারা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং জনসাধারণের প্রতিভূরূপই তাঁহারা ক্ষমতার ব্যবহার কবিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইতালী ও স্পেনে যে নববিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে গণপ্রাধান্যকে স্বীকার করিয়া শক্তিদ্বয়ের শাসনপ্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস। এ হিসাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে ইংলণ্ডের অলিভার ক্রমওয়েলের আন্দোলনের তুলনা চলিতে পারে। গণমূলক দুর্বল শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে শক্তিদ্বয় পুরুষের যথেষ্ট শাসনে দেশের বায়-সঙ্কোচ ঘটাইয়া এবং খুব কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার প্রবর্তন করিয়া সর্বত্র শৃঙ্খলা ও সংহতি আনয়ন করিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করাই এই নব আন্দোলনের উদ্দেশ্য। একজন শক্তিদ্বয় পুরুষ যতদিন পধ্যস্ত নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান ততদিন পর্য্যন্ত একরূপ শাসনে সফলই ফলিয়া থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের শক্তির উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়াই সে ব্যক্তি-বিশেষটির অন্তর্দ্বানের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নানারূপ গোলযোগেব সূত্রপাত ঘটে। দেশ যখন পুঞ্জীভূত আবজ্ঞনায় ভরিয়া উঠে, দুর্বলতা যখন নানা অত্যাচারের কাবণ হইয়া উঠে, তখন কিন্তু দুই-একজন শক্তিদ্বয়ের শাসন অনেক সময়ে মঙ্গলের কাবণ হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় দুর্দশা হইতে মুক্ত করিয়া ইতালীকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্ত মুসোলিনি ফ্যাসিস্তি বিপ্লবেব সূচনা কবেন। মুসোলিনিব পরিচালনায় শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত নবীন ইতালী রোমক সাম্রাজ্যের পূর্বগৌরবে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। অ্যালবেনীয়াতে গ্রীসের প্ররোচনাতেই ইতালীর দূতের গুপ্তহত্যাকার হস্তে মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে মনে করিয়া এই হত্যাকাণ্ডেব দায়িত্ব গ্রীসের উপর আরোপ করিয়া মুসোলিনি গ্রীক সরকারকে বৈরুপ হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন তাহা স্বাট্ গ্রীসের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

র্যাপেলো স্কিনসর্ভে আড্রিয়াটিক উপসাগরের কর্তৃত্ব লইয়া ইতালী সরকার ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে যে রফা-নিষ্পত্তি হয় তাহাতে ফিউম-সংক্রান্ত কতকগুলি সর্ভের শেষ মীমাংসা হয় নাই। শেষ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ফিউমে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সিন্ধোর

দোপোলি শাসনকর্ত্তা নিকীচিত হন। ইউরোপের অর্থনৈতিক দুর্বস্থা বাড়িয়া উঠাতে ফিউম প্রদেশের দুর্দশা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে ফিউম সরকার বেকার সমস্যার সমাধান না করিতে পারায় মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। দোপোলি ইতালী-সরকারকে জানাইয়াছেন যে শীঘ্রই ফিউম সম্বন্ধে একটা মীমাংসা না হইলে শাসনতন্ত্রের অভাবে অরাজকতা দেখা দিবে। বৈরাজ্য ও মাংস-শ্যায়ের হস্ত হইতে ফিউমকে রক্ষা করিবার অজুহাতে মুসোলিনি-মন্ত্রীসভা ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল জিয়ান্দাইনকে ফিউমের এর সামরিক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইতালীর এই হঠাৎ অধিকারে যুগোস্লাভিয়া-সরকার অত্যন্ত বিদ্রস্ত হইয়াছেন। যুগোস্লাভিয়া কোনও দিন আপনাব দাবী পতিত্যাগ করেন নাই। এবং তাহাব এই দাবীর সূত্রে উভয় রাজ্যের মধ্যে কথা-বার্তা চলিতেছিল। কাগে-কাগেই যুগোস্লাভিয়ার সহিত কোন-প্রকার নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই ইতালীর ফিউম অধিকার যুগোস্লাভিয়া কখনই পছন্দ করিতে পারে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ আক্রমণেব হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত ইতালী ফিউম-প্রান্তে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্বার্থে স্বার্থে বৈরুপ সংঘাত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় এইরূপ একটা ক্ষুদ্র উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আবার শীঘ্রই শাস্তিহীন ইউরোপে সমরানল ছলিয়া উঠিবে।

বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইউরোপে পোল, সোভাক্ প্রভৃতি জাতিকে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া স্পেনেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আপনার পূর্বগৌরবেব কথা স্মরণ করিয়া বর্তমান দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে স্পেনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই স্পেন দুর্বস্থার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। আপনার বিশাল সাম্রাজ্য একে একে হারাইয়া স্পেনেব অবশিষ্ট ছিল মরক্কো প্রদেশ। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মুরজাতিও বিদ্রোহী হইয়া মরক্কোর মেলিলা অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করে। এই তের বৎসর স্পেন বিদ্রোহ দমনের বৃথা প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছে। অভিযানের পর অভিযান অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে পনেরো বার মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু অকর্মণ্য মন্ত্রীসভার পরিবর্তে দুর্বল মন্ত্রীসভারই হস্তে শাসনভার পড়াতে ফল একই হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর নূতন বন্দোবস্তের চেষ্টা হইয়াছে, নূতন লোকের উপর শৃঙ্খলার ভার পড়িয়াছে, কিন্তু একইরকমের বিশৃঙ্খলা, একইরকমের বেবন্দোবস্ত সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বর্তমানকালোপযোগী সাজসরঞ্জামহীন বৈজ্ঞানিক যুদ্ধপদ্ধতিতে-অশিক্ষিত বর্কর মুর জাতির নিকট বার বার পরাস্ত হইয়াও ইজ্জতের ভয়ে স্পেন মরক্কো প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনের চরম দুর্গতি হয়। এইবার মেলিলা অভিযানকে সফল করিবার জন্ত বিপুল উদ্যোগ

চলিতে থাকে। এবং বিরূপ আয়োজনের ফলে দেড় লক্ষ মুসজ্জিত সৈন্য মেলিয়া দুর্গ জয় করিবার জন্ত প্রেরিত হয়। কিন্তু স্পেনের এমনই দুর্ভাগ্য যে সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া প্রায় দশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় করিয়া অভিযান ফিরিয়া আসে। স্পেন-সরকারের এই শক্তিক্রমে স্বেয়োগ বুঝিয়া ক্যাটালোনিয়া প্রদেশের অধিবাসীবর্গ মাথা নাড়া দিতে আরম্ভ করে। ক্যাটালোনিয়া-প্রদেশবাসীগণ স্পেনের শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিয়াছে। বৈবাজ্যবাদ (anarchism) এ প্রদেশে অনেক দিন হইতেই বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাসিলোনা সহর বৈবাজ্যবাদীদের একটি প্রধান আস্তানা। তাই বাসিলোনা গুলে সরকার-পক্ষের সহিত ইহাদের দাঙ্গা হাঙ্গামা অনেকবারই হইয়া গিয়াছে। অকর্মণ্য মন্ত্রীসভার কর্মকণ্ঠতার অভাব দেখিয়া বৈবাজ্যবাদীগণ নিজেদের স্বাধীনসিদ্ধির জন্ত ক্যাটালোনিয়া-বাসীগণকে স্পেনের সম্পদ ছিন্ত করিয়া স্বরাট হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ঘরে ও বাহিরে স্পেনের এই অসীম দুর্গতি কর্মণীব দ্য-রিভেরাব প্রাণে আঘাত করে। শক্তিদ্র পুরুষের যথেষ্ট শাসনের স্বরাট স্পেনের বর্তমান অবস্থার একমাত্র প্রতিকার সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া দ্য-রিভেরা সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই বিদ্রোহ সম্রাটের বিবন্ধে নহে। কেবলমাত্র বর্তমান মন্ত্রীসভাকে দূর্ব করিয়া দিয়া শাসনভার শক্তিদ্র পুরুষদিগের এক পরিচালনা-সমিতির (directory) হস্তে সম্পূর্ণভাবে স্তম্ভ করিয়া দেওয়াই এই বিদ্রোহের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্য-রিভেরা বলেন যে বৈবাজ্যবাদী এবং মুক্তিকামীদিগকে দমন করা পরিচালকগণের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। তাহার পর মরক্কোতে আপনাব মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করা ইহাদের কর্তব্য। জাতীয় অহঙ্কার অটুট রাখিয়া যথাসম্ভব মরক্কোর যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে স্পেনকে সরিয়া পড়িতে হইবে। যুদ্ধের অসম্ভব ব্যয় বহন করা রাজস্বের বর্তমান অবস্থায় স্পেনের পক্ষে সম্ভব নহে। দ্য-রিভেরার কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া স্পেনের সামরিক বিভাগ দ্য-রিভেরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। বিপদ গণিয়া মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন ও সম্রাট অ্যালফোনসো দ্য-রিভেরাকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান গণসভাকে মানিয়া চলিতে বা আইন-পরিষদের হুকুম মানিতে দ্য-রিভেরা রাজী নহেন। সেইজন্ত মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দ্য-রিভেরা সম্মত হন নাই। চল্লের মতকে ছিন্ত করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না স্বাধীনমত আত্মবিকাশ করিতে সমর্থ হইবে ততদিন শাসন-পরিষদ ও আইন-মজলিস উঠাইয়া দিয়া শক্তিশালী পুরুষদিগকে বাছাই করিয়া দ্য-রিভেরা এক পরিচালকমণ্ডলী (directory) গঠন করিয়া দেশশাসনের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিবেন। সম্রাট দ্য-রিভেরার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ রোধ করিবার জন্ত সামরিক আইন জারি করিবার হুকুমনামা সহি করিয়াছেন। সামরিক আইনের বলে বিরুদ্ধবাদীদিগকে দমন করিবার সুবিধা দ্য-রিভেরা লাভ করিলেন।

শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়াই দ্য-রিভেরা জুয়া খেলা বন্ধ করিয়া এক হুকুমনামা জারি করিয়াছেন এবং নানাপ্রকার কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দেশে শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলিত আনিবার প্রয়াস করিতেছেন।

তুরস্কে নূতন শাসনতন্ত্র—

লোজান সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নবীন তুরস্কের শাসন-পদ্ধতি লইয়া তুরস্কে একটা নূতন সমস্তা দেখা দিয়াছে। আঙ্কারা-সরকারের হুকুমে খলিফার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শূন্য করিয়া তাঁহাকে ইসলামধর্ম-

জগতের গুরু করিয়াই যখন কেবল রাধিবার বন্দোবস্ত হইল তখন প্রয়োজনের চাপে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব মুস্তাফা কামালের উপর অর্পণ করা হইলেও কোনও বিধি অনুসারে আইনসম্মতভাবে তাঁহার নির্বাচন হয় নাই। স্তামুল হইতে রাজধানী আঙ্কারাতে সরাইয়া লওয়াও প্রজাবর্গের মত লইয়া হয় নাই। লোজান বৈঠকের পর যখন শান্তি স্থাপিত হইল তখন আত্মরক্ষার অজুহাতে যে-সব ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা বজায় রাখিতে হইলে আইন মজলিসের সম্মতি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মুস্তাফার দল নিয়মতন্ত্র প্রচলনের চেষ্টাই পাইয়া আসিয়াছেন। কাঙ্ক্ষিত পূর্বে কাজগুলিকে আইন মজলিসের নিকট হইতে মঞ্জুর করাইয়া লওয়া দরকার হইল।

তুরস্কের শাসনতন্ত্র সাধারণতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইবে বলিয়া আইন-মজলিস ঘোষণা করিয়াছেন এবং মুস্তাফা কামাল পাশা প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। রাজধানী কোথায় হইবে এখনও স্থির হয় নাই। ধার্মিক মুসলমানেরা স্তামুলেই রাজধানী রাখিবার জন্ত ইচ্ছুক কিন্তু জাতীয় দল রাষ্ট্রনীতিক ও সামরিক সুবিধার দিক হইতে আঙ্কারাতেই রাজধানী স্থাপনের জন্ত বদ্ধপরিকর। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে একটি শেষ মীমাংসা হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত তুরস্ক রাজ্যে ধর্মতন্ত্র (theocracy) প্রভাবই বেশী ছিল, মুস্তাফা কামালের সাধনায় তাহা রাষ্ট্রতন্ত্রে পরিণত হইল।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

দিল্লীর কংগ্রেস—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মোলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন—“কংগ্রেস এখন আর কেবলমাত্র আমলা-তন্ত্রের অস্থায়ী কায়ের প্রতিবাদ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া নাই—নে শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কেবল মাত্র নিজের নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির দাসত্ব-মোচনের চেষ্টায় ভারতকে যোগদান করিতে হইবে। খেলাফতের আন্দোলনে যোগদান করায় ভারতবর্ষেরও উপকার হইয়াছে। তাহাতে ভারতবাসীর মনেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। জাতীয় সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পক্ষে অসহযোগিতাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অসহযোগ-নীতির ফলেই দেশের লোকের চোখ ফুটিয়াছে—আইন-আদালতের গম্বুজকে দেশের লোকে এখন আর তেমন ভয় করে না।

“কাউন্সিল প্রবেশ-সম্পর্কে মতভেদ লইয়া যথেষ্ট শক্তির অপব্যয় হইয়াছে। গয়া কংগ্রেসের পূর্ব যদি সকলে মিলিয়া একযোগে কাজ করিতেন তাহা হইলে বর্তমান বিরোধ গঢ়িত না। বর্তমান অবস্থায় কাউন্সিল বর্জন যুগ। এখন কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া কাউন্সিল-গুলিকে অসহযোগের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। কাউন্সিলের ভিতরে ও বাহিরে কাজ চালাইবার ভার নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটিকে নিজের হাতে লইতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের একতা বাতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ স্বপ্নের মতই অলীক বলিয়া মনে হয়। আমি ঈশ্বরের নামে আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা এইখানেই টিক করুন—ভাবতবাসী তাঁহার মুক্তির শেষ আশাটুকু বাঁচাইয়া রাখিবে, না সাহাবানপু ও আগ্রাব রক্তাশ্রিত যুক্তিকায় তাহা বিসর্জন দিবে। ১৯১২ সালে মুসলমানদের রাজনীতিকক্ষেত্র হইতে দূর সরিয়া থাকা আমি যেমন সমর্থন করি নাই, এখনও তেমনি

হিন্দুদের সংগঠন ও শুদ্ধি-আন্দোলনের আশি বিবোধী। নীতি হিসাবে এ পথ আপত্তিজনক নহে, কিন্তু ঈর্ষা এবং অশ্রুতির আবহাওয়ায় ইহা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষেরই সৃষ্টি করিলে। বর্তমানে ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ কবিত্তে না পাবিলেও ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গের জন্য আশা দিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।'

কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) অহিংস অসহযোগ নীতি পুনরায় সমর্থন করিয়া এই মহাসভা ঘোষণা করিতেছেন যে, তাঁহাদের ধর্মগত বা বিবেক-সম্পর্কে কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে না সেই শ্রেণীর কংগ্রেসসেবকগণ আগামী নির্বাচনে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-পদেব প্রতিযোগিতা কবিত্তে পারিবেন। মহাসভা আরো প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করা হউক, এবং বহু সদস্য সম্ভব স্বরাজ্য লাভের জন্য মহান্যায় নির্দেশ-মত সমস্ত কংগ্রেস-সেবকগণ গঠননীতি সম্পূর্ণ করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ আরম্ভ করুন।

(২) কংগ্রেস স্থির কবিত্তেছেন যে আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া জনকত নেতাকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রাজনৈতিক কয়েদীগণের কারামুক্তি, জজিবৎ-উল-আববেব স্বাধীনতা ও পাঞ্জাব অনাচারেব সম্ভোগজনক মীমাংসা করার জন্য এখনই স্বরাজ্যলাভ দাবী করা। সেই স্বরাজ্যলাভের জন্য কমিটি সকল প্রদেশে উপদেশ দিবেন। কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা মহম্মদ আলি, বল্লভভাই পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মঙ্গল সিং, ডাক্তার বিচলু, জহরলাল নেহরু ও বিঠলভাই পটেল।

(৩) হিন্দু মুসলমানের ভিত্তর ঐক্যস্থাপনের জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হইবে। প্রথম কমিটি জাতীয় সঙ্গ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন, দ্বিতীয়-কমিটি সম্প্রতি যে-সমস্ত স্থানে হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইয়া গিয়াছে সেই-সকল স্থান অনুসন্ধান কবিত্তা একটি বিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৪) ভাবতবর্ষ এখন স্বাধীনতাব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড সেই পথের প্রতিবন্ধক। উপনিবেশসমূহে ভাবতবাসাদেব প্রতি কৃতদাসের মত ব্যবহার করা হইতেছে ও তাহাদিগকে অগমানিত করা হইতেছে। স্বতরাং ভারতবাসী ব্রিটেন ও তাহাব উপনিবেশ-জাত সমস্ত দ্রব্য বর্জন কবিত্তে।

ইহা ছাড়া কংগ্রেসে ছোটখাট আরো কতকগুলি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

নাভার সম্পর্কে শিখদের চাকল্য—

নাভার মহারাজকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যশাসনের ভার একজন ইংরেজ কর্মচারীর উপর প্রদত্ত হইয়াছে এই ব্যাপার লইয়া শিখ সম্প্রদায়েব ভিতর ভীষণ চাকল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা নির্দোষ বলিয়া বিবেচিত মহারাজের প্রতি অবৈধ দণ্ডের প্রতিবাদ কবিত্তা বিগয়টি পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য গবনে স্ট্রকে অনুবোধ করিয়াছিলেন। গবনে স্ট্রের নিকট হইতে কোনো উত্তর না পাওয়ায় অকালী জখা নাভারাজ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইতেছে। নাভারাজ্যে শিখ দেওয়ানের অধিবেশনও বন্ধ কবিত্তা দেওয়া হইয়াছে। শিখগণ এ অস্থায় আদেশও প্রতিপালন কবিত্তেছেন না। খালসা-কলেজের জনৈক অধ্যাপক নাভায় গবস্থান করিতেছিলেন; অকালীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে এই সন্দেহে তাঁহাকে নাভারাজ্য হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে। নাভাব আভ্যন্তরিক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল, অধ্যাপক গিদ্‌ওয়ানী এবং শ্রীযুক্ত শান্তনু দিল্লী-

কংগ্রেসের পর নাভায় গিয়াছিলেন। নাভারাজ্যের জাইটোতে পদার্পণ করিবার পরই তাঁহারাও-গ্রেপ্তার হইয়াছেন। নাভার জেলা আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সর্দার নারায়ণ সিংহের এজলাসে তাঁহাদের বিচারও শুরু হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ এবং ১৪৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জহরলালের গ্রেপ্তারের পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পুত্রের সহিত দেখা করিতে নাভায় গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজি নাভারাজ্যে কোনোপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবেন না এবং পুত্রের সহিত দেখা করিয়াই নাভারাজ্য ত্যাগ করিবেন—এই দুই সর্তে নাভার রাজ-সরকার পিতাকে পুত্রের সহিত দেখা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল সেই সর্তে সীকৃত না হইয়া নাভারাজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে নাভায় নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-আন্দোলন আরম্ভ করা কর্তব্য কি না দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া ডাঃ কিচলু এক ইস্তাহাব বাহিব করিয়াছেন।

ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। অকালী জখা প্রত্যাহ দলে দলে নাভারাজ্যে অভিমুখে রওনা হইতেছে এবং গ্রেপ্তার হইতেছে। স্বতরাং নাভাতেও আবার গুরুকা-বাগের অভিনয় আরম্ভ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

পঞ্চজমের বিবাহ—

সম্প্রতি মাদ্রাজের খৃষ্টান মিশনারীবা কুমারী পঞ্চজম নামী একটি হিন্দু বালিকাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে কুমারীর জাতি তাঁহাকে মিশনারীদেব হাত হইতে উদ্ধার করেন। মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই তারিখে শ্রীযুক্ত পি মণিক নায়াগার নামক একজন ইলেক্ট্রিক-ইঞ্জিনিয়ারের সহিত শ্রীমতী পঞ্চজমের হিন্দুমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চজমের আত্মীয়েরা এই বিবাহে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই বিবাহকায় নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

ডাঃ নাইডুর অবস্থা—

বোম্বাইএব 'ভয়েস অব ইণ্ডিয়া' জানাইতেছেন, ত্রিচিনপল্লী জেলে ডাঃ বন্দারাজু নাইডুর উপর জেল-কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার কবিত্তেছে। তাঁহাকে তাঁহাব সাধারণ খাদ্য দেওয়া হইতেছে না, অস্থায় বন্দীদের নিকট হইতে তাঁহাকে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাঁহাকে কোনো পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়া হয় না, অথবা লিখিবার জিনিষপত্রও দেওয়া হইতেছে না। ওজনে ৬ সের কমিয়া গিয়াও তিনি বেশ প্রফুল্ল আছেন।

সামন্ত-রাজ্য-প্রজাসম্মিলন—

দিল্লীতে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় কংগ্রেসসম্মুখে নিখিল-ভারত সামন্ত রাজ্য-সমূহের প্রতিনিধিমূলক সমিতি স্থাপন কবিত্তার জন্য একটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ কেল্কার সভাপতিব আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি সামন্ত-রাজ্যসমূহের শাসন-প্রণালী, শাসন-সংস্কার ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন-সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভায় ভারতের সামন্তরাজ্যসমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য সমগ্রভারতব্যাপী স্থনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন উপস্থিত করিবার এবং আগামী ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে দিল্লীতে নিখিল-ভারত-সামন্ত-রাজ্য-প্রজা-সম্মিলনের অধিবেশন বসাইবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

রয়াল কমিশনের সফর—

রয়াল কমিশনের সভ্যগণ ৪ঠা নবেম্বর হইতে ২০শে নবেম্বর পর্যন্ত

দিল্লীতে, ২২শে নবেম্বর হইতে ২৯শে নবেম্বর পর্যন্ত এলাহাবাদে, ১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বোম্বাইয়ে, ৩রা জানুয়ারী হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত মাদ্রাজে, ১৬ই জানুয়ারী হইতে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতায়, ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পাটনায় সফর করিবেন। পাটনা হইতে তাঁহারা আবার দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন।

বেহার বন্ডায় সাহায্য—

মিঃ ম্যাকফারসন ও শ্রীযুক্ত সিংহ বিহারের বন্ডায় প্রাবিত স্থান-সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ছাপরায় একটি সভায় শ্রীযুক্ত সিংহ বলিয়াছেন তিনি বন্ডার সাহায্যের জন্ত তিন লক্ষ টাকা দান করিবেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের আবেদনের ফলে নানা স্থান হইতে এপর্যন্ত ১৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ঝালোয়ারের মহারাজা—

‘নেশন’ পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন :—ভারতের রাজন্যবর্গে যে কি ছুববস্থা তাহা দিন দিন জনসাধারণের গোচর হইতেছে। ইতিপূর্বে নান্দা, চাম্পা ও উদয়পুরের মহারাজার বিষয় সকলেই অবগত হইয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ ঝালোয়ারের মহারাজা নাকি বাজ্যেব সাহিত সাময়িকভাবে সম্পদ তিন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্তমান বাবৎ তাঁহাব ইংলণ্ডে বাস করিব ইহাট নাকি কাণ। সম্প্রতি পলিটিক্যাল বিভাগেব একজন মিলিটারী কর্মচারী রাজ্য শাসন করিতেছেন।

লালা গিরিধারী লাল—

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী লালা গিরিধারী লাল ২ বৎসব কাবাদও ৩ ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি গ্রেপ্তার হন তখন তাঁহাব সঙ্গে ২৩৩ টাকা ছিল। সরকারে তাঁহা বাজ্যেব হইয়াছে। সম্প্রতি জরিমানা আদায়েব জন্ত তাঁহাব বাড়াব চেয়াব সোফা প্রভৃতি ক্রোক করা হইয়াছে। জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া জরিমানাব টাকা সংগৃহীত হইবে।

মায়াজ্য-প্রদর্শনীর জন্ত দান—

বিটিশ-মায়াজ্য-প্রদর্শনীর যে অংশে মাদ্রাজেব দ্রব্যসমূহ প্রদর্শিত হইবে তাহার ব্যয়-নির্বাহের জন্ত পাঠাপূর্বমেব বাজা মাদ্রাজেব লাট বাহাজুরের নিকট ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

লালা লাজপতের দান -

সাহারনপুরেব দাঙ্গায় যে-সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্ত লালা লাজপত রায় ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

নটরাজনের পদত্যাগ -

‘বথে ক্রনিকেল’ জানাইতেছেন যে কেনিয়া অপমানের প্রতিবাদ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত নটরাজন বোম্বাই-গবর্নমেন্টের অধীনে বিচাৰকের পদ পরিত্যাগ করিয়া একখানা পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

কাশ্মীরে তারবিহীন টেলিফোন—

সম্প্রতি কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যে তারহীন টেলিফোন স্থাপিত হইয়াছে। এই পার্শ্বত দেশের মধ্য দিয়া ১৫০০০ ফুট পাহাড় অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য হইলেও ইঞ্জিনিয়ারেব অধ্যবসায়ের ফলে তাহা

সম্ভব হইয়াছে। এই টেলিফোন লাইনের উভয় প্রান্তেই কথাবার্তা খুব স্পষ্টভাবে শোনা গিয়াছিল।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

বাংলায় ডাকাতির বহর—

গত জুলাই মাসে বাংলা দেশে ৭৫টি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে হইয়াছে ৫১টি। গত বৎসব (১৯২২) আগষ্ট মাসে হইয়াছিল ৫৫টি। ডাকাতির সংখ্যা বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। দারিদ্র্য নিবারিত না হইলে ডাকাতি কমিবার সম্ভাবনা অল্প।

আনন্দময়ীর আবেদন—

আফ্রীটোলা বালিকা-বধূ নিগাতনের বিষয় আপনাবা সকলেই অবগত আছেন। আমি সেই নির্যাতিতা বধূ শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী, বয়স ১৮ বৎসর। এখন আমি পিতাব গলগহ। পিতা দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত, তাহাতে বয়সও অধিক, আমার ভবিষ্যৎ-চিন্তায়ও বিশেষ কাতব। একপ অবস্থায় দ্বিধ পিতাকে আনো বিপন্ন করা অযৌক্তিক-বিবেচনায় আমাব জীবিকার জন্ত দেশবাসীর কৃপাব উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলাম। অনেক ভদ্রমহিলা মেয়েব মত শ্বেচ্ছক্কে আমাকে দেখিতেছেন, সাহায্য করিতেছেন, নানা প্রকার সহূপদেশও দিতেছেন। সেই মাতৃগণেব উপদেশ-মত “সাবিত্রী আশ্রম”-প্রতিষ্ঠাব সম্বন্ধ করিয়াছি। সম্প্রতি আমাব এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক-ঔষধ-বাবসায়ী শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ১১ নং সিমলা স্ট্রীট, (কলিকাতা) হইতে ১০০ টাকা সাহায্য করায়, আমাব সংকল্প সাফল্য-লাভ করিবে, এই আশা পাউলাম।

সাহায্য যেকপ সাহায্য (মাসিক বা এককালীন) জীবিকার বা আশ্রমেব পক্ষে বিবেচনা করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া চির-ঋণী রাখিবেন। উক্তি,—

বিনীতা, আপনাদের মেহের কথা
শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী।
শ্রীযুক্ত অদোবনাথ মজুমদার মহাশয়েব বাটী,
গ্রাম—মালকা, পোঃ সোনারপুর,
জেলা—২৪ পব্গণা।

সাহিত্য-বিষয়ে উৎসাহ দান—

- ১। দয়ালস্মৃতি সুরবন্দক—
বিষয়—“বর্তমান সময়ে গল্পসমস্ত্রাব সমাবানকল্পে বঙ্গদেশের কুটীর-শিল্পসমূহেব উন্নতিব প্রয়োজনীয়তা।”
- ২। বটকুম্বস্মৃতি বোপ্যপদক (স্বর্ণগর্ভ)—
বিষয়—“জাতীয়তাগঠনে সজ্জবদ্ধজীবনেব প্রভাব।”
- ৩। কৃন্দাস পাল বোপ্যপদক—
বিষয়—Lives of great men and their influence on mass education.
- ৪। স্বর্ণমণি বোপ্যপদক—
বিষয়—“একটি ক্ষুদ্রগলে বর্তমান কালে বাংলার পল্লীজীবনের নিপুং চিত্র।”
- ৫। নন্দনাগীস্মৃতি বোপ্যপদক—

বিষয়—“রমেশ দত্তের আদর্শ নারী চিত্র।”

প্রবন্ধগুলি ১২ নং মুরলীধর সেন লেন কলিকাতা এই ঠিকানায় ১৫ই নভেম্বর তারিখের মধ্যে স্বহৃদ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বাংলার একটি প্রাচীন কীর্তি লোপ—

পদ্মাগর্ভে রাজাবাড়ীর মঠ।—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজা চাঁদরায় ও কেদার রায় তাঁহাদের মাতার চিতার উপর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজাবাড়ীতে এক সুবৃহৎ মঠ স্থাপন করেন। প্রায় তিনশত কি ততোধিক বৎসর যাবৎ সেই মঠটি বহু বাধাবিহীন অতিক্রম করিয়া গর্ভভরে শির উন্নত করিয়া পদ্মাতীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া হিন্দুদের পূর্বকীর্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। ক্রমাগত দুইবার পদ্মা তাহার কীর্তিনাশা নাম সফল করিবার মানসে মঠটির প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু যেন দয়া করিয়া উহাকে গ্রাস করে নাই। ইহার শিল্পকার্য এত সুন্দর ছিগযে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সুদৃশ্য মঠটির প্রত্যেকখানি ইষ্টক নানাবিধ কারুকার্যে খচিত ছিল। মঠটি উচ্চতায় প্রায় ৮০ হস্ত এবং পরিধি ১২০ হাত ছিল। শুনা যায় ইহা নাকি আরও উচ্চ ছিল, ক্রমেই নীচের দিকে কতকটা বসিয়া গিয়াছিল। গত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় এই মঠটি নিজ বায়ে সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। পদ্মানদী এবার ঢাকা জিলার দক্ষিণ দিক দিয়া অতি প্রবলবেগে ভাঙিতেছে। সম্প্রতি উক্ত বিশাল মঠটিকে গ্রাস করিয়া সে ভাঙ্গন-যজ্ঞে পূর্ণাঙ্গিত প্রদান করিয়াছে। রাজাবাড়ীর এই মঠের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ কীর্তি লোপ পাইল।

—২৪ পরগণা-বাতাবৎ।

সাহিত্যিকের সম্মান-লাভ—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কৃত।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জগৎতারিণী-স্বর্ণ-পদক দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

—স্বদেশ।

বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান—

হিন্দু-ধর্ম অনুসারে হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্ত মেদিনীপুরে একটি বিধবাবিবাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক এই সমিতির সভ্য হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরেও অনেকে এই সমিতিকে সাহায্য করিতেছেন।—সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস শর্ম্মণের চেষ্টায় এপর্যন্ত একটি বিধবাবিবাহ হইয়াছে।—স্বদেশ

দান ও সংকল্প—

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি।—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে বিহারের বস্ত্রাঙ্গীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদর হস্তে ৫০০ টাকা এবং তমলুকে বস্ত্রাঙ্গীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের হস্তে ৪৪১।৯০ প্রদান করিয়াছেন।—যুগবার্তা।

সাহায্যদান—বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে বিজ্ঞান শ্রেণী খুলিবার জন্ত ১৬০০০ টাকা এককালীন প্রদান করিয়াছেন। এজন্ত লর্ড লিটনের গভর্নমেন্ট জনসাধারণের ধন্যবাদার্থ।

—কাশীপুরনিবাসী।

জাপান-সাহায্যে বিশ্বভারতী। ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানকে সাহায্য করিবার জন্ত শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাণ্ডারের সম্পাদক হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর ছাত্র এবং শিক্ষকদিগের নিকট হইতে টাকা তুলিয়া ৭৫০ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহারা যে টাকা সংগ্রহ করিবেন, তাহা সমস্তই জাপানের রাজদূতের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এই ভাণ্ডারে কেহ টাকা দিতে ইচ্ছা করিলে শান্তি-নিকেতনে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে পারেন।—স্বদেশ।

নূতন শিক্ষালয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়। বৈদ্যনাথ ধাম—পোঃ আঃ দেওঘর। যাহাতে বালকগণ শৈশব হইতেই লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গেই জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইয়া নিজেদের চরিত্রগঠনপূর্বক কর্মঠ স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হই, সেই উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। শরীর মন ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিদ্যাগীর ভিতরের পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞানানুশীলন, কর্তৃকুশলতা, নিয়মানুবর্তিতা, চরিত্র এবং সামাজিক জীবন গঠন প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাজগতের আদর্শগুলিকে লক্ষ্য করিয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর মানুষগঠনই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। স্বামী সন্তানবান্দ ইহার অধ্যক্ষ।

গুরুসদয় দত্তের সংকার্য—

দত্ত মহাশয় আগামী বয়ের জন্ত বাঁকুড়া জেলার প্রত্যেক পল্লী-সমিতির করণীয় এইরূপ কার্য-তালিকা নির্ধারিত করিয়াছেন:— প্রত্যেক পল্লী-সমিতি বালকদের ও বালিকাদের জন্ত বিদ্যালয় খুলিবে, শ্রমিকদের জন্ত নৈশ-বিদ্যালয় খুলিবে। প্রত্যেক পল্লীসমিতি অন্ততঃ ২টি করিয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করিবে এবং পাঁচশত করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া পুষ্করিণী পানীয়-জলের জন্ত স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী সমিতি কৃষি-কার্যের কিছু-কিছু নূতন সংস্কার, এবং গ্রাম্য শিল্পের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

সদনুষ্ঠান—

বিনামূল্যে কালারের চিকিৎসার কেন্দ্র—বেঙ্গল হেলথ এসোসিয়েশন বিনামূল্যে কালারের রোগীদের চিকিৎসার জন্ত ইলিয়ট রোড ও সার্কুলার রোডের সঙ্গমস্থলে মেসার্স শ্রীমানী কোম্পানীর গুণধালায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত ডাক্তার রোগী দেখিবার জন্ত এই গুণধালায় উপস্থিত থাকিবেন।—সম্মিলনী।

—সেবক।

সিন্ধুদেশে নূতন আবিষ্কার

সিন্ধুনদীর গতি-অভুযায়ী সিন্ধুদেশ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—উত্তর সিন্ধুদেশ, মধ্য সিন্ধুদেশ ও দক্ষিণ সিন্ধুদেশ। দক্ষিণ সিন্ধুদেশ আমাদের বাংলা দেশের মত নদীমাতৃক দেশ, কাজেই তাহা আমাদের দেশের মতই জনবহুল, সুফলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা। অতি প্রাচীনকালে এই দেশের ঃর্থ অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে এই বিশাল নদীর পলি পড়িয়া এই দেশটির উদ্ভব হইয়াছে। সিন্ধুদেশের মধ্য অংশ দক্ষিণভাগের পূর্বে পয়বস্তি হইয়াছিল, সেই কারণে এই দেশের যুক্তিকা শক্ত। উত্তর সিন্ধুদেশে নদীটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও অল্প কোন পয়ঃপ্রণালী নাই। এই কারণে উত্তর সিন্ধুদেশ মরুভূমি-সদৃশ—চারিদিকে বালুকামাণি ধূ ধূ করিতেছে, কেবল মাঝে মাঝে দুই-চারিটি বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কেবল নদীর উভয় পাশে ১০/১৫ মাইল পর্য্যন্ত একরূপ ফসল হয়। এই প্রাচীন প্রদেশটির অনেক স্থানে বৌদ্ধ-যুগের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূর্বে সিন্ধুদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনেক কর্মচারী দক্ষিণভাগের অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কেহই এই জনশৃঙ্খ ও মরুভূমি-সদৃশ উত্তর প্রদেশে খননকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। গত বৎসর শীতকালে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পশ্চিম-প্রান্তের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সুকঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার এই প্রথম প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে সার্থক হইয়াছে।

এই চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের বিবরণ প্রদান করিবার পূর্বে উত্তর সিন্ধুপ্রদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করা আবশ্যিক। 'রোহরী আলোর' নগর উত্তর সিন্ধুদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এইস্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট পর্বতমালা আছে। এইস্থানে সিন্ধু নদী এই-সকল পর্বতমালা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বাংলা দেশের পদ্মা

এবং মেঘনা নদীর গায় সিন্ধু নদী গতিপরিবর্তন করিয়া থাকে। ঐতিহাসিকেরা নির্দেশ করিয়া থাকেন সিন্ধুনদী এপর্য্যন্ত অন্ততঃ ১৭ বার গতি পরিবর্তন করিয়াছে। এই গতি পরিবর্তনের নিদর্শন উত্তর ও মধ্য সিন্ধুপ্রদেশে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং পূর্বে পূর্বনারা এবং পশ্চিমে পশ্চিমনারা নামী দুইটি ক্ষুদ্র মরা নদী এখনও এই প্রদেশে বর্তমান আছে।

এই প্রদেশের অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ প্রদক্ষিণাস্তে সর্বোচ্চ ধ্বংসাবশেষটিই খনন করা হইর হয়। ইহা মহেঞ্জদড়ো বা মহেঞ্জমারী নামে পরিচিত। এই স্থানটি নর্থওয়েস্টার্ন রেলপথের রুক কোটরী শাখার দোকরী স্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটির আয়তন প্রায় ৭৫০ বিঘা।

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্বোচ্চ একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। নানপ্রকার চিহ্ন দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে সিন্ধুনদী খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে এইস্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। এতদিন সকলেই ভুলিয়া আসিতেছিল যে, পূর্বনারাই সিন্ধুনদীর সর্বপ্রাচীন গর্ভ। এই ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে সে ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থপতির সন্নিকটস্থ ঝাউবন দেখিয়া বোঝা যায় পূর্বে এস্থান দিয়া সিন্ধুনদী প্রবাহিত ছিল। তখন এই অংশে নদীর মধ্যে দ্বীপের গায় বড় বড় চড়া ছিল। এইপ্রকার দুইটি চড়ার উপর এই গৌরবমণ্ডিত নগরের দুইটি প্রধান দেবমন্দির অবস্থিত ছিল। এই বিস্তীর্ণ সहरটির আয়তন ও ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় মহেঞ্জদড়ো প্রাচীন সিন্ধু দেশের রাজধানী ছিল। এই সहरটি নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল। এখানে একটি স্ববৃহৎ (প্রায় দেড় মাইল লম্বা) রাজপথেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বীপের চারিদিকে বাঁধা ঘাট ও সোপানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান। রাজপথের নিকটে যাইবার সোপানও ছিল বলিয়া



মহেন্দ্রদেড়ো নগরের প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ
(প্রাচীন সিন্ধুনদীর গর্ভ হইতে গৃহীত)

প্রতীয়মান হয়। একটি ঘাটের কাছে প্রায় ৫০৫৫ ফুট উচ্চ একটি ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে। ইহাই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। রাজপ্রাসাদটি পরিখা-বেষ্টিত ছিল তাহাও বোঝা যায়। রাজপ্রাসাদ হইতে কিছুদূরে গেলেই ছোট ছোট রাস্তার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলেই সহরের হাটবাজার ছিল, এবং সহরের এই অংশই জনবহুল ছিল। :

বাংলা দেশের মত সিন্ধুদেশেও প্রস্তরের অভাব। কাজেই এখানকার সমস্ত মৌখমালা এবং মন্দিরাদি ইষ্টক-নির্মিত। প্রাচীন ব্যাবিলনের স্থপতিদের ত্রায় সিন্ধুদেশের প্রাচীন স্থপতির্যোগ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক-নির্মিত মন্দির উপর মন্দিরাদি নিম্মাণ করিত। সিন্ধুদেশের স্থপতির্যোগ মন্দিরগুলিকে বহু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ৪০৫০ ফুট দেওয়ালের উপর ইষ্টক-মঞ্চ নির্মাণ করিত। আবিষ্কৃত স্তূপটি ১৬০০ বর্গফুট একটি ইষ্টকমঞ্চের মধ্যস্থলে নির্মিত। মঞ্চটির চতুর্দিকস্থ প্রাঙ্গণের চারিপাশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রাঙ্গণে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহৎ স্তূপটি

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মঞ্চে পূর্বদিকের সোপানাবলী দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। সোপানাবলীর সাহায্যে উপরে উঠিলে প্রবেশ-পথ। এখানে ছয়টি স্তূপ ছিল। তৎপরে প্রাঙ্গণ। প্রাচীন 'স্তূপ' নামক বৌদ্ধ মন্দির-সমূহ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি ভিতরে ফাঁপা ও অগ্রগুলি নিরেট। মহেন্দ্রদেড়োর স্তূপটি ফাঁপা। এই স্তূপটির উপরিভাগ রৌদ্রপক ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। স্তূপটি পূর্বদিকের। ইহার ভিতরের প্রবেশ-পথে উভয় পাশে সোপানাবলী আছে। এই-সকল সোপানের সাহায্যে চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই স্তূপটি প্রদক্ষিণ করেন তখন ইহার ছাদ ভগ্নাবস্থায় ছিল। এই প্রদেশের মুসলমান জমিদারবর্গ কর্তৃক এই কুকার্যটি অতুষ্টিত হইয়াছে। তাহারা ভূপ্রোথিত অর্থলোভে এই-সকল স্তূপের নানা অংশ বিনষ্ট করিয়া এই-সমস্ত প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন পাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

এই স্তূপটির প্রবেশপথের দুই দিককার সোপানাবলীর মধ্যস্থলে একটি ছোট মন্দির আছে—সেখানে একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এত দীর্ঘ

দিন জলরৌদ্র সহ করিয়াও যে মূর্তিটির চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। মূর্তিটি ইষ্টকের উপর কর্দমের প্রলেপ দিয়া নির্মিত হইয়াছিল। সমাসীন বুদ্ধের হস্তদ্বয়ের ও জজ্বা-প্রদেশের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এককালে মূর্তিটি নানা বর্ণে চিত্রিত ছিল এবং বোধ হয় সুবর্ণপত্রে মণ্ডিত ছিল। কালক্রমে চিত্রলেপ ও সুবর্ণপত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেবল মূর্তির কাঠামোর সজ্জিত ইষ্টকগুলি দেখিলে বোধ হয় যে এককালে এস্থানে ধ্যানমুদ্রায় সমাসীন বুদ্ধমূর্তি ছিল।

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভাঙ্গা হাঁড়ি কড়ি শঙ্খ প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অনেক তামার পয়সাও পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশের উপরকার লিখিত অংশ অত্যন্ত অস্পষ্ট।

যে ইষ্টক-মঞ্চের উপর স্তূপটি নির্মিত সেটি প্রধান মঞ্চের মধ্যস্থলে নির্মিত এবং এই ছোট মঞ্চের উত্তর ও দক্ষিণ গায়ে দুই তিনটি বড় বড় সিঁড়ির ধাপের মত ধাপ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশের গীজে পিরামিডের মত এই ধাপগুলি মাকুষের উঠিবার ধাপ নহে। এককালে এই-সমস্ত ধাপের উপরে মাটির বা পাথরের বুদ্ধমূর্তি সজ্জিত থাকিত। খনন-কালে ছোট মঞ্চটির গায়ে রাশি রাশি ভস্ম পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্তূপটি এককালে অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছিল। রৌদ্র-পক ইষ্টকের যে স্তূপটি এই মঞ্চের উপর নির্মিত, তাহার ভিতরটা ফাঁপা ছিল এবং এই রৌদ্র-পক ইষ্টক-নির্মিত স্তূপের ভিতরে অথবা বাহিরে বহু চিত্র ছিল। এই-সমস্ত চিত্রের অনেক অংশ রৌদ্রপক-ইষ্টকের উপরে পাওয়া গিয়াছে। এই ১৭ শত বৎসর জলরৌদ্র সহ করিয়াও এই-সমস্ত চিত্রের অংশগুলি এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। কোন অংশে বুদ্ধ- বা বোধিসত্ত্ব-মূর্তি, কোনটিতে বা দেওয়াল-চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। একটির উপরে নীল জমিতে শাদা ফুল এবং তাহার উপরে গোলাপী জমিতে মেটে লাল বর্ণের ফুল আছে। বুদ্ধ- বা বোধিসত্ত্ব-মূর্তিগুলি সাধারণতঃ শাদা ও লাল রংএ চিত্রিত হইয়াছে। এই জাতীয় কোন

কোন চিত্রযুক্ত ইষ্টকের উপরে কাল অক্ষরে চিত্রিত লিপি আছে। কোন লিপি খরোষ্ঠী অক্ষরে—ইহা এখনকার পার্শ্বী অক্ষরের ঘায় দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে লিখিত হইত। আবার কোন লিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে। এই আকারের ব্রাহ্মী অক্ষর ও খরোষ্ঠী অক্ষর যীশুখৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পবে আর ব্যবহার হয় নাই।

এই চিত্রগুলি অজস্র চিত্রাবলী অপেক্ষা বহু পুরাতন এবং স্যার আউরেল ষ্টাইন মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন বিনষ্ট নগরগুলিতে যে-জাতীয় চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এই চিত্রগুলি অনেকটা সেই জাতীয় এবং ইহাতে প্রাচীন গ্রীক শিল্পের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অপেক্ষাকৃত ছোট ইষ্টকের মঞ্চটির উপর রৌদ্র-পক ইষ্টকের স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নীচে এক ফুট পরিমাণ ভস্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে একটি প্রাচীন স্তূপ ধ্বংস হইয়া গেলে তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই স্তূপটি নির্মিত হইয়াছিল। স্তূপের চারিদিকে যে প্রাঙ্গণ আছে, তাহার চারিপাশে যে-সমস্ত ছোট ছোট কুঠুরী আছে, তাহাতে অনেকপ্রকারের প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তির খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। পূর্বদিকের একটি কুঠুরীতে অনেকগুলি চীনেমাটির ছোট-ছোট বুদ্ধমূর্তির খণ্ড ও একটি শকের মস্তক পাওয়া গিয়াছিল। পশ্চিমদিকের কুঠুরীগুলিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ঐ-সমস্ত মুদ্রা ঘরের মেঝের নীচে মন্ডায় পাত্রে রক্ষিত ছিল। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিকগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মুদ্রা। অনেকগুলি মুদ্রা নূতন ধরণের। এরূপ মুদ্রা এপর্যন্ত ভারতের কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এ-সমুদয় মুদ্রা সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাচীন কালের মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলির সহিত ভারতবর্ষের অগ্র প্রদেশে আবিষ্কৃত কার্ষাপণ বা কাহাপণের কোন সাদৃশ্য নাই। এই মুদ্রাগুলি ছাঁচে ঢালাই করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, এগুলি punch-marked (অঙ্ক-চিত্রিত) নহে।

মহেঞ্জদড়োতে যে তাম্রমুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে

তাহার মধ্যে সর্কাপেক্ষা আধুনিকগুলি শক জাতীয় কুষাণ বংশীয় সম্রাটদের রাজত্বকালের মুদ্রা। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন আরও দুই জাতীয় মুদ্রা ঐ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সর্কাপ্রাচীন মুদ্রাগুলির উপরকার চিহ্নাদির পাঠোদ্ধার হওয়াতে প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীনকালে সিন্ধুদেশে বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন জরপুস্ত্রীয় ধর্ম পাশাপাশি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই-সকল মুদ্রাতে সমাসীন অথবা দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মুদ্রায় আবার মূর্তির মস্তকের চতুর্দিকে প্রভামণ্ডল বা ভ্রামণ্ডল (halo) আছে। অনেক মুদ্রায় প্রাচীন অগ্নিবেদীও আছে। পারস্য দেশের পার্থিয়ান বংশের মুদ্রায় অগ্নি-বেদীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাতেই সর্কাপ্রথমে অগ্নি-বেদী দেখিতে পাওয়া যায়। স্মতরাং মহেঞ্জদড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত সর্কাপ্রাচীন মুদ্রায় অগ্নি-বেদীর যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাই পৃথিবীতে সর্কাপেক্ষা প্রাচীন অগ্নি-বেদীর চিত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি গোলাকার, কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্যের মুদ্রার আয় পুরু নহে। এপর্যন্ত এরূপ কোন মুদ্রা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই-সকল মুদ্রার এক পার্শ্বে ভারতীয় রণ-দেবতা মহাসেন অথবা কার্তিকেয়ের মূর্তি, অপর পার্শ্বে অগ্ন্যাগ্নি দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি কুষাণ সম্রাটগণ কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়, এবং বোধ হয় এই মুদ্রাগুলিই ক্রমে ক্রমে পূর্কপ্রচলিত সমকোণী কার্ষাপণ মুদ্রার স্থান অধিকার করে। কুষাণ বংশের সম্রাটগণ সিন্ধুদেশ অধিকার করিলে এই জাতীয় মুদ্রার পরিবর্তে কুষাণ বংশীয় সম্রাটগণের পুরু তাম্রমুদ্রা সিন্ধু দেশে প্রচলিত হইয়াছিল।

এই ধ্বংসস্তুপের ভিতর কয়েকটি সীল-মোহরও আবিষ্কৃত হয়। এগুলি প্রস্তরনির্মিত নহে। পূর্ককালে প্যারিস-প্র্যাষ্টারের আয় একপ্রকার পদার্থ সিন্ধুদেশে ব্যবহার হইত। ইহার বর্তমান সিন্ধী নাম চিরোলী।

এই চিরোলী-নির্মিত দুইটি সীলমোহর এবং আর একটি সীলমোহরের একখণ্ড পূর্কবর্ণিত স্তুপের পাদদেশে অর্থাৎ নদীর ঘাটের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তিনটি সীলমোহরের মধ্যভাগে একটি চতুর্ভুজ আকৃতি আছে এবং এই জঙ্কর আকৃতির সম্মুখে একটি ধ্বজ আছে এবং সীলমোহরের উপরে ও নিম্নে কতকগুলি অক্ষর আছে। এই জাতীয় সীলমোহর ইতিপূর্কে পাঞ্জাবের মণ্ট্‌গমেরী জেলার হারাপ্লা গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। দুই তিন বৎসর পূর্কে এই অঞ্চলেই রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী কতকগুলি সীলমোহর আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ও অগ্ন্যাগ্নি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই-সকল মোহরের উপরকার অক্ষরগুলি ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ক তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রাহ্মী বর্ণমালার প্রাচীন আকার। প্রকৃত পক্ষে এই-সকল লিপি চিত্রাক্ষর ভিন্ন আর কিছুই নহে; যাহারা বলেন যে এই-সকল লিপি প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালায় লিখিত, তাহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টার জেনারল ডাক্তার ডি বি স্পুনারও এই-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইয়াছেন।

মহেঞ্জদড়োতে যে সীলমোহরগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে তিনটিতে দুইটি বিভিন্নপ্রকারের চিত্রাক্ষর দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবিষ্কৃত ৪৫টি মুদ্রায় শুধু একপ্রকারের চিত্রাক্ষর আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, যে জাতি এই-সমস্ত সীলমোহর ব্যবহার করিত তাহারা প্রাচীন মিশরবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ছিল এবং মুদ্রার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল।

এশিয়া মহাদেশে পূর্কে এরূপ চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হয় নাই। এই চিত্রাক্ষরগুলি প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরের অনুরূপ নহে। কাজেই এগুলি আবিষ্কৃত হওয়াতে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এই-সকল সীলমোহরের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে সীলমোহরগুলির মধ্যস্থলে বন্যা সমেত একপ্রকার একশৃঙ্গ বন্যগর্ভ (unicorn) মূর্তি দৃষ্ট হয়। হারাপ্লা গ্রামে আবিষ্কৃত সীলমোহর দেখিয়া পূর্কের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা

অনুমান করিয়াছিলেন যে এই জাতীয় সীলমোহরে বৃষের মূর্তি আছে। কিন্তু ডাক্তার স্পনার প্রমাণ করিয়াছেন যে এই জন্তুগুলি একশৃঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা প্রাচীন গ্রীক পর্যটকগণ কর্তৃক বর্ণিত একশৃঙ্গ গর্দভের (unicorn) মূর্তি। খ্রীষুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতানুসারে এই তিনটি সীলমোহরে যে জাতীয় চিত্রাঙ্কর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা এশিয়াখণ্ডে খৃষ্টের জন্মের ৩ হাজার বৎসর পূর্বে

ব্যবহৃত হইত। এই অনুমানের কারণ সরকারী কাৰ্য্য-বিবরণী মুদ্রিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বারান্তরে এই ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত দ্রব্যের বিবরণ প্রদান করা হইবে। *

* প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলের অনুমোদন অনুসারে এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত "সিদ্ধেশ্বরের ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্তূপের" ইংরেজী বিবরণ হইতে সংকলিত।

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পাঁচের বাড়ি

- ১। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, পালট, সাণ্ড।
- ২। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, পালট, শির।
- ৩। তামেচা, কোমর, শির, করক, বাহেরা।
- ৪। শির, করক, পালট, ছল, ভাণ্ডার।
- ৫। বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, সাণ্ড, তামেচা।
- ৬। তামেচা, পালট, ছল, শির, গ্রীবাণ।
- ৭। তামেচা, কোমর, ছল, শির, গ্রীবাণ।

“সাণ্ড” = মস্তকের ঠিক মধ্যদেশ বরাবর সীতের দুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে ক্রমশঃ দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের বামপার্শ্ব ঘেঁষিয়া পাখুর মূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়। অসির অগ্রভাগে দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশ ছেদিত হয় এবং অসির মধ্য-ভাগে বাম বক্ষ ও বাম উদর ছেদিত হয়। এই আঘাতের দ্বারা সরলভাবে উপবিষ্ট অশ্বারোহী সহ অশ্ব ছেদিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

“করক” = দক্ষিণ পদের সন্ধিস্থলের ভিতর দিকের গিরার উপরের সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে চারি অঙ্গুলী পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে আঘাত করিয়া বক্রভাবে পদসন্ধি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

“ছল” = নাভিকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলি ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসিকে ভূমির সমান্তরালভাবে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণনা :—

১। “সাণ্ড” আটকাইবার নিমিত্ত হাতের মুঠার রক্তাঙ্গুলী দক্ষিণ দিকের উপর বরাবর থাকিবে ও গণিবন্ধ মস্তক হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে, লাঠি বক্ষের সমান্তরালভাবে থাকিবে এবং অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া বাম দিক হইতে প্রায় এক হস্ত বাম দিক বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

৩য়, ৪র্থ। “করকের” আঘাত প্রয়োগ করিয়া তরাস কিম্বা গরদেশ উভয়প্রকারেই লাঠির চালনা হইতে পারে।

“শির” আটকাইয়া লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নের দিকে চালনা করিয়া, পদাঙ্গুষ্ঠের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে ও বামে ভূমি সংলগ্ন করিয়া লাঠিকে ভূমির উপরে লম্বভাবে রাখিয়া “করক” আটকাইতে হইবে।

৫র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম। ছলের প্রতিকার করিবার নিমিত্ত লাঠিকে বক্ষের সমান্তরালভাবে চালনা করিয়া অগ্রবিন্দু বামপার্শ্বের দিক দিয়া উপরে তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে। সে সময়ে প্রয়োজন হইলে ঠাটের অস্তিত্ব ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া সম্মুখের হাঁটু একটু সরল রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ছয়ের বাড়ি

- ১। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, করক,

- বাহেরা। ২। শির, বাহেরা, তামেচা, কোমর, চির, সাগু। ৩। তামেচা, চির, শির, ছল, বাহেরা, ভাণ্ডার। ৪। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, শির, গ্রীবাণ। ৫। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, শির, করক, বাহেরা। ৬। তামেচা, শির, চির, ছল, সাগু, কোমর। ৭। বাহেরা, ছল, চির, গ্রীবাণ, ভাণ্ডার, করক।

সাতের বাড়ি

- ১। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, ছল, শির। ২। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, ছল, উন্টা শির (শির রাস্ত্) ৩। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, ছল, সাগু। ৪। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, ছল, উন্টা সাগু (সাগু চপ্) ৫। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, ছল, শির, গ্রীবাণ।

“উন্টা শির” (শির রাস্ত্) = মস্তকের মধ্য দেশ বরাবর সীতীর দুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ক্র, দক্ষিণ চক্ষু, নাসিকার অগ্রভাগ ও বাম কোমর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

উন্টা সাগু (সাগু চপ্) = মস্তকের ঠিক মধ্য দেশ বরাবর সীতীর দুই অঙ্গুলী বাম হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে ক্রমশঃ দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব ঘেঁষিয়া পায়ু মূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়। অসির অগ্রভাগে বাম পৃষ্ঠদেশ ছেদিত হয় এবং অসির মধ্যভাগে দক্ষিণ বক্ষ ও দক্ষিণ উদর ছেদিত হয়।

বর্ণনা:—

২য়। “উন্টা শির” আটকাইবার কালে হাতের মুঠো দক্ষিণ স্বক্ষের উপর বরাবর থাকিবে, মণিবন্ধ মস্তক হইতে প্রায় অর্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে, লাঠি বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে, অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া বাম স্বক্ষ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত বাম বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

৩র্থ। “উন্টা সাগু” আটকাইবার কালে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অর্ধ হস্ত সম্মুখে ও কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত উর্দ্ধে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু

ঈষৎ নিম্নমুখ হইয়া বাম স্বক্ষ হইতে প্রায় এক হস্ত বাম দিক বরাবর থাকিবে। লাঠি বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে।

আটের বাড়ি

- ১। শির, করক, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, ছল, সাগু।

- ২। শির, মোটা, করক, পালট, চির, ছল, ভাণ্ডার, সাগু।

- ৩। শির, বাহেরা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, চির, ছল, সাগু।

- ৪। বাহেরা, অন্তর, মোটা, কোমর, পালট, ছল, চির, সাগু।

- ৫। বাহেরা, ভাণ্ডার, পালট, শির,

সাকেন, মোটা, কোমর, তামেচা।

“সাকেন” = অসির অগ্রভাগ দ্বারা বাম হাঁটুর চারি অঙ্গুলী উর্দ্ধে এবং অসির মধ্যভাগ দ্বারা দক্ষিণ হাঁটুর প্রায় দ্বাদশ অঙ্গুলী উর্দ্ধে এক সঙ্গে কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা:—৫ম। “সাকেন” আটকাইবার সময় হাতের মুঠো বাম কোমরপার্শ্ব হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত বাম দিক বরাবর থাকিবে। বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে আটের বাড়ি সম্পন্ন করিয়া, ক্রমে অল্পে অল্পে ক্রমশঃ চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। এবং পর্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে ও অপরজন বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ও মাঝে মাঝে পরস্পরে বিভিন্ন পাঠের অভ্যাস করিতে হইবে।

নয়ের বাড়ি

- ১। তামেচা, কোমর, চির, ছল, বাহেরা, করক, পালট, ভাণ্ডার, তেওয়ার।

- ২। তামেচা, কোমর, চির, শির, ছল, বাহেরা, করক, পালট, ভাণ্ডার।

- ৩। তামেচা, পালট, গ্রীবাণ, কোমর, ভুজ, মোটা করক, সাগু, ভাণ্ডার।

- ৪। শির, তামেচা, গ্রীবাণ, উন্টা মোটা, মন, ভাণ্ডার, সাকেন, করক, সাগু।

৫। হিমাএল, ভাণ্ডার, আসর, মন, তেওয়ার, সাকেন, পালট, তামেচা, সাণ্ড।

“তেওয়ার” = দক্ষিণ কর্ণের প্রায় তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কর্ণমূলের নিম্ন কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

“ভুজ” = বাম বাহির মধ্যভাগ; বাম স্কন্ধ ও কনুই-এর মাঝামাঝি। “উন্টা মোটা” = বাম স্কন্ধ মোটা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ স্তনের বোটার দুই অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর দক্ষিণ বক্ষপার্শ্ব কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

“মন” = বাম বক্ষপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ গলদেশের মূল কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

“হিমাএল” — দক্ষিণ গলদেশের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কোমর পার্শ্ব কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

“আসর” = দক্ষিণ হাঁটুর অর্দ্ধহস্ত উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিতরের দিকে ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে উরুদেশ কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা :—১। “তেওয়ার” আটকাইবার সময় হাতের কব্জি দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ মোটা হইতে প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী বাম দিক বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

৩য়। “ভুজ” আটকাইবার সময় হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম স্কন্ধ হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী বামে ও প্রায় অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ বামের দিকে হেলিয়া থাকিবে।

৪র্থ। “উন্টা মোটা” আটকাইবার সময় হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম ক্রুর অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম কুক্ষি হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম দিক বরাবর সম্মুখে থাকিবে।

“মন” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম বক্ষপার্শ্বের বামে ও লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ হাঁটু বরাবর গেলে প্রতিপক্ষের আঘাতকে বামে ও নিম্নে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে।

৫ম। “হিমাএল” আটকাইবার কালে হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধ মোটের প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ মোটা হইতে

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত বাম ও সম্মুখ ভাগ বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

“আসর” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা কোমর হইতে ঈষৎ নিম্ন দিক বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে।

নয়ের চতুর্থ বাড়িতে তামেচা ও সাণ্ডের আঘাতের প্রতিকার আঘাত করিয়াই করিতে হইবে।

দশের বাড়ি।

১। তামেচা, মোটা, করক, পালট, চির, বাহেরা, ছল, ভাণ্ডার, কোমর, সাণ্ড।

২। তামেচা, চাপনি, উন্টা মোটা, ধুনিয়া পালট, সাকেন, করক, তেওয়ার, কোমর, ভাণ্ডার, হিমাএল।

৩। শির, ছল, পালট, উন্টা মোটা, চির, তেওয়ার, মোটা, চাকি, দক্ষিণ আনি, সাণ্ড।

৪। ধুনিয়া পালট, জজ্বা, চাপনি, আসর, কোমর, মোটা, অন্তর, বাহেরা, তেওয়ার, সাণ্ড।

“চাপনি” — দক্ষিণ হাঁটুকে দক্ষিণ দিক হইতে একটু বক্রভাবে নিম্নমুখে কাটিয়া ফেলা হয়।

“ধুনিয়া পালট” = দক্ষিণ পদের বাহিরের দিকের গিরার ঠিক মধ্যভাগ হইতে চারি অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে আঘাত করিয়া উর্দ্ধদিক বরাবর সন্ধিস্থল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

“চাকি” = বাম কর্ণের প্রায় তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

“দক্ষিণ আনি” দক্ষিণ স্তনের বোটাকে কেন্দ্র ধরিয়া চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

“দক্ষিণ আনি” প্রয়োগকালে হাতের পিঠ নিজ বাম দিকে, অঙ্গুলীগুলি দক্ষিণ দিকে, কনুইটি নিম্নের দিকে এবং অসির ধারের পিঠ উপরের দিকে থাকে।

“জজ্বা” = দক্ষিণ হাঁটু ও গুল্ফের ঠিক মধ্যদেশ বরাবর প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা :—২য়। “চাপনি” আটকাইবার কালে হাতের

মুঠা কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে ; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। অসির পার্শ্ব দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে হইবে।

“ধুনিয়া পালট” আটকাইবার কালে লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অর্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখ বরাবর ভূমিস্পর্শ করিয়া ভূমির উপরে লম্ব বরাবর থাকিবে।

৩। “চাকি” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম কর্ণের কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ ক্ষুদ্র মোড়ের প্রায় এক হস্ত দক্ষিণ ও কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

প্রকারান্তর :—হাতের মুঠা মস্তকের মধ্যদেশের অর্ধ হস্ত সম্মুখে ও উর্দ্ধে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম ক্ষুদ্র মোড় হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম ও অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবর থাকিবে।

“দক্ষিণ আনি”র প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু নিজ বাম দিক দিয়া উপরে তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। (হলের অনুরূপ)

৪র্থ। “জজ্বা” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে ; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্ন মুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। অসির পার্শ্ব দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে হইবে।

এগারর বাড়ি।

১। শির, হল, গ্রীবাণ, আনি, পালট, ভাণ্ডার, চির, মোড়া, মন, আসর, তামেচা।

২। তামেচা, পালট, উন্টা মোড়া, কোমর, দিগর, তেওয়ার, ভাণ্ডার, হাতকাটি, চাকি, দক্ষিণ আনি, সাণ্ড।

৩। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, আসর, মন, দিগর, করক, মোড়া, তেওয়ার, আনি, বাহেরা।

৪। করক, পিণ্ডি, দিগর, সাকেন, ভাণ্ডার, মন,

ভুজ, উন্টা মোড়া, গ্রীবাণ, উন্টা অন্তর, উন্টা সাণ্ড। (সাণ্ড চপ্.)

“আনি” = বাম হৃদয়ের বটুকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

“দিগর” = দক্ষিণ হাঁটুর ভিতর দিক হইতে ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়।

“পিণ্ডি” = দক্ষিণ হাঁটু ও গুল্ফের মধ্যদেশ বরাবর ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়।

“উন্টা অন্তর” = বাম কর্ণ মূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক ও গলদেশের ঠিক সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন দিয়া বাহির হইয়া যায়।

বর্ণনা :—আনির প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে।

প্রকারান্তর :—অথবা নিজ লাঠি নিম্নমুখ করিয়া রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ বাম দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

২য়। “দিগর” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা নিজ নাভির প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবর ঈষৎ নিম্নে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী বরাবর সম্মুখে থাকিবে।

৩র্থ। “পিণ্ডি” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা নিজ নাভি হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ ও প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে।

“উন্টা অন্তর” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম ক্ষুদ্র-মোড়ের ঈষৎ বাম ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবর থাকিবে। লাঠি উর্দ্ধ মুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্ব বরাবর থাকিবে।

ক্রমশঃ

শ্রী পুলিনবিহারী দাস



“মুসলমানী নাম”

উপরি উক্ত প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, যে, ‘কোন ইংরেজ মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম বেমালুম বদলাইয়া যাইবেই এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না। অধিকন্তু তিনি অনুমান করেন যে মুসলমান মাত্রেই নাম আরবী হইতে হইবে একপ কোন ইসলামিক ধর্মবিধি নাই।’ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমায়ক। প্রত্যেক মুসলমান বালক বালিকাব আরবী ভাষাতে নাম দেওয়া এবং কোন হিন্দু বা অপর কোন ধর্মাবলম্বী মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইলে তাহার পূর্ব নামেব পরিবর্তে মুসলমানী নাম দেওয়া ইসলামিক ধর্মসম্মত। মিষ্টার মার্শাডিউক পিকথল (Mr. Mar.naduke Pickthall) ও মিষ্টার ডি জি আপসন (Mr. D. G Upson) মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইবার সময় ইচ্ছাদেব নামও নিশ্চয়ই পরিবর্তিত করিয়া মুসলমানী নাম রাখা হইয়াছিল। তবে যদি কেহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদেব পূর্বনামেই অভিহিত কবেন, তাহা হইলে সে আলাদা কথা।

লেখক বলেন যে ভারতীয় মুসলমানদেব ভারতীয় ভাষা অনুযায়ী নাম রাখায় কোন বাধা নাই। কিন্তু তাঁহাব একথা যে যুক্তিসঙ্গত নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

রহিমদাদ খাঁ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য। মি: মার্শাডিউক পিকথল ও মি: ডি জি আপসনকে “কেহ” “তাঁহাদেব পূর্বনামেই অভিহিত কবেন” না; তাঁহারা নিজেই নিজেদেব সংবাদপত্রাদিতে ঐ ঐ ইংরেজী নামে অভিহিত কবিয়া থাকেন। পত্রলেখক মহাশয় যদি উক্ত দুই ব্যক্তিব আরবী নামেব উল্লেখ কোথাও পাঠিয়া থাকেন, তাহা হইলে গল্পগ্রহ কবিয়া প্রমাণ সহ তাহা আমাদের নিকট পাঠাইবেন।

বাংলা দেশে মুসলমানদের যাহু সেখ, হাক্ক সেখ, কালু প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। এগুলি সম্পূর্ণ আববী নাম নহে।

‘ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় ভাষা অনুযায়ী নাম রাখার কোন বাধা নাই’, ঠিক একথা আমি লিখি নাই। পত্রলেখক আমার মন্তব্যের, ‘যদি না থাকে, তাহা হইলে,’ এই কথাগুলি ও তাহার পূর্ববর্তী দুটি বাক্য বাদ দিয়াছেন।

জাতীয় ঐক্য ও মিলনের ধারা বজায় রাখিবার জন্ত প্রত্যেক মুসলমানের নাম আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ ও অশ্বাশ্ব আউলিয়া দর্বশ পীরপয়গম্বর শাহমুফি প্রভৃতি সাধুপুরুষদের পবিত্র নামের সহিত যোগ রাখিয়া আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। এরূপ নামকরণ পুণ্যজনক বলিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস। তাই স্ত্রীপুরুষ-নির্কিশেষে পৃথিবীর সব-স্থানের মুসলমানদের ও যে-সকল খৃষ্টান হিন্দু প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পূর্বনাম বদলাইয়া আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের নামে মুসলমানদের নামকরণ না করা বিষয়ে আর-একটা গুরুতর বাধা রহিয়াছে। হিন্দুগণ প্রতিমাপূজক; সুতরাং তাঁহাদের নামগুলিও প্রায় সবই পৌরাণিক গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত ও নানা দেবদেবীর নামানুসারে হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় একমাত্র

আল্লাহর উপাসক মুসলমানের নাম হিন্দুর বহুদেবত্বপ্রাপক নামানুসারে একেবারেই হইতে পারে না। মুসলমানী মতে ইহা সম্পূর্ণ নিন্দনীয় ও ধর্মবিগর্হিত কাজ। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাবে সময় সময় ইহার বাতিকমও লক্ষিত হয়; যথা—সৌদামিনী বেগম, গগন ঠাকুর, মনোহর খাঁ, হরেন্দ্র ভূইঞা, নগেন ইত্যাদি মুসলমানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমানী নামের সঙ্গে খৃষ্টানী নামেব কতকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কাবণ, উভয়ের ধর্মতত্ত্বে কিছু মিল আছে। যথা—David=দাউদ, Eve=হাওয়া, Joseph=উইসুফ, Isaac=ইস্রাক, Jacob=ইয়াকুব, Adam=আদম, Moses=মুছা, Jeshu=ইসা, Abraham=এব্রাহিম, Solomon=সোলেমান, Sara=সারা, Michael=মোকাইল, Sofia=সোফিয়া, Mary=মবিসম, ইত্যাদি। আববী ভাষা ব্যতীত অশ্ব ভাষায় মুসলমানের নামকরণ করা নিন্দনীয় হইলেও এদিক্ দিয়া তাহা কতকটা সমর্থন করা যাইতে পারে।

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন “কোন অশ্ব-ধর্মাবলম্বী ভারতবাসী মুসলমান হইলে তাহার নাম বেমালুম বদলিয়া যায়। কিন্তু মার্শাডিউক পিকথল, জর্জ আপসন প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ মুসলমান হওয়ার পরও তাঁহাদের নাম বদলায় নাই।” [লেখক যে কথাগুলি আমার বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমার নহে।—প্রবাসী সম্পাদক।] এ বাবণা ঠিক নহে, উক্ত মহোদয়দেব সম্পূর্ণ নাম মোহাম্মদ মার্শাডিউক পিকথল ও দাউদ জর্জ আপসন। এরূপ লর্ড হেডলি আল্কারক, প্রফেসর হাবন মোস্তফা লিয়ন, কাপ্তেন মুরাদ্দীন টিফেনসন, ইত্যাদি। একটু লক্ষ্য কবিলে এরূপ নাম হিন্দু হইতে মুসলমানধর্মগ্রহণকারী লোকদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে। যথা—দীন মোহাম্মদ গাঙ্গুলি, বোকনুদ্দীন ঠাকুর, গাজী মাহমুদ ধর্মপাল, ইত্যাদি। অবশ্ব আমরা ব্যক্তিগতভাবে এরূপ খিচুড়ি নামেরও পক্ষপাতী নই। হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতির আয় মুসলমানের নাম রাখার আরও অস্ববিধা আছে। জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক হরেন্দ্র নামক একজন মুসলমান মশ্বকে সে হিন্দু কি মুসলমান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হিরণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক খৃষ্টান প্রফেসর ছিলেন, তাঁহাব নাম দেখিয়া অনেক ছাত্রই তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম কবিতেন। আপসন সাহেব যে মুসলমান তাহা আমরা অনেকদিন পর্যন্ত জানিতে পারি নাই। সুতরাং বিশ্বজোড়া মোসলেমেব বিশ্বজনীনতা ও বৈশিষ্ট্য বক্ষার অনুরোধে আরবী ভাষায় মুসলমানদেব নামকরণের যে আবশ্বকতা ও সার্থকতা আছে সেবিষয়ে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই।

মোহাম্মদ আববুল হাকিম বিক্রমপুরী

সম্পাদকীয় মন্তব্য। বিক্রমপুরী মহাশয়ের দীর্ঘ পত্রের কেবল প্রাসঙ্গিক অংশটি ছাপিলাম। মুসলমানেরা নিজেদের নাম যেরূপই রাখুন তাহাতে আমাদের কোনপ্রকার বিধি বা নিষেধ নির্দেশ করিবার অধিকার নাই। আমরা কেবল ইংরেজ-জাতীয় মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমানদের নামের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখিয়া কিছু আলোচনা ও অনুমান করিতেছিলাম।

বিক্রমপুরী মহাশয় বলিতেছেন, মিষ্টার পিক্‌থলের নামের গোড়ায় “মোহাম্মদ” শব্দটি আছে। আমরা কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। নাইজীস্ সেফুরীতে তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধ দেখিয়াছি; আগেকার বোম্বাই ক্রনিক্লে তাঁহার ছাপা নাম দেখিয়াছি; তাঁহার প্রণীত একটি গল্পের বহি সমালোচনার জন্ত আমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নাম দেখিয়াছি; ঐ বহির সঙ্গে আমার নামে তাঁহার একখানা চিঠি আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর দেখিয়াছি; কিন্তু কোথাও ‘মোহাম্মদ’ নামটি দেখি নাই। সেইরূপ, মুসলমান হইবার আগে মিষ্টার ডি জি আপসন্ ডি জি আপসন্ই ছিলেন, এখনও আছেন; কিন্তু আগে “ডি”টি “ডেভিড”-জ্ঞাপক ছিল, এখন উহা ‘দাউদ’-জ্ঞাপক হইয়াছে। যেমন গোপালচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টিয়ান হইলে জজ্‌ চার্লস্ ঘোষ হইতে পারেন। যাহা হইক, পত্রলেখকদ্বয়ের সব কথাই নিভুল বলিয়া মানিয়া লইলেও, আমার আসল বক্তব্য জান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না। আমি লিখিয়াছিলাম, “কোন ইংরেজ মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম বেমালুম বদলিয়া যাইবেই, এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না।” বিক্রমপুরী মহাশয় যতগুলি ইউরোপীয় মুসলমানের নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিরই এক বা একাধিক শব্দ হইতে মানুষগুলিকে ইউরোপীয় বলিয়া বুঝা যায়; অর্থাৎ নামগুলি “বেমালুম বদলিয়া” যায় নাই। তাহার মানে এই, যে, এই-সব লোক মুসলমান ধর্মের খাতিরে নিজেদের নাম হইতে ইউরোপীয়ত্ব বিলুপ্ত করেন নাই; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান তাঁহাদের নামের মধ্যে ভারতীয় কোন চিহ্নই রাখেন না। যে-সব নামে ভারতীয়ত্ব আছে, সেগুলিকে বিক্রমপুরী মহাশয় খিচুড়ী নাম বলিয়াছেন। তিনি “বিখজোড়া মোস্লেমের বিখজনীনতা” চান, অথচ কোন মুসলমান যে আগে হিন্দু ছিলেন, তাহার কোন চিহ্ন তাঁহার নামে রাখিতে চান না। হিন্দুদিগকে “বিখ”-বহিভূত মনে করিয়া ইউরোপীয়দিগকে “বিখের” অন্তর্গত মনে করিবার কোন কারণ নাই। হিন্দুত্ব-বা ভারতীয়ত্ব-জ্ঞাপক নামগুলিকে অবিখজনীন মনে করিলে, কাজেই বলিতে হয়, মাস্‌ম্যাডিউক্ পিক্‌থল, মুকদ্দিন্ স্টিফেনস্, বিখজনীন নাম নহে। পুরা আরবী নামও আরবদেশীয়, “বিখজোড়া” নহে। কোন ভাষার নামই “বিখজোড়া” বা “বিখজনীন” নহে ও হইতে পারে না। কেন না, কোন ধর্মের বা কোন ভাষার “বিখজনীন” হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিন্দুদের সব নাম দেবদেবীর নাম অনুসারে রাখা হয় না; যথা বিনয়ভূষণ, বিভূষণ, গগনলাল, অতুল, প্রফুল্ল, ইত্যাদি। মুসলমানেরা অবশ্য আরব দেশীয় নামকে ভারতীয় সমৃদয় নাম অপেক্ষা পবিত্রতর মনে করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের ধাণা ভারতের নাম অপেক্ষা ইউরোপীয় নাম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং মুসলমান সমাজ যদি মাস্‌ম্যাডিউক্ পিক্‌থল আদি নাম কাহাকেও রাখিতে দেন, তাহা হইলে অতুল ভৌমিক মুসলমান হইলে তাঁহার নাম সম্পূর্ণ বদলাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এবিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে না।

সাঁতার

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সাঁতার সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার শেষে যে লিখিত হইয়াছে “কিন্তু ছুংখের বিষয় উহাদের মধ্যে বাঙ্গালী খুব কম.....” ইত্যাদি—ইহা ঠিক হয় নাই। অবশ্য কলেজ-স্কোয়ার-ক্রাবে বাঙ্গালী বেশী না থাকিতে পারে, কিন্তু কলেজ স্কোয়ার ক্রাব ছাড়া আরো বহু সম্ভরণ-সমিতি আছে—যেমন সেন্ট্রাল স্‌ইমিং ক্লাব, আহিরীটোলা স্‌ইমিং ক্লাব, লাইফ্‌ স্‌ইমিং সোসাইটি প্রভৃতি। তাহাতে বহু বাঙ্গালী সভ্য আছেন এবং প্রত্যেক বৎসবেই সম্ভরণ-প্রতিযোগিতার ফল দেখিলেই দেখা যাইবে যে বাঙ্গালী-সম্ভান এখন আর তাঁহাদের পিতামাতার অঞ্চল ধরিয়ানাই, প্রত্যেক বৎসবেই তাঁহারা সব বিষয়েই ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। এ বিষয়ে একমাত্র অবাঙ্গালী শ্রীযুক্ত ষারকাদাস মুলজী যাহা কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা বাঙ্গালী মুরারীলাল (পোকা) মুখোপাধ্যায়, যুগলকিশোর গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র ভড়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র দে, শান্তিপ্রিয় পাল, অফুল্লকুমার ঘোষ, সুশীলসুন্দর শীল, আশুতোষ দত্ত প্রভৃতির তুলনায় কিছুই নহে।

সেন্ট্রাল স্‌ইমিং ক্লাবের শ্রীমান্ অফুল্লকুমারের সম্বন্ধে আরও একটু লেখা উচিত ছিল।—ইনি কেবল প্রথম হন নাই, অধিকন্তু সকল বিষয়েই পূর্বেকাল সময়-নির্দেশ (Record) ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা নীচের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পূর্বেকাল সময়-নির্দেশ	অফুল্লকুমারের সময়
১ মাইল (২৭ মিঃ ৯১ সেঃ)	২৫ মিঃ ৪৮ সেঃ
(কলেজ-স্কোয়ার ক্রাবে শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন দে তাঁহাদের Inter-Club Sportএ এই সময়-নির্দেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন)।	

অর্ধ মাইল (১২ মিঃ ৪৩ সেঃ ‘পোকা’ মুখোঃ)	১২ মিঃ ২৯ ^১ / _২ সেঃ
সিকি মাইল (৬ মিঃ ৩১ সেঃ ঐ)	৫ মিঃ ৪৯ ^১ / _২ সেঃ
২২০ গজ (২ মিঃ ৫১ সেঃ সুশীল শীল)	২ মিঃ ৪৪ সেঃ

গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর (৭ই আশ্বিন) তারিখের ১৩ মাইল সাঁতারেও বাঙ্গালী অফুল্লকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ পাল ও রবীন্দ্রনাথ রক্ষিত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহারা তিনজনই সেন্ট্রাল স্‌ইমিং ক্লাবের সভ্য। এক্ষেত্রেও শ্রীমান্ অফুল্লকুমার গত বৎসরের সময়-নির্দেশ ভঙ্গ করিয়াছেন।

ছয় বৎসরের শিশুটি অর্ধ মাইল সাঁতার কাটে নাই, সিকি মাইল কাটিয়াছে। তাহাও বিস্ময়কর বটে।

তামসকুমার মল্লিক



বেলা-শেষের গান—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এম্‌ সি সবকান এণ্ড্‌ সন্স, ৯০। ২ এ হ্যাভিসন বোর্ড, কলিকাতা। ১৭৩ পৃষ্ঠা। এক টাকা ছয় আনা। ১৩৩০।

যে কবির জীবন-বেলা অকালে শেষ হওয়াতে সমগ্র বঙ্গ হাহাকার করিয়াছিল, সেই বাঙালীর প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর কতকংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৪৫টি বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বসেব কবিতা এই পুস্তকে আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার প্রবিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই পুস্তক পাঠক-পাঠিকার নিকট নিশ্চয় সমাদৃত হইবে।

আবোল-তাবোল—শ্রী সুকুমার রায়, বি-এম্‌ সি, এফ্‌-আব্‌-পি এম্‌ কর্তৃক লিপিত ও চিত্রিত। প্রবাসীর আকাবের ৫২ পৃষ্ঠাব বই। বৎচিত্রে ভূষিত। দামের উল্লেখ নাই। প্রকাশক ইউ রায় এণ্ড্‌ সন্স, ১০০ গড়পার বোর্ড, কলিকাতা। ১৩৩০।

সুকুমার রায়ের লেখার সঙ্গে বঙ্গদেশের শিশু-সমাজ সুপরিচিত, ইঁহার অকাল-বিয়োগে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা বিশেষ ক্ষতিগস্ত হইয়াছে। ইঁহার নাশ সময়ের যে সব বঙ্গভাষা রসরচনা "সন্দেহ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলিই সংগ্রহ করিয়া বই ছাপা হইতেছিল; দুঃখের বিষয় সুকুমার-বাবু ইঁহার প্রকাশ দেখিয়া বাইতে পারিলেন না, তাঁহার মরণোত্তর-কালে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। সুকুমার-বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ উদ্ভট আজগুবি অসংলগ্ন কথায় আবোল তাবোল কবিতা-রচনা-পদ্ধতির প্রবর্তক। শিশুবা সংলগ্ন চিন্তাদারা অপেক্ষা অসংলগ্ন আবোল-তাবোল বচনায় আনন্দ অধিক পায়; কল্পকল্প প্রবাহেও এই অনাবিলহাস্যাপূর্ণ রসবচনা সমানই উপভোগ করে। ভাব অসংলগ্ন, ভাষা আবোল-তাবোল হইলেও রচনার বাক্যবীতি বিশুদ্ধ, ছন্দ ও মিল নিপুণ স্বন্দর; এই কবিতা পড়িলে শিশুদেব ছন্দ ও মিল মধুরে জ্ঞান ও ভাষা-শিক্ষা আনন্দের ভিতর দিয়া হইবে। এরূপ বই বাংলাভাষায় এই একমাত্র ও ইঁহা নূতন প্রবর্তনা—এখন ইঁহার বিশেষ প্রচার ও সমাদর হওয়া উচিত।

রমলা—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু। গুণদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্‌ সন্স, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ২৭৬ পৃষ্ঠা। সাত টাকা। ১৩৩০।

মণীন্দ্রলালের রমলা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মণীন্দ্রলাল বড় মিঠা হাতে কবিত্ব-সবস ভাষায় গল্প লিখেন; এই উপন্যাসে তিনি নিছক কবিপনা ও নিছক অর্থোপাসনাব ব্যর্থতা দেখাইয়া উভয়ের সংমিশ্রণে ও সামঞ্জস্যেই যে প্রকৃত সাংসারিক সুখ তাহাই নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের ঝাঁকা মলাটের ছবিটি উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মানসিক প্রবণতা ও সমস্ত ঘটনার একটি ইঙ্গিতপূর্ণ সূক্ষ্ম প্রকাশ।

কবি সেখ সাদী—শ্রী হরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত। অধ্যাপক ডাক্তার হেদায়েৎ হোসেন, পি এচ্‌-ডি লিপিত ভূমিকা। বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, কলিকাতা। ১৩০ পৃষ্ঠা। সচিত্র। শক্ত কাগজের মোটা মলাট। পাঁচ টাকা। ১৩৩০।

ফার্সীভাষার কবিদের মধ্যে কবির সেখ সাদী একজন প্রধান। তাঁহার জীবন যুগ ও বাক্যের পরিচয় এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক বড় ইংবেজী গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংকলন করিয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। লেখক ফার্সী ভাষাভাষী যে জ্ঞানেন না তাঁহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়; গ্রন্থকার ফার্সী ভাষাভাষী হইলে যেকোন শব্দ ও নিভুল বিবরণ দিতে পারিতেন, এপুস্তক মেরূপ হয় নাই, পবেব মূখে ঝাল খাওয়ার গ্যায় ইংবেজী হইতে সংকলিত উপকরণ লেখক নিজস্ব কবিতা আন্তরিকতার সহিত লিপিতে পাবেন নাই। যে সব কবিতার অনুবাদ পড়ে দিয়াছেন তাঁহারও ছন্দ ও মিল সর্বত্র নিপুণ হয় নাই। এই অনুবাদগুলির সহিত বাংলা অক্ষরে ফার্সী মূল দিলে আরো ভাল হইত। গাঁহার নিজে কবির নন, তাঁহাদের উচিত গদ্যে কবিতার অনুবাদ করা। যাহাই হউক, কবি সেখ সাদীর পরিচয় লাভের পক্ষে এই পুস্তক যথেষ্ট সাহায্য করিবে; ৭৭ং অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই পুস্তক হইতে সাদীর জীবন ও কাব্য-পরিচয়ক অপব বড় পুস্তকের নাম জানিতে পারিবেন।

জলধর-গ্রন্থাবলী—রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর। গুণদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্‌ সন্স, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ৬২৪ পৃষ্ঠা। দুই টাকা। ১৩৩০।

এইখণ্ডে জলধর-বাবুর নিম্নলিখিত বইগুলি আছে—

(১) চিত্রাঙ্গি (ভ্রমণ-গ্রন্থাবলী), (২) পাগল (উপন্যাস), (৩) প্রবাস চিত্র (ভ্রমণ), (৪) চোখেব জল (উপন্যাস), (৫) পুরাতন পঞ্জিকা (গল্পগুচ্ছ), (৬) কবির সেখ (উপন্যাস), (৭) আশাবাদ (উপন্যাস সমষ্টি)

জলধর-বাবুর ভ্রমণ-সংগ্রহ প্রসিদ্ধ, উপন্যাস জনপ্রিয়। সুতরাং তাঁহাদের পরিচয় দিতে হইবে না। গাঁহার জলধর-বাবুর লেখা ভালোবাসেন, তাঁহারা একত্রে অনেকগুলি বই এই গ্রন্থাবলীতে পাইবেন।

গ্রন্থাবলীতে একটি খুচীপত্রের নিতান্ত অভাব আছে। অল্প খণ্ডে প্রকাশকেরা এ অভাব রাপিবেন না,—এই আশা ও অনুরোধ।

বাসস্তিকা—প্রথম খণ্ড ১৩২৯।—শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি এল্‌ সম্পাদিত। ডুঃস কুলপ্যাপ ৮ পেজি ১২০ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত্যসভায় পঠিত ছাত্রদের কতকগুলি রচনার সহিত অধ্যাপকদের কয়েকটি রচনার সমষ্টি এই বাসস্তিকা—প্রতিবৎসরের বাসস্তিক ফল। এইবাবকার ফলের ফিবিপ্তি—

১। সুবেব লহর (কবিতা)—শ্রী শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বি-এ—বাক্যবহুল স্বল্পপ্রাণ কবিতা। জগতের সমস্তই মূরে বাঁধা এইটুকু মাত্র বক্তব্য।

২। মধ্য-এশিয়ায় ভাবভীষ সভ্যতা—শ্রী নরেন্দ্রমোহন রায়, বি-এ—সাব্‌ আউরেল্‌ টাইন মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার যে-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন ও অস্বাভাবিক যাকিছু প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া

গিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বহু জাতব্য তথ্যে পূর্ণ ও মনোজ্ঞ।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—পলাশীর যুদ্ধের পব হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ধারা অনুসরণ। ১৮৫০ সালে মেকলের ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন হইলে ১৮৬০ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে নূতন প্রবর্তনের কাল। কিন্তু “১৭৫৭ ষ্ট্রাক্দের পরে একশ’ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বড় বই বাংলায় লেখা হয় নাই।” তার পর মিশনরী-প্রচেষ্টা। বসুন্দরন গোস্বামীর রামরসায়ন ও রাধামাধবোদয় দুখানি “অমূল্য রত্ন।” “রবীন্দ্রের সঙ্গে পুরাণো যুগ বাংলাদেশ হ’তে বিদায় গ্রহণ কবলে।” মাইকেল নবযুগের প্রবর্তক—অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী, নূতন ধরণের নাটক ও প্রহসন বচনা করিলেন, তাঁহার পব বামনাবায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র নাটক বচনায় খ্যাতিলাভ করেন। দীনবন্ধু “হাসির ভিতর দিয়ে বিদ্রূপ বর্ণনে সিদ্ধহস্ত, তাঁর মত কেউ ছিল না।” ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রথম পেশাদারী থিয়েটারের পত্তন ও গিরীশ ঘোষের নাটক অভিনয়। তিনি সংস্কৃত অঙ্গকার-শাস্ত্রের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও নাটকে শাস্ত্রসের অবতারণা করেচেন। “অমৃতলাল বসুর আটোব ধারণা অধিক, তাঁর নাটকের এসব খুঁত নেই।” ১৮৩৮-৩৯ সালে প্রথমে বাংলায় গল্পের বই বের হয়—নব-বাবু-বিলাস ও নব-বিবি-বিলাস,। “এসব বই এখন খুঁজে পাওয়া যায় না।” ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বেতালপঞ্চাবিংশতি”। তার পর গিবীশ বিদ্যারত্নের “দশকুমার-চবিত” তারাশঙ্করের “কাদম্বরী” “বিচিত্রবীর্ঘ্য” “রোমাবতী”। “কল্কাতায় গৌরমোহন আঢ়া প্রথমে ইংরেজী স্কুল খুলেন। ১৮১৭-১৮ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়।” “১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক্ ইংবেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।” “এব পর তৎকালে একটি প্রাইভেট কলেজেব প্রতিষ্ঠা হয় ও কৃষ্ণনগরে গবর্ণমেন্ট একটি কলেজ স্থাপন করেন।” “বাংলায় প্রথম মৌলিক গল্পের বই টেকচাঁদ ঠাকুর ক’ত ‘আলালের ঘরের দুলাল।’ তাব পর তাঁব ‘বামা-রঞ্জিকা’ প্রকাশিত হয়। তাব পর আসিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। ‘ভক্তম প্যাঁচাব নক্সা বইখানি সকলের পড়া উচিত।” “১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়—দ্বিতিন বছর পবে কপালকুণ্ডলা।” “প্রতাপ গোস্বামী এসময়ে ‘বঙ্গাধিপ-পরাজয়’ লেখেন।” “তাব পব সাপ্তাহিক পত্রিকা আকাবে উপস্থাপন বেক্ষে সূক হ’ল।” “লণ্ডন-রহস্য’ ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ এভাবে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়।” “১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হয়। বঙ্গদর্শন বাংলা-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে।” বঙ্গদর্শনের লেখকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অক্ষয়চন্দ্র সবকাব, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম স্তর ঐতিহাসিক উপস্থাপন, বিত্তীয় স্তরে শিল্পকলাব দিকে ঝোঁক—বিশ্ববৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর—দুটো প্রট্ট এক গল্পে জুড়িয়া দেওয়া। ‘বিশ্ববৃক্ষে এচেষ্টা সফল হয়েছে, চন্দ্রশেখরে তা হযর্ন।’ তৃতীয় স্তরে নিখুঁত চরিত্র অঙ্কন ও সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট ফলাইতে চেষ্টা—রজনী, কৃষ্ণবাস্তুর উইল। ‘কৃষ্ণবাস্তুর উইলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা উন্নতির চাম শিগরে উঠেচে। এরকম শ্রেষ্ঠ রচনা আর হয় নাই।’ চতুর্থ স্তরে ধর্মপুস্তক রচনা—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—“এই তিনখানা বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য কম।” উপস্থাপন-জগতে যারা বঙ্কিমবাবুর অনুসরণ করেন তাঁদের মধ্যে এক নম্বর রমেশ দত্ত। বঙ্গদর্শনের অনুসরণ করিয়া দুখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—আর্যদর্শন ও বাঙ্কব।

“বঙ্কিমবাবুর পর অসংখ্য উপস্থাপন লেখা হয়েছে।—প্রথমতঃ—আর্টের দিকে এদের দৃষ্টি নেই। লেখকদের যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধ নেই ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ক্ষমতাও এদের আছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ—

popularityর দিকে দৃষ্টি বেশী। তৃতীয়তঃ—আজকালকার উপস্থাপন moral toneএর বড় অভাব দেখা যায়।”

“গীতিকাব্য বাংলার একচেটিয়া।” “সুদূর বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী প্রচারক পোল-করতাল নিয়ে গান করতে করতে তিব্বত মঙ্গোলিয়া সাইবেরীয়ায় ধর্মপ্রচার কবেছিলেন।” জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস গীতিকাব্যের রাজা। বর্তমানে গীতিকাব্যের রাজা রবীন্দ্রনাথ। “বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম গানের সাহায্য প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-গান প্রাণের আবেগে রচিত হয়েছিল—ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সে গান রচিত হয় নাই। উদ্দেশ্য নিয়ে গান রচনা করলে কি শোচনীয় ফল হয় তার পবিচয় আমরা ব্রহ্মসঙ্গীতে পাই।”

“Highest Art, Highest Morality, Highest Religion একই জিনিষ (যেখানেই এর কোন একটির নির্মূল ও সম্পূর্ণ বিকাশ, সেখানেই অপর দুটি আপনি এসে জুটে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে একটির ভিতর দিয়ে আর-একটিকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয় তখনই সব পণ্ড হ’য়ে যায়। কালিদাস একথাটি খুব ভাল করে’ উপলক্ষ করেছিলেন; তাইতে তাঁব রচনা এত নিখুঁত। তিনি কাব্য লিপ্তেন; তাব ভিতর দিয়ে ধর্ম-প্রচার কবতে চেষ্টা কবেননি; ধর্ম ও নীতি তাঁব লেখায় আপনি এসে জুটেছে।”

শাস্ত্রী-মহাশয় ঐতিহাসিক। এজ্ঞ প্রভু যাহা, পুরাতন যাহাও তাহার সম্বন্ধে তিনি যোগ্য জ্ঞাতবী। যাহা স্বজামান বর্তমান ও নূতন তাহার সম্বন্ধে তাঁহাব মন্তব্য ভ্রমসঙ্কল। বঙ্কিম পববর্তী উপস্থাপন সম্বন্ধে তাঁহাব অশ্রিত নিতান্ত ভ্রান্ত। ব্রহ্মসঙ্গীতেব মধ্যে প্রাণের আবেগে রচিত বসবচনা আছে বারো আনা—চাব আনা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য হিসাবে নিবেস গানও আছে, কিন্তু কোন কিছুব বিচাব কবিভে হয় তাহাব অধিকাংশ দেখিয়াই।

৪। বিদ্য-যাত্রা (কবিতা)—শ্রী উমাপ্রসন্ন দে, বি-এ—mock heroic style।

৫। গোলাপেব জন্মকথা (কথিকা)—শ্রী শশীচন্দ্র বায়

৬। একা (গল্প)—শ্রী নবশচন্দ্র সেনগুপ্ত

৭। স্মৃতিবা (কবিতা)—শ্রী বখীন্দ্রনাথ গুহবায়

৮। মতান্তর প্রমাণ (কাব্যপবিচয়)—শ্রী গিগীশচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ

৯। আবাহন (কবিতা)—শ্রী ভূপেন্দ্রচন্দ্র হাজরা।

১০। বহির্ভারতে ভাবতীয় সভ্যতা—শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি এইচ-ডি—এশিয়া-মাইনব সিরিয়া আর্মেনিয়ান চীন এক গ্রাম আনাম কাঞ্চোডিয়া কোচিন মালয় প্রভৃতি দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিস্তারিত মনোজ্ঞ কোতৃত্বহলোদীপক বহুলতথ্যপূর্ণ স্থলিখিত রচনা—প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্যপাঠ্য।

১১। মহারাষ্ট্রে সামাজিক প্রচেষ্টা (বিবরণ)—শ্রী হেরম্ব ভট্টাচার্য্য, বি-এ—মহারাষ্ট্র দেশে সামাজিক হিতসাধন-চেষ্টার বিবরণ।

১২। পল্লীসমস্যা—শ্রী পারিমল রায়—পল্লীসংস্কার ও পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধীয় আলোচনা।

১৩। বহুরূপী (গল্প)—শ্রী মনমথ রায়, বি-এ।

তিন দফা ছবি আছে। ব্যঙ্গ ও রঙ্গচিত্রগুলি সুন্দর। নরেশ-বাবুর উৎকট ছবিখানি না ছাপিলেই ভালো হইত।

মোটের উপর বাসস্তিকা উত্তম হইয়াছে।

মসূনবী-শরীফ - আবদুল ওয়াহেদ প্রণীত। চট্টগ্রাম নর্ম্যাল স্কুল। ৩৯০ পৃষ্ঠা। দুই টাকা। ১৩৩০।

মওলানা জালালউদ্দীন রুমী একজন ভাবরসিক শ্রেষ্ঠ সূফী ও উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন; তাঁহার ফার্সীভাষায় রচিত মসূনবী কাব্য

পারস্য সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের একাংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন ও বঙ্গবাসী মাত্রেই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। ষাঁহার দেশ-বিদেশের কবিভাবুকতা ও সর্বজনীন সার্বকালিক সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্বের সম্বোগ করিতে উৎসুক তাঁহার এই কাব্য পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

অনুবাদ সাধারণ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে হইয়াছে; এবং মিল সর্বত্র উৎকৃষ্ট হয় নাই।

অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে ফার্সী মূল ছাপিলে মূল ফার্সী ছন্দ-সৌন্দর্য্য বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা উপভোগ করিতে পারিতেন। যদি পুস্তক সুবৃহৎ হইবার ভয়ে তাহা না করা যায়, তবু স্থানে স্থানে বিশেষ কবিত্বমণ্ডিত শ্লোকের মূল দিতে পারা যাইত। ভূমিকায় ফার্সী অক্ষরে মূল শ্লোক কয়েকটি থাকিতে ইহা ফার্সীভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালীর নিকট অধিকতর শ্রীতিকর হইয়াছে।

স্বভাবকবি গোবিন্দদাস—শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রী পরেশমোহন হালদার, বি-এলু, রংপুর, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র। কাপড়ে বাঁধা। দু টাকা। ১৩৩০।

গোবিন্দদাস বাংলাদেশের একজন বড় কবি। তিনি দেশবিদেশে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান নাই, তাঁহার কালচার ব্যাপক ছিল না, তবু তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি ছিল—কবিত্ব তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত, এতদ্বারা তিনি স্বভাব-কবি। তাঁহার কবিত্বে বিশেষত্ব ছিল সরলতা ও পল্লী-জীবনের ছবি এবং স্বদেশ- ও স্বজাতিপ্রীতি। গোবিন্দদাসের জীবন দুঃখে সংগ্রামের নিয়্যাতনভোগের ভিত্তির দিয়া অতিবাহিত হইলেও তাঁহার কবিতা রসমধুর প্রবহমান সুন্দর সুস্বাদু। এই কবির জীবন ও কাব্যের পরিচয় সকলেরই জানা উচিত। এই দরিদ্র ও অনাদৃত কবির জীবনচরিত্র এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত শ্রীত হইয়াছি। আমরা যখন কলেজে ছাত্র ছিলাম, তখন গোবিন্দ দাসের সমস্ত পুস্তক কিমিয়া স্বর্ণমণ্ডিত মরোক্কো চামড়ায় বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলাম—সুতরাং এই কবির জীবনচরিত্র ও কাব্য-পরিচয় পাইয়া আমরা সে সত্য সত্যই হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

মোহন-সুধা—শ্রী শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। প্রকাশক বিপিন্ লাইব্রেরী, ঢাকা। ১১৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র। পাঁচ টাকা। ১৩৩০।

রাজা রামমোহন রায় ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। তিনি মানব-জীবনে আবগুক প্রত্যেক বিষয়ের আদর্শ অবস্থা আপনার অসামান্য মনীষার বলে দেখিতে পাইয়া তাঁহার স্বদেশে সেইসব বিষয়ের প্রবর্তন ও সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল দিকে তাঁহাকে আমরা অদ্বৈতরূপে দেখিতে পাই। সেই মহাপুরুষের জীবনী ও কর্ম-প্রচেষ্টার সকল দিকের পরিচয় এই পুস্তকে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে রাজার বাংলা গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা আছে। ষাঁহার রাজার বড় জীবন চরিত্র পাঠ কবিবার অবসর পান না, তাঁহার এই পুস্তক পাঠ করিলেও রাজাকে বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তের পরিচয়ের প্রভাবে নিজেরাও সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক হইতে পারিবেন।

যুধিষ্ঠির—শ্রী শশিভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১১৪ পৃঃ সচিত্র। এক টাকা। ১৩৩০।

যুধিষ্ঠিরের আখ্যান ও চরিত্র শিশুপাঠ্য কবিত্ব লেখা। যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে বহুগুণের সমাবেশ থাকিতে তিনি ধর্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই আদর্শচরিত্রের আখ্যান শিশুরা পাঠ করিলে, তাহাদের চরিত্র সংগঠনে সাহায্য হইবে। আখ্যান-রচনানীতি একটু সেকেলে, গুরুগম্ভীর সংস্কৃতশব্দবহুল—কিশোর-কিশোরীদিগের পাঠ্য হইতে পারে। ছবিগুলি ভালো।

• মুদ্রারক্ষস

উমাকান্ত (সামাজিক উপন্যাস)—স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী

কর্তৃক বিরচিত। সুন্দর বাঁধান। ২৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গের একগুণের ধর্মনেতা ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার সকল বিশেষত্বই এই উপন্যাসে বর্তমান। অল্প কথায়, অল্পসংখ্যক উপযুক্ত ঘটনার রেখাপাতে, এক-একটি মহামনা মানুষের ছবি আঁকিয়া তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এপুস্তকে তাঁহার সে শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। উমাকান্ত, উমাকান্তের জননী, বৃদ্ধ রামগতি,—ইহাদের প্রত্যেকের চরিত্র এমন মহৎ, ও সে চরিত্র এমন সুন্দর ফুটিয়াছে যে পাঠকের মনে এমন সত্যকার মানুষ দেখিতে ও এমন মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়া উন্নত হইতে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। গ্রন্থকার ইহাদের দোষ ও খুঁতগুলিও ঠিক ইহাদের উন্নত প্রকৃতির অনুরূপ করিয়াই আঁকিয়াছেন। “তিনি যদি কখনও জাতিবিবাদের রণে অবতীর্ণ হন, তবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরে সমগ্র দেহটি রাখিয়া অগ্নিবৃষ্টির স্থায় বাক্যবৃষ্টি করিতে পারেন,”—এই একটি কথায় গ্রন্থকার যে-ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন তাহা একটি দীর্ঘ প্যারাগ্রাফেও অধিক স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। মানুষের এমন তাজা সজীব ছবি নচরাচর উপন্যাসে পাওয়া যায় না। নবযুবক উমাকান্তের মনে প্রথম দায়িত্ব ও গান্ধীধর্মের ভাবের উন্মেষ,—এটি এমন বিষয় যে সহজে কোনও উপন্যাস-লেখক ইহার বর্ণনায় হাত দিতে চাহিবেন না, কিন্তু গ্রন্থকারের হাতে এটি চমৎকাবে ফুটিয়াছে। উমাকান্তের প্রথম পত্নী-সম্ভাসনও অতি সুন্দর ও পবিত্র। সেকেলে বৃদ্ধ রামগতির মহৎ দেখিয়া পাঠক চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিবেন না; উমাকান্তের বাড়ীর মহিলাদের মতই তাঁহাকে বলিতে হইবে, “ওমা, কি মানুষ! কি মানুষ!” ভদ্রযুবক নরেশ পতিতা বিনোদিনীকে প্রেমের শক্তিতে শুদ্ধ করিয়া লইয়া বিবাহ করিলেন। এ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার পাঠককে পাপের স্বাদটি বেশ করিয়া চাখিবাব সুযোগ দিবার জন্ত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে দু'চাবি পাঠা খরচ করেন নাই; অথচ যে-ভাবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে গদয় আর্দ্র ও উন্নত হয়। গ্রন্থকার দায়িত্ববিহীন সাহিত্যবিলাসী কিংবা লেখনীজীবী ছিলেন না, ধর্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কি হইলে একপ নারীকে ভদ্রসমাজে গ্রহণ করা সম্ভব, এ প্রশ্ন তাঁহাকে স্নেহ জীবনে বড়বার মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। এতদ্বারা এ উপন্যাসে তাঁহার কল্পিত এই ঘটনার বিশেষ মূল্য আছে। গ্রন্থকার সাহিত্যিকরূপেও যশস্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উন্নত জীবন ও চরিত্রের বিশেষত্বই তিনি আমরা এই উপন্যাসে তাঁহার নিজের সেই চরিত্রের ও প্রকৃতির (autobiographical traits) জায়া যত অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে, তাঁহার আর কোনও উপন্যাসে ওত পড়ে নাই।

গ্রন্থকারের “বিধবাব ছেলে” ও “উমাকান্ত” ঘটনামাহিমাতে প্রায় এক, কিন্তু “বিধবাব ছেলে”তে নায়কের সদনুষ্ঠানগুলির বিস্তৃত বর্ণনায় দবন্ মানুষগুলি ঝাপসা হইয়া পড়িয়াছিল। এপুস্তকে তাহা হয় নাই। যাহা হউক, উপন্যাস-লেখকগণ গল্পের প্রটটিকে জটিল করিয়া পাঠকের কৌতুহল উত্তেজিত করিবার জন্ত যে-সকল কৌশল অবলম্বন করেন, এপুস্তকে তাহা নাই, ইহাব প্রট প্রায় জীবন-চরিত্রের মতই সরল। কিন্তু সংসারের সাধারণ ঘটনা-বলীর ও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেকগুলি সজীব মহাদয় ও মহৎ চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে আশ্চর্যরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন।

স

বিষ্ণুর দশ অবতার *

হিন্দুদের ধারণা, ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। খৃষ্টান্দের খৃষ্ট ভগবৎপ্রেরিত, ভগবানের পুত্র। মুসলমান্দের মহম্মদ ভগবানের প্রেরিত পুরুষ, ভগবানের সখা। এইপ্রকারে, ভগবানের বা ভগবৎশক্তিবিশিষ্ট পুরুষের পৃথিবীতে আবিভাবে বিশ্বাস পৃথিবীর সভ্য জাতি যাত্রাই দেখা যায়। বাঙ্গলা দেশে আমবা তো অবতারের জ্বালায় বিব্রত, এখানে সেখানে ১০ বছর ১২ বছর অন্তর ভগবান্ কেবল অবতীর্ণই হইতেছেন! এই ব্যাপার কিন্তু অশাস্ত্রীয় নহে, ভাগবতে আছে—অবতারাঃ হুসংখ্যোয়াঃ। তাই চারিদিকে দেগি, কেহ শিবের অবতার, কেহ বিষ্ণুর অবতার, ইত্যাদি।

বিষ্ণুর অবতারই কিন্তু পুরাণে সমাদৃত প্রসিদ্ধ। জগৎ-রক্ষারূপ কাজ সহজ নহে, অনেকটা নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতে হয়। ভগবানের ঠাতের কারিগরী এই বিশ্বটা বড় সুবিধার জায়গা নহে। একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশভক্ত সম্রাসী বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার চেয়ে একটা ভাল বিশ্ব তৈয়ার করিয়া দিতে পারিতেন। এখানে ভোরবেলা রাঁধা ডাল বিকালে টকিয়া উঠে। একটা পরম ধার্মিক শান্তশীল জাতি দেখিতে দেখিতে ছু'পাঁচ শ বছরের মধ্যে তাঁও নৃত্য করিতে করিতে যা'চ্ছে-তাই করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। নিজে হাতে গড়িয়াছেন, ফেলিয়া তো আর দিতে পারেন না, কাজেই বিষ্ণুকে মাঝে মাঝে আসিয়া মিশ্র কথা বলিয়া, বেত পিটিয়া বিদ্রোহী দলকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে পারিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং যে ভগবানের ভুবনভ্রমণে আগমন, ইহারই নাম অবতার।

ঋগ্বেদের আমল হইতেই বিষ্ণুর কামব্যবহার পরিচয় পাই। ব্রাহ্মণগুলিতে তো বিষ্ণুই প্রধান দেবতা হইয়া

পড়িয়াছেন। ইহার পরেই, ইতিহাসে পুরাণে যেখানে যে ব্যক্তি বা উপকথাব নাগক একটু অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, তিনিই বিষ্ণুর অবতার হইয়া পড়িয়াছেন। তাই ভাগবতের উক্তি, অবতারাঃ হুসংখ্যোয়াঃ।

আমরা কথায় কথায় বলি, বিষ্ণুর দশ অবতার। কিন্তু অবতারের সংখ্যা দশে নির্দেশ অনেক পরবর্তী বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পুরাণে মাত্র ছয় অবতারের উল্লেখ আছে। কোথাও সাত অবতার। কোথাও আবার অবতারের সংখ্যা তেইশ-চব্বিশে গিয়া উঠিয়াছে (শ্রীমদ্ভাগবত)। নারদ অবতাব, ব্যাস অবতার, বৃদ্ধ অবতাব, জৈনদেব প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব অবতার, ইত্যাদি।

সংখ্যা যখন দশেই নির্দিষ্ট হইয়া গেল, তখনও কাহাকে কাহাকে ঐ দশ সংখ্যায় ধরা হইবে তাহা ঠিক হয় নাই। মহাভাবতের দক্ষিণভারতীয় সংস্করণে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায় :—

মংস্রাঃ কৃষ্ণো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ ।

রামো-রামশ্চ বামশ্চ বুদ্ধঃ কঙ্কীতি তে দশ ॥

ঠিক এই তালিকাব অনুযায়ী এবং অবিকল প্রায় এই ভাষাতেই একটি শ্লোক বাঙ্গলা দেশে অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্লোকটির মূল যে কোন পুরাণ, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। * যাহা হউক, বাঙ্গলা দেশে অবতার-গণনায় এই তালিকাই প্রধানতঃ অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু ব্যতিক্রম যে একেবারে হয় নাই, তাহা নহে।

বাঙ্গলা দেশে যেখানে সেখানে কাল পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সমস্তই প্রাঙ্-মুসলমান যুগের। এই মূর্তির বামাধঃ, বামোঙ্ক, দক্ষিণোঙ্ক ও দক্ষিণাধঃ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম থাকে। এই মূর্তিগুলির চালেতে সময় সময় দশ

* লেখক কর্তৃক সংকলিত এবং অনতিবিলম্বে প্রকাশিতব্য "Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculpture in the Dacca Museum"এর এক অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত।

* ঐ শ্লোকটি বরাহপুরাণে আছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

অবতারের মূর্তি অঙ্কিত থাকে। বিষ্ণু-পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট আর-একরকম প্রস্তর-শিল্পের নমুনা বাঙ্গালাদেশে পাওয়া যায়। আমি এগুলির বিষ্ণুপট্ট নামকরণ করিয়াছি। চতুর্দশ বৎসরের প্রবাসীর ভাঙ্গ সংখ্যায় “দশ অবতার প্রস্তর” নাম দিয়া এইগুলি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পাচ-সাত ইঞ্চি দীর্ঘ, ঐরকম প্রস্তর, এবং ইঞ্চিখানেক বেদের মাপে এই পাথরের পাটাগুলি তৈয়ার হইত। এগুলির এক দিকে বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদির মূর্তি এবং অপর পিঠে দশ অবতারের মূর্তি খোদিত থাকিত। রাজসাহীর যাদুঘরে, ঢাকার যাদুঘরে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইগুলির নমুনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে আমার একখানা এইরূপ পাটা আছে। এই বিষ্ণুপট্ট-গুলি হইতেও দশ অবতারের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ধরা হইত এবং কাহার পবে কাহাকে বসান হইত, তাহা জানা যায়।

জয়দেব (আনুমানিক ১১৭০ খৃঃ) গীতগোবিন্দে বিখ্যাত দশ-অবতার-শ্লোকে উপরিউল্লিখিত শ্লোকের মংগল কৃষ্ণা বরাহশচ ইত্যাদি তালিকারই অনুসরণ করিয়াছেন। বিষ্ণুমূর্তি ও বিষ্ণুপট্টগুলিও অধিকাংশই জয়দেবের সময়ের—অর্থাৎ পাল-সেন-বর্ম্ম রাজাদের আমলের—তৈয়ারী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অনেক বিষ্ণুমূর্তিতে রামের পরে পরশুরামের স্থান দেখা যায়। কেন যে এই-রকম ভুল শিল্পীরা করিত তাহাব ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। পরশুরামের পবে রামের আবিভাবের মত একটা সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে শিল্পীরা জানিত না, ইহাই কি ধরিয়া লইতে হইবে? যদি তাহাই হয়, যাহাবা শিল্পীদের নির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত কিনিয়া লইতেন তাহারা সকলেই তো আর মূর্খ ছিলেন না? তাহারা এমন ভ্রমপূর্ণ মূর্তি স্থাপনার্থ কিনিতেন কেন? ঢাকা-মিউজিয়মে দুখানা বিষ্ণুপট্ট আছে, দুখানাই বিক্রমপুরের খিলপাড়া দেউলে প্রাপ্ত। এই বিষ্ণুপট্ট দুখানিতেও পরশুরামকে রামের পরে দেওয়া হইয়াছে। আর দুখানা বিষ্ণুপট্ট পাওয়া যায় রামপালের দক্ষিণাংশে স্থিত একটা পুকুর কাটিতে। এ দুখানাও ঢাকা-মিউজিয়মে আছে। উহাদের একখানাতে

পরশুরাম বাদ পড়িয়াছেন, আর একখানাতে বলরাম বাদ পড়িয়াছেন। উহাদের স্থানে দেখা দিয়াছেন ত্রিবিক্রম অর্থাৎ একবার বামন-মূর্তি খোদিয়া তাহার পরে আবার বামনের আকাশে-এক-পা-তোলা লীলা-মূর্তি খোদিত হইয়াছে।

আর-একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কৃষ্ণভক্তের দেশে, এই রাই-কানু-প্রেমগীতি-প্লাবিত দেশে, কৃষ্ণ কোথাও অবতার-রূপে প্রদর্শিত হন নাই! এমন কি গীত-গোবিন্দেও না। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণস্ব ভগবান্ স্বয়ং এই শাস্ত্রবাক্য অমৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ জয়দেব গোস্বামীর মতে দশ অবতার কৃষ্ণেরই অবতার। কিন্তু কৃষ্ণের অংশাবতাররূপে প্রসিদ্ধিও শাস্ত্রেই আছে। বাঙ্গালায় বর্ম্মরাজারা পরমবৈষ্ণব ছিলেন। ভোজবর্ম্মের বেলাব-লিপিতে চন্দ্রবংশ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে।

সোপীং গোপীশত কেলিকারঃ

কৃষ্ণে মহাভারত সূত্রধারঃ।

অ [১] দ্যঃ * পুমানংশরুতাবতারঃ

প্রাভূভবোদ্ধত ভূমিভারঃ ॥

— *Dacca Review*, July, 1912, *JASB*, 1914, p. 127. E. I. XII, p. 39.

(অনুবাদ)

সেই কৃষ্ণ যিনি এই পৃথিবীতে শত শত গোপী লইয়া কেলি করিয়াছেন, যিনি মহাভারতের সূত্রধারস্বরূপ, যিনি আদ্য পুরুষের অংশরুত অবতার, যিনি ভূমিভার হরণ করিয়াছিলেন, তিনিও (এই বংশে) প্রাভূভূত হইয়াছিলেন।

এই শ্লোকের মূল উৎস ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ও ২২শ শ্লোক দুইটি বলিয়া মনে হয়। ঐ শ্লোক দুইটিতেই কৃষ্ণের অংশাবতরণ ও ভূমিভারহরণের প্রসঙ্গ আছে। পরমবৈষ্ণব ভোজবর্ম্মের বেলাব-লিপিতেও যখন কৃষ্ণের অংশাবতার স্বীকৃত হইয়াছে, তখন মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে হয়ত এই

* ‘আদ্যঃ’ আমার পাঠ। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত দ্বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থাৎ এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আদ্যঃ পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

অংশাবতরণপ্রসিদ্ধির জগুই বর্ম-সেনদের আমলের শিল্পী-
গণ কৃষ্ণকে অবতারের তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন।

প্রায় প্রত্যেক অবতারেরই এক-একখানা পুরাণ বা
উপপুরাণ আছে,—মৎস্য পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
নৃসিংহ পুরাণ, বামন পুরাণ ইত্যাদি। রামায়ণ ও
মহাভারত ইতিহাস বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ও-দুখানাও
প্রকৃত পক্ষে পুরাণ,—একখানা রামের পুবাণ, একখানা
কৃষ্ণের পুরাণ।

অবতারসমূহের ঐতিহ্য নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত
হইল।



বিক্রমপুরে প্রাপ্ত মৎস্যাবতার মূর্তি

মৎস্যাবতার

মৎস্যাবতারের কাহিনী প্রথমে শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখা
দেয় (১৮)। মানবের আদি পিতা মনু একদিন হাত
ধুইবার সময় দুইহাতের মধ্যে এক ক্ষুদ্র মৎস্য পাইলেন।
মৎস্য বলিল, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমিও
আপনাকে রক্ষা করিব।

মনু। কি হইতে আমাকে রক্ষা করিবে ?

মৎস্য। জল-প্লাবনে এই সমস্ত স্থল ভাসিয়া যাইবে,
আমি সেই প্লাবন হইতে আপনাকে রক্ষা করিব।

মনু। তোমাকে কিরূপে রক্ষা করিব ?

মৎস্য। যতদিন ছোট থাকি ততদিনই আমাদের
বিপদ,—অল্প মাছে ধরিয়া ধরিয়া খায়। আপনি আমাকে
প্রথমে একটা হাড়ীর মধ্যে রাখুন, বড় হইলে একটা পুকুর
কাটিয়া তাহাতে রাখিবেন, আরও বড় হইলে সমুদ্রে
ছাড়িয়া দিবেন, তখন আর কেহ আমার কিছু কবিত্তে
পারিবে না।

মৎস্য শীঘ্রই বড় হইয়া উঠিল। একদিন সে মনুকে
বলিল,— বৎসরের মধ্যেই জল-প্লাবন হইবে, আপনি
নৌকা প্রস্তুত করুন। প্লাবন আসিলে নৌকাতে উঠিয়া
আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি প্লাবন হইতে আপনাকে
উদ্ধার করিব।

প্লাবন নির্দিষ্ট সময়ে আসিল। মনু নৌকাতে উঠিয়া
মৎস্যকে স্মরণ করিলেন। সেই বিপুলকায় মৎস্য নৌকার
নিকটে ভাসিতে লাগিল। মনু মাছেব শিংয়েব সহিত
দড়ি দিয়া নৌকা বাঁধিলেন। মৎস্য নৌকা টানিয়া উত্তর-
গিরিতে গিয়া লাগাইল। এইরূপে জলপ্লাবনে মনু রক্ষা
পাইলেন।

শতপথ-ব্রাহ্মণের এই গল্প পুরাণে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছে,—তথায় দেখা যায় মনু সমস্ত প্রাণীর এক
এক জোড়া, বৃক্ষলতাদির বীজ এবং বেদসমূহ লইয়া
নৌকায় উঠিয়াছিলেন। ইহা হইতেই মৎস্যাবতারে বিষ্ণুর
বেদ উদ্ধার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে মৎস্য ব্রহ্মার
অবতার, কিন্তু মৎস্য, ভাগবত, ও অগ্নিপু্রাণে মৎস্য বিষ্ণুর
অবতার হইয়াছেন।

স্মরণীয় যে, জলপ্লাবন-কাহিনী পৃষ্ঠানদের বাইবেলেও
আছে এবং তাহা পুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ।



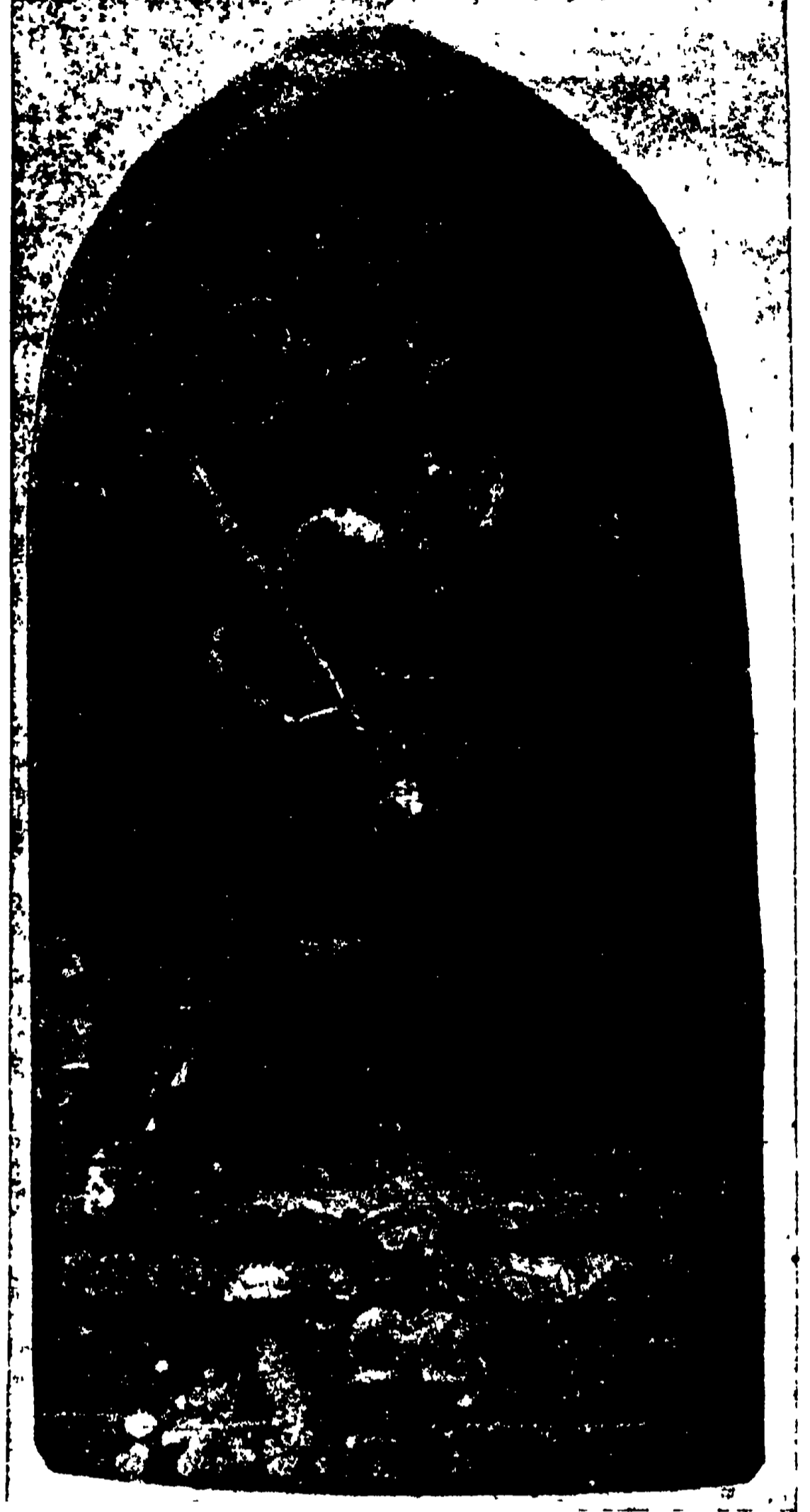
বরাহ অবতার
[ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত]

কুর্মা অবতার

কুর্মা অবতার-কাহিনীর মূল ৩ শতপথ-ব্রাহ্মণ (৭.৪, ৩, ৫)।

“স যৎ কুর্মো নাম এতদ্বা রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা
অপৃজত। যদপৃজত অকরোৎ তদ্যদকরোৎ তস্মাৎ
কুর্মঃ। কশ্যপো বৈ কুর্মস্তস্মাদাতঃ সর্কঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য
ইতি। স যঃ স কুর্মোহসৌ স আদিত্যঃ।

(অনুবাদ) প্রজাপতি কুর্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা
সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ করিয়াছিলেন।
করিয়াছিলেন তাই তিনি কুর্ম। কশ্যপ (কচ্ছপ) অর্থে
কুর্ম বুঝায়, তাই এই জীবগণকে কাশ্যপ্য বলা হয়।
যিনি সেই কুর্ম, তিনিই আদিত্য।



রাণীগাটিতে প্রাপ্ত বরাহ অবতার-মূর্তি

এই ক্ষুদ্র শাস্ত্রোক্তিটিতে পুরাণ-কাহিনী-সৃষ্টির অনেক
বীজ লুক্কায়িত আছে। আজ সেই-সমস্তের আলোচনার
দরকার নাই। দ্রষ্টব্য শুধু এই যে এখানে প্রজাপতির
কুর্মরূপ ধারণ করার প্রসঙ্গ আছে। সেই কুর্মকেই আবার
আদিত্য বলা হইয়াছে। বিষ্ণু এক আদিত্য। ক্রমে
পুরাণে কুর্ম বিষ্ণু অভিন্ন হইয়া উঠিলেন।

অমৃতোদ্ধারের জন্তু দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন-কালে
কুর্মরূপী বিষ্ণু মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বতের তলে যাইয়া তাহা
ধারণ করিয়াছিলেন। কুর্ম পুরাণের প্রথম অধ্যায়
দেখুন।

বরাহাবতার

পৃথিবী সমুদ্র-জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল,
সে সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত। কেহ বলেন, অতিরিক্ত



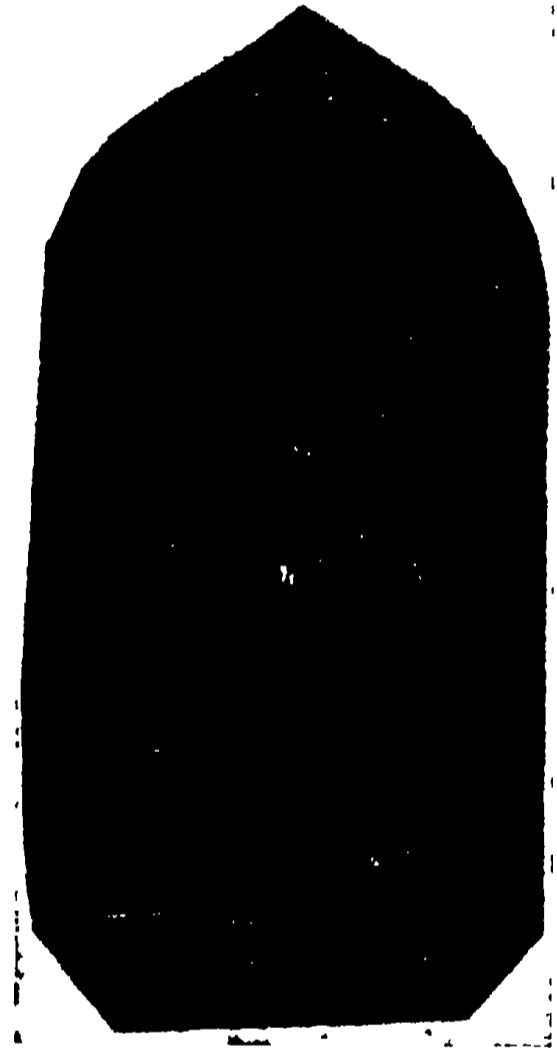
টঙ্গিবাড়ী নৃসিংহাবতার

লোকের ভারে। কেহ বলে, পাপীষ পাপের ভারে। কেহ বলেন, প্রলয়-জলে। কেহ আবার বলেন, বিষ্ণুর অসহ্য তেজে। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, প্রজাপতি বরাহ-রূপে দাঁতে খুঁড়িয়া পৃথিবীকে জলের উপরে ভাসাইয়া তুলিয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই বরাহের নাম এম্ব। লিঙ্গপুরাণেও দেখা যায়, প্রজাপতিই বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণকার বলিয়াছেন, প্রজাপতি ও নারায়ণ অভিন্ন। এইরূপে বৃদ্ধ প্রজাপতির এই অবতারটিও অপেক্ষাকৃত নব দেবতা বিষ্ণু আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

নৃসিংহাবতার

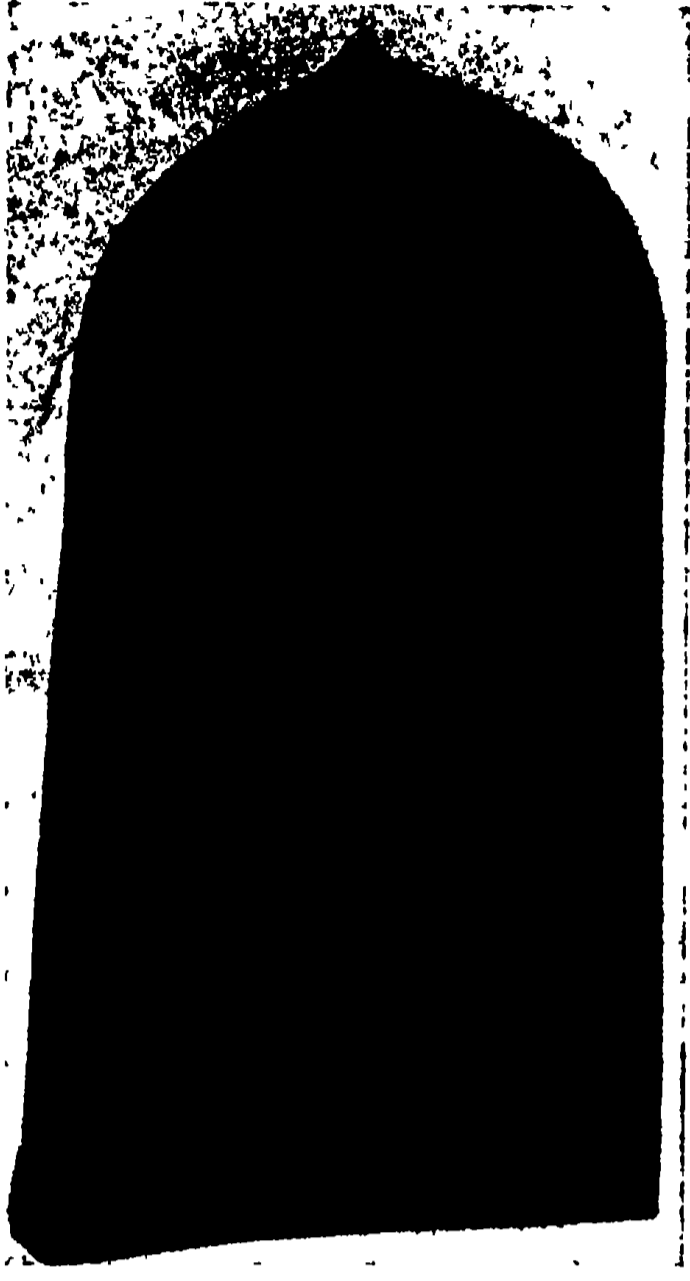
নৃসিংহাবতারের কাহিনী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। প্রহ্লাদের গল্প অনেকেই জানেন। প্রহ্লাদের পিতা

হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নাম শুনিতে পারিতেন না, প্রহ্লাদ কিন্তু 'ক'তে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হন! তাই আমরা কথায় বলি, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! হিরণ্যকশিপু পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বিষ্ণু কোথায় আছে? ভক্ত প্রহ্লাদ বলিলেন, তিনি সর্বত্রই আছেন। নিকটে ছিল একটা পাথরের স্তম্ভ। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে এই পাথরের স্তম্ভেও আছে? প্রহ্লাদ বলিলেন, নিশ্চয়ই আছেন। বিষ্ণুদেবী হিরণ্যকশিপু দৌড়িয়া গিয়া স্তম্ভে লাথি মারিলেন। অগ্নি সেই স্তম্ভ ফাটিয়া গেল, তাহা হইতে বিষ্ণু অর্ধসিংহ অর্ধ মাকুষ আকৃতিতে ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে বাহির হইলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে নখরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।



বৈষ্ণব আথ বায় নৃসিংহাবতার

এই গল্পও সমস্ত পুরাণে একরকম নহে। কোন কোন পুরাণে স্তম্ভ ফাটিয়া নৃসিংহের আবির্ভাবের গল্প নাই। সম্মুখ-যুদ্ধে নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ভাগবতে দেখা যায়, হিরণ্যকশিপু স্তম্ভকে লাথি মারেন নাই, মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের নৃসিংহমূর্তিতে কিন্তু হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে লাথি মারিতেছেন, মূর্তির এক ধারে ক্ষুদ্রাকারে এই দৃশ্য দেখান হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের মূর্তিতত্ত্ববিৎ ৬ গোপীনাথ রাও লিখিয়া গিয়াছেন, লাথি মারাব কথা পদ্মপুরাণে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের



বৈষ্ণব আখড়ায় স্থিত নৃসিংহাবতার-

পদ্মপুরাণে কিন্তু লাথি মারার কথা খুঁজিয়া পাইলাম না।* বঙ্গবাসী সংস্করণের পদ্মপুরাণে আছে, হিরণ্যকশিপু তরবারি দ্বারা স্তম্ভে আঘাত করিলেন।

বৈদিক তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ আছে।

বামনাবতার

প্রহ্লাদের পুত্র বৈরোচন তাঁহার পুত্র বলি। বলি প্রবল হইয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দখল করিয়া লইলেন। তখন বিষ্ণু হৃষিকায় ব্রাহ্মণের রূপে বলির নিকট যাইয়া শুধু ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন। বলি ভিক্ষা দিলেন। তখন বামনরূপী বিষ্ণু এক পদে আকাশ ও একপদে পৃথিবী আবৃত করিয়া ফেলিলেন। আর এক পা রাখিবার আর যত্নগা নাই, তাহা বলির মস্তকে রাখিলেন এবং পা দিয়া ঠেলিয়া বলিকে পাতালে পাঠাইয়া দিলেন। এই গল্প অনেক পুরাণেই আছে, কোন কোন পুরাণে বলির দানের উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুর তিন পাদবিক্ষেপ বেদের আমল হইতেই

* এই লাথি মারার কথা কোন্ পুরাণে আছে, কেহ জানিলে দয়া করিয়া পোঃ রমনা, ঢাকা, এই ঠিকানায় লিখিয়া জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।—লেখক।



ঢাকা মির্জায়ামর বামনাবতার

প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ আচমনের ঋক্‌মন্ত্র, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্চাৎ সুর্যঃ দিবীং চক্ষুরাততম্, মনে করিতে পাবেন। বিষ্ণু (অর্থাৎ সূর্য) তিন পাদ নিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম করেন। সন্ধ্যা হইতে সকাল এক পা, সকাল হইতে দুপুরে এক পা আর দুপুর হইতে সন্ধ্যায় এক পা ফেলা হয়। আচমনে পরমং পদং অর্থাৎ সর্বোচ্চ পাদবিক্ষেপের (দুপুরের) কথা বলা হইয়াছে।

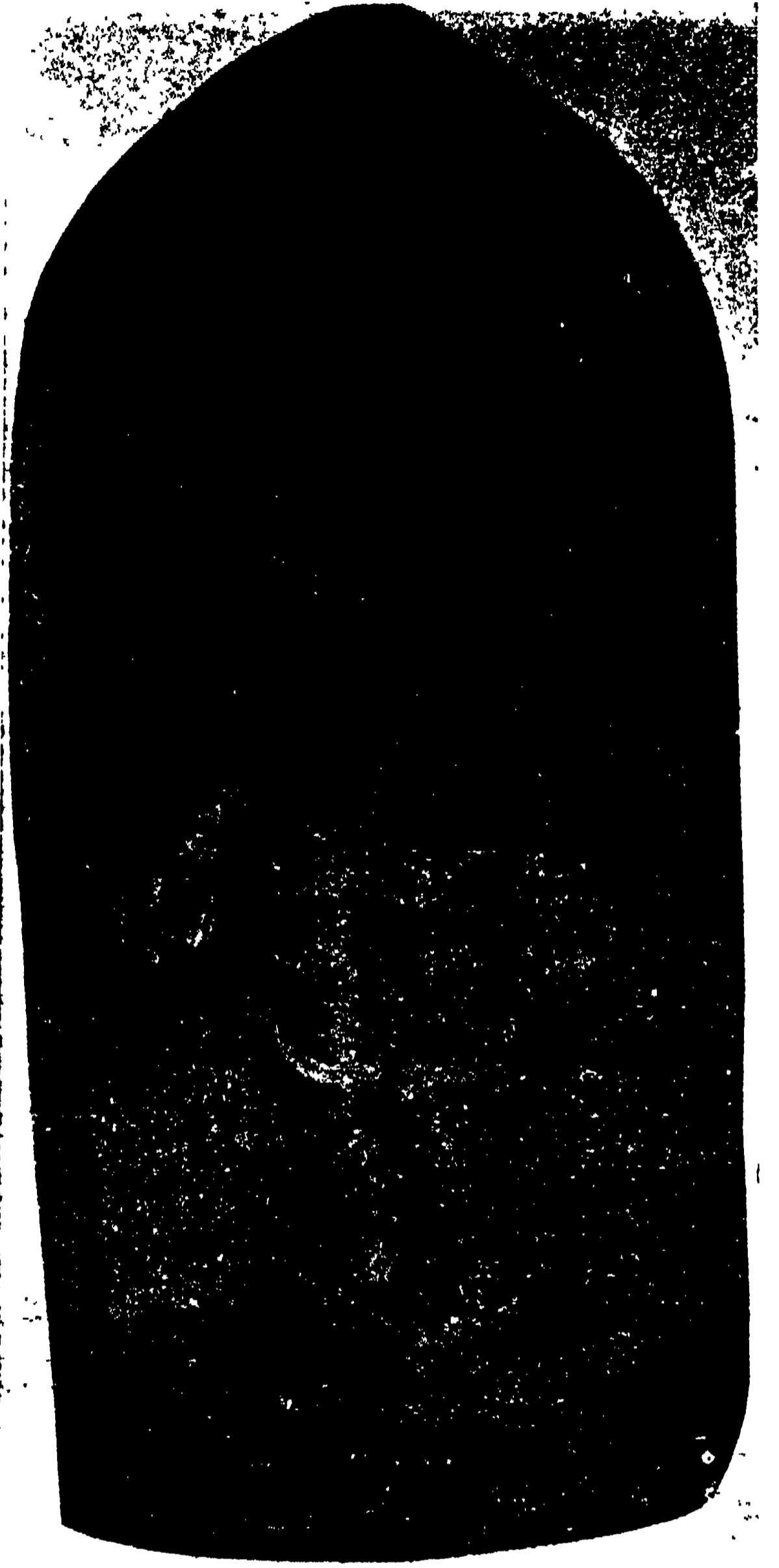
শিবশিবস্পর্শিত ক্ষত্রিয়দের দমন করিবার জন্ত ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

স্বামের গল্প সকলেই জানেন।



বৈষ্ণব আখড়ায় বামনাবতার

বলরাম যে কি করিয়া অবতাররূপে গ্রাহ্য হইলেন তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি দিবানিশি মদে চুর হইয়া থাকিতেন। পুরাণে তাঁহার কোন একটা বড় কাজের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। লাক্ষ্মণ তাঁহার প্রধান অস্ত্র। মদের ঝোঁকে একবার যমুনা-নদীকে নিকটে আসিতে ডাকিয়াছিলেন। যমুনা আসিল না দেখিয়া হল বিধিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন।



রাণাহাটিতে প্রাপ্ত পরশুরাম মূর্তি

বুদ্ধকে অবতার-রূপে কল্পনা হিন্দুধর্মের জীবনী-শক্তি ও উদারতার পরিচায়ক। কিন্তু পরবর্তী পুরাণ-কারগণ পূর্বপুরুষের এই কীর্তিটি লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধরূপে বিষ্ণু অশুরদিগকে নাস্তিক্যবাদ শিখাইয়া নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কঙ্কি এখনও অবতার হন নাই। কলির শেষে কঙ্কি আবির্ভূত হইবেন এবং ম্লেচ্ছ নিধন করিবেন।

এই গেল অবতারের কাহিনী। এখন অবতার-

গুলির পাথরের মূর্তির কথা একটু বলি। বাঙ্গলাদেশে বরাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতারের মূর্তিই বেশী পাওয়া যায়। বিক্রমপুরে একটি অপূর্ণসুন্দর মংস্র অবতারের মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, নীচে তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইল। একটি পরশুরাম-অবতারের মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি মূর্তিই অসাধারণ। দ্বিতীয় একটি মংস্র বা দ্বিতীয় একটি পরশুরাম বাঙ্গলার কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। বুদ্ধ মূর্তি অবশ্য বাঙ্গলা দেশে অনেকই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ওগুলিকে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের মূর্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

উপরে যে মংস্রাবতারের মূর্তির উল্লেখ করিয়াছি উহা বিক্রমপুরে, রামপালের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। মূর্তিখানি কাল পাথরের, প্রায় তিন ফুট উচ্চ। চিত্রে দেখা যাইবে, মূর্তিখানি খুবই সুন্দর, পাকা কারিকরের হাতের তৈয়ারী।

বিক্রমপুরে বরাহমূর্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। দুখানার ছবি দিলাম। চালভাঙ্গাখানি ঢাকা-মিউজিয়মে আছে। বরাহের উখিত বাম কনুইর উপর অঞ্জলিবদ্ধহস্তা ভয়কম্পিতা পৃথিবীর মূর্তি থাকে। সময় সময় বরাহের বিস্তৃত পদদ্বয়ের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি শূকরমূর্তি উৎকীর্ণ থাকে; শূকরটি যেন জলের নীচে পৃথিবীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ঢাকা-মিউজিয়মের মূর্তিখানায় পৃথিবীর মূর্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নীচে শূকরও নাই, বরাহাবতারের দ্বিতীয় মূর্তিখানাতে পৃথিবী ও শূকর দুই আছে। ঢাকা-মিউজিয়মের মূর্তিখানাও ভাঙ্গিয়া খুব ভাল। দ্বিতীয় খানাও মন্দ নহে। উহা বিক্রমপুর রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া যায়।

মংস্রপুরাণে অষ্টবাহু নৃসিংহমূর্তি নির্মাণের বিধি লিপিবদ্ধ আছে। ঢাকা-মিউজিয়মে একখানা নৃসিংহ আছে, উহা চতুর্ভুজ। বিক্রমপুরে আরও বহু নৃসিংহ-মূর্তি আছে। টঙ্গিবাড়ী-বাজারে এক বটগাছের নীচে একখানা ছয়হাতওয়াল নৃসিংহ আছে। তাহার ছবি দেওয়া হইল। বিক্রমপুরে এক বৈষ্ণব-আখড়ায় কয়েকখানি নৃসিংহমূর্তি আছে। সবগুলিই ছয়-হাতওয়াল। আটহাতওয়াল নৃসিংহ পূর্ববঙ্গে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ঢাকা-মিউজিয়মে একখানা অতি সুন্দর বামন-অবতারের মূর্তি আছে। বামনের এক পা আকাশে উখিত। পায়ের নীচে দেখান হইয়াছে, বলি বসিয়া দান করিতেছেন, ছত্রধারী বামন দাঁড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন, ভৃত্য ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিতেছে, সেই জলে দান শুদ্ধ হইতেছে।

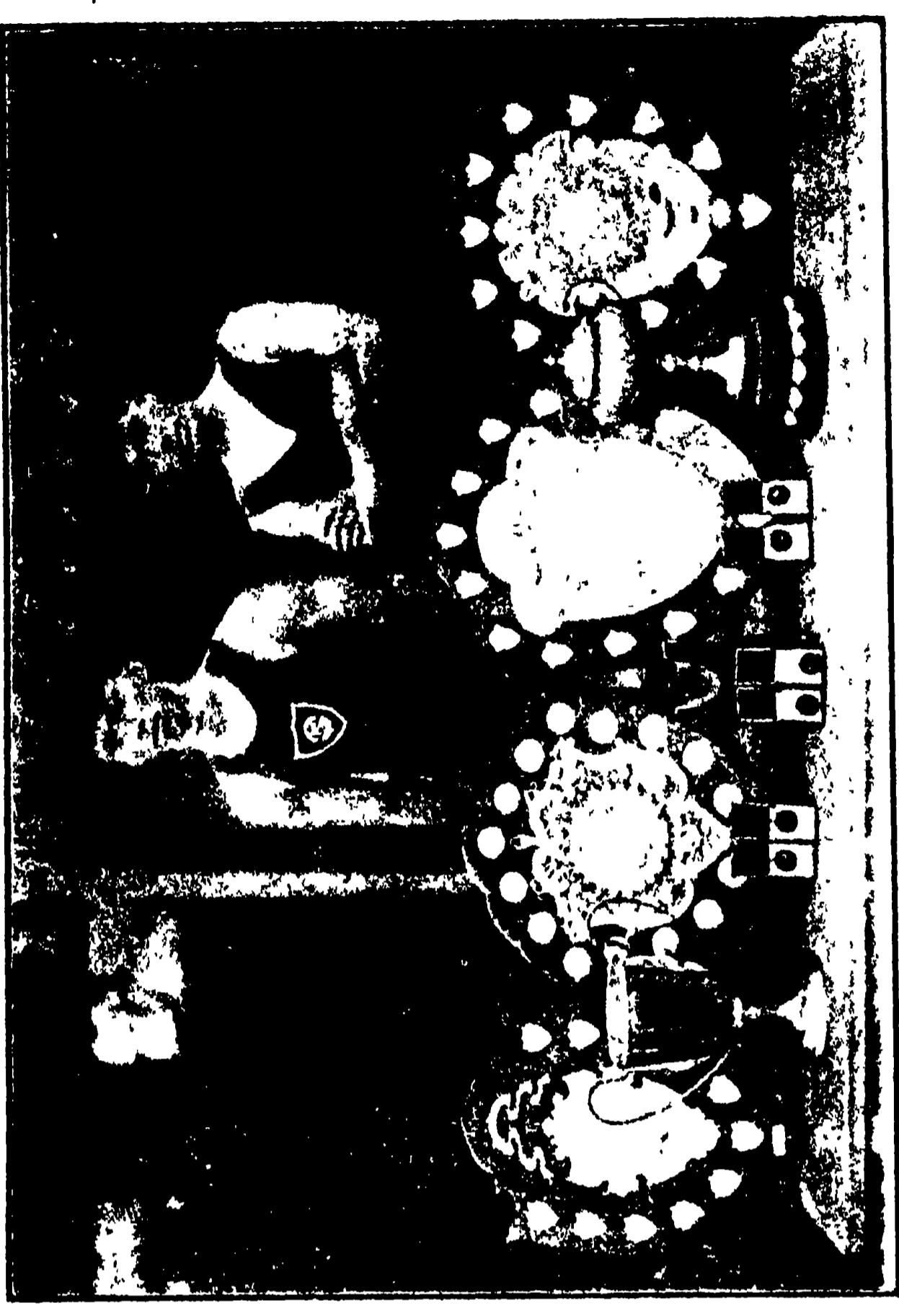
পূর্বোক্ত বৈষ্ণব আখড়ায় প্রায় ছয় ফুট উচ্চ একখানা বামন-অবতারের মূর্তি আছে। ইহাও কাল পাথরে তৈয়াবী ও প্রচুর-কারুকায্য-সমন্বিত। নীচে ১১শ-১২শ খৃষ্টীয় শতাব্দীর অক্ষরে 'ন মো বা' এই অক্ষর কয়টি লিখিত আছে। বোধ হয়—নমো বামনায় লিখিত হইতেছিল। অক্ষকার মন্দিরের মধ্যে মূর্তিখানি রাখা হইয়াছে, তাই ভাল ফটোগ্রাফ উঠে নাই।

পূর্বোক্ত পরশুরাম-মূর্তিখানা বিশেষত্ব-বর্জিত। বিষ্ণুর গদার স্থানে হাতে পরশু। অতি সাদাসিধা মূর্তি। এখানিও রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী

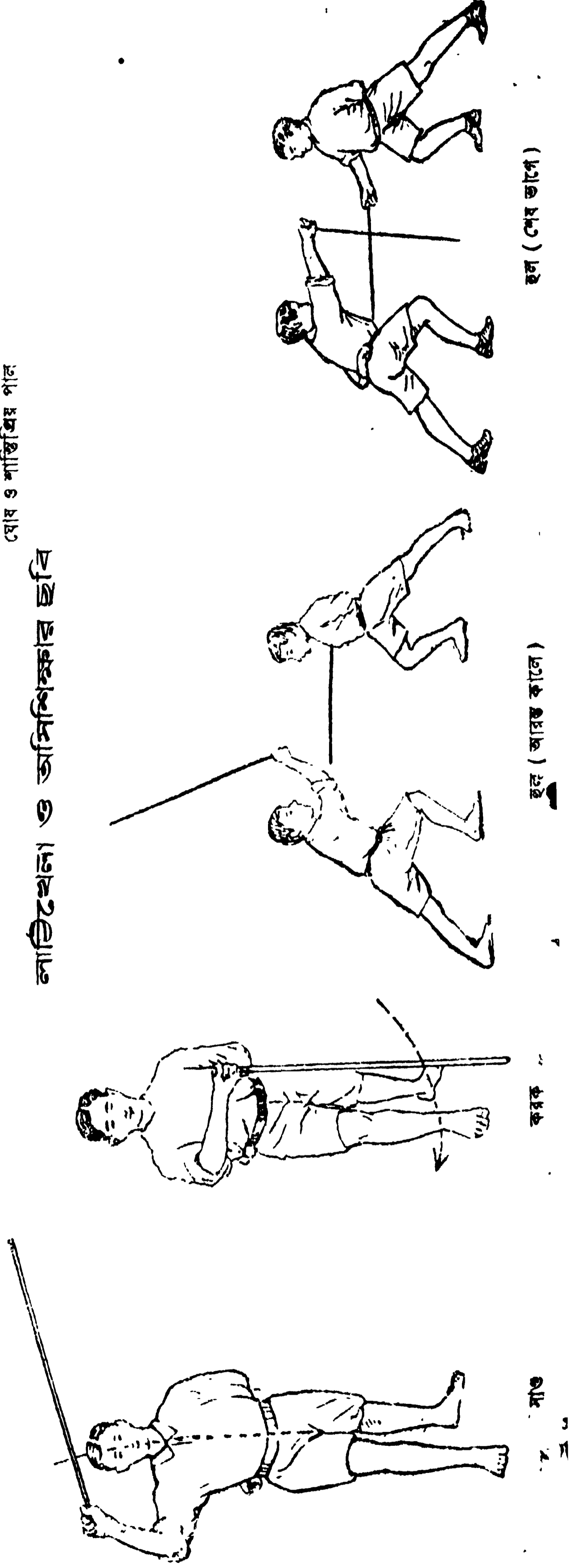


১০ নাইল সাতারের প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় - শ্রী যুক্ত
 অক্ষয়কুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ পাল ও রবীন্দ্রনাথ বসু
 (দক্ষিণ দিক হইতে যথাক্রমে)



এক নাইল, ৬ মাইল ও ২২০ গজ সাতারের প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় - শ্রী যুক্ত
 অক্ষয়কুমার ঘোষ ও শান্তিপ্রিয় পাল

লাডিংখেল) ও অসিগিম্কার ছবি

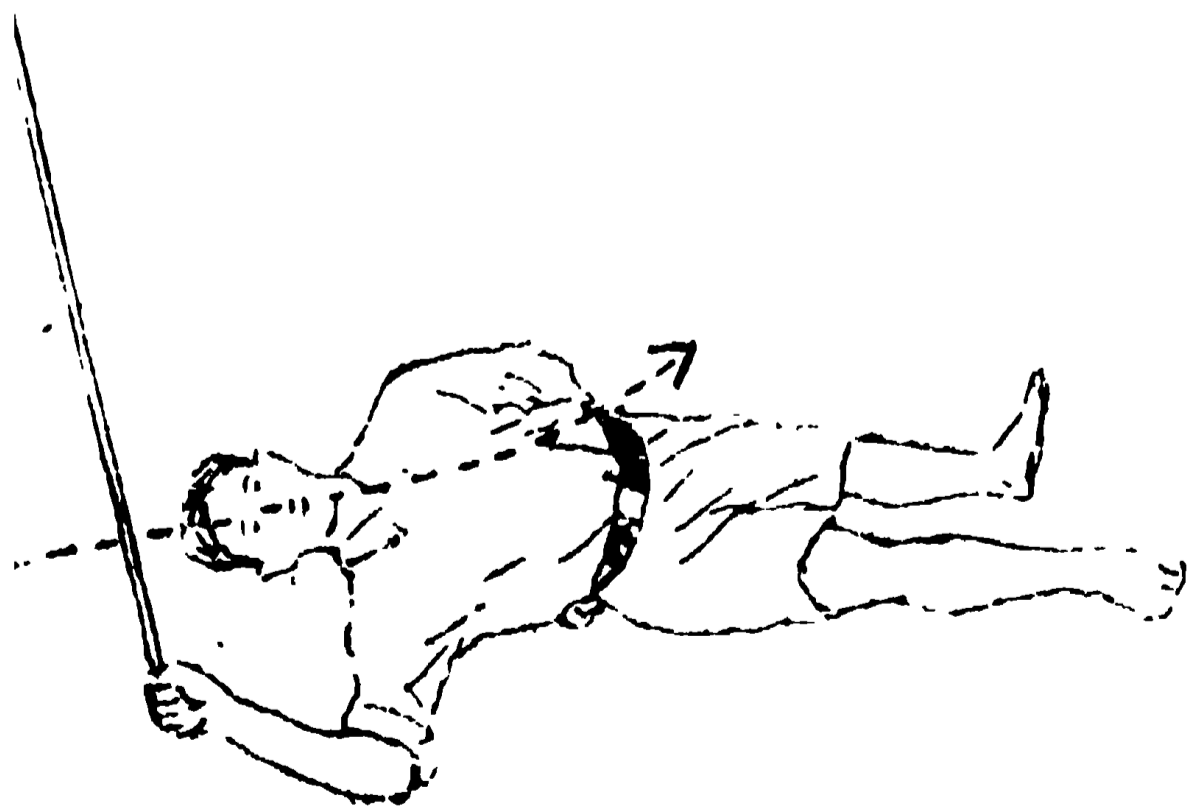


১১ মাও

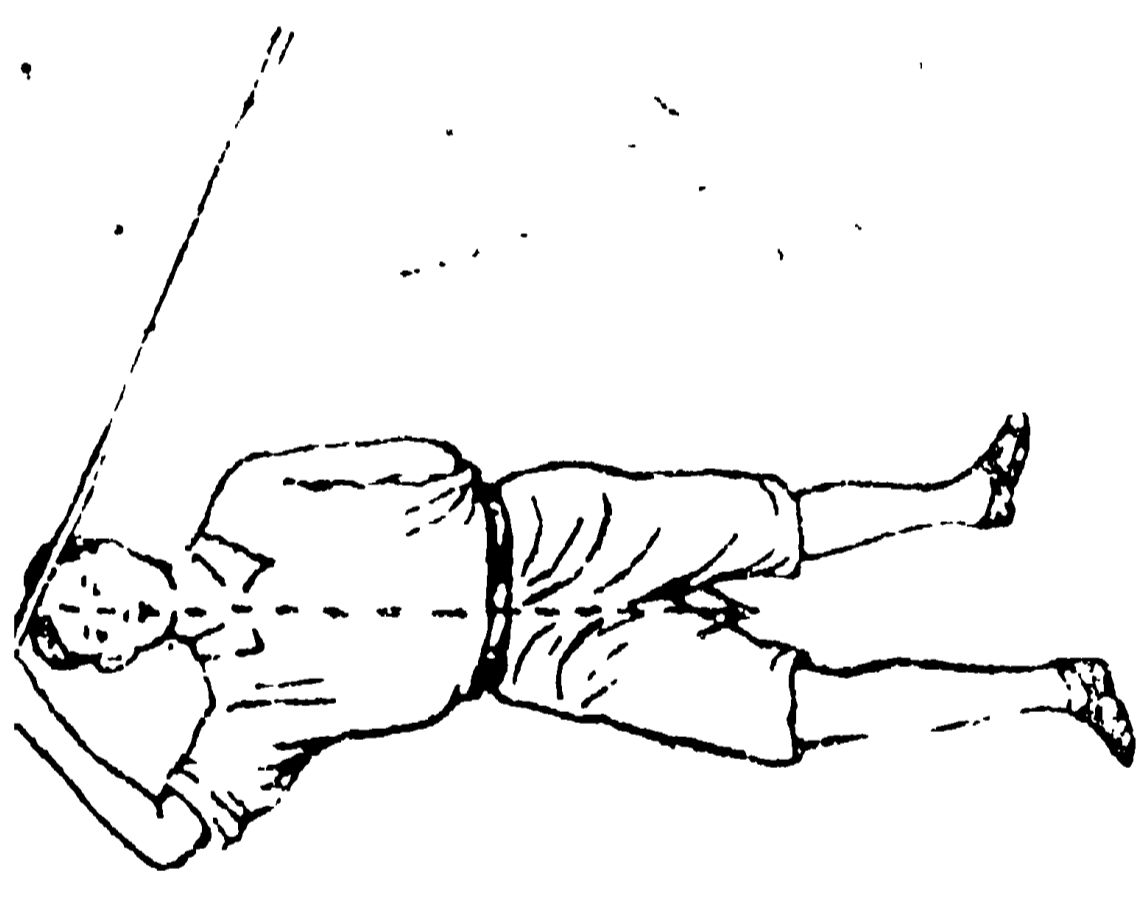
করক

হুল (আরম্ভ কালে)

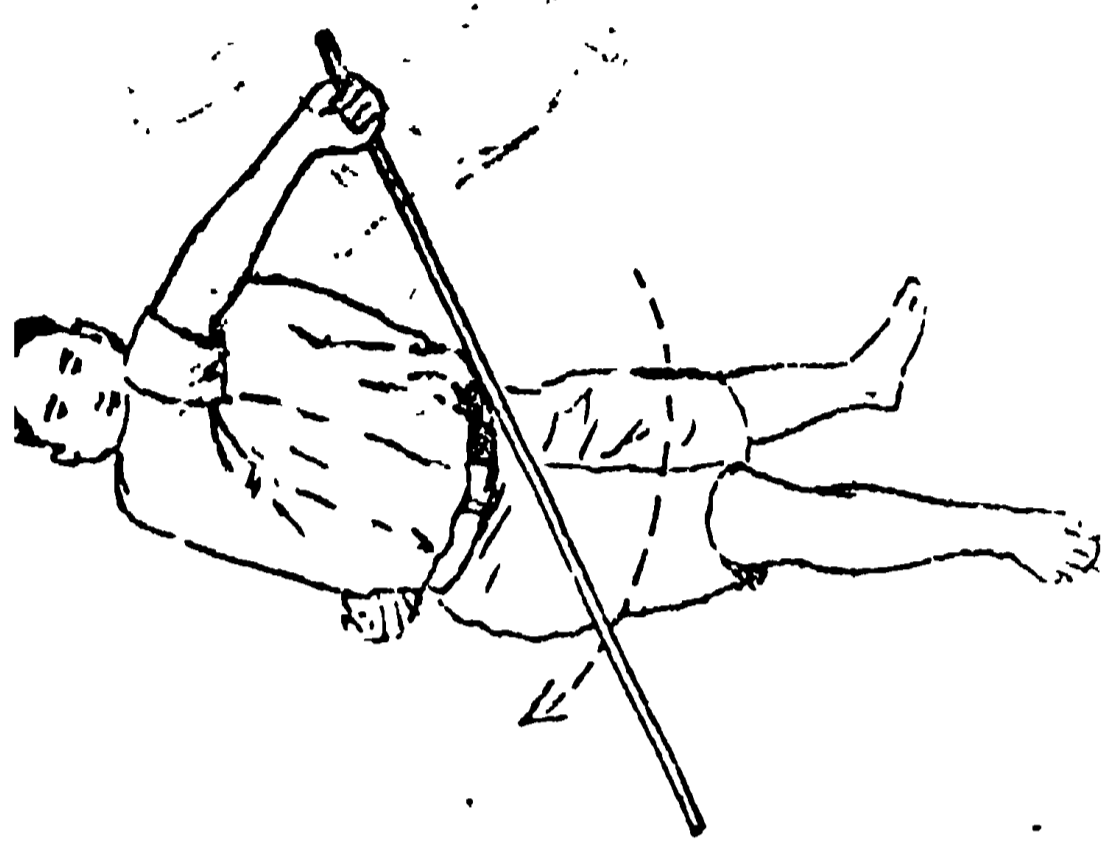
হুল (শেষ ভাগে)



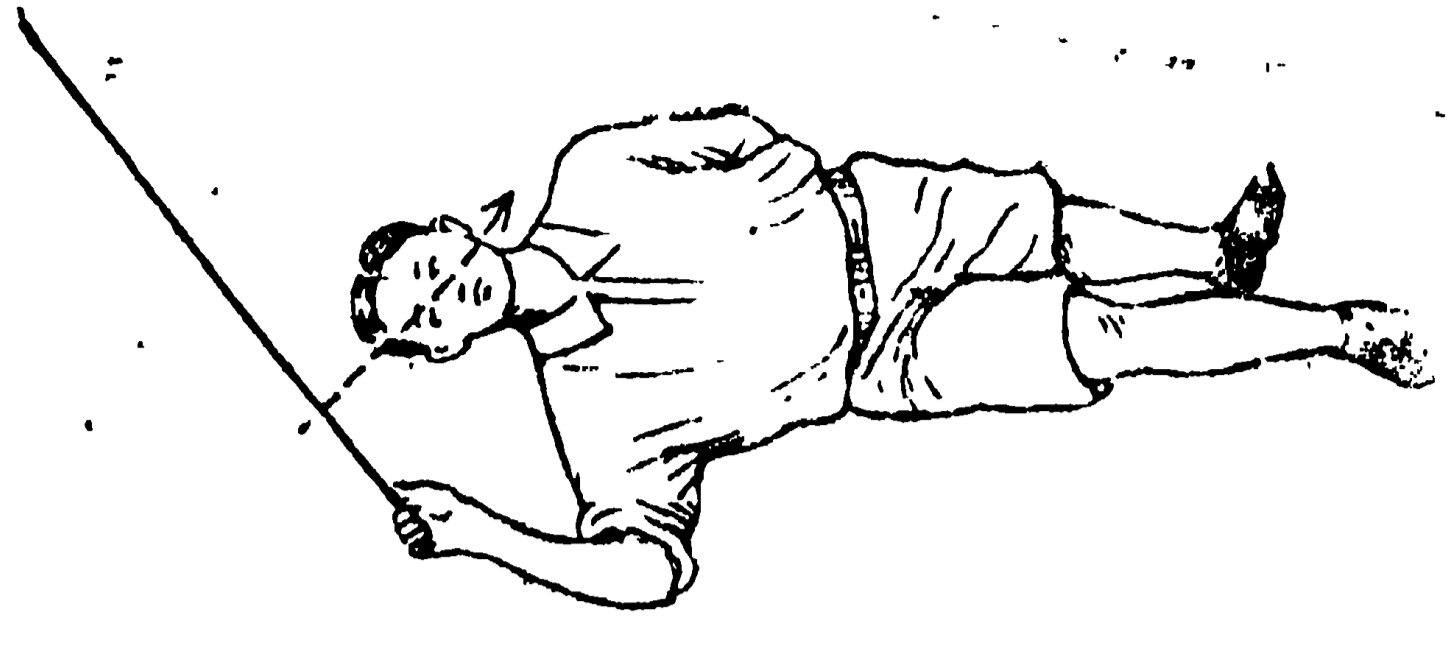
উত্তা শির



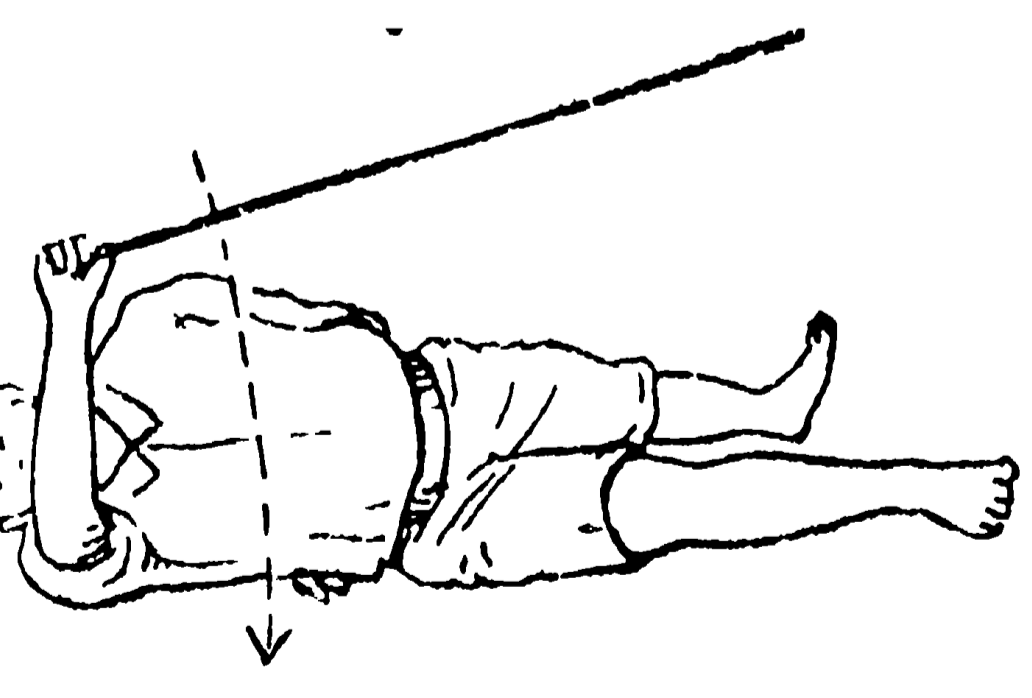
উত্তা নাও



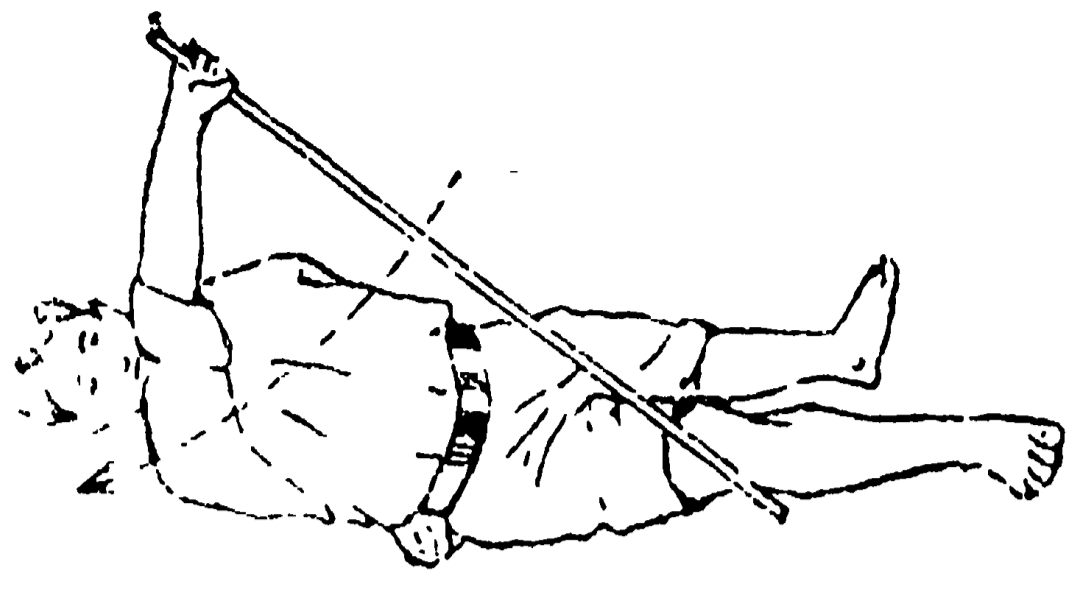
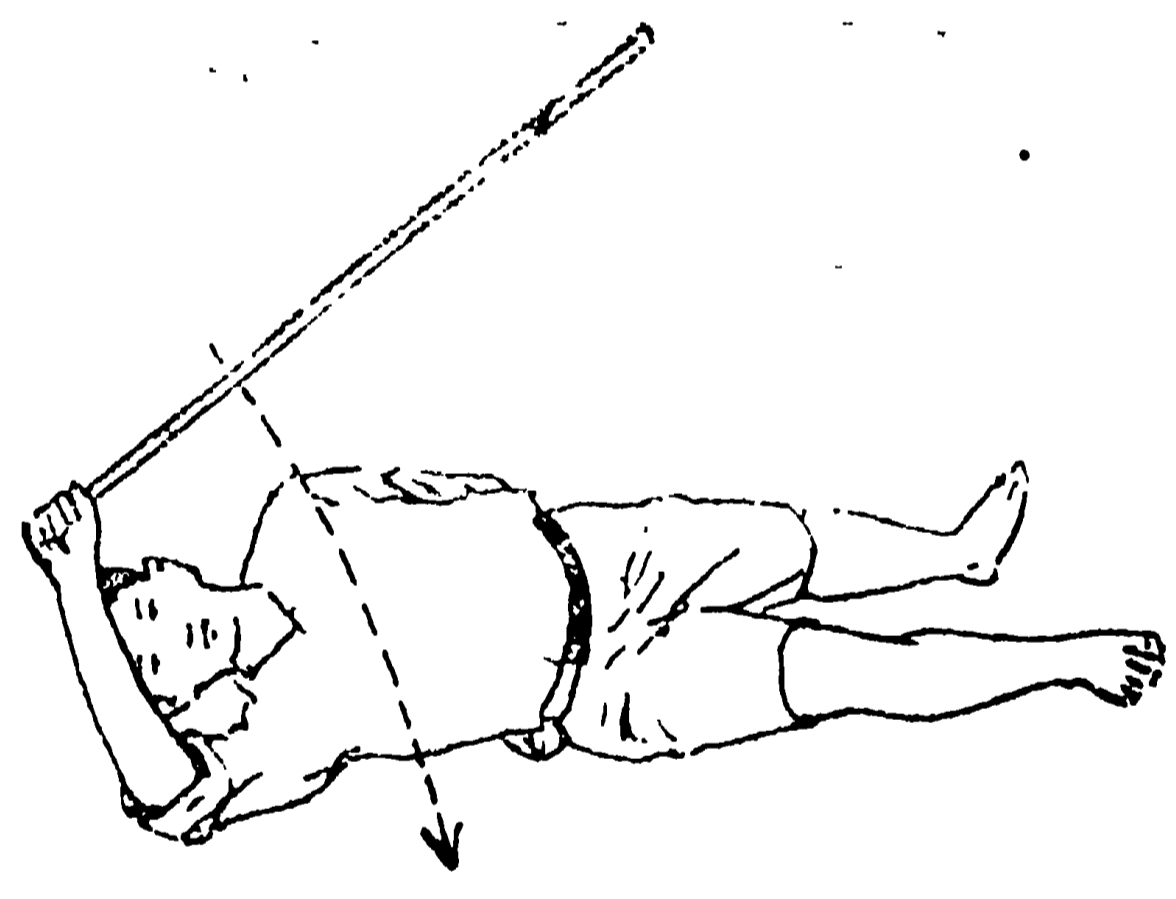
সাকেন
[আটকহিবার কিকিং পুরে]

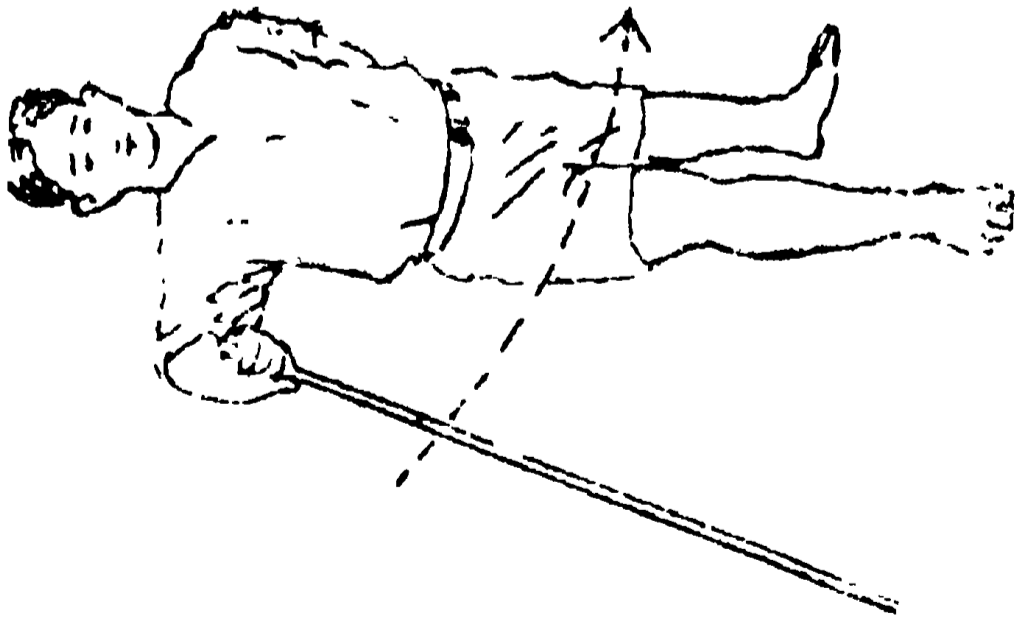


তেওয়ার

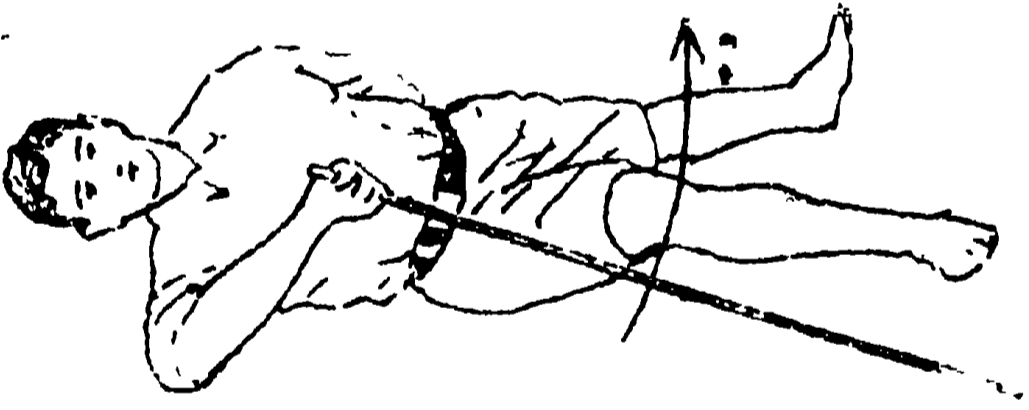


উত্তা মোল

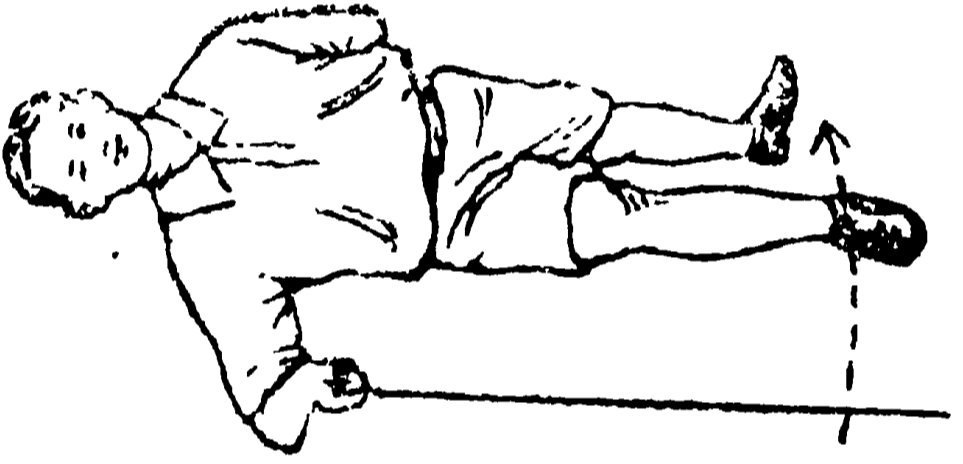




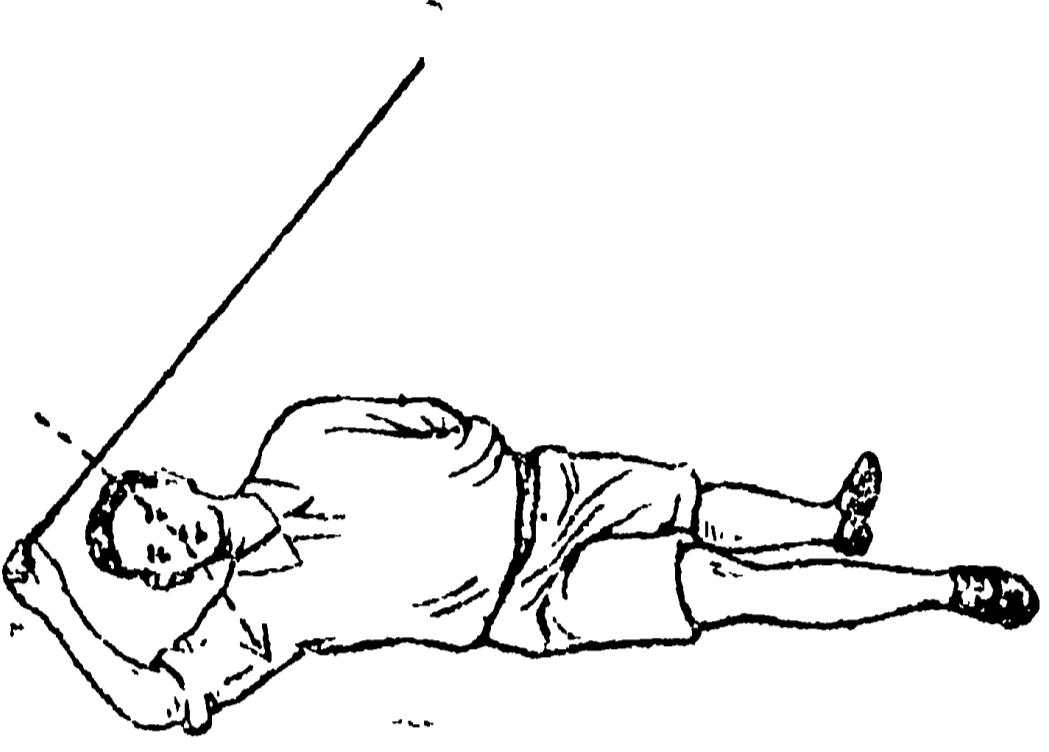
আসন্ন



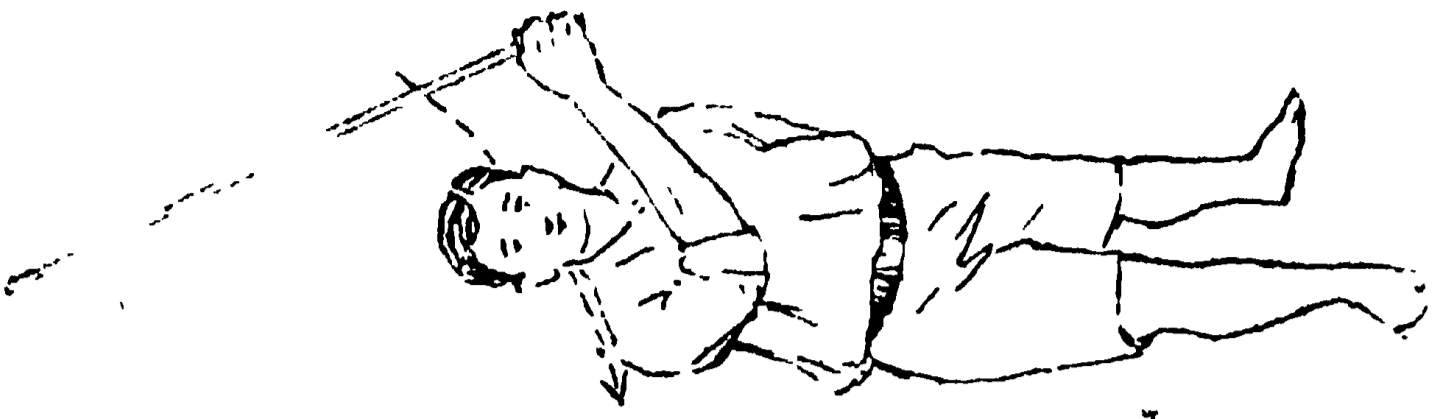
চাপনি



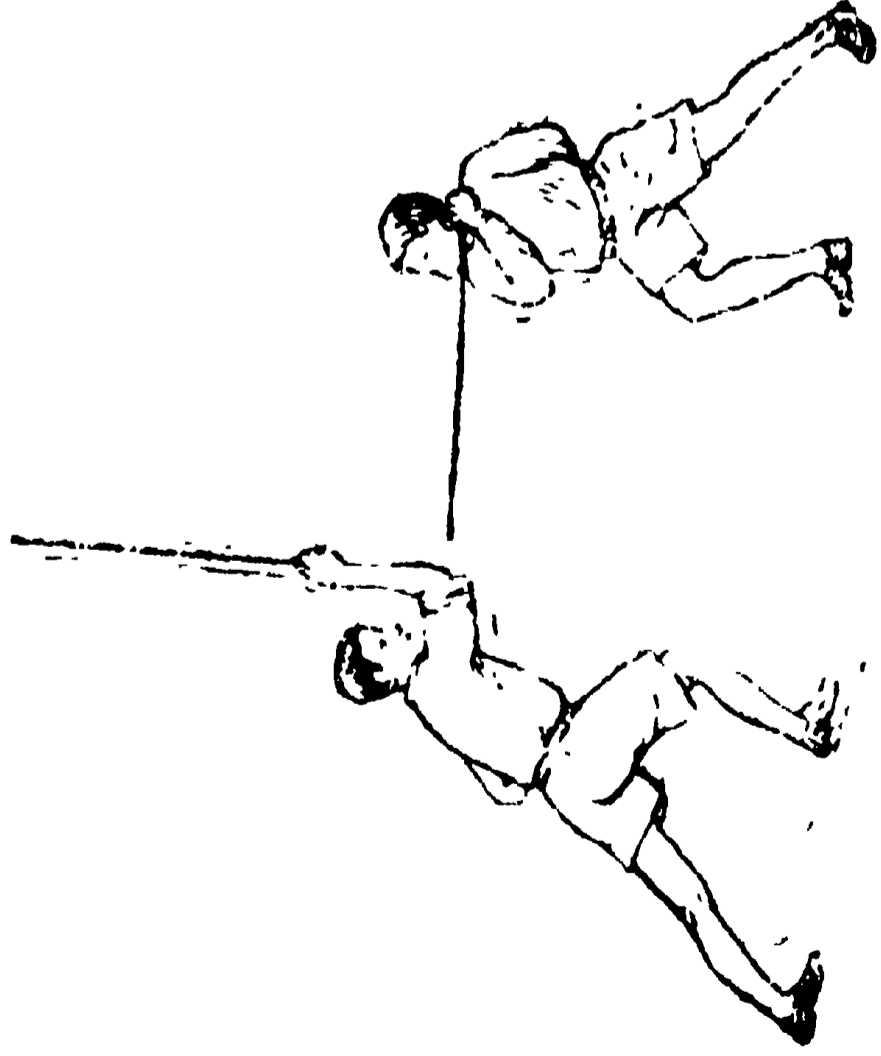
খুনিয়া পালাই



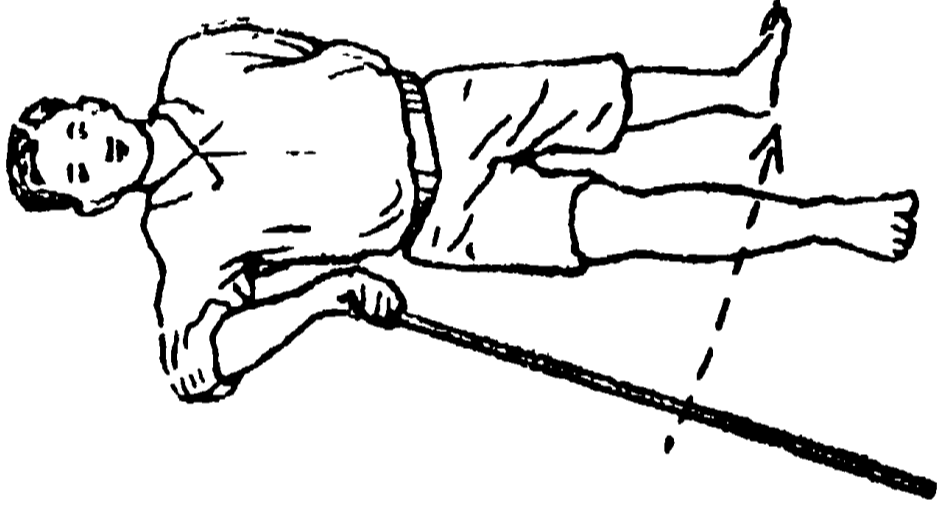
চাকি



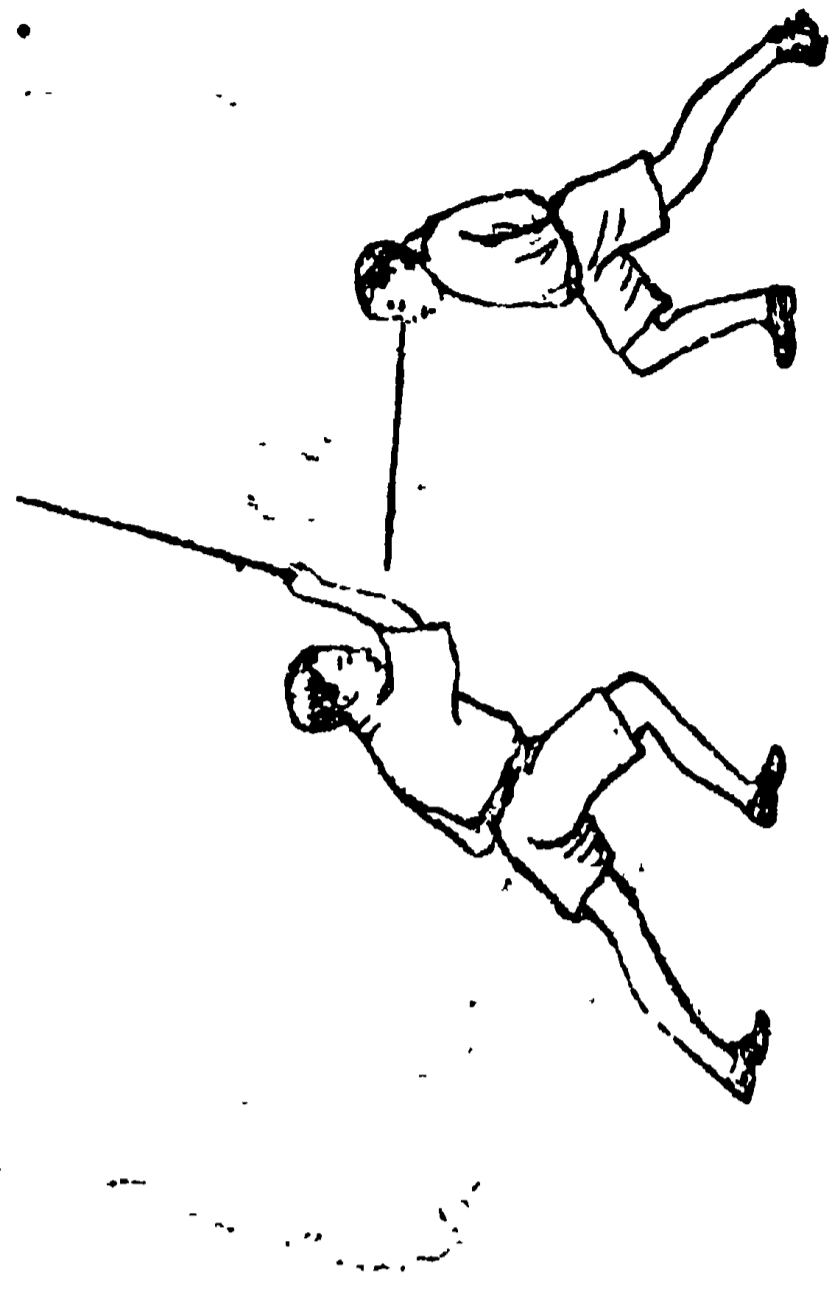
চাকি (অকরাস্তর)



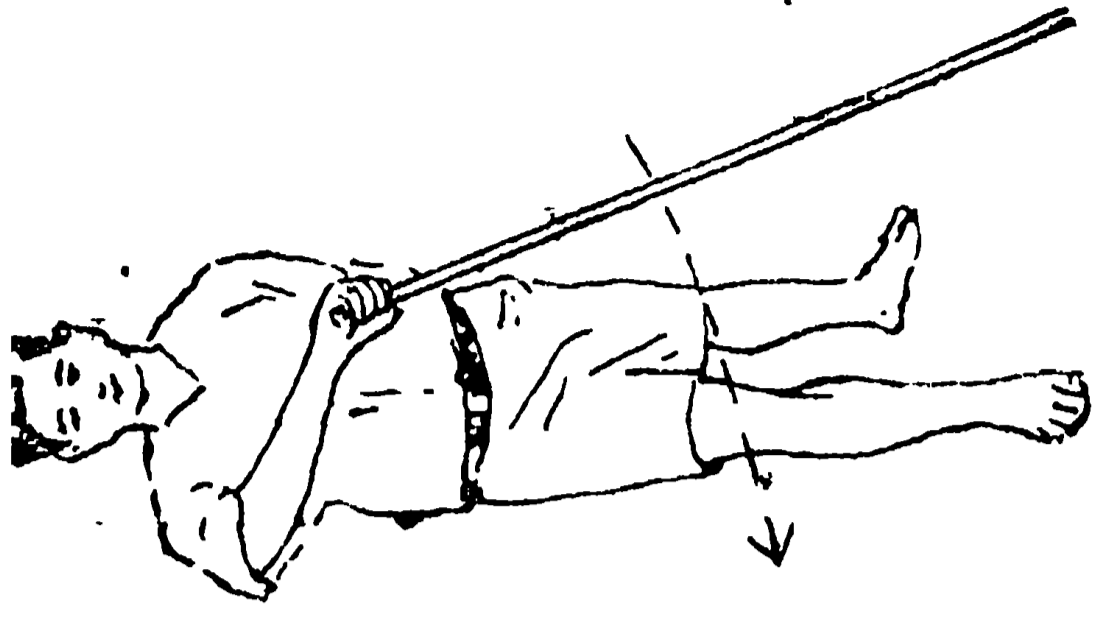
দক্ষিণ আনি



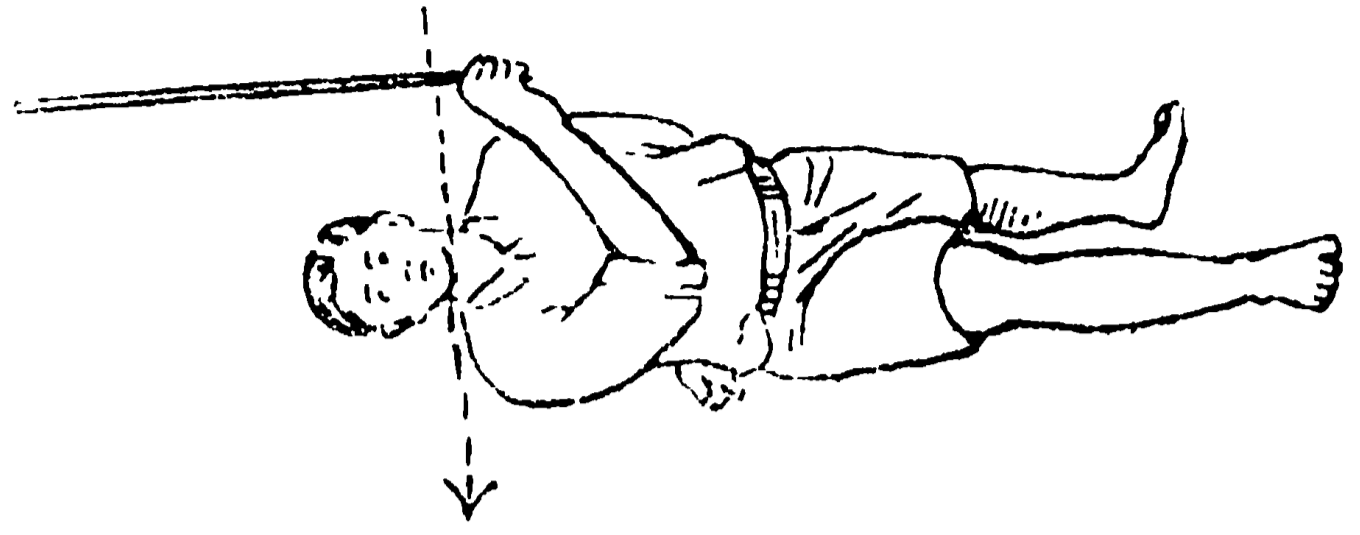
ভজা



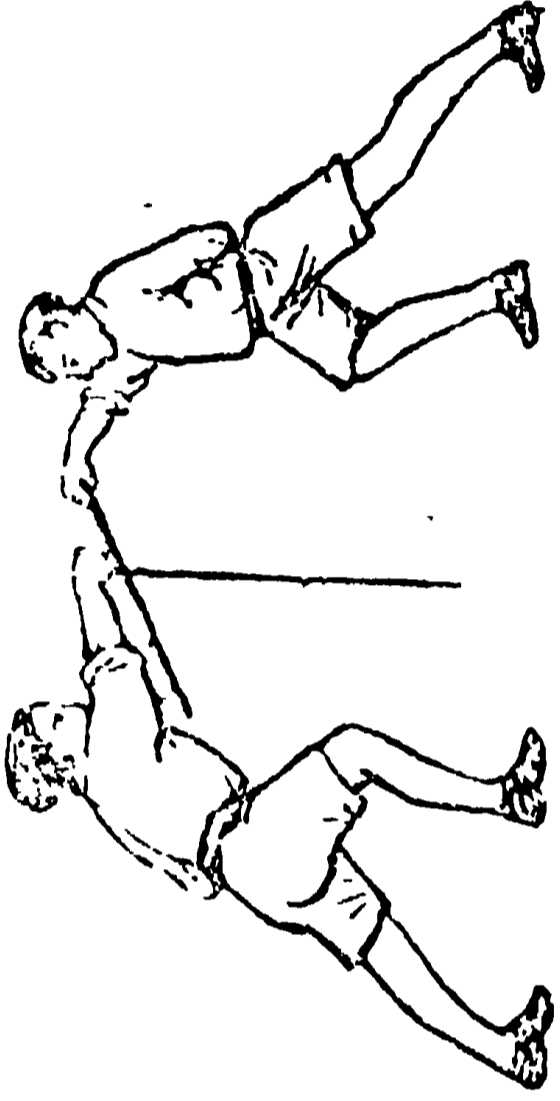
আনি



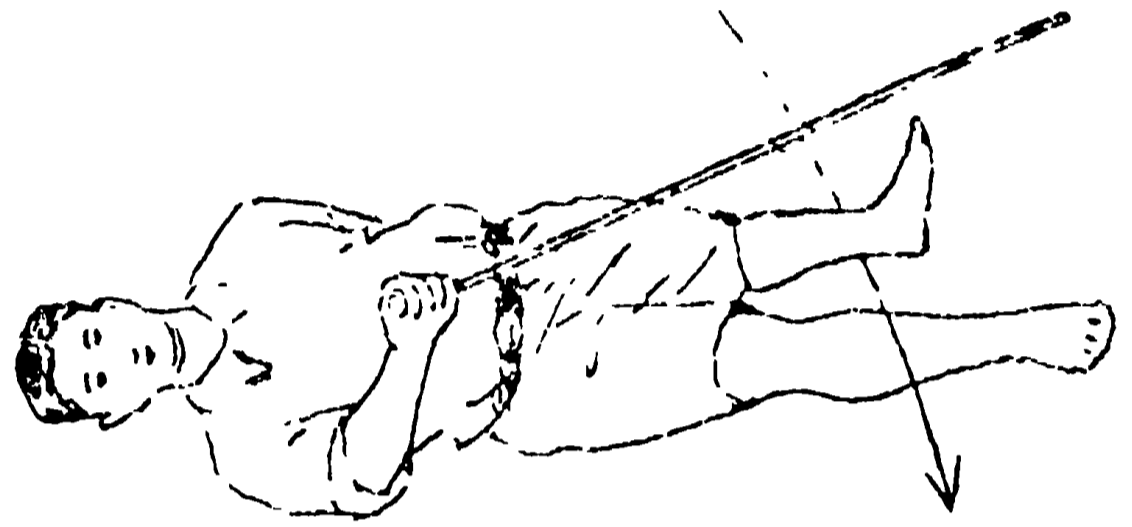
দিগর



উটা-অস্তর



আনি (প্রকারণস্তর)



পিণ্ডি

পরগাছা

খুনী মোকদ্দমার ফাঁসাদে পড়ে' পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের পর শঙ্কর যে-দিন ছাড়া পেয়ে জেলখানার বাইরে এসে দাঁড়াল, সেদিন তার মুক্তির আনন্দ ছাপিয়ে কিসের যেন একটা দুঃস্বপ্ন আহ্বান তার দেহ-মনকে সবলে আবার সেই স্তূর্দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের দিকেই টানতে লাগল। আকাশে আলো-ছায়ার মাতামাতি তার চোপের সামনে কেমন যেন বিস্তীর্ণ দেখাতে লাগল। জেলে যতদিন সে ছিল নিয়ম-মত কাজ করত, যা খাবার পেত মহানন্দে খেত, রাত্রে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত, আর যখন একটু অবসর পেত ভাবত তার স্ত্রীর কথা। মংসারে তার স্ত্রীকে দেখবার লোক আর কেউ ছিল

না। বয়স যখন তার বারো বছর তখন শঙ্কর তাকে ঘরে আনে। তার ছিল এক বুড়ো মা, শঙ্কর তাকেও আশ্রয় দেয়। আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে এই তিনটি লোক নিয়েই তার ছোট মংসারটি বেশ চলে' যাচ্ছিল। বিয়ের বছর না ঘুরে আস্তেই শঙ্করের শান্তুড়ী মারা গেলেন। তিনি মারা যাবার মাস সাতেক পরেই শঙ্কর জেলে যায়। জেলে যখন সে যায় তখন তার স্ত্রী মালতী অস্তঃস্বা ছিল। শঙ্করকে যে-দিন পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে' নিয়ে গেল, সে-দিনের কথা সে এ জীবনে ভুলতে পারবে না। সে-দিন তার সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল মালতীকে দেখে। মালতী সে-দিন কত করে'ই না পুলিশের লোকদের পায়ে মাথা খুঁড়েছিল, কত করে'ই না শঙ্করকে

ফিরিয়ে দেবার জন্তু নিতান্ত অবুঝের মতই কাকুতি-
মিনতি করেছিল—সে কথা কি শঙ্কর ভুলতে পারে ?

শঙ্করের জেলে যাওয়া ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। সে
নিজে অপরাধী নয়—একথা সে নিজে যেমন জান্ত
গ্রামের অনেকেই ঠিক তেমনি জান্ত। সেই খুনের লাসটা
যে কি করে' শঙ্করের ঘরের পিছনের পুরানো কুপটাতে
কে কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের শক্রতা-সাধন করবার জন্তু এনে
রেখেছিল সে রহস্য শঙ্কর আজও ভেদ করতে পারে নি।
বিচারের সময় সারা গ্রামময় খুঁজে সে নিজের সপক্ষে
একজন সাক্ষীও পেল না; তার অপরাধ সে কোনোদিন
কারু কাছে মাথা নোয়াতে পারত না। কিন্তু বিপক্ষে
তার সাক্ষী হ'ল ঢের। তবুও আরো দু'তিনটি লোক এর
মধ্যে জড়িত ছিল বলে' আসল অপরাধী যে কে সেটা ভাল
করে' ঠিক করা গেল না। কাজেই কারু চরম দণ্ড হ'ল
না। সকলেরই জেগ হ'ল, শঙ্করের হল সবচেয়ে বেশী।

শঙ্কর জেল থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে
রইল—পৃথিবীটাকে একবার ভাল করে' দেখে নিতে।
তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। সদর থেকে গ্রামে হেঁটে যেতে
হবে। গ্রাম অনেক দূরে। শঙ্কর জেলখানা থেকে
কেবল একটা জিনিষ নিয়ে বেরিয়েছিল—সেইটেই তার
একমাত্র সম্বল—সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য। এই শঙ্কর যে
সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শক্তিহীন সামর্থ্যহীন শঙ্কর, তা'
দেশে কারু চিন্তার সো নেই—এমনি আশ্চর্য্য পরিবর্তন
হয়েছে! শঙ্কর আগে ছিল পাতলা ছিপুছিপে আর লম্বা,
মাথার কটা চুল কগাছ গুণে' বেছে দেওয়া যেত; আর
এখন তার বুকের পাটা পঞ্চাশ ইঞ্চি; লম্বা লম্বা হাত
দুখানি যেমন মোটা তেমনি শক্ত, যেন কাঠ; মাথায় এক
বোঝা উষ্ণকুল চুল। শঙ্কর একবার গ্রামের পথের কথা
মনে করলে, আবার ভাবল, গ্রামে সেয়ে কি হবে?
মালতী কি বেঁচে আছে? এ পাঁচ বছরে তো সে তার
কোনো খবরই পায় নি। বেঁচে থাকলেও গ্রামে নেই,
কারণ সেখানে কে তাকে খেতে পরতে দেবে? তার কি
সম্মান হয়েছে, সে কি বেঁচে আছে? মালতী তাকে কি
খাইয়ে মাহুষ করবে—তার যে নিজেরই জ্বোটে না?—
এই-সব কত কথাই না আজ শঙ্করের মনকে তোলাপাড়া

করে' তুলল। খানিকক্ষণ সেইখানে বসে' থেকে তার
পর শঙ্কর চলতে লাগল—গ্রামেরই দিকে।

বোশেখ মাস। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কালোগেঘের
দল মাথার জটা উড়িয়ে দিয়ে আকাশ জুড়ে বন্দ্যুকে মেতে
গেল। তাদের হুকারে আকাশ পাতাল কেঁপে উঠল।
তাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আগুন ছুটে লাগল। শঙ্করের
মনে ভয় হ'ল। প্রকৃতির এমন রুদ্র খেলা সে বহুদিন
দেখে নি। বহুদিন এমন উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মেঘের
এমন গুরুগম্ভীর গর্জন তার কানে পশে নি। শঙ্করের
পেছন ফিরে চাইতে সাহস হচ্ছে না—ক্রতপদে ঝড়ের
আগে আগে ছুটে চলেছে। পেছনে ভয়ঙ্কর সোঁ-সোঁ
শব্দ। শঙ্কর মাঠ পার হয়ে এসে একটা বাড়ীতে উঠল।
সেটা একটা মন্দিরের পাণ্ডার বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকই
শঙ্কর একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। ভিতর থেকে
একজন প্রৌঢ়গোছের পাণ্ডা একটি বছর পাঁচেকের ফুট-
ফুটে ছেলেকে কোলে নিয়ে দরজা খুলেই একেবারে
সভয়ে পিছিয়ে দাঁড়িয়ে বললে,—একি! কে তুমি?

শঙ্কর তখন ভয়ে কাঁপছিল। সাষ্টাঙ্গে পাণ্ডাঠাকুরকে
প্রণাম করে' বলল—ঠাকুর মশাই, আমায় একটু স্থান
দিন, ঝড় থেমে গেলেই আমি বেরিয়ে যাব, আমার
বড় ভয় করছে।

শঙ্করের করুণ স্বরে আর অতবড় একটা লোককে
সামান্য ঝড়ের ভয়ে এমন করে' কাঁপতে দেখে পাণ্ডা-
ঠাকুরের দম্বা হ'ল, সে শঙ্করকে ভিতরে আসতে বললে।
শঙ্কর ভিতরে এসে সভয়ে দরজা বন্ধ করে' দিয়ে এক-
কোণে গিয়ে বসে' পড়ল। পাণ্ডাঠাকুরের কোলের ছেলেটি
এতক্ষণ ধরে' শঙ্করকে দেখছিল। সে বললে—দাদাঠাকুর,
আমার ভয় করছে—ও ডাকাত।

পাণ্ডাঠাকুর হেসে বললে,—না দাদু, ভয় কি, ও
ভালো মাহুষ।

ছেলেটি আর কোনো কথা না বলে' দাদাঠাকুরের
কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সেই ঘুমন্ত শিশুর
মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শঙ্করের চোখ যেন ঠিকরে গেল।
কি সুন্দর ছেলে, চোখ দুটি যেন ঠিক মালতীর চোখের
মতো, রংটাও ঠিক তেমনি। যদি তার অমনি সুন্দর

একটি ছেলে থাকতো, যদি সে গ্রামে যেয়ে দেখতে পেত যে তার সেই ছোট কুটীরখানিতে মালতী ঠিক এমনি একটি ছেলে কোলে করে' তার প্রতীক্ষায় পথের দিকে চেয়ে বসে' আছে, তবে তার কতই না আনন্দ হ'ত। সহসা শঙ্করের বুক চিরে একটা তপ্ত নিশ্বাস বেরিয়ে এল। আজ বহুদিন পরে তার শুষ্ক চোখের কোণে আঁশ্রু হয়ে উঠল। কিসের যেন একটা পুলকময় আবেশে তখন শঙ্করের দেহ-মন অভিভূত।

২

পরদিন দুপুর-বেলায় গ্রামে এসে তার সব সুখ-স্বপ্নই মরীচিকার মতো কোথায় যেন গিলিয়ে গেল। তাব সে কুটীরের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই। সেখানে সব আগাছার বোপ হয়ে গেছে। যাকে সামনে পেল তার কাছেই মালতীর কথা জিজ্ঞাসা করলে, কেউ ঠিক উত্তর দিতে পারলে না। কেউ বলে—ঐ পাশের গায়ে আছে, কেউ বলে—সে আর নেই; কেউ বলে—তাকে কবে কোন বোষ্টম ভেকু দিয়ে কণ্ঠ-বদল করেছে। শেষের কথাটাই শঙ্করের কাছে সত্য বলে' মনে হ'ল। মালতীর রূপ ছিল। কাজেই একরূপ সহায়সম্পদহীনা রূপসী যে অনেক বোষ্টমের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাতে আর সন্দেহ কি? সে সেই পরিত্যক্ত ভিটাতে বসে' বসে' অনেক ভাবলে, চোখের অনেক জল টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়ে' শুকিয়ে গেল। গ্রামের দু-এক জনে এসে বলল,—শঙ্কর, আবার বিয়ে করে' সংসারে মন দে।—শঙ্কর এ কথার কোনো উত্তর দিল না। বিয়ে করে' সংসারী হ'তে তার মন আর কিছুতেই চায় না। তবে এমন একটা কিছু চাই যাকে নিয়ে সে তার কর্মকান্ত দিনগুলি নির্ঝিন্বে কাটিয়ে দিতে পারে। সেই পাণ্ডা-ঠাকুরের কথা মনে হল। পরদিন সেইখানে ফিরে এসে সে বিনা-বেতনে চাকরী নিল।

পাণ্ডা-ঠাকুর যখন মন্দিরে যায় তখন শঙ্কর তার ঘরে পাহারায় থাকে। পাণ্ডা-ঠাকুরের এক ঐ ছোট ছেলেটি ছাড়া আর কেউই নেই। ছেলেটির নাম দেবদাস। পাণ্ডা-ঠাকুর দাসু বলে' ডাকত। দাসু এখন শঙ্করের কাছে আসতে ভয় পায় না, শঙ্করের বড়ই বাধ্য হয়ে পড়েছে। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার আরতির সময় সে শঙ্করের সঙ্গে গল্প করতে করতে পাণ্ডা-ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে যেতেও ভুলে যায়। আগে দাসুকে একা পাণ্ডা-ঠাকুরকে দেখতে হ'ত, এখন শঙ্করই তার সব ভার প্রায় নিয়ে বসেছে। এক-একদিন দাসু রাতে শঙ্করের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে, পাণ্ডা-ঠাকুর শোবার সময় এসে শঙ্করের কোল থেকে তাকে নিয়ে যায়, সারারাত শঙ্কর ছটফট করে' মরে—ঘুম হয় না। একদিন শঙ্করের মনে বড়ই

একটা বদখেয়াল হ'ল। সে ভাবলে কি করলে সে দাসুর সবটুকু আদার সবটুকু অত্যাচারের ভার একা নিতে পারে, কি করলে দাসুকে সে একা বুক জড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারে, তাতে বাধা দেবার আর কেউ না থাকে। চুরি? চুরি করে' কি লাভ? কোথায় লুকিয়ে রাখবে? পাণ্ডা-ঠাকুর তো তক্ষুনি সমস্ত দেশ পাতি পাতি কবে' খুঁজে যেখন থেকে হোক দাসুকে বের করবেই করবে। দাসুকে ছাড়া যে তার একটি দিনও চলে না। কিন্তু চুরি না করে'ই বা উপায় কি? কোনো প্রকায়ে লুকিয়ে যদি এদেশ ছেড়ে যেতে পারে, কোনো এক পাগড়-পর্কতে লুকোতে পারে, তবেই তো রক্ষা পাওয়া যায়—তবেই তো দাসুকে পাওয়া যায়। শঙ্কর দাসুকে চুরি করাই ঠিক কবে' ফেললে।

সে-দিন অমাবসার রাত্রি। মন্দিরে পূজার বিরাট আয়োজন। পাণ্ডা-ঠাকুরের ফিবে আসতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই দাসুকে আর নিয়ে গেল না। দাসু খেয়ে দেয়ে নানা কথা বলতে বলতে শঙ্করের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল। শঙ্কর ঘুমন্ত দাসুকে বুক ভাল করে' জড়িয়ে ধরে' বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর ধীরে ধীরে হেটে চলল। কিন্তু ভয় হল যে পাছে এর মধ্যে কোন কারণে পাণ্ডা-ঠাকুর যদি হঠাৎ বাসায় ফিরে যেয়ে থাকে তবেই সর্দনাশ ঘটাবে। সে দাসুকে আরো জোরে বুক চেপে ধরে' প্রাণপণে ছুটতে লাগল। দাসুব ঘুম ভেঙে গেল। সে প্রশ্ন করল,— কোথায় যাচ্ছ শঙ্কর-দা?

শঙ্কর ছুটতে ছুটতে বললে,—চল, পরে শুন্বি।

দাসু ভুলবার ছেলে নয়। সে কেঁদে বলল,—আমায় এ অন্ধকারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বল?

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না, পূর্ণবেগে ছুটতে লাগল।

দাসু চীৎকার কবে' কেঁদে উঠে বললে,—দাদাঠাকুর, শঙ্করদা আমায় চুরি কবে' নিয়ে পালাচ্ছে, শীগগীর এসো। আমায় বাঁচাও। আমায় বাঁচাও।

শঙ্কর দেখলে এ তো মহামুপ্শিল। এব চীৎকাবে চারদিকের লোক জড় হতে পারে। সে দাসুর মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে' ছুটতে লাগল। তবুও ভাঙা ভাঙা স্তবের কান্না শোনা যেতে লাগল। এবার শঙ্কর কোমরের কাপড় খুলে তার এক দিক দাসুর মুখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে ছুটতে লাগল। এবার আর দাসু কাঁদতে পারলে না। শঙ্করের বোপ হল যেন তার পিছু পিছু কেউ ছুটে আসছে। কোথায় পালায়? ঐ যে একটা ঝোপের আড়ালে ছোট একটা কুটীর দেখা যায় না, ঐ যে মিটমিট কবে' দীপ জলছে, ঐখানে লুকালে হয় না? শঙ্কর সভয়ে সেই কুটীরে ঢুকে পড়ল। ও

কুটীরে যে থাকত সে শঙ্করকে দেখেই চিনে ফেললে। যুগ-যুগান্ত না দেখা হলেও যে সে শঙ্করের মুখ এ জীবনে ভুলতে পারে না। শঙ্করও চিনলে এ তারই সেই মালতী। মালতী শঙ্করের কোলে ছোট ছেলেটি দেখে জিজ্ঞাসা করলে,—এ কার ছেলে? তুমি কোথা থেকে একে নিয়ে এলে?

শঙ্কর চুরিব কথাটা মালতীর কাছেও গোপন করে বুললে,—এ আমার এক বন্ধুর ছেলে। তুই আব কথা বলিসনে মালতী, তুই বাইরে একটু সবে দাঁড়া।

শঙ্করের গলার সুর ও চোখের চাউনি দেখে মালতীর ভয় হল, সন্দেহ হল। সে বুললে,—চুরি করে আননি তো?

শঙ্কর বুললে,—চুরি!—না—হ্যাঁ ঠিক নয়—তবে কি জানিস মালতী, তুই চুপ কর।

মালতী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে,—কোথেকে চুরি করে এনেছ? ঠাকুর-মন্দির থেকে? পাণ্ডা ঠাকুরের ঘর থেকে?

শঙ্কর বিষ্ময়ে নির্ঝাঁক হয়ে মালতীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। মালতী ললাটে করাঘাত করে চৈচিয়ে বলে উঠল,—কি করেছ, শেষে নিজের ছেলে চুরি! কেন আনলে, আমি যে ওকে ঠাকুর-মন্দিরে দান করেছি।

শঙ্কর সবলে দাস্তকে বৃকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বুললে,—আমার ছেলে! দান কবেছ! কার কথায় দান করেছ মালতী?

মালতী শঙ্করের কণ্ঠস্বরে ভয় পেল, একটু পিছনে সরে বুললে,—দান না করে আমার যে আর উপায় ছিল না। তা না হলে বাছা এতদিন না পেয়ে মারা যেত!

—কি কবে দান করলে? পাণ্ডা-ঠাকুর তোমায় চেনেন? তবে চলো তাঁর পা ধরে মিনতি করে নিজের ছেলে নিজেরা ফিরিয়ে নিয়ে আসব চলো।

মালতী আঁচলে চক্ষু মুছে বুললে,—না তিনি তো আমায় চেনেন না। আমি রাত করে মন্দিরের বারান্দায় একে ঘুম পাড়িয়ে বেখে এসেছিলুম, তখন এর বয়েস ছ'মাস। তার পব কতদিন ভেবেছি কেন এমন কাজ করলুম, মা হয়ে বৃকের সন্তানকে কেন এমন করে দূরে ফেলে দিলুম! কিন্তু উপায় ছিল না। তখন আমি সে কথা প্রকাশ করলেও কেউ বিশ্বাস করত না। পাণ্ডা-ঠাকুরের টাকা পয়সার অভাব নেই, তিনি কত যত্নে ওকে পালন করেছেন। আমি প্রতিদিন কাজে অকাজে আগে একবার করে মন্দিরে যেতুম, শেষে ভাবলুম যাকে ত্যাগ করেছি তাকে ভুলব। তাই প্রাণ আমার শতকণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেও আর আমি সেখানে যাই নি।

শঙ্কর বসে ছিল, উঠে মালতীকে সজোরে এক

পদাঘাত করে বুললে,—সর্বনাশী! তোর মতো রাক্ষসী মা এমন সোনার কার্তিক গর্ভে ধরেছিল কেন? হায় হায়! এখন কি হবে? কি করে আমার দাস্তকে রক্ষা করি, কোথায় পালাই? শেষে কি নিজের ছেলে নিজের চুরি করে জেলে যেতে হবে? হা ভগবান! এ কি করলে?

৩

দাস্তর কান্না আর থামে না। শঙ্কর তাকে কত করে বুঝালে, তবু সে শোনে না। তার মুখে কেবল সেই একই কথা,—দাদাঠাকুরের কাছে যাব, দাদাঠাকুরের কাছে যাব। শঙ্কর একবার ঘরে যায়, একবার বাইরে আসে। যখন কুটীরের পাশ দিয়ে কোনো লোক যেতে দেখা যায়, তখন সে দৌড়ে গিয়ে দাস্তর মুখ চেপে ধরে, আবার লোক সরে গেলে ছেড়ে দেয়। এমনি করে একদিন একরাত্রি কেটে গেল। দাস্ত এক ফোঁটা দুধ বা জল কিছুই খেল না। সন্ধ্যার পরে দাস্তর জ্বর হ'ল। প্রবল জ্বর। আর সে উচ্চ চীৎকার নেই, দুর্জয় জ্বরের তাড়নে অবোধ ক্ষুদ্র শিশু বিছানায় ঢলে পড়েছে। শঙ্কর শিয়রে বসে—নীরব নিরুণ। তার হৃদয় চিত্ত তখন তার বিপক্ষে তুমুল বিদ্রোহ করেছে। এখন সে কি করে? ডাক্তার আনতে গেলে সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর ডাক্তার না আনলেও দাস্তর জীবনের কোনো আশা নেই। জ্বরের দ্বাশে দাস্তর মুখখানি শুকিয়ে গেছে—বৈশাখের রোদে বাগানের গোলাপ যেমন করে মলিন হয়ে শুকিয়ে যায়। শঙ্কর সেই মুখখানির দিকে চেয়ে। ক্রমে শিশুর সর্বাঙ্গ অবশ শিথিল হ'য়ে আসছে। শঙ্কর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বুললে,—মালতী, তুই বোস, আমি চললাম যদি ডাক্তার আনতে পাবি তবে ফিরব, নৈলে আর ফিরব না।

শঙ্কর দীর্ঘ দীর্ঘ কুটীর থেকে বেরিয়ে এল। রাত্রির গনাক্ষকারে নিজের শরীর নিজের চোখে দেখা যায় না—এমনি নিবিড় এমনি স্ফিটভেদ্য! শঙ্কর সভয়ে সেই অন্ধকারে প্রান্তর অতিক্রম করে গ্রামের দিকে চলল; পল্লীর নিঃস্বপ্ন প্রান্তর প্রেতপুরীর মত ভয়াবহ। আশে-পাশে মহা মানুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনেই শঙ্কর ভয়ে শিউরে ওঠে—ঐ বৃষ্টি ধরতে এল!—আর অমনি দ্রুতপদে চলতে থাকে। এমনি করে সে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। একবার মনে হ'ল পাণ্ডা-ঠাকুরকে খবর দিলে হ'ত, সে হয়ত বা বেশী টাকা দিয়ে ভাল ডাক্তার নিতে পারত, হয়ত বা দাস্ত বাঁচতে পারত। কিন্তু তাতে শঙ্করের লাভ কি? সে ডাক্তারের ঘরের সামনে এসে ডাকল,—ডাক্তার-বাবু!

ডাক্তার ঘুমুচ্ছিল। শঙ্করের ডাকে জেগে উঠে বুললে,—কে?

শঙ্কর বার দুই ইতস্ততঃ করে', বার দুই কেশে নিয়ে বললে,—আমি শঙ্কর।

শঙ্কর! ডাক্তার লাফিয়ে উঠল। পুলিশের খোঁজা-খুঁজির কথা ডাক্তার জানত। বাইরে এসে একবার শঙ্করের আপাদমস্তক দেখেই সে বুঝতে পারলে যে এই সেই ছেলে-চুরির অপরাধী ফেরারী আসামী শঙ্কর। ডাক্তার প্রশ্ন করলে,—তুমি মন্দিরের পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ী থাকতে না?

শঙ্কর হাঁ কি না কি বলবে ঠিক না পেয়ে মৌন হয়ে রইল।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলে,— তুমি তার ঘর থেকে এক ছেলে চুরি করে' নিয়ে পালাও নি?

শঙ্কর এবার ডাক্তারের পায়ের উপর পড়ে' বললে,— ডাক্তার-বাবু, আপনি ওসব কথা পরে শুন্বেন, আগে চলুন।

ডাক্তার সবিস্ময়ে বললে,—কোথায় যাব?

শঙ্কর ডাক্তারের পা দুখানি আরো জোরে চেপে ধরে' বললে,—চলুন ডাক্তার-বাবু, কোনো ভয় নেই।

প্রথম ডাক্তারের ভয় হ'ল—শঙ্করের চেহারা দেখে। অতবড় লম্বা, ডাকাতের মত চেহারা, চোখ দুটো স্থাপদের মত হিংস্র। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনে ডাক্তারের দয়া হ'ল। সে নীরবে শঙ্করের পিছু পিছু চলল—উদ্দেশ্য—আর কিছু হোক আর না হোক শঙ্করের বাড়ীর গোঁজটা অন্তত নিয়ে এসে পাণ্ডা-ঠাকুরকে দেওয়া যাবে। অন্ধকারের মধ্যে দুই জনে প্রাস্তর অতিক্রম করে' একটা জীর্ণ-কুটারের সামনে এসে দাঁড়াল। শঙ্কর কুটারের বাইরে দাঁড়িয়ে বললে,— ডাক্তার-বাবু, ঘরে যান, দাস্ত মরুছে, আমি আর যাব না। যদি পারেন তাকে বাঁচাবেন—নির্দোষ শিশু। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাব না তার যত্ননা দেখতে। শেষ হয়ে যাবার আগে আমায় একবার ডাক্তার, আমি একবার শেষ-দেখা দেখে নেব।

ডাক্তার সভয়ে কুটারে ঢুকল। মালতীর কোলে মাথা রেখে দাস্ত এলিয়ে পড়েছে। একটা আধ-ফোটা গোলাপের কলিকে জোর করে' টেনে ছিঁড়ে তপ্ত মাটিতে ফেলে দিলে সেটা যেমন করে' শুকিয়ে ম্লান হয়ে যায়— দাস্তও ঠিক তেমনি হয়ে গেছে। বৃকে পিঠে খিল ধরে' গেছে। সেই সরল মুখখানির উপর অস্তিমের করাল ছায়া বড়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দাস্তর কাছে বসে' ডাক্তারের দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। শিশুর বাচ্চার কোনো লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই। হাত পা ধীরে ধীরে হিম অসাড় হয়ে আসছে। নিশ্বাস ক্ষীণ— অতিক্ষীণ। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার জামার হাতায় চোখের জলটা মুছে নিয়ে ডাক্তার,—শঙ্কর!

শঙ্কর কাঠের পুতুলের মত ঠিক এই ডাকটর অপেক্ষা করে'ই যেন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়াল—দেব-মন্দিরে শয়তান যেমন সভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার বলল,—পাণ্ডা-ঠাকুরকে একবার খবর দিলে হয় না?

শঙ্করের গলা ধরে' এসেছিল, সে ভাঙা গলায় বললে,— তা হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবু, ফিরে এসে কি আর দেখতে পাবো?

ডাক্তার বললে,—পাবে। তাড়াতাড়ি এসো।

শঙ্কর আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে' ছুটে লাগল। বাতাসের আগে আগে ছুটে এসে পাণ্ডা-ঠাকুরের দরজার সামনে দাঁড়াল। তখন ঘরে প্রদীপ জল্ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে শঙ্কর দেখলে—পাণ্ডা-ঠাকুর বসে' বসে' কি যেন ভাবছে, তার চোখের জলে বৃক ভেসে গেছে! চেহারা দেখে শঙ্কর চমকে উঠল! মহামারীর সময় একে একে সমস্ত পরিবারকে হারিয়ে জীবিতাবশিষ্ট গৃহস্বামীর চেহারা যে রকম দেখায় পাণ্ডা-ঠাকুরের চেহারা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। শঙ্কর অনায়াসে বুঝতে পারলে, কেন তার এমন দশা হয়েছে। প্রথম পাণ্ডাঠাকুরকে ডাকতে তার সাহস হ'ল না। তার পর দাস্তর মুখখানির কথা যেই মনে হল, মনে হল যে ফিরে যেয়ে হয়ত বা আর তাকে দেখতে পাবে না, তখন তার চমক ভাঙল। সে সভয়ে ডাকল,—দাদা-ঠাকুর!

শঙ্করের গলার স্বর শুনেই পাণ্ডা-ঠাকুর চিন্তে পারলে। সে উন্মাদের মত লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে এসে বললে,—কে? শঙ্কর? দে আমার দাতুকে দে! তোকে আমি কিছু বলব না, একজীবন অনায়াসে খেতে পারবি এমন ধন তোকে আমি দিয়ে যাব। তোকে আমি সব দেব, তুই আমার দাতুকে ফিরিয়ে দে।

চলো, দিচ্ছি।—বলে' শঙ্কর বেরিয়ে পড়ল। পাণ্ডা-ঠাকুর পিছু পিছু ছুটে চলল। নিমিষের মধ্যে মাঠ পেরিয়ে ভাঙা কুটারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে শঙ্কর বললে,—যাও, এই ঘরে যাও।

পাণ্ডা-ঠাকুর লাফিয়ে পড়ে' দাতুকে নিজের কোলে টেনে তুলে নিল—শাবকহারা ব্যাঘ্র যেমন করে' তার সন্তানকে অপহারীর কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়। বৃকের মধ্যে টেনে নিয়ে পাণ্ডা-ঠাকুর ডাকল,—দাতু!

মুহূর্ত্তকালের জন্ত যেন দাস্তর জ্ঞান ফিরে এল। রক্তবর্ণ চক্ষু দুটো মেলে একবার পাণ্ডা-ঠাকুরের দিকে চেয়ে আবার চক্ষু বুজল—আর চক্ষু খুলল না, কিন্তু ঠোঁটের উপর ফুটে উঠল একটু নিশ্চিন্ত নিভরের হাসি!

শ্রী প্রিয়নাথ বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমি পীড়িত ও দুর্বল আছি বলিয়া এ মাসের কাগজে নিম্ন রক্ষার জন্ত সামান্য কিছু বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিলাম।

ব্রিটানিকার আর্চারী, ফেসিং, ফয়েল্-ফেসিং, কেন্-ফেসিং, সিংগল্-ষ্টিক, প্রভৃতি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

উইলিয়ম্ উইন্স্টান্‌লী পিয়ার্সন্

শাস্তিনিকেতন আশ্রমের অন্ততম অধ্যাপক, ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু, সকল জাতির স্বাধীনতার একান্ত অমুরাগী, মানবপ্রেমিক উইলিয়ম্ উইন্স্টান্‌লী পিয়ার্সন্ মহাশয়ের ইটালীতে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম।

পঞ্চাশ বৎসর পরের ঘর-সংসার

ভারতবর্ষের অনেক লোকের ধারণা যে খ্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের আদত রূপটি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আমেরিকায় খ্রীশিক্ষার প্রভূত বিস্তার ও উন্নতি সত্ত্বেও, ইতিমধ্যেই উল্টা কথা শোনা যাইতেছে; ওয়ান্‌ সিটিজেন্‌ পত্রে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

“গৃহকার্য্য বলিতে আজকাল আমরা যাহা বুঝি পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহার কোনো চিহ্নই থাকিবে না। অস্তুত গৃহস্থালীর দাসত্ব এবং বর্তমান দাস-দাসীর অস্তিত্ব যে আর থাকিবে না, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। প্যাট-ইন্টিটিউটের গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ডব্লিউ হো এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞানের আরো বহু শিক্ষক ও ছাত্রেরও এইরূপ ধারণা।”

‘মিঃ হো বলেন,—“পঞ্চাশ বৎসর পরে ঝি-চাকরের কোনো স্থানই গৃহস্থালীতে প্রায় থাকিবে না; কিন্তু আমেরিকান্‌ গৃহ সংসার তখন আধুনিক গৃহের তুলনায় চিত্তাকর্ষক ও কার্য্যকারী অনেক বেশী হইবে।”

‘আমি বলিলাম, “কিন্তু ঘর সংসার চালাইতে এবং সকল দিক্‌ দিয়া ভাল ভাবে ইহার স্বথ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইলে পরিশ্রমের দরকার। এবং কেবল একটি মানুষের শ্রমেও তাহা হওয়া সম্ভব নয়।”

‘তিনি বলিলেন, “সে কথা সত্য। কিন্তু ভবিষ্যতে নিজেরা সংসারের কাজে আরো অনেক বেশী সময় দিবেন, এবং বাহিরের লোকের সাহায্য দরকার হইলে ঘণ্টা, দিন কিম্বা সপ্তাহ হিসাবে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের উচ্চদের কাজ পাইতে পারিবেন। যে জাতীয় কাজ দরকার, তাহার জন্তই লোক ভাড়া পাওয়া যাইবে। গৃহকর্ম্ম আর নীচ কাজ থাকিবে না; ইতিমধ্যেই ইহার সম্বন্ধে মানুষের হীন ধারণা কমিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতে গৃহবর্ষকে মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে; সকল রকম কাজকেই আমরা যেমন শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছি ইহাকেও তেমনি করিব।

“একশত বৎসর পূর্বে গৃহই সামাজিক জীবনের কেন্দ্র

মল্লভূম-শিল্পসমিতি

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বহুকাল হইতে তসর, গরন, প্রভৃতি কাপড়ের জন্ত বিখ্যাত। এক্ষণে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, এম্-এ, ও আরও দুইজন গ্রাজুয়েট মল্লভূম-শিল্পসমিতি নাম দিয়া একটি কারুবার স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেনারসী কাপড়ের মত কাপড়ও প্রস্তুত করাইতেছেন। জিনিষ ভাল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। দাম বেনারসী অপেক্ষা কম। বাংলাদেশে এইসব কাপড়ের খুব কাটুতি হওয়া উচিত। তা ছাড়া, অগ্নাত্ত রকমের কাপড়ও আছে।

ধনুবিদ্যা, অসিক্রীড়া, ইত্যাদি

বন্দুক কামান প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হইবার পূর্বে, যুদ্ধে তীর ধনু, তলোয়ার, গদা, প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। বর্তমান সময়ে যদিও যুদ্ধে তীর ধনু ব্যবহৃত হয় না, তথাপি জাপানে, আমেরিকার ও ইউরোপের নানাদেশে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ধনুবিদ্যা শিক্ষা করে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়, এবং পটুতা ও একাগ্রতা জন্মে। তলোয়ারের দ্বারাও যুদ্ধে জয়লাভ করিবার কল্পনা আজকাল কোন প্রকৃতিস্থ লোকে করে না। কিন্তু তলোয়ার খেলারও চলন ইউরোপে খুব আছে। লাঠিখেলারও চলন আছে। একাগ্রতা, পটুতা ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধি প্রধান লক্ষ্য।

এইসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এন্‌সাইক্লোপীডিয়া

ছিল। বহু শিল্পব্যবসায়ের কেন্দ্রও গৃহই ছিল। বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কারের, কারখানার উদ্ভবের এবং আমাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গত শতাব্দী হইতে গৃহের বহু পুরাতন কার্য লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিছুকাল ধরিয়া আমরা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। এদেশের মানুষের মাঝামাঝি একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসিবার পূর্বে সকল বিষয়েই চরমে গিয়া উঠিবার একটা ঝোঁক আছে।

“এই ক্ষেত্রেও চরমে উঠিবার বেলা আমরা গৃহের সকল কাজ ও কর্তব্য হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া ছিলাম। মাঝামাঝির শোভন সীমায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের কতকগুলি কাজ আবার তাহাকে ফিরাইয়া দিব বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা একান্তই গৃহের এলাকার অন্তর্গত। তাই আমার মনে হয়, পারিবারিক জীবন আবার ফিরিয়া আসিতেছে; পুরাকালে যে পারিবারিক জীবন ছিল সে-জীবন অবশ্য আর ফিরিয়া আসিবে না; এই নূতন জীবনে অধ্যয়ন ও গভীরতর জ্ঞানের ফলে আরো দৃঢ়তা ও উন্নতির দেখা মিলিবে।

“বিবাহিত রমণীদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনের একটা বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘর-সংসার গড়িতে ব্যয় করিবেন। প্রথমতঃ মেয়েদের নিজেদের ভরণ-পোষণ করিবার মত শিক্ষা দিয়া মানুষ করা হইবে। শিক্ষা সমাপনের পর অনেকে হয়ত নিজ নিজ পছন্দ-মত কাজে কয়েক বৎসর লাগিয়া থাকিতে পারেন। তাহার পর তাঁহারা বিবাহ করিবেন এবং সন্তানসন্ততির জন্ম ও পালন-কালটায় প্রায় সমস্ত চিন্তা ও সময়ই গৃহ-ধর্মের জন্ম ব্যয় করিবেন। মানসিক, আর্থিক ও শারীরিক সকল দিক দিয়াই মেয়েরা-জীবনের সন্তান-ধারণ-যুগটায় গৃহের অনুরক্ত হন।

“মেয়েরা নিজেদের কাজ ও সন্তানের যত্ন নিজেরাই করিবেন, দরকার-মত গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তানপালন ও অগ্রাণ্ড কাজে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন। কাজের জন্ম ভাড়া করিয়া আনা এইসব বিশেষজ্ঞেরা পুরাকালের মত সংসারের অঙ্গীভূত হইয়া আর থাকিবেন না, বিশেষ একটা শ্রেণীভুক্ত হইয়াও থাকিবেন না। আজকাল সকল শিক্ষিত ব্যবসায়ীর মত ইহারাও শিক্ষিত ব্যবসায়ী হইবেন। ইহারা শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের মত সম্মান ও ব্যক্তিত্বের দাবী করিবেন।

“কোনো কোনো সহরে গৃহকার্যকে একটা ব্যবসয়ে পরিণত করিবার জন্ম আন্দোলন হইতেছে। শিক্ষার প্রতি অর্থাৎ জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতি আমাদের একটা

সার্বজনীন টান হওয়াতে, এবং আমরা শিক্ষিত কর্মীর কর্মের মূল্য বুঝিতে শিখিতে, মানুষের চোখে গৃহকার্যের মর্যাদা বাড়িয়া উঠিতেছে। এই কার্যে লোক পাওয়া জনমতের উপরই নির্ভর করে। আমি এমন অনেক উদ্র ও শিক্ষিতা যুবতীকে জানি যাহারা গৃহকার্য সম্বন্ধে মানুষের সেকলে হীন ধারণাটা ঘুচিয়া গেলেই লোকের বাড়ী গিয়া অর্থের বিনিময়ে কাজের সাহায্য করিয়া দিয়া আসিতে রাজি আছেন। সকল ব্যবসয়েই মানুষ, তাহার কার্যপটুতার উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে কি না এবং সম্মানজনক ব্যবহার পাইতেছে কি না, এই দুইটি বড় জিনিষ দেখিয়া চলে। সকলজাতীয় শ্রমেই শ্রমিকদের মনের ভাব বদলাইতে শুরু করিয়াছে, গৃহকার্যেও নিশ্চয় তাহার সূচনা হইবে। সেকলে ভেদ-রেখাগুলিকে আমরা ক্রমে উঠাইয়া দিতেছি। হইতে পারে যে ইতিমধ্যেই নূতন কোনো ভেদরেখা দেখা দিয়াছে, কারণ আজকালকার মানুষ পরাসক্ত ও গলগ্রহকে ভাল চোখে দেখে না।”

আত্মনিন্দার একটি দৃষ্টান্ত

কাগজে দেখিলাম, হিন্দুমহাসভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র হইতে আগত শ্রীপাদ শাস্ত্রী নামক একজন লোক বাঙালীদের ভীকৃতার গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে হাসাইয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, বাঙালীদের নিন্দা করিবার জন্ম সে-সব কথা তিনি বলেন নাই, অর্থাৎ তিনি আমাদের কল্যাণ-প্রার্থী। একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কল্যাণ-কামনায় সমালোচনা ও-রকমের হয় না। ঐ নিন্দুক ব্যক্তিকে আমরা বাঙালীবিরোধী মনে করি, এবং তাঁহার গল্পগুলাও সত্য ঘটনা কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বাঙালী একটা অদ্ভুত সাহসী জাতি; আমরা তাহা মনে করি না ও বলি না। কিন্তু জন-সমষ্টির ও ব্যক্তিবিশেষের ভীকৃতার চরম দৃষ্টান্ত ভারতীয় বীরজাতিদের ব্যবহার হইতেও দেখান যায়। তাহার দ্বারা তাহাদের জাতিগত ভীকৃতা প্রমাণ হয় না। অতএব, আমরা মনে করি, যাহারা প্রতিকূল মন্তব্য না করিয়া শ্রীপাদ শাস্ত্রীর অবজ্ঞা-ও-বিরোধ-প্রণোদিত গল্প বাংলা কাগজে ছাপিয়াছেন, তাঁহারা স্বেবিবেচনার কাজ করেন নাই।

বাঙালী বিপ্লববাদীদের “রাজনৈতিক” ডাকাতী, “রাজনৈতিক” খুন প্রভৃতির সমর্থন আমরা করি না, নিন্দাই করি; যেমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীরদের পরদেশ লুণ্ঠন ও অগণিত নরহত্যারও প্রশংসা করি না। কিন্তু

আমরা চাই, যে, বাঙালীর ছেলেরা ডাকাত গুণ্ডা জন্ম করিতে, নারীর উপর অত্যাচারীদিগকে দমন করিতে এবং নানা বিপৎসঙ্কল সংকাজে সেইরূপ সাহস প্রদর্শন করুন যেরূপ নিভীকতা বিপৎগামী ও নিবোধ বিপ্লববাদীরা দেখাইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি এরূপ সাহস তাঁহাদের অনেকের আছে।

শাক্ত বিপ্লববাদীর পুনরাবির্ভাব ?

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে, রাজনৈতিক কয়েদী-দিগকে জেল হইতে খালাস দেওয়া হউক। অবশ্য, যাহারা খুনখারাবী করিয়াছে, তিনি এরূপ কয়েদী-দের মুক্তি চান নাই। যাহা হউক, সরকার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়, এবং বলা হয়, যে, অল্পবলে ও তদ্বিধ অন্য উপায়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগী একটা দল বঙ্গে গোপনে গড়িয়া উঠিতেছে। এই প্রকারে প্রমথবাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সরকার পক্ষ হইতে স্টিফেন্সন সাহেব অনেক বাঙ্গালী সম্পাদককে সরকারী উক্তির প্রমাণও দিয়াছিলেন, অনিতেছি। এই-সব প্রমাণের মূল্য কিরূপ, জানি না। শাক্ত বিপ্লববাদীর পুনরাবির্ভাব যে হয় নাই বা হইতেই পারে না, এরূপ বলিবার মত গোপনীয় দেশের খবর আমরা রাখি না। কিন্তু যদি সত্যই সেরূপ পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাতে, সাত্ত্বিক প্রতিরোধ ও অসহযোগ-পন্থার অনুসরণ করিয়া যাহারা জেলে গিয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তির বাধা কোথায়? তাঁহারা ত শাক্ত বিপ্লববাদী নহেন। আঘাত সহ্য করাই তাঁহাদের ধর্ম, আঘাত করা তাঁহাদের নীতি নহে।

ইংরেজের রাজনীতি বড় আজব চৌঙ্গ। অমুনয় বিনয় প্রার্থনা “আইনসঙ্গত” আন্দোলনে তাঁহারা কান দেন না। অসহযোগপন্থীদিগকে তাঁহারা জেলে পাঠান, এবং অন্য সব পথ বন্ধ দেখিয়া যাহারা উন্নত ও “মরিয়া” হইয়া তাহার উন্টা পথের পথিক শাক্ত বিপ্লববাদী হইয়া তাহাদের ফাঁসী দেন। অসহযোগ-প্রচেষ্টা ও শাক্ত বিপ্লবচেষ্টা উভয়ই যে ইংরেজের শাসননীতির ফল, তাহা স্বীকৃত হয় না। রাশ্‌ক্রু উইলিয়মসের লেখা সরকারী বার্ষিক ভারতবিবরণীতে স্বীকৃত হইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লববাদ ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হয়। সেইজন্য, বোধ হয়, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহাকে ছয় বৎসরের নিমিত্ত কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে, তাঁহার প্রভাব কার্যক্ষেত্র হইতে কতকটা অপমৃত হওয়ায়, যদি বিপ্লবপন্থার পুনরাবির্ভাব হয়, তাহা হইলে দোষটা কাহার ?

গোস্বামী তুলসীদাসকে শ্রদ্ধা অর্পণ

তিন শত বৎসর পূর্বে বারাণসীধামে হিন্দী ভাষায় রামায়ণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণেতা মহাকবি গোস্বামী তুলসীদাস পরলোক যাত্রা করেন। এইজন্য এবৎসর বারাণসীতে ও হিন্দীভাষী আরও অনেক স্থানে তাঁহাকে শ্রদ্ধা অর্পণের জন্ম সভা হয়। তিনি কবি, ভক্ত ও ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন। হিন্দীভাষী প্রদেশসমূহে তাঁহার রামায়ণ দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ ও জীবন যে পরিমাণে গঠিত হইয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থ দ্বারা তাহা হয় নাই। ইহার গ্রন্থাবলীর ভাল অনুবাদ ও ইহার জীবনের আলোচনা যত হইবে, ততই মঙ্গল।

আমেরিকান সংবাদিকদের ক্রটির কথা

ডাক্তার গ্লেন ফ্র্যাঙ্ক সেকুরী ম্যাগাজিন পত্রে যে সাতটি দোষকে আমেরিকান সংবাদ-পত্র পরিচালনের মহাদোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি অল্পদেশেও এবং তথায় সমানই অকল্যাণকর বলিয়া বোধ হয়। অস্তিতঃ ভারতবর্ষে ত বটেই। সুতরাং তাঁহার মতগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে কাজে লাগিতে পারে। তাঁহার মতে যে কয়টি মহাদোষের জন্ম আমেরিকার (এবং অন্যান্য দেশের) মাসিক এবং সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে লোকহিত সাধন করিতে পারে না, তাহা এই—

“প্রথমতঃ, আমেরিকান পত্রিকাগুলি অপরিবর্তনীয় মতামত এবং কায্যপ্রণালীনিয়ামক নীতি (policy) লইয়া কাজ আরম্ভ করে। প্রত্যেক মাসিক পত্রেরই এরূপ একটি নির্দিষ্ট নীতি থাকিতে হইবে, এই ধারণাটির জন্ম উপকার অপেক্ষা অপকার হইয়াছে বেশী। অর্থগুরু হওয়া এক্ষেত্রে যেমন দোষের, কোন প্রকারে মত পরিবর্তন না করাও সেইরূপ। অবশ্য আমি ইহা বলিতে চাই না, যে, উপযুক্ত সম্পাদক হইতে হইলে তাঁহাকে একেবারে মেরুদণ্ডবিহীন হইতে হইবে। কোন বিষয়েই কোন স্পষ্ট মত নাই, এমন মানুষের পক্ষ লইয়াও আমি ওকালতী করিতেছি না। আমি শুধু এই বলিতে চাই, যে, আজকালকার পরিবর্তনশীল জগতে যদি কতকগুলি অপরিবর্তনীয় মতামত লইয়া কাজে নামা যায়, তাহা হইলে দেশের লোককে ভাল করিয়া কিছু বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত; অথচ এইটাই পত্রিকার কাজ।

“আমেরিকায় দশটা খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রের ভিতর ন’টার এই অবস্থা। তাহার ফলে অধিকাংশ আমেরিকান পত্রিকাই খুব ভাল করিয়া মাকা-মারা হইয়া উঠিয়াছে—কতকগুলি রক্ষণশীল, কতকগুলি উদার-নৈতিক, ইত্যাদি। এবং যে যুক্তি একটি পত্রিকাকে এইরূপ একটা নির্দিষ্ট মতের বাহন বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, তখনই ইহার পাঠকের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ মতাবলম্বী মানুষ ভিন্ন আর কেহই উহা পাঠ করিতে চায় না। সাধারণভাবে কথা বলিতে গেলে একেবারে নিভুল কিছু বলা শক্ত; তবু ইহা ভরসা

করিয়া বলা চলে, যে, উদারনৈতিকগণ, শুধু উদারনৈতিক পত্রিকাই পাঠ করেন এবং রক্ষণশীলগণও কেবলমাত্র গোঁড়া কাগজগুলির দিকেই পক্ষপাত দেখান। বন্ধমূল মত, এবং সমুদয় ব্যাপারকে নির্দিষ্ট কোন একটা দিক হইতে দেখা; এই দুইটি জিনিষ প্রাচীরের মত ঝাড়া হইয়া শিক্ষিত সমাজের এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগের ভিতর মানসিক বাণিজ্য বা আদান প্রদান অত্যন্তই কম।”

তাহা হইলে এইরূপ আদান-প্রদানের কি প্রকার ব্যবস্থা করা যায় ?

“প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে দুই বা তিন শ্রেণীর পত্রিকা পড়িয়া তবে বিভিন্ন মতামত জানিতে হইবে, একপ বাবস্থা হওয়া উচিত নয়। নানাপ্রকার মতামত একই পত্রিকায় পাওয়া যাইবে না কেন? আদর্শ পত্রিকার সত্যের প্রতি প্রবলচিত্ত অনুরাগ ভিন্ন আর কোন লক্ষ্য থাকি উচিত নয়। সত্যের খাতিরে যখন যে-দিকে যাইতে হয়, আদর্শ সম্পাদক তাহাই যাইবেন। ফলে হয়ত তাহাকে জানুয়ারী মাসে রক্ষণশীল এবং ফেব্রুয়ারী মাসে উদারনৈতিক হইতে হইবে। পত্রিকাগুলিকে এক একটি নির্দিষ্ট গোপে ভাগ করিয়া রাখা, এবং সম্পাদকদিগের যে অভ্যাস-দোষে এইপ্রকার মার্কী মারা সম্ভব হয়, এই দুইটি দোষে জাতির অগ্রগমন যথেষ্ট দ্রুত হইতে পারে না, এবং জাতির ভিতর ভাবের সংঘাত এবং মানসিক অস্বস্থি পব চলিতে থাকে।”

ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক আরও বলিতেছেন—

“দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকান পত্রিকাগুলি, দেশের লোকে যে-সব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে, সেইগুলিই বাদ দেয়। ধর্ম, বাণিজ্য, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে, যে জিনিষগুলি সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনীয় এবং সেগুলি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হইলে, মণ্ডলী, সম্প্রদায় এবং ক্লাবগুলিতে সত্যসত্যই যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, সেগুলি অধিকাংশ সম্পাদকের আফিসেই প্রবেশপথ পায় না। আমেরিকান সম্পাদকগণ সর্কদাই এমন জিনিষের সন্ধানে ব্যস্ত, যাহা অধিকতম-সংখ্যক লোকে তাহাদের পত্রিকা কিনিতে উৎসাহিত করিবে, কিন্তু এমন জিনিষ তাহারা চান না, যাহার আলোচনা হইলে শেষে তাহাদের অনেক গ্রাহকই তাহাদের কাগজ লওয়া বন্ধ করিবেন। খানিষটা আগ্রহ উদ্বেক করিতে তাহারা অবশ্য চান, কিন্তু অতিরিক্ত আগ্রহে তাহাদের আপত্তি আছে। স্বীকার না করিলেও এই নীতি অনুসরণ করিয়াই তাহারা চলেন। সম্পাদক মহাশয় গ্রাহকগণ কিসেব ভিতর রস খুঁজিয়া পাইবেন তাহা আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত, তাহাদিগের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয় তাহা ভাবিবার বা আলোচনা করিবার অবকাশ তাহারা নাই। যে সম্পাদক কেবলমাত্র পাঠকের আগ্রহ উদ্বেক করিতেই চান, কালে তিনি একটি উত্তেজনা-সবনরাত্তর বণিক হইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু যিনি পাঠকের যথার্থ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাহাকেই বলি যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ।

“একেবারে সর্বদোষের অতীত হইয়া উঠিতে হইবে, এমন উপদেশ আমি দিতেছি না। পাঠকদিগের ক্রটির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে তাহারা পত্রিকাটি ত্যাগ করিবে, এবং কাগজ চলিবে না। আমি বলিতে চাই, যে, অনেক ক্ষেত্রে অতি-সাবধানতার পরিবর্তে একটু যদি সাহস দেখানো যায় তাহা হইলে আর্থিক সুবিধাও হয়, এবং পত্রিকা পরিচালনের সামাজিক মূল্য বৃদ্ধি ত হয়ই।

“তৃতীয়তঃ, আমেরিকান পত্রিকাগুলি পাঠকবর্গের বুদ্ধিকে বড় কমাইয়া দেবে। অধিকাংশ সম্পাদকই একটি ভুল করেন, ‘সাধারণ

পাঠক’ নামে তাহারা একটি কাল্পনিক জীব সৃষ্টি করেন, যে কোন কালে ছিল না, নাই, এবং থাকিবেও না। আমাদের ভিতর অনেকেই পাঠকের বুদ্ধির অগম্য ভাবে লেখনী চালনা করিয়া বা তাহারা অল্পবুদ্ধির স্তরে নামিয়া আসিয়া লিখিবার চেষ্টায় যে-সময় নষ্ট করেন, পাঠকের মনে যথার্থ কি যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টায় ততটা মোটেই করেন না।

“পাঠকের বুদ্ধি সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করাটা সাধারণ সম্পাদকদিগের সর্কপ্রধান দোষ। ইহা অস্বীকার করা চলে না, যে, আমাদের জনপ্রিয় পত্রিকাগুলি এই ধারণা লইয়াই চলে, যে, আমেরিকান মনকে কাহুকত দেওয়া আমোদ দেওয়া চলে, কিন্তু তাহাকে কখনও স্বন্দে আহ্বান করা চলে না।

“চতুর্থতঃ, আমেরিকাব সম্পাদকবর্গ পাঠকের জ্ঞান একটু বাড়াইয়া দেখেন। উচ্চদের কাগজগুলির এইটাই সর্কপ্রধান দোষ। বোধ হয় উইলিয়ম হাজলিটাই বলিয়া থাকিবেন, যে, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া নতন করিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত, যে, পৃথিবীর লোকে কিছুই জানে না। আসল কথা, আমাদের ভিতর অতি অল্প লোকেই কোন কিছু সম্বন্ধে পাকাপাকি খবর রাখে। উচ্চদের কাগজগুলিতে এমন অনেক অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য সংক্ষেপে দেওয়া থাকে, যাহা একটু বিশদ ভাবে লিখিলে হাজার হাজার আমেরিকান অতিশয় আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে পারে। তবে পড়িতে বসিয়া, যদি অভিধান, বিশ্বকোষ, সাময়িক সাহিত্যের নিঘণ্ট এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতির এক-একটি বিশেষজ্ঞ পবিবেষ্টিত হইয়া, পড়িতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য কেহ পড়িবে কি না সন্দেহ।

“আদর্শ পত্রিকার উচিত পাঠকের বুদ্ধিকে বড় করিয়া এবং তাহার জ্ঞানকে ছোট করিয়া দেখা। পত্রিকায় যেরূপ প্রবন্ধকে আমি আদর্শ মনে করি, তাহা এমন ভাবে লেখা হইবে যেন তাহার পাঠকপাঠিকার দল অকস্মাৎ মঙ্গল গ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে,—তাহারা ইংরেজী ভাষা জানে, কিন্তু এক্ষেত্রে যে-সকল তথ্যের আলোচনা হইতেছে, সেগুলির বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। একটি প্রবন্ধ বুলিতে হইলে যাহা কিছু জানা দরকার, সব যেন ঐ প্রবন্ধের ভিতরেই থাকে। আমি অবশ্য খুব বেশী বাড়াইয়া বলিতেছি। কিন্তু এইদিকে উন্নতির খানিকটা চেষ্টা না করিলে আমাদের গভীরবিষয়ক পত্রিকাগুলিও যথার্থ পত্রিকার পরিবর্তে গল্প শুনাইবার কাগজই থাকিয়া যাইবে।

“পঞ্চমতঃ, আমেরিকান কাগজগুলি আমাদের মাতৃভাষায় লিপিত নয়। উচ্চদের এবং নীচদের সকল কাগজেরই এই দোষ আছে। অভদ্র চলতি কথা খারাপ মাতৃভাষা নয় এবং দুর্কোষ্য আড়ষ্ট পণ্ডিতী ভাষাও নয়।

“উচ্চদের কাগজগুলি যদি আপনাদের পণ্ডিতী বুকুনী ত্যাগ করিয়া সাধারণ ভাষায় কথা বলেন এবং নীচদের কাগজগুলি যদি অভদ্র চলতি কথা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে জনসমাজের কতখানি উন্নতি যে হয়, তাহা একমুখে বর্ণনা করা যায় না। কয়েকটি মাত্র বিশেষ অনুগ্রহীত ব্যক্তির মধ্যেই দেশের উচ্চ চিন্তার ধারাটা তাহা হইলে আবদ্ধ হইয়া থাকে না, এবং আমেরিকান ভাষার শোচনীয় অধঃপতন নিবারিত হয়।

“ষষ্ঠতঃ, আমেরিকান পত্রিকাগুলি যথাকালে কথা বলার দিকে বড় বেশী লক্ষ্য রাখে। যখন যাহা ঘটিল, অমনই তৎক্ষণাৎ ঠিক সময়ে কিছু লিখিবার জন্ত এমন উর্দ্ধ্বাসে দৌড়ের ভিতর কোথাও একটা গলদ আছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সকল পত্রিকার বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ করা যায়। চট করিয়া যে মত

প্রকাশ করা হয়, তাহা অপেক্ষা ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কথা বলা হয় তাহার মূল্য যে অধিক আমি কেবল ইহাই বলিতেছি না; সে ত জানা কথাই। আমি বরং ইহাই বলিতে চাই, যে, যেদিন একটা ঘটনা ঘটিল অথবা যে মাসে ঘটিল, সেই দিনে বা সেই মাসেই যদি সে বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে উহা যথাকালে প্রকাশিত হইল বলা চলে না। আমেরিকান পত্রিকাগুলি আসলে যথাকালে কাজ করে না, ইহাই বোধ হয় আমার বলা উচিত; কারণ যে সময়ে কথা বলিলে কথাতে যথার্থ দেশের কাজ হয়, তাহাই যথাকাল; এবং কোন ঘটনা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার যথাকাল, উহা যে মুহূর্ত্তে ঘটিল তখনই নয়, কিন্তু উহা যখন জনসমাজের মনে চিন্তায় এবং বাক্যে স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন। পাঁজী দেখিয়া দিন স্থির করা সম্পাদকের উচিত নয়। তাঁহাব দেখা উচিত, যে, কতদিনে একটা ঘটনার সংবাদ ও চিন্তা এমনভাবে দেশব্যাপী হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে, যে, সে বিষয়ে কিছু লিগিলে অধিকতমসংখ্যক মানুষ আগ্রহ করিয়া উহা পাঠ করিবে এবং সে বিষয়ে আলোচনা করিবে।

“সপ্তমতঃ. আমেরিকান পত্রিকাগুলি আমেরিকানদের (Americanism এর) সমর্থন করেন। উহাকে তাঁহারা পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত কোন অপরিবর্তনীয় স্বাবর বা স্থিতিশীল জিনিস মনে করেন। কিন্তু আমেরিকানরা কোন অচল সম্পত্তি নয়, উহাকে সযত্ন রক্ষা করিবার দব্কার নাই; উহা বর্ধগশীল জিনিস, উহাকে বিকশিত হইতে, বাড়িতে দিতে হইবে। আমরা উহাকে রক্ষা করিবার জন্ত যে শক্তি ব্যয় কবি, তাহাব অর্ধেকও যদি উহাকে বিকশিত করিয়া তোলাকপ সৃষ্টি কাথোর দিকে দিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বৃনিত্তে পারিতাম, যে, উহাব বিবর্তন বা বিকাশই উহাকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। একটি মজার ব্যাপার এই দেখি, যে, যে-সকল সম্পাদক আমেরিকানদেরকে রক্ষা করিতে সর্বাপেক্ষা ব্যস্ত, তাঁহারা ই বোধ হয় জিনিসটি কি ভাল করিয়া বলিতে পারেন না।”

ভারতবর্ষেও আমরা দ্বেখি লোকে “হিন্দুত্ব”, “ভারতীয়তা”, “ভারতীয় সভ্যতা” প্রভৃতির হইয়া প্রচুর ওকালতী কবে। তাহারা ধবিয়া লয়, যে, ঐ জিনিসগুলি

অচল স্বাবর, এবং একেবারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু সেগুলি অচল মোটেই নয়, উহারা এখনও বাড়িতেছে, এবং তাহাদের বিকাশ বিবর্তন এবং বৃদ্ধি যেন উপযুক্ত ভাবে এবং স্থপথে হয়, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার।

বিশ্বভারতী-সংবাদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সমস্ত বাংলা পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন— তাঁহার পুস্তকের সংখ্যা দেড়শতেরও উপর হইবে। ঠাকুর মহাশয়ের সমস্ত বাংলা বই কলিকাতায় ১০ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বিশ্বভারতী-কার্যালয়ে বিক্রয় হইবে। এই গ্রন্থালয়ের সংলগ্ন একটি পাঠাগারও খোলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের যে-কোন বই ঐ পাঠাগারে গিয়া পাঠ করার সুবিধা থাকিবে।

শাস্ত্রনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি কারিগরী-বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেই বিভাগে বই বাঁধানো, গালার কাজ, কাপড় বোনো, কাঁথা সেলাই, কাঠের ও মাটির খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি কাজ শিখানো হইতেছে। এ বিভাগের পরিচালন-ভার প্রধানত মহিলারাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিভাগের সমস্ত কাজের নমুনাও বিশ্বভারতীর উপরি-উক্ত কলিকাতার কার্যালয়ে পবিদর্শনের জন্ত রাখা হইবে।

চিত্র-পরিচয়

বন্দনা

গুজরাট অঞ্চলে মহিলাবা দেবতার সম্মুখে মন্দিরা বাজাইয়া ভজন গান করেন।

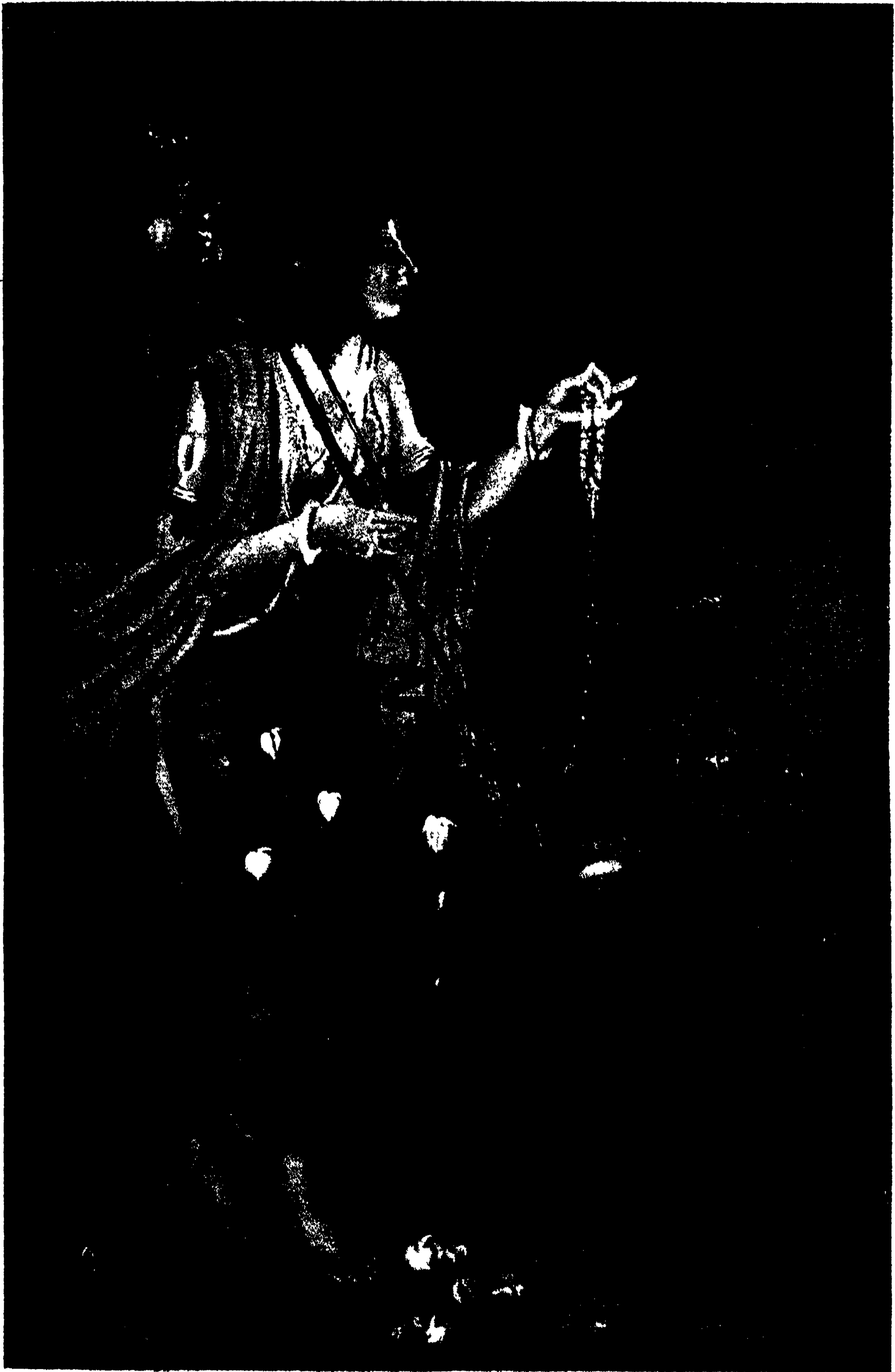
কাশ্মীরী পণ্ডিতানী

কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদিগকে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণীদিগকে পণ্ডিতানী বলে।

“বেলা অবসান হল”

বেলা-অবসানে কমল মুদ্রিত হইতেছে, মুদ্রিত কুসুম ছাড়িয়া প্রজাপতি ও ভ্রমর ফিরিয়া চলিয়াছে—এই মৃত্যুর ও বিচ্ছেদের পূর্বাভাস ভাবকের মনে বেদনা ও নয়নে অশ্রু জাগাইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়



নারদ
চিত্রকর শ্রীপরশুচন্দ্র সিংহ

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

২য় সংখ্যা

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসে, তাদের সংখ্যা দশ বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালীতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পারলে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এইজন্তে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি করে'ও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে যুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। একদিন বোকার মত করছিলাম মাছি-মাঝা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মত করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেন্সিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সব-কটাকেও একত্র যোগ করতে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

বায়ুগুলে ঝড় জিনিষটাকে আমরা দুর্যোগ বলেই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুমোর আকারে আসতে থাকে। এই প্রহারটা ত হ'ল একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ? আসল কথা, যে-বায়ুস্তর-গুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেছে। এক অংশের বড় বেশি গোরব, আর এক অংশের বড় বেশি লাঘব হয়েছে। এত সহ হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়গড় করে' ওঠে, পবনদেবের ভেঁপু ছ ছ করে' ছকার দিতে থাকে। যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পংক্তি-ভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চলবার সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটলেই তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। তখন ঐ যে অরণ্যটার গাঙ্গীর্ঘ্য নষ্ট হয়ে যায়, ঐ যে সমুদ্রটা পাগলামি করতে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিশতক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, স্বর্গে মর্ত্যে এই রব উঠল, “ভেদ ঘটেছে, ভেদ ঘটেছে।”

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মাহুষের মধ্যেও তাই।

বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি, ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘটল, তাহলে ঐ ভেদটাই হল মূল বিপদ। যতক্ষণ সেটা আছে, ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, উনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন করবার চেষ্টা করে' ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই ধামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কি চাই সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারো প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না, তা নয়; পলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্সন্ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে' গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রই অধীনতা। এমন কি, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্সন্ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি? কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়? যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সংজ্ঞাবাদ থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্ষের অবিশ্বাসী হ'ত, তাহলে তার সম্বন্ধে রবিন্সন্ ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হ'ত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই বলেই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, স্তত্রাং ঐ আমাকে বাঁধে, আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায়, সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতা-

মূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসম্বন্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্নের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ করে' তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলি ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে? যে মুক্তিতে অহঙ্কার দূর করে' দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য—এইজন্মে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাইনে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাইনে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে' দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েছি, সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলে' প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেচে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা চাই। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে' বুঝতে হবে যে যুরোপ যখন বলেচে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজ-দেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল—সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি

ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েচে। আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ—নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিরূপে ব্যবহার করে' কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে' পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায় এ কথাই কোনো অর্থই নেই। সে কেমন হয়, না, মেজবোঁ বল্চেন যে তিনি স্বামীর মুখ দেখতে চান না, সন্তানদের দূরে রাখতে চান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, কিন্তু বড় বোঁয়ের হাত থেকে ঘরকরনা নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।

যুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে' তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা

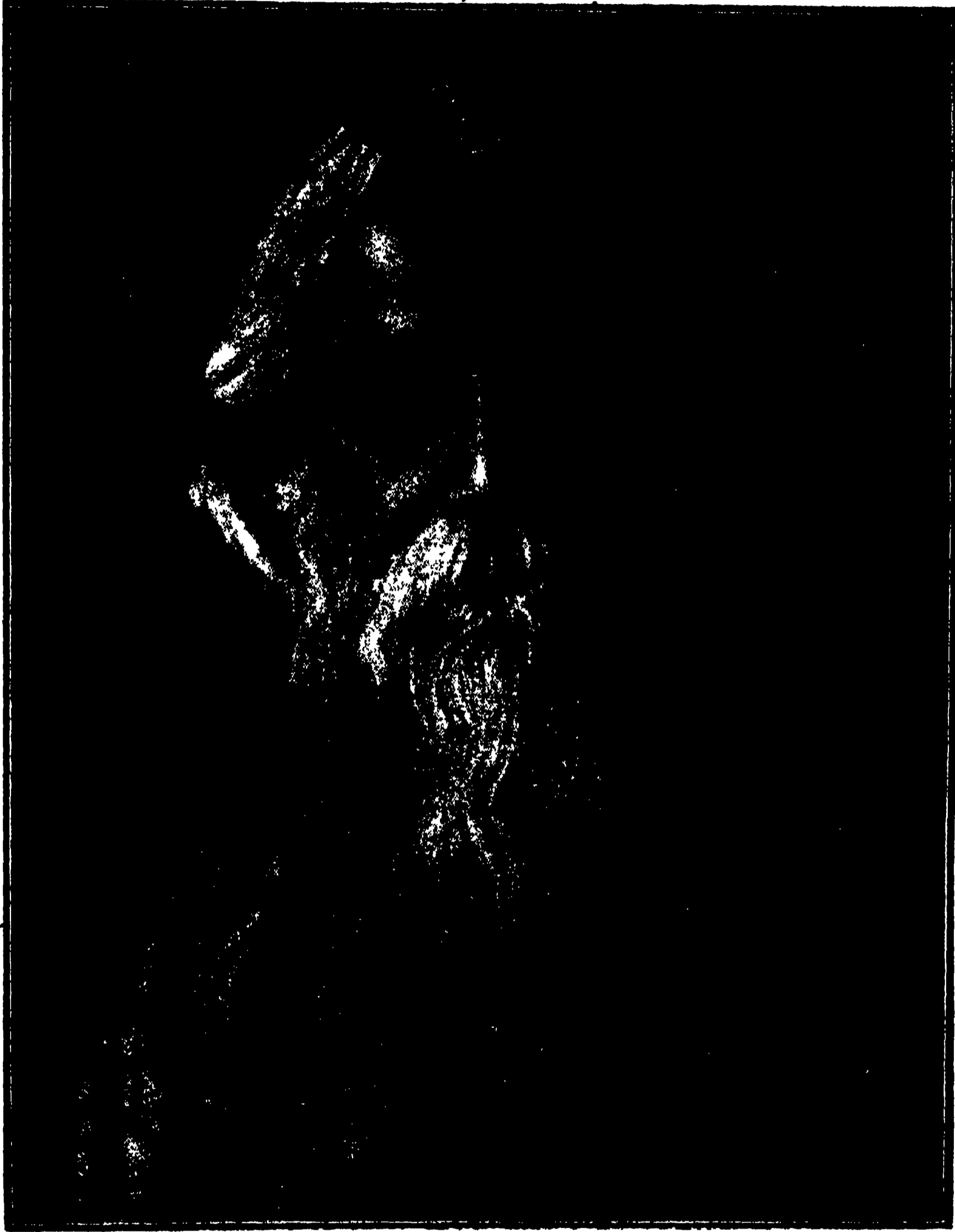
এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অপরদিকে প্রজা যদিচ একই জাতের মানুষ, তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী

হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেল্লাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে' ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখছি, আরেকটা বিপ্লবের হাওয়া বইচে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে, আর যারা মজুরী খাটুচ্ছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে 'উঠে' কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলে-পুলেরা লেখা-পড়া শিখতে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে দয়া করে' মাঝে মাঝে

সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল; ধনীর অনুগ্রহের ছিটে-ফোঁটা

সেই ভেদ ত ঘোচে না, তাই আপদও মিটতে চায় না।

বহুকাল হল ইংলণ্ড থেকে একদল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলণ্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল; এই শাসনের দ্বাৰা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ



আমেরিকায় বসতি করে

মেটেনি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে' ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। অথচ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

একদিন ইটালিতে অষ্ট্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে মুক্তিলাভ করে' সমস্তার সমাধান করেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভেদের দুঃখ থেকে ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। এমন কি, আমাদের দেশের ধর্মসাধনার মূল কথাটা হচ্ছে ঐ,—তাতে বলে—ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিজ্ঞান।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আরেক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ; এক পা বড় আরেক পা ছোট, সে আরেক রকমের ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অণু অংশের বিচ্ছেদ, সে অণু রকমের ভেদ; এই সব রকম ভেদই স্বাধীন-শক্তি-যোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি করে' নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে' চালাতে গেলে তার বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ঐ যে পূর্বেই বলেছি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে' জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয়নি, সূতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে' আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজ-নৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সূতাকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধু সম্বন্ধে ছড়ায় বল্চে :—

এক কণ্ঠে রাঁধেন বাড়েন, এক কণ্ঠে খান,
এক কণ্ঠে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।

তিন কণ্ঠেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল,—কিন্তু দ্বিতীয় কণ্ঠটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কণ্ঠের সেটা আয়ত্ত্বাধীন ছিল না; অতএব উদর এবং আহার-সমস্তার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন,—বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কণ্ঠের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার ফলভোগ করে' পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে-কথা ধরে' নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে' বারবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবী করেছেন, শেষে শিব-ঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বেলা বইয়ে দিয়েছেন—নয়ত রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আরেকজন পাত শূণ্য করে' দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্তা হচ্ছে, যে কারণে এমনটা ঘটে, আর যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিব-ঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন, সেটা সর্বাগ্রে দূর করে' দেওয়া;—আব্দার করে' বল্লেই হবে না যে, মেজ-বউ যেমন করে' খাচ্ছে আমিও ঠিক তেমনি করে' খাব।

আমরা সর্বদাই বলে' থাকি বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করিনে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে' আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘৃষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যারা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে পাশে চারদিকেই

ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুন্সিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক, কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কি বলেই ফেল। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে' বলবেন—ও ত সবাই জানে! এইজন্মেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তার-বাবু অনিদ্রা না বলে' যদি ইন্সুমনিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে ষোলো টাকা ফি দেওয়া ষোলো আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অস্ত নেই। প্রথমেই বলেছি—ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মত ব্যবহার করতে পারি কখন? যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চারদিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাস্কর-ভাস্করবোয়ের সম্পর্ক, যার পায়ের শিরার রক্ত বৃকের কাছে উঠতে গেলেই দাব্‌ডানি খেয়ে ফিরে যায়, যার তর্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়, যার পায়ের তেল মালিশের দরকার হলে' ডান-হাত হরতাল করে' বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অল্প পাড়ার দেহটার মত স্বযোগ স্ববিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে অল্প

দেহটা জুতো জামা পরে' লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মত জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের পরে নিজের ভুল যোগ করে' দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে' পড়বে, ছাতা পেলেও তার ছাতা হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মত লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অল্প পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার গ্রহসনটাকে হয়ত ট্রাজেডিতে সমাপ্ত করে' দিতে পারে। এখানে জুতো জামা ছাতা লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিক্রপটি হয়ত বলে' থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিতে একটা জামা জোগাড় করে' নিয়ে সর্বত্র ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি ঘটে' উঠবে। আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্বশেষে; কেননা, নিজস্ব ফাঁকিকে মানুষ ভালবাসে, তাকে যাচাই করে' দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত,—আমরা কি নেশন, না, নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারিনি, কিন্তু আমরা নেশন নই এ-কথা যে-মানুষ বলত রাজা হলে তা'কে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংসভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হ'ত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজারল্যান্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও ত তারা এক নেশন, তবে আর কি! শুনে ভাবতুম,—যাক, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বললেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল—“ভয় কি, দুর্গা বলে' ঝুলে পড়” তখন সে সাস্তনা পায়নি; কেননা দুর্গা বলতে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুই-

জব্বল্যাণ্ডের লোকেরাও নেশন, আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে' সাত্বনাটা কি,—ফলের বেলায় দেখি আমরা 'ঝুলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনীতে করে' জল এনে কলক ভঙ্গন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনীটা আছে, কিন্তু তার কলক-ভঙ্গন হয় না, উর্টোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। স্বইজব্বল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক, ভেদবুদ্ধি ত নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিষয় দূর করবার প্রস্তাব হবামাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্বেগে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যারা নিজেদের এক মহাজাত বলে' বহুনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্ম্মের শাসনে চিরদিনের জন্তে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না, সূত্রাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্ত-বিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠানু দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রী হরণ করে' থাকে। একবার এই রকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য কর কেন? সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, "উয়ো ত বেনিয়াকী লড়্কী।" "বেনিয়াকী লড়্কী" হিন্দু, আর যে ব্যক্তি তার হরণব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্তে একের আঘাত অণ্ডের মর্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্চে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড় সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে

পড়ে, তখন আপনাকে আপনি যাঁকি দিলে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে' থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম-হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান-হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে-কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি—সেইজন্তে সেদিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তু গড়ে' তুলতে 'চাই তার মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে' গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিৎকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত-মত চাপা দিলেই সে ত পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না। এসব কথা শুনলে অর্ধৈর্ষ্য হয়ে কেউ কেউ বলে' ওঠেন, "আমাদের চারদিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবে, অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ তারই। ইতিপূর্বে আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি নির্বিবাদেই ছিলুম কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি।" শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র খোঁজে। পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ করে' সর্বনাশের পাল্লা আরম্ভ করে' দেয়। বিপদটা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্চে সকল বিপদের সেরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়া দিয়েচে। মাঝে মাঝে লোনা জল স্বেচ্ছতেও হয়েছিল, কিন্তু সে দুঃখটা মনে রাখবার মত নয়। যেদিন তুফান উঠল, সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েচে। কাপ্তেন যদি বলে—যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার ফাটলটি ঘেঁষন ছিল তেমনই থাক; তা হলে ঐ কাপ্তেনের

মত নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয়পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয়, তা হলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে তারা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগতে আসেনি। তারা ভয়ঙ্কর বেগে চোপে অ'ঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্বলাত্মকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক-কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাসু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করে' বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট কর্চি ততক্ষণ যথাসর্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগলে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন—কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে' সমুদ্রকে জেঁবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মত ধর্মপ্রাণ হিন্দুরও এতবড় আব্দার তিনি শুনবেন না। অতএব কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়্চি যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফাটল-মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন—সেদিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে তার একটা প্রমাণ দেখ যে, যদিও আমরা সনাতন-পন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই। আমি বলি এহ বাহ। স্পর্শদোষ ত আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই ত পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্বে অন্তত বলেছি, ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে' বলবার চেষ্টা করি। সকলেই বলে' থাকে—ধর্মশব্দের মূল অর্থ হচ্ছে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব, তারা হচ্ছে ধর্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক

নেই। এই-সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল করতে থাকি, তা হলে বাঁচিনে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্তন চল্চে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অস্ত নেই, সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে' বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচিনে। এই নিত্য-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘটবেই। যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভাল, কিন্তু তাই বলে' ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে, পৃথিবী ধর্মের মত ধ্রুব হলেই আমার পক্ষে ভাল—তার নড়চড় হতে থাকলেই সর্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে, সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব করে' তুলি, তা হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোণো গাড়ি বেচতে হয় বা মেরামত করতে হয়, নতুন গাড়ি কিনতে হয় বা ভাড়া করতে হয়, কখনো বা গাড়িতে ঢুকতে হয়, কখনো বা গাড়ি থেকে বেরতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব দেখলে তার থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্তে বিধান নেবার পূর্বে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী কর, তখন কোনো তর্ক না করে'ই কথাটাকে মাথায় করে' নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না, তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে—কেন করব না? একথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মত অনিত্য, তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল, এসব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে,—বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার শিকার আছে “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে

বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে' তারা দেবপূজার অপমান করতে কুষ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য মিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভূতুড়ে কাণ্ড। কেন, কি বৃত্তান্ত, বলে' ভূতের কোনো জবাবদিহী নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা-ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এত বড় জোর তার কিসের? না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীক মন তাকে বাস্তব বলে' মেনে নিয়েছে। প্রকৃত বাস্তব যে, সে বাস্তবের নিয়মে সংযত, যদি বা সে বাড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারী ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে' মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্মে কেবল বুক ছরছর করে, গা ছমছম করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে "কেন", জবাব দিতে পারিনে, কেবল পিঠের দিকে বড়ো-আঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি "ঐ যে!" তার পরেও যদি বলে "কই যে?" তাকে নাস্তিক বলে' তাড়া করে' যাই। মনে ভাবি, গৌয়ারটা বিপদ ঘটালে বুঝি,— ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে "কেন?" তা হলে উত্তরে বলি, "আর যেখানেই কেন খাটাও, এখানে কেন খাটাতে এস না বাপু, মানে মানে বিদায় হও। মরবার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ে।"

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার না সর্বমানবের। সুতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক-কারায় অবরুদ্ধ অকাল-জরাগ্রস্তদের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বৃহত্তের সঙ্গে এই ভেদ থাকারটাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা পূর্বেই

বলেচি ভেদটাই সকলদিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে' দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে' কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে' দিন কাটাই।

জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্তগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকি-লীলার শাস্তি হবে না, সুতরাং পর-পদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদ-যুগলের পরিবর্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ।

যন্ত্রসালিত বড় বড় কারখানায় মানুষকে পীড়িত করে' যন্ত্রবৎ করে বলে' আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটুক্তি করে' থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়্চি জেনে মনে বিশেষ সাস্থনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে; যে-হেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে বর্ষকে একটা বিশেষ সক্ষীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সক্ষীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে' বহুযুগ ধরে' বহুকোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশ-জোড়া মানুষ-পেষা জাঁতা-কল কি কল-হিসাবে কারো চেয়ে খাটো। বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে' এতবড় সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূণ্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে বলে' আমি ত জানিনে। চট-কল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয়, জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্মেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটা-কাটা যে-সব অতি ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। একটা বোঝা খালাস হতেই আরেকটা বোঝা তাদের অধিকার করে' বসে।

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন—“স নো বৃদ্ধা শুভয়া সংযুক্ত” —“য একঃ অবর্ণঃ”—যিনি এক, যিনি বর্ণভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চাননি। “বৃদ্ধা শুভয়া” শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেন, অন্ধ বশুতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন করে বোঝা-পড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাজটাই খুব বড় কাজ। আমরা বিশ্ব সৃষ্টিতে দেখতে পাই, আকস্মিক—বিজ্ঞানে যাকে variation বলে—আচম্কা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে এক ঘরে, কিন্তু বিশ্বনিয়ম বিশ্বচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সবার করে নেন, অথচ সে এক নূতন বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে, আকস্মিক প্রায়ই অনাহৃত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করলে এই নূতন আগলুকটি চারদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে, রুচিকে, চাবিত্রকে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে পণ্ডিত অবমানিত না করে সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে করা যাক একদা এক ফকীর বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সারা হল, ছাগলটারও একটা চরম সদগতি হয়ে গেল। উচিত ছিল এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্বকালোনের খাতিরের রাস্তার মাঝখান থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার করবে কে? অবুদ্ধি করে না, কেননা, তার কাজ হচ্ছে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা;—বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেচে তার সম্বন্ধে সে বিচারপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করতে পারে। যে দেশে, যা আছে তাকেই স্বীকার করা, যা ছিল তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভক্তি-

গদগদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদুর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে বসল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল—শুরুপক্ষের কার্তিক-সপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটিশরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা ত্রিকোটি কুলমুদ্রেরেৎ। এমনি করে অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোক-চলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাঁধা পড়ে থাকটা সহজ হয়ে ওঠে। যারা নিষ্ঠাবান তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অতএব কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাকলে আমাদের ধর্ম থাকে না। যারা খুঁটিশরীকে মানেও না, এমন কি, যারা বিদেশী ভাবুক, তাবাও বলে, “আহা, একেই ত বলে আধ্যাত্মিকতা; নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপুঁড়াতে চায় না।” সেই সঙ্গে এও বলে, “আমাদের বিশেষত্ব অতএব রকমের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ করতে চাইনে, কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধর্মের বেড়া জালে এই রকম বাঁধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে। কারণ, এটি দূর থেকে দেখতে বড় সুন্দর।”

সৌন্দর্য নিয়ে তর্ক করতে চাইনে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্মের নিজের অধিকারে ধর্ম বড়, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়। আমার মত অর্ধাচারেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্রশ্ন করবে, এমনতর খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে? বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে তার ঘুম হয় না। যে-হেতু, গৃহিণীরা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করে বলেন, “ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কি জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়। তোমরা চূপ করে থাক না। কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মত ডানপিটে ছেলের ত অভাব নেই।” শুনে আমাদের মত নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুকধুক করতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে

সংসারটাকে ত ছেকে ফেলতে পারিনে। কাজেই পরের দিন ভোর-বেলাতেই এক সৈবের বেশি ছাগছন্ধ তিন তোলার বেশি রজত খরচ করে' হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এই ত গেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির বাস্তায় কর্মের বাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে' পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে' তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চির্বাচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা! ভাবুক লোকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে চলছিল নেত্রে বলেন, আহা, এখানে ভক্তিটাই হ'ল বড় কথা এবং স্তন্দর কথা, খুঁটিটা ত উপলক্ষ্য; আমাদের মত আধুনিকেরা বলে, এখানে বুদ্ধিটাই হ'ল বড় কথা, স্তন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল।—কিন্তু আগ, গৃহিণী যখন অশুভ-আশঙ্কায় করছোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজেব ডান-হাত বাঁধা রেখে আসেন, তার কি অনির্কচনীয় মাধুর্য! আধুনিক বলে, যেখানে ডান-হাত উৎসর্গ করা সার্থক, যেখানে তাতে নেই অশুভতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য;—কিন্তু যেখানে অশুভ-আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তাব-কুশ্রী-কবলে সেই মাধুর্যকে গিলে খাচ্ছে, স্তন্দর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি = প্রধান সমস্যা হিন্দুমুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা-নির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে শাদা-কালো ছক কেটে দুই স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে, আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু-পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বৃশ্ম্যান জাতীয় লোক পরকে দেখবামাত্র তাকে

নির্কিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্ছে পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে-মহুঘাত্য পরিষ্ফুট হয় বৃশ্ম্যানের তা হতে পারেনি, সে চূড়ান্ত বর্করতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে-জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেচে সেই জাতি ততই উচ্চ-শ্রেণীর মহুঘাত্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেচে। সে-জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেচে।

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে' পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্ত সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূবত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজ্বল করে' গেঁথে রেখেচে, এতে করে' সকল মানুষের সঙ্গে সত্য-যোগে মহুঘাত্যের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সঙ্কীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে' রেখেচে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্য-সত্যের চেয়ে বাহ্য-বিধান কৃত্রিম-প্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেচে।

পূর্বেই বলেছি—মানব-জগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক হিন্দুর এই ব্যবস্থা, সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ক না পড়ে এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্টো। ধর্মগণ্ডীর বহির্ভর্তী পরকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর বলে' জানে, কিন্তু সেই পরকে সেই কাফেরকে বরাবরকার মত ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুসী। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে'-বেব-করা শ্লোক কি বলে, সেটা কাজের কথা নয়, কিন্তু লোকব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধরে' ধর্মকে আপন দুর্গম দুর্গ করে' পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যুহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে' তাকে ছিনিয়ে এনেচে। এতে করে' এদের মনঃপ্রকৃতি দুই রকম ছাঁদের ভেদ-

বুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার করে' নিয়েছে;—আত্মীয়তার দিক্ থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে' ঠেকিয়ে রাখে, আত্মীয়তার দিক্ থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে স্লেচ্ছ বলে' ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে' সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত ঐ যে প্রথমা কণ্ঠাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কণ্ঠাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল, সে হচ্ছে ঐ মধ্যমা কণ্ঠাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কণ্ঠা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতীন, এই দুই পোলিটিকাল allyদের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত। পদ্মায় বাড়ের সময় দেখেচি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আটকাবাব চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝটপট করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। বাড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেবে এসেছে। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলেনি। কেননা, বাংলার অথগু অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার ছুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ কম-সাম্রাজ্যের অথগু অঙ্গকে ব্যঙ্গী-করণের ছুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতর মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলিনি, আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের ঙ্গ এক-মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে যগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করুন আবার কি দিয়ে এদের চঞ্চু দুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে

ভোলাবার চেষ্টা করে' ভাঙা যাবে না। কঞ্চল চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে' তোলা গেল সে একদিন দেখতে পায় তাতে করে' তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোবেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐচ্ছিক জমে' উঠেছে আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অমুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনও বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নিঃস্রীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ ঘটবে কি করে'? অত্যন্ত দুর্ঘ্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশ রকম বড় হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার খাবার মধ্যে। গত যুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর করে' সহায়তের জন্যে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ধোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশান-বৈরাগ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহধারে ভারতীয়দের জন্যে অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য

সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মহাআজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অল্পভবযোগ্য করে' তোলবার চেষ্টা করেচেন। উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপোষ-নিষ্পত্তি সবল-দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না। আমরা যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারতুম, তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালো রকম রফা করবার জন্তে আপনিই আমাদের ডাক পাড়ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই পরস্পর রফা-নিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাকলে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে। স্বর্ণের জল পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেঘের মধ্যে একটা আপোষের কনফারেন্স বসেছিল। ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কি রকম অত্যন্ত সরল করে' এনেছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দুমুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়-পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপ্লাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দুমুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা স্তদীর্ঘকাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্য-ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে' এসেচে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপ্লা-মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কনগ্রেস-মঞ্চঘটিত ভ্রাতৃত্বভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুৎ করে' পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বুখা। অথচ আমরা বারবারই বলে' আস্চি আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাৎ করে' দিয়ে তার পরে

চালের কথা ভাবব, আগে স্বরাট হব, তার পরে মাহুস হব।

মালাবার-উৎপাত সম্বন্ধে এই ত গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হিন্দুমুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুঞ্জের এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা করে' দক্ষিণের হিন্দুসমাজগুরু শঙ্করাচার্যের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েচেন; তাতে বলেচেন :—

“The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile, and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life leaving their children and womenfolk behind, to take care of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation, God, the Almighty and the Omniscient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf.”

ডাক্তার মুঞ্জের এ-কথাটির মানে হচ্ছে এই যে হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যেস করেনি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েচে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে বলে'ই ছুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আরেকটা অংশে তিনি বলেচেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাস-স্থাপনের জন্তে বিশেষভাবে সুবিধা করে' দিয়েছিলেন। এমন কি, হিন্দুদের মুসলমান-করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রত্ন দিচ্ছেছিলেন যে তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হ'তেই হ'ত। এর প্রধান কারণ ধর্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্র-যাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলে'ই মেনে নিয়েছিলেন; তাই, মালাবারের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্য রক্ষার ভার সেই-সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মান্ত, মনুকে মান্ত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসে'ও

তারা স্বাধীন হয় না। তারা কৰ্মের মধ্যাহ্নকালকেও
সুপ্তির নিশীথ রাত্রি বানিয়ে তোলে। এই জন্তেই তাদের

“ঠিক ছপ্প’র বেলা

ভূতে মারে ঢেলা।”

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোস মাত্র
পরে’ অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই
অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দু-সিংহাসনে এখনো রাজা আছে।
তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে
বলে ভগবান্ আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা
অবুদ্ধিকে রাজা করে’ দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে’
আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধি-
বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান কখনো মোগল
কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে’ বস্চে। বাইরের থেকে
এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য।
এরা এক একটা ঢেলা মাত্র, এরা ভূত নয়।—আমরা
মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে
অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কৰ্ম। তাই
ঠিক ছপ্প’র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা কর্চে,
কাজ কর্চে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই
পিঠের উপর

ঠিক ছপ্প’র বেলা

ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই
অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই
আমাদের চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের
উপর পরবশতাকে চ’ড়িয়ে দিয়েচে—সেই আমাদের
এতদূর অন্ধ করে’ দিয়েচে যে যখন চীৎকার-শব্দে ঢেলাকে
গাল পেড়ে গলা ভাঙ’চি তখন সেই ভূতটাকে পরমাঙ্গীয়
পরমারাধ্য বলে, তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তবভিটে দেবত্ব
করে’ ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের
পরিত্রাণের আশা থাকে না, কেননা জগতে ঢেলা
অসংখ্য, ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা
আসে, কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে
পারলে ঢেলাগুলো পায় পড়ে’ থাকে, গায়ে পড়ে না।
ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত
প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে
নয়, চিন্তা দিয়ে কৰ্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি
ব্যবহার দিয়ে;—“য একঃ অবর্ণঃ” যিনি এক এবং সকল
বর্ণভেদের অতীত, “স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তুঃ” তিনিই
আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গেঁয়ো-গীত

(হিন্দুস্থানী)

বাবলা-গাছের আড়াল দিয়ে উঠল চাঁদা রে,
ওই আলোর ঝালর ঝুলিয়ে দিল ডাইনে বাঁ ধারে ;
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !—
হলুদ-বরণ চাঁদার রং,
মরি কিবা রূপের ঢং,
স্বরগ-পুরে ফুটল যেন সোনার গাঁদা রে,
তার আলোর-পরাগ ঝরঝর ঐ ঝরছে আঁধারে ;
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !—
ঝুঝুঝু পূবের বায়
শাপের বনে কি গান গায় ।

ঝিল্লীগুলো তান ধরেছে ঝুঁদাড্-পাঁদাড়ে,—
অশখ-গাছে খাম্বল এবার পেঁচার কাঁদা রে ;
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !—
কেটে গেল বাদল আজ,
উজল হ’ল আঁধার মাঁঝ,
ভিমি ভিমি মাদল বাজায় দাওয়ায় দাদা রে,—
ওই বাবলা-গাছের আড়াল দিয়ে উঠল চাঁদা রে ।
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !—

শ্রী স্ননির্মল বসু

সমাধান

সমস্তার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অম্নি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্ত দায়িক করে' জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে—আমরা ত একটা তবু যাহোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এম্নি একটা সমাধান খাড়া কব, দেখা যাক তোমারি বা কত বড় যোগ্যতা!

আমি জানি, কোনও ঔষধ-সত্ত্বে এক বিলাতী ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণস্বরে যেম্নি বলেচে, “জ্বর”, অম্নি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখন তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জরস্বরস গিলিয়ে দিলেন—সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সঙ্কটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের—তা হলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বলতে পারতেন যে, ‘তবে তুমিই চিকিৎসা কর না; আমি ত তবু যা হয় একটা কোনো ঔষধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি ত কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে!’ আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, “আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জ্বর নয় মেয়ের জ্বর, অতএব বাপকে ঔষধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।”

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে স্ত্রীবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা বলে' নির্ণয় করছি, সে আপন সমাধানের ইচ্ছিত আপনিই প্রকাশ করচে।—অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল, অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন; শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারিনে বলে'ই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পর-বশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান ‘শিক্ষা’ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই; অতএব সকলকেই চরকায় স্ততো কাটতে হবে। আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই এ-কথাটা আমার মত মানুষের কাছেও দুর্লভ নয়। এর মধ্যে দুর্লভ ব্যাপার হচ্ছে, কোন্টা আগুন সেইটে স্থির করা; তা হলেই সিদ্ধান্ত করা সহজ হবে কোন্টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশকোটি ভাঙাকুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চরকার স্ততো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পারিচিনে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ আগুনের চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাকলেও এ আগুন জলতে থাকবে। বিদেশী আমাদের রাজা এটাও আগুন নয় এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জলবে—এমন কি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে, হঠাৎ আগুন লেগেচে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেলব। হাজার বছরের উর্দ্ধকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে স্ততো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দু'দিনে বশ মানবে এ-কথা মেনে নিতে পারিনে। আজ দুশো-বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয়নি, সেইসঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে' জলছিল। সেই আগুনের জ্বালানি-কাঠটা হচ্ছে ধর্ম্মে কর্ম্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্কর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে, সেখানে বনে জঙ্গলে ফল মূল খেয়ে চলে; কিন্তু যেখানে বহুলোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালরকম করে' চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড় সভ্যতারই অন্তরূপের আশ্রয় হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সভ্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে ত অল্পের চেয়ে বড় বই ছোট নয়। ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে'

বিচিত্র ও বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু দেখানে অধিকাংশ লোক মুঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্কারের নানা বিভীষিকায় সর্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় সর্বদা ছুটোছুটি করে' মর্মে সেখানে 'এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ ঞ্চায় অধিকার পেতে পারে। আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজপর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিনি। কিন্তু আধুনিক যুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেছে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান- ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের 'বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে' মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা কবেচে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভাল করে' বুঝতেই পারবে না, বহন করা ত দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাকে তারা অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন বলে' বিশ্বাস করে তাঁর বানীকে দৈববাণী বলে' জেনে তারা ক্ষণকালের জন্তে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া করে' কোনো এক সময়ে কোনো একটা কাজ তারা মরীয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জন্তে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন সেই কাজটা কোনও অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন করে' নিতে পারে। কিন্তু কচিৎ-বিস্মুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো

জ্বালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বলবে না এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সূচপায়।

এমন লোককে জানা আছে, যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর, যে, সে-পথের সামনে বসে' বসে' পথটাকে হ্রস্ব করাব দৈব উপায় চিন্তায় আধ বোজা চোখে সে সর্বদা নিযুক্ত, তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কমে না। এমন সময় সন্ধ্যাসী: এসে বললে, তিনমাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি কবে' দিতে পারি। এক মুহূর্তে তার জড়তা ছুটে' গেল। সেই তিনটে মাস সন্ধ্যাসীর কথামত সে দুঃসাধ্য সাধন করতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্ধ্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে না, এটা সন্ধ্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চলতে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই, তাকে অলৌকিক-শক্তি-পথের আভাস দেবামাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগা-তাবিজ বিক্রি হবে কেন? যারা রোগ তাপ বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসঙ্গত উপায়ের পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগা-তাবিজে স্বস্ত্যয়নে তন্মুগ্ধে মননে মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজস্র সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। একথা ভুলে যায় যে, এই তাগা-তাবিজ-গ্রন্থদেরই রোগ তাপ বিপদ আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারো কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগা-তাবিজ-গ্রন্থদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শত-ধারায় চিরদিন উৎসারিত।

যে-দেশে বসন্ত-রোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা

জেনেচে এবং সে কাবণটা বুদ্ধিব দ্বারা নিবারণ করেছে, সে-দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে' দৌড় মেরেচে। আর যে-দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে' চোখ বুজে ঠিক করে' বসে' থাকে, সে দেশে মা-শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজ-চ্যুতির লক্ষণ।

আমার কথাটা একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্ছে এই যে, দেশের একদল লোক ত বিদ্যাশিক্ষা করেছে। তারা ত পবীক্ষা পাস করবার বেলায় জাগতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণ বিশুদ্ধ ইংবেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির পরে, বিশ্ব-বিধির পরে, বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্ছে? তারাও কি বুদ্ধিব অক্ষতায় সংসারে সকলরকমেরই দৈন্ত্য বিস্তার কবে না?

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধি-মুক্তির জোর বড় বেশি দেখতে পাইনে; তারাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা'-তা' মেনে নিতে প্রস্তুত; অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধি-বিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মৃত্যুর বিপুল ভাবাকর্ষণ জিনিষটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্টি শক্তির প্রয়োজন হয়। যে-সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের পরে আস্থাবান নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেচে, সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রণালীর দোষে একে ত শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরাতশয় সঙ্কীর্ণ। এইজন্তে সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে' রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত

বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনাধিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিংয়ের ঘুম ঘুমোই; আমরা কুতর্ক করে' লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীকৃত্ববশত যে কাজ করি তার একটা স্ননিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় করে' দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে' ঠেকে যে একে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে' মেনে নিতে মন রাজি হয় না। এইখানে গীতার উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে দিতে হয় যে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের অধিকার নয়। আশুফলের প্রতি অতিশয় লোভ করে'ই আমরা জাজুকরের শরণাপন্ন হই; ফলের বদলে ফলের মরীচিকা দেখে নৃত্য করতে থাকি। তাতে সময়ও নষ্ট হয়, বুদ্ধিও নষ্ট হয়, ফলও নষ্ট হয়। তাতে বর্তমানকে ভোলাতে গিয়ে ভবিষ্যৎকে মাটি করি।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড় অথচ তার উপায়টা খুব ছোট হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির পরে বিশ্বাস; বাস্তবের পরে নয়, নিজের শক্তির পরে নয়।

সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেচে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।—বাংলা দেশ ম্যালেরিয়ায় মরুচে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে' দিয়েচে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্ত্য, অধ্যবসায়ের অভাব এই রোগজীর্ণতার ফল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন কেবল যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারুব তাও নয়, এমনপ্রকৃতির কাজ এমন-ধরণে করতে পারুব যা এখন পারিনে। অর্থাৎ, কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে

তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ-কথা সকলেই জানি, সকলেই মানি,—কিন্তু সেইসঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েছে যে, বাংলা দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলা দেশ ক্রমে ক্রমে নির্মূষ হতে পারে, কিন্তু নির্মূষ হতে কি করে? অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে' উঠলেন দেশ থেকে মশা তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড় কথা বলবার ভয়সাকেই ত আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরুমানা অবতারমানা দেশে এতবড় বৃকের পাটা ত দেখতে পাওয়া যায়না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেচেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হ'ল।

স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে' দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি যেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ করলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মত প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নূতন নূতন ডাক্তার গোপাল চাটুজের জন্তে তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে' থাকতে হবে, আর ইতিমধ্যে তার পীলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতিসাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের একটা বিষম ব্যাধি। এ'তে মাহুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুণতি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে' যায়। স্বরাজ্য বল, সভ্যতা বল, মাহুষের যা-কিছু মূল্যবান ঐশ্বর্য সমস্তই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই বেশি হোক না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই বলেই ফসল ফলাতে পারে না। ভারতবর্ষের' ত্রিশকোটি

মাহুষের মূল পরিমাণ-হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতার, এই অবুদ্ধির, জগদল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে ঠেলে না ফেললে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল হবে না এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বলতেই হবে এই আমাদের কাজ। এ-কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তাঁর হাতের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আয়তন থেকে যারা সফলতার বিচার করেন তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন, সত্যতা থেকে যারা বিচার করেন তাঁরা জানেন যে, সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে' নিতে পারেন।

আজকের দিনে জার্মানির কল্যাণ দুর্গতি হয়েছে, সকল দিক থেকে সে কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা সকলেরই জানা আছে। এই জার্মানিতে এই দুঃখের দিনে, যখন তার সত্যই ঘরে আগুন লেগেছে, তখন জার্মানি আগুন নেবাবার নানা উপায়ের মধ্যে কোন একটা বিশেষ উপায়কে প্রাধান্য দিয়েছে। সে কথা আমাদেরও আলোচনার যোগ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবার জ'ন্তু যে প্রচেষ্টা আজ সেখানে প্রবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি চিঠি বই বেরিয়েছে। তার নাম, *Newer Adult Education in Germany*. তার থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে' দিই—

There are two forms of ruin—the sudden calamity of an earthquake and the slow, certain, steady advance of general decay that nothing seems able to impede. This latter is now the fate of Germany. A small percentage of the population may still make a display of wealth; but the structure of the country, its general welfare, its healthiness and growth are irretrievably stunted. The people face this. They know that for them there is no hope left, unless they have sufficient courage and vitality to build up with their own hands. The youth of Germany knows that it has no future unless it can build up one, and it is certain that this building will be of far-reaching influence in the entire structure of European civilisation. Adult education going to be one of the pillars of this structure.

এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কয়েকটি ভাব্‌বার কথা আছে

প্রথম হচ্ছে, জার্মানির অবস্থা নিতান্তই নৈরাশ্রজনক। কিন্তু তবুও সেখানকার লোকে সেটাকে চরম বলে' মেনে নিয়ে ভাগ্যের নিন্দা করছে না, তার কারণ, তারা সত্যের বর পাবার জন্তে বরাবর বাস্তব পথ অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। তারা বুদ্ধিকে মানে বলে'ই নিজেকে মানে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এরা এ-কথা নিঃসন্দেহ জানে যে ভাবী কালের জন্তে যখন উন্নতির নূতন ভিৎ বসাতে হবে তখন সেটা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর। এই উন্নতির দ্বারা তারা যে নিজের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বড় হবে তা নয়, সমগ্র যুরোপের সভ্যতার সঙ্গে আপন প্রভাবের দ্বারা সম্মিলিত হবে। তৃতীয় কথা হচ্ছে এই, অবস্থা যতই শোচনীয় হোক, ব্যাপারটা যতই দুঃসাধ্য হোক, তবু এটা করাই চাই।

এ-কথা বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ মানুষ শিক্ষার দ্বারাই তৈরি হয়,—“মানুষ করে' তোলা” কথাটার মধ্যে এই অর্থ আছে; প্রকৃতির ক্রিয়া জন্তকে জন্ত করে, মানুষের শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে' তোলে। আজকের দিনে যে মানসিক অবস্থায় আমরা এসে পৌঁচেছি,—সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, সে অবস্থা আমাদের পূর্ব-কালীন শিক্ষার দ্বারাই ঘটেছে। এই অবস্থা পাকা করবার জন্তে কত শাস্ত্র কত উপদেশ কত ব্যবস্থা আছে তার সীমা নেই। যে বর্তমান অবস্থা এই শিক্ষার ফল, সেটা হচ্ছে ভিতর দিক থেকে মনের স্বাতন্ত্র্যহীনতার অবস্থা। এই অবস্থা কোনোমতেই বাইবের দিকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অমুকুল হতেই পারে না। অতএব যদি স্বরাজকে প্রার্থনীয় বলে'ই মনে করি তা হলে আগেকার শিক্ষাকে অতিক্রম করে' এমন কোনো রকম শিক্ষা দেশে চালাতে হবে যাতে দেশের লোকের মন বুদ্ধিবৃত্তির স্বরাজের প্রতি আস্থাবান হতে পারে। যে শিক্ষায় আমাদের বর্তমানটা গড়ে' উঠেছে, সেই শিক্ষাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে' ওঠে, তা হলে সে আমাদের এই বর্তমানেরই পুনরা-বৃত্তি হবে।

আজ জার্মানি একথা চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে যে, তার পূর্বতন শিক্ষাবিধির মধ্যে একটা দোষ ছিল।

“Germans feel that the well-oiled and smoothly

running machine-like system of pre-war days was a system that was losing its substance, producing a mechanical form of culture—a culture that was lacking in essentials, a culture that seemed to turn out human beings with most extraordinarily cultivated brains but somehow out of touch with the human heart—science as apart from life, art, craft, learning, recreation, all in separate compartments, and disharmony as a summary of all.”

সার্কর্ভোম শিক্ষার সমগ্রতার দ্বারাই জার্মানির অধিবাসী মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করবে এই চিন্তা সে দেশে আগুন লাগার রূপকের জোরে উপেক্ষিত হয়নি। অথচ সেখানে অন্নভাব বস্ত্রভাব আমাদের দেশের চেয়েও প্রবলতর। আগে সূতো কাটব, কাপড় বুনব, খাব, এবং তদ্বারায় স্বরাজ পাব, তার পরে উপযুক্ত অবকাশ নিয়ে মনের দিক থেকে মানুষ হব এ-কথা মানুষের কথাই নয়। প্রাণের যেমন একটা সমগ্রতা আছে, তাইট সাজিয়ে ক্রমে ক্রমে টুকরো টুকরো করে' গড়া নয়, মনুষ্যত্বেরও তেমনি সমগ্রতা আছে। তার দেহ পরবে বস্ত্র, আর তার মন থাকবে উলঙ্গ, এ নয় না—কোনো প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে তার পূর্ণতাকে কিছুকাল ধরে'ও খণ্ডিত করলে সে ক্ষতি হয়ত কোনোকালে আর পূরণ হবে না। যদি বলি যতদিন স্বরাজ না পাব ততদিন দেশে শিল্পকার্যকে প্রত্যাশ দেব না, কেন না, শিল্প-কার্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়, তা সৌখীন, তা' হলে স্বরাজ কবে পাব জানিনে, কিন্তু যে শিল্প শত শত বৎসরের সাধনায় প্রাণলাভ করেছে, স্বল্পকালের অনাদরে চিরদিনের জন্তে তা লুপ্ত হতে পারে। দেশে এমন লোকের অভাব নেই যারা বলবেন না হয় তাই হ'ল। আমি এই বলি, মানুষকে একদিকে অসম্পূর্ণ করে' আর একদিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কলসীর একদিক থেকে ছিদ্র করে' আর একদিক থেকে তাতে জল ঢালা। মানুষ আপন সম্পূর্ণতা প্রকাশ করবার অবসর পাবে এইজন্তই মানুষের স্বাধীনতা। স্পার্টা আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে' বাহুবলের সাধনা করেছিল, তাতে কোনো ফল পায়নি; এথেন্স তার কোনো একটা বিশেষ শক্তিকে সর্বাঙ্গ করিতে চায়নি, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণতাকে চেয়েছিল, এইজন্তে সকল

শক্তির সঙ্গে যোগেই সে বাহুবলকে পেয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, মনুষ্যত্বের প্রাণময় অঞ্চলতাই মানুষের পরম সত্য, কোন আশু প্রয়োজনের লোভে তাকে খণ্ডিত করলে সমস্তটাকেই ক্লিষ্ট করা হয়।

সেই চটি বই থেকে আর-একটি অংশ উদ্ধৃত করে' আমার এই লেখা শেষ করি।

“Everywhere, certainly, there is goodwill and courage in the face of insuperable difficulty. Those who have not experienced it, cannot realise what it means to be under-fed, under-paid, over-worked, and yet to go on unswervingly with the work of the education of the people. Through the straining of every nerve many thousand marks may be collected for this purpose, while the sum dwindles as it is held in the hand to mere nothingness through the uncontrollable depreciation of the currency.

“This material side of the question cannot be overlooked, as the instability of conditions ruins all effort. A thousand marks today are a hundred in a couple of days time, and the educator of the people of one week may be working in

a factory the next in order to provide for his wife and his child as well as for his own livelihood. If the State were to appoint adult teachers as it does school teachers, salaries would rise to meet the depreciation, but the State stringently refuses to swell the budget by financing any new educational enterprise, and leaves the adult educational movement to struggle on almost unaided. It is extraordinary enough that ways and means can be found to continue at all, and this obviously is due solely to the keenness and self-sacrificing devotion of those working in the cause of bringing education within reach of the people. It will take many years before Germany sees clearly where the moulding of her efforts in adult education has led to, but what can be more absorbing and instructive than to study its growth?”

এই দুটি প্যারাগ্রাফ থেকে আমাদের শিক্ষার ও চিন্তার বিষয় যেটুকু আছে সে হচ্ছে এই যে, কাজের বাধা অতি কঠিন, কাজের ফল অতি নিকট নয়, অথচ কাজের অধ্যবসায় দুর্দমনীয়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উইলিয়াম পিয়ার্সন্

ভারতবর্ষে ফিরিবার ঠিক পূর্বে ইটালীতে ভ্রমণকালে শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পিয়ার্সন্ মহাশয়ের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তাঁহার নাম জনসাধারণের নিকট বিস্তৃতভাবে পরিচিত না হইতে পারে, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা শুধু তাঁহার আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের প্রতি ভালবাসা তাঁহার কাছে যেরূপ সত্যকার সামগ্রী ছিল, সেবার আদর্শকে তিনি তাঁহার স্বভাবের সহিত যেরূপ পূর্ণভাবে মিলাইতে পারিয়াছিলেন, খুব কম লোকেরই ভিতর আমরা তাহা দেখিয়াছি। যে-সকল অজ্ঞাত অখ্যাতিনামা লোকের মধ্যে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতও কোনো বিশেষত্ব ছিল না, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাহাদের নিজের সখ্য দান করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, এবং এই দানের মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অহঙ্কার রিপূর সংকর্ষ-

সাধনজনিত আত্মতৃপ্তিগত ভাববিলাসের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোককে তিনি নিত্যনিয়ত যে-সাহায্য করিতেন তাহার অন্য তাঁহার সর্বসাধারণের প্রশংসা দ্বারা পুরস্কৃত হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহার কাছে নিজের দৈনিককৃত্যের মতই তাহা নিতান্ত সহজ এবং প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার দেশপ্রেম ছিল সর্বমানবের দেশের-প্রতি, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের লোকের উপর কিছুমাত্র অবিচার বা নিষ্ঠুর আচরণ ঘটিলে তিনি অন্তরের সহিত বেদনা অনুভব করিতেন, এবং মহৎভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্ত তিনি নির্ভীক-চিত্তে আপন দেশবাসীর নিকট শাস্তি বরণ করিয়া লইয়াছেন। শাস্তিনিকেতন আশ্রমকে তিনি আপন আবাসভূমি বলিয়া জানিয়াছিলেন, তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে এইখানেই তিনি তাঁহার বিশ্বমানবের প্রতি সেবার আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং যে-



উইলিয়াম পিয়ার্সন ও রবীন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন আশ্রমে

ভারতের কল্যাণের সহিত তাঁহার জীবনের সকল আশা জড়িত ছিল, তাহার প্রতিও নিজের সুগভীর ভালবাসা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন।

আমি জানি এদেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাহারা তাঁহার মহৎ নিঃস্বার্থ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অমুভব করেন, এবং তাঁহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাহারা তাহার মৃত্যুসংবাদে মর্মান্বিত হইয়াছেন। আমার মনে দৃঢ় ধারণা যে তাঁহার এই প্রিয় আশ্রমে তাঁহার নামে একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করিবার ইচ্ছাকে সকলেই অমুমোদন করিবেন। আমাদের আশ্রম-সংক্রান্ত হাঁসপাতালটি যাহাতে নূতন করিয়া তৈরী হয়, এবং যথাবশত সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের পর উত্তমরূপে চালিত হয়, ইহাই

তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, এবং বরাবরই তিনি এইজন্ম সচেष्ट ছিলেন এবং যথাসম্ভব অর্থদান করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আমরা যদি তাঁহার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে পারি, এবং ছেলেদের জন্ম স্বতন্ত্রবিভাগের ব্যবস্থা রাখিয়া একটি ভালরকম হাঁসপাতাল নির্মাণ করি, তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতিকে যথার্থ সম্মান করা হইবে, এবং মানবের দুঃখকষ্টে তিনি যে সমবেদনা অমুভব করিতেন তাহার আদর্শ এই হাঁসপাতাল আমাদের সর্বদা মনে করাইয়া দিবে। এই অভিপ্রায়ে আমরা তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন এমন সব লোকের নিকট আজ উপস্থিত হইতেছি, এবং আশা করিতেছি যে এ বিষয়ে সকলেই আমাদের মুক্তহস্তে দান করিয়া সাহায্য করিবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ

ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ

রাজপথ

[১৪]

স্বমিত্রার জন্মদিনোৎসবের ঘটনার পর মাস দুই অতি-বাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সুরেশ্বর বিমান ও স্বমিত্রা কয়েকবার মিলিত হইয়াছে এবং তদবসরে তিন জনের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের সম্পর্কে প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। একত্র হইলেই একটা কোনও প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া তিন জনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হয়, এবং মনের গভীরতলনিহিত বিরোধ ভাষার মধ্যে আলোড়িত হইয়া ভাসিয়া উঠে এবং প্রকাশ পায়।

এই বিরোধটা প্রকাশ পাইত বিমান এবং সুরেশ্বরের মধ্যে সর্বদা, সুরেশ্বর ও স্বমিত্রার মধ্যে সময় সময়, এবং বিমান ও স্বমিত্রার মধ্যে কদাচিৎ। বিমান-বিহারী সর্ববিষয়ে এবং সর্বতোভাবে স্বমিত্রার সহিত ঐক্য রাখিয়া চলিত। সুরেশ্বর এবং স্বমিত্রার মধ্যে প্রায়ই তর্ক এবং হৃদয় ঘটিত বলিয়া সে মনে করিত স্বমিত্রার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিবে। কিন্তু মানুষের মন যে অতটা সহজ নহে তাহা সে জানিত না। বিরুদ্ধাচরণে সৌজ্ঞেয় না বাড়িলেও আকর্ষণ বাড়ে; ঐক্যের চেয়ে বিরোধ অধিকতর মর্মস্পর্শী।

শ্রোতস্বতী যখন সমতল ভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে তখন প্রশান্ত থাকে, কিন্তু যখন বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া যায় তখন হৃদয় উঠে। সেই প্রাকৃতিক বিধির অনুরূপ নিয়মে বিমানের সহিত কথাবার্তায় স্বমিত্রাকে বেশ শাস্ত মনে হইত, কিন্তু সুরেশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে সে অধীর হইয়া উঠিত। সুরেশ্বর কিন্তু সে সময়ে তাহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা হইতে একটুও ভিত্তিচ্যুত হইত না। জলে আর পাথরে সংঘর্ষ বাধিলে জল অধীর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সফেন উচ্ছ্বাসের মধ্যে পাথর স্তব্ধ হইয়াই থাকে।

কিন্তু এই বিরোধ এবং সংঘর্ষের তিত্তরদিয়াই অল্পে

অল্পে অলক্ষিতে সুরেশ্বরের প্রতি স্বমিত্রার একটা গভীর আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ দিনই বিমানবিহারী একা আসিয়া তাহার সহিত সন্ধ্যা অতি-বাহিত করিয়া যাইত, কিন্তু সে-সকল দিনে বিমানবিহারীর সহিত একটানা একসূরা নিবিরোধ নিব্বিবাদ কথা-বার্তায় অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বমিত্রার বিরক্তি ধরিয়া যাইত। না থাকিত তাহার মধ্যে উত্তেজনা, না থাকিত তাহার মধ্যে উদ্দীপনা, না থাকিত বিতর্ক, না থাকিত বিচার। কেবল মিল, কেবল ঐক্য। দুই ঘণ্টার প্রশ্ন দুই মিনিটে শেষ হইত।

স্বমিত্রা সময়ে সময়ে তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে তর্ককে নিরোধ করিতে বিমানবিহারীর কিছুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব হইত না; শুধু অপ্রতিবাদের দ্বারাই নহে, প্রয়োজন হইলে স্বীয় মত বর্জন করিয়াও বিমানবিহারী স্বমিত্রার সহিত একমত হইত। কিন্তু স্বমিত্রার উচ্ছল প্রকৃতি তাহাতে তৃপ্তি পাইত না। সুরেশ্বরের সবল এবং সপ্রতিবাদ বিরোধের তুলনায় বিমানবিহারীর নিব্বিবাদ ঐক্য স্বমিত্রার নিতান্ত ফিকা মনে হইত।

কোন এক মাসিকপত্রে নারীনিগ্রহ-শীর্ষক স্বমিত্রার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তব্য, পুরুষ বহুকাল হইতে কৌশলে নারী-জাতিকে তাহাদের সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; তাহার ফলে ক্রমশঃ নারীজাতি দুর্বল ও আশ্রয়ার্থী হইয়া উঠিয়াছে; নচেৎ নারীজাতি কখনই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যেদিন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেদিন সন্ধ্যাকালে সুরেশ্বর ও বিমান উভয়েই স্বমিত্রাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। বিমান সে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া উচ্চ-কণ্ঠে প্রশংসা করিল; বলিল প্রবন্ধটি যুক্তি- ও বিচার-গৌরবে অপূর্ব হইয়াছে। ইহার পূর্বে আর কেহ এমন অখণ্ডনীয়রূপে নারী-জাতির সপক্ষে ওকালতী করিতে পারে নাই।

কৌতূহলী স্বরেশ্বর স্মিত্রার দিকে চাহিয়া আগ্রহ-ভরে কহিল, “কই দেখি, দেখি! নারীর অধিকারের বিষয়ে কি ওকালতী করেছেন দেখি।”

স্মিত্রা আরক্ত মুখে কহিল, “না, না, সে কিছুই হয়নি, সে আপনার ভাল লাগবে না।”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “বিমান-বাবুর যখন এত ভাল লেগেছে তখন আমার ভাল লাগবে না বলছেন কেন? আপনি কি বলতে চান যে বিমান-বাবুর পছন্দ আর মতের কোনও মূল্য নেই, না আমার রস-বোধের কিছু মাত্র শক্তি নেই?”

অপ্রতিভ মুখে স্মিত্রা কহিল, “না, তা বলছি নে।

স্বরেশ্বর হাসিয়া কহিল, “তবে বিমান-বাবুর আর আমার মধ্যে প্রভেদ করছেন কেন? প্রবন্ধটা তাঁকে যখন দেখিয়েছেন তখন আমাকে দেখাতে আপত্তি কি?”

স্মিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল, “আমি দেখাইনি, তিনি নিজেই দেখেছেন।”

স্বরেশ্বর তেমনি হাসিয়া কহিল, “আমাকে না হয় আপনি নিজেই দেখান। সব বিষয়েই যে বিমান-বাবু আর আমার মধ্যে অভিন্ন ব্যবহার করতে হবে তার কি মানে আছে।

এই ক্রতপরিবর্তিত যুক্তিতে কৌতূকাঙ্কিত হইয়া স্মিত্রা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, “না, তার কোনো মানে নেই।” তাহার পর আর বাদানুবাদ না করিয়া মাসিক পত্রখানা লইয়া আসিয়া স্বরেশ্বরের হস্তে দিল।

স্বরেশ্বর স্মিত্রার প্রবন্ধটি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে তন্মধ্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়া পড়িল। যতক্ষণ ধরিয়া স্বরেশ্বর পাঠ করিল স্মিত্রা অধীর কম্পিত হৃদয়ে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তৎকালে বিমানবিহারী তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও সে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। পাঠান্তে স্বরেশ্বর কিরূপ সমালোচনা করিবে,—নিন্দা করিবে, না স্তুতি করিবে, সেই চিন্তা তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল; ক্ষণপূর্বে বিমানবিহারী যে অমিত

এবং অমিশ্র প্রশংসা করিয়াছিল তাহা তাহাকে কিছুমাত্র আশ্বাস দিতেছিল না।

পাঠ শেষ হইলে স্বরেশ্বর স্মিত্রার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, “এটা কিন্তু আপনার ঠিক ওকালতী হয়নি; এটা পুরুষ-জাতির সঙ্গে কলহ হয়েছে। কলহটা আবার কিরকম জানেন? দেহের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অধিকার-ভোগ আর অধিকার-ভেদ নিয়ে কলহের মত। মুখ বসে’ বসে’ খায় বলে’ হাত একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে বলেছিল, যত রসাস্বাদন মুখ করবে আর আমি পরিশ্রম করে’ তাকে আহার জোগাব? তা হবে না। রই-লাম আমি ঝুলে’ আর উপর দিকে উঠছি নে!” পরে দেখা গিয়েছিল যে বিদ্রোহের ফলে মুখের চেয়ে হাতের লাঞ্ছনা কম হয়নি; মুখ পর্য্যন্ত না ওঠার ফলে মুখ পর্য্যন্ত ওঠবার শক্তিই তার লুপ্ত হয়েছিল। তেমনি অল্পপূর্ণার বৃত্তিকে দাস্তবৃত্তি বলে’ ভুল করে’ পুরুষ-জাতিকে আপনারা যদি শুকিয়ে মরতে চেষ্টা করেন, ঠিক জানবেন তাতে আপনারাও পুষ্ট হবেন না।” বলিয়া স্বরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

স্বরেশ্বরের এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় স্মিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রথমটা তাহার মুখ দিয়া প্রতিবাদের কোনো বাক্য বহির্গত হইল না, কিন্তু ক্ষণপরে সে নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইয়া বলিল, “আপনাদের এই দৃষ্ট, এই অহঙ্কারই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ। আপনারা যে মনে করেন আপনারা উপার্জন করে’ এনে না দিলে আমাদের শুকিয়ে মরতে হবে, এইটাই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অত্যাচার।”

স্বরেশ্বর শাস্ত-সংযতভাবে কহিল, “ঠিক বিপরীত। আমরা যে-ও-রকম মনে করি আপনাদের এই ধারণাই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অবিচার। শক্তি আর প্রকৃতির বিভিন্নতার অমুরোধে এতদিন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে অধিকার ভাগ হয়ে এসেছে তা নিয়ে যদি আপনারা মামলা করতে চান ত হৃষ্টিকর্তাকে প্রতিবাদী করবেন, পুরুষদের করবেন না।”

স্মিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল, “কিন্তু আমাদের শক্তি আর প্রকৃতির জগ্রে কি আপনারাই দায়ী নন? চিরদিন

আমাদের দুর্বল করে' রেখেছেন বলে'ই কি আমরা দুর্বল নই?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া স্বরেশ্বরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই কথাই ত আপনি আপনার প্রবন্ধের মধ্যে নানা প্রকারে কয়েকবার বলেছেন। কিন্তু এ ত বহুপুরাতন অসার যুক্তি! এ আর আপনারা কতবার বলবেন? এ তর্কের উত্তরে আমি যদি বলি যে কোনো এক জাতি যদি অপর কোনো জাতিকে চিরদিন বলহীন করে' রাখতে পেরে থাকে তা হ'লে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে প্রথমোক্ত জাতি অপর জাতির চেয়ে সবল, তার উত্তরে আপনাবা কি বলবেন বলুন?"

স্বরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল বিমূঢ়-ভাবে নীরবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, 'বল্ব, এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হ'তে পারে যে চিরদিনই পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে নানা ছলে আব কৌশলে দাবিয়ে রেখেছে।'

সুমিত্রার কথা শুনিয়া স্বরেশ্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অর্থাৎ আপনি স্বীকার করছেন পুরুষ নারীর চেয়ে, শক্তিতে বড় না হোক, বুদ্ধিতে নিশ্চয় বড়?"

বিমান এতক্ষণ এ তর্কের মধ্যে কোনও কথা কহে নাই, কোন দিক হইতে সুমিত্রার পক্ষ গ্রহণ করিয়া সে স্বরেশ্বরকে আক্রমণ করিবে তাহাই সে মনে মনে ভাবিতেছিল। এবার সুমিত্রাকে কোনও উত্তর দিবার অবসর না দিয়া সে বলিল, "ছল আর কৌশলকে বুদ্ধি বলা চলে না; ছষ্টবুদ্ধি বলতে পারেন।"

স্বরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "ছষ্টবুদ্ধিও বুদ্ধিরই অন্তর্গত। তা ছাড়া বুদ্ধি ছষ্ট হ'লেও যে একটা প্রবল শক্তি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

বিমান উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা হ'লে অত্যাচার উৎপীড়ন জুলুম জবরদস্তী সবই যে এক একটা প্রবল শক্তি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই?"

স্বরেশ্বর শাস্তভাবে কহিল, "নিশ্চয়ই নেই। কারণ ওগুলোকে শুধু শক্তির দ্বারাই প্রতিহত করা যায়। তর্ক অথবা প্রবন্ধের দ্বারা করা যায় না। বিশেষতঃ

আজকাল মাসিক পত্রে নারীজাগরণ-সম্বন্ধে সচরাচর যেন সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার দ্বারা ত যায়ই না।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত কহিল, "আমার অবিনয় ক্ষমা করবেন, কিন্তু একথা আমাকে বলতেই হবে যে নারী-জাগরণ-বিষয়ে আপনাদের লেখা প্রবন্ধগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টি করা, জাগরণটা আপনাদের কি-ভাবে হওয়া আবশ্যিক সে ধারণাটা বোধ হয় আপনাদেরই ঠিক নেই, তাই আপনাদের প্রবন্ধগুলিতে পুরুষজাতির প্রতি কটুক্তি ছাড়া আর বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় না।"

এই স্পষ্ট এবং কঠোর উক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোনও উত্তর না পাইয়া সুমিত্রা বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বিমানবিহারী উত্তপ হইয়া উঠিয়া বলিল, "মেয়েরা পুরুষদের প্রতি কটুক্তি করছে বলে' আপনি অমুযোগ করছেন, কিন্তু আপনি এই দু'চারটা কথায় তাদের প্রতি যেরকম কটুক্তি করলেন তারা সকলে মিলে কি ততটা করতে পেরেছে? মাপ করবেন স্বরেশ্বর-বাবু, স্ত্রী-জাতির সম্পর্কে আর-একটু সংযত আর-শিষ্ট হ'লে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হয় না।"

বিমানবিহারীর এই তিরস্কারে বিস্মিত হইয়া স্বরেশ্বর বলিল, "না, নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু মেয়েরা এই যে পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধিয়েছেন তাতে কি তাঁরা পুরুষদের পক্ষ থেকে শুধু সংযম আর শিষ্টতাই আশা করেন, সামান্য প্রতিবাদও আশঙ্কা করেন না?" তাহার পর সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "দেখুন, অন্তঃপুরের পাটিল ভেঙে আপনারা যখন রাজপথে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছেন তখন আর রাজপথের ধূলি-কাঁকর-দুঃখ-তাপকে ভয় করলে চলবে না। এটা নিশ্চয় জানবেন যে গোলাপের চাষ করতে হ'লে সন্দেশে কাঁটার চাষ করতেই হবে।"

সুমিত্রা আরও স্মিতমুখে কহিল, "তা আমরা জানি।"

স্বরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "তা যদি জানেন; তা হ'লে এ কথাও জানবেন যে একই পক্ষ থেকে ভয় আর ভক্তি দুই প্রত্যাশা করা চলে না। মন্দির থেকে বেরিয়ে

এসে দেবতা যদি ভক্তের প্রতি সংহারমূর্তি ধারণ করেন, তা হ'লে ভক্ত ভয় নিশ্চয়ই পায়; কিন্তু ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া বোধ হয় স্বর্গিত রাখে।”

এবার স্মিত্রা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, “স্বর্গিত রূপতে হবে না। আপনারা একেবারে বন্ধ করুন। দেবী বলে’ আমাদের ভুলিয়ে না রেখে মানবীর পদে আমাদের দাঁড়াতে দিন।”

স্বরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “দেখলেন ত বিমান-বাবু, এঁদের মানসিক অবস্থাটা। নারীজাতির খাতিরে এঁরা আমাদের কাছ থেকে বিশেষ করে’ কিছুমাত্র শিষ্টতা বা সংযম-পেতে চান না। অথচ আমি এঁর প্রবন্ধের অকপট সমালোচনা করছিলাম বলে আপনি আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে অপরাধী করছিলেন!” তাহার পর স্মিত্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “কিন্তু আপনার ভাষাটি ভারি চমৎকার হয়েছে। একেবারে তবুতরে, বাবুতরে! আমাদের প্রতি যে অকারণ গালি বর্ষণ করেছেন তার একমাত্র সাস্থনা এই যে খা বলেছেন তা সুন্দর কবেই বলেছেন।” বলিয়া স্বরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

সেদিন স্বরেশ্বর প্রস্থান করার পরও বিমানবিহারী কিছুক্ষণ থাকিয়া গেল। স্মিত্রাকে দ্বিষৎ উন্নয়ন লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, “স্বরেশ্বরের আসল মূর্তিটি ক্রমশঃই প্রকাশ পাচ্ছে! তার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা হ'লে হয়ত দেখা যাবে সে আজ যতটুকু রুঢ়তা প্রকাশ করে’ গেল, সেটাও তার ভাগ করা বিনয়ের অভিনয়!”

স্মিত্রা সবিম্বয়ে কহিল, “রুঢ়তা প্রকাশ করে’ গেলেন কখন?”

বিমানবিহারী রুঢ়মুখে কহিল, “তুমি যদি সেটা বুঝতে না পেরে থাক তা হ'লে এখন তা বোঝাতে যাওয়া যেমন কঠিন তেমনি অনাবশ্যক! তুমি কি মনে কর ~~কিন্তু~~ শুধু রুঢ় কথা দিয়েই প্রকাশ করা যায়?”

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া স্মিত্রা ক্ষণকাল নির্ঝাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর স্মিতমুখে কহিল, “স্বরেশ্বর-বাবু যদি হেঁয়ালী করে’ গিয়ে থাকেন ত কি করে’ বুঝব বলুন?”

স্মিত্রার এই সপরিহাস লঘু উত্তরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিমান কহিল, “হেঁয়ালী? কেন, তোমাকে আর তোমাদের সমস্ত দলটিকে সে প্রকারান্তরে কপট বলে’ গেল না? বললে না যে তোমাদের প্রবন্ধ লেখবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টি করা?”

স্মিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, “হ্যাঁ, সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলেছিলেন বটে কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে এটুকু বলাকে রুঢ়তা বলা যায় কি?” বিমানবিহারী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, “সমালোচনা বলছ তুমি কাকে? অনর্থক অকারণ নিন্দাকে যদি সমালোচনা বলতে হয় তাহলে গালাগালিকেও উপদেশ বলা চলে! একটা জিনিসকে অপর জিনিসের সঙ্গে গোল কোরো না স্মিত্রা। তোমার প্রবন্ধে যুক্তিতর্কের সংশ্রব নেই বললে সমালোচনা করা হয়, কি নিন্দা করা হয়, এটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে—এবং সেটুকু বুঝে’ চূপ করে’ থাকার ধৈর্য্য আমার নেই!”

বিমানবিহারীর কথার শেষাংশের তাৎপর্য্য উপলক্ষ্য করিয়া আরক্তমুখে স্মিত্রা কহিল, “কিন্তু অকারণ আমার প্রবন্ধের নিন্দা করে’ স্বরেশ্বর-বাবুর কি লাভ?”

বিমানবিহারী বলিল, “লাভ কিছুই নেই। এটুকু হচ্ছে ওর প্রকৃতি। একদল লোক আছে তারা মনে করে অপরের সঙ্গে একমত হ'লেই খাটো হ'তে হয়। তাই তারা কারণে অকারণে সব কথার প্রতিবাদ করে’ নিজেদের বিশেষত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। আমি বললাম, তোমার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, অতএব সে বলে’ গেল আর কিছু থাক আর নাই থাক যুক্তিটাই তাতে নেই!”

কিন্তু বিমানবিহারীর এত কথা, এবং পরে আরও বহু বহু প্রশংসা সত্ত্বেও, স্মিত্রা যখন একাকী হইয়া প্রবন্ধটা খুলিয়া দেখিতে বসিল, তখন তাহার নিকট স্বরেশ্বরের নিন্দা-প্রশংসাই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহার প্রবন্ধ যেন সূচাক পরিচ্ছদে আবৃত কুগঠিত দেহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মৌরীফুল

স্বাক্ষর তখনও ঠিক হয় না। মুখ্যো-বাড়ী পিছনে শিবগানে জোনাকীর দল মাঁজ জালবাব উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুবেব পাড়ে গাছেব মাথাযা জুড়েব দল কালো হইয়া কুলিতেছে—মাঠের ধাবে শিবগানেব পিছনটা সূর্যাস্তেব শেষ-আলোয় উজ্জল। ঐরিক্ বেষ কবিত্তপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখ্যোদেব অন্দর-বাড়ী হইতে এক তুমুল কলবব আব হ চৈ উঠিল।

এক রামতনু মুখ্যো শিবরুক্ষ পবমহংসেব শিষ্য। তিনি বোজ সন্ধ্যা বেলায় আভূতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তাব চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘবে রাখিয়া দেন। অতঃপূর্বেব মত আজও তাকেব উপব একটা বাটিতে ঘিটা ছিল, তাব পুত্রবধু সূশীলা সেই বাটি তাকেব উপব হিতে পাতিয়া সে ঘিটার সমস্তই দিয়া খাবাব তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখ্যো মহকুমাব কোটে গিয়াছিলেন ও-মাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মোকদ্দমাব সাফ্য দিতে। বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরাব মুখে জিজ্ঞাসা করেন—“আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তাব ভাইয়েব পাচীলেব জাষণা নিয়ে মামলায় প্রধান সাফ্য ছিলেন না?”

রামতনু মুখ্যো বলিয়াছিলেন—“হাঁ তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন—“তু-নালির চৌধুরীদের কানসোনার মাঠের দাঙ্গার মোকদ্দমায় আপনি পুলিশের দিকে সাফ্য দিয়াছিলেন কি না?”

রামতনু মুখ্যো মহাশয়কে ঢোক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন,—“আচ্ছা এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি হাদী পক্ষের সাফ্য ছিলেন কি না?”

কবে তিনি এ সাফ্য দিয়াছিলেন, মুখ্যো মহাশয়

প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন না, তার পর বিপক্ষের উকীলেব পুনঃপুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুসেফ-বাবুব কুকুটী-মিশ্রিত দৃষ্টিব সম্মুখে হতভাগ্য রামতনু মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাফ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোটেই তাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

তাহাব পর কোটে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনু উপব কি ব্যঙ্গাত্তিক করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল আমলায় ভক্তি মুসেফ-বাবুব এজলাসে ঠাং কিকপে সম্পূর্ণ সমপক্ষেব আবিষ্কার করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আব প্রয়োজন নাই। তবে মোটেব উপব বলা যায়, রামতনু মুখ্যো যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাব শবীবের ও মনের অবস্থা খবই খাবাপ। কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন পা হাত ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শীতের উদ্দেশে আভূতি দিয়া অনিত্য বিষয়বিষয়ে জ্জ্বলিত মনকে একটু শিব করিবেন, না দেখেন যে আভূতিব জন্ত আলাদা করিয়া তোলা যে ঘি-টুকু তাকে ছিল, তাব সবটাই একেবাবে নষ্ট হইয়াছে!

তাব পর প্রায় অর্ধ-ঘণ্টা ধবিয়া মুখ্যো-বাড়ীর অন্দর মহলে একটা বাঁতিনত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখ্যো মহাশয়েব পুত্রবধু সূশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সামলাইয়া লইয়া এমন সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠাবো-বৎসর-বয়স্ক তরুণীব মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোটে বিপক্ষের উকীলেব অপমানে ও ঘবে আসিয়া পুত্রবধুর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখ্যো পুত্রবধুব পিতৃকুল ও তাহাব নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমনসব ছরুহ পারিভাষিক শব্দেব ব্যবহাব করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখ্যো মহাশয়েব ছেলে কিশোরী বাড়ী

আসিল, তাহার বয়স ২৫২৬ হইবে, বেশী লেখা পড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ২ টা কা বেতনে মুহুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত পা ধুইতে গেল। তার পর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুটুঘুটে অন্ধকার ঘরে স্মশীলা তাহার সম্মুখের বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ী ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লঠন জালিয়া ও বাঁশের লাঠিগাছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়-বাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপে গ্রামের নিষ্কম্মা যুবকদিগের যাত্রার আখুড়াই ও রিহাসেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক বাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্মের ভিতর।

রামতনু মুখ্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্ত সকাল সন্ধ্যায় মুখ্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন, তাঁহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ-বয়সে ইত্যাদি।

তাঁহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাজক্ষার জন্ত দায়ী একমাত্র তাঁহার পুত্রবধু স্মশীলা। স্মশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্ত রামতনু মুখ্যের বাড়ীতে কাক চিল বসিবার উপায় নাই। শত্রু-শাস্ত্রীকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্ঠার ক্রটি দেখা যায় না।

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আঁড়ি এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহাৰ্য্য বিশেষ করিয়া সে শুইতে

গিয়া দেখিল স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের স্বরে বলিল—“কখন এলে? তা আমায় একটু ডাকলে না কেন?”

কিশোরী বলিল—“আর ডেকে কি হবে? আমার আর কি হাত পা নেই! নিতে জানিনে?”

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—“নিতে জান তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বন্বে না। এ যেন হয়েছে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়ীস্থল লোক আমার পেছনে এমন করে’ লেগেছে কেন শুনতে চাই। না হয় বরং—”

কাম্মায় ফুলিয়া সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত দুপুরের সময় গায় পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে। এরকম করিয়া আব সংসার কবা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া থাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায় তাহা হইলে আর পারা যায় না। কিছু না, ও একটা ছল, এ সামান্য সূত্র ধরিয়া এগনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—“যা খুসী কালকে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে’ ওঠাবো।”

স্মশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখ্যে শুনিলেন চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। ষাইবার সময় তিনি বলিলেন—“ও বোঁমা, একটু সকাল-সকাল ভাত দিয়ো, কোটে যেতে হবে।” বেলা ৯টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন স্মশীলা স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রান্নাধিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকীদার হাঁকার স্বরে বলিতে লাগিলেন—“হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে

পাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বল্চি—ও বোমা, দুটো ত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো-কিছু রাঁধ—হাতে যে ধরতে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা কোনে?—এই বেলা ছপুরের সময় রাণী এখন এলেন যে—”

সুশীলা রক হইতে সমান গলায় উত্তর দিল—“মাইনে-রা দাসী ত নই, আমি যখন পারবো তখন রান্না চড়াবো—সকাল থেকে বসে’ আছি নাকি? এত খাটনি সেরে বার আটটার মধ্যে ভাত দেবো—মামুষের তো আর রীর নয়—যার না চলবে সে নিজে গিয়ে রেঁধে নিক্—”

এই কথার উত্তরে মোক্ষদা খুস্তী হাতে রান্নাঘরের ওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্তনের একটা ধুনিক সংস্করণ শুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা টনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বার বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, মালেরিয়ায় শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে অতি ময়লা এক মছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে কটা ছোট বাখারীর ছড়ি লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। হলেটি পাশের গ্রামের আতরালি ঘরামির ছেলে, গত বৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, দুটি ছোট ছোট বোন মার মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব মারাপ, সবদিন খাওয়া জুটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি জাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন করে। সে এগ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে আসিত, কিন্তু খুখ্যে-বাড়ী আর কখনো আসে নাই, তাহার একটা কারণ এই যে দানশীলতার জন্ত রামতল্ল মুখ্যে গ্রামের মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ সুর পরিয়া উচ্চঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাং গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক বস্তাধস্তি করিয়া রামতল্লর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ গিঁচাইয়া বলিলেন—“খাম্—খাম্, ও-সব রাখ্—এখন ও-সব দেখবার সখ্ নেই—যা অল্প বাড়ী দেখ্গে যা—যা—”

সুশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—“শোন, তোর বাড়ী কোথায় রে?”

—হরিষপুর, মা-ঠাকুরগ।

—তোর বাড়ীতে কে আছে আব?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকুরগ—মোদের আর কেউ নেই, মুই বড়, মোর ছোট দুটো বোন আছে—”

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস্? ই্যা রে এতে চলে?

রামতল্লর ধমক খাইয়া ছেলেমামুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল ছ ছ করিয়া পড়িতেই মালেরিয়াশীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না মা-ঠাকুরগ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখ্তি চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতি পার্তাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারের—এই শীতি মা-ঠাকুরগ—

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল, “দাঁড়া, আমি আস্চি।”

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সামলাইয়া চাহিয়া দেখিল আল্‌নায় একখানা নতুন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে—হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া সেইখানা টান দিয়া লইল। তার পর জানালা দিয়া বাড়ীর মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপিচুপি বলিল—“এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাটবে। কাটবে না? খুব মোটা। শীগ্গির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা কেউ না দেখে—”

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুশীলা বলিল—“ওরে এক্ষনি কে এসে পড়বে, শীগ্গির যা—”

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা ভিতর-বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল খুশুর আহাৰ করিতে বসিয়াছেন। ছেলেটার দুঃখে সুশীলাব মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল, সে গিয়া রান্না-ঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, খুশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনাকে কিছু দেব বাবা?”

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—“তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয়ত বলো নিজে মরি বাঁচি একরকম করে' সাঙ্গ করে' তুলি।”

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এই-সব ব্যাপারেই স্মশীলা অত্যন্ত চটিয়া যাইত, রামতনু পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জরু করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহাব আর কাণ্ড জ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান্ হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন?

মাস দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে যে বার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘবে ঢুকিয়া দেখিল স্মশীলা ঘরের মেজেয় বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী স্মশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে!

স্মশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু ছুঁমির হাসি হাসিল, বলিল,—বলব কেন?

—থাক, না বল, ভাত দাও। রাত কম হয়নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

স্মশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছিল না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পূর্বানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে ছুটো ভাল কথা শুনে নাই, তাহার নারীহৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্য সে ঘুমে তুলিতে তুলিতেও এই সামান্য ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে প্য দেওয়া দূরে থাকুক, সে দিকে ঘেঁসিলও না দেখিয়া স্মশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজকলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চূপ্‌চাপ্‌ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এপাশ ওপাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া এবার সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না? অনেকদিন তো বলনি, বলবে লক্ষ্মীটি—

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া স্মশীলা মুগ্ধ হইয়া যাইত,—জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন পরীদের জগৎ, খেজুর-বনের মধ্যে ঠাণ্ডাজলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, পথহীন দুরন্ত মরু-প্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড়, তরুণ শাহজাদাগণের দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ-সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যর অন্ধ-রাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহজাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকেই যাত্রার দলের রাজার পোষাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহজাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এইরকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নাগক-নাগিকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া সে স্বামীকে প্রথম ভালবাসে। সে আজ ৫৬ বৎসরের কথা, কিন্তু স্মশীলার এখনও সে ধোর কাটে নাই।

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল,—হ্যাঃ, এখন গল্প বলব! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত-ছপূরের সময় বকুবক করি আর কি! তোমাদের কি? বাড়ী বসে' সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চূপ্‌ করিয়া যাইত। স্মশীলার মেজাজ

ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল,—তা হোক, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয়—

—না বেশী নয়— তোমার তো রাত কমবেশীর জ্ঞান কত! নাও, চূপ্‌চাপ্‌ শুয়ে পড় এখন—

সুশীলা এইবার জিদ্‌ ধরিল,—বলো না একটা, একটা ছোট দেখেই না হয় বলো—এত করে' বলছি একটা কথা রাখতে পার না—

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল,—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল! রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই—সমস্তদিন তো গলাবাজিতে বাড়ী সর্বগরম রাখবে, রাত্রিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলাব ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল,—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অস্ববিধে হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখন থেকে—রাত দুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্যন্ত ভাত নিয়ে বসে' থাকে? নিজের দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি! নিজের খাটনিটাই কেবল—

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ঐশ্যচ্যুতি ঘটিল—উঠিয়া বসিয়া প্রথমে সে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো—ঘর থেকে বেরো আপদ্—দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা বেরো—যেখানে খুসি যা—

ঘরে আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী দুই হাতের নখ দিয়া আঁচড়াইয়া তাহার হাতের আঙুলগুলিতে রক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরাণী শাহাজাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে ছরস্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন ফুলের পাপড়ীর মত শাদা, ভোর রাত্রে বাতাস নেবু-ফুলের গন্ধে আর পাপিয়াব গানে মাগ্লামাখি, সুশীলা

তখন ঘরের দোরের বাহিরে দালানে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইলে যে যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—“বৌমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পূজো দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল সেরে নাও।”

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইহারাই গ্রামেব জমিদার এবং ইহাদেরই জমি-জমা-সংক্রান্ত মোকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহালাদি শেষ করিয়া ভাল কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়ীতে কলিকাতা হইতে একটি বউ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম্-এ পাস করিয়া বছর দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরী পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজ্ঞ চৌধুরী-গৃহিণী রামপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে সে কখনো পাড়ারগায়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল নীলাম্বরী-কাপড়-পরনে তাহারই সমবয়সী আর-একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়চোপড় পরিবার অগোছাল ধরণ দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়ারগায়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল নয়। নৌকার ওধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রীব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বড়মামুষী ফর্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখা-পড়া জানিত এবং দেশবিদেশের খবরাখবরও কিছু-কিছু রাখিত—চৌধুরী-গৃহিণীর একঘেয়ে বড়মামুষী চালের কথাবার্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর,

স লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে গালো-কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—
:তোমার নাম কি ভাই ?

সুশীলা সন্দিক্‌সুরে বলিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকম দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোমটা किसের ভাই ? তুমি আমার আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোমটা তুলিয়া দিল—খুলিতেই সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—রং যদিও ততটা ফর্সা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্‌ণশ্যাম কল্মী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারামুখখানায় মাথানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগায়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল জিজ্ঞাসা করিল--উনি কিসের আছেন তোমার কে ভাই, শাশুড়ী ?

—ই্যা।

—এস আর-একটু সরে' এস ভাই, দুজনে গল্প করি আমার দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই ?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিম্লে।

—কোন শিম্লে ? কল্কাতা শিম্লে ?

কলিকাতায় শিম্লে আছে নাকি ? কৈ তাহা তো সুশীলা কোন দিন শোনে নাই। সে বলিল—আমার বাপের বাড়ী এখান থেকে তো বেশী দূর নয়, ৫১৬ কোশ পথ, গরুর গাড়ী করে' যেতে হয়।

নদীর ধারের যবক্ষেত, সমক্ষেত, বুনো গাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুসি। এ-সব সে পূর্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ, বড় সুন্দর তো ! ওটা কি পাখী ভাই ?

—ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো ?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কল্কাতার বাইরে অ্যাদিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগান-বাড়ীতে যাবার কথা মনে আছে, তার পর এই আস্‌চি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। ওটা किसের ক্ষেত ভাই ?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরির ক্ষেত দেখাইতেছে—প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ-ঝলসানো রং, অদৃষ্টপূর্ব দাগী সিক্কের শাড়ী, ব্লাউজ এবং চিক্‌চিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ সঙ্গিনীর উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত এসব সামান্য জিনিসও নাই নাকি ? সুশীলা হাসিয়া বলিল, —তুমি ফুলের গন্ধ দেখে' বুঝতে পার না ভাই ? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ীর গায়ে তো কত মৌরীর ক্ষেত আছে—মৌরীর শাক কখনো খাওনি ? কল্কাতায় বুঝি নেই ?

কলিকাতার বোট বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে ! প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল ? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।

দুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিক্ ওদিক্ বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক্ !...

নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে! ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া বসিয়া কেমন ঝিমায়!

কলিকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই। কেমন?

সুশীলা খুসি হইয়া বলিল খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলা—

—এক কাজ করি এস—আসতে আসতে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমরা দুজনে মৌরীফুল পাতাই। কেমন?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহাবা মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বোঁসারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক—সেদিন পূজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তার তলায় ভাঙা ইটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে স্ক্রু করিয়া সকলরকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্য্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল দেখিগে কেমন পূজো হচ্ছে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ-বেচা বুড়ীর নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই?

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—“আর বলতে হবে না মা-ঠাকুরগণ। তা তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায়নি, ও-বয়েসে অনেকের—

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ী বলিল—এবার বুঝলাম মা-ঠাকুরগণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখো টান আছে। একটা ঔষধ দিই, নিয়ে যাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে—ওরকম কত হয় মা-ঠাকুরগণ—

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলিল—এই নাও, বেটে খাইয়ে দিও। কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল হবে না। আট আনা লাগবে।

স্বামীর বারমুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া গেল। তাহার আঁচলে একটা আধুলী বাঁধা ছিল, আজ্জকার দিনে জিনিষটা-আস্টা কিনিবার জন্ত সে ইহা বাড়ী হইতে শাওড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বাড়ীর বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলীটি শাওড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাকুরগণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল।

পূজা দেওয়া সাক্ষ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল,—ভাই, তুমি এখন দিন কতক আছে তো?

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চলে' যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাকবে ভাই—চিঠি পত্র দেবে তো? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় বুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কখনো ভুলব না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে ছুঁ, একগুঁয়ে ঝগুড়াটে।

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা তার মায়ের দেওয়া আংটি, প্রথম বিবাহের পর তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই

তোমার আঙুল, তুমি হলে মৌরীফুল, তোমায় খাওয়াবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরী-ফুলকে ভুলে যাবে না।

স্বশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল,—বউটি চট করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল—দূর পাগল! না ভাই, এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই—

স্বশীলা জোর করিতে গেল—হোক ভাই, দেখি—মায়ের দেওয়া বলেই—

বউটি বলিল—দূর! না ভাই, ও-সব রাখো—সে বরং—

স্বশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি স্বশীলার হাত ধরিয়া বলিল,—পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিতে যাবে ভাই?—আচ্ছা, তুমি যদি দিতে চাও এই পূজোর সময় আস্বো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই!—আর আমায় ভুলবে না তো ভাই?

স্বশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুলবো ভাই মৌরীফুল? কখখোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল—

তাহার পর সে একটু আনাড়ি ধরণে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল—তোমায় কি ভুলতে পারি?—

কথা শেষ না করিয়াই সে ছুইহাতে সঙ্গিনীর গলা হুড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে চরিয়া গেল।

কলিকাতার বউটি এই অদ্ভুতপ্রকৃতি সঙ্গিনীর মশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার সন্নেহে চুসন করিল—তার পর দুজনেই চোখের জলে ঝাপ্সাদৃষ্টি হইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি-একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে ২১ দিন দেবী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণীর আস্থানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাবার সময় বলিয়া গেলেন,—বৌমা, আমার ফেরবার কোনো ঠিক নেই, রান্না-বান্না করে' রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখতে পারব না, চৌধুরী-বাড়ীর কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোবে উঠিয়া বাসন-মাজা জল-তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল স্বশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন কি-চাকর প্রবেশ কবে নাই—যদিও পূর্বে বাড়ীতে বরাবরই একজন করিয়া কি থাকিত। স্বশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল—যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম সারিয়া স্বশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, একথা স্বশীলা বহুবার শব্দরকে জানাইয়াছে। রামতলু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেকদিন হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই। কিশোরীর দোষ নাই, কেননা সে বড় বাড়ীতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছনে থিড়কীর বাইরে অনেক শুকনা বাঁশ ও ডালপালা পড়িয়া আছে—স্বশীলা রান্না চড়ানোর পূর্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন-মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতলু দেখিলেন—কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আসিলেই এখনি একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধু বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া স্বশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল,

দিকে বাড়ীতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের
‘ল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে
গেল,—পার্ব না, রোজ রোজ এমন করে’ সংসার
ফরা আমায় দিয়ে হ’য়ে উঠবে না—আজ দুমাস ধরে’
লুচি কাঠ নেই, কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক
মাছেন সব, তার একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই—
কি দিয়ে রাধবে? হাত পা উল্লুনের মধ্যে দিয়ে
বে নাকি? রোজ রোজ কাঠ কাটে, কেটে
ধা;—অত স্থখে আর কাজ নেই—থাকল হাঁড়ী
ড’, যিনি যখন আসবেন, তিনি তখন করে’ নেবেন—

রাধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা
বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুলা
বাটিয়া রাখা যাক—সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার
জন্য কয়েকদিনের মসলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে
বউ, পরনে একখানা পুরানো চেলীর কাপড়, হাতে
খাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা—একটি বাটি হাতে
রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল
—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া
বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—
ঠাক্করণ নেই—

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—একি দিদি, এত বেলা
হ’ল, এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ী-
কুঁড়ি ভেঙে ফেলিনি এই কত!—

বউটির চক্ষে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—
না দিদি, ওসব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও
লক্ষ্মীটি, নৈলে জান তো কিরকম লোক সব—

—দেব—দেখবে সব আজ কিরকম মজা, রোজ
রোজ কাঠ কাটবে আর ভাত রাধবে, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি,
আমি দিচ্ছি কেটে।

—তোমার কি দায় তুই দিতে যাবি? বস্ ঠাণ্ডা
হ’য়ে—বাদের গরজ আছে তারা নিয়ে যা বুঝুক গিয়ে—

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে,
জান তো ওরা—

—তুই বস্ দেখি ওখানে চূপ করে’, দেখিস্
এখন মজা—আজ দুমাস ধরে’ রোজ বলছি কাঠ
নেই, কথা কানে যায় না কারুর,—আজ মজাটি
দেখাব—

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল,
কারণ মজা কোন্ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু
সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে
না পারিয়া সে চূপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখু্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন
মুখু্যের পুত্রবধু। পাশেই এদের বাড়ী। রামলোচনের
অবস্থা খুবই খারাপ—তা সত্ত্বেও তিনি বছর দুই হইল
ছেলের বিবাহ দিয়াছেন—রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্র-
বধুই গৃহিণী। ছরবছার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে
সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে
অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়ীতে হাত পাতিয়া
তেলটা হুনটা লইয়া যাইত, চাল না থাকিলে আঁচলে
বাঁধিয়া চাল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—
কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না।
মোক্ষদা ঠাক্করণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে
জিনিষপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট
বাক্য বর্ষণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়,
কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা
ঠাক্করণের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা
যখন যাহা দরকার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য
একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁসিয়ার মোক্ষদা ঠাক্করণ
তাহা কখন ভুলিতেন না—গলা টিপিয়া কড়াক্রান্তিতে
তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল
অগোছালো ও অগ্রমনস্কধরণের মানুষ, সে ধার দিয়া
অত শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল হুন ধার
দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না,—শোধ
দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত,—ওই তুই আবার
দিতে এলি ভাই ছোট বৌ; ওর আবার নেব কি?—
ধা,—ও তুই নিয়ে যা চাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল—তার পর, তোর রান্নাবান্না ?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুষ্ঠিতভাবে বলিল—শেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা হয়নি। আজ রাধবার নেই—এক্ষণে দুদিনের দ্বিঘে যাব—সেইজন্তে—

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয়নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুষ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে—

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদেব মজা না দেখিয়ে আজ আর কিছুতে ছ'ড়'চিনে—

বেলা ১২টার সময় মোক্ষদা ঠাকুরণ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হৈচৈ বাধাইয়া দিলেন—প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবারই কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক টানিতে সুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈঃস্বরে সুশীলার কুলঙ্গী গাথিতে লাগিলেন—সুশীলাও যে খুব শাস্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শক্রতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আঁও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ী আসিয়া এ অশাস্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুকনা চেলা-কাঠ পড়িয়া ছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিল—সুশীলা তখনও বসিয়া বাটনা বাটিতে-ছিল—স্বামীকে শুকনা কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্না-ঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া

গেল—আয়রকার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুটো তুলিয়া নিজের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তাহার পর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা মারিল একেবারে উঠানে। ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ খুবড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল—মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ীর বউটি তখন শশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ-বাড়ীর মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়কীতে ছুটিয়া আসিয়া উকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; সর্বাঙ্গে ধূলা, বাটনার পাত্রে উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ; মাথার খোঁপা এক ধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর, কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্গুলী-বাড়ী হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু'একজন পাড়ার মেয়ে সামনের দরজায় গিয়া উকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচীলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা, বিশৃঙ্খলতা, অপমানিতা দিদিকে অসহায়ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কিরকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাগাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, শশুর ভাসুর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কীর বাহিরে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ীর প্রোট গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা-হাতে,—কি হে রামতনু, বলি ব্যাপারখানা কি শুনি, বলিয়া বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে

না পারিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং স্মশীলার হাত ধরিয়া খিড়কী-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন ও-রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করলাম?—

তার পরদিন দুপুরবেলা স্মশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতে-ছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাকুরগণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, স্মশীলা পিছন ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কিরকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি?—কি মেশাচ্ছ ডালের বাটিতে?

স্মশীলা পিছন ফিরিয়াই শাণ্ডীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল, তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল—তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধু উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাকুরগণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্বনাশ। আর একটু হ'লে হয়েছিল, গো,—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলী-বাড়ীর মেয়েপুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সাম্নে সে বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—দ্যাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাণ্ডী-মাগী বড় ছুঁ,—নিজের চোখে দেখে' নাও ব্যাপার, কি সর্বনাশ হ'য়ে যেত এখুনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ—

এক-উঠান লোব—সকলেই শুনিল রামতনুর দুঃস্থ পুত্রবধু স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক হইয়া গেল, কেউ মুচ্কি হাসিয়া বলিল—ওসব আমরা অনেককাল জানি, আমরা রীত দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে বলে' এতদিন—

কে একজন বলিল—জিনিসটা কি তা দেখা হয়েছে?—

মোক্ষদা ঠাকুরগণের গাল-বাদের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগগির বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শান্ত্রে বলে, ছুঁটা ভার্য্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ী ডাকিয়া আপদ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্ত অন্ত বউঝিও দেখাদেখি ঐরকম হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে স্মশীলাকে অন্ত একঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদা ঠাকুরগণের বন্দোবস্ত, কাল সকালেই যখন যেকোনকার আপদ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না। ঘরের জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে,—সে স্বভাবতঃ নির্কোষ, লাজনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত স্বপ্নরশাণ্ডী ও এক-উঠান লোকের সাম্নে এভাবে অপমানিতাও সে কোনদিন হয় নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে।

ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চূড়ি ভাঙিয়া হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী ৫।৬ বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল ?

পান খাওয়ানোর কথাটিই স্মৃশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রে জ্যোৎস্না ক্রমে আরো ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন-গুলো প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের সিমুলতলায় সঙ্ক্যার ছায়ার কোলে গিয়া চলিয়া পড়ে, পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী, বসন্ত-লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরাতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নৃতন করিয়া টাটকা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।

শুইয়া শুইয়া স্মৃশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্য সত্য যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভালবাসে ওই ছোট বউটা। আহা, ছোট বউএর বড় কষ্ট! ভগবান্ দিন দিলে সে ছোট বউএর দুঃখ ঘুচাইবে। কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নইলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরী করিয়া দিতে পারে। চাকরী হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না, ...মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুম্ভার মাচা বাঁধিবে, বাজার-খরচ

কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছাল নয়, একবার বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে গোছাল কিনা... আচ্ছা, ওই বাড়ীখানায় যদি আগুন লাগে! না— আগুন দিবে কে? ছোট বউ! উহঁ, দিতে তাহার শান্তুড়ী ঠাকুরগুঁই দিবে, যেরকম লোক!

জানালায় বাহিরে জ্যোৎস্নায় ওগুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো? তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজিয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ও-রকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে... আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না? লাল চোকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখান।

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধুর উঠিবার দেবী হইতে লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকুরগুঁই ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন পুত্রবধু জ্বরের ঘোরে অঘোর অচেতন অবস্থায় ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল।

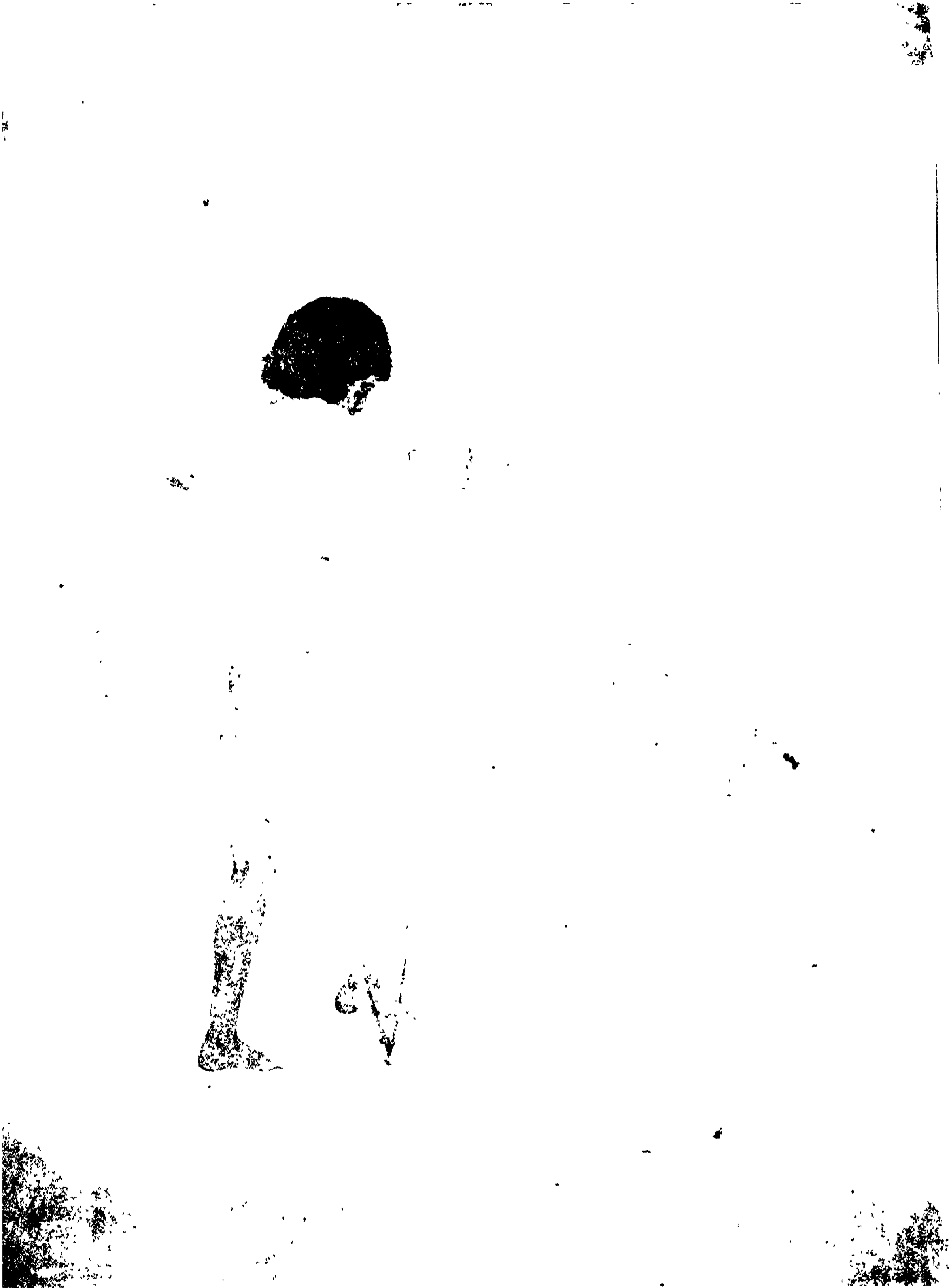
সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল—সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বলছে—আমি অন্ধ ভেবে—

সঙ্ক্যার কিছুপূর্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাকচিলগুলোও একটু স্থস্থির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্মপটু, ছসিয়ার, গোছাল। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন পরেই যখন কিশোরী পালেদের ষ্টেটে ভাল চাকরীটা পাইল, তখন নতুন বোঁএর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুসি হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউএর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে নাই।

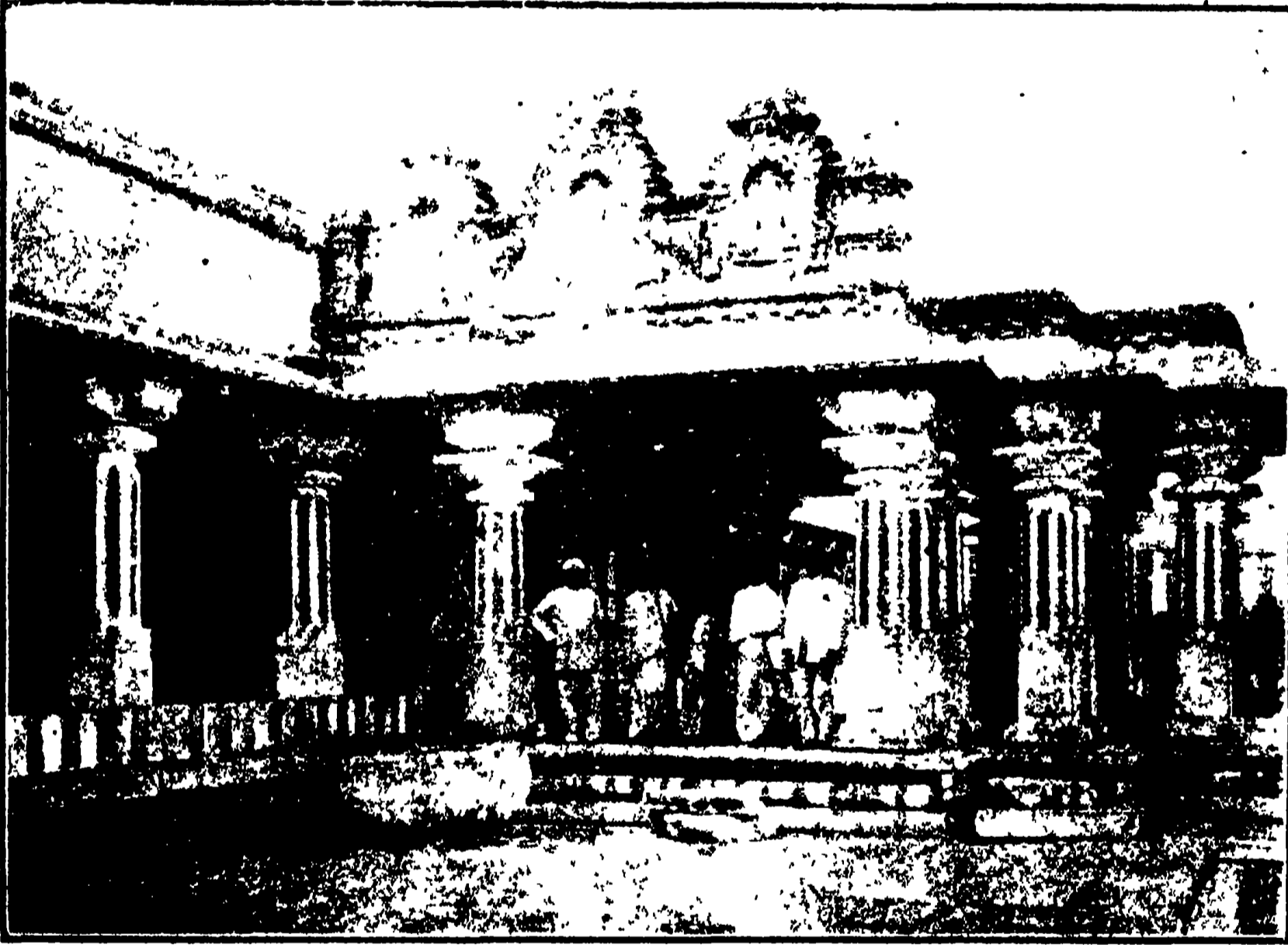
শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



বাণী
চিত্রকব শ্রীগোপালকব ভট্টাচার্য

মহীশূর রাজ্যের তীর্থস্থান

রামায়ণে মহীশূর রাজ্যের অনেক তীর্থস্থানের নামের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক হিন্দু ভিন্ন অগ্ন্যধর্মমতালম্বীদেরও অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূরে অবস্থিত। যদিও পূর্বে বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মহীশূরে বাস করিত, কিন্তু বর্তমানে এখানে তাহাদের কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ নাই। কিন্তু জৈন-শৈব-বৈষ্ণবমতাবলম্বীদের অনেক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মহীশূর রাজ্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে প্রয়াস পাইলাম।



শ্রবণবেলগোলার মন্দির

শ্রবণবেলগোলা।— মহাবীর-প্রবর্তিত জৈনধর্মাবলম্বীদের শ্রবণবেলগোলা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে তাহাদের প্রধান গুরু বাস করেন। সেই কারণে ভারতবর্ষের সমস্ত জৈনরাই এ স্থানটিকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে। এখানে গোমতেশ্বরের একটি বিশাল প্রস্তরমূর্তি আছে। মূর্তিটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ ও পাহাড় খুদিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে। গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্তির চতুর্দিকে অনেক মন্দিরাদি আছে। এখানে একটি

সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে ধর্মজীবন বাপন করেন। এখানকার পর্বতোপরিষ্কৃত প্রাচীনতম মন্দিরটি সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে এবং পর্বতের নাম হইয়াছে চন্দ্রবেট। যে পর্বতের উপর বিশাল প্রস্তরমূর্তিটি খোদিত হইয়াছে তাহার নাম ইন্দ্রবেট। পর্বতটি সামুদ্রেশের গ্রাম হইতে প্রায় চারিগত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। মন্দিরগামী দর্শকগণকে পাহাড়ের পাদদেশে জুতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে হয়।

গ্রীষ্মকালে পাছুকাবিহীন অবস্থায় এই পর্বতারোহণ করা বিশেষ কষ্টকর। মূর্তিটি উত্তরমুখী অবস্থায় দণ্ডায়মান। যে ভাস্কর এই বিশাল মূর্তিটি প্রস্তর করিয়াছেন তিনি নিপুণতার সহিত তাহার কার্য সম্পাদন করেন নাই। কারণ মূর্তিটির বাহুদ্বয় শরীরের অনুপাতে বড় হইয়াছে। অগ্ন্যধর্মপ্রত্যঙ্গ মাপানুযায়ী হয় নাই। নির্বিচারচিত্ত ধ্যানীর মূর্তি কল্পনা করিয়া ভাস্কর মূর্তিটির দেহের নিম্নভাগে উইটিপি ও পদদ্বয়ে লতাপাতা খোদিত করিয়াছেন। যেন ধ্যাননিরত সন্ন্যাসী ভগবৎচিন্তায় এতই বিভোর যে নিজের

দেহের প্রতি মনোনিবেশ করিবার কোনই আগ্রহ নাই। এখানে প্রতিবৎসর ছোট ছোট উৎসব হয়। দশ বার বৎসর অন্তর এই বিশাল মূর্তিটির অঙ্গ ঘৃত দ্বারা ধোত করা হয়। সেই সময় এখানে খুব বড় উৎসব হইয়া থাকে ও ধনী জৈনরা এই ব্যাপারে গহস্ব সহস্র টাকা ব্যয় করেন।

শৃঙ্গেরী।— ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মঠগুলির মধ্যে শৃঙ্গেরী মঠ অন্যতম। মহীশূর রাজ্যের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে

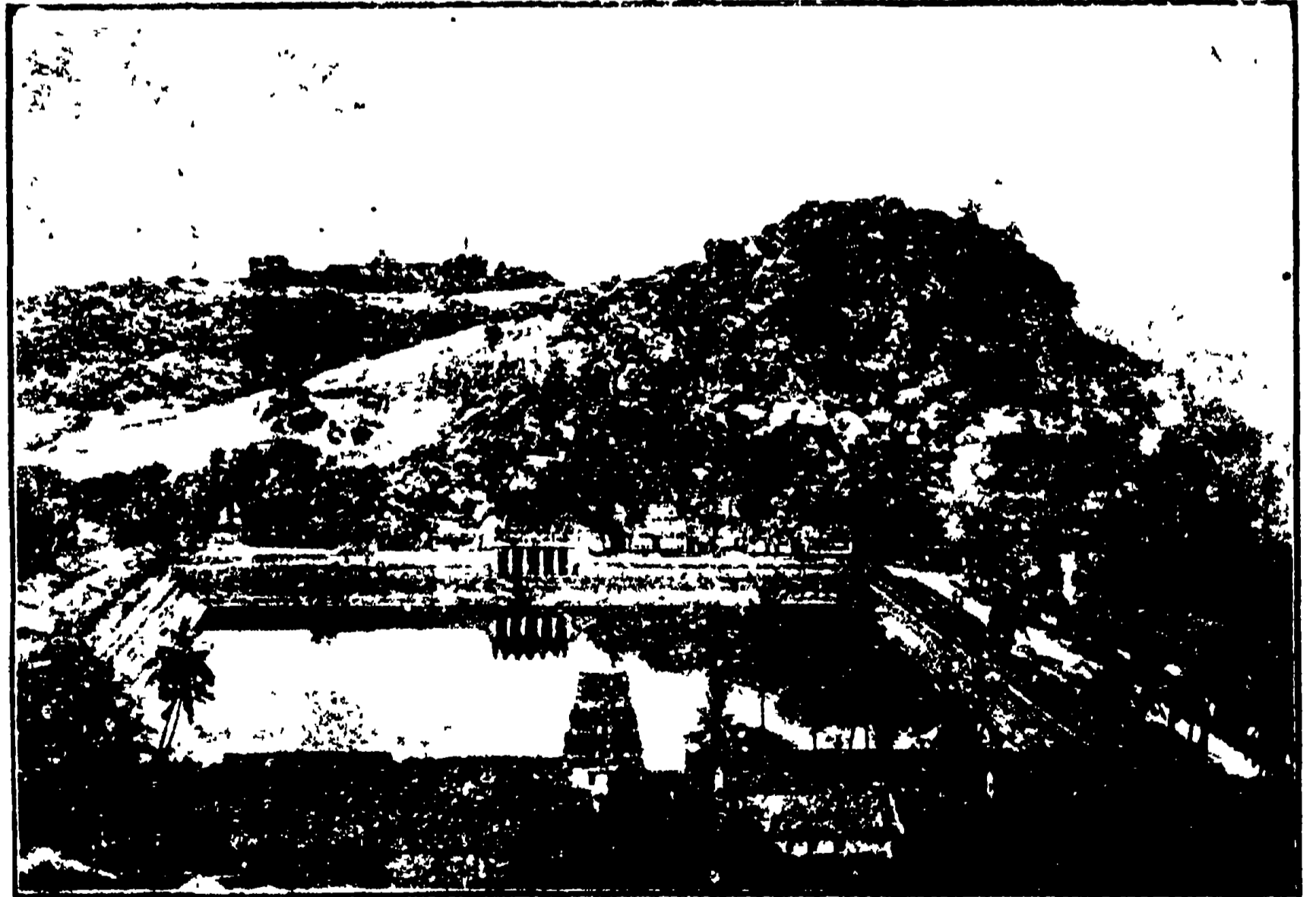


গোনতেখব মূর্তি শ্রবণবেঙ্গলগোলা.



গোনতেখব মূর্তির পশ্চাদভাগ

স্থানটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। কথিত আছে বিভাগুৎ ঋষি এখানে প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং রাজা দশরথের পুত্রোষ্ট্রধ্বজের পুরোহিত ঋষ্যাশ্ব্ব মূনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এস্থানটির মাহাত্ম্য কমিয়া যায় না। শৈব শঙ্করাচার্য্যও এস্থানটিকে নানা উপায়ে মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার পরবর্ত্তী স্থলাভিষিক্তগণ নানা-প্রকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে এই স্থানটি শৈব উপাসকদিগের একটি



শ্রবণবেঙ্গলগোলায় পবিত্র কুণ্ড

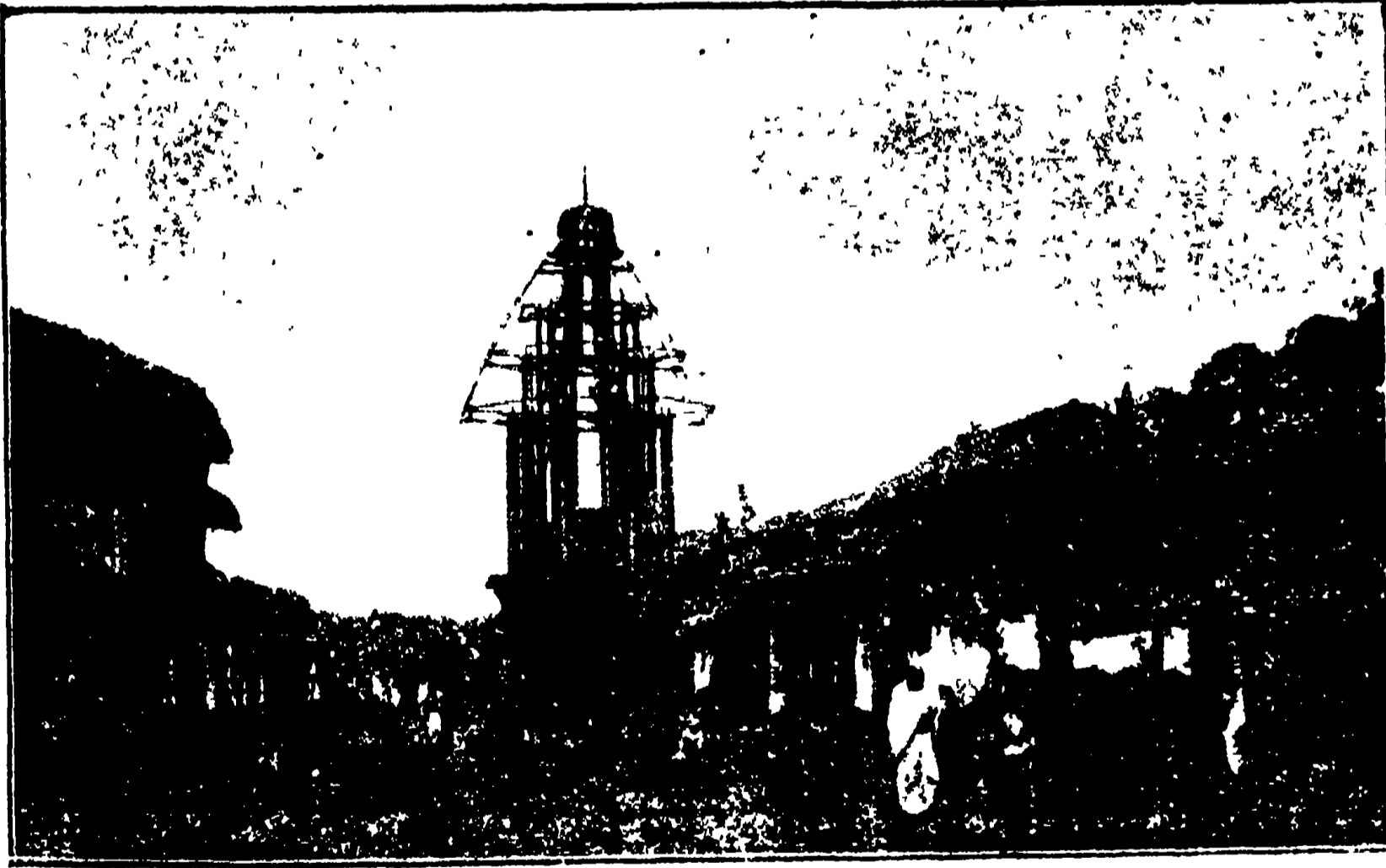
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপে গণ্য হইয়াছে। শৃঙ্খেরী বিশেষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি যখন তাঁহার স্মার্ত্তর ঋক সর্গদর্শনসম্বন্ধী সর্গদর্শন লোক কর্ত্তকর্ত্ত পাল্লীতে করিয়া নতির্গত তন তখন সতস্র সহস্র নরনারী



শূভ্রের নব-নির্মিত মন্দির



শূভ্রের মন্দিরের সোপানাবলীতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদল



শূভ্রের রথ

নগ্নপদে তাঁহার অহুগমন করে। তিনি যেখানে পদার্পণ করেন সেখানেই রাজার গায় সম্মান ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। কয়েক বর্ষ হইল একটি যুবক এই মঠের গুরু

ঘাট আছে—সেখানে প্রত্যহই শত শত পোষা মৎস্য খেলা করে। এখানে প্রতিবৎসরই কয়েকটি উৎসব হয়। সর্কাপেক্ষা বিখ্যাত উৎসবটির নাম নবরাত্রি।

সম্পাদন করিতেছেন। শূভ্রের গ্রামে যাইবার পথ অত্যন্ত দুর্গম। এখানে শতাধিক ছোট ছোট মন্দির আছে। পথ চলিতে চলিতে সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সর্কাপেক্ষা বিখ্যাত মন্দিরটির নাম বিদায়শঙ্কর। এই মন্দিরটি সুন্দররূপে কারুকার্যখচিত। এখানকার গুরু নদীর উপরে একটি নবনির্মিত গৃহে বাস করেন। এই গৃহ আধুনিক কায়দায় নির্মিত। ভেলার সাহায্যে এই গৃহে গমনাগমন করিতে হয়। নদীর তীরে বাধা-



বেলুড় মন্দির

ভোজ দেওয়া হয় ও মহিলাদর্শকদিগকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মহীশূরের রাজা এই মঠটিতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। মঠের অনেক ধনী ভক্ত আছে। তাঁহারাও বহু অর্থ সাহায্য করেন। যদিও শৃঙ্গেরী তীর্থের অনেক প্রাচীনতম কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি যুগ যুগ ধরিয়া শঙ্কর-উপাসকগণ ও অগ্ন্যগ্ন হিন্দুগণ এই মঠটিকে প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া আসিতেছেন।

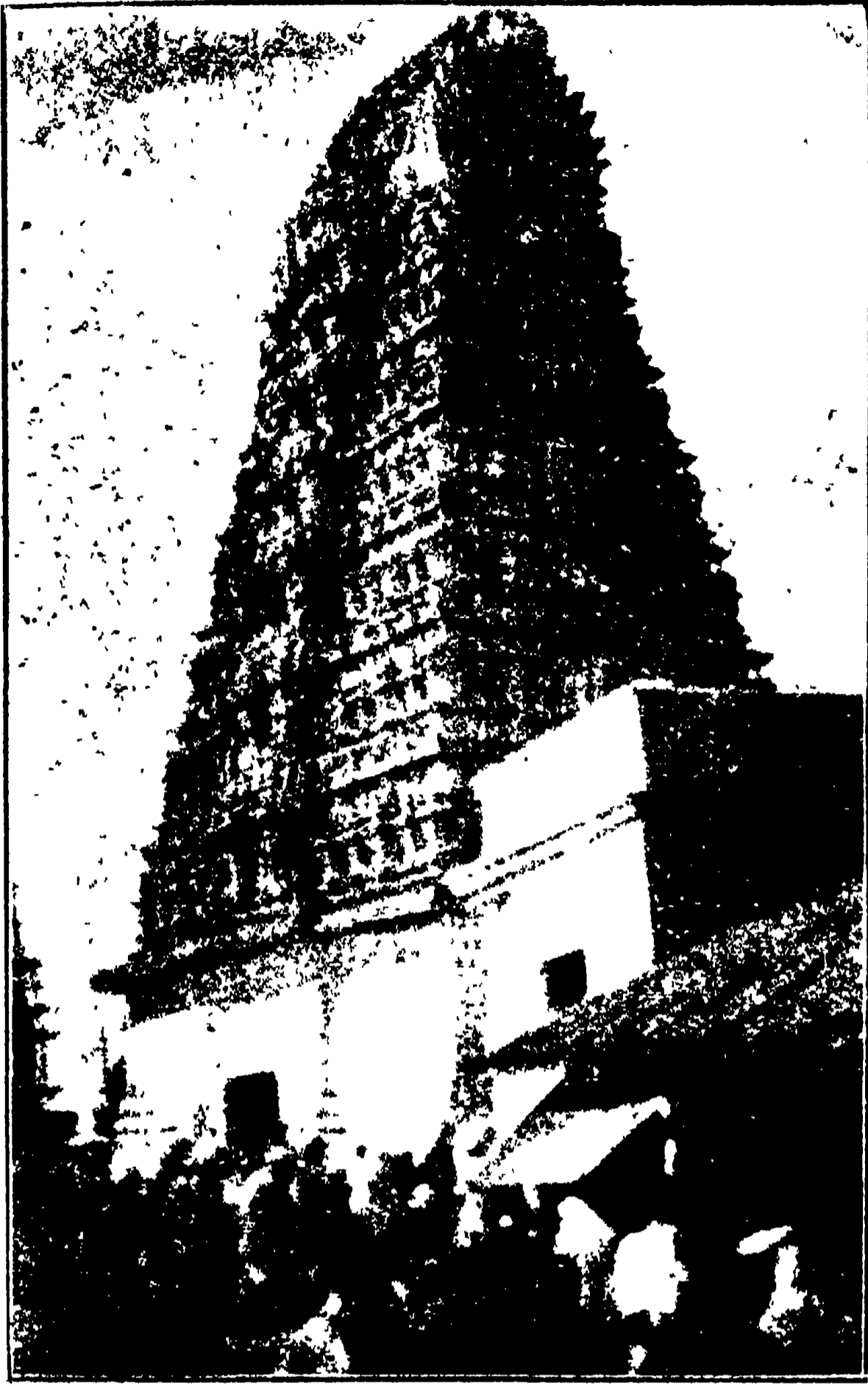
বেলুড়—পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে এই স্থানটির নাম ভেলুর বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা দক্ষিণ-কাশী নামেও খ্যাত। এখানকার মন্দিরটি চেন্ন-কেশবের নামে উৎসর্গীকৃত। হুদ-শালা বংশের রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন ধর্ম পরিবর্তন করিয়া বিষ্ণুর উপাসক হন। তিনিই দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নিৰ্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের চিত্রাদি প্রাচীন চালুক্য চিত্রকলার নিদর্শন প্রদান কবে। এই শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাদি দেখিবার জগ্নু প্রতিবৎসর বেলুড়ে বহু লোক-সমাগম হয়। চৈত্র মাসে এখানে একটি বাৎসরিক উৎসব হয়—সে সময়ে এপ্রদেশের অনেক লোক এখানে সমবেত হয়। এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা সম্বন্ধে এপ্রদেশে একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যখন মন্দিরে দেবতাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন ভুলক্রমে দেবীকে

লোকের বিশ্বাস সেইজগ্নু দেবতা সময় সময় স্বরূহৎ পাছুকা পরিয়া এই পর্কতে গমন করেন। এই কারণে মন্দিরে এক জোড়া বৃহৎ পাছুকা আছে। পাছুকা পুরাতন হইয়া গেলে নির্দিষ্ট কারিগর দ্বারা পুনরায় পাছুকা প্রস্তুত করা হয়। এই শ্রেণীর কারিকরণের মন্দিরের আঞ্জিনায় প্রবেশাধিকার আছে। প্রতিবৎসর কেবলমাত্র উৎসবদিবসে সর্কশ্রেণীর লোককেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। যদিও ক্রমে ক্রমে উৎসবের ধুম কমিয়া আসিতেছে, তথাপিও এখানকার মন্দিরের কারুকার্য দেখিবার নিমিত্ত

বৎসরে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

নঞ্জনগড়—নঞ্জনগড়ের মন্দিরটি মহীশূব সহর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজসরকার এই





চামুণ্ডী মন্দির

মন্দিরটির উন্নতির জন্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। এখানে প্রতিবৎসর মহাসমারোহের সহিত রথযাত্রা পর্ব সম্পন্ন হয়। সেই সময় দক্ষিণাত্যের নানা দেশ হইতে অসংখ্য নরনারী এখানে সমবেত হয়। বহুপ্রাচীনকালে এই মন্দিরটি নঞ্জন্দেশের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। মন্দিরটির এক অংশে ৬৬ জন ভক্ত শৈবের মূর্তি আছে। আসল মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৩৮৫ ফুট ও প্রস্থ ১৬০ ফুট। এই মন্দিরটি ১৪৭টি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। মহীশূরের রাজবংশ বহুদিন হইতেই এই মন্দিরটির ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মুন্সী কৃষ্ণরাজ ওদেয়ার কর্তৃক গোপুরম্ নির্মিত হয়। রাজ-পরিবারের মহিলারাও মন্দিরের নানা অংশ নিজ নিজ ব্যয়ে নির্মিত করাইয়াছেন। মহীশূর হইতে রেলপথে এই মন্দিরটিতে যাওয়া যায়।

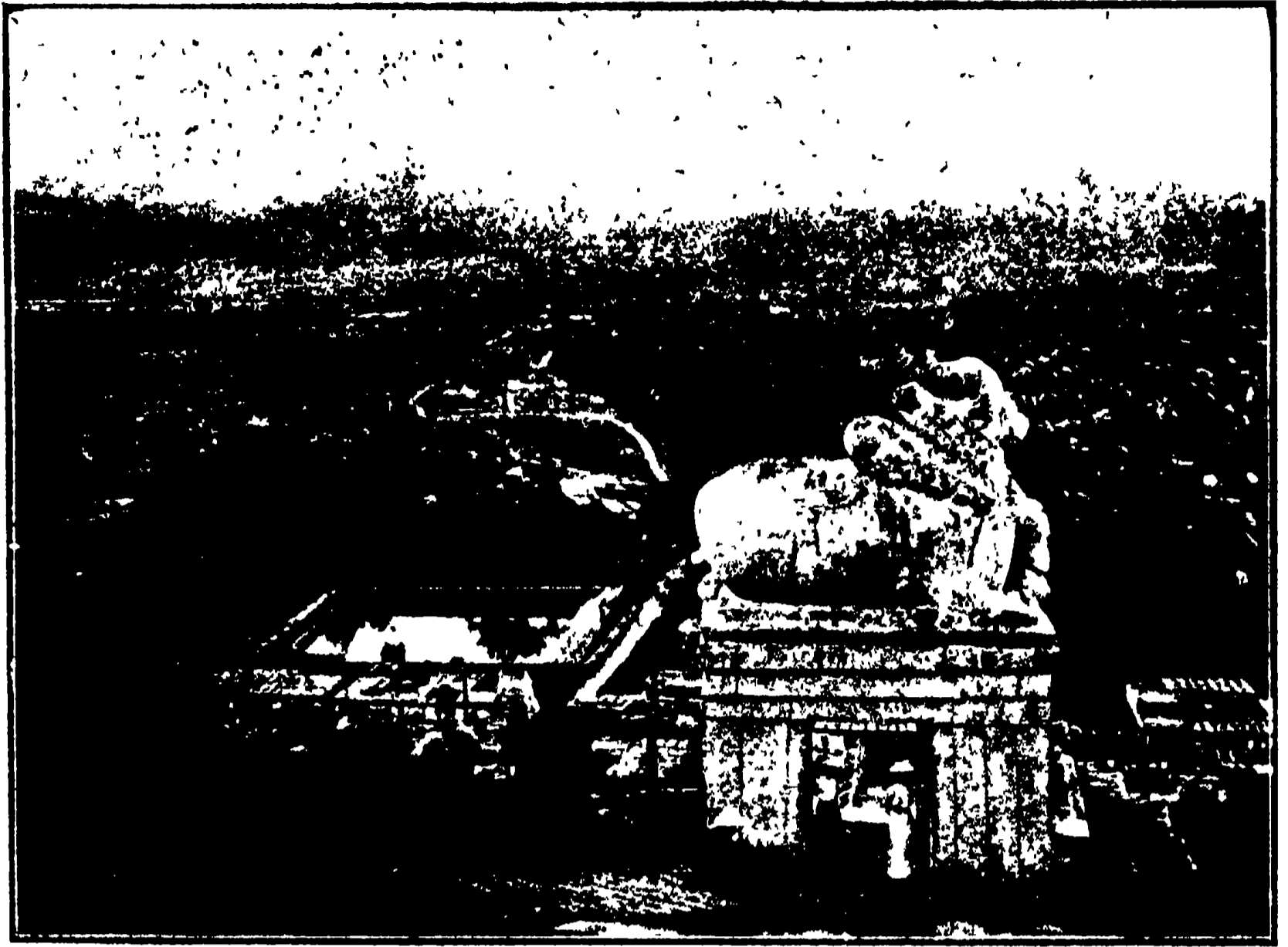
চামুণ্ডী—চামুণ্ডী পর্বতের উপর যে মন্দিরটি আছে তাহাও রাজপরিবারের সাহায্যে পরিচালিত। মহীশূর সহর হইতে চামুণ্ডী পর্বত দেখা যায়। পর্বতটি ৩৫০০ ফুট উচ্চ। ইহাতে আয়োজন করিবার জন্ত রাস্তা ও সোপানাবলী আছে। মহীশূরের রাজা এখানে যাইবার জন্ত একটি ১৬ ফুট চওড়া বাস্তা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।



চামুণ্ডী মন্দিরের নিকট বৃহৎ মূর্তি

মোটর যোগেও এ পথে পর্বতের উপরে গঠা যায়। প্রতিবৎসর দশেরা বা বিজয়া-দশমীর সময় এখানে বিরাট উৎসব হয়। এই সময় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নানা শ্রেণীর ভিক্ষুকদল। ইহারা পর্বতে উঠিবার সোপানাবলীতে সমবেত হয়। এখানকার সুদৃশ্য মন্দিরটি পর্বতের উচ্চতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাজ ওদেয়ার মন্দিরটির সংস্কার করান ও মন্দিরটির একটি চূড়া নিৰ্ম্মাণ

করান। মহীশূরের রাজারা এ মন্দির-
টির আরও অনেক সংস্কার করাইয়া-
ছেন। বর্তমানে পর্কতে আরোহণ
করিবার সোপানাবলীতে বৈদ্যুতিক
আলোক সংযোগ করা হইয়াছে।
সোপান সাহায্যে পর্কতে উঠিবার
মধ্যপথে একটি বিশাল খোদিত বৃষ-
মূর্তি আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌদ
দেবরাজ এই বৃষটি নিষ্কাণ করাইয়া-
ছিলেন। এই মন্দিরে কালীমূর্তি
প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রাচীনকালে
এখানে নরবলি দেওয়া হইত।



মেলকোট—সংস্কারক রামানুজা-
চার্য্য চোল-রাজগণ কর্তৃক নিপীড়িত
হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি এখানে
চতুর্দশ বর্ষ কাল বাস করেন। স্মৃতাং এটি বৈষ্ণবদের
একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। মুসলমান আক্রমণকারীগণ এখান-
কার মন্দিরের অনেক অংশ ধ্বংস করিয়াছে। রামানুজ
কতিপয় নিম্নশ্রেণীর লোকের সাহায্যে দিল্লী হইতে
শ্রীকৃষ্ণের অপহৃত মূর্তি উদ্ধার করেন। সেই কারণে
প্রতিবৎসর একদিন সেই শ্রেণীর লোকেবা মন্দিবে
প্রবেশ করিবার অনুমতি পায়।

বাবুদান পীঠ—এখানকার গুহাটি হিন্দু মুসলমান
উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান। চীকুমাগালুর হইতে
কয়েক মাইল দূরে এই গুহাটি অবস্থিত। মুসলমানদের
বিশ্বাস যে বাবুদান নামক একজন কালান্দরের এখানে
সমাধি হইয়াছিল, সেই কারণে ইহা তাহাদের তীর্থস্থান।
হিন্দুরা বলে যে এখানে দত্তাত্রেয়ের সিংহাসন আছে,
কাছেই ইহা একটি হিন্দুতীর্থ। এখানে উভয় সম্প্রদায়েরই
অনেক যাত্রী প্রতিবৎসর আগমন করে। গুহাটি বর্তমানে
মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে আছে।

শিবগঙ্গা—ব্যাঙ্কালোর জেলার অন্তর্গত শিবগঙ্গা
পর্কতে প্রতিবৎসরেই অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।
প্রবাদ যে এই পর্কতে উঠিবার যতটি সোপান আছে
এই স্থান হইতে কাশী তত যোজন দূরে অবস্থিত।

শিবগঙ্গা পাহাড় হইতে চামুণ্ডীব দৃশ্য

এই পর্কত প্রদক্ষিণ করার নাম কাশী দর্শন। প্রবাদ
যে এই পর্কত প্রদক্ষিণ করিলে কাশী তীর্থ দর্শন করার
পূণ্য অর্জিত হয়।

• তীর্থহল্লী—এই স্থানটি মালনাদ জেলায় অবস্থিত।
প্রতি বৎসর স্নানযাত্রা উপলক্ষে এখানে অনেক যাত্রীর
সমাগম হয়। কথিত আছে যে এখানে স্নান করিয়া
পরশুরাম সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

চিতলদ্রুগ—এই স্থানটি লিঙ্গায়তদিগের একটি
প্রসিদ্ধ তীর্থ। মহীশূর রাজ্যে অনেক লিঙ্গায়তের বাস
—স্মৃতাং ইহা একটি প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়।
লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এখানকার মঠে
বাস করেন।

এতদ্ব্যতীত মহীশূর রাজ্যে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
তীর্থস্থান আছে। স্থানাভাবে সকলগুলির বিবরণ প্রদান
করা সম্ভবপব হইল না। তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শনের
জন্য মহীশূরের রাজার মুজরাই বিভাগে অনেক কর্মচারী
আছেন। তাঁহারা সমস্ত মন্দিরাদি সম্বন্ধে অভাব
অভিযোগ শ্রবণান্তে রাজ-দরবারে পেশ করেন।
মহীশূরের রাজ-সরকার তীর্থস্থানগুলি সংরক্ষণের নিমিত্ত
যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

নির্বাসিতের আত্মকথা

আজ জীবনের পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হইবার পূর্বেই যখন যবনিকা ফেলিতে হইবে তখন এই ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনীটা আমি লিখিয়া যাইব। এ কাহিনী লিখিবার কোন প্রয়োজন আছে কি না জানি না, কিন্তু এই সুদূরে সব শেষ হইবার পূর্বে আমার হৃদয়টা অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছে, ঠোঁট দুটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; কাহার উপর এ অভিমান জানি না, কিন্তু যদি এ জীবনের পরেও আমার কিছু বাঁচিয়া থাকে এবং এ পৃথিবীর কথা শুনিতে পায় তাহা হইলে আমি ঠিক জানি যে যদি এ কাহিনী পড়িয়া কেহ সহানুভূতিব স্ববে “আহা” বলে, তাহা হইলে আনার সেই অমর অবশেষ নিশ্চয়ই ফুঁকারিয়া কাঁদিয়া উঠিবে।

আমার বয়স এই ২৬ বৎসর। চার বৎসর আগে আমার জীবন সুখের অমৃতে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম এ অমৃতের এক তিল কোন দিনই বুঝি কম পড়িবে না; যেদিন কেশের উপর শুভ্রতার পরোয়ানা জারি করিয়া মৃত্যুর দূত আসিবে, সেদিনও বুঝি এই অমৃত এমনই কানায় কানায় উপ্চাইয়া পড়িবে। আজ সেই মৃত্যুর দূত ত কাঁচা চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাব পরোয়ানা জারি করিতেছে, কিন্তু জীবনে সে অমৃত কই? কষ্ট যে শুষ্ক, মন যে শুকনো পাতর চেয়েও নীরস। যাক্ সে কথা - আজ কেন আমি এই আন্দামানে মৃত্যুর কালো গহ্বরের মুখে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি তাহাই বলি—সে এক রমণীর জন্ত। অদ্বুত এক নারী! তেমন মেয়ে বাঙালীর মধ্যে কেন কোন জাতির মধ্যে আছে কি না জানি না। সে আজ কোথায় বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার জলন্ত রূপ আজও আমার চোখের সম্মুখে ঠিক সেইভাবেই জলিতেছে—বোধ হয় মৃত্যুর পরেও এই ভাবেই জলিবে।

* * * *

মফঃস্বলের এক কলেজ হইতে আই-এসসি পাস করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম দিনই য়ে ছেলেটির

পাশে বসিয়াছিলাম তাহার নাম বীরেন। কৌকড়ান চুল অযত্ববিগ্নস্ত, সুন্দর পুষ্ট শরীরটিতে যত্নের অভাব সুস্পষ্ট, নাকটি টিকোণো বাঁকা, চোখ দুটি তত টানা নয় কিন্তু তীক্ষ্ণ।

অধ্যাপক কথায় কথায় সেদিন নেপোলিয়নের কথা আনিয়া ফেলিলেন। অধ্যাপকটি নেপোলিয়নের একটি গোঁড়া ভক্ত। তিনি নেপোলিয়নের বীরত্ব, নেপোলিয়নের নির্ভীকতা সম্বন্ধে বেশ প্রাণেব সহিত বলিতেছিলেন, আর বীরেন শুনিতেছিল সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া—তাহার শব্দবট্টা এক একবার আবেগে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সহিত বন্ধুত্ব সেই দিনই হইয়া গেল; সেদিন আমার সুদিন কি দুদিন আজও আমি ঠিক কবিয়া উঠিতে পারি নাই।

সে ছিল যেন একটা শিব শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। সে আমাকে দেখাইয়াছিল একটা বিদ্যাতের চমক্ যাহা একবার তীব্র আলো দিয়াই চির-অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়।

একটা বৎসরের মধ্যে একমাস বোধ হয় তাহার সঙ্গ-ছাড়া থাকি নাই, শুধু সে আসিলেই আমার সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ হইয়া উঠিত—ভাবিয়াছিলাম আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি, সম্পূর্ণ পাইয়াছি। কি ভুল! তাহাকে সম্পূর্ণ পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু একটুও বুঝি নাই। আজ যখন তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছি তখন তাহা হইতে কত দূরে!

তাহাব বিশেষত্ব ছিল তাহার অল্প কথা। এত কম কথা কহিতে আমি আর কাহাকেও শুনি নাই। আমরা দুজনে প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি চলিয়াছি, তাহার মুখে একটিও কথা নাই, আমিও যেন তাহার মৌনিতায় মুগ্ধ ও পূর্ণ হইয়া থাকিতাম, কথার অভাব বোধ করিতাম না।

সেদিন শনিবার, কলেজ সকাল-সকাল বন্ধ হইয়াছিল; বীরেনকে সেদিন ক্লাসে দেখি নাই। ছুটির পর মেসের বাসায় নিজের ঘরটিতে বসিয়া আছি, এমন সময় বীরেন

আসিয়া উপস্থিত। তাহার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আজ আমার মনে হইল যে তাহার চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক আছে যাহা আমি এতদিন লক্ষ্য করি নাই।

• সে আসিয়াই বলিল, “অশান্ত, এরকম পড়া-শুনার কোন সাথকতা আমি কিছুদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি না।”

আমার নাম ‘শান্ত’। কিন্তু আমার সকল-রকম খেলায় ও ব্যায়ামে দক্ষতা এবং মাপপিট করিবার স্পৃহা দেখিয়া সে নামটা একটু বদলাইয়া লইয়াছিল।

সে বলিল, “তাই আজ আমি চলেম।”

আমি আশ্চর্য হইয় জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে’থায়?”

সে তাহার কোকডান এক গোছা চল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল, “দেশে ঢাকা জেলায়।”

কেন জানি না আমি বকেব ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, দৃষ্টি নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি করবে?”

সে বলিল, “এখনো কিছু ঠিক করিনি।”

সে চলিয়া গেল।

২

ইহার পর এক বৎসর হইবে—হ্যা, ঠিক এক বৎসর, ঢাকায় একটা ফুটবল ‘ম্যাচে’ সন্দর্ভিক ভাবে মার খাইয়া খেলা শেষ হইবার পূর্বেই অতি কষ্টে মাঠ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, নাখাটা হঠাৎ কেমন ঘূবিয়া ওঠাতে পড়িয়া যাইতেছিলাম, দু’টি সবল বাহু আমাকে জড়াইয়া ধরিল—তাহা বীরেনের। ঠিক মনে পড়ে আমার মুখের উপর বীরেনের মুখ ঝাঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর আর মনে নাই, সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম।

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম বিপুল জনতা আমার চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে আর আমি বীরেনের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। জ্ঞান হইতেই উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, বীরেন শান্তেরে বলিল, “উঠো না—” উঠিলাম না, শুইয়া রহিলাম। খেলার সঙ্গীরা আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া বলিল আঘাত গুরুতর হইয়াছে, অতএব আমাকে ডাক্তারগণায় লইয়া যাওয়া দরকার।

বীরেন তাহাদিগকে বলিল যে সে আমার আত্মীয়, সেই-জন্ত সেব্যবস্থা সেই করিবে। ইহাতে কাহারও বিশেষ আপত্তি দেখা গেল না। অতি যত্নে গাড়ীতে তুলিয়া যখন সে আমাকে তাহার বাশায় লইয়া আসিল তখন রাত্রি চটা হইবে।

গাড়ী হইতে ছোট শিশুটির মত সে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। সে বলিষ্ঠ জানিতাম, কিন্তু সে যে এত বলিষ্ঠ সে ধারণা আমার ছিল না। আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, “আমি হেঁটে যেতে পারব।”

সে চিরকালই কম কথা কহে, আজও শুধু সংক্ষেপে বলিল, “না, তোমার পায়ে চোট লেগেছে।”

বারান্দা পার হইয়া বীরেন আমাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিতেই, একটি তরুণী বর্ষস্বর অতি নিকট হইতে আমার কানে গেল, “দাদা—”

তরুণী বর্ষস্বর আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না, কারণ, আমার মাথা বীরেনের কাপে ছিল, কিন্তু যাহা কানে গেল তাহা আমি কখন শুনি নাই—একটা বীণার যেন সাতটা তার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, একটা বাঁশীতে যেন উজ্জান-বহান সুর বাজিয়া গেল।

বিছানায় আসিয়া যখন বীরেন আমাকে শোয়াইয়া দিল তখন দেখিতে পাইলাম সেই তরুণীর মুখ, ১৫।১৬ বৎসরের একটি তরুণী বিস্মিত হইয়া আমার প্রতি চাহিয়া আছে। তাহার সেই দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি আজ এই মৃত্যুবন্ধারে আসিয়াও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, মৃত্যুর পরে যদি চোখ থাকে, দেখিব!

তাহার মুখে সৌন্দর্য ছিল নিশ্চয়, কিন্তু শুধু সূন্দর সে নয়, সে যে অপূর্ণ। তাহার বর্ণ উজ্জল নহে, শ্যাম নহে, তাহার বর্ণ পালিস্-করা সোনার উপর প্রতিফলিত বিদ্যুতের আলোর আভা। তাহার চোখ শুধু টানা নহে, শুধু বড় নহে, টানা বড় চোখ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতর অমন বিদ্যুতের আলো আর কোথাও দেখিতে পাই না।

বার বার তাহার কথা বলিতে গিয়া বিদ্যুতের কথা বলিতেছি—কারণ এই স্বদূরে সব অন্ধকার হইবার পূর্বে তাহাকে এক টকরা বিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই মনে হইতেছে

না। বিছাৎই বটে—যাহা আলো দিতে পারে—যাহা নিমেষে ধ্বংস করিতে পারে।

৩

কিছুক্ষণ পরেই খুব জোরে জ্বর আসিয়াছিল। তিন কিম্বা চার দিন জ্বরের ঘোরেই কাটিয়া গিয়াছিল, কিছু মনে নাই। যখন চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিবার এবং বুঝিবার ক্ষমতা হইল তখন প্রাতঃকাল। সে একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া টেবিলের নিকট কি করিতেছিল; আমার পাশ-ফেরার শব্দে ফিরিয়া দেখিল আমি চাহিয়া আছি। আমার ঠিক মনে পড়ে আমি তাহার সেই অদ্ভুত দুই চোখে একটা আনন্দের আভা খেলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম! বীরেন আসিয়া যবে ঢুকিল এবং আমাকে জাগরিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “অশান্ত, কেমন আছ?”

আমি ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, “ভাল আছি।”

বীরেন মুখ ফিরাইয়া বলিল, “চপল, অশান্তকে কিছু খেতে দে—”

চপল! চপলা! যে তাহার এই নাম রাখিয়াছিল, সে কি নখদর্পণে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দেখিয়া লইয়াছিল?

চপলা এক বাটি গরম দুধ লইয়া আমিল এবং বীরেন ‘ফিডিং কাপ’ করিয়া তাহা আশু আশু আমাকে পান করাইয়া দিল।

দুই চারি দিনের মধ্যে আমি অনেকটা সারিয়া উঠিলাম—তাহা যে-ডাক্তার দেখিতেছিল তাহার ঔষধের গুণে, না চপলার সেবার গুণে বলিতে পারি না।

সেদিন ভাত পথ্য করিয়াছি। চপলা আমাকে না ঘুমাইতে দিবার কত-রকম কন্দীই না বাহির করিতেছে—“আচ্ছা আপনার নাম ‘অশান্ত’ কে দিগেছিল? আপনার মা?—ভারি ছুটু ছিলেন বুঝি? তা বেশ বোঝা যায়—তা না হ’লে ফুটবল খেলতে এসে এমন মারামারি ক’রে বসেন?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “না না, মা আমার নাম ‘অশান্ত’ দেননি, বরং ‘শান্ত’ই দিগেছিলেন; কিন্তু তোমার ঐ দাদাটিই আমাকে ‘অশান্ত’ ক’রে তুলেছে।”

চপলা বলিল, “তা হোকগে—ঐ ‘অশান্ত’ই বেশ, আমার অশান্ত লোককে ভারি ভাল লাগে।”

আমার মুখ চোখ বোধ হয় মুহূর্তের জন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চপলা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, “চিরকাল শান্ত, পা গুনে গুনে চলে, চারিদিক না ভেবে কাজ করে না—এইরকম লোক দেখলে আমার ঘেন্না হয়। যে জিনিষটা মানুষকে মানুষ ক’রে তোলে, তাদের মধ্যে তা নেই, তারা গাছ-পাথরের সামিল।”

চপলার চোখ দুটা যেন চক্চক করিয়া উঠিল। ১৯১৬ বৎসরের বালিকার মুখে এরকম কথা কখন শুনি নাই—কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

চপলা বোধ হয় আমার এই অভিভূত ভাবটা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই ও-প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্ত বলিল, “আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন?”

আমি বলিলাম, “কেউ নেই—মা বাবা বহুদিন মাঝে গেছেন—এক দাদা আছেন, তিনি বর্ষায় থাকেন—”

চপলা কতকটা নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, “ঠিক আমাদেরই মত।”

এমন সময় বীরেন একখানা চিঠি-হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “চপল, আমি বোধ হয় দিন কতকের জন্ত বাইবে যাচ্ছি—”

চপলা কোন কথা বলিল না।

আমি অনুসন্ধিৎসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায় যাচ্ছ?”

বীরেন বলিল, “কিছু দূরে।”

আমি জেদ্ করিয়া বলিলাম, “তবুও—”

বীরেন শান্তস্বরে বলিল, “সে জায়গা ভূমি জান না—নাম শুন্দেও বুঝতে পারবে না—আসায়ের কাছাকাছি।”

তাহার গভীর মুখ লক্ষ্য করিয়া আমি আর কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না, শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, “কবে ফিরবে?”

পূর্ববৎ শান্তভাবে সে বলিল, “কিছু ঠিক নেই।

তবে ১৫ দিনের মধ্যে নয়। তুমি ভাল করে' না সেরে যেন যেও না—অন্ততঃ আমি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করো।”

বীরেনের যাওয়ার কথা শুনিয়া অবধি আমি নিজের যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলাম এবং মনের কোণে একটা অজ্ঞাত ব্যথাও অনুভব করিতেছিলাম। বীরেনের অসুস্থস্থিতিতে আমার আর যে তথ্য থাকা উচিত নহে তাহার নিঃসন্দ্বিগ্ন কারণ চপলা এবং একটি বৃদ্ধা দাসী ছাড়া আর বাড়ীতে কেহ ছিল না। কিন্তু বীরেনের শেষের কথাটায় আমার মনের কোণ হইতে অজ্ঞাত ব্যথাটা যেমন যাহুমন্ত্র-বলে সরিয়া গেল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সারা মনটা তাহার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। এ লোকটা কি দেবতা! তাহা না হইলে বন্ধুর প্রতি ইহার এত বিশ্বাস!

সেদিন ঐরকমই ভাবিয়াছিলাম, পরে কিন্তু অল্প-রকম ভাবিয়াছি। সেদিন সে তাহার বন্ধুকে বিশ্বাস করে নাই—করিয়াছিল তাহার ভগ্নীকে।

মনের মধ্যে নানারকম তোলপাড় করিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম বীরেন বাহির হইয়া যাইতেছে। আমি ডাকিয়া বলিলাম, “বীরেন, আমি বেশ সেরে উঠেছি, এইবার আমিও যাই—”

বীরেন, “পাগল হয়েছ, এখনও তুমি খুব দুর্বল” বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি নিজেকে না দেখিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেছিলাম, যে, আমার মুখের ছবিতে বিপন্ন ভাব স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। চপলার চোখ যেন কৌতুকে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। তাহার ওষ্ঠে চাপাহাসির খেলা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার চাপাহাসিতে তাহার চোখের চাহনিত্তে আমার সারা মনে যেন আগুন ধরিয়া গেল। আমার মনে তখন কি হইতেছিল জানি না, আমি বলিয়া ফেলিলাম, “চপলা, তুমি কি চাও না যে আমি এখান থেকে যাই?” হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মরিয়া গেলাম, কিন্তু সে লজ্জা আমার দ্বিগুণ হইল চপলার উত্তরে।

চপলা খুব সাধারণভাবে বলিল, “কল্প লোককে কে

উত্তরটা যেন আমার পিঠে চাবুক মারিয়া আমাকে সজাগ করিয়া দিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা আমার উচিত নহে। সেইজন্য বলিলাম, “আমি বেশ সেরে উঠেছি—তা ছাড়া আমার বাড়ী যাওয়াও একবার নিতান্ত দরকার। তোমার দাদাকে একবার ডাকো, আমি বুঝিয়ে বলি।”

চপলা বলিল, “দাদা চ'লে গেছেন।”

আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, “চ'লে গেছে! কখন?”

“এই যে একটু আগেই গেলেন—যাই আপনাকে ওমুখ দিই” বলিয়া চপলা উঠিয়া গেল।

আমি হতবুদ্ধির মত চূপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিলাম। অত বড় বাড়ীটাতে আমি আর চপলা! কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

৪

আজ এই মৃত্যুর সাম্না-সাম্নি দাঁড়াইয়া আমি নিজেকে নিজেকে প্রশ্ন করিতেছি, যে, যে-নারী আমার সমস্ত জীবনটা এমন বিরস করিয়া আমাকে এমন ঘৃণিত মৃত্যুর মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাকে কি আজও আমি ভালবাসি?—বলিতে পারি না—আমার এ পোড়া মন এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েও ত স্পষ্টভাবে “না” বলিতে পারিতেছে না। এখন যদি কোন যাহুমন্ত্রবলে এই লৌহ-কারাগার বিবাহ-বাসরে পরিণত হয়, আর সেই নারী ফুলের মালা হাতে লইয়া আমাকে বরণ করিতে আসে, তাহা হইলে আমি কি তাহাকে প্রত্যাখান করিব? এ-সব আমি কী ভাবিতেছি! পাগল হইলাম নাকি—যাহা লিখিতে বসিয়াছি তাহা যে আমাকে শেষ করিতে হইবে, পাগল হইলে চলবে না ত!

ইয়া, বীরেন সেদিন চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার দিন তিন-চার পরে চপলা একখানা দৈনিক সংবাদপত্র আমার হাতে দিয়া বলিল, “ঘুমুবেন না, পড়ুন—”

সেই সময়টা “স্বদেশীর” সময়। সারা বাংলা দেশটা তখন কিসের একটা উন্মাদনায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। ঢাকাবিটা ‘বোম্বেসের’ বিবরণ সে-দিনের কাগজটায়

ছিল। আমি কাগজটায় একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম চপলা একটা চেয়ারের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। চোখ তুলিতেই সে বলিল, “এরাই মানুষ, কি বলুন!”

আমি আর কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম। চপলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, “আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন এরা ভুল করছে?”

আমি যে কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ এসব কথা আমি কখন ভাবি নাই। সেইজন্য কোন-রকমে বলিলাম,—“ই্যা, তা ভুলই বা কেমন ক’রে বলি—”

চপলা আমার কথায় মনোযোগ না দিয়া নিজেই বলিয়া চলিল, “হয়ত ভুল করছে—হয়ত করছে না, কিন্তু তারা কাজ করছে, তারা চুপ ক’রে বসে নেই। যদি ভুলই হয় তা হ’লেও তারা ভুল কাজ ক’রে ঠিক কাজের রাস্তা তৈরী করছে।”

আমি বিস্মিত হইয়া শুনিতেছিলাম আর ভাবিতে-ছিলাম এই ১৫১৬ বৎসরের কিশোরী এ-কী এসব বলিতেছে!

আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া চপলা অল্প একটু হাসিয়া বলিল, “আপনার নাম ‘অশাস্ত’ হ’লেও আপনার ভিতরটা ভারি ‘শাস্ত’, না?”

আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম, “কেন বল ত?”

চপলার ওষ্ঠে তখনও একটু হাসির রেখা প্রভাতের প্রথম কিরণের মত লাগিয়াছিল; সে বলিল, “এই-রকমই আমার মনে হয়।”

তাহার ওষ্ঠের আবেশময় মৃদু হাসি, তাহার মুখের অল্পময় সৌন্দর্য্য, তাহার অদ্ভুত চক্ষু আমার মনে তখন বিপ্লব বাধাইয়া তুলিয়াছিল আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতে-ছিলাম, হঠাৎ আমার মুখ দিয়া আমার মনের কথা অক্ষুট স্বরে বাহির হইয়া আগিল, “চপলা, তুমি বড় সুন্দর!”

একটা খুব মৃদু কম্পন তাহার সমস্ত দেহটা আলোড়িত করিয়া গেল, একটু গোলাপী রঙের আভা গণ্ডে না ফুটিতে ফুটিতেই মিলাইয়া গেল। এক মুহূর্ত পরেই খুবই সাধারণ কথার মত সে বলিল, “লোকে

তাই বলে বটে।” তার পর চেয়ারটা ছাড়িয়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবা মাত্র আমার আবেশ ভাঙিয়া মনটা সজাগ হইয়া উঠিল এবং আমার সমস্ত মুখটা প্রথমে লজ্জায় লাল তাহার পর নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণায় কালো হইয়া গেল। মনে মনে, বলিলাম—“আর নয়, আজই শেষ। আজই আমাকে এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে—” আমি ঠিক জানিতাম চপলা ঘৃণায় আমার সম্মুখে আজ আর আসিবে না - অতএব আমাকে নিজে গিয়াই আমার বিদায়ের সংবাদটা দিতে হইবে।

কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চপলা আমার ঘরে আসিয়া পূর্বের সেই চেয়ারটা অধিকার করিয়া বসিল এবং আমার মুখের প্রতি অসঙ্কোচে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “কি ভাব্চেন।”

আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলিলাম, “তেমন কিছু নয়।”

চপলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে হাসি নয়, যেন একটা প্রাণ-মাতান গান, যেন রূপার পেয়ালায় সোনার কাঠির আঘাতের শব্দ।

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, “তেমন কিছু নয় বল্ছেন, কিন্তু আমি জানি বেশ একটু ‘তেমন কিছু’। কি ভাব্চেন বল্?”

আমি শঙ্কিতস্বরে বলিলাম, “কি?”

সে আর-একবার হাসির লহর তুলিয়া বলিল, “ভাব্চেন ‘ভারি অন্তায় হ’য়ে গেছে, আজই চ’লে যাব’ কেমন, না? সেটি কিন্তু হবে না। চলে যাওয়া, সে দাদা আসার পর—” তাহার পর একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, “আর অন্তায়ই বা কি হয়েছে বলুন? সুন্দরকে সুন্দর বলতে পাবেন না? ফুলের বেলা পাখীর বেলা বুঝি কিছু দোষ হয় না, যত দোষ মানুষের বেলা।”

আমার মনের অবস্থাটা বর্ণনা করিতে চেষ্টা না করাই ভাল।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, “দেখুন, এই যে রাস্তাটা আমাদের বাড়ীর সামনে দিঘে

গিয়েছে, এটা বেশ নির্জন। আমরা ওবেলা ওটা দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসব, কি বলুন? আপনার একটু একটু বেড়ান দরকার হয়েছে। যাই আপনার দুখটা হ'ল কিনা দেখি।”

সে চলিয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই অদ্ভুত কিশোরীর কথা। একি মায়াবিনী! কুহক জানে?

৫

সেদিনের কথাটা খুব স্পষ্ট মনে আছে। সেই দিনই সেখানকার শেষ দিন কিনা।

রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম; চপলাও পাশে পাশে চলিয়াছিল। অনেকক্ষণ মিশ্রণে কাটিতেছিল। চপলা নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, “চলুন ফেরা যাক। আপনি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।”

আমি বলিলাম, “না, ক্লান্ত হইনি—চলো আর-একটু এগুনো যাক।”

চপলা যেন একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না—না, বেশী বেড়ান আপনার ভাল নয়। আর এগুনো হবে না।”

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, “আচ্ছা চলো, ফেরা যাক। কিন্তু আমার স্বহতার সঙ্গকে তোমার দাবী যেন সবচেয়ে বেশী।”

চপলার গণ্ড কপোল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে কিন্তু যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে বলিল, “আপনি দাদার অস্বস্থ বন্ধু কিনা?”

আজ কিন্তু এ কথা আমাকে ততটা লজ্জা দিতে পারিল না। আজ যেন আমার সব কথা বলিবার দিন। আজ আমার সাহস দুর্জয়। আমি বলিলাম “শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই কি—”

কথাটা শেষ করিবার পূর্বে চপলা বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “ঐ দেখুন, মেঘ ক'রে আসছে, চলুন চলুন শীগ্গির ফেরা যাক—”

সেদিন সেই বর্ষার সন্ধ্যাও যেন আমার কাছে স্বপ্নময় রঙীন বসন্তের সন্ধ্যার মত মনে হইতে লাগিল। প্রাণের সেই ভিজা বাতাসেও যেন কিসের একটা

মাদকতা অনুভব করিতে লাগিলাম। আজ সমস্ত প্রকৃতি যেন সিরাজীর পেয়ালায় চুমুক দিয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছে। শিরা-উপশিরার প্রত্যেক রক্তবিন্দু যেন হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, পাইয়াছি! পাইয়াছি!! আবিষ্টের মত বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রে আহারের সময় দেখিলাম চপলাও যেন এক মধুর-মোহে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার চোখেও যেন গোলাপী নেশার আমেজ! কি সুন্দর সলজ্জ মুগ্ধ দৃষ্টি!

হায়! আমাব এ স্বপ্ন যদি একটি দিনও স্থায়ী হইত! চিরজীবন চাহি না, সেই এক দিনের জন্ত যে আমি চির-জীবন বিনিময় করিতে পারিতাম! কিন্তু না—একটি সম্পূর্ণ দিনও না, প্রভাত হইবার পূর্বেই যে আমার স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাঙিল!

রাত্রি ১২টা কি ১টা হইবে, মোহময় আবেশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমার ঘরের যে ছোট জানালাটা চপলার ঘরের দিকে ছিল সেটা অল্প একটু খোলা ছিল, তাহা দিয়া দেখিলাম চপলার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। চপলা কাহার সঙ্গে যেন মূঢ় কথাবার্তা করিতেছে। যাহার সহিত কথা করিতেছিল তাহার স্বর একবার কানে গেল—এ স্বর যে পুরুষের! একটা ঝাঁকানি খাইয়া যেন মোহ ছুটিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম, শিষ্টাচার ভুলিয়া সস্তর্পণে চোরের গায় জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, একটি তরুণ যুবক ১৮-১৯ বৎসর বয়স হইবে, চপলার বিছানায় বসিয়া আছে—চপলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আর দেখিতে পারিলাম না—বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। সেই পুরাতন উপমাটা মনে পড়িল “ফুলের মধ্যে কীট”।

আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিলাম। সমস্ত চৈতন্য যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পাশের ঘরের কথাবার্তা আর কানে ঢুকিতেছিল না। মূঢ় অথচ অসহ্য একটা যন্ত্রণা সমস্ত বুকটা যেন ভাঙিয়া দিতেছিল। এইরকমভাবে কতক্ষণ পড়িয়া ছিলাম জানি না। দ্বারের উপর মূঢ় করাঘাতে চৈতন্য যেন ফিরিয়া আসিল। উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে?”

উত্তর হইল, “আমি চপলা, দোরটা খুলুন ত।”

কি যেন একটা ফিরিয়া পাইবার আশায় তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম চপলা আলো-হাতে দাঁড়াইয়া আছে—সেই অতুল সৌন্দর্য্য, সেই অতুলনীয় দৃষ্টি। “আম্বন আমার ঘরে” বলিয়া সে আলো লইয়া অগ্রসর হইল। আমি মস্তমুগ্ধের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। হঠাৎ মনে হইল, “এ কী করিতেছি! এই গভীর রাত্রে এক নারীর শয়নকক্ষে চলিয়াছি, যে নারীর দুষ্কৃতির ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা এই মাত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।” ভাবিলাম ফিরিয়া যাই—কিন্তু ততক্ষণে চপলাব শয়নকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম।

টেবিলের উপর আলোটা রাখিয়া চপলা এক পার্শ্বে শির নত করিয়া দাঁড়াইয়া বহিল। আমিও অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বহিলাম। এক মিনিট দু’মিনিট করিয়া প্রায় পাঁচমিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

আমি অবৈষ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাকে এখানে ডাকলে কেন?”

তু’ এক মুহূর্ত্ত সে কোনও কথা কহিল না, তাহাব পব শির নত করিয়া খুব ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি আমাকে ভালবাসেন?”

অন্য সময় হইলে এই অবস্থায় এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর দিতাম জানি না; কিন্তু আজ নাকি কিছু পূর্বে বড় আঘাত পাইয়াছিলাম, তাই তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলাম, “না, কোনদিন না!”

এই কথায় চপলা শির উন্নত করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার চক্ষু বিষ্ময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এ উত্তর বুঝি সে কোন দিনই আশা করে নাই। তাহার চোখ হঠাৎ ধারাল ছুরির মত চক্চক্ করিয়া উঠিল—সে তাহার দৃষ্টি একবার ঘরের চতুর্দিকে ফিরাইয়া লইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল ঈষৎ উন্মুক্ত সেই জানালাটার দিকে। তু’ এক মুহূর্ত্ত সেই দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সে যখন দৃষ্টি ফিরাইল তখন তাহাব ওষ্ঠে একটু মুহূ হাসির রেখা লাগিয়া আছে। আমার দিকে তাহার সেই অতুলনীয় চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া সে ঈষৎ হাসির সহিত বলিল, “সে আমার দাদা।”

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “দাদা!—কে বীরেন?”

“না, তাঁর ছোট, ধীরেন।”

“কই তাঁকে ত আমি—”

“না দেগেননি। সব বল্ছি। কিন্তু তার পূর্বে আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিন।”

যে মোহময় আবেশটা এতক্ষণ ছুটিয়া গিয়াছিল সেটা আবার আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমি বলিলাম, “তোমাব অন্তমান ঠিক।”

ক্ষীণ হাসির একটা রেখা চপলাব ওষ্ঠে বিকশিত হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। সেও মস্তক নত করিয়া বলিল, “আমার হৃদয়ের কথা না বল্লেও বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়।”

সেদিন ঐ কথায় আমাব সমস্ত শরীরটা একটা পুলকের শিহরণে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিসের যেন একটা কুহকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আজ মনে হইতেছে কুমাৰীব প্রথম-প্রণয়-প্রকাশের ধ্বংসটা বুঝি ঠিক ওরূপ নয়। তাহার কণ্ঠস্বর সে সময় অত স্পষ্ট সতেজ হওয়া যেন একটু কি বকম! যাক্ সে কথা, তু’জ্বনেই স্থান কাল ভুলিয়া নিজেব অন্তরের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছিলাম। মিনিট পাঁচ পবে চপলা বলিল, “আমরা যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাতে কণ্ঠাপণ দিতে হয় জানেন ত?”

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, “জানি। কেন?”

সে বলিল, “আমারও একটা পণ আছে, সে পণ আপনাকে দিতে হবে।”

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “কি পণ?”

চপলা আমাব চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, “বল্ছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে সে পণ আপনি জীবন পণ ক’রেও দেবেন।”

আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। আমার নিকট এ কি এমন পণ চায় যাহার জন্ম পূর্বে হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইতেছে। মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় চপলা ধীরে ধীরে আমার কাছে সরিয়া আসিয়া আমার একটা হাত ধরিয়া বলিল, “ভয় পাচ্ছ। ছিঃ! তুমি ‘অশান্ত’ না!”

এই তাহার প্রথম স্পর্শ। সে স্পর্শে সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিষা গেল। আমি যন্ত্র-চালিতের ছায় বলিলাম, “ভয় কিসের? প্রতিজ্ঞা করুনাম।”

চপলা ধীরগন্তীরভাবে বলিল, “ঈশ্বর সাক্ষী— প্রতিজ্ঞা করুন।”

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, “ঈশ্বর সাক্ষী, প্রতিজ্ঞা করুনাম।”

চপলা সেই ঘরের কোণে বসান ছোট একটা আলমারী খুলিয়া কি একটা বাহির করিয়া আনিল এবং আমার চোখের সামনে ধরিয়া বলিল, “এটা কি জান ত?”

কি সর্কনাশ! একটা পিস্তল!

আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, “এটা কি হবে?”

চপলা দৃঢ়ভাবে বলিল, “এটা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে!”

আমি প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আমাকে?”

চপলা ঠিক তোনি প্রশান্তভাবে বলিল, “তোমাকে। এটা চালাতে জান ত? এই দেখ এইরকমভাবে চালায়।”

সে বোড়া ফেলিয়া চাল-ইবার কৌশল দেখাইয়া দিল। তাহার পর আমার একটা হাত ধরিয়া খাটের উপর বসাইয়া নিজে পাশে বসিল; অভিজ্ঞতের মত বসিয়া রহিলাম। চপলা বলিল, “সব শোন! আজকাল যারা বোমাওঘালাদের ঘড়যন্ত্রে আছে, আমার দু'ভাই তাদের দুজন। দাদা আসামের ছোটলাটকে খুন করতে গিয়েছিলেন, ধরা পড়েছেন। তোমাকে সেই কাজ করতে হবে। একজন মৈত্র মরলে তার জায়গায় আর-একজন দাঁড়ায়—দু'ভাইয়েব নিয়মই এই। ছোড়া এর চেয়ে আরো দুরকারী কাজে লিপ্ত আছে, তার প্রাণও স্মৃতোর উপর ঝুলছে, তাই তোমাকে প্রয়োজন হয়েছে।”

শুনিতো শুনিতো দু'টিম বার গিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। উঃ কি ভয়ানক! আমাকেও ইহার মধ্যে যাইতে হইবে পিস্তল হাতে করিয়া খুন করিতে—। মাথা গোলমাল হইয়া গেল। আর যেন কিছু ধারণা করিতে পারিতো-ছিলাম না। শুধু মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া শিরশির

করিয়া কি একটা ওঠা-নামা করিতেছিল। চপলা আমার হাতে পিস্তলটা দিয়া তাহার সেই সুন্দর বাহু দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “যাও, ভয় কি? তুমি ‘অশাস্ত’, আজ সত্যই অশাস্ত হ'য়ে ওঠ, উদ্দাম ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাও! যায় যাবে প্রাণ—প্রাণ ক'দিনের? সেই প্রাণের মায়া করুছ যা রোজ বুটের তলায় পেশা যাচ্ছে? বাচতে যদি হয় তবে মানুষের মত—আর মরতে যদি হয় তাও মানুষের মত—বীরের মত। আমার মিলন হবে মানুষের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে নয়। ইংরেজের ফাঁসি-কাঠে যদি তোমার প্রাণ যায় তবে পরপারে অপেক্ষা কোরো। আমিও ফাঁসি-কাঠে গলা দিয়ে তোমার কাছে যাব। যে দড়ি তোমার গলা আলিঙ্গন করবে সে দড়ি আমার গলার হার হবে। যাও প্রিয়তম, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি জানিনে— হয় ত এই আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।”

চপলা নিবিড়ভাবে আমাকে চুষন করিল। সে চুষনে যে কি মদিরা ছিল জানি না, মাতাল হইলাম, পাগল হইলাম!

সেই রাত্রেই আবশ্যিক জিনিসপত্র লইয়া ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম।—

* * * *

আর বেশী বলিবার নাই।

ধরা পড়িলাম পাড়ীতেই। বিচারে শাস্তি হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। যখন মাতৃভূমির নিকট শেষ বিদায় লইয়া জাহাজে উঠি তখন ভীড়ের মধ্যে চকিতের মত একটি তরুণীর দীপ্ত মুখ দেখিয়াছিলাম—তাহা চপলার।

ভাবিয়াছিলাম এই মুখের ছবি সম্বল করিয়া ২০ বৎসর কাটাইয়া দিব। কিন্তু কী ভুল! চার বৎসরও অতীত হয় নাই, সে ছবি এই মরুভূমির মাঝে কোথায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। এই ২৬ বৎসর বয়সেই জীবন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে—আর যন্ত্রণা-অত্যাচার সহিতে পারি না, আজই আমার জীবনের শেষ রাত্রি।

প্রকাশকের কথা

যাহার কাহিনী আমি প্রকাশ করিলাম তিনি যেদিন আত্মহত্যা করেন তাহার পরদিনই আমি সেই কক্ষে নীত হই এবং একটি অন্ধকার কোণে একতাড়া কাগজের

বাণিল কুড়াইয়া পাই, তাহাতে উপরে লিখিত কাহিনীটি ছিল।

আজ আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেশে আসিয়া কৌতূহলের বশে চপলার খোঁজ লইয়াছিলাম।

শুনলাম, বহুদিন যাবৎ সে নিরুদ্দেশ। কেহ বলে সে আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ বলে সে পাগল হইয়া গিয়াছে।

শ্রী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

মায়ের ছেলে

এক

টাইগ্রীসের বৃকে কালো জলের ক্ষীণ আর্কনাদ—আকাশে কালো মেঘের মাতামাতি—পৃথিবীর বৃকে ঝড় উঠিবে।

চারিদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ট্রেঞ্চ বা পগার, তার পর কাঁটার বেড়া; এর মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্যদের শতাধিক শিবির, শিবিরের মধ্যে সহস্র তুরগ বাঙ্গালী নিদ্রিত।

কোয়াটার-গার্ডের চারিদিকে ১০ জন সশস্ত্র শাস্ত্রী ঘুরিতেছে—গায়ে তাহাদের কালো রংএর লম্বা কোট, স্কন্ধে টোটাভরা রাইফল—যেন অন্ধকারের মুর্তিমান বিদ্রোহী পুত্র। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিল—আকাশে মেঘ ডাকিল—কিন্তু সে গর্জন যেমনি গম্ভীর তেমনি নিস্তেজ, দুইদিকের বৃষ্টিভেজা লাল আলো দুইটা মাতালের চোখের ঘোলাটে চাহনিতে সহস্র রাইফলের উপর পাণ্ডুর দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছিল।

অসীম ঘুরিতেছে—তাহার কত কথা মনে হইতেছিল। গ্রামের স্কুল হইতে পাস্ করিয়া সে কলিকাতায় আসে। কথা সে চিরকালই খুব কম কাহিত—কিন্তু ভাবিতে পারিত সে খুব। বাঙ্গালী-জীবনের এই ক্রমবর্ধিষ্ণু আলস্য যুগযুগান্তরব্যাপী পাষণ্ডতুল্য জড়তা,—এর বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। এক মায়ের এক ছেলে সে—কিন্তু তাহার মারও যিনি মা সেই ভারতমাতার আস্থান তার কানে পৌঁছিয়াছিল—তাই একদিন কাহাকেও না জানাইয়া সে করাচির জাহাজে উঠিয়াছিল।

আজ সে ভাবিতেছিল বাংলার ছায়া-স্বশীতল পাড়াগাঁয়ের কথা। আজ এই অন্ধকারের মাঝখানে

দাঁড়াইয়া অতীতের সহস্র স্মৃতিতে সে জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। কি ভাবিয়া সে আসিয়াছিল—আর বাংলার তথাকথিত ভদ্রসমাজের যে পরিচয় দিনে দিনে সে এইখানে পাইতেছিল তা বাস্তবিকই শোচনীয়।

বৃষ্টি তেমনই অলস-মসৃণভাবে পড়িতেছে—নজ্জ তেমনি তন্দ্রালুভাবে ডাকিতেছে—বাংলায় কিন্তু ৬ মনটি হয় না—বৃষ্টি পড়ে তো অনর্গলভাবে ধরার বৃক ভাসাইয়া ঝর্ণা-নদী ছুটাইয়া পড়ে—বজ্র ডাকে তো আকাশের বৃক ভাঙিয়া চুরিয়া চৌচির করিয়া ডাকে। বোথায় বাংলা—কোথায় তুকীস্থানের এই বৃক্ষলতাহীন অন্ধকারময় শিবির-প্রাঙ্গণ!

হঠাৎ অসীম থম্কিয়া দাঁড়াইল। বহুদূরে ছায়ার মত তিন-চারিটা মছুমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্তমধ্যে সেফ্টি-কেস্ খুলিয়া জলদগম্ভীর স্বরে হাঁকিল—হু কাম্‌স্ দেয়ার—হল্‌ট্! কিন্তু তার পরেই আর কিছু নাই—স্কন্ধের বন্দুক স্কন্ধে আসিল—অসীম ডাবিল চোখের ধাঁধা। আবার ডাবিল—গুলি না করা অত্যাঘ হইয়াছে—সৈনিকের কাজ কর্তব্যাপালন করা—সেই অশরীরী ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করিয়াই বন্দুক ছোড়া উচিত ছিল।

বৃষ্টি একটু বেশী করিয়া নামিল—অসীম আরো বেশী সতর্ক হইল, কারণ তাহার ঘুম পাইতেছিল। চারিদিকে শত্রুর আড্ডা, এমন রাত্রিটা বে তাহারা হেলায় নষ্ট করিবে এমন মনে হইল না। অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হইয়া সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের কানায় কানায় চাপিয়া বসিল।

হঠাৎ সেই নেশ অন্ধকার মথিত করিয়া চারিবার রাইফলের শব্দ হইল—মুহূর্তমধ্যে বিউগল্ বাজিয়া

উঠিল—চারিদিকে হৈ চৈ পড়িল—বুট পড়ি পরার ধুম। শত্রু আসিয়াছে—সকলের প্রাণ একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল—বুকের নীচে রক্ত যেন লাফাইয়া উঠিল। অসীম কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল—কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। রাত্রিশেষের সেই উচ্ছ্বল মাতাল বায়ু যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল—এ যুদ্ধের আহ্বান নয়।

ছই

রাত্রি তখনও ভোর হয় নাই। বৃষ্টি তেমনই পড়িতেছে, অন্ধকার তেমনই মুখ বুজিয়া আছে, আর প্রকৃতির এই আকুটি-কুটিল চোখের নীচে দাঁড়াইয়া সহস্র বাঙ্গালী যুবক। প্রত্যেকের হাতে রাইফল্, কিন্তু কারো মুখে উৎসাহ নাই। নিহিত স্বেদাধারের মৃতদেহ আনীত হইল। যাহারা যুদ্ধস্থলে শত শত প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে তাহারাজ আজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দর্শনে শিহরিয়া উঠিল। রক্তে সমস্ত দেহ একেবারে মাখা, বুকের পাজর উড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সকলে দাঁড়াইয়া রহিল।

একে একে প্রত্যেকের রাইফল্ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সকল অস্ত্রই একেবারে ঝকঝকে, কোথাও একটু দাগ নাই—নলী সম্পূর্ণ পরিষ্কার। সকলের মনই একবার ভয়ে চমকিয়া উঠিল, হয়ত এখনই সদ্যানিহত স্বেদাধারের আততায়ী ধরা পড়িবে। কিন্তু সকলের বন্দুকই পরীক্ষা করা হইল।

পূর্বাগনে প্রভাতের অক্ষুট চাপা আলোক দেখা দিল। সে প্রভাত যেমনই কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর। সমস্ত আকাশময় পুঞ্জীভূত কালো মেঘের ছড়াছড়ি—মাঝে মাঝে ঘোলাটে সাদা মেঘে সে কালীর উপর যেন চুন লেপিয়াছে। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—চারিদিকে অসম্ভবরকমের বিকট স্তব্ধতা। সূর্যের একটি রশ্মিও সে মেঘজাল ভেদ করিয়া বাহির হয় নাই। মুহূর্ত্ত-মধ্যে যেন প্রকৃতির বীভৎস নিস্তব্ধতা সহস্র গজ্জনে ভাঙিয়া চুরিয়া চতুর্দিকে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িবে। সহস্র বাঙ্গালী যুবক সেদিন একস্থানে দাঁড়াইয়া সেই দুর্ঘ্যোগময়ী নিশা যাপন করিল।

প্রভাতে স্বেদাধার-মেজর আসিলেন—সকলে অভ্যাস-মত আজও সম্মত হইয়া দাঁড়াইল। তিনি অতিশয় গভীরভাবে বলিলেন—কে এ-কাজ করিয়াছ বলো—সৈন্য-বিভাগে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নাই। শত্রুর গুপ্তচরের এ-কাজ নয়—এ-কাজ তোমাদের—বলো, কে, বা কাহারো সৈনিকের অল্পযুক্ত এ জঘন্য নীচ কার্যে সংশ্লিষ্ট ছিলে।

সকলে নিকাক্—একটু শব্দ নাই—একটু চাঞ্চল্য নাই। দেখিতে দেখিতে ক্যাপ্টেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছকুম হইল—যতক্ষণ না দোষী আত্মসমর্পণ করে ততক্ষণ সকলকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে—অনাহারে অনিদ্রায়—বাড়ে জলে, নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। আর এক সপ্তাহমধ্যে অপরাধী বাহির না হইলে সমস্ত রেজিমেণ্ট্ দ্বীপান্তরে নিক্ষেপিত হইবে।

সকলের হৃদয় চমকিয়া উঠিল—শেষ আদেশ শুনিয়া। চোখে চোখে একবার আগুন খেলিল—বাংলার কথা মনে হইল—মা বাবা ভাই বোনের কথা মনে হইল।

সমস্ত দিন চলিয়া গেল। বিকালে আকাশে অস্তগামী সূর্যের একটু ক্ষীণ আভা দেখা দিল। সে আভা যেন মুমূর্ষুর মুখের হাসির মত—পরক্ষণেই আবার গভীর আঁধারে বিলীন হইল। কিছুতেই কিছু হইল না—শত ভয় প্রদর্শন—শত অত্মনয়—কিছুতেই দোষী বাহির হইল না।

এড্ জুট্যান্ট্ যিনি ছিলেন তাঁহার মাথায় এক নূতন বুদ্ধি আসিল—বাঙ্গালীর ধাত তিনি জানিতেন—বাঙ্গালী-প্রাণের কোমল অংশটুকু তিনি ভাল বুঝিতেন, তাই নিজে আসিয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—বাংলা মায়ের বীর পুত্রগণ! তোমরা বাংলা দেশকে ভালবাস—৪২ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনকে ভালবাস। বাংলার ছেলে তোমরা—ছুধের সঙ্গে তোমরা “জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী” বাণী কণ্ঠস্থ করিয়াছ—বাংলা মায়ের বহু বছরের গ্লানি তোমরা ঘুচাইতে এখানে আসিয়াছ। আমার কথা শোন—ভাব—কি কাজ করিতে তোমরা আজ বসিয়াছ। সাতের বলিয়াছেন সময় পল্টন

নির্ধারিত হইবে। সে কি ভীষণ জিনিস তোমরা জান না—তোমরা দেখ নাই। তোমাদের হাত হইতে ঐ রাইফ্ল্ কাড়িয়া লওয়া হইবে—তোমাদের পাশে ঐ সঙ্গী আর ঝুলিবে না—জগতের পৃষ্ঠ হইতে এক মুহূর্তে—একটি আদেশে ৪২ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনের নাম উঠিয়া যাইবে—লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া বলিবে বাঙ্গালী সৈন্য হইবার অনুপযোগী—ঐ এত খৃষ্টাব্দে তাহাকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে দেওয়া হইয়াছিল আর সে তাহার প্রাপ্ত ক্ষমতার একরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।—

সমস্ত রাত্রির জাগরণজনিত ক্লেশে প্রত্যেকের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল—সমস্ত দিন কাহাবো মুখে এক ফোঁটা জল পড়ে নাই। কিন্তু এ বক্তৃতা যেন সকলেব প্রাণে অগ্নিমদিরা ঢালিল—উদ্গ্রীব হইয়া সকলে সেই বাণী শুনিতে লাগিল।

সকলের চেয়ে একটি প্রাণে বেশী আলোড়ন উপস্থিত হইল। তাহঁতো মায়ের ছেলে সে—মায়ের সম্মান রক্ষা করিতে একটা প্রাণ কি এতই মূল্যবান—সমস্ত পল্টনকে ছরপনেয় কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কি সে তাহার একবারের জীবন দিতে পাবে না। সে কি আজ সেই আততায়ীদের সব কলঙ্কভার নিজের স্কন্ধে লইবে না?

এড জুট্যান্ট্ বুঝিলেন ফল হইয়াছে—তাহার বক্তৃতাতে কাজ হইবে—বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি—তাহাকে ভাবিতে দেওয়া হউক।

কিয়ৎকাল পরে আবার আরম্ভ করিলেন—আর একটা কথা তোমরা মনে রাখিও। যে কলঙ্কের মসীলেপ তোমরা আজ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় করিয়া যাইতেছ তাহা তোমাদের বংশধরগণ শত চেষ্টাতেও ক্ষালন করিতে পারিবে না। সৈনিক তোমরা—বীর তোমরা—প্রাণ তো তোমাদের একটা খেলার জিনিস। একটা গুলির আঘাত—একটা সঙ্গীনের খোঁচা এর মূল্য—এর জন্ত এত। যে-বা যাহারা এ-কাজ করিয়াছে—হয়ত কোন মহান উদ্দেশ্যেই করিয়াছে—কিন্তু এই কার্য গোপন করিবার অভিলাষে

তাহাদের সে মহত্ব ঢাকিয়া যাইবে—এ যেন মনে থাকে—একটা জীবন তো—দেশের জন্ত তো তাহা উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছ। আজ যদি আমার স্বীকার-উক্তি সমস্ত পল্টন রক্ষা পাইত আমি হাসিমুখে তাহা করিতাম—এ মৃত্যু লোভনীয়, এ মৃত্যুর ইতিহাস বাংলার প্রাণে আগুনের অক্ষরে লেখা থাকিবে—স্বীকার কর কে এ-কাজ করিয়াছ?

না—আর থাকা অসম্ভব। প্রাণ দিতে সে আসিয়াছে, প্রাণ দিবার এমন সুযোগ আর কখনও হইবে না—মায়ের ছেলে সে—আজ সকলেব সম্মুখে সে অবীরোচিত হত্যার অপরাধ স্বীকার করিয়া জীবন দিবে—জগৎ দেখুক বাঙ্গালী ভীক নহে—সে প্রাণ দিতে জানে—কারণ সে প্রাণের নেশায় ভবপুর।

এক কোণ হইতে সে উল্কাসম ছুটিয়া বাহির হইল—সকলে সবিস্ময়ে দেখিল সে আর কেহ নহে—অসীম।

তিন

রাত্রি থাকিতেই সকলে বুট পটি পরিয়া প্রস্তুত হইল। আজ অসীমের শাস্তি হইবে—কি যে সে শাস্তি হইবে তাহা কেহ জানে না আর জানে নাই বা কেন—এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু—নশংস হত্যা।

অন্ধকার থাকিতেই বিউগ্ল্ বাজিল। সকলের বুক একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল। দিনের পর দিন তাহারা এই বিউগলের আশ্বানেই জাগিয়াছে—এই বিউগলের উন্মাদকারী আশ্বানবাণী তাহাদের রক্তের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের মনে হইল এ তো প্যারেডের আশ্বান নয়। সকলের মন একসঙ্গে দমিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল! হুকুম হইল “form fours, left turn, quick march” সহস্র বামপদ অগ্রসর হইল, সহস্র ডান হাত ছুলিল, তালে তালে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, কি মনোহর সে দৃশ্য!

বহুদিন তাহারা রাইফ্ল্ ছাড়া প্যারেড্ করে নাই—বাম-হাত যেন আব নড়িতে চাহে না—সমশ্রেণীতে তাহারা চলিল।

চারিদিকে ধু ধু মাঠ—বহুদূরে অর্ধচক্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ

বৃক্ষসমূহ—শূন্যতা কানায় কানায় ভরা। খুনখারাবির রক্তরঙে পূব-আকাশ মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। লাল ডগ্‌ডগে সূর্য্য কালী-মাতার হস্তস্থিত খড়্গে অঙ্কিত দিম্বুর-চক্রের মত ভয়ঙ্কর—দেখিলে ভয় হয়। ক্রমে সূর্য্য উপরে উঠিল—চারিদিক হইতে অগ্নিকণাবাহী বাতাস বহিল—মাটির অন্তস্তল হইতে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া সেই বিরোট্‌ মাঠের বুক বিষাক্ত করিয়া দিল।

মাঝে মাঝে দুই একটা পত্রপুষ্পহীন গাছ—মূর্ত্তিমান্ অলঙ্কার মত দাঁড়াইয়া। গ্রীষ্মে শীতে বসন্তে বধায় এক-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—কোথায়ও এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই। শিকড়গুলি সব বাহির হইয়া রহিয়াছে—যেন বুলুফার প্রবল তাড়নায় সহস্র শীর্ণ বাহু বাড়াইয়াছে।

মারুচ্ করিতে করিতে তাহারা প্রায় এক মাইল পথ আসিল। হুকুম হইল—হল্ট্—সব এক মুহূর্ত্তে নিশ্চল। অদূরে নবনিশ্চিত ফাঁসিকাঠ দেখিয়া কাহারও আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না—কি নিষ্ঠুর শাস্তি, সৈনিকের প্রাণ যাইবে ফাঁসিকাঠে—আর এই নিষ্ঠুর হত্যা-ভিনয়ের জন্ত এ বিরোট্‌ আয়োজনের কি কিছু প্রয়োজন ছিল—সহস্র ভাইয়ের সম্মুখে একটি ভাইকে হত্যা করিবার কি প্রয়োজন ?

২০ জন করিয়া সেকশন ভাগ হইল—প্রত্যেকের সম্মুখে একজন করিয়া সুসজ্জিত গুরুখা সৈন্য দাঁড়াইল—হাতে তাহাদের টোটাভরা বন্দুক—বন্দুকের আগে ঝক্-ঝক্ করিতেছে নররক্তপিপাসু সঙ্গী।

অসীম উপস্থিত হইল—পরনে কয়েদীর বেশ—হাতে হাতকড়ি—চারিদিকে গুরুখা সৈন্য পরিবেষ্টিত, সকলে এক নিমিষে তাহার মুখের দিকে চাহিল—কি দিব্য জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ সে মুখখানি।

ফাঁসি-কাঠের নিম্নে সে নীত হইল। সাহেব আসিয়া একটা কাগজ হইতে তাহার দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিলেন—তুমি উপরস্থ কর্মচারীকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে—তোমার অপরাধ অতি গুরুতর—অতএব তোমাকে এ শাস্তি দেওয়া গেল যে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলান হইবে—ইহাই কোর্ট-মার্শাল বিচার। সকলে স্তব্ধ—নির্ঝক্ !

অসীমের মনে শেষবারের মত বাংলার কথা মনে হইল—মনে হইল সেই সোনার ধান-ক্ষেত—সেই সবুজ বেতস বন, মনে হইল সেই সুনীল আকাশ—মিঠে ধানের গন্ধে ভরা মুক্ত বাতাস। ছোট কাল হইতে সে দীঘির কালো জলে সাংরাইয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরুর ডাক শুনিয়া মানুষ হইয়াছে। সহরে আসিয়া তাহার ভাল লাগে নাই—সহরে বড় কৃত্রিমতা। আবার মনে পড়িল তাহার মার কথা—সেই বিধবা মার একমাত্র সন্তান সে—আপনার বলিতে তাঁহার আর কেহ নাই—কোলে পিঠে করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তার সে মা আজও হয়ত তাঁর ছেলের পত্রের আশায় বসিয়া আছেন, কত আশা করিয়া বাঁচিয়া আছেন আবার পুত্রের মুখ দেখিবেন, এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধ বাঁমিলে আবার ‘মা’ ডাক শুনিবেন। তিনি কি স্বপ্নেও জানেন যে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র অন্যের অপরাধে আজ স্বদূর তুর্কীস্থানের লতাগুল্মহীন প্রান্তরে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতেছে—কি ভীষণ! তাহার চোখে জল আসিল, ঐ তো সম্মুখে তাহার চির পরিচিত মাঠ যেখানে সে মাসাধিক কাল যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে—এই তো তাহার সহস্র ভাই যাহাদের সাথে মারুচ্ করিয়াছে,—এ সব ছাড়িয়া সে কোথায় চলিয়াছে!

ফাঁসি-কাঠে অসীম উঠিল—তাহার গাল বাহিয়া দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার পাণ্ডুর মুখ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তো আজ মরিতে যাইতেছে না—সে অমর হইতে যাইতেছে—মায়ের জন্ত সে প্রাণ দিতেছে—ভারতমাতা—যে তাহার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত শয়ন স্বপন—অশন বসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে—সেই ভারতমাতার জন্ত সে আজ মরিতেছে, অসীম চোখ বুজিল। সম্মুখে তাহার মূর্ত্তি-মতী হইয়া দাঁড়াইল—শস্যশ্রামল নদীগিরিমণ্ডিত অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যশোভাম্বিত চিরপূজিত ভারতবর্ষ—যাঁর বৃকে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে যাঁর অঙ্গে—যাঁর জলে—যাঁর ফলে সে মানুষ হইয়াছে। করজোড়ে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল—মা, আমি তোমার ছেলে—পাপ মানি না পুণ্য মানি না, ধর্ম্ম মানি না ঈশ্বর মানি না, শুধু জানি তুমি আছ—জানি তুমিই একমাত্র পূজার্ত, তুমি পরপদদলিত

লাহিত, তাই আজ আমি যাইতেছি—যুগে যুগে আমি যেন তোমার কোলে আসি—মুক্তি চাই না—আমি যেন শত আবর্জনা-বিবর্জনের মধ্যেও তোমাকে না হারাই, তুমি আমার, আমি তোমার। ভাই সব! তোমরা রহিলে, মা'র কলঙ্কার মোচন করিও, মা'র দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করিও।

সকলে চুপ—হায় রে কোন্ মায়ের সাগরছেঁচা মাণিক-সম ছেলে তুই আজ চলিলি। তোর মা যে তোকে অনেক শিবপূজা করিয়া পাইয়াছিল—নিজে না খাইয়া তোকে খাওয়াইয়াছে—আজ তোর মরিবার সময় হইয়াছে, কিন্তু যুগে যুগে তোর মত ছেলের মা যদি ভারত হইতে পারে তবেই ভারত স্বাধীন হইবে।

বুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। দ্বিসহস্র চক্ষুতে আগুন জলিয়া উঠিল, সম্মুখের উদ্যত-বন্দুক গুরুধারা সতর্ক হইল—তার পরেই সব চুপ। বিরাট মাঠের বৃকে চৈত্র-রৌদ্র খাঁখাঁ করিতেছে।

দ্বিসহস্র বাঙ্গালী-চোখের পুত অশ্রুতে সেদিন তুর্কী-স্থানের পোড়া মাটি তৃপ্ত হইয়া গেল।*

শ্রী নির্মলকুমার রায়

* গত ফেব্রুয়ারী মাসে Indian Territorial Forceএর ট্রেনিং থাকার কালে আমার শিবির-সহচর—২৮ দিনের বন্ধু শ্রী অমলচন্দ্র বসু এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের নিকট হইতে উপরি-উক্ত কাহিনীটি শুনি। নাম-ধাম বদলাইয়া কাহিনীতে বাদসাদ দিয়া ও জোড়া-তালি লাগাইয়া গল্পটি লিখিলাম।—একটু বাঙ্গালীর তরুণ প্রাণের বীরত্ব যেন বাংলার ঘরে ঘরে ঘোষিত হয়।—লেখক।

অকস্মীর কাজ

এই যে ধরার অকেজোরা কি করে তা তারাই জানে,
নাইক তাদের কাজের মানে অমরকোষে অভিধানে।
ছিনিমিনি খেলছে তারা দিবস-নিশি প্রাণটা নিয়ে,
দেখলে পরে ভয় লাগে ভাই, বুকটা ওঠে টনটনিয়ে।
রিক্তা তিথি আজকে মঘা,—ঘরের ছেলে নেই বেরুতে,
বরযাত্র যাচ্ছে ওরা স্নমেরু আর কুমেরুতে।
মরীচিকার অর্থ খুঁজে সাহারাতে ঝলসে মরে,
চেয়ে চেয়ে চাঁদের পানে চোখে ওদের চালশে ধরে।
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেঁয়ালিতে,
বিপুল ধরা হচ্ছে উজল খেয়ালীদের দেয়ালীতে।

২

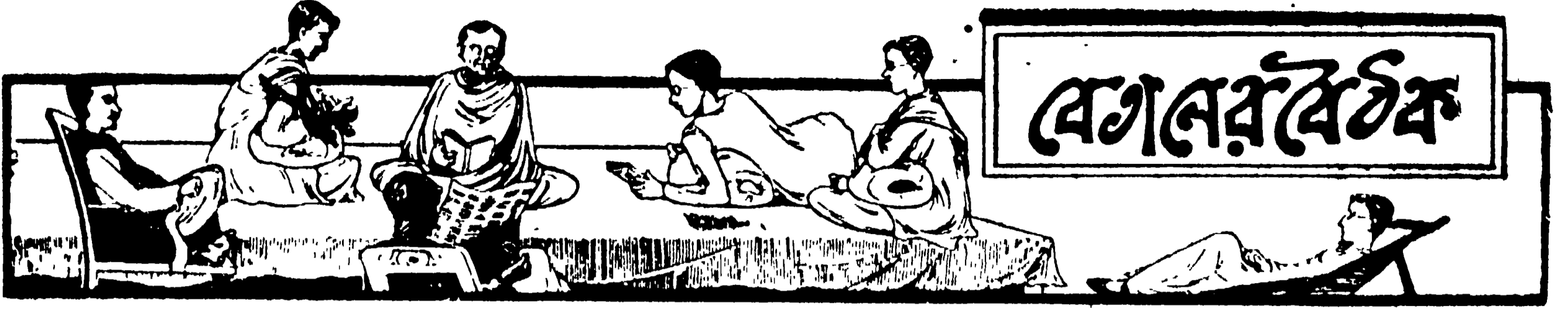
আকাশেতে ডিগ্বাজী দেয় গ্রহের সাথে কইতে কথা,
চায় পাতাতে তারায় তারায় বিশ্বব্যাপী কুটুস্থতা ;
বিস্তৃভিয়স্ ডাকছে তাদের উষ্ণ তাহার অন্তরেতে,
ঠেকছে গিয়ে পান্‌সী তাদের মঙ্গলেরি বন্দরেতে।
ঘুরছে তারা নানান বেশে নানান দেশে কিসের মোহে ?
বেতুইনের তাবুতে হায় দেখছি কেহ উষ্ট্র দোহে।

খেয়াল করে' চাপতে ছোট্টে কষ্টে এভারেষ্ট-শিরে,
পেয়াল করে' মাপতে জোটে পাগ্লাঝোরার পাগলামিরে !
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেঁয়ালিতে,
বিপুল ধরা হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে।

৩

পদ্মরাগের চায়নাক ভাগ, চায় না যেতে স্বর্ণ-ক্ষেতে,
পাতাল-বাণী শুন্তে থাকে সাগরতলে কর্ণ পেতে।
আগাছাদের ফুলের স্তবাস কি কুতুহল জাগায় প্রাণে,
উষর ভূমে পড়ায় পলি, দিন নবীনের বন্যা আনে।
আমরা অচল মৌনী-বাবা বসেই মরি সাত্বিকেরা,
শিখীর পিঠে হচ্ছে উধাও ধরার যত কার্তিকেরা।
আমরা রাখি খসড়া খতেন, খুদ খুঁটে খাই ঘরের কোণে,
তরুণ গরুড় উঠছে নভে অমৃতের ওই অন্বেষণে।
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেঁয়ালিতে,
বিপুল ধরা হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সম্বন্ধ-নিরসনের দিগদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আত্মজ্ঞান হইয়া গথার্থ ও যুক্তিসূক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাহ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বৈচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেগলবৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহাব উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৩৭)

সর্বপ্রথম যৌথ কারবার

বঙ্গালীদের স্থাপিত সর্বপ্রথম যৌথ কারবারের নাম কি? উহা কোন স্থানে স্থাপিত ও কত মূলধন লইয়া গঠিত হয়? কে কে প্রথম ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়?

শ্রী রামানুজ কর

(১৩৮)

‘মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর’

১৩২৭ সনের চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেন লিখিয়াছেন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের রাজা ফ্লা লামাওএর পুত্রগণ কর্তৃক তিব্বতে নীত হইয়াছিলেন। হাজার বৎসর পূর্বের এই বাঙ্গালী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিসে জানা যায়? তিনি ব্রহ্মদেশে ও তিব্বতে কি কি কাজ করিয়াছিলেন? তাহাব লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে কি কি গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে? ও কি কি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে?

শ্রী ভাবাপদ লাহিড়ী

(১৩৯)

ব্যায়াম শিক্ষার বিদ্যালয়

ভারতবর্ষে কোথাও ব্যায়াম শিক্ষা বিদ্যালয় আছে কি না? যদি থাকে তবে কোথায়? তাহাব বিস্তারিত ঠিকানা কি?

শ্রী মশায়উদ্দিন প্রধান

শ্রী বাহারউদ্দিন সরকার

(১৪০)

‘বর্ধমান জেলার পাঠশালা’

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা কেতুগ্রামের সার্মিল নিজ কেতুগ্রামের মধ্যে বহুলা নামক ১টি এবং অটুহাস নামক ১টি মহাপীঠ বিদ্যমান আছে। এবং ঐ দুইটিই যে তন্ত্রোক্ত মহাপীঠ ইহাই অত্রস্থ জনসাধারণের পূজবাসুক্রমে বিশ্বাস। কিন্তু পঞ্জিকাতে লাক্ষপুর নামক স্থানে অটুহাস বিদ্যমান আছে এবং সেইটিকেই মহাপীঠ বলিয়া প্রকাশ করা হইতেছে।

এদিকে কেতুগ্রাম-অটুহাসে ভৈরব বিশেষ নামে খ্যাত আছেন আর লাক্ষপুরে ভৈরব বিশেষ বলিয়া খ্যাত। বর্ধমান রাজস্টেট বহু পূর্বকালে কেতুগ্রামেই অটুহাস মহাপীঠ স্বীকার করিয়া তাহার সেবা-পূজাদির ব্যবস্থার জন্ত কতক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। এবং ভাল ভাল সাধুসন্ন্যাসীগণও ঐ স্থানটিকেই মহাপীঠ বলিয়া নির্দেশ করেন। ততএব এসম্বন্ধে প্রকৃত বৃত্তান্ত কি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত মহাপীঠ কোন স্থানে? অটুহাস মহাপীঠ যাহা কেতুগ্রামে আছে তাহাব পার্শ্বে এক উত্তরবাহিনী নদীও দেখা যায়, কিন্তু লাক্ষপুরের অটুহাসের পার্শ্বে কোন উত্তরবাহিনী নদী নাই।

শ্রী নৃসিংহসুরারি পাল

(১৪১)

‘কৃষ্টিশিক্ষা-প্রণালী’

কৃষ্টি-শিক্ষা-প্রণালী ও নিয়মাবলী জানিতে পাবা যায় এরূপ কোন বই আছে কি না?

‘সন্তোষ’

(১৪২)

প্রপিতামহের সম্বোধনবাচক বাংলা শব্দ

প্রপিতামহীকে ‘স্বিমা’ সম্বোধন করা হয়, কিন্তু প্রপিতামহের সম্বোধন পদের কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। প্রপিতামহকে কি বলিয়া সম্বোধন করা হয় বা করা যাইতে পাবে?

কল্যাণী

(১৪৩)

‘বাংলার ত্রয়োদশ চাকলাদারের ইতিবৃত্ত’

‘বাংলার ত্রয়োদশ চাকলাদারের’ নাম, উপাধি ও কর্তব্য কি কি? কোন্ কোন্ ইতিহাসে চাকলাদারের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়?

মোঃ ইয়াকুব

(১৪৪)

মাক্কাতার আমল

লোকে কোন পুরাতন বখা শুনিলে ‘মাক্কাতার আমল’ এই প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এবং তাৎপর্য কি? মাক্কাতাই কি অতি পুরাতন রাজা?

শ্রী শশিভষণ ধর চৌধুরী

(১৪৫)

পণ্ডিত গৌরীচন্দ্র উবাসনী

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত গৌরীচন্দ্র উবাসনীর জীবনী কেহ জানেন কি? তিনি কতদিন পূর্বের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা লিখিয়াছিলেন।

শ্রী নীরদবরণ ভট্টাচার্য্য

(১৪৬)

গাছের পাতা

পৃথিবীতে কোন্ গাছের পাতা সব চাইতে বড়? সেই গাছ কোন্ কোন্ দেশে জন্মায়? এবং সেই গাছের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাণ কি?

Victoria Regia নামক বিখ্যাত আফ্রিকান পদ্মের পত্রের দীর্ঘতম ব্যাসের পরিমাণ কি?

শ্রী সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(১৪৭)

কোন্ কাতে শোওয়া উচিত?

শত পদ আহার শেষে

চলিয়া শোবে বাম পাশে,

বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু মিঃ ব্যাক্স তাঁর Manual of Hygiene and Domestic Economy পুস্তকে ঠিক উল্টা কথা লিখিয়াছেন। কোন্ মতটি বিজ্ঞানসম্মত?

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ কৃষ্ণ

(১৪৮)

মৃতসংকারান্তে

মৃতদেহ দক্ষ করিয়া ঘরে যাইবার পূর্বে বাহিরে থাকিয়া অগ্নিতে হাত-পায় সেক দিয়া, লৌহ তাম্র ইত্যাদি স্পর্শ করিয়া ঘরে প্রবেশ করার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত। কিজন্ম এরূপ করা হয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী পরিমলকান্তি রায়

(১৪৯)

বৌদ্ধ

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভাবতের কোন্ প্রদেশে কত আছে এবং কোন্ স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদির অধিক আলোচনা হইয়া থাকে?

শ্রী ভূপতিনাথ পালিত

(১৫০)

ইক্ষুর পোকা

ইক্ষুর চারা ছোট থাকিতেই একরকম পোকামাঝে মাঝে গোড়া কাটিয়া দেয়। এই পোকা নিবারণের উপায় কি?

শ্রী নীহাররঞ্জন চৌধুরী

(১৫১)

মৃত শিশুর সংকার

হিন্দুগণ ছুই বৎসরের নূন বয়সের মৃত শিশুকে সংগর্ভে প্রোথিত করেন, এবং তদুর্দ্ধ্বয়স্ক মৃতের দাহ সংকার করেন।

এই দ্বিবিধ ব্যবহার হেতু কি?

শ্রী রোহিণীচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

(১৫২)

মাধন রক্ষা করিবার উপায় কি?

শ্রী মণীন্দ্রকুমার দত্ত।

(১৫৩)

“সাদা জীরা”

ভারতে সাদা জীরার চাষ হয় কি না? যদি হয়, উহার আবাদ-প্রণালী কি এবং কোথায় বা উহার বীজ পাওয়া যায়?

শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দাস

(১৫৪)

দাস-বাবসায় বা ক্রীতদাস-প্রথা

এখন পৃথিবীর মধ্যে কোথায় দাসব্যবসায় প্রচলিত আছে? কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ মহাত্মা যত্নে কোন্ কোন্ দেশ হইতে ক্রীতদাস-প্রথা রহিত হইয়াছে?

শ্রী বিহারীভূষণ সাঁতরা

(১৫৫)

চালের পোকা

চাউল কিছুদিনের পুরাতন হইলেই উহাতে একপ্রকার কীটের অবির্ভাব হয় ও উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। চাউলে এইপ্রকার কীটের উপদ্রব না হইয়া উহা অনেকদিন অবিকৃত রাখিবার সহজ উপায় কি?

এম্ এম্ চৌধুরী

(১৫৬)

“ছাপান্ন গাঁই”

“পাঁচ গোত্র ছাপান্ন ‘গাঁই’,

তার উপরে ব্রাহ্মণ নাই।

যদি থাকে ছুই-এক ঘর,

বশিষ্ঠ আর পরাশর।”

ছাপান্ন গাঁই কি কি? উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ কি?

শ্রী শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

(১৫৭)

গ্রন্থকীট

পুস্তক বহুদিন আলমারিতে রাখিলে উহাতে একরকম কীট জন্মায় এবং পুস্তকেব মলাটে এবং পাতায় ছোট ছোট গর্ত করিয়া পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার কোনও সহজ প্রতিকার আছে কি? ন্যাপথালিন দিয়া কোনও ফল পাই নাই।

শ্রী মন্থনাথ দত্ত।

মীমাংসা

(৩)

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বাংলার বাজা

খৃষ্টপূর্ব ৬৪২ অব্দে মগধে শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তদ্বংশীয় ৫ম রাজা “বিম্বিসার” ৫৩৭ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন।

“গৌতম বুদ্ধ” খঃ পূর্ব ৫৫৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৭৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতএব তিনি যে রাজা “বিম্বিসারের” রাজত্বকালীন ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্বীয় “রাজ্যার্থ্য পরিত্যাগ পূর্বক মুক্তির কামনায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন”, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও আছে।

মগধের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ বেহার। প্রাচীন বঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা,—অঙ্গ (পূর্ব বেহার বা 'দেব বঙ্গ') বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) ও কলিঙ্গ (দক্ষিণ বঙ্গ ও উড়িষ্যা)।

বিশ্বিসারের রাজত্বকালে অঙ্গদেশ মগধ-সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে কে যে অঙ্গের রাজা ছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না; তবে ইহা বেশ প্রমাণিত হয়, যে, তখন অঙ্গদেশের স্বতন্ত্র রাজা ছিল।

বিশ্বিসারের রাজত্বকালীন বঙ্গে ও কলিঙ্গে পতঙ্গ রাজা ছিল কিনা লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বহুগবেষণাপূর্ণ বিবরণী হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতএব বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের সময় বাংলার রাজা কে কে ছিলেন তাহার সীমান্ত প্রবৃত্তি পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত নহে বলিলে অমৌলিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা দেখিতে পাই যে বঙ্গে ও কলিঙ্গে খৃঃ পূর্ব ৩৭০ অব্দে পর নন্দবংশীয় রাজস্ববর্গের সময় আর্ধ্য সভ্যতার বিস্তৃতি হয়। এবং চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্বকালীন (৩২২—২৯৮ খঃ পূঃ) বঙ্গদেশ মগধের শাসনাধীনে আসে।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশ আদিম জাতির আধিনিবাস ছিল; তাহার পূঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে আধুনিক সভ্যতা প্রাপ্ত হয়।

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলা দেশে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আধুনিক সভ্যতা প্রাপ্ত কোন রাজা ছিলেন না; কিন্তু আধুনিক সভ্যতার দ্বারা বলিয়া জানিত বাংলা দেশে সেই-সকল আদিম জাতির মধ্যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক শাসনকর্তার ইতিহাস নিকট করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শ্রী যশোদাচন্দ্রকব ঘোষ

(৩৭)

"কাগজ ছেঁড়া"

যে কোন কাগজ ছিঁড়িয়া তাহার বিভক্ত স্থানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিন্ন অংশ বহিয়াছে—এবং সেই অংশই কাগজ সংবদ্ধ হইয়া থাকে। যখন কোন চণ্ডা কাগজের দুই দিকে সমানভাবে টানা যায় তখন কাগজের সমস্ত অংশে হাতের জোর পড়ে না, সুতরাং হস্ত দ্বারা সাধারণতঃ যে জোর প্রয়োগ করা হয় কাগজের অংশের বন্ধন ও জোর তদপেক্ষা বেশী, তাই কাগজ সহজে ছেঁড়া যায় না। কিন্তু এক ইঞ্চি চণ্ডা এক টুকরা কাগজ যদি দুই হস্তের অঙ্গুলীতে চাপ দ্বারা বিপরীত দিকে টানা যায় তাহা হইলে সহজেই কাগজ ছিঁড়িয়া গাইবে, কারণ, একরূপ অবস্থায় কাগজের সমস্ত অংশের উপর হস্তের টান পড়িবে, কাজে-কাজেই সহজে ছিঁড়িয়া গাইবে। ইহাতে অপর কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীমতী অগ্রহায়ণ

(৮৫)

আমেরিকা যাইবার পথ

ভারতবর্ষ হইতে প্রশান্ত-মহাসাগর দিয়া আমেরিকা যাইবার পথ—পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে বোম্বাই হইতে হংকং (১৭ দিন)।

প্রশান্ত মহাসাগরের ডাক-জাহাজ কিংবা তোমো কিমেন কাইশার জাহাজে হংকং হইতে কোবে (৭ দিন)

কোবে হইতে ইয়োকোহামা (টেনে)।

পরবর্তী প্রশান্ত-মহাসাগরের ডাক-জাহাজ কিংবা তোমো কিমেন কাইশার জাহাজে ইয়োকোহামা হইতে স্যান ফ্রান্সিসকো (১৬ দিন)।

ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা প্রশান্ত-মহাসাগরের পথে হংকং শাংহাই কিংবা অল্প কোন জাপানী বন্দর হইয়া গাইতে হয়। পথ-ক্রম, যথা,—

(১) কলিকাতা হইতে :—

বি-আই-এস-এন্-কোং (আপ্‌কাব লাইন) কিংবা ইন্দোচীন এস-এন্-কোং জাহাজে হংকং (১৬ দিন), শাংহাই (২৪ দিন)। (এই দুই কোংর জাহাজ সম্মিলিতভাবে প্রতিসপ্তাহে চাড়ে ।)

(২) বোম্বাই হইতে :—

পি অ্যাণ্ড ও এস-এন কোংর মাসিক যাত্রী-জাহাজে শাংহাই (২১ দিন)।

নিপ্পন ইউসেন কাইশার মাসিক জাহাজে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী লইবার বন্দোবস্ত আছে।

(৩) কলোম্বো হইতে :—

পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানীর পাস্ফিক যাত্রী-জাহাজে শাংহাই মেসাজেরি মারিতিমেব কিংবা নিপ্পন ইউসেন কাইশার পাস্ফিক যাত্রী-জাহাজে জাপানী বন্দবে পৌঁছান যাইতে পারে। হংকং শাংহাই কিংবা জাপানী বন্দরগুলি হইতে আমেরিকা পথ :—

(১) কানাডা—প্রশান্ত-মহাসাগরীয় বাষ্পীয় পোত কোংর পাস্ফিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ১৬ দিন, শাংহাই হইতে ১৬ দিন এবং ইয়োকোহামা হইতে ৯ দিন লাগে।

(২) অ্যাটমিভাল লাইনে হংকং হইতে ১৯ দিন, শাংহাই হইতে ১৬ দিন, ইয়োকোহামা হইতে ১০ দিন লাগে। জাহাজ এক পক্ষ অঙ্গুর চাড়ে।

(৩) নিপ্পন ইউসেন কাইশার মাসিক যাত্রী জাহাজে হংকং হইতে ৩১ দিন, শাংহাই হইতে ২৬ দিন ও ইয়োকোহামা হইতে ১৫ দিন লাগে।

(৪) তোমো কিমেন কাইশার পাস্ফিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২৯ দিন, শাংহাই হইতে ২৬ দিন, ইয়োকোহামা হইতে ১৬ দিন লাগে।

(৫) প্রশান্ত-মহাসাগরের ডাকপথে মাসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২২ দিন, শাংহাই হইতে ১৮ দিন, ও ইয়োকোহামা হইতে ১৪ দিন লাগে।

(৬) চীনা ডাক-পথে মাসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২২ দিন, শাংহাই হইতে ১৯ দিন, ও ইয়োকোহামা হইতে ১৭ দিন লাগে।

সমস্ত আমেরিকার মহাদেশবাসী বেলগণ দিয়া বৃক্ষবাষ্ট্রে এক বন্দবের সহিত অল্প বন্দবের সংযোগ আছে।

টমাস বুক অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পৌঁছ লইলে কোন লাইনে ভাড়া কত ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞাতবা বিদ্য জানা যাইবে।

শ্রী শিবিনন্দকিশোর দত্তবায়

(১০৪)

বোধিজ্ঞান

বাবু মহেন্দ্র বায় প্রণীত "তীর্থবিবরণে" দেখিলাম, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পার্শ্বে যে বোধিজ্ঞান বিদ্যমান আছে, উহা বুদ্ধদেবের বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির বট-বৃক্ষ। উহার বয়স আড়াই হাজার বৎসর।

অল্প একখানি পুস্তকে দেখিলাম, সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সজ্জসিত্রা সিংহলে বোধিজ্ঞান প্রচার করিবার সময় বোধিজ্ঞানের একটি শাখা কাটিয়া অনতিদূরে শাখাটি পুতিয়াছিলেন। সেই বৃক্ষটিই বুদ্ধগয়ার নিকট বুদ্ধমন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত বোধিজ্ঞান। উহা অদ্যপি বর্তমান আছে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ২৬৩—২২৬ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত।

তালা হইলে এই বোধিদ্রুমের বয়স ২১০০ বৎসর কিংবা তাহার কিছু বেশী বলা যাইতে পারে। কোন অল্পতরুবিদ্ব এসম্বন্ধে সঠিক উত্তর দিলে উপকৃত হইব।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বোধি—অর্থৎ,—বটবৃক্ষ নয়। এর স্থিতি মন্দিরের পশ্চিমে, মন্দিরদ্বারের ঠিক উল্টা দিকে—মন্দির-সংলগ্ন একটি বেদির উপর। এর পূর্ব স্থান সম্বন্ধে একটু মতান্তর আছে (Vide District Gazetteer, Gaya, by O' Malley)।

বর্তমান বোধিদ্রুমটি দেখে ৫০ বছরের বলে' বোধ হয় না। কিন্তু ইতিহাসে এটির বয়স ৫০ বছর সাব্যস্ত হয়েছে। ১৮১১ খৃঃ অঃ বুকানন সাহেব যে গাছটি দেখে এক শত বছর বয়স নির্ধারণ করেছিলেন, সেটি ১৮৭৫ সালে ঝড়ে পড়ে' যায়। তার পব পূর্বোক্ত বোধিদ্রুমেরই একটি চাবাকে তার প্রলাভিসিক্ত করা হয় (District Gazetteer, Gaya, by O' Malley)। বর্তমান গাছটি সেই গাছ। সম্ভবতঃ শান-বাঁধান বেদির উপর থাকার জন্য বয়সের অনুরূপ বাড়তে পায়নি।

প্রায় ৬০০ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক বোধিদ্রুমটিকে সম্মলে' তুলে' ফেলে' পুড়িয়ে দেন (Early History of India by Vincent Smith, page 320)। তার পব অশোকের উক্ত পুস্তক মগধের রাজা পুনর্বর্ধন এর পুনবায় স্থাপনা করেন। সে গাছটি কতদিন ছিল কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ৬০০ খৃঃ অঃ থেকে প্রায় ১৭০০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত বোধিদ্রুমের বিষয় আর কিছু জানা যায় না। কেউ যদি জানেন প্রমাণ সহ সংবাদ দিতে গাবেন।

যখন অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি তখন তিনিই প্রথম বোধিদ্রুমটি কাটান (সম্ভবতঃ সম্মলে নয়)। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পব এটি প্রায় এত বেশী যত্নশীল হয়েছিলেন যে তাঁর রাণী ঈর্ষ্যা এটিকে নষ্ট করেন। তিনিও সম্ভবতঃ এটিকে সম্মলে নষ্ট করেননি।

মোট কথা বোধিদ্রুমটি কয়েক বার নষ্ট হয়। মন্দির মেঝামেঝের সময় ৩০ ফুট উঁচু বেদির নীচে পুরান বোধিদ্রুমের দুটি সম্মল স্তম্ভ পাওয়া যায়। সে-দুটি সম্ভবতঃ ৬০০ খৃঃ অঃের পুস্তকের। কারণ বেদিটি পুনর্বর্ধনের সময়ের।

এমালি সাহেব বর্তমান বোধিদ্রুমটিকে পুস্তকের বোধিদ্রুমেরই বংশজ প্রতিগ্ন কবতে ইচ্ছুক। কিন্তু সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। আচার্য্য স্মারভট্ট

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে সম্রাট অশোক কর্তৃক এহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দীক্ষার পবে ইহাকে পুনঃসংস্থাপন করিয়া এই বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে তিনি পূজা ভক্তি কবিতেন। বৃক্ষের প্রতি বাজার অত্যধিক ভক্তিভাঙ্গা দর্শনে অস্বাভাবিক হইয়া বাণী ত্রিয্যবক্ষিতা গোপনে উহা কাটিয়া ফেলেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে তা পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। তৃতীয়বার যত্ন খৃষ্টাব্দে গোডেব রাজা শশাঙ্ক নবেদ্য স্তম্ভ এই বৃক্ষে মূলাংগপাটন কবিয়াছিলেন, কিন্তু মগধের পূর্ব-বর্ধন উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। এ-সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প এই যে, কোন এক অজ্ঞাত শক্তি প্রভাবে এক বাত্মিতে এই গাছটি দশ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে। রাজা পূর্ববর্ধন শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহা চতুর্দিকে ২৪ ফুট উচ্চ এক প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুকানন হামিলটন সাহেব বুদ্ধগয়ায় আসিয়া এই গাছটিকে খুব সজীব ও মতেজ দেখিতে পান। তাঁহার মতে তখন উহা বয়স শতবর্ষের কম ছিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অবল ঝড়ে উহা মাটিতে পড়িয়া যায়। বর্তমান বৃক্ষটির বয়স ৫০

বৎসরের অধিক হইবে না। সম্ভবতঃ উহা মূল বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এবিষয়ে আরও সবিস্তার জানিতে হইলে শ্রী অতুলচন্দ্র মূগোপাধ্যায়ের প্রণীত "গয়া-কাহিনী" পাঠ করিবেন।

শ্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০৭)

একাদশী দুঃপ্রকার। সম্পূর্ণ ও বিক্রা। বিক্রা আবার পূর্ব-বিক্রা পব বিক্রা প্রভৃতি ভেদে অনেককম। ব্রত উপবাসাদিতে পূর্ব-বিক্রা পবিত্র্যাজা। মুনি পয়সনসীব উক্তি আছে পঞ্চমী-বিক্রা মঞ্জীতে, মঞ্জী-বিক্রা সপ্তমীতে ও দশমী-বিক্রা একাদশীতে সুদীব্যক্তি উপবাস কবিলে না। সাবদা-পুৰাণে লিপিত আছে একাদশী মঞ্জী পূর্ণিমা চতুর্দশী তৃতীয়া চতুর্গী অমাবস্যা ও অষ্টমী এই-সকল তিথি পবিত্র্যাজা হইলে উপবাসে গ্রীতা। কিন্তু পূর্ববিক্রা হইলে পবিত্র্যাজা। সৌর-ধর্মোক্তবে ব্যবস্থা আছে একাদশী ও দ্বাদশী উপবাসের যোগা, কিম্বা একাদশী-সম্মিত্তা দ্বাদশীতে উপবাস কর্বা। কিন্তু দশমীযুক্তা একাদশী উপবাস সম্বন্ধে পবিত্র্যাজা। হরিত্তিক্তিবিলাসের দ্বাদশ বিলাসে ৭৩ হইতে ১৪২ শোকে (উপবাস-নির্নয় ও বিক্রা-উপবাস দোস) নানা পুরাণ সংহিতাদি গ্রন্থের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। বিশদরূপে জানিতে হইলে হরিত্তিক্তিবিলাসে গোপালী পণ্ডিতের ব্যবস্থা পড়িয়া দেখিবেন।

শ্রী সত্যনাথগোপাল দত্ত

সন্দপুৰাণে ও পদ্মপুৰাণে একাদশীত্ব সুবিস্তৃত আছে। রঘুনন্দনের একাদশীত্ব সংক্ষিপ্ত। ইহাদের মতে দশমী-বিক্রা একাদশী করা নিবিক্রা।

চাক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০৯)

এলাচের গাছ

এলাচ পাবিতে আনন্ত কবিলে, গাছ হইতে তুলিয়া আনিয়া প্রথমে ফলের মতই ফুটাঠিয়া নষ্ট হইবে। তাহার পব এলাচগুলি বাতাসে শুকাইয়া হইতে হয়। এককপ অক্ষিয়া জবজবন কবিলে, এলাচ নষ্টের আশঙ্কা থাকে না। ইহা পরীক্ষিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১১২)

দুগ্ধ লবণ পাইওয়া

দুগ্ধ লবণ মিশ্রিত কবিয়া পাইওয়া কোনপ্রকার অনিষ্ট হইবার কারণ নাহ, খাদ্যভোজের অন্যো গাশীত্রুক্ষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ বর্তমান থাকে, এইজন্যই দুগ্ধো মস্তিত লবণ সেবন হিন্দুশাস্ত্র-বিবাক্ত।

১২০১ সালের পাত্ৰাসমাচাবে ১০১ পৃষ্ঠা ও ৩৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রী জগন্নাথ দাস

সন্দপুৰাণে দুগ্ধ লবণ সংযোগ নিষেধ করা হইয়াছে ; কিন্তু কোনো কোনো দেশে উহা পচলিত বলিয়া সেট সেই দেশের পক্ষে উহা নিষেধ নয় বলা হইয়াছে।

চাক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১৩)

বিপ্যাত 'শের মুতাকবিণের' অনুবাদক নোটা মানাস (Nota-Manus)। অনুবাদের মূল্য ৬০ টাকা—তিন খণ্ডে আর ক্যাথে কোম্পানী R. Cambay & Co. কলিকাতা দ্বারা প্রকাশিত। মোহাম্মদ মন্থুর উদ্দীন শাহজাদপুরী

(১২১)

বাংলার স্বাধীন হিন্দু রাজা

বাল্লালাদেশে প্রবাদ আছে যে পুরাকালে সিংহবাহু নামে একজন বাঙ্গালী এই বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাঢ়দেশে সিংহপুর নামক নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহারই পুত্র বিজয় সিংহ খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে সিংহল (Ceylon) বিজয় করিয়াছিলেন। বিজয়-সিংহের সিংহল-বিজয়ের চিত্র এখন অজস্তার গুহায় দেখা যায়।

আরো কিংবদন্তী আছে, যে আদিশূর নামক জনৈক বাঙ্গালী খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বাংলাব প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজধানী ছিল গোড়ে। কথিত হয় যে তিনি কনৌজ হইতে বাংলা দেশে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারাই বর্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ।

এই-সকল প্রবাদবাক্যের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে-সকল বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি ও মূল্য আছে তাহাই নিয়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

আর্য্যগণের পূর্ব বঙ্গদেশে অনার্য্য দস্যুরা বাস করিত। আর্য্যরা আসিয়া হিন্দুধর্ম সংস্থাপন ও আর্য্যসভ্যতার বিস্তার করিলেন এবং তৎসঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, বারেন্দ্র—উত্তরবঙ্গ, বঙ্গ—পূর্ববঙ্গ, ও রাঢ়—পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গ।

মৌর্য্য- ও গুপ্ত-রাজত্বকালে বাংলাদেশ তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্যবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে তাঁহার সুবিম্বৃত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে পরিণত হইল। তখন বাংলার উপর তল্লিকটবর্তী অনেকগুলি প্রবল শক্তির নজর পড়িল। তাহার ফলে বাংলার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে।

বাংলার সেই দুর্দিনে সেই পরিবর্তন-সমস্কৃত সময়ে দেশেব অনেক ক্ষমতাশালী বিজ্ঞলোক সম্মিলিত হইয়া দেশের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্ত “গোপাল” নামক জনৈক বুদ্ধিমান ও সুচেষ্টাব লোককে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা সকলে স্বেচ্ছাপূর্বক “গোপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার ওরূপ বণ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই একদিন প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত বাংলার শাসনে আসিয়াছিল। গোপালকে আবার “গোপালদেব” বলিয়াও অভিহিত করা হয়। উক্ত “গোপালদেব” বাংলার প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজা ছিলেন।

“গোপাল” এই নামের শেষে “পাল” শব্দ আছে বলিয়া তাহার বংশ বাংলার “পালবংশ” বলিয়া খ্যাত।

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল এক সময় প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গোপালদেবের রাজধানী ছিল। বর্তমান বগুড়া সহরের ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থানগড়ের যে ধ্বংসস্তুপ আছে, তাহাই প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দু রাজার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্মৃতিচিহ্ন।

অনন্তর বাংলাদেশ সেনবাহুগণের হস্তগত হইলে তাঁহার প্রথমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে রাজসাহীর অষ্টর্গত “দেওপারে” এবং অবশেষে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে গোড়ে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান।

শ্রী যশোদাকিন্ধর দোম

(১২২)

স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এইরূপ :—স্বধর্ম ও পরধর্ম বলিতে কি বুঝায়, আমরা প্রথমে তাহাই আলোচনা করিব। স্বধর্ম কি ?—স্ব অর্থাৎ আত্মার ধর্মই স্বধর্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম দ্বারা আপনাকে জানা যায় অর্থাৎ

যিনি আপনাকে জানেন, তাহাই এখানে স্বধর্ম। আর পরধর্ম কি ?—ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম অর্থাৎ যে ধর্ম দ্বারা চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ থাকে—যাহাতে আত্মজ্ঞান জন্মে না (কারণ জিতেন্দ্রিয় না হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে না), তাহাই এখানে পরধর্মের অর্থ। তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত পরধর্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ধর্মে আসক্ত থাকি যায়, তাবৎ স্বধর্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মে না বা তাহাতে থাকিও যায় না—কেবল পবধর্মেই থাকি হয়।

পরন্তু জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্য, তখন স্বধর্ম অর্থাৎ আত্মধর্মে থাকিয়াই মরণ ভাল। যেহেতু উহা জীবকে ইহজন্মে, বিশেষতঃ পরজন্মে, উন্নত করে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গণের ধর্মে থাকিয়া মরণ হইলে তাহার মত ভয়াবহ আর কিছুই নাই। কারণ পরধর্মে ভোগের নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সেইজন্মেই শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়া গিয়াছেন—“স্বধর্মে থাকিয়া মরণও ভাল ; কিন্তু পরধর্মে থাকিয়া মরণ বড়ই ভয়াবহ।”

এখানে পরধর্মকে ভয়াবহ বলিবার তাৎপর্থা এই যে, উহা দ্বারা ভোগেব অবসান না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

“স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পবধর্মো ভয়াবহঃ” সন্ধকে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম দুইটি—

(১) ইহার বাস্তবিক অর্থ ?

(২) কোথায় প্রয়োগ হইয়াছিল ?

(১ম) স্বানুষ্ঠিতাৎ (সর্ব্বাঙ্গপূর্ত্যাকৃতাৎ অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম হইতে) বিগ্নাৎ (সদোষ অপি অর্থাৎ অজহীন) স্বধর্মঃ (স্বকীয়ো ধর্মঃ অর্থাৎ নিজ-প্রকৃতিগত ধর্ম) শ্রেয়ঃ (পেশস্যতরঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ)। অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ।

“স্বধর্মে (প্রবর্তমানস্য) নিধনং (মরণং অর্থাৎ মৃত্যু) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠঃ অর্থাৎ কলাগকর) পরধর্মঃ (ইন্দ্রিয়ধর্মঃ) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল) স্বধর্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম পালনে দেহান্ত হইলেও কলাগ লাভ হয় কিন্তু পরধর্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মের কার্য্য অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল।

(২য়) মহাবুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমগ্ৰগুণসম্পন্ন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন গুণজন ও আত্মীয়গণ নষ্ট হইলে ধর্মহানি হইবে এই ভাবিয়া যখন শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া আত্মজ্ঞান হারাইয়া সামান্ত মানবের স্থায় দীনভাবে শিষ্য স্বীকার করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি-রূপ “কৃত্রিয়ধর্ম শ্রেয়” কি যুদ্ধে নিবৃত্তি শ্রেয়, ইহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানেচ্ছু ধীমান্ অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক হইতে যে-সকল আত্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এই শ্লোকাংশ (৩য়) অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের তদ্ব্যখ্যাত।

গীতা-শাস্ত্র সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক, কেননা, পূর্বব্রহ্ম বলিয়া কল্পিত শ্রীকৃষ্ণমুখ-পদ্মবিন্দুসহিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে সাধারণ সমাজ গঠিত বর্ণাশ্রমধর্মী ব্যক্তির স্থায় হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীর গোঁড়ামি-ভাব দেখাইয়া অর্জুনকে নীচমতাবপ্রাপ্ত দলাদলি বা আত্মপরি-ভাবে উপদেশ দিয়াছেন ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কেননা ভগবদ্রূপ ধর্ম সর্ব্বজনীন মনুষ্য মাত্রেই রক্ষা বা পরিভ্রাণের উপায়। সুতরাং এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে মনুষ্য মাত্রেই সকলেই নিজ নিজ প্রকৃতির ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করে বা করা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কারণ প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুকূল কার্য্য করিতে সকল জ্ঞানীব্যক্তিই ইচ্ছা করে, প্রতিকূল কার্য্য করিতে কেহ চায় না। ৩য় অধ্যায়ের ৩৩শ ৩৪শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকলে স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্ম করেন,

২য় প্রকরণ। যে নারিকেল-বৃক্ষ দুই তিন হাত লম্বা হইয়াছে সেই গাছের উপর প্রত্যেক দিন লবণ-জল দিবে। এই নিয়ম দুই তিন মাস পালন করিলে দেখিতে পাইবে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং কোন প্রকার পোকা ঐ গাছে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই গাছের জলও লবণাক্ত হইবে।

হীবালাল সাত্ত

নারিকেলের চারা লাগাইবার পূর্বে যে গর্ত করা হয়, তাহাতে যদি ছাই ও লবণ মিশাইয়া নারিকেল চারা লাগান যায়, তাহা হইলে আর পোকাকার উৎপাত হইতে পারে না। ইহা পরীক্ষিত ঘটনা।

তদ্বিন্ন নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বনেও পোকাকার উৎপাত নিবারিত হয়।
ধরা :—

১। গাছের গোড়ায় চারিদিকে বৃত্তাকারে এক ফুট গর্ত করিয়া তাহাতে ৩৪ দিন যাবৎ বেষণ করিয়া গো-চোনা চালিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

২। মিষ্ট-দ্রব্য যোগে গাছে অধিক পরিমাণে লালপিঁপড়া লাগাইতে পারিলে, তদ্বারাও পোকাকার উৎপাত কমিয়া যায়।

৩। গাছের গোড়ায় ধানের তুষ ও পানা দিলেও গাছ ভাল থাকে।

৪। ষণন গাছে পোকা ধবে, তখন গাছী দ্বারা (যাহারা গাছ বাছিয়া দেয়, তাহাদিগকে গাছী বলে) গাছের পোকা বাছাইয়া ও মাথা কাটাইয়া লইলে সেই গাছের আর কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৩২)

চীনা-বাদামের চাষ

মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশে চীনাবাদামের চাষ হয়। মোট ১২৪৬ হাজার একর জমিতে এই ফসল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শাস্ত্রের পরিমাণ ৯২০ হাজার টন। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজে ১৪১২ হাজার, ব্রহ্মদেশে ৩৪৯ হাজার বোম্বাই প্রদেশে ২৭২ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। বাংলাদেশে কোন কোন জেলায় চীনা-বাদামের আবাদ হয়। বাঁকুড়া জেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ১০০ বিঘা। অতি অল্পায়াসে এ-জেলায় ডাঙ্গা জমিতে চীনা-বাদামের চাষ হইতে পারে। ফসল বিঘা-প্রতি ৫ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত হয়। এই চীনাবাদাম ফ্রান্স-বেলজিয়াম অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী জার্মানি ইতালি গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রােল দেশে রপ্তানি হয়। চীনাবাদাম, চীনাবাদামের তৈল এবং গৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ৩ কোটি টাকার চীনাবাদাম বিদেশে রপ্তানি হয় এবং একা গ্রেট ব্রিটেন প্রতিবৎসর নানা দেশ হইতে প্রায় ৫০ কোটি টাকার চীনাবাদাম খরিদ করে। মান্দ্রাজ হইতে বাংলায় চীনাবাদামের তৈল আমদানী হয়। এই চীনাবাদামের তৈলের সহিত চর্বি ও সামান্য বিশুদ্ধ হৃত মিশ্রিত করিয়া বাজারে যুত বলিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়।

শ্রী বামনারায়ণ ক

(১৩৫)

উই পোকা নিবারণের উপায়

সিমেন্ট ফাটিয়া গেলে পোকা ধরবে মেজেতে অনেক সময় উইয়ের টিপি তুলিতে দেখা যায়। এইসমস্ত স্থলে টিপি ভাঙ্গিয়া প্রচুর পরিমাণে কড়া তামাক পাতা-ভিজান জল, কুঁতেয় জল কিম্বা কেরোসিন চালিয়া দিলে সমস্ত উই নষ্ট হইয়া যাইবে। তখন পুনরায় ভালরূপে সিমেন্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। দালানের কড়িকাঠ বর্গী দরজা জানালা ফ্রেম কবাট ইত্যাদি বড় চৌকাঠায় পরিমাণ-মত নুন গুলিয়া সেই লোনা-জলে দুই এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উঠাইয়া উত্তমরূপে বোজে শুকাইয়া ক্রিয়াজোটে-অয়েল দ্বারা দুইবার বেষণ করিয়া প্রলেপ দিয়া কাজে লাগাইবে। ইহাতে কাঠ উই এবং ঘুণ উভয়ের হাত হইতেই রক্ষা পাইবে।

শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও

শ্রী স্বরেন্দ্রকিশোর নন্দী রায়

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, উইপোকাকার উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। যথা,—

১। ঘরের খুঁটি বা দালানের ভীম প্রভৃতি লাগাইবার পূর্বে ভীম প্রভৃতি লগণের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পবে উঁতে ভিজান-জল মাখাইয়া লইলে উই ধ্বংস হইতে পারে না। উহার সহিত তালপাতার বস মাখাইয়া লইলে আরও ভাল হয়।

২। দশ সেব জলে এক তোলা বসকর্পূব (বেনেদোকানে কিনিতে পাওয়া যায়) গুলিয়া সেই মিশ্রিত জল উইপোকাকার উপদ্রবের স্থানসমূহে ছিটাইয়া দিলে পোকাকার উপদ্রব কমিয়া যায়।

৩। জলের সহিত বেশী পরিমাণে লবণ মিশাইয়া সেই জল ছিটাইয়া দিলেও পোকা মরিয়া যায়।

উইপোকা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আমি গত মনোর চৈত্র সংখ্যা “ভাবতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠকে” আলোচনা করিয়াছি। প্রশ্নকর্তা উহা দেখিতে পাবেন।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৩৬)

অধুবাচীর মধ্যে অগ্নিপক পাদা খাওয়া নিষিদ্ধ কেন ?

অধুবাচীর মধ্যে যতী, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজগণের পাকদ্রব্য খাওয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

“যতিনো ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ দ্বিজসুতথা।

অধুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ ॥

অপাকং পবপাকং বা অধুবাচী দিনে তথা।

ভোজনং নৈব কর্তব্যং চাণ্ডালান্ন সনং স্মৃতং ॥”

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

কণ্ঠ পাথর



গান

আকাশ-তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
জামের বনে জামের বনে রব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তাব পূজক-ত্বা ডালে
পাতায় পাতায়।

নদীর ধারে বাবে বাবে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে বব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাতায় ॥

(শার্কিনিকৈতন পত্রিকা, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

আমিচ, কোথা হতে আজ পেলি ডাড়া
মার্টের গণে গামল বেণে
সপেক দাঁড়া।
জয়ধ্বজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে
পূব হতে কোন্ পশ্চিমেতে যায় বে উড়ে,
পূবপূব ভেবী কাবে দেষ যে মাড়া।
নাচের নেশা লাগল তালের পাতায় পাতায়
হাওয়ার দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হতে আকাশে কার চুটোছুটি
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি,
ত্বা নদীর চেটেয়ে চেটেয়ে কে দেষ নাড়া ॥

(শার্কিনিকৈতন-পত্রিকা, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাখী

তোমার হাতে রাখীখানি
বাবো আমার দখিন হাতে,
স্বয়ং যেমন ধরার করে
আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে।
তোমার আশিস্ আমার কাজে
সফল হবে বিশ্বমাঝে,
জলবে তোমার দীপ্ত শিখা
আমার সকল বেদনাতে ॥
কর্ম করি যে হাত লয়ে
কর্ম-বান্ধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে
জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।•

তোমার রাখী বাঁধো আঁটি,—

সকল বান্ধন যাবে কাটি,

কর্ম তখন বোধাব মত

বাজবে মধুর মুচ্ছ নাতে ॥

(প্রাচী, আশ্বিন)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবী দুর্গা

ত্রক্ষবৈবর্তপুত্র ত্রেতাযুগে প্রমাণ যোগাইয়াছে। এই
পুত্রাণেব মতে, আরোচিয় মগস্তুরে স্ববধ রাজা ও সমাধি বৈশ্য শরতে
দুর্গাব আবাদনা করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আরও
একটু গগনসব হইয়া বলেন, প্রবতে স্বয়জ রাজা সর্বপ্রথম দেবীর পূজা
করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমপাদে রাজা দক্ষুজমর্দন বর্তমান ছিলেন।
ইহার তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভূজা দুর্গামূর্তি পূজা
করিয়াছিলেন। স্মৃত্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব-তত্ত্বও আছে;
কাজেই রঘুনন্দনের সময়ে দুর্গোৎসব হইত। আকবরের চোপদার রাজা
কংসনারায়ণ বাঙলায় দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম
বিখ্যাত টাকাকার কৃষ্ণকান্ত, পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ—রাজা
গণেশের শ্রালক। ইনি এক মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন।
বাসুদেবপুত্রের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর-রাজাদের পুরোহিত।
উহাদের মধ্যে বমেশ শাস্ত্রী বাঙলা-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত
ছিলেন। তিনি বলিলেন—মহাযজ্ঞ চারিটি—বিশ্বজিৎ, রাজস্বয়,
অগ্নমেধ ও গোমেধ। একালে এ সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। তিনি
তাহাকে দুর্গোৎসব কবিবার ব্যবস্থা ও আদেশ দেন। আট
নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এই দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান
হয়। বমেশ শাস্ত্রী দুর্গোৎসবপদ্ধতি লেখেন। এই পূজাপদ্ধতি
দেখিয়া জগৎনাবায়ণ নয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পূজা করেন। এ পূজা
হইল বাসন্তী পূজা। তাব পব মাতোড়ের রাজা ও আরও অনেক
লোকে দুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পূজা আজও চলিয়া
গািমতেছে।

আমাদের দেশে প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। বাঙলার বাহিরে
কোন কোন দেশে শুধু নবপত্রিকার পূজা হয়। নেপালে নব-
পত্রিকা পূজা হয়।

ঋগ্বেদে (২য় মণ্ডল, ২৭শ সূক্ত, ৯ম ঋক্) উপদেশ করিতেছেন—

ঔ দিয়া চকে বরণো ভূতানাং গর্ভমাদধে।

দক্ষস্ত পিতরং তনা ॥

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,
দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের
নাম যে “দক্ষ-তনয়া” ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ।
যজ্ঞবেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষ-তনয়া অগ্নিকে
আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া লোকে বৈদিকযুগের শেষ দিকে ধারণা
করিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত
আর কেহ নন। কেন না, ‘রুদ্র’ শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই

বুঝাইত। তা' ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অষ্টমূর্তির নাম—রুদ্র, সর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান পাওয়া যায়। শিবের সহিত দক্ষ-কন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার। অগ্নির সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় পুরাণে শিব দুর্গার বিবাহ-ব্যাপার।

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সমস্ত বেদি রক্ষা করিতেন। ঋগ্বেদ (১।১৩৬।৩) উপদেশ করিতেছেন—

“জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ং ক্ষিতিং সর্বতীম,”—

“যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।”

ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডেব সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভূতি দানের দরকার হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর ...অর্থাৎ ‘দক্ষকন্যা’র উপর পীতবর্ণের মূর্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুলিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে “হব্যবাহনী” বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০।১৮।৩) ঈরিত হইয়াছে—“যাক্ৰুচো জাতবেদসো দেবতা হব্যবাহনীঃ। তাভির্ণো যজ্ঞমিষুঃ।” অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকট হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মূর্তিই আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের দশদিক্ দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের একজন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন; একজন যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার চারি হাত। একটি দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের জন্য অধোগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ। মূর্তিমান্ বেদজ্ঞান হইতেছেন সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা কার্তিকেয় যজ্ঞ রক্ষা করিতেন—আর গণেশ যজ্ঞের সূচনা করিয়া দেন, তাই তাঁর চারি হাত। বৈদিক যজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও যজমান, এই চারি হাত। দুর্গার পক্ষেও এগুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়া আমরা পাই—

বি পাজসা পুথুনা শোশুচানো বাধস্য দ্বিসো রক্ষসো অসীবাঃ। ৩।১৫।১।

“তুমি বিস্তীর্ণ তেজোধারা অত্যন্ত দীপ্তিমান্, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।”

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিক মন্ত্রে অগ্নি-দেবতার নিকট অশ্বরগণকে বধ করা হইতেছে।

দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি, তাহার আর-একটি প্রমাণ এই—

দুর্গা দেবীর অর্চনাকালে আমরা সামবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—

“ও অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সংসি

বর্হিসি।”

বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, ‘দক্ষ-কন্যা’ ক্রমশঃ ‘উমা’তে পরিণত হইলেন, ‘উমা’ ‘অম্বিকা’য় এবং ‘অম্বিকা’ ‘দুর্গা’য় পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন

না। যজ্ঞবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রী-দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

শুক্ল যজুর্বেদ (৩।৫৭) [বাহুবলী সংহিতা] বলিতেছেন—হে রুদ্র, এই তোমার হবির্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আশ্বাদন কর—‘এষ তে রুদ্রভাগঃ স্বশ্রা অম্বিকায় ঙ্ং জুষস্ব স্বাহা।’ তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আমরা দুর্গা মহাদেব কার্তিক গণেশ নন্দিকে একসঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। উমা অম্বিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন উমাপতি, অম্বিকাপতি। তখন উমা বা অম্বিকা মহাদেবের ভগিনী নন। আমরা তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের উক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

১। পুরুষশ্চ বিদ্ব সহশ্রাশ্চ ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্বহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্বহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্বহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। [১০ম প্রপাঠক। ১ম অনুবাক। ৫] তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় মহাসেনায় ধীমহি। তন্নো যমুথঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৬]

২। কাত্যায়নায় বিদ্বহে কন্বকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৭] নাবায়ণোপনিষৎ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছে—“কাত্যায়নায়ৈঃ বিদ্বহে, কন্বকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।”

[সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গব্যতায় হইয়া থাকে। তাই ‘দুর্গা’ বুঝাইতে ‘দুর্গি’র প্রয়োগ হইয়াছে। ‘দুর্গিঃ দুর্গলিঙ্গাদিব্যতায়ঃ সর্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।’]

৩। নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপত্যে-
-ম্বিকাপত্য উমাপত্যে নমো নমঃ। ১০।১৮।

বৃহদেবতা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে (২।৭৮, ৭৯) আমরা দেখিতে পাই, অদिति বাক্ সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন। আমরা যে দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, তাঁহার বাহন সিংহ। দেবী বাক্ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্যসাধনায় তাঁহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক্ ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে (Shakti and akta by Sir John Woodroffe pp. 456-457.) তাহার প্রমাণ আছে। বাক্ এবং দুর্গা যে অভিন্ন, বৃহদেবতা তাহার প্রমাণ। আমরা যতটুকু পাইলাম, তাহা হইতে দুর্গার সহিত সিংহের সংশ্বে একটা কারণ স্থির করা যাইতে পারে। ঋষিধান-ব্রাহ্মণে (৪।১৯) রাজিসুক্ত বাচনের নির্দেশ আছে। পূজাকালে স্থালিপাক যজ্ঞরাত্রির পূজা করিতে হয়। দেবী বাক্ ও যজ্ঞ-রাত্রি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিন্ন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (৩।৪।৬।১০) উল্লেখ আছে যে, ইহারা কখন কখন সম্পূর্ণ অভিন্ন। রাজিসুক্ত ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ঋকসুক্ত (২৫) রাজিদেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১) স্থান পাইয়াছে। এই আরণ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুর্গা হব্যবাহনী ও অগ্নি এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুর্গা ও অগ্নি, অভিন্ন বলিয়া দুর্গাকে জিহ্বাশালিনী বলা হইয়াছে। এই জিহ্বা সাতটি। তাহাদের নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সধুজবর্ণা, স্কুলিঙ্গিনী এবং শুচিস্মিতা। এই সপ্তজিহ্বা প্রকট করিয়া যে দুর্গা বলিগ্রহণ করেন, গৃহ্যসংগ্রহ (১।১৩।১৪) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পূজা হইত। সেই দেবতাগুলি

বৈদিক যুগের শেষ দিকে দুর্গা নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাঙ্গালনেয়ী-সংহিতায় অশ্বিনী রুদ্রভগিনী, তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০।১৮) দুর্গা রুদ্রপত্নী। এই আরণ্যকে (১০।১) আবার দুর্গাদেবীর আরাধনা আছে। সেইখানে তিনি বৈরোচনী। বিরোচন সূর্য্য বা অগ্নির নাম। অশ্বজ (১০।১১৭) যেখানে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেখানে দুর্গার (দুর্গির) আরও দুইটি নাম আছে—একটি কাম্যায়নী, অপরটি কাম্যকুমারী। কেনোপনিষদে (৩।২৫) পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞা দেবী হিমবানের কাম্যা উমা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) রুদ্রকে উমাপতি বলা হইয়াছে। এই আরণ্যকে (১০।২৬।৩০) সরস্বতীকে বরদা, মহাদেবী সন্ধ্যাবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে আবার এগুলিকে দুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

বৈদিক যুগ হইতে পরযুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে দুর্গা-তন্ত্রের আরম্ভ হইয়া রামায়ণ-মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়।

(যমুনা, কার্তিক)

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কৈফিয়ৎ

কবি হোন বা কলাবিৎ হোন তাঁরা লোকের ফরমাস টেনে আনেন,—রাজার ফরমাস, প্রভুর ফরমাস, বহুপ্রভুর সমাবেশরূপী সাধারণের ফরমাস। ফরমাসের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। তার একটা কারণ, অন্ধরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চলতে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশাপাশি নেই। উভয়ত্রই যাদের ট্যাঙ্কো দিতে হয়—এক জায়গায় খুসি হয়ে, আরেক জায়গায় দায়ে পড়ে—তাদের বড় মুষ্কিল। জীবিকা অর্জনের দিকে সময় দিলে ভিতর-মহলের কাজ চলে না। যেখানে ট্রামের লাইন বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশা করা মিথ্যা। এই কারণে ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপোষ হয়েছে এই যে, মালি জোগাবে ফুল আর ট্রাম-লাইনের মালেক জোগাবে অন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে মানুষ অন্ন জোগায় মর্ত্যলোকে তার প্রতাপ বেশি। কারণ, ফুলের সখ, পেটের জ্বালায় সঙ্গে জবরদস্তিতে সমকক্ষ নয়।

শুধু কেবল অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের সুযোগটাই বড় কথা নয়। ধনীদেব যে টাকা, তার জন্ত তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিন্দুক আছে, কিন্তু গুণীদের যে কীর্ত্তি, তার খনি যেখানেই থাক তার আধার ত তাদের নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে কীর্ত্তি সকল কালের, সকল মানুষের। এইজন্ত তার এমন একটি জায়গা পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল দেশকালেব সে গোচর হতে পারে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মঞ্চের উপর যে কবি ছিলেন, সেদিনকার ভারতবর্ষে তিনি সকল রসিক-মণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—গোড়াতেই তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়নি। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবির ভাল কাব্যও দৈবক্রমে এইরকম উঁচু ডাঙাতে আশ্রয় পায় নি বলে কালের বশ্যাস্রোতে ভেসে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ-কথা মনে রাখতে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফরমাস তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্তই তাঁরা মারা যান না, ভাবীকালের জন্তে টিকে থাকেন। লোভে পড়ে ফরমাস যারা সম্পূর্ণ

স্বীকার করে নেয়, তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের করবার জো নেই। তাঁরা রাজার ফরমাস পুরোপুরী খেটেছিলেন, এইজন্তে তখন হাতে-হাতে তাঁদের নগদ-পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফরমাস খাটতে অপটু ছিলেন বলে দিওনাগের স্কুল হস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে ফরমাস খাটতে হয়েছে তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে বলেছিলেন “যে আদেশ, মহারাজ; যা বলছেন তাই করব” অথচ সম্পূর্ণ আরেকটা কিছু করেচেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্ত্তিকলাপের অস্তোষ্টিসংকার হয়ে যায়নি—চিরদিনের রসিক-সভায় তাঁর প্রবেশ অব্যাহত হয়েছে।

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে,—একটা প্রয়োজনের, আর একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের ফরমাসে এই প্রয়োজনের আসর সরগবন্দ হয়ে ওঠে, ভিতরের ফরমাসে লীলার আসর জমে। আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেছে; তার ক্ষুধা বিরাট, তার দাবী বিস্তর। সেই বহুবসনাধারী জীব তার বহুতর ফরমাসে মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে বেখেচে;—কত তার আসবাব আয়োজন, পাইক বরকন্দাজ, কাড়ানাকাড়া-ঢাকটোলের তুমুল কলরব—তার “চাই চাই” শব্দেব গর্জনে স্বর্গমর্ত্তী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই গর্জনেটা লীলার আসরেও প্রবেশ করে দাবী প্রচার করতে থাকে যে, তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত কবে তুলুক। সে-জনো সে খুব বড় মজুবী আব জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজী আছে। আগেকার রাজসভার চেয়ে সে হাঁকও দেয় বেশি, দামও দেয় বেশি। সেইজন্তে ঢাকীর পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীণকারের পক্ষে নয়। ওস্তাদ হাত জোড় করে বলে, “তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ কবে থাকতে রাজি আছি, বীণাটা গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরতেও রাজি আছি, কিন্তু আমাকে তোমাদের সদর-রাস্তায় গড়েব বাদ্যের দলে ডেকে না। কেন না, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তাঁর গানের আসরের জন্তে পূর্ক হতেই বায়না পেয়ে বসে আছি।” এতে জনসাধারণ নানা-প্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, “তুমি লোকহিত মান না, দেশহিত মান না, কেবল আপন খেয়ালকেই মান।” বীণকার বলতে চেষ্ঠা করে, “আমি আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি।” সহস্রসনাধারী গর্জন করে বলে ওঠে—“চুপ!”

জনসাধারণ বলতে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায়, স্বভাবতই তার প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভূত। এইজন্তে স্বভাবতই প্রয়োজন সাধনের দাম তার কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবজ্ঞা কবে। ক্ষুধার সময়ে বকুলের চেয়ে বার্ত্তাকুব দাম বেশি হয়। সেজন্তে ক্ষুধাতুরকে দোষ দিইনে; কিন্তু বকুলকে যখন বার্ত্তাকুর পদ গ্রহণ কববার জন্তে ফরমাস আসে, তখন সেই ফরমাসকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরের দেশেও বকুল ফুটিয়েচেন, এতে বকুলের কোনও হাত নেই। তাব একটিমাত্র দায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যাই ঘটুক, তাকে কারো দরকার থাক বা না থাক, তাকে বকুল হয়ে উঠতেই হবে,—ঝবে পড়ে ত পড়বে, মালায় গাঁথা হয় ত তাই সই। এই কথাটাকেই গীতা বলেচেন, “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ”। দেখা গেছে স্বধর্ম্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ম্ম

করিলে কখন কোনও পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি কার্যজননশক্তি তাহাই মায়া। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিতা মায়াকে সেই সর্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ-কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে—এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই অগ্নি বলা যায় না, সেই প্রকার পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনও পরমাশ্রা বলা যায় না। তাহা হইলে শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি? শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ এ-কথা বলিতে পার না, যেহেতু শূন্য সেই শক্তির কার্যস্বরূপ বলিয়াছি। সুতরাং মায়াকে সং হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ভবনীয় শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শক্তিতত্ত্ব এইরূপ লেখা আছে—

অপ্রমেয়স্ত শক্তিস্ত শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।

সৌখ্যচিন্মাত্ররূপস্ত সর্বস্তানাকৃতেরপি ॥

ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ ।

তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সূত্রত ॥

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃত্বকর্তৃত্বাপি চ ।

ইত্যাদিকানাং শক্তী নামস্তো নাস্তি শিবাশ্রয়নঃ ॥

অপ্রমেয় শক্তিযুক্ত শুভময় সৌখ্যচিন্মাত্র স্বরূপ আকৃতিবিহীন হইলেও তাহার ইচ্ছাসত্তা, ব্যোমসত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তার ক্রমশঃ বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতা সত্তা মহাসত্তা। পরমাত্মার জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাত্মা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্বাণ-প্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে লিখিত আছে—

তাহার পর দেখিলাম সেই মহাকাশে বিশাল-দেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * * * * * দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে ছায়ার স্তায় এক মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে নির্গত হইল। প্রথমে সেই মূর্তিটি ছায়া ধারণা হওয়ার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। * * * * * তাহার পর ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম—ছায়া নহে; একটি ত্রিলোচনা রমণীমূর্তি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণা, কৃশা, তাঁহার সর্বাঙ্গে শিরা পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিশাল দেহ জীর্ণ; তাঁহার বদনগুণ্ডল হইতে সতত বহিষ্কৃত নির্গত হইতেছিল, তিনি বাসস্ত বনরাজির স্তায় পুষ্পপল্লবরমণীয় শেখর ধারণ করিয়া ছিলেন। * * * * * তিনি এত কৃশা যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ; এইজন্য যেন বিধাতা সূদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা তাঁহার পতনোন্মুখ বিশীর্ণ দেহ একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি এত দীর্ঘ লম্বমান যে তাঁহার মস্তক ও চরণ নথ দেখিবার জন্ত আমাকে একবার অতি উর্দ্ধে একবার অতি নিম্নে গমনাগমন করিতে বধেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অস্ত্রতন্ত্রী দ্বারা গ্রথিত। শরীর প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর স্তায় মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত শরীর সূত্র দ্বারা বিজড়িত। সূর্য্যাদি দেবের ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক কমলমালা দ্বারা মালা গ্রন্থন করিয়া সেই মালা তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে বায়ু সঙ্কুচিত উজ্জলশিখাসম্পন্ন বহির সংযোগে সমুজ্জ্বল হইয়া ছিল। তাঁহার লম্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল; নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুণ্ডল নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল স্তনদ্বয় বিশুদ্ধ দীর্ঘ অলাবুর মত লম্বমান উরু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার খট্টাঙ্গমণ্ডলে কার্ত্তিকের ময়ূরপুচ্ছে ও ব্রহ্মার কেশজালে বিশোভিত ইন্দ্রাদিদেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল। তাঁহার দস্তপংক্তিরূপ চন্দ্রশ্রেণী

হইতে নির্মলকিরণপুঞ্জ বিনিঃসৃত হইতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অন্ধকার-সাগরের একটা উর্দ্ধরেখা উঠিয়াছে। * * * * * দেখিলাম তিনি কখনও একবাহু, কখন বহুবাহু হইতেছেন। কখনও অনন্ত বিশালবাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে-ছেন। তাঁহার বাহুসমূহের উৎক্ষেপণে এই জগৎরূপ নৃত্যমণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিতেছে। কখনও তিনি একমুখী, কখনও বহুমুখী, কখনও মুখবিহীনা হইতেছেন, কখনও বা অনন্ত ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন। কখনও এক পদে অবস্থান করিতেছেন, কখনও বহুপদা, কখনও বা অনন্তপদা, কখনও বা একেবারে পদশূন্য হইতেছেন। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমি তাঁহাকে কালরাত্রি বলিয়া অসুমান করিলাম। সাধুগণ ইহাকেই ভগবতী কালী বলিয়া থাকেন।

নির্বাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৮১ সর্গে—রাম কহিলেন, হে মুনিবর! ভগবতী কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত? আর তিনি শূর্ণ, ফাল, কুন্দাল মুসলাদির মাল্য ধারণ করেন কেন? বাশিষ্ঠ কহিলেন—সেই ভৈরব যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া বলিলাম তাঁহার যে মনোময়ী স্পন্দশক্তি তাঁহাকেই তুমি মায়া বা কালী বলিয়া জানিও। ঐ মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। ঐ ইচ্ছারূপিতা স্পন্দশক্তি জীবাশ্রীদের জীবনরূপে পরিণত হওয়ার জীবচৈতন্য নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি বা মূল কারণ বলিয়া 'প্রকৃতি' নামে দৃশ্যভাসে অনুভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া 'ক্রিয়া' নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বড়বাগ্নিস্থলার স্তায় দৃশ্যমান আদিত্য-মণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া 'শুষ্কা' নামে অভিহিত হন। উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীব্র বলিয়া তিনি 'চণ্ডিকা' নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া ইহার নাম 'জয়া'। সর্বসিদ্ধির আশ্রম বলিয়া ইহার নাম 'সিদ্ধা'। সর্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া ইহার নাম 'বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া'। বলে ইহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না, বলিয়া ইহার নাম 'অপরাজিতা'। ইহার মহিমা কেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম 'দুর্গা'। প্রণবের সারাংশশক্তিও ইনি; এইজন্য ইহার নাম 'উমা' (উ, ম, অ= উঁ)। নামজপকারীদের পরমার্থস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম 'গায়ত্রী'; সর্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইহার নাম 'সাবিত্রী'। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহা হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইহার নাম 'সরস্বতী'। ইনি গৌরাজী বলিয়া ইহার নাম 'গৌরী'; যখন শিবশরীরের অনুষ্টিপী হন তখনই গৌরী নামে অভিহিত হন। মস্তকের ভূষণবিন্দুরূপ ইন্দুকলা বলিয়াও ইহার নাম 'উমা'। উক্ত কাল ও কালী আকাশস্বরূপা বলিয়া উহাদের বর্ণ কৃষ্ণ।

উক্ত নির্বাণ-প্রকরণের পূর্বভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলায়ে অষ্টমাতৃকার আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাতৃকা যথা:— জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বা ও উৎপলা।

যজুর্বেদেও "অম্বিকা" দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় রুদ্রের ভগিনী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাতে উমা হৈমবতী বলা হইয়াছে। উমা ব্রহ্মবিদ্যা হইতে কালে ব্রহ্মশক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে। দেব্যোপনিষদে মহাদেবী ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য ও অশূন্য, আনন্দ ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বহুচোপনিষদে দেবী সর্বাঙ্গে একমাত্র ছিলেন এবং তিনিই ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-পরিশিষ্টের রাতিপরিশিষ্টে দুর্গা দেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়।

কৈবল্যোপনিষৎ:—



ভূগঙ্গী-তলায়



সৈদের চাঁদ

উমাসহায় পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্ ।

ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৭।

এখানে শিবকে ‘উমা’-সহায় বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম ও অষ্টাদশ অনুবাকে দুর্গা ও অম্বিকা বা উমাব উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গা অগ্নির সহিত অভিন্ন; তাহার কালী, করালী, মনোজবা মলোহিতা, স্ফুট্রবর্ণা, স্কুলিঙ্গিনী, শুচিস্নিতা নামে সমস্তজিহ্বা (গৃহসংগ্রহ ১।৩।১৪ ; মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৪) ।

পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।৪১, ৪২) ইন্দ্রাণী, বরুণানী, শর্বাণী, রুদ্রাণী, মুড়াণী, পদ পাওয়া যায়।

এই-সকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

মহাভারতের বিরাটপর্বে কথিত আছে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কথিত আছে অর্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদরচনাকালে ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-রচনাকালে দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন। উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যাকেই বলিত, কিন্তু অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমশঃ পরব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল এবং উমা মহেশ্বরের পত্নী ও মায়াক্ষিত্রী স্বরূপে উপাসিত হইলেন। সাংখ্যমতাবলম্বী ও অদ্বৈতবাদীগণও পরব্রহ্মের এই শক্তি স্বীকার করিলেন। মহাভারত-রচনাকালে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত হইয়া তাহার পূজা হইত। এইরূপ নগরে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া অগ্নি-পুরাণে ১০৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। “কারণ দেবালয়শূন্য নগর গ্রাম দুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইতে পারে”। ১৬-১৭। মহাভারতেও দুর্গাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনার সময়ে শক্তিক্রপিলী দুর্গাদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পত্নীর কল্পনা যে পাণিনির পূর্ববর্তী তাহাও পাইলাম।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।২৯০-২৯১—

বিনায়কশ্চ জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোহম্বিকাম্ ।

দূর্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দর্ভার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্ ॥

রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে ।

পূজান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥

অনন্তর বিনায়কজননী অম্বিকাকে দুর্বা সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য ও পূর্ণাঞ্জলি প্রদান করিয়া মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিবে। কাত্যায়ন-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে যজ্ঞপূর্বক পূজা করিবার বিষয় উল্লেখ আছে। বিষ্ণু-সংহিতার ষটপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দুর্গাসাবিত্রীর দ্বারা পুত হইবার উল্লেখ আছে। এই দুর্গাসাবিত্রী তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে। (কাত্যায়নে বিদ্বাহে কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ)—তৈত্তিরীয় আরণ্যক নবম অনুবাক । নারায়ণোপনিষৎমতেও এইরূপ।

ললিতবিস্তরের চতুবিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গল্প-পুরাণের পূর্ব খণ্ডে (অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে) দুর্গাদেবী অষ্টা-বিংশতিভূজা, অষ্টাদশভূজা, দ্বাদশভূজা, অষ্টভূজা এবং চতুভূজা রূপে পূজিত হইবার উল্লেখ আছে। নবম্যাঙ্গি তিথিতে তাহার পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি এবং তাহাদের অসিতাদ্বাদি ভৈরবের পূজাবিধানও আছে (চতুবিংশ অধ্যায়)। কুঞ্জিকা-পূজারও বিধান

আছে (ষড়্বিংশ অধ্যায়)। ত্রিপুরা ও জ্বালামুখীর পূজাবিধান আছে (২০৪ অধ্যায়)।

অগ্নিপুরাণে (অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠার প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এবং উমাপূজার বিবরণ ৩২৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। স্কট হইতে তারণ করেন বলিয়া দুর্গা নাম হইয়াছে (৩২৩ অধ্যায়)। তিনি বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেমকরী, বহুভূজা নামে প্রসিদ্ধা (১২ অধ্যায়)। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী গৌরীর পূজা করিবে। ইহার নাম গৌরীনবমী ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় অষ্টমীতে কন্যাতে সূর্য ও চন্দ্র মূলা-নক্ষত্রে সংক্রম হইলে তাহার নাম অর্ঘ্যদ্বিনা নবমী। তৎকালে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও মহিষমর্দিনীর পূজা করিবে; ইত্যাদি (১৮৫ অধ্যায়)। জম্বীর্ষী হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে পটে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি লিখিয়া এবং আয়ুধকাম্মুর্কাদিশস্ত্র ও ধ্বজাছত্রচামরাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। রাজিতে জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদান করিয়া পরদিবস পুনরায় পূর্ববৎ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—হে ভদ্রকালি! মহাকালি! দুর্গে! দুর্গতিহারিণি! ত্রৈলোক্যবিজয়ে! চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্ন হইয়া আমার শাস্তি ও যশোবিধান করুন। (২৬৮ অধ্যায়)।

(মাধবী, আশ্বিন)

শ্রী মনীষিনাথ বসু সরস্বতী

রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান

রামায়ণের নানাস্থানে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশালার উল্লেখ আছে। যন্ত্রবিজ্ঞানে আর্ধ্যভারতের সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা অপেক্ষা অনার্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল লঙ্কায় অধিক উন্নত ছিল। মানবী জ্ঞান অপেক্ষা দানবী জ্ঞানে বৈচিত্র্যের পরিচয় অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। (লঙ্কা ৩)।

অযোধ্যা ও লঙ্কা—উভয় স্থানের বর্ণনাতেই দুর্গাদির ও যন্ত্রাদির উল্লেখ আছে। উভয় স্থানের দুর্গাশীর্ষেই লৌহনির্মিত শত শত শতস্ত্রী নামক যন্ত্র রক্ষিত হইত।

রামায়ণের টীকাকার রামানুজ শতস্ত্রীকে নালিক আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া লিখিয়াছেন, রামায়ণে আগ্নেয়াস্ত্র ও নালিক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং শতস্ত্রীকে আধুনিক কামান-তুলা আগ্নেয়-অস্ত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কুশধ্বজের সংকান্ত রাজধানীতেও প্রাকারোপরি যন্ত্রধলকসমূহের উল্লেখ আছে। (রা ৭১)

লঙ্কায় রাবণের শয্যা-গৃহে যন্ত্র-ঢালিত পাখা ছিল। হনুমান নিশায়োগে সেই কক্ষে যাইয়া কৃত্রিমবালহস্তে বীজ্যমান পাখা বিন্ময়ে অবাক হইয়া দেখিয়াছিলেন।

“বালবাজনহস্তাভিবীজ্যমানং সমস্ততঃ ।” ৫।৫।১০

লঙ্কায় দানব শিল্পী বিশ্বকর্মা-রচিত শূন্যগামী “পুষ্পক” নামক একটি যান বা বিমান ছিল। পুষ্পক ছিল হংসঢালিত মহাবেগশালী বিমান। লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ সর্গ ১ শ্লোক। উহা আরোহীর ইচ্ছানুসারে, ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিত।

আকাশের উর্দ্ধদেশে উঠিয়া সেই স্থান হইতে নিম্নস্থিত জনপ্রাণী, ধর-বাড়ীর আকৃতি ক্রুরূপ দেখা যায়, কিঙ্কিয়া কাণ্ডের ৬২ সর্গে তাহার বর্ণনা আছে। এগুলি পরীক্ষিত সত্য বলিয়াই মনে হয়।

মাগরে সেতুবন্ধনে কোন উচ্চ বৈজ্ঞানিক রীতি আচরিত হইয়াছিল

কি না, মহর্ষির রচনায় তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু সাগর-বন্ধনে যে যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণে আছে। যথা—

হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ ।

পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ । ৫৬।৬।২২

হস্তীর স্তায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্বত-সকল উৎপাটিত হইয়া যন্ত্র-সাহায্যে (সমুদ্রে) নীত হইতে লাগিল।

সেতু যে কেবল জলে পাথর ভাসাইয়া হয় নাই, পরন্তু তাহাতে মাপ-পরিমাপেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা তিনি দেখাইতে ক্রটি করেন নাই। তাহার সংক্ষেপ বর্ণনাটি এইরূপ—প্রস্তরখণ্ডসকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে সমুদ্রের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশের দিকে উখিত হইতে লাগিল এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক বানর সূত্র ধরিয়া সেই সেতুর সম-বিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে বানর-শিল্পী নল ঘোরকর্মা কৰ্মাদিগের সাহায্যে সেতুবন্ধন করিতে লাগিল। (লঙ্কা ২২ সর্গ)

একস্থানে পাংশু যন্ত্রের সাহায্যে সেতু ও কূপ খননের উল্লেখ আছে। (৯।২।৮০)

রামায়ণে অর্ণবযানের উল্লেখ আছে। অর্ণব-যানের উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে। কিন্তু তাহা যন্ত্রে চালিত হইত, কি বায়ুবেগে চালিত হইত, অথবা নাবিকগণের চেষ্টায় চালিত হইত, সে সম্বন্ধে কোন আভাসই রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। ইহাকে রামায়ণে রাক্ষসী মারা বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১৭।৬।৮৫)

(সৌভভ, কার্তিক) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

রঙ্গ-প্রদর্শনী পদাবলী

বস্ত্রের রঙ্গের কথা কত আর ক'ব ।

নিত্য হয় অভিনয় দৃশ্য নব নব ॥

এলেন বিলাত-ফের্তা গায়ে কোর্তাকুতি ।

অধ গোরা অধ কালা বর্ণচোরা মূর্তি ॥

কুদয়ে দছুর যেন শার্দ লের নাতি ।

দর্পে হালে কেঁচো যেন সর্পের সজাতি ॥

পায়রা তোলে পাখম শিখীর দেখি শিখি ।

ঠোকর দিয়া বলে কাক “কেকা ডাকো দিকি ?”

নাসিকা বধন করি মুখিকা হুন্দরী

কি সরেস করিণী সেজেছে আহা মরি !

ডালা মিছরি ফেলি ধুএ' খুদে-পিপ্ড়েগুলি

ঝোলাগুড়ের সঙ্গে করে মরণ-কোলাকুলি ॥

এই-সব দৃশ্য দেখি বনি-গিয়া জড়,

কলির চতুর্থপাদে করিলাম গড় ॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কার্তিক) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে—

গগনে গগনে ডাকে দেয়া ।

কবে নব-বন-বরিষণে

গোপনে গোপনে এলি কেয়া ।

পূরবে নীরব ইসারাতে

একদা নিদ্রাহীন রাতে

হাওয়াতে কি পথে দিলি খেয়া ।

(আষাঢ়ের খেম্বালের কোন্ খেয়া)

যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা

কাঁটাতে কি ভয়ে দিলি ঢাকা ।

বুনি এলি যার অভিসারে

মনে মনে দেখা হল তারে—

আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া ।

(আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া)

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কার্তিক) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাম

নাম জিনিসটা মানুষের একটা অতি প্রিয় সম্পত্তি। সকল সম্পদ ত্যাগ করিলেও মানুষ নাম ত্যাগ করিতে পারে না। এই নামকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিবার জন্ত দেশ বিদেশে কত মানুষ শক্তি সামর্থ্য ধন জন মান ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। মানুষ অতি বড় শপথ করিবার সময় বলে ‘একথা যদি সত্য না হয়, তবে আমার নাম অমুকচক্র অমুকই নয়।’ অপমান করিবার একটি চরম উপায় মানুষের নামে ফুকুর পোষা।

পুরুষের মধ্যে আপামর সাধারণ সকলেরই নিজ নামে আজীবন অধিকার থাকে। কিন্তু প্রায় কোনো দেশেই স্ত্রীলোকের নিজের সম্পূর্ণ নামে অধিকার বিবাহের পর থাকে না। ভারতবর্ষেই এমন অনেক সভ্য দেশ আছে যেখানে আজ পর্যন্ত বহু স্ত্রীলোকের কোনো নাম নাই। পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায় সকল পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের নাম। সকল বাড়ীর বড় মেয়েই জেঠি অর্থাৎ বড়কী, মেজ মেয়ে মাইলি, সেজ মেয়ে সাঁইলি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি। আজকালকার অতি

নব্যা মেয়েদের অনেকের নিজস্ব একটা করিয়া নাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষেরই কোনো দেশে বিবাহের পর মেয়েদের সমস্ত নামটাই বদলাইয়া যায়। বিবাহের পূর্বে যিনি ছিলেন শ্রীমতী দুর্গাবতী বসু, তিনি যদি হরিনাথ মল্লিককে বিবাহ করিয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীরানী মল্লিক হইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে চেনা দেবতার পক্ষেও কঠিন হয়। কিন্তু এমন প্রথাও ভারতে আছে। অবশ্য আজকাল কিছু কিছু বদল হইতেছে। আবার অনেক দেশ আছে যেখানে পুরুষের পারিবারিক নাম ব্যবহৃত হয় না। পিতার নাম হয়ত উদয়াচলম্, পুত্রের নাম অরুণাচলম্, কন্যার নাম পদ্মম্। এখানে যদি বিবাহের পর কন্যার নাম না বদল হয় ত একরকম চলে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়া ভদ্র লোক মাত্র মিষ্টার হইতে বাধ্য হন, স্ত্রীরাং পিতা হন মিঃ উদয়াচলম্, মাতা হন মিসেস উদয়াচলম্ পুত্রবধু হন মিসেস অরুণাচলম্, কন্যা কখনও মিস্ পদ্মম্ কখনও মিস্ উদয়াচলম্। এক্ষেত্রে পারিবারিক এক নাম থাকার সুবিধাটা থাকে না, অথচ মেয়েদের পক্ষে নিজস্ব নামটা হারাইবার একটা সম্ভাবনা থাকে।

বাংলাদেশে মেয়েদের এই নাম সমস্যাটা চিরকালই অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এ দেশে বিবাহের পূর্বে ও পরে মেয়েদের নাম একই থাকিবার কথা। ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহের পূর্বে শ্রীমতী স্ত্রীমতী দেবী থাকিলে বিবাহের পরেও তাহাই থাকেন। শূদ্র কন্যা হরিনতী দাসী হইলে শূদ্র বধু হইয়াও তাহাই থাকেন। আমরা যদি ইংরেজের দেখাদেখি 'মিসেসে'র সমাদর না করিতাম তাহা হইলে আমাদের দেশে নারীর অধিকারের একটা বড় সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। বাঙালী মেয়ের নামের গায়ে বিবাহিতার ছাপ মারিয়া সম্পত্তির সামিল করিয়া দেওয়ার নিয়মও এদেশে ছিল না। তাহারা সকলেই শ্রীমতী ; মিস্ অথবা মিসেস্ নহে।

আজকাল দুইটি কারণে এইরূপ নাম ব্যবহারেও একটু অসুবিধা ঘটতেছে। দাস নামটা যদিও বেশ

চলিয়া যাইতেছে তবু দাসী আখ্যাটায় হীনতার গন্ধ আছে বলিয়া মানুষে ইহা নিজে ব্যবহার করিতে চায় না এবং অপরকেও লিখিতে ভয় পায়। তাছাড়া অসবর্ণ বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণ কন্যা শূদ্রবধু এবং শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণবধু হইতেছেন। এ ক্ষেত্রেও জন্মাবধি সকল-কেই দেবী না বলিলে নাম বদলাইয়া যাইবার সম্ভাবনাটা থাকিয়া যায়। ফলে সমস্ত বাঙালী মেয়ের একটি মাত্র 'শেষনাম' হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার উন্নত-তর যুগে খ্যাতিনামা মহিলাদের নামের গোলমাল হইতে পারে। এখনি হইতেছে। ইন্দিরা দেবী এক বৎসর পূর্বেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুইজন ছিলেন। তবে ইহাতে আমাদের বেশী ভীত হইবার কারণ নাই। আমাদের দেশে এক পরিবারের দুটি মানুষের এক নাম রাখিবার নিয়ম না থাকাতে প্রতি পরিবারে পিতৃকুল মাতৃকুলের নাম বাদ দিয়া নাম রাখে। ফলে বাঙালীর নামের সংখ্যাই বেশী। পাশ্চাত্য দেশে পিতা মাতা পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির নাম রাখা একটা ফ্যাশান ও গৌরবের বস্তু। ফলে Elder Pitt, Younger Pitt প্রভৃতি বিখ্যাত পিতাপুত্রের একনামও প্রায় দেখা যায়। ইহাতেও ত ওদেশের লোকের বেশী অসুবিধা হইতেছে না।

ইহা ছাড়া আর একটি কথাও বলিবার আছে। স্ত্রীলোক যতই স্বাধীনতালাভ করুন, গৃহ-সংসারেই অধিকাংশের আজীবন কাটিবে। বাহিরেই পুরুষের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে, তবু হিন্দুস্থানী প্রভৃতি অনেক জাতির লোকের পদবীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই বেশ চলিতেছে। মিঃ হুম্মান প্রসাদ, কি মিঃ মাতাদীনের পিতৃনাম কিংবা পারিবারিক নামের দরকার হয় না। স্ত্রীরাং বস্তু কি চক্রবর্তীর গৃহলক্ষ্মী মঙ্গলা কি ক্ষেমকরীর পিতৃনাম অথবা পতির নাম নিজ নামের পিছনে না জুড়িলেও চলবে। তাহারা আজীবন দেবী লিখিলে ঘরের কি বাহিরের খুব বেশী ক্ষতি হইবে না, উপরন্তু নিজস্ব নাম চিরকাল বজায় রাখিবার গৌরবটা থাকিবে।

শ্রী শান্তা দেবী

রথযাত্রা

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশির কোনও রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ নাগরিক

মহাকালের রথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল। কিছুতেই নড়লেন না। কার দোষে হ'ল তা জানি, গণকারণ গুণে' বলে দিয়েছেন।

২ নাগরিক

হয়ত কারো দোষ নেই, হয়ত মহাকাল ক্লান্ত, আর চলতে রাজি নন।

১ নাগরিক

আরে বল কি? চলতে রাজি না হলে আমাদের চলবে কি করে? ঐ দেখনা, রথের দড়িটা পড়ে' আছে, কত যুগের দড়ি—কত মানুষের হাত পড়ে'ছে ঐ দড়িতে, এমন করে' ত কোনোদিন ধুলোয় পড়ে' থাকেনি।

৩ নাগরিক

রথ যদি না চলে, আর ঐ দড়ি যদি পড়ে' থাকে তাহলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গীলায় দড়ি হবে।

৪ নাগরিক

বাবা রে, ঐ দড়িটা দেখে ভয় লাগ'ছে, মনে হচ্ছে ও যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণা ধরে' উঠবে।

৩ নাগরিক

দেখ না ভাই, একটু একটু যেন নড়'ছে মনে হচ্ছে।

১ নাগরিক

আমরা যদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে' ওঠে, তাহলে যে সর্কনাশ হবে।

৩ নাগরিক

তাহলে জগতের সব জোড়গুলো বিজোড় হয়ে উঠবে রে। তাহলে রথটা চলবে আমাদের বৃকের পাঁজরের উপর দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলে'ই ত ওর চাকার তুলায় পড়িনে। এখন উপায়?

১ নাগরিক

ঐ দেখনা, পুরুতঠাকুর বসে' মন্ত্র পড়'ছে।

২ নাগরিক

রথযাত্রায় সব আগেই ঐ পুরুতঠাকুরের দলরাই ত দড়ি ধরে' প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মন্ত্র পড়ে'ই কাজ সারবেন নাকি?

৪ নাগরিক

চেষ্টার ক্রটি হয়নি। ভোরের বেলা সেই অন্ধকার থাকতে সবার আগে ওঁরাই ত একচোট টানাটানি করে' নিয়েছেন। কলিযুগে ওঁদের কি আর তেজ আছে রে?

৩ নাগরিক

ঐ দেখ, আমার কেমন মনে হচ্ছে ঐ রশিটা যেন যুগ-যুগান্তরের নাড়ীর মত দব্দব্দ কর'ছে।

১ নাগরিক

আমার মনে হচ্ছে ঐ রথ চলবে কোনো এক পুণ্যাঙ্গী মহাপুরুষের স্পর্শ পেলে।

২ নাগরিক

আরে, রথ চালাতে পুণ্যাঙ্গী মহাপুরুষের জন্তে বসে থাকলে শুভলগ্নও ত বসে' থাকবে না। ততক্ষণ আমাদের মত পাপাঙ্গীদের দশা হবে কি?

১ নাগরিক

পাপাঙ্গীদের দশা কি হবে সেজন্তে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

২ নাগরিক

বলিস কি রে! পুণ্যাঙ্গীর জন্তে এ জগৎ তৈরি হয়নি। তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। সৃষ্টিটা আমাদেরই জন্তে। দৈবাৎ দুটো একটা পুণ্যাঙ্গী দেখা দেয়; বেশিক্ষণ টিকতে পারে না—আমাদের ঠেলা খেয়ে বনে জঙ্গলে গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়।

১ নাগরিক

তাহলে তুমিই দড়িটা ধরে' টান দাও না, দাদা, দেখা যাক রথ এগোয়, না দড়িটা ছেঁড়ে, না তুমিই পড় মুখ খুব'ড়ে।

২ নাগরিক

দাদা, আমাদের সঙ্গে পুণ্যাঙ্গাদের তফাৎটা এই যে, গুন্ডিতে তারা একটা ছোটো, আমরা অনেক। যদি ভরসা করে' সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চলবেই। মিলতে পারলেম না বলে' টানতে পারলেম না, পুণ্যাঙ্গাদের জন্তে শৃঙ্খর দিকে তাকিয়ে রইলেম।

৪ নাগরিক

ওরে ভাই, দড়িটা মনে হল যেন নড়ে' উঠল, কথা-বার্তা সামলে বলিস্ রে!

১ নাগরিক

শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মমুহুর্তে রথের প্রথম টানটা পূর্বো-হিতের হাতে, দ্বিতীয় প্রহবে দ্বিতীয় টানটা রাজার, সেও ত হায়ে গেল রথ এগোল না; এখন তৃতীয় টানটা কাব হাতে পড়বে?

(সৈন্যদলের প্রশ্ন)

১ সৈন্য

বড লজ্জা দিলে বে! স্বয়ং রাজা হাত লাগালে সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাজার জনে ধবে' টান দিলুম, চাকার একটু কঁচাচ কঁচা শব্দও হল না।

২ সৈন্য

আমরা ক্ষত্রিয়, আমবা ত শূদ্রের মত গোক নই— রথটানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া।

২ সৈনিক

কিনা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করচে কুড়ুলখানা নিয়ে রথটাকে টুকরো টুকরো করে' ফেলি। দেখি মহাকাল কেমন ঠেকাতে পাবেন!

১ নাগরিক

দাদা, তোমাদের অস্ত্রের জোবে রথ চলবেও না, রথ ভাঙবেও না। গণৎকার কি গুনে' বলেচে তা শোনো নি বুঝি?

১ সৈনিক

কি বল ত।

১ নাগরিক

ত্রৈতা যুগে একবার যে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন তাই ঘটবে।

১ সৈনিক

আরে ত্রৈতায়ুগে ত লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল।

১ নাগরিক

সে নয়, সে নয়।

২ সৈনিক

কিন্দ্রিফ্যাকাণ্ড?

১ নাগরিক

তারি কাছাকাছি। সেই যে শূদ্র তপস্যা করতে গিয়েছিল, মহাকাল তাতেই ত সে দিন ক্ষেপে উঠেছিলেন। তাব পব বামচন্দ্র শূদ্রের মাথা কেটে তবে বাবাকে শাস্ত্র কবেছিলেন।

৩ সৈনিক

আজ ত সে ভয় নেই, আজ ব্রাহ্মণই তপস্যা ছেড়ে দিযেচে, শূদ্রের ত কথাই নেই।

১ নাগরিক

এখানকাব শূদ্রেরা কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করেছে। পবা পড়লে বলে, আমরা কি মানুষ নই? স্বয়ং কলিযুগ শূদ্রের কানে মন্ত্র দিতে বসেচে যে তারা মানুষ। বথ যে চলে না তাতে মহাকালের দোষ কি—না চললেই ভাল। যদি চলতে শুরু করে তা হলে চন্দ্রসূর্য্য গুঁড়িয়ে ফেলবে। শূদ্র চোখ রাঙিয়ে বলে কিনা আমরা কি মানুষ নই? কালে কালে কতই গুন্ড!

১ সৈনিক

আজ শূদ্র পড়চে শাস্ত্র, কাল ব্রাহ্মণ ধরবে লাঙল! সর্কনাশ!

২ সৈনিক

তা হলে চল ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কমে' হাত চালানো যাক। ওবা মানুষ, না আমরা মানুষ, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিই।

২ নাগরিক

রাজাকে কে গিয়ে বলেচে, কলিযুগে শাস্ত্রও চলে না, অস্ত্রও চলে না, একমাত্র চলে স্বর্ণমুদ্রা। রাজা তাই আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেচেন। ধনপতি টান দিলেই রথ চলবে এই-বকম সকলের বিশ্বাস।

১ সৈনিক

বেণের টানে যদি রথ চলে তা হলে আমরা অঙ্গ গলায় বেঁধে জলে ডুবে মরব।

২ সৈনিক

তা রাগ করলে চলবে কেন? বেণের টান আজকাল সবজায়গাতেই লেগেছে। এমন কি পুষ্পধনুর ছিলেটা বেণের টানেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার তীরগুলো বেণের ঘরেই তৈরি।

৩ সৈনিক

তা সত্যি, আজকাল আমাদের রাজত্বে বাজা থাকেন সামনে, কিন্তু পিছনে থাকে বেণে।

১ সৈনিক

পিছনেই থাকে ত থাকনা, আমরা ত থাকি ডাইনে বাঁয়ে, মান ত আমাদেরই।

৩ সৈনিক

পাশে যে থাকে তার মান থাকতে পারে, কিন্তু পিছনে যে থাকে ঠেলাটা যে তারি।

(ধনপতির অনুচরদের প্রবেশ)

১ সৈনিক

এরা সব কে?

২ সৈনিক

আংটির হীবে থেকে আলোর উচ্চিৎড়েগুলো চোখের উপর লাফ দিয়ে পড়ছে।

৩ সৈনিক

গলায় সোনার হার নয় ত, সোনার শিকল বললেই হয়। কে এরা?

১ নাগরিক

এরাই ত আমাদের ধনপতি শেঠীব দল। ঐ সোনার শিকল দিয়ে এরা মহাকালকে বেঁধে ফেলেছে বলেই তাঁর রথ চলছে না।

১ সৈনিক

তোমরা কি করতে এসেচ?

১ ধনিক

রাজা আমাদের প্রভু ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কারো হাতে রথ চলছে না, তাঁর হাতে চলবে বলেই সবাই আশা করে' আছে।

২ সৈনিক

সবাই বলতে কে রে, বাপু? আর আশাই বা করে কেন?

২ ধনিক

আজকাল যা কিছু চলছে সবই যে ধনপতির হাতে চলছে।

১ সৈনিক

এখনি দেখিয়ে দিতে পারি তলোয়ার তার হাতে চলে না, আমাদের হাতে চলে।

৩ ধনিক

তোমাদের হাত চালাচ্ছে কে সেটা বুঝি এখনো খবর পাওনি?

১ সৈনিক

চূপ্. বেয়াদব!

২ ধনিক

আমরা চূপ্. করব? আজ আমাদেরই আওয়াজ জলে স্থলে আকাশে তা জান?

১ সৈনিক

তোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতশ্রী যখন বজ্রনাদ করে' ওঠে—

২ ধনিক

তোমাদের শতশ্রী বজ্রনাদে আমাদেরই কথা এক-ঘাট থেকে আরেক ঘাটে, এক হাট থেকে আরেক হাটে ঘোষণা করবার জন্তে আছে।

১ নাগরিক

দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে' পেরে উঠবে না।

১ সৈনিক

কি বল? পারবে না!

১ নাগরিক

না, তোমাদের কোনো তলোয়ার ওদের নিমক খেয়েছে, কোনটা বা ওদের ঘুস খেয়েছে, খাপ থেকে বের করতে গেলেই তা বুঝতে পারবে।

১ ধনিক

শুনেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার জন্তে নর্ষদা-তীরের বাবাজীকে আজ আনা হয়েছিল। কি হ'ল খবর জান?

২ ধনিক

জানি বই কি। যখন এরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল, দেখল, প্রভু পদ্মাসনে দুই পা আটকে দিয়ে চিং হয়ে পড়ে' আছেন। সাড়াশব্দ নেই। বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানো হল। কিন্তু পা দু'খানা আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে, চলে না।

১ নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কি, তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে একবারও চলার নাম করেনি। তা বাবাজি বললেন কি ?

২ ধনিক

বলা-কওয়ার বলাই নেই। চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেচেন। গৌ গৌ করতে লাগলেন, তার থেকে যাব যে-বকম খেয়াল সে সেই-রকমেরই অর্থ করে' নিলে।

১ ধনিক

তার পরে ?

২ ধনিক

তার পর ধরাধরি করে' বাবাজিকে রথতলা পর্যন্ত আনা গেল। কিন্তু যেমনি দাড়ি ধরলেন রথের চাকা মাটির মধ্যে বসে' যেতে লাগল।

১ ধনিক

হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে ডুবিয়েচেন, মহাকালের রথটাকে স্কন্ধ তেমনি তলিয়ে দিচ্ছিলেন বুঝি ?

২ ধনিক

ওঁর পঁয়ষটি বৎসরের উপবাসের ভাৱে চাকা বসে' গেল। একদিনের উপবাসের ধাক্কাতেই আমাদের পা চলতে চায় না !

১ নাগরিক

উপবাসের ভাবের কথা বল্চ, তোমাদের অহঙ্কারের ভারটা বড় কম নয়।

২ নাগরিক

সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ কবে। দেখব আজ তোমাদের ধনপতিব মাথা কেমন হেঁট না হয়।

১ ধনিক

আচ্ছা দেখো। বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় কে ? সে ত আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে' দেয় তা হলে তাঁর যে চলা না-চলা দুই সমান হয়ে উঠবে ! পেট চলা হল সব চলার মূলে।

(মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি

মন্ত্রী মশায়, আজ আমাকে ডাক পড়ল কেন ?

মন্ত্রী

রাজ্যে যখন কোনো অনর্থপাত হয় তখন ত তোমাকেই সর্বাগ্রে ডাক পড়ে।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বারা তার ত্রুটি হয় না। কিন্তু আজকের সঙ্কটটা কি রকমের ?

মন্ত্রী

শুনেচ বোধ হয়, মহাকালের রথ আজ কারো হাতের টানেই চল্চে না।

ধনপতি

শুনেচি। কিন্তু মন্ত্রী, এ-সব কাজ ত এত দিন—

মন্ত্রী

জানি, এতদিন আমাদের পুরোহিত ঠাকুররাই এ-সব কাজ চালিয়েচেন। কিন্তু তখন যে এঁরা স্বাধীন সাধনার জোবে নিজে চলতেন, চালাতেও পারতেন। এখন এঁরা তোমারই দ্বারে অচল হয়ে বাধা, এখন এঁদের হাতে কিছুই চল্বে না।

ধনপতি

অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাজপারিষদ সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো ত বাধা ঘটেনি। তখন আমরা ত কেবল চাকায় তেল জুগিয়ে এসেচি, রশিতে টান দিইনি ত।

মন্ত্রী

দেখ শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চল্চে বাবা মহাকালের বখচক ঘোবাব দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হয়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রশি ধরতে-

না-ধরতে রথটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মত ধড়ফড় করে' নড়ে' উঠত। এবারে যে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বল, শাস্ত্রই বল সমস্ত অর্থহীন হয়ে পড়েচে—অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে।

ধনপতি

আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্ঠা করে' দেখুক যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে সকল লোকের সাম্নে—

মন্ত্রী

কেন আর দেরি করা শেঠজি? রাজ্যের সমস্ত লোক উপোষ করে' আছে, রথ মন্দিবে গিয়ে না পৌঁছলে কেউ জলগ্রহণ করবে না। তোমার চেষ্ঠাতেও যদি রথ না চলে লজ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্ঠা ব্যর্থ হ'ল, দেশস্বদ্ধ লোক ত তা' দেখেচে।

ধনপতি

তঁারা হলেন লোকপাল, আমরা হলুম পালের লোক; জনসাধারণে তাঁদের বিচার কবে একরকমে, আমাদের বিচার করে আরেক রকমে। রথ যদি না চলে আমার লজ্জা আছে, কিন্তু রথ যদি চলে তা হলে আমার ভয়। তা হলে আমার সেই শুভাদৃষ্টের স্পর্ধা কোনো লোক ক্ষমা করতে পারবেই না। কতখন কাল থেকে তোমরাই ভাবতে বসবে আমাকে খরী কবা যায় কি উপায়ে?

মন্ত্রী

যা বল্চ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তবুও রথ চলা চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধা কর তা হলে দেশের লোক ক্ষেপে যাবে।

ধনপতি

আচ্ছা তবে চেষ্ঠা করে' দেখি। কিন্তু যদি দৈবক্রমে আমার চেষ্ঠা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো না। (দলের লোকদের প্রতি) বল, সিদ্ধিরস্ত!

সকলে

সিদ্ধিরস্ত!

ধনপতি

বল, জয় সিদ্ধি দেবী!

সকলে

জয় সিদ্ধিদেবী।

ধনপতি

টান্বে কি! এ রশি যে তুলতেই পারিনে। মহাকালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন কি সহজ লোকের কর্ম! (দলের লোকের প্রতি) এস, তোমরাও সবাই এস। সকলে মিলে হাত লাগাও। আমার খাতাঞ্চি কোথায় গেল? এস, এস। এস কোষাধ্যক্ষ। আবার বল, সিদ্ধিরস্ত—টানো! সিদ্ধিরস্ত, আরেক টান। সিদ্ধিরস্ত—জোরে! নাঃ, কিছুই হ'ল না! আমাদের হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ্চে।

সকলে

হুয়ো! হুয়ো!

১ সৈনিক

যাক! আমাদের মান রক্ষা হ'ল।

ধনপতি

নমস্কাব, মহাকাল! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি স্থির হয়ে রইলে। আমার হাতে যদি তুমি টলতে, আমারি ঘাড়ের উপরে টলে' পড়তে, একেবারে পিষে যেতুম।

খাতাঞ্চি

প্রভু, এই যুগে আমাদের যে সম্মান সনাদর ক্রমেই বেড়ে উঠ্ছিল সেটার বড় ক্ষতি হল।

ধনপতি

দেখ, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকচক্ষুব অগোচরে বড় হয়েছি। আজ রথের সাম্নে এসে পড়ে আমাদের সঙ্কট ঘটেচে—আশেপাশে লোকের দাঁত-কিড়িমিড় অনেক দিন থেকে গুন্টি। এখন যদি স্পষ্ট সবাই দেখতে পায় যে, রশি ধবে' আমরাই রথ চালাচ্ছি তাহলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগবে যে বেশিক্ষণ টিক্বে না।

১ সৈনিক

যদি সেকাল থাকত তা হলে তোমার হাতে রথ চল্বে না বলে' তোমার মাথা কাটা যেত।

ধনপতি

অর্থাৎ তোমরা তা হলে হাতে কাঙ্ পেতে। মাথা কাটতে না-পেলেই তোমরা বেকার।

১ সৈনিক

আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে না; রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই মান খর্ব হয়ে গেছে।

ধনপতি

সত্যি কথা বলি—যখন সবাই গায়ে হাত দিতে সাহস করত তখন ঢেং বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই যে আমাদের মান্তে বাধ্য হয়েছে এরই মধ্যে আমাদের মরণ। মন্ত্রীমশায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাব্চ কি ?

মন্ত্রী

ভাব্চি সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো উপায় ত আর বাকি নেই !

ধনপতি

ভাবনা কি ! যখন তোমাদের কোনো উপায় খাটল না, তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের করবেন। তাঁর চল্‌বার গরজ তাঁরই, আমাদের নয়; তাঁর ডাক পড়লেই যেখান থেকে হোক তাঁর বাহন ছুটে আসবে। আজ যাদের দেখাই যাচ্ছে না, কাল তারা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বে। তার আগে আমার খাতাপত্র সামলাইগে। এস হে কোমাদ্যক্ষ, আজ সিন্ধুকগুলো একটু শক্ত করে বন্ধ করতে হ'বে।

(ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান।)

(চরের প্রবেশ)

চর

মন্ত্রী-মশায়, আমাদের শূদ্রপাড়ায় ভারি গোল বেধে গেছে।

মন্ত্রী

কেন, কি হয়েছে !

চর

দলে দলে আস্চে সব ছুটে। তা'রা বলে, বাবার রথ আমরা চালাব !

সকলে

বলে কি ! রশি ছুঁতেই দেব না !

চর

কিন্তু তাদের ঠেকাবে কে ?

সৈন্যদল

আমরা আছি।

চর

তোমরা ক'জনই বা আছ। তাদের মারুতে মারুতে তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে' ধাবে—তবু এত বাকি থাকবে যে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না।

চর

মন্ত্রী মশায়, তুমি যে একেবারে বসে' পড়লে ?

মন্ত্রী

ওরা দল বেঁধে আস্চে বলে' আমি ভয় করিনে।

চর

তবে ?

মন্ত্রী

আমার মনে ভয় হচ্ছে ওরা পারবে।

সৈনিকদল

বল কি, মন্ত্রী মহারাজ, ওরা পারবে মহাকালের রথ টানতে ? শিলা জলে ভাসবে ?

মন্ত্রী

দৈবাৎ যদি পারে তা হলে বিধাতার নূতন বিধি শুরু হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই ত বিভীষিকা। যা বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে, তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়।

সৈনিকদল

কি করতে চান, আমাদের কি করতে বলেন ছকুম করুন। আমার কিছুই ভয় করিনে।

মন্ত্রী

সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে ভোলা হয়। গৌয়ার্ত্তমি করে', তলোয়ারের বেড়া তুলে' দিয়েই মহাকালের বচা ঠেকানো যায় না।

চর

তা কি করতে হবে বলেন।

মন্ত্রী

ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্ছে সংপরামর্শ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিন্তে পারে। সেই চিন্তে দিলেই আর রক্ষ নেই।

সৈনিকদল

তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি ? ওরা আসুক ?

চর

ঐ যে এসে পড়েছে ।

মন্ত্রী

তোমরা কিছুর কোরো না । স্থির হয়ে থাক ।

(শূদ্রদলের প্রবেশ)

মন্ত্রী

(দলপতির প্রতি) এই যে সর্দার ! তোমাদের দেখে' বড় খুসি হলুম ।

দলপতি

মন্ত্রী-মশায়, আমরা বাবার রথ চালাতে এসেছি ।

মন্ত্রী

চিরদিন তোমরাই ত বাবার রথ চালিয়ে এসেচ, আমরা ত উপলক্ষ্যমাত্র । সে কি আর জানিনে ?

দলপতি

এতদিন আমরা রথের চাকার তলায় পড়েছি, আমাদের দলে' দিয়ে রথ চলে' গেছে । এবার ত আমাদের বলি বাবা নিল না ।

মন্ত্রী

সে ত দেখতে পাচ্ছি । আজ ভোর-বেলায় তোমাদের পঞ্চাশ জন চাকার সামনে ধুলোয় লুটোপুটি করলে—তবু চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লক্ষণ দেখা গেল না । নড়ল না, কঁয়া কঁয়া করে' চীৎকার করে' উঠল না— তাদের স্তব্ধতা দেখেই ত ভয় পেয়েছি ।

দলপতি

এবারে রথের তলাটাতে পড়ুবাব জন্যে মহাকাল আমাদের ডাক দেননি তিনি ডেকেচেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে ।

পুরোহিত

সত্যি নাকি ? কেমন করে' জানলে ?

দলপতি

কেমন করে' জানা যায় সে ত কেউ জানে না । কিন্তু আজ ভোর-বেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে' গেছে । ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান সবাই বল্চে,—বাবা ডেকেচেন ।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্তে ।

দলপতি

না, টান দেবার জন্তে ।

পুরোহিত

দেখ, বাবা, ভালো করে' ভেবে দেখ, সমস্ত সংসার যারা চালায় মহাকালের রথের রশির জিম্মে তাদেরই পরে ।

দলপতি

ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও ?

পুরোহিত

তা দেখ, কাল খারাপ বটে, তবু হাজার হোক আমরা ত ব্রাহ্মণ বটে ?

দলপতি

মন্ত্রী-মশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও ?

মন্ত্রী

সংসার বলতে ত তোমরাই । নিজগুণে চল, আমরা চালাক লোকেরা বলে' থাকি আমরাই চালাচ্ছি । তোমাদের বাদ দিলে আমরা ক'জনই বা আছি !

দলপতি

আমাদের বাদ দিলে তোমরা যে ক'জনাই থাকনা, থাকবে কি উপায়ে ?

মন্ত্রী

হা, ঠা, সে ত ঠিক কথা ।

দলপতি

আমরাই ত জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ ; আমরাই বুনিচি বন্দ, তা'তেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা !

সৈনিক

সর্দারনাশ ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত জোড় কবে' বলে' আস্ছিল, "তোমরাই আমাদের অন্ন-বস্ত্রের মালিক" । আজ এ কি রকমের সব উল্টো বুলি ! আর ত সহ হয় না ।

মন্ত্রী

(সৈনিকের প্রতি) চুপ কর । (দলপতিকে) সর্দার, আমরা ত তোমাদের জন্তেই অপেক্ষা করছিলাম । মহা-

কালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বুঝিনে, আমরা
কি এত মূঢ়? তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে'
দিয়ে যাও, তার পরে আমাদের কাজ করবার অবসর
আমরা পাব।

দলপতি

আয় রে ভাই, সবাই মিলে টান দে! মরি আব
বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই।

মন্ত্রী

কিন্তু সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চলো। যে-রাস্তায়
বরাবর রথ চলেচে সেই বাস্তায়। আমাদের ঘাডের
উপর এসে না পড়ে যেন।

দলপতি

বগেব পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে
নেবেন, আমরা ত বাহন, আমরা কীইবা বুঝি। আয় বে
সবাই! ঐ দেখ্‌চিস্‌ বথের চূড়ায় কেতনটা ছুঁলে উঠেচে,
স্বয়ং বাবার ইসারা! ভয় নেই, আয় সবাই!

পুরোহিত

ছুঁলে বে ছুঁলে! রশি ছুঁলে! ছি, ছি!

নাগবিকগণ

হায়, হায়, কি সর্বনাশ!

পুরোহিত

চোখ বোজ রে তোরা সবাই চোখ বোজ, ক্রুদ্ধ মহা-
কালের মূর্ত্তি দেখলে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি।

সৈনিক

ও কি ও! একি চাকারই শব্দ নাকি? না আকাশ
আর্ত্তনাদ করে উঠল?

পুরোহিত

হতেই পারে না।

নাগবিক

ঐ ত, নড়ল যেন!

সৈনিক

ধুলো উড়েচে যে! অগ্নায়, ঘোর অগ্নায়! রথ
চলেচে! পাপ! মহাপাপ!

শূদ্রদল

জয়, জয় মহাকালের জয়!

পুরোহিত

তাই ত, এ কি কাণ্ড হ'ল!

সৈনিক

ঠাকুর, হুকুম কর! আমাদের সমস্ত অগ্নিশব্দ নিয়ে
'এই অপবিত্র বথচলা বন্ধ কবে' দিই।

পুরোহিত

হুকুম করতে ত সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি
ইচ্ছে কবে' জাত খোয়ান্‌ আমাদের হুকুমে তাব
প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

সৈনিক

তা হলে ফেলে দিই আমাদের অঙ্গ!

পুরোহিত

আব আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র!

নাগবিকগণ

আমরা যাই সব নগর ছেড়ে! মন্ত্রী-মশায় তুমি কি
করবে? কোথায় যাচ্ছ?

মন্ত্রী

আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরতে।

সৈনিক

ওদের সঙ্গে মিলবে?

মন্ত্রী

তা হলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখ্‌চি ওরা
যে আজ তাঁর প্রসাদ পেয়েচে। এ ত স্বপ্ন নয়, মায়া নয়।
ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে' আজ কেউ মান রক্ষা করতে
পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে।

সৈনিক

কিন্তু তাই বলে' ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে বাশ ধরা!
ঠেকাবই ওদের। দলবল ডাকতে চললুম। মহাকালের
রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে।

পুরোহিত

আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে
লাগতে পারব।

মন্ত্রী

ঠেকাতে পারবে না। এবার দেখ্‌চি চাকার তলায়
তোমাদেরই পড়তে হবে।

সৈনিক

তাই সই। বাবার রথের চাকা এতদিন যতসব চণ্ডালের মাংস খেয়ে অশুচি হয়ে আছে। আজ শুক মাংস পাবে।

পুরোহিত

ঐ দেখ, ঐ দেখ মন্ত্রী! এবি মধ্যো বথটা রাজপথ থেকে নেমে পড়েছে। কোথায় কোন্ পল্লীর উপরে পড়বে কিছুই বলা যায় না।

সৈনিক

ঐ যে ধনপতিব দল ওখান থেকে চীংকাব করে' আমাদের ডাক্চে! রথটা যেন ওদেরই ভাঙাব লক্ষ্য করে' চলেছে। ওরা ভয় পেয়ে গেছে। চল চল, ওদের বক্ষা করিগে!

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষা কর, তার পবে অন্য কথা। আমার ত মনে হচ্ছে রথটা ঠিক তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে নুঁকেছে, ওর আর কিছু চিহ্নবার্কি থাক্বে না। ঐ দেখ!

সৈনিক

উপায়?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধর'সে—তা হলে বক্ষা পাবাব পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর দ্বিধা করবার সময় নেই। (প্রস্থান)

সৈনিক

(পরম্পর) কি করবে? ঠাকুর, তুমি কি করবে?

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কি করবে?

সৈনিক

জানিনে, রশি ধরব, না, লড়াই করব? ঠাকুর, তুমি কি করবে?

পুরোহিত

জানিনে, রশি ধরব, না আবার শাপ আওড়াবে বসব?

১ সৈনিক

শুন্তে পাচ্চ—হুড়মুড় শব্দে পৃথিবীটা যেন ভেঙেচুরে পড়্চে।

২ সৈনিক

চেয়ে দেখ, ওরা টান্চে বলে' মনেই হচ্ছে না। রথটাই ওদের ঠেলে' নিয়ে চলেছে।

৩ সৈনিক

প্রকৃত-ঠাকুর, দেখ্চ রথটা যেন বেঁচে উঠেছে। কি একম হেঁকে চলেছে। এতবার রথযাত্রা দেখেচি, ওর এরকম সজীবমূর্তি কখনো দেখিনি। এতকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলেছিল, আজ জেগে চলেছে। তাই আমাদের পথ মান্চে না, নিজেব পথ বানিয়ে নিচ্ছে।

২ সৈনিক

কিছু গেল যে সব। রথযাত্রাব এমন সর্কনেশে উৎসব ত কোনোদিন দেখিনি। ঐ যে কবি আস্চে, ওকে জিজ্ঞাসা করনা, এ-সবের মানে কি?

পুরোহিত

আমরাই বুঝতে পারলুম না, কবি বুঝতে পারবে? ওরা ত কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শাস্ত্রের কথা জানেই না।

১ সৈনিক

শাস্ত্রের কথাগুলো কোন্কালে মরে' গেছে ঠাকুর। তাই তোমাদের কথা ত আর খাটে না দেখি। ওদের যে সব তাজা কথা, তাই শুন্লে বিশ্বাস হয়।

(কবির প্রবেশ)

২ সৈনিক

কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পার?

কবি

পারি বৈ কি।

১ সৈনিক

প্রকৃতের হাতে রাজার হাতে রথ চল্লে না, এব মানে কি?

কবি

ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মান্লেই হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক

কবি, তোমার কথা শুন্লে হঠাৎ মনে হয়, হৃদয় বা একটা মানে আছে, খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি

এরা বাধন মানতে চায়নি, শুধু চলাকেই মেনেছিল।
তাই স্বাধীন বাধনটা উন্নত হয়ে ওদের উপর লাজ
লাগছে, ওঁ ডিয়ে যাবে।

পুরোহিত

আর তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান যে দড়ির
নিয়ম সামলে চলতে পারবে ?

কবি

হয়ত পারবে না। একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা,
তখন মরবার সময় আসবে। দেখোনা, কালই বলতে
হুকুম করবে, আমাদেরি হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়।
মে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিজ্ঞা নিজের হাতে গড়েছেন,
অস্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল
পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হয়ে উঠবেন বল-রামের
চেলা, হলধরের মাংসামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

পুরোহিত

তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের
ডাক পড়বে।

কবি

ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর। মহাকাল বারেবারেই
রথযাত্রায় কবিদের ডেকেছেন। তারা কাজের লোকের
ভিড় ঠেলে পৌঁছতে পারেনি।

পুরোহিত

জায়া চালাবে কিসের জোরে ?

কবি

পায়ের জোরে নয়ই। আমরা মানি ছন্দ, আমরা
জানি এক-কোঁকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি

ছন্দরকে কর্ণধার করলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে।
তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোর, বা
অস্ত্রের কঠোর,—সেটা হল ভীকুর বিশ্বাস; দুর্বলের
বিশ্বাস, অসাড়েঁর বিশ্বাস।

সৈনিক

ওহে কবি, তুমি ত উপদেশ দিতে বসলে, ওদিকে যে
আগুন লাগল।

কবি

যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেছে। যা থাকবার
তা থাকবেই।

সৈনিক

তুমি কি করবে ?

কবি

আমি গান গাব, “ভয় নেই।”

সৈনিক

তাতে হুঁবে কি ?

কবি

যারা রথ টান্চে তারা চলবার তাল পাবে। বেতাল
টানটাই ভয়কর।

সৈনিক

আমরা কি করব ?

পুরোহিত

আমি কি করব ?

কবি

তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই।
দেখ, ভাব। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠ। তার
পরে ডাক পড়বার জন্তে তৈরী হয়ে থাক।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



স্মৃতির মন্দির—

মানুষের মনে যে স্মৃতি-মন্দির আছে, তাহা প্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড। এই মন্দিরে যে কত সহস্র প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহার মনের এই-সমস্ত প্রকোষ্ঠ বেশ শৃঙ্খলার সহিত সাজান থাকে, তাহার স্মৃতি-মন্দিরকে একটি গোছান ভাঁড়ার-ঘর বলা চলে। কোথায় কি রাখিয়াছে, কবে রাখিয়াছি আর কেনই বা রাখিয়াছি, ভাবিয়া আকুল হইতে হয় না। প্রয়োজন-মত যাহা দরকার তাহা বাহির করিয়া লইলেই হয়।



স্মৃতি-মন্দিরের দুয়ার

স্মৃতিশক্তি চালনা করিয়া বৃদ্ধি করা যায়। স্মৃতিশক্তির চর্চা যাহারা যত বেশী করে, তাহাদের স্মৃতিশক্তি তত প্রখর। কিন্তু স্মৃতিশক্তির চর্চা না করিয়া ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়া পড়া যায় যে এক ঘটনা পূর্বে কি করিয়াছি, তাহা বহুকষ্টে স্মরণ করিতে হয়।

পৃথিবীতে অনেকের আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তির কথা শোনা যায়। এমন অনেক মোকদ্দমার সাক্ষীর কথা শোনা যায়, যাহারা অনেক বৎসর পরেও কোন এক বিশেষ ঘটনার বা কথাবার্তার সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিতে পারে। কোন কোন লোক কাহাকে কি কি কথা কেমনভাবে বলিয়াছে, তাহার সমস্ত আবৃত্তি করিতে পারে। যাহারা সামান্য সামান্য ব্যাপারও মনে রাখিতে পারে না, তাহাদের কাছে ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টার দ্বারা সবই সম্ভব হইতে পারে।

ওয়শিংটন এবং নেপোলিয়ন তাঁহাদের বিরাট সৈন্যদলের হাজার হাজার লোকের নাম এবং মুখ মনে রাখিতেন এবং তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। এভ্রাহাম লিন্কলন জীবনে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নথদর্পণে ছিল। শিকাগোর এক ধবর-কাগজ-আপিসের বালক-কর্মচারী সহরের প্রত্যেকটি রাস্তার নাম, অবস্থান, কারার-বিগ্রেড-আপিসগুলির নম্বর, অবস্থান, ধানার ঠিকানা এবং বড় বড় সব আপিসের ঠিকানা মুখস্থ রাখিয়াছে। ইহাও বড় সহজ ব্যাপার নয়, কারণ শিকাগো সহরটি কলিকাতার দ্বিগুণ।

আমাদের দেশেও এই-রকম অনেক লোক আছেন এবং ছিলেন।

চেষ্টা করিয়া কেহ নেপোলিয়ন, রামমোহন, বা রবীন্দ্রনাথ হইতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিয়া আমরা সকলেই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া খুব উঁচু স্তরে তুলিতে পারি। তাহাতে আমাদের এবং সমাজের অনেক লাভ হয়। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার কয়েকটি প্রকৃষ্ট নিয়ম আছে—

(১) একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে।

(২) কোন জিনিষ দেখিবার সময় সকল ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে দর্শন করিতে হইবে—তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সবই মনের মধ্যে স্মৃতি-মন্দিরে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) মনের যে ক্ষমতা দুর্বল, চালনা এবং ব্যাঘাম দ্বারা তাহাকে সতেজ এবং সবল করিতে হইবে।

(৪) প্রথম-দর্শনের ফল চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) মধ্যে মধ্যে গত-ঘটনাবলীর মনে মনে পুনরালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

(৬) নিজের স্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস করিতে হইবে। কাগজে লেখা নোটের উপর ভরসা করা ঠিক নয়।



স্মৃতিমন্দির—স্মৃতি-প্রকোষ্ঠগুলি দেখিবার জিনিষ

(৭) কোন ঘটনা মনে রাখিতে হইলে—কি ঘটনা, কখন ঘটিল, কোথায় এবং কেন ঘটিল, কে কে ইহার সহিত জড়িত, ঘটনার ফল কি হইল, ইত্যাদি সবই মনে রাখিবার চেষ্টা করা দরকার।

(৮) স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে—তাহা না হইলে ইহার কোন দরকার নাই। বাজে এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় মনে করিয়া রাখিবার তেমন দরকার নাই।

“আমার স্মৃতিশক্তি নাই” বলিয়া দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ স্থানিয়মে চেষ্টা করলে সকল লোকেরই স্মৃতিশক্তি সতেজ হইবেই। তবে যেমন-তেমনভাবে ইহা করিলে চলিবে না—ইহার জন্ত রীতিমত সাধনা প্রয়োজন।

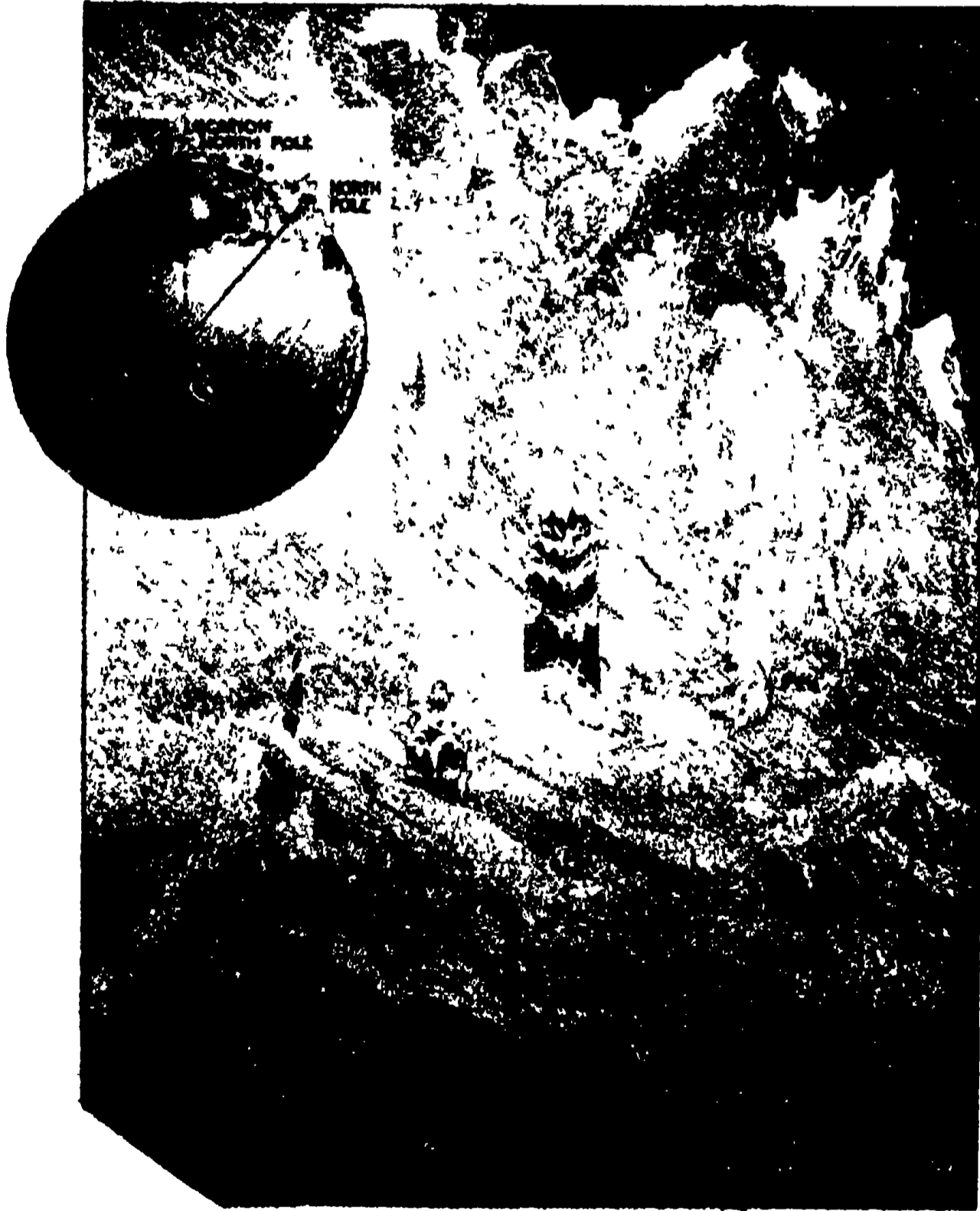
ভবিষ্যৎ বরফের যুগ—

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, মনে হয়, কিছুদিন পরে পৃথিবীময় আর-একটা বরফের যুগ আসিয়া পড়িতে পারে। সমস্ত পৃথিবী বড় বড় বরফের চাপে ভরিয়া যাইবে এবং তাহাদের চাপে বর্তমান সভ্যতার সকল রকম কীর্তি লোপ পাইবে।



কাপ্তেন ম্যাকমিলানের জাহাজ “বাওদোইন” বরফের মধ্যে

কাপ্তেন ডোনাল্ড ম্যাকমিলান এই প্রস্নের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ম্যাকমিলান সাহেব ১৯০৮ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত উত্তর মেরু প্রদেশে ৮ বার গিয়াছেন।



ভবিষ্যৎ বরফের যুগের কল্পিতচিত্র—মানুষের তৈরী ঘর বাড়ী কেমন করিয়া বরফে চাপা পড়িয়া যাইবে, তাহাই দেখান হইয়াছে

আমেরিকার অনেক ভূতত্ত্ববিদ বলিতেছেন যে আমেরিকা একটা বরফের যুগের শেষে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার আরম্ভে উত্তর-আমেরিকার ৪,০০০,০০০, বর্গমাইল জমি বরফে ঢাকা ছিল—এবং ইহা ৫০০,০০০, বছর পূর্বে আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে বরফের চাপ মাঝে মাঝে অত্যধিক বাড়িয়া উঠিত, এবং এই অবস্থা প্রায় ২৬,০০০ বছর করিয়া থাকিত।



ভবিষ্যৎ বরফের যুগের লোকেরা বোধ হয় এইরকম পোষাক পরিবে

কাপ্তেন ম্যাকমিলান বলেন যে আল্‌স্‌ পাহাড়, আলাস্কা, ইত্যাদি স্থানে বরফ কমিয়া আসিতেছে, এবং লোকালয় হইতে ক্রমশঃ দূরের প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু উত্তর মেরুপ্রদেশে গ্লেশিয়ার ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে। গত ৭০ বছরের ম্যাপ এবং বিবরণ দেখিলে ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। উত্তর প্রদেশসমূহে (আমেরিকায়) ক্রমশঃ বেশী বরফ-পাত হইতেছে। সমস্ত পাহাড় উপত্যকা বরফে ছাইয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে গাছ-পালা জীব-জন্তু সব মরিয়া যাইতেছে। উত্তর আটলান্টিকেও বরফের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

গ্রিনল্যান্ডের জমির পরিমাণ ৩০০,০০০ বর্গ মাইল, তাহার ৪০০,০০০ বর্গমাইল বরফে ঢাকা। বাকি ১০০,০০০ মাইল বরফে ঢাকিয়া গেলে তাহার ফল আরো অনেক স্থানে চড়াইবে। এল্‌স্‌মেরার ল্যাণ্ড্‌ও ক্রমে

বরফে পূর্ণ হইতেছে। এই-সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া গেলে বরফের চাপ ক্রমশঃ সমুদ্রের জলে পড়িবে এবং বরফের অকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় লোকালয়ের দিকে ভাসিয়া আসিতে থাকিবে। তাহাতে যে কত জাহাজ এবং কতলোকের প্রাণ নষ্ট হইবে তাহার সংখ্যা নাই। কাপ্তেন ম্যাকমিলান বলিতেছেন যে এই বরফের বিস্তৃতির গতির পরিমাণ জানিতে পারিল হিসাব করিয়া বলা যাইবে যে আর কতদিন পরে উত্তর-আমেরিকা একেবারে বরফে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি পুন্ডরায় উত্তর-মেরুর দিকে যাত্রা করিয়াছেন—বরফের বিস্তৃতির গতি নিরূপণ করিবার চেষ্টায়। তাঁহার আশা আছে যে তাঁহার এই চেষ্টা পূর্ণ হইবে।

নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তিনি দেশের এবং মানুষের কল্যাণের জন্ত বার বার নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছেন। স্বাধীন জাতির লোক বাঁচিতে জানে বলিয়া মরিতেও জানে। বিদেশের লোক আসিয়া আমাদের গৌরীশঙ্করশৃঙ্গে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ আমরা মরার মত বসিয়া আছি।

লালমানুষদের কথা —

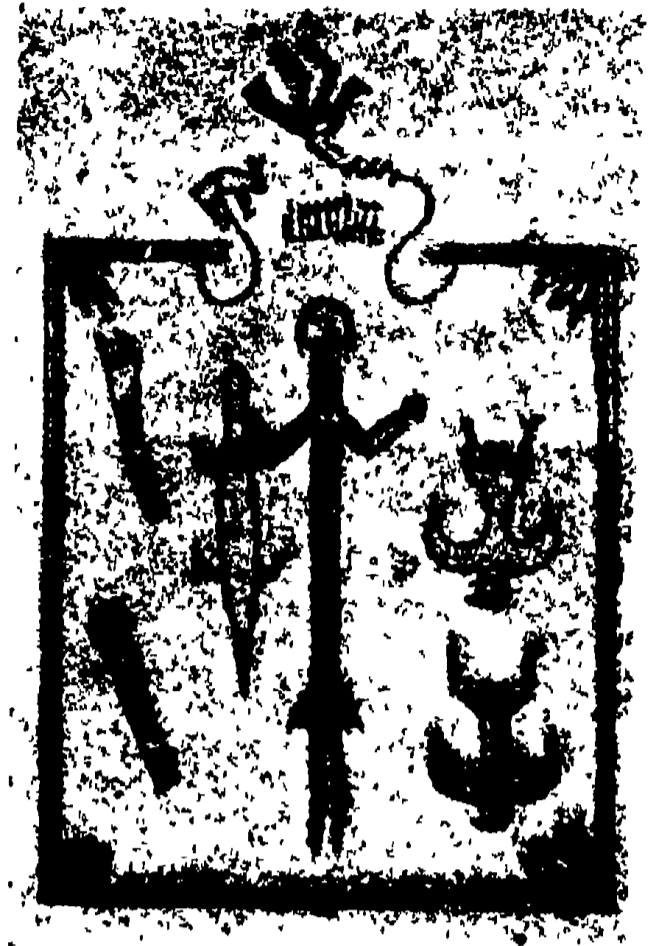
আমরা আমেরিকার লাল মানুষদের গল্প অনেক কিছুই পড়িয়াছি। এই লাল মানুষেরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহারা যে-সমস্ত জঙ্গলে বাস করিত, ক্রমশঃ যেতাজরা সে-সমস্ত দখল করিতেছে। তাহার ফলে লাল মানুষেরা ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া লয় পাইতেছে।



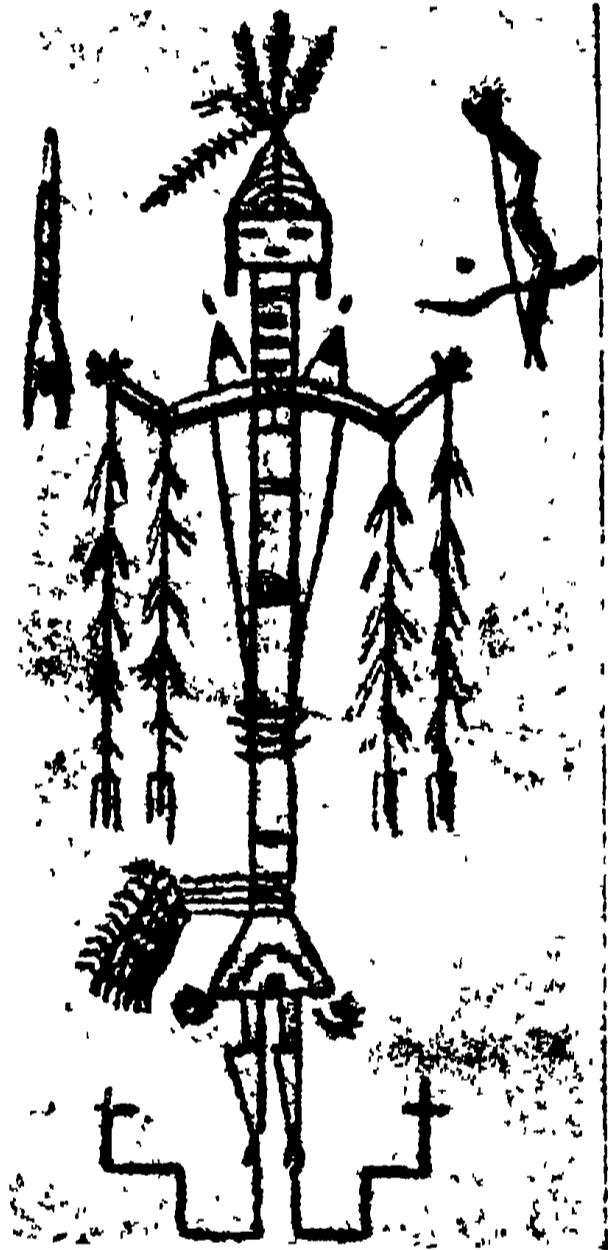
একদল লাল মানুষ

এই লাল মানুষদের মধ্যে নানাপ্রকার ভূত-প্রেত পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

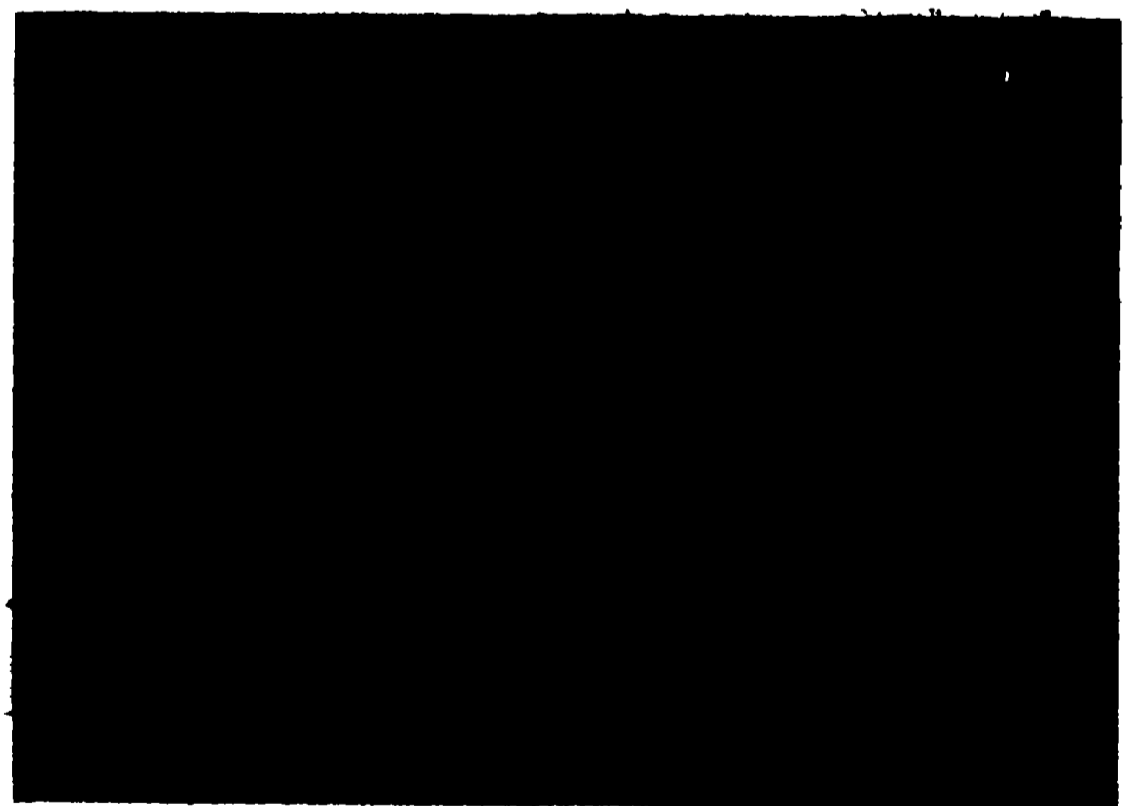
লালমানুষদের মধ্যে বাহারা বৈদ্য—তাহাদের সকলেই মানিয়া চলে। কারণ বিপদে তাহারা ভূতপ্রেতদের তাড়াইয়া দিয়া দেশে শান্তি আনে। নানারকমের মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা এই কাজ করিতে হয়। কোন উৎসব উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকারের চিত্র আঁকার পদ্ধতি আছে। এই-সমস্ত ছবি সূর্যোদয়ের পরেই শুরু করিয়া সূর্যাস্তের পূর্বে সারা করিতে হয়। ইহা শাস্ত্রের বিধান—কাজেই ইহার নড়চড় হইবার জো নাই। সবরকমের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট আনন্দ নিরানন্দের জন্ত বিভিন্নপ্রকারের ছবি আঁকিবার পদ্ধতি আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই ছবি বালির উপর আঁকা হয়—তবে যদি বালিতে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে হরিণের চামড়ার উপর আঁকা হয়। কয়েকটি চিত্রের নমুনা দেওয়া হইল।



“ঈগল্ ট্যাপ” — উৎসব-সময়ে এই ছবি আঁকা হয়



বালির উপর আঁকা তীর-মানুষের ছবি

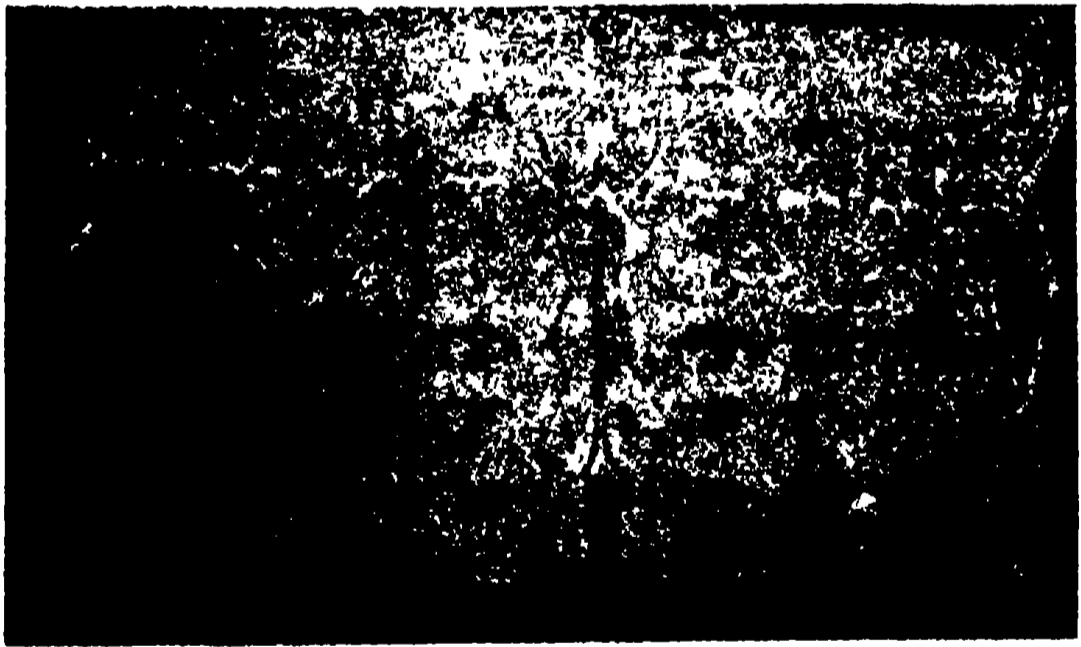


যুগের পঞ্চ যুগ ধরিয়৷ আমেরিকার লাল মানুষেরা এই নাটু-সিলু-ইড্-আই-ইশির অর্থাৎ রাসধনুর ছবি আঁকিয়া আসিতেছে



হাস্-কা-ইশি এবং ছ বোয়া

কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমার্কে লালমানুষদের একটি বিশেষ উৎসব হয়। তাহাতে তাহাদের আদিম কালের নানাপ্রকার আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক জমা হয়। এই উৎসবে দুইজন সর্দারের ছবি তোলা হয়। একজনের নাম হাস্-কা-ইয়াসি—ইনি নাভায়োশ প্রদেশের সর্কাপেফা অধিকবয়স্ক বৃদ্ধ। আর একজন ছ বোয়া (Du Bois)—সীমাস্ত্র প্রদেশের শেষ স্কাউট। এই দুইজন লোক বহুকাল ধরিয়া একে অশ্রের প্রাণবধ করিবার জন্য ঘুরিয়াছিল—একে অশ্রের পরম শত্রু ছিল। বর্তমানে ইহারা পরম শান্তভাবে বসিয়া আছে।



সাদা জমির উপর রঙীন বালি দ্বারা আঁকা রামধনু

লালমানুষদের এই-সমস্ত ছবি, অনেকের মতে, পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এই-সমস্ত চিত্র দেখিলে প্রাচীন গ্রীস অ্যাসিরিয়ার কথা মনে হয়। চিত্রের প্রত্যেকটি রেখার মধ্যে কিছু না কিছু অর্থ আছে। কিন্তু আশা আছে যেতাজ সভ্যতার নিক্ত আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লালমানুষদের সকল চিত্র ক্রমশঃ লোপ পাইবে। হয়ত দু-একটা চিত্রের নমুনা মিউজিয়মের এক কোণে টাঙ্গান থাকিবে।

দাঁতের কসরত—

মানুষের চৌরাল ভয়ানক শক্ত এবং জোরাল। আমরা অনেকেই সার্বকাসে দেখিয়াছি যে একজন লোক দাঁতে করিয়া খুব ভারী জিনিষ মাটি হইতে উত্তোলন করে। সামান্ত একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই



গাস্ লেসিস্ দাঁতের জোরে লোহার শিক্ ভাঙিতেছেন



গাস্ লেসিস্ দাঁতের জোরে লোহার শিক্ ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন

দাঁতে বেশ জোর করিতে পারে, এবং খুব ভারী দ্রব্য তুলিয়া অনেকেই অগাধ করিতে পারে। সামনের দাঁত অপেক্ষা পাশের দাঁতের শক্তি অনেক বেশী। হাত অপেক্ষা দাঁত দিয়া কোন জিনিষকে বেশী শক্ত করিয়া ধরা যায়। দাঁতের-ধরার ওজনও হাতের-ধরা ওজন অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। শক্তিশালী লোকে দাঁতের সাহায্যে ৩০০ পাউণ্ড ওজন দিয়া ধরিতে পারে। সাধারণ জোরাল ব্যক্তি মাটি হইতে ২৬০ পাউণ্ড ওজনের জিনিষকে, তাহার শরীরের সমস্ত পেশীতে জোর দিয়া, তুলিতে পারে। দাঁতের ব্যবহার যত বেশী হইবে, তাহার জোর ততই বেশী হইবে। ছেলেবেলা হইতে বাহারা সকল খাচ্চ দাঁত দিয়া ভাল করিয়া চিবাইয়া খায়, তাহাদের দাঁত সকল সময়েই বেশ জোরাল থাকে। দাঁতের অবশ্যে অনেকেই নানাপ্রকার অস্ত্র রোগে কষ্ট পায়।

অন্যদের দাঁত এত খাবাণ যে বাঁদাম ভাঙা হুরের কথা, একটু শক্ত



পিয়ানো এবং বাদক গাস্ লেসিসের দাঁতে ঝুলিতেছে

কিছুটা তাহারা চিবাইয়া খাইতে পারে না। ইহা ছেলেবয়সের অযত্নের শুভফল। অনেকে তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের দাঁত দিয়া বাদাম ইত্যাদি শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিয়া খাইতে মানা করেন। তাঁহাদের ধারণা ইহাতে দাঁত খারাপ হইতে পারে। ইহা ভুল ধারণা। শক্ত জিনিষ দাঁত দিয়া ভাঙ্গিলে মুখের এবং চোয়ালের অনেক শিরা এবং পেশী শক্ত হইবে এবং মুখের জোর বাড়িবে। জন্তুরা সকল জিনিষই দাঁতের সাহায্যে ভাঙ্গে বলিয়া তাহাদের দাঁতের এবং মুখের জোর এত বেশী।

যাহারা নরম খাবার ছাড়া অল্প কিছু খাইতে পাবে না, তাহারা যদি ক্রমে ক্রমে শক্ত খাবার চিবাইয়া খাইবার অভ্যাস করে, তবে তাহাদের দাঁতের জোর ক্রমে ক্রমে বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে হজম-শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে। দেখা গিয়াছে একজন লোকের দাঁতের চাপ এমনি করিয়া তিরিশ পাউণ্ড পর্যন্ত উঠিয়াছে—ইহাতে সময় লাগিয়াছিল মাত্র তিন-চার মাস!

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে কিছুকাল পূর্বে এক রকম বুনো বাদাম হইত—তাহা ভাঙ্গিতে প্রায় ১০০ হইতে ২০০ চাপ প্রয়োজন হইত। ঐ প্রদেশের লোকেরা ঐ বাদাম দাঁত দিয়া ভাঙ্গিয়া খাইত—সেইপ্রকার ঐখানের লোকদের দাঁতের অস্বাভাবিক জোর ছিল। এখন ঐ বাদামের চাষ হইতেছে—কিন্তু তাহার খোসা এখন সামান্য চাপে নষ্ট হইয়া যায়—কাজেই আর দাঁতের বেশী জোরের দরকার হয় না।

দাঁতের ব্যায়াম করিয়া দাঁতের জোর কি ভয়ানক বাড়ান যায় তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। একটা কাঠের কড়ি হইতে আট-ইঞ্চি-পৌতা একটা লোহা দাঁত দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা বড় সোজা কথা নয়। পিয়ানো-বাদককে পিয়ানো-সমেত দাঁড়ে বসাইয়া দাঁতে করিয়া শুল্লে বেশী-কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখাও রাম-শ্যামের কাজ নয়। যিনি এই কাজ দুটি প্রায়ই করেন—তাঁর নাম গাস্ লেসিস।

দাঁত যদি নীরোগ থাকে, তবে সকলেই হাড়, বাদাম ইত্যাদির মত শক্ত শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে পারেন, তাহাতে অপকার কিছুই হইবে না—উপকার হইবার সম্ভাবনা পুরা মাত্রায় আছে।

“মামির” অভিশাপ—

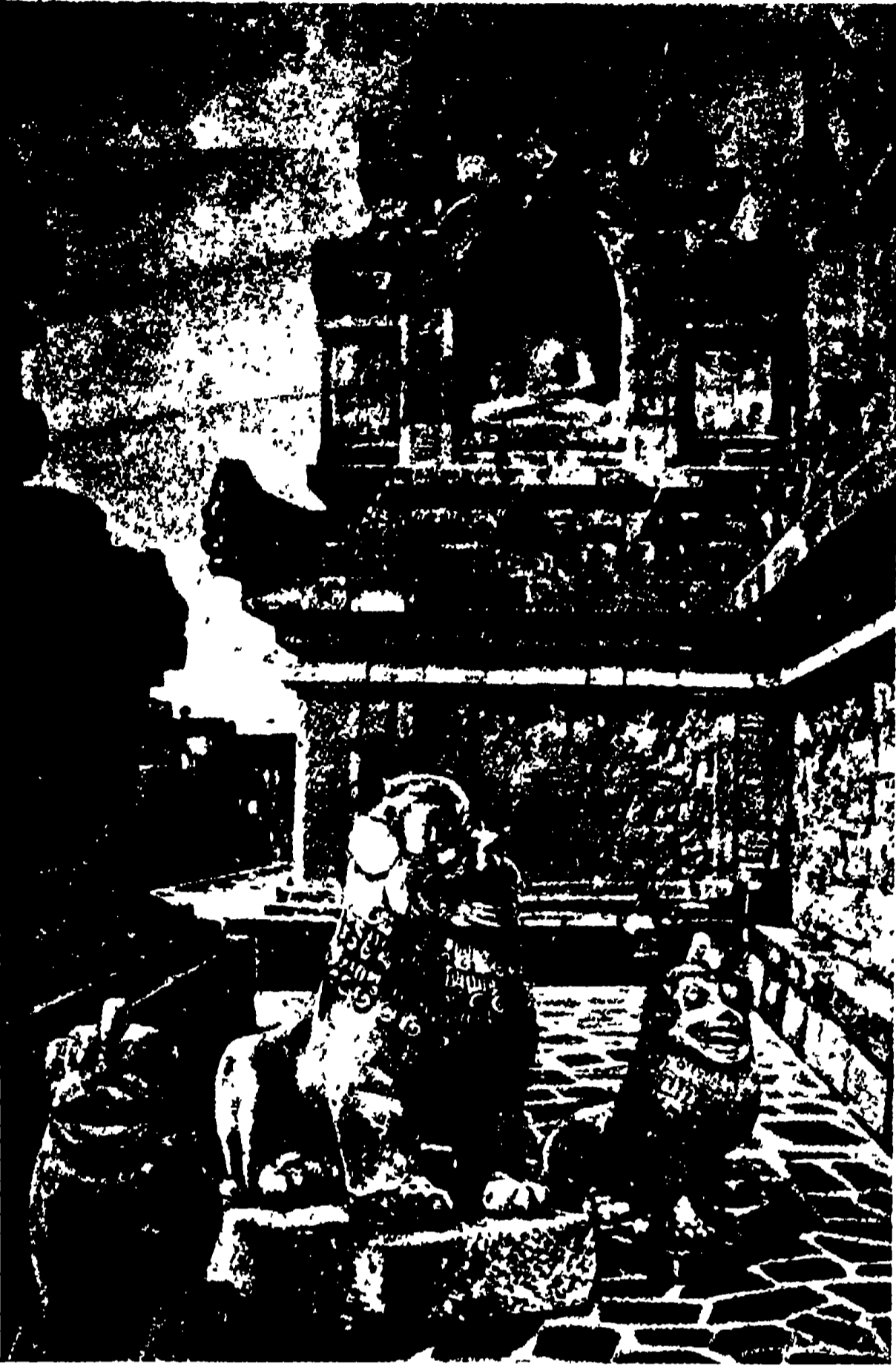
তুতানখামেনের মামি উদ্ধার করিবার কিছুকাল পরেই লর্ড কারনারভন্ মারা গিয়াছেন। ইহার পূর্বেও অনেক লোক বিশেষ বিশেষ মামির অধিকারী হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ ভোগ করিয়াছেন অনেকে আবার মারাও গিয়াছেন। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে মনে করেন যে মামিদের উপর কোন এক দৈবশক্তি ক্রিয়া করে, যাহা মামির চির-নিদ্রার ব্যাঘাতকারীকে নানাপ্রকারে বিপদে ফেলে। লোকে ভাবিয়া পায় না, যে, ৩০০০ বছর পূর্বের মৃত কবরস্থিত মামি কেমন করিয়া এই মহৎ অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে, ইজিপ্টের একটা মামির বাস্তুর এক টুকরা কাঠ আছে—তাহা খিব্‌স্ সহরের মন্দিরের একজন পুরোহিতপত্নীর। এই কাঠের টুকরা অনেক লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। ইজিপ্টলজিষ্টদের মতে এই পুরোহিতপত্নী খৃষ্টপূর্ব

১৬০০ অব্দে বাঁচিয়া ছিল। এই কফিনের ঢাকনায় একজন মৃত্যু নারীর মুখ নানা-রঙে আঁকা আছে। একজন ইংরেজ প্রথমে ইহা ক্রয় করেন। কাইরো পৌছিবার পূর্বেই তাঁহার হাত বন্ধুকের গুলিতে উড়িয়া যায়। তার পর তিনি খবর পাইলেন তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। অবশেষে তিনি নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার সঙ্গীও মারা গেলেন। তার পর এই কফিনের বাস্তুর ঢাকনি একজন ইংরেজ মহিলার হাতে আসে। তাঁহাকেও নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়। একদিন একজন অতিথি এই ভদ্রমহিলার গৃহে আসেন—তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকেন। তার পর কফিনের ঢাকনি দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি উহা বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন।

এই ঢাকনির একখানা ফোটো তোলা হয়। ফোটোতে মূর্তির চোখ দেখিয়া মনে হইত যেন তাহা একটা বিষাক্ত ঘৃণায় ভরা। এই কফিনের বাস্তুর ঢাকনি আরো অনেক হাত ঘুরিয়া অবশেষে মিউজিয়মে যায়। সে সেখানে কাহারো কোন অনিষ্ট না করিয়াই বাস করিতেছে।

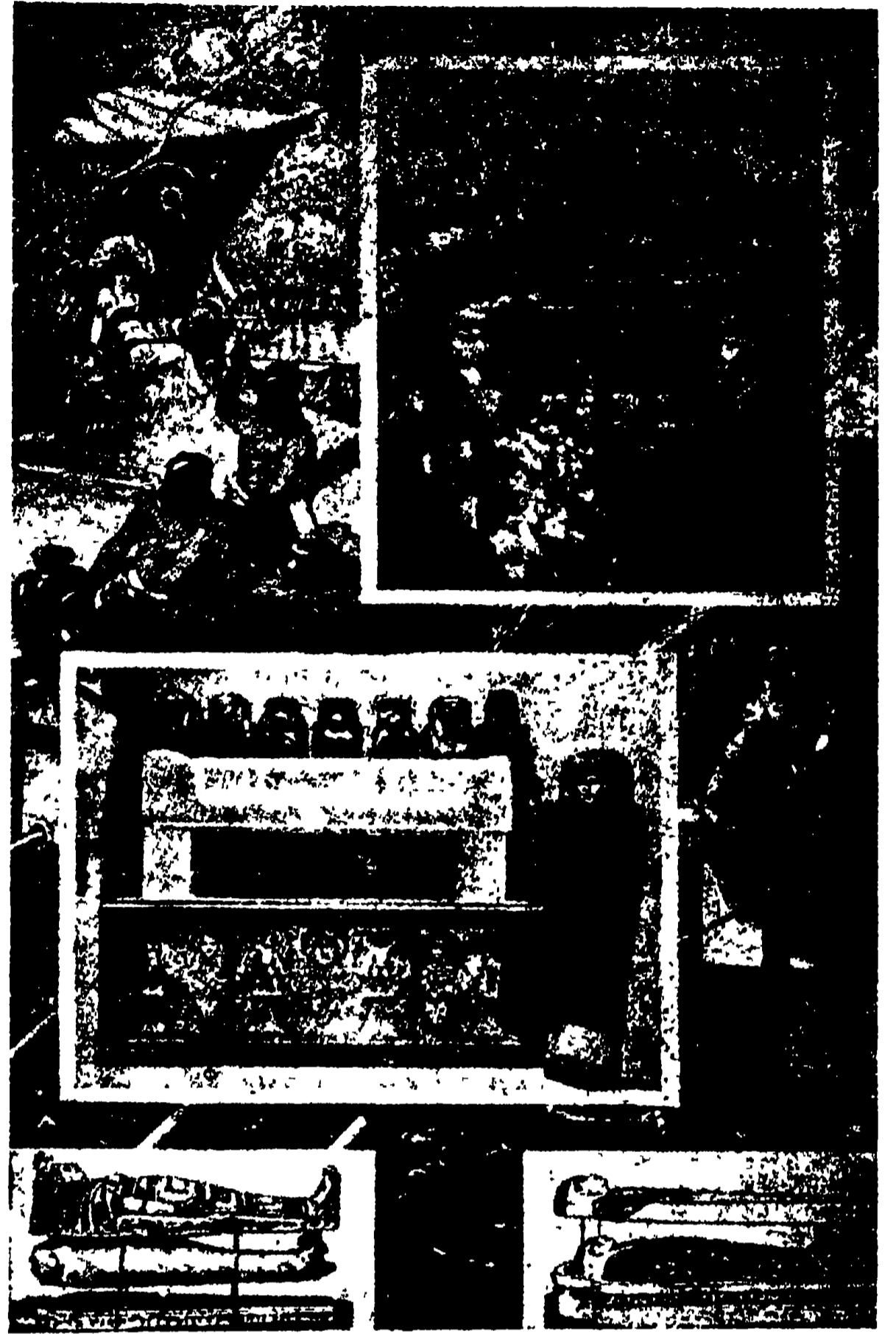
একটি কাঠনির্মিত গৌতম-বুদ্ধের মূর্তি সম্বন্ধে এমনি একটা কথা শোনা যায়। ভারতবর্ষে এক জাহাজের কাপ্তেন তাহা ক্রয় করেন। ইংলেণ্ডে পৌছিবার পূর্বেই হঠাৎ অকারণে জাহাজে আগুন লাগে। জাহাজের লক্ষেরা বুদ্ধমূর্তিকে জলে ফেলিয়া দিবার জন্ত জেদ করে। যাহা হউক কোনরকমে জাহাজকে লিভারপুলে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কাপ্তেন তখন এই বুদ্ধমূর্তিকে জলে ভাসাইয়া লইয়া তীরে লইয়া যান। কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কাপ্তেনের মৃত্যুর পর কাপ্তেন-ছহিতা বুদ্ধমূর্তিকে ঘরে রাখেন কিন্তু চাকর-বাকরেরা গোলমাল আরম্ভ করিল। কেহ বলিল মূর্তি চলিয়া বেড়ায়, কেহ বা বলিল মূর্তি চাঙ্গিদিকে তাকাইয়া দেখে। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও ভীত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে কোন বাহিরের লোক আসিলে সেও এই



এই বুদ্ধমূর্তিকে যে কেহ স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে,
তাহারই সর্বনাশ হইয়াছে

মূর্তি দেখিলে ভয় পাইত। অবশেষে ১৯১১ সালে এই মূর্তি লণ্ডনের এক মিউজিয়মে দান করা হয়।

এক হীরা সম্বন্ধেও এইরকম কথা চলিত আছে। হীরাটির ইংরেজী নাম Hope Diamond. কোন এক হিন্দু মন্দিরের এক মূর্তির কপাল হইতে ইহা খুলিয়া লওয়া হয়। ১৭ শতাব্দীতে টাভার্নিয়ের ইহা প্রথম ইউরোপে লইয়া যান। ইউরোপে পৌঁছিয়াই তাঁহার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হইয়া যায়। অবশেষে তিনি এই হীরা চতুর্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। রাজা লুই ইহা তাঁহার প্রিয়পাত্রী মাদাম মনুশেনকে দান করেন। মাদাম এই হীরা পাইবার অল্পকাল পরেই রাজার অমুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। তাহার পর রাজকুমারী লাঞ্চেল এই হীরার মালিক হন। ফরাসী বিদ্রোহীদের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ফাল্‌স নামে একজন ফরাসী ইহা পায়। চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে সে ইহা বিক্রয় করিয়া দেয় এবং অবশেষে সে অনাহারে মরে। ১৮৩০ সালে ইহা হেনরি টমাস হোপ নামে একজন ইংরেজ ক্রয় করেন। তাঁহার পৌত্র লর্ড হোপ ইহার অধিকারী হইয়া নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। এই হোপ ডায়মন্ড কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অনেককে ইহা সর্বস্বান্ত করিয়াছে। অনেককে পাগল করিয়াছে, অনেককে হত্যা করিয়াছে। অনেক ক্রোরপতি, বণিক, রুশীয় রাজকুমার ইত্যাদির সর্বনাশ করিয়া ইহা একজন আমেরিকান ক্রোরপতির হস্তে



ইজিপ্টের রাণী ক্লিওপেট্রার কবরের দুয়ার—
এইসব এখন যাদুঘরে আছে

আসে। কিছুদিন হইল তাঁহার একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে। প্রাচ্য দেশের এই সমস্ত মাসি, দেবমন্দিরের মূর্তি ইত্যাদি ভ্রবোর মধ্যে সত্যি কোন প্রকার শক্তি নিহিত আছে কি না কেহ বলিতে পারে না; বৈজ্ঞানিকেরাও এখনও ইহার কোন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

পুরাণকালের চিকিৎসা-শাস্ত্র—

ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদেবা একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ৪০০০ পুস্তক এবং ৪২০০ পুঁথি আছে। এই-সকল পুঁথির মধ্যে ১৪০০ খৃঃ অব্দের একজন ইহুদি বৈদ্যের লিখিত একটি পুঁথি আছে। ইহাতে প্রায় ১৩০০ রোগের ব্যবস্থা আছে।

বিছার কামড় সম্বন্ধে আছে—

যদি গাধার পিঠে চড়া অবস্থায় কোন লোককে বিছায় কামড়ায়, তবে সেই লোক যদি তৎক্ষণাৎ গাধার ল্যাঞ্জের দিকে মুখ করিয়া বসে, তবে কামড়ের জ্বালা গাধার দেহে প্রবেশ করিবে। এই ইহুদি বৈদ্য “আব্রাহাম” নামে খ্যাত। তিনি আরব-নারীদের দাঁত-মাজা সম্বন্ধে বলেন—কচি বাদাম-গাছের (যাহাতে একবারও ফল ফলে নাই) ছাল দিয়া আরব-নারীরা দাঁত মাজে। ইহাতে দাঁতের ব্যাধি দূর হয় এবং দাঁত শাদা থাকে।

কানে ব্যাধি সে সময়েও মাঝে মাঝে হইত। তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা



ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদদের পাঠাগার

—জলপাই-গাছের সরু শিকড় জলে সিদ্ধ করিতে করিতে তাহার বাষ্প কানে লাগাইলে কানের ব্যথা দূর হয়। চুল ওঠা বন্ধ করিতে হইলে শশকের চর্কি এবং মজ্জা চামড়ায় ঘষিতে হইবে।

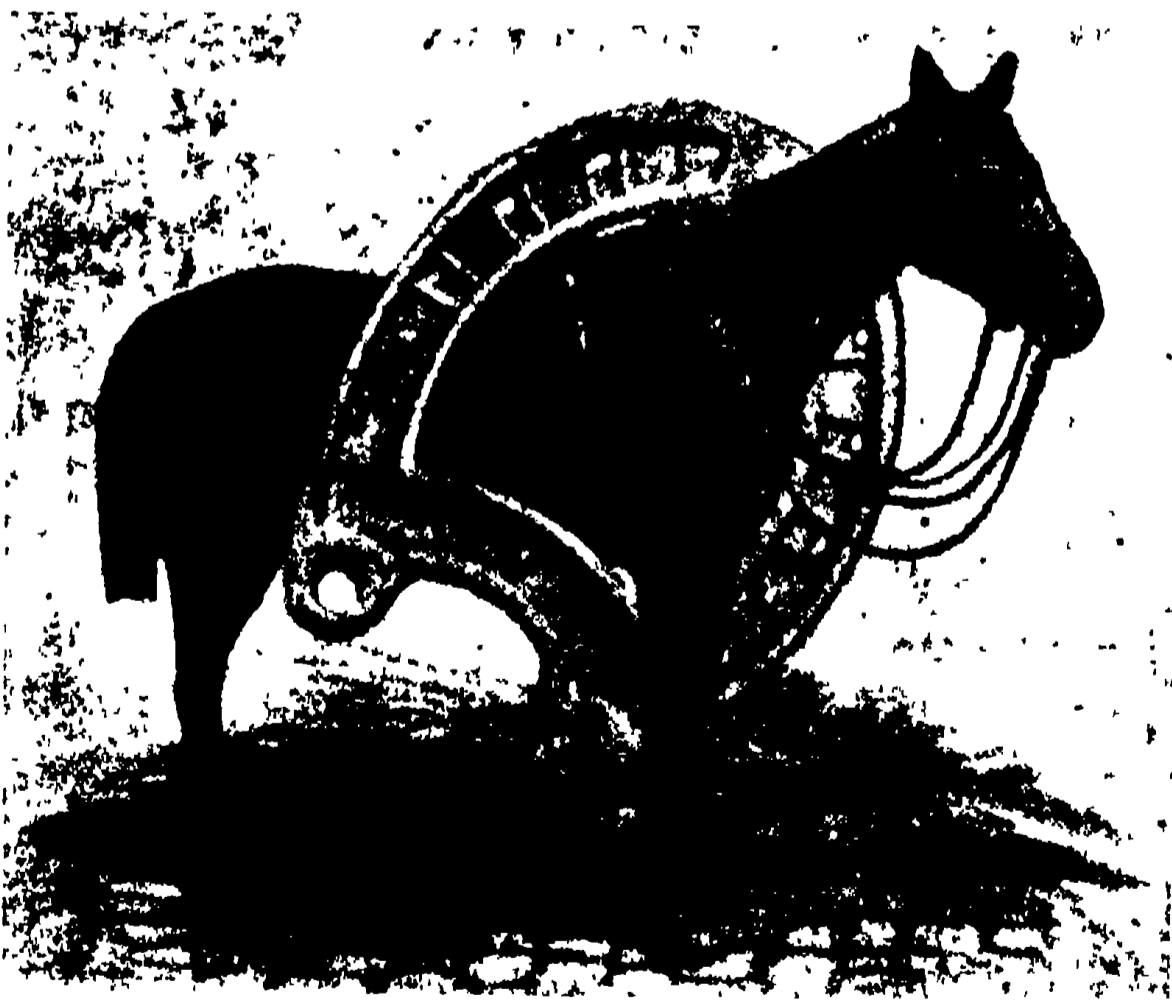
২০টি হাঁসের ডান চোখ সজে রাখিলে পখে দৃশ্যভয় দূর হইবে।

অনিদ্রা রোগ দূর করিতে হইলে রোগীর বালিসের তলায় কাল-কুকুরের দাঁত রাখিতে হইবে।

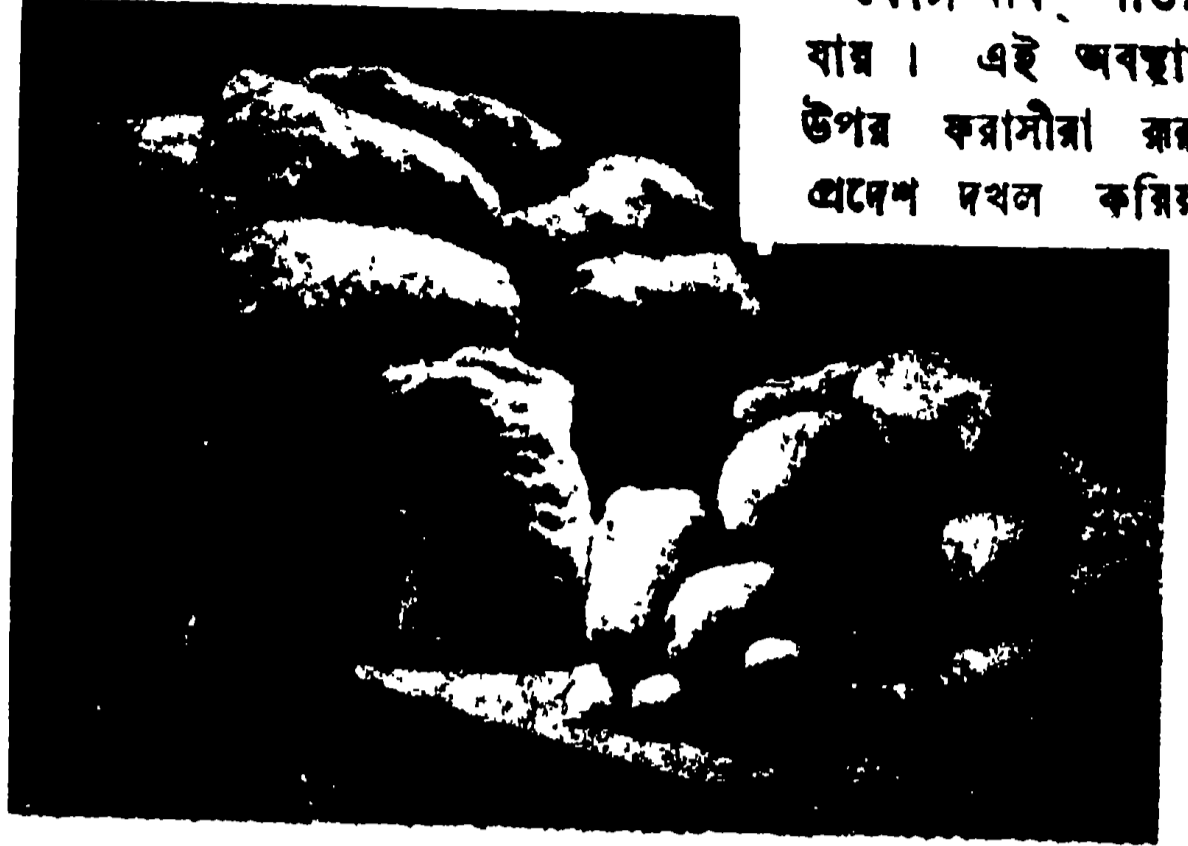
পুঁথিখানি হিক্র ভাষায় লেখা, এবং কাগজ এত পাংলা যে তাহা পড়া বেজায় শক্ত।

জার্মানির অর্থ-সমস্যা—

বর্তমান সময়ের জার্মানির অর্থ-সঙ্কটের কথা সকলেই জানেন। এই অর্থসঙ্কটের জন্ম সেখানের লোকের দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। যুদ্ধের পূর্বে দেশের সচ্ছল অবস্থার তুলনা ছিল না বলিলেও চলে; কিন্তু যুদ্ধের পরে আজ সেই দেশের দুঃখ-কষ্টের তুলনা নাই। একখণ্ড রুটির জন্ম লোকে হাহাকার করিয়া বেড়ায়। বাজারে আজ জার্মান মার্কেটের কোন মূল্য নাই। এক পাউণ্ডে অর্থাৎ প্তীমাদের দেশের ১৫ টাকায় আজকাল

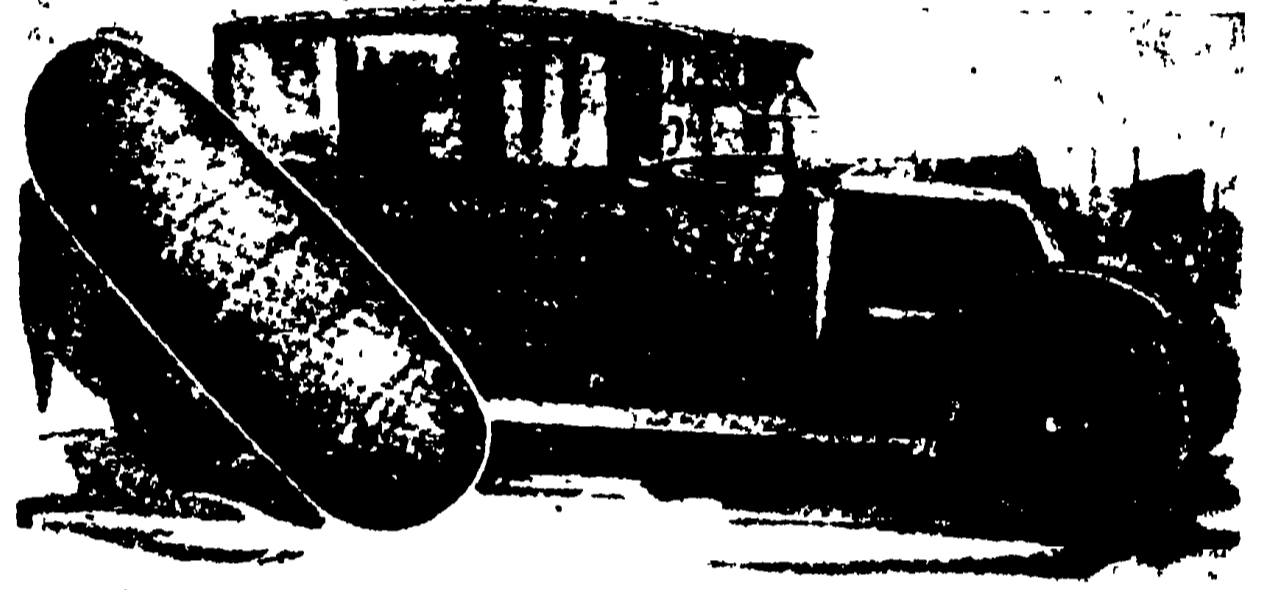


বর্তমান ঘোড়ার নাগের দামে ১০ বৎসর পূর্বে জার্মানিতে একটি ঘোড়া পাওয়া যাইত



৫ কোটি মার্ক্ পাওয়া যায়। এই অবস্থার উপর ফরাসীরা রূর-প্রদেশ দখল করিয়া

জার্মানিতে একমুঠা আলু বর্তমান দামে ১০ বৎসর পূর্বে এক গাড়া আলু পাওয়া যাইত



বর্তমানে একখানা রুটির যা দাম—দশ বৎসর পূর্বে জার্মানিতে সেইদামে একখানা মোটর-গাড়ী পাওয়া যাইত



দশ বৎসর পূর্বে তিনটি গরুর যা দাম ছিল—এখন সেই দামে এক ভাঁড় দুধ পাওয়াও হুঙ্কর

অবস্থা আরো সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে-মৃতপ্রায় জার্মানির উপর ফরাসীদের বর্বরতা দেখিয়া অনেক সভ্যদেশ অবাক হইয়া গিয়াছে। বলুকান দেশসমূহের এবং অষ্ট্রিয়ার অবস্থাও প্রায় একইরকম। গত জুলাই মাসে সমগ্র জার্মানিতে ২০,২৪১,৭৪২, ২৬৬,০০০ মার্ক্ বাজারে ছিল। ৪১টি মুদ্রায় ২৪ ঘণ্টা কাজ করিয়া প্রতিঘণ্টায় ১৭,৫৬৩,৮১২, ৪২ মার্ক্ ছাপা হইত। ইহা ছাড়া অ্যালুমিনিয়ামের উপর ছাপা ২১,২০০,০০০,০০০ মার্ক্ ছিল। এই সময় হাজার মার্কেটের কম মূল্যের কোন নোট ছাপান হইত না, কারণ তাহাতে খরচ বেশী পড়িত।

কাগজের মার্কেট এই বাড়ীবাড়িতে লোকজনের বেতন অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে—অবশ্য তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই—বরং কষ্টের মাত্রাই বাড়িয়া গিয়াছে। বাহারা যুদ্ধের পূর্বে জার্মান ব্যাঙ্ক মার্কেটের দরে টাকা জমা রাখিয়াছিল—এবং জমার হুদে আরামে দিন কাটাইত, তাহাদেরই অবস্থা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা ধারাপ হইয়াছে।

দশ বছর পূর্বে জার্মানিতে যে পরিবারের আয় বার্ষিক ২৫,০০০, মার্ক ছিল—তাহাদের লোকে খনী বলিত—কিন্তু বর্তমানে ঐ দামে সামান্য একটা বাজে জিনিষ ক্রয় করিতে পারা যায় না।

রাশিয়াতে এখন নোট ছাপা প্রায় বন্ধ আছে। বর্তমানে রাশিয়ার একখানা ১০-রুবল্ গোল্ড-নোটের দাম বাতারে ইংবেজী পাউণ্ড ষোল্লিঃ অপেক্ষা বেশী বলিলেও হয়।

ছবিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, বর্তমানে জার্মান মার্কেট মূল্য কি প্রকার।

মুক-অভিনয়ে পরী রাজ্যের দৃশ্য—

প্যারিসে একটি মুক-অভিনয়ে এক বাহুরকের ভূমিকা ছিল।



পরীরাজ্যের দৃশ্য

রাজসভা বসিয়াছে—নানা দেশের দূতেরা যাওয়া আসা করিতেছে। চারিদিকে লোকজন, চোখ-ঝলসানো ঝাড় লঠন। তাহার মধ্যে বাহুরকর প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ হাত নাড়িয়া দিবা মাত্র দর্শকের সামনে একটি অদ্ভুত পরীরাজ্যের দৃশ্য হাজির হইল। পরীরাজ্যের সব মূর্তিগুলিই জীবন্ত এবং সচল। সোনার পাখী উড়িয়া যাইতেছে। ড্র্যাগন তাহাকে গিলিবার জন্ত তাড়া করিয়াছে। ছবিতে দেখুন দৃশ্যটি কি চমৎকার।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

আঁকা-বাঁকা নারিকেল-গাছ—

নারিকেল-গাছ সাধারণতঃ সোজাই হয়। ধানুকুড়িয়াতে কিন্তু একটি নারিকেল-গাছ আছে তাহা সাপের মত আঁকা-বাঁকা হইয়া



আঁকা-বাঁকা নারিকেল-গাছ

বাঁড়াইয়া আছে। ইহার একটা স্থান এত বেশী বাঁকা, যে, একজন লোক সেখানে ঘোড়ায়-চড়িবার মত করিয়া বেশ বসিতে পারে। এরূপ গাছ বিরল।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সাউ

বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্র *

সপ্তসিন্ধু প্রদেশে সরস্বতীর যে স্তুতি একদা উদীরিত হইয়াছিল, সেই স্তুতি আমাদের সারস্বত সমাজকে পালন করুন।

যিনি স্মৃতি-জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তিস্বরূপিণী; যিনি সর্ব-বিদ্যাধিদেবী, জ্ঞানাধিদেবী, বাগধিষ্ঠাতৃদেবী; যিনি সংখ্যা-ব্যাখ্যা-ভ্রম-সিদ্ধান্তরূপা; তিনি বরদা হউন ॥

জ্ঞান অনন্ত, বিদ্যা অসংখ্য, বাক্ অগণ্য। অতএব সরস্বতীর পূজা একার সাধ্য নয়, বহুগোষ্ঠী সমাজের প্রয়োজন।

কেহ পূজার উপচার ও মূর্তির উপাদান সংগ্রহ করেন, কেহ বিধিপূর্বক সরস্বতীর স্বরূপ ধ্যান করেন। ইহারা সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে পূজা করেন। কেহ নরনারী, জাতিধর্মনির্বিশেষে মন্তোচ্চারণপূর্বক মাক্‌ল্যা বিলাইতে থাকেন। ইহারা সরস্বতীকে বৈষ্ণবীশক্তিরূপে পূজা করেন। কেহ দুঃখ ও দুর্গতি, শোক ও ভয় হইতে মুক্ত হইবার এং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার কামনায় সরস্বতী নামে দুর্গাদেবীর পূজা করেন। মহারাষ্ট্র-দেশ-সম্বলিত দক্ষিণাপথে বঙ্গের দুর্গাপূজা নাই, শারদীয়া সরস্বতী-পূজা আছে। তিনি ধ্যানময়ী হইয়া জ্ঞান, সম্যক্ বাঙময়ী হইয়া বিদ্যা, কলনাময়ী হইয়া কলা। অতএব সরস্বতীর মন্দিরে ওবেশ-অধিকার সকলেরই আছে, কেবল উপচার-পরিভ্রষ্টের নাই।

সারস্বত সমাজের অভিধেয় ও প্রয়োজন বলা হইল। বাঁকুড়ায় বিনিয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতেছি।

আমি বঙ্গের বাহিরে বহুকাল কাটাঁইয়া তিনবৎসর হইল বাঁকুড়ায় আসিয়াছি। আমার জন্মস্থান বাঁকুড়া-জেলার নিকটে হইলেও এখানে এত বিষয় নূতন দেখিতেছি যে সেসবের বৃত্তান্ত জানিতে স্বভাবতঃ কৌতু-হল জন্মিয়া থাকে। আপনাদের নিকট সেসব পুরাতন, এবং পুরাতন বলিয়া হয়ত আপনাদের জিজ্ঞাসার উদয় হয় না।

তথাপি পুরাতন যত অজ্ঞাত, নূতন তত নয়। কারণ পুরাতন অতীতে, নূতন বর্তমানে; পুরাতন পশ্চাতে, নূতন সম্মুখে। কিন্তু পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া বর্তমানের স্থিতি। অতএব পুরাতনকে না জানিলে নূতন জানিতে পারা যায় না। এই হেতু পুরাতন ও ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন। কে চর্চা করিবে?

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার বর্তমান সীমা ভুলিয়া যান। ইহা প্রাকৃতিক নয়, পুর তন বিভাগও নয়। উত্তর সীমায় দামোদর নদ কতকটা প্রাকৃতিক বিভাগ করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমে মানভূমি দক্ষিণে মেদিনীপুর, এবং পূর্বে হুগলী জেলা অল্পে-অল্পে বাঁকুড়ায় বিলীন হইয়াছে। মধ্যভারতের মালভূমির পূর্বপ্রান্তে মানভূমি, এবং মানভূমির পূর্বে বাঁকুড়া; কিন্তু কোথায় মানভূমির শেষ এবং বাঁকুড়ার আরম্ভ, তাহা ভূমি দেখিয়া বলিতে পারা যায় না। এই-রূপ দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও উৎকলে বাঁকুড়া অদৃশ্য হইয়াছে। অতএব দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাঁকুড়ার সীমাপরিবর্তনের স্থ্যোপ ছিল। এখান-কার পাথর্যা, কাঁকর্যা, লালমাট্যা, উচুনীচু ভূমি বহুকাল-বধি বনভূমি ছিল, এবং পূর্বকালের ঝাড়খণ্ডের পূর্বভাগ হইয়াছিল। 'ঝাড়খণ্ড' শব্দের অর্থ বনভূমি।

জাঙ্গলদেশবাসী স্বভাবতঃ দারুণ হইয়া থাকে। অল্পবরা নীরসা ভূমি, হিংস্র পশু এবং ততোধিক হিংস্র দস্যুর বিচরণভূমি হইয়াছিল। দেশের কিয়দংশের নাম ছিল, মল্লভূমি। কতকাল পরে, কে জানে; বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ দস্যুর আক্রমণ নিবারণ অভিপ্রায়ে ঘট্টপাল বা ঘাটোয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মল্লভূমির মল্লজাতি বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এক প্রাচীন মল্লাধিপ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন।

* সমাজের আরম্ভ-সমাগমে পঠিত। স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদ, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, হিতকরী সমিতি, প্রভৃতি নামে সারস্বত সমাজ আছে। এই-সব সমাজের কার্যক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ তাহা এই উদ্বোধন-পত্র হইতে উপলব্ধ হইবে।—প্রঃ সং।

মহাসংহিতায় এই জাতির উল্লেখ আছে। ঝল্ল-মল্ল-ভিল্ল প্রভৃতি প্রাচীন জাতিবাচক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বনবিষ্ণুপুরের মল্ল রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। গুণ-কর্ম লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন স্মৃতিকারগণ বহু অনার্য জাতিকে ত্রাত্য ক্ষত্রিয় গণনা করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীও এই, বিষ্ণুপুরের রাজারা আদিতে বাগ্দী ছিলেন। এখানে শুনিতেছি, তাইারা মেট্যা জাতি ছিলেন, এবং বাঁকুড়ার মৎস্যজীবী মেট্যা জাতি আপনা-দিগকে মল্লভূমির মেট্যা বলে। অন্তত মেট্যা জাতি বাগ্দীর এক শ্রেণী বলিয়া গণ্য। বাগ্দীও মাছ ধরে, শিবাঘনগ্রন্থে বাগ্দীনীকে মাছ ধরিতে দেখি। মেদিনী-পুরের বগড়ী পরগণায় বাগ্দীর বাহুল্য আছে। বোধ হয়, বকদ্বীপ শব্দের বিকারে ব-গ-ডী, অর্থাৎ যেখানে বক বিচরণ করিত। পূর্বকালে এই অঞ্চল জলা ভূমি ছিল। এখনও বহুস্থলে জলা ভূমি আছে। বোধ হয় ব-ক-দ্বী-পী (অর্থাৎ বকদ্বীপবাসী) হইতে ব-গ-দী—বাগদী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এদিকে দেখি, মা-টি-য়া শব্দের সংক্ষেপে মে-ট্যা নাম। মৃত্তিজ, মাটি-জাত=মাটিয়া; এইরূপ, ভূমি-জাত=ভূমিজ বা ভূঞা। মৃত্তিজ, ভূমিজ শব্দের অর্থ আদিম অধিবাসী (indigenous)।

আমাদের ভাষার 'রাড়-বাগদী', 'রাড়-চোয়াড়', শব্দ দুইটি সকলেই জানে। প্রথমে মনে হয়, রা-ড় শব্দ রা-ঢ় শব্দের বিকার। তখন অর্থ হয়, রাঢ়ের বাগদী, রাঢ়ের চোয়াড়। কিন্তু এই অর্থ ঠিক মনে হয় না। কারণ ব্যাকরণে বাধে। তা ছাড়া, রাঢ়ের সর্বত্র কিংবা অধিক স্থানে বাগদী ও চোয়াড় নাই। পরন্তু রাঢ়ের তুল্য শ্রেষ্ঠ দেশও পূর্বকালে বিরল ছিল। এ কারণ মনে হয়, উভয় শব্দ দ্বন্দ্ব-সমাস-নিষ্পন্ন সহচর শব্দ, যেমন বন-জঙ্গল, থালা-বাটা ইত্যাদি। কবিকল্পে এই অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সেখানে ব্যাধ বলিতেছে, "আমি গো চোয়াড় রাড়।" অতএব চোয়াড়, যেমন এক জাতির দুর্গাম ঘোষণা করিতেছে, রাড়ও তেমন অপর এক জাতির নিন্দাবাচক নাম। সে কোন্ জাতি, কে জানে। হেমচন্দ্র কোষে সং রা-টি শব্দ আছে, অর্থ যুদ্ধ, কলহ, দ্বন্দ্ব। অতএব রাড়জাতি দ্বন্দ্বপ্রিয় ছিল।

চোয়াড় শব্দের অর্থও প্রায় তাই বুঝায়। দৃষ্ট্যকে চুয়াড় বলিত। চুরি-আড়=চুরি-আড়—চুআড় (র লুপ্ত)। খেলায় দক্ষ যে, সে যেমন খেল আড়, খেলাড়; চুরিতে দক্ষ যে, সে তেমন চুয়াড় (দক্ষ, রত অর্থে বা আড় প্রত্যয়)। ভূমিজ জাতিব-প্রতি চুয়াড় নাম প্রযুক্ত হইত। এই জাতি বাঁকুড়া, মানভূমি, ময়ূরভঞ্জ, কেওঁঝার প্রভৃতি স্থানে অনেক আছে। ইহাদের বর্তমান প্রতাপও অল্প নয়। ভূমিজ জাতি রক্তের টীকানা দিলে কেওঁঝারে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয় না। মানভূমির বিপিন ভূঞার শৌর্ষ শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূমিজ ব্যতীত মৃত্তিজ জাতি থাকে। এই জাতিই কি পূর্বে রাড় নামে খ্যাত ছিল?

মল্ল শব্দের এক অর্থ, বলিষ্ঠ, বাহুযোদ্ধা। পূর্বকালে বাগ্দী জাতি সৈনিক হইত। মেলেরিয়া রোগের আক্রমণে পূর্বে ইহারা লাঠীআল, ডাকাইত, দরোয়ান, দিগার (দিকুপাল) প্রভৃতি হইত। এহেন দেশে বিষ্ণুপুরের রাজবংশেব উদয় হইয়াছিল। কবিকল্প কালকেতুর রাজ্যস্থাপন বর্ণনা কবিয়াছেন। সেকালে সেরূপ রাজ্যের অভাব ছিল না। তথাপি বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধি হেতু মনে হয়, কবিকল্প এই রাজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের পূর্বনাম কি ছিল, কে জানে। রাজারা বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগী হইবার পরে রাজধানীর নাম বিষ্ণুপুর হইয়া থাকিবে।

বাঁকুড়া জেলায় দশ লক্ষ লোকের মধ্যে বাগদী প্রায় এক লক্ষ। বাউরী লক্ষাধিক। আচারে ব্যবহারে বাউরী আরও নীচ। বোধ হয়, সং ব-ব-র হইতে বাবরী, বাউরী নামের উৎপত্তি। বাঁকুড়ায় সাঁওতালও প্রায় এক লক্ষ। এই তিন জাতি মিলিয়া বাঁকুড়ার প্রায় পাঁচ আনা অধিবাসী।

আশ্চর্য এই, বাঁকুড়ায় এক লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এই অসভ্য বর্বর দেশে ইহাদের আদিপুরুষ কেন আসিয়াছিলেন, কে জানে। প্রাচীন কলিঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া পড়ে, এবং কলিঙ্গের পরেই উৎকলিঙ্গ, বর্তমান উৎকল। এই হেতু বাঁকুড়ায় উৎকলীয় ব্রাহ্মণের বাস বুঝিতে পারি। কিন্তু কি সূত্রে কণৌজ

ব্রাহ্মণের আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান কতব্য। বাঁকুড়ার পূর্বাংশ, বঙ্গের উর্বরা সমস্থলীর সদৃশ বটে; কিন্তু সেখানে লক্ষ ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের যোগ্য ভূমি দেখিতে পাই না। বাঁকুড়া নদীমাতৃকা ভূমি নয়, মনে রাখিতে হইবে সমস্ত বঙ্গ ব্রাহ্মণ, মাত্র সাড়ে বার লক্ষ।

বাঁকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। ইহার নাম সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামন্তো ক্ষুদ্রভূপালঃ। ক্ষুদ্র রাজার নাম সামন্ত। বড় রাজাব অধীনে, সে রাজার রাজ্যের প্রান্তে সামন্ত রাজ্য। 'রায়' উপাধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত আছে। কারণ, সং রাজন্ শব্দের বিকারে রা-য়। ওড়িষ্যার সামন্ত-রায়, সংক্ষেপে সামন্তরা, এবং মধ্যরাঢ়ের সাতরা, এককালে রাজবংশীয় ছিল। বাঁকুড়া জেলার সামন্তরাজ্য ছাতনায় স্থাপিত ছিল। বাঁকুড়া শহর সামন্তভূমিতে অবস্থিত। সামন্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু দেখিলে বুঝি, ইহারা আদিতে বাঙ্গালী ছিল না। কেহ কেহ বলেন, সামন্তরা ছত্রী। ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত আদি সামন্ত সাহস-ব্যবসায়ী হইয়া ছাতনায় রাজা হইয়াছিলেন।

শুনি, বিষ্ণুপুরের মল্লবংশও বঙ্গের বাহির হইতে আসিয়াছে। এইরূপ, প্রাচীন রাজাদিগের সকলেই নাকি বিদেশাগত, একজনও বাঙ্গালী ছিলেন না। শশুনিয়া পাহাড়ে যে চন্দ্রবর্মার নাম ক্ষোদিত আছে, তিনি নব্যমতে বঙ্গের নিকটে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গের ভিতরে পড়েন নাই। বঙ্গ ও উৎকল ও ছোটনাগপুরের প্রান্তস্থিত এই বনাকীর্ণ ভূখণ্ড সাহসিকের বিক্রম-প্রকাশের লীলাভূমি হইয়াছিল। কত রাজার উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কে জানে। যেসকল গ্রামের নামে গ-ড় শব্দ যুক্ত আছে, সে সে গ্রামে এক এক রাজার আবাস ছিল। বলা-গড়, পানা-গড়, শক্তি-গড়, অসুর-গড়, বেত্র-গড়, মন্দারণ-গড়, নারায়ণ-গড় নামের ইতিহাস কে শোনাইবে? সমস্থলীতে প্রাকার ও পরিখা নির্মাণ করিয়া দুর্গ রচিত হইত, অরণ্য-বেষ্টিত হইলে গড় আরও দুর্গম হইত। স্বাভাবিক অরণ্য না থাকিলে বেউড়-বাঁশের কৃত্রিম বন দ্বারা দুর্গ রক্ষিত হইত। বাঁকুড়া জেলায় বহুগ্রামের নামে গড় নাম যুক্ত আছে।

কিন্তু মল্লভূমি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল কি? মল্লরাজত্বকালে অনেক দেবমন্দির ও বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল, রাজধানী বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে পারা যায় না। কারণ পেটে ও পিঠে মারিয়া প্রাসাদ নির্মাণ ও তড়াগ খনন অত্যাধি ঘটিতেছে, ইংরেজ রাজ্যে না হউক বেশী রাজ্যে বেঠি (বেগার) ধরা প্রচলিত আছে। যে দেশে প্রজার কীর্তি দেখিতে পাই না, সে দেশে লক্ষ্মীর কুপা কই? তন্তুবায় বঙ্গের কোন্ গ্রামে না ছিল? কাংশুকার কোন্ গঞ্জে নাই? অবশ্য সে কালে প্রজা এত ছিল না, তেমনই কৃষিযোগ্য ভূমিও অধিক ছিল না। কিন্তু কেবল কৃষিকর্ম দ্বারা, বণিক-সহায় ব্যতীত কৃষিজাত দ্বারা কোনও দেশ ধনশালী হইতে পারে না। পথ দুর্গম, বনবেষ্টিত; ঘাট দস্যুর উপদ্রুত; সার্থবাহ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে পারিত না। তা ছাড়া মল্লভূমি ধনশালী হইলে মুঘল বাদশাহের লোলুপ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত কি? বর্গীর লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি পুনঃ-পুনঃ চরিতার্থ হইয়াছিল বটে; বোধ হয় পূর্বভাগে ও দক্ষিণে তাহাদের ছনিবার অত্যাচার পর্যবাসিত হইত।

ধনশালী না হইলেও মল্লভূমি দরিদ্র ছিল না। কারণ দরিদ্র দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই থাকে না। রাজ্যগ্রহে সঙ্গীত কলা সমাদৃত হইয়াছিল, কিন্তু প্রজাও সে রস হইতে বঞ্চিত ছিল না। একালের মতন অল্পকষ্ট থাকিলে সে কলা এত কাল তিষ্ঠিতে পারিত না।

এখন বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়া আছে, পাঁচ ছয় বৎসর পরে পরে স্বেভিক্ষে যায় না। লোকে বলে, স্বেভিক্ষির অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়। এটা কিন্তু স্থূল কথা। এই যে উত্তর-বঙ্গের জেলাকে জেলা জলে ডুবিয়া গেল, অতিবৃষ্টি এক কারণ নহে। দেশের নদী, বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী। যদি সে প্রণালী রুদ্ধ না হয়, অতিবৃষ্টি হইলেও গ্রামকে গ্রাম পক্ষকাল ডুবিয়া থাকিতে পারে না। বাঁকুড়ায় অনাবৃষ্টি নূতন সৃষ্টি কি? যদি নূতন না হয়, তাহা হইলে সে কালেও দুর্ভিক্ষ হইত না কি? ছিয়াত্তর সালের মনস্তর যেমন ভীষণ হইয়াছিল, বোধ হয় তেমন ভীষণ হইবার সম্ভাবনা অধিক ছিল। কারণ অজন্মা হইলে অল্প স্থানের ধান-আনাইমা প্রজারক্ষার সুগম পথ ছিল না।

নিকটবর্তী স্থানও যোগাইতে পারিত না, কারণ অনাবৃষ্টি অল্পদেশব্যাপী কদাচিত্ হয়।

এই প্রশ্ন একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। প্রথমে দেখি, অনাবৃষ্টির হেতু কি। পূর্ববঙ্গে অনাবৃষ্টি হয় না, এখানে হয় কেন? দেখিতেছি, আরব-সাগর ও বঙ্গসাগর হইতে যে দুই নীরদ বায়ুপ্রবাহ আমাদের দেশে বহিয়া থাকে, উহাদের সংঘর্ষস্থলে বাঁকুড়া অবস্থিত। শুধু বাঁকুড়া নহে, মেদিনীপুর ও গুড়িয়ার দশাও তাই, কভু এই, কভু অই প্রবাহ প্রবল হইয়া উভয়ে দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে স্রবৃষ্টি, বিশেষতঃ যথাকালে বৃষ্টি, বাঁকুড়ার ভাগ্যে নাই।

কিন্তু প্রকৃতি অণু এক বিষয়ে উদার ছিলেন। পূর্বকালে বাঁকুড়া বনভূমি ছিল। বিষ্ণুপুর নাম এখনও বনবিষ্ণুপুর নামে খ্যাত। সে জঙ্গল আর নাই। লোকে বন নিমূল করিয়া শূখনা ডাঙ্গা ফেলিয়া রাখিয়াছে। মান্যবর মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্বের বনভূমির এক মানচিত্র করাইয়াছেন। তাহাতে দেখি অধিক কাল নয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়া জেলার বার আনা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তখন প্রজা এত বৃদ্ধি পায় নাই, কৃষিভূমির টান পড়ে নাই, কাঠের দর চড়ে নাই, এবং বোধ হয় বড় বড় জঙ্গল যার-তার অধিকারেও যায় নাই। এখন বৃষ্টিজল বৃক্ষমূলে আবদ্ধ হয় না, বৃক্ষদেহে রসরূপে সঞ্চিত হয় না। পড়িবামাত্র গড়াইয়া জোলে উপস্থিত হয়, কিয়দংশ ভূনিম্নগত হইয়া কাঁকর-বাহুল্যহেতু অবিলম্বে সেই জোলে আসিয়া পড়ে, পরে খাল ও নদীর বণ্ডা সৃষ্টি করে। অনাবৃষ্টি হইলে ইন্ডের দোষ, অতিবৃষ্টি হইলেও ইন্ডের দোষ। কিন্তু বুদ্ধিমান জন প্রকৃতির সহিত কলহ করে না। প্রকৃতির দানে নিজের প্রয়োজন যথাযোগ্য সাধন করে। আমাদের বৃদ্ধি থাকিলে বন কাটিয়া শূখনা ডাঙ্গা করিতাম না, কিংবা নদীর দুই তীরে অবিচ্ছিন্ন বাঁধ বাঁধিয়া বনভূমির উর্বরতা-শক্তি সাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে দিতাম না। যে মাটির উপরিভাগে পাথর কাঁকর মোটা বালি, তাহার জল কে আটকাইতে পারিবে? অতঃশ্রোত কে রোধ করিবে? পারিত গাছে; কিন্তু তাহা নিমূল। শূখনা পাতা বরিয়া পড়ে না, পাতা পচিয়া মাটি হয় না,

মাটিতে রসও থাকে না। বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমাংশ সেদিন পর্যন্ত বনাকীর্ণ ছিল। এখন সেখানে পাতা পচার লেশ নাই। অনেকে জানেন, এখন সেখানে কুআতে যত হাত দোড়ী লাগে তখন তত লাগিত না।

অরণ্যধ্বংসের দ্বিতীয় ফলও ঘটয়া থাকিবে। বায়ু শুষ্ক হইয়া থাকিবে। ভূনিম্নগত যে জল বৃক্ষ-মূল দ্বারা শোষিত হয়, কাণ্ড ও প্রকাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা-পথে উঠিয়া পত্রের নাসারন্ধ্র দিয়া তাহার অধিকাংশ বাষ্পাকারে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে বায়ু শুষ্ক হইতে পায় না। শুষ্ক বায়ুতে দেহের রস শূখাইয়া যায়, পিপাসা বৃদ্ধি পায়, এবং পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টায় বৃক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন মাটিতে রস থাকিলেও শস্তের পুষ্টি ও আধিক্য আশা করিতে পারা যায় না।

প্রকৃতির সহিত কলহ না করিয়াও পূর্বকালে লোকে জলস্থতির ব্যবস্থা করিয়াছিল। যেখানে বৃষ্টি অনিশ্চিত সেখানেই পুষ্করিণী ও বক্ষে বৃষ্টিজল ধরিয়া রাখিত। বাঁকুড়ায় এখন সেসব বৃজিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উদ্ধারের উদ্যম হইতেছে, কিন্তু কেবল তদ্বারা ছুভিক্ষের উপশম হইবে না। বস্তুতঃ, বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হয় না। ধান চাল পাওয়া যায়, লোকে অর্থাভাবে কিনিতে পারে না। বলা বাহুল্য, অর্থের অভাব আর অন্নের অভাব, এক কথা নহে। বৃষ্টিজল সঞ্চিত থাকিলে ধান শূখাইবার শঙ্কা থাকিবে না; ধান জন্মিবে, কৃষিজীবী মাসকয়েক কর্ম পাইবে, বেতন পাইবে। ধানে ও বেতনে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তা বলিয়া ধান যে সস্তা হইবে, একথা বলিতে পারা যায় না।

অন্যদিক্ দিয়া দেখি। বর্তমানে কৃষিযোগ্য ভূমিই আমাদের একমাত্র ধন হইয়াছে। জনসংখ্যার অল্পপাতে বাঁকুড়ায় এই ভূমি অল্প। লক্ষ লক্ষ লোক ভূমি-হীন। তাহাদিগকে অন্তের ভরণীয় হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়। যখন ভূ-স্বামী ভর্তার শস্তহানি হয়, তখন ভরণীয় প্রথমে কষ্ট পায়। সাজায় চাষ, কি ভাগে চাষ, ভরণীয়ের পক্ষে সমান কথা। বাস্তবিক, কর্ষণোপযোগী যাবতীয় ভূমি বাঁকুড়ার যাবতীয় লোককে সমান ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের ভাগে দুই বিঘাও পড়ে না। যদি

দুই বিঘাও ধরি, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় বহুরেও দেহের পরিশ্রমের বিনিময়ে স্বয়ংসরের মাত্র গ্রাসের যোগাড় হইত, অল্প ব্যয়ের নিমিত্ত এক পয়সাও থাকিত না। বস্তুতঃ সকলের জমি নাই; যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে স্বেচ্ছা ও অনাবৃষ্টি প্রায় সমান। অল্প কর্মপায় না বলিয়া তাহারা কষ্ট পায়।

সেকালেও এই অবস্থা ছিল, স্বেচ্ছা কুবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ছিল। পুষ্করিণী ও বাঁধে জল থাকিত, আর থাকিত যেখানকার ধান সেখানে, অধিক দূরে যাইত না। ইহাদের ফলে মাত্র এক বৎসরের অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষ হইত না। অনাবৃষ্টি বহুবর্ষব্যাপী হইলে রক্ষার উপায় থাকিত না। কিন্তু একই অঞ্চলে এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।

তখন সকলের জমি ছিল না। কিন্তু ভরণ-পোষণের বহুবিধ উপায় ছিল। জীবিকার প্রাচীন উপায়গুলি একে একে সরিয়া যাওয়াতে আমাদের দৈনন্দিন ঘটনা ঘটিয়াছে। বাঁকুড়ায় এক বন হইতে কতলোকের খাদ্য সংগৃহীত হইত। অসভ্যদিগের পক্ষে বন এত মূল্যবান যে আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। চাষবাস নাই, স্বচ্ছন্দে পুত্রকলত্র লইয়া দিন কাটাইতেছে। যাহাদের অল্পস্বল্প চাষ আছে, তাহারা ধনবান্। এক মহুআ গাছ কত লোকের খাদ্য নির্বাহ করে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে বাঁকুড়ায় নাকি মউলের মর্যাই বাঁধা হইত, এখন মউল দুপ্রাপ্য হইয়াছে। মৃগয়া ছিল, তাহার স্মৃতিবশে এখনও বর্ষে বর্ষে, যদিও এক দিন, বাগদীর দল মৃগয়ায় বহির্গত হয়। কিছুদিন পূর্বেও গ্রামে গ্রামে যে বিল-ভোজন, বন-ভোজন ছিল, তাহা মৃগয়ার প্রাচীন স্মৃতি। বাউরী বাগদী সাঁওতালের কষ্টের জীবন ছিল বটে, কিন্তু সে কষ্ট তাহারা অসুভব করিতে পারিত না। কত লোক মৈনিক পদাতিক ও অল্প রাজভৃত্য হইত। কত ব্যবসায় ছিল, কত কলা ছিল। ধনরা জাতি জানে না, তাহাদের পূর্বপুরুষ কত কর্মকার যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করিত। খদির নির্ধাস করিত; লোহার জানে না এক কালে তাহারা লৌহকার ছিল; আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিত।

বাঁকুড়ায় গোপাল জাতিও অল্প নাই। এক কালে এই জাতি হইতে বীরের উদয় হইয়াছিল। সে কালে গো ও মহিষ পালন কষ্টকর ছিল না, বনশ্রান্ত-ভূমি চারণ হইয়াছিল। এই জাতির দেহ এখনও বলিষ্ঠ ও মাংসল। এ দেহ আর থাকিবে না, দেশের গোধন শূন্য হইয়াছে। তৈলি জাতিও অল্প নাই। ইহাদের কত লোকে শকট-চালক ছিল, কে সংখ্যা করিবে? রেলপথে যাতায়াত করিতে আরাম বটে, কিন্তু পেটে শুখাইয়া আরাম ভোগ করিতেছি। এই-রূপ, সেসব তাঁতী বই, কর্মকার কই? তাহাদের অল্প চিরকালের তরে মারা গিয়াছে। অথচ ভাবি, আমাদের দারিদ্র্যের হেতু কি।

সে কাল আর নাই, কিন্তু আমরা কালান্তর লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এখন যদি বা লক্ষ্য হইতেছে, তাহাতে হতাশ হইয়া পড়িতেছি। কালবিলম্বে ঘুম ভাঙিলে অবসাদ আসে। চোখের সামনে চিলে ছোঁ-মারিয়া আমিষ লইয়া ছুটিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইতেছি না, চোখ কচলাইতেছি।

বাঁকুড়াই ধরুন। এই শহরে অধর্শতাকী পূর্বে যে ক্ষুদ্র বাজার নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বাড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই; পঁচিশ বৎসর পূর্বে ডাকঘরে পাঁচজন কেরানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পাঁচজনেই কার্য নির্বাহ হইতেছে। কাল দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হইতেছে, দশ পাঁচ বৎসর বিশ্বামের অবকাশ দিতেছে না। কামী ও কামিনী কয়লার খাদে ও চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। নামাল দেশে শত শত গিয়া দুই দশ টাকা আনি-তেছে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পাচক ও ভৃত্য ও দাসী বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছে। চোখে না দেখিলে দেশের এই দারিদ্র্য বিশ্বাস হইত না। মুখ দেখিয়া কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র, কে ভদ্র কে নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বাজালীর দেহ শীর্ণ ও দুর্বল; দক্ষিণ রাত্ মেলেরিয়ায় জর্জর; কিন্তু বাঁকুড়ায় যেখানে মেলেরিয়া নাই বা অল্প, সেখানেও এইরূপ শীর্ণ ও দুর্বল দেহ যত দেখিতেছি এত যেন কোথাও দেখি নাই। যখন শানিলায় বাজারে পাটশাগ ওজনে বিক্রি

হয়, তখন বুঝিলাম বাঁকুড়া দরিদ্রের দেশই বটে, নইলে অখাদ্য পাইয়া ক্ষুণ্ণবৃত্তি করিত না। যখন শুনিলাম বাজারে বিক্রি চারি আনা সের বিক্রি হইতেছে, তখন বুঝিলাম বাঁকুড়াবাসী বণ্ড গাছের চাষ করিতেও উদাসীন। কিন্তু যখন শুনিলাম বিলাসী আলুরও সেই দর, তখন বুঝিলাম বাঁকুড়া অজ্ঞানও বটে। যাইরা ভদ্রলোক, যাইরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে গণ্য, তাহাদের কান্তিহীন লাবণ্যবর্জিত মলিন মুখমণ্ডল, জ্যোতিহীন চক্ষু, অবসন্ন গতি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, এমন কেন ?

গত জনসংখ্যানে প্রকাশ হইয়াছে, গত দশ বৎসবে বাঁকুড়ায় দশ জনের স্থানে নয় জন হইয়াছে। যাইরা ভাবুক, তাহারা ইহাতেই চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আরও ভয়ানক। লোকক্ষয় দশজনে এক নয়, দুই হইয়াছে। অভাগা বাঙ্গালী ব্যতীত, হিন্দু ব্যতীত, সব জাতি বাড়িতেছে, দশ বৎসবে অন্ততঃ এক জন বাড়ে। বাঁকুড়ায় বৃদ্ধি দূরে থাক, স্থিতিও নাই, হ্রাস হইয়াছে। স্বাভাবিক ক্রমে যেখানে এগার জন দেখিতাম, সেখানে নয় জন দেখিতেছি। বলকর, পুষ্টি-কর, প্রাণকর, আয়ুষ্কর আহার পাইলে এ দশ ঘটিল কি ? প্রকৃতির একি নির্ভুর লীলা ; জীবন ও জীবনোপায়ের সমন্বয়ের এ কি নিম্ন ব্যবস্থা !

শুধু এই নহে। কার অভিশাপে বাঁকুড়া কুষ্ঠক্ষেত্র হইয়াছে ! দেশের অগ্রত এই পাপরোগ আছে সত্য, কিন্তু ভারতের মধ্যে বাঁকুড়ায় অধিক কেন ! বাঁকুড়ায় ছয় হাজার গ্রাম, ছয়হাজার কুষ্ঠী গণা হইয়াছিল, কত গণা হয় নাই, কে জানে। দশ বার হাজারের কম হইবে কি ? কি কারণে প্রথম বীজ উপস্থ হইয়াছিল, কে জানে। তার পর কত কাল ধরিয়া বংশানুক্রমে ও সংস্পর্শদোষে রোগের বীজ ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমরা নাকি হিন্দু ; শূচি-অশূচির বিচার আমরা যেমন জানি পৃথিবীর কেহই তেমন জানে না। হায় শাস্ত্র ! কে পড়ে, কে বা মানে। কোন্ শাস্ত্রে কুষ্ঠীর সংস্পর্শ নিষিদ্ধ হয় নাই ? কোন্ স্মৃতিতে, কোন্ আয়ুর্বেদে কুষ্ঠীবংশে বিবাহ বিহিত হইয়াছে ? মূর্খ, পুত্রস্নেহে পাগল ; কিন্তু জানে না কি ভয়ঙ্কর পাপের পরিণাম ভোগ করিতে পুত্র-পৌত্রাদিকে রাখিয়া

যাইতেছে। ভদ্র ইতর কাহারও দৃকপাত নাই : পথে ঘাটে, জলে ডাঙ্গায়, বাজারে দোকানে, নরস্বন্দরের হাতে, রজকের বস্ত্রে, রোগের বীজ ব্যাপ্ত হইতেছে। মুন্সিপালিটির চিন্তা নাই, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কতব্য নাই, কাহারও এক কপর্দক ব্যয় নাই। মেলেরিয়া, কলেরা, বসন্ত দেখা দিলে ডাক্তার ছুটাছুটি করেন। কিন্তু কুষ্ঠরোগ নিত্যসহচর হইয়া বিনাবাধায় যথাতথা বিচরণ করিতেছে। ইহাতে একজনের প্রাণ নয়, দুই পাঁচজনের নয় ; বংশকে বংশ, দেশকে দেশ সমূলে উৎসন্ন হইতেছে ; কে দেখে, কে ভাবে ?

কেহ কেহ স্বধাইতে পারেন, দেশের এই অবস্থার সহিত সারস্বত সমাজের কি সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদি সরস্বতী জ্ঞানাধিদেবী বুদ্ধিশক্তি-স্বরূপিণী, তাহা হইলে এই বিতর্ক উঠিতে পারে না। সারস্বতসমাজ নইলে দেশের পুরাত্ত ও ইতিহাস, সমাজনীতি ও অর্থনীতি, ধর্ম ও কর্ম, আচার ও ব্যবহার, রোগ ও তাপ, বিদ্যা ও কলা, বাতী ও বৃত্তি, কে চিন্তা করিবে ? সরকারী কর্মচারীর 'রিপোর্ট' পড়িয়া আমাদের কর্ম নির্বাহ হইবে কি ? স্থূলদর্শী মনে করেন, ধনে ও মানে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বড় হইলেই তিনি ধন্য হইলেন। তিনি ভুলিয়া যান, তাহার ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হইলে, প্রতিবেশী অজ্ঞান ও নীচমনা দুর্জন হইলে ক্ষেত্রফল তাহাকে ও তাহার বংশকেও ভোগ করিতে হইবে। • ধনমদ, গুহুমদ, বিদ্যামদ, অধিকারমদ বুঝি ; কিন্তু ইহাও জানি স্বল্পতোয়ে সফরী ফরফর করে, অগাধজলসঞ্চারী রোহিতের প্রমত্ততা নাই।

শিক্ষা বিস্তার হইলে দেশের দুর্নীতি ও দুর্গতির কিছু উপশম হইবে। কিন্তু সুফলের আশা অধিক করিবেন না। কারণ, বর্তমান শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষা। ইংলণ্ডের ইংরেজজাতির নিমিত্ত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা। ইহার নামেই, English Education এই নামেই প্রকাশ, ইহা আমাদের দেশব্যতিরিক্ত শিক্ষা, সমাজ-বিচ্ছিন্ন শিক্ষা। বিদেশীয় শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধির কৃত্রিম মার্জনা হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োগকালে কৃত্রিম বুদ্ধি হত হয়। ইহার বহু উদাহরণ জানা আছে। আপনাদের

হৃদগত হইবে বলিয়া বাঁকুড়া শহর হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিই। ঘনবসতি পল্লীর মধ্যে তড়াগ-নির্মাণ, অশিক্ষিত বাউরী ও বাগদী করে নাই। পূর্বকালের নয়, নূতন নির্মিত। যাইারা করাইয়াছেন, তাইারা প্রাচীন নহেন, নব্য সভ্য শিক্ষিত। এমন তড়াগ যাহাকে জলপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শহরের এক নরক-কুণ্ডের ন্যাকার-জনক মল-নালীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে! এমন স্থানে তড়াগ যেখানে বর্ষাকালে পাড়ার মলমূত্র দৌত হইয়া তড়াগের জল বৃদ্ধি করে! সেখানে তড়াগ নয়, 'তড়ার' (তটের) প্রয়োজন ছিল। সেখানে আরাম নির্মিত হইলে পল্লীর শোভা ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হইত। যেখানে কদাচারের বাহুল্য, বীভৎস সংক্রামক রোগের প্রাবল্য, সেখানে জীবনরূপ জলের নিমিত্ত পুষ্করিণী নহে, কূপ প্রশস্ত, নলকূপ (tube well) নিরাপদ। সরকার হইতে স্বাস্থ্যতত্ত্বপ্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। যে দেশের শহরেই, বৃদ্ধিমান জ্ঞানবান্ অগ্রগামী ভদ্রলোকের বাস নগরেই, এই শোচনীয় কাণ্ড স্বচ্ছন্দে সংঘটিত হইয়াছে, সে দেশের গ্রামে তাইার স্বাস্থ্যতত্ত্ব গুহাতে নিহিত হইবে। জল যে নারায়ণ, তিনি সরকারী কর্মচারী বলিয়া এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না, কারণ মন্ত্রটি হিন্দু পুরাণের। তিনি ব্যাধি-জনক অণুজীবের বিভীষিকা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাহা বস্ত্রপটেই চিত্রিত থাকিবে, হৃদয়পট স্পর্শ করিবে না।

এখন আর-এক দিক্ দেখি। প্রথমে বাগ্-দেবীকে স্মরণ করি। বাঙ্গালা ভাষা মধুর, এত মধুর যে শুধু ভারতবাসীর নয়, পশ্চিমদেশীর কানেও মধুর বোধ হয়। কিন্তু বাঁকুড়ার ভাষা এরূপ নহে। যোজনাস্তে ভাষা, সত্য বটে। কিন্তু বাঁকুড়ার ভাষা শ্রুতিকটু ও রক্ষ। ইহার কারণ পূর্বে উদ্দেশ্য করিয়াছি। স্বভাব ও শিক্ষা অমুখ্যায়ী মানুষের ভাষা হইয়া থাকে, স্বভাবে দেশের গুণ পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করে। অধীর হইলে শিষ্ট ও শাস্তেরও ভাষা পরুষ হইয়া পড়ে। বাঁকুড়ার ভাষা, অধৈর্যের পরিচায়ক, প্রতিপদের দ্বিতীয় অক্ষরে বল-শ্রাস করিয়া ব্যক্ত হয়। এই কারণে রক্ষ শোনায।

বাঙ্গালা ভাষায় বলশ্রাস প্রায় নাই, প্রথম স্বর দীর্ঘ; বাঁকুড়ায় দ্বিতীয় স্বর দীর্ঘ ও উদাত্ত। একবার এক ভদ্রলোক আমার এক কথার উত্তরে, 'আছে-এ' বলিয়া ছিলেন। তাইার উদাত্ত স্বরে আমি আশ্চর্য হইয়া-ছিলাম। পরে, বুঝিয়াছি, বাঁকুড়ার ভাষাই এই, ভদ্রলোকটি শিক্ষিত হইলেও দেশভাষা ভুলিতে পারেন নাই ফলে যে শব্দে একটি অক্ষর আছে, সে শব্দ উচ্চারণ করিতে বাঁকুড়াবাসীকে বেগ পাইতে হয়। সং ব-ক্ষ বাং বাধ, বাঁকুড়ায় বা- - -দ হইয়া পূর্ববঙ্গের বা- - -ত (ভাত), এবং কাটোয়ার পা- - -র (পাড়) স্মরণ করাইয়া দেয়।

গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় গুরু পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বের 'বুড়া খুড়া' এখন 'বুড়ো খুড়ো', 'চিড়া পিঠা' এখন 'চিড়ে পিঠে', 'রাঙ্ক্যা বাড়্যা' এখন 'রেংঘ্যে বেড়ো' হইয়াছে। পূর্বের 'আইছি', 'খায়', 'পান্য', 'আশ' আর নাই; 'এসেছি', 'খেয়ে', 'পেলে', 'এস' হইয়া গিয়াছে। লিখিত ভাষায় এই এই রূপ প্রবেশ করিতেছে। কারণ দীর্ঘ-আকার, হ্রস্ব ওকার ও একাধারে পরিণত হইয়া ভাষার মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বাঁকুড়া বঙ্গের প্রান্তে বলিয়া ভাষা-সংস্কারের সুযোগ পায় নাই।

কিন্তু এই কারণেই বাঁকুড়ার শব্দ শাস্ত্রিকের নিকট বহুমূল্য। দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষা, বাঙ্গালা ভাষা নামে খ্যাত। বাঁকুড়া সে ভাষার পূর্বরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বহু পুরাতন শব্দ যাহা অল্পদর্শীর দৃষ্টিতে লুপ্ত বোধ হইয়াছে, বাঁকুড়া সেসব জলজীহ্বস্ত। বহুকাল পূর্বে বাঙ্গালা ও ওড়িয়া ভাষা, এক ভাষার দুই ভাষা ছিল, বাঁকুড়া সেই প্রাচীন সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন রূপ দ্বারা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় স্বগম হয়। বাঙ্গালা 'খুটা' শব্দের মূলনির্ণয়ে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। এখানে যেমন অনিলাম 'খুনি' অমনই বুঝিলাম সং 'কুট' নয়, 'কুণিকা' নয়, সং 'সুণা' হইতে 'খুটা', 'খুটি'। বাং ওং হিং 'গোড়' কত প্রচলিত শব্দ। এখানে 'ভোড়', আসামে 'ভোরি', এবং বাং 'ঘোড় তোলা' (জুতা), সেই এক সং 'গোহির' হইতে আসিয়াছে। ঢাকায় কলা-গাছের

খোড়ের নাম 'ভারালি', মূলে সেই শব্দ। এমন কি এই খোড় ও ধানগাছের খোড় সেই গোহির হওয়া আশ্চর্য নয়। কলাগাছের 'খোড়' এখানে 'সাঁজা', ওড়িয়াতে 'মঞ্জা'; এখানে 'মারগ', ওড়িয়াতে 'মারগ', বাঙ্গালায় মাজা; এখানে 'জুঁটা', ওড়িয়াতে 'অণ্টা', অণ্ড্র 'কোমর' বলে। স্ত্রীলোকের শাড়ীকে এখানে বলে 'লইতা', সং নেত্র বা° নেত্র বলিয়া মনে হয়। কে এই-সকল শব্দ লিপিবদ্ধ করিয়া চিরলোপ হইতে রক্ষা করিবে? কে বাঙ্গালা কোষ সঙ্কলনে সাহায্য করিবে!

যিনি প্রাচীন সাহিত্য চর্চা করিতে চান, তাহারও অনেক কাজ আছে। এই বাঁকুড়া হইতে রামাই পণ্ডিতের শূণ্যপুরাণ এবং বিষ্ণুপুর হইতে চণ্ডীদাসী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইয়াছে! শূণ্যপুরাণে ঠিক বাঁকুড়ার ভাষা নাই। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেও 'অনন্ত' নাম থাকাতে তাহার শুদ্ধতায় সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু দুই-ই অমূল্য। এইরূপ অমূল্য পুথী আরও কত আছে, কে খুজিয়া দেখিয়াছে? শুনিতেছি, ইন্দাসের অন্তর্গত স্বর্নসায়রের সীতারাম দাসের ধর্মপুরাণ এখনও হস্তান্তরিত হয় নাই। সীতারাম দাস তিনশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ঘনরামের কি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মসঙ্কল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সীতারামের পুথিতে অপূর্বকথন নিশ্চয়ই আছে। কে তাহা উদ্ধার করিবে?

বাঁকুড়া হুগলী মেদিনীপুর বর্ধমান জেলায় নিরঞ্জন ধর্মের বহু মন্দির আছে। কোথায় কত আছে, জানিতে পারিলে উহার আদি উৎপত্তি নির্ণয়ে সুবিধা হইত। ধর্মঠাকুরের সেবক, ব্রাহ্মণেতর জাতি হইয়া থাকে; কদাচিত্ ব্রাহ্মণকেও পূজা করিতে দেখি। ওড়িয়ায় বহু বাউরী শূণ্যবাদী। এই 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম' আমাদের কত লোকের ভয় ও ভাবনা, শরণ ও আশ্রয় হইয়া আছেন, আমরা কদাচিত্ স্মরণ করি। রূপনারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ, বাঁকুড়া রায়, পঞ্চানন, কাঁকড়াবিছা, বুড়াধর্ম, প্রভৃতি বিগ্রহের নাম ও ধাম একত্র করিতে পারিলেও ধর্মের ব্যাপ্তি বুঝিতে পারা যায়। ধর্মের গাজন বুঝিতে পারি; কিন্তু শিবের ও শীতলার গাজনের হেতু

কি? আমরা বাঁকুড়ায় মনসা ও ভাছ পূজার ঘট দেখিতেছি, কিন্তু কুদ্রাশিনী ও অণ্ড্র গ্রামদেবীর কথা কে শোনাইবে?

বাঁকুড়া জেলায় ছাতনা গ্রামে বাসলী দেবী প্রসিদ্ধ আছেন। কেহ কেহ বলেন, অমর কবি চণ্ডীদাস এই বাসলীর পূজারী ছিলেন। লোকে চণ্ডীদাসের ভিটা, রামী রজকিনীর ঘাট দেখাইয়া দেয় এবং তাহার ভাতা দেবীদাসের নাম স্মরণ করে। কেহ কেহ মন্দিরগাত্রে লিখিত ১৪৭৬ শক (ইং ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) কবির আবির্ভাব-কাল বলে। ইহাতে কিন্তু চণ্ডীদাস মাড়ে তিন শত বৎসরের হইয়া পড়েন। এই কাল, মন্দির নির্মাণের বা সংস্কারের কাল। পূর্বে অপর মন্দির ছিল না, কে বলিতে পারে। কবি সন্দেহ আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক সন্দেহ আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্দেহ করেন, চণ্ডীদাস নামে দুই কবি ছিলেন। আমার বিবেচনায় বাসলীসেবক বটু চণ্ডীদাস একাধিক হওয়া প্রায় অসম্ভব। নানুরের মাঠে ও ছাতনার গ্রামে কবির কিছু কাল কাটিয়া থাকিবে। বহু কবি সন্দেহ এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। বীরভূমি ও পুরী, দুই স্থানই জয়দেবকে অধিকার করিতে চায়।

ছাতনার প্রাচীন নাম বাসলীনগর। বহু কালাবধি এখানে সামন্তভূপগণের আবাস আছে। ইহারা ছত্রী। তাই নাম ছত্রীস্থান বা ছাতনা, যেমন রাজপুতস্থান হইতে রাজপুতনা। কিম্বদন্তী এই, এখানে প্রথমে ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। সে বংশের শেষ রাজা বাসলীর ভক্ত হইতে পারেন নাই। ইহাতে দেবীর কোপ জন্মে, ব্রাহ্মণবংশ ধ্বংস হয়, এবং বর্তমান ছত্রীরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার বোধ হয় এই কিম্বদন্তীর মূলে সত্য আছে। বাসলীদেবী চণ্ডী নামে পূজিতা হইলেও পণ্ডিতেরা অমুমান করেন তিনি বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রেশ্বরী। অতএব সেকালে ব্রাহ্মণের অভক্তি আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। হয় ত বাসলী সামন্তজাতির কুলদেবী ছিলেন, এবং পাঁচ শত বৎসর পূর্বে মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই অমুমান সত্য হইলে বটু চণ্ডীদাস স্বচ্ছন্দে ছাতনায় আসিতে পারেন।

ছাতনা দূরে থাক, বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি জানি না। ইহার পূর্ব নাম বাঁকুড়া না হইলে মনে করিতাম, ধর্মঠাকুর বঙ্কুরায় বা বাঁকারায় হইতে বাঁকুড়া। এখানে এখন ধর্মঠাকুর নাই। পূর্বে ছিলেন কি না, কে জানে। পাশের দ্বারকেশ্বর নদের নাম ধরুন। মহাদেবের নামে ঈশ্বর থাকে? কিন্তু দ্বারকা বা দ্বারিকা কোথায়? ভবিষ্যপুরাণে নাম, দারিকেশী। দারি, দারিকা অর্থে সন্ধি, বিদীর্ণ স্থান (a fissure); যে নদী পর্বত বিদীর্ণ হইয়া বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারকেশ্বর নদের আরম্ভ-স্থানে পর্বত নাই। দারী অর্থে বারবনিতাও আছে; এই অর্থ ধরিলে বারবনিতার কেশ-সাদৃশ্যে নদীর নাম। মূল ধরিতে না পারিলে বানান শুদ্ধ হয় না। 'দ্বা' লিখিব, কি 'দা' লিখিব, বুঝিতে পারি না। অপর নদী, গন্ধেশ্বরী। ইহার সহিত গন্ধবণিকের সম্বন্ধ আছে কি? একতেশ্বর ঠাকুর শিব বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর নামে শিব বুঝি। কিন্তু একতার ঈশ্বর শিব ছিলেন না, ছিলেন বৃদ্ধ। আদিত্যে একতেশ্বর বৌদ্ধমূর্তি কি?

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইতে চান তাঁহাদেরও ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। এখানে এমন অনেক গাছ আছে, যেসব নিম্ন বঙ্গে, দক্ষিণরাঢ়ে নাই। গুজরাটের বনে কবিকঙ্কণ অনেক গাছ দেখিয়াছিলেন, সেসব দামুণ্ডায় নাই, এখানে আছে। নিম্ন বঙ্গের পাখী ও মাছ এখানে সব নাই; তেমনই এখানকার কিরাত সর্প (ডোমনা চিত্তী) সেখানে কদাচিত্ দেখি।

একথা সবাই জানি, বাঁকুড়া ও নামাল দেশ এক নয়। কিন্তু জানি না, প্রত্যেকের কি গুণে কি অন্তর ঘটিয়াছে। কবি গাইয়াছেন বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু পুণ্য হউক; আমরাও গাই বাংলার বায়ু পুণ্য হউক। এখানকার বায়ু স্বচ্ছ ও শুষ্ক, এমন শুষ্ক যে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের রাত্রির আকাশে একটি তারাও দীপ্তিহীন হয় না। স্বচ্ছ ও শুষ্ক বলিয়া এখানকার মানুষের বর্ণ মলিন। জন্মকালে যে গৌরবর্ণ, অন্তত যে গৌরবর্ণ, রবিকরপ্রভাবে এখানে সে কৃষ্ণ। এই মলিনত্বের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাস বৃষ্টির, এবং বর্ষা হইতে শীতান্ত হ্রাসের কাল। বর্ষাকালের আকাশ

মেঘাচ্ছন্ন, এবং দক্ষিণায়নে বায়ু আর্দ্র ও রবিকর মৃদু হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের পূর্বাঙ্কে যে রণকুম্বাসা (এখানে বলে ধুকু) দেখি, আবহের এই রঞ্জোলক্ষণ কে বর্ণনা করিবে? মনে করিতাম নদীবহুল পূর্ববঙ্গেই ঘূর্ণিঝড় সম্ভবে। কিন্তু এই বৎসর রেল-স্টেশনের নিকট হইতে যে ঝড় বহিয়াছিল তাহার শক্তি অল্প ছিল না। আর যে রক্তধূলি অপরাঙ্কে ঘূর্ণিত হইতে হইতে নৈঋত কোণ হইতে ঈশান দিকে চলিয়া যায়, যাহার ঘনতায় কোলের মানুষ চিনিতে পারা যায় না, তাহার উৎপত্তি কোথায়, পরিণাম কোথায়? তিন বৎসরে তিনবার দেখিলাম। এ বৎসর রাত্রি ৯।১০টার সময় দেখা দিয়াছিল। ১৩২৮ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে যে ধূলিবাত্যা বাঁকুড়ায় অপরাঙ্ক ৪টার সময় দেখা গিয়াছিল, রাণীগঞ্জ ও বর্ধমান দিয়া গিয়া কলিকাতায় সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়াছিল। সে কি এক বাত্যা কি পৃথক বাত্যা একদা উথিত হইয়াছিল?

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এসব বুঝি বিদ্যার নিমিত্ত বিদ্যাচর্চা। আমি এই বুঝি মানি না। বিনা প্রয়োজনে বোন কর্ম হয় না, বিজ্ঞানের এষণাও না। এষণায় যে আনন্দ এ স্থলে সেটির লাভই প্রয়োজন। কিন্তু পরে সে এষণা হইতে লৌকিক হিতও হইয়া থাকে। যে কৃষি হইতে আমাদের জীবিকা হইতেছে, এক প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন সে কৃষি এই গ্রীষ্মদেশে উদ্যানকর্ম বিশেষ। বলা বাহুল্য উদ্যানকর্ম ও কৃষিকর্ম এক নহে। ক্ষেত্র ও বীজের যোগে শস্যের উৎপত্তি। উত্তম বীজ চাই, উত্তম ক্ষেত্রও চাই, নইলে শস্য উত্তম জন্মে না। কিন্তু ক্ষেত্র বলিতে কেবল মৃত্তিকা নহে; যে দেশে ক্ষেত্র, সে দেশের ধর্ম ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। বাঁকুড়ায় শীত গ্রীষ্ম প্রবল, বায়ু শুষ্ক; এই পর্যন্ত জানি, কিন্তু ক্ষেত্রের এই এই ধর্মের বশে কোন্ শস্যের কি ইষ্টানিষ্ট হয়, তাহা জানা আছে কি? মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিতে পারি, করাও হইয়া থাকে। কিন্তু আবহবিচার কোথায় হইতেছে? দুঃখ হয়, আবহ ও কৃষির, আবহ ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিচার উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বাঁকুড়ায় আবহলক্ষণ জানিবারও উপায় নাই। এদেশে অন্তত: আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব

হইতে যে বৃষ্টিমান ছিল ; এখন এই বিজ্ঞানের দিনে, তাহাই দুই চারি স্থানে স্থাপিত আছে। পূর্বে ধ্বংসরোপণ দ্বারা প্রবহদিক নিরূপিত হইত। এখন তাহাও দেখিতে পাই না। বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়াতে আবহলক্ষণ লিখিত হইতেছে, বাঁকুড়াতেও হইত, কিন্তু স্বল্পব্যয় বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গভমেণ্ট্ আবহলিখন উঠাইয়া দিয়াছেন, বাঁকুড়া হাঁ না কিছুই বলে নাই। সারস্বত সমাজ থাকিলে উঠিয়া যাইত কি ? মনে রাখিবেন, বহু বৎসরের এবং বহুস্থানের আবহলক্ষণ না পাইলে বিচার চলিতে পারে না।

বাঁকুড়ার ভূমি প্রাচীন, মধ্য ও পূর্ববঙ্গের স্রায় আধুনিক হে। ভূবিদ্যার ভাষায় বাঁকুড়া তৃতীয় যুগের, স্থানে স্থানে দ্বিতীয় যুগেরও চিহ্ন আছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারত এই রূপ প্রাচীন। কত কাল গিয়াছে, কত বৃষ্টি বাত্যা বহিয়া গিয়াছে, কত নূতন নদীনালা সৃষ্টি হইয়াছে, কত পুরাতন পাহাড় সমভূমি হইয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য বোধ হয়, বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমভাগ দিয়া বন্যা বহিয়া যাইত, অনতিদূরে কোচপাথরের পাহাড় ছিল, তাহার খণ্ডসকল এখানে ওখানে, কোথাও বা রাশি রাশি, সঞ্চিত রহিয়াছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে পাথর্যা কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বকালে পাথর্যা কয়লা জানা ছিল না, কিন্তু সিংহভূমির খনিজ আকর সব অজানা ছিল না। লোহার জাতি আকর হইতে লৌহ পৃথক করিত ; টাটা কোম্পানীর লৌহ আবিষ্কার নূতন কথা নহে। সিংহভূমি, তুঙ্গভূমি, শেখর-ভূমি, ধবলভূমি, বীরভূমি, বরাহভূমি প্রভৃতি নাম হইতে বুঝি এই স্থান দিয়া আর্ঘগণের যাতায়াত ছিল। তাহারা কলাকর্ম করিতেন না, কিন্তু ধাতু ও রত্ন পরীক্ষা করিতেন। সেকালে যাহা ছিল, এই নব্যশিক্ষার দিনে তাহাও যে দেখিতে পাই না।

বাঁকুড়ায় একটা বড় কলেজ, তিন চারিটা ইন্স্কুল আছে। এইসবে অন্ততঃ ৭০৭৫ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষিত রাজকর্মচারী আছেন, শতাধিক উকীল আছেন। শতাধিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, অন্ততঃ দুইশত পাঠক আছেন। অথচ সাধারণ গ্রন্থশালা নাই। সঙ্গীত-

চর্চা কিছু আছে, কিন্তু কাব্য ও পুরাণ ও ইতিহাস পাঠের প্রয়াস কই ? বহু নগরে গ্রন্থশালা নাই, কিন্তু সেটা উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে না। সাহিত্যচর্চা ব্যতীত কেমন করিয়া চিত্র সরস থাকিতে পারে, কেমন করিয়া মানসিক পুষ্টি লাভ হইতে পারে ? আমরা ভাত খাইয়া বাঁচিয়া নাই ; বাঁচিয়া আছি আমাদের সাহিত্যের প্রভাবে। কে আমাদের ধর্ম ও নীতি, আচার ও ব্যবহার বাঁধিয়া দিয়াছে ? কে হতাশের সান্ত্বনা, উন্মার্গগামী সংযম, তাপক্লিষ্টের শান্তি, দুঃখাতের আশা, সঞ্চার করে ? নিরক্ষর পুখী পড়িতে পারে না, কিন্তু আমাদের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের রস হইতে বঞ্চিত নহে। মানবজাতি যাত্রাই সাহিত্যের রসে জীবিত আছে। যখনই সে মানব হইয়া জন্মিয়াছে, তখনই তাহার অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনাও জুটিয়াছে। এই যে স্মৃতি, সে স্মৃতি স্ব স্ব চরিতস্মৃতি নহে, জাতি-চরিত-স্মৃতি। বাঙ্গালীর জাতি-স্মৃতি বাঙ্গালীর নিত্য ধর্ম। ইতর প্রাণীর অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের চিন্তা নাই। তাহারা এক সহজ স্মৃতিবশে চলে। আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়া সহজস্মৃতি ব্যতীত আর-এক স্মৃতির বশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। সে স্মৃতি, জাতি-স্মৃতি। বাঙ্গালীর জাতিস্মৃতি ইংরেজের নাই, ইংরেজের স্মৃতি বাঙ্গালীর নাই। এইরূপ, হিন্দুস্থানী মারোআড়ী মরাঠী প্রভৃতির স্মৃতি বাঙ্গালীর নয়। যত জাতি তত স্মৃতি। কিংবা স্মৃতি দ্বারাই জাতিভেদ ঘটে। সাহিত্য আর কিছু নয়, জাতিস্মৃতির বাহ্যপ্রকাশ। আমরা মানব, কাজেই মানবধর্মস্মৃতি আমরা পাইয়াছি ; ভারতীয় বলিয়া ভারতীয় স্মৃতি এবং বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালী-স্মৃতি পাইয়াছি। লৌকিক আচারে, সামাজিক ব্যবহারে সে স্মৃতি আমাদের পথপ্রদর্শক।

ভারতীয়স্মৃতি, আর্ঘস্মৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা না জানিলে নয়। স্মৃতির বিষয়, বহু সংস্কৃতগ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালাভাষা দ্বারা সংস্কৃতসাহিত্যের মর্ম অবগত হইতে পারি। কিন্তু এতদ্বারা সংস্কৃতসাহিত্যের রসগ্রহণ সম্যক হইতে পারে না। এই হেতু সারস্বতসমাজের

গ্রন্থশালায় সংস্কৃত গ্রন্থও রাখিতে হইবে। অনেকে ইংরেজী জানেন, ইংরেজী সাহিত্য বিপুল। এই এক সাহিত্য দ্বারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সাহিত্যের সংবাদ লইতে পারি। অতএব উত্তম উত্তম ইংরেজী গ্রন্থও চাই।

কিন্তু গ্রন্থশালায় গ্রন্থ পুঞ্জীভূত হইলেই সকলের ভোগে আসে না। আপণে রত্নের প্রকাশ দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারা যায় না। যাহাতে সে রত্ন সাধারণের ভোগে আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গৃহপতি ও গৃহপত্নী পাঠ করুন, না করুন, বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রন্থ পাঠাইয়া তাহাদিকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। গ্রন্থশালায় এক অঙ্ক চলনীয় না হইলে সম্যক ফল পাওয়া যায় না।

সারস্বতসমাজ নিজেব জ্ঞানবিস্তার চরিতার্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। দেশে জ্ঞানবিস্তার না হইলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারিবে না। লক্ষপতি লক্ষমুদ্রার উপর উপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে দেশের হিতাহিত কিছুই সাধিত হয় না। বিধাতার এমনই বিধান, লক্ষ ফল দশজনে বাটিয়া না খাইলে আনন্দ হয় না। তস্মিন্ তুষ্টি জগৎ তুষ্টিং,—তাহারা তুষ্টি হইলে ‘আমি’ও তুষ্টি।

পাঠশালা বসাইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে পাঠ পড়াইতে পারেন; কিন্তু যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত, যুবা ও প্রৌঢ়, তাহারা কি অধয়িনশীল ভবিষ্যৎ-বংশের আশায় বসিয়া থাকিবে? তাহাদের নিমিত্ত কি ব্যবস্থা আছে? পাঠশালা ও ইন্স্কুল বন্ধ, টোল ও কলেজ আরও হটক; ইংরেজী বিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রসারলাভ করুক, সারস্বতসমাজও কার্য করিতে থাকুন। মহাহুভব সদয়ব্যবহার কালেক্টর সাহেব বাঁকুড়ায় লক্ষ্মীর আবির্ভাব নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। তাহার যত্ন সফল হউক। তাহার প্রতিষ্ঠিত “কৃষি ও হিতকরী সমিতি” কার্যকরী হউক। কারণ নিত্য অনশনে সরস্বতীর পূজা হইতে পারে না, রোগক্লিষ্টের চিন্তার মধ্যে সরস্বতীর ধ্যান হয় না। একথাও সত্য, সরস্বতীর কৃপা নইলে লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী হইয়া দাঁড়ান। সেদিন এক বিজ্ঞাপনে পড়িতেছিলাম, “বাঁকুড়া সম্মিলনী” বাঁকুড়াবাসীর পরস্পর সৌহার্দ কামনা করেন। সৌহার্দ কেন নাই, এবং কি

উপায়ে তাহা আসিতে পারে, তাহার উল্লেখ পাই নাই। আমাদের কাম্যের অন্ত নাই; কিন্তু কামনার দৃঢ়তা কই? পরস্পর অবিশ্বাসেই বাঙ্গালী মজিয়াছে, অবিশ্বাসের কাজও করিয়াছে। কিন্তু কেন? ধর্ম হইতে কম, এবং কম হইতে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, দুইটা পৃথক করাতে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে।

“সম্মিলনী” বিজ্ঞাপন পড়িয়া দুঃখও হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মিলনী এখনও গ্রামীণতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখানকার লোকে আমায় বিদেশী বলে। শুনিয়া প্রথম প্রথম হাসি পাইত। কিন্তু পরে বুঝিলাম, “বাঁকুড়া” বলিতে ইহারা বাজারটুকু মাত্র বুঝে। পাড়ার নাম অবশ্য থাকিবে, কিন্তু পাড়া বড় হইয়া যে গ্রাম, এবং গ্রাম বড় হইয়া যে জেলা, সাধারণ জনগণ ততদূর আসে নাই। দুঃখ হইতেছে, “সম্মিলনী”ও জেলার বাহিরে যাইতে পারেন নাই। গ্রামীণতার গণ আছে। কিন্তু যখন প্রধানগুণ, পরস্পরপ্রীতি নাই, তখন দোষের ভাগই প্রকট হইয়া উঠে। বাঁকুড়াবাসী বাঁকুড়াবাসীকেই বিশ্বাস করে কই? গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বিশ্বাস কই? জীববিদ্যার একটা স্থূল কথা এই যে, উৎপীড়িত হইয়া যে জীবকে বাঁচিতে হয়, সে আত্মরক্ষার্থে প্রবঞ্চনাপরায়ণ হয়। মনে হয়, বাঁকুড়া বহু উৎপীড়িত হইয়াছে, বহুবার ঠকিয়াছে! ফলে এখন শঠে শঠ্য সমাচরণ করিতেছে।

পূর্বে আভাসে বলিয়াছি, কেবল কৃষি দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কেবল কৃষক দ্বারা সমাজও রক্ষা পায় না। কারু চাই, কার্মিক চাই, ব্যাপারী চাই। আশ্চর্য এই, এই বাঁকুড়ায় যেখানে নাকি দুর্ভিক্ষ নিত্য-সঙ্গী, সেখানে অল্প জেলা হইতে, এমন কি বিহার হইতে, কারু ও কার্মিক আনাইতে হইতেছে! বঙ্গের সর্বত্র কারু ও কার্মিক অ-শিক্ষিত (untrained)। তত্পরি অসত্যবাদিতা, শঠতা, সময়-লঙ্ঘন, অবিনীত ব্যবহার জুটিয়া ইহাদের এবং দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, কিসে প্রতিকার হইবে? কলিকাতায় মারোআড়ীর স্থিতি ও প্রতিপত্তি বুঝিতে পারি। এই বাঁকুড়া গ্রামতুল্য; এখানে মারোআড়ী গায়ের জোরে ঢোকে নাই,

ব্যাপার-বুদ্ধিবলে ক্ষুদ্র স্থানেও ধনসঞ্চয় করিতেছে। কচ্ছী ঠিকাদার যোগ্য বলিয়াই এই শহরে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। মারোআড়ী ও কচ্ছী সাধু নহে; কিন্তু ব্যাপার-সাধুতা নিশ্চয়ই আছে। বাজারে দেখি, দোকানী দোকান পাতিয়াছে, কেনা-বেচা চলিতেছে; আর উদ্ধত ব্যবহারে অভ্যস্ত বাঁকুড়ারই গ্রাহকের মুখে শুনিয়াছি, কেনা দায়। দর চড়া বলিয়া নহে, অশিষ্ট ব্যবহারে গ্রাহকের মনোবেদনা। মিষ্টি মুখের কি গুণ, দোকানীর তাহা জানা নাই।

আমার বিশ্বাস, অশিক্ষিত অশিষ্ট জনগণের ব্যবহারে আমরা যে ক্ষুব্ধ, কখনও বা ক্রুদ্ধ হই, তাহা আমাদেরই ব্যবহারের প্রতিবিম্ব। কারণ তাহাদের শিক্ষাদাতা আমরাই। আমাদের রেড়ো ব্যবহার বঙ্গের সর্বত্র বিকৃত। তথাপি, স্বভাব মাথায় চড়িয়া বসিয়া আছে। কারণ বিদ্যা-শিক্ষা আর বিনয়-শিক্ষা এক নয়।

বঙ্গের এক এক জেলায় মামলা-মকদ্দমা বেশী। সেখানকার লোক ছুঁদিয়া, অর্থাৎ দ্বন্দ্বপ্রিয়। পূর্বকাল হইলে তাহারা মারা-মারি, হানা-হানি করিত। অত্যাচারিত হইত বলিয়া তাহারা আত্মরক্ষার্থে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই যে পূর্বস্বভাব, একালে ব্যক্ত হইবার সে উপায় নাই। এক উপায়, ক্ষুদ্র উপায় আছে, আদালতে মামলা করা। আমার যেখানে জন্ম, সেখানকার লোক মামলা-বাজ বলিয়া বিখ্যাত। ক্ষেত্রবিশেষে কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যও আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছুঁদিয়া ছিলেন, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। ৩ রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমায়িকতার অবধি ছিল না। বাঁকুড়ায় নাকি মকদ্দমা কম; কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্য বেশী কি?

চিত্ত সরস না হইলে এগুণ সহজে আসে না। সাহিত্যরস একমাত্র রস যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা আসিতে পারে। সংসাহিত্য হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যদি দোকানের দোকানীকে, বাজারের মুদীকে, হাটের পসারীকে দিবাকর্মের অবসানে রামায়ণ পড়াইতে পারেন, যদি গ্রামে গ্রামে ওড়িয়ায় ভাগবতঘরের তুল্য পুরাণঘর করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশে আত্মজ্ঞান-প্রচারের সুত্রপাত হইবে। ওড়িয়ায় এমন গ্রাম নাই,

যে গ্রামে ভাগবতঘর নাই। সেখানে মক্ষ্যার পর পাড়ার ও গ্রামের শ্রোতা উপস্থিত হয়, এক পাঠক ওড়িয়া ভাগবত পাঠ করেন। ফলে নিরক্ষর বাউরীর মুখে ভাগবতের উপদেশ শুনিতো পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও এই রীতি ছিল, রামায়ণমহাভারত পাঠ এখন বন্ধ হইয়াছে। আরও ছিল, পুণ্যবানের গৃহে পুরাণপাঠ ও কথকতা, ধনবানের গৃহে পৌরাণিক যাত্রা গান। সে-সব পুনঃপ্রচলন কে করিবে?

আমাদের শুভ এই, দেশের মানুষ এখনও, এই দুদিনেও, আনন্দ উপভোগ কবিতো পারে। ইংরেজী-শিক্ষিত জ্ঞানে বাড়িয়াছেন, কিন্তু রসে বঞ্চিত হইয়াছেন, দেশের আমোদ-আহ্লাদ সম্ভোগ করিবার শক্তি হারাইয়াছেন। ইহাদের তুল্য দুঃখী আর কে আছে? শিক্ষার এ কি পরিণাম! বাঁকুড়ায় বারমাসে তের পার্বণ ছাড়া কত 'পরব' আছে, কত কুটুম্বিতা কত সমাজব্যবহার আছে, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিয়াছি, কারু ও কার্মিক, যাহাদের দিন-বেতন একমাত্র সম্বল, তাহারাও দিনিকা অগ্রাহ করিয়া পরবে মত্ত হয়, পাঁচ ক্রোশ দূরে ভোজনের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে, যাত্রাগান পাইলে ত কথাই নাই। এই রসবোধ যতদিন আছে, ততদিন তাহারা মানুষ আছে, তাহাদিগকে তুলিয়া লওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান চাই, একের অভাবে অগ্র পশু হইয়া পড়ে। কি কাল পড়িয়াছে, তাহা সবাই জানে; কিন্তু কালোচিত ব্যবস্থা কি হইতে পারে, তাহা সকলে জানে না। এবিষয় ভাবিবার চিন্তিবাব লোক চাই। তেমনই দেশের লোক দেশে আছে বটে, কিন্তু দেশ চেনে না। চিনাইবার লোক চাই। অর্থাৎ প্রদেষ্ঠা আবশ্যিক। নৈশবিদ্যালয় বন্ধক। লিখিতে পড়িতে শিখিলে জ্ঞানমন্দিরের কুঞ্চিকা করতলগত হয়; কিন্তু মন্দির দূরবর্তী হইলে, বিগ্রহ চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে অপ্রয়োগহেতু সে কুঞ্চিকা মলারূত হইয়া অল্পে অল্পে অদৃশ্য হয়। অতএব বিদ্যালয়ের যোগান্ চাই; সে যোগান্ পর্যটকপ্রদেষ্ঠার কর্ম।

আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি শঙ্কা করিতেছি। কিন্তু আশা করি, সারস্বত সমাজের কর্মক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ, তাহার ক্ষীণ আভাস দিতে পারিয়াছি। অবশ্য এমন ভাবিবেন না-যে এই সমাজ একদা বা অচিরে সমুদয় কর্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কত কি করিবার আছে, দেখিবার আছে, ভাবিবার আছে, তাহারই গোটা কয়েক উল্লেখ করিলাম। অধিকারভেদে কর্মের ভেদ অবশ্য হইবে। সবাই ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হইতে পারেন না। যাহাঁর যে কর্ম রতি, তিনি সে কর্ম করিবেন। কাজেই সমাজ বা সমিতির প্রয়োজন। যে যে কর্মের আভাস দিলাম, তাহা সারস্বত সমাজ করুন কিংবা অগ্র নামে কেহ করুন করিতেই হইবে, কায়েন মনসা বাচা করিতেই হইবে, আজি করুন আর কালি করুন। শুধু বাঁকুড়ায় নয়, বঙ্গের, ভারতের, নগরে নগরে এক এক দল সৃষ্টি

চাই। তাহাঁরা লোকমত চালনা করিতে থাকিবেন। মাসিকপত্র বা দৈনিকপত্র কয়জন পড়েন, কয়জনই বা তাহা হইতে প্রেরণা পাইয়া কর্মে উদ্যুক্ত হইতে পারেন?

অতএব এই সমাজের সহিত “বাঁকুড়া সম্মিলনী” কিংবা “কৃষি ও হিতকরী সমিতির” সীমা-বিবাদ থাকিতে পারে না। যদি এই দুই সমিতি একাএকা কিংবা উভয়ে দেশে আত্মজ্ঞান, কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান প্রচার করিতে স্বীকৃত হন, সারস্বতসমাজের আবশ্যকতা থাকিবে না। সারস্বত সমাজের বয়স এখনও একবৎসর হয় নাই; উঠিয়া গেলে কাহারও মনঃকষ্ট হইবে না। কিন্তু মনে রাখিবেন, মানবসমাজের অন্যান্য অঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক অঙ্গ পুষ্টির প্রয়াসী হইলে একাদী বাত সঞ্চারের আশঙ্কা আছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য

সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা দরকার।

প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে;—যে-কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সামাজিক আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে তা সমাজের লোকদের মধ্যে সেটি কি-ভাবে বণ্টন করা হয় তার উপর নির্ভর করে। সামাজিক আয়কে যদি মাত্রায় বিভাগ করা হয় তা হলে সমাজের লোকেরা নানান অনুপাতে সামাজিক আয়ের ভাগ পেলে প্রত্যেকের অংশকে মাত্রায় প্রকাশ করা যায়। যথা, রাম-বাবু পেলেন বাৎসরিক দুশ মাত্রা ভোগ্য; শ্যাম-বাবু পাঁচশ মাত্রা, রামধন পঞ্চাশ মাত্রা, জনসন্ পঞ্চাশ হাজার মাত্রা, ইত্যাদি। অবশ্য সত্যকার জগতে সব-কিছুই টাকায় প্রকাশ করা হয়। এখন বিভিন্ন লোকে যে সামাজিক আয়ের অংশ উপভোগ করছে, এটা অগ্র দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে সামাজিক আয় নানা-প্রকার ব্যবহারে লাগছে। যথা, কেউ চাল অথবা

আলুর সাহায্যে দেহ পোষণ করছে আর কেউ তার থেকে ছইস্কি তৈরী করে' দেহের সর্বনাশ করছে। কোথাও সামাজিক আয়ের অংশ বেশী মাত্রায় পাওয়ার ফলে কেউ অতিভোজন করে' জীবন পাত করছে, আর অগ্র কোথাও আর-কেউ অল্প-পাওয়ার ফলে মন-খেয়ে মারা যাচ্ছে।

আমাদের নিয়ম অনুসারে কোন ভোগ্যসমষ্টি থেকে অধিকতম প্রয়োজনীয়তা পেতে হলে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত মাত্রার (অর্থাৎ যে মাত্রা কোন ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়তা দেয়) প্রয়োজনীয়তা সমান হওয়া দরকার; এবং নানান ব্যবহারে ভোগ্য ব্যবহৃত হলে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমতার দিকে যত যায় ততই বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়। যার ভাগে ভোগ্যের মাত্রা যত বেশী করে' পড়ে তার কাছে সাধারণতঃ নিজ অংশের সীমাস্থিত মাত্রার প্রয়োজনীয়তা দানের ক্ষমতা তত কম। ১০০০

টাকার আয়ের শেষ মুদ্রাটির বা প্রয়োজনীয়তা ১০ টাকা আয়ের শেষ মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং যাদের ভাগে সামাজিক আয়ের অংশ বেশী পড়ে তাদের চেয়ে যেসব লোকের ভাগে সামাজিক আয়ের অংশ কম পড়ে, তাদের ভাগের পরিমাণ বেড়ে গেলে স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওয়া যাবে। অর্থাৎ দরিদ্রের (কারা দরিদ্র তা নির্ণয় করার চেষ্টার প্রয়োজন নেই) অংশে বেশী করে' ভোগ্য বা সামাজিক আয়ের অংশ দিলে ধনীকে দেওয়া অপেক্ষা তার প্রয়োজনীয়তা-দানের ক্ষমতা বেশী হবে। কেননা দরিদ্রের কাছে যদি কোন ভোগ্যের দশম মাত্রা সীমাস্থিত মাত্রা হয়, ধনীর কাছে সেই ভোগ্যের এক হাজার পঞ্চাশতম মাত্রা সম্ভব সীমাস্থিত মাত্রা। দরিদ্র ও ধনী দুই জনই মানুষ। কাজেই ভোগ্য ব্যবহার করে' তৃপ্তি লাভ এমন কিছু বিভিন্নভাবে তারা করতে পারে না যাতে দশম মাত্রা ও একহাজার পঞ্চাশতম মাত্রা সমান প্রয়োজনীয়তা দিতে পারে। কাজেই ধনীর অংশ থেকে কয়েক মাত্রা নিয়ে দরিদ্রের অংশে দিলে বেশী প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি হবে নিশ্চয়।

অবশ্য এরকম করলে পরোক্ষভাবে স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যেতেও পারে। যেমন সামাজিক আয়ের শুধু বণ্টনের দিকই আছে এমন নয়। কাজেই কেউ যদি শুধু বণ্টন-প্রণালীর দোষগুণ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তাঁর দ্বারা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অপকার ঘটতে পারে অনেক। বণ্টন সম্বন্ধে যখন কথা বলা হয় তখন ধরে' নেওয়া হয় যে সামাজিক আয় উৎপাদন সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। যদি বণ্টন-প্রণালী পরিবর্তন করতে গিয়ে উৎপাদনের দিকটি খোঁড়া হ'য়ে যায় তা হ'লে লাভের চেয়ে লোকসান হয়ত বেশী হবে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক যে ধনীরাই সবকিছু উৎপাদন করে বা এমনভাবে সব কিছু উৎপাদনে সাহায্য করে যাতে তাদের উৎপাদন-ক্ষেত্রে উপস্থিতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এবং তাদের আয়ের পরিমাণ অথবা সামাজিক আয়ে তাদের ভাগের পরিমাণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধে তাদের

উৎসাহও পরিবর্তিত হবে। এমন কি তাদের আয় শতকরা দশ কমিয়ে দিলে তাদের উৎপাদন-উৎসাহ শতকরা কুড়ি কমে' যাবে। এক্ষেত্রে তাদের ভাগ থেকে নিয়ে দরিদ্রদের ভাগ বাড়ানোর ফল হবে, সামাজিক আয়ের পরিমাণ-হানি।

তা ছাড়া সামাজিক আয়ের আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে ভোগের দিক। সব লোক 'ত সমাজে যা-কিছু উৎপাদিত হয় সব-কিছুর একটু একটু করে' নেয় না। সামাজিক আয়টা যেমন টাকায় প্রকাশ করা যায়, সেই-রকম ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসংঘ-বিশেষের অংশও টাকায় প্রকাশ করা হয়। অংশ নির্ধারণ হ'য়ে গেলে অংশী তার যেসব ভোগ্য ভাল লাগে তাই টাকার বদলে যোগাড় করে' কিনে' নেয়। সে পায় সাধারণভাবে-কিন্তু তার ক্ষমতা (টাকা) এবং তার বদলে নেয় ভোগ্য। কি ভোগ্য নেবে তা সাধারণতঃ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কাজেই সামাজিক আয়ের উৎপাদন ও বণ্টন ঠিক হ'য়ে গেলেও ভোগের দিকটা দেখতে হবে। ধরা যাক দরিদ্ররা উৎপাদনকার্যে ধনীদের 'চেয়ে বেশী সাহায্য করে। এবং ধনীদের অংশ থেকে কিছু নিয়ে দরিদ্রের অংশে দিলে উৎপাদন কমে' যায় না। কিন্তু দরিদ্ররা যদি উপরি অংশটুকু নিয়ে এমনভাবে ভোগ করে যাতে তাদের কার্যকরী ক্ষমতা কমে' যায়, তা হ'লে ফলে উৎপাদন কমে' যাবে। যেমন মদ্যপান, বা বিলাসিতা। মদ্যপান করলে কার্যকরী ক্ষমতা কমে' যায়। বেশী মাত্রায় সামাজিক আয়ের ভাগ পেয়ে যদি দরিদ্ররা মদ্যপান শুরু করে তা হ'লে এ ক্ষেত্রে বণ্টন-প্রণালী বদলানোর ফল কুফল। যথা, কোন এক স্থলে দেখা গিয়েছে যে সাঁওতাল মজুরদের মাইনে' বাড়িয়ে দিলে তারা মদ খেয়ে সময় নষ্ট করে' বেড়ায় এবং কাজ কম করে। কাজেই অল্পদিক সম্বন্ধে কিছু না বলে' শুধু যদি বলা হয় যে সামাজিক আয়ে দরিদ্রের অংশ যদি বাড়ান যায়, ধনীর অংশ সেই পরিমাণ কমে' গেলেও তাতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে, তা হ'লে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

সামাজিক আয় উপার্জন অথবা এক কথায় উৎপাদন করতে মানুষকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ কিনা

প্রকৃতি সাধারণতঃ বিনা কষ্টে মানুষকে কিছু পেতে দেয় না। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই কষ্টস্বীকারেরও সম্বন্ধ আছে। একই পরিমাণ ভোগ্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করতে হ'তে পারে। এবং সামাজিক আয় সমান থাকলে ও উৎপাদন-কষ্ট বেড়ে গেলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যাবে। ধরা যাক ভোগ্য শুধু একরকমই আছে ও সেটি কয়লা। সামাজিক আয় হচ্ছে ক-পরিমাণ কয়লা। কয়লা যদি অগভীর খনিতে থাকে তা হ'লে মানুষ খ-পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করে' সেই আয় উপার্জন করতে পারে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরের কয়লা ফুরিয়ে আসবে এবং শীঘ্রই ক-পরিমাণ কয়লা জোগাড় করতে খ+গ-পরিমাণ কষ্ট করতে হবে। এতে 'সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যাবে অথচ সামাজিক আয় সমানই থাকবে।

বুঝবার সুবিধার জন্তে আমাদের এখন কএকটি জিনিস পরিষ্কার করে' ভেবে নিতে হবে।

১। কয়েক বৎসরের সামাজিক আয় জড়িয়ে দেখলে তার এক-একটা গড়পড়তা পরিমাণ আছে। যথা উদাহরণ,

বৎসর	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
লক্ষ টাকা	১০০	১১০	১১৫	৯৫	৯০	১২০	১০০	১২৫	৮৫	১০৫

গড়পড়তা বাৎসরিক সামাজিক আয় তা হ'লে হ'ল

$$\frac{১০৪৫}{১০} = ১০৪.৫ \text{ লক্ষ টাকা}$$

২। প্রত্যেক বৎসর সামাজিক আয়ের একটা অংশ দরিদ্র লোকেরা পায় এবং ঐ কয়েক বৎসর জড়িয়ে ধরলে দরিদ্রের অংশেরও একটা গড়পড়তা বাৎসরিক পরিমাণ আছে, এবং দরিদ্রের অংশের সঙ্গে সমগ্র সামাজিক আয়ের একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। যেমন উপরোক্ত বৎসরগুলিতে দরিদ্রেরা যদি গড়ে ২০ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে তা হ'লে তাদের অংশ হচ্ছে গড়ে সামাজিক আয়ের প্রায় শতকরা ১৯.২৫ ভাগ। (ঠিক ১৯.২৩.৭৬%)। এই গড় পরিমাণগুলি কিন্তু সত্য সত্য কোন বৎসরই না দেখা যেতে পারে। যথা আমাদের উদাহরণে সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ, ১০৪.৫ লক্ষ টাকা কোন বৎসরেই আয় হয়নি। প্রত্যেক বৎসরই গড়-পরিমাণ থেকে আসল পরিমাণ বিভিন্ন হ'তে পারে এবং অনেক সময়ই হবে।

দরিদ্রের অংশের গড়-পরিমাণও সেইপ্রকার আসল পরিমাণ থেকে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বিভিন্ন হয়। প্রত্যেক বৎসরের বিভিন্নতা একত্র দেখলে তারও একটা গড়-পরিমাণ আছে। অর্থাৎ কএক বৎসর একসঙ্গে দেখলে বাৎসরিক সামাজিক আয়ের পরিমাণ সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন হয়। একটা দরিদ্রের অংশও সেইরূপ দরিদ্রের গড় অংশ থেকে একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন হয়। আমাদের উদাহরণে বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকায়

বৎসর	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
	১০০	১১০	১১৫	৯৫	৯০	১২০	১০০	১২৫	৮৫	১০৫

গড়-পরিমাণ হচ্ছে ১০৪.৫ লক্ষ টাকা, সুতরাং গড়-পরিমাণ থেকে বিভিন্নতা হচ্ছে

১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
১০৪.৫	১০৪.৫	১০৪.৫	১০৪.৫	১০৪.৫
১০০	১১০	১১৫	৯৫	৯০
-৪.৫	+৬.৫	+১১.৫	-৯.৫	-১৪.৫
৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
১০৪.৫	১০৪.৫	১০৪.৫	১০৪.৫	১০৪.৫
১২০	১০০	১২৫	৮৫	১০৫

+১৬.৫ -৪.৫ +২১.৫ -১৯.৫ +১৫ লক্ষ টাকা

সব বৎসরের বিভিন্নতার গড়-পরিমাণ হচ্ছে

$$\frac{৪.৫+৬.৫+১১.৫+৯.৫+১৪.৫+১৬.৫+৪.৫+১৯.৫+১৫}{১০} = ১১$$

সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে, বিশেষ বিশেষ বৎসরের আয়ের বিভিন্নতা নিয়ে কথা হচ্ছে। এই গড়-পরিমাণ থেকে কোন বিশেষ বৎসরের সামাজিক আয় থেকে বেশী হবে কি কম হবে সে অল্প কথা। কাজেই + ও - দুইএরই এক্ষেত্রে সমান দাম। এই যে গড়-পরিমাণ হ'তে বিভিন্নতা, একে আয়ের অস্থিরতা বলা চলে। আমরা দুটি জিনিস পাচ্ছি; এক, সামাজিক আয়ের অস্থিরতা, আর এক দরিদ্রের আয়ের (অর্থাৎ দরিদ্র সামাজিক আয়ের যে অংশ পায় তার) অস্থিরতা। দরিদ্রের আয়ের অস্থিরতা নির্ণয় সামাজিক আয়ের অস্থিরতা নির্ণয় করার মত করে'ই ঠিক করতে হবে। আয় অস্থির হ'লে অর্থাৎ আজ একরকম আর কাল আর-এক-রকম হ'লে কোন একটা নির্দিষ্টভাবে

জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায় না। যেমন আজ দেখলাম মাছ মাংস খাবার পয়সা আছে আর কাল দেখলাম পাঁজাভাত খেয়ে থাকতে হবে। নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমান অভ্যাস করলাম, হঠাৎ দেখলাম মাটিতে শুতে হবে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্লাব, আড্ডা প্রভৃতির ভক্ত হ'য়ে উঠলাম, এমন সময় চাঁদা দেবার অবস্থা আর রইল না। এরকম হ'লে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যায়। আবার যার আয় যত কম তার পক্ষে আয়ের অস্থিরতা তত মারাত্মক। বেশী আয় যার তার আয় কোনো সময় একটু কম হ'লে প্রথমতঃ আয়ের যে অংশটা সে জমায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ও অবিলম্বে ভোগ না করে, সে দিকেই টান পড়ে। আগে খেয়ে পরে জমায়; কাজেই হঠাৎ আয় কমলে তার জীবন-যাত্রায় খুব একটা নাড়া পড়ে না। আয় বাড়লেও অকস্মাৎ ভোগের মাত্রা সে বাড়ায় না, জমায় বেশী। দ্বিতীয়তঃ যার আয় বেশী সে অনেক অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসে টাকা খরচ করে। আয় হঠাৎ একটু কমে' গেলে এই অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় খরচগুলি আগে বন্ধ হয়। এতে খুব বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের হানি হয় না। কিন্তু দরিদ্রের আয় বাড়লে যেমন সে আগের মত আধপেটা খেয়ে বাকিটা জমায় না, একটু বেশীই খায়; তেমনি আয় কমলেও পেটেই তার ধাক্কাটা সবচেয়ে জোরে লাগে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে প্রথমতঃ আয়ের অস্থিরতার পরিবর্তন হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়তঃ আয়ের পরিমাণ যত কম তার অস্থিরতা ততই কষ্টদায়ক হয়। এখন অবধি আমরা যা আলোচনা

করেছি তা থেকে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা চলে।

১। যদি কোন কারণে মানুষের উৎপাদনকষ্ট না বেড়ে উৎপাদনশক্তি বেড়ে যায় এবং ফলে সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ বেড়ে যায়, তা হ'লে, সামাজিক আয়ের বণ্টন-প্রণালী ফলে নিকৃষ্ট হ'য়ে না গেলে ও তার অস্থিরতা বেড়ে না গেলে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সাধারণতঃ বেড়ে যাবে। সাধারণতঃ বলা হচ্ছে, কেননা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য আরও নানাভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং ফলে, যেমন দুয়ে দুয়ে চার হবেই হবে বলা যায় সে-রকম নিশ্চিত ভাবে কথা বলা স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলে না।

২। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ে দরিদ্রের ভাগ বেড়ে যায়, তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে' না গেলে, অথবা তার অস্থিরতা বেড়ে না গেলে সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে।

৩। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ের অস্থিরতা কমে' যায় তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে' না গেলে অথবা বণ্টন-প্রণালী নিকৃষ্ট হ'য়ে না গেলে, সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে।

৪। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ের যে-অংশ দরিদ্রের ভোগে লাগে তা বেড়ে যায়, অর্থাৎ দরিদ্রের আয়ের অস্থিরতা কমে' যায়, এমন কি ফলে যদি ধনীরা আয়ের অস্থিরতা সেই পরিমাণে বেড়েও যায়, তা হ'লে অল্প সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

দুর্যোগ

গগনে গগনে দেয়া হাঁকে,
 সৃষ্টিবিনাশী খর ডাকে,—
 ওঠে ঝড়।
 কোথা বে পথিক দ্ববা কর
 —ভরা কর!

পথে প্রান্তরে উড়ে পুলি,
 কোথা রে রাখাল পথ 'ভুলি',
 বেলা যায়,—
 গোপুলি-মগন-আঁধি- -যায়
 —আঁধিয়ায়!

হে কিসাণ! ফের গৃহ পানে,
 শক্তি বধ ভয় মানে,
 ক্ষণে চায়;—
 পথে মেথা আঁধি মিশে যায়
 —মিশে যায়!

মেঘমালা হানে জল- -ধাৰা,
 গৃহহীন ভেবে ভয়ে সারা;
 লাগে দোল!
 আজি বাবি ঝরে উত- বোল
 —উতরোল!

ভিড় লাগে আজি গাড়ে গাড়ে,
 মাতাল বাদল-বায় নাচে;
 কাঁপে ঘর।
 বিভল পরাণে লাগে ডর
 —লাগে ডর!

জলহীন প্রান্তর- -মাঝে
 কোথাও পথিক চলে না যে,—
 আঁধি- -যায়;
 মাতামাতি আজি বরি- -যায়
 —বরিষায়!

কোথায় ভিজিছে গৃহ- -হারা
 ছক ছক হিয়া ভয়ে সারা;—
 গতি- -হীন!
 আশ্রয় নাহি, গেল দিন
 —গেল দিন!

একাকী কোথায় পথ- -বাসী
 আশ্রয় লহ ঘরে 'আসি';
 বারে বার
 জ্বরে বায়ু হাঁকে কাঁপে দ্বার
 - কাঁপে দ্বার!

আজি তব ঘরে দ্বার খোলা,
 ঘবছাড়া কোথা পথ- -ভোলা;
 ঝড়ে বায়—
 শক্তি বধু পথ চায়
 —পথ চায়!

কে গো বধু বাতায়ন- -পাশে,—
 অপলক চোখে প্রিয়- -আশে?—
 উদা- -সীন,—
 শূন্য শয়নে রহি লীন
 —রহি লীন!

কোথা অভিসারিকা ধালা,
 মিছে গাঁথ অভিসার- -মালা—
 বাঁধ কেশ;
 তিমির বামিনী, খোল বেশ
 —খোল বেশ!

বাসক-শয়নে কোথা নারী,
 মিছে বেশবাস ফেল ছাড়ি';
 ব্যথা- -ভার-
 বুকে উতরোল হাহা- -কার
 হাহাকার!

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

বেনো-জল

পনেরো

সমুদ্রের উপর দিয়ে রৌদ্রের জলন্ত বন্যা বহে যাচ্ছে—
জলধির বিপুল হিন্দোলাকে কল্পনাতীত মণি-মাণিক্যে
বিচিত্র ক'রে তুলে'। দুপুর-বেলায় চারিদিকে যেন এক
রৌদ্রময়ী রাত্রির নিষ্কলতা থা থা করছে,—কিন্তু
প্রকৃতির এই অপূর্ণ নাট্যশালায় দর্শকের অভাবে
সমুদ্র একটুও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েনি, তার মত্ত তাণ্ডবের
অভিনয়, গম্ভীর স্বর-সাধনা আর প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস
সমানই চলেছে—আর চলেছেই!

রতন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছে,—হাঁ, আর্টিষ্ট
বটে এই সমুদ্র! আমরা মাছুষ-আর্টিষ্ট, বাহবা না পেলে
দমে' যাই, টিটুকিরি দিলে ভেঙে পড়ি। সমজদার না
থাকলে কাজ বন্ধ ক'রে বসি। সমুদ্র কিন্তু এ-সবের
কোন ধারই ধারে না, তুমি ভালোই বল আর মন্দই
বল সে তাতে সম্পূর্ণ নির্ভীকার, সে চায় খালি নিজের
মনে নেচে-গেয়ে আপনাকে এই বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে
দিয়ে বহে যেতে। তার উৎসাহ আসে নিজের ভিতর
থেকে,—বাইরে থেকে নয়। এই তো খাঁটি আর্টিষ্টের
লক্ষণ! তুমি বাধা দিলেও তার নাচ-গান বন্ধ হবে না,
তুমি হাততালি দিলেও সে বাড়াবাড়ি করবে না।
সমুদ্রকে দেখে আমরা অনেক শিখতে পারি।

সমুদ্রের পানে চেয়ে রতন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে
রইল।

জানুয়ার ধারে ব'সে স্মিত্রা একপাশা ছবির উপরে
রঙের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে' ফিরে দেখে'
সে বললে, “কি ভাব'চেন, রতনবাবু?”

রতন বললে, “বুদ্ধদেবের মূর্তির সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা
করছি।”

“কি-রকম?”

—“তুমি ধ্যানী-বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্তি দেখেছ?”

—“হঁ, মিউজিয়মে দেখেছি।”

—“সেই মূর্তির সঙ্গে কখনো সমুদ্রের তুলনা ক'রে
দেখেছ?”

—“না, আপনার মত আমি ত দার্শনিক নই,
অতটা কষ্টকল্পনা করবার বাতিক আমার নেই।”

“শোনো স্মিত্রা, এ একটা মৌলিক ‘আইডিয়া’!
ধ্যানী-বুদ্ধের শিলা-মূর্তি,—নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার
মতন স্থির। আর এই সমুদ্র—এ হচ্ছে গতি-চাঞ্চল্যের
উচ্ছ্বাসিত প্রকাশ। এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে কি
নিম্নে তুলনা চলে বল দেখি?”

—“আমি জানি না, আপনার পূর্ণিমা কে জিজ্ঞাসা
করবেন।”

পূর্ণিমার নামে রতন আহত দৃষ্টিতে স্মিত্রার দিকে
চাইলে। কিন্তু তার পরেই সহজ স্বরে বললে, “ধ্যানী-
বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ লাভের জগ্গে সাধনায় স্থির। আর
সমুদ্রের বিশাল মূর্তি গতির সাধনায় অস্থির। কিন্তু
এই স্থিরতা আর অস্থিরতার মন্যে আশ্চর্য্য একটি
মিল আছে, আপন আপন সাধন-সীমার বাইরে অণু
কোন-কিছুর বিষয়েই এরা কেউ একটুও সচেতন নয়।
বুদ্ধের স্থিরতাও গম্ভীর, আর সমুদ্রের অস্থিরতাও গম্ভীর।
বিশ্ব-ভরা বিপবেও এই স্থিরতা অস্থির বা এই অস্থিরতা
স্থির হবে না।.....এই দুই বৈচিত্র্যই হচ্ছে জগৎসৃষ্টির
মূল—এই দুই সাধনাব মধ্য দিয়েই মানুষের সভ্যতা
সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে চাইছে। বললে স্মিত্রা?”

স্মিত্রা মাথা নেড়ে বললে, “উঁহঁ! অত বড় বড়
কথা আমার এই ছোট মাথায় ঢুকবে না। রতন-বাবু!
আপনার পূর্ণিমাও বোধ হয় এ-সব তত্ত্ব শুনতে রাজি
হবে না।”

রতন একটু অসম্মতভাবে বললে, “বার বার তুমি
পূর্ণিমার নাম করছ কেন?”

—“বার বার তাকে মনে পড়ছে ব'লে। সে যে ভারি
স্মন্দরী!”

রতন বিরক্তমুখে শুরু হ'য়ে রইল।

স্মিত্রা বললে, “আচ্ছা রতনবাবু, আপনি কি
বলেন? সত্যিই কি পূর্ণিমা স্মন্দরী নয়?”

রতন বললে, “আঃ! কি যে বাজে বক, তার ঠিক নেই!”

—“দোহাই রতনবাবু, আপনি পূর্ণিমার রূপের কিছু উপমা দিন!”

“উপমা?”

—“ই্যা। এই যেমন বুদ্ধদেবের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করলেন, তেমনি আর কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা করে বুঝিয়ে দিন, পূর্ণিমার রূপ কত সুন্দর! বলুন, পূর্ণিমাকে দেখতে কার মত? আকাশের চাঁদের মত, না বাগানের গোলাপের মত, না রবিবাবুর মানস-সুন্দরীর মত?”

—“সুমিত্রা, দিনে দিনে তোমার মুখ বড় বাচাল হ’য়ে উঠছে...নাও, এখন ছুটুমি বন্ধ করে ছবিখানা তাড়াতাড়ি এঁকে ফেল।”

—“পূর্ণিমা যে জ্যাস্ত ছবি, তার কাছে এ তুলির ছবি তুচ্ছ! ...পূর্ণিমাকে আমি সুন্দরী বলছি ব’লে আপনি য়াগ করছেন কেন, রতনবাবু? সুন্দরকে সুন্দর বলব না?”

—“ইঠাৎ পূর্ণিমাকে সুন্দর বলবার জন্তে তোমার এতটা আগ্রহ হ’ল কেন বল দেখি?”

—“কেন, পূর্ণিমা কি সুন্দরী নয়?”

—“আমি কি সে-কথা অস্বীকার করছি?”

—“তবে পূর্ণিমার রূপের উপমা দিতে এমন আপত্তি করছেন কেন?”

—“উপমা আবার দেব কি?”

—“তবে কি আপনি বলতে চান, পূর্ণিমার রূপের উপমা নেই?”

—“আমি কিছু বলতে চাই না।”

—“না, আপনাকে বলতেই হবে”—ব’লে সুমিত্রা চেয়ায় ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললে, “আচ্ছা, পূর্ণিমা কি আমার দিদির চেয়ে সুন্দরী?”

—“আমি জানি না।”

—“আমার চেয়ে?”

—“তুমিও সুন্দর, পূর্ণিমাও সুন্দর। কেমন, তোমার আগ্রহ মিটল ত?”

—“এ-কথা আপনি আমার সামনে চক্কলজ্জায় প’ড়ে বলছেন।”

—“না, আমি সত্যি কথাই বলছি।”

—“কিন্তু কে বেশী সুন্দর—আমি, না পূর্ণিমা?”

—“জানি না। সৌন্দর্য্য আনন্দের জিনিষ, তা নিয়ে তুলনায় সমালোচনা চলে না।”

—“আচ্ছা, আপনি পূর্ণিমাকে খুব ভালোবাসেন, —না?”

—“আমি পূর্ণিমাকে, তোমাকে, তোমার বাবা, মা, দাদা, আর দিদির—সবাইকে ভালোবাসি। কেমন, আর কিছু জানতে চাও কি?”

—“আচ্ছা, পূর্ণিমাকে আপনি বিয়ে করতে রাজি আছেন?”

রতন একটু সচকিত হ’য়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে দেখলে। এতক্ষণ সে ভাবছিল, সুমিত্রা তার স্বাভাবিক সরলতার জন্তেই বালিকার মতন অমন-সব প্রশ্ন করছে, কিন্তু এখন তার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগান দিলে। এ সরলতার আড়ালে যেন কোন উদ্দেশ্য আছে! সে ভাবতে লাগল, সুমিত্রা কি তার মনের ভিতরে ছিপ্ ফেলতে চাইছে? কিন্তু কেন?

সুমিত্রা হাসতে হাসতে বললে, “রতনবাবু, চূপ করে রইলেন যে?...ও, বুঝেছি, পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি নেই।”

রতন ক্রুদ্ধস্বরে বললে, “না। তুমি জান, আমি গরীব, এমন অসম্ভব কথা কোনদিন আমি মনেও ভাবিনি।”

—“কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হ’তে পারে।”

—“সম্ভব হ’লেও আমি রাজি হব না।”

—“কেন, রতনবাবু?”

—“আমি গরীব।”

—“পূর্ণিমাকে বিয়ে করলে আপনি আর গরীব থাকবেন না।”

—“না, আমি গরীবই থাকতে চাই, ধনীর মেয়েকে বিয়ে করে ধনী হবার সাধ আমার নেই।”

“আপনি পূর্ণিমাকে ভালোবাসেন, তবু তাকে বিয়ে করবেন না?”

—“পূর্ণিমা আমার বন্ধু, তার মধ্যে তুমি বিবাহের

কথা তুলছ কেন?... আর দেখ স্মিত্রা, আমি ইচ্ছা করি না যে, এইসব বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি কথা কও।”

—“কেন কইব না? পূর্ণিমা আপনার বন্ধু, আর আমি বুঝি আপনার কেউ নই?”

—“তুমি আমার ছাত্রী।”

স্মিত্রা মুখ ভার ক’রে আবার ব’সে পড়ল। সে আজ সত্যসত্যই রতনের মনের ভিতরটা তলিয়ে দেখবার ফিকিরে ছিল, কিন্তু এত কথার পরেও তার চেষ্টা সফল হ’ল না।

খানিকক্ষণ পরে রতন বললে, “স্মিত্রা, কণারকে যাবে?”

—“সে আবার কোথায়?”

—“এখান থেকে আঠারো মাইল দূরের একটা জায়গা।”

—“সেখানে কি আছে!”

—“একটা ভাঙা মন্দির।”

—“তাই দেখতে অত দূরে কে যায়?”

—“তোমরা না যাও, আমি যাচ্ছি।”

—“একলা?”

—“না, আনন্দবাবু যাবেন, পূর্ণিমা যাবেন।”

—“কবে যাচ্ছেন?”

—“পরশু।”

স্মিত্রা হেঁট হ’য়ে ছবির উপরে রং ফলাতে লাগল।

রতন বললে, “তোমার বাবাকেও জিজ্ঞাসা করে’ দেখব, যদি তিনি যান।”

স্মিত্রা জবাব দিলে না।

রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখানা বই নিয়ে চেয়ারের উপরে ব’সে পড়ল!.....

ছবির উপরে রঙের শেষ প্রলেপ দিয়ে, স্মিত্রা উঠে’ দাঁড়িয়ে বললে, “ছবিখানা কেমন হ’ল দেখুন।”

রতন হাত বাড়িয়ে স্মিত্রার হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে দেখতে লাগল।

স্মিত্রা একটু ইতস্তত ক’রে বললে, “রতনবাবু, আমিও আপনাদের সঙ্গে কণারকে যাব!”

—“হঠাৎ যে তোমার মত বদলে গেল?”

স্মিত্রা বললে, “আমার মত, আমি বদলাতে চাই বদলাব—যা-খুসি করব, তার জন্তে আপনার কাছে জবাবদিহি করতে যাব কেন?”

ঘোলো

কিন্তু এ-বাড়ীর কেউই কণারকে যেতে রাজি হলেন না।

বিনয়-বাবুর সদ্দি হয়েছে, সারারাত খোলা মাঠে ঠাণ্ডা লাগাতে নারাজ। সন্তোষ চিন্তা দেখতে গিয়েছে। সেন-গিম্মির যাবার ইচ্ছা থাকলেও স্বামীকে একলা রেখে যেতে পারলেন না। স্মিত্রা বাধা পেয়ে মুখখানি চুন ক’রে রইল। বিনয়-বাবু তার মুখ দেখে বললেন, “আচ্ছা স্মি, তোমার যদি এতই সাধ হ’য়ে থাকে, আনন্দের সঙ্গে তুমি কণারকে যেতে পার।” বাবার হুকুম পেয়ে স্মিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না।

মেসার্স বাসু-চ্যাটো-কুমারবাহাদুরদের কাছেও রতন কণারকে যাবার প্রস্তাব তুলেছিল। শুনে’ মিঃ বাসু গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে নির্ঝক আপত্তি জানালেন, মিঃ চ্যাটো প্রচণ্ড হাস্তে উচ্ছ্বসিত হ’য়ে উঠলেন এবং কুমার-বাহাদুরও তাঁর দেখাদেখি হাস্তে শুরু করলেন—যদিও নিজেই বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কেন হাসছেন।

রতন বললে, “মিঃ চ্যাটো, আপনার এই দুর্কৌধ হাস্তের কি কোন গুঁড় রহস্য আছে? আমি ত আপনাকে মোটেই হাসাবার চেষ্টা করিনি!”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “আঠারো মাইল মরুভূমি পার হ’য়ে, সারারাত কষ্টভোগ ক’রে কণারকে গিয়ে কি দেখব? না, ঋশানের মধ্যে একরাশ ভাঙা পাথর! এমন পাগলামির প্রস্তাব কি হাস্তকর নয়?”

—“কেন, হাস্তকর কি-জন্তে?”

—“এতে লাভ হবে কি?”

—“ভারতীয় আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখে’ চোখকে সার্থক করতে পারবেন।”

—“যে আর্ট অনেকদিন আগে ম’রে গেছে, যার মধ্যে আর জীবন নেই, নতুন সৃষ্টি নেই, যা আর ধর্তমানের কাজে লাগবে না, তাকে দেখে ফল কি, রতনবাবু?”

—“মিঃ চ্যাটো, আপনার মত শিক্ষিত লোকের মুখে

এ কথা শুনে' দুঃখিত হলাম। প্রথমতঃ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আর্ট কখনো মরে না, তা অমর, কালের চঞ্চল প্রবাহ তার কাছে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, লাভ-লোক-সানের খাতা খুলে আর্টের বিচার চলে না, কারণ কোন টাকশালেই আজ পর্যন্ত আর্ট তৈরি হয়েছে ব'লে শোনা যায়নি। আর্ট আমাদের পকেট ভারী করে না, কিন্তু রসিককে স্বর্গীয় আনন্দের আনন্দ দেয়। আর্ট আমাদেরকে আপিসের কাজে নামায় না, কিন্তু কাজের ছুটির সময়ে আমাদের মনের খোরাক যোগায়। আর্টের মধ্যে উদ্দেশ্য খোঁজ করলে আপনারা হতাশ হবেন,—আর্ট হচ্ছে আর্ট—সে দালালের পণ্য, 'শেয়ার মার্কেটের শেয়ার', ব্যারিষ্টারের 'ব্রিফ', ডাক্তারের 'প্রেসক্রিপশন', উমেদারের কর্মখালির বিজ্ঞাপন, ছাত্রের হিতোপদেশ বা সমাজপতির হুকুম নয়—আর্টের একমাত্র পরিচয় আর্ট—ওকালতি ডাক্তারি, কেরানিগিরি ও সওদাগরি ছাড়াও যে মানুষের অল্প কাজ আছে, আর্ট তার সাক্ষ্য! ভারতবর্ষ যে চিরদিন পশুর মত রক্তমাংসের সাধনা বা জীবন-সংগ্রামের সমস্তা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে থাকেনি, ভারতের প্রাচীন আর্ট তারই জলন্ত প্রমাণ। কারণ আমাদের সেই গৌরবময় অতীতের একটি প্রধান কেন্দ্র, তাই আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।"

মিঃ বাসু একটা হাই তুলে' মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, "অতীত, কেবল অতীত! এই অতীত অতীত ক'রেই আমাদের জাতিটা অধঃপতনে যেতে বসেছে!"

মিঃ চ্যাটো বললেন, "আমি চাই বর্তমান, আমি চাই ভবিষ্যৎ! বর্তমানের সাধনা করতে পেরেছে ব'লেই যুরোপ আজ এত বড়!"

একটা-কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ভেবে কুমার-বাহাদুর বললেন, "নিশ্চয়!"

রতন বললে, "অতীত হচ্ছে বর্তমানের স্মৃতিকাগার, ভবিষ্যতের আশা! এমন দেশ দেখাতে পারেন, অতীতের সাহায্য না নিয়ে যে বড় হ'তে পেরেছে?"

মিঃ চ্যাটো বললেন, "আমেরিকা!"

—“আমেরিকা? আমেরিকা কি কোন একটিমাত্র জাতির স্বদেশ? সে তো ছুনিয়ার নিখিল-জাতির সমন্বয়-

ক্ষেত্র বা মিলন-ভূমি! তার অতীত তাই নিজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—যুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে' দেখুন, আমেরিকার অতীতকে সেইখানেই পাবেন। যুরোপের অতীত থেকেই আমেরিকার বর্তমান রসসংগ্রহ করে—কারণ আমেরিকার জন্ম হয়েছে যুরোপে। তাই ফি বৎসরেই হাজার হাজার আমেরিকান যাত্রী রোম, পম্পিআই ও গ্রীসের পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ছুটে' যায়। কেবল এইটুকুতেই তারা তুষ্ট নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার অতীতকে দেখে' শিক্ষালাভ করবার জন্তে তারা সেই স্মৃতির থেকে আসে ব্যাবিলনের ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে, মিশরের জীর্ণ পিরামিডের ছায়ায়, ভারতের চূর্ণ-বিচূর্ণ বিজয়ন পরিত্যক্ত গুহা-মন্দিরের মধ্যে। আপনারা এদের কি বলতে চান?"

মিঃ বাসু নীরবে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করলেন, মিঃ চ্যাটো গম্ভীরভাবে ধূমপান করতে লাগলেন, এবং কুমার-বাহাদুর তাঁদের মুখরক্ষার জন্তে রতনের কণ্ঠস্বর একটা জবাব দিতে গিয়ে কোন কথাই বলতে পারলেন না।

বিনয়-বাবু স্তম্ভভাবে ব'সে ব'সে এই আলোচনা শুনছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বললেন, "রতন, তোমারই জিজ্ঞাস্য, এঁরা তিনজনেই অসম্ভব-রকম হেরে গেছেন।"

মিঃ বাসু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "হেরে গেছি কি-রকম?" বিনয়-বাবু হেসে বললেন, "তর্কে মুখবন্ধ করা হারেরই লক্ষণ।"

মিঃ চ্যাটো বললেন, "অকারণ তর্কে সময় নষ্ট করতে আমার আপত্তি আছে। এটা যদি হারের লক্ষণ হয়, তা হ'লে আমরা অবশ্য নাচার।"

কুমার-বাহাদুর যৎপরোনাস্তি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "এ-কথা আমিও স্বীকার করি। আমাদের খুসি, আমরা কণারকে যাব না। এজন্তে এত জবাবদিহির দরকার হচ্ছে কেন, তা তো আমি কোনমতেই বুঝতে পারছি না!"

রতন হেসে বললে, "কুমার-বাহাদুর সত্যিকথাই বলছেন।"

কুমার-বাহাদুর গর্কিতভাবে বললেন, "কারণ, সত্যি

কথা বলাই আমার স্বভাব। আমরা কণারকে যাব না, আর এটা হচ্ছে আমাদের খুসি।”

রতন বললে, “নিশ্চয়! তবে কি জানেন কুমার-বাহাদুর, অক্ষ যদি হঠাৎ কঠোর প্রতিজ্ঞা ক’রে বসে— ‘আমি চাঁদ দেখব না’, তবে সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে কতখানি তার খুসি, আর কতখানি যুক্তি আছে, তা বিচার ক’রে না দেখলে চলবে কেন?”

মিঃ চ্যাটো মুখ রক্তবর্ণ ক’রে অধীরস্বরে বললেন, “রতনবাবু, রতনবাবু! আপনি উদ্ভতার সীমা লঙ্ঘন করছেন! আপনার এ-কথার অর্থ কি?”

—“অত্যন্ত স্পষ্ট, এজন্তে মানের বই খুলতে হবে না”—এই ব’লেই রতন সেখান থেকে উঠে আস্তে আস্তে চ’লে গেল।

মিঃ চ্যাটো মনে মনে বললেন, “তোমার এই দর্প আরো কতদিন থাকে, আমি তা দেখুবই দেখব।”

সতেরো

ধূ-ধূ করছে সীমাহীন মরুভূমি, চারিদিক মৃত্যুর স্তব্ধ হৃদয়ের মত নীরব, মাঝে মাঝে নিয়ম রাতের কানের কাছে বাজছে শুধু কুম্ কুম্ ক’রে কিঁকির কুম্‌কুমি, মাথার উপরে মেঘ-তোরণের সামনে স্বপ্নপুরীর প্রহরীর মত জেগে আছে কেবল চাঁদের উজ্জ্বল মুখ।

বালুকা-শয্যার বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত ক’রে একটি গোসান-চক্র-চিহ্নিত সঙ্কীর্ণ পথের রেখা দৃষ্টির আড়ালে কোথায় কতদূরে তলিয়ে গেছে, তারই উপর দিয়ে ছ-খানা গরুর গাড়ী টিমিয়ে টিমিয়ে করুণা চীৎকার করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

আনন্দবাবু, রতন, পূর্ণিমা ও স্মিত্রা,—প্রত্যেকের জন্তেই এক-একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা রয়েছে। সন্ধ্যা-প্রথমের ও সন্ধ্যাশেষের দুখানা গাড়ীর ভিতরে আছে দুজন দরওয়ান ও দুজন চাকর।

খানিক পরেই রতন গাড়ীর ভিতর থেকে নেমে পড়ল। তার দেখাদেগি নামল পূর্ণিমা। আনন্দ-বাবু বললেন, “ব্যাপার কি রতন, সবাই গাড়ী ছেড়ে হঠাৎ নামলে কেন?”

রতন বললে, “গরুর গাড়ী আমাদের দেহ নিয়ে

যে-রকম উৎসাহে লোফালুফি খেলা শুরু করেছে, তাতে নেমে পড়াই স্ববিধে বিবেচনা করছি।”

আনন্দ-বাবু বললেন, “হ্যাঁ, আমরা সবাই বিংশ শতাব্দীর ‘মোটর’-যুগের মানুষ, সত্যযুগের এ বিশেষত্ব আমাদের ধাতে সঙ্ঘ হ’বে কেন? আমি কিন্তু তবু গাড়ী ছাড়তে রাজি নই, কারণ স্বথের চেয়ে স্বস্তি ভালো, বুড়ো হাতে হাঁটাইটি সহিবে না।”

রতন আর পূর্ণিমা গাড়ী পিছনে রেখে এগিয়ে চলল—বালির উপরে জুতো প’বে চলতে অস্ববিধে ব’লে শুধু-পায়ে।

একটু পরেই একটা ধারাবাহিক অস্ফুট-গম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল—সে ধ্বনি যেন আসছে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে, শুন্লে সঙ্গীত রোমাঞ্চিত হ’য়ে ওঠে।

পূর্ণিমা সবিস্ময়ে বললে, “ও কিসের শব্দ?”

—“মরুভূমির কান্না।”

—“মরুভূমির কান্না?”

—“হ্যাঁ, কবির কানে তাই মনে হ’বে। কিন্তু আসলে ও হচ্ছে সমুদ্রের হাহাকার। তুমার্ত মরুকে স্নিগ্ধ করবার চেষ্টা করছে সে যুগ যুগ ধ’রে, কিন্তু পারছে না ব’লে অশ্রান্ত হাহাকারে ফেটে পড়ছে! এই হাহাকারের ভিতর দিয়েই আমাদের কণারকের শিল্প-স্মৃতিসমাধি দেখতে যেতে হবে।”

আশে-পাশে বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, আলো-আধারির রহস্য গায়ে মেখে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, তাদের পায়ের তলা দিয়ে কালের অদৃশ্য স্রোত বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে যেন কারুরই কোন খেয়াল নেই!

পূর্ণিমা বললে, “উঃ, চারিদিক কি নির্জন! এ নির্জনতা যেন হাত দিয়ে অনুভব করা যায়!”

রতন বললে, “আমরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম রাতে ফিরে গেছি, যেদিন বিশ্বের মধ্যে একাকী ব’সে প্রকৃতি ধ্যানস্থ হ’য়ে থাকত। মাথার উপরে ঐ অনন্ত আকাশ, সামনে অনন্ত রজনী, চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি আর ওদিকে অনন্ত সাগর, অনন্তের এই মহোৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা যেন চলেছি—”

—“সৃষ্টির সেই আদি দম্পতির মত !”

রতন চমকে ফিরে দেখলে, তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে স্মিত্রা ।

—“স্মিত্রা ?”

—“হ্যাঁ । কেমন রতন-বাবু, আমার উপমা ত ঠিক হয়েছে ?”

—“তুমি যে গাড়ী থেকে নেমে এলে বড় ?”

—“কেন, আপনারা নামতে পারেন, আমিও পারব না কেন ?”

—“কিন্তু তোমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে ।”

—“ঠাণ্ডা ত আমার একচেটে সম্পত্তি নয়, যে আমিই কেবল একলা ভোগ করব । তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে ত বলুন, আমি না-হয় ফিরেই যাচ্ছি ।”

—“না, না, আপত্তি আবার কিদের । তবে—”

—“তবে আমার জন্তে আপনার কবিত্ব-শ্রোতে ভাঁটা পড়তে পারে,—কেমন, আপনি এই কথা বলতে চান ত ? ভয় নেই, আমি পিছনে পিছনে খালি শ্রোতাই হ'য়ে থাকুব, কোন বাধা দেব না ।”

রতন আর কিছু বললে না ।

পূর্ণিমা হেসে বললে, “স্মিত্রা, তুমি এত কথা শিখলে কোথেকে ?”

স্মিত্রা বললে, “জানি না । বোধ হয় গেল-জন্মে আমি তোতাপাখী ছিলাম । অন্ততঃ আমার বাবা তো প্রায়ই এ-কথা ব'লে থাকেন ।”

তিনজনে পাশাপাশি চলতে লাগল—অনেকক্ষণ । রতন স্মিত্রার উপরে সত্যসত্যই চ'টে গিয়েছিল—সেই ‘আদিদম্পতি’র অশোভন ইঙ্গিতের জন্তে । কাজেই কথা-বার্তা আর বড় হ'ল না ।.....

পূর্ণিমা হঠাৎ বললে, “রতন-বাবু, দেখুন—দেখুন, কী ও-গুলো ?”

—“হরিণ ।”

শুনেই স্মিত্রা তাদের দিকে ছুটে গেল । কিন্তু খানিক দূর যেতে না যেতেই হরিণের পাল একটা বালিঘাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হ'ল । স্মিত্রা ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, “হরিণগুলো ভারি দুষ্ট !”

আরো কিছুদূর এগিয়ে পূর্ণিমা বললে, “এইবার আমার পা ব্যথা করছে, গাড়ীতে ফিরে যাই ।”

রতন বললে, “তুমিও যাও স্মিত্রা ।”

স্মিত্রা বললে, “আর আপনি ?”

—“আমি এখন যাব না, আজকের এই রাত আমার বড় ভালো লাগছে ।”

—‘তবে আমারও সেই মত জান্বেন, গাড়ীর গর্তের মধ্যে এত শীত আমার চুকতে ইচ্ছে করছে না ।’

পূর্ণিমা একলাই ফিরে গেল ।.....

আরো খানিকটা এগিয়ে স্মিত্রা পিছন ফিরে দেখলে, বালু-প্রান্তরের মাঝখানে এক জায়গায় কতক-গুলো তালগাছ—পাছে মরুভূমি ছিনিয়ে নেয় যেন এই ভয়েই—একসঙ্গে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদেরই পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে চাঁদকে—ঠিক একখানি চবির মত !

স্মিত্রা উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠল, “দেখুন রতন-বাবু !”

রতন ফিরে দেখে বললে, “হঁ, চমৎকার !”

—“কিন্তু এ দৃশ্য আরো চমৎকার হ'ত, পূর্ণিমা যদি এখানে থাকত । না রতন-বাবু !”

রতন রাগ ক'রে বললে, “স্মিত্রা, তোমার বাচালতা আর আমার ভালো লাগছে না । তুমি ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ ।”

স্মিত্রা বললে, “আমাকে যে আপনার ভালো লাগে না, আমি ত তা জানিই । আমি আসবার আগে আপনি কত কথা কইছিলেন, কিন্তু আমি আসার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি যেন মুখে তালা-চাবি দিয়ে আছেন ।”

—“হ্যাঁ, তার কারণ, তুমি এসেই এমন একটা অভদ্র ইঙ্গিত করেছিলে, যার পরে আর কথা কওয়া চলে না ।”

—“অভদ্র ইঙ্গিত ?”

—“হ্যাঁ, অভদ্র ইঙ্গিত । পূর্ণিমা কি মনে করেছেন, তা, জানি না ।”

—“ভয় নেই, পূর্ণিমা রাগ করে ত আমার উপরেই করবে, আপনার উপরে নয় । পূর্ণিমার রাগকে আপনি ভয় করতে পারেন—আমি করি না ।”

রতন অত্যন্ত অধীরভাবে বললে, “স্বমিত্রা! ফের তুমি ঐ সুরে কথা কইছ?”

—“ই্যা, আমার খুসি, আমি এই ভাবেই কথা কইব!”

রতন দাঁড়িয়ে প’ড়ে বললে, “অমন অভদ্রভাবে আর একটি কথা বললে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।”

—“সম্পর্ক রাখতে না চান, রাখবেন না।”

—“বেশ!” বলে রতন তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

খানিক পরে পিছন ফিরে’ দেখলে, স্বমিত্রা তার সঙ্গে নেই। প্রথমে সে ভাবলে, স্বমিত্রা গাড়ীতে ফিবে’ গেছে। কিন্তু তার পরেই দেখলে, গাড়ীগুলোর একখানাও নজরে পড়ছে না। একটা মস্ত বালির পাহাড় তার দৃষ্টিকে আড়াল ক’রে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভয় হ’ল, স্বমিত্রা যদি একলা পথ ভুলে অশুভদিকে গিয়ে পড়ে! রতন ব্যস্ত-ভাবে আবার ফিরে’ চলল।

কিন্তু বেশীদূর আর আসতে হ’ল না, একটু এসেই রতন অবাক হ’য়ে দেখলে, পথের ধারেই একটা কাঁটা-ঝোপের পাশে, স্বমিত্রা ছুই হাঁটুর মাঝে মুখ রেখে চুপ করে’ বসে’ আছে!

রতন তার কাছে গিয়ে বললে, “একি স্বমিত্রা, এখানে এমন ক’রে বসে’ কেন?”

স্বমিত্রা পাথরের মূর্তির মতই নিঃসাড় হ’য়ে বসে’ রইল।

—“স্বমিত্রা! শুন্ছ? লক্ষ্মীটি, ওঠ!”

স্বমিত্রা জবাব দিলে না, মুখও তুললে না!

অদূরে গাড়োয়ানদের গলা পাওয়া গেল। রতন ব্যস্ত-কণ্ঠে বললে, “ওঠ, ওঠ—স্বমিত্রা! আনন্দ-বাবু যদি দেখতে পান, তা হ’লে কি ভাববেন বল দেখি?”

স্বমিত্রা আস্তে আস্তে মুখ তুললে। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় রতন দেখলে, স্বমিত্রার চোখে ও কপালে কি চক্চক ক’রে উঠল! অশ্রু?

রতন সবিস্ময়ে বললে, “আঃ, স্বমিত্রা! তুমি ক’দছ? কেন, আমি কি তোমাকে—”

স্বমিত্রা বিছাতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে’ তীব্রস্বরে বললে, “কেন আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন? আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?”—বলতে বলতে সে দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে চ’লে গেল।

রতন হতভম্বের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

আধখানি চাঁদ

আধখানি চাঁদ যায় ভেসে—কার

অলস তরণী,—

কে দ্যায় পাড়ি স্বদূর নীলের

স্বপন-সরণি।

মোতির নরী খোঁপায় পরি’

খেলায় যত জ্যোতির পরী,

উরস ’পরে উজল ওড়ে

জরীর ওড়নী;

নীরব নিশি—নিখর দিশি

যুধির বরণী।

আধখানি চাঁদ চায় হেসে কার

মধুর চাহনি,—

বয়ন করে মোহন মায়া

নয়ন-গাহনী।

আকাশেরি অসীম ছেদে

খুশীর ঝারা ঝরচে যে এ,

ভুলোক ধরে পুলক-ভরে

দ্যালোক-লাবণি;

আধখানি চাঁদ কাহার চাওয়া

নিখিল-পাবনী!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী



বাংলা

ধানের ভবিষ্যৎ—

এবার বঙ্গদেশে বৃষ্টি খুব কম হওয়ায় গল্পীবাসী জনসাধারণ খুবই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে তাহাদেব কৃষি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আমন ধাঞ্জেব আব আশা নাই, অল্পদিকে পানীয় জলের অভাব ভীষণ-ভাবে উপস্থিত হইবে মনে কবিয়া গল্পীবাসী স্ত্রীলোক চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। জলাভাব উপস্থিত হইলেই ব্যাধিব প্রাবল্য ঘটবে, ফলে অনাভাব, জলাভাবের কষ্টেব উপর আবার ব্যাধিব প্রবল পীড়ন আবস্ত হইবে।

—যশোহর

বন্যার কারণ—

গঙ্গা, যমুনা ও গোমতীর স্ফীত জলরাশি বিহাব ও যুদ্ধ-প্রদে-র সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্নহীন, গৃহহীন করিয়াছে। উত্তরবঙ্গে যখন গভ বৎসর বন্যা হইয়াছিল, তখন ভবিষ্যতেব বন্যা নিবারণেব জন্তু কাবণ অনুসন্ধানেব কথা উঠিয়াছিল। রেলওয়ে লাইনের মধ্যে প্রচুব পরিমাণে জলনিকাশের ব্যবস্থাব জন্তু প্রণালী-নির্মাণের কথা উঠিয়াছিল। তার পর কি হইল, সাধাণে কিছু জানে না। আবার যখন বন্যা আসিলে তখন সনাতন কন্দন আবার জাগিলে। বন্যার কারণ অনুসন্ধানের খোঁজ পড়িলে। লক্ষ্যবন্যা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ কবিত্তে গিয়া, এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রিকা বলিয়াছেন, বন্যার কারণ অনুসন্ধান কবিবার জন্তু একটি "অনুসন্ধান-কমিটি" নিযুক্ত করা হউক। কমিটি বন্যার কারণ নির্দেশ করিয়া দিলে উক্ত কাবণগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

যদি হোমবা-চৌমবা মডারেট ধানাদিবা দল, হুজুরের দ্বাবাবে ধন্য দিয়া গড়েন, তাহা হইলে একটা অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু অনুসন্ধান-কমিটির উপদেশ কার্যে পরিণত কবিত্তে হইলে যখন টাকার কথা উঠিলে, তখনই কর্তাবা দুঃখিতভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিবেন 'টাকা নাই'! 'টাকা নাই' এই সনাতন উত্তরের উপর অবশু আর কোন তর্কই চলে না। অতএব এই-সব অনুসন্ধান-কমিটির বার্থ অনুষ্ঠানের জন্তু ভাবতবাসীর পক্ষ হইতে বাগ্ৰতা প্রদর্শন করা আশ্বপ্রবন্ধনাই ন'মাস্থর মাত্র। যে জাতি নিজের আয়সম্পদ ও বিধিনির্দিষ্ট অধিকার গ্রহণ করার জন্য উত্তম প্রকাশ করে না, যাহাবা নিজেদের অসম্পত্তাব জন্য লজ্জিত হয় না, তাহাদেব দুঃখ স্বং বিখ্যাত ও দুঃখ বতে পারেন না। প্রতিবাবের শাস্ত ও উপায় আয়তের মধ্যে থাবা মাস্থ ও যাহাবা আশ্বশক্তি ত সনাস্থ প্রস্তুত ভীষণতায় সর্বদা সঙ্কুচিত,—তাহাদেব এই শোচনীয় অসহায় মরণ, স্বাভাবিক নিয়মই ঘটয়া থাকে। চাঁদার টাকার মুষ্টিভঙ্গাব নিকট আয়সম্মান বিক্রয় করিয়া খাঁচিয়া থাকিবার উপর যতদিন আমাদের ঘৃণা না জন্মিলে ততদিন এই মৃত্যুর অভিশযান কিছুতেই প্রতিহত হইতে পারে না। বন্যার কারণ

প্রকৃতপক্ষে এই পবশাসিত জাতির লজ্জাকর পরমুখাপেক্ষিতা; আর কিছু নহে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বেটলি সাতের বন্যাব জন্য রেলওয়ে লাইনের উপর দোষ দিয়া-ছিলেন। আব চৌশটিহাজাবী মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ অতিবৃষ্টির উপর দোষ সমর্পণ করিয়া প্রচুর আশ্বপ্রসাদে আরাগে ৬৩ হাজার উপভোগ করিতেছেন।

ডাকাতি ও পুলিশ—

পুলিশ ও গুণ্ডা—পুলিশ যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে সন্ত্রাস সন্ত্রাস গুণ্ডার দলও ভাবী হইয়া উঠিতেছে। ১৯১৮ সালে কলিকাতায় পুলিশ ইন্স্পেক্টর ছিলেন ২৮ জন—আব এখন হইয়াছেন ৫৬ জন। উভয়েব মধ্য কার্য-কারণেব কোনও সম্বন্ধ নাই ক?

—আশ্বশক্তি

বাংলার দাতুশিল্প—

বঙ্গদেশের যে সব জেলা তামা কাঁসা প্রভৃতি ধাতু ব তৈজসপত্র প্রস্তুতের জন্তু বিখ্যাত তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

বর্ধমান—বনপাণ, দাঁইচাট, পূর্বস্থলী, কালনা, মাটিয়াবীতে বড় বড় ধাতু-নির্মিত পাত্র, রান্নার জন্তু পেটা হাঁড়ি প্রস্তুত হয়।

বীরভূম ও বাঁকুড়া—দুবরাজপুর নলহাটি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুত্র পাত্রসায়ব প্রভৃতিব বাসন প্রসিদ্ধ। বাঁকুড়া বড় বড় জলের ঘড়ার জন্তু প্রসিদ্ধ।

ভগলী—বালি এবং বাঁশবাড়িয়া ও খামাবপাড়িতে অতি উন্নতধরণেব বাসন প্রস্তুত হয়।

মেদিনীপুর—চক্রকোণা, রামলীবনপুর, ফবাব ও বাটাল প্রসিদ্ধ। বাটালের গাড়ু এবং ফবাবের খালা বিখ্যাত।

নদীয়া—নবদ্বীপ, শাস্ত্রপুর, রাণাঘাট, এবং নেহেরপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

মুর্শিদাবাদ—খাগড়াই বাসন চিরবিখ্যাত। ভঙ্গীপুরও এদিক দিয়া বেশ উন্নত। খাগড়ার গেলাস, ডিশ, বাটি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীময় উহাদের খ্যাতি ছড়াইয়া গিয়াছে।

ঢাকা—ঢাকা জেলার বহু স্থানে কাঁসার কাজ হইয়া থাকে। লৌহজং পিতলের চাদরের জিনিষ প্রস্তুতের জন্তু বিখ্যাত।

মৈমনসিংহ—ইসলামপুরী খালা প্রসিদ্ধ। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাগমারী খুব প্রসিদ্ধ।

ফরিদপুর—পালক, রাজবাড়ী, সমধিক প্রসিদ্ধ।

ত্রিপুরায় বিটবর; রাজসাহাঁতে নাটোরের অন্তর্গত কলম, ও বুধপাড়া প্রসিদ্ধ।

মালদহ—ইংলিশবাজার অন্তর্গত কুতুবপুরের পিতলের লোটা অতি সুন্দর। নবাবগঞ্জও প্রসিদ্ধ।

রঙ্গপুরের নিলফামারীর অন্তর্গত গোমনতীতে পিতল ও কাঁসার জিনিষ প্রস্তুত হয়।

—মোহাম্মদী

বাংলার নারী—

বাংলা দেশের হিন্দু নারীর সংখ্যা ৯৬, ৬৭, ৪৪৮ জন। ইহার মধ্যে ১৫ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত বিধবার সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৪, ৭৫, ৯.৬ জন।

—কল্যাণী

১৫ বৎসরের বিধবার বিবাহ দিতে গেলেও এ দেশের লোক মারিতে আসে। অথচ ইংরেজের আবিচারের প্রতিকার এখনই চাই। সুন্দর সামঞ্জস্য বটে!

দান—

শ্রীমতী হরিমতী দত্ত নূতন গৃহনির্মাণের জন্ত নারী শিক্ষা-সমিতির ২৫০০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। গত বছর তিনি ঐ সমিতির ১০,০০০ টাকা দিয়াছিলেন।

—স্বদেশ

শ্রীহট্টের বন্দরবাজারের স্বনামধন্য বণিক শ্রীযুক্ত জয়রামল তুঙ্গীয়া মহাশয় ডাক্তার সাহেব মিঃ মেকয়ের হস্তে ৫০০০ দান করিয়াছেন। তাঁহার দানের টাকা দ্বারা শ্রীহট্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের অপারেশন গৃহ নির্মিত হইবে এবং গৃহ জয়রামল তুঙ্গীয়া মহাশয় অপারেশন রুম নামে অভিহিত হইবে। (পরিদর্শক)

—আমদানীর পত্রিকা

আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে দান।—মাণিকতলা মিউনিসিপালিটি কলিকাতার জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে ১৯২৩ ১৯২৪ সনের জন্ত ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—সম্মিলনী

পুরাতন প্রথায় শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করিবার জন্ত কাশিমবাজারের মহারাজা 'পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট' নামে যে স্কুল খুলিয়াছেন, তাহার গৃহ নির্মাণের জন্ত ১০১১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের শ্রীমতী সুনীলা সুন্দরী ভদ্র ৪০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

—স্বদেশ

ঢাকা অনাথ-আশ্রম—

ঢাকা অনাথ আশ্রমে এক বৎসরের শিশু হইতে ১৮ বৎসরের ১৩টি বালক ও ১৪টি বালিকা আছে। তাহাদের অভ্যস্ত বস্ত্রাভাব। বস্ত্র দান করিয়া পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদের কৃতজ্ঞতা ও ভগবানের আশীর্বাদভাজন হউন।

আশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা অনাথ আশ্রম ঢাকা, কর্তৃক বস্ত্র অথবা অর্থসাহায্য কৃতজ্ঞতাব সহিত গৃহীত হইবে।

স্বাধীন জীবিকার পথ—

পেয়ারা বাগান।—পেয়ারা একটি উৎকৃষ্ট ফল। বঙ্গদেশের সাধারণ পেয়ারা অতি অপকৃষ্ট। বঙ্গদেশের লোকেরা দস্তুর মতন পেয়ারার বাগান করে না। অথচ-সমুদ্র গাছে আর কি ভাল ফল হইবে? পশ্চিমে এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি বহু জেলায় উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা জন্মে। ঐসকল স্থানে দস্তুর মতন পেয়ারার বাগান করা হয়। কলিকাতায় সেই সকল পেয়ারা রাশি রাশি আমদানী ও বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতায় কাফি পেয়ারা নামক এক জাতীয় বৃহৎ পেয়ারা আছে। কলিকাতা হইতে ১৫২.০ মাইল দূরে—রেল ষ্টেশনের নিকটে যদি কেহ পেয়ারা বাগান করেন, আর এলাহাবাদ, কাশীর বা অন্ত-প্রকার বৃহৎজাতীয় পেয়ারার চারা বা কলম রোপণ করেন, তবে বেশ লাভবান হইতে পারেন। ১০ হাত তফাৎ কলম বসাইলে ৮×৮=৬৪টা

গাছ হইতে পারে। ২,৩ বৎসরের মধ্যেই ফলন আশস্ত হয়। ৪।৫ বৎসর পবে বেশ ফলে। তখন গাছ প্রতি গড়ে ১০০ পেয়ারা হইলে ২\শ' হিসাবে ১২৮\ টাকার পেয়ারা এক বিঘা জমিতে হইতে পারিবে। ভাল চাঁটা, মাটি কোপাইয়া দেওয়া, ওজন পরিষ্কার করা প্রভৃতি প্রধান কাজ। সুতরাং ২৮\ খরচ পড়িলেও ১০০\ টাকা লাভের আশা করা যাইতে পারে। ঐসকল স্থানে প্রতি বিঘা জমি ২০০\ মূল্যে খরিদ করিলেও ২ বৎসরে জামর মূল্য উঠিয়া যাইবে। কলম না কিনিয়া পাকা পেয়ারার চারা করিলেও চলিতে পারে। একবার গাছ জমিলে আর কলম করিবার অসুবিধা থাকিবে না। কেহ অন্ততঃ ৫ বিঘা জমিতে পেয়ারার বাগান করিলে বৎসরে ৫৬ শত টাকা আয়েব উপায় হইবে। পেয়ারা বাগানের ভিতর হুদুদ এবং আদার চাখ করিলে আর একটি আয়েব পথ হইতে পারে। কবে আমাদেব যুবকগণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিবে, বুঝিতে পারি না।

পাত ও কাগজীলেবুর বাগান।—বঙ্গদেশের নানা জেলায় পাতিলেবু ও কাগজীলেবু বিস্তৃত আছে। ইহারও দস্তুর মতন বাগান করিলে প্রচুর লাভের আশা করা যাইতে পারে। কলিকাতায় এই উভয়প্রকার লেবু উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালার অল্প স্থানেই নিয়মিতরূপে ইহার বাগান করা হইয়া থাকে। শুনা যায়, মালদহ জেলায় পাতিলেবুব বিস্তৃত বাগান আছে। পশ্চিম হইতে কলিকাতায় বহু লেবু আমদানী হয়। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমা-ধীন চরনামদাবী, চরপাতা, রঘুনাথপুর, কাউনিয়া প্রভৃতি গ্রামে, এবং উহান নিকটবর্তী নোয়াখালী জেলায় কতকগুলি গ্রামে বিস্তৃত কাগজীলেবু ও কমলালেবু জায়। ব্যাপারী ও ফড়িয়াগণ তাহা ক্রয় করিয়া নানাদিকে চালান দিয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত কাগজীলেবুর বাগান আছে। ঐসকল স্থানে কাগজী ও পাতিলেবুব বিস্তৃত বাগান করিলে খুব লাভবান হওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই পাত ও কাগজীলেবুর বাগান হইতে পারে। আমরা এদিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

—জোল্‌তান

ছাপাখানার বিপদ—

অনেকেই অবগত নহেন যে, ছাপাখানার ব্যবসারে কিঞ্চিৎ নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। বিলাতে বেকার সমস্তার জয় বাঙ্গলাতেও বেকার সমস্তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় বেকারের সংখ্যা যতই বেশী হইক, বিলাতেব বেকারের অল্প সর্বাংশে জুটাইতেই হইবে। বিলাত হইতে ছাপাখানাওয়ালাদেব দাজাল কলিকাতায় বাঙ্গালায় যুঝিতেছেন, ইঁহারা এখানকাব বাজার অপেক্ষা সম্ভাব্যে কাজ লইতেছেন, ফলে কলিকাতার বাজারে ছাপাখানার কাজের অন্তা ক্রমশঃ শোচনীয়ই হইতেছে। এখান হইতে বিলাতেব দর হ্রাস হইবার প্রভূত কারণ আছে। আমাদের দেশে গবর্নমেন্টের শুধু-আইন এই বিষয়ে তাহাদের বিশেষ সাহায্যকারী। কলিকাতায় বন্দরে যে কাগজ আমদানী হয়, গবর্নমেন্ট তাহার একটা সর্বাংশ দব বাঁধিয়া দিয়াছেন, যাহার সহিত প্রকৃত ক্রয়েব দামের কোন সম্পর্ক নাহ। গবর্নমেন্টে এই যে নিরিখ, ইহা সম্পূর্ণ তাঁহাদের খেচ্ছাব উপর নির্ভর করে। সেই দবের উপর গবর্নমেন্ট হইতে শতকবা ১৫\ টাকা হাবে শুদ্ধ আদায় করা হয়, ফলে কাগজের দর বাঙ্গালায় কমিতেছে না। ইহার ফলে এখানকার ছাপাখানার কাজের বিদেশ দব কমাইবার সুবিধা হইতেছে না,—কিন্তু বিলাত হইতে যে কাগজ ছাপিয়া আসিতেছে তাহার উপর যে শুদ্ধ আদায় হয়, তাহা ইন্ডিয়েসের উল্লিখিত

দরের উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে মাত্র। ইহা সম্পূর্ণ অর্থোক্তিক ও স্মারবিগর্হিত।—(হিতবাদী)—আনন্দবাজার পত্রিকা

চবুকা-প্রচারের উপকারিতা—

রাজসাহীর কামারগাঁও কেন্দ্রে চবুকার কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। অনেক বুদ্ধা রমণী তাঁহাদের পূর্বাশিক্ষানুযায়ী ১২ নম্বরের ৬০ তোলা সূতা সপ্তাহে কাটিয়া ১ টাকা উপার্জন করিতেছেন। বগুড়ার তালোরাতে সূতাকাটা বেশ চলিতেছে। এমন কি নয় বৎসরের বালিকাও সূতা কাটিয়া দৈনিক এক আনা উপার্জন করিতেছে। বগুড়ার দক্ষিণাঞ্চলের কসলের অবস্থা বিশেষ আশাশ্রিত না হওয়ার লোকেরা দুঃখে পড়িয়া চবুকা চালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

পতিতা নারীদের সজ্জা—

সম্প্রতি কলিকাতার সোনাগাছি ও রামবাগানের পতিতাগণ সম্মিলিতা হইয়া “সুক্তিসমাজ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, পতিতাগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করাইয়া অশ্রুবৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য করা, পতিতাদের বালিকা কন্যারা যাহাতে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া কোন সহুপায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্যে পতিতাদের বালিকা কন্যাদের জন্ম স্কুল, কলেজ ও বোর্ডিং স্থাপন করা প্রভৃতি। ইহা ছাড়া যে-সকল ভদ্রগৃহস্থ কন্যা বুদ্ধির ভ্রমে ও দৈবদুর্ভিক্ষপাকে এই পথে আসিয়া পড়ে, এই সমিতি উপদেশ দিয়া তাহাদের নিবারণ করিবে এবং ভদ্রভাবে জীবনযাপন করিতে সাহায্য করিবে। ত্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোকের শিক্ষা, উপদেশ ও পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

—মোহাম্মদী

অনুকরণীয় সামাজিক সংস্কার—

বরোদার অস্পৃশ্যতা—বরদার গাইকোবাড় খ্যাত রাজ্য হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্ত বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। অন্ত্যজ জাতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং দরিদ্র অন্ত্যজ ছাত্রগণকে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্যে তিনি চিরদিন মনোহস্ত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি তাহাদিগের অনেককে রাজকাৰ্য্যে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সামাজিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তাহারা এখন নিজেরাই নিজেদের উন্নতি বিধানে অনেকটা সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে এবং মদ্যপান একেবারেই কমানিয়া দিয়াছে।

—আত্মশক্তি

বাঙালীর সাহস—

বালকের বীরত্ব—নদীয়া জেলার বালিয়াডাঙ্গা-নিবাসী এক ভদ্রলোককে একদিন বনের মধ্যে বাঘে ধরে। ভদ্রলোক প্রাণ-ভয়ে আর্তনাদ করিতে থাকেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া এক চতুর্দশ-বর্ষীয় বালক তাঁহাকে সাহায্য করিতে গমন করে। বালকের বীরত্বে বাঘ পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং ভদ্রলোকটিও প্রাণে প্রাণে রক্ষা পান।

—আত্মশক্তি

মৃত্যু-সংবাদ—

পরলোকে পিয়াসন্। ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু কবির রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য মিঃ পিয়াসন্ সম্প্রতি ইটালী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

সেখানে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে শুনিয়া আমরা মর্মান্বিত হইলাম। মিঃ পিয়াসন্ বহু বৎসর পূর্বে কলিকাতার কোনও মিশনারী কলেজে অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি ছাত্রদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব আচরণ করিতেন। কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল নাকি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এইভাবে বাঙালী ছাত্রদের সহিত মিশিলে প্রেষ্টিজ (ইচ্ছত) বজায় রাখা শক্ত হইবে। মিঃ পিয়াসন্ সেদিন হইতে মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। তিনি নিবেদিতার ন্যায় বাঙালীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, এবং বাংলাদেশের সেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। একরূপ মহানুভব ব্যক্তির মৃত্যুতে বাঙালী মাঝেই আঁধা ব্যথিত। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার সৎগতি বিধান করুন।

—ঢাকা-প্রকাশ

৮ পূর্ণেন্দুনারায়ণ—বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির অধ্যক্ষ, প্রাণ-নন্দ-কো-যুগের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী, দার্শনিক পণ্ডিত, বাঁকিপুরের প্রবাসী বাঙালী রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর পরলোক গমন করেছেন। আমরা তাঁর শোকসম্প্রদেয় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। তাঁর পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুক।

—বিজলী

মহিলার মৃত্যু—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩রা অক্টোবর বেলা একটার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বোম্বাই সহরে জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে বাঙালার মহিলা-প্রতিনিধিরূপে শ্রীমতী স্বর্গকুমারী দেবী ও স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দাশের সঙ্গে ইনিও উপস্থিত ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার শোকসম্প্রদেয় পরিবারের সান্ত্বনা বিধান করুন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

অশ্বিনীকুমার দত্ত—

গত ২১ কার্তিক তারিখে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের একজন যথার্থ সাধু, উদারচেতা, একনিষ্ঠ কর্মী অপস্থত হইল। তাঁহার আজীবন দেশসেবা, ঈশ্বরপরায়ণ চরিত্র বাঙালীর অনুকরণের বিষয়।

সেবক

ভারতবর্ষ

বিহারে গান্ধী সজ্জা—

সার্চলাইট' সংবাদ দিতেছেন—মতিহারীতে বিহার প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনের সময় বিশিষ্ট বিশিষ্ট অসহযোগীগণ মিলিত হইয়া একটি সভা করেন। 'গান্ধী সজ্জা' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান খুলিবার কথা এই সভায় স্থির হইয়াছে। কেবল মাত্র দুটসকল-বিশিষ্ট এবং পরীক্ষিত কর্মীদেরকেই ইহার সভ্য করা হইবে। সভ্য-দিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে দেশের জন্ত তাহারা জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত নীতির প্রচার করা এবং উহা পালন করাই সজ্জার উদ্দেশ্য।

রাজকোটের উন্নতি—

কাঠিয়াবাড়ের রাজকোট রাজ্য ক্ষতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই উন্নতির স্বরূপটা নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। রাজকোট রাজ্যে মোট প্রজার সংখ্যা ৬৬০৯৩ জন, উহার ভিতর ৩০৯৯৩ জন পুরুষ ও ৩৫১০০ জন রমণী। সমস্ত প্রজার ভিতর ২৭০০০ জন বর্তমানে ভোটাধিকারী। এই ভোটাধিকারীদের ভিতর ১৩০০০ রমণী আছেন।

রমণীকে এতপানি অধিকার ভারতবর্ষের আর কোথাও দেওয়া হয় নাই।

লক্ষ্মী মিউনিসিপ্যালিটির দৃঢ়তা—

লর্ড রেডিংএর আগমন উপলক্ষে লক্ষ্মী মিউনিসিপ্যালিটি এবার তাঁহাকে কোনো দরমের অভিনন্দন প্রদান করেন নাই। গত ২৫ বৎসরে লক্ষ্মীয়ে একরূপ ব্যাপার আর কখনও সজ্বলিত হয় নাই। এমন কি জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড এবং রাউলট আইন বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও লর্ড চেম্‌সফোর্ড লক্ষ্মীয়ে অভিনন্দন পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও মানুষের মন যে বদলাইয়া যাইতে শুরু হইয়াছে— এইগুলিই তাহার প্রমাণ।

বোম্বাই কাউন্সিলের নির্বাচন—

বোম্বাই সহরের অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন।

- (১) মিঃ কে পি করিমন
- (২) ডাক্তার ভেঙ্কার
- (৩) মিঃ কে এস দাদাচাঁজী
- (৪) মিঃ জয়সুখলাল কে মেহতা
- (৫) মিঃ পূজাভাই ঠাকরসী
- (৬) মিঃ এ এন হুর্কি

এই ছয় জনের ভিতর মিঃ দাদাচাঁজী এবং মিঃ হুর্কি ব্যতীত আর সকলেই স্বরাজ্য দলের লোক। সুতরাং বোম্বাইএ লোকমত যে স্বরাজ্য দলকেই সমর্থন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বারাণসীতে সম্ভরণ প্রতিযোগিতা—

গত ২২শে অক্টোবর কাশ্মীর সেণ্ট্রাল সুইমিং ইউনিয়নের উদ্যোগে টিকারী ঘাট হইতে অহল্যাবাই ঘাট পর্যন্ত ১১ মাইল সম্ভরণের প্রথম বার্ষিক প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিতায় তিনজন বাঙ্গালীই প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম যিনি হইয়াছেন তাঁহার নাম শ্রী কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী—বয়স ১৮ বৎসর। দ্বিতীয় স্থান যিনি অধিকার করিয়াছেন তাঁহার নাম শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বয়স ১৯ বৎসর। তৃতীয়স্থানাধিকারীর নাম শ্রী ফণিভূষণ চক্রবর্তী—বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

শারীরিক ব্যায়ামে বাঙ্গালী সকলের পিছনে পড়িয়া আছে। সুতরাং সম্ভরণ-প্রতিযোগিতায় তাহাদের এই দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবে।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ—

ছয় জন পার্শা যুবক সাইকেলে সমস্ত পৃথিবী তিন বৎসরে পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বোম্বাই হইতে সাইকেলে চড়িয়া আশ্রা হইয়া দিল্লী পৌঁছিয়াছেন এবং সেখান হইতে কাছোর হইয়া সীমান্ত-প্রদেশ দিয়া কাবুল ও পারস্ত যাত্রা করিবেন।

এরূপ সাহসিকতার উদাহরণ পাশ্চাত্য দেশে দুর্লভ না হইলেও এদেশে এরূপ উদাহরণ সুলভ নহে। আমরা এই পার্শা যুবক কয়টিকে অন্তরের আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি।

মহীশূর-রাজ্যে শাসন-সংস্কার—

মহীশূর-রাজ্যের মহারাজা বাহাদুর বর্তমান শাসনপদ্ধতির সংস্কার করিয়া এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন। এই ঘোষণা অনুসারে তাঁহার পরলোকগত পিতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এসেম্বলিকে ঢের বেশী ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এখন হইতে কোনো নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে গেলে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ জরুরী ব্যাপার ব্যতীত ব্যবস্থা-পরিষদ বড় ক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের প্রবর্তন করিতে হইলেও এই সভার মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ শাসন-সংক্রান্ত কার্য্য বা রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়নের প্রস্তাব পাশ মহারাজা নিজেই করিতে পারিবেন।

সাধারণতঃ ২৫০ জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া ২৭৫ জন পর্যন্ত সদস্য গৃহীত হইতে পারিবে।

১৬ বৎসর পূর্বে যে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইয়াছিল তাহার ক্ষমতাও বাড়ানো হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পরিষদে প্রতিনিধিসংখ্যা ততো বৃদ্ধি হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বাড়াইবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারিবেন। বাজেটের সময় এই পরিষদের খরচ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে।

প্রতিনিধি পরিষদ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় পরিষদেই প্রতিনিধি প্রেরণের উপযুক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। নির্বাচনের ক্ষমতা অর্জন করিতে এখন যে-পরিমাণ সম্পত্তি থাকা দরকার অতঃপর তাহার সর্ধেক সম্পত্তিতেই নির্বাচনের অধিকার লাভ করা যাইবে।

মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, তালুক-বোর্ড এবং পঞ্চায়তের ক্ষমতা আরো বাড়াইয়া দিয়া স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে এই-সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আরো অধিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন—

পঞ্জাব-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১৩ই নবেম্বর অমৃতসরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিবে। পরদিন নিখিল-ভারত-নেতাদের পরামর্শ-সভা। ডাঃ কিচলু সত্যাপ্রহ কামিটির সদস্যদিগকে ১৩ই তারিখ অমৃতসরে সমবেত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন। ঠালা গিরিধারী লাল ও লালা রূপলাল পুরী নেতাদের এবং সদস্যগণের জন্য সকল প্রকার আয়োজন করিতেছেন।

অমৃতসরে, নিরুপভব আইন-অধ্যয়ন সম্পর্কেও একটি আকিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনের পূর্বে তাহার কাজ আরম্ভ হইবে না।

বঙ্কু হার প্রতিযোগিতা—

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মালবীয় এলাহাবাদ হইতে জানাইয়াছেন— আগামী জানুয়ারী মাসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের সময় নিখিল-ভারত-বঙ্কুতা-প্রতিযোগিতার তৃতীয় অধিবেশন হইবে। সেই প্রতিযোগিতায় যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবেন তিনি একটি রৌপ্যানির্মিত বিজয়চিহ্ন (trophy) পাইবেন। এতদ্ব্যতীত তিনজন শ্রেষ্ঠবক্তা ও মহিলা বক্তার প্রত্যেককে একটি করিয়া স্বর্ণপদক

পুরস্কার দেওয়া হইবে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভিতর যাহারা এই বক্তৃতায় প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশদ বিবরণ জানিতে পারিবেন। রাইট অনারেল্ লক্ষ্মীনারায়ণ কালিজল, ইউনিভার্সিটি পালারামেন্ট, বেনারস।

জেলা-আইনের পরিবর্তন—

জেলের আইন-কানূনের কতকগুলি সংশোধন করা হইয়াছে। জেলের ভিতর হাতকড়া পরাইবার নিয়মের কিছু রদ বদল করা হইয়াছে। অতঃপর কোন শাস্তি দিবার পূর্বে কয়েদীকে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন সেরূপ শাস্তি বহনের ক্ষমতা কয়েদীর আছে কি না। শাস্তির জন্তও নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া কয়েদী পুনঃ পুনঃ জেল নিয়ম অমান্য করিবে কেবল সেই ক্ষেত্রেই শাস্তি দেওয়া হইবে। শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে পরিশ্রমে কেহ অসমর্থ হইলে যে পর্যন্ত না সে কর্মক্ষম হয় সে পর্যন্ত তাহাকে কর্ম হইতে অবসর দেওয়া হইবে। জেলে প্রবেশ করিবার পর কোন কয়েদী যদি দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৫২, ৩৫৩ বা ৩৯৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধে দণ্ডিত হয় অথবা জেলের কোন ওয়ার্ডার বা কতৃপক্ষকে প্রহার করার জন্ত দণ্ডিত হয় তাহা হইলে কারা-বিভাগের ইন্স্পেক্টর জেনারেলের মঞ্জুরী লইয়া তাহাব দণ্ডের পরিমাণ-হ্রাস বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

বার-কমিটি—

ব্যারিষ্টার এবং উকিলদের ভিতর যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্ত সকাউন্সিল বডলাট ভারত-সচিবের অনুমতি লইয়া এক কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই পার্থক্য দূর করা কতদূর সম্ভব হইবে এবং কি ভাবে এই পার্থক্য দূর করা হইবে কমিটি তাহা লইয়া আলোচনা করিবেন। কমিটির সভাপতি হইবেন পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব চীফ জাস্টিস চামিয়ার সাহেব এবং সদস্য হইবেন—

- (১) মাজাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কাউটস্ টুটার
- (২) বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি দিন্শা ফার্দীনজী মোল্লা
- (৩) বাঙ্গালার এড্ভোকেট জেনারেল মিঃ এস আর দাস
- (৪) বাঙ্গলা সরকারের সেক্রেটারী এইচ পি ডুবাল
- (৫) ব্যারিষ্টার কর্নেল স্যার হেনরী ষ্টানিয়ন
- (৬) বোম্বাইএর উকিল সরকার সীতারাম সুন্দর রায় পাটকর
- (৭) মাজাজ হাইকোর্টের উকিল টি রঙ্গচামিয়ার
- (৮) কলিকাতা ল-সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কমিটির সেক্রেটারী হইবেন জে এইচ ওয়াইজ।

কমিটি নবেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সমবেত হইয়া প্রথম কার্য আরম্ভ করিবেন। তাহাদের রিপোর্ট ভারত-সরকারে দাখিল করিতে হইবে।

দিল্লীতে রয়্যাল কমিশন—

সিভিল সার্ভিস সম্পর্কীয় রয়্যাল কমিশনের সভাপতি লর্ড লী, স্মার রেজিনাল্ড ফ্রাডক এবং অস্থায়ী সদস্যগণ গত ২রা নবেম্বর প্রাতে কৈশর-ই-হিন্দু নামক জাহাজে করিয়া বোম্বাই সহরে অবতরণ করিয়াছেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তাহারা স্পেশাল ট্রেনে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

কমিশনের প্রথম অধিবেশনের দিন সভাপতি লর্ড লী বলিয়াছেন— কমিশন সাতটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের ভারতগবমেণ্টের কিংবা প্রাদেশিক গবমেণ্টের

অধীন করা হইবে কি না, এ সম্বন্ধে কোনো পরিবর্তন করা যাইতে পারে কি না, উক্ত সাতসের কর্মচারীদের কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইবে, ইন্ডোরপ হইতে কি পরিমাণ কর্মচারী সংগ্রহ করা হইবে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমাইতে পারা যাইবে কি না। কর্মচারীদের বেতন পেনশন ভাতা ইত্যাদিও কমিশনের আলোচ্য বিষয় হইবে। কোন অভাব অভিযোগ আসিলেও কমিশন তাহার প্রতিকার সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবেন।

কোকনদ কংগ্রেস—

কোকনদ কংগ্রেসের সেক্রেটারী নিম্নলিখিত বুলেটিন বাহির করিয়াছেন।—

কংগ্রেস মণ্ডপে মাত্র ১২০০০ লোকের স্থান হইবে। ৫০০০ প্রতিনিধি এবং ৪০০০ অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য বাদে মোট ৩০০০ দর্শকের স্থান হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদের স্থান তাহাদের অর্ধ-সাহায্য অনুসারে নির্ণীত হইবে। তাহাদিগকে ১০০০ অথবা তদপেক্ষা বেশী, ৫০০০, ২০০০, ৫০০, অথবা অন্ততঃ ২৫ টাকা টাকাদা দিতে হইবে।

দর্শকদের স্থানও তাহাদের টিকিটের মূল্য অনুসারে নিরূপিত হইবে। দর্শকদের টিকিটের মূল্য ১০০০, ৫০০, ২০০, ৫০ ও ২৫ টাকা হইবে। মহিলা-প্রতিনিধিদের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য মাত্র ১০ টাকা ধার্য হইয়াছে।

দর্শকদিগকে টিকিটের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া নাম রেজিস্ট্রি করিয়া রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। এলা ডিসেম্বর হইতে ছাপানো টিকিট বাহির করা হইবে।

হে কংগ্রেস, 'দারিদ্রের কেহ নহ তুমি'।

হিন্দু মুসলমানে বিরোধ—

পূর্ব উপলক্ষে মসজিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুরা বাজাতে বাজনা বাজাইয়া যাইতে না পারে নাগপুরে মুসলমানদের তরফ হইতে সে-জনা একটি প্রতিবাদ উপস্থিত করা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান নেতাগণ বিবাদের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইহার পরে ম্যাজিস্ট্রেট মসজিদের নিকট দিয়া হিন্দুদের বাজনা বাজাইয়া যাওয়া নিষেধ করিয়া দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের এই আদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুরা সত্যাগ্রহ করিয়া প্রত্যহ মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া যাইতেছে। এ পর্যন্ত ১৬০ জন এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ৮ই নবেম্বর হিন্দুদের এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রার ভিতর ডাঃ খারে, ডাঃ পরাজপে, ডাঃ চৌককার, ডাঃ হেডওয়ার, শ্রীযুক্ত ওগেল, শ্রীযুক্ত ফিজেরার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী, দেশমুখ প্রভৃতি জমনায়কও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের একতরফা অন্যান্য আদেশই যে হিন্দুদিগকে সত্যাগ্রহে উত্তেজিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাপারটিতে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘনীভূত হইয়া ওঠা যে কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। অগের বিষয় এই বিবাদ আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

মাজাজের নির্বাচন-ফল—

মাজাজ সহর হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মাজাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন :—ডাঃ সি নটেশন, মেসার্স মুদালিয়র, টনিকাচলম্ চেটী এবং বেঙ্কটাচলম্ চেটী। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন মিঃ এস সত্যমুক্তি।

অ হালী দলন—

অকালী আন্দোলন উপলক্ষে দলে দলে অকালীরা কারা-বরণ করিতেছেন । অভ্যুত্থান ব্যক্তিদের ভিতর সন্মানিত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অভাব নাই । কয়েকজন কারারুদ্ধ অকালীর পদমর্যাদাব পরিচয় অমৃতবাজার-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন ।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বিদেশ

ইংলণ্ডে অবাধ-বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ—

করদাতা মাত্রেরই শাসনপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার যেদিন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, সেইদিন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রধারায় বিশেষ বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় কবিয়া রাষ্ট্র-নৈতিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে । ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যই এই যে, নির্বাচনে যে দল অধিক-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় সেই দলের হস্তে দেশের শাসন-ভার অর্পিত হয় । এই দলের শাসনে ব্যক্তির স্বাধীন মত স্ফূর্তি পায় না ; দলের মতকেই সর্বদা মানিয়া চলিতে হয় । অবশ্যই কখনও কখনও স্ত্রুই একজন শক্তিবৎ পুরুষ দলেব উপর প্রভাববিস্তার কবিয়া দলেব মত পরিবর্তন করিয়া নিজেব মতের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় যে দলের নিকট ব্যক্তিব বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায় ।

অনেক সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে বিশেষ প্রয়োজনে দলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, গবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের সে প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, তবুও দলটি ভাঙ্গিয়া যায় নাই । দল বাঁধিয়া প্রভুত্ব বজায় রাখিবার নেশায় দলেব লোকগুলি একত্র রহিয়াছে এবং কোনও বিশেষ রাষ্ট্রধারাব প্রবর্তনের চেষ্টা ইহাদের মধ্যে না থাকিলেও সংখ্যান জোরে ইহারা শাসনকাণ্ড পরিচালন করিতেছে । নিজেব কোনও বিশেষ লক্ষ্য না থাকিতে দেশ-শাসনের আদর্শ হীন হইয়া পড়ে ও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ দেশেব মঙ্গলের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় । ইংলণ্ডে যে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ছিল শ্রমিকদল আপন প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্বে তাহাব অবস্থা কতকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । আইরিশ স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ভালে যে মূল নীতিটি লইয়া উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলের বিরোধ ছিল তাহা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছিল । বাণিজ্য সংরক্ষণ-নীতি লইয়া যে আন্দোলন তাহাও স্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল । সাম্রাজ্য-লিপ্সাও উভয় দলের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল । ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতিব ক্ষেত্রে উভয়ের প্রভেদ বড় দেখা যায় নাই, কেবল রাষ্ট্রনীতির আদর্শ লইয়া উভয়েব মধ্যে বাগ বিতণ্ডা চলিতেছিল । তাই বিশ্ব-যুদ্ধের সময় শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্ত ইংলণ্ডে যখন সমবেতভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হইল তখন লয়েড্‌জর্জের নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন সহজ হইয়া উঠিয়াছিল । যুদ্ধের পরে রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজীতে লয়েড্‌জর্জ ক্রমাগত ফ্রান্সেব নিকট হাবিয়া যাওয়াতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তরুণ দল যখন লয়েড্‌জর্জের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তখন হইতেই নূতন করিয়া ইংলণ্ডে দলা-দলির সূচনা হইয়াছে । পুরাতন পন্থার প্রতি লোকের আস্থা না থাকিতে একটি অভিনব নীতিব প্রবর্তন না করিতে পারিলে দেশ-বাসী শ্রমিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে বুঝিতে পারিয়া রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদল আপনাদের আদর্শ নূতন ছাঁচে

ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন । অবাধ-বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি লইয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক জগতে পুরাতন বিরোধ । বিরোধে এককালে অবাধ-বাণিজ্যপন্থী উদারনৈতিকদল জয়লাভ করিয়াছিল । কিন্তু এখন ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়াতে এই তর্কটি আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে । ইংলণ্ড প্রধানতঃ নির্মাণশিল্প ও ভারবাহী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল । কৃষিজাত জীব্য ইংলণ্ডে এত অধিক হইত না যে তাহা দ্বারা ইংলণ্ডেব অভাব দূরিতে পারে । বিনাপ্রক্ষে খাদ্যজীব্য আনয়ন করিলে স্থলভে খাদ্যজীব্য পাওয়া যাইবে এবং তাহাতেই দরিদ্র লোকদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া অবাধ-বাণিজ্য-নীতি ইংলণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল । সে সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প-সম্পত্তি অবিকশিত ছিল ; কাজে কাজেই উপনিবেশের কোনও স্বার্থধারা এই প্রস্তাব সহিত জড়িত ছিল না । বর্তমানকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য সংরক্ষণ ও তাহাব শ্রীশক্তি সাধন ইংলণ্ডের একটি মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে । যুদ্ধের অবকাশে মার্কিন ইংরেজের ভারবাহী ব্যবসা অনেকটা কাড়িয়া লইয়াছেন । যুদ্ধের পরে কয়লার মালিক হইয়া পড়াতে শিল্পজগতে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে এবং জার্মানীর ধনবৈষম্যের সুযোগ লইয়া নানাদেশের ব্যবসায়ী দেশ-বিদেশে সস্তায় জার্মান মাল চালান দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পকলাব ক্ষতি করিতেছে ।

নানাদিকের এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । গৃহজাত শিল্প বক্ষা কবিত হইলে বিদেশজাত শিল্পের উপর শুষ্ক বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দেশজ শিল্পকে অপেক্ষাকৃত স্থলভ রাখা ভিন্ন উপায় নাই বলিয়া ইহারা মনে করেন । গৃহজাত শিল্পের পর, ইহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে-কোনও স্থানে উৎপন্ন জব্যকে বিদেশীর জব্য অপেক্ষা সুবিধাদরে বিক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিবার জন্ত পছন্দমূলক শুল্কহার (Preferential tariff) সৃষ্টি কবিত ইচ্ছা করেন ।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বল্টউইন্ এই সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন কবিবার সঙ্কল্প কবিয়াছেন । কিন্তু বিগত নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের নেতা বোনার্ল-ল সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করিবার পূর্বে নির্বাচকগণের মত জানিবার জন্ত নূতন নির্বাচন তত্ত্বীকার করিয়াছিলেন । সেইজন্ত এই নীতি প্রবর্তন করিতে হইলে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । বল্টউইন্ সাহেব সংরক্ষণ-নীতি প্রচার করাতে রক্ষণশীল দলেব এক রবার্ট সেসিজ ভিন্ন প্রায় সকল প্রধানেরাই তাহাব মতের সমর্থন করিয়াছেন । উদারমতাবলম্বীরা কিন্তু অবাধ-বাণিজ্য-নীতিব সমর্থন করিয়া সংরক্ষণ-নীতিকে বাধা দিবার জন্ত দল বাঁধিতেছেন । লয়েড্‌জর্জ উদারনৈতিক দল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবাধ-নীতিব তিনি একজন গোড়া প্রতিপোষক ; সেইজন্ত তিনি সদলবলে আসুকুইথ্ সাহেবের দলে যোগ দিলেন ।

রক্ষণশীলদল বলেন যে, সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তিত হইলে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা মিটিয়া যাইবে । শ্রমিকদল বলেন বেকার-সমস্যা সমাধানের সে পন্থা নহে । শ্রমিক-দলপতি হেগার্সন্ ও র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন । ইহার ফলে ৬ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডে আবার নূতন নির্বাচন হইবে এবং সেই নির্বাচনে নূতন মতবাদগুলির দ্বন্দ্ব খুব ফুটিয়া উঠিবে । দেখা যাইবে ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসী কোন মতবাদ গ্রহণ কবে ।

জার্মানীতে আভ্যন্তরিক গোলযোগ—

যুদ্ধাবসানে ধ্বংসাবশিষ্ট জার্মানীর নষ্টপ্রায় শিল্প-বাণিজ্যের

পুনরুদ্ধারের জন্ত রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভ করিবার জন্ত জার্মানীর ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করায়ত্ত করিবার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। র্যাটেনো, ষ্টাইনিস্, ফ্রাপ প্রভৃতি ধনী জার্মান রাষ্ট্রীয়জীবনে অল্পদিনের মধ্যেই যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য-ও শক্তিলোপুপ রাষ্ট্রীয় নেতাদের অবিবেচনার ফলেই জার্মানী বর্তমান দুর্দশায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এই বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠাতে জনসাধারণ ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাই শ্রমিক দল ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় জগতে প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ-সমস্যার কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারাতে কোনও শাসন-পরিষদ বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিতেছিল না। মিত্রশক্তিবর্গের চাহিদা মিটাইতে না পারাতে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল তাহাব ফলে মন্ত্রীসভার পর মন্ত্রীসভার পতন ঘটতে লাগিল এবং জার্মানীর দুর্দশা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। ফরাসী যখন আপনার পাওনা আদায় করিবার অস্ত্র উপায় না দেখিয়া রুস অবরোধ করিয়া বসিলেন তখন জার্মান শিল্পবাণিজ্যের এমনই দুর্বস্থা হইল যে তাহার আশু প্রতিকার না হইলে জার্মানীতে বৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিবে বুঝিতে পারিয়া জার্মান মন্ত্রী ট্রেসমান্ ফ্রাঙ্কের সঙ্গে একটি রফানিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিগত ৩০শে জুলাই এক ইস্তাহারে ফরাসী ঘোষণা করিয়া দিলেন যে রুসের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবসানের চকুমনামা জার্মান সরকার যতদিন না দিবেন ততদিন পর্যন্ত ফরাসী সরকার জার্মানীর সহিত বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্ত কোনও আলোচনা করিবেন না। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অবসান ঘটিলে ক্ষতিপূরণ দাবীর পুনরালোচনা করিতে ফরাসী স্বীকৃত আছেন।

ট্রেসমান্-মন্ত্রীসভা সেইজন্ত রুসের সংশোধন অবসান ঘোষণা করিলেন; কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী পঁয়াকারে পূর্ব প্রতিশ্রুতিকে অবহেলা করিয়া পুরা দাবিই করিতে লাগিলেন। জার্মানীতে যাহাতে গোলযোগ আরও বাড়িয়া উঠিয়া জার্মান সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় পঁয়াকারের ইহাই অভিপ্রাণ। অতীত ষ্টাইনিসের দল ট্রেসমান্-মন্ত্রীসভাব অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ফ্রাঙ্কের সঙ্গে ব্যস্তভাবে স্থবিধা করিয়া লইবার জন্ত ষ্টাইনিস্ ফরাসী সরকারের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছেন, ফরাসী-পক্ষে সেনাপতি দেগুতের সহিত ষ্টাইনিসের এ-সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে এইসব কথাবার্তার ফলে ফরাসী ট্রেসমান্-মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইয়া ষ্টাইনিসের প্রভুত্ব ফিরাইয়া আনিবার জন্ত জার্মানীর নিকট পূর্কদাবীর ষোল আনাই দাবী কবিতেছেন। ষ্টাইনিস্ ও পঁয়াকারে উভয়েই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ট্রেসমান্ শাসন-পরিষদের পতন কামনা করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পঁয়াকারে চাহেন জার্মানীর আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা, ষ্টাইনিস্ চাহেন ব্যবসায়ীমণ্ডলের রাষ্ট্রীয় শাসনে অগণ্ড প্রভুত্ব। উভয়ের স্বার্থধারা বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য ট্রেসমান্-মন্ত্রীসভার পতন ঘটান। সেইজন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি স্বার্থপ্রায়ে উভয়ের স্বার্থ মিলন অসম্ভব নহে।

ট্রেসমান্ কিন্তু জার্মানীকে বঁচাইবার জন্ত খুব চেষ্টা পাইতেছেন। কঠোর নিয়মনিষ্ঠার প্রবর্তন ও সর্বত্র শৃঙ্খলা ও সংহতি আনয়ন করিয়া নূতন জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে শক্তিশ্রমের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত ট্রেসমান্ ব্যগ্র। তাই তিনি দেশের নিয়মতন্ত্রপ্রণালী কিছুদিনের জন্ত স্থগিত রাখিয়া সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাসন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার হ্যার গেস্‌লারের হাতে দিয়াছেন। সাম্রাজ্য-বিরোধী যে-সমস্ত দল জার্মানীতে ষড়যন্ত্র করিতেছিল শাসনভার পাইয়াই

গেস্‌লার সেই-সমস্ত দলের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বৈরাজ্যবাদীদল, রাজপন্থীদল ও রাইনল্যান্ডের স্বাধীনতা-প্রয়াসী দল জার্মান সাম্রাজ্যের ঐক্য নষ্ট করিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছিল। এই তিন দলের সর্বপ্রকার আন্দোলন আইনবিরুদ্ধ বলিয়া গেস্‌লার ঘোষণা করিলেন। ব্যাভেরিয়া চিরকালই রাজপন্থী। তাই ব্যাভেরিয়া গেস্‌লারের শাসন অস্বীকার করিয়া সেনাপতি ফন্ কার্কে আপনাদের একচ্ছত্র শাসক নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু জার্মান সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবাব বাসনা ব্যাভেরিয়ার নাই। তাই ফন্ কার্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্যাভেরিয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেও জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যেই থাকিবে। ব্যাভেরিয়া আপনার স্বাধীন সত্তা লাভ কবিত্তে চাহেন না; সাম্রাজ্যের আদর্শ ব্যাভেরিয়া কখনই ভুলিবেন না। জার্মান সাম্রাজ্যকে পূর্বগোরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ব্যাভেরিয়া চেষ্টা পাইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ব্যাভেরিয়ার বীর বাজকুমার রুপেকট কে ব্যাভেরিয়া সিংহাসনে বসাইতে চাহেন।

ফরাসীর সাহায্য পাইয়া রাইনল্যান্ডে স্বাধীনতা-প্রয়াসী দলও মুক্তি পাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। এই মুক্তিকামীদলের নেতা ডাক্তার উর্টন রাইনল্যান্ডকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ডুসেল্ডফ্ নগর ইহাদেব প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে। কিন্তু রাইনল্যান্ড-সাম্রাজ্যপন্থীদের সংখ্যাও কম নহে। তাই দুই দলে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে। কলৌ সহর সাম্রাজ্যপন্থীদের প্রধান আস্তানা। ফরাসী-স্বকার রাইনল্যান্ডের সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন। ইংরেজ সরকার কিন্তু এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে রাইনল্যান্ডে এইরূপ ব্যবস্থা ভাস্‌ই-সন্ধিসূত্রেব বিপরীত, সেইজন্ত ইংরেজ-স্বকার তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। বৈরাজ্যবাদী দলও সাম্রাজ্য প্রদেশে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। বৈরাজ্যবাদী দলের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্ত ট্রেসমান্ স্বাঙ্গন-মন্ত্রীসভা দমন করিয়া ফন্ কারের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে জার্মানীতে প্রসিয় প্রভাব কমিয়া ব্যাভেরিয়ার প্রভাব বাড়িয়া উঠিবে। তখন যুদ্ধের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠা কিছুই বিচিত্র নহে।

সাম্রাজ্য-বৈঠকে সাক্ষাৎ—

ভারতবর্ষের আন্তরিক সাহায্য লাভ করিতে না পারিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি সামর্থ্য অনেক কমিয়া যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ভারতের ধন-ও জনবল বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ভরসা। সেইজন্ত কাগজপত্রে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ইংরেজ-সরকার বরাবরই স্বীকার করেন এবং সাম্রাজ্য-বৈঠকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে ভারতবর্ষ হইতে মনোনীত প্রতিনিধিও প্রেরিত হয়। যদিও এই মনোনয়ন প্রজার অতিক্রমিত অনুসারে হইল কি না তাহা দেখিবার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। যাহা হোক, সাম্রাজ্য-বৈঠকে ইংরেজ-সরকারের মনোনীত তথাকথিত ভারতের প্রতিনিধি কেহ না কেহ বরাবরই উপস্থিত থাকেন এবং আলোচনা-সভাতে ভারতের মতামত আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে ব্যক্ত করেন। সাম্রাজ্য-বৈঠকে প্রতিনিধি সরকারপক্ষ অবশ্য নরমপন্থীদের (মডারেট) মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া আসিয়াছেন; তথাপি বৃটিশ উপনিবেশে ভারত-বাসীর প্রতি যে ব্যবহার করা হয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ তাঁহারা বরাবরই করিয়া আসিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বৈঠকে উপনিবেশের প্রতিনিধি-সমূহ ইহার অতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে কিছুই লাভ হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে ভারতবাসীর দুর্দশা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। একই রাজতন্ত্রের প্রজা হইয়াও ভারতবাসী যে

উপনিবেশবাসীর নিকট অস্পৃশ্য ইহা ভারতের ইজ্জতে লাগিয়াছে। তাই ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করেন তাহার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত-বাসীর মাধ্যমে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং ভারতবাসী নগরবাসীর অধিকার অনেক পরিমাণে লাভ করিয়াছিল। মহাত্মা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসার পর দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যে নানা দৌর্ভাগ্যের পরিচয় পাইয়া আফ্রিকার যেত অধিবাসীগণ আবার ভারতবাসীদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন। আফ্রিকাবাসী ব্যুরর নেতা জেনারেল স্মাট্‌স্ কৃষ্ণকায় জাতিকে অসীমঘৃণার চক্ষে দেখেন। তাই তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে ভারতবাসীর সম্বন্ধে নানা অপমানকর আইন জারি হইতে লাগিল এবং ভারতবাসীর নির্যাতনের সীমা রহিল না। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতের প্রতি এই ঘৃণার ভাব আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। নেটাল ও কেপ প্রদেশেও ভারতবাসীর প্রতি নিপীড়ন চলিতেছে। এই সকল অত্যাচারের অশ্রু প্রতিকার না পাইয়া ভারতবর্ষের তরফ হইতে সাম্রাজ্য-শিল্পপ্রদর্শনীকে পরিহার করিবার কথা উঠিয়াছে ও ভারতের আইন-মঞ্জলিসে উপনিবেশবাসীর ব্যবহারের প্রতিবাদে তুল্যরূপ ব্যবহার করিবার আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। এই-সব ব্যাপার হইতে ভারতবাসীর প্রকৃত মনোভাব বৃদ্ধিতে পারিয়া আমরাদিগকে শাস্ত করিবার জন্য বর্তমান বৎসরের সাম্রাজ্য-বৈঠকে উপনিবেশে ভারতবাসীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হয়। ভারত-সচিব লর্ড পিল ভারতবর্ষের জন্য অনেক ওকালতী করেন। তাহার পর ভারতের মনোনীত প্রতিনিধি স্মার তেজবাহাদুর সাপ্র ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বেশ তেজের সহিত বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ভিক্ষা বা অনুন্নয়-বিনয় নাই, তেজের সহিত আপনার দাবী জানানো হইয়াছে। তেজবাহাদুরের বক্তৃতার প্রধান কথা হইতেছে যে ভারতবাসী কিছুতেই তাঁহার ইজ্জত নষ্ট হইতে দিবে না। উপনিবেশসমূহের বিরুদ্ধে ভারতে যে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে তাহার মূলে ভারতের ইজ্জত। তিনি বলেন, “আমি ভারতের ইজ্জতের জন্য লড়িতেছি। আমরা বহির্ভারতে ভারতবাসীর সম্মান অটুট রাখিবার জন্য একমন একপ্রাণে লড়িব। এই বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। আমাদের গৃহবিবাদ আছে সত্য, আমাদের মধ্যে নরম ও গরমপন্থীর মতের প্রভেদ আছে, আমাদের মধ্যে সহযোগী ও অসহযোগী, হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণের মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে একমত। আমরা বিদেশে ভারতবাসীর সম্মান রক্ষার জন্য যে কি পরিমাণে ব্যগ্র তাহা আপনারা অবগত নহেন। আমাদের ভাষাতে একটি

কথায় এই আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ইজ্জত। আমরা প্রাণ দিতে পারি তবুও ইজ্জত দিব না। ভুলিয়া যাইবেন না যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ভারতের উপর নির্ভর করে। সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে ভারতবর্ষ। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী ভারতে বাস করে এবং তাহার অতি প্রাচীন সভ্যতার আলো বহিয়া আনিয়াছে। আমরা সাম্রাজ্যের সহিত বন্ধন অটুট রাখিয়াছি কিন্তু আমাদের সাম্রাজ্য-ভক্তি আপনাদের ব্যবহারে যদি ছুটিয়া যায় তবে আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভটি খসিয়া যাইবে। মনে করিবেন না যে আমি কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্যপ্রয়ামী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অশাস্ত মতের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। ভারতের জনসাধারণের মধ্যেও গভীর বিক্ষোভ উঠিয়াছে। আগ পর্যন্তও জাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছে।”

তেজবাহাদুরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ভারতবাসীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধি জেনারেল স্মাট্‌স্ কোনওরূপ প্রতিকার করিতে নাবাজ। স্মাট্‌স বলেন জীবনযাত্রার মাপকাঠি বিভিন্ন হওয়াতে দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউরোপীয়গণ ভারতবাসীর সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠে না। তাই আশ্রয়ার্থে ইহারা ভারতবাসীকে সমান অধিকার দিবে না। তিনি বলেন—

“It is a case of a small civilisation, a small community finding itself in the danger of being overwhelmed by a much older and more powerful civilisation, and it is the economic competition from a people who have entirely different standards and viewpoints from ourselves. You cannot blame these pioneers, these very small communities in South Africa and Central Africa, if they put up every possible fight for the civilisation which they have started, their own European civilisation. They are not there to foster Indian civilisation—they are there to foster Western civilisation.” কাজে কাজেই তিনি স্পষ্টাঙ্গরে বলিয়া দিতেছেন যে “So far as South Africa is concerned, it is a question of impossibility” ভারতবাসীকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে অসম্ভব।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্র-পরিচয়

নারদ

ঈদের চাঁদ

ব্রহ্মার বরে নারদ চিরযৌবন বীণাবাদনপটু ত্রিলোক-পর্ষাটক হইয়াছিলেন।—কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণ।

পিতা বৃক অক্ষ। কন্যা অক্ষ পিতাকে নিজের দৃষ্টি দিয়া শুভদিনের চন্দ্রোদয় দেখাইতেছে।

চারু

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিশ্বভারতী-নারীবিভাগ

আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্ত পাইয়াছি :—

“শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত নারী-বিভাগ হইতে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অগ্ণত শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রকলা, বঙ্গবয়ন এবং বই-বাঁধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া চলিতেছে। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগীপরিচর্যা, শাকসজ্জী ফুলফলের বাগান তৈয়ারী, বিজ্ঞানবিত্তিত গৃহকর্ম-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীরা পারদর্শিতা লাভ করে, ইহা আমাদের ইচ্ছা। নানা কারণে পুরুষ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা নিয়মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্গীর্ণ পথে বিদ্যা উপার্জন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের নারীদেব পক্ষে এ সম্বন্ধে অবশ্যবাধ্যতা নাই। এজন্ত, বুদ্ধি চরিত্র কর্মপটুতা ও সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উদারভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাধা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই স্মরণ আছে বলিয়া, ভরসা করি, নারীশিক্ষায় আগ্রহবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যথোচিত আনুকূল্য পাইলে দেশবিদেশ হইতে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শে নারী-শিক্ষালয় গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য হইব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত দেশের বিদ্যোৎসাহী বদান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে এককালীন বা মাসিক বা বার্ষিক দান প্রার্থনা করিতেছি; আশা করি, আমাদের আবেদন বিফল হইবে না। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

নারীর অর্থকরী বৃত্তি

আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে, শিক্ষিতা মহিলারা শিক্ষা, চিকিৎসা, পুস্তক-রচনা, সংবাদপত্র-চালনা, খাত্তী-

বিদ্যা, পোষাক-নির্মাণ, শুল্কবা, বস্ত্রব্যবসায়, ও সর্ব-শেষে ওকালতীর কার্যে দেখা দিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কুলি, কণ্ট্রাক্টার, দোকানদার, কৃষিব্যবসায়ী, ছদ্ম-ব্যবসায়ী, ধোপানী, নাপিতানী, রাঁধুনী, দাসী, প্রভৃতির কাজ করিয়া বহু রমণীকে উপার্জন করিতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা যে কত রকম ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, আমেরিকান “ওয়ান সিটিজেন” পত্রে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে দেখি :—

“এ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রের যে-সকল বিভাগে কেবল মাত্র পুরুষের গতিবিধি ছিল, রমণীজাতিও যে সেই-সকল বিভাগে ক্রমশ ক্রম-গতিতে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন, মহিলা-কর্মসম্পন্নের একটি আধুনিক পরিবীক্ষণের ফলে তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। মাল প্রভৃতির চালান বিভাগে নারী কর্মীর সংখ্যা গত দশ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে; এই দশ বৎসরেই কেরাণী, রেখাক্ষর-লেখক, টাইপিষ্ট, হিসাব-রক্ষক, টেলিফোন-যন্ত্রী, শুল্ককারিণী প্রভৃতি নারীর সংখ্যা ৫০,০০ এরও বেশী বাড়িয়াছে। শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের ব্যবসায়েও রমণীর সংখ্যা দীর্ঘে দীর্ঘে বাড়িতেছে; অনেকে যন্ত্রনির্মাতা, যন্ত্রচালক, রাজমিস্ত্রী, হাতিয়ার-নির্মাতা, লোহা ঢালাইকার, পলস্তরাকারী, নল-মেরামত-কারী, গ্যাসযোজনকারী, এমন কি মুচি, কামার প্রভৃতির কাজেও চুকিতেছেন। সরকারী কাজেও ইহাদের নিয়োগ বাড়িতেছে; কারণ ইহাতে এই দশ বৎসরে ইহাদের হার শতকরা ৬০.৭ করিয়া বাড়িয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জেলার কর্মচারী, সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের কর্মচারী, পোস্টমিষ্ট্রেস (ডাককর্ত্রী) প্রভৃতির সংখ্যা ছিল ২৭৫; দশ বৎসরে বাড়িয়া হইয়াছে ৬৫২; বাল অপরাধীদের ও পলাতক এবং ভবঘুরে বালকদের তত্ত্বাবধায়কের কার্যে মহিলার সংখ্যা ১৮৮ হইতে ৭৮০ হইয়াছে। এই রিপোর্টে ৮ জন আকাশযান-চালক, ৫৭ জন যন্ত্র-উদ্ভাবক, ৪১ জন এঞ্জিনিয়ার, ১৩৭ জন সৌধশিল্পী,

২ জন অরণ্য-পাল, ২৫ জন শোভন-উত্থান-রচয়িত্রী রমণীর নাম পাওয়া যায়। রসায়নবিৎ, জহুরী, ধাতুবিদ্যাবিদ, ধর্মযাজক, নকসানবীশ, উকীল, বিচারপতি, কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, ধর্ম ও সমাজের হিতসাধক জনসেবা-ব্রতী, ব্যায়ামশিক্ষক ও নৃত্যশিক্ষকের কাজে রমণীর সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়াছে। কেবল মাত্র ক্ষেতমজুর, পোষাক-নির্মাতা ও ভৃত্যের কাজে রমণীর সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে। দাসীর কাজের হার ১৯১০ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৩১.৩ হইতে ১৯২০তে শতকরা ২৫.৬ পর্যন্ত নামিয়াছে।”

দাসীর কাজটাই সকল দেশে পুরাকালে মেয়েদের প্রধান বৃত্তি ছিল। পোষাক তৈয়ারীর কাজটা পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরাই বেশী করিত, কারণ তাহা বা তৈরী পোষাক পরে। আমাদের দেশের মেয়েদের অতি অল্প লোকেই তৈয়ারী পোষাক পরে, না হইলে দেখা যাইত মজুর দাসীও পোষাক নিম্নাতার কাজই এ দেশে রমণীরা বেশী কবে। আসামে, আরাকান জেলায় এবং কক্সবাজার মহকুমায় নারীরা অনেকে বস্ত্র-বয়নের কাজ করে। পুরাতন পথ ছাড়াই নূতন নূতন বৃত্তির দিকে মেয়েদের ঝোঁক হওয়াতে পাশ্চাত্য দেশে রমণীদের পুরাতন বৃত্তিসমূহে রমণীদের টান ও সঙ্গে সঙ্গে কস্মীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

এদেশে বৃত্তি হিসাবে না হইলেও আচাধ্য ও উপদেষ্টা রূপে ধর্মযাজকের কাজ মেয়েরা করেন। খৃষ্টীয় মিশনে দেশী মহিলারা বৃত্তি হিসাবেও ধর্মকাণ্ডা করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিনী হিন্দু নারীরাও ঐ কাজ করেন। “ওয়ান সিটিজেন” পত্রে উল্লিখিত বহু কাজ এ দেশের রমণীরা করিতে পারেন এবং ঘরে কিছু কিছু করিয়াও থাকেন। সুবিধার অভাবে ও লোকলজ্জার ভয়ে এই-সকল সংরক্তি প্রকাশ্যে অবলম্বন করিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন। এই মিথ্যা লজ্জা ঘুচিয়া যাওয়া উচিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে, বিদ্যাসাগর-বাণীভবনের ছাত্রীরা স্নাকুরার কাজ শিখিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই বেশ অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বৃত্তি হিসাবে কি কি কাজ করেন ও করিতে পারেন, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করা দরকার।

বীরলা মহাশয়ের বদান্যতা

কলিকাতার শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বীরলা মহাশয় বিহার ও ওড়িশার প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ মেডিক্যাল কলেজ ফণ্ডে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া প্রকৃত উদারের পরিচয় দিয়াছেন। এই অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কোন সন্দেহ করিয়াছেন কি না জানি না। আশা করি দরিদ্র ভারতবাসীদের সেবাতেই ইহার অধিকাংশ ব্যয় করা হইবে এবং মোটা মাহিনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পুষিতে ও সুসজ্জিত ইউরোপীয় ওয়ার্ডের বিল মিটাইতে গিয়া দরিদ্রদের ভাগ্যে শূন্য পড়িবে না।

শ্রীযুক্ত যমুনালালের গাড়ী নিলাম

দশ টাকায় মোটরকার এবং তিন টাকায় বগী গাড়ী নিলামে চড়িলে সেইগুলি কেহ কেনে নাই—ব্যাপারটা বিস্ময়কর নহে কি? শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালালের সম্পত্তি-ভুক্ত এই জিনিষ দুটি এইরূপ হাস্যকর রকম অল্প মূল্যে ও ওয়ার্ডাতে বিক্রী করা যায় নাই। সেগুলিকে রাজকোটে পাঠানো হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকের আদর্শ নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের শক্তি যে একেবারেই নাই জগৎকে একথা বুঝাইতে অনেকে ভাল বাসিলেও এই সামান্য ঘটনাটিও তাহার উল্টা প্রমাণ দেয়। ভারতবাসীরা যে সম্ভব হইয়া কাজ করিতে সক্ষম, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; তবে কাজটার প্রতি প্রাণের টান থাকা চাই।

ভারতীয় জেলখানা

স্যার আলেকজান্ডার কারডিউ মহাশয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে বক্তৃতা করিবার সময় বলিয়াছেন, যে সভ্য জগতের সমুদায় জেলখানার মধ্যে ভারতবর্ষের জেলখানাগুলি নিকৃষ্টতম। বর্তমান সভ্য জগতের মতে জেলখানা অপরাধীদের সংপথে ফিরিবার সুযোগ পাইবার স্থান। আধুনিক মানুষ সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্তই অপরাধীকে দণ্ড দিতে চায়, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত নয়। স্যার আলেকজান্ডারের মতে ভারতীয়

জেলখানাগুলি অপরাধীদের উন্নতির অপেক্ষা অবনতির সহায়তাই বেশী করে। ভারতের ইংরেজশাসনযন্ত্রের ইংরেজেরই এই প্রশংসাবাদটি অল্পমম!

গৌরীশঙ্কর অভিযান

ইংরেজ ও আমেরিকান পর্যটকেরা গৌরীশঙ্করের দুর্লভ্য শিখরে আরোহণ করিবার জন্ত আবার দলবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহারা অক্লিঞ্জনপূর্ণ একটি যন্ত্র এই অভিযানের সময় ব্যবহার করিবেন; আল্পস্ পর্বতে তাহার কার্যোপযোগিতার পরীক্ষা হইতেছে।

এ বিষয়ে ভারতবাসীদের কি কিছুই করিবার নাই? আমরা কি চিরকাল পরের হাতে আমাদের দেশের সকল কঠিন কার্যের ভার ফেলিয়া দিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিব? ভারতের কয়েকজন ধনী মিলিয়া একদল যুবককে সুইজারল্যান্ডে পর্বত-আরোহণ-বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিতে পাঠাইয়া দিলে ত পারেন। ইহারা ফিরিয়া আসিলে ভারতীয়ের দ্বারাই ভারতীয় পর্বতশিখর আরোহণ ও আবিষ্কারের কার্যে এই ধনীরা সাহায্য করিতে পারেন। আমাদের যাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না, এমন সকল উদ্দেশ্যে বিদেশীরা আমাদের দেশে আসিলে আমরা কোনোই আপত্তি করি না; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ক্রেশ বোধ হয়। পাশ্চাত্য দেশে ধনী মাত্রেরই অষ্টপ্রহর নবাবী ব্যসন ও চর্কির বোঝায় ডুবিয়া খুসী হইয়া কেদারা হেলান দিয়া থাকে না। তাহারা জনসমাজের বিশেষ একজাতীয় কাজে লাগিয়া যায়। এই-সকল কাজে হাতে হাতে টাকা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরিণামে এগুলি দেশের উপকার করে। ধনীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে গোবংশের উৎকর্ষসাধন, অশ্বপালের উৎকর্ষসাধন, হাঁস মুরগীর পাল তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে মন দেন। কেহ বা বহু কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য দেশ পর্যটন কি আবিষ্কারে লাগিয়া যান। ইহারাই অনেকে মিলিয়া বিমান-বিহার, মোটর চালনা, ঘোড়সওয়ারি, খেলা, কুস্তি ও নানা প্রকার ব্যায়ামের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া তোলেন। ইহারা নানাভাবে শিল্পী, বারিগর ও

সাহিত্যিকের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন, সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টিতেও মন দেন। এক কথায় বলিতে দেশের ও জাতির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন ও সভ্যতার বিকাশের ইহারা অনেকে সহায়। কিন্তু ভারতের ধনকুবেররা কি করিতেছেন? দেশের এই ধনী-সম্প্রদায় জাতির কোন্ হিতকর্মে লাগিতেছেন?

বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা

লাহোরে বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার একটি আশ্রম আছে। এই আশ্রমে ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রদেশের বিবাহার্থিনী বিধবারা আশ্রয় পান। সভার কার্যের সাহায্যের জন্ত একটি মাসিকপত্রও আছে। আমরা সভার কার্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার নীচে দিলাম:—

“ভারতবর্ষের নানা শাখা-সমিতি ও সহযোগীদের নিকট হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে, যে, ১৯২৩ অব্দের আগষ্ট মাসে সভার সাহায্যে ৮৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত মোট ৫৮৮টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মধ্যে—

ব্রাহ্মণ ১১১, ক্ষত্রিয় ১২৩, আরারা ১২৮, কায়স্থ ১৩, আগরওয়াল ৭৬, রাজপুত ৫৩, শিখ ৫, এবং অন্যান্য জাতি ৭৯, মোট— ৫৮৮।

মহিলা-কর্মী-সংসদ

যে-সকল ভারতীয়া মহিলা দারিদ্র্য ও আত্মীয়-বন্ধুর পীড়নে দুঃখ পান, এবং নিশ্চম ও নৃশংস স্বামী প্রভৃতির দ্বারা লাঞ্চিত হন, তাহাদের হয় দুঃখভোগেই, নয় স্বীয় জীবিকা অর্জন দ্বারা দিন কাটাইতে হয়। মহিলা-কর্মী-সংসদ এই-সকল মহিলাকে কাজের সুবিধার জন্ত মণ্ডলী-বদ্ধ করিতে চান। সংসদ কলিকাতার মূল কারখানায় মেয়েদের কাজ শিখাইয়া তাহাদেরই মফস্বলের শাখা কারখানায় পাঠাইতে চান। দুঃখিনী নারীরা বৃত্তিশিক্ষা দ্বারা কি করিয়া সচুপায়ে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন, তাহাই সংসদের শিক্ষার প্রধান বিষয়। মণ্ডলী গঠনের উদ্যোগী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়া বহু বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া

সংসদের কাজ চালাইতেছেন। সকলের বড় অভাব অর্থের অনটন। সংসদে এখন বার তের জন মহিলা তাঁত চালানো, চরকা কাটা, সূচিশিল্প, দরজির কাজ, কাঁটার কাজ, প্রভৃতির উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইতেছেন। আমরা ইহাদের কাজের নমুনা দেখিয়াছি। জিনিষগুলি বাজারে বিক্রয় করিবার মত হইয়াছে। সংসদ একটি উচ্চ আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আর-একটু পড়া উচিত। যাহারা সাহায্য করিতে চান, তাহারা শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারকে, ৭২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

জগতের আশার কথা

আধুনিক বালকবালিকাদের মনে যে একটি সেবার ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা পরস্পর দলনে নিযুক্ত জাতিগুলির মধ্যে ভালবাসা ও পরসেবার ভাব জাগাইয়া তুলিবে এবং ফলে জগতের সুখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিষয়ে আমেরিকার চাইল্ড ওয়েল্‌ফেয়ার পত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশের অনুবাদ নীচে দিলাম।

আজিকার দিনে জগতে যে একটি নূতন আশার উদয় হইয়াছে, মানাদেশের বালকবালিকাবাই সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। জগৎ সেই দিনের আশাপথ চাহিয়া আছে, যেদিন সমস্ত বিধে শান্তি বিরাজ করিবে, এক জাতি আর-এক জাতিকে ভয় ও ঘৃণা কবিত্তে ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বেরে বাঁধিয়া একত্রে বাস করিবে।

আশ্চর্য্য যে এই বিশ্বব্যাপী শান্তির আশা বিগত বিশ্বসংগ্রামের সংক্রান্ত নানা ঘটনা হইতেও উদ্ভূত হইয়াছে। সেই-সব বিগত উৎকর্ষার দিনে যখন সকলেই বীর সেনানীদের কোনো প্রকারে সাহায্য ও সুখ দিবার জন্য যথাশক্তি খাটিতে ব্যগ্র হইয়া থাকিত, তখন আমেরিকার বিদ্যালয়ের নবীন প্রাণগুলিও সাহায্য করিবার অনুমতি চাহিল। তাহাদের 'রেড ক্রসের' সেবক-সম্প্রদায়ে ভর্তি করিয়া লইয়া জুনিয়ার আমেরিকান রেড ক্রস নাম দেওয়া হইল। যুদ্ধের অবসানে দেখা গেল, ইউরোপে প্রায় প্রত্যেক দেশে হাজার হাজার শিশু গৃহহারা নিবন্ধ ও জীর্ণবাস হইয়া ঘুরিতেছে; যাহাদের বা গৃহ আছে তাহাদের মুখে হাসি কণ্ঠে কলোচ্ছ্বাস নাই, খেলাধুলা ভুলিয়া শিশুজীবনের সকল আনন্দে বঞ্চিত হইয়া তাহারা দিন কাটাইতেছে। জুনিয়ার রেড ক্রসের সভ্যরা দেখিল যুদ্ধক্ষেত্রের কাজ শেষ হইয়া গেলেও এ ক্ষেত্রে তাহাদের জন্য কাজ পড়িয়া আছে; তাহাদের নবীন প্রাণ সে কাজের ডাকে তখনি সাড়া দিল। সেই সময়েই দেখা গেল যে দেশে ও হাঁসপাতালে পীড়িত সৈন্য, যেরে যেরে অভাবগ্রস্ত শিশু ও রোগী প্রভৃতির সেবাব কাজ পড়িয়া আছে। এত কাজ থাকিতে কেবল যুদ্ধাবসানের খাতিরে জুনিয়ার রেড ক্রসের দল

ভাঙিয়া দেওয়া স্বপ্নেও ভাবা চলে না। কাজেই তাহারা পূর্ণ উৎসাহে কাজ করিয়া চলিল। এখন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রায় ৫,০০০,০০০ বালক বালিকা ৩০,০০০ বিদ্যালয় হইতে দেশ-বিদেশের বন্ধুরূপে ধরে বাহিরে সুখশান্তি আনিবার কাজে লাগিয়া আছে।

বিশ্বব্যাপী শান্তির সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ভাবিয়া পাইতেছেন না? বাকিটা পড়িলেই বুঝিবেন। ইউরোপের বালকবালিকাদের যখন বলা হইল যে আমেরিকার বালকবালিকাদের চেষ্টি ও স্বার্থতাগের ফলেই তাহারা অল্পবয়স্ক বিদ্যালয় পুস্তকাগার, খেলার মাঠ, খেলনা ও অস্থায়ী উপহার পাইতেছে, তখন বেলজিয়ম ফ্রান্স পোল্যান্ড চেকো-স্লোভাকিয়া এবং বন্ধন দেশসমূহের ডেলেমেয়েরা সমুদ্রপারের তরুণ বন্ধুদের সঙ্গদয়তায় গুমী হইয়া কেবল যে ধন্যবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা নয়; তাহারা বন্ধুদের যৎমান্য উপহার দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শুধু ইহাতে তাহাদের মন উঠিল না। তাহারাও একটা জুনিয়ার বেড ক্রসের দল গড়িবার জন্য গোল-মাল বাধাইয়া দিল। তাহাদের অপেক্ষা দৃঃখীও ত আছে; এই অতি-অভাগাদের সেবা তাহারা করিবে। আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ঊড়বোপে ২৩টি দেশে বালকবালিকাবা একটি রেড ক্রস সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাদের পত্রিকা, "আমি সেবক", এই মন্ত্র লিখিত আছে। এইরূপে গত দুই বৎসরের মধ্যে এমন একটি জগৎ-জোড়া শিশু-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা স্বযোগ পাইলেই সেবা করিতে অগসর হইয়া আসে।

আমেরিকা ও ইউরোপের জুনিয়ারেরা পরস্পরের সহিত চিঠিপত্র, পুস্তক ও উপহার আদান-প্রদানের ফলে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতেছে এবং উভয় দলের মধ্যে একটি স্থায়ী বন্ধুত্বের বন্ধন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। এই শিশুবা যখন পূর্ণবয়স্ক নরনারী হইয়া উঠিবে, তখন তাহারা জানিবে যে অল্প দেশে নবনাথীরাও তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতা গৃহ ও প্রাণকে তাহাদের মত ভালবাসে। বাল্যকালে বিদেশী বালক-দেব সঙ্গে পত্র ও উপহার বিনিময়ে কথামনে করিয়া তখনকার দিন হইতে অভিজ্ঞ মনের মিলেব উপব নিভর করিয়া সমুদয় যুদ্ধবিগ্রহ ও দুঃখদুর্গতির মূল ভয় ঘৃণা হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তাহারা মনের দুয়াদের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে দিবে না। নিজ নিজ দেশেও জাতির গৌরবে গৌরবাগ্নিত হইয়া ইহারা শান্তিতে বাস করিবে কিন্তু অপর দেশ ও জাতির মধ্যেও যে সাক্ষা কবিবার এবং ভালবাসিবার জিনিষ আছে তাহা মনে রাখিবে। এই কথাই আলাবামা একটি জুনিয়ার এইভাবে বলিয়াছে, "জুনিয়ার বেড-ক্রস আমাদেরকে সজাতি ও ভিন্ন-জাতির বালকবালিকাদিগকে ভালবাসিতে ও তাহাদের মন বুঝিতে সাহায্য করে। তাই মনে হয় আমরা যখন বড় হইব তখন এখনকার মত জাতিতে জাতিতে এত বিরোধ আর থাকিবে না।" প্রায় এই কথাই হৃদুব ভঙ্গীর একটি জুনিয়ার এ দেশের শিশুদের নিকট পত্রে বলিয়াছে— "জাতিতে জাতিতে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া যে নবীনেরই কাজ তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই জুনিয়ার রেড-ক্রস সম্প্রদায় গড়া হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি যে অস্থায়ী দেশেও এই কারণে সকল দেশে মধ্যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় জুনিয়ার রেড-ক্রস সম্প্রদায় গড়া হইয়াছে। জাতিগত বিষয় মনুষ্যের মনে আছে ততক্ষণ কোনো কনফারেন্সের আন্তর্জাতিক মিলন ঘটাইবার সাধ্য নাই। অতএব এস আমরা পরস্পরের লাভ স্বীকার করি; সব বাধা অতিক্রম করিয়া জুনিয়ার রেড-ক্রসে ভিতর দিয়া আমাদের মিলন হউক। হউক না নানা বিভিন্ন ভাষা, তবু একই গান দেশে দেশে সকলে গাহিতে কি আনন্দই না আমরা অনুভব করিব।"

এই শিশুজগতের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ হউক। তাহাদের নির্মল মন যে শান্তিময় জগতের সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, তাহারাই তাহা সৃষ্টি করিয়া মানব নাম সার্থক করুক।

ভারতীয় পুরাতন পুস্তকালয়

ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় সংখ্যায় অতি অল্প। এইরূপ একটি পুস্তকালয়ের বিষয় শ্রীযুক্ত সদাশিব রাও অক্টোবর মাসের ওয়েল্ফেয়ার পত্রে লিখিয়াছেন। পুস্তকালয়টির নাম তাঞ্জোর মহারাজা সারফোজী সরস্বতী লাইব্রেরী। শ্রীযুক্ত রাও মহাশয় বলেন,

পুস্তকালয়টি ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলা যায় না; তবে এষ্ট বিষয়ে অল্প স্বল্প যেটুকু গৌড় পাওয়া যায় তাহাতে মোটামুটি বলা চলে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঞ্জোবেব নায়ক রাজাদের আমলে লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠিত।

প্রাসাদের উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত একটি বড় হল যবে লাইব্রেরীটি আছে। ঘরের সামনে একটি প্রশস্ত চারকোণা উঠান, অপরদিকে মহারাজা সারফোজীব মূর্তি সম্বলিত নায়ক-দেবদেব-হল।

এই লাইব্রেরীটিতে তালপাতা ও কাগজে লেখা ২৫,০০০ হাজার পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি দেবনাগরী, নন্দী নাগরী, তামিল, ত্রেণ্ডু, কন্নড়, গ্রন্থ, মলয়ালম, বাংলা এবং উড়িয়া ভাষায় প্রায় সকল বকন জাতব্য বিষয়ে লিখিত। পুস্তকগুলির অবিকারণ সংস্কৃত ভাষায়। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার মুদ্রিত পুস্তকও আছে। এগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য দেশে মুদ্রিত ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, লাতিন, ইটালীয়ান ও গ্রীক ভাষার পুস্তক। ইহা ছাড়া কতকগুলি মূল ও মুদ্রিত ছবির সংগ্রহও আছে। ছবিগুলির প্রায় সব কয়টিই ভাবতীয় বিষয়ে অঙ্কিত।

দেশী ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিবার সময় অনেকে বৈজ্ঞানিক নানা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না পাওয়াতে বিড়ম্বনা বোধ করেন। ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত জি, এম, মাধব বলিতেছেন,

“বাংলা, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাগুলির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ শোনা যায়, যে, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষার স্থায় এই-সব দেশীয় ভাষায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক শব্দ

নাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে বৈজ্ঞানিক শব্দের জাতি নাই। আন্তর্জাতিক মুদ্রার মত ইহা সকল ভাষাতেই সম, এক ভাষা হইতে আর এক ভাষা ইহাদের জাতি না বদলাইয়া অনায়াসে গ্রহণ করেন। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, জুলজি, বটানি, কেমিষ্ট্রী, জিওলজি প্রভৃতি শব্দ জাতি নির্বিশেষে সকল ভাষারই সম্প্রাপ্ত। ইংরেজী ভাষা স্বয়ংই ত গ্রীক ও লাতিন বৈজ্ঞানিক শব্দ ধার করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি গ্রীক ও লাতিন শব্দ বাদ দিলে ইংরেজী ভাষাকে ভাষা বলাই শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপীয় ভাষাগুলি যদি পরস্পরের নিকট বৈজ্ঞানিক শব্দ ধার করিতে পারে, তবে ভারতীয় ভাষাই বা তাহা কবিলে ক্ষতি কি?”

সর্ববঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা

২৪শে কার্তিকের দৈনিক পত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে

সবিনয় নিবেদন, অঙ্ক ১০ই নবেম্বর ২৪শে কার্তিক শনিবার বৈকালে ৪ খটিকাব সময় ৬২ নং বতবাজার স্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশন-ভবনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্ত বায়ত কৃষক শ্রমকর্মী আদি পল্লীপ্রজা ও তৎসংক্রান্ত নীচের এক সভা হইবে। বিভিন্ন ছেলা-সম্মিলনীর সভ্যগণের, পল্লীপ্রজা ও সকল পল্লীবাসীগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। সাব পি সি বায় মহাশয় সভাপতির আমন গ্রহণ কবিবেন।

কৃষক ও রায়ত সভা
১৩নং মির্জাপুর স্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীমত্যানন্দ বসু
সৈয়দ এরফান আলি
শ্রীকেশবচন্দ্র বোস
সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়

- ১। পল্লীর অভাব অভিযোগ ও পল্লীসংস্কার-গঠন-পদ্ধতি বিবৃত ও আলোচনা।
- ২। কাউন্সিল, ইন্ডিয়ান বোর্ড, আদি পায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহে ভোটদান-বিষয়ে প্রজাব অজ্ঞতা ও অস্বাধীনতা।
- ৩। প্রজাপত্নী আইন সংশোধনে প্রজাব স্বজ্ঞান।
- ৪। বস্তা, হাজা, শুকা ও স্বল্পমূল্যে পাটাদি চানের ক্ষতি।
- ৫। ম্যালেরিয়া নিবারণ। ৬। বিবিধ।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের উন্নতি-সাধনের সর্বপ্রথম পথ পল্লীসংস্কার ও পল্লীগঠনের ভিতর দিয়া হওয়া উচিত। পল্লীবাসী কৃষকদের দারিদ্র্য অজ্ঞতা ও দুঃখদুর্দশা মোচন করিতে পারিলে দেশের অর্ধেক দুর্গতির মূল বিনষ্ট হয়। কিন্তু সহরে বসিয়া সভাসমিতির প্রস্তাবের ভিতর দিয়া পল্লীসংস্কার করা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে নামিয়া করা তত সহজ নয়। যাহারা পল্লী-সংস্কার করিতে চান তাহাদিগকে পল্লীতে বাস করিয়া পল্লীভুক্ত হইয়া পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের সহিত আপনাদের সুখ-দুঃখ

মিলাইয়া এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা পল্লী-বাসীর অবিশ্বাসের বাধা দূর করিয়া তাহাদের প্রকৃত আত্মীয় হওয়া সম্ভব হইবে না।

এই বন্যা-ভুক্তি-ও লুপ্ত-পীড়িত দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়-কৃষিকার্যের উন্নতি করিতে পারিলে, সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিলে, কৃষিজীবীকে নিজ অধিকারে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করিতে পারিলে, জল সরবরাহের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের উন্নতি করিতে পারিলে, গো-মহিষাদির যত্ন করিতে পারিলে, পল্লীবাসীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধার উপযোগী প্রকৃত খাদ্য যোগাইতে পারিলে, এবং সর্বোপরি তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরশীল করিতে পারিলে পল্লীশ্রী যে শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পল্লীর প্রাণ যাহারা সেই বালক ও যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে পল্লীপীতি জাগা দরকার; নাগরিক জীবনের প্রতি প্রাণের টান অনুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে অজ্ঞ ও অসমর্থ পুরাতনপন্থী কৃষক ছাড়া সকলেই পল্লী ত্যাগ করিয়া আসিবে। সুতরাং পল্লীসংস্কার খবরের কাগজের পৃষ্ঠার বাহিরে আর অগ্রসর হইবে না।

কন্যা গুরুকুল

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ চই নভেম্বর দরিয়াগঞ্জে বালিকাদের গুরুকুলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। বালিকাদের শিক্ষার অভাব মোচন করিবার সকল প্রকার অনুষ্ঠানকেই আমরা সাদরে বরণ করি। আমরা আশা করি কন্যাগুরুকুল ভুক্তিপীড়িতের একমুষ্টি চাউলের মত কেবল মাত্র শিক্ষার ক্ষুধা নিবারণ করিয়াই তৃপ্ত হইবেন না; বালিকাদের অন্তঃকরণের সকল সুপ্ত সৌন্দর্য জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের প্রকৃত নারীমহিমায় মগ্নিত করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহায় হইবেন।

জাতীয় শিশু সপ্তাহ

আগামী জানুয়ারি মাসে বড়সাঁট-পত্নী লেডি রেডিং ভারতবর্ষের নানা সহরে জাতীয় শিশু সপ্তাহ পালন

করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই উপলক্ষে শিশু-প্রদর্শনী মাতৃমঙ্গল-বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি হইবে।

এদেশে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ রকম বেশী। বাংলা-দেশে ১৯২১ সালে হাজারকরা ২১১.৪ শিশু বালক ও হাজারকরা ২০০.৫ শিশু বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটিরও বেশী মৃত্যু হইয়াছে। অথচ ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ দ্বীপ-সমূহে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে হাজারকরা মাত্র ৫৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। বাংলার মৃত্যুহারই যে শুধু ভয়াবহ তাহা নহে। যাহারা জীবন-সংগ্রামে কিছুদিনের জন্ত টিকিয়া থাকে, তাহারাও ক্ষীণজীবী, জড়বুদ্ধি, ভালমানুষ হইয়া কোনো প্রকারে জীবনের কয়েকটা দিন কাটাইয়া যায়। শিশুর দেহমনের পালন ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং ঘরে ঘরে শিশু মড়কের অবসান করিতে হইলে, মাতার দেহ ও মন শিশু-পালনের উপযোগী হওয়া সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। এই সর্বপ্রধান উপকরণের অভাবই যে-দেশে ঘরে ঘরে বিবাজ করিতেছে সে-দেশে শিশুর কল্যাণ কামনা করা চলে, কিন্তু আশা করা শক্ত। তবু নিয়মিত আহার, যথেষ্ট পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ, পরিচ্ছন্নতা, মুক্তবায়ু, পর্যাপ্ত পরিচ্ছদ, খেলা ধলা ও আনন্দের আয়োজন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই ক্ষীণপ্রাণ অপুষ্টদেহ শিশুদেরও জীবনের পথে কিছু দূর আগাইয়া দেওয়া যায়।

কথা ও কাজ

এখন দেশময় স্বদেশহিতৈষণার কথা খুব শুনা যাইতেছে; কারণ, অনেক লোক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইতে চান বলিয়া আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন। বাংলা দেশের ও ভারতের চেহারা দেখিলে এবং বিদেশে আমাদের মান-মর্যাদার কথা স্মরণ করিলে কে বিশ্বাস করিবে, যে, দেশে এত হিতৈষী ও সেবক ছিল?

যাহারা নির্বাচিত হইবেন, তাহাদের বর্তমান কথায় ও ভবিষ্যৎ কাজে যেন মিল থাকে। যাহারা নির্বাচিত

হইবেন না, তাঁহারা নির্বাচিত হইবেন না বলিয়াই দেশের উপর রাগ করিয়া যেন দেশহিতৈষণার কথাগুলো কাজে পরিণত করিতে বিরত না হন। ব্যবস্থাপক সভায় না গেলেও যে দেশহিত করা যায়, বরঞ্চ ইচ্ছা থাকিলে বেশী হিত করা যায়, তাহা বুঝা ও বুঝান খুব সহজ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষেপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ভারতবর্ষের অন্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী; কিন্তু ইহার কার্যক্ষেত্রও বৃহত্তম। কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে ভাল কর্মী চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মী ইহার অধ্যাপকেরা। অধ্যাপকদিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে তাঁহারা অধিকতর বেতন যেখানে পাইবেন সেইখানে চলিয়া যান। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈর্ষ্যা, বা অভিযোগ, বা আক্ষেপ, বা ক্রোধ, বা আক্রোশের একটি কারণ হইয়াছে। ভাল কোন অধ্যাপক অন্ত্র চলিয়া গেলে মনের এই ভাব নানা আকারে প্রকাশ পায়। অভিপ্রায় এই, যে, ভাল অধ্যাপকেরা স্বার্থত্যাগ করিয়া কলিকাতাতেই থাকুন। তাঁহারা তাহা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সুখের বিষয়ই হয়। কিন্তু মানুষ আর্থিক ক্ষতিস্বীকার যে-সব কারণে করে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান কি না, তাহা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিলে ভাল হয়। শিক্ষার, জ্ঞানের, চরিত্রের, ধর্মনীতির, আন্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ কোথাও থাকিলে মানুষ এইরূপ কোন-না-কোন আদর্শের জন্ত স্বার্থত্যাগ করে। গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের অধিকতর বা অধিকতম সুযোগের ক্ষণও লোকে স্বার্থত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্যাপীঠগুলির মধ্যে আদর্শ কিম্বা গবেষণাদির সুযোগ যদি সমান থাকে, তাহা হইলে বেতন যেখানে বেশী, মানুষ স্বভাবতঃ সেখানেই যায়। আবার, যদি কোন এক বিদ্যাপীঠে উচ্চ আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে উচ্চ বেতনের আকর্ষণে অন্ত্র যাওয়াও স্বাভাবিক। যদি এমন হইত, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকেও বেশী বেতন দিতে পারেন না, কিম্বা যদি ইহার বেতনের হারের পার্থক্য যোগ্যতার পার্থক্য অনুসারী হইত, তাহা হইলেও লোকে স্বার্থত্যাগ করিত।

কিন্তু মনজোগান, তোষামদ, প্রভৃতি যেখানে অন্ততম যোগ্যতা বলিয়া কার্যতঃ দেখা যায়, এবং যেখানে কেহ কেহ গৃঢ় কারণে বেশী বেতনও পায়, সেখানে স্বার্থত্যাগের কথা উঠিতে পারে না।

আমাদের বিবেচনায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়াও যদি যোগ্যতম লোকদিগকে রাখা যাইত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইত; কার্যক্ষেত্র সংকীর্ণতর না করিয়াও অধ্যাপক-সংখ্যা সহজেই কমান যায়, এবং বাকি অধ্যাপকদিগকে অন্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমান বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাপকসংখ্যা বাড়াইয়া আশ্রিত-পোষণ অন্ত্রগত-সমর্থকের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল, যে, অনেকের প্রত্যাশিত বা প্রতিশ্রুত বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, কিন্তু নূতন অধ্যাপক নিয়োগ চলিতেছে—আর্থিক টানাটানি সত্ত্বেও চলিতেছে।

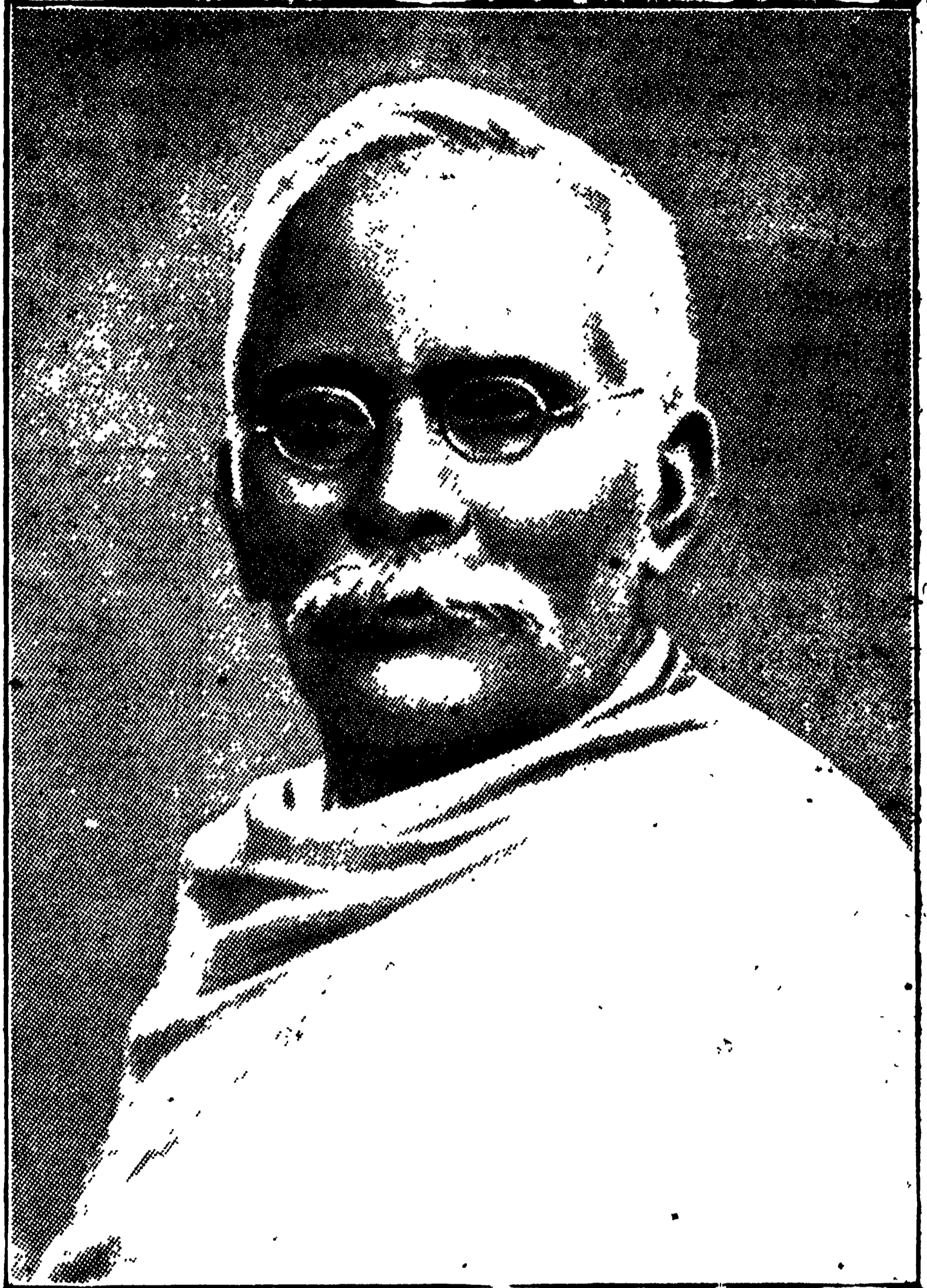
মজার কথা এই, যে, ছাত্র কমিলেও অধ্যাপক বাড়ে ও ব্যয় বাড়ে। ১৯১৯-২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্র ছিল ৮৮ + ৭৫ = ১৬৩ (একশত তেষট্টি) জন। ১৯২০-২১ সালে উহা কমিয়া হয় ৮২ + ৪৬ = ১২৮ (একশত আটশ) জন। ১৯১৯-২০ সালে সাঁইত্রিশ জন অধ্যাপক ছিল, পর বৎসর উহা বাড়িয়া আটত্রিশ হয়। ১৯১৯-২০ সালে অধ্যাপকদের মাসিক বেতন ছিল ৮৮২৫ টাকা; ১৯২০-২১এ উহা বাড়িয়া ৯১৭৫ টাকা হয়। অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে ১২৮ জন ছাত্রকে ইতিহাস পড়াইবার জন্ত একলক্ষ দশ হাজার একশত টাকা খরচ হয়!

আমরা ঐতিহাসিক না হইলেও এইটুকু বুঝি, যে, শুধু এক বাংলা দেশেরই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ও জ্ঞান দান করিবার জন্ত একশত অধ্যাপক নিয়োগ করা অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, যে, কতগুলি যোগ্য লোককে উপযুক্ত বেতন দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কার্যক্ষেত্রে বরাবর রাখিতে পারেন? যখন দেখা যাইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়, যাঁহারা অন্ত্র চলিয়া গেলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিতে পারেন না, তখন

তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিবার জন্ত অল্প দিকে ব্যয়সংক্ষেপ কেন করেন না? তাঁহারা যোগ্য লোক নহেন বলিবার জো নাই; কারণ, তাঁহারা অযোগ্য হইলে তাঁহাদের অগ্রত গমনে অসন্তোষ আক্রোশ আদি প্রকাশ হইত না। যদি একরূপ বলা হয়, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও অনাবশ্যক অধ্যাপক নাই, তাহা হইলে সর্বসাধারণকে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া জানান হউক, কে কত কাজ করেন, কি কাজ করেন, কত কাজ করিয়াছেন, কি কাজ করিয়াছেন। দুই চারি জনের সার্টিফিকেট খবরের কাগজে ছাপিলে ও ছাপাইলে তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না, যে, অল্প বহুসংখ্যক অধ্যাপকদের প্রত্যেকেই ভারী লায়েক এবং প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য নিৰ্বাহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

উনসত্তর বৎসর বয়সে ভবানীপুরে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে ওকালতী ব্যবশায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে তাঁহার বেশ পসারও জমিয়াছিল। কিন্তু নানা প্রকারে দেশের সেবা করিবার জন্ত তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দেন। বালক ও যুবকদের প্রকৃত শিক্ষার জন্ত তিনি ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে এই শিক্ষালয়ের ফল খুব ভাল হইত; কিন্তু ইহাই ইহার বিশেষত্ব ছিল না। ছাত্রদের চরিত্রের গঠন ও বিকাশের



অশ্বিনীকুমার দত্ত

(আনন্দবাজার-পত্রিকার সৌজন্যে)

নানাবিধ চেষ্টা এখানে হইত। অশ্বিনী-বাবুর আমলে ষাহারা ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া তাঁহার সহকারী ছিলেন, তাঁহারা এই শিক্ষালয়ের এই দিকটির বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিলে দেশের কল্যাণ হইবে। অশ্বিনীকুমার আগেকার যুগের কংগ্রেসের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের প্রতিনিধিদের মিছিল পুলিশ "বৈধ লাঠি" (Regulation Lathis) চালাইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা-

কমিটির সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাদের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করিত। কংগ্রেসের এক অধিবেশনে—কোথায় তাহা মনে পড়িতেছে না— তিনি অনেক “স্বদেশভক্ত”কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের সহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাদের মনে আছে। তিনি স্বয়ং নন্দলাল-জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। এইজন্য তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া দেশসেবা জনসেবা করিতেন না। সেই কারণেই তিনি নির্বাসিত হন—বিধাতার কোন বিধি কিম্বা ব্রিটিশ প্রভুদের কোন আইন লঙ্ঘন করায় তাঁহার নির্বাসন হয় নাই; নির্বাসন হইয়াছিল এইজন্য, যে, বরিশালে তাঁহার প্রভাব উচ্চতম রাজ-কর্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, এবং এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাগী সাহসী ও প্রেমিক জনসেবকের আবির্ভাব হইতেছিল। এই প্রভাবের একমাত্র কারণ তাঁহার অকপট মানবপ্রেম এবং অক্লান্ত জনসেবা। দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে তিনি শিশুস্বল্পার সহিত আর্ন্তের সেবা এবং সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এইসব কারণে তিনি যে কেবল রাজপুরুষদের ঈর্ষ্যা ভয় ও ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহাতে তাঁহার শরীরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই এই মহাপ্রাণ সাধু-পুরুষের সেবা হইতে দেশ অনেক বৎসর বঞ্চিত থাকিয়া, আজ তাঁহার পরামর্শ এবং তাঁহার সংসর্গের অনুপ্রাণনা হইতেও বঞ্চিত হইল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অনুপ্রাণনা রহিয়া গেল। উহা আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি। সম্প্রদায়-নির্কর্ষণে তাঁহার আধ্যাত্মিক বংশধরেরা ইহার দ্বারা চিরকাল অনুপ্রাণিত হইতে থাকিবে। তিনি যেমন বাগ্মী ছিলেন, তেমনি ভক্ত ও ভাবুক ও চিন্তাশীল সুলেখকও ছিলেন। “ভক্তিযোগ” তাঁহার লেখনী-প্রসূত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

স্বীজাতির উচ্চশিক্ষা যাঁহারা চান, তাঁহারা স্বর্গীয় ব্রজকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। তাঁহারই কন্যা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। (এ বৎসর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসুও বি-এ উপাধি লাভ করেন।) ইহাতে তাঁহার পিতার ও তাঁহার বিদ্যাহারাগ স্মৃতি হইয়াছিল, এবং তাঁহার মানসিক বলেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এখন বাংলাদেশের হিন্দুসমাজেরও কোন কোন বালিকা কলেজে পড়েন, এবং বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা লাভ অপরাধে শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুকে অনেক লোকনিন্দা



ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

সহ করিতে হইয়াছিল। বি-এ উপাধি লাভ করিবার পর পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি কর্তৃপক্ষের অনেকের বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। নারীর পক্ষে এইরূপ নূতন কাজের শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতেও তাঁহাকে ছুঁড় লোকদের নিন্দা সহ করিতে হয়। কিন্তু

তিনি মানসিক বলের দ্বারা তাহা অগ্রাহ করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং ইংলণ্ড গিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে আরও যোগ্যতা লাভ করেন। নারীদের উচ্চ-শিক্ষালাভে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় প্রকৃত হইবার পথে অগ্রণী বলিয়া তিনি স্ত্রীজাতির ও নারী-হিতৈষীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে কংগ্রেসে ও সমাজ-সংস্কার-সমিতিতে বক্তৃতা করেন। কলিকাতায় যে ট্রান্সভাল্ ভারতীয় সভা স্থাপিত হয়, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী তাহার নেত্রী হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। খনিতে মজুরাণীদের কাজ বন্ধ হইবার প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ও শ্রীমতী কামিনী রায় বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের কোন কোন খনি দেখিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করেন। তিনি সকল দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয়-অধিকার-লাভ-প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন।



পিয়াম্‌ন্-চিকিৎসালয়

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অধ্যাপক উইলিয়ম্ উইন্সটান্‌লী পিয়াম্‌ন্ মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ শান্তিনিকেতন পল্লীতে একটি চিকিৎসালয় নির্মাণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। উহার আনুমানিক ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা হইবে। পিয়াম্‌ন্ মহাশয়ের স্বভাব এরূপ ছিল, যে, তিনি শিশু বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই সহিত প্রীতির সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারিতেন। যে-কেহ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, বয়সনির্কিশেষে তিনিই তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছেন। সুতরাং মনের মধ্যে স্বভাবতই এই আশার উজ্জেক হয়, যে, ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে, তাঁহাকে যাহারা ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে একটি বাহ্য প্রতিষ্ঠানের মূর্তি দিতে সচেষ্ট হইবেন। পিয়াম্‌ন্ মহাশয়ের চরিত্রের একটি প্রধান ভূষণ এই ছিল, যে,

উইলিয়ম্ উইন্সটান্‌লী পিয়াম্‌ন্

তিনি আত্মবিশ্বস্ত হইয়া, যশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অপরের সেবা করিতেন। সংকল্পিত প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা এইরূপ সেবার ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে।

পিয়াম্‌ন্-চিকিৎসালয়ের জন্ম সাহায্য বিশ্বভারতীয় অর্থসচিব মহাশয়কে শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানাঘ পাঠাইতে হইবে।

জাতীয় আদর্শ

প্রত্যেক সভ্য জাতির জীবনের মধ্য দিয়া তার জাতীয় আদর্শ, তার জাতীয়তা প্রকাশ পায়। সেই আদর্শ, সেই জাতীয়তা শুধু মুখের কথায় অথবা শাস্ত্রের বচনে প্রকাশ হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত জাতীয়তা অথবা

জীবন্ত আদর্শ যাহা তাহা সর্বদাই জাতির কার্যের ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে যেরূপ মুখের ও শাস্ত্রের বচনে নারীগণ দেবী, শরীর মন্দির, বলহীনের আত্মা নাই, জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা শ্রেয়, ছাত্রগণ ব্রহ্মচারী এবং হিন্দুজাতি শ্রেষ্ঠজাতি; কিন্তু কার্যে আমরা নারীকে পুড়িয়া মরিতে বা অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করি, তাহাকে বহুক্লেমে অশেষ অপমান ও অসহ যন্ত্রণা ভোগ করাই, শরীরকে কদর্য্য ও নির্বীৰ্য্য করিয়া রাখি, শরীরে ও মনে সর্বতোভাবে বলহীন হইয়া শুধু আত্মার বড়াই করি, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচার্যের সকল পবিত্রতা উপেক্ষা করি এবং হিন্দুজাতিকে অবনতির শেষ সীমায় আনিয়া ফেলিয়া রাখি; তাহাতে বোধ হয় আমাদের জাতীয় আদর্শ মৃত ও আমাদের জাতীয়তা নাই। আমরা ব্যক্তিগত দোষগুণ লইয়াই এখন অত্যন্ত বেশীমাত্রায় ব্যস্ত; জাতীয়তা ও আদর্শবাদ আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই একটা মনভুলান মিথ্যা মাত্র। একথা অবশ্য সত্য যে আমাদের প্রকৃত জাতীয়তা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে তুলনায় আমাদের জাতীয় জীবনে মৃত আদর্শের বিজ্ঞাপন ও প্রচার একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া থাকে।

অপর কোন দেশে কিছু ভাল দেখিলেই “আমাদের মহাভারতে উহা ছিল” অথবা “আমাদের শাস্ত্রেরও ঐ একই মত” বলিয়া চীৎকার করা আমাদের একটা জাতীয় অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে, ঠাকুরদাদার ধন-সম্পত্তি ছিল বলিয়া ভিখারী যেমন ধনী নহে, সেইরূপ অতীতের কোলে আমাদের বর্তমান জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন যে-সকল গৌরবজনক মহামত জ্ঞান ও কার্যকলাপ রহিয়াছে তাহাতে আমাদের অগৌরব ও অকর্মণ্যতা অপ্রমাণ হইয়া যায় না।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ সূপ্রজনন-বিজ্ঞান (Eugenics) বুঝিতেন কি না জানি না। কিন্তু কথা উঠিলে অনেক শাস্ত্রবিদ এখনই আসিয়া বলিবেন “বর্তমান আমাদের কি শিখাইবে? বর্তমান ত নবীন, তাহার জ্ঞান হইবে কি করিয়া?” নবীন কেন যে উৎকৃষ্টতর ও নূতন জ্ঞানে ও স্বকার্যে জগৎকে সৌন্দর্য্যশালী করিতে পারিবে না

তাহার প্রমাণ স্বরূপ শুধু বৃদ্ধের মনে নবীনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নাই। বৃদ্ধ রেলগাড়ী চড়িয়া তিন দিবসে অল্পব্যয়ে বৃন্দাবন যাইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু এই রেলপথের সাহায্য লওয়া হইল নবীনের সেবা গ্রহণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীন কিছু বলিলে তাঁহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিবে সুতরাং “নবীন, তুমি কর্মক্ষম বটে, কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছু অভাব আছে”। নবীনকে বলিতেছি না যে বৃদ্ধের কাছে শিখিবার কিছু নাই। সর্বত্রই শিখিবার আছে এবং কোন ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের নিকট কিছু শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ বার্ককোর লক্ষণ।

বৃদ্ধ শাস্ত্রবিদ বলিবেন “আমাদের শাস্ত্রে সূপ্রজনন-বিজ্ঞান বিষয়ে যাহা নাই তাহা না শিখিলেও চলে”, কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সূপ্রজনন-জ্ঞানের অভাব ভগ্নশরীর বালিকা মাতা ও নিশ্চেষ্ট মৃতপ্রায় ও অনেকস্থলে জন্মান্তর জন্মক্ষণ বা অক্ষয়ী শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের মিথ্যাচরণের জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছে। মিথ্যাচরণ বলিতেছি কেন? যে বিশ্বাস, যে জ্ঞান জীবনের কার্যে দেখা যায় না তাহাই মিথ্যা বিশ্বাস, তাহাই মিথ্যা জ্ঞান। অর্থাৎ সেই বিশ্বাস বা জ্ঞান সত্য-সত্য কাহারও হৃদয়ে নাই। তাহা জ্ঞাতপারে অথবা অজ্ঞাতপারে একটা বিশ্বাস ও জ্ঞানের ভাগ বা মিথ্যা অভিনয় মাত্র। সেইরূপ যে কার্য ও সে জীবননির্বাহপ্রণালী মনের বিশ্বাস বা জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা মিথ্যাচরণ। আমাদের অনেক পণ্ডিতের (পণ্ডিত বলিতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝাইতেছে) আচরণ মূর্খাচরণ। মূর্খাচরণ বলিতেছি কেন? মূর্খ কে? যে জ্ঞান লাভ করে নাই সে মূর্খ এবং সে ছাড়া যাহারা জ্ঞান লাভে অনিচ্ছুক অথবা জ্ঞান লাভকে তাচ্ছিল্য করে তাহারাও মূর্খ। আমাদের শিক্ষিত-সমাজের মধ্যেও (প্রকৃত শিক্ষার অভাবে) প্রায় সর্বত্র বাল্যবিবাহ, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, নির্বোধের শ্রায় সন্তান পালন, শরীরের প্রতি অত্যাচার, এক কথায়, মনের জ্ঞান যাহা বলে কার্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয়। ইহা গেল মিথ্যাচরণ। কিন্তু ইহা ছাড়াও দেখা যায় যে

শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতেছেন “বাল্য বিবাহে দোষ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভুল (যদিও আমি সে বিষয় কিছু জানি না)। ৮ সার গুরুদাস বাল্যবিবাহের সন্তান। (সুতরাং বাল্য বিবাহের সন্তান মাত্রই গুরুদাসের সমতুল্য।)” বাল্য-বিবাহের একটি সফল ফলিয়াছিল হয়ত। ইহা সত্য হইলেও ইহার চেয়ে মর্ষণঘাতী সত্য এই যে বাল্যবিবাহের একটি নহে কোটি কোটি কুফল ফলিয়াছে এবং ফলিতেছে। ইহা গেল ‘শিক্ষিত’ সমাজের মূর্খাচরণের কথা।

এখানে আমাদের জাতীয় দোষগুলি দেখাইবার কারণ এই যে বর্তমান কালে আমরা অপরের দোষ দেখিতে একটু বেশী মাত্রায়ই ব্যগ্র। জাতীয় অবনতির যুগে আত্মদোষ বিস্মৃত হওয়া বিপদজনক। জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহার জীবন উন্নততর না হইলে, জাতির উন্নতি সম্ভব কি না। তাঁহার শরীর ও মন আরও সুন্দর ও সুগঠিত না হইলে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিকে দুইয়াই জাতি গঠিত, জাতি নামধেয় কোন মূর্ত্তিমান দানব নাই যে তার উপকার জাতীয় ব্যক্তির উপকার হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে হইতে পারে। আমাদের জাতীয় আদর্শকে নূতন করিয়া জীবনের কার্যে দেখাইতে হইবে। সেই আদর্শে শাস্ত্রের মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে তাহা ত থাকিবেই, উপরন্তু বাহির হইতে নূতনতব যাহা কিছু তাহাকেও আপনার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জাতীয় আদর্শ সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া কোন মহাপুরুষ জাতির সম্মুখে ধরবেন এবং জাতি তাহা দেখিয়া কাৰ্য্য করিবে ইহা সম্ভব নহে। জাতীয় আদর্শ প্রথমত কয়েকটি লোকের হৃদয়ে থাকে। তার পর ব্যক্তি হইতে গৃহে, গৃহ হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে বহুগ্রামে, এইরূপে সেই আদর্শ দেশব্যাপী বা বহুদেশব্যাপী হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্রমশঃ প্রচারের পথে তাহার মধ্যে পরি-বর্তনও হয়। একের বা কতিপয়ের অন্তরে যাহা জাগিয়া উঠে, তাহা দেশব্যাপী হইয়া গৃহীত হইতে হইলে তাহার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। কিন্তু জাতীয় জীবনে সেই আদর্শ প্রকৃত রূপে গৃহীত হইতে হইলে সকল ব্যক্তিকে তাহা কাৰ্য্যে মান্য করিতে হইবে। পরের নিকট আত্মজাহিরের অঙ্গ বা অক্ষম

শরীর ও মন লইয়া পিতৃপুরুষের সাহায্যে আত্মপ্রাণ-বোধের আনন্দলাভের উপায় স্বরূপ তাহা ব্যবহৃত হইলে কোন লাভ নাই। কোন কিছুকে তাচ্ছিল্য করিয়া সময়ের অপব্যবহার অপেক্ষা সেখানে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনাদর্শকে চিরনবীন ও চির-জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা ও কাৰ্য্যত শরীর ও মনকে সেই আদর্শের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টাই ব্যক্তির ও জাতির প্রধান কর্তব্য।

জাপানে ধ্বংস- ও হত্যা-লীলা

সম্প্রতি জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার তুল্য ভূমিকম্প পৃথিবীতে আর হয় নাই এসম্বন্ধে সকলেই একমত। খবরের কাগজে প্রথম যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা কিছু বাড়াইয়া বলা হইয়া থাকিলেও, আজকাল যে পূর্ব হইতে সঠিক খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও এই ধ্বংস-ব্যাপার কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। একেবারে নিতুল হিসাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, আর কখনও যে পাওয়া যাইবে তাহার কোন সম্ভাবনাও নাই। মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তোকিও সহরে ১১০০০০ জন, ইয়োকোহামায় ৩০০০০ জন, কামাকুরাতে ১০০০, মিউরা উপদ্বীপে ১০০০০ জন, ওদাওয়ারা ও আতামিতে ১০০০, বোসা উপদ্বীপে ৫০০০ জন—মোটের উপর ১৬৬০০০ জন লোক মারা গিয়াছে। তাহা ছাড়া ইয়োকোহামাতে ৭০০০০খানি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে ও মাত্র শতখানেক বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ইয়োকোসুকাতে ১২০০০ বাড়ীর মধ্যে মাত্র ১৫০খানা রক্ষা পাইয়াছে। তোকিওতে শতকরা ৯৩ খানি বাড়ী হয় পড়িয়া গিয়াছে, নয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তোকিও সহরে কোন কোন বহুতল হর্ম্মোর তিনতলার মেঝের ফাটল দেখা যাইতেছে, কিন্তু সর্কনিয় কিম্বা স্কোচ তলায় খুব কম ক্ষতি হইয়াছে দেখা যাইতেছে। তোকিও সহরে যে আশ্রয় লাগিয়া গিয়াছিল তাহাতে রাজকীয় গ্রন্থাগারের অনেকাংশই পুড়িয়া গিয়াছে ও প্রায় ৭০০০০০ খণ্ড বই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।



তোকিও সহরের ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের পরের একটি সাধারণ দৃশ্য

এই ভীষণ প্রাকৃতিক উৎপাতের সময় জাপানীরা বিদেশী লোকদের প্রতি মোটের উপর ভাল ব্যবহারই করিয়াছে। কিন্তু কোরিয়ার অধিবাসীদিগের উপর তাহাদের যে অত্যাচারের খবর পাওয়া যাইতেছে তাহা অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচায়ক।

জাপানের গভর্নেন্ট্ এই অত্যাচারের কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু খ্যাতনামা সাংবাদিক ব্রেন্সফোর্ড লিখিতেছেন যে এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অত্র বিদেশী লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছে যে তাহারা সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় স্বচক্ষে কোরিয়ার অধিবাসীদিগকে হত হইতে দেখিয়াছে। এইসব হত্যার দোষ সাধারণতঃ কতকগুলি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারী যুবকসম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপান হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়গুলিকে সেখানকার রাজসরকার সুনজরেই দেখিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক গায়ে ৭ সহরের প্রায়

প্রত্যেক পাড়াতেই তাহাদের আড্ডা আছে। নানারূপ সামাজিক প্রচেষ্টাতেই সাধারণতঃ ইহাদের কাজ আবদ্ধ থাকে ও তাহারা নিজেদের নৈতিক উন্নতির জন্তও উৎসাহ দেখায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যোদ্ধধর্ম্মও আদর্শরূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখা হয়। সেই আদর্শের প্রেরণাতেই যে তাহারা নরহত্যা করিতে দ্বিধা করে নাই তাহা বুঝা যাইতেছে। একথা স্বীকার্য যে সত্য-সত্যই জাপানীদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিল কোরিয়ার অধিবাসীরা এই ধ্বংস-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে; আর এই যুবকসমূহ সত্যসত্যই মনে করিয়াছিল যে তাহারা নিজ লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থেই কার্য্য করিতেছিল।

সস্তা দামে মজুর খাটাইবার জন্ত অনেক কোরিয়া-বাসীকে জাপানীরা নিজেদের দেশে আনে, আর



ভূমিকম্পের পর তোকিও সহরের দৃশ্য । অধিবাসীরা নিরাশ্রয় হইয়াছে তবুও শাস্ত ও পরিচ্ছন্ন



মিকম্পের পর তোকিও সহরের দৃশ্য । রাজপ্রাসাদের বাহিরে নিরাশ্রয় লোকদের ভঙ্গ প্রস্তুত কুটীরাবলী

অহাদের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব তাহারা বরাবরই পোষণ করে। কোরিয়ার জাতীয় দলের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাগুলি জাপানের খবরের কাগজে এমন আকারে বাহির হইত যাহাতে জাপানী জাতির মন কোরিয়ানদের উপর আরও বিরূপ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় যত আশঙ্কি জনজাতিকেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আতঙ্ক সৃষ্টির সহায়তা করে। মুখে মুখে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে কোরিয়ার জাতীয় দলের লোকেরাই এই-সব অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছিল। সহরের কূপের পানীয় জলও তাহারা বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। এরূপ অভিযোগও তাহাদের নামে হয়। তাহা ছাড়া অশ্রান্ত গুরুতর অত্যাচারের অপবাদও লোকে এই-সব কোরিয়ার অধিবাসীদের নামে প্রচার করিয়াছিল।

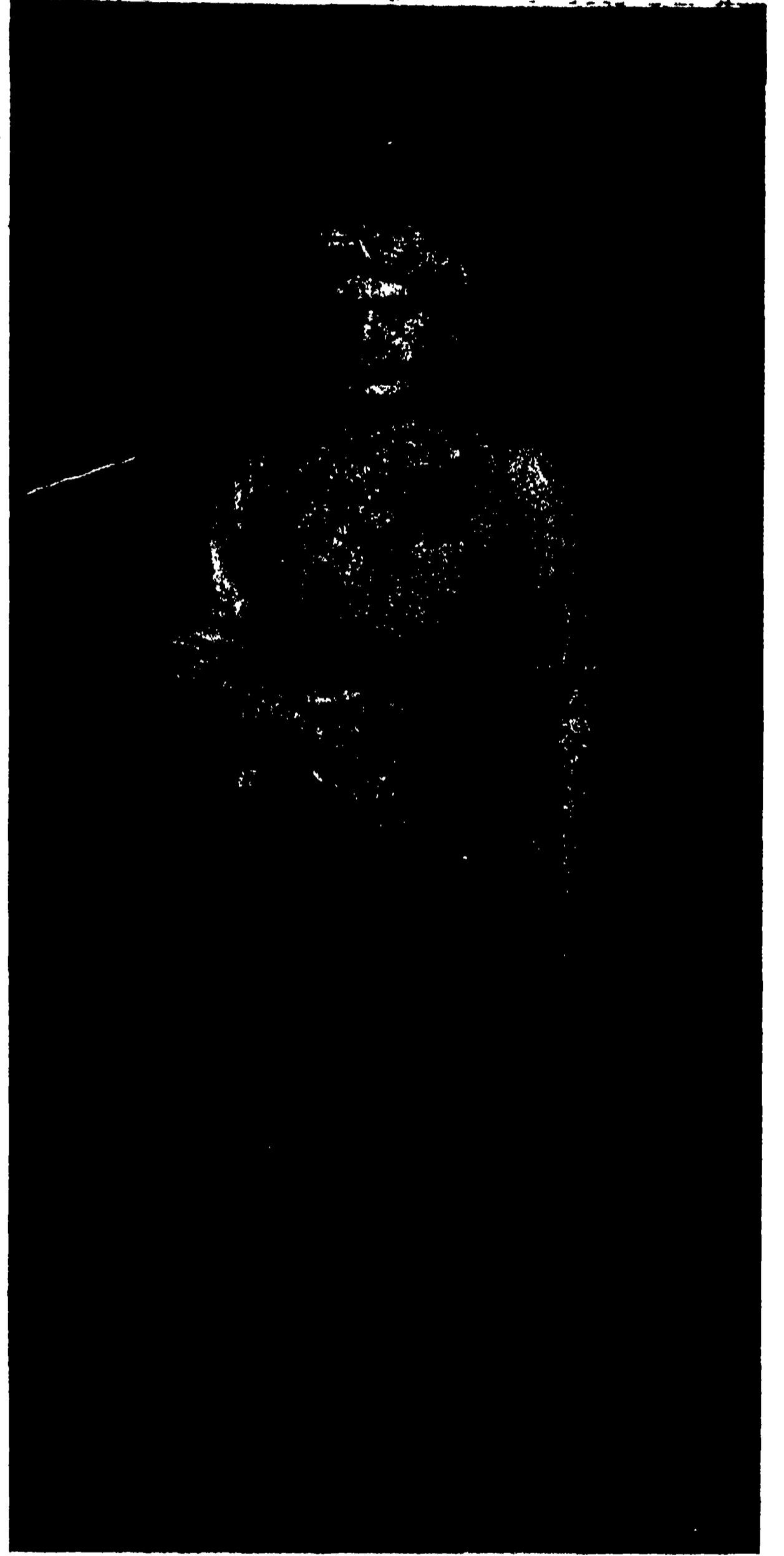
ইহা খুবই সম্ভব যে কোরিয়ার অধিবাসীদের অত্যাচারের কথাও অনেকটা সত্য। যখন তাহারা দেখিল যে জাপানের লোকেরা তাহাদের অন্ন-পানীয় বন্ধ করিয়াছে ও দেখা-মাত্রই তাহাদের প্রাণবধ করিতেছে তখন তাহারাও মরীয়া হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক বিদেশী পর্যটক মনে করেন যে কোরিয়া-বাসীদেরই বেশি দোষ। কিন্তু ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড সাহেব বলেন যে কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে তিনি কোন কোরীয়কে আক্রমণকারীরূপে দেখিয়াছেন। অথচ তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে এদৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন।

প্রথম কয়েকদিন জাপান সরকার এইসব অদ্ভুত জনরব নিরাকরণ করিতে তেমন কিছুই করেন নাই। চার পাঁচদিন পরে এক বিলম্বিত ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে এইসব জনরব বিশ্বাস করিতে নিষেধ করা হয় ও কোরীয়দের প্রতি ও অন্যান্য বিদেশীয়দের প্রতি তিতিকা প্রদর্শন করিতে বলা হয়। ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড বলিতে-ছেন যে সহরের কোরীয় বাসিন্দাদের খুব অল্পসংখ্যক লোকই প্রাণে বাঁচিয়াছে। যাহাদের বাহির হইতে নিঃসন্দেহে কোরীয় বলিয়া চেনা যায় না, তাহাদিগকে ভাষা পরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে তাহারা

কোরীয় নয়। চীনাদের অনেককেও এইরূপ ভাষা পরীক্ষা করিয়া কোরীয় বলিয়া সন্দেহে হত্যা করা হইয়াছে।

মহাত্মের গঠিত প্রতিমূর্তি

প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুক্ত মহাত্মে লিম্ব'ডিরাজ্যের পরলোক-



মহাত্মের গঠিত লিম্ব'ডি রাজ্যের পরলোকগত ঠাকুর সাহেবের প্রতিমূর্তি গত রাজা ঠাকুর সাহেবের এক প্রতিমূর্তি গঠন করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রতিক্রম প্রকাশ করিলাম।

আচার্য্য ভিন্তার্নিৎস্

(DR. M. WINTERNITZ)

প্রাগ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক ডাক্তার ভিন্তার্নিৎস্ এতদিন বিশ্বভারতীতে ছিলেন। তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাতে সকলে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে সম্প্রতি তাঁহার বিদায় গ্রহণে তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রমণ্ডলীর সকলের বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা বিশেষ-রূপে বোধ হইয়াছে।

বিদায়-কালে কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে বিদায়-



আচার্য্য ভিন্তার্নিৎস্কে বিদায়। মধ্যস্থলে আচার্য্য ভিন্তার্নিৎস্, তাঁহার দক্ষিণে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার বামদিকে শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী।



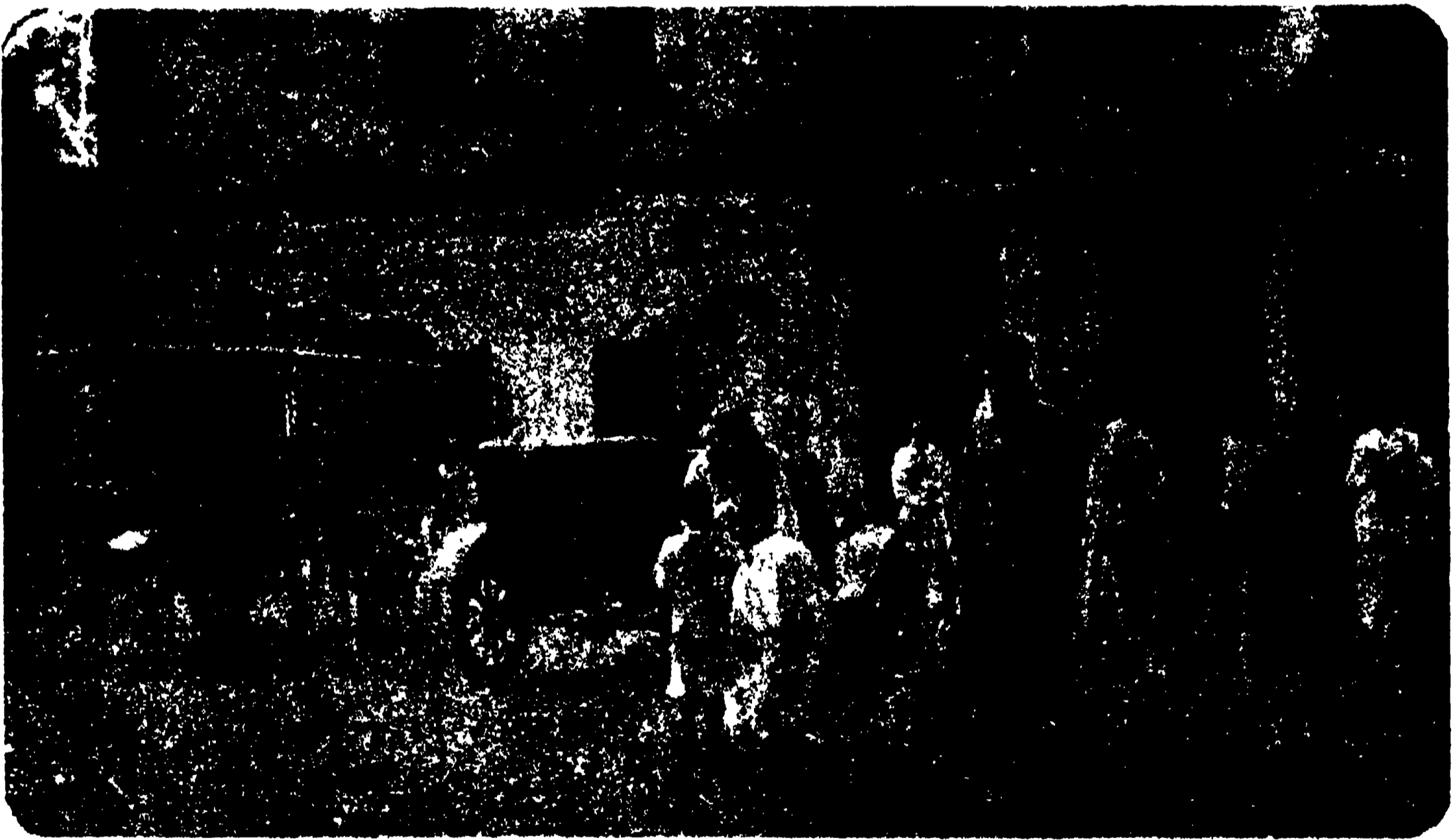
বোলপুর ষ্টেশনে টেনের সম্মুখে ভিন্তার্নিৎস্ রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের অব্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদায় দিতে আনিয়াছেন

লিপি দিয়াছেন তাহার একস্থানে আছে, “আপনার চরিত্রেব প্রতি আমাদের ভালবাসা, আপনার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সমান হইয়া উঠিয়াছে।” আচার্য্য ভিন্তার্নিৎস্ উত্তরে বলেন, “প্রসিদ্ধ কবি গেটে বলিয়াছেন :—“প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে আর বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারা যাইবে না।” আমি বলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিল না।

“১৯২১ খৃঃ অব্দে আপনি যখন আমাদের দেশে বক্তৃতা দিতে যান তখন আমি আমার বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম, ‘আপনার বক্তৃতার সাফল্য দেখিয়া আমার মনে হয়,



ভিন্তার্নিৎস্কে বিদায় দিবসের জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রমের তরবীপিকায় সমবেত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলী



শান্তিনিকেতন হইতে আচার্য্য ভিন্তার্নিৎসের বিদায়।

ভিন্তার্নিৎস্কে ছাত্রগণ প্রণাম করিয়া বিদায় দিতেছেন। পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি দণ্ডায়মান

যে, কোন না কোন দিন সমস্ত পৃথিবী, কবি ও আদর্শ-বাদীর সহিত সার্ব দিয়া দাঁড়াইবে।'

“তখন আমি ভাবি নাই যে দুই বৎসর পরেও পৃথিবীর অবস্থা আমার আশা পূর্ণ হইবার পথে এতটা অস্তরায় হইয়া থাকিবে।

“কিন্তু আজকার ইয়োরোপের এই অশান্তি ও এই দুর্দশা দেখিয়া মনে হয় যে যাহারা পাশবিক শক্তিতে, হিংসায়, স্বার্থপর জাতীয়তায় ও জাতীয় স্বার্থপরতায় বিশ্বাস করে, তাহারা তুল করে এবং এই-সব জিনিস কখনও আনন্দের পথে মানুষকে লইয়া যাইবে না। স্বব দেখিয়া শুনিয়া

মনে হয় যে বাজারের লোকেরা ঠিক বুঝে নাই—ঠিক বুঝিয়াছে করি ও আদর্শবাদী।

“আমার মনে হয় যে আদর্শ যাহা তাহাই শুধু সত্য, তাহাই শুধু চিরস্থায়ী হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিলেই জগৎ উদ্ধার হইবে না। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা মিলিলে তবেই জগতের মঙ্গল। কয়েক বৎসর পূর্বে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় একজন লিখিয়াছিলেন ‘কোন কোন মহাত্মা পূর্ব ও পশ্চিমের মতামতবিনিময় স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাহাতেই যে নিশ্চয় উপকার হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অসভ্যতার সহিত অসভ্যতা মিলিলে ফলে অসভ্যতাই হয়’। কথাটি সত্য।

“আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। আমি জানি এদেশেও ইয়োরোপের মত অসভ্যতা পাশবিকতা আছে। ভারতীয় সাহিত্যে, ভারতীয় ধর্মে, ভারতীয় অশ্রান্ত ব্যাপারে

আবজ্ঞনা কিছু নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাই বলি—এই-সকল আবজ্ঞনা আবজ্ঞনার টিনে (Dust bin) ফেলিয়া দাও এবং ভালটুকু রাখ। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ যা কিছু তাহাই রাখা হউক, তাহা না হইলে পাশ্চাত্য আবজ্ঞনার সহিত ভারতীয় আবজ্ঞনা মিলিয়া এক বিরাট আবজ্ঞনার সৃষ্টি হইবে।” আচার্য্যের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার কথা।

অ . .

বাংলায় প্রথম আর্কিমপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকেরা তাহাদের কাগজের আর্কিমপ্তাহিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, বাংলা আর্কিমপ্তাহিক কাগজ এই প্রথম। কাগজখানির দৈনিক সংস্করণ যে বেশ ভাল চলিতেছে তাহা এই নূতন উদ্যোগ হইতে বুঝা যায়।

অ

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

পূর্বাভাস

বাবোর বাড়ি

১। তামেচা, করক, তেওয়ার, পালট, শিব, ভাগ্যব, কোমরকাট, মাণ্ড, উণ্টাসাণ্ড, হুল, বাহেবা, গ্রীবান্।

২। বাহেরা, ফাক্, দে, করক, পৃষ্ঠ দক্ষিণ, ভাগ্যবকাট্, অঙ্ক, হালকুম, ভুজ, পালট্, পৃষ্ঠ উত্তর, উণ্টা অঙ্ক।

কোমরকাট্ = দক্ষিণ-কোমর-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে অসি পায়ুমূল ছেদন করিয়া যায়।

ফাক্ = বাম বাহুমূলের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধদিকে স্বল্পদেশ ছেদন করিয়া বাম বাহুকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

দে = দক্ষিণ বক্ষপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে বাম বক্ষ ও গলদেশের সন্ধিস্থল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়।

পৃষ্ঠ দক্ষিণ = পশ্চাদ্ভর্তী পদ শূণ্ণে তুলিয়া শরীর সম্মুখে অগ্রসর করাইয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া আঘাত করা হয়।

ভাগ্যবকাট্ = বাম কোমর-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে অসি পায়ুমূল ছেদন করিয়া যায়।

অঙ্ক্, দক্ষিণ উর্দ্ধদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থলকে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে আঘাত করিয়া সমগ্র দক্ষিণ পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

হালকুম্ = গলদেশের দক্ষিণ পার্শ্বের পিছন দিক হইতে অসির উণ্টা পিঠ দিয়া সরলভাবে গলদেশ ছেদন করিয়া ফেলা হয়।

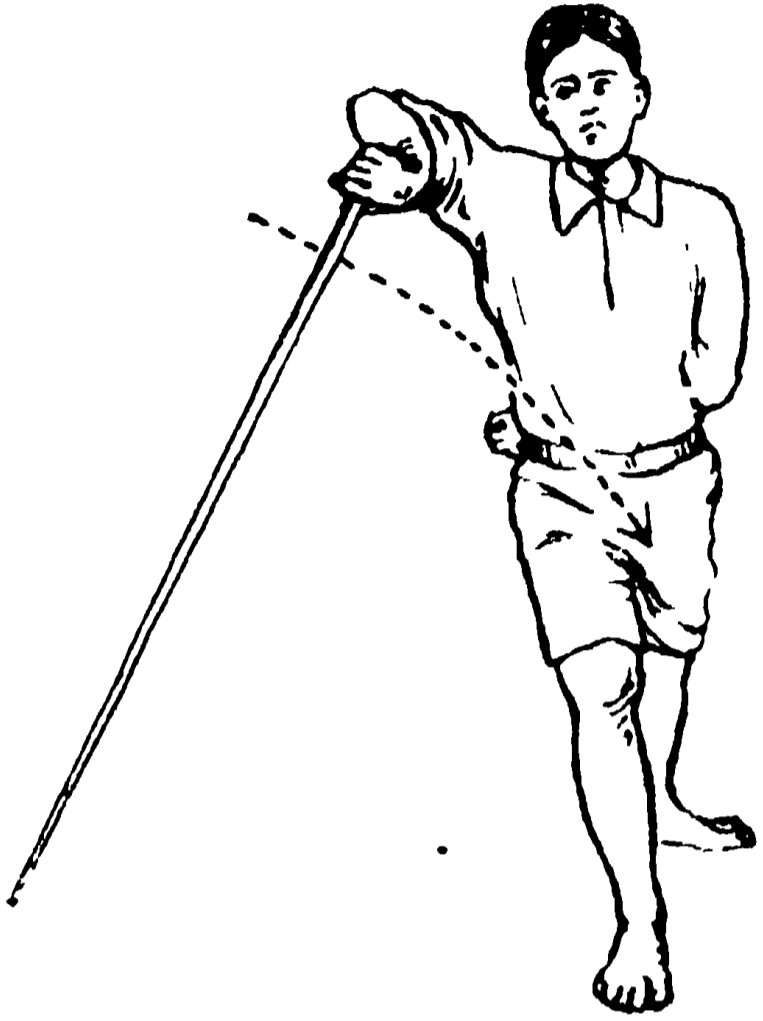
পৃষ্ঠ উত্তর = পশ্চাদ্ভর্তী পদ শূণ্ণে তুলিয়া শরীর সম্মুখে অগ্রসর করাইয়া বাম পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া আঘাত করিতে হয়।

উণ্টা অঙ্ক্ = বাম উর্দ্ধদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থলকে বাম পার্শ্ব হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে আঘাত করিয়া সমগ্র বাম পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা :—

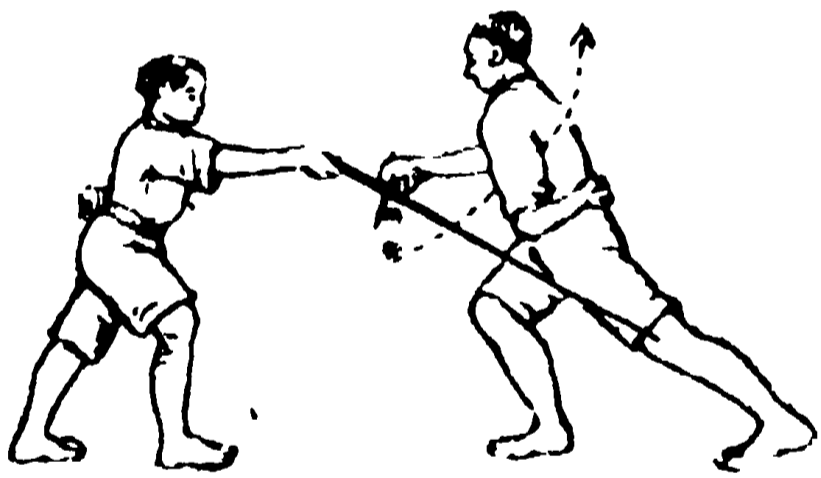
“কোমরকাট্” আটকাইবার কালে হাতের মুঠ্, দক্ষিণ-বক্ষ-পার্শ্বের প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবরে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া দক্ষিণ দিকে

হেলিয়া থাকিবে। লাঠির সমস্যত্রে একটি বক্রিত রেখা কল্পনা করিলে তাহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্ধ-সমকোণে মিলিত হইবে। সমগ্র লাঠি বক্রের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।



কোমর কাট

“ফাক্” আটকাইবার কালে উপর হইতে হাঁকিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে সোজা নিম্নেব দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



ফাক্

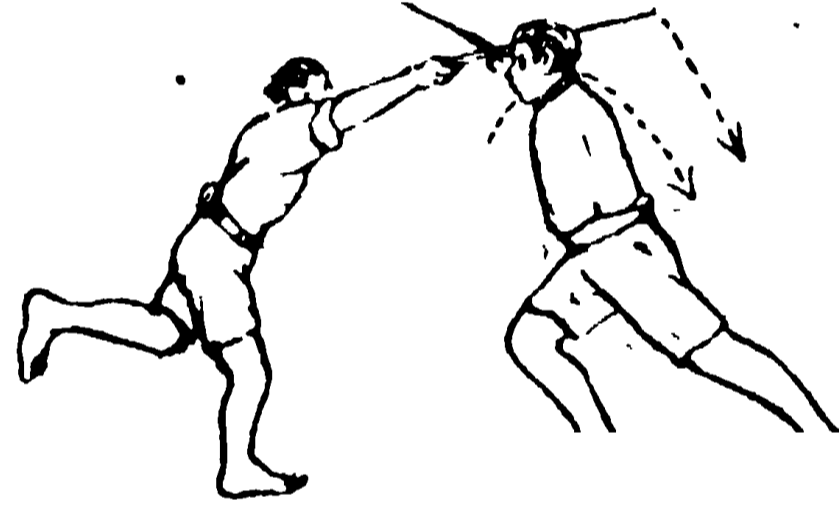
“দে” আটকাইবার কালে হাতের মুঠ্ দক্ষিণ-বক্ষ-পার্শ্বের প্রায় অর্ধ হস্ত দক্ষিণে এবং ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখে বরাবরে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখে হইয়া বাম পাশ্বে হেলিয়া থাকিবে। লাঠির সমস্যত্রে একটি বক্রিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্ধ-সমকোণে মিলিত হইবে। সমগ্র লাঠি বক্রের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।

“পৃষ্ঠ দক্ষিণ” আটকাইবার কালে হাতের মুঠ্ দক্ষিণ দক্ষ মোড় হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে, চতুর্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অর্ধহস্ত উর্ধ্বে বরাবরে রাখিয়া এবং



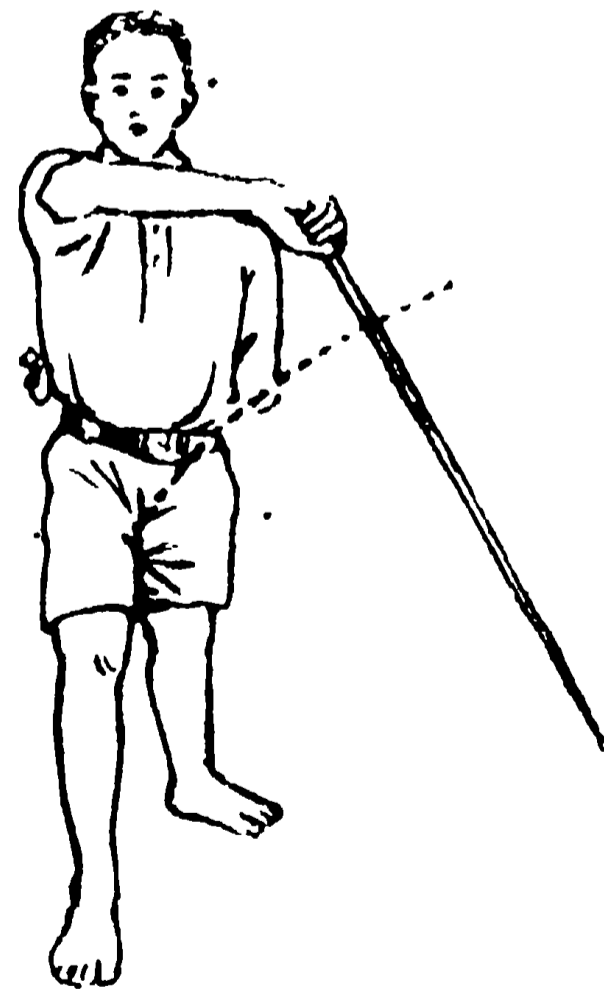
দে

লাঠিকে ভূমির সমান্তরালভাবে ধরিয়া নিম্ন হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধ্বদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



পৃষ্ঠ দক্ষিণ

“ভাণ্ডারকাট্” আটকাইবার কালে হাতের মুঠ্ নাভি হইতে চারি অঙ্গুলী উর্ধ্বে এবং প্রায় চতুর্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে



ভাণ্ডার কাট্

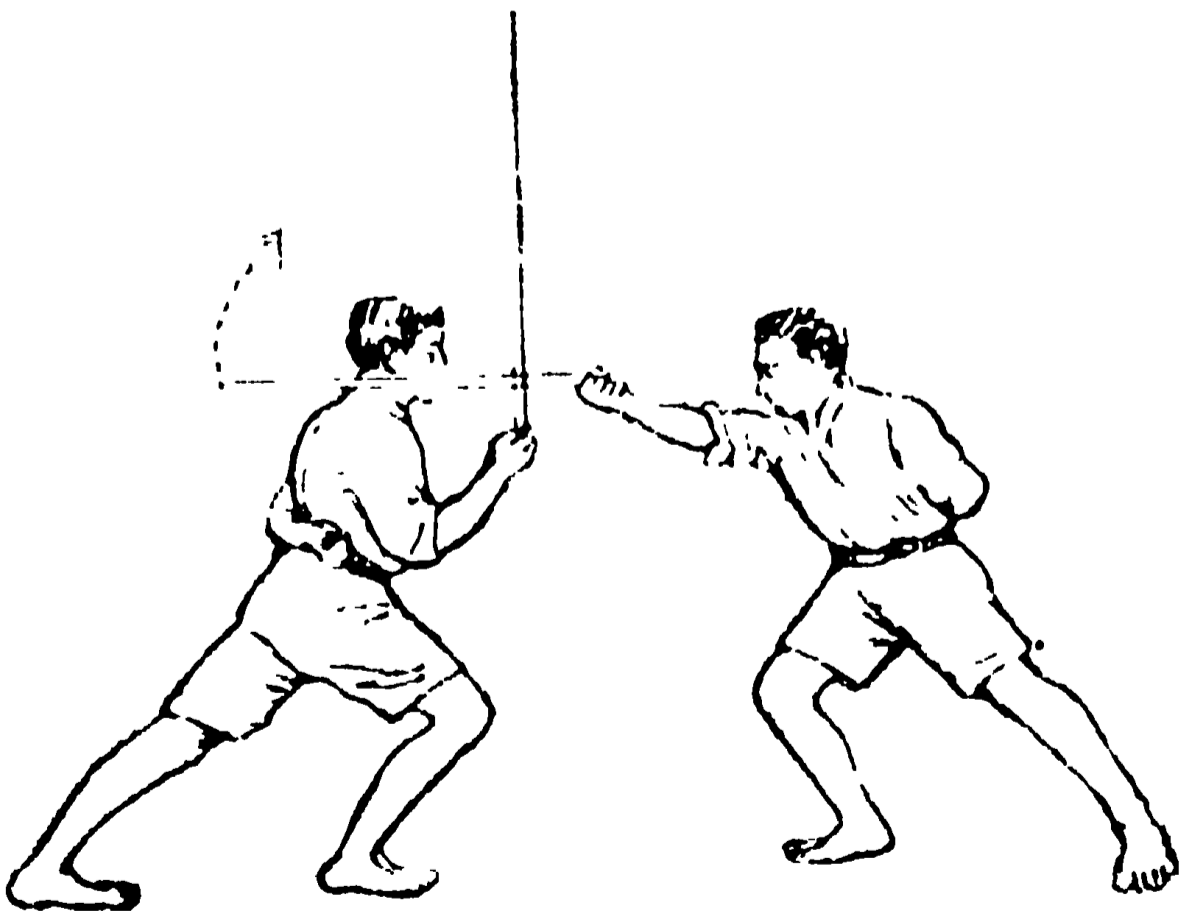
থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু বামপার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অর্ধসমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বন্ধের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।

“অঙ্ক” আটকাইবার কালে হাতের মুঠু দক্ষিণ-কোমর-পার্শ্ব বরাবরে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অর্ধসমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বন্ধের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।



অঙ্ক

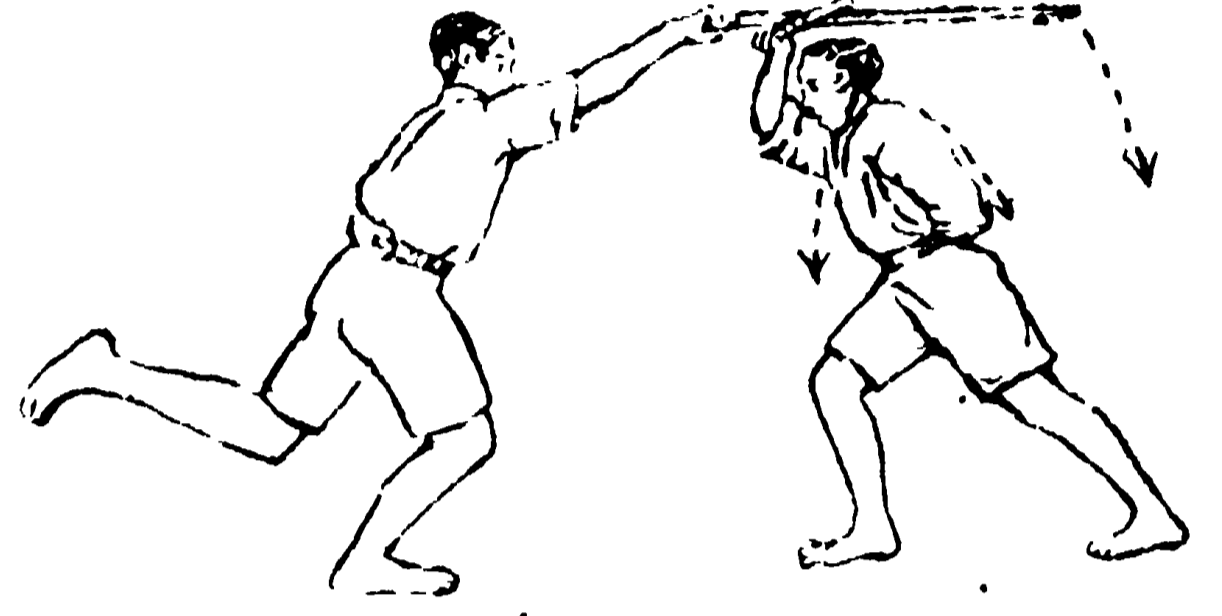
“হালকুম” আটকাইবার কালে হাতের মুঠু দক্ষিণ স্কন্ধ মোড় হইতে কিঞ্চিদধিক চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে ও



হালকুম

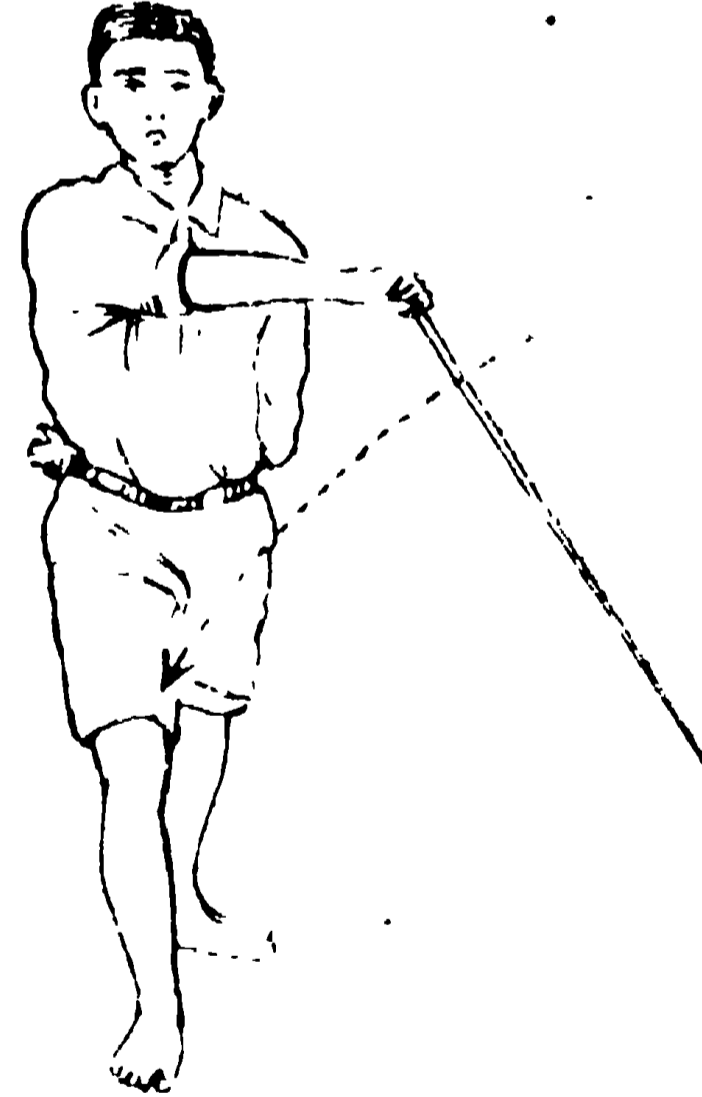
নিম্নে এবং কিঞ্চিদধিক অর্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে। লাঠি উর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্ব বরাবরে থাকিবে।

“পৃষ্ঠ উত্তর” আটকাইবার কালে হাতের মুঠু নাসিকাগের অর্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে রাখিয়া লাঠিকে ভূমির সমান্তরাল করিয়া নিম্ন হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



পৃষ্ঠ উত্তর

“উন্টা অঙ্ক” আটকাইবার কালে হাতের মুঠু নাভি হইতে প্রায় চতুর্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া বাম পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অর্ধসমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বন্ধের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।



উন্টা অঙ্ক

তেরোর বাড়ি

২। তামেচা, মন, জুকুটি, উন্টাফাক, উন্টাহালকুম, জবেগা, উন্টাজবেগা, আসর, দিগর, ভর্জা, উন্টাজুকুটি, হঞ্জুর, উন্টাহঞ্জুর।

ক্রকুটি = দক্ষিণ ক্র ও ক্র-মধ্য বরাবরে আঘাত করিয়া অভ্যন্তরের দিকে দক্ষিণ চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়।

উন্টাফাক্ = দক্ষিণ-বাহু-মূলের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধদিকে স্বল্পদেশ ছেদন করিয়া দক্ষিণ বাহুকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

উন্টা হালকুম্ = গলদেশের বাম পার্শ্বের পিছন দিক হইতে অসির উন্টা পিঠ দিয়া সরলভাবে গলদেশ ছেদন করিয়া ফেলা হয়।

জবেগা = দক্ষিণ গল-পার্শ্বের ঠিক মধ্য বরাবরে সরল ভাবে ছেদন করিয়া বাম-গল-পার্শ্বের ঠিক মধ্য বরাবরে অসি বাহির হইয়া যায়।

উন্টা জবেগা = বাম-গল-পার্শ্বের ঠিক মধ্য বরাবরে সরলভাবে ছেদন করিয়া দক্ষিণ-গল-পার্শ্বের ঠিক মধ্য বরাবরে অসি বাহির হইয়া যায়।

ভঙ্জা = দক্ষিণ স্বল্প মোড় ও কহুইএর মধ্য বরাবরে নিম্নমুখে বক্রভাবে আঘাত করিয়া দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া ফেলা হয়।

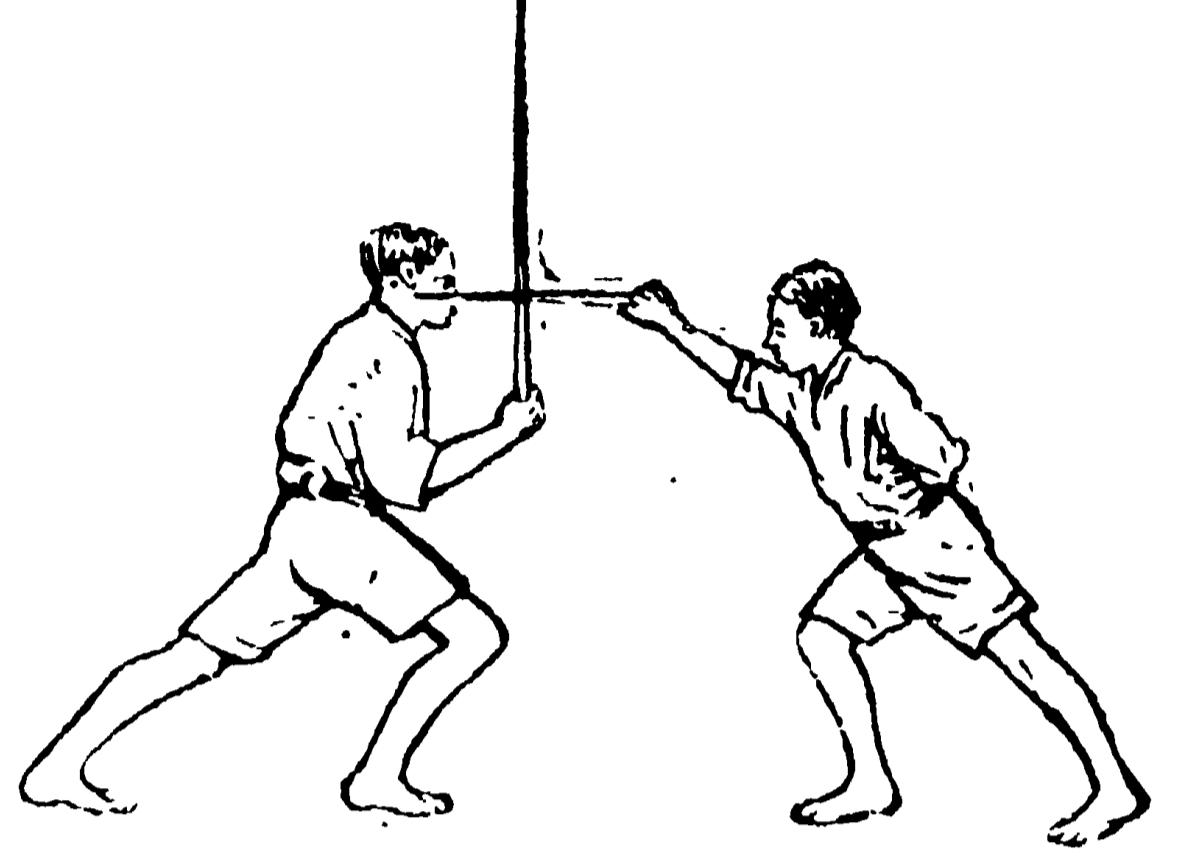
উন্টাক্রকুটি = বাম ক্র ও ক্র-মধ্য বরাবরে আঘাত করিয়া বাম চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়।

হঞ্জুর = বাম স্বল্পদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী নিম্নে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। অসির ধারের দিক উপরের দিকে থাকে।

উন্টা হঞ্জুর = দক্ষিণ স্বল্পদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী নিম্নে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। অসির ধারের দিক উপরের দিকে থাকে। শরীর অল্প পরিমাণ বামে ঘুরাইয়া মারিতে হয়।

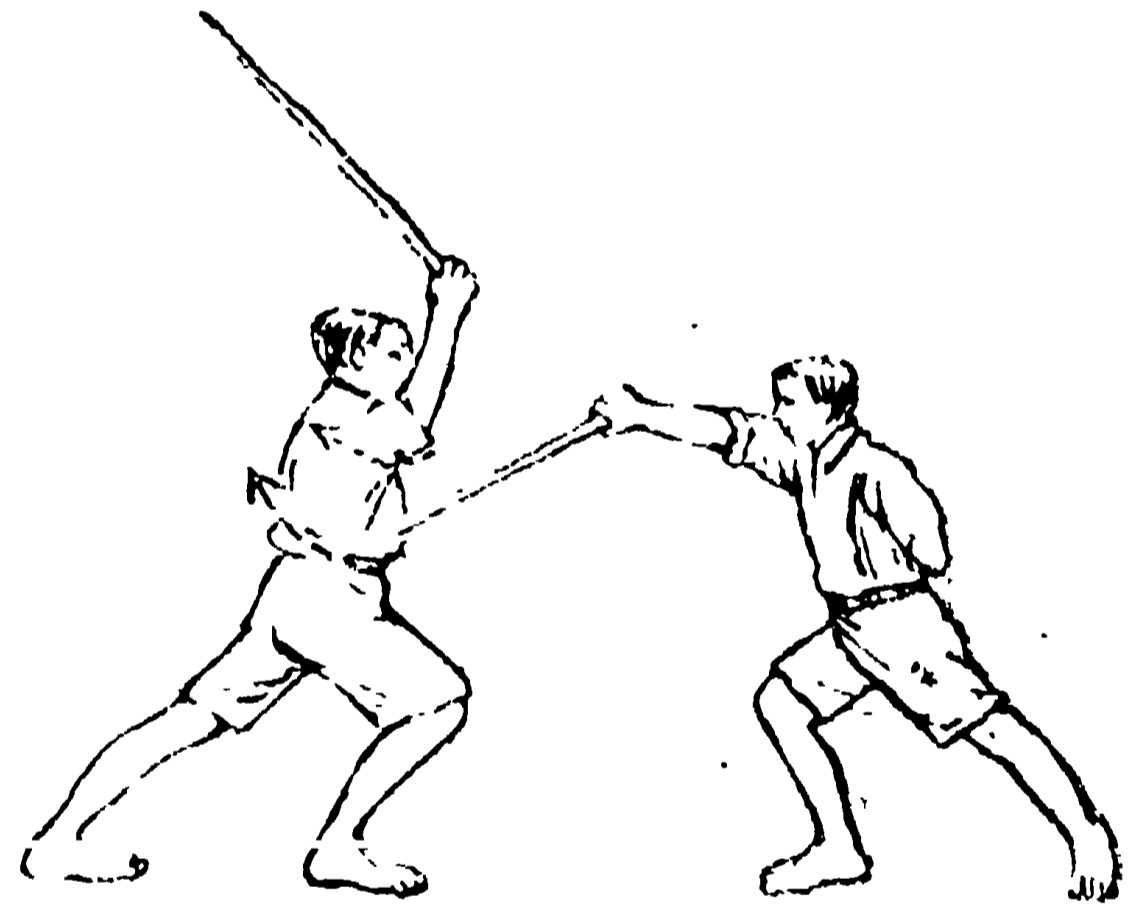
বর্ণনা :—

“ক্রকুটি” আটকাইবার কালে হাতের মুঠ নাসিকা-গ্ৰের অর্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু উর্দ্ধমুখ হইয়া ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে।



ক্রকুটি

“উন্টা ফাক্” আটকাইবার কালে লাঠি উপর হইতে ঠাকিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে আঘাত করিয়া নিম্নে ও দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



উন্টাফাক্

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস



“মুসলমানী নাম”

সম্পাদক মহাশয় আমার “মুসলমানী নাম” শীর্ষক আলোচনার একটি মন্তব্য লিখিয়াছেন। ঐ বিষয়ে আমি এগন আর বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহি না; তবে উহার স্থানে স্থানে সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিতান্ত ভুল বুলিয়াছেন বলিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি আজীবন সর্বপ্রকারের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী পরিহারেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছি; তাই আজ আমার সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়কে ভুল ধারণা করিতে দেখিয়া বাস্তবিকই অবাক হইয়াছি। ভারত আমার জন্মভূমি—প্রিয় লীলানিকেতন; আমার নিকট ভারত-পেঙ্গা পৃথিবীর আর কোন দেশই প্রিয় হইতে পারে না। ভারতের

সব-কিছু অতি আদরের সামগ্রী। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—“যে-সব নামে ভারতীয় আছে, সেগুলিকে বিক্রমপুরী মহাশয় খিচুড়ী নাম বলিয়াছেন।” আমি কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় নামের সম্বন্ধেই একথা বলিয়াছি; ভারতীয় আমার নিকট ইউরোপীয়দের অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয় ও প্রিয়। আর আমি হিন্দুদিগকে বিশ্ববহিষ্ঠ ও ইউরোপীয়দিগকে বিশ্বের অন্তর্গত মনে করি নাই; আমার নিকট পৃথিবীর সব জাতির চেয়ে হিন্দু বৈশী শ্রীতি ও সহানুভূতি পাইতে পারে। ভারতীয় হিসাবে হিন্দুর গৌরব ও সম্মানে আমিও নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকি। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব, তাই নিরন্ত হইলাম।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

সাঁওতালি গান

(ঝুমুরের * তালে বচিত)

১
আগে ছিল উজল রাত,
পরে এলো আঁধাবি—
হে ননদি, এখন তুমি শুয়ো না অঙ্গনে—
অমন করে' শুয়ো না অঙ্গনে!
আঁধার-ঢাকা নিঝুম রাত—
নাহি আলো চাঁদারই,
এলো-মেলো ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে কনকনে।
অমন করে' শুয়ো না অঙ্গনে।
টপুকে বেড়া তুকবে চোর
না ভাঙ্গতে ঘুমটি তোর,—
করবে চুরি তোমার সাধের তাবিজ ও করুণে।
অমন করে' শুয়ো না অঙ্গনে।

(বাঁশি—তুতু তুআ উতু তুআ তুতুর তুআ তু—)

২

দীঘির ঘাটে জল আনতে হারিয়ে গেছে কানের দুল,
হে ননদি, বোলো না দাদারে—
তোমার বোলো না দাদারে।

তোমার দাদা ক্ষেত্কে গেছে আনতে তুলে ঝিঙের ফুল,
বোলো না দাদারে,—
তোমার বোলো না দাদারে!
শুন্তে পেলো তোমার দাদা বাধাবে আজ হলুফুল,—
বোলো না দাদাবে।
ভেঙে এনে চাঁপার ডাল
তুলবে আমার পিঠের ছাল,
কেঁদে আমি মরুব একেবারে,—
বোলো না দাদারে;
হে ননদি, হে ননদি, বোলো না দাদারে—।
(মাদল—ধিতাং ধিতাং তুরুর ধিতাং)

শ্রী হুনির্মল বসু

* ঝুমুর একরকম নাচ। বিহার অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। একদল যুবতী হাত ধরাধরি করে' নাচে আর গান করে, আর যুবকেরা তালে তালে বাঁশী ও মাদল বাজায়।



সবলতা ও দুর্বলতা—শ্রীমৎস্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০ আনা। ১৩৩০।

এই গ্রন্থে স্বামীজি সবলতা ও দুর্বলতার কষ্টপাথরে সব কাজের ধর্মার্থ কামিয়া লইয়া বিচার করিয়াছেন। সত্য মিথ্যা কি, পাপ পুণ্য কি,—এইসব নীতি-ধর্মের কথা লেখকের মতে গেরূপভাবে বিচারিত হওয়া উচিত তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বাংলার পল্লীসমস্যা—শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০ বারো আনা। (১৩৩০)

এই পুস্তকটিতে (১) সেকাল ও একাল (২) কৃষকের দারিদ্র্য (৩) কৃষক ও জমিদার (৪) মহাজন ও কৃষক (৫) পল্লীশিল্পের ধ্বংস (৬) জননিকাশের বাধা (৭) বাংলার জলকষ্ট (৮) গোজাতির অবনতি (৯) অরণ্যসম্পদ ও তাহার অপচয় (১০) পল্লীর রক্তশোষণ (১১) পল্লীসংস্কার ও সমবায়-নীতি (১২) পল্লীশিক্ষার ধারা (১৩) শিক্ষিতের পল্লীপ্রত্যাবর্তন ও (১৪) পল্লীসেবক, এই কয়টি অধ্যায়ে বহু তথ্যের সাহায্যে পল্লীসমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরিশিষ্টেও অনেক অর্থনীতিগত বিষয়ের তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। পল্লীর অভাব-অভিযোগের কথা যাহারা আলোচনা করিতে চান এ পুস্তক তাঁহাদের খুব উপকারে লাগবে। পুস্তকে মুদ্রাকরপ্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে বলিয়া পড়িতে একটু অস্ববিধা হয়।

ইসলাম-গৌরব—অধ্যাপক শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ প্রণীত। প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০ আনা। ১৩৩০।

এই পুস্তকে অতি সংক্ষেপে ইসলাম সভ্যতার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় অল্প কোন পুস্তকে এরূপ ব্যাপকভাবে ইসলামের কথা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই, কাজেই এ পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুণ্য কবিয়াছে। ইহা সাহায্যে বাঙালী পাঠক ইসলাম-সভ্যতার গোবন্দেব কথা মোটামুটি জানিতে পারিবেন।

পাগলের প্রাণের কথা—শ্রী মুনীন্দ্রনাথ দে কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য বাবো আনা। পৃঃ ১৯৫। (১৩২৯)

পুস্তকখানিতে সাধকের মুখনিঃসৃত উপদেশপূর্ণ কথা আছে। সর্বত্রই ইহার আদর হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বইখানিতে পরমহংসদেবের একখানি ছবি আছে।

পুণ্যচিহ্ন—শ্রী রসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক ঢাকা মডেল লাইব্রেরী। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ২১৯। (১৩২৪)

কয়েকটি কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। প্লটটি আমাদের ভালো লাগে নাই। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

প্রভাবতী—শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ১৫৪। (১৩২৯)

মঞ্জীমঞ্জলের প্রভাবতীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চাঙ্ক নাটক রচিত। অবিনাশ-বাবু বইখানি বেশ সবস ভাষাতে লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির দাম একটু বেশী হইয়াছে।

সংকথা (২য় সং)—শ্রীমৎস্বামী অঙ্কুরানন্দ শ্রীমুখ-নিঃসৃত স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। সংগ্রাহক শ্রী শ্রী লাটমহারাজার শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীর মুখনিঃসৃত উপদেশবাক্যগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ-কথাসূত্রের শ্রী স্বামীজীব কথাগুলিও বেশ সরল। স্মরণীয় বইখানি সর্বজনপাঠ্য ও সর্বজনশিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির বিকয়লক্ষ অর্থ কাশীধামে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরে অর্পিত হইবে।

পুলিস-নীতি—মোলবী সমিন উদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৯২। (১৩৩০)

গ্রন্থকার বর্তমান পুলিশ-বিভাগে কাৰ্য্য করিয়াছেন। স্মরণীয় পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানিতে “নূতন পুলিশ ইন্স্পেক্টার বাবুগণের প্রতি উপদেশ ও পুলিসের কলঙ্ক মোচনের ব্যবস্থা” আছে। পুলিশ-বিভাগের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আমরা শুনিতে পাই। পুলিশ-বাবুবা যদি এই গ্রন্থলিপিত উপদেশ-সমূহ পালন করিয়া চলেন তাহা হইলে দেশ বহু দুঃখ দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবে। সাধারণেও পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

গায়ত্রী—শ্রী কার্তিকচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৯৬। (১৩২৯)

ইহা একখানি সপ্তাঙ্ক নাটক। গ্রন্থকার অযথা অঙ্কের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। ১ম, ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ অঙ্কে মাত্র একটি করিয়া দৃশ্য। এই ক্ষুদ্র নাটকে আবার সর্বদাকল্যে ৫৩টি গান আছে। নাটকখানি সফল রচনা নহে।

প্রভাত
মায়াপুরী—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু, ৪৫ আমহাট্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২২৪ পৃষ্ঠা। পটু পটুয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের পরিকল্পিত সুন্দর রঙীন প্রচ্ছদপট। দেড় টাকা।

মণীন্দ্রলালের কল্পনা-মায়াপুরীর স্বপ্নপেলব আকাশকুসুমের এগারটি স্তবক দিয়া এই মায়াপুরী সজ্জিত হইয়াছে। এগারোটি গল্পই ভাবের বৈচিত্র্যে ও নূতনত্বে, বর্ণনার লালিত্যে ও মোহনতায় পরম উপভোগ্য। মণীন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যে গল্পরচনার একটি নূতন কবিদ্বরসমধুর ভাব-বিশ্বল রীতির প্রবর্তক। স্মরণীয় তাঁহার গল্পগুলি একেবারে স্বতন্ত্র; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার রচনার জাঙ্ঘল্যমান ধাকা সত্ত্বেও ইহার ধরণ নূতন।

মুদ্রা-রাক্ষস



କନ୍ୟା ଦେବୀର ତ୍ରୟିକ ବିଧି
ଚିତ୍ରକର ଶିବୀବେନ୍ଦ୍ର .ମ.

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩০

৩য় সংখ্যা

অথর্কবেদের ঈশ্বরবাদ

অথর্কবেদের অধিকাংশ স্থলেই ধর্মের যে আদর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি হীন। কিন্তু দুই-এক স্থলে ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ে এমন উচ্চ কথাও বলা হইয়াছে, যাহা অপর বেদসংহিতাতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ, বিশ্ব-কর্মা, ‘সেই এক’ ইত্যাদি দেবতার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অথর্কবেদের ঋতুসূক্তে যে ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদের ঈশ্বর-তত্ত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ‘ঋতু’ অর্থ ‘সুস্থ’ বা “আশ্রয়”; যিনি বিশ্বভুবনের আশ্রয়, তাঁহাকেই ঋতু বলা হইয়াছে। ‘ঋতু’ বিষয়ে দুইটি সূক্ত আছে। আমাদিগের আলোচনার জন্ত যে যে অংশ আবশ্যিক তাহা নিম্নে অনূদিত হইল।

ঋতুসূক্ত (১০।৭)

(১)

তাঁহার কোন্ অঙ্গে তপঃ অধিষ্ঠান করিতেছে ?
কোন্ অঙ্গে ঋতু নিহিত ? কোথায় ব্রত ? কোথায়
শ্রদ্ধা ? তাঁহার কোন্ অঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠিত ?

(২)

তাঁহার কোন অঙ্গ হইতে অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে ?

কোন্ অঙ্গ হইতে মাতরিখা প্রবাহিত হইতেছে ?
তাঁহার কোন্ অঙ্গ হইতে চন্দ্রমা মহান্ স্ফস্তব অঙ্গ
পরিমাণ কবিত্তে করিতে বিচরণ করিতেছে ?

(৩)

তাঁহার কোন্ অঙ্গে ভূমি প্রতিষ্ঠিত ? কোন্ অঙ্গে
অস্তরিক্ষ প্রতিষ্ঠিত ? কোন্ অঙ্গে দ্যৌ স্থাপিত হইয়া
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ? আকাশেব উর্দ্ধতর স্থানই বা
কোন্ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ?

(৪)

কাহাকে পাইবার আশায় অগ্নি উর্দ্ধমুখ হইয়া
প্রজ্জলিত হয় ? কাহাকে পাইবার ইচ্ছায় মাতরিখা
প্রবাহিত হয় ? আবর্জনকারী পথসমূহ যাহাকে পাইবার
জন্ত ইচ্ছা করে এবং যাহাতে প্রবেশ করে, সেই ঋতু
কে ? * আমাকে বল।

(৫)

অর্ধমাস ও মাসসমূহ বৎসরের সহিত মিলিত হইয়া
কোথায় গমন করে ? ঋতুসমূহ এবং ঋতুসম্বন্ধী

* মূলে আছে “কতমঃ”। বহু বস্তুব মধ্যে “একটি”কে বুঝাইতে
হইলে ‘তম’ প্রত্যয় হয়। সূত্রাং “কতমঃ” শব্দের মৌলিক অর্থ
“এ সমুদায়ের মধ্যে কোন্টি ?”

অগ্নাগ্নি কাল যাহাতে গমন করে, সেই স্বস্ত কে ?
আমাকে বল ।

(৬)

অহু (অথাৎ দিবা) ও রাত্রি নামক বিভিন্নরূপবিশিষ্ট
যুবক ও যুবতী (কিংবা যুবতীদ্বয়) যাহাকে পাইবাব
ইচ্ছায় সম্মিলিত হইয়া ধাবিত হয় ? যাহাকে পাইবার
ইচ্ছায় জনসমূহ গমন করে সেই, স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(৭)

প্রজাপতি লোকসমূহকে যাহাতে স্থাপন করিয়া সেই-
সমুদায়কে ধারণ করিয়া আছেন, সেই স্বস্ত কে ?
আমাকে বল ।

(৮)

প্রজাপতি যে উৎকৃষ্ট, নিরুৎকৃষ্ট ও মধ্যমাদি নানাবিধ
বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বস্ত তাহাদিগের মধ্যে কতদূর প্রবেশ
করিয়াছেন ? কতদূরই বা প্রবেশ করেন নাই ?

(৯)

স্বস্ত অতীতকালের কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন ?
ভবিষ্যতের কত অংশই বা তাহার উদরে রহিয়াছে ?
তিনি এক অঙ্গকে সহস্রভাগে বিভাগ করিয়াছেন তাহার
মধ্যেই বা তিনি কতটুকু প্রবেশ করিয়াছেন ?

(১০)

মানবগণ যে বলেন ঋগ্বেদে পৃথিব্যাди লোকসমূহ,
কোশসমূহ, জলসমূহ, ব্রহ্ম (মন্ত্র) বহির্গতে, এবং তাহার
অভ্যন্তরেই 'সং' ও 'অসং' নিহিত আছে,—সেই স্বস্ত কে ?
আমাকে বল ।

(১১)

যাহাতে ৩৩ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব ধারণ
করে, যাহাতে ব্রহ্মা, জলসমূহ এবং ব্রহ্ম সমাহিত, সেই
স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(১২)

যাহাতে ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্য ও
বায়ু নিহিত, সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(১৩)

যাহার অঙ্গে ৩৩ জন দেবতা সমাহিত হইয়া আছে,
সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(১৪)

যাহাতে প্রথম জাত ঋষিগণ ঋক, যজু, মহী ও একর্ষি
অবস্থান করেন, সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(১৫)

যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষে মৃত্যু ও অমৃতত্ব
সমাহিত, যাহার সমুদ্র নাড়ীরূপে পুরুষে অবস্থিত,
সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(১৬)

চারিটি দিক্ যাহার প্রধান নাড়ীরূপে অবস্থিত, যজু
যে স্থলে অবস্থিত থাকিয়া পরাক্রম প্রকাশ করে, সেই
স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(১৭)

যিনি জানেন যে পুরুষই ব্রহ্ম, তিনি পরমেষ্ঠীকে
জানেন ; যিনি পরমেষ্ঠীকে জানেন, তিনি প্রজাপতিকে
জানেন । যিনি ছোষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জানেন, তিনি সেইভাবে
স্বস্তকেই জানেন ।

(১৮)

বৈশ্বানর যাহার শির, অগ্নিরোগণ যাহার চক্ষু
হইয়াছিল, যাতুগণ যাহার অঙ্গ, সেই স্বস্ত কে ? আমাকে
বল ।

(১৯)

ব্রহ্মকে যাহার মুখ বলা হয়, মপু-কশা যাহার জিহ্বা,
বিরাট্ যাহার উধঃ, সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(২০)

যাহা হইতে ঋকসমূহকে কাটিয়া বাহির করা
হইয়াছিল, যাহা হইতে যজুঃসমূহকে বিচ্ছিন্ন করা
হইয়াছিল, সামসমূহ যাহার লোগ, অথর্ষাঙ্গিরস যাহার
মুখ,—সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(২১)

যেখানে আদিত্য রুদ্র ও বসুগণ সমাহিত, ভূত ভব্য
ও সর্বলোক প্রতিষ্ঠিত, সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল ।

(২২)

৩৩ জন দেবতা, সর্বদা যাহার নিধি রক্ষা করে,
(সেই স্বস্ত কে ? আমাকে বল) । হে দেবগণ ! তোমরা
যে ধন রক্ষা করিতেছ, তাহা এখন কে রক্ষা করিবে ?

(২৪)

যেখানে ব্রহ্মবিৎ দেবগণ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, (সেই স্কন্ধ কে ? আমাকে বল)। যিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ জানেন, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বেদিতা।

(২৫)

যেসমুদায় দেবতা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা অতি ক্ষমতাশালী। অসৎকে স্কন্ধের এক অঙ্গ বলা হয়।

(২৬)

যেখানে (অর্থাৎ যে অঙ্গে) স্কন্ধ সেই পুরাণকে উৎপন্ন করিয়া ব্যবর্তন করিয়াছিলেন, স্কন্ধের সেই অঙ্কেই লোকে পুরাতন বলিয়া জানিত।

(২৭)

যাঁহার অঙ্গে ৩৩ জন দেবতা স্বীয় স্বীয় অঙ্গ লাভ করিয়াছে, কোন কোন ব্রহ্মবিৎ সেই দেবগণকে জানেন।

(২৮)

লোকে হিরণ্যগর্ভকে পরম (পুরুষ) অনির্কচনীয়া বলিয়া জানে। কিন্তু স্কন্ধই অগ্রে লোকসমূহের মধ্যে হিরণ্য সেচন করিয়াছিলেন (এবং সেই হিরণ্য হইতেই হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি)।

(২৯)

এই স্কন্ধেই লোকসমূহ, স্কন্ধেই তপঃ, স্কন্ধেই ঋত সমাহিত। হে স্কন্ধ ! আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে ইন্দ্রে সমাহিত।

(৩০)

ইন্দ্রে লোকসমূহ, ইন্দ্রে তপঃ, ইন্দ্রে ঋত সমাহিত। হে ইন্দ্র ! আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে স্কন্ধে সমাহিত।

(৩১)

ভূমি যাঁহার প্রমা, অন্তরিক্স যাঁহার উদর, যিনি দ্যৌকে মূর্দ্ধা করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(৩২)

সূর্য্য ও পুনর্নব চন্দ্র (যে চন্দ্র পুনঃ পুনঃ নূতন হয়) যাঁহার চক্ষু, অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(৩৩)

যায়ু যাঁহার প্রাণ ও অপান, অন্ধিরোগণ যাঁহার চক্ষু

হইয়াছিল, দিক্‌সমূহকে যিনি প্রজ্ঞানী (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার) করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(৩৫)

স্কন্ধ দ্যৌ এবং পৃথিবী এই উভয়কেই ধারণ করিয়াছেন, স্কন্ধ অন্তরিক্সকে ধারণ করিয়াছেন, স্কন্ধ ছয়টি দিক্‌কে ধারণ করিয়াছেন, বিশ্বভূবন স্কন্ধে প্রবেশ করিয়াছে।

(৩৬)

এক মহাযক্ষ তপস্যা-রত হইয়া ভূবনমধ্যে মলিলপৃষ্ঠে বিচরণ করেন। শাখা যেমন বৃক্ষশৃঙ্খের চতুর্দিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, দেবগণও তেমনি এই মহাযক্ষের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

(৩৭)

যাঁহার জন্ত দেবগণ সর্পদা হস্ত, পদ, বাক্য, শ্রোত্র ও চক্ষু দ্বারা অপরিমিত বলি আহরণ করেন, সেই স্কন্ধ কে ? আমাকে বল।

(৪০)

তাঁহার তমঃ অপহৃত হইয়াছে, তিনি পাপ হইতে ব্যবৃত্ত (অর্থাৎ পৃথক্, মুক্ত) হইয়াছেন। প্রজাপতিতে যে ত্রিবিধ জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিঃ তাঁহাতেই।

(অথর্কবেদ ১০।৭)

ইহার পরের সূক্তেও (১০।৮) স্কন্ধবিষয়ক মন্ত্র আছে। ইহার প্রথম দুইটি মন্ত্র এই :—

(১)

যিনি ভূত, ভব্য এবং সমুদায়েরই অধিষ্ঠান, স্বর্গ কেবল যাঁহারই, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(২)

এই দ্যৌ এবং ভূমি স্কন্ধ কর্তৃক বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহা প্রাণবান্ আত্মবান্ এবং নির্মমক্ৰিয়াবান্—তাহা স্কন্ধেই।

এই-সমুদায় মন্ত্রে যাহা বলা হইল তাহার সারার্থ এই—

ক। দেশ ও কাল স্কন্ধে প্রতিষ্ঠিত। যাহা দেশে বর্তমান, কালে যাহা অবস্থিত—স্কন্ধেই সে সমুদায়ের প্রতিষ্ঠা। পৃথিবী দ্যৌ ও অপরাপর লোক, এবং ভূত, বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ—সমুদায়ই স্কন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

রহিয়াছে। তপঃ, ব্রত, ঋত, মত্য প্রভৃতিরও প্রতিষ্ঠা সেই ক্ষুদ্রই। যাহা কিছু সৃষ্ট, তাহা ক্ষুদ্রই অঙ্গ এবং ক্ষুদ্র কর্তৃক বিধৃত।

খ। 'সৎ' এবং 'অসৎ' উভয়ই ক্ষুদ্রে প্রতিষ্ঠিত। 'অসৎ'ও ক্ষুদ্রের একটি অঙ্গ।

গ। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতা ক্ষুদ্রে প্রতিষ্ঠিত। ঋষি ৩৩ জন দেবতার কথা বলিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই জন্ম আছে। ইহারা ক্ষুদ্রের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এবং ক্ষুদ্রে প্রতিষ্ঠিত।

ঘ। একটি মন্ত্বে বলা হইয়াছে ক্ষুদ্র ইন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত এবং ইন্দ্র ক্ষুদ্রে প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা ঋষি ক্ষুদ্র ও ইন্দ্রের একত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। "বৈদিক দেবগণের একত্র" নামক প্রবন্ধে এবিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

ঙ। কয়েকটি মন্ত্বে ব্রহ্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্বেই উক্ত হইয়াছে যে ক্ষুদ্রই সর্বমুলাধার। ইহাতে মনে হয় যে ঋষি ক্ষুদ্র ও ব্রহ্মের একত্র স্বীকার করিতেন। কোন কোন মন্ত্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ক্ষুদ্রের অঙ্গ। ইহাতে অনুমান করিতে হয় যে ব্রহ্মের স্থান ক্ষুদ্রের নিম্নে। কিন্তু ক্ষুদ্রকে কখনই ব্রহ্ম অপেক্ষা নিম্নতর স্থান দেওয়া হয় নাই। "ব্রহ্মবাদের সূচনা" নামক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

চ। একটি মন্ত্বে (১৭৭৩৮) এক মহা যক্ষের কথা বলা হইয়াছে। আত্মাকে সাধারণতঃ যক্ষ বলা হইত। যক্ষ যেমন শাখাসমূহ আশ্রিত হইয়া থাকে, এই মহা-যক্ষও তেমনই দেবগণ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইতেছে যক্ষ আত্ম-রূপী। এস্থলে উপনিষদের আত্মতত্ত্বের বীজ পাওয়া যাইতেছে।

মন্তব্য

ক্ষুদ্রসূক্ত বংশত বংশের পুণে রাচত হইয়াছিল। এই সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, ও ধর্মবিশ্বাস কি-প্রকার ছিল, কিভাবে রাজ্য শাসিত হইত, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঘটনা ও অবস্থা কিপ্রকার ছিল তাহা আমরা জানি না। অথচ এই-সমুদয় ঘটনা দ্বারাই প্রধানতঃ মানুষের জীবন গঠিত, চালিত ও অধুর্জিত হইয়া থাকে।

আমরা অল্প সময়ে অল্প প্রদেশে বাস করিতেছি ; সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের জীবন বিভিন্নভাবে গঠিত ও নিয়মিত হইতেছে। এ অবস্থায় ঋষিগণের প্রাণের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের আকাজক্ষা এবং আদর্শ অনুভব করা সহজ নহে। তবুও চিন্তা দ্বারা যতটুকু বৃদ্ধিতে পারিতেছি, তাহাতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে হইতেছে। জগতে অনেক জাতি আছে, যাহারা একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কোন জাতির ধর্মসাহিত্যেই ক্ষুদ্রসূক্তের ন্যায় উচ্চ তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রে যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা একশ্রেণীর "দেববাদ"। "বহুদেববাদ" হইতে ইহাব পার্থক্য অতি সামান্য। বহুদেববাদে দেবতার সংখ্যা বহু ; একদেববাদে দেবতা একজন। কিন্তু এই 'একদেবতা' বহুদেবতাদেরই অন্যতম দেবতা। প্রথমে সাধারণতঃ অন্যান্য দেবতাকে হীন করা হয়, তাহার পরে ইহাদিগকে অগ্রাহ করা হয়, এবং কোন কোন ধর্মে ইহাদিগকে একেবারেই অস্বীকার করা হয়। এইপ্রকারে যখন কোন একদেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং সকলের কর্তা ও অধিপতি হয়, তখনই লোকে তাহাকে ঈশ্বর বা একেশ্বর বলিয়া থাকে ('বৈদিক একেশ্বরবাদ'—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, দ্রষ্টব্য)।

খৃষ্টানদিগের পুরাতন বাইবেলেও এইরূপে একদেববাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমে সকলেই বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিত ; তাহার পরে অপরাপর দেবতাকে অগ্রাহ করিয়া 'জিহোভা'কে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। অপর দেবতা যে ছিল না তাহা নহে। জিহোভা নিজেই ইহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; তবে তিনি এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে তাহাদিগকে কেহ পূজা করিতে পারিবে না। জিহোভার অনুবর্তিগণ এইরূপে আপনার দেবতাপ্রাণকে তুচ্ছ ও জঘন্য জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। এইরূপে ইহুদী জাতির মধ্যে একদেববাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সৃষ্টির ক্রম এই :—

১। প্রথমতঃ অপরাপর দেবতাকে হীন বিবেচনা করা হইয়াছিল।

২। তাহার পরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল।

৩। সর্বশেষে কেহ কেহ উহাদিগকে একবারেই অস্বীকার করিয়াছিল।

এইরূপে বহু দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইল বটে, কিন্তু অবশিষ্ট এক দেবতার প্রকৃতি অপরিবর্তিতই রহিয়া গেল। কিন্তু স্বস্তের প্রকৃতি এপ্রকার নহে। তিনি বহু দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা নহেন; এক অর্থে তাঁহাকে দেবতাই বলা যায় না। তিনি

অধিদেবতা।

সমুদায় দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার দ্বারাই নিয়মিত।

অপর দেশের ঈশ্বরবাদে বা একদেববাদে অষ্টা ও

সৃষ্টির মধ্যে আত্যন্তিক পার্থক্য ও দূরত্ব আনয়ন করা হইয়াছে। অষ্টা বাস করেন স্বর্গলোকে বা এই জগতের অতীত কোন স্থানে। সেই স্থানে থাকিয়া তিনি এই সৃষ্ট জগতের পালনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বস্ত-স্বস্তের আদর্শ অন্যপ্রকার। এই সৃষ্টজগতের সহিত স্বস্তের আত্যন্তিক পার্থক্য নাই এবং দূরত্বও নাই। ইহা নিত্য স্বস্তে অবস্থিত এবং ইহা স্বস্তেরই অঙ্গ। 'স-দেব' এবং 'স-মানব' এই ব্রহ্মাণ্ড স্বস্তেরই অঙ্গীভূত। যাহা আছে কেবল যে তাহাই স্বস্তের অঙ্গ তাহা নহে। যাহা নহে, যাহা অসৎ, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ তাহাও স্বস্তের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে।

উত্তর কালে এই মতই পরিবর্তিত ও বিকশিত হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছে।

পরবর্তী প্রবন্ধে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

যদিও বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালার বাহিরে সম্মানিত হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীর নিজের দেশে বঙ্গসাহিত্যের স্থান বড় উচ্চে নয়। তাহার কারণ, সাহিত্যকে এখনও আমরা জাতির গৌরবের ভূষণ বলিয়া মনে করিতে শিখি নাই, ভূতের বোঝা মাত্র বলিয়া মনে করি। দেশাত্ম-বোধে এখনও আমরা উদ্বুদ্ধ হই নাই, সমস্ত জাতির প্রাণ এখনও এক সুরের লয়ে বাঁধা হয় নাই। দেশময় ভিন্ন ভিন্ন সুরের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ আহরণে ব্যস্ত। তাই এখনও আমাদের দেশে বঙ্কিম-অমূল্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের দিন দেশময় সাড়া পড়িয়া যায় না।

সেইজন্য আজ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে গেলে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিতে হয়। তাঁহাদের ঠিকভাবে দেখিবার সময় কি হইয়াছে, জাতির তথা দেশের প্রাণের সহিত তাঁহাদের যোগ কি সম্পূর্ণ-

ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে? না, এখনও কালাবসরে আরও ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ হইবে, এবং তখনই তাঁহাদের আলোচনার উপযুক্ত সময় হইতে পারে? এ কথার বিচার করা বড় কঠিন। এখন ভবিষ্যতের কাজ ভবিষ্যতের জন্ত রাখিয়া তাঁহাদের প্রভাব ও রচনাবলী আমাদের জীবনে যে স্থান পাইয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাইতে পারে।

নিতান্ত আদি ছাড়িয়া দিলে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের কাজ ছিল রাজসভার স্তুতিগান ও গৃহস্থের ঘরের কথা বলা। আমাদের দেশের সাহিত্য যেমন domesticated বা ঘরের ভাবে অমূল্য-প্রাণিত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোন দেশে তাহা হয় নাই। বাঙ্গালার কবিকুল হয় হুশেন শাহ ও রাজা রঘুনাথদের অবদান গাহিয়াছেন, না হয় চণ্ডী, মনসা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি গৃহরক্ষাকর্তা দেবদেবীর পূজাপাসনা

প্রচারের জন্য সরস্বতীর বরভিক্ষা করিয়াছেন। সমস্ত কৃষ্ণলীলাকে তাঁহারা এমন একটি অস্তরাক্রম ত মিলন-বিরহের ছাঁচে ঢালিয়াছেন যে স্বর্গকাম চিত্তও সে গান শুনিয়া গৃহের জন্য উন্মুখ হয়। চণ্ডীদাস এবং অজ্ঞাত-নামা বাউল কবিদের কয়েকটি mystic গান এবং পল্লী-কবিগণের স্থানীয় গাথা (ballad) ছাড়াই দিলে সমস্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এই ঘরোয়া কথায় ভরা, বাঙ্গালীর সংসার-চিত্র তাঁহাদের সাহিত্যে কল্পনার উজ্জ্বললোকে দেদীপ্যমান। সেখানে রাজপুত-সাহিত্যের চারণের গান নাই, মারাঠা-সাহিত্যের নিপুণ যুদ্ধগাথা নাই, তামিল কবিগণের ভজন নাই, জীবনের দুরাগত অনন্ত-সমুদ্র-কল্লোল নাই।

এই গৃহোপাসক, সৌন্দর্যালিপ্সু, ভাবপ্রবণ জাতির মধ্যে যখন সহস্রা উনবিংশ শতাব্দীর আলোড়ন আরম্ভ হইল, তখন অতি অল্প সময়ের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এত অল্প সময়ের ভিতরে এতবড় পরিবর্তন আর কোন জাতির ইতিহাসে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। বোধ হয় সমস্ত জাতির মন একটা পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল বলিয়াই এই পরিবর্তন এত সহজে ঘটিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশেও বিদেশীয়-সংঘাত-জনিত এই পরিবর্তন এত শীঘ্র সংঘটিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, জয়রাম প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর গুপ্ত বেশী দূরের কথা নয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই কেমন পরিষ্কার একটা ভেদ সূচিত হইয়াছে। কি কি নিগূঢ় কারণে এই পরিবর্তন ঘটিল ঐতিহাসিক তাহার বিচার করিবেন, সাহিত্যে তাহার যে ফল ফলিয়াছে আমরা শুধু তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। নূতন প্রবর্তিত বিদেশীয় শিক্ষা ও পুরাতন সমাজের সংঘর্ষে দেখিতে দেখিতে আমাদের জাতিত্বের উচ্ছেদ হইল। দেশের অন্তঃস্থিত একটা নিবিড় ক্রমাট মনের সাদা বন্ধ হইয়া গেল। ব্যক্তিগত চিন্তা ও স্ব স্ব জীবনের পারিপার্শ্বিক বিকাশের মধ্য দিয়াই সাহিত্য রচিত হইতে আরম্ভ হইল। এই পরিবর্তন যে ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়া গেল, তাহা এতদিন আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই, কারণ তখনও সে আলোড়ন হইতে

আমরা বাহিরে আসিতে পারি নাই। আজ কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া এই অকস্মাৎ পরিবর্তন বিশেষরূপেই চোখে পড়িতেছে।

এই যুগের প্রধান কবি ঈশ্বর গুপ্তই বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন। এই ঈশ্বর গুপ্তের লেখা পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার সমস্ত রস-রচনা, ভক্তির গান,—সমস্তেরই অন্তরে হয় ব্যঙ্গ, না হয় শ্লেষ। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের লেখা এত ব্যঙ্গপ্রধান কেন? যে কারণে মধ্যবর্তী যুগে রোমে জুভেনাল, পার্সিউস প্রভৃতি লেখকের আবির্ভাব, যে কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে (Satire) ব্যঙ্গরচনার প্রাধান্য, ঠিক সেই কারণেই ঈশ্বর গুপ্তও ব্যঙ্গপ্রধান। জাতির মনের একটা স্থিতি ছিল না, দু'এর মাঝখানে তাহা ছলিতেছিল। একধারে অপরিণত অবোঝা পশ্চিমের ভাব, আর-একদিকে ধ্বংসাবশিষ্ট দেশের মনের ভাব। উভয়ই তাঁহার কাছে সমান ব্যঙ্গের বিষয়, কারণ, কোনটাই তাঁহার কাছে কোন কাজের নয়। দুর্গোৎসবও তাঁহার কাছে ব্যঙ্গের বিষয়, বড়দিনও তাঁহার কাছে ব্যঙ্গের বিষয়। যেখানে তিনি নিতান্ত ভাবগাভীর্ঘ্যে টলটল করিতেছেন সেখানেও ভিতরে ভিতরে একটা 'Devil who cares' কুছ-পরোয়া-নেই-ভাব নিজের কবিতাতেই তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালায় তখন স্থায়ী গৌরবান্বিত সাহিত্যের অভাব হইয়াছিল। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতার এই পিচুড়ী হইতে দেশকে পরিজ্ঞান করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন,—স্বসঙ্গত, পরিষ্কার গল্পের ভাষা সৃষ্টি করিয়া। কিন্তু ভাষা সৃষ্টি করিতেই তাঁহার সময় চলিয়া গেল, বিষয় তিনি আর দিয়া যাইতে পারিলেন না। আলেয়ার আলোর মত নিজের জীবন জ্বালাইয়া মধুসূদন যে বাণীর আরাতি করিলেন, তাহাতে লোকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহার কবিগুরুগণের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার কবিতার আলোকে তাহারা মিল্টন্স দাস্তে-হোমারকে চিনিয়া লইল। তাঁহার দীপ জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। তখনকার সাহিত্য-কাননের

অঙ্ককার শাখায় শুধু একটি আখটি হতোমর্পেচার ডাক শুনা যাইতেছিল।

এই সময় বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চারিদিকের এই বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে আহরণ করিয়া সাহিত্যকে প্রথম স্থায়ী করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাকে স্থায়ী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহাকে ধীরে ধীরে গতি প্রদান করিলেন, বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত করিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র একা এ-সমস্ত কাজ করেন নাই। তাঁহার সহিত সেই সময়ে কৃতকর্মা বহু সহযোগীর মিলন ঘটিয়াছিল। নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু কৃতী লেখক তাঁহার সহিত বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যে এক এক যুগে এমন ঘটে, যে, একজন না থাকিলে আর সকলের থাকা রুখা হইয়া যায়। কিছু আগে বা পরে ষাহারা আসেন, তাঁহারা সকলেই মধ্যবর্তী একজনকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্যে সার্থকতা লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র না থাকিলে ইহাদের কাহারও কার্যই বেশ ঘনীভূত হইয়া একত্র-সম্বন্ধ কোন মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিত না। ফল-কথা, বঙ্কিমচন্দ্র না থাকিলে ইহারাও থাকিতেন কি না সন্দেহ।

এখন বুঝা যাইতেছে, এই সর্বতোমুখী প্রতিভাই তাঁহার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চারিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রালোচনায় সত্যই বলিয়াছেন, তিনি দশভুজার মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবিভূত হইয়াছিলেন, দশহস্তে তিনি বরাভয়াদি ধরিয়া একাধারে শত্রুনিষ্পেষণ করিয়াছেন এবং সাহিত্যের বল সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন একাধারে আতিবোধহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের অতীত ভুলিয়া পশ্চিমের নূতন নূতন চিন্তাধারা ও সাহিত্যকলারসে আপনাদের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল এবং অন্তর্দিকে সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ জনসাধারণ বাহিরের আকর্ষণে ভীত হইয়া আপনার কোণটিতে ক্রমশঃই অধিকতর অঙ্ককারের মধ্যে লুকাইয়া

চন্দ্রই 'মা ভৈঃ' স্বরে তাহাদের আহ্বান করিয়া একদলকে দেশের অতীতের দিকে ফিরাইয়াছেন এবং অন্যদলকে বাহিরের আলোর দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ষাহারা অভিনিবিষ্টচিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বোধ হয় দেখিয়াছেন, গান্ধীর্ষ্যই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং তাঁহার মুখচ্ছবিতেও তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অটল গান্ধীর্ষ্যই তাঁহাকে এই বিরূপ শক্তি দান করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অটল স্বৈর্ঘ্যের সহিত যতদূর সম্ভব তাহার ভাল মন্দ দুইদিক বিচার করিয়া, তাহার সৌন্দর্যকলা আহরণ করিয়া, সেই গুণে ও সেই কলায় দেশীয় চরিত্রকে উজ্জীবিত করা এবং দেশীয় সাহিত্যকে ভূষিত করা তখনকার দিনে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই পারিয়াছিলেন। অল্প অনেক মনীষী তাহার প্রবল নূতনতর টানে গা ভাসাইয়া দেশের মন হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের মূলে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্তন। যে সাহিত্যের ধারা পশ্চিমে তখন প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে তাহার সাড়া তখন আমাদের দেশে সবে মাত্র নূতন পড়িয়াছে। পশ্চিমেব সাহিত্যসমালোচকগণ ষাহাকে রোমাটিক্-মুভ্‌মেণ্ট নাম দিয়া থাকেন, বঙ্কিমযুগের সাহিত্যে তাহার দোষগুণ উভয়ই উজ্জলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বাঙ্গালায় রোমাটিক্-মুভ্‌মেণ্টের ফল-স্বরূপ বঙ্কিমযুগের সাহিত্য কখন আলোচিত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু তাহা না করিলে তাহার দোষগুণের সহিত সমস্ত প্রকৃতি যে ধরা পড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলেও আমাদের সেই সাহিত্যধারার ভিতর দিয়া তাঁহাকে প্রথম বুঝিতে হইবে।

ইউরোপীয় তথা ইংরেজী সাহিত্যে যে রোমাটিক্-মুভ্‌মেণ্ট প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেছে, বাহিরের প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার গূঢ় মিলন-চেষ্টায়। এই চেষ্টা যে সকল স্থলে সকল হইয়াছে

অনির্দেশিত দূর সৌন্দর্য্যে লুক্ক মন যখন প্রকৃতির সহিত মিলনের জন্ত ধাবিত হয়, তখন রাস্তার বহু খুঁটিনাটি তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। রোমান্টিক-মুভ্‌মেণ্টের লেখকগণেরও তাহাই হইয়াছিল। কেহ অতীতের মনোহারী পরীরাজ্যের মত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সেখানে গল্পের ঘুমন্ত রাজকুমারীর মত নূতন সৌন্দর্য্য-রাশিকে পাইয়া বাহিরের বিপুল জীবন হইতে তফাতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কেহ মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে গিয়া জীবনের নিবিড়তর পুষ্প-লঘু সৌন্দর্য্যরাশিকে তুলিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নগ্ন মানবাত্মার সহিত নিবিড়তম পরিচয় তাঁহারা প্রায় কেহই করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় সেই রোমান্টিক-মুভ্‌মেণ্টের শ্রেষ্ঠ সাধক। তাঁহার সমস্ত লেখাতেই প্রায় আমরা জাতির অতীত আলোচনা দেখিতে পাই। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যেও ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের অতীত-চিত্ররূপেই কবির মনে প্রথমে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের নায়ক-নায়িকার মানব-ভাগ্য তাহার পর তিনি চিন্তা করিয়াছেন। তাহার পর বাঙ্গালার সমসাময়িক চিত্র দিয়া বর্তমান সমাজের ব্যর্থতায় তিনি সেই অতীতের শিক্ষাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ইহার নিদর্শন। এবং পরিশেষে বাঙ্গালার অতীতের ভিতর দিয়া স্বকল্পিত ভবিষ্যতের পূর্ণতার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারামে। কপালকুণ্ডলা তাঁহার এই রোমান্টিক সাধনার চূড়ান্ত ফল। কপালকুণ্ডলার মত রোমান্স বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় লেখা হয় নাই। ইহার সমস্ত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার ইহা স্থান নহে, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার উপযুক্ত বটে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষেত্রে সিদ্ধির তাহা শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। ইহারা যে সকলেই ইউরোপীয় রোমান্টিক-মুভ্‌মেণ্টের ফল তাহার প্রধান প্রমাণ, ইহাদের সাধারণ নাম দেওয়া ঘাইতে পারে 'রোমান্স'। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত না হইলে

সাহিত্যে রোমান্টিক-মুভ্‌মেণ্ট না চলিলে আমাদের দেশে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'দেবী চৌধুরাণী'ও লেখা হইত না।

এই রোমান্টিক-মুভ্‌মেণ্টের প্রধান গলদ হইয়াছিল প্রকৃত সৌন্দর্য্য-বিচারে। যে বিস্তারশীল সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ আমাদেরকে আপনা হইতে দূরে লইয়া যায়, রূপ হইতে টানিয়া অপরূপের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, সেই সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া বা না বুঝিয়া রোমান্টিক লেখকগণ শুধু রূপ-যাহা পটে প্রতিভাত হইতে পারে, তাহাতেই বেশী মজিয়া-ছিলেন, Beautiful ছাড়িয়া Picturesque এর জন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। রোমান্টিক লেখকগণের অতীত সাধনা তাঁহাদের Medievalism, তাঁহাদের দরিদ্র জীবনের সহিত সহানুভূতি, সমস্তের ভিতরেই সেই নিগূঢ় গলদটি দেখা দিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব তাঁহাতেও এই দোষ কিয়ৎ পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। তাঁহার কপালকুণ্ডলা, মুণালিনী, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের মধ্যে ইহা বহু পরিমাণেই সংক্রামিত হইয়াছিল। রমেশ-চন্দ্রের রাজপুত-জীবনসঙ্ঘা, মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত, মাধবীকরণ প্রভৃতির ঘটনাবলী মনে করুন। পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে অনেক স্থলে এইসকলের কৃত্রিমতাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন 'তখন আমার গল্পের নায়ক .সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রাজকুমারীকে লইয়া দুর্গের বাতায়ন হইতে স্বাম্প প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিল' ইত্যাদি।* তাঁহার এই গভীর শ্লেষ বুঝিতে আর কাহারও বাকি থাকে না। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং অন্যান্য কবিতাবলী, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, এবং অন্যান্য বহু নিবন্ধকারের লেখা প্রকৃত রস বা সৌন্দর্য্যবোধ হইতে ততদূর উদ্ধূর হয় নাই, যেমন একটা অপ্রাকৃতিক বা প্রকৃতি-বহির্ভূত জীবনানুমান ও তজ্জনিত রূপপ্রকাশ-চেষ্টা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই চারিধারের স্বতঃ-উৎসৃত জীবনকে রসের আকারে না ধরিয়া তাঁহারা একটা

* রাজপুত-জীবনসঙ্ঘা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, দশম বর্ষীয়

অতীতের জীবন বহুনা করিয়া তাহাকে নানাভাবে সাজাইয়াছিলেন। ইহা যে প্রকৃত জীবনের উচ্ছ্বাস নয় তাহার প্রমাণ ইহা কখন অন্তর্মুখী হয় নাই। চিত্রের মত তাহা সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু জীবনের মত নিবিড় রসোৎসারী হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্ররাজি দেশকালহীন মানবাত্মার পদবী ত লাভ করিতেই পারে নাই, কোন কোন স্থলে সাধারণ মানব-মানবীর পদও পায় নাই; যেমন 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ ও শৈবলিনী, 'কপালকুণ্ডলায়' স্বয়ং নায়িকা, 'সীতারামে' রূপসী সন্ন্যাসিনী স্ত্রী। কেবল অনির্দেশ্য কোন গল্পলোকের উচ্চতম স্তরে বসিয়া দেখিলে তাহার পামাণের কারুকার্যের মত সুন্দর দেখায়, আপাত-দৃষ্টিতে জীবন্ত বলিয়া ভ্রমও হয়, পবন স্থিভাবে দেখিলে শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দেয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে জীবনের উত্তাপের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি শুধু উপন্যাস-রচনাতেই পর্যাবসিত হয় নাই। শুধু তাহা হইলে, তাহার স্থান আমাদের জাতির জীবনে এত উচ্চে হইত কি না সন্দেহ। আমরা বলিয়াছি, তাহার প্রতিভার বিশেষত্ব তাহার সর্বতোমুখিতা। তিনি যেমন রস-সাহিত্যে ইউরোপীয় রোমান্টিক মুভ্‌মেণ্টের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তেমনি ধর্ম-ও সমাজ-তত্ত্বালোচনার ভিত্তি দিয়া তিনি ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও সমাজ-তথ্যের বহু সমস্যা আমাদের জীবনের মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার বিরামহীন চিন্তারাশি দেশের জীবনধারাকে বহুদিকে বহুভাবে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার পর তিনি যেভাবে উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, মুর্থ সকলের জীবনের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে শুধু লেখনী-সহায়ে নূতন নূতন মত ও নূতন নূতন চিন্তা দেশের মধ্যে প্রচার করিতেছিলেন, তাহাতে তাহাকে সত্যই তখনকার দিনের অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সাহিত্য-সম্রাট বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাঙ্গালীকে এবং তাহাদের সহিত ভারতবাসীকে বর্তমান জগতের উপযোগী করা। সাহিত্যকে যেমন তিনি স্থায়ী আকার দান করিয়া পরে নূতন নূতন প্রতিভাশালী লেখকেব

অভ্যুদয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, ধীবে ধীবে যেমন একটি নূতন সাহিত্যের ধারা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তেমনই জাতীয় জীবনকেও তিনি স্থায়ী ও নূতন-ভাবে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা তাহাই ঘটিয়াছিল, সাহিত্য যেমন একধারে জাতির জীবনাদর্শে গঠিত হইতেছিল, তেমনি জীবনও সাহিত্যের নূতন নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত অল্পপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছিল। সাহিত্য ও জীবনের এই reaction পরস্পরাপেক্ষিতা বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতিভার, তাহার ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রামমোহন রায়েব মত যদিও তিনি সমাজ- বা ধর্ম-সংস্কারকরূপে কাব্যক্ষেত্রে নামেন নাই, তথাপি পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর ধর্মমত-গঠনে তখনকার দিনে তাহার প্রভাব বড় কম ছিল না। কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্মতত্ত্ব বা অন্তর্শীলনতত্ত্ব নাম দিয়া তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সমাজ-গঠন ও আদর্শ-নরনারী-চরিত্র-গঠনের সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহা সেকালে অনেকেরই চক্ষে সমাজ- ও ধর্মমত-গঠন সম্বন্ধে একেবারে নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছিল। আজ কালের ব্যবধানে আমরা তাহার বহু খুঁত, বহু অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তখনকার লোকে তাহাকেই জীবনের নূতন আলোক ভাবিয়া অনুসরণ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ- বা ধর্মমত-গঠন সম্বন্ধে কোন নূতন কথাই বলেন নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ এবং তৎকালবর্তী সময়ে ইউরোপে কাল্‌চার-বাদ লইয়া মহাদ্রুম পড়িয়া গিয়াছিল। একধারে কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত, অগ্ৰধারে পজিটিভিষ্ট-বেদের প্রধান পুষ্টি অগুস্ত্‌ কং মানুষের সর্বাঙ্গীণ পরিণতির উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। ইংলণ্ডেও এই আলোচনার মাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং ম্যাথু আরনল্ড-প্রমুখ বহু মনীষী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ইহার সমাধান-চেষ্টা করিতে- ছিলেন। জাতিত্বের উচ্ছেদে আমাদের দেশে মনুষ্যত্ব তখন সত্যই বড় সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিয়াছিল। দু'পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার একটা আইডিয়া-বা মনোরত্তি-বিকাশের আশ্রয় ছিল না। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের

গভীর হৃদয়ে মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উত্থিত হইল। এই কালচার-বাদ সেই সময়ে তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি এই উপলক্ষে কতক আমাদের প্রাচীন দর্শনের তথ্যগুলিকে ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া, কতক হার্কার্ট-স্পেন্সার প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকগণের মত বিচার করিয়া, পজ্জিটিভিজ্‌ম্ ও সাংখ্যের এক খিচুড়ি তৈয়ার করিয়া অনুশীলন-তত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্ব নাম দিয়া বাহির করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাতে ভুলিয়াছিলেন, এখন আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। গীতার নিকাম ধর্ম ও কর্ম এবং অনুশীলন-তত্ত্বের কালচার (ইহা যে প্রকৃত পক্ষে কালচার-বাদই, যদিও তাহাতে দর্শনের ছোপ লাগান হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি কালচার কথাটি এড়াইবার বহু চেষ্টা করিয়াও এড়াইতে পারেন নাই, শেষে তাঁহাকে ইংরেজি অক্ষরে কালচার কথাটাই বসাইতে হইয়াছে) যে একই জিনিষ ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মতে আদর্শচরিত্র কৃষ্ণের জীবনে যাহা সফল হইয়াছিল, তাহা আদর্শান্বেষী মানুষের সম্মুখে স্থাপিত করিলে তাহা দ্বারাই তাহারাও সফলতা লাভ করিতে পারিবে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কথা। মানুষ যে কলের পুতুলীর মত আদর্শানুসারে সফলতা লাভ করিতে পারে না ইহা তিনি একেবারেই ভাবেন নাই। ইহা দ্বারা সার্থকতা আসিতে পারে না এমন কথা নয়, কিন্তু ইহার বাহিরেও যে সার্থকতা আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু সে সময়কার নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার মধ্যে ক্ষণেকের জন্ত ইহা একটি উচ্চ ও সরল আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই উপায়েই তিনি তখনকার মত জাতির অতীত চেষ্টার সহিত বর্তমান চেষ্টাকে বাধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার যাহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ বর্তমান বাঙ্গালীজাতিকে তথা ভারতবাসী জনসাধারণকে বর্তমান যুগের উপযোগী করা, তাহারই পোষকতা করিবার জন্ত তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও অনুশীলনতত্ত্ব রচনা এবং প্রচার করেন। তিনিই একরকম বলিতে গেলে বর্তমান বাঙ্গালায় আধুনিকতা বা modernismএর প্রথম প্রবর্তক।

রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে তাঁহার পুরকমাত্র, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্ভাবিত পথে তিনি এই জাতির হৃদয়কে বিশ্বজনের পথে মিলাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত লেখার ভাবেই আমরা তাঁহার এই আধুনিকতা-প্রবর্তনের চেষ্টা দেখিতে পাই। তিনি তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থে যে জাতির অতীত-চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, সে শুধু গল্পের প্লট বা আখ্যায়িকাভাগের সঙ্কলন জন্ত মাত্র নহে। প্রাচীনের যে আভা নূতনকে উজ্জ্বল করে, তাহাকে শুধু ছায়ায় ঢাকিয়া রাখে না, সেই প্রাচীনতাকে তিনি উজ্জীবিত করিয়াছিলেন নূতনকে গৌরবান্বিত করিবার জন্ত। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় অতীতের ভিতর দিয়া তাঁহার চক্ষু পড়িয়াছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে, বর্তমান যেখানে সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। জাতির নবজাগরণ-সূচক যে ‘বন্দেমাতরং’ ধ্বনি উষার বিহগকাকলীর মত তাঁহার কণ্ঠে জাগিয়াই মিলাইয়া গিয়াছিল, আজ যদিও তাহা কয়েক সহস্র লোকের অলসতার আবরণমাত্ররূপে পর্ষাবসিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি অহত হইয়া নাই। কোন শুভ মুহূর্ত্তে তাহা লক্ষকণ্ঠে মঙ্গলধ্বনিক্রমে আবার বাজিয়া উঠিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের পুরক এবং সাহিত্য-সাম্রাজ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ধরিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিলে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বুঝান যায় না। রবীন্দ্রনাথ যদিও এখনও লিখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। নূতন পথ আর তিনি দেখাইতেছেন না। এখন তাঁহার কাজের বিচার করিলে বোধ হয় অগ্রায় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ তাৎকালিক ইউরোপ হইতে উপকরণ-সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যে বিচলিত করিয়া তাহাকে বর্তমান-সময়োপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মের অন্তরালে যে বিশ্বমনের খেলা চলিতেছে তাহার সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিয়া তাহারই বিকাশ দেখাইয়াছেন স্বরচিত সাহিত্য-এবং সমাজতত্ত্ব-আলোচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে স্বদেশীয় সাহিত্য সমাজ ও ধর্মমত গঠনের প্রয়াসে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া

গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আরও উর্ধ্বে, আরও আগে চলিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বসাহিত্যরাজ্যে বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ শুধু বৃথা গর্বের, parochial pride বা দেশ-শ্লাঘার কথা নহে, ইহা না নির্দেশ করিলে রবীন্দ্রনাথের কৃতকর্মের ফল বিচার করা সম্ভব হইবে না। তবে, তাঁহার সমস্ত কাজের বিস্তৃত আলোচনাও এখানে সম্ভব নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় যখন ইউরোপের পঞ্চাশ বৎসর আগেকার রোমান্টিক মুভমেন্ট প্রথম বাঙ্গলা দেশে আসিয়া নূতন রস ও কলাসৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনি পরবর্তী যুগের ইউরোপের Neo-Romanticism, Naturalism, Impressionism এবং Symbolism এর প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা বলিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কিছুমাত্র নিন্দা নাই, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, ইউরোপের নূতন নূতন প্রবর্তিত চিন্তা ও সৌন্দর্যরসধারায় বিশ্বমনের যে খেলা চলিতেছিল তাহা হইতে তিনি পিছাইয়া যান নাই, বরং আরও আগাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য-প্রবন্ধ মন ইউরোপীয় কবি ও সাহিত্যিকগণের অনন্তভূত অনেক পথেও সৌন্দর্য ও রস আহরণ করিয়াছে। তিনি শুধু Naturalism এর শুষ্ক উষ্ণতায় পথ হারান নাই, photographic truth প্রকৃতির ছব্ব নকলের মধ্যে মানবের চিরন্তন সৌন্দর্যপ্রকাশ-চেষ্টা বিসর্জন দেন নাই। যখন তিনি জীবনের কোন খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তখন তাঁহার চোখ পড়িয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত রসে। হাউপ্টম্যানের মত তিনি শুধু জীবনের কাঠাম মাপিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই। তাহার রসও অন্তর্ভব করিয়াছেন। তিনি Neo-Romanticism বা Impressionism এর আবির্ভাব গা ভাসাইয়া জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ভুলিয়া যান নাই। তাহাকে জীবনের অপেক্ষা অধিক স্ফূর্ত করিতে গিয়া অপ্রকৃত ছায়াময় জীবন গড়িয়া তুলেন নাই। তিনি আপনার হৃদয়-নির্দিষ্ট পথে সৌন্দর্যের তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, কেবল মাঝে মাঝে দুরাগত লোকান্তরের

আলো তাঁহারও পথে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু একটি পথে কখনও তিনি আপনাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি কখনও objective world বা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ‘বিষবৃক্ষের’ প্রথমে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রির কথা মনে করুন,—

“আকাশে মেঘাডম্বর-কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই যনাক্তমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রাস্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপীসকল, সহস্র-সহস্র-খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের স্থায় শোভা পাইতেছিল। কেবল মাত্র গর্জনবিরত শ্বেত-কৃষ্ণাভ মেঘ মালার মধ্যে হৃদয়ীর্ণ সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল। স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হাস প্রাপ্ত হয় না। কেবল মাত্র নববারি সমাগম-প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার স্থায় অশ্রান্ত রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে, বৃক্ষাশ্রয় হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বসাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বসাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুর পতনশব্দ, অনিঃসৃত জলে গুগাঙ্গের পদসঞ্চারণ-শব্দ, কচিং বৃক্ষাক্রম পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল-মোচনার্থ পক্ষ-বিবুনন-শব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দুসকলের এককালীন পতনশব্দ।”

‘চন্দ্রশেখরে’ শৈবলিনীর পর্কতবাস মনে করুন,—

“এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাডম্বর করিয়া আসিল। রক্তশূণ্য, ছেদ-শূণ্য, অনন্ত বিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকার-মাত্রায়ক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রসূর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। * * * * * তুমি জড়প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, গ্ৰেহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্রেশের জননী,—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি, তুমি সর্বস্বপের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণ-কারিণী, সর্বাস্বন্দরী, তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী, নানারূপ-রঞ্জিনী! কালি! তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্র-কিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া ভুবন মোহিয়াছ, গঙ্গার ক্ষুদ্রোশ্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র বুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে কত স্থখে যুবক-যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে। যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি! তুমি অবিধাসযোগ্যা সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না,—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই, কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকর্তা, সর্বনাশিনী, সর্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজ্ঞেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!”

কপালকুণ্ডলার সমুদ্রসৈকতে সন্ধ্যালোকে আবির্ভাব মনে করুন,—

“ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর

পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা ; সুপৌকৃত বিমল-কুমুদাম-
গ্রথিত মালার স্তায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে স্তম্ভ
হইয়াছে, কাননকুমুদা ধরণীর উপযুক্ত অলকাতরণ, নীল-জলমণ্ডল-
মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও
এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা
সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাশ্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে,
তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে
অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত
সুবর্ণের স্তায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতিব
সমুদ্রপোত স্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর স্তায় জলধিঙ্গদয়ে
উড়িতেছিল। * * * পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল
জলের উপব বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম
সন্ধান করিয়া লইতে হইবেক। দীর্ঘনিঃশ্বাস ভাগ করিয়া গাত্রোথান
করিলেন। * * গাত্রোথান করিয়া সমুদ্রেব দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন।
ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্বমূর্তি ! সেই গম্ভীরনাদি বাবিধিতীরে
সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। * *
মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায়
না। অর্কচন্দ্রনিঃসৃত কোমুদীবর্ণ, ঘন কৃষ্ণ চিকুবঙ্গাল, পরস্পরের
সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েবই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল,
তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার
মোহিনীশক্তি অন্তর্ভূত হয় না।”

এখন, সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বহিঃপ্রকৃতি ভেদ
করিয়া বন্ধিমচন্দ্র এক পা’ও ভিতরে যান নাই।
ইংরেজীতে রোমাণ্টিক বলিলে (রোমাঞ্চকর বলিলেও
বলিতে পারেন) যাহা বুঝায়, তাহাতে তিনি সিদ্ধ-
হস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বই এইখানে যে তিনি
বহিঃপ্রকৃতি হইতে একেবারে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে
চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন বাঙ্গালার শ্যামলমাঠ
পল্লীবাট খেয়াঘাটের কথা বলিতেছেন, তখন তিনি শুধু
বাঙ্গালার পল্লীশ্রী দেখিতেছেন না, তিনি তাহাদের
ভিতর দিয়া সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য অন্তর্ভব করিতেছেন।
তাহাদের অন্তরলীন যে সৌন্দর্য্যরাগ তাহাদিগকে বিশ্ব-
প্রকৃতির অন্তর্গত করিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যরাগই তাঁহার
চেতনাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ‘সোনার
তরী’ তাঁহার ‘পসারিণী’ তাঁহার এমন শতক কবিতা তাই
এমন অজানা, weird সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।
তাঁহার সমুদ্রতীরের কলগর্জ্জনধ্বনির অন্তরালে যে
অনন্ত নীরবতার চেতনা, নৈশাকাশের নক্ষত্রমালার
দীপ্তি হরণ করিয়া যে বিরাত্ অন্ধকারের অন্তর্ভূতি সে
কেবল সেই বিশ্বপ্রকৃতির চেতনা-সমুদ্ভূত। বন্ধিমচন্দ্রে
ও রবীন্দ্রনাথে এইখানে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন এই বহিঃপ্রকৃতি ভেদ
করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান করিয়াছেন, অত্রদিকে
তেমনি অবস্থা দেশ কাল লঙ্ঘন করিয়া নগ্ন মানবাত্মার
নিবিড় প্রচেষ্টা অঙ্কিত করিয়া মানবজীবনের উচ্চতর
স্বার্থসমূহের বিকাশ দেখাইয়াছেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে
বাঙ্গালায় মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের Psychological
Novelএর জন্মদাতা বলেন। ইংরেজীতে যাহাকে
psychological novel বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহা
লেখেন নাই। তাঁহার লেখা অনেক সময় psycholo-
gical novelএরও গণ্ডী কাটাইয়া উচ্চতর ভাবে অমু-
প্রাণিত হইয়াছে। ‘গোরা’ তিনি যাহা আরম্ভ
করিয়াছিলেন, ‘ঘরে বাইরে’তে তাহার একাংশের পরিণতি
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভূতি ও বন্ধিমচন্দ্রের
আখ্যায়িকা রচনার ব্যবধান তাঁহার ‘গোরা’তেই স্পষ্ট
বুঝা যায়। একজন আইরিশ শিশু বাঙ্গালীর ঘরে
পালিত হইয়া যে সমাজের ও জীবনের নূতন নূতন
সমস্কার সমাধানের চেষ্টা করিবে, ইহা নিতান্তই আড়ম্বরহীন
আখ্যায়িকা। একজন আখ্যায়িকাকার ইহাতে কখনই
সম্বলিত হইতে পারেন না। যিনি জীবনকে শুধু বাহির
হইতে দেখেন, তাহার Pomp এবং Show, আড়ম্বর ও
জমক যাহার চোখে রাজশোভাযাত্রার চমক লাগাইয়া দেয়,
তিনি জীবনের অন্তরালে নিরাবরণ নগ্ন যে মানবাত্মা—
যাহার শুভাশুভের কল্পনায় বিশ্বজগৎ ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গি-
তেছে ও গড়িতেছে, তাহার খোঁজ রাখেন না। তেমন
কোন আখ্যায়িকাকার যদি এই আইরিশ যুবকের ভাগ্য-
বিধাতা হইতেন, তবে তিনি হয়ত বন্ধিমচন্দ্রের ধরণেই
গ্রন্থের কতক দূরে তাহার পিতা মাতা বা আত্মীয়স্বজনকে
হাজির করাইয়া অশ্রুজলাভিষিক্ত দৃশ্যে “আমি ‘Pat’ বা
‘Tom’ ” বা ওইরূপ কিছু একটা মিলন ও পরিচয়ের
দৃশ্য আনিয়া ফেলিতেন, কত আয়াল্যাণ্ডের জন্ত
চিন্তা, কত জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে গল্পের পূর্ণতা
সম্পাদন করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে
যে নগ্ন সুন্দর মানবাত্মার ছবিটি প্রতিভাত হইয়াছে, সে
কি সে গল্পের নায়ক হইতে পারে? সে যে আপনার



“বিসজ্জন” নাটকের অভিনয়ে
জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

U. Ray & Sons, Calcutta

তাহার ঘটনাচক্র! ললিতা ও সূচরিতা, বিনয় ও গোরা তাহারা যে জীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আপনাদের লাভ করিতেছে, নাই সেখানে কল্পিত ঘটনার দ্বন্দ্ব, নাই মিথ্যা হা হতাশ, অজ্ঞাত দেশের জগু জল্পনা-কল্পনা।

‘ঘরে-বাইরে’তে রবীন্দ্রনাথ আরও উচ্চে উঠিয়াছেন। ‘গোরা’ যে ছবি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল, সেখানে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আমাদের সংসারে, সমাজে, দেশে, এই ঘরে-বাইরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। আমাদের স্ব স্ব জীবনেও এই ভিতরে-বাইরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ভিতর চায় এক রকম, বাহিরের দাবী অন্তরূপ। ঘরের জগু কি বাহিরের দাবী ছাড়িতে হইবে, না বাহিরকে ছাড়িয়া ঘরের জগু আত্মোৎসর্গ করিব? এ এক কঠিন সমস্যা। ছু’য়ের সামঞ্জস্য কি হয় না? রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশকে দিয়া দেখাইয়াছেন, মানুষ স্বীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ছু’য়ের দ্বন্দ্ব সে সহজে মিটাইতে পারে। বাহিরের আকর্ষণে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয় তাহার সমাধান একদেগুই হইয়া যায়, যখন আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্থির হইয়া কেহ সে গোলযোগকেও আপনার করিয়া লইতে পারে। দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এই যে বাহিরের ও ঘরের দ্বন্দ্ব, এরও সমাপ্তি হয় সেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানবাত্মার বিকাশে। যখন মোহ, লোভ, স্বার্থ, এসবের উপর করুণা তাহার কোমল মাতৃহস্ত বুলাইয়া যায়, তখন দেশ ও সমাজ চলিয়া গিয়া শুধু অন্তরের এক অসীম তৃপ্তিতে সব ভাঙ্গা জোড়া লাগিয়া যায়, সব কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব কি থামিবার? এ যে শুধু মানবাত্মার বিকাশের একটা উপলক্ষ্য। চিরকাল এ দ্বন্দ্ব চলিবে এবং চিরকাল মানবাত্মা তাহার উপর জয়লাভ করিবে। ‘ঘরে-বাইরে’ ‘Sex duel’ বা যৌন দ্বন্দ্ব আছে, ‘anacrhism’ বা বৈরাজ্য-তত্ত্ব আছে, বাংলার এবং জগতের সমসাময়িক চিন্তাধারার বহু ছায়াপাত আছে; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহাই তাহাব অন্তর্নিহিত কথা।

এই নগ্ন মানবাত্মার বিবৃতিই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও বহু উর্দ্ধে। তাঁহার বিশেষরচিত গ্রন্থাবলীতে এই জীবনের রস টলটল করিতেছে। বাহিরের-চিন্তা-মুক্ত মানবাত্মা

জীবনের পথে অনন্তের তীর্থযাত্রা করিয়াছে। তাঁহার ছোট ছোট গল্পরাশিতে ইহার প্রথম আরাভ হইয়াছিল। তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে একটি ছোট পুকুর-ঘাটের দৃশ্য, গ্রামের ধারে নদীতীরের পিছল পথ, ছায়াঢাকা আঙ্গিনায় গৃহস্থবধুর চলাফেরা, ঘাটের ধারে নৌকা বাঁধা, পদ্মার বক্ষে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঙ্গালার প্রান্তরকোড়শায়িত সহস্র পল্লীগ্রামের এমন সহস্র সহস্র দৃশ্যে যে একটি অপূর্ণানুভূত ভাব সহসা মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, তিনি তাহারই কায়া রচনা করিয়াছিলেন। যিনি সেগুলিকে শুধু বাঙ্গালার পল্লীজীবনের নিখুঁত ফোটো বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি তাহাদের অর্ধেক সৌন্দর্য্য অশ্রুভব করেন নাই। মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন সৌন্দর্য্যপিপাসু চিত্ত বসিয়া আছে, যে তাহার নূতন আলোকে কুৎসিতকে সুন্দর করে, আবার সুন্দরকেও কুৎসিত করিতে পারে, সেই চিত্ত বিবাহীর মত যাহাকে খুঁজিয়াছে, তিনি সেই সৌন্দর্য্যদেবতার পদে অর্ঘ্য দিয়াছেন কৰ্দমাক্ত পল্লীপথের ছবিতে, নিশীথ রাতের জোনাকির আলোতে, ছেঁড়া-জামা-পরা ছেলের হাসিতে, মুখরাবধুকৃত স্বামী-তর্জ্জনে। মানুষ তখনও তাঁহার কাছে বাহিরের একটি ভাবের পটভূমিকা (Background), প্রতিচ্ছায়াফলক মাত্র। তার পর ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি আরও উন্মুক্ত হইয়াছে। ঘনীভূত সেই ভাবরাজ্যের উপরে তিনি মানবাত্মার গৌরব অন্তর্ভব করিয়াছেন, ভাবের ক্ষণিকতা ভেদ করিয়া তিনি মানবাত্মার অনন্ততা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং মানুষের সেই চিরন্তন সৌন্দর্য্যলিপ্সাকে বিকশিত মানবাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রে যেমন আমরা দেখিয়াছি, তাহার অটল গাভীর্ঘ্যই—Vigour বা ওজঃ তাঁহার সাহিত্যশক্তির মূল, তেমন রবীন্দ্রনাথে তাঁহার মোহনীয়তা, সৌন্দর্য্যবোধ, জীবনের পেলব রসানুভূতিই,—Delicacy, fineness সূক্ষ্মাব সূক্ষ্ম কারুকাষ্য—সতত চঞ্চল, নব নব রূপে বিকশিত। তাঁহার উপন্যাস ও সমাজ-তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা তাঁহার কাব্যগ্রন্থে ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। জীবনের অসীম সৌন্দর্য্যকে তিনি রূপের আকারে ধরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে স্বরের

মাঝে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যখন আমরা বাহিরের রূপের দিকে চাহি, তখন নর, নারী, আলো, ছায়া, আকাশ, তরু, গিরি, নদী, ফুল, ফলের ভিন্ন-ভিন্নতার মাঝে হারাইয়া যাই, বড় জোর তাহাদের সমাবেশ-সামঞ্জস্য মাত্র দেখিতে পাই। কিন্তু সেই বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত বহিদৃশ্যের মাঝে যে একটি একটানা সৌন্দর্যের ধারা বহিতে থাকে, যাহা বাহিরের সকল পৃথক সত্তাকে এক করিয়া, ঘনীভূত করিয়া, তাহার মাঝে থাকিয়াও তাহাকে মিলাইয়া লইয়া স্বতন্ত্র বিকাশ লাভ করে, সেই সৌন্দর্যধারাকে ধরিতে হইলে আমাদের অন্তরকে শুধু বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিলে চলে না, তাহাকে বাহির হইতে ভিতরে লইয়া আসিতে হয়, ক্ষণিকতার অন্তরাল হইতে অনন্তের মাঝে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। তখনই প্রকৃত সৌন্দর্য-ভোগ সম্ভব। এই সৌন্দর্য-ভোগ অনন্ত ক্ষণে অনন্ত রূপে আমাদের জীবনে দেখা দিতেছে। জীবন তাহারই অনন্ত লীলায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ হইতে শব্দে, শব্দ হইতে বর্ণে, আবার বর্ণ শব্দানুসারিণী চিন্তার গূঢ় উত্তেজনায় ইহা আমাদের জীবনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন রূপে দেখা দিতেছে, জীবনকে নূতন শক্তি প্রদান করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই গূঢ় আশ্বাদ লাভ করিয়াছেন, যখন তিনি গাহিতেছেন,—

“স্বরের আলো জীবন ফেলে ছেয়ে,
স্বরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পামাণ টুটে’ ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় স্বরের সুরধূনা।”

যখন তিনি জানাইতেছেন ‘স্বরের আসন পাতিয়া
তাঁহার জীবনেশ্বরকে বসাইবেন,’ যখন শত বিচিত্র বর্ণে
গন্ধে এই ধরণীর পানে চক্ষু মেলিয়া উদ্বেল হইয়াছেন,

তখনও তিনি সেই জীবনেরই রসাস্বাদন করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ, সমস্ত জীবন একটি ছন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বরের মধ্যে লয় হইয়া যাইতেছে, আবার সেই স্বরের লয়ে সন্ধ্যামেঘে রং ধরিতেছে, আকাশে ভোরের আলো ফুটিতেছে। স্বর ও রূপ তাঁহার কাছ এক অভিন্ন লয়ে গ্রথিত মহাজীবনের সৌন্দর্যের বিকাশ মাত্র। কখনও তাঁহার অন্তরের গভীর পিপাসা বাউল কবিদের সহজ সরল উচ্ছ্বাসে বাজিয়া উঠিয়াছে,—“কইতে যে চাই, কইতে কথা বাধে,” “দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার,”—আবার কখন ভাবগম্ভীরহৃদয়ে প্রকাশের অতীত-প্রায় চেতনার ভাষায় গাহিয়াছেন,—

“বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোণায় ভাবি তাই ॥
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার,
পরাণনখা, বন্ধ হে আমার।

ভারতের প্রাণস্বরূপ সেই প্রাচীন বৈদিক ঋষিরই মত তিনি উদাত্ত অমুদাত্ত স্বরে, মেঘপাটল বন-নীল প্রকৃতির অন্তর-গহনে জীবনাতীত এক পূর্ণ জীবনের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তিনি বৈদিক ঋষিরই মত রহস্য মন্ত্রের উপাসক, রহস্যবাদী ঋষি, Mystic। এ যুগের কামরোল ও ধূলা-বালিকে তিনি সেই একই মন্ত্রে মহান্ জীবনরহস্যের স্বরে বাঁধিয়া দিয়াছেন। এ যুগ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে চাহিলেও করিতে পারিতেছে না।*

শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* [চট্টগ্রাম কলেজ রিসার্চ সোসাইটির পাব্লিক অধিবেশনে পঠিত]

উৎসাহ

শান্তিবাদের পক্ষে ভালকম ওকালতি করিয়া এমাসন শেষে বলিতেছেন :—

“If peace is sought to be defended or preserved for the safety of the luxurious or the timid it is a sham and the peace will be base. War is better and the peace will be broken ”

অর্থাৎ, বিলাসী ও ভীকদের সুবিধার জন্মই যদি শান্তি কামনা করা হয় তবে সেসকম শান্তির মূল্য কিছুই নাই। তেমন শান্তি মানুষের অন্তরাআকে হীনতাপন্ন করে। তাহা অপেক্ষা সংগ্রামই শ্রেয়স্কর; এবং মানুষ দুদিন আগে পরে এমন শান্তির ব্যর্থ চেষ্টা পরিহার করিবেই।

আসলে কথা এই,—যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়; colonial self-governmentও নয়; পূরাপূরি independenceও নয়; মানুষের যাহা অন্তরতম আকাঙ্ক্ষার বিষয় তাহা হইতেছে সুন্দর জীবন, মহত্ব। ভোগকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে জীবনে যে সঙ্কচিত ভাব আসিয়া পড়ে, সুখের উপকরণ যাহা আছে তাহা পাছে হারাইতে হয় এই আশঙ্কায় কর্তব্যের পথে চলিতে গিয়া যেই কুণ্ঠিত দৌর্ভল্যে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, সেই কুণ্ঠা, সেই বীৰ্যহীন সঙ্কোচ হইতে মুক্ত জীবনযাপন করাই মানুষের সর্কাপেক্ষা বড় গরজ। সুখস্পৃহা এবং দুঃখকে এড়াইয়া চলিবার আকাঙ্ক্ষাই মানবাত্মার স্বাধীন স্ফূর্তির পথে প্রবল অন্তরায়। এই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিই মানুষকে একান্তভাবে বহিঃশক্তির অধীন জন্তুজীবনের উর্দ্ধে উঠিতে দেয় না। এই হেতু, ভারতবর্ষের সর্কশ্রেষ্ঠ ধর্মো-পদেষ্ঠা বলিতেছেন :—“কৈব্যাং মাস্ম গমঃ”। আর যাহা কর কিম্বা নাই কর বীৰ্যহীনতাকে পরিহার করিতে হইবে; তাহাই হইতেছে সর্কাপেক্ষা অধম হীনতা। শান্তি ভাল জিনিস, নিষ্ঠুরতাও আদরণীয় নয়, কিন্তু তাই বলিয়া নীচতাকে স্বীকার করিবে? আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে! সে ত কিছুতেই হইতে পারে না! আরামের জন্ম ও ভোগবিলাসে জীবন কাটাইয়া দিবার জন্ম, হৃদয়কে কর্তব্যের কঠোরতা

হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছায় যদি শান্তি চাও, তবে দিক্ সে শান্তিকে—সে শান্তি তোমাকে হারাইতেই হইবে।

“লাগেনাকো কেবল যেন
কোমল করুণা!
মৃহু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ কোরোনা।”

মানুষের ইহাই গভীরতম প্রার্থনা; এই প্রার্থনার উত্তরে ভগবান যেরূপে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকে দেখা দেন তাহা দেখিয়া অর্জুন বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—

‘লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা-
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈশ্চ লিঙ্গিঃ
তেজোভিরাপূর্ধ্য জগৎ সমগ্রং
ভাসন্তবোগ্রা প্রতপন্তি বিক্ষো।’

মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্ম এই উগ্রতেজা দেবতার উপাসনা করিতে হইবে,—ইহার অনুশাসন মানিধা বুক শক্ত করিতে হইবে,—“ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ভল্যং” ত্যাগ করিয়া নির্মম কঠোর মহত্বের পথে চলিতে হইবে।

এইখানেই ত্যাগ-ধর্মের স্থান। ত্যাগ ত শুধু ছাড়া নয়, নিজেকে শুধু বঞ্চিত করা নয়—ইহা সহজকে ছাড়া গভীরের জন্ম, আরামকে ছাড়া সত্য শান্তির জন্ম, জীবনের মায়া ছাড়া ভয়হীন জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের জন্ম। যুদ্ধই হউক শান্তিই হউক, এই ত্যাগধর্মের দ্বারা যদি তাহা অনুপ্রাণিত না হয় তবে মানুষ মহত্বের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে। মানুষের বীরত্বের পরিচয় এই ত্যাগে—এই প্রবৃত্তির অধীনতা পাশ ছেদনে। মানুষের কর্মপ্রণালীর মূল্য নিরূপিত হইবে, এই বীরত্ব-চর্চার অবকাশ উহাতে কতটা আছে তাহা দ্বারা। দার্শনিক উইলিয়াম্ জেম্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে —

“The deepest difference practically in the moral life of man is the difference between the easy-going and the strenuous mood. When in the easy-going mood, the shrinking from present ill is our ruling consideration. The strenuous mood, on the contrary, makes us quite indifferent to present ill if only the greater ideal be attained. The — — — — —”

“মোহের বন্ধন” ছিন্ন করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না। “কার্পণ্যোপহতস্বভাবঃ” হওয়াতে অজ্ঞানের যে কর্তব্যবিমুগতা জন্মিয়াছিল, ভক্তিই উহা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। কৌরবদিগের কৃত অন্তায় সহিয়া যাইবার মত হীনতাও তিনি স্বীকার করিতে যাইতেছিলেন যতক্ষণ ভগবানের categorical imperative, রুদ্রদেবতার সর্বনাশা ডাক তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয় নাই।

এই গীতোকৃত দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাবতবর্ষের কবি গাহিয়াছেন :—

“আমরা বিনাপণে খেলব না গো,
খেলব রাজ্য ছেলের মত।
ফেলব খেলায় ধনরতন
যেখায় মোদের আছে যত।
সর্বনাশা তোমার যে ডাক
যায় যদি যাক সকলি যাক,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে
খেলা মোদের কব্ব সারা,
তাব পবে কোন বনের কোণে
হারের দলটি হ'ব হাবা।”

এই ভাবের ভাবুক হইয়া—আয়ল্যাণ্ডের বীর কবি পাদ্রিক পিয়াম'ও লিখিয়াছেন :—

“That no one can finely live who hoards life too
jealously, that one must be generous in service and
withal joyous, accounting even supreme sacrifices
light.”

অর্থাৎ, বাঁচিবার মত করিয়া বাঁচিতে হইলে দিল্দরিয়া হওয়া চাই। জীবনকে সুন্দর, সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে রূপণতার মত এত বড় বাধা আর নাই। বিফলতার আশঙ্কা, হারাইবার ভয় যদি মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ত্যাগ যদি সহজ ও আনন্দজনক না হয়, দুঃখমৃত্যুকে যদি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা না যায় তবে বৃহৎ প্রয়াসের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, এবং তাহা করিতে না পারিলে, মানুষের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা, ভূমাকে পাইবার ইচ্ছা পদে পদে ব্যাহত হয়—সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হওয়া যায় না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মানুষ এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। ভগবানে ভক্তি, আত্মসমর্পণ ইহার জন্ম একান্ত আবশ্যিক। আদর্শানুসারিতা এই

ধর্মভাবেরই ব'হুরূপ; এই ভাবের দ্বারা অল্পপ্রাণিত হইলেই মানুষ নিজের আদর্শের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারে :—

“দুঃখের বেগে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে।”

ভগবান্ মানুষকে অনাদি কাল হইতে বলিতেছেন :—

“যুধ্যস্ব”, অন্তায়ের প্রতিরোধ কর। সংসারে শ্রাঘের প্রতিষ্ঠার জন্ম, ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্ম তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে, “যজ্ঞার্থে” এই কর্ম করিতে গিয়া তোমার কাজের কি ফল হইবে,—ইহাতে তোমার নিজের কতটা ক্ষতি হইবে, তোমার কোন্ আত্মীয়-স্বজন কতটা দুঃখ পাইবে এইসব ভাবনা তুমি ভাবিতে পাইবে না। মমত্ব-বোধ-জনিত মর্মান্তিক দুঃখস্বীকার বরিয়াই তোমাকে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মানবাত্মাতে নিহিত এই categorical imperative এই ফলাফল-নিরপেক্ষ অলঙ্ঘনীয় বিধি মানিয়া চলাই ধর্মজীবন—মানুষের সত্য-জীবন। এই ভগবদ্বাক্যকে জীবনের নিয়ামক করিয়া আইরিশ কবি ভক্তির আবেগে বলিতেছেন :—

“Lord, I have staked my soul, I have staked the
lives of my kin

On the truth of Thy dreadful word. Do not
remember my failures,

But remember this my faith.”

কর্মের ইহাই কৌশল! ভগবদগীতার ইহাই শিক্ষা। “যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি”, “যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।” এই শিক্ষাই মার্কিন-দেশের জ্ঞানী এমাস'ন'ও দিতেছেন নিম্ন-লিখিত কথাটিতে :—

“It is the wisdom of man in every instance of his
labour to hitch his wagon to a star and see that his
chore is done by the gods themselves. That is the
way we are strong.”

সোজা কথায়, দেবতার প্রীতিকামনায় কোন মহৎ
ভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কাজ করিতে

খাকাই জীবনের সার্থকতা-সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় ;
কারণ, কেবল এই উপায়েই “স্থিতধী” হওয়া যায় এবং
“স্থিতধী” অর্থাৎ সর্বাবস্থাতে অবিচলিত নিষ্ঠাসম্পন্ন
হইয়া প্রতিদিনের কর্তব্য কুরিয়া যাইতে পারিলেই মানুষ
ক্ষতির দ্বারা, পরাজয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও অভিভূত
হয় না, এমাসনের ভাষায়—

“Can calmly front the morrow in the negligency
of that trust which carries God with it.”

জীবনের যিনি প্রভু, তাঁহার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া,
ভগবৎকার্যের নিমিত্তমাত্র হইয়া ছুরুছ কর্তব্যের পথে
প্রশান্তচিত্তে অস্থলিতপদে অগ্রসর হইতে পারে—হারের
মধ্য হইতেও আপাতপ্রতীয়মান সর্বনাশের মধ্য হইতেও,
সর্বশক্তিমানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে পারে :—

“এই হারা ত শেষ-হারা নহ্ন,
আবাব খেলা আছে পবে ;
জিত্ ল যে সে জিত্ ল কি না,
কে বলবে তা সত্য করে’ ।

হেরে তোমার কর্তব্য সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে ।
তার পরে কি করবে তুমি
সে কথা কেউ ভাবতে পারে ?”

এবং এইরূপে “দৃঢ়নিশ্চয়” হইয়া উদার আনন্দেব
স্বরে গাহিয়া উঠিতে পারে :—

“বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আয়ুপব ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমাব ঘর ?
কিসেরই বা সুখ, ক’দিনেব প্রাণ
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান ;
অমর মরণ বস্তুরণ নাচিছে মগোরবে ;—
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বঁধন ছিঁড়িতে হবে ।”

শ্রী মহেন্দ্রলাল রায়

ভাঙনের গান

অত্যাচারের গুরু মস্তনে উদগারি’ হলাহল,
দেশে দেশে আজো অত্যাচারীর অঁটুট রহিল বল ।
মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি অমানুষী অবিচাব ;—
আজিকে নবীন যুগের প্রভাতে হবে হবে প্রতিকার ।
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল !
ভাঙনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল ।

স্বার্থের সনে স্বার্থ ঠেকিয়া জলে অগ্নির শিখা,
সেই সময়ের বহি-মাঝেও তোমার মরণ লিখা !—
মৃত্যু-ছুয়ারে হানা দিলে হাতে মৃত্তক রূপাণ শত
ফিরিতে কি দাস-শৃঙ্খল-ভারে দেহভার করি’ নত ?
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল !
ভাঙনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল ।

একের স্বার্থ-রথ-ঘঘরে বাজে পীড়িতের গান,
বছর বৃকের পাজর পিষিয়া সে রথের অভিযান ।—
এদের ঘেবিয়া আছে যুগভরা অত্যাচারের শিখা,—
এই পাজরের তপ্ত নিশাসে জলিবে মৃত্যু-শিখা !
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল !
ভাঙনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল ।

হের, দুর্বল শোণিত ঢালিয়া তর্পণ করে কার—
শক্তি-পিপাসী অত্যাচারীর রাখিতে অহঙ্কার !
যুগ-যুগ-ধরি’-নিপীড়িত হিয়া ভেদি’ ওঠে হাহা রব—
ধন-গর্ভিত অত্যাচারীর হবে হবে পরাভব ।
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্বল দল !
ভাঙনের পালা শুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল ।

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

দশ জন বৈজ্ঞানিক



আরিস্টটল

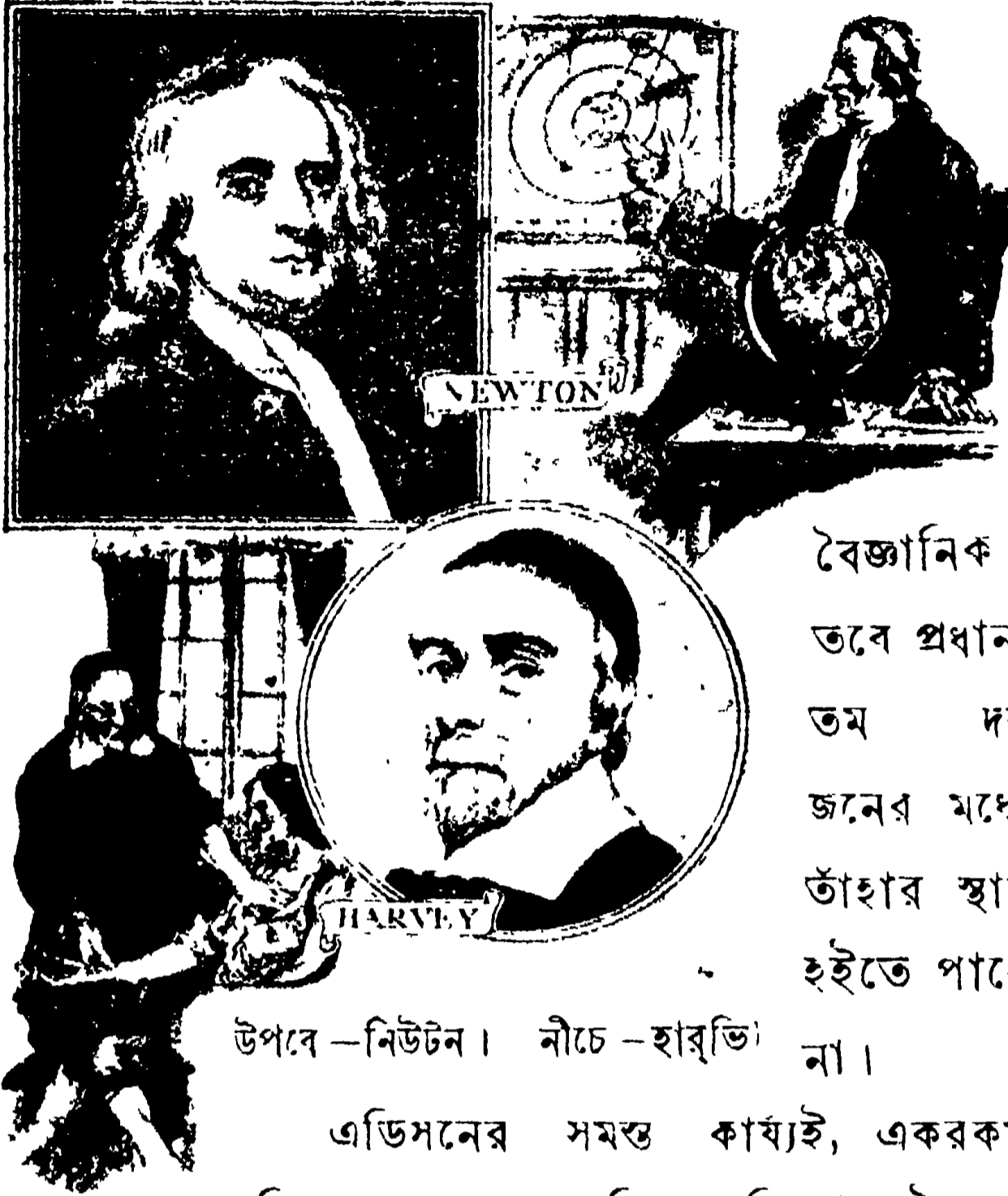
পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রধান দশ জনের নাম করা অতি কঠিন কার্য। এই কথা মনে হইলেই এটি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে। একজন দার্শনিক তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া যে-সকল চিন্তা করিয়াছিলেন, একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দু-একটি কথায় সেইসকল চিন্তার শির কথা শ্রবণ করিতে চায়। দার্শনিক বিশ্বয়ে চূপ করিয়া ছিলেন, কোনপ্রকার উত্তর করিতে পারেন নাই।

হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেবল মাত্র দশ জনকে সর্বোচ্চ আসন দান করাও অতি বিষম কথা, হঠাৎ ভাবিলে? সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ লোকের সম্মুখে “বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক” বলিলেই এমন-সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের নাম তাহাদের মনে আসে যাহারা বিজ্ঞানকে নানারকমের জনহিতকর এবং অগ্ন্যগ্নপ্রকারের কার্যে লাগাইয়াছেন। এডিসনের নাম সহজেই অনেকের মনে আসিবে। অনেকেই বলিবেন এডিসন পৃথিবীর সন্মাপেক্ষা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই হইবেন। কিন্তু এডিসন বিজ্ঞানকে কার্যে লাগাইয়াছেন মাত্র। যে নিয়মে এবং সূত্রে ভর করিয়া তিনি এইসকল কার্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আবিষ্কৃত নয়। অগ্ন্যগ্ন বৈজ্ঞানিকদের স্বন্ধে ভর করিয়া এডিসন তাঁহার নিজের নাম করিয়াছেন। লোকে তলাইয়া দেখিতে পায় না

প্রশংসাত্মক দেয়। তাহা মনে দেখিতে গিয়া আমরা তাহার ভিত্তির কথা মনে করি না— কিন্তু ভিত্তিবিহীন তাহা মনে বলা যায় কি? তাহা মনে মাটির উপরের অংশ বাদ দিয়াও ভিত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ভিত্তি বাদ দিয়া উপরের অংশ কোথায় থাকিবে? কিন্তু তাই বলিয়া

উপরের অংশের যে কোন? প্রশংসাই পাইবার কথা নয়, তাহা বলিতেছি না। এডিসনকে ছোট করিতেছি না। তিনিও একজন বিখ্যাত





বৈজ্ঞানিক ,
তবে প্রধান-
তম দশ
জনের মধ্যে
তাঁহার স্থান
হইতে পারে

উপরে—নিউটন। নিচে—হার্ভি।

এডিসনের সমস্ত কাঁচাই, একরকম বলিতে গেলে, আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম গিব্‌সের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই গিব্‌সের নাম শতকরা ৫০ জন আমেরিকানও জানেন কি না সন্দেহ। বিজ্ঞানে ওয়াটের স্থানও এডিসনের মত। সকলেই জানেন যে ওয়াট, ষ্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। কিন্তু ওয়াটের আবিষ্কৃত সূত্রের উপর তাঁহার আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যখনই কোন-একটি নূতন বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার হইয়াছে—তাঁহার অনতিবিলম্বেই একদল বৈজ্ঞানিক নানারকম জনহিতকর এবং জন-আনন্দজনক কার্যে সেই সূত্রটিকে লাগাইয়াছেন। ইহাতেও মানবসমাজের কল্যাণ যে বড় কম হয় তাহা নস। এবং এই কারণেই বোধ হয় লোকে সেইসব বৈজ্ঞানিকদের কথা বেশী জানিতে পারে এবং মনে রাখে, যাহারা সাধারণের আনন্দ এবং উপকারের জন্ত কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলিকে সাধারণ কাজে লাগায়। যে লোক মিষ্ট এবং সুস্বাদু ফল বিক্রয় করে,

দই দোকানীকে চিনি, কিন্তু তাহার বাগানে কোন

কিছু কিছু নিঃশেষ করিয়াছে তাহার খোঁজ আমরা

কয়জনে রাখি? যাহার কার্যকে আমরা চোখের সামনে সহজেই এবং বেশীর ভাগ সময় দেখিতে পাই—তাঁহারই কথা আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি।

এখন কথা হইতেছে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কাহাদের বলা হইবে। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের বলা হইবে, যাহারা তাঁহাদের জীবিত-কালে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন, যাহাদের আবিষ্কারের ফলে পুরাতন ধারার অনেক ওলটপালট হইয়াছে এবং অনেক-কিছু মিথ্যা এবং ভুল বলিয়াও প্রমাণ হইয়াছে। তাঁহারাষ্ট শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যাহারা বিজ্ঞান-মৌখের এক-একটি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে অ্যাবিষ্ট-টলের কথা। কারণ সেই সময়, আজ হইতে দুহাজার বৎসরেরও



লাভোয়াসিয়ে



পূর্বে অক্ষয় ছাড়া আর কোন বিজ্ঞান ছিল না বলিলেও চলে। বৈজ্ঞানিক

ব্যাপ্যার স্থলে কতকগুলি মাথামুগ্ধীন গল্পের প্রচলন ছিল।

কিন্তু অ্যাবিষ্টটলের মনের মধ্যে নূতন ভালোক প্রবেশ করিল। তিনি সমস্ত মিথ্যার মধ্য দিয়া সত্যকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে তখন এক ইচ্ছা—“আমি জানিতে চাই।” তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন—এবং জানিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি তুলনামূলক শারীরবিজ্ঞানের (anatomy) ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নানা প্রকার জীবজন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহাদের শরীরের অস্থি-সংগঠনের পরিচয়



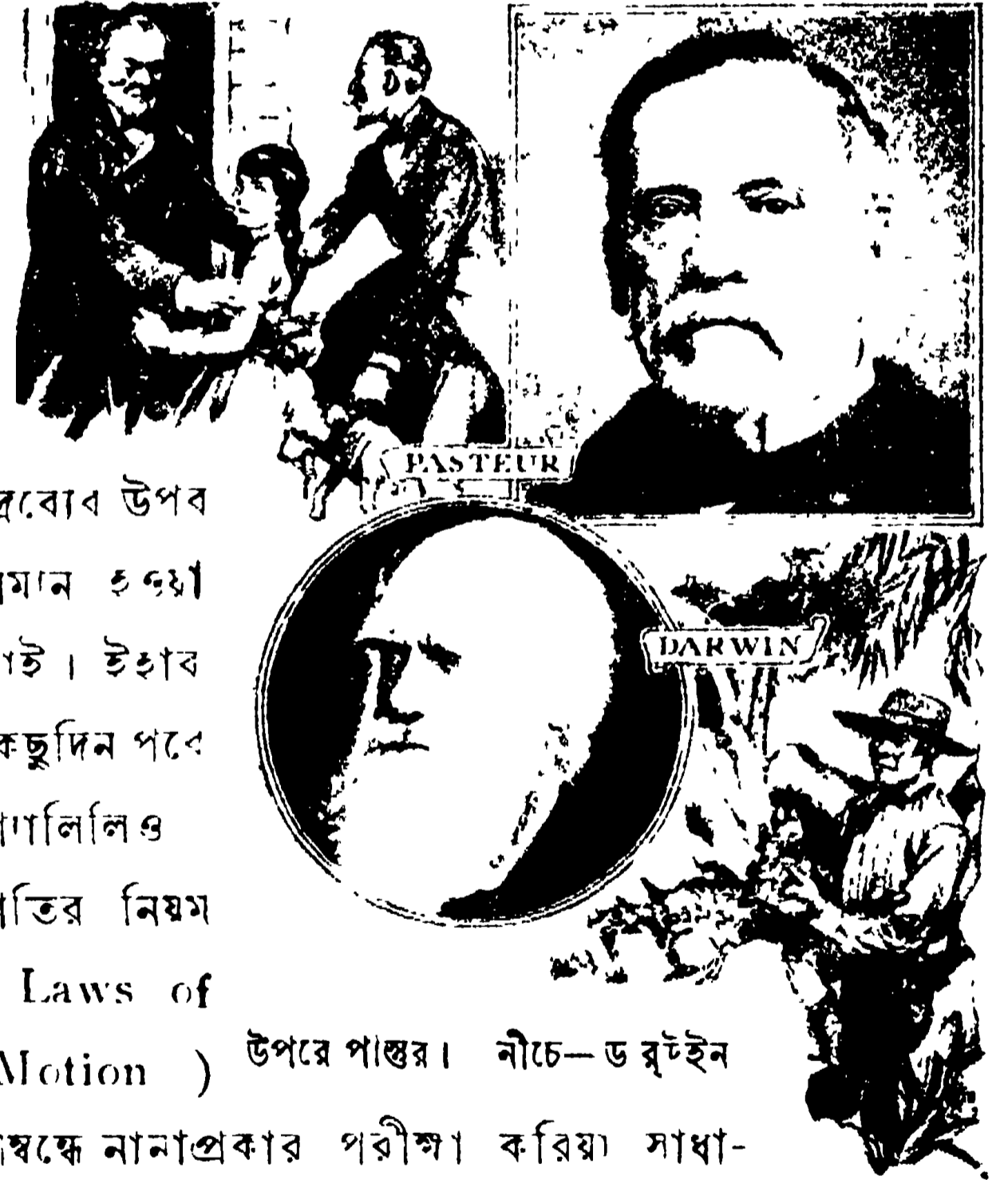
হেল্মহোল্ট্‌স্

প্রদান করেন। কোন্ অস্থির কি দ্রব্যকার, অণু কোন্ অস্থির সহিত তাহার কি যোগ, কেমন তাহার গঠন, ইত্যাদি অস্থি-পরিচয় অ্যারিষ্টটল প্রথমে আবিষ্কার করেন। বাহুড় এবং তিমি যে সংযুগ্মীয় জন্তু এ সংবাদ মানুষকে তিনিই প্রথম জ্ঞাপন করেন।

অ্যারিষ্টটল জন্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি চমৎকার পুস্তক লেখেন। সেই পুস্তক আজও পড়িলে আমরা অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারি। পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষলতাদি বিষয়ে তাহার অতি প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি সবল পশুপক্ষীর বাহ্যিক আচার-ব্যবহার বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অবশেষে তাহাদের উপব অঙ্গোপচার করিয়া তাহাদের শরীরের ভিতর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। জীবজন্তুর আচার-ব্যবহার এবং শরীর পর্য্যবেক্ষণ কবিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না— তাহাদের জীবন-ধারণের উপায়, তাহারা কি খায়, কেমনভাবে খায়, কেমনভাবে সন্তান পালন করে ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এইসমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি জন্তুবিজ্ঞানকে বিশেষ বিশেষ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এবং কিভাবে জীবজন্তুর বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহার একটি বিশেষ পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান অতিসভ্যতার দিনেও শত শত তরুণ যাত্রী সেই গ্রীক মহাজনের পথেই চলিয়াছে এবং তাহাতে সফলমনোরথ হইতেছে।

অ্যারিষ্টটলের পরেই গ্যালিলিওর নাম কবিত্তে হয়।

গ্যালিলিও বর্তমান যন্ত্রবিজ্ঞানের (mechanics) পিতা। গ্যালিলিওর সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত যে কোন উচ্চ স্থান হইতে কোন দ্রব্যের পতন-সময় তাহার ভারের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। গ্যালিলিও ইহা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্তু পিসান নগরের হেলানো স্তম্ভে আরোহণ করিয়া দুইটি অসমান ভারের দ্রব্য নীচের দিকে একই সময়ে নিক্ষেপ করেন। এই কাৰ্য্য করিবার পূর্বে তৎকালীন পণ্ডিত এবং ছাত্রেরা তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিত। গ্যালিলিও এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন যে বায়ুর প্রতিকূলতা বাদ দিয়া দেখিলে সকল জিনিষের পতনের বেগ সমান। ২০ হাত উপর হইতে ১০ সের ওজনের জিনিষ পড়িতে যে সময় লাগিবে, এক সেব জিনিষ পড়িতেও সেই সময় লাগিবে—তবে বায়ুর প্রতিকূলতা উভয়



দ্রব্যের উপব সমান হওয়া চাই। ইহাব কিছুদিন পরে গ্যালিলিও গতির নিয়ম (Laws of Motion) উপরে পাশুর। নীচে—ড রুট্টইন সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া সাধারণকে দেখান।

গ্যালিলিও টেলিস্কোপ তৈরী করিতেন। এইসমস্ত দূরবীণের সাহায্যে তিনি গগন-মণ্ডলের গ্রহতারকাদের কাৰ্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন। গ্যালিলিও যে-দিন বলিলেন যে, “পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য ঘোরে না—সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে” যেদিন যখন পৃথিবীর সূর্য্য



বার্ণার্ড

করিতেন যে, পৃথিবী
সৌর জগতের কেন্দ্র
—সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীর
চারিদিকে ঘুরিতেছে।

তাহারা সাধারণ লোকদেরও এই শিক্ষা দান করিতেন।
এই-সমস্ত লোকে গ্যালিলিওকে অধর্ম্মিক এবং সমাজ-
দ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এবং অবশেষে পান-
দণ্ডের ভয় দেখাইয়া গ্যালিলিওকে তাহার মত ভুল
বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন; যদিও মনে
মনে তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন—“আমার কথাই
ঠিক—মুখে আমি এখন উল্টা কথা বলিতেছি।”

জ্যোতির্বিদ্যা গ্যালিলিওর আবিষ্কার-সমূহেব উপরই
প্রতিষ্ঠিত। এইসমস্ত আবিষ্কারেব জন্মই গ্যালিলিওর
স্থান শ্রেষ্ঠ দশজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে।

গ্যালিলিওর উপর ভর কবিয়া আইজাক নিউটন
মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি (Law of Gravitation) আবিষ্কার
করিলেন। এই নিয়মে আমরা জানিতে পারি কেমন
করিয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের গতিবেগ সকল সময় অণু
প্রত্যেকটি দ্রব্যের দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে। এখন
অনেকের মনে হইতেছে যে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম অপেক্ষাও
আর একটি বড় নিয়ম আছে—তাহা আইনষ্টাইনের
ধিওরি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নিউটনের আবিষ্কারের দাম
কমিতেছে না—কারণ আইনষ্টাইনের আবিষ্কার নিউটনের
মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মকে খণ্ডন করিতেছে না, তাহাকে আরো
জোর দিতেছে।

এই মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়া নিউটন
জ্যোতির্বিদ্যেব একটি নূতন যুগে আনিয়া দিলেন।
এই নিয়মের সাহায্যে সৌর মণ্ডলের সকল গ্রহতারকার
গতির একটি পরিমাণ নির্ণয় করা হইল এবং এই
নিয়মের সাহায্যে গণনা করিয়া জ্যোতির্বিদ্যেরা
এখন বলিতে পাবেন কবে এবং কোথায় কি তারকা
দেখা দিবে—কবে সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি হইবে।
নিউটনই প্রথম দেখান কেমন করিয়া পৃথিবীর অল্পপাতে
সূর্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, কেমন করিয়া জোয়ার-
ভাঁটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কবি পোপ
বলিতেছেন—প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিয়মকানুন
অন্ধকারের আবরণে ঢাকা ছিল, ঈশ্বর বলিলেন নিউটনের
জন্মলাভ হউক—তাহার পরেই চারিদিকে আলোক
ছড়াইয়া পড়িল।



ফ্যারাডে

সতেরো শতাব্দীতে উইলিয়াম হার্ভি মানুষের শরীরের
মধ্যে যে রক্ত-চলাচল হয়—এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার
করেন। মানুষেব ফুস্ফুস্ যে শরীরে রক্ত-চলাচলের
জন্ম পাম্পের কাজ করে, তাহা হার্ভি প্রথম আবিষ্কার
করেন। তিনি এই আবিষ্কার খান্দাজে কবেন নাই—
ব্যাঙের পায়ে প্রথম এই রক্ত-চলাচল পর্য্যবেক্ষণ করেন।
তিনি নানারকম পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রমাণ করিলেন।
এই আবিষ্কার হইবার পব চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক পরি-
বর্তন হয়। এই সময় লোকে যাহা-তাহা বিশ্বাস করিত।
যেমন—পচা মাংস হইতে মাছি জন্মাইতে পারে—ঘোড়ার
চুল হইতে কেঁচো গজাইতে পারে। কিন্তু হার্ভি নানা-

রকম পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, যে, কোন জীবন্ত জন্তু স্বজাতীয় অণু কোন জীবন্ত জন্তু ছাড়া অণু কিছু হইতে জন্মলাভ করিতে পারে না। হার্ভি এই সমস্ত আবিষ্কারের দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়া বর্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আন্তোয়ান লরঁ লাভোয়্যাসিএ (Antoine Laurent Lavoisier) ফরাসী বিদ্রোহের সময় প্যারিসে বাস করিতেন। সেই সময় প্যারিসের লোকেরা “আমাদের বৈজ্ঞানিকে প্রয়োজন নাই” বলিয়া লাভোয়্যাসিএর কাঁসিব আজ্ঞা দেয়। তাঁহার পূর্বে পৃথিবীতে প্রকৃত বাসায়নিক ছিল না। কেবল একদল লোক সকল ধাতুকে সোনায় পরিবর্তন করিবার চেষ্টায় থাকিত, কিন্তু তাহাদের কার্যে কোন বৈজ্ঞানিক লক্ষণ ছিল না। লাভোয়্যাসিএ আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না। তাহার আকাব এবং অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। লাভোয়্যাসিএ পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দেন। একটি পাত্রের মধ্যে কোন দ্রব্যকে ভরিয়া, তাহার মুখ বেষ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইলে, যাহাতে কোন দ্রব্য বাহির হইতে কিম্বা প্রবেশ করিতেও না পারে,—এমন কি বায়ুও নয়। তার পর সেই পাত্রস্থিত দ্রব্যকে গরম করিয়া গ্যাসে পরিণত করিলে পর চোখে দেখা যাইবে যে পাত্র শূন্য—কিন্তু ওজন করিলে দেখা যাইবে যে গরম করিবার পূর্বের ওজনের সহিত—গরম করিবার পরের ওজন সমানই আছে, কোনপ্রকার কম-বেশী হয় নাই। ইহা ওজন করিবার জন্তু রাসায়নিক মানদণ্ডের জন্ম হয়। এই মানদণ্ডে অতি—অতি সামান্য ভারেরও ওজন পরিমাণ করা যাইতে পারে।

সেই সময়ের লোক মনে করিত যে phlogiston নামে একপ্রকার দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে পর কোন জিনিষ পুড়িতে পারে। Phlogistonকে কোন রকমেই পোড়ান যায় না। লাভোয়্যাসিএ এই ভ্রান্তি দূর করিয়া প্রমাণ করেন যে অক্সিজেনের সাহায্যেই সব জিনিষ পোড়ে—অক্সিজেনের অবর্ত্তমানে কোন দ্রব্য আগুনে পুড়িতে পারে না। লাভোয়্যাসিএ বর্ত্তমান রসায়নের

“কোন শক্তিই পৃথিবীতে নষ্ট হয় না,” এই সত্যের আবিষ্কার হেল্মহোল্ট্‌স্ (Helmholtz)। তিনি বলেন যে একপ্রকার শক্তিকে অণু আর-একপ্রকার শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে—কিন্তু কোন শক্তিকে একেবারে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। কোন শক্তি কেহ জন্ম দিতেও পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কয়লা পুড়িয়া জলকে বাষ্পে পরিণত করে। নায়াগ্রা-প্রপাতের শক্তিকে ধরিয়া মানুষ হাজার কাজে লাগাইতেছে। জল-প্রপাতের পতন-বেগকে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। এই-রকম নানাপ্রকার শক্তির অদল-বদল এবং বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন সাধন করিয়া লোকে নিজেদের কাজে লাগাইতে পারে। এই-সমস্তের মূলে হেল্মহোল্ট্‌স্ রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে যাহা-কিছু হইতেছে, সে-সকলের মূলে রহিয়াছেন—মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁহার নানাপ্রকার পরীক্ষা এবং আবিষ্কারের জন্তুই আজ আমরা টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন দেখিতে পাইতেছি। ফ্যারাডেব পূর্বে মানুষ বিদ্যুৎ-শক্তিকে একটা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিত, তাহার পরিচয় থাকিলেও তাহাকে কোনপ্রকার কাজে লাগাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। ফ্যারাডে প্রমাণ করেন যে বিদ্যুৎ-প্রবাহযুক্ত একটি তারের নিকট আর-একটি সাধারণ তার রাখিলে তাহাতেও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে। এই তথ্যের উপর ভর করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও বিদ্যুৎ তিনিই প্রথম উৎপন্ন করেন।

হার্ভি শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকে সকলের বোধ-গম্য করিয়া ব্যাখ্যা করেন। শরীরের ভিতরের এবং বাহিরের কোন অঙ্গের কি কাজ তাহা তিনি অতি সহজ-ভাবে সকলের সামনে ধরেন।

রুড বার্গার্ড্‌ মানুষের শরীরের মধ্যে কিপ্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি হয় তাহা আবিষ্কার করেন। এই সমস্তের চিকিৎসকদের বিশ্বাস ছিল যে “যকৎ কেবল মাত্র

পিত্ত উৎপন্ন করে—অতএব যকৃতের কাজ পিত্ত উৎপন্ন করা। বার্ণার্ড প্রমাণ করিয়া দিলেন যে যকৃতের কাজ অন্তপ্রকার। শরীরের রক্তের জন্ম চিনি জমা করিয়া রাখা এবং প্রয়োজন-মত তাহা রক্তের মধ্যে চালান করাই যকৃতের কাজ। ইহা প্রমাণ হইবামাত্র সেই-সময়ের বৈজ্ঞানিকরা বহুমূত্র রোগের কারণ ধরিতে পারিলেন।

বার্ণার্ডের প্রধান আবিষ্কার ductless glands এর (নালিহীন মাংসগ্রন্থির) প্রয়োজন এবং ক্রিয়া—endrocines. তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন যে কণ্ঠার (Adam's apple) কাছে দুটি লাল দাগের উপর মানুষের শরীরের উৎকর্ষ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এই দুইটি glands ঠিকভাবে না থাকিলে মানুষের মন এবং শরীর, কিছুই উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধিত হইতে পারে না। বার্ণার্ড পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করেন যে যদি অক্রিয়মান ductless glands-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ভেড়ার thyroid glands অর্থাৎ গলগ্রন্থির রস পান বা তাহার শরীরে এই জিনিষ অন্তর্নিষ্কাশিত (inject) করা যায় তবে সেই অপরিপক মানুষকে একটি পূর্ণ-স্বাস্থ্য সবল সুন্দর মানুষে পরিণত করা যায়। এই আবিষ্কারে পৃথিবীর এবং সমস্ত মানবের যে কত বড় উপকার হইয়াছে, তাহা বলা বলা যায় না।

এইবার ডারউইনের নাম করিতে হয়। এই বৈজ্ঞানিকের কথা বলিলেই অনেকে হয়ত ক্রুদ্ধ হইবেন, কারণ ইনি আমাদের বহু-পূর্বপুরুষদের বাঁদর বা হনুমান বলিয়াছিলেন। কিন্তু ডারউইনের যথার্থ আবিষ্কার অনেকের কাছেই অবোধ্য বলিয়া লোকে তাহার নাম করিলেই চটিয়া যায়।

ডারউইন জগতেব ক্রমবিকাশ তথ্য (evolution) আবিষ্কার করেন নাই। তাহার বহু পূর্বেই লোকে এ কথা জানিত। কিন্তু তিনি তাহার নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষকে ইহা প্রমাণ করিয়া দেখান। আমরা কোন লাল-পাতাওয়ালা গাছ দেখিলেই মনে করি ইহার জন্ম আর-একটি লাল-পাতা-ওয়ালা বৃক্ষ হইতে। কিন্তু ডারউইন প্রমাণ করিলেন বহু যুগ পূর্বে এই লাল-পাতাওয়ালা বৃক্ষের পাতা মোটেই লাল

ছিল না—যুগের পর যুগ ধরিয়া নানা পরিবর্তন হইতে হইতে ইহার পাতা এখন আমাদের চোখের সামনে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ডারউইনের মৌলিক আবিষ্কার এমন কিছু নাই; কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক এবং পরিশ্রমী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি যাহা পড়িতেন বা শুনিতেন তাহার বৈজ্ঞানিক সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। একখানি পুস্তক লিখিতে তাহার বিশ বৎসব সময় লাগে! ইহা হইতেই বুঝা যায়, তাহার বৈজ্ঞানিক পরিমাণ কিরূপ।

ডারউইন কলেজ ত্যাগ করিয়াই “বিগল্” জাহাজে করিয়া দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। এই সময় তিনি এই মহাসত্য আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন কিছুই জন্মলাভ করিয়া মরিয়া গিয়া নিঃশেষ হইয়া যায় না। জগতের সমস্ত প্রাণসমষ্টি একটি মাকড়সার জালের মতন। বিশেষ কোন জায়গায় আঘাত পড়িলে জালের সমস্ত অঙ্গেই তাহার স্পন্দন পৌঁছায়।

জাহাজে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার এক স্থানে প্রস্তরীভূত একপ্রকার বর্মিল জন্তু (armadillos) দেখিতে পান। যেখানে ইহা দেখেন, তাহার কিছু দূরেই জীবন্ত অবস্থায় এই জন্তুকে দেখিতে পান। শরীরের নানাপ্রকার তারতম্য ঘটা সত্ত্বেও, বর্তমানের এই বিশেষ জন্তু সেই প্রস্তরীভূত জন্তুর বংশ-ধর তাহা ডারউইন প্রমাণ করেন। ডারউইন কখনও কোন বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি যাহা বলিতেন তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করিতেন।

ডারউইন দেখান যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া জন্তুদের শরীরের নানারকম অদলবদল করা যায়। ক্ষুদ্র জন্তুকে বড় করা যায় এবং বড় জন্তুকে ক্ষুদ্র করা যায়। বর্তমানে এই নিয়মে নানাপ্রকার নূতন মুরগীর চাষ হইতেছে—কিন্তু যাহারা এই চাষ করিতেছে, তাহারা ডারউইনের নাম জানে কি না সন্দেহ।

ডারউইনের পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যে মানুষ ক্রমশঃ অদোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। ডারউইন পৃথিবীতে নূতন আলোক আনিলেন, তিনি বলিলেন “মানুষ ক্রমশঃ

উচ্চস্তরে উঠিতেছে। আদি মানুষ বর্তমান মানব হইতে বহু অংশে নিকৃষ্ট ছিল এবং বহু যুগ পরের মানব বর্তমান হইতে আরো বহু পরিমাণে উচ্চস্তরের হইবে।”

সর্বশেষে পাস্তরের নাম করা হইল—কিন্তু পাস্তরের কার্য্য অণু সকলের কাজ অপেক্ষা কোন অংশে শূন্য বা নিকৃষ্ট নহে। পাস্তর বলিলেন জীবন-বিদ্যাব সাহায্যে (biologically) সকলপ্রকার রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাইতে পারে। পাস্তর আবিষ্কার করিলেন যে জীবন্ত জীবাণু-সকল রোগের মূল—এবং এই জীবাণু মারিবাব উপায় আছে। তিনি এই উপায়ও আবিষ্কার করেন। কলেরা, জলাতঙ্ক, ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদি রোগের অমোঘ ঔষধ পাস্তর আবিষ্কার করেন।

রোগের কারণ-সন্ধান-প্রণালী (theory of disease) পাস্তর একবারে বদলাইয়া দিলেন। পাস্তর বোগ-জীবাণু বধের জন্ত লসিকা দ্বারা (serum treatment) টিকা দেওয়া প্রথম আবিষ্কার করেন। যে-সমস্ত মহামারী ব্যাপিতে কোটি কোটি লোক মারা যাইত, পাস্তর তাহা

নিবারণ করিয়াছেন। মানব-সমাজ পাস্তরের নিকট কতখানি কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় বলা যায় না।

দশজন শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকের নাম করা হইল। ইহাদের মধ্যে একজনও আমেরিকান নাই। তাহার কাবণ আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার তেমন কিছু করেন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানকে মানবের ভৃত্য করিবার কাজে বেশী মন দিয়াছেন ও চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে অবশ্য মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছে, এবং এইজন্যই বর্তমান সময়ে আমেরিকাতে যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ছড়াছড়ি। দশ জনের মধ্যে চার জন ইংরেজ—ইহার কারণ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেরা পৈর্যের সঙ্গে এক মনে বহু বৎসর ধরিয়া কোন বিশেষ আবিষ্কারের পিছনে লাগিয়া থাকিতে পারেন।

জীবিত কোন বৈজ্ঞানিকের নামও করা হয় নাই, কারণ, তাহাদের সম্বন্ধে এখন কিছু বলা সমীচীন হইবে না। তাহাদের কাব্য এখনো শেষ হয় নাই।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ঘণ্টা-তিনেকের আত্মবিনোদন

(চীন হইতে ফ্রান্সে যাইবার যাত্রাপথে)

(পিয়ের-নোটের ফরাসী হইতে)

... বাত্রি ৯ টা। কাফি গৃহেব অভ্যস্তরে। সমস্ত খোলা। তবু ঘরের ভিতরে বিষম গরম। কতকগুলো টেবিল গাভা, টেবিলগুলো একটু নন্দেহজনক। মজবী ও ত্যাগিব গন্ধ ছাড়িতেছে। এনটা সাদা ঘব; রাণী ত্রিটোরিয়া ও তাহার পরিবারবর্গের প্রসন্নমুদ্রাঙ্কিত বঙ্গীন হাবিব দ্বারা ধরের দেওয়াল বিভূষিত। দুটি ফর্সা রং বালিকা, দুইজন স্ত্রী-পরিবেষণের পরিচারিকা, কতকগুলো রোদে-পোড়া সাহেবের চাবিদিকে কতই হাবভাব দেখাইয়া খোরাকেরা করিতেছে। সাদা হাত-কাটা-জামা-পরা—সাহেবেরা বিভিন্ন যুরোপীয় ভাষায় কথা কহিতেছে।—ভয়ানক গরম, ভয়ানক গরম; চাঁদোয়া-ছাদে খুলানো, পিটোল-দীপগুলার চারিধারে মশক ও পতঙ্গবৃন্দ বৌ-বৌ শব্দ করিতেছে। একটি ইংরেজ বালক একটা যান্ত্রিক পিয়ানোর হাতল ধুরাইয়া দিল আর অমনি তাহা হইতে “অপেরা”-নাটিকার একটা পরিচিত সুর বাহির হইয়া পড়িল। এই সময় বাহির হইতে একটা কোলাহল-শব্দ আসিয়া উহাকে অনেকটা বেহরো করিয়া তুলিল।

একটা সোজা রাস্তার সম্মুখস্থ একটা বড় গোছের খোলা জায়গা হইতে, যান-বাহনের তরঙ্গহিলোল ও শতসহস্র লঠন সমেত, একটা জন-শ্রোত ঠেলিয়া আসিতেছে।

মনে হয় যেন কোন গ্রীষ্ম-সাযাহে পারীনগরেব “বুলভারে”র (Boulevard) দৃশ্য।—দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—পতুলের পরিচ্ছদ পরিয়া লোকগুলো চলিছে, গাজ হইতে আফিম ও মগনাভিব গন্ধ বাহির হইতেছে; তাব পব, পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত, গায়েব রং হলুদে, বেণী খুলিতেছে...যাহারা বাহৃতঃ যুবোপেব অভিনয় করে,—খুব নিকট হইতে তাহাদিগকে নোংরা চীনার কাঁক বলিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। এই দ্রুতগামী অধিকাংশ গাড়ীতেই খোড়ার মতো ধাবমান মানুষকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা গাড়ী টানিতেছে তাহারা চীনা, নগ্নকাষ, বেণীটা গোপার মত মাথায় জড়ানো, ফানসু আকারের টুপি-পরা; উহারা যাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহারাও চীনা; মাথার বেণী বাতাসে তুলিতেছে, হাত-পাখা হাতে লইয়া গট হইয়া বসিয়া আছে। দোকান—চীনা; রঙ্গীন লঠনগুলো—চীনা; কণ্ঠধব, কোলাহল, বাদ-বিসম্বাদ—চীনা।—সমস্তই পীতবর্ণ, ব্যস্তমস্ত, অতিলোভী, বাহুরে-ধরণের ও অশীল।—ঝটিকা-গর্ভ একটা ভিজে গরম; মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধ, গাঁজিয়া-উঠা ফলের গন্ধ, মাটির উপর সাজানো বীভৎস খাদ্যদ্রব্য; পুড়াইবার ধূপ ও পুরীষের রূপ:

আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে যুগনাভির গন্ধ— উহা বড়ই তীব্র, স্নায়ুপীড়ক বমন-উদ্দীপক ও অসহ্য ..

এই নগরই—শিঙ্গাপুর। এই জনতার মধ্যে চলিয়াছে দেবতার মত সুন্দর কতিপয় ভারতবাসী, কতকগুলি মালাবারী, কতকগুলি মালাই, কতিপয় পার্সি, শিবস্মরণ মাথায় কতিপয় ইংরেজ, সকল জাতীয় নাবিকবৃন্দ, এবং জাপানের আমদানী কতকগুলি রঞ্জিনী রমণী; কিন্তু এই চীনাক্রম পিপ্পড়ার চিবিবর মধ্যে উহারা যেন ডুবিয়া গিয়াছে—হারাইয়া গিয়াছে।

মধ্যকার বড় রাস্তার ধারে ধারে, বাষ্পভারাক্রান্ত চিরন্তন আকাশের নীচে, সকল রকম মন্দির উপিত হইয়াছে; রহস্যময় মূর্তি বিশিষ্ট হিন্দুমন্দির; ভীষণ-দৈত্যদানবসমগ্নিত চীনামন্দির, মুসলমান মসজিদ; প্রটেস্ট্যান্ট ও রোমান-সম্প্রদায়ের খৃষ্টগির্জা... সমস্তই পাশাপাশি ভাড়াভাবে অবস্থিত—এই চিত্তক্লেশকর ভাড়াভাব রক্ষা করিবার ভার ইংরেজ পাহারাওলাদের উপর...

রাত্রি দশটা।—একটা কাফির আঙুড়ায় সর্জাত হইতেছে। গৃহটা কাঠের; কিন্তু উহার গঠনাদি গুরুভার ও প্রকাণ্ড পরিমাণের এবং গ্রীক-দেবমন্দিরকে উপহাস করিয়া যেন উহার গুস্তুলেণী নিরলঙ্কার কঠোরতার সহিত নির্মিত হইয়াছে। হস্তেবীয় নাবী-বাদকের একটা দল ষ্টাটস্ রচিত একটা নাচের সুর খুব কোলাহলসহকারে বাজাইতেছে, তাহার পর এক Bardlai রমণী সঙ্গীতমঞ্চের উপর উঠিয়া “বেড়ার” গান গাহিল। পক্ষী-বিক্ষেতা কতিপয় ভারতীয় দোকানদার ময়না লইয়া, আশ্চর্যরকমের টিয়া লইয়া, হীবামন লইয়া বিয়াব-পাখিদিগের টেবিলগুলোর ভিতর দিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হীবামন-গুলি বহুবর্ণ, মনে হয় যেন রং দিয়া চিত্রিত। ৪০০ হাত দূবে, কোলাহলহীন শাস্ত্র একটা চতুষ্কোণ পবিসর-ভূমি; মিসি-বাবাবা একগুণ শ্যানল শাদল-ভূমি উপর পায়চালি করিতেছে। ঐ ভূমির বাস ইংরেজ বরণে একেবারে মুড়িয়া ছাটা। উহার মধ্যস্থলে স্মারান পাঁচায় কালো-চূড়াওয়ালী একটা বড় গির্জা।—কিন্তু বাতানটা গুরুভাড়াভাব—এবং জোনাকি কাকে কাকে ডাড়াইতেছে।

রাত্রি ১১ টা। গাড়ী ও জনতায় ছুই-কদম দূবে, হিন্দুমন্দিরের অঙ্গনটা একেবারে গালি ও নিস্তর। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—সেই বিস্ব-বেগা-প্রদেশসুলভ জ্যোৎস্না—যেন সোনালি রংএব দিনমান। এই অপূর্ব আভাবিশিষ্ট আলোকের ভূমি উপর, মন্দিরটা পক্ষীয় সানিবন্ধ চূড়াগুলার ছবি আঁকিয়াছে। মন্দিরের নালাভ বিশাল ছায়ার দগুণ মন্দিরকে যেন গাছমস্তবন্ধ একটা লম্ববর্ণের জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে—যেন এখনই অস্তহিত হইবে। যেন উহা একটা অতি-প্রাকৃতিক রসে সন্মতোভাবে পরিসিস্ত এবং উহার চতুর্দিকে একটা ধর্মজনিত শান্তি বিরাজ কবিত্তেছে। বাহিরে যে জগন্নাথ চান-জগৎ অবস্থিত, মনে হয় যেন সেখান হইতে আমরা বহুদূরে রহিয়াছি। দেবালয়েব উন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে, কতকগুলি কলানো দীপ জ্বলিতেছে। খুব পিছনে বড় বড় মাথাওয়ালী কতকগুলি ছুইবুদ্ধি দেবতাও দেখা যাইতেছে—তাহাদের চারিদিকে কতকগুলি অজানা বিগ্রহ; উহাদের সম্মুখে বৃক্ষহীন কতকগুলি ফুল ছড়ানো রহিয়াছে—মল্লিকা ও গন্ধরাজের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত।

৩৪ জন ভারতবাসী নবীন যুবক ঐখানে পাহারা দিতেছে; খাটো ধুতি-পরা; বালিকার মতো চুল কাধ পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখের ভাবটা বুনো ধংগের, চোখের সাদাটা দেখিতে কতকটা মিনার মত। উহাদের মুখ স্ত্রী এবং উহাদের গণ্ডদেশ শ্মশ্রুহীন; কিন্তু উহাদের গোলাকার বস্তুর উপর, ঘৃণাজনক কালো বোয়ী

গজাইয়া উঠিয়াছে, সর্কসুন্ধ ধরিতে গেলে, উহারা যেন বিশ্বয়-উদ্দীপক ত্রেমনি বাভংস; মনে হয় যেন উহারা নাবী, বানর ও হরিণ হইতে প্রহৃত।

দেবতাদের নিকটবর্তী স্থানে, উহারা ঘনিষ্ঠ আশ্রয়ের মত খুব খোলাখুলিভাবে কণাবাড়া কহিতেছে, হাসিতেছে।

উহাদের মধ্যে একজন, কতকগুলি জুইফুলের মালা হাতে লইয়া গোলাপী জ্যোৎস্নার আলোকে, অঙ্গন পার হইয়া একটা অতিক্ষুদ্র নিজনি দেবালয়ের নিশ্চি আসিল। এই মন্দিরের পুতুলটা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। এই দেবতার ওটা বাহু, মাথায় একটা উচ্চ মুকুট; কাচের বড় বড় চোখ, মুখের ভাবটা অ-শিব ও ভাষণ. অশ্রুশ্রী জীবন্তের ঞায়, বাকানো, দোমডানো, যন্ত্রণাবঞ্জক; দেবতা একাই আছেন—সর্জার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ,—উহার সম্মুখেই জ্বলিতেছে।

কোন পশুব সম্মুখে গেকপ তাহাব পাদ্য আনীত হয়, সেইরূপ দেবতাব দিকে একবারও না তাকাইয়া, সেই জুইফুলের খালাটি ঐ নবীনযুবক দেবতার পদতলে রাখিয়া দিল।

দ্বিগ্রহব বালি। শিঙ্গাপুরের শেষ বাড়ীগুলো ও শেষ আলোকচ্ছটা আবড়ো-খাবড়ো একটা মাটির পিছনে অস্তহিত হইল;—একটা খোলা ময়দান—উদ্ভিজে পূর্ণ। নগরের দ্বারদেশ হইতেই হবিৎশ্রামল মতেজ দুর্গম জটিল জঙ্গল আবস্ত হইয়াছে—“মালাই” প্রায়দীপেব প্রায় সমস্ত স্থানই এই জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

কি চমৎকার বাত্রি—কি সুন্দর। আমাদেরই মতন ওক গাছ, পপ্লাব গাছ, মাগনোলিয়া গাছ—কিন্তু সবই যেন পরিবর্জিত থাকিলে; এবং সমস্তই বড় বড় স্রবভি ফুলে আচ্ছাদিত।

আব,—পাতাবাহাবেরই বা কি বাহাব, তালজাতীয় বৃক্ষেবই বা কি শোভা।—এত জাতীয় গাছপুত্রী সকলপ্রকার আকাব ধাবণ করিয়া জ্যোৎস্নাব আলোকে, ধাতব পত্র পল্লবের মত ঝিক্‌মিক্ কবিত্তেছে; প্রথমে, বিশাল পদমসমানত নাবিকেল, তারপর স্পার্বা-গাছ—খুব উচ্চ, জলাভূমি খাগড়াব মত সূক্ষ্ম ও মোজা, পল্কা বৃন্তেব অগ্রভাগে কুণ্ডিত পালকের গুচ্ছ। সর্বাংগেব বিস্ময়জনক—“পর্যটকের তরু”। উহাব বড় বড় পাতা; পেক পাতাবা যেকপ পাত্যম মেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াষ সেইকপ পাত্যমের স্মার উহার পাতাগুলো বেশ সুমমভাবে নিজবৃন্তেব চারিদিকে যেন পাত্যম ছড়াইয়া আছে—মনে হয় যেন চীনের প্রকাণ্ড পর্দাগুলো বনের মধ্যে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রামল উদ্ভিজেব রং এতটা সন্জ মে, এই দ্বিগ্রহব রাত্রিতেও এই গোলাপী রংএর জ্যোৎস্নালোকে, আরও যেন বেশী সন্জ বলিয়া মনে হইতেছে।

রাস্তা ট খুব নিজনি। কিন্তু এ কি।—পল্লব-মগুপেব প্রাপ্ত হঠতে, গাড়ীব লঠন দেখা যাইতেছে—দীর্ঘ-সারি বাঁধিয়া গাড়ী আসিতেছে—কিন্তু খোড়াব সাদাশব্দ নাই।

আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীগুলো খুবই ছোট; প্রত্যেক গাড়ীব আরোহী সাদা পোশাক-পরা একজন ইংরেজ নাবিক;—নগ্রকায় এক চীনা গাড়ীতে যোতা,—কান্ত হইয়া হাঁপাইতেছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই নাবিকেরা একটা বাজিব খেলা খেলিতেছে। যে প্রথমে পেঁচাবে, সেই বাজির টাকা পাইবে। এই নাবিকেরা বেশ কায়দাহবস্ত ও গম্ভীর; মুখের কণায় বাহবা দিয়া, হাত তালি দিয়া ধাবকদিগকে উহারা উত্তেজিত কবিত্তেছে।

উহারা চলিয়া গেল—অস্তহিত হইল। আবার এই দ্বিগ্রহব বাত্রি-সুলভ বঃস্ময়ী নিস্তরতা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা দুই আলোকচ্ছটা তরুমগুপেব ভিতর দিয়া যেন ছাঁকিয়া আসিতেছে;

তরমগুপের তলায়, সবুজ কাদা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কিন্তু সময়ে-সময়ে, উজ্জ্বল চাঁদেব কিরণ পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়া উপর হইতে নামিতেছে,—তাগাতে করিয়া লতাবাহারগুলা অথবা বড় বড় সুন্দর তাল-জাতীয় বৃক্ষগুলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই গাছগুলা পরী উদ্যানের গাছেব মত নিশ্চল।

ওঃ! এই নীরবতা, এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা, এই ঝিঁঝি পোকের লঘু সঙ্গীত, এই মাটির গন্ধ, গাছগাছড়ার স্রগন্ধ, ফুলের সৌরভ—কি চমৎকার!

কিন্তু সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে সেই তীব্র মৃগনাভির গন্ধ—এমন কি এই বনভূমির মধ্যেও। এই মালাই-দেশে সবই মৃগনাভি-গন্ধী; এমন কি মৃগিকেব মত একপ্রকার নৈশ জীব—পাখীর মত হধোৎফুল্ল মুহূৰে—“কুইক্”! “কুইক্”! “কুইক্”! করিতে করিতে যাহারা রাস্তাব উপর দিয়া প্রতি মিনিট খুব দ্রুত চলিয়া যায়—তাহারাও তাহাদের পিছনে তাহাদের মৃগনাভিসিক্ত গায়ের গন্ধ রাখিয়া যাইতেছে.

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাতন কলিকাতার ফৌজদারী বিচার

এ দেশে কোম্পানীর রাজ্য সংস্থাপিত হইবার কিয়ৎকাল পরে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টের ব্যবস্থা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচারকার্য নিষ্পন্ন হইত। সুপ্রীম কোর্ট ক্রিপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতেন তাহা মহারাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমার বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজা নন্দকুমার বাঙ্গলা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বংশবর্ণাদায় শ্রেষ্ঠ, বৈভবে অভূতনীয়, পদগৌরবে অস্বীকৃত্য ছিলেন। কাব্যদগতায় সর্ববাদিসম্মতিক্রমে তৎকালে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে এই মহারাজা নন্দকুমার ওয়াবেন হেষ্টিংসের চক্রান্তে, বলাকি দানের নাম জাল করিয়া কৃত্রিম তনমুক প্রস্তুত করার অপরাধে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত বিচারে তৎকালে শুদ্ধ সুপ্রীম কোর্টেই হইত তাহা নহে। কলিকাতার ম্যাজিস্ট্রেট ফুড্র সুড্র ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলির বিচার করিতেন। এইসমস্ত মোকদ্দমার বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিচারকগণ কোন আইনের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইতেন না। কোন একটি কার্য দণ্ডই কি না এবং দণ্ডই হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিরূপ শাস্তি পাওয়া উচিত, এইসমস্ত বিখয়ের অবধারণার ভার তাহাদিগের উপরে আস্ত থাকিত। পদ্ধতিটি কতকটা কাজির বিচারের অনুরূপ ছিল; কিন্তু কাজির আদালতে বিশেষ অবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কারণ, কাজি ভারতবাসী; তিনি দেশের অবস্থা এবং ভাবতবাসীর বাতিনীতি সমস্তই জানিতেন। কিন্তু কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতে বিচারক থাকতেন ইংরেজ কর্মচারী, অভিযোগকারীগণ অধিকাংশ স্থলেই ইংরেজ, ফিরিঙ্গি অথবা পটুগীজ এবং তাহারা বেশকর ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিতেন, তাহারা সকলেই ইতর শ্রেণীর ভারতবাসী। এরূপ স্থলে সুবিচারের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সুবিচারই হটক আর অবিচারই হটক সে স্বতন্ত্র কথা। মোকদ্দমাগুলির বিবরণ পাঠ করিলে তবানীশ্বন কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজের অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণের নিমিত্ত কয়েকটি অভিযোগের নিষ্পত্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :— *

১। “জন রিংওয়েল তাহার পাচক রজনীব নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী ফরিয়াদীর জনৈক ভৃত্যকে প্রহার

করতঃ কার্যত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছিল। আসামী পূর্বে একবার অপরাধ করায় তাহার একটি কর্ণ ছেদন করিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়, আদেশ হইল তাহাকে দশ বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২। এণ্ডার্সনের পিসি নামী ক্রীতদাসী তাহার বাটা ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল। চৌকিদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। আদেশ হইল, আসামীকে দশ বেত মারিয়া তাহার মনিবের নিকটে প্রেরণ করা হয়।

৩। মুনिया নামক একটি বালককে কলিকাতার অষ্টম বিভাগের পাইকগণ গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে। আসামী দস্যুতা অপরাধে কাজারী আদালতে অনেকবার শাস্তি পাইয়াছে। কিয়দ্দিন পূর্বে তাহাকে বিশ বেত মারিয়া তাহাব প্রতি এইকপ আদেশ হইয়াছিল, সে যেন হাওড়া পার হইয়া কলিকাতায় না আসে। সে এইক্ষেণে সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে। আদেশ হইল তাহাকে পনব বেত মারিয়া হাওড়ার পারে প্রেরণ করা হয়।

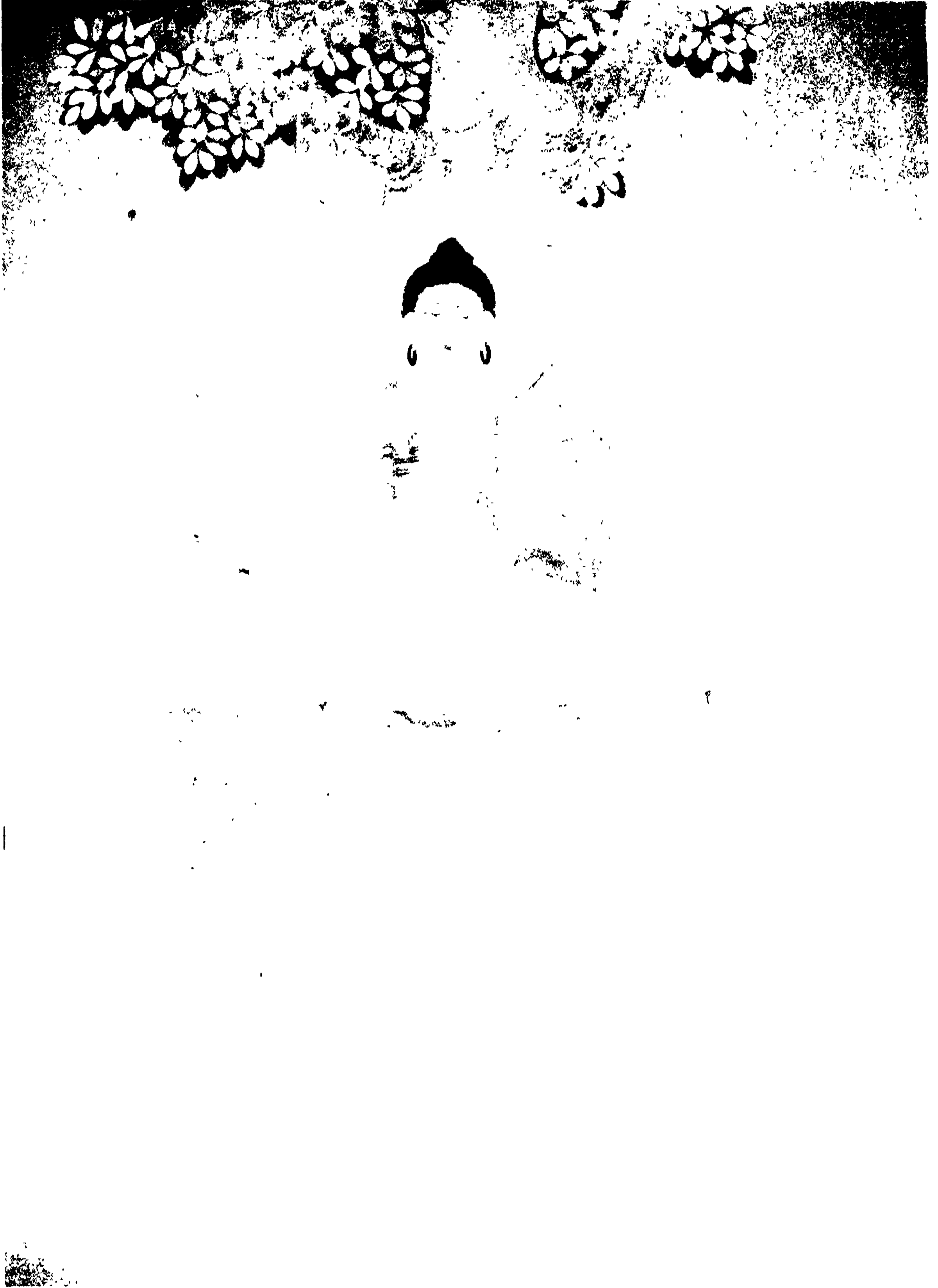
৪। কাপ্তেন পটু বেণীবাবুব নিকট একখানি শকট মেরামত করিতে দিয়াছিল। আসামী শকটখানি মেরামত করে নাই। আদেশ হইল আসামীকে দশ জুতা।

৫। কর্ণেল ওয়াটসন রামসিংহের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী প্রতারক। সে জাতিতে নাপিত। কিন্তু সূত্রধর বলিয়া পরিচয় দিয়া ফরিয়াদীর বেতন গ্রহণ করিয়াছে। আদেশ হইল, তাহাকে পনর বেত মারা হয়। তৎপরে তাহাকে কুলীবাজাবের মধ্য দিয়া কর্ণেল ওয়াটসনের বাটা পর্য্যন্ত সে নাপিত এই কথা ঢোল সহরতের দ্বারা প্রচার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হয়।

৬। জেকব জোসেপ তাহার পাচক তিথুনের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী তাহার একটি কাঁসার ঘটি আর কয়েকটি জিনিস চুরি করিয়াছে। আদেশ হইল, চোরাই মাল ফেরত না দেওয়া পর্য্যন্ত আসামীকে হরিণবাটার জেলে আবদ্ধ রাখা হয়।

৭। রামহরি বাজিক রামগোপালের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী একটি বালকের গলা হইতে তুলসীর মালা ছিনাইয়া লইয়াছে। আদেশ হইল দশ বেত।

৮। কার্টব নামক পোর্ট গালবানী তাহার বালক ভৃত্য জ্যাকের নামে একখানি রূপার চামচ চুরি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। আসামী প্রথমতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিল যে চামচখানি সে একজন দোকানদারকে দিয়াছে। দোকানদারের উপর সমন জারি হইলে সে উপস্থিত হইয়া বলিল যে সে কিছুই জানে না। তখন



বুদ্ধদেব
শ্রীমতী যুগলিনী দেবী কর্তৃক অঙ্কিত

U Ray & Sons, Calcutta

আসামী অপর ব্যক্তির নাম করিয়া বলে যে চানচখানি তাহার নিকটে আছে। অনুপস্থানে জানা গেল যে সেখানেও নাই। আসামী ছোটখাট একটি বনমাইস। আদেশ হইল, পাঁচ বেত।

৯। এই অক্টোবর তারিখে শ্বামা গোয়ালাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। অদ্য সে খালাস হইল, তাহার উপর এইরূপ আদেশ হইল যে পুনর্বার যদি কেহ তাহাকে চোর বলিয়া ধরে, তাহা হইলে তাহার ফাঁসি হইবে।

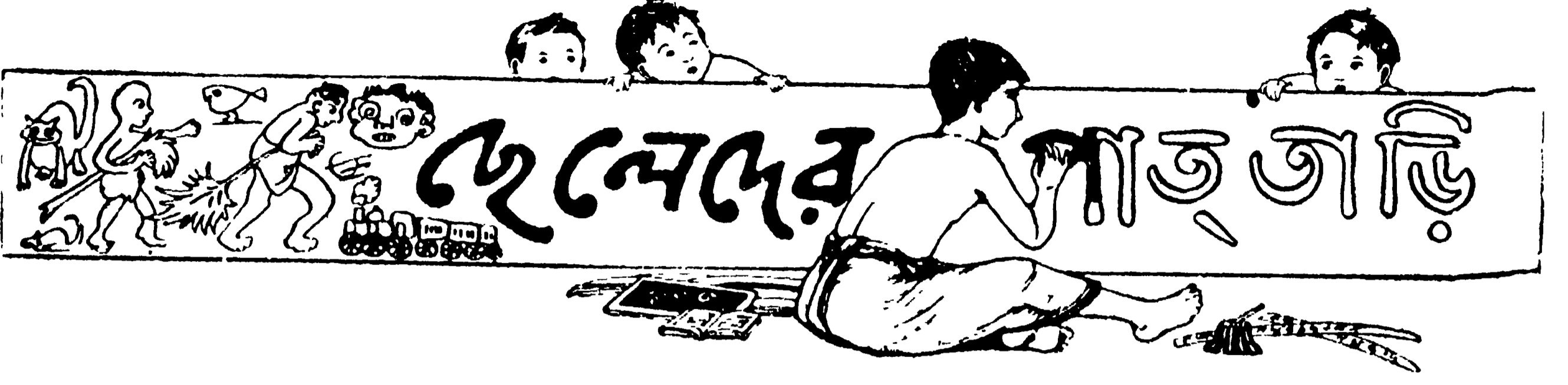
১০। বাকের মহম্মদ রামধোমির নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে আসামীর স্ত্রী ফরিয়াদীর স্ত্রীক গালাগালি দিয়াছে। আদেশ হইল, ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের প্রত্যেকের পাঁচ টাকা জরিমানা হয়।

১১। ফরিয়াদী ক্যাষ্ট্‌ওয়ান, তাঁহার নেথরানীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে আসামী তাঁহার কতকগুলি পিতল চুরি করিয়া বক্তারাম নামক দোকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। আসামী অনেক দিন যাবৎ এইরূপ চুরি করিতেছে। একরূপ কুদৃষ্টান্তে অজ্ঞাত চাকরবর্গ অসচ্চরিত্র হইতে পারে। আদেশ হইল বক্তারামকে ২০ বেত ও মেথবানীকে দশ বেত মারা হউক। শাস্তি হইয়া গেলে, আসামীদ্বয়ের অপরাধ সর্বসাধারণের নিকট প্রচারের নিমিত্ত তাহা-বিগকে একপানি গো-শকটে চড়াইয়া ঢোল সহরত কবিত্তে করিতে কলিকাতার সহরের ভিতরে লইয়া বেড়াইয়া হয়।”

কর্ণচ্ছেদন, পাচুকা-প্রহার, স্ত্রীলোকের প্রতি বেত্রাঘাত ইত্যাদি-প্রকার দণ্ডপ্রদানের ব্যবস্থা ইউরোপীয় মস্তিষ্কসম্বন্ধে অথবা মুসলমান গবর্ণমেন্টের অনুকরণে কোম্পানীর আদালতে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কারণ তৎকালে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অপরাধীগণের প্রতি বর্ধরতা প্রদর্শিত হইত। ১৭৮৯ খৃঃ পর্যন্ত ফরাসীদেশের দণ্ডবিধি আইনে অক্ষচ্ছেদনের ব্যবস্থা ছিল। ইংলণ্ড দেশেরও বিচারে বর্ধরতা বর্ণে ছিল। কোন স্ত্রীলোক স্বামী-যাতিনী হইলে অথবা কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিলে তাহাকে জীবন্ত দণ্ড করা হইত। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়প্রকার অপরাধীই বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। তদ্বিন্ন কতকগুলি অপরাধে দোমী সাব্যস্ত হইলে অপরাধীগণকে পিলারিয়স্তের দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হইত। পিলারি প্রথাটি কোম্পানীর রাজ্যেও প্রবর্তিত হইয়াছিল; পরিশেষে ইংলণ্ডে রহিত হইয়া গেল এদেশেও রহিত হইয়া গিয়াছিল। উল্লিখিত মোকদ্দমা কয়েকটির বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বৃদ্ধিতে পারা যায় যে প্রবাসী ইউরোপীয়গণের ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্বপ্রকার স্বার্থের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা মাজিস্ট্রেট স্বীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এণ্ডার্সনের ক্রীতদাসী তাঁহার বাটী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল। এণ্ডার্সন তাহা জানিতেন না সুতরাং দাসীর নামে আদালতে অভিযোগও করেন নাই। চৌকিদার দাসীকে এণ্ডার্সনের বাটী হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া এণ্ডার্সনের নিকটে লইয়া গেল না, মাজিস্ট্রেটের নিকটে

উপস্থিত করিল। মাজিস্ট্রেট এণ্ডার্সনের নামে শমন জারি করিলেন না, অথবা দাসী সম্বন্ধে কোন কথাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন না। তিনি চৌকিদারের সমুখে পলায়নের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসামীর প্রতি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে এণ্ডার্সনের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। একরূপ ঘটনা যদি বর্তমান সময়ে ঘটিত তাহা হইলে পাঠকগণ মাজিস্ট্রেটকে এণ্ডার্সনের বেতনভোগী কর্তৃকারী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সে সময়ে কলিকাতাবাসী ইউরোপীয়গণ সকলেই আপনাদিগকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তৃতীয় মোকদ্দমটির বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত কখন কখন আসামীর প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া তাহাকে হাওড়ার পাঠে পাঠাইয়া দিতেন। সে সময়ে হাওড়ার পুল ছিল না, স্ত্রীমারও ছিল না, সেইজন্য মাজিস্ট্রেট মনে করিতেন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে নদী অপর পারে পাঠাইলে সে পুনর্বার কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত করিতে পারিবে না। কিন্তু কখন কখন আদালতের এইরূপ আদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইত; কারণ, মুনিয়া নামক বালকটি হাওড়ায় প্রেরিত হইয়াও পুনর্বার কলিকাতায় আসিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ আদালতের বিচারে দোমী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে সর্ব সাধারণের নিকট এই কথা প্রচারের নিমিত্ত মাজিস্ট্রেট যে উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে হাস্য সহরণ করা যায় না। রামসিংহ জাতিতে নাপিত, সে সূত্রধর বলিয়া আশ্রয়পরিচয় প্রদান পূর্বক কর্ণেল ওয়াটসনের বেতন গ্রহণ করিয়াছিল। আদালত তাহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই পাছে অশ্রু কোন ব্যক্তি মনে করে রামসিংহ নাপিত নহে সূত্রধর সেইজন্য ঢোল সহরতের দ্বারা তাহার জাতির পরিচয় দিতে দিতে তাহাকে মুসলীগণ পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। মেথবানী পিতল চুরি করিয়া বক্তারাম দোকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল উভয়েরই বেত্রদণ্ড হইল। তৎপরে উভয়কে গো-শকটে চড়াইয়া কলিকাতা সহরের প্রত্যেক স্থানে লইয়া যাওয়া হইল এবং ঢোল বাজাইয়া সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা হইল যে ইহারা পিতল চুরি করিয়া শাস্তি পাইয়াছে। একরূপভাবে অপরাধ-প্রচারে আবশ্যকতা আমরা এইক্ষেণে উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু সে সময়ে কলিকাতা একটি অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল, লোকসংখ্যাও বেশ ছিল না সেই জন্য সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষগণ মনে করিতেন অপরাধীগণকে শাস্তি দিয়া যদি প্রত্যেক গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে শাস্তি দেওয়ার ফল কি? ১০ নং মোকদ্দমা নিম্পত্তিটি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি সেরূপ মত করি না। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বচসা হইলে উভয়েরই স্বামী দণ্ডনী হইতে কি সন্দেহ আছে? একরূপ ব্যবস্থায় পাঠকগণ অবশ্য অসম্মত হইবেন কিন্তু পাঠকগণের আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রী স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ



শোধ-বোধ

পোষ মাসের শীতের রাতে একটি শীর্ণ, কদাকার কুকুরছানা সমরাম সহরের পথে অতি কাতর ক্রন্দনে পথিকদের জানাচ্ছিল যে সে অতি অসহায়। শীতে তার নড়বার শক্তি ছিল না। পথ দিয়ে অনেকেই গেল, কিন্তু কেউ তার দিকে দৃকপাতও করলে না। ঝঞ্ঝনে একটা একা সেই পথে যাচ্ছিল। পথের উপর এমন অনধিকারে বসে' থাকার জন্তে ছোকরা একাওয়ালা কুকুরছানাটিকে এক চাবুক বসিয়ে দিলে। আঘাত করা যার অভ্যাস হ'য়ে গেছে তার লখু গুরু জ্ঞান বড় থাকে না। কুকুরছানাটি আঘাতের বেদনায় যখন বুকফাটা আন্তনাদ করে' উঠল তখন সেই পথের পথিক ছোট একটি বালকের বুকে তার কান্নার আঘাতটা গিয়ে বড় ককণভাবেই লাগল। বালক তখন শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ শেষ করে' বাসায় ফিরে'ছিল। এমনশুভাচারটা কোমল-প্রাণ বালকের কাছে বড়ই খারাপ ঠেকল, কুকুরছানাটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্তে সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে। ছানাটি দরদীর হাতের কোমল স্পর্শ পেয়ে শান্ত হ'ল। কিন্তু সে শীতে বড়ই কাঁপছিল। বালক নিজের বই-বঁধা আঁকড়াটা খুলে' কুকুরের গায়ে ভাল করে' জড়িয়ে দিয়ে তাকে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সামনের একটা বাড়ীর দালানে একটা কোণে বসিয়ে রেখে দিলে। পরে কুকুরছানাটি যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল তখন বালক নিজের বাসায় ফিরে' গেল। কিন্তু কুকুরছানাটি বোধ হয় এমন যত্ন কারও কাছে পায়নি। তাই সে বালকটির সঙ্গ ছাড়লে না। বালক যখন আপন মনে পথ চলেছিল তখন কুকুরছানাটি তারই পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। যে শীতে এতক্ষণ পথ থেকে নড়তে পারছিল

না, সে এখন দয়া ও স্নেহের উত্তাপে বল পেয়ে বালকের পিছনে পিছনে তার বাড়ী পর্যন্ত যেতে কিছু কষ্ট অনুভব করলে না। বালক বাড়ী ঢুকতে গিয়ে এই অনাহত অতিথি কুকুরছানাটিকে দেখতে পেল। বালকের কোমল প্রাণে দয়াটা শীঘ্রই আসে। সে আহারাদির পর নিজের আহার্যের কিছু ভাগ কুকুরছানাটিকে এনে দিলে—আর একটা ছেঁড়া চট এনে তাকে ঢাকা দিয়ে দালানের এক কোণে রাতের মত তাকে আশ্রয় দিলে। একটা কদাকার কুকুরছানাকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া বাড়ীর কারও মঞ্জব হ'ল না। পরদিন সকালেই কুকুরছানাটি বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'ল। কিন্তু সে বাড়ীর স্মৃতি ছাড়লে না। বালকটি লুকিয়ে তাকে নিজের আহারের কিছু কিছু ভাগ দিত।

পাঁচ মাস পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে বালকটি তার বাপ-মার সঙ্গে দেশে গেল। কুকুরটি কিন্তু সেই দোর আগলে পড়ে' রইল। ছুটির পর যখন আবার সকলে ফিরে এল তখন বাড়ী ঢুকতেই প্রথম দৃশ্য যা দেখা গেল তা বড়ই ভীষণ ও আশ্চর্যজনক। উঠানের মাঝখানে একটা ভীষণকায় রক্তাক্ত মানুষ মবে' পড়ে' আছে— তার পাশেই কুকুরটিও মৃতপ্রায়—উঠবার বা নড়বার শক্তি নেই।

তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হ'ল—পুলিশ-তদন্তে জানা গেল যে, মৃত লোকটি এক জেল-ফেরৎ চোর। কুকুরটির জন্তে একটা সোনার "মেডেল" তৈয়ারি হ'য়ে এল। কিন্তু তখন সে ঋণ শোধ দিয়ে পরপারে যাত্রা করেছে।

আচার্য্য শ্রীশ্যাম ভট্ট

কালিদাস

(মালাবারে প্রচলিত গল্প)

এক ছিল রাখাল, সে নিজেই গরু নিয়ে রোজ মাঠে চরাতে যেত। মাঠেই মাঝখানে—যেখানে দিগন্ত খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যেত, সেখানে একটা গাছের তলায় তার আড়া বসত। সেটা ছিল এক প্রকাণ্ড বটগাছ। বোধ হয় যেন কোন্ আদ্যিকালের বটগাছ—সে তার ডালপালা নিয়ে সেখানে নিজেই বসে বসে আর গাঙ্গীযোব পরিচয় দিচ্ছিল। তারই তলাতে গরুগুলো চরত, আব রাখাল তারই ছায়াতে দিব্যি আরাম করে বসে নিজেই প্রিয় বাঁশীটি বাজাত। সে নিজের মনে বাঁশী বাজিয়ে যেত, কেউ শুনেছে কি না তা ফিরেও দেখত না। কত পথভোলা পথিক তার বাঁশী শুনে খম্কে দাঁড়াত, আর তার বাঁশীর কত প্রশংসা করত, তাকে কত বাহবা দিত। রাখাল কিন্তু আপন মনে কেবল বাজিয়েই যেত, তাদের বাহবা নিতে ফিরেও চাইত না।

একদিন হ'ল কি—সেদিন ছিল শ্রাবণের বাদলা দিন— রাখাল তার বাঁশী নিয়ে গাছতলায় বাঁশী বাজাচ্ছে, আব গরুগুলো কচি দাম খুঁজে খুঁজে যাচ্ছে, এমন সময়ে মুম্বলপারায় বৃষ্টি এল—তার সঙ্গে আবাব শিলাবৃষ্টি হ'তে লাগল; গরুগুলো ত ভয়ে ভয়ে বটগাছের কাছে ধেঁসে এল, রাখালও গাছতলায় জড়সড় হ'য়ে বসল; কিন্তু বৃষ্টি আরও বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে শিলাও খুব বড় বড় করে পড়তে লাগল; তখন রাখাল প্রাণভয়ে সেখান থেকে দিলে এক ছুট; কিন্তু যাবে কোথায়? হঠাৎ তার মনে পড়ল যে কাছে ত একটা দেবমন্দির রয়েছে— সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত হয়; অমনি সে ছুটে সেই মন্দিরে আশ্রয় নিতে গেল; তার বরাত ছিল ভাল, তাই দরজাটা ছিল খোলা—সে ত তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে; এখন হয়েছে কি—সেই মন্দিরটা হচ্ছে কালীর মন্দির—সেই সময়টা কালী কি কাজে যেন বাইরে গিয়েছিলেন; তিনি ফিরে এসে দেখেন—ওমা, মন্দিরের দরজা যে বন্ধ! তিনি ত পড়লেন ভারি মুস্কিলে! দরজায় ঠেলা দেন—ভিতর থেকে বন্ধ।

দরজায় থাকার শব্দ শুনে সেই রাখাল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“কে?”

সেই দেবী উত্তর করলেন—“আমি কালী। তুমি কে?”

রাখাল ত ভেবে পেল না কি উত্তর দেবে, সে বলে ফেললে—“আমি দাস।”

দেবী তখন বললেন—“আচ্ছা, তবে দরজা খোল, আমি তোমাকে বড়লোক করে দেব।”

বড়লোক হবার লোভ রাখালের যথেষ্ট ছিল, তাই সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে।

দেবী তখন তাকে বললেন—“ওই যে ওখানে বেল-পাতা পড়ে রয়েছে, ওটা খাও। তা হ'লে আমার আশীর্বাদে তুমি জগতে একজন বড় পণ্ডিত হ'তে পারবে। আর তুমি নিজেকে দাস বলে পরিচয় দিয়েছ বলে তুমি জগতে ‘কালিদাস’ নামে খ্যাত হবে।”

সেই থেকে সেই রাখাল জগতে ‘কালিদাস’ বলে পরিচিত হ'ল, আর কালে পৃথিবীর একজন বড় কবি বলে বিখ্যাত হ'ল।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

পাখীর কাজ

কত বিভিন্ন-রকমের পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইয়া থাকি। অনেকে হয়ত মনে করেন যে কেবল পাখী আমাদের কত সুন্দর সুবে গান শুনায ও তাহাদের মনোহর নৃত্যাদির দ্বারা আমাদের আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্তু পাখীর প্রধান কাজ অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ হইতে আমাদের শস্যাদি রক্ষা করা। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে কোন ক্ষেতে পঙ্গপাল, ফড়িং প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ফসল নষ্ট করিতেছে, এমন সময়ে কোন পাখী তাহার সন্ধান পাইল; এবং অচিরে অনেকগুলি পাখী আসিয়া জুটিল; দুই একদিনের মধ্যেই ক্ষেতের কীট-পতঙ্গ নাশ করিল। এইরূপে পাখীর জন্ত অনেক ফসল রক্ষা পায়।

যে-সকল পাখী এই কাজ করে তাহাদের নাম বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের পরিচিত কাক বক চড়াই হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামা দোয়েল কিম্বা বুলবুল প্রভৃতি সকল পাখীই অল্পবিস্তর কীটভোজী। আবার পাখীরা একরকম খাণ্ডে পরিতুষ্ট থাকে না, যখন যে খাদ্য প্রচুর পায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে; শরৎকালে যখন দেওয়ালী-পোকা প্রচুর জন্মে, তখন অনেক পাখী তাহাই খাইয়া থাকে, পরে তাহারা আবার শস্য পাকিলে তাহাই খায়।

আমাদের চড়াই প্রায় সর্বভুক। সহরে তাহাদের অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন। এবার মাটির টবে ফুলের বীজ রোপণ করিয়া একটিও গাছ তৈয়ারি করিতে পারিলাম না, কত উপায় স্থির করিয়া চড়াইয়ের অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলাম, সবই বিফল হইল। ছোট ছোট চারা জন্মিলেই তাহারা খাইয়া ফেলিবে, কিছুতেই নিস্তার নাই। আবার ইহারাই গাছের পোকা-মাকড় নিমূল করিতে সিদ্ধহস্ত। কানাডা দেশে একবার ফসলে একরূপ পোকা লাগিল, কিছুতেই তাহাদের উচ্ছেদ করা যায় না। দেখিয়া শেষে এই চড়াই সেখানে লইয়া যাওয়া হইল এবং এইরূপে ফসল রক্ষা হইল। সেদিন হইতে চড়াই কানাডা দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল।

সকলেই জানেন যে স্ক্যালেরিয়া জর মশা দ্বারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং মশা বন্ধ জলে, যেমন ডোবা খাল প্রভৃতিতে, ডিম পাড়ে। যদি তথায় কয়েকটা ইঁস রাখা যায়, তবে আর মশা বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ মশার ছানা ইঁসের প্রিয় খাদ্য।

ক্ষেতে নূতন লাঙ্গল দেওয়া হইলেই দেখা যায় যে, কতকগুলি বক তথায় চরিতেছে ও মৃত্তিকার কীট-গুলিকে খাইতেছে। আবার পাখীরা যে কেবল কীট-পতঙ্গ খায় তাহা নহে, ইন্দুর আদি ছোট ছোট জন্তুও খাইয়া থাকে।

পেচককে লক্ষ্মীর বাহন বলে, কারণ গোলাবাড়ীতে, যেখানে ধান থাকে, তথায় ইন্দুরে বড় উৎপাত করে। পেচক ইন্দুরের শত্রু। ইন্দুর মারিয়া পেচক গৃহস্থের লক্ষ্মীলাভের, অর্থাৎ অপচয়-নিবারণের সুবিধা করিয়া দেয়।

পাখীদের আব-একটি কাজ বড় বিষয়কর। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, যদি কোন স্থানে একটি পুষ্করিণী দীর্ঘ নিষ্কাশন করা যায় ও যদি তাহাতে বাহির হইতে জল না আসিতে দেওয়া যায় ও মাছ না ছাড়া যায় তবুও সেই পুষ্করিণীতে কিছু দিনের মধ্যেই মৎস্য আপনাআপনি জন্মে দেখা যায়। এ মৎস্য কোথা হইতে আসিল? পক্ষীরাই ইহার জন্ত দায়ী। দেখা গিয়াছে যে নদীচর পাখীগুলির পায়ে যে পাক লাগিয়া থাকে তাহার সহিত মাছের ডিমও অনেক থাকে। পুষ্করিণী থাকিলেই পাখী আসিবে, ও তাহাদের পায়ে মাছের ডিমও আসিয়া তথায় মৎস্য-বংশ বিস্তার করে। এইরূপেই হয়ত ১৮০০০ ফুট উচ্চ মানস-সরোবরেও মৎস্যের সঞ্চয় হইয়া থাকিবে। জলজীবী মৎস্য এইরূপে পাখীর পা ধরিয়া হিমালয় লঙ্ঘন করিয়াছে!

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

মুকুরে *

বড়লোক জমিদারের মেয়ে নেলি দেখতে বেশ সুশ্রী। বড়লোকের মেয়ে, দিব্য প্রজাপতিটির মত, সেজেগুজে' দিনরাত অবাধগতিতে খেলে' বেড়াত। তার পর যৌবন যতই তার সারা শরীরখানি লাষণের প্রভার অপূর্ণ শ্রীতে ভরিয়ে তুলছিল,—একটা ভাবনা তার মনে ততই তোলাপাড়া করছিল,—সেটা তার বিয়ের ভাবনা। দিনরাত সে ভাবছে, যেন তার বিয়ে হয়েছে,—কেমন সুন্দর তার স্বামী—তাকে কত ভালবাসে সে—অনেক টাকাকড়ি তার—দুগুনে

খুব সুখে আছে—কেউ কাকেও চোখের আড়াল করতে পারে না,—একদণ্ডের তফাৎ হ'লে প্রাণ অমনি যায়-যায় হ'য়ে ওঠে। সে কত ভালবাসা—কত সুখ—কত আনন্দ; তার পর যেন তার একটি খোকা হয়েছে, ফুটন্ত গোলাপের মত; তার স্বর্গীয় হাসিতে সারা ঘরখানি আলোকিত হ'য়ে উঠেছে, তখন তার স্বামীর দিকে চেয়ে গোলাপেরই পাপড়ীর মত পেলব খোকার সেই ঠোঁট দুখানিতে চুমো দিচ্ছে; আর সেই চুমোর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে লেগে গেছে তার খোকার ঠোঁটের খানিকটা হাসি, আর চোখে ফুটে বেরিয়েছে স্বর্গীয় আনন্দের এক অপূর্ণ উচ্ছ্বাস,—সে কত সুখ, কত আনন্দ। এইরকম ভেবে ভেবে সে তার ভবিষ্যৎখানি নিস্তের মনোমত হ'বে

* রূপ লেখক আন্তন শেকভের Looking Glass নামক গল্প অবলম্বনে লিখিত।

বশ রঙীন করে' আঁকছিল। আর সে ছোটোছোটো নেই, খেলাধুলো নেই—কেবল নিজের ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আঁকে, আর মাঝে মাঝে একেবারে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন নববর্ষের সন্ধ্যায় সে আশির সামনে দাঁড়িয়ে পোষাক পরছে আর তার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কথা ভাবছে—ভাবতে ভাবতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছে—বাহাজগতের কোন অমুভূতিই তার নেই। নিস্পন্দ হয়ে সে সেই আশির সামনে দাঁড়িয়ে আছে—ভারাক্রান্ত চোখ দুটি তার অর্ধনির্মীলিত—ঠোঁট দুখানি ঈশৎ বিচ্ছিন্ন; দেখলে বুঝতে পারা যায় না, সে যুগুচ্ছে কি জেগে আছে—কিন্তু সত্যিই সে তখন তার ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশে' গিয়ে আশিতে তারই ছবি দেখছে।

প্রথমে ভেসে উঠল তার চোপের সামনে দুটি সুন্দর কমনীয় চক্ষু—মনহরণকারী তার দৃষ্টি; তার পর ধনুকের মত দুটি ঙ্গ, তার পর সমস্ত মুখটি; তার পর সমস্ত দেহখানি,—ঠা, ঠা, সে চিন্তে পেরেছে—এই ত তার প্রিয়তম—তার স্বামী, যার সঙ্গে ভবিষ্যৎ তাকে একত্ববে বেঁধে রেখেছে। সে এসে নেলির সঙ্গে কত কথা কইলে—কত হাসলে—কত ভালবাসলে তাকে। তার সঙ্গে নেলির বিয়ে হ'য়ে গেছে—কত সুখে তারা দুজনে একসঙ্গে বাস করছে—অভাব-অশ্রুবিধার নাম তারা কখনও শোনেনি। নেলি মনপ্রাণ সব তার স্বামীকে অর্পণ করেছে। দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে; কেউ কারো অদর্শন সহ্য করতে পারে না। ওঃ—সে কত সুখ—কত আনন্দ! নেলি যেন একেবারে তার স্বামীর সঙ্গে মিশে' গেছে।

শীতকালের রাত্রি; সহরের বাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে—চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই রাত্রে নেলি ডাক্তার লুকিসেব দরজায় টোকা দিচ্ছে—চাকরটা বেরিয়ে আসতেই নেলি জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তার বাড়ী আছেন? চাকরটা চুপিচুপি বললে—ডাক্তার সাবান্দিন রোগী দেখে' এসে এই মাত্র শুয়েছেন, তিনি আগাতে বারণ করে' দিয়েছেন—তাকে আর ডাকা হবে না।

“ডাকা হবে না?” বলে'ই নেলি চুকে পড়ল বাড়ীর ভিতর। তার পর অন্ধকারে এ-ঘর সে-ঘর কবে' দুখানা চেয়ার উল্টে' ফেলে', দেয়ালে দুবার মাথা ঠুকে' শেষে ডাক্তারের শোবার ঘরে এসে হাজির। ডাক্তার তখন বিছানায় শুয়ে হাত দিয়ে নিজে' নিখাসের উপর পরীক্ষা করছিলেন। ঘরে একটা আলো মিটমিট করে' জ্বলছিল।

নেলি কিছু না বলে'ই মেয়ে বসে' কাঁদতে আরম্ভ কবে' দিলে। খুব খানিকটা কাঁদবার পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাক্তারকে বললে—“আমার স্বামীর বড় অশুখ।” ডাক্তার তখন আস্তে আস্তে উঠে' হাতের উপর মাথাটা বেখে নেলির দিকে চাইতেই নেলি আবার বললে,—তখন ফোঁপানিটা অনেকটা কমে' এসেছে,—“আমার স্বামীর বড় অশুখ, দয়া কবে' উঠুন শীগগির;—উঠুন।”

ডাক্তার মুখখানা বিকৃত কবে' বিরক্তভাবে বললেন—“আঃ।”

“আসুন—আসুন। এক্ষুণি—এগণি, ঠা না হলে—ওঃ। ভাবতে পারা যায় না—আপনার পায়ে পড়ি আসুন।” ক্রান্ত, বিবর্ণ নেলি তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাক্তারকে তার স্বামীর অশুখের কথা বলতে লাগল। আহা! তার আশা ভরসা, সুখসম্পদ, তার বর্তমান ভবিষ্যৎ; এক কথায় তার যথাসর্বস্ব—তার স্বামীর অশুখের কথা বলতেও তার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। তার সে করুণ কাতরোক্তিতে পাথরও নড়ে' ওঠে,—ডাক্তার কিন্তু নিশ্চল। খানিক পরে নেলির দিকে চেয়ে হাতের উপর জোরে একটা নিখাস ফেলে', ডাক্তার বললেন—“কাল যার কাল।”

“অসম্ভব। তাব যে টাইফাস হয়েছে,—এক্ষুণি, এই মুহূর্তেই আপনাকে দরকার হয়ে পড়েছে, উঠুন দয়া করে'।”

“আমি এইমাত্র আসছি। আজ তিনদিন ধরে' টাইফাস রোগী দেখে' বেড়াচ্ছি—একটুও বিশ্রাম করতে পাইনি। আমি আজ নিজেই অশুখ হ'য়ে পড়েছি। আজ আর আমি পারব না,—কিছুতেই নয়। আমার নিজেরই টাইফাস হয়েছে।” তার পর পার্শ্বমিটার দিয়ে নিজের উত্তাপ পরীক্ষা করে' সেটা নেলির চোখে' সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন—“এই দেখ, আমার নিজেরই টেম্পারেচার প্রায় ১০৩ ডিগ্রি। অতি কষ্টে আমি বসে' আছি,—মাফ কবো, আমাকে ক্ষমা কবে'।”

ডাক্তার শুয়ে পড়লেন।

হতাশ হ'য়ে নেলি তখন ডাক্তারের পায়ে ধরে' বললে—“আপনার পায়ে পড়ি—দোহাই আপনার, একটুবার আসুন। একটু কষ্ট করুন, আপনাকে আমি পুষিয়ে দেব, টাকার জম্ম আপনি ভাববেন না।”

“আঃ! কেন বিবস্ত্র কর? বলে'ই ত দিয়েছি, যেতে পারব না।”

নেলি তখন উঠে' দাঁড়িয়েছে। তার চোখ দুটো জলে ভরে' এসেছে—তার প্রাণের মধ্যে যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা কি এই ডাক্তার বুঝবে—কত ভালবাসে সে তার স্বামীকে। তার যন্ত্রণার এক অংশও যদি ডাক্তারকে বুঝান যেত, তা হ'লে ডাক্তার তার নিজের অশুখ ভুলে' গিয়ে এতক্ষণ তাব স্বামীকে দেখতে ছুটত। কিন্তু কি করে' বুঝাবে সে,—সেরকম ভাষা ত সে জানে না।

শেষে লুকিস বললে—“সরকারী ডাক্তারের কাছে যাও।”

“একেবারে অসম্ভব। সে ত এখান থেকে আরও ২০ মাইল। সে সময় আব নেই: এই রাত্রিতে ঘোড়াও অতদূর যাবে না। সে হ'তেই পাবে না। উঠুন, উঠুন—আপনাকে আসতেই হবে। আমাকে দেখে আপনার একটুও দয়া হচ্ছে না?”

“কি কব্বা। আমার জব; মাথা অবধি আমার যুচ্ছে,—এ অবস্থায় রোগী দেখা যায় না, একথা হুমি বুঝবে না। যাও, আমায় একলা থাকতে দাও।”

“আপনি আসতে বাধ্য। যাব না, একথা আপনি কিছুতেই বলতে পাবেন না। লোকে পূর্বের প্রাণ বাঁচাবার জম্মে নিজের জীবন অবধি দিয়ে দেয়, আর আপনি পয়সা নিয়ে রোগী দেখতে যেতে চাইছেন না। কি স্বার্থপর লোক। আপনাকে আমি আদালতে হাজির করাব কিন্তু।”

ডাক্তার আবার পাশ ফিবে শুলেন। নেলি ভাবলে, এ কথাগুলো বলা তাব ভাল হয়নি। এ ত ডাক্তারকে অপমান করা হ'ল। কিন্তু কি কব্বা সে—তাব যে স্বামীর অশুখ। সংঘমের কথা, ভ্রত্নতার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছে। নেলি তখন ডাক্তারের পায়ে' উপর মাথা বেখে রাস্তার ভিখারীর মত মিনতি করতে লাগল। অবশেষে ডাক্তার কাশতে কাশতে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে' বললেন—“আমার কোর্টটা?”

নেলি দেওয়াল থেকে জামাটা এনে ডাক্তারকে পরিয়ে দিয়ে বললে—“আসুন, এইবার। আপনাকে আমি পুষিয়ে দেব, আর সারা জীবন আপনার এ দয়া আমরা মনে রাখব।”

এ কি। জামা পরে'ই সে ডাক্তার আবার শুয়ে পড়লেন! নেলি ডাক্তারের চাকরকে ডেকে এনে, দুজনে ধরে' আস্তে আস্তে ডাক্তারকে তার গাড়ীতে তুলে' নিলে।

শীতের হাওয়া ত ছ করে' বইছে,—রাস্তায় বরফ জমে' গেছে। গাড়োয়ানকে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে, রাস্তাটা ঠিক করে'

হবে। ঘোড়াগুলো একটু আস্তে চললেই নেলি অমনি গাড়োয়ানকে মিনতি করে বলে—“চালাও ভাই, চালাও।” ভোরবেলা নেলি ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ী পৌঁছল। ডাক্তারকে বাইরের ঘরে একখানা কেদারায় বসিয়ে নেলি বললে—“আপনি এক মিনিট বসুন, আমি এখনি আসছি।”

নেলি ফিরে এসে দেখে ডাক্তার সোফায় শুয়ে পাড়ছেন।

“ডাক্তার, ডাক্তার!”

“আঃ। তোমনাকে বল—”

“কি বলছেন?”

“মিটিংএ সকলেই তখন বললে—ব্রাসভ বলেছিল—। কে হে—? কি দরুকাব—?”

“এ কি! ডাক্তার যে প্রলাপ বকছে। হা ভগবান—এ কি হ’ল?”

নেলি স্বামী যখন সেবে উঠেছে, তখন তাদের অনেক দেনা। জমিদারী বাঁধা পড়েছে—ব্যাঙ্কের দেনার সুদ অবধি দিতে পারছে না। অভাবের ভাবনায় তারা স্বামী-স্ত্রীতে রাত্রে ঘুমতে পারে না।—তার পর ছেলে মেয়ে হয়েছে ৫৬টি। তাদের আবার আজ কারো জ্ব, কাল কারো সর্দি, পরশু কারো ডিপথিরিয়া; তার পর একটি ছেলের

মৃত্যু হ’ল—এই রকম নানা দুশ্চিন্তায় নেলি ক্রমশঃ বুকের অস্থিত দেখা দিলে। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তখনও এ-সব সহ্য করছে। আহা তারা দুজনে স্বামীস্ত্রীতে যদি একসঙ্গে মরতে পারে।

দেশে মড়ক এল। নেলি সর্বদা সাবধান ও সশঙ্ক হ’য়ে রয়েছে—কিন্তু কাল মড়ক তার স্বামীকে ছাড়লে না। নেলি স্বামীর পাশে বসে এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে! তার পর কফিন ও কবরে নিয়ে যাবার অশ্রু স্রঞ্জাম সব ঘরের মধ্যে নিয়ে আসতে দেখে উন্নতভাবে স্বামী মুখের দিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠল,—এ কি? এসব কেন?

নেলির বোধ হ’ল, তার সমস্ত বিনাহিত জীবনটাই গেন কেবল এই ঘটনাটারই একটা সুদীর্ঘ জড়ভূমিকা মাত্র।

হঠাৎ কিম্বের একটা শব্দে নেলি চমকে লাফিয়ে উঠল,—হাতের আঁশিখানা তার ফসকে তখন মোজায় পড়ে গেছে। সামনের আঁশিখানার দিকে চেয়ে দেখে তার সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ, গণ্ডে অশ্রু রেখা।

একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নেলি তখন ভাবলে—এ কি, গুমিয়ে পড়েছিলাম না কি।

শ্রী গোবিন্দপদ বিশ্বাস

ভোরের বাতাস

ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া শোফার চলিয়া গেলে শৈলজা শ্রীকান্তকে একান্তে ডাকিয়া বলিল—“শ্রীকান্ত, একটা কাজ করবি ভাই?”

“কি কাজ সেজদি?—আচ্ছা টিকিটটা কবে নিই ত আগে।”

“একটা দিনের জন্ত গিরিডি হ’য়ে যাবি?”

“গিরিডি! কি দরুকার সেজদি?” দ্রুতগমনোত্ত চরণযুগলকে সংযত করিয়া বিস্মিত শ্রীকান্ত ফিরিয়া দাঁড়াইল।

“মেজদির সঙ্গে আর-একবার দেখা হবে। আর—”

“এর মধ্যে আর কি আবার! এই ত একমাস আগে মেজদির সঙ্গে দেখা হ’ল।”

“কিরণ-বাবু কাল গিরিডি পৌঁছেছেন। মেজদির বাসাতেই বোধ হয় উঠবেন।”

এই কথা কয়টা বলিতে শৈলজা যে লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিতেছিল শৈলজার ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়াই শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। বলিল—“জিতেন-বাবরা যদি রাগ করেন সেজদি। বঝিয়ে বলতে পারেন

হৃদয় বিপরীত হ’তে পারে। তার পর, বাবা কি বলবেন?”

“বাবা যে চিঠি লিখেছেন তাতে তাঁরা জানেন আমরা দুদিন পরে রওনা হব। তাঁদের টেলিগ্রাম না করলে ত তাঁরা জানতে পারবেন না। টেলিগ্রাফ তুই করিসনে। তবে বাবা শুনলে রাগ করবেন। কিন্তু যদি এখন যাওয়া না হয় তা হলে আর কিরণ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর আর বাঁচবার আশা নেই।”

“বাঁচবার আশা নেই? বল কি সেজদি!” স্তম্ভিত-প্রায় হইয়া শ্রীকান্ত কহিল।

শৈলজা ধরা গলায় বলিল—“বাঁচবেন না। নিশ্চয়ই।” শৈলজার আর্তস্বরে আহত হইয়া শ্রীকান্ত বলিল—“আচ্ছা চল সেজদি, গিরিডি হ’য়েই যাব।”

“কিন্তু বাবার বিরাগ বা রাগ সহ্য করতে হবে। তখন আমার উপর রাগ করবে না ত?”

“না সেজদি। তুমি কি আমাকে তেমনই ভাব! চল, আর দেয়ী করা হবে না।”

বলিয়া দান পত্রাক্রম শ্রীকান্ত টিকিট-দায়ের দিক

অগ্রসর হইল। শ্রীকান্ত যে তাহার জন্ম কতখানি ঝঙ্কি মাথায় করিয়া লইল তাহা ভাবিতে ভাবিতে শৈলজা ভ্রাতাকে অনুসরণ করিল।

গাড়ীতে বসিয়া শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল—“কোথাকার টিকিট করলে, শ্রীকান্ত?”

গিরিডি যাওয়াটা যে এত সহজে হইবে এ কথা বুঝি শৈলজার তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না।

শ্রীকান্ত যেন ভরসা দিয়া কহিল—“গিরিডির।”

লিলুয়া ছাড়িয়া গেলে শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—“সেজদি, তুমি কি করে’ কিরণ-বাবুর অস্থখের খবর পেলে? তিনি কি চিঠি লিখেছিলেন?”

“বাবাকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন। বাবা মাকে পড়ে’ শোনাচ্ছিলেন, আমি পাশের ঘরে ছিলাম, তাই শুন্তে পেয়েছিলাম।”

“কি লিখেছিলেন কিরণ-বাবু?”

‘লিখেছিলেন—ডাক্তার বলেছেন, জীবনের আশা নেই। গিরিডিতে কিছুদিন থেকে একবার দেখবেন। মেজদির বাসায় উঠবেন; তার পর সুবিধামত অন্য বাসায় যাবেন। যদি মন ভাল থাকে এবং শরীর কিছুদিন টিকে তা হলে ওখানেই থাকবেন। ভাল না লাগলে ওখান থেকে পুঁজী যাবেন। যাবার পথে কল্কাতা হ’য়ে যাবেন।”

“বাবা বুঝি এই পত্র পেয়ে তোমায় শীগগির পাঠিয়ে দিলেন?”

অনেকখানি লজ্জা পাইয়াই শৈলজা বলিল—“তাই হবে।”

বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। শরতের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। পশ্চিম দিক তখন অস্তগামী সূর্যের রক্তিম কিরণে রঞ্জিত হইয়া ছিল। তাহার রঙীন আভা শৈলজার ম্লান মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে ভাবিতেছিল ও কল্পনাচক্ষে দেখিতেছিল গিরিডির একটি সুন্দর সুসজ্জিত ভবনে একজন তাহার সমস্ত গৌরব সমস্ত ক্ষমতা দিয়া জীবনের চিত্তা রচনা করিতেছে। সেই ত সেদিন তাহার জীবনের সূর্য পূর্ব গগনে প্রতিভাত হইতেছিল। ইহারি মধ্যে তাহার পশ্চিম গগনে যাইবার সময় হইয়া আসিল?

ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল। আলোকিত গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরের অন্ধকার বড়ই গাঢ় দেখাইতেছিল। রক্তিম মেঘের কোন চিহ্ন তখন আকাশে কোথাও ছিল না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলজা ভাবিল—হঠাৎ এমনি করিয়া কি—তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে? কথাটা মনে হইতেই শৈলজা শিহরিয়া উঠিল।

২)

সকালে চা-পান-রত স্বামীর সঙ্গে বিরজা গৃহস্থালীর কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময় বাহিরে চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ তাহাদের গেটের সম্মুখে আসিয়া থামিল বলিয়া মনে হইল।

বিরজা কান পাতিয়া বলিল—“ইয়া গা, গাড়ীখানা এখানেই থামল না?”

স্বামী ইহা অনুমোদন করিতে না করিতে বিরজা মেয়েকে বলিল—“দেখ তো রাণী, কে এল।”

রাণী বলিয়া মেয়েটি ঘরের ভিতরের দিক্কার বারান্দায় একখণ্ড পাথরের উপর ইট ঘষিয়া ঘষিয়া খেলা ঘরের রান্নার মসলা পিষিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া মসলা পেয়া অসমাপ্ত রাখিয়া ছুটিয়া বাহিরের দিকে আসিল। একটু পরেই রাণীর মিষ্ট তীক্ষ্ণ গলা শুনা গেল—“ও মা, সেজ মাসিমা এসেছেন, ছোট মামা এসেছেন, —ও মা!”

“সত্যি নাকি! দেখি”—বলিয়া গৃহস্থালীর প্রসঙ্গ চাপ দিয়া বিরজা তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে আসিলেন।

“তুমি যে রাণীর মা তা তোমার হাঁটনি দেখে’ স্পষ্ট বোঝা গেল”—বলিয়া বিরজার স্বামী অমরনাথ মুছ হাঁসিয়া চায়ের বাটিতে একটা বড় গোছের চুমুক দিয়া জানালার দিকে সরিয়া আসিলেন।

একটু পরেই রাণী ও বিরজাব পশ্চাতে শ্রীকান্ত ও শৈলজা আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল।

অমরনাথ প্রফুল্ল মুখে শৈলজার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—“অত্যন্ত অতিরিক্তভাবে স্বামী-সোহাগিনী হও; হাতের লোহা এবং সোনা অক্ষয় হোক।”

তার পর শ্রীকান্তের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—“তুমি যুবক শীঘ্র মোড়শী জীর মুখ-নাড়া সহ করিতে ক'র।”

আশীর্বাদের বেগ ও অতিশয্যে তিন ভাইবোনেই শূয়া ফেলিল। বিরজা ভাইবোনকে সাদরে বসাইয়া তার পানে চাহিয়া বলিল—“সাদা কথাও এমন ভঙ্গী রে' বল যে মনে হবে কি একটা কাণ্ড করে' বসলে।”

অমরনাথ হাসিয়া বলিলে—“কথাটা কিন্তু তোমার হইয়ের অপ্রিয় হয়নি। হয় না হয় তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর। রামায়ণের একটা উপমা দিলেই ব্যাপারটা খুব ঝল হ'য়ে উঠবে। অন্ধমুনি দশরথকে শাপ দিয়েছিলেন, পুত্রশোকে তোমার মৃত্যু হবে। তাতেই তিনি আনন্দে অধীর হয়েছিলেন; যেহেতু পুত্রশোক পেতে হ'লে পুত্রলাভ অবশ্যস্বাবী। এ ক্ষেত্রে মোড়শীর মুখনাড়া সহ করতে হ'লেই তাঁর পাণিপীড়নটা আগেই করতে হবে। কি বল শ্রীকান্ত?”

বিরজা হাসিয়া বলিল—“আচ্ছা, তুমি এখন ঠাট্টা খামাও। এদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা কই।”

“আচ্ছা, আমার তা হ'লে এখন পেন্সন্ হ'ল। পাষণ্ড শ্রীকান্ত, তোমার জন্ম আমার আজ এই ছুবস্থা!”—বলিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত অমরনাথ শ্রীকান্তের পানে গাহিলেন। সকলে একমুদ্রে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীকান্ত প্রাতঃকৃত্য সারিয়া অমরনাথের কাছে বসিয়া। পানে প্রবৃত্ত হইল। শৈলজাকে সঙ্গে লইয়া বিরজা ভতরের দিকে চলিয়া গেল। রাজায় রাজায় দেখা হয় বোনে বোনে দেখা হয় না। বিবাহিতা ভগ্নীদের হাদরাদের পরস্পর দেখা-শুনা অল্পই ঘটিয়া থাকে, তাই এই প্রবাদের জন্ম।

বিরজা অপ্রত্যাশিত ভাবে শৈলজার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে নিষ্কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—“শৈল, হঠাৎ যে? তুই যে আবার পাটনা যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে' যাবি তা ভাবিনি।”

শৈলজা নিরুত্তর রহিল।

শৈলজার কাঁধে স্নেহভরা হাত রাখিয়া তাহার কৃষ্ণ অতিসুন্দর মুখের পানে চাহিয়া বিরজা বলিল—

“শৈল ভাই, এত রোগা হ'য়ে গেহিস্ কেন! আবার বুঝি—”

বলিয়াই শৈলজার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া অক্ষু-শোচনায় গুরু হইয়া গেল।

“না মেজদি, ভালোই ত আছি”—কথা কয়টি শৈলজার মুখ দিয়া এমন সুরে বাহির হইল যেন এই থাকটাই তাহার জীবনের ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিরজা দেখিল শৈলজার চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। কি একটা কথা যেন সে বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না।

বিরজা জিদ করিয়া শৈলজাকে স্নানাদি শেষ করিবার জন্ত পাঠাইয়া দিল। স্নান করিয়া শৈলজা কিছু স্নু হইল। তাহাকে নিজ হাতে কিছু খাওয়াইয়া দুই বোনে শয্যার উপর পাশাপাশি বসিল। শৈলর একখানি হাত সন্মুখে আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল—“শৈল, ভাই, সত্যি করে বল, কিরণের কোন চিঠি পেয়েছিলি তুই?”

শৈলজার বুকের শব্দ তখন এত জোরে হইতেছিল যে তাহার ভয় হইতেছিল বুঝি বা বিরজা এখনি শুনিতে পাইবে। মুখ নীচু করিয়া শৈল উত্তর দিল—“না, মেজদি।”

“তবে তুই কি ক'রে জান্নলি কিরণের এখানে আসবার কথা ছিল। চমকাসনে ভাই। আসা পয্যন্ত তোর চোখ যে সেই একই কথা বলে' দিচ্ছে। আমার কাছে লজ্জা কেন ভাই!”

শৈল আর আপনাকে গোপন করিতে না পারিয়া কহিল—“বাবাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাই থেকে আমি জান্তে পেরেছিলাম। হয়ত তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না—তাই মনে করে' এখান দিয়ে হ'য়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া আর অদৃষ্টে নেই।”

বলিয়া শৈলজা বিরজার প্রসারিত বাহুর উপর ললাট রাখিয়া মুখ লুকাইল।

বিরজা সন্মুখে শৈলজার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল আর অক্ষুভব করিতে লাগিল শৈলজার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া অক্ষু তাহারই বাহু সিক্ত করিতেছে। শৈলজার

জন্ম তাহার দুঃখ হইলেও সে শশুরবাড়ী গিয়া এই বিলম্বের জন্ম কি কৈফিয়ৎ দিবে তাহা ভাবিয়া বিরজার মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না।

শৈলজা একটু শান্ত হইলে বিরজা বলিল—“কিরণের কালই এখানে আসবার কথা ছিল। কালই তার পত্র পেয়েছি, হঠাৎ অসুখটা বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তারের কথা-মত কিছুদিনের জন্ম আসা বন্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু শৈল, তুই আবার কেন এসব কথা ভাবছিস্ বোন? তোর চেয়ে ধৈর্য্য যে আমাদের কারও ছিল না।”

শৈলজা আপনার অশ্রুপ্লাবিত মুখ বিরজার পানে উঠাইয়া বলিল—“মেজদি, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কোরো না। আমি দিন রাত কাজ নিয়ে থাকি যাতে করে কোন ভাবনা আমার মনে না আসে। কিন্তু মেজদি, আমার মত সামান্য একটা মেয়েমানুষের জন্ম অত বড় একটা প্রাণ নষ্ট হ'তে বসেছে তা যে ভোলা যায় না!”

শৈলজার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল বালিশে মুখ লুকাইয়া শৈলজা শুইয়া পড়িল। বিরজা তাহার মাথাটিতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তখন অপরাহ্ন। সম্মুখের পথ দিয়া সুসজ্জিত নরনারী লমণে চলিয়াছে। তাহাদের হাস্য-পরিহাস, গল্প, উচ্চস্বরে কথাবার্তা সব সেই ঘর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বিরজা কহিল “শৈলজা, বেড়াতে বেরুবি?”

শৈলজা খাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাইবে না।

“চল সখীটি, একটুখানি বেড়িয়ে আসবি। আগে এত ভালবাস্তিস্ বেড়াতে!”

বিশেষ করিয়া অমরোধ করাতে শৈলজাকে সম্মত হইতে হইল।

বিরজা কহিল—“তুই একটু গা গড়িয়ে নে। আমি ততক্ষণ রাতের রান্নার একটা ব্যবস্থা করে' দিয়ে আসি। মিনিট কুড়ি পরেই কিন্তু আমি এসে ডাকব।”

ঘর হইতে বাহির হইয়া ছুয়ার বন্ধ করিয়া

বিরজা হঠাৎ

খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শৈলজা স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই যে সকলকে লুকাইয়া গিরিডি আসার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল আর রহিল কেবল ইহার একটা গল্পনা লোকনিন্দার সম্ভাবনা—শৈলজা শুইয়া শুইয়া তাহার ভাবিতে লাগিল। একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিব পাশে একখানি বই। হাতে লইয়া পড়িল—রত্নদীপ।

প্রভাত-বাবু উপত্যাসের মধ্যে এইখানিই শৈলজা সবচেয়ে ভাল লাগিত। প্রকৃত প্রেম যে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করিয়া তুলিতে পারে, স্বার্থপরকে স্বার্থ বা দিতে শিখায় এই সত্যটুকু পুষ্পেব সৌরভের মত তাহাতে বিমল আনন্দ দিয়াছিল। বইখানি খুলিতেই একখানি খামের চিঠি বাহির হইল। খামখানি তাহার মেজদিদির নামে। অনেক দিন পরে ও দুর্বল হাতের বিকৃত লেখা হইলেও শৈলজা চিনিতে পারিল ইহা কিরণবাবুর হস্তাক্ষর। তাহার মেজদিদি যে চিঠির কথা বলিয়াছিল এ সেই চিঠি।

শ্রায় হউক, অশ্রায় হউক, শৈলজা চিঠি না খুলিয়া পারিল না। কম্পিত-হৃদয়ে খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া শৈলজা পড়িল :—

বিশ্বনাথ

২

কাশীধাম

১২ আশ্বিন ১৩—

মেজদিদি,

আপনাদের পত্র পাইয়াছি। আপনারা যে আমাকে সাগ্রহে আশ্রয় করিবেন তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু এত ঠিক করিয়াও যাওয়া ঘটিল না। কাল যখন বাস হইতে বাহির হইবার কথা তাহার ঘণ্টা খানেক আগে হঠাৎ মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত উঠিল। ডাক্তার বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। বাহির হওয়া হইল না।

এখনও রাণীমার দেওয়া বাসাতেই আছি। ছেলেটিকে এখন আর পড়াইতে পারি না। হয়ত আর পড়ানো উচিত নহে বুঝিয়া রাণীমা ছয় মাসের পূরা বেতনে ছুটি দিয়াছেন। গঙ্গার ধারের বাসাটিও আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ছুটির দুই মাস এখানেই কাটিয়া গিয়ে

কিরণ

মাশা আছে আর বাকি চার মাগের মধ্যে সংসারের
দনা-পাওনা সব মিটাইতে পারিব।

সকাল, সন্ধ্যা, ও দুপুর গঙ্গার দিকের জানালার ধারে
ধানার উপর কখন শুইয়া কখন বসিয়া থাকি।
দেখিয়া দেখিয়া গঙ্গার কখন কি মূর্তি হইবে, আকাশের রং
কিভাবে বদলাইবে, বাতাসে কখন কি কথা ফুটিয়া
রবে সব যেন কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। কেহ পুরী বা
ও টেয়ার, কেহ বা সিমলা বা দার্জিলিং যাইতে
লিতেছেন। কিন্তু সে-সবে আর উৎসাহ নাই।
কাজনই বা কি?

এক রাতে মোটেই ঘুম আসিল না। শেষ রাতে
ঠিয়া বসিয়া জীবনের বিগত ঘটনা স্মরণ করিতেছিলাম।
গিরিডির কথা সবপ্রথম মনে আসিল। আপনি ত
জানেন গিরিডিতেই আমার সত্যকার জীবনের আরম্ভ
হইয়াছিল। সেইখানেই আপনাদের সহিত আমার প্রথম
পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যেখানে জীবন একদিন
পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজ আবার যদি
সেইখানে গিয়াই জীবনটাকে শেষ করিতে পাই তো
আর চেয়ে বেশী সৌভাগ্য এখন আর কি হইতে পারে?

এই শীর্ণ দেহ ও শক্তিহীন মন লইয়া মনে হয় প্রকৃত
সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য লাভের দিন আর সেই বিগত স্মরণীয়
দিনের চিন্তা এই দুইয়ের মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ নাই।
নিক্তির তৌলে চড়াইলে হয়ত শেষেরটাই ভারি হইয়া
পড়। তাই গিরিডি যাইবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইয়া
ঠিল।

একটি সংবাদ শুনিয়া আমার স্বপ্নাবশিষ্ট দিন কয়টার
ও শাস্তি হারাইয়াছি। আপনাকে লেখার জন্য ক্ষমা
কারবেন। আর যদি এসম্বন্ধে কিছু জানেন আমাকে
দানাইবেন।

শুনিলাম শৈলজা সুখী হয় নাই। তাহাকে নাকি
স্বপ্নাও সহিতে হয়। এক সময়ে অন্য একজনের সহিত
তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল ইহা লইয়া সেখানে
আলোচনার অন্ত নাই। আমার এক আগেকার ছাত্র
শৈলজার মামাতো ভাই। সে আমাকে দেখিতে
গিয়াছিল। শুনিলাম একদিন বাডীস্থল লোকের

সামনে শৈলজার বাক্স অহুস্কান করান হইয়াছিল
পূর্বেকার সেই লোকটার কোন চিঠি আছে কি না
দেখিবার জন্য। সেই হইতে তাহার নাকি চিঠি-
পত্রলেখা পড়া-শুনাকরা সব বন্ধ। শৈলজা লেখা-
পড়া করিতে পাইবে না একথা আমি যে কল্পনাও করিতে
পারি না। ইহার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর শৈলজাকে
দেওয়া যাইত না।

রোগশয্যা শুইয়া আমি ত ইহার কোনই প্রতিকার
খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ মনে হয় সত্যই যদি
আপনাদের ভাই হইয়া জন্মাইতাম ও ভায়ের মত ভাল-
বাসিতে অধিকার পাইতাম তাহার চেয়ে অধিক সুখের
বিষয় আর কিছুই থাকিত না। আর একজন শৈলজাকে
ভালবাসিয়াছিল ইহার জন্য তাহাকে আর দুঃখ পাইতে
হইত না।

ভালবাসাই মানুষের পরম লাভ—তা সে যেভাবেই
হউক না কেন, তাহার স্বরূপও এক, ভিন্ন নহে। মানুষ
দেহটাকে লইয়া বড়ই কাড়াকাড়ি কবিয়া তাহার বিভিন্ন
মূর্তি গড়িয়া তুলে মাত্র। ভালবাসিয়া ও ভালবাসা পাইয়া
আমি প্রভূত লাভ করিয়াছি, অপরিমিত আনন্দও
পাইয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষতি অনেক
দুঃখও সহ করিতেছি। আমার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা
পাইতে হইতেছে ইহার চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে
পারে?

কিন্তু আমি কি করিব? এ দুঃখ হইতে তাহাকে
বাঁচাইবার কি উপায় আছে? শৈলজা সুখী হইয়াছে,
তাহার আর কোন দুঃখ নাই, তাহার স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর
সকলেই তাহার মর্যাদা বুঝিয়াছে—একথা আজ যদি
জানিতে পারি, বিশ্বেশ্বরের নাম লইয়া বলিতেছি, এই যে
রোগের দুঃসহ যন্ত্রণা—যাহাতে প্রতিক্ষণ মনে হইতেছে
বুকের মধ্যকার নরম জায়গাটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া কাটিয়া
কাটিয়া বাহির করা হইতেছে—এও আমি হাসিমুখে সহ
করিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু
মরিলে বা বাঁচিয়া থাকিয়া কঠোরতম দুঃখ সহ করিলেও
যে তাহাকে দুঃখের হাত হইতে বাঁচাইতে পারা যাইবে, নু
এই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ।

তছে। শৈলজার

তিন বৎসর হইল সে স্বপ্নের অবসান হইয়াছে। এই তিন বৎসর একটি দিনের জন্মও কলিকাতা যাই নাই। গিরিডিতে কতবার আপনারা সকলে একত্র হইয়াছেন শুনিয়াছি, তাও কখন যাই নাই। সমস্ত অস্তরের সহিত ভাবিয়াছি শৈলজা পূর্বকথা ভুলিয়া সুখী হোক। নহিলে আমার কি যাইতে ইচ্ছা হইত না, না, ইচ্ছা করিলে আমি যাইতে পারিতাম না ?

অনেক রাত্রি হইয়াছে। বাহিরের হাওয়া এখন ঠাণ্ডা—বুরফের মত। দিন রাত্রি জরভোগ করার জন্ম এ-বাতাস বড় মধুব লাগিতেছে! এ জীবনের পর মরণও যেন এমনই সুন্দর লাগে।

যাহা আমি শুনিয়াছি আপনাকে বলিলাম। যদি কোন উপায় থাকে করিবেন। অমবদা'কে সব কথা বলিবেন। সেই স্নেহময় বিশাল বলিষ্ঠ হৃদয় ও উদ্ভাবন-শীল মস্তিষ্কে হয়ত কোন বুদ্ধি যোগাইবে।

আপনাদের প্রণাম কবিতেছি। আশীর্বাদ করিবেন, আমার আত্মা যেন শীঘ্র শান্তি পায়।

স্নেহাশ্রিত

কিরণ।

কাজ মিটাইয়া বিরজা যখন ফিরিল শৈলজা তখন মাটিতে লুটাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। ভূমিকম্পের বেগের মত প্রচণ্ড দুঃখ তাহার সমস্ত শরীরকে যেন কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। মাথার কাছে কিরণের হাতের লেখা চিঠিখানি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে—যেন মাথার গণির অধিকার হারাইয়া শৈলজার দেহ-ভুজঙ্গ মর্ম্মস্থদ দুঃখে আছাড়ি বিছাড়ি করিতেছিল।

(৩)

শৈলজা সকালের ট্রেনে চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে তাহাদের তুলিয়া দিয়া আসিয়া অবধি বিরজা মনমরা হইয়া আছে।

“কেনই বা এরকম আসা। এতে মন আরও ছাই হ'য়ে যায়।”—বলিয়া বিরজা স্বামীর পানে চাহিল।

অমরনাথ বলিলেন—“তবু তো দেখাটা হ'ল।”

বিরজা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—“ই্যাগা, তোমার কি

মনে হয় শৈলর খশুরবাড়ীর ওরা জানতে পারবে যে শৈল গিরিডি এসেছিল ?”

অমরনাথের বিশ্বাস যে জানিতে পারিবে। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যটুকু না কহিয়া অমরনাথ বলিলেন—“তা ঠিক বলা যায় না। তবে জানতে পারলেই বা ক্ষতি কি ? আমরা এখানে রয়েছি ; একদিন দেরি করে' না হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করে' গিয়েছে। তাতে আর কি দোষ হয়েছে ?”

“ই্যা, তারা তোমার মত কিনা তাই কথাটা এত সহজ করে' ভেবে নেবে খন।” বলিয়া বিরজা বিমর্ষভাবে বাহিরের দিকে চাহিল।

একটু পরেই বিরজা আবার জিজ্ঞাসা করিল—“শৈল এবার যেন আরও রোগা হ'য়ে গিয়েছে। নয় ?”

অমরনাথ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন—“হাঁ হইয়াছে।

“শৈল বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচবে না। কেন যে বাবা শেষটা এমন জিদ্ধের' বসলেন তাই ভাবি ”—বিরজা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল।

অমরনাথ কহিলেন—“কিরণের মায়ে'র দুর্গাম সম্বন্ধে একখানা বেনামী চিঠি আসতেই তিনি কিরণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরণ, এ সত্যি ! কিরণ সব স্বীকার করলে। তার পর থেকে ওর মনটা এমন হ'য়ে গেল যে ওদের দুজনের কথা একসঙ্গে তুলতে কেউ সাহসই করলে না। তিনি যে আভিজাত্যের বড় পক্ষপাতী আর কিরণের মায়ে'র দুর্গামের কথাটা যে হালিসহরে সবাই জানত !”

“বাবা এত উদার, কিন্তু এ বিষয়ে কেন যে এমন করলেন ! আহা, এদের দুজনের মিলন হ'লে কি সুন্দরই হ'ত। আর এখন এদের কথা মনে করলেই চোখে জল আসে।” বিরজার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছিল।

অমরনাথ বলিলেন—“তাঁরও খুব দোষ নেই। তিনিও এতটা জানতেন না। এরা দুজনে আবার বড় চাপা ছিল ; খশুর-মহাশয়ের মনে আর একটা খটকা লেগেছিল। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, কিরণ এ খবরটা ইচ্ছে করে' গোপন রেখেছিল। কিন্তু কিরণ

যে বিবাহের কথা তুলবার আগে নিশ্চয়ই ও-কথা তাঁকে বলিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেটা না হবার সেটা এইরকম করে' বুঝবার ভুলেই উল্টে যায়।”

একটা যেন দুর্ভোগের সম্ভাবনায় সকাল-বেলাটা কাটিয়া গেল। না কোন কাজ, না কোন কথাবার্তায় কাহারও মন লাগিতেছিল।

নামমাত্র আহারাদির পর দুপুরে অমরনাথ স্ত্রীকে মাসিকপত্রের একটা গল্প পড়িয়া শুনাইতেছেন এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—“অমরদা, অমরদা!”

“কে? যাই।” বলিয়া অমর উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। একটু পরেই ফিরিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিরণ আসিয়া বিরজাকে প্রণাম করিয়া কোন-মতে সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

কিরণকে দেখিলে আর পূর্বের কিরণ বলিয়া চট্ করিয়া চেনা যায় না।—সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সরল দেহ কৃশ হইয়া সম্মুখেব দিকে হুইয়া পড়িয়াছে। গায়ের সেই উজ্জল গোর বর্ণ একেবারে রক্তশূণ্য বলিয়া মনে হইতেছে। মাথার চুল অর্ধেক উঠিয়া গিয়াছে। বাকি অর্ধেক অযত্নে কক্ষ ও শীর্ণ হইয়া বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু চক্ষু দুটির অসাধারণ দীপ্তটুকু ম্লান হয় নাই।

বিরজা বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—“একি, কিরণ তুমি! কাল রাত্তিরেও যদি আস্তে শৈলর সঙ্গে দেখা হ'ত। তুমি আসবে খবর পেয়ে কলকাতা থেকে পাটনা যাবার পথে সে এখানে এসেছিল। আজ সকালে গেল।”

মুহ্যমান কিরণের চক্ষুদুটি চারিদিক্‌টায় একবার ভাল করিয়া চাহিয়া বুঝি দেখিয়া লইল যে আসিয়াছিল সে কোথাও কিছু ফেলিয়া গিয়াছে কি না। তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া গেল। অমর তাড়াতাড়ি কিরণকে ধরিয়া পাশের বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

বিরজা একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে কিরণের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। তাহার কপালে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিয়াছিল ক্রমে তাহা মিলাইয়া গেল। একটু পরে কিরণ চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—“একটু স্থস্থ হয়েছে?”

“হ্যাঁ”—বলিয়া কিরণ উঠিয়া বসিতে গেল।

অমরনাথ বাধা দিয়া বলিলেন—“না, আরও খানিকটা শুয়ে থাকো। দুর্বল শরীরে এতখানি পথ একা এসেছ। খবর দিলে আমরা ত অন্ততঃ ষ্টেশন পর্যন্ত যেতে পারতাম।

অমরের মুখের পানে চাহিয়া কিরণ ধীরে ধীরে বলিল—“না আসাই তো আপাততঃ স্থির করে-ছিলাম দাদা। কিন্তু কাল সকাল থেকে অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম। কে যেন গিরিডি'র দিকে বড় জোরে টান্ছিল। তেমন টান জীবনে আর কখন অনুভব করিনি। কাশীতে থাকা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। রাত্তির টেনে কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কেন যে যাচ্ছি তা তখন বুঝতে পারিনি; এখন বুঝেছি।”

কথাগুলি বলিতে যে পরিশ্রম হইয়াছিল তাহার জন্ত কিরণ চক্ষু মুদিয়া আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিরণের মনে শুধু এই কথাটি অমৃত মধুর সঙ্গীতের মত বার বার ধ্বনিত হইতেছিল—

“শৈলজা আসিয়াছিল—শৈলজা আসিয়াছিল।”

আর এই যে আসা ইহার জন্ত শৈলজাকে যে কত আয়োজন, কত ত্যাগ স্বীকার, কতখানি বিপদ খাড়ে করিতে হইয়াছিল তাহা কিরণ যেমন জানে তেমন বুঝি আর কেহই জানে না।

তবু শৈলজা আসিয়াছিল! তাহাকে একবার শেষ-দেখা দিবার জন্ত নারী হইয়াও শৈলজা এতটা করিয়া-ছিল!

কিন্তু তবু ত দেখা হইল না!

তা না হউক। এই যে সে আসিয়াছিল, এত দুর্ভোগ মাথায় করিয়া, মমতার মূর্তি ধরিয়া সে যে এখানে উদয় হইয়াছিল—ইহাই কি যথেষ্ট নহে?

জীবনের পাত্র কতবার ভরিয়া উঠিয়াছে, কতবার শূণ্য হইয়াছে। কিন্তু এমন অমৃতবিন্দু দিয়া তাহার পরি-পূর্ণতা বুঝি আর কখন সাধিত হয় নাই। ইহার পরে

এ পৃথিবী—এই আনন্দের লীলাভূমি, এই বিগলিত দুঃখের প্রস্রবণ এখান হইতে বিদায় লইতে আর দুঃখ কি ?

শুধু—ভগবান্ যেন শৈলকে তাহার এই নিষ্ফল যাত্রার দুঃখ— এই অসমসাহসিক করুণার বিপদ হইতে রক্ষা করেন !

কিরণের মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তার পর আর দুই বিন্দু, আরও দুই বিন্দু—আরও, আরও।

বড়ই ক্ষোভ ও আক্ষেপের সাহিত অমরনাথের মুখ হইতে বাহির হইল—“কেন তবে কাল এলে না বিরণ !”

কিরণ তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মেলিয়া বলিল—“অদৃষ্ট !”

(৪)

গিরিডিতে কিছুদিন থাকিবে মনে করিয়াই কিরণ বাহির হইয়াছিল ; কিন্তু এখানে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া তাহার গিরিডি ত্যাগ করিয়া যাওয়া বা থাকা দুইই সমান কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল ।

যদি একেবারে না আসিত একরকম হইত ; আসিল যদি, একটা দিন আগে কেন আসিল না—এই চিন্তা তাহাকে আরও অবসন্ন করিয়া তুলিল। তাহার শবীরও এমন হইয়া দাঁড়াইল যেন অন্ততঃ দিন দশ কোথাও যাওয়া অসম্ভব। পৃথক বাসার কথা কিরণ মুখেও আনিতে পারিল না। বাহিরের দিক্কার ঘরটি সবচেয়ে ভালো বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। স্বামী স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া কথায় গল্পে তাহাকে অগ্নমনস্ক ও প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গভীর দুঃখ যেন দাগ কাটিয়া তাহার অন্তরে বসিয়া গিয়াছিল। সে দুঃখের হ্রাস কিছুতেই বুঝি হইবার নহে।

একদিন শেষ রাত্রে বিরজার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামী ও পুত্রকন্যা সব নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রিত। খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বিরজা বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। একটু পরে উঠিয়া মাথার দিক্কার জানালাটা একবার খুলিয়া দিল। একরাশি স্নিগ্ধ শুভ্র ফুলের মত শীতল সুন্দর জ্যোৎস্না জানালা দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বিরজা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল অনেকগুলি

তারা নিভিয়া গিয়াছে, চাঁদও যেন একটু পরেই নিশ্চিন্ত হইয়া আসিবে।

হঠাৎ একটা গানের সুর তাহার কানে আসিল। কে গুণ্গুন্ করিয়া কি একটা করুণ সুর ধরিয়াছে। গলা যেন কিরণের বলিয়াই মনে হইল। হাঁ, নিশ্চয়ই কিরণের—কিরণের কণ্ঠ অতি সুন্দর ছিল। আগে এমন দিন ছিল না যখন কিরণেব গান ব্যতীত দিন বা রাত্রি কাটিত। সে মিষ্ট সুর ভুলিবার নহে !

বিরজা ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া গানের কথা বলিল। অমরনাথ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন—“হাঁ কিরণের গলা।”

“চল, কাছে গিয়ে শুনে আসি”—বলিয়া বিরজা উঠিল। সাবধানে ছম্মার খুলিয়া দুই জনে ধীরপদে আসিয়া কিরণেব ঘরের কাছাকাছি দাঁড়াইল।

কিরণ জানালা খুলিয়া দিয়া জানালার কাছে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল। জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া ভোবের আলো ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভোরের শীতল বাতাস তাহার ললাট স্নিগ্ধ করিয়া রুক্ষ চুলগুলি উড়াইতেছিল।

বাহিরের দিকে চাহিয়া কিরণ অতি করুণ সুরে গাহিতেছিল :---

ভোরের বাতাস, কোথা ভেসে যাসু ?

যাসু বঁধুয়ার দেশে।

লুটিয়া আনিম্ কস্তুরি-বাস

ম'খানো তাহারি কেশে।

পশিতে সে ঘরে যদি না পারিসু,

ওরে সে দোরের ধুলা এনে দিসু ;

সেই সে ধুলার কাঁজল আমি যে পরিব নয়নে

কেশে !

এই হতাশের মর্মভেদী সুর, আর বিরহীর সর্বরিক্ত মূর্তি বিরজা আব সহিতে পারিতেছিল না। চুপিচুপি আর্তকণ্ঠে সে অমরনাথকে বলিল—“চল, আমি আর এ দেখতে পারছি নে।”

দুজনে যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন বিরজার দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে

বিরজা কহিল—“দেখেছ, কিরণ সারারাত বিছানায়
শোয়নি !”

অমর বলিলেন—“হ্যাঁ ।”

“এ করে' আর কিরণ কদিন বাঁচবে !—হ্যাঁ গা, এর
কি কোন প্রতিকার নেই ?”

বিরজা স্বামীর দিকে চাহিয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া
উঠিল ।

অমর বলিলেন—“এ জন্মে বুঝি নেই ।”

“পরজন্মে হবে ?”

“যদি পরজন্ম থাকে নিশ্চয়ই হবে ।”

“আমি শুধু ভাবি এত প্রেম সব ব্যর্থ হল !”

অমর স্ত্রীর চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—“ব্যর্থ হয়নি ।

তুজনকারই হৃদয়ের এই গভীর প্রেম চির-বিরহের মধ্যে
সার্থক হবে ।”

তুজনেরই একসঙ্গে মনে হইল—শৈলজা এখন কি
করিতেছে !

ভোরের বাতাস কি এই চির-বিরহীর প্রেমের ভারতা
তাহার বঁধুয়ার কাছে পৌঁছাইয়া দিতেছে না ?

শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য

নীল পাখী

ঘুম ভেঙে আজ সকালবেলা
যেই উঠেছি জাগি',
হঠাৎ এসে বাতায়নে
বসল সে এক পাখী—
অপুরাজিতার একটি গুচ্ছি,
নীল মাণিকের একটি কুচি,
নীল আকাশের টুকরা খানিক—
কার যেন নীল আঁখি !

আলোক এল বর্ষা-শেষের
সোনার বাণী লয়ে,
বাতাস এল শিউলি-বনের
স্বপ্ন স্ববাস ব'য়ে ।
নীল পাখী সে ক্ষণিক র'য়ে
আবার গেল উধাও হ'য়ে,
শরৎ-রাণীর নীলাম্বরীর
আঁচল-আভাস না কি ?

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী

হেঁয়ালি

একদা এই পথে
যেন সে কোথা যাবে
চরণ ফেলে যেন বেয়াড়া চঞ্চল !
ভ্রমর-কালো আঁখি
বাঁধুল-ঠোটে ফোটে
পরণে নীল-সাড়ী— লুটিছে অঞ্চল ।

গোলাপ লাজ পায়
সুকালো কেশরাশি
অচেনা পথে ধায় তবু ত নির্ভীক !
‘হেঁয়ালি’ ব'লে তারে
ছুটিয়া কাছে এসে
ভুলে সে গেছে আহা যাবে যে কোন্ দিক্ ।

এমনি দিশাহারা
কে যেন বুঝায়েছে
সরমে বেধে বেধে সামালি' অম্বর ;
আমারি চোখে চোখে
আজি এ ভীতি কেন,—
অবাধে ঢেলে-দেওয়া কই সে অন্তর ?

শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায়



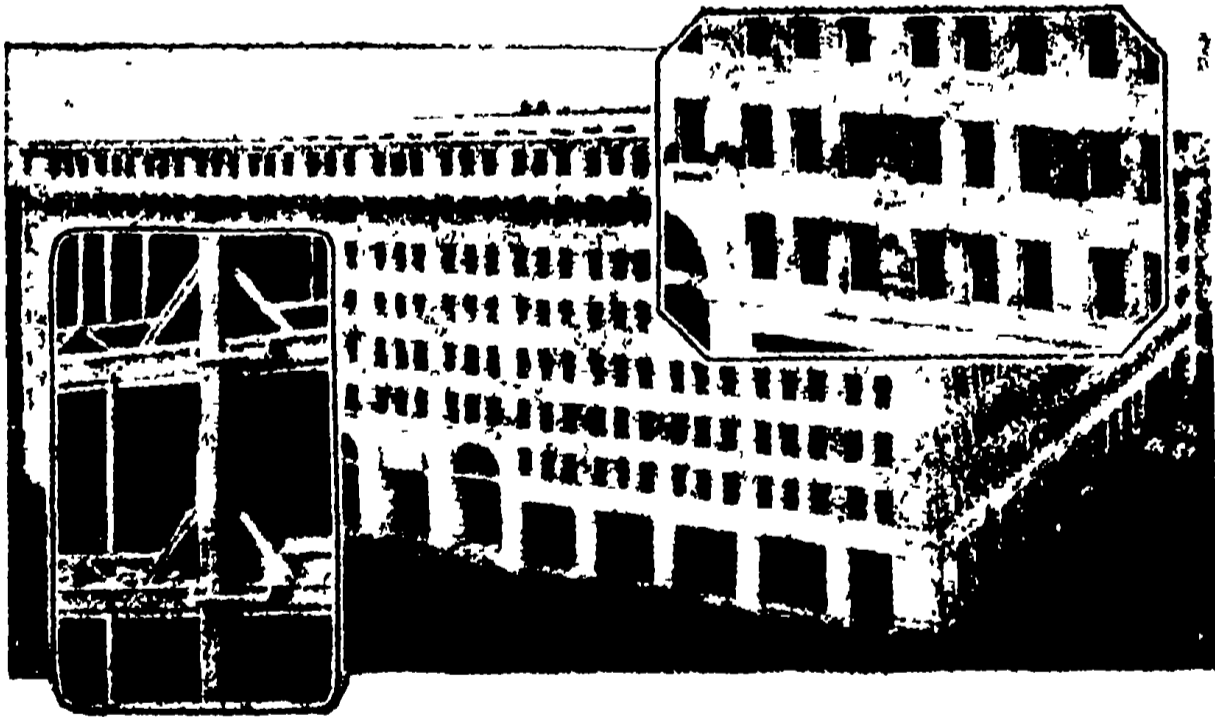
ভূমিকম্পের কথা—

কিছুদিন পূর্বে জাপানে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গেল তাহার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার ফলে যে কত হাজার লোক মরিল, কত কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। জাপানে ভূমিকম্প এই প্রথম নয়, পূর্বে আবার অনেকবার হইয়াছে—তবে এমন ভয়ানক ক্ষতি আবার কোন বার হয় নাই।

পূর্বে আর-একবারের ভূমিকম্পে তোকিওর অনেক ঘর বাড়ী হোটেল হাঁসপাতাল ইত্যাদি চূরমার হইয়াছিল। তবে তোকিওর সমস্ত অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। আর-একবার ইয়োকোহামাতে ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের জল আসিয়া পড়ে, তাহাতে প্রায় সমস্ত ঘরবাড়ী ভাসিয়া যায়, কোটি কোটি টাকার মালপত্র নষ্ট হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়।

বহুশতাব্দী পূর্বে জাপান এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার পর হঠাৎ ভূমিকম্পের ফলে বর্তমান জাপান এবং এশিয়ার মাঝখানে সমস্ত জমি বন্দিয়া গেল এবং তাহার স্থান সমুদ্রের জলে পূর্ণ হইয়া গেল। জাপান দ্বীপের জন্মও নাকি ভূমিকম্পের ফলে হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় জাপানে এত ঘন ঘন ভূমিকম্পের দর্শন পাওয়া যায়।

এখন বলা যাইতে পারে—জাপানীরা জাপান ত্যাগ করিয়া অস্থ কোথাও চলিয়া গেলেই পারে—সকল সময়ে মরিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া জাপানে থাকিবার প্রয়োজন কি? ইহার একমাত্র সহজ উত্তর—জাপানীরা যাইবে কোথায়?



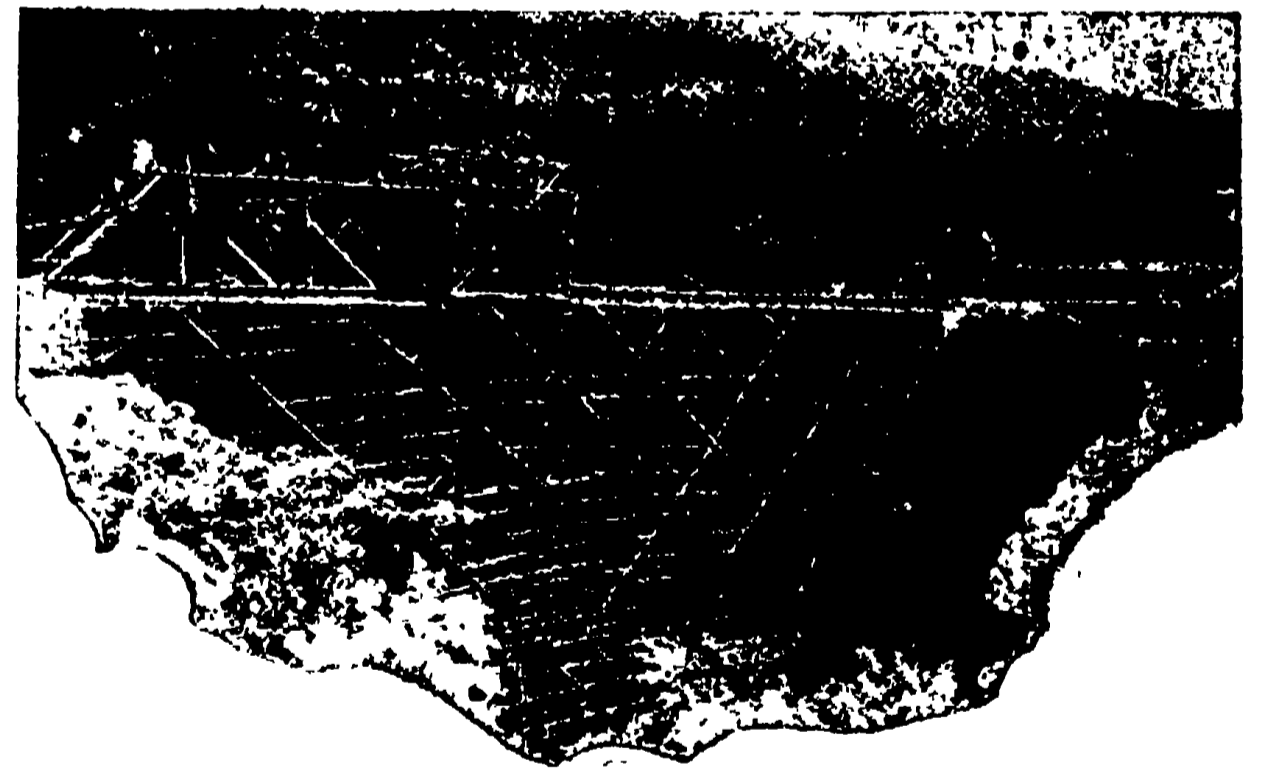
ইম্পাতের স্কেমের উপর এই রকম বাড়ী করিয়া, বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার ভূমিকম্পের আক্রমণ রোধ করিবার আশা করেন

লোহার এবং কংক্রিটের বাড়ী তৈরী করিবার কথাও মনে আসিতে পারে—কিন্তু ইটপাথর এবং লোহার তৈরী বাড়ী ভূমিকম্পের সময় কত কাজের হইতে পারে তাহাও ভাবিবার কথা। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী ভূমিকম্পের পরেও অটুট অবস্থায় দেখা গিয়াছে—কিন্তু ইট-পাথরের তৈরী বড় বড় বাড়ী সব ভাসিয়া চূরমার হইয়া গিয়াছে—দেখা যায়।

যে-সব সহরে ভূমিকম্পের ভয় আছে, সেইসব সহরে বেশী উঁচু বাড়ী তৈরী করায় বিপদ আছে। সেইজন্যই বোধ হয় ইয়োকোহামা ইত্যাদি সহরে প্রায় সব বাড়ীই ছোট ছোট এবং কাঠের তৈরী। তোকিও সহরেও এই ব্যবস্থা। এই কারণে সহরের ঘর বাড়ী আকাশের দিকে না বাড়িতে পারিয়া লম্বায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভূমিকম্পের হাত হইতে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাইবার উপায় জাপানবাসীরা এখনো বাহির করিতে পাবে নাই।

ভূমিকম্প কেন হয়—তাহার সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। একটি মতকে সকলেই একে একম সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা এই—মাটির নীচেব গোলমালের জন্ত উপরের মাটি ধসিয়া যায়, ফাটিয়া যায় অথবা এবড়ো-খেবড়ো হইয়া যায়—ইহার ফলে উপরের যা কিছু ঘরবাড়ী থাকে সবই পড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে নড়ন-চড়ন এত ভয়ানক হয় যে উপরের মাটি নীচে চলিয়া যায় এবং সহরের পর্বত সহর লুপ্ত হইয়া যায়। পৃথিবীর বুকের মধ্যে সকল সময়েই আগুন জ্বলিতেছে—আগুন যখন পৃথিবীর উপরের দিকে পৌঁছায় তখনই এই কাণ্ড হয়।

জাপানের ভূমিকম্পের একটা কারণ এই হইতে পারে যে সমুদ্রের তলার জল ক্রমশঃ মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। এই জল যখন মাটির মধ্যের প্রজ্বলিত ধাতুর সঙ্গে আসিয়া লাগে তখন তাহার ফলে ভয়ানক একটা ধাক্কা মাটির উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়।



কম্পন সহ্য করিবার মত করিয়া এই রকম বাঁধ জাপানে তৈরী হয়

জাপানের পশ্চিমে তুশাকারা গহ্বর। এই গহ্বর ২৭৬০০ ফুট গভীর। এই গহ্বর, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক ভূমিকম্পগুলির মূল কারণ। এই গহ্বরের তলায় জলের চাপ ভয়ানক বলিয়া জল সহজেই মাটির মধ্যে প্রবেশ করে।

জাপানে এইভাবে যে ভূমিকম্প হয়—তাহা ছয় মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। ভূমিকম্প যে জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই হইয়াছিল

তাহার প্রমাণ আছে। কারণ ভূমিকম্পের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের চেউ আসিয়া সহরের গিতর প্রবেশ কবিত্তে থাকে।

প্রকৃতি ভূমিকম্পের সাহায্যে পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত নির্মাণ করেন। ভূমিকম্প না হইলে সমস্ত পৃথিবী সমতল ভূমি হইয়া থাকিত।

সমুদ্রের তলায় জলের চাপ এত ভয়ানক যে—সেই চাপের দ্বারা জলকে আকাশের গায়ে সমুদ্রের গভীরতার সমপরিমাণ উচ্চে ছোড়া যাইতে পারে। তুশাকারা গহ্বরের নিম্নে জলের যে চাপ আছে সেই চাপের দ্বারা গহ্বরের সমস্ত জলকে আকাশের দিকে পাঁচ মাইল উঁচুতে ছোড়া যায়। এই চাপে চল শক্ত পাথর ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই জল যখন জলন্ত ধাতুর গায়ে আসিয়া লাগে তখন তাহা গরম বাষ্পে পরিণত হয়। জাপানের কেবল মাত্র হণ্ড দ্বীপ নয়, অন্যান্য প্রায় সব দ্বীপগুলিই এইরকম ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র-উপকূলে এখনো খুব গভীর জল দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে মনে হয় যে সমুদ্র-উপকূলের পাহাড়পর্বতগুলিও ভূমিকম্পের ফলে উঠিয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে ভূমিকম্প পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানেই হয়। এ ধারণা ভ্রমাত্মক। পৃথিবীর এমন একহাত পরিমাণ স্থানও নাই, যেখানে ভূমিকম্প হয় না। এমনও দেখা যায় যে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান মানুষের অবোধা কোন উপায়ে স্থিতি পরিবর্তন করে। অনেক পাহাড়কে সবিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। অবশ্য এইসব স্থান পরিবর্তন সাধারণ চোখে বুঝা যায় না, বৈজ্ঞানিক-ভাবে মাপজোক করিয়া বুঝিতে পারা যায়।



যুগে পর যুগ ধবিয়া পৃথিবীর বৃকে এইসব আগুন জ্বলিতেছে।

এই প্রকার স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়

পৃথিবীর অঙ্গের এইরূপ নড়াচড়া কেবল মাত্র ভূমিকম্পের সময়ই ঘটে এমন নয়। জাপানে যে শাক্তব মেদিন উচ্চুস হইয়াছিল ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে অবরুদ্ধ শক্তি সানফ্রান্সিস্কোতে ছাড়া পাইয়াছিল তাহা চাপের দরুন সঙ্কুচিত হইয়া এইরূপ বেগযুক্ত হইয়াছিল। অনুমান হয় যে এই শক্তি অল্প অল্প চাপের জন্ত ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতেছিল, আর যখন এই আভ্যন্তরীণ চাপ পৃথিবীর আবরণের সহ্য করিবার মাত্রা ছাড়াইয়া গেল, তখনই সব চূবমার হইয়া গেল। এই আতিমাত্রিক চাপের সময় যে ভাঙন ধবে তাহাতেই সহসা ভূখণ্ডের স্থান পরিবর্তন হয় ও ভূপৃষ্ঠে কম্পন অনুভূত হয়।

যদি দেখা যায় কোন এক জায়গায় পৃথিবীর আবরণের কোন

অংশ উত্তর দিকে সরিয়া যাইতেছে তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের উপরের কোন শক্তিব প্রয়োগে যে একরূপ ঘটিতেছে তাহা অনুমান করিবার কোন কাবণ নাই। যতটা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এই বুঝা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশগুলি পবম্পরের দিকে ঝুঁকিয়া ভার-সমতা দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে। কোন একটা জায়গা ধসিয়া গেলে কিংবা কোন পাহাড় জলাশ্রাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ভার এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়। এমনি করিয়া এই ভার-সমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই সঞ্চলন-ব্যাপার যদি বেশী জোরে ঘটে, তাহা হইলে যে অংশ নুতন ভারাক্রান্ত হইয়াছে সেই অংশ হইতে একটি শক্তিশ্রোত হাঙ্গা দিকে প্রবাহিত হয় ও তাহাতে পৃথিবীর আবরণটার উপর টান পড়ে। ফলে হয় যে অংশ ফাটিয়া যায় নয় ধসিয়া যায় ও তাহাতেই ভূমিকম্প ঘটে।

ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ী ভাঙিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ বাড়ীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে নাড়া পাইয়া ফাঁক হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারেরা এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে পরীক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যদি কোন বাড়ীকে এমনভাবে শক্ত করিয়া তৈরী করা যায় যে হাজার নাড়াচাড়াতেও বাড়ীখানি অটুটভাবে থাকে ও এক সময়ে বিশেষ একদিকেই নড়ে, তাহা হইলে সেই বাড়ী খুব সম্ভব ভূমিকম্পের পরেও অটুট থাকিবে। এইজন্য ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিক উভয়ে মিলিয়া স্থব করিয়াছেন, যে, যে দেশে সময়ে অসময়ে ভূমিকম্প হয়, সেই দেশে বাড়ী তৈরী করিবার জন্ত প্রথমে কঠিন ইম্পাতের একটি শক্ত কাঠাম তৈরী করিতে হইবে। কাঠামকে যথেষ্ট পরিমাণে ভারীও করিতে হইবে। যাহা কিছু জোড়াতাড়া লাগাইতে হইবে—তাহাও বেশ শক্ত করিয়া ইম্পাতের পাতা দিয়া লাগাইতে হইবে। জোড়াতাড়া দেওয়ার জন্ত যতদূর সম্ভব বেশী রিভেট বা পেরেক ব্যবহার করিতে হইবে। মোটের উপর দেখিতে হইবে যে ফ্রেমের কোন অংশ ঢিলা বা আলুগা হইয়া না থাকে, এবং কাঠামর যে-কোন স্থানে আঘাত কবিলে, তাহার স্পন্দন যেন কাঠামর সব জায়গায় পৌঁছায়। এই কাঠামর উপর যদি বাড়ী তৈরী করা যায়— তাহা ভূমিকম্পের পরেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। অবশ্য একেবারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—তবে যতদূর সম্ভব মনে হয়, এইপ্রকার বাড়ীতে কোন ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষার দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এইসমস্ত বাড়ীতে যদি আগুন লাগে, তাহা হইলেও ফ্রেমখানি অটুট থাকে। জাপানে এই প্রথায় কতকগুলি সাততলা আটতলা বাড়ী নির্মাণ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই টিকিয়া আছে—কিন্তু সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের সময় আর-একটি প্রধান বিপদ মানুষকে আক্রমণ করে। সহরের গ্যাস-পাইপ ইত্যাদি ভাঙিয়া গিয়া, তাহাতে আগুন লাগিয়া যায়। জলের নলও ফাটিয়া যায়—তাহাতে জল-প্রাপ্তির আশা নির্মূল হয়। এইজন্য যে-সমস্ত সহরে ভূমিকম্পের আশঙ্কা অত্যধিক, সেই-সমস্ত সহরে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে কলের নল ভাঙিয়া গেলেও সহরে ছড়াইবার জন্ত প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। জল রাখিবার স্থানগুলিও বিশেষভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। যে-সমস্ত স্থানে ভূমিকম্প বেশী দেখা যায়, সেই-সমস্ত বিশেষ স্থান হইতে বহু দূরে জলরক্ষা করিতে হইবে। সহরে জল প্রেরণের জন্ত দুই তিনটি পাম্পিং স্টেশন রাখাও প্রয়োজন—অবশ্য সবগুলি একসঙ্গে কাজ করিবে না—প্রয়োজনমত যে-কোন একটি কাজ করিবে, অল্পগুলি রিজার্ভ বা সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইবে।

ভূমিকম্পের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—



অকম্পনীয় শয়নাগার—জাপানে ভূমিকম্পে গৃহহীন অধিবাসীরা বড় বড় জলের নলে ঘুমাইতেছে

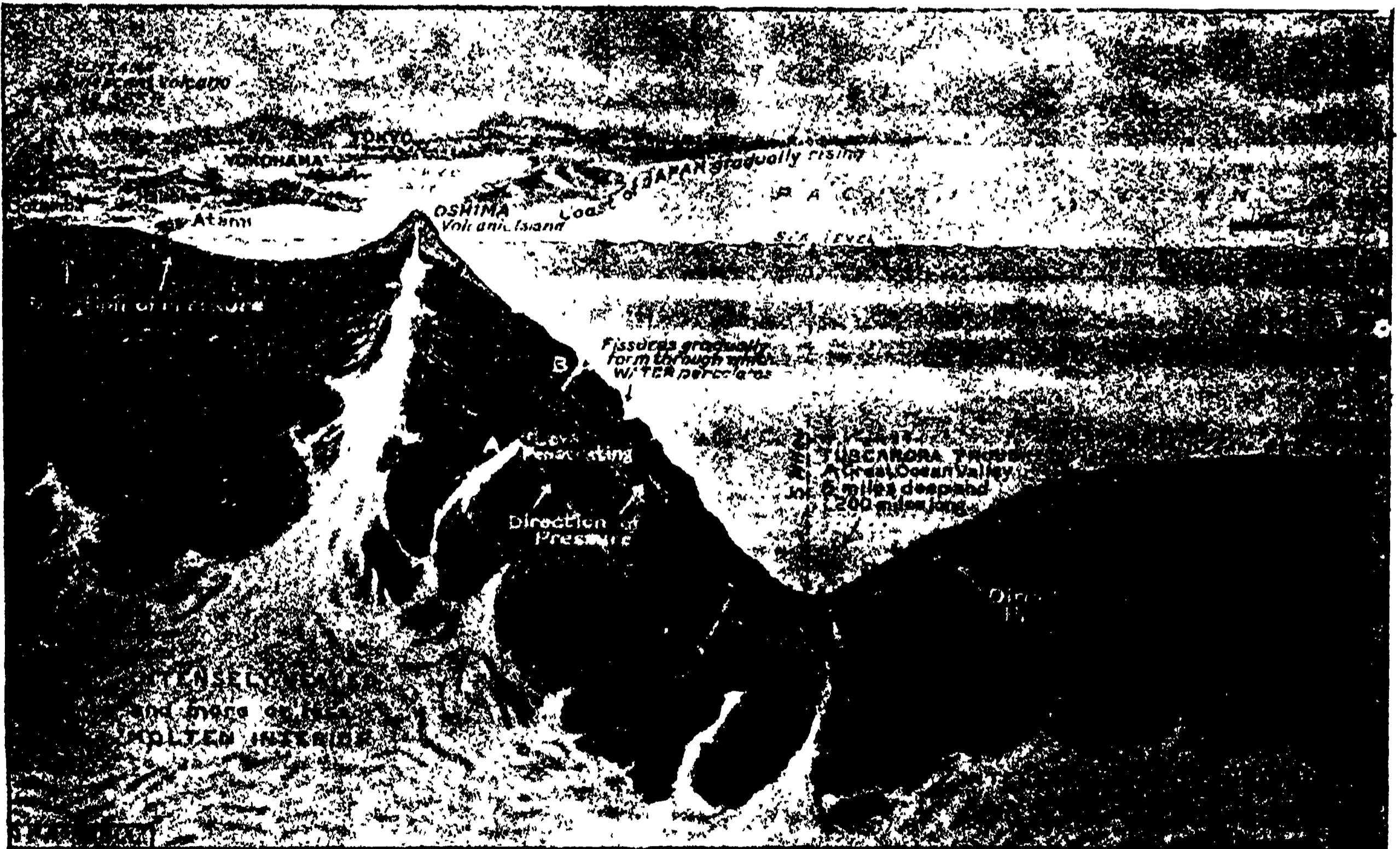
জাপানে এবাব যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কথা হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর পূর্বে। জাপানের রাজকীয় ভূমিকম্প-অনুসন্ধান সমিতির অধ্যক্ষ অধ্যাপক এফ্ ওমোরি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে ছ বৎসরের মধ্যেই কোন না কোন সময় ভয়ানক ঝাঁকানি অনুভূত হইবে। পূর্বে পূর্বে বৎসর যেরূপ ও যে সংখ্যায় কাঁপন দেখা দিয়াছিল সেই তথ্য অবলম্বন করিয়া এই গণনামূলক অনুমান করা হইয়াছে। এই জাপানী বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, পৃথিবীর কোন এক জায়গায় কম্পন ঘন ঘন ও সংখ্যায় বেশী হইলে সেই স্থানটির প্রচণ্ড দোলায় দুর্লভার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এক স্থানে অনেক দিন পর পর সামান্য সামান্য একটু নড়াচড়া দেখা দিলে পরে একসময় সেই স্থানে দারুণ আন্দোলনের সম্ভাবনা আছে। কয়েক বৎসর হইতে জাপানে এই মুহূ দোলানির নিত্যন্ত অসম্ভাব ঘটিতেছিল।

জাপানের উত্তরাংশে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় অধ্যাপক মহাশয় তাহার সহিত ভূমিকম্পের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে যখন এই অংশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী হইবে তখন তাহার ফলে ভূমিকম্প ঘটবে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই আগষ্ট চিলি-দেশে যে ভূমিকম্প হয় তাহার কথাও অধ্যাপক ওমোরি আগে হইতে বলিয়াছিলেন। সেই বৎসর ১৮ই এপ্রেল ক্যালিফোর্নিয়া দেশে ভূমিকম্পের পর তিনি বলেন যে তাহার পবনভর্তী ভূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা দিবে। অচিরেই চিলির ভূ কম্প ঘটিল।

কালক্রমে বোধ হয় সকল ভূমিকম্পের কথাই গণনা করিয়া বলা যাইবে। এপযাস্ত যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে কিছু বলা

ভূমিকম্পের কারণ বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চিত্র—





২ ভূমিকম্পের কেন্দ্র

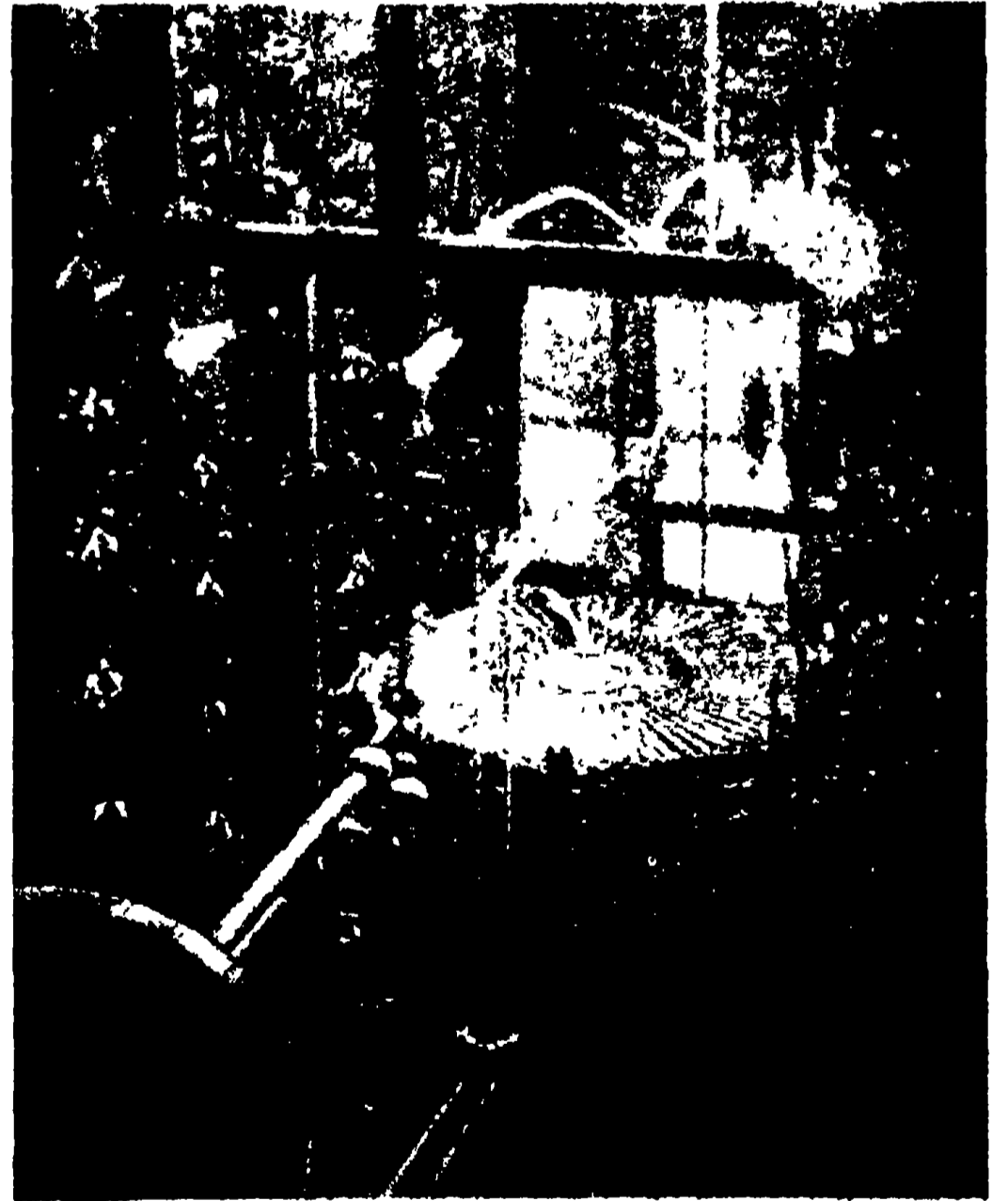
এখনো তত সহজ নয়, কিন্তু জাপানে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে অনুসন্ধান-কার্য চলিতেছে তাহাতে এমন সব নিয়ম আবিষ্কার হইতে পারে যাহার সাহায্যে একরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা মোটেই শক্ত হইবে না।

তাপহীন আলোক—

দুই বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক তাপহীন আলোক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই আলোক নাকি মানুষের কাজের জন্য অসীম ক্ষমতার আধার হইবে।

এই বৈজ্ঞানিক মিউ জাব্‌সির হ্যারিসন সহরে বাস করেন। তাঁহার বিজ্ঞানাগারটি দেখিবার জিনিষ। এইখানে কাজ করিতে করিতে তিনি একপ্রকার কাচের নল—অনেকটা ইলেক্ট্রিক বাল্বের মত—প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নল হইতে ১০০-মোমবাতি-সমান আলো তিন বৎসর ধরিয়া সমানে জ্বলিবে। বাতির জন্য ব্যাটারি, তার-সংযোগ ইত্যাদি কিছুই দরকার হইবে না। ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে আধ সের পদার্থের (matter) মধ্যে এত শক্তি নিহিত আছে যে তাহা কোটি মণ কয়লা হইতেও পাওয়া যায় না। এক টুকরা পাথর, ইস্পাত, এমন কি একটা সামান্ত তামার পয়সার মধ্যেও অসীম শক্তি আবদ্ধ আছে। যে মহাশক্তি সমস্ত সৌরজগৎ চালনা করিতেছে, সেই শক্তিই সামান্ত সামান্ত জ্বলের মধ্যে এইসব শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইসমস্ত শক্তিকে যদি মুক্ত করিতে পারা যায়, তবে মানুষের কাজ করিবার জন্য বাষ্প, বিদ্যুৎ বা কয়লা লুপ্ত প্রয়োগ হইয়া যাইবে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্তার উইলিয়াম ব্র্যাগ বলেন, “আমার বিশ্বাস এই শক্তি একদিন মানুষের হাতে আসিবে। ইহা হাজার বছর পরেও হইতে পারে অথবা কাল রাত্রিতেও ঘটতে পারে।”



মানুষের তৈরী চোখ-ঝলসানো বৈদ্যুতিক ক্ষুরণ

বৈজ্ঞানিকদের মতে সমস্ত পদার্থই—সোনা, রূপা, কাঠ, পাথর, সবই—অণু-সমষ্টি; এইসকল অণু আবার পরমাণুর সমষ্টি; এইসকল পরমাণু অগণ্য স্পন্দমান ইলেকট্রনের সমষ্টি। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে তাহাকে



আকাশ হইতে বিদ্যুৎ টানিয়া “ঠাণ্ডা”-বাতি নির্মাণের কাজে লাগানো হইতেছে



এইখানে ৫০,০০০ ডিগ্রী গরমে কাজ হইতেছে। ইহার বেশী গরম মানুষ কল্পনা করিতে পারে না

পরমাণু অপেক্ষা হাজারগুণ ক্ষুদ্র। ইলেকট্রন সমস্ত সময়েই ধাবমান, তাহাদের গতি সেকেন্ডে ১০,০০০ মাইল হইতে ৬০,০০০ মাইল। ঘড়ির একবার টিক করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রন সমস্ত পৃথিবী ছয় বারের বেশী ঘুরিয়া আসিতে পারে। একটা বন্দুকের গুলিকে এই বেগে নিক্ষেপ করিতে হইলে ১৩৪০ পিপারও বেশী বারুদ প্রয়োজন হইবে। একটা তামার পয়সার মধ্যে যে ইলেকট্রন-শক্তি আছে তাহা মুক্ত করিতে পারিলে ৪০,০০০,০০০ হস্ পাওয়ারের সমান হইবে। একটা শক্ত কাঁড়ার খোলায় যে পরিমাণ পরমাণু-শক্তি আবদ্ধ হইয়া আছে তাহা হঠাৎ মুক্ত হইলে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড অটালিকাকে চূর্ণ করিতে পারে।

“তাপহীন আলোক”-আবিষ্কার-চেষ্টায় যুয়ান জে টোমাডেলি বিদ্যুৎ-পাত লইয়া তাঁহার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেন। আকাশের বিদ্যুৎ যে হঠাৎ চম্‌কায় তাহার বৈদ্যুতিক চাপ (volt or electric pressure) ৫০,০০০,০০০ ভোল্ট। কিন্তু ইহা ১/১০০ সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া যায় বলিয়া খুব কম পরিমাণ শক্তি বিকাশ হয়। মিঃ টোমাডেলি তাঁহার পরীক্ষাকালে একটি ৫,০০০,০০০ ভোল্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ-শুল্ক বিক্ষিপ্ত করেন তাহার ব্যাস এক গজ, ইহা ৩৭ ফুট লম্বা দিয়া অল্প স্থানে গিয়া পড়ে এবং ৩৯ সেকেন্ড বর্তমান থাকে।

ইহা করিতে পারিয়া তিনি তাঁহার আবিষ্কার-কার্যে এক পা অগ্রসর হইলেন, কারণ এই শক্তি একটি পরমাণুর শক্তি মুক্ত করিতে

পারিবে এবং তাহাকে বাগাইতেও পারিবে। এই বিদ্যুৎশুল্কের লক্ষ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচলী-বাতির মধ্যের সূত্রাকার বস্তুগুলিতে কতকগুলি explosions বা সশব্দ-বিদারণ হয়। সমস্ত বাল্বের বিদারণ এক সঙ্গে হয় না, বহু বৎসর ধরিয়া ইহা ঘটিতে থাকে। এই বিদারণ বাল্বের মধ্যস্থিত ধাতব-সূত্রের সংগঠনের উপর নির্ভর করে। আবিষ্কারকের মতে তড়িৎ-উৎপাদনী কারখানার বিদ্যুৎ ইহা হইতে পারে না—আকাশের বিদ্যুতের দ্বারাই ইহা সম্ভবপর।

হ্যারিসন্ ল্যাবোরেটরির কলকজাগুলি অতি অদ্ভুত। বিজ্ঞানাগারের বাহিরেই অনেক উঁচুতে একটি ধাতব চাক্তি রক্ষিত আছে। এই চাক্তি আকাশ হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে, এবং চাক্তি হইতে ধাতু-নির্মিত তারে করিয়া বিদ্যুৎ ল্যাবোরেটরির মধ্যে আনয়ন করা হয়। ধাতব বৃক্ষ-সংযুক্ত একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক যন্ত্রে এই বিদ্যুৎ পৌঁছান হয়।

মিঃ টোমাডেলি তাঁহার “তাপহীন বাতির” বাল্বগুলি বিশেষভাবে তৈরী করিয়াছেন। ইহার মধ্যের যে ধাতব সূত্রগুলি আছে তাহা সবুজ পাতাতে ঘসা হইয়াছে। এই পরীক্ষার সময় টোমাডেলি সাহেবকে অনেকরকম কষ্ট এবং বিপদ পাব হইতে হইয়াছে। কথা নাট বার্তা

ছূর্তীগাক্রমে কোন সময়েই তাহাদের কামড় খাইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই দেশেবলোকেরা বলে যে বিষম রাগিয়া গেলে এই বিছারা আত্মহত্যা করে—আমার একধায় বিশ্বাস হয় না। “আহত বৃশ্চিক দংশে আপনার বুক” কথাটি আমি বিশ্বাস কবি না। আমি বৃশ্চিককে আহত করিয়া দেখিয়াছি—বৃশ্চিক প্রাণপণে আঘাত-কারীকেই দংশন করিবার চেষ্টা কবে।

তিরিশ বছর পূর্বে আমি একবার মসকাও হইতে ধিবগিজের চালু প্রদেশে যাইবার পথে ওরেনবার্গে গিয়াছিলাম। এই পথ সামারার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ওরেনবার্গে আমাকে বাধা হইয়া চাবচাকাওয়ালা টারান্টাস গাড়ী কিনিতে হইল। আমি গবাল হুদের পূর্ব দিয়া



রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টিব মধ্যে ষোড়নের দল তিব্বতী-দলের দ্বারা আক্রান্ত হইল

ডাক-রাস্তার উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথ ১২০০ মাইল—ইহা পার হইতে ১৯ দিন লাগিয়াছিল। গড়ে ১৮ মাইল অস্তব ঘোড়া বদল করিতে হইয়াছিল। ঘোড়া বদল করিবার আড়ডাগুলি সবই রুশীয়-দের হাতে, কিন্তু অস্থচালক প্রায় সব খিরগিজদেশবাসী। শুকনো এবং শক্ত রাস্তায় ‘টরকা’ অর্থাৎ তিন ঘোড়াতেই গাড়ী বেশ টানিতে পারে। কিন্তু পথ যেখানে খাবাপ কিম্বা কর্দ্দমাস্ত সেইসব স্থানে ‘চট ভোরকা’ ‘পারা টোরকা’ অর্থাৎ চার বা পাঁচ ঘোড়াব দরকার হয়। অরাল হুদের তীরের বালুপথে ঘোড়াতে আমার মাল-বোঝাই গাড়ী টানিতে পারিল না—কাজেই বাধা হইয়া আমার টারান্টাস টানিবার জন্ত তিনটি উট জড়িতে হইল। সে দশা বড় চমৎকার হইয়াছিল—

উটের পিঠে মানুষ, পিছনে গাড়ী—এবং তাহার পশ্চাতে ঘোড়ার দল। উট জলের মত করিয়া বালি ছড়াইতে ছড়াইতে ধপ্ ধপ্ করিয়া চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে এই পথে গিয়াছিলাম। তখন হইতে মরুভূমির উপর বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। এই সময় পথের ধারের টেলিগ্রাফ-পোস্ট পথিকের বড়ই উপকার করে। সমস্ত পথঘাট ঢাকা পড়িয়া যায়—পথ চিনিবার উপায় এই পোস্টগুলি। কিন্তু খিরগিজ্-চালকেরা বলিল, শীতকালে যখন প্রবল ঝড় হয়, তখন এইখানে নিপুণ পথপ্রদর্শকেরাও পথ ভুল করে। কারণ তখন একটা টেলিগ্রাফের খুঁটি হইতে আর-একটা খুঁটি দেখা যায় না। এই সময় ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু পরিষ্কার রাত্রে এইসমস্ত পথ-প্রদর্শকেরা চোখ বন্ধ করিয়াও পথ বলিয়া দিতে পারে। আমার গাড়ী-চালক বহুদূরস্থিত কোন বস্তুকে দেখিয়া তাহা কি গাড়ী, কয় ঘোড়ার, কোনদিকে যাইতেছে, ঘোড়ার কি রং ইত্যাদি সবই বলিয়া দিতে পারিত। আমি কিন্তু দূরে, আকাশের শেষ কোণে কেবল ছোট একটা কিছু দেখিতে পাইতাম মাত্র। কিন্তু তাহা যে কি তাহা কখনই বলিতে পারিতাম না। আমার প্রদর্শক যাহা বলিত সবই মিলিয়া যাইত। এখন তাশকন্দ্ পর্যন্ত আমরা-ভারনবাগ রেলপথ নির্মাণ করাতে রাস্তাটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাস্তাটিও নাই বলিলেই হয়।

১৮৯৭ সালে গোবি মরুভূমির মধ্য দিয়া একবার যাত্রা করিয়া ছিলাম। আমি কালগান হইতে কাইআখটা পর্যন্ত গিয়াছিলাম। এই পথটিও ১২০০ মাইল। এই সময় সাইবেরিয়ান রেলপথ কম্প্-পযান্ত ছিল। সেই জন্ত আমাকে সেজ্ ব্যবহার করিতে হয়। কাই-আখটা হইতে বৈকাল হুদের উপর দিয়া আমাকে সেজ্ করিয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু গোবি মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ আমার চিরকাল মনে থাকিবে। সে এক অদ্ভুত গাড়ী। গাড়ীখানি ছোট—গাড়ীর সাম্নেই ঘোড়া নাই;—একটা লম্বা ডাঙা, তাহাতে আড়াআড়িভাবে আর-একটা ডাঙা, এই ডাঙাকে পায়ের উপর রাখিয়া দুইজন সওয়ার ঘোড়ার লাগাম ধরে—সামনে আরো দুইজন ঘোড়সওয়ার, তাহাদের কোমরে নরম দড়ি বাঁধা—সেই দড়ি আগের ঘোড়সওয়ারদের শরীরে জড়ান থাকে। (ছবি দেখুন।) ১৪১২০ মাইল অস্তর ঘোড়া বদল হয়। একদল ঘোড়া ক্লাস্ত হইলে—পাশ হইতে অস্ত একদল সওয়ার আসিয়া গাড়ীর ষোল পায়ের উপর তুলিয়া লয়। এই কার্যে ইহারা দক্ষ কেমন করিয়া যে এক নিমেষে এইসব করে তাহা বুঝা যায় না।

এসিয়াবাসীরা পথঘাট নির্মাণ করিতে জানে না, কারণ ভগবান্ যখন মরুভূমির জন্ত উট দিয়াছেন—পাহাড়পর্বতের জন্ত ঘোড়া দিয়াছেন তখন আর ভাল রাস্তা করিবার দরকার কি? (লেখক ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অস্তান্ত বহু কালের সভ্যদেশ সম্বন্ধে এ কথা বোধ হয় বলিতেছেন না।)

আমি একবার একদল পথিকের সহিত ছদ্মবেশে তিব্বত প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। জনপ্রাণীহীন পর্বতের উপর দিয়া আমাদের পথ। মাঝে মাঝে বরফ জমিয়া আছে। রাস্তাও অতি বিপদজনক এবং সংকীর্ণ। কিছুদূর গিয়া আমি দুইজন মোজল অনুচরের সহিত দল ত্যাগ করিলাম। আমাদের সঙ্গে পাঁচটি খচ্চর, চারটি ঘোড়া এবং দুইটি কুকুর ছিল।

দ্বিতীয় দিনে আমরা দুইটি হুদের মধ্যবর্তী স্থানে আড্ডা গাড়িলাম। এইখানে আমার ভেক এবং বেশ পূর্ণভাবে বদল করিতে হইল। রাত্রে হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিল। আমরা তাঁবুর মধ্যে কোনরকমে পড়িয়া থাকিলাম, হঠাৎ আমাদের পশুরক্ষক আসিয়া বলিল, “ডাকাত

ডাকাত আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম—কিন্তু তখন ডাকাতের দল আমাদের দুইটি ঘোড়া লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে—বন্দুকের গুলি ছুড়িলাম। ফলে ডাকাতেরা আরো বেগে পলায়ন করিল। ইহার পরে আমরা সব সময় সতর্ক পাহারা রাখিতাম—সেইসব রাত্রির কথা বেশ মনে আছে। আমরা পালা করিয়া পাহারা দিতাম। বৃষ্টিতে পথখাট পূর্ণ শীতের হাওয়া তার মাঝে ভিজিতে ভিজিতে আমরা পশুদলকে পাহারা দিতাম। এইরকম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে সাচুটসাজ্‌পো নদী আমাদের পথে পড়িল। নদী তখন ঘোলাটে জলে পূর্ণ।

আমার সহচর সারএব লামা একটা খচ্চরে চড়িয়া আমার আগে আগে যাইতেছিল—সে নদীর কূলে আসিয়াই খচ্চর সমেত জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পিছনে আর-একটা খচ্চর ছিল, তাহার পিঠে কাপড়-চোপড় ইত্যাদির বাগ্ন বোঝাই করা ছিল। নদীর স্রোতের জোরে মাল সমেত খচ্চর ভাসিয়া গেল। ভাবিলাম সে আর ফিরিতে পারিবে না—কিন্তু একটু পরে দেখিলাম সে কোনমতে অপর পারে গিয়া উঠিয়াছে। আমিও জলে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। মাঝে মাঝে জল আমার কোমর এবং ঘোড়ার গলা পর্যন্ত উঠিতেছিল—একবার আমাব ঘোড়ার পা ফস্কাইয়া গেল। অনেক কষ্টে সে আমাকে লইয়া পরপারে পদার্পণ করিল।

কয়েকদিন পরে আমরা একজায়গায় গিয়া তাঁবু ফেলিলাম। সেখান হইতে দূরে আরো বারোটি তাঁবু দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। সকাল বেলায় তিনজন তিব্বতী আসিয়া সারএব লামার সহিত কথাবার্তা বলিল। তাহারা একদল ইয়াক-শিকারীর নিকট শূনিয়াছিল যে একদল খেতাজ তিব্বতের দিকে আসিতেছে। তাহারা আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে খেতাজ বলিয়া সন্দেহ করিল।

রাত্রিবেলায় তাহারা আপনাদের তাঁবুর চারিদিকে ঘিরিয়া আগুন জ্বালিয়া পাহারা দিতে লাগিল। পরের দিন সকালে দেখিলাম চারিদিকে ঘোড়সওয়ার আসিতেছে, তাহারা তাহাদের তলোয়ার খুলিয়া আমাদের দেখাইয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।

এমনিভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর সেই প্রদেশের শাসনকর্তা কাম্বা বোম্বো আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি বলিলেন, “যদি আর এক পা তিব্বতের দিকে অগ্রসর হও, তবে তোমার গলা কাটা যাইবে।”

আমার আর ভরসা হইল না—তিনজনে বৃহৎ শত্রুদলের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব বলিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিলাম।

বিজ্ঞান-গোয়েন্দা—

শার্লক্ হোম্‌স্‌ এবং দুর্প্যা দুইজন বিখ্যাত গোয়েন্দার কথা গল্পে পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইজন অদ্ভুত উপায়ে অপরাধী চোর-ডাকাত-খুনেদের ধরিতে পারিতেন। দাবী ব্যক্তি এই পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন শার্লক্ হোম্‌সের হাত হইতে তাহার নিস্তার পাইবার জো নাই। এ সমস্ত গেল উপস্থাসের কথা। আমেরিকাতে এখন অপরাধী ধরিবার কাজে সত্যিকার শার্লক্ হোম্‌স্‌ হইয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান।

এখন অপরাধী এবং পুলিশ এই দুইজনে সব সময়েই যুদ্ধ চলিয়াছে। চোর-ডাকাতেরাও বিজ্ঞানের সাহায্য পূরা মাত্রাতেই গ্রহণ করিতেছে। এখন কে ভাবে কে জিতে যাবে, সমস্ত বিষয়



আমেরিকার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত টিগ সই-বিশারদ
ফে ড্‌ স্যাণ্ডবার্গ

চোর-ডাকাতেরা এখন মোটর, এয়ারোপ্লেন, মোটর-বোট ইত্যাদি সব-কিছুরই ব্যবহার করিতেছে।

বর্তমান সময়ে অপরাধ-বিজ্ঞান গণিতশাস্ত্রের মত সঠিক হইয়া উঠিয়াছে।



জানলার সাসিতে আঙ্গুলের দাগ রাসায়নিক উপায়ে স্পষ্ট করা হইতেছে

কিছুদিন পূর্বে নিউজার্সিতে একদল পুলিশ একজন পাকা-চোরকে ব্যাল্‌লুঠের অপরাধে ধরিতে যায়। অপরাধী দুয়ারে ধাক্কা দিবামাত্র সে দুয়ার খুলিল এবং পুলিশের দলকে দেখা মাত্র পিস্তলের গুলিতে দুইজনকে হত্যা করিল এবং আর-একজনকে বিষম আহত করিয়া বাড়ীর মধ্যে একটা গুপ্তস্থানে গিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ

গোয়েন্দা-ছাত্রদের মানুষ চিনিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। কে কি রকম প্রকৃতির লোক তাহা জানিতে পারিলে তাহার সহিত সেইসকল কথা-বার্তা চালাইবার ব্যবস্থা করা সহজ হইয়া উঠে।



র্যাডিওতে চারিদিকে শব্দ ছড়ান হইবা মাত্র পুলিশ মোটর সাইকেলে চড়িয়া অপরাধীর পিছন লইবে —
সঙ্গে মেসিনগানও আছে

হাতে বন্ধ করিল বটে—কিন্তু কেমন করিয়া তাহাকে ধরা যায়—পুলিস ছয়ার খুলিতে গেলে মরিবার ভয় আছে, কারণ চোরের হাতে পিস্তল আছে এবং সে যে হত্যা করিতেও পিছপাও নয় তাহাও সকলে দেখিয়াছে। একমাত্র উপায় তাহাকে অনাহারে মৃতপ্রায় করিয়া ধরা — কিন্তু তাহাও বহুকালসাপেক্ষ। এইখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে চোরকে ধরা হইল। একজন গোয়েন্দা ছয়ারটাকে কোনরকমে একটু ফাঁক করিয়া চোর-কুঠরির মধ্যে একটা কাঁদন্-গ্যাসের বোমা ফেলিয়া দিল। একটু পরে চোর মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে পুলিশের হাতে ধরা দিল।

শারীর-সংস্থান-বিজ্ঞান (anatomy), পদার্থ-বিজ্ঞান, এবং মনোবিজ্ঞান অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষ সহায়।

মাটিতে পায়ের দাগ দেখিয়া, তাহা পরীক্ষা করিয়া অপরাধীর শরীর কিপ্রকার, সে লম্বা না বেঁটে ইত্যাদি অনেক-কিছুই বলা যায়।

পায়ের দাগ দেখিয়া অপরাধী ধরা শক্ত বটে, কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান তাহাও সম্ভব করিয়াছে। পায়ের মাপ দেখিয়া হয়ত কয়েকজন লোককে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করা হইল। তার পর মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে ষষ্ঠ্য অপরাধীকে ধরা যাইবে।

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বর্তমান গোয়েন্দাব একটি প্রধান অস্ত্র (আমাদের দেশের পশ্চিম গোয়েন্দা এবং পুলিশের কথা বলিতেছি না—তাহারা কোন বিজ্ঞানের ধার ধারে না, কেবল লাঠি-বিজ্ঞান একটু আধটু প্রয়োগ করিতে পারে, তাও ভয়ে ভয়ে)।

কিছুকাল পূর্বে নিউইয়র্কের একটি বড় ব্যাঙ্কের তোষাখানা হইতে একটি বহুমূল্য পুলিন্দা চুরি হয়। একজন গোয়েন্দার উপর চোর ধরিবার ভার পড়িল। যে চারজন লোক তোষাখানায় যাওয়া আসা করে গোয়েন্দা তাহাদের নিজেব ঘরে আনিল। ২০ মিনিট পরে অপরাধী তাহাব অপরাধ স্বীকার করিল।

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এই কাজটি ঘটিল। অপরাধীকে সামনে বসাইয়া গোয়েন্দা নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল অবশেষে প্রকৃত অপরাধী উপাস্তর না দেখিয়া অপরাধ স্বীকার করিল। সব লোককেই যে একরকম প্রশ্ন করিতে হয় এমন কোন আইন নাই। অপরাধীর প্রকৃতি বুঝিয়া তাহার সহিত সেইসকল কথাবার্তা

পুলিসেব আরো নানাপ্রকার কাজ এইখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন লোকের পিছু লওয়া, অপরাধীর চেহাবাব বর্ণনা জানা থাকিলে ভিড়ের মধ্যেও তাহাকে বাছিয়া লওয়া ইত্যাদি সবই শিখান হয়।

আঙ্গুলের দাগ হইতে অপরাধী ধরা পড়ে। নানা উপায়ে এই আঙ্গুলের দাগকে, জানালার কাচ, বা অস্ত্র কোন দ্রব্যের উপর স্পষ্ট করিয়া ফোটানো যায় এবং তাহার ফোটো তোলাও যায়। রেডিও ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এই দাগের এবং অনেক সময় অপরাধীর ছবিও, খুন বা ডাকাতি ঘটবার কয়েক মিনিটেই মধ্যেই দেশের সমস্ত সহবে ছড়াইয়া দেওয়া যায়।



অপরাধী সত্য বলিতেছে কিম্বা মিথ্যা কহিতেছে তাহা
এই কাল ধরা পড়িবে

রসায়ন এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র অপরাধী ধরিবার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। রক্তের দাগ ইত্যাদি, জালিয়াতের কালী এবং কাগজ পরীক্ষা এবং আরো অনেকপ্রকার আরক ঔষধাদি, যাহা অপরাধী ব্যবহার করে, তাহার পরীক্ষা অনুবীক্ষণ এবং রসায়নের সাহায্যে বিনা



ধরাইয়া দিয়াছে। মাইক্রোস্কোপের নীচে ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে একজন লোকের বিভিন্ন কলে টাইপ করা কতকগুলি লেখার মধ্যেও যথেষ্ট সাম্য আছে। বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উপর বিশেষ প্রকার চাপ বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

একপ্রকার কল আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে তাহা বেশ সহজে বুঝা যাইবে। কলটি সাক্ষীর বা অপরাধীর বুকে লাগাইয়া দিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে। মিথ্যা বলিলে তাহার হৃৎস্পন্দনের এবং ফুস ফুসেব শব্দ এবং কার্য্য বদলাইয়া যাইবে। সত্য বলিলে তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না। যত বড় পাজী বা বদমায়েস হউক না কেন, কোন মিথ্যা বা তৈরী-করা কথা বলিতে গেলেই একটু মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়—এই চেষ্টা কলে ধরা পড়িয়া যায়।

তবে চোর ডাকাত এবং অপরাধীরাও চূপ করিয়া বসিয়া নাই—তাহারাও পুলিশ এবং গোয়েন্দা ঠকাইবার জন্ত নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিতেছে। এখন বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে লড়াই চলিতেছে।

চলন্ত-চিত্রে পোকামাকড়—

পোকামাকড়রা কোন দিন মনে করে নাই যে মানুষ একদিন বায়োস্কোপের জন্ত তাহাদের ছবি তুলিবে। পোকামাকড়দের জীবনধারণ-প্রণালী, তাহাদের ঘরবাড়ী তৈরী কেমন করিয়া হয়, তাহারা কেমন করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে ইত্যাদির ছবি তোলা হইয়াছে। বায়োস্কোপের ছবিতে এইসব পোকামাকড়

হাজারগুণ বড় দেখায়—তাহাদিগকে ভীষণ দৈত্য বলিয়া মনে হয়।

মাকড়সার ছবি অতি ভয়ানক দেখায়। তাহাব জালের এক প্রান্তে সে চূপ করিয়া বসিয়া থাকে, তার পর মাছি পড়িলে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া মাছিকে চিরবন্দী করে তাহা দেখিবার জিনিষ। যখন পোকামাকড়কে আক্রমণ করে, তখন মাকড়সাকে অতিশয় সাহসী এবং বীর বলিয়া মনে হয়; কিন্তু জালের কাছে মানুষ দেখিলে মাকড়সা আর অগ্রসর হয় না—জাল হইতে দূরে চূপ করিয়া বসিয়া থাকে।

পোকামাকড়ের ছবি তোলা বড় শক্ত ব্যাপার। আলোর তেজ যদি সামান্য বেশী হয়, তাহা হইলে পোকারা চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে অথবা দূরে সরিয়া যাইবে। এমন পোকাও আছে যাহা বা তীব্র আলোকে সরিয়া যায়; অথবা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়—সেইজন্ত এইসব পোকামাকড়দের কিন্তু তুলিবার জন্ত একপ্রকার ঠাণ্ডা বাতি ব্যবহার হয়। পোকামাকড়ের আবাস

উপরে— কেজো মোমাছির লোমশ মাথা

মাঝখানে— বাঁমদিকে, মোমাছির খলি

ডানদিকে, মোমাছির জিহ্বা

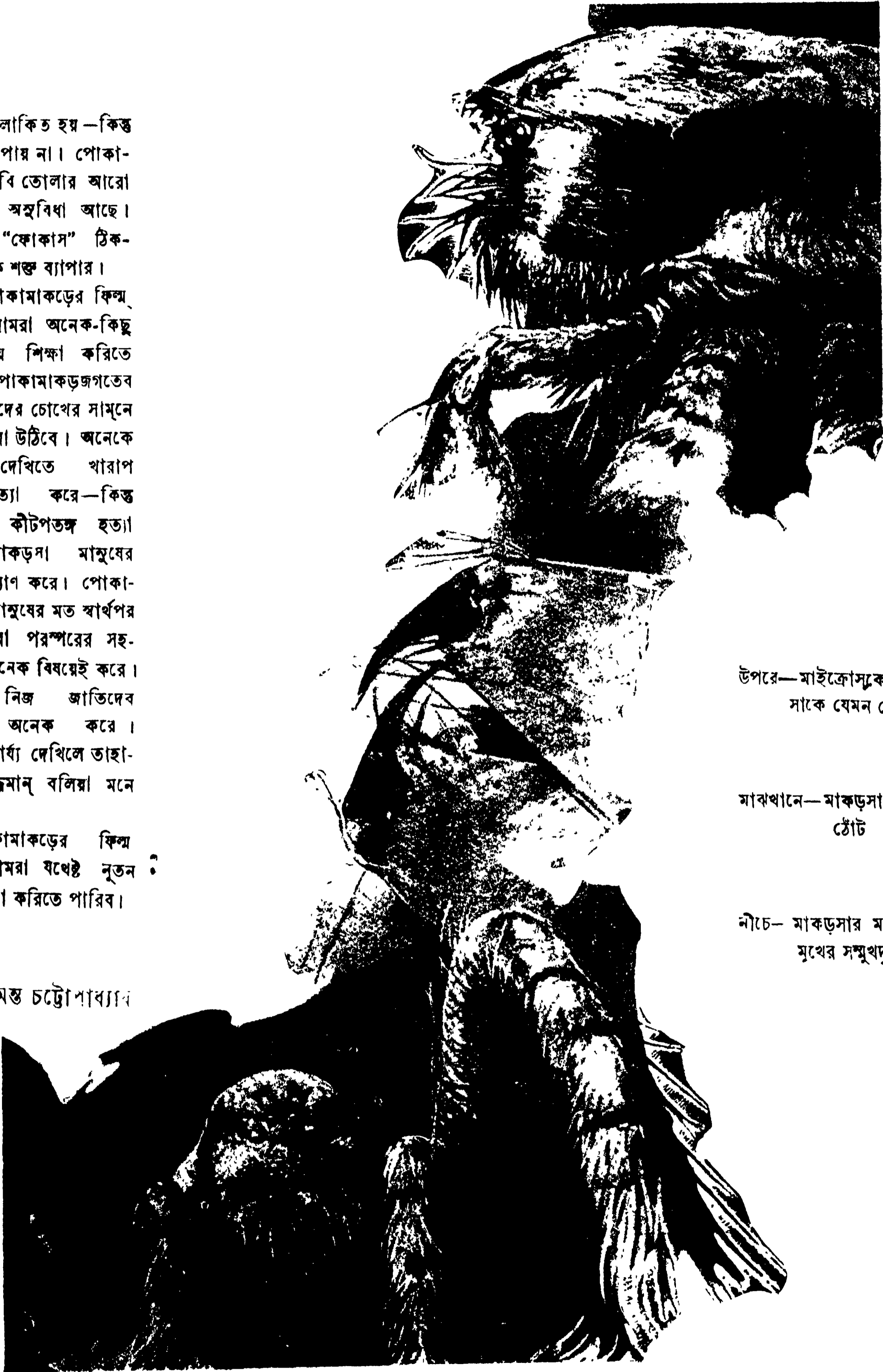
নীচে— লাল পিপড়াকে পাশ হইতে কেমন দেখায়

তাহাতে আলোকিত হয়—কিন্তু তাহারা ভয় পায় না। পোকামাকড়ের ছবি তোলার আরো নানাপ্রকার অসুবিধা আছে। ক্যামেরার “ফোকাস” ঠিক করা ভয়ানক শক্ত ব্যাপার।

এই পোকামাকড়ের ফিল্ম দেখিয়া আমরা অনেক-কিছু নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। পোকামাকড়জগতের ঘটনা আমাদের চোখের সামনে সহজে ফুটিয়া উঠিবে। অনেকে মাকড়সা দেখিতে খারাপ বলিয়া হত্যা করে—কিন্তু নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ হত্যা করিয়া মাকড়সা মানুষের অনেক কল্যাণ করে। পোকামাকড়েরা মানুষের মত স্বার্থপর নয়, তাহারা পরস্পরের সহযোগিতা অনেক বিষয়েই করে। তাহারা নিজ জাতিদের সাহায্যও অনেক করে। তাহাদের কার্য দেখিলে তাহাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়।

পোকামাকড়ের ফিল্ম দেখিয়া আমরা যথেষ্ট নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারিব।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়



উপরে—মাইক্রোস্কোপে মাকড়সাকে যেমন দেখায়

মাঝখানে—মাকড়সার ভয়ানক ঠোঁট

নীচে—মাকড়সার মাথার এবং মুখের সম্মুখদৃশ্য

রাজপথ

[১৫]

একটা বিশেষ কোনও কার্য উপলক্ষ্যে স্বরেশ্বরকে কয়েকদিনের জন্ত পূর্ববঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সে তাহার তাঁতঘরের জন্ত একজন সুদক্ষ তাঁতী লইয়া আসে। সে কয়েকদিন ধরিয়া তিনজোড়া সুন্দর খদ্দের শাড়ীতে বিচিত্র পাড় তৈয়ার করিতেছিল। শাড়ীগুলি তাঁত হইতে নামার পর স্ববেশ্বর তিন জোড়াই গৃহে লইয়া আসিল।

মাধবী গৃহকার্যে রত ছিল। স্ববেশ্বর অন্তর্দৃষ্টি করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া বলিল, “মাধবী, দেখ, দেখি, বিশ্বাস হয় কি যে এ আমাদের তাঁতে বোনা কাপড়?”

মাধবী বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, “সত্যি দাদা, চমৎকার হয়েছে! ঢাকাই শাড়ীর পাড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন হয়নি।”

স্বরেশ্বর হাসিয়া কহিল, “ঢাকার কাবিগর দিয়ে কাজ করালে ঢাকাই শাড়ীর চেয়ে খারাপ কেন হবে রে?”

সপ্রশংস নেত্রে কাপড়গুলি নাড়িতে নাড়িতে মাধবী বলিল, “কত করে’ পড়’তা পড়’ল দাদা?”

স্বরেশ্বর বলিল, “দশটাকা সাত আনা জোড়া।”

মনে মনে হিসাব করিয়া মাধবী কহিল, “তা হলে এগার টাকা বার আনা বিক্রী। তা মন্দ কি? সম্ভাই ত হ’ল দাদা। তিন জোড়াই দোকানে পাঠিয়ে দাও, আজই বিক্রী হয়ে যাবে।”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “একজোড়া তোর জন্তে রাখব মাধবী।”

মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না, দাদা, এত ভাল কাপড় বাড়ীতে রেখে কি হবে? একে ত মেয়েরা খদ্দের পরতেই চায় না—এ রকম ভাল কাপড় পেলে তবু একটু পরতে চাইবে।”

স্বরেশ্বর কহিল, “তা হোক মাধবী, খদ্দের ভিন্ন তুই যখন আর কিছু পরিসনে, একজোড়া ভাল কাপড় থাকা

দরকার। কোথাও যাওয়া আসা আছে।” তাহার পর হাসিতে হাসিতে কহিল, “তা ছাড়া বিপিন বোসের বাড়ী থেকে যদি কেউ তোর তল্লাসে আসে তখন ত একটা ভাল কাপড় চাই!”

বিপিন বোসের বাড়ীর উল্লেখ মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রহস্য এইটুকু ছিল যে বিপিন বোস নামে কোনও প্রোঢ় ধনী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পত্নী হারাইয়া তৃতীয় বারের জন্ত বিহ্বল হইয়া মাধবীর পাণিগ্রহণের প্রয়াসী হইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল স্বরেশ্বর তাহাকে আসন গ্রহণেরও অবসর দেয় নাই, কিন্তু তদবধি সুবিধা পাইলেই সে বিপিন বোসের উল্লেখ করিয়া মাধবীকে ক্ষেপাইতে ছাড়িত না।

মাধবী আরক্ত-স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া কপট ক্রোধের সহিত কহিল, “ফের যদি ও-কথা বলবে দাদা তাহলে ভাল হবে না বলছি!” তাহার পব সহসা কোথাকার কোন সুত্র কেমন করিয়া অবলম্বন করিয়া বলিল, “আচ্ছা দাদা, একজোড়া কাপড় সুমিত্রাকে দাও না কেন?”

এবার স্ববেশ্বরের মুখ আরক্ত হইল। বিপিন বোসের কথাব উত্তরে সুমিত্রার কথায় এমন একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ব্যক্ত ছিল যে স্বরেশ্বর কোনরূপেই তাহা হইতে রক্ষা পাইল না। সে লজ্জিত মুখে কহিল, “সুমিত্রাকে দিয়ে কি হবে?” তাহার পর তাড়াতাড়ি কহিল, “তা দিলেও হয়। তবে বিনামূল্যে নয়; বিক্রী করতে হবে। এখন তার এমন একটু রং ধরেছে যে পয়সা দিয়েও বোধহয় একজোড়া খদ্দের কিনতে পারে।”

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া কহিল, “তবে তাই ভাল, পরখ করে’ দেখ কেনে এক না।”

কয়েকদিন পূর্বে সুমিত্রাকে খদ্দেরের পরিচ্ছদ পরিতে দেখিয়া স্বরেশ্বর আনন্দ প্রকাশ করিলে সুমিত্রা সদর্পে যে কথা বলিয়াছিল তাহা স্বরেশ্বরের মনে পড়িল। একবার মনে হইল এত শীঘ্র পরীক্ষা করিতে যাওয়া হয়ত নিরাপদ

হইবে না। প্রতিযোগিতার কথা একবার কোনরূপে মনে হইলে স্মিত্রা প্রবলভাবে প্রতিকূল হইয়া উঠিবে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লোভ আশঙ্কাকে পরাজিত করিল।

অপরাহ্নে সুরেশ্বর একজোড়া শাড়ী লইয়া স্মিত্রাদেব গৃহে উপস্থিত হইল। সুরমা কয়েক দিন হইতে শশুরালয়ে গিয়াছে। জয়ন্তী দ্বিপ্রহরে কোনও আশ্রয়ের গৃহে গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এবং প্রমদাচরণ তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে শঙ্করাচার্যের বেদান্তভাষ্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন।

সুরেশ্বরের আগমন-সংবাদ পাইয়া স্মিত্রা বাহিরে আসিল।

স্মিত্রাকে দেখিয়া সুরেশ্বর করযোড়ে নমস্কার করিয়া সহাস্তে বলিল,—“আজ্ঞ আব অভ্যাগত নই; আজ আমি ব্যবসাদার, বিক্রি করিতে এসেছি।”

স্মিত্রা স্মিতমুখে ঔৎসুক্য সহকারে কহিল, “তাই নাকি? কই দেখি কি বিক্রী করিতে এসেছেন?” তাহার পর সুরেশ্বরের পার্শ্বে রক্ষিত বস্ত্রের বাগ্গিলটা দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া লইয়া বলিল, “এই বুঝি? খুলে দেখ্বে?”

“দেখুন।”

বাগ্গিল খুলিয়া খদরের শাড়ী দেখিয়া প্রথমটা স্মিত্রার মুখ ঈষৎ মলিন হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই সে হাস্যপ্রফুল্লমুখে কহিল, “চমৎকার শাড়ী ত! এ কি আপনার তাঁতে বোনা?”

সুরেশ্বর হৃষ্টমুখে কহিল, “হ্যাঁ, আমাদের তাঁতেই বোনা। কাপড়টা বাস্তবিকই ভাল হওয়াতে একজোড়া আমার বোন মাধবীর জন্তে কিনেছি। আর একজোড়া আপনার জন্তে এনেছি। যদি ইচ্ছা হয় বা দরকার থাকে ত রাখ্ণ্টে পারেন।” বলিয়া সুরেশ্বর উচ্চস্ববে হাসিয়া উঠিল, বলিল, “ঠিক ব্যবসাদারের মত কথাগুলো বল্ছিনে?”

স্মিতমুখে স্মিত্রা কহিল, “যখন দরদস্তুর করবেন তখন বুঝতে পারব ব্যবসাদারের মত কথা কন্ কি না; এখন ত বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিনে।” তাহার পর বস্ত্রাংশে বিদ্ধ একখণ্ড কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ায় বলিল, “এই কি দাম?”

সুরেশ্বর কহিল, “হ্যাঁ।”

“একখানা কাপড়ের, না জোড়ার?”

“জোড়ার।”

স্মিত্রা সবিষ্ময়ে কহিল, “জোড়ার? খুব সস্তা ত! একখানা কাপড়ের এই দাম হলেও আমি সস্তা মনে কর্তাম।” তাহার পর আরক্ত মুখে ইতস্ততঃ ভাবে কহিল, “কিন্তু এত সস্তা হলেও আমার নেওয়ার পক্ষে অস্ববিধা আছে।”

সুরেশ্বর মুহূর্ত্তমুখে কহিল, “তা হলে বিনামূল্যে নিলে যদি অস্ববিধা না হয়, তাই নিন!”

একটা কথা স্মিত্রার জিহ্বাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অশ্রুদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, “তাতে আপনার লাভ কি হবে?”

সুরেশ্বর তেমনি স্মিতমুখে সহজ ভাবে বলিল, “লাভ কি সংসাবে একই রকম আছে? টাকা আনা পয়সার লাভটাও লাভ বটে, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় সবচেয়ে মোটামুটি লাভ। মাতৃমের হিসাবের খাতা শুধু যে কাগজেই তৈরী হয় তা নয়।”

স্মিত্রার আনত-আরক্ত মুখে সিঁদুরিয়া মেঘে বিদ্যুৎ স্ফুবনের মত মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে সে কহিল, “কিন্তু সে রকম হিসাবের খাতা ত আমারও থাকতে পারে।”

উৎফুল্ল হইয়া সুরেশ্বর বলিল, “তা যদি থাকে তা হলে ত কোন গোলই নেই! অল্পগ্রহ করে কাপড় জোড়া গ্রহণ করে দয়ার হিসাবে কিছু খরচ লিখে দিন।”

এবার স্মিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, “কথায় আপনার সঙ্গে ত পারবার যো নেই!”

সুরেশ্বর সহাস্ত মুখে কহিল, “তা যদি না থাকে ত কাপড় জোড়া রেখে যাই?”

মাথা নাড়িয়া স্মিত্রা বলিল, “না।”

“কেন, আত্মমর্যাদায় বাধ্বে?”

“বাধ্বেতে পারে। বাধা কি অত্মায়?”

“না, অত্মায় নয়, যদি না আত্মমর্যাদার চেয়েও বড় কিছু জিনিষ মনের মধ্যে প্রবল থাকে!”

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া স্মিত্রার মখ পাংলু হইয়া

গেল। আত্মমর্যাদার চেয়ে বড় জিনিষের দ্বারা স্বরেশ্বর কোন জিনিষ বুঝাইতে চাহে তাহা মনে মনে অহুমান করিয়া তাহার বিস্ময়চকিত চিত্ত প্রবল উত্তেজনায কাঁপিতে লাগিল। কথা না কহিয়া নীরব থাকিলে অবস্থাটাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোলা হইবে বুঝিতে পারিয়াও সে নতনেত্রে বাক্যহারা হইয়া বসিয়া রহিল।

স্বমিত্রার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া স্বরেশ্বর মূহু হাসিয়া বলিল, “দেখছি আপনাকে ভারি বিব্রত করে’ তুলেছি; কিন্তু দেশ কি রকম বিব্রত সেটা মনে করে’ আশা করি আমার আজকের এ উৎপীড়নটুকু ক্ষমা করবেন।”

স্বরেশ্বরের কথা শুনিয়া স্বমিত্রার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। সে আর্ন্ত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “ক্ষমা আমাকেই আপনি করবেন, কারণ আপনার এ সামান্য উপরোধটুকু রাখতে পারলাম না। কিন্তু কেন পারলাম না, তা শুন্বেন কি?”

অহুঃস্বকভাবে স্বরেশ্বর বলিল, “যদি আপত্তি না থাকে ত বলুন।”

স্বমিত্রা বলিল, “আপনার এ কাপড়খানা কিন্তে হলে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাবা বিপন্ন হবেন, এ ত আপনি জানেন। আমার নিজের ত আলাদা পয়সা নেই।”

স্বমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বরেশ্বর কহিল, “চেষ্টা করলে আপনি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারেন, কিন্তু এ বাড়ীতে সেটা সম্ভব হবে না।”

এই অপবাদে আহত হইয়া স্বমিত্রা প্রশ্ন করিল, “কি সম্ভব হবে না, স্বরেশ্বর-বাবু?”

স্বরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, “নিজে উপার্জন করে’ দাম দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা চরকা বিক্রী করি, ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি একটা চরকা নিয়ে সুতো কেটে অনায়াসে তাই থেকে কাপড়ের দামটা শোধ করতে পারেন। আমার কোন মাধবী বোধ হয় পনের দিন চরকা কেটে এরকম একঝোড়া কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে।”

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া স্বমিত্রা কহিল, “আপনার কোন হুঁসুড়ি ত পারেন, কিন্তু আমি পারিনে।”

স্বরেশ্বর এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিল, “তা যেন পারেন না কিন্তু আলাদা পয়সা আপনার থাকলে কি করতেন? কিন্তেন?”

স্বরেশ্বরের এই সুদূরপ্রসারী ছর্ণিবার অহুসঙ্কিৎসা স্বমিত্রার ভাল লাগিল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বিরক্তি-বিরূপ মুখে বলিল, “তা জেনে কি হবে আপনার?”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “আর কিছু না হোক একটা কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।”

আরক্ত মুখে স্বমিত্রা কহিল, “আমাকে আপনাদের দলে টানতে পেরেছেন কি না এই কৌতূহল ত? আচ্ছা, আমাকে দলে টানতে পারলেই কি আপনাদের স্বরাজ শাস্ত হবে?”

স্বরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল, “সবটা হবে না; আপনি যতটুকু আটকে রেখেছেন ততটুকু হবে।”

এই তিরস্কারের আঘাতে ও অপমানে স্বমিত্রার কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কহিল, “দেখুন স্বরেশ্বর-বাবু, স্বদেশী প্রচার করা যদি আপনার ব্রত হয় তা হলে এ বাড়ীর আশা আপনি ত্যাগ করুন। এ বাড়ীতে আপনি কিছু করতে পারবেন না।”

শুনিয়া স্বরেশ্বর মূহু মূহু হাসিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, “বাইরের আকার যদি সব সময়েই ভিতরের অবস্থার পরিচয় হ’ত তা হলে বাকুদের ভিতর থেকে কখনও অগ্নিবর্ষণ হোত না। অতএব আপনাদের বাড়ী দেখে আশাহীন হবার কোন কারণ নেই। স্বদেশী প্রচার যদি আমার ব্রত হয় তা হলে জানবেন আপনাদের বাড়ীতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না, উদ্ঘাপনই হবে। আচ্ছা, তা হলে আসি।” বলিয়া স্বরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই সময়ে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দিক একবার দেখিয়া লইয়া স্বরেশ্বরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “স্বদেশী প্রচার যে তোমার

ব্রত নয় তা আমি জানতে পেরেছি, স্বরেশ্বর ; কিন্তু কেন তুমি আমাদের পিছনে এমন করে' লেগেছ বল দেখি, আমাদের ত কোন অপরাধ নেই। চোর আমরা নই, কিন্তু তুমি যদি আমাদের চোর বানিয়ে বিপদে ফেলতে চেষ্টা কর তাতে কি তোমার ভাল হবে ?”

স্বরেশ্বর বিকট-বিশ্বয়ে নির্ঝাঁকু হইয়া ক্ষণকাল জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, “আমি ত এসব কথার মানে কিছুই বুঝতে পারছিলাম!”

জয়ন্তী তেমনি উদ্ধত ভাবে কহিলেন, “আচ্ছা মানে তোমাকে আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এইটাই কি তোমার উচিত হচ্ছে ? এই সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন এসে আমার মেয়েকে এমন করে' ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করা ? সে ত আর ছেলেমানুষ নয়, আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে !”

এই দূষিত অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে স্বরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে কোনও প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, “যখন-তখন আসি, তা বলা যায় না, কারণ অধিকাংশ স্থলেই আপনারা যখন ডেকেছেন তখন এসেছি। কিন্তু তার পরে আপনার যা অভিযোগ তার কোন উত্তর আমি দিতে চাইনে।”

“আচ্ছা, তা না চাও নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি কোন উত্তর দেওয়া দরকার মনে কর না ?” বলিয়া জয়ন্তী একখানা রেজেষ্ট্রি-করা খাম স্বরেশ্বরের হস্তে দিয়া কহিলেন, “চিঠিখানা পড়ে' দেখ।”

স্বরেশ্বর খাম হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া আদ্যন্ত পাঠ করিল, এবং পাঠান্তে পুনরায় খামের মধ্যে পুরিয়া জয়ন্তীকে প্রত্যর্পণ করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, “আপনি ত এসব বিশ্বাসই করেছেন। কিন্তু আপনিও কি একথা বিশ্বাস করেন ?” বলিয়া সে সুমিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সুমিত্রা তাহার বেদনাহত ব্যথিত মুখ কোনও প্রকারে উখিত করিয়া ক্রিষ্ট কণ্ঠে কহিল, “কি কথা বলুন ?”

“এই চিঠির কথা ? অর্থাৎ আমি একজন গোয়েন্দা,

‘স্পাই’ ; আমার এই খদ্দেরের পোষাক ছদ্মবেশ, আর আমার স্বদেশ-প্রেম লোককে ফাঁদে ফেলবার জন্তে কপট অভিনয় ?”

স্বরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, “না, আমি এর একবর্ণও বিশ্বাস করিনে ! কিন্তু আপনি গোয়েন্দা হয়ে কপট অভিনয় করলেও আমার প্রাণে যেটুকু স্বদেশ-ভক্তি জাগিয়েছেন তা খাঁটি জিনিস ; তার জন্তে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

জয়ন্তী সুমিত্রার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, “মিছামিছি বাচালতা কোরো না, সুমিত্রা !”

সুমিত্রা সে কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া স্বরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “আপনি আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন স্বরেশ্বর-বাবু সে কথা আমি একটুও ভুলিনি। কিন্তু আমি আজ আপনাকে তার চেয়ে অনেক বেশী অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না তার জন্তে আমাকে ক্ষমা করবেন। এবাড়ীতে আর আপনি আসবেন না তা বুঝতে পারছি, কিন্তু দয়া করে' একটা ভাল চরকা আগাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আপনার উপদেশ-মত কাপড়ের দাম শোধ করব। কাপড়টা আগাকে দিয়ে যান।” বলিয়া স্বরেশ্বরের হস্ত হইতে সুমিত্রা বস্ত্রের বাগ্গিলটা টানিয়া লইল।

সুমিত্রার এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া স্বরেশ্বরের মুখ হর্ষে এবং বিশ্বয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে শাস্ত-স্মিতমুখে বলিল, “ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন সুমিত্রা ! তুমি যেমন করে' আজ আমার মান রাখলে এর বেশী আর কি করে' রাখা যায় তা আমি জানিনে ! তুমি শুনে রাখ, আমার মনে আর কোন দুঃখ কোন গ্লানি নেই ! সেদিন তোমার খদ্দের-পরা অদ্ভুত মূর্তি দেখে যে আশা জেগেছিল তা যে এত শীঘ্র এমন করে' সফল হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভুলো না সুমিত্রা, আমাদের দেশের বড় ছরবস্থা ! তুমি শুধু তোমার জননীরই কণ্ঠা নও, দেশমাতারও তুমি কণ্ঠা।”

তাহার পর জয়ন্তীর দিকে ফিরিয়া স্বরেশ্বর বলিল,

“দেখুন, আমি বাস্তবিকই গোয়েন্দা নই; গোয়েন্দার চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী।— একজন দীন দরিদ্র স্বদেশ-সেবক! আপনি আমার উপর যে কারণেই হোক বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু তবুও দয়া করে’ আমার একটা প্রণাম নিন্। কারণ, আপনি স্মিত্রার মা!”

তাহার পর নত হইয়া জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া সুরেশ্বর কক্ষ হইতে নিজস্ব হইয়া গেল।

[১৬]

দাহ এবং দীপ্তি একসঙ্গে লইয়া তুবুড়ি যেমন করিয়া জ্বলিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া সুরেশ্বরের মন বেদনা ও আনন্দ একসঙ্গে বহন করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অপমানের গ্লানিতে যাহা একদিকে নিদারুণভাবে পুড়িতে থাকিল, আনন্দের প্রভায় তাহাই অপরদিকে ভাস্বর হইয়া উঠিল! পথে বাহির হইয়া সুরেশ্বর মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট পার হইয়া বেচু চের্জীর ষ্ট্রীটে বিমানবিহারীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু ক্ষণমাত্র তথায় দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই পুনরায় প্রত্যাভর্তন করিল, এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইবা মাত্র একটা দক্ষিণগামী ট্রাম-গাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

কর্জন-পার্কে সুরেশ্বর যখন প্রবেশ করিল তখন শীতকালের সন্ধ্যার ধূসর আবরণে চারিদিক্ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, এবং সেই অস্পষ্টতার মধ্যে চতুর্দিকে ক্রম-বর্ধনশীল দীপাবলি নীলাশ্রীর গায়ে চুম্বকির মত একে একে ফুটিয়া উঠিতেছিল। বাগান তখন জনবিরল হইয়া আসিয়াছিল, কাজেই সুরেশ্বর সহজেই একটা শূণ্য বেঞ্চ অধিকার করিয়া উপবেশন করিল।

উত্যক্ত কর্ণ এবং উত্তপ্ত চক্ষুকে রাজপথের কোলাহল এবং দৃশ্যবৈচিত্র্যের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্ত নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সুরেশ্বর তাহার অধীরোদাত হৃদয়কে কতকটা শান্ত করিয়া লইল। প্রজ্বলিত অঙ্গার যেমন ধীরে ধীরে তাহার কৃষ্ণবর্ণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রভাময় হইয়া উঠে, তাহার চিত্ত ঠিক সেইরূপে জয়ন্তী-প্রদত্ত মালিগ্ন হইতে মুক্ত হইয়া স্মিত্রার কল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আজ সে স্মিত্রার নিকট হইতে যে মহামূল্য সম্পদ লাভ করিয়া

আসিয়াছে তাহা যে শুধু লাভ করিয়াছে তাহাই নয়, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া লাভ করিয়াছে। প্রহরী স্বক্ষে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে রাজনন্দিনী তাহার কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিয়াছে! নিমজ্জিত চিত্তে সুরেশ্বর স্মিত্রার সেই রোষদীপ্ত আরক্ত মূর্তি এবং অকুণ্ঠিত সতেজ বাক্য স্মরণ করিতে লাগিল, এবং যতই স্মরণ করিতে লাগিল ততই স্মিত্রার সেই প্রদীপ্ত স্মন্দর মূর্তি তাহার সংগ্রাম-সাধনার বিজয়বধুর মূর্তিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। মনে হইল আজ তাহার তপস্যার গুণ কঠোর প্রাঙ্গণে সিদ্ধি মূর্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার তৃণ-মুক্তিকার দেবী-প্রতিমার প্রাণসঞ্চার হইয়াছে!

সুরেশ্বরের এই অপরিমিত আনন্দ অকারণ নহে, এবং স্মিত্রার নিকট হইতে সে যতটুকু লাভ করিয়াছে তাহাতেই পরিণিবদ্ধ নহে। যে অখণ্ডের বোধ অতীন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়ের মধ্যে নিত্য-বর্তমান আছে, মানুষ খণ্ডের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার সন্ধান পায়। রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির মত সুরেশ্বর স্মিত্রার মধ্যে বিশ্ববিজয়িনী অচিন্তনীয় মূর্তি দেখিতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশের পাচকোটি নরনারীর মধ্যে একটি মাত্র ডেপুটি-ছহিতার চিত্তজয়ের মতই অদ্যকার ঘটনা সামান্য বলিয়া তাহার মনে হইল না।

সমস্ত গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইয়া লঘুচিত্তে সুরেশ্বর যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন মাধবী একরাশ তুলা লইয়া পাঁজ প্রস্তুত করিতে করিতে আপন মনে গুণ্ণুন্ করিয়া গান করিতেছিল। সুরেশ্বর তাহার কঠিন নাগরা জুতা নিম্নতলেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, দূর হইতে মাধবীকে অতি নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সস্তর্পণে নিকটে আসিয়া তাহার বেণী ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিয়া মাধবী কহিল, “তা বুঝতেই পেরেছি যে দাদা ভিন্ন আর কেউ নয়।”

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, “তাই ত! দাদা বুঝতে পারলে লোকে অতখানি চমকে ওঠে কিনা!”

মাধবী হাসিয়া কহিল, “দাদা বুঝতে পারলেও লোকে

চম্কে ওঠে ! বোঝা আর চম্কানোর মধ্যে ভাববার সময় থাকে না !” তার পর স্বরেশ্বরের সানন্দ মূর্তি দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, “তোমায় যে এত খুসী দেখছি দাদা ? স্মিত্রা কাপড়-জোড়া কিনেছে বুঝি ?”

স্বরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, “তা কিনেছে, কিন্তু শুধু কেনেই মি মাধবী, খুব ভাল রকম দাম দিতে রাজী হয়েছে !”

মাধবী আগ্রহ সহকারে বলিল, “কি রকম শুনি ?”

স্বরেশ্বর কহিল, “বলেছে চরকায় নিজে স্ত্রীতো কেটে, স্ত্রীতো বিক্রী করে’ দাম শোধ করবে।”

স্বরেশ্বরের কথা শুনিয়া মাধবীর মন বিষয়ে ভরিয়া গেল।—“একেবারে এতটা উন্নতি ! এত বিশ্বাস হয় না দাদা, অতিভক্তি নয় ত ?”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “না রে, না, তা নয়। কয়লার খনির মধ্যে স্মিত্রাকে পাওয়া গিয়েছে বলেই মনে করিস্ নে যে সে আসল হীরে নয়। ভগবান্ তাকে ছিলতে আরম্ভ করেছেন ; এরি মধ্যে সে চক্চকে হয়ে উঠেছে !”

মাধবী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, “আচ্ছা, দাদা, স্মিত্রার মা কোনরকম আপত্তি করলেন না ? তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ?”

মুহূ হাসিয়া স্বরেশ্বর বলিল, “ছিলেন বই কি ! তিনি ছিলেন বলেই ত হ’ল রে ; নইলে কাপড়-জোড়া ত ফিরিয়েই নিয়ে আসছিলাম।”

সবিস্ময়ে মাধবী কহিল, “কেন ?”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “শুনলে মনে হয়ত দুঃখ পাবি তাই ভেবেছিলাম সব কথাটা তোকে বলব না। কিন্তু এতটা যখন শুনলি তখন সবটাই শোন।” বলিয়া স্বরেশ্বর অল্পপূর্বকাহিনী মাধবীকে খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া মাধবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর বলিল, “দেবতাকে দানব বললে যে পাপ হয় তোমাকে ‘স্পাই’ বললে সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা

শুনে দুঃখ খুবই পেলাম। কিন্তু একদিন এ দুঃখ নিশ্চয়ই যাবে। কবে, জান দাদা ?”

স্বরেশ্বর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কবে ?”

ক্রুদ্ধ স্মিতমুখে মাধবী বলিল, “যে দিন তুমি স্মিত্রাকে এবাড়ীতে নিয়ে আসবে সেই দিন !”

গভীর বিষ্ময়ে স্বরেশ্বর কহিল, “আমি স্মিত্রাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসব ? কেমন করে’ মাধবী ?”

মাধবী তাহার আরক্ত মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া বলিল, “বিয়ে করে’ !”

“বিয়ে করে’ ?”—অপরিমেয় বিষ্ময়ে স্বরেশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পুনরায় মাধবীর বেণী নাড়িয়া দিয়া বলিল “তোমার মত আর একটি পাগল যদি ভূভারতে থাকে মাধবী ! বিয়ে করার যে প্রথা আজকাল চলিত আছে সে প্রথায় ত স্মিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি আগেকার রাক্ষুসে প্রথায় গভীর রাত্রে প্রমদা-বাবুর বাড়ী গিয়ে যুদ্ধ করে’ স্মিত্রা-হরণ করি ত স্বতন্ত্র কথা ! কিন্তু তা’ ত হবে না। জানিস্ ত আমাদের মস্ত হচ্ছে অল্পপীড়ক অসহযোগ।” বলিয়া স্বরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

মাধবী কহিল, “তা আমি জানি নে ; কিন্তু এ তুমি দেখে নিয়ো দাদা, স্মিত্রার মাকে একদিন তোমাকেই বরণ করে’ ঘরে তুলতে হবে। আমার কথা সেদিন তুমি মনে কোরো।”

আরও কয়েকবার মাধবীকে পাগল বলিয়া, এবং আরও কয়েকবার তাহার বেণী আকর্ষণ করিয়া স্বরেশ্বর প্রস্থান করিল। কিন্তু লৌহ যেমন চুষকের দেহ-সংস্কৃত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে মাধবীর বাক্য সেদিন স্বরেশ্বরের চিত্তে আটকাইয়া রহিল, শুধু জাগ্রতাবস্থায় নহে, নিদ্রার মধ্যেও।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



দময়ন্তী

চিত্রকর শ্রীহুশাশকব ভট্টাচার্য

অদৃষ্ট-চক্র

১ম পরিচ্ছেদ

স্বাগত

গলায় বগলশ-আঁটা, বৃহৎ, বলিষ্ঠকায় একটা কুকুর নবদ্বীপের স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সন্ধ্যা হইয়াছে। প্ল্যাটফর্মের আলো জ্বলা হইতেছে, গাড়ী আসিতে বিলম্ব নাই। লোক-সমাগমে স্টেশন সর-গরম।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে লোকজন নামা-ওঠা করিতে লাগিল, কুলী ডাকিতে লাগিল, গাড়ী খুঁজিতে লাগিল, নানারূপ ফেরীওয়ালা নানাছাঁদে হাঁকিতে লাগিল,— কুকুরটা ব্যস্তভাবে ঝঁকিতে ঝঁকিতে গাড়ীর ধারে ধারে পাশ কাটাইয়া চলিল—যেন কাহার সন্ধান করিতেছে। এমন সময় সকল কোলাহল ছাপাইয়া কে ডাকিল— “জোসেফ্”।

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ছুটিয়া গিয়া নাচিয়া, লাফাইয়া, এক শ্যামবর্ণ নধরকান্তি বলিষ্ঠ-কায় যুবকের গায়ে ভর দিয়া উঠিয়া, তাহার মুখের দিকে মুখ বাড়াইয়া, লেজ নাড়িয়া, নানা ভঙ্গীতে আদর ও অভ্যর্থনা জানাইতে লাগিল। যুবক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, ঘাড় চাপড়াইয়া হুকুম করিল—“আগে সেলাম।”

অমনি সেই বৃহদাকার কুকুরটা যুবকের সামনে পায়ের উপর মাথাটা নোয়াইয়া দিল। পর মুহূর্তেই উঠিয়া হাঁ করিয়া প্রভুর প্রতি চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

যুবক হাতের ব্যাগ হইতে একটা ছোট লণ্ঠন বাহির করিয়া জালিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর রাখিয়া হুকুম করিল—“বাড়ী চল”। জোসেফ তৎক্ষণাৎ আলোটা মুখে তুলিয়া লইয়া রেল-লাইনের ধারে ধারে আগে আগে চলিল।

২য় পরিচ্ছেদ

প্রভাবতীর বড় সুখ

মণিলাল আজ বড় হৃষ্টচিত্তে বাটা আসিতেছিল। তাহার বন্ধু ব্রজগোপাল টেলিগ্রাম করিয়াছে যে নির্ঝিল্লি তাহার একটি পুত্রসন্তান প্রসূত হইয়াছে। কত ভাবনাই যে ছিল! প্রভাবতীর পিতৃকুলে এমন কেহ নাই যে এই প্রথম বারটির জগৎ লইয়া যায়। আর মণিলালের সংসারে তো কেবল মাত্র প্রভাবতী আর জোসেফ্। একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল আর তাহার স্ত্রী।

কলিকাতায় কৰ্ম করিতে হয়,—উকীলের মুহুরীগিরি। বাল্যকালে পড়া-শুনা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। তাহার উপর কুকুরটা যেদিন নিঃসহায় শৈশবে, শীতের রাত্রে, কক্ষণ ক্রন্দনে শ্রাণ আকৃষ্ট করিল, সেদিন হইতে লেখাপড়া একেবারে মাধায় উঠিল। তাহাকে খাওয়ান ধোয়ান, কসরৎ শিখান-তেই সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। অবশ্য জোসেফের দ্বারা এখন তদন্তরূপ উপকার পাওয়া যায়। সে দিবারাত্র যমদূতের মত বাড়ী পাহারা দেয়, ছাতে জিনিষপত্র শুকাইতে দিলে আঙুলিয়া বসিয়া থাকে,—হুমানের উৎপীড়ন হইতে গাছ পালা রক্ষা করে,—চিঠি লিখিয়া দিলে ডাকঘরে গিয়া সামনের প্যা-দুটা তুলিয়া ডাকবাঞ্ছ ফেলিয়া আসিতে পারে, এমনি কত কি করে। আদরও পাইত সে যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্রীতে যেন একটা সন্তানের মত তাহার যত্ন করিত। আর প্রভাবতীর সতের-আঠারো বৎসর বয়স হইল এত দিনেও সন্তান কোলে পায় নাই।

প্রভাবতীর বড় সুখ, ভরা যৌবনে একটা মাধুরী যেন দেহটাতে আঁটিয়া উঠিতেছে না, স্বামীর সোহাগ—অপর্যাপ্ত, গৃহের একমাত্র অধীশ্বরী—গরীব গৃহস্থের পক্ষে টাকাকড়িও রোজগার মন্দ হইত না, তাহার উপর আবার ভগবান্ তাহার কোলে আজ এ কী উপহার পাঠাইলেন! এ আসিয়াই যে এক অপূর্ব আকর্ষণে

হৃদয় ভরিয়া দিল; এ কাদিলে প্রাণ কাদিয়া উঠে,—
বক্ষে ধরিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

খুব বাহাদুরী

গোকা পাশের ঘরে দোলায় শুইয়া কাদিতেছে।
প্রভাবতী বলিল—“আরে ছেলে কাদ্চে, যাও—সকল
সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।”

মণিলাল বলিল—“আরে ছেলে একটু কাঁচুক না,
ডাক্তার ব'লেছে কাঁদলে ফুস্ফুসের জোর বাড়ে।”

প্রভাবতী—“তুমি এখন একটু রাস্তা দাও দিকি,
বক্তৃতাটা পরে কোরো।”

মণিলাল হাত তুলিয়া ছুয়ার আঙুলিয়া ছিল।
সে বলিল—“তুমি পান-ছোটো আগে মুড়ে' দাও দিকি,
ছেলের কাছে পরে যেও।”

প্রভাবতী—“দেখ্বে মজা?”

মণিলাল—“দেখ্বে মজা?”

প্রভাবতী বোধ হয় মাথায় একটা মস্তলব আঁটিতে-
ছিল। সে গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া আবার কহিল—“তবে
দেখ্বে মজা।”

মণিলাল বলিল—“হাঁ দেখ্বে, দেখাও।”

প্রভাবতী ফস্ করিয়া মণিলালের বগলে কাতু-
কুতু দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, আবার পিছন হইতে
একটা কড়া রকমের চিম্টিও কাটিয়া দিল। মণিলাল
ঠকিয়া গিয়া দাঁত খিঁচাইল। প্রভাবতী তাহার উত্তরে একটু
মিষ্টি করিয়া ছোট রকম জিভ ভ্যাঙাইয়া চলিয়া গেল।
বুদ্ধির প্রার্থন্যে উদ্ভাসিত, ওই কৃষ্ণতার চক্ষু দুটির উপর
কালো টিপখানি কেমন মানাইয়াছে; বাঁকা কবরীর
নিম্নভাগে, চূর্ণ কুস্তলের মধ্যে ওই গ্রীবার অংশটুকুর কত
শোভা! মণিলাল নিজেই পান মুড়িতে বসিল। সুপারি
খিলির ফাঁক দিয়া পড়িয়া যায়, চূর্ণখয়েরের দাগ হাতে
লাগিয়া যায়, মুড়িয়া রাখিবামাত্র আবার হাত-পা খুলিয়া
পানগুলা যেন উপহাস করে, লবঙ্গ গাঁথিতে গেলে পানের
অঙ্গ ছিড়িয়া লবঙ্গ আলগা হইয়া পড়ে ও পানগুলা হাঁ
করিয়া বলে—“থাক আর বাহাদুরিতে কাজ নেই।”

প্রভাবতী অনক্ষ্যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া মুখ
টিপিয়া হাসিতেছিল। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে
টানিতে বলিল—“থাক আর বাহাদুরীতে কাজ নেই,
একটা মজা দেখ্বে এস।”

মণিলাল এই চতুরা স্ত্রীটিকে বুদ্ধিতে কোন কালে
আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার উপর টাটকা একবার
ঠকিয়া সে একটু অবিশ্বাসের সহিত বলিল—“কি মজাটা
আগে বলোই না।” প্রভাবতী টানাটানি না কমাইয়া
বলিল—“শীগুগির শীগুগির আগে ওঠো, আগে ওঠো।”

মণিলাল আশ্বে আশ্বে উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল,
“চালাকী নয় ত?”

প্রভাবতী জানালার বাহির হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া
দেখাইল—জোসেফ খোকার দোলার দড়িটা মুখে লইয়া
আশ্বে আশ্বে দোল দিতেছে, খোকা চুপ করিয়াছে!

মণিলাল নিম্নস্বরে কহিল, “তুমি শিখিয়েছে?”

প্রভাবতীও নিম্নস্বরে উত্তর দিল—“না, আজকেই
দেখ্ছি ও নিজে নিজে মতলব খাটিয়েছে, কাঁদলে আমি
দোল দিয়ে থামাই দেখে কিনা।”

মণিলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া জোসেফের ঘাড়
চাপড়াইয়া বলিল—“বলিহারি জোসেফ, খুব বাহাদুরি,
খুব বাহাদুরি।”

জোসেফ লেজ নাড়িয়া, হাঁ করিয়া, জিভ বাহির
করিয়া আফ্লাদে গদগদ হইয়া প্রভুর দিকে চাহিল।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

এত সুখ সহিল না

এত সুখ সহিল না। তিন মাসের শিশুটি রাখিয়া
প্রভাবতী অকালে স্বর্গারোহণ করিল। হঠাৎ দুই তিন
দিনের দমকা-জ্বরে কেমন করিয়া কি হইয়া গেল;
মণিলাল ভাল বুদ্ধিতেও পারিল না ভাল করিয়া চিকিৎসা
করাইবার সুযোগও পাইল না। মাথায় তাহার আকাশ
ভাঙ্গিয়া পড়িল। একে দুর্ভিক্ষ শোক, তাহার উপর
এই অপোগণ্ড শিশুর লালমপালনের সমস্তা! ব্রজ-
গোপালের স্ত্রী খোকাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রজ-
গোপাল বড় জ্বালাইল। সে কোন প্রাণে আবার

বিবাহ দেওয়ার জন্ত পাইয়া বসিয়াছে! ব্রজগোপালের স্ত্রীর বড় কষ্ট হইতেছে সত্য। নিজের সংসার সামলাইয়া, অত কচি ছেলের বোলআনা ভার সহ্য সোজা কথা নহে।

ব্রজগোপাল দেখিল এই অছিলায় জোর না করিলে ভবিষ্যতে আর মণিলালকে সংসারী করা যাইবে না। একটি পাত্রীও কি ভগবান্ জোগাইয়া রাখিয়াছিলেন!

সরোজবাসিনীর পিতা সামান্য চাকুরী করিতেন। তিনি পেন্শন্ লইয়া গৌর-গঙ্গার স্থান বলিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহার কাল পূর্ণ হইল। বিবাহ দেওয়া হইল না। বিধবা মোক্ষদা বড়ই বিপদে পড়িলেন। কন্যার বিবাহ দেওয়া কি নিঃসহায়া স্ত্রীলোকের সাধ্য! অপরিচিত দেশ, কাহাকেই বা অন্বেষণ করা যায়, কেই বা ভার লয়। বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া যায় মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীর আহার নিজ্যা ত্যাগ হইয়া আসে। ব্রজগোপালের মাতার সহিত গঙ্গাজল পাতান ছিল। মোক্ষদা ঠাকুরাণ তাঁহাকেই ধরিয়া বসিয়া আছেন, যদি কোন উপায় হয়।

ইতিমধ্যে মণিলালের এই বিপদ ঘটিল। সরোজকে বাড়ীতে আনাইয়া ব্রজগোপাল দেখিল। ব্রজগোপালের স্ত্রী ত' তখনই ছেলে কোলে দিয়া সরোজকে বলিয়া দিল— “দেখো ভাই, বিনা কষ্টে সোনার টাঁদ মিল্ল ব'লে যেন কখন অনাদর কোরো না। যে ওকে ফেলে' গেছে, ওর জন্তে মৃত্যু-শয্যাতেও তার শাস্তি ছিল না।”

কচি প্রাণের বাঁধনটুকুর জন্ত মণিলাল এক দিনের তরে প্রাণ ভরিয়া শোক করিতে পাইল না। আবার সংসারের কঠিন পরিহাসের মধ্যে গা ঢালিয়া দিয়া খোকার জন্ত নূতন মা আনিতে হইল। সে যে মরিবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—“দেখো আমার ছেলে যেন অবহেলায় মারা না যায়।” এমন কি কুকুরটাকে পর্য্যন্ত ডাকিয়া বলিয়াছিল—“জোসেফ, খোকা রইল, তুই দেখিস্।” একথা কি সে বিকারের ঝোঁকে বলিয়াছিল? জোসেফ কি বুঝিয়াছিল? কে জানে এই মার প্রাণ! এই অপত্য-স্নেহ! মৃত্যুতেও অতৃপ্তি—।

কই শেষ সময়টা মণিলালের কথা ত তেমন করিয়া ভাবিল না।

মণিলাল যখন সরোজের হাতে খোকা কে সঁপিয়া দিয়া বলিল, “এ তোমারই পেটের সন্তান,” সরোজ তাহার বহু পূর্বে তাহাকে চুমু খাইয়া, ভালবাসিয়া, তাহার মা হইয়া বসিয়া ছিল।

৫ম পরিচ্ছেদ

জোসেফের দুর্গতি

মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে জামাই বাড়ী পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। সরোজ ছেলে মানুষ, সে কি আর একা ঘর করিতে পারে, না সমর্থ বয়সে তাহাকে একা ফেলিয়া রাখা যায়। জামাই আগে প্রতি সপ্তাহে বাটি আসিতেন, ইদানীং তাহাও বন্ধ করিয়াছেন।

মোক্ষদা নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, গৌরাজ দর্শন করেন, কুকুরের আদর তিনি বোঝেন না। কুকুর ছোঁয়া গেলে তাঁহাকে আবার স্নান করিতে হয়। কুকুরটাও কি এমন বেয়াড়া গা! যখন তখন ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটার কাছে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে কেন বল ত? মুখখানা দেখিয়াছ? যেন ছেলেটাকে গিলিয়া খাইতে চায়। বাধ্য হইয়া সেটাকে তাড়াইতে হয়। জোসেফের আর সে খাওয়ার পারিপাট্য নাই,—কোন দিন একমুঠা ভাত পায়, কোনদিন তাও পায় না। সে চুরি করিয়া যখন তখন খোকার কাছে গিয়া বসিয়া থাকে কেন? তাহাকে পাহারা দেয়? না তাহাকে ভালবাসে? খোকা তাহাকে দেখিলেই হাত পা নাড়িয়া খেলা করে, হৌ হৌ করিয়া সাড়া দেয়। জোসেফ কি তাই এই অপরিচিতাদের হাতে খোকা কে ফেলিয়া রাখিতে চাহে না?

খোকার যত্ন মোক্ষদা ঠাকুরাণ সরোজের অনিচ্ছার উপর জোর করিয়া করিতেন। দেখ না দেখ খানিক বাসি দুধ, কি ঠাণ্ডা, মাছি-বসা, আটাকা দুধ গিলাইয়া দেওয়া, হঠাৎ বাদলার দিনে স্নান করাইয়া দেওয়া, এ সকল মোক্ষদা ঠাকুরাণ করিতে ভালবাসিতেন। সরোজ রাগ করিলে বলিতেন—“তোমার কি সেই বয়স মা, না তুই এ সব কখন ক'রেছিস? আমি যে কদিন আছি, তোমার

কেন কষ্ট করতে হবে! আহা দায়ে প'ড়েই ত সতীনের কাঁটার উপর তোকে দিতে হয়েছে, নইলে জামাই কি আর তোর যুগিয়া হ'য়েছেন," বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, কর্তা যে-সকল ভাল ভাল সম্বন্ধ করিয়াছিলেন তাহার ফর্দ আওড়াইতেন।

মণিলালও অনেক দুঃখে বাড়ী-আসা বন্ধ করিয়াছিল। বাড়ী আসিলেই মোক্ষদা ঠাকুরাণী প্রভাবতীর পরিত্যক্ত গহনাকাপড়গুলার দাবী করিয়া প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিতেন, এবং সেই সূত্রে যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিতেন তাহা কাটা ঘায়ে স্তনের ছিটার গায় জ্বালা দিত। খোকা এখন মাসুকের দিকে চাহিয়া হাসিতে শিথিয়াছে, "হৌকি, হৌকি" করিতে শিথিয়াছে। মণিলালের প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, প্রভাবতীর মত মুখের ভাব, তাহারই মত মুখের চাহনী,—বুক ফাটিয়া তাহার উদ্দেশেই চোখের জল গড়াইয়া পড়ে। ছেলে বৃকে চাপিয়া ধরিলে বুক জুড়ায় ত বটে। একথা সে যখন বলিত তখন ভাল: বিশ্বাস হইত না;—এখন সে যদি থাকিত তাহা হইলে—; আবার বৃঝি বুক ভাসিয়া যায়।

মণিলালের বিশ্বাস হইয়াছে, খোকার প্রতি সরোজের স্নেহটা অকৃত্রিমই বটে। তাই শাশুড়ীর উপর যখন বিরক্তি বাড়িতে লাগিল, বাড়ী আসাও তখন বন্ধ হইয়া আসিল। ব্রজগোপাল আর আগের মত খবর লইতে পারে না। মোক্ষদা অসন্তুষ্টা হন। পুরুষ মানুষের মেয়ে মানুষের বাড়ী যখন তখন যাতয়াত করা ভাল দেখায় না।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর কত সয়?

সরোজ বলিল—“মা, তুমি অন্ততঃ ব্রজ-বাবুর বাড়ী খবর দাও। ছেলের আমার চেহারা দেখে' বুক যে শুকিয়ে যাচ্ছে।’

মোক্ষদা বলিলেন—“দেখ্ সরোজ, তোর বড় বাড়া-বাড়ি। আমি কি চুপ ক'রে ব'সে আছি; পীরতলার ককিরের ঔষধটা ছদিন দেখা হ'ল, আজ না হয় রামপদ সাধুর জলপড়াটা সন্ধ্যার সময় খেয়ে আসবে। রক্ত আমাশয়ে ডাক্তার বদ্যি কি ক'রবে? ব্রজগোপালহৈ

চৈ ক'রে কতকগুলো ডাক্তার বদ্যি জড়ো করা ছাড়া কি হাত দিয়ে ঠেলে' রোগ সারিয়ে দেবে?”

সরোজের প্রাণ ছটফট করে। মা কিছুতেই কথা শোনে না। মণিলালের ঠিকানাও জানা নাই, আর শিরোনাম লিখিবার কৌশলও ত জানা নাই। ওদিকে ছেলে যেন দিন দিন কালীর মূর্ত্তি হইয়া যাইতেছে!

শেষে একদিন সরোজ মনের ক্ষোভে বলিল—“মা আমি মাথা খুঁড়ে মরব যদি তুমি ব্রজ-বাবুকে না ডেকে আনবে।”

মা আপন মনে বকিতে বকিতে ব্রজ-বাবুকে ডাকিতে গেলেন। “সতীনের কাঁটার উপর এত দরদ! মেয়ের অনাছিষ্টি।”

ব্রজগোপাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিল, এবং তাঁহার মুখে অবস্থা শুনিয়া মণিলালকে টেলিগ্রাফ করিল।

জোসেফ আজ কিছুতেই খোকার ঘর হইতে বাহির হইতেছে না। মোক্ষদা পুনরায় স্নান করা স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রাণপণে ঠেঙাইতেছেন, সে বসিয়া বসিয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া আর্তনাদ করিতেছে কিন্তু একপাও নড়িতেছে না। হুম্ দাম্ শব্দে পিঠের উপর লাঠি পড়িতেছে, পিঠ বৃঝি ভাঙিল।

সরোজ রাগিয়া কাঁদিয়া বলিল—“দোহাই মা, মরার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিও না, ওকে ঘরে থাকতে দাও, গোপাল আমার চ'ম্কে উঠু'চে দেখেও কি তোমার দয়া হচ্ছে না? তুমি কি মানুষ না পাষণ?”

ব্রজগোপাল স্ত্রীকে লইয়া আসিয়া সরোজের কাছে বসাইয়া দিল। মণিলাল আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। জোসেফ শব্দেহের পিছু পিছু গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল। মোটে সাতমাসের শিশু, গঙ্গার বালির মধ্যে তাহাকে প্রোথিত করিয়া ব্রজগোপাল ফিরিয়া আসিল।

রাত্রে মণিলাল বাড়ী আসিল। জোসেফ কিন্তু আদর জানাইতে কাছে আসিল না। একবার দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াই সরিয়া পড়িল।

ব্রজগোপাল ছুটিয়া দেখা 'করিতে আসিয়াছে। মণিলাল কাষ্ঠপুস্তলিকার স্তায় খোকার পরিত্যক্ত দোলা-টির কাছে পা রাখাইয়া বসিয়া আছে। সে সহজভাবে কথা

৩য় সংখ্যা । সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৫৩

বার্তা কহিতেছে দেখিয়া ব্রজগোপালের ভিতর ভিতর ভয় করিতেছে। এমন সময় জোসেফ অতি কষ্টে খোকর শব্দেহটা ঘাড়ের কাছে ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে আনিয়া প্রভুর পায়ের কাছে শয়ন করাইয়া দিল।

সরোজ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া “গোপল রে— বাবা আমার!” বলিয়া ধড়াস করিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। মণিলাল যেন হাত পা ভাঙিয়া জোসেফের পাশে পড়িয়া গিয়া বলিল—“জোসেফ, বাবা, দেখা করিয়ে দিলি।” ব্রজগোপাল প্রত্যাৎপন্নমতি-সহকারে তাড়াতাড়ি মৃতদেহ ঢাকিয়া আবার উঠাইয়া লইয়া দাহ করিতে গেল।

৭ম পরিচ্ছেদ

চিহ্ন-লোপ

মণিলালের ভিটায় তাল পড়িয়াছে। সরোজের সদাই মূর্ছা হয়। মোক্ষদার রাত্রে গা ছম্-ছম্-করে। মণিলালের বাটা ছাড়িয়া তিনি নিজ বাটীতে চলিয়া আসিয়াছেন। মায়ে ঝিয়ে আর বনে না। সরোজ বড় খিটখিটে হইয়াছে। সদাই ঝগড়া করে, চটপট শুনাইয়া দেয়। বুকুরটাকে ব্রজগোপাল লইয়া আসিয়াছিল। সে কিন্তু থাকে নাই। প্রায়ই দেখা যাইত সে গঙ্গার বালুচরে ইতস্ততঃ শুঁকিয়া শুঁকিয়া যেন কিসের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার খাওয়া-দাওয়াও যেন বন্ধ, ক্রমশঃ যেন শীর্ণ, শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল।

ব্রজগোপাল লিখিল—“জোসেফ ঘরে থাকে না। খায় না; কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু কয়েক দিন হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাইতেছি না।”

এই পত্র পাইয়া মণিলাল বহুদিন পরে আবার বাড়ী আসিল। বাড়ীর মধ্যে আগাচার জঙ্গল হইয়াছে, রোয়াকের ফাটলে ফাটলে গাছ গজাইয়াছে, ধূলা ময়লা আবর্জনার পা ফেলিবার জায়গা নাই। খোকর ঘরের ছয়রের সামনে জোসেফ মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তখনও প্রাণ ছিল। মণিলাল যখন “জোসেফ, বাপ আমার” বলিয়া চীৎকাব করিয়া ডাকিল, জোসেফ তখন অতিকষ্টে মাথাটা তুলিয়া কাপিতে কাপিতে প্রভুব নোলে মাথাটা রাখিল। মবিবাব আগে আর-একবার মুখ নাড়িয়া প্রভুব ডাকের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ব্রজগোপালের পুত্র আলো লইয়া আসিল। তাহার পিছনে গাবছায়ায় একটি স্ত্রীমূর্তি আনিয়া দাঁড়াইল না? মণিলালের কি মাথার ঠিক ছিল না? নহিলে সে যে মূর্তির দিকে না চাহিয়াই “প্রভা, আর কি দেখতে এলে ভাই” একথা বলিবে কেন? সরোজও কি বাহুজ্ঞান হারাইয়াছিল? নহিলে সে ব্রজগোপালের সামনে অমন করিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া দামীর পা ছুটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে পারিবে কেন?

ছুজনের আজ দ্বিতীয় বার পুত্রশোক।

শ্রী রণজিৎকুমার ঙ্ট্রাচার্য্য

সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায়

(১)

সামাজিক আয় মাপবার মাপকাঠি হচ্ছে টাকা। অর্থাৎ সামাজিক আয় কত, তা প্রকাশ করা হবে টাকায়; এবং সমাজের সব লোকের বা লোকসংঘের (কোম্পানী ইত্যাদির) সবস্বত্ব কত টাকা আয় হ'ল, তাই

দিয়ে মোট সামাজিক আয়ের (বা আসলে একটি ভোগ্যসমষ্টি মাত্র) পরিমাণ জানা যাবে। টাকাটা একটা মাপকাঠি মাত্র এবং মানুষের কাজের সুবিধার জগুই তার সৃষ্টি। কা নিজেই একটা ভোগ্যবস্তু তা ঠিক; কিন্তু সে শুধু এই কাজের সুবিধা করে' দেয় বলে'; সুতরাং

টাকার তৃপ্তিদানক্ষমতা শুধু পরোক্ষভাবেই আছে একথা বলা চলে। অবশ্য এমন ছলভ উদাহরণ জোগাড় করা যায়, যেখানে টাকা সাফাভাবেও ভোগ্য; যেমন, যদি কেউ অনেক টাকা এক সঙ্গে দেখে' আনন্দ পায় (রূপণ প্রভৃতি) অথবা কেউ যদি বালিসের বদলে টাকার খলি মাথায় দিয়ে ধুমায়। এদের কাছে টাকাই ভোগ্য। এসব স্থলে ব্যাপারটা একটা অস্বাভাবিক রকম মানসিক অবস্থার ফল। অথবা টাকার গাদা করে' রেখে যদি কোন পাগল আনন্দ পায়, সে আনন্দ নিয়ে ব্যাধিবিজ্ঞান (Pathology) আলোচনা করতে পারে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞান, সচরাচর যা ঘটে' থাকে বা দেখা যায়, তাইই আলোচনা করে। সমুদ্রের জলরাশির গতি নিয়ে যার কার্‌বার, সে যদি দেখে যে সমুদ্রের জল কোন কারণে উত্তর দিকে যাচ্ছে, অথচ কয়েক ফোঁটা জল কোন শুশুক বা মাছের লাফালাফির ফলে দক্ষিণে ছিটকে পড়ল, তা হ'লে সে তা দেখে'ও দেখে না। তার কাছে বিশেষ করে' কয়েক ফোঁটা জলের গতির মূল্য কিছু নেই। সেইবকম সাধারণ গুণ ও গতি নিয়েই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কার্‌বার, অসাধারণ ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকে বাদ দিলেও সাধারণ সত্যগুলি সত্যই থাকে। টাকা যদি টাকার কাজ ছাড়া অন্য কাজ করে তবে আমরা সে ক্ষেত্রে তাকে টাকা বলব না। যথা, কোন জাতির কোন মানুষ যদি একটা পিয়ানো বিছানা পাত্‌বার জন্য ব্যবহার করে, তা হ'লে পিয়ানো বাজিয়ে সেই জাতির কি পরিমাণ আনন্দ লাভ হচ্ছে জানতে হ'লে সে হিসাব থেকে ঐ পিয়ানোরূপ পালঙ্কটি বাদ পড়বে।

মাপকাঠি যদি নিজে সমান না থাকে তা তা দিয়ে মাপা একটু শক্ত হ'য়ে পড়ে। গজকাঠি যদি আজ কিছু লম্বা আর কাল কিছু খাট হ'য়ে যায় তা হ'লে সেই গজকাঠি দিয়ে মাপা একটু অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। একজন তাঁতী যদি সেই গজকাঠি ব্যবহার করে' বলে যে গত বছর আমি ২০০ গজ কাপড় বুনেছিলাম, এবছর ২৫০ গজ বুনেছি তা হ'লে তার কথার মূল্য কি তা বলা শক্ত। গজকাঠি যদি আগেরই সমান লম্বা থাকে, তা হ'লে বলা

যায়, যে, তাঁতি শতকরা ২৫ পরিমাণ কাজ বেশী করেছে। গজকাঠি যদি আবার গজ প্রতি ৯ ইঞ্চি (২৫%) খাট হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে কাজ আগেরই সমান করেছে। আর যদি গজকাঠি গজ প্রতি ৯ ইঞ্চি লম্বা হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে, যে, সে আগের চেয়ে ঢের বেশী কাজই করেছে—:৫০ গজ কাপড় বুনেনি, বুনেছে ৩১২.৫ গজ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে, মাপকাঠি নিজে স্থির না থাকলে তা দিয়ে মাপা শক্ত এবং কোনো উপায়ে মাপকাঠির অস্থিরতার পরিমাণ নির্ণয় করতে না পারলে মাপা জিনিসের যথার্থ পরিমাণ কি তা বোঝা শক্ত। কিন্তু মাপকাঠি কি হারে বাড়ছে কমেছে তা জানা থাকলে তা দিয়ে কাজ চালান যায়। এমন কি মোটামুটি জানা থাকলেও মোটামুটি কাজ চলে।

সমাজে যে ভোগ্য অদল-বদল করা হয়, তা টাকার সাহায্যেই করা হয়। অর্থাৎ মোদক সন্দেশের বদলে জামা জোগাড় করার জন্য সন্দেশপ্রয়াসী দর্জির খোজে বার হয় না; যে কেউ সন্দেশ চায়, তাকেই টাকার বদলে সন্দেশ দিয়ে দেয় এবং যে কেউ জামা বিক্রি করতে রাজি থাকে, তার কাছে টাকার বদলে জামা নেয়। সমাজে এরকম যত অদল-বদল হয়, সব টাকার সাহায্য নিয়েই হয়। একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হ'লেও মোটামুটি সত্য। এখানে টাকা বলতে, কোন বিশেষ মুদ্রা বোঝাচ্ছে না, তা মনে রাখতে হবে। যা কিছু 'টাকার কাজ করে, সবই টাকা বলে' ধরে' নিতে হবে। (চেক, ছাতি প্রভৃতিও টাকা।) একটা টাকার বদলে একবার কিছু কেনা কিম্বা বেচা হ'লে, সেই টাকাটা তার কাজ একবার করলে ধরতে হবে। আর সমাজে যত কেনা-বেচা হয়, তাকে সমাজের সমগ্র ব্যবসায় বলে' ধরতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসায়ের জন্য কত টাকা প্রয়োজন হবে, তা সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসায়ই দেখিয়ে দেবে। কেন না কি পরিমাণ ব্যবসায় হ'ল টাকার ভাষাতেই তা প্রকাশ করা হবে। যেমন, নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসায় ১০০ লক্ষ

৩য় সংখ্যা] সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৫৫

টাকার ব্যবসায় হ'তে পারে। এর জন্ম ১০০ লক্ষ টাকা দরকার হবে। অর্থাৎ সমাজে যদি ১০০ লক্ষ টাকা সত্যই থাকে, তা হ'লে সে পরিমাণ ব্যবসায়ের জন্ম সে টাকাকে মাত্র একবার টাকার কাজ করতে হবে। অর্থাৎ সেই ১০০ লক্ষ টাকা মাত্র একবার কেনা-বেচার সূত্রে হাত বদলাবে। কিন্তু প্রত্যেক টাকাই (আগেই বলেছি, টাকা অর্থে ভারতে প্রচলিত রৌপ্যখণ্ড মাত্র নয়, তা মনে রাখা দরকার। যা-কিছু টাকার কাজ করে, তাই এক্ষেত্রে টাকা।) বৎসরে বহুবার হাত বদলায়। এবং এক টাকা যদি দশবার হাত বদলায়, তা হলে সেই টাকাটা দশ টাকার কাজ করলে ধরতে হবে। অর্থাৎ বাৎসরিক ১০০ লক্ষ টাকা পরিমাণ ব্যবসায় চালাবার জন্ম ১০০ লক্ষ টাকা বছরে একবার হাত বদলালেও চলে, আবার দশ লক্ষ টাকা বছরে দশ বার হাত বদলালেও চলে। সুতরাং কোন্ বছর সমাজে কত টাকা আছে, তা ঠিক করতে হ'লে শুধু টাকার সংখ্যাটা জানলেই হয় না; তার ভ্রমণের বেগ, অর্থাৎ তা বৎসরে কবার হাত বদলায়, তাও জানতে হয়। টাকা বছরে দশবার হাত বদলালে তার **বাৎসরিক ভ্রমণের বেগ** দশ বলতে হবে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে, টাকার সংখ্যাকে তার বাৎসরিক ভ্রমণের বেগ দিয়ে গুণ করলে ব্যবসাতে খাটান টাকার বাৎসরিক পরিমাণ পাওয়া যায়।

টাকার বদলে সব জিনিস পাওয়া যায়। যদি চালের বদলে সব কিছু পাওয়া যেত, তা হ'লে কোন কারণে, চালের পরিমাণ বেড়ে গেলে সব কিছুর বদলে বেশী বেশী মাত্রায় চাল পাওয়া যেত। সেইরকম, কোন কারণে টাকার পরিমাণ বেড়ে গেলে, সব কিছুর জন্মেই বেশী টাকা পাওয়া যাবে—অর্থাৎ সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে বা টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা কমে' যাবে। কিন্তু যে-সব জিনিস টাকার বদলে পাওয়া যায়, তার পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেলে সেরকম হবে না। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ শতকরা ২৫ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ২৫ বেড়ে গেলে জিনিসের দাম

বাড়বে না এবং টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা সমানই থাকবে। টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা কি, তা ঠিক করতে হলে টাকার পরিমাণকে ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করতে হবে, অর্থাৎ টাকার সংখ্যা \times টাকার ভ্রমণের বেগ = ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ = টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা। টাকার সংখ্যা যদি হয় ট ও তার ভ্রমণের বেগ ট ভ এবং ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণকে যদি ব বলা যায় তা হ'লে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতাকে $\frac{ট \times ট ভ}{ব}$ এর সমান বলা চলে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার পরিবর্তন সাধারণতঃ তিন দিক দিয়ে হ'তে পারে। এক, ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ পরিবর্তিত হ'য়ে গিয়ে (অনাবৃষ্টি, বন্যা, পশুমড়ক, মহামারী, জাহাজডুবি, যুদ্ধ, ব্যাঙ্কফেল, রাষ্ট্রবিপ্লব ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কোনো কারণে—ভোগ্য উৎপাদন কমে' যেতে পারে। পরস্পরের উপর বিশ্বাস কমে' গেলে অথবা জিনিসের দাম কোনো কারণে খুব অস্থির হ'য়ে উঠলে ভোগ্য কেনা বেচা কমে' যেতে পারে; আবার নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কারণে ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বেড়েও যেতে পারে।) দ্বিতীয়তঃ টাকার সংখ্যা পরিবর্তিত হলে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা পরিবর্তিত হ'তে পারে। (যথা বেশী বা কম টাকা টাঁকশাল বা ছাপাখানা থেকে বেরতে পারে, চেক ও ছড়ির ব্যবহার কম বেশী হ'তে পারে, ইত্যাদি।) তৃতীয়তঃ, টাকার ভ্রমণবেগ বা গতিশীলতা বেড়ে' বা কমে' যেতে পারে। (যথা লোকের অভ্যাস অল্প অল্প করে' বদলে এমন হতে পারে, যে, টাকা পাওয়া মাত্র খরচ করাই রীতি হয়ে দাঁড়াবে; অথবা মাসান্তে দাম দেওয়ার নিয়ম উঠে' গিয়ে সাপ্তাহিক দাম দেওয়ার নিয়ম শুরু হ'তে পারে। ব্যাঙ্ক বা অন্তর্ধার দেবার জায়গাগুলি আরও সহজে ও কম সূদে পার দিতে পারে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বাড়লে ইহা হওয়ার সম্ভবনা বাড়ে। এ সবার উল্টা রকমও হ'তে পারে।)

এখন ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ, টাকার সংখ্যা

ও টাকার ভ্রমণবেগ, এসবের কোনটিই যে একলা একলা বদলাবে, এমন নয়। সব কটিই একসঙ্গে বদলাতে পারে। কোনটির পরিমাণ কত ছিল এবং কত হ'ল, তা নির্ণয় করতে গেলে অনেক গোলমাল। আমাদের শুধু জানা দরকার যে আমরা যে টাকার মাপকাঠি ব্যবহার করে' সামাজিক আয় মাপবার চেষ্টা করছি সেই মাপকাঠিটি নিজেই বদলায় কি না এবং ক্ষেত্রবিশেষে বদলেছে কি না। টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বদলেছে কি না, তা জান্‌বার উপায় টাকা কতটা কিন্তে পার্ন্ত এবং কতটা কিন্তে পার্ন্তেছে, তাই তুলনা করে' দেখা। যেসব জিনিস বা ভোগ্য সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচা হয়, টাকার কেন্‌বার ক্ষমতাব বিচার করতে হ'লে সেইগুলির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। কোনো একটা জিনিস বদলেছে কি না ঠিক করতে হ'লে তার কোনো একটা অবস্থা-বিশেষ থেকে সূত্র করতে হবে, অর্থাৎ অমুক সময় খা ছিল, তা থেকে অন্যরকম হয়েছে কি না, এইরকমভাবে দেখতে হবে। টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বাড়ল কি কমল বা স্থিব রইল, তা দেখতে হ'লে প্রথমতঃ সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচা হয় এমন জিনিস দেখে' একটা তালিকা করতে হয়; যথা চাল, ডাল, ময়দা, আটা, দি, তেল, কাপড়, বাড়ীভাড়া, রেলভাড়া, শিক্ষার খরচ, ঔষধ ইত্যাদি। তালিকা কি রকম হবে, তা, সমাজটি কিপ্রকার ও জুতার লোকের আচার-ব্যবহার কিপ্রকার, তার উপর নির্ভর করবে। এইরকম একটা ভোগ্য-সমষ্টির যদি প্রত্যেকটির সমান পরিমাণ ধরে' (যে-ভাবেই হোক) তাদের দামগুলি যোগ কবে' বলা হয়, যে, "এই ভোগ্য-সমষ্টি যদি অন্য কোন সময়ে কিন্তে এর দুগুণ দাম লাগে, তা হ'লে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা অর্ধেক হ'য়ে গেছে জান্তে হবে"; অথবা আব-এক সময় উক্ত ভোগ্য-সমষ্টি কিন্তে যদি অর্ধেক দাম লাগে, তা হ'লে যদি বলি, "টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা দুগুণ বেড়ে গেছে," তা হ'লে ভুল হবে। তালিকায় যদি শুধু ক-চাল, ক-ডাল, ক-কাপড়, ক-ঘরভাড়া ও ক-জুতা থাকে এবং তার দাম যদি চাল-একটাকা ডাল-একটাকা কাপড়-একটাকা, ঘরভাড়া-একটাকা ও জুতা-দশটাকা হয়; তা হলে ঐ ভোগ্য-সমষ্টির জন্ম টাকা লাগবে - ১ + ১ + ১ + ১ + ১০

= ১৪। অতঃপর যদি জুতার দাম দুগুণ হ'য়ে যায় ও অন্য সব-কিছুর দাম অর্ধেক হ'য়ে যায়, তা হ'লে সেই ভোগ্য-সমষ্টি কিন্তে লাগবে $১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ২০ = ২২$ অর্থাৎ ১৪র প্রায় দুগুণ। এখন কি বলতে হবে—যে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক কমে' গিয়েছে এবং তার থেকে কি এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে সামাজিক আয় যদি টাকায় এবার ২০০ লক্ষ হ'য়ে থাকে তা হ'লে আগেকার যে ১০০ লক্ষ টাকা পরিমাণ সামাজিক আয় ছিল, এবারকার আয় তার প্রায় অর্ধেক হ'য়ে গেছে? নিশ্চয়ই না; কেননা লোকে চাল, ডাল, কাপড়, ঘরভাড়া ইত্যাদিতে যত খরচ করে, জুতাতে তত করে না। কাজেই শুধু জুতার খাতিরে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার দুর্গাম হ'লে চলবে না। কেনা-বেচার দিক থেকে জুতার গুরুত্ব চাল ডাল কাপড় ও ঘরভাড়ার গুরুত্বের সমান নয়। এই কারণে আমাদের ভোগ্যসমষ্টিতে প্রথমতঃ বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকেই ধরতে হবে এবং তার পরে তার ভিতর যেগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বেশী সেগুলির পরিমাণও তালিকায় সেই অনুপাতে বেশী রাখতে হবে। তা না হ'লে কোনো একটি ভোগ্যের দাম কম-বেশী হলে, টাকার কেন্‌বার ক্ষমতায় (সাধারণভাবে) যে হ্রাস বা বৃদ্ধি দৃষ্ট হবে, সেটা সত্য অবস্থার পরিচায়ক হবে না। যে জিনিসটার কেনা-বেচা যত বেশী হয়, তার দামের পরিবর্তন টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার পরিবর্তনে তত বেশী সাহায্য করবে। ভোগ্যের তালিকায় চিড়েমুড়ির সমান দাম হ'লে হবে না। ওজন কবে' জিনিসগুলি তালিকার মধ্যে দিতে হবে। ওজনের নির্ভ্র হবে জিনিসের ব্যবহার বা কেনা-বেচা কত হয় তার পরিমাণ। এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। তালিকায় কি কি জিনিস ধরা হবে? কোনটিকে তালিকায় কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হবে? জিনিসের দাম খুচরা দাম, না পাইকারী দাম ধরা হবে? কোনো বছর যেসব জিনিস প্রয়োজনীয় থাকে, অন্য বছর যদি সেইগুলিই প্রয়োজনীয় না থাকে বা একই অনুপাতে প্রয়োজনীয় না থাকে তা হ'লে কি করা হবে? একই নামে ক্রীত জিনিস দুই বৎসরে ভিন্ন জিনিস হ'লে কি

৩য় সংখ্যা] সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৫৭

হবে? (১৯১০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকার এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকার কি একই জিনিস? আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যাতে একই নামে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি হয়েছে।) কিন্তু এইসব প্রশ্নের বা এই জাতীয় আর যা প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্তর দেওয়া সংক্ষেপে সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের ব্যাপারটা কি হয়, তাই জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কিভাবে হয় এবং তাতে দোষ কি, কি হতে পারে, সেসব প্রশ্নের আলোচনা বৃহৎ পুস্তকেই সম্ভব।

কোনো বছর যদি একটা তালিকা কবে' দেখা যায় যে তালিকাভুক্ত জিনিসগুলির দাম (টাকায়) একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়েছে, এবং অল্প এক বছর যদি সেই তালিকার ভোগ্যসমষ্টির দাম প্রথম বছর থেকে বিভিন্ন হয়, তা হ'লে প্রথম বছরের দামকে ১০০ বলে' ধবে' নিয়ে দ্বিতীয় বছরের দামটি সেই অনুপাতে কষে' বাব করতে হবে।

যথা :—

পরিমাণ	১ম বৎসর	
	ভোগ্য	টাকার মূল্য
১০	ক	১৫
১৫	খ	২০
৫	গ	১০
১২	ঘ	১৬
১৪	ঙ	১৪
২	চ	২
৩	ছ	৩

ভোগ্য-সমষ্টি

৮০ টাকা

পরিমাণ	২য় বৎসর	
	ভোগ্য	টাকার মূল্য
১০	ক	২০
১৫	খ	২৫
৫	গ	৮
১২	ঘ	২২
১৪	ঙ	২৪
২	চ	২
৩	ছ	৫

১০৬

তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বছরে যা কিন্তে ৮০\ লেগেছিল, দ্বিতীয় বছর তার দাম হ'ল ১০৬\। প্রথম বছরকে যদি আরম্ভ বৎসর বলা যায়, তা হ'লে ৮০\ কে ১০০ ধরতে হবে। তা হ'লে দ্বিতীয় বৎসর টাকার কেন্ভার ক্ষমতা ধরতে হবে ৮০ : ১০৬ :: ১০০ : ক (এবংসর টাকার কেন্ভার ক্ষমতা) — $\frac{১০৬ \times ১০০}{৮০}$

= ১৩২.৫। অর্থাৎ এবংসর, আরম্ভ বৎসরে যা ১০০ টাকায় পাওয়া যেত তা কিন্তে ১৩২.৫ লাগছে। তা হ'লে টাকার দ্বিতীয় বৎসর কিন্ভার ক্ষমতা শতকরা প্রায় ৩৩ করে' কমেছে এই ধরতে হবে। এই জাতীয় সংখ্যাগুলিকে সূচক-সংখ্যা (Index number) বলা হয়। এই জাতীয় সংখ্যা দিয়ে যে শুধু টাকার কিন্ভার ক্ষমতা জানা যায় তা নয়; এগুলি দিয়ে আরও অনেক-কিছু জানা যায়। যেমন ধরা যাক, কোন একটা কারবারে মজুরদের মাইনে বাড়ান হয়েছে শতকরা ৫০\ হিসাবে। এখন সেটা শুধু একটা টাকার বাড়তি। মজুররা ত আর টাকা খাবেও না, পরবেও না, বা টাকা দিয়ে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবে না। এই টাকা দিয়ে তখন কি কেনা যায়, তাই দিয়ে দেখতে হবে তাদের মাইনে কত বেড়েছে। যদি আগের কম মাইনে দিয়ে তারা কম পরিমাণ ভোগ্য কিনতে পারত এবং এখন যদি ৫০ বেশী মাইনে দিয়ে সেই একই পরিমাণ ভোগ্য কিনতে পারে, তা হ'লে মাইনে বেড়ে লাভটা কোথায় হ'ল? যদি ৫০ বেশী মাইনের সাহায্যে ২৫\ বেশী ভোগ্য কেনা যায় তা হলে লাভ কিছু হ'লেও ৫০ হ'ল না। আর যদি আগে যা পাওয়া যেত এখন তার ৭৫\ মাত্র পাওয়া যায়, তা হ'লে তাঁকাল মাইনে বাড়লেও আসল মাইনে কমল। সামাজিক আয় মাপবার সুবিধার জগৎ যে সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হবে এ-সব ক্ষেত্রে অবশ্য তা দিয়ে কাজ হবে না। বিশেষ করে' মজুররা কি কি জিনিস কেনে, এবং তার মধ্যে কোন্ জিনিস বেশী কেনে বা কম কেনে, দেখে', আলাদা একটা তালিকা করতে হবে, এবং সেই তালিকা-ভুক্ত জিনিস কিন্তে আগে ও পরে কত টাকা

লাগত ও লাগে, দেখে স্থির করতে হবে, মজুরের পক্ষে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বেড়েছে কি কমেছে। ঘড়ি, ঘোড়া, মোটর-কার, বড় বাড়ীর ভাড়া, বহুমূল্য খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির দাম বদলালে তার একটা সাধারণভাবে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার দিক থেকে মানে আছে; কিন্তু বিশেষ করে মজুর বা আর-কোনো দলভুক্ত ব্যক্তিদের উপার্জনের টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বদলেছে কি না জানতে হ'লে, জানা কি কেনে এবং কি পরিমাণে কেনে তা আগে জানতে হবে।

সূচক-সংখ্যা জানা থাকলে সামাজিক আয় মাপ্‌বার সুবিধা হয় বলা হয়েছে। অর্থাৎ মাপকাঠি কিভাবে নিজে বদলাচ্ছে জানা থাকলে তা দিয়ে মাপা সম্ভব হয়। আজ-কাল নানা জায়গায় যেসকল সূচক-সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে সব জায়গাতেই একটা আরম্ভ বৎসর বা সময় ধরে' নেওয়া হয়, অর্থাৎ অমুক বৎসর যদি ১০০ ছিল তা হ'লে পরবর্তী অল্প অল্প বৎসরে ১০০ + ক অথবা ১০০ - ক হয়েছে। এইভাবেই টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা জ্ঞাপন করা হয়। শতকরা কি হারে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা বদলেছে জানা থাকলে টাকায় প্রকাশিত সামাজিক আয়ের আসল মূল্য জানা আর শক্ত থাকে না। কেবল একটা গোলমাল আছে, সেটা বিশেষ করে' আলোচনা করা দরকার। প্রত্যেক বছরই নূতন নূতন ভোগ্যের আবিষ্কার হয় এবং পুরাতন ভোগ্যের নাম না বদলালেও তার স্বভাব অনেকস্থলেই এত বদলে যায় যে মাঝে অনেক বছরের ব্যবধান পড়লে, কোন দুই তালিকাতে নামে একই ভোগ্যসমষ্টি থাকলেও কাজে তা বিভিন্ন জিনিস বুঝায়। প্রথম ক্ষেত্রে পুরাতন তালিকার যতই গুণ থাকুক না কেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মূল্যহীন ও অকেজো হ'য়ে দাঁড়ায়। যেমন, যদি খনির কয়লার যুগের আগে কোনো তালিকায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব কাঠ-কয়লাকে দেওয়া হ'য়ে থাকে এবং যদি পরে (কয়লার খনির কয়লা পাওয়ার পরে) কাঠ-কয়লায় দাম ১০০ গুণ বেড়ে গিয়ে থাকে তা হ'লে তার ফলে সূচক-সংখ্যায় হয়ত এই দেখা যাবে যে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা খুবই কমে' গিয়েছে; অথচ হয়ত নূতন করে' তালিকা করলে তাতে কাঠকয়লা জায়গাই পাবে না

এবং খনির কয়লা সেই স্থান অধিকার করার ফলে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতাও অত কম মনে হবে না। এক্ষেত্রে এরকম তুলনার দামই নেই। এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম বছরের সূচক-সংখ্যার সঙ্গে কাছাকাছি কোনো বছরের সূচক-সংখ্যার তুলনা করতে হয়, তার পর এই দ্বিতীয় বছরের একটা সূচক-সংখ্যার সঙ্গে তার একটা কাছাকাছি কোনো বছরের সূচক-সংখ্যার সম্বন্ধ ঠিক করতে হয়। অতঃপর এইভাবে ক্রমে এগিয়ে চলে' যতক্ষণ না শেষ বছরের সঙ্গে প্রথম বছরের সম্বন্ধ নির্ণয় হ'য়ে যায় ততক্ষণ ক্রমশঃ এগিয়ে চলতে হয়। যেমন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের তালিকার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে' তার সঙ্গে ১৮৮৫ খৃঃ অঃ তুলনা করে' যদি দেখা যায় যে ১২৫ হয়, তা হ'লে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের একটা তালিকা করে' তার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে' আবার তার সঙ্গে ১৮৯০-এর তালিকার তুলনা করতে হয়। যদি দেখা যায় এতে ১১০ হ'ল তা হ'লে ১৮৯০-এর সংখ্যা ১৮৮০-র সংখ্যার ১০০ : ১১০ :: ১২৫ : ক = $\frac{১১০ \times ১২৫}{১০০} = ১৩৭.৫$ । এখন ১৮৯০-এর একটা তালিকার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে' ১৮৯৫-এর সংখ্যার সঙ্গে তুলনায় যদি তার দাম ৮০ হয়, তা হ'লে ১৮৮০ তুলনায় ১৮৯৫-এর সংখ্যার দাম হবে ১০০ : ৮০ :: ১৩৭.৫ : ক ∴ ক = $\frac{৮০ \times ১৩৭.৫}{১০০} = ১১০$ । এইরকমভাবে শেষ অবধি হয়ত দেখা যাবে যে ১৮৮০-র তুলনায় ১৯২০-তে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১০০ : ১৮০ অর্থাৎ শতকরা ৮০ কম। (১৮৮০-তে ১০০ টাকায় যা কেনা যেত ১৯২০-তে তা কিনতে ১৮০ টাকা লাগে অর্থাৎ টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা সেই অল্পপাতে কমেছে।)

এইরকম ধাপে-ধাপে এগোবার মানে আগে হঠাৎ লক্ষ দেওয়ার যে-সব দোষ দেখান হয়েছে সেগুলি দূর করার চেষ্টা। ৫ বছর করে' ধাপ না নিয়ে বছর বছর নিলে আরো ভাল। প্রত্যেক বছর নূতন করে' তালিকা করতে তুলগুলি গোড়াতেই ছেঁটে দেওয়া সম্ভব হয়; অনেক বছর ধরে' জমে' জমে' তারা মিথ্যার আকার নিতে আর পারবে না। আমাদের উদাহরণের কাঠকয়লা আন্তে আন্তে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব হারিয়ে শেষে তালিকা থেকে বাদ পড়ে' যাবে। এইভাবে তুলনা

করাকে শৃঙ্খল-পদ্ধতিতে (chain method) তুলনা করা বলা চলে। মাপকাঠিকে মাপা নিয়ে আরও অনেক কিছু গোলমাল আছে, কিন্তু তার ভিতর যাওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।

(২)

সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক ব্যক্তিদের মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ বলে 'একটা এমন কোনো জানোয়ার নেই যে সে ভোগা-সম্ভোগ করে' স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে। ব্যক্তিই হচ্ছে সমাজের বোধশক্তির যন্ত্র ও কেন্দ্র। ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ ভোগ করার শক্তির উপরেই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে; শুধু ভোগ্যসমষ্টি একটা থাকলেই হয় না। ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য-আহরণ-ক্ষমতা না থাকলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক উপকরণ মাঠে মারা যায়। একটা ভাল ছবি বা একটা ভাল গান কি একটা বাজনা বুঝে' উপভোগ করতে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শুধু লাইব্রেরীতে পুস্তক থাকলেই হয় না, পড়বার ক্ষমতা না থাকলে তা থেকে কোনো স্বাচ্ছন্দ্য কেউ পাবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার আর-একটা বড় উপায় হচ্ছে, নানা উপকরণ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা। সামাজিক শক্তির কতকটা ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্তে খরচ করলে তার থেকে অনেক উপকার পাওয়া যায়। সেইপ্রকার শারীরিক উন্নতিও অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুস্থ সবল শরীর ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? জরাজীর্ণ কি সুখলাভের উপকরণ পেলেও সুখী হ'তে পারে? যার সর্বদা মাথা ধরে তার কি কিছুতে আনন্দ আছে? এখন, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন কি-ভাবে হ'তে পারে তা দেখতে হবে। দুইটি প্রধান উপায়ে এই কার্য সাধন করা যায়:—একটি মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন; আর একটি যোগ্য লোক ছাড়া অযোগ্য লোকের বংশবৃদ্ধি নিবারণ, অর্থাৎ জীববিজ্ঞানসম্মতভাবে ভবিষ্যৎ বংশের পিতামাতা বাছাই করা। দ্বিতীয় উপায়ে সমাজ থেকে ধারাপ অংশটুকু বাদ দেওয়া যাবে আশা করা যেতে

পারে, অর্থাৎ অর্ধবৃদ্ধি, অল্পবৃদ্ধি, উন্নাদ, জন্মগত মাতাল বা বংশানুক্রমিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত, অকেপো ভিক্ষুক (pauper) অপকর্মী দুর্জন ইত্যাদিকে সমাজ থেকে এইভাবে অনেকটা দূর করে' দেওয়া যায়। বাছাই-করা বীজে যেমন ফসল ভাল হয়, সেইরকম বাছাই-করা পিতামাতায় ভবিষ্যৎ জাতি উন্নত হয়। বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে যে পৃথিবীতে প্রথম প্রথম যখন জীবন শুরু হয়, তখন প্রাণীরা অতি নিকৃষ্ট ধরণের ছিল। কোন রকমে প্রকৃতির কাছ থেকে পুষ্টি আহরণ করে' দেহ ধারণ করতে পারে ও বংশ বিস্তার করতে পারে এইরকম প্রাণীতেই সেই বহুপুরাতন কালে পৃথিবী পূর্ণ ছিল। আকৃতি-গত পার্থক্য উদ্ভিদে ও প্রাণীতে খুব ছিল না। অনেক স্থলে প্রাণী চলাচল-শক্তি-রহিত ছিল। পুরুভূজ শাঁখ শামুক প্রভৃতি জলের বাসিন্দারাই পৃথিবীর আদিমকালে রাজত্ব করত।

তার পর ক্রমে ক্রমে চিংড়ি কাঁকড়া ও নানাপ্রকার অদ্ভূত জলচরেরা পৃথিবীতে এল। তখন শুধু জলেই প্রায় পৃথিবী ঢাকা ছিল। স্থলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানা-প্রকার জানোয়ার (উভচর জলচর খেচর ও সর্কচর) পৃথিবীতে এল; বর্তমানে তারা লুপ্ত হয়েছে। তার পর কত জাতীয় প্রাণী এল আর গেল তার ইয়ত্তা নেই—শেষে এলাম আমরা।

প্রাণী-জগতে নূতন নূতন ধরণের জীবের বিবর্তন হ'ল কিপ্রকারে? এবিষয়ে বিজ্ঞান বলছে যে জীব-জগতে এমন তিনটি প্রবল শক্তি সব সময় বর্তমান রয়েছে যার জন্তে নিকৃষ্ট জাতের প্রাণী থেকেই অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের প্রাণীর উদ্ভব হচ্ছে। একে বলে প্রাণী-জীবনের ক্রমবিকাশ। এই শক্তিগুলি হচ্ছে, ১। জীবন-সংগ্রাম (Struggle for Existence), ২। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) এবং ৩। বংশানুক্রমিকতা (Heredity)। জীবন-সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্বাচন হয় এইভাবে:—অনেক রকম ও বিভিন্নগুণসম্পন্ন বহু প্রাণী যদি কোনো জায়গায় থাকে, তা হ'লে সেই জায়গার অবস্থা কারুর প্রাণ-ধারণের পক্ষে সুবিধাজনক ও কারুর প্রাণ-ধারণের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। যার প্রতি পারি-

পারিবারিক অবস্থা সদয় (অর্থাৎ সেইপ্রকার পারিবারিক অবস্থায় অন্তের তুলনায় যে সহজে জীবন ধারণ করতে পারে) তাকে যেন প্রকৃতি ভবিষ্যৎ জাতির পিতামাতারূপে নির্বাচন করছেন, কেননা যার প্রতি পারিবারিক অবস্থা সদয় নয়, তার পক্ষে জীবনধারণ শক্ত এবং জীবন ধারণই যদি কেউ না করে, তা হ'লে তাকে দিয়ে বংশরক্ষা হওয়া আরো শক্ত। ক্রমে ক্রমে তার জাতি লোপ পেয়ে যাবে। পারিবারিক অবস্থা বলতে জল বাতাস খাদ্য শত্রু ইত্যাদি সবই বোঝায়। ধরা যাক, কোনো অবস্থায় যদি খাদ্য গাছের ডগায় থাকে এবং সব জন্তুরাই যদি গাছে উঠতে অক্ষম হয় তা হ'লে যে জাতীয় জন্তুর গলা লম্বা তার পক্ষে বাঁচা সে অবস্থায়, অন্তের তুলনায়, সহজ হবে। তাড়া করে' যদি খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় বা পালিয়ে যদি অনবরত প্রাণ বাঁচাতে হয় তা হলে বেগবান জন্তুই সহজে বাঁচবে। বেগবানকে প্রকৃতি নির্বাচন করলেন বলতে হবে। পারিবারিক অবস্থায় বেঁচে থাকতে অক্ষম যে, সে ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত সক্ষমই বংশবিস্তার কবে' বেঁচে থাকবে। এই যে বেঁচে থাকার জন্তু সংগ্রাম বা জীবন-সংগ্রাম, এ শুধু প্রকৃতির সঙ্গে না, পরস্পরের সঙ্গেও। অপেক্ষাকৃত বলবান বলহীনকে পৃথিবীর কোল থেকে দূর করে' দেবার চেষ্টা সূতত করছে এবং সেই আদিম কাল থেকেই পৃথিবী বলহীনের লভ্য নয়। জীবনসংগ্রামে সেই রক্ষা পায় বা জয়ী হয়, যে পারিবারিক অবস্থা ও শত্রুকে জয় করতে পারে।

এখন দেখতে হবে যে বলবানের জয় হ'লেই ভবিষ্যৎ জাতি বিগত জাতির চেয়ে বলবান হবে কেন? এর উত্তরে বিজ্ঞান বলে, যে সন্তান তার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীতে তার পূর্বপুরুষদের অনুগমন করে। একে বলে বংশানুক্রমিতা। বংশানুক্রমিতার গুণে, যদি অপেক্ষাকৃত বলবান বা গুণবানই শুধু বংশবৃদ্ধি করতে পায় তা হ'লে ভবিষ্যৎ জাতির মধ্যে অধিক-সংখ্যক লোক বলবান ও গুণবান হয়।*

কাজেই আমরা দেখছি, যে, শাণী-জগতে ক্রমবিকাশ ঐ তিন শক্তির জোরেই হচ্ছে। ঐ শক্তিগুলিই আছে কেন, এ প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেওয়া শক্ত, তবে বিজ্ঞান 'কেন'র উত্তর দেয় না, সে উত্তর দেয় দর্শন। বিজ্ঞান শুধু 'কি করে' হয়,' তাই খুঁজতে ব্যস্ত।

মানব-সমাজে প্রাকৃতিক নির্বাচন নির্বিবাদে হ'তে পারে না। তার কারণ জীবনসংগ্রামে মানুষ ঠিক জানোয়ারের মত আচরণ করে না,* পরস্পরকে সাহা করে'ই সাধারণতঃ সকলে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে' সমাজে কার্যবিভাগ (division of labour) করে' মানুষ এমনভাবে জীবন কাটায়, যে, প্রায় কেউই অপরের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। কাজেই সর্বক্ষেত্রে অধিক-গুণসম্পন্নই যে শুধু বংশ বিস্তার করে, তা নয়। এমন কি সমাজের নিকৃষ্ট অংশের লোকেরাই বংশ-বিস্তারে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হয়। কাজেই কৃত্রিম অবস্থায় পড়ার ফলে মানব-জাতির ক্রমোন্নতিও অনেকটা মানব-জাতিরই হাতে পড়েছে।

যার কোনো কারণ দেখাতে পারে না। প্রকৃতি শুধু গুণবানকে নির্বাচন করে, জীবন-সংগ্রামও তাই করে। স্বেপার্জিত গুণ (acquired character) বংশানুক্রমিকভাবে সন্তানকে দেওয়া যায় না, বিজ্ঞান বলছে। অধ্যাপক জে এ টমসনের মতে কোন কোন ক্ষেত্রে এক পুরুষ অধিক স্বেপার্জিত সং বা অসং গুণ সন্তানকে দেওয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে আবার তা সন্তান থেকে লোপ পেয়ে যায় (Prof. J. A. Thompson, Heredity)। শুধু বংশগত গুণই সেভাবে দেওয়া যায়। তবে এই নূতন নূতন গুণ আসে কোথা থেকে? কে জানে? এই নবগুণবিশিষ্ট প্রাণীরা (mutations) কোনো কোনো স্থলে এইসব গুণ বংশানুক্রম ভাবে সন্তানকে দিতে পারে। ক্রমবিকাশে নবগুণ-বিশিষ্টতাও তার কাজ কবে। এবং তার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

* "In place of ruthless self-assertion, social progress demands self-restraint; in place of thrusting aside or treading down all competitors, it requires that the individual shall not merely respect, but shall help, his fellows, its interest is directed not so much to the Survival of the Fittest as to the fitting of as many as possible to survive. It repudiates the gladiatorial theory of existence." T. H. Huxley. অর্থাৎ মানব-জাতির আদর্শ শুধু সর্বাপেক্ষা বলবানের জীবনধারণ ও দুর্বলের বিনাশ নয়। বরং মানবের আদর্শ দুর্বলকেও জীবনধারণে সক্ষম করিয়া তোলা। শুধু উপযুক্ততমের রক্ষণ ততটা প্রয়োজনীয় নয়; বরং প্রয়োজনীয় অধিকতম ব্যক্তিকে উপযুক্ত করিয়া তোলা।

* জীব-জগতে থেকে থেকে কোনো অজানা কারণে নূতনগুণসম্পন্ন জীব জন্মগ্রহণ করে। নূতন গুণ তাকে বলা যায়, শুধু বংশানুক্রমিতা

আমাদের দেশে ভবিষ্যৎ জাতির স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দৃষ্টিপাত না করে, অজ্ঞান ও নির্কোণের মতই লোকে বংশবিস্তার করে' থাকে। আমেরিকার অনেক স্থলে অত্যন্ত বুদ্ধিহীন (idiots), উন্মাদ (lunatics) ও জন্মগত দুর্জনকে (habitual criminals) বংশবিস্তারে অসমর্থ করে' দেওয়া আইনসঙ্গত করা হয়েছে। কোন কোন দেশে বিবাহের অনুমতিপত্র পাবার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে সকলে বাধ্য হয়। তার কারণ বংশগত ব্যাধি (Hereditary disease) কাকুর থাকলে তাকে বংশ বিস্তার করতে না দেবার চেষ্টা। বংশগত ব্যাধি কি কি এবং রোগ-বিশেষ বংশগত কি না, তা এখানে আলোচ্য নয়। কথাটা এই যে যে-সব ব্যাধি পিতামাতার থাকলে সন্তানের হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী, সেইসকল রোগগ্রস্ত বংশের বিস্তার হওয়া সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নয়। যাদের রোগ থাকে, তাদেরও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয় এবং সমাজে রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশী থাকলে সুস্থ লোকদেরও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয়। রোগ বলাতে

শারীরিক ব্যাধি বোঝায় না, মানসিক ব্যাধিও তার মধ্যে ধরা হয় (বংশগত অত্যন্তবুদ্ধিতা, উন্মাদ অবস্থা, অস্বাভাবিক বৃত্তি ইত্যাদি)। শরীর ও মন যে-সব বংশের লোকদের জন্মগতরূপে ব্যাধিগ্রস্ত, সেইসকল বংশের লোক ভবিষ্যৎ জাতিতে যত কম থাকবে, ভবিষ্যৎ জাতির সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ততই বাড়বে। অবশ্য কোন কোন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বংশানুক্রমিক তা বলা শক্ত, তবে কতকগুলি সন্দেহ সন্দেহ নেই এবং সেই-গুলি সন্দেহে আইন থাকা উচিত।

কেউ বলতে পারেন, যে ব্যাধিগ্রস্ত বংশে কি অতি-মানব (super-man or genius) জন্মায় না? ইয়া, জন্মায় কখন কখন, কিন্তু তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী জন্মায় রোগগ্রস্ত সাধারণ মানব। এই হাজার হাজার রোগী সমাজে না জন্মালে সমাজের যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হবে, দুই একটি অতিমানব জন্মালেও তার শতাংশের এক অংশ স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে না। কবে এক অতি-মানবের আবির্ভাব হবে এই আশায় হাজার

হাজার লোককে জীবন্ত করে' সমাজের দুঃখ বাড়তে হবে কি? তা ছাড়া এইরকম বংশের বিস্তারে দুঃখ যে বাড়বে এটা নিশ্চিত এবং অতি-মানব আসবে কি না তা এখনও অনিশ্চিত; কেবল সম্ভাবনা আছে মাত্র। এবং ব্যাধিগ্রস্ত বংশে সুস্থ বংশাপেক্ষা অধিক অতিমানব জন্মায় একথা কেহ প্রমাণ করেনি। বরং সুস্থবংশেই অতিমানবের সংখ্যা অধিক। সুতরাং অতিমানব পেতে হ'লে রোগবিস্তার বন্ধ করে' স্বাস্থ্যবিস্তার চেষ্টাই অধিক সুবুদ্ধির লক্ষণ। কোন্ দিকে নজর দিয়ে কাজ করব আমরা? অবশ্য এসব বিষয়ে আইন-প্রণয়নে অনেক ব্যাঘাত আছে। কোন্ পিতা-মাতার রোগ জন্মগত এবং কার রোগ স্বোপার্জিত, কোন্ রোগ বংশানুক্রমিক এবং কোন্টি নয়, এসব ঠিক করা শক্ত এবং বিজ্ঞান এখনও এসব দিকে বেশী অগ্রসর হয়নি। তবে আইনের সাহায্য ছাড়াও ব্যক্তি যদি সামাজিক কর্তব্যবোধে চারিদিক দেখে' তবে বিবাহ করেন এবং সন্দেহ-স্থলে সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে লাবধান হন, তা হ'লেও অনেকটা কাজ হয়। মোট কথা, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জাতির উৎকর্ষসাধন প্রয়োজন এবং তার একটা উপায়, বংশ বাছাই করে' ভবিষ্যৎ জাতির উন্নতি-সাধন।

কোনো একটা সমাজের লোকেরা শরীর ও মনের দিক দিয়ে গুণবান্ বা নিগুণ হয় দুটি কারণে। প্রথমতঃ জন্মগত কারণে এবং দ্বিতীয়তঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় গুণে বা দোষে। প্রথমটি নিয়ে অনেক-কিছু বলা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে ব্যক্তির বাইরে যে-কোন তথ্য সমুদয় কারণ বা অবস্থাকেই ধরা যায়। জন্মস্থানের স্বাস্থ্য, খাদ্য, জীবনযাত্রার প্রণালী, শিক্ষা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, পারিবারিক আচার-ব্যবহার, বন্ধুবান্ধব, রাষ্ট্রীয় অবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়ে। শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে বাস করে, ততদিনও যে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার হাত থেকে মুক্ত থাকে তা নয়। মা যদি মদ খায়, তা হ'লে শিশুর অপকার হয়। মা যদি না খায়, অখাদ্য খায়, বা অতিরিক্ত খায়, তাতেও শিশুর অপকার হয়। মায়ের ভিতর দিয়ে হ'লেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার ছাপ জন্মের আগেও

শিশুর গায়ে মেরে দেয়। তা ছাড়া পিতামাতার উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার অভাব নানাভাবে থাকতে পারে (যথা বংশগত ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা)। আবার বয়স-গত ও অন্যান্য অবস্থাগত অক্ষমতাও থাকতে পারে। যেমন অল্পবয়স্ক পিতামাতার সন্তান কচিৎ সবল ও সুস্থ হয়। রুগ্ন বা দুর্বল অবস্থায় সন্তান উৎপাদনের ফলও খারাপ হয়। মাতাল অবস্থার সন্তানও বেশীর ভাগ সময় ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে জন্মায়। এইসবই পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্ম হচ্ছে, ধরা হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল না হ'লে অতিবিশুদ্ধ, পবিত্র, নীরোগ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বংশের সন্তানও রুগ্ন, কুচরিত্র ও অল্পবুদ্ধি হ'য়ে বেড়ে উঠতে পারে। এক পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবার দ্বিতীয় পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্ম অনেকাংশে দায়ী। দ্বিতীয় পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রথম পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্মদাতা বললেও বেশী ভুল হয় না; * কাজেই যদি ভাল বংশের সন্তান পুরুষের পর পুরুষ খাবাপ লোক হ'য়ে বেড়ে ওঠে তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমই থাকবে। যে-সব জীববিজ্ঞান (Biology) ও সৃজাত-বিজ্ঞানের (Eugenics) সেবকেরা ভাবেন, যে, শুধু বংশ-বাছাই করেই সমাজের সব দুঃখ দূর করা যায় বা বাছাই করাই সমাজসংস্কারের একমাত্র পথ, তাঁরা ভুলে যান, যে, বাছাই করে শুধু আমরা উৎকৃষ্ট ধরনের **অভূমিষ্ট শিশুই** পাব—তার পর শিশু কিপ্রকার মানুষ হ'য়ে উঠবে, তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সমাজের লোকদের যে-সব দোষগুণের উপর নির্ভর করে, তার বেশীর ভাগই আবার স্বোপার্জিত,—বা স্বোপার্জিত হ'তে পারে। নীরোগ বংশের লোকেরা প্রত্যেক পুরুষেই নিজদোষে রুগ্ন হ'য়ে পড়তে পারে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বংশের লোকেও শিক্ষার দোষে অল্পবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি হ'য়ে যেতে পারে। মাংলামি করে সমাজের লোকে সকলে সব স্বাচ্ছন্দ্য জলে দিতে পারে। কাজেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি না করলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য

অসম্ভব। এই উন্নতির চেষ্টার ক্ষেত্রে—শিক্ষা, খাদ্য ও রক্ষন-প্রণালী, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি, রোগ চিকিৎসা বা নিবারণ, বাসস্থানের স্বাস্থ্যোন্নতি, বাল্যবিবাহ-নিবারণ, শিশুর শরীর ও মনের উৎকর্ষ-সাধন-চেষ্টা, কুনীতি ও কুঅভ্যাস দূর করা ইত্যাদি সব-কিছুই রয়েছে। কেউ-কেউ ভাবেন যে শিশু-মৃত্যুর ফলে জাতের দুর্বল অংশ মরে গিয়ে সবলটুকুই থাকে এবং ফলে জাতি ক্রমেই সবল হয়। এটাও ভুল; কেননা শিশুমৃত্যু জাতের দুর্বল অংশটুকু ছেঁটে বাদ দেয় না শিশুমৃত্যুতে শুধু দুর্বল শিশু **শিশু** বাদ পড়ে যায় এবং দুর্বল শিশু এবং দুর্বল ব্যক্তি এক জিনিস নয়। *

শিশু-অবস্থায় নানা কারণে কেউ কেউ দুর্বল থাকে; সেইসব কারণ দূর হ'য়ে গেলেই তাবা সবল মানুষ হ'য়ে বেড়ে ওঠে। কাজেই শিশুমৃত্যু দূর করলে জাতের দিক থেকে লাভ হবাব সম্ভাবনা খুব বেশী; বিশেষতঃ, শিশুমৃত্যুর কারণ দূর করলে সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-কালাবধি লোকের যা রোগ হয় তারও অনেক লাঘব হবে, কেননা অনেক ক্ষেত্রে একই কারণে কণ্ঠশিশুর যৌবনে মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের পরেই শিক্ষার স্থান। শিক্ষার অভাবে বা দোমে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করে সুখলাভে অক্ষম হয়। এক কথায় বললে বলা যায়, যে, শিক্ষার অভাবে মানুষের রসগ্রাহিতা কমে যায়। তা ছাড়া সুশিক্ষার অভাবে সমাজে অপরাধ বাড়ে, সাধারণভাবে কার্যকরী ক্ষমতা কমে যায়, স্বশৃঙ্খলা কমে যায়; এক কথায়, লোক যদি না সুশিক্ষিত হয় তা হ'লে পরোক্ষভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের লাঘব হয়। পারিবারিক রীতি-নীতির দোষে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, মনের

* The mortality of infancy is selective only as regards the special dangers of infancy and its influence scarcely extends beyond the second year of life, whilst the weakening effect of a sickly infancy is of greater duration.

*"Environment as well as people have children."
Pigou—*Economics of Welfare*, p. 98.

Suggestion of Mr. Yule.
cd, 5263, 1909—10

বিস্তার কমে' যায়। এসবগুলি না থাকলে মানুষের কাৰ্যশক্তিও কমে' যায় আর তার স্বাচ্ছন্দ্যও কমে' যায়। * কাজেই দেখছি যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের দিক থেকে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষণ, স্বাস্থ্যবর্ধন, সমাজসংস্কার, ছন্নৌতি দমন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, ইত্যাদি এবং এইসবগুলির সব দিকই আলোচ্য বিষয়। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে লিখতে গেলে বিশাল এক লাইব্রেরী হ'য়ে দাঁড়ায়। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক সব-কিছুর ফল। কাজেই

* সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সমাজের লোকসংখ্যার আর-একটি সম্বন্ধ আছে। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে হ'লে মানুষের অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট-পরিমাণ ভোগ্য প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণটি কি তা স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে নির্দেশ করা সম্ভব। সে যাই হোক, ভোগ্য উৎপাদন ক্রমশঃ বে হারে বাড়ান সম্ভব, সমাজে লোক-সংখ্যা তার চেয়ে বেশী হারে বেড়ে চলে। অর্থাৎ ভোগ্যের পরিমাণকে হ্রাস কবে' অন্তে বা সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা হ্রাসের বেশী হ'য়ে যাওয়া সম্ভব। নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার সাহায্যে কোনো কোনো সময় ভোগ্য-উৎপাদন খুব বেশী হারে বেড়ে যায়; কিন্তু সেক্ষেত্রেও জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশী। এর উপর যদি আবার জনসংখ্যা সংখ্যায় বাড়লেও গুণে না বাড়ে, অর্থাৎ যদি লোকে বংশ-পরম্পরায় নিগূর্ণ হ'য়ে আসে (যেমন অনেক স্থলে আমাদের দেশে হয়েছে) তা হ'লে গোলযোগ আরও বাড়ে। সামাজিক আয়ের তুলনায় লোকসংখ্যা অতিবিস্তৃত হ'য়ে গিয়ে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যায়। অবশ্যই যে সব কারণে লোকসংখ্যা বিপদজনকরূপে বেড়ে চলে সেগুলি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে নিবারণ করা দরকার। বিবাহের বয়স যত বাড়ান যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা বাড়ে তত কম। অগুণের মত পরিবারবৃদ্ধি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আর-একটি কারণ। পরিবারপালন-ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা দোষাবহ। একান্তবস্তা পরিবারগুলি এই দিক থেকে দোষাবহ। কেননা এইসব পরিবারে অক্ষম লোকে বিবাহ করতে ভরসা পায়, পবেব ক্ষম্বে জীবনযাপন করার সুবিধা থাকায়। তা ছাড়া (ভালভাবে খাইয়ে, পরিষ্কার, শিক্ষা দিয়ে) যেসংখ্যক সন্তানাদি পালন করার ক্ষমতা আছে, তার বেশী সন্তান উৎপাদনও সামাজিক পাপ। আদর্শ সমাজে বহুসন্তানবান্ অক্ষম লোককে অপরাধীরূপে গণ্য করা উচিত। আত্মনির্ভরশীলতা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির একটি প্রধান উপকরণ। একান্তবর্তী পরিবার সেই আত্মনির্ভরশীলতা নষ্ট করে। সমাজের লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেয়ে গুণবৃদ্ধির দরকার বেশী; বিশেষতঃ যে-সব দেশে যথেষ্ট বা অত্যধিক লোক (প্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলি ভোগ বা ভোগ্য উৎপাদনার্থে ব্যবহার করার পক্ষে ও সমাজগঠনের পক্ষে), সে-সব দেশে কথাটা বেশী করে' খাটে। আমাদের দেশে বিশেষ করে' লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা, তাদের গুণবৃদ্ধির দিকে অধিক নজর দেওয়া উচিত। কি উপায়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায়, বা কি উপায়ে দুষণীয় ধরণের একান্তবর্তিতা দূর করা যায়, বা কি উপায়ে আয়ের তুলনায় বৃহৎ পরিবার না হয়, তা এখানে আলোচ্য নয়।

ব্যাপারটি ভাল করে' আলোচনা করা এক বিরাট ব্যাপার। এইসব দিক থেকে যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বাড়ে, তা বেশীর ভাগ সময়ই অপরিমেয়। আমরা এখন শুধু পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আলোচনা করব। অর্থাৎ পরিমেয় সামাজিক আয়, তার বণ্টন, উৎপাদন ও ভোগ, এইগুলির বিষয়ই বন্দব। এবিষয়ে আরও অনেক বন্দব আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, পরিমেয় সামাজিক আয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্দেশ করে এবং তা ছাড়া পরিমেয় সামাজিক আয় পরিমেয় বলে'ই তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব। সামাজিক আয় (১) ও তার অস্থিরতা (২), সামাজিক আয়ের দরিদ্রের অংশ (৩) ও সেই অংশের অস্থিরতা (৪)—এখন এই চারটি জিনিস আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে। কোন কারণে যদি (১) প্রথমটি বাড়ে এবং অগ্র-গুলি স্থির থাকে, তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। (২) দ্বিতীয়টি যদি কমে এবং অগ্রগুলি স্থির থাকে, তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। (৩) তৃতীয়টি যদি বাড়ে ও অগ্রগুলি স্থির থাকে, তা হ'লেও ফল তাই; এবং (৪) চতুর্থটি যদি কমে এবং অগ্রগুলি স্থির থাকে, এমন কি দ্বিতীয়টি যদি সেই সঙ্গে সেই অল্পপাতে বাড়েও তা হ'লেও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। কিন্তু কোন কারণ এক সঙ্গে সবগুলিকেই আক্রমণ করতে পারে—এবং তা একভাবে নাও করতে পারে। অর্থাৎ একই কারণে সামাজিক আয় ও তার অস্থিরতার এবং দরিদ্রের অংশ ও তার অস্থিরতার বিভিন্নরূপ পরিবর্তন হ'তে পারে।

কতকগুলি জিনিস আছে, যাতে স্পষ্টভাবেই সামাজিক আয় বেড়ে যায়। যেমন, আবিষ্কার (খনি, নূতন দেশ, নূতন প্রাকৃতিক দ্রব্যভাণ্ডার ইত্যাদি) ও উদ্ভাবনা (যেমন সহজে কাজ হয় বা বেশী কাজ হয় এমন যন্ত্রের উদ্ভাবনা, সামাজিক উৎপাদনা শক্তির অপচয়নিবারণের উপায়-উদ্ভাবন বা সুশৃঙ্খলা বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন, যথা ব্যাক-স্থাপন, বা বিশাল কারখানা-স্থাপন ইত্যাদি, সমবায় বা যৌথ কারবার, কারখানায় এবই যন্ত্রের সাহায্যে দুই কিস্তিতে শ্রমজীবী নিয়োগ করে' বেশী কাজ আদায় করা ইত্যাদি)। উৎপাদনের উপকরণ তিনটি—

প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন—কিভাবে ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায় মানুষ কিভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লে সবচেয়ে বেশী কাজ দিতে পারে, এবং রাষ্ট্র (State) কিভাবে কাজ করলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারে; এই প্রশ্নগুলিরও গুরুত্ব অনেক। আমরা অতঃপর একে একে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে

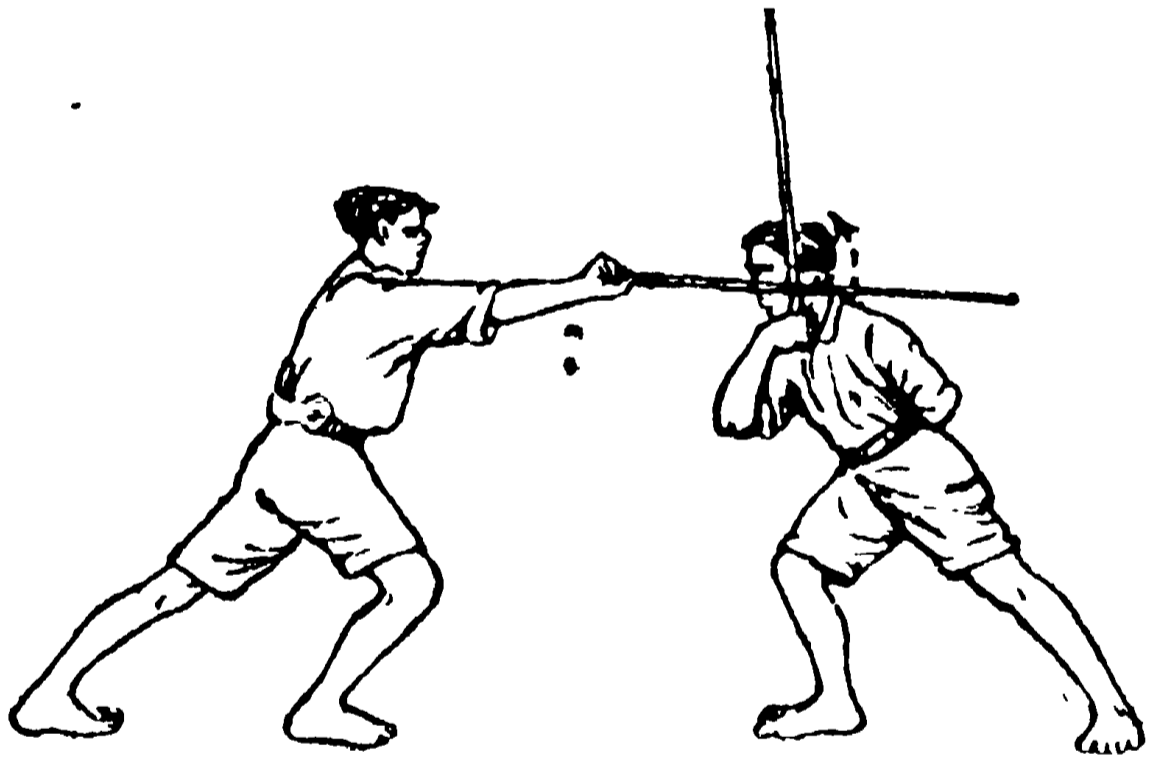
আলোচনা করব। এগুলি কিভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহায়তা করে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার সারাংশ কি, তা দেখতে হবে। তা ছাড়া কি কি কারণে দরিদ্রের সামাজিক আয়ের অংশ বাড়ে কমে, কিভাবে সামাজিক আয় ও দরিদ্রের অংশের অস্থিরতা বাড়ে কমে, তাও আমাদের দেখতে হবে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

তেরের বাড়ির—

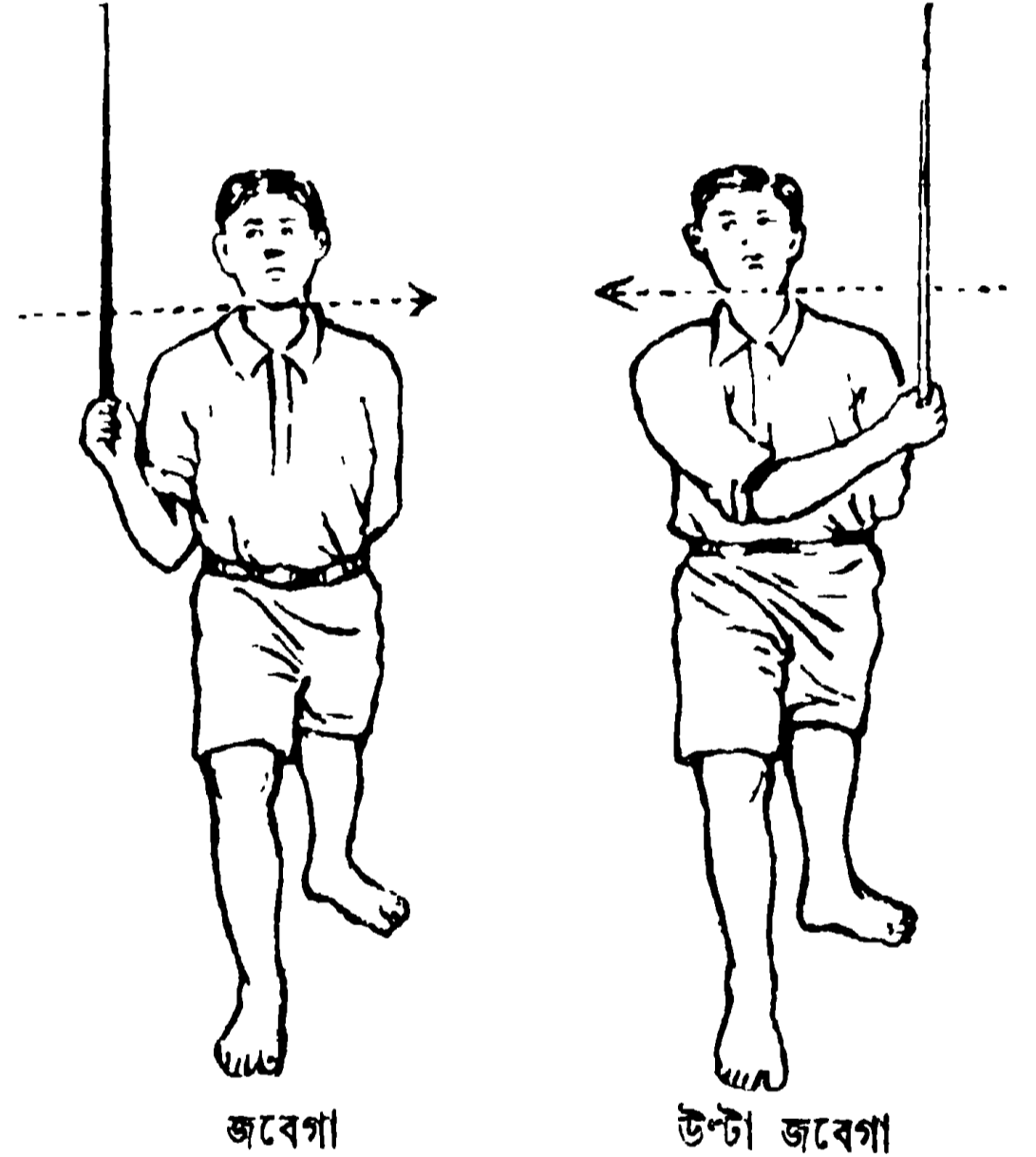
“উন্টা হালকুম” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম স্বক্ক-মোটের ঈষৎ বাম ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি উর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে।



উন্টা হালকুম

“জবেগা” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা দক্ষিণ স্বক্ক-মোটের ঈষৎ দক্ষিণ ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি উর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে।

“উন্টা জবেগা” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম স্বক্ক মোটের ঈষৎ বাম ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি উর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে।



জবেগা

উন্টা জবেগা

“ভর্জা” আটকাইবার কালে হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্বক্ক মোটের প্রায় দশ অঙ্গুলী দক্ষিণে ও নিম্নে এবং প্রায় চতুর্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে।

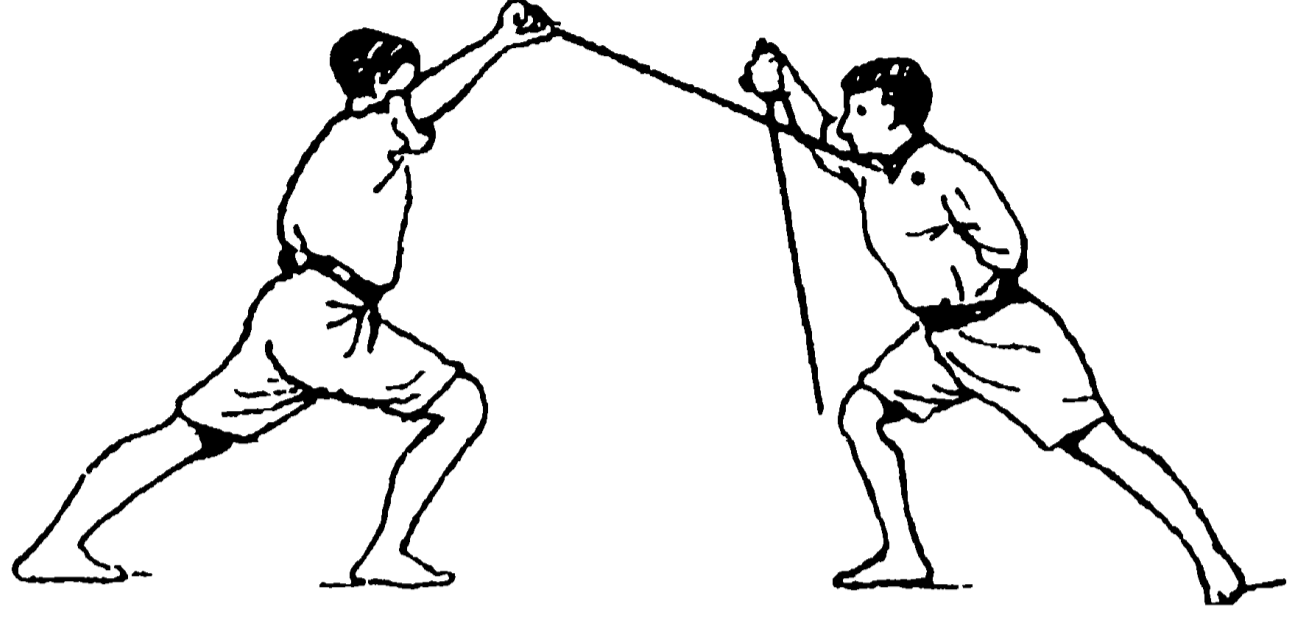
“উন্টা ক্রকুটি” আটকাইবার কালে হাতের মুঠা নাসিকাগ্রের অর্ধহস্ত সম্মুখ ভাগে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু উর্দ্ধমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে।

“হঞ্জুরের” প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে।

নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধে ও নিজ বাম দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

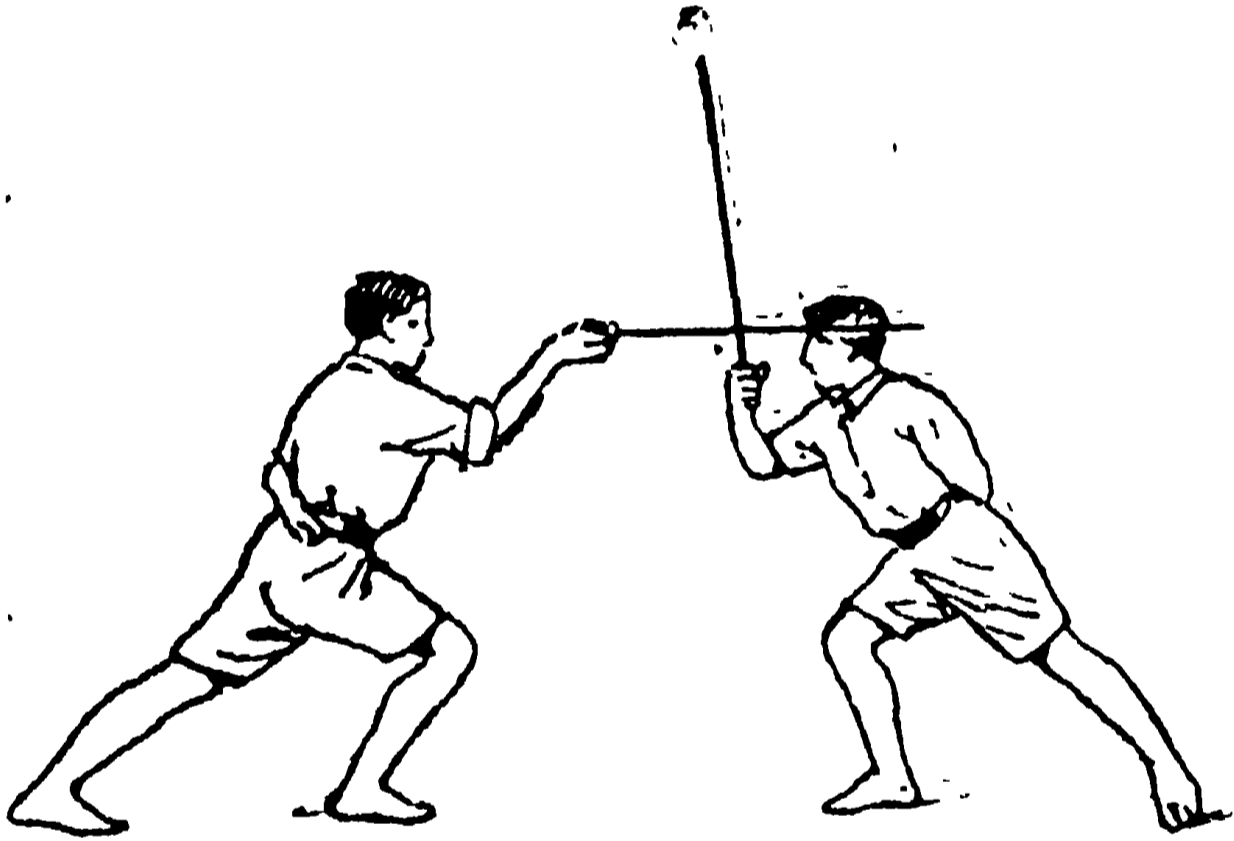


ভজ্জা

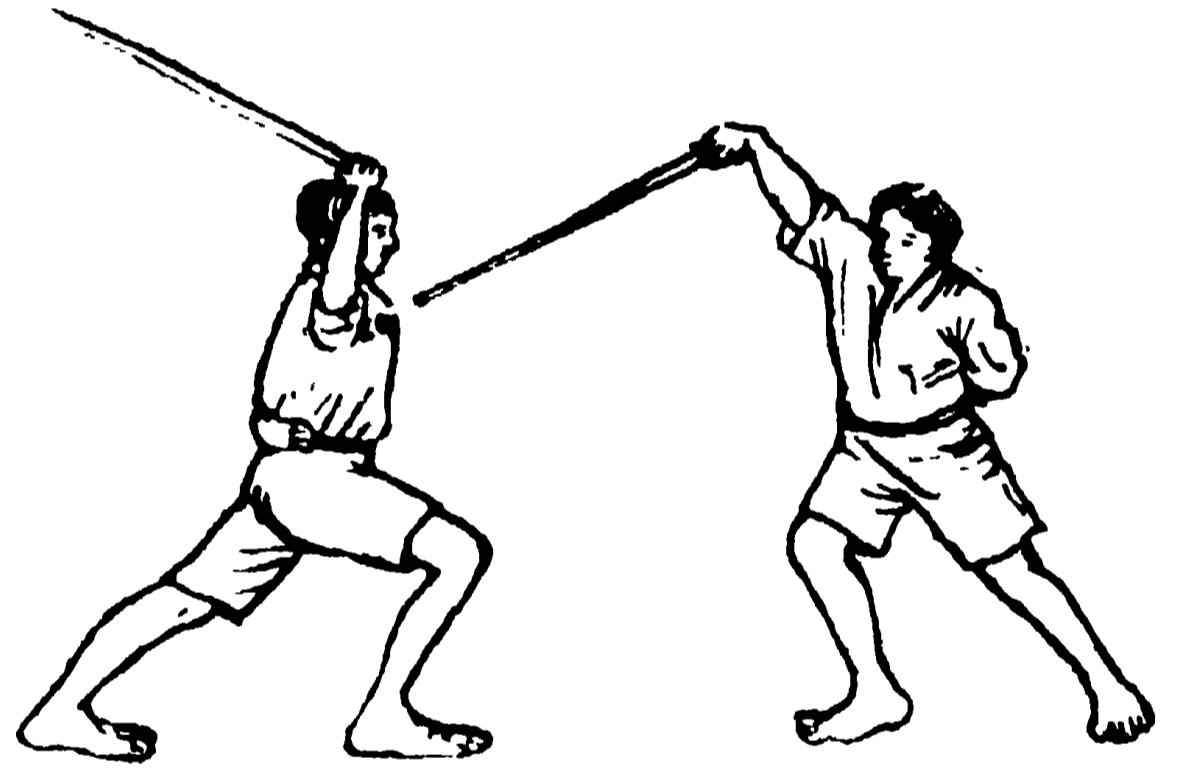


হঞ্জুর প্রকারান্তর

“উন্টা হঞ্জুর”এর প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু নিজ বাম দিক দিয়া উপরে তুলিয়া ইাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে

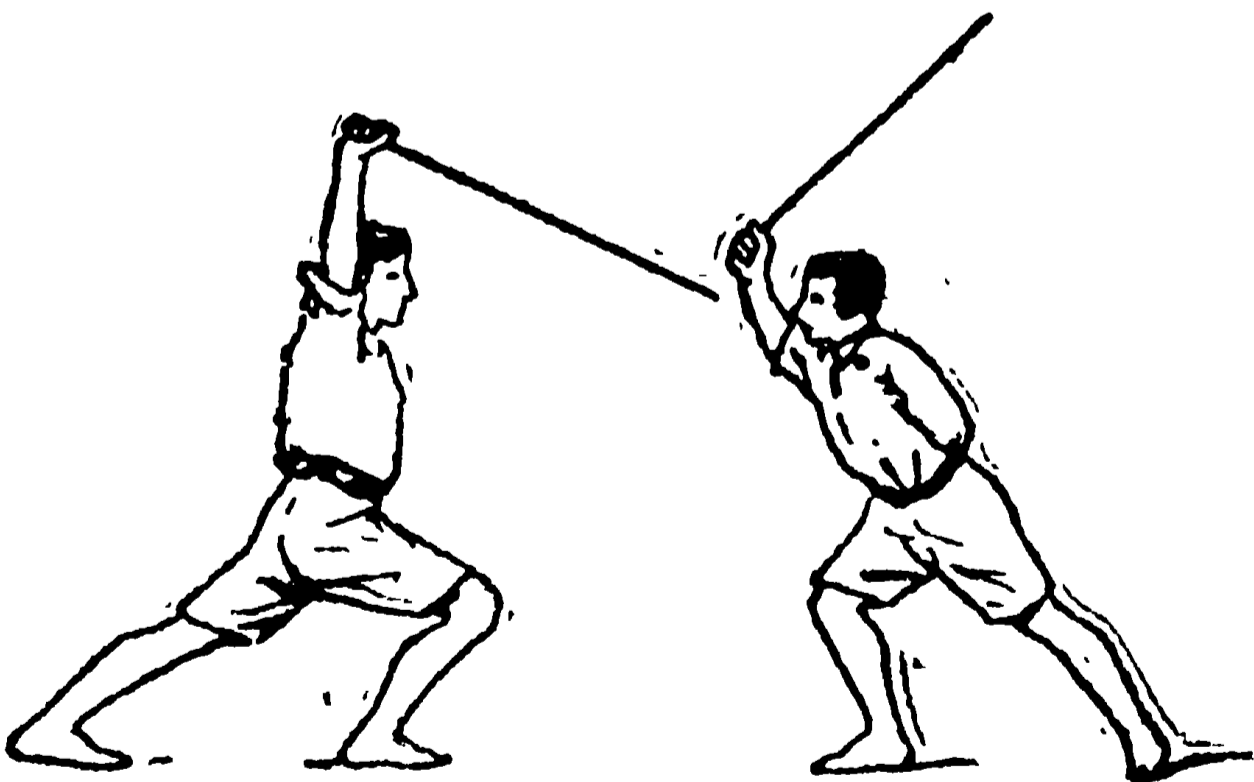


উন্টা জকুটি



উন্টা হঞ্জুব

চৌদ্দর বাড়ি—



হঞ্জুর

প্রকারান্তর :—

অথবা নিজ লাঠিকে নিম্নমুখ রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ

১। গ্রীবান, বাহেরা, চাকি, হাতকাটি, শির, মন, কোমর, আসর, মাকেন, ধুনিয়া করক, পোসংপা, মাণ্ড, ধুনিয়া পালট, ইয়কমা।

ধুনিয়াকরক—দক্ষিণ পদের ভিতর দিকের গাঁঠের নিম্নের সীমানা হইতে নীচের দিকের অংশে আঘাত করিয়া বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে পদ-সঙ্কেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

পোসংপা—পায়ের পাতার মধ্য-দেশ বরাবর দক্ষিণ পাশ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়।

ইয়কমা—বাম স্কন্ধ-দেশের সম্মুখস্থ অস্থির ভিতরে অসির অগ্রবিন্দু ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। অসির ধারের পিঠ উপর দিকে থাকে।

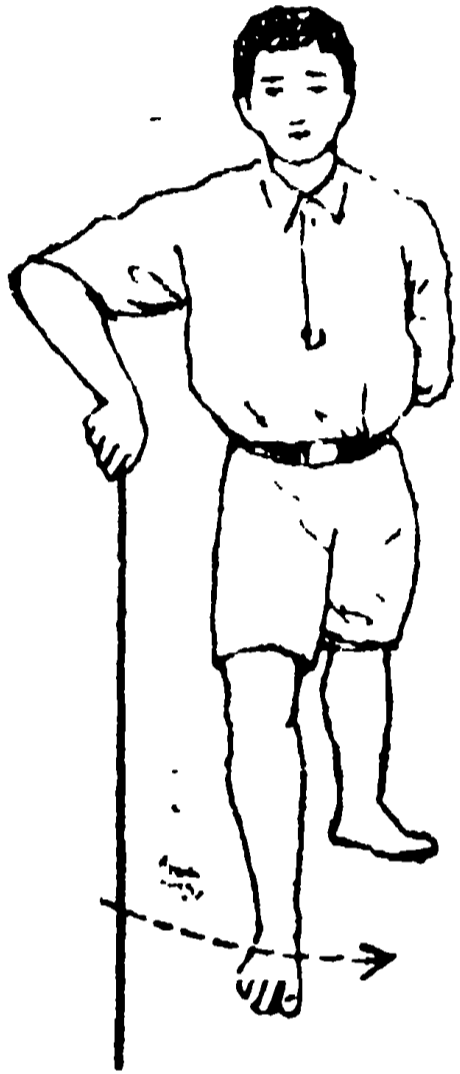
বর্ণনা :—

“ধূনিয়াকরক্” আটকাইবার কালে পুরোবর্তী পদের বৃদ্ধাজুলীর অর্ধ হস্ত বামে ও সম্মুখে লাঠির অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে।

“পোসং পা” আটকাইবার কালে পুরোবর্তী পদের বৃদ্ধাজুলীর কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখে লাঠির অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে।

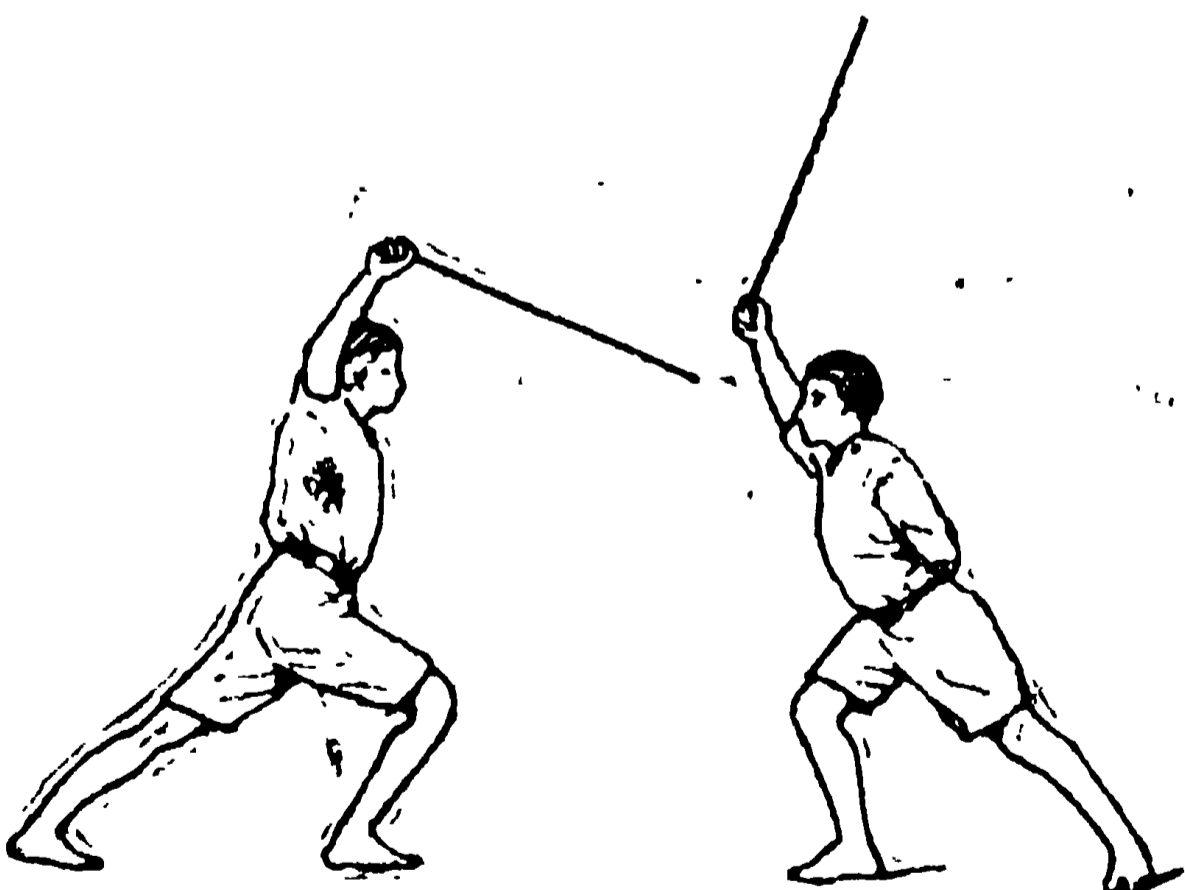


ধূনিয়াকরক্



পোসং পা

“ইয়ক্মা” র প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া ইাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে।

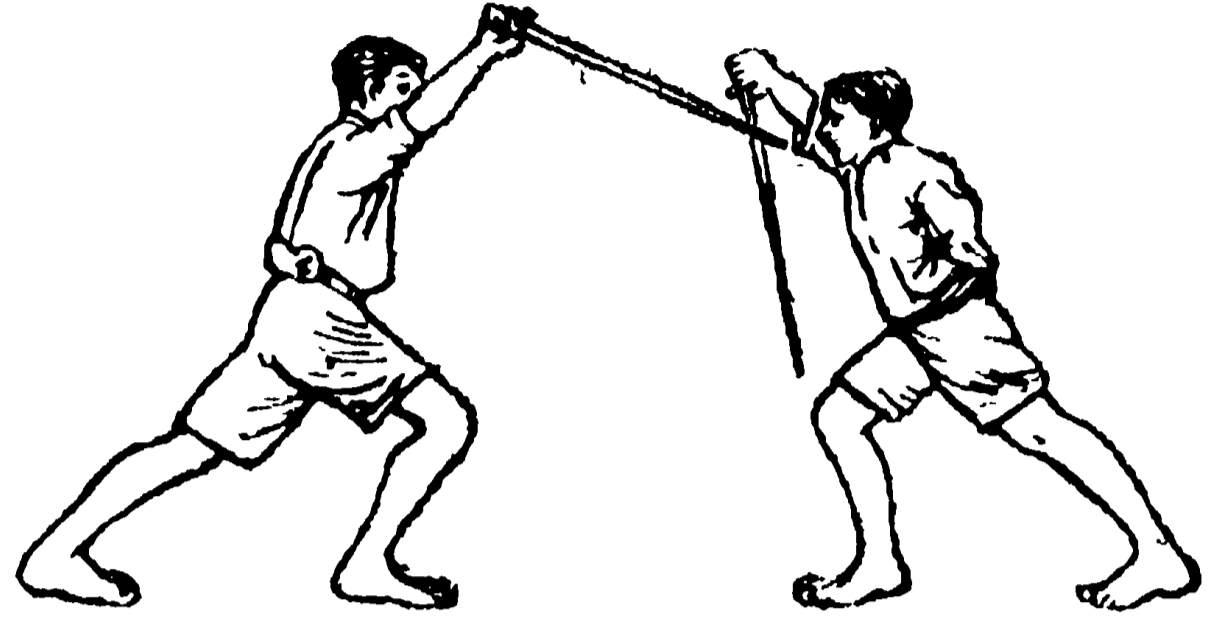


ইয়ক্মা

প্রকারান্তর :—

থবা নিজ লাঠিকে নিম্নমুখ করিয়া রাখিয়া অগ্রবিন্দু

ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিয়ের দিক হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধে ও নিজ বামদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



ইয়ক্মা প্রকারান্তর

শৃঙ্গসহ যে কোনও ঠাটে দাঁড়াইয়া লাঠি কোমরের সমান্তরাল এবং শৃঙ্গ বক্ষের সমান্তরাল করিয়া ধরিতে হইবে। ইহাই সেই সেই ঠাটের “কেল্লাবন্দ”।

পনরর বাড়িগেলিবার কালে অভিবাদনের আঘাত করিয়া অপর হস্তে লাঠি ও শৃঙ্গ একত্রে ধরিয়া পরে হস্ত স্পর্শ ও অভিবাদন সমাপ্ত করিতে হইবে।

পনরর বাড়ি—

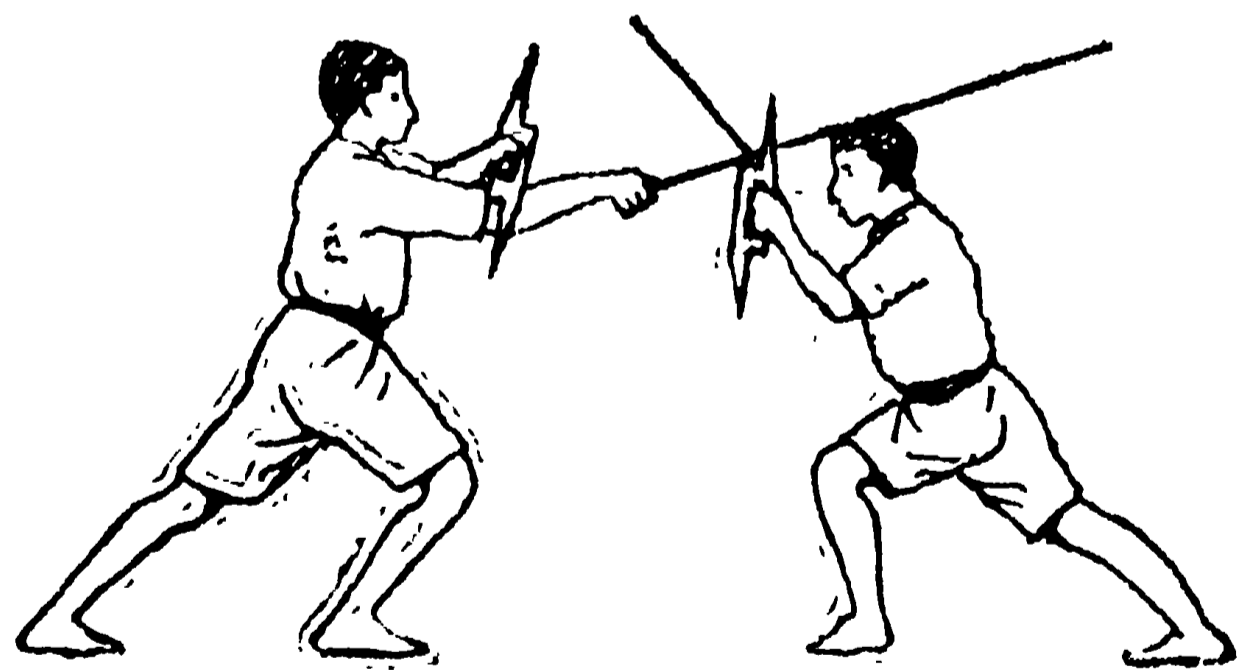
(শৃঙ্গ সহিত)

ঠাট—দোয়াঙ্গ।

১। তেওয়ার +, হাতকাটি +, শিফরকা দাও +, ছাপকা +, হাতকাটি পেশ +, হাতকাটি পোস +, কণা +, হিমাএল +, শির + কোঠ +, ভূজ +, ওজ্জা +, তামেচা +, বাহেরা +, সাও +।

শিফরকা দাও—বাম হস্তের হাতকাটি।

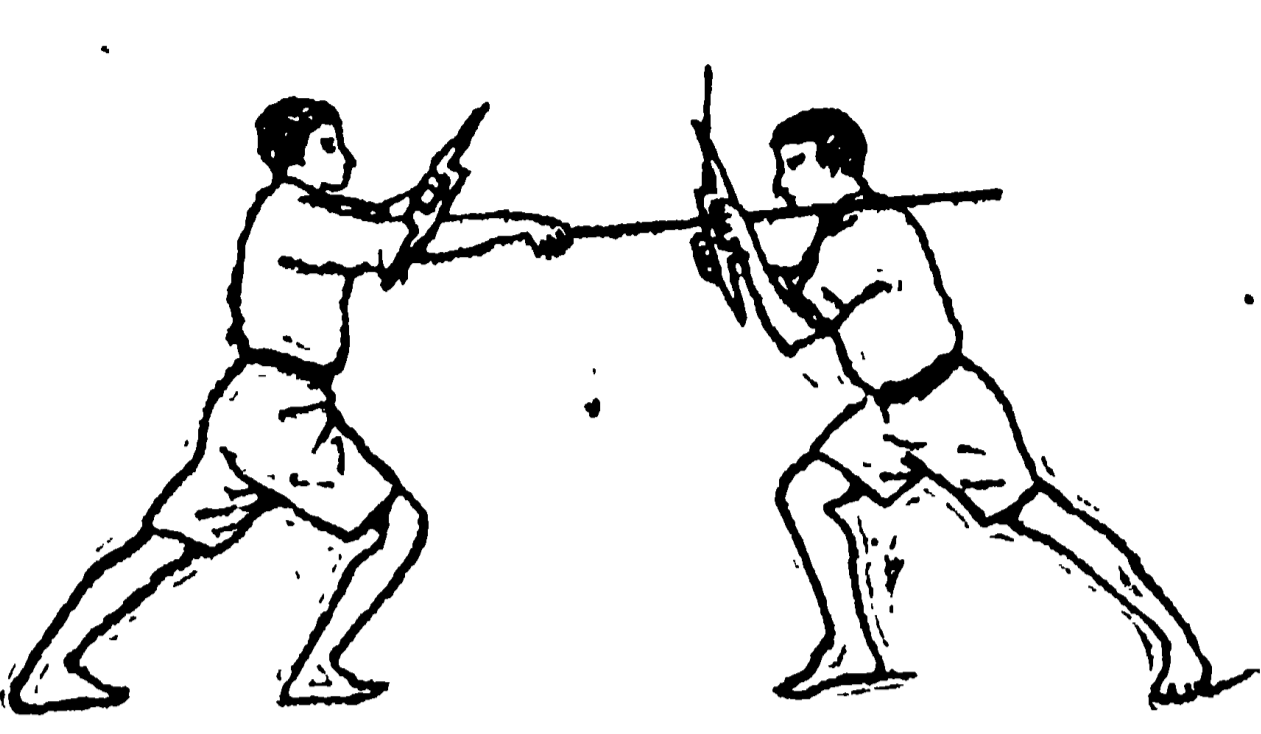
শিফর—ঢাল বা শৃঙ্গ।



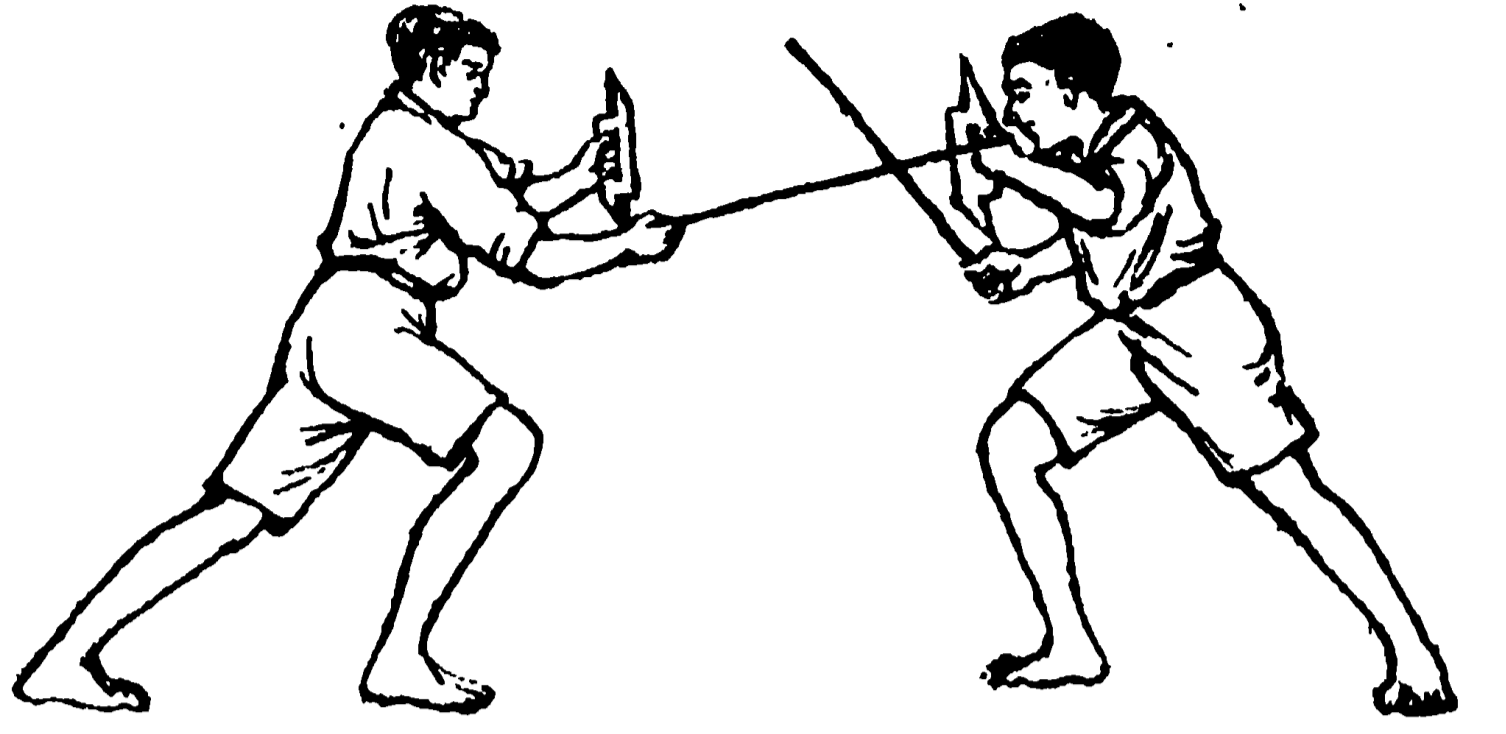
শিফরকা দাও

ছাপকা—হস্তের কানার সহিত বৃদ্ধাজুলী ব্যতিরেকে অপর চারিটি অঙ্গুলীর সন্ধিগুলি একত্রে কাটিয়া ফেলা হয়।

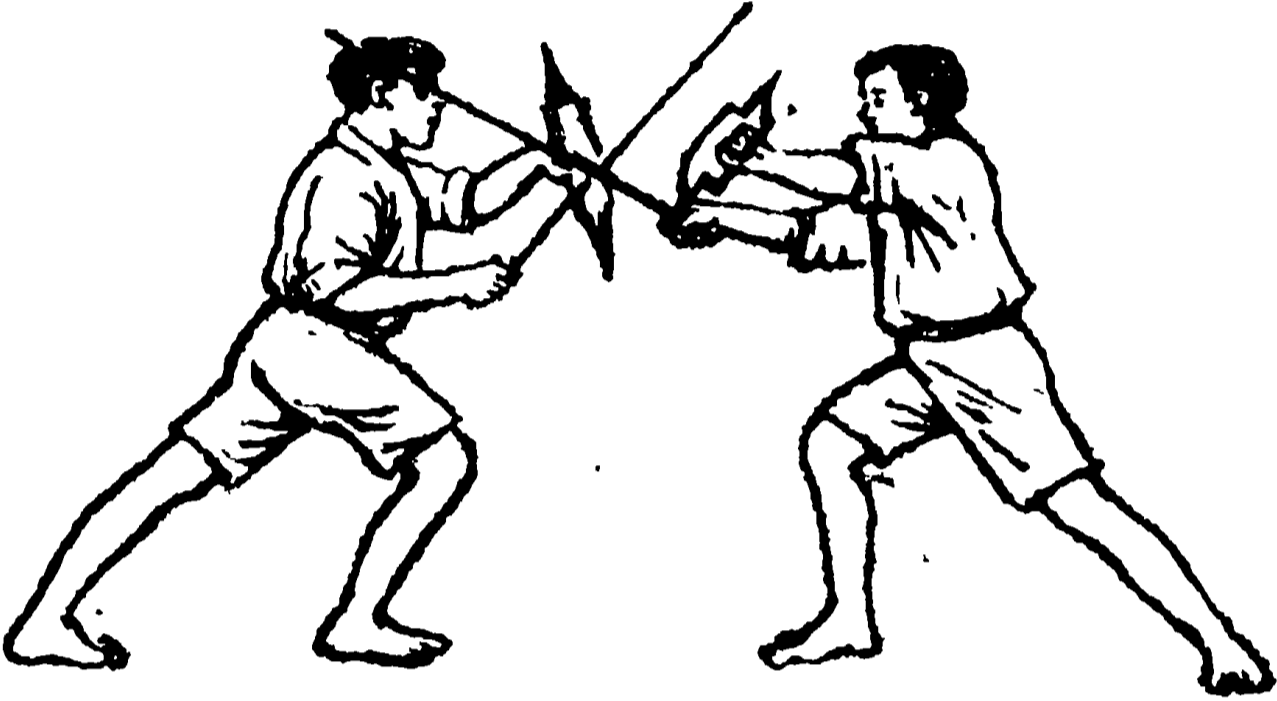
হাত কাটি পেশ = হস্ততালুর দিকের হস্তের কর্জ।



ধাপকা

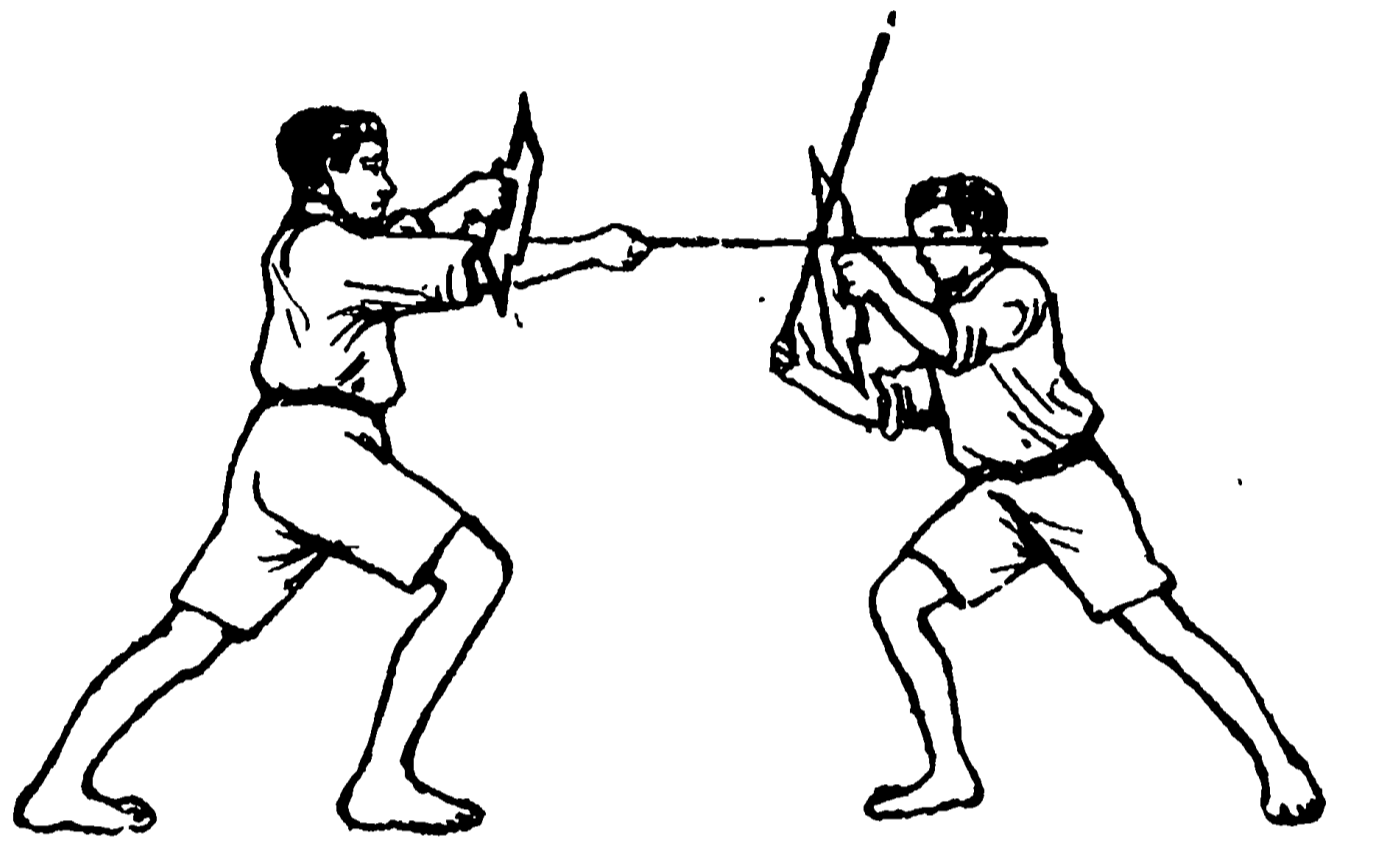


কণা



হাতকাটি পেশ

হাতকাটি পোঙ্গ—হস্তপৃষ্ঠেব দিকের হস্তের কড়ি।



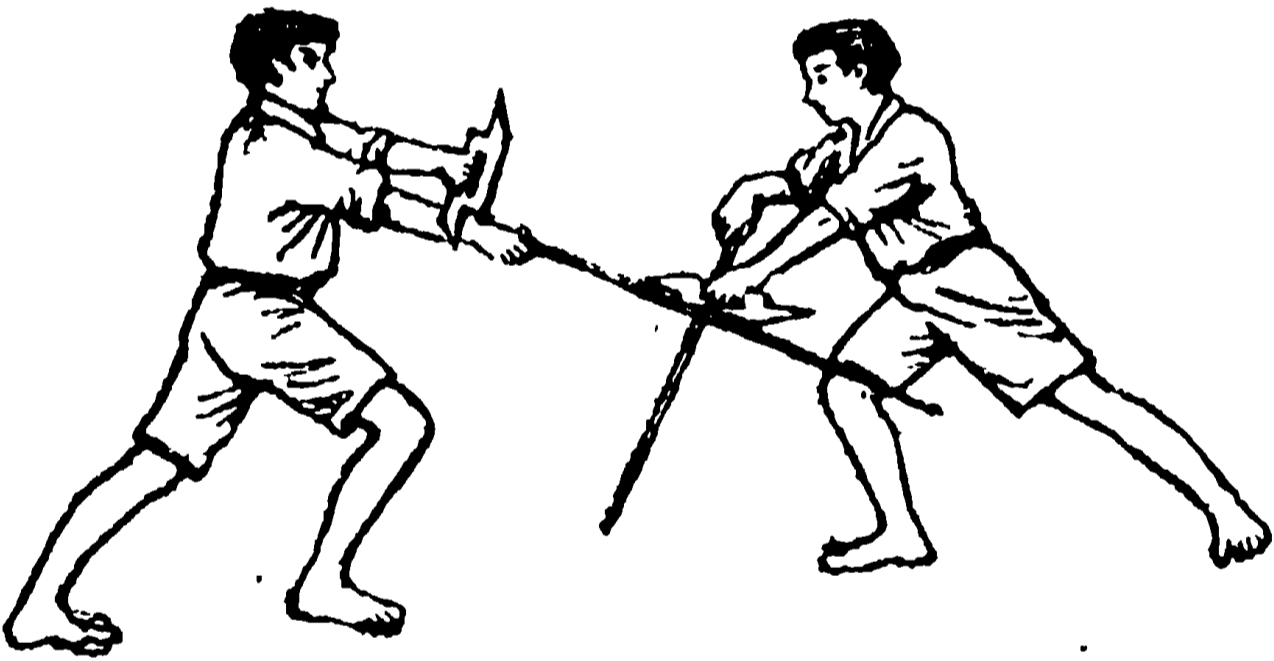
ঠোক

সাধারণতঃ শৃঙ্গকে প্রতিপক্ষের আঘাতের গতির দিকের সঙ্গে সমকোণ করিয়া ধরিতে হইবে। শৃঙ্গ ও লাঠি একত্র করিয়া আটকাইবার কালে সাধারণতঃ শ্রাম সর্বদাই শৃঙ্গ লাঠির সম্মুখে থাকিবে।

সম ঘাত (শ্রাম ঘাত)

শ্রাম ঘাত খেলিবার সময়ে পূর্বাপেক্ষা ঈষৎ ভারি লাঠি ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাহাতে আঘাতের তীব্রতা সাধনে শক্তি জন্মিয়া থাকে। শ্রাম ঘাত খেলাতেই দ্রুত ও অতি দ্রুত চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। অমসৃণ ঈষৎ ভারী লাঠি সহ দক্ষতার সহিত অতি দ্রুত শ্রাম ঘাত খেলায় রত থাকিতে পারিলে প্রত্যক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।

শ্রামঘাত খেলিবার কালে উভয়কে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার করিয়া যাইতে হইবে এবং সমস্ত আঘাতই গরদেশে প্রয়োগ করিয়া তরাসে টানিয়া আনিতে হইবে। প্রত্যেকটি ধারাই কতিপয়সংখ্যক বার বাম হস্তে খেলিয়া পরে দক্ষিণ হস্তে সমসংখ্যক বার খেলিতে হইবে। এবং পরে যিনি



হাতকাটি পোঙ্গ

কণা—নিজ দক্ষিণ দিক হইতে হুকিয়া হস্ত কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অসির অগ্রভাগ দ্বারা কণনালী ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

ঠোক—যে হস্তে অসি প্রত থাকিবে, সেই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা—

যে আঘাতগুলির সঙ্গে “+” চিহ্ন রহিয়াছে তাহা কেবল শৃঙ্গ দ্বারা আটকাইতে হইবে। যে আঘাতগুলির সঙ্গে “+” চিহ্ন রহিয়াছে তাহা শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া আটকাইতে হইবে। শৃঙ্গদ্বারা আটকাইবার কালে

প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিপক্ষ প্রথম আরম্ভ করিবেন এবং পূর্বের সমসংখ্যক বার খেলিবেন এইরূপ উভয় হস্তেই করিবেন।

প্রথম ক্রম

ঠাট—একাদ্ব।

- ১। গ্রীবান, হাতকাটি।
- ২। গ্রীবান, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
- ৩। গ্রীবান, বাহেরা, হাতকাটি ভাণ্ডার।
- ৪। গ্রীবান, সাকেন্, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
- ৫। গ্রীবান, পোস্ৎপা, সাকেন্, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
- ৬। গ্রীবান, ভুজ, পোস্ৎপা, সাকেন, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
- ৭। গ্রীবান, মন্, ভুজ, পোস্ৎপা, সাকেন, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
- ৮। গ্রীবান, আসর, মন্, ভুজ, পোস্ৎপা, সাকেন, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
- ৯। গ্রীবান, তামেচা, আসর, মন্, ভুজ, পোস্ৎপা, সাকেন, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
- ১০। গ্রীবান, পালট্, তামেচা, আসর, মন্, ভুজ, পোস্ৎপা, সাকেন্, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট—একাদ্ব।

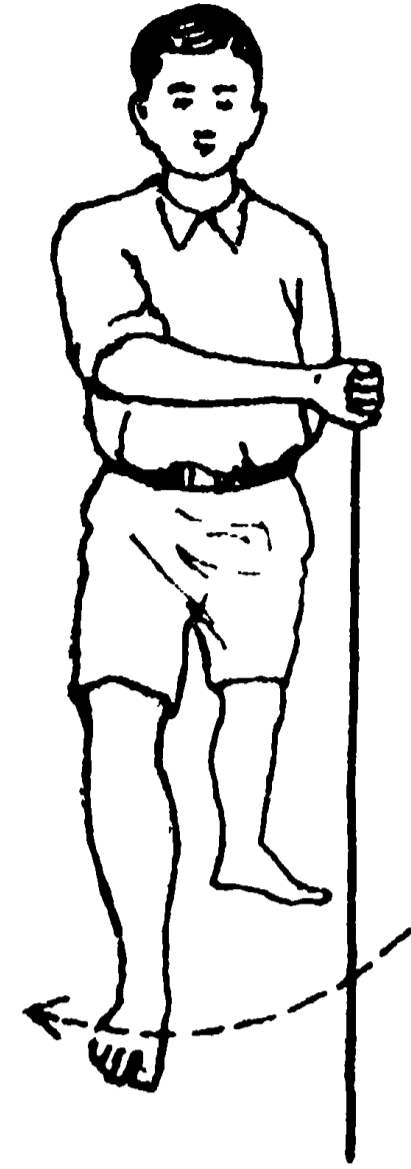
- ১। হিমাএল, হাতকাটি।
- ২। হিমাএল, হাতকাটি, কোমর।
- ৩। হিমাএল, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
- ৪। হিমাএল, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
- ৫। হিমাএল, উন্টা পোস্ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
- ৬। হিমাএল, ভজ্জা, উন্টা পোস্ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
- ৭। হিমাএল, দে, ভজ্জা, উন্টা পোস্ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
- ৮। হিমাএল, সাকেন্, দে, ভজ্জা, উন্টা পোস্ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
- ৯। হিমাএল, বাহেরা, সাকেন্, দে, ভজ্জা, উন্টা পোস্ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
- ১০। হিমাএল, করক, বাহেরা, সাকেন, দে, ভজ্জা, উন্টা পোস্ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।

উন্টা পোস্ৎপা—পায়ের পাতার মধ্যদেশ বরাবর বামপার্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়।

তৃতীয় ক্রম

ঠাট—একাদ্ব।

- ১। গ্রীবান, তামেচা।
- ২। গ্রীবান, তামেচা, পালট্।
- ৩। গ্রীবান, আসর, তামেচা, পালট্।
- ৪। গ্রীবান, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।



উন্টা পোস্ৎপা

- ৫। গ্রীবান, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
- ৬। গ্রীবান, পোস্ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
- ৭। গ্রীবান, সাকেন্, পোস্ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
- ৮। গ্রীবান, বাহেরা, সাকেন্, পোস্ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
- ৯। গ্রীবান, ভাণ্ডার, বাহেরা, সাকেন্, পোস্ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
- ১০। গ্রীবান, হাতকাটি, ভাণ্ডার, বাহেরা, সাকেন্, পোস্ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।

চতুর্থ ক্রম

ঠাট—একাদ্ব।

- ১। হিমাএল, বাহেরা।
- ২। হিমাএল, বাহেরা, করক।
- ৩। হিমাএল, সাকেন্, বাহেরা, করক।
- ৪। হিমাএল, দে, সাকেন্, বাহেরা, করক।
- ৫। হিমাএল, ভজ্জা, দে, সাকেন, বাহেরা, করক।
- ৬। হিমাএল, উন্টা পোস্ৎপা, ভজ্জা, দে, সাকেন্, বাহেরা, করক।
- ৭। হিমাএল, আসর, উন্টা পোস্ৎপা, ভজ্জা, দে, সাকেন্, বাহেরা, করক।
- ৮। হিমাএল, তামেচা, আসর, উন্টা পোস্ৎপা, দে, ভজ্জা, সাকেন্, বাহেরা, করক।
- ৯। হিমাএল, কোমর, তামেচা, আসর, উন্টা পোস্ৎপা, দে, ভজ্জা, সাকেন্, বাহেরা, করক।
- ১০। হিমাএল, হাতকাটি, কোমর, তামেচা, আসর, উন্টা পোস্ৎপা, দে, ভজ্জা, সাকেন্, বাহেরা, করক।

পঞ্চম ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

- ১। হিমাএল, দে ।
- ২। হিমাএল, দে, কোমর ।
- ৩। হিমাএল, দে, কোমর, আসর ।

ষষ্ঠ ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

- ১। গ্রীবান, মন্ ।
- ২। গ্রীবান, মন্, ভাণ্ডার ।
- ৩। গ্রীবান, মন্, ভাণ্ডার, সাকেন ।

সপ্তম ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

- ১। শির, করক্ ।
- ২। কোমর, শির, করক্ ।
- ৩। তেওয়ার, কোমর, শির, করক্ ।
- ৪। তেওয়ার, উণ্টা শির, কোমর, শির, করক্ ।
- ৫। তেওব, অঙ্ক্, উণ্টা শির, কোমর, শির, করক্ ।
- ৬। তেওয়ার, ভর্জা, অঙ্ক্, উণ্টা শির, কোমর, শির, করক্ ।

অষ্টম ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

- ১। সাণ্ড, পালট্ ।
- ২। ভাণ্ডার, সাণ্ড, পালট্ ।
- ৩। চাকি, ভাণ্ডার, সাণ্ড, পালট্ ।
- ৪। চাকি, শির, ভাণ্ডার, সাণ্ড, পালট্ ।
- ৫। চাকি, উণ্টা অঙ্ক্, শির, ভাণ্ডার, সাণ্ড, পালট্ ।
- ৬। কিকি, ভুজ, উণ্টা অঙ্ক্, শির, ভাণ্ডার, সাণ্ড, পালট্ ।

বিষম-ঘাত (মিল বাট)

বিষম-ঘাত-পর্যায়ে বামে লিখিত আঘাতগুলি এক জনে প্রয়োগ করিবে, প্রত্যেকটি আঘাতের উত্তরে প্রতিপক্ষ সেই আঘাতটির দক্ষিণে লিখিত আঘাতটির প্রয়োগ করিবে এবং প্রথম ব্যক্তির শেষ আঘাতটির প্রয়োগ হইয়া গেলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে এবং প্রথম ব্যক্তি উত্তরের আঘাত-গুলির প্রয়োগ করিবে। প্রথমে বাম হস্তে ক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ হস্তে ক্রীড়া করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ

(মার্) (জবাব)

গ্রীবান পালট্ ।

বাহেরা করক্ ।

তামেচা ভাণ্ডার ।

গ্রীবান গ্রীবান (এয়াদা) ।

মার = আক্রমণ ; জবাব = উত্তর ।

এয়াদা = প্রথম হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির

ও প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাত

পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিবে ।

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ

(মার্) (জবাব)

হিমাএল করক্ ।

তামেচা পালট্ ।

বাহেরা ভাণ্ডার ।

হিমাএল হিমাএল (এয়াদা) ।

তৃতীয় ক্রম

ঠাট—দোয়াঙ্গ

(মার্) (জবাব)

তামেচা মোড়া ।

শির শিব ।

বাহেরা ভাণ্ডার ।

কোমর শির ।

ভর্জা উণ্টা মোড়া ।

করক শির ।

শিব তামেচা (এয়াদা) ।

চতুর্থ ক্রম

ঠাট—দোয়াঙ্গ

(মার্) (জবাব)

বাহেরা উণ্টা মোড়া ।

সাণ্ড সাণ্ড ।

তামেচা কোমর ।

ভাণ্ডার সাণ্ড ।

ভুজ উণ্টা মোড়া ।

পালট্ সাণ্ড ।

সাণ্ড বাহেরা (এয়াদা) ।

পঞ্চম ক্রম
ঠাট—পাথরী

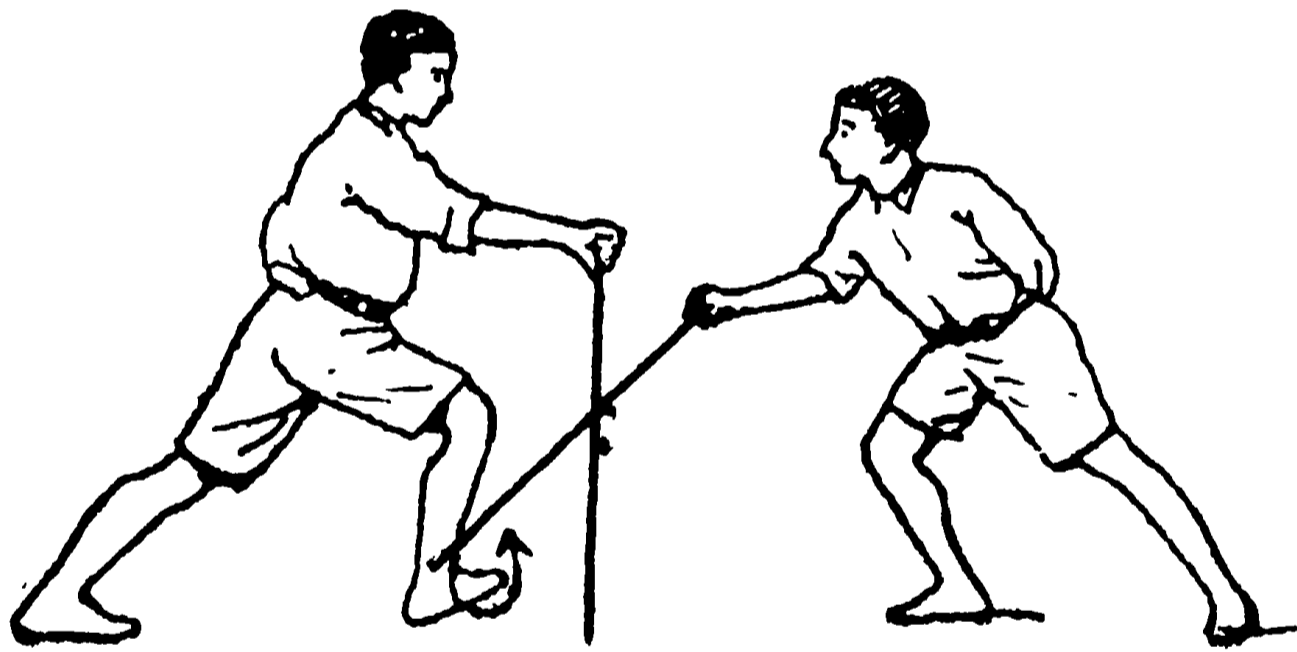
(মার)

তামেচা
ভজ্জা
ভাণ্ডার
মোটা
ভুজ
চাকি
গ্রীবান
করক
পালট
হালকুম্
পাগ্
সাকেন্
শির

(জবাব)

পালট!
শিব।
বাহেরা।
শিব।
উন্টা মোটা।
বাহেরা।
সাণ্ড।
মোটা।
গ্রীবান।
ফাক্।
চাকি।
শির।
তামেচা (এয়াদা)।

পাগ্ = প্রতিপক্ষ পুরোবর্তী পদের গোড়ালিতে ভর করিয়া পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উন্টা-পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। ধুনিয়া পালটের ন্যায় আট্কাইতে হইবে।



পাগ্

ষষ্ঠ ক্রম

ঠাট—পাথরী

(মার)

বাহেরা
ভুজ
কোমর
মোটা
ভজ্জা
তেওয়ার
হিমাএল
পালট
করক

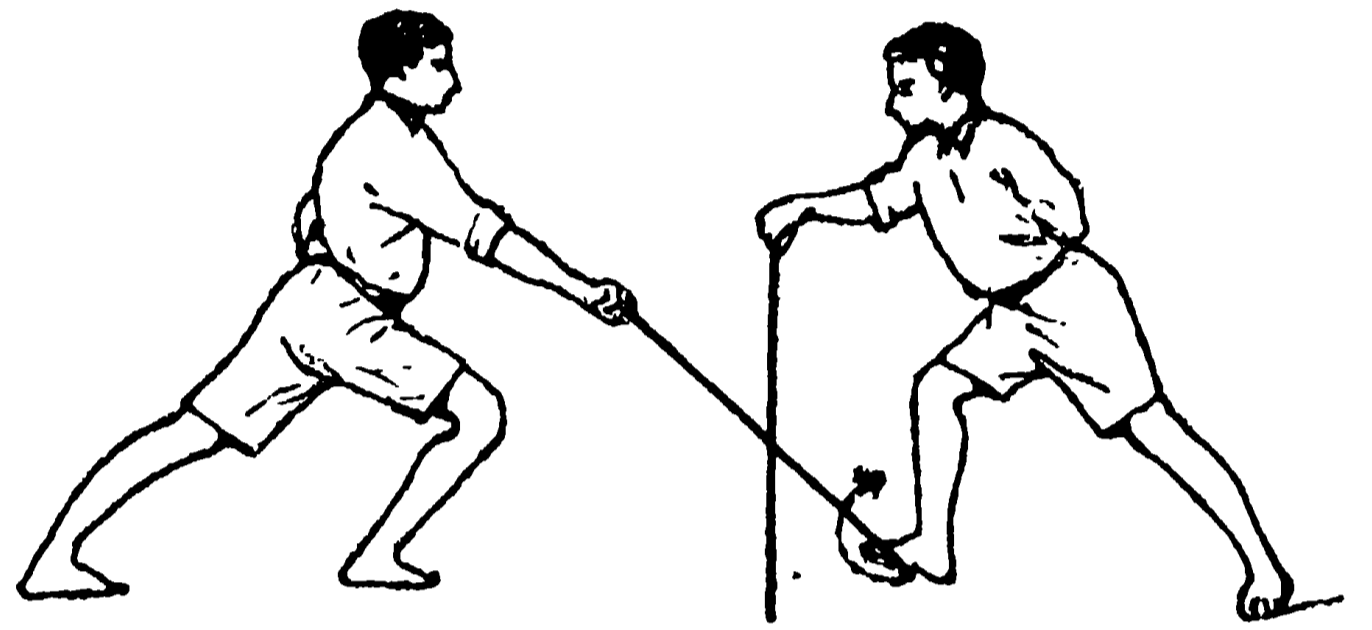
(জবাব)

করক।
সাণ্ড।
তামেচা।
সাণ্ড।
উন্টা মোটা।
তামেচা।
শির।
মোটা।
গ্রীবান।

উন্টা হালকুম্
উন্টা পাগ্
আসর
সাণ্ড

উন্টা ফাক্।
তেওয়ার।
সাণ্ড।
বাহেরা (এয়াদা)।

উন্টা পাগ্ = প্রতিপক্ষ পুরোবর্তী পদের গোড়ালিতে ভর করিয়া পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উন্টা পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের বাম পার্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়; ধুনিয়া করকের ন্যায় আট্কাইতে হইবে।



উন্টা পাগ্

চতুর্শুখী

প্রথমে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে। পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ-হস্তে লাঠি ও বামহস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে। উভয়কেই একত্রে প্রত্যেকটি আঘাতের সমান-ভাবে লাঠি দ্বারা প্রয়োগ ও শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিকার করিতে হইবে। চতুর্শুখী পধ্যায় হইতে বাহেরার অভিবাদন করিতে হইবে।

প্রথম ধারা

গ্রীবান, শির, ভুজ, দে, পাগ্, চাকি, সাণ্ড, ভাণ্ডার, তেওয়ার, করক, পালট, ভজ্জা।

বর্ণনা :—

“ভুজ” মারিয়া লাঠিকে প্রতিপক্ষের শৃঙ্গের সহিত ঘেষিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া আনিয়া “দে” মারিতে হইবে।

“পাগ্” মারিয়া তরাসে টানিয়া লাঠি পিছন দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া চাকি মারিতে হইবে।

“সাণ্ড” মারিবার কালে শৃঙ্গ বাম পার্শ্ব হইতে ঘুরাইয়া মাথার উপর দিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের আঘাত

আটকাইবার নিমিত্ত নিজ লাঠির সম্মুখে আনিতে হইবে, স্ততরাং নিজ লাঠি নিজ শৃঙ্গের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে “সাণ্ডের” আঘাত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রতিপক্ষের লাঠি নিজ শৃঙ্গ ও লাঠির মধ্যে পতিত হইবে। কখনও ইচ্ছাপূর্বক নিজ লাঠি ও নিজ শৃঙ্গ একত্রিত করিয়া আঘাত প্রয়োগে উদ্বৃত্ত হইতে নাই।

“পালট” প্রভৃতি নিয়ের দিকের আঘাত প্রয়োগ-কালে বামপদ একটুকু সম্মুখে আসিবে, পরে যথাস্থানে যাইবে এবং ঐ সঙ্গে-সঙ্গেই পরের আঘাত প্রয়োগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ধারা

হিমাএল, সাণ্ড, ভজ্জা, মন, উণ্টা পাগ, তেওয়ার, শির, কোমর, চাকি, পালট, করক, ভুজ।

তৃতীয় ধারা

বাহেরা, উণ্টা মোটা, ভাণ্ডার, শির, তামেচা, ভজ্জা, সাণ্ড, ভুজ, মোটা, চাকি, তেওয়ার, গ্রীবান।

চতুর্থ ধারা

তামেচা, মোটা, কোমর, সাণ্ড, বাহেরা, ভুজ, শির, ভজ্জা, উণ্টা মোটা, তেওয়ার, চাকি, হিমাএল।

পঞ্চম ধারা

বাহেরা, পোসংপা, দে, উণ্টা মোটা, হিমাএল, ভাণ্ডার, কোমর, শির, পালট, তামেচা, মোটা, পাগ, চাপনি, চাকি, সাণ্ড, করক, গ্রীবান, মন, তেওয়ার, ভুজ, আসর, সাকেন, হাতকাটি, অন্তর, দিগর।

বর্ণনা :—সমস্ত আঘাতই গরদেশে, প্রয়োগ করিতে হইবে। “পাগ” ও এস্থলে তরাসে টানিয়া আনিতে হইবে না।

“হাতকাটি” মারিয়া লাঠি প্রতিপক্ষের মাথার উপর দিয়া আনিয়া নিজ দক্ষিণ দিক হইতে নিজ মাথার উপর দিয়া আনিয়া অন্তর মারিতে হইবে।

ষষ্ঠ ধারা

তামেচা, উণ্টা পোসংপা, মন, মোটা, গ্রীবান, কোমর, ভাণ্ডার, সাণ্ড, করক, বাহেরা, উণ্টা মোটা, উণ্টা পাগ, দিগর, তেওয়ার, শির, পালট, হিমাএল, দে, চাকি, ভজ্জা, সাকেন, আসর, হাতকাটি, উণ্টা অন্তর, চাপনি।

গহ্বর (গোহার)

বহুলোকের মধ্যে পতিত হইয়া আশ্রয়ক্ষার

প্রয়োজন হইলে “গহ্বর”-পর্যায়ে দক্ষতা লাভের দরকার হইয়া থাকে।

প্রথমে কতিপয় শিক্ষার্থী প্রত্যেকে এক লাঠির দূরত্বে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইবে, পরে পূর্বের অভ্যাস কোনও একটি “ঘাতে”র ধারা কিম্বা শ্রামঘাত অথবা বিষম-ঘাতের যে-কোনও ক্রমের প্রথম আঘাতটি কোনও একজনে তাহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ আঘাতটি আটকাইয়া তাহার পরের আঘাতটি তাহার অপর-পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে মারিবে; এইরূপে ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া আসিয়া খেলা চলিতে থাকিবে।

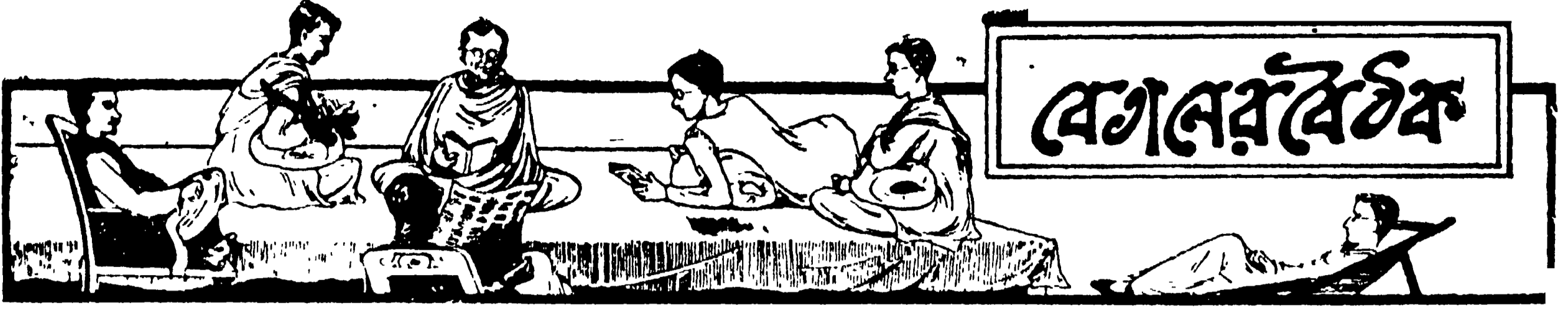
“ঘাত” প্রভৃতির যে ধারাটি মনোনীত করিবে তাহার মধ্যে আঘাতের সংখ্যা এবং যে কয়জন লোক দাঁড়াইবে তাহাদের সংখ্যা, এই দুই সংখ্যার মধ্যে যেন কোন সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে; তাহা হইলেই প্রথম আঘাতটি ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকের উপরেই পড়িতে থাকিবে।

পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মণ্ডলের কেন্দ্রে দাঁড়াইবে এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি মণ্ডলের একজনকে আঘাত করিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির পর্যায়ানুযায়ী আঘাতের প্রতিকার করিবে, এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা চালাইতে থাকিবে।

দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই এবং মণ্ডলের দক্ষিণ ও বাম উভয় আবর্তেই এইরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। পরে মণ্ডলের সীমানায় চারি জন কিম্বা পাঁচ জনের অধিক থাকিবে না, এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি অতি দ্রুত চালনায় সকলের সঙ্গে খেলিতে থাকিবে। সাধারণতঃ একসঙ্গে চারি জনের অধিক এক ব্যক্তিকে সফলতার সহিত আঘাত করিতে পারে না। এইরূপে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রে থাকিয়া দক্ষতা অর্জন করিবে।

ক্রমশঃ

শ্রী পুলিনবিহারী দাস



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাংস্কৃতিক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে ১ গর সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্যে লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা স্মৃতিধার জন্ত বিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন— তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহারা কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৫৮)

বুদ্ধদেব

এক সাহেবের সম্পাদিত কাহিন্যানের ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থের ভূমিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন যে বর্তমানে জানা গিয়াছে যে ভারতের বুদ্ধদেব বাস্তবিকপক্ষে কোন রাজার পুত্র ছিলেন না। এবিষয়ে কেহ প্রকৃত তথ্য জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(১৫৯)

ভারতবর্ষে সিমেন্ট কারখানা

আমাদের দেশে কোথাও স্বদেশী সিমেন্ট ফ্যাক্টরী (বিলাতী মাটির কারখানা) আছে কিনা? থাকিলে তাহা কোথায়, সংখ্যায় কতগুলি ও তথায় দেশীয় লোককে শিক্ষানবিশরূপে গ্রহণ করা হয় কিনা?

শ্রী পান্নালাল দাস

(১৬০)

ভারতবর্ষে খড়িমাটির পাহাড়

ভারতবর্ষে কোথাও খড়িমাটির পাহাড় কিংবা কারখানা আছে কিনা? যদি থাকে, কোথায়? পেলিন্ চকু তৈয়ারী করিবার প্রণালী কোন্‌খানে শিক্ষা করা যায়?

শ্রী অবনীমোহন দাসগুপ্ত

(১৬১)

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা কতদিনের প্রাচীন? বৈদিকযুগে কি এই উপাসনা প্রচলিত ছিল? যদি না ছিল তবে কোন্‌ সময়ে ইহা প্রচলিত হয়? এই উপাসনা কোন্‌ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক ও নৈতিক মঙ্গলের জন্ত কতদূর সঙ্গত এবিষয়ে কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ সিংহ বেদান্তভূষণ

(১৬২)

ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ

হিন্দুরা যে জাপান, যাতা, বোর্নিও, সেলিবিস, সিংহল ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন— তাহার সবিশেষ বিবরণ কোন্‌ পুস্তকে পাওয়া যায়?

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

শ্রী যতুনাথ মণ্ডল

(১৬৩)

“মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক কে?

১২৭৯ সালে কলিকাতা ২০১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট “মধ্যস্থ” মুদ্রায়িত হইতে “মধ্যস্থ” নামক একখানা স্বসম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। “মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক কে ছিলেন? উহার বার্ষিক মূল্য কত ছিল?

শ্রী রাধাচরণ দাস

(১৬৪)

বঙ্গদেশে সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকা

বঙ্গভাষায় এ পর্যন্ত সঙ্গীতবিষয়ক কতগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছে,— তাহাদের প্রত্যেকের সম্পাদকের নাম কি এবং কাৰ্যালয় কোথায়? ইহাদের মধ্যে কয়খানা অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে?

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬৫)

সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত

প্রক্ষিপ্ত-অংশ-বিবর্জিত সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারতের কোন সংস্করণ আছে কিনা এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের এমন কোন অনুবাদ আছে কি না যাহাতে মূল সংস্কৃতে যথাযথ অনুসরণ করা হইয়াছে?

শ্রী ত্রিপুরাচরণ ঘোষ

(১৬৬)

একাদশী তিথিতে অন্নগ্রহণ

শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গোস্বামীর আত্মজীবনীমতঃ পঞ্চম অধ্যায়ঃ

যায় যে চৈতন্যদেব—তখন বিশ্বস্তর মিশ্র, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—
তাঁহার মাতাকে একাদশীর দিন অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

“প্রভু কহে, একাদশীতে অন্ন না খাইবা।

শচী কহে না খাইব, ভালই কহিলা।

সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥”

ইহার অর্থ কি? নবদ্বীপের স্মার্ত-প্রধান স্থানে কি ব্রাহ্মণ
বিধবা একাদশীর দিন অন্নগ্রহণ করিতেন? সমগ্র বঙ্গদেশেই কি
ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল? অথবা খ্রীষ্টীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে ঐ আচার
ছিল, এবং মহাপ্রভু নিজে উক্ত সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা
ঐ প্রথামত চলিতেন? খ্রীষ্টীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে ঐ প্রথা কখনও প্রচলিত
ছিল বা বর্তমানে আছে কি?

শ্রী যতীশচন্দ্র বাগ্‌চী

(১৬৭)

ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

বঙ্গদেশে কিম্বা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায় কোথায় ইলেক্‌ট্রিক্যাল
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় আছে? কিরূপ যোগ্যতা থাকিলে
ঐ-সকল বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়?

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সরকার

(১৬৮)

রোটার্সগড়

সেরশাহ কর্তৃক রোটার্সগড় বিজয়ের ইতিহাস কোন্ গ্রন্থে পাওয়া
যায়?

রোটার্সগড় কোন্ সময়ে কি অস্তিত্ব প্রাপ্ত ও কাহার দ্বারা নির্মিত
হইয়াছিল?

মণিলাল মাইতি

(১৬৯)

হরিতকী-রক্ষা

পোকার উপদ্রব হইতে কাঁচা হরিতকী রক্ষা করিয়া কি উপায়ে
বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী করা যাইতে পারে?

শ্রীমতী শান্তিলতা সেন

(১৭০)

নীলকণ্ঠ পাখী

দুর্গাপূজার সময় বিজয়ার দিন যে, নীলকণ্ঠ পাখী ছাড়া হয়, ইহার
কোনো কারণ আছে কি?

শ্রী সরযু রায়

(১৭১)

প্রিভি-কাউন্সিলের ভারতীয় সভ্য

‘প্রিভি-কাউন্সিলে’র প্রথম ভারতীয় সভ্য কে?

শ্রী সরসীকুমার রায়চৌধুরী

(১৭২)

পৃথিবীর সর্বপ্রধান পুস্তকালয়

পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ পুস্তকালয়ের নাম কি? উহা কোথায়
অবস্থিত? উহার পুস্তকের সংখ্যা কত? ভারতের মধ্যেই বা কোন্
পুস্তকালয়টি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ? উহাতে কত পুস্তক আছে?

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৭৩)

বঙ্গদেশে অনাথ-আশ্রমের সংখ্যা

বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত বিকলাঙ্গ ও অকর্মণ্য লোকদিগের জন্ম,
অনাথ ও নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের জন্ম এবং অনাথা দুঃস্থা ও
পতিতা স্ত্রীলোকদিগের জন্ম কতগুলি সভা, সমিতি, আশ্রম বা সাহায্য-
ভাণ্ডার আছে, তাহাদের ঠিকানা কি এবং পরিচালকগণের নাম কি?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ দে

(১৭৪)

সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভিদ-বিদ্যা-সংক্রান্ত পুস্তক

সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভিদ-বিদ্যার কোনো পুস্তক আছে কি না? তাহার
নাম কি?

শ্রী জীবনলাল দাশগুপ্ত

(১৭৫)

বোতাম তৈরী

বোতাম তৈরী করিবার জন্ম নারিকেলের মালাকে কি ভাবে নরম
করিতে হয়? বিম্বক হইতে বোতাম তৈরী করিতে হইলে বিম্বককে
কিভাবে নরম করিতে হইবে?—কি দিয়া উভয় মিশ্রিত পালিশ করিলে
ভাল বোতাম হইবে?

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র পাল

মীমাংসা

(৪৯)

রুদ্রাক্ষ ও তাম্রমুদ্রা

তাম্রমুদ্রার উপর রুদ্রাক্ষ স্থাপন করিয়া তদুপরি আর-একটি
তাম্রমুদ্রা স্থাপন করিলে সংঘর্ষণ (friction) দ্বারা উৎপন্ন একপ্রকার
বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাব হয়। এই পরীক্ষা ভল্টা কর্তৃক আবিষ্কৃত
Electrophorus নামক যন্ত্র কর্তৃক পরীক্ষার স্মার। আবার সঞ্চালনী-
শক্তি-বিশিষ্ট-পদার্থগাত্রে যে যে অংশ অধিক বহির্গত থাকে কিংবা
যে যে অংশের ন্যূনত্ব তীক্ষ্ণ, সেই সেই অংশে বৈদ্যুতিক ঘনতা
(electric density) অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে; এবং যে যে
অংশের উত্তানতা অধিক সেই সেই অংশে অল্প পরিমাণে থাকে। বৈদ্যুতিক
পদার্থের দ্বারা পূর্ণকৃত একটি পদার্থের নিকটবর্তী বায়ু পরমাণু-
সকলও তাহার সম্পর্কে আকৃষ্ট হয় এবং প্রতিনিবৃত্তি (repulsion)
ভোগ করে। বায়ুপরমাণু যত অধিক থাকে বৈদ্যুতিক ঘনতাও তত
অধিক হয়। তীক্ষ্ণ ও বহির্গত অংশে ঘনতা অধিক থাকে এবং এই
এই অংশে প্রতিনিবৃত্তিও অধিক। এই নিমিত্ত আকৃষ্ট বায়ুপরমাণু
ঐ পদার্থের বৈদ্যুতিক আক্রমণের সহিত তাড়িত হয়। এইসকল
তীক্ষ্ণ অংশের বায়ুপরমাণু একটি পশ্চাদপসারী প্রতিঘাত (backward
reaction) দান করে। এই প্রতিঘাতেই ঐ রুদ্রাক্ষ নিবৃত্ত-বায়ু-
প্রবাহের বিপরীত দিকে চালিত হয়। যদি ঐসকল তীক্ষ্ণ অংশ
মোম কিম্বা এইরূপ অপর কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত করা যায় তবে
ইহা আর ঘুরিবে না। Dey's Electricity—page 142,
'action of points', এবং Watson's Physics, p. 672,
'Electrophorus' দেখুন।

শ্রী সমরকুমার দত্ত

(৭৩)

সাদা পাথরের বাসন সাফ

জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড (Dilute Nitric Acid) দ্বারা ধোত করিলে ময়লা সাদা পাথরের বাসন পরিষ্কৃত হয়। একটি লাঠিতে এক টুকরা বস্ত্র জড়াইয়া ঐ অল্পশক্তি এসিডে ভিজাইয়া ক্ষিপ্ৰহস্তে সমভাবে বাসনে মাখাইতে হইবে। পরে পরিষ্কার জলে এবং সাবানে ধোত করিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু বাসনে পালিশ থাকিলে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তখন পালিশ পাথর কিংবা কামা দ্বারা ঘষিয়া পালিশ করিতে হইবে।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ নাগ

(৯১)

ভাদ্রমাসে কলাগাছ

ভাদ্রমাসে কলাগাছ পুঁতিলে কলাগাছ প্রায়ই মরিয়া যায়—এ প্রবচনে কোনো পৌরাণিক ইতিহাস নাই। ‘রাবণ’ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে রাবণবংশের স্মরণ প্রচুর কলাগাছ বুঝাইবার জন্ত। ভাদ্র মাসে কলাগাছ পুঁতিলে যে কলাগাছ মরিয়া যায় তাহার আরও কয়েকটি প্রবচন আছে ; যথা—

“কলা ক’লে ভাদ্রমাসে

নির্কংশ হয় সবংশে।”

অর্থাৎ ভাদ্রমাসে কলাগাছ বসাইলে সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়।

‘সিংহ মীন বর্জে’

কলা খাবে আর্জে।”

ভাদ্র (সিংহ) ও চৈত্র (মীন) ব্যতীত সকল মাসেই কলা-গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। [Agricultural Sayings in Bengal, by R. L. Banerji, ৪১ পৃষ্ঠা দেখুন।]

শ্রী সনৎকুমার দত্ত

(১০৩)

ঘাটু গান

ঘাটু গান সাধারণতঃ মৈমনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে এবং শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা জিলার গীত হইয়া থাকে। নেত্রকোণা অঞ্চলেও ঘাটুগানের বেশ প্রচলন আছে। ঘাটু গান জিনিসটা পুরোপুরি রাখাক্ষ-বিষয়ক। কে এই গানের প্রবর্তক তাহা ঠিক জানা যায় না। বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ইহা আবদ্ধ থাকায় ইহার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবে ‘লালা’ নামক কোন্ এক ব্যক্তি নাকি ইহার প্রথম রচয়িতা। এই লালার বাস বিহার প্রদেশের কোনো স্থানে ছিল। এইজন্ত ঘাটু গানে অনেক হিন্দী, ব্রজ বুলী এবং কিছু কিছু মৈথিলী ভাষার কথা প্রচলিত আছে। ঘাটু গানের সঠিক বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলে বঙ্গের প্রাচীন লোক-ইতিহাসের কতক উপাদান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়। বর্তমানেও ঘাটু গানে প্রাচীন নর্তকীগানের নৃত্যপদ্ধতি অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই আছে। আমার বিনীত নিবেদন,— ঘাটুগানপ্রচলিত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট অঞ্চলের, সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসেবী সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি দয়া করিয়া স্ব স্ব স্থানের প্রচুর ঘাটু গান সংগ্রহ করিয়া নিম্নঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তবে গবেষণা কার্যের ও বাংলা প্রাচীন লোক-ইতিহাস আবিষ্কারের যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। আশা করি আমার এ অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও মুক্তালতাতে ঘাটু গানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ রায়

গৌরী লাইব্রেরী নেত্রকোণা ময়মনসিংহ

এই গান কোথা হইতে আসিল কে প্রথম রচনা করিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। লোকে বলে—‘এই গান পূর্বদিক হইতে আসিয়াছে।’ বঙ্গ যে এককালে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—এই গান হইতে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। কারণ এই গান কেবল রাখাব বিষয় লইয়া রচিত এবং এই গানের স্থায়ী ভাব কৃষ্ণবিরহ।

এই গানের বিশেষত্ব এই যে পদাবলী বা কীর্তনের মত ইহা গীত হয় না। গায়কগণ চারিধারে উপবেশন করে। একটি ‘ছোকরা’কে (এই ‘ছোকরা’র লম্বা চুল রাখিতে হয়) নানা আভরণে ভূষিত করিয়া ঠিক রাখার মত সাজাইয়া আসরে নামাইয়া দেওয়া হয়। সে নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া রাখার যে সময় যে ভাব হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করে। এই ছোকরাকে ‘ঘাটু’ বলে। ‘ঘাটু’ হইতেই এই গানের নাম ‘ঘাটু’র গান হইয়াছে।

শ্রী ফণীন্দ্রকুমার অধিকারী

(১১১)

“ডিম ফুটাইবার যন্ত্র”

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে এবিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবে।

“বকুল”

(১১২)

কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর স্ব-রচিত “শীতলামঙ্গল” পালার একস্থানে উল্লেখ আছে,—

“শীতলার পদতলে কবি নিত্যানন্দ বলে

সাকিন কানাইচকে ঘর।”

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিত্যানন্দের বাসস্থান মেদিনীপুর জিলাব অন্তঃপাতী কানাইচক গ্রামে অবস্থিত ছিল। উক্ত গ্রাম কাশীজোড়া পরগণারই অন্তর্ভুক্ত। ইহার পূর্ববাস কোথায় ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১১৫)

গজনির সুলতান মানুষদের ভাবত আক্রমণ-সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই স্ত্রীলোকের কেশপাশে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করার ঐতিহাসিক প্রমাণ পরিস্ফুট হইবে।

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

(১১৬)

জাপানে শিক্ষা

গত ২৭শে জুলাই Hindustan Association of Japan হইতে যে চিঠি পাইয়াছি, তাহা হইতে নিম্নের খবর দেওয়া গেল। সাধারণের অবগতির জন্ত অগৃহ-বাজার পত্রিকায় Indian Students in Japan শীর্ষক প্রবন্ধে উহা প্রকাশিত হয়।

জাপানে গিয়া যাহারা নূতন কোন কারিগরি শিক্ষালাভে ইচ্ছুক, প্রথমতঃ জাপানী ভাষায় তাদের দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা ওখামে গিয়া শিক্ষা করিয়া লইতে কষ্ট হয়। জাপানী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার সাহায্যে জাপানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখান

অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্র বর্তমানে নিম্নলিখিত কলেজসমূহে শিক্ষা পাইতেছে। ভূমিকম্পের পর কি হইয়াছে জানা যায় নাই।

(১) Agricultural College of Tokyo, Imperial University.

(২) The Tokyo Imperial Sericultural College.

(৩) Tokyo Higher Technical College.

Agricultural Collegeএ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়ান হয়। তিন বৎসর প্রত্যেক বিষয় পড়ার পর ডিগ্রির জন্য পরীক্ষা দিতে হয়।

(১) Agriculture (a) Proper (b) Politics and Economics.

(২) Agricultural Chemistry.

(৩) Forestry (৪) Veterinary Medicine (৫) Fishery.

The Tokyo Sericultural College কোন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে। উহাতে (১) Sericulture Proper (২) Mulberry Cultivation (৩) Filature Theory and Practice—প্রত্যেক বিষয় তিন তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

Higher Technical Collegeএ (১) Dyeing and Weaving (২) Applied Chemistry (৩) Mechanical Engineering (৪) Electricity (৫) Ceramics (৬) Industrial Designs and (৭) Architecture—প্রত্যেক বিষয় তিন তিন বৎসর শিক্ষা করিতে হয়।

১লা এপ্রিল নূতন সেশন্ আরম্ভ হয়। ভারতীয় ছাত্রগণকে বিশিষ্ট ছাত্রভাবে গণ্য করা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রকৃত ছাত্র হওয়া যায়। ভারতীয় যে-কোন বিদ্যালয়েই অন্ততঃ Intermediate in Science or Artএ পাশ করা হইলেই হয়। বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে কোন ডিগ্রি দেওয়া হয় না।

ভর্তি হইতে লাগে (Admission fee) Agricultural Collegeএ ৫ ইয়েন ও বাৎসরিক ফি ৭৫ ইয়েন। Sericulture এবং Higher Technical Collegeএ ৫ ইয়েন ভর্তি-ফি এবং ৫০ ইয়েন বাৎসরিক ফি। এতদ্বিধা খাকা খাওয়া ইত্যাদির খরচও মাসিক ১০০ হইতে ১২৫ ইয়েন।

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে জাপানে খাকা-খাওয়া বড়ই ব্যয়বহুল হইয়াছে। নিজের খরচ চালাইবার মতন উপার্জনের সুযোগ পাওয়া দুর্ঘট। কেহ যেন সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া ওখানে না যান। অনেক ছাত্র ওখানে গিয়া শেষে বড়ই কষ্ট সহ্য করেন। সাধারণত ১০০ ইয়েন আমাদের ১০০ সমান, কিন্তু বর্তমানে উহা প্রায় ১৭০ টাকার উপরে উঠিয়াছে।

আমাদের কাছে যে Prospectus আছে কেহ লিখিলে পাঠাইয়া দিতে পারি। নিম্নের ঠিকানায় তিন আনা পরিমাণ ডাক-খরচ পাঠাইলে সকল খবর জানা যায়। ভারতীয় ছাত্রদের ঠিক ঠিক খবর প্রদানের জন্য এই অনুষ্ঠান।

Hony. Secretary,
Hindustan Association of Japan
Post Box No. I,
Shibuya Tokyo, Japan.

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

৫৭ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা

(১২০)

নীলনদের ইতিহাস

প্রাচীন হিন্দুগণ যে নীলনদের অস্তিত্বের বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন তাহা সর্বপ্রথম ফ্লাবিস্ উইলফোর্ড নামক ভারতীয় সৈনিক বিভাগের একজন ইংরেজ কর্মচারী আমাদের জ্ঞান-গোচর করেন। বিশিষ্ট কোন পুরাণের বিশেষ কোনো অংশ হইতে প্রাচীন হিন্দুদের নীলনদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগতির বিষয় জানা যায় না; পরন্তু, সমস্ত পুরাণগুলি বহুসংখ্যক পাঠ করিলে আমরা যে কএকটি ভৌগোলিক বর্ণনা পাই তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে প্রাচীন হিন্দুগণ নীলনদের বিষয় অবগত ছিলেন। যেমন, মিশ্রদেশের প্রসঙ্গে আমরা নীলনদের উল্লেখ পাই। আধুনিক মিশর দেশ (Egypt) এই মিশ্র শব্দ হইতে আসিয়াছে। আরও ঐ দেশের লোককে “শ্যামমুখ বর্ধর” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐপ্রকার লোক অদ্যাপি ঐ দেশে দেখা যায়। মনে রাখা দরকার যে ঐতিহাসিক অনুগম (Generalization) মাত্র একটি বর্ণনার উপর নির্ভর করে না; কেবল মাত্র একটি বিবরণ হইতে আমরা একপ জটিল সমস্যার কোন স্থির মীমাংসা করিতে পারি না। উইলফোর্ড সমস্ত পুরাণ হইতে নীলনদের বর্ণনা তাঁহার প্রবন্ধে সমাধিষ্ট করিয়াছেন। (Asiatic Researches, Vol. III, 1791)। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এসম্বন্ধে Journal of the Discovery of the Source of the Nile, Sept. 1860, এবং মডার্ন রিভিউএ (১৯১৫) অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জায়সওয়ালের প্রবন্ধ দেখিতে পারেন।

অক্ষয় দত্ত

(১২১)

বাংলার স্বাধীন হিন্দুরাজা

যতদূর মনে হয়, বাংলার প্রথম স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিলেন সিংহবাহন (বা সিংহবাহ)। ইহার রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক)। ইহারই পুত্র বিজয় সিংহ সাত শত সৈন্য লইয়া সিংহলে যাত্রা করেন ও সিংহলে জয় করিয়া তথায় বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করেন।

অক্ষয় দত্ত

(১২২)

“ভূ-পর্যটক মার্টিনেট্”

আমেরিকাবাসী ভূপর্যটক (Globe-trotter) মিঃ হিপোলাইট “মার্টিনেট্” ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে আমেরিকার United Statesএর Seattle (সিয়াটল্) নগর থেকে তাঁর ভূবন-ভ্রমণের যাত্রা শুরু করেন। এবং যথাক্রমে ইংলণ্ড, হলণ্ড, বেল্জিয়াম্, সুইজারলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, আলবেনীয়া, গ্রীস, ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটামিয়া, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের য়ুনান প্রদেশে অতিরিক্ত পারিশ্রমে ও অজ্ঞাহারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

(১৩০)

কবি হরিশ্চন্দ্র শাহ

উদ্বোধন-ভারত চরিত্রের শাহ নামক চরিত্রের কবি হরিশ্চন্দ্র শাহ

যায়। তন্মধ্যে একজন পাঞ্জাবের অন্তর্গত সৌবরাওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃবাসভূমি নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে। ইঁহার জীবনী সাধারণের নিকট একরূপ অস্পষ্ট অবস্থায় আছে। কানপুর-নিবাসী আমার জনৈক কারাবন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোকর্ননাথ মিশ্র গত বৎসর কবি হরিশ্চন্দ্রের একখানি হিন্দীভাষায় লিখিত আত্মচরিত দেখাইয়াছিলেন। তাহার বাংলা অনুবাদ আমার নিকটে আছে। সেই পুস্তক হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা অতি শিশুকালে মাতাপিতার সহিত সৌবরাওয়ে চলিয়া আসেন। তাঁহার পিতা নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোনও স্থানে ঐশ্বর্যশালী কোনও এক সুবর্ণ-বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার নবাবের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ১৩৮৭ শকে সমস্ত ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতামহ ও পিতামহী তাঁহার পিতাকে লইয়া পাঞ্জাবে পলাইয়া আসেন। “ভজন”, “মহাবত”, “আখের” ও “ছাদি” নামক কয়েকখানি প্রেম-কবিতার গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। গয়া সংস্কৃত-চতুষ্পাঠীর জনৈক অধ্যাপকের নিকট জ্ঞানিয়াছিলাম যে তিনি কবি হরিশ্চন্দ্রের কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়াছেন—ছাপাইবার ইচ্ছা আছে। ইহা ছাড়া গুরুমুখী ভাষায় লিখিত তাঁহার দুইখানি বই সাধু কৃপাল সিংহের নিকট দেখিয়াছি। ঐ পুস্তকের একখানিতে আছে যে তাঁহার পিতামহ বাংলা হইতে পলাইয়া এখানে আসিয়া “দত্ত” উপাধি ত্যাগ করিয়া “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গয়া অঞ্চলে তাঁহার রচিত বহু গান এখনও চলিত আছে।

দ্বিতীয় কবি হরিশ্চন্দ্র শাহর পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না—মধ্যপ্রদেশে ইঁহার রচিত অনেকগুলি গান শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশের স্থানীয় কিংবদন্তীতে জানা যায়—এ হরিশ্চন্দ্র একজন পাগল ছিলেন—তাঁহার নাম খাম ঠিকানা কেহই জানিত না। মধ্যপ্রদেশের সহিত পাঞ্জাবের হরিশ্চন্দ্রের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৩১)

জাফানের চাষ

ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ভিন্ন নিম্নলিখিত স্থানেও জাফান জন্মে। যথা—বেলুচিস্তান, ত্রিবাঙ্কুর, রাজপুতানা, মালাবার-উপকূল, নীলগিরি।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

জাকরণ-(crocus. N. O. Irideae) ফুলের সৌন্দর্য্যে সকলেই বিমোহিত। সৌন্দর্য্যের জন্ত কেহ কেহ ইহাকে স্বর্গীয় পুষ্প (flower of paradise) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমাদের এই নিম্নপ্রদেশ ইহার চাষের উপযোগী নহে। পার্শ্বত্যা অঞ্চলেই ইহাদের চাষ করিতে হয়। ইহারা নানা-জাতীয়। নিম্নপ্রদেশে শীতকালে সবুজ-গৃহে (green-house) দুই এক জাতের চাষ হইতে পারে। কিন্তু স্থায়ী হয় না, বর্ষাকালে মূল পচিয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ইহাদের পরমবৈরী। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে, পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে, কুমায়ুন, দেরাদুন, মুসৌরী, কাশ্মীর ও নীলগিরির কাছে ইহাদের কোন কোন জাতের চাষ হয়। ইমোরোপের প্রায় সকলদেশেই ইহা জন্মিয়া থাকে। কাশ্মীরে ও পারস্য দেশে ইহার প্রচুর চাষ হয়। এই চাষ খুব লাভজনক।

শরৎ ব্রহ্ম

(১৩২)

চীনা-বাদাম-চাষ

চীনা-বাদাম (arachis hypogaea) মাদ্রাজ প্রদেশেই খুব বেশী পরিমিত জায়গায় চাষ করা হয়। বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলাতেও বর্তমানে খুব চাষ হইতেছে। সবরকম মাটিতেই ইহার চাষ হইতে পারে। তবে নিম্ন জমিতে সুবিধা হয় না। এঁটেল মাটিতে (argillaceous soil) চাষে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এবিষয়ে কোন পুস্তক বাংলায় নাই।

Leaflet No. 1 of 1916. Agriculture Department, Bengal ও প্রবাসী, ১৩২৫ সাল, ২য় খণ্ড—চীনাবাদাম, ৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শরৎ ব্রহ্ম

(১৩৩)

“ব্যায়াম-শিক্ষার বিদ্যালয়”

ভারতবর্ষে ব্যায়াম-শিক্ষার প্রধান বিদ্যালয় বাঙ্গালোরে (Bangalore)। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ—অধ্যাপক কৃষ্ণরাও। ইনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি বাঙ্গালোরে বহু ছাত্রকে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন ও ভারতে প্রত্যেক দেশের যুবকদিগকে চিঠিপত্রের সাহায্যে উপদেশ ও ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তারিত খবর সহজ জানিতে পারিবেন।

Prof. M. V. Krishna Rao,

Director of Physical Culture Institute,

P.O. Basavangudi,

Bangalore city.

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

বাঙ্গালার বিখ্যাত বলা (আমারার ভূতপূর্ব সিভিল সার্জন) কাপ্তেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আই, এম, এস, মহাশয়, সম্প্রতি ১০১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় একটি ব্যায়াম-শিক্ষা-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

বরোদার ‘শ্রী জুয়াদাদা ব্যায়াম-মন্দিরে’ সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রফেসর মাণিক রাও এই ব্যায়াম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এই ব্যায়াম-মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, এখানে ভারতবর্ষের নিজস্ব ব্যায়াম-পদ্ধতি এবং ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ব্যায়াম-পদ্ধতি—এই দুই প্রকারের ব্যায়াম-পদ্ধতিই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে যদি কাহারও জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি এই বৎসরের (১৯২৩) গত মার্চ মাসের ওয়েলফেয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত, An Institute of Physical Culture নামক প্রবন্ধটা দেখিতে পারেন।

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

(১৪০)

পীঠস্থান

“অটহাসে চৌঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।

বিবেশো ভৈরবস্ তত্র সর্বাভিষ্টপ্রদায়কঃ।”

উদ্ধৃত পীঠমালার শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভৈরবের নাম বিবেশ,

দেবীর নাম ফুল্লরা। প্রশ্নকর্তা কিন্তু কেতুগ্রাম-অটহাসের ভৈরবের নাম বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত ভৈরবের স্তোত্র তন্মোক্ত ভৈরবের নাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তন্মোক্ত ভৈরবই প্রামাণিক বেশী। সুতরাং বিংশ-ভৈরব যেখানে আছেন, সেই স্থান কখনই পীঠস্থান হইতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত ভৈরব কোন্ গ্রামে অবস্থিত আছেন? উহার গীমাংসার একমাত্র উপায়—গাঁগারা তীর্থভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের তত্ত্বৎ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ-সমুদয় পাঠ করা বা তাঁহাদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা। তাই আমি ঐকম্প এক ব্যক্তির “তীর্থবিবরণ” হইতে দেখাইতেছি যে, লাভপুর গ্রামেই মহাপীঠ অবস্থিত। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—“লাভপুর গ্রামে সতীর ওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরবের নাম বিশেষ। লাভপুর লুপলাইন-আমুদ-পুর স্টেশন হইতে ৭ মাইল ব্যবধান।”—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত “বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ।” ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, লাভপুরেই পীঠস্থান অবস্থিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৪১)

“কুস্তি শিক্ষার পুস্তক”

একজন বিখ্যাত আমেরিকান কুস্তিগিরের পুস্তকের নাম ও কাথার পাওয়া যায়, नीচে দিলাম।

“Wrestling Guide” by Hakensmith and Jenkin.

(i) S. Roy & Co., 11-1 Esplanade, Calcutta.

(ii) Thacker Spink & Co., Calcutta.

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

কুস্তি সম্বন্ধে একখানি ইংরেজী বইএর নাম—

Handbook of Wrestling by Hugh F. Leonard. শ্রীযুক্ত

পূর্ণচন্দ্র রায়ের ‘স্বাস্থ্য ও শক্তি’ নামক পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় ছ’এক কথা লেখা আছে।

মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন শাহ জাদুপুৰী

(১৪২)

প্রপিতামহের সম্বোধনবাচক বাংলা শব্দ

আজকাল বাঙ্গালীর প্রপিতামহকে সম্বোধন করার বালাই বড় নাই; কাজেই সম্বোধন-পদেও উদ্দেশ্য পাওয়া ভার। আমরা প্রাচীন লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে প্রপিতামহকে “বড় বাপ” বা “বুড়া ঠাকুরদাদা” বলিয়া সম্বোধন করা হইত।

শ্রী মনোমোহন বায়ও

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নন্দাস

পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে প্রপিতামহকে “পো-বাবা” ও প্রপিতামহীকে “বি-মা” বলিয়া সম্বোধন করে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে প্রপিতামহকে “তাই মহাশয়” বলিয়া সম্বোধন করা হয়, এবং তৎপত্নীকে ‘মাইমা’ বলিয়া ডাকা হয়।

শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সবস্বতী বিজ্ঞানভূষণ

শ্রীমতী শ্রীতিকর্ণা দত্ত-জায়া

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র দেবশর্মা চক্রবর্তী

অ’দের দেশে (?) প্রপিতামহকে “পো-মহাশয়” বলিয়া ডাকা হয়।

শ্রী হোমেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

প্রপিতামহকে মেদনীপুরের দক্ষিণ’কলে ‘বুড়া বাবা’ বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

(১৪৪)

মাকাতার আমল

মাকাতা সত্যযুগের একজন অতি পরাক্রমশালী সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি। “মাকাতার আমল” বলিলে বহু প্রাচীন কাল বুঝায়। কাজেই লোকে বহুকাল হইতে কোন কিছু বলিয়া বা কথিয়া আসিতেছে একুপ বুঝাইতে হইলে “মাকাতার আমল” বলিয়া থাকে।

গচিহাটা পাব্লিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ

মাকাতা অতিপূর্বকালের রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্বেও আরও অনেক রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার নামই অতি প্রাচীনতমোক্ত হইয়াছে কেন? আশ্রয় মনে হয় মাকাতার জন্মই তাঁহার কারণ। তাঁহার জন্ম একটু অদ্ভুত রকমে, এবং তিনি সাতিশয় প্রবল পবাকান্ত হইয়া ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলেন। প্রভুতদক্ষিণ যজ্ঞাদি করিয়া অবশেষে ইন্দ্রের আক্রমণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি-সাতিশয় শাসন দ্বারা এক দিনেই সমাগরা ধরা পড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।

মাকাতা ইক্ষ্বাকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যুবনাথ। তিনিও ত্রিদিক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন; তথাপি তাঁহার কোন সন্তান জন্মল না। তখন তিনি অমাত্যের উপর বাজাতার অপরাধ করিয়া যথাস্থানে সংযত হইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একদা বাত্রিতে উপবাস-ব্রতের সাতিশয় কষ্ট ও পিপাসায় শুষ্ক হইয়া ভূভূমণ্ডির আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ শাসিনীতে মহাত্মা ভৃগুনন্দন মহাবাজ যুবনাথের পুর-নিমিত্ত এক যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞস্থলে কলসের মধ্যে মন্ত্রপূত সলিল রাখিয়াছিলেন। বাজাহিনী কলস জল পান করিয়া শক্রহুলা পুত্র প্রসব করিবেন, মহর্ষিগণ এই স্থির করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর ঐ কলস সংস্থাপনপূর্বক অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রা ঘাইতেছিলেন। পিপাসাসুক্ষক নরপতি যুবনাথ বাবংগার অতি উচ্চৈশ্বরে জল চাহিলেন। শুষ্ককণ্ঠ হওয়ায় তাঁহার শব্দ অস্পষ্ট ছিল, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। তার পর জল অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি সেই যজ্ঞবেদীস্থ কলসের মন্ত্রপূত শীতল জল পান করিয়া পবিত্র লাভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভার্গবাদি মূনিগণ জাগরিত হইয়া কলস জলশূন্য দেখিতে পাঠিলেন। যুবনাথ সেই জল পান করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, “আপনি অতি কঠোর কাজ করিয়াছেন, এবং উহার ফলভোগ আপনাকেই করিতে হইবে। নিষিদ্ধ মনিবাণ্য। আপনিই তপোবলসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন। উহার অক্ষথা হইবে না।” মহর্ষিগণ মহাবাজ যুবনাথের কাল নিমিত্ত বিধিযত ব্যবস্থা করিলেন। শতবৎসর পরে মহাগাল যুবনাথের বাম পাশ ভেদ করিয়া সূর্য্যাসম প্রভা-সম্পন্ন মহাত্মা এক রম্য বহির্গত হইল। তৎপর ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বালকের পানের নিমিত্ত নিজেই প্রদেশিনী বালকের মুখে দিয়া বলিলেন “মাং ধামাদি” আশ্রয় এই প্রদেশিনী বস পান করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। এই নিমিত্ত দেবগণ তাঁহার নাম মাকাতা রাখিলেন।

এই রাজা মাকাতার জন্ম পুরুরের উদবে হইয়াছিল। যুবনাথই তাঁহার পিতা ও মাতা। তিনিও অতি প্রাচীন কালের ত্রিভুবনবিজয়ী মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য জন্মের জন্মই এবং এইপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা যেই সময় ঘটে সেই

সময় অতীত প্রাচীন কাল বলিয়াই এবং কোন একটি ঘটনার পুরাতনত্ব বুঝাইতে হইলেই লোকে মাক্ততার আমল বলিয়া থাকে।

কালী সিংহের মহাভারতের বনপর্বের ষড়বিংশত্যাধিক-শততম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র দেবশর্মা চক্রবর্তী

কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে—

আদিপুরুষের নাম হইল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পুত্র তিন জন।
ব্রহ্মা হইতে উদ্ভব সকল চরাচর।
পুত্র তাঁর জন্মিল মরীচ গুণধর।
মরীচের নন্দন কণ্ঠপ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য ইহা বিদিত সংসারে।
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু তাঁর খ্যাতি।
মনু হইতে জন্মিলেক বহু নরপতি।
ইক্ষ্বাকু, মাক্তাতা, হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।

যোগীন্দ্র বসু বি-এ, সম্পাদিত রামায়ণ, ৫ম পৃঃ

আর হর্ষচরিতে আছে :—

ভরতাজ্জুন-মাক্তাত-ভগীরথ-যুধিষ্ঠিরাঃ।
সগর-নহষণ-ঐচব সপ্তৈতে চক্রবর্তিনঃ ॥

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে মাক্তাতা অতি প্রাচীন রাজা। তাহার পূর্বে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা আব কেহ হন নাই। মাক্তাতাব প্রাচীনত্ব এবং প্রবল পবাক্রম হইতেই প্রবাদবাক্যেও উৎপত্তি।

শ্রী বিবজানাথ ভট্টাচার্য্য

(১৪৬)

সবচেয়ে বড় গাছের পাতা

আমাদের দেশের কলা-গাছের পাতাই উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পাতা। ভিক্টোরিয়া রেজিয়া নামক বিখ্যাত পদ্মপত্রের দীর্ঘতম ব্যাস ১৫ ফুট বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রী সুনীলকুমার ঘোষ দস্তিদার

যতদূর জানা গিয়াছে ভিক্টোরিয়া রেজিয়ার পাতা অপেক্ষা বড় পাতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। ইহার পাতার ব্যাস ১২ ফুট পর্যন্ত হইতে শোনা গিয়াছে। ফুলও প্রায় ১ ফুট—১।০ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়।

আমাদের দেশে এইপ্রকার এক জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম “কাঁটা-পদ্ম” (Euryale Ferox)। পূর্ববঙ্গালায় এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অপেক্ষা বড় পাতা ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দীর্ঘতম ব্যাস প্রায় ২।০ ফুট পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিক্টোরিয়া রেজিয়া কিংবা “কাঁটা-পদ্ম” পাতা উভয়ই গোলাকাব। “কাঁটা-পদ্ম” গাছ শিবপুর বোটা নিক্যাল গার্ডেনে আছে।

শ্রী হীরেন্দ্রনাথায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

(১৪৭)

“কোন কাতে শোওয়া উচিত”

ডুইজন বিশেষজ্ঞের মত নিম্নে দিলাম।

Prof. M. V. Krishna Rao, Director, Physical C. Institute, Bangalore, বলেন—“The posture of the body has much to do with obtaining sound, healthy sleep. A person should not lie in a curled-up, cramped

position, and never on the back. The right side is the most suitable to repose upon, because when the body is in that posture the stomach is enabled to gravitate the food more rapidly into the intestines ; also the liver does not press so heavily upon the top of the bowels.

Prof. Mohun C. R. D. Naidur “Handbook to Health Chart and The Coming Man” পুস্তকে লেখা আছে—Do not sleep on your back. To prevent this habit put a small stone in a towel and tie it to the back. Sleep inclining on the left side and rise from opposite side.

নিগমানন্দস্বামীর “যোগীন্দ্র” পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায়, যে কোন্ কাতে শোওয়া উচিত ও তাহার ফল কি হয়।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

বাম কাতে শোওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অমুকুল এবং উহাই বিজ্ঞান-সম্মত। উহার কারণ এই :—উদরের ডান পার্শ্বে গ্ৰীহা এবং বাম পার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত। যকৃৎ পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। উহা হইতে একপ্রকার পাচক-রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহার ফলে, হজম-ক্রিয়া অতি সহজেই সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু গ্ৰীহাতে তাদৃশ ক্ষমতা বর্ধমান নাই। তদবস্থায় উহাকে ভুক্তদ্রব্য দ্বারা আরও ভারাক্রান্ত করিলে, পরিপাক-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মিয়া স্বাস্থ্যের অবিষ্ট হইতে পারে। উহাকে খালি রাখাই যুক্তিযুক্ত। একারণ ডান পার্শ্বে শয়ন করা বিজ্ঞানসম্মত নহে ; বাম পার্শ্বে শয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহার ফলে ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। অধিকন্তু গ্ৰীহাতেও তখন আব কোন চাপ পড়িতে পাবে না।

উপরোক্ত কারণ ভিন্নও আর-একটি কারণে বাম কাতে শোওয়া সম্ভব। যোগশাস্ত্রমতে নাড়ী ৩টি—পিঙ্গলা (ডান-নাক—উহার এক নাম সূর্য্য) ঈড়া (বাম-নাক—চন্দ্র) ও সুষুম্না। দিবাভাগে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে। উহার সহিত পাকস্থলীর ঘনিষ্ঠ সংসর্গ। একারণ ডান-নাসিকা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবার কালে আহাৰ করিলে সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। রাত্রিকালে ঈড়া দ্বারা (বাম নাক) শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে। ঐ সময়ে বাম-কাতে শুইলে ভুক্ত-দ্রব্য সহজে পরিপাক হইয়া অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। একারণ বাম কাতে শোওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৪৯)

বৌদ্ধ

বৌদ্ধ

একশত অধিবাসীর মধ্যে

বৌদ্ধের সংখ্যা

ব্রহ্মদেশ	১১২০১২৪৩	৪৫.০৬
বঙ্গদেশ	২৬৫৬.৪	.৫৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৫.৫	
যুক্ত প্রদেশ	৪৮৮	
পাঞ্জাব	৩২৩.০	.০২
মধ্যপ্রদেশ ও বিহার	২৮	
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ	.	
বেলুচিস্তান	১৬.০	.০৪

বৌদ্ধ	একশত অধিবাসীর মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা	(১৫০) ইক্ষুর পোকা
মাদ্রাজ	১২১৬	
বোম্বাই	১৮০৬	০.১
আসাম	১৩১৬২	০.১৭
আজমীর মাদ্রাস	১	
দিল্লী	৬	
কুর্গ	১৪	০.১
আন্দামান নিকোবর	২৬৫২	২.৭২
মোট ব্রিটিশ ভারতবর্ষ	১১৪২০৮১৫	৪.৬৫
দেশীয় রাজ্য		
আসাম—মণিপুর	৩৫৮	০.৯
বড়োদা	১	
বাংলা দেশীয়-রাজ্য	১০১৫৫	১.১৩
বিহার ও উড়িষ্যা	১২৪৩	০.৩
বোম্বাই	৪৪	
মধ্যভারত	১০	
হায়দ্রাবাদ	১০	
কাশ্মীর	৩৭৬৮৫	১.১৪
মাদ্রাজ দেশীয়-রাজ্য	৪২	
মহীশূর	১৩১৯	০.২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১১৬	০.২১
পঞ্জাব	২৬৮২	০.৬
সিকিম	২৬৭৮৮	৩২.৭৮
মোট দেশীয়-রাজ্য	৮০৪৫৩	১.২
ভারতবর্ষে মোট বৌদ্ধ	১১৫৭১২৬৮	৩.৬৬

বৌদ্ধ	প্রতি ১০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধি	শতকরা
১৯০১ সালে	৯৪৭৬৭৫৯	৩২২
১৯১১ " "	১০৭২১৪৫৩	৩৪২
১৯২১ " "	১১৫৭১২৬৮	৩৬৬
বৌদ্ধ বিধবার সংখ্যা		৬৭২২১৩

ব্রহ্মদেশ বাদে ভারত-সাম্রাজ্যে ষত বৌদ্ধের বাস তাহার শতকরা ৭৪.৬ জন বাংলা দেশে বসে করে। বাংলা প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট বৌদ্ধের সংখ্যা ২৭৫৭৫৯; ইহার মধ্যে পুরুষ ১০৪৬৫৯, স্ত্রী ১৩৫১০০।

১৮৮১ সালে বাংলা দেশে ১৫৫১০২,
১৮৯১ সালে ১৯৩৬৪৫,
১৯০১ সালে ২১৬৫০৬,
১৯১১ সালে ২৪৬৮৬৬ বৌদ্ধের বাস ছিল।

গত চল্লিশ বৎসরে বাংলা দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা শতকরা ৭৭.৮ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কোন্ বিভাগে কত বৌদ্ধের বাস তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

বর্ধমান বিভাগ	১৬২	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৯৩২৬৮
প্রেসিডেন্সি	৩৬৬৮	কুচবিহার	৮
রাজসাহী	৫২১০৪	ত্রিপুরা রাজ্য	১০১৪৭
ঢাকা	১০৪০২		

শ্রী রামানন্দ কব

কেরোসিন তেল দ্বারা যে-কোন পোকা নষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু অমিশ্র কেরোসিন অত্যন্ত উগ্র বলিয়া ইহাতে গাছের পাতা মরিয়া যায়। এইজন্য উহাকে জল ও সাবানের সহিত মিশাইয়া ক্ষীণ করিয়া লইতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থকে ইংরেজীতে Kerosene emulsion কহে। উহা ষাণ কীটদষ্ট গাছেব গোড়া ভিজাইয়া দিলে নিশ্চয়ই কীট নষ্ট হইবে। প্রস্তুত-প্রণালী।—অন্ধ পাউণ্ড বার-সাবান ১ গ্যালন জলের সহিত ফুটাইয়া আঙুনের উপর হইতে নামাইয়া উহাতে ২ গ্যালন কেরোসিন তেল ঢালিয়া একটি কাঠি দ্বারা খুব নাড়িয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লও। ইহার ১ ভাগের সহিত ৬—১০ ভাগ জল মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।

গচিহাটা পাব্লিক লাইব্রেরীর সভাপণ

১। ইক্ষু কাটিবার পর ভূমিতে যে পাতা ও অগ্ন্যস্ত্র জিনিস পড়িয়া থাকে, তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিয়া পরে আঙুন দ্বারা পোড়াইয়া দিলে সেই জমিতে কখনও পোকায় উপস্থব হইবে না। তাৎক্ষণিক জমিতে ইক্ষুর ফলন অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে।

২। জমিতে কীড়া-জাতীয় পোকা জন্মিলে, মাটি হইতে ঐ পোকা উঠাইয়া কেরোসিন-মিশ্রিত জলে ফেলিয়া রাখিলে পোকা মরিয়া যায়। ইহাতে অশুবিধা হইলে, মিশ্রিত জল জমিতে ছিটাইয়া দিবে। কীড়া স্তম্ভপোকায় পরিণত হইবার পূর্বে আলকাৎরা দ্বারা ডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত।

৩। চূনের জল, কেরোসিন-মিশ্রিত জল, তামাক-পাতা-ভিজান জল, ফিটকারীর জল বা ছকার বাসী জল জমিতে ছিটাইয়া দিলে, সেই জমিতে আর পোকা থাকিতে পারে না। পোকা মরিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত জল ইক্ষু গাছেব পাতায় ছিটানও একান্ত আবশ্যিক।

৪। ভূঁতের জল ও কপূরের জল ছিটাইয়া দিলেও পোকা মরে।

৫। পোকা-ধরা পাতা ও ডাঁটায় তামাকের গুল-ভিজান জল সহ সামান্য কপূর ও সাবানের জল মিশাইয়া লাগাইলে পোকায় উৎপাত নিবারিত হয়।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৫২)

মাখন রক্ষা করার উপায় কি ?

১। মাখনের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে, সহজে নষ্ট হইতে পারে না। মাখনের পরিমাণ যাহা হইবে, লবণের পরিমাণ তাহার তিন ভাগের এক ভাগ হওয়া চাই। পাত্রে মাখন এমনভাবে রাখিবেন—যাহাতে মুগ হইতে ১ ইঞ্চি স্থান খালি থাকে। তাহার পর, ঢাকনির দ্বারা মুগ ভালরূপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

২। বহুদিন হইল, একখানি বহিতে দেখিয়াছি, টিনের মধ্যে মাখন রাখিতে হইলে, উহাতে মাখন রাখিয়া উপরে কিছু Tartaric Acid ও সোডা-মিশান জল ঢালিয়া মুগটি ঝালাই করিয়া রাখিলে, শীত নষ্ট হয় না।

৩। একটু কড়া গরম রাখিলেও ভাল থাকিতে পারে।

শ্রী বমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মাখনের সঙ্গে খানিকটা লবণ মিশাইয়া ঠাণ্ডাজলে রাখিলে কুডি-বাইশ দিন পর্যন্ত ভাল থাকিবে। মাঝে মাঝে জল বদলাইতে হয়। পূর্ব বৈশ্যদিন রাখিবার প্রয়োজন হইলে, টিনের পাত্রে কিম্বা এইরূপ সুবিধামত পাত্রে, ভালরূপে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া রাখিলে বহুদিন পর্যন্ত থাকিবে। পরীক্ষিত।

শ্রী শোভারানী রায়

২ ভাগ লবণের সহিত একভাগ চিনি ও একভাগ সোরা মিশ্রিত করিবে। ইহাতে মাখন-দিলে-থাবাপ হয় না। এক পাউণ্ড পরিমিত মাখনে ১ আউন্স উক্ত দ্রব্য দিবে। মাখনে ছুগন্ধ হইলে ১ ড্রাম সোড়া তাহাতে দিবে।

একটি টিনে মাখন, টিনের উপরে এক ইঞ্চি স্থান খালি রাখিয়া, পূর্ণ করিবে। তাহার উপর বাজাবেব গুড়া লুনে পূর্ণ করিয়া একটি টিনের ঢাকনিতে উত্তমরূপে মুগ বন্ধ করিয়া গালাব মোচন করিবে। ইহা বহুদিন মাখন টাটকা রাখিবার সহজ এবং মূলভ উপায়।

টাটকা মাখন লইয়া কাপড়ে নিংড়াইয়া যতদূর সম্ভব মলশূন্য করিবে। পরে মাখনগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটি কাচের বোতলে ঠাসিয়া উপরে কপু দিয়া মোমে বন্ধ করিবে। একটি জলপূর্ণ হাঁড়িতে উক্ত বোতল রাখিয়া অগ্নিতাপে জল ফুটাইয়া লইবে। এই উপায়ে মাখন ছয়মাস টাটকা থাকে।

শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দাস

(১৫৩)

সাদা জীবাব চাষ

বেহার অঞ্চলে সাদা জীরার চাষ হয়। আমি কয়েক বৎসর পূর্বে সাদারাম হইতে কোনও বন্ধুবন্ধবা জীবাব বীজ সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিয়াছিলাম। নিয়মতন্ত্রের আদর্শতা বহু পাছ তেমন ঝড়াল ও অধিক-ফলপ্রদ হয় নাই। মৌনী, ধ'নে, রূপনী প্রভৃতিব ত্রায় ইহাব বীজ কান্তিক মাসে বপন করিতে হয়; আবাদ-প্রণালীও এই-সমস্ত ফসলের অনুরূপ। দোকানে যে সাদা জীবাব পাওয়া যায় তাহা অধিক হয় না। বীজ-জীরার দাম বাজারে বিক্রীত জীবাব দাম অপেক্ষা তেমন বেশী নয়। শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে আবাদ করিলে উহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ কবণ

বৃহৎ প্রদেশের আত্রা জেলায় সাদা জীরাব চাষ হয় এবং বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় আমদানী হয়। চেষ্টা করিলে আত্রা জেলায় সাদা জীরার বীজ পাওয়া যায়।

শ্রী রামানুজ কর

(১৫৪)

চালের পোকা

১। চা-খড়ির গুড়া চালের সাথে মিশ্রিত করিয়া রাখিলে চালে পোকা ধরার ভয় থাকে না। দোকানদার অথবা যাহারা রাগী কারবার করে তাহারা এইভাবে সস্তা দামা চাল রাখিয়া পুণ্যতন করিয়া থাকে।

২। চালের সাথে নিমপাতা মিশাইয়া রাখিলে পোকা ধরে না।

৩। চালের ভিতর রসুন রাখিয়া দিলেও পোকায় হাত হইতে চাল রক্ষা করা যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে গৃহস্থগণ সহজে চাল রক্ষার উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ ও
শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া

১। চাউলের সঙ্গে ছাই মিশাইয়া রাখিলে তাব পোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকে না।

২। ফিটকারীর জল, চূনের জল, কপূরের জল বা হরিদ্রার জল চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে, কখনই সেই চাউলে পোকা ধরিতে পারে না।

৩। সপ্তাহে একবার করিয়া চাউল রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যিক।

৪। যে হাঁড়িতে চাউল রাখা হয়, সেই হাঁড়ির তলায় প্রথমে কয়েকটা নিম-পাতা দিয়া চাউল রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে চাউলের মধ্যেও ২১টা করিয়া পাতা দিতে হইবে। তাহার পর হাঁড়ির মুখটি ভালরূপে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে পোকায় আক্রমণ নিবারিত হয়।

৫। কুলা দ্বারা চাউলের কুঁড়া খুব ভালরূপে ছাড়াইয়া রাখিলে, পোকায় আশঙ্কা কম থাকে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রী কমলকামিনী দেবী

চাউল ভাল করিয়া ঝাড়িয়া তাহার সহিত নিমপাতা মিশাইয়া কোনও পাত্রেব ভিতর বায়ুশূন্য-ভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে বাহিরের সহিত কোনওপ্রকার সংশ্রব না থাকে। তাহা হইলে চাউলে আর পোকা লাগিবে না। কিন্তু প্রতিবৎসর একবার করিয়া রৌদ্রে দিয়া মুগ বন্ধ পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সরকার

চাউল উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বড় বড় মাটির জালায় কিংবা বাঁশের পাত্রে (বাঁশের পাত্র হইলে গোবর দ্বারা লেপিয়া লইতে হইবে) রাখিয়া উপবে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া ছাই ছড়াইয়া রাখিলে ইহার ভিতর পোকা প্রবেশ করিয়া চাউল নষ্ট করিবার আর কোনই আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ, কোন পোকায়ই নিশাস লইবার জন্য নাক নাই; শরীরেব দুই পার্শ্বে ছোট ছোট কতকগুলি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি দ্বারাই উহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাণ্ড চলে। ছাই কিংবা অন্ত কোন পৃথক পুঁড়ায় এই ছিদ্রগুলির মুখ বন্ধ হইয়া গেলে শরীরের ভিতর বায়ু চলাচল করিতে না পারাতে পোকা মরিয়া যায়। শাকসব্জীর গাছে পোকা ধরিলে ছাই ছড়াইয়া দেওয়ারও ইহাই অর্থ। চাউল বাহির করিবার সময় উপব হইতে আস্তে আস্তে ছাইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই চলিবে।

শ্রী মনোমোহন রায় ও

শ্রী গৌরচন্দ্র মমদাস

চাউল বা অন্যান্য শস্য অনেকদিন পোকায় অত্যাচার হইতে বাচাওয়া রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত। যথা—

১। গোলাজাত করিবার পূর্বে ২৩ দিন খুব শক্ত বোধ লাগাইতে হইবে।

২। গোলায় তুলিবার পূর্বে দেখিবে যে তাহাতে কোন আংজনা বা অন্ত কোনরূপ শস্ত নাই, যাহার ভিতর পোকা লুকাইয়া থাকিতে বা জন্মিতে পারে।

৩। পোকাধরা শস্ত বদাচ গোলায় রাখিবে না। কারণ একটী মাত্র পোকা হইতে উহার বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে যে অল্পকালের মধ্যে গোলার সমস্ত শস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

৪। গোলা-ঘরের চতুর্দিক উত্তমরূপে আঁটা হওয়া উচিত; নচেৎ অন্ত্র হইতে পোকা আসিয়া শস্যে প্রবেশ করিতে পারে।

৫। চাউলের সহিত চুন, সফেদা ইত্যাদি মিশাইয়া রাখিলে পোকা ধরিতে পারে না।

৬। গোলা হইতে চাউল মাঝে মাঝে নামাইয়া রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

৭। কার্বন-বাইসাল্ফাইড নামে একপ্রকার বিষাক্ত উগ্র আয়ক আছে, ইহা খোলা থাকিলে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। পোকাধরা শস্যে এই বিষাক্ত বাষ্প লাগাইলে সমস্ত পোকা এমন কি পোকায় ডিম থাকিলে উহাও নষ্ট হইয়া যায় অথচ উহাতে শাস্ত্রের কোনই হানি

হইবে না। চারিদিক আঁটা একটি ঘর বা পাতে শস্ত ঢালিয়া এই বাষ্প ২৪ ঘণ্টা কাল বন্ধ রাখিতে হইবে। ১৫ ঘন-ফুট পাতে বাষ্প যোগাইতে ১ আউন্স আঁকের দরকার। কিন্তু কার্বন-বাই-সাল্ফাইডের বাষ্প নামান্য আঁগুনের স্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। আলো, জ্বলন্ত চুরট, সিগারেট বা অন্য কোন-প্রকার আঁগুন লইয়া সেখানে গেলে বিপদ হইতে পারে, কাজেই এসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা লওয়া উচিত।

গচিহাটা পাল্লিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ
(১৫৫)

মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষেধ

খাদ্যাদ্য সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় বাক্য আছে, তাহাতে ত্রিপিভেদে ও মাসাভাদে খাদ্যাদ্য বিচার আছে। শরীরবর্ধন হইতে এই-সমস্ত বিধি-নিষেধ। তার পব মাঘ মাসে মূলা পরিপক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে মূলা স্বাদ পূর্ববৎ থাকে না। এই সময়ে মূলা খাইলে অন্নবোগাদি জন্মে। পরিপক মূলা খাইলে তাহা পরিপাক করা কষ্টকর হয়। আরও বিশেষ কারণ এই যে এই সময়ে মূলা খাইলে মূলা বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিতে পারে না। তাই শরীরে মূলের আশায় এই পরিপুষ্ট ও পরিপক মূলা ভক্ষণ না করাই লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি। মাঘ মাসে মূলা খাওয়ার প্রথা থাকিলে বিক্রয়-কারীরা অর্থ পাওয়ার আশায় ভাল ভাল মূলা বিক্রয় কবিধা ফেলিত আর অকর্মণ্য ও পাপাণ্ড গাছেব বীজ রাখিত। ইহাব ফলে আগামী বৎসরে ভাল মূলা হইতে পাবিত না। পুষ্ট গাছের বীজ হইতে যে গাছ জন্মে, তাহা ভাল হয়, আর অপুষ্ট গাছেব বীজে খারাপ ফসল জন্মে। ইহা সকল শস্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এবং ইহা কৃষিবিজ্ঞান-সম্মত কথা।

শ্রী প্রকল্পচন্দ্র দেবগর্ভা চক্রবর্তী

(১৫৬)

ছাপান্ন গাঁই

ক। শাণ্ডিল্য গোত্রে (ভট্টনারায়ণ-বংশ) সোলটি গাঁই, যথা—বন্দ্য, কুসুম (বা কুসুমকুলী), দৌর্ভাঙ্গী, নোসালী, বটব্যাল, পরিহা (বা পারি), কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সৈয়ক (বা সৈক), গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাস (বা মাসচটক), বহুয়ারি ও করাল।

খ। কাশ্যপ গোত্রে (দক্ষ-বংশ) সোলটি গাঁই, যথা—চট্ট, অমুলী (বা আমরুলিক), তৈলবাটী, পোড়ারি, হড় গুড়, কুরিঠাল, পাকড়াশী, পুনলী, মূলগ্রামী, কয়ারী, পলশারী, পীতম্ভু, সিমলায়ী, ভট্ট ও পালধি।

গ। সাবর্ণ গোত্রে (বেদগর্ভ বংশ) বারটি গাঁই, যথা—গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দী, ঘণ্টা, কুণ্ড, সয়ারিক, সাটো, দায়ী, নায়ী, পারী, বালী ও সিদ্ধল।

ঘ। বাৎস্ত গোত্রে (ছান্দড়-বংশ) আটটি গাঁই, যথা—কাজ্জিবিম্বী (বা কাজ্জীলাল), মহিস্তা, পুত্ৰিতুণ্ড, পিপলাই (বা পিপলী), ঘোষাল, বাপুলি, কাজ্জারী ও শিমলাল।

ঙ। ভরদ্বাজ গোত্রে (শ্রীহৃদ-বংশ) চারিটি গাঁই, যথা—মুখটি, ভিণ্ডী (বা ডিংসাই), সাহরী ও রায়ীগাঁই।

১৬ + ১৬ + ১২ + ৮ + ৪ = ৫৬।

(১) শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি পাঁচটি গোত্রীয় বন্দ্য, চট্ট, মুখটি প্রভৃতি ছাপান্ন গ্রামীণ ব্রাহ্মণগণের বংশধর ভিন্ন নিষ্ঠাবান্ সদ্ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে নাই—শ্লোকটির সোজাহুজি অর্থ যদি এই হয় তাহা হইলে বারেন্দ্র বৈদিক ও সাতশতী, বঙ্গদেশে প্রচলিত এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে পড়েন না। সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক যজ্ঞকর্মণ

অপারগ বলিয়া নিস্তেজ ব্রাহ্মণরূপে সমাজে গণ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের নাম এ গ্লোকে বাদ পড়িবারই কথা। শ্লোকটি যখন রচিত বা প্রচলিত হইয়াছিল তখন বৈদিকগণ বোধহয় এদেশে আসেন নাই কিংবা অল্পদিন মাত্র আসিয়াছেন, তখনও উপনিবেশিকরূপে পরিগণিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের নামোল্লেখ না থাকা বিশেষ দোষের নহে। কিন্তু বারেন্দ্রগণের নাম এগ্লোকে না থাকা বড় আশ্চর্যের বিষয়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ যে বংশে জন্মিয়াছেন তাঁহারাও সেই বংশের সম্মান, রাঢ়ীয়গণের যে যে গোত্র তাঁহাদেরও সেই সেই গোত্র আছে, তবে তাঁহাদের গাঁইগুলি পৃথক্। ঠাঁদিপুর কাঞ্চকুড় হইতে যে পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে প্রত্যেকেব একটি করিয়া সহোদর ভ্রাতা ও একজন করিয়া কাঞ্চকুড় গ্ৰাম আসিয়াছিলেন। বারেন্দ্রগণ সেই ভ্রাতা পাঁচটিব বংশধর। যাজ্ঞিক পঞ্চ-ব্রাহ্মণের বংশধরগণ যেমন রাঢ়ে রাজদত্ত গ্রাম পাঠিলেন, তাঁহাদের পাঁচজনের পাঁচ ভ্রাতার বংশধরগণও তেমনই বেবেন্দ্রভূমে রাজ-সকাশ হইতে গ্রাম পাঠিয়াছিলেন। রাজদত্ত পৃথক্ গ্রামের নামে বাবেন্দ্রগণের পরিচয় হইল। সুতরাং বারেন্দ্রগণের গাঁইগুলি রাঢ়ী ছাপান্ন গাঁইএর অতিরিক্ত হইলেও উভয়ে একই বংশের সম্মান, ব্রাহ্মণ্যে অধিকার উভয়েরই সমান।

ঢালিমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় স্মৃষ্কনির্ণয় নামক পুস্তকে এই শ্লোকটি বিবেচনিত বলিয়া গভিন্নত প্রকাশ কবিয়াছেন। মনোমালিন্ত হইলে ভ্রাতার পবম্পের কংসা করেন এ ঘটনা সংসারে বিরল নহে। রাঢ়ী ও বাবেন্দ্রগণের মধ্যে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। (স্মৃষ্ক-নির্ণয় ২১ পৃঃ)।

(২) কাঞ্চকুড় হইতে আগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পঞ্চকৈব বংশধর বলিয়া তাহারা পরিচয় দিবেন তাহাদিগকে অবশ্য অবশ্য উপরে লিখিত ছাপান্ন গাঁই মধো পড়িতে হইবে—এরূপ অর্থও কবা যায়। (সং নিঃ ২১ পৃঃ) বারেন্দ্রগণ সম্বন্ধে তাহা হইলে এ গ্লোক খাটে না, মাত্র রাঢ়ী সমাজে প্রযোজ্য। কিন্তু সেখানেও উহা প্রয়োগ করায় একটু অন্তরায় আছে।

ছাপান্ন গাঁইএর তালিকায় বাৎস্ত গোত্রে (ছান্দড় বংশ) যে আটটি গাঁইএর উল্লেখ করিয়াছি ই বংশে তাহার অতিরিক্ত পূর্বগ্রামী, চোৎখণ্ডী ও দীধল নামে তিনটি অতিরিক্ত গাঁই আছে।

ছান্দড়ের নয় পুত্র ও দুই পৌত্র ছিল। তাঁহার পুত্রেরা যখন রাজ-সকাশ হইতে গ্রাম লাভ করেন তখন একটি পুত্র ও পৌত্র-দুইজন হয় উপস্থিত ছিলেন না, না হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। উহারা তিন জন পরে রাজার নিকট হইতে তিনখানি পৃথক্ গ্রাম পাঠিয়া সেই গ্রামীণ বা গাঁই বলিয়া পরিচিত হন। (সং নিঃ কোড়পত্র ২১ পৃঃ) এই নূতন গাঁই তিনটি, ছাপান্ন গাঁই মধো পবিসংখ্যাত না হইলেও, রাঢ়ী-শ্রেণীর মধো সংযুক্ত। (সং নিঃ ২১ পৃঃ) কুলে, শীলে, মানে, মধ্যাদায় ইঁহারা পূর্ব হইতে বিদ্যমান গাঁইগুলির সমতুল্য। সুতরাং ঠিক-মত হিসাবে রাঢ়ী সমাজে গাঁই-সংখ্যা উনষাট, ছাপান্ন নহে।

সাতশতী-ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত গোত্রগুলির মধো বশিষ্ঠ ও পরাশর নামে দুইটি গোত্র আছে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের শ্রায় সাত-শতীদেবও গাঁই ছিল। কিন্তু সাংখ্যক ও বেদজ্ঞ বলিয়া রাঢ়ী-বারেন্দ্রের জনসমাজে যেকপ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল, তাঁহাদের সেরূপ ছিল না। ইহাব কারণ পূর্বের প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি।

উত্তর কালে সাতশতী কুলের যে-সকল সম্মান সর্ব্ব বিষয়ে সদৃশ-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদিগকে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ আপনাদের মধো উঠাইয়া লন। প্রথম অবস্থায় সাতজন মাত্র পরিগৃহীত হন। তাহার মধো পাঁচজন বারেন্দ্র বংশের ও দুইজন রাঢ়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন।

করিয়াছিলেন। এই নিয়মানুসারে সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা-ব্রাহ্মণের পুনরুদ্ধার করিয়া বিনয়াদি সদ্বৃত্ত-প্রভাবে কান্তকুজাগত ব্রাহ্মণ-কুলে মিলিত হইয়াছিলেন। (স: নি: ২৮৮ পৃ:)

যে দুইজন (বা ঘর) সাতশতী রাঢ়ী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া-ছিলেন, তাহারা বোধহয় বশিষ্ঠ ও পরাশর গোত্রীয় ছিলেন।

শ্লোকটি সম্বন্ধ-নির্ঘে ৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে। উহাতে শেষের লাইনে বশিষ্ঠের স্থানে সাতশতী আছে।

শ্রী সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৫৭)
প্রশ্নকীট

উক্ত কীট নিবারণের কোনও সহজ উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। উগ্রগন্ধ স্থাপ খালিন বা কর্পূর প্রভৃতি দিয়া সুফল না পাইবার কথা। কারণ কীটগুলির আণুশক্তি আছে কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে মতভেদ আছে।

পুস্তকগুলি আলমারী হইতে মাসে অন্তত একবার বাহির করিয়া

প্রত্যেকখানি কয়েক সেকেন্ডের জলও যদি ভিতরের পাতা খুলিয়া নাড়াচাড়া করা হয় তাহা হইলে কীটের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা করা যায়। কষ্টসাধ্য হইলেও ইহাই একমাত্র উপায়। যে-সব পুস্তকের রীতিমত ব্যবহার আছে তাহা পুরাতন বা পূর্ব হইতে কীটদষ্ট হইলেও তাহাতে পুনরায় কীট লাগে না। কিন্তু নূতন পুস্তকও ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলে মাস কয়েকের মধ্যেই তাহা কীট-কবলিত হয়।

আলমারীতে বন্ধ না করিয়া খোলা রাখিলে পুস্তক রাখিলে কীটদষ্ট হইবার ভয় অনেকটা কম। এটিও পরীক্ষিত।

শ্রী সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলমারীতে পুস্তক রাখিলে যে পোকা জন্মায় তাহা অনেক সময় স্থাপখালিন দিলেও নষ্ট হয় না। তবে ইহা অপেক্ষা হুল্লর একটি দেশী উপায় আছে। আলমারীতে পুস্তক রাখিয়া তাহার নীচে নিমপাতা রাখিয়া দিলে পুস্তকে পোকা ধরিতে পারে না। ইহা আমরা আমাদের দেশের লাইব্রেরীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

শ্রী হীৰেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

ঘর-মুখো

সাঁঝের আগেই কাজের ছুটি,—ভাইয়া বাজা মুরলী—
আম'ল যা আনন্দেতে বিকট 'সেরিং' জুড়লি !
গান্ থামা তুই, মুরলী বাজ', আমি বাজাই মাদলা,—
ঘর-মুখো চল, ঘর-মুখো চল,—আস্ছে নেমে বাদলা ।
বিজন-বনে বস্তু মোদের,—চল রে ছুটে' ভাইয়া—
পথ চেয়ে আজ থাকবে 'বহ', থাকবে বুড়ী মাইয়া :
সাঁঝের বাতি জালিয়ে ঘরে আকুল হ'য়ে থাকবে—
চলতে পথে করলে দেবী—ভাব্বে তারা ভাব্বে ।
হপ্তা পরে মিলল ছুটি—কয়লা-কাটা বন্ধ,
উঠ্ছে হাসির হরুরা ভীষণ, বুক-ছাপা আনন্দ ;
খোস্-মেজাজে চল মোরা, নাইক কোনো চিন্তা,—
(মাদল) তাধিন্ ধিন্, তাধিন্ ধিন্, ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ তা ।

“এতোয়ারের” ছুটি রে কাল, তাই ত এত ফুর্তি—
তাই ত এত গানের বহর,—দিল্দরিয়া মূর্তি !
পড়্বে বিজন পথের ধারে পাহাড় নদী জঙ্গলা—
ভয় কি তাতে ?—আমরা দুজন,—নান্কু এবং মঙ্গলা ।
হয়ত পথে নাম্বে বাদল, হয়ত হবে রাত্রি,
হয়ত পথে ভিজ্বে দুজন বন-গাঁ-মুখো যাত্রী ;
ডাক্বে হুঁড়ার বিকট রবে, বল্বে তারে—‘আয় না,’
মঙ্গলা মাঝি, নান্কু মাঝি—কিছুতে ভয় পায় না ।
গানের তালে চরণ ফেলে', মাদল-বাঁশীর সঙ্গে—
নাচ্বে তাধিন্—হাস্বে হো হো,—চল্বে ছুটে' রঙ্গে ;
হপ্তা পরে একটি দিবস স্বাধীন, মোরা স্বাধিন্,—
(মাদল) ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ ধিন্ তা, তা ধিন্ ধিন্, তা ধিন্ ।

শ্রী স্ননির্মল বসু



পথের সাথী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। শিশিব পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২৬৮ পৃষ্ঠা। রেশমী কাপড়ে বঁধা। দুই টাকা।

যতীন্দ্রমোহন বিখ্যাত কবি। এবার তিনি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপন্যাসটি সংক্ষেপে এই—

ললিত সপরিবারে ষ্ট্রিমারের যাত্রী। ষ্ট্রিমার চড়ায় আটকাইয়া অচল। ললিত অসহায়-প্রকৃতির লোক, তাঁর স্ত্রী উমাতারা ততোধিক। ললিত শিশুপুত্রের দুধের জন্ত ব্যস্ত হইয়া ষ্ট্রিমারে দুরিতে দুরিতে দেখিল একটি ছেলে চা-সত্র খুলিয়া চা খররাত করিতেছে। উভয়ে আলাপ এবং অভয়ের অভয় দান। ললিতের সঙ্গে তাহাব ভাগিনেয়ী মল্লিকা ছিল; মল্লিকা ও অভয়ে মিলিয়া রক্ষন উপলক্ষ্যে চিত্তবন্ধন। অভয় কর্মী ছেলে; সে বেশ সপ্রতিভ চটপটে। কলিকাতায় ফিরিয়াই অভয় দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে মঞ্চস্থলে গেল। সেখানে অভয়ের সঙ্গী অতুল একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে কুড়াইয়া আনিল, তাহার নাম রাধারাণী। তাহারা তিনজনে দুর্ভিক্ষসাহায্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপ একত্র বাসের ঘনিষ্ঠতার ফল হইল—রাধারাণী ভালোবাসিল অভয়কে এবং অতুল ভালোবাসিল রাধারাণীকে—চিরন্তন ত্রিভুজের জটিলতা। অভয় একটু কাজপাগল উদাসীন প্রকৃতির লোক, এবং একটু আয়ত্তরিতও বটে। মল্লিকা যে তাহাকে ভালোবাসে তাহা জানিয়াও তাহার উহাকে পাইবার জন্ত ব্যস্ততা ব্যগ্রতা নাই। এদিকে জগদীশ নামে একটি যুবক মল্লিকাকে পাইবার জন্ত সাধু অসাধু কোনো চেষ্টাই বাদ দিতেছে না। অভয় নিরাশ্রয় রাধারাণীকে মল্লিকাদেব বাড়ীতে আনিয়াই রাখিয়াছিল; তাহার প্রতি হিংসার দুর্বলতার এক মুহূর্তে মল্লিকা জগদীশকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু যখন জগদীশের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গেল তখন মল্লিকা নিজের ভুল বুঝিয়া নিজে উপযাচিকা হইয়া অভয়কে পত্র লিখিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ জানাইল। অভয় তখন বাড়ীতে; পত্র পাইয়াও তার ব্যস্ততা নাই; সে দুর্ভিক্ষসাহায্যের কাজে ব্যস্ত। তার পর অভয়ের মাতৃবিয়োগ হইল। যখন সে কলিকাতায় ফিরিল তখন মল্লিকা মনোভঙ্গে মৃত্যুশয্যায়; অভয়ের অবহেলা হইতে যম তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। অভয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পব মল্লিকার মৃত্যু হইল। তখন শোকাক্ত অভয় মনে করিল—যে ভুল সে একবার করিয়াছে, তেমন ভুল আর সে করিবে না—তুমু করিয়া রাধারাণীর সহিত অতুলের বিবাহ দিয়া দিল। অভয়ের হুকুম বলিয়া রাধারাণী অতুলকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিল না; এবং অতুল তা রাধারাণীকে চায় বলিয়াই রাধারাণী যে অভয়কে ভালোবাসে তাহা জানিয়াও জানাইল না। ইহাদের বিবাহের পর যখন অভয় অতুলের মুখ হইতেই জানিল যে রাধারাণী তাহাকেই ভালোবাসে, তখন তার অনুতাপের অন্ত রহিল না। এই ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত না হইলেও পুস্তকের মধ্যকার একটি প্রধান চরিত্র বিধু—সেও ললিতের বিধবা ভাগিনেয়ী। বড় ছায়া বড় মনে বড় মনে

অভয় যখন সর্ব্বহারা হইয়া পথে বাহির হইল, তখন তার পথের সাথী হইল এই দিদি বিধু।

বইখানি প্রথম-রচনা হিসাবে মন্দ হয় নাই। প্রট ভালো, চরিত্র-গুলির পরিস্ফুটনের সম্ভাবনীয়তা ছিল; কিন্তু চরিত্রগুলি পরিপূর্ণ-ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাবে রচনা একঘেয়ে লাগে, পড়িবার আগ্রহ উদ্ভিক্ত হয় না, গল্পের নিজের টানে পড়িয়া যাওয়া হয় না, ছোর করিয়া পড়িতে হয়। কবির উপন্যাসে প্রকৃতি ও হাসি একরকম বাদ পড়িয়া গিয়াছে—এইটাই বেশী আশ্চর্য্য ও অশোভন ঠেকে। জগতে শুধু বয়স্ক মানুষই নাই—শিশু আছে, পশুপক্ষী আছে, প্রকৃতির মৌন্দ্যলীলা আছে। ললিতের থোকা আছে, কিন্তু সে রঙ্গক্ষেত্রের একজন অভিনেতা নয়। জগৎটা নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীরমুখ লোকদের হিতসাধনমণ্ডলী যে নয়, কবি-উপন্যাসিক সে পরিচয় দিতে পারেন নাই।

মাধবী—শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২২৫ পৃষ্ঠা। সাধারণ সংস্করণ দেড় টাকা, রাজসংস্করণ দুই টাকা।

এখানি ঐতিহাসিকের লেখা সামাজিক উপন্যাস—সোনার পাথর-বাটি। মাধবী ও প্রবোধ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা। মাধবী স্ত্রীস্বাধীনতার চরম আদর্শ পালনে বন্ধপরিকর—যাহাকে সে ভালোবাসে ও যে তাহাকে ভালোবাসে এই দুজনে স্বাধীন সর্ব্বনিরপেক্ষভাবে মিলিত হইবে, স্ত্রী বলিয়াই সে সমাজ বা প্রিয়জনের অধীনতা স্বীকার কোনো রকমেই করিবে না; তাহার দয়িত বল্লভ যে লোক, তাহার সহিত সে কেবলমাত্র প্রেম ও প্রণয়ের যোগেই মিলিত হইবে ও থাকিবে, কৃত্রিম সামাজিক বিধি বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়; দয়িতকে সে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিবে না; সে তার পিতৃকুলের পদবী বদলাইয়া স্বামীর পদবী গ্রহণ করিবে না; তাহার ঘর করিতে যাইবে না; সে নিজে স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিয়া নিজে উপার্জন করিয়া নিজের খরচ চালাইবে; সন্তান হইলে তাহাদের পালনের ব্যয় ও দায়িত্ব উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইবে। এই অসামাজিক আদর্শ অনুসারে মিলিত হইল মাধবী ও প্রবোধ। তার ফলে প্রবোধ ধনী পিতার ত্যাজ্যপুত্র ও সমাজে নিন্দিত হইল। মাধবীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে সে সমাজে ধিক্কৃত হইতে লাগিল। তখন তাহারা দুজনে বিদেশে গেল। সেখানে হঠাৎ প্রবোধ মারা গেল এবং মাধবীর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইল। সে কোথাও চাকরী পায় না, সম্মান পায় না, সে খবরের কাগজে লিখিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জন করে। এই সংগ্রামে তার রূপ যৌবন স্বাস্থ্য সব গেল। যে ডাক্তার বিদেশে প্রবোধের চিকিৎসা করিয়াছিল সে মাধবীকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইল, কিন্তু মাধবী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। যে মেয়ে এখন মাধবীর একমাত্র অবলম্বন, সেও সমাজে অপমানিত হওয়ার মাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বৃদ্ধ দাদামশায়ের কাছে চলিয়া গেল। এইরূপে সর্ব্বশূন্য মাধবীর জীবনের অবসান হইল, তথাপি সে স্বীকার করিল না যে সে কিছু অশ্রয় করিয়াছে। সে নিজের আদর্শের কাছে

সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে ভালো ফুটিয়াছে প্রবোধের পিতা দৃঢ়চরিত্র বৃদ্ধ ডাক্তার। প্রবোধের চরিত্র মোটেই খোলে নাই। মাধবীর ছবিও বেশ জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, মাধবী যেন লেখকের তত্ত্বমুগ্ধি হইয়াছে, কেবল বড় বড় বক্তৃতাব সমষ্টি। লেখকের শিক্ষিতা মহিলাব স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে মোটেই অভিজ্ঞতা নাই; এজন্য মাধবীর চর্বি—ছবি ঠিক বলা যায় না, কারণ তাহা ফুটে নাই,—মাধবীর আচরণের বিবরণ স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক অসঙ্গত অশোভন অভঙ্গ হইয়াছে;—যখন স্থবণ্ড হয় নাই প্রবোধ তাহাকে জীবনসঙ্গিনী বলিয়া সমাজনিবপেক্ষ হইয়া গ্রহণ করিবে কিনা, তখনই সাধারণ পার্কে বসিয়া মালীর সামনে মাধবীর আচরণ নিতান্তই নিন্দনীয় অশুদ্ধেয়। ইহাতে লেখকের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়াছে—মাধবীর চরিত্র এমনভাবে অঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল যে সামাজিক জীব পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি সে ছোব করিয়া আদায় করিবে। যাই হোক, শেষে লেখক সমাজেরই জয় দেখাইয়াছেন, যদিও সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও দুর্কলতা এবং মাধবীর উদারতা ও দৃঢ়তা পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানির প্লেট সম্পূর্ণ নূতন ও অসমসাহসিক; সমাজের একটা মস্তবড় সমস্যা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে; সমাজ যে ইহার সমাধান কিরূপভাবে করিবে তাহা ভবিষ্যতাই জানে; কিন্তু লেখক অপ্রস্তুত সমাজের সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত করিয়া নিজের ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

চালচিত্র—শ্রী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত কে এম্ কোনার এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১১০ বোম্বাই স্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৭ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

এই চালচিত্র পূজার আনন্দ-প্রতিমার কাগাম; ইহাতে বাক্যের বর্ণে গল্পের ছবি আছে বারোটি—৬ দশজন বিখ্যাত পটুয়া ইহাব অঙ্গ-প্রসাধন করিয়াছেন—(১) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরাবুনি—বাজপুত্র ইতিহাসের কাহিনী, (২) শ্রী জলধর সেন, ততঃ কিম্, (৩) শ্রী সৌভীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়, নিশির স্বপ্ন, (৪) শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়, ফুল, (৫) শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলব নিবেদন, (৬) শ্রী প্রেনাস্কব আতর্থা, মুশাফের, (৭) শ্রী সর্বোজনাথ ঘোষ, চন্দ্রালোক, (৮) শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য, পাখাকুলি, (৯) শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোম্ব, রাজকণ্ঠা, (১০) শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু, লতিফের স্নান, (১১) শ্রী অমরেশ সিকদার, ছবিব দাম, (১২) শ্রী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্ধকারের অভিসার।

এই বইখানিতে বারোটি নামজাদা লেখকের বারোটি গল্প একত্র ছাপা হইয়াছে। ইহাব কাগজ উত্তম, ছাপা ভালো, প্রচ্ছদপট আঁকা নামজাদা পটু পটুয়া শ্রী চারুচন্দ্র রায়ের। বইখানি শোভন ও সুন্দর হইয়াছে। লেখার দোষগুণের বিচারে ক্ষান্ত রহিলাম, কাবণ তাহা হইলে তুলনায় সমালোচনা করিতে হইত।

নবগ্রহ—শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৭৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। দেড় টাকা।

এই পুস্তকে নয়টি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলি স্থলিখিত।

চিত্রে ভাববৈচিত্র্য—শ্রী ভাবকনাথ বাগ্চী ও শ্রী দেবকণ্ঠ সরস্বতী। বেঙ্গল লাইব্রেরী; ৮ গুলুওস্তাগবের লেন, কলিকাতা। ফুলস্ক্যাপ্ আট-পেজী আকার। রেশমী কাপড়ে বাঁধা, সোনার ভলে নাম ছাপা। আড়াই টাকা।

বাগ্চী-মহাশয় বিবিধ বেশভূষা ও ভাবভঙ্গীর সাহায্যে বিবিধ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ছবি তুলাইয়াছেন; এক-একটি বিষয় অভিনয়

করিতে একাধিক লোকের আবশ্যক হইয়াছে, সেই একাধিক লোকের ভূমিকা একা বাগ্চী মহাশয়ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফোটোগ্রাফীর কৌশলে একজনের ছবিই একসঙ্গে জুড়িয়া বহুজনের অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন; একই চিত্রে তিনি পুরুষ ও স্ত্রী দুই রূপে দু-তিন মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। এই বহুরূপী বিদ্যায় তিনি বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, ছবিগুলির অধিকাংশই স্বাভাবিক ও সবগুলিই কৌতুককর বাস্তবিক হইয়াছে। আমাদের বেশী ভালো লাগিয়াছে—হারমোনিয়ম-বাদক, খোল-বাদক, কর্ণাল-বাদক, বেহালা-বাদক, উড়ে চাকর, এবং সব-সে-সেবা প্রোফেসার জগবন্ধু। সরস্বতী-মহাশয় গল্পে গল্পে এইসব ছবিব একটি করিয়া পরিচয় লিখিয়াছেন, পরিচয়গুলিও সরস স্থলিখিত হইয়াছে—পদের চন্দ্র ও মিল নিখুঁত এবং ভাবব্যঞ্জনাও উত্তম হইয়াছে। চিত্রে ও বাক্যে মিলিয়া একটি সমগ্রস ভাবদ্যোতনা প্রকাশ পাইয়াছে।

The Village Gods of South India : By The Right Reverend Henry Whitehead, D. D., Bishop of Madras. Association Press (Y. M. C. A.), 5 Russell Street, Calcutta. কাপড়ে বাঁধা বইএর দাম তিন টাকা; কাগজের মলাটওয়াল বইএর দাম দুই টাকা।

এই পবম উপাদেয় বইখানিতে দক্ষিণ-ভারতের গ্রাম্যদেবতার ইতিহাস পূজাপদ্ধতি প্রভাব ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা ও ছবি আছে। যাঁহাবা ধর্মতত্ত্ব আলোচনা ও অনুসন্ধান করেন তাঁহাদেব পক্ষে ত এই পুস্তকখানি অত্যাবশ্যক; যাঁহারা সাধারণ পাঠক, তাঁহাবাও ইহার মধ্যে দক্ষিণাত্যেব হিন্দুদেব আচার-ব্যবহার বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতির পরিচয় এবং হিন্দুদেব দেবদেবীর অসংখ্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিবেন। বইখানি ঐতিহাসিক নিবপেক্ষতার সহিত লেখা; পবধর্মের কনংস্কারের প্রতি ও কোথাও স্লেম-বিদ্রূপ ত নাই-ই, অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পায় নাই। বইখানি বিশেষ মূল্যবান।

The Hindu Religious Year : By M. M. Underhill, R. Litt., Association Press (Y. M. C. A.) 5, Russell Street, Calcutta. দাম দু-টাকা, তিন টাকা।

এই পুস্তকে মহাবাহুদেশপ্রচলিত পৌর্বাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব, কালপরিমাণ, সৌর চান্দ্র বৎসর, মাস, অধিমা, মলমাস, গ্রহণ, শুক্রের উদয়াস্ত, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, শুক্র কৃষ্ণ পক্ষ, সংক্রান্তি, বার, ঋতু, তিথি, যোগ, ব্রত, পানরণ, শ্রাদ্ধ, পুষ্পপূজা, বৃক্ষপূজা, সরীসৃপপূজা, জড়পূজা, মেলা, তীর্থ ইত্যাদিবিবিধ বর্ণনা আছে। একই হিন্দুসমাজের প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় এই পুস্তক হইতে পাওয়া যায়। ইহা হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের একখানি পঞ্জিকা বিশেষ; শুষ্ক পঞ্জিকা নয়, বিবিধ-উপাখ্যান-সম্বলিত বহুলতথ্যপূর্ণ সরস রচনা। লেখক আশ্চর্য অনুসন্ধিসার সাহায্যে মহারাষ্ট্র হিন্দুসমাজের পালপার্বণ অনুষ্ঠান বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। লেখক ঐতিহাসিক নিবপেক্ষতার সহিত সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, কোথাও পবধর্মের প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। এই বইখানি ধর্মতত্ত্বে তুলনামূলক অধ্যয়নের বিশেষ আবশ্যক উপাদান হইয়াছে। স্মরণ্য ইহা হিন্দু অহিন্দু সকল শ্রেণীবি পাঠক পাঠিকার নিকট সমাদৃত হইবাব দাবী বাখে।

Poems by Indian Women : Edited by Margaret Macnicol. The Heritage of India Series. Association Press, 5, Russell Street, Calcutta Paper, Re. 1, cloth 1-8 1923.

ভারতীয় নারীদের কবিতা। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের

সকল প্রদেশের নারী-কবিদের জীবন এবং কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকের গোড়ার দিকে একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন্ কবি, কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন এবং কি ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন তাহা জানিতে পারা যায়। পুস্তকখানি যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত, তাহা হইলেও যাহাদের বেশী পড়িবার অবসর নাই অথবা যাহারা বড় বই পড়িতে চান না, তাহাদের কাছে এই বইখানির আদর হইবে। কবিদের লেখার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেকেবই দু-একটি করিয়া কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদে মূল কবিতার ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে বটে, তবে এই অনুবাদেও আমরা কবিদের কবিত্বের কিছু পরিচয় পাই। বিভিন্ন প্রদেশের নারী-কবিদের কবিতাগুলি সেই বিশেষ প্রদেশের কোনো পণ্ডিত লোককে দিয়া অনুবাদ করাইলে আরো ভালো হইত বলিয়া মনে হয়। বইখানির ছাপা, কাগজ ইত্যাদি বেশ ভাল হইয়াছে।

মুদ্রারক্ষস

নীহার (উপন্যাস)—শ্রী হরিশচন্দ্র দে, ৫০ নং আলীপুর রোড, আলীপুর। ছয় আনা।
চলনসই।

চিরকুমার (উপন্যাস)—শ্রী মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩১১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা। শ্রাবণ ১৩৩০।

বইখানি পড়িতে একরকম মন্দ লাগে না, তবে মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। বইখানিকে অনাবশ্যক বেশী বড় করা হইয়াছে; বাজে অংশ বাদ-সাদ দিয়া বইখানিকে আবার সুখপাঠ্য করা যাইতে পারে। বাধাই, ছাপা, কাগজ ভাল হয় নাই।

ছোট ছোট গল্প—শ্রী যোগীন্দ্রনাথ বসু। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপিজিটরি। এক টাকা চার আনা। ১৩৩০।

যোগীন্দ্র-বাবু বইয়ের পরিচয় নতুন করিয়া দিবার দরকার নাই। এই ছোট গল্পগুলি কেবল ছেলে মেয়ে নয়—অনেক বড়ারও পড়িতে বেশ ভাল লাগিবে। তবে বইএর ছবিগুলি আরো ভাল কবা উচিত ছিল। একখানি ছবি চাড়া আর কোনটিকেই ভাল বলা চলে না। “দিগুনাগাচার্যের চতুষ্পাঠীতে ভাল ও বেতাল”—ছবিখানি বেশ ভাল বলা যাইতে পারে। ছাপা ও বাধাই ভাল।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (উপন্যাস)—শ্রী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ব্যানার্জী গাঙ্গুলী এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস্ কলিকাতা। দেড় টাকা।

“বিপ্লবী”তে ধারাবাহিকভাবে বাহিব হইয়াছিল। লেখক উপন্যাসের ছলে অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন। বিশেষতঃ গ্রাম সংস্কার সম্বন্ধে অনেক তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে উপদেশ বড় শক্ত এবং জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সাধারণ পাঠকের তাহা ভাল না লাগিবার কথা। উপন্যাসের প্লটও মামুলি ধরণের। তবে লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ বই-বিক্রির আয় সেনহাটী কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউটকে দেওয়া হইবে। ছাপা, কাগজ, বাধাই ভালই হইয়াছে।

অরুণার বিয়ে (উপন্যাস)—শ্রী নীহাররঞ্জন দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এবং এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্সের দোকানে পাওয়া যায়। এক টাকা। আশ্বিন, ১৩৩০।

পুস্তকের মলাটের উপর চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা একখানি চমৎকার

প্রচ্ছদপট। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে ঐখানিই বিশেষ করিয়া চোখ ও মন হরণ করে।

উপন্যাসখানি মামুলি, তবে পড়িতে মন্দ লাগে না। লেখক একটি বিশেষ ভুল কথা লিখিয়াছেন। বিবাহের পূর্বে কোন যুবকের সঙ্গে তাহাব হইতে-পাবে-পড়ী গাড়ীতে করিয়া কোন বয়স্ক আত্মীয় বা আত্মীয়কে না লইয়া কোথাও যায় না। কোন সমাজেই এ প্রথা নাই। উপন্যাস বলিয়া যা-তা লেখা চল না। এই উপন্যাসের নায়ক এক স্থানে নায়িকাকে গাড়ীতে কবিতা নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন—নায়ক-মাতা ভানী বধু দেখিবেন বলিয়া। বরের বাড়ী বলাকেই কন্যার গৃহে গিয়া কন্যা দেখিয়া আসে। ভাবী-বধু তাহার ভাবী-শাশুড়ীকে নিজেকে দেখাইতে যায়, এমন কথা কোথাও শুনি নাই। তবে আমরা শুনি নাই বলিয়া যে তাহা হইতে পাবে না, এমন কথাও বলিতে পারি না।

বইখানির বাধাই এবং ছাপা বেশ ঝবঝবে।

বিধবা বা কলঙ্কিনী (সামাজিক উপন্যাস)—শ্রী হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত। ১৭ নং নেবুতলা লেন, কলিকাতা। আট আনা। ১২:২ মাল।

উপন্যাস হিসাবে ভাল লাগিল না, তবে লেখক আমাদের বর্তমান হিন্দু সমাজের নরকগুলি অনাচার এবং অনিয়ম লোকের সামনে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা সার্থক হটুক এই কামনা করি।

সরল-হোমিও-ভৈষজ্যাবলী—শ্রী খগেন্দ্রনাথ বসু। লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৩৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

হোমিওপ্যাথিক মতে যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহাদের এই বই-খানি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। নানাপ্রকার রোগের লক্ষণ এবং তাহার ঔষধের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যে-কোন লোক এই বইখানি পড়িলে উপকার পাইবেন। এবং হোমিও-ডাক্তার না হইয়াও চিকিৎসা কবিত্তে পারিবেন। হোমিও চিকিৎসকের কাছেও এই পুস্তকখানির আদর হইবে আশা কবি। পুস্তকখানির ছাপা এবং কাগজ আরও একটু ভাল হওয়া প্রয়োজন।

দেয়ালি (কবিতার বই)—শ্রী প্রমথনাথ বিশি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

কবিতাগুলি পড়িতে বেশ লাগিল। কয়েকটি কবিতা বেশ উচু ধরণের। কবি কবিতাগুলির নামকরণ না করিয়া পাঠকের একদিকে ফাঁকি দিয়াছেন, আর একদিকে ভাল করিয়াছেন। কারণ কবিতা লেখা অপেক্ষা কবিতার নামকরণ সত্যই শক্ত ব্যাপার। এই তরুণ-কবির কবিতাগুলি আজকাল মাসিক পত্রের অনেক কবির কবিতা অপেক্ষা সুখপাঠ্য। কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের দৈন্য নাই, ভাষারও সৌন্দর্য্য আছে। কতকগুলি কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছায়া দেখা যায়—তাহাতে অবশ্য দোষের কিছু নাই। দু-একটি কবিতা বাদ দিলে বইখানি সর্বোৎকৃষ্ট হইত। ছাপা ও কাগজ ভাল।

গ্রন্থকীর্ট

বিপ্লবের বলি (প্রথম ভাগ)—যতীন্দ্রনাথ। বি প্র ভাণ্ডার, গোলন্দলপাড়া, চন্দ্রনগর হইতে শ্রী বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য অলিখিত।

পুস্তকখানির নাম যতীন্দ্রনাথ হইলেও ইহাতে যতীন্দ্রনাথ মুখো-

পাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবপন্থীদের . জীবনবৃত্তান্ত আছে । ইহার কোনটি বা কেতাবী ভাষায় লেখা, কোনটি বা চলিত ভাষায় লেখা । একই পুস্তকে ভাষার অনমতা বিন্দুশ বুলিয়া বোধ হয় । তাহা ছাড়া ভাষার প্রাদেশিকতা দোষ বহুস্থলে আছে ও বর্ণাশুদ্ধির জন্ত পড়িতে বাধে । ৫১ পৃষ্ঠায় সামসুল আলমের জায়গায় সামসুল হবার নাম লেখা হইয়াছে । পুস্তকখানির কাহিনী-অংশটুকু বেশ কৌতূহলজনক, ব্যাখ্যান-অংশটুকু বড় নীরস ।

সংসারী—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক—ডাক্তার এন্সি ব্যানার্জী প্রণীত । চতুর্থ সংস্করণ । সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত । মূল্য ১।০ । ১৩৩০ ।

বইখানির পূর্বসংস্করণের পরিচয় এই পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল । নূতন সংস্করণে পুস্তকের উপযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে । সংসার চালাইতে 'সংসারী' কাজে লাগিবে ।

অ

জার্মানসমাজে গরমের ছুটি

(১)

গ্রীষ্মকালে সহর ছাড়িয়া বাহিরে কিছুকাল কাটানো জার্মানির মধ্যবিত্ত লোকদের একটা দস্তুর দেখিতেছি । উকিল, ডাক্তার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, ইস্কুল-মাষ্টার, লেখক, চিত্রকর, গায়ক, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নর-নারীকেই ছুটির আরাম ভোগ করিতে দেখা যায় ।

এই উপলক্ষ্যে ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর একটা নয়া আন্দোলন দেখা দিয়াছে । বহু জার্মান ছাত্রছাত্রী ফিনল্যাণ্ডে গিয়াছে, জুগোস্লাভিয়ায় গিয়াছে, সুইডেনে গিয়াছে, ইংল্যাণ্ডে গিয়াছে । তাহাদের পরিবর্তে জার্মানিতে বেড়াইতে আসিয়াছে ফিনল্যাণ্ডের, জুগোস্লাভিয়ার, সুইডেনের এবং ইংল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রী ।

ছাত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফ হইতে অথবা কোনো ছাত্রপরিষৎ বা যৌবনসম্মিলনীর তরফ হইতে । গবর্নেন্ট, রেল-জাহাজ কোম্পানী এবং জনসাধারণের সংগৃহীত টাঁদা তহবিল হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে পর্যটনের খরচপত্রে কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়া থাকে ।

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এইরূপ ছাত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । গুজরাটের যুবকেরা বাংলায়, যুক্তপ্রদেশের লোকেরা মহারাষ্ট্রে, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা মাদ্রাজে, মাদ্রাজের পর্যটকেরা পঞ্জাবে কয়েক সপ্তাহ কাটাইতে অভ্যস্ত হউন । পর্যটনবৃত্তি স্থাপন করিবার

জন্ত ভারতের প্রাদেশিক জননায়কগণের পক্ষে উষ্ণ-পড়িয়া লাগিবার দিন আসিয়াছে ।

(২)

ছুটির সময়টা—তিন চার সপ্তাহ—স্থখে স্বচ্ছন্দে বিনা মানসিক পরিশ্রমে কাটানো প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জার্মান নবনারী শরীর-চর্চার অঙ্গ বিবেচনা করিয়া থাকে । স্বাস্থ্যরক্ষার এক প্রধান উপায় স্বরূপ মফঃস্বলে বাস করাটা সমাদৃত হয় । খাওয়া, বেড়ানো, ঘুমমায়া, কুস্তীকস্রং করা ছাড়া গ্রীষ্মাবকাশে অল্প কোনো কাজ ইহাদের চিন্তায় স্থান পায় না ।

এই অভ্যাস ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সেও দেখিতে পাওয়া যায় । ভারতবর্ষে এই অভ্যাস একদম নাই একথা বলা চলে না । তবে স্বাস্থ্য, শক্তি, শারীরিক উৎকর্ষ, উদ্বোধন আনন্দময় জীবন, খেলাধুলা ইত্যাদির দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আজও প্রচুর পরিমাণে পড়ে নাই একথা স্বীকার করিতেই হইবে ।

জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসের ভিতর লাখ লাখ জার্মান নরনারী নিজেদের বাস্তবিতা ছাড়িয়া কোনো দূর পল্লীতে যাইয়া বসবাস করে । কেহ দুই সপ্তাহের জন্ত, কেহ চার সপ্তাহের জন্ত, কেহ ছয় সপ্তাহের জন্ত, ইত্যাদি । এমন কি প্রত্যেক শনিবার রবিবার—কি শীতে কি গ্রীষ্মে—বালিন শহরের অগণিত লোক নিকটবর্তী মফঃস্বলে "নিষ্কর্মা"র জীবন কাটাইতে চলিয়া

যায়। প্রকৃতির আবেষ্টনে খোলা মাঠে খোলা আকাশে দশ বার ঘণ্টা কাটানো প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই জার্মান মাত্রেই জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনুসারে কাজ করা হইয়া থাকে।

(৩)

ভারতের যুবা বৃদ্ধাদের মধ্যে দুইচার জন হয় ত শহরের বাহিরে হাঁটিয়া নিজ নিজ জেলার দশবিশ মাইল স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ধরণের জেলা-পর্যটন, পল্লী-পর্যবেক্ষণ জার্মানির মধ্যবিত্ত সমাজে হৃদয় চলিতেছে।

জার্মানির বন কানন নদী সরোবর পাহাড় উপত্যকা সবই পায়ে হাঁটিয়া দেখিয়া বেড়াইয়াছে এমন যুবকযুবতী প্রোট প্রোট লাখ লাখ আছে। ঘাড়ে একটা থলের ভিতর কিছু কাপড়চোপড় আর খাদ্যবস্তু বহিয়া বনভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গ্রীষ্মে বহুলোকেরই “স্বপ্ন” বিশেষ।

কাজেই দেখিতে পাই উচ্চশিক্ষিত জার্মান নরনারীরা স্বদেশের প্রত্যেক সৌন্দর্যময় জনপদের খবর রাখে। হ্রদ, উপবন, গাছগাছড়া, শিকারের জানোয়ার কিছুই ইহাদের অজানা থাকে না। রেল ষ্টীমার ইত্যাদির যুগে পায়ে হাঁটিয়া দেশ দেখা উচ্চশিক্ষিত ভারত-সন্তানের পক্ষে একটা নূতন কিছু মনে হইবে।

বস্তুতঃ জার্মানরা যতটুকু রেল যোগা আবশ্যিক সেটুকু ফুরাইলেই “পায়দলে” হ্রদ-পরিক্রম, বন-পরিক্রম, পাহাড়-পরিক্রম সুরু করে। মধ্যযুগের ভারতে এবং ইউরোপে তীর্থযাত্রীরা যেরূপ করিত, আজকালকার দিনেও জার্মানরা প্রকৃতি-প্রেমের টানে সেইরূপ করিতেছে। নবীন ভারতের পক্ষে এই প্রকৃতি-পরায়ণতা হাতে পায়ে নূতন করিয়া শিখিবার আয়োজন করা কর্তব্য।

(৪)

জার্মানির সমুদ্রকূল অতি সামান্য মাত্র। কিন্তু তাহার প্রত্যেক পল্লীই জার্মান নরনারীর পরিচিত। সমুদ্রে সাতার কাটা, সাগরের কিনারায় হাঁটিয়া হাওয়া খাওয়া

ভারতেও নেহাৎ অজানা নয়। কিন্তু এদিকে ভারতীয় মধ্যবিত্তের নজর আরও বেশী পড়া দরকার।

জার্মানির পাহাড়গুলো নেহাৎ নীচু। কিন্তু কোনো পাহাড়ই জার্মান পর্যটকদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। অধিকন্তু ব্যাহেরিয়া অঞ্চলে যাইয়া আল্‌স্ পাহাড়ের ঘাড় মটুকানো বহু জার্মানেরই সাধ। ভারতবর্ষে এই ধরণের পাহাড়-পর্যটন এখনো সুরু হয় নাই। দিম্‌লা, দার্জিলিঙেব পাহাড়ী-শহরে বেড়াইতে যাওয়া ত “বাবুগিরি” মাত্র।

জার্মানরা তাহাদের বন-কাননের সবিশেষ তারিফ করে। বাস্তবিক পক্ষে বনসম্পদ জার্মানিতে বিদেশীর পক্ষে একটা অভিনব স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের থলি বিশেষ। পাইন, লিগুন, মেপ্ল্ ইত্যাদির বন জার্মানির প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন আটদশ ঘণ্টা এই-সকল বনে কাটাইয়া রাত্রিকালে নিকটবর্তী কোনো কুঁড়েতে শুইয়া থাকিবার জন্ত হাজার হাজার লোক লালায়িত। এই ধরণের বনভ্রমণ ভারতে বোধ হয় আজও দেখা দেয় নাই।

বালিনের আশেপাশে দেড় দুই ঘণ্টার রেলপথের মধ্যে সাগরসদৃশ হ্রদেব বা সরোবরের সংখ্যা অনেক। বালিনকে বাস্তবিক পক্ষে হ্রদ-কানন-বেষ্টিত নগর বলিলে কোনো অত্যুক্তি করা হইবে না। এই-সকল হ্রদের চারিদিক হাঁটিয়া দেখা গ্রীষ্মকালে জার্মানদের এক বড় কাজ। জার্মানির নদীতে-নদীতে, হ্রদে-হ্রদে খালের সাহায্যে যোগাযোগ আছে। কাজেই একমাত্র জলপথেই গোটা জার্মানি দেখা সম্ভব।

(৫)

লড়াই খামিবার পব হইতে জার্মানিতে “যৌবন-আন্দোলন” সুরু হইয়াছে। খেলাধুলা কুস্তীকস্রং এই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ। বেশভূষায়, খাওয়াদাওয়ায় সংঘম ও ব্রহ্মচর্য পালনও এক বিশেষত্ব। পল্লীভ্রমণ, বন-পরিক্রম, পাহাড়-পর্যটন ইত্যাদি প্রকৃতি-পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই যৌবন-আন্দোলনেরই সামিল।

জার্মান গনমেন্ট, বিশদ্রিশ বৎসর ধরিয়া মজুরদের

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তু নানাপ্রকার আইন করিয়াছেন। তাহার আনুষ্ঠানিক স্বরূপ জার্মানির বিভিন্ন জনপদে হাস্পাতাল, আরোগ্যশালা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকারী অথবা বে-সরকারী বীমা-সমিতির লোকজনেরা বিনা পয়সায় অথবা কম পয়সায় এই-সমুদয় আরোগ্যশালায় অতিথি হইতে পারে।

জীমেঙ্গ-শুকোর্ট্ ইত্যাদি জার্মানির বড় বড় শিল্প-কারখানার অধীনেও এই ধরণের আরোগ্যশালা পরিচালিত হয়। কারখানার মজুরদিগকে স্বাস্থ্যের জন্তু ঐ স্থানে পাঠানো হইয়া থাকে।

অধিকন্তু একমাত্র ব্যবসায়ের জন্যও বহু আরোগ্য-শালা জার্মানির সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলি হোটেল বিশেষ। তবে চিকিৎসকের অধীনে পরিচালিত হয় বলিয়া রোগীরাও এইখানে বসবাস করিলে নিজ নিজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। অধিকন্তু হাস্পাতালের আস্বাব যত্নপাতি সবই এই-সকল হোটলে যথারীতি রক্ষিত হয়। কাছেই বিনা উদ্বেগে রোগীরা কয়েক মাস কাটাতে পারে।

(৬)

টিয়রিঙ্গেন এবং স্যাক্সনি প্রদেশদ্বয়ের পাহাড়ী

বন জার্মান সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। এই-সকল অঞ্চলে আরোগ্যশালা কাজেই অনেক। অধিকন্তু জার্মানির নানা অঞ্চলের জল নানাপ্রকার রোগের ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। এই জলমাহাত্ম্যে বহুসংখ্যক পল্লী স্বাস্থ্য-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। এই ধরণের জনপদকে “ব্যাড” বা স্নানাগার বলে। দূর বিদেশের লোকও—কেহ পেটের অস্ব্থের জন্তু, কেহ পায়ের গিঁঠের ব্যথার জন্তু—এই “ব্যাডে” স্নান করিতে আসে।

মেক্লেম্বুর্গ্ প্রদেশের হুদ ও কাননগুলা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ফণ্টানে নামক জার্মানির একজন আধুনিক গদ্যলেখকের রচনায় এই জনপদের প্রকৃতিসম্পদ চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। বিলাতের “লেক্ ডিষ্ট্রিক্ট্” যেরূপ, মেক্লেম্বুর্গের ফ্যাষ্টেনবুর্গ অঞ্চলও সেইরূপ। এই অঞ্চলে কয়েকটা সরকারী বেসরকারী আরোগ্যশালা আছে। অধিকন্তু ব্যবসায়ী-চিকিৎসকের অধীনেও “সানাটোরিয়াম্” কায়েম করা হইয়াছে। পূর্বে যে বাড়ীটা “শ্লস” বা রাজপ্রাসাদ ছিল সেইখানে এই আরোগ্যশালা চলিতেছে। এখানে বসবাস করিয়া বনে হরিণ শিকার করা চলে, হুদে মাছধরাও সম্ভব। তাহা ছাড়া, পাইনের হাওয়া ত সর্বদাই বহিতেছে।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

বেনো-জল

আঠারো

মরুভূমির বৃকের উপরে পরীর স্বপনের মতন অপূর্ক এক তপোবন—ফলে-ফুলে শ্রামতলায় মনোরম। কণারকের কালো দেউলের ভাঙা ললাটের উপরে সূর্যের প্রথম হাসির আল্পনা ফুটে উঠেছে। মানুষ এই সূর্য্য-মন্দিরকে আজ ত্যাগ ক’রে গেছে বটে, দেবতা কিন্তু এখনো তাঁর প্রাচীন আশ্রমকে ভুলতে পারেন-নি, তাই এখনো প্রতিদিন তিনি সারাবেলা এই মন্দিরের দিকে স্থির ও নিম্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন এবং যে বিগ্রহশৃঙ্খ শিল্প-

বিচিত্র রত্নবেদীর তলায় আর একটি ভক্তের মাথাও-নত হয় না এবং একটি পূজার ফুলও নিবেদিত হয় না, আজও তার উপরে প্রত্যহ তিনি নিজের আলোক-হস্তের পবিত্র স্পর্শ সন্নেহে বুলিয়ে দিয়ে যান!

মানুষ ভুলেছে, কিন্তু বনের পাখী ভোলে-নি! কণারকের বিজন শ্রামলতা তাদের স্তবগানে স্মধুর হয়ে উঠেছে।.....ডাক-বাংলোর আঙিনায় আনন্দ-বাবু একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে চুপ ক’রে ব’সে আছেন এবং তাঁর সাম্নে মরুভূমির বিগুফ তৃষা সাগরের অনন্ত নীলিমার দিকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে।

আনন্দ-বাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, “রতন, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব !”

রতন বললে, “কেন বলুন দেখি ?”

—“এমন স্বর্গের সন্ধান দিয়েছ ব’লে। এই ভাঙা দেউলের প্রাচীন স্মৃতি, মরুর বুকে এই কল্পনাতীত শ্রাঘলতা, আকাশের এই অগাধ নীলিমা, সূর্যের এই অবাধ আলো, বনের পাখীর এই স্বাধীন গান আর প্রভাতের এই অপূর্ব স্নিগ্ধতা,—এরা সমস্ত মিলে আমাকে একেবারে বিভোর ক’রে তুলেছে! আর যে আমার ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না!—স্বর্গ, স্বর্গ, এই তো স্বর্গ!”

পূর্ণিমা বললে, “কিন্তু বাবা, এ স্বর্গে মশার অত্যাচার বড় বেশী, কাল সারারাত আমাদের ঘুম হয়-নি, সে-কথা কি এখনি ভুলে গেলে?”

আনন্দ-বাবু বললেন, “আজ-সকালের এই আনন্দের প্রলেপে কালকের রাতের কষ্ট আমার তুচ্ছ মনে হচ্ছে।”

পূর্ণিমা বললে, “কিন্তু আমি যে ভুলতে পারছি না, বাবা; দেখনা আমার গায়ে এখনো মশার ছলের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে! আজ রাত্রে আমি আর কিছুতেই স্বর্গবাস করতে রাজি নই।”

কিন্তু মশার এমন স্ত্রীক্ল হুলও আনন্দ-বাবুর আনন্দকে কিছুমাত্র দমাতে পারে-নি। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বার বার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলতে লাগলেন, “চমৎকার জায়গা, চমৎকার জায়গা! রতন, সকালে এখানে যারা মন্দির গড়েছিল, তারা সকলেই নিশ্চয় কবি ছিল!”

রতন বললে, “খালি এখানে কেন আনন্দ-বাবু, ভারতের প্রাচীন শিল্পীরা সর্বত্রই কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইলোরা, অজন্তা, এলিফাণ্টা, কারলী, সালসতী, সাক্ষী, ভরত, সারনাথ, গান্ধার, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, বুদ্ধগয়া—এ-সমস্তই প্রকৃতির কোলের ভিতরে সাজানো আছে। একালেই শিল্পীরা হয়েছে সহরের দোকানদারের মত—কিন্তু সকাল ছিল কবিত্বের যুগ, আসল আর্টিষ্টের জন্ম সম্ভব হয়েছিল তাই তখনকার দিনেই।……কিন্তু স্মিত্রাকে দেখতে পাচ্ছি না, সে কোথায় গেল?”

পূর্ণিমা বললে, “সে বেড়াতে যাচ্ছি ব’লে ঐদিকপানে গিয়েছে। আচ্ছা রতন-বাবু, কাল সকাল থেকে স্মিত্রা

এমন মন-মরা হয়ে আছে কেন, বলতে পারেন? যে মাহুষ হর্বোলায় মতন দিন-রাত বুলি না কেটে থাকতে পারে না, তার মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয় কি?”

স্মিত্রার মুখ কেন যে বন্ধ হয়েছে, রতন তা ভালো-রকমই জানে। পবন রাতের সেই ব্যাপারের পর থেকে স্মিত্রা আর রতনের সঙ্গে একটিও কথা কয়-নি—এমন-কি পূর্ণিমার সঙ্গেও হার ভালো ক’রে কথা কইছে না। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন ক’রে রেখেছে। আসল কারণ এখনো কেউ ধরতে পারে-নি বটে, কিন্তু রতন বেশ বুঝলে যে, স্মিত্রার এই অশোভন ব্যবহার আরো বেশীক্ষণ স্থায়ী হ’তে দেওয়া উচিত নয়। তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবার জন্তে রতন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “আপনারা বসুন, আমি স্মিত্রাকে খুঁজে নিয়ে আসি।”

পূর্ণিমা বললে, “শীগগির আসবেন, নইলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।”

বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে, রতন চারিদিকে তন্ন-তন্ন ক’রে খুঁজলে, কিন্তু স্মিত্রাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তখন সে ভাবলে, স্মিত্রা এতক্ষণে বোধ হয় অল্প পথে বাংলাতে ফিরে গিয়েছে।……সে আনমনে ভাঙা মন্দিরগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল; ওদিকে চ’লে যাওয়া হচ্ছে সে খেয়াল আর মোটেই রইল না।

মন্দিরের আপাদমস্তক জুড়ে লতা-পাতা-ফুল, পশু-পক্ষী আর পাথরে-গড়া জনতা ভিড় ক’রে আছে—শিল্পীর বিচিত্র পরিকল্পনায় সেই জড় শিলাস্তূপ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! শত শত ভাবের খেলা, অগুস্তি ভঙ্গীর লীলা, রূপ ও ছন্দের মেলা; মন্দিরের যতটুকু টিকে আছে, ততটুকুর সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের মধ্যেই যেন প্রজাপতির পাখনার মত অপূর্ব কারুকার্যের বাহার! এক শূণ্ণচূর্ণী প্রকাণ্ড মন্দিরকে এমনভাবে ক্ষুদে’ ক্ষুদে’ তৈরি করতে যে কি বিপুল ধৈর্যের আবশ্যক, রতন অবাক হয়ে তা ভাবতে লাগল।

মন্দিরের টঙে গুঞ্জের তলায় অনেকগুলো বড় বড়

মৃতি দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোকে একবার ভালো ক'রে পরখ করবার জন্তে রতন উপরে উঠল...সেখান থেকে চারিদিকে দেখা গেল সীমাহীন ধূ-ধূ করছে বালু-প্রাস্তর, পৃথিবী যেন তার সমস্ত শ্রামল সম্পদ ফেলে অসীমের উদ্দেশে বিবাসী হয়েছে! দূরে—দিকচক্রবালরেখার পাশে ঠিক যেন একটি নীল-পেন্সিলের দাগ টেনে সূর্য্যকরদীপ্ত সমুদ্র কোথায় চ'লে গেছে! দূর থেকে সমুদ্রের বিশালতা আর বুঝবার যো নেই, তাকে মনে হচ্ছে একটি সুদীর্ঘ নদীর রেখার মত!...রতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কল্পনায় দেখতে লাগল সেদিনের সেই হারিয়ে-যাওয়া চিত্রকে,—মহাসাগরের লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে-দিন গম্ভীর মেঘমল্লারে উচ্ছ্বসিত হয়ে, প্রচণ্ড আবেগোল্লাসে কর্ণারকের অর্ক-মন্দিরের পাষণ-সোপান-তলে এসে মাথানত ক'রে লুটিয়ে পড়ত!...

প্রধান মন্দির কবে ভেঙে পড়েছে, এখন কেবল মন্দিরের নীচের সামান্য অংশ টিকে আছে—উপর থেকে সেখানটা দেখতে মস্ত একটা কূপের গর্ভের মত। রতন আন্তে-আন্তে তার মধ্যে নামল। ভগ্ন-মন্দির-গর্ভে এখনো ময়ূর্ণ পাথরের রত্নবেদী দেবতাশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেদীর দিকে দুই পা এগিয়েই রতন সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল...সেইখানে, বেদীর গায়ে ঠেসান দিয়ে, চূপ ক'রে ব'সে আছে স্মিত্রা—ঠিক যেন পাথরের পটে আঁকা পাথরেরই এক প্রতিমার মতন!...তার মুখ বিষন্ন, আর দুই চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দুই গাল ব'য়ে গড়িয়ে পড়ছে!

অবাক, স্তম্ভিত হয়ে রতন দাঁড়িয়ে রইল।

স্মিত্রাও রতনকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু সে কোন কথা কইলে না—এমন-কি তার মুখেরও কোনরকম ভাবান্তর পর্য্যন্ত হ'ল না।

এখানে এমন ভাবে এ-সময়ে স্মিত্রাকে যে দেখতে পাবে, একথা রতন স্বপ্নেও ভাবে-নি! আর, প্রাণের কী লুকানো ব্যথা তার দুই চোখকে আজ এমন সজল ক'রে তুলেছে! রতন জানত, বয়স হ'লেও স্মিত্রা বালিকা মাত্র! বালিকার মতই সে নির্কিচরে যা মুখে আসে তাই ব'লে ফেলে, বগড়া করে, আড়ি করে,

আবার গায়ে প'ড়ে ভাব করে,—কিন্তু এবারে তার কি হয়েছে? পরশু রাতে, কর্ণারকের মাঠে সে এমন হঠাৎ রেগেই বা গেল কেন, আর বার বার আড়ালে এসে এ-রকম ক'রে তার কাঁদবারই বা কারণ কি? সে তো স্মিত্রাকে বিশেষ কিছু বলে-নি, কেবল তার অশ্রায় মুখরতার জন্তে মূঢ় ভৎসনা করেছে মাত্র। এর চেয়ে ঢের বেশী কড়া কথা স্মিত্রা তো কতবার হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।...

রতন মনে মনে এমনি সব তোলাপাড়া করছে, ততক্ষণে স্মিত্রা আপনাকে সামলে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। তার পর কোন কথা না কয়েই সেখান থেকে চ'লে যেতে উদ্যত হ'ল।

রতন তাড়াতাড়ি তার সামনে এগিয়ে এসে বললে, “যেও না স্মিত্রা, দাঁড়াও।”

স্মিত্রা দাঁড়িয়ে প'ড়ে নির্ঝক্ভাবে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

রতন বললে, “স্মিত্রা, তুমি কাঁদচ কেন?”

স্মিত্রা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললে, “রতন-বাবু, আপনারা আজকে কি কর্ণারকেই থাকবেন?”

—“হ্যাঁ, আনন্দ-বাবুর তো ইচ্ছা তাই।”

—“কিন্তু আমার আর এখনটা ভালো লাগছে না।”

—“বেশ, আনন্দ-বাবুকে তোমার কথা জানাব।”

—“হ্যাঁ, জানাবেন—আমি আজকেই যেতে চাই।”

—“কিন্তু তুমি আমার কথার তো কোন জবাবই দিলে না!”

—“কি কথা?”

—“কেন তুমি আমার উপরে রাগ ক'রে আছ? কেন তুমি কাঁদছ?”

—“আমি আপনার উপরে রাগ করি-নি।”

—“রাগ কর-নি! তবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছ কেন?”

—“কারণ আপনার কথা কইবার লোকের অভাব নেই।”

স্মিত্রা এখনো তাকে আঘাত দিতে ছাড়ছে না।

কিন্তু সে আঘাত গ্রাহ্য না ক'রেই রতন বললে, “বেশ, মান্‌লুম। কিন্তু তোমার এ কান্নার কারণ কি?”

—“আমি কাঁদছি কেন, তা জান্‌বার কোন অধিকারই আপনার নেই। ক্ষমা করুন, আর-কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, এখন পথ ছেড়ে একটু স'রে দাঁড়ান।”

রতন নিজের উদ্দীপ্ত ক্রোধের আবেগকে দমন ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে স্তমিত্রার স্তমুখ থেকে একপাশে স'রে গেল, স্তমিত্রার ভাষা আজ আর সে বালিকার কথার মতন তুচ্ছ ব'লে মনে করতে পারলে না।

উনিশ

নীচের ঘরে বসে' বিনয়-বাবু খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময়ে মিঃ চ্যাটো আর-একটি অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন।

বিনয়-বাবু খবরের কাগজখানা রেখে বললেন, “আসুন, মিঃ চ্যাটো।”—তার পর জিজ্ঞাসু চোখে আগন্তকের দিকে তাকালেন।

মিঃ চ্যাটো বললেন, “মিঃ সেন, ইনি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখার্জী, কলকাতা পুলিশে সি-আই-ডি বিভাগের সব-ইন্স্পেক্টর, আপাততঃ আমাদেরই মত এখানে 'চেঞ্জের' জন্তে আছেন। একটি বিশেষ দরকারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।”

বিনয়-বাবু পুলিশকে ভারি ভয় করতেন—বিশেষ সি-আই-ডি বিভাগকে। তিনি একটু ত্রস্ত স্বরে বললেন, “আমার সঙ্গে ওঁর কিসের দরকার?”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “দরকার ওঁর নয়—দরকার আপনারই।”

বিনয়-বাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, “আমার দরকার?”

—“হ্যাঁ। নিবারণ-বাবুর মুখে এমন একটা কথা শুন্‌লুম, যা আপনার জানা উচিত মনে করি। বিপদ আস্‌বার আগেই সাবধান হওয়া ভালো। তাই এঁকে সঙ্গে ক'রে এনেছি।”

বিনয়-বাবুর বিস্ময় তো বাড়্‌ল বটেই, সেই সঙ্গে তাঁর মনে বিলক্ষণ ভয়েরও সঞ্চার হ'ল। যে দিন-কাল পড়েছে

কিসে কি হয় কিছুই তো বলা যায় না! তিনি ব্যস্ত ভাবে বললেন, “বিপদের কথা কি বলছেন, মিঃ চ্যাটো? কিসের বিপদ? আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌বে নাকি?”

নিবারণ সহাস্যে দস্তবিকাশ ক'রে বললে, “আপনি অনেকটা আঁচ করতে পেরেছেন দেখ্‌ছি!”

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়-বাবু বিবর্ণমুখে বললেন, “বলেন কি মশাই?”

মিঃ চ্যাটো তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, “মিঃ সেন, একেবারে অতটা চঞ্চল হবেন না, আগে সব কথা শুন্‌ন।”

বিনয়-বাবু বললেন, “বলেন কি মিঃ চ্যাটো, এমন কথা শুনেও চঞ্চল হব না?”

নিবারণ বললে, “মিঃ সেন, আপনার বাড়ীতে বাইরে থেকে ডাকাত পড়্‌বে না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন।”

বিনয়-বাবু বললেন, “আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ডাকাত বাইরে থেকে পড়্‌বে না তো আকাশ থেকে পড়্‌বে মশাই?”

নিবারণ দ্বিতীয়বার দস্তবিকাশ ক'রে বললে, “ব্যাপার অনেকটা সেই-রকমই বটে। আপনার বাড়ীতে বাইরে থেকে ডাকাত এইজন্তে পড়্‌বে না যে বাড়ীর ভিতরেই আপনি ডাকাত পুষে রেখেছেন।”

বিনয়-বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, “বাড়ীর ভিতরে আমি ডাকাত পুষে রেখেছি! কী বলছেন আপনি?”

—“আমি ঠিক কথাই বলছি। ডাকাত আপনার বাড়ীর ভিতরেই আছে।”

—“কে সে?”

—“রতন।”

বিনয়-বাবু ভাবলেন, তিনি ভুল নাম শুন্‌লেন। তাই আবার স্তম্বলেন, “কি বললেন?”

—“রতন।”

এবারে বিনয়-বাবু উচ্চস্বরে হাস্য না ক'রে পারলেন না। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, “মশাই, রতনকে যদি ডাকাত বলেন, তাহ'লে আমাকে আপনি গুণ্ডা বললেও আমি কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করব না।”

মিঃ চ্যাটো গম্ভীর মুখে বললেন, “দেখুন মিঃ সেন, অন্ধবিশ্বাস কোথাও ভালো নয়। আগে সব কথা শুনুন, তার পর অবিশ্বাস করতে হয় করবেন!”

বিনয়-বাবু সহাস্য মুখেই বললেন, “আচ্ছা, আমি শুনছি। দেখা যাক, এই দারুণ কৌতুকটা আপনারা কতটা চরমে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। নিবারণ-বাবু, রতন যে ডাকাত, এটা আপনি কি করে আবিষ্কার করলেন?”

নিবারণ বললে, “আপনি ঠাট্টা করছেন? করুন, আমি কিন্তু সত্য কথাই বলছি—খালি তাই নয়, আমার কথা যে সত্য, প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে।”

বিনয়-বাবু সচমকে বললেন, “প্রকাশ্য আদালতে? আপনার কথার অর্থ কি?”

—“কলকাতায় রতনকে ডাকাতী মামলার আসামী রূপে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল।”

বিনয়-বাবু বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে নিবারণের মুখের পানে নির্বাক ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

নিবারণ তাঁর ভাবগতিক দেখে তৃতীয়বার দস্তবিকাণ করে বললে, “সে আজ প্রায় দু-বছরের আগেকার কথা। কলকাতায় এক ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতী করে আরো কতকগুলো ছোকরার সঙ্গে রতন ধরা পড়ে। আজকাল রাজনৈতিক ডাকাতির ফ্যাসান উঠেছে জানেন তো, এও তাই।”—

বিনয়-বাবুর মনের উপরে নিবারণের কথাগুলো কি-রকম কাজ করেছে তা আন্দাজ করবার জন্তে মিঃ চ্যাটো মনোযোগের সঙ্গে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনয়-বাবু বললেন, “বিচারে রতনের কি হ'ল?”

—“অবশ্য, বিচারের ফলে রতন সে-যাত্রা কোন গতিকে বেঁচে যায়।”

বিনয়-বাবু উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বললেন, “হ্যাঁ, সে তো ছাড়া পাবেই, রতন কি কখনো ডাকাত হ'তে পারে?”

নিবারণ বললে, “না, মিঃ সেন, খালাস পেলেও রতনের নির্দোষিতা-প্রমাণিত হয়-নি।”

—“নিশ্চয় সে নির্দোষ বলেই খালাস পেয়েছে।”

—“রতন খালাস পেয়েছে কেবল প্রমাণ-অভাবে। হাকিম তাকে নির্দোষ বলে স্বীকার করেন-নি। তার মত তার আর-এক সঙ্গীও সে-যাত্রা খালাস পেয়েছিল, কিন্তু পরে আর-এক মামলায় ধরা পড়ে এখন জেল খাটছে। রতনের উপর থেকে এখনো আমাদের সন্দেহ যায়-নি, আমরা তার সমস্ত গতিবিধির সন্ধান রাখি। তার পিছনে সর্বদাই আমাদের চর ঘুরছে। সে যে এখানে এসেছে, কলকাতা থেকে এখানকার পুলিশ-বিভাগকে যথাসময়ে সে খবর জানানো হয়েছে। এখানকার সাহেবরাও তার বিরুদ্ধে অনেক কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছে। রতন সাংঘাতিক লোক। হয় শীঘ্রই তাকে ফের গ্রেপ্তার করা হবে, নয় তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “এসব ব্যাপার আপনার জানা উচিত মনে ক'রেই নিবারণ-বাবুকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।”

বিনয়-বাবু হুঃখিতভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

নিবারণ বললে, “মিঃ সেন, আপনাকে আমি আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রতন এখানে থাকলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন।”

চমকিত স্বরে বিনয়-বাবু বললেন, “কেন, আমি বিপদে পড়ব কেন?”

—“প্রথমতঃ আপনার বাড়ীতে খানাতল্লাসী হ'তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রতন কোন কারণে ধরা পড়লে আপনাকেও পুলিশ-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে।”

মিঃ চ্যাটো বললেন, “সেটা আপনার নামের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হবে, বুঝতে পারছেন কি?”

নিবারণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

বিনয়-বাবু চিন্তিত ভাবে বললেন, “আনন্দ এখানে নেই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি? মিঃ চ্যাটো, আপনি আমাকে কি করতে বলেন?”

—“আপনার কর্তব্য তো খুবই সোজা।”

—“সোজা?”

—“হ্যাঁ। রতনকে বিদায় ক'রে দিন।”

বিনয়-বাবু নিরুত্তর হয়ে ভাবতে লাগলেন।

মনে মনে হেসে মিঃ চ্যাটো বললেন, “কোথাকার

একটা উড়ো-আপদকে ঘাড়ে ক'রে কেন আপনি বিপদে পড়বেন ? আপনি দেশের আর দেশের মধ্যে একজন মাগু গণ্য লোক, আপনি যদি পুলিশ-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়েন, খবরের কাগজগুলারা তা হলে ধূনোর গঞ্জে মনসার মত নেচে উঠবে, আপনার নাম দিয়ে যা-খুসি তাই লিখবে,— মিঃ সেন, হাতীকে পাঁকে ফেলবার জগ্রে পৃথিবীর উৎসাহের অভাব কোন দিনই হয়-নি !”

—“সব বুঝছি, মিঃ চ্যাটো, বুঝছি। কিন্তু—” বলতে বলতে হঠাৎ থেমে, বিনয়-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়া-তাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে কতটা বিচলিত

হয়েছেন, সেটা তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মিঃ চ্যাটো বিলক্ষণই বুঝতে পারলেন।

বিনয়-বাবুর পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে না যেতেই পাশের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে কুমার-বাহাদুর আত্মপ্রকাশ করলেন।

মিঃ চ্যাটো বিজয়ী বীরের মত গর্কিত অথচ নিম্ন-স্বরে বললেন, “আজ আমার ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছি !”

কুমার-বাহাদুর একগাল হেসে বললেন, “পাশের ঘর থেকে আমি সমস্ত শুনেছি !”

ক্রমশঃ

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

একটি আদর্শ গ্রাম

[আদর্শ গ্রাম কিরূপ হওয়া উচিত, কিছুকাল পূর্বে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম ; এবং আদর্শের দিকে কোন গ্রাম অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে জানিতে পারিলে তাহার সচিত্র বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। তদনুসারে “স্থল” গ্রামের বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইল। — প্রবাসী-সম্পাদক।]

গত বৎসরের পৌষমাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রগঞ্জে সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পল্লীর যে কল্পিত চিত্র দিয়াছেন, বঙ্গের প্রত্যেকটি পল্লীকে ঐরূপে গড়িয়া তোলা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইলেও চার-পাঁচখানি গ্রাম লইয়া ঐরূপ এক-একটি আদর্শ পল্লীকে স্থাপন করা অসম্ভব মনে হয় না। মাহুষ কোন সময়েই ঠিক আদর্শে উপনীত হইতে পারে না। কারণ, সে যত উন্নত হইতে থাকে, তাহার আদর্শও তত উন্নত হইতে থাকে। অতএব, আদর্শের দিকে সতত অগ্রসর হইবার অবিরাম চেষ্টা দ্বারা মাহুষের সজীবতা প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগুলির অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, পূর্ববঙ্গের পল্লীসমূহের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। পূর্ববঙ্গে যে-সব গ্রামে জমিদারগণের বাস আছে সেখানে দুই-একটি

বিদ্যালয় বা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকিতে প্রায় দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যত্ন ও উদ্যমের অভাবে নূতন প্রতিষ্ঠান ত হয়ই না, বরং পুরাতনগুলির অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। প্রধানতঃ পল্লীতে উপার্জনের পথ না থাকায় এবং শিক্ষা বিস্তার না হওয়াতেই দরিদ্রেরা উপার্জন-উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বথ-সুবিধার জন্ম পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরগামী হইতেছেন। পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে পল্লীবাসীর অর্থোপার্জনের সুযোগ সুবিধা এবং পল্লীসমাজের জড়তা ও অবসাদ দূর, কবিয়া বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের সৃজন করিতে হইবে। শিক্ষা, অর্থোপার্জন, স্বাস্থ্যায়ত্তি, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি যে-সব লক্ষণ মানবজীবনে উন্নতি ও পরিপুষ্টির পরিচায়ক, সেগুলি যাহাতে একসঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে তাহার উত্তম ব্যবস্থা করা চাই। বক্তৃতা-বা প্রবন্ধ-যোগে প্রচার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে অধিক ফল হওয়া সম্ভব। আমাদের পল্লীতে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যেরূপ কার্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির জন্ম যে নীতি অনুসরণ করা হইতেছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রাকৃতিক বিবরণ—যাতায়াতের সুবিধা

স্থল গ্রামে যাতায়াতের পথ

বারেন্দ্রভূমের সর্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কেন্দ্র “স্থল” গ্রাম পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার মধ্যে বর্তমান ব্রহ্মপুত্র-নদের (যমুনা নদীর) পশ্চিম কূলে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দ হইতে গোয়ালন্দ-বাহা-চুরাবাদ সার্ভিসের ষ্টীমার যোগে এখানে যাতায়াত করিতে হয়। ষ্টেশনের নাম স্থল ষ্টীমার ঘাট। পার্শ্ববর্তী স্থল-বসন্তপুর স্থল-নওহাটা গ্রামের নামও এই স্থল গ্রামের নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বিস্তৃত মাঠ আছে, বিশুদ্ধ বায়ুর আদৌ অভাব হয় না। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান। প্রসিদ্ধ পাকড়াণী

বোর্ডের ও সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সভ্য থাকিয়া জেলা-বোর্ডের ও জনসাধারণের সেবায় ব্রতী আছেন। তাঁহাদের পুরুষাত্মক যত্ন ও চেষ্টাতেই তাঁহাদের গ্রামটি বঙ্গের অগ্রতম আদর্শ পল্লীকেন্দ্ররূপে সুপরিচিত হইয়াছে।

প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ

গ্রামের সদর রাস্তা উচ্চ ও প্রশস্ত। ষ্টীমার-ঘাট, হাটবাজার, রেজেষ্টারী অফিস, পোষ্টাফিস, থানা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াতের এইটিই প্রধান সড়ক। সড়কের ধারেই জমিদারদিগের বাড়ী ও বাগান এবং দক্ষিণে সংলগ্ন সেই ময়দান। এই স্থানের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য মফঃস্বলের অনেক সহরেও দেখা যায় না।



স্থল জমিদার-বাড়ী

জমিদারগণ গ্রামের মালিক। বহু পূর্বে হইতে এই জমিদার-বংশ জনসাধারণের হিতকল্পে নানা-প্রকার আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশের উন্নতিসাধন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজী ১৮৭৬ সনে রোড্‌সেম্‌ কমিটির সময় হইতেই এই বংশের নায়কগণ স্বায়ত্তশাসন-আন্দোলনে যোগদান করিয়া বরাবর পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট

সাধারণ গ্রাম্য পথ

বর্ষাকালে প্রতিবৎসরই এক্ষণে জলপ্রাবন হয়। সেই সময় স্থল-পথে যাতায়াতের সুবিধার জ্ঞাত ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের দ্বারা সড়কের খালের উপর একটি উত্তম পাকা সেতু নির্মিত হইয়াছে। ষ্টীমার-ঘাট ও অন্য় স্থানে

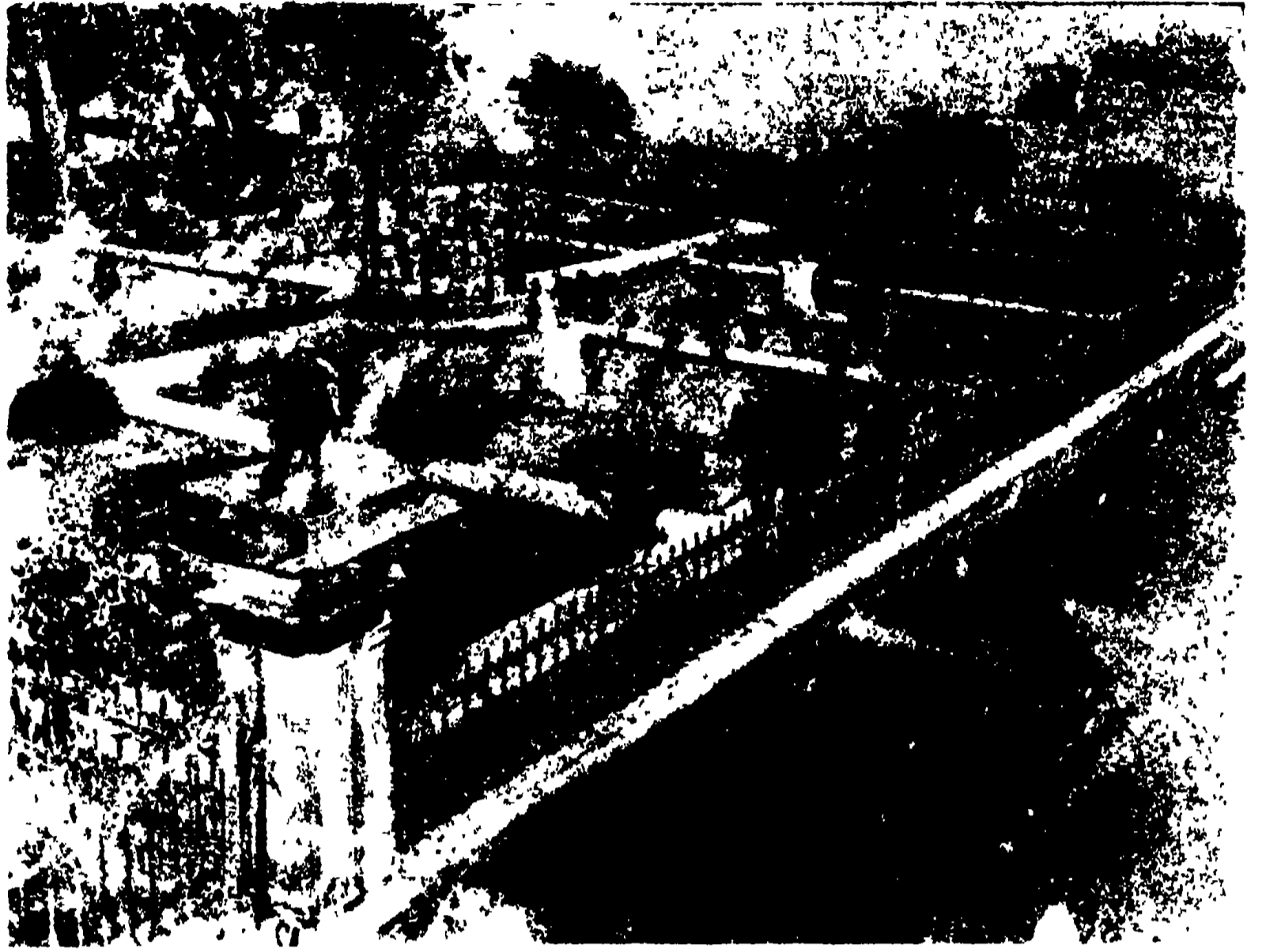
ঘাতাত্ম্যের জন্তু চারখানি ঘোড়ার গাড়ী
ভাড়া খাটে ও পাল্কী প্রভৃতি পাওয়া
যায়।

পোষ্টাফিস

বহু পূর্ব হইতেই গ্রামে পোষ্ট-অফিস
ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে চারিটি ব্রাঞ্চ অফিস
সহ সেটি সব-অফিসে পরিণত হয়। টেলি-
গ্রাফ অফিস স্থাপনজন্তু জমিদারগণ সাধা-
রণের পক্ষ হইতে গ্যারাণ্টি-বণ্ড প্রদান
করিয়াছেন। সমস্ত অফিস খোলার জন্তু
চেষ্টা চলিতেছে।

স্থল ডাক-বাংলা

জেলায় এই অঞ্চলের রাজকীয় পরিদর্শন
উপলক্ষে রাজকর্মচারীদের থাকিবাব
জন্তু ইংরেজী ১৯১৫ সনে পাবনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সদর
রাস্তার ধারে একটি বৃহৎ পাকা ডাকবাংলা নিৰ্মাণ
করিয়াছেন।



শারদাবাস

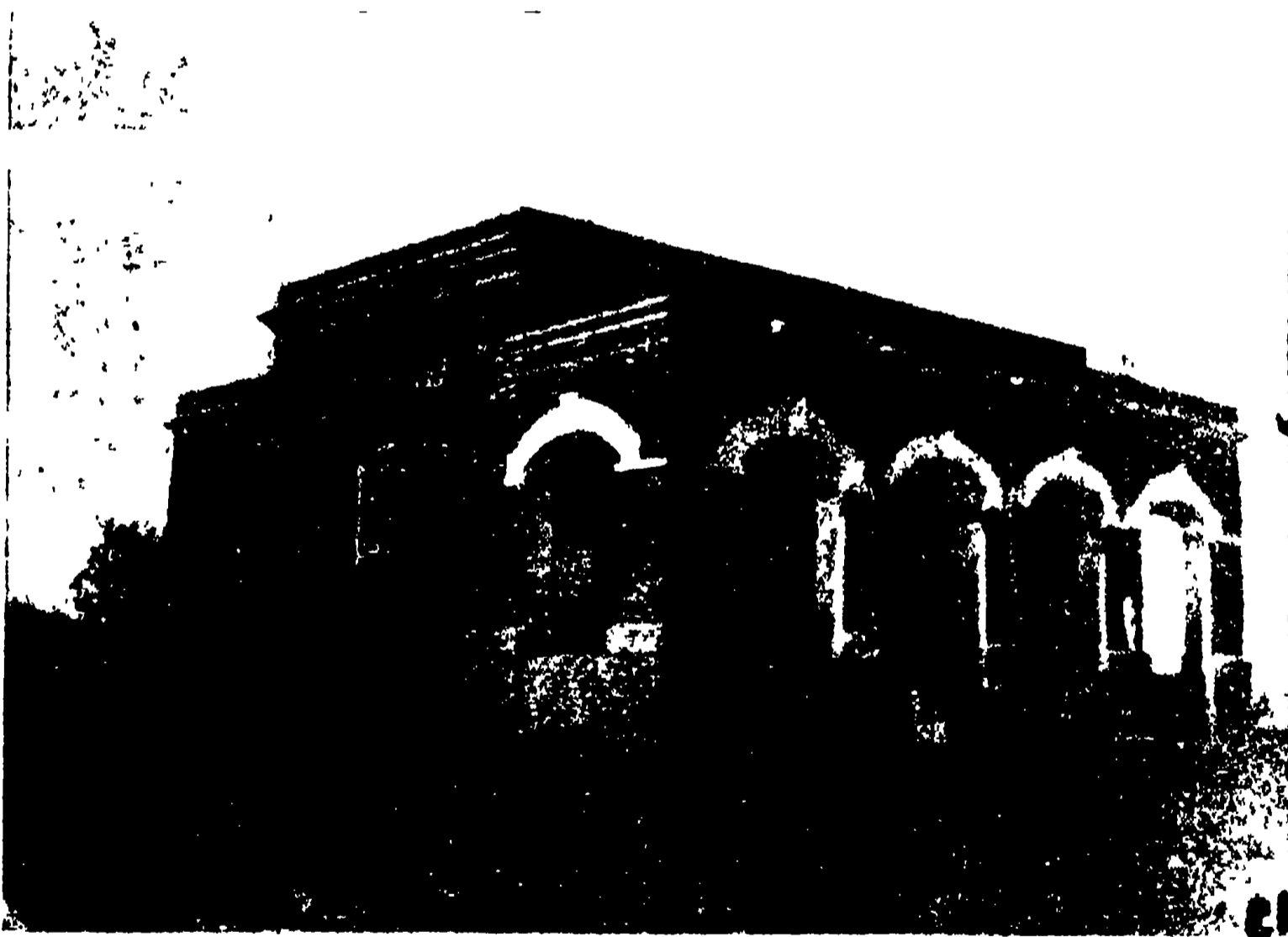
শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান

ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রামের শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে বহু পূর্ব হইতেই স্থানীয়
জমিদারগণ যত্ন লইয়া আসিতেছেন। পার্শী
ও সংস্কৃত শিক্ষার আমলে গ্রামে একটি পার্শী
মোকতব ও দুইটি বৃহৎ টোল ছিল।

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের
প্রারম্ভেই ইংরেজী ১৮৬১ সনে ৮ শ্রীমন্ত
পাকড়াশী মহাশয় বোয়ালিয়া (রাজসাহী)
হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রবেশিকা
পরীক্ষায় সর্বপ্রথম কৃতকার্য হইয়াছিলেন।
ইহার তিন বৎসর পরেই ইংরেজী ১৮৬৪
সনে গ্রামে স্থল-পাকড়াশী ইন্সটিটিউশন্
নামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত
হয়। ইংরেজী ১৮৯৪ সনে এই বিদ্যালয় উচ্চ
ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জমিদারগণ

এই বিদ্যালয়ের স্থান, গৃহ, আসবাব ইত্যাদি প্রদান
করিয়া এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত ব্যয়ভার বহন
করিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের
পরিচালন-ভার কমিটির হস্তে ন্যস্ত আছে। ছাত্র-
দিগের অনুশীলন-সমিতি ও খেলার সুব্যবস্থা আছে।



স্থল ডাক বাংলা

স্থল রেজিষ্ট্রেশন্ অফিস

এই ডাক-বাংলার নিকটেই স্থল সব-রেজিষ্ট্রী
অফিস ও থানা অবস্থিত। বেজেষ্ট্রী অফিসটি ১৯০৭
সনে স্থাপিত হইয়া ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে।



স্থল পাকড়াশী ইনস্টিটিউশন্

ইতিপূর্বে কয়েকবার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বাজসাহী বিভাগে এবং পাবনা জেলায় ম্যাট্রিকুলেশন ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তাহাকে “হুর্গানাথ পাকড়াশী বৃত্তি” দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জগু কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হইতেছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা এবং গৃহশিল্প

ইংরেজী ১৯১২ সনে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রলাল পাকড়াশী মহাশয়ের স্মৃতিতে গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টি জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়া স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া নিজ নিজ গৃহে অনুশীলন দ্বারা গ্রামস্থ অনেক ভদ্রমহিলা হোমিও-প্যাথিক গৃহচিকিৎসা, ধাত্ত্রীবিদ্যা, সূতাকাটা, সেলাইয়ের কাজ, কার্পেটের কাজ প্রভৃতি গৃহশিল্পে পারদর্শী হইয়া-

ছেন। সমবায় পদ্ধতিতে মহিলাদিগের মধ্যে কুটীরশিল্প প্রচলনের ব্যবস্থা হইতেছে।

শোভারাম বিদ্যাপীঠ

ইং ১৯১৮ সনে জমিদারগণ পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল স্থাপন করিয়া সুন্দর গৃহ ও সুশিক্ষিত অধ্যাপক সহ নির্দিষ্ট ব্যয়-নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২০।২২টি ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। পরিচালন-সমিতি এই বিদ্যালয়ে আয়ুর্কৌদ শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া একটি আধুনিক বিদ্যাপীঠ গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিয়াছেন।

অন্যান্য নানা বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষার জগু গ্রামে দুইটি



ব্রজেন্দ্রলাল বালিকা-বিদ্যালয়

প্রাইমারী স্কুল আছে। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবারও চেষ্টা হইতেছে।

ইংরেজী ১৯০২ সনে ইয়ংম্যান্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গ্রামে গঠিত হইয়াছিল। গ্রন্থশালা সহ খেলার ব্যবস্থা ও গ্রামের হিতানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়া এই সমিতি উত্তম কার্য্য দেখাইয়াছে। লাই-

শ্রী ও পাঠাগার সহ “স্থল বাণীমন্দির” নামে একটি ক্লাব রেজিস্ট্রী করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে।

স্থল-সমাজ পত্রিকা

গত ৮ বৎসর যাবৎ কলেজের ছাত্রগণ গ্রীষ্ম ও পূজা-অবকাশে “স্থল-সমাজ” নামে একখানি সচিত্র ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন।

শারদীয় সম্মিলন

প্রতিবৎসর পূজার সময় গ্রামবাসীদিগের একটি শারদীয় সম্মিলন হয়। তদুপলক্ষে যুবকগণ আবৃত্তি, স্তোত্র পাঠ, গানবাজনা ও কৌতুকাভিনয় করে।

নাট্য-সমাজ

বঙ্গলা ১২৮৫ সনে “স্থল আদি আৰ্য্য রঙ্গভূমি” নামে একটি নাট্য-সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। তদবধি এই রঙ্গমঞ্চে রাজা ও রাণী, প্রতাপাদিত্য, জনা, সাজাহান, পাণ্ডব-গৌরব, বলিদান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক সূচাক্রমে অভিনীত হইয়াছে। বর্তমানে প্রতিবৎসরই গ্রীষ্ম ও পূজা-অবকাশে অভিনয় করা হয়।

গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা-বিদ্যায় গ্রামে অনেকেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।



স্থল শোভাবাম চতুপ্পাগী

সভা সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন জন্ম কোনও পাব্লিক হল নাই বটে, কিন্তু জমিদার-বাটীতে চারটি বৃহৎ নাট্যমন্দির আছে। তাহারাই অল্পগ্রহপূর্বক সভাসমিতির অধিবেশন, বক্তৃতা ও নাট্যাভিনয়, প্রভৃতি উপলক্ষে স্থান-দান ও অগ্ন্যাগ্ন সাহায্য করিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে বাণী-মন্দিরে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার স্থান রাখার ব্যবস্থা হইবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণ

সাধারণ স্বাস্থ্য

গ্রামে স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল থাকে। ঋতু-বিশেষে জ্বর ও সংক্রামক রোগের সাময়িক আক্রমণ দেখা যায় মাত্র। পূর্বেই বলা হইয়াছে গ্রামে বিশুদ্ধ বায়ু অভাব হয় না। সর্বসময়ে গ্রামে পাঁচটি পুকুর আছে, তন্মধ্যে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত “বড় কুম” একটি বৃহৎ দীঘি। সাধারণে এই স্থানের জলই সদাসর্বদা ব্যবহার করে। গ্রামটি বঙ্গের নিম্নভূমিতে অবস্থিত। কাজেই প্রতিবৎসর বর্ষার প্লাবনে ধৌত হইয়া যায়। সে-সময়ে পুকুরগুলিও জলমগ্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে বড়কুমের যে মনোরম দৃশ্য হয় তাহার চিত্র দেওয়া হইল।



ভরা বর্ষায় ‘বড়কুমের’ দৃশ্য

জলাশয় ও চিকিৎসালয়

গ্রামের পূর্বপাড়ায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি বৃহৎ ইদারা আছে।

ইংরেজী ১৯২০ সনে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গ্রামে জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ৮ বিনোদলাল পাকড়াশী মহাশয়ের পুত্রগণ চিকিৎসালয়ের স্থান ও পিতার স্মৃতিতে গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। চিকিৎসালয়ে আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত সুযোগ্য ডাক্তার আছেন। ইহা ছাড়া গ্রামে দুইজন কবিরাজ দুইজন ম্যালোপ্যাথিক ও তিনজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন।

অর্থোন্নতি

গ্রামে থাকিয়া অর্থোপার্জননের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্ত নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে ও হইতেছে। গ্রামে ৫টি জমিদারী কাছারী ও একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। তাহাতে অনেক কর্মচারী ও শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তা ছাড়া ইং ১৯০৭ সন হইতে একটি সব-রেজিষ্টারী অফিস স্থাপিত হওয়ায় বহুসংখ্যক কেরানী ও প্রায় ৩০টি লোক দলিল লেখার কার্যে নিযুক্ত আছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে চার বৎসর যাবৎ গ্রামে স্থল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কটি ৪ বৎসর কার্য করিয়া দুই বৎসর যাবৎ শতকরা ১৫ হারে ডিভিডেণ্ড দিতেছে। ব্যাঙ্কে তীর্থবাসীদিগের স্থায়ী আমানতের উপর অধিক সুদ দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ডিরেক্টর বোর্ডে সুদক্ষ সজ্জন ব্যক্তি থাকায় ব্যাঙ্কের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমানত বৃদ্ধি পাইতেছে।

বয়ন বিদ্যালয়

পাবনা জেলায় বহু তাঁতীর বাস, বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রায় ৫০ হাজার বস্ত্রশিল্পীর বাস। মিহী ধুতি, শাড়ী ও মসলিন খানের উপর মুগা ও জরির কাজ করিয়া এই-সকল তাঁতী উৎকৃষ্ট কারুকার্য দেখাইয়াছে। মধ্যযুগে কিছুদিন তাঁতীগণ বয়নশিল্প ত্যাগ করিয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় জেলা-বোর্ডের মেম্বর থাকিবার সময় তাঁহার যত্নে ইং

১৯২০ সনে স্থলগ্রামে একটি ভ্রমণশীল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক তন্তুবায় উন্নত প্রণালীর বয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জনে সক্ষম হইয়াছে। তাহার পর হইতেই তাঁতীদের অদম্য উৎসাহ দেখা দিয়াছে। তাহারা সকল অসুবিধা দূর করিয়া উন্নত প্রণালীর ব্যবসাপদ্ধতি দ্বারা পল্লীর অর্থোন্নতি সাধনের ও বেকার সমস্যা মোচনের জন্ত বহু-পরিকর হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, এম্-এ, বি-এল, মহোদয়ের নেতৃত্বে স্থল উইভিং এণ্ড স্পিনিং কোম্পানী নামে একলক্ষ টাকা মূলধনের একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর কারখানায় একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় ও বিদেশাগত অনেক যুবক বয়নশিল্প দ্বারা বেশ অর্থোপার্জন করিতেছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শিবেশ-বাবুর স্বকীয় তত্ত্বাবধানে কোম্পানীটি উন্নতি লাভ করিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী সর্বভারতীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে কলিকাতায় অতি সম্ভাদরে সুন্দর বস্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ স্বদেশী ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিসনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আর-একটি পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। কোম্পানীটি অল্পদিনের মধ্যেই উন্নতিশীল হওয়ায় সাধারণে সাগ্রহে অংশ ক্রয় করিতেছে। কোম্পানীটির এইরূপ উন্নতি দেখিয়া ২৫ লক্ষ টাকা মূলধনে সিরাজগঞ্জে একটি কটন মিলস্ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে। সম্ভবতঃ সত্বরই উহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

গ্রামে ৩৪টি মুদীখানা আছে বটে, কিন্তু সম্ভাদরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া মিউনি-সিপালিটীর নিয়মে হাটবাজার পরিচালন, আলো-প্রদান ও অন্যান্য কার্য নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে “স্থল স্টোরস্” নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী খোলা হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বহু তাঁতীর বাস এবং সূতা বিক্রয়ের বৃহৎ দুইটি হাট আছে, কিন্তু পাকা রংএর কোন কারখানা এতদ্বারা নাই। সেজন্য নানারূপ অসুবিধা বোধ হইত। শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়

“কেশোরাম মিল্‌স্” হইতে রং করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং স্থল সায়েন্টিফিক্ ডাই ওয়ার্ক স্ নামে একটি কারখানা খুলিয়াছেন। যন্ত্র ও উপকরণ কতক কতক আসিয়াছে।

স্বর্গীয় ডাক্তার ক্ষীরোদলাল ভট্টাচার্য মহাশয় প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পূর্বে “স্থলবসন্তপুর মেডিক্যাল হল্” নামে একটি ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। উহা সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

জমিদারী ব্যবসা নানা কারণে শত অসুবিধায় ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেগুলি দূর করিয়া যৌথ উদ্যমে সরঞ্জামী কমাইয়া ও অন্তব্যবসা যোগ করতঃ ইহাকে উন্নত করিতে বাংলা দেশে প্রায় ২৫।৩০টি জমিদারী কোম্পানী গঠিত হইয়া সবেগে চলিতেছে। স্থলগ্রামেও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় জমিদারী ইম্‌প্রুভ্‌মেন্ট্‌ ট্রাষ্ট্‌ লিঃ নামে ঐরূপ আদর্শে একটি কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। স্থানীয় কোম্পানীগুলি সাধু ব্যক্তি দ্বারা সুপরিচালিত। ইহার অনেকগুলির মধ্যে ৫ হাজার হইতে লক্ষ টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে মনে হয়। ইহা ছাড়া এখানে শস্ত-বাধাই-ও চালানী, পাটের কাজ, সূতার ব্যবসা, কৃষি, জমিদারী, তালুকদারী, কোম্পানী পরিচালন, কুটীরশিল্প, দেশলাই সাবান, বোতাম তৈরি, প্রভৃতি নানা কার্যের সুযোগ আছে। নিকটে ৫।৬ মাইলের মধ্যে ৮।১০টা হাট আছে। আধুনিক রুটির যৌথ কাজ ও সমবায়-প্রথায় আস্থাবান কোন ব্যক্তি পল্লীতে অল্প সরঞ্জামী-ব্যয়ে ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক থাকিলে এই কোম্পানীর সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন।

গ্রামের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার মহাশয় চিত্রশিল্পের চর্চা করিয়া থাকেন। আমাদের প্রকাশিত সমস্তগুলি আলোক-চিত্রই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার মহাশয়েব সৌজন্যে প্রাপ্ত। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এতদ্ভিন্ন গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বাজার আছে। বাজারে মনোহারী জিনিষ, জামা কাপড়, জুতা, ছাতা, ঘড়ি, সাই-কেল মেরামত, মহাজন ও দর্জি প্রভৃতির দোকান আছে।



স্থল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্ ব্যাঙ্কের ও জমিদারী ইম্‌প্রুভ্‌মেন্ট্‌ ট্রাষ্টের অফিস-গৃহ

গ্রামে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের কারখানা, কুটীরশিল্প, ডেইরীফার্মিং, জোতদারী ও সমবায় কৃষিসমিতি প্রভৃতি গঠন করিয়া পল্লীর অর্থোন্নতিকল্পে গ্রামস্থ শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রামে এই-সমস্ত যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ছাপার কার্যাদি ভিন্ন স্থান হইতে করিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত এখানেই একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে একটি ছাপাখানা খুলিবার চেষ্টা হইতেছে।

আজকাল অনেক ধনবান্ সজ্জন পল্লীপ্রেমিক ভদ্র-বংশীয় ব্যক্তি সুসজ্জুক পল্লী খোঁজ করিয়া অল্পই পাইয়া থাকেন। স্থল গ্রামের মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী ২।৩ মাইলের মধ্যে মাঠযুক্ত চমৎকার স্থান আছে। কোন ধনবান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজে বসবাসের সুবিধা করিয়া লইতে পারেন।

নৈতিক ও সামাজিক অসুষ্ঠান স্থলে পাকড়াশী জমিদারগণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের

বংশধর। তাঁহারা বহু সদাচারী উচ্চবংশীয় কুলীন ও অগ্রাণ্ড ভদ্রসন্তানগণকে আশ্রয় দিয়া নিজগ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের সদহুষ্ঠান, আতিথ্য ও সামাজিক সৌজন্যের প্রভূত সুখ্যাতি রহিয়াছে।

শ্রীগৌরান্দ দেব

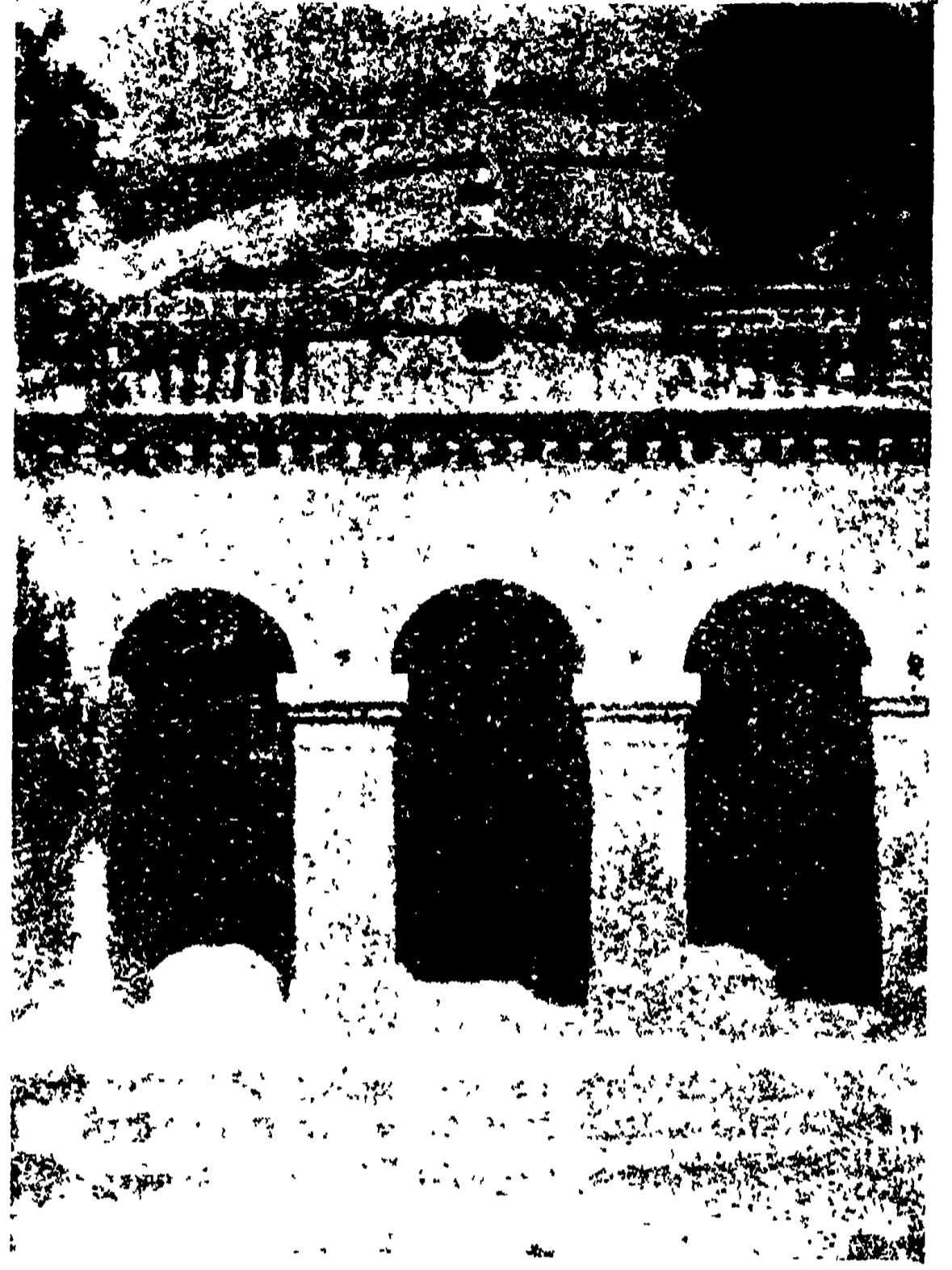
প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামে শ্রীগৌরান্দ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মনোহর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর দোলপূর্ণিমার সময় এই বিগ্রহের প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ মেলা হয়। পাবনা জেলার প্রধান মেলার মধ্যে ইহা অগ্রতম। ইহাতে প্রায় ৬৭ হাজার লোকের সমাগম হয়।

গৌরান্দ-মন্দির

কথিত আছে যে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদ ৬৪ মোহাস্তগণের অগ্রতম শ্রী কবিচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ তদীয় শ্রীপাটে এই দুই দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণ দুর্দান্ত মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে ঐ বিগ্রহ রক্ষা



শ্রীশ্রীগৌরানিত্যাই বিগ্রহ

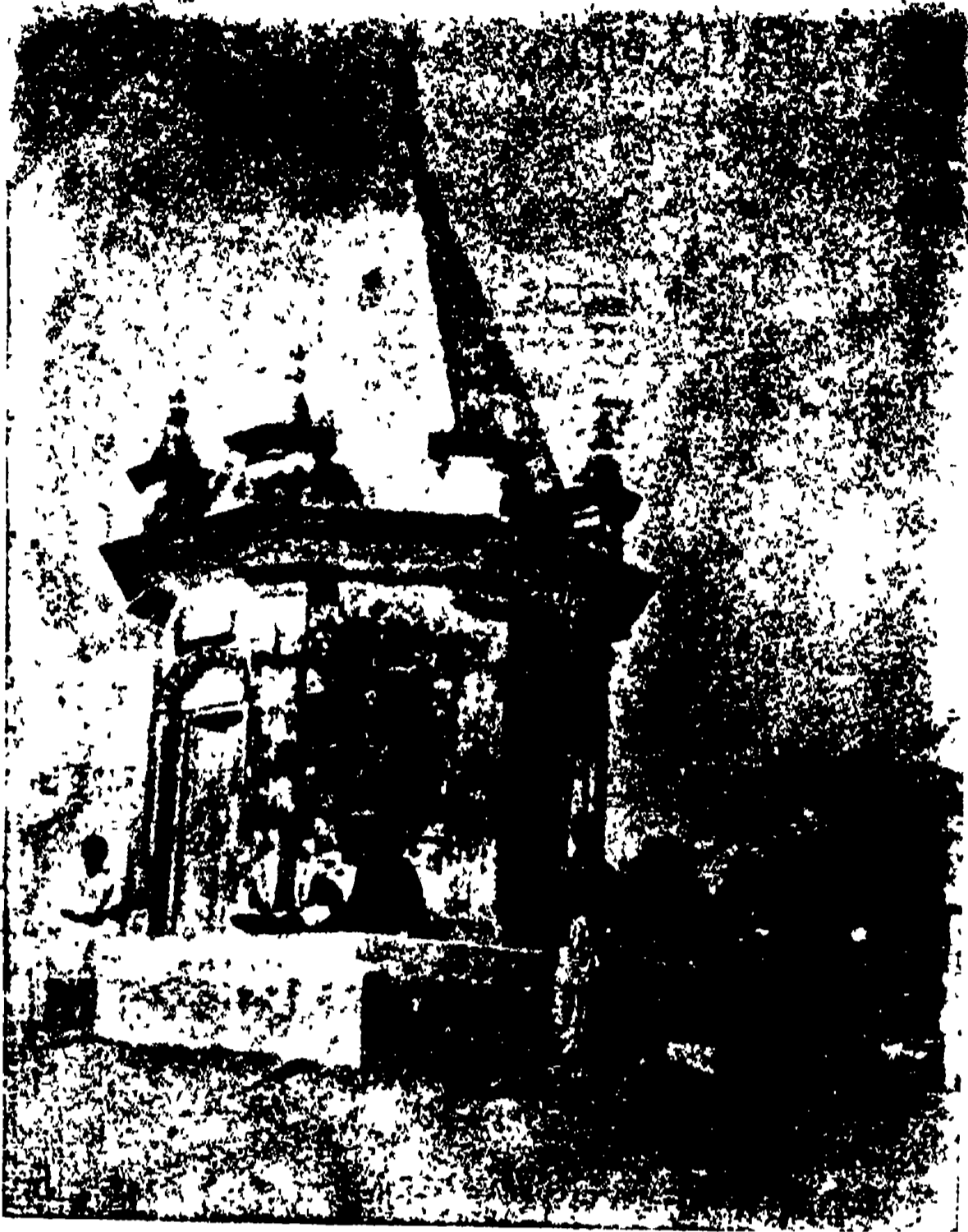


শ্রীগৌরান্দ মন্দির

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাকড়াশী জমিদার মহাশয়ের বদাশ্রুতায় নিশ্চিত করিবার জন্ত নৌকাপথে পলায়ন করিয়া রাজসাহী জেলার নানাস্থান ভ্রমণকরতঃ বর্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত তপসীবাড়ী গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। অতঃপর নাটোর রাজদরবার হইতে বর্তমান স্থলগ্রামে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া এই গ্রামে আসিয়া বিগ্রহ সহ স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। সেও প্রায় ২৫০ শত বৎসরের কথা। গৌরান্দদলের মেলাও ঐ সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাকড়াশী জমিদার মহাশয় এই বিগ্রহের জন্ত একটি বৃহৎ পাকা মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় গঠিত এই মূর্তি প্রধান বৈষ্ণব মাত্রেই দেখিতে আসেন। এজন্ত এস্থান একটি বৈষ্ণব-তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

গৌরান্দ ও নিত্যানন্দ দেবের মূর্তি

জমিদারগণ দুইটি প্রস্তরময়ী কালীমূর্তি এবং শিবস্থাপন করিয়া প্রাঙ্গণস্থ মনোরম মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির



শ্রীশীকেদারেখর মন্দির



শ্রীশ্রী দয়াময়ী কালীমন্দির

দ্বারা নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেব বিগ্রহের সেবার পালা অল্পমারে অতিথি-সেবার ব্যবস্থা আছে। দয়াময়ী ও জয়কালী প্রতিমা এবং গোরাক্ষ ও গোবিন্দদেব বিগ্রহের মূর্তির গায় সুশী ও চিত্তাকর্ষক মূর্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

বারোয়ারী পূজা

গ্রামে আরও ৮খানি নিত্যসেবার (শিব, নারায়ণ প্রভৃতির) ব্যবস্থা আছে। এতদ্ভিন্ন ৩ খানি বারোয়ারী পূজার আসন আছে এবং পর্যায়ক্রমে বারোয়ারী পূজা হইয়া থাকে। গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে স্থানীয় মুসলমানদের উপাসনার জন্য একটি জুম্মা-মসজিদগৃহ স্থাপিত আছে।

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা ও হরিবাসর

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে ৭৬৯সর হইল “স্থল হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা” নামে একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা কলিকাতার গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর “পাবনা শাখা”রূপে গৃহীত। প্রতি শনিবারে সভার অধিবেশনে নিয়মিত ভাগবত পাঠ,



শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ



শ্রীশ্রীকালী মন্দির

কথকতা ও কীর্তনাদি হয়। বৈশাখী সংক্রান্তিতে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, রসকীর্তনাদি ও মহোৎসব হয়। বিভিন্ন স্থানের কীর্তন সম্প্রদায় ও হরিসভা এই উৎসবে যোগদান করে। স্থানীয় একদল মুসলমান সম্প্রদায় তারকব্রহ্মনাম কীর্তনে যোগদান করিয়া হরিসভার সহিত একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে।

অল্পদিন হইল গ্রামস্থ যুবকগণ শ্রীগৌরাজ সেবা সমিতি নামে স্থানীয় নানাবিধ হিতসাধনেব জন্ম একটি সজ্জ গঠন করিয়াছেন। ঋণের সেবা আর্ন্ত্রাণ বিপন্নের সাহায্য প্রভৃতি সদহুষ্ঠান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ প্রভৃতি অনেক কার্য এই সমিতি গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রামস্থ অধিবাসীগণ অধিকাংশই একবংশ-সত্ত্বত ও আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রামবাসীগণের মধ্যে

কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকিলেও দোল-ভূর্গোৎসব, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য-উপলক্ষে পরস্পরের সহায়তা ও সহায়ভূতি পাওয়া যায়। পরস্পরের এই নির্ভরশীলতাই "স্থল"গ্রামের একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়।

গ্রামে টেনিস ক্লাব আছে। নিয়মিত খেলা হয়। ফুটবল ক্রীকেট প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা আছে। কাপ, শিল্প, প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-মূলক খেলাও হয়।

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির সময় মহা-সমারোহে পদ্মা পূজার নৌকা-বাইচ হয়। তদুপলক্ষে প্রায় পাঁচশত নৌকার সমাগম হইয়া থাকে। ইহাদের দুইটি পুরস্কার দেওয়া হয়। ফাল্গুন মাসে গৌরাজ-দোলের

মেলার সময় ঘোড়-দৌড় হয়।

যে-সকল অহুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইল সেগুলির উন্নতিকল্পে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করা হইতেছে এবং নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলার জন্ম যুবকবৃন্দ যত্ববান্ আছেন।

উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই যে আমাদের এই ক্ষুদ্র অহুষ্ঠান অপেক্ষাও গ্রামের হিতসাধন-কল্পে স্থানীয়স্থিত কোন অহুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা দেশে অবশ্যই আছে। পাঠক-পাঠিকাগণ এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমাদেরকে অহুগ্রহপূর্বক জানাইয়া তাঁহাদের সজ্ঞ অহুষ্ঠানের আদর্শের আদান-প্রদানের সুযোগ দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

“নারী-সমস্যা”

হঠাৎ যদি এই দেশের কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে জগতের কোন্ কোন্ প্রকারের জ্ঞানলাভের, কোন্ কোন্ নির্মল আনন্দ উপভোগের, কোন্ কোন্ রাজপথ উদ্যান ও দেশ ভ্রমণের এবং নিজ জীবনের কোন্ কোন্ কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মাহুষের থাকে উচিত, তাহা হইলে সম্ভবত তিনি বলিবেন, জগতের সকল-রকম জ্ঞানলাভের, সকল নির্মল আনন্দ উপভোগের, সর্বদেশ ভ্রমণের ও, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, নিজ জীবনের সকল কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মাহুষের থাকে উচিত। এই অধিকার আমাদের নাই বলিয়া, শুনিতে পাই, অনেকে আহা! নিজে ত্যাগ করিয়া স্বদেশ উদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই যদি ‘মাহুষ’ শব্দের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উত্তরে আমরা যে কথা শুনিব, তাহাতে নারীকে মাহুষ মনে না করিবার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রায়শাস্ত্রে এইপ্রকার লোকদের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর বিবাহ ও বৈধব্যের কথা উঠিলেই ইহাদের অধিকাংশের বুদ্ধিব্রংশ হইতে দেখা যায়। কাজেই ‘নারীসমস্যা’ বলিয়া যদিও কোনো কথা সৃষ্টি হয় নাই, তবু ‘নারীসমস্যা’র কথা শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়।

উচ্চাঙ্গের জীশিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, স্বাধীনতা যে সকল মানবের অর্থাৎ নারীরও জন্মলব্ধ সম্পত্তি, এবং বাল্যবিবাহের, বিশেষতঃ বাল্যমাতৃত্বের, ফলে যে নারীর দেহ মন ও ভবিষ্যৎ বংশের বহু ক্ষতি হয়, এসকল কথা এদেশেও আর নূতন নয়। যাহার মস্তিষ্কে কিছু সার পদার্থ আছে, হৃদয়ে স্নেহ প্রেম আছে এবং নিজহিত ও পরহিতের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনিই এ-সকল কথার সত্যতা মনে মনে স্বীকার করেন। কিন্তু মনে মনে যাহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ, কেহ বা দেশাচারের ভয়ে, কেহ বা শারীরিক ও মানসিক জড়তা ও আলস্যের বশে, কেহ বা আজন্ম গতানুগতিক হওয়ার

ফলে, কেহবা স্বার্থের দায়ে, কেহবা “সনাতনপন্থী”* বলিয়া পূজা পাইবার লোভে, কেহ বা দেশের ভালমন্দ সমস্তই দেশভক্তির আতিশয়ো শিরোধার্য্য করিবার উৎসাহে, মুখে এবং কার্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। উপরন্তু বহু অর্দ্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত নর-নারী, দেশের কি ক্ষতি করিতেছেন তাহা না বুঝিয়া, নিজেদের অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া, কাগজে কলমে যুক্তিহীন আবল-তাবল লিখিয়া জীজ্ঞাতির উন্নতির পথে নব নব বাধা সৃষ্টি করিয়া নারীসমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের লেখনীপ্রসূত এই-সব অপূর্ব্ব সম্বন্ধে দূবদৃষ্টি কোথাও নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চিহ্নও দেখা যায় না, পূর্বাপর সামঞ্জস্য অনেক স্থলে পাওয়া যায় না, এবং প্রামাণ্য দৃষ্টান্তের একান্তই অভাব। বাজে গল্প ও উড়ো খবরের উপর বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি দৃষ্টান্তকে সম্বল করিয়া এবং ‘বটতলা’র গল্পের উচ্চশিক্ষিতার নমুনাকে সত্য মনে করিয়া বৈঠকী গল্প করা চলে, কিন্তু দেশব্যাপী বড় বড় সমস্যার সমাধান যে করা যায় না, তাহা ইহারা ভুলিয়া যান। এই-সব প্রবন্ধের ফলে, আমাদের দেশের মাসিক-পত্রের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যাহারা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত মত ও মিথ্যা সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেশের অল্পশিক্ষিত পাঠকদের অধিকাংশেরই ধারণা ছাপার অক্ষরে যে কথা লেখা থাকে, তাহা প্রায় বেদবাক্যেব কাছাকাছি সত্য; তদুপরি যদি দুই চারিটা দুর্কোষ সংস্কৃত বচন এবং গোটা কয়েক খ্যাতনামা লোকের নাম জোড়া থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

কিছুদিন হইল কয়েকটি মাসিক-পত্রে প্রায় প্রতি-

* সনাতন পন্থা সম্বন্ধে লোকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদ ও উপনিষদ্ প্রাধান্যময়; স্মৃতি ও পুরাণ তাহার পরবর্তী। সুতরাং যাহারা উপনিষদিক ধর্ম না জানিয়া বা না মানিয়া পৌরাণিক ধর্ম মানেন ও স্মৃতির অগ্রসরণ করেন, তাঁহারা “সনাতনপন্থী” নাম পাইতে পারেন না।

মাসেই এইরূপ যুক্তিতর্কহীন ভ্রান্তিপ্রমাদপূর্ণ প্রবন্ধাদি দেখা যাইতেছে। লেখকলেখিকার রচনা দেখিলে বোধ হয়, আমাদের দেশে বুকি বা অন্তত দুচার লাখ মেয়েই হাতা-বেড়ি ফেলিয়া শামলা মাথায় দিয়া উকিল ব্যারিষ্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বসিয়াছেন, কম করিয়া ১০।১৫ হাজার অন্তঃপুরিকা হয়ত বুট ও বনেট পরিয়া রাজপথে দিবারাত্রি টহল দিয়া বেড়াইতেছেন, দেশব্যাপী স্কুলে কলেজে মেয়ে আর ধরে না, আফিসে আদালতে মহিলা কর্মচারীর ভিড়ে হাঁটা-চলা দুষ্কর এবং ঘরে ঘরে মাতৃস্নেহবঞ্চিত শিশুপাল দিবারাত্রি মুখব্যাদান করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। তাই সদয়হৃদয় লেখক-লেখিকারা দেশের এই ঘোর দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্ত দুই হাতে কলম লইয়া সব্যসাচী হইয়া সমরে নামিয়াছেন। কিন্তু হায় রে বিড়ম্বনা! এই শিশুমাতৃক নিরক্ষর দেশের মুষ্টিমেয় বালিকার “বোধোদয়” ও “ষ্টেপ বাই ষ্টেপ” এর বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান কেন?

স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা যৌবনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা লইয়া এই-সকল লেখক-লেখিকার আহা-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে। সকলগুলির সপক্ষে যুক্তি দেখানো এবং বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা একসঙ্গে সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বোপরে স্থান দিয়া ক্রমশ অগাধ বিষয়ে কিছু বলিব।

সভ্য জগতে মানুষ জন্মাবধি নানা শিক্ষার ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠে; একেবারে শিক্ষাবিহীন হইয়া আধুনিক জগতে কোনো মানুষেরই জীবনযাত্রা নির্বাহ করা চলে না। শিক্ষা, স্ন হউক, কু হউক, অল্প হউক, বিস্তর হউক, মানুষের জীবনের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীলোকও যখন মানুষ, তখন সংসারে টিকিয়া থাকিবার জন্তই তাঁহারও যে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা অতিবড় “সনাতনপন্থী”ও স্বীকার করিবেন। তর্ক হইতেছে শিক্ষার মাত্রা ও প্রকার লইয়া। একের মতে যাহা অল্প শিক্ষা, অন্দের মতে তাহাই অতিরিক্ত; একের কাছে যাহা স্ন, অন্দের কাছে তাহাই কু। তবে প্রমাণটা যুক্তির সাহায্যে না দিয়া বাবাজাল বিচার দ্বারা দিলে মানুষে মানিয়া লইতে আপত্তি করিতে পারে।

শিশুকে হাত ধরিয়া চলিতে শিখানো, আবৃত্তি করাইয়া কথা বলিতে শিখানো, গুরুজনের দেখাদেখি আচার ব্যবহার, ভালমন্দ বিচার শিখানো, সব-কিছুই শিক্ষা। যে-কোনো উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষের মনো-লোকের সুপ্ৰসংপ্রবৃত্তিগুলিকে (কুশিক্ষা হইলে অসংপ্রবৃত্তিসমূহকেও) জাগাইয়া তোলা হয়, অক্ষুট গুণসকল বিকশিত করিয়া তোলা হয়, নব নব চিন্তার ধারা মনে আনিয়া দেওয়া হয়, অন্তদৃষ্টি, দূর্দৃষ্টি ও জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি করা হয়, বোধ ও বিচার-শক্তি শাণিত ও মার্জিত করা হয়, স্ক্রুচি গড়িয়া তোলা হয় এবং ব্যবহারিক জীবনে মানুষকে সংযত শোভন ও আত্মনির্ভরশীল হইতে সক্ষম করা হয়, তাহাই শিক্ষা। কিন্তু এ জগতে শিক্ষার বিষয় এত অসংখ্য ও বিচিত্র যে প্রত্যেক মানুষকে মুখে মুখে মোটামুটি সকল শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রপ্রতি দশ বিশ হাজার গুরুর প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া, দেশবিদেশ হইতে সেই-সকল গুরু সংগ্রহ করিতে মানুষের প্রাণাস্ত ও সর্বস্বান্ত হইয়া যায়। এবং যে-সকল গুরু পার্থিব জগৎ হইতে চিরদিনেব জন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষার স্বাদ হইতে মানুষকে আজীবন বঞ্চিত থাকিতে হয়। অতীতের জ্ঞানসম্ভারকে সভ্য মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানের মানুষ ভবিষ্যতের জন্ত তাহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া বংশধরদের দান করিয়া যাইতেছে। মানুষ যদি গুরুরূপে অতীতকে এক দিনের জন্তও অস্বীকার করিত, তবে জগদব্যাপী এই সভ্যতা এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। এই সভ্যতার ধারা বজায় রাখিবার জন্ত ও শিক্ষাকে সহজ করিবার জন্ত অক্ষর পরিচয় ও পুস্তক পঠন ও লিখন এবং ক্রমশঃ আরো নানা নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়কে বর্তমান জগৎ শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং বর্তমানে যদিও পুস্তকপাঠ ও শিক্ষা শব্দ-দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবু প্রচ্ছন্নরূপে এই কথাটা মানুষের মনে সর্বদাই থাকে, যে, লিখন ও পঠন ব্যাপারটা প্রকৃত শিক্ষার সোপান মাত্র। মানুষ মানুষের নিকটই শিক্ষা পায়, অক্ষর ও পুস্তক কেবল একের নিকট হইতে আর-এক জনের নিকট তাহা পৌছাইয়া দেয় মাত্র। অবশ্য,

প্রকৃতির নিকট হইতেও মানুষ শিক্ষা পায় ; তাহা এখানে ধরিলাম না।

আমাদের দেশের এক দল মানুষ আছেন, আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কিম্বা যাত্রা কথকতা প্রভৃতি হইতে মৌখিক শিক্ষায় ঠাহাদের আপত্তি নাই, কিন্তু অক্ষরপরিচয়ে বিষম আপত্তি। দুইটার মধ্যে বাস্তবিক ঐকান্তিক আকাশ-পাতাল প্রভেদ যে কি, তাহা তাঁহারা নিজেরাও বোঝেন না, পরকেও বুঝাইতে পারেন না। কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শিক্ষা হয় তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের বেলাতেই যত গোলমাল। পুস্তক প্রচারের পরিবর্তে ভবিষ্যতে যদি ঘরে ঘরে গ্রামো-ফোনের রেকর্ড বিলি করা হয়, কিম্বা রেডিওর সাহায্যে লোককে ঘরে বসিয়া বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, উপদেশ, ও গান শুনাইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে “সনাতন-পন্থীরা” কি অন্তরমহলে এইরূপ বন্দোবস্ত হইতে দিবেন ? না, এক সনাতন মানুষ ছাড়া, নব আবিষ্কৃত কোনো যন্ত্রের সাহায্য লইতে তাঁহাদের আপত্তি ? বায়োস্কোপের সাহায্যে শিক্ষাও ত চোখের সাহায্যে শিক্ষা ; কিন্তু অনেক নিরক্ষর মহিলা বায়োস্কোপ দেখিয়া থাকেন।

আধুনিক লেখকলেখিকাদের কাহারও কাহারও ধারণা যে যতদিন পর্যন্ত হিন্দুনারীর অক্ষর পরিচয়, বিশেষ করিয়া ইংরেজী অক্ষর পরিচয়, না হয়, তত দিন পর্যন্ত তাঁহারা প্রত্যেকে একাধারে সতী, লক্ষ্মী, সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনী, অহল্যাবান্ধ, লক্ষ্মীবান্ধ হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করেন ; কিন্তু যে মুহূর্তে এবিসিডির সাক্ষাৎ পান, অমনই সকল গুণ গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া “সখের মেম সাহেব” হইয়া উঠেন। আশ্চর্য, যে হিন্দুনারী “কত শত রাবণ দুর্ঘোষনের” প্রলোভন এড়াইয়া কর্তব্য-পথে অবিচলিত হইয়া আছেন, কত ঝঞ্জা-ঝড়েও ‘প্রাতে অঙ্কনে গোবর-ছড়া’ দিতে বিরত হন না, যে হিন্দুনারী পুরুষকে অঞ্চল-চাপা না দিয়া “জাগাইয়া চেতন করিয়া দিতেছেন,” যে হিন্দুনারী শত শত “শয়তানের শয়তানী পদ্মিনীর মত পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন,” যে হিন্দুনারী ‘অবরোধ প্রথা’ ‘বিধবা বিবাহ’ প্রভৃতি ‘বাজে চিস্তার’ দিকে ঘৃণাভরেও

মন দেন না, সেই হিন্দুনারীই সামান্য দুইখানা বর্ণ-পরিচয় ও ইংরেজী প্রাইমারের ধাক্কায় সকল কর্তব্য তুলিয়া কুপথের পঙ্কিলতায় গড়াইয়া পড়িতেছেন !! শুধু তাহাই নহে, মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় ঠাহারা শত শত রাবণদুর্ঘোষন-মর্দিনী, দৈনিক-পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় তাঁহাদেরই অনেকে গ্রামে গ্রামে কাপুরুষ ও পাষাণের হাতে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা ; মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় যে বঙ্গনারী সেবা-পরিচর্যায় পুরুষের ‘সকল জ্বালা যন্ত্রণা’ জুড়াইয়া দিতেছেন, আদম-সুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় তাঁহারা প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশ, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিশ্চয় হাতে স্বামীপুত্রকে তুলিয়া দিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। আদর্শমাতা বঙ্গরমণীর ক্রোড় হইতে প্রতি বৎসর দুইটি নয় দশটি নয়, ৫০।৬০ লক্ষ দুঃখপোষ্য শিশু যমালয়ে চলিয়া যাইতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ৫৯,৭৬,৫২৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।* মাসিক-পত্রে দেখিতে পাই, ‘ভীক পুরুষ নারীর অঞ্চলের শরণ লইলে, হিন্দুনারী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে জাগাইয়া চেতন করিয়া দিয়াছে।’ কিন্তু বাস্তব জগতের খোঁজ লইতে গেলে দেখা যায়, গ্রামে গ্রামে পুরুষ, দারোগা চৌকিদার জমিদার মহাজন, সকলের পদচিহ্ন বুক পাতিয়া লইতেছেন, ঘরে নারী অঞ্চল দিয়া তাহারই ধূলা ঝাড়িতেছেন। সহরে পুরুষ বড়-সাহেবের হুকুমিকি, ছোট-সাহেবের গালাগালি, বড়-বাবুর লাঞ্ছনা, গুণ্ডা এবং গাঁটকাটার ছোরা, পুলিশের কল, গোরার চাবুক, সকলই মহাবৈষ্ণবের মত মুখ বৃজিয়া সহিয়া যাইতেছেন এবং অধিকাংশ নারী স্বামীর আদর্শে পুত্রকে তৈয়ার করিয়া তুলিবার আশায় সকল-প্রকার পুরুষোচিত ব্যায়াম হইতে তাহাকে সযত্নে সরাইয়া ‘জীবন-যুদ্ধের উপযোগী’ করিয়া গড়িয়া তুলিতে অভিলাষী ! খেলার মাঠে ফিরিঙ্গির হাতে লাঞ্ছিত জাতভাইকে ফেলিয়া সহস্র পুরুষ যখন উর্দ্ধ্বাঙ্গে নারীর অঞ্চলের

* এত অধিক শিশুমৃত্যু অবশ্য কেবল মাতাদের দোষেই হয় না ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, দেশে যথেষ্ট সুশিক্ষিতা ধাত্রী থাকিলে এবং মাতা এবং তাঁহার সম্পর্কীয় মহিলারা সৃতিকাগার ও শিশুপালন সম্বন্ধে সুশিক্ষিতা হইলে অনেক শিশুর মৃত্যু নিবারিত হইত।

শরণ লইতে দৌড় দেন, তখন কয়জন নারী তাঁহাদের ফিরাইয়া দিয়াছেন জানিতে পারি কি? পথে একটা গুণ্ডার ছোরার ভয়ে রাস্তার দুই ধারের পুরুষ যখন দরজায় ছড়কা দিয়াছেন, তখন কয়জন নারী দ্বার খুলিয়া স্বামীপুত্রকে বিপন্নের উদ্ধারের কাজে পাঠাইয়াছেন, শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। “হিন্দুনারী কখনও অশ্রায় ও ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারে নাই।” তাই আহা-বিহারে, কথায় কাজে, হাঁটিতে চলিতে, পুরুষদের ‘নিষ্ঠাবত্তা’র আর অন্ত নাই। কলিকাতার রাস্তার দুই ধারে চায়ের দোকানের বাহুল্য দিন দিনই বাড়িতেছে। সেখানে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর জঠরে কত যে কুকুট-বংশের অবতংস নিত্য যাইতেছে তার ঠিকানা নাই। ট্রামের গাড়ীতে কঙাক্টারের সঙ্গে কোম্পানীকে ঠকাইতে কত সাত্বিক পুরুষ প্রত্যহ জল্পনায় মাতিতেছেন, তাহার হিসাব নাই। ধর্মপ্রাণ কত ধুরন্ধর যে কলিকাতার স্থান-বিশেষে নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারই বা কে ঠিকানা রাখে? দেবীনামধেয়া কত হিন্দুনারী যে শাশুড়ী নন্দ ও স্বামী প্রভৃতির প্রীতির আতিশয্যে আদালত ও যমালয়ের শরণ লইতেছেন, তাহাও প্রতিদিনের দৈনিক-পত্রের ফাইল ঘাঁটিলেই দেখা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে “যে-সব পদ্মিনী শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেন” বলিয়া মাসিক-পত্রের লেখিকাদের কাছে শুনি, আজকাল খবরের-কাগজে দেখি তাঁহারা পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় কিম্বা স্বামীকে চরিতার্থ করিবার সত্বদেশে যখন-তখন কেরোসিন গায়ে ঢালিয়া নিজেরাই পুড়িয়া মরিতেছেন। (১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৩৫৫০টি রমণী বাংলা দেশে আত্মহত্যা করিয়াছে।) “অবরোধ-প্রথাও” নাকি আমাদের মধ্যে নাই,” তাহা “পূর্বে মুসলমান নবাব বাদশার হারেমে* ছিল।” তবে রেলপথে সঙ্গী পুরুষের মুখ না দেখিয়াই আশ্রয় শুনিয়া প্রতারকের পিছনে গাড়ী ছাড়িয়া নামিয়া যায়, এরূপ স্ত্রীলোক সঙ্কল্পী সত্য

ঘটনা কোন্ দেশের? পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার ভয়ে বা লেডি ডাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, স্মৃতিকা ও নানা স্ত্রীরোগে ভুগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া পরলোকযাত্রা করে কাহার? বাহিরে আসিয়া অন্ন উপার্জন করিবার লজ্জায় সন্তান সহ আত্মহত্যা করিয়াছিল কোন্ দেশের মেয়ে? উচ্চ প্রাচীর ও বন্ধ জানালার উৎপাতে বিধাতার বায়ু বিষ হইয়া প্রাণবধ করে কোন্ দেশের মেয়েদের? গাড়ীর অভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাধা পাই-তেছে কোন্ দেশে? অবরোধ-প্রথা সহরে এবং ভদ্র-লোকদিগের মধ্যেই বেশী। সহরের মৃত্যুর হার তুলনা করিলে দেখিবেন, কলিকাতায় হাজারে যেখানে ২৮·৪ পুরুষের মৃত্যু হয় সেখানে ৪৫·১ স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। অথচ মোট মৃত্যুর হার বাংলা দেশে পুরুষের হাজারকরা ৩০·৬ এবং স্ত্রীলোকের ২৯·৭। শুনা যায় জীবিত মানুষের চেয়ে ভূতের গতিবিধি বেশী দ্রুত ও ব্যাপক। তাই বোধ হয় নবাবের হারেমের মৃত অবরোধ-প্রথা ছুতঘোনি লাভ করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেহ হয়ত বলিবেন, যে, হিন্দুনারীর এই যে-সকল অবনতির দৃষ্টান্ত দৈনিক-কাগজের পৃষ্ঠায় এবং আদম-সুমারীর রিপোর্টে দেখা যায়, তাহা আধুনিক শিক্ষারই ফল; এই শিক্ষা না থাকিলে হিন্দু নারী সতী, সাবিত্রী, পদ্মিনী ও লক্ষ্মীবাহির মতই ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেন। কিন্তু সেন্সস্ রিপোর্টেই দেখা যায়, যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দেও পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্কা নারী বাংলা দেশে হাজারকরা ২১জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানেন, অর্থাৎ চিঠি লিখিতে ও পড়িতে পারেন। ইহারা উচ্চশিক্ষিতা নহেন, “ইব্‌সেন্‌ ব্রাউনিং কীটসের লেখা, Tolstoyএর deal সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন না,” এমন কি “ইংরেজীনবীশ”ও নহেন। বাংলা দেশে পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্কা দশহাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র তেইশজন ইংরেজী পড়িতে ও লিখিতে জানেন। সুতরাং প্রতি দশ হাজারে বাকি ৯৯৭ জন স্ত্রীলোকের সাবিত্রীর মত যমালয় হইতে স্বামী-পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার, পদ্মিনীর মত শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ফেলিবার, সীতার মত রাবণ দলন করিবার, জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান গড়িবার এবং

* “অহর্যাম্পশারুপা,” “অন্তঃপুরিকা,” প্রভৃতি কথাগুলি তাহা হইলে আরবী কিম্বা ফারসী।

ভীক পুরুষকে জাগাইবার ক্ষমতা থাকা উচিত। কিন্তু তাহাই কি আমরা ঘরে ঘরে দেখিতেছি? না, যা-কিছু দেখিতেছি, তাহাই “পূর্বেকার নবাব-বাদশার হারেমের স্বপ্ন” ও ভবিষ্যতের ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম কুহক? “তথাকথিত এম-এ, বি-এ পাশ উচ্চশিক্ষিতা ভগিনী”র সংখ্যা আমাদের দেশের নারীসংখ্যার তুলনায় ধ্বংসের মধ্যেই নহে। “বই নাড়া-চাড়া করিয়াই” ঠাহারা নিজেদের উচ্চশিক্ষিতা মনে করেন, তাঁহারা যে “মারাত্মক ভুল” করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইবসেন ও ব্রাউনিংএর ধূলা ঝাড়িলেও যত বিদ্যা হয়, বাস্মীকির রামায়ণের ধূলা ঝাড়িলেও ঠিক ততখানিই বিদ্যা হয়। ধূলা ঝাড়া সকল ক্ষেত্রেই ধূলা ঝাড়া। “তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতা” ও “প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু-নারী” ওড়ানো ধুলার বহর দেখিয়া তাঁহাদের কাহারও বিদ্যার বিচার করিলে চলবে না।

বাংলাদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা যাহা, তাহা আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয়। তাহার বর্ণনায় গোরবও নাই, আনন্দও নাই। কিন্তু কল্পনার আবরণ দ্বারা তাহা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা অধিকতর লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

কোনো কোনো “প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু-নারী” নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, রমণীদের কাজ “সন্তানদের গড়িয়া তোলা, জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা পীড়িত আত্মীয়ের পরিচর্যা করা, স্বামীর চিত্ত-বিনোদন করা, গৃহস্থালীর কার্য দেখা,—তৎসঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রসার, অবসর-মত কাব্য-সাহিত্য চর্চা করা ইত্যাদি।” ধরা যাক, স্ত্রীলোকের কর্তব্য এই কয়টি মাত্র ও এই কয়টিতেই তাঁহাদের সকল আনন্দ নিহিত,—এক কথায়, গৃহই তাঁহাদের সমস্ত জীবনের একমাত্র কেন্দ্র। এই গৃহধর্ম পালন করিতে হইলে কি কি বিদ্যা জানা উচিত, তাহা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যাক।

রমণীর প্রথম কর্তব্য সন্তানদের গড়িয়া তোলা ও জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করা। এই সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন হইতেই তাহার যত্নের আবশ্যক। মাতা কি খাইলে,

কেমন অবস্থায় থাকিলে, কতখানি পরিশ্রম করিলে, মানসিক কোন্ কোন্ উত্তেজনার হাতে পড়িলে, কতখানি বিজ্ঞান বা বন্ধ বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে, কোন্ বয়সের হইলে এবং কিরূপ চিন্তাদি করিলে গর্ভস্থ সন্তানের কি কি হিত অহিত হয়, প্রত্যেক ভাবী মাতার তাহা জানা উচিত। কিন্তু ঠাকুর-মা ও দিদিমার হাতে শিক্ষিতা কয়জন বঙ্গরমণী তাহা জানেন?

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে কোথায় স্মৃতিকা-গৃহ হইবে, কি কি শোধক দ্রব্য লাগিবে, কোন্ যন্ত্র অবশ্য-প্রয়োজন হইবে এবং লোক না পাইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর কেমন করিয়া তাহাকে পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে, তাহাকে কি রকম শীত ও আতপে রাখা উচিত, কেমন করিয়া স্তন্যদান ও স্নানাদি করানো উচিত, মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, ইহাও জানা দরকার। কয়জন ঠাকুর-মা ও দিদিমা এইসব শিক্ষা দিতে পারেন? চক্ষে শু দেখা যায়, বহু ঠাকুর-মা দিদিমা প্রসূতিকে প্রসবের পূর্বে পোড়া মাটি প্রভৃতি খাওয়াইয়া, অপরিষ্কার আহার দিয়া, পরে ভিজা মাটিতে ছেঁড়া মাদুরে শোয়াইয়া বাঁশের টাচাড়ি দ্বারা সজ্জাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া অশোধিত ছেঁড়া কাপড়ে জড়াইয়া ফেলিয়া ধমুষ্টকারের কবলে অহরহ মাতাপুত্রকে যমালয়ে পাঠাইতেছেন। পৈঁচোয় পাওয়া নাম দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু পৈঁচোকে যে ঠাকুর-মা দিদিমারা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়া সন্তান উৎসর্গ করেন, তাহা তাঁহাদের জানা পর্য্যন্ত নাই। এ-সকল উড়ো কথা নয়, খাঁটি সত্য কথা।

শিশুর যখন বয়স বাড়িতে থাকে, তখন মাতাই তাহার সর্বপ্রধান সঙ্গী। সেই সময় জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মাতাই তাহাকে বহু কু ও সু শিক্ষা দেন। মাতার নিজের যদি কোনো শিক্ষাই না থাকে, তাহা হইলে সুশিক্ষা দেওয়া কঠিন। শিশুর মনে কোতূহল অদম্য। এই কোতূহল চরিতার্থ করিয়া শিশুর জ্ঞানপিপাসা বাড়াইতে ও তাহার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করিতে হইলে মাতাকে অসংখ্য ছোট বড় বিষয় জানিতে হয়। কিন্তু “সনাতন” মাতারা কি তাহা জানেন? তাঁহারা যে প্রশ্নের উত্তর

নিজেই জানেন না, তাহা শিশুকে কি বুঝাইবেন? “ফের কথা, থাম্ বলছি, পাকা ছেলে,” অথবা, “জালালে লক্ষ্মী-ছাড়া”, প্রভৃতি স্তমধুর উত্তরে তাঁহার শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া অজ্ঞাতসারে চিরতরে তাহার জ্ঞানস্পৃহা ঘুচাইবার চেষ্টা করেন। জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান গড়িতে হইলে মাতাকে যে দেহমনের কত বর্ষ, কত আয়ুধ অক্ষুণ্ণ সন্তানের জন্ত জোগাইতে হয়, কেবলমাত্র স্তন্যদায়িনী মাতারা কি তাহার খোঁজ রাখেন?

রমণীর দ্বিতীয় কর্তব্য—আত্মীয়-স্বজন, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও পীড়িতের সেবা যত্ন করা। কিন্তু কোন্ বয়সের মানুষের দিনে কতবার কি খাদ্য খাইতে হয়, কি রোগে কি পথ্য করিতে হয়, নানাবিধ পথ্য রন্ধন কি করিয়া করিতে হয়, নানাবিধ রোগীব শুশ্রূষা কেমন করিয়া করিতে হয়, চিকিৎসক হাতের কাছে না থাকিলে রোগীকে লইয়া কখন কি করিতে হয়, জীর্ণ-শীর্ণ মানুষকে কি খাইতে দিতে হয়, অতিরিক্ত চর্কি-বহুল মানুষকেই বা কেমন খাদ্য দিতে হয়, ইহার খবর কয়জন রমণী জানেন? অন্নপ্রাশনের দিন হইতে স্নান করিয়া শশানযাত্রার দিন পর্যন্ত সেই মাকাতা-প্রবর্তিত খাদ্যই স্নান অস্নান সকল বাঙ্গালী খাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে তাহাদের দেহের কি ক্ষতি কি বৃদ্ধি হইতেছে গৃহিণীরা কি তাহার খোঁজ রাখেন? শুধু স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া গলদর্শন হইলেই হয় না, প্রিয়জনকে অমৃত জ্ঞানে আবর্জনা বা বিষ দিতেছেন কিনা, সে টুকুও জানা চাই। পীড়িতের সেবা করার পূর্বে আত্মীয়গণ যাহাতে পীড়িত না হন, সেইটা দেখা দরকার। স্তত্রাং গৃহে সকলে স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়ম পালন করিতেছে কি না এবং পানীয় আহাৰ্য্য পরিচ্ছদ শয়ন ও নিজার ঠিক স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে। বঙ্গনারী কি তাহা ঘরে ঘরে দেখিতেছেন?

তৃতীয় কর্তব্য—স্বামীর চিত্তবিনোদন করা। ষাঁহার স্নকঠ আছে, কি বিধিদত্ত আরো কোনো গুণ আছে, তিনি অল্প আয়াসেই এক-দ্ব্যর্থের খানিকটা করিতে পারেন। কিন্তু যিনি এসব সম্পদে বঞ্চিত, তাঁহাকে কথায়, কাজে, ব্যবহারে, গল্পে ও আদরে যত্ন স্বামীকে

আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতে হয়। স্বামী যে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, ব্যায়াম, ক্রীড়া কি ভ্রমণে আনন্দ পান, দিদিমার ছাত্রী স্ত্রী যদি তাহার কিছুই না বুঝেন, তবে স্বামীর মনের একটা দিক তাঁহার নিকট চিররুদ্ধ থাকিয়া যায়; স্বামীর প্রিয় উপায়ে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে স্ত্রী ত পারেনই না, উপরন্তু যে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার অভিন্নহৃদয় হইবার কথা, তাঁহার হৃদয়ের একটা কক্ষই তাঁহার অজানা থাকিয়া যায়। চিত্তবিনোদনের আর-একটা উপায় ছোট বড় সকল দিক দিয়া মানুষের চক্ষুর্কর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করা। যে স্ত্রীর রেখা ও বর্ণ-বিচারের জ্ঞান আছে, তিনি নিজ ও সন্তানসন্ততির পোষাকে পরিচ্ছদে এবং গৃহসজ্জায় তাহা ফলাইয়া স্বামীর চক্ষুকে আনন্দ দান করিতে পারেন; ষাঁহার সুর-জ্ঞান আছে, তিনি কঠ-ও যন্ত্র-সঙ্গীতে কর্ণকে তৃপ্তি দিতে পারেন; ষাঁহার আতিথ্যবিদ্যা জানা আছে, বাক্যবিচারের ক্ষমতা আছে, তিনি অতিথি অভ্যাগত আনিয়া গৃহকে আনন্দ-ময় করিতে পারেন। কিন্তু এ সকল বিছাই শিক্ষা-সাপেক্ষ।

চতুর্থ কর্তব্য—গৃহস্থালীর কার্য দেখাও শিক্ষা না থাকিলে হয় না। যে গৃহে ধন-ঐশ্বর্য আছে, তাহার গৃহিণীকে দাস-দাসী নির্বাচন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হয়। সারাক্ষণ দাসের দাস সাজিয়া অনেক ধনী-গৃহিণী ঝি-চাকরের পিছনে লাগিয়া থাকিয়া যে দিন কাটান, অথবা তাহাদের হাতে সর্বস্ব ফেলিয়া লুণ্ঠন ও বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখান, দাসদাসীকে শিক্ষা দিতে জানিলে তাহা ঘটিত না।

নিপুণা গৃহিণীর অর্থনীতি, হিসাবরক্ষণ-প্রণালী, ভবিষ্যতের খরচের খসড়া তৈরি, উদ্যানপালন, গোপালন, দুগ্ধ সংরক্ষণ, অল্প আয়ে সংসার চালানো, বিনা ভৃত্যেও অবসর সৃষ্টি, এক উপায়ে দুই কার্য সিদ্ধি, নষ্ট দ্রব্যের পুনরুদ্ধার, অপচয় নিবারণ প্রভৃতি নানা বিদ্যা জানা থাকা দরকার। গৃহধর্ম ছেলেখেলা নয়, তাহাতেও বৈজ্ঞানিকের মত সাধনা করিয়া শিখিবার বহু জিনিষ আছে। সাংসারিক ব্যবহারের সকল জিনিষের উৎকর্ষ

অপকর্ষ, বাজারদর, গৃহনির্মিত ও ক্রীত জিনিষের প্রভেদ প্রভৃতিও জানিতে হয়। বুদ্ধি মার্জিত ও গাণিত না হইলে, এই-সকল বিদ্যা শিক্ষা ও অনুশীলন না করিলে এবং নানা জায়গায় যাওয়া আসা না থাকিলে এত জ্ঞান থাকা সম্ভব হয় না। আদর্শ গৃহকর্ত্রীর কমসম করিমা পঞ্চাশ ষাটটা বিদ্যা জানা থাকা দরকার। উপরে যে-সকল বিদ্যার উল্লেখ করিলাম তাহা ছাড়াও খাদ্যের পুষ্টি ও মূল্যের তুলনামূলক জ্ঞান, পচনশীল খাদ্য নির্বাচনক্ষমতা, পাইকারি খরিদের সুবিধা ও উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান, সমবায় প্রথার সাহায্যে ব্যয়সঙ্কোচ, বৈজ্ঞানিক উপায় ও যন্ত্রের সাহায্যে অল্পশ্রমে অধিক কার্য্য করিবার জ্ঞান, সময়ের ফলমূল অকালের জন্ত টাটকা অবস্থায় সংরক্ষণ করিবার জ্ঞান, রন্ধনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী, খাদ্যে ও বস্ত্রাদিতে ভেজাল ধরিবার ক্ষমতা, গরম ও ঠাণ্ডা কাপড়ের সুবিধা অসুবিধা ও সৌন্দর্য্য, কাপড় কাচা, ইস্ত্রী করা, দাগ তোলা, রিপু করা, রং করা, পোষাক কাটা ছাঁটা, প্রভৃতি বহু জ্ঞান গৃহিণীর নিত্যকার্য্যে দরকার হয়।

স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুসন্তানগণ জীবনের অধিকাংশ সময় গৃহেই কাটায়; সুতরাং বাসগৃহ কি রকম পল্লীতে, কিরূপ বায়ু ও আলোক চলাচলের উপযুক্ত স্থানে হওয়া উচিত, তাহাও স্ত্রীলোকের জানা দরকার। গৃহ-সজ্জা ও সংস্কারের জ্ঞান, গৃহের ভাড়া ও সুবিধার তুলনামূলক জ্ঞান, মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গৃহের আব-হাওয়ার প্রভাব কি প্রকার, তাহাও জানিতে হইবে। সাংসারিক আয়ের কতখানি অংশ খাওয়া-পরা, শিক্ষা, আনন্দলাভ, দান ধ্যান সংরক্ষণ ও ভ্রমণ প্রভৃতিতে ব্যয় করিলে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হয়, তাহাও গৃহিণীকেই স্থির করিতে হইবে।

শুধু গৃহধর্ম পালন করিবার জন্তই স্ত্রীলোকের এইরূপ নানা জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। পরিবারের দুইটি চারটি ঠাকুরমা কিম্বা দিদিমার নিকট এত শিক্ষা সম্ভব নহে। একে ত দিদিমারা নিজেরাই অতিসামান্য শিক্ষাই পাইয়াছেন, তাহার উপর তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও কেবল দুই একটি পরিবার সম্বন্ধে। তাঁহারা ভাল যাহা শিখাইতে পারেন, তাহা অবজ্ঞেয় নহে; কিন্তু তাহা যথেষ্টও নহে।

এই বৈজ্ঞানিক যুগে যখন কোটি কোটি মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞান, পুস্তকপ্রচার, বায়োস্কোপ, রেডিও প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অতি স্থলভ করিয়া দিতেছে, তখন চোখ বুজিয়া তাহা ফিরাইয়া দিয়া একমাত্র দিদিমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকা কি অতিবড় মুখের কাজ নয়? স্থলকলেজের শিক্ষার যাহারা বিরোধী, তাঁহারা হয়ত বলিবেন উপরোক্ত বিদ্যাসকল স্থলকলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় না; সুতরাং সেখানে শিক্ষালাভ করা বৃথা। আধুনিক স্থল-কলেজ-গুলি আদর্শ নয় জানি, কিন্তু সেগুলি সেগুলিকে বর্জন না করিয়া সংস্কার করাই দরকার। যতদিন সংস্কার না-ও হয়, ততদিন অশিক্ষার চেয়ে সামান্য শিক্ষাও ভাল। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ দুধকলা না পাইলে ক্ষুদ-কুঁড়া ফেলিয়া দেয় না। আধুনিক শিক্ষা আর কিছু না শিখাইলেও বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত পড়িতে শিখাইয়াও মানুষের প্রভূত উপকার করিয়াছে। স্থলকলেজে যে বাংলা ইংরেজী পড়িতে শিখিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে এবং স্বযোগ পাইলে স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিজ চেষ্টাতেই শিক্ষা করিতে পারে। মানুষ যে-কোন ভাষা ও বিদ্যাই শিক্ষা করুক না কেন, তাহাতে তাহার অপকার অপেক্ষা উপকারই বেশী হয়। তাহার জ্ঞান ও আনন্দ লাভের ক্ষেত্র প্রত্যেক নবমার্জিত বিদ্যার সহিত বিস্তৃতি লাভ করে।

সংসারধর্ম পালনের পর বহু স্ত্রীলোকেরই অবসর থাকে। এই অবসর-কালটা নিজের ও পরিবার-পরি-জনের পক্ষে সুখকর ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জ্ঞান থাকা স্ত্রীলোকের দরকার। যে পরিবারে অর্থাভাব আছে, সেখানে অবসর-কালে অর্থকরী বিদ্যার চর্চাই বুদ্ধির কাজ। যেখানে তাহা নাই, সেখানে কেবল শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা করিলেও চলিতে পারে। আমাদের দেশের অনেক লেখকলেখিকার মতে কুটীর-শিল্প অর্থাৎ সূতা কাটা, তাঁত বোনা, পোষক তৈয়ারি করা, মোজা গেঞ্জি বোনা প্রভৃতি করিলে মেয়েরা সহজেই কিছু অর্থ উপার্জন ও সংকার্য্যে অবসর যাপন করিতে পারিবেন।

একথা সত্য। কিন্তু সকলরকম গৃহশিল্পেরই শিক্ষা করার প্রয়োজন আছে; চরকা-কাটাতেও কিছু আছে। “নবাবের হারেমের যে-অবরোধ প্রথার ভূত” বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, তাহার কল্যাণে দরুজি, ছুতোর, তাঁতী, ধোপা, শালকর, ময়রা, শ্রাকুরা প্রভৃতির কাছে কাজ শেখা মেয়েদের পক্ষে কঠিন। তা-ছাড়া, সকল-প্রকার গৃহশিল্পই বৈজ্ঞানিকযুগে পূর্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তা হইয়া উঠিয়াছে, কলের প্রতিযোগিতায় সস্তায় কাজ না করিলে বিকায় না। যে-সব কাজে কেবল শিল্পীর নৈপুণ্যেরই দাম, তাহাতে আবার শিক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী। কিন্তু এই-সব শিল্পের বিষয়ে বাংলা পুস্তক প্রায় নাই, অথচ ইংরেজী বিস্তর আছে। সুতরাং ইংরেজী শিখিলে ও মাপ জোক প্রভৃতির জ্ঞান কিছু অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদি জানা থাকিলে এক্ষেত্রেও সুবিধা হয়। না জানিলে প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবেনই না, অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফলে অপটু হাতের জিনিষ কেহ কিনিবেন না, শিল্প চর্চার ফলে লাভের চেয়ে লোকসান বহুত বেশী হইবে। মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় যত সজাগ ও পর্যবেক্ষণে পটু হয়, সকল কর্মক্ষেত্রেই সে তত সফল হয়। সেইজন্ম বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত প্রভৃতিকে দক্ষ করিতে হইলে বহু বিদ্যার সাধনা প্রয়োজন।

অনেক লেখকলেখিকার বিশ্বাস, মেয়েরা স্কুলকলেজে পড়িলে, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সকলেই ঘর সংসার ফেলিয়া স্কুলমাষ্টারী ওকালতী কেরানীগিরি বা ডেপুটি-গিরি করিতে যাইবেন। যে দেশে একটি মাত্র কুমারী ওকালতী করিবার অনুমতি পাইয়াছেন এবং যে দেশের ত্রিসীমানায় কোনো মহিলা ডেপুটিগিরি করেন নাই, সে দেশের কল্পনাকুশল ঔপন্যাসিকরা বাস্তবে এতখানি উপন্যাসের রং ফলাইয়া যুদ্ধে না নামিলেই পারিতেন। তবু যখন নামিয়াইছেন, তখন বলা যাইতে পারে, শিক্ষিতা বাঙ্গালী রমণীর প্রধান কর্মক্ষেত্র বাংলার বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে যদি লেখিকা খোঁজ করেন ত দেখিবেন, শিক্ষয়িত্রীরা অধিকাংশ কুমারী, সামান্য অংশ বিধবা এবং অতি অল্প কয়েকজন সধবা। সধবাদের মধ্যে আবার অধিকাংশ নিঃসন্তান, কয়েকজন বয়স্ক সন্তানের জননী এবং

মাত্র দুই দশজন শিশু সন্তানের জননী। একজন মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়া যে সমষ্টিব বিচার করা চলে না, তাহা এই সকল লেখিকার লেখায় অনেকবারই দেখা যায়; অথাৎ ইহারা নিজেরাই “একটি লেডি ডাক্তারের মুখে শোন তাঁহার নিজ-জীবনের একটি গল্পকে” সম্বল করিয়া যুগে নামেন। কুমারী শিক্ষয়িত্রীরা অধিকাংশই বিবাহের পর চাকরী ছাড়িয়া দেন, অবস্থায় না কুলাইলে বা সংসারে অসুবিধা হয় না দেখিলে কেহ কেহ বিবাহের পরেও চাকরী করেন; লেখিকার এ সংবাদ যে জানা নাই তাহা মনে হয় না, তবুও তিনি তাহা গোপন করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রসার, পৃথিবীর অল্প দেশেই সেরূপ হইয়াছে। তবু আমেরিকার “ওয়ান সিটিজেন” পত্রে দেখি—

“পঞ্চাশ বৎসর পরে আমেরিকান গৃহসংসার আধুনিক গৃহে তুলনায় অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর হইবে। ভবিষ্যতে মেয়েরা নিজেরা সংসারের কাজে আরো অনেক বেশী সময় দিবেন গৃহকর্ম আর নীচ কাজ থাকিবেন না। ভবিষ্যতে গৃহকর্মকে মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে। বিবাহিত রমণীদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনের একটা বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘরসংসার গড়িতে ব্যয় করিবেন। সন্তানসন্ততির জন্ম ও পালনের কালটায় প্রায় সমস্ত চিন্তা ও সময়ই গৃহধর্মের জন্ম ব্যয় করিবেন। মানসিক, আর্থিক ও শারীরিক সকল দিক দিয়াই মেয়েরা জীবনের সন্তান-ধারণ যুগটায় গৃহের অনুরক্ত হন। মেয়েরা নিজেরা কাজ ও সন্তানের যত্ন নিজেরাই করিবেন, দরকার-মত গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তানপালন ও অগ্ন্যস্ত্র কাজে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন।”

বিবাহের পূর্বে এবং সন্তানসন্ততি বড় হইয়া গেলে মেয়েরা যদি গৃহের বাহিরে কোনো অর্থকরী বিদ্যার অনুসরণ করেন, কি দেশ-ও সমাজ-হিতকর কার্য করেন, তাহাতে দেশের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই ত বেশী হইবে। বিবাহিত জীবনেও অবসরকালে অর্থ উপার্জন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব। শিক্ষা ও বিবেচনা থাকিলে সংসারের ক্ষতি না করিয়াও তরুণী মাতারা যে অর্থ উপার্জন করিতে পারেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৃহকর্ম করিলে গৃহিণীদের অবসরও বাড়িবে, সুতরাং বাহিরের কাজ করিবার বেশী সুবিধাও হইবে।

অনেকে “এই চাকরীসমস্তার দিনে” শিক্ষিতা রমণীদের “পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া” সমস্তা

জটিলতর করিতে গান করিতেছেন। আমাদের দেশে চাকরীসমস্যা যে ক্ষেত্রে, সেই কেরানী-কুল-শোভিত আপিস-আদালতে বাঙ্গালী মেয়ের দেখা এখনও পাওয়া যায় নাই; লেখিকা অথবা কেন ভয় পাইতেছেন জানি না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদেই শিক্ষিতা বঙ্গরমণীদের অধিকাংশকে দেখা যায়। এই কাজে আরও বহু রমণীর যে প্রয়োজন আছে, তাহা সকলেই জানেন, এমন কি “সনাতনপন্থীরা” নিজেরাও তাহা স্বীকার করেন। লেডি ডাক্তারের ও শিক্ষিতা ধাত্রীর ও গুরুশ্রমিকারিণীর কার্যক্ষেত্রে ত সমস্ত দেশ জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রোজ্‌গারী মেয়েদের গালি দিতে গিয়াও ‘সনাতনপন্থী’দের তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে-সকল কাজে কেবল মেয়েদের চাহিদাই বেশী এবং উপযুক্ত মেয়ের অভাবে যে-সব কাজ আমাদের দেশে ভালভাবে হইতে পারিতেছে না, শিক্ষিতা মহিলারা স্বভাবত সেই-সব কাজে বেশী যাইবেন এবং তাহা হইলেই পুরুষদের ‘চাকরী-সমস্যা’ জটিলতর না হইয়া দেশ ও সংসারের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইবে। (ভুল যে কেহ করিবেন না, এমন কথা বলিতেছি না; ভুল করিয়া ঠকিয়াই মানুষ ঠিক পথে যাইতে শিখে।) গুরুশ্রমিকা, ধাত্রীবিদ্যা, দস্ত-চিকিৎসা, চক্ষু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-তত্ত্বাবধান, হাসপাতাল-পরিদর্শন, স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, শিশু-শিক্ষা, ব্যায়াম-শিক্ষা, ফোটোগ্রাফী, পোষাকের ঠিক করা, নারী-শিল্পভাণ্ডার স্থাপন, সংবাদপত্রাদিতে লেখা, নারীহিতৈষী পত্র চালনা, অনাথাশ্রম গঠন, পুস্তক রচনা, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া, বোর্ডিং পরিচালন, ভদ্র ও উচ্চদরের হোটেল পরিচালন, গোশালাপ্রতিষ্ঠা, শাক-শক্তির বাগান করা, স্থাপত্য, গহনা নির্মাণ ও নক্সাকরা, অঙ্কশ্রম ও আতুরাশ্রমের তত্ত্বাবধান, দোকানে মহিলা খরিদারের জিনিষ যোগানো, বাল-অপরাধীর তত্ত্বাবধান, মহিলা মক্কেলের ওকালতী, সমাজহিতসাধন, পতিতো-দ্ধার, উন্নাদের সেবা প্রভৃতি অসংখ্য কাজ আমাদের দেশে যাহা হওয়া উচিত মেয়েদের সাহায্যের অভাবে তাহা হইতে পারিতেছে না। এই-সকল কাজ বিশেষ করিয়া মেয়েদেরই কাজ। ইহাতে তাঁহারা লাগিলে

ভীড় বাড়ানো হইবে না, প্রকৃত কার্য উদ্ধার করা হইবে।

ধাত্রীবিদ্যা ও শিক্ষাদান পুরাকালে মহিলাদের কাজ ছিল বলিয়া অনেকের বর্তমানেও তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু পুরাকালে ত মহিলারা মাসিকপত্রে উপন্যাস লিখিতেন না, প্রবন্ধ লিখিয়া পুরুষের সঙ্গে ঝগড়াও করিতেন না; তবে কোনো কোনো মহিলা মাসিক পত্রের আডাল হইতে যুক্তক্ষেত্রে নাগিয়াছেন কেন? বর্তমান ও অতীত বলিয়া দুইটা কাটাছাঁটা বিভাগ কালের মধ্যে নাই। অতীতে এমন দিনও ছিল যখন পুরুষ ও নারী কাঁচা মাংস খাইতেন, গাছের বস্কল পরিতেন, আরো অতীতে বিবস্ত্র থাকিতেন, সামাজিক কোনো প্রথা মানিতেন না; কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল নিয়ম বদলাইয়া গিয়াছে। উন্নত মানুষ পরিবর্তনকে গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। অতীতে রমণী ব্যারিষ্টারী করেন নাই বলিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার ব্যাবিষ্টারীর ভয়ে মূর্ছা যাইবার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। “নারীর ইজ্জত রক্ষা নারীরই কাজ” ইহারা বলেন; তবে মহিলা উকীল হইলে ক্ষতি কি? মহিলার মানসম্মত রক্ষার জন্ত, কাপুরুষের হস্তের লাঞ্ছনা হইতে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর ছাঁকা পোড়া হইতে উদ্ধার করিতে, চক্রীর চক্র হইতে বাহির করিতে, মহিলার স্বার্থের মর্যাদা রক্ষা করিতে, মহিলা উকীল ব্যারিষ্টারই ত বেশী সক্ষম হইবেন। যাহারা নিজেদের “সেকলে” বলিয়া বড়াই করিয়া “একলে” শিক্ষাকে গালি দেন, তাঁহারা যদি খুঁটাইয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন, জীবনযাত্রা-পথে সাবিত্রী দ্রৌপদী কুন্তী দময়ন্তী শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ রাখিয়া তাঁহারা নিত্য চলিতেছেন।

শিক্ষার মধ্যে কোন্টা যে হিন্দুজনোচিত আর কোন্টা যে “মেম-সাহেবী”, কোন্টা যে “মেয়েলি” আর কোন্টা যে “পুরুষালি” তাহাও বুঝাইয়া বলা দরকার। স্কুল-কলেজে মেয়েরা সচরাচর ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, দর্শন, ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ পড়ে, যাহা ঠিক বাসন-মাজা কিম্বা ঘরঝাঁট দেওয়ার মত “মেয়েলি” বিদ্যা নয়। কিন্তু ইহার কোনোটার গায়েই ত পুরুষদের ছাপ দেওয়া

নাই। অল্প দিকে আবার, রাঁধাবাড়া, বাসন-মাজা ও ঘর কাঁট দেওয়ার কাজও অসংখ্য পুরুষ করে। ভাবিয়া দেখিলে দেখিবেন, মহাভারত বা রামায়ণও অংশত ইতিহাস, “সনাতনপন্থীরা” মহিলাদের তাহা পড়িতে বলেন; তীর্থদর্শন-ধর্মের যাহারা এত পক্ষপাতী, পুস্তকে ভূগোল পড়িলেই তাঁহাদের জাতি যাইবে না; বাজারের হিসাব রাখিতে হইলেও অঙ্কের প্রয়োজন যখন হয়, তখন উচ্চ গণিত পড়িলেই স্ত্রী পুরুষ হইয়া যাইবেন না; বেদ বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি শ্রুতি পড়িলে যদি স্ত্রীলোক পুরুষ না হন, ত হেগেলের দর্শন পড়িলেও হইবেন না।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আরো অনেক লেখকলেখিকা অনেক আবোল-তাবোল প্রলাপ বকিয়াছেন, সকলগুলির উত্তর এক প্রবন্ধে দেওয়া শক্ত। এখানে কেবল একজন লেখকের উর্ধ্বরমস্তিষ্ককল্পিত শিক্ষিতা রমণীর বর্ণনার কথা বলিয়া শেষ করিব। লেখকের মতে বেথুন-কলেজের শিক্ষার পরিবর্তে মহাকালী-পাঠশালার শিক্ষার প্রচলন ঘরে ঘরে হইলেই বাংলা স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিবে। মহাকালী-পাঠশালার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; উহা যে-প্রশংসার যোগ্য তাহা অবশ্যই উহাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু মহাকালী-পাঠশালার এমন সব ভক্ত থাকিতেও তাহা যে কেন ভূতলে স্বর্গ না আনিয়া অকালে স্বর্গযাত্রা করিতে বসিয়াছে, তাহা তাঁহাঁরাই জানেন। লেখক একজন মহাকালী-পাঠশালার ছাত্রীর শিবপূজা শাশুড়ীভক্তি ও অন্নপূর্ণাত্মের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বেথুন-কলেজের শিক্ষিতাকে পাঠককে “কল্পনা” করিয়া লইতে বলিয়াছেন। বাস্তবকে যে “কল্পনা-চক্ষে” দেখিয়া সমালোচনা করিতে হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বে জানিতাম না। লেখকের কল্পিতা শিক্ষিতা বধু প্রথম তাঁহার কল্পলোকে প্রবেশ করিলেন বুট ও বনেট পরিয়া, তাহার পর অশুচি হস্তে পূজার সামগ্রী ছুঁইয়া ও আরো অনেক অঘটন ঘটাইয়া শাশুড়ীকে খান্সামা করিয়া লেখকের মস্তিষ্ক-রক্তমণ্ডলের ঘবনিকা পাত করিলেন। শাশুড়ীকে খান্সামা করিতে

যদিও কোনো শিক্ষিতাকে দেখি নাই, তবু ধরা যাব শাশুড়ী পুত্র ও পুত্রবধুকে পরিবেষণ করিয়া কোথাও খাওয়াইয়াছেন। হিন্দুনারী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পতি-পুত্রকন্যাকে খাওয়ানোটা চিরকাল গৌরবের বস্তু মনে করেন, পথের কাঙ্গালকে রাঁধিয়া খাওয়ানোও তাঁহার কাছে শ্লাঘার বিষয়। তবে বেচারী বধু এমন কি অপরাধ করিল, যে, তাহাকে যত্ন করিয়া পরিবেষণ করিয়া খাইতে দিলেই শাশুড়ীর সম্মানের হানি হইবে? বেথুন-কলেজের শত শত ছাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বনেট কাহাকেও পরিতে দেখি নাই, বুটও ছুই চারিটি ‘ছুকপোষ্য’ বালিকা ছাড়া কাহারও পায়ে দেখি নাই। (ঐ বয়সের নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বাড়ীর বালিকাদিগকেও বুট পরিতে দেখিয়াছি।) তাঁহাদের মধ্যে শতাধিককে স্বহস্তে রন্ধন করিতে দেখিয়াছি এবং এক জনেরও হিষ্টীরিয়া আমি দেখি নাই; কিন্তু অগণিত নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরও হিষ্টীরিয়া হয়। প্রাতঃকালে বৌমার শয্যাপার্শ্বে চায়ের পেয়লা হস্তে যে শাশুড়ীরা আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা কোন্ থিয়েটারের ভূমিকায় নামিয়াছিলেন জানিতে পারিলে বেথুন-কলেজের ছাত্রীরা বাধিত হইবেন।

বাংলাদেশই ভারতবর্ষের সবটা নয়, বাঙ্গালী হিন্দুই একমাত্র হিন্দু বা নিষ্ঠাবত্তম হিন্দু নহেন। অল্প অনেক প্রদেশের হিন্দুমহিলাদিগকে চামড়ার জুতা পরিতে দেখিয়াছি। তাহার গড়ন অবশ্য দেশী রকমের, কিন্তু তাহার জায়গায় বুট পরিলেই যে বড় বেশী অপরাধ হয়, এরূপ মনে হয় না। বাঙ্গালী হিন্দু পুরুষেরা ত ঠনুঠনে বা তালতলার চটির পরিবর্তে বুট পরেন। তাহাতে ত হিন্দুত্ব লোপ পায় না।

বাজে কথার উত্তর না দিয়াও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা এখনও আছে। বারাস্তরে সে-সব কথা ও যৌবনবিবাহ স্ত্রীস্বাধীনতা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি “নারী-সমস্যা”র অন্যান্য দিক লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী শান্তা দেবী

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলের কাজ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন শেষ না হইয়া গেলে বুঝা যাইবে না, কোন্ দলের কত লোক ইহার সভ্য হইলেন। স্বরাজ্য দলের নেতারা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে গবর্নমেন্টের নিকট পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবী করিবেন। এই দাবী মঞ্জুর হইলে ভাল, নতুবা তাহারা গবর্নমেন্টের সকল কাজের বিরোধিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগুলি অচল করিয়া দিবেন।

যদি স্বরাজ্য দলের এত বেশী লোক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন, যে, সরকারী সভ্য, মনোনীত সভ্য এবং মডারেট সভ্যেরা দল বাধিয়াও সংখ্যায় তাঁহাদের চেয়ে বেশী না হন, তাহা হইলে স্বরাজ্য দল বিরোধিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে পারিবেন। কিন্তু তখনও গবর্নমেন্টের কাজ অচল হইবে না। গবর্নর-জেনারেল নিজের ভাবতশাসন-সংস্কার আইন অনুযায়ী ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা কাজ চালাইতে পারিবেন। কিন্তু ভারতশাসন-সংস্কার আইনের উদ্দেশ্য এই, যে, ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে দেশের শাসনকার্য নির্বাহিত হয়। স্বরাজ্যদলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে আইনের ঐ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে পারিলে স্বরাজ্যদলের ঘোষিত প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা অচল হইলে এবং বড়লাট নিজের আদেশ দ্বারা শাসন-কার্য চালাইতে বাধ্য হইলে স্বরাজ্যদলের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এমন বলা যায় না। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য “স্বরাজ” লাভ। ব্যবস্থাপক সভার যতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহাকে স্বরাজ্য বলা যায় না; তাহা সামান্য। দেশের লোকের অধিকাংশেরই প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নাই, অতি অল্পসংখ্যক লোকের আছে। তাঁহারা যে-সব প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তাঁহাদের ক্ষমতাও কম। সুতরাং ইহা ঠিক, যে,

বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলির দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও ঠিক, যে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের ক্ষমতা যত কমই হউক, কিছু ক্ষমতা তাঁহাদের আছে, এবং গণতন্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। যদি ব্যবস্থাপক সভা অচল হইয়া যায়, তাহা হইলে নির্বাচকদের প্রতিনিধিদের এই ক্ষমতাটুকুও থাকিবে না।

ইহার ফল দুই প্রকার হইতে পারে। তাহার আলোচনা করিবার আগে দেখা যাক, গবর্নর-জেনারেল স্বরাজ্যদলের স্বরাজ্যের দাবী গ্রাহ্য করিলে কি ফল হইতে পারে। এই দাবী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রস্তাবটির পক্ষে অধিকাংশ সভ্য মত দিলে উহা গবর্নর-জেনারেলের নিকট যাইবে। সেকৌন্সিল গবর্নর-জেনারেল উহার অনুমোদন করিতে পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্তু তিনি অনুমোদন করিলেই ভারতবর্ষ স্বরাজ্য পাইবে না। ভারতবর্ষকে আইনে দ্বারা স্বরাজ্য দিবার মালিক ব্রিটিশ পালেমেন্ট। বড়লাট তাহার অনুমোদন সহ প্রস্তাবটি ভারত-সচিবকে পাঠাইবেন। সেকৌন্সিল ভারতসচিবের উহা পছন্দ হইলে তিনি উহা ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় উপস্থিত করিবেন। মন্ত্রীসভা উহার অনুমোদন করিলে বর্তমান ভারতশাসন আইন আবশ্যক-মত পরিবর্তন করিবার জন্য একটি আইনে খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা পালেমেন্টে উপস্থিত করিবেন। পালেমেন্টে ঐ খসড়া আইনে পরিণত হইলে তদনুযায়ী স্বরাজ্য ভারতবর্ষ পাইতে পারিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, নূতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল স্বয়ং কিম্বা অগ্রাগ্র দলের অবিলম্বে-স্বরাজ্য-প্রার্থী সভ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংখ্যাভূমিষ্ঠ হইলেও, আরো অনেক অমুকুল অবস্থা ঘটিলে, তবে আইনের পথে স্বরাজ্য লাভ ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। যাহা এতগুলি “যদি” উপর নির্ভর করে, তাহার বেশী প্রত্যাশা না করাই ভাল।

যদি সর্কৌন্সিল গবর্নর-জেনারেল স্বরাজ্যের প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ্যপ্রার্থীরা ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা সফল হইলে, বড়লাট নিজেই আইনসম্বন্ধে ক্ষমতা অনুসারে রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইতে থাকিবেন। কিন্তু এভাবে কাজ চালাইতে হইলে তাহাকেও এক হিসাবে গবর্নমেন্টের পরাজয় বলিতে হইবে। সুতরাং বরাবর এই প্রকারে কাজ না চালাইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে বর্তমান ভারত-শাসন আইন এমন ভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে, যাহাতে ব্যবস্থাপক সভা পুনরায় অচল না হয়।

এই পরিবর্তন দুই প্রকারের হইতে পারে। এক হইতে পারে, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি বাস্তবিক আরো গণতান্ত্রিক হইবে, উহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরো বাড়িবে। কিন্তু একরূপ হইতে পারে, যে, গণতান্ত্রিকতার মুখোসটা আরো মোহজনক করিয়া ব্যবস্থা আসলে এমন করা হইবে, যাহাতে সভ্যদের ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করিবার ক্ষমতা এখনকার চেয়ে খুব কম হয়, কিন্তু লুপ্ত হয়। কি যে হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

কিন্তু নূতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল বেশ পুরু না হইলে, এই সমস্ত জল্পনাই বৃথা হইবে।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের যত সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, ঐ দলের লোকেরাও বোধ হয় তত আশা করেন নাই; অল্প লোকদেরও অনুমান ইহা অপেক্ষা কম ছিল।

এই দলের চেষ্টা এতটা সফল হইবার কারণ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়াছে। দল হিসাবে স্বরাজ্যদল এখন পর্যন্ত দেশের জন্ত কিছুই করেন নাই। সুতরাং দেশহিতসাধনে তাঁহাদের কৃতিত্বের জোরে তাঁহারা এতটা সফলতা লাভ করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। বাক্তি হিসাবেও স্বরাজ্যদলের নির্বাচিত অনেক সভ্য তাঁহাদের পরাজিত প্রতিদ্বন্দীদের অপেক্ষা অযোগ্য লোক। সেইজন্য আমাদের অনুমান এই, যে, প্রধানতঃ গবর্নমেন্ট এবং তাহার পর মন্ত্রীদের দল দেশের

লোকদের বিরাগভাজন বলিয়া বিরোধী স্বরাজ্যদলের এতটা জিত হইয়াছে। যে ও যাহা আমাদের বিদ্বেষভাজন, তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিবে বলিলে স্বভাবতই তাহার প্রতি অমুরাগ জন্মে। গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটা রব তুলিয়া দিয়া কার্য উদ্ধার করার ফিকিরটা মোটেই নূতন নয়; অথচ সব দেশেই লোকে ইহাতে আগেও ভুলিয়াছে, ভবিষ্যতেও ভুলিবে। এই বাংলা দেশেও, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনেক গলদ আছে ও সংস্কারের প্রয়োজন, সে কথাটা আশুবাবু ও তাঁহার দল চাপা দিয়া ফেলিলেন এইরূপ রব তুলিয়া, যে, গবর্নমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। গবর্নমেন্টের মেরুপ কুমন্ত্রণ থাকিলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষগুলো গুণে পরিণত হয় না। কিন্তু গবর্নমেন্টের প্রতি লোকের যে রাগ বরাবর আছে, তাহাকে আরো বাড়াইয়া দিয়া ঐ দোষগুলোর দিক হইতে মানুষের দৃষ্টি আশুবাবুর দল অল্প দিকে চালিত করিলেন।

স্বরাজ্যদলের আংশিক জয়ও এই-প্রকারের একটা চালের দ্বারা লুক্ক হইয়াছে। গবর্নমেন্ট খারাপ, মন্ত্রীর খারাপ লোক, গবর্নমেন্টের আংশিক সমর্থকেরাও খারাপ লোক; অতএব, গবর্নমেন্ট-পক্ষের পূরাপুরি বিরোধীরা অবশ্য ভাল লোক ও যোগ্য লোক—গ্নায়শাস্ত্রের অনুমোদিত এইরূপ ধারণার বশে, গবর্নমেন্টের দলের লোক নহেন, অথচ মডারেট দলেরও লোক নহেন, গবর্নমেন্টের প্রত্যেক কাজেরই বিরোধিতা করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন, যোগ্য ও সং একরূপ লোক নির্বাচিত না হইয়া কোন কোন স্থলে তদপেক্ষা অযোগ্য এমন লোক নির্বাচিত হইয়াছেন, যাহাদের একমাত্র বা প্রধান যোগ্যতা এই, যে, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাকে ও গবর্নমেন্টকে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

স্বরাজ্যদলের প্রধান কোন কোন ব্যক্তির প্রভাব এবং লোকপ্রিয়তাও ঐদলের আংশিক জয়ের একটি কারণ।

স্বরাজ্যদলের বিপক্ষেরা বলেন, যে, ঐদলের লোকদিগকে জিতাইবার জন্ত উহার কর্মীরা অনেক মিথ্যাচরণ প্রভৃতি করিয়াছেন। ইহা সত্য কথা। দল হিসাবে বলিতে গেলে, বোধ হয় কোন দল সম্বন্ধেই ইহা

বলা যায় না, যে, উহার কর্মীরা মোটেই অসত্যের প্রায় দেয় নাই বা মিথ্যাচরণ করে নাই—যদিও ইহা সত্য, যে, ব্যক্তিগত হিসাবে কোন কোন সভ্যপদ-প্রার্থী কোনও গর্হিত উপায় অবলম্বন করেন নাই বা করান নাই। স্বরাজ্যদলের কর্মীরা বেশী অগ্রায় করিয়াছেন, কিম্বা অপর দলের কর্মীরা করিয়াছেন, অথবা কে কি কি ও কত অগ্রায় করিয়াছেন, আমরা তাহা জানিবার চেষ্টা করি নাই। এইজন্য এবিষয়ে অধিক কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি না।

ঠাহারা আপনাদিগকে স্বরাজ্যদলভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া কাজ হাসিল করিয়াছেন, ঠাহারা যে সকলেই ঐদলের লোক নহেন, কেহ কেহ কেবল কার্যাসিদ্ধির জন্য নিজেকে ঐ দলভুক্ত বলিতেছেন, তাহা আগে হইতেই অনুমিত হইয়াছিল। সেই অনুমান যে সত্য ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কাজ আরম্ভ হইলে আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ নিজেকে স্বরাজ্যদলভুক্ত না বলিলেও স্বরাজ্যদলের সাহায্যে নির্বাচিত হইয়াছেন। ঠাহারা ইহার প্রতিদানস্বরূপ সভায় গিয়া কিরূপ কাজ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহাও জানিতে বেশী বিলম্ব হইবে না।

মনে রাখিতে হইবে, যে, স্বরাজ্যের দাবী করিবার স্থান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক সভা তাহার স্থান নহে; প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের একমাত্র কাজ, সভার সব কাজের বিরুদ্ধাচরণ করা। সরকারী ও সরকারের সমর্থক লোকদের প্রস্তাব, বিল, প্রভৃতির বিরোধিতা ত ঠাহারা করিবেনই; অধিকন্তু স্বতন্ত্র (Independent) কোন সভ্য কিছু ভাল আইনের খসড়া বা প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহারও বিরোধিতা স্বরাজ্যদল করিতে বাধ্য। কেন না, এরূপ ভাল কিছু সমর্থন যদি উহার করেন, এবং যদি তদ্বারা ঐ আইন পাস বা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত হইয়া যাইবে, যে, ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা সামান্য কিছু দেশহিত হইতে পারে। কিন্তু স্বরাজ্যদল যাহা ভাঙিতে চান, তাহার দ্বারা দেশের কিছু উপকার হইতে পারে, কার্যতঃ

ইহা প্রমাণ হইতে দেওয়া স্বরাজ্যদলের ধ্বংসপ্রয়াস-নীতিকে বলবৎ করিবে না।

প্রত্যেক কাজেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলেই ঠাহারা দেখিতে পাইবেন, যে, ঠাহাদের দলের সংখ্যা এমন নয়, যে, ঠাহারা সকল বা অধিকা শব্দে এই নীতিকে জয়যুক্ত করিতে পারেন। সুতরাং, ঠাহাদের ভাঙিবার বা অচল করিবার প্রতিজ্ঞা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঠাহারা কার্যে পরিণত করিতে পারিবেন না।

মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রস্তাব বা আইনের খসড়া সভার নিকট উপস্থাপিত হইবে, যাহা দেশহিতকর। এরূপ ক্ষেত্রেও স্বরাজ্যদলের লোকেরা ঠাহাদের বিরোধ ও ধ্বংসনীতির অনুসরণ করিবেন কি? যদি করেন, তাহা হইলে ঠাহাদের এরূপ আচরণের এই ব্যাখ্যা হওয়া বিচিত্র নহে, যে, ঠাহারা দেশের ভাল কখন করিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু আপাততঃ ঠাহারা দেশহিতে বাধা দিতেছেন। তাহা হইলে ঠাহাদের লোকপ্রিয়তা কতকটা কমিয়া যাইবাব সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ঠাহারা যদি ঠাহাদের ঘোষিত নীতির অনুসরণ না করিয়া দেশহিতকর প্রস্তাব ও বিলের সমর্থন এবং অহিতকর প্রস্তাব ও বিলের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে ঠাহাদের সহিত মডারেট দলের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচিত্ত লোকদের কোন প্রভেদ থাকিবে না; এবং তাহা হইলে ঠাহারা যে রব তুলিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা লোকে ভণ্ডামি বলিবে। ইতিমধ্যেই মাদ্রাজের স্বরাজ্যদলের মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি বলিয়াছেন, “রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় কর্তব্যতালিকায় বিশ্বাস করি না।” মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভাকে স্বরাজ্য লাভের উপায়-স্বরূপে ব্যবহার করিতে উদ্যোগী কোন দলের অভ্যুদয় হইলে স্বরাজ্যদল ঠাহাদের নীতি পরিবর্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন।*

* “But, as a practical politician, I do not believe in permanent unchangeable political programmes. If, for example, in Madras, the “Justice” party with its reactionary and communalistic ideals is to be replaced by a really progressive noncommunal party pledged to use the Council for the attainment of Swara nd

বাংলা দেশের স্বরাজ্যদলের মুখপত্র “ফরওয়ার্ড” ও বলিয়াছেন, কার্যসিদ্ধির জন্ত তাঁহারা কোন কার্য-প্রণালীকেই অতি নীচ মনে করিবেন না।

স্বরাজ্যদল মত বা কার্যপ্রণালী যতই পরিবর্তন করুন না, যতক্ষণ তাঁহারা লোককে বুঝাইতে পারিবেন, যে, গবর্নমেন্টের বিরোধী তাঁহাদের সমান আর কেহ নাই, ততক্ষণ তাঁহারা বহুলোকের প্রিয় থাকিবেন। কথায় বলে, জনসাধারণ কোন কথা দীর্ঘকাল মনে করিয়া রাখে না; যে যখন যত প্রচণ্ড হুজুক তুলিতে পারে, তাহারই জিত হয়। লোকদেখান কিছু একটা কবিবার ও বলিবার, কাজ হাসিল করিবার জন্ত পূর্বাপর-সঙ্গতিকে অগ্রাহ্য করিবার, এবং উচ্চনীতিকে প্রয়োজন-মত পদদলিত করিবার ক্ষমতা স্বরাজ্যদলের কর্তৃপক্ষের আছে—যে-কোন রাজনৈতিক বা অন্য দল জয়কেই একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য কবে, তাহাদেরই এই ক্ষমতা জন্মিতে পারে। কিন্তু এই পথেব পথিকদের জিত হইলেও লোকহিত তাহাদের দ্বারা হয় না। তাহারা হারিয়া যাইবার ভয়ে ধর্ম্ম এবং লোকহিতকে বলি দিতেও পারে।

ভবিষ্যতে যদি সংঘবদ্ধ অন্য কোন দল স্বরাজ্যদল অপেক্ষা ও গবর্নমেন্ট-শত্রু বলিয়া কার্যতঃ আপনাদিগকে প্রমাণ করিতে পারেন, অন্ততঃ সেইরূপ ধারণা লোকের মনে জন্মাইতে পারেন, তাঁহাদেরও অল্পকালস্থায়ী জিত হইবে। কিন্তু যাহারা দেশহিত চান, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাভূষিষ্ঠতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দেশের লোকেব জ্ঞান, মানসিক শক্তি, চরিত্রবল এবং দৈহিক স্বাস্থ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকুন।

মন্ত্রী কাহার হইবেন ?

এবার বাংলাদেশের মন্ত্রী কাহার হইবেন, তাহা লইয়া জল্পনা ও অনুমান পথে ঘাটে বৈঠকখানায় ও খবরের কাগজে চলিতেছে, এবং নানা গুজব রটিতেছে। কেহ

কেহ এরূপ কথা প্রচার করিতেছেন, যে, তাঁহাদের সম্মতি লইবার জন্ত লাট সাহেবের লোক তাঁহাদের বাড়ী হাঁটা-হাঁটি করিতেছে। যাহারাই মন্ত্রী হউন তাঁহারা জানিয়া রাখুন, যে, তাঁহারা বৎসরে চৌষট্টিহাজার টাকা বেতন লইবেনই, যদি এরূপ ভ্বেদ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকিবে না। জোগাড়-যত্ন করিয়া তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় বেতনহাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাইতে পারেন, কিন্তু তাহার দ্বারা লোকের বিরাগ ও অশ্রদ্ধা এড়াইতে পারিবেন না। লোকের বিরাগ ও অশ্রদ্ধাকেও অগ্রাহ্য করা উচিত, যদি তাহা কোন মহৎ কর্তব্যের অনুসরণ বশতঃ করিতে হয়; কিন্তু টাকার লোভ সেরূপ মহৎ কোন জিনিষ নয়। বৎসরে ৬৪,০০০ বেতন দিবার মত অবস্থা বাংলাদেশের নয়।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্তব্য

অনেক দেশের ব্যবস্থাপক সভার কাজের নিয়ম এরূপ, যে, নির্বাচিত সভ্যেরা যে নীতির সমর্থন করিয়া নির্বাচকদের ভোট পাইয়াছেন, সভায় গিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, নির্বাচকরা পুনর্বার নির্বাচনেব সময়ের আগে সভ্যদিগকে তাঁহাদের এরূপ আচরণের প্রতিফল দিতে পারেন না। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলিরও নিয়ম এইরূপ। যিনি যে দলের লোক বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন, তিনি যদি সে দল ছাড়িয়া অন্য দলে যোগ দেন, যাহা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা যদি না করেন, তাহা হইলেও তিন বৎসর তিনি সভ্য থাকিবেনই; নির্বাচকগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। তাঁহার কর্তব্যজ্ঞানের উপরই এখন নির্ভর করিতে হইবে।

সুইটজারল্যাণ্ডে ও অন্য কোন কোন দেশে নির্বাচিত সভ্যেরা এরূপ যথেষ্ট আচরণ করিতে পারেন না। সেখানে রেফারেন্ডমের (referendumএর) নিয়ম থাকায়, কোন প্রস্তাব বা আইনের খসড়া সম্বন্ধে নির্বাচকদের মত লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, এদেশে কিম্বা বিলাতে যেমন কোন প্রস্তাব বা বিল সভার সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে সভ্যদের মত অনুসারেই তাহা মঞ্জুর

practically accepting the Swarajya Party's programme in its spirit, it will be for the party to consider, what its attitude should be. I will not venture to say more."

না-মঞ্জুর হয়, সুইটজারল্যান্ডে তাহা না হইয়া দেশে যে-সব লোক সভ্যদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখেও প্রস্তাব বা বিলটি উপস্থিত করা যাইতে পারে। তাহা করা হইলে দেশের এই-সব লোক যে দিকে মত দেন, তদনুসারেই কাজ হয়।

আমাদের দেশে যতদিন পর্যন্ত এইরূপ রেফারেণ্ডমের নিয়ম প্রবর্তিত না হইতেছে, ততদিন সভ্যদের কর্তব্যজ্ঞান এবং লোকনিন্দার ভয়ের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। সেইজন্য যাহারা কোন্সিল এবং কোন্সিলের কাজে খুব গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁহাদের স্থানীয় সভাসমিতিতে এবং খবরের কাগজে সভ্যদের ব্যবহারের নিরপেক্ষ সমালোচনা হওয়া খুব দরকার।

ব্যবস্থাপক সভার সমুদায় সভ্যই সমগ্র দেশের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে বাধ্য। তা ছাড়া, যিনি যে স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাহার হিতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি তাঁহাকে রাখিতে হইবে।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী যত সামান্য ভাবেই আমাদের দেশে থাকুক না, প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর মূল নীতি অন্তর্হত হওয়াতেই ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্ম হইয়াছে। সত্বেও যে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে পারিষা-ছেন, তাহা ঐ প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর জোরে। অতএব সমুদয় নির্বাচিত সভ্যের একটি কর্তব্য এই, দেশের লোকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার হ্রাস না পাইয়া যাহাতে বৃদ্ধি পায় এই চেষ্টা করা। এখন যত লোক নির্বাচক আছেন, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা আরো বেশী লোক নির্বাচক হইলে ভাল হয়। তা ছাড়া, নির্বাচকদের অন্ত্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও সভ্যদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যিক।

যাহারা মিউনিসিপালিটি হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা না কমে এবং মিউনিসিপালিটির আয়ব্যয়ের ও কাজের উপর উহার করদাতাদের ক্ষমতা না কমে—বরং বাড়ে। যাহারা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে নির্বাচিত হইয়া-ছেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন বোর্ডের ক্ষমতা না কমিয়া বরং বাড়ে, এবং বোর্ডের আয়ব্যয় ও কাজের

উপর করদাতাদের ক্ষমতা না কমিয়া বাড়ে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা-দিগকে যেমন একদিকে দেখিতে হইবে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির ক্ষমতার হ্রাস না হয়, তেমনি অন্যদিকে দেখিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নির্বাচকদিগের ক্ষমতা না কমিয়া আরও বাড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়রূপ নির্বাচনক্ষেত্রের বিষয়ই বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদিগকে নির্বাচন করেন গ্রাজুয়েটগণ। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাজুয়েটের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের উপর পরোক্ষ রকম ক্ষমতাও নাই; বর্তমান নিয়মে থাকিতে পারেও না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য কয়জন সদস্য মাত্র অল্পসংখ্যক গ্রাজুয়েট দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু আইন এরূপ হওয়া উচিত, যাহার বলে অধিকাংশ গ্রাজুয়েট অধিকাংশ সদস্যকে নির্বাচন করিতে পাবেন, এবং বিনিয়মসায় কিম্বা মূল্য দিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়েব সমুদয় মিনিট রিপোর্ট্ আদি পাইতে পারেন এবং তদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়েব কৃত সমুদয় কাজ সম্বন্ধে ওয়াকীফ-হাল থাকিতে পারেন। সব প্রদেশেই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রতিনিধিদের দেখা উচিত, যে, যে গ্রাজুয়েট-সমষ্টির ভোটে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন, সেই গ্রাজুয়েটসমষ্টির বিদ্যালয়ের কাজের উপর ক্ষমতা যেন বাড়ে। গ্রাজুয়েটদের ক্ষমতা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দোষ চুকিয়াছে। জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ অধ্যাপকমণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। একপ অধ্যাপক যাহারা আছেন তাহাদের দ্বারা লোকহিত হইতেছে। পণ্ডিতম্ভন্য এবং সাহিত্য-চোরদের দ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। যিনি অর্থনীতি-বিভাগে নোট লিখাইতে গিয়া “they resorted to barter” লিখাইতে চান কিন্তু শেষে ছাত্রদের সংশোধন গ্রহণ করিয়া বলিতে বাধ্য হন, “আচ্ছা বাবারা, ‘they resorted to barter’ই লেখ”, তদ্বিধ ব্যক্তিও অধ্যাপক আছেন।

মিউনিসিপালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির ক্ষমতা বৃদ্ধি যাহাতে হয়, তাহা দেখাই প্রতিনিধিদের একমাত্র কর্তব্য নহে। ঐ-সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে নিজনিজ কর্তব্য করেন, একমাত্র দেশহিতেই লক্ষ্য রাখিয়া

কাজ করেন, তদ্রূপ ব্যবস্থা না থাকিলে তাহা প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করাও প্রতিনিধিদের কর্তব্য।

নির্বাচন ও গোবধ

স্বরাজ্যদলের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুইই আছেন। গোঁড়া হিন্দুরা গোবধ চান না; মুসলমানের গোবধে আপত্তি নাই—কাহারও কাহারও বরং জেদ আছে যে গোবধ করিতেই হইবে। এ অবস্থায় স্বরাজ্যদল, দল হিসাবে, গোবধ নিবারণ বা প্রবর্তন কোন বিষয়েই কিছু বলিতে পারেন না—বিশেষতঃ যখন তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে ভাঙিতে বা অচল করিতেই সভায় যাইতেছেন, অথবা কিছু কাজ করিতে বা অথবা কোন কাজে বাধা দিতে যাইতেছেন না।

কলিকাতার বড়-বাজারের নির্বাচনে কিন্তু একজন পদপ্রার্থীকে গোভক্ষক ও অথকে গোরক্ষক বলিয়া প্রচার করিয়া স্বরাজ্য দল জিতিয়াছেন। অবশ্য জয়ের ইহাই সম্ভবতঃ একমাত্র কারণ নহে। যিনি পরাজিত হইয়াছেন, গবর্ণমেন্টের অবিচারিত সমর্থক ও একান্ত খয়েরখা বলিয়া তাঁহার অধ্যাতি থাকতেও তিনি লোকের বিরাগভাজন ছিলেন। কিন্তু যে দলের প্রধান প্রধান কোন কোন লোকের সর্ববিধ “নিষিদ্ধ” মাংস-ভক্ষণ সুপরিজ্ঞাত, সেই দলের পক্ষে, “গোজাতি বিপন্ন, দোহাই রক্ষা কর,” রব তোলা হাশ্বকর। আমরা মৎস্যমাংসাহারী নহি, সুতরাং গোবধেও উৎসাহ নাই, ছাগাদি বধেও উৎসাহ নাই; বরং গবাদি বধ হ্রাস হওয়াই প্রার্থনীয় মনে করি। কিন্তু গোজাতির এবং অন্ততঃ মানবজাতির শিশুদের কল্যাণের জন্তই ইহাও বলা দরকার মনে করি, যে, গোভক্ষক বলিয়া আত্মপ্লাঘা করিলেই কিম্বা গোরক্ষীগণসভার দলভুক্ত হইলেই গোরুর হিত হয় না। আমাদের এই বাংলাদেশে খাইতে না দেওয়া এবং অথবা নানা প্রকারে যত নিষ্ঠুরতা গোরুর উপর করা হয়, সেই প্রকার নিষ্ঠুরতা গোভক্ষকদের দেশে হয় না। এই কারণে, বাংলাদেশে গোবংশের অবনতি হইতেছে, ভাল গোরু লোপ পাইতেছে। আমরা গোবধ করা মন্দ মনে করি। কিন্তু গোঁড়া

হিন্দুরা ভুলিয়া যান, যে, কেবল জবাই করিলেই গোবধ করা হয় না; অথবা করিয়া, প্রহারাদি করিয়া খাইতে না দিয়া গোরুর আয়ু হ্রাস করিলেও গোবধ করা হয়। গোরক্ষা করিবার উৎসাহে দাঙ্গা করিয়া মনুষ্যবধ কেহ কেহ করে; কিন্তু তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয় না, যে, দাঙ্গাকারীরা গোরুর খুব যত্ন করেন এবং গোজাতির আয়ুর্বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। গোখাদকের দেশ সুইটজারল্যান্ড হইতে টিনের কোঁটায় ভরা ঘন দুধ আসে, আর হিন্দু-বাঙালী-প্রধান মহর কলিকাতায় সাত আনায় এক সেরের কম দামে খাঁটি গোদুগ্ধ পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি, গোখাদক লণ্ডন শহরে গোরক্ষক কলিকাতার বড়-বাজার অপেক্ষা সস্তায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

যাহা হউক, স্বরাজ্যদল যখন নিজেকে গোরক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিকটে এই দাবী করা অত্যাচার হইবে না, যে, তাঁহারা গোবংশের উন্নতির জন্ত সর্ববিধ চেষ্টা করিবেন।

জাতীয় উন্নতির উপকরণ

বর্তমানকালে জাতীয় উন্নতির কথা সকলের মুখেই শুনা যাইতেছে এবং অনেকের মনেই এই বিষয়ে নানা প্রকার ধারণা আছে। যে-সকল ব্যক্তি জাতীয় উন্নতির কথা লইয়া চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১। যাহারা ভাবেন যে জাতীয় উন্নতি একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা এবং বাহিরের বিষয় না থাকিলেই, স্বভাবের নিয়মের তাড়নায় জাতি উন্নতির পথে ক্রমশঃ আগুয়ান হইবে। ২। যাহারা ভাবেন, যে, জাতীয় উন্নতি জাতির কর্মশক্তি ও চিন্তাশীলতার প্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ শুধু বাহিরের অন্তরায় দূর হইলেই উন্নতি আপনা হইতে আইসে না, উন্নতি গড়িয়া তুলিতে হয়।

এই দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীতও অনেকে আছেন যাহারা উভয় উপায়ই প্রয়োজনীয় মনে করেন; অর্থাৎ ইহাদিগের মতে বাহিরের বিষয় দূর হইলে তবেই জাতীয় কর্মকুশলতা ও চিন্তাশীলতা স্বাবলম্বিত হইতে ও পূর্ণতা

লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহারাও কর্মকুশলতা এবং চিন্তাশীলতাকেই জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিঘ্ন দূর করা অপেক্ষা উচ্চতর আসন দান করেন, কেননা বিঘ্ন দূর করিতে হইলেও এই দুইটির প্রয়োজন রহিয়াছে।

ধরা যাউক, যে, যে-কোন উপায়ে হউক, বাহিরের লোক আমাদিগের কার্যে আর কোন বাধা দিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু বাহিরের বিঘ্ন দূর হইলেই কি দেশের লোকের অকস্মাৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইবে? রাষ্ট্র আপনার হস্তে আসিলেই কি জাতীয় উন্নতি নিশ্চিত হইয়া যায়? স্বাধীন দেশ মাত্রই কি সর্বক্ষেত্রেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আবাসভূমি?

ইহা অবশ্য ঠিক যে সকল দুঃখ, সকল দারিদ্র্য অপেক্ষা পরাধীনতা মানুষকে অধিক পীড়িত করে; কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না, যে, পরাধীনতা শেষ হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়। একটি বিশাল জাতির সুখ দুঃখ নানান অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং স্বাধীনতা তাহার মধ্যে সর্বদারস্ত্রে প্রয়োজন হইলেও স্বাধীনতাই সব নহে। জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের গুণের উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্য জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়—উৎকৃষ্ট শিক্ষক, উৎকৃষ্ট অর্থনীতিজ্ঞ, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যকলাবিদ। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণই জাতিকে যথার্থ উন্নতির পথে লইয়া যান।

ব্যক্তি যেমন স্বাধীনভাবে মূখের গায় যথেষ্টাচার করিয়া জহন্নামে যাইতে পারে, জাতিও তেমনই অথবা আরও দ্রুতবেগে অধঃপতনের পথে আগুয়ান হয়, যদি না তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি যথেষ্ট থাকেন।

আমাদিগকে দিবারাত্রি স্বাধীনতার কথা ভাবিতে হইবে; কিন্তু ইহাও ভাবিতে হইবে, যে, কি করিয়া আমাদের জাতির সকল লোককে সুশিক্ষা দান করা যায়, কি করিয়া জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়, কি করিয়া ব্যক্তি শক্তিশালী সুস্থ ও বুদ্ধিমান হয়, কি করিয়া জাতীয় ধনসম্পত্তি এরূপ ভাবে ব্যবহার করা যায় যাহাতে জাতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য অধিকতম হয়, কি করিয়া জাতির গৃহে গৃহে

স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও সুখ শান্তি আনয়ন করা যায়, ও কি করিয়া এই জাতি জগতের জাতিসভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিতে পারে, “আমারও কিছু দিবার আছে, আমি শুধু লইতে আসি নাই।”

আজকাল দেশে ইংবেজবিদ্বেষের ফলে আত্মদোষ-বিশ্মৃত অথবা আত্মদোষকে জোর করিয়া গুণ বলিয়া প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টিত লোক দেখা যাইতেছে। যথা, কোথাও কোথাও দেখিতেছি, যে, বাল্যবিবাহ ভাল, হিন্দুনারীর আপনার ঠাকুরমা ও অগ্রাণ্ড গুরুজন ব্যতীত জগতের অপর কাহারও নিকট শিখিবার বিশেষ কিছু নাই, আধুনিক শিক্ষা সকলকে অপদার্থ করিয়া দেয়, ইত্যাদি নানা প্রকার মত প্রচার চেষ্টা হইতেছে। জ্ঞান ও সত্য কোন জাতির নিজস্ব নহে, তাহা জগতের। আমরা যদি জাতিবিশেষকে না ভালবাসি, তাহাতে বলিবাব বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যদি সেই জাতির মধ্যে ভাল যাহা-কিছু তাহাকেও আত্মশ্লাঘা অথবা অহঙ্কারের খাতিরে বর্জনীয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে তাহা আমাদিগেরই দোষ। উন্নত জাতির জন্ম উন্নত ব্যক্তির প্রয়োজন। ব্যক্তি অযোগ্য ও নিগুণ থাকিলে জাতিও সেইরূপই হইবে। ইহা জানিয়াও যদি আমরা পুরাতনের ভূতের দোষাত্ম্যে জাতীয় উন্নতির পথ ছাড়িয়া অধোগমন করি, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

বাল্য বিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার দিদিমা কি বলিচ্ছিলেন, তাহা দিয়া, অথবা কোন ব্যক্তি-বিশেষ বাল্যবিবাহের সম্ভান কি না, তাহা দিয়াও হইবে না। বিজ্ঞানকে তাহার উত্তর দিতে বলা হউক।

শিক্ষিতা নারী অশিক্ষিতা অথবা অল্পশিক্ষিতা অপেক্ষা অধিক কর্মকুশল ও উপযুক্ততর মাতা কি না, তাহার উত্তর সত্য জীবন হইতে পাওয়া যাইবে। জাতীয় ধনসম্পত্তির উৎপাদন-কার্য্য ও তাহার সম্ভোগ যথাযথরূপে হইতেছে কি না, তাহাও চক্ষু খুলিয়া দেখা হউক এবং তাহার প্রতিকার প্রয়োজন ও সম্ভব হইলে, সেই চেষ্টা করা হউক। আধুনিক শিক্ষার

দোষ ধরিবার পূর্বে দেখা হউক ব্যাপারটি আধুনিক হইলেও শিক্ষা কি না এবং তাহা না হইলে যথার্থ আধুনিক শিক্ষার উপকারিতা আছে কি না বিচার করিয়া উপযুক্ত বোধ হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হউক।

বর্তমানে আমাদের দেশে চীৎকার ও আশ্ফালন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় হইতেছে। যে জাতির লোকেরা ক্ষুধার অন্ন, শীত ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র, বোগেব ঔষধ ও চিকিৎসা, সামাজিক উৎপীড়নের প্রতিকার, অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক ও নিরাশায় আশার চিহ্ন কোথাও পায় না, সে দেশের লোকের উদ্দামতা ও বড়াই করা ত্যাগ করিয়া স্থির চিত্তে সকল দিক দেখিয়া সত্য অবলম্বন করিয়া নূতন পুৰাতন সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন ও উৎকৃষ্টতর জাতি গঠনের দিকে মন দেওয়া উচিত।

অ

লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাসুল

ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা বাহিরের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাহিরের প্রতিযোগিতা সর্বক্ষেত্রে সুনীতিসঙ্গত ভাবে চলিতেছে না, এবং ভারতের লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাও নূতন বলিয়া নবজাত শিশুর গায় পবিণতবয়স্ক কারুবারের সহিত প্রতিযোগিতায় বর্তমানে সক্ষম নহে। শিশুকে যেমন বয়স্কের সহিত ধস্তাধস্তি কবিত্তে দিলে তাহা, প্রথমত, নিৰ্দুর্ভিতার কাষা হয়, ও, দ্বিতীয়ত, শিশু পরাস্ত হইলেও তাহাতে তাহাব কোন প্রকাব অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না; সেইরূপ যে-সকল জাতীয় ব্যবসা নূতন আরম্ভ হইয়াছে সেই-সকল ব্যবসাকে বাহিরের ব্যবসাদারের হস্ত হইতে রক্ষা না করিলে নিৰ্কোষের গায় জাতীয় অপকার সাধন করা হয় এবং নবজাত ব্যবসা পরিণতবয়স্ক ব্যবসার সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইলেও তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ হয় না।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা ভারতবর্ষে খুবই ভালমতে গড়িয়া উঠা উচিত। পুরাতন কালে ভারতের উক্ত ব্যবসাতে কি প্রকার প্রতিপত্তি ছিল, তাহার বর্ণনা ছাড়িয়া দিলেও, দেখা যাইতেছে, যে, লৌহ ও ইস্পাত

প্রস্তুত করিবার প্রাকৃতিক উপকরণ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে ও এরূপ সহজলভ্য ভাবে রহিয়াছে, যে, তাহা ব্যবহার করা খুবই সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য। প্রধান উপকরণ অসংস্কৃত খনিজ লৌহ এবং কয়লা ভারতে প্রচুর ও পরস্পর নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া যায়। ইহা একটি খুবই সুবিধাজনক অবস্থা।

কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের কারুবার ভাল করিয়া করিতে হইলে আরো কতকগুলি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। এইগুলির অভাবে ব্যবসার লাভ কমিয়া যায় অথবা খরচ বাড়িয়া যায়। এই-সকল অবস্থা, কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসা না চালাইলে আইসে না এবং সেই কারণেই লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা প্রথম প্রথম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থাপিত পরজাতীয় কারুবারের হস্ত হইতে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

এই-সকল সুবিধাজনক অথবা অবশুপ্রয়োজনীয় অবস্থার মধ্যে প্রধান—পর্যাপ্ত মূলধন, উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ও পরিচালনা এবং উপযুক্তরূপে শিক্ষিত শ্রমজীবী। ভারতবর্ষে তিনটির কোনটিই বর্তমানে নাই। এই ব্যবসাতে পর্যাপ্ত মূলধন অর্থে যাহা বুঝায় তাহা ভারতের কোন কারুবারের নাই। একটি ভাল রকম লৌহ ও ইস্পাতের কারুখানা চালাইতে হইলে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান কালে শুধু একটি কারুখানা চালাইয়াও যথেষ্ট অল্প খরচে এই ব্যবসা চালান সম্ভব হয় না। অনেকগুলি কারুখানা এক পরিচালনার অধীনে চলিলে অনেক সুবিধা হয়। উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ও পরিচালনা বহু পরিমাণে উপযুক্ত মূলধনের উপর নির্ভর করে; কিন্তু তাহা ব্যতীতও (ভারতে দুর্লভ অথবা বহুব্যয়লভ্য) বিশেষরূপে শিক্ষিত কর্মচারীর অভাবে পরিচালনা নিকৃষ্ট হয়। শ্রমজীবীগণ শিক্ষিত না হইলে এই ব্যবসাতে বিশেষ অসুবিধা হয়। অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত শ্রমজীবীর সাহায্যে কার্য চালাইতে হইলে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনব্যয় অতিরিক্ত হইয়া পড়ে এবং সেই কারণে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কঠিন হইয়া আসে। কিন্তু শ্রমজীবীকে শিক্ষাদান এইক্ষেত্রে বিশেষ কষ্টসাধ্য। লৌহ ও ইস্পাতের কারুখানায় যে-সকল শ্রমজীবী কার্য

করে, তাহাদিগের কার্যদক্ষতা প্রায় পুরুষাত্মকমিক। অর্থাৎ অল্পবয়স হইতে এইরূপ কার্যের আবহাওয়ায় মানুষ না হইলে উপযুক্তরূপ দক্ষতালাভ সম্ভব হয় না। এবং ভারতে সেরূপ সুবিধাজনক শিক্ষার উপযুক্ত অবস্থা প্রায় ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া এইরূপ কারখানা না চলিলে হইবে না। ততদিন ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের কারবারে শ্রমজীবীর খরচ কিছু অধিক হইবে।

বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষিত হইলে এই ব্যবসাতে মূলধন আরও সহজে ও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে ; কেন না সংরক্ষিত ব্যবসা অধিক লাভজনক হয়। ফলে বন্দোবস্ত ও পরিচালনা উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব হইবে এবং কিছুকাল পরে উচ্চ কর্মচারী ও শ্রমজীবীর খরচও কমিয়া আসিবে। তখন সংরক্ষণ ব্যতীতও এই ব্যবসা দাঁড়াইতে পারিবে। বাহিরের প্রতিযোগিতা শুধু যে বয়সজনিত শক্তিতে শক্তিশালী তাহা নহে। বাহিবের কারবারীর মূলধন অধিক, বন্দোবস্ত ও পরিচালনা উৎকৃষ্টতর এবং (কার্যের তুলনায়) শ্রমিক অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়লভ্য ; কিন্তু ইহা ব্যতীত সামগ্রিক ধরণের কতকগুলি সুবিধায় তাহাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রথমতঃ, অনেক বাহিরের ব্যবসাদারের কলকজা যন্ত্রপাতি যুদ্ধের সময়ের অত্যধিক লাভের পরমাণু খরিদ করা। ফলে তাহাদের উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে কলকজা-ও যন্ত্রপাতি-ঘটিত ব্যয় ভারতের ব্যবসাদারের তুলনায় অতিশয় অল্প।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন দেশের গবর্ণমেন্ট লৌহ ও ইস্পাতের কারবারীকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। যথা, বেল্জিয়ামের কারবারী প্রতি টন লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানির জন্য ৩০।ফ্রাঙ্ক করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য লাভ করে। কোন কোন দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার এত অস্বাভাবিক-রকম অল্প, যে, সেই-সকল দেশের ব্যবসাদার পরের দেশে জিনিষ বিক্রয় করিতে কোনই কষ্ট পায় না। দেশের মুদ্রা অপর জাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলে যে ক্ষতি হয় তাহা সমস্ত জাতির ক্ষতি ; অর্থাৎ

এইরূপ নিচু হারে মুদ্রা বিনিময় করিয়া জাতির সকল লোক রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। ইহাও এক-প্রকার গবর্ণমেন্টের সাহায্য বলিলেও চলে।

বিশাল-আকার কারখানা ও অসংখ্য দ্রব্য একত্রে প্রস্তুত করিলে দ্রব্য-পিছু খরচ কম হয়। অর্থাৎ ১০০টি জিনিষ করিতে জিনিষ-পিছু যাহা খরচ হয়, ১ লক্ষ জিনিষ করিতে তাহা অপেক্ষা জিনিষ-পিছু অনেক অল্প খরচ হয়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষাও অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় ; এবং উপযুক্ত মূল্যে যাহা বিক্রয় হয় তাহা বিক্রয় করিয়া বাড়তি যাহা-কিছু তাহা জলেব দরে দূর দেশের বাজারে ছাড়া হয়। ইহাকে পরের দিকে বাড়তি চাপান বলা যায়। অথবা শুধু বোঝাই-করা বলিলেও চলে (Dumping—গাদা করা)। ইহাতে মোট লাভ অধিক হয় এবং অনেক স্থলে দূর দেশের ব্যবসাদারকে এইরূপ দুষ্ট প্রতিযোগিতায় ধায়ের করিয়া অবশেষে তাহার বাজারে চড়াও করিয়া বসিয়া একাধিপত্যের জোরে অধিক মূল্য হারিকিয়া, পূর্বকার অল্প মূল্যে জিনিষ বিক্রয়ের ক্ষতি (?) হুদে আসলে পোষাইয়া লওয়া হয়।

বিদেশীর সুবিধার খাতিবে ভারতে সংরক্ষণ-নীতির আদব না থাকায় ভারতবর্ষ সারা জগতের বাড়তি মাল ছাড়িবার বাজার। ইহার ফলে ভারতের ব্যবসাদার দুষ্ট প্রতিযোগিতায় ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। এইরূপ নানান কারণে ভারতবর্ষের লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাদারগণ লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল বসাইতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছেন। লৌহ ও ইস্পাত সকলপ্রকার আধুনিক কারবার ও কারখানার ভিত্তিগত ব্যবসা (Basic Industry)। যন্ত্রপাতি ও কলকজা না থাকিলে বর্তমান জগৎ অচল হইয়া যাইবে এবং যন্ত্র ও কল-কজার মূলে বহিয়াছে লৌহ ও ইস্পাত। সুতরাং যাহারা আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চান, তাহারা

সর্বাগ্রে এই ব্যবস্যাটিকে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন মনে করেন। ভারতের দারিদ্র্যের মূলে রহিয়াছে মানুষের শ্রমের অব্যবহার ও দুর্ব্যবহার। এই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে প্রয়োজন, সকলকে কার্যে লাগান ও সকলের শ্রম যথাযথ ব্যবহার করা। কিন্তু সকল-প্রকার কারখানাজাত দ্রব্য আমরা আমাদের এক মাত্র সম্বল প্রকৃতির দানের পরিবর্তে বাহিরের ব্যবসাদারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। ফলে আমাদের নিজের খাদ্যের অনটন ঘটে এবং দেশের অর্ধেক লোক শ্রমশক্তির অব্যবহার অথবা কুব্যবহার করিয়া অর্দ্ধাহারে ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কালযাপন করে। সকলপ্রকার কারখানার সৃষ্টি এদেশে একান্ত আবশ্যিক। কারখানার সৃষ্টি বলিতে যেন কেহ তৎক্ষণাৎ নিকট ও শ্রমজীবী-উৎপীড়নের লীলাভূমি কারখানার কথা না ভাবেন। কারখানাও সকলের জন্ম ও সুখস্বাস্থ্যসময় হয় ও হইতে পারে। আমাদের লক্ষ্য সেইরূপ কারখানা—বিলাতী ধরণের অথবা আমেরিকান ধরণের কোন বন্দোবস্তের প্রতি আমাদের টান নাই।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা সফল না হইলে এই নবযুগ ভারতে আসিবে না এবং সেইজন্যই এই ব্যবস্যাটিকে সর্বাগ্রে বাড়াইয়া তোলা আবশ্যিক। একবার দাঁড়াইয়া গেলে আপনার শক্তিতেই ইহা জগতের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে; কিন্তু দাঁড়াইতে সময় লাগিবে এবং সেইজন্য সাময়িক-ভাবে এই ব্যবস্যাটিকে সংরক্ষণ করা উচিত। কি পরিমাণ মাশুল বসাইলে বিদেশী লৌহ ও ইস্পাত ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হইবে, আমরা তাহার আলোচনা করিব না, কেন না, তাহার আলোচনা বিশেষজ্ঞের কার্য। কিন্তু ইহা বলা যায় যে মূল্য ধরিয়া শতকরা ২০ টাকা মাশুলের কমে কিছু বাজ হইবে না। তাতার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার মালিকগণ শতকরা ৩০এরও অধিক মাশুল প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে বে-বন্দোবস্ত ও অমিতব্যয়িত্বের অভিযোগ শুনা যায়।

একদল ইংরেজ লৌহ ও ইস্পাতের সংরক্ষণ প্রয়োজন মনে করে না। তাহাদের মতে ইহাতে লৌহ ও ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকল ব্যবসায়ের অনিষ্ট হইবে। কিন্তু তাহারা একথা বলে নাই, বলিতে পারিবেও না, যে বাহিরের ব্যবসাদার চিবকাল ধরিয়া অল্পমূল্যে উক্ত দ্রব্য-গুলি ভারতকে সরবরাহ করিবে। দেশীয় ব্যবসাদার প্রতিযোগিতার বাহিবে চলিয়া গেলে, বিদেশীরা পুনর্বার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হইলে যখন আমাদের নিকট বিদেশী ব্যবসাদার পুরামাত্রার দাম এবং তাহারও উপর কিছু আদায় করিয়া লইবে, তখন এই-সকল ইংরেজ আমাদের রক্ষা করিবে না। ইয়োরোপীয়গণ পুনর্বার যুদ্ধে লিপ্ত হইলে যখন আমাদের লৌহ ও ইস্পাত জুটিবে না, তখনও ইহা আমাদের রক্ষা করিবে না।

আমাদের আশা আছে, যে, সময়ে ভারতেই যথেষ্ট ও সম্ভায় ইস্পাত ও লৌহ প্রস্তুত হইবে। তখন আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে সক্ষম হইব। এই-সকল ইংরেজ তাহাতে বিশ্বাস করে না। কেনই বা করিবে? ইংরেজ আজ জগতে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাতে অগ্রজাতীয়ের নিকট পরাস্ত। ভারত তাহার শেষ আশা। তাহার পক্ষে এদেশে যথেষ্ট মূল্যে যাহা খুসী বিক্রয় করা চলে। ইহা আমাদের প্রকৃত দাসত্ব।

বাস্তবিকও ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত এবং তন্নির্মিত জিনিষ বিদেশ হইতে যত আসে, তাহার অধিকাংশ বিলাত হইতে আসে। এমন লাভের ব্যবসা ইংরেজ ছাড়িবে কেন? সংরক্ষক মাশুল বসিলে ইংরেজের এই লাভের ব্যবসা যাইবে বলিয়াই ইংরেজরা সংরক্ষক মাশুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

অ

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

শরীরধারণের জন্ম যে কয়টি জিনিষের প্রয়োজন, মানুষ তাহার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করে। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও বস্ত্রের অভাব হইলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। তাই এই কয়টি জিনিষের কথা মানুষের মনে সবার আগে আসে। জগতে জন্মলাভ করিয়া মানুষ জীবনটাকে

নানাদিক্ দিয়া উপাভাগ করিতে চায় বলিয়া শরীরটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন ; আধ্যাত্মিক, মানসিক বা শারীরিক যে-কোনো প্রকার আনন্দই চাই না কেন, শরীরটা ভাল না থাকিলে কোনটাই গ্রহণ করা যায় না। একথা আমরা সকলেই জানি কিন্তু অনেকেই জানি না এবং মানি না, যে, শরীরটাকে কেবলমাত্র কোন প্রকারে রক্ষা করিলে শুধু যে জীবনের বহু আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা নহে, জীবনটাই অনেক স্থলে নিজের ও পরিবার-প্রতিবাসীর কাছে একটা নিরানন্দের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

আনন্দই মানুষের জীবনের কেন্দ্র। আমরা জ্ঞান-পিপাসা, লোক-হিতৈষণা, স্বদেশ-প্রীতি, কর্তব্য-বুদ্ধি, ভগবৎভক্তি বা আর যে-কোনো নামেই মানুষের জীবনের কর্মপ্রেরণাকে অভিহিত করি না কেন, সকলের মূলেই আনন্দ রহিয়াছে। এই আনন্দ-রস আকর্ষণ পান করিতে হইলে সুস্থ দেহ ও মনের প্রয়োজন। সুস্থ মনও বহু পরিমাণে সুস্থ দেহের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং এক দিক্ দিয়া বলা যাইতে পারে, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী তিনি যিনি মানুষকে সুস্থ শরীর ধারণ করিতে সক্ষম করেন। মানুষের জ্ঞান, প্রেম, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতির সহিত মানুষের দেহের প্রতি শিরা, স্নায়ু, অস্থি, মাংস, চর্ম, পেশী, মেদ ও রক্তকণা প্রভৃতির যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা বুঝিলে দেখা যায়, যে, শরীর সর্বাত্মক সুস্থ, পূর্ণতা-প্রাপ্ত ও আদর্শরূপ হইলে মানুষের মানসিক গুণাবলীও পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়।

সুতরাং মানুষের সমাজে চিকিৎসকের স্থান অতি উচ্চ স্থান, এবং তাঁহার কর্তব্যও অতি উচ্চ দরের। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, যে, চিকিৎসকের যাহা মুখ্য কর্তব্য তাহা অপেক্ষা গৌণ কর্তব্যের দিকেই তাঁহার নিজের ও সাধারণ মানুষের নজর বেশী। কি করিয়া সুস্থ দেহ লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং বড় হইয়া আজীবন সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে সেই উপদেশ মানুষকে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত, রোগীকে নীরোগ করার কর্তব্য দ্বিতীয়স্থানীয়। কারণ রোগ একবার হইলে জীবনের যে কয় দিন মানুষ

রোগ ভোগ করে সে কয়টা দিন জীবনের আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত ত সে হয়ই, তা ছাড়া ভবিষ্যতেও তাহার শরীর আর আদর্শ শরীর না থাকিতে পারে।

কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসক ও জনসাধারণের মধ্যে যে চুক্তি আছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তাহাতে চিকিৎসকের মুখ্য কর্তব্যটির দেখাও আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আমরা জানি, গৃহে কাহারও রোগ হইলে টাকা দিয়া ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য থাকিলে তিনি আসিয়া রোগীকে নিবাময় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। কিন্তু রোগ না হইবার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যদি কোনো দেশে এমন ব্যবস্থা থাকিত যে সুস্থ মানুষ বছরে কিম্বা মাসে চিকিৎসককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিবে এবং পীড়িত হইয়া পড়িলে ডাক্তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা ত করিবেনই, উপরন্তু ডাক্তারের কোনো ক্রটি ধরা পড়িলে অর্থদণ্ড দিবেন, তাহা হইলে ডাক্তারের মুখ্য কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টিটাই প্রথমে যাইত।

এই রকম নিয়ম হয়ত বর্তমানের অতি জটিল-জীবন-যাত্রা-পথের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অগ্ৰাণ্ড আর কয়েকটা নিয়ম সকল দেশেই থাকা উচিত। আমাদের দেশে এবং অগ্ৰাণ্ড অনেক দেশে ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই সমান অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইতে হয়। মানুষের স্বাস্থ্য কিম্বা জীবনের মূল্য ধনের আধিক্য কিম্বা স্বল্পতার উপর নির্ভর করে না। ধনীর স্বাস্থ্যহানি হইলে তাঁহার যতখানি দুঃখ ও ক্ষতি হয়, দরিদ্রের তাহা অপেক্ষা কম ত হয়ই না, অনেক সময় বেশীই হয়। সুতরাং নিজ স্বাস্থ্যের জন্ত চিকিৎসককে পাইতে ইচ্ছা দরিদ্রেরও হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অর্থাভাবে দরিদ্রকে হয় কুড়ানো উপদেশেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, নয় চিকিৎসকের করুণার উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষকে অগ্নির করুণার ভিখারী হইতে বাধা করিলে তাহার আত্ম-মর্যাদার লাঘব করা হয়। তাই “ইনকম্ ট্যাক্স”র মত প্রতি রোজ্ গারী মানুষের আয় অমুযায়ী একটা ডাক্তারের “ফী” নির্দিষ্ট থাকিলে তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া

থাকিতে হয় না। নিজ আয় অন্ত্যায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা অর্থের বিনিময়ে প্রত্যেক মানুষ যদি বৎসরে নির্দিষ্ট কয়েক বার সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা নিজ নিজ শরীর পরীক্ষা করাইবার ও স্বাস্থ্যপালন ও উন্নতির উপদেশ পাইবার অধিকারী হয়, ত, সুস্থদেহের আনন্দ মানুষের পক্ষে বহু সুলভ লয়। “ইনকমার্গাঙ্কু” যেমন অতি অল্প আয়ের মানুষকে দিতে হয় না, তেমনি অতি অল্প আয়ের মানুষের এই নির্দিষ্ট ডাক্তারের ফীটাও বাদ যাওয়া উচিত। বিনা ফীতেই বৎসরে কয়েকবার ডাক্তারের পরামর্শ পাইবার অধিকার তাহাদের থাকিবে। নীরোগ অবস্থাতে ডাক্তারকে ডাকিতে এখনও মানুষ পারে, কিন্তু তাহাতে অর্থব্যয় বোগচিকিৎসার সমানই করিতে হয়। অতএব রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ নিবারণের চেষ্টা, সুস্থ থাকার চেষ্টা, সুলভ হওয়ার ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এই ব্যবস্থাগুলি চিকিৎসক ও বোজ্জগাবী জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে করিতে পাবেন। তা ছাড়া অগ্ণান্য অনেক দেশের মত সরকারের তরফ হইতেও বিনা পয়সায় কিস্তি নির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে সম্পদা চিকিৎসা পাইবার এবং বিশেষ করিয়া রোগ নিবারণ করিবার ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের অধিকার মানুষকে দেওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসককে নির্দিষ্ট একটা বেতন দিয়া কোন পল্লী কি গ্রামের ভার দিয়া এই সত্ত্ব করা যাইতে পারে, যে, বৎসরের শেষে সেই পল্লী বা গ্রামের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ অনুসারে তাহাকে আরো অর্থ দেওয়া হইবে। তাহার পল্লীতে যত কম মানুষের মৃত্যু হইবে, যত রোগীর সংখ্যা কম হইবে, যত আদর্শ সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হইবে, ততই তাহার আয় বাড়িতে থাকিবে।

কিন্তু তাহা না হইয়া বর্তমানকালে যত রোগের মডক হয়, যত স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অঙ্গহানি হয়, ততই চিকিৎসক সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন।

শিশুর জীবনে পুস্তকের স্থান

ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিবার নানা উপায়

আনন্দ দেওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে “চাইল্ড্ ওয়েল্‌ফেয়ার” পত্র বলিচ্ছেন :—

“শিশুকে যতরকম উপহার দেওয়া যাইতে পারে, তাহার মধ্যে পড়িবার অভ্যাসের মত বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আনন্দদায়ক এবং জীবন সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম উপহার আর কিছু নাই। শিশুকে যদি পড়িবার অভ্যাস করাইতে পার, এবং ভাল মন্দ দেখিয়া ঠিক পথে সেই অভ্যাসটি চালাইতে শিখাইতে পার, তবে তাহাকে চিরকৃতজ্ঞ রাখিবার উপযুক্ত কিছু একটা সম্পদ দান করা হইবে।

“পুস্তক শিশুর জীবনের নিত্য সঙ্গী হওয়া উচিত। কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই পুস্তকাবলীর সম্পর্ক অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলা উচিত নয়। পড়াটা যে একটা কর্তব্য, একটা বোঝা, এই ধারণা শিশুর মনে হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। পড়িয়া যে মজা ও আনন্দ পাওয়া যায়, সুখে সময় কাটানো যায়, এই বিশ্বাসটাই মনে ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। পড়াটা যেন শিশুর কাছে বাস্তবিক সুখকর হয়, তাহা হইলেই দিনের মধ্যে পড়িবার সময়টা তাহার কাছে প্রার্থিত সম্পদের মত মনোহর বোধ হইবে। এটা করা বাস্তবিক কিছু শক্তও নয়। পুস্তকে বাস্তবিকই মজা ও আনন্দ আছে। জগতে যেমন বিচিত্র মন বিচিত্র আনন্দ খোঁজে, তেমনি বিচিত্র পুস্তক বিচিত্র আনন্দ জোগায়। বালক কি বালিকার জীবনের এমন কোন কাজ কি জিনিষই নাই বলা যায়, যাহার ক্ষেত্রে পুস্তকের পাতার মধ্যে আনিয়া ফেলা যায় না। এমন কোন সুখস্বপ্ন নাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই যাহাতে পুস্তক সাহায্য করিতে না পারে; শিশুর জীবন ত স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষেরই মেলা। পুস্তক শত শত পথ দিয়া শিশুজীবনের আনন্দ বাড়াইয়া তুলিতে পারে।”

সুশিক্ষিতা পরিচারিকা

অনেকের ধারণা “মেমসাহেব্‌রা” নিজগৃহেরও কোনো

কাজে কাল কাটাইয়া দেন। কিন্তু বাস্তবিক নিজ নিজ গৃহকর্ম ত আজকালকার অভাবের দিনে অনেকেই করেন, তা-ছাড়া পরের কাজও যে করেন, তাহার প্রমাণ ১০ই নবেম্বরের টাইমস্ এডুকেশনাল সাপ্লিমেন্টে দেখিতে পাই।—

“ডেম্ মেরিয়েল্ ট্যালবট্ ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের নারীসমিতির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি লণ্ডনে অষ্ট্রেলিয়ানদের কোনো সভায় অতিথিরূপে আসিয়া বলিয়াছিলেন, যে, যদিও ইংলণ্ডে চাকরচাকরানীর অত্যন্ত অভাব দেখা যায়, তবু উপনিবেশসমূহের অভাবের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। তিনি বলেন, পনেরটি ইংরেজ বালিকা শীঘ্রই সমুদ্রপারে চাকরানীর কাজ করিতে যাইবেন, ইহারা সকল দিক্ দিয়াই ইংরেজ রমণীদের গোরবের বস্ত্র। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেপ্টেনহ্যাম্-ও গার্টন-কলেজের ছাত্রী। দেশে ইহাদের কার্যক্ষেত্র নাই বলিয়া ইহারা বিদেশে যাইতেছেন।”

শ



অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী

অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী

গত অগ্রহায়ণ মাসে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠ্যগণিতের প্রণেতা বলিয়া বাংলা এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে সুপরিচিত অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এম্-এ পাস্ করিবার পর কলিকাতায় সিটিকলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান হইতে তিনি আলিগড় কলেজের গণিতের অধ্যাপক হইয়া যান। আলিগড়ে তিনি আটাশ বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রীতি অর্জন করেন ও যশস্বী হন। অনেক নামজাদা ও বিদ্বান্ মুসলমান তাঁহার ছাত্র। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মৌলানা শৌকৎ আলি ও মৌলানা মহম্মদ আলি অগ্রতম। যাদববাবুকে বাল্যকালে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মৈমনসিংহে যখন তিনি এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় পাইয়া হার্ডিং মিডল্ স্কুলে ভর্তি হন, তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর। সেই বয়সে আরো কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে পালা করিয়া তাঁহাকে সেই

আত্মীয়ের বাসায় সমস্ত পরিবারের রক্ষণ করিতে হইত। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া উঠে। দুটি ভাই, দুটি ভগিনী, ও মাতা, পাঁচজনের ভার তাঁহার উপর পড়ে। যাহা হউক, তিনি বহুকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পান। তাহার পর অবৈতনিক ছাত্র হইয়া ও গৃহশিক্ষকতা করিয়া তিনি কঠোর শ্রম দ্বারা এণ্টেন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৫২ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পরও বরাবর বৃত্তি পাইয়া তিনি এম্-এ পর্যন্ত পাস্ করেন। “শেষ জীবনে সম্পদলক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাইয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে চিরযত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলি তিনি প্রার্থী যে-কোন গরীব ছাত্রকে বিনামূল্যে দান করিতেন।” মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রলেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব লিপিদক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ও

হিন্দী তিন ভাষায় কাগজ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম কাগজের সম্পাদকতা তিনি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদন ও তাহাতে লেখা ছাড়া তিনি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। বাংলা-ভাষায় একখানি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উৎপাদন করিবে, এই ওজুহাতে গবর্ণমেন্ট তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

ইংরেজ রাজকর্মচারীর বেতনবৃদ্ধি

ভারতবর্ষের সরকারী চাকরীগুলি দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—সামরিক ও অসামরিক। অসামরিক চাকরীগুলি আবার দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—সাম্রাজ্যিক বা সমগ্রভারতীয়, এবং প্রাদেশিক। সাম্রাজ্যিক বা সমগ্রভারতীয় অধিকাংশ চাকরীতে ইংরেজরা নিযুক্ত আছেন। এই চাকরীদের অধিকাংশকে সচরাচর সিবি-লিয়ান্ বলা হয়। ইহারা কলেক্টর, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি হন, এবং কখন কখন অগ্নাশ্রম বিভাগের বড় কাজগুলিও ইহারা দখল করেন।

যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর জিনিষপত্রের দাম বাড়ায় অগ্নাশ্রম সকল লোকের খরচ যেমন বাড়িয়াছে, চাকরীদেরও খরচ তেমন বাড়িয়াছে। কিন্তু বড় চাকর্যে যারা, তাদের তেমন কিছু কষ্ট হয় নাই যেমন ভারতের বহুকোটি গরীব সাধারণ লোকদের হইয়াছে। ইংরেজদের মধ্যে যাহারা বলেন, যে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ধনী হইতেছে তাঁহারাও সচরাচর ভারতবাসীর গড় আয় জনপ্রতি বার্ষিক পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী বলেন না। কিন্তু অনেক লোকের বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ-ষাট অপেক্ষা বেশী; সুতরাং গড় আয় পঞ্চাশ-ষাটের মানে এই, যে, বিশ্বের লোকের আয় পঞ্চাশ-ষাটেরও কম, কাহারও কাহারও কোন আয়ই নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে পরান্ন-জীবীর সংখ্যা খুব বেশী। যাহা হউক, ৫০।৬০ টাকার কম আয়ের লোক এদেশে বহুকোটি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ সামান্য পেয়াদা চাপরাসী কনুষ্ঠেবলের বার্ষিক বেতন পঞ্চাশ-ষাটের অধিক—

উপরি পাওনাটা ছাড়িয়াই দিলাম। সুতরাং ইহা খুব জোর করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, জিনিষপত্র মহার্ঘ হওয়ায় এদেশে অনেক কোটি সাধারণ লোকের ঘেরূপ কষ্ট হইতেছে, নিম্নতম শ্রেণীর সরকারী চাকর্যেদেরও ঘেরূপ কষ্ট হয় নাই। উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম চাকর্যে-দের অল্পবন্দেব কষ্ট ত নিশ্চয়ই হয় নাই, উদ্ধৃত্ত ও সঞ্চয় পূর্ক্সাপেক্ষা কমিয়াছিল মাত্র। কিন্তু যে বহু কোটি লোক কাহারও চাকর্যে নয়, তাহারা ত কাহাকেও বলিতে পারে না, “আমাদের খরচ বাড়িয়াছে, অতএব আয় বাড়াইয়া দাও।” কিন্তু যাহারা সরকারী চাকর্যে তাহারা তাহাদের মনিব গবর্ণমেন্ট কে বলিয়াছিল, “বেতন বাড়াইয়া দাও।” বেতন বৃদ্ধি এবং ছুটি ও পেন্সনাদির সুবিধার জগ্ন চীৎকার উচ্চতম শ্রেণীর চাকর্যেদের অর্থাৎ সমগ্র-ভারতীয় চাকর্যেদের (যাহাদের অধিকাংশ ইংরেজ) সর্ক্সাপেক্ষা বেশী কারিয়াছিল। তদনুসারে তাহাদের বেতনাদি বৃদ্ধি এক দফা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে তাহারা যুদ্ধের আগেকার সময়ের চেয়ে মোটামুটি শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী পাইতেছে। কিন্তু এই অসামরিক উচ্চতম চাকর্যেদের ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে। তাহারা একরূপ গোলমাল কবিত্তে থাকে যেন তাহাদের মধ্যে দুঃখ দেখা দিয়াছে। তাহাদের মতে দারিদ্র্যই তাহাদের একমাত্র দুঃখ নহে। নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায়, তাহারা বলে, তাহাদের ক্ষমতা মান ইচ্ছা প্রভাব কমিয়াছে, কৈফিয়ৎ দিতে হয় বেশী, লোকে সমালোচনা করে বেশী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে কিনা, পেটে খাইলে পিঠে নয়, এই নীতি অনুসারে তাহারা বেশী টাকা পাইলে এইসব অত্যাচার সহ্য করিতে রাজী আছে!

এই প্রকার সোবুগোল হওয়ায় গবর্ণমেন্ট তাহাদের (অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহারা নিজেই নিজেদের) দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার জগ্ন একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission) বসাইয়াছেন। লর্ড লী তাহার সভাপতি বলিয়া তাহার নাম লী কমিশন। ইহার সভ্যরা ভারতের সব প্রদেশে সাক্ষ্য লইয়া বেড়াইতেছেন।

অসামরিক সমগ্রভারতীয় চাকর্যেদের বেতন বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে দেখিয়া সামরিক অফিসারেরাও আগেই কাঁচুনী গাহিয়া রাখিয়াছেন, “উহাদিগকেই যদি সব দিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা কি পাইব ?” অতএব, ইহা নিশ্চিত, যে, অসামরিক বড় চাকর্যেদের বেতনাদি বাড়া স্থির হইয়া গেলেই সামরিকেরা নিজেদের দাবী খাড়া করিবেন।

এদিকে আর-একটা কথাও যুদ্ধের সময় ও পরে উঠিয়াছে, যে, সিভিল সার্ভিসের জন্ত যোগ্যতম ব্রিটিশ যুবকেরা আর পরীক্ষা দেয় না। তাহার কারণ এই বলা হইতেছে, যে, খরচের তুলনায় সিভিলিয়ানদের বেতন এখন আর আগেবার মত নাই এবং তাহাদের সুখ সুবিধা প্রভাব কৰ্ভু কমিয়াছে। কিন্তু অল্প যে-সব কারণ আছে, তাহা বলা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রাণনাশ অঙ্গহানি অসামর্থ্য হওয়ায় যে মোটের উপর যোগ্য যুবকের সংখ্যাই কমিয়াছে, সে কথাটা এবং এইরূপ আরও প্রধান প্রধান কথা চাপা দেওয়া হইতেছে।

যাহা হউক, ইহা যদি সত্যও হয়, যে, এখনকার বেতনাদিতে যোগ্যতম ইংরেজ আর পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলেও কি আমরাদিগকে, যত বেশী টাকাই হউক দিয়া, ইংরেজ রাখিতেই হইবে ? গোড়ার কথা হইতেছে আয় বৃদ্ধি বায়। তাতার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার প্রধান কর্মচারী পেরিন্ সাহেবের বেতন বড় লাটের চেয়ে বেশী। ধরিয়া লওয়া যাক, তিনি অতিবড় যোগ্য লোক। কিন্তু কোন গ্রামের বা শহরের কামারশালের কাজ চালাইবার জন্ত যদি কেহ বলেন, যে, ঐ বড়লাটের অধিক-বেতনভোগী আমেরিকান্ মিষ্টার পেরিনের দরের লোক লইতেই হইবে, নতুবা চলিবে না, তাহা হইলে সে কথাটাকে কেহ কি বিবেচকের কথা বলিবে ? প্রাতঃবন্দর দেখা যাইতেছে, ভারতের বজেটে অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের খসড়ায় ঘাটতি পড়িতেছে। সামরিক ব্যয় কমাইবার জন্ত কমিশন বসাইয়াও এমন কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হয় নাই যাহাতে আয় ব্যয় সমান রাখা যায়। যে দেশের অবস্থা এইরূপ, সেই দেশের লোককে এই কথা বলা, যে, “তোমাদের জন্ত ইংলণ্ড উৎকৃষ্টতম

লোক ভিন্ন দিবেন না,” উপহাসের মত শুনায়, অথবা কেতাবী ভাষায় “বলপূর্কক গ্রহণের” মত শুনায় বলিলেও চলে। আমরা বলি, তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে স্বাধীনতা স্থাপনের এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়া লড়িয়াছ এবং আমাদের দেশেরও লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়াছ, আমরাদিগকে দেড় শত কোটি টাকা “স্বৈচ্ছাকৃত দান” করাইয়াছ ;—আমাদিগকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও না কেন, যে, আমরাই স্থির করিব, যে, কত ইংরেজ কর্মচারীর সাহায্য আমাদের দরকার এবং কি দরের ইংরেজের মজুরী আমরা যোগাইতে পারি ? হইতে পারে, যে, আমরা যত টাকা দিতে পারি, তাহাতে যোগ্যতম ইংরেজকে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আমাদের যে টাকা নাই ; আমরাদিগকে নিরেস মালেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। ডাল পুরী ছুধ বলা খাইবার পয়সা যাহার নাই, শাক ভাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

বেশী টাকা বেতন দিলেই যে যোগ্যতম লোক পাওয়া যায়, ইহা সব স্থলে ঘটে না। কর্মচারী মনোনয়ন, নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিলে কম টাকাতেও খুব ভাল লোক পাওয়া যায়। ভারতবাসী শতকরা এতটির বেশী চাকরী পাইবে না, এমন কেন বলা হইতেছে ? এইরূপ ব্যবস্থা কর না কেন, যে, অন্যান্য প্রতিযোগিতায় যাহারা যোগ্যতম হইবে তাহারা জাতি-বর্ণনির্কীর্ণে চাকরী পাইবে ? যোগ্যতার শারীরিক মানসিক খুব উচ্চ মাপকাঠি (standard) রাখ না কেন ? এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় যোগ্যতম লোক যত টাকায় পাওয়া যায়, সেইটাই বেতনের সাধারণ হার স্থির করিয়া বিদেশীদিগকে শত বা পচিশ টাকা বেশী দাও না কেন ?

উত্তরে তোমরা বলিবে, ভারতীয়েরা নিকৃষ্ট জাতি, তাহাদের পরাধীনতাই নিকৃষ্টতার প্রমাণ, তাহারা দেশের কাজের কর্তা ও পরিচালক হইতে পারে না ; অতএব শ্রেষ্ঠ জাতির লোক চাই, ইত্যাদি। যে কোন রকমের কাজ করিবার সুযোগ ভারতীয়েরা পাইতেছে তাহাতেই তাহারা যোগ্যতা দেখাইতেছে, এ তর্ক না হয় নাই তুলিলাম—এবং ইহার উত্তরেও বলা যায়, যে, ভারতীয়েরা যে অণের প্রদত্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে

বাধ্য হইতেছে, নিজেদের স্বযোগ নিজেরাই করিয়া লইতে পারিতেছে না ইহা তাহাদের নিরুপস্থিতার অন্ততম প্রমাণ। আমরা বলিব ইংরেজরাই ত পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন জাতি নহে; গত মহাযুদ্ধে আমেরিকান্ ফরাসী ইংরেজ ইতালীয় জাপানী সহযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। জাপানীরা শ্বেতকায় নহে ও এসিয়ার লোক, অতএব কোন না কোন রকমের নিরুপস্থিতা তাহাদের আছে। শ্বেতকায়দের এই অহঙ্কার মানিয়া লইলেও, শ্বেতকায় স্বাধীন শক্তিশালী জাতি কয়েকটি ত থাকে? তাহাদের মধ্য হইতে, আমরা যত টাকা দিতে পারি, সেই টাকায় যোগ্যতম লোক বাছিয়া লইতে দাও না কেন? জাপানীরা প্রথম প্রথম এবং এখনও তাহাদের শিক্ষার ও কাজ চ'লাইবার সাহায্যের জন্ত নিজেদের বিবেচনা- ও প্রয়োজন-মত আমেরিকান্ জার্মান ফ্রেঞ্চ ইংরেজ সব রকম লোক নিযুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাতে তাহারা সস্তায় ভাল লোক পাইয়াছে। আমরাদিগকেও এই প্রকাবে ভাল লোক বাছিয়া লইতে দাও না কেন? যেখানে ভারতীয়দের পূরা ক্ষমতা, সেখানেও ত তাহারা প্রয়োজন-মত ইংরেজ ও অন্ত শ্বেতকায় নিযুক্ত করে। ইংবেজ বা অন্ত শ্বেতকায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ আমরা বরং কাজ মাটি করিব তবু কোন শ্বেতকায়কে নিযুক্ত করিব না, এরূপ জেদ ও নিবৃদ্ধিতা আমাদের নাই।

আমাদের কথার উত্তর ইংরেজ দিবেন না; কিন্তু যদি দেন, তাহা হইলে তাহারা বলিতে পাবেন, “আমরা তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছি, আমরা তোমাদের প্রভু; অন্ত কোন শ্বেতজাতি তোমাদিগকে পরাজিত করে নাই ও তোমাদের প্রভু নহে। অতএব লুটের ভাগ তাহারা কেন পাইবে?” ইহার উত্তরে আমরা বলিব, “ঠিক, ঠিক, অতি ঠিক!!! কিন্তু তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বাধীনতা স্থাপন, সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বুলি ছাড়িয়া দাও।”

ভারতীয় চাকরীগুলার বেতন যেমন বাড়িয়াছে, প্রাদেশিকগুলারও বাড়িয়াছে। যে-সব শ্রেণীর দেশী লোক চাকরীজীবী বা চাকরীর প্রত্যাশা রাখে, তাহারা এমন কোন ব্যবস্থা চায় না যাহা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ

ভাবে তাহাদের পাওনায় বা পাওনার আশায় হাত পড়িতে পারে। আমরাও চাকরীজীবী ও চাকরী-প্রত্যাশী “ভদ্র” শ্রেণীর লোক। কিন্তু শ্রেণীগত স্বার্থ অপেক্ষা সকল শ্রেণীর স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, বড়। সেইজন্য আমাদের সকলেরই উচিত দেশের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা যাহাতে হয় সেই চেষ্টা করা।

যুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষে উচ্চ উচ্চতর ও উচ্চতম শ্রেণীর চাকরীগুলির বেতন দেশের অবস্থা হিসাবে অত্যন্ত বেশী ছিল। যুদ্ধের পূর্বের বর্দ্ধিত বেতনগুলিও দেশের আয়ের অনুপাতে অত্যন্ত বেশী। সব স্থলে ধনী হংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না, যদিও অনেক শ্রেণীর চাকরীর বেতন ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতে বেশী। এসিয়ার জাপানের সহিত তুলনা করুন। জাপানীদের আয় ভারতীয়দের চেয়ে বেশী। জাপানে জীবন ধারণের ব্যয় ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী। অথচ সেখানকার সর্বোচ্চ-পদস্থ কর্মচারী প্রধান মন্ত্রী মাসে দেড় হাজার টাকা বেতন পান, অন্যান্য মন্ত্রীর পান এক হাজার করিয়া। প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি তার চেয়েও কম বেতন পান। সুতরাং আমাদের দেশে কাহারও বেতন যে সাধারণতঃ এক হাজার টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ধনী আমেরিকাতেও সাধারণতঃ উচ্চ চাকরীগুলির বেতন ভারতীয় সেই-সব শ্রেণীর চাকরীর বেতন অপেক্ষা কম। এ-সব কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। দৈনিক “হিন্দুস্থান” বিস্তৃতভাবে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন।

এখন যত বেতন দেওয়া হয়, তার চেয়ে কম বেতন দিলেই হাকিমরা জজরা ঘুস লইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তিন শত টাকার মুন্সেফ্ ঘুস লয়েন না, কিন্তু ৫৪০০ টাকার কোন এক চাকর্যে ঘুসখোর, একথা বাংলাদেশে রাষ্ট্র। অভাবে পড়িলে মানুষ দুর্ভিক্ষ করে বটে, কিন্তু অভাব আপেক্ষিক শব্দ। চরিত্রই প্রধান জিনিষ। যে হেড্ কন্স্টেবল থাকিতে ঘুস লইত, সে উচ্চতর কাজ পাইয়াও ঘুস লয়।

লী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সাক্ষারী কেবল যে বেশী বেতনের দাবী করিতেছে তাহা নয়।

“আমাদের উপর মন্ত্রীদের প্রভুত্ব থাকা উচিত নয়, আমাদের কাজ বা আমাদের বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কিছু বলিবার বা করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়,” ইত্যাকার কথাও শুনা যাইতেছে। “তাহা হইলে বল না কেন, “ভারতশাসনসংস্কার জিনিষটা যত ভূয়ো, আমরা তাহাকে তার চেয়েও ভূয়ো করিতে বন্ধ-পরিষ্কর” ? প্রতিনিধিতন্ত্র-শাসনপ্রণালী যে-সব দেশে প্রচলিত আছে, সর্বত্রই গবর্ণমেন্টের কাজের সকল বিভাগের আয়ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভার কর্তৃত্ব আছে, সকলেরই কাজের আলোচনা করিবার অধিকার প্রতিনিধিদের আছে। ভারতবর্ষকে সৃষ্টিছাড়া দেশ মনে করিলে চলিবে না।

এরূপ তর্কও উঠিতেছে, যে, অমুক শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বাড়াইলে মোটে এত হাজার বা এত লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে, দেশের সমগ্র আয় ও ব্যয়ের তুলনায় ইহা মুমাত্ত। কিন্তু অনেকগুলো তিল একত্র করিলে তালের সমান হয়, “রাই কুড়াইয়া বেল” হয়, সমুদ্র জল-বিন্দুর সমষ্টি ; সব চাকর্যেই যদি বলেন, যাহা বাহার তাঁহা তিপ্পান্ন, তাহা হইলে সকলের দাবীর সমষ্টি বড় কম হইবে না, এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পণ্যাদ্রব্য-উৎপাদনব্যবস্থা, বাণিজ্য, জাহাজনির্মাণ, প্রভৃতির সমুচিত ব্যবস্থা করিবার মত টাকা কোন কালেই জুটিবে না।

বাণিজ্য-জাহাজ

ভারতের মাল রপ্তানি এবং এদেশে বাহিরের জিনিষ আমদানি এবং মানুষের যাতায়াত বিদেশী জাহাজে, প্রধানতঃ ইংরেজদের জাহাজে, হয়। তাণ ছাড়া, ভারত-সাম্রাজ্যেরই এক বন্দর হইতে অল্প বন্দর পর্যন্ত যাত্রী ও মাল চলাচলও প্রধানতঃ বিদেশীদের জাহাজে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি ভারতীয়দের টাকায় ক্রীত ও নির্মিত তাহাদের জাহাজেই হওয়া উচিত কি না, তাহা নির্ধারণের জন্ত একটি কমিটি বসিয়াছে। নানা স্বাধীন দেশের উপকূলে জাহাজ চালান আইন দ্বারা সেই সেই দেশের লোকদের একচেটিয়া করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের

দেশেও যে ইহা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারত-উপকূলে জাহাজ চালান আইনতঃ ভারতীয়দের একচেটিয়া না হইলে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর দুই প্রতিযোগিতার জন্ত ভারতীয়েরা কখনও এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে বা টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। গত বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত টি ভি শেষগিরি আইয়ার এবিষয়ে যে আইনের খসড়া উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহার সমর্থক।

পরলোকগত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ “হিন্দু” পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক প্রায় এক বৎসরকাল বোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। গত ১২ই ডিসেম্বর সকালবেলা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আয়াঙ্গার মহাশয় জীবনের প্রথমভাগে কয়েদাটোরে ওকালতি কবিতেন, পরে মাদ্রাজে আদে। তাঁহার সম্পাদিত ফৌজদারী-কার্যবিধি-আইনের একটি টীকা-সংবলিত সংস্করণ আছে। “হিন্দু” পত্রিকাখানি পূর্বে জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৫ সালে আয়াঙ্গার মহাশয় তাহা কিনিয়া লন। এই কম বৎসর যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া কাগজখানিকে ইংরেজী ভাষায় লিপিত দেশীয় সংবাদপত্রের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার স্বাধীন মতবাদ গভমেণ্টকে চিরদিনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সময় কাগজখানিকে ইংলণ্ডে যাইতে দেওয়া হইত না, অথচ আয়াঙ্গার মহাশয়কে গভমেণ্টের খরচায় ইয়ো-রোপের যুদ্ধভূমিতে ও ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আয়াঙ্গার মহাশয় বরাবরই জাতীয়-দলভুক্ত ছিলেন। নাগপুর কংগ্রেস হইতে তিনি অসহযোগনীতি প্রচারে যোগ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে সিভিল-ডিস্‌অবডিয়েন্স-কমিটি ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করে, আয়াঙ্গার মহাশয় তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে মত দেন। ইহার পরেই তিনি অসুখে পড়েন ও এতদিন ভুগিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।



বিদেশ

ইংলণ্ডে নির্বাচনের ফল—

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতিকে আশয় করিয়া বক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সহিত অগ্রাশ্রয় বাষ্ট্রনৈতিকদলের মধ্যে যে বিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার ফলে ইংলণ্ডের নির্বাচকেরা কোন্ মতকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত তাহা স্থিরনিশ্চয়তার সহিত জানিবার জন্ম ইংলণ্ডে নূতন নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। মূলতঃ এই নির্বাচনে অবাধ-বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণের লড়াই হইলেও ধনাধিক্যানুসারে বর্দ্ধিত হারে কর নির্ধারণ করা উচিত কিনা এই প্রশ্নও নির্বাচকদিগের সম্মুখে অমিকদল উপস্থিত করিয়াছিলেন।

নির্বাচনের ফলে দেখা যাইতেছে যে এপর্যন্ত ২৫৯ জন বক্ষণশীলদলের, ১৮৮ জন অমিকদলের, ১৪৮ জন উদারনৈতিকদলের এবং ৮ জন স্বাধীনমতাবলম্বী প্রতিনিধি মহাসভাতে প্রেরিত হইয়াছেন। কয়েকটি স্থানের নির্বাচন-সংবাদ এখনও আসে নাই। বিগত নির্বাচনে বক্ষণশীলদলের ৩৪৫ জন, শ্রমজীবীদের ১৪১ জন, উদারনৈতিকদলের ৬১ জন, লয়েড জর্জের অনুগত জাতীয়-উদারনৈতিকদলের ৫৫ জন ও স্বাধীনমতাবলম্বী ৮ জন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই নির্বাচনের পূর্বেই অবাধবাণিজ্যনীতিকে সংরক্ষণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া লয়েড জর্জের জাতীয়-উদারনৈতিকদল অগ্রাশ্রয় বিষয়ে আপনাদের বিরোধ ভুলিয়া গিয়া অ্যাসকুইথের পতাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কাজে-কাজেই এই নির্বাচন-ব্যাপারে উদারনৈতিকদল সর্বত্রই একযোগে কাজ করিয়াছেন। বিগত নির্বাচনে বক্ষণশীলদল সংখ্যায় এত অধিক নির্বাচিত হইয়াছিলেন যে তাহার বিরুদ্ধে যদি অগ্রাশ্রয় সব দল একযোগে দাঁড়াইত তথাপি বক্ষণশীলদলের প্রাধান্য বজায় থাকিত। কিন্তু এই নির্বাচনে যদিও বক্ষণশীলদল সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তথাপি তাহা এত অধিক নহে যে অমিক ও উদারনৈতিকদলের মিলিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শেষোক্ত এই দুইদল সংরক্ষণ-নীতির বিরোধী। কাজে-কাজেই সংরক্ষণনীতি যে ইংলণ্ড গ্রহণ করে নাই তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। নির্বাচনের ফলাফল হইতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি যে ক্রমশঃ অমিকদলের হস্তে গিয়া পড়িতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিগত নির্বাচনে অমিকদল যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা হইতেই ইহা প্রথম বুঝা গিয়াছিল যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আর গতানুগতিক পথে চলিতে বড় রাজি নহে। তাই অমিকদলের শাসন-পদ্ধতি কিরূপভাবে চলে তাহা দেখিবার জন্ম জনসাধারণের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে। এই নির্বাচনে নির্বাচক-মণ্ডলীর এই মানসিক অবস্থাটি আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। নির্বাচনে বক্ষণশীলদল ৮৫টি পদ হারাইয়াছেন। অমিকদল ৪৬টি পদ নূতন অধিকার করিয়াছেন এবং উদারনৈতিকদল ৪১টি পদ নূতন লাভ করিয়াছেন। অমিকদল এইবারও সংস্থিতসম্পন্ন বিরুদ্ধদল-রূপেই

পরিগণিত হইবেন। তবে অমিক ও উদারনৈতিকদলের সম্মিলিত আক্রমণের ভয়ে যদি কোনও বক্ষণশীল নেতা মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সম্মত না হন তবে অমিক নেতার নেতৃত্বাধীনে অমিক ও উদারনৈতিকদলের সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারে। কিন্তু সে পথে অস্ত্রায় অনেক। অমিকদল যে-সমস্ত অমিক আইন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থাতে যে-সমস্ত নূতন প্রথা প্রবর্তন করিতে চাহেন, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া উদারনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভবপব নহে। ধনাধিক্যানুসারে বর্দ্ধিত হারে কর-নির্ধারণ-নীতি উদারনৈতিক দল কখনই গ্রহণ করিবেন না। এই-সমস্ত বিচার করিয়া রাষ্ট্রবেত্তাগণ মনে করেন যে লর্ড ডার্কির্স নেতৃত্বাধীনে বক্ষণশীল মন্ত্রীসভার প্রতি ইংলণ্ডের শাসনভার ঋণ হইবে। বল্ডউইন্স সাহেবের প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ দেশের লোকের তাঁহার প্রতি যে আস্থা নাই তাহা নির্বাচনফলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সে মন্ত্রীসভাও যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে একপ মনে হয় না। নূতন মন্ত্রীসভার পতন হইলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রথা-অনুসারে সংস্থিত-সম্মত বিরুদ্ধবাদীদের উপর শাসনভার অর্পিত হয়। সুতরাং অচিরেই যে অমিকদলের হস্তে ইংলণ্ডের ভাগ্যানিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লক্ষ্য করিয়া দেখিবার কয়েকটি বিষয় নির্বাচনে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলের বক্ষণশীলগণ একেবারে ভোট পায় নাই; পক্ষান্তরে অমিক ও উদারনৈতিকদল বহু ভোট পাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ইতিপূর্বে বক্ষণশীল দলেরই প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু এই নির্বাচনদ্বন্দ্ব উদারনৈতিক দল আশ্চর্যরূপ জয়লাভ করিয়াছে। ব্যঙ্গ-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে অমিকদলের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার ভারতীয় পার্শ্বী মাপুজি সাকলাৎবালা নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। যে-সব জননায়ক এইবার পরাজিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উইন্সটন চার্চিল, আর্থার হেগার্ড, শ্রাব অ্যালফ্রেড মণ্ড, হামার গ্রিনউড, হিষ্টন ইয়ং, উইলিয়াম ওয়াটসন, শ্রার মোস্ বেনেট, ওয়াল্টার রাঙ্গি-ম্যানের পরাজয় খুব উল্লেখযোগ্য। বিগত নির্বাচনে মাত্র দুইজন মহিলা নির্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুইজন মহিলা, লেডি অ্যাপ্টর ও শ্রীমতী উইন্টিংহাম এবারও নির্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার ছাড়া আরও কয়েকটি মহিলা এইবার নির্বাচিত হইয়াছেন। বক্ষণশীলদলের ডাচেস অফ অ্যাথল্, উদারনৈতিকদলের লেডি টেরিংটন ও কুমারী র্যাথ্‌বান, অমিকদলের কুমারী জুসন্, শ্রীমতী মার্গারেট বনফিল্ড ও কুমারী এস্ লরেস্ নির্বাচনদ্বন্দ্ব জয়লাভ করিয়াছেন।

চীনে নূতন গোলযোগ—

উত্তর চীনের গণতন্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাচারী অধিনায়ক উপাইফুর আক্রমণ হইতে দক্ষিণ চীনের গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্ম ডাক্তার সান-ইয়েটসেন অবসরে কালযাপন না করিয়া পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় দক্ষিণ চীনে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে

এবং অরাজকতা বিদূরিত হইয়া শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। চতুর রাজনীতিক সান্ দেখিলেন যে শাসন-ব্যবস্থা সুন্দররূপে প্রবর্তন করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন, অথচ অর্থাগমের সর্বপ্রধান উপায় যে বাণিজ্য-কর তাহা বিদেশীর হস্তে। ইউরোপীয় বণিক সভ্যতা-বিস্তারের অছিলায় যখন বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিল তখন লাভের আশাতে চীনে অহিফেন-চালানী কারবার চালাইবার চেষ্টা পায়। তখন চীন সরকার তাহাতে বাধা দিলে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। সে যুদ্ধে চীনে হার মানিতে হইয়াছিল। তাহার পর আরও কয়েকবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য সেনানীর নিকট চীন বার বার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সেই সময় সন্ধিসর্ত্তে বৈদেশিক শক্তিবর্গ যুদ্ধ-ঋণপরিশোধ ও বন্দার-বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বাণিজ্য-শুল্ক হস্তগত করিয়া লন। ক্যান্টন প্রভৃতি কয়েকটি বন্দর সন্ধি-বন্দর নামে পরিচিত হয় এবং এই-সব বন্দরের সকল ভার বিদেশীর হস্তে থাকে। সান্ বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে বিদেশীয় হস্ত হইতে রাজস্বের এই প্রধান উপায়টিকে কাড়িয়া লইতে না পারিলে চীনেব মঙ্গল নাই। তাই তিনি ক্যান্টন বন্দর বিদেশীয়ের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্ত উদগ্রীব হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, চীনে পক্ষ করিয়া বাণিব্যব জন্ত বৈদেশিক শক্তিবর্গের মড়ককে ব্যর্থ করিতে হইলে শুদ্ধ আদায়ের যে অধিকার অস্বাভাবিক বিদেশীয় শক্তিবর্গ চীনের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন তাহা চীনে ফিরাইয়া লইতেই হইবে। এইজন্য নবীন চীনে বিরাট অভিযানের আয়োজন করিতে হইবে। হয়ত বিদেশীয় শক্তিবর্গের সম্মিলিত আঘাতে চীন পরাভূত হইবে; তখন রাশিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া চীন যে বিপ্লব সহিত মহা-সমবে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে যে ভীষণ সংহারলীলার সৃষ্টি হইবে তজ্জন্য ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জই দায়ী। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই বিশ্বযুদ্ধে চীন জয়লাভ করিবে ও প্রাচ্য দেশীয় এক অভিনব গণতন্ত্র কালে বিধে শাস্তি আনিবে। সেই অভিনব গণতন্ত্রের বর্ত্তিকা বহন করিয়া আজ চীন প্রাচ্যেব মঙ্গলের জন্ত অমিতবিক্রমে কড়িবাব জন্ত প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথের শফর—

বহু সামন্ত রাজার নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের রাজ্যে পবিত্র করিতেছেন। গত ১২ই নবেম্বর তিনি রাজকোটের দর্বাণগৃহে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু লোক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। ধ্রুঙ্গার মহারাজা ২৫,০০০; পোরবন্দরের মহারাজা ২০,০০০; মার্ভির ঠাকুর সাহেব ১০,০০০ দান করিয়াছেন। গত ২৮ শে নবেম্বর রবীন্দ্রনাথ জামনগরে পৌঁছিয়াছেন। জামসাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বিশ্বভারতী-ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা দান করিবেন। এপর্যন্ত বিশ্বভারতী-ভাণ্ডারে মাত্র ১,৩৫,০০০ টাকা উঠিয়াছে।

গবর্নমেন্টের খাম্-খেয়ালী—

যুক্ত-প্রদেশের গবর্নমেন্ট সম্প্রতি এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, তথাকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি বড়লাট এবং গবর্নর ছাড়া আর কাহারো অভিনন্দনে অর্থব্যয় করিতে পারিবেন না। গত ২১শে নবেম্বর এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের এক সভায় এআদেশ অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। তাঁহার স্থির

করিয়াছেন মোলানা শৌকত আলী সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইবে। সেজন্য ৫০ টাকা ব্যয়ও মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কুম্ভ-মেলায় সেবা-সমিতি—

আগামী মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইবে। যাত্রীদের চিকিৎসা, বাসস্থান-নির্ভয় এবং অস্বাস্থ্য সাহায্যের জন্ত এলাহাবাদের সেবা-সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই দলে জী পুরুষ উভয় প্রকারেরই স্বেচ্ছা-সেবক গ্রহণ করা হইবে।

এই-সমস্ত জনহিতকর কার্যের জন্ত ৫০০ উৎসাহী স্বেচ্ছা-সেবক এবং ১৫০০০ টাকার প্রয়োজন। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে সেবা-সমিতির কাজ আরম্ভ হইবে। টাকা পয়সা সমস্ত—বি মনোমোহন দাস ব্যাঙ্কার ও ট্রেজারার সেবা-সমিতি, রাণীমণ্ডী, এলাহাবাদ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এই সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন পণ্ডিত মানবীরজী, এবং সাধারণ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জর।

অকালী আন্দোলনে সামন্তরাজাদের অনুরোধ—

পাঞ্জাবের অকালী পত্রে প্রকাশ—কাশ্মীরের মহারাজা, বিন্দের মহারাজা এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম বড়লাটকে জানাইয়াছেন—নাভার মহারাজকে পুনরায় গদিতে বসাইয়া অকালী আন্দোলন শাস্ত করিয়া দেওয়া হটক। তাঁহারা নাকি বড়লাটকে ঐ প্রকার অনুরোধ জানাইবার জন্ত অস্বাস্থ্য সামন্ত-রাজ্যেও পত্র লিখিয়াছেন।

হিন্দু অনাথ-আশ্রম—

হায়দ্রাবাদে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে একটি হিন্দু অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনাথ-আশ্রমের জন্ত প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। তন্মধ্যে প্রতাপগড়ের রাজা ৫০,০০০ মহারাজা স্থার বিদ্যেপ্রসাদ ৫০০০ এবং শ্রীযুক্ত বামন্দাস নায়ক ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

মৌলানা হসরৎ মোহানীর অবস্থা—

পূণার সংবাদে প্রকাশ যারবেদা জেলে হসরৎ মোহানীর উপর নাকি খুব নির্যাতন হইতেছে। তাঁহাকে একটি নির্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে আলো প্রদানেরও কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাঁহাকে খুব অল্পই পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হয়। যে দুই-একখানা পুস্তক তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল জেলকর্তৃপক্ষ তাহাও কাড়িয়া লইয়াছেন।

কলিকাতা 'টুরিষ্ট' ক্লাবের অভিযান—

কলিকাতা টুরিষ্ট ক্লাবের সদস্যগণ গত বৎসর সাইকেলে সাতদিনে কলিকাতা হইতে কাশী পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল দূরবর্তী পেশোয়ারের অভিমুখে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু পিপলীতে ডাকাতের আক্রমণে একজনের মাথা সাংঘাতিক রকমে আহত হওয়ায় তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। মোটের উপর তাঁহারা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া ১১ দিনে ১০৪ ঘণ্টায় ১০২ মাইল গিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বাজপেয়ী—

গত ৫ই ডিসেম্বর পণ্ডিত বাজপেয়ী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুর মাত্র দুইদিন পূর্বে তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অথচ পণ্ডিতজী দীর্ঘকাল হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন তাঁহার অস্বাস্থ্যের জন্তই বহু পূর্বে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল

কিন্তু ভারতের স্বায়পরায়ণ গবর্নমেন্টের সাহসে ও স্বায়পরতায় তাহা ঘটে নাই।

ধলার হাতে কালার মৃত্যু—

পুণা সহর হইতে তিনজন গোরা সৈনিক ৮ মাইল উত্তরে কোনো গ্রামে শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা একটা জলাশয়ে বহু হংস শিকার করে এবং একজন গ্রামবাসীকে সেই শিকার সংগ্রহ করিয়া আনিতে আদেশ দেয়। কিন্তু জলাশয়টি দামে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাতে নামা বিপজ্জনক মনে করিয়া লোকটি আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে সৈনিকপ্রবরদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাহারা লোকটিকে প্রহার করিতে থাকে। প্রকৃত ব্যক্তির চীৎকারে সেইস্থানে অনেকগুলি লোক জমে। ক্রমে উভয় পক্ষের ভিতর বচনা সুর হইয়া যায়। ওয়াকার নামক একজন সৈনিক ইহার পর গুলি করিয়া একজন গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা এদেশে নূতন নহে। পদাঘাতে যখন এদেশের লোকের পীড়া ফাটে তখন হাতে বন্দুক থাকিলে তো কথাই নাই। এ জাতি একে কাপুরুষ, তাহার উপর নিরস্ত্র। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের বিধান যে তাহার এইরূপ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

অন্ধের প্রতি কারাদণ্ড —

আহমদাবাদের আমরেলীর জনৈক অন্ধ কবির প্রতি সম্প্রতি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য ভালো স্বভাবের এক মুচলেগা দিতে বলা হইয়াছিল—তিনি তাহা না দেওয়ায় তাঁহার প্রতি উপরি-উক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া এই মর্মে এক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন যে, বিকলাঙ্গের জন্য তাঁহার প্রতি কোনো প্রকার করুণা না করিয়াই যেন তাঁহাকে দণ্ডিত করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে পৃথক্ ভাবে রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই অন্ধ কবির অপরাধ—তিনি সাধারণ সভায় স্বদেশী সঙ্গীত গান করিতেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

বঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা —

গত ১৯২১-২২ সালের বাংলার শাসন সঞ্চয় রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বেশ ভালই হইয়াছে। পূর্বে যেমন রক্ষণশীল সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের একান্ত বিরোধী ছিলেন, এখন সে ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

এখন প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব জন্মিয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য বঙ্গদেশে পূর্বে মোট ১২১৯৯ বিদ্যালয় ছিল। আলোচ্যবর্ষে আরও ৮১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবৎসর লোকেব আয় তেমন না থাকায় ছাত্রীসংখ্যা ৩৪০৫৩৬ হইতে ৩৩৩৮৭০তে নামিয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে মোট ১৩৩জন পর্দানশীন ছাত্রী এবং তাহাদের ৫৮জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষা প্রদানের নিয়মের কিছুই পরিবর্তন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে বাংলারদেশে সর্বমমেত ১৩টি মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষালয় ছিল। সেগুলির ছাত্রীসংখ্যা ২১৩। আবশ্যিক অনুযায়ী শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাইতেছে না। আরও শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন।

—এডুকেশন গেজেট

চরমনাইর অত্যাচার তদন্ত—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গত ৩০এ জুনের একটি সভায় এই-সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করেন। কমিটি মোট ৭০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তাহারা খুন, বলপ্রয়োগ, নাবীর লজ্জা-সরম নাশ, অপমান, প্রহার, লুটপাট, ঘর ঘর ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতির সাক্ষ্য দেয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে গাইজুদ্দার মৃত্যু সম্পর্কে পুরুষ ও নাবী উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই বলে যে তাহারা স্বচক্ষে কতকগুলি পুলিশের লোককে মৃতব্যক্তিকে মাঠের মধ্য দিয়া টানিয়া ইঁচড়াইয়া লইয়া সেখানে ফেলিয়া রাখিতে দেখিয়াছে। ১১টি বলপ্রয়োগের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যও পাওয়া গিয়াছে; উৎপীড়িতের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। এবং অনেক নারী ও তাহাদের আত্মীয়গণ যে-সমস্ত ঘটনাকে মাত্র লজ্জাহানিকর বা অশ্লীলভাবে অত্যাচার করা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহার মধ্যেও যে বাস্তবিক পক্ষে বলপ্রয়োগের ব্যাপার অনেক আছে এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লুটতরাজ ও গৃহদ্বংস প্রভৃতি অতি ভীষণ অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু রমণীগণের প্রতি যে অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এ-সমস্ত তার তুলনায় নগণ্য। সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ১৮ই মে ও ১৫ই জুনে পুলিশগণ ঠিক উন্নত কুকুরের মত ব্যবহার করিয়াছে।

—বন্দেমাতরম্

বাংলার পুলিশ—

	১৯২১	১৯২২
১। দাঙ্গাহান্ধামা	৬১৩	২৪৬
২। ডাকাতি	৭১৬	৮৯৬
৩। বেলগয়ে হইতে মাল হারান ও চুরীর সংখ্যা	৩৭৩৬	৫৫৮৮
৪। পুরস্কৃত পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা	৬৪৬৮	৬৪০৩
৫। আদালতের বিচারে দণ্ডিত পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা	২৪৭	২৩৪
৬। পুলিশের জন্য ব্যয়	১৪৭ লক্ষ	১৪৮ লক্ষ টাকা
থানার সংখ্যা	৬৮৮	
নিম্নতমবিভাগে পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা		২৪১০২

—সারণি

আত্মরক্ষার উপায় নাশ—

১৯২৩ সালের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯২৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছোরা, বর্শা, লাঠি, বন্দুক অথবা অস্ত্র কোনও অস্ত্র লইয়া কলিকাতা সহরে অথবা সহরতলীতে সাধারণ স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ করিয়া “কলিকাতা গেজেটে” একটি ইস্তাহার বাহির হইয়াছে। যে ছড়ি, ভূমি হইতে বহনকারীর কটিনেশ অপেক্ষা উচ্চ এবং যাহার ব্যাস ১ ইঞ্চির বেশী, তাহাই এই ইস্তাহার-অনুসারে লাঠি বলিয়া গণ্য হইবে।

—সোনার বাংলা

সেবক



নাতির স্মৃতি

চিত্রকব শিল্প-সাহিত্যাচাৰ্য্য শ্ৰীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ

চিত্ৰাধিকাৰিণী শ্ৰীমতী মাধা বায়েৰ সৌজত্বে।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩০

৪র্থ সংখ্যা

আমাদের লক্ষ্য

আজ আমি যে কথাটি বলবার জন্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছি তার ভিতরে নূতন কিছু না থাকলেও সেটা কেবল আমার পুঁথিপড়া বিদ্যাগ্রসূত নয়, কতকটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাতও বটে। এজন্য প্রচ্ছন্ন আত্মস্তরিতার নামাস্তর যে অতিরিক্ত বিনয়, তার ভাণ না করে' আমি সরলভাবে আপনাদের নিকট নিবেদন করতে পারি যে, সে কথাটি বলবার আমার যৎসামান্য অধিকার আছে। আমার বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলবার চেষ্টা করব, এবং ছ-একটি উদাহরণ দ্বারা সেটা ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পেলে আশা করি তা' অপ্রীতিকর হলেও অপ্রাসঙ্গিক বলে' বিবেচিত হবে না।

সকলেই জানেন, যে, পাশ্চাত্য জগতে যৌবনের প্রারম্ভে কি কৈশোর বয়সেই, যখন মানসিক বৃত্তিগুলি নমনীয় থাকে এবং কাহার কোন বিষয়ে প্রবণতা আছে ও সিদ্ধিলাভ সহজ এটা বুঝা যায়, তখন পিতামাতা ছেলেদের জীবিকা অর্জন ও উন্নতি সাধনের পথ নির্দিষ্ট করে' দেন। অল্প বয়সে তারা লক্ষ্য স্থির করে' নেয় বলে'ই একাগ্রতার সঙ্গে স্ব স্ব লক্ষ্য অনুসরণ করে' অনেকদূর

অগ্রসর হতে পারে। “বাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”—সুতরাং জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে' পাশ্চাত্য যুবকগণ নিতান্তই হাবুডুবু খায় না। সর্বদাই যে তারা একরূপ লক্ষ্য স্থির করে' পথ চলতে থাকে তা নয়, লক্ষ্যত্রষ্টও অনেক সময়েই হয়ে থাকে, তবে আমাদের মধ্যে লক্ষ্যের অভাবে যতটা শক্তির অপচয় ঘটে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে ততটা হয় না। আমাদের কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অনেক সঙ্কীর্ণ, গম্য পথের সংখ্যাও অনেক কম এবং সেগুলি ঋজু অপেক্ষা কুটিলই বেশী, সুতরাং আমাদের নির্বাচনের অবসর বেশী নেই—অধিকাংশ ভ্রমযুবককেই এক সনাতন ওকালতির ধ্রুবতারার অনুসরণ করে' সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়, একথা অনেকাংশে সত্য হলেও, আমাদের প্রকৃতিগত জড়তা ও নূতনের প্রতি অনায়া এবং পিতৃ-পিতামহ-প্রদর্শিত সন্মার্গ পরিত্যাগ করে' কোন অপরিচিত অনিশ্চিত অভিনব পথে চলতে একান্ত অনিচ্ছা যে আমাদের নির্বাচন-ক্ষেত্রে কতকটা অগ্রসর করে' রেখেছে, সেবিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই।

যাহোক, আজ এসম্বন্ধে কোন তর্ক উত্থাপন করা

আমার উদ্দেশ্য নয়। মেনেই নেওয়া গেল যে, আমাদের কার্যক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ এবং তার উপর আমাদের কোন হাত নেই এবং যে পরিমাণে আমাদের রাস্তা খোলাসা হয়েছে, সেই পরিমাণে আমরা নানাদিকে অগ্রসর হতেও পেরেছি। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে আমরা যে পথ ধরে' চলি সে পথেও অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিজের অনর্থক সাফল্য থেকে বঞ্চিত করি ;—এটা যে জাতিহিসাবে আমাদের কত বড় একটা লোকসান, তা বুঝাবার চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য।

ওকালতি, ডাক্তারি, প্রভৃতি অল্প কয়েকটি অর্থকরী বিদ্যাই মাত্র আমাদের আয়ত্ত—এটা স্বীকার করলেও আমরা কি দেখতে পাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে আমরা যখন স্ব স্ব জীবিকা অর্জনের পথে বাহির হই, তখন গোড়া থেকেই আমাদের আক্ষেপ হয় কেন আমাদের পসার জমে' উঠল না। 'শতমারী ভবেং বৈদ্য' এ কথাটির মূলে যে সত্যটি আছে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত যে নিপুণ ভিষক বা আর কিছু হওয়া যায় না, সেটা আমরা ভুলে যাই। যতদিন পসার জমে না উঠে, ততদিন নিজ নিজ অধীত বিষয়ে নব নব তথ্য, নূতনতর আবিষ্কৃত গুলির সঙ্গে যোগ সাধনের চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে যে কাজ দেখতে পারে, জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি ভাল করে' আয়ত্ত করবার প্রয়াস পেয়ে বিফল-মনোরথ হলেও যে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, এ কথাগুলি কদাচিৎ আমাদের মনে স্থান পায়। অধীত-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন ত দূরের কথা, সারস্বত মন্দিরের বাইরে এসে পুস্তকস্থ যে বিদ্যার বলে বাবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের অধিকার পেয়েছি, তাই ভুলে যেতে শুরু করি এবং তাস পিটিয়ে বড়ের চাল দিয়ে 'হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়' নীতির অহুসরণ করে', সুদীর্ঘ অবসরটাকে জগদল পাথরের মত বুক চেপে বসতে না দিয়ে, লঘু স্বচ্ছ শারদীয় অত্রের মত নীলাকাশের গায় উড়ে যেতে পারলে আমরা পরম আরাম উপভোগ করি, একথা অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকের পক্ষেই খাটে।

অনেকে বলতে পারেন, পেটে খেলে পিঠে সয়, বুদ্ধিহীন: কিং ন করোতি পাপং; যতদিন দারুণ বুদ্ধি

জঠরকে পীড়া দিতে থাকে, ততদিন একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা পোষায় না। কিন্তু যদি বুঝতাম যে 'হা অর্থ যো অর্থ' করে' কেবল হা-হতাশ করতে থাকলে, কিম্বা 'খেলে বেড়িয়ে গল্পগুস্তাব করে' সময়টাকে কাটিয়ে দিলে, আমাদের ভাগ্যে সেই অমরবাহিত রৌপ্যচক্র-লাভ ঘটবে, তাহলে কোন কথাই ছিল না। বরঞ্চ এইটাই সত্য যে, যদি আমাদের দৈন্তের অবকাশে কঠোর শ্রমশীলতা দ্বারা আমরা অধীতবিদ্যার উৎকর্ষসাধনে তৎপর হই, তাহলে আমাদের আয়াস-ও-অশ্রুশীলন-লব্ধ বিশিষ্টতা বেশী দিন চাপা থাকবে না, এবং তার উপযুক্ত মজুরী না মিললেও আর্থিক হিসাবেও সেটা কোন দিন লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে। সেই শুভ মুহূর্তের জন্ত অলসভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকলে তার আগমন সুদূরপর্যন্ত হবে। তার জন্ত কঠোর সাধন দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে, দীর্ঘ অভিসার-সাজে সজ্জিত হতে হবে। সময়ের এরূপ সদ্যবহার থেকে নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যাবে, মনের স্নায়ুগুলি সতেজ ও দৃঢ় হবে; বাইবেলের ভাষায় বলতে গেলে, ভগবদ্-দত্ত যে talentটি, যে পুঁজিটি, নিয়ে আমরা সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, তাকে সুদে খাটিয়ে বাড়াতে পেরেছি বলে' একটা অনির্করণীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করব।

প্রতি মাস-কাবারে নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে দৈনিক উপার্জননের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারা যে কত বড় মুক্তি, সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সেই অর্থ-চিন্তা-রূপ বাহ্য দাসত্ব থেকে মুক্তি যদি আমাদের আলস্য বাড়ায়, মানসিক জড়তা বেশী করে' এনে দেয়, তা হলে সে মুক্তিটাই একটা ভীষণ বন্ধনে পরিণত হয়। যদি এই জড়তাই চাকুরি-জীবনের বিশেষত্ব হয়, তবে সে বন্ধনের শৃঙ্খল দ্বারা আপনাদের অধিকাংশের কর কলঙ্কিত হয় নি বলে' আক্ষেপ করবার কোন কারণ দেখতে পাই না। বস্তুত: দারিদ্র্য কথাটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়া বা না হওয়া কারণ প্রকৃতিগত, কারণ নয়। বাণীর শ্রেষ্ঠ সেবকগণ—যাদের নাম জগতে অমর হয়ে আছে—আর্থিক হিসাবে প্রায় কেউই বড়লোক ছিলেন না। কবি হেমচন্দ্রই সে কথা বলে' গিয়েছেন ;—

'হায় মা ভারতি, চিরদিন তোমার
কেন এ কুখ্যাতি হবে?
যে জন সেবিবে ও রাজ্যচরণ,
সেই সে দরিদ্র হবে।'

কিন্তু অর্থসম্পদবিহীন হয়েও ত তাঁরা কেউই বাগ্দেরী
সেবাস্রত ত্যাগ করেন নি। তার হেতু এই যে, মানুষ
কেবল কুটি খেয়েই বাঁচে না—অন্নময় কোষের স্থূল আব-
রণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আনন্দের সূক্ষ্ম কোষগুলি
নিহিত রয়েছে, তারাই আমাদের জীবনী-শক্তির পুষ্টি-
সাধন করে।

অতএব পেটে ভাল করে' খেতে না পেলেও এমন
একটা রাসায়নিক শক্তি অর্জন করা যায় যা মনটাকে
সর্বদা নবীন, উজ্জ্বল, আশাবিত, উৎসাহপূর্ণ করে'
রাখে; তাকে নীরস, মৃতপ্রায়, নিরুৎসাহ ও ভয়ানক
হতে দেয় না। এটা কি একটা পরম লাভ নয়? কঠোর-
নিষদের ভাষায়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যখন শ্রেয়
অপেক্ষা প্রেমকে বরণ করে' নিয়ে 'বিস্তময়ী শূক' অর্থাৎ
পথে মজ্জমান হয়ে পড়ি, তখন যদি এমন একটা অননুভূত
অপূর্ব রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয় "যং লক্ষ্য চা-
পরং লাভং মনুতে নাধিকং ততঃ। যন্মিনু স্থিতো ন
দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—সেটা কি এতই তুচ্ছ যে
তার জন্তু তাস পাশা গল্পগুজব ছেড়ে কিঞ্চিৎ সাধনা
করতে পারি না? নচিকেতা ত তার জন্তু সর্বস্ব পণ
করেছিলেন; এমাস'ন প্রভৃতি পাশ্চাত্য সূধীগণ সেই
উপাখ্যান থেকে মানসিক খাদ্য সংগ্রহ করে' পুষ্টিলাভ
করেছেন।

হয়ত কেউ বলে' বসবেন, এটা ত ধর্মের কথা, তত্ত্বের
কথা হচ্ছে; তবে কি আমাদের যৌবনেই যোগী
হতে হবে নাকি? আমার উত্তর এই, আমি আপনা-
দিগকে তত্ত্বকথা শুনাতে আসিনি, আমি স্বপ্নেও সে
যোগ্যতা দাবী করি না—কিন্তু আমাদের দেশে 'ধর্ম'
'সাধন', 'যোগ' এই কথাগুলি যেকোন সঙ্গীর্ণ অর্থে সাধা-
য়গতঃ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, আমি আপনাদিগকে সেই সঙ্গীর্ণ
পারিভাষিক অর্থ পরিহার করে' সেগুলিকে একটু ব্যাপক
ভাবে গ্রহণ করতে বলছি মাত্র। আমি এই বলতে চাই যে,
কেবল 'পরাবিদ্যা'-বিষয়ে নয়, 'অপরাবিদ্যা'-সম্পর্কেও

আপনাদিগকে 'যোগী' হতে হবে, 'সাধনা' করতে হবে,
যার যেটা 'স্বধর্ম'—অর্থাৎ যিনি যে-বিষয়ে নিপুণ তাঁকে
সেটায় পারদর্শিতা ও যোগ্যতা অর্জন করার জন্তু যত্নশীল
হতে হবে। একরূপ করতে পারলেই তবে পরিণত বয়সে
আপনাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে, 'স্বধর্ম' অর্থাৎ
নিজ নিজ ক্ষমতার আয়ত্তাধীন বিষয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়ে
দেশকে সমাজকে জগৎকে যার যেটুকু দেবার তিনি
ততটুকু দিতে পারবেন, এবং যতখানি সার্থকতা তাঁর
ভগবদ্-দত্ত প্রতিভার অধিগম্য, ততখানি সার্থকতা অর্জন
করে' নিজে কৃতকৃতার্থ হতে পারবেন। নতুবা ব্যর্থতার
নিষ্ফল অনুশোচনায় জীবন ত ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে
আত্মগোপন করে' থাকতেই তিনি পছন্দ করবেন।

লাটিন ভাষায় একটি কথা আছে tedium vitae এবং
ফরাসি ভাষায় আর-একটি কথা আছে joie de vivre।
প্রথম কথাটির অর্থ হচ্ছে জীবনে অপ্রীতি এবং দ্বিতীয়
বাক্যটির মানে হচ্ছে বেঁচে থাকবার স্কুর্তি। আমাদের
জীবনে অবসাদের ভাবটা বড়ই সুস্পষ্ট। সাংখ্যদর্শন-মতে
জীবন দুঃখময়—সংসার কুপিতফণিফণাচ্ছায়াতুল্য।
আমাদের কবি গাহিয়াছেন, 'সংসারে শান্তির আশা
মরীচিকায় যথা জল।' এই অতি প্রাচীন হিন্দুধর্ম
যুগযুগান্তরের দুঃখবাদের সাধনায় ও সহস্র বৎসরের পর-
পদলেহনের ফলে এমনই মৃতপ্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছে
যে, এর তুহিনশীতল শোণিতে জীবন্ত জাতির তপ্ত রক্ত-
ধারা প্রবাহিত করতে চেষ্টা করা আকাশকুসুমেরই মত
স্বপ্ন মাত্র বলে' মনে হয়। আমরা সর্বদা ত্রিবিধ তাপে
তাপিত—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক
বিভীষিকাগুলি নিত্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে নৃত্য
করছে, হাঁচি-টুকটুকির ভয়ে আমরা সদা মুহমান, বেঁচে
থাকবার আমাদের এতই সাধ যে পাঁজিপুঁথি না ঘেঁটে
আমরা এক পা নড়ি না। অথচ অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস
যে ওলাওঠা, মহামারী, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি
লোকক্ষয়ের যাবতীয় অহুষ্ঠানগুলি আমাদেরকে যেমন
পেয়ে বসেছে, জগতের আর কোন জাতিকে এমন
সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করতে পারে নি। আমাদের
বৈদিক সাহিত্যে সর্বদাই এই কথাটি দেখা যায়,—'শতায়ু'

বৈ পুরুষঃ', 'জিজীবিষেচ্ ছতং সমাঃ'—মানুষের পরমায়ু একশত বৎসর, কিন্তু অধুনা এ-কথাটি স্লেচ্ছ জাতির সম্বন্ধে ঘেঁরুপ সত্য, আমাদের পক্ষে ঠিক তার বিপরীত। শৈশব-মৃত্যু, অকালমৃত্যু, প্রভৃতি মূল্যবান অধিকারগুলিতে আমাদের একচেটিয়া স্বত্ব; অল্প কোন সভ্যজাতি এ-সব বিষয়ে আমাদের কাছে এগুতে পারে না। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন—'নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তম্ বাস্ব-মর্থোহতিবর্ততে'—যে বালোচিতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি বেশী পরিমাণে নক্ষত্রজিজ্ঞাসু হয়, অর্থ তাকে অতিক্রম করে' যায়, অর্থাৎ কিনা, যাঁরা খুব গ্রহনক্ষত্র মেনে চলেন, তাঁদের ভাগ্যে ধনলাভ ঘটে না। কিন্তু আমরা এখন আর সে-সব কথা মানিনে। আমাদের বাহিরে যে বিরাট জড়জগৎ বিস্তৃত রয়েছে, সর্বদা আমরা তাকে ভয় করে' অতি সম্ভরণে নিজের দিক ত ক্ষুদ্র প্রাণটি বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করি—

'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায় !'

সংসারের অনিত্যতার চিন্তায় মনে কালচে ধরে' গেছে, সর্বদা মোহমুগ্ধর বৈরাগ্যশতক আওড়াচ্ছি এবং শাস্তি স্বস্ত্যয়ন লক্ষ্মীপূজা শনিপূজা কিছুই বাদ দিচ্ছি না। কিন্তু লক্ষ্মী পলায়ন করেছেন, শনি কায়ম হয়ে বসেছে, আর আমরা 'ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি' হয়ে আছি।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের লোকগুলি যেন এক-একটা উজ্জ্বলপিণ্ড—উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, তেজ, নির্ভীকতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। Joie de vivre—জীবনে প্রীতি, প্রাণের স্পন্দন, বেঁচে থাকার ক্ষুধা, তাদের ভাবে, কথায়, কার্যে, শতধারায় ঠিকরে পড়ছে। বৃদ্ধ বয়সেও খেলা করছে,—আমাদের মত অলস জীবনের জড়তা দূর করবার জন্তু ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে নয়, প্রাণের অফুরন্ত ক্ষুরণের নৈতিক বাহ্য প্রকাশের প্রেরণায়—আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন গুরুতর মানসিক শক্তির লীলাখেলা দেখাচ্ছে, যাতে করে' জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। 'ক্লব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' 'নাআনং অবসাদয়েৎ'—গীতাকার এই উদীপনাপূর্ণ বাক্যগুলি যেন তাদের

জন্তুই লিখে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের বেদান্তধর্মকে এখন practical (কেজো) করতে হবে অর্থাৎ যে 'বিগতভীঃ' মন্ত্রের উদাত্ত বাণী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ দান, সেটাকে পুঁথির পাতা থেকে খসিয়ে এনে জীবন-যুদ্ধের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তার সঙ্গে পাশ্চাত্য humanitarianism অর্থাৎ লোকহিতব্রত যোগ করে' 'সর্বত্র সমদর্শনঃ' গীতার এই মহান আদর্শকে অধ্যাত্মজগৎ থেকে নামিয়ে এনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজে লাগিয়ে এক নব বেদান্তধর্ম স্থাপন করতে হবে—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' প্রভৃতি মন্ত্রকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, যা বেদান্তমন্ত্রের শারীরিকভাষ্যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও করতে সাহস পাননি—কারণ 'ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ'—তিনিও এই নীতির সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি মহাত্মা বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' আমার যুবক বন্ধুদিগকে আহ্বান করে' বিনীতভাবে বলছি, তাঁরা এই সামাজিক ভেদবুদ্ধি দূরীকরণ রূপ বৈদান্তিক লোকহিতব্রত গ্রহণ করুন, তাঁদের এই লক্ষ্য হোক, এতে জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হবে না, কিন্তু এই ব্রত উদ্‌ঘাপনের জন্তু যে শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনা চাই, তাতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যৌবনে দাও রাজ-টীকা'—বাস্তবিক সকল মহৎ আদর্শের বীজ যৌবনেই উদ্ভূত হয়ে থাকে, যার লক্ষ্য যৌবনে বিশিষ্টতা লাভ করেনি সে পরিণত বয়সে কদাচিৎ তা ফলিয়ে তুলতে সক্ষম হয়—অতএব এই ব্রত গ্রহণের পক্ষে যৌবনই প্রকৃষ্ট সময়। মিসেস্ ব্রাউনিং বলেছেন—

'An ignorance of means may minister
To greatness, but an ignorance of aims
Makes it impossible to be great at all.'

“মহত্ত্বলাভের উপায় জানা না থাকলেও মহৎ হওয়া যেতে পারে, কিন্তু উচ্চ লক্ষ্যের অজ্ঞতা থাকলে মহৎ হওয়া অসম্ভব।”

লক্ষ্য স্থির থাকলে উপায়ের জন্তু ভাবতে হবে না, উপায় আপনি আপনার পথ খুঁজে নেবে।

এই মহৎ ব্রতে বিফলতার আশঙ্কায় কেউ যেন ভীত

না হন। আমাদের গীতাকারই ত বলেছেন, কর্মে আমাদের অধিকার আছে, ফলে নয়। বহু পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন, বিফলতা লক্ষ্যের বিষয় নয়, আদর্শের ক্ষুদ্রতাই লক্ষ্যকর। বিফলতার উপরই ত সাফল্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যাদৃশী ভাবনা, সিদ্ধি ততটা না হলেও কতকটা তদনুরূপ হওয়া অবশ্যস্বাভাবী। আর্থিক উন্নতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে, এবং সেটা কিছু বিশেষ বড় কথা নয়। দেহরক্ষা করলেই অনেক তথাকথিত বড়-মানুষের স্মৃতি সমাধিপ্রাপ্ত হয়। ‘সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।’ একথা অতি সত্য যে, মহৎ যাহার চেষ্টা ঈশ্বর তাহার সহায়। রবীন্দ্রনাথের সুন্দর ভাষায়,

‘তোমার পতাকা যারে দাও তারে
বহিবারে দাও শক্তি !
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভক্তি !’

আমাদের সর্বাপেক্ষা গভীর মোহ যে অতীতপ্রীতি, সেটা, যে জাতীয় জড়তা বা *tedium vitae*র বিরুদ্ধে আমি আপনাদিগকে যুদ্ধঘোষণা করতে বলছি, তাকে মজ্জাগত করে’ রেখেছে। অতীতপ্রীতির একটা ভাল দিক আছে, সেটাকে আমি নিন্দা করছি না। যে জাতির পূর্বপুরুষের উপর শ্রদ্ধা না থাকে, তার নিজের উপরও আস্থা কমে’ যায়। আত্মসম্মানজ্ঞান উদ্বুদ্ধ না হলে তাকে দিয়ে কোন মহৎ কাজের আশা করা যায় না। কিন্তু কোন দিন আমরা পোলাও কালিয়া খেয়েছিলাম বলে’ আজও প্রতি উদগারে তার মহিমাকীর্তন করতে গেলে জগৎ-সমক্ষে আমাদের হাশ্বাস্পদ হতে হয়। ইংরেজ জাতি ত একথা বলতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না যে, দুহাজার বৎসর পূর্বে ভারত যখন সমগ্র জগতে সভ্যতার আলো বিকিরণ করছিল, তখন তারা উদ্ভিপর্যায় নগ্নগাত্র শাখা-যুগের স্তায় গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত। বর্তমানে যে তাদের গৌরব করবার অনেক সামগ্রী আছে, তাই তাদের দৃষ্টি একান্ত অতীতনিবদ্ধ নয়। আমরা ভুলে যাই, কবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে যে কথাটি বলে’ গিয়েছেন—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
নচাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং ।
সন্তঃ পরীক্ষান্তরন্তুজন্তে
মুঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥

“যা কিছু পুরাতন তাই ভাল নয়, কাব্য নূতন হলেই কিছু মন্দ হয় না, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষা করে’ ছ’এর একটি গ্রহণ করেন; মুঢ় যে, সে-ই কেবল পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হয় অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খায়।” বৃহস্পতি তাঁর ধর্মসূত্রে বলে’ গিয়েছেন, কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করে’ কর্তব্যনির্গম করা ঠিক নয়, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে। যে যুগে এসকল কথা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, সেটা ছিল স্বাধীন চিন্তার যুগ। তখন আমাদের বুদ্ধি রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক দাসত্বের চাপে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েনি। এখন আমাদের স্বাধীন চিন্তা লোপ পেতে বসেছে।

“অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন !

* * * * *
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা’ যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই !
আগে চল আগে চল ভাই !”

রাজনৈতিক আন্দোলন জিনিষটা এখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, এবং বিলেত থেকে আমদানি সকল জিনিষের মধ্যে ঐ একটি বস্তুর আবশ্যকতা আমরা ভাল করে’ই উপলব্ধি করতে শিখেছি। স্তুরাং রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকেই ২১টা উদাহরণ দেওয়া যাক। সিড্‌নি স্মিথ্ আক্ষেপ করে’ বলেছিলেন, সকল বিঘাই অনুশীলন-সাপেক্ষ বলে’ আমরা মনে করি, কেবল এক রাজনীতি ছাড়া; সেখানে সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ ও অশিক্ষিতপটু। যখন তিনি এ-কথা বলেছিলেন, ইংলণ্ডের সে যুগ অনেক কাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর কথাটা আমাদের পক্ষে এখনও অনেকটা খাটে। সংসারে যেমন পর-নিন্দার মত মুখরোচক আর কিছু নেই, সেইরূপ স্বজাতির দোষের দিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ না করে’ অজ্ঞজাতির দোষোদ্ঘাটনের চেষ্টাটাও অতি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সেই পর যখন বিদেশীর আকারে আমাদের মাথার উপর চেপে

বসে' রয়েছে, এবং ক্ষীরসরননীটা তাদেরই ভোগে লাগছে, আমরা একটু জলো দুধ খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছি, অনেকের ভাগ্যে তাও জুটছে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাদের গালাগালি দিয়ে যা ফল, তার চেয়ে অনেক বেশী ফল লাভ হবে নিজের দোষগুলি বুঝে' সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করলে। নিজেরা শক্তিশালী হয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে ঘাড়ের কোন ভূত ত নামবে না। একটাকে নামাতে পারলেও যে আর-একটা উড়ে এসে জুড়ে' বসবে। কিন্তু সেদিকে আমাদের কয়জনের লক্ষ্য আছে? মহাত্মা গোখলে বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মও অনেক শিক্ষা, অনেক অমুশীলনের দরকার;—সরকারী নানাবিধ বিবরণী ও সংখ্যাবিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে' ভারতের ইতিহাস, পৃথিবীর অগাণ্ড জাতির ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক মূল সূত্রগুলি, ভারতের ও অগাণ্ড দেশের রাষ্ট্রগঠনপ্রণালীর তুলনামূলক সমালোচনা, ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে লক্ষ্যপ্রবেশ হতে পারলে, এবং সর্ববিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যাপারে যোগদান করে' সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করে' তুলতে পারলে, তবেই আদর্শ রাজনীতিবিদ হওয়া যায়, এবং রাজদরবারে বসে' অকাটা যুক্তির দ্বারা কর্তৃপক্ষের ভ্রমপ্রমাদগুলি খণ্ডন করা যায়। তিনি নিজেকে এই আদর্শে গড়ে' তুলেছিলেন বলে'ই জন মলি ও লর্ড কার্জন প্রভৃতি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদগণ তাঁকে সম্মান করতেন, এবং লর্ড কার্জনের গ্রাম বাগ্মীও বলেছিলেন, it is a pleasure to cross swords with him—তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার আসরে বসে' বাদানুবাদ করে' তৃপ্তি লাভ হয়। দেশে এরূপ একদল কর্মীর নিতান্তই আবশ্যিক, যারা রাজনীতিচর্চায় জীবন অতি-বাহিত করবেন, এবং তজ্জন্ম দীর্ঘ সাধনার দ্বারা নিজেকে তৈরি করে' নেবেন, তাহলেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারব। এটা তিনি বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলে'ই Servants of India Society 'ভারতসেবক-সঙ্ঘ' নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের জন্ম যে-সব নিয়মাবলী প্রস্তুত করে' গিয়েছেন, তা ঠিক যেন আমাদের কোন শঙ্করমঠ বা গুরুকুলের

আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পড়ে' দেখলেই জানতে পারবেন। লর্ড সিংহ বলেছেন, এরূপ একটি সেবকসঙ্ঘ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান অভাব। ভারতের অগাণ্ড প্রদেশে এরূপ আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, এবং সেখানে যে-সব লোক তৈরি হয়ে উঠছে, তারা তত্তৎ প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ করছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই অবসরবিনোদন-কল্পে আল্‌বোলায় ধূম উদ্দীগরণ করতে করতে কিংবা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হল ভেবে, কেবল কঠিনালাীর জ্বোরে রাষ্ট্রিক ব্যাপারে দলপতির আসন গ্রহণ করতে অগ্রসর হই, এবং ইংরেজ জাতির নিন্দা কীর্তনে ঘনঘন করতালির শব্দে যখন আসর মুখরিত করে' তুলি, তখন সত্য সত্যই জীবন ধন্য মনে করি।

আয়ব্যয় (finance), মুদ্রাবিজ্ঞান (currency), বিনিময় (exchange) প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক'জন বিশেষজ্ঞের আসন দাবী করতে পারেন, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। ভারতের রাজস্ব-সচিব স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই বণিক-সভার অধিবেশনে এসম্বন্ধে কি বলেছেন শুনুন :—

"I believe that on sound financial principles and administration depends more almost than on anything else the happy emergence of India as a self-governing dominion of the British Commonwealth of nations. For this reason the problems we are discussing deserve the close attention and study of all who are working for India's political future. But they must be studied scientifically and singlemindedly as subjects of a highly technical and complex nature, not simply as a happy hunting ground in which to find weapons to attack the Government."

এর ভাবার্থ এই যে, ভারতে স্বরাজ্য স্থাপন, খাঁটি রাজস্বনীতি নির্বাচন ও তার প্রয়োগের উপর যতটা নির্ভর করে, এমন আর কিছুই উপর নয়। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ভাল করবার জন্ম যারা চেষ্টা করছেন, আয়-ব্যয় ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের গভীর অভিনিবেশ

আবশ্যক। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত জটিল বিষয় জেনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একাগ্রতার সঙ্গে সে-সকল বিষয় অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হবে, কেবল গবমেণ্টকে আক্রমণ করবার অস্ত্র খুঁজবার উদ্দেশ্যে ঐ-সকল ক্ষেত্রে নেচে কুঁড়ে বেড়ালে চলবে না। অনেকে বলবেন, গবমেণ্টের সহায়তার অভাবেই ত আমাদের শিক্ষালাভ ঘটে না। একথা সত্য হলেও, যতদিন আমরা এ-সকল বিষয়ে লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠা হতে না পারব, ততদিন রাজনীতিক্ষেত্রে কিছুতেই আমরা যোগ্যতার দাবী করতে পারব না। দাদাভাই নোরোজী, ওয়াচা প্রভৃতি বোম্বাই অঞ্চলের নেতাগণ ইংরেজের সাহায্য ব্যতিরেকেই ত উক্ত বিষয়গুলিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। গবমেণ্টের রাজস্বনীতি সম্বন্ধে যোগ্য সমালোচনা কয়খানি দেশীয় কাগজে দেখতে পাওয়া যায়? এ-সকল বিষয়ে ইংরেজ-পরিচালিত কাগজ-গুলি থেকেই অনেক সময় আমাদের লোকমত সংগ্রহ করতে হয়, কারণ আমাদের মধ্যে এসব তত্ত্বের 'বক্তা শ্রোতা চ ছিন্নভিন্ন'। মোট কথা আমাদেরকে second best দ্বিতীয় হলে চলবে না, the very best সকলের সেরা হতে হবে—এই লক্ষ্য অনুসরণ করে' রাজনীতি ও অগ্রগতি ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের গড়ে' তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান জগতে অন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দ্বিতীয়ের স্থান নেই।

বস্তুতঃ আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের এই যে যুগ-ব্যাপী দাসত্ব, এই জাতীয় কলঙ্ক কেবল আত্মপরাধ-বৃক্ষের ফল মাত্র। তা যদি না হত, তবে ত ভগবান আমাদেরই আশ্রয় সাদা চামুড়ার ভয়ে ভীত, এটা স্বীকার করতে হত। আমরা স্বরাজ্য পেলেই যোগ্য হয়ে উঠব, এটা যদি সত্য হয়, তবে ভগবানের ত এটা মস্ত অবিচার যে তিনি আমাদেরকে এতকাল স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত রেখেছেন!

আমাদের কোন দোষ নেই, অথচ আমরা পরাধীন অধঃপতিত হয়েছি, এমনটি হলে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকে না। ইতিহাসপাঠক মাত্রই জানেন যে পরাধীনতা আমাদের আত্মকৃত ব্যাধি, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবে মরেছি। যে একতা, যৈজী, অভেদবুদ্ধি, বীৰ্য্য, স্বার্থত্যাগ,

মহৎ আদর্শ, স্বেচ্ছাচার-ও-পরপীড়ন-বিমুখতা, দেশাত্ম-বোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি ব্যতীত কোন জাতি কখনও জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করতে পারেনি—দীর্ঘ কাল ধরে' আমাদের মধ্যে সেগুলির অভাব বেড়ে যাচ্ছিল বলে'ই ত আমাদের এত অধঃপতন। এখনও সেই ভেদ-বুদ্ধি কতটা দূর হয়েছে? বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট বাহাদুর মাক্রাজে আদি-দ্রাবিড় মহাজন-সভায় যে কথাগুলি বলেছেন, তা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য :—

"None can deny that these social restrictions and limitations are a formidable obstacle to unity and progress in India. They have also unfortunately repercussions beyond India itself.....signs are not wanting that these class disabilities lessen the prestige of India as a country in the eyes of foreign nations also."

অর্থাৎ—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এদেশে যে-সকল সামাজিক বিধিনিষেধ ও সঙ্কীর্ণতা প্রচলিত আছে, সেগুলি জাতীয় একতা ও উন্নতির ভীষণ অন্তরায়; দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের বাহিরেও তারা প্রতিঘাত উৎপাদন করে। সামাজিক কতকগুলি অধিকার থেকে শ্রেণীবিশেষকে বঞ্চিত করার দরুন ভারত যে বৈদেশিক জাতিসমূহের নিকট সম্মান হারাচ্ছেন তার অনেক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

ভগবানের রাজ্যে কিছুকালের জন্তু অসতের জয় সতের ক্ষয় না হয় এমন নয়। বিশ্বনিয়মের নিগূঢ় রহস্য বিশ্বশ্রুতি ভিন্ন আর কারও সম্যকরূপে ভেদ করতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে মোটের উপর 'যতোধর্ম্মন্ততোজয়ঃ' এই বাক্যটির উপর বিশ্বাস না থাকলে ধর্ম্মই বা কি, কর্ম্মই বা কি, 'যাবজ্জীবং সুখং জীবং ঋণং কৃত্বা মৃতং পিবং' এই লোকায়ত-নীতি অনুসরণ করে' জীবনটাকে চালিয়ে দেওয়াই ত ঠিক। যাহোক, আমার কথা হচ্ছে এই যে, যেমন আত্মিক ক্ষেত্রে তেমনই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, ('স্বরাট' শব্দটি যে বৈদান্তিক পরিভাষা থেকে গৃহীত এ-কথাটি সকলে জানেন কিনা জানি না), স্বরাজ্য-সিদ্ধির জন্তু কঠোর সাধনার আবশ্যক। সেই সাধনাই আমাদের মধ্যে একদল যুবকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সে সাধনা কি?

—না আমাদের গোড়ার গলদগুলি দূর করবার জন্ত বন্ধপরিষ্কার হয়ে নিজেকে ও দেশকে প্রস্তুত করে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Nationalism স্বাধীনতা গ্রন্থে যে বলেছেন, আমরা সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপর আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এটা কি সত্য নয়? বড়ই অপ্রিয় বলে' এসব কথা ভিতর আমরা সহজে প্রবেশ করতে চাই না, কিন্তু উটপক্ষীর গায় চোখ বুজে থাকলেই ত আমাদের জাতীয় দুর্বলতার কারণগুলি দূর হবে না। মহাত্মা গান্ধি এটা ভালরূপই জানতেন বলে' অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে তাঁর জাতিসংগঠন-কার্যের মধ্যে সর্বপ্রধান আসন দিয়েছিলেন। কিন্তু অসহযোগপন্থী মফস্বলের একটি সুপরিচিত দৈনিক পত্রে আমি দেখেছি, তার সম্পাদক লিখেছেন, যে, গান্ধি মহারাজ স্বয়ং বেণেবংশোদ্ভূত, সুতরাং তাঁর পক্ষে এ-কথা বলা খুবই স্বাভাবিক হলেও অভিজাতবংশজাত হিন্দু-সমাজের নেতাদেরকে তিনি যা বলবেন তাই তাদের নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই! সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন জন্ত সর্বত্র যে আন্দোলনের বণ্ডা বহে গিয়েছে, তাতে শ্রেণী, সমাজ, জাতি, class, community and race প্রভৃতি নিয়ে ভেদমূলক যতগুলি সংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেই সংস্কারগুলির দোহাই দিয়ে, উপস্থিত কার্যসিদ্ধির জন্ত, কত তথাকথিত 'জাতীয়'-পতাকাধারী স্বেচ্ছাসেবক ও তাদের নেতৃবৃন্দ কত কথাই না বলেছেন! এতে জাতীয় ঐক্যসাধনের মূলে যে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে, ঐ বস্তুটি যে আরও সুদূরপর্যন্ত হয়ে পড়ছে, বাস্তবিক এরূপ দোহাই দেওয়া যে ঘোরতর জাতি-দ্রোহিতা, ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে এই স্থূল কথাটা কি অনেকেই বিশ্বাস করেনি? প্রতিপক্ষের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ, ভোটদাতাগণের মনের উপর অশ্রায় প্রভাব বিস্তারের সর্ববিধ প্রয়াস, অহিংসাবাদী অসহযোগপন্থী ও সহযোগপন্থী উভয়দলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান দেখা গিয়েছে। আর-একটি অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে পাচ্ছি—'হিন্দু স্বরাজ্য সদস্য', 'মুসলমান স্বরাজ্য সদস্য'। এটা যেন ঠিক কাঁঠালের আমস্বের মত। স্বরাজ্যে ত

কোন জাতিভেদ চলতে পারে না—সকলেই ভারতবাসী, ভারতমায়ের সন্তান। যে পাশ্চাত্য জাতির অহুকরণে আমাদের রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠছে, তাদের মধ্যে স্বদেশের অধিবাসী মাত্রই স্বজাতি,—হোক না কেন সে প্রটেস্ট্যান্ট, রোমান ক্যাথলিক বা ইহুদি। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রথমতঃ দেশ, তার পর ধর্ম। যতদিন আমাদের দেশোত্তরান এতটা প্রবল না হয়েছে যে আমাদের রাষ্ট্রচৈতন্য ও জাতীয় ঐক্যবোধ ব্যক্তিগত ধর্মের গণ্ডী ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে, ততদিন আবার স্বরাজ কোথায়? এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, যদি ফরোয়ার্ড পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নির্দিষ্ট কার্য-নীতিই আমাদের অভীক্ষিত হয়—“no method is too mean if it advances the nation's plans to reach its goal”—যে-কোন উপায় জাতীয় উদ্দেশ্য অহুকরণে আমাদের সাহায্য করে, যতই নীচ হোক না কেন, আমাদেরকে তা অবলম্বন করতে হবে—তা হলে ইংরেজের কুটিল নীতির দোষ ধরি কি বলে? আমাদের যে আধ্যাত্মিক spiritual সভ্যতার জয়গানে দিগন্ত নিনাদিত হয়ে ওঠে, তার পরিণাম কি এই? বস্তুতঃ যদি আমাদের মূললক্ষ্যগুলি ঠিক থাকত, তাহলে এই মোটা কথাটা এরূপভাবে আমরা ভুলে যেতে পারতাম না।

আমি জানি এ-সকল কথা আমাদের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর, সুতরাং যারা লোকপ্রিয় জননায়ক হতে চান, তাঁরা এগুলি এড়িয়ে চলেন। বাঙালী sentimental ভাববিলাসী জাতি; কোন একটা উত্তেজনার প্রবল আবেগ যখন তার বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে ওঠে তখন যে-কেউ তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, ধূর্জটির অলকনিঃসৃত জাহ্নবীর প্লাবনে ঐরাবতের গায় তাকে একেবারে ভেসে যেতে হয়। তথাপি দেশে এমন একদল লোক চাই, যারা ভগবানের শ্রেষ্ঠদান যে বিচারবুদ্ধি, লোকপ্রিয় হওয়ার জন্ত তাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়, যারা মানসিক দাসত্বকে সর্বাপেক্ষা হীন দাসত্ব বলে বিবেচনা করে। জেম্‌স্‌ রাসেল্‌ লাউয়েলের বিখ্যাত কবিতাটি আপনারা সকলেই পড়েছেন:—

"They are slaves who will not choose
Hatred, scoffing and abuse,
Rather than in silence shrink
From the truth they needs must think,
They are slaves who dare not be
In the right with two or three."

অর্থ—

দাসত্বের অতি হেয় এই ত লক্ষণ,
নিন্দা ঘৃণা অপঘণ না করি' বরণ
যে সত্য মানসে মম হয় প্রতিভাত
প্রকাণ্ডে ঘোষিতে তারে হই সঙ্কুচিত ;
তুই বা তিনের সঙ্গে সত্যপথে যেতে
দাসতুল্য সেই, যার ভয় আগে চিতে ।

এতক্ষণ রাজনীতির কথা বলা গেল । আমি আর্দ্রকের ব্যবসায়ী, অর্নবপোতের সংবাদে আমার আবশ্যিক কি, অনেকেই মনে মনে অবশ্য এ-কথা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন । স্মতরাং এবিষয়ে আর বাগ-বিস্তার না করে' এই বলে'ই ক্ষান্ত হওয়া যাক যে, অনেক সময় যারা খেলে তাদের চেয়ে দর্শকবৃন্দ ভাল করে' খেলাটা দেখতে পায় । যারা ক্রীড়ক, তারা স্ব স্ব ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, মোটের উপর খেলাটা কি রকম চলছে, সেটা দেখবার তাদের অবসর থাকে না । এইজন্ম রাজনীতি-ক্ষেত্রে একদল চিন্তাশীল দর্শকেরও আবশ্যিক আছে, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার নিভৃত গৃহ-কোণে আরাম-কেদারায় বসে' আমি পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে রাজনীতিচর্চাটা করে' আসছি । তবে এটা সত্য যে সাহিত্যসেবাই আমার প্রকৃত প্রিয়বস্তু, তাতে আমি যে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করি, আর কিছুতেই তেমন নয় । স্মতরাং সেইদিক দিয়ে আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে' আজকার মত আমার বক্তব্য শেষ করব ।

বলা আবশ্যিক, আমি কোন সঙ্কীর্ণ অর্থে 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করি নি । জন্ মলি' এক স্থলে সাহিত্যের এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন :—

"The master organon for giving men the precious qualities of breadth of interest and balance of judgment ; multiplicity of sympathies and steadiness of sight ; ...literature being concerned...to diffuse the light by which common men are able to see the great

host of ideas and facts that do not shine in the brightness of their own atmosphere."

এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে পদ্ধতি অনুসরণ করে' আমাদের মন প্রসার লাভ করে ও বিচার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হয় ; কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলিতে জিজ্ঞাসিত না থেকে আমরা নানা বিষয়ের সহিত সহানুভূতি দ্বারা যোগ স্থাপনে আগ্রহবান হই এবং আমাদের স্থির দৃষ্টি লাভ হয় ; আমাদের মানসক্ষেত্রে যে-সকল ভাব ও তথ্য স্বয়ম্ভূত হয় না,—সে-সকল বিষয়ে যে বৃত্তির সাহায্যে আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, সেই পদ্ধতি ও সেই বৃত্তি যে উপাদান অবলম্বনে বিকাশলাভ করে, তাকেই সাহিত্য বলা চলে । স্মতরাং সাহিত্যের এই সংজ্ঞার মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান সকলই অন্তর্ভুক্ত । এই যে সম্যগ্দর্শন যেটা সংসাহিত্যাত্মশীলনের চরম ফল ও বিশেষত্ব, এটা কি পরম সাধনার বস্তু নয় ? এই আদর্শ কি আমাদের অন্ত-নিহিত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করার পক্ষে প্রচুর নয় ? সত্য বটে, ইহা সহজলভ্য নয়, স্বতঃস্ফূর্ত হয় না । কিন্তু কোন সাধনার জন্মই ত রাজকীয় রাস্তা তৈরি নেই । 'সহজিয়া' মত ও 'সহজিয়া' সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাধনকে কি গভীর পক্ষে নিমজ্জিত করেছিল, সেটা ত ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞের নিকট অপরিচিত নেই । বিবেকানন্দ বজ্রগম্ভীরনির্ঘোষে পুনঃ পুনঃ আমাদের সাবধান করে' দিয়েছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না । ফাঁকি ধরা পড়বেই, মেকি কিছুদিন চললেও বেশী দিন চলবে না । অতএব যারা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অনুভূতি-গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎকাব লাভ করতে চান, তাঁদের গোড়া থেকেই লক্ষ্য স্থির করে' চলতে হবে । সর্ববিধ আমোদ প্রমোদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত রেখে, চক্ষু কোটরগত করে' গ্রন্থকীট হয়ে অকালবার্দ্ধক্যকে বরণ করে' নিতে হবে, আমি একথা বলছি, এটা যেন কেউ মনে না করেন । জীবনটাকে সরস রাখতেই হবে, রোমান কবি টেরেন্সের ভাষায় বলব, মানুষ আমি, অতএব মানবের সর্ববিধ প্রচেষ্টা ও সুখদুঃখের সঙ্গে আমার যোগ রক্ষা করে' চলতে হবে । কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই কর্মজীবন ছাড়া আর-একটা জীবন আছে, যা, তার প্রাণটিকে

সঞ্জীবিত রাখে, সেটাকে তার ভাবরাজ্য বা ভাবময় জীবন বলা চলে। আমাদের সাধারণ কর্মজীবন আমাদের জীবিকাসংস্থানের উপাদান সংগ্রহ করে' দেয়, আমরা সতত যে 'স্বত-সবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রের-চিস্তা' জর্জরিত থাকি, তা যোগানই ওর প্রধান কাজ। কিন্তু কর্ম যখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বেষ্টনীকে অতিক্রম করে' উন্নততর ক্ষেত্রে বিচরণ করতে চায়, তখন আমাদের ভাবময় জীবনই তার এবং মনের খোরাক যুগিয়ে থাকে। যে-সকল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ আমাদের মগ্নচৈতন্যে স্তম্ভ অবস্থায় লীন হয়ে থাকে, আমি যে ব্যাপক অর্থে 'সাহিত্য' শব্দ ব্যবহার করেছি, তার আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারাই সেগুলি জাগ্রত হ'য়ে আমাদের ভাব ও কর্মের উপর একটা উন্নততর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কতকগুলি মহৎ আদর্শের সঙ্গে পরিচয় ও তার অনুশীলন ব্যতিরেকে সমাগ-দৃষ্টি লাভ হয় না। যে বস্তু ভিতর দিয়ে ঐ মহৎ আদর্শগুলি আমাদের মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়, তাকেই আমি সাহিত্যের উপাদান বলি। ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীগণ এরূপ সাহিত্য-সেবালক মানসিক অবস্থাকে culture (কালচার) বলে' বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' এই কালচারেরই প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন। মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধন এর উদ্দেশ্য। গ্রীকজাতির এই আদর্শ ছিল, এবং আধুনিক পাশ্চাত্যজাতিগণ মানসিক উত্তরাধিকারস্বত্রে তার কতকটা লাভ করেছেন। আমাদের শিক্ষা ও সাধনা অনেকটা একদেশদর্শী, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তি ও পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত। যে-সকল জাগতিক ব্যাপার নিয়ে আমাদের প্রতিমূর্ত্তে কারবার করতে হয়, সে-সকল প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন। স্কুল-কলেজে এসকল বিষয়ে আমরা ঘেটুকু পড়ি, তা কেবল অর্থোপার্জনের খাতিরে। আমাদের মনের উপর সেগুলি কোন স্থায়ী দাগ রেখে যায় না। সুতরাং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও সমন্বয়ের সাধনা আমাদের পক্ষে অত্যাৱণ্যক। যে মাত্রাজ্ঞানের অভাব আমাদের কর্ম ও চিন্তাকে অনেকাংশে পঙ্গু করে' রেখেছে, 'কালচার'

ব্যতীত তার দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সকলকেই যে একই নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে হবে, সকলেই যে সাহিত্যচর্চা করবে, তা নয়। তবে জনসাধারণের বুদ্ধি-বৃত্তিকে কিয়ৎপরিমাণে মার্জিত করে' তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞান প্রচার করতে হলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই আত্মোৎকর্ষসাধন-চেষ্টার ব্যাপকতা লাভ করা বিশেষ দরকার। নতুবা আমরা কেতাবে পড়ব এক, কাজে করব অন্তরূপ—আমাদের বিচারবুদ্ধি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে না এবং দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বিপুল জনসংখ্যাকে আমরা ঠিক পথে চালাতে পারব না। কেননা সকল বিষয়েই এ-কথা বলা চলে না—'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ'। অনেক সময় আমার ধর্ম কি, অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে আমার কর্তব্য কি, সেটা জানিনে বলে'ই আমার প্রবৃত্তিকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে' যা অকরণীয় তাকেই কর্তব্য বলে' মেনে নি। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটে' থাকে, এবং এ'কেই আমি জাতীয় জীবনে শক্তির অঙ্গস্র অপচয়—national inefficiency রূপ একটা শোচনীয় ট্রাজেডি বলে' বর্ণনা করেছি।

যে সাবিত্রীমন্ত্র আজও আমাদের ঘরে ঘরে উদীরিত হয়ে থাকে, বিশ্বমানবের প্রার্থনা আর কোথাও এত উচ্চ গ্রামে গ্রথিত হয়েছে বলে' আমার জানা নেই। প্রার্থনা বলতে সবলের নিকট দুর্বলের কাতর ক্রন্দনই আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি। প্রগাঢ় ভক্তি, একনিষ্ঠ বিশ্বাস, ঐকান্তিক নির্ভর এর উপাদান, ঈশ্বরে পরামুরক্তি এর প্রাণ। কিন্তু কোথাও কি এরূপ ধ্যান শুনা গিয়েছে, যে সবিতৃদেব আমাদের ধীশক্তি প্রচোদিত করেন, তাঁর বরণা ভর্গ অর্থাৎ তেজকে আমরা ধ্যান করি? ধীশক্তির বিকাশ, তার সবিতাসদৃশ অমিততেজকে ধ্যানে উপলব্ধি করা—এই না আমাদের প্রার্থনার বিষয়? যে জাতি জ্ঞানের মহিমা ও গরিষ্ঠতা এরূপ ভাবে বুঝেছে, তার অধঃপতিত সন্তান আমরা সেই জ্ঞানালোক থেকে এতই সরে' পড়েছি যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা ইউরোপের Dark Ages বা তমসচ্ছন্ন যুগের সঙ্গে তুলিত হয়, আর পক্ষান্তরে পুশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনাবী গেটে প্রভৃতি 'Licht, mehr licht!' 'Light—more light!'

‘আলোক, আরো আলোক’ বলে’ যেন আমাদেরই ভারতের সনাতন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে করতে জ্ঞানপথে অমৃত-লোকে প্রয়াণ করেন! এটা কি আমাদের কম পরিতাপের কথা? বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জাতীয় অবনতির চরমসীমায় উপনীত হয়েছি। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত ব্রজেননাথ শীল, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার হাভেল ও ডাক্তার কুমারস্বামী প্রভৃতির রচিত গ্রন্থগুলি পড়লেই দেখতে পাবেন, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প ললিতকলা সকল বিষয়েই আমরা কত দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ থেমে গিয়েছি, জ্ঞানের বর্ধিকা নিবে গিয়েছে। আবার সেই বর্ধিকাহস্তে আমাদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হবে; কেন না ‘ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যাতে’। যদি পৃথিবীর অগ্ন্যাগ্ন সভ্যজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে আমরা সাম্যের দাবী করতে চাই, তবে কেবল রাজনীতি নয়, অগ্ন্যাগ্ন যে-সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতা লাভ রাজনীতি অপেক্ষা অনেক কঠিন, সে-সকল উন্নততর বিষয়ের চর্চায় আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে—এ পথে আমাদের জীবনে হয়ত আমরা সামান্যই সিদ্ধিলাভ করতে পারব—হয়ত আমাদের জীবিতকালে মানসিক স্বরাজ্য-সিদ্ধি ঘটে’ উঠবে না—কিন্তু তা’ বলে’ পশ্চাৎপদ হব না। কবি সত্যই বলেছেন,

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।

আমাদেরই প্রদর্শিত পথে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর-গণ অনেকটা অগ্রসর হতে পারবে, এবং তাদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমাদের তপস্শা সিদ্ধিলাভ করবে। তখন আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক সর্কবিধ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে—বহুধা বিভক্ত হিন্দুজাতি পুনরায় একত্র সংবদ্ধ হয়ে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে স্বরাজ্যের যে স্বায়ী সৌধ নিৰ্মাণ করবে, কোন বৈদেশিক শক্তি সেটা ভেঙ্গে ফেলবার কল্পনাও করবে না—‘এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে’। “দর্শক”

(বিগত ১লা পৌষ তারিখে মাদারিপুর পার্লিক লাইব্রেরী গৃহে পঠিত)

[মফস্বলের যে ক্ষুদ্র সহরে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল, সেখানে অসহযোগ-আন্দোলন খুবই প্রবল ছিল, এবং জেলে যাওয়াটা অত্যন্ত সংক্রামক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উক্ত আন্দোলনের স্থানীয় প্রধান নেতা, যিনি বাস্তবিক স্বার্থত্যাগের অনেক পরিচয় দিয়েছেন, সভায় উপস্থিত ছিলেন। রচনা পাঠাস্তে তিনি এই বলে’ তার সমালোচনা করেছিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে সকলকেই যোগ দিতে হবে, তার পর যোগ্যতা অর্জনের পথ আপনি খুলে যাবে—জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। শেষোক্ত কথাটি সত্য মেনে নিয়েও আমি এই বলতে চাই, যার ফুসফুস দুর্বল, তাকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বে বায়ুকোষ কার্যক্ষম করে’ নিতে হবে—যেমন ক্রিকেট মাচ্ খেলতে হলে পূর্বে প্র্যাকটিস করে’ নিতে হয়। আর সকলকেই যে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে এতবড় জুলুমই বা কেন? হিন্দুধর্মে ত অধিকারীভেদের ব্যবস্থা কথায় কথায় শুনতে পাওয়া যায়—রাজনৈতিক ব্যাপারে তা খাটবে না কেন? তিনি আর-একটি কথা বলেছিলেন যা নিতান্তই ব্রান্ত বলে’ আমি মনে করি—আমরা যতই যোগ্য হয়ে উঠব, ততই নাকি বৈদেশিক রাজশক্তি আমাদের দমিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। এরূপ চেষ্টা করলেও তার বিফলতা নিশ্চিত, এবং যোগ্যতার যে একটা নৈতিক প্রভাব আছে, তা আমাদের প্রভুদের মনের উপরও কার্য্য করবেই করবে। যোগ্যতা অর্জনের জগ্ন যে কঠোর সাধনার দরকার, তাকে ফাঁকি দিয়ে সহজে স্বরাজ্যলাভের প্রয়াস পেলে আমরা নিজেকে বঞ্চিত করব মাত্র। জনৈক বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত নবীন সন্ন্যাসী প্রবন্ধ শুনে বলেছিলেন যে, এসব বাজে কচ্কচির সঙ্গে জীবনের লক্ষ্যের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ সেই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, এবং তা নাকি এক মুহূর্তে লাভ করা যায়। যে প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেদান্তধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জগ্ন বিবেকানন্দ প্রাণপণ করে’ গিয়েছেন, তাঁর প্রশিষ্যবর্গ এখন সে লক্ষ্য হারিয়ে, প্রচলিত লোকমতের বিক্রমে দাঁড়াবার সাহস ও যোগ্যতার অভাবে পুনরায় পশু হয়ে পড়ছেন, ও মুক্তির স্বপ্ন নিয়েই জীবনটাকে সার্থক করে’ তুলবার অসীক চেষ্টায় জাতীয় শক্তির অপব্যয়

করছেন। সর্কাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের সামাজিক ভেদবুদ্ধিদূরীকরণরূপ যে লক্ষ্য আমি আমার যুবকবন্ধুগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলাম, সে সম্বন্ধে কেউ একটি কথাও বললেন না— আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন এবিষয়টি নীরবে চাপা দিয়ে যাওয়া হয়, সভাতেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কেবল জর্নৈক বক্তা আমার সমর্থন করতে উঠে যখন বলেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর হিংসা এখনও আমরা তুলতে পারিনি, তখন উপস্থিত একমাত্র শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের করতালি সভার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিল। প্রবন্ধপাঠের অল্পক্ষণ পূর্বেই জর্নৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট থেকে আমি একখানি চিঠি পেয়েছিলাম, তিনি যা লিখেছিলেন তাতে আমাদের জানুয়ার ও ভাবুবার অনেক কথা আছে। তিনি মফস্বলে সফরে গিয়ে এক শিক্ষিত মুসলমান দারোগার ঐকান্তিক অহুরোধ এড়াতে না পেরে এক রাত্রির জঞ্জি তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। এতে তাঁর হিন্দু কর্মচারী ও ভৃত্যবর্গের মনে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল যে, তা দেখে তিনি লিখেছেন—হায়রে আমার দুর্ভাগা দেশ! আবার ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গেই নানাবিষয়ে আলাপ করে' তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন—Scratch a Mahomedan and you will find a fanatic অর্থাৎ অন্ধ গোঁড়ামিতে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর ও আমার উভয়েরই অভিজ্ঞতা এই যে, শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোককে কোন হিন্দু বন্ধু প্রীতি-ভোজনে নিমন্ত্রণ করলে, ধীরে ধীরে গলনালীছেদনরূপ সনাতন মুসলমান রীতিতে পশুটিকে হনন করা হয়েছে কি না এটা না জেনে তাঁরা তার মাংস ভক্ষণ করতে প্রস্তুত নন। ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করলে হিন্দুনারীকে বিবাহ করতে মুসলমান কখনও পশ্চাদ্গত হন না, কিন্তু মুসলমান রমণীকে ধর্মাস্তরিত করে' নিয়ে কোন হিন্দু তাকে বিবাহ করতে চাইলে মুসলমানগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। কেন না তাঁদেরই ঞ্চায় প্রচার দ্বারা তাঁদের স্বধর্মীকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আর্ধ্যসমাজ যে “শুদ্ধি”-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করছেন, মুসলমানসমাজ তার ঘোরতর

বিরোধী। সম্প্রতি এক ধনী বৈষ্ণবের গৃহে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে জর্নৈক দেশবিশ্রুত বক্তার বক্তৃতা শুনে গিয়ে দেখা গেল, উপস্থিত মুসলমান কৃষকদিগকে সভামণ্ডপের বাইরে বসতে দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যদেব এ দৃশ্য দেখলে কি বলতেন? ‘যবন’ হরিদাসের আখ্যায়িকা কি কেবল উপাখ্যানের বস্তু হয়েই থাকবে? স্থানীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানের বিবাদ হিন্দু-মুসলমানের হৃদয় বলে' পরিগণিত হয় না, তখন নমঃশূদ্র অন্ত্যজজাতি মাত্র; যদিও রাজনৈতিক নির্বাচন-ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত তারা বহুমানাস্পদ। আবার কোতুক ও পরিতাপের বিষয় এই যে, যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় অধুনা সামাজিক উচ্চস্তরের জাতির সঙ্গে সাম্যের দাবী করেন, তাঁরাই আবার পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং সেই-সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পাংক্তেয়তা নাই। নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের ‘জাতে তুলে’ নেওয়ার কথা ত নমঃশূদ্র নেতাগণ কল্পনাতেও স্থান দেন না; প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে যারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, কেবল তাঁদের সঙ্গে সমতা লাভের জঞ্জি তাঁরা ব্যগ্র। এইরূপ ভেদবুদ্ধি যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। দেশের সকল লোকের অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করবার কুসংস্কারজাত যে ঘোরতর অন্তরায়গুলি বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলি আমরা যতদিন দূর করতে না পারছি, ততদিন ‘একতা’ শব্দটি নিতান্তই নিরর্থক নয় কি? আমাদের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যা কিছু একতা, তা কেবল সমভাবে পরকর্তৃক নির্যাতনের ফল। এটা একতার একটা উপায় হলেও স্থায়ী উপায় নয়। সামাজিক ভেদবুদ্ধি দূরীকরণ ব্যতীত স্থায়ী একতার সম্ভাবনা নেই। আহা! সাম্যই এখনও আমাদের নিকট এত স্বদূর-পর্যন্ত, বিবাহসাম্যের ত কথাই নেই। অথচ যাদের দৃষ্টান্তে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, সেই ইংরেজজাতি ফরাসি বা জার্মান মহিলা বিয়ে করে বলে' ত জাতীয়তা হারায় না, সন্তানাদিও সম্পূর্ণ পিতৃজাতিক হয়ে ওঠে, পিতৃবংশের জঞ্জি মাতৃবংশের সঙ্গে যুক্ত করে' প্রাণ দেয়। যে-সকল মোগল-সম্রাট রাজপুত রমণীর গর্ভ-জাত, তাঁরা ত কেউ অমুসলমান

ছিলেন না। আমাদের হিন্দু বিধবাদের ঋণ আচারনিষ্ঠা জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নেই বললে অত্যাুক্তি হবে না। বিধর্মের প্রতি বিদ্রোহ তাঁদের মধ্যে যত প্রবল, হিন্দু পুরুষদের মধ্যে ততটা নয়। তথাপি এই হিন্দু বিধবাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধর্মাস্তর গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও চিরাগত রীতিনীতি ও অভ্যাসগুলির আমূল পরিবর্তনের জন্ত ত বেশী দিন আবশ্যক হয় না। এতেই দেখা যায় যে এ-সকল বাহু আচার ও বিধি-নিষেধের বন্ধন যতটা অচলপ্রতিষ্ঠ ও দুর্ভিক্ষম্য বলে' আমরা মনে করি, সেগুলি বাস্তবিক ততটা নয়, সেগুলি ঝেড়ে ফেলতে কেবল মানসিক ভাবের ঈর্ষ্য পরিবর্তন আবশ্যক মাত্র। বলা বাহুল্য, আমি সদাচারের কথা বলছি না, অর্থ-শূন্য ও অনিষ্টকর প্রথাগুলির কথাই বলছি। যদি অন্তোত্তের প্রতি সন্দেহটা কিঞ্চিৎ খর্ব করে' নিয়ে, ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনগুলি যার যার নিজস্ব রেখে, অনাবশ্যক বহিরঙ্গ সঙ্কে বন্ধনটা কতকটা শিথিল করে' দিয়ে, বিসম্বাদী মনটাকে একটুখানি পরম্পরাভিমুখী করে' দেওয়া যায়, তা হ'লে বাহ্যস্থানের পার্থক্যগুলি আমাদের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন করে' রেখেছে, সেটাকে ভূমিসাৎ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। এটা বেশ দেখতে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমাজে একবার একটা কিছু চালিয়ে নিতে পারলে সেটা বেশ চলে' যায়। আভি-জাত্যগর্কিত রাজপুত-মহিলাদের মোগল-অস্তঃপুরে প্রবেশ-প্রথাটা বেশ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ অসবর্ণ বিবাহ করে'ও এবং নিজের পরিবারে চালিয়েও দেশবন্ধুর সম্মানিত পদে আসীন, অনেক নিম্নজাতি উপবীতী হয়েছে বলে' তাদের হিন্দুত্বের দাবী অগ্রাহ্য হয় না; কালাপানি পার হলে আজকাল আর জাতি যায় না;—কেবল একটা গভীর inertia বা জড়তার অচলায়তন আমাদের পথ জুড়ে রয়েছে। যদি দেশের কতকগুলি শিক্ষিত উদ্রলোক একসঙ্গে সেটাকে

একটা ধাক্কা দিতে সাহস পান, তা হলে হিন্দুমানীর দাবী সম্পূর্ণ বজায় রেখেই পংক্তিভোজন ও বিবাহক্ষেত্রে সাম্যনীতি অবলম্বন করে' প্রকৃত জাতি-সংগঠনের সহায়তা করতে পারেন। এ কথাগুলি বলার বিশেষ আবশ্যক হয়েছে এজন্য যে, এখন আর হিন্দু মুসলমান একান্ত পৃথক থেকে স্বরাজ্যের কল্পনা করলে চলবে না। মহম্মদ ঘোরী ও মহম্মদ গজ্জনবীর পূর্বে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের যুগে, সে কল্পনা সম্ভবপর ছিল, যদিও তখন ভারতে বৌদ্ধসম্রাট একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। ভারত জুড়ে এখন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে, এখন একে অণুকে অতিক্রম করে' রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখলে তাকে বাতুল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না।* সুতরাং ধর্মসঙ্কে পার্থক্য থাকলেও অগ্রাণু সভ্য জাতির ঋণ, সামাজিক হিসাবে হিন্দু-মুসলমানকে এক হতে হবে। যদি হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলিত হয়ে, ধর্মগত স্বরাজ্যের ব্যর্থ কল্পনায় কাল অতিবাহিত না করে', "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" "যে বিশাল প্রাণ" জন্মলাভ করবে, তার অনুপ্রেরণায় এক বিরাট ভারতীয় জাতি গঠনে প্রস্তুত হয়ে সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক মানব-রচিত কৃত্রিম বাধাবিঘ্নগুলি দূর করার সমবেত চেষ্টায় একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেন, তবেই প্রতিকূল রাজ-শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বরাজ্যলাভ সম্ভবপর হবে; নতুবা জাতীয় একতা যে অর্থশূন্য প্রলাপে মাত্র পর্যবসিত হবে, এর থেকে অধিকতর স্বতঃসিদ্ধ কথা আর কিছু আমার জানা নেই।]

“দর্শক”

* কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনের সভাপতি মোলানা মহম্মদ আলী এইরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন :—“One thing is certain and it is this, that neither can the Hindus exterminate Musalmans today, nor can the Musalmans get rid of the Hindus”, ইত্যাদি। প্রবন্ধলেখক কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসে উপরের কথাগুলি লিখেছিলেন।

ঝাড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ

দেওঘর বা দেবগৃহ ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। ঝাড় দেশে যেমন তারকেশ্বর, ঝাড়খণ্ডে তদ্রূপ বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ এই নাম লইবার এবং পীঠস্থান হইবার বহু পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। এখানে সতীর হৃৎপিণ্ড পতিত হইয়াছিল। তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে—“হৃদপিঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ত ভৈরবঃ, দেবতা জয়দুর্গা।” এখানে বৈদ্যনাথ শিব, দেবী জয়দুর্গা। এই পীঠস্থান মহাভৈরবের নাম হইতে বৈদ্যনাথ নামে প্রথিত হইয়াছে। বৈদ্যনাথের মন্দিরাদি মহারাজা জরাসন্ধের “দেবগৃহ” নামক দেবালয়ের একান্তে প্রতিষ্ঠিত। দেওঘরের জলসাগর সরোবর জরাসন্ধের “জরা-সাগর” বলিয়া কথিত হয়। দেবগৃহের মন্দিরোপকর্ষণস্থ “মানস” এবং “শিবগঙ্গা” নামক সরোবরদ্বয় রাবণ কর্তৃক খনিত বলিয়া পাণ্ডারা ইহাদের প্রাচীনত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই বলেন মানস-সরোবর মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সমগ্র সাঁওতাল-পর্বগণার মধ্যে তীর্থক্ষেত্র বৈদ্যনাথ-ধাম একটি বাঙ্গালীবহুল স্থান। এখানকার উপনিবেশ অতি প্রাচীন। প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় বাণীকান্ত মুখোপাধ্যায় সন্তানাদি না হওয়ায় মনের কষ্টে কাশীবাসী হইতে মনস্থ করিলে, তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়, তিনি যেন বৈদ্যনাথ মহাদেবের পাণ্ডাগিরি ও সেবা করিবার জন্ত বৈদ্যনাথ ধামে বাস করেন। স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া বাণীকান্ত জন্মস্থান শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া দেবগৃহ- (দেওঘর) বাসী হন। ইনিই দেওঘরের প্রথম বাঙ্গালী উপনিবেশিক বলিয়া উক্ত হন। বাণীকান্তের দুই পুত্র—নীলাধর ও রূপারাম। বাণীকান্ত মহাদেবের স্বপ্নাদেশে চক্রবর্তী উপাধি ধারণ করেন। তদবধি ইহার বংশধরগণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চক্রবর্তী পদবীতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার বংশীয় ১৪ ঘর মতান্তরে সর্বশুদ্ধ ১৩ ঘর চক্রবর্তী; তন্মধ্যে দুই ঘর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক ঘর চট্টোপাধ্যায় “ঠাকুর” উপাধি পরিচয়ে বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগিরি করিতেছেন। বর্তমান চক্রবর্তী

উপাধিটি পাণ্ডাগণের মধ্যে জয়-বিজয় চক্রবর্তী, রাখাল চক্রবর্তী, সারদা চক্রবর্তী, সুরেন্দ্র চক্রবর্তী, ভোলা চক্রবর্তী, রামানাথ চক্রবর্তী, রাসবিহারী চক্রবর্তী এবং গিরিশ চক্রবর্তীর নামে আমরা পাইয়াছি। শেষোক্ত পাণ্ডাঠাকুরের নিকট আমরা তাঁহাদের বংশ-পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

বাণীকান্তের পর জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জেলা হইতে কাশীবাস করিতে বাহির হইয়া বৈদ্যনাথ দর্শনার্থ এখানে আসেন; কিন্তু পূজার পর বৈদ্যনাথ দেবের আদেশে এখানেই বসবাস করেন এবং পূর্বগত বাণীকান্ত চক্রবর্তীর গৃহে বিবাহ করেন। তিনি লালাবাবুর পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তরফ হইতে সেবাইত নিযুক্ত হইয়া মন্দিরে পূজা পাঠ করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনো পাকপাড়ার সিংহ-বাবুদের নিকট হইতে দৈনিক ২ টাকা বৃত্তি পান। জগৎরাম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এই বিষয়ে দলিল আছে। তিনিই বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ‘ঠাকুর’ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অতঃপর ‘ঠাকুর’ বলিয়াই পরিচিত। এই বংশীয় ৮৬-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ পাণ্ডা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঠাকুরের (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিকট তাঁহাদের উপনিবেশের বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ কৃষ্ণরাম, মণিরাম, জীংরাম, গোবিন্দরাম এবং তিনি (উমেশচন্দ্র) প্রায় সকলেই পূর্বোক্ত চক্রবর্তীদের গৃহে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ রাণীগঞ্জের নিকট নিমচা গ্রামে তপাদার উপাধিধারী চট্টোপাধ্যায় বংশে এবং বর্তমান ঝাড়ুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলায় বিবাহ করিয়া থাকেন।

এই বাঙ্গালী পাণ্ডাদিগের গৃহে মেয়েরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা ও হিন্দীতে এবং পুরুষরা বিশুদ্ধ হিন্দীতে এমন কি মেয়েদের সহিতও হিন্দীতে কথা বলেন। পশ্চিমা পাণ্ডাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে পকায় ভোজন ও শবদেহ বহনাদি

আচার প্রচলিত আছে, ভাতের চলন নাই। পাণ্ডা উমেশ ঠাকুর বাঙ্গালায় কিন্তু হিন্দী উচ্চারণে বলিলেন, “মন্দিরের মধ্যে হামরা সত্তবানু আছি।” তিনি আরও বলিলেন যে পাণ্ডা রাসবিহারী চক্রবর্তীর নিকট পাঁচ শ বৎসরের দলিল আছে, তাহারও বহু পূর্বে তাঁহারা দেওঘরে আসিয়াছিলেন।

এখানে কনোজ মৈথিল ও বাঙ্গালী পাণ্ডাদের মধ্যে বাঙ্গালী পাণ্ডাদের নিজস্ব কুড়িখানি ভ্রাসন আছে। হিন্দুস্থানী পাণ্ডাদের ৬০০ বাড়ী আছে। পাণ্ডাদের ১৩ ঘর হইতে ৩৬০ ঘর এবং এখন তাহা হইতে হাজার ঘর হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালী পাণ্ডাদের আকার-প্রকার বেশভূষা হইতে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। কথা-বার্তা হইতেও ধরিবার জো নাই। কারণ হিন্দুতীরের সকল শ্রেণীর পাণ্ডাই এক-একজন বহু-ভাষাবিৎ।

ইংরেজ-শাসন এখানে প্রবর্তিত হইবার পর হইতে যিনি উপযুক্ত বলিয়া সাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হইতেছেন, তিনিই প্রধান পাণ্ডার স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন।

বৈষ্ণনাথের মন্দিরে জলঘড়ি দেখিয়া পেটা-ঘড়ি বাজাইবার প্রথা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতে প্রচলিত আছে। ঘড়িদার কালাচাঁদের পিতামহ প্রথম ঘড়িদার ছিলেন। তিনি বাণীকাস্তের পর এখানে আসেন।

বাণীকাস্তের বংশে ষাঁহার নিকট যজ্ঞমানী খাতাপত্র ২০০ সাল হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন তাঁহাদের অন্ত্যন্ত জাতিদের নিকট আরও পুরাতন সময়ের খাতাপত্র পাওয়া যায়।

এক শতাব্দীর অধিক পূর্বে বর্ধমান হইতে ৮ প্রসন্ন-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া দেওঘরে একটি মণিহারির দোকান করেন। ইহাই এখানে বাঙ্গালীর প্রথম দোকান। ক্রমে প্রসন্ন-বাবু বাড়ীঘর চায় আবাদ প্রভৃতি করিয়া বৈষ্ণনাথেই স্থায়ী হন। তাঁহার পর প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে ট্রেডিং কোম্পানী গঠিত হয়। জনৈক মাড়বারীর দোকান ক্রয় করিয়া এই কোম্পানী স্থাপিত হয়, তখন তাহার নাম ছিল “স্বদেশী ভাণ্ডার”। ১৩১৩ সালে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শে ঐ নামের পরিবর্তে “বৈষ্ণনাথ ট্রেডিং কোম্পানী” নাম দেওয়া হয়।

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া-সব্ভিবিসন-নিবাসী পরলোগত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুলিশের সব্ইন্সপেক্টর হইয়া বৈষ্ণনাথে আসেন এবং প্রথমে থানায় থাকিয়া পরে ভৈরব-বাজারে বাস করেন। তিনি গৃহবিবাদের ফলে একখানি গামছা মাত্র লইয়া বাটীর বাহির হন এবং বীরভূমে আসিয়া জনৈক

ভদ্রলোকের বাটীতে রন্ধন-কার্য্য করিয়া দিনপাত করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালা লেখাপড়াও শিখিতে থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আপনার বাটীতে লইয়া যান। তিনি বীরভূমের মোক্তার ছিলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি মাতুলালয় হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণনগরে গিয়া রাইটার কনেষ্টবলের কার্য্য লাভ করেন। পরে তাঁহার সংবাদ পাইয়া কাটোয়া হইতে আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু তিনি বাড়ী না গিয়া শীঘ্রই তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে জামতাড়ার সাহানা গ্রামের ফাঁড়ীতে হেড্ কনেষ্টবল হইয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে সব্ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত হইয়া তিনি দেওঘরে আসেন। ইহার দশ বৎসর পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়। তিনি এই বিদ্রোহ-দমনকারীদের অন্ত্যন্ত ছিলেন। এই বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের মধ্যে একরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার উপক্রম করে। মহেশ-বাবু অমানুষিক চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা তাহা নিবারণ করেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্ত তিনি গবর্নেন্ট হইতে বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। সাঁওতাল-বিদ্রোহীদ্বয় দিল্লির মাঝি ও মন্দির মাঝিকে কেহ বহু চেষ্টাতেও ধৃত করিতে পারে নাই, কিন্তু মহেশ-বাবু তাহাদিগকে ধরিয়া দেন। বিদ্রোহীদের ফাঁসি হয়। তাহাতে মাঝিঘরের কয়েকজন সাঁওতাল অশুচর ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু গবর্নেন্ট কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তিনি অব্যাহতি লাভ করেন। সাঁওতাল-বিদ্রোহের দ্বাদশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গোরা সৈন্যদিগের রসদ দেওয়া ও হিফাজত করার জন্ত প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে তিনি প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। পুলিশের কর্মচারিগণের উপর বিদ্রোহীদের বিশেষ কুদৃষ্টি ছিল। সব্ইন্সপেক্টর মহেশ-বাবু তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত গৃহ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করেন। তিনি একটি বন্দুক মাত্র সঙ্গে লইয়া দেওঘর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফুলঝুরী পাহাড়ে লুকাইয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত টাকাকড়ি—প্রায় ৬০ হাজার টাকা—ছোট্টকী নামী এক হিন্দুস্থানী দাসীর জিম্মায় রাখিয়া যান। বিদ্রোহ-দমনের পর তিনি গৃহে ফিরিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সেই দাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বস্তা দাসী তদবধি তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া স্বীয় ভরণপোষণের চিন্তা হইতে মুক্ত হয় এবং বাসের জন্ত একটি ভ্রাসন পুরস্কার

স্বরূপ লাভ করে। মৃত্যুকালে সেই বাটী আবার বৃদ্ধা মহেশ-বাবুর বংশধরদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এখানে বসন্ত রোগ সংক্রামক হইয়া মহেশ-বাবুর পরিবারবর্গকে আক্রমণ করায় তাঁহার স্ত্রী, এক ভাইঝি ও দুইটি ভাইপো একদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহাতে মহেশ-বাবু পাগলের মত হইয়া পুলিশের কক্ষ ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন একস্ট্রো এসিষ্ট্যান্ট কমিশনের বেঞ্চ ক্লার্কের কক্ষ করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দেন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। অচিরেই চিনি ও লবণের কারবার আরম্ভ করেন। এই ব্যবসাতে প্রভূত ধন উপার্জন করেন।

এই মহকুমার অন্তর্গত করো নামক একটি গ্রাম আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের কৃষ্ণনগর হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গালীরা আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এক্ষণে করোর আদি বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী হারা হইয়াছেন ও স্থানীয় লোকদের সহিত চাষ-বাস করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। করোর আদি আচার্য মহাশয় রামেশ্বর তর্কালঙ্কার তিন শতাব্দীর পূর্বে আগত উপনিবেশিকদিগের সমসাময়িক। মহেশ-বাবু এই করো গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা আজিও জীবিতা আছেন। মহেশ-বাবুর ভ্রাতৃপুত্রত্রয়ের মধ্যে বর্তমান বাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় মোক্তার। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে দেওঘর এবং কুণ্ডার মধ্যবর্তী প্রায় ৩০০ একর অর্থাৎ প্রায় সহস্র বিঘা পরিমাণ নিম্ন জলাভূমি স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিবৃত ছিল। ঐ ভূখণ্ড মহেশ-বাবু মহন্ত মেঘনাথ পুরীর নিকট হইতে মকুররী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন এবং সমস্ত জঙ্গল কাটাইয়া তাহাতে করহনী ধাত্তের আবাদ করেন। এই হেতু ঐ স্থানের নাম “করণীবাদ” হইয়াছে। এই করণীবাদ ভুলক্রমে অনেকে করণীবাগ কহিয়া থাকেন। এখানে বহু বাঙ্গালী ও মাড়বারীর বাস হইয়াছে।

এদেশে মহেশ-বাবুর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্মের মন্দিরে দৈনিক বন্ধনী অর্থাৎ সরকারী পূজার পূর্বে পাণ্ডা ছাড়া অন্য কোন লোক ঠাকুর স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ইহার পরিবারবর্গের সে অধিকার আছে, প্রধান পুরোহিত স্বর্গীয় পণ্ডিত

ঈশ্বরীন্দ্র ওঝা ইহার বংশধরগণকে এ অধিকার দিয়া গিয়াছেন। মহেশ-বাবু বন্দুকচালনায় সুদক্ষ ছিলেন, অতি উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিলেন। একদিন ৬০ মাইল পথ অশ্বারোহণে গিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং আর একদিন বীরভূম হইতে অশ্বারোহণে দেওঘর গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মহেশ-বাবু মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার সমসাময়িক ঘটওয়াল বৈষ্ণবংশীয় তিনকড়ি রায় সাঁওতাল-বিদ্রোহের পূর্বে শিমরাতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের পর রামলাল কবিরাজ মহাশয় বাঁকুড়া তিলোড়ী হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। ঝোঝাগড়ীতে আজিও তাঁহার বাড়ী আছে। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহাদের প্রায় সমসাময়িক বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪-পর্বগণা হালিসহর হইতে আসিয়া আদালতের মুহুরী হন।

রোহনী গ্রামে ও তাহার নিকট কয়েকঘর বাঙ্গালী বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন। রিখিয়ায় একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠিত হইয়াছে। রোহনী ষ্টেটের জনৈক বাঙ্গালী ম্যানেজার বহুদিন হইতে এখানে আছেন। তিনি দেওঘরের সর্দার পাণ্ডার নিকট হইতে “শিক্দার” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার কেদারনাথ সেন, বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী পুরানদাহায় আছেন। এখানে স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়-দিগের একখানি ভদ্রাসন আছে। বাঙ্গালী তান্ত্রিক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মানন্দজী ২৫।৩ বৎসর পূর্বে স্থানীয় চোল পাহাড়ে বাস করিতেন। রাণাঘাটের অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রামচরণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গুরু প্রসিদ্ধ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্ত “তপোবন” পাহাড়ে আশ্রম করিয়া দিয়াছেন, ইহা তীর্থস্থানের স্তায় অসংখ্য যাত্রীর দর্শনীয় হইয়া আছে। চৌধুরী মহাশয় করণীবাদে তাঁহার স্বকীয় জমীতে আর-একটি আশ্রম ও শিবমন্দির করিয়া দিয়াছেন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস বোধ হয় “বঙ্গাধিপ-পরাজয়”। দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহী জমিদার প্রতাপাদিত্য রায়কে বঙ্গের অধিপতি বলা কতদূর সম্ভব তাহা বিচার করিবার সময় এখন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনি দক্ষিণ-বঙ্গ ও তাহার সমুদ্র-উপকূলের ঘটনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া পরে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে “বঙ্গাধিপ-পরাজয়” উপন্যাস হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের কায়স্থ-রাজবংশের ইতিহাস-রূপেই বঙ্গসাহিত্যে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক লেখকগণ, উপাদান থাকিলেও, নূতন-গ্রন্থ-রচনাকালে তাহা ব্যবহার করেন না; এইজন্যই “প্রতাপাদিত্য” নাটকে গঙ্গালিখ “রডা” নামে বিখ্যাত এরং বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের “ডিস্ক্রী ডিক্রীজ এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুগণের মগবন্ধুগণের” নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গাধিপ-পরাজয়, উপন্যাস কি ইতিহাস সে-সম্বন্ধে এখন মতদ্বৈধ আছে; সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’-কেই ক্রমপর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়।

সাহিত্যরথীদিগের মতে উপন্যাস হিসাবে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে; তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিরূপে রচিত হওয়া উচিত, দুর্গেশনন্দিনী তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যে মধ্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে লেখকগণ প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি সেই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। দুর্গেশনন্দিনীর কলু খাঁ, ওসমান খাঁ, জগৎসিংহ ও মানসিংহ একদিন বাস্তবজগতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের সময় ও সেই যুগের প্রধান ঘটনাবলী

ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। উপন্যাস-রচনা-কালে গ্রন্থকার নাম-বৈষম্য বা ঘটনা-বৈষম্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এইজন্যই দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে কথাসাহিত্যের হিসাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না হইলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ইতিহাস দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—আধুনিক ও প্রাচীন। আধুনিক ইতিহাস বর্তমানের কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারে না, কারণ বর্তমানের কার্যাবলীর প্রকৃত কারণসমূহ এখনো প্রচ্ছন্ন। নেপোলিয়ানের জীবদ্দশায় বিদেগবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া উভয় পক্ষের ঐতিহাসিকগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নেপোলিয়ানের বংশ ও প্রাচীন ফরাসী রাজবংশ সিংহাসন-চ্যুত হইলে তাহার অধিকাংশ মিথ্যা প্রমাণ হইয়া প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব জীবিত থাকিতে তাঁহার রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর দ্বিশত বৎসর পরে সেই-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। এইজন্যই আধুনিক ইতিহাসও বর্তমানকে বর্জন করিয়া থাকে। দেশভেদে ইতিহাসের কতটা আধুনিক, কতটা প্রাচীন, তাহার প্রভেদ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে খৃষ্টের জন্মের পূর্বের ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস এবং খৃষ্টাব্দের শেষ সহস্র বৎসরের ইতিহাস মধ্যযুগের। ইহার মধ্যেও প্রকার-ভেদ আছে। প্রাচ্যে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব-ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস এবং মোগল- (মুগল বা মোঙ্গোল) বিজয়ের পরবর্তী ইতিহাস আধুনিক। এই আধুনিক যুগ হইতে ভারত-মহাসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী ও ফিরিঙ্গি বণিকসম্প্রদায়-সমূহের অধিকার লাভের কথা বর্জনীয়। এই সাধারণ বিভাগত্রয়ের মধ্যে আমাদের দেশের উপন্যাস-লেখকেরা আধুনিক ও মধ্যযুগের উপাদান অবলম্বন করিয়াই কথা-সাহিত্য

রচনা করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র “মৃগালিনী”তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৃগালিনী যখন রচিত হইয়াছিল তখন মগধে হিন্দু বা বৌদ্ধ কে রাজা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন না; সে যুগের প্রধান ঐতিহাসিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও তাহা জানিতেন কি না সন্দেহ; তখন মগধের সঙ্গে গোড়েব কি সম্বন্ধ ছিল তাহাও কেহ জানিত না; সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মগধ-রাজপুত্রের নাম হেমচন্দ্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন যতটুকু ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের চত্বরে গোবিন্দপাল দেবের নামযুক্ত শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ে গোবিন্দপালের স্থান তখনও নির্দিষ্ট হয় নাই। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে নেপালরাজ্যের গ্রন্থাগারে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত গোবিন্দপাল দেবের নামযুক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থের পুস্তিকাসমূহ আবিষ্কৃত হইলে গোবিন্দপালের কাল ও স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। একটি নামের অভাবে “মৃগালিনী” অঙ্গহানি হয় নাই। ধর্ম্মাধিকার পশুপতি, চৌরোদ্ধরণিক শাস্ত্রশীল প্রভৃতি নাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রাজকর্ম্মচারীদিগের নাম, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস হইতে গৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং ঐতিহাসিকের নিকট “মৃগালিনী” সর্বাঙ্গসুন্দর। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি উপন্যাস রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ গ্রন্থকারদিগের আলস্য। প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের কথা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, শিলালিপি বা তাম্রশাসনও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সুতরাং তাহা পড়িতে বা বুঝিতে বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না। প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় ও ইংরেজী ভাষায় বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই যুগে উপাদানের অভাব নাই, নাম তারিখ ঘটনাবলী সমস্ত সহজে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের

মধ্যযুগের ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। এই যুগে মুসলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত উপন্যাসের নাই, তাহার উপর এই যুগের মুসলমান ঐতিহাসিক একদেশদর্শী, সুতরাং তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে বিশ্বাসযোগ্য অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্বত্র স্থলভ নহে। সর্বাঙ্গের কঠিন কথা—মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন, কারণ তাহা তুর্কী আরব্য অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত। এই-সকল কারণেই এক রাজপুতনা ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর অপর প্রদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস উপন্যাস-লেখকের নিকট সহজে বোধগম্য নহে।

ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাস মোগল ঐতিহাসিকের রূপায় ও ইংরেজ অল্পবাদকের দ্বারা সর্বত্র সুপরিচিত। শীতারাম ও রাজসিংহ সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি নাই, যদিও অধ্যাপক যত্ননাথ সরকারের দ্বারা মনস্বী লেখক রাজপুতনার গিরিরক্ষুপথে সপরিবার বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে বন্ধন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি রাজসিংহ আধুনিক উপন্যাসের দ্বারা অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই। “দেবীচৌধুরাণী” “আনন্দমঠ” ও “চন্দ্রশেখর” আধুনিক ঐতিহাসিক যুগের বহির্ভূত, কারণ ইংরেজ বণিকের অধিকার-যুগের ইতিহাস রচিত হইবার প্রকৃত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং “দেবীচৌধুরাণী” বা “চন্দ্রশেখরকে” ঐতিহাসিক উপন্যাস-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায় না। “আনন্দমঠ” উপন্যাস কি রূপক তাহার বিচার এখনো হয় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসর পর্য্যন্ত যে-সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই বোধ হয়। সুপরিচিত গ্রন্থকর্তাদের লিখিত উপন্যাসে বিসদৃশ নাম বা ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে-সমস্ত উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহাতে সকল সময়ে ইতিহাসের মর্যাদা

অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আধুনিক কথা-সাহিত্যের যুগে ঐতিহাসিকের আখ্যানের আদর নাই, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রচনাও কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে।

সেইজন্তু কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা স্থগিত ছিল না এবং এখনও নাই। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমান শতাব্দীতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুই-একখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষপ্রতিষ্ঠ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ইহাদের রচনার প্রাচীন বা মধ্যযুগের পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা বর্ণনায় ইতিহাসের মধ্যাদা অক্ষুণ্ণ নাই। উপন্যাস হিসাবে হরিসাধন-বাবুর “কঙ্কণচোর” অথবা শচীশ-বাবুর “রাজাগণেশের” স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে কোথায় তাহা নির্দেশ করিবার স্পর্শা আমি রাখি না, কেবল যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমি জীবিকা অর্জন করিয়া থাকি তাহারই খাতিরে কতকগুলি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। “কঙ্কণচোরের” ভূমিকায় শ্রদ্ধাস্পদ হরিসাধন-বাবু লিখিয়াছেন, “চিবকাল মোগল-পাঠানের ঘটনা-সম্পর্কীয় উপন্যাস লিখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালের উপন্যাস-রচনায় আমার এই প্রথম উদ্যম।” গ্রন্থের আরম্ভেই দেখা গেল, যে, চিত্রে অশ্বপৃষ্ঠে যে রাজমূর্ত্তি আছে তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর অথবা বিংশ শতাব্দীর রাজপুত-বেশধারী যুবার মূর্ত্তি। যীশুখৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে রাজা বা প্রজা, ধনী বা দরিদ্র—কেহই এইরূপ পোষাক পরিত না। একথা কেবল আমিই বলিতেছি না, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কেহই এবিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তিনিই একথা বলিতে বাধ্য হইবেন। রাজার পশ্চাতে যে দুই জন অশ্বারোহী চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার গবর্ণর সাহেবের শরীররক্ষীদের আদর্শে শিল্পী তাহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আফগান কুল্লা ও আফ্রিদী পাগড়ী তখনো ভারতবর্ষে চলে নাই

এবং আকবরের রাজ্যকালে রোশেনিয়া জাতির বিদ্রোহের পূর্বে চলিয়াছিল কি না সন্দেহ। চৌরঙ্গরণিক যে পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছে তাহা অনেকটা লক্ষ্মীয়ার নব নাগরের ভাবে এবং সহিসের আকার বিংশতি শতাব্দীর পদস্থ ইংরেজের সহিসের মত। কথাটি বলা নিতান্তই আবশ্যিক, তাহা না হইলে একথার উত্থাপন করিতাম না। কারণ অল্পদিন পূর্বে কলিকাতার কোন একটি থিয়েটারে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “চন্দ্রগুপ্ত” নামক নাটকের অভিনয় উপলক্ষে আমার এক আত্মীয় আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, হরিসাধন-বাবুর মত লক্ষপ্রতিষ্ঠ প্রথিতযশা গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থে যখন এই জাতীয় চিত্র বাহির হইয়াছে তখন রাজার এইরূপ পোষাক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর রাজবেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে পোষাক হরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের লোকে সে পোষাক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ব্যবহার করিত না, সুতরাং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহার ব্যবহার অচিস্তনীয়। হরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে অতি সামান্য চেষ্টায় সংশোধন করিতে পারিতেন। যেমন মহাপ্রতীহার শব্দের পরিবর্তে কোটোয়াল শব্দের প্রয়োগ, নালন্দ স্থলে নলান্দা এবং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক চাণক্যকে দিয়া মহানির্বাণ তত্ত্বের আলোচনা। হরিসাধন-বাবু যদি কলিকাতা মিউজিয়ম্ বা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন অথবা যাহারা প্রাচীন ইতিহাসেব চর্চা করেন তাহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তাহার উপন্যাসে এই জাতীয় ভুল বা কালানুচিততা-দোষ থাকিত না। চাণক্যকে দিয়া মহানির্বাণ তত্ত্ব পড়ানো যীশুখৃষ্টকে বা বুদ্ধকে দিয়া অস্কার ওয়াইল্ড্ বা হাইনরিক্ ইবুসেনের গ্রন্থ পড়ানোর মত দেখায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা বিসদৃশ দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

ভূতপূর্ব এবং অধুনা সিংহাসনচ্যুত সাহিত্যসম্রাট্ ৩বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত “রাজাগণেশ” নামক ঐতিহাসিক

উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। এখন বাঙ্গলা দেশে অশ্লীলতা-বিবর্জিত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ দেখিলেই বুঝা উচিত যে, রচনা হিসাবে গ্রন্থকারের কিছু মূল্য আছে; তাহা না থাকিলে উপন্যাসের বাঙ্গালী পাঠিকা কখনই দুইহাজার বই কিনিয়া পড়িতেন না। “রাজা গণেশ” ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—প্রথম উদ্দেশ্য, উপন্যাসের আকারে ঐতিহাসিক সত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ঐতিহাসিক ঘটনার আবরণ দিয়া একটা নূতন গল্প রচনা। প্রথম উদ্দেশ্য রাজা গণেশে সিদ্ধ হয় নাই, কারণ গ্রন্থকার ছাপা ইংরেজী বা বাঙ্গলা ইতিহাসে রাজা গণেশ বা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বাহা লিপিত হইয়াছে তাহাও পাঠ করেন নাই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই, কারণ তিনি রাজা গণেশ ও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ইতিহাসের কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ব্লুম্যানের Contributions to the History and Geography of Bengal কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ইংরেজী ১৮৭০-৭৫ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল; ৩৮জনীকান্ত চক্রবর্তীর “গৌড়ের ইতিহাসের” দ্বিতীয়খণ্ড ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল তথাপি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত “রাজা গণেশের” তৃতীয় সংস্করণে “সুলতান সৈয়ফ উদ্দীন আসলতান” নামক ইংরেজী আরবী পার্শ্বী ও বাঙ্গলা ভাষা মিশ্রিত অসম্ভব নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিনা কারণে বাঙ্গলা ভাষার উপরে এতটা অত্যাচার করিবার কি প্রয়োজন আছে? “আসলতান” কোন রাজার নাম নহে, শচীশ-বাবু বোধ হয় কোন ইংরেজী গ্রন্থে “অস্-সুলতান” নামক আরবী কথাটি পাঠ করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাহাকে বাদশাহের নামের একটা অংশ করিয়া লইয়াছেন। ইহার কৈফিয়ৎ তাহার দেওয়া উচিত। সিকন্দর শাহের পুত্রের পুরা নাম গিয়াস-উদ্দীন আজমশাহ, তাঁহার পুত্রের নাম সৈয়ফ-উদ্দীন হুম্জা শাহ। এই নাম যখন “সৈয়ফ-উদ্দীন আসলতান” আকার দাবণ করিয়া বাঙ্গালী উপন্যাস-লেখকের উপন্যাসে অবতীর্ণ হইয়াছে তখন আমাব মত পেশাদার প্রত্নতত্ত্ব-

ব্যবসায়ীরও তাহা চিনিয়া লওয়া কষ্টকর। সমস্ত মুসলমানী নামই এমন বিকৃত হইয়াছে যে তাহা চিনিয়া ওঠা কঠিন। ঐতিহাসিক উপাখ্যানও বিশ্বাসযোগ্য নহে। হুম্জা শাহের পুত্রের নাম “আলিন সা” নহে, এ নামে ইলিয়াস শাহের বংশে কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। হুম্জা শাহের পুত্রের নাম বায়াজিদ শাহ, রিয়াজ-উস্-সালাতীন-প্রণেতা বলেন যে, বায়াজিদ জারজ পুত্র। গণেশের উখান এবং তাঁহার পুত্রের ধর্মাস্তর গ্রহণের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সমস্যা নিহিত আছে, উপন্যাসে অবশ্য কেহ তাহার সম্মান করিতে যায় না; কিন্তু যে লেখক মুদ্রিত গ্রন্থ পড়িয়া রাজার নাম স্পষ্ট পড়িতে পারেন না, তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আকারে আখ্যানকে রচনা করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হন কেন? “রাজা গণেশ” নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাদটীকায় কতকগুলি অসত্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদ ঐতিহাসিক মাত্রেরই আবশ্যক। তিনটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম,—(১) পাঠান রাজত্বকালে “খাঁ”, “খাঁ সাহেব”, “সিংহ” উপাধি ছিল। শুধু ভাড়া চক্রের অধিপতি “খাঁ সাহেব” উপাধি পাইয়াছিলেন। (পৃ: ১১) (২) বন্দুক বিশেষ। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় দেশে বন্দুক বা কামান ছিল না। জালাল-উদ্দীনের সময়ে কামান প্রথম দেখা যায়। তাঁহার নামাঙ্কিত আগ্নেয়াস্ত্র গৌড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। (পৃ: ৩৪) (৩) পাল, সেন রাজাদের সময়ে রমণীরা ঘাগ্‌রা পরিধান করিত। পাঠান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর দেশ যত দরিদ্র হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই জীলোকেরা ঘাগ্‌রা ছাড়িয়া পাটের পাছড়া পরিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণীরা তখনও রেশমের প্রস্তুত ঘাগ্‌রা পরিতেন। (পৃ: ১৩৫)

তিনটিই ঘোর অসত্য। “রায়” হিন্দু উপাধি। সিংহও হিন্দু উপাধি। “খাঁ” ও “খাঁ সাহেব” মুসলমানের উপাধি, হিন্দু যখনদোষগ্রস্ত না হইলে এই উপাধি গ্রহণ করিত না।

জালালউদ্দীনেব সময় কামান ছিল না এবং তাঁহার নামাঙ্কিত আগ্নেয়াস্ত্র বাঙ্গলার বা ভারতবর্ষের কোনস্থানে

আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পাল ও সেনরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালী জীলোকেরা ঘাগরা পরিত কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। শচীশ-বাবু কোন্ অধিকারে এই জাতীয় অসত্য বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলন করিতে গিয়াছিলেন ?

আর দুইখানি গ্রন্থের নাম করিয়াই এপ্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে। প্রথমখানি মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিরচিত “বেনের মেয়ে” এবং দ্বিতীয়খানি স্বর্গগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “ডঙ্কানিশান”। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, “বাঙ্গালী এখন কেবল এ-কেলে ‘গণিকাতন্ত্রের’ উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন ?” তাঁহার “বেনের মেয়ে” উপন্যাস নহে, ইহা ইতিহাসের এসেন্স, শর্করা-মণ্ডিত গুটিকা, পাঠ করিবার সময় নীলমণি চক্রবর্তী অথবা “আর ডি বন্দ্যো”র গলাতেও সময়ে সময়ে আটুকাইয়া যায়। সহজিয়া-বাদের এমন সুন্দর সুন্দরিত ম্যানুয়েল আর নাই। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়া নিদ্বিষ্ট হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গলা দেশের পাঠিকা হয় তো ইহাকে মোটেই উপন্যাস বলিতে রাজী হইবেন না। এই গ্রন্থে একটি নায়িকা এবং একটি প্রচ্ছন্ন নায়ক আছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রেম জন্মিয়াছিল কি না, তাহা “ভাষা” পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ও “খণ্ডনাথগুণ্যাজম” না পড়িলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে না। আমি স্বয়ং এজাতীয় গ্রন্থ একখানিও পড়ি নাই, সুতরাং সে-কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। “বেনের মেয়ে” ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

কীর্তিস্তম্ভমালার অন্যতম। ইহাতে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না। তবে কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাভূষণ অমূল্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বাগ্দী জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন; বোধ হয় সেই প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের রূপা বাগ্দী, রাজা রূপনারায়ণ সিংহ হইয়া উঠিয়াছিল। তবে ইহা স্বর্ণ-বণিক্ জাতির বল্লাল-চরিত ও পুড্যাগ্রামের ভট্টভট্টের দেববংশের মত ঐতিহাসিক বিদ্রূপ কি না, সাধারণের সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কিছু নাই।

সত্যেন্দ্রনাথের “ডঙ্কানিশান” অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।* সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাঙ্গালাসাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইত। যে-সকল কথার অর্থ সহজে বুঝিতে পারা যায় না তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। নাম, উপাধি, পারিপার্শ্বিক ঘটনা—সকল বিষয়েই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। এমন উপাদেয় উপন্যাস অনেক দিন পড়ি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, সুতরাং অপরের বলিতে দোষ নাই, এখনকার বাঙ্গালী কেবল গণিকাতন্ত্রের উপন্যাসই পড়িতে চান। যদি কেহ ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়িতে চান, তবে তিনি যেন সত্যেন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ উপন্যাসখানাই পাঠ করেন এবং বিক্রয় হইবার আশা না থাকিলেও যদি কেহ বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন তাহা হইলে কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই উপন্যাসখানি তাঁহার আদর্শ হইবার যোগ্য।

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

* প্রবাসীতে প্রকাশিত।

ভারতের উপকূলস্থ “মাহে”* নগর

(পিয়ের লোটর ফরাসী হইতে)

একটি প্রশান্ত ক্ষুদ্র দেশ,—মাথার উপর তাল-গুঞ্জের খিলান-মণ্ডপ। এই খিলান-মণ্ডপটি অব্যবচ্ছিন্ন ভাবে সটান চলিয়াছে : নীচে মানুষ ও পদার্থসমূহ। অতিকায় তালবৃক্ষপুঞ্জের রন্ধুব মধ্য দিয়া অতিকণ্ঠে একটু আকাশ দেখা যাইতেছে এবং সেখান হইতে আলোক-

কিরণ নামিয়া আসিতেছে। তালগাছগুলি জড়াজড়ি করিয়া আছে—যেঁসার্দেসি করিয়া আছে। কতকগুলি গাছ যেন প্যাপোম ছড়াইয়া

* Mahe (উচ্চারণ মায়ে) ফরাসী উপনিবেশ—মাত্রাজ উপকূলে—কালিকটের উত্তরে।

আছে ; আর কতকগুলি গাছ কৃষ্ণিত পালকগুচ্ছের মত যেন সাজানো রহিয়াছে এবং খুব নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই তরমুসপটি উচ্চ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে—দীর্ঘ ও ভঙ্গুর বৃন্তগুলি উহাকে ধারণ করিয়া আছে। এই বৃন্তগুলি খাগড়ার মত নমনীয়। একটা চিরন্তন ছায়ার মধ্যে, একটা স্বচ্ছ হরিৎ রাত্রির মধ্যে, লোকেরা চলাফেরা করিতেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ৫টার সময়, জাহাজ হইতে বালুবাশিব উপর নামিয়া পড়িলাম। একটা শীর্ণকায় নদীর মুখ। আমি হৃদয় হইতে—শেষপ্রান্তিক এসিয়া হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। ভাবতের এই মোহিনী শোভা, এই উজ্জ্বল প্রভা আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। এই সমস্ত অনন্তসাধারণ ও অতুলনীয় সামগ্রী আবার পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। যে নদী দিয়া আমি আসিলাম, সূর্য্য অস্তগামী হইলেও সমস্ত নদীকে কিরণে রঞ্জিত করিয়াছে ; কতকগুলি তালগুচ্ছ সূর্যের করস্পর্শে আশ্চর্য্যকর সোনালি হইয়া উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে আকাশ যেন সোনার ধূলায় সমাচ্ছন্ন। আমাব ডিজি তীরে ভিড়িতেছে দুই নদীর তটদেশে, বিশাল সবুজ পর্দার মত এইসব তালগাছের নীচে, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে। উহারা সাদা লাল অথবা হলুদে বসনে আচ্ছাদিত হইয়া, দেবতার মত চমৎকায় ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা, এবং তাহাদের গাছপালা, তাহাদের দেশ, তাহাদের আকাশ, সমস্তই মনে হয় যেন একটা দেব-ছাতিতে পরিম্মত।

একটা বারাণ্ডাওয়ালা গৃহ—সাদা ধপ্পে,—সবুজ-জানালা-খড়খড়ি বিশিষ্ট—জলের ধারে, অন্তরীপের মত একটা শৈলখণ্ডের উপর স্থাপিত। সুন্দর বাড়ীটি, খুব পুরাতন,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ; এই ছায়া-নিবিড় উপনিবেশটি এই কোম্পানীর শাসনাধীনে ছিল।

বালুভূমির উপর দিয়া কয়েক পা গিয়াই একটা নিম্ন উদ্ভানে প্রবেশ করিলাম—এই উদ্যান এই গৃহেরই সংশ্লিষ্ট। উদ্যানের মাথার উপরে—যেমন সমস্ত—সবুজ গাছপালার খিলান-মণ্ডপ প্রসারিত। এই মধুর ছায়াতলে আসিয়া মনে হয় যেন এক পবীর উদ্যানে আসিয়াছি ;—নানা প্রকার অজ্ঞাত ফুল, ফুলের মত পাতা-পল্লবও সমুচ্ছল ও নেত্রাকর্ষক ; বেগুনী লাল, সাদা ও হলুদে-ফুটুক-দেওয়া—বিচিত্র বর্ণের ; যেন চিত্রকরের স্বচ্ছানুসাবে নানা বর্ণে চিত্রিত। সেকালের ধবনে বাগানের ভিত্তি ছোট ছোট গলি-পথ, পাথরের বেঞ্চি শেওলা পড়িয়া সবুজ হইয়া গিয়াছে। ভ্রমসম্পত্তির মালিক মরিয়া গেলে কোন পল্লী যেরূপ হয়—এই উদ্যানটি যেন সেইরূপ জীর্ণ ও পরিত্যক্ত আকার ধারণ করিয়াছে।

বাগানে প্রবেশ করিয়া, ফটকের দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিলাম। রাস্তার মত একটা-কিছু যেন আমার সম্মুখে ;—এই রাস্তাটা অতিকষ্টে তালীবন ভেদ করিয়া চলিয়াছে ; দেখিলে মনে হয় যেন দক্ষিণ ফ্রান্সের আমাদের কোন গ্রামকে স্থানান্তরিত করিয়া এখানে বসানো হইয়াছে এবং বিশ্ব-রেণাবর্তী প্রদেশ-স্থলভ শক্তিশালী বস ইহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবে ; বড় বড় তালগাছ ছায়ার মধ্যে অবস্থিত ; কিন্তু উহাদের মাথা এখনও অস্তগামী সূর্যের দ্বারা কনক-রঞ্জিত ; এবং এই ছোট ছোট গৃহগুলি, উহাদের উদ্ভোখিত দীর্ঘ বৃন্তগুলার কাছে কি নীচুই মনে হয় ! এখানে একটি ছোট নগর-দালান আছে ; উহার উপর তে-রঙা নিশান উড়িতেছে, লাল জামা গায়ে, তামবর্ণ সিপাহিরা ফটকের সম্মুখে পাহারা দিতেছে ; এখানে অদ্ভুত রকমের একটা ছোট হোটেল আছে—কোন মুসাফিরদের জন্ত কে জানে ; একটি ছোট পাঠশালা আছে, ছোট ছোট কতকগুলি দোকান আছে ; এই দোকানে ভারতবাসীর কলা ও গরমমশলা

কেনে। তাহার পর, আর কিছুই নাই ; উহারই জের স্বরূপ কতকগুলি দীর্ঘ তরুণীধি বরাবর প্রসারিত হইয়া হরিৎপুঞ্জের গভীর দেশে বিলীন হইয়া গিয়াছে ; মাটির রং রক্তাভ, উহাতে পড়িয়া শাখাপল্লবের রং যেন আরও উজ্জ্বল ও অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। উপরে যেখানে মধ্যে মধ্যে তালীবন একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে সেইখানকার আকাশের ফাঁকগুলি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং খুব গভীর বলিয়া মনে হইতেছে। রাস্তার দুইধারে যে-সব তালগাছের পালকগুচ্ছ হুলিতেছে, সেই নমনীয় গাছগুলার মধ্যে, বাজপাখীর ঝাঁক ককশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ক্রমাগত যাওয়া আসা করিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, জীবজন্তদের মধ্যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যে, একটা জীবন-তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতেছে ; কিন্তু উহার মধ্যে নিমজ্জিত ক্ষুদ্র নগরটি যেন মৃত।

এইসব ছায়াময় পথে যে সকল লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা সকলেই সুশী শান্ত উদার-প্রকৃতি ; উহাদের বড় বড় মধুমলের চোখ—সেই কালো রহস্যময় চিত্তবিমোহন ভারতীয় চোখ। বঙ্গদেশ অর্ধনগ্ন ; উহাদের শরীর প্রাচীন গ্রীসীয় ধরণে সাদা কিংবা লাল মসুলিন-কাপড়ে আচ্ছাদিত। রমণীগণ দেবীর ঞ্চায় সাজসজ্জায় বিভূষিত ; উহাদের পীতাম্বর কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে,—গ্রীক মার্বেলেব যেন প্রায়-অতিবন্ধিত তাম্র-প্রতিরূপ বলিলেও হয়। পুরুষদের ফোলানো বুক, শরীরের গড়ন রমণীদিগেরই মত পাতলা, কেবল কাঁধ অপেক্ষাকৃত চওড়া ; নীলকৃষ্ণ গাশ্ব, প্রাচীন গ্রীক ধরণে বৃষ্ণিত। আমাদের চামাদের মত উহারা ফবাসীতে “বৌ জুর” বলে ; এবং ঐ কথা বলিবার সময়, তাহারা আমাদেরই নিজের লোক এই মনে করিয়া, উহাদের মুখে একটা গর্বেব ভাব প্রকাশ পায়। উহাদের ইচ্ছা একটু দাঁড়াইয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা কহে। তাহারা আমাদের ভাষায় একটু কথা কহিতে পারে, তাহারা একটু হাসিয়া যুদ্ধের সম্বন্ধে, চীন দেশের বাপারাди সম্বন্ধে, কথা আরম্ভ করিয়া দেয়। বলে—“আমাদের নাবিক, আমাদের সৈনিক” ... ইহা অনপেক্ষিত ও অদ্ভুত। হাঁ, উহারা যেন এইখানে ঠিক ফ্রান্সেই আছে। তখন আমার মনে পড়িল, একবার, (Saigon) সাইগোর আদালতে কি-একটা অপরাধে অপরাধী একজন ভারতবাসীর বিচার চলিতেছিল ; বিচারক কমিকান্ মেজিষ্ট্রেট, অনভ্যজ্ঞানে সেইভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করায়, সে উত্তর দিয়াছিল :—“তোমাদের দুইশত বৎসর পূর্বে আমবা ফবাসী হইয়াছি ...”

এখানে একরকম ঢাকা শকট দেখা যায়—উটের মত কম্পদ-বিশিষ্ট দুইটা সাদা গকতে টানিয়া লইয়া যায় ; উহাদের অদ্ভুতরকম নিশ্চল লম্বা মুখ। এপ্রদেশের ইহাই একমাত্র যান-বাহন ; উহারা টেলিচারি কিংবা কোনানোরে চড়নদার লইয়া যায়। ঐ দুইটি সবচেয়ে নিকটবর্তী ইঙ্গ-ভারতীয় নগর। সহরের রাস্তার মত, অনেকগুলি চওড়া চওড়া রাস্তা, তালীবনের ভিতর দিয়া আড়া-আড়ি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় সব রাস্তাই মাটির ভিতরে নিমজ্জিত—তাই, আরও আর্জ ও ছায়া-নিবিড়। উহাদের দুই ধারে যে মাটির টিবি আছে, তাহা সুন্দর পাতা-বাহারেও সুন্দর শৈবালে মণ্ডিত। এখানকার ঘননিবিড় অরণ্যের মধ্যে,—“মায়ে” যে সময় একটা বড় নগর ছিল, সেই সময়ে তাহার চারিদিক বেষ্টিত করিয়া যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায় ! চৌদ্দ লুই আমলের ফটকের ভগ্নাবশেষ, টানা-পুলের ভগ্নাবশেষ। ফলতঃ এই উপনিবেশের মধ্যে যাহা কিছু পুরাতন—আজিকার দিনে,—সমস্তই পরিত্যক্ত। আমাদের পাশ্চাত্য নগরদিগের ঞ্চায় উহারও একটা অতীত আছে। উহার পৌরবাসিত শতাব্দীর স্মৃতিগুলি,—যাহা এক্ষণে উদ্ভিজ্জগামল শব্দ-আচ্ছাদনে আবৃত

হইয়া চির-নিদ্রায় নিমগ্ন,—মনের মধ্যে একটা বিষাদের ভাব আনিয়া দেয়।

পথ-চলুতি লোকেরা বিভিন্ন জাতের, ও বিভিন্ন বর্ণের ; কেহ কেহ শুধু শ্যামবর্ণ ; তাদের বড় বড় চোখের সাদাটায় একটু নীলিমার আভা দেখা যায় ; আর কতকগুলি লোক প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, মুখে একটা বুনো ভাব ; কিন্তু তারাও দেখিতে সুশ্রী,—সেই অতুলনীয় ভারতীয় সৌন্দর্য্য তাহাদের মুখেও লক্ষিত হয়। এই দেখ কতকগুলি লোক (নিশ্চয়ই দেশের গণ্যমান্য) যুরোপীয় পোষাক-পরা ; আমরা যখন তাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তাহারা একটু টিমা চালে চলিতে লাগিল—শিশুদের মত তাহাদের ভাবটা এই যে—আমরা তাহাদিগকে একবার চাহিয়া দেখি। কিন্তু হুঃখের বিষয় ঐ পোষাকে উহাদিগকে আদৌ মানাইতেছিল না। বিশেষত স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সাজসজ্জা করিয়াছিল, তাহা দেখিলে না হাসিয়া থাকি যায় না ; কিন্তু তাহাদের যে সুন্দর চোখের দৃষ্টি—সেই দৃষ্টির খাতিবে আমরা হাঙ্গুল সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—এবং আমাদের মনে হইল যেন আমাদের যাত্রা-পথে কতকগুলি রহস্যময় অন্ধকাবের ফুল বুড়াইয়া পাইলাম। সেই চিরস্তন-সবুজ তালীবন-মণ্ডপের ছায়া-তলে দেশীয় লোকদের গৃহ ; গৃহের চারিদিকে কলাগাছ, পুষ্পিত “লান্তানা”, লাল “হিরিস্কম্” ;—যে-সকল উদ্ভিজ্জ কোন উদ্যানকে মনোমুগ্ধকর করিতে পারে, তাহা সমস্তই আছে। এই ছোট-ছোট গৃহের সাদা দেওয়াল, শার্মি হীন জানালা,—চওড়া-চওড়া গরাদে দিয়া বন্ধ ; নিবিড় শাখাপল্লবের দরণ গৃহের ভিতরটা অতি কষ্টে দেখা যায় ; ভিতরটা নগ্ন ও প্রায় খালি। কিন্তু সব সময়েই একটা টেবিলের উপর একটা ঝিনুকেব দোয়াৎ ও কতকগুলি কাগজ থাকে ;—সেইখানে বসিয়া উহারা লেখে—কতকগুলি সাদামাটা চলুতি বিষয়ের কথা ; কিন্তু সেই কথার পুরাতন শব্দগুলি পৃথিবীর আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; এবং আমাদের পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের মূল অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা এক্ষণে উহার অনুশীলনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

...দিবস চলিয়া যাইতেছে, দিনের আলো স্পষ্ট নাহিয়া পড়িয়াছে। এখনো কিছু স্বর্ণরাশি ইতস্তত তালগাছের মাথায় গড়াইয়া চলিয়াছে ; ভাহার পর এই শেষ প্রতিবিম্বচ্ছটা যখন নিবিয়া গেল তখন আবার “হরিৎরাত্রি” সর্বত্র ঘনাইয়া আসিল—তখন এই বিজন-সুন্দর তরু-বীথির মধ্যে কেমন একটা বিষাদের ভাব আসিয়া পড়িল। আমার কাছ দিয়া একটি বালিকা চলিয়া গেল—তার গাল দুটি ঈষৎ তাত্রাত, নীল রং-এর যুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছে। তাহার বেরূপ অপ্রচলিত ঢং-এর সাজসজ্জা, ছিপ্‌ছিপে পাতলা গড়ন, কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো চুল, তাহাতে সেকালের উপন্যাসের পীতবর্ণ “ক্রেওল” রমণীদের ভাবটা আমার মনে আসিল,—যেন কোন “ভিজিগী”, যেন কোন “কোরা”। তাই একটা বিষাদময় ত্রুৎসূক্য সহকারে তাহাকে আমি নিবীক্ষণ করিতে

লাগিলাম। এই ভারতীয় বালিকাটি নিশ্চয় খুব পরিব ; কেননা, সে নিবিড় গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, ঘন পল্লবে ঢাকা একটা কুটীরের মধ্যে স্বপ্ন করিয়া পড়িয়া পড়িল এবং লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন সেই বিজন আকাশের নিস্তরুতা ও অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইল ...

পথের আলো ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে ; এই সময় একজন পুরুষ, মৃগ-স্বলভ নিস্তরু লগ্নতা সহকারে, প্রায় আমার গা-ঘেসিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এ আর এক জাতের লোক, আরও আদিম কালের মানব-জাতির কোন এক শাখার লোক। প্রায় নগ্ন, কোমরে ছুরী ঝোলানো, গোর কৃষ্ণবর্ণ, ভালুকের মত শক্ত ঘন লোমে তার বক্ষদেশ আগ্রত। জাহাজের মাস্তুলের চেয়েও লম্বা ও সোজা একটা প্রকাণ্ড তালগাছের কাছে আসিয়া সে থামিল। এবং হাত পা চালাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গাছ বাহিয়া উঠিতে লাগিল—যেন ঐ গাছের উপরে একটা কি জরুরি কাজ রাতারাতি শেষ না করিলে চলিবে না—আশ্চর্য্যকর বানরের মত চটুল লোকটা। এই মধ্যে খুব অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে—এই অন্ধকারে তালীবনের মধ্যে সে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল ...

শেষ গোধূলিতে, আমার ডিক্কিতে উঠিবার জন্য যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম ; তখন কতকগুলি বালক, এক প্রকার ঘাসে-বোনা হাতপাখা, কমলা-লেবু, তীব্রগন্ধী বজনীগন্ধা ফুলের তোড়া বিক্রী করিবার জন্য আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের লম্বা চুল, ঝাঁটা-সাঁটা ধূতি কোমরে জড়ানো।

দাঁড়ের কএক আঘাতেই, আমরা নদীর এই ক্ষুদ্র-নমুনাটিকে অতিক্রম করিয়া, সাগরে আসিয়া পড়িলাম। তখন সমুদ্র আমাদের সম্মুখে হরিৎ-ঝিনুকের বিজনতা মত প্রসারিত হইল—এই ঝিনুকের প্রতিবিম্বচ্ছটা অর্থাৎ পরিবর্তনশীল—প্রতিবিম্বগুলি নিজেই যেন স্বয়ম্প্রভ হইয়া উঠিবে এইরূপ ভাব ধারণ করিল।

যে পুষ্পগুচ্ছগুলি বালকেরা আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, অন্ধকাবে তাহার গন্ধ আরও বেশী তীব্র বলিয়া মনে হইতেছে—অশ্রুত অশ্রুতিকর গন্ধের সহিত ডাক্তার জমি যতই দূরে সরিয়া যাইতেছে ততই এই গন্ধের তীব্রতা আরও অশ্রুত হইতেছে। আমাদের যাত্রাপথে জলের উপর এই রজনীগন্ধার গন্ধ রাখিয়া যাইতেছি।

দিক্‌চক্রবাল,—নিম্নে একটু লাল, তাব পর বেগুনী, তার পর সবুজ, তার পর ইম্পাতের রং, মণ্ডবের রং—এইরূপ ইন্দ্রধনুর স্তবকে স্তবকে রঞ্জিত হইয়াছে। তারাগুলি একরূপ ঝঙ্কঝঙ্ক করিয়া জ্বলিতেছে যে মনে হয় যেন আজ রাত্রে বৃষ্টি উহারা পৃথিবীর পূর্ব নিকটে আসিয়াছে—সেই সীমাবিন্দু পর্য্যন্ত আসিয়াছে, যেখানে অন্তমান সূর্যের স্পষ্ট গোলাপী কিরণচ্ছটা এখনো নীল-গগন-মণ্ডলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এইবার বাত্রি সমাগত—কিন্তু তথাপি যেন আলোক-উৎসবের একটা ঐন্দ্রজালিক আলোকে সর্বত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত

গানের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সাদৃশ্য কোথায় ও পার্থক্য কোথায় সে-বিষয়ে একটু আলোচনা করব। সকলেই জানেন যে যদিও কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে ভাবগ, পার্থক্য অপরিমীম, তথাপি তাদের মধ্যে কোথাও একটু যোগ যেন রয়ে গেছে; কাব্য-জগতের দিক্চক্রবাল যেখানটিতে নিজেকে নিজে অতিক্রম করে' গিয়ে অনন্তকে স্পর্শ করেছে ঠিক সেখানটিতেই সঙ্গীত-লোক সুরু হয়ে অনন্ত ভাব-জগতে প্রসারিত হয়ে গেছে। কাব্যের শক্তির যেখানটিতে শেষ সীমা, সেখানটিতেই সে সঙ্গীত-রাজ্যের পরিধিতে সংলগ্ন হয়ে আছে, কিন্তু কিছুতেই সে ওই পরিধির ভিতরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না। কাব্যশক্তির লক্ষণই হচ্ছে এই যে কাব্য প্রধানত বাকু ও অর্থের সাহায্যে প্রথমে মানসলোকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরে ওই মনোজগতের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ের অল্পভূতিজাত অনন্তরূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে' রূপের অতীত অসীম সৌন্দর্য-লোকের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে; সেখানটিতেই আমাদের মন কাব্যের বচনকে অতিক্রম করে' গিয়ে কাব্যের অনির্কচনীয়তাকে স্পর্শ করে' অগাধ আনন্দের মধ্যে মগ্ন হয়ে সার্থকতা লাভ করে, আর সেখানটিতেই কাব্যের ধ্বনি এবং ছন্দও হিসাবের রাজ্যকে অতিক্রম করে' কেবলি সঙ্গীতের সুর ও লয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার তীব্র আগ্রহে ও আকুলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সঙ্গীত-শক্তির আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া এর প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। সঙ্গীত প্রথমেই কথাকে অতিক্রম করে' গিয়ে মনকে অনির্কচনীয়তার নিবিড় আনন্দস্পর্শে সাফল্য দান করে; পরে কথার ও ভাবের রাজ্যসীমায় এসে পৌঁছে' কথা ও ভাবকে অনির্কচনীয়তা ও অনন্তের মহিমায় স্পন্দিত করে' তোলে এবং কথাকে চিরন্তনতা ও অসীমের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অমরতা দান করে। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাব্যের

গতি বহু কথা ভাব এবং রূপের থেকে অনন্ত অরূপ অনির্কচনীয়তার আনন্দ-জগতের দিকে; কাব্যের গতি সীমা ও বহুত্বের জগৎ থেকে অনন্ত অনির্কচনীয়তার দিকে আরোহণ। কিন্তু সঙ্গীত অনন্ত অনির্কচনীয়তার আনন্দ-জগৎ থেকে সীমা ও রূপের জগৎকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করতে থাকে; সঙ্গীতের গতি কথা ও রূপের জগৎকে অরূপ অনির্কচনীয়তার দিকে উৎকর্ষণ। কাজেই কাব্য চায় সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে' সার্থকতা লাভ করতে, আর সঙ্গীত চায় কাব্যকে আপন অন্তরের অনির্কচনীয় আনন্দে মগ্নিত করে' সার্থকতা দান করতে। এই নিগূঢ় সত্যটিকে আপনার কবিচিত্তে উপলব্ধি করে'ই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

“সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।”

কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক্ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের অন্তর্গত সাদৃশ্যের আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। আমাদের উদ্দেশ্য বাহু গঠনের দিক্ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের রচনা-প্রণালীর সাদৃশ্য ও পার্থক্যের আলোচনা করা; কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোন্ ঐক্য-ভূমিতে পরস্পরের সাযুজ্য লাভ করেছে আমরা সেইটেই দেখতে চেষ্টা করব। প্রথমেই মনে রাখতে হবে গানেই হোক, বা কাব্যেই হোক, ছন্দ-কোনোটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; গানে এবং কাব্যে উভয়েতেই ছন্দ গোণ, মুখ্য-উদ্দেশ্যরূপ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সে সহায়ক বা বাহন মাত্র। কিন্তু যেহেতু কাব্য ও সঙ্গীত কোনো একটি সীমারেখায় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হয়ে থাকলেও তারা স্বরূপত সৌন্দর্য্য-লোকের দুটো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে, সেজন্মে তাদের বাহন ছন্দগুলোও কোনো একটি সামান্য ক্ষেত্রে পরস্পর মিলিত হয়েও দুটো বিভিন্ন পথেই আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। কাব্যে ছন্দের উদ্দেশ্য কাব্যের

কথা ও ভাবকে সৌন্দর্য্যস্বমায় মণ্ডিত করে' কথা ও রূপকে অনির্কচনীয়তা ও অরূপের মধ্যে মুক্তি দেওয়া। গানে ছন্দের উদ্দেশ্য গানের অরূপ নিবিড় আনন্দ-রসকে কথার মধ্যে খরিয়ে দিয়ে মনের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কাব্যের ছন্দের কারুবার প্রধানত কথাকে নিয়ে, কিন্তু কথার অতীত অরূপ অসীমের দিকে তার ব্যঞ্জনা। গানের ছন্দের উদ্দেশ্য কথার অতীতকে আভাসে ইঙ্গিতে মনের গোচরে ফুটিয়ে তোলা, কিন্তু কথার অতীতকে কথার মধ্যেই মূর্তি দান করা তার সাধনা। সহজেই বোঝা যাচ্ছে যেহেতু কথার অতীত স্বরকে ফুটিয়ে তোলাই গানের ছন্দের প্রতিজ্ঞা, সেজন্মেই গানের ছন্দের সাধনা কাব্যের ছন্দের চাইতে ঢের বেশি বৃহত্তর ও মহত্তর। কথাকে একটা বিশেষ ভাবে হুলিয়ে দিয়ে তার ভিতরকার ভাবকে বাক্যত করে' অনির্কচনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে' দেওয়াই কাব্যের ছন্দের কাজ; কিন্তু গানের ছন্দকে স্বরের সূক্ষ্মতম ধ্বনিস্পন্দনকেও যথাযথরূপে মুক্তি দিয়ে অথচ আকৃষ্ট করে' মনের পরিধির মধ্যে এনে পৌঁছিয়ে দিতে হয়। সূত্রাং গানের ছন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, এমন কি সঙ্গীতের স্বরের যথার্থ স্বরূপটিকে বিশ্লেষণের বা হিসাবের সীমার মধ্যে আনা অসম্ভব বললেই হয়। কিন্তু কাব্যের ছন্দে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। যদিও কাব্যে ছন্দ ধ্বনিকে নব নব বিচিত্র উপায়ে তরঙ্গিত করে' ভাবকে ওই ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে লীলায়িত করে' মনের স্তরে স্তরে স্পন্দিত করে' তোলে, তথাপি কাব্যে ভাব বা বাগর্থই মুখ্য, ছন্দ বা বাগর্থের বাহন ধ্বনির নিয়ন্ত্রণ-রীতি গৌণ। কথাকে নাড়াচাড়া করে' তার ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই কাব্য-ছন্দের উদ্দেশ্য, এবং এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তার সার্থকতার অবসান। কাজেই কাব্যে ধ্বনির নিয়ামক ছন্দ-শাস্ত্রের পরিধি সংকীর্ণ; ধ্বনিলীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্ত প্রক্রিয়াকে কাল তথা মনের গোচর করা কাব্য-ছন্দের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ছন্দের পরিধি আর ধ্বনিলীলার পরিধি সমায়তন; ধ্বনিলীলার সূক্ষ্মতম থেকে

সর্বপ্রকার প্রকাশকে ফুটিয়ে তোলাতেই গানের ছন্দের সার্থকতা। সূত্রাং গানের ক্ষেত্রে ছন্দশাস্ত্র ও ধ্বনিশাস্ত্র সমপরিদর, এবং সেজন্মেই গীত-ছন্দের বিকাশভঙ্গী এত বিচিত্র ও অফুরন্ত। যা হোক, গীত-ছন্দের এই অফুরন্ত বিকাশভঙ্গীর আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে গানের ছন্দ কাব্য-ছন্দকে প্রথম সোপানেই ছাড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু এই প্রথম সোপানটিতেই একটি অতি ক্ষুদ্রপরিসর সামান্য ভূমিতে এই দুই ছন্দ পরস্পরের সাযুজ্য লাভ করেছে। অথচ ঐ ক্ষুদ্র ভূমিটুকুর মধ্যেও ঐ দু'ছন্দের গতিলীলা কত বিভিন্ন দিকে তাই দেখাতে চেষ্টা করব। গানের ছন্দ স্বরের ক্ষীণতম ও সূক্ষ্মতম আবেগকেও ফুটিয়ে তুলতে চায়, সেজন্মে গীত-ছন্দের বিভাগ উপবিভাগ অনেক এবং তার পারিভাষিক সংজ্ঞাও অল্প নয়। কাব্য-ছন্দের উদ্দেশ্য অত ব্যাপক ও গভীর নয় বলে' তাব বিভাগ ও পারিভাষিক শব্দ গীত-ছন্দের তুলনায় অনেক কম। তথাপি পরস্পরের আংশিক সাদৃশ্য হেতু উভয় শাস্ত্রেই কতকগুলো সামান্য পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়। আমরা এ শব্দগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ এবং উক্ত দু শাস্ত্রে এদের অর্থগত তারতম্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে'ই কাব্য- ও গীত-ছন্দের আলোচনায় নিবৃত্ত হব। কাব্য ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই মাত্রা লয় যতি ও তাল এ ক'টা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়। আমরা একে একে এ ক'টা পরিভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

মাত্রা ও লয়

প্রথমেই মাত্রার কথা বলা প্রয়োজন। কবিতায় মাত্রা শব্দটি খুবই সাধারণ বা স্থূলভাবে ব্যবহৃত হয়; কবিতার মাত্রার খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গানে মাত্রার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন; তিলান্ন ব্যতিক্রমেও গানের স্বরের ধারা বাধা পায়, কাজেই রস-ভঙ্গ হয়। কবিতার ধ্বনিরও কালের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে মাত্রার হিসাব রাখতে হয়; কিন্তু তদুপরি কবিতায় স্থায়িত্ব-ভেদে মাত্রার কোনো প্রকার-ভেদ নেই। কবিতায় সব মাত্রাই এক জাতীয়

ও সমান স্বায়ী। কিন্তু গানে সব মাত্রা সমান ভাবে চলে না, তার গতির বিচিত্র ভঙ্গী ও লীলা আছে। সূত্রাং কবিতার মাত্রা একঘেয়ে ও একরঙা; কিন্তু গানের মাত্রার স্বরূপ বিচিত্র। সেজন্তেই কবিতা গানের তুলনায় অনেকটা একঘেয়ে শুন্তে হয়। এসম্বন্ধে যথাস্থানে আরো দু-একটা কথা আলোচনা করুব। এখন গানের মাত্রা ও কবিতার মাত্রার পার্থক্যটি বিশদ করতে চেষ্টা করুব।

দুটো বিশিষ্ট উপায়ে গানের মাত্রা কবিতার মাত্রা থেকে পার্থক্য ও আভিজাত্য লাভ করে' শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। প্রথমত, কবিতায় অক্ষরগুলোর মাত্রার তারতম্য বিশেষ নেই, সবগুলো অক্ষরই প্রায় একমাত্রায় একভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলে। আমরা আগেই দেখেছি কবিতার অক্ষরগুলো হয় একমাত্রিক নয় দ্বিমাত্রিক হবে; অথবা হবার জো নেই।

†

†

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—

†

তুমি বিচিত্ররূপিণী।—রবীন্দ্রনাথ

এখানে কেবল চিহ্নিত অক্ষরগুলো দ্বিমাত্রিক, বাকি সবগুলো একমাত্রিক। সর্বত্রই এই রকম। কবিতায় কোনো বর্ণের দুয়ের অধিক বা একের কম মাত্রা থাকে না। কিন্তু গানে একেকটি বর্ণ ত্রিমাত্রিক চতুর্মাত্রিক প্রভৃতি বহুমাত্রিক তো হতে পারেই, আবার অল্পদিকে একেকটি বর্ণ অর্ধমাত্রিক সিকিমাত্রিক প্রভৃতি অনেক প্রকার ভগ্নমাত্রিকও হতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই মাত্রাবৈচিত্র্যের ফলে ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত) তরঙ্গিত হয়ে উঠে; মধ্যে মধ্যে দ্বিমাত্রিক বর্ণের অস্তিত্ব-হেতুই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ওরকম গতিভঙ্গীতে ছলে উঠতে পারে, নতুবা এ ছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। উপরের পদ্যাংশটি পড়লেই এর যথার্থ্য উপলব্ধি হবে; শুধু তিনটি গুরু স্বরের প্রভাবেই এ ছন্দের সুরটা কেমন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। ঠিক এই কারণেই গানের সুরপ্রবাহ এমন বিচিত্র উপায়ে নৃত্যপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কবিতায় কোন বর্ণ গুরু এবং

কোন বর্ণ লঘু হবে তা পূর্বে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে বলে' ছন্দ-রচয়িতার স্বাধীনতা কম, কেবল লঘু গুরু বর্ণের সন্নিবেশ-কৌশলের উপরেই তার কৃতিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু গানে মাত্রা-পরিমাণ নির্দেশ করা সম্বন্ধে সুর-রচয়িতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তা ছাড়া তাঁর স্বাধীনতার ক্ষেত্রের পরিসরও খুব বেশি; তিনি সিকি মাত্রা বা তার নীচু থেকে চার মাত্রা বা তার উর্দ্ধেও বিচরণ করতে পারেন। কিন্তু কাব্য-ছন্দ-রচয়িতার শুধু একমাত্রিক এবং দ্বিমাত্রিক বর্ণ নিয়েই কারবার; সূত্রাং তাঁর বিচরণ-ভূমি অতি সংকীর্ণ। কবিতায় একটি বর্ণ এক মাত্রার কম বা দু মাত্রার বেশি হতে পারে না; কিন্তু গানে একটি বর্ণ সিকি-মাত্রিক থেকে বহু-মাত্রিক হতে পারে। সেজন্তেই গানের গতি-বৈচিত্র্য কবিতার চাইতে ঢের বেশী। যেখানে কয়েকটি সিকি-মাত্রিক বর্ণ একত্র হয়েছে সেখানে গানের ধ্বনি-প্রবাহ অত্যন্ত ধরগতি; যেখানে একেকটি বর্ণের পরিমাণ অর্ধমাত্রা, সেখানকার গতি অনেকটা মধুর; আবার যেখানে একেকটি বর্ণই বহু-মাত্রা-ব্যাপী সেখানে সুরের গতি খুব বেশি ধীর এবং গম্ভীর। এইরূপে মাত্রা-বৈচিত্র্যে সুরের গতিবেগ অতি অদ্ভুত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যে-কোনো একটি গানের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখলেই গানের মাত্রা-বৈচিত্র্যের এই অসীম শক্তি ধরা পড়বে। গানে মাত্রা-বৈচিত্র্যের আরেকটি গৌণ ফল প্রতি পাদের অন্তর্গত অক্ষর-সংখ্যার অসমতা। আমরা পূর্বেই দেখেছি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পাদের অক্ষর-সংখ্যা খুবই অনিয়মিত; গুরু স্বরের আধিক্য বা অল্পতা হেতু অক্ষর-সংখ্যা কমে কিংবা বাড়ে।

†

†

স্নিগ্ধ সজল মেঘ-বজ্রল দিবসে

বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রথম ছন্দে দুটো গুরু স্বর অক্ষর-সংখ্যা কমিয়ে তেরো করেছে; দ্বিতীয় ছন্দে ওরকম গুরু স্বর নেই বলে' অক্ষর-সংখ্যা পনেরো। কিন্তু উভয় ছন্দেই মাত্রা-সংখ্যা সমান অর্থাৎ পনেরো। গানের এক

পাদের সঙ্গে আরেক পাদের অক্ষর-সংখ্যার পার্থক্য আরো অনেক বেশি হতে পারে। যেখানে ভগ্ন-মাত্রিক বা অল্প-মাত্রিক বর্ণ বেশি সেখানে অক্ষর-সংখ্যাও বেশী; কিন্তু বহু-মাত্রিক বর্ণের আধিক্যে অক্ষর-সংখ্যা অনেক কমে যায়।

এই তো গেল গানে মাত্রার গুণন-বিষয়ক বা ভগ্নাংশ-বিষয়ক প্রকার-ভেদ। দ্বিতীয় প্রকার ভেদ হচ্ছে মাত্রার স্থায়িত্ব নিয়ে। প্রথমেই মাত্রার সংজ্ঞা নির্দেশ করার সময়েই বলা হয়েছে যে কালের দিক দিয়ে ধ্বনি-পরিমাণের একক বা unitকে মাত্রা বলা হয়। একটি লঘুস্বর বা লঘুস্বরাস্ত্র ব্যঞ্জন বর্ণ (যথা অ,ই, বা ক,খ) উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সে সময়-পরিমাণকে একমাত্রা বলে' অভিহিত করেছি। মাত্রার এ সংজ্ঞা কাব্য ও সঙ্গীত উভয়েই সমভাবে খাটে। এই একমাত্রা-কালের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণকে দু মাত্রা বা তিন মাত্রা, এবং তার অর্ধেক বা সিকি পরিমাণ কালকে অর্ধমাত্রা বা সিকি মাত্রা বলব। গানে দেড়মাত্রা প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে। কিন্তু গানে মাত্রা-পরিমাণের আরো সূক্ষ্ম বিচার করা প্রয়োজন। একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে এক মাত্রা বা মাত্রার একক বলে' অভিহিত করেছি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই মনে সংশয় জাগবে এ সংজ্ঞা ঠিক হল কি না; কেননা একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে কত সময় লাগবে তার তো কোনো স্থিরতা নেই। বস্তুত ওই সংজ্ঞাটি আপেক্ষিক; কারণ, ওটা বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির অথবা একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমি হয়তো এখন রেগে বা অন্য কোনো ব্যস্ততায় খুব দ্রুতগতিতে কথা বলছি আবার হয়তো অন্য সময়ে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে খুব ধীরে ধীরে কথা বলব। সুতরাং আমার কথার এক মাত্রার সময়-পরিমাণের কোনো স্থিরতা নেই,—ব্যস্ততার সময় এক মাত্রার উচ্চারণে যে সময় লাগে, ধীরতার সময় তার পরিমাণ দেড়গুণ কি দ্বিগুণ পর্য্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং মাত্রার কোনো নিরপেক্ষ সংজ্ঞা হল না। যদি বলা যায় যে বিশেষ ব্যস্ততা বা ধীরতা বাদ দিয়ে স্বভাবত অমুক্তোচ্চিত বা অনবসন্ন অবস্থায় আমার

এক বর্ণের উচ্চারণে যে সময় লাগে সেইটেই মাত্রার যথার্থ নিরপেক্ষ পরিমাণ, তথাপি ঠিক হবে না। কারণ, সকল লোকে সমান গতিতে উচ্চারণ করে না; এক বর্ণের উচ্চারণে আমার যে সময় লাগে অন্যের ঠিক সে সময় লাগে না,—কারো বেশি লাগে, কারো কম লাগে। সুতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মাত্রা-পরিমাণ নির্ণয়ের উপায় কি? প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে ওটাকে আরো একটু বিশদ করে' বুঝিয়ে বলা দরকার, কেননা এর উপরেই কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের একটা প্রধান পার্থক্য নির্ভর করে। মনে কর কেউ একটা গান করছে। এখন গানটির প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন মাত্রা-পরিমাণ নির্দেশ করা আছে, কোনোটার সিকি মাত্রা, কোনোটার দেড় দুই তিন বা চার ইত্যাদি। এম্বলে গায়কের দুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত দেখতে হবে যেন গানের আদ্যন্ত সর্বত্র মাত্রার সমতা রক্ষা হয়; অর্থাৎ গানের প্রথমেই এক মাত্রা যতটুকু কাল স্থায়ী হয়েছে গানের শেষ পর্য্যন্ত যেন মাত্রার ওই স্থায়িত্ব-কালের স্থিরতা বা সমতা (uniformity) রক্ষা হয়, এবং ভগ্ন-মাত্রা ও গুণ-মাত্রাগুলোর স্থায়িত্বও যেন এককের স্থায়িত্বের সমানুপাতিক হয়। মাত্রার এই সমতার উপরেই সমগ্র গানটির ধ্বনি-প্রবাহের গতি-সাম্য নির্ভর করে। ধ্বনি-প্রবাহের এই গতি-সাম্যকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে লয় নামে অভিহিত করা হয়। যদি লয় ঠিক না থাকে অর্থাৎ গানের গতি যদি সর্বত্র সমান না হয়ে কোথাও দ্রুত কোথাও বিলম্বিত হয় তবে সঙ্গীতের সমস্ত মাধুর্যই নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বনির এই গতি-সাম্য বা লয়ই সঙ্গীতের মাধুর্যের মূল কারণ। সুতরাং দেখা গেল যে প্রতিমাত্রার স্থায়িত্ব-কাল যথানুপাতে সুনির্দিষ্ট হলেই সমগ্র সঙ্গীতটির লয়ও স্থির হয়ে যায়। এখন আমরা লয়ের এ সংজ্ঞা দিতে পারি যে সঙ্গীতের আদ্যন্ত সর্বত্র মাত্রার কাল-পরিমাণের সমতা বা সমানুপাত রক্ষা করাকেই লয় বলে। দ্বিতীয়ত, মাত্রার সমতা রক্ষা হলে লয় ঠিক থাকে বটে, কিন্তু একটি মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে যাদের কিছুমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে যে শুধু লয় ঠিক থাকলেই

গানের মাধুর্য সম্পূর্ণ রক্ষা হয় না। লয়ের গতিবেগের ক্রমও (rate) নির্দিষ্ট হওয়া দরকার; কোনো গান দ্রুত লয়ে এবং কোনো গান বিলম্বিত লয়ে গীত হলেই ভালো শোনায়। সুতরাং যে গান দ্রুত লয়ে গীত হবে সে গানের মাত্রাও অল্পক্ষণ স্থায়ী হবে, আবার বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হলেই মাত্রার স্থায়িত্ব-বালুরও বৃদ্ধি হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতে মাত্রার কোনো বাধাবোধ স্থায়িত্বকাল নির্দিষ্ট নেই, গান-ভেদে মাত্রা-পরিমাণও বিভিন্ন হয়। সঙ্গীতে ধ্বনিপ্রবাহের এই গতিক্রম বা লয় অনেক প্রকার হতে পারে; কোনো গান দ্রুত লয়ে, কোনো গান অতিদ্রুত, বিলম্বিত, অতিবিলম্বিত, ঈষৎ-বিলম্বিত বা মধ্য লয়ে গাওয়া হয়। কিন্তু এ বিশেষণ-গুলো সবই আপেক্ষিক শব্দ, এগুলো গায়ক বা শ্রোতার ক্ষতিশক্তির উপর নির্ভর করে। আমি যে লয়টিকে

দ্রুত মনে করছি তুমি হয়তো তাকেই মধ্য বা বিলম্বিত মনে করতে পার। সুতরাং গানের লয় বা গতিক্রম বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলে। এ লয় ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। যাতে এ ভিন্নতা না হয়ে সর্বত্র লয়ের সমতা রক্ষা হয় সেজন্তে অনেক সময় মাত্রামাণ (metronome) নামক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়। ওই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মাত্রার স্থায়িত্ব-কাল সুনির্দিষ্ট করা যায়, সুতরাং গানের সর্বত্র গতিসাম্য বা লয় এবং ব্যক্তিনির্কীর্ণশেষে গতিক্রম বা লয়ের প্রকার-ভেদও স্থির থাকে। যাহোক, এবিষয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনা নিষ্পয়োজন। এখন আমরা কবিতায় এই মাত্রা ও লয়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাই দেখতে চেষ্টা করব।

(ক্রমশঃ)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

সম্পাদকের বিপদ

‘গোলক’ কাগজের সম্পাদকের নাম গৌরচরণ বসু। বয়সে প্রবীণ—দাঁড়ি গোপ যে পাকা এবং মেজাজ যে কড়া—এই প্রবীণতার জন্মেই। পাকা সম্পাদক—লেখার মধ্যে ঝাঁজ বেশ থাকে। আর যাকে খোঁচা দেওয়া হয়—তার পেটে খোঁচা বেশ কোঁৎ করে’ লাগে। গৌর-বাবু কাগজখানার জন্মে অনেক পয়সা খরচ করেছেন। এমন একটা সময় গেছে, যখন গৌর-বাবু সমস্ত দিন রাত্রি আপিস এবং প্রেসেই কাটিয়েছেন। গত দু-বছর থেকে কাগজের আয় একটু বেড়েছে—এখন আর গৌর-বাবুকে তত বেশী খাটতে হয় না।

হঠাৎ একটা গোলমাল মাঝখানে এসে পড়ল—যার জন্মে গৌর-বাবুর “গোলকে”র কাটুতি কমে’ গেল। সহরের কে একজন হরি-বাবু আর-একখানা কাগজ বার করল—তার নাম হ’ল “চন্দ্র”। চন্দ্রের দাম গোলকের চেয়ে কম—অথচ গোলকে যে খবর যেমন ভাবে থাকে চন্দ্রেও সেই-সব তেমনি ভাবেই পাওয়া যায়। গৌর-বাবু দেশের বড় বড় সব সহরে লোক রেখে, তাদের মাইনে

দিয়ে নানা খবর আনাতেন। গৌর-বাবুর বড় প্রেস। গৌর-বাবুর আপিসে এবং প্রেসে অনেক লোক দিন রাত্রি খাটে—সব সময় গম্গম করে। গৌর-বাবু দিন রাত কড়া চোখে এবং চটা মেজাজে সব কাজ দেখে বেড়ান। ‘চন্দ্র’-কাগজের প্রেস একটা টিনে-ছাওয়া ঘরে। সেই প্রেসে জন দশেক লোক কাজ করে—প্রেস মাত্র একটা। আপিস আর প্রেস এক জায়গাতেই। হরি-বাবুর প্রেসে এবং আপিসে দিনে কোন কাজ হয় না। যা কাজ হয় কেবল রাত্রে—তাও দশটার পর আরম্ভ হয়। অথচ মজা এমন যে হরি-বাবুর কাগজের কাটুতি গৌর-বাবুর কাগজের চেয়ে কম ত হ’লই না—বরং মাসে মাসে বেশ বেড়েই যেতে লাগল। লোকে দাম কম দিয়ে হরি-বাবুর কাগজে সব খবরই পায়—কাজেই তারা আর ভাল দাম দিয়ে গৌর-বাবুর কাগজ কিনবে কেন।

চন্দ্র-সম্পাদক হরি-বাবু কাগজ বার করবার আগে মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাট্রিন-ইন্সপেক্টার ছিলেন। তার পর তাঁর নামে ঘুস নেবার একটা নালিশ হয়—

তা সেটা নাকি মিথ্যা। তা যা হোক—কর্তারা গরিব হরি-বাবুকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। গৌর-বাবু ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার—তিনি ইচ্ছে করলে নাকি হরি-বাবুকে কাজে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি বললেন—“চোরকে পাবলিক কাজে রাখতে আমার ঘোর আপত্তি আছে।” হরি-বাবু গৌর-বাবুর ওপর চটে’ গেলেন। এবং আর কোথাও কোনো রকম সুবিধে করতে না পেয়ে সম্পাদক হয়ে বসলেন।

হরি-বাবুর কাগজ পড়ে’ সবাই বলতে লাগল—“হরি-বাবুর ল্যাটিন-ইন্সপেক্টরের” কাজ গিয়ে ভালই হয়েছে। ওঁর যে এত বিদ্যে—তা না হলে কেউ কোনো দিন জানতেও পারত না। গৌর-বাবু আবার ওঁকে চোর বলেন কোন্ হিসেবে? গৌর-বাবু ত ডাকাত! আমাদের কাছ থেকে এতদিন দু’পয়সার কাগজের জন্তে চার পয়সা করে’ নিয়েছেন”—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৌর বাবু ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর কাগজের সব খবর হরি-বাবুর কাগজে কেমন করে’ যে যায়—এ তাঁর বুদ্ধির অগম্য বলে’ মনে হল। প্রথম তাঁর মনে হল যে হয়ত তাঁরই কোনো লোক গোপনে চন্দ্র-সম্পাদককে খবর বিক্রি করে। সবাইকে সন্দেহ করতে করতে গৌর-বাবুর এমন অবস্থা হল যে নিজের স্ত্রীকেও তিনি মাঝে মাঝে সন্দেহ করতেন।

রাত্রে একদিন গৌর-বাবু কি একটা খসখস শব্দ শুনতে পেলেন। কান খাড়া করে’ তাঁর মনে হল যে শব্দটা তাঁর দেওয়াল থেকে আসছে।

আস্তে আস্তে তিনি উঠে বসলেন। তার পর শব্দ করে’ লাঠিটা বাগিয়ে ধরে’ দুয়ারের দিকে গেলেন। দুয়ারের কাছে গিয়ে পাশের ঘরের দেওয়ালের কাছে দেখলেন যে কে একজন তাঁর কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। গৌর-বাবুর মনটা হঠাৎ বেজায় খুসী হয়ে উঠল। মনে ভাবলেন—এতদিনে ধরেছি—দাঁড়াও বাবা, আমার ফাইল চুরি করা—হঁ!

তার পর গৌর-বাবু হঠাৎ দুয়ারের শিকল বন্ধ করে’ দিয়ে বাড়ীর অগ্র সবাইকে চীৎকার করে’ ডাকতে আরম্ভ করে’ দিলেন। কাছেই প্রেস এবং আপিস, সবাই ছুটে

এল—ডাঙা এবং আলো নিয়ে। সকলের মুখে খুব একটা উত্তেজনার ভাব এই মনে করে’ যে—এতদিন পরে আসল চোর ধরা পড়লে কর্তা আর-সবাইকে অনাবশ্যক সন্দেহ হতে রেহাই দেবেন।

লোকজন সব এসে পড়লে গৌর-বাবু দুয়ারের দু’পাশে সবাইকে বেশ সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জানালার নীচেও দু’জন করে’ লোক ডাঙা উচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, চোর যদি লাফ দেয় তাকে পিটিয়েই তার দফা সেরে দেবে—হাঁ—এক্কেবারে। কেউ কেউ বলল যে পুলিশ ডেকে আনা ভাল, কারণ চোরটা কোনো রকম শব্দ করছে না, হয়ত তার হাতে পিস্তল আছে। গৌর-বাবু বললেন—চোরকে আগে ধরে’ তার পর পুলিশ ডাকাই ভাল।

গৌর-বাবু তাঁর দু’নলা বন্দুটিকে বাগিয়ে ধরলে পর আস্তে আস্তে দুয়ার খোলা হ’ল। সকলে দেখল ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে সর্ষাঙ্গে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গৌর-বাবু এক লাফে তার কাছে গিয়ে তাকে ঝপাত করে’ জড়িয়ে ধরে’ একদম বাইরে টেনে আনলেন। লোকরা তখন সবাই ডাঙা হাতে চোরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—পাছে সে পালায়। তার পর গৌর-বাবু যেই চোরের মুখের কাপড় জোর করে’ টেনে খুলে দিলেন আর তার মুখে আলো পড়ল, অমনি সবাই হঠাৎ চোঁ-চোঁ দৌড় দিল! গৌর-বাবুর হাতের বন্দুকটা পড়ে’ গেল এবং হঠাৎ তার থেকে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে ছাতের কোণের জলের টবে লাগল এবং টব ফুটো হয়ে গিয়ে তার জল ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে এসে গৌর-বাবুর দাড়ি এবং চুল আধুত করতে লাগল।

গৌর-বাবু উদাসভাবে আপনার ঘরে চলে’ গেলেন।

চোর আর কেউ নয় গৌর-বাবুর বড় ছেলের বউ—রাত্রে ছেলে কাঁদছিল বলে’ একটা মোমবাতি আর দেশলাইয়ের জন্তে শব্দরের ঘরে এসেছিল। ছেড়া কাগজও কিছু নেবার ইচ্ছে ছিল—জালিয়ে ছুধ গরম করবার জন্তে।

এর পর গৌর-বাবু তিন দিন অন্দরে যান মি। পুত্রবধু তবুও বাপের বাড়ী চলে গেল।

গৌর-বাবু এর পর থেকে একটু সাবধান হলেন। সন্দেহ হলেই কিছু করেন না। কিন্তু চেষ্টা যতই করুন না কেন—চোরকে বা হরি-বাবুর কাগজে তাঁর কাগজের সব খবর কেমন করে' যায় এ তিনি কোনো রকমেই ধরতে পারলেন না। তাঁর চটা মেজাজ আরও যেন চটে' উঠতে লাগল। কোনো কারণ নেই সেদিন প্রেসের দারোয়ানকে অনাবশ্যক ঘা-কতক দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। আর একদিন আপিসের গোপাল-বাবুকে সন্দেহ করে' তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। অনেক পুরানো লোক গেল—নতুন লোক এল, তাতে কাজের আরো গোলমাল হতে লাগল—গৌর-বাবুর মেজাজও আরো খারাপ হতে লাগল। শেষে একদিন প্রেসের দেড়ে কালীওয়ালাকে বিশেষ-কিছু-ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করার জন্ত সে গৌর-বাবুর মাথায় একটিন নীল কালী টেলে দিয়ে চলে' গেল।

এদিকে হরি-বাবুর 'চন্দ্রের' কাটুতি বেড়ে চলেছে। গৌর-বাবু এখন আর বাড়ীতে প্রায়ই থাকেন না—প্রেসেই সব সময় থাকেন। তাঁর সামনেই সব কাজ হয়। প্রেসের মধ্যেই লোকজনদের খাবার ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রেসের গেটে খুকুরি কোমরে বেঁধে গুরখা দারোয়ান—কোনো লোক কোনো রকমের কাগজ নিয়ে বাইরে যেতে পারে না—সব গৌর-বাবুকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

তবুও কিছুতেই কিছু হয় না। চন্দ্রের কাটুতি বেশ হতে লাগল—গোলকের অবস্থা ক্রমশ মন্দ হয়েই চলল।

শেষে গৌর-বাবু একদিন করলেন কি—কতকগুলো বিষয়ে ছোট ছোট নোট নিজে লিখলেন। নিজে তাঁর প্রকৃ দেখলেন—নিজের সামনে ম্যাটার প্রেসে চড়ল।

মনে করলেম চন্দ্রকে এবার জব্দ করেছি। পরের দিন দেখলেন যে গোলকের "নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র" ইত্যাদি সবই "চন্দ্র"ও ছাপা হয়েছে।

গৌর-বাবু ভেবে পান না—এ কি রকম করে' হতে পারে। "চন্দ্র" আর "গোলক" একই সঙ্গে বের হয়। কাজেই এ হতে পারে না যে 'চন্দ্র' 'গোলক' থেকে মকল করে।

প্রেসে গৌর-বাবু লোকজনের উপর পাহারা দেবার জন্তে লোক রাখলেন দুজন—এবং নিজে তিনি সেই দুজন লোকের উপর চোখ রাখলেন।

গৌর-বাবু একদিন ছপুর্নে খেতে বাড়ী গেছেন—তাঁর ঘরে তুকেই তিনি দেখলেন যে তাঁর সেজ ছেলে কি-একটা কাগজ পড়ছিল, তাঁকে দেখেই হঠাৎ কাগজ-খানা নিয়ে দৌড় দিল।

গৌর-বাবুর মনে হল পয়সার জন্ত লোকে সবই করতে পারে। ছেলেও বাবার সর্বনাশ করতে পারে। বাবাও যে পারে না তাও নয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে গজেন নিশ্চয়ই তাঁর দেবাজ থেকে কাগজপত্র চুরি করে' চন্দ্র-সম্পাদককে বিক্রি করে। কি করবেন ভাবছেন এমন সময় দেখলেন গজেন তার চটি তাড়াতাড়িতে পরে' যেতে পারে নি। তখন গৌর-বাবু করলেন কি—একটা কবল জড়িয়ে ছুয়ারের অঙ্ককার কোণে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গা ঘামে ভিজ্জে গেল। গজেন আর যেন আসেই না। এই রকম ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। গজেন এদিকে করেছে কি—খানিকক্ষণ বাইরে বেড়িয়ে—“বাবা এতক্ষণে বাইরে গেছেন” মনে করে'—পা টিপে টিপে যেই ঘরে পা দিয়েছে—অমনি তার ঘাড়ে কবল-জড়ানো গৌর-বাবু গিয়ে পড়লেন। গজেন 'বাবা রে' বলে' অজ্ঞান হয়ে পড়ল। গৌর-বাবু তখন কবল ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর সমস্ত গা দিয়ে দরদর করে' ঘাম পড়ছে। রাগে তাঁর চোখ দুটো যেন জলছে। গোলমাল শুনে গৌর-বাবুর স্ত্রী, বড় ছেলে রমেন, মেয়েরা এবং চাকর-বাকর দু-একজন এসে দাঁড়িয়েছে। গৌর-বাবু চৈচিয়ে তাঁর স্ত্রী থাকহরিকে বললেন—তোমার গুণের ছেলের কাণ্ড দেখ—আমার সর্বনাশ এমনি করে'ই করছে—।

থাকহরি বললেন—কি সর্বনাশ? হ্যাঁ—গা, তোমার কি করেছে গজা?

“এই দেখনা কি সর্বনাশ”—বলে'ই গৌর-বাবু গজেনের পকেট থেকে টেনে একটা কাগজ মোড়া অবস্থায় বার করলেন—। কাগজখানা বার করে'ই সোজা করে' ধরে' জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করলেন—।

“প্রাণ-প্রতিম-প্রিয়তম-রাজামণি-ওগো-আমার—” এই-টুকু পড়েই গৌর-বাবু কাগজখানা ফেলে দিয়েই সেখান থেকে চলে’ গেলেন গম্ভীর ভাবে। রমেনের মুখখানা তখন একটা দেখবার জিনিষ। মুখখানায় তখন—ইলেক্‌সনে ইলেক্‌টেড-না-হওয়া-মালসীর মুখের ভাব, বাছুর-মরা গরুর মুখের ভাব, রায়-বাহাদুরের সঙ্গে সাব্‌ডেপুটি-বাবুর কথা না বলার দুঃখ, পরীক্ষায়-ফেল-করা বিড়ি-থেকে লম্বা-টেরীওধালা ছেঁড়া-চটি-পায়ে বকা ছেলের অস্তর-বেদনা ইত্যাদি সবই মেশানো ছিল।

গৌর-বাবু চলে’ যেতেই সে মোড়া কাগজখানা নিয়েই অগ্নি ঘরে চলে’ গেল। যাবার সময় মাটিতে-শোওয়া গজেনকে চোখের চাউনিতে বলে’ গেল—দাঁড়াও, দেখাবো তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে পুরের চিঠি পড়ার মজা—।

চিঠিখানা গৌর-বাবুর বড় পুত্র-বধুর, অর্থাৎ রমেনের স্ত্রীর। গজেনের রোগই ছিল—দাদাকে বৌদি কি লেখে তাই লুকিয়ে পড়া এবং সেই আদর্শে ভবিষ্য প্রেমসীকে চিঠি লেখা শেখা।

গৌর-বাবু এর পর থেকে আরো সাবধান হলেন। প্রেসের মধ্যেই তাঁর আপিস করলেন—এবং যতসব দরকারী কাগজপত্র সব আপিসেই রাখতেন। সন্ধ্য রাত তাঁর প্রায় না ঘুমিয়েই কাটত। যাই একটু তন্দ্রা আসত, অমনি গৌর-বাবুর মনে হত—কে বুকি কাগজপত্র নিয়ে চলে’ যাচ্ছে বাইরে—অমনি তাঁর ঘুম ভেঙে যেত।

ভোর তিনটা—টিপ্‌ টিপ্‌ করে’ বৃষ্টি পড়ছে—গৌর-বাবু তাঁর চেয়ারে চুপ করে’ বসে’ আছেন আর তামাক খাচ্ছেন। প্রেসের লোকরা সব কাজে ব্যস্ত—কারণ আজকাল খুব ভোরেই কাগজ বেরোয়। এমন সময় গৌর-বাবু দেখলেন প্রেসের সামনের রাস্তার ডাষ্টবিন থেকে একটা লোক যা কাগজপত্র পেল সব কুড়িয়ে নিয়ে গেল। গৌর-বাবু মনে করলেন—কোনো গরীব লোক ময়লা কাগজ বেচে দিন গুজরান করে। তাকে দেখে গৌর-বাবুর একটু কষ্টও হল, আহা বেচারী, ভিজ্জে ভিজ্জেই পেট চালাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এই রকম যখন কয়েকদিন উপরো-উপরি গরীব

লোকটাকে দেখলেন, তখন তাঁর মনে কেমন একটা সন্দেহ হল।

কয়েক দিন পরে গৌর-বাবু কতকগুলো সংবাদ নিয়ে তৈরী করলেন। তার দু-একটা নমুনা:—

(১) মহারাজা গজেন্দ্রচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হইবে।

(২) গবর্নর সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন—কারণ জানা যায় নাই।

(৩) জাষ্টিস বোসের হৃদরোগে গত কল্য বৈকালে মৃত্যু হইয়াছে।

(৪) পুলিশ সাহেব, উকিল ভজ্জহরি-বাবুকে কেবল লাখি-মারা নয়, অপমানও করিয়াছেন—এই অজুহাতে পুলিশ সাহেবের নামে নালিশ রুজু হইয়াছে।

(৫) কাল বেলা তিনটার সময় টাউন হলে মিটিং হইবে—মোলানা রম্জান সাহেবের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ হইবে।

(৬) চায়না ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে সহরের প্রসিদ্ধ ধনী রামখেলন কাইয়া দেউলিয়া হইয়াছেন। আজ চায়না ব্যাঙ্ক বেলা তিনটার সময় টাকা-গচ্ছিত-কারীদের শতকরা ১২ করিয়া দিবে।

এই-রকমের আরো নানা রকমের খবর তৈরী ও কম্পোজ করা হল। তার পর প্রুফ দেখা হল। সেই-সমস্ত দেখা-প্রুফ একটু পরে ডাষ্টবিনে ফেলে দেওয়া হল। তার পর কম্পোজ-করা ম্যাটার গৌর-বাবু ভেঙে ফেলতে বললেন। প্রেসের লোকেরা মনে করুল বাবুর মাথার দোষ হয়েছে।

এদিকে কিন্তু আর-একদল লোক অগ্নি ঘরে বসে’ পরের দিন কাগজে যা যাবে সব কম্পোজ করুল। সেই-সমস্ত খবর ইত্যাদির প্রুফ দেখা হয়ে গেলে পর ম্যাটার যখন প্রেসে চড়ল তখন গৌর-বাবু সমস্ত দেখা-প্রুফ নিজের সামনে পুড়িয়ে দিলেন।

সেইদিন রাতে আবার সেই গরীব-বেচারী লোকটা ডাষ্টবিনের কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

যথাসময়ে দুখানা কাগজ বেরল। ফেরিওয়ালারা চারদিকে খুব হৈ চৈ করতে করতে “চন্দ্র” বিক্রি করতে লাগল। সেদিন ‘চন্দ্র’ বেজায় বিক্রি হল।

গৌর-বাবু 'চন্দ্র'খানা হাতে পেয়েই দেখলেন গোলকের কোনো খবরই তাতে নেই। "চন্দ্রে" রয়েছে তাঁর হাতের তৈরী সব নিছক মিথ্যা খবরগুলো।

সেদিনকার "চন্দ্রে" প্রকাশিত খবরগুলো একেবারে বাজে। কারণ—(১) মহারাজা গজেন্দ্রচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হবার কোনো কারণ নেই—এবং কোনো কালেও তা হবে না।

(২) লার্ট সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপার স্বপ্নে হতে পারে, বাস্তবে নয়।

(৩) জাষ্টিস বোস সেদিনও আস্ত বেঁচে আছেন এবং রীতিমত আদালত করছেন।

(৪) ভজ্জহরি-বাবু পুলিশ সাহেবের বন্ধু।

(৫) টাউন হলে কোনো বক্তৃতা হবার কথা নেই, তা ছাড়া মৌলানা রম্জান সাহেবের জেল কোনো কালেও হয় নাই। তার উপর সেবার তিনি খাঁ সাহেবী বক্শিশ পাইয়াছেন।

(৬) চায়না ব্যাক্ ফেল করার কথা একেবারে বাজে।

সেদিন বেলা যত বাড়তে লাগল—হরি-বাবুর আপিসে ততই লোকজনের ভীড় হতে লাগল। কেউ হরি-বাবুকে মারতে চায়, কেউ দাড়ি ছিঁড়তে চায়, কেউ বা তাঁকে জলে চোবাতে চায়। এক একজন মাহুষের আকৃতি, প্রকৃতি এবং ক্রটি এক ঐক রকমের। সকলেই আপন আপন ক্রটি অহুসারে হরি-বাবুর ব্যবস্থা করতে চায়। যাদের নামে বাজে খবর বেরিয়েছিল তারা সবাই মিলে হরি-বাবুকে হেঁই-মারে-কি-তেঁই-মারে।

চীন দেশে চুরিচামারির শাস্তিই হচ্ছে গলায় মস্ত ভারি একটা কাঠের চাকা পরিয়ে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ান। এই চাকাটার সরকারী নাম হচ্ছে ক্যাং। একদিন এক জন চীনাকে এই ক্যাং গলায় দিয়ে রাস্তায় বেড়াতে দেখে তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে—"ব্যাপার কি?" সে বললে—"আরে ভাই, রাস্তায় এক গাছা দড়ি পড়েছিল

এদিকে চায়না-ব্যাকের দরজায় হাজার হাজার লোক জমা হয়ে গেছে—সবাইকার মুখে হাহাকার। ব্যাকের কর্তারা অবাক হয়ে গেলেন এমন ব্যাপার দেখে। তার পর সব ব্যাপার দেখে শুনে লোকজনদের অনেককে টাকা দিয়ে অনেককে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠালেন এবং শেষে পুলিশকেস্ করলেন 'চন্দ্রে'র নামে।

ব্যাপার যখন অনেক দূর গড়িয়েছে—তখন চন্দ্র-আপিসে পুলিশ-সাহেব একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হল। সে অনেক কষ্টে লোকজনের ভীড় ঠেলে হরি-বাবুকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে একেবারে সোজা হাজতে চালান করল।

হরি-বাবুর নামে নালিশ হয়েছে গোটা বারো।

তবে গৌর-বাবু অনেক কষ্টে হরি-বাবুকে জেল থেকে বাঁচালেন। হরি-বাবু প্রেস ইত্যাদি সব বিক্রি করে' অন্য কোথাও চলে' গেলেন। লোকে বলে বিদেশে তিনি সাইকেল্ এবং ষ্টোভ্ মেরামতের দোকান করেছেন।

তা সত্ত্বেও, গৌর-বাবুর আপিসের নিয়ম হল—প্রেসের কোনো রকম কাগজপত্র—প্রফ্ ত দূরের কথা—বাইরে ফেলা হবে না, এবং এর জন্য বিশেষ করে' একজন লোক রাখা হল। তার নাম হচ্ছে হুঁশিয়ার সিং, তাই মাইনে হল সাড়ে ন'টাকা এবং সে দিনবাত্রি একটা খাটিয়ার উপর ঘুমোয় প্রেসের সামনে।

হেমসু চট্টোপাধ্যায়

তাই কুড়িয়ে নেওয়াতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছি।" বন্ধুটি তার ডবল পয়সার মতন গোল গোল ছুটি চোখ বিস্ফারিত করে' বললে—"দেশ দিন দিন অরাজক হল দেখছি—দড়ি নেওয়াতেহ এত কঠিন শাস্তি!" চীনা বললে—"তা ঠিক নয়, তবে দড়িটার একধারে একটা বলদও বাঁধা ছিল কি না।"

শ্রী বীরেশ্বর বাগচী

মুক্তিপ্লাবন

ওমরের খুব নাম-ডাক শুনে গ্রীসের রাজা তাঁর বার্তা নিতে সভা হতে দূত পাঠিয়েছেন। ওমরের সন্ধানে দূত এসে হাজির। রাজপ্রাসাদ নেই, শাস্ত্রী নেই, পুরজনের কলরব নেই; আছে কেবল বিধবাবেশে অসীমপ্রসারিণী মরুস্থলী ও তার মাঝে মাঝে খোশা-গাছ। রাজসদনের চিহ্নই যখন চোখে পড়ল না, তখন বার্তাহর একজন পথের মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ওগো বাছা, ওমর খলিফার ডবন কোথা?” মেয়েটি বলল, “তিনি তো মাঠে ঐ খোশা-তলায় শুয়ে রয়েছেন।” কথা শুনে দূত তো কিছুই ঠাণ্ডা করতে পারলেন না, ভাবলেন, মেয়েটি বুঝিবা ঠাট্টা করল। যা হোক তিনি ঐ গাছটির দিকেই চললেন। খানিকদূর যেতেই দেখেন, গাছতলাতে চেটাইয়ের উপর কে যেন শুয়ে আছে; গায়ে তাঁর ছেঁড়া তালি-দেওয়া কাপড়—ফকীরের বেশ; কিছুতেই তাঁর মনে নিচ্ছে না যে ঐ দরবেশই ওমর খলিফ। তখনও ওমর ঘুমিয়ে আছেন, মূর্তির সে দীনতা ভেদ করে’ কি এক অসামান্য তেজ ফুটে বা’র হচ্ছিল, তাতে তাঁর মত বড় বড় রাজসভাচারী দূতরাজকেও অভিভূত করে’ ফেলল। এমন সময়ে ঘুম থেকে উঠে ওমর নিজ পরিচয় দিলে তাঁর সন্দেহ অপনোদন হ’ল; সামান্যক্ষণ আলাপেই দূত বুঝতে পারলেন কেন সেই দীনতার অবতার সর্বসাধারণের হৃদয়জয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। দরিদ্রাদপি দরিদ্র প্রজার সাথে সমান জীবন কাটিয়ে ভগবানের চরণে ব্যক্তিগত পার্থিব বাসনা সঁপে’ দিয়ে ইস্লামমণি ওমর খলিফ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মন্ত্রে গণতন্ত্রের জীবন্ত মহান্ আদর্শ রেখে গিয়েছেন।

পৃথিবীর আর-এক ধারে আর-এক সময়ে এই-রকম আর-একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এক ছপুর রাতে গণতন্ত্রের অগ্রদূত আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুসন্তান এব্রাহাম লিন্‌কল্‌ন প্রেসিডেন্টের ঘরে নিদ্রিত; এক বৃদ্ধা সে রাতে বিপদে পড়েছে, সে সেই অসময়ে আবেদন নিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘরে এসে হাজির। তিনি

তখনই উঠে বৃদ্ধার বিপদহারের ব্যবস্থা করে’ দিলেন। লিন্‌কল্‌ন বড় পদ পেয়েও আত্মবিশ্বস্ত হননি; তিনি তাঁর কাজ ও চরিত্রের দ্বারা রাজকীয় ক্ষমতার বর্ষ ভেদ করে’ আমেরিকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আপনার জন হয়েছিলেন; যিনি আমেরিকার বিশাল যুক্তরাজ্যের সভাপতি বা কর্ণধার হয়েও নিজেকে জনসাধারণেরই একজন, আর কাজে চিন্তায় ও কথায় নিজেকে সাধারণের সামান্য ভৃত্য জ্ঞান করে’ গৌরব অনুভব করতেন, সেই নরদেবতার চরিত্রগরিমায় ক্ষমতার সিংহাসনে আরুঢ় পশুবলদৃষ্ট কোন্‌ মাহুষের না উচ্চশির স্বতঃই নত হয়?

সমাজজীবনেই বা কি, ব্যক্তির জীবনেই বা কি, আত্মা যতক্ষণ নিজেই নিজের প্রভু হতে না পারছে, ততক্ষণ তার শাস্তি কোথায়? গণতন্ত্র বা Democracy জাতির ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়ার একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা-মূলক প্রয়াস; সজ্জের মধ্য দিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে একটা অধ্যাত্ম আদর্শের দিকে সমাজকে চালানর প্রয়াস মানব-ইতিহাসে সেদিন শুরু হয়েছে মাত্র। গণতন্ত্রই যে সমাজের সকল রোগের ঔষধ, সকল-দুঃখ-অপহারী, এটা আশা করা অসম্ভব: এর বর্তমান অবস্থাতে অন্তায়; গণতন্ত্রের মহান্ উদ্দেশ্য এখনও সকল জায়গায় সফল হয় নি; তাই বলে’ যে এর ভবিষ্যৎ চিত্র আঁধারময় তা বলা বাতুলতামাত্র; সফলতা-বিফলতার মধ্য দিয়েই শেষ বিজয় খুবই সম্ভব ইহারই। প্রাচীন আথেনীয় (গ্রীক) বা আজ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত গণতন্ত্র (Direct Democracy) হ’তে আরম্ভ করে’ (Executive) শাসনপরিষদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ও খর্ব করতে নিত্য-উপায়-উদ্ভাবনশীল নব প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা Representative Democracy (যার আদর্শ হ’ল ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্র) পর্যন্ত সবই সেই প্রয়াসের ইতিহাস।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের উপর অধুনা সাধারণের আস্থা কমে’ আসছে; কারণ প্রতিনিধিরা জাতির সাধারণ ইচ্ছাকে কার্যে ঠিক পরিণত করতে পারেন না; অনেক

সময়ে তাঁদের কাজ জাতির সাধারণ ইচ্ছার বিপরীতগামী হতেও দেখা যায়। সুইজারল্যান্ডের সিধা গণতন্ত্রকে সেজ্ঞা আজকাল অনেকে আদর করছেন। সে দেশ ছোট ছোট ক্যান্টনে বিভক্ত। এই ক্যান্টনগুলিতে মাত্র একটি করে জনসভা আছে, হাউস অব লর্ডসের মত দ্বিতীয় কোন সভা নেই। তবে সখ্যবন্ধে সকল ক্যান্টনের কেন্দ্রস্থানীয় একটি দ্বিতীয় সিনেট সভাও আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ক্যান্টনের লোকেরা প্রকৃতির কোন একটি রম্যস্থানে সকলে সমবেত হয়ে বিরাট সভা করে তাতে কোন নতন আইন তৈয়ারীর প্রস্তাবের জ্ঞা আবেদন করে; একে বলে “ইনিশিয়েটিভ্”; আর দেশের গভর্নমেন্টের গঠন বা Constitution সম্বন্ধে কোন বদল করতে হলে সমগ্র দেশের জনমণ্ডলীর অমুমোদনের জন্য প্রস্তাব তুলতে হয়; একে বলে রেফারেন্ডাম্; আর সর্বসাধারণে একত্র মিলে রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে গভর্নমেন্ট বা মন্ত্রীগণ কোন নীতির অনুসরণ করবেন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাকে “প্লেবিসাইট্” বলে। রাজ্যসম্পর্কীয় ব্যাপারে প্রতিনিধিব সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই মতামত প্রকাশ করাতে বিশেষ অসুবিধা হয় না যদি সমগ্র দেশকে এক-একটি ছোট গণ্ডিতে পরিণত করা যায় ও প্রতি গণ্ডিতে একই সময়ে সভার ব্যবস্থা হয়।

এখন প্রাচীন এথেন্স্ ও আধুনিক সুইজারল্যান্ডের দুই-রকমের সিধা গণতন্ত্রের কথা বলি। এ দুটিকে গণতন্ত্রের নিখুঁত আদর্শ বলে ধরা হয়। এদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এই যে আথেনীয় বা গ্রীক গণতন্ত্রে শান্তি-স্থাপন, যুদ্ধঘোষণা, নৌবিভাগ ও সেনা-রক্ষা, উপনিবেশ সম্পর্কীয় ও আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত রাজকাব্য নির্বাহ বিষয় জনসভায় নিষ্পত্তি হত, আইন তৈয়ারীতে সাধারণ সভার হাত ছিল না। কিন্তু সুইস্ গণতন্ত্রে ঠিক তার উল্টা; আইন প্রণয়নাদি সকলের সমবেত সভাতে হয়; পক্ষান্তরে রাজকার্যনির্বাহবিষয়ে জনসাধারণের প্রভাব তাদৃশ লক্ষিত হয় না—কর্মচারীরা এ বিষয়ে আর আর জনতন্ত্র-শাসিত দেশের কর্মচারী হতে বিভিন্ন ও অধিকতর স্বাধীন। প্রত্যেক গভর্নমেন্টেরই তার মূলনীতির বিপক্ষে অবস্থিত অল্প ঐর্ভাবের দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার স্থায়িত্বের

পক্ষে মঙ্গলজনক, এতে অনুমত মূলনীতির মাত্রা অতিরিক্ত হতে পায় না; যেমন জনতন্ত্রমূলক শাসনের সঙ্গে আমলা-তন্ত্রের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ থাকতে সুইস্ গণতন্ত্রে সমতা রক্ষিত হয়েছে। সুইস্ গণতন্ত্রের পরস্পরবিরোধী নীতির সমন্বয় সাধন ছাড়া তার সফলতার আরও অনেক কারণ আছে; দেশটা ছোট, আর সেই-রকম ছোট ছোট দেশের পক্ষে গণতন্ত্র ভাল; বড় বড় দেশের পক্ষে গণতন্ত্র সফল করতে হলে সেখানে রাষ্ট্রসখ্য নীতির (federal principle) অনুসরণ করতে হয়।

ম্যাকিয়াভেলি, ক্রমো প্রভৃতির মতে বড় বড় দেশের পক্ষে রাজতন্ত্র শাসনই প্রশস্ত; কিন্তু আমরা বলি সেখানে সখ্যবন্ধের প্রয়োগে গণতন্ত্র শাসনও বেশ চালান যেতে পারে; এ নিয়মে সমগ্র দেশকে কতকগুলি ছোট্টে ভাগ করে নিয়ে প্রতি ছোট্টে জনতন্ত্র-শাসিত করতে হয়; ছোট্টগুলি সখ্যবন্ধ বা federationএর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থা।

একতাই বল; এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সখ্যবন্ধ-প্রণালী। সখ্যবন্ধ বা federationএর নিয়ম হচ্ছে এই যে কেন্দ্র, central বা federal গভর্নমেন্টের হাতে যুদ্ধ-ঘোষণা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশরক্ষা, সন্ধি প্রভৃতির মত সমগ্র-দেশ-সম্পর্কীয় ব্যাপার পরিচালনার ক্ষমতা রাখা হয়; আর স্থানীয়, local বা state গভর্নমেন্টের উপর বাকী অনেক মোটা স্থানীয় বিষয় সম্পর্কের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়; এতে স্থানীয় বা local গভর্নমেন্টগুলি প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তাতে কাজও ভাল হয় কেন্দ্র বা central গভর্নমেন্টের কাজ তাদের মধ্যে লাগাম ধরে বসে থাকা ও বিদেশের সঙ্গে কান্ধার রাখা। সখ্যবন্ধ প্রণালীতে ছোট্টগুলির উপর বেশী ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়; যে পর্যন্ত না তারা অন্তের কাজে হস্তক্ষেপ করে সে পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন। এই ছোট্টগুলিতে প্রতিনিধিতন্ত্র আইনসভা, মন্ত্রীসভা ও মন্ত্রীসভার শিরঃস্থানীয় কার্যাব্যক্ষ, গভর্নর বা সভাপতি থাকেন, অর্থাৎ ছোট্ট গভর্নমেন্টগুলিতে এক-একটা স্বতন্ত্র গণতন্ত্রমূলক রাজ্যের সকল রকম আনুষঙ্গিক জিনিস

ও আস্বাব থাকে। সমস্ত ছেটের প্রতিনিধি মিলে কেন্দ্র-গভর্নমেন্টের আইনসভা অর্থাৎ মন্ত্রীসভা ও সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি রাজ্যের কর্মচারীদের পাণ্ডা ; যদিও তিনি ও মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধিদের মধ্য হ'তেই গৃহীত, তথাপি তাঁরা চাকরীজীবী কর্মচারী নন। মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের ব্যাপার প্রায় এই রকমই। কিন্তু কানাডার একটু বিশেষত্ব আছে ; সেখানে ছোট গভর্নমেন্ট, কেন্দ্র বা central গভর্নমেন্ট, আইনসভা মন্ত্রীসভা প্রভৃতি সকলই আছে, কেন্দ্র-গভর্নমেন্টে প্রধান মন্ত্রীও আছেন ; কিন্তু কানাডা তো যুক্তরাজ্যের মত একেবারে মুক্ত নয়, তাই সেখানকার রাষ্ট্রের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্যের নিদর্শনরূপে, কার্যতঃ অধিকন্তু, একজন ব্রিটিশ গভর্নর থাকেন ; ইনি বিশেষ কিছু ক্ষমতা পরিচালন করেন না। সম্প্রতি কানাডাকে আরও একটু স্বাভাব্য দেওয়া হয়েছে ; কানাডা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি করেছে। তা ছাড়া ব্রিটিশ গভর্নর কানাডার পার্লামেন্টের গ্রহণীয় হওয়াও চাই, এমন কথাও উঠেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রজাতন্ত্রেও ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি জনসভার কাজে বাধা দেন না, বা জনসভাতে পাশ-করা কোন আইন তাঁর ভেটো বা নাকচ করার ক্ষমতা থাকলেও তিনি সে ক্ষমতা পরিচালন করেন না, বা করতে সাহস পান না। আর আমাদের শাসন-সংস্কারের ভারতে গভর্নর জেনারেলের ভেটো করার ক্ষমতা এমনই অবাধ ও অপ্রতিহত যে এটা যখন-তখন সম্মিলিত জনমতকে অগ্রাহ করে' কোন নূতন আইন পাশ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাকচ করতে পারে। সেদিন লবণশুল্কের অতিরিক্তির বিষয়ে এটা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। (এই উপনিবেশ-গভর্নমেন্টগুলির অর্ধ-নিজস্ব নিশান আছে ; নিশানে ব্রিটিশ "ইউনিয়ান জ্যাক" ও তার কোলে উপনিবেশিক স্বাধীন পতাকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-শাসন-সংস্কারে ভারতের জ্ঞান একরূপ কোন নিশানের প্রস্তাব নাই)।

প্রজাতন্ত্র গভর্নমেন্টের জননী বিলাতের গভর্নমেন্টের গড়ন (constitution) বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে ; তার আলোচনার স্থান এখানে হবে না।

তবে গভর্নমেন্টের সর্বসর্কা পার্লামেন্ট, মহাসভার কথা একটু বলব। হাউস অব কমন্স ও হাউস অব লর্ডস এই দুইএ মিলিয়ে পার্লামেন্ট বলা হয় ; এরাই আইনের কর্তা। কিন্তু সাধারণতঃ পার্লামেন্ট বলতে লোকে হাউস অব কমন্স ও সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভাই বুঝে। অভিজাত সম্প্রদায় বা লর্ডসদের সভাকে হাউস অব লর্ডস বলে। কমন্স সভায় সাত শতেরও বেশী সভ্য আছে। সারা দেশটা হতে সভ্য নির্বাচন করে' পাঠান হলে কমন্স সভায় যে দলের জনবল বেশী দেখা যায় সেই দলের থেকে সকলের চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে রাজা প্রধানমন্ত্রী দেন। প্রধান মন্ত্রী নিজের সহকর্মী অগাণ্ড বিভাগীয় মন্ত্রীদের নাম রাজসদনে প্রস্তাব করলে সেইমত নিয়োগ হয়। প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর পারিষদেরা রাজ্যের সর্বপ্রধান কার্যকরী সভা (cabinet বা executive) গঠন করেন। তিনি ও তাঁর সভ্য কমন্স সভার কাছে দায়ী ; মন্ত্রীরা সেখানে দলে পুষ্ট ; অগাণ্ড দলের লোক সাধারণতঃ আর-একটা দল পাকিয়ে মন্ত্রীদলের কাজের সমালোচনা করে ; এই সমালোচনা রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যিক। সমালোচনার দলকে গভর্নমেন্টের অপোজিশান বা প্রতিপক্ষ বলে।

পার্লামেন্টে সভ্যেরা কোন নূতন আইনের প্রস্তাব করতে চাইলে সেটা বিলের আকারে কমন্সে তিনবার পড়তে হয়। প্রথম ছবার পড়া হ'লে প্রস্তাবটি সমস্ত হাউস অব কমন্সকে কমিটিতে পরিণত করে' সেখানে তার এক-এক অংশ ধরে' আলোচনা ছাটকাট করা হয় ও ভোটের গ্রাহ্য হলে পর গ্রহণ করা হয়। তার পর একদিন ঐ বিল সমস্ত হাউস অব কমন্সের বিবেচনাধীন থাকে। বিবেচনার শেষে উহা আবার তিনবার কমন্সে পড়া হয়। এর পর বিল লর্ডসে যায় ; সেখানে সর্বসম্মত তিনবার পড়ার মধ্যে কোন পরিবর্তন না হলে রাজকীয় অমুমোদনে আইনে পরিণত হয়। কিন্তু লর্ডস সভা কোন পরিবর্তন প্রস্তাব করলে বিল কমন্সে ফিরে যায়। তখন তার পুনবিবেচনা আরম্ভ হয়। অনেক সময়ে কমন্সে ছবার বিল পড়া হলে সমস্ত হাউসের কমিটিতে তাকে ফেলা

হয় না; কমন্সের অনেকগুলি ষ্ট্যান্ডিং কমিটি আছে; সেগুলি মন্ত্রীদের পক্ষীয় ও সমালোচনাকারী প্রতিপক্ষের লোক নিয়ে গড়া। এ ব্যবস্থাতে হাউস একই সময়ে অনেকগুলি কমিটিতে ভাগ হয়ে অনেক কাজ করতে পারেন; এতে সময় সংক্ষেপ হয়। পার্লামেন্টে বাজেট আলোচনা ও টাকা সরবরাহ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিরা বিভাগীয় মন্ত্রীদের উপর বেশ একটু কর্তৃত্ব করার অবসর পান।

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র তিনটি—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা— অধ্যাত্মরসে সিঞ্চিত হলেই প্রাণময় হয়ে উঠে। আধ্যাত্মিক জীবন তথা অস্থান-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই এগুলির সার্থকতা হয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এযাবৎ যন্ত্র বা পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যে বেশী আবদ্ধ হয়ে পড়াতে, তার আবিষ্কারের দিকেই বেশী ঝোঁকাতে তেমন বিকশিত হতে পারছে না। আর এক কালে প্রাচীতে দরবেশী গণতন্ত্রের মন্ত্র মুসলমানের কাজে ও জীবনে প্রথম কয়েক দিনের অল্প জয়যুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত যত্নাভাবে ও পরবর্তী সময়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ব্যক্তিগত স্বার্থে কলুষিত হওয়াতে তা স্থায়ী হতে পারে নি। সুতরাং ভাবকে ধরে রাখতে হলে তার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্র-পদ্ধতিরও বিশেষ রকম দরকার আছে। তবে নাফল্য বিষয়ে এ দু'এরই বিকাশে সামঞ্জস্য থাকার দরকার; কোনটিই আরটিকে অবহেলা করে আণ্ডয়ান হতে পারে না।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানে রাজশক্তিকে নষ্ট করা নয়; এর মানে হচ্ছে এই যে প্রকৃত রাজ-ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় রাজকার্যনির্বাহকদের (executive) হাত হতে জনসাধারণের হাতে নেওয়া; অবশ্য রাজক্ষমতা জনসাধারণের করতলগত হলে executiveএর যে কাজ থাকবে না তা নয়, executive কর্মচারীরা তখন জনসাধারণের ছন্দানুবর্তন করবেন অর্থাৎ সাধারণের প্রভুভাবে না চলে ভূত্যাভাবে চলবেন। Executiveএর যথেষ্ট ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব হয় কখন? সকলে মিলে যখন দেশের ও

কড়ি রাজস্বের আদায়ে ও ব্যয়ে বেশ একটু কর্তৃত্ব করতে পায়, তখনই গণতন্ত্র খানিকটা সম্ভব হয়। এই অমোঘ অস্ত্র তাদের হাতে থাকতে executive বেশী প্রভুত্ব পেতে পারে না। সমগ্র একটা দেশের লোকসংখ্যা খুব বেশী, এ কারণে ও অল্প কারণে সকলেই কর্তৃত্বের অধিকার প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতে পায় না। পছন্দসই প্রতিনিধি নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত করে তাঁরা তাঁদের সাধারণ ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করেন; যোগ্য প্রতিনিধিরা তাঁদের সভায় বসে আইনকানুন তৈরী ও টাকাকড়ি খরচের ব্যবস্থাদি করেন। রেলওয়ে, স্টীমার-লাইন, নৌবিভাগ, সেনাবিভাগ প্রভৃতির উপর সাধারণের কর্তৃত্ব না থাকলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি অবাধ হতে পায় না; চাঁদপুরের গুলির ব্যাপারে এ কথা সত্যতা উপলব্ধি হয়েছিল। জাতি তার চরিত্রে চিন্তায় ও চলাফেরায় মুক্ত হতে না পারলে স্বাধীনতা প্রকাশের কোন বাহ্যমন্ত্র, এখানে গণতন্ত্র-শাসন, জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না; যন্ত্র কতকটা এ পথের সহায় বটে, কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাসলব্ধ বন্ধন বা মুক্তিই ফলাফল নির্ণয়ে বেশী প্রভাবশালী; তাই গণতন্ত্রের উদ্বোধনে দাসস্থলভ বুদ্ধি ও চিন্তায় প্রাথমিক স্বাভাবিক বা স্বাধীনতালাভ আবশ্যিক; পরে সেই স্বাভাবিক বাস্তবের মধ্যে প্রাণবান্ হয়ে, সত্য হয়ে, রাজনৈতিক সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাভাবিকতা ও সভাসমিতি করার বিষয়ে স্বাধীনতা প্রভৃতিকে আমরা গণতন্ত্রের দান না বলে তার সহায়ক বল; এগুলির আরম্ভ ইংল্যাণ্ডে অভিজাত-সম্প্রদায় বা লর্ডস্দের প্রভাবকালে; তা হলেও এগুলি বিনা গণতন্ত্রের মন্ত্র পূর্ণবিকাশ লাভ করে না। এখানে বিলাতের Habeas Corpus Actএর কথা একটু বলি। Executive বা শাসন-পরিষৎ যে-কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত কারণ বিনা আটক করলে, এই নিয়ম অনুসারে বিচারক Habeas Corpus Writ বা'র করে তাকে খালাস করতে পারেন। বিলাতে এই আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাভাবিকতা কতকটা নিরাপদ করা হয়েছে। দেশব্যাপী অরাজকতা প্রভৃতি দুর্বি-

প্রজাসাধারণের কয়টি অতিসাধারণ অধিকার সাময়িক ভাবে লোপ পায়; Reign of Law বা “ধর্মের দ্বারা দেশশাসন” তখন কিছু সময়ের জন্য শিকেষ তোলার থাকে। অরাজকতা হেতু আইনের এই তিরোভাবকে ইংরেজীতে American Civil Liberty নামক পুস্তকের লেখক লিবার বলেছেন police rule বা পুলিশ-শাসন। তার পর এভাবে martial law বা সাময়িক আইন জারি করে’ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ আইনের চোখে সঙ্গত নয় বলে’ দুর্ঘটনা ঘটান পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে Indemnity Act নামে এক অসাধারণ আইনের আশ্রয় নিতে হয়, এতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী যথেষ্ট-ক্ষমতা-পরিচালনকারী কর্মচারীদের কাজ আইনসঙ্গত করে’ নেওয়া হয়। যদি ঐ আইন পাশ করা না হয় তা হলে ঐ রাজকর্মচারীরা সাধারণ আইনের আমলে ধরা পড়েন। তাঁদের হাতের জলশুদ্ধি করে’ নিতেই এই ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রের সার্থকতা শুধু যন্ত্রের নামেতেই শেষ নয়; গণতন্ত্রের সার্থকতা বাস্তবের প্রাণে, জাতীয় চরিত্রে, রাজনৈতিক জীবনে চলাফেরা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। নিজের দেশের রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জীবনপ্রবাহে বাধা না দিয়ে আত্ম স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী হ’লেই এবং দেশের ও রাজ্যসংক্রান্তবিষয়ে আত্মবোধ হ’লে, আত্ম সাধারণ ইচ্ছার মধ্য দিয়ে কাজে চরিতার্থ ও প্রকটিত হ’লে গণতন্ত্রের অধ্যাত্মতা সফল হয়; আত্মার শুধু বাঁচলেই হ’ল না, সুখে বাঁচা চাই। প্রতি অস্থানে প্রতিষ্ঠানে তার প্রাধান্য স্থ প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, তার ব্যক্তি ও মুক্ত থাকার দরকার; নিজ বাসভূমে জাতীয় আত্মা পরবাসী হ’লে, পিঞ্জরাবদ্ধ থাকলে, বাইরের সঙ্গে অর্থাৎ দেশের বাহ্য অস্থান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে জীবনের সম্বন্ধে মাখামাখিভাবে পূর্ণবিকশিত হয়ে না উঠতে পারলে, সেগুলির সাথে তার আপনা-আপনি ভাবনা জাগলে গণতন্ত্রের বড়াই করা চলে না; এমন প্রাণহীন জিনিস চাঁদের আলোয় জলভ্রমের মত।

ভারত-শাসন-সংস্কারে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার কি ও কতটুকু এখন তার একটু আলোচনা করি।

১৯১৭ খ্রষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট, তারিখে পার্লামেন্টে মাননীয় মন্টেগু সাহেব ব্রিটিশরাজের পক্ষ হতে ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশভারতকে সাম্রাজ্যের অঙ্গবিশেষ বলে’ গণ্য রেখে ক্রমে তাকে প্রজাসাধারণের কাছে দায়িত্ব-মূলক শাসনপ্রণালী দেওয়াই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম লক্ষ্য। এই ঘোষণা অনুসারে প্রথমে প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হয়; ক্রমে সেগুলিকে পূরাপূরি স্বায়ত্তশাসিত করে’ ষ্টেট-গভর্নমেন্টের মত করাই উদ্দেশ্য; আপাততঃ প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলিতে আধা-ব্রিটিশ আধা-দেশীয় করে’ কাজ আরম্ভ হয়েছে।

ব্রিটিশ আধাখানা—গভর্নর ও তাঁর শাসন-পরিষৎ (executive council) দ্বারা গঠিত; তিনি ভারত-সচিবের (Secretary of State) মধ্য দিয়ে বিলাতের পার্লামেন্টের কাছে দায়ী। আর দেশীয় আধাখানা—দেশীয় জনমঞ্জীদের দ্বারা গঠিত; আইন-সভ্যদের মধ্য হতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোক বেছে নিয়ে মন্ত্রীসভা গড়া হয়। আইন-সভার সভ্যরা আবার তাঁদের নির্বাচক জনসাধারণের বা ভোটারদের এক-একটা নির্বাচন-গণ্ডী বা electorate হতে প্রেরিত প্রতিনিধি। তাঁরা এই ভাবে সভাতে তাঁদের কাজের জন্ত দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, নতুবা পরবর্তী নির্বাচনে ভোট পাওয়ার আশা অতি কম থাকে। গভর্নরের শাসন-পরিষৎ (executive council) আর তার সঙ্গে জোড়াদেওয়া দেশী মঞ্জীদের সভা—এ দুয়ের মিলনে হ’ল কতকটা শাদাকালোয় হরিহর-মিলন; প্রমথ-বাবুর “দুইয়ার্কী” নামে এই ইঙ্গিত আছে; বিলাতের ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভা যেমন প্রধান কর্মকর্তা (executive), প্রাদেশিক গভর্নমেন্টে যুগলসভার সভ্যরা—গভর্নমেন্ট-পক্ষীয় হোন আর জনসাধারণের লোক হোন—মোটামুটি হিসাবে ক্যাবিনেটের সভ্যদের মত গভর্নমেন্টের মন্ত্রী।

ক্যাবিনেট-সভ্যের সহকারী সম্পাদক বা আণ্ডার-সেক্রেটারী আছে; তাঁকে পার্লামেন্টারী আণ্ডার-সেক্রেটারী বলা হয়; তিনি ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর দলের লোক ও মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; তিনিও পার্লামেন্টের

নির্বাচিত সভা ; সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক উদীয়মান রাজনৈতিকরাই এই আণ্ডার-সেক্রেটারীর পদ পেয়ে থাকেন ; পাল্লামেন্টারী আণ্ডার-সেক্রেটারীরা ‘মিনিষ্ট্রি’ নামে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় মন্ত্রীসভার সভ্য, তবে তাঁরা ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত নন ; মিনিষ্ট্রি প্রধানতঃ ক্যাবিনেটের সভ্যদের ও এই শ্রেণীর আণ্ডার-সেক্রেটারীদের নিয়ে গড়া ; ক্যাবিনেটের সভ্যেরা শাসন-নীতি নির্ধারণ করেন, মিনিষ্ট্রির অপর সভ্যেরা সেই নীতি অনুসারে কাজ করেন ; সুতরাং পাল্লামেন্টারী আণ্ডার-সেক্রেটারীকে বিভাগের কাজকর্মও কিছু দেখতে শুন্তে হয় ; কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ হ’ল তিনি পাল্লামেন্টের লর্ড্‌স্ বা কমন্স্‌ সভা বা হাউসের সভ্য তাঁর কর্তার (বা ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর) হয়ে সেখানে জবাবদিহি করা । আমাদের ভারত-সচিব (Secretary of State) ক্যাবিনেট সভার সভ্য ; তিনি কমন্সের লোক হলে লর্ড্‌স্‌ বসতে পারেন না । সে-ক্ষেত্রে একজন লর্ড্‌স্‌ সভার সভ্য তাঁর আণ্ডার-সেক্রেটারী বা সহকারী হয়ে সেখানে তাঁর বিভাগের জ্ঞ জবাবদিহি করেন । কিন্তু কোন লর্ড্‌ ভারত-সচিব বা তাঁর সহকারী হলে তিনি দরকার-মত উভয় সভাতেই বসতে পারেন । পাল্লামেন্টারী আণ্ডার-সেক্রেটারীরা পাল্লামেন্ট্‌ অর্থাৎ স্থায়ী আণ্ডার-সেক্রেটারীদের থেকে বিভিন্ন ; দ্বিতীয়োক্তরা কোন পার্টি বা দলের লোক নন, সুতরাং মন্ত্রীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণীর সহকারীদের পদত্যাগ করতে হয় না ; এঁরা মন্ত্রীদের অধীনে এক এক বিভাগে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারী । ক্যাবিনেটের মন্ত্রীর নিজ নিজ বিভাগের জ্ঞ পাল্লামেন্ট্‌ তথা দেশের কাছে দায়ী ; কিন্তু গভর্নমেন্টের সাধারণ নীতির জ্ঞ তাঁরা সকলে এক যোগে দায়ী ; দ্বিতীয় প্রকারের দায়িত্ব প্রথাই ক্রমে বাড়তে দেখা যাচ্ছে—সেটা কতকটা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একতা রাখার চেষ্টা হ’তেই জাত ।

ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটে ছরকম সভ্য আছেন, এক রকম হলেন কাউন্সিলার (Executive Councillor) আর এক রকম হলেন জনমন্ত্রী (popular

Minister) । প্রথমোক্তরা গভর্নমেন্ট্‌-পক্ষীয় মন্ত্রী, তাঁদের আমরা পারিষদ বসতে পারি । জনমন্ত্রীদের হাতে যে বিভাগগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হ’ল শিক্ষা স্বাস্থ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পল্লীসমিতি শিল্প ও আবগারী । এগুলিকে হস্তান্তরিত (Transferred) বিষয় বলা হয়েছে । আর গভর্নমেন্টের পারিষদদের হাতে যে বিষয়গুলি রইল সেগুলি—আইন বিচার পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগ । এদের রক্ষিত (Reserved) নাম দেওয়া হয়েছে । প্রাদেশিক ক্যাবিনেট বা যুগল-সভাগুলিতে যদি গভর্নমেন্ট্‌-পক্ষীয় অংশে বিলাতী পারিষদ (Councillor) হন একজন, দেশী পারিষদও হবেন একজন ; আর দেশী আধ-খানাতেও মোট পারিষদদের সংখ্যার ‘পাষণ ভাঙতে’ দুজন জনমন্ত্রী নিয়োগ করার চেষ্টা সাধারণতঃ করা হয় ; বর্তমানে বাংলার শাসন পরিষদে (Executive Council) চারজন সভ্য আছেন ; এর মধ্যে দুজন ইংরেজ আর দুজন বাঙালী ; আর জন-মন্ত্রী তিন জন নেওয়া হয়েছে ; গভর্নর পারিষদ ও জনমন্ত্রী-সভা এই দুইএর মাঝামাঝি এবং কার্যতঃ উপরে অধিষ্ঠান করছেন ।

পূর্বেই বলা হয়েছে রক্ষিত (Reserved) বিষয়ের জ্ঞ গভর্নর বিলাতের পাল্লামেন্টের কাছে দায়ী ; যদি কোন রক্ষিত বিষয়ে আইন-সভা টাকা মঞ্জুর না করেন বা কমিয়ে দেন আর তাতে যদি ঐ বিভাগের কার্য-কুশলতার হানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে গভর্নর আইনসভার মতের বিরুদ্ধে টাকা দিতে পারেন । শাসন-সংস্কার আইন বা ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের নির্দেশ অনুসারে এই ক্ষমতা শুধু নামে মাত্র গভর্নরের নেই, তিনি দরকার বুঝলে এর রীতিমত ব্যবহার করতে পারেন । বঙ্গীয় আইন-সভার শীতের অধিবেশনগুলির শেষে গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে সভাসভার ঘোষণাকালে গভর্নর লর্ড্‌ রোনাল্ড্‌শে সংরক্ষিত পুলিশ প্রভৃতি বিভাগে আইন-সভা ২৩ লক্ষ টাকা বাজেটে কমানতে গভর্নরের ক্ষমতার বিষয়ে হুচার কথা বলেন । অবশ্য জনমন্ত্রীদের উপর চ্যুত বিভাগে সভা টাকা না দিলে মন্ত্রীরা যদি বুঝেন যে ঐ টাকার অভাবে তাঁদের বিভাগের কাজ চালান অসম্ভব হবে, তা হলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সভার ঘাড়ে

ফেলে পদত্যাগ কৰতে পাবেন; সভা হতে তখন এমন নূতন মন্ত্ৰী গৃহীত হবেন যিনি সভাৰ কথাযত চলতে ও কাজ চালাতে পাবেন। রক্ষিত বিষয়ে একুপ সম্ভব নয়, কারণ গভৰ্ণৰ সে-সকল বিষয়ে বিলাতে পাৰ্লামেণ্টেৰ কাছে দায়ী, তিনি তো স্থানীয় আইন-সভাৰ কাছে দায়ী নন; তাঁৰ জনমন্ত্ৰীদেৰ মত পদত্যাগেৰ কথাই আস্তে পারে না। হস্তান্তৰিত বিষয়ে তো কথাই নেই, রক্ষিত বিষয়েও আইন-সভাৰ মতকে যতটা বজায় রেখে চলা যায় ততই ভাল ব'লে বোধ হয়। হস্তান্তৰিত ও রক্ষিত বিষয়গত তাবতম্য কম লক্ষিত হ'লেই মঙ্গল।

মন্ত্ৰীদেৰ সংখ্যা বাড়ানতে দেশেৰ লোকেৰ আপত্তি দেখা যায়। তাঁদেৰ আপত্তিব কারণ ব্যয়বাহুল্যেৰ ভয়। অবশ্য মন্ত্ৰীৰ বেতন কম নিলে বা নামে মাত্ৰ নিলে বৰ্তমান খৰচেই খাৰও বেশী মন্ত্ৰীৰ নিয়োগ চলতে পাবে। শাসন-সংস্কাৰে কাউন্সিলাৰ, জনমন্ত্ৰী, সেক্ৰেটাৰী প্ৰভৃতি আস্বাবে ব্যয়বাহুল্য অনিবাৰ্য্য। মন্ত্ৰীৰ সংখ্যা কম হ'লে ক্ষমতাপ্ৰিয়তা বা autocracy ব প্ৰশ্নয় পাওয়াৰ ভয় থাকে। শাসন-পৰিষদে (Executive) মন্ত্ৰী বা সভা যত বেশী থাকে ততই ভাল, অবশ্য খুব বেশী আবার ভাল নয়; কারণ অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়াৰ ভয় থাকে। জনতন্ত্ৰ-শাসনে ব্যয়বাহুল্য একটু হয়েই থাকে। সে জনতন্ত্ৰ প্ৰাণবান্ হ'লে দেশেৰ জন-সাধাৰণেৰ সঙ্গে শাসক-সম্প্ৰদায়েৰ প্ৰাণেৰ মিল ঘটলে উভয় পক্ষেই ভাগ্য এক সূত্ৰে বাঁধা থাকলে লোকে তাঁৰ জন্ত খৰচেব বিলাসিতাটা হাস্তে হাস্তে বঠতে পারে। কানাডা প্ৰভৃতি অগ্ৰাণ স্বশাসিত দেশে মন্ত্ৰীদেৰ সংখ্যা এখানকাৰ চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাঁদেৰ বেতন বেশী নয়।

বাংলাৰ আইন-সভায় ১৪১ জন সভ্য নিৰ্দ্ধাৰিত হয়েছে; তাৰ মধ্যে শতকরা ৭০ জন অৰ্থাৎ প্ৰায় শতাবধি নিৰ্দ্ধাৰিত সভ্য। আইন-সভাৰ সভ্য হিসাবে এখানে বেতনেৰ বন্দোবস্ত নেই; বিলাতে ও কানাডায় তা আছে। ব্ৰহ্মদেশেৰ শাসন-সংস্কাৰে আইন-সভাতে শতকরা ৬০ জন নিৰ্দ্ধাৰিত সভ্য রাখাৰ কথা হয়েছে। বাংলাৰ ন্যায় এত বড় দেশে আইন-সভাৰ জন্ত ১৪১ জন

সভ্য অত্যন্ত কম; জনসংখ্যাহিসাবে গ্ৰেট্-ব্ৰিটেন ও বাংলা প্ৰায় সমান,—গ্ৰেট্-ব্ৰিটেন্ বলতে আয়াবুল্যাণ্ড্কেও বুঝায়; আয়াবুল্যাণ্ড্ পৃথক্ হওয়ার আগে গ্ৰেট্-ব্ৰিটেনেৰ পাৰ্লামেণ্টেৰ কমন্স সভাতে প্ৰায় সাত শত জন সভ্য ছিল; সেখানে ভোট দেওয়ার অধিকাৰ আমাদেৰ এখানকাৰ চেয়ে অনেক বেশী লোকেৰ আছে; আমাদেৰ এখানে জনসংখ্যাৰ তুলনায় ভোটাৰেৰ সংখ্যা কম; ভোটাৰেৰ তুলনায় ব্ৰিটেন্ ও আমাদেৰ বাংলায় নিৰ্দ্ধাৰিত প্ৰতিনিধিৰ অনুপাত কম নয়; বিলাতে ১০,০০০ ভোটাৰেৰ জন্ত একজন সভ্য নিৰ্দ্ধিষ্ট আছে, এখানে ২০০০ ভোটাৰেৰ পক্ষে একজন প্ৰতিনিধি দেওয়া হয়েছে। এখানে মোট ভোটাৰেৰ সংখ্যা কম থাকতে প্ৰতিনিধিও সে অনুপাতে কম; আগল কথা হচ্ছে এই যে ভোটাৰেৰ সংখ্যা আৰও বাড়িয়ে দিয়ে প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা বেশী কৰা উচিত ছিল। প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা বেশী হ'লেই নিৰ্দ্ধাচন-বাপাৰ নিয়ে দেশময় বেশী সাড়া পড়ে' যেত আৰ তাতে প্ৰথম দফা স্বায়ত্তশাসনেৰ একটা প্ৰধান উদ্দেশ্য—যা হচ্ছে জনতন্ত্ৰ-শাসনেৰ মূলতন্ত্ৰ লোকেৰে শিথিয়ে নেওয়া— অধিকতৰ সফল হত।

ৰোড্-সেস্, চৌকীদাৰী ট্যাক্স্ ও মিউনিসিপ্যাল রেটেৰ একটা নিৰ্দ্ধিষ্ট হাৰ দেওয়ার উপৰ ভোটেৰ ক্ষমতা নিৰ্ভৰ কৰে। সাত বছৰেৰ পুরানো গ্ৰ্যাজুয়েট্ ও ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্দ্ধাচনে ভোট দিতে পাবেন। এই ভোট দেওয়ার অধিকাৰ পূৰ্ণোক্ত যে-কোন একটা বিষয় হতেই জন্মে; একাধিক বিষয় হতে এই অধিকাৰ জন্মালেও একাধিক ভোটেৰ অধিকাৰ হয় না; বাংলায় এক-একটা জেলা ধ'ৰে এক একটা নিৰ্দ্ধাচন-গণ্ডী (electorate) গড়া হয়েছে; জনসংখ্যা অনুসাৰে মোটামুটি ভাবে এক-এক জেলা হতে হিন্দু ও মুসলমান প্ৰতিনিধি নিৰ্দ্ধাৰিত হয়েছে। মিণ্টোমলি শাসন-সংস্কাৰে এরকম কিছু ছিল না; সে নিয়মে সাধাৰণ লোকে পল্লীতে ও সকলে সোজাসৃজিভাবে প্ৰতিনিধি নিৰ্দ্ধাচনেৰ অধিকাৰ পায় নি। তখন কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্যবসায়ী সভা প্ৰভৃতি

নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল; সে নির্বাচন-ব্যাপার পর্দার আড়ালেই হয়ে যেত, দেশে তার সাড়া পাওয়া যেত না। বর্তমান শাসন-সংস্কার আইনে চাষী শ্রমজীবী ব্যবসায়ী দোকানী অগ্রাণ্ড ব্যবসায়ের লোক এবং সহরবাসী ও পল্লীবাসী সকলকে আইন-সভার সভ্য নির্বাচনের জন্ত ভোটের অধিকার পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হয়েছে। সত্য কথা বলতে গেলে মিটোমলি সংস্কারের লক্ষ্য ঠিক গণতন্ত্র শাসনের সূত্রপাত করার দিকে ছিল না। গণতন্ত্রের অত্যাশঙ্ক জিনিস নির্বাচন-গণ্ডী (electorate) তখন বাস্তবিক কোন কিছু ছিল না, এখন তা কিছু হয়েছে। এই ইলেক্টরেট বা নির্বাচন-গণ্ডী গণতন্ত্রের অট্টালিকার ভিত্তি। এদেশে শতকরা ৯০ জন কৃষিক্রীবী ও পল্লীবাসী। এদের মধ্যেই নির্বাচন-অধিকারের বহু-প্রসার সমস্তার বিষয় ছিল। লেখাপড়া অনেকেই জানে না, সেজন্য নির্বাচনের অধিকার বা ভোটের ক্ষমতা দিতে লেখাপড়ার কথা ধরা হয় নি। দুদশ জনও যাতে অধিকার পায় সেই মতলবে আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ খুব কমই ধরা হয়েছে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী, মুসলমান সম্প্রদায় ও মাদ্রাজের অত্রাঙ্গদের জন্ত বিশেষ নির্বাচন-বিধির প্রবর্তন করা হয়েছে। সাধারণ নির্বাচন-প্রথায় এই সম্প্রদায়গুলি মনের মত প্রতিনিধি নাও পেতে পারেন—এই আশঙ্কায় এই বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক বা আইন-সভাতে এক জন প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি শাসন-সংস্কারের প্রথম চার বছরের জন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন; এই সভাপতি বিলাতের হাউস অব কমন্সের স্পিকারের মত; তবে স্পিকার সভ্যদের দ্বারা সভ্যদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হন; আমাদের সভার সভাপতি এবারের মত বাইরে হতে গভর্নর কর্তৃক মনোনীত হলেন; ইনিও বেতনভোগী; চার বছর পরের থেকে সভাপতি সভ্যদের মধ্য থেকে সভ্যদের দ্বারাই নির্বাচিত হবেন। তাঁদের এই প্রথম দশায় পার্লামেন্টের কাজ চালানর সম্বন্ধে ভাল-রকম অভিজ্ঞতা ও ধীরতার অভাব হতে পারে—এই আশঙ্কায় যিনি সাবধানতার সঙ্গে কাজ চালাতে পারবেন এমন একজনকে বাইরে হতে বেছে

নেওয়া হয়েছিল। বিলাতে কমন্স সভায় স্পিকারের ক্ষমতা সর্বোপরি; বিভাগীয় মন্ত্রীরাও ঐ সভার সভ্য হলেও সভার মধ্যে তাঁরা স্পিকারের কথা শুন্তে বাধ্য। আমাদের এখানেও সভাপতির ক্ষমতা বেশীই দেওয়া হয়েছে। এখানে এক ডেপুটি সভাপতি সভ্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিলাতের হাউস অব কমন্স সভা, মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্ত যে টাকা চান সে টাকা মঞ্জুর করার আগে, কমিটিতে পরিণত হয়; এই কমিটিতে বাজেট বা দেশের বিভিন্ন বিভাগের খরচের কথা আলোচনা হয়; এ সময় স্পিকার আর সভাপতি থাকেন না, আর-একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়; কিন্তু বাংলার আইন-সভায় এ ব্যবস্থা এখনও হয় নি; সভাকে কমিটিতে পরিণত না করেই বাজেট আলোচনা হয়। বিলাতে হাউস অব কমন্সই টাকা মঞ্জুর করার কর্তা; বাংলার আইন-সভায় কোন কোন বিষয়ে এই নীতি কতকটা চালানর চেষ্টা হচ্ছে।

ভারত-গভর্নমেন্ট যে কয়টা আয়ের বিষয় বাংলা গভর্নমেন্টকে ছেড়ে দিয়েছেন তাতে বাংলার বার্ষিক ব্যয় চলছে না; প্রায় দেড় কোটি টাকার স্বল্পতা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। পার্টের রাজস্ব শুধু বাংলা হতেই আদায় হয়। এতে আয় প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে টাকাটা ভারত-গভর্নমেন্টের রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত বলে' ধরা হচ্ছে। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টে দেশীয় দলের মন্ত্রীদের উপর যে বিভাগগুলির ভার দেওয়া হয়েছে সেগুলির কাজ ভাল চললে দেশে স্বায়ত্তশাসনের পথ খুলে যায়; মরা জাতির ধড়ে জীবন-সঞ্চার করতে হ'লে নিশ্চয়ই প্রথমে শিক্ষা শিল্প ও স্বাস্থ্যের দিকে ঝাঁক দিতে হয়; বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হয়েছে; যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্টবোর্ড ইচ্ছা করলেই কাজ আরম্ভ করতে পারেন; কিন্তু অর্থাত্তাব। শিল্পবিভাগেও উন্নতির জল রেলওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতি হাতে থাকার দরকার। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ শুরু হয়েছিল মাত্র। লর্ড রোনাল্ডশের চেষ্টায় দেশের মধ্যে দু-একটি ছোট জায়গা বেছে

নিয়ে খাল কাটা ও ডোবা বিল ভাট করা হচ্ছিল। এসব বিভাগে কাজ করবার চের আছে; কিন্তু টাকার অভাব এদিকে যত বেশী অল্প দিকে তত নয়। বাংলার মোট আয়ের শতকরা ৩৫-মাত্র ঐ কয়টি বিভাগের জন্য রাখা হয়েছে। বাকী টাকা পুলিশ বিচার প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয়ের জন্য রাখা হয়েছে। যে বিভাগগুলির কার্যতৎপরতার উপর শাসন-সংস্কারের সফলতা বেশী নির্ভর করছে সেগুলিই বিশেষ অভাবগ্রস্ত; ভারত-গভর্নমেন্টের বাজেটেও বেশীর ভাগ টাকা সেনা-বিভাগে দেওয়া হয়েছে। বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। ঋণ গ্রহণ বা নূতন করস্থাপনের দ্বারা এই অর্থের সংগ্রহ হতে পারে; এক্ষেত্রে ঋণই সমীচীন বোধ হয়, তা অদূর ভবিষ্যতে শোধ হওয়ার আশা আছে।

বাংলার আইন সভায় যে-সকল মস্তব্য বা resolution পাশ হবে টাকাকড়ির অবস্থা বা অল্প কোন কোন বিষয়ে বিবেচনা করে' জনমন্ত্রী বা পারিষদ সেগুলি গ্রহণ করতেও পারেন বা নাও পারেন। Reserved বা সংরক্ষিত বিষয়ে পারিষদ বা গভর্নমেন্ট-পক্ষীয় মন্ত্রী মস্তব্য গ্রহণ করতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবেন; অবশ্য transferred বা জনমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে মস্তব্য অপেক্ষাকৃত বেশী গৃহীত হবে আশা করা যায়। মস্তব্য গৃহীত হলেও তা কার্যে পরিণত করা না-করা টাকার অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে টাকা গভর্নমেন্টকে জনসভার কাছে চাইতে হয়। ঐ বাজেট কিছুদিন আলোচনার বিষয়ীভূত থাকে; আলোচনার সময়ে সভ্যেরা suggestion আকারে কোন কোন বিষয়ে মতামত দিতে পারেন; যেমন তাঁরা বলতে পারেন, অমুক বিষয়ে অত না দিয়ে অত দিলে ভাল হত, ইত্যাদি। কিন্তু এই সময়ে দেওয়া suggestion বা মতামত মন্ত্রীর অমুসরণ করতে বাধ্য নয়। তবে এর পর এখন বাজেটে এক-একটা বিষয় ধরে' গভর্নমেন্ট বা মন্ত্রীর নিজ নিজ বিভাগের জন্য টাকা চান তখন প্রতিনিধিরা ঐ-সব বিষয়ে টাকা মঞ্জুর নাও করতে

পারেন বা কম টাকা মঞ্জুর করতে পারেন, স্বতরাং এই অল্প প্রতিনিধিদের হাতে থাকতে মন্ত্রী ও পারিষদেরা সভ্যদের মতামত অল্প সময়েও অগ্রাহ্য করার সাহস খুব বেশী পান না। সভ্যেরা এই অর্থমঞ্জুরের বা money-votingএব সময় খরচ কাটতে ও বাদ দিতে পারেন, কিন্তু বাড়াতে পারেন না, কারণ তা হ'লেই টাকাবাড়ানর প্রশ্ন এসে পড়ে। ভারতীয় আইন-সভায় বাজেটের টা।। মঞ্জুর উপলক্ষ্যে মিঃ নর্টন বিচার-বিভাগ হতে কিছু টাকা কেটে ঐ-টাকায় দিল্লীতে আইন-সভার সভ্যদের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট-পক্ষের উত্তরে বলা হয় যে মিঃ নর্টনের প্রস্তাবটি গভর্নমেন্ট-পক্ষের কেউ করতে পারতেন, কিন্তু আর কোন সাধারণ সভ্য পারেন না। একটা নূতন বিষয়ে টাকা দেওয়ার মানেই এই দাঁড়ায় যে ঐ বিষয়ে একেবারে শূন্য টাকা থেকে অতটা বাড়ান বা ঐ বিষয়ে নূতন টাকা চাওয়া; ঐ টাকা চাইতে কেবল মন্ত্রীরাই পারেন।

বিলাতে পার্লামেন্ট সভা বা হাউস অব কমন্সে সকল মস্তব্য পাশ হলেও গৃহীত নাও হতে পারে। Simultaneous Civil Service পরীক্ষার বিল ১৯০৬ সালে কমন্সে পাশ হলেও গৃহীত হয় নি। বাজেট আলোচনার সময়ে টাকা মঞ্জুরের জন্য ভোট লওয়ার আগে সমস্ত হাউস কমিটিতে পরিণত হয়,—পরামর্শমূলক আলোচনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা। আমাদের প্রাদেশিক সভা ও ভারত-গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভাতেও টাকা মঞ্জুরের জন্য ভোটের ক্ষমতা সভ্যদের দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সভাতে এই ক্ষমতা সংরক্ষিত বিষয়ে রাজ্যরক্ষা শান্তিরক্ষা প্রভৃতির খাতিরে কতকটা সীমাবদ্ধ, জনমন্ত্রীদের হাতে তদুপরি বিষয়ে ততটা সীমাবদ্ধ নয়। প্রাদেশিক সংরক্ষিত বিষয়ে টাকা মঞ্জুরের যে ক্ষমতা সভ্যদের আছে সেই-রকম ক্ষমতা ভারতীয় আইন-সভাকে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সভার জন্য সভ্যদের মধ্যে থেকে গড়া একটি হিসাব-পর্যবেক্ষক-সমিতি মঞ্জুর-করা অর্থের যথাযথ প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

একটা সাধারণ তহবিল হতে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত

বিষয়ে টাকা খরচ করা হবে। প্রতি বছর গভর্নমেন্ট-পক্ষীয় ও জনপক্ষীয় মন্ত্রীরা যুক্ত অধিবেশনে পরামর্শ করে' ঐ টাকা ভাগ করে' নেবেন। জনসাধারণের মন্ত্রী ও গভর্নমেন্টের পারিষদ—এ দুইএর পদমর্যাদা সমান হবে। তবে জনমন্ত্রীদের বেতন-নির্ধারণ আইন-সভা হতে হবে; গভর্নরের বেতন একটা consolidated fund বা পাকা তহবিলের অন্তর্গত থাকবে; তাতে আইন-সভা হাত দিতে পারবেন না। বাজেট আইন-সভায় পাশ হয়ে গেলে গভর্নর ও তার পর ভারত-সচিব (Secretary of State) অমুদ্রিত করলে Ordinance-এর দ্বারা পাশ হতে পারবে।

যদি গভর্নর জনমন্ত্রীর কথা না শুনে তে মন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেন বা পদে থাকতেও পারেন। যদি তিনি পদ না ছাড়েন তে সেটা আইন-সভার সভ্যরা পছন্দ না করলে অনেক উপায়ে তাঁরা তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারেন। এটা নিতান্ত কম ক্ষমতা নয়। দেশের পক্ষে হিতকরী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আইন জনপ্রতিনিধিরাই সভাতে পাশ করবেন; তাঁরা তা না করলে দেশের লোকের আস্থা হারাবেন ও পরবারের নির্বাচনে তাঁদের উপযুক্ত ভোট না পাওয়ারই সম্ভাবনা।

ভারত-গভর্নমেন্ট্ আপাততঃ কেবল পার্লামেন্টের কাছেই দায়ী; জনসাধারণের কাছে দায়িত্ব বলে' কোন কিছু তাঁদের নেই; সুতরাং প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট্-গুলির মত এখানে দু-গরিক হয় নি; জনসাধারণের আধা অংশ - ও ব্রিটিশ-রাজের আধা ভাগ—এ ভাবে ভারত-গভর্নমেন্ট্কে এখনও ভাগা দেওয়া হয় নি। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের হাতে অনেক বিষয় ছেড়ে দেওয়াতে ভারত-গভর্নমেন্টের হাতে যা বাকী আছে তা সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দুভাগে ভাগ না করলেও চলে এই বিবেচনায় প্রাদেশিক নীতি এখানে অনুমত হয় নি। ভাইসরয়ের বা বড়লাটের পরিষদে (Executive Councilএ) তিনজন সরকারী ও তিনজন বেসরকারী দেশী সভ্য আছেন।

ভারতীয় আইন-সভা এখন হতে বরাবর জনসাধা-

রণের নির্বাচিত সভ্যদের দ্বারা গঠিত হবে। Indirect Election বা পরোক্ষ নির্বাচনের সাহায্যে প্রাদেশিক সভাস্তর হতে প্রতিনিধি নিয়ে গড়া হবে না। এ ব্যবস্থা ভাল। এখানে নিম্নসভায় ১৪৪ জন সভ্যের মধ্যে ১০৩ জন নির্বাচিত সভ্য আর মনোনীত সভ্যের এক তৃতীয়াংশ বেসরকারী সভ্য, হওয়া চাই। এই সভার সভাপতি এখন বড়লাট কর্তৃক নির্বাচিত হন। আর এক বছর পরে সভ্যগণই তাঁদের মধ্যে থেকে সভাপতি নির্বাচন করবেন। আর ভারতীয় আইন-সভার উপরিতন সভা হ'ল কতকটা বিলাতের লর্ডস সভার মত। এর নাম কাউন্সিল অব্ স্টেট্। এখানে ৬০ জন সভ্য থাকেন; তার মধ্যে ৩৩ জন নির্বাচিত ও ২৭ জন মনোনীত; এই ২৭ জনের মধ্যে ২০ জনের বেশী সরকারী সভ্য থাকতে পারেন না। এখানে বড়লাট সভাপতিত্ব করতে পারেন না। এই সভাতেও নির্বাচন-নীতি চালান হয়েছে; তা লর্ডসে নেই, সেখানে মাত্র কয়েকজন আইরিশ ও স্কচ পিয়ার বা লর্ড্ অভিজাত বা লর্ড্দের মধ্য হতে গৃহীত হন। উচ্চ ও নিম্ন আইন-সভার এ দুটি ভাগ থাকতে কতকগুলি সুবিধাও আছে। তার মধ্যে একটি সুবিধা এই যে একটি মাত্র সভা হ'ল কর্তা হ'লে তাড়াতাড়ি আইন পাশ হওয়ার যে ভয় থাকে আইন গৃহীত হওয়ার আগে পর পর দুটি সভায় আইন পাশ হওয়ার নিয়ম থাকতে একটু ধীরতার সঙ্গে সকল দিক ভেবে কোন একটা নূতন আইন তৈয়ার হওয়ার বা নূতন কিছু পরিবর্তনের সম্ভব হয়।

নিম্ন ও উচ্চ সভা কোন আইন পাশ করলে তা বড়লাটের অনুমত হলে গৃহীত হয়। এই দুই সভাই বাজেট আলোচনা করতে পারেন। নিম্ন সভাকে বাজেট আলোচনার পর টাকা মঞ্জুরের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; উচ্চ সভাকে তা দেওয়া হয় নি; নিম্ন সভা কোন বিষয়ে টাকা দিতেও পারেন নাও পারেন। এ বিষয়ে তার ক্ষমতা কতকটা হাউস অব্ কমন্সের মত। রাজ্যসংক্রান্ত ঋণের সুদ বেতন পেনশান রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি রক্ষিত (reserved) বিষয় ছাড়া আইন-সভা অল্প সকল বিষয়ে ভোট দিতে পারেন।

ভারত-গভর্নমেন্ট্ তথা ভাইসরয় ভারত-সচিব বা Secretary of State এর কাছে দায়ী। তাঁরা ভারতের জনসাধারণের কাছে দায়ী নন, পূর্বেই বলেছি। ভারত-সচিব বিলাতের পার্লামেন্ট্ মহাসভা তথা বিলাতের জনসাধারণের কাছে দায়ী; তাঁর সভার নাম ইণ্ডিয়া কাউন্সিল। এই সভা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পেনশান-প্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত ছিল। এই কর্মচারী সকলেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ঐ সময়ে ভারতীয় মুসলমান একজন ও হিন্দু একজন সদস্য নেওয়া হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিন জন ভারতবাসীকে ঐ সভার সদস্য করা হয়।

পার্লামেন্টের লর্ডস্ ও কমন্স্ এই দুই সভা হতে সভ্য নিয়ে একটা কমিটি গড়া হয়েছিল। এই কমিটির অনুমোদন অল্পসারে অদূর ভবিষ্যতে তিনের বেশী ভারতীয়কে ভারত সচিবের সভার সভ্য করা স্থির হয়। সভ্যদের কাজ হবে সচিব মহাশয়কে পরামর্শ দেওয়া। যে সকল ক্ষেত্রে আইন-সভাগুলি, বড়নাট ও তাঁহার পারিষদেরা (councillors) একমত, সেখানে ভারতসচিব হস্তক্ষেপ করবেন না। নূতন সংস্কার-আইনে এই ধার্য্য হয়েছে।

সম্প্রতি 'ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) ও গভর্নর জেনারল' এই নাম বদলিয়ে শুধু গভর্নর-জেনারল এই নাম রাখার প্রস্তাব হয়েছে। কারণ সংস্কার-আইনে রাজপ্রতিনিধিত্ব গভর্নর-জেনারল ছাড়া গভর্নরেরও কিছু বর্তায়; তাই গোলমালের হাত এড়ানর জন্তু ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নামটাই তুলে দেওয়ার কথা চলেছে।

এখন দেশে প্রাণবান্ গণতন্ত্রের সৃষ্টি করতে হলে শুধু শাসন-সংস্কারে চলবে না; এই রকম আরও সংস্কার এসে যদি একটা পূরোপুরি স্বায়ত্ত-শাসনের যন্ত্র এনে আমাদের সামনে ফেলে যায় তাতেও প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ হবে না—যদি না আমাদের অন্তরে ও বাইরে সকল কাজে চলা-ফেরার মধ্যে মুক্তির ভাব জাগে। কারণ বাইরে থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারে না, কেবল যন্ত্র দিতে পারে; আবার, আমাদের অন্তরের মুক্তি আপনা হতেই বাইরের সঙ্গে প্রাণের যোগে পূর্ণ-বিকশিত ও প্রফুল্ল হয়; এটা বাস্তবিক ঘটলে আমাদের

প্রাণে প্রাণে হাড়ে হাড়ে মুক্তির হাওয়া বইবে, কাউবে তখন বলে' দিতে হবে না "এই তোমার স্বাতন্ত্র্য, এই তোমার গালো।" স্মরণ্য অধ্যাত্ম গণতন্ত্রের উদ্বোধনের কাজ বেশীর ভাগ আমাদের নিজের মধ্যেই,—আত্মশোধনে, গৃহস্থালী-পরিমার্জনে; আসন পাতা হলেই দেবতা তাতে আপনা হতেই নেমে আসবেন। বাহ্য বিকাশের ভাবনা এখন ভাববার নয়, স্মরণ্য নিজের অন্তর-শোধনে কাবও সঙ্গে ঠোকাঠুকির ভয় থাকে অন্ততঃ উচিত নয়। জাতীয়ভাবে, ব্যাপকভাবে এই মানসিক উন্নয়ন বাহ্যিক বিপ্লব বিনাও শুধু আত্মিক প্রলয়ের মধ্যে দিয়েও সম্ভবে। এখন কান্নাকাটি খুঁটিনাটি ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে সবাইকে কোমর বেঁধে কাজে নামতে হবে; যিনি যে দিক দিয়ে পারেন কাজ করে' যাবেন। দেশের সর্বত্র পল্লীতে নগরে আশার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে; নিজে বিশ্বাসী হয়ে সকলের প্রাণে বিশ্বাস ঢেলে দিতে হবে; সকলের প্রাণে আত্মসম্মান দেশপ্ৰীতি ও দেশের জন্তু গৌরববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে, তাদের বুঝাতে হবে দেশের কাজেই ও সকলের মঙ্গলের মাঝেই ব্যক্তি-বিশেষের মঙ্গলের বীজ নিহিত। লোকে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখে—কি খাওয়াসংস্থানে কি শিল্পবিষয়ে কি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ে তাব ব্যবস্থা করতে হবে। এখনকার উপায় কেবল প্রচারের কাজের মধ্যে। অনবরত দেশের অবস্থা, অগ্ন্যাগ্ন সৌভাগ্যশালী দেশের লোকের অবস্থার খবরাখবর, পৌর-কর্তব্য ও পৌর আদর্শ, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে বহুল আলোচনার দরকার। অগ্ন্যাগ্ন দেশের অবস্থা বিবেচনা তারা যতই করবে ততই তারা নিজের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হিংসা ঘেঁষ ভুলে যাবে ও অপব জাতির তুলনায় তাদের অভাব বুঝতে পেরে আত্মোন্নতিতে তৎপর হবে। এজন্তু সভাসমিতি বক্তৃতা কথকতা বা মুকুন্দ-দাসের যাত্রার মত অভিনয়াদির দ্বারা জনশিক্ষার প্রসার করা যেতে পারে। খবরের কাগজ বর্তমান রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচারের পক্ষে বেশ উপযোগী। এই কাজে নেমে আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবে হাজার উচ্চ ভাব এনে জগৎকে দিলেও তা টেকে না; তার অভাবেই

যেমন চৈতন্যের ভাবময় ধর্মের বিকৃতি এখন ঘটেছে। সেজন্য প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র স্থাপন করে' করে' কাজ করে' যেতে হবে, অর্থাৎ কাজ স্থায়ী করতে গেলে কর্মশৃঙ্খলার organisationএর খুবই দরকার আছে। কৃষক, শ্রমজীবী, শিক্ষক, শিল্পী, সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যেই অর্থাৎ সামাজিক অংশবিশেষগুলির নিজেদের ভিতরেও সজ্জ প্রতিষ্ঠার বহুল প্রয়োজন। এই-সকল সজ্জের যতই প্রতিষ্ঠা হয় ততই রাষ্ট্রীয় মঙ্গল ও শান্তি হয়। কারণ, রাষ্ট্র বা state—ধর্মাধিকরণ, ধর্মসভা, কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি সমাজ-জীবনের কতকগুলি মূল সজ্জ নিয়ে—একটা মহাসজ্জ বই আর কিছুই নয়; সর্বোচ্চ সজ্জ স্টেটের মধ্যে অনেক ছোট ছোট সমাজ বা সজ্জ এইভাবেই লুকিয়ে আছে। এখন সমাজজীবনের জটিলতার সঙ্গে সূজে তার কাজ অবাধ করতে হলে নব নব সজ্জ সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্র বিকশিত করে' তুলতে হবে। সুতরাং সজ্জ-বন্ধনের দ্বারা কাজে আগুয়ান হয়ে চলতে হবে, নইলে কাজ টিকবে না। এই ভাবেই আমাদের জাতীয় আত্মার মুক্তিপ্রাপ্তিকে বাহ্যিক বাধ

দিয়ে রক্ষা করে' বহমান করে' নিয়ে যেতে হবে ও তাকে মত্ততা থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে।

এরকমে সমাজের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিপ্রাপ্তি ফুটে উঠলে জাতীয় আত্মা অপ্রতিহত ও অবাধ হয়। মানুষই এ-যুগের দেবতা; তাকে নিয়েই সব; তাকে চেপে রেখে নয়, তার বিকাশ ও মুক্তি দিয়েই যুগের সকল সাধনার সিদ্ধি; আত্মজ্ঞান ও কর্মে সামঞ্জস্য লাভ করে' সামাজিক মুক্তির ভিতরে চরিতার্থ হওয়াই, নব্যযুগের মানুষের লক্ষ্য। সুতরাং তার জীবনের লক্ষ্য অনুসারেই আসন্ন গণতন্ত্রের সামাজিক যন্ত্রের লক্ষ্য স্থির হবে, জাতি ধর্ম-নির্বিণেষে সকলের অধাত্ম-প্রয়াস সফলের এ-দিনে যুগ যুগায়ত সাধারণ ইচ্ছার পরিণতি করতেই এ-যুগের মানুষ আজ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে নিজ স্থান অধিকার করবেন; তাঁর সুরেই সমাজ-যন্ত্রের সুর বাঁধা হতে যাবে; যন্ত্রের গর্ভে তখন প্রাণের হিলোল খেলে যন্ত্রকে স্পন্দিত বেগবান্ ও প্রাণময় করে' তুলবে; শাসক-শাসিতভাব ধরা হতে মুছে গেলে দরবেশী গণতন্ত্রের ভ্রাতৃত্বপ্রেমে সারা ধরা জাগবে।

শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার

উৎকণ্ঠিতা

(কবীর)

এই বিবশিত তনু মন মোর
যৌবনে ঢল-ঢল—
দিয়েছে আমারে প্রিয়ের বারতা,
তাই চিত চঞ্চল !

পেয়েছি সে লিপি, তাই তাঁর লাগি
মালাখানি গাঁথি' আছি নিশা জাগি ;
মিলন-আশায়, বল, কত কাল
রহিব গো, পথ চাহি !

ওগো অবিনাশী, ওগো প্রিয়তম,
ক্ষয়-ভয় আছে সময়ের মম,—
তোমার ত তাহা নাহি !

হে অনাদি, তব দ্বরা নাহি তাই,
গেলে তব ক্ষণ কোন ক্ষতি নাই ;
নিঃস্ব করি এ যৌবন যাবে,
কেমনে সহিব বল।

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

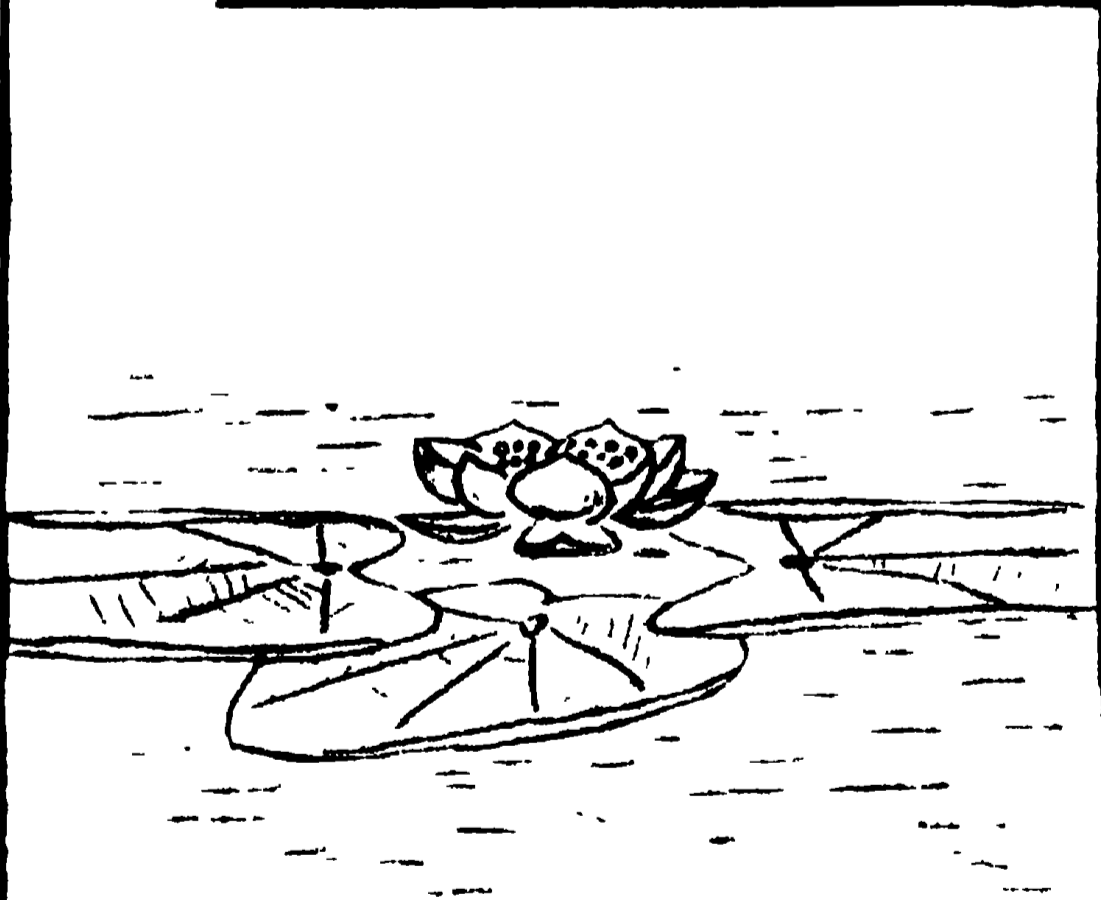
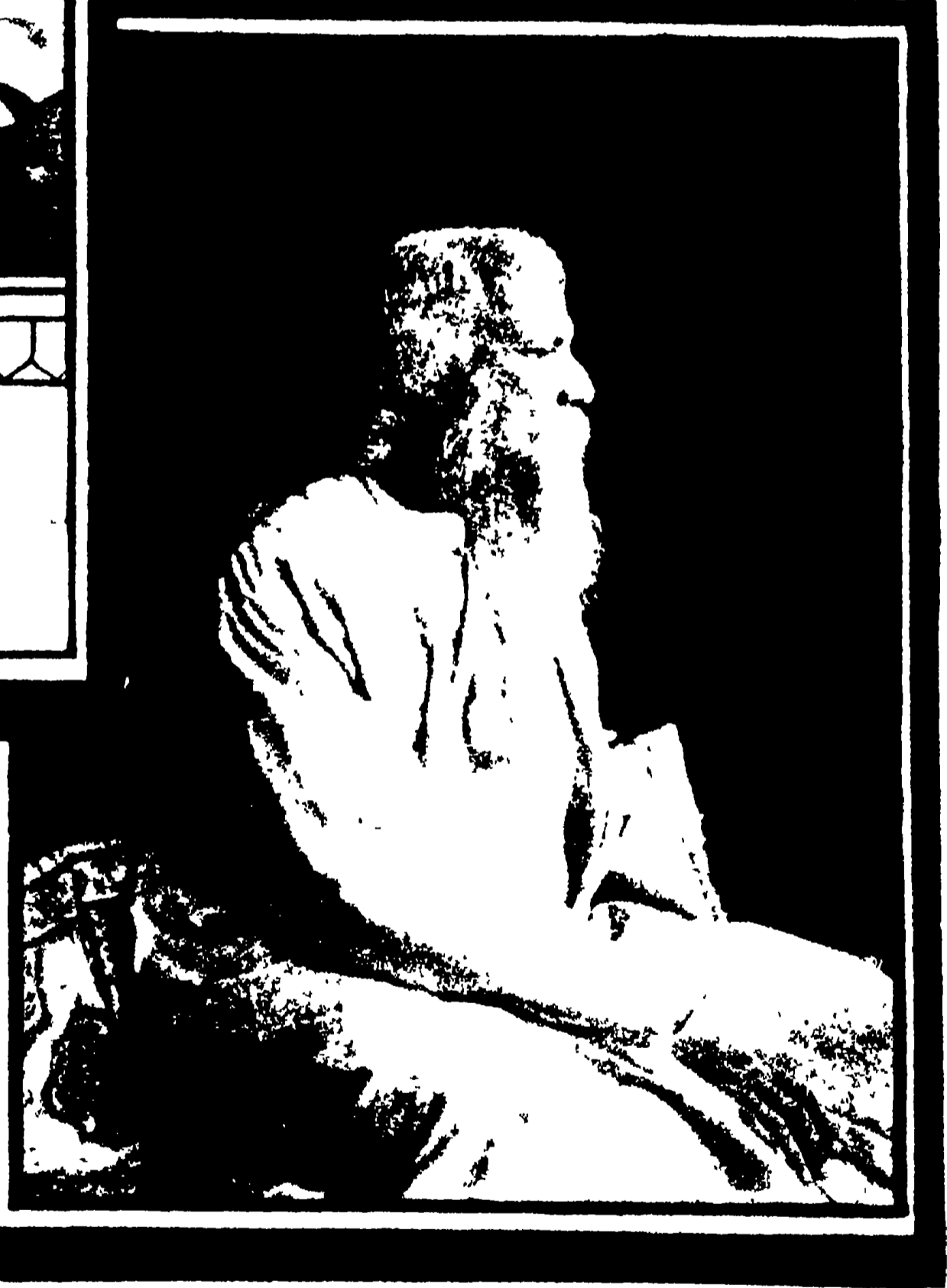
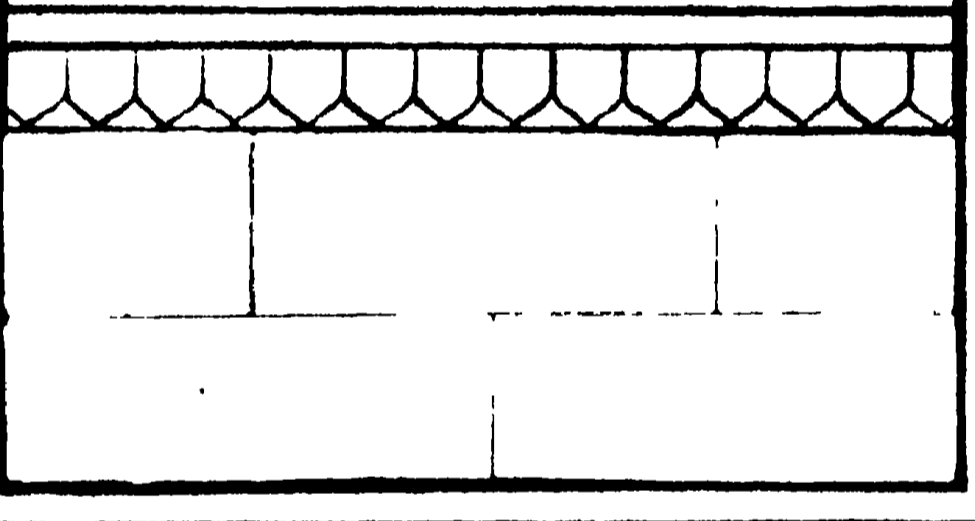
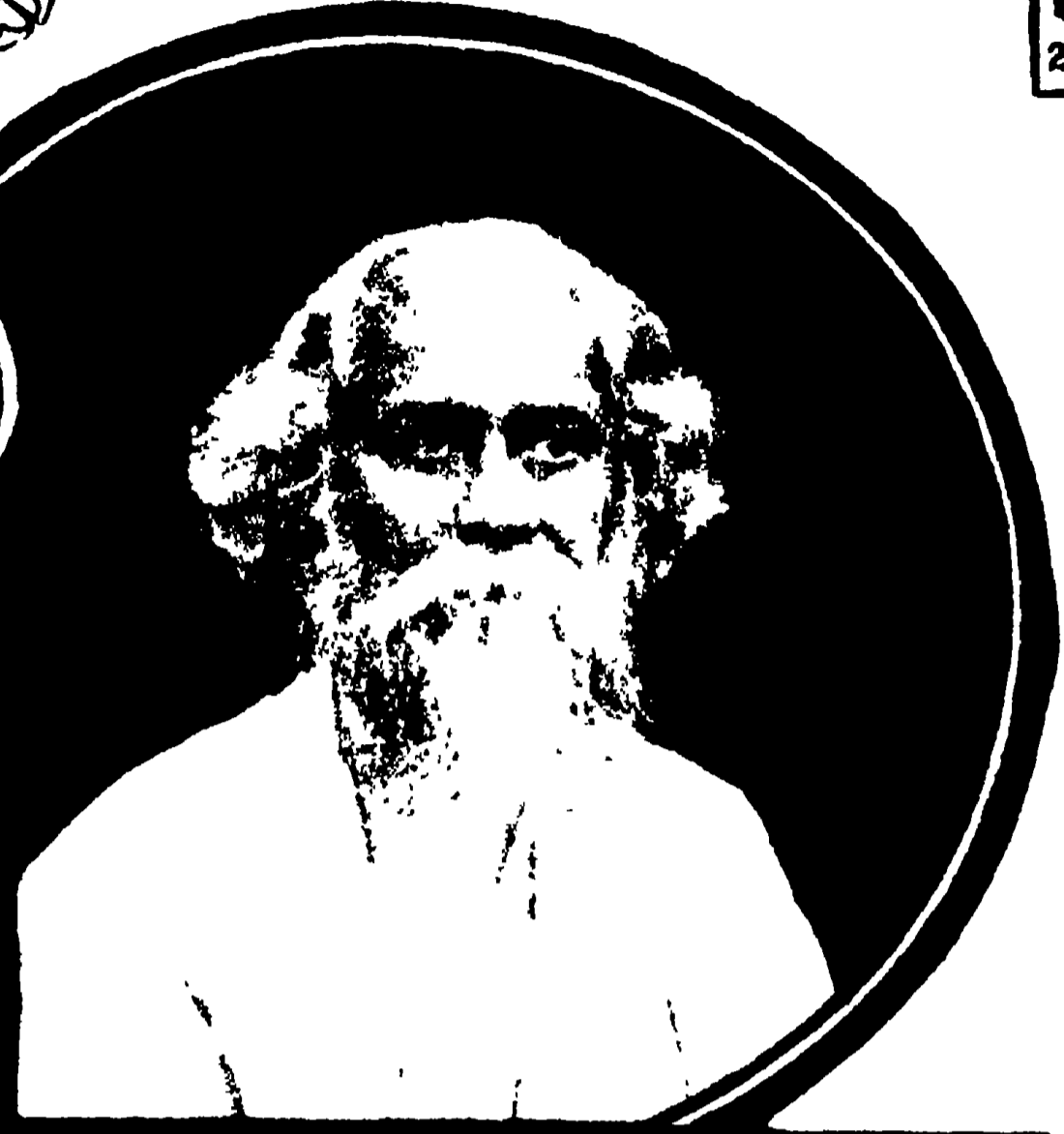
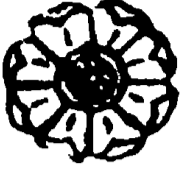
ওয়ান্ট্ হুইটম্যান্

শুভক্ষণে হে মহান্ কবি,
বসি' বসি' একরঙা ছবি
সাজাইলে মানবের মনের গুহায় ;
প্রাণ দিলে, ভাষা দিলে তায়।

অপূর্ব সে সাম্যসাম, অপূর্ব সে আনন্দের গীত।
বিশ্ববাসী হ'ল বিমোহিত।
আনন্দের জয়-ভেরী উঠিল বাজিয়া।
রহিয়া রহিয়া
প্রাণহীন দেগে তার আসিছে আভাস।
তাই মোরা পাই যে আশ্বাস।

তোমার সে গীত যেন বহি-মুখে শিখার মতন।
তোমার সে বাণী যেন প্রলয়ের জীমূত-গর্জন।
বিশ্বেরে জেনেছ সত্য নিজের স্বদেশ,—
নাই হিংসা, নাই কোনো ঘেব।
অকাতরে কুণ্ডাহীন গাহিয়াছ শুধু সাম্য-সাম।
হে গণ-তান্ত্রিক কবি, ভারতের লও গো প্রণাম।

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মহলানবিশের সৌজনে

কবিতা পাঠ



গান

নিশীথ রাতের প্রাণ

কোন সুখা যে চাঁদের আলোর
আজ করেছে পান ॥
মনের সুখে তাই
আজ গোপন কিছু নাই,
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে
সব করেছে দান ।
দখিন হাওয়ায় তার
সব খুলেছে দার ।
তারি নিমন্ত্রণে
আজি ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই
রাত-জাগা মোর গান ॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা
যুধীবনের গন্ধে ভরা ।
কোন ভোলা-দিনের ঝিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি,
ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোমটা-পরা ॥
কেন বিজ্ঞন বাটের পানে
তাকিয়ে আছি কে তা জানে ।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে
আসবে আমার ঘরের পাশে,
বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে
গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা ।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তীর্থ

কালীঘাটে গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো
আদিগঙ্গাকে দেখলাম । তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে । সমুদ্রে আনাগোনার
পথ তার চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে । যখন এই নদীটির ধারা

সঙ্গীত ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট
ইত্যাদি দেশে নিজের বাণিজ্যের সখক বিস্তার করেছিল । এ যেন
মৈত্রীর ধারার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর
করেছিল । তাই এই নদী পুণ্য-নদী বলে গণ্য হয়েছিল । তেমনি
ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদনদী আছে সবগুলি
সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল । কেন? কেননা, এই নদীগুলি
মানুষের সঙ্গে মানুষের সখকস্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল । ছোট ছোট
নদী তো ঢের আছে—তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে, কিন্তু না
আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব । তারা তাদের জলধারার এই
বিখ্যমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি; মানুষের সঙ্গে মানুষের
মিলনে তারা সাহায্য করে নি । সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে
তীর্থদক হ'ল না । যেখান দিয়ে বড় বড় নদী বয়ে গিয়েছে, সেখানে
কত বড় বড় নগর হয়েছে—সে-সব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে ।
এই-সব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায়
গিয়েছে । আমাদের দেশের চতুর্পাশে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান
বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে থাকেন ।
এই গঙ্গাও তেমনি এক সময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে
বিস্তারিত করেছিল, তেমনি আর একদিক দিয়ে সে তার সুধাতৃষ্ণা
দূর করেছিল । সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা ।

তাহলে আমরা দেখলাম এই পবিত্রতা কোথায়? কলাগমর
আহ্বানে ও সুরোগে মানুষ বড় ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে—
আপনার স্বার্থবুদ্ধির গভীর মধ্যে একা একা বন্ধ হয়ে থাকে নি ।
এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা
পবিত্র হ'তে পারে ।

কিন্তু যখন তাব ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল, সমুদ্রের সঙ্গে তার
অবাধ সখক নষ্ট হ'ল, তখন তার গভীরতাও কমে গেল । গঙ্গা
দেখলাম, কিন্তু চিত্র ধূসী হ'ল না । যদিও এখনো লোকে তাকে
শ্রদ্ধা করে সেটা তাদের অভ্যাস মাত্র । জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ
নেই ।

আমাদের ভাবতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে । একসময়
পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান
করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়-সত্যকে লাভ করার
জন্মে এসে মিলেছিল । ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ বা তা সমস্ত
বিশ্ব বিলিয়ে দিয়েছিল । সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন
করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল । গঙ্গা আমাদের
কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হ'ল? তার কারণ, বুদ্ধদেব এখানে তপস্বী
কবেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্বীর ফল, ভারত সমস্ত বিশ্ব বর্টন
করে দিয়েছে । যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর
অমৃত-অন্ন পরিবেষণের ভার না নেয়, তবে গঙ্গাতে আর কিছুমাত্র
পুণ্য অবশিষ্ট নেই । কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝতে হবে তা'

আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড় করতে পারে? না তার মন্দির পারে?

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে—যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না; সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে' যাবার জন্তে, থাকবার জন্তে নয়। যেমন কলকাতার বড়-বাজার—সেখানে এসে শ্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না। সেখানে লাভলোকমানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতার জন্মেছি—সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ী আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে' মনে করতে পারছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেণ্ট দেখে বড় বড় বাড়ী ঘর দেখে তার কি হবে? ওখানে কার আহ্বান আছে? বণিকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে—সেখানে কি হয়? সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে, সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেলাবার জন্তে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

যে জীবনে কোনো বড় প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে-জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে-জীবনের কোন প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে' তার মধ্যে থাকে! কি করে' তারা মনে তৃপ্তি পায়।

(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা

নেপালে গিয়ে শুনলাম কলেজ-লাইব্রেরী আছে, তাতে অনেক পুঁথি আছে। দেখতে গিয়ে দেখি পুঁথি আছে ১৫০০ বৎসব আগেকার, হাতের লেখা। ১৯০৭ সালে রামচরিত পেলাম। রামচরিত ভীষণ বই, ৪ সর্গ, তার প্রত্যেক কবিতায় এক দিকে রামায়ণ আর এক দিকে রামলীলা। কিছুই বোঝা গেল না। খসড়া ঠিক করে' ছাপতে ১০ বৎসর লেগেছে।

এই রামপাল-চরিত বইখানার প্রথম সর্গে ৩৬টি কবিতা আছে, তার তিন পুরুষের ইতিহাস আছে। বিগ্রহ (?) পাল ও তার দুই ছেলে রাজত্ব করেছিল। রামপাল-চরিতে ৫০।৬০ বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়। বোধ হয় একাদশ শতাব্দীতে গৌড়ে খুব প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, ২ জন বড় বড় রাজা ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। একজনের নাম গাঙ্গেয় দেব, আর একজনের নাম কর্ণচন্দী। এঁরা বাঙ্গালার অনেক অংশে বিহার স্থাপন করেছিলেন, বীরভূমেও করেছিলেন, আর আর দেশেও করেছেন। বীরভূমে এঁদের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়, মিথিলায় বহু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। রামপাল কর্ণচন্দীকে তাড়িয়ে দূর করে' দিয়ে সমস্ত দেশ রাজত্ব করেছিলেন। সেজন্ত রামপালকে বলে কলিকালের রাম, সন্ধ্যাকর নন্দী কলিকালের বাণ্মীকি। এই রাজত্বের বিবরণ কতক উৎকীর্ণ লিপিতে, কতক রামপাল-চরিতে পাওয়া যায়, আর কোন জিনিষে পাওয়া যায় না—আর পাওয়া যায় তিব্বতে, তার খানিক ইতিহাস তিব্বত থেকে কশিয়ার, কশিরা থেকে জার্মানিতে, জার্মানি থেকে ইংলণ্ডে গেছে। সে-সকল বই থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। এর থেকে আমাদের ইতিহাস হল। কিন্তু পাল বংশের আইন, ইতিহাস, সাহিত্য

সম্বন্ধে বই আছে; সে বই অধিকাংশ আমাদের দেশে নেই, আছে নেপালে।

নাথদের খুঁজে খুঁজে মূলগ্রন্থ পেলাম, সেখানার নাম “মহাকৌল-জ্ঞানবিনির্গর।” নাথপন্থী যারা আছে তারা একেবারে বৌদ্ধ নয়, এরা কোল। কোল-সম্প্রদায়ের অনেকে শৈব; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভিতরও অনেকে আছে। এই কোল সম্প্রদায়, যাদের আমরা নাথ বলি, তাদের উৎপত্তি চন্দ্রদ্বীপে। চন্দ্রদ্বীপ—বরিশাল জেলা। সেখানে অনেক জেলে ছিল, সে জেলেনের উপাধি ছিল কৈবর্ত কেবট ধীবর। মহাদেব সেখানে আবিভূত হলেন, মহাদেবের স্ত্রী পার্বতী জ্ঞান বিতরণ করেন। জ্ঞান হারিয়ে গেলে—খোঁজ খোঁজ—কোথাও পাওয়া গেল না। অনেক বইতে লেখে জ্ঞান কোলধর্ম। তাই ত জ্ঞান কোণায় গেল? পার্বতী বলেন—অমুক জায়গায় আছে।—তবেই হয়েছে! কার্তিক মেটা সমুদ্রের জলে ফেলেছে। সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল না। বড় বড় মৎসেত্র ধীবর ছিল, তারা জাল পাতল। শেষে একটা মস্ত মাছ ধরা হল। তার পেট চিরে জ্ঞান বের করল। মহাদেব বলেন, জ্ঞান কাউকে দিবে না, কার্তিকও যেন টের না পায়। কিন্তু আবার কার্তিক মেটা জলে ফেলে দিল। এবার খেয়ে ফেল প্রকাণ্ড এক তিমি মাছ। মহাদেব জাল টানলেন, কিন্তু মাছ উঠে না; যে জ্ঞানের বলে মহাদেব হয়েছেন সে জ্ঞান যখন নেই, কি করে' মাছ উঠবে? শেষে পার্বতী মেটাকে উঠালেন। তার পেট থেকে জ্ঞান বেরল। তখন মৎস্যেত্রের দল জ্ঞান পেল। এটা অনেক আগে সপ্তম শতাব্দীর শেষে কি ৮ম শতাব্দীর গোড়ায়। বইখানি একাদশ শতাব্দীর। সুতরাং আমি বুঝি এই, নাথ যারা বলে তারা কোল-ধর্মাবলম্বী শৈব। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুস্থান পাঞ্জাব ও নেপালে অনেক শৈব আছে; কিন্তু এই নাথ-সম্প্রদায় বরিশালের বাইরে কেবল কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে আছে। এই নাথেরা বৌদ্ধ নাথদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মিশে গিয়েছে; সে মিশার থেকে তাদের বাহির করা কঠিন। আমরা ৮৪ জন নাথের উল্লেখ পাই। এই ৮৪ জনের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই আমাদের কোল নাথ, কতকগুলি বৌদ্ধ—বৌদ্ধের আঁর শৈব কতকটা মিলামিলি হয়ে গেছে।—এ হ'ল প্রথম জিনিষ -পালেদের আগে।

তার পর পালেরা উপস্থিত হল। রাজা ধর্মপালের সময় দুই দল হয়েছিল। এই দুইদলে ৭ম শতাব্দীতে ক্রমাগত ঝগড়া কাটাকাটি মরামারি চলছিল। ঝগড়া বেশী হলে যে দল হারল তারা চীন মঙ্গলিয়ায় চলে' গেল। খুব যখন ঝগড়া সে সময় ধর্মপাল বাংলা দেশের, উত্তর ভারতের, রাজা হলেন। তিনি দেখলেন এই ঝগড়া মিটাতে হবে; সেজন্ত চন্দ্রভাগ (?) পণ্ডিতকে ধরলেন। তিনি বলেন, দেখ, এই ঝগড়া মিটিয়ে দেব। অদ্ভুত উপায়ে ঝগড়া মিটালেন। মূল গ্রন্থে বই দুই টীকা ছিল, দুই টীকা একত্রিত করে' তিনি এক টীকা করলেন। সে টীকায় এই ঝগড়া মিটে গেল। কিন্তু আর একটা জিনিষ এসে হাজির হল। এই যে শৈব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, এই শৈব ধর্মের অনেক জিনিষ বৌদ্ধ ধর্মে পাই; প্রথম জিনিষ মহাস্থবাব।

দেশে একজন রাজা ছিলেন, তিনি মহাস্থবাব'এর মধ্যে বজ্রযান মত প্রচার করেন। তাঁর পুত্র সিংহলে ও জামাই তিব্বতে প্রচার করতে গেলেন, মেয়ে দেশে রইল; ছেলে জামাই মেয়ে বজ্রযান পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিল। বজ্রযানের কথা এই—নির্বাণ পেলে কি অবস্থা হবে? বুদ্ধ বলতেন জিজ্ঞাসা ক'র না, তুমি জন্ম জরা মৃত্যু এ বৃত্তে পারলেই নিশ্চিত থাক, তার বাইরে যাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু মন তাতে তৃপ্তি লাভ করল না, ক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে

নাগার্জুন বলেন—শুশ্রূ হয়ে থাকবে। কথাটা মনে গেল বটে, কিন্তু কেউ চায় না শুশ্রূ হয়ে থাকতে; নরকে যাব সেও ভাল, কিন্তু শুশ্রূ থাকতে কেউ রাজী নয়। ফলে আর-একটা মত হ'ল, শুশ্রূ হয়ে থাকবে, কিন্তু জ্ঞান থাকবে। এই মহাত্মবাদ মত এল, আমার জ্ঞানে শুশ্রূই চাই। —আন্তে আন্তে শব্দর এই থেকে নিয়ে মায়বাদ সৃষ্টি করলেন। বৈষ্ণবেরা শব্দকে প্রচ্ছন্ন বোদ্ধ বলে; কিন্তু শব্দর প্রচ্ছন্ন নয়, স্পষ্ট বোদ্ধ ছিলেন।—তখন বজ্রযানের সৃষ্টি হল। স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ধর্ম; ধর্ম সাধনার জন্ত স্ত্রী চাইই।—এই ভাবে ধর্মবিধব চলতে লাগল। বজ্রযান, মহাযান, বেদান্ত ও অগ্নিযান মত হ'ল। এই-সবের একখানা বই আমার কাছে আছে, পূর্ববঙ্গে বিজয় বলে' একজন বোদ্ধ যোগী ছিলেন, তিনি লিখেছেন, ১২২৫ সালে। সে বইএ এই-সব কথা পরিষ্কার লেখা আছে—ধর্মের এই-সব কথা—বোদ্ধদের ধর্ম, আমাদের ধর্ম কি ছিল এই-সব কথা। পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এল। তাদের কতকগুলি লৌকিক আচার বোদ্ধদের ব্যাপারে পরিণত হয়ে উঠেছে। নানা কারণে তারা আমাদের সঙ্গে জড়িত হল, নিজেদের ধর্ম প্রচার করতে লাগল। সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম নয়, সে ধর্ম বৈদিক জিনিষের চেয়ে অনেক ছোট—গৃহস্থালীর ধর্ম; সেটা তারা নিল, নিয়ে বই আরম্ভ করল। আমাদের বা ছিল, তাই সে সব কথা বলে নি, তারা বোদ্ধদের কথা বলেছে, বলা উচিত, কারণ বোদ্ধরা তখন প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রবল হল, তারা সব বই লিপিতে আরম্ভ করল; কি কবে' গৃহস্থালী আচার বিচার দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি শাস্ত্রমত কাগজ করতে হয়—এসকল বই লিপিতে আবিস্কৃত করল, চমৎকার বই। ভবদেব ভট্ট বড় পণ্ডিত, রাঢ়ী শ্রেণী সামবেদী ব্রাহ্মণ; হলধর মিশ্র, এঁরা সমাজ বাঁধবার জন্ত বড় বড় বই লিপিতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের চর্চা আরম্ভ হল। বোদ্ধেরা সংস্কৃত বলত, বাংলাও বলত, কিন্তু কোন ভাই জানত না। তারা বলত আমরা শাস্ত্রবাদী নই, বিবেকসিদ্ধ না হলে কোন শাস্ত্রই মানব না। তারা প্রথমা বিভক্তির স্থানে পঞ্চমী, পঞ্চমীর স্থানে দ্বিতীয়া, একবচনের স্থানে বহুবচন, পুংলিঙ্গের স্থানে ক্রীবলিঙ্গ ব্যবহার করত। এতে এমন ক্ষতি করেছে যে এখন আমরা তার অর্থ করতে পারি না। মূলকথা এই, নাথের উৎপত্তি পূর্ববঙ্গে। আর ব্রাহ্মণেরা সমাজ বাঁধবার জন্ত যা দরকার, করেছেন। কিন্তু বজ্রযান-সহজযানের সময় দেশের লোকের অবস্থা কি ছিল বিশেষ জানা যায় না; তারা সমাজে সে-ভাবে ছিল যে-ভাবে বোদ্ধেরা নেপালে আছে। বোদ্ধেরা আমাদের আচার বিচার মানত না, কতক কতক মানত, কখন কখন গৌটাও দিত, দেবতা একেবারে মানত না, সব আমি নিজে, অহং। যখন দেবতার ধ্যান করতে হবে—আমরা বলি মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, তারা বলবে আমি অমুক দেবতা হয়েছি, আমার চার হাত পাঁচ মাথা দশ পা বেরিয়েছে, আমি অমুক দেবতা হয়েছি। এ ছুটা জিনিষে কত তফাৎ। আমরা দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, ওরা তা করে না—নিজে চেষ্টি করে দেবতা হতে। এটা বুদ্ধকে গুরু বলে' মানে। নেপালের লোক দুই ধর্ম অবলম্বী—দেবভজা আর গুরুভজা God-worshiper আর manworshiper. গুরুভজা গুরু হতে চায়, গুরু হয়ে হয়ে শেষে বজ্রযানে এসে দাঁড়ায়। এরা দেহাত্মবাদী। এই দেহই সব, এ দেহে ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণে স্বর্গ নরক আছে।—আমাদের দেশে যারা ভিক্ষা করে তারা বোদ্ধদের শেষ চিহ্ন। এরা দেহকে বড় মনে করে। এই দেহকে মানে, আর কিছু মানে না। এই ত হিন্দুর সঙ্গে বোদ্ধদের তফাৎ; এ তফাৎ বড় বেশী তফাৎ, —World within world. সকালে দেবতা অপেক্ষা মানুষের

ক্ষমতা বেশী ছিল। যারা রাজা ছিলেন, বোদ্ধ রাজা, তাঁরা সকল ধর্মের লোককে যার যেমন গুণ তার তেমন পুরস্কার দিতেন; ব্রাহ্মণের হাতে বিচার দিয়েছিলেন, আইন জিনিষ ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। বোদ্ধ রাজা যেখানে ছিল সেখানে আইন হিন্দুর হাতে ছিল, কিন্তু বিচারের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য করতে দিত না; বুদ্ধদেব যে-বন্দোবস্ত করেছিলেন, সেখানে তা বাহাল ছিল, আইন ব্রাহ্মণদের হাতে থাকতে আধিপত্য কতকটা তাদের হল। পালদের সময় একটা গুণ্ডকর ব্যাপার হয়, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণদিগকে তারা খাতির করতে আরম্ভ করল। দুই জায়গায় তাদেরকে ১৫৬ খানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর-একদল ব্রাহ্মণ ছিল, তারা শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণ। শাকদ্বীপের বর্তমান নাম সিধিয়া, পারস্যের উত্তরে পূর্ব তুর্কীস্থান প্রভৃতি নিয়ে এক বড় দেশ, ইউরোপীয় রাষ্ট্রের কাছে পর্য্যন্ত। ভগবান্ পবিত্র সূর্যের উপাসনা করবার জন্ত যাদবেরা সেখান থেকে কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। নানা কারণে শাকদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ আসে। শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ছিল, তারা আমাদের বেদ জানত না, সূর্যের উপাসনা করত, তারা নক্ষত্রের গতিবিধি, জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা করত, আবশ্যক হলে ঠিকুজী করত। শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদেরকে আমরা আচার্য্য বলি।

ব্রাহ্মণেরা বড় বড় যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞের বাহুল্য ছিল, তাঁরা দশবিধ সংস্কার নিয়ে থাকতেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাঁরা থাকতেন। পাল রাজাদের সময় তান্ত্রিক নিয়ম ছিল না, তন্ত্রের উল্লেখ ছিলেন না। আগমবাগীশ প্রভৃতি দশ জন লোক মোড়ণ শতাব্দীতে বোদ্ধতন্ত্র নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ঢকাতে চেষ্টা করেন। সেখানেও কানে মন্ত্র দেওয়া হত। তাঁদের মধ্যে তিনজন লোক ক্ষমতাপন্ন ছিল, তাঁদের নাম ত্রিগুণানন্দ, একানন্দ, পূর্ণানন্দ। তাঁদের একজনের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল, তারা এই জিনিষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ঢকাতে লাগল। তন্ত্র জিনিষ একেবারে বোদ্ধধর্মের ক্ষীভূত না হলেও বোদ্ধ মতের অনুকুল ছিল। তন্ত্র-উপাসনা করতে গেলে আমি শিব হয়েছি, শক্তি হয়েছি এরূপ বলতে হয়। আমি শক্তি চাই, একথা তারা বলে না। আমরা বলি আমাদের পুত্র দাও, আরোগ্য দাও। তারা বলে আমরা তাই হয়েছি। সেইটা বোদ্ধ। এই রকম করে' ক্রমে ক্রমে বোদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ-সমাজে ঢকতে লাগল।

নেপালে দেপি বোদ্ধ আর হিন্দু রয়েছে; তারা পরস্পর অনাচরণীয়, বোদ্ধ যেখানে যাবে ব্রাহ্মণ সেখানে যাবে না, বোদ্ধ জল নিলে ব্রাহ্মণে সে জল নেবে না, বোদ্ধ যে কুয়ার জল ব্যবহার করবে ব্রাহ্মণ সে কুয়ার জল ব্যবহার কবে না, ঘরে এলে জল ফেলে দেয়। আমাদের দেশে যাদের অনাচরণীয় জাত মনে করি, তারা বোধ হয় এককালে বোদ্ধ ছিল, সেইজন্ত অনাচরণীয় হয়েছে; তখন তারা আমাদের সঙ্গে মিলতে চেষ্টা করে নি, তারা প্রবল ছিল, পালরাজগণের সময় তারা প্রবল ছিল, তারা ব্রাহ্মণদের ঢকতে দিত না। আর এক কথা তারা বলত—ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করছে। একথা ঠিক নয়। দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক অনাচরণীয় ছিল, যেমন মুসলমানেরা আর আমরা আছি; বোদ্ধ আর হিন্দুতে সে রকম অনাচরণীয় ভাব ছিল। সে সময় অর্থাগম খুব ছিল, নানা প্রকারে লোক অর্থাগমের উপায় করত, নানা দেশে যেত। পাল-রাজাদের সময় তিব্বত বোদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। পাল রাজাদের সময় বোদ্ধেরা মঙ্গোলিয়া দখল করে; আর বর্ষা শ্রাম জাপানে বোদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে যায়। লঙ্কাদ্বীপে অনেক লোক বোদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে যায়। তখন বোদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ ছিল, বোদ্ধ ধর্ম খুব জেঁকে উঠেছিল, লোক উদ্যোগী ছিল, কোন দেশে যেতে ভীত হত না, ব্যবসা-বাণিজ্য

ধন অর্জন করত। জাতি-বিচার ছিল না; কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল। বৌদ্ধদের জাতি-বিচার নেপালে পাওয়া যায়। পাল-রাজাগণের সময় জাতিবিচার ছিল না, পাল-রাজাদের সময় কেবল কৈবর্তদের মন্ত্র দেওয়া হত না; তারা মাছ মারত, যারা মাছ মারে তাদের কেমন করে' মন্ত্র দেবে? কৈবর্তেরা যতক্ষণ না মাছ মারা বাবসা ত্যাগ করে, ততক্ষণ তাদের বৌদ্ধ করতে পাবেন না এই ছিল নিয়ম। এইজন্য কৈবর্তেরা হয়ে গেল ছোট। শিব এসে তাদের রক্ষা করলেন, তারা কোল হল। কৈবর্তেরা অধিকাংশ কোল। এই রকম করে' করে' পালবংশের সময়ের সামাজিক ইতিহাস কিছু দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু ভাল করে' কথাটা বলবার সময় এখনো উপস্থিত হয় নি। বিঘ-চরিত থেকে অনেক ইতিহাস বের হবে। কোন কোন দেশে বড় পুরাতন তাস আছে, তার ছবি থেকে এটা ঠিক হল আমাদের দশ অবতার এখন যেমন মৎস্য কৃষ্ণ বরাহ, হাজার বৎসর পূর্বে তা ছিল না, অল্প রকম ছিল; এই তাস যদি ফেলে দিতাম তা হলে এ ইতিহাস পাওয়া যেত না। এই রকম ভাবে ইতিহাস বের করার চেষ্টা করতে হবে, কেবল ঠিক করা চাই চোখ। তা'হলে সব জায়গা থেকে ইতিহাস বের হবে।

(প্রবর্তক, কার্তিক)

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লক্ষ্মী

বৈদিক উষাই পৌরাণিক লক্ষ্মী। বেদে অনেক স্থলে উষা সূর্য-প্রিয়াক্রমে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক বিষ্ণু সূর্যের নামান্তর মাত্র। সুতরাং সূর্যপ্রিয়া বৈদিক উষা বিষ্ণুপ্রিয়া পৌরাণিক লক্ষ্মী হইয়াছেন।

গ্রীক রোমীয় উষার স্থায় বৈদিক উষারও রথ আছে। শ্রীশূক্তে শ্রীকে 'অথর্ষকী' 'রথমধ্যা' বলা হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক শ্রী জলধি-ছহিতা, মন্বনকালে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। গ্রীক উষা সমুদ্র হইতে অশ্বযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া প্রভাতগগন রঞ্জিত করিয়া আসিতেন। বেদে সমুদ্র বলিতে অনেক স্থলে অন্তরীক্ষ বুঝাইত, সেই হিসাবে উষা সমুদ্রছহিতা।

বৈদিক স্ত্রী-দেবতাদের মধ্যে উষার আসন সর্বাপেক্ষা উচ্চ, অথচ পৌরাণিক যুগে উষার উল্লেখ নাই, পুরাণে সে স্ববর্ণকিরণ একেবারে নির্বাপিত। সেই উষা পুরাণে একেবারে লুপ্ত হন নাই, তিনি লক্ষ্মীরূপে এখনও বিরাজ করিতেছেন। উষাকে বেদে বাজিনী-বতী বা অন্নবতী বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীও অন্নবতী।

লক্ষ্মীর একটি নাম শ্রী। ঋগ্বেদে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় রূপ ও ঐশ্বর্য অর্থে 'শ্রী' কথাটি পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় শ্রী বলিয়া কোন দেবীর উল্লেখ নাই। এখন শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর নিকট লোক প্রচুর শস্ত অন্ন বস্ত্র ধন-সম্পদের জন্ত প্রার্থনা করে। বৈদিকযুগে আর্ধ্যগণ প্রচুর শস্ত ও পাণ্ডি সম্পদের জন্ত পুরস্কি ধিষণা প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। এখনকার আর্থিক অনাটনের দিনে লোকে বহুপুত্র কামনা করিতে সাহস করে না। কিন্তু আর্ধ্যগণের তখন লক্ষ্য ছিল, কিরূপে দলপুষ্টি হয়, অনার্থ্য শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ও সাংসারিক কার্যে সহায়তার জন্ত পুত্রের আবণ্ডকতা তাঁহারা অনুভব করিতেন এবং সেইজন্য তাঁহারা উপাস্ত্র দেব-দেবীগণের নিকটে পুত্রলাভের প্রার্থনা জানাইতেন। কুহু ও সিনী-বালীর নিকট তাঁহারা সন্তানের জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। অথর্ষকীবেদে আছে, তাঁহার সম্পদ ও বীরপুত্রের জন্ত

কুহুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুপত্নী বলিয়া কাহারও উল্লেখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদের শেষ অংশের একটি শূক্ত সূত্রজননের জন্ত বিষ্ণু ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা। বোধ হয় সেই ঋ অথর্ষকীবেদে সিনীবালীকে বিষ্ণুপত্নী বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের বিষ্ণুপত্নী শ্রী বা লক্ষ্মীর নিকট সন্তান সূত্রসবের জন্ত বা বহু সন্তান লাভের জন্ত প্রার্থনা কেহ করে না। বৌদ্ধযুগে যক্ষিণী হারিতী মে ভার লইয়াছিলেন; আধুনিক যুগে জম্বলা রাক্ষসী, পাঁচুঠাকুর ও যক্ষীদেবী তাহা লইয়াছেন। তথাপি লোক আশীর্বাদ করিবার সময় 'ধনে পুত্র লক্ষ্মীলাভের কথা এখনও উল্লেখ করে। শ্রীশূক্তে দেখা যায়, প্রার্থনাকারী ধন ধান্ত গো-হস্তি-রথ-অশ্ব ও আয়ু প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-পৌত্রের জন্তও কামনা জানাইতেছেন, কারণ পুত্র-পৌত্রও ত সম্পৎ-সোভাগের চিহ্ন।

শাস্ত্রায়নগৃহসূক্তে ও শতপথ-ব্রাহ্মণে শ্রী দেবী হইয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বহুকেশবতী 'শ্রী'র উল্লেখ আছে। শাস্ত্রায়ন-গৃহসূক্তে বিষ্ণু, অনুমতি, স্মৃতি ও ভূতি দেবীগণের মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণেও শ্রী দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন— তথায় তাঁহার ধন-সম্পদ ঐশ্বর্য সবই আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রী সম্বন্ধে যে কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিবার জন্ত তপস্বী করিতেছিলেন। তিনি তপ করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে শ্রী তাঁহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। (গ্রীক দেবেল্ল জিউসের মস্তক হইতে এথেনা দেবীর উদ্ভব ইহার সহিত তুলনীয়।) শ্রী দীপ্তিমান্ অবয়বে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিলেন। সেই শোভাময়ী আলোর প্রতিমা দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, তাঁহাকে নিধন করিয়া তাঁহার শোভাসম্পদ কাড়িয়া লইবেন। প্রজাপতি দেবগণকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "শ্রী স্ত্রীলোক, লোকে স্ত্রীহত্যা করে না।" প্রজাপতি শ্রীকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহার যথাসর্বশ্ব কাড়িয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। অগ্নি তাহার অন্ন লইলেন, সোম তাঁহার রাজ্য, বরুণ তাঁহার সাম্রাজ্য, মিত্র তাঁহার ক্ষত্র, ইন্দ্র তাঁহার বল, বৃহস্পতি তাঁহার ব্রহ্মতেজ, সবিতৃ তাঁহার রাষ্ট্র, পুষা তাঁহার ঐশ্বর্য, সরস্বতী তাঁহার পুষ্টি এবং তৃষ্ণা তাঁহার রূপ লইলেন। পরে শ্রী প্রজাপতির পরামর্শে যজ্ঞ করিয়া ঐ-সকল দেবতাকে আহ্বান করিলেন; এবং তাঁহারা যাহা যাহা লইয়াছিলেন, তুষ্ণ হইয়া, সব শ্রীকে একে একে ফিরাইয়া দিলেন।

শ্রীশূক্ত শ্রী দেবীর উদ্দেশে রচিত। ঠিক বৈদিক যুগে ইহা রচিত না হইতে পারে, কিন্তু সেইজন্য ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে চলিবে না, কারণ বৃহদেবতাগ্রন্থে মন্ত্রসূত্রী বা সূক্ত-প্রণেত্রীগণের নামের মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়া যায়। পৌরাণিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে শ্রী প্রধান দেবীগণের মধ্যে পরিগণিত। পৌরাণিক বৃত্তান্ত-অনুসারে সমুদ্রমন্বন হইতে শ্রীর উৎপত্তি। (গ্রীকদিগের প্রেম-সৌন্দর্যের দেবী এফ্রোডাইটিও Aphrodite সমুদ্রফেন হইতে উৎপন্ন।) মহাভারতে আছে, মন্বন-কালে যেতপদ্মাসীনা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উদ্ভূত হইলেন। রামায়ণে বাল্মীকীর নাম আছে বটে, কিন্তু শ্রীর নাম নাই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, শ্রী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা এবং ধর্মের পত্নী। তাহার পর যখন রুষ্ট চূর্কাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন, দেবগণ দানবহস্তে পরাজিত হইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্রমন্বন করিয়া দেবগণ পুনরায় শ্রীকে পাইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে সাগর হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তির যে বর্ণনা

আছে, তাহা বাস্তবিকই কবিত্তময়। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ধনুস্তরির পর স্কুরংকান্তিমতী বিকসিত-কমলে-স্থিতা পঙ্কজহস্তা শ্রীদেবী সাগর হইতে উথিত হইলেন। মহর্ষিগণ শ্রীশুক্রে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাসু আদি গন্ধর্ভগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গা আদি নদী তাঁহার স্নানার্থ জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। দিগ্গজ-সকল হেমপাত্রস্থিত বিমল জল লইয়া সর্ব-লোকমহেশ্বরী সেই দেবীকে স্নান করাইতে লাগিল। ক্ষীরোদ সাগর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অম্লানপঙ্কজমালা প্রদান করিল। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত কবিলেন। দেবী স্নাতা, ভূষণভূষিতা ও দিব্যমালাশ্রয়ধরা হইয়া সর্বদেব-সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা আবও কবিত্তময় এবং আরও বিস্তারিত। কান্তিপ্রভায় দিগ্গজ রঞ্জিত করিয়া দেবী বিদ্যানগালার স্নায় আবিভূতা হইলেন। মহল্ল তাঁহাকে অদ্ভুত আসন আনিয়া দিলেন, শ্রেষ্ঠ নদীগণ মূর্ত্তিমতী হইয়া হেমকুন্ডে পবিত্র জল দিল। ভূমিদেবী অভিষেচন-উপযোগী ওষধি সকল, গোগণ পঞ্চগব্য এবং বসন্ত মধুমাসের উৎপন্ন উপহাররাজি প্রদান করিলেন। গন্ধর্ভকঠোচ্চারিত মঙ্গলপাঠ, নদীগণের নৃত্যগীত, মেঘের তুমুলনিষনে বাজ্যযন্ত্র-বাদন, দিগ্গজগণ কর্তৃক পূর্ণকলস হইতে জলবর্ষণ ও দ্বিজগণ কর্তৃক সূক্তবাচ্য উচ্চারণ— এই-সকলের মধ্যে ঋষিগণ দেবীর অগ্রিমেক-কার্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পর দেবী বসন্তা। সমুদ্র পীত কোশেয়বাস, বরণ মধুমন্ত ভবরঞ্জিত কুম্ভমবাস, বিশ্বকর্মা বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কুণ্ডল দিলেন। তাহাব পব ভ্রমরগুঞ্জিত মালা লইয়া নুপুরশিঞ্জিত চরণে হেমলতার স্নায় ভ্রমণ কবিত্তে করিতে দেবী নারায়ণের গলে সেই মালা প্রদান করিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে লজ্জা-বিভাসিত স্মিতবিক্ষারিত লোচনে তাঁহার বক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাহার পর ব্রহ্মবৈবর্ত-পুবাণে লক্ষ্মীচরিত্র যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, দেবী যেন কোন বঙ্গগৃহস্থের কুলবধু। তিনি নারায়ণের পত্নী—গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার সপত্নী। পুবাণকার সপত্নী-গণের বলহ ও তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর অবিচল শাস্ত্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন; লক্ষ্মীচরিত্র আদর্শ বধুচরিত্র। কলহ-রতা দুই সপত্নীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের কলহ শাস্তি করিতে গিয়া লক্ষ্মী বিনাদোষে সরস্বতী কর্তৃক অভিশপ্তা হইলেন। লক্ষ্মী কাহাকেও অভিশাপ দিলেন না, তাঁহার সপত্নীযুগল পবম্পরকে শাপ প্রদান করিলেন। অভিশাপের কাণ্ড শেষ হইলে পব নারায়ণ লক্ষ্মীর উপর স্তবিতার করিয়া গঙ্গাকে শিবের নিকট এবং সরস্বতীকে ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করিতে চাহিলেন। এখনও লক্ষ্মী লক্ষ্মী, তিনি স্বামীকে সপত্নী-ষয়ের উপর প্রসন্ন হইবার জন্য অনুন্নয় করিলেন। গুণমুগ্ধ স্বামী তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রার্থনা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগের লক্ষ্মী চরিত্রের ভূমনা নাই। পুরাণকারগণ দুঃনাইনী। লক্ষ্মীর স্বাভাবিক নম্রতার জন্ম তাঁহাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলে, দেবীভাগবতের গ্রানিকর বৃত্তান্ত। লক্ষ্মীর জাতা উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যখন সূর্য্যপুত্র রেবন্ত আসিতেছিলেন, তখন অশ্ব ও অথারোহীর প্রতি একান্তে দৃষ্টিপাত করিতে লক্ষ্মী নারায়ণ কর্তৃক অভিশপ্তা হইলেন। লক্ষ্মীকে অস্বরূপ ধারণ করিতে হইল। তাহার পর অস্বরূপী বিষ্ণুর ঔরসে তাঁহার পুত্র হয়। অস্বরূপধারণের কাহিনীটি বৈদিক সূর্য্য-সরণ্য বা পৌরাণিক সূর্য্য-সংজ্ঞার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। বৈদিক সূর্য্য ও বৈদিক বিষ্ণু একই দেবতা। পুরাণের যুগেও বিষ্ণু ও সূর্য্য উভয়েই আদিত্য।

সুতরাং দেবী-ভাগবতের কাহিনীটি রচনা করিতে বিশেষ অস্ববিধা হয় নাই। তাহার পর মহাঃ যে লক্ষ্মীর শাপমোচন করিলেন, তাহা দ্বারা শিবের ক্ষমতা প্রমাণ, র চেষ্টা হইয়াছে। দেবীভাগবতকে একখানি শাস্ত্র ও সেই হিসাবে শৈব পুরাণ বলা যাইতে পারে। শৈব পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য দেখাইবার চেষ্টা যে সমগ্র কাহিনীটি রচনার কারণ, ইহাও বলা যাইতে পারে।

কোন কোন স্থলে মানব কি কি অমুঠান করিলে শ্রী তাহার গৃহে অধিষ্ঠান কবেন, তাহার বিবরণ মহাভারতের লক্ষ্মীবাসব-সংবাদে আছে। সিরি কালকল্পী জাতকে সিরি (শ্রী)ও প্রায় তাহাই বলিতেছেন। বৌদ্ধযুগে সিরি বা সিরি-মা দেবতা একটি উপাস্ত্র দেবী। সিরি-কালকল্পী জাতকে সিরি উত্তরদিকপাল ধৃতরাষ্ট্রের চুহিতা; পশ্চিমদিকপাল বিরূপাক্ষের চুহিতা কালকল্পী। কালকল্পীকে কথাবার্তার আমাদের অলক্ষ্মী বলিয়া মনে হয়। যেখানে লোভ, দ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, যেখানে পরনিন্দা, মূর্খতা, ধনা, সেইখানেই কালকল্পী বা অলক্ষ্মী। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডের এক স্থলে কালকল্পী ও অলক্ষ্মীর একত্রে উল্লেখ আছে। পদ্মপুবাণে স্বর্গপণ্ডে আছে, সমুদ্রমস্থনকালে অলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পর লক্ষ্মীর উদ্ভব হয়। অলক্ষ্মী বৈদিক নিখতির পৌরাণিক রূপান্তর।

আমাদের দেশে ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা হয়। এতদ্ব্যতীত আশ্বিন মাসে পূর্ণিমায় কোজাগর লক্ষ্মীপূজা হয়। শ্রামাপূজাব দিন অমাবস্যাতে কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে এবং ঐ দিন কোন কোন গৃহস্থের বাড়ী প্রথমে অলক্ষ্মীর পূজা হইলে পরে অলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া লক্ষ্মীপূজা হয়।

শারদীয়া পূর্ণিমাতে যে লক্ষ্মীপূজা হয়—যাহার প্রচলিত নাম কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা—তাহা এখনও হিন্দুব নিকট একটি প্রধান পর্বে। পূজনীয় স্মার্ত্ত-শিবোমনি রতনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এই তিথিব কবণীয় কার্যের বিধান দিয়া গিয়াছেন। কোজাগর-পূর্ণিমাতে লক্ষ্মী ও ঐরাবতস্থিত ইন্দ্রের পূজা এবং সকলে স্নান ও স্নবেশ ধারণ করিয়া অক্ষক্রীড়া করিয়া রাত্রি জাগরণ কবিবে; কারণ, নিশীথে বরদা লক্ষ্মী বলেন, “কে জাগরিত আছে? যে জাগরিত থাকিয়া অক্ষক্রীড়া করে, তাহাকে আমি বিত্ত প্রদান করি। নারিকেল ও চিপটিকের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা করিবে এবং বঙ্গুগণের সহিত উহা ভোজন করিবে।” যে নারিকেলের জলপান করিয়া অক্ষক্রীড়ায় নিশি অতিবাহিত করে, লক্ষ্মী তাহাকে ধন দান করিয়া থাকেন।

আশ্বিন-পূর্ণিমায় এই কোজাগর লক্ষ্মীপূজা একটি বহু প্রাচীন উৎসবের সহিত জড়িত। বহুশতাব্দী পূর্বে শরৎকালে শস্ত কর্তন হইলে সীতা-যজ্ঞ হইত এবং তাহাতে সীতা এবং ইন্দ্র আহূত হইতেন। পারস্বর-গৃহস্থে এই স্থানে সীতাকে ইন্দ্রপত্নী বলা হইয়াছে; কারণ, সীতা লাক্ষ্মপদ্ধতিরূপিনী শস্ত-উৎপাদয়িত্রী ভূমিদেবী; ইন্দ্র বৃষ্টি-জলপ্রদানকারী কৃষিকার্যের স্তবিতাদাতা দেব। পূর্বে সীতা-যজ্ঞে ইন্দ্র আহূত হইতেন বলিয়া তিথিতত্ত্বে কোজাগর-পূর্ণিমায় ইন্দ্রের পূজার বিধি আছে। লক্ষ্মী যে সীতার রূপান্তর, তাহা রামায়ণাদি গ্রন্থে বার বার বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও লক্ষ্মীর যে-বুর্ধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীর হস্তে ধাত্তমঞ্জরী। তন্মহে মহালক্ষ্মীর একটি ধ্যানে লক্ষ্মীর হস্তে শালিধাত্তের মঞ্জরী। এখনও লক্ষ্মীপূজার সময় কাঠায় ভরিয়া নবীম ধাত্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীশুক্রে লক্ষ্মী হিরণ্যবর্ণা, আবার পদ্মবর্ণা বলিয়া বর্ণিত। তন্মহে মহালক্ষ্মীর ধ্যানে দেবী বালার্কদ্ব্যতি, সিন্দুরাঙ্ককান্তি, সৌদামিনী-

সন্নিভা। তিনি নানালঙ্কারভূষিতা। তিথিতত্ত্বে আদিত্যপুরাণ হইতে লক্ষ্মীর যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি গৌরবর্ণা। তাঁহার হস্তসংখ্যা এবং হস্তে তিনি কি কি ধারণ করিয়া থাকিবেন, এই দুইটি বিষয়ে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দেবী কোথাও দ্বিহস্তা, কোথাও বা চতুর্হস্তা, কোথাও বা তিনি ষড়্ভুজা বা অষ্টভুজা। আবার এক স্থানে মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজারূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই মহালক্ষ্মী মহাকালীমূর্ত্তির অঙ্গরূপ বিকাশ। কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীপূজায় যে বলিদানের বিধি আছে, তাহা বোধ হয় এই মহালক্ষ্মীর পূজা।

তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত আদিত্যপুরাণ অনুসারে লক্ষ্মীর হস্তে পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশ। লক্ষ্মীর প্রত্যেক মূর্ত্তিকল্পনাতেই হস্তে পদ্ম থাকে। কোন কোন মূর্ত্তিতে হস্তে বসুপাত্র (রত্নপূর্ণ পাত্র) স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ (লেবু) থাকে। কমলার হস্তধৃত লেবুই কমলা-লেবু নামে অভিহিত হইয়াছে কি না, তাহা বলা যায় না। অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর হস্তে যথাক্রমে অক্ষ, প্রক, পরশু, গদা, কুল্লিশ, পদ্ম, ধনু, কুণ্ডিকা (কমণ্ডলু) দণ্ড, শক্তি, অসি, চর্ম্ম, জলজ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাণ ও সুদর্শন (চক্র)। শুক্রনীতির অনুসারে লক্ষ্মীর এক হস্তে বীণা, দুইটি হস্তে বর এবং অভয়মুদ্রা থাকিবে। তথায় আর-একটি হস্তে লক্ষ্মফলেরও উল্লেখ আছে। লক্ষ্মফল সম্ভবতঃ মাতুলুঙ্গ। মূর্ত্তিবিশেষে দেবীর এক হস্তে শ্রীফল থাকিবে, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীফল সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে যে, একদা শিব-পূজাকালে একটি পদ্মের অভাব ঘটায় লক্ষ্মী মুকুলিত পদ্মনদূশ আপানার একটি স্তন কর্তন করিয়া দিয়াছিলেন। মহাদেবের বরে তাহাই বিল্ব বা শ্রীফল হয়। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত লক্ষ্মী-মূর্ত্তির হস্তে পদ্ম ও শ্রীফল। এইটি গজলক্ষ্মীমূর্ত্তি। দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা, দুইটি হস্তী দেবীর উপর জলবর্ষণ করিতেছে।

বিষ্ণুমূর্ত্তিসহ যে লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা দ্বিহস্তবিশিষ্ট। শ্রীগুপ্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়' নামক পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, বাসুদেব, ত্রৈলোক্যমোহন, নারায়ণ প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে লক্ষ্মীমূর্ত্তিও আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তিতে দেবী নারায়ণের বাম অঙ্গের উপর উপবিষ্ট এবং কোন কোন স্থলে তাঁহার হস্ত দ্বারা পদস্পর্শকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায়, লক্ষ্মী বরাহরূপধারী বিষ্ণুর পদতলে উপবিষ্টা থাকেন। অনন্তশায়িনী বিষ্ণুমূর্ত্তিতে বিষ্ণু নাগের উপর শয়ান এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। অগ্নিপুবাণের হরিশঙ্কর-মূর্ত্তিতে নারায়ণ জলশায়ী অবস্থায় বামপার্শ্বে শয়ান। ইহার শরীরের এক অংশ রুদ্র (মহাদেব)-মূর্ত্তি এবং অপর অংশ কেশব (বিষ্ণু)-মূর্ত্তির লক্ষণযুক্ত এবং মূর্ত্তিটি গৌরী ও লক্ষ্মীমূর্ত্তিসমন্বিত। ভারতবর্ষে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও তাহাদিগের উপাস্ত দেব-দেবীগণের মধ্যে ঐক্য-সম্পাদনের চেষ্টা ছিল। সেই সেই চেষ্টার ফলে হরিশঙ্কর মূর্ত্তি ও মহালক্ষ্মী মহাকালী মহাসরস্বতীমূর্ত্তি।

চিত্রে লক্ষ্মীর বাহন পেচক দেখা যায়। ইহার কারণ ঠিক বলা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী অনুসারে দেবগণের যে বাহন, তাহাদের শক্তিরূপিণী দেবীগণেরও সেই বাহন। সূতবাং বৈষ্ণবীর বাহন গরুড়; সেই হিসাবে লক্ষ্মীর বাহন গরুড় হওয়া উচিত ছিল। পেচককে গরুড়ের স্ত্রী-সংস্করণ বলিয়াই বোধ হয়। এথেষ্টের পুংলক্ষ্মী বা রক্ষসিত্রী এথেনা দেবীর প্রিয় পক্ষীও পেচক।

দেবী-ভাগবতে আছে যে, লক্ষ্মী নানা মূর্ত্তিতে নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন। স্বর্গধামে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী, এই লক্ষ্মীর অভাবে ইন্দ্র শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রাজস্ববনে তিনি রাজলক্ষ্মী, এইজন্যই পরমভাগবত

শুপ্তরাজগণ মুদ্রায় লক্ষ্মীচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আর মর্ত্যালোকে তিনি গৃহলক্ষ্মী—এই মূর্ত্তিতে তিনি এখনও হিন্দুগৃহে বিরাজ করিতেছেন।

(মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ)

শ্রী ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত

মেয়েলী সঙ্গীত অসংখ্য। সেই-সব সংখ্যাহীন গীতাবলী আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, পূজার মালুমী, ত্রৈতের গীত, প্রাতঃস্নানের গান, বিবাহের গীত, মহেলা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নের গীত, স্নান-কামানের গীত, বর-বধুর যাত্রার গীত, পঞ্চায়ত, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভঞ্জনের গীত, বরশয্যার গীত, ইত্যাদি বহুবিধ গীত মেয়েলী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া, সীতা-সাবিত্রী শ্রীরাধিকার বারমাসী, রামের বনবাস, নিমাইয়ের সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার গায়িকা স্ত্রীলোক আছেন, তাহারা উপযুক্ত-মত বেতন লইয়া বিবাহাদি উৎসবের বাড়ীতে কীর্তন করিয়া থাকেন। বাৎসল্য-রস-সংপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বালালীলাই সেই কীর্তনের বিষয়। ইহাকে “খেলাকীর্তন” বা “গোপিনী কীর্তন” বলে। এই গোপিনী বা খেলা-কীর্তন মেয়েলী সঙ্গীত।

ভাটি অঞ্চলের স্ত্রীলোকে “ধামালি” বা “ধামাইল” বলিয়া একপ্রকার গীত গাইয়া থাকেন; সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবি রচিত রূপামুরাগের পদ। শ্রীকৃষ্ণ আর গৌরাজ্জই “ধামাইল” গীতের বিষয়।

দশ, পনব, কি বিশ-পাঁচিশ জন স্ত্রীলোককে মুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া, তালে তালে করতাল দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ধামালি গাইতে হয়। ব্রাহ্মণ কাষস্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে “ধামালি” গাইতে দেখা যায় না। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি “ধামাইল” লিখিয়া দিতেছি।

“গৌর বরণ, রূপের কিরণ, লাগল নয়নে।

(লাগল নয়নে সজনী, লাগল নয়নে) ॥

আমার গৌর অপরূপ, কোটি-মন্থথ-স্বরূপ,
সজনী, কখন চক্ষে দেখি না এরূপ,

গৌরা আড়-নয়নের চাউনি দিয়ে পরাণ ধবিয়া টানে।

যদি গৌর কুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই,

সজনী, তিন কড়ার মূল কুলে দিলাম ছাই,

আমি গৌর কুলে কুল মিশারে, সজনী, ম'জে রব তাঁর চরণে।

ভেবে জয়মঙ্গলে কয়, আমার গৌর রসময়,

সজনী, রসে মাখা তনুখানি হয়,

গোরার রসে ডুবু ডুবু আঁখি, একদিন চেয়েছিল আমার পানে।”

মেয়েলী সঙ্গীত গীতি-সাহিত্যের প্রায় অর্ধাংশই সরস করিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্ত গীতাবলী কাহার রচিত, তাহার কোন নামের ভণিতা নাই। তবে যে-সকল পুরুষের গান মেয়েরা আপনাদের করিয়া লইয়াছেন, এবং বৈষ্ণব-কবি-রচিত যে-সকল পদাবলী মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে, তাহার দু-একটিতে রচকের নাম শুনিতো পাওয়া যায়। বোধ হয়, খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতগুলি পল্লীর স্ত্রীকবি কর্তৃকই রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী এবং পুরুষের গান বাছিয়া পৃথক করিয়া লইলেও, খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখ্যায় অল্প হইবে না। হিন্দুধর্ম্মের বাবতীর

শুভানুষ্ঠানেই মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। কতকগুলি গীত বিধুজ্ঞ মন্ত্রের স্মার হইয়া গিয়াছে। সেগুলি না গাইলে নয়; নচেৎ শুভকার্য অঙ্গহীন হইয়া যায়।

যদিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ-মিত্রতার অভাব কিম্বা রচনা সৌন্দর্য্যশূন্য, তথাচ স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইয়া রাগিণীর মধুরতায় গীতগুলি মধুর হইতেও সুমধুর হইয়া উঠে, ভক্ত ভাবকের নয়নাশ্র আকর্ষণে সমর্থ হয়, হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্ব ভাব-বৈচিত্র্যের দাবন খুলিয়া দেয়, মানুষকে টানিয়া আর-এক রাজ্যে লইয়া যায়।

মেয়েলী সঙ্গীতের ভাষা ও রচনা বর্তমান শিক্ষিত সমাজের ভাষা-রচনার মত উজ্জ্বল না হইলেও স্বাভাবিক কবিদের স্ফূরণ-শৃঙ্খল নহে। প্রাচীন পল্লীভাষায় রচিত মেয়েলী সঙ্গীতসমূহ ভাষা-দোষ-দুষ্টি না হইয়া বরঞ্চ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যে সমধিক উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের একটি অঙ্গ বলিয়া এই গীত-রত্নগুলি বাণী ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য।

বিবাহের গীতের মধ্যে গালি দেওয়ার একরকম গীত আছে। সেই গালির গীতে এবং বিবাহের কোন কোন গীতে অল্লাধিক পরিমাণে অশ্লীলতার ভাঁজ আছে। বিবাহ-বাড়ীতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজনের উপরেই অল্লাধিক পরিমাণে গালি বর্ষিত হইয়া থাকে। আগতক নাপিত ধোপা, এমন কি, পুরোহিত ঠাকুরকে পর্য্যন্ত ভাগ লইতে হয়। নাপিত, বব কিম্বা বধূকে কামাইতে বসিল, মেয়েরা গান ধরিলেন,—

“আমার সোণার চাঁদকে কামাইতে

নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।

হাত ভাল কামাও নাপিত, হাতের দশ নোখ বে।

পাও ভাল কামাও নাপিত, পায়ের দশ নোখ রে।

মুখ ভাল কামাও নাপিত, পূর্ণমাসীর চান্দ বে।

মাথা ভাল কামাও নাপিত, ডাব নারিকল রে।

ভালা কইরা কামাইলে, পাইবে জমী বাড়ী বে।

ভালা না হইলে নাপিত, খাইবে জুতার বাড়ি রে।”

পুরোহিত নান্দী-মুখ বা বৃদ্ধিশ্রদ্ধ কবাইতে যেই বসিলেন,—অমনি মেয়েরা গীত ধরিলেন,—

“বাছাই নান্দীমুখ করে,—শুভ কার্য্য কবে।” ইত্যাদি। এই গীতটি গাইয়াই ধরিলেন বামুনকে,—

“উন্দ্রা বান্দ্রা বামুন রে, কত কলা লাগে রে,

যত কলা লাগে রে, দিব জামাইর মায়েরে।” ইত্যাদি।

পূজার মালুদী গীত হইবার সময় আজকাল মধ্যে মধ্যে আমবা অন্দর-মহল হইতে কবিওয়ালাদের ডাকস্বর এবং স্বর্গীয় সাধক কবি রাম-প্রসাদের গলা শুনিতে পাই।—

“কালিকে, ওমা ভব-পালিকে, বাঙ্গালীকে নিও না আসাম।

তুমি আত্মাশক্তি, ভগবতী,

সস্তানের প্রতি হইও না বাম ॥” ইত্যাদি।

“মা, মা, বলে’ আর ডাকব না।

ছিলাম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী,

আর কি ক্ষমতা রাখ আউলাকেশী,—

স্বারে স্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,

মা মৈলে কি তার ছেলে বাঁচে না ॥” ইত্যাদি।

জল-ভরার গীতে বৈষ্ণব কবিদের প্রাচীন রূপানুরাগের পদই অধিক। আধুনিক পল্লীকবিদেরও রসাল অনেক পদ জল-ভরায় স্থান পাইয়াছে। যথা,—

“গৌররূপ লাগিল নয়নে।

আমি কৃষ্ণে চাহিয়াছিলাম গো,—

গৌরচাম্দের পানে ॥

কলসীতে নাই বে পানী, আমি গিয়াছিলাম সুরধনী,

গৌব কেবা না শুনি শ্রবণে।

একদিন জলেব ঘাটে দেখে তারে মরেছি পরাণে ॥

গৌব থাকে রাজপথে,—

তোমরা কেও যাইও না জল আনিত্তে গো,

দেখলে তারে মরিবে পবাণে,

শেষে আমার মত ঠেকবে শোবা,

গোপালচান্দে ভণে ॥” ইত্যাদি।

এগুলি খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত নহে। খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতসকল বহুকাল পূর্ব হইতে পূজার ব্রতে সহেলায় ও বিবাহাদিতে মন্ত্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার কোন পরিবর্তন পরিবর্তন নাই, একসুরে একটানে চলিয়াছে।

কার্তিক পূজার গীতের বয়স নির্ণয় করা অসাধ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সুরে যে ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, এখনও সেইরূপই আছে। যথা,—

“বুলে আবে কার্তিক যাইবাইন,

অভিলাসে এরো, কে কে যাইবা।

সঙ্গে লো ঠমকী রাধা, কে কে যাইবা।

যব থাক্যা রামের পিসী বুলে —

আমি এরো আমি যাইবাম সঙ্গে লো,

ঠমকী রাধা, আমি যাইবাম ॥” ইত্যাদি।

সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সারা রাত্রি ভরিয়া নানারকমেব গীত কার্তিকপূজার গীত হয়। নমুনা-স্বরূপ একটা বাঘের গীত লিখিয়া দিতেছি—

“বাঘা কান্দে বে, বাগুনীর লাগিয়া, বাঘা কান্দে রে।

বাঘা বুলে বাগুনী এই না পথে যাইও।

নবীনের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও ॥”

এইরূপ ‘হারার গরু দেখ্যা, রামনাথের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও।’ অর্থাৎ ব্রতে যতজন মেয়েলোক থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটীস্থ একজনেব নামোল্লেখ করিতে হইবে। নতুবা বাঘ রাগ করিয়া গরু মাঝিয়া ফেলিবে।

এই-সকল প্রাচীন মেয়েলী সঙ্গীতের ভিত্তি ঐতিহাসিক তত্ত্বের অস্পষ্ট রেখাপাত আছে। প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ যে জঙ্গলময় ছিল, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তব উৎপাতও যে বেশী ছিল, প্রাগুক্ত বাঘের গীতে তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। এখনও রাখালেরা বাড়ী বাড়ী মাগিয়া “বাঘের ব্রত” করে।

বিবাহের একটি গীতে কস্তা পণ-প্রথার প্রমাণ দিতেছে।

“তোর বাপে লো কস্তা বড় দুঃখু থৈছে,

বড় দুঃখু থৈছে;—তোরে জুকা লো কস্তা

টাকা বাটা লৈছে।

তোর টাকা রে কুমার, তোর সঙ্গে আইছে;

তোর সঙ্গে আইছে।

আমার বাপে রে কুমার, দেশের বেবার লইছে।

তোব বাপে লো কস্তা, বড় দুঃখু থৈছে,

বড় দুঃখু থৈছে।

তোরে জুকা লো কস্তা শত্রু-শাড়া লইছে ॥

তোর শত্রু-শাড়া রে কস্তার কোন আশা নাই—

তোর সঙ্গে আইছে ।

আমার বাপে রে ধুমার, দেশের বেবার লইছে ॥”

ময়মনসিংহের ছোট ছোট বালিকারাও পুতুল-বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের অনেক গীত শিখিয়া ফেলে । এবং মধুর কণ্ঠে অর্ধশুট ভাষায় গাইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে । বধু-পুতুলটিকে পাকীতে তুলিয়া উলুধনি পূর্বক বালিকারা গলাগলি দাঁড়াইয়া গাহিতেছে,—

“পুংলা যাও গো জামাইর ঘরে ।

তিন দিন ধইরা আইছুন জামাই,

রইছইন ফুলের তলে ॥

ফুলের তলে ঝামুর ঝুমুর, কলার তলে বিয়া,

কইত্য আইছইন ছাওয়াল জামাই,

মড়ক মাখাত দিয়া ॥

আদরে আদরে বাবা,—আগে দিছ বিয়া ।

এখন কেনে কান্দ বাবা, গাম্‌চা মুখ দিয়া ॥”

বসন্তকালে শ্রীলোকেরা বসন্ত রায়ের ব্রতের পূর্বে, সপ্তাহ কাল “উত্তম” পূজা করিয়া থাকেন ; আমাদের নন্দহুলাল শ্রীকৃষ্ণই “উত্তম” । তাঁহারই আর-এক নাম “বসন্তরায়” ।

বসন্তকালের অপরাহ্ন বেলায় কুমারী কন্যাগণ দ্রোণ ধুস্তর পলাশ মন্দার ভাণ্ডীর প্রভৃতি নানা জাতীয় বাসন্তী কুম্ভে ডালা সাজাইয়া লইয়া বিশ্ব কদম্ব নিম্ব অভাবে অশ্রু কোন বৃক্ষমূলে সন্ধ্যাকালে উত্তমের পূজা করেন । ফুলের ডালায় ছোট ছোট মাটির ঢেলা এবং ধাতু ছুঁকিও থাকে । কুমারীরা মন্ত্রপাঠপূর্বক গুল ঢেলা এবং ধাতু ছুঁকি উত্তমোদ্দেশ্যে বৃক্ষমূলে দিয়া প্রণাম করেন । উত্তম পূজার মন্ত্র বথা,—

“উত্তম ঠাকুর ভাল । আমি কাল ।

উত্তম ঠাকুর ভাল । ঠাকুর-দাদা কাল ॥

উত্তম ঠাকুর ভাল । আমার বাবা কাল ॥” ইত্যাদি ।

বাটীস্থ ভাই ভগিনী পিতা মাতা সকলকেই ‘কাল’ বলিতে হয় । কেবল উত্তম ঠাকুর কাল হইয়াও ভাল ।

পূজা সমাপন করিয়া মেয়েরা সেই পূজিত বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া গীত ধরেন,—

১। “কে তুল রে ফুল ঝাঁজাড়ীর মাঝে ।

ঠাকুর-বাড়ীর বাী গো আমি ফুলের অধিকারী ।

(কে তুল রে ফুল,)

আগা ধইরা তুল ফুল, মাঝে ভ্যাজা পড়ে ।

(কে তুল রে ফুল,)

সাজি ভইরা তুলে ফুল, পোপা ভইরা পরে ।

(কে তুল রে ফুল)

সাত ভাইয়ের বইন গো আমি,

ফুলের অধিকারী । (কে তুল রে ফুল) ॥”

২। “কুঞ্জের মাঝে কে রে, কুঞ্জের মাঝে কে ?

নন্দের ছাইলা কালাচান্দ কৃষ্ণ এসেছে ॥

এক দেউরী ছই দেউরী তিন দেউরীর পরে ।

তিন দেউরীর পরে গিয়া পাইলাম ঠাকুরের লাগ রে ॥

(কুঞ্জের মাঝে কে ?)

কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইলাইন একটুকু পান ।

রাধিকারে দেখইন ঠাউকু রে পুন্ন মাসীর চান ॥

(কুঞ্জের মাঝে কে ?)

কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুকু গুয়া ।

রাধিকারে দেখইন ঠাউকু রে পিঞ্জরের স্ময়া ॥

(কুঞ্জের মাঝে কে ?) ॥”

বসন্তরায়ের ব্রতের গীত আর অতিসার ব্রতের গীত প্রায়ই একই রকম । ঠাকুরের নিকট দৈনন্দিন্যই অধিক ।

“খোপের কৈতর,—উয়াপে খাইল,—

ঠাকুর অতিসার,—কি দিয়া পূজিব ?

গাছের কলা,—বাহুড়ে খাইল,—

ও ঠাকুর অতিসার, কি দিয়া পূজিব ?

আউটার দুধ,—বিলাইয়ে খাইল,—

ঠাকুর অতিসার, কি দিয়া পূজিব ? ॥” ইত্যাদি ।

(মহেলা বা সই পাতার গীত ।)

- ১। চলিলা কমলা গো—মহেলা পাতিবারে ।
চিড়া-গুঁড়া লৈল কমলা,—ডাইলারে ভরিয়া ॥
কলা চিনি লৈল কমলা, পাইলারে ভরিয়া ।
পান শুবারী লৈল কমলা - বাটারে ভরিয়া ॥
পুষ্প দুর্কা লৈল কমলা,—সাজিরে ভরিয়া ।”
- ২। “লক্ষ-ফুলের মালা রে বেদনী সইয়ের গলে ।
সীধার সিন্দুর বদল করে,—তানা ছইয়ে সইয়ে ।
হাতের শঙ্খ বদল কবে, তানা ছইয়ে সইয়ে ।
আয়না কাই বদল করে, তানা ছইয়ে সইয়ে ॥”

(বন-দুর্গাপূজার গীত ।)

“ভক্তিভাবে পূজিবাম তোমারে গো,—

বন-দুর্গা,—(ভক্তিভাবে,—)

হংস কৈতর দিবাম, জুলুঙ্গা ভরিয়া গো,

বন-দুর্গা,—(ভক্তিভাবে,—) ইত্যাদি ॥”

১। (পূজার মাল্‌নী ।)

“কহে শঙ্কু সেনাপতি,

বণে ভঙ্গ দিও না—

বধিলে ত ব্রহ্মময়ী,—

ভবে জন্ম আর হবে না ।

(দেবীর প্রতি ।)

দুর্গে দুর্গে, ওমা দুর্গে, তারিণী দুঃখহারিণি

বনের মধ্যে কর যুদ্ধ, আউলাইয়া মাথার ে :

কৈ যাও গো মা কৈলাসেশ্বরী—

ত্যাগ্য কইরে কৈলাসপুত্রী

কি ভাইবে মা ভববাণী,

চলেছ গো একাকিনী ।

জানি জানি ওমা তারা,

তুমি শিবের নয়নতারা,—

তোমাকে হইয়ে হারা

বাঁচবে না গো শূলপাণি ॥”

এই গীতটি অতি সুন্দর । নাগ মুস্তারামের দুর্গা-পুরাণ হইতে পদ-ভঙ্গাবস্থায় আসিয়া মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয় । তবে “শঙ্কু” স্থলে “শঙ্কু” হইয়াছে ।

২। ওমা বসন পৈর । ॥

বসন পৈর বসন পৈর মা গো, বসন পৈর তুমি ।

চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি ॥

পাতালে আছিল মা গো, হয়ে ভক্তকাসী ।

মহীরাবণ কণ্ঠে পূজা, দিবে নরবলি ॥

মাথায় সোনার মুকুট ঠেকায়ে গগনে ।

মা হইরা টলক কের —বালকের মত ॥

বাম হস্তে ঋধির-ভাণ্ড—ডাইন হস্তে অসি ।
কাটিয়া অহরের মুণ্ড কচি রাশি রাশি ॥
জিহ্বায় ঋধির-ধারা, গলে মুণ্ডমালা ।
হেঁচুখে চাইয়া দেখ মা পদতলে ভোলা ॥”

৩। “দুর্গা আমার বিপদ-বিনাশিনী ।

জয়তারা তারিণী মা গো হিমালয়-নন্দিনী ।
মা গো তোমার পদে করে স্তুতি, রাম রঘুনি ॥
ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যজমান ।
কত ব্রহ্মা ভগবতীর পূজার বিধান ॥
শঙ্খ লাগে, সিন্দূর লাগে, রক্ত কাকন ।
কুম্ভকুম্ভ কস্তুরী লাগে,—আগর চন্দন ॥
সপ্তমী পূজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে ।
ভোগ নৈবিদ্যি দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে ॥
অষ্টমী পূজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে ।
বিলপত্র দিলেন ব্রহ্মা,—হাজারে হাজারে ॥
নবমী পূজিলেন ব্রহ্মা নব উপচারে ।
মেঘ-মৈষ দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে ॥”

ময়মনসিংহ শাস্ত্রপ্রধান স্থান । মা ভগবতীর ছয়ারে মহিষ-পাঁঠা বলি দিলে তিনি অতিশয় প্রীতলাভ করেন । এই বিশ্বাসের বশীভূত আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সর্ষদাই কাহিলে কাতরে দেবীর ছয়ারে জোড়া পাঁঠা, জোড়া মহিষ মানসিক করেন । মেয়েদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, ব্রহ্মাও রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবে হাজারে হাজারে মেঘ মহিষ বলি দিতে বাধ্য হইলেন ।

৪। বিবাহের গীত ।

“শুভ ক্ষণে আনিল গৌরীরে ও কি ওরে,
ইল্ল ধরিল ছাতি, বেদ পড়ে প্রজাপতি,
নটেতে মঙ্গল ধরনি করে ॥
ওকি ওরে, অন্তস্পর্শ করি দূর, দশ বাহু করি যোড়,
প্রণাম যে করিল বিশেষে ।
ওকি ওরে, তুলাতুলি সপ্তবার, জয়ধরনি জোকার,
মশাল জ্বলিছে চাইরে পাশে ॥
ওকি ওবে, শিবের মুকুট মাখে, ফুল ছিটায় বাম হাতে,
নামাইল, ছায়া-মণ্ডপ ধরে ।
ওকি ওরে, দেখিয়া গৌরীর মুখ, শিবের মনে কোঁতুক,
পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে ॥
ওকি ওরে, তবে সাত পাক ফিরি, পার্বতী আর ত্রিপুরারি,
রৈল পূর্ব পশ্চিম মুখে ।
ওকি ওরে, জিনিয়া সে কোটি ভাসু দৌহার স্থলর তনু,
হেন রূপ দেবগণে দেখে ॥”

৫। বিবাহের গীত ।

“পুঙ্খুর্গীর চাইর পারে,
চাম্পা নাগেশ্বর,
ডাল ভাঙ্গ, পুষ্প তুল,
বিদেশী নাগর ।
দেখা দে লো রায়ের ভগ্নী,
দেখা দে আমারে,
কত টেকার অলঙ্কারে শোভিব তোমারে ?
লক্ষ টেকার গয়না হৈলে, না শোভে আমারে ।
তোমার হাতের বাজু হৈলে, শোভিবে আমারে ॥”

৬। বরবধুর যাত্রা-সময়ের গীত ।

“চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই ;
মা রৈছেন বৌ-ঘরা পাতিয়া ।

চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
ভগ্নী রৈছে ময়ূব পাখা লৈয়া ।

চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
পিসী রৈছেন ধাতু দুর্বা লৈয়া ।

চল কন্যা দেশে যাই আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
(আমার) মামী বৈছেন যুতের বাতি লৈয়া ।”

৭। বর বধু বাড়ীতে পঁজিছিলে গীত ।

“তুমি যে গেছলা রে বাছাই, নবীন স্বশুর-দেশে,
নবীন স্বশুর-দেশে ।

তোমার স্বশুব-শাশুড়িয়ে কি কি দান কচ্ছে ?
দিছিল একটা শালের গো যোড়া,

তারে থৈয়া আইছি, তাবে থৈয়া আইছি,
তোমার বধুরে লৈয়া দেশে চল্যা আইছি ॥” ইত্যাদি ।

কন্যাকে জামাতাব সঙ্গে যাত্রা করাইয়া দিবাব সময় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এক কূল-কিনাবা-শৃঙ্গ করণ-রসের সনুজে ডুবিয়া পড়েন তখন মেয়েবা পদ্মা-পূর্ণাণের কবি নারায়ণদেবেন আশ্রয়গ্রহণপূর্বক সাহে রাজাব স্ত্রী স্মিতাব কথায় বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস নিবৃত্তি করেন ।

৮। “ও কী গো, কেমনে বকিবা জামাইর ঘর ।

বিপুলাকে কোলে করি, স্মিত্রা স স্মন্দরী,
সকরণে কান্দয়ে বিস্তর ॥

সদায় গুমের ভুলা, ভাল মন্দ না বুঝিলা,

(ও কী গো,) জামাই তোমারে যাবে লইয়া ।

সাত পুত্র আছে মোর, রূপে গুণে বিদ্যাধর,

তাতে মোর নাহি এত দয়া ॥

পদ্মা মনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ,

কেমনে রব বুকে পালাণ দিয়া ।

নিশিকালে নিত্রা যাইও, সকালে মা জাগিও.

গুরুজনে সেবিও মন দিয়া ॥

শতক বৎসর জীও, সাত পুত্রের মা হইও,

পাক! চুলে পরিও সিন্দূর ।

মানিও স্বামীর কথা, না করিও অশ্রুথা,

কইও কথা অতি স্মধুব ॥

(বিপুলার উক্তি ।)

(মা গো) সাত ভাই কুশলে রউক, বাপের কল্যাণ হউক,

(মা গো) তুমি থাকো জন্মের আয়োরাগী ।

যদি সে কান্দহ মাও, আমার মস্তক খাও,

(মা গো) কন্যা হৈলে হয় পরাধিনী ॥”

এই গীতটি গাইবার সময় গায়িকা স্ত্রীগণের এবং অপরাপর পুরুষ সকলের মুখই বাৎসল্যের অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া পড়ে ।

৯। বর-বধুব পাশা-পেলার গীত ।

“আজু কি আনন্দ ! ধ্রু

কি আনন্দ হৈল আজু রস-বৃন্দাবনে ।

মদনমোহন খেলে পাশা, মনমোহিনীর মনে ॥ ইত্যাদি

১০। একটি জল-ভরার গীত ।

“তোমরা দেখছনি সজনী সই জলে ।

মদনমোহন, বংশীবদন, কদম্বেরি তলে ॥” ইত্যাদি

(সৌরভ, অগ্রহায়ণ)

শ্রী বিজয়নারায়ণ আচার্য্য

রামায়ণে রত্নের ব্যবহার

রামায়ণে রাজগৃহাদির, পোষাক-পরিচ্ছদের, তৈজস-পত্রের ও অস্ত্রাশ্র বর্ণনায় নানা প্রকারের রত্নাদির উল্লেখ আছে।

রামায়ণে নিম্নলিখিত রত্নগুলির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহা-নীলমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্ভব মণি, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, বিক্রম (প্রবাল), বৈদূর্য, মরকত, মুক্তা, ফটিক, বজ্রমণি বা হীরক, শ্বেত রত্ন ও কৃষ্ণ শিলা ইত্যাদি।

তখন ইন্দ্রনীল নামক মূল্যবান প্রস্তর খোদিত শিল্পীরা মূর্তি প্রস্তুত করিত। অযোধ্যার রাজপথের পার্শ্বে পার্শ্বে ইন্দ্রনীল-প্রস্তরের মূর্তি (Statue) স্থাপিত ছিল।—তত্রেন্দ্রনীল-প্রতিমা প্রতোগীবর-শোভিতাঃ ॥ ১৮।২।৮

রাবণের পুষ্পক রথে মূল্যবান ইন্দ্রনীল ও মহানীল-নির্মিত বেদিকা ছিল।—ইন্দ্রনীল-মহানীল-প্রবর-বেদিকাম্। ১৬।৫।৯

সীতা রামের যে-চূড়ামণি সবচেয়ে অভিজ্ঞান স্বরূপে রাখিয়াছিলেন, সেই চূড়ামণিটি ছিল—‘বারিসম্ভবঃ’ অর্থাৎ সমুদ্ররত্ন (সু ৪০-৮ শ্লোক)।

রাম-শবনের দ্বারসমূহ ছিল—প্রবাল ও মণি-মুক্তা খচিত।—মণি-বিক্রম-তোরণম্...মুক্তামণিভিরাকীর্ণঃ।

রাবণের রথখানাও ছিল—হেমজাল-বিততং মণি-বিক্রম-ভূষিতম্। ৩।৩।১১

রাবণের সিংহাসনগুলির কোন-কোনটি ছিল বৈদূর্যমণি খচিত, কোনটি বা ছিল মরকতময়। (ল ১১)

রাবণের শয্যাগৃহের পর্যায়স্থ বৈদূর্য মণির সহিত হস্তীদন্তের সমাবেশে নির্মিত হইয়াছিল। দাস্ত-কাঞ্চন-চিত্রাজৈত্র বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ। ২।৫।১০

আজকাল যেমন হীরক অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়, রামায়ণের যুগেও তাহা সেইরূপে ব্যবহৃত হইত। হীরক-খচিত অলঙ্কার (সু ১০), হীরক-খচিত বর্ম (ল ৭০) প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণে আছে। লঙ্কার রাজপ্রাসাদগুলিও বজ্রমণিতে বা হীরকখণ্ডে শোভিত ছিল।—বজ্র-বৈদূর্য-চিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোরমৈঃ। ৮।৪।৫৫

লঙ্কার চতুর্দিকে যে স্বর্ণপ্রাচীর ছিল, সেই স্বর্ণপ্রাচীরও ছিল—মণি-বিক্রম-বৈদূর্য-মুক্তা-বিরচিতাস্তরুম্। ১৪।৩।৩

ফটিকের ব্যবহার লঙ্কার অপরিপূর্ণ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফটিক কাঁচ নহে। প্রাচীনকালে কৈলাশ পর্বতে, বিষ্ণু পর্বতে ও

লঙ্কারীপে ফটিক উৎপন্ন হইত। কৈলাশ পর্বতে শুভ্রফটিক ছিল, দুই নামে পরিচিত—সূর্যকান্ত মণি ও চল্লকান্ত মণি। সূর্যকিরণ-সম্পাতে যে প্রস্তর-মণি হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাহার নাম ছিল সূর্যকান্ত মণি; আর চল্লকিরণসম্পাতে বাহা হইতে বারি নিঃসৃত হইত তাহার নাম ছিল—চল্লকান্ত মণি। কৈলাশ পর্বতে এইরূপ মূল্যবান ফটিকের জন্মস্থান হেতু এখনও তাহা ফটিকাচল বলিয়া পরিচিত।

লঙ্কার প্রাসাদ, চৈত্য, দেবায়তন—সমস্তই ছিল ফটিকপ্রভাবে প্রভাবিত। লঙ্কার অনেক তৈজস-পত্রও ফটিকনির্মিত ছিল। মণি-ময় ফটিক পানপাত্রের উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় আছে (সু ১০)। ফটিক খোদিত বোধ হয় এই-সকল পাত্র প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাতে মণিমুক্তা বসান হইত।

(সৌরভ, অগ্রহায়ণ)

শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধদেব

জৈনদের তীর্থঙ্কর শ্রেণীর চতুর্দশশতাব্দী ও শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান বা মহাবীর স্বামী।

বুদ্ধদেব পঞ্চবিংশতিতম ও শেষ বুদ্ধ।

পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী সন্ন্যাসীদের নিগম (নিগ্রহ, গ্রন্থিহীন, বন্ধনহীন) বলিত ও গৃহস্থদের শ্রাবক বলিত। এই সম্প্রদায় ঋষভ দেব স্থাপন করেন। পার্শ্বনাথ স্বামীর সময় খৃঃ পূঃ ৮৭৮—৭৭৮।

বর্ধমান স্বামী ও বুদ্ধদেব প্রায় সমসাময়িক।

বুদ্ধদেব	বর্ধমান স্বামী
জন্ম খৃঃ পূঃ ৫৫৭	৫৯৯ (চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশী)
দীক্ষা ৫২৭-৫২৮	৫৭০ (অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ দশমী)
জ্ঞানলাভ ৫২১	৪৫৭ (বৈশাখ শুক্লা দশমী)
মোক্ষ ৪৭৭	৫২৭ (কার্তিক অমাবস্তা)

বর্ধমান স্বামীর মোক্ষ-বৎসবে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনেক দিকান্ত একই প্রকার, কিন্তু কোন কোন স্থানে মারাত্মক প্রভেদ আছে। ঐ প্রভেদ কালের প্রভেদ বা সংস্কার।

(মানসী ও মর্মবাণী, পৌষ)

শ্রী অমৃতলাল শীল

ঘরে

ঘরে হেরি চলিয়াছে বঞ্চনার পালা,—
প্রত্যেক বাঙ্গালী-নারী হতেছে বঞ্চিত।
শিক্ষা নাই—স্বাস্থ্য নাই; হৃদয়ের জ্বালা
অহরহ পলে-পলে হতেছে সঞ্চিত।

হে নবীন, ঘরে নাই যাহা তুমি চাও,
সেখা আছে অজ্ঞতার অভিশাপরাশি।
আজি বৃথা দ্বারে দ্বারে সামাগান গাও—
বুঝিবে না একবর্ণ তব পিসী-মাসী।

সে দোষ ত কারো নহে; তোমারি সে দোষ।
তোমাদের মুখ চাহি' তারা রহে বাঁচি'।
সব দ্বার দেছ রুদ্ধি'—করে নাই রোষ—
বলেছে সন্তোষভরে, 'মোরা বেশ আছি'।

আর কত ইহাদের রাখিবে ঠকায়ে?
রাত্রি গেছে—রৌদ্র ওই এসেছে ঘনায়ে।

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

মরা-মা

ঘুমিয়েছিলাম বড় গভীর ঘুমের ধোরে,
 ঝগান-ঘাটে নদীর দিকে শিয়র করে' ।
 ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে,
 জলের ছলচ্ছলধ্বনির কলস্বনে ।
 দুপূব-রাতে সেই শাড়ী আর সেই সিঁদুরে
 জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কান্না দূরে !
 মেয়ে কঁাদে—আমার নন্দরাণীর গলা—
 কী যে করুণ কাতর স্বরে,—যায় না বলা !
 “মাগো আমার, আজকে রাতে আয় না মাগো,
 একলা আছি কেউ কাছে নেই, দেখে যাগো !
 কেউ করে না—একটু এসে আদর কর,
 আর-একটা যে না এয়েছে নতুনতর !
 অন্ধকারে একলা শুয়ে ভয় যে করে !
 নেই বিছানা—হয় না যে ঘুম মাটির 'পরে ।
 পেট জ্বলে যে দিনে-রাতে ক্ষুধায় মরি—
 কেমন করে' বলনা মাগো ঘুমিয়ে পড়ি ?”
 অসাড় অধোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে—
 কান্না শুনে ঘুম যে ভাঙে ঝগান-ভূমে !

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে—
 ঘুমিয়েছিলাম,—আবার দেখি নয়ন খুলে'
 আঁধার ধরা,—চাঁদের মুখে রক্ত কেন ?
 তারার চোখে জলের ফোঁটা—কঁাদছে যেন !
 গেলাম হেঁটে শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে',
 বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিড়কী খুলে—
 ঘরটিতে তার ঘুটঘুটে কী অন্ধকার !
 তাইতে তবু শাদা দেপায় মুখ আমার !
 “ওমা মাগো !—এই যে তোমার পেইছি দেখা !
 ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে একা !
 মুখে তোমার রক্ত যে নেই, চোখ যে ঘুমায় !”
 ভয় গেল তার একটু হাসি একটি চুমায় ।

মাথায় দিলাম হাত বুলিয়ে, গান শুনিয়ে
 ছড়ার স্বরে, দিলাম দোলা বক্ষে নিয়ে ।
 “অমনি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো !
 ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো !”
 চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ'ল—
 বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে প'ল !

সেই ঝগানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
 নন্দা আছে বৃকের উপর মুখটি থুয়ে ;
 মুখে তাহার রক্ত যে নাই একটুখানি,
 তবু কেমন ঘুমিয়ে হাসে নন্দরাণী !
 এমন সময় শিশুর করুণ কণ্ঠস্বরে
 ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে !
 সে যে আমার ছেলের গলা—আমায় ডাকে—
 আঁগুটা ছেলে পঞ্চু আমার ডাকছে কাকে !
 “ওরা মারে—গায়ে আমার বড়ই ব্যথা—
 ছুঁ, বলে' গাল দি ওদের—সত্যি কথা !
 দেয় না খেতে—ক্ষুধায় জ্বলি দিবস-রাতি—
 ইচ্ছে করে পালাই কোথা, নেই যে সাথী !”
 ঘুমিয়েছিলাম স্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে,
 ভাঙল তবু সে ঘুম আমার ঝগান ভূমে ।

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
 ঘুমিয়েছিলাম,—আবার দেখি নয়ন খুলে,
 আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন ?
 তারার চোখে জলের ফোঁটা—কঁাদছে যেন !
 গেলাম চলে' শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে—
 ঘরের ভিতর এলাম শেষে খিলটি খুলে' ।
 “ওমা মাগো, এই যে তোমার পেইছি দেখা,
 ভয় করে না তোমার পানে চাইতে একা ;
 নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালের 'পরে—
 বড় কাহিল, অবশ দেহ ব্যথার ভরে !”

শক্ত ছেলে—ভয় পেলে না, উঠল হেসে !
 আহ্লাদে হাত বুলিয়ে দিলাম মাথায় কেশে ।
 বৃকে তুলে দুই গালে তার দিলাম চুমা,
 গানের সুরে কইলু কানে—‘এবার ঘুমা’ ।
 “অমনি করে’ গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো—
 ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো !”
 চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ’ল,
 বাছা আমার ঘুমিয়ে প’ল ঘুমিয়ে প’ল !

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,—
 ছেলে মেয়ে এক বৃকেতে ঘুমায় দু’য়ে ।
 ঘুমিয়েছিলাম—হুঠাৎ জেগে ভয় যেন পাই,
 আর-দুটিরে ঘুম থেকে আর জাগাই নি তাই !
 কচি ছেলের কান্না শুনি অন্ধকারে—
 বোল ফোর্টেনি, চিঁচিঁ করে’ ডাকছে কারে ?
 ও যে আমার ফোলের ছেলে—খোকায় গলা—
 নেহাৎ কচি—বোল ফোর্টেনি—হায় অবলা !
 কেউ দেখে না, নেয় না তারে—বাছা আমার !
 মাঘের বৃকের দুধ না পেয়ে বাঁচে না আর !
 ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিলটি খুলে,
 দেখি খোকন শুকিয়ে গেছে—নিলাম তুলে,
 কত করে’ খাম্বল বাছার ফুঁপিয়ে-ওঠা,
 মুখে দিলাম হাড়-বেরোনো বৃকের বোঁটা ।

সেই রাঙা-চাঁদ দিচ্ছে উকি আকাশ থেকে—
 পাংশু হ’ল আমার চাঁদের সে-মুখ দেখে !
 চুমায় চুমায় কান্না আমার চাপতে হ’ল,
 খোকন তখন ঘুমিয়ে প’ল ঘুমিয়ে প’ল !

ঘুমিয়ে প’ল, নেতিয়ে প’ল’—আর সাড়া নেই,
 শুইয়ে দিলাম মেঝের উপর অন্ধকারেই !
 হাত-পা’গুলি সমান করে’ দিলাম রেখে,
 গায়ের উপর দোলাইখানি দিলাম ঢেকে ।
 ছুটে দেখি আর-এক ঘরে—স্বামীর পাশে
 সতীন ঘুমায়—তারই কেবল ঘুম না আসে !
 দেখেই আমার চিন্তে, তবু লাগল ধাঁধা,
 সেই আঁধারে মুখ যে আমার দেখায় শাদা !
 চোখে-চোখে যেমন চাওয়া—কী চীৎকার !
 জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তার !
 চুপে—চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে,
 খানিক পরেই খোকায় তারা সেথায় আনে ।
 বড় হ’জন দুই পাশেতে—কাছে কাছে—
 খোকন আমার বৃকের টা । ঘুমিয়ে আছে ।
 আমরা সবাই ঘুমাই জলের কলসনে,
 ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে !*

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

* একটি ইংরেজী কবিতার অনুকরণে ।

চালপড়া

চালপড়ার নাম অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন ।
 পাঠশালে যখন পড়িতাম তখন বার কয়েক চালপড়া
 খাইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে । কোন বালকের
 পুস্তকাদি অপহৃত হইলেই, আমাদের বিজ্ঞ গুরুমহাশয়টি
 এই চালপড়ার হান্ধামা করিয়া বসিতেন । কোন জিনিষ
 চুরি হইলে, পল্লীগ্রামে এখনও চালপড়া খাওয়াইবার ভয়
 দেখান হয় । যে চুরি করিয়াছে, চালপড়া খাওয়াইলে নাকি
 তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠে এবং আসল চোর ধরা পড়ে ।

চালপড়ার প্রবাদটি আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচলিত,
 কিন্তু ওই জিনিষটা খাওয়াইয়া চোর ধরিতে কেহ স্বচক্ষে
 দেখেন নাই, বোধ হয় । তা ছাড়া এই চালপড়া
 জিনিষটা কি ? ইহার মূলে কোন সত্য আছে, না গল্প
 মাত্র ? কত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি,
 তাঁহারা বলেন, “ও একটা ভয় দেখাইবার ফন্দি ।”

প্রাচীনকালে ভারতে শাস্ত্রানুমোদিত পরীক্ষার দ্বারা
 দোষী নির্দোষী স্থির করা হইত । শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ নয়

প্রকার পরীক্ষার উল্লেখ আছে। গত শ্রাবণের প্রবাসীতে ভারতের প্রাচীন বিচার-পদ্ধতি শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত নয় প্রকার পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে।

এই নয় প্রকার পরীক্ষার মধ্যে চালপড়া বা তণ্ডুল-পরীক্ষা একটি। যথা:—

“ধটোহ্মিগ্নিকদকৈব বিয়ং কোষঞ্চ পঞ্চমম্।

যষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তপ্তমাষকম্।

অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্মজং স্মৃতং।”

—বৃহস্পতি।

কাত্যায়ন ও দিব্যতস্বে আবার এই নয় প্রকার পরীক্ষার প্রয়োগ-বিধি ও মন্ত্রাদি বিস্তৃত বর্ণন আছে। সামান্য চাউল উত্তমরূপে ধুইয়া শুষ্ক হইলে, দেবতার স্নান-জলে একটি নূতন মাটির পাত্রে উহা এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন বিচারক শুচি হইয়া বসিবেন এবং চোরের দলকে স্নান করাইয়া পূর্বমুখে বসাইবেন।

পরে একখানি ভূর্জপত্রে বা অশথ-পাতায় এই মন্ত্র লিখিবেন,—

আদিত্য-চন্দ্রাবনিলোহনলশ্চ

দ্যৌভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।

অশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যো

ধর্মো হি জানাতি নরশ্চ বৃত্তং ॥

এই মন্ত্র-লেখা পাতা পর পর এক-একজনের মাথায় রাখিয়া, উক্ত ভিজান চাউল সামান্য চর্কণ করিতে দেওয়া হয় এবং অন্তত একখানি অশথ-পাতায় চর্কিত চাউল রাখিতে বলা হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সকলকে এই নিয়মে চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে যাহার চর্কিত চাউলে রক্ত দেখা যাইত, সেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইত। চাউল চর্কণ করিবার সময় দোষী ব্যক্তির তালু শুষ্ক হইয়া যাইত এবং সে কাঁপিতে থাকিত।

শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন

যে ভোগ্য-সমষ্টিকে সামাজিক আয় বলা হয়, তা উৎপাদিত হয় তিনটি উপকরণের সাহায্যে:—প্রকৃতি, মানুষ, ও মূলধন। সামাজিক আয় বাড়াতে হলে এই উপকরণগুলির পরিমাণ (আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে) বা ভোগ্য-উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে হয়। প্রকৃতির কোনো সঞ্চিত ধন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে তাকে খুঁজে বের করা (যেমন, খনি, অকর্ষিত জমি, বা অল্প চেষ্টায় ব্যবহারযোগ্য হয় এমন জমি, জলশক্তি, ইত্যাদি), মানুষের শক্তির অপচয় নিবারণ করা, মানুষের লুকান ক্ষমতা-গুলিকে ফুটে উঠবার সুযোগ দেওয়া, মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা বা অপচয় নিবারণ, ইত্যাদি নানা ভাবে সামাজিক আয় বৃদ্ধির আয়োজন করা যেতে পারে। সামাজিক আয় বৃদ্ধির তিনটি উপায় সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা যায়।

১। আবিষ্কার, ২। উদ্ভাবনা, ৩। সংরক্ষণ।

আবিষ্কার বলতে অজানা অবস্থায় অব্যবহৃত ভাবে যে-সব ভোগ্য বা তার উপকরণ পড়ে ছিল, তাকে কাজে

লাগান বুঝায়। যেমন কোন্ নদীতে মাছ আছে তা আবিষ্কার করা, বা এমন কোনো জলপ্রপাত খুঁজে বের করা যার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, অথবা কোন্ ঝরণার জলে ঔষধের কাঁচ হয় আবিষ্কার করা, ইত্যাদি। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আবিষ্কারকে উদ্ভাবনার সাহায্যে কাজে লাগাতে হয়। তদুপ আবিষ্কারকে আলাদা করে ধরাই উচিত। আবিষ্কারের জন্ম সমাজের উচিত, কোথায় কি আছে দেখে খুঁজে বেড়াবার লোক নিযুক্ত করা। খনিজ পদার্থ কোথায় কি আছে, জলশক্তি কোথায় কিরূপ আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোথায় কোন্ ভোগ্যের ভাণ্ডার পড়ে আছে, এই-সব খোঁজ করে বের করাই এদের কাজ হবে।

তার পর উদ্ভাবনা। যন্ত্রের উদ্ভাবনা, উপায়ের উদ্ভাবনা, ব্যবহারের উদ্ভাবনা, সবই উদ্ভাবনা। মানুষের বুদ্ধি সর্বদাই অল্পশ্রমে কাজ সারবার উপায় খুঁজছে। এই থেকেই যন্ত্রের উৎপত্তি। পুরাকালে, দিনের পর দিন লিপে

একখণ্ড বই হত; আর আজ, ৭ দিনে ১০,০০০ খানা বই বের করা অতি সাধারণ কাজ। এক্ষেত্রে মানুষ নিজের শক্তি সাক্ষাৎ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে না। প্রথমে শক্তি দিয়ে তৈরী করছে যন্ত্র, তার পর যন্ত্র মানুষের জায়গা নিয়ে কাজ করে' দিচ্ছে। আজকাল যন্ত্র তৈরী করার যন্ত্রেরও অভাব নেই। মানুষ শুধু মানসিক শক্তি খরচ করে, প্রকৃতি যন্ত্ররূপ ধারণ করে' মানুষের কাজ বাকিটুকু সবই করে' দেয়। নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে' মানুষ সমান খরচে বেশী কাজ করে' নিচ্ছে। উদ্ভাবনা যন্ত্রেরও হতে পারে, কার্যপ্রণালীরও হতে পারে। যেমন ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণ ও উপায়গুলি নানা ভাবে ব্যবহার করা যায়। ক-পরিমাণ প্রকৃতি (অর্থাৎ প্রাকৃতিক জিনিস) ক-পরিমাণ মানুষ (অর্থাৎ মানুষের শ্রম, মানসিক বা দৈহিক) ও ক-পরিমাণ মূলধন দিয়ে খ-পরিমাণ ভোগ্য উৎপাদন হয়; আবার ২ক-পরিমাণ প্রকৃতি, ২ক পরিমাণ মানুষ ও ২ক-পরিমাণ মূলধন দিয়েও খ-পরিমাণ ভোগ্য পাওয়া যেতে পারে। হয়ত ২ক প্রকৃতি+২ক মানুষ+২ক মূলধন ২খ ভোগ্য দান করবে। হয়ত ১০ক প্রকৃতি+৫ক মানুষ+১০ক মূলধন ১৫খ ভোগ্য উৎপাদন করবে। কি উপায় বা প্রণালী অবলম্বনে সব চেয়ে বেশী লাভ হবে, মানুষের উদ্ভাবনা-শক্তি সর্বদা তাই দেখছে। ক-কি উপায়ে অপব্যয় ও অপচয় নিবারণ করা যায়, তা ঠিক করাও উদ্ভাবনার কাজ। কারখানায় কোনো বস্তু প্রস্তুত করতে গিয়ে সব সময়ই আনুষঙ্গিক নানা বস্তু বেরিয়ে পড়ে; যেমন গ্যাস তৈরী করতে কোক, আলকাট্রা ও কার্বন, বা তক্তা তৈরী করতে কাঠের গুঁড়া। এ-সব আনুষঙ্গিক দ্রব্য-গুলির (Bye products) সদ্যবহার করতে পারলে লাভ আছে। এও উদ্ভাবনার ক্ষেত্র। এক মণ তেল পুড়িয়ে একটা চুল্লী জ্বলতে পারে; আবার সমানই তাপ দেয় এমন চুল্লীর উদ্ভাবনা হতে পারে যাতে মাত্র আধ মণ তেল পুড়বে। তেল না হয়ে কয়লাও হতে পারে।

ভোগ্যকে যেমন ভোগীর পক্ষে সহজলভ্য করে' দিলে ভোগ্যের স্বাচ্ছন্দ্যদান-ক্ষমতা বেড়ে যায় (যথা,

'নদীতে মাছ আছে ধরে' খাও গিয়ে' না বলে' 'এই নাও মাছ' বললে মাছ খাওয়ার সুখ বেড়ে যায়) তেমনি ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণগুলিকেও সহজলভ্য করতে পারলে লাভ আছে। মানুষকে যদি সব সময় "কোথায় ধান, কোথায় কয়লা, কোথায় পাট, কোথায় লোহা, কোথায় মূলধন," ইত্যাদি চীৎকাব করে' ঘুরতে হয় তা হলে উৎপাদন-কার্য শক্ত হয়ে পড়ে। ঠিক কাজের জায়গায় ও সময়ে যদি উৎপাদনের উপকরণগুলি পাওয়া যায়, তা হলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক বছর, ছমাস, যাই হোক) নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দিয়ে বেশী ভোগ্য উৎপাদিত হতে পারে। অর্থাৎ কি না, উৎপাদনের উপকরণগুলি অচল অটল হলে সামাজিক আয়ের ক্ষতি হয়। কোনো জায়গায় লোহা অসংস্কৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তা গলিয়ে বিশুদ্ধ লোহা বের করার জন্তু কয়লাও পাওয়া যায়; অথচ যদি শ্রমজীবীরা সেখানে না যেতে চায়, বা গোড়ার বন্দোবস্ত ও কাজ সুরু করার মত মূলধন না পাওয়া যায় বা বহুকষ্টে পাওয়া যায়, তা হলে সামাজিক আয়ের দিক থেকে ক্ষতি হবে। কাজেই সামাজিক আয়ের সুবিধার দিক থেকে উৎপাদনের উপকরণগুলির অচল ভাব যত কমে' আসে ততই ভাল। অর্থাৎ উপকরণের সচলতার উপর তার কার্যকারিতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে-কোন কাজে উপকরণ-গুলি কি কি হারে ব্যবহৃত হবে এবং শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত কি তা ঠিক করতে উদ্ভাবনা-শক্তির দরকার। সাধারণ ভাবে উপকরণগুলিকে সচল করে' তুলতেও উদ্ভাবনা-শক্তির প্রয়োজন। মূলধন ধার দেবার জন্তে যে-সব বন্দোবস্ত আছে (যেমন ব্যাঙ্ক, লোন অফিস ইত্যাদি; মহাজন কাবুলিওয়ালারাও বাদ পড়ে না), সেগুলি মূলধনকে সচল করে' তোলে। আবার সংবাদ-প্রকাশ, দ্রুতগামী ট্রেন, ইত্যাদি, এরাও কাজের জায়গায় ও সময়ে উপকরণ-গুলিকে পৌঁছে দেবার সাহায্য করে। যেমন কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে লোকে কাজের জায়গায় রেলগাড়ী চড়ে' হাজির হয়। নূতন খনি আবিষ্কৃত হয়েছে শুনলেই বা সংবাদপত্রে পড়লেই সেই দিকে সামাজিক মূলধন ও মানুষ ছুটতে সুরু করে। শিকার অভাবে অজ্ঞানতা বশত;

অনেক সময় লোকে নির্বোধের মত মূলধন একেজো অবস্থায় ফেলে রাখে ও শ্রম করতে সক্ষম হয়েও এবং সমাজে কার্য্যভাব না থাকলেও লোকে নিজের বাসস্থানে কাজবিহীন অবস্থায় কষ্ট পায়। শিক্ষা মানুষের মনকে উদ্যোগী ও সজাগ করে' তোলে; শিক্ষাই মানুষকে অনেক দূর অবধি দেখতে শেখায়। শিক্ষার বিস্তার মূলধন ও মানুষকে সচল করে' তোলে। উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল করে' তুলতে হলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে মূলধন সচরাচর বিনা কাজে ও কোনো ফল প্রসব না করে' পড়ে' থাকে। মূলধন সচল করে' তুলতে হলে আরও ব্যাকের প্রয়োজন, এবং সেই-সব ব্যাক্ জাতীয় কারবারগুলিকে মূলধন সরবরাহ করে' বাড়িয়ে তুলবে। শ্রমজীবীকে সচল করে' তুললে ও শিক্ষা দিলে, নানা প্রকার কাজে সহজেই কার্য্যক্ষম লোক পাওয়া যাবে এবং ফলে সামাজিক আয় বেড়ে চলবে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই বছরের বেশীর ভাগ সময় বসে' থাকলে সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অসম্ভব। কাজেই সমাজের প্রধান সম্পত্তি যে মানুষের শ্রম তার অপচয় নিবারণ সর্বাপ্রায়ে দরকার।

সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করলে কাজ বেশী হয়। এই সুশৃঙ্খলতা ও সংঘবদ্ধতাও উদ্ভাবনার ফল। কারবারের আয়তন, শিল্প অমুসারে, ছোট বড় হলে কাজ কম খরচে হয়। যেমন ছবি আঁকার কাজ—হাজার খানেক চিত্রকর এক ঘরে বসে' কেউ আকাশ-টুকু আঁকছে, কেউ জলটুকু আঁকছে, কেউ গাছগুলি আঁকছে, এ প্রকারে শ্রমবিভাগ করে' হয় না। ছবিতে, চিত্রকরের মনের ভিতর যে ভাব আছে, তাই রংএর ও রেখার সাহায্যে ব্যক্ত হয় বলে' তাতে শ্রমবিভাগ চলে না। একজনের সৌন্দর্য্যবোধ অপরের চেয়ে এমন ভিন্ন রকমের হতে পারে, যে, দুইয়ের মিশ্রণে কদর্য্যতা সৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু অন্য কোনো শিল্পে শ্রমবিভাগ ও বৃহৎ আয়তনের কারখানাই শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত হতে পারে। যেমন গ্যাস প্রস্তুত। একেত্রে যদি প্রত্যেক গঠন তত্ত্বও তখন মাত্র গ্যাস তৈরী করার মত

করে, তা হলে গ্যাসের জন্য খরচ হবে অসম্ভব রকম। একেত্রে অনেক লোক ও অনেক মূলধন একত্র করে' বহু পরিমাণ কয়লা জোগাড় করে' গ্যাস প্রস্তুত করলে গ্যাস সস্তায় হবে এবং আনুষঙ্গিক মালগুলিও বিক্রয় করে' ব্যবসা আরও লাভবান হবে। বলাই বাহুল্য, যে, এই-সব ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের কেউ শুধু কয়লা বইবে, কেউ চুল্লী ঠিক রাখবে, কেউ অন্য কাজ করবে, অর্থাৎ শ্রম বিভাগ করে' কাজ হবে। তার পর কি ভাবে বেতন দিলে কাজ ভাল পাওয়া যায়, কি পরিমাণ বেতন দিলে শ্রমজীবী কর্মক্ষম থাকে, কি ধরণে ব্যবসা করলে বৃহৎ আয়তনের কারবার সম্ভব হয় (যেখ কারবার, সমবায় ইত্যাদি), কি ভাবে শ্রমজীবীদের কাজ করালে যত্ন (মূলধন) হতে বেশী কাজ পাওয়া যায়, কতক্ষণ কাজ করলে ও কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করলে কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, ইত্যাদি ঠিক করতেও উদ্ভাবনা-শক্তির ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন।

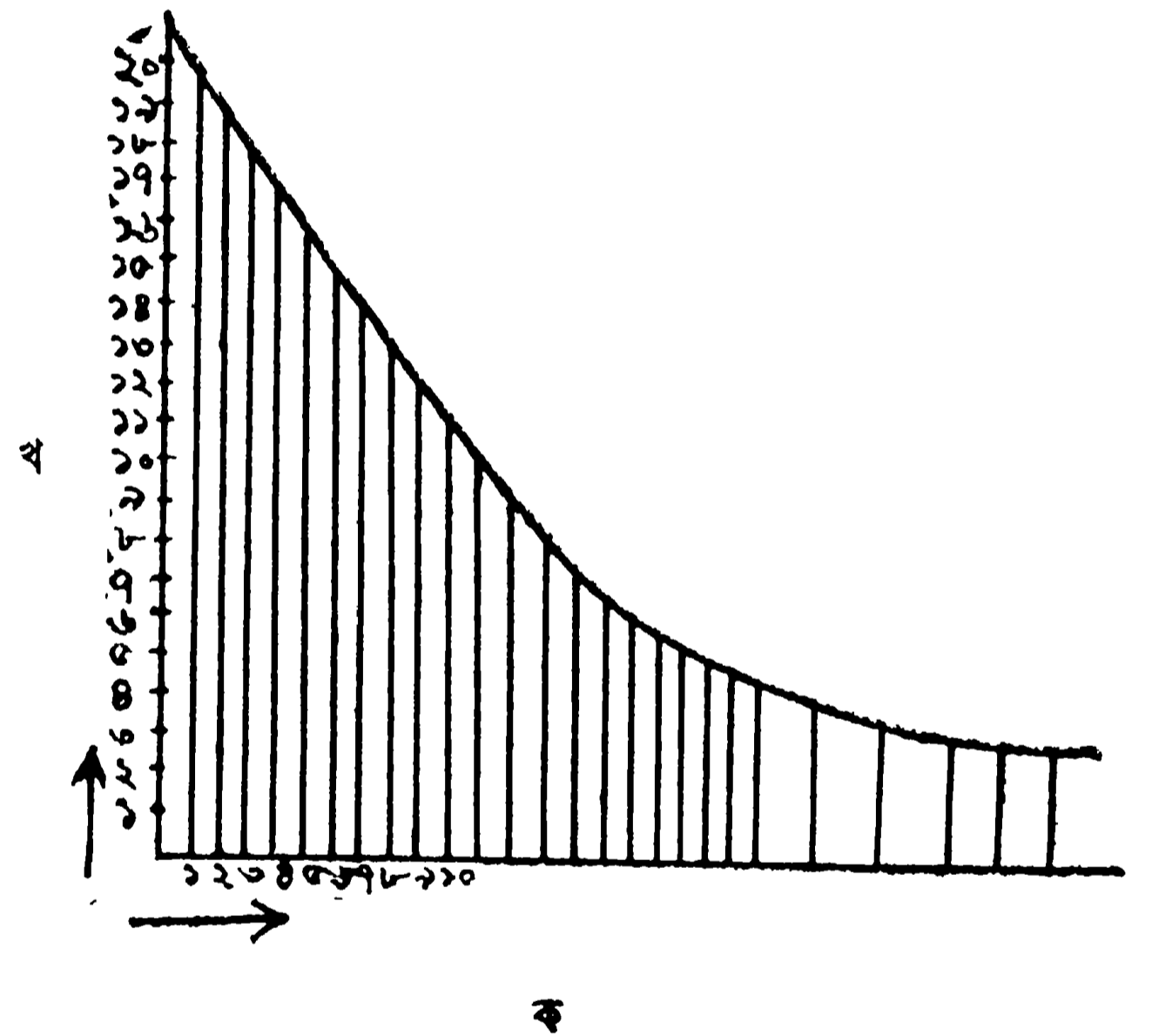
সামাজিক সম্পত্তি যেটুকু আছে, যা থেকে সমাজের উপকার স্থায়ী ভাবে হতে থাকে, সেটুকুর সংরক্ষণ দরকার। যেমন বন জঙ্গল সংরক্ষণ, নদী ভরাট না হয়ে যায় দেখা, বা মানুষের স্বাস্থ্য ও সকল প্রকার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা, ইত্যাদি।

শেষ কথা এই, যে, আবিষ্কার, উদ্ভাবনা ও সংরক্ষণ, সাধারণতঃ সবই পরস্পরের সাহায্যে হয় এবং সবগুলিই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। কোন্টি বেশী, কোন্টি কম, আলোচনায় লাভ নেই। উৎপাদনের উপকরণগুলি (প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন) কি ভাবে ব্যবহার করলে তাদের দ্বারা সব চেয়ে বেশী উৎপাদন করা যেতে পারে এবং তাদের সচল (অর্থাৎ ঠিক স্থানে ও কালে পাওয়ার উপায়) করে' তুলবার কি কি ব্যবস্থা সমাজে আছে, দেখবার আগে ভোগ্যের দাম (টাকায়) কি ভাবে সমাজে নির্দিষ্ট হয়, তা দেখা দরকার। দাম কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে—মূল্য নয়—তার কারণ মূল্য কথাটির সঙ্গে লোকে সাধারণতঃ প্রয়োজনীয়তার একটা সম্বন্ধ আছে বলে' ধরে' নেয়। পাছে প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য মাত্র গোলমাল হয়, সেইজন্য যে পরিমাণ টাকা কোন

জিনিস কিনতে লাগে তাকে জিনিসের দাম বলা হবে। একটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা (বা ব্যবহারিক মূল্য) কি, তা তার দাম দিয়ে বিচার করা যায় না। যেমন হাওয়ার দাম (আর্থিক বা বদলে পাওয়ার মূল্য) কিছুই নেই, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। হুনের দাম খুবই কম, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। জলের দাম কোনো স্থলে কিছুই না, কোথাও খুব কম কিছু, কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। দাম কি হবে তা দেখতে গেলে জিনিসটা লোকে চায় কি পরিমাণে এবং জিনিসটা আছে কি পরিমাণে, এই দুই দিক দিয়ে দেখতে হবে। অর্থাৎ হাওয়া চায় লোকে খুবই, কিন্তু যত চায় তার চেয়ে বেশী হাওয়া পাওয়া যায়, কাজেই তার দাম নেই। দাম অর্থাৎ যা দিতে কিছু নেওয়া অথবা অদল-বদল করে' জিনিস নেওয়া যায়। কিন্তু যে জিনিস অজস্র, অপরিমিত চার দিকে রয়েছে তার জন্তে লোকে কিছু দিতে যাবে কেন? কাজেই হাওয়ার দাম নেই। কিন্তু সোনার দাম আছে খুব। কারণ লোকে যে পরিমাণ সোনা চায় তার চেয়ে সোনা আছে তের কম। কাজেই সোনার বদলে সব চেয়ে বেশী দিতে যারা রাজি ও সক্ষম তারাই শুধু সোনা পায়। এক কথায়, জিনিসের দাম ঠিক হয় জিনিস কিনবার ইচ্ছা (demand) এবং জিনিস বেচবার ইচ্ছা (supply), এই দুই শক্তির জোরে। ইচ্ছা দুই ক্ষেত্রেই সক্রিয় (active) হওয়া দরকার। অর্থাৎ শুধু মনে মনে পাবার ইচ্ছা বা বাসনা, কিনবার ইচ্ছা নয়। সে ইচ্ছা টাকার ভাষায় প্রকাশ করা দরকার অর্থাৎ কিনা বলা দরকার যে “এই পরিমাণ জিনিসের জন্ত আমি এই পরিমাণ টাকা দিতে রাজি ও সক্ষম আছি”। বেচবার ইচ্ছাও সেই ভাবে প্রকাশিত হওয়া দরকার অর্থাৎ বিক্রেতাকে বলতে হবে, “এই পরিমাণ জিনিস এই পরিমাণ টাকা পেলে আমি সরবরাহ করতে রাজি ও সক্ষম আছি।” ক্রমশঃ-বিক্রীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে যতই ভোগ্যের পরিমাণ বাড়ান যায় ততই তার প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। কাজেই ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তা

২ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তার অর্ধেকের বেশী। ৩ক-পরিমাণ জিনিস ক-পরিমাণ জিনিসের তিনগুণের কম প্রয়োজনীয়তা দেবে। যে জিনিস প্রয়োজনীয়তা দেবে কম, তা কিনবার ইচ্ছাও হয় কম; কাজেই কোনো লোক কোনো জিনিসের (ভোগ্য) কি কি পরিমাণ কি কি দামে কিনতে ইচ্ছুক তা লিখলে পরিমাণের সঙ্গে দাম কমে আসবে। যথা এক সের ঘি যদি কেউ ৫ টাকা সের হিসাবে কিনতে ইচ্ছুক থাকে, তা হলে সে দুই সের ঘি ৪ টাকা (ধরা যাক) সের হিসাবে কিনতে ইচ্ছুক হবে; তিন সের ঘি ৩ টাকা হিসাবে, ৪ সের ২ টাকা হিসাবে, ৫ সের ১৫০ হিসাবে, ৬ সের ১০ হিসাবে, ইত্যাদি।

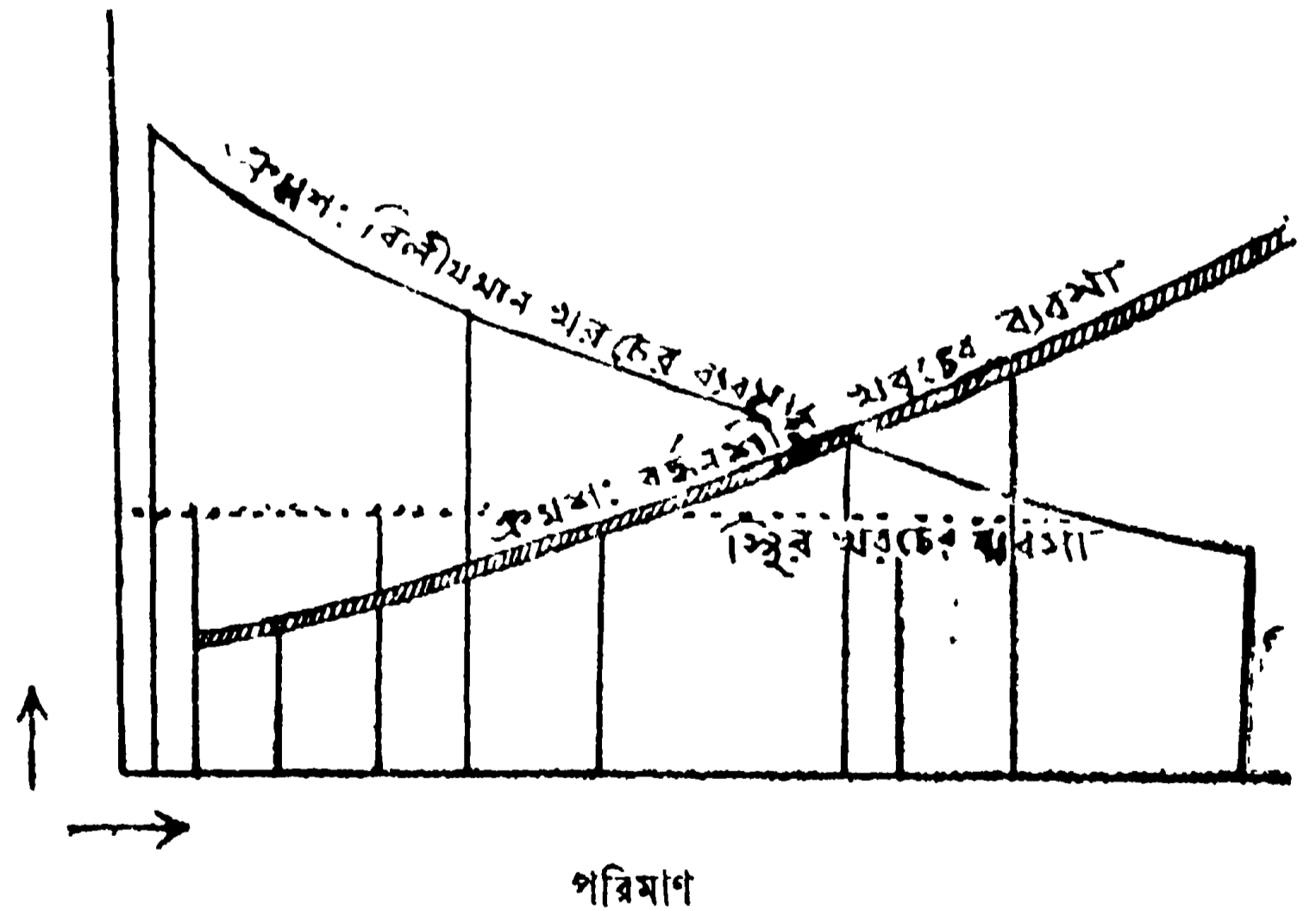
তার কিনবার ইচ্ছার একটা ছবি আঁকা চলো।



ছবিতে ক-রেখাটির উপর জিনিসের পরিমাণ দেখান হচ্ছে এবং পরিমাণ যতই ডান দিকে যাচ্ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে; আর x-রেখাটির উপর টাকার দাম দেখান হচ্ছে। জিনিসের পরিমাণ থেকে সের প্রতি দামের সমান উঁচু করে' রেখা টানলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেরদর দেখিয়ে এক-একটা রেখা টানা যায়। এখন রেখাগুলির মাথা আর-একটি রেখা টেনে জুড়ে দিলে সেই রেখাটি ব্যক্তিবিশেষের সেই জিনিস কিনবার ইচ্ছা-নির্দেশক রেখা হবে। অর্থাৎ তা থেকে বুঝা যাবে ব্যক্তিবিশেষ কি কি দামে কি কি পরিমাণ ভোগ্য কিনতে রাজি

আছে। এই জাতীয় রেখাগুলি সাধারণতঃ সর্বদাই নিম্নগামী হয়। সমাজের সব লোকের ভোগ্য-বিশেষ কিন্বার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলি উপরি উপরি বসালে একটা গড়ে বাজারের (অর্থাৎ বাজারে যারা কিনতে যায় তাদের একত্র) কিন্বার ইচ্ছা নির্দেশক রেখা পাওয়া যায়। এমন লোকও এদিক্ ওদিক্ ছুচার জন থাকে যারা দাম বেশী কম দিতে ইচ্ছুক হয়; কিন্তু সাধারণ ভাবে বাজারের সকল খরিদারের ইচ্ছা নির্দেশক একটা রেখা পাওয়া যায়। কেউ যেন না ভাবেন, যে, বাস্তব জীবনে রেখা টেনে কাজ হয়। দর-দস্তুর করা বা বেশী দাম মনে হলে না-কেনা ইত্যাদির ভিতর দিয়েই বাজার (অর্থাৎ ক্রেতাসমষ্টি) তার কিন্বার ইচ্ছা জানিয়ে দেয়। কেবল বুঝবার সুবিধার জন্তে আমরা সেই ইচ্ছাকে এঁকে দেখাবার চেষ্টা করছি। এখন বিক্রেতার দিকটা দেখা যাক। বেচবার ইচ্ছার যদি একটা ছবি আঁকা যায় তা হলে তার আকৃতি নানা প্রকার হতে পারে। কোনো কোনো জিনিস একই দরে যে-কোনো পরিমাণে সরবরাহ করা যায়। কোনো কোনো জিনিসের দর, যতই পরিমাণ বাড়ে, ততই বেড়ে যায়; আবার কোনো কোনোটির দর পরিমাণের সঙ্গে কমে' যায়। তার কারণ জিনিস তৈরী করতে খরচ কি হয় তা সেই জিনিসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। হয়ত ১ লক্ষ মণ ধান উৎপাদন করতে যা খরচ হয়, চাষযোগ্য জমি কমে' এলে ২ লক্ষ মণ করতে তার তিন গুণ খরচ হয়। ১০০ মণ মাছ ধরতে যা কষ্ট বা খরচ ২০০ মণ ধরতে তার ৪ গুণ খরচ বা কষ্ট হতে পারে। আবার ক-পরিমাণ গ্যাস, সূচ, সূতা, ছুরিকাঁচি, শিশি বোতল, তৈরী করতে যা খরচ হয় তার চারগুণ করতে গেলে খরচ চারগুণের কম হতে পারে। কারণ প্রকৃতির কাছ থেকে ভোগ্য আদায় (বা আহরণ) যেখানে হয় সেখানে ভোগ্যের পরিমাণের তুলনায় চেষ্টার (কষ্ট বা খরচের) পরিমাণ উত্তরোত্তর বেশী হারে বেড়ে চলে। আবার যন্ত্রের সাহায্যে যেখানে ভোগ্য

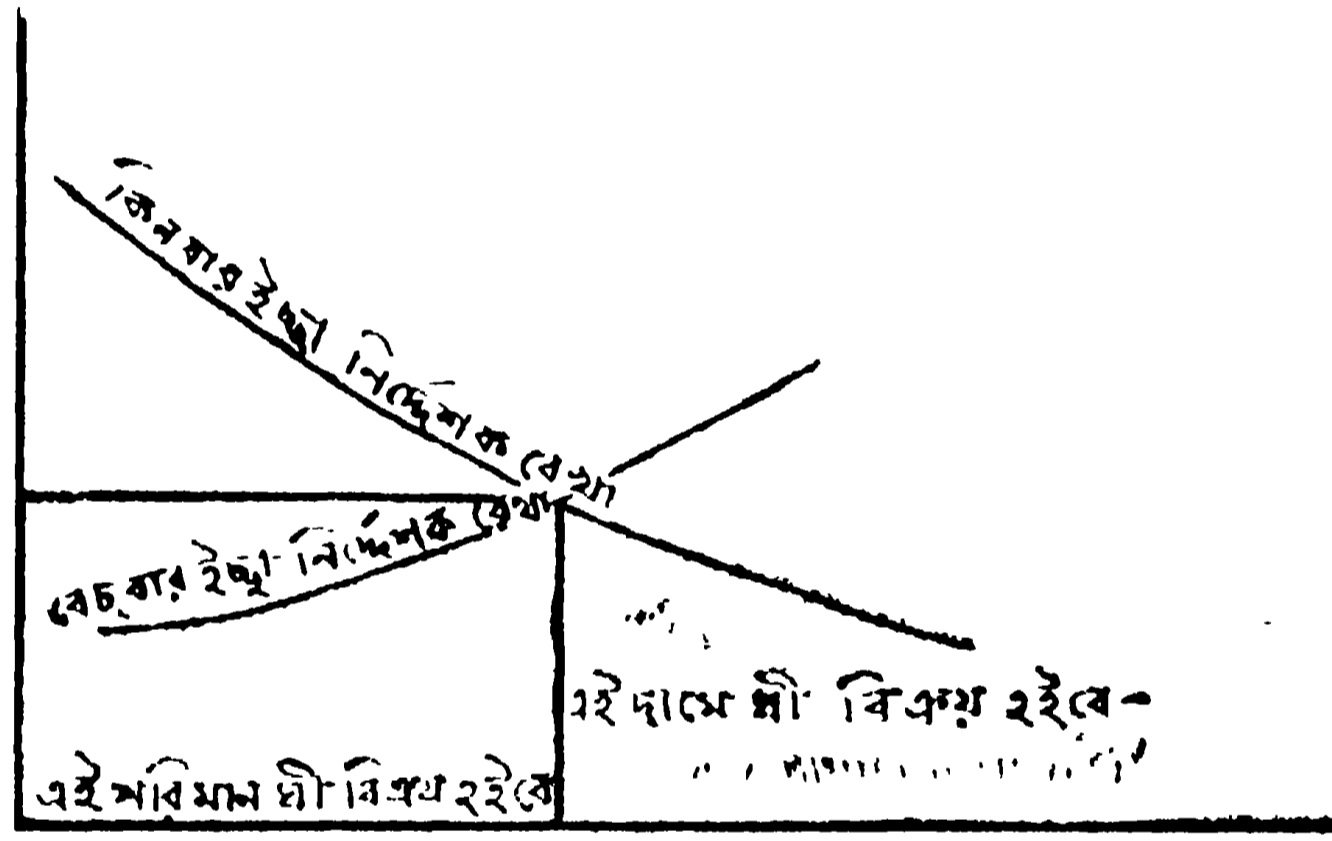
উৎপাদন করা হয় বা যে-সব ভোগ্য উৎপাদনে আনুশঙ্গিক দ্রব্য অনেক কিছু উৎপাদিত হয়, (যেমন গ্যাসের আনুশঙ্গিক দ্রব্য, কোক কয়লা, আলকাংরা ইত্যাদি) বা যেখানে শ্রমবিভাগে কাজ সহজ হয়ে আসে এবং তার ক্ষেত্র আছে, সেইসব স্থলে উৎপাদন উত্তরোত্তর সহজ হয়ে আসে; অর্থাৎ ভোগ্যের পরিমাণ যতই বেশী হয় বা কারবারের আয়তন যতই বাড়ে, ততই প্রতি ভোগ্যের এককে (unitএ) উৎপাদনের খরচ কম হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম বেশী যাই হোক খঃচ সমান হারে হয়। যে-সব ব্যবসাতে খরচ ক্রমে বেড়ে যায়, সেগুলিকে ক্রমশঃ-বর্ধমানশীল খরচের ব্যবসায় বলা চলে; যেমন কোনো কোনো প্রকার চাষ বাস জাতীয় ব্যবসায়। আবার যে-সব ব্যবসাতে খরচ ক্রমে কমে' আসে, সেগুলিকে ক্রমশঃ-বিলীণমান খরচের ব্যবসায় বলা চলে (যেমন কারখানার প্রস্তুত প্রায় সব জিনিসই, বিশেষ করে' যেগুলিতে প্রকৃতিজাত অসংস্কৃত উপকরণের খরচই সব খরচের বেশীর ভাগ নয়)। আবার অন্য ব্যবসায় আছে যাতে খরচ জিনিসের পরিমাণের সঙ্গে বদলায় না। এগুলি স্থির খরচের ব্যবসায়। এখন,



বেচবার ইচ্ছার রেখা নির্ভর করে ভোগ্যের উৎপাদন কোন্ নিয়মের অধীন, তার উপর। স্থির খরচের ব্যবসায়ে যে-সব ভোগ্য উৎপাদিত হয়, সেইসব ভোগ্য যে-কোনো পরিমাণেই হোক না কেন সরবরাহ করতে দাঁ

একই হবে। কিন্তু বর্ধনশীল খরচে যে-সব ভোগ্য উৎপাদিত হয়, সেগুলির জন্তে বর্ধনশীল হারে বিক্রেতা দাম চাইবে। আবার বিলীয়মান খরচে যে-ভোগ্য উৎপাদন হয়, সে-ভোগ্যের দর পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে কমে' যাবে। এছাড়া আর-এক প্রকার অবস্থা হতে পারে যাতে খরচ পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে কখনো বাড়ে, কখনো কমে, আবার কখনো স্থির থাকে। এক্ষেত্রে দরও ঐরূপ অনির্দিষ্ট গতিতে বাড়বে, কমবে বা স্থির থাকবে। সব বিক্রেতার বেচবার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলি একসঙ্গে উপরি উপরি রাখলে সাধারণ বা বাজারের * বেচবার ইচ্ছা নির্দেশক রেখা পাওয়া যায়। কেনবার ইচ্ছার রেখার উপর বেচবার ইচ্ছার রেখা স্থাপন করলে তারা কোনো স্থলে বা একের অধিক স্থলে মিলিত হবে।

সের প্রতি দাম
৪১০ দরে ক্রেতা ও বিক্রেতা
সমান
৩ টাকা সেরে ক্রেতার চেয়ে
বিক্রেতা কম
২ সের ঘিরের ক্রেতা
অসংখ্য, বিক্রেতারই অভাব



ঘিরের পরিমাণ

উপরের ছবিতে ঘিরের দাম কোন্ ঘিরের বাজারে কত হবে দেখান হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে একশত সের ঘি

* বাজার বলতে স্থানবিশেষ বুঝায় না। নানান ভোগ্যের বাজার নানান স্থান ও কাল জুড়ে অবস্থিত। যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ এমন ভাবে সকলে সকলের সঙ্গে কাজ করতে পারে যে দর-দস্তুর করে' বাচাই ও প্রতিযোগিতার ফলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট ভোগ্য সেই সম্বন্ধের মধ্যে একই দরে বিক্রি হয়, সেই সম্বন্ধ সেই ভোগ্যের বাজার। যে-ভোগ্য যত বহুকাল স্থায়ী, সর্বত্র আদৃত, বিশদরূপে বর্ণনার ও শ্রেণীবিন্যাসের উপযোগী (১নং তুলা, অমুক কোম্পানীর ডিবেকার শেয়ার, ক-শ্রেণীর শালের তক্তা মাপ খগ), দূরে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত, সেই ভোগ্যের বাজার তত বিস্তৃত। যেমন-তুলা, সোনা, রূপা, গম, পাট, নানা প্রকার কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদির বাজার পৃথিবী জুড়ে। আবার মাছের বাজার খুবই সংকীর্ণ। কোনো বাজারে যে কেউ কাউকে ঠকায় না তা নয়, কিন্তু আমরা মোটামুটি বলতে পারি, যে, কোনো ভোগ্যের বাজারে সমস্তবিশেষের সেই ভোগ্যের দর সব বিক্রেতার সম্বন্ধে সমান।

২ টাকা সের দরে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক লোক থাকলেও সেই দরে সেই বাজারে ১২শত সের ঘিরের ক্রেতা আছে। কাজেই যদিও ঐ দরে ঘি বিক্রি হয়ে যায়, তবুও অনেকে ঘি কিনতে পাবে না বা যতটা চায় ততটা পাবে না। কাজেই বিনা ঘিতে রান্না করার চেয়ে লোকে দাম একটু একটু করে' বাড়াবে। ৩ টাকা সেরে ক্রেতার ক্রয় ক্রম হতে ইচ্ছুক হবে ৯শত সের ঘি; কিন্তু বিক্রেতার বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হবে মাত্র ৫ শত সের। কাজেই ৩ টাকা সের দাম হবে না; কেননা অনেকে এখন বেশী দামে ঘি কিনতে ইচ্ছুক থাকবে। ৪ টাকা সেরে ৮ শত সের ঘির ক্রেতা জুটবে, কিন্তু মাত্র ৭ শত সের ঘির বিক্রেতা থাকবে। কিন্তু ৪১০ টাকা সেরে ৭৭৫ সের ঘি লোকে কিনতে চাইবে। আবার লোকে ঐ দামে ঠিক ততটুকু ঘিই বিক্রয় করতে রাজী হবে। কাজেই ঘির দাম ৪১০ টাকা সের হবে। বাজারের অবস্থা উপরোক্ত রকম হলে আর কোনো দামই স্থায়ী দাম (stable price) হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য অবস্থা বদলালে দামও বদলাবে। ঘি খাওয়া বেড়ে গেলে বা কমে' গেলে, ঘি প্রস্তুতের

খরচা বেড়ে গেলে বা কমে' গেলে কিনবার ও বেচবার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলিও বদলে যাবে এবং দামও দিন কতক অস্থির ভাবে উঠে নেমে নতুন কোনো একটা স্থায়ী অবস্থা লাভ করবে। স্থায়ী দাম কি অবস্থায় কি রকম হবে, তা নিয়ে আলোচনা না করে' আমরা এখন অল্প বিষয় আলোচনা করব। দাম ঠিক কি করে' হয় এবং তার যে দুটি দিক আছে (কেনার ও বেচার), তা আমরা দেখলাম। আরও দেখলাম যে জিনিস উৎপাদনের কষ্ট স্বীকার বা খরচ জিনিসের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে একক প্রতি (per unit) কখনও বাড়ে কখনও কমে এবং কখনও বা সমানই থাকে। মানুষ ও মূলধনের সাহায্য অপেক্ষা

চাষবাষ, মাছধরা ইত্যাদি), তাতে সাধারণতঃ খরচ ক্রমে বেড়ে' চলে। যে-সব ব্যবসায় প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ ও মূলধন লাগে বেশী, তাতে খরচ ক্রমে কমে।

অতঃপর আমরা নানা ব্যবসায়ের মধ্যে, সামাজিক সম্পত্তিতে যেটুকু 'প্রকৃতি', 'মানুষ' ও 'মূলধন' আছে, তা কি ভাবে বিভাগ ও ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশী ভোগ্য উৎপাদিত হয়, তাই দেখ্ব। আরও দেখ্ব সব

উপকরণগুলিকে কি করে' বেশী সচল এবং কার্যকারী করে' তোলা যায়, তাই। মানুষ বলতে অতঃপর অনেক স্থলে শ্রমজীবী বুঝতে হবে। শ্রম যে করে, সেই শ্রমজীবী হবে। তাকে ইট বইতে হবে, বা অন্য কোনো রকম দৈহিক শ্রম করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। শ্রম মস্তিষ্কেরও হতে পারে, শরীরেরও হতে পারে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন

তুমি শুধুই আমার হবে,—

আমি রইব তোমার হ'য়ে ?

তোমার মনেই থাকো তবে ;

কাজ নেইকো আমার হ'য়ে।

আমার মুখেই আমার দুখেই

রইবে চেয়ে আমার মুখেই,

মদির মোহের নিদের মতন

মোরেই কি এ রাখবে ঘিরে ?

রুদ্ধ গৃহের গোপন কোণে

মোরেই নিয়ে থাকবে কি রে ?

হা প্রেমসী ! হা মোহিনী !

হা রূপসী !—মুগ্ধা নারী !

জানো না কি বিশ্ব-নাড়ীর

সঙ্গে মোদের যুক্ত নাড়ী ?

ল'য়ে ধুলো খেলা মিছাই

ব'য়ে যাবে বেলা কি ছাই,

বিশ্ব-বেলার বালুর কণা

রইব মোরা বিশ্ব ছাড়ি ?

বনের পাখী রইব খাঁচায়

নিসর্গেরি দৃশ্য ছাড়ি ?

বিশ্ব-বাসীর প্রতিবেশী

আয় ছুটি' আয় বিশ্ব-পথে,

আয় দেখি আয় কাঁদিয়া যায়

কোন্ অভাগা নিঃশ্ব পথে।

কে, ভাসে কে চোখের জলে,

টানিয়া নে বুকের তলে,

বিশ্ব-দুখে বিশ্ব-শোকে

আয় ছুটি' আয় সঙ্গ দিতে ;—

বিশ্ব-স্বপ্নের মহোৎসবে

আয় ছুটি' আয় সঙ্গ নিতে।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী

আলোচনা



“বাঁকুড়া সারস্বতসমাজের উদ্বোধন-পত্র”

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় “বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধন পত্র” প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি দুইটি বিষয় না জানিয়া না শুনিয়া নিজের ইচ্ছা-মত যাহা তাহা লিখিয়াছেন।—

১। মৃত্তিজ, মাটি-জাত = মাটিয়া ; এইরূপ, ভূমি-জাত = ভূমিজ বা ভূঞা। মৃত্তিকা, ভূমিজ শব্দেব অর্থ আদিম অধিবাসী।

২। আর লিখিয়াছেন—“বাঁকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। ইহার নাম সামস্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামস্তো ক্ষুদ্রভূপালঃ। ক্ষুদ্র রাজার রাজ্যের প্রান্তে সামস্ত রাজ্য। রায় উপাধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত আছে। কারণ সং রাজন্ শব্দের বিকারে রায়। ওড়িয়ার সামস্ত রায়, সংক্ষেপে সামস্তবা, এবং মধ্যপ্রদেশের সাতারা, এককালে রাজবংশীয় ছিল। বাঁকুড়া জেলার সামস্তরাজ্য ছাতনায় স্থাপিত ছিল। বাঁকুড়া মহর সামস্তভূমিতে অবস্থিত। সামস্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু দেখিলে বুদ্ধি, ইহারা আদিতে বাঙ্গালী ছিল না। কেহ কেহ বলেন সামস্তরা ছত্রী। ইহা অনস্বব নহে। হয় ত আদি সামস্ত সাহস ব্যবসায়ী হইয়া ছাতনায় রাজা হইয়াছিলেন।”

যোগেশ-বাবু যদি দয়া করিয়া মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কাঁথি, অঞ্চলে যাইয়া একবার দেখিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন সামস্তবা ভূঞা কি জাতি বা তাহাদের চাল চলন কি। মুসলমান রাজত্বের ভূঞা উপাধি তমলুকের রাজাদের ছিল। সামস্তরা উপাধি ময়নাগড়ের রাজাদের। আদি বাজাদের নাম কালিন্দী রাম সামস্ত ; কিন্তু বর্তমান রাজাদের উপাধি বাহুবলীন্দ্র। উৎকলের খণ্ডাইত বা মহানায়ক ইত্যাদি বঙ্গীয় চামীকবর্ত্ত বা মাহিষ্য ইত্যাদির জাতির সম্বন্ধ অর্থাৎ চিহ্নেরও উপাধি এক ; ইহার সকলে মাহিষ্য। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অনেক প্রাচীন জমিদার ভূঞা সামস্তরাংশ আছেন। তাঁহারা সকলে প্রায় বিষ্ণু-উপাসক, তবে কেহ কেহ শক্তি-উপাসকও আছেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ প্রতিপালিত হইতেছেন। কিন্তু যোগেশ-বাবু তাঁহাদিগকে বলেন “একটা নূতন জাতি”, আদিম অধিবাসী। আশ্চর্য্য বটে। মাহিষ্যগণ পুরাকালে যুদ্ধপ্রিয় ছিল। বর্তমানকালে কৃষিপ্রিয়।

ভারতে মাহিষ্যগণের বর্ত্তমান উপাধি নিম্নে দিলাম।—

বাহুবলীন্দ্র, গণেশ-মহাপাত্র, গজপতি, গড়নায়ক, মহাবথ, নায়ক, রণসাঁপ, রণসিংহ, সেনাপতি, মহাপাত্র, ভূপতি, মহানায়ক ভূঞা, ভূমিপ, ভূপাল, জানা, হাজারা, সামস্ত, শতরা, দলই, আষক বা আদক, দৈশিক, দলপতি, চৌধুরী, মাইতি, সিংহ, বাঘ, হাতী, মাহিষ, গিরি, তুঙ্গ, কপাট, কাজলী, কাজি, মেটা, মাঝি, খাঁড়া, দণ্ডপাট, পাত্র, পট্টনায়ক, কোটাল, বীরা, সমরী, ধাবক, সেনী, পাজা, সিংলী, মল্ল, রাজপুত্র, মহাস্ত, ঘোড়া, তালুকদার, নায়ের, মজুমদার, পুরাকায়স্থ, ক্ষেত্রী, বাহুবল, রাউৎ, হালদার, মৌলিক, সর্দা, স্তম্ভভেদি, দৌবরীক, রায়, মঙ্গরাজ, অক্ষপতি, নরপতি, পতাকী, সম্ভরণ, বেরা, দিগা, বজ্রি, প্রধান, মণ্ডল, করণ, বর, কর, ধাড়া বা ধর, সিকদার, বৈদ্য, মহাস্তি, মানা, খাঁ, কয়াল, বৈতালিক, বিশ্বাস, জোয়দার, কুইতি, দেশমুখ্য, সরকার, ইত্যাদি।

আবার কেহ কেহ বলেন নিম্নলিখিত ১৯টি উপাধি মাহিষ্য জাতির প্রধান।—

সিংহ, ব্যাঙ্গ, মহাপাত্র, হাজারা, মণ্ডল, হুত্রপতি, গল্পপতি, রায়, মহাবল। সামস্ত, সাতারা, ভূঞা, প্রধান, মাইতি, চৌধুরী, বিশ্বাস, বীর, গিরি, সেনাপতি।

আবার মাহিষ্য-কুলার্ণবে লিখিত আছে—মাহিষ্য আদি উপাধি সাতটি ‘সামস্ত শতরা চৈব ভূমিপথ ভূপালকঃ’

জানা মানাদকো সপ্ত আদিম গৃহমুচ্যতে ॥’

যোগেশ-বাবু সামস্তরাকে যে নূতনজাতি মনে করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। তাঁহারা দেশভেদে ভাষাভেদে একটা নূতন জাতি হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মাহিষ্য। যেমন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তুর্কা-গড়ের রাজা জমিদারগণ মাহিষ্যগণের সঙ্গে কস্তা আদান প্রদান করেন বা মাহিষ্য। কিন্তু ঐ তুর্কাগড়ের ক্ষেত্রিগণ পুরীজেলা রথীপুরে বাস করেন। তাঁহারা ক্ষেত্রিগণের সঙ্গে কস্তা আদান প্রদান করেন বা করিতেছেন। যোগেশ-বাবু কি করিয়া ইহাদিগকে আদিম জাতি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। মাহিষ্য জাতি ক্ষেত্রীবর্ণের অন্তর্গত মাহিষ্য।

যোগেশ-বাবুকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।—

১। তমলুকের ইতিহাস (সেবানন্দ ভারতী প্রণীত)। ২। ব্রাহ্মি-বিজয়, ৩। সিদ্ধান্ত সমুদ্র, ৪। আর্ধ্যপ্রভা, ৫। মাহিষ্য-প্রকাশ, ৬। মাহিষ্যবিবৃতি, ৭। মাহিষ্যতত্ত্ববিধি, ৮। ইংরেজিতে দি মাহিষ্য।

পুস্তকগুলি পাইবার ঠিকানা ৬৪নং পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, (ইটালি) কলিকাতা।

শ্রী শশিভূষণ মাইতি

উত্তর

ইহার উত্তর অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে। এক এক উপাধি বহু জাতির মধ্যে আছে, এবং যে ব্যক্তি যে জাতির অন্তর্গত মনে করে, তাহাকে সে জাতির লোক স্বীকার করিতে হইবে। বাঁকুড়ায় যাহারা সামস্ত নামে আখ্যাত তাহারা নিজদিগকে মাহিষ্য বলে। এখানে ‘রায়’ প্রায় জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ, ‘মেটা’ নামও জাতিবাচক। হুগলী জেলায় সে জাতি ‘বাগ্দী’ শ্রেণীতে গণ্য। মানভূমের বিপিন, ভূমিজ। কিন্তু লোকে তাহাকে বিপিন ভূঞা বলে। এইরূপ, ওড়িয়ায় ভূমিজ ও ভূঞা এক। কেহ ইহাদিকে মাহিষ্য বলে না।

ভূমিজ শব্দ সংস্কৃত বলিয়া মনে হয়। আদিম অধিবাসী অর্থেও আসে। জাত, বিশিষ্ট প্রভৃতি অর্থে বাঙ্গলা ভাষায় ইয়া প্রত্যয় হয়। ভূমি + ইয়া = ভূমীয়া - ভূঞা, অর্থাৎ ভূমি জাত, ভূমি-বিশিষ্ট। দ্বিতীয় অর্থে ভূঞা বর্ত্তমান জমিদার ; বঙ্গের দ্বাদশভূঞার নাম ইতিহাসে এসিদ্ধ। এইরূপ শব্দবিচারে, মাটি + ইয়া = মাটীয়া - মাট্যা - মেট্যা; অর্থাৎ মৃত্তিজ বা মৃত্তিবাসী।

আমি জাতিবিচার করি নাই। বাকুড়ার দারিদ্র্যের হেতু খুঁজিতে গিয়া বাতী দেখিতে হইয়াছে এবং সে কারণে জাতির নাম আসিয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

প্রতিবাদ

অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের “বাকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্র” কয়েকটি ভ্রমপূর্ণ কথা ছাপা হইয়াছে। যন-বসতি পল্লীর মধ্যে তিনি যে তড়াগেব উল্লেখ করিয়াছেন বাকুড়ায় (Carmichael Tank) কাবমাইকেল ট্যাক্স সম্বন্ধে এই উক্তি বসিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধিতে পারা যায়। “জীবনরূপ জলের জন্ত” এই পুঙ্কবিণী খনন করা হয় নাই। জলের কল তাহার পূর্বে ঐ স্থানে হইয়া সে অভাব দূর করিয়াছিল। ঐ খানে ১২১৪ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া এয়ারটি অস্বাস্থ্যকর ডোবা ও নীচু মাটিতে জমী ছিল। মিতা শত শত লোকে ঐ স্থানে মলত্যাগ করিত। স্বাস্থ্যতত্ত্ব উদাসীন ঐ জনবহুল পল্লীর লোকে ডোবাগুলি বিন-তুল্য জল ব্যবহারে বিবত থাকিত না। সময়ে সময়ে তজ্জন্ত কলেবা বসন্তাদি সংক্রামক বোগেব প্রাদুর্ভাব ঐ স্থানে হইয়া সহবে ব্যাপ্ত হইত। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া ভবিষ্যতে মড়ক নিবারণ যাহাতে হয় তাহার জন্ত মন্যস্থলে বেগানে ২৩টি বড় ডোবা ছিল ঐ পুকুরটি সেইখানে কাটিয়া সেই মাটিতে চাষি দিকের ডোবা ও নীচু জমীগুলি ভাট করান হইয়াছিল। যে আবাদ নির্মাণের উপদেশ এক্ষয়ে যোগেশ বাবু দিতেছেন, তৎসম্বন্ধেও সকলে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে ঐ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু করিবার সামর্থ্য ও উপায় ছিল না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথাপি আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। এই তড়াগকে “জলপূর্ণ করিবার অস্তিত্রায়ে শহরের এক নরককুণ্ডের ঞ্কারজনক মলনালীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে” ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা চলে না। সংযোগস্থলটি একবার দেখিলেই বৃদ্ধিতে পাবা যায় মলনালীর জল মানুষে চেষ্টা করিয়া লইয়া গেলে তবেই ঐ পুঙ্কবিণীতে পড়িবে। মেরূপ করিতে কেহ পায় না। বর্ষাকালে যে দিন অতিবিক্ত বৃষ্টি হয় মলনালী ও বাস্তা বেশ পরিষ্কাররূপে দোত হইয়া বাইবার পর বৃষ্টির জল পুঙ্কবিণীতে লইয়া যাইতে পায়। “বর্ষাকালে বৃষ্টিব জলে পাড়ার মলমূত্র ধোত হইয়া জল-বৃদ্ধি’ করিতে পারে না, তাহার বন্দোবস্ত আছে। তবে পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ নিবারণ না করিলে তাহা ধোত হইয়া জলে পড়া অনিবার্য।

“বাজারে ঝিঙ্গা চারি আনা সের বিক্রি হইতেছে, বাকুড়াবাসী বস্ত্র গাছের চাষ করিতে উদাসীন বলিয়া” নয়। যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী বলিয়া নূতন ঝিঙ্গা বাজারে আনিলে শীতকালে কিছুদিন দাম বেশী থাকে। যে বাজারে প্রত্যহ ৮ ১০ মণ ঝিঙ্গা বিক্রয় হয় সেখানে নূতন আমদানীর সময় কোন কোন দিন ২৪ সের ঝিঙ্গা বিক্রির জন্ত আনিলে চারি আনা সের বিক্রি হওয়া বিচিত্র নয়। সকল স্থানেই নূতন শাকসজ্জী এমনই অগ্নিমূল্যে প্রথম প্রথম বিক্রয় হয়।

“বিলাতী আলুরও সেই দর”, কিন্তু সেই সময় নয়, ঝিঙ্গা যখন চারি আনা সের মূল্যে বিক্রি হয়। শীতের শেষে ঝিঙ্গার দর যখন চারি আনা, বিলাতী আলুর তখন এক আনার বেশী দাম নয়।

“অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে যে ক্ষুদ্র বাজার নির্মিত হইয়াছিল তাহা বাড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই”, কারণ তৎকালে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আবশ্য-কের অতিরিক্ত বড় করিয়া বাজার নির্মাণ হইয়াছিল। বিশ বৎসর আগে দেখিয়াছি ক্রেতা-বিক্রেতার অভাবে এই বাজারে অনেকস্থান খালি

থাকিত। কিন্তু আকাল স্থান সঙ্কলন হয় বলা চলে না, রাস্তাগুলি পথান্ত বন্ধ বলিয়া বিদেহানা স্থান পায় না। “পঁচিশ বৎসর পূর্বে ডাকঘরে পঁচিশ কেবানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পঁচিশনেই কার্য নিরীহ হইতেছে” এ সংবাদ যোগেশ-বাবু কোথায় পাইলেন জানি না। ২০ বৎসর পূর্বে যাহা দেখিয়াছি, মনে হয় না তখনও ৭৮ জনের কম কেবানী ছিল। অন্তর্ভুক্ত ১৪১৫ বৎসর পূর্বে স্থানের অসঙ্কলন জন্ত ডাকঘরের আবেদন পূত্র আয়তনে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে দেখিয়াছি। আবাদ ৪৫ বৎসর পূর্বেও বিড় বাড়িয়াছে। এখন কেবানীর সংখ্যা যাহা দেখিতে পাওয়া যায় ১৪১৬ জনের কম নয়। ইহা ছাড়া জাল-বাজানে অনেক দিন হইল একটি বাবু অফিস খুলিতে হইয়াছে। একটি মাবু অফিস ইবার অন্তর্ভুক্ত আছে—কিন্তু ব্যয়-সংস্কার চলিয়াছে বলিয়া এখন বন্ধ আছে।

শ্রী সূর্যগোপাল দত্ত

উত্তর

উদ্বোধন পত্রে বাকুড়া শহর সম্বন্ধে দুইচারিটা কথা বলিয়াছি। প্রতিবাদ হইতে বর্দ্ধিত হইতেছে, পশ্চিম হইতেও সত্য কথা দিগিয়াছি। ১। কোন স্থানে পুঙ্ক হইয়াছে, তাহা প্রতিবাদকারী ধরিতে পারিয়াছেন। অতএব আমায় বর্ণনা কার্যনিক নহে। মলনালীর জলও তাহাতে পড়ে, বর্ষাকালে পড়ে অল্প কালে পড়ে না। চাষি পাড় উঁচু নহে, পাড়ার পানী চাষি পাড়ের বোগেব যনবসতি, স্থানে স্থানে গায়খানা পানী পাড়ে ও পুঙ্ক গায়খান লোকেব মলমূত্র ত্যাগের স্থানও দুটিয়া। বর্ষাকালে পাড়া-ধোআনি প্রায়েই পড়ে। মনে বাপিতে হইতে বর্ষাকালে কলেবা আনাসি ও ভ্রুতি রোগ জন্মে। সকালে দেখি নাই, পান-বেলা দেখিয়াছি মেয়েবা কলসী জল লইয়া যায়। মেয়েবা কি করে? আমাদেব অনেকো জ্ঞান আছে যে দুই এক ঘটা পানী জল শুদ্ধ হইলেই বর্তমান স্বাস্থ্যবিদ্যাব অনুশাসন পালিত হইবে।

আমি “বাকুড়া কল টেক্স” পূর্বে ইংহাস জানি না, বাঙ্গালী-পাড়ায় এই ইংবেগা নাম কেন রাখা হইয়াছে তাহাও জানি না। কিন্তু জানি কলেবা জল পথান্ত নহে, স্থগাপ্যও নহে। মানুষ স্বভাবতঃ জলস, নইতো যাকে পচাও না লইয়া দুবে সদর বাস্তা হইতে কলের জল লইয়া যাইত। দণ্ডেভয় দেখাইয়া মানুষেব আলস্ত বৃচাইতে পাবা যায় না। বাকুড়ায় ইহা পূবি ভূবি প্রমাণ আছে। গন্ধেশ্বরী নদীর যে স্থান হইতে কলেবা জল আসিতেছে, মুন্সিপালিটির নিষেধ সত্ত্বেও সে-স্থান বিস্তা-স্বেত হইয়াছে। অতএব জলের ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে ঝিঙ্গা করিলেও লোকে তাহা দূষিত করিতে পারিবে না। কাবমাইকেল টেক্সের ফলেব বর্ষ দেখিলেই বৃদ্ধিতে পারা যায়, জল পচা। কাবণ কি?

মেদিনীপুর বর্তমান ভগলী প্রভৃতি পুরাতন শহবে পচা ডোবা আছে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লোকে খব-বাড়ী করে নাই, পাশের রাস্তা ক্রমশঃ উঁচু হইয়া বাড়ীর মস-নিকাশে বাধা ঘটবে, ভাবে নাই। স্বাস্থ্যবিধানও দুর্বল হইয়াছে। যে মুন্সিপালিটি পারিতেছে পচা ডোবা ভরাইয়া দিতেছে, পথঘাট চওড়া কবিতোছে। বাকুড়া শহর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্রমশঃ পুরাতন ও বর্দ্ধিত হইবে। অতএব এখন হইতে বিষয় বৃদ্ধি কল্পনা করিয়া স্বাস্থ্যকর নগর নির্মাণের ধারা বাধিয়া রাখা না করিলে মুন্সিপালিটিকে বিপন্ন হইতে হইবে। বৃষ্টিজল নিকাশের পথ, মল-মূত্র-নালীর পথ ঠিক করা নগর মাত্রেই কঠিন সমস্যা। বাকুড়ার ভূমি উঁচু নীচু। গৃহনির্মাণের দ্বারা নীচু জমি

ভরাট হইয়া যাইতেছে, পূর্বের স্বাভাবিক জলনিকাশে বাধা পড়িতেছে। কারমাইকেল টেক কম্পাইয়া এইরূপ বাধা ঘটায় কি না, দেখি নাই। যদি পূর্বে সেখানে ডোবা ছিল, নীচু জমি ছিল, তাহা হইলে বোধ হয়, এখন এই পুকুরে পাড়ার জল জমিয়া থাকে। বাঁকুড়ায় পচা এঁধো ডোবা দেখিয়াছি। মাটি দিয়া ভরাইতেই হইবে। কারমাইকেল টেকের জল পচিয়া গিয়াছে। হয়, উহার চারি পাড়ের বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া উহাকে আরামে পরিণত করিতে হইবে। না হয়, পাড়ার জলের জন্ত পথ খুলিয়া দিয়া উহাকে প্রাচীর দিয়া ঘিঘিয়া দিতে হইবে। দুই কল্পেই অর্থব্যয়। শুনিয়াছি, কাটাইতে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে, উহার দোষ সংশোধন নিমিত্ত পরে আর কত টাকা লাগিবে ভাবিবার কথা।

২। প্রতিবাদে অল্প যে তিনটি বিষয় লিপিত হইয়াছে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। কারণ প্রত্যেকেই বাঁকুড়ার আলম, নিশ্চেষ্টতা, কষ্টসহিষ্ণুতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ডাকঘরের কথা বলি। আমি তখন বাঁকুড়ার ব্যাপার জানিতাম না। মনি-অর্ডার পাঠাইতে গিয়া আমার পত্রবাহক পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিত, বলিত ডাকঘরে এত ভিড় যে সেদিন কাজ হইতে পারিল না। এইরূপ, বার বার শুনিবাব পব একদিন নিজে গিয়া ডাকঘরের বারান্দায় ৩টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিলাম, মনি-অর্ডার পাঠাইতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল কেরাণীর ক্ষিপ্ততার অভাবে লোকের ভিড় হইতেছে। পরে বুঝিলাম তাঁহার দোষ দিলে চলিবে না, মানুষের কর্ম-সামর্থ্যেরও সীমা আছে। একদিন নয়, দুইদিন নয়; এক ঘণ্টা নয়, আধ ঘণ্টা নয়; প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই কর্ম করিতে করিতে, হয় নির্জীব যন্ত্র, নয় পাগল হইবার কথা। টাকা-কড়ির কর্ম; বুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হয়। নইলে ভুল; ভুলের পর ভৎসনা, ভৎসনার পর জরিমানা, জরিমানার পর বেতন হ্রাস বা কর্মহানি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভীষিকার শ্রোত প্রবল। অল্পদিকে মাসের শেষে কয়েকটা টাকা—যাহাতে অতিকষ্টে দিনযাত্রা নির্বাহ হয়। ফলে পাগলামি, অর্থাৎ মেজাজ খিট-খিটা হইয়া পড়ে, অধিকার-মদের মত্ততার লোভ জন্মে। দৈব হটক, স্বকর্ম হটক, নিজের প্রতি অসন্তোষ, খিট-খিটা ব্যবহারে প্রকাশিত হয়। আর, অধিকার-মদ নীচে যত, উপরে তত হয়। কনষ্টেবলের যত, দারোগার তত নয়; দারোগার যত, ডেপুটী হাকিমের তত নয়; এইরূপ অধিকার অল্প হইলে মত্ততা অধিক হয়, আইনের ধারা প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কারণ, ব্যাপ্তির অভাবে তৃপ্তি অল্প পরিসরে আবদ্ধ হয়। উৎকোচ গ্রহণ, তৃপ্তির আর-এক পথ। উপরি পাওনার প্রবল আকাঙ্ক্ষার প্রধান হেতু এই। দোকানে খরিদারের যত ভিড় হয়, দোকানীর মুখে হাসি, বাক্যে বিনয় তত ফুটিয়া উঠে। কিন্তু রেলস্টেশনের টিকিটকাটা বাবুর, আদালতের মামলা-মুহুরীর চিত্ত কাজের ভিড়ে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। কড়া হুকুমে, ঘুষ বন্ধ হইতে পারে না, অবিনয়ও অন্তর্হিত হয় না। বেতনের সঙ্গে কমিশনের অর্থাৎ উপরি লাভের আশ্চর্য গুণ ইংরেজ ব্যবসায়ী বিলক্ষণ বুঝে। ইংরেজ সন্সকার বুঝেন না কেন? ইত্যাকার চিন্তা চলিতেছে, এমন সময় শুনিলাম, “তিনটা বেজেছে, আজ আর হবে না।” তখনও আট দশ জন প্রার্থী দাঁড়াইয়া; দুই এক জন আমার আগে আসিয়াছিল। “তিনটা”,—এই ধ্বনির নিকট যুক্তি চলে না, কাল ও সাগর-বেলা কাহারও অপেক্ষায় থাকে না। লোক-গুলি বিরক্ত-মিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। একজনের উক্তি শুনিয়া কৌতুক অমুভব করিয়াছিলাম। “চিরকালই এক!” কারণ মনি-অর্ডার-বাবুর দোষ নাই, দোষ তাহার নিজের। কাল এক নয়, নিত্য-পরিবর্তিত: সে মনে করিতেছিল এক।

প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিয়াছিলেন, “লোকে কষ্ট ভুগিয়াও কিছু বলে না, আমরা কি করিব। পঁচিশ বছর আগে পঁচ জন কেরাণী ছিল, এখনও পঁচ জন।” কর্তারা আমাদের কথা শোনে না, বলেন Public complaint কই।

ঠিক কথা, Public complaint কই? কষ্টসহিষ্ণুতা আমাদের বার আনা কষ্টের কারণ। কষ্ট লাঘবের উপায় চিন্তা করি না; মনে করি জমিলে যেমন মরণ আছে, দুঃখভোগ তেমনই স্বাভাবিক।

অনাড় দেশে সাড়া পাইলে আনন্দ হয়, প্রতিবাদ পাইয়া আমার আনন্দ হইতেছে। আমি ভুল লিখি, আর যাহাই লিখি, কিছুই যায় আসে না। যায় আসে দুঃখ-অনুভবের অভাবে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

“বাংলায় প্রথম আর্কসপ্তাহিক”

আনন্দবাজারের পূর্বে কয়েকখানি আর্কসপ্তাহিক কাগজ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, যথা:—

ধুমকেতু (২৩শে শ্রাবণ ১৩২৯),
বিধবাণী, স্থনীতি (চট্টগ্রামের)।

বাহার

চট্টগ্রামের “স্থনীতি” পত্রিকাই সর্বাপেক্ষা প্রথম আর্কসপ্তাহিক (?), উহা ১৩২৯ সালের প্রথম হইতে প্রকাশিত।

শ্রী করুণাশেখর দত্ত

অগ্রহায়ণের ‘প্রবাসীতে’ বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত শিরোনামায় ‘অ’ লিখিয়াছেন:—

“আনন্দ-বাজার পত্রিকার পরিচালকেরা তাঁহাদের কাগজের আর্কসপ্তাহিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ (?) করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, বাংলা আর্কসপ্তাহিক (?) কাগজ এই প্রথম।.....”

.....আনন্দবাজারের পূর্বে অন্যান্য থানা বাংলা আর্কসপ্তাহিক পত্র বাহির হইয়াছিল:—

(১) সমাচার-চন্দ্রিকা (১৮২২)। (২) রসরাজ (১৮৩৯)।
(৩) সংবাদসুজনরঞ্জন (১৮৪০)। (৪) সংবাদ-রত্নাকর (১৮৪৭)
(৫) ধুমকেতু (১৯২২)।

এ-ছাড়া আরো যে ২১ খানা ছিল না, তা’ বলা যায় না।.....

শ্রী রাধাচরণ দাস

[পত্রলেখক মহাশয়েরা একটু মনোযোগ দিয়া মন্তব্যটি পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন যে এখানে দৈনিক কাগজের আর্কসপ্তাহিক সংস্করণের কথা বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র আর্কসপ্তাহিক কাগজের কথা বলা হয় নাই। দৈনিক কাগজে যে লেখাগুলি বাহির হয়, সেইগুলি একত্র করিয়া সপ্তাহে দুইবার একটি সংস্করণ বাহির করার রীতি ইংরেজী কাগজের (যথা বেঙ্গলীর ও অমৃতবাজারের) আছে। বাংলা দৈনিক কাগজের এইরূপ সাপ্তাহিক সংস্করণ আছে (যথা বহুমতীর, হিতবাদী যতদিন দৈনিক ছিল ততদিন হিতবাদীর), কিন্তু আর্কসপ্তাহিক সংস্করণ যতদূর জানি বোধ হয় ছিল না। অগ্রহায়ণের প্রবাসীর স্বল্প-পরিসর মন্তব্যটির আগে-পরের বাক্যে সংস্করণ কথাটি আছে, কিন্তু মন্তব্যটির মধ্যে ‘এ ধরণের’ কথাটি পড়িয়া গিয়া বোধ-সৌকর্যের হানি ঘটাইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

শেষের পত্রলেখক সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া আমাদের ব্যবহৃত “আর্কসপ্তাহিক” ও ‘মনস্থ’ পদ দুইটিকে নিজেই সংশয়-চিহ্নে অঙ্কিত

প্রযুক্ত 'অর্কসাপ্তাহিক' পদই অশুদ্ধ, আমাদের প্রযুক্ত 'আর্কসপ্তাহিক' ও তাহার বৈকল্পিক রূপ 'অর্কসপ্তাহিক' এই দুইটিই ব্যাকরণ-সম্মত। 'অর্কঃ পরিমাণস্ত পূর্বস্ত তু বা ; 'নাতঃ পরস্ত' (পাণিনি ৭-৩-২৬ ও ২৭)। মনঃস্থই যে আদিম সংস্কৃত রূপ তাহা কে না জানে, কিন্তু বাংলায় মনঃস্থই উচ্চারণতঃ ও অভিধানতঃ শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া স্বীকৃত। (দ্রষ্টব্য - রামকমল বিদ্যালয়কারের প্রকৃতিবাদ অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ও সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা শব্দকোষ।)]

“অ”

গৌড় ব্রাহ্মণ

গৌড় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আঙ্গকাল “প্রবাসী” “বঙ্গবাণী” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলিতে আলোচনা চলিতেছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় আশ্বিন মাসের “বঙ্গবাণী” পত্রিকায় ‘বাঙ্গালীর জাতি পরিচয়’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ কার্তিক সংখ্যা “প্রবাসী” পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন “বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ইহারা কেহই খাঁটি বাঙ্গালী নহে। ইহারা কাশ্মীর হইতে আমদানী-করা মানুষ। স্বল্পপুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের পরে পুনঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রাহ্মণ মাশ্র ও গ্রাহ হইয়াছিলেন ; আখ্যাবর্তের পঞ্চ গৌড় এবং দাক্ষিণাত্যেব পঞ্চ আবিড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে গৌড় উৎকল মৈথিল সারস্বত এবং কাশ্মীর এই পঞ্চ শ্রেণীর মাশ্র। গৌড় ব্রাহ্মণই খাঁটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ অথচ এখন বাঙ্গালাদেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবেন না।” এদিকে শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “ব্রাহ্মণ-ইতিহাস” নামক পুস্তকের ৩৪শ পৃষ্ঠায় কাশ্মীর হইতে আগত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে ‘গৌড় ব্রাহ্মণ’ বলিয়াছেন। বঙ্গদেশে খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ বর্তমানে আছেন কি না এবং বর্তমানে কোন্ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ তাহাই আলোচ্য। যে সময়ে মনুসংহিতার রচনা হয় সে সময় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যবাস হয় নাই ; তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গ ভিন্ন বঙ্গদেশে দ্বিজাতিগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মহাভারতীয় যুগের পূর্বে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় রাজগণের আবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রয়োজনবশতঃ সঙ্ঘ সঙ্ঘেই ব্রাহ্মণ্যবাস হইয়াছিল। মনু মহারাজের নিষেধ বাক্যের প্রতিষেধ হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমসেন পোণ্ড্রাধিপতি বাহুদেব ও বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেনকে পরাজয় করিয়া রাজস্বয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। অতএব ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়ের বসবাস হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রাকালে অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ যজ্ঞীয়গিরিশোভিত সতত-দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্ঘ্যসেত্র সন্দর্শন করিয়া-ছিলেন, যথা—

“এতে কলিঙ্গাঃ কোস্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।

যত্রায়জত ধর্মোহপি দেবাত্মরম্য এত্য বৈ ॥

ঋষিভিঃ সমুপযুক্তং যজ্ঞীয়-গিরি-শোভিতম্।

উত্তরং তীরম্ এতদ্ দি সততঃ-দ্বিজ-সেবিতম্ ॥”—বনপর্ব।

কলিঙ্গদেশ গঙ্গানদীর মোহানা হইতে কৃষ্ণানদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (Indian Shipping, p. 144)। মহাভারতীয় যুগের অবসানে ও কলির প্রারম্ভে নাহিষ্যবাজ্ঞবর্গ কর্তৃক তাম্রলিপ্ত রাজ্য

বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিন্নাবয়ব কলিঙ্গরাজ্যের সীমা সুবর্ণরেখা নদীর দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।

“অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকা।”—হরিবংশ

অতএব তাম্রলিপ্তেব পার্শ্বেই কলিঙ্গ দেশ ছিল দেখা যাইতেছে। তাম্রলিপ্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার পর কলিঙ্গ দেশের উত্তরাংশ স্বাধীন হইলে “উৎকলিঙ্গ বা উৎকল” স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

পৌরাণিক যুগের পর খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ ভারত-ভ্রমণে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী তমলুক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে আলোকিত ছিল। বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক হিন্দু দেবমন্দিরের উচ্চচূড়ায় সুশোভিত ছিল।

এই-সমস্ত দেবমন্দিরের সেবক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই তমলুকের পূর্ব-গৌবব-গাথা গাহিয়াছেন। এই তমলুক হইতেই নাহিষ্য রাজ্যবর্গ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সহ সমগ্র ভারত-মাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম প্রবর্তিত করিয়া-ছিলেন—বাঙ্গালী আখ্যজাতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীরমান করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্মবিষয়ে বহু সংখ্যক হিন্দুব্রাহ্মণ দেখিয়া যান। ইহারাও গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ-বংশধর।

ভারতে দশপ্রকার ব্রাহ্মণ বর্তমান আছে, যথা—

সারস্বতাঃ কাশ্মীরুজা গৌড় মৈথিলোৎকলাঃ।

পঞ্চগৌড়ঃ সমাখ্যাতা বিদ্যাসোত্তরবাসিনঃ ॥

কর্ণাটশৈব তৈলঙ্গ। গুর্জররাষ্ট্রবাসিনঃ ॥

অঙ্গাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিদ্বাদক্ষিণবাসিনঃ ॥—স্বল্পপুরাণ

সাবস্বত কাশ্মীরুজ গৌড় মৈথিল ও উৎকল ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাগিরির উত্তরদিগ্ধাসী পঞ্চগৌড়ী আর কর্ণাট তৈলঙ্গ গুর্জর অঙ্গ ও দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাগিরির দক্ষিণদিগ্ধাসী পঞ্চদ্রাবিড়ী।

রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ঠাকুরগণের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চক যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই, যখন বঙ্গের সামন্তরাজ শ্যামলবর্ষদেব তাঁহার শাকু-মন্ত্র সম্পাদন করিবার জন্ত পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আদিপুরুষ শুনক-গোত্রীয় যশোধর মিশ্র মহাশয়কে আহ্বান করেন নাই, এমন কি মুসলমান-জুম্মুদি দিল্লীর দ্বারে যখন প্রতিধ্বনিত হয় নাই এবং গজনির মামুদ ভারত আক্রমণ করিবার জন্ত সিফুন্দী অতিক্রম করিতেও সাহসী হন নাই, সেই সময়ের বহুপূর্ব হইতে বঙ্গদেশে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আখ্য-সমাজের কর্ণধার ছিলেন।

৮ম শতাব্দী হইতে পালবংশীয় রাজাধিরাজ গোপালদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ১১শ শতাব্দীতে মদনপাল পর্য্যন্ত গৌড়রাজলক্ষ্মী পাল-বংশের অক্ষয়িণী ছিলেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বেদপারগ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ বংশাবলীক্রমে পাল-রাজবংশের মন্ত্রী ছিলেন। দিনাজপুরের গরুড়-স্তম্ভে ২৮টি গৌকে উক্ত মন্ত্রীবংশের ক্ষমতা ও যশোগাথা কীর্তিত হইয়াছে। পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তখন বৌদ্ধধর্মের ধর-শ্রোতের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল এবং ধীরে ধীরে সাধারণের মনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাই দেখিতে পাই বৃহস্পতি-তুল্য কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে সাফাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রুসংহার-কারী নানা-সাগব-মেখলাভরণা বহুক্ষরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশুরপাল নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শঙ্কংসলিলাপ্ত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র (শাস্তি) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণদিগের নীতি-কৌশলে পালরাজগণ নৃপহস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নন্দদার জনক বিদ্যাপর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ-ললাটশোভিত ইন্দুকিরণে-উদ্ভাসিত হিমালয় পর্য্যন্ত এক সূর্যের উদয়াস্তকালে অরণ্যরাগে রঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ্য-শক্তির আশ্রয় না লইলে পাল-

রাজগণের উপায়ান্তর ছিল না ; এমনকি তাঁহারা মন্ত্রীর অবতারের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং মন্ত্রী সভায় হইলে অগ্রে চন্দ্রবিদ্যাকারী মহর্ষি আসন প্রদান করিয়া নানা-নন্দ-মুকুটাক্রিত-পাদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। অশ্রুদিকে ব্রাহ্মণগণও পালবংশের ইষ্টদেব বুদ্ধদেবকে শ্রীভগবানের দশ অবতারের মধ্যে অশ্রুতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। তাই আমরা জয়দেব গোস্বামীকৃত দশ অবতারের স্তোত্র মধ্যে দেখিতে পাই—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ স্রীভজাতঃ

সদয় জনয় দর্শিত পশুঘাতঃ

কেশব-ধৃত-বুদ্ধ-শরীর

জয় জগদীশ হরে।

প্রজাপুঞ্জের নির্বাচনক্রমে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া প্রজা-শক্তির সাহায্যে সমগ্র উত্তরাপথগামী বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রবলপরাক্রমশালী নরপাল দেবপাল-দেবও তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সম্মুখে সচকিত ভাবে কি কারণে উপবেশন করিতেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায় যে প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণই প্রজাপুঞ্জের অভিনায়ক থাকিয়া রাজ-নির্বাচনকারী (King-maker) ছিলেন। এই পালবংশের শেষ রাজা মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা শিখিলহস্ত হইতে বিজয়সেন গোড়ের শাসনদণ্ড বিচ্যূন করিয়া সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আদিশূর যে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহা ঐতিহাসিকগণ খাবার করিতেছেন।

অতএব সেন-বংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্বে হইতে গোড়ীয় ব্রাহ্মণ-গণ সতেজে সদম্মানে বর্তমান ছিলেন। মহারাষ্ট্র নুর্জিবের সময়ে বহুপূর্বকাল হইতে গোড়ে ব্রাহ্মণবাস হইয়াছিল এবং একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহারা পূর্ণ প্রতাপে সমাজের কণ্ঠধর ছিলেন। সেইসমস্ত ব্রাহ্মণের বংশ এখন কোথায়? রাঢ়া বাবুল পাশ্চাত্য বা দক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে খাটি গোড় ব্রাহ্মণ এই কথা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ তাঁহারা কয়েক শত বৎসর মাত্র বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। গোড়ের আদি ব্রাহ্মণ-বংশ যে একবারে নির্বংশ হইয়া গিয়াছে, আজ তাহাদের একটি অক্ষর মাত্র জীবিত নাই, ইহা সমস্ত কথ্য। এমন ব্রাহ্মণ ঘারা ১০০ শত বৎসরের মধ্যে যদি সমগ্র বাঙ্গালা ভারতব্রহ্ম হইতে পারে, তাহা হইলে মহাভারতীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাল-রাজগণের শাসন-কাল পর্যন্ত যে গোড়ীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পূর্ণ সভীবতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহারা বঙ্গদেশ হইতে একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অসম্ভব। এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যিক। পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল কথার মিল হইয়াছে, একটি কথার মিল হয় নাই। সেই কথাটি এই যে “বাঙ্গালা দেশে একটিও গোড় ব্রাহ্মণ পাইবে না”।

কি কারণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটিও খাটি গোড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না তাহাই এইবারে আলোচ্য।

এক্ষণে ইতিহাসের আলোকে দেখা যাউক—গোড়ের আদি ব্রাহ্মণ-বংশ কোথায় কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কার্য ব্রাহ্মণের পালনীয়। অতএব গোড় ব্রাহ্মণ কাহাদের যাজন করিতেছেন?

মাহিষ্য-জাতির আশ্রয়ে গোড়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশ অদ্যাবধি কালযাপন করিতেছেন। এইবারে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজের কিঞ্চিৎমাত্র

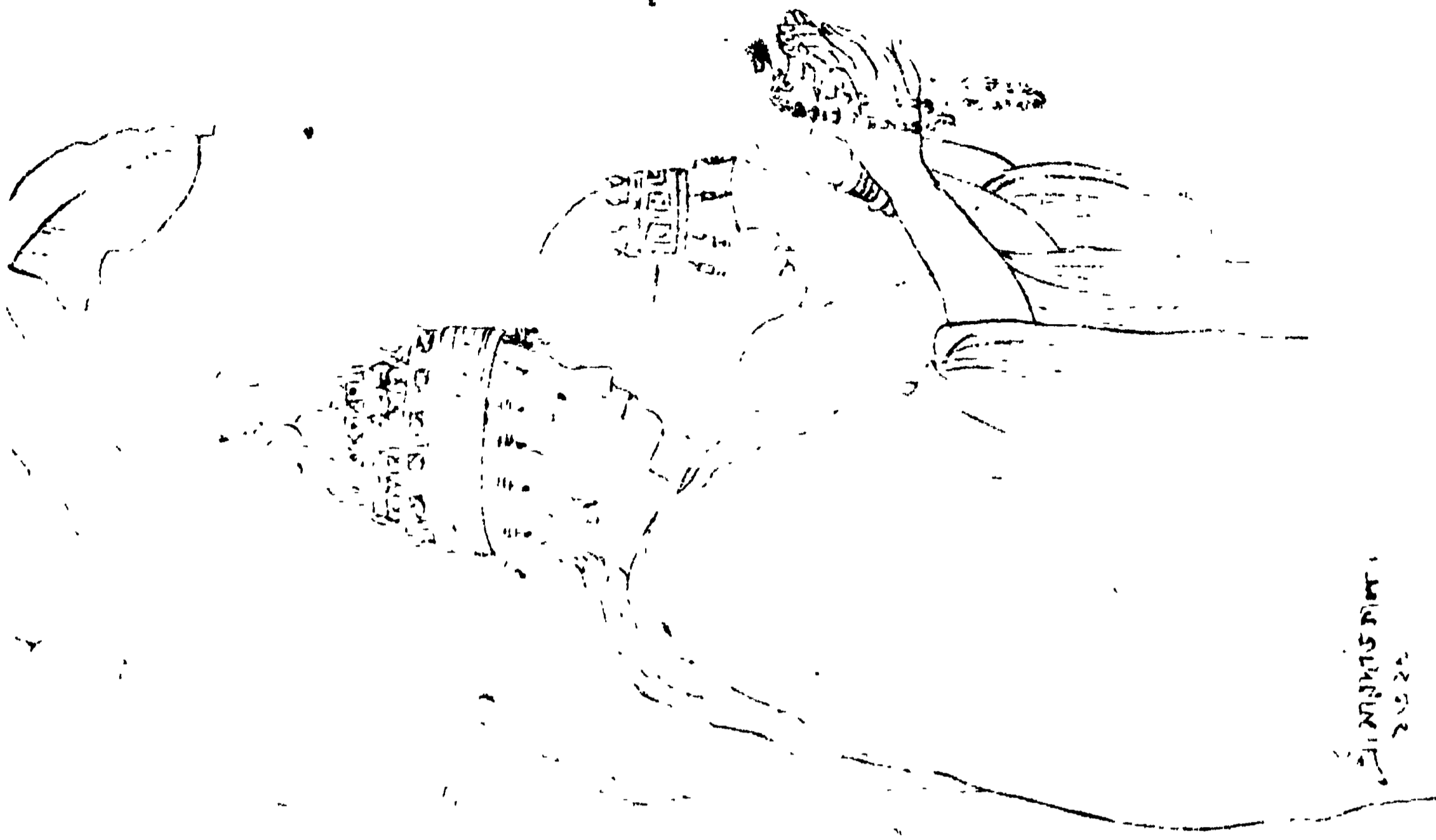
আলোচনা করা যাউক। উক্ত গোড় ব্রাহ্মণ বর্ণ-ব্রাহ্মণ নহেন। বর্ণ-ব্রাহ্মণ মাত্রই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ৫ গোত্র হইতে বহির্গত হইয়া অন্ত্যজ ও জলাচরণীয় জাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন,—যেমন কলু, বাগ্দী, শৌণ্ডিক, মুচি, জালিক (ধীবর) প্রভৃতি জাতিগণের পুণোহিত ব্রাহ্মণগণ কনোজাগত পঞ্চগোত্র-সম্মুত ব্রাহ্মণ-বংশ-ধারা। কিন্তু মাহিষ্য পুরোধাগণ পঞ্চগোত্র রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্মুত নহেন। তাঁহারা শাণ্ডিক্য, যুত-কৌশিক, রঘুঋষি, কাত্যায়ন হংসঋষি, মৌদগল্য, পুণ্ডরিক, গৌতম, কর্ণ, কাশ্যপ ও আলম্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেক গোত্র-সম্মুত প্রাচীন ঋষিবংশ-জাত। তাঁহারা বঙ্গের আদি গোড় ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী বারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিক্রাগিরির উত্তরদিখানী পঞ্চগোড়ের অন্ততম কাণ্ডকুঞ্জীয় শাখা বঙ্গে নবাগত উপনিবিষ্ট সম্প্রদায়। শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে যে কেন তিনি গোড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না তাহার উত্তরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় “লক্ষণ সেনের সময়” শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, “বানপালের মৃত্যুর পর পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয়-সেন বারেন্দ্রে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন মতাই কৌলীন্ড প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি না তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্ড-প্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু-শতাব্দী পবে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে, সত্য মতাই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্ড প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পাল রাজবংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয় সেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে অভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সখ্যকীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন অভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত-প্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কি না সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপদ্য নিহত হইলে পাদপহীন দেশে অভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।”

পাল বংশীয় রাজগণ যে মাহিষ্য জাতি এবং তাঁহাদের বংশাবলী যে এখনও ঢাকা জেলায় ভাকুর্ভা ও কোণাগাকানগড়ে বর্তমান আছে, রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় “প্রবাসী” পত্রিকায় এই কথা লিখিয়াছেন। পাল-রাজগণের মন্ত্রিবংশ যে গোড়ীয় ব্রাহ্মণ তাহা আমি মৎপ্রণীত “ভ্রাতৃবিজয়” পুস্তকে এবং সন ১৩০৮ সালের আখ্যাত সংখ্যার “ভারতবর্ষে” প্রতিপন্ন করিয়াছি। সেনবংশের অভ্যুদয়ে মাহিষ্য জাতি অভিবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজিত মাহিষ্যজাতির পক্ষপাতী গোড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে জেতা সেনবংশ এবং সেনাভুগৃহীত জাতিগণ যুগের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন; কত মিথ্যা কিম্বা চাতুরী প্রচার করিয়া সাধারণের সম্মুখে গোড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ করিয়া আসিতেছেন। এইজন্যই বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় একটিও খাটি গোড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না।

শ্রী হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী

পাহাড়ী মেয়েদের নাম

গত অগ্রহায়ণ মাসের ‘প্রবাসী’তে ‘নাম’ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে:—
“পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায় সকল পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের



শ্রীমতী সারদাচরণ
২৩.২২



শ্রীমতী
২৩.২২

যাত্রী

বর-বধূ

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল ।

নাম। সকল বাড়ীর বড় মেয়েই জেঠি, মেজ মেয়ে মাইলি, সেজ মেয়ে সাঁইলি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি।” এই ধারণাটি একেবারেই ভুল। আমাদের মধ্যেও প্রথমা কন্যাকে বড়, মধ্যমাকে মেজ, তৃতীয়াকে সেজ এবং কনিষ্ঠাকে ছোটই বলা হইয়া থাকে। তবে পাহাড়ীদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু, আমরা ‘বড়’ ‘মেজ’ ‘সেজ’ বা ‘ছোট’ বলিয়া কাহাকেও ডাকি না, কিন্তু ইহারা তাহা করে। এগুলিকে ‘নাম’ বলা যায় বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাদের প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মেয়েরই একটি করিয়া নিজস্ব নাম আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ না করিলে সে নামে ইহাদিগকে ডাকে না। স্বধু মেয়েদের বেলায় নয়, পুরুষদের বেলায়ও ইহাব কোনও ব্যতিক্রম হয় না; তাহাদিগকে ‘জেঠা’ ‘মায়লা’ ‘সায়লা’, ‘কাঁয়লা,’ ‘অস্তরে’ ‘ষস্তরে’ ‘মস্তরে’ ‘কাছা’ ইত্যাদি ক্রমেই ডাকা হয়। বিবাহের পরে ইহারা মেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লজ্জা বোধ

করে। সেইজন্য মেয়ের স্বামী যদি স্বস্তরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় এবং তাহার পদবী যদি ‘স্বস্তর’ হয় তাহা হইলে বিবাহের অব্যবহিত পরেই মেয়ে সে পিতার বড় মেজ ছোট মেয়েই হউক না কেন ‘জেঠি স্বস্তরনী’ বলিয়া অভিহিতা হয়। অবশ্য ইহা কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ‘স্বস্তর’ জাতির পক্ষেই নহে; পরন্তু যে-কোন পুত্র এবং যে-কোন জাতির মধ্যেই একেই বলা হয়।

প্রবন্ধে আছে, “জেঠি মেয়ে কাঞ্চি,” কথাটা ‘কাঞ্চি’ নহে, “কাঙ্কি”। পরিশেষে বক্তব্য, যদি নেপালবাসী ‘নেপালী’ এবং দার্জিলিং-প্রবাসী ‘নেপালী’ ছাড়া অন্য কোনও ‘পাহাড়ী’দের কথা প্রবন্ধে লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এ প্রতিবাদ নিবন্ধক, কারণ অস্ত্র স্থানের ‘পাহাড়ী’দের সম্বন্ধে কিছু জানার সৌভাগ্য আমার আজ পর্যন্ত হয় নাই।

ডা. বারিদকান্তি বসু

বেনো-জল

বিশ

বৈকালের পরেই সকলে আবার পুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

আনন্দ-বাবুর মোটেই এত তাড়াতাড়ি ফেরবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্মিত্রা যখন বাবু বার অভিযোগ করতে লাগল যে, তার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, সে আর এক ঘণ্টাও এখানে থাকতে রাঙ্গি নয়, তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই ফিরতে হ’ল।

গরুর গাড়ী পুরীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ’ল, আনন্দ-বাবু তখনো কণারকের শ্রামল ছবির পানে পিপাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সে ছবির স্নিগ্ধ রং সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখতে দেখতে নিঃশেষে মুছে গেল; আনন্দ-বাবু দুঃখিতভাবে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, “শুন্ছ রতন?”

পাশের গাড়ী থেকে রতন সাড়া দিলে, “আজ্ঞে?”

—“আবার আমরা কণারকে আসব!”

—“বেশ তো, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।”

—“কিন্তু এবারে আর আমি শাস্ত্র-বাক্যে অবহেলা করব না।”

—“তার মানে?”

—“শাস্ত্র বলছেন ‘পথে নারী বিবর্জিতা’। কথাটা ভারি খাঁটি হে! এই দেখনা আমাদের সঙ্গে মেয়েজাটো

না থাকলে তো এত শিগগির পাত্তাড়ি গুটোতে হ’ত না!”

পূর্ণিমা শুন্তে পেয়ে অগ্নি গাড়ী থেকে বললে, “এ তুমি অগ্নয় বলছ বাবা! কণারকে আসতে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমার আপত্তি ঐ মশাদের জন্তে!”

আনন্দ বাবু বললেন, “কিন্তু আমি সেজন্তে আপত্তি করছি না কেন? তার কাবণ, আমি হচ্ছি পুরুষ, আর তুমি হচ্ছ নারী! অতএব ভবিষ্যতে কণারকের পথে তুমি ‘বিবর্জিতা’ হবে! বুঝেছ? এই আমার প্রতিজ্ঞা!”

পূর্ণিমা হাসতে হাসতে বললে, “আচ্ছা বাবা, তুমি দেখে নিও, ভবিষ্যতে আমি একটি মশারি সংগ্রহ করে নিশ্চয়ই তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব!”

গাড়ীর ভিতরে ব’সে ব’সে তিনজনে এমনি কথাবার্তা কইতে কইতে এগিয়ে চললেন,—কিন্তু সে কথাবার্তায় স্মিত্রা একেবারেই যোগ দিলে না। গাড়ীর ভিতরে দুই চোখ মুদে চূপ করে শুয়ে শুয়ে সে খালি এক কথাই ভাবছে—কখন এ পথ শেষ হবে, কখন এ পথ শেষ হবে!

খানিক পরে টান উঠল। পূর্ণিমা বললে, “রতন-বাবু, আসুন এইবারে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ি।”

রতন গাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে দেখলে, মরুভূমির বিশুদ্ধ অসীমতাকে স্নিগ্ধ করে বালিয়াড়ির শিখরের পর

যাচ্ছে—সে প্রবাহের মধ্যে তার প্রাণ-মন তখনি বিপুল পুলকে সঁতার দিতে চাইলে, কিন্তু তার পরেই কি ভেবে সে বললে, “না, আজ আর আমার হাঁটতে সাধ যাচ্ছে না।”

* * *

পরের দিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসেই বিনয়-বাবু দেখলেন, স্মিত্রা আঙিনার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, “স্মি! তুই কখন এলি?”

স্মিত্রা বললে, “এই সবে আসছি, বাবা!”

—“কিন্তু আজ তো তোদের ফেরবার কথা ছিল না!”

—“না, আমি একরকম জোর ক’রেই চ’লে এসেছি!”

—“জোর ক’রে? কেন, কণারক কি তোর ভালো লাগল না?”

—“কণারক খুব ভালো জায়গা, বাবা!”

—“তবে যে বলছি, জোর ক’রে চলে এসেছি?”

—“হ্যাঁ, রতন-বাবুর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি আর কখনো কথা কইব না!”

বিনয়-বাবু সবিস্ময়ে বললেন, “রতনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে! কেন রে?”

—“তিনি বোধ হয় ভাবেন, আমার কোনো আত্ম-সম্মান নেই!”

বিনয়-বাবু চমকে উঠলেন। নীরবে কিছুক্ষণ স্মিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, “রতন কি তোমাকে অপমান করেছে?”

—“ঠিক অপমান না করুন, রতন-বাবু আমাকে বড় তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন।”

—“কি রকম?”

—“সে অনেক কথা, বাবা! রতন-বাবুর কাছে আমি আর ছবি-আঁকা শিখব না”—এই ব’লেই স্মিত্রা চ’লে গেল।

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর আশু আশু নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন, অত্যন্ত চিন্তিত মুখে।.....

ছুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর রতন একটু নিশ্চিত

দিবা-নিদ্রার আয়োজন করছে, এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, বিনয়-বাবু তাকে ডাকছেন।

রতন গিয়ে দেখলে, বিনয়-বাবু গম্ভীরমুখে ঘরের ভিতরে পায়চারি করছেন।

রতন বললে, “আপনি আমাকে ডেকেছেন?”

বিনয়-বাবু বললেন, “হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আঁক আমার বিশেষ কথা আছে।”

রতন একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে বসল। বিনয়-বাবুও তার সামনের চেয়ারে ব’সে পড়লেন, কিন্তু কিছুই বললেন না।

খানিকক্ষণ পরে রতন বললে, “আপনি কি বলবেন বলছিলেন না?”

বিনয়-বাবু কেমন বাধো-বাধো গলায় বললেন, “হ্যাঁ! তোমাকে আমি—” কিন্তু এই পর্য্যন্ত ব’লেই থেমে পড়লেন।

রতন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, “আপনি অতটা ‘কিন্তু’ হচ্ছেন কেন, বিনয়-বাবু?”

—“কথাটা বড়ই গুরুতর রতন, কি ক’রে তোমাকে বলব বুঝতে পারছি না।”

রতন অবাক হয়ে বিনয়-বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বিনয়-বাবু আরো খানিকটা ইতস্ততঃ ক’রে শেষটা বললেন, “রতন, তুমি কি কখনো আদালতে আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছিলে?”

রতন চমকে উঠল। এতক্ষণে সে বুঝলে, বিনয়-বাবুর বক্তব্য কি!.....আশু আশু সে বললে, “হ্যাঁ। একবার আমাকে আসামী হ’তে হয়েছিল বটে।”

—“ডাকাতি মামলায়?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“পরে তুমি প্রমাণ অভাবে খালাস পাও বটে, কিন্তু নির্দোষ ব’লে প্রতিপন্ন হও-নি?”

—“এও সত্যি কথা।”

—“এখনো তোমার ওপরে পুলিশের নজর আছে?”

—“হ্যাঁ, আর এইজন্যেই আমি কোথাও চেষ্টা ক’রেও চাকরি পাই-নি।”

—“তাহলে আমি যা শুনেছি মিথ্যে নয় ?”—এই ব’লে বিনয়-বাবু আবার দাঁড়িয়ে উঠলেন।

রতন বললে, “কিন্তু কার মুখে আপনি এ-সব কথা শুনলেন ?”

—“কাল পুলিশের একজন লোক আমার এখানে এসেছিল।”

রতন উত্তেজিত ভাবে বললে, “এখানেও পুলিশ এসেছিল ? বিনয়-বাবু, এই পুলিশ নির্দোষকেও অপরাধী ক’রে তোলে। পুলিশ একবার যাকে সন্দেহ করে, সে বেচারীর অপরাধী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ, সে সুপথে থাকলেও পুলিশের নির্দয় ষড়যন্ত্রে সমাজে সে পতিতের মতন ব্যবহার পাবে, সংপথে জীবিকা নির্বাহের উপায় থেকেও বঞ্চিত হবে। কাজেই শেষটা তাকে হতাশ হয়ে আবার কুপথে পদার্পণ করতে হয়। এ অন্যায় বিনয়-বাবু, অন্যায় ! পুলিশ কি কখনো আমাকে শাস্তি দেবে না ?”

বিনয়-বাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, “রতন, তোমাকে বিশ্বাস ক’রে আমি আমার পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েছি, কিন্তু তোমার জীবনের এই ইতিহাস তুমি তো আমাকে জানাও নি !”

রতন আহত কণ্ঠে বললে, “কেন বিনয়-বাবু, আমার ইতিহাস আগে জানলে আপনিও কি আমাকে ত্যাগ করতেন ?”

—“এখানে ত্যাগ করার কোনো কথাই হচ্ছে না। কিন্তু আমার কাছে এমনভাবে আত্মগোপন করা তোমার উচিত হয় নি।”

রতন বিদ্রোহের মতন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তার পর অধীরস্বরে বললে, “বিনয়-বাবু, বিনয়-বাবু ! আপনি কি আমাকে ডাকাত ব’লে মনে করেন ?”

—“না। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছে যে, হয়তো যৌবনের চাপল্যে কুসঙ্গে মিশে—”

—“থাক বিনয়-বাবু, আর বলবেন না। এ বড় আশ্চর্য্য যে, এতদিনেও আপনি আমাকে চিন্তে পারলেন না !”

—“শোনো রতন, অধীর হয়ো না। কাল পুলিশের এক লোক আমার দরজার কাছে এসেছিল।

কথাও বলেছে যে, তোমার জন্যে আমারও পুলিশ-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। আমার বন্ধুরা তো পরামর্শ দিচ্ছেন যে—”

বাধা দিয়ে রতন উদ্ধত স্বরে বললে, “আপনার বন্ধুদের আমি চিনি, সুতরাং তাঁরা যে কি পরামর্শ দিচ্ছেন তাও আমি বুঝতে পারছি।.....হ্যাঁ, বন্ধুদের পরামর্শ আপনি অগ্রাহ্য করবেন না, বিনয়-বাবু ! তা’হলে হয়তো পরে আপনাকে অসুখ্য করতে হবে”—বলতে বলতে রতন দরজার দিকে অগ্রসর হল।

—“রতন, রতন, শোনো। কোথায় যাচ্ছ ?”

—“কলকাতায়।”

বিনয়-বাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে রতনের একখানা হাত ধ’রে বললেন, “আমি কি তোমাকে কলকাতায় যেতে বলছি, রতন ?”

বিনয়-বাবুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অভিমানে প্রায় অব-রুদ্ধ স্বরে রতন বললে, “না, আমি ডাকাত, আমি এখানে থাকলে আপনি বিপদে পড়বেন,” ব’লেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনয়-বাবু অত্যন্ত কাতর ও অসহায়ের মতন হ’য়ে একখানা চেয়ারের উপরে ব’সে পড়লেন।

একুশ

কণারকে যাওয়া থেকে আসা পর্যন্ত তিন দিন পথ-শ্রমে আর অনিদ্রায় রতনের শরীর যারপরনাই শ্রান্ত হয়েছিল, তার পর আবার এই অভাবিত আঘাত। ঠিক বিশ্রামের সময়েই তাকে নিরাশ্রয়ের মত আবার কলকাতায় যেতে হবে।

আনন্দ-বাবুর কথা মনে হ’ল। রতন একবার ভাবলে কলকাতায় যাবার আগে খাণিকক্ষণের জন্তে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠলে হয়।.....কিন্তু বিনয়-বাবুর বাড়ী-ছাড়ার ইতিহাস শুনলে তিনিও যদি শেষটা ভয় পান ? না, দরকার নেই কোথাও গিয়ে—সে গরিব, সহায়হীন, ধনীদেব সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই তাকে এমনি আঘাত পেতে হবে।

রতন তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিতে

বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগল, ভবিষ্যতেও বরাবর এমনি একলা থাকবে, তার জীবন সমাজের জন্তে সৃষ্ট হয় নি—সমাজ হচ্ছে ধনীদিগের খেলাঘর, সেখানে তার কিসের দরকার ?

তার ব্যাগের ভিতরে স্মিত্রার ঝাঁকা খানকয়েক ছবি ছিল। ছবিগুলোর উপরে সে একবার চোখ বুলিয়ে গেল। এই অল্পদিনেই স্মিত্রার আঙুল বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো ছবির রেখা দেখলে বাস্তবিকই স্মিত্রাতি করতে হয়, আরো কিছুকাল তার শিক্ষাধীনে থাকলে স্মিত্রার হাতের কাজ অনেকটা নিখুঁৎ হয়ে উঠত। এই-সব কথা ভাবতে ভাবতে রতন ছবিগুলিকে টেবিলের উপরে এমন ভাবে রেখে দিলে যাতে ক'রে সে চলে গেলে পর এ ঘরে ঢুকলেই স্মিত্রার চোখ তার উপরে পড়ে।.....স্মিত্রার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে হ'ত, কিন্তু সে উপায়ও তো নেই! স্মিত্রা যে তার সঙ্গে আগেই কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছে!

গোছগাছ শেষ ক'রে রতন নিজের মোট তুলে নিয়ে অগ্রসর হ'ল। তার পর দরজাটা খুলতেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল—স্মিত্রা!

রতন অবাক হয়ে ছ' পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

স্মিত্রা বললে, “কোথায় যাচ্ছেন ?”

যে স্মিত্রা আজ তিনদিন ধ'রে তার সঙ্গে কথা কয় নি, এমন সময়ে তার দেখা পাবার আশা রতন মোটেই করে নি। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বিস্মিতের মতন।

স্মিত্রা হাসিমুখে বললে, “রতন-বাবু, এ তিনদিন আপনার সঙ্গে আমার আড়ি ছিল। আজ আবার ভাব করতে এসেছি।”

রতন মূঢ়কণ্ঠে বললে, “শুনে স্থখী হলুম।”

—“কিন্তু আপনি মোট ঘাড়ে ক'রে কোথায় যাচ্ছেন বলুন দেখি ?”

—“তোমার বাবার কাছে সে কথা শুনো। এখন পথ ছাড়া।”

—“আমি পথ ছাড়তে আসি নি, রতন-বাবু।”

—“তার মানে ?”

—“আমি পথ আগ্লাতে এসেছি।”

—“কেন ?”

—“বলছি। আগে মোট নামান।”

—“না, দয়া ক'রে ছেলেমানুষী কোরো না, আমাকে যেতে দাও।”

—“কোথায় যাবেন, পূর্ণিমার কাছে ?”

—“আবার তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?”

—“সত্যি বলছি, রতন-বাবু, আমি ঠাট্টা করছি না।”

—“আমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সব কথা তোমার বাবার কাছেই জানতে পারবে।”

—“আমি সব কথা শুনেছি রতনবাবু, কিন্তু আমার উপরে আপনি কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন ?”

—“স্মিত্রা, তোমার উপরে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি ?”

—“নইলে এমন ক'রে চ'লে যেতে চান ?”

—“তুমি যখন সব কথাই জানো, তখন কেন আমি যাচ্ছি তা কি তুমি জানো না ?”

—“জানি। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না।”

—“তবু আমাকে যেতে হবে।”

—“আমি যেতে দেব না।”

—“তুমি !”

—“হ্যাঁ, রতন-বাবু, আমি—আমি, আমি আপনাকে যেতে দেব না !”

—“সে কি স্মিত্রা !”

—“আপনি গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব !”

বিস্ময়ে নীর্বাক হয়ে স্মিত্রার মুখের পানে রতন চেয়ে রইল।

স্মিত্রা আবেগ-ভরে বলতে লাগল, “ভাবছেন আমি ছেলেমানুষী করছি ? না, রতন-বাবু, তা নয়! আপনি যদি বলেন, এখুনি আমি আপনার সঙ্গে চ'লে যেতে পারি—কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আপনি কি তাই চান ? চুপ ক'রে রইলেন কেন—বলুন, বলুন। আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না”—বলতে বলতে তার দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা উছলে পড়ল—সে দুই হাতে নিজের মুখে ঢেকে, সেই-খান, রতনের পায়েব কাছে ধুপ্ ক'রে ব'সে পড়ল।

তার পরেই পায়ের শব্দে চম্কে, মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলে—রতন ঠিক ঝড়ের মতই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

মাটির উপরে আছড়ে পড়ে একান্ত আর্ত্বস্বরে স্মিত্রা বলে উঠল—“যাবেন না রতন-বাবু, যাবেন না, যাবেন না !”
(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

“নারী-সমস্যা”

অনেক লোকের ধারণা, যে, টাকা-কড়ি ফল-মূল ঔষধ-পত্র অথবা হাতী-ঘোড়ার মত স্বাধীনতা একটা-কিছু জিনিষ যাহাতে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার নাই ; তবে দরকার বোধ করিলে উপরওয়ালারা ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষকে তাহা অল্পবিস্তর দান করিতে পারেন । একটা বিদেশী জাতি আমাদের জাতিকে স্বাধীনতা দিবে কি না-দিবে ভাবিতে বসিলে আমাদের রাগ হয় ; আমরা বলি, আমাদের স্বাধীনতা কি উহাদের লোহার সিন্দুকের মোহর যে রূপা করিয়া উহারা না দিলে আমরা পাইব না । অথচ নিজেদের ঘরে বসিয়া আমরা সর্বদাই মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি, “তাই ত, স্ত্রীলোককে কি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ?” স্ত্রীলোক নিজেও ভাবিয়া পাইতেছেন না, যে, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা করিবেন কি না ; পুরুষও ভাবিয়া পাইতেছেন না, স্ত্রীলোককে বিধিত মস্তিষ্কার সদ্যবহার করিতে দেওয়া উচিত কি না । কিন্তু এই কথাটা উভয়েই ভুলিয়া যান, যে, স্বাধীনতা একটা দেনা-পাওনার জিনিষ নয়, মানুষের দেহ মন মস্তিষ্কের মত ইহাও মানুষ ভগবানের নিকট হইতেই লইয়া আসিয়াছে । নির্বুদ্ধিতার ফলে দেহ মন কি মস্তিষ্কে মানুষ যেমন নিজেই নষ্ট করিতে পারে, ইহাকেও তেমনি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে ; পরের অত্যাচারে মানুষ যেমন অঙ্গহীন কি জড়বুদ্ধি হইতে পারে, তেমনি পরাধীনও হইতে পারে । পরে যখন মানুষের কোনো অঙ্গহানি বা শারীরিক কোনো ক্ষতি ঘটায়, তখন তাহার শরীরটা পরের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় না ; পরে কাহারও স্বাধীনতা হরণ করিলেও পরকেই মালিক বলিয়া মানিয়া লইতে কেহ বাধ্য হয় না ।

কি পুরুষ কি নারী—মানুষ মাত্রই স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । “পুরুষ-স্বাধীনতা” কিম্বা “স্ত্রী-স্বাধীনতা” কাহারও অপরকে দিবার অপেক্ষা ভগবান্ কিম্বা প্রকৃতি রাখেন নাই । তবে স্ত্রী ও পুরুষ বহু ক্ষেত্রে অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতা হেলায় হারাইয়াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া “স্বাধীনতা” নামের মর্যাদা নষ্ট করিয়াছেন ।

স্বাধীনতা ও অধিকার সম্বন্ধে আমাদের দেশের বহু লেখকলেখিকার বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে । ইহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, যে, স্ত্রীজাতিকে যে-সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা না হয়, সেইখানেই তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া স্বভাব ও প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিয়া পথভ্রষ্ট হন । সমাজ অথবা আইন স্ত্রীজাতিকে যে-সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত এখনও করেন নাই, সেই-সকল অধিকারের দাবীই স্ত্রীজাতি সর্বদা করিতেছেন কি না, একথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না । পুরুষের উদাহরণ দিয়া এই কথাটা সহজেই বোঝান যায় । আমাদের দেশের আধুনিক সমাজ কিম্বা আইন পুরুষ মাত্রকে অবিবাহিত থাকিবার অথবা সন্ন্যাসী হইবার অধিকার দিয়া রাখিয়াছে ; অর্থাৎ তাঁহারা যদি বিবাহ না করেন, সন্ন্যাসী হন, তাহাতে সমাজ কিম্বা আইন বাধা দিবে না । কিন্তু কার্যত দেখা যায়, অধিকাংশ পুরুষই তাঁহাদের এই অধিকার অমুসারে চিরকুমার থাকিতে বা সন্ন্যাসী হইতে ভুলিয়া যান । তবে মেয়েদের এই অধিকারটা হইতে বঞ্চিত না করিলেই যে তাঁহারা সকলে কুমারী থাকিবেন, এমন মনে করিবার কিছু কারণ আছে কি ? যে গৃহকর্ম নারীর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া পরিচিত,

তাহাতেও ত পুরুষের হস্তক্ষেপ করায় শাস্ত্রে অথবা আইনে মানা নাই; কিন্তু এই অধিকারের সদ্যবহার করিয়া গৃহকর্ম করিতে পুরুষকে সর্ব স্থলে বা অধিকাংশ স্থলে ত দেখা যায় না। পত্নীর মৃত্যুতে একাদশীর উপবাস ও ব্রহ্মচর্য পালন ত পুরুষকে করিতে শাস্ত্রকার কি আইনকর্তা বারণ করেন নাই; তবে এদিকেই বা তাঁহাদের দৃষ্টি এত কম কেন?

মানুষের অধিকার মানুষ স্ববিধা ইচ্ছা শক্তি কর্তব্য ও পছন্দ-মত সকল দিক দেখিয়া খাটায়। সকল মানুষের সকল কাজ করিবার ইচ্ছা স্ববিধা শক্তি ও সময় না থাকিতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন্ মানুষটির কোন্ কাজ করিবার মত অবস্থা হইবে কি না-হইবে, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কেহ বলিতে পারে না; কোনো একটা জাতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায় না। সুতরাং অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার স্পর্ধা না রাখিয়া মানুষকে নিজ স্বভাব ও শক্তি প্রভৃতি অনুসরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়াই সভ্য সমাজের নিয়ম হওয়া উচিত। নিজ অধিকার অনুসারে কাজ করিতে গিয়া মানুষ যাহাতে নিজের ও অপরের কোনো ক্ষতি না করে, তাহা দেখিবার জ্ঞান আধুনিক মানুষের শিক্ষিত মস্তিষ্ক আছে, স্বার্থবুদ্ধি আছে, আইন আদালত আছে, মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণীত বহু নিয়ম আছে, সামাজিক বন্ধন ও আচার ব্যবহার আছে। পাছে সৈ নিজের কিম্বা অপরের ক্ষতি করে এই ভয়ে তাহাকে জন্মাবধি জেলখানার কয়েদী করিয়া রাখিবার দরকার নাই।

সচরাচর একটা তর্ক শোনা যায়, যে, গৃহের বাহিরের কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপরে ত উঠিতেই পারেন না, এমন কি সমকক্ষও হইতে পারেন না। “রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সর্বত্রই পুরুষ নারীর অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে।” সুতরাং যে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার উপায় আছে তাহা ফেলিয়া বৃথা আয়ু ও শক্তি ক্ষয় করিয়া পঞ্চম শ্রেণীর পুরুষের প্রতিমূর্তি হইবার চেষ্টা কেন? ব্যাস, বাল্মীকি, ভিক্টর হিউগো, শেঙ্গ পীয়ার, র্যাফেল, চাণক্য, কি বিস্মার্ক হইবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা যখন নাই, তখন সামান্য চুনো-

পুঁটি হইবার জ্ঞান এ-সকল ক্ষেত্রে নারীদের প্রবে লাভের অধিকারের দাবী করিয়া কি হইবে?

ধরা যাক, বহিজর্গতের কোনো কার্যক্ষেত্রেই না পুরুষের মত উচ্চদের সৃজনী শক্তি ও প্রতিভার পরি দিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না; অর্থাৎ সব শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষদের প্রতিভার তুলনায় সর্বশ্রে প্রতিভাশালিনী নারীদের প্রতিভা অতিক্রমপ্রভ এ সংখ্যায়ও এই-সকল নারী ঐজাতীয় পুরুষদের অপেক্ষ অনেক কম। সমগ্র পুরুষজাতি ধরিয়া যদি বিচার করা তাহা হইলে দেখিব, সাধারণ মানুষের তুলনায় জগতে সর্বদেশে ও সর্বকালেই অসাধারণ ও উচ্চদের প্রতিভাবান মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জগতের ইতিহাস যতদি হইতে লিখিত হইয়াছে, ততদিন যে কোটি কোটি পুরু পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কম জন অতিমানব ও মহাপুরুষ। জন্মিয়াছেন হিসাব করিয়া দেখাইতে খুব বেশী সময় লাগে না। কোটি পুরুষ প্রতি ইহাদের সংখ্যা কত সামান্য হইবে দেখিতে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ মানুষের সৃষ্টিকাল হইতে পুরুষ শিক্ষার ও কর্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছা পাইয়া আসিতেছে নারীরা সেরূপ এবং ততটা স্বেচ্ছা আগে ত পানই নাই, এখনও পাইতেছেন না। সুতরাং জগতে একজন নারীও যদি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় না দিয়া থাকেন, তবে এই হিসাব দেখিবার পর তাহাতে নারীদের লজ্জা কি দুঃখের খুব বেশী কারণ থাকিবে না। সর্ববিধ স্বেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিভাবান ও অমরকীর্তিমান পুরুষের সংখ্যা যদি এত কম হয়, তাহা হইলে স্বেচ্ছাগহীনা নারীর অমরকীর্তি না-থাকাটা লজ্জা দুঃখ বা বিষয়ের বিষয় হইত না। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নারীর অমরকীর্তি আছে। এত অল্প পুরুষ জগতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও সমস্ত পুরুষজাতির বহিজর্গতের সমস্ত কর্মক্ষেত্রে শিক্ষালাভ অনুশীলন ও অর্জিত বিদ্যা দানে কেহ আপত্তি করে না; কারণ সমস্ত পুরুষ জাতির কোন্ অংশ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উদয় হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না এবং জগতে মুষ্টিমেয় মহামানব লইয়াই মানুষের জীবনচক্র চলে না। মহামানবগণ

যে মহা মনীষার কীর্তি যুগে যুগে অগ্নিশিখার মত এক একবার এক এক স্থানে জ্বলিয়া দিয়া যান, তাহাকে সাধারণ মানুষই তাহার ক্ষুদ্র প্রতিভার সাহায্যে নিত্য ব্যবহারের বস্তু করিয়া তুলে। আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষের করায়ত্ত্ব বিনি করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে আতপদান, আলোকদান, ইন্ধনস্থানীয় হওয়া, বার্তা-বহন, শকটচালন, প্রভৃতি নানা কার্যে যাহারা লাগাইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভার মূল্য জগতের কাছে কিছু কম নয়। আবার ইহাদের উদ্ভাবিত উপায় শিখিয়া যাহারা কাচের বাতি, লোহার পাখা, ট্রামের লাইন, টেলিগ্রাফের তার তৈয়ারি করিতেছেন, খাটাইতেছেন এবং দরকার-মত তাহার নানা উন্নতিসাধন করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভা আরো ক্ষীণ বলা যাইতে পারে; কিন্তু সংসারক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিভার এই সামান্য প্রকাশও কি অত্যন্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ নহে? প্রতিভা জলকণার মত সাগরে, নদীতে, নিকরে, মেঘে, বৃষ্টিতে, বাষ্পে, যেখানে যতটুকুই থাকুক না কেন, সম্ভাবহার করিলে ততটুকু সফলই দিবে এবং এই কণা-সংগ্রহের সমষ্টি পরিণামে সাগরের বারিরাশি অপেক্ষা কম হইবে না।

মাতৃস্নেহ জগতে যতখানি আদর্শস্থানে পৌছাইতে পারিয়াছে—পিতৃস্নেহ তেমন পারে নাই। যশোদা, মেনকা, মেরী, অন্নপূর্ণা, কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃরূপের বহু প্রকাশ মানুষের ধর্মজীবনের সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহু দৃষ্টান্তও আছে। পাতিত্রত্যে নারী যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, পত্নীপ্রেমে পুরুষ তাহা দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিতে নারী যেমন নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, পুরুষ তাহা পারেন নাই। স্তুতিয়া যেমন করিয়া বুদ্ধের কল্পণাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন, শ্রীমতী যেমন করিয়া রক্তের অক্ষরে ভক্তির গাথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাহা পারেন নাই। আজও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। স্নেহ প্রেম ও ভক্তির নিকট নিজ ভূত ভবিষ্যৎ

ও বর্তমানকে নারী যেমন নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছে, পুরুষ তাহা পারেন নাই। কিন্তু প্রেম ভক্তি ও বাৎসল্যের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর নিকট পরাজিত হইলেও ইহার দাবী তাঁহারা ছাড়িয়া দেন নাই। জগতে মাতৃস্নেহের পাশে পিতৃস্নেহের উচ্চ স্থান আছে; পিতা স্নেহ করিলে, মাতার কার্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, কেহ মনে করেন না; সম্মানও পিতৃস্নেহকে অনাবশ্যক কোনো দিন ভাবে নাই; পতিব্রতের প্রেমের পাশে পত্নীপ্রেমিকের প্রীতির স্থানও তুচ্ছ নয়। ভক্তিমতীর ভক্তির পাশে ভক্তেরও স্থান আছে। সংখ্যায় অল্প হইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে মূল্য কমিয়া যায় না। জগতে সতী সাবিত্রী বহু থাকিতে পারেন কিন্তু শিবের প্রেম তাহাতে ম্লান হইয়া যায় নাই; যশোদা, মেরী মাতা, মেনকা, কি কৌশল্যা সংখ্যায় অনেক বেশী বলিয়া দশরথের বাৎসল্য তুচ্ছ করিবার নয়। সূতরাং, একজন অহল্যাবান্ধ, একজন ঝান্সীর রাণী, কি একজন জোয়ান্ অব্ আর্ক্ অথবা একজন ম্যাডাম কুরী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষ অস্বীকার করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। অথবা ভবিষ্যতে একজনও যাহাতে না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই।

নারীর যদি স্বজনী শক্তি নাই থাকে, তবু পুরুষের সৃষ্টিশক্তির প্রকাশে ত সে সাহায্য করিতে পারে। সুর শিক্ষার ফলে নারী যদি সুর সৃষ্টি করিতে না পারে, তবু বর্গ-ও যন্ত্র-সঙ্গীতে সুরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ত দেখাইতে পারে। বিজ্ঞান-রাজ্যে কোনো নূতন আবিষ্কার যদি নারী নাই করিতে পারে, তবু ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎসংসারের বহু কার্যসিদ্ধি ত সে করিতে পারে। জগতে যে মানুষ যে ক্ষেত্রে নূতন কোনো আবিষ্কার করে নাই, কিংবা আশ্চর্য্য মৌলিকতা দেখায় নাই, তাহাকে যদি সেই ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত, তাহা হইলে জগৎসংসার চালাইবার জন্ম ভগবান্ কোটা কোটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুই চারিটি নিউটন গ্যালিলিও হোমার বাল্মীকি না সৃষ্টি করিয়া কোটা মহামানবেরই সৃষ্টি করিতেন। মানুষের যে-কোনো তুচ্ছ দানই মানুষের কাজে লাগে, বর্ধঙ্গগতে

তাহারই মূল্য আছে। যদি দেখা যাইত, পুরুষ-কেরানীর জায়গায় স্ত্রী-কেরানী রাখিবামাত্র হিসাবে দুই আর দুইয়ে ছয় লেখা হয়, কিংবা পুরুষ-ডাক্তারের জায়গায় স্ত্রী-ডাক্তার ডাকিবামাত্র রোগীকে দুধের বদলে কার্বলিক এসিড খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবে স্ত্রীর কার্যকে বৃথা এবং অনিষ্ট-কর বলিবার অধিকার আমাদের থাকিত। কিন্তু সাধারণ কাজ যখন একই ভাবে চলে, তখন নৈয়ায়িকের লড়াই করিয়া তাহার মূল্য কিছুতেই কমাইয়া দেওয়া যায় না। মানুষের প্রতিভা ও বুদ্ধির মাপ অনুসারেই যদি তাহাকে অধিকার দিতে হয়, তবে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের চেয়ে নিরক্ষা পুরুষের অধিকার কম হওয়া উচিত। এই মাপ অনুসারেও বহু পুরুষের অধিকার হরণ ও বহু নারীকে অধিকার দান করা চলে। যে দেশে মানুষ যেমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, তাহাকে তেমনই অধিকার দিয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক, কি জার্মানীকে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক অধিকার দিতে হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের “সমকক্ষ” হইতে পারেন না বলায় একটা ভুলও আছে। নারী যদি সকল ক্ষেত্রে ঠিক পুরুষের প্রতিচ্ছবি হইতেন, তাহা হইলে ত তাঁহারা পুরুষই হইতে পারিতেন। একজন পুরুষও ত ঠিক আর-একজন পুরুষের মত হন না, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের মত হন;—ব্যাস বাল্মীকির মত হন নাই, শেক্সপীয়র হোমরের মত হন নাই; ইহারা কেহ কাহারও ঠিক সমকক্ষ হন নাই। ফরাসী বারাপনা জোয়ান্ অব্ আর্ক্ প্রাণ দিয়াছেন স্বাধীনতার জন্ত, স্পার্টান্ বীর সিন্ডনিসের ঠিক সমকক্ষ হইয়া উঠিবার উৎসাহে নয়। মৈত্রেয়ী মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্ত নারী হইয়াও সংসারসম্পদ দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক হইবার ছুরাশার বশে নয়। নারীর মনে যদি কোনো কর্মপ্রেরণা থাকে, তবে তাহা অপর কাহারও সহিত তুলনায় ওজন না করিয়াও জগতের কার্যে লাগিতে পারিবে। নারীর প্রতিভা যদি কাব্য সাহিত্য ও শিল্পে বিকশিত হইতে চায়, তবে তাহা সামান্য হইলেও নারীকে নিজেকে এবং অপরকে কিছু আনন্দ দিবে। তাহা না হইলে, ষাঁহারা বলেন, বাঙালী মেয়ের কাছে “একঘেয়ে

প্রেমের গল্প ইত্যাদি” ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, তাঁহারা প্রতিমাসে নানা মাসিক পত্রিকায় “প্রেমের গল্প” লিখিয়া ছাপাইতেন না।

বহির্জগতের কোনো বর্ষক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমান অথবা অধিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না, ইহা বলা আজকালকার দিনে আর শোভা পায় না। এই ভ্রান্ত মতটিকে পাশ্চাত্যদেশে ত বহুকাল অসত্য বলিয়া প্রমাণ করা হইয়া গিয়াছে, আমাদের দেশেও হইয়াছে। তবু ষাঁহারা সে বিষয়ে কোনো খোঁজ না লইয়াই কলিকাতার কলেজে শিক্ষিতা দশ বিশটি বাঙালী মেয়েকে ব্যাস বাল্মীকি নিউটন গ্যালিলিও, কি চাণক্য বিস্মার্ক্ হইতে না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্ত কিছু বলা দরকার। সত্য বটে আমাদের দেশের “তথাকথিত দশবিশ জন উচ্চশিক্ষিতা নারী” এবং “প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু নারী”র মধ্যে খুব অল্প দুই একজন মাত্র “একঘেয়ে প্রেমের গল্প কবিতা বা এক আধটা স্বদেশী গান ছাড়া” জগৎকে বেশী কিছু দান করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহার দ্বারাই কি নারীশক্তির অক্ষমতা প্রমাণ হয়? আমাদের দেশের দিদিমা ঠাকুরমারা তাঁহাদের প্রতিভার বিকাশের সহায়তা করিতে পারেন নাই এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও গভীর ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়েরা খুব বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই দেশটি ছাড়াও পৃথিবীর মানচিত্রে আরো দেশ দেখা যায়, সেখানকার মেয়েরাও মেয়েই। তাঁহারা নিজেদের প্রতিভার শক্তির ও মৌলিকতার কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, চোখ মেলিয়া দেখিলেই ত আমাদের ভুল ভাঙিয়া যাইত।

সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া যে সর্বগ্রাসী সমরানল কয় বৎসর পূর্বে জলিয়াছিল, আমাদের দেশের নারী-হিতৈষীরা বোধ হয় তাহার কথা ইতিমধ্যেই ভুলিয়া যান নাই। তখন ঘর সংসার পুত্রকন্যা স্ত্রী ভগ্নী মাতা সকলকে ফেলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্যের চর্চা ভুলিয়া, চিকিৎসা সেবা অন্নসংস্থান বস্ত্র যোগান দূরে ঠেলিয়া,—এককথায় সভ্যজগতের সমস্ত বর্তব্য দায়িত্ব

আনন্দ ও জ্ঞানাত্মশীলন পিছনে রাখিয়া, পূর্ণবয়স্ক নীরোগ ও শক্তিমান পুরুষমাত্রই যে যুদ্ধদানবের সর্বনাশী অগ্নিলীলার ইন্ধন যোগাইতে ছুটিয়াছিল, একথা কি শিক্ষিত মানুষমাত্রই জানেন না? কিন্তু সমস্ত পুরুষশক্তির এই নিঃস্বয় অবহেলার ফলে ইউরোপের বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু ও নারীগণ কি জহর-ব্রত করিয়া একসঙ্গে পুড়িয়া মরিয়া বিরহবেদনা ও সংসারভার মোচন করিয়াছিল? যুদ্ধ-শেষে ভগ্নহৃদয় অবসন্ন অঙ্গহীন পীড়িত ক্ষুধিত তৃষিত নিরানন্দ ও স্নেহভিক্ষু পুরুষগণ কি দেশে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সংসারচক্রকে স্তব্ধ ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া হতাশায় ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল? বর্তমান ইউরোপের চলতি ইতিহাস তাই সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বিরাট মহাদেশের জটিল জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়াছিল ইউরোপের নারীগণ; তাহারা ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইয়াছিল, বস্ত্রহীনের বস্ত্র বুনিয়াছিল, নিরানন্দের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, বাণিজ্যব্যবসায়, আপিস-আদালত, যানবাহন, কলকজা, চিকিৎসা-সেবা, দেনা-পাওনা, কাগজপত্র হিসাবনিকাশ, সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধানই তাহারা করিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প ব্যবসায় রক্ষা ও বাণিজ্য চালনার কার্যে মেয়েরা যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার রিপোর্টে অ্যান্ড জুটান্ট-জেনারেল-টু-দি-ফোসেজ্জ বলিতেছেন, “প্রায় সমস্ত কার্যক্ষেত্রেই মেয়েরা যে পুরুষের স্থান দখল করিয়া সফলতা দেখাইতে পারে, তাহা তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।” বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে বলেন, “কলকজার কাজে মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা অধিক ক্ষিপ্ততা ও নিপুণতা দেখাইয়াছেন।” কেহ বলেন, “অল্প মাহিনায় স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা অধিক কাজ দেয়। তাহাদের হাত ও আঙুল সকল রকম কাজের অধিকতর উপযোগী।” “উইমেন্স ওয়ার ওয়ার্ক” বলেন, “যে ১৭০১ রকম কাজে মেয়েদের লাগানো যায়, তাহার সবগুলিতেই মেয়েরা পুরুষের মত ভালভাবে কাজ চালাইতে পারে; কোনো কোনোটাতে মেয়েরা আরো বেশী ভাল কাজ করে।” যুদ্ধের মালমশলা তৈরির কাজও মেয়েরাই যুদ্ধের সময় করিয়াছিল। এই বিভাগের

ফরাসী-মন্ত্রী বলেন, “ফরাসী কারখানার মতে ছোট ছোট কাজে মেয়েরা সকল জায়গাতেই পুরুষের মত জিনিষ তৈরি করে, অনেক স্থলে মেয়েদের তৈরি জিনিষ ভাল হয়। ভারি কাজে মেয়েদের সুবিধামত কলকজা পাইলে মেয়েরা প্রায় পুরুষের সমান কাজই দেয়।” ইটালীও এই সাক্ষ্যই দেয়। ইহা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সেবা ও চিকিৎসা মেয়েরা করিয়াছে। অ্যান্থ্রাক্সের মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ও বিপদ অগ্রাহ করিয়া মৃত আহত ও পীড়িত সৈনিকদের কুড়াইয়া বেড়াইয়াছে। অনেক স্থলে আহত অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া মহিলা চিকিৎসকই সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম মাসেই এক জার্মানীতেই ৭০,০০০ রমণী শুশ্রূষাকারিণীর কাজ করিবার জন্ত ব্যবস্থাপকসভার দরজায় আবেদন লইয়া আসিয়াছিলেন। ইটালিয়ান্ সমরসচিব বলিয়াছিলেন, “যুদ্ধক্ষেত্রের হাস্পাতালসমূহে মেয়েদের কাজ করিতে দিয়া আমরা ২১,০০০ সৈন্যকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইতে পারিব।” ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট ফন বর্গষ্ট্রফ বলিয়াছিলেন, “যে জাতির নারীগণ শ্রেষ্ঠ, এ যুদ্ধে তাহারাই জয়লাভ করিবে।” উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শুধু মেয়েরাই দশহাজারবকম নতন উদ্ভাবনার জন্ত পেটেন্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবশ্য এসমস্তই সাধারণ মানুষের কাজ। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা কি মহামানবের মনীষার কথা এখানে বলা হইতেছে না। উচ্চ দরের প্রতিভার পরিচয়ও যে বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা দিতেছেন, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায়। হইতে পারে সংখ্যায় তাহারা পুরুষের সমান নহেন। “রসায়নশাস্ত্রে মাদাম কুরী, পদার্থ-বিজ্ঞানে হার্শা এয়ার্টন, জ্যোতিষতত্ত্বে কেরোলিন হর্শেল ও লেডি হগিন্স, ভূ-প্রাণিত অঙ্গারীভূত ও প্রস্তুরীভূত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে মারী ষ্টোপস্ প্রভৃতি অনেক মহিলা বিজ্ঞানজগতে নতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।” সাহিত্যজগতে স্যাফো, জর্জ এলিয়ট, সেলমা লাগেরলফ্ প্রভৃতি বহু মহিলা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। নাট্য-জগতে মহিলারা অনেকস্থলে ক্রতিত্ব পুরুষকে পিছনে

ফেলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাজগতে মস্তেসোরী যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ আজ তাঁহার কাছে ঋণী।

এইরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে চেষ্টা করিলাম না। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদের প্রতিভা জগৎকে আনন্দ ও জ্ঞান দিয়াছে। ইহারা যদি এই-সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত থাকিতেন, তাহা হইলে জগৎও ইহাদের অমূল্য দানের উপকার ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিত।

স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রতিভাকে ঠিক একই-প্রকারের মাপকাঠিতে মাপিয়া একই ছাঁচে ঢালিয়া বিচার করিলে এই-রকম ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের মানসিক শক্তির বিকাশ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারও সে-সকল স্থানে বিভিন্ন-রকম হওয়া দরকার। শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির ভিতর দিয়া নারী-প্রতিভা গুণবিষয়ে যে-ভাবে বিকশিত হইবে, তাহাকে সকল ক্ষেত্রে পুরুষোচিত মাপকাঠি দিয়া মাপিলে ঠিক গায়সঙ্গত ব্যবহার হইবে না। আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও নারী এখনও নিজপথ হ্রত ঠিক খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই; কারণ সকল দেশেই বহির্জগতের পথ অঘেষণে নারী অল্পদিন মাত্র বাহির হইয়াছেন। তাই প্রথম প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা পুরুষদের প্রবর্তিত পথে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। হইতে পারে, এই পথ চলার ব্যাপারে কোনো দিন তাঁহারা নিজেদের জন্য নূতন-রকম পথ আবিষ্কার করিবেন, যে পথের শেষে তাঁহারা হ্রত এমন সকল সৌন্দর্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারিবেন যাহা পুরুষোচিত মাপকাঠির মাপে ঠিক পুরুষের অর্জিত বিদ্যার তুল্য হইবে না, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নূতনত্ব বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য থাকিবে যাহা পুরুষ দেখাইতে পারেন নাই এবং সেইজন্মই তাহা অমূল্য হইবে। গৃহসংসারের মধ্যে নারীর পাশে পুরুষের স্থান আছে; কিন্তু নারীকে মানুষ গৃহের যে অঙ্গরূপে দেখে, পুরুষকে তাহা দেখে না; আত্মীয় স্বজন, পুত্র কন্যা, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত, সকলের সঙ্গেই গৃহকর্তারও সম্পর্ক আছে, গৃহিণীরও

আছে। কিন্তু গৃহিণীর এই সম্পর্কের পরিচয়টি যে-ভাবে প্রকাশ পায়, গৃহস্বামীর সম্পর্কের পরিচয় ঠিক সে-ভাবে প্রকাশ পায় না। গৃহকর্তার ব্যবহার ঠিক গৃহিণীর মত হইল না বলিয়া কেহ দুঃখ প্রকাশও করে না, গৃহকর্তাকে বাতিলও করিয়া দিতে চায় না। তেমনি বহির্জগতের সহিত নারীর সম্পর্কের প্রকাশ ঠিক পুরুষের মত, মাত্রা ও গুণে এক না হইলে কিছু ক্ষতি নাই, বিভিন্নতাটাই তাহার সৌন্দর্য। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রমণী অদ্বিতীয় সমর-সচিব না হইয়া যদি জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু কারণ আছে কি? চিকিৎসা-জগতে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রচিকিৎসক না হইয়া শিশুজীবনের উৎকর্ষ সাধন কিম্বা মানসিক ব্যাধি মোচন যদি করেন, তাহাতে জগতের দুঃখভার বাড়িবে কি? শিল্প-জগতে প্রবেশ করিয়া র্যাফেলের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-পথের সকল উপকরণগুলি সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়া মানুষের জীবন আর-একটু আনন্দময় করিলে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে কি?

রাষ্ট্র বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি বর্তমান জগতের বিরাট্ বিরাট্ যন্ত্রগুলিকে পুরুষ ও স্ত্রী ঠিক একই চক্ষে দেখে না। যেখানে যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই-সকল যন্ত্রের নিকট-সম্পর্কে আসিয়াছে, সেইখানেই তাহাদের দৃষ্টির বিভিন্নতা ধরা পড়িয়াছে। পুরুষ যেখানে শুধু যন্ত্রটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কলকজারূপে মানুষকে দেখিয়াই খুসী হইয়াছে, নারী সেখানে যন্ত্রটাকে উপেক্ষা করিয়া মানুষটাকে আগে দেখিয়াছে। পুরুষ অপরাধীরূপ বিকল যন্ত্রকে সায়েস্তা করিবার জন্ত জেলখানারূপ আর-একটা যন্ত্র স্থাপন করিলেন, ক্ষুদ্র মানুষগুলার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। কিন্তু নারী এলিজাবেথ ফ্রাই মানুষের এই দুর্গতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, “এই দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের দুঃখ দুর্গতি মোচনের উপায় চিন্তাতে” মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন; তাঁহারই চেষ্টাতে কারা-সংস্কার বিষয়ে পালিয়ামেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পুরুষ জগতের দুঃখের কথা ভাবেন না একথা বলিতেছি না; বহু বিশ্বজোড়া দুঃখমোচনে তাঁহারাই অগ্রণী হইয়াছেন; বলিতেছি, তাঁহারা বৃহৎ একটা সুবিধার অন্তরালে

ছোট ছোট দুঃখকে দেখিতে পান না। কিন্তু ছোট এত-টুকু শিশুকে বড়র চেয়ে অনেক বড় করিয়া দেখা যাহার কাজ, তাহার চোখে এই-সব “ক্ষুদ্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়।” কারখানা দোকান বাজারে যে-দেশের মেয়েরা বেশী কাজ করে, সে-দেশে শোনা যায় মেয়েরা অতি অল্পদিনেই একটা কাজ ছাড়িয়া আর-একটা কাজের সন্ধানে ঘুরিয়া ফেরে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, “এই ঘোরা-ফেরা বেশী মাহিনার আশায় মোটেই নয়।” মেয়েদের চোখে যে কাজ দেখিতে ভাল লাগে না, যে কাজে রুচি সৌন্দর্য্যবোধ পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বলিদান করিতে হয়, যে কাজ অশ্রীতিকর ও যেখানে কাজের দোসরদের বন্ধুরূপে পাওয়া যায় না, সে কাজ মেয়েরা করিতে চায় না। হইতে পারে, নারীশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিলে নারীর এইরূপ মনের গতির ফলে বহির্জগতের কক্ষক্ষেত্র-গুলি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করিবে, স্মৃতি ও স্মৃতিত্বের পরিচয় দিবে, মনকে প্রফুল্ল করিবে এবং মানুষের বন্ধুবন্ধি করিবে।

নারী-প্রতিভা বিকাশের যথেষ্ট সুবিধা যে পায় নাই, তাহা ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। যে-কোনো দেশ ধরিয়াই বিচার করি না কেন, দেখিব, পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক শিক্ষালাভ করিতেছেন অতি অল্পকাল। যেখানেও বা ইতিহাসের গোড়ার দিকে কিছু পরিমাণ রমণী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন দেখা যায়, সেখানেও সেই সূদূর অতীত ও বর্তমানের মধ্যবর্তী একটা বিরূঢ় কাল মেয়েরা শিক্ষা বিনাই জীবন যাপন করিয়া-ছেন। বহু অধিকারেও তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে বঞ্চিত।

অনেকে মনে করেন, “সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি এই যুগ যুগান্তর” যে মেয়েরা গৃহকোণে পুরুষের “অধীনতায়” অথবা আশ্রয়ে সকল অধিকার ত্যাগ করিয়া কাটাইয়াছেন, এই সত্যটাই তাঁহাদের বহির্জগতের অধিকার লাভে অক্ষম বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও বলিবার অনেক থাকে। সৃষ্টিটা যতদিন আদিম অবস্থায় ছিল, ততদিন প্রকৃতিরূপিণী নারীদের সৃষ্টি ও সংসার

গুছাইতে, পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিতে এবং সন্তানকে একান্তভাবে নিজ চেষ্টায় পালন করিয়া তুলিতেই সমস্ত প্রতিভা বুদ্ধি শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সহিত সৃষ্টির শৃঙ্খলা আনয়নে নারীর কাজ কমিয়া আসিয়াছে। গৃহসংসার ও সন্তান নারীর মনকে বহুল পরিমাণে মুক্তি দিয়াছে। ভবিষ্যতে আরো দিবে। এই মুক্ত মন ও শক্তির ত একটা ক্ষেত্র চাই। সামান্য একটা উদাহরণেই একথাটা বুঝাইয়া বলা যায়। সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ বনে হিংস্র জীবদের সঙ্গে একই জায়গায় বাস করিত। তখন সন্তানপালন মানে ছিল বাঘ ভালুক নরখাদক প্রভৃতি সকলের হাত হইতে শিশুকে বাঁচাইয়া অশুষ্ক তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া তত্পরি তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটান। তার পরের সভ্যযুগেও গৃহিণীকে ক্ষেত হইতে ফসল আনিতে হইত, নদী হইতে জল আনিতে হইত, দুগ্ধ দোহন করিতে হইত, সূতা কাটিতে হইত, ধান ভানিতে হইত, ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হইত, আরো কত সহস্র খুঁটিনাটি কাজ নিজহাতে করিয়া লইতে হইত। কিন্তু এই শ্রমবিভাগ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যখন কল খুলিলে বিছানার পাশে জল পাওয়া সম্ভব, বৈদ্যাতিক স্বেচ্ছা টিপিলেই উনান জ্বালান চলে, রান্না চড়াইয়া দশ মাইল দূরে বেড়াইতে গেলেও পুড়িয়া যাইবার ভয় নাই, তখন যে-সব স্ত্রীলোক এতখানি অবসর পাইবেন, তাহা লইয়া তাঁহারা করিবেন কি? অবশ্য সব জায়গার সকল নারীর এ অবস্থা এখনও হয় নাই। কিন্তু ক্রমে হইবে; এবং এখনই সকল সভ্যদেশে কতকগুলি নারীর অবসর আদিমযুগের নারীর অবসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

তাহার উপর সৃষ্টিব্যাপারে পূর্বে প্রতিদম্পতির যত সন্তান থাকার প্রয়োজন ছিল, এখন তাহা নাই; কারণ পৃথিবী বাড়ে নাই কিন্তু মানুষ বাড়িয়া চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে পরিবার ছোট হইলে এবং বিবাহ বেশী বয়সে করিলে মেয়েদের অবসর আরো বাড়িয়া যাইবে। কতক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতার সংখ্যা বাড়িবে, কেহ কেহ চিরকুমারী থাকিবেন, বিধবা নারীও থাকিবেন। স্তত্রাং

মেয়েদের বহির্জগতের অধিকারে বঞ্চিত করিলে এতখানি উদ্ভূত শক্তি হয়. অপব্যয় হইবে, নয় মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীলোকের ভারমুক্ত মন ও অবকাশের খোরাক জোগাইবার জন্তই ত তাঁহাদের সকল অধিকার দিতে হইবে। শৃঙ্খলিত দেহমনে জীলোক যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, মুক্ত অবস্থায় তাহার অপেক্ষা বেশী দেওয়াই স্বাভাবিক। তাঁহার মানসিক শক্তি ও প্রতিভাকে পূর্বে যেখানে কেবল সংসাররচনায় লাগাইয়াছিলেন, নারী এখন তাহার কিয়দংশ বহু পরিমাণে অল্প কাজে দিতে পারিবেন। যে সমাজে কোনো শক্তির অপচয় হয় না, কোনো মানুষ দান না করিয়া গ্রহণ করে না, সেই ত অর্থনীতির মতে আদর্শ সমাজ। কিন্তু আমাদের ধনীর ঘরে ঘরে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদেরও ঘরে অনেক নারীকে কি জীবনটা বৃথা নষ্ট করিতে দেখিতেছি না? সমাজ-দেহের এতখানি শক্তির অপচয় না করিয়া অবসরপ্রাপ্ত রমণীরা পূর্বে যে সময়টায় নদী হইতে জল আনিতে যাইতেন এখন সেই সময়ে অর্থ উপার্জন করিয়া কলের ট্যাঙ্ক দিতে পারিবেন। যে সময়ে উনানে গোবর লেপিয়া কাঠ কয়লা ঘুঁটে কেরসিন ঘাঁটিয়া রন্ধন করিতেন, সেই সময়ে উপার্জন করিয়া বৈদ্যুতিক চুল্লী ব্যবহার করিতে পারিবেন। একরূপ অবস্থা এখনও অধিকাংশের হয় নাই; কিন্তু কালক্রমে হইবে। এবং এখনই কাহারও কাহারও হইয়াছে।

নারীর গৃহকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলেও বহির্জগতে তাঁহার অধিকার থাকা দরকার। সন্তানকে নীরোগ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে শুধু মায়ের নিজের ঘরটি সুন্দর হইলেই হয় না; সহর, প্রতিবাসী, রাস্তাঘাট, দোকানবাজার, সবেসই উন্নতি দরকার। ধনীর ও শিক্ষিতের ঘরের সন্তানকেও যে প্লেগে কলেরায় মরিতে দেখা যায়, বাহির হইতে রোগ কুড়াইয়া আনা তাহার কারণ নয় কি? মায়ের যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে তিনি সেই অধিকারের ফলে দোকানে ভেজাল বন্ধ, সহরের রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করিতে পারেন। পুরুষ যে এ কাজ করিতে পারেন না, তাহা নয়। তবে, পুরুষ ত ছেলেকে ভাত মাখিয়া খাওয়াইতে কি রাত্রি

জাগিয়া সেবা করিতেও পারেন; তবু মাতাকেই এই কাজ করিতে হয় কেন? আসল কথা এই, যে, বহির্জগতেও মাতৃস্নেহের একরূপ কার্যক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষেরা এখনও বিশেষ-কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মদ্যপ পিতা পুত্র ও স্বামীর অত্যাচারে ও অবহেলায় রমণীর সোনার সংসারই ছাই হইয়া যায়। পুরুষ এখানে নিজ সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে রমণীরও সর্বনাশ করে। রমণীর যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে তিনি দেশ হইতে এই বিষ চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারেন। বর্তমান জগতে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে ও অগ্ন্যাণ্ড অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হইয়াছে, মেয়েরাই তাহার প্রধান উদ্যোগী, এবং সে সংগ্রামে বহু স্থলেই তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, দরিদ্র রমণীকে পেটের দায়ে ঘর ছাড়িয়া কলে কারখানায় কয়লাখনিতে ও পথে ঘাটে অল্প উপার্জন করিতে যাইতে সকল দেশেই হয় এবং হইবে। কিন্তু ইহাদের স্বার্থের দিকে চাহিবার অধিকার যদি ইহাদের ও অল্প নারীদের না থাকে, তবে দুর্বল দেহ ও অধীন মনের ফলে বহু লাঞ্ছনা ভোগ ইহাদের করিতে হইবে। মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকিলে দুর্বল নারীর দেহমন লজ্জা-সন্ত্রম এবং জাত ও অজাত সন্তানের দিকে মেয়েরা জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন। বহু দেশে মেয়েরা ইহা করিতেছেনও; কারখানার মেয়েদের জন্ত ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মেয়েরা অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। নিউজীলণ্ডে গ্ৰন্থতীর ও শিশুর খাদ্যী, শুল্কযাকারিণী, চিকিৎসক এবং ঔষধ ও খাদ্য সরকার হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

পৃথিবীতে দেশে দেশে কালে কালে বহু সময়ানল জলিয়াছে। রাষ্ট্র কি বাণিজ্য-যন্ত্রের স্বার্থে এই আশুনে পুরুষ নিজে পুড়িয়া মরিয়াছে, কত শত শত মায়ের সোনার সংসার ছারখার করিয়া তাহারা তাঁহাদের অভিষাপ কুড়াইয়াছে। যুদ্ধ-যন্ত্রের পেষণে শুধু যে মায়ের সন্তান, ভগিনীর ভ্রাতা, পত্নীর স্বামী ও কন্যার পিতা পিতৃ হইয়া মরিয়াছে তাহা নহে, রমণীর দেহ মন ও লজ্জা-সন্ত্রম বহু লাঞ্ছনা সহ করিয়াছে; তাহার উপর তাহাকে একই

হাতে ঘর ও বাহিরের পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম ও সৈনিকের রসদও জোগাইতে হইয়াছে। পুরুষ যুদ্ধের নেশায় মাতিয়া যে দুঃখ সহজে সহ্য করিয়াছে, রমণীকে গৃহকোণে বিষাদের ভারে মুইয়া পড়িয়া তাহার ষিগুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের নিদারুণতা রমণীর প্রাণে পুরুষের অপেক্ষা বহুগুণ বেদনা দিয়াছে। হইতে পারে, ইহার ফলে স্বাধীন রমণীরা একদিন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বলিয়াছিলেন, “রমণীরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার পাইলে জাতিতে জাতিতে শান্তি স্থাপনের সহায়তা করিবেন এবং এই যে ভীষণ যুদ্ধের জন্ম আগরা দুঃখ করিতেছি, তাহার পুনরাভিনয় নিবারণ কবিবেন। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গীকৃত হইয়াছে। মেয়েরা ভোট দিবার অধিকার পাইয়া যদি জগতের ইতিহাসে একটা যুদ্ধও কমাইয়া দিতে পারেন, তবে ভগবান ও মানুষের চক্ষে তাঁহাদের এ অধিকার সার্থক হইবে।” ইতি মধ্যেই “শান্তি ও স্বাধীনতার জন্ম নারীদের অন্তর্জাতিক সংঘ” (International League of Women for Peace and Liberty) এই ক্ষেত্রে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের যা কিছু কাজ, সবই মেয়েরা করেন।

স্ত্রীলোক যখন দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তখন তাহাকে আবর্জনার মত ঘর হইতে কাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেই নিশ্চিত হওয়া যায়! কিন্তু পুরুষের দুর্নীতির ফলে সে নিজেকে ত নষ্ট করেই, সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীপরিবারেরও বহু দুর্দশা করে। অপরের পাপে ভ্রম জীলোকের এই যে লাঞ্ছনাভোগ, মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে ইহা বহু পরিমাণে দূর করা যায়। অনেক সভ্য দেশে তাহা হইতেছে।

মেয়েদের কেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, সেই পুরানো কথাটা মোটামুটি বলিতেই এতখানি জায়গা লাগিল; অল্প দু-চারিটা কথা মাত্র উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব। অনেকে মনে করেন, “মানুষের মনটাও গৃহে অর্থাগম অপেক্ষা স্ত্রীর নিকট স্নেহ-সহায়ত্বের অধিকতর

প্রত্যাশী।” গৃহে অর্থ থাকিলে স্ত্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষা স্নেহ প্রেম বেশী আদরের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হতভাগ্য পঠদশা শেষ হইবার পূর্বেই পিতামাতার আদেশে একটি স্ত্রী গলায় গাঁথিয়াছে, এবং বিশ টাকা উপার্জন করিবার পূর্বে চারিটি শিশুর পিতা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীর স্নেহ-সহায়ত্ব চোখের জলের রূপে স্বামীকে অভিষিক্ত না করিয়া যদি অর্থ রূপে ক্ষুধায় অন্ন জোগায়, তাহাতে কি গৃহসংসারটা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিবে? “মাহিনার টাকার চেয়ে প্রেমময়ী পত্নীর হাতের সেবা স্বামীর পক্ষে অধিকতর লোভনীয় হওয়া স্বাভাবিক সন্দেহ নাই।” কিন্তু যে প্রেমময়ীর হস্ত ছাড়া সেবা করিবার আর কোনো উপকরণ নাই, সে যদি পীড়িত, দরিদ্র, অথবা বহুপরিবারভারাক্রান্ত স্বামীর সেবার উপকরণ নিজে সংগ্রহ করে, অথবা ধনী হইয়াও অবসরের সময় উপার্জন করিয়া স্বামীকে তাহার প্রিয় সামগ্রী উপহার দেয়, তাহাতে ত তাহার স্বামীর গৌরব বোধ করা উচিত।

অনেকে মনে করেন, “মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত করিয়া শাস্ত্র তাঁহাদের স্বাধীনতার পথে কাঁটা গাড়িয়া দেন নাই।” “পিতা, পতি, পুত্র, সং হইলে তাঁদের মধ্যে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা ও মনের স্বাধীনক্ষুর্তি আবার সেই-রকম হইতে পারে।” সংসারে সং মানুষ এত ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যাইতেছে না, যে, প্রত্যেক নারীর ভাগ্যেই পিতা পতি ও পুত্রগণ সকলেই সং হইবেন। ভাগ্যগুণে, হয় সাধু পিতা, কিম্বা সং পতি, একজন মাত্রও, যদি সকল নারীর কপালে জুটিত, তাহা হইলে সংসারে বহু দুঃখ দূর হইয়া যাইত। তাহা যখন ঘটে না, তখন নারীর স্বাধীনতাটুকুও হরণ করিয়া তাহার মাথার দুঃখের বোঝা আর-একটু ভারী করিয়া দিবার কি প্রয়োজন আছে? পিতা, পতি ও পুত্র সং হইলে ত আর স্ত্রীলোক সাধ করিয়া কাঁটা-গাছে চুল জড়াইয়া তাহাদের সহিত কলহ করিয়া “স্বাধীনতা” দেখাইবে না। অথবা যদি স্বভাবের দোষে কোনো রমণী তাহা করেও, তাহা হইলে পায়ে শিকল বাঁধিয়া তাহাকে মধুরভাষিণী স্ত্রীকীর্ণা করা যে কত কঠিন, তাহা এই শাস্ত্রপীড়িত দেশেও আমরা ঘরে ঘরেই দেখিতেছি।

কেহ কেহ মনে করেন, প্রাচীনভারতে অর্থাৎ বৈদিক-যুগেও নারী “স্বাতন্ত্র্যবর্জিতা” ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা “প্রথিতনায়ী শৌর্য্যবীৰ্য্যশালিনী মহিমময়ী” হইতে পারিয়াছিলেন। “স্বাতন্ত্র্যবর্জিতা” বলিতে কি কি বোঝায়, ঠিক জানি না। কিন্তু মনু প্রভৃতি স্মৃতি ও সংহিতাকারের আইন মানিয়া চলিলে স্ত্রীলোকের যে অবস্থায় থাকিতে হয়, বৈদিকযুগের নারীর সে অবস্থা ছিল না। অতি প্রাচীন যুগে ভারতনারীর অধিকার বহুক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ছিল বলিয়াই তাঁহারা কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন; তৎপরবর্ত্তী যুগে সে-সব অধিকারে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে কি শৌর্য্যবীৰ্য্য কিছুই তাঁহারা, সাধারণতঃ, পূর্বের মত দেখাইতে পারেন নাই। মনু বলিয়াছেন, “স্ত্রীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই”; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, “ঋগ্বেদে এরূপ কোনও উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং স্ত্রীগণ পতির সহিত একত্র যজ্ঞ করিতেছেন এবং বনিতাগণ যজ্ঞে নিযুক্ত আছেন, এইরূপ বহু উক্তি বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।” ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে বহু নারী আজীবন অবিবাহিতা থাকিতেন। “ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত নারী-ঋষিগণের উল্লেখ দেখা যায় :—ঘোষা, সূর্য্যা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ইন্দ্রাণী বা শচী এবং সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি। ইহারা সকলেই ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করিয়া ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন।” “বিশ্ববারা কেবল যে মন্ত্র রচনা করিয়াই জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু অগ্নির স্তব উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকেরও কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিশ্ববারা নারী, অথচ তিনি হোতা, তিনি উদগাতা, তিনি অধ্বর্যু এবং তিনি স্বয়ংই তাঁহার কৃত যজ্ঞের ব্রহ্ম। পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্যের সমস্ত অধিকার নারীতে বর্ত্তমান।” (অবিনাশচন্দ্র দাস।)

বৈদিক যুগের পরেও হারীতস্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, পূর্বে কুমারীদের ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধু এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা বেদাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেন; সদ্যোবধুরা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। উভয়েরই উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা

স্বাধ্যায়, সমিধ্ আহরণ ও ভিক্ষাচর্য্যায় অধিকারী ছিলেন ইহারা আজীবন কুমারী থাকিতেন। গার্গী, স্কলভ রামায়ণের শবরী, ভবভূতির উত্তরচরিতের আত্মেয়ী, ইহা সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। উত্তররামচরিতে দেখি পাই, আত্মেয়ী লবকুশ প্রভৃতি পুরুষ ছাত্রদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পড়িতেন, এক আশ্রম হইতে আর-এ আশ্রমে পাঠের সুবিধার জন্ত আপনি চলিয়া যাইতেছেন ইত্যাদি। মনু প্রভৃতির বহু শাসনই আধুনিক হিন্দু সুবিধাবাদের জন্ত অথবা অন্য নানা কারণে মানেন না স্তরাং স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য লোপের বেলায়ই বেশ কড়া কড়ি করিবার উৎসাহও না দেখাইলে পারেন।

শাস্ত্রে, বিবাহে অর্থগ্রহণ পাপ; স্ত্রীধন হরণের ফল নরকবাস; ছাত্রজীবনে বিবাহ নিষিদ্ধ; সপিণ্ড কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ; হীনক্রিয়, নিষ্পুরুষ, নিশ্চন্দ ও যক্ষ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত পরিবারে বিবাহ বারণ। কিন্তু বিবাহে অর্থ গ্রহণ না করিলেই আজকাল খবরে কাগজে নাম উঠে, ও ছাত্রজীবনে বিবাহে আপত্তি করিলে মা-বাবার প্রতি সম্মান দেখান হয় না। সপিণ্ড বিবাহও অনেক স্থলে চলে; হীনক্রিয়ের ও নিশ্চন্দ অর্থাৎ মুখের অর্থ সহ কন্যা গ্রহণ প্রায়ই দেখা যায় অত্যাগ্র নিষেধও গ্রাহ্য করিতে ব্যস্ত কম লোকে নিষ্পুরুষ পরিবারের কন্যা কোথাও অবিবাহিত বসিয়া থাকে না; বরং শত্রুদের সম্পত্তির লোভে ভাবী জামাইদের ঘোড়দৌড় লাগিবার সম্ভাবনা ঘটে। প্রাপ্ত যৌবনা কন্যাকে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া নিম্ন ইচ্ছামত পতিবরণ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক লেখকলেখিকাদের মতে স্বমতে বিবাহ একটা লজ্জার বিষয়।

আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করাও স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্হিত নয়, বরং গৌরবের বিষয় বলিয়াই যাহারা মনে করেন, তাঁহারা পুরুষের সহিত “প্যারেড কবিয়া যুদ্ধ শিক্ষা করিতে” কেন আপত্তি করেন, জানি না। যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া পুরুষের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা যায়, তবে তাহার পূর্বে এই প্রকৃত পুরুষোচিত বিজ্ঞাটা পুরুষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখিয়া

রাখিলে ত জয়লাভের সম্ভাবনাটা বাড়ে বই কমে না। “স্বধর্ম ও সম্মান রক্ষার জগু” যদি কোনো মহিলা আত্মহত্যা করিয়া “তৃণ খণ্ডের স্তায় অনায়াসে” পুড়িয়া না মরিয়া শত্রুনিধন করিয়া জয়লাভ করিতে পারেন, কিম্বা প্রাণও মান একত্রে রাখিবার চেষ্টাটাও অন্তত করেন, তবে আমি ত তাঁহাকেই অধিক সম্মান করি।

“স্বাধীনতা” কথাটির অর্থেই বোঝা যায়, ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। যে-দেশের পুরুষমানুষদের ঘাড়ের উপর মাথা থাকিতে দিনে-দুপরে নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচার হয়, সে-দেশে নারীকে পুরুষের অধীনে

বা আশ্রয়ে রাখিয়া নিরাপদ রাখার কল্পনাটা ভীষণ ও ক্রুর উপহাস। যে মানুষ নিজেকে নিজে শাসন করিতে ও রক্ষা করিতে শিখিয়াছে, তাহার কোনো উপরিওয়ালার প্রয়োজন হয় না। পরের শাসন মানুষের পায়ে বেড়ি পরাইতে পারে, চক্ষু অন্ধ করিয়া দিতে পারে, মনের প্রদীপে ছাই চাপা দিতে পারে, কিন্তু মানুষ গড়িয়া দিতে পারে না। মুক্ত মন, জাগ্রত দৃষ্টি, ও পূর্ণ অধিকারই মানুষকে নিজ পথে নিজ প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতে সহায়তা করে। মানব জাতির অর্দ্ধাংশেরই কি কেবল লক্ষ্য লাভ করা দরকার?

শ্রী শান্তা দেবী

রাজপথ

[১৭]

স্বরেশ্বর কক্ষ হইতে নিজস্ব হইয়া যাওয়ার পর সুমিত্রা ক্ষণকাল নির্ঝাঁক হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে, দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহা রোধ করিতে লাগিল।

কণ্ঠের আচরণে জয়ন্তী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও চিন্তিত হইলেও উপস্থিত অবস্থায় সে-ভাব মুখে প্রকাশ করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। কণ্ঠস্বর যথা-শক্তি কোমল করিয়া তিনি বলিলেন, “স্বরেশ্বরকে নিয়ে ক্রমশঃ একটু অসুবিধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, সে যখন সহজেই গেল তখন এ ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে তুলো না, সুমিত্রা।”

সুমিত্রা তাহার আনত-আর্দ্র নেত্র উত্থিত করিয়া কহিল, “এ’কে তুমি সহজে যাওয়া বলছ, মা? তোমার দারোয়ান দিয়ে স্বরেশ্বর-বাবুকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে’ দিলে কি এর চেয়ে বেশী হত বলে’ তোমার মনে হয়?”

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখ অসন্তোষের

ছায়াপাতে অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, “নিজের মান যে নিজে নষ্ট করে, তার মান কেউ রাখতে পারে না!”

ক্ষণকাল নির্ঝাঁক থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, “নিজের প্রাণ বিপন্ন করে’ যিনি তোমার মেয়ের মান রেখে-ছিলেন, তিনি নিজে মান রাখতে পারেন না এ কথা কি তুমি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস কর?”

এই উপকার-প্রাপ্তির উল্লেখে মনে মনে জলিয়া উঠিয়া জয়ন্তী বিদ্রূপ-বিকৃত স্বরে কহিলেন, “কবে কোন্ যুগে কি করেছিল না-করেছিল বলে’ চিরদিনই সে হাতে মাথা কাটবে না কি? তুমি জানো, স্বরেশ্বরের সঙ্গে তোমার এই মেলা-মেশার জন্তে বিমান এ বাড়ীতে আসা কমিয়ে দিয়েছে?”

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুমিত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল জয়ন্তীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর কঠিন স্বরে বলিল, “তাই বুঝি তোমরা স্বরেশ্বর-বাবুর এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করবার জন্তে এই মিথ্যা অপবাদের ঘড়য়ন্ত্র করেছ?”

সুমিত্রার এ কথায় বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া জয়ন্তী

তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “খনরদার স্মিত্রা, বিমানকে তুমি এবিষয়ে কোনো কথা বোলো না! এ চিঠির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।”

“কেমন করে’ তুমি জানলে যে তাঁর সম্পর্ক নেই?”

“এ একজন কোন্ হরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছে—একে-বারে অণু হাতের লেখা। চিঠি নিয়ে তুমি দেখতে পার” বলিয়া জয়ন্তী পত্রখানা স্মিত্রার দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

স্মিত্রা হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, “চিঠি আমি দেখতে চাই নে, কিন্তু এ চিঠি যে বিমান বাবু লেখান নি তা তুমি কি করে’ জানলে?”

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, “যে-রকম করে’ই হোক আমি তা জানি।”

“তা হলে কে এ চিঠি লিখেছে তাও বোধহয় তুমি জান?”

এই কঠিন প্রশ্নে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া জয়ন্তী বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সহসা স্মিত্রার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, “লক্ষ্মীটি স্মিত্রা, এ কথা নিয়ে মিছিমিছি গোল করিস্ নে! আমি তোরা মা, আমার কথা বিশ্বাস কর, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তুই ছেলেমানুষ, তাই সব কথা বুঝতে পারছিস্ নে!”

“সত্যি-সত্যিই বুঝতে পারছি নে!” বলিয়া উচ্ছলিত অশ্রু রোধ করিতে করিতে স্মিত্রা ড্রয়িং-রুম হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিজ কক্ষে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার এতক্ষণের ষড়-নিরুদ্ধ দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তাহার অবসন্ন ক্রিষ্ট দেহ একটা ইজিচেয়ারে বিলুপ্তিত হইয়া পড়িল এবং নেত্র হইতে অসংরুদ্ধ তপ্ত অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ঝরিতে লাগিল। তাহার পর বহু ক্ষণ পরে সে যখন বর্ষাবিধৌত আকাশের মত তাহার দুঃখ-পরিসিক্ত হৃদয়ের মধ্যে অবলোকন করিবার অবকাশ পাইল, দেখিল নিভৃত-নিহিত কোন্ বস্তুর উজ্জ্বল প্রভায় তাহার ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত দুঃখ ও গ্লানি কখন অলঙ্কিতে

বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! সুরেশ্বরকে সে যে-সকল কথা বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে সুরেশ্বর তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা সে মনে মনে বারম্বার আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং যতই আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল ততই বৃদ্ধিতে পারিল যে বাক্যের সাহায্যে পরস্পরে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছে, বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঘটনাস্থলে জয়ন্তী প্রবেশ করায় যতটুকু পরিতাপের কারণ ঘটয়াছিল জয়ন্তী প্রবেশ না করিয়া সেদিনকার ঘটনা পরিসমাপ্ত হইলেই মোটের উপর অধিকতর পরিতাপের কারণ ঘটত।

সন্ধ্যার পর বিমানবিহারী নিয়মিত বেড়াইতে আসিয়াছিল। ড্রয়িং-রুমে আর সকলেই সমবেত হইয়াছিল, শুধু স্মিত্রা আসে নাই। দ্বিপ্রহরে প্রমদাচরণ বেদান্ত-ভাষ্যের যে-অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয়বার আলোচনা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বিমানবিহারীকে বৃঝাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু বিমানবিহারী সে কূট প্রশ্নের মধ্যে মনঃসংযোগ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অনাগ্রহ-ভরে শুধু তাহা শুনিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই-একটা অসংলগ্ন বাক্যের প্রয়োগে কোনো প্রকারে আলোচনায় যোগ রাখিয়া চলিয়াছিল।

সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর প্রমদাচরণের নিকট বেদান্ত-ভাষ্যের লোভে যে বিমানবিহারী উপস্থিত হয় নাই, এবং প্রমদাচরণ যে তাহার লক্ষ্য নহেন, উপলক্ষ্য, একথা প্রমদাচরণ বৃদ্ধিতে না পারিলেও জয়ন্তীর বৃদ্ধিতে বিলম্ব হয় নাই। তাই অদূর-ভবিষ্যতের এই ডেপুটি-জামাতার মনোরঞ্জনার্থে জয়ন্তী বিমলাকে বলিলেন, “বিমলা, স্মিত্রা এখনও এলো না কেন? তাকে ডেকে নিয়ে আয় ত, বিমানকে ছুচারণান গান শোনাবে।”

এই প্রস্তাবে বিমানবিহারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল অসহিষ্ণুতা হইতে মুক্ত হইয়া বেদান্ত-ভাষ্যের আলোচনার প্রতি সহসা এমন মনোযোগী হইয়া উঠিল যে শাস্ত্রাভ্যাসীলনে জয়ন্তীর এই বিঘ্নসম্পাদনের জন্ত প্রমদাচরণ মনে মনে স্কন্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং ক্ষীণ



অনন্তের লীলা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভষণ গুপ্ত ।

প্রতিবাদার্থে মুহূ কণ্ঠে কহিলেন, “আ হ না হয় গান থাক, আমরা এই আলোচনাটাই শেষ করি।”

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া কহিল, “রক্ষে কর ! তোমার ও নীরস শাস্ত্রচর্চা আজ বন্ধ থাক ! সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে বিমানেরই বা ঞ্-সব ভাল লাগবে কেন ?”

বিমানবিহারী বিলক্ষণ-রূপেই জানিত যে প্রতি-যোগিতায় জয়ন্তীর সহিত প্রমদাচরণ পারিয়া উঠিবেন না ; যে মুহূর্ত্তে স্মিত্রা উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই বেদাস্ত-ভাষ্য বন্ধ করিতে হইবে। তাই সে জয়ন্তীর কথার উত্তরে স্বতঃপ্রসূত হইয়া এমন কথা বলিল যাহাতে মনে হইল যে বেদাস্তভাষ্য ভিন্ন সে অপর কিছুই চাহে না, এবং সে সক্ষম্য তাহার একমাত্র অভিলাষ ছিল বেদাস্তভাষ্যের চর্চা করা।

কিন্তু ক্ষণ পরে বিগলা যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে স্মিত্রার মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া আছে, আসিতে পারিবে না এবং সেই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া প্রমদাচরণ সবিস্তারে বেদাস্তভাষ্য আলোচনা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বিমানবিহারী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিরস কণ্ঠে কহিল, “আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে ; আজ তা হলে এখন আসি।”

প্রমদাচরণ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, “কিন্তু আমাদের আলোচনাটা ত শেষ হল না, মাঝখানেই রয়ে গেল !”

বিমান মুহূ হাসিয়া কহিল, “বাকিটা আর-একদিন শেষ করা যাবে, আজ একটু দরকার আছে।”

ক্ষুণ্ণমনে প্রমদাচরণ কহিলেন, “আচ্ছা, তাহলে থাক।”

বিমান প্রস্থান করিলে জয়ন্তী অদ্যকার ঘটনাটা কতকটা পরিবর্তন, কতকটা পরিবর্জন, এবং কতকটা পরিবর্জন করিয়া প্রমদাচরণকে জানাইলেন।

সমস্ত শুনিয়া প্রমদাচরণ মনের মধ্যে গভীর ভাবে ব্যাখ্যাত হইলেন। মস্তকের কেশের মধ্যে দশ-বারো মিনিট ক্ষুণ্ণবেগে হস্ত সঞ্চালন করিয়া অবশেষে জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি ভুল করেছ, জয়ন্তী। আমরা ত মানুষ নিয়েই চিরকালটা কাটিয়েছি, মানুষ আমরা চিনি। স্বরেশ্বর কখনই তা নয় !”

জয়ন্তী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “শেষ দশ বৎসর তুমি

ত সেক্রেটারিয়াটে কেরাণীগিরি করেছ ! তুমি আবার মানুষ চেন কি ?”

এই অভিযোগের পর প্রমদাচরণের আর কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না, তিনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। জয়ন্তী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “তুমি মানুষ চিন্তে পার ; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ চিনি। স্বরেশ্বরের এবাড়ীতে আসা বন্ধ না করলে তোমার মেয়ের পক্ষে ভাল হত না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে।”

“ভাল হলেই ভাল।” বলিয়া প্রমদাচরণ আসন ত্যাগ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেন।

[১৮]

জয়ন্তীর সহিত স্বরেশ্বরের সংঘর্ষের পর তিন চার দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যোদ্ধা যেমন সময় হইতে প্রত্যাভর্তনের পর পরম সন্তোষ ও পুলকের সহিত নিজের অস্ত্রসমূহ নাড়িয়া-চাড়িয়া পর্যবেক্ষণ করে, স্বরেশ্বর ঠিক সেইরূপে এ কয়েক দিন তাহার তাঁত ও চরকা লইয়া প্রায় সমস্ত সময় কাটাইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এতদিন যাহা প্রছাই আকষণ করিত, স্মিষ্ট তরল অমুরাগে সিক্ত হইয়া এখন তাহা সরস হইয়া উঠিয়াছে ! চরকা ধরিয়া বসিলে স্বরেশ্বরের হাত হইতে আর মোটা সূতা বাহির হয় না ; কেমন করিয়া প্রাণের আবেগটুকু অঙ্গুলীর টিপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, টিপ দিলেই তাহা হইতে রাশি রাশি মিহি সূতা অবলীলাক্রমে বাহির হইতে থাকে আর মনে হয় কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র বয়নার্থে তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। যত-গুলি তাঁত নাগিতেছে, স্বরেশ্বর প্রত্যেকটিতেই মিহি সূতা চড়াইতেছে এবং সেই শাড়ীগুলির পাড়ের রং ও প্যাটার্নের জন্ত ঢাকার কারিগরের সহিত পরামর্শ ও আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে।

দ্বিপ্রহরে তারাসুন্দরী নিজ কক্ষে বসিয়া মহাভারত পড়িতেছিলেন, এবং স্বরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা-ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছিল।

কথায় কথায় মাধবী বলিল, “দাদা, স্মিত্রা একটা চরকা পাঠিয়ে দিতে বলেছিল, কই দিলে না ত ?”

স্বরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, “চরকা দেওয়া ত শক্ত নয়, পাঠিয়ে দেওয়াই শক্ত! কয়েক দিনই ত ভাবছি, কিন্তু কোনো উপায়ই ঠাওরাতে পারছি নে।”

মাধবী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, “এক কাজ করলে হয় না? একখানা চিঠি লিখে কানাইকে দিয়ে একটা চরকা যদি পাঠিয়ে দাও?”

মাধবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া স্বরেশ্বর কহিল, “তা হলেই হয়েছে! গিন্নীর চোখে যদি পড়ে তাহলে কানাই যাবে পুলিশে আর চরকা যাবে উনোনে! গিন্নীকে টপকে একেবারে স্মিত্রার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। একবার স্মিত্রার হাতে পৌঁছলে তখন নিশ্চিন্তি। স্মিত্রাকে গিন্নী সহজে পেরে উঠবেন না, সে গিন্নীর চেয়ে অনেক শক্ত।”

স্বরেশ্বরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে মাধবী পুনরায় চরকা কাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর অকস্মাৎ একটা কথা খেয়াল হওয়ায় চরকা বন্ধ করিয়া আগ্রহ সহকারে বলিল, “একটা উপায় আছে, দাদা?”

“কি?”

সহাস্ত-মুখে মাধবী বলিল, “তুমি যদি অসুমতি দাও আমি নিজে গিয়ে স্মিত্রাকে চরকা দিয়ে আসতে পারি। আমি যেন চরকা বিক্রী করে’ বেড়াই সেই পারচয়ে গিয়ে স্মিত্রাকে একটা চরকা দিয়ে আসব। তারা বড় লোক, দাম যদি দ্যায় দাম নেবো; আর দাম যদি দিতে না পারে তখন অগত্যা তোমার পরিচয় দিয়ে ষিনা-মূল্যেই চরকা দিয়ে আসব।”

বিস্মিত-স্মিতমুখে স্বরেশ্বর কহিল, “বলিস্ কি রে, স্মিত্রা? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে চরকা দিয়ে আসতে পারবি?”

মাধবী সহাস্ত-মুখে বলিল, “নিশ্চয়ই পারব! তোমাদের স্বরাজ লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পারব না?” বলিয়া হাসিতে লাগিল।

“আমার বোন বলে’ তোকেও যদি অপমান করে? যদি স্পাই বলে?”

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, “স্মিত্রার মার কাছে তোমার বোন বলে’ আমি পরিচয় দেবো না। এক-

খানা বন্ধ-গাড়ীতে দু-তিনটে চরকা নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে স্মিত্রাদের বাড়ীতে উপস্থিত হব। প্রথমে এমনি গিয়ে স্মিত্রার সঙ্গে দেখা করব, তার পর চরকার কথা বলে’ তাকে রাজি করে’ একটা চরকা গাড়ী থেকে আনিয়ে নেবো।”

“যেমন অবলীলাক্রমে বলে’ গেলি, ব্যাপারটা ঠিক তেমন সহজ নয় মাধবী!”

মাধবী গাভীর্ধ্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “কিন্তু খুব শক্ত বলে’ও ত আমার মনে হচ্ছে না। একজন ভদ্র-লোকের বাড়ী গিয়ে একটি মেয়েকে একখানি চরকা দিয়ে আসা। সে মেয়েটি আবার নিজেই চরকা পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।”

কথাটা প্রথমে কৌতুক-পরিহাসের আকারেই উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ কথায় কথায় বাস্তব হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। মাধবীর কথাটা একেবারে উপেক্ষণীয় বলিয়া স্বরেশ্বরের আর মনে হইল না। এমন কি ইহা ভিন্ন উপায়ান্তরও আর নাই বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল। অপর পক্ষে মাধবী এই কৌতুকপ্রদ কার্য সম্পাদন করিবার উৎসাহ ও উদ্বেগ ভোগ করিবার জন্য ক্রমশঃ প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ব্যাপারটায় এমন একটু রঙ্গ ও সাহসিকতার কথা ছিল যে তাহার উত্তেজনা মাধবীকে প্রবলভাবে প্ররোচিত করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, যে বিচিত্র পদার্থটি তাহার দাদাকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত করিয়াছে তাহাকে দেখিয়া আসিবার একটা কৌতুহলও ছিল।

স্বরেশ্বর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “সহজভাবে যদি কাজটা করে’ আসতে পারিস তা হলে না হয় তাই কর। যাস্ ত হবে যাবি? আজই?”

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “এখনই। তুমি রাম-দীন কোচমানে’র একখানা গাড়ী আনিয়ে দাও, আর আমার সঙ্গে কানাই চলুক। আমি ততক্ষণ মা’র মতট নিয়ে আসি।”

“মা যদি স্মিত্রাদের বাড়ী তোর একলা যাওয়ায় আপত্তি করেন?”

“সে আমি যতটুকু বলা দরকার তা ব’লে মার মত করিয়ে নেবো।” বলিয়া মাধবী তারাসুন্দরীর উদ্দেশে প্রশ্ন করিল; এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “মা’র মত করিয়েছি। তুমি গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা কর।”

গাড়ী আসিলে মাধবী স্বরেশ্বরকে বলিল, “কোন চরকাটা স্মিত্রাকে দেবে, দাদা?”

যতগুলো চরকা গৃহে উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে স্বরেশ্বরের হাতের চরকাটাই সর্বোৎকৃষ্ট। স্বরেশ্বরের মনে মনে ইচ্ছা হইতেছিল সেই চরকাটাই স্মিত্রাকে পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু কোন দিক হইতে কেমন একটা সঙ্কোচ আসিতেছিল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছিল না; তাই মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে সে-ই মাধবীকে প্রশ্ন করিল, “তুই কি বলিস? কোনটা দেওয়া যায়?”

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, “আমি বলি তোমার নিজের হাতের চরকাটা দাও। তুমি নিজে নূতন একটা চরকা ঠিক করে’ নিতে পারবে, স্মিত্রা এই প্রথম চরকা অভ্যাস করবে, তার পক্ষে একটা ভাল চরকা দরকার।”

মাধবীর কথায় স্বরেশ্বরের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল; সে মুহূ স্মিতমুখে বলিল, “তোমার চরকাটাও ত মন্দ নয়, সেইটেই দে না কেন?”

মাধবী বলিল, “আমার চরকার চেয়ে তোমার চরকাটা অনেক ভাল। তা ছাড়া তোমার চরকাটা স্মিত্রার হাতে ভাল চলবে।” বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

মাধবীর পরিহাসে কপটক্রোধ-ভরে স্বরেশ্বর বলিল, “তোমার মাথা হবে! এ ত আর বিপিন-বোসের মোটর-কার নয় যে তুই চড়লেই বোঁ বোঁ করে’ চলবে।”

মাধবী ক্রষ্ট-স্মিত মুখে বলিল, “না দাদা! একটা ভাল কাজে যাচ্ছি এখন যা-তা কথা বলে’ যাত্রা নষ্ট কোরো না!”

“বিপিন-বোসের সে গুণও আছে না কি রে?”

“নেই?”

“তুই এত খবর নিলি কবে, মাধবী?”

“যাও! বেশী ফাজলামী কোরো না। আমার এখন নষ্ট করবার মত সময় নেই।” বলিয়া মাধবী পুরাতন ভৃত্য

কানাইকে ডাকিয়া স্বরেশ্বরের চরকা ও অপর একখানি চরকা গাড়ীর ভিতরে চড়াইয়া দিতে বলিল।

স্বরেশ্বর আর কোনো আপত্তি করিল না, চরকা দুটি লইয়া কানাই প্রশ্ন করিলে, শুধু বলিল, “আমার ভারি যত্নের চরকাটি বিলিয়ে দিচ্ছি, মাধবী।”

“তার জন্তে তুমি একটুও দুঃখিত নও!”

“গুণতেও জানিস না কি রে?”

“জানি!” বলিয়া মাধবী একটি ছোট ডালায় তুলার পাঁজ ভরিয়া লইতে বসিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, “এগুলি বৌ-দিদিকে উপহার দিবে আস্ব।”

একথায় স্বরেশ্বরের হাস্য-প্রফুল্ল মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, “না, না, মাধবী! ঠাট্টাটাও সীমার মধ্যেই রাখিস! স্মিত্রা একজন ভদ্র-লোকের মেয়ে; তার ওপর আমাদের যখন কোনো সম্পর্কের দাবী নেই, তখন তাকে নিয়ে যথেষ্টা ঠাট্টা করবার আমাদের কোনো অধিকার নেই!”

এ তিরস্কারে মাধবীর প্রসন্ন মুখে কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটিল না। সে তেমনি হাসিমুখে বলিল, “জানি আমি স্মিত্রা ভদ্রলোকের মেয়ে, আর জানি আমি তাকে বউদিদি করে’ নিতে পারব, তাই তাকে বউদিদি বলছি।”

গম্ভীর বিষ্ময়ে স্বরেশ্বর বলিল, “তুই করে’ নিতে পারবি?”

সহাস্তমুখে লঘু-ভাবে মাধবী কহিল, “হ্যাঁ, আমিই করে’ নিতে পারব।”

“কি করে’?”

“যেমন করে’ পারি। সে যখন করবে তখন দেখো। এখন বাড়ীটা কানাইকে ভাল করে’ বুঝিয়ে দেবে চল।”

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া চিন্তিত-মুখে স্বরেশ্বর কহিল, “দেখিস মাধবী, সেখানে গিয়ে যা-তা’ কথা বলে যেন হাল্কা হয়ে আসিস নে!”

মাধবী হাসিয়া বলিল, “না গো না, সে ভাবনা তোমার নেই। খুব ভাল ভাল কথা বলে’ ভারী হয়ে-ই আস্ব। এখন চল, দেবী হয়ে যাচ্ছে।”

কানাইকে সর্ববিষয়ে উপদেশ দেওয়ার পর মাধবীকে

গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া স্বরেশ্বর আর দ্বিতলে না গিয়া বৈঠক-খানার ঘরে গিয়া বসিয়া একটা ইংরেজী সংবাদপত্রের জন্ত লিখিত কোনো প্রবন্ধের প্রফ দেখিতে বসিল। মনটা একটু বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দুই চারি ছত্র প্রফ দেখিতে দেখিতেই তন্মধ্যে মনোযোগ বসিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে বাহিরে দ্বারের সম্মুখে কে ডাকিল, “স্বরেশ্বর আছ?”

কণ্ঠস্বর বিমানবিহারীর মত মনে হইল; কিন্তু সে স্বরেশ্বর বলিয়া ডাকে না, স্বরেশ্বর-বাবু বলিয়া ডাকে; তাই “আছি” বলিয়া সাড়া দিয়া স্বরেশ্বর সকৌতূহলে দ্বার খুলিয়া দেখিল বিমানবিহারীই দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

স্বরেশ্বর বিমানবিহারীর বন্ধুদের সম্বোধনকে স্বীকার করিয়া লইয়া প্রফুল্লমুখে আগ্রহসহকারে বলিল, “এস, এস, ভিতরে এস।”

ভিতরে আসিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে স্বরেশ্বর বলিল, “তার পর? কি খবর?”

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, “খবর আর কি? স্মিত্রার ছকুম তামিল করিতে এসেছি।”

স্বরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, “হাকিমের ছকুম তামিল করে না কি?”

বিমানবিহারী বলিল, “হাকিমের সব রকম কুকার্য্য করে।”

“উপস্থিত কি কুকার্য্য করিতে এসেছ শুনি?”

বিমান বলিল, “তুমি স্মিত্রাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে

এসেছ; এখন তার সঙ্গে তোমার কাছ থেকে একটি চরকা কাঁধে করে’ নিয়ে যেতে হবে।”

স্বরেশ্বর মনে মনে একটু চমকিত হইয়া উঠিল ক্ষণকাল চূপ করিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে বলিল, “কাঁধে করে’ রাজপথ দিয়ে ডেপুটি চরকা নিয়ে গেলে ডেপুটি গিরি টিকবে?”

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুমি আ স্মিত্রা, দুজনে যে রকম পিছনে লেগেছ ডেপুটি-গিরি টেকে কি না সন্দেহ!”

স্বরেশ্বর বলিল, “তা হলে আমাদের দুজনকেও বর্জন কর না, ডেপুটি-গিরিই থাক।”

“তোমাদের দুজনের একজনকেও বর্জন কর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কথাটা আজকে গোলা-খুলিভাবে সাদা কথায় তোমাকে বুঝিয়ে যাব। তার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “এই শীতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল!”

বিমানবিহারী মাথা চুলকাইয়া বলিল, “বিপদে পড়লে মাহুযে এর চেয়েও গুরুতর কাজ করে! তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন জল ছেড়ে ঘোল না খেতে হয়!”

স্বরেশ্বর হাসিতে হাসিতে জল আনিতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চীন-সম্রাটের কর-ভারে প্রজারা অতিষ্ঠ হ’য়ে উঠেছিল। কিন্তু সাহস করে’ সম্রাটের সামনে কেউ কিছু বলতে পারছিল না। অবশেষে একজন সভাসদ এমন ভাবে কথাটি সম্রাটের কাছে বলল যাতে তাকেও সম্রাটের বিরাগভাজন হতে হ’ল না অথচ দেশেরও চের মঙ্গল হল। উক্ত সভাসদটি একদিন সম্রাটের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একখানা ভারি কাল মেঘের উপর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সম্রাট দেখে বললেন—‘এখনই ফিরে যাওয়া দরকার, নহত ভিজতে হবে।’ সভাসদ আশ্চর্য্য

হয়ে বলল—‘সেকি! ও মেঘ সহরে ঢুকতেও সাহস পাবে না—কিছু ভয় নেই।’ সম্রাট কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; সভাসদ উত্তর দিল—‘যদি গোস্বামী করে’ চীন-রাজধানীতে ঢোকে তবে ওঁর কাছ থেকে দস্তরমতন খাজনা আদায় করে’ নেওয়া হবে।’

কথাটা সম্রাট বুঝলেন;—তার পরেই অহুস্কান করে’ সমস্ত জানলেন। ফলে প্রজার করভার অর্ধেক কমে’ গেল।

শ্রী বীরেশ্বর বাগ্‌ছী



একুশ-মাথাওয়ালা খেজুরগাছ—

২৪ পরগণার অন্তর্গত বাহুড়িয়া থানার নিকট আরশুলা গ্রামে এই গাছটি এখনও বর্তমান আছে। গাছটিকে প্রথম ছয় বৎসর “কাটিয়া” রস লওয়া হইয়াছিল, তাহার দাগ ছবিতোও বেশ প্রত্যক্ষ। সপ্তম বৎসরে গাছ কাটিবার সময়ে শিউলি দেখিতে পায় যে গাছের মাথাব কাছে ছোট ছোট অঙ্গুর বাহির হইয়াছে। দেখা সন্দেহে সে রীতিমত গাছ কাটে। বাড়ীতে আসিয়া তাহার অবস্থা হয় ও তাহার পন দিবসে তাহার

তাহা হয়ও। সমুদ্রে উপরের দিকে নানা-প্রকার জলীয় লতাপাতা ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু যত নীচে নামা যায়, ততই গাছপালা কমিতে থাকে এবং অবশেষে একেবারে লোপ পাইয়া যায়। কতকগুলি ছবি দেওয়া হইল—এই ছবিগুলি হেলিগোল্যান্ডের জীবতত্ত্বানুসন্ধানের পবিত্রাগারের বৈজ্ঞানিকেরা বহু পৰিশ্রম এবং কষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্তগুলিকে অগভীর জলে আনিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এবং জলোব মধ্যে ফোটা তোলাও বিশেষ সহজে হয় নাই।



একুশ-মাথাওয়ালা খেজুরগাছ

মৃত্যু হয়। তদবধি, গাছটিতে কোন অজানা দেবতাব আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, লোকে গাছটি আর কাটে না। ফড়কী গাছগুলি যথেষ্ট মোটা, ইচ্ছা করিলে সেগুলি কাটিয়া রস বাহির করা যায়।

প্রবোধচন্দ্র সাউ



সাগাবিত্তা (Widowed Sea-Anemone) - দলছাড়া হইয়া একলা বাস কবে বলিয়া এই নাম। গাছের মত দেখিতে কিন্তু মাথায় চুলের বু টিতে ছোট ছোট প্রাণী পড়িলে তাহার মরণ হয়—চুলগুলিতে বিষ আছে

মোটর-জগতের কথা—

মোটবে রান্না

মোটর-কারের সামনে মোটর-ইঞ্জিন থাকে। এইখানেই মোটরের সব কলকজা এবং এই স্থানটি ধাতব ঢাকনিব দ্বারা ঢাকা থাকে। জেমস্ ই জেড্ ফাউল নামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়স্ (Preuss) নামক স্থানের এক ব্যক্তি একটি অভিনব উনান তৈয়ার করিয়াছেন। এই উনানটি গর শরৎকালে একটি ঘোঁসনা সারকর ব্যবহার

সমুদ্রে-জগতের কথা—

সমুদ্রের তলায় নানা-প্রকার জন্ত বাস করে। এই-সব সমুদ্রতল-বাসীদের দেখিলে গাছপালা বলিয়া ভয় হইবার কথা এবং অনেকের



সমুদ্রতলবাসী ছ-একটি প্রাণীর নমুনা।
দেখিতে ফুলের মতন—রংএর বৈচিত্র্যও তেমনি।
বা দিকে একজন আবার গল্‌দা-চিংড়ি গাড়ীতে
চড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের ইংরেজি নাম
Sea-Anemone



কম্পাস স্ফেলিক্স। দেখিতে বিট বা বিলাতি মূলার মত—

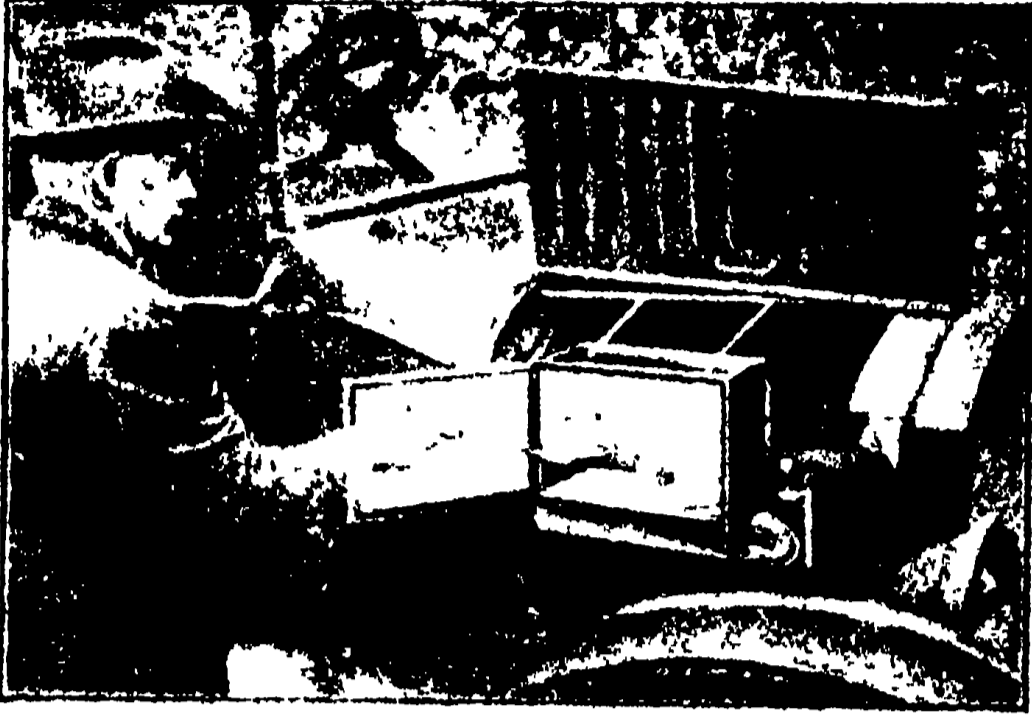


সি-কিউকাম্বার বা সমুদ্রের শশা। ইহারা তারা মাছের খুড়তত ভাই, সে কাছেই
রহিয়াছে, বহুদিনের পর দেখা বলিয়া বাক্যলাপ করিতেছে

ইঞ্জিনের ভিতর ফিট করা থাকে। কফি, ষ্টু, ডিম-সিদ্ধ ইত্যাদি গাণি
চলিতে চলিতে তৈয়ার করা যাইতে পারে। উনানের জন্ত যে তা
প্রয়োজন তাহা মোটর-ইঞ্জিন হইতেই পাওয়া যায়।

মোটরে করিয়া যাঁহারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে

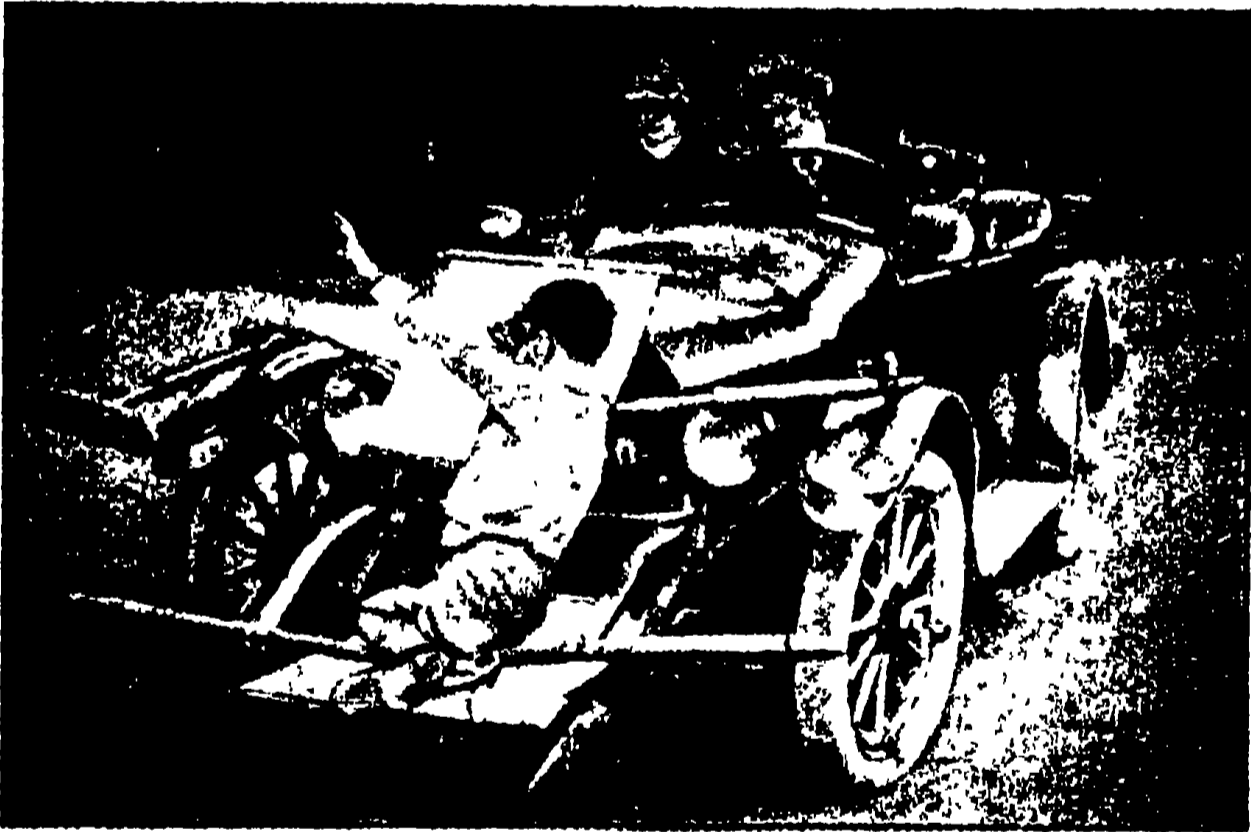
উঠে নাই; কিছু দিন অপেক্ষা করিলে এই উনান পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।



মোটরের রান্নার উনান

নূতন-ধরণের মোটর গাড়ী

আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক মোটর-কাব, রেলগাড়ী ইত্যাদির সামনে পড়িয়া অকালে এবং অসময়ে প্রাণ হারায় বা এমনভাবে আহত হয় যাহাতে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা নাকি অতি প্রচুব, সেই-জন্মেই হয়ত আমাদের দেশের প্রাণের বাজারদর সস্তা। যে, মানুষ চাপা দেয়, তার হয়ত ১৩ জরিমানা হয় এবং যে চাপা পড়ে সে হয় মরিয়া যায়, নয় ৫ শরীর-মেরামতি খব্চা পায়। এ দেশের কর্তাদের কিন্তু এই-সমস্ত দুর্ঘটনা বন্ধ করিবার কোনো চেষ্টা নাই।



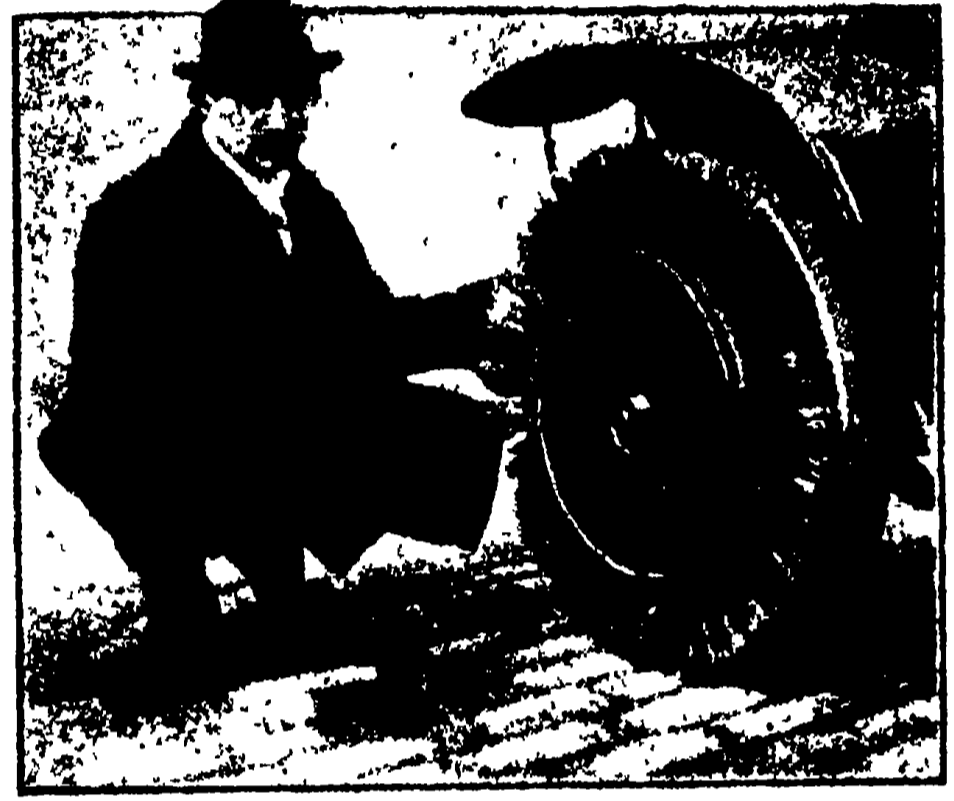
সামনে-পড়া-লোক-বাঁচান কল। লোকটি অসহায় অবস্থায় নিরাপদ স্থানে পড়িয়া গেল এবং মরে নাই দেখিয়া হয়ত অবাক হইয়া গেল

মোটরওয়ালারাও এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করে না। কারণ দক্ষকার নাই। যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা কিন্তু বসিয়া নাই। তাহারা নিত্যই নব নব আবিষ্কার করিয়া তাহাদের জীবনের সুখ শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার চেষ্টায় রত আছে। মোটর-দুর্ঘটনা অতিরিক্ত হওয়াতে তাহারা মোটরের সামনে একপ্রকার কল বসাইয়াছে। মোটরের সামনে এই কলের সঙ্গে কোনো লোকের ধাক্কা লাগিবা মাত্র কল হইতে দুইটি হাতল সড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং সামনে স্থিত ব্যক্তিকে মোটরের সহিত যুক্ত দুইটি ক্যাশিশ

ষ্ট্রেচারের উপর টানিয়া লয়—ইহার দ্বারা এই হয় যে সামনেস্থিত ব্যক্তির মোটরের কোনো শক্ত অংশের সহিত সংঘর্ষণ হয় না—কাঞ্জেই সে আহত হয় না। কলের হাতল এবং ষ্ট্রেচারও এমনভাবে স্থিত যে মোটরের সামনে যেরকমভাবেই লোক গিয়া পড়ুক না কেন, সে রক্ষা পাইবেই, তাহার মরিবার কোনো আশঙ্কাই নাই।

কাদা-আটকান চাকা

মোটর-কারের চাকাটি দেখুন। এই চাকা যখন রাস্তার জল-কাদার উপর দিয়া চলিবে তখন আপনাব বা আপনাব মাস্তুতো ভাইএর গায়ের রঙীন পাঞ্জাবী এবং লালপেড়ে কাপড়ের উপর কাপা ছিটাইয়া যাইবে না। প্যারিসে এক ভদ্রলোক চাকার গায়ে বুরুশ লাগাইয়া এইটি তৈয়ার করিয়াছেন।



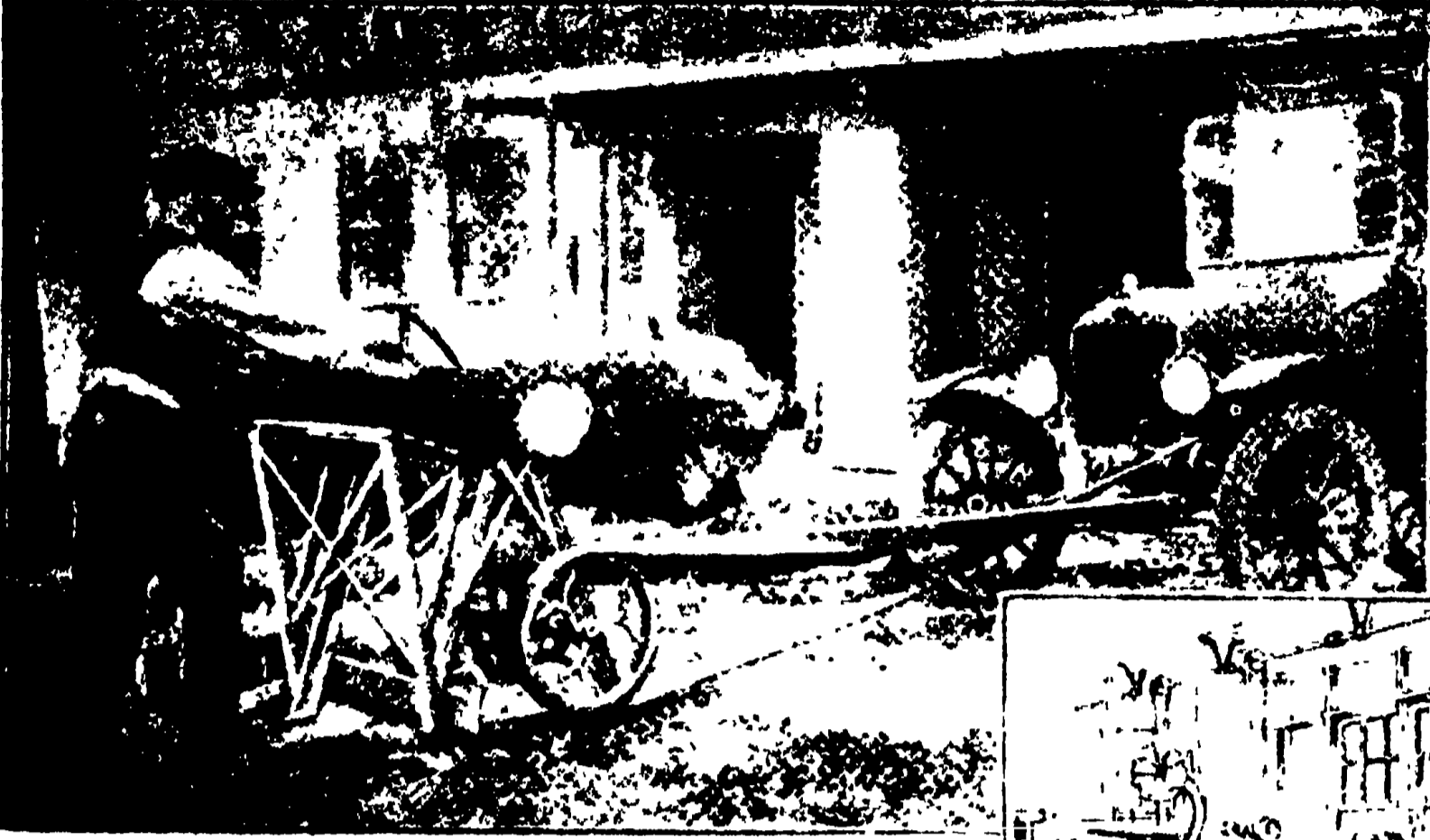
মোটরের কাদা-আটকানো চাকা

কারখানার কাজে ফোর্ড-গাড়ী

মোটরের ষ্টার্টিং-ক্যাঙ্কব কাছে একটি চামড়ার পোটি লাগাইয়া কেমন করিয়া মোটর-কারকে ধরেব কাজে লাগানো যাইতে পারে ছবিতে তাই দেখানো হইতেছে। মোটরকে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা মোটর-ইঞ্জিনের গঠন এবং কেমন করিয়া চলে ইত্যাদি সব জানেন তাহারা ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। এইবকম একটি ফোর্ড-ইঞ্জিনের দ্বারা ছোট একটি কারখানার কাজ চালানো যাইতে পারে, আবার বিকাল-বেলায় কারখানার পোশাক ছাড়িয়া মোটর চড়িয়া হাওয়া পাওয়াও চলিতে পারে।

কাচের ফুল—

শিকাগোর জীবতত্ত্বের মিউজিয়ামে কাচের দ্বারা নানা-প্রকার ফুল তৈয়াবী হয়, যাহা দেখিলে প্রকৃতির তৈরী ফুলের অপেক্ষা বেশী সুন্দর বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকটি ফুলকে এত কষ্ট এবং পরিশ্রম এবং দক্ষতা স্বীকার করিয়া করিতে হয় যে তাহাকে আসলের সহিত মিলাইয়া দেখিলে কোনো প্রকারে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইবে না। আসল এবং নকল একেবারে ছবছ একই প্রকার। ফুলের ডাঁটা, পাপড়ি, রেণু, রং ইত্যাদি সবই সত্যিকার রূপে ফুটিয়া উঠে, দেখিলে একেবারে সজীব বলিয়া মনে হয়। এই-সমস্ত ফুল দেখিয়া সত্যিকার ফুলের সম্বন্ধে নানা-প্রকার শিক্ষালাভ করা যায়। কোনো কোনো ফুলের পরাগ, রেশমী হতা অপেক্ষাও



ফোর্ড মোটরের সাহায্যে কেমন ভাবে কাণ্ডানার কাজ চলে দেখুন। বাঁ দিকে কাত কল, ডান দিকে ছোট কারখানা চলিতেছে



তাহাদের চোখে দেখাও যায় না, এই-সমস্ত পুষ্প-বৃক্ষকে অণুবীক্ষণের তলায় রাখিয়া তাহার নকল তৈরী করা হয়। ফুলের রংও নকল ফুলে স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে একটি কামান-গোলা (Cannon-ball) নামক বৃক্ষ শিকাগোতে চালান দেওয়া হয়। চালানোর পূর্বে, প্রথমে বৃক্ষটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং গঠন প্রণালী খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করা হয়, তাহার পর ঐ বৃক্ষের ফোটো লওয়া হয়। তাহার পর

বৃক্ষের মাথার উপরের সমস্ত পাতা ছাটিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত ডাল পালানোর দিয়া কাটিয়া বিভিন্ন বাগ্জে প্যাক করা হয়। এবং ফল, ফুল এবং কিছু পাতা অবিকৃত



শিল্পী যজ্ঞ সাহায্যে নকল ফল ফুল তৈরী করিতেছে



আসল পাতা এবং ফুল দেখিয়া শিল্পী নকল পাতা-ফুল তৈরী করিতেছে

স্বপ্ন—তাহা নির্মাণ করিতে শিল্পীর অসীম কুশলতার প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ফুল এবং তাহার গাছ এত ছোট হয় যে সব সময়

রাখিবার জন্য আরকে ডুবাইয়া রাখা হয়। যে-সমস্ত অংশ সহজে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, তাহাদের প্লাস্টিকের ছাঁচ তৈরী করা হয়, এবং সেই সঙ্গে ছাঁচের উপর সত্যকার বৃক্ষের অনুরূপ রংও দেওয়া হয়। এই-সমস্ত হইয়া গেলে পর খণ্ড খণ্ড অবস্থায় গাছটিকে চালান দেওয়া হয়। শিল্পীর সমস্ত অংশ-গুলিকে সামনে রাখিয়া আর-একটি সম্পূর্ণ নকল বৃক্ষ নির্মাণ করে, তাহা দেখিলে কেহ নকল বলিয়া বুঝিতে পারে না। বড় বৃক্ষ তৈরী করিতে হইলে গাছের গুঁড়ি রোদ-জল খাওয়ান সিজন্ড্ কাঠ গুদিয়া করিতে হয়। তাহার পর ইম্পাণ্টের ছাপে চাপিয়া, সবুজ রবারের মত একপ্রকার পদার্থ হইতে গাছের পাতা তৈরী করিতে হয়।

এই-সমস্ত ফল ফুল এবং গাছ-পালা এমন স্থানে রক্ষা করা হয়, যাহাতে দেখিবামাত্রই মনে হয় যে ইহারা স্বাভাবিকভাবেই সেই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা যে মানুষের সৃষ্টি, এ কথা কেহ কল্পনা করিবার অবসর পায় না।

এই-সমস্ত তৈরী করিতে হইলে শিল্পীকে অনেক সময় খুব ভাল করিয়া উদ্ভিদতত্ত্ব পাঠ করিতে হয়। তাহা না হইলে সময় সময় কাজ অচল হইয়া যায়। অনেক সময় শিল্পীকে দূর দেশে গিয়া কোনো বিশেষ বৃক্ষ সম্বন্ধে সকল তথ্য বেশ করিয়া দেখিয়া এবং শিখিয়া আসিতে হয়। এই-সমস্ত না দেখা থাকিলে নকল বৃক্ষকে সত্যকার বৃক্ষের ছবছ করিয়া তৈরী করা সম্ভব হয় না।

ফল-ফুলের বৃক্ষে * পাখী মৌমাছি বা অন্ত কোনপ্রকার কীট পতঙ্গ নাই, এ কথা ভাবিতেও কেমন লাগে। সেইজন্য বৃক্ষবৃঞ্জ তৈরী করিয়া তাহার ফুলে নকল কীট পতঙ্গ মৌমাছি ইত্যাদি বসাইতে হয়। অনেক গাছে পাখী এবং পাখীর বাসাও বসাইতে হয়। এই-সমস্ত হইয়া গেলে পর কুঞ্জের কাছে গিয়া দাঁড়াইলে মনে হয় প্রকৃতির তৈরী কোনো স্থানের স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। নানা-রকম জন্তুও এইরকমভাবে তৈরী করিয়া বৃঞ্জ-মধ্যে রক্ষা করা হয়।

আসলের সহিত নকলের একমাত্র তফাৎ—নকল ফুলের গন্ধ নাই, নকল ফুলের রস নাই, নকল মৌমাছি গুন্গুন্ করে না এবং ছল ফুটায় না। নকল পাখী গান করে না। এই-সব নকল জিনিসে প্রাণ ছাড়া সবই পাওয়া যায়।



ক্যানন-বল গাছটির একটি একটি ডাল কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া এবং নম্বর দিয়া চালান দেওয়া হয়—শিল্পীর হাতে সে আবার সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে



একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষ—দেখিলে নকল বলিয়া ধরিলার কাহারো সাধা নাই—রংএ এবং চঙে একেবারে আসলের যমজ ভাই



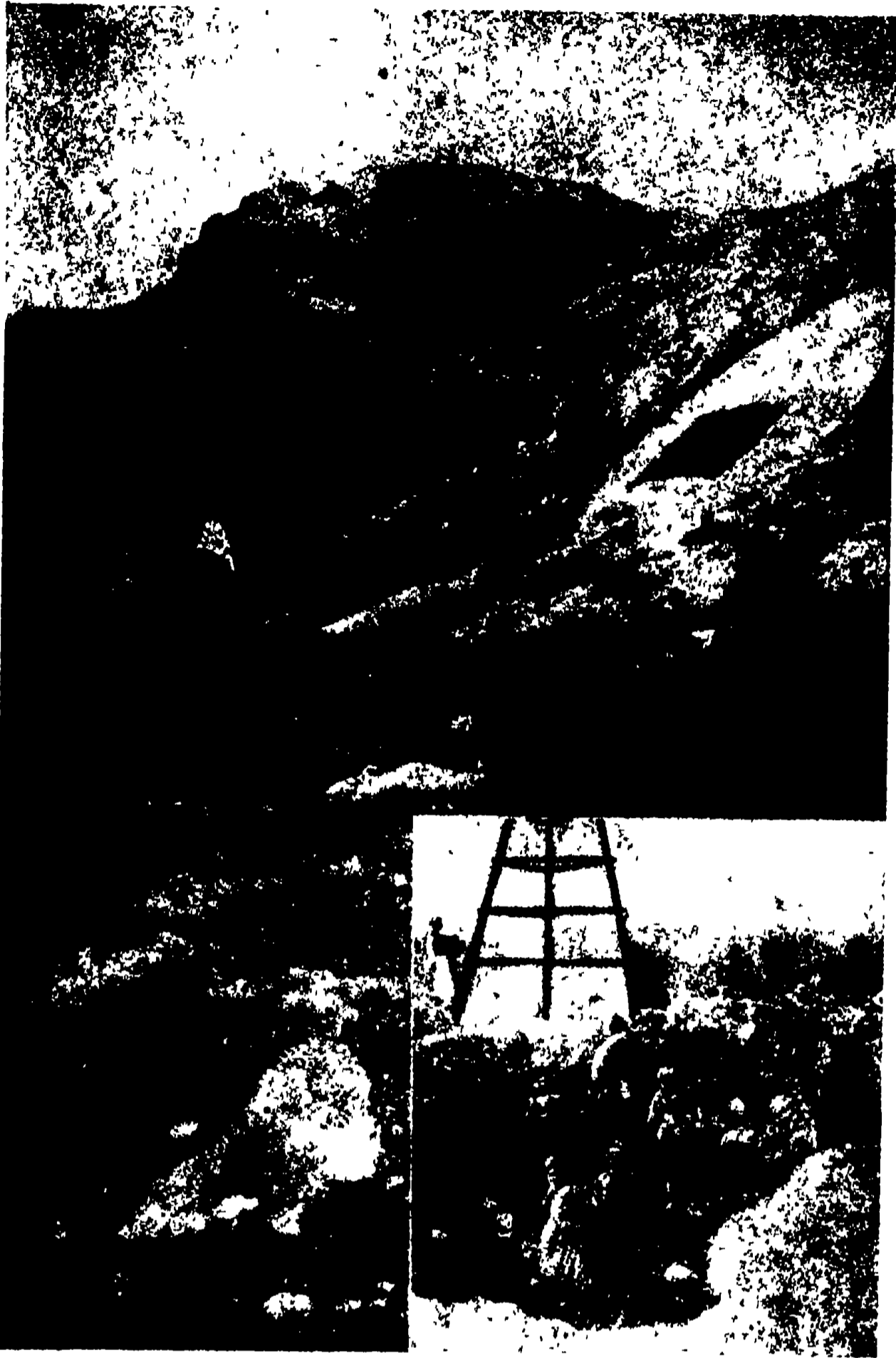
আসল গাছের অবিকল নকল—ইহার কেবল একটি অভাব, সে রস-গন্ধহীন

প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার—

মাটির তলায় হাজার হাজার বছর পূর্বকার সভ্যতার কত চিহ্ন বর্তমান আছে তাহার সংখ্যা নাই। মানুষ যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার সংখ্যা অতি সামান্য—এখনও যে কত প্রাচীন সহর ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় লোকচক্ষুর অস্তুরালে রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই-সমস্ত সহর ইত্যাদি বর্তমান কালের ইতিহাস আরম্ভ হইবার বহু পূর্বের—তাহাদের বয়স নির্ণয় করা সকল সময় সহজ হয় না। এখন অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ এই-সমস্ত আবিষ্কারের কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাহাদের এক-একটি আবিষ্কারে মানুষ বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়।

দুই হাজার বছরের পূর্বে লঙ্কাদীপে অগুরাধাপুর নামে এক বিশাল সহর ছিল। এই সহরটি ধ্বংস হইয়া মাটি-চাপা পড়ে। সম্প্রতি একদল বৈজ্ঞানিক এই সহরটি আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইজিপ্টের আলেকজেন্দ্রিয়াতে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সমুদ্রের তলে নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, জলের নীচে বহুকাল



এই সমস্ত টিপির তলে বহুগুণের পূর্বের সহর এবং সভ্যতার চিহ্ন ঢাকা আছে—ডান দিকে নীচে একদল লোক এই সমস্ত আবিষ্কারে খনন কায়া করিতেছে

পূর্বের নিশ্চিত একটি বন্দন আছে। প্রাচীন ফারাওগণ নাকি এই বন্দন নির্মাণ করিয়াছিলেন। এটিতে যে সমস্ত খননকার্য হইতেছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকদের মতে আরো অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার হইবে।

কিছুকাল উত্তর ইজিপ্টের উর নামক স্থানে একটি মন্দির মাটির তলায় পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটি নাকি মাটির নীচে আবিষ্কৃত সকল মন্দির ইত্যাদি অপেক্ষা পুরাতন। এই সহর হইতেই বাইবেলে বর্ণিত আব্রাহাম নামক এক অতি সভ্য লোকের আগমন হয়।

আমেরিকার মানুষের অগম্য গভীর বন-প্রদেশে, প্যাটাগোনিয়ার জলাভূমিতে, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি ইত্যাদি অনেক স্থানেই হাজার হাজার বছর পূর্বের সভ্যতার অনেক কিছুই মাটির তলায় পাওয়া যাইতেছে।

মেক্সিকো-উপত্যকায় যে-সকল প্রত্নতত্ত্ববিদের দল এইসব কাজ করিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, এইখানে পর পর পাঁচটি সভ্যতার উত্থান এবং পতন হয়। সর্বাপেক্ষা পুরাতন সভ্যতার চিহ্নরূপ যে-সব ঘর বাড়ী মন্দির ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহা মাটির উপর হইতে ৪০ ফুট নীচে। এই স্থানের আরো দক্ষিণে আর-একটি সভ্যতার উত্থান হয়। ৩০০ হইতে ৬০০ শতাব্দীর মধ্যে এই সভ্যতার পতনের



ইজিপ্টে হাজার হাজার বছর পূর্বের সভ্যতার প্রমাণ আবিষ্কার —উপরে সীমাহীন মরুভূমি

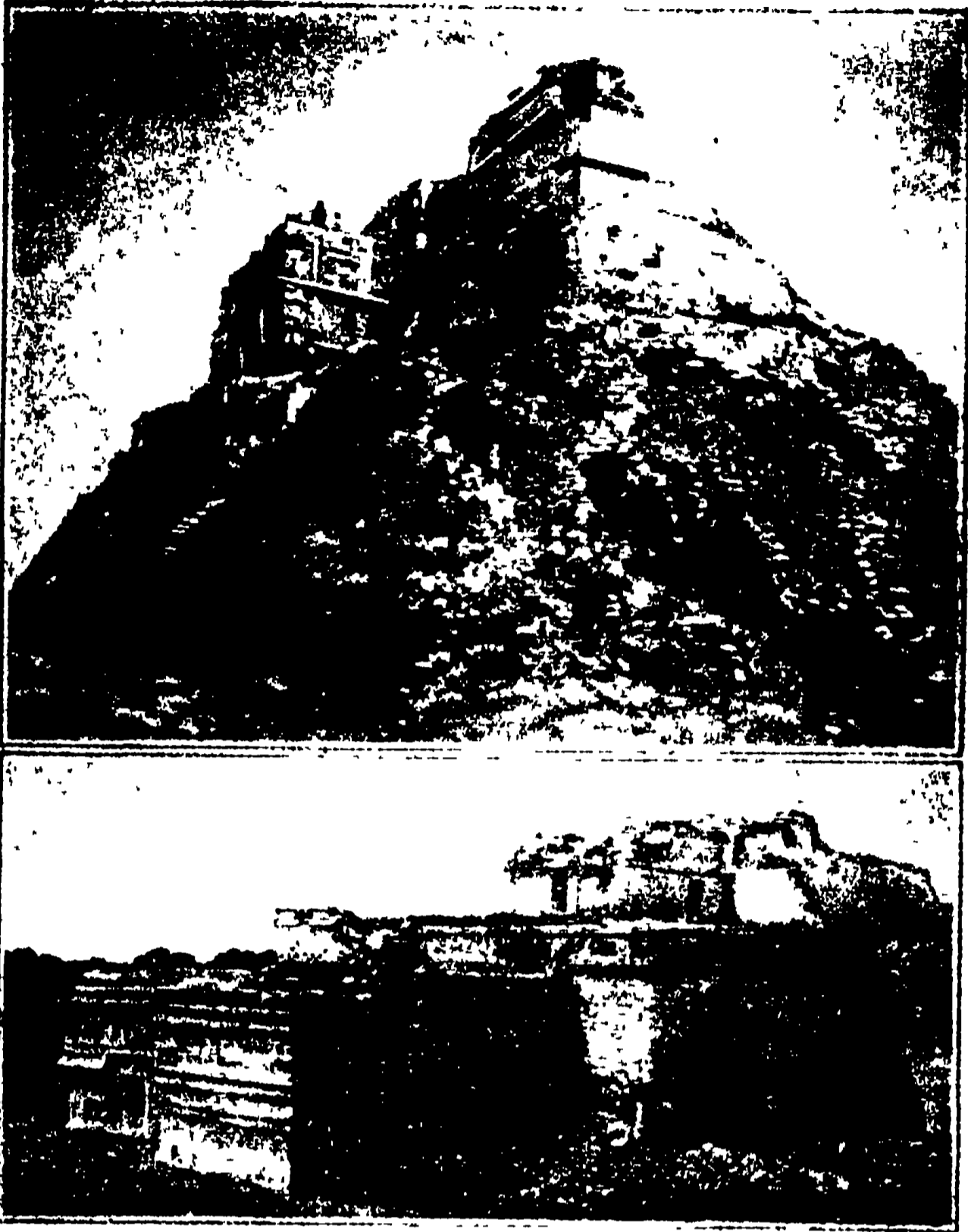
সঙ্গে, ইহাদের পূর্বের হাজার হাজার বছরের যে কত কিছু লোপ পাইয়াছে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে, বড় উচ্চ স্তূপের তলায় এবং মানুষের অগম্য অজ্ঞান স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের আবিষ্কারের যে কত কি আছে তাহা বলা যায় না। এক-এক স্থানে এমন সমস্ত রঙীন চিত্র পাওয়া গিয়াছে যাহা বর্তমান শিল্পীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকেও হার মানায়। মণি-মাণিক্য-খচিত এমন অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার মূল্য এক রাজার সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিলেও পাওয়া যায় না।

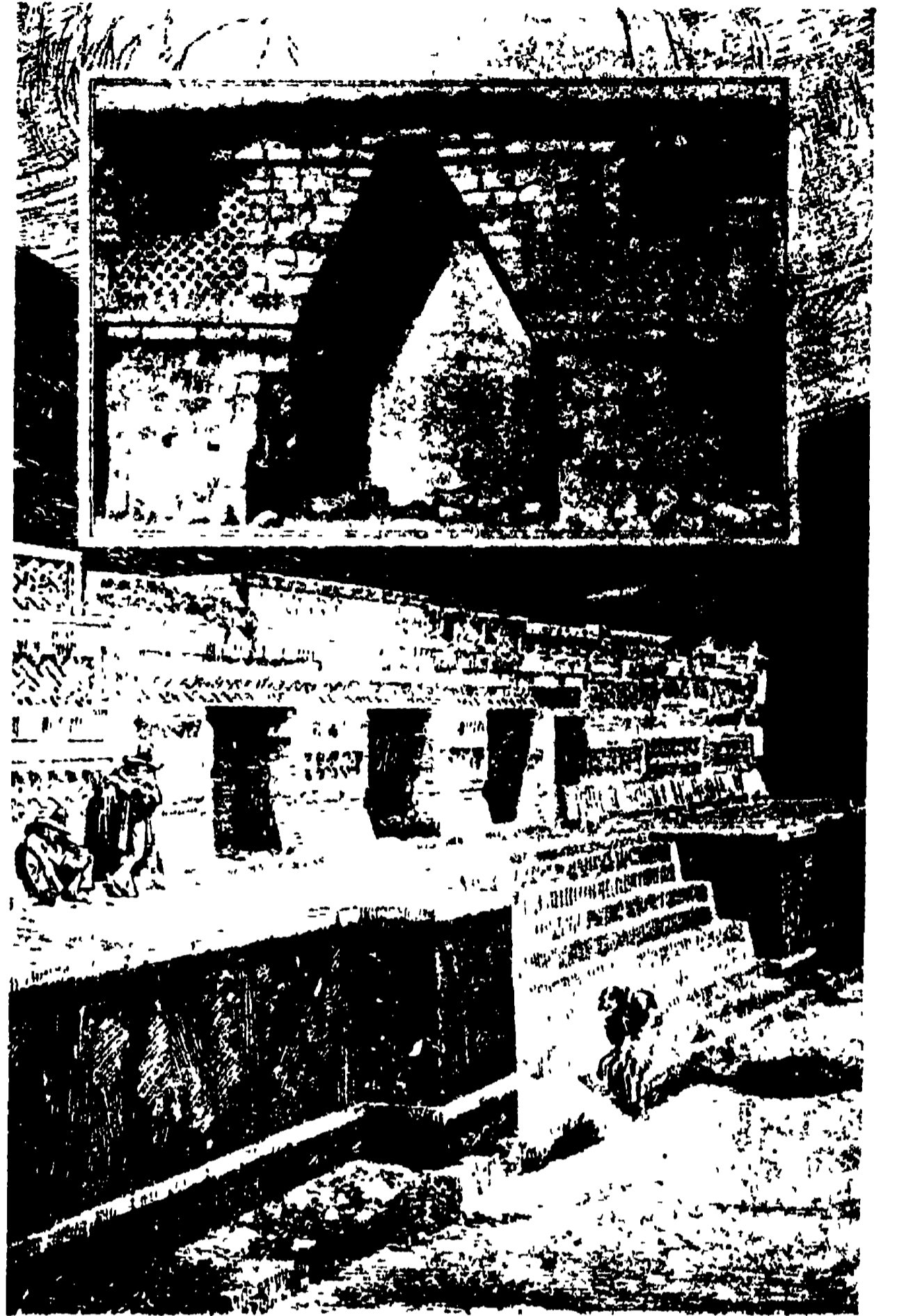
কে জানে, আমাদের এই সভ্যতাও হয়ত একদিন বহু যুগ পরে সভ্যতার-পলির বহুস্তর নিয়ে পড়িয়া থাকিবে, এবং তখনকার দিনের অতি-অতি সভ্য লোকেরা মাটির নীচে খনন করিয়া আমাদের ট্রাম লাইন, এয়ারোপ্লেন, জাহাজ, কামান, ঘর বাড়ী ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া হয়ত বিশ্বয়ে অবাক হইবে এই মনে করিয়া, যে, ৩০ বিংশ শতাব্দীর লোকেরাও ত বেশ সভ্য ছিল, কারণ আমাদের সময়কার খেলনার কিছু কিছু তাহাদেরও জানা ছিল।

বৃক্ষবাসীদের কথা—

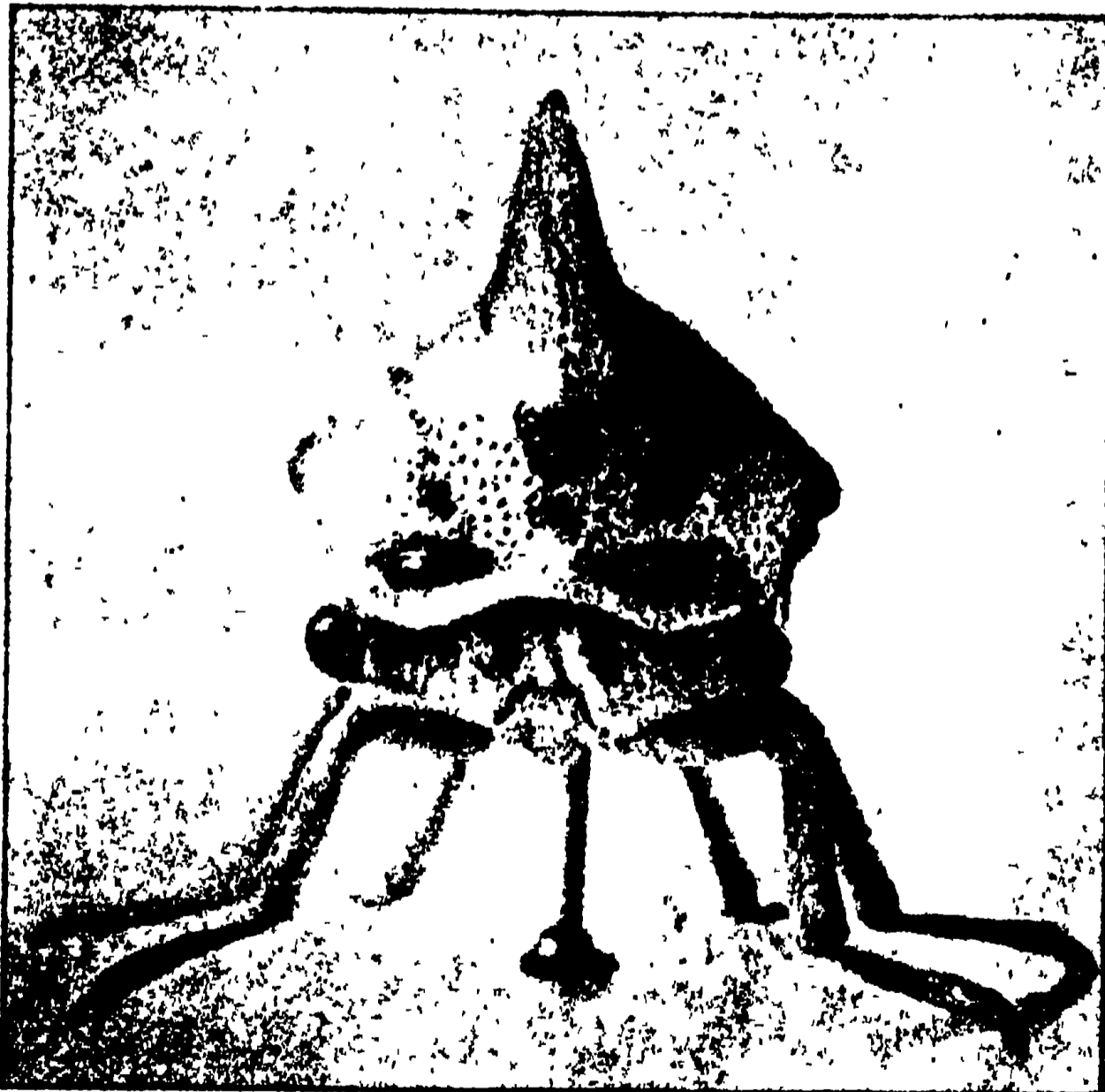
পৃথিবীতে কত রকম পোকা-মাকড়, এবং তাহাদের রূপ যে কত অপকণ তাহা বলা যায় না। বতকগুলি পোকা অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের



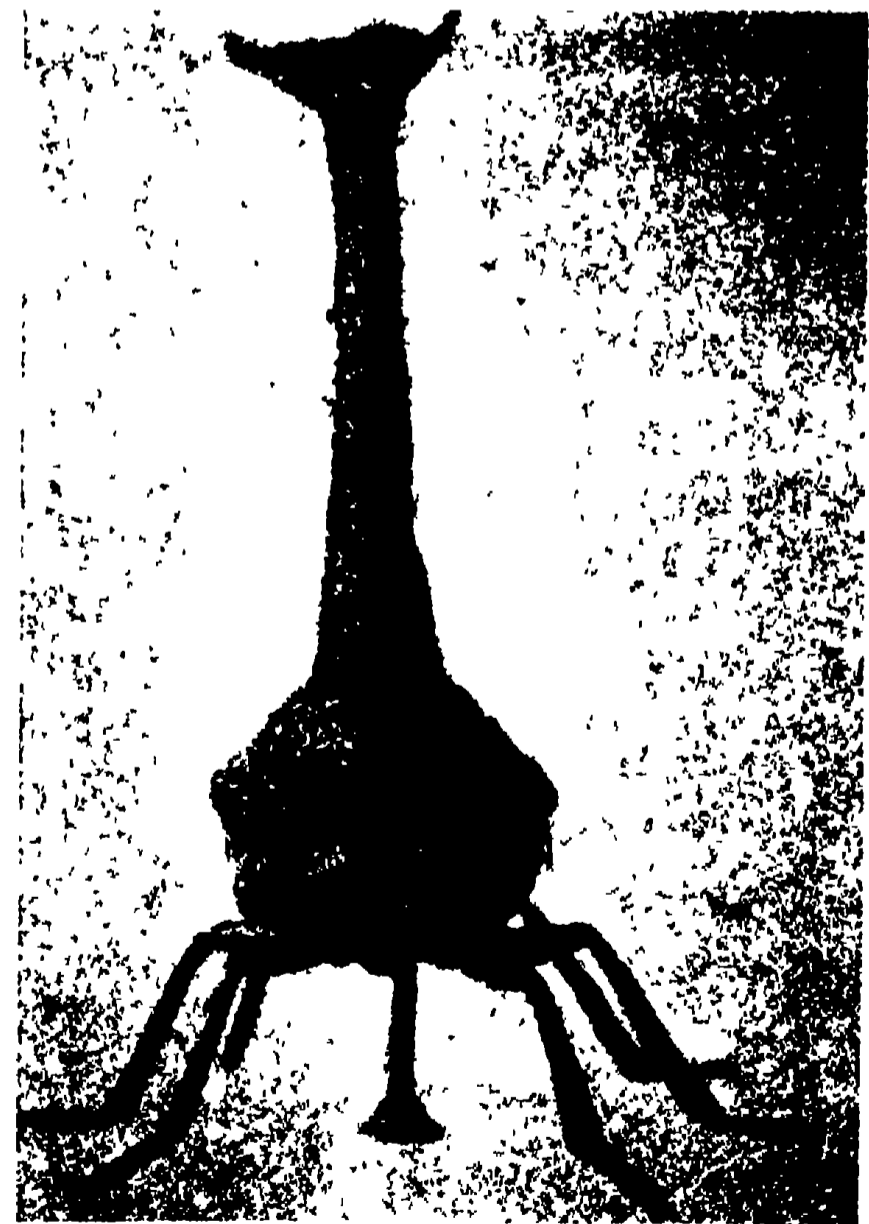
মাটির এবং বালির স্তূপ খনন করিয়া আবিষ্কৃত দুর্গ এবং মন্দিরাদি



মেক্সিকোতে মাটির নীচে প্রাপ্ত প্রাচীর এবং তোপগদার, এই-সব হাজার হাজার বছর পূর্বে নির্মিত হয়



চশমাধারী ফড়িংবাবু—ইনি দক্ষিণ ব্রেজিলের





অদ্ভুত ফড়িং—চিত্রকরের গেয়াল-খুমির চিত্র অঙ্কনকেও পরাজিত
করিয়াছে। ইনি ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়া বেড়ান

অদ্ভুত ফড়িং—ইনিও ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়া বেড়ান

বিশেষভাবে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণের প্রয়োজন। কয়েক
প্রকার গাছ-ফড়িং আছে তাহাদের দেখিতে অপেক্ষ। এইরকম
কয়েকটি ফড়িংএর মডেল নির্মাণ করা হইয়াছে। মডেলগুলি মোমের
এবং সেগুলি নিউ-ইয়র্কের এক যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই মোমের
ফড়িংগুলি দেখিবার জিনিস, কারণ এত বড় করিয়া এ-পথ্যস্ত কেহ
ইহাদের মডেল নির্মাণ করেন নাই। এই মডেল দেখিয়া ইহাদের
দেহের অতি অদ্ভুত এবং বিচিত্র গঠনের এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয়
পাওয়া যায়। এই মডেলগুলি কীট-জগতের অনেক নূতন খবর দিবে।

ফড়িংরা গাছেব এবং পাতার রস খাইয়া দিন যাপন করে। তাহাদের
একপ্রকার সরু লম্বা ঠোঁট আছে। এই ঠোঁটে কতকগুলি কুঁচি আছে।
গরমদেশের ফড়িংদের এই কুঁচিগুলি বহু বর্ণের হয়। ইহাদের চারিটি
চোখ, দুটি বড় বড় এবং নীচে দুটি ছোট। ফড়িংদের চাটনি ক্লান্ত এবং
অবসন্ন। অনেক ফড়িংএর চোখেব এবং মাথার নীচে একটি দাগ থাকে,
তাহাতে ফড়িংবাবুকে চশমা-পরা বলিয়া মনে হয়। ইহাদের ডানাও
চারিটি, দুটি বাহিরের দিকে এবং দুটি ভিতরের দিকে। বাহিরের
ডানা দুটি ছোট এবং স্বচ্ছ, অল্প দুটি পাটমেটেব মত। পিছনের পা
দুটি সামনের পা অপেক্ষা লম্বা এবং এই পায়ের সাহায্যেই ফড়িং তাহার
শরীরের তুলনায় খুব উঁচুতে লাফাইতে পারে।

এই-সব ফড়িংদের বক্ষস্থলের গঠন অতি অদ্ভুত। একটু বড় হইলে
অনেকপ্রকার ফড়িংএব বক্ষ হইতে একটি শিং বাহির হয়। এই শিং
আকারেপ্রকারে এমন বিদ্যুটে যে প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহাদের গঠন এবং
বর্ধন কেমনভাবে হয়, তাহা অনেক সময় কোনো বকমেই বুঝিতে পারেন
না। এই-সব অদ্ভুত শিং দেখিলে পুরাকালের প্রস্তুতভূত অনেক
স্তম্ভপায়ী জন্তুদের শিংএর কথা মনে হয়। দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকাব
ফড়িংদের মধ্যে এইরকম বেশী দেখা যায়। কোনো-প্রকার ফড়িংএর
পিঠেব উপবভাগ দাড়ি কামাইবাবু জুবার মতন। কোনো ফড়িংএর শিং
লম্বা তাহার ডগায় একটি বল আছে, কোনোটি তলোয়ারের মতন আবার
কোনোটি বা ছোরার মতন। বত রকমের হয় তাহাব সংখ্যা করা
যায় না।

অনেকপ্রকার ফড়িংএর গড়নের দৈনিক পরিবর্তন হয়। আজ
হয়ত তাহার ডানা নাই, কাল সকালে দেখিব তাহার দুইটি ডানা
গজাইয়াছে, পরশু দেখিব তাহার একটি শিংও হইয়াছে। কবে যে কি
নূতন পরিবর্তন হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারিবে না।

ছবির নীচে কয়েকটি ফড়িংএর পরিচয় দেওয়া হইল। এই ছবিগুলি
হাজার হাজার বিভিন্ন ফড়িংএর মাত্র চারটির উদাহরণ।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়



বেদবাণী—শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার। এম্ সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২ হারিসন রোড, কলিকাতা। পৃ: ৯+৭+ ৩৫৯+২৬; মূল্য ৩।

এই গ্রন্থ ঋগ্বেদ-বিষয়ক। ইহার প্রথমেই 'প্রবেশক'। এই অংশে বেদ-বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। ঋগ্বেদ রচনার কাল, বৈদিক সাহিত্য, ঋগ্বেদের ঋষি, সূক্ত ও দেবতা, ঋষিগণের আদিমনিবাস, বৈদিক সমাজ, নীতি, ও সভ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয় এই প্রবেশিকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, বৈদিক সাহিত্যে তাহাই দেবতা। এই অর্থে ইন্দ্র, অগ্নি বরুণাদি যেমন দেবতা, তেমনি অরণ্যানী প্রস্তর অথ মণ্ডুক শ্রদ্ধা স্বপ্ন প্রভৃতিও বৈদিক দেবতা।

এই গ্রন্থে এই-প্রকার প্রায় প্রত্যেক দেবতার বিষয়েই অস্তিত্ব: একটা সূক্ত অনূদিত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে একাধিক সূক্তও দেওয়া হইয়াছে; দুই-একটি স্থলে অনাবশ্যক বোধে কোন কোন ঋক্ পরিত্যক্তও হইয়াছে। ঋগ্বেদে বালখিল্যসহ ১০২৮টি সূক্ত; ইহাব মধ্য হইতে গ্রন্থকর্তৃদ্বয় ৮৯টি সূক্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সুবিবেচনা ও বিচক্ষণতার সহিত এই সূক্তসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। যে যে বিষয়ে সূক্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটি এই—সৃষ্টিতত্ত্ব; অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবতা; নদী ওষধি অরণ্যানী প্রভৃতি; গো অথ মণ্ডুকাদি; মায়ী, মনুয়া, মন প্রভৃতি; হু:স্বপ্ন, সপত্নী প্রভৃতি; দান, দক্ষিণা, দূত, যুতা, বিবাহ, পিতৃলোক, যম ইত্যাদি।

প্রথমে প্রত্যেক দেবতার বিবরণ, তাহার পরে সেই দেবতা-বিষয়ক সূক্তের পদ্যে অনুবাদ। দেববিবরণ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সূক্ত অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বঙ্গ-ভাষায় এই-প্রকার পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশে একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। এজন্য আমরা গ্রন্থকর্তৃদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সাধারণ পাঠক যে-সমুদায় বিষয় জানিবার জন্য ঋগ্বেদ পাঠ করিতে চাহেন, এই গ্রন্থে সে সমুদায়ই বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে চাহেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে সমগ্র ঋগ্বেদ পাঠ করা সহজও নহে, এবং আবশ্যকও নহে। চারু-বাবুর 'প্রবেশক' ও দেব-বিবরণ এবং প্যারী-বাবুর অনুবাদ পাঠ করিলেই বেদবিষয়ে পাঠকগণের সাধারণ জ্ঞান হইবে।

গ্রন্থ নিভুল হয় নাই। চারু-বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন— 'ইন্দ্রের নাম অবন্তাতেও আছে; সেখানে ইনি অহর, বৃত্রহন' (পৃ: ৭৪)।

প্রকৃত কথা এই—অবন্তাতে অহরই পূজ্য এবং দেবগণ যুগা ও বিঘ্নেষের বস্ত্র। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে ঋষিগণ উপাস্য-দেবগণকে অনেক স্থলে 'অহর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু

ইহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে এবং উত্তর কালে 'অহরগণে' যুগা ও বিঘ্নেষের বস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রধানত ইন্দ্রই 'অহর'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঋগ্বেদেও কয়েকটি স্থলে ইন্দ্রকে অহর বলা হইয়াছে (৩।৩৮।৪; ৮।৭৯।৬ বালখিল্যবাদে ১০।৯৬।১১; ১০।৯৯।১২)। অবন্তাতে কেবল দুইটি স্থলে ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় (বন্দীদাং ১০।৯; ১৯।৪৩)। এই উত্তর স্থলে ইন্দ্র একজন দেবতা এবং যুগা ও বিঘ্নেষের বস্ত্র। কিন্তু অবন্তাতে বৃত্রহন ('বেত্রেধুন্ন') অতি পূজনীয়। ইহার উদ্দেশে বস্ত্র সম্পাদন কর হইত (যশ্ ১৪)। অবন্তার ইন্দ্র অহরও নহেন, বৃত্রহনও নহেন।

কবি সূক্তানুবাদে কোন কোন স্থলে অসাবধান হইয়াছেন। যেমন দ্যাবাপৃথিবীর বন্দনাতে (১।১৮৫) দ্বিতীয় ঋকে অনুবাদ কর হইয়াছে—'পিতার কোলেতে' (পৃ: ২০৮)। কিন্তু মূলে আছে 'পিত্রো: উপস্থে'—ইহার অর্থ 'মাতা-পিতার কোড়ে'। ঐ অংশেরই পঞ্চম ঋকে 'যুবতী' 'স্বসারা' এই দুইটি কথা আছে সাধারণত: 'যুবতী' অর্থ 'দুইজন যুবতি' এবং 'স্বসারা' অর্থ 'দুই ভগিনী'। প্যারীমোহন-বাবুও এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যুবতী—যুবক ও যুবতী; স্বসারা—ভ্রাতা ও ভগিনী। এক্ষেপে স্বন্দে এই-প্রকারে পদ সিদ্ধ হইতে পারে। এস্থলে দ্যো শব্দ পুংলিঙ্গ এবং পৃথিবী স্ত্রীলিঙ্গ; এইজন্যই এই-প্রকার অর্থ করা সম্ভব মনে হইতেছে। তবে এ-প্রকার অর্থ বিচারগম্য। সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্য যে-কোন অনুবাদেই সিদ্ধ হইবে।

একটা সূক্তের অনুবাদ (১০।১৩৩) স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তীর্থসলিল হইতে গৃহীত।

গ্রন্থের 'নিদর্শনী' ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপিনী; ইহাতে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

যে-সমুদায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিলে বৈদিকতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এই পুস্তকের 'প্রমাণ-পঞ্জীতে' সে-সমুদায়ের নাম দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতার সাধারণ তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। আশা করি ইহার বিশেষ আদর হইবে।

মনুস্মৃতি-লাভ—প্রণেতা শ্রী সত্যাক্ষরী। প্রকাশক শ্রী পঞ্চানন মিত্র, এম্-এ, পি-আর-এস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পৃ: ২৩২ (৫৩"×৩২")। মূল্য ১।০।

পুস্তিকাতে এই-সমুদায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে—
(১) আত্ম-পরিচয়ে বাহুভূমি। (২) আত্ম-পরিচয়ে শ্রমভূমি। (৩) জীবন-যজ্ঞে পথ-নির্দেশ। (৪) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। (৫) শিক্ষার্থী ও সংসর্গ। (৬) আদর্শ বর্ণন।

শেষ অধ্যায়ে গৌতম-বুদ্ধ কবীর লুথার খীণ্ড নিত্যানন্দ শাস্ত্রী

গ্রাম বিবেকানন্দ রাজা-রামমোহন ও হজরত মহম্মদ বিষয়ে দুই-একটি কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন ঘটনা ঐতিহাসিক নহে। তিনি লিখিয়াছেন—এই উক্তিটি যীশুর—‘হে পিতঃ, এই অধোদেহা কি করিতেছে তাহা জানে না। আপনি : ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।’ (পৃ ১২০)। ঐহারা-বাইবেল-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ঠাহারা সকলেই বলেন এই অংশ যীশুর উক্তি নহে; এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইংরেজী বাইবেলের নূতন সংস্করণেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

এসে এই-প্রকার আরও ভুল আছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

পাথরের দাম—শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি, প্রণীত।
কলকাতা চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—আট আনা সংস্করণ। আশ্বিন ১৩৩০।

মাণিক-বাবুর গল্পগুলির রচনা বেশ স্বরূপে তক্তকে। সকলেরই পড়িতে ভাল লাগিবে। বইখানির বাঁধাই এবং ছাপা খারাপ।

বেড়াল ঠাকুরবি—শ্রী বিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রণীত। এম্, সি,
সরকার এণ্ড সন্স, ২০।২এ, হারিসন রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা।
১৩৩০।

রবীন্দ্রনাথ বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“এগুলি...প্রতিদিনের ঘরকন্নার হাঁড়ি-কুঁড়ির অন্তরের কথা।... এই গল্পগুলির যে চেহারা পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস আছে এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য।”

আমাদের দেশের রূপকথার সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বিভূতি-বাবু কতকগুলি রূপকথাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। যদিও এই বইটি ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা, তবুও বুড়ারাও এ বইখানি পড়িয়া সুখ পাইবেন।

বইখানির ছাপা বাঁধাই এবং কাগজ সবই খুব চমৎকার হইয়াছে। বইখানির ছবিগুলিও বেশ হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে দু-একটি ছবি বড় অস্পষ্ট হইয়াছে। বইখানির বহুল প্রচার হইবে আশা করি। উপহার দিবার পক্ষে বইখানি খুব উপযোগী হইয়াছে।

‘গ্রন্থকীর্ট

মরীচিকা—শ্রী ধগেন্দ্রনাথ বসু, কাব্যবিনোদ প্রণীত।
শ্রী সত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক দৌলতপুর হইতে প্রকাশিত। পৃঃ
১০৩। মূল্য আট আনা। ১৩৩০।

ছোট গল্পের বই। বইখানিতে সাতটি ছোট গল্প আছে, যথা :—
(১) প্রত্যাবর্তন, (২) আমিনা, (৩) মৃত্যু-মিলন, (৪) কর্তব্যের
ডাক, (৫) হরিণ ডাক্তার, (৬) রক্তের লিখন, (৭) বিধবা। গল্প-
গুলি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

পত্রাবলী (সচিত্র)—ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ হইতে স্বামী
মহাদেবানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৥/০ আনা। পৃঃ ১৩৩। ১৩২২।

ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠ স্বামী প্রেমানন্দের উদ্যোগেই প্রস্তুত
হয়। স্বামীজী সাধারণের আধ্যাত্মিক মঙ্গল-কামনার উহার শ্রিয়
শিষ্যগণের নিকট যে-সকল পত্র লিখিয়াছেন, এই পুস্তকখানিতে সেই
পত্রের কয়েকখানি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বইখানিতে অনেক উপদেশ-
পূর্ণ কথা আছে।

স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়-জীবনী—শ্রী রজনী-
কান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৮৬। ১৩৩০।

স্বর্গীয় নীলরতন-বাবু নানা স্থানে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তাঁহার
জনৈক শিক্ষক-বন্ধু কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। নীলরতন-বাবু
চণ্ডীদাসের বহু অনাবিকৃত পদাবলী আবিষ্কার ও সম্পাদন করিয়া বিশেষ
যশস্বী হইয়াছিলেন।

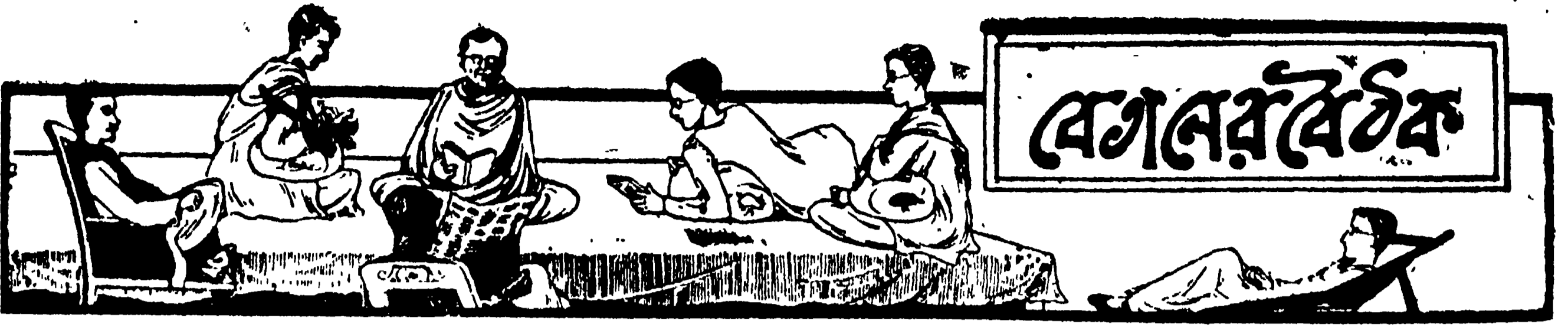
স্বাধীনতার স্বরূপ—শ্রী শ্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত। শ্রী
হিমাংশুকুমার রায় কর্তৃক ঢাকা সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।
পৃঃ ২২। মূল্য বারো আনা। ১৩৩০।

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় socialism বা সার্বজনীন
সাম্য-সমাজের কোন সম্ভাবনা আছে কি না—গ্রন্থকার তাহাই
আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা অতি সরল। পুস্তকখানি
সাধারণের পক্ষে সুখবোধ্য হইয়াছে।

প্রভাত

মাদারিপুর পাব্লিক লাইব্রেরির ১৯২২-২৩
সালের কার্য বিবরণী।

ঢাকা বিভাগে যে তিনটি পুস্তকালয় সরকারী রিপোর্টে
প্রশংসাপাশ করিয়াছে। তাহার দুটি ঢাকানগরে অবস্থিত, এবং
মাদারিপুর লাইব্রেরি তাহাদের অন্ততম। এই হিতকর অনুষ্ঠানটির
অক্রান্তকর্মী নীরব সেবক শ্রীযুক্ত ডুবনেশ্বর সেন, বি-এল। লাই-
ব্রেরির হলগৃহটি স্বন্দর, তাহাতে বসিয়া পড়া শুনা করার সুবন্দোবস্ত
আছে। এখানে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে বক্তৃতা হইয়া থাকে,
তাহাতে বেশ লোক-সমাগম হয়। আমাদের মঞ্চালের রাজনৈতিক-
আন্দোলন-মুখরিত আত্মসংস্কারপ্রয়াসবর্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমা-
গুলিতে জ্ঞানার্জনের এইরূপ কতকগুলি ছোট-খাট কেন্দ্র স্থাপিত
হইলে ভিতর দিক হইতে সত্যকার জাতিগঠনের অনেকটা সহায়তা
হয় সন্দেহ নাই।



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বৈচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৭৬)

“উল্ধনি”

বাংলায় হিন্দুদের সমস্ত শুভ কার্যেই মেয়েরা উল্ধনি দিয়া থাকে। বাংলা ভিন্ন ভারতের অছাড়া দেশের হিন্দুদিগের মধ্যে এই রীতি আছে কি না? উল্ধনি আর্ধ্যদের মধ্যে কোন্ যুগে কি উপলক্ষে প্রথম প্রচারিত হয়? পার্শ্ববর্তীদের মধ্যে এই প্রথা আছে কি?

কুমারী বীণাপাণি রায়

(১৭৭)

ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি

মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিশ্চয়রূপে স্থির হয় নাই। ভীষ্মের মৃত্যু শুক্রাষ্টমীর দিন ধরা হয়। তিনি পতনের পর ৫৮ দিন বাঁচিয়াছিলেন, ৫৯তম দিবসে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। ২৯ দিন ১২ ঘণ্টাতে এক চান্দ্র মাস হয়, অর্থাৎ ৫৯ দিনে পূর্ণ দুই মাস হয়। শুক্রাষ্টমীর দিন মৃত্যু হইলে দুই মাস পূর্বে শুরু নবমীতে তাহার পতন হইয়াছিল। সে দিন যুদ্ধের দশম দিন ছিল। তাহার চার দিন পরে [যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে] রাজ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেদিন শুক্রা জ্যৈষ্ঠাদশী হওয়া উচিত। কিন্তু সন্ধ্যার পর অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়া অর্জুন সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘুমাইতে বলিয়াছিলেন। ত্রিযামা রজনী গত হইলে চলোদয় হইল ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। [জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা। জ্যৈষ্ঠবধ-পর্যায়। ১৮৫ অধ্যায়] অতএব সেদিন কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠাদশী ছিল। ভীষ্মের মৃত্যু শুক্রা অথবা কৃষ্ণাষ্টমী ঠিক জানিতে পারিলে অয়নগতি হিসাব করিয়া উত্তরায়ণের সময়, অতএব যুদ্ধের সময় পাওয়া যাইতে পারে। কোনও পাঠক অনুগ্রহপূর্বক সাহায্য করিলে বাধিত হইব।

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১৭৮)

ভারতের তামাক

ইতিহাসে জানা যায় ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সম্রাট্ আকবরের সম্রাট্ ভারতবর্ষে তামাক আমদানী হয়। হিন্দুরা শব্দাহের পর চিতার

উপর তামাক সাজাইয়া দিয়া থাকে। দেওয়ার কারণ কি? ইহা কি শাস্ত্রানুমোদিত বা লোকাচার? কোন্ সময় হইতে এ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে? পৃথিবীর অন্ত কোন জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা আছে কি না?

শ্রী যতীন্দ্রচন্দ্র দেবরায়

(১৭৯)

নদীর উৎপত্তি-ক্ষেত্র

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধু এই-সকল নদনদীর উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে কোথায় প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়?

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(১৮০)

রাজসাহীর বিজোহী জমিদার উদয়নারায়ণ

ষ্টয়ার্ট কৃত বাঙ্গলার ইতিহাসে মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে রাজসাহীর বিজোহী জমিদার উদয়নারায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরে ইনি পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন এবং তাহার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া নাটোরের বাজা রামজীবনকে দেওয়া হয়। এই উদয়নারায়ণের রাজধানী কোথায় ছিল? পুঁঠিয়া অথবা তাহেরপুরের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল কি? প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিলে বাধিত হইব।

যতীন্দ্রচন্দ্র বাগচী

(১৮১)

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে নদী

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া পেশোয়ার বাইতে হইলে পথে কি কি নদী পড়ে? নদীগুলির নাম কি এবং সে-গুলিতে সেতু আছে কি না?

শ্রী আব্দুল হক

মীমাংসা

(১৩০)

খড়ীমাটি

Dehri Rohtas Light Railwayএর তিলধু নামক স্টেশনের সম্মুখ পাহাড়ের কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে খড়ীমাটি পাওয়া যায়।

শ্রী কুমুদকুমার সাধু

(১৩৬)

চৈতন্যচরিতামৃত্তে একাদশীপ্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্তের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পৌষ মাসের প্রবাসীতে কোন প্রসঙ্গের যে-সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। মূল চৈতন্যচরিতামৃত্তে ব্যাপারটি এই ভাবে লিখিত হইয়াছে।

একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
এতু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান।
মাতা কহে তাহা দিব যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে একাদশী অন্ন না খাইবা।
শচী বোলে না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্ত, আদি লীলা, পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই ঘটনার উপর 'তৎকালে নবদ্বীপের স্থান স্মার্তপ্রধান স্থানে বিধবাগণ একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতেন কি না' ইত্যাদি প্রশ্ন উদ্ভূত হইতে পারে না। কারণ, শচীদেবী তখন আদৌ বিধবা নহেন, জগন্নাথ (পুরুন্দর) মিশ্র তখনও জীবিত। উপরি-উদ্ধৃত অংশের পরবর্তী অংশ পাঠ করিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। উপরি উদ্ধৃত অংশের ঠিক অর্থাৎ হিত পরেই এইরূপ লেখা আছে—

তবে মিশ্র বিধবাপের দেখিয়া যৌবন।
কল্পা লাগি বিত্তা দিতে মিশ্রের হইল মন।
বিধবাপ শুনি ঘর হইতে পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা।
শুনি মিশ্র পুরুন্দর দুঃখী হইল মন।
তবে পিতামাতার যে কৈল আশাসন ॥ ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্ত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যায়।

এই-সমস্ত ঘটনার বহুদিন পর—

“কখোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্ত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যায়।

মিশ্র যে বিধবাপের সন্ন্যাস করিবার পরও জীবিত ছিলেন তাহা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অমিয়নিমাইচরিত' প্রভৃতি সমস্ত বৈকল্পিক গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে সে-সকল উদ্ধৃত করিলাম না। আলোচ্য ঘটনা বিধবাপের সন্ন্যাসেরও পূর্ববর্তী, কাজেই জগন্নাথ যে সে সময়ে জীবিত ছিলেন এবং শচীদেবী তখনও বিধবা হন নাই ইহা সন্দেহ। চৈতন্যদেব তাঁহার মাতার সধবা অবস্থাতেই তাঁহাকে অন্ন খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে একাদশীতে যে তখন উপবাস প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অল্প গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব একাদশীর দিনে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বিকুনৈবেদ্যে ভাজন করিতে চাহিয়া বলিতেছেন—

একাদশী উপবাস ত্যজিল দৌহার।

বিষ্ণু লাগি করিয়াছে বত উপহার ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

পুরুষগণ যে সময়ে একাদশীর উপবাস করিতেন তখন বিধবাগণ করিতেন না, ইহা অবিশ্বাস্য। তাহার পর আরও কথা আছে।—
বিপ্রদ্বয় নিমাইয়ের এই অদ্ভুত যাচঞার কহিতেছেন—

(দুই বিপ্র বোলে) মহা অদ্ভুত কাহিনী।

শিশুর এমত বুদ্ধি কতু নাহি শুনি ॥

কেমনে জানিল আনি শ্রীহরিবাসর।

কেমনে বা জানিল নৈবেদ্য বহতর ॥ ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

'শ্রীহরিবাসর' কথাটি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল যে এই বিপ্রদ্বয়ই একাদশীর উপবাস করিতেন তাহা নহে—একাদশীর দিন সর্বসাধারণের সমস্তই “শ্রীহরিবাসরের” ব্যবস্থা ছিল এইরূপই অর্থবোধ হইতেছে। যাহাই হউক “চৈতন্যচরিতামৃত্তের” উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে তৎকালে বিধবাগণের একাদশীতে অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই মনে আসিতে পারে না। পরন্তু যে কালে একাদশীতে পুরুষগণের পক্ষেও “শ্রীহরিবাসরের” ব্যবস্থা ছিল সে সময়ে বিধবাগণও যে উপবাস-ত্রত পালন করিতেন, ইহা বিখ্যাস করিবার যথেষ্ট কারণ বিজ্ঞমান। বলা বাহুল্য 'শ্রীহরিবাসর' কথাটির বাংলা ইন্ডিয়ান্স অনুযায়ী অর্থ 'উপবাস'।

শ্রী তারাপদ লাহিড়ী

শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার মাতাকে যখন একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মাতা শচীদেবী “বিধবা” ছিলেন না। উক্ত ঘটনা শ্রীগোবিন্দদেবের নয় বৎসর বয়সে উপনয়নের সময় ঘটে, জগন্নাথ মিশ্র তখন শুধু জীবিতই ছিলেন না—স্বয়ং আচার্য্য হইয়া পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী-মন্ত্র দিয়াছিলেন। উপনয়নের কিছুদিনকাল দুই বৎসর পর জগন্নাথমিশ্রের মৃত্যু হয়। ঐ সময় শ্রীগোবিন্দদেব “নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও ছিলেন” না—কারণ, দুই বৎসর পর পিতৃহীন অবস্থায় তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পড়াশুনাতে বরং নানারূপ অমনোযোগিতার কথাই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত্ত, মুরারি-গুপ্তের করচা, অমিয় নিমাইচরিত ও Lord Gouranga জট্টব্য।

শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার সধবা মাতাকেই একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—কারণ একাদশীতে উপবাস করা হিন্দু-শাস্ত্রমতে একটি সাঙ্ঘিক লক্ষণ। সধবা, বিধবা, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী সকলকেই শাস্ত্র একাদশীতে উপবাস করিতে আদেশ করিতেছেন, শচীদেবী সধবা অবস্থাতেই একাদশীতে উপবাস করিতে আরম্ভ করিলেন—বহু সধবাই তখন এইরূপ করিতেন।

ভৃগু-ভানু-দিনোপেতা সূর্যসংক্রান্তি-সংযুতা।

একাদশী সদা পোষ্যা পুত্র-পৌত্র-বিবর্দ্ধিনী।

—বিকুণ্ঠপৌত্রেরে।

গৃহস্থা ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিস্ তথৈব চ।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োর উভয়োর অপি ॥

—আগ্নেরে।

বর্তমানে বঙ্গদেশের পুরুষদিগকে আর একাদশীতে বাধ্যতামূলক উপবাস করিতে হয় না—কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাকেই বাধ্যতামূলক উপবাস করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই উপবাসে অশক্ত হইলে রাত্রিতে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা আছে। বরেন্দ্রভূমিতে

শ্রীহটে ও আসামের কেরকটি স্থানে শিশু বিধবাই হটক আর বৃদ্ধ বিধবাই হটক সকলকেই নিরসু উপবাস করিতে হয়। পূর্বকালে শ্রীহটেও শাস্ত্রীয় উপদেশের সন্ধান রক্ষিত ছিল। “রত্নমালিকা” নামক গ্রন্থের হস্ত-লিখিত পুরাতন পুঁথিতে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্র, রোগী ক্ষীণাঙ্গী ও অক্ষান্ত কারণে অসমর্থ ব্যক্তিকে একাদশীতে উপবাস করিতে নিষেধ করিয়া কল মূল দুগ্ধ জল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন, যথা—“অশক্তং প্রতি নারদীয়ে। অমুক্শো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণিণাং বরবর্ণিনি।”—বায়ুপুরাণ। উপবাস-নিষেধে তু কিঞ্চিদভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ। ন দুষ্যেৎ উপবাসেন উপবাসফলং লভেৎ। উপবাস-নিষেধাসমর্থনোর ভক্ষ্যপ্রকারম্ আহ নারদীয়ম্। মূলং ফলং পরসু তোরম্ উপভোগাং ভবেচ্ ছুতম্ ন ভেবং ভোজনং কৈশ্চিদ্ একাদশ্যাং প্রকীৰ্ত্তিতম্।”

—রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বম্।

অশক্তিকে অশক্ত-পক্ষে রাত্রিতে হবিষ্যন্ন ভোজনের ব্যবস্থাও শাস্ত্র দিতেছেন। তবে সে হবিষ্যন্ন তুলসী-সংযুক্ত হওয়া চাই, যথা—

“বায়ু পুরাণে। নস্তং হবিষ্যন্নম্ অনোদনম্ বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরম্ অথাসু চ আজ্যং। যৎ পক্ষগব্যং যদি বাধ বায়ুঃ প্রশস্তম্ অত্রোত্তরম্ উত্তরক্। ফলাহারাদাবাপি তুলসী-রহিতয়ে দোষম্ আহ গরুড়পুরাণম্।”

—রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বম্।

একাদশীর উপবাসে অশক্ত হইলে যে হবিষ্যন্ন করার ব্যবস্থা আছে স্মৃতি শাস্ত্রে তাহার একটি দফা আছে, যথা—

“হবিষ্যন্নম্ আহ স্মৃতিঃ। হৈমন্তিকং সিতাশ্বিনং ধাশ্বিনম্ মুক্ষাসু তিলা যবাঃ। ফলাসকজু নিবাবা বাস্তকং হিলমোচিক। যষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং। লবণে সৈন্ধবে সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পিণী। পরোঃ মুক্তসারঞ্চ পনসাত্র হরিতকী। তিস্তিড়ী জীরককৈব নাগরস্কঞ্চ পিঙ্গলী। কদলী লবণী ধাত্রী ফল্যাশ্চ শুষ্কম্ ঐক্ষবং। অঠৈলপকং মুনয়ো হবিষ্যন্নং বিদ্বব্ বুধাঃ ॥”

—রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বম্।

শুককণ্ঠ, মৃতপ্রায়, অশক্ত বালবিধবা ও অশীতিপর বৃদ্ধা বিধবাকে একাদশীতে নিরসু উপবাস করিতে হইবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের ত্রিসীমাতেও নাই। শ্রীহট্ট, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, প্রভৃতি অঞ্চলে উহা একরূপ দেশাচার হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত দিগন্ত-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “একাদশী” এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে এ বিষয় স বিশেষ জানিতে পারিবেন।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৬৭)

ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

কলিকাতার মানিকভল্লার মুরারীপুকুর রোডে বেঙ্গল টেকনিকেল ইনস্টিটিউটে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। এখান-

কার পাঠক্রম (course) বেশ উচ্চ ও স্বল্পক অধ্যাপকগণ অতি যত্ন সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষাইয়া থাকেন। বিলাতের ও আমেরিকার কলেজের কোর্স এখানে পড়ান হয়, তবে কোম ফলিত তড়িৎবিজ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয় পড়ান হয় না। কলেজ এখন অস্থায়ীভাবে এখানে আছে, খুব সম্ভব এই গরমের সময় যাদবপুরে যাইবে। সেখানে হাতে-কলমে শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রবেশিকা অথবা তাহার অনুরূপ কোন পরীক্ষার অক্ষশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া যায়। বিশেষ বিবরণ কলেজে পাওয়া যায়।

শ্রী মণিভূষণ মজুমদার

(১৭১)

প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য

প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য রাইট অনারেবল্ সৈয়দ আমীর আলী। ইনি বাঙ্গালী মুসলমান। কিছুকাল পূর্বে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতির কা্য করিতেছেন।

শ্রী প্রভাত সান্দ্যাল

(১৭২)

বৃহত্তম পুস্তকালয়

ফ্রান্স দেশের পারী নগরে বিল্লিওতেক্ নাংশিওনাল নামক পুস্তকালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পুস্তক ও এক লক্ষ বিশ হাজার হস্তলিখিত গ্রন্থাদি ঐ পুস্তকালয়ে ছিল। ২১ জন ইংরেজ অধ্যাপকের মধ্যে শুনেছি ইংলণ্ডের ব্রুমস্বেরী নগরে মণ্টেন্ হাউসে অবস্থিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। পূর্বেজ্ঞান দুই পুস্তকালয়ই তাঁরা দেখেছেন। তাঁরা বলেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অনেক ছোট ছোট এক-এক বিষয়ের পুস্তক একত্রে বাঁধিরে খরচ কমান হইতে বলে’ বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের উপর ছিল না। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভারতের শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয়।

শ্রী হুজুরগোপাল দত্ত

ভারতের মধ্যে তাঞ্জোরের গ্রন্থাগার এবং বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে প্রায় ২ লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক ও ১৩৫০ খানি পুঁথি আছে।

গচিহাটা পাব্লিক-লাইব্রেরীর সভ্যগণ

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ মাসের প্রবাসীর ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ১৪৭ নং প্রশ্নের উত্তরে “উদরের ‘ডান’ পার্শ্ব” স্থলে উদরের ‘বাম’ পার্শ্ব হইবে এবং “ ‘বাম’ পার্শ্ব যকৃত অবস্থিত” স্থলে ‘ডান’ পার্শ্ব যকৃত অবস্থিত হইবে।



বাংলা

বাংলার হিন্দু কৃষক কোথায় গেল ?—

১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাংলার জনসংখ্যা ৪,৭০৫,৪২, ৬২ ; তন্মধ্যে হিন্দু ২,০৮,০৯১৪৮, মুসলমান ২৫৪,৮৬,১২৪ । বাংলার কৃষকসংখ্যা ৩,০৫,৪৩,৫৭৭ । তন্মধ্যে হিন্দু ১,০১,৭৯,৫০৫, মুসলমান ১,৯৭,২১,৮৫১ । ১৯১১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাংলার কৃষকসংখ্যা ছিল ২৯৭৪৮৬৬৬ ; তন্মধ্যে হিন্দু ১০৪৫০২৫৮, মুসলমান ১৮৭১৯৬৯ । দশ বৎসরে হিন্দু-কৃষকের সংখ্যা ২৭০৭৫৩ কম হইয়াছে । কিন্তু দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের সংখ্যা ১০০২১৫৯ বাড়িয়াছে ।

বাংলার হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু-কৃষক কমিল কেন এবং মুসলমান কৃষক বাড়িল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কি আবশ্যিক মনে করেন না ?

হিন্দু কৃষকের সংখ্যা কমিল কেন তাহার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিতেছি ।

(১) হিন্দু-কৃষক অনেকেই বিবাহ করিতে পারে না ; পণ না দিলে কন্যা পাওয়া যায় না ; টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত থাকে ; সুতরাং তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে ।

(২) হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলন নাই । প্রৌঢ় বয়সে ঘাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহারা ৮।১০ বৎসরের কন্যা বিবাহ করে ; সম্ভান হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীকে বিধবা করিয়া পরলোক যাত্রা করে । সুতরাং বাহুসী বিবাহ করিতে পারে, তাহারাও বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না ।

(৩) যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিত, তবে প্রৌঢ় বয়সে কৃষকেরা বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত এবং পুত্র কন্যা রাখিয়া এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারিত ।

(৪) বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে কন্যাপণ উঠিয়া যাইত ; সুতরাং কৃষকদের বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইত না ।

বঙ্গের হিন্দু-কৃষকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে অবিলম্বে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে সকলের দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত ।

(৫) হিন্দু কৃষকেরা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না । হিন্দু-কৃষকদের অনেকেরই গাভী নাই ; সুতরাং দুধ, দই, ঘি খাইতে পায় না । অপর দিকে প্রায় সমস্ত মুসলমান-কৃষক গাভী পালন করে । গৃহজাত দুধের কিয়দংশ বিক্রয় করে, অপরংশ নিজেরা পান করিয়া থাকে । মুসলমানেরা দিবসের কার্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই তাহা করে না । মুসলমান পুষ্টিকর মাংসাদি আহার করে, হিন্দুর তাহার সুবিধা নাই । সুতরাং হিন্দু-কৃষক দুর্বল, মুসলমান সবল । মুসলমান সবল দেখে লইয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট চাষ করিতে পারে, হিন্দু দুর্বল দেখে তাহা পারে না । কাজেই মুসলমান-কৃষকের যেরূপ আয় হিন্দুর সেরূপ নয় । দরিদ্রতা হিন্দুকৃষকদের আয়-এক কারণ ।

(৬) হিন্দু-কৃষক পুঙ্খানুপুঙ্খ একই বাড়ীতে বাস করে, বহু-কালের জঞ্জাল ও আবর্জনা ও বাড়ীর চতুর্পার্শ্ব জঙ্গল তাহার আবাস-ভূমিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে । অধিকাংশ মুসলমান-কৃষক এক বাড়ীতে বহুদিন থাকে না । তাহাদের বাড়ীতে বৃক্ষাদিও বেশী নাই । তাহারা সচরাচর নদীর নূতন চরে যাইয়া বসতি স্থাপন করে । সুতরাং তাহাদের দেহ হিন্দুকৃষকের মত শীঘ্রই জরাজীর্ণ হয় না ।

(৭) হিন্দু-কৃষক তাহার দুর্বল দেহে এক বিধা জন্মিতে যত শস্ত উৎপাদন করে, মুসলমান-কৃষক তদপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং কৃষিকার্যে মুসলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর ভুত হয় না । হাটবাজারে হিন্দু যে মূল্যে শস্তাদি বিক্রয় করিতে চায়, মুসলমান তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে । প্রতি-যোগিতায় হিন্দু হারিয়া যাইতেছে ; সুতরাং বাধ্য হইয়া অনেক হিন্দু-কৃষক কৃষিকার্য পরিত্যাগ করিতেছে ।

হিন্দু-কৃষক লোপ হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করিলাম । এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কারণ আছে । হিন্দু-কৃষকের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ বে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন না করিলে বাংলা দেশে যে হিন্দু-কৃষকের চিহ্নমাত্র থাকিবে না এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । সুতরাং যদি হিন্দু-কৃষক রক্ষা করা উচিত মনে হয়, তবে বাংলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে আরম্ভ করুন । —সঞ্জীবনী

জাতি অনুযায়ী শিক্ষা—

৫ হইতে উর্ধ্ব বয়স্ক প্রতি সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতদের জাতি ও সংখ্যা :—

বৈষ্ণ ৬৬২, আগরওয়াল (কলিকাতা) ৫৪২, ব্রাহ্মণ ৪৮৪, কায়স্থ ৪১২, স্বর্ণ-বর্ণিক ৩৮৩, গন্ধ-বর্ণিক ৩৪৪, সাহা ৩৪২, ভারতবাসী খৃষ্টান ২৮৮, বারুই ২২৯, তেলি ২২৫, কামার ২০২, সদগোপ ২০০, সূঁড়ি ১৮৮, যুগী ১৭৬, তাঁতি ১৬৮, নাপিত ১৫২, কলু ১৫২, বৈষ্ণব ১৪২, পোদ ১৩৮, শূদ্র ১৩৭, চাষী কৈবর্ত ১৩১, সূত্রধর ১২১, গোয়াল ১১৯, কুমার ১১৬, কাপালী ১১৫, টিপরাই ৯১, মগ ৮৯, ধোবা ৮৮, নমঃশূদ্র ৮৫, পাটনী ৭০, জালী কৈবর্ত ৬৮, রাজবংশী ৬৫, নিকারী ৬২, চাকমা ৫৮, সেখ ৫৭, টিয়র ৫৪, জোলা ৫২, ডুইমালী ৫১, মালো ৪৮, কোচ ৩৮, চামার ৩৫, কলু ৩৪, বাগদী ২৪, ভইয়া ২৪, মুচী ২২, বাউরী ৭, সাঁওতাল ৫ ।

৫ হইতে উর্ধ্ব-বয়স্ক এক সহস্র পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা (হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি)—

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১
পশ্চিমবঙ্গ (বর্ধমান বিভাগ)	২১৪	২১৬	২৩০

মধ্যবঙ্গ (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)	১৭৮	২০০	২৩২	শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি			
উত্তর বঙ্গ (রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ)	৫৯	১১১	১৩৪	সঙ্গোপ	—৩.১	—১.৬	—৪.৬
পূর্ববঙ্গ (ঢাকা বিভাগ)	১২১	১৩৬	১৫৪	সাঁওতাল	—৪.২	২.৯	৫.২
চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ত্রিপুরা রাজ্য	১৩৬	১৪২	১৬৯	সোণার (স্বর্ণকার)	—১৬.৫	—৫.৪	—২১.০
সমগ্র বঙ্গ	১৪৭	১৬১	১৮২	শূত্র	—৩৪.১	—১২.৯	—৪৭.২
				সূত্রধর	—৫.৬	৪.৩	—০.৯
				ভাষুলী	—৫.৪	—৭.৬	—১২.৬
				তাতি	—১.০	৩.২	২.১
				তেলি ও তিলি	—১৪.১	৩.৮	—২.০
				তিয়র	—১৮.৪	০.৮	—১৭.৭

শিক্ষার বিস্তৃতি
বয়স ৫ হইতে উর্দ্ধ।

১৯০১-১৯১১	১৯১১-১৯২১
শতকরা ১ জন বৃদ্ধি	শতকরা ৬ জন বৃদ্ধি
" ১৫ "	" ১৪ "
" ১৭ "	" ২১ "
" ১২ "	" ১৩ "
" ১২ "	" ১১ "
" ৯ "	" ১৩ "

—সঞ্জীবনী— যশোহর

“নিম্ন” জাতির সংখ্যা হ্রাস—

হিন্দু সমাজের বহু নিম্ন জাতি ও অন্তর্গত জাতি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, আমরা তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

জাতির নাম	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৯০১-২১
বাগদী	—১১.৮	—০.০	—১১.৯
বাকুই	৪.৩	৮.৮	১৩.৫
বাউরী	—৩.৪	১.২	—২.২
ভুইমালী	—১০.৯	৩.০	—৮.২
ভুইয়া	—১২.৮	৩৮.৯	২১.১
মজ	—১২.৩	৭.৭	—৫.৫
চাষাধোবা	—৭৭.৪	৯৫.৩	—৫৫.৮
ধোবা	—০.৩	১.৬	১.৪
ডোম	—১৩.৬	—৬.৮	—২৪.৮
সোঙ্গর	—১২.৫	৪৭.৯	২৯.৪
গোয়াল	—৯.৭	১.১	—৮.৫
হাড়ি	—১৪.৩	—৩.৮	—১৭.৭
যুগী	১.৩	৫.৩	৬.৮
চাঁদী কৈবর্ত	৩.৪	৯.৫	১৩.২
জেজে কৈবর্ত	১৭.৬	২৩.১	৪৪.৮
কলু	—১৪.০	—২.৫	—১৬.২
কপালী	—২.৯	—৭.৫	১০.৬
কুমার	—২.১	৪.২	২.০
কুর্নী	২.৬	১৪.৮	১৭.৯
মালাকার	—১০.৬	৯.২	—২.৪
ময়রা	—৩.৮	—১.৩	—৫.১
মুচি	—৮.৩	৯.৩	০.৩
নাগিত	—০.৭	৩.৬	২.৮
পাটনী	—৩০.৭	০.১	৩০.৬
পোদ	৯.৭	১৫.৫	২১.৬

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি নিম্নবর্ণের হিন্দু জাতি তাহাদের প্রধান প্রধান বাসভূমিতে কেমন ভাবে কমিয়াছে দেখুন—

জাতির নাম	বাসস্থান	শতকরা হ্রাস
আগুরী	বর্ধমান-বাকুড়া-হাওড়া	—১৩.৬
চাই	মুর্শিদাবাদ-মালদহ-রাজসাহী	—৯.৪
চামাতী	মালদহ	—৩৩.৩
ধানুক	মুর্শিদাবাদ মালদহ	—২০.৯
গঙ্গাই	মালদহ দিনাজপুর	—৭.০
হদি	ময়মনসিংহ	—১৪.৫
হাজঙ	ঐ	—১০.০
কন্দরা	মেদিনীপুর	—৮.২
কান্তা	ঐ	—৫৬.৬
খেন	দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-রঙ্গপুর	—১২.৩
কোনাই	বীরভূম	—১.৬
কোড়া	বর্ধমান-বীরভূম-বাকুড়া	—২১.০
কোটাল	বর্ধমান	—১.৬
মেচ	জলপাইগুড়ি	—৫১.৮
নাগর	মালদহ	—১৫.৬
নায়ক	বাকুড়া-মেদিনীপুর	—৬২.২
পুগুরী	বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-মালদহ	—৪০.৪
রাজু	মেদিনীপুর	—১১.৭
সীমান্ত	বাকুড়া	—৯৫.৪

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

নারীর স্বাবলম্বনের উপায়—

“বঙ্গনারী”-সম্পাদিকা শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার লিখিতেছেন—

আজকাল প্রায় সকল নারীই বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানেন, কিন্তু সেই-প্রকার লেখা-পড়ার উপার্জনের কোনও সুযোগ ছিল না। সম্প্রতি ২৫ নং বাহুড়বাগান লেনের নারী-শিক্ষাশ্রমে এই শ্রেণীর নারীদিগকে কম্পোজিটারী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৩ মাস শিক্ষা করিলেই কাজ করিতে পারা যাইবে। যে-সকল নারী কাজ শিক্ষা করিবেন, তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটিকে উপযুক্ত বেতন দিয়া “বঙ্গনারী”-প্রেসে গ্রহণ করা হইবে।

যিনি কাজ করিতে ইচ্ছা করেন, নিজে আসিয়া সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী

কলিকাতার পুরুষ ও নারী—

কলিকাতা সহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত অস্বাভাবিক। খাস কলিকাতার প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় মাত্র

৪৭০ জন স্ত্রীলোক, হাওড়াতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫২০ জন স্ত্রীলোক এবং ২৪-পরগণা ও সহরতলীতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৬১৪ জন স্ত্রীলোক। বাঙ্গলার মফঃস্বল সহরে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৮১৬ জন। যে-সমস্ত মফঃস্বল সহরে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র বা কল-কারখানা আছে, সেই-সব স্থানে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যা কলিকাতা সহরের মতই কম,—প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫৩৭ জন। টিটাগড়, কাঁচড়াপাড়া, বঙ্গবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৪৩৬ হইতে ৪৪০ জনের মধ্যে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বাঙ্গলার স্ত্রীলোকেরা, যে-কোন কারণেই হোক, অধিকাংশই গ্রামে বাস করে; সহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে বা কল-কারখানার কাজে এখনও এদেশে স্ত্রী-মজুরের আমদানী পাশ্চাত্য দেশের মত হয় নাই।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা তুলনা করিতে গিয়া আর-একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রায় সর্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ইউরোপে যুদ্ধের পর অবশ্য স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বেশী বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্বেও ঐ-সব দেশে পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যাই বেশী ছিল। ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে তাহার বিপরীত অবস্থা। এমন কি ৪০।৫০ বৎসরের সেন্সাস তুলনা করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গলা সহরে ও মফঃস্বলে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বাড়িতেছে না, কমের দিকেই যাইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে ব্যাপারটি অনেকটা বুঝা যাইবে—

প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা

	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
কলিকাতা সহর	৪৭০	৪৭৫	৫০৭	৫২৬
২৪-পরগণা ও সহরতলী	৬১৪	৬৫৬	৬৮০	৭৭২
হাওড়া	৫২০	৫৬২	৫৭৭	৬৫৪
মফঃস্বলের ব্যবসা				
বা কল-কারখানা সহর	৫৩৭	৫৮২	৬০৫	৬৮৫
সাধারণ মফঃস্বল সহর	৮১৬	৮৪১	৮৬৯	৯০৩
সমগ্র বঙ্গ	৯৩৪	৯৪৫	৯৬০	৯৭৩

(১৮৮১ সালে সমগ্র বঙ্গের স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৯৯৪ জন ও ১৮৭২ সালে ৯৯২ জন ছিল।)

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে বাঙ্গলার সর্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা কমিতেছে। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইহা কোন জাতির পক্ষে স্বলক্ষণ নহে। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে প্রায় সর্বত্র স্ত্রী-সংখ্যা বেশী দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহার ব্যতিক্রম জাতির জীবনী-শক্তির অভাব সূচনা করিতেছে।

এই সঙ্গে আর-একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিলেও, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। হিন্দু-স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। বিগত দশ বৎসরে ২০ হইতে ২৫—এই বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা (প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায়) ৩৬৬ হইতে ৩৮৫ বাড়িয়াছে, ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৩৫ হইতে ৩৬৭ বাড়িয়াছে এবং ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৩৬৯ বাড়িয়াছে। ফিরিঙ্গী বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। সহরের উত্তরাংশে শ্রীমতীকুমারটুলি জোড়াবাগান এবং জোড়া-সাঁকো অঞ্চলে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে; অস্তদিকে পার্কট্রীট,

ফিরিঙ্গী টেরেস এবং কলিকাতার ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

উপরে বাহা দেখাইলাম, তাহার রহস্য বুঝিতে হইলে আর-একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। যে সহরে পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত কম, সেখানে দুর্নীতি ও বৈশ্য-বৃত্তির আধিক্য হইবেই। সমস্ত কলিকাতা সহরে ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৪৯৮১১৩ বা ৫ লক্ষ জন; তার মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ১০৩৩৯৭ জন বা ১ লক্ষের কিছু উপরে। ইহাদের মধ্যে, কলিকাতায় ৮৮৭৭, সহরতলীতে ৬৪১ এবং হাওড়ায় ১২৯৬ জন স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ্য বৈশ্য বুলিয়া লেখা হইয়াছে। বাদবাকী কত স্ত্রীলোক যে “অপ্রকাশ্য, বৈশ্য”, বা “হাফ্ গেরল্ড”, তাহা অনুমানেই বুঝা যায়। ধরিতে গেলে সহরে প্রকৃতপক্ষে বৈশ্যের সংখ্যা প্রতি ১৮ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন। এক সম্প্রদায়ের লোক “জাত বৈশ্য” বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়; ইহাদের স্ত্রীলোকের অনেকেই বৈশ্যবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করে। কলিকাতা সহরে ‘জাত-বৈশ্যদের’ মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৫৯ জন ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের ‘জাত বৈশ্য’ স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১১৭০ জন এবং ৪০-এর উপরে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১৪৫৮ জন। এই-সমস্ত অধিবস্তু ‘জাত বৈশ্য’ স্ত্রীলোকগণই কি, পানওয়ালী, ‘বাড়ীওয়ালী’ প্রভৃতির ব্যবসা করে। ফিরিঙ্গীদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। গাঁহার কলিকাতার প্রভৃতি অঞ্চলের খবর রাখেন, তাহার ইহার রহস্য বুঝিতে পারিবেন। —আনন্দবাজার-পত্রিকা

কালাজুরের অত্যাচার—

ম্যালেরিয়া, কালাজুর এখন একমাত্র পল্লীগ্রামে নিবন্ধ নহে, কলিকাতায়ও কালাজুর দেখা দিয়াছে। ১৯২২ সালে কলিকাতায় ৬০০০ লোক কালাজুরে ভুগিতেছে বলিয়া কর্তৃপক্ষ সাধারণকে জানাইয়াছেন। সরকার আশঙ্কা করেন যে ইহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিলে আগামী ৫৬ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার লোকসংখ্যা শতকরা ৬০ হইতে ৮০ জন কালাজুরে আক্রান্ত হইবে।

এখন বঙ্গদেশে প্রায় ২।৩ লক্ষের পর রোগী কালাজুরে ভুগিতেছে। ১৫টি জেলার জেলাবোর্ড কালাজুর চিকিৎসার জন্য বিশেষ কেন্দ্র খুলিয়াছে। ত্রিপুরা ৮, ফরিদপুর ১৫, মালদহ ৮ এবং রাজসাহীতে ১২টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে (কলিকাতার বাহিরে) প্রায় ২০০ চিকিৎসালয় আছে, সমস্তগুলিতেই কালাজুরের কেন্দ্র হইতে পারে। এবং ৭০০ গবর্ণমেন্ট কালাজুর নিবারণ কাজে দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া প্রকাশ। বখায় জীবন-মরণ-সমস্তা তথায় গবর্ণমেন্ট এত কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? —যশোহর

দান ও সদহুষ্ঠান—

শ্রীমতীকুমারনাথের জাতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের টেরিটোরিয়াল ফোর্সে এক লক্ষ এবং ছাত্রগণের দৈনিক উন্নতি সাধন করিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।—যশোহর

অনাথ-আশ্রমে দান।—কলিকাতার মুসলমান অনাথ-আশ্রমের সাহায্যকল্পে নিজাম ১০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—২৪ পরগণা বার্তাবহ

মহিষদলের রাজার দান।—মেদিনীপুর কলেজের বাটী নির্মাণ

ফণ্ডে মহিষাঘলের রাজা পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় বি-এস-সি শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি রাখিবার ঘর নির্মিত হইবে।—সম্মিলনী

তমলুকে বয়ন-বিদ্যালয়।—তমলুক হ্যামিটন হাই স্কুলের সহিত একটি বয়ন-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তমলুকেব ভূতপূর্ব সবডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার ইহার উন্নতি-কল্পে ৭৫ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সবডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয়ও ৪৫ টাকা দান করিয়াছেন। জেলাবোর্ড হইতে মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।—নীহার

সদনুষ্ঠান।—সম্প্রতি কালীঘাটে কালীমাতার মন্দিরের সন্নিকটে একটি ধর্মশালা নির্মাণের জন্য স্থান শ্রীযুক্ত হরিরাম গোয়েন্দা পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি টাকাটা কলিকাতা কর্পোরেশনে জমা দিয়াছেন।—২৪ পরগণা বাস্তাবহ।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর এক শাখা পাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার হিতসাধন মণ্ডলীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র পাবনা গমন করিয়া তথায় জনহিতকর কার্যে সাধারণের উৎসাহ জাগ্রত করিয়াছিলেন। শীতলাইএব জমিদার ও অন্যান্য বহু লোক বিনা পয়সায় কালাহরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম চেষ্টা দেখিয়া লর্ড লিটন হিতসাধন মণ্ডলীর কার্যের সাহায্যেব জন্য ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ভবানীপুর ৩১ নং কালীঘাট বোডস্থিত নিখিল ভারত অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় আশ্রমের পক্ষ হইতে জানাইতেছেন যে, আশ্রমে সম্প্রতি নিম্নলিখিত রূপ দান পাওয়া গিয়াছে।—শ্রীযুক্ত যৌথ মনাজী জোহার ২০০০ ; কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ১২৭১/০ ; পান্নালাল দে ১৫০০ ; কুমারকৃষ্ণ মিত্র ২০০০ ; গৌরচন্দ্র লাহা ১০০০ ; চুণিলাল মতি লাল ৫১০ ; মোট ৮১৮১/০। দেশের সহৃদয় ভ্রাতৃ মহোদয়গণ এই সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

কর্পোরেশনের সভায় চেয়ারম্যান জানান যে কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিজ নামে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কর্পোরেশনের হস্তে ২৫,০০০ ও তাঁহার মাতার নামে একটি মাতৃ নিবাস 'মেটাব্‌নিটা হোম' স্থাপনের জন্য তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অনুমান ৭৫,০০০ দান করিয়াছেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা

বিখ্যাত স্বদেশী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস মশাই তাঁর গুরু অশ্বিনী-কুমারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্ববাজ সেবক সঙ্ঘের কর্মীদের জন্য এক হাজার টাকা দান করেছেন। —বিজলী

কলিকাতার নিকটবর্তী পাইকপাড়ার সদাশয় জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের স্থায়ী বাড়ী নির্মাণের জন্য, সাঁওতাল পরগণার দেওঘর সহরের প্রান্তভাগে ৬০ বিঘা পরিমাণ জমি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া সর্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা

শোক-সংবাদ —

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী বাবু দাশরথি সান্যাল মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৬০ বৎসর পূর্বে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বরাহনগর নামক স্থানে বাবু দাশরথি সান্যালের জন্ম হয়। শৈশবে তাঁহার আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না ; হুতরাং নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তিনি

অল্পদিনের মধ্যেই ফৌজদারী মোকদ্দমার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবী হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্বদেশী মামলার তিনি দেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।—সোণার বাংলা

শ্রীযুক্ত সুর্য্যকুমার অগস্তি পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অগস্তি একজন ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার উন্নতি সংশ্লিষ্ট সকল কার্যেই তিনি যোগদান করিতেন। ১৯২২ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী যখন মেদিনীপুরে যান তখন মেদিনীপুরবাসীর পক্ষ হইয়া শ্রীযুক্ত অগস্তি তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।—বন্দেমাতরম্

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ নলিনীনাথ রায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র ৩০ বৎসর বয়সেই তিনি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। যশোহরের প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর অনুষ্ঠানেই সহিতই তাঁহার আশ্রয়, যোগ ছিল। তিনি দেশ হইতে কালান্ধব ও মালেরিয়া দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। —যুগবাস্তী

সমাজের কথা —

বিপরীত ছুঁৎমার্গ।—“আনন্দবাজার পত্রিকা” বলেন,—টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হোস্টেলের বাড়ীতে, আমাদের বিশুদ্ধ উচ্চদের হিন্দু-ঘরের ছেলেরা, মুসলমান-ভাইদের সঙ্গে এক ঘরেই বসবাস করেন। হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির এটা খুব ভাল আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু নমঃশূত্র ছেলেদের সেখানে বসবাস করিতে দেওয়া হয় না। তাহা হইলে ঐ বিশুদ্ধ হিন্দু-সন্তানদের ছুঁৎমার্গ রূপ পরম আধ্যাত্মিক আচরণের ব্যাঘাত হয়। যদি কোন নমঃশূত্র বিদ্যার্থী উঁচু জাতের ছেলেদের সঙ্গে পাইতে চায় তবে ধর্ম ও নামটা বদলাইতে হইবে। ছুঁৎমার্গ ব্যাধিটা যে কি প্রকার, এই দৃষ্টান্ত থেকে কতকটা বুঝা যায়। —সম্মিলনী

সম্প্রতি গোলন্দপাড়ার ব্রাহ্মণদের এক সামাজিক সভা হইয়াছিল। গোলন্দপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধক্রমে তথাকার ব্রাহ্মণ সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামস্থ তাৎ ব্রাহ্মণদিগকে ঐ দিন প্রাতঃকালে স্বীয় গৃহে আহ্বান করিয়া বিলাতফেরতদিগের সম্বন্ধে যথাকর্তব্য আলোচনার ব্যবস্থা করেন। সভায় গ্রামের যুবক বৃদ্ধ সকল ব্রাহ্মণই উপস্থিত হইয়াছিলেন। নানারূপ আলোচনার পর সভায় স্থির হইয়াছে—(১) বিলাত-যাত্রা কোনরূপ দোষাবহ নহে; বিলাত যাইয়া কেহ অশ্রায় কাজ করেন না। (২) সমাজে থাকিবার জন্য বিলাতফেরতকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। (৩) বিলাতফেরত লোক সমাজে থাকিতে চাহিলে তিনি সমাজপতিকে সেই কথা জানানমাত্র সমাজপতি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের এক সভা আহ্বান করিবেন; সেই সভায় বিলাতফেরত এইমাত্র জানাইবেন যে তিনি সমাজে থাকিতে চান। সমাজে থাকিবার জন্য তাঁহার এই উক্তিই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা সভার মস্তব্যঙুলিতে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদের কয়েকটি ব্রাহ্মণ সমাজও সম্প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের বর্তারা এই সকল স্নেহ-কাণ্ডের কোন সংবাদ রাখেন কি ?

—সম্মিলনী

গ্রামবাসীদের সংসাহস—

ত্রিপুরা জেলার কসভা থানার এলাকাগামী রাস্তায়

জন ডাকাত ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। ডাকাতেরা নগদে এবং গহনাপত্রে ৩৮০০ টাকা লইয়া পলাইতেছিল। এমন সময় গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতদের কাছে বন্দুক ছিল, বোমা ছিল, রামদা প্রভৃতি সাজ্জাতিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাহাতে ভীত না হইয়া জোট বাঁধিয়া ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই চালায় এবং ৫ জন ডাকাতকে ঘায়েল করে; ইহাদের মধ্যে দুইজনকে তাহারা তখনই ধরিয়াছিল, পরে আর-একজন ধরা পড়িয়াছে। এই গ্রামবাসীরা ডাকাতের দলকে আক্রমণ করিয়া প্রকৃত সংসাহস দেখাইয়াছে। এমন সংসাহসের অভাবেই আমরা অধিকাংশ সময় বিড়ম্বিত হই। বাংলাদেশে এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানকার লোকে “ডাকাত পড়িল” শুনিলে ঘবে পালায়।... এই-সকল দুর্ভাগ্যকে মায়েস্তা করিবার জন্ত আনাদিগকেও সজ্ঞবদ্ধ হইতে হইবে—এইজন্ত আমরা গ্রামরক্ষা সমিতি গঠনের উপর এতটা জোর দিয়া থাকি।—স্বরাজ

— সেবক

ভারতবর্ষ

৪৩ মাইল সাতার—

এলাহাবাদে হিন্দুস্থান সুইমিং এসোসিয়েশন নামে সস্তরকারীদের এক সমিতি আছে। সেই সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বালক সস্ত্রতি প্রয়াগের ত্রিবেণী ঘাটের এক মাইল দূরে সোমেশ্বর হইতে ১৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরিয়া ৪৩ মাইল গঙ্গার উপর সাতার দিয়াছিলেন। তাহার এ সাহসিকতা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। ইনি নাকি ইংলিশ্ চ্যাম্পিওন অতিক্রম করিবারও সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কাকিনাড়া কংগ্রেস —

অন্ধ্রদেশে কাকিনাড়া সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মোলানা মহম্মদ আলি মুভাপতির আসন অসঙ্কুত করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে।

(১) কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসেই শেষ সমাপ্ত হইবে। নির্ধারিত সময় ব্যতীত অল্প সময়ে কংগ্রেস ডাকিতে হইলে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি পূর্বে যথারীতি বিজ্ঞাপন দিবেন। প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটির অধিকাংশের অনুমোদন অনুসারেও কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহৃত হইতে পারিবে। নিখিল ভারত-রাষ্ট্রীয় সমিতি এই অধিবেশনের স্থান এবং সময় নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং কংগ্রেসের নিয়মানুসারে অস্থায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাব নির্দেশ করিবেন। পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ এক প্রদেশ বলিয়া ধরা হইবে এবং সেই অনুসারে কংগ্রেসের প্রদেশের সংখ্যা নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপণ উক্ত কমিটির অধীনস্থ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিকে তাহাদের কার্যের বাৎসরিক রিপোর্ট-৩০ নবেম্বরের মধ্যে নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-সমিতি নিকট দাখিল করিতে হইবে। প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনের মধ্যে যাহারা কংগ্রেসের টাকা দিয়াছেন কেবলমাত্র তাহারাই কংগ্রেসের নির্বাচনে যোগদান করিতে পারিবেন। ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উহা বাহাল থাকিবে।

(২) পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু প্রস্তাব করেন—দিল্লী-কংগ্রেসে



মোলানা মহম্মদ আলি

গঠিত কমিটি ভারতের জাতীয় চুক্তিপত্র এবং বাংলার জাতীয় চুক্তিপত্র সম্বন্ধে দেশের মতামত সংগ্রহ করিয়া আগামী মার্চ মাসের ৩১শে তারিখে ভিত্তি নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-সমিতির নিকট এসম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দাখিল করিবেন। এবং নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-সমিতি এসম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। উক্ত কমিটির সভ্য সর্দার মহাতাবসিং কাবারুদ্ধ থাকায় তাহার স্থানে জাশবালের সর্দার অমরসিংকে সভ্য নির্বাচিত করা হইক।

শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ এই প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এই প্রস্তাবের ভিত্তি হইতে “বাংলার জাতীয় চুক্তি” এই কথা কয়েকটি তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কথা কয়েকটি তুলিয়া দিয়াই প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে।

(৩) পণ্ডিত জহালাল নেহেরু কংগ্রেসের গঠন মূলক কার্য-সাধনের জন্ত স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে।

(৪) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি অপমানসূচক ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ভারত হইতে বিদেশে শ্রমিক পাঠানো একেবারে বন্ধ করার জন্ত দেশবাসীকে পরামর্শ দেওয়া সঙ্গত এবং এই উদ্দেশ্যে সমস্ত বিষয় ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে এক সর্ব-কমিটি নিযুক্ত করিবার জন্ত অনুরোধ করা উচিত।

(৫) শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়ার প্রস্তাব করেন—(ক) কলিকাতা

নাগপুর আহমদাবাদ গয়া এবং দিল্লীতে যে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এই কংগ্রেস তাহা পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন। দিল্লী-কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাতে লোকের মনে স্কুল কলেজ আদালত এবং কাউন্সিল বর্জন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া একটি সন্দেহের উদয় হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেস আবার ঘোষণা করিতেছেন যে এসম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির কোল্লঙ্ঘন পরিবর্তন হয় নাই। (খ) কংগ্রেস দেশ-বাসীর নিকট এই আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন বন্দোবস্তীতে গৃহীত গঠনমূলক কাগ্যতালিকা অনুসরণ করেন এবং আইন অমান্যের জন্ত প্রস্তুত হন। (গ) এই কংগ্রেস প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, দ্রুত উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত কমিটিগুলি যেন অবিলম্বে কায়ে প্রস্তুত হন।

(৬) কংগ্রেসের কাগ্যের পরিচালনার জন্ত কংগ্রেসের কাগ্যকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদেশে প্রদেশে কাগ্যালয় গঠন করিতে হইবে। ঐ সকল কাগ্যালয়ে বেতনভুক্ত কাম্বাচী থাকিবেন।

(৭) মৌলানা শৌকৎ আলির প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচন সমিতিতে একটি নিখিল ভারত-গদর বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শেঠ যমুনালাল বাজাজ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মৌলানা শৌকৎ আলি অন্ত্যতম সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ভারতের সকল গদর প্রচলন এবং সাধারণ ভাণ্ডার হাতে যে ব্যাপ্ত আছে তাহার অতিবিক্ত অর্থ সংগ্রহ করাই এই বোর্ডের উদ্দেশ্য হইবে। এই বোর্ড প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিগুলির সহিত মিলিয়া কাজ করিবেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গদর-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর পরিদর্শন-ক্ষমতা প্রায়োগ চাড়াও নুহন নুতন গদর-প্রতিষ্ঠান খুলিতে যত্নবান হইবেন।

(৮) শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সভাবকাবকে দীর্ঘকাল কারাবদ্ধ করিয়া রাখায় গবর্নমেন্টের উপর দোষাবোপ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৯) আগামী বৎসবে কংগ্রেসের অধিবেশন কর্ণাটকে হওয়ার জন্ত কর্ণাটকে যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

(১০) একটি প্রস্তাবে কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং কেনিয়া কংগ্রেসের ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে ভারতের পক্ষ হইতে কেনিয়া-প্রবাসীদিগকে আন্তরিকতা জানাইবার জন্ত অনুরোধ দেওয়া হইয়াছে।

(১১) একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গুরুদ্বার প্রবন্ধক-কমিটি এবং অকালীদের বিকল্পে গবর্নমেন্টের কার্যাবলী যাবতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং অহিংস-অসহযোগের বিকল্পে অভিযান। কংগ্রেস সমগ্র দেশবাসীকে অর্থ ও লোকচর্নের দ্বারা অকালীদের সাহায্য করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন।

খিলাফৎ কন্ফারেন্স—

মৌলানা শৌকৎ আলি এবার কাকিনাডায় খিলাফৎ কন্ফারেন্সের সভাপতির আনন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় যে সব প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে নিম্নে তাহাব কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

(১) খিলাফৎ সভা এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দাবী করিতেছেন।—(ক) তুর্ক-সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। (খ) খেঁস প্রত্যর্পণ। (গ) স্মার্মা ও এশিয়া-মাইনরের উপকূল প্রত্যর্পণ। (ঘ) জজিরৎ-ইল-আরবের স্বাধীনতা ও রক্ষা।

লোজানের সন্ধিতে এই দাবীগুলির প্রথমটি মাত্র পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু জজিরৎ উল আরবের রক্ষার দাবী এখনো পূর্ণ হয় নাই। এই সভা



মৌলানা শৌকৎ আলি

স্পষ্টভাবে এবং শেষবার ঘোষণা করিতেছেন যে, আরবের সকল প্রদেশকে স্বাধীন ও সুশাসিত করিতে হইবে। সমস্ত মোসলম-জগৎ এজন্ত যথাসাধ্য সংগ্রাম করিবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হইবে না।

(২) এই সভা জাতীয় চুক্তি ও স্বরাজ্যদলের চুক্তির নিম্নলিখিত মূল নীতিগুলি স্বীকার করিয়া লইতেছেন। (ক) লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। (খ) যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অল্প সে সম্প্রদায়কে বক্ষা করিতে হইবে। (গ) ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির ভিতর মৌহাদ্দী স্থাপন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের সমস্ত খিলাফৎ কমিটি ও অপবাপর মুসলমান সমিতিগুলি জাতীয় চুক্তি ও স্বরাজ্যদলের চুক্তি এই দুই চুক্তির সম্যক আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রাদেশিক-খিলাফৎ-কমিটির সাহায্যে এক সার্ব-কমিটির কাছে প্রেরণ করিবেন। এই সার্ব-কমিটিকে

আবার ১৯২৪ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয়-খিলাফৎ-কমিটির কাছে রিপোর্টে দিতে হইবে। সাব-কমিটির সদস্যগণের নাম মোলানা আবুল কালাম আজাদ, মোলানা আবুল সদর বাবিলী ও আই এ কে শেরুওয়ানি।

(৩) স্বরাজলাভ করা মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয়মোদিত কর্তব্য।

(৪) হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-বন্ধন হৃদয় করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ই যেন উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যস্থানগুলি রক্ষার জন্ত যত্নবান হন। দাঙ্গাকারীরা যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, তাহাদিগকে বাধাদানের চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

(৫) খিলাফৎ-কমিটিগুলির পুনর্গঠনের জন্ত কার্যনির্বাহক-কমিটির উপর ভার দেওয়া হইবে এবং জঞ্জিরৎ-উল-আরব ও ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার জন্ত মাসিক ও বাৎসরিক চাঁদা এবং এককালীন দানের জন্ত আবেদন করিতে হইবে।

(৬) আর্ধ্যসমাজ প্রচারকার্যের জন্ত বেতন দিয়া লোক রাখিয়া থাকে। সেইরূপ বেতনভুক্ত খিলাফৎ কর্মীও নিযুক্ত হওয়া দরকার।

বোর্সাদে সত্যগ্রহ—

বোম্বাই-গভমেণ্ট গুজরাটের কায়রা জেলার বোর্সাদ তালুকে নিগ্রহ-পুলিশ-ট্যাঙ্ক বসাইয়াছিলেন। ঐ তালুক, ট্যাঙ্ক দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া স্থানে স্থানে সত্যগ্রহ আশ্রম খুলিয়াছে। এই আন্দোলনে বল্লভভাই পটেল অধিনায়কত্ব করিতেছেন। বোর্সাদ তালুকের অধিবাসীরা জাতিতে অধিকাংশই 'ধারালো'। তাহাদের কয়েকজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা, তাহারা স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বহু তালুকের ভয়ের কারণ। বোম্বাই-সরকার সেইজন্ত এই তালুকে নিগ্রহ-পুলিশ মোতায়েন করেন। কয়েকজন গুণ্ডা যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই প্রায়শ্চিত্তের জন্ত দরিদ্র জন-সাধারণকে ট্যাঙ্কের ভার বহন করিতে বলা উদ্বোধন পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং জন-সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই লোকে সত্যগ্রহ করিয়া ট্যাঙ্ক দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। 'ভয়েস অব ইন্ডিয়া' জানাইয়াছেন যে, এই অপরাধে সরকারী কর্মচারীরা লোকজনের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। কিন্তু স্থানীয় আমিকেরা এই-সব বাজেয়াপ্ত-করা জিনিষপত্র বহন করিতেছে না। ফলে নিগ্রহ-পুলিশদের ঘারাই সেগুলি বহাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। দরবার শ্রীগোপাল দাস দেশাই তাহার ১০নং সত্যগ্রহ-ইস্তাহারে পুলিশের লোকজনকে কুলীর কাজ করিতে নিষেধ করিয়া কেবল মাত্র পুলিশের কর্তব্য পালন করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন।

গত ২২শে ডিসেম্বর বোর্সাদে অনেক লোকের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, কিন্তু সেজন্ত কোনো ইস্তাহার পূর্বে জারি করা হয় নাই। বাজেয়াপ্ত জিনিষপত্রের মূল্যের হিসাব প্রায়ই করা হয় না। সময় সময় রসিদও দেওয়া হয় না। বাজারে জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করিবার সময় সেগুলি বহন করিবার নিমিত্ত পুলিশ মোটর-গাড়ী সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া থাকেন, কিন্তু চালকের অভিজ্ঞতার অভাবে সেদিন তিনটি শিশু চাপা পড়িয়া জখম হইয়াছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর খাণ্ডেশ্বরের কয়েকজন খৃষ্টিয়ান চামারের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাহারা কোন পাদরীর চিঠি লইয়া কলেজটারের সঙ্গে দেখা করে। উক্ত খৃষ্টিয়ানদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

পালজ নামক স্থানে একজন দরিদ্র চামারের দেয় পাঁচ টাকা ট্যাঙ্কের জন্ত কুড়ি টাকা মূল্যের একটি গরু বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

পরে (৮।১।২৪ তারিখে) খবর পাওয়া গিয়াছে যে সত্যগ্রহের জয় হইয়াছে, গভমেণ্ট নিগ্রহ-পুলিশ সবাইয়া ট্যাঙ্ক মক্ষ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

খিলাফৎ-প্রতিনিধি—

সর্ব-ভারত-খিলাফৎ-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতবাসী মুসলমানদের মত ব্যক্ত করিবার জন্ত আঞ্জোরায় একদল প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে। হাকিম আফমুল খাঁ সেই দলের মুখপাত্র হইবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন :— মোলানা মহম্মদ আলি, ডাঃ আনসারি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মোতিলাল বা জহরলাল নেহরু, মোলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মোলানা মুএজ্জন আলি (সম্পাদক)। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ইঁহারা যাত্রা করিবেন।

মুসলমান মহিলা-বন্ফারেন্স—

সম্প্রতি আলিগড় সহরে মুসলমান মহিলাদের একটি কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, পঞ্জাব এবং অম্বালা প্রদেশের বহু মুসলমান মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের মিসেস মমতাজ ইয়ারজঙ্গ সভানেত্রী আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কনফারেন্সে মুসলমান-সমাজ-সংস্কার-সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাব হইতেছে এই—দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান বালিকা স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিবে। মুসলমান-সম্প্রদায়ের ভিতর বহুবিবাহ এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রথার প্রতিবাদ করিয়া, এক পত্নী থাকিতে কোনো মুসলমানেরই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা সঙ্গত নহে, এই মর্মে আর-একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশী শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার করিয়া দেশী শিল্পের উন্নতি করিবার জন্ত চেষ্টা করা উচিত, এই মর্মেও কনফারেন্স একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

নারীদের জাগরণ ভিন্ন কোনো জাতিরই উন্নতি সম্ভবপর নহে। মুসলমান নারীদের জাগরণে পূর্বাভাস সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়েরই উন্নতির অগ্রদূত—তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলের অধিবেশন—

লক্ষ্মী সহরে ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনুর্ত জাতির প্রতি হিন্দু-সমাজের সহানুভূতি প্রদর্শন নিখিল-ভারত-হিন্দু-সংগঠন, কলিযুগে আপকর্ষের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দু-সমাজের প্রতি সাধুদের কর্তব্য, মালুকানা রাজপুতদের শুদ্ধিক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

জাতীয় চুক্তিপত্র—

কংগ্রেসের সাব-কমিটি 'Indian National Pact' নাম দিয়া একটি প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপি তৈরী করিয়াছেন। তাহার মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

(১) ভারতের জন্ত স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়েরই অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য। প্রত্যেক স্বাধীন জাতি তাহার নিজের দেশে যে সব সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে স্বরাজ ভারতবর্ষে সেই-সব সুবিধা ও অধিকার প্রদান করিবে।

(২) স্বরাজ গভমেণ্ট গণতন্ত্রমূলক হইবে এবং তাহা বিভিন্ন

প্রাদেশিক গবর্নমেন্টসমূহের এক সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হইয়া এই গবর্নমেন্টের রীতি নীতি স্থির করিবেন।

(৩) হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে। উহা দেব-নাগরী বা উর্দু যে-কোন অক্ষরে লেখা চলিবে।

(৪) সকল সম্প্রদায়কে ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাভাব্য অর্থাৎ ধর্ম বিজ্ঞান, পূজাপদ্ধতি, ধর্মপ্রচার, ধর্ম-সমিতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্বাভাব্য দেওয়া হইবে। এই স্বাভাব্য সম্প্রদায়সমূহের একটা বৈধ অধিকার হইবে। এ অধিকারে গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উল্লিখিত অধিকার ভোগ করিতে হইবে। কেহ অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার জন্ত বলপ্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৫) কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত করা হইবে না। সরকারী অর্থ কোনো ধর্মের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে না।

(৬) স্বরাজ গবর্নমেন্টকে ভিতরের বা বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হিন্দু-মুসলমান-প্রমুখ সবল সম্প্রদায়েরই কর্তব্য হইবে।

(৭) বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা যেকপ তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদের রাজনৈতিক বোধ ও দায়িত্বজ্ঞান এখনও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে নাই এ-কথা স্মরণ রাখিয়া, যে সকল সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম, আরো কিছুদিন তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া চলিতে হইবে। এজন্য স্বরাজ গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভা-গুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত প্রতিনিধি প্রেরণের স্বতন্ত্র রকম ব্যবস্থা থাকিবে।

(৮) ইদুজ্জাহা পর্ব ব্যতীত মুসলমানেরা গোহত্যা করিতে পারিবেন না। সে সময়েও গোহত্যা এমন ভাবে করিতে হইবে, যেন হিন্দুদের মনে কোনরূপ আঘাত না লাগে।

(৯) স্থানীয় মিলন-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পূজার সময়ে ব্যতীত ধর্মস্থানের সম্মুখে গান বাজনা করা চলিবে না।

(১০) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিছিল যদি একই তাবিখে বাহির হয় তবে স্থানীয় মিলন পরিষদ মিছিলগুলিব জন্ত বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন রাস্তা নির্দেশ করিয়া দিবেন।

(১১) দুর্গোৎসব, মহরম, রথযাত্রা, শিখ-দেওয়ান প্রভৃতির সময় যাহাতে কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্ত প্রাদেশিক ও স্থানীয় সম্মিলিত-পরিষদ নিযুক্ত করিয়া আপোষ ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হইবে।

(১২) সমস্ত প্রাচ্যজাতির এক সমবায় গঠন করিতে হইবে। এ সমবায়ের উদ্দেশ্য—প্রতীচীর অর্থগুরুতা হইতে আত্মরক্ষা করা এবং প্রাচ্যের শিক্ষাশিল্প প্রভৃতিকে উৎসাহিত করা।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পণ্য বয়কট—

বোম্বাই গির্গাওয়ের জেলা-কংগ্রেস-কমিটি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পণ্য বয়কটের জন্ত রীতিমত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। স্থানীয় স্বরাজ্য পার্টি ও শ্রাণনালিষ্ট মিউনিসিপ্যাল পার্টিও সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সর্বত্র এই বয়কট ব্যবস্থা অনুসারে আন্দোলন চালানো হইবে।

বিধবা-বিবাহ—

লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক-সভার উদ্যোগে গত নবেম্বর মাসে ভারতের সর্বত্র ৬১টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ইংরেজী বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে নবেম্বর মাসের শেষদিন পর্যন্ত সমগ্র ভারতে মোট ৭৭৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। পরিণীতা বিধবাদের



শ্রাব আলি ইমাম

ভিতর পঞ্জাবের ৫৯৫টি, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশের ৪টি, সিন্ধুর ৩০টি, দিল্লীতে ২৭টি, যুক্তপ্রদেশে ৮০টি, মাদ্রাজের ৫টি, বাংলার ১১টি, এবং বোম্বায়ে ২১টি।

শ্রাব আলি ইমাম—

'ভয়েস অব ইণ্ডিয়া'তে প্রকাশ, শ্রাব আলি ইমাম পুনরায় নিজাম-বাজ্যের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইবেন। অতঃপর বেয়ার প্রদেশ ফিবিয়া পাইবার নিমিত্ত বিলাতে আবেদন আর নিবেদনের খালা বহিয়া বেড়াইবেন শ্রাব আলি ইমামের বদলে শ্রাব কে জি গুপ্ত। শ্রাব আলি ইমামের কাজের দক্ষিণা হইবে মাসিক ১৫০০০ টাকা। ইহা অত্যন্ত অধিক বেতন। প্রবল-পরাক্রান্ত জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ইহার দশমাংশ অর্থাৎ মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতন পান।

পটুকোটায় নতন ব্যবস্থাপক সভা—

পটুকোটা ব্যবস্থাপক আড্ডাইসরী কাউন্সিল উঠাইয়া দিয়া নতন ব্যবস্থাপক সভা করা হইবে। এই সভায় স্ত্রীলোকদিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইবে। অনেক মহিলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপ্রদ-প্রার্থী হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রা—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অল্প দিনের ভিতরেই একদল ভারতীয় পণ্ডিত সহ চীন জাপান স্রমাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্ম-বহুল দেশ পরিভ্রমণে গমন করিবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া এ বিষয়ে নাকি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের জন্ত অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

রায়বাহাদুর শেঠ বলদেও দাস বিরলা বিশ্বভারতীর জন্ত বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গোমাংস আমদানীর স্কীম—

শ্রীযুক্ত জসোয়ালী অষ্টেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে গোমাংস আমদানী করা সম্বন্ধে একটি স্কীম খাড়া করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে গত ১৩ই ডিসেম্বর নিখিল-ভারত-গো-রক্ষা-সম্মিলনের কার্যক্রমী সমিতির

আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সমিতির মতে এই স্বীকৃত অর্থনীতির দিক হইতে অস্ববিধাজনক হইবে এবং উহাতে গো-হত্যা সম্বন্ধে অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। ফলে ভারতে গোহত্যা বৃদ্ধি হইবে। এইসব দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া সম্মিলনী স্বীকৃতি গ্রহণ করেন নাই।

মহাত্মার স্বাস্থ্য—

বোম্বে কনিকল সংবাদ দিতেছেন যে, শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী গত ১৮ই ডিসেম্বর জেলে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মহাত্মার যেকোন শারীরিক অবস্থার কথা শোনা যাইতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পূর্বে তাঁহার দেহের ওজন ১৩ সের কমিয়া গিয়াছিল, পরে আবার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শেষোক্ত সংবাদে প্রকাশ যে তাঁহার দেহের ওজন বর্তমানে মোটে ৯৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৮ সের মাত্র। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার ওজন ১০৮ পাউণ্ড ছিল, কিছুদিন পরে ৩ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল মহাত্মার স্বাস্থ্য সংবাদ অবগত হইবার জন্ত বোম্বাই সরকারের নিকট নাকি পত্র লিখিয়াছেন। মহাত্মার ডাক্তার তালবারকার এবং কাম্বুগাও মহাত্মার ডাক্তারী পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গবর্নমেন্টের নিকট পত্র দিয়াছেন। কিন্তু কেহই এপর্যন্ত উত্তর পান নাই।

ব্রহ্মের শিক্ষা-ব্যবস্থা—

ব্রহ্মদেশে ইংরেজী স্কুল খুলিবার সময় গ্রাব বর্ণ-বেশম্মা বাখা হইবে না বলিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন। ঐ নীতি অনুসারে তাঁহার ইউরোপীয় শিক্ষানবীশ ও অনাথদের বৃত্তি এবং ইউরোপীয় বেতন-ভাতার তুলিয়া দিবেন। ইউরোপীয়দের জন্ত আর বিশেষ বৃত্তি থাকিবে না এবং রেঙ্গুন আকিয়াব মৌলমীন ও মন্দালয়ে জাতি-ধর্ম-নির্ধায়ে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত নূতন বোর্ড গঠিত হইবে।

নাগরিক প্রহরী—

দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে বোম্বাই গিবর্গাওয়েব জেলা-কংগ্রেস-কমিটি “নাগরিক প্রহরীদল” নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ডাক্তার সব্বকার্ সে বোর্ডের সভাপতি হইয়াছেন। স্থানীয় জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সদস্যরা উক্ত স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিতে পারিবেন। ডিল্লি, লাঠি খেলা, সাঁতাব, সাইকেল চড়া, আহতের প্রাথমিক চিকিৎসা, এম্বুল্যান্সের কাজ প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটির সংসাহস—

অন্ধ্রদেশের কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে মৌলানা মহম্মদ আলি এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সেখানে গমন করিলে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

গত ১৯২১ সালে কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি মহাত্মা গান্ধীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে স্বকার হইতে আদেশ দেওয়া হয় যে, স্বকারের অনুমতি না লইয়া এই-সব কাজে অর্থব্যয় করিলে তাহা মঞ্জুর করা হইবে না। সরকারে এই আদেশ অমান্য করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি সেই বৎসরেই পুসিফুট জনসনকে অভিনন্দিত করেন—তাহাতে চারি টাকা ব্যয় হয়। এই চারি টাকার ব্যাপার লইয়া এখনও গবর্নমেন্টের সহিত মিউনিসিপ্যালিটির চিঠি লেখালেখি চলিতেছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন যখন অন্ধ্রদেশ পরিভ্রমণে বাহির হন তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত এক অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত হয়। এপর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট এবং গবর্নমেন্ট এই-সমস্ত বিল মঞ্জুর

করেন নাই। এসমস্ত সম্বন্ধে কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি মৌলানা মহম্মদ আলিকে এবং চিত্তরঞ্জনকে আবার অভিনন্দিত করিয়া বিশেষ সংসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রতন টাটার দান—

পরলোকগত শ্রীর রতন টাটা সর্বসাধারণের উপকারার্থে দানের জন্ত যে তহবিল রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ মাসে ২,৬৮,৭০০ টাকা দান করা হইয়াছে। ইহার ভিতর ২৮,০০০ টাকা ধরমপুত্র যক্ষ্মা-হাঁসপাতালের জন্ত; ৩০,০০০ টাকা নাগপুর মিওর হাঁসপাতালের জন্ত; ২৮,৫০০ টাকা আহমদাবাদ রতন টাটা অনাথ-আশ্রমের জন্ত; ২৫,০০০ টাকা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীর জন্ত; ২০,০০০ টাকা জমশেদপুর টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের জন্ত; ২১,০০০ টাকা লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে সমাজবিজ্ঞানের একটি ক্লাস খুলিবার জন্ত; ২০,০০০ টাকা জাপানের ভূমিকম্পে সাহায্যের জন্ত দেওয়া হইয়াছে।

খৃষ্টিয়ান সম্মিলন—

সম্প্রতি বাঙ্গালোবে নিখিল-ভারত-খৃষ্টিয়ান-সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ কে টি পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনে কেনিয়া ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেজন্ত দুঃখপ্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আর-এক প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া জাতীয় একতার জন্ত হিন্দু-মুসলমানের সহিত খৃষ্টিয়ানদিগকে এক যোগে কাজ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্বাচনের বিরুদ্ধেও এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বিদেশ

ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নবসম্মত --

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের চাপে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে চুক্তির মিলন নানা ভাবে নানা সময়ে হইয়া আসিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এইরূপ মিলন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-জীবনে একটি নূতন নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই নীতি ইতিহাসে Balance of Powers অর্থাৎ শক্তিপুঞ্জের সামর্থ্যের সমতা সাধন নীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নেপোলিয়ানের পরিচালনায় যখন ফ্রান্সের পক্ষে বিশ্বজয় সম্ভবপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল তখন তাহার গতিকে প্রতিহত করিবার জন্ত ইংরেজ ও প্রুসিয়ার মধ্যে এইরূপ একটি মিলন ঘটয়াছিল। তাহার পর শক্তিপুঞ্জ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিবার জন্ত নানারূপ চুক্তির মিলন ঘটাইয়াছেন, কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধির পর আর সে মিলন টিকিয়া থাকে নাই। রুশশক্তি যখন প্রবল ছিল তখন তাহার ভারত-অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্ক-শক্তিকে প্রবল রাখা অবিধাজনক বোধ হওয়াতে ইংবেজ তুরস্কের সহিত মিত্রতা করিয়া আসিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়াকে প্রবল করিয়া রুশের সহিত অস্বাভ্যাস্য সান্নিধ্যের মিলনের বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য ফরাসী ও ইংরেজ অষ্ট্রিয়ার প্রতিপোধকতা এক সময় খুবই করিয়াছিলেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর যখন রুশশক্তি হীনবীর্য হইয়া পড়িল তখন আর ইংরেজের তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সীতি রাখিবার বিশেষ

প্রয়োজন রহিল না। অপর দিকে জার্মান-সাম্রাজ্য ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠাতে ইংরেজ ও ফরাসীর পক্ষে জার্মানীর শক্তি যাহাতে আব বৃদ্ধিলাভ করিতে না পারে তাহার উপায় করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। প্রাচ্যে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনের মানসে জার্মানী তুরস্কেব সহিত হৃদয়তা স্থাপন করিয়া সার্ক-মোস্লেম (pan-Islamic) আন্দোলনের প্রতিপক্ষিতা করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যে জার্মানীর প্রভুত্ব বিস্তারে ইংরেজ ফরাসী ও রুশ বিব্রত হইয়া উঠিলেন। জার্মানীর বলবৃদ্ধি ফ্রান্স রাশিয়া ও ইংরেজের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়াতে উক্ত তিন শক্তি পবম্পরকে সাহায্য করিবার জন্য মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই তিন শক্তির সম্মিলিত প্রভাবেই ১৯০৭ করিবার ৩ন্য জার্মানী আবার অষ্ট্রিয়া ও ইতালীর সহিত মধ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে ত্রিমিত্রনিলনের (Triple Alliance) গতি ত্রয়ী (Triple Entente) রাষ্ট্রনীতির বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। এই দুইটি সম্মিলিত শক্তির স্বার্থের ধারা বিপরীতগামী হওয়াতেই বিগত বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বিশ্বযুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রধারায় যে নূতন আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছে, শক্তিপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে যে সন্দেহ জাগিয়াছে, স্বার্থের যে সংঘাত বাধিয়া উঠিয়াছে তাহাতে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নূতন সমন্বয় একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। স্বার্থের দায়ে আবার নূতন করিয়া মিলন এবং নববিবোধের সৃষ্টি হইতেছে। লোহ, তৈল এবং কয়লার মালিকানা লইয়া যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহার ফলে যে কালে একটা নূতন হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিবে তাহা বৃদ্ধিতে পারিয়া শক্তিপুঞ্জ আপনআপন বলবৃদ্ধির উপায় খুঁজিতেছেন; তাহার ফলে নূতন দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে।

ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঙ্খা পরস্পরকে বিপরীত পথে বহুদিন হইতে চালিত করিতেছে। ভূমধ্যসাগরের প্রভুত্ব লইয়াই ইতালী ও ইংরেজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা জাগিয়া উঠাতে ইংরেজ ইতালীর প্রতিকূল। সেইজন্য ইতালী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত হৃদয়তা করিবার জন্য ব্যাকুল। রুশ ও ইতালীর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতে দেখিয়া ফ্রান্স ইউরোপের বাজারে আপনার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সংক্রান্ত কতকগুলি রক্ষা করিয়া বসিলেন। মধ্য ইউরোপের এই রাজ্যগুলির কাঁচামাল বন্ধক রাখিয়া ফ্রান্স ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য টাকা বর্জ দিয়াছেন।

ইতালী যে সমস্ত স্থান হইতে তাহার নির্মাণ-শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করিত, ফ্রান্স একে একে সে-সমস্ত দেশকে হাত করিয়া লওয়াতে ইতালীর সন্দেহ জন্মিয়াছে যে ফ্রান্স ইতালীর ব্যবসা-বাণিজ্যকে ধ্বংস করিবার মতলব আঁটিয়াছে। ইতালীর এপোকা (Epoca) নামক সংবাদপত্র যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ ইংরেজী কাগজে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—“France is gradually laying hands on all the sources of raw materials in Europe and she is barely concealing her desire to starve Italian Industries. Even if France is more generous than she is expected to be, no supplies of raw material can compensate Italy for the break-up of the equilibrium of Europe and the establishment of a French power as wide as the continent.” শুধু যে কাঁচামালের অভাব হইবার ভয়ে ইতালী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন

শক্তি-সমূহব সমতা নষ্ট করিয়া ফ্রান্সকে এমনই প্রবল পবাক্রান্ত করিয়া তুলিবে যে তাহাব শক্তিকে প্রতিহত করা শক্তিপুঞ্জব সাপ্যে কুলাইবে না বলিয়া ইতালীর মহা আতঙ্ক হইয়াছে। আর ইতালী মনে কবে যে ইতালী ও রুশের ভবিষ্যৎ সামবিক যোগাযোগের অন্তরায় হইবার উদ্দেশ্যে মিলনের পথে একটি প্রাচীর গড়িয়া তুলার অভিসন্ধিতেই চেকোস্লোভাকিয়াব সহিত ফ্রান্সের মিলনের এত প্রয়াস।

ইংবেজও ফ্রান্সেব এই মিলন-প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত বেশী রকম মাতামাতি বলিয়াই সন্দেহ করেন এবং ইংবেজের বিশ্বাস যে ইহার অন্তরালে ফ্রান্সের নিশ্চয় কোনও গোপন অভিসন্ধি রহিয়াছে। তাই ফ্রান্সকে চাপিয়া রাখিবার জন্য ইংরেজ টিউটন জাতির সহিত একটি মিলন সংঘটন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং অর্থাভাবের অজুহাতে ফ্রান্স যে ইংলণ্ডেব যুদ্ধস্বপ্ন এতদিন শোধ করেন নাই তাহা আদায় করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন। ইংরেজ বলেন যে ফ্রান্সের যদি অর্থেরই অনাটন তবে মধ্যইউরোপীয় রাজ্যসমূহকে ঋণদান ফ্রান্সেব পক্ষে সম্ভব কিরূপে হইল?

এদিকে লোজান-বৈঠকে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়া তুরস্কেব বলভরসা অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। মুস্তাফা কামালের পরিচালনায় নবীন তুরস্ক অতি আশ্চর্যরূপ দক্ষতার সহিত অতিদ্রুত গতিতে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। সমাজ-ও রাষ্ট্র সংস্কারে মুস্তাফা কামাল তাহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ধর্মের গোঁড়ামী হইতে রাষ্ট্রীয় আচার-ব্যবহাবে নুক্ত করিয়া অতি উদার ভিত্তির উপর নূতন শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া তুরস্কের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন। ধর্মগুরু খলিফার শাসনের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া শাসন-পরিষদে গণপ্রাধিক্য স্থাপন করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপরিষদের এক নূতন আইনের বলে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং বমণীর রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীর উন্নতিকর বিধিসমূহ একে একে প্রবর্তিত হওয়াতে তুরস্ক সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠজাতিসমূহের পর্যায়ভুক্ত হইবার দাবী করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

কামালের শ্রায় চতুব রাজনীতিক বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন যে ইউরোপীয় শক্তি-সমন্বয়ের বিরুদ্ধে একাকী আঁটিয়া উঠা তুরস্কেব পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, এমনকি সার্ক-মোসলমান আন্দোলন যদি কোনও দিন সফল হয় তাহা হইলেও সম্মিলিত খেতকায় জাতির বিপক্ষে মোস্লেম জগৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। তাই হাঙ্গেরি ও অষ্ট্রিয়াকে মুতামুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে কামাল চেষ্টা পাইতেছেন। হাঙ্গেরি ও অষ্ট্রিয়ার অর্থাভাবে শাসন পবিচালন করা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল; দেশময় অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ইহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন না দেখিয়া তুরস্ক সরকার ঋণদান করিয়া এই দুইটি রাজ্যকে ধ্বংসের মুখ হইতে বক্ষা করিয়াছেন এবং যাহাতে আবার এই রাষ্ট্যেব লক্ষ্মীশী ফিরিয়া আসে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। মোটামুটি চারিটি বিপরীত স্বার্থের ধারা ইউরোপীয় রাষ্ট্র-নীতির মধ্যে বর্তমানযুগে প্রবাহিত হইতেছে। প্রথম—ফরাসী ও মধ্য-ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মিলন, দ্বিতীয়—ইতালী ও রুশের মিলন-প্রচেষ্টা, তৃতীয়—ইংরেজ ও টিউটন জাতির মধ্যের শ্রীতির বন্ধন, চতুর্থ—তুরস্কের সহিত অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির মিলন। এই চারিটি শক্তিপুঞ্জের স্বার্থের সংঘাত যে রোম ও স্কোভ জাগাইয়া তুলিবে, যে দেশ হিংসা ও ঙ্খার বহি জ্বলাইবে তাহা শাস্তিহারা ইউরোপকে কোন মৃত্যুর মুখে লইয়া যাইবে কে জানে।

জাতিতে জাতিতে এই যে বিদ্বেষ-বিষ ফুটিয়া উঠিতেছে এই বিষ

সমাধান করিবার ভার ভারতের উপর। মহাত্মা গান্ধীর মস্ত দীক্ষিত ভারত কি মহামানবের মিলনত্রীর্ষ হইয়া উঠিবে না?

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অবস্থা—

নূতন নির্বাচনের ফলে রক্ষণশীল দল জয়ী হইলেও এত অধিক-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে তাহারা সমর্থ হয় নাই যে শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলের সম্মিলিত আক্রমণ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রথা অনুসারে শ্রমিক দলই সংস্থিতি সম্পন্ন বিরুদ্ধবাদী দল। বর্তমান শাসন-পরিষদের পতন হইলে রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে শ্রমিক দলের উপরই ইংলণ্ডের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হওয়া উচিত।

বিপ্লবপন্থী এই শ্রমিক দলের সম্বন্ধে পুরাতন দলের নেতৃবর্গের একটা ভীতি আছে। শ্রমিক দলের শাসনে দেশের ভীষণ অমঙ্গল সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া, শ্রমিক দল দেশের কর্তৃকার যাহাতে না হইতে পারেন তাহার জন্ত অনেকই উদারনৈতিক নেতা অ্যাসকুইথকে বন্ড্‌উইন্‌ মন্ত্রীসভার সমর্থন করিতে অনুবোধ করেন। অ্যাসকুইথ কিন্তু রক্ষণশীল দলের সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি বলেন যে বাণিজ্য সংরক্ষণ নীতি অপবা ধনাধিক্যানুসারে বর্জিত হারে কব নির্ধারণ নীতির সমর্থন দেশ করে নাই; কাজে-কাজেই তিনি এ দুইটির কোনটিরও সমর্থন করিবেন না। কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বাধীনে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রীয় নীতি যেক্রম দুর্বলতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বের দরবারে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। এইকপ দুর্বল শাসন-তন্ত্রকে বজায় রাখিবার সহায়তা তিনি কিছুতেই করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রমিক দল যদি বেশ ধীর ভাবে শাসন-ভার পরিচালন করেন তাহা হইলে উদারনৈতিক দল তাহাদের সমর্থন করিবেন।

শ্রমিকদলপতি র্যান্সে ম্যাকডোনাল্ড বলিতেছেন যে, শাসন ভার পাইয়া শ্রমিক দল অবিবেচকের ন্যায় কোনও কাজ করিবেন না। তাঁহারা বেশ ধীর ভাবেই ইংলণ্ডের মঙ্গল বিধানের জন্ত চেষ্টা করিবেন। শ্রমিক দল স্থির করিয়াছেন যে মহাসভার কায্যারম্ভ করিবার জন্ত অগতের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সম্রাট যে বক্তৃতা দেন তাহা আলোচিত হইবার সময় বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রতি মহাসভার আস্থাহীনতা প্রাপন করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন; যদি উদারনৈতিক দল এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতা করেন তবে রক্ষণশীল দলের পরাজয় অবশ্যসম্ভাবী। পরাজিত হইলে বন্ড্‌উইন্‌ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তখন শ্রমিক দলের প্রতি শাসনের ভার অর্পিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু লর্ড বদারমিয়াবের কর্তৃত্বাধীন যে সমস্ত রক্ষণশীল-মতাবলম্বী সংবাদপত্র আছে তাহারা একটি নূতন সুর তুলিয়াছে। ইহার বলে যে র্যান্সে ম্যাকডোনাল্ডের হস্তে ইংলণ্ডের শাসনভার পড়িলে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপদ ইংলণ্ডে ঘনাইয়া উঠিবে তাহার কথা স্মরণ করিয়া পবাজয়ের বেদনা তুলিয়া উদারনৈতিক দলকে সমর্থন করা রক্ষণশীল দলের কর্তব্য। লণ্ডন সহরের রক্ষণশীল দলের সভা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অপর পক্ষের কাহার হস্তে শাসন-পরিষদ গঠনের ভার দেওয়া হইবে সে-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চিরাচরিত বিধি অনুসারে পদত্যাগের অনতিপূর্বে বন্ড্‌উইন্‌ সাহেবের সম্রাটের সহিত যে মন্ত্রণা হইবে তাহাতে সংস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াও যেন বন্ড্‌উইন্‌ সাহেব উদারনৈতিক নেতা অ্যাসকুইথ সাহেবকে আহ্বান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। সম্রাট কিন্তু পদত্যাগ-করা মন্ত্রীর মতানুসরণ করিতে বাধ্য নহেন। শ্রমিক দলের স্ফারসঙ্গত অধিকারকে কাপুরুষের স্থায় এইরূপ অস্থায় আচরণ

দ্বারা যদি আটকাইয়া রাখার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় দলাদলিতে সম্রাটের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের দোষ অর্পিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া রক্ষণশীল দলের অনেকে আবার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লর্ড বিভার্ককের পরিচালিত ডেলি এক্সপ্রেস পত্র শ্রমিক দলকে এইরূপ ভাবে আটকাইয়া রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ অস্থায়ভাবে শ্রমিক দলকে শাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে রাজ্যতন্ত্রের বিপদ সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইহার বিশ্বাস।

কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায় হইতে লোক বাছাই করিয়া শাসন-পরিষদ গঠন করা শ্রমিকদলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। ম্যাকডোনাল্ড কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠনের ভার পাইবার আশু সম্ভাবনা দেখিয়া ইতিমধ্যেই সে কার্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছেন; নিয়োগের আদেশ পাইলে যাহাতে শাসন-পরিষদের প্রত্যেক বিভাগেই উপযুক্ত লোক নিয়োজিত হয়েন তাহার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে শ্রমিক-মন্ত্রীসভাতে ভারত-সচিব হইবেন কর্ণেল জোঁসিয়া ওয়েজ্‌উড, পবরাষ্ট্র-বিভাগের ভার পাইবেন সিড্‌নি ওয়েব ও অর্থ-সচিব হইবেন ফিলিপ হ্রোডেন। লর্ড সভার সর্বকারী প্রতিনিধি হইবেন লর্ড হ্যাল্‌ডেন ও তাঁহার সহকারী হইবেন লর্ড পার্‌মুর। আর্থার হেগার্টসনকে মহাসভাতে নির্বাচিত করিয়া লইবার চেষ্টা হইবে। ফ্রাইনিস, ল্যান্‌ম্‌বেরি, টমাস, ম্যার পাট্রিক হেষ্টিংস ও হেগার্টসনকে মন্ত্রীসভাতে গ্রহণ করা হইবে।

লর্ড গ্রে, লর্ড বাকমস্টার, মিষ্টার সি আর বাক্সটন প্রভৃতি যে-সব উদারনৈতিক নেতা উদারনৈতিক দলকে সার্বভৌমিক উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন তাঁহারাও শ্রমিক দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে পারেন এবং মন্ত্রীসভায় ইহাদের স্থান হওয়াও সম্ভব।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—

রয়টার গুজব রটাইয়াছিল যে এই বৎসর একজন ভারতবাসী খুব সম্ভব সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু এ বৎসর সাহিত্যের পুরস্কার পাইয়াছেন আইরিশ কবি উইলিয়াম বট্‌লার ইয়েট্‌স্‌।

ইয়েট্‌সের কবিত্ব এতদিন পর্যন্ত তেমন সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু অতি দলকালের মধ্যেই বিশ্বের দরবারে ইহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবাহী সাধারণতঃ নোবেল পুরস্কার পাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সময় সময় তেমন অসামান্য প্রতিভা না থাকিলেও যদি কোনও সাহিত্যসেবী তাঁহার দেশের সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমাদৃত করিবার জন্ত নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। মিস্ত্রাল প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না। কিন্তু প্রভেন্সাল প্রদেশের গ্রাম্য সাহিত্যে ইহার প্রভাবে এমনই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে যে বিশ্বের সভাতে প্রভেন্সাল ভাষার আদ্য হইয়াছে বখেট। সেইদৃষ্ট নোবেল কমিটি তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া অভিনন্দিত করেন। কেল্টিক জাতীয় অভ্যুত্থানের ঐতিহ্যিক কবিবর ইয়েট্‌স্‌কেও আইরিশ জাগরণের পুরোহিত বলিয়াই আজ এই সম্মান প্রদত্ত হইয়াছে।

ইয়েট্‌সের আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া কবি সিন্‌জে, লেডি গ্রেগরি, পাড্রেইক ওকনোর, হার্জ্‌ রাসেল, হার্জ্‌ মুর প্রভৃতি সাহিত্য-সাধনার প্রবৃত্ত হন। ইহাদের সাহচর্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইয়েট্‌স্‌ আইরিশ জাতীয় অভিনয়শালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে জাতীয় ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত ইহারা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। আজ আইরিশ জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং বিশ্বের দরবারে আইরিশ সাহিত্য অভিনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু যে বন্ধুসভা আয়ারল্যান্ডে নব আকাজ্ঞা জাগাইয়াছিলেন আজ তাঁহাদের

সাহিত্যসাধনা নিভিয়া আসিয়াছে। সিন্জে জীবিত নাই, রাসেল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, লেডি গ্রেগোরি অবসর-স্থল সন্ধান করিতেছেন, পাড্রেইক ওকোনর শিশু-দিগের মনোরঞ্জনার্থ গল্পরচনায় ব্রতী হইয়াছেন।

ভাগ্যবিধাতা কিন্তু ইয়েটসের প্রতি সুপ্রসন্ন। আইরিশ স্বাধীন-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই নানারূপ রাজসম্মান লাভ ইহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। ডাবলিনের টিনিটি কলেজ হইতে ইনি ডক্টর অব লিটারেচার অর্থাৎ সাহিত্যাচার্য উপাধি লাভ করিয়াছেন। আইরিশ মহাসভার সভ্যরূপে মনোনীত হইয়া স্কুমাভ-কলাসচিব (minister of fine arts) হইয়াছেন।

যখন ইংরেজ-সরকারের সহিত আইরিশ জাতীয় দলের রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ চলিতেছে তখন ইংলণ্ডের বিশেষ আগ্রহে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ

ইয়েটসকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহেন; কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক ইয়েটস দেশবীর এই আদর প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম পুস্তক The Wandering of the Oisín প্রকাশিত হয়। Celtic Twilight, Countess Kathalcen ও Land of Heart's Desire নামক পুস্তকত্রয়ই অস্বাভাবিক পুস্তক হইতে সমধিক প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যাব ইনি একজন ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ-পাঠক-মহলে পরিচিত করাইতে যাহারা প্রথমে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইয়েটস তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান।

আইরিশ জাতীয় শিল্পনয়নার প্রতিষ্ঠা-বন্দনোত্তে ইহার কাউণ্টেস কাগাবিন নামক নাটক অভিনয় হয়।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

দ্বিতীয় অধিবেশন

প্রয়াগ

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্বনীল আকাশের নীচে কালিন্দীর হৃৎ-ক্ষেত্র-সুশোভিত তীরে উপরিস্থ মনোহর টুকাব-হলে পৌষের মধ্যাহ্নে রবির স্কুমধুর উষ্ণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া সহস্র পরিমিত নর-নারী ও বালক-বালিকা লইয়া বন্দেমাতরম্ উদ্বোধন-সঙ্গীত ও বাগদেবী-বন্দনার পর এই অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হয়। অবসর-প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি সার্ব শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অধিবেশনের পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রতিনিধিগণ ও অপর অভ্যাগত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাষার সংরক্ষণের জ্ঞান এবং পরস্পরের শ্রীবৃদ্ধির জ্ঞান এতদিন যে একপাশে কোন চেষ্টা হয় নাই সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—“অদ্যকার এই জনহিতকর অকুষ্ঠান এদেশবাসী বাঙ্গালীর এক অক্ষয় কীর্তি।” তাহার মতে পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা একান্ত আবশ্যিক; এবং সাহিত্য-

চর্চাই ইহার প্রধান উপায়, কেন না “পৃথিবীতে যত জাতি উন্নত হইয়াছে তাহাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাহাদের উন্নতি ও সভ্যতার মূলে একমাত্র সাহিত্যচর্চা।” জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি সামাজিক উন্নতিও সংগঠিত হইতে পারে তাহা হইলে তিনি মনে করেন এই সম্মিলন মহিমামণ্ডিত হইতে পারিবে। এই অভিভাষণের পর অধিবেশনের অগ্রতম পৃষ্ঠপোষক যুক্ত-প্রদেশের প্রধানতম হিসাব-রক্ষক (accountant general) দেওয়ান বাহাদুর রাজমঞ্জী প্রবীণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার স্বরচিত ভাবপূর্ণ এক কবিতা আবৃত্তি করিয়া সম্মিলনের অভিনন্দন করেন। তাহার মতে মাতৃসেবার জ্ঞান প্রবাসী বাঙ্গালী অদ্য সমবেত হইয়াছে এবং যাহারা এই কার্যে জ্ঞান অবসর করিতে পারে না তাহারা বাঙ্গালী নামের অযোগ্য।

অতঃপর কার্য্যাপক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য মহাশয় এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্মকথা, ইহার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধিলাভের উপায় প্রাঞ্জলভাবে দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য-বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে রসাত্মক ভাষায়

বর্ণন করেন। “বিগত ফাল্গুন মাসে হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বারাণসী নগরীতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ভাব-বিনিময় দ্বারা পরস্পরের উন্নতি-সাধন এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য।” তাঁহার মতে “প্রধানতঃ চাকরিই বাঙ্গালীকে বঙ্গের বাহিরে আকৃষ্ট করিয়াছে। রাজশক্তির সহায়তা ও সাহায্য ব্যতীত চাকরিজীবীর আর্থিক সামাজিক বা পরমার্থিক উৎকর্ষ-সাধন বর্তমান যুগে সম্ভবপর নহে। সজ্জবদ্ধ না হইয়া বিংশ শতাব্দীতে সভ্যজগতের কোথাও কোন সম্প্রদায় জন্মগত অধিকারও লাভ করিতে পারে নাই। সম্প্রদায়-বিশেষের অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে হইলে সম্মিলিত স্বরে আন্দোলন করা ইদানীং একটা প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। এই-সকল কথার সত্যতা উপলব্ধি বজ্র বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বল্পসংখ্যক বিদেশী বণিকদিগেরও প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সম্প্রদায় বা জাতির হিসাবে অগ্রণী ও অসংখ্য হইলেও এ-সকল প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর সে অধিকার নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা দেশে কেবল ইংরেজদিগের নহে, অবাঙ্গালী মাড়োয়ারী প্রভৃতি সম্প্রদায়-বিশেষেরও তত্ত্বাত্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। কোনরূপ সর্বজনস্বীকৃত বাঙ্গালী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া এবং বাঙ্গালীর জন্মগত উচ্চশীলতার অভাব-বশতঃই প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। সজ্জবদ্ধ না হইলে সামাজিক সুখ সুবিধা হইতেও প্রবাসীকে বিশেষ ভাবে বঞ্চিত হইতে হয়। ধনীদিগের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে পুত্র-কন্যার বিবাহ এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রবাসে একমাত্র রাজার জাতিই নিজ মাতৃভাষার প্রচলন রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ক্রম বিক্রম বিদ্যালয় ও কার্যস্থল সর্বত্রই প্রবাসী বাঙ্গালীকে হয় প্রাদেশিক ভাষা নয় রাজভাষা ইংরেজী

ব্যবহার করিতে হয়। জীবনযাত্রা-নির্কাহের কোথাও যখন বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন হইতেছে না তখন অপরি-হার্য্যভাবে প্রাদেশিক ভাষাই প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মিলনের মাতৃভাষা-স্বরূপ হইয়া পড়িতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি এরূপে মাতৃভাষা বিস্মৃত হইয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গালার সহিত তাহাদের ভাবধারা স্থিৎ থাকিতে পারে না, কেননা ভাষা-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, ভাষার ভিতর দিয়াই লোক ভাবিতে শিখে। এ-সকল সমস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে প্রবাসীর প্রতিনিধিগণকে একত্র হইয়া ভাবিতে হইবে। অদ্যাবধি প্রবাসী বাঙ্গালীর কোনরূপ সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল না; এই অচিরপ্রসূত সাহিত্য-সম্মিলনকে পরিপোষণ করিতে পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর সে অভাব দূরীভূত হইতে পারে।”

ইহার পর কাথ্যাদ্যক্ষ মহাশয় ছুঃখের সহিত জ্ঞাপন করেন যে অস্বস্থতাবশতঃ নির্কাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুপস্থিত এবং প্রস্তাব করেন যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। অতঃপর তর্কভূষণ মহাশয় নির্কাচিত সভাপতির অনুপস্থিতিতে আন্তরিক ছুঃখ প্রকাশ করিয়া স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। এলাহাবাদস্থ অশোক-সুস্তের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব হইতে এ-সকল প্রদেশের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থও বাঙ্গালী ধর্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্যাদির লীলাক্ষেত্র। বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্তি এ-সকল প্রদেশের অপরাপর স্থানেও আছে। এজন্ত অহঙ্কার করা উচিত নহে; গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক। এ-সকল-প্রদেশ-বাসীর সহিত বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া যাহাতে বাঙ্গালী নিজের বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সে উপদেশই তিনি সকলকে দিতে চাহেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘নিবেদন’ নামক অভিভাষণ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ

মুখোপাধ্যায় ভাবপ্রবণতার সহিত পাঠ করেন। চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পরে মুদ্রিত হইবে।

ইহার পর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে অভ্যর্থনা-সমিতির উপস্থিত সভ্যগণ ও অভ্যাগত প্রতিনিধিগণ লইয়া বিষয়-নির্বাচন-সমিতি গঠিত হয়। পক্ষান্তরে এই সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া 'সম্মিলনের নিয়মাবলী (সংগঠন)', 'আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ নির্ধারণ' ও 'প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণার্থ' তিনটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। সায়াহ্ন সাত ঘটিকা হইতে টুকর-হলে সাক্ষাসম্মিলন হয়। শাখা সমিতির সিদ্ধান্ত-সকল পরদিন পূর্বাঙ্ক নয় ঘটিকার সময় বিষয়-নির্বাচন-সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা পর্যন্ত আলোচিত হয়।

পরদিবস ১১ই পৌষ অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা 'বঙ্গ আমার জননী আমার' এই সঙ্গীতের পর অধিবেশনের কাণ্ড আরম্ভ হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার প্রারম্ভেই উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্কপ্রদেশের শিক্ষা-সচিব রাজা পরমানন্দের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং এই সভার মস্তব্য সরকার বাহাদুর ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে প্রেবণ করিবার জ্ঞা কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অতঃপর প্রাপ্ত প্রবন্ধ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ উপলক্ষে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় জ্ঞাপন করেন, যে, সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জ্ঞা পুরস্কার দেওয়ার যে প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা বিষয়-নির্বাচন-সমিতি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং প্রাচুর্য্য হিসাবে বিষয়-বৈচিত্র্য কম থাকায় প্রাপ্ত প্রবন্ধ-সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় নাই; সময়ের অভাব-বশতঃ ১৪টি মাত্র প্রবন্ধ সন্মমক্ষে পঠিত হইবে। সুদূব দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ হইতে 'উদ্দু' নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় প্রতিনিধি-রূপে এই সভায় উপস্থিত, এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জ্ঞা সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে প্রতিনিধিগণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য-গণের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয়।

সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সঙ্গীতের পর পুনরায় সাধারণ সভার কার্য্যারম্ভ হয়। নির্বাচিত বক্তা শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অন্তঃস্থিতি-বশতঃ ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একরূপ সম্মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় বলেন যে "মিলনের দ্বারাই প্রাণের সঞ্চারণ হয় এবং বিভিন্ন ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি ও রক্ষাতেই বাঙ্গালীব বিশেষত্ব।"

ইহার পর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বিষয়-নির্বাচন-সমিতির নির্ধারিত নিয়মাবলীব ও প্রস্তাবসমূহের আলোচনা করিতে সভাকে আহ্বান করেন। বহু আলোচনার পর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সম্মিলনের স্থায়ী নাম "প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন" সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় এবং রেজেষ্টারি করিবার জ্ঞা অনুরোধিত হয়। আপাততঃ প্রয়াগেই কেন্দ্রস্থল করিয়া একাদশ জন নিয়মিত সদস্য লইয়া এক পরিচালক-সমিতি নির্বাচিত হয়।

- ১। সভাপতি—শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়।
- ২। সহকারী সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
- ৩। কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায়।
- ৪। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী মিত্র।
- ৫। " "—শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
- ৬। সাধারণ সভ্য—শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু (প্রয়াগ)।
- ৭। " "—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন (লক্ষ্মী)।
- ৮। " "—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন (কানপুর)।
- ৯। " "—শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কালী)।
- ১০। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব।
- ১১। বহুমান অধিবেশনের কার্য্যাধ্যক্ষরূপে আধিকারক সদস্য—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সঙ্গীয় অশ্বিনী-কুমার দত্ত, ৬ পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ও ৬ মনোরমা দেবীর মৃত্যুতে সভা শোক

প্রকাশ করেন এবং কার্যাদ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অস্বস্থতা-বশতঃ অল্পপস্থিতির জন্ত আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আরোগ্যলাভার্থ ৩ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির অগ্রতম পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি, ইউয়িং ক্লিকিয়ান কলেজের কর্তৃপক্ষ, অভ্যাগত প্রতিনিধিবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সাহা ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে সূচাক্রমে অধিবেশনের কার্য সম্পাদনের জন্ত অভ্যর্থনা-সমিতি, কার্যাদ্যক্ষ, স্বেচ্ছাসেবকগণ, সঙ্গীতকারগণ ও স্থানীয় উপস্থিত মহিলাবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। “এমন বিরাট সম্মিলনেব কার্য এত ধীরভাবে ও সূচাক্রমে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন” বলিয়া কার্যাদ্যক্ষ ও অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার শেষ বক্তব্য বলেন যে “এরূপ সভা সম্মিলন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে—প্রবাসী বাঙ্গালীর

জাতীয় জীবনে জাগরণ ও বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা।” কিন্তু এরূপ জাগরণের মধ্যে পাশ্চাত্য অনুকরণ দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন, কেননা তাহাতে বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাঁহার মতে ধর্মের ভিতরে সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টাতেই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। তিনি ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে “প্রাণী-দেহ ও জীব-শরীর মাত্রই ভগবদ্-বিকাশের আধার, মানবশরীর-সৃষ্টিতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। শান্ত ও নির্মল হইয়া জীব-জগতের সঙ্গে সদ্ভক্তি রক্ষা করাতেই সেই ভগবৎ-সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে। জাতীয় গৌরব-বোধ থাকা উচিত হইলেও এই জাতীয় জাগরণের দিনে বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মশ্লাঘা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়”—এই অনুরোধ সভাতে জানাইয়া তিনি আপনার বক্তব্য শেষ করেন।

অবশেষে শ্রীযুক্ত ননীলাল দে মহাশয় দ্বারা ‘ভারত আমার, ভারত আমার’ এই সঙ্গীতের পর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হয়।

শ্রী প্রসন্নকুমার আচার্য

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

(পূর্বানুবৃত্তি)

মিশ্রঘাত

মিশ্রঘাত খেলিবার কালে সর্বদাই “হাতকাটি” সুরক্ষিত রাখিতে হয়। সেইহেতু সাধারণতঃ শৃঙ্গ প্রায় সর্বদাই দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধের সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়, এবং প্রায় সর্বদাই স্বীয় শৃঙ্গ প্রতিপক্ষের লাঠির অগ্রগতির প্রতিরোধ-কল্পে তৎসম্মুখ বরাবরে ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়।

“মিশ্রঘাত”-সম্পর্কিত পাঠক্রম-মধ্যে যে আঘাত-গুলির সঙ্গে “+” চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের

প্রতিরোধ শৃঙ্গ দ্বারা করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে “ক” চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের প্রতিরোধ শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই যোজিত থাকিবে না তাহাদের প্রতিরোধ শুধু লাঠি দ্বারাই করিতে হইবে।

শিক্ষাভ্যাস-কালে প্রত্যেকটি ক্রমই প্রথমে দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে; পরে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া সমসংখ্যকবার খেলিতে হইবে; তৎপরে পর্যায়ক্রমে

এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ এবং
অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ
করিয়া প্রত্যেকটি ক্রম অভ্যাস করিবে। প্রত্যেকটি
ক্রমই পর্যায়ক্রমে সমসংখ্যকবার দক্ষিণ ও বাম হস্তে
লাঠি ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। হাতকাটি
- ৩। কোমর, শির+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। হাতকাটি
- ৩। কোমর, শির+

(বিপরীতারম্ভ)

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। হাতকাটি
- ৩। চাপ্‌নি, ভুজ, শির+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। হাতকাটি
- ৩। চাপ্‌নি, ভুজ, শির+

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

এ স্থলে “শির”এর প্রতিকার লাঠি দ্বারা কিম্বা শৃঙ্গ
দ্বারা উভয় রকমেই হইতে পারে।

তৃতীয় ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। কোমর
- ৩। হিমাএল্+
- ৪। ভাণ্ডার, মোঢ়া, সাঙ্+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। কোমর
- ৩। হিমাএল্+
- ৪। ভাণ্ডার, মোঢ়া, সাঙ্+

(বিপরীতারম্ভ)

চতুর্থ ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। হাতকাটি
- ৩। অন্তর+
- ৪। কোমর, উণ্টামোঢ়া+
- ৫। শৃঙ্গবাহী!
- ৬। চাকি+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। হাতকাটি
- ৩। অন্তর+
- ৪। কোমর, উণ্টামোঢ়া+,
- ৫। শৃঙ্গবাহী!
- ৬। চাকি+

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

শৃঙ্গবাহী = শিফরুকাটাও

পঞ্চম ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২।
- ৩।
- ৪। দিগর

(প্রত্যাক্রমণ)

ভাণ্ডার+ (চৌমুখী)
বাহেরা+ (চৌমুখী)

- ১। গ্রীবান+
- ৪। শির+

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

“শিরের” প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠি স্বকীয় বাম দিক্
হইতে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

ষষ্ঠ ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। বাহেরা!, তামেচা!
- ৩। চাপ্‌নি
- ৪। আসর
- ৫। হাতকাটি+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। বাহেরা!, তামেচা!
- ৩। সাঙ্+
- ৪। উণ্টামোঢ়া+, কোমর

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

হাতকাটির প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু পিছন
হইতে উপরে তুলিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া স্বকীয়
বাম দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

সপ্তম ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)

- ১। হিমাএল্+
- ২। ভুজ+
- ৩। আসর
- ৪। উত্তর! আনি

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। হিমাএল্+
- ২। ভুজ+
- ৩। আসর
- ৪। ওরাস

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

“উত্তর আনির” প্রতিকার কল্পে নিজ লাঠি নিম্নমুখ
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিম্নের দিক্ হইতে আঘাত
করিতে হইবে।

অষ্টম ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ

(আক্রমণ)

- ১। তেওয়ার+
- ২। ভর্জা, উন্টামোড়া, বাহেরা,
- ৩। সাকেন্
- ৪। ভুজ+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। তেওয়ার+
- ২। ভর্জা, উন্টামোড়া, বাহেরা,
- ৩। হালুকুম, কোমর, হাতকাটি পোস্+ (বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

এ স্থলে “হাতকাটি পোস্” অসিপৃষ্ঠ দ্বারা প্রয়োগ করিতে হইবে।

নবম ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ

(আক্রমণ)

- ১। হাতকাটি পেশ
- ২। উন্টামোড়া
- ৩। শির+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। শূঙ্গবাহী
- ২। চাকি+
- (বিপরীতারম্ভ)

দশম ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ

(আক্রমণ)

- ১। হিমাএল্+
- ২। মন্+
- ৩। চাকি+, চাপনি, শূঙ্গবাহী
- ৪। গ্রীবান+
- ৫। হল

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। হিমাএল্+
- ২। মন্+
- ৩। চাকি+, চাপনি, শূঙ্গবাহী
- ৪। গ্রীবান+
- ৫। (তরাস) (বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

এ স্থলে “হলের” প্রতিকার-কল্পে নিজ লাঠি নিম্নমুখ রাখিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিম্নের দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

একাদশ ক্রম

ঠাট্ট দোয়াঙ্গ

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। শূঙ্গবাহী
- ৩। উন্টামোড়া, অঙ্
- ৪। মোড়া, কোমর+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। শূঙ্গবাহী
- ৩। উন্টামোড়া, অঙ্ (বিপরীতারম্ভ)

দ্বাদশ ক্রম

(আক্রমণ)

- ১। আনি
- ২। হাতকাটি অধঃ

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। (তরাস) চাকি+
- ২। হল (জার্ক)

৩। ভুজ+

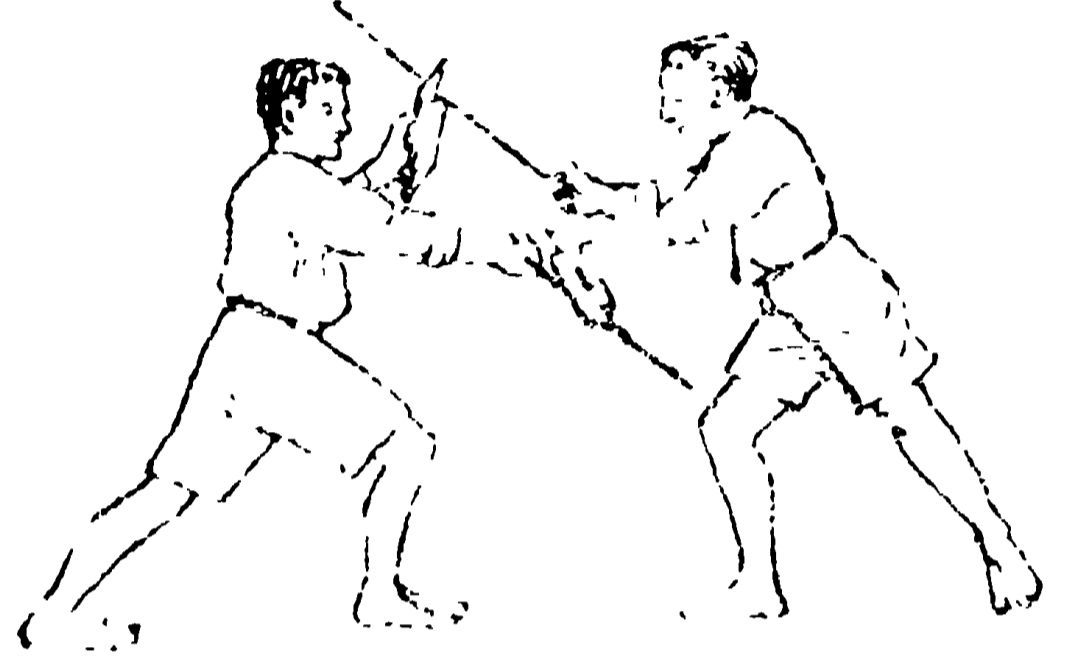
- ৪। পালট (আলীঢ়) +
- ৫। (ঠাট্ট) হালুকুম

৩। ভুজ+

- ৪। (আলীঢ়) শির + (বিপরীতারম্ভ)

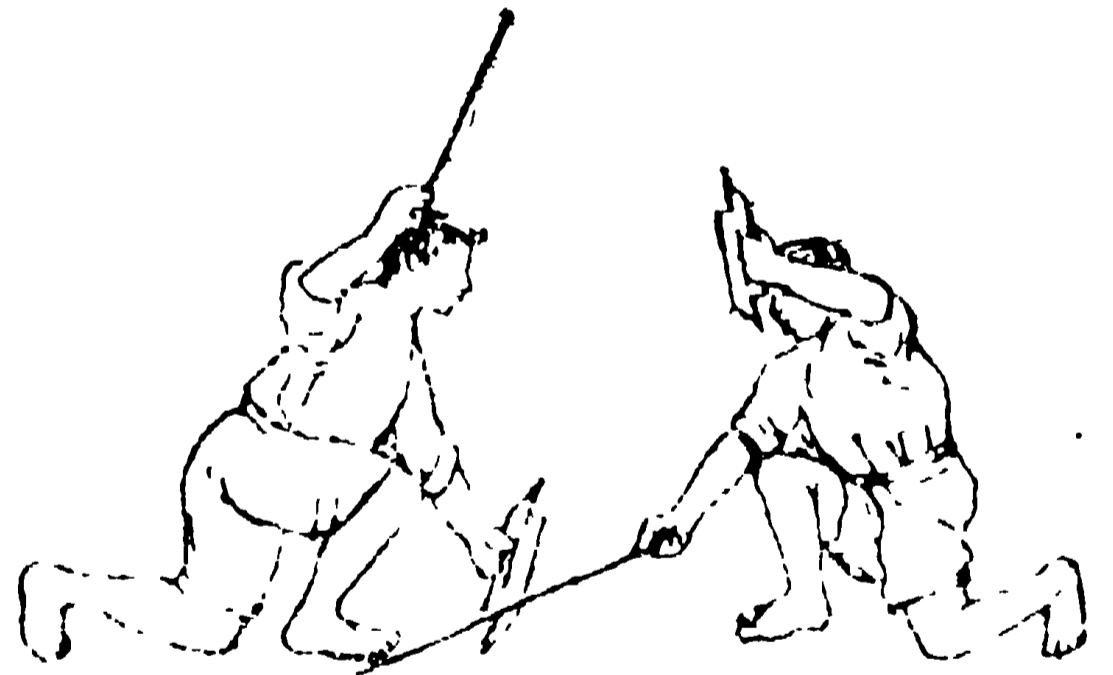
বর্ণনা:—এ স্থলে “আনির” প্রতিকার-কল্পে নিম্ন দিক্ হইতে, কিন্তু “হলের” প্রতিকার-কল্পে উপর দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

হাতকাটি অধঃ = হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে মণিবন্ধে আঘাত।



হাতকাটি অধঃ—বাম দিকে লোক আঘাত করিতেছে

আলীঢ় = বাম হাঁটু, জজ্বা ও পদ পশ্চাৎ দিকে ভূমিতে বিস্তৃত, দক্ষিণ পদ সম্মুখে ভূমিতে স্থাপিত, জজ্বা ভূমির উপরে লম্ব বরাবরে এবং জাহ্নসন্ধি ভঙ্গ করিয়া সমগ্র উরুদেশ ভূমির সমান্তরালে, ও শরীর ভূমির উপর প্রায় লম্ব বরাবরে ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকিবে।



আলীঢ় (পালট)

ত্রয়োদশ ক্রম

ঠাট্ট রাউটা

(আক্রমণ)

- ১। (অবনমন) গল আনি+
- ২। (তুরস্ত) কঠা
- ৩। (উভয়ে) তামেচা

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। (তুরস্ত) হাতকাটি+
- ২। (অবনমন) করক

(উভয়ে অবনমন)

৪। (উভয়ে) চাপনি+ (চৌমুখী)
৫। শির

(বিপরীতঃস্ব)

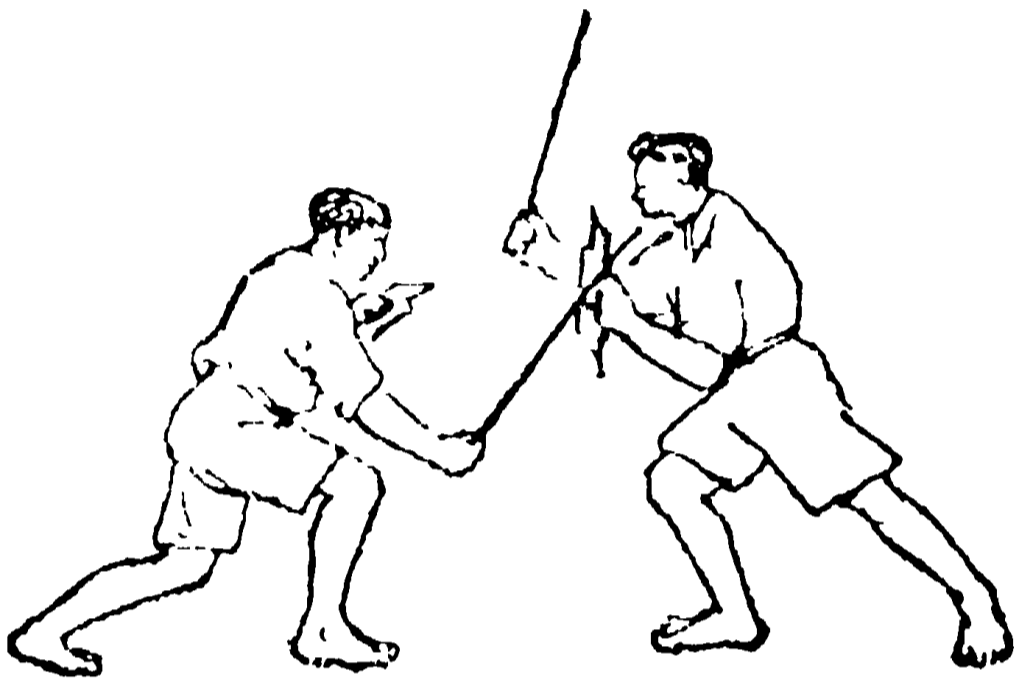
পঞ্চদশ ক্রম
ঠাট্ রাউট

বর্ণনা :—

অবনমন=শরীর অপসারিত করিয়া (সাধারণতঃ বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া) প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া।

তুরস্ত = তন্মুহুর্তে।

“গল-আনি” = কণ্ঠনালী ও মস্তকের সন্ধিস্থলের সম্মুখ বরাবরে অসির অগ্রবিন্দু বক্রভাবে উর্দ্ধমুখে মস্তক-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।



গল—আনি

কণ্ঠার প্রতিকার-কল্পে শরীর একটু পিছনে অপসারিত করিয়া “অবনমন” করিতে হইবে।

চতুর্দশ ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্ক

(আক্রমণ)

- ১। গ্রীবান+
- ২। হাতকাটি
- ৩। মন্ +
- ৪। কোমর
- ৫। পালট্
- ৬। পোস্ৎপা
- ৭। হিমাএল্+
- ৮। হাল্কুম
- ৯। শির

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। গ্রীবান +
- ২। হাতকাটি
- ৩। মন্ +
- ৪। কোমর
- ৫। পালট্
- ৬। পোস্ৎপা
- ৭। হিমাএল্ +
- ৮। (অবনমন)
- (বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

“হাল্কুম” প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত অসি ভূমির সমান্তরাল ভাবে নিজ বাম পার্শ্বের পিছনে লইয়া হস্তের মুষ্টি ঘুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যথাস্থানে আঘাত করিতে হইবে।

(আক্রমণ)

- ১। কোমর+
- ২। চাপনি
- ৩। আনি দক্ষিণ চক্ষু
- ৪। (অবনমন) শির

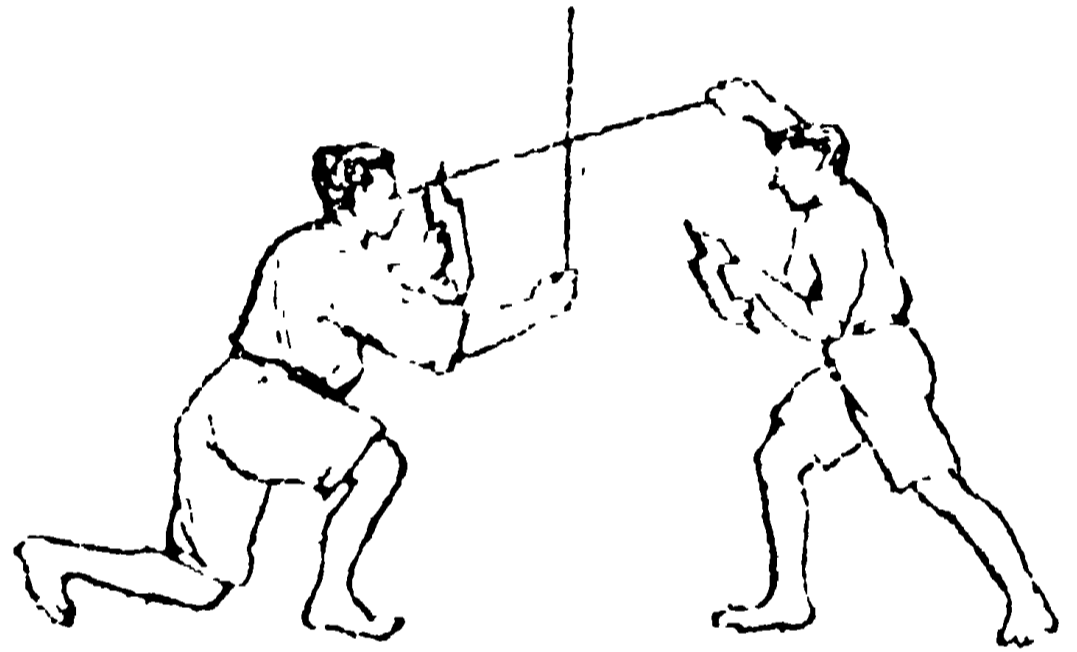
(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। জবেগা+
- ২। শৃঙ্গবাহীঃ
- ৩। (উর্দ্ধতরাস)
- (অবনমন) হিমাএল্
- (বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

আনি দক্ষিণ চক্ষু—দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে আনির আয় প্রয়োগ।

ইহার প্রতিকার-কল্পে লাঠি নিম্নমুখ হইতে ক্রমে উর্দ্ধমুখ করিয়া নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া (উর্দ্ধতরাসে) প্রতিপক্ষের লাঠি ঈষৎ উর্দ্ধে ও তাহার বামে দূর করিয়া দিতে হইবে।



আনি দক্ষিণ চক্ষু

ষোড়শ ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্ক

(আক্রমণ)

- ১। আনি
- ২। শৃঙ্গবাহীঃ
- ৩। শির+, কোমর, দিগর, হিমাএল্+
- ৪। শির+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। হাতকাটি+
- ২। শৃঙ্গবাহী, বাহেরা+, করক
- ৩। চাকি+
- (বিপরীতারম্ভ)

সপ্তদশ ক্রম

ঠাট্ গোমুখ

(আক্রমণ)

- ১। ভর্জাঃ
- ২। হাতকাটিঃ, শৃঙ্গবাহীঃ, ছাপ্কাঃ
- ৩। (তুরস্ত) মন্ (তুরস্ত) উটাঃহাল্কুম
- ৪। (তুরস্ত) শির+

(প্রত্যাক্রমণ)

- ১। (তুরস্ত) অক্
- ২। তুরস্ত
- ধূনিয়াকরক, চাপনি।
- ৩। (তুরস্ত তরাস)
- (তুরস্ত) চাকি+
- (বিপরীতারম্ভ)

অষ্টাদশ ক্রম

ঠাট্ট পাথুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। চাপনি (ধাঁধা) (তুরস্ত) অস্তর +	১। অস্তর +
২। উণ্টা জবেগা (ধাঁধা)	২। (অবনমন)
৩। আসর	৩। (তুরস্ত) দে।
৪। (সশৃঙ্গে) (লাঠি অভ্যঙ্গবে)	৪। (সশৃঙ্গে প্রতিকার)
হাতকাটি পেশ।	(লাঠি বহির্দিকে)
ও গ্রীবানা	(বিপরীতারস্ত)

বর্ণনা :—

“ধাঁধা” = কোনও নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিবার ভাণ করিয়া অত্র আঘাত করা, কিম্বা করিবার উত্তোগ করা।

“সশৃঙ্গে” আঘাতের প্রয়োগ কিম্বা প্রতিকারের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিপক্ষের লাঠি হস্তচ্যুত করার চেষ্টার অভিসন্ধি হেতু লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া হস্ত চালনা।

উনবিংশ ক্রম

ঠাট্ট পাথুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শৃঙ্গবাহী।	১। তামেচা।
২। উণ্টাহালুকুম্ + তেওয়ার	২। (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে)
(তরাস) + শির (ধাঁধা)	রোক্‌সার + (সহ) ছাপকা।
(আচক্রবা) উদর +	
(সহ) (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে)	
উণ্টামোড়া +	
৩। চক্রিকা (দ্বিসম্ভব)।	৩। চক্রিকা (দ্বিসম্ভব)।
৪। সাকেন (দ্বিসম্ভব)।	৪। সাকেন (দ্বিসম্ভব)।
৫। শির +	(বিপরীতারস্ত)

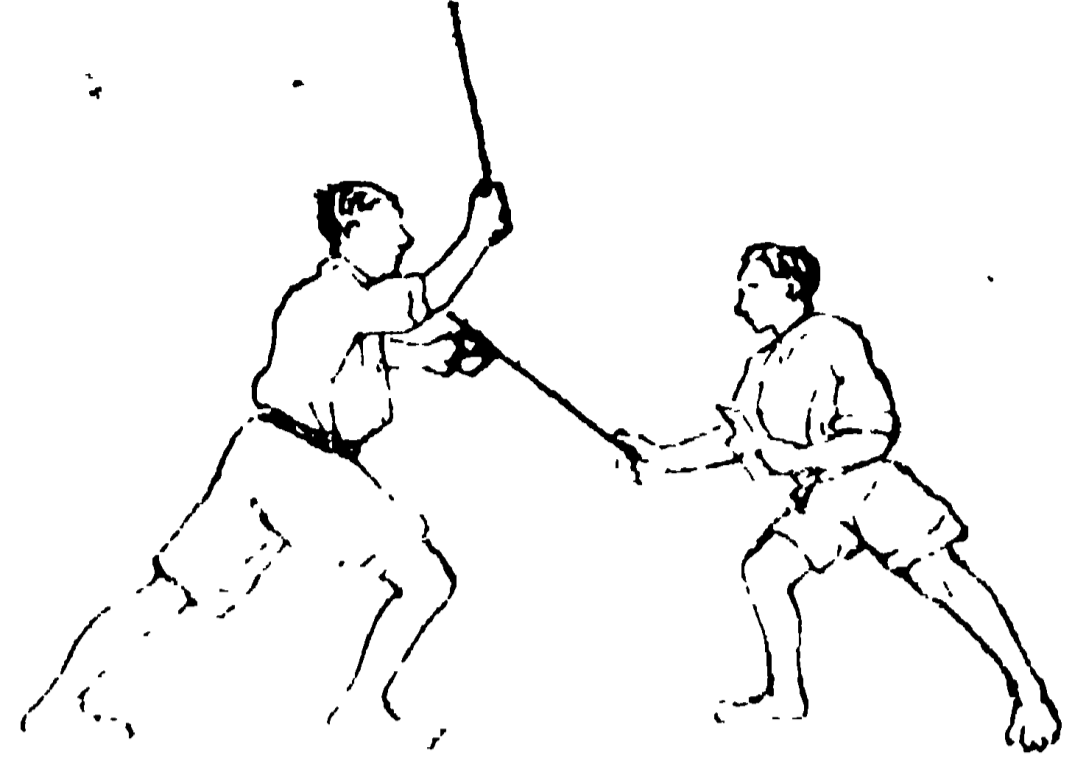
বর্ণনা :—

“আচক্র বা” = হস্ত সঙ্কচিত করিয়া অসির অগ্রভাগ দ্বারা আঁচড় অর্থাৎ “তরাসে” ক্ষুদ্র আঘাত। উদব = বুক-পাত হইতে নাভি পর্যন্ত চিরিয়া ফেলা।

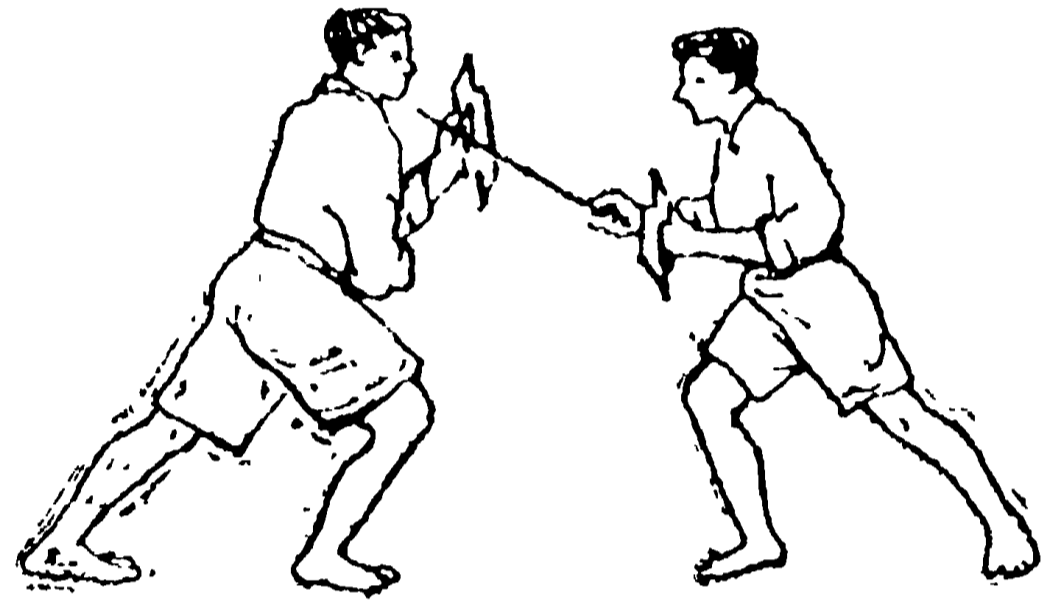
রোক্‌সার = কর্ণমূলের নিম্ন হইতে দক্ষিণ গলদেশে চোয়ালের অস্থি সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া ফেলা।

চক্রিকা = বাম মস্তক পার্শ্বের অস্থি যে-স্থলে নিম্নের দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথায় আঘাত করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্নে ছেদন করিয়া অসি নির্গত হইয়া যাইবে।

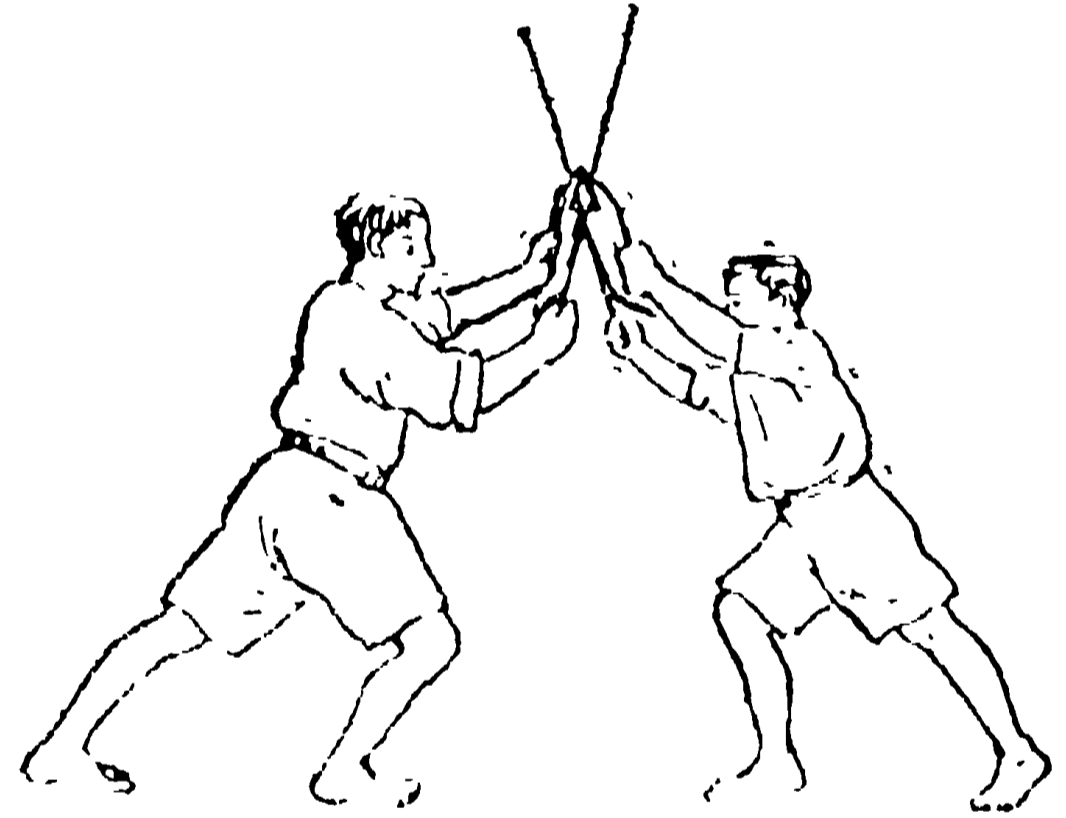
দ্বিসম্ভব = লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া প্রতিপক্ষের



উদর



বোক্‌সার



চক্রিকা (দ্বিসম্ভব)

কোনও আঘাত প্রতিহত করিয়া ঐরূপ একত্র অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করার অভিপ্রায়ে।

বিংশ ক্রম

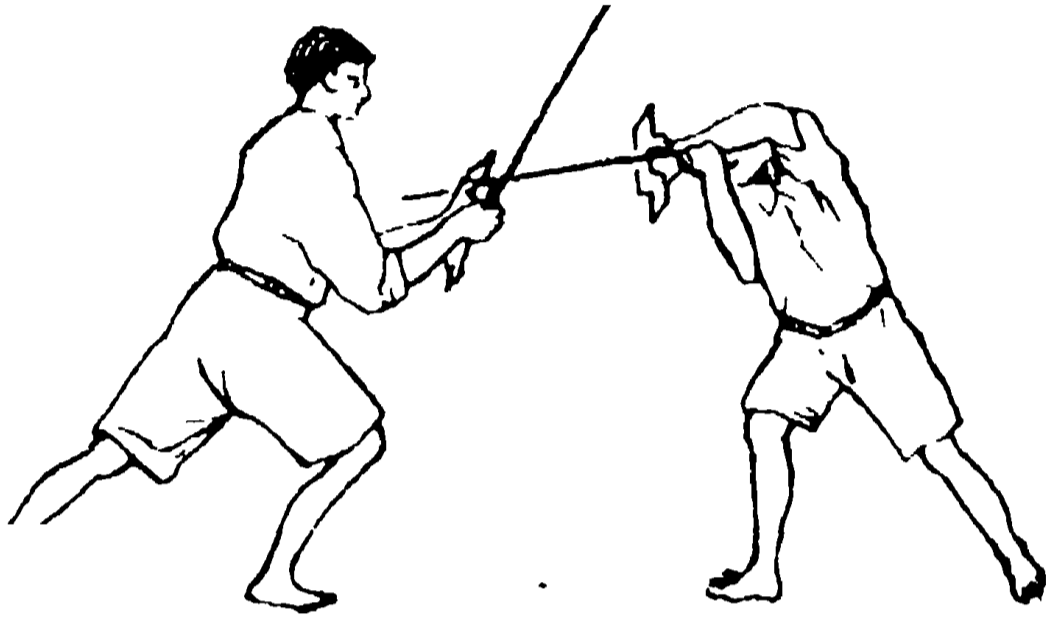
ঠাট্ট রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটি পূর্বা (অসিকে)	১। উর্জা +, উণ্টাহালুকুম্ +
নিম্নমুখে নিজ দক্ষিণ দিকে একটু	(পশ্চাৎপদ পদ পুরোবর্তী,
ঝুলাইয়া বাম দিক হইতে তুলিয়া	পদের পশ্চাতে লইয়া অসি-
ঘুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা	পৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত
আঘাত করিতে হইবে)	করিতে হইবে)

- ২। কণা (ধাঁধা), তামেচা +, } ২। উপটামোচা +, চাপ্‌নি
পালট (আলীড়) } (তরাস), হাতকাটি পেশ
(ধাঁধা), হঞ্জুবী
৩। (গুরু বন্ধন) } ৩। (অনুমোক্ষণ)
(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

হাতকাটি পূর্ব = হস্তের মণিবন্ধের বৃদ্ধাজুলীর দিকে আঘাত।



হাতকাটি পূর্ব

গুরুবন্ধন = নিজ শৃঙ্গ ও অসি দ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে জোরে চাপিয়া ধরা।

অনুমোক্ষণ = নিজ শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসি ও শৃঙ্গকে ঠেলিয়া ধরিয়া “গুরুবন্ধন” হইতে নিজ অসিকে মুক্ত করিয়া আনয়ন।

একবিংশতি ক্রম

ঠাট্‌ গোমুখ

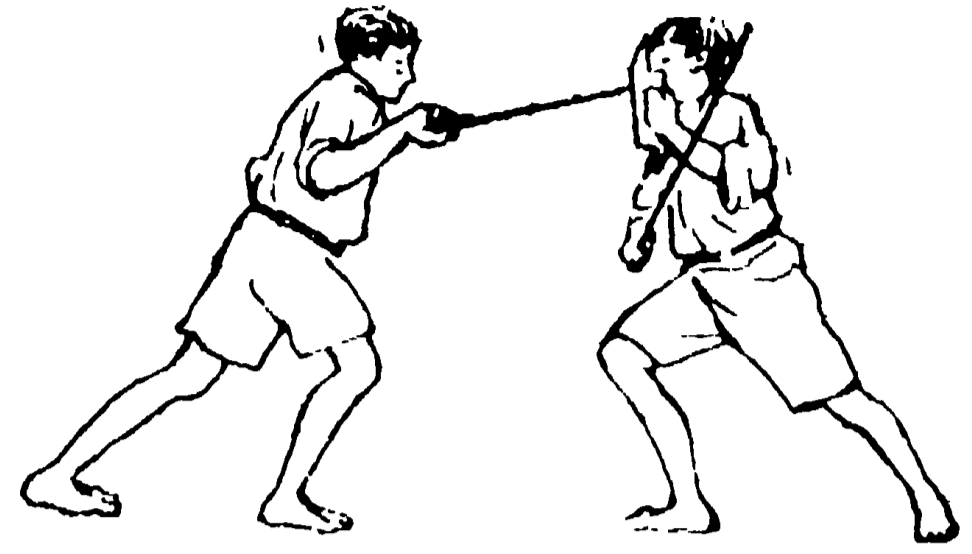
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| (আক্রমণ) | (প্রত্যাক্রমণ) |
| ১। বাহেরা +, বুচ্ (তরাস) | ১। উত্তরচক্ষু আনি |
| (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) অধর + | } |
| (অভিযান স্থিতি) | |
| ২। (গুরু বন্ধন) | ২। (অনুমোক্ষণ) |
| ৩। (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) চাকি + | পালট্‌, চির (তরাস) |
| | জবেগা (তরাস) + |
| | (বিপরীতারম্ভ) |

বর্ণনা :—

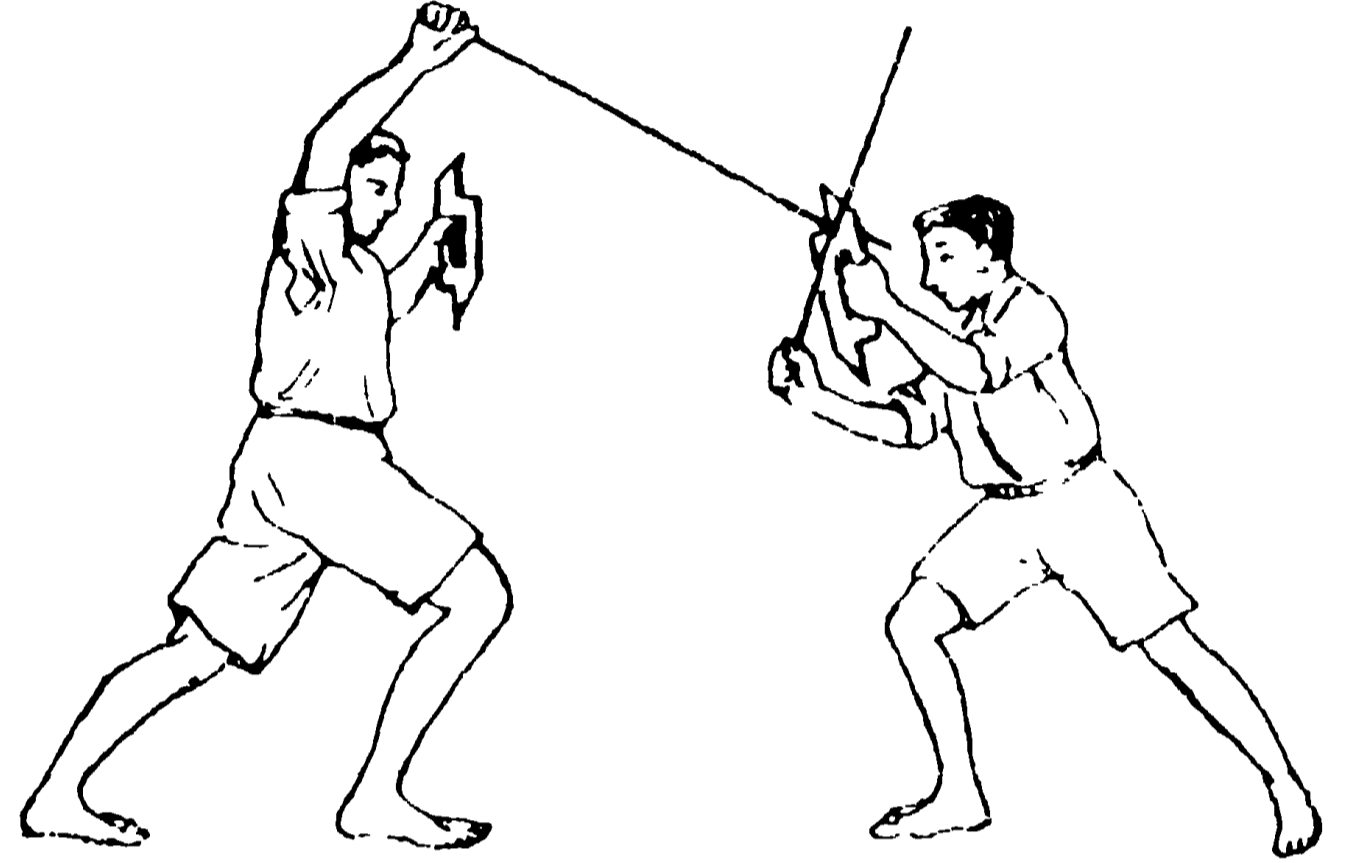
“অধর” = প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক হইতে অধরোষ্ঠ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে।

অভিযান স্থিতি = কিল্লাবন্দী।

উত্তর চক্ষু আনি = বাম চক্ষুর মধ্যে ‘আনির’ শ্রায় প্রয়োগ।



অধব (আচক্রবা)



নেত্রোপরি উত্তর আনি

দ্বাবিংশ ক্রম

ঠাট্‌ একাঙ্গ্‌ পাথুরী

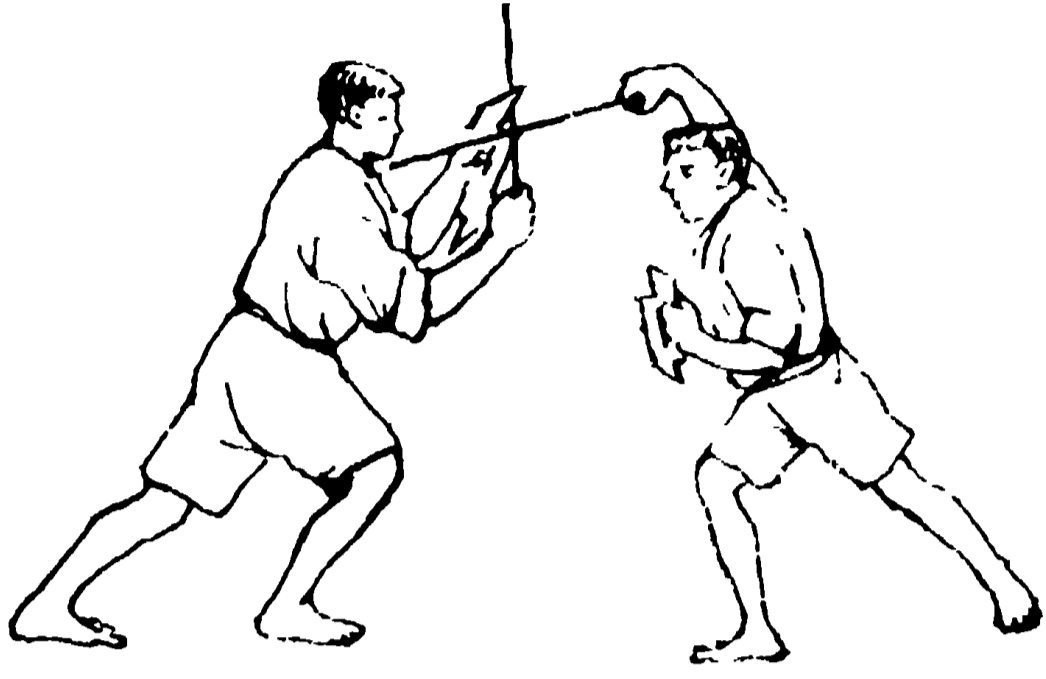
- | | |
|--|---|
| (আক্রমণ) | (প্রত্যাক্রমণ) |
| ১। (জার্ক) ভর্জা (ধাঁধা), ভর্জা + | ১। মাকেন |
| ২। (তুরম্ভ) তেওয়ার + | ২। উপটাহালুক্‌ম্‌ + (পশ্চাৎ- |
| (প্রতিপক্ষের পালট্‌ পার্শ্ব হইতে অসিকে নিজ শিরোপরি তুলিয়া “শির” নাম্বিবার ভাণ করিয়া পুনরায় বামাবর্তে নিজ শিরোপরি ঘুরাইয়া) (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) | স্থিত পদ পুরোবর্তী পদের পশ্চাতে লইয়া অসিপৃষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে) |
| ঠোক্‌ : | |
| ৩। শৃঙ্গবাহী : | ৩। শৃঙ্গবাহী : |
| ৪। চাকি + | ৪। (অসি নিজ শিরোপরি ঘুরাইয়া) হিমাএল্‌ |
| ৫। গলবিন্দু + | ৫। (গুরুবন্ধন) |
| ৬। (অনুমোক্ষণ) | (বিপরীতারম্ভ) |

বর্ণনা :—

একাঙ্গ্‌ পাথুরী = একাঙ্গের ঠাটে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎবর্তী পদের অঙ্গুলীতে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

(প্রথম আরম্ভকালে জার্ক ভর্জার প্রয়োগের ভাণ করিয়া অসির গতি ঘুরাইয়া পুনরায় ভর্জাতেই আঘাত করিতে হইবে।)

গলবিন্দু = গলদেশ ও বক্ষস্থলের সন্ধিমূলে অসির
অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।



গলবিন্দু

ত্রয়োবিংশ ক্রম

ঠাট্ রাউটা

(আক্রমণ)

১। উণ্টাইয়ক্মা †, হাতকাটি †
উত্তর চক্ষু আনি †, শৃঙ্গবাহী †

২। সাকেন্

৩। (প্রতিপক্ষের কোমর-পার্শ্ব

হইতে অসি নিম্ন মুখে তুলিয়া)

গ্রীবান্ (ধাঁধাঁ), ভাণ্ডার †

৪। ক্রকুটী

৫। (তুরস্ত) (আলীচ) বাহেরা †

(প্রত্যাক্রমণ)

১। দক্ষিণ চক্রিকা,
শৃঙ্গবাহী (ধাঁধাঁ) হাত-
কাটি †, গ্রীবান †
(লাঠি শৃঙ্গের সম্মুখে)২। পৃষ্ঠদক্ষিণ †, (পশ্চাদ্বর্তী
পদ শূন্যে)

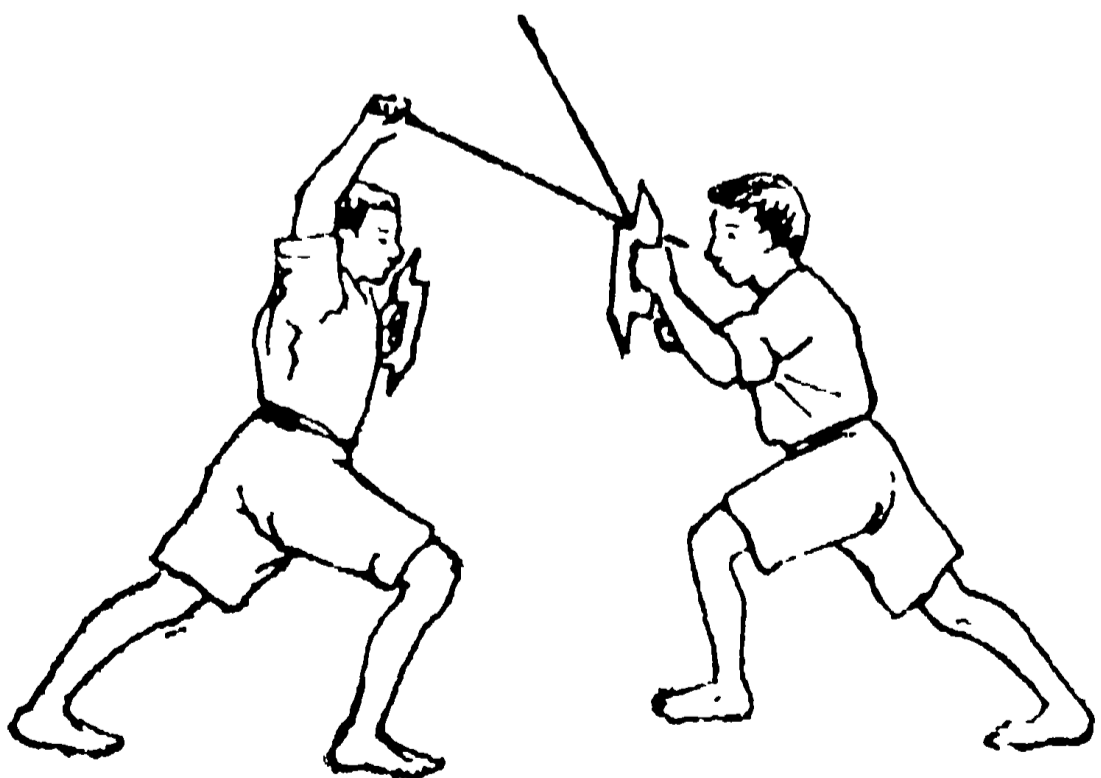
৩। তামেচা †

৪। (অবনমন, উভয়ে) (অনীচ)
বাহেরা

(বিপরীতাবস্ত)

বর্ণনা :—

উণ্টাইয়ক্মা—দক্ষিণ স্কন্ধদেশের অস্থির এক অঙ্গুলী
উক্কে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।



উণ্টাইয়ক্মা

দক্ষিণ চক্রিকা = দক্ষিণ মস্তক পার্শ্বের অস্থি যে স্থলে
নিম্নের দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে তথায় আঘাত
করিয়া বাম কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্নে ছেদন করিয়া
অসি নির্গত হইয়া যাইবে।



দক্ষিণ চক্রিকা

চতুর্বিংশ ক্রম

ঠাট্ পাথরী

(আক্রমণ)

১। হাতকাটি †

২। দে †

৩। হালুক্মা †, চাকি (তরাস) †,
জল্

৪। ভুজ (ধাঁধাঁ), (আচনবা) †

৫। বাহেরা (ধাঁধাঁ), উণ্টা ক্রকুটী †

(প্রত্যাক্রমণ)

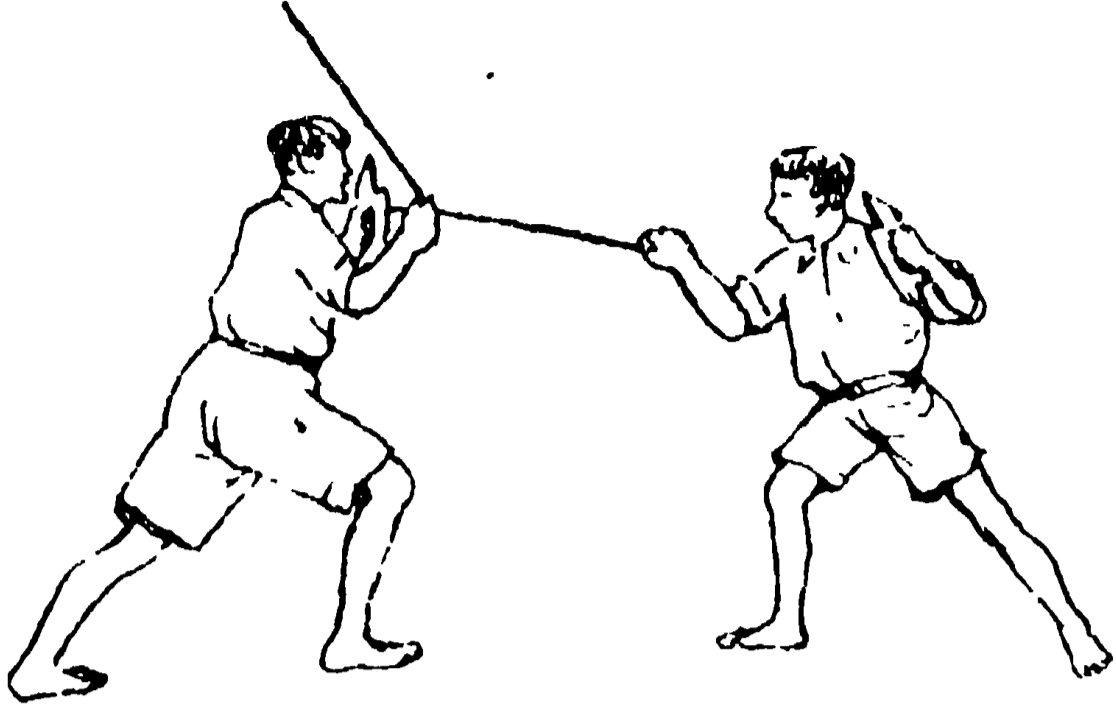
১। বাহেরা †

২। পৃষ্ঠ উত্তর † (পশ্চাদ্বর্তী
পদ শূন্যে)৩। শৃঙ্গবাহী (ধাঁধাঁ)
উণ্টা রোক্মার †৪। (অবনমন) দক্ষিণ চক্ষু
আনি †৫। তামেচা (ধাঁধাঁ),
উণ্টা হালুক্মা †, চির
(বিপরীতাবস্ত)

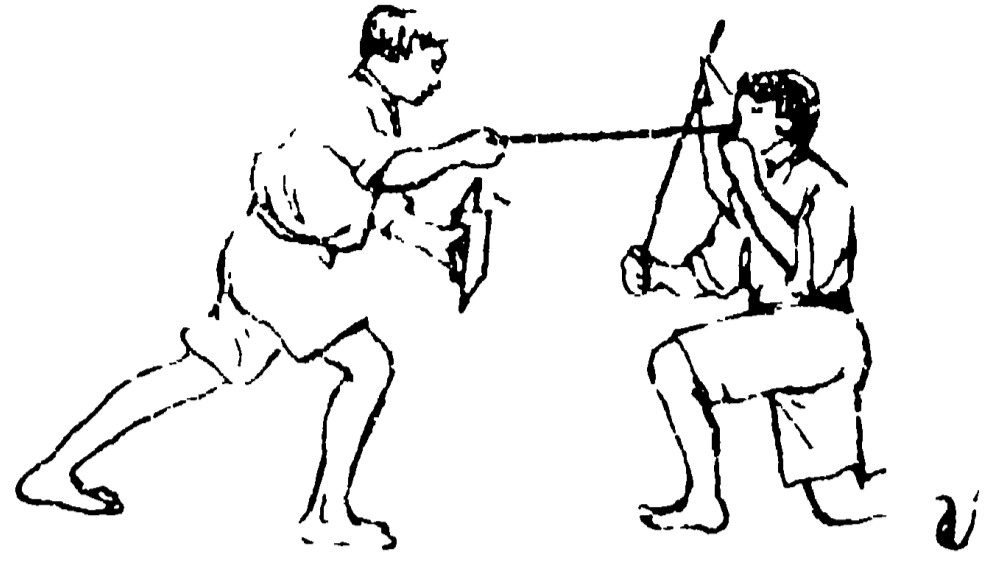
বর্ণনা :—

উণ্টা রোক্মার—কর্ণমূলের নিম্ন হইতে বামগলদেশে
চোয়ালের অস্থির সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া দিতে
হইবে।

উত্তর অধর = প্রতিপক্ষের বাম দিক হইতে অধরোষ্ঠ
ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে।



উঁটা রোক্‌সার



উত্তর অধর

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

বিবিধ প্রসঙ্গ

“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই”

“বেঙ্গলী” পত্রিকায় দেখা গেল, দেশবন্ধু দাশ কাকিনাড়া নিখিলভারত ছাত্রসমিতির অধিবেশনে বলিয়াছেন, “Everybody must have freedom. I want my freedom. I want the right to do what I think is best to my province,” ইত্যাদি। অর্থাৎ “প্রত্যেকের স্বাধীনতা চাই। আমি আমার স্বাধীনতা চাই। বাংলা দেশের পক্ষে যাহা ভাল মনে করি, আমি তাহা করিবার স্বাধীনতা চাই।” ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, “l’etat ? c’est moi !” “রাষ্ট্র ? আমিই ত রাষ্ট্র !” দেশবন্ধুর কথায় আমাদের সম্রাট চতুর্দশ লুইর কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশের পৌনে পাঁচ কোটি অধিবাসীর স্বাধীনতা বলিতে দেশবন্ধু যে তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত তাঁহার নিজের স্বাধীনতা বুঝেন, এটা নিতান্ত কষ্ট-কল্পনা নয়। তাঁহার বাধ্য ও অহুগত মুষ্টিমেয় স্বরাজ্য-সদস্যদিগকে লইয়াই স্বগৃহে বসিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান-মীমাংসাপত্র বা রফানামা প্রস্তুত করিয়াছেন; সূতরাং ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা চতুর্দশ লুইর আদর্শ হইতে বিভিন্ন নহে।

কাকিনাড়া হইতে দেশবন্ধু যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, স্বরাজ্য দল একটি খসড়া রফানামা প্রস্তুত করিয়াছেন মাত্র, এবং “if any scheme is better than the one put forward by the Swarajya party, the Provincial Congress Committee and every Association must accept it।” অর্থাৎ দেশের লোকে যদি অণু কোন উৎকৃষ্টতর রফানিস্পত্তির প্রস্তাব উপস্থিত করে, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি এবং প্রত্যেক সমিতি অবশ্য তাহা গ্রহণ করিবেন। অথচ কাকিনাড়া ছাত্র-সম্মিলনে তিনি বলিয়াছেন, “I shall not be crushed by a central organisation even of the Indian National Congress” অর্থাৎ জাতীয় মহা-সমিতির কোন কেন্দ্রীয় সংঘ যে তাহাকে পিণিয়া ফেলিবে, এটা তিনি সহ্য করিবেন না। তিনি জাতীয় মহা-সমিতির আদেশ মান্য করিবেন না, অথচ প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির আদেশ অবনত মণ্ডকে স্বীকার করিয়া লইবেন, এটা কতদূর সম্ভবপর, তাহা বিবেচ্য। তবে প্রাদেশিক সমিতির নির্দ্ধারণটি দেশবন্ধুর মনোমত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা

স্বীকার্য। তাঁহার প্রচারিত রফানামার কোথাও একথা দেখিতে পাই না, যে, উহা একটি খসড়া মাত্র। তিনি constructive scheme চাহেন, অর্থাৎ এমন প্রস্তাব চাহেন, যাহা হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্পাদনের সহায়তা করে। শ্রীযুক্ত আনসারি ও লাজপত রায় মহাশয়-দ্বয়ের উপর একরূপ একটি national pact বা জাতীয় মীমাংসাপত্র প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত ছিল, এবং তাঁহারা কাকিনাড়া কংগ্রেসে যে খসড়াটি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাংশে দেশবন্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচন-নীতি সম্বন্ধে মণ্টেগু সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ২২৯ প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন, "it is difficult to see how the change from this system to national representation is to occur" অর্থাৎ এই ভেদমূলক প্রতিনিধি-নির্বাচন হইতে জাতীয় নির্বাচন-নীতিতে কি প্রকারে পৌঁছান যায়, তাহা বুঝা শক্ত। ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিয়া, হিন্দু-মুসলমান ভোটদাতাগণের একটি মিলিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির উভয়ধর্মাবলম্বী ভোটার দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলে, কালক্রমে মুসলমান ও হিন্দুর স্থায়ী মিলনের পথ উন্মুক্ত থাকিবে, অথচ আপাততঃ লঙ্কো কংগ্রেসের নির্ধারিতমতে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের বাঞ্ছিত পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্রও রুদ্ধ হইবে না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে একমাত্র constructive scheme অর্থাৎ জাতিগঠনোপযোগী প্রস্তাব। দেশবন্ধু যদি ভেদমূলক নির্বাচনপ্রথার গভী ব্যবস্থাপক সভায় আবদ্ধ রাখিয়া মুসলমান সভ্যদিগকে একরূপে তাহার গতিপরিবর্তন করিতে সম্মত করিতে পারিতেন, তবেই মুসলমান 'স্বরাজ্যসভ্য' নাম সার্থক হইত, এবং তাঁহারা যে তাঁহার স্বরাজ্যদলভুক্ত, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার রফা-নিষ্পত্তির ফলে পৃথক নির্বাচন-ক্ষেত্র কেবল ব্যবস্থাপক সমিতির ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থাকিয়া গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন-কেন্দ্রগুলিতে পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; যে দলাদলি ও ভেদনীতি কেবল বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় সভাগৃহে প্রবেশলাভে সক্ষম হইয়াছিল,

তাহা এখন দেশময় প্রসারিত হইয়া সর্বত্র ঈর্ষ্যাভেদের ধূমায়িত বহ্নিকে প্রদীপ্ত দাবানলে পরিণত করিবার স্বযোগ লাভ করিয়াছে। এই কারণে ও অন্যান্য বহু সঙ্গত কারণে প্রবীণ হিন্দু কংগ্রেসনেতাগণ দেশবন্ধুর প্রস্তাবিত মীমাংসার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলাদেশে স্বরাজ্যদলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ কেহই নাই, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকাংশই অখ্যাতনামা। স্বরাজ্যদলের বাহিরে আর কোন হিন্দু নেতা দেশবন্ধুর রফা-নিষ্পত্তির সমর্থন করেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তথাকথিত মুসলমান স্বরাজ্যসদস্যগণকে স্বীয় দলে রাখিবার জন্ত বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু ঈর্ষ্য রফানামায় সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নহে। নিজের দলের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার দেশ-বাসীদিগের প্রকৃত স্বার্থ বলি দিয়াছেন, স্বরাজ্য-সভ্যগণ ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই একরূপ মনে করিতেছেন।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই চাই, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা চাহেন না, তিনি চাহেন স্বীয় দলের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি নিজের যা খুসি তাই করিবার অধিকার। রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতার দাবী করিলে দলগঠন করা চলে না; সেইজন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতকটা থর্ক করিয়া দলের ঐক্য ও কার্যকরী শক্তি রক্ষা করা হয়। Party system বা দল গঠনের ও তদ্বারা কার্য পরিচালনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা যায়; তবে এখানে মোটামুটি ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, যতক্ষণ দলের বা সম্প্রদায়ের মত ব্যক্তিগত বিবেক বা বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া না উঠে, ততক্ষণ সজ্জমতের নিকট আশ্রমত বিসর্জন না করিলে দল গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তু দল গড়িতে গিয়া কাহারও বিবেক বা জ্ঞানবুদ্ধিকে বলিদান করা সঙ্গত নহে। দেশের কল্যাণকে দলের ক্ষুদ্র স্বার্থের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে দিলে দেশকে ত বঞ্চনা করা হয়ই, দলও বেশী দিন টিকিয়া থাকে না; কারণ

পরিণামে সত্যের জয় অবশ্যস্বাবী। এক্ষেত্রে সেই সত্য এই, যে, হিন্দুমুসলমানের মিলন ব্যতীত স্বরাজ্য-সিদ্ধির অন্য পথ নাই এবং communal representation অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচনের নীতির বিস্তৃতি সেই মিলনের সেতু নহে, তাহার ঘোরতর অন্তরায়।

২১ পৌষ ১৩৩০।

“মফস্বলবাসী”

সরকারী চাকরীর ভাগ

দেশে যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারা নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকরী পাইতে ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না; তাহা খুবই স্বাভাবিক। সে-সম্বন্ধে কোন তর্কবিতর্কের প্রয়োজন নাই। কি উপায়ে তাহারা অধিকাংশ সরকারী চাকরী পাইতে পারে, কেবল তাহাই বিচার্য।

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট্ রাষ্ট্রীয় হিসাবে যাহাকে বাংলা দেশ বলেন, আসল বাংলা দেশ তাহা অপেক্ষা বড়। যে ভূখণ্ডে বাংলা ভাষাই অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা, আসল বাংলা আমরা তাহাকেই বলি। এই আসল বাংলার শতকরা কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান, তাহার বিচার না করিয়া, আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রীয় বাংলা-দেশকেই বাংলা বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেখিতেছি, এখানে শতকরা ৫৩.৫৫ জন অধিবাসী মুসলমান। স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে কথা হইয়াছে, যে, মুসলমানদিগকে শতকরা ৫৫টি সরকারী চাকরী দিতে হইবে। এখন দেখা দরকার, যে, শতকরা ৫৫টি সরকারী চাকরী পাইবার মত যোগ্যতা মুসলমান সম্প্রদায়ের আছে কি না।

কিন্তু এরূপ কথা তুলিলেই মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে তর্ক উঠিতে পারে, “যোগ্যতার কথা কেন তোল? আমরা দলে পুরু; অতএব আমাদের যোগ্যতা কম হইলেও বেশীর ভাগ চাকরী আমরাদিগকে দেওয়া উচিত।”

কোন ধর্মসম্প্রদায়ের হাতে কত টাকার কত চাকরী গেল, বা কাহার হাতে কত ক্ষমতা গেল, এরূপ ভাগাভাগি রেষারেষির ভাব হইতে আমরা এই বিষয়টির বিচার করিতে অনিচ্ছুক। আমরা দেখিতে চাই, কিরূপ বন্দো-

বস্ত্রে সমগ্র দেশ স্বাস্থ্যে জ্ঞানে ধনে শক্তিতে উন্নত হয়। তাহার আলোচনা করিতে গেলে অতীত ইতিহাসেব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার। তাহার আগে একটা গোড়ার কথা বলি।

সব কাজেই যোগ্যতা চাই

ছোট বা বড়, সামান্য বা মহৎ, যে-কোন কাজই মানুষ করিতে চাক, তাহাতে সেই কাজের উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা, ক্ষমতার প্রয়োজন। যিনি কেবল কামারের কাজ জানেন, তিনি কুমারের কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল লাঠি চালাইতে জানেন, তিনি গোলন্দাজের কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল দিয়াশলাই ফেরী করিতে পাবেন, তিনি দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে পারেন না; যিনি কেবল চীনের বাসনে জলখাবার পরিবেশন করিতে পারেন, যিনি চীনের বাসন তৈরী করিতে পারেন না, তিনি কেবল শিক্ষকতা বা কেরানীগিরি করিতে পারেন, তিনি চিকিৎসা বা এঞ্জিনিয়ারিং করিতে পারেন না; যিনি কেবল গাড়োয়ানের কাজে দক্ষ, তিনি জাহাজের সেরাং বা মাল্লার কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল চিকিৎসা জানেন, তিনি জজিয়তী করিতে পারেন না; এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক ওকালতী করিতে কিম্বা রাজমন্ত্রী অধ্যাপকতা করিতে পারেন না; যিনি কেবল সঙ্গীতের ওস্তাদ, তিনি যোদ্ধা ও সেনাপতির কাজ করিতে পারেন না; ইত্যাদি।

লেখাপড়া-জানা-মাপেক্ষ যে-সব কাজ আছে, তাহার মধ্যে কেরানীগিরি এবং মাষ্টারীকেই সাধারণতঃ লোকে খুব সোজা কাজ মনে করে। কিন্তু কেরানীগিরির জগৎও যে-সব পবীক্ষা লওয়া হইত বা হয়, তাহাতেও যাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ রকম শিক্ষা ও জ্ঞান বেশী, তাহারাি প্রতিযোগিতায় কাজ পাইত বা পায়। ইহাও জানা কথা, যে, কেরানীগিরিতেও ভাল কেরানী মন্দ কেরানী আছে। সুতরাং ইহা বৃষ্টিতে বেশী কষ্ট হয় না, যে, ভাল-রকম কেরানীগিরি করাও যার তার সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষকতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, ইহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান চাইই, অধিকন্তু

শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিশু, বালকবালিকা ও তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ করিবার দক্ষতা চাই। এইজন্য পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে শিক্ষাদান (pedagogy) একটি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-সমষ্টি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উহা শিখাইবার জন্য বিস্তারিত শিক্ষালয় আছে, এবং উহার সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা ও গবেষণা হইতেছে।

কেরানীগিরি ও মাষ্টারী ছাড়া যে-সব সরকারী কাজ আছে, তাহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া বিশেষ-রকম শিক্ষা ও জ্ঞান চাইই। যেমন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, এঞ্জিনিয়ারিং, পশুচিকিৎসা, কৃষির উন্নতিসাধন, বিচার, ভূতত্ত্ব ও খনিজসম্বন্ধীয় কাজ, অরণ্য-বিভাগের কাজ, কল-কারখানা বিভাগের কাজ, স্থলযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, ইত্যাদি।

পুলিসের কাজ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর পুলিস কৰ্মচারীদের কাজ, সমাজে এখনও হেয় বিবেচিত হয়। তাহার কারণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, পুলিসের কাজ, এমন কি নিম্নতম পুলিসের অর্থাৎ কন্টেবলের কাজ, করিতে হইলেও সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশের পুলিসের অন্তর্গত সব সভ্যদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অক্ষমতার একটা প্রধান কারণ তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার অভাব বা অল্পতা। কন্টেবলের কাজও যে-সে ভাল করিয়া করিতে পারে না।

গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে, এবং আগেও জানা ছিল, যে, যাহাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাহারা সৈন্যসংখ্যা, অর্থবল, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের অন্তর্গত সরঞ্জাম, ইত্যাদিতে সমকক্ষ হইলেও, যে পক্ষের সৈন্যেরা বেশী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, জিৎ সাধারণতঃ তাহারই হয়। এখানেও শিক্ষার প্রাধান্য দেখা যাইতেছে।

অতএব, সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে, যে, অন্তর্গত সব-রকম কাজের মত, সরকারী চাকরীও যে-রকমেই হউক না, তাহাতে তদনুরূপ যোগ্যতার আবশ্যিক। যোগ্যতার মধ্যে চারিত্রিক শক্তি আছে, স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, শিক্ষা দ্বারা মার্জিত বুদ্ধি আছে, সাধাবণ ও বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞান

আছে। মোটের উপর বলা যায়, যে, যোগ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয় শিক্ষার উপর। কতক শিক্ষা পরোক্ষভাবে পরিবার ও প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে লব্ধ হয়, বাকী শিক্ষালয় হইতে এবং পুস্তকাদি হইতে লব্ধ হয়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

এখন ইতিহাসের কথা বলি। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই যখন প্রধানতঃ ভারত-বর্ষের অধিবাসী ছিলেন, তখন তাহারা ও তাহাদের রাজারা বা শাসনকর্তারা এমন ভাবে দেশের কাজ ও সমাজের কাজ চালাইতে পারেন নাই, যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীদের সর্ববিধ শক্তির বিকাশ হইতে পারে, এবং সকলের সমবেত শক্তি দেশহিত ও দেশরক্ষার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারতের প্রাচীন যুগ বলিতে বহুশতাব্দী বুঝায়। তাহার প্রত্যেক শতাব্দীতে দেশের প্রত্যেক অংশেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠন এবং উভয়ের কার্য সম্পাদনের রীতি এক-রকম ছিল না। কিন্তু মোটামুটি ইহা বলা যায়, যে, জাতিভেদ-প্রথা থাকার দরুন, দেশের লোকদের মধ্যে যে-কেহ যে-কোন কাজ করিতে ইচ্ছুক, শক্তি ও যোগ্যতা থাকিলে সে তাহা করিতে পাইবে, একরূপ রীতি ভারতে সে পরিমাণে ছিল না, যে পরিমাণে উহা বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ-সকলে আছে। সেইজন্য দেশরক্ষার কাজ রাজাদের ও ক্ষত্রিয়দের ছাড়া যে অন্তর্গতেরও কাজ, এই ধারণা জন্মে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাতিভেদ-প্রথা-রূপ কৃত্রিম প্রথা মানব-প্রকৃতিকে নষ্ট করিতে বা চাপা দিতে পারে না। বলিয়া, আমরা ভারতের অতীত ইতিহাসে শূদ্র রাজা, ব্রাহ্মণ রাজা, প্রভৃতি দেখিতে পাই। মধ্যযুগে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়াছিল, তখন, কেবল ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ও যোদ্ধা হইবে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম দ্বারা হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের এখানে মোটামুটি বক্তব্য এই, যে, হিন্দু জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতিদের দেশরক্ষার অক্ষমতার একটি কারণ এই, যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতমের আদর হইবে, এই আদর্শ স্থাপন করিবার চেষ্টা না করায় তাহারা অযোগ্য হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। সেই কারণে বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক মুসলমানেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। মুসলমানেরাও, দেশকে নিজের করিয়া লইয়া, সকলের সর্ববিধ শক্তির বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া, সকলকে সর্ববিধ শক্তি বিকাশের সুযোগ দিয়া যোগ্যতমের আদর করিয়া, সর্বসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনের অধিকার দিতে পারেন নাই। এইজন্য মুসলমান রাজারা ও তাঁহাদের কর্মচারীরা বিধাতার তুলদাঁড়িতে অযোগ্য বিবেচিত হন। ইংবেজ বাণিজ্য করিতে আসিয়া বাজা হইয়াছিল এইজন্য, যে, মোটের উপর তাহাদের যোগ্যতা বেশী ছিল।

সংক্ষেপে, আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, বাষ্ট্রীয় ছোট বড় কাজ চালান, দেশেব ছোট বড় কাজ চালান, যথাযোগ্য ভাবে যার-তার দ্বারা হয় না; কাহাকেও কোন একটা কার্যক্ষেত্রের সবটার বা কতকটার মালিক করিয়া দিলেই যে সে ঠিকমত কাজ চালাইয়া মালিকত্ব রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করা খুব ভুল। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ ত ভারতের সব কার্যক্ষেত্রের মালিক ছিল; কিন্তু সে মালিকত্ব গেল কেন? অযোগ্যতাব জন্ম। মুসলমান ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেব রাষ্ট্রীয় কার্যক্ষেত্রেব মালিক ছিল। তাহা গেল কেন? অযোগ্যতা হেতু। মরাঠা ভারতের অনেক প্রদেশের প্রভু হইয়াছিল। প্রভু থাকিতে পারিল না কেন? অযোগ্যতার নিমিত্ত। ইহাই মোটামুটি উত্তর। জ্ঞান অর্জন ও দানের, ধর্ম আচরণ ও ধর্মোপদেশ দানের পুরাপুরি অধিকার (শতকরা ৫৫ অংশ নহে) শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণের; রাজকার্য ও যুদ্ধেব পূর্বা অধিকার (শতকরা ৫৫ অংশ নহে) শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয়ের। কিন্তু এসব কার্যক্ষেত্রে অগ্ৰাণ্য ধর্মের ও জাতির (caste-এর) লোকেরাও বহু শতাব্দী হইতে ভাগ বসাইতে সমর্থ হইয়াছে কেমন করিয়া? অধিকতর যোগ্যতার দ্বারা? মুসলমান যখন এদেশ জয় করিলেন, তখন তিনি সরকারী কাজের শতকরা ১০০টিই, ৫৫টি নহে, স্বধর্মীকে দিতে সমর্থ, ও অধিকারী ছিলেন; কিন্তু প্রভুত্বের সময়ও তাহা দিতে পারেন নাই। কারণ সব কাজ মুসলমানের

দ্বারা চালাইবার মত নানা-প্রকারের শক্তি দক্ষতা যোগ্যতা মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। এইজন্য অনেক বড় বড় কাজ আওরঞ্জীব বাদশাও হিন্দুকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান-শাসনকালের শেষ দিকে যখন মৈসূরের হিন্দুরাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হাইদার আলী ও টিপু সুল্তান রাজত্ব করেন, তখনও তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন পূর্ণিয়া— একজন হিন্দু। বঙ্গের শেষ নবাবদের রাজত্ব-কালেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রভৃতির পদে গাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক হিন্দুর নাম দৃষ্ট হয়। আজকালকার দিনেও দেখিতে পাই, যখন কিছু কাল পূর্বে বঙ্গের কোন কোন মুসলমান ধর্মনেতা মুসলমান জমীদারদিগকে হিন্দু কর্মচারী ছাড়াইয়া তাহাদের জায়গায় মুসলমান কর্মচারী রাখিতে বলেন, তখন সে অল্পরোধ রক্ষিত হয় নাই। আফগানিস্থানের বর্তমান সুযোগ্য আমীবেরও একজন প্রধান কর্মচারী দেওয়ান নিরঞ্জনদাস হিন্দু; কারণ সম্ভবতঃ আমীর তাঁহাকেই এই কাজেব সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করেন।

অতএব, আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, মুসলমানেরা শতকরা ৫৫টি কেন, শতকরা ৮০টি সরকারী কাজই প্রাপ্ত হউন, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; কিন্তু যোগ্যতা দ্বারা তাহারা উহা প্রাপ্ত হউন। যোগ্যতা অর্জনের জন্ম তাঁহাদিগকে শিক্ষা লাভের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হউক। সেইসঙ্গে হিন্দু সমাজের যে-সব জা'ত মুসলমানের চেয়েও শিক্ষায় পশ্চাদ্ভর্তী তাঁহাদিগকেও সুযোগ দেওয়া হউক।

হিন্দুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

একজন শিক্ষিত মুসলমান খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, হিন্দুরা সব আফিস দখল করিয়া বসিয়াছে; তাহাদের বড়-বাবুরা যোগ্য মুসলমানকে চাকরী না দিয়া কেবল হিন্দুকেই চাকরী দেয়। কোন হিন্দু চাকরোর বা অনেক হিন্দু চাকরোর এইরূপ দোষ নাই, ইহা আমরা বলিতেছি না। মুসলমান চাকরোদেরও অনেকের এই দোষ

আছে—কম, বেশী বা সমান আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু, কোন কোন স্থলে হিন্দু বা মুসলমান পক্ষপাতী হইলেও, স্ববিস্তৃত দেশের হাজার হাজার চাকরীতে হিন্দুর পক্ষপাতিতায় মুসলমানরা যোগ্যতা সত্ত্বেও চুকিতে পারিতেছে না, ইহা নিতান্তই বাজে কথা (তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি);—বিশেষতঃ যখন কাজ দিবার আমল মালিক অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ, এবং ইংরেজ কেবলই হিন্দুর অন্তকূলে পক্ষপাতিত্ব করে, ইহা সত্য নহে।

স্বরাজ্য-দলের চুক্তিপত্রের স্থল মর্ম্ম এই, যে, সরকারী কাজের শতকরা ৫৫টি মুসলমান এবং ৪৫টি হিন্দু পাইবে। সরকারী কাজ উচ্চ ও নিম্ন নানা রকমের আছে। এই কার্যবিভাগটাকে অনেকটা হিন্দুর বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কার্যবিভাগের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হিন্দুর শাস্ত্র বলেন, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ আদি রাষ্ট্রীয় কাজ ক্ষত্রিয়ের। স্বরাজ্য-দল বলিতেছেন, রাজ্যশাসন, রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজের অর্ধেকের উপর মুসলমানের; বাকি, অর্ধেকের কম, হিন্দুর। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম হিন্দুব শাস্ত্রীয় কার্যবিভাগ মানে নাই বলিয়া বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী কার্যবিভাগ পুস্তকের পাতায় মাত্র আবদ্ধ হইয়া আছে; প্রাকৃতিক নিয়ম যোগ্যতমেরই অনুকূল বলিয়া স্বরাজ্য-দলের ফতোয়াও মানিবে না। যোগ্যতা অনুসারে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই ৪৫টি বা ৫৫টির বেশী বা কম পাইবে।

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, যে, সরকারী কাজের যোগ্যতার ভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষা যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সরকারী কাজও তাহারা সেই পরিমাণে পাইবে। কোন কোন স্থলে হিন্দুব প্রতি পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকিলেও, মোটের উপর যে অবিচার হয় নাই, তাহার একটা পরোক্ষ কিন্তু অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিতেছি। চিকিৎসা বিভাগের সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত ডাক্তার অপেক্ষা বেসরকারী এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী হাকিমী কবিরাজী প্রভৃতি নানা মতের চিকিৎসকের সংখ্যা ঢের বেশী। ১৯২১ সালের বঙ্গের সেন্সস্ রিপোর্ট অনুসারে চিকিৎসাদি কাজে নিযুক্ত কর্ম্মী ও পোষ্যের

মোট সংখ্যা ১,৭৭,৩৬৯। তাহার মধ্যে ১,৪১,৩২৫ হিন্দু; ৩৬,০৪৪ মুসলমান (অগ্ন্যন্ত ধর্ম্মের লোকদের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক)। হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু চিকিৎসাদি কাজে যত হিন্দুর জীবিকানির্ভাহ হয়, তাহার সিকি মুসলমানেরও হয় না। এখানে কেহ বলিতে পারিবেন না, যে, কেহ পক্ষপাতিত্ব করিয়া মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে।

আইনের ব্যবসাও একটি “স্বাধীন” ব্যবসা। বঙ্গের ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে দেখিতে পাই, মোট ব্যারিষ্টার, উকীল, কাজী, মোক্তার ও রেভিনিউ এজেন্টের ও তাহাদের পোষ্যদের মোট সংখ্যা ৫৬,৯১৯। ইহার মধ্যে হিন্দু ৫০,৭৩১; মুসলমান ৫,১৮৮। বঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী; তাহারা হিন্দুদের চেয়ে মোকদ্দমাও কম করে না। অথচ আইনব্যবসায়ী মুসলমানের সংখ্যা ঐ-ব্যবসায়ী হিন্দুর চেয়ে খুব কম। উকীল ব্যারিষ্টারের মুহুরী, দরখাস্ত-লেখক প্রভৃতির সংখ্যা মোট ৩০,৮৪০; তন্মধ্যে হিন্দু ২৬,১৮০, মুসলমান ৪,৬৬০।

ধর্ম্মব্যবসায়ীর সংখ্যাও ধরুন। এই কাজে মুসলমান মুসলমানকে এবং হিন্দু হিন্দুকেই নিযুক্ত করিতে বাধ্য। মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্ম হিন্দু পুরোহিতের দ্বারা হইতে পারে না, এবং গবর্নমেন্ট কোন পরীক্ষা লইয়াও কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মব্যবসায়ী কে হইবে, ঠিক করিয়া দেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন-প্রকার পক্ষপাতিত্বের কথা উঠিতে পারে না। ধর্ম্মব্যবসায়ীর মোট সংখ্যা ৩,২০,৪৬৫। তাহার মধ্যে ২,৭৬,৫০৪ হিন্দু; ৪৩,৯৬১ মুসলমান।

অতএব, মোটামুটি দেখা গেল, যে, যে-সব “স্বাধীন” ব্যবসার কাজে অল্প বা বেশী লেখাপড়া জানা দরকার, এবং যাহাতে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বের কথা উঠিতে পারে না, বরং যাহাতে যোগ্যতাই টিকিয়া থাকিবার ও উন্নতি করিবার প্রধান উপায়, তাহাতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ঢের বেশী।

শিক্ষাসাপেক্ষ স্বাধীন ব্যবসায় ও সরকারী চাকরীর ভাগ

এখন দেখা যাক, মুসলমানেরা অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপরিলিখিত কাজ-সকলে যতটা ভাগ পাইয়াছেন, কাহারও পক্ষপাতিত্বের দরুন সরকারী চাকরীর ভাগ তার চেয়ে কম পাইয়াছেন কি না।

সেন্সস্ রিপোর্টে সরকারী কাজকে দুটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—সরকারী বল বিভাগ (Public Force) এবং সরকারী কার্যনির্বাহ বিভাগ (Public Administration)। সরকারী বলের চারিটি ভাগ—স্থল-সৈন্য, নৌসৈন্য, আকাশসৈন্য, পুলিশ। সরকারী বল বিভাগে মোট সংখ্যা ১,৭৭,৬৫৭; হিন্দু ১১৩,০২৫, মুসলমান ৫৭,১৫১। কার্যনির্বাহ বিভাগে মোট সংখ্যা ১,৪৪,২৬৩; হিন্দু ১,০৭,০৭২, মুসলমান ৩২,৪১৮।

আমরা উপরে দেখিয়াছি, এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, টীকাদার, কম্পাউণ্ডার, ধাত্রী, প্রভৃতির কাজ দ্বারা যত হিন্দুর জীবিকা নির্বাহ হয় তাহার সিকি মুসলমানেরও জীবিকা নির্বাহ তাহার দ্বারা হয় না। কিন্তু সরকারী বল ও সরকারী কার্যনির্বাহ, সরকারী চাকরীর এই দুই প্রধান বিভাগে দ্বারা যত হিন্দু পালিত হয়, তাহার সিকি অপেক্ষা অনেক বেশী মুসলমান পালিত হয়। অতএব, এই দুই ক্ষেত্রে মোটামুটি মুসলমানের যোগ্যতা অবহেলিত হয় নাই। উপরে আরো দেখিয়াছি, আইন-ব্যবসায় যত হিন্দু পালিত হয়, তাহার নবম অংশ মুসলমান পালিত হয়। সরকারী চাকরীতে মুসলমানের অনুপাত ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। উকীলের মুহুরী ইত্যাদি হিন্দু যত, মুসলমান তাহার সিকি। কিন্তু মুসলমান সরকারী চাকর্যে হিন্দু সরকারী চাকর্যের সিকির চেয়ে ঢের বেশী।

অতএব, দেখা যাইতেছে, শিক্ষাসাপেক্ষ “স্বাধীন” ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতায় মুসলমান নিজের যোগ্যতার জোরে যে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছেন, সরকারী চাকরীতে (হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব মানিয়া লইলেও) তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থান পাইয়াছেন। সুতরাং

ইহা নিশ্চিত, যে, যদি চাকরী-দাতা কোন কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা মুসলমানের অনুকূলে করিয়াছেন, প্রতিকূলে নহে।

রুশিয়ার দৃষ্টান্তের উপদেশ

রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবে সাম্রাজ্য বিলুপ্ত, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ও মূলধনীরা ক্ষমতাচ্যুত এবং খুব বেশী পবিমাণে নিহত হইয়াছিল। যাহারা কৃষিকার্য, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও অন্তর্বিধ দৈহিক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কবে, তাহাবাই সর্বসর্কা হয় এবং এক নূতন রকমের সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হইতে দিবার কোন ইচ্ছা ত তাহাদের ছিলই না; তাহারা ঐ শ্রেণীর লোকদের কোন সাহায্য লইবার ইচ্ছাও করে নাই। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, কোন কোন কাজ ঐ শ্রেণীর লোকের সাহায্য ভিন্ন চলে না, তখন তাহারা তাহাদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। রুশিয়ার এই বন্ধ্যেভিক্‌রা কেবল যে সংখ্যায় অল্প সব রকমের অধিবাসীদের চেয়ে খুব বেশী ছিল, তাহা নহে; তাহাবা বিপ্লবের দ্বারা সর্বসর্কাও হইয়াছিল। তথাপি তাহারা সব রকম কাজ হস্তগত করিয়াও চালাইতে না পারিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়, যে, সব কাজ দখল করিবার ক্ষমতা ঘটনাচক্রে হস্তগত হইলেও সব কাজ করিবার মত যোগ্যতা না থাকিলে তাহা নিজেদের হাতে রাখা যায় না। সেইরূপ, শতকরা ৫৫টি সরকারী কাজ বাঙ্গালী মুসলমানরা হস্তগত করিবার ক্ষমতা পাইলেও, তাহার সবগুলি ভাল করিয়া করিবার মত যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য লোক মুসলমান-সমাজে এখন নাই। তাহারা বলিতে পারেন, “স্বরাজ পাইতেও ত দেবী আছে; ততদিনে যথেষ্ট যোগ্য লোক আমাদের মধ্যে হইবে।” তাহার উত্তরে বলি, যোগ্য লোক যথেষ্ট হইলে কাজও তাহারা যথেষ্ট পাইবেন; কারণ, এখনই ত (উপরিলিখিত সেন্সস্ হইতে গৃহীত অঙ্কগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে, যে,) মুসলমানেরা

তাহাদের সম্প্রদায়ের যোগ্যতার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী সরকারী কাজ তাহারা করিতেছেন। সুতরাং এখন হইতেই কাজ ভাগাভাগি সম্বন্ধে ঝগড়া বাধান উচিত নহে। তা ছাড়া, কাগজে দেখা গেল, মুসলমানেরা স্বাভাবিক অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন; শীঘ্রই ইংরেজ-রাজত্বকালেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের তরফ হইতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে, যে, বঙ্গের সব সরকারী কাজের শতকরা ৫৫টি তাহাদিগকে দেওয়া হউক।

অমুসলমানেরা চাকরীর ইচ্ছা ছাড়ুন

বস্তুতঃ, গবর্ণমেন্টের কূটনীতির জয়েব জগ্ন মুসলমানদের ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করা যদি এখন বা অল্প কোন সময়ে আবশ্যিক হয়, তাহা হইলে উহা গৃহীত হইবে। এইজন্য হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সরকারী চাকরীর প্রত্যাশা তাহারা যতটা করেন, তাহা এখন হইতেই ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। আর, বরাবর ত অল্প নানা কারণেও চাকরী না করিয়া স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিতে দেশহিতৈষীরা সুপরামর্শ দিয়া আসিতেছেন। মাড়োয়ারীরা চাকরীর প্রত্যাশা করে না। তাহাদের টাকা ও ক্ষমতা কম নয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে ভাটিয়া, কচ্ছা, সিন্ধা, পঞ্জাবী, মাদ্রাজী, প্রভৃতিরও আসিয়া বহু ধনশালী হইতেছে। মাড়োয়ারীদের ও তাহাদের অনেকে মলধন লইয়াও আসে নাই। অতএব মূলধনহীন বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকদের চাকরী না করিয়াও অনেক সংস্থান করা সম্ভব নহে। মুসলমানেরা যোগ্যতম না হইয়াও যদি এখন অনেক বৎসর সমৃদ্ধ চাকরী বা শতকরা ৭০।৮০টি চাকরী পাইতে পাকেন (কারণ, এইরূপ বেশী সংখ্যায় তাহাদিগকে চাকরী না দিলে সব চাকরীর শতকরা ৫৫টি তাহাদের হস্তগত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে), তাহা হইলে উহা বাস্তব পক্ষে কল্যাণকর না হইলেও, অমুসলমান শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এক হিসাবে শাপে বর হইতেও পারে, কারণ, তাহারা বাধ্য হইয়া স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিবে, অনেকে তাহাতে

রুতকায়া হইবে, এবং মোটের উপর তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও স্বাধীনচিত্ততা বাড়িবে। মুসলমানরা কিছুদিন চাকরীর সুখ ভোগ করিবার পর তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হিতৈষী মনাসীবাৎ স্বাধীন জীবিকার সম্বন্ধে আন্দোলন জড়িবেন।

শিক্ষার বিস্তৃতি ও চাকরীর অংশ

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, আমাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে সরকারী কাজের ভাগ হওয়া উচিত নয়; যে সম্প্রদায়েব মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরী করিবার ইচ্ছা থাকিলে, শিক্ষার বিস্তৃতির অনুপাতে চাকরী তাহারা স্বভাবতই পাইয়া থাকেন।

এখন আমরা দেখিতে চাই, মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ, সে অনুসারে তাহারা যথেষ্ট চাকরী পাইতেছেন কি না। সাধারণতঃ ২০ ও তদুচ্চ বয়সের লোকেরাই চাকরী করেন, এবং আজকাল নিম্নতম শ্রেণীর কোন কোন কাজ ছাড়া ইংরেজী না জানিলে কোন চাকরী পাওয়া যায় না। অতএব, আমাদের পক্ষে দেখিতে হইবে, ২০ ও তদুচ্চ বয়সের লিখন-পঠনক্ষম ও ইংরেজী-জানা লোক বাংলাদেশে কোন সম্প্রদায়ে কত আছেন।

ঐ বয়সের লিখন-

পঠনক্ষম পুরুষ

মুসলমান

৩,১৭,৬৩০

হিন্দু

১৮,৫৫,৫৭৬

ঐ বয়সের ইংরেজী-

জানা পুরুষ

মুসলমান

৮১,৮০৩

হিন্দু

৩,৭৭,৮৫৬

এই তালিকায় দেখিতেছি, মুসলমানেরা মোট লোকসংখ্যায় হিন্দুদের চেয়ে খুব বেশী হইলেও, তাহাদের মধ্যে চাকরীর বয়সের কেবলমাত্র মাত্রভাষায় চিঠি লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ পুরুষ হিন্দুদের অর্ধেকের চেয়েও কম। ইংরেজী-জানা চাকরীপ্রার্থী লোক আজকাল বিস্তর থাকায় শুধু মাত্রভাষায়-লিখনপঠনক্ষম লোকদের চাকরী পাওয়া আজকাল সুকঠিন। পাইলেও তাহারা কন্ঠেবলীর

মত নিম্নশ্রেণীর কাজই পায়। পুলিশের ছোট বড় সব কাজে হিন্দু কর্মী ও পোষার সংখ্যা ১,১০,৪১৬, মুসলমান ৫৬,৬৬৭, গ্রাম্য চৌকীদারীতে হিন্দু ৭২,৮২৬, মুসলমান ৪৪,৪৫৩। অর্থাৎ উভয় রকম কাজেই মুসলমান হিন্দুর অর্ধেক অপেক্ষা বেশী। কেবলমাত্র মাতৃভাষা-লিখন-পঠনক্ষম চাকরীর বয়সের মুসলমান পুরুষ হিন্দুদের অর্ধেকেরও কম। সুতরাং ঐরূপ শিক্ষার উপযোগী সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি অবিচার হয় নাই। ইংরেজের সরকারী চাকরী করিবার প্রধান যোগ্যতা ইংরেজীর জ্ঞান। চাকরীর বয়সের ইংরেজী-জানা মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা হিন্দুদের ঐ বয়সের ইংরেজী-জানা পুরুষদের সংখ্যার সিকিরও অনেক কম। কিন্তু সরকারী কাযানির্বাহ (Public Administration) বিভাগসকলে হিন্দু ১,০৭,০৭২, মুসলমান ৩২,৪১৮, অর্থাৎ হিন্দুর সিকির অনেক বেশী। মুসলমানেরা মনে করেন, পুলিশের কাজে তাঁহাদের যোগ্যতা বেশী। পুলিশবিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, গ্রাম্য চৌকীদারীর অর্ধেকের বেশী তাঁহাদের হাতে; উচ্চতর সমুদয় কাজের মধ্যে ৩০,৫২০ হিন্দু; ১২,২১৪ মুসলমান, অর্থাৎ হিন্দুর এক তৃতীয়াংশেরও বেশী।

দেখা গেল যে, শিক্ষার বিস্তার দ্বারা যোগ্যতার পরিমাপ করিয়া তদনুসারে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানের প্রতি অবিচার করা হয় নাই। বরং তাঁহাদের মধ্যে চাকরীর বয়সের লোকের শিক্ষিত অভূপাতে তাঁহারা চাকরী বেশীই পাইয়াছেন।

চারিত্রিক যোগ্যতা

আমরা পূর্বে সরকারী চাকরীর যোগ্যতার বিষয় আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি, যে, সংচরিত্রও যোগ্যতার একটি অঙ্গ। অর্থাৎ কাহাকেও চাকরী দিতে হইলে সে পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী কি না, নেশা করে কি না, ঘুষ লইতে পারে কি পারে না, ইত্যাদিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এখন একটা কথা উঠিতে পারে, যে, মুসলমানেরা লেখাপড়া কিছু নিরস হইলেও হিন্দুদের চেয়ে চরিত্রাংশে শ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠ কি না নিকৃষ্ট বা সমান, তাহা বলিবার মত যথেষ্ট ব্যাপক ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। তবে, আমরা কয়েক বৎসর উপযুক্ত প্রবাসীতে জেল-বিভাগেব রিপোর্ট পঢ়্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, চরিত্র-বিষয়ে মুসলমানদিগেব কোন সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠতা নাই। সুতরাং শৈশব হইতে পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ রকমের সম্ভাবিত সুশিক্ষা পাইলে মুসলমানের যেমন সংচরিত্র হইবার সম্ভাবনা, হিন্দুরও তেমনই সম্ভাবনা, ইহার বেশী কিছু বলিতে পারি না।

আমাদের হাতের কাছে বঙ্গের ১৯২১ সালের জেল-রিপোর্ট রহিয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, ঐ সালে অপরাধ করিয়া যে ২৮২১৭ জনের কারাদণ্ড হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫.৬২ জন মুসলমান, ৩০.৩১ জন হিন্দু। বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে ৫৩.৫৫ মুসলমান, ৪৩.৭২ হিন্দু। সুতরাং অপরাধপ্রবণতা মুসলমানদের মধ্যে বেশী দেখা যাইতেছে। শুধু বাংলা দেশেই যে এইরূপ দেখা যায়, তাহা নহে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ১৯২২ সালের জেল রিপোর্ট হইতে নীচের তালিকাটি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সমুদয় অধিবাসীর এবং জেলখানাগুলির অধিবাসীর শতকরা কয়জন কোন দম্মাবলম্বী, তাহা দেখান হইয়াছে।

সমগ অধিবাসী।

জেল-অধিবাসী

	১৯২০	১৯২১	১৯২২
পষ্টিমান	০.৩৮	০.২২	০.২৬
মুসলমান	১৪.৩৮	১৭.২৭	১৮.২৩
হিন্দু	৮.৫০	৮.১৭	৮.৫১

অনাবশ্যক বোধে অন্যান্য প্রদেশের অঙ্ক দিলাম না।

মুসলমানবহুল জেলাসমূহে শিক্ষার বিস্তার

জন্ ষ্ট্র্যাট্ মিল তাঁহার “চিন্তা ও বিচারেব স্বাধীনতা” শীর্ষক প্রবন্ধে কোরান্ শরীফ্ হইতে একটা বচনের এই ইংরেজী অল্লেখ্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

“A ruler who appoints any man to an office, when there is in his dominion another man better qualified

for it, sins against God and against the State.'
(Quoted in *The Indian Messenger*.)

অর্থাৎ, যে শাসনকর্ত্তা তাঁহার রাজ্যে যোগ্যতার লোক থাকিতে অশু কাহাকেও কোন পদে নিযুক্ত করেন, তিনি ঈশ্বরের ও বাষ্ট্রের নিকট অপরাধী হন।

কোরানজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার মূল আরবী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। আফ্গানিস্তানের বর্ত্তমান আমীর যে হিন্দু দেওয়ান নিরঞ্জনদাসকে রাজস্ব-বিভাগের খুব উচ্চ কাজ দিয়াছেন, আকবর যে টোডর মল, মানসিংহ প্রভৃতিকে, আওরঞ্জীব যে

জয়সিংহ প্রভৃতিকে, হায়দরআলী ও টিপু সুল্তান যে পুণিয়াকে উচ্চ রাজকার্য্য দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ কোরান-শরিফ-নির্দিষ্ট এই নীতি অনুসারে দিয়া-ছিলেন।

বঙ্গের যে-সকল জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, তথায় ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে শিক্ষার বিস্তার কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখিলে, শতকরা ৫৫টি সরকারী কাজ মুসলমানদিগকে দেওয়া কোরান শরীফের উপদেশ অনুযায়ী হইবে কি না বুঝা যাইবে।

জেলা	সমুদয় অধিবাসীর প্রতি দশ হাজারে		মোট লিখনপঠনক্ষম		মোট ইংরেজী-জানা	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
নদিয়া	৩৯১১	৬০১৮	৭৩১১৫	২১৭৭৬	২০২৩৫	২৭৬২
মুর্শিদাবাদ	৪৫০৫	৫৩৫৭	৬২০৮১	২৫৪৯০	১৩২৭২	২৬৬০
যশোর	৬৮১১	৬১৭৬	৮১৫২৪	৪৯৫২৫	১৩৪৮৫	৩৩২৫
রাজশাহী	২১৩৭	৭৬৫৪	৩৭০২৫	৪২৪০২	৭৩১১	২৯১৬
দিনাজপুর	৪৪০৯	৪৯০৭	৫৫২৫৩	৭৫৭৩৫	৬৫০৩	৩৬৭৯
রংপুর	৩১৫৫	৬৮০৩	৬৮১০৮	৭৪৮৬৬	৯৩৩৫	৫৭৮৯
বগুড়া	১৬৬৪	৮২৪৯	২৪৭৪৩	৬৪৫০১	৫৭৩৩	৬১৩৪
পাবনা	২৪০৬	৭৫৮৩	৫২৪২২	৬৮৩৭৯	১৩১৩০	৫৭৯৩
মালদহ	৪০৬৩	৫১৫১	২৭২১৮	১৯০৪৪	৩৬০৮	১৮৮৬
ঢাকা	৩৪২০	৫৫৩৬	১৮৩৪১৯	৭৭৫১৩	৪২৮৪৭	১০৭৬৬
মৈমনসিং	২৪২৭	৭৪৯১	১৪৫৫০৩	১০০২৯৯	৩০৮৩৫	১৪৪৯৬
ফরিদপুর	৩৬৩৫	৬৩৪৬	১২৫৯৪৭	৪৮১০৫	২৫৮৫৫	৫৫৯৩
						৫৫৯৪
বাখরগঞ্জ	২৮৭৫	৭০৫৬	১৬৪৭৭৫	১৩৩৭৫৫	২৪৮৫২	৬৪০৪
ত্রিপুরা	২৫৭৯	৭৪১২	১২৪৫০৪	১১৪৪২১	২০৩৮০	১১৫৮৫
নোয়াখালি	২২৩৫	৭৭৫৭	৩৫৫৮১	৫৮৫৮৫	৭৫০৪	৫০৭০
চট্টগ্রাম	২২৫৮	৭২৮১	৬০৪৫৪	৪৯৫৯৭	১২৮১০	৫৫০৬

বঙ্গের যোলটি জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী। মোট মুসলমান লোকসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও ইহার মধ্যে ১১টি জেলায় মুসলমান লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা হিন্দু লিখনপঠনক্ষম অপেক্ষা কম। যে পাঁচটিতে মুসলমান লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা হিন্দু লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, তাহার মধ্যে, রাজশাহীতে সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান শতকরা ৭৬, হিন্দু ২১; দিনাজপুরে মুসলমান ৪৯, হিন্দু ৫১; রংপুরে মুসলমান ৬৮, হিন্দু ৩১; বগুড়ায় মুসলমান ৮২, হিন্দু ১৬; নোয়াখালিতে মুসলমান ৭৭, হিন্দু ২২।

যোলটি মুসলমানপ্রধান জেলার মধ্যে এক মাত্র বগুড়ায় ইংরেজী-জানা মুসলমানের সংখ্যা ইংরেজী-জানা

হিন্দুর চেয়ে ৪০১ জন মাত্র বেশী; কিন্তু বগুড়ার শতকরা ৮২ জন অধিবাসী মুসলমান, কেবল মাত্র শতকরা ১৬ জন হিন্দু। উহার মোট মুসলমান লোক-সংখ্যা ৮,৬৪,৯৯৮; হিন্দু ১,৭৪,৪৬৬।

ইংরেজের সরকারী চাকরীর যোগ্যতার প্রধান অংশ ইংরেজী ভাষার জ্ঞান। মুসলমানেরা তাহাতে অনগ্রসর বলিয়া তাঁহারা সরকারী কাজ সংখ্যায় কম পান, কিন্তু পূর্বে দেখিয়াছি, যে, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতির অনুপাতে তাঁহারা তাঁহাদের পাওনা অপেক্ষা বেশীই পাইয়া থাকেন। শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি তাঁহাদের মধ্যে আরো হইলে তাঁহারা আরো কাজ পাইবেন। দেশের সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের জন্ত সরকারী শিক্ষার বন্দোবস্ত

যাহা আছে, তাহার সুবিধা হইতে সরকার তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই, অল্প সকলের মত তাঁহারাও সেই সুবিধা ভোগ করিতে পারেন। অধিকন্তু তাঁহাদের জন্ম কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও আছে, যে ব্যবস্থা, তাঁহাদেরই মত এবং তাঁহাদের চেয়েও শিক্ষায় অনগ্রসর কোন কোন শ্রেণীর হিন্দুর ও ভূতপূজকদের জন্ম নাই। সকলের জন্ম শিক্ষার বরাদ্দ না কমাইয়া যদি মুসলমানদের শিক্ষার আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা সুখী বই অসুখী হইব না; কারণ তাহাতে শেষ পর্যন্ত দেশের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রভূত কল্যাণ হইবে।

—

সরকারী চাকরী দ্বারা কত লোক পালিত হয়

সেন্সস্ রিপোর্টে দেখিতে পাই, সরকারী চাকরীতে বাংলাদেশে মোট কর্মী ও পোষ্যের সংখ্যা ৩,২১,৯২৬। ইহার মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদার এবং মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির কর্মচারীদিগকেও ধরা হইয়াছে। বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২। ইহা হইতে সরকারী চাকর ও তাহাদের পোষ্যদিগকে বাদ দিলে ৪,৭২,৭০,৫৩৬ জন লোক বাকী থাকে। সুতরাং সরকারী চাকরীর দ্বারা বাস্তবিক খুব অল্প লোকই পালিত হয়। তাহা লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মনো-মালিন্য জন্মান অত্যন্ত স্বার্থপরতা ও মুর্থতার কাজ।

সত্য বটে, এদেশে বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা বশতঃ এবং লোকদের পণ্যশিল্প ও অল্প বহুবিধ স্বাধীন ব্যবসা খুব বেশী না থাকায়, সরকারী চাকরীটাকে লোকে অগ্রাগ্র সত্য এবং গণতন্ত্র দেশের চেয়ে বেশী দরকারী ও মূল্যবান মনে করে। তা ছাড়া, বিদেশী সরকারী চাকর্যেরা যেমন আপনাদিগকে সর্বসাধারণের চাকর অর্থাৎ সেবক মনে না করিয়া প্রভু মনে করে, সেইরূপ দেশী চাকর্যেরাও (বিশেষতঃ পুলিশ ও হাকিমেরা) আপনাদিগকে দেশের অগ্র লোকদের সেবক মনে না করিয়া প্রভু মনে করে। সর্বসাধারণেও দাস-বুদ্ধি বশতঃ তাহাদিগকে মনিব বলিয়া মানিয়া লওয়ায়

সরকারী চাকরীর গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে ও বজায় আছে। কিন্তু বাস্তবিক চাকরী যত বড়ই হউক, পরিচারকের কাজ মাত্র। অল্প সত্য দেশ-সকলে, বিশেষতঃ যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, চাকর্যে-দিগকে চাকর্যে বলিয়াই অল্প লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় না। আমাদের দেশেও, বাস্তবিক যখন রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক, ও শিল্পবিষয়ক স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সরকারী চাকর্যেরা নিজেদের প্রকৃত স্থান ও ওজন বুঝিয়া ভারিকী চা'ল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

আপাততঃ আমরা দেখিতেছি, যে, বঙ্গের কেবল-মাত্র মুসলমানেরাই যদি সব সরকারী চাকরী পান, তাহা হইলে হিসাবটা দাঁড়ায় এইরূপ। বাংলায় মুসলমানের মোট সংখ্যা ২,৫৪,৮৬,১২৪। ইহার মধ্যে সরকারী চাকরীর দ্বারা ৩,২১,৯২৬ জন কর্মী ও পোষ্য পালিত হইলে বাকী থাকে ২,৫১,৬৪,১৯৮। মুসলমানেরা সরকারী চাকরীগুলি সব পাইলেও এই আড়াই কোটিরও অধিক মুসলমানকে অল্প উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। অতএব, তাঁহারা যেন মনে না করেন, যে, কেবলমাত্র সরকারী চাকরী পাওয়া না-পাওয়ার উপরই তাঁহাদের জীবন-মরণ মান-ইজ্জত প্রভাব-প্রতিপত্তি উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে। সওয়া তিন লাখ লোকের জীবিকার কথা অপেক্ষা আড়াই কোটি লোকের জীবিকার কথা ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অত্য়দিকে, যদি বাঙালী হিন্দুরাই সব চাকরী পান, তাহা হইলেও হিসাবে এই দাঁড়ায়, যে, মোট বাঙালী হিন্দু ২,০৮,০৯,১৪৮ জনের মধ্যে মাত্র ৩,২১,৯২৬ জন সরকারী চাকরীর দ্বারা পালিত হইবে; বাকী ২,০৪,৮৭-২২২ জন হিন্দুকে অল্প উপায়ে জীবিকানির্বাহ করিতে হইবে। সেইজন্য সরকারী চাকরীগুলো হাতছাড়া হইবার দুর্ভাবনায় বুদ্ধিমান কোন হিন্দু যেন দুই কোটির উপর হিন্দুর জীবিকা নির্বাহ কেমন করিয়া ভাল ভাবে হইতে পারে, সে চিন্তা করিতে তুলিয়া না যান।

ইহা সত্য কথা, যে, সরকারী উচ্চ কাজ যাহারা করে, তাহাদের হাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর

করে। কিন্তু স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে “চাকরো”-রাজ ত থাকিবে না।

এখানে বলা দরকার, সরকারী ডাক্তার, সরকারী অধ্যাপক, প্রভৃতি কতকগুলি চাকরোকে সেন্সাস রিপোর্টে সরকারী কাৰ্য্যনির্বাহ বিভাগে না ধরায়, মোট সরকারী চাকরোদের এবং তাহাদের পোষ্যদের সংখ্যা কিছু কম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলকে ধরিলেও সংখ্যা ৪ লাখের উপর হইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন পেশায় হিন্দু-মুসলমানের ভূয়িষ্ঠতা

বস্তুতঃ, সরকারী চাকরীর ভাগ লইয়া এই যে হিন্দু-মুসলমানের ভাগ-বাটোয়ারার তর্কবিতর্ক, ইহাতে ইংরেজী-জানা মুসলমানেরা তাহাদের ক্ষুদ্র শ্রেণীগত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যুক্তিতেছেন; তাহারা সবাই চাকরী পাইয়া গেলেও বাকী আড়াই কোটিব অধিক মুসলমানের অল্পসংখ্যা যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। চাকরীপ্রত্যাশী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের সম্বন্ধেও এই মন্তব্য অনেকটা প্রযোজ্য; কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষে যতটা প্রযোজ্য, ততটা নহে। তাহার কারণ বলিতেছি। শিক্ষিত মুসলমানেবা অশিক্ষিত দরিদ্রতর মুসলমানদের ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িতেছেন না, বলিলে বিন্দুমাত্রও অগ্নায় কথা বলা হয় না; কারণ, আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, দুভিক্ষে, ভূমিকম্পে, ঝড়-তুফানে, জলপ্লাবনে, মহামারীতে যখনই মুসলমানপ্রধান কোন জেলা বা জেলাসমষ্টি বিপন্ন হয়, তখন জাতি ও ধর্মনির্দেশে বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করে প্রধানতঃ বা কেবলমাত্র হিন্দুরা। এরূপ কাজে মুসলমান কর্মী ও দাতাদের সংখ্যা বরাবরই খুব কম দেখা যায়। অথচ, চাকরীর দাবী কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্বের দাবীর বেলায় সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়েব নামে সিংহের ডাগটি দাবী করিতে এই কর্তব্যবিমুখ শিক্ষিত মুসলমানরা খুবই তৎপর। শিক্ষিত হিন্দুরা সর্বসাধারণের হিত-

সাধনে যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগী না হইলেও মুসলমান অপেক্ষা অধিক মনোযোগী।

যাহা হউক, এসব হুক কথা লিখিলে শিক্ষিত মুসলমানদের আয়সংশোধন না করিয়া চটিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। চটাইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। অথচ সত্য গোপন করাও উচিত নহে বলিয়া কিছু লিখিলাম। এখন আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি।

সেন্সাস রিপোর্টে দেখিতে পাই, সাধারণ মুসলমান চাষীর সংখ্যা সাধারণ হিন্দু চাষীর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ; হিন্দু চাষীর সংখ্যা কমিয়াছে, মুসলমান চাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে; কিন্তু জমীদার, তালুকদার, পত্তনীদার, প্রভৃতিদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের প্রায় দ্বিগুণ ও বড় জমীদার প্রায় সকলেই হিন্দু। এইসব তথ্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জানা ও মনে রাখা উচিত। মোগলরাজত্বকালেও অনেক বড় বড় হিন্দু ভূস্বামী ছিলেন, কিন্তু বড় মুসলমান জমীদারও অনেক ছিলেন। সেন্সাস রিপোর্টে বড় মুসলমান জমীদার বেশী না থাকার দুটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম, মুসলমান উত্তরাধিকার আইন অনুসারে সম্পত্তি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে, চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে, প্রথম প্রথম জমীদারী বিক্রী হইয়া যাইবার আইন (Sale Laws) অনুসারে অনেক জমীদারদের চতুর হিন্দু কর্মচারীরা ঐ সুযোগে উহা কিনিয়া লয়। সেন্সাস রিপোর্টে ইহাও লিখিত হইয়াছে, যে, পুরাতন অনেক হিন্দু জমীদার-বংশেরও এই-প্রকারে পতন ঘটে; কিন্তু প্রায় সব স্থলেই ক্রেতারা ছিল হিন্দু। এই-সব কথা সত্য হইলে ইহার মধ্যেও মুসলমানদের এক-রকমের অযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তাহাদের হিন্দু কর্মচারীরা যদি এতই ছবুন্ধি ও চতুর ছিল, তাহা হইলে তাহারা সেকালে মুসলমান কর্মচারী রাখিলেই পারিতেন। কিন্তু গুণিতে পাই, একালেও মুসলমান জমীদারেরা অনেক স্থলেই হিন্দু কর্মচারী রাখেন। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে বৃ্ত্ত ইহা স্বীকার করিলেও, তাহারা যে যোগ্যতায়ও শ্রেষ্ঠ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ,

অযোগ্য ও ধূর্ত লোককে কেহ চাকরী দেয় না ; কিন্তু লোকে যোগ্য পূর্ত বিধর্মী লোককেও চাকরী দিতে কখন কখন বাধ্য হয়, যদি স্বধর্মী যোগ্য লোক না পায়।

কৃষি ছাড়া অল্প অনেক রকম বৃত্তি ও পেশায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু কতকগুলি কাজে মুসলমান বেশী। যথা, আস্‌বাব এবং গৃহনির্মাণ সম্বন্ধীয় কাজ, গাড়োয়ানের কাজ, নদীর ষ্টীমাবেব কাজ, নৌকার মাঝির কাজ, সমুদ্রগামী জাহাজে লঙ্করের কাজ, কলিকাতা বন্দরে জাহাজের মালখালাসী নৌকার কাজ, দরজী মাংসবিক্রেতা দপ্তরী, এবং ছাপাখানার জমাদার প্রভৃতির কাজ, চামড়ার ব্যবসা, ইত্যাদি। গাড়ী নৌকা প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসাতেও মুসলমান-প্রাধান্য আছে। কিন্তু সাধাবণতঃ ব্যবসাতে হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমানের তিন গুণ।

হিন্দুরা কতকগুলি পরায়ত্ত চাকরী লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে। কিন্তু জমীই হইতেছে আসল সম্পত্তি ; এবং যে উহা চাষ করে, কালক্রমে সে যে উহার মালিক হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বতরাং চামের কাজ হিন্দুর হাত হইতে মুসলমানের হাতে চলিয়া যাওয়ায় হিন্দু বেকুবী ও অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

যোগ্যতা অনুসারে চাকরী না দেওয়ার ফল

ছোট বা বড়, সরকারী কাজ খে-রকমেরই হউক না, তাহা যোগ্যতমের দ্বারা করাইলে যেমন ভাল হয়, কম যোগ্যের দ্বারা করাইলে তেমন হইবে না। অতএব, যোগ্যতাকেই প্রধান স্থান না দিয়া ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে অধিকাংশ সরকারী কাজ বিলি করিলে, দেশের কাজ কিছু খারাপ কিম্বা খুব খারাপ হইবে। ইহার কুফল দেশেব লোককে ভুগিতে হইবে ; এবং দেশের লোকের অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া মুসলমান-দিগকেই বেশী ভুগিতে হইবে। সরকারী চাকরীর সবগুলিই যদি মুসলমানেরা পান, তাহা হইলেও জোর চারি লক্ষ মুসলমানের আর্থিক সুবিধা হইবে ; কিন্তু কুফল ভুগিতে হইবে বাকী আড়াই কোটির উপর মুসলমানকে। দু'কোটির উপর হিন্দুকেও যে কুফল ভুগিতে

হইবে, তাহা মুসলমান নেতারা না হয় গ্রাহ্য নাই করিলেন।

শিক্ষার উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অতএব, ধর্মনিবিশেষে যোগ্যতমকে চাকরী না দিলে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি হইবে কি না, তাহাও বিবেচ্য। মুসলমান যদি হিন্দুর সমান উচ্চশিক্ষা না পাইয়াও চাকরী পান, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টার একটা কারণ মুসলমানদের মধ্যে কম প্রবল হইবে। উচ্চতর শিক্ষা পাইয়াও হিন্দু যদি দেখে যে তাহা অপেক্ষা কম শিক্ষিত মুসলমান চাকরী পাইতেছে, তাহা হইলে তাহারও উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহ কমিতে পারে। অতএব ধর্ম অনুসারে চাকরী ভাগ করিলে উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষার ক্ষতি হইবে। জ্ঞানের জগুই জ্ঞান লাভ, শুনিতে ভাল এবং উহা উচ্চ আদর্শও বটে। কিন্তু সাধাবণতঃ মানুষ সব রকম চেষ্টারই পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা করে, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীসকল হইতে মুসলমান আমলে এবং তাহার পরেও অনেকে মুসলমান হইয়াছে। তাহার একটা প্রবল কারণ, হিন্দু-সমাজে অনেক জা'ত অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বিবেচিত হয় ; কিন্তু তাহারা মুসলমান হইলে তাহাদিগকে অল্প মুসলমানেরা অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় মনে করে না। ইহা একটা মস্ত সামাজিক সুবিধা। এই-সব জা'তের লোকসংখ্যা অনুসারে চাকরী তাহারা কখনও পায় নাই ; উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও কখন বলেন নাই, যে, যেহেতু তাহারা সংখ্যায় অনেক, অতএব তাহারা শিক্ষায় অনগ্রসর হইলেও শতকরা এতগুলি চাকরী তাহাদের পাওয়া উচিত। তাহাদের মধ্যে অনেক জা'ত শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে বেশী অগ্রসর, কোন-কোনটি বা মুসলমানের চেয়েও কম অগ্রসর। কিন্তু বেশী বা কম অগ্রসর, যাহাই তাহারা হউক, চাকরীর একটা নির্দিষ্ট অংশ তাহারা পাক, হিন্দু স্বরাজ্য-সভ্যেরা ইহা বলেন নাই, বলিবেনও মা। হিন্দু স্বরাজ্যবাদীরা তাহাদের অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তাও কাখ্যতঃ দূর করিতেছেন না। কিন্তু তাহারা মুসলমান হইলে তাহাদের অস্পৃশ্যতাও যুচে, চাকরীর একটা

নির্দিষ্ট ভাগও তাহারা পাইবে। সুতরাং স্বরাজ্যদলের হিন্দু সভ্যেরা হিন্দুসমাজের এইসকল শ্রেণীর লোকদিগকে কি কার্যতঃ বলিয়া দিতেছেন না, যে, “তোমরা মুসলমান হইয়া যাও; তাহা হইলে তোমাদের সামাজিক ও আর্থিক উভয় সুবিধাই হইবে”?

এরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে, যে, মুসলমানদিগের অসন্তোষ দূর করিবার জন্ত খুব বেশী পরিমাণে তাহাদিগকে সরকারী চাকরী দেওয়া উচিত। মুসলমান কেন, সব সম্প্রদায়ের লোককেই গাঢ় ও বৈধ উপায়ে সন্তুষ্ট করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু শিক্ষিত ও যোগ্যতম হিন্দুর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য অহিন্দুকে চাকরী দিলে হিন্দুর অসন্তোষও যে বাড়িবে, তাহাও বিবেচ্য। বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যায় কম বটে, কিন্তু তাহাদের অসন্তোষ তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় মনে করা উচিত নয়। মল্লী-মিণ্টো শাসনসংস্কার হিন্দু আন্দোলনের জ্বালাই হইয়াছিল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রধানতঃ হিন্দু আন্দোলন। তাহাতে সরকারকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। বোম্বার উৎপাত, এবং রাজনৈতিক খুন ও ডাকাতি হিন্দু অসন্তোষের ফল। তাহাও সরকার তুচ্ছ মনে কবিত্তে পারেন নাই। আমরা অবশ্য সরকারী চাকরী যথেষ্ট পরিমাণে না-পাওয়াটাকে একটা জীবন-নরণের ব্যাপার মনে কবি না; তাহার জন্ত বিপ্লবচেষ্টারও দরকার দেখি না। কিন্তু বেকার-সমস্যা প্রধানতঃ চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুদের সমস্যা। এই সমস্যাকে আরও উৎকর্ষ করিয়া তোলা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে কি না, বিবেচনার বিষয়। কালক্রমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্য ও যোগ্যতম লোকের সংখ্যা বাড়িবে। ক্রমশঃ তাহারা নিশ্চয়ই বেশী করিয়া সরকারী চাকরী পাইতে থাকিবেন, এবং হিন্দুরাও ক্রমশঃ অগ্রাগ্র বৃত্তি অবলম্বন করিবে। এইরূপ ক্রমশঃ পরিবর্তনে কোন সমস্যার উদ্ভব হইবে না। শিক্ষিত বেকারের দল বাড়িলে তাহারা জীবিকানির্বাহের জন্ত যে-সকল সাধু উপায় অবলম্বন করিতে পারে, চাষ তাহার অগ্রতম। কিন্তু চাষে ক্রমশঃ মুসলমানের আধিপত্য বাড়িতেছে। শিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান চাষীকে চাষের

কাজে আইনসঙ্গত ভাবে কিয়ৎ পরিমাণেও বেদখল করিলে তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্তোষ বাড়িবে কি?

দেশের শিক্ষালয়গুলিতে যোগ্যতম লোক রাখা দরকার। সরকারী তহবিল হইতে শিক্ষার জন্ত যত টাকা দেওয়া চলে, তাহাতে যতদূর যোগ্য লোক পাওয়া সম্ভব, নিয়ুক্ত করা উচিত। নতুবা শিক্ষার সম্যক উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষাদাতা নিয়োগের সময় কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচার না করিয়া ধর্মের বিচার করিলে, সরকারী শিক্ষালয়গুলির উৎকর্ষ রক্ষিত হইবে না, বরং কমিবে। অত্র দিকে বেসরকারী শিক্ষালয়গুলি ধর্মের বিচার করিয়া লোক রাখিতে বাধ্য না থাকায়, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা উৎকর্ষ হইবে। সুতরাং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ছাত্র কম পাইবে ও অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে। তখন সেগুলি বহু ব্যয়ে বাঁচাইয়া রাখা কি সরকারী টাকার অপব্যয় হইবে না? অথচ, না রাখিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ জন্মিবে। এই উভয়-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়, সকল সম্প্রদায়কে বলা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মীর নিয়োগ ধর্মনির্কিশেষে যোগ্যতমেরই হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, অতএব সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে মন দিতে থাকুন।

বিচার-বিভাগেও যোগ্যতম লোক রাখা দরকার। অবিচারে মানুষের বড় অনিষ্ট হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়া যোগ্যতম বিচারক না রাখিলে তাহাদের অনিষ্ট ও অসন্তোষই বেশী হইবে। অথচ ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে যোগ্যতম লোক রাখা চলিবে না। তা ছাড়া, প্রতি বৎসর একটিনি করিবার ও পাকা মুনসেফ হইবার জন্ত যতগুলি এম্-এ বি-এল্ দরকার হয়, তাহার রকম দশ আনা বার আনা চৌদ্দ আনা এম্-এ বি-এল্, অন্ততঃ শুধু বি-এল্, কি মুসলমান-সমাজ পাস করেন?

অসহযোগীদের, সুতরাং স্বরাজ্যদলেরও লোকদের, সরকারী শিক্ষালয় ও আদালতগুলিকে অশ্রদ্ধেয় ও অকেজো করিবার অভিপ্রায় আছে বটে। যোগ্যতম

লোক না রাখিয়া ধর্মের বিচার করিয়া লোক রাখিলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে বটে।

আরও অনেক সরকারী কার্যবিভাগ আছে, যাহাতে বিশেষ-রকম জ্ঞানের, উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। নানাবিধ বিজ্ঞানে এম্-এস্‌সি, ডি-এস্‌সি, পাস্‌, এম্‌নকি বিএস্‌সি পাস্‌ও, যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান করেন না। বি-ই পাস্‌ও যথেষ্টসংখ্যক করেন না। ডাক্তারী এম্‌-বি, এম্‌-ডিও তদ্রূপ। অতএব বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-সাপেক্ষ নানা বিভাগে যথেষ্টসংখ্যক কর্মী যোগাইতে মুসলমান সম্প্রদায় এখন অসমর্থ। চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু যোগ্য না হইয়াও চাকরী পাইলে সে চেষ্টার কারণ প্রবল হইবে না।

বঙ্গে বিধবাবিবাহ

পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি গ্ৰায্য অপক্ষপাত ব্যবহারের অনুরোধে, নরনারীর স্বাভাবিক সমান অধিকার রক্ষার অনুরোধে, সামাজিক পতিব্রতা রক্ষার জন্ত, বঙ্গের নানা শ্রেণীর হিন্দুর এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের সংখ্যাভ্রাস নিবারণ করিবার জন্ত, দয়াধর্মের অনুরোধে, বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ খুব প্রচলিত হওয়া উচিত। এইজন্ত সামান্য যে দু একটি বিধবার বিবাহ হইতেছে, তাহাও আমরা স্বলক্ষণ ও সুখের বিষয় মনে করি। মেদিনীপুরের বিধবা-বিবাহ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি-এল্‌ লিখিয়াছেন :—

“মেদিনীপুরে একটি বিধবা-বিবাহ সমিতি গত এপ্রিল মাসে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির চেষ্টায় হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। গত ২৩/১১/২৩ তারিখে ভুল্লভূম পরগণার গ্রামে একটি বাল্য-বিধবার বিবাহ হইয়াছে। পাচরা গ্রামের শ্রীমান হরিপদ মহাপাত্র ঐ বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বব ও কন্যা পক্ষের বহু জাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর ও কন্যা উভয়ে সদগোপ জাতীয়। বিবাহস্থলে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ সকলে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গর আরও একটি বিধবার বিবাহ হইবার আশা আছে। অর্থাভাবে সমিতির কার্য ক্রম অগ্রসর হইতেছে না। দেশের কুসংস্কার দূর করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। কুসংস্কারক ব্যক্তিগণ পদে পদে বাধা দিতেছে। ৫টি বিবাহ মধ্যে সদগোপ ২টি, গোপ ১টি, নাপিত ১টি, মাহিয়া ১টি।”

আনন্দবাজার-পত্রিকায় নীচেব সংবাদটি বাহির হইয়াছে।

“ত্রিপুরা রাজ্যের আগড়তলায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের ভগ্নী ৭ বৎসব বয়সেই স্বামীহারা হইয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের জনৈক কর্মচারীর সহিত এই বালবিধবাবি বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজার আনুকূল্য ও অর্থ-সাহায্যেই এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহারাজা স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।”

শিশুমঙ্গল সপ্তাহ

কেমন করিয়া শিশুদের মঙ্গল সাধন করা যায়, কিরূপে তাহাদিগকে সুস্থ সবল রাখিয়া তাহাদের অকালমৃত্যু নিবারণ করা যায়, সে বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্ত কলিকাতায় ১৪ই মাঘ হইতে ১৯শে মাঘ পর্যন্ত একটি প্রদর্শনী হইবে। ইহাতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যিক, তাহা যথাসম্ভব দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। রোগের প্রথম অবস্থায় কি করা কর্তব্য, পীড়িত অবস্থায় কেমন করিয়া শুশুকা করিতে হয়, শিশুদের খাদ্য কেমন করিয়া তৈরী করিতে হয়, ইত্যাদি প্রতিদিন দেখান হইবে। মিস্ বেট্‌গৌ শিশুহিতসাধন বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে তাহা বায়োস্কোপের সাহায্যে দেখান হইবে। অস্ত্র-পুরিকাদের জন্ত স্বতন্ত্র একটি দিন রাখা হইবে। সুস্থ সবল শিশুদের মেলা প্রদর্শনীর শেষ দিন হইবে।

বাংলার মন্ত্রী

এবার বাংলার তিন মন্ত্রী হইয়াছেন, মৌলবী এ কে ফজলুল হক, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, এবং মিঃ এ কে আবু আমেদ গজনবী। ফজলুল হক সাহেব শিক্ষামন্ত্রী, গজনবী সাহেব কৃষি ও শিল্পের মন্ত্রী এবং মল্লিক সাহেব স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্যের মন্ত্রী হইলেন। মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র এবং নবাব নবাব আলী চৌধুরী মন্ত্রী হইবার আগে যতটা দেশহিতমণা ও কার্যদক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, ফজলুল হক সাহেব ও গজনবী সাহেব তাহা অপেক্ষা কম দেখান নাই। সুতরাং তাহাদের মন্ত্রীত্ব লাভে মন্ত্রী-পদের অসম্মান হইল না। তবে মন্ত্রীরূপে তাহাদের কৃতিত্ব কিরূপ হইবে, এখন বুঝিবার ও বলিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য তাহাদের চেয়ে যোগ্য লোক দেশে অনেক আছেন। কিন্তু হয় তাহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন

নাই, নয় তাঁহারা মন্ত্রী হইতে রাজী হন নাই, কিম্বা গবর্নর তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক বা অন্তর্বিধ কারণে মনোনীত করেন নাই। স্মার স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরীকচিত হন নাই; স্মতরাং তাঁহার সহিত মল্লিক সাহেবের তুলনার প্রয়োজন নাই। ইহার চেয়ে যোগ্য লোকও দেশে আছেন। ইনিও মন্ত্রী হইয়া কি করিতে পারিবেন, না দেখিলে বিশ্বাস নাই। তবে যদি এই তিন ব্যক্তি বার্ষিক চৌষটি হাজার টাকা শোষণ না করিয়া অল্প কিছু কমও লইতে রাজী হন, তাহা হইলে তাহাও একটা কীর্তি হইবে বটে। প্রবল-পরাক্রান্ত জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাসিক দেড় হাজার এবং অন্ত মন্ত্রীর মাসিক হাজার টাকা বেতন লইয়া থাকেন। স্মতরাং ম্যালেরিয়ায় ছারখার এবং ভারতগবর্নমেন্টের দয়ায় শূন্যতহবিল বাংলা দেশের মন্ত্রীর যদি মাসিক পাঁচ হাজার লইয়া খুচরা কয়েকটা টাকাও ছাড়িয়া দেন, তাহা বাঙালী দেশভক্ত মন্ত্রীর পক্ষে কম দয়া হইবে না। শুনা যায়, সে-কালে বড় ঘরানা যে-সব ইংরেজ সৈনিক বিভাগে অফিসারের কাজ করিতে আসিত, তাহাদের কেহ কেহ বেতনের অর্থের নোট কথানা পকেটে পুবিয়া চলিয়া যাইত, টাকা রেজকী পয়সা পাই কেরানী চাপ্রাসীরা লইত। মন্ত্রী মহাশয়েরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মাসিক ৩৩৩১/৪ পাই বাংলা দেশের গরীব প্রজাদিগকে মাপ করিলে খুব অনুগ্রহ করা হইবে। তাহা হইলে বুঝিব, জাপানী মন্ত্রীর মাসিক হাজার টাকা লন, ইহার লন, মাসিক পাঁচ হাজার মাত্র; অতএব জাপানী মন্ত্রীদের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ স্বদেশপ্রেম বাঙালী মন্ত্রীদের জন্মিয়াছে; এবং তাহাতে দেশের লোক পুলকিত হইবে! আগেকার বারের মন্ত্রীর বার্ষিক ৪৮০০০ মাত্র আশ্রুমাং করিয়া বাকী ষোলহাজার দেশহিতে লাগাইবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন হিসাব পাওয়া গেল না। এইজন্য এবার বার্ষিক ষোল হাজারের পরিবর্তে বার্ষিক চারি হাজার টাকার শিক্ষা জানান যাইতেছে।

জাতীয় উন্নতি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহার
আমাদিগের মধ্যে বর্তমানে জাতীয় উন্নতি লইয়া চিন্তা ও আলোচনা খুবই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। নানান মুনির নানান মত, কথাটির সত্যতা প্রমাণের স্বযোগ এরূপ আর কখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ভুল ধারণা রহিয়াছে দেখা যায়। মতামত প্রকাশ-কালে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মানুষ, চিন্তার সহিত ভাল লাগা না-লাগার যে বিশেষ পার্থক্য আছে, একথা ভুলিয়া যায়। আমার কি ভাল লাগে অথবা না লাগে, অর্থাৎ কোন কিছুকে আমার হৃদয় কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহার সহিত আমার চিন্তার ধারার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। পৃথিবী গোল না হইয়া ত্রিকোণ হইলে কাহারো কাহারো হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য, পৃথিবী ত্রিকোণ, ইহা কাহারও ভাবা উচিত নহে। বাস্তবিক ঐরূপ অসঙ্গত ধারণা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে না থাকিলেও, ঐ-প্রকার গোলযোগ অনেকের মনেই হইয়া থাকে। আমরা যখন বলি, “আমার মনে হয় অমুক জিনিষ ভক্ষণ করিলেই শরীর ভাল হয়”, তখন কি আমরা চিন্তা-শক্তি ব্যবহার করিয়া কথাটি বলি? একটি আবছা মনোভাবকে চিন্তা বলিয়া ভুল করি বলিলেই যথার্থ বলা হয়। আমার মনে হয়, অর্থে, আমি চিন্তা করিয়া ইহা মনে করি, একথা বুঝায় না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আমাদের এই ভুল ধারণা বর্তমান। চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, এই জ্ঞানের অভাবই বহু ভুল ধারণা ও অবিবেচনার মূল। বাহিরের ঘটনা মানুষের মনে কি-প্রকার অনুভূতির সৃষ্টি করিবে, তাহা নির্ভর করে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তাহার শিক্ষা ও পরিবেষ্টনী প্রভৃতি নানান কিছুর উপর। হিন্দু যে গোবধ পাপ মনে করে এবং মুসলমান যে করে না, ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, গোবধ সম্বন্ধে ভারতীয় মানবের মনোভাব চিন্তার দ্বারা চালিত নহে; জন্মাবধি শিক্ষা ও অন্যান্য কারণের প্রভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের মনে একই বিষয়ে বিভিন্ন-প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। মানুষের বিশ্বাস বিশেষ করিয়া এই-প্রকার

শিক্ষা ও অন্তর্বিধ প্রভাবের ফল। ভারি জিনিষ মস্তকে পড়িলে আঘাত লাগে, এই বিশ্বাস বিশ্বের সর্বত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হয়; কেননা ইহার বিপরীত শিক্ষা বা উদাহরণ জগতে নাই। দুই আর দুইএ চার না হইয়া তিন অথবা পাঁচ, হয় একথাও ভরসা করিয়া এ জগতের কোন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। অতিমানবেরা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। মোটর-চালক যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, কলকজা সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে সমান। কোন মোটরচালকই বিশ্বাস করে না, যে, 'ব্রেক' কষিলে গাড়ী আরও দ্রুতগামী হয়, অথবা তৈলের অভাবই এঞ্জিন চলিবার পক্ষে অমুকুল। বিজ্ঞান এবং অগ্রাণ্ড অনেক বিষয়ে জগতের সকল শিক্ষিত মানবের মধ্যে একমত দেখা যায়। তাহার কারণ এই-সকল ক্ষেত্রে মানুষ অনুভূতিকে চিন্তা বলিয়া ভ্রম করেন না।

কিন্তু যিশু আবার আসিবেন, অথবা আসিবেন না; গোবধ ভাল অথবা মন্দ; মানুষের নিজের মত আগে, না তাহার ধর্মসম্প্রদায়ের মত লোকমত অথবা গুরুর মত আগে; ভারতীয় মানব নিজের অদৃষ্ট নিজের হাতে রাখিবে, অথবা ইংরেজের হাতে রাখিবে, স্ত্রীলোকগণ মানুষ কি না; মানুষের আত্মা আছে কি না; ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ মত প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন না কিন্তু চিন্তা করিতে চাহে না। ইহার কারণ, মানুষের উপর অনুভূতির অত্যাচার। বেচারী বাঙালী কিছুতেই খুসী হইয়া ভাবিতে পারে না, যে, কাজ করিবার পক্ষে ধূতি পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠ পোষাক নহে, ফেনগালা ভাত শ্রেষ্ঠ আহাৰ্য্য নহে, বাল্যবিবাহ দুষ্ণীয় ও জাতীয় আত্মহত্যার সামিল, স্ত্রীলোকদিগকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা তাহাদের শরীর ও মন উভয়ের পক্ষেই অপকারী, সত্য কথা যে ভাষাতেই লিখিত হউক তাহা সত্য, ইত্যাদি। তাহার মন কিছুতেই শুনিতে চাহে না, যে, তাহার অনুভূতি তাহাকে ভুল বুঝাইতেছে। নিজের নিবুদ্ধিতা স্বীকার করার মতই, নিজ অনুভূতিকে মিথ্যাবাদী বলিতে মানুষের অহমিকায় আঘাত লাগে। কাজেই চিন্তা ও

যুক্তিকে, দিদিমা, ঠাকুরমা, বিবেক, ভালমন্দজ্ঞান, প্রভৃতি নানান ছদ্মবেশধারী অনুভূতির খাতিরে বর্জন করিয়া বাঙালী দ্রুতবেগে অহমিকার মোটরগাড়ী হাঁকাইয়া আত্মহত্যার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নানান বিষয়েই দেখা যাইতেছে, যে, বাঙালী নিজের পূর্বশিক্ষা, পারিপার্শ্বিক, সমাজ ও কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে জাত অনুভূতিগুলির দোহাই দিয়া অবিবেচনা ও নিবুদ্ধিতা দোষে দুষ্ট হইতেছে। জ্ঞানের উপর সকল বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্ভর করে। আমরা জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানবিরুদ্ধ কার্য্য ত করিয়া থাকিই; বহুক্ষেত্রে আবার জ্ঞানকেই অস্বীকার করি। কুশিক্ষা ও কুসংস্কারলব্ধ অনুভূতিগুলিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য এ এক বিরাট আয়োজন। কিন্তু ফলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কথা দূরে থাকুক, দুর্গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে।

বর্তমান কালে আমরা মতামতের মূল্য বিচার করিবার পূর্বে যেন দেখি যে উক্ত মতামত জ্ঞান ও চিন্তার উপরে নির্মিত, অথবা শুধু মানসিক অনুভূতির প্রকাশ।

জাতীয় আদর্শের গঠন-প্রণালী

বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে, সর্বাঙ্গসুন্দর। ব্যক্তি অথবা জাতি কি আদর্শ অনুসারে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে, তাহা বলিতে গেলে এই কথাটি ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি কখনও একাঙ্গসুন্দর হইতে চাহে না তাহা নহে; কোন কোন জাতিও সেইরূপ আংশিক সৌন্দর্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা সাধারণত ব্যক্তির বা জাতির আদর্শের অসম্পূর্ণতার ফল। ব্যক্তিবিশেষ শীর্ণ দেহ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের একত্র সংস্থাপনকে আদর্শ মনে করিতে পারেন। অপর কেহ কোন একটি বিশেষ বিষয় মাত্র লইয়াই জীবনের প্রতি মুহূর্ত কাটাইতে পারেন। জাতিবিশেষ শুধু অর্থের জন্য সকল শক্তি ও চেষ্টা ব্যয় করিতে পারে। কিন্তু আদর্শ জীবন, ব্যক্তিগতই হউক অথবা জাতীয়ই হউক, কদাপি এইরূপ একাঙ্গিমূখী ও একাঙ্গসুন্দর হইতে

পারে না। কেহ বলিতে পারেন, যে, কার্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে হইলে একাগ্রচিত্তে একটি বিষয় লইয়া পড়িয়া না থাকিলে সফলকাম হওয়া যায় না। কিন্তু কার্যবিশেষ উত্তম অথবা উৎকৃষ্টতম রূপে সাধন করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ব্যক্তি অথবা জাতি যন্ত্র নহে, যে, তাহা হইতে যত কার্য আদায় হইবে, ততই তাহার মূল্য। জীবনের মূল্য তাহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির উপর নির্ভর করে। সঙ্গীতে আনন্দ নাই, খাদ্যের উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, সাহিত্যে ও শিল্পে অনুরাগ নাই, বর্ণবিজ্ঞানের সৌন্দর্য বা কদর্যতা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, পরকে নিজের মনের কথা বুঝাইবার অথবা পরের মনের কথা নিজে বুঝিবার ক্ষমতা নাট, ইত্যাদি নানা দোষে ছুটে যে ব্যক্তি বা জাতি, তাহার মাছ ধরিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, অথবা সে অসম্ভব রকম অল্প আয়াসে পরস্ব আত্মসাৎ করিতে পারে, বা খনি হইতে অতি দ্রুত কয়লা উত্তোলন করিতে সক্ষম, বলিয়া তাহাকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব বা জাতীয়তার ক্ষেত্রে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হইবে কি? জাতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সর্বাভিমুখী হওয়া প্রয়োজন, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু উহা সর্বাভিমুখী হইলেই কি জাতি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে?

সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য জিনিষটির একটি বিশেষত্ব আছে। অঙ্গবিশেষ সুন্দর হইলেই যে তাহা অঙ্গ অঙ্গের সহিত একত্র স্থাপিত হইলেও সুন্দর থাকিবে ও দেখাইবে, এমন কোন বাধাবাহকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, যে, দুধ ও আলতা মিশ্রিত বর্ণ এবং নিটোল শালপ্রাণ্ড মহাভূঙ্গ, মাহুঘের বাহুর সৌন্দর্যের আদর্শ। ঐরূপ একখানি বাহু শীর্ণ শ্যামবর্ণ ও প্লীহাগ্রণ্ড শরীরে স্থাপন করিলে কি তাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে কি কারুকায়ময় মর্ম্মর-বেদী শোভা পায়? উহাকে শুধু স্বস্থানচ্যুত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। দরিত্রের বুটিকে কি মর্ম্মর-সোপান নির্মাণ সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচায়ক? সর্ব্ব অঙ্গের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট না হইলে

কোন অঙ্গের সৌন্দর্য্যের কোন অর্থ হয় না।

জাতীয় আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইলে অন্ধ অহুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিলে সৌন্দর্য্যের পরিবর্তে কদর্য্য অসামঞ্জস্যের আবির্ভাব হইবার বিশেষ সম্ভাবন। নিষ্কিকার চিত্তে চিন্তাশক্তির ব্যবহার ও পৃথিবীর সকল জ্ঞান সমান আদরের সহিত পরীক্ষা করিয়া কার্য করিলেই আদর্শের ক্ষেত্রে এই সম্ভতি সম্ভব। জাতির জাতীয়তার প্রকাশ নানান কার্যের ভিতর দিয়া হয়। কোথাও জাতি ঐশ্বর্য্য উৎপাদনে উৎসুক, কোথাও শক্তি সঙ্কে ব্যগ্র, কোথাও জ্ঞান আহরণে আত্মবিশ্বস্ত, কোথাও বা জগতের মঙ্গল-সাধনে স্বার্থত্যাগে যত্ববান। অপরদিকে আবার কোন জাতি কোথাও পরস্ব অপহরণে আগ্রহান, অথবা হিংস্র স্বার্থপরতায় উন্নত।

আমরা যে নতন জাতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহার সকল ব্যবহার, সকল কাব্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রয়োজন। তাহা না হইলে, আমাদের অবস্থা “পরহিতার্থে” পরস্বগ্রাসী ও “সভ্যতার সেবার্থে” বর্ধরতায় নিমগ্ন পাশ্চাত্য জাতিগুলির মতই হইবে।

এই সর্বাঙ্গসুন্দর সুসমঞ্জস জাতীয়তা স্বল্পে উন্নত কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন। সে কল্পনায় জাতীয়তার সকল রূপের একত্র দর্শন পাওয়া যাইবে। যে-সকল শিল্পী তাজ-মহল পার্থেনন্ প্রমুখ স্থাপত্য-ঐশ্বর্য্যের স্রষ্টা তাঁহারা কল্পনায় উহাদিগের সম্পূর্ণতাই দেখিয়াছিলেন। খণ্ড খণ্ড করিয়া কল্পনা করিলে স্থাপত্যসৌন্দর্য্য সম্ভব হয় না। অথবা কেহ-বা একটি আদর্শ চূড়া, কেহ-বা একটি আদর্শ গিলান নির্মাণ করিল; এরূপ করিয়াও কার্য হয় না। সঙ্গীতের রচয়িতা কখন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার রচনার কথা কল্পনা করেন না। অথবা নানান লোকে মিলিয়া মহাকাব্য লিখন সম্ভব হইলেও, সে কাব্যে সৌন্দর্য্য কত দূর পাওয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। নানান ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত মাল মসলা ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু সমগ্রটির সৌন্দর্য্য শেষ অবধি অনেক মন ঘুরিয়া কোন এক মহতী কল্পনার কোলে ফুটিয়া উঠিবে। জাতীয়তার সৌন্দর্য্য খাপছাড়া ভাবে শ্রমবিভাগ করিয়া লভ্য নহে।

বর্তমান ভারতে স্বল্পবুদ্ধি অঙ্গবিশ্লেষক অনেক দেখিতেছি। কিন্তু প্রকৃত মহাশিল্পীর সেই অভিব্যাপী কল্পনা এখনও দেখি নাই।

অ

ডাক্তার মুইর ও কুষ্ঠ চিকিৎসা

বাংলা দেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা কুষ্ঠ রোগের আধিক্য দেখা যায়; অথচ বাংলা দেশে এই রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত অথবা এই রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষরূপে দুর্লভ। এই বোগ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা যে শুধু জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায়, তাহা নহে; ডাক্তার ও অন্যান্য চিকিৎসাজীবীরাও অজ্ঞানতা-মুক্ত নহেন। ফলে কাহারও কুষ্ঠব্যাদি হইলে প্রথমতঃ সে রোগের প্রথম লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে না, যে, তাহার কুষ্ঠ হইয়াছে; সুতরাং যে সময় চিকিৎসা করিলে ব্যাদি দূর করা সম্ভব, সে সময়ে চিকিৎসা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যথাসময়ে চিকিৎসা করিলে যে এই রোগেব কবল হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব, তাহাই বা কয় জন জানে? সচরাচর দেখা যায়, যে, কুষ্ঠরোগ হইয়াছে ভ্রমে লোকে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কিন্তু চিকিৎসক অথবা অণু কেহ তাহাকে বলিতে পারিতেছে না, যে, তাহার কুষ্ঠ হয় নাই। ইহাও, এই রোগ সম্বন্ধে যে অজ্ঞানতা সর্বত্র দেখা যায়, তাহার ফল।

ডাক্তার মুইর কুষ্ঠ রোগ সম্বন্ধে চর্চা করিয়া ও সাধারণের নিকট কুষ্ঠরোগ চর্চার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া সর্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠব্যাদি সারান যায় এবং রোগটি যতদূর ছুরারোগ্য ও সংক্রামক বলিয়া সাধারণের ধারণা, তাহা সত্য নহে। তাঁহার মতে এই রোগটি জগৎ হইতে দূর করিতে হইলে সর্বপ্রথমে চিকিৎসকদিগের নৃতন করিয়া শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর জনসাধারণকেও এই বিষয়ে জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। রোগের প্রথম লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে এখনও খুবই অল্পসংখ্যক চিকিৎসকের কোনরূপ পরিষ্কার ধারণা আছে। ইহার জন্য ডাক্তার মুইর বলেন, যে, অনেকগুলি কুষ্ঠ-চিকিৎসাকেন্দ্র রাখিলে সর্বদিক হইতে সুবিধা হইবে।

এই-সকল চিকিৎসাকেন্দ্র হইতে চিকিৎসকদিগকে কুষ্ঠ-রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা হইবে এবং জনসাধারণের নিকটও এই রোগেব সম্বন্ধে সত্যাসত্য প্রচার করা হইবে। এই রোগ ছুরারোগ্য ও ভীষণরূপ সংক্রামক নহে জানিলে বোগ গোপন ও অবহেলা করা অনেক দূর নিবারিত হইবে আশা করা যায় এবং সাধারণের ও গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইলে শীঘ্রই ভারতবর্ষ হইতে ইহা দূর হইবে এইরূপ আশা করা যায়।

অ

ইন্সুলীন ও বহুমূত্র

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা-জগতের একটি অরণীয় ঘটনা ইন্সুলীন আবিষ্কার। ছুরারোগ্য বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা ইন্সুলীন সাহায্যে একরূপ অত্যাশ্চর্য্য সফলতার সহিত হইয়াছে, যে, তাহা প্রায় বাছুরের মায়ার মতই। রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ধীরে ধীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় ইন্সুলীন চিকিৎসাব ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাকে সতেজ করিয়া তোলা হইতেছে। এমন কি, রোগী অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াও ইন্সুলীনের গুণে আরোগ্য লাভ করিতেছে।

ইন্সুলীন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুকালব্যাপী গবেষণার ফলেই ইহা পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে বহুমূত্র রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব। এখানে ইন্সুলীন ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই পথে কয়েকটি বিঘ্ন আছে। প্রথমত, এখানের চিকিৎসক-গণ এখনও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। দ্বিতীয়ত, আম্-দানী-করা ইন্সুলীন নষ্ট হইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা। হতশক্তি ইন্সুলীন ব্যবহারে লাভ না হইলে, লোকের ইহার উপর আস্থা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যাহাতে ভাল অবস্থায় ইন্সুলীন আম্-দানী করা ও ব্যবহারের পূর্ব অবধি রক্ষা করা যায়, তাহার চেষ্টা ভারতবর্ষে হওয়া দরকার। বম্বার পাস্তুর ইনষ্টিটিউ-টের অধ্যক্ষ মেজর টেলর ও ডাঃ ডাগ্লাস এই বিষয়ের চর্চা করিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে একটি প্রবন্ধ

লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে আরও ইন্সলীন আমদানী করিবার পূর্বে দেখা দরকার—

১। তাজা ইন্সলীন কি ভাবে পুরাতন ইন্সলীন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

২। বিশেষ করিয়া শীতল ভাবে রক্ষিত অবস্থায় আমদানী করিলে কি লাভ হয়।

৩। তাহার পর কত দিন অবধি শীতল রক্ষণ (Cold Storage) করিলে ইহার গুণ বজায় থাকে।

৪। কি প্রকার অবস্থায় রক্ষিত হইলে ইহা উৎকৃষ্ট থাকে, কিসে নিকৃষ্ট হইয়া যায়।

এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসা ও ইন্সলীন বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত না হইলে, এইরূপ চিকিৎসার প্রসার ও আদর এদেশে সম্ভব হইবে না।

অ

স্বরাজ্য-চুক্তি ও মুসলমান সম্প্রদায়

মুসলমানদিগের সভাসমিতিগুলি স্বরাজ্যচুক্তির সমর্থন করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, যে, উহাতে মুসলমানদিগকে যে অংশ দিবার কথা হইয়াছে, তাহার এক কণা কমও তাঁহারা লইবেন না। অধিকন্তু তাঁহারা হিন্দুদিগকে ও তাঁহাদের যুগপৎসমূহকে সাবধান করিতেছেন ও শাসাইতেছেন, যে, যেন তাঁহারা এই চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করেন।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। স্বরাজ্য দলের সভ্যরা দেশের লোকের নিকট হইতে এরূপ চুক্তি করিবার কোন ক্ষমতা পান নাই। তাঁহারা দেশের লোকের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই অববেচনার কাজটি করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কংগ্রেস ও হিন্দু-সমাজ কর্তৃক উহা গৃহীত না হওয়ায়, চুক্তিটিকে লোকমত-সংগ্রহার্থ খসড়া মাত্র বলিলে চলিবে না। বাস্তবিক উহা খসড়া নহে; খসড়া হইলে উহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া কংগ্রেসের মঞ্জুরীর জগু উপস্থিত করা হইত না। এখন মুসলমানরা স্বভাবতই মনে করিবেন, যে, তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতা হিন্দুসমাজ করিতেছেন না,

কারণ তাঁহারা কখনও এই চুক্তিতে মত দেন নাই, চুক্তি করিবার ক্ষমতা কাহাকেও দেন নাই, খবরের কাগজে ছাপা হইবার আগে চুক্তির কথা তাঁহারা জানিতেন না। বেকুবী ও বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেহ করিয়া থাকে, ত, তাহা স্বরাজ্যদলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা।

পৃথিবীর সব জাতিই স্বার্থপর, পরার্থপর জাতি (nation) কোথাও নাই। সেইরূপ পরার্থপর সম্প্রদায়, শ্রেণী, বা সমাজও কোথাও নাই। সবাই যে যতটা পারে আদায় করিয়া লয়। ইহা আধ্যাত্মিক আদর্শের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মানবসমষ্টি এখনও সম্মিলিতভাবে আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসারে চলিতে শিখে নাই।

চাকরীর অংশ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় এ-বিষয়ে ধীর ভাবে আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য, হিন্দুদিগকে বলি তাঁহারা মুসলমানদের উপর চটিবেন না, কারণ স্বরাজ্য-সভ্যেরাই ত এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। হিন্দুরা অনেক স্থলে হুজুকে মাতিয়া, খুব যোগ্য লোক থাকিতেও, ষাঁহাকে চেনেন না এমন লোককেও ভোট দিয়া কোন্সিলে পাঠাইয়াছেন—এই আশায় যে তাঁহারা গবর্ণমেন্টকে অচল ও চুরমার করিয়া দিবেন। এখন এই অববেচনার ফল তাঁহারা ভুগুন; মুসলমানের উপর রাগ করিলে কি হইবে?

মুসলমানদিগকেও বলি, হিন্দুদের উপর রাগ করা ও তাঁহাদিগকে শাসান গ্রায়সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, সমগ্র হিন্দু সমাজ এই চুক্তির জগু বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে। মুসলমানগণ ইহাও বিবেচনা করিবেন, যে, তাঁহাদের নিজের যে-যে পেশায় প্রাধাণ আছে, হিন্দুরা তাহাতে বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে চাহিলে তাঁহারাও ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইবেন? সুতরাং সরকারী কতকগুলো চাকরী হিন্দুদের হাতছাড়া হইলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুরা স্বভাবতঃ উদ্বিগ্ন হইতে পারেন।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বলি, দেশে তাঁহারা ছাড়াও মানুষ আছে, ধর্মসম্প্রদায় আছে। তাহারা

সংখ্যায় কম হইলেও ভারতীয়, এবং মহৎ কাজ করিয়াছে। তাহাদের কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমরা কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের একরূপ আর্থিক লাভ-লাভের দিক দিয়া এ বিষয়টির আলোচনা করি নাই, করা বাঞ্ছনীয়ও মনে করি না; যাহাতে সমগ্র বাংলাদেশের ও উহার অধিবাসী পৌনে পাঁচ কোটি বাঙালীর স্থায়ী কল্যাণ হয়, সেইরূপ ব্যবস্থারই আমরা পক্ষপাতী। যে যে-কাজের যোগ্যতম, অরাধে সে তাহা করিতে পাইবে, এই নীতি অনুসরণ ভিন্ন কোন জাতির স্থায়ী কল্যাণ নাই। ইহা আমরা ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি। সংখ্যাধিক্য কিম্বা বলাধিক্য-বশতঃ সব রকম কাজ হস্তগত হইলেও, মুসলমানেরা কিম্বা হিন্দুরা, অথবা ভারতীয় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পাসী শিখ খৃষ্টিয়ান্ প্রভৃতির সন্মিলিত ভাবে ভারতের সব-রকমের রাষ্ট্রীয় কাজ, কল-কারখানা রেল ষ্টীমার খনি প্রভৃতির কাজ, এখ. ই সব নিজেরা চালাইতে পারিবেন না, তাঁহারা নিজে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য লোকদের সাহায্য লইতে হইবে। অতএব, অধৈর্য্য ভাল নয়; সকলেই যোগ্যতম হইয়া জীবনের সকল বিভাগের কাজ যিনি যতটা পারেন, ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে করিতে থাকুন।

কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতা

এবারকার কংগ্রেসে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীর বক্তৃতা অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য এবং আলোচনার যোগ্য কথা অনেক আছে। অভিজ্ঞগণটির রচনাবীতিও উৎকৃষ্ট।

হিন্দু মুসলমানের মিলন ও সদ্ভাব ব্যতিরেকে ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রীয় এবং অন্তর্বিধ উন্নতিও অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ মৌলানা সাহেব বলেন, যে, অধিকাংশ ঝগড়া হৃন্দ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সামান্য কারণে ঘটে; উভয় সম্প্রদায়ের লোকে একটু ঔদার্য্য ও পরমতসহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে সমস্যার সমাধান ও সদ্ভাব রক্ষিত হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্ত সভাপতি মহাশয় কতকগুলি প্রস্তাব করেন; যথা, আপোসে বিবাদ

নিষ্পত্তির জন্ত উভয় ধর্মের সন্মিলিত সদ্ভাবসম্পাদিকা সমিতি, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানগুলির ও সংবাদপত্রগুলির অবিরাম সাবধানতা ও সতর্কতা, চাকরীতে এবং ব্যবস্থাপক সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভাসমিতিতে সাম্প্রদায়িক দাবী গ্রাহ্য করা সম্বন্ধে সদাশয়তা, ইত্যাদি।

মৌলানা সাহেব মনে কবেন, যে, সাম্প্রদায়িক আলাদা প্রতিনিধি থাকায় হিন্দু মুসলমানের ঐক্য শীঘ্র স্থাপিত হইবে। আমরা মনে করি, যে, হিন্দু ও মুসলমানের বর্তমান মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আলাদা প্রতিনিধি থাকা কিছুকাল পর্য্যন্ত দরকার। কিন্তু তাঁহাদের নির্বাচন সন্মিলিত হিন্দু মুসলমান নির্বাচকসমষ্টি দ্বারা হইলেই, কালক্রমে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমুদয় প্রতিনিধি সমুদয় নির্বাচক দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারিবেন, এবং তখন পৌরজ্ঞানপদ অধিকার ও কর্তব্য (citizenship) সম্পূর্ণরূপে জাতীয় (national) হইবে, সাম্প্রদায়িক (communal) থাকিবে না।

অহিংসা সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলেন, তিনি মুসলমান, এবং ইসলাম্ ধর্ম অনুসারে বিশ্বাস করেন, যে, যুদ্ধ একটি অতিবড় অকল্যাণ, কিন্তু যুদ্ধ অপেক্ষাও অমঙ্গলকর জিনিস আছে; আবশ্যক হইলে তাহা নিবারণ করিবার জন্ত যুদ্ধ করা উচিত; যখন শত্রু আঙ্গ বল ভিন্ন অন্য কোন যুক্তি বুঝিবে না, তখন মুসলমান যুদ্ধ দ্বারাই সে যুক্তির নিবাসন করিবে। “কিন্তু আমি মহাত্মা গান্ধীর সহিত কাজ করিতে রাজী হইয়াছি, এবং যতদিন তাঁহার সঙ্গে যুক্ত থাকিব ততদিন আঙ্গরক্ষার জন্তও আঙ্গ বল প্রয়োগ করিব না। এবং আমি স্বেচ্ছায় এই সর্বোচ্চ আবদ্ধ হইয়াছি; কারণ আমি মনে করি, যে, আঙ্গ বল প্রয়োগ ব্যতীতও আমরা জয় লাভ করিতে পারি। ৩২ কোটি লোকের পক্ষে আঙ্গ বলের ব্যবহার নিন্দার বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। যদি আঙ্গ বলের দ্বারা জয় লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা জাতির সকল শ্রেণীর দ্বারা লব্ধ জয় হইবে না, কিন্তু প্রধানতঃ যোদ্ধা শ্রেণীদের দ্বারা লব্ধ জয় হইবে। কিন্তু তাহারা পৃথিবীর অন্ত সব দেশ অপেক্ষা এদেশে অল্প সব শ্রেণীর লোক-সকল হইতে বেশী বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর

সম্বন্ধবিহীন। আমাদের স্বরাজ সকলের—“রাজ” হওয়া চাই (কেবল যোদ্ধা—“রাজ” হইলে চলিবে না); এবং তাহা হইতে হইলে স্বরাজ সকলের স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গ ও আত্মবলিদান দ্বারা লব্ধ হওয়া চাই। তাহা না হইলে আমাদেরকে, কেবল স্বরাজ লাভের জন্তু নহে, স্বরাজ রক্ষার জন্তুও যোদ্ধা শ্রেণীদের বলবীর্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু ইহা আমাদের করা চলিবে না। (কারণ, যাহাদের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহারা কালক্রমে প্রভু ও অত্যাচারী হইয়া উঠে।) অধিকতম লোকের ন্যূনতম ত্যাগের দ্বারা স্বরাজ লাভ করিতে হইবে, ন্যূনতম লোকদের অধিকতম আত্মবলিদানের দ্বারা নহে। যেহেতু অহিংস অসহযোগের জাতিগঠনাত্মক অনুষ্ঠানসমষ্টির ফলদায়কতায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সেইজন্তু আজ বল প্রয়োগের জন্তু আমার হৃদয় লালায়িত নহে। এই গঠনমূলক অনুষ্ঠানসমষ্টি আমাদেরকে জয়ী করিতে যদি নাও পারে, তাহা হইলেও, আমি জানি, স্বেচ্ছায় প্রফুল্লচিত্তে দুঃখ সহ করিলে তাহাই সফল আত্ম বল প্রয়োগের জন্তু উৎকৃষ্টতম প্রস্তুতি হইবে। কিন্তু, ঐশ্বরেচ্ছায়, আমরা যদি মন প্রাণ দিয়া কাজ করি এবং যদি জাতিকে গঠনমূলক অনুষ্ঠানগুলির জন্তু সামান্য ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা আমাদেরকে সিদ্ধির আশায় নিরাশ করিবে না।”

স্বরাজ জাতির নিকট কি দাবী করে ?

মৌলানা মহম্মদ আলি বলেন, “আমাদের যে পনের লক্ষ ভারতীয় জা’তভাই অপরের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তু যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ দিতে গিয়াছিল, এবং অনেকে প্রাণ দিয়াওছে। (আমরা আমাদের নিজেদের জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তু তাহাদের মত ত্যাগ করিতেছি কি ? করিতে প্রস্তুত আছি কি ?) অহিংস অসহযোগ আমাদের কাছে যে সামান্য ত্যাগ চায়, তাহা হইতে পিছপাও হওয়া কি আমাদের উচিত ? আমাদের বর্তমান কার্যসমষ্টি জাতীয় কাজের আরম্ভ মাত্র ; এবং স্বরাজ লব্ধ হইবার পর সৈনিকদের চেয়েও বেশী ত্যাগ

পাকার আমাদেরকে করিতে হইবে। কোন একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তু প্রাণ দেওয়া বেশী কঠিন নয়। সকল দেশে সকল যুগে মানুষ ইহা করিয়াছে, এবং কখন কখন অতি তুচ্ছ কারণে করিয়াছে। কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনের জন্তুই জীবন ধারণ করা, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাহার জন্তু ব্যয় করা, এবং প্রয়োজন হইলে, তজ্জন্তু দুঃখভোগ করা—ইহাই কঠিনতর কাজ। যে লক্ষ্যের জন্তু আমাদেরকে জীবন ধারণ ও যাপন এবং দুঃখ সহ করিতে হইবে, তাহা, ভারতবর্ষে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন।”

গোবধ

মৌলানা সাহেব গোবধ সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা বলিয়াছেন। মংগুয়া গান্ধী খিলাফতকে রূপক ভাষায় নামধেয় বলিবার পূর্বেই “আমার ভাই ও আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে, গোবধের সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক রাখিব না; আমি জানি হিন্দু ভাইদের চোখে গাভী কিরূপ ভক্তির পাত্র। তখন হইতে আমাদের বাড়ীতে চাবরেরাও গোমাংস ভোজন করে না, এবং আমাদের স্বধর্ম্মীদিগকে এইরূপ করিতে অনুরোধ করা আমাদের কর্তব্য মনে করি। গো কোদুবানী আমার ভাই ও আমি কখন করি নাই, সকল দরকারের সময় ছাগ বলি দিয়াছি।”

তাহার পর তিনি বলেন, যে, “দরিদ্রতর নগরবাসী মুসলমানদের গোমাংস প্রধান খাদ্য; ছাগ ও মেঘ মাংসের মূল্য খুব কমাইতে না পারিলে খাদ্যের জন্তু গোবধ একেবারে বন্ধ করা যাইবে না। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে, বেশীর ভাগ গাভী হিন্দুদের সম্পত্তি। গাভী দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিলেই তাহারা যদি উহা বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে গোবধ অনেক কমিতে পারে। গাভী রক্ষার জন্তু ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার নিমিত্ত মেঘছাগব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ দিতে পারা যায়।” পরিশেষে তিনি সকলকে, বরদাস্ত করা এবং ত্যাগস্বীকার করা, এই দুইটি বিষয়ে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন।

আমাদের মনে হয়, কোন পক্ষেরই অবুঝ হওয়া উচিত নয়। হিন্দুর মনের ভাব বুঝিয়া মুসলমানদের যথাসম্ভব কম গোবধ এবং নিভৃত স্থানে গোবধ করা কর্তব্য। অল্প দিকে, দরিদ্রতর মুসলমানের খাণ্ড এবং ধর্ম্মাহুষ্ঠানের জন্ত আবশ্যিক বলিয়া উহা একেবারে আইন দ্বারা বন্ধ করাইবার চেষ্টা করাও হিন্দুদের উচিত নহে। বাংলা দেশের বাহিরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ মাছ মাংস খান না। বাংলা দেশের হিন্দুদের সব জাতির লোক মাছ মাংস ভক্ষণে এবং দুর্গা-পূজা কালী-পূজা প্রভৃতিতে ছাগ বলিদানে অভ্যস্ত। সেই কারণে অগ্রাণ্ড প্রদেশের ব্রাহ্মণ ও অগ্র কোন কোন নিরামিষভোজী জাতির পক্ষে বঙ্গের ব্রাহ্মণদের মৎস্যমাংস ভোজন এবং ছাগ বলিদান একেবারে বন্ধ করিবার চেষ্টা অসুচিত হইবে। ইহাও মনে রাখা উচিত, যে, অতীত কালে এক সময়ে ভারতীয় আর্ষ্যদের মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ এবং খাণ্ডেব জন্ত গোবধ প্রচলিত ছিল।

“বদ্মাষ সম্প্রদায়”

মৌলানা সাহেবের একথা ঠিক, যে, বদ্মাষরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, তাহারা এক আলাদা সম্প্রদায়। কারণ ইহা সত্য, যে, হিন্দুর ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মই বদ্মায়েষী করিতে বলে না। ইহার উপর আমরা একটা কথা বলিতে চাই। যখনই যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবে, তখনই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা যেন স্থির করেন, যে, দাঙ্গায় লিপ্ত অধিকাংশ বদ্মাষ কোন কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যখনই দেখা যাইবে, যে, কোন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বেশীর ভাগ বদ্মাষকে জন্ম দিয়াছে, তখনই সেই সেই সম্প্রদায়ের নেতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টারা যেন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের স্থায়ী চেষ্টা করিতে থাকেন।

“শুদ্ধি” ও সংঘবন্ধন

“শুদ্ধি” এবং হিন্দুদের সংঘবন্ধ হইবার চেষ্টাতে মৌলানা সাহেব কোন দোষ দেখেন নাই : কিন্তু তিনি

বলেন, যে, অস্বাভাবিক অনুন্নত জাতি-সকলের উন্নতির জন্ত ও তাহাদের প্রতি ঞ্চায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্তই যেন হিন্দুরা এই-সকল চেষ্টা করেন, দল পুরু করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ত যেন না করেন।

মৌলানা সাহেবের একথা সত্য, যে, খৃষ্টিয়ান্ মিশনারীরা যে হাজার হাজার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে খৃষ্টিয়ান্ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দু কাগজওয়ালারা চীৎকার করেন না, কিন্তু মুসলমানরা তাহাদিগকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহারা চোঁচাইবেন। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, মুসলমানেরাও খৃষ্টিয়ান্ পাদ্রীদের অগ্রধর্ম্মাবলম্বীদিগকে খৃষ্টিয়ান্ করিবার চেষ্টায় বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করেন নাই, কিন্তু আর্ষ্য-সমাজী ও হিন্দুদের “শুদ্ধি” প্রচেষ্টায় উত্তেজিত হইয়াছেন। মৌলানা সাহেব এই কথাটি বলেন নাই। তিনি তাঁহার অভিভাষণে অনেক স্থলেই নিরপেক্ষভাবে উভয় দিক দেখিয়া কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে দুই দিক দেখিতে পারেন নাই।

সত্য ও ঞ্চায়ের খাতিরে, খৃষ্টিয়ান্ পাদ্রী ও মুসলমান মোল্লাদের স্বধর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টার একটা প্রধান প্রভেদের উল্লেখ করিতে হইবে। খৃষ্টিয়ান্ পাদ্রীরা যাহাদিগকে বাপ্তাইজ্ করেন, তাহাদের সাধারণ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্ত স্কুল স্থাপন করিবার ও তদ্বারা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় সেরূপ কিছু করেন না। ফলে আমরা দেখিতে পাই, যে, নিরক্ষরতা ও ইসলাম্ ধর্ম্মের অমূল্য উপদেশ-সকল সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং প্রয়োজন অহুসারে ধর্ম্মাক্রতা ও ধর্ম্মোন্নততা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যতটা দেখা যায়, অগ্র কোন সম্প্রদায়ে ততটা দেখা যায় না। নিরক্ষরতা ধরুন। নীচের তালিকা ১৯২১ সালের বঙ্গের সেন্সস্ হইতে গৃহীত। সংখ্যাগুলি স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সম্মিলিত সংখ্যা।

ধর্ম্ম	হাজারে লিখনপঠনক্ষম	হাজারে ইংরেজী-জানা
হিন্দু	১৫৮	৩২
মুসলমান	৫৯	৬
দেশী খৃষ্টিয়ান	২৩৬	১১১

ব্রাহ্ম	৮২১	৬১৬
বৌদ্ধ	২৬	২
ভূতপূজক	৭	০.৩

(শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে) মুসলমানদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা যে বেশী, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি।

অতএব, ধর্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি কেবল পার্থিব কারণেও লোকে খৃষ্টিয়ান্ করিবার চেষ্টায় না চেষ্টাইয়া নামে-মাত্র-মুসলমান করিবার চেষ্টায় বিচলিত হয়, তাহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

মৌলানা সাহেব এই প্রসঙ্গে একজন ধনী প্রভাবশালী মুসলমান ভদ্রলোকের যে প্রস্তাবটি কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তাহাতে আমরা সায় দিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, আদিম-নিবাসী জাতিসকল ও হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ জাতিসকল যে-সব অঞ্চলে বাস করে, তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মপ্রচারকেরা তাঁহাদের কর্মীর এবং হস্তস্থিত টাকার পরিমাণ অনুসারে এক এক বৎসর বা দীর্ঘতর কালের জন্ম ভাগ করিয়া লউন। হিন্দুর অংশে যে-সব জায়গা পড়িবে, সেখানে হিন্দু নির্দিষ্ট-কাল কাজ করিবেন; মুসলমানও তদ্রূপ নিজের অংশে কাজ করিবেন। নিজের নির্দিষ্ট স্থানের অল্পমত লোকদিগকে তাঁহারা নিজ নিজ সমাজের সামিল করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ ভাগাভাগিটা কতকটা প্রবল জাতিদের সমুদয় পৃথিবীর দুর্বল “অসভ্য” জাতিদিগকে “ম্যাগেট” দ্বারা ভাগ করিয়া লওয়ার মত শুনায়। সাঁওতাল বা গৌড় যদি বলে, আমি হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান্ কিছুই হইব না, তাহা হইলে তাহাকে উক্ত কোন সম্প্রদায়ের গ্রাস ও হজম করিবার কি অধিকার আছে? তা ছাড়া, একই স্থানের কতক সাঁওতাল বা চামার বা হাড়ি উন্নত-হিন্দু হইতে, কতক মুসলমান হইতে, কতক খৃষ্টিয়ান্ হইতে, কতক বৌদ্ধ হইতে চাহিতে পারে। কেবল একটি ধর্মের আলোক ঐ স্থানে ধরিয়া অল্প ধর্মের আলোক আটকাইবার অধিকার কাহারও আছে কি? তা ছাড়া, নির্দিষ্ট কালের জন্ম এক সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কোন স্থানে কাজ করিয়া যদি চলিয়া যান, ও পরে অল্প

ধর্মের লোকেরা সেখানে গিয়া নিজের দল পুরু করিতে চান, তাহা হইলে কি নূতন করিয়া ঝগড়া বাধিবে না? ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাগাভাগি চলিতে পারে না।

স্বরাজ ও বিদেশীর আক্রমণ

মৌলানা মহম্মদ আলীর মতে, ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত হইলে তাহাতে মুসলমানদের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। স্ব-রাজ কিম্বা সর্ব-রাজের মধ্যে স্ব-ধর্মও উহা আছে। ইসলাম ইহা বলেন না, যে, দিল্লীতে মোগলের সিংহাসনে একজন মুসলমানকেই বসিতে হইবে। তা ছাড়া, সকলেই জানেন, পৃথিবীর প্রবলতম মুসলমান রাষ্ট্রে রাজসিংহাসন আর নাই, তথায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক খাঁটি মুসলমান অতীত কালের পৃথিবীর বড় বড় মুসলমান-সাম্রাজ্যের কথা সেরূপ গৌরবের সহিত স্মরণ করেন না, যেরূপ গৌরবের সহিত খিলাফতের প্রথম ত্রিশ বৎসরের কথা স্মৃত হয়, যখন খলিফাগণ সাধারণতন্ত্রের প্রধান সেবক ছিলেন।

এই-সকল কথা হইতে বুঝা যায়, যে, মৌলানা সাহেবের মনের ঝোঁক সাধারণতন্ত্রের দিকে।

ভারতীয় মোসুমেদের সাহায্যে আফগানিস্থানের ভারত আক্রমণ করিবার আশঙ্কা সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে, ওটা একটা জুজু মাত্র। তিনি বলেন, স্বরাজ লব্ধ হইবার পর যদি কোন বিদেশী (যে ধর্মেরই হউক) ভারত আক্রমণ করিতে সাহসী হয়, তিনি তাহা হইলে ভারতীয় সৈন্যদলে ভর্তি হইবেন, এবং নিশ্চয়ই পলাতক হইবেন না।

তাঁহার মতে হিন্দুরা যদি-বা স্বরাজ-সংগ্রামে ক্ষান্ত হন, তাহা হইলেও মুসলমানেরা স্বরাজের জন্ম চেষ্টা করিতে থাকিবে, এবং স্বরাজ লব্ধ হইলে হিন্দুদিগকেও তাহার ফলভাগী করিবে।

স্বরাজের অর্থ

স্বরাজের অর্থ যে হিন্দুর প্রভুত্ব ও মুসলমানের দাসত্ব, কিম্বা মুসলমানের প্রভুত্ব ও হিন্দুর দাসত্ব নহে, তাহা

তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তিনি আরও বলেন, উভয় সম্প্রদায়েরই লোকের বুঝা উচিত, যে, কেহ কাহাকেও নিমূল করিতে পারিবে না। হিন্দুরা মুসলমানকে নিমূল করিতে চাহিলে, যখন মহম্মদ বিন্ কাসিম্ সিন্ধুদেশে পদার্পণ করে, তখন করা উচিত ছিল; মুসলমানরা হিন্দুকে ধ্বংস করিতে চাহিলে তাহারা যখন ভারতে প্রবলতম ছিল, তখন করা উচিত ছিল। অতএব এখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সকলের জন্ত স্বরাজের চেষ্টা করিতে হইবে, নিজের প্রভুত্ব ও অস্ত্রের দাসত্বের জন্ত নহে। মুসলমান হিন্দুর মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিও, তিনি বিদেশী মুসলমানেরও আক্রমণে বাধা দিবেন; হিন্দুও মুসলমানের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করুন, যে, হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের মানে মুসলমানের দাসত্ব নহে। “আমার নিজের কথা এই, যে, আমি বর্তমান প্রভুদের পরিবর্তে বরং হিন্দুর দাসত্ব করিতে রাজী আছি; কারণ তদ্বারা আমার স্বধর্মী পঁচিশ কোটি লোকের দাসত্ব নিবারণ করিতে পারিব,— যাহাদের দাসত্ব এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যপূজা একার্থক।”

—

সংস্কৃত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা

আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় জীবনের উপর স্থাপিত এবং তাহা হইতে বিবর্তিত। বর্তমানকে বুঝিতে হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠ অংশকে সংরক্ষিত, বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে অতীতের শ্রেষ্ঠ অংশকেও জানিতে বুঝিতে হইবে। বর্তমানে মন্দ যাহা, তাহা বর্জন বা পরিবর্তন করিতে হইলেও, তাহার মূল বা বনিয়াদ প্রাচীনের কিছু মধ্য আছে কি না, দেখিতে হইবে। অতএব, আমাদের অতীতকে জানা কেবল যে ইতিহাস রচনার জন্ত প্রয়োজন তাহা নহে, আমাদের সমগ্র সভ্যতার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্তও আবশ্যিক, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্তও আবশ্যিক। এই অতীতের সাক্ষ্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে, প্রাচীন মূর্ত্তা প্রভৃতিতে আছে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক আছে প্রাচীন সাহিত্যে। সুতরাং আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অন্বেষণ যে একান্ত আবশ্যিক তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্য শব্দটি আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। পালি সাহিত্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ না করিলেও তাহার অন্বেষণও আমাদের অভিপ্রেত।

বাংলা দেশে যে-সকল টোল আছে, তাহাতে সংস্কৃতের চর্চা হয় বটে। কিন্তু টোলগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। এক-একটি টোলে একটি

বা দুটি বা তিনটি বিষয়ের অধ্যাপনা ২।১ জন অধ্যাপক স্বতন্ত্র ভাবে করেন। কোথাও কোথাও এক-একটি বিষয়ের গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাত্রেরা লাভ করে, কোথাও কোথাও তাহাও করে না। কিন্তু এক-একটি বিষয়েরও ভাল পুস্তকসংগ্রহ টোলগুলিতে কচিৎ দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া, যেখানে ব্যাকরণ অধীত হয়, তাহা ব্যাকরণের জন্তই হয়; স্মৃতি বা কাব্য বা গ্ৰন্থও এই প্রকারে স্মৃতি বা কাব্য বা গ্ৰন্থের জন্যই অধীত হয়। একটি বা একাধিক বিষয়ের জ্ঞানের আলোকপাত অপর বিষয়গুলির উপর প্রায় হয় না, সকল বিষয়গুলির জ্ঞানের পরস্পরসাপেক্ষতা উপলব্ধ ও প্রদর্শিত হয় না, এবং সমুদয়ের জ্ঞানের সমষ্টি দ্বারা সমগ্র অতীতকে জানিবার বুঝিবার সমালোচনা করিবার ও অতীতের গর্ভ হইতে রত্ন উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয় না। ম্যাজিয়মে বিলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল বা বিলুপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহের অংশবিশেষের প্রস্তুত নমুনা রক্ষিত হইয়া যেমন অশিক্ষিতেরও কৌতূকাবহ হয়, আমরা সংস্কৃত পালি প্রভৃতি সাহিত্যকে তদ্রূপ কিছু মনে করি, এ ধারণা যেন কাহারও না হয়। কেন না, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞানের, সাংস্কৃতিকতার, আধ্যাত্মিক অনুভূতির, এরূপ অনেক নিদর্শন আছে, যাহা এখনও কোথাও অতিক্রান্ত হয় নাই।

এই-সকল কারণে, এমন অন্ততঃ একটি বিদ্যাপীঠ থাকা দরকার যেখানে প্রাচীন সাহিত্যের সকল শাখা অধীত হইবে, তাহার অধ্যাপনার জন্য যোগ্য অধ্যাপক-সকল থাকিবেন, এবং সকল শাখার সমুদয় মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তক যথাসম্ভব সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এরূপ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে না হইলেও তাহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাইতে পারে।

যে-সব কলেজে পাশ্চাত্য নানা বিদ্যার সহিত সংস্কৃতও অধীত হয়, তথায় সংস্কৃতের গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান লব্ধ হইতে পারে না। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বয়ং আর দশটি বিষয়ের অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা সংস্কৃতের যেরূপ অন্বেষণ ও তাহার যেরূপ পুস্তকসংগ্রহের কথা বলিতেছি, তাহা করিতে পারেন না।

সংস্কৃত কলেজেও কেবল মাত্র সংস্কৃত প্রাচীন ধরণের পণ্ডিতমণ্ডলী থাকিলে চলিবে না। তাহার কারণ, যাহারা কেবল সংস্কৃতেরই চর্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান গভীর ও স্বস্ববিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইলেও, আধুনিক জগতের জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত নহে। অত্র দিকে আবার প্রাচীন ধরণের পণ্ডিতেরাও একান্ত প্রয়োজনীয়। অধ্যাপক টিব (Thibaut) একবার মহা-

মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, যে, “আমরা সাবেক ধরণের এদেশী পণ্ডিতদের সাহায্য না লইয়া কাজ করিতে পারি না।” অতএব, সাবেক ধরণের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্যই থাকিবেন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান্ ও মনীষীও চাই। তাহার কারণ বলিতেছি।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কার। এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডে এবং দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। জাপানের কোন কোন মঠে এমন সংস্কৃত বহি পাওয়া গিয়াছে, যাহা ভারতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিব্বতী ও চীন ভাষায় এমন সংস্কৃত বহির অনুবাদ আছে, যাহার মূল ভারতে এখন আর নাই। মধ্য এশিয়ায় বালুকাচ্ছন্ন ভূগর্ভপ্রোথিত বহু নগরে ও জনপদেও সংস্কৃত বা তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যের এবং ভারতীয় শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ায় এমন আৰ্য্যভাষার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহা এখন পৃথিবী হইতে লয় পাইয়াছে। যব দ্বীপ, বলি দ্বীপ, প্রভৃতিতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনতম বর্ণমালা ভারতীয়। আনাম শ্যাম কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান। বর্তমান ভারতের সীমার মধ্যে ও বাহিরে শিলালিপির উদ্ধার ও তাহার সাহায্যে প্রাচীন ভারতেতিহাসে আলোকপাতও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা করিয়াছেন।

এই-সকল কারণে, পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষার জ্ঞান যাহার বা যাহাদের আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কি প্রণালীতে গবেষণা করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদির কাল নির্ণয় করেন, কেমন করিয়া প্রক্ষিপ্তের ও মূলের বিচার করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন বিদ্যার সকল শাখার পরস্পর সাহায্যে নানা অমূল্য সত্য আবিষ্কার ও তথ্য নিরূপণ করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন গ্রীস ও রোম, প্রাচীন চীন তিব্বত ও জাপান, প্রাচীন মিসর, প্রাচীন আসীরিয়া, বাবিলন পারস্য, প্রভৃতির সভ্যতা দর্শন সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা কেমন করিয়া করেন, ইত্যাদি বিষয় যিনি বা যাহারা জানেন, এরূপ লোকও সংস্কৃত কলেজে থাকা একান্ত আবশ্যিক। নতুবা, ইহা শুধু একটি বৃহৎ টোলে পরিণত হইবে। কিন্তু, বৃহৎ টোলের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিলেও শুধু তাহাই আদর্শের অনুরূপ হইবে না।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিবার লোক কিরূপ হওয়া

আবশ্যিক বলিয়াছি। তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইতেই হইবে, হিন্দু হইতেই হইবে, ভারতীয় হইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ, ইহারও ইতিহাসে দেখিতে পাই, ইহা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হইবার পর প্রথম প্রথম যখন ইহা কেবল টোলের মত সংস্কৃতেরই অধ্যাপনা করিত, তখন ইহার ভার ছিল একটি কমিটির হাতে, এবং তাহার সেক্রেটারী, প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের কাজ করিতেন। ভারতীয় এবং বিদেশী, হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান্, উভয় রকম লোকই কখন না কখন সেক্রেটারী ছিলেন। ভারতীয় সেক্রেটারী ছিলেন, রামকমল সেন, বৈদ্য; রাধাকান্ত দেব, কায়স্থ; রসময় দত্ত, কায়স্থ। তদ্বাবধায়ক ও পরিচালকের নাম সেক্রেটারীর পরিবর্তে প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতে। কাউয়েল্ সাহেব, খৃষ্টিয়ান্, প্রশমকুমার সর্কাধিকারী, কায়স্থ, প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে হিন্দু হইতে হইবে, বা ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এরূপ কোন নিয়মও নাই, নজীরও নাই। এবং ইহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ট্যান্ড্ হইতে পরিচালিতও হয় না। সেইজন্য আমরা বলি, গবর্ণমেন্ট এই কলেজেব জন্ত যত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত, এবং তাহার মধ্যে যত টাকা অধ্যক্ষের বেতন দিতে প্রস্তুত, সেই টাকায় জাতিধর্মবর্ণনির্বিষে যোগ্যতম লোক নিযুক্ত করুন।

আমরা যে যে কারণে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান-সম্পন্ন অধ্যক্ষ ও দু'একজন অধ্যাপক নিয়োগ আবশ্যিক মনে করি, সেই সেই কারণে ছাত্রদিগকেও শুধু সংস্কৃত ও পালি না শিখাইয়া পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষা ও বিদ্যা শিখান প্রয়োজন। অবশ্য, ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশীয় যে-সকল ছাত্র কেবল সংস্কৃত বা সংস্কৃত ও পালি শিখিতে চান, তাঁহাদিগকে ইংরেজী বা অন্য কোন পাশ্চাত্য ভাষা বা পাশ্চাত্য কোন বিদ্যা শিখিতে বাধ্য করা হইবে না।

উদারনৈতিকদিগের কন্ফারেন্স্

মডারেট্ নামটা ঠিক তাঁহাদের লক্ষ্য ও রাষ্ট্রীয় মতের পরিচায়ক নহে বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে লিবার্যাল বা উদারনৈতিক বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বার্ষিক কন্ফারেন্স্ এবার পুনায় হইয়াছিল। স্যার তেজ বাহাদুর সাক্ষী সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে প্রথমে বিগত সাম্রাজ্যিক মন্ত্রণাসভায় তাঁহার কার্যের বিষয় বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে তিনি জেনারেল স্মার্টসের জেদে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাহা সত্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ধরা পড়িয়াছেন জেনারেল স্মার্টস্; খেতচর্ম্মী ব্রিটিশসাম্রাজ্যতুস্ত সব শেষালের এক

রা, জেনারেল স্মার্টস্ জোরে ছকা-ছয়া করায় দোষটা তাঁহারই হইয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ ত ভারী সহানুভূতি-সম্পন্ন; কিন্তু, আমরা স্বদেশে স্বায়ত্তশাসক নহি, এই অছিলায় যে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে আমাদের সমান অধিকার দেওয়া হয় না, তাহার মূল উচ্ছেদ করিবার জন্ত ব্রিটিশসিংহ ভারতে পূরা স্বায়ত্তশাসন কেন প্রবর্তিত করেন না?

সাক্ষী মহাশয় বলিয়াছেন, যে, অসহযোগীরা মনে করেন, যে, কেবল তাঁহারই স্বরাজ চান। তাহা নহে; উদারনৈতিকেরাও স্বরাজ চান। নূতন আমলের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বৎসরেই ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করা হইয়াছিল। ভারত-গবর্নমেন্ট তাহা ভারত সচিবকে জানাইয়াছিলেন। ভারত-সচিব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাহার মূলবটা পরিষ্কার বুঝা যায় নাই।

অবশ্য কেবল অসহযোগীরাই স্বরাজ চান, ইহা ঠিক নহে। কিন্তু দাবীর মাত্রায় ও পরিমাণে প্রভেদ আছে। উদারনৈতিকগণ পূনা কন্ফারেন্সেও এবিষয়ে যে প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে রাষ্ট্রীয় সকল বিভাগে প্রাদেশিক পূরা দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ভারতীয় যে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছেন, তাহাতে সামরিক বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগগুলি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের হাতেই থাকিবে বলিয়া মত দিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, অসহযোগীরা এই রকমের অঙ্গহীন স্বরাজ চান না; অনেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই চান।

উদারনৈতিকরা যে সেনাবিভাগে খুব শীঘ্র শীঘ্র ভারতীয়তাপাদন (Indianisation) চান, তাহাও বলা কর্তব্য। পূনা কন্ফারেন্সে তাঁহার এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন।

—

ভারতে জাহাজ নির্মাণ

ভারতবর্ষের লোকদের নিজের বাণিজ্য-জাহাজ থাকা উচিত কি না, এবিষয়ে দেশের লোকদিগকে সরকারের সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া উচিত ও আবশ্যিক কিনা, এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্ত গবর্নমেন্ট এক কমিটি বসাইয়াছেন। এদেশে কমিটি ও কমিশন বসান হয়, অধিকাংশ স্থলে কোন একটা প্রয়োজনীয় কাজে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত, কিম্বা উহা না-করিবার অছিলা বা ওজুহাত বাহির করিবার জন্ত, কিম্বা ব্যাপারটাকে বৃহৎ সাক্ষ্যসংগ্রহপুস্তক ও রিপোর্টের দ্বারা চাপা দিবার নিমিত্ত।

বর্তমান ক্ষেত্রে ইংরেজের তরফ হইতে বেশ মজার



সার তেজ বাহাদুর সাক্ষী

মজার সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। সকলের সাক্ষ্যের আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না; কেন না, আমরা স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবার আগে, জাহাজ নির্মাণে যথোপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ পাইব না, ইহা নিশ্চিত। ম্যাকিনন্ ম্যাকেন্জি কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যজাহাজ ও রণতরী দ্বারাই ভারতের সব কাজ চলিতে পারে। তা পারে বৈ কি! নতুবা আমাদের আমদানী ও রপ্তানীর সব মাল জাহাজে বহন করিয়া আমাদের কোটি কোটি টাকা গ্রাস করিবার এবং আমাদের শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টাতে বাধা দিবার সুবিধা হইবে কেমন করিয়া? আরো বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ; উহার সরকারী তহবিল হইতে জাহাজ নির্মাণে সাহায্য বা রণতরী নির্মাণ চলিতে পারে না। কিন্তু যখন ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কোটি কোটি টাকা নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের জন্ত খরচ করে, যখন ১৫০ কোটি টাকা ভারতের “স্বৈচ্ছাকৃত দান” বলিয়া আদায় করা হয়, যখন সামরিক ও সিবিল্ কর্মচারীদের মোটা বেতন আরো মোটা করা হয়, যখন নূতন নূতন প্রাদেশিক বিভাগ

স্থাপন, নূতন রাজধানী নির্মাণ, প্রভৃতিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, তখন ত ভারতবর্ষ গরীব বিবেচিত হয় না ! যখন তর্ক উঠে, যে, ব্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ষ গরীব না ধনী হইতেছে, তখন ত বলা হয়, ভারতবর্ষ খুব ধনী হইতেছে ! এই সেদিনও বোম্বাইয়ের গবর্নর স্যার জর্জ লইফ্ কার্ধ্যভার ত্যাগের প্রাক্কালে বক্তৃতা করেন, যে, ভারতবর্ষ খুব ধনী হইতেছে, এবং বড় কাম্‌চারী-দিগকে আরও বেতন দিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে !

ইংরেজের পক্ষ হইতে একরূপ সাক্ষ্যও দেওয়া হইয়াছে, যে, ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ হিন্দুরা, বড় খাড়াখাণ্ডের বিচার করে ; সুতরাং তাহারা জাহাজের অফিসার বা সাধারণ কর্মী হইবার যোগ্য নহে ! কিন্তু খাদ্যাখাণ্ডের বিচার সত্ত্বেও ত বিস্তর ভারতীয় ইউরোপ আমেরিকা জাপানে শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে, বিস্তর ভারতীয় বিদেশে ব্যবসা করিতেছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী ভারতীয় আফ্রিকায় আমেরিকায় ফিজিতে মরীচ-দ্বীপে মালয়ে শ্রমিকের কাজ করিতেছে। প্রাচীন ভারতের লোকদের নিজের জাহাজ ছিল। তাহাতে তাহারা বহু দূর দেশে যাইত। কোম্পানীর আমলের কিছুদিন পর্য্যন্তও ভারতীয়দের জাহাজ ছিল। ইংরেজরা স্বার্থপরতা-বশতঃ ভারতীয় জাহাজের উচ্ছেদ সাধন করে। এক শূকরমাংস ছাড়া অল্প খাদ্য মাংসে অন্ততঃ ভারতীয় মুসলমানদের ত আপত্তি নাই। হিন্দুরা সামুদ্রিক জীবনের অযোগ্য বিবেচিত হইলেও অন্ততঃ ভারতীয় মুসলমানেরা যোগ্য হইয়া উঠিলেও আমরা আনন্দিত হইব। তাঁহারা ত সেরাং লক্ষর প্রভৃতির কাজ দক্ষতা ও সাহসের সহিত কুরিয়া থাকেন।

ইংরেজ তরফের আর এক ধাঁচের সাক্ষ্য এই, যে, নাবিকের জীবন বড় ঝঞ্ঝাট বিপদ ও কষ্টের জীবন ; মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ভারতীয়রা কি একরূপ আটপিঠো, সাহসী, ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারিবে ? অতএব, আগে কতকগুলি যুবককে জাহাজে করিয়া নানা দূর দেশে লইয়া যাওয়া হউক। যদি তাহাদের একরূপ জীবন ভাল লাগে, যদি তাহাদের নানা মাত্রার শীতাতপ সহ্য হয়, যদি দীর্ঘপ্রবাস সহ্য হয়, তাহা হইলে না হয় তাহাদিগকে জাহাজের অফিসারের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

আমরা বলি, আমাদের যুবকেরা যদি গৌরীশঙ্করের সর্বোচ্চ চূড়ায় এখন উঠিতে নাই পারে, তাহা হইলে কি নিম্নতর শৃঙ্গেও তাহারা উঠিবে না ? সুমেরু বা কুমেরু-গামী জাহাজে তাহারা যাইতে পারিবে না বলিয়া কি জাপান ফিলিপাইন পর্য্যন্তও যাইতে পারিবে না ? করাচী হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্তও জাহাজ চালাইতে পারিবে না ?

বাণিজ্যজাহাজের ব্যবসাকে দুটা ভাগে ভাগ করা যায় ; ভারতীয় নদীর এবং ভারত-উপকূলের ব্যবসা, এবং দূর-বিদেশগামী জাহাজের ব্যবসা। আমরা উপকূলের ও ভারতীয় নদীর ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিতে চাই। অল্প অনেক সভ্য দেশে আভ্যন্তরীণ নদীর এবং উপকূলের ব্যবসা আইন দ্বারা তত্ত্বদেশীয় ও জাতীয় লোকদের একচেটিয়া করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারতেও আমরা সেইরূপ চাই। এবং তাহার জন্য সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ বাহা প্রয়োজন, তাহা দিবার মত টাকা ভারতীয় রাজকোষে আছে ও থাকা উচিত। অপব্যয় নিবারণ করিলে সন্ধ্যায়ের টাকা সব সময়েই পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান মার্কেটাইল্ মেরীন্ কমিটি নামক এই কমিটির সমক্ষে বাংলা দেশের মিঃ এন্স এন্স বন্দ্যো এবং মিঃ যোগেন্দ্রনাথ রায় বেশ স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া ইংরেজরা দেশী বাণিজ্য-জাহাজের ব্যবসা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে ও নষ্ট করে। মিঃ বন্দ্যোর সত্য কথা কমিটির সভাপতি স্মার আর্থার ফ্রুমের মতে আপত্তিজনক হওয়ায় তাঁহাকে জেরা করা হয় নাই। রায় মহাশয়ের কোন একটি উক্তি আপত্তি-জনক মনে হওয়ায় ফ্রুম তাঁহাকে উহা প্রত্যাহার করিতে বলেন। রায় মহাশয় তাহা করেন নাই। ঠিকই করিয়া-ছেন। তোমাদের মনের মত কথা না বলিলেই তাহা আপত্তিজনক হয়।

নেপাল ও ভারত-গবর্নমেন্ট্

ভারত-গবর্নমেন্ট্ নেপালের সহিত এক নূতন সন্ধি করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য নেপালের নিকটবর্তী রাজ্যসমূহে শান্তি রক্ষণ। নেপাল ভারতের ভিতর দিয়া যত ইচ্ছা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাইতে পারিবে। তাহাতে নেপাল খুব সামরিক বলশালী হইবে।

চীনে এখনও গৃহবিবাদ আছে বটে ; কিন্তু কাল-ক্রমে চীন সুশৃঙ্খল ও সবল হইবে। তিব্বত স্বয়ং কিম্বা চীনের অধীন বা সহযোগীরূপে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত থাকিলে ভয়ের কারণ হইতে পারে। রুশিয়ার বলশেভিক্ গবর্নমেন্ট্ ত চায়ই, যে, সব দেশে রুশিয়ার মত সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-প্রকার নানা কাবণে ভারত-গবর্নমেন্ট্ দেশের উত্তর দিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য নেপালের সহিত এই সন্ধি করিয়া থাকিবেন। নেপালের গুণী সৈন্তের সাহায্যে, কল্পিত ভবিষ্যৎ-ভারতবিপ্লব-দমনেচ্ছাও ইহার মূলে থাকিতে পারে।

কিন্তু যে গবর্নমেন্ট্ ভয়প্রযুক্ত নিজের প্রজাদিগকে উচ্চতম সামরিক শিক্ষায় ও সজ্জায় বঞ্চিত রাখিয়া

দুর্বল রাখে, অথচ নিকটস্থ রাজ্যকে প্রবল হইতে সাহায্য করে, তাহাকে বুদ্ধিমান ও গায়কারী বলা যায় না। আফগানিস্থানকেও ত ভারতবর্ষ বহু বৎসর টাকা দিয়াছিল। তাহার ফল কিরূপ হইয়াছে ?

ব্যারিষ্টার ও উকীল

উকীলদের উপর ব্যারিষ্টারদের যে একটা কৃত্রিম শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহা লোপের চেষ্টা হওয়ায় ব্যারিষ্টারদের পক্ষ হইতে অনেক বাজে কথা বলা হইতেছে। বস্তুতঃ, সুবিচারের জন্ত আমাদিগকে কেন যে চিরকাল ইংলণ্ড-শিক্ষিত লোক আমদানী করিতে হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই। এখানে যদি আইন শিক্ষার কোন ক্রটি থাকে, ত, তাহা সুধূরাইয়া লওয়া হউক। হাইকোর্টের অরিজিটাল সাইডে যদি এটর্নীদের মধ্য-বর্তিতা ব্যতিরেকে উকীল ও অন্ত আইনজ্ঞেরা কাজ করিতে পান, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে কাজ হয়, বিচারও কিছু খারাপ হয় না।

ভারত-ধর্মমহামণ্ডল

লক্ষ্মী নগরে ভারত ধর্মমহামণ্ডলের গত অধিবেশনে অবনত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি, হিন্দুদিগের সংঘবদ্ধ হওন, আপদ্-ধর্ম, মালকানা রাজপুতদিগের 'শুদ্ধি,' প্রভৃতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইংরেজী "resolution" কথাটির বাংলা সচরাচর "প্রস্তাব" করা হয়। কিন্তু উহার প্রাথমিক অর্থ "প্রতিজ্ঞা"। যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না, তাহারা জগতের সর্বত্র অমানুষ বিবেচিত হয়। এই জন্ত জানিতে কৌতূহল হয়, ভারত-ধর্মমহামণ্ডলের সভোরা ও শ্রোতারা অবনত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি কিরূপ আচরণ দ্বারা, কি কাজ দ্বারা, কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেখাইতে চান। ভূয়ো কথার কোন মূল্য নাই; অধিকন্তু তাহা মানুষকে হাশ্বাস্পদ ও অশ্রদ্ধার পাত্র করে।

যৌগিক ও আত্মিক সভা

কাকিনাড়ায় সমগ্রভারতীয় যৌগিক ও আত্মিক সভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ডি রাও তাঁহার অভিভাষণে বলেন, যে, মানুষ যদি বৃদ্ধিতে পারে, যে, মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহা মনে হয়, মৃত্যু বাস্তবিক তাহা নয়, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশসেবকদিগকে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অনেকেই পালন করিতে পারে।

মানুষের "মৃত্যু" তাহার আত্মা। আত্মার মৃত্যু নাই। সকল দেশের ধার্মিক লোকেরা ইহা বিশ্বাস করেন। পরলোকগন্ত আত্মার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া ইহা প্রমাণ করিবার নানা চেষ্টা হইতেছে। ইউরোপ আমেরিকায় এই যোগ সত্য কিনা, যোগলব্ধ বার্তা সত্য কি না, ইহার মধ্যে কোন প্রত্যারণা আছে কি না, তাহা নির্ধারণের জন্ত নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইতেছে। এদেশে সেরূপ কিছু হইতেছে না। একেবারে কিছু বিশ্বাস না করা যেমন দোষ, বিনাপ্রমাণে সহজেই যা-তা বিশ্বাস করাও তেমনি একটা দুর্বলতা।

হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির কনফারেন্স

হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে-সব কনফারেন্স হয়, তাহাতে সেই সেই জাতির উন্নতির জন্ত নানা-প্রকার প্রস্তাব ধার্য্য হয়। ইহা দোষের বিষয় নহে, আত্মাদেরই বিষয়। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরের কনফারেন্সে আগেকার বৎসরের প্রস্তাবগুলি অমুসারে কাজ কতটুকু হইল, তাহার একটি রিপোর্ট পঠিত হওয়া উচিত। যেমন ধরুন, স্বর্ণ-বণিক কনফারেন্সে এবার স্থির হইয়াছে, যে, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা নিবারণ করিতে হইবে, এবং গ্রামের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এইরূপ প্রস্তাব ইহাদের এবং অন্ত কোন কোন জাতির কনফারেন্সে আগেও ধার্য্য হইয়াছিল। সুতরাং দেখা উচিত, যে, আগেকার বৎসরের প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্যে পরিণত হইয়াছে। কোন কাজ না হইলে শুধু প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু যদি অল্প কাজও হয়, তাহা হইলে তাহা জাতির সকল লোককে জানাইলে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। বিভিন্ন জাতির কনফারেন্সের পূরা রিপোর্ট খবরের কাগজে বাহির হয় না। এইজন্ত এইসব কথা আমরা আন্দাজী লিখিতেছি। আগেকার বৎসরের রিপোর্ট এই-সকল কনফারেন্সে পঠিত হইয়া থাকিলে তাহা স্থবির বিষয়।

ইংরেজ খুন

দৈনিক কাগজে দেখিতেছি, ২৭ পৌষ শনিবার সকালে এক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতায় একজন ইংরেজকে গুলি করিয়াছে। ইংরেজটি গুলি খাইয়া পড়িয়া যাইবার পরও হত্যাকারী তাহাকে আরও ছয় বার গুলি করে বলিয়া খবর বাহির হইয়াছে। পলায়ন করিবার সময়ও ঘাতক কয়েক জনকে গুলি করে, এবং শেষে ধরা পড়ে। কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, নিতৃত ঠংবজাক এক-

জন উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মচারী মনে করিয়া ঘাতক তাহাকে মারিয়াছে, এবং সে বিপ্লবপ্রমাদী দলের একজন প্রধান লোক। এসব কথা সত্য কি না, বলা যায় না।

দেশে যত খুন হয়, তাহার সবগুলিই শোচনীয়; কিন্তু সবগুলির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা দরকার হয় না। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি কারণে যে-সব খুন হয়, তাহাও গর্হিত কাজ। আকস্মিক অনভিপ্রেত খুনও মধ্যে মধ্যে হয়। সে সমস্তই দুঃখের বিষয়। ইংরেজ যখন লঘুচিত্ততা-বশতঃ, দেশী লোকের প্রাণের মূল্য কম এবং দেশী লোককে মারিলে প্রাণদণ্ড হয় না দেখিয়া, কোন দেশী লোককে বধ করে, তাহাও অতি গর্হিত ও শোচনীয় দৃশ্য। ভারতীয় লোক ইংরেজকে মারিলেও তাহা কখন কখন ব্যক্তিগত কারণে হইতে পারে। অগ্ন্যান্ত খুনের ঞ্চায় তাহা গর্হিত ও শোচনীয় দৃশ্য। কিন্তু এসকল স্থলে জাতিবিদ্বেষ ও রাজনৈতিক কারণের অনুমান সহজেই পুলিশের ও ইংরেজদের মনে আসে, এবং কখন কখন তাহা সত্যও হইতে পারে। এইজন্য বলা দরকার, যে, এইরূপ কারণে খুন করাও গর্হিত ও শোচনীয় কাজ। তা ছাড়া ঘাতক ধরা পড়িলে তাহার প্রাণ তা যায়ই, আবাকস্ত অগ্নি বিস্তর দেশী লোক সন্দেহভাজন ও নির্যাতিত হয়। এরকম কাজে কোন বীরত্বও নাই, ইহাতে দেশের কোন উপকারও হয় না, এবং হইতে পারে না। দস্তুরমত যুদ্ধ করা ধর্মসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলিলেও, দেখা গিয়াছে, যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জয় সফল যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ খুনের সঙ্গে যুদ্ধের সাদৃশ্য নাই, এবং স্বাধীনতা-যুদ্ধের ফললাভ এরূপ খুনের দ্বারা লব্ধ হইতে পারে না, কোন দেশে হয় নাই। ফলের কথা এইজন্য বলিতেছি, যে, ফল যাহাই হউক না, খুন জিনিষটাই খারাপ, ইহা অনেকে বুঝে না ও স্বীকার করে না; এই হেতু এইরূপ খুনের সমর্থকদিগকে বলা দরকার এবং দেখান দরকার, যে, এইরূপ খুন দ্বারা দেশের মঙ্গল হয় না।

শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলন

গত ১৩ই পৌষ ঢাকায় বালিকাবিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রীদিগের সম্মিলনে সভাপতির কাজ করিবার ভার প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্যোগ্য হস্তে গুস্ত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তব্য সূচিস্থিত হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটি-সকলের অন্তর্গত স্থান-সকলের বাসিন্দা বালিকাদিগের শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করিবার একটি প্রস্তাব সম্মিলনে গৃহীত হয়। ইহা হওয়া উচিত।

সর্বভারত-ছাত্রসম্মিলন

কলিকাতার সর্বভারত-ছাত্রসম্মিলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অগ্ন্যান্ত কথার মধ্যে বলেন, ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া স্বরাজসাধনার সাহায্য করিতে পারে। ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া কিরূপ স্বরাজ সাধনা করিয়াছিল ও করিতেছে, তাহা ত দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের দল তাহাদের শিক্ষারও ত কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অতএব, এখন এসব বোল চা'ল ছাড়িয়া দিলে হয় না?

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ

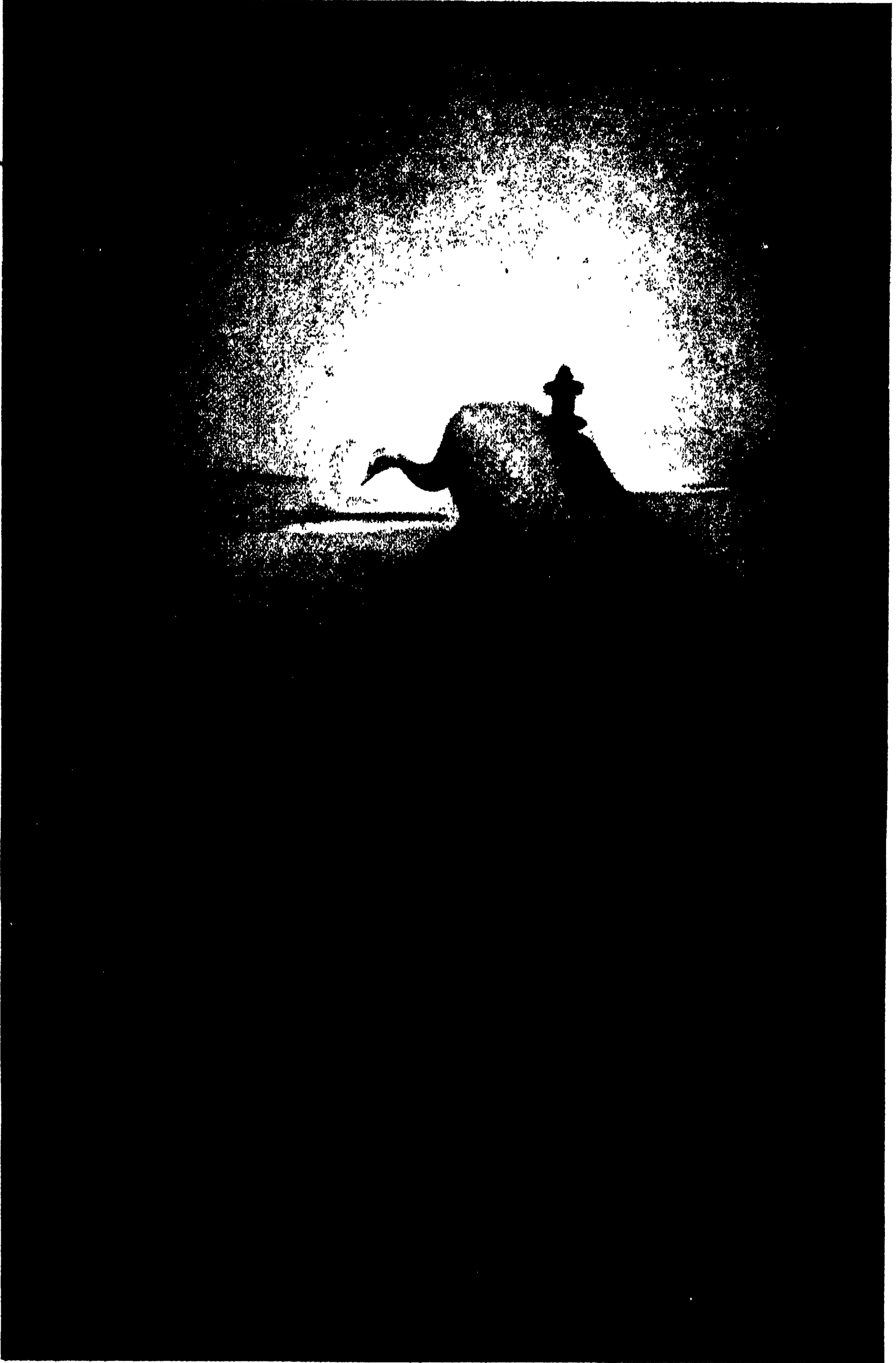
প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র এবং অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষা ইংলণ্ডে হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য গভীর এবং নানা-সাহিত্যব্যাপী ছিল। তিনি স্ককবি ছিলেন। তাঁহার ইংরেজী কবিতা ঠিক ইংরেজ স্ককবিরই মত ছিল, বিদেশীর লেখা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বিদ্যাচর্চা লইয়াই থাকিতেন, এবং অতি অনাড়ম্বর লোক ছিলেন; নিজেকে লোকের সাম্মে খাড়া করিবার ইচ্ছা ও প্রয়াস তাঁহার ছিল না। এইজন্য অনেকে তাঁহার অস্তিত্ব এবং নাম পর্যন্তও অবগত নহেন। কত বড় বিদ্বান্ ও কত বড় অধ্যাপক তিনি ছিলেন, তাহা অনেকে জানিতেনও না। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি ৫৫ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই পেনশন্ লইয়াছিলেন।

“আনন্দবাজারে”র অর্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার অর্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহাতে সপ্তাহের খবর, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতার প্রতিলিপি, প্রভৃতি ত থাকেই, অধিকন্তু হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ, স্ত্রীলোকদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত সমাজ-সেবা প্রভৃতির মত অতি হিতকর প্রবন্ধও থাকে। দেশবিদেশের ভারতীয় দেশভক্তদের ছবি এবং মুসলমান-জগতের সংবাদ প্রকাশে ইহার খুব উদ্যোগিতা আছে।

মুসলমান মহিলাদের কন্ফারেন্স

এবারকার মুসলমান মহিলা-কন্ফারেন্সে একজন পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। ইহা ত হওয়াই চাই। তুরক্ষে বহুবিবাহ আইনবিরুদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের মুসলমান নারীরাই কি ঘুমাইয়া থাকিবেন?



ময়ূর
চিত্রকর শ্রীসাবদাচরণ উকিল

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩০

৫ম সংখ্যা

প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন

আমি কথা দিয়াও আপনাদের সহিত মিলিত হইতে না পারায় সান্তিশয় লজ্জা ও বেদনা অনুভব করিতেছি। অল্পগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাব অল্পপস্থিতির কারণ প্রয়াগস্থ কোন কোন বন্ধু অবগত আছেন। শরীরের রুগ্ন ও ভগ্ন অবস্থাই ইহার কারণ।...

আমার শরীর যদিও কলিকাতায়, তথাপি আমি সর্কাস্ত্রঃকরণে আপনাদের সহিত যোগ দিতেছি জানিবেন। আমি তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। আমার জীবনের বহু দুঃখশোক ও আনন্দের স্মৃতি এলাহাবাদের সহিত জড়িত। আমাকে এখনও আপনাদেরই একজন মনে করিলে কৃতার্থ হইব।...

বঙ্গের বাহিরের বাঙালী আমরা কেমন করিয়া বাংলার সভ্যতা ও চিন্তার ধারার সহিত যোগ রক্ষা করিতে পারি, বাঙালীর বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারি, তাহার উপায় চিন্তা আমরা অনেকেই কখন কখন করিয়া থাকি। সেইজন্য এই বিষয়ে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

আমরা মাহুয, আমরা এশিয়াবাসী, আমরা ভারত-বর্ষীয়, আমরা বাঙালী। রোমক কবি টেরেন্স্ (Terence)

বলিয়াছেন, “Homo sum; humani nihil a me alienum puto”. “আমি মাহুয; যাহা কিছু মানবীয়, তাহার কিছুই সহিত আমি নিজেকে সম্পর্কবিহীন মনে করি না।” আমরাও মাহুয; অতএব মাহুযের যত শক্তি বৃত্তি ও গুণ আছে, সকলগুলিতেই আমরাদিগকে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে। - নতুবা বাঙালীর বিশেষত্ব আমরা রক্ষা করিতে পারিব না। আমরা যদি অমাহুয হই, তাহা হইলে বাঙালীত্ব রক্ষার কথা উঠিতেই পারে না।

আমরা এশিয়ার মাহুয। এশিয়ার মাহুযের বিশেষত্ব কি কি, তাহা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নহে, এবং তাহা করিবার ক্ষমতা ও সময় আমার নাই। আমি কেবল একটা কথা এই বলিতে চাই, যে, এশিয়ার মাহুযদের, ইতিহাসের প্রারম্ভকাল, এমন কি পার্গৈতিহাসিক সময় হইতে, একটি বিশেষত্ব এই দেখা গিয়াছে, যে, তাহারা বাহির অপেক্ষা ভিতরের জিনিষকে, দেহ অপেক্ষা আত্মার কল্যাণ ও আনন্দকে, অধিকতর আবশ্যিক ও গৌরবসম্পন্ন মনে করিয়াছে। এই কারণে আমরা

* প্রয়াগে, উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

দেখিতে পাই, পৃথিবীর সমুদয় ধর্মের উদ্ভব এশিয়াতে হইয়াছে ; অন্যান্য দেশ ও মহাদেশ তাহাদের ধর্ম এশিয়া হইতে গ্রহণ করিয়াছে ।

অতএব আমরা বাঙালীরা যদি এশিয়াবাসীর প্রধান বিশেষত্ব রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের বাহিরের জিনিষের মোহে-আসক্তিতে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না ; আমাদের ভিতরের ঐশ্বর্য্যো, অস্তরের কল্যাণে, হৃদয়মনের উৎকর্ষে, আত্মার আনন্দেও মনো-নিবেশ করিতে হইবে । আমি কাহাকেও সংসারত্যাগী সম্মাসী হইতে বলিতেছি না । বাহিরের জিনিষের প্রয়োজন আছে । আত্মার কল্যাণ বিকাশ স্মৃতি ও আনন্দের জন্মও বাহিরের অমুকুল অবস্থার একান্ত প্রয়োজন আছে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহিরের যাহা কিছু তাহা ভৃত্য মাত্র, সহায় মাত্র, পরিচারক মাত্র ; অন্তরাত্মাই প্রভু । বাহির তাহার সেবা করিবার মাত্র অধিকারী ; উহা প্রভুর আসন দখল করিতে পারে না ; করিলে অকল্যাণ হয় ।

আমরা ভারতবর্ষীয় । অতএব ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্বের কথাও বলি । পৃথিবীর আর কোনও দেশ নাই, যেখানে ভারতবর্ষের মত হিন্দু জৈন বৌদ্ধ জরথুষ্ট্রীয় ইহুদী খৃষ্টীয় মুসলমান প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম ও সভ্যতার একত্র সমাবেশ দেখা যায় । আমাদের দেশে সংঘর্ষ সংগ্রাম মারামারি কাটাকাটি আগে হইয়া গিয়াছে, এখনও হয় ; কিন্তু মোটের উপর আমরা যতটা পরমত-সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য্য অবলম্বন করিয়া সকলের মধ্যে যেরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতি তাহা করে নাই । আমার বিশ্বাস, জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় সভ্যতায় মৈত্রী-ও সামঞ্জস্য-বিধান-সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষই করিবে ; ভারতবর্ষ তাহা না করিলে আর কেহ পারিবে বলিয়া এখন মনে হইতেছে না—ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কেহ বলিতে পারে না । আমরা বাঙালীরা ভারত-বর্ষীয় বলিয়া, জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় সভ্যতায় মিলনসাধনের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদেরও স্থান এবং কর্তব্য রহিয়াছে ।

শেষ কথা, বাঙালীর বিশেষত্ব সঘর্ষে । যোগ্যতা ও সময়ের অভাব বশতঃ আমাদের সমুদয় বিশেষত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা আমি করিব না । ছুই একটি কথা মাত্র বলিব ।

জীব ও জড়ের একটি প্রধান প্রভেদ এই, যে, জীব আত্মরক্ষার জন্ত অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ করিতে পারে, পরিবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে, জড় তাহা পারে না । যে জীব যে পরিমাণে নিজেকে পরিবেষ্টক অবস্থার সহিত যতটা খাপ খাওয়াইতে পারে, সে তত বাঁচিবার উপযুক্ত হয় । এই খাপ খাওয়াইবার শক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত কোন জাতির নাই বলিতেছি না ; কিন্তু কোন কোন দিকে বাঙালীর আছে ইহাই বলিতেছি । পাশ্চাত্যের সহিত যখন সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন বাঙালী পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে এবং তাহার সহিত আপনাকে সমঞ্জসীভূত করিতে বিরত থাকে নাই ; ভারতের অস্ত কোন কোন জাতি ও সম্প্রদায় বিরত ছিল । অবশ্য, আমরা যে এক সময়ে অতিরিক্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা আতিশয়া-দোষ । এরূপ ভুল ও দোষ পরিবর্তনের যুগে সব দেশেই হয় বটে, তাহা হইলেও ইহা বর্জনীয় । কোন কোন বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্যের সহিত সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের উপকার এখনও যথেষ্টরূপে লাভ করিতে পারি নাই—যথা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে, এবং দৈহিক শ্রমের গৌরব বোধে । এই এই বিষয়ে আমরা ক্রমে উন্নতি করিতেছি ।

স্বস্থ সবল মানুষের লক্ষণ এই, যে, সে নিজের দেহ-মনের পুষ্টির জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজের দেহ-মনের অঙ্গীভূত করিতে পারে । অস্বস্থ মানুষের দৈহিক ও মানসিক অঙ্গীর্ণতা হয়, গ্রহণ ও নিজস্বীকরণের ক্ষমতা তাহার কম থাকে ।

পাশ্চাত্য যখন জোর করিয়া আমাদের দ্বারে ধাক্কা দিল, তখন তাহার মধ্যে যাহা ভাল তাহা লইবার জন্ত বাঙালী প্রস্তুত হইয়াছিল । কিন্তু বাঙালীর শিরোমণির ভিত্তারীর মত লইবার জন্ত ব্যগ্র হন নাই ; স্বস্থ সবল মানুষের মত লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । দৃষ্টান্তরূপ

বলি, রামমোহন রায় নিঃশু ভিখারীর মত পাশ্চাত্যের ঘারে উপস্থিত হন নাই। তিনি প্রাচ্য, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার গৌরবমণ্ডিত উদার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ও মিলন সাধন করিয়া ভবিষ্যতের পূর্ণতর মানব-সভ্যতার বিকাশসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। একজন পাদরী এশিয়াবাসীদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া আক্রমণ করায় তিনি লিখিয়াছিলেন :—

“Before ‘A Christian’ indulges in a tirade about persons being ‘degraded by Asiatic effeminacy’ he should have recollected that almost all the ancient prophets and patriarchs venerated by Christians, nay even Jesus Christ himself,..... were ASIATICS, so that if a Christian thinks it degrading to be born or to reside in Asia, he directly reflects upon them.”

অন্য এক সময়ে অন্য একজন বিদেশী খৃষ্টিয়ান, ভারতবানীরা বুদ্ধির আলোকের (ray of intelligenceএর) জ্ঞান ইংরেজদের নিকট স্বর্ণী, তাঁহাকে এই কথা বলায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন :—

“If by the ‘Ray of Intelligence’ for which the Christian says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with respect to Science, Literature, or Religion, I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners.”

মনে রাখিতে হইবে যে রামমোহন যখন এই কথা লিখিয়াছিলেন, তখন ভারতে প্রত্নতত্ত্বের ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা ও আলোচনা প্রবর্তিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দূরে ঠেলিয়া না রাখিলে উহা আমাদের প্রাচ্য ভারতীয়

বাহালীত্ব থাকিবে না, এই ভয় রামমোহনের মনে উদ্ভিত হয় নাই। তিনি ইসলামিক ইহুদী খৃষ্টিয় বৌদ্ধ—প্রাচ্য প্রতীচ্য সব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের করিবার সাহস ও শক্তি রাখিতেন। অন্ত দিক্ দিয়া, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রভৃতি কোন বাঙালী মনস্বীই পাশ্চাত্যের ভয়ে মনের সদর দরজায় হড়কা আঁটিয়া দেন নাই। সব মানুষের যাহা, তাহা আমারও, জ্ঞান ও সত্যে দেশভেদ জাতিভেদ নাই—বাঙালী মনস্বীরা এই মন্ত্র অনুসারেই জীবনকে নিয়মিত করিয়াছেন। সর্বদেশের সর্বকালের আত্মিক ঐশ্বর্য্য আপনার করিবার সাহস, পৌরুষ ও শক্তি বাঙালী মনস্বীদের বরাবরই দেখা গিয়াছে।

মানসিক বদ্বহুমী বাঙালী মনস্বীদের হয় নাই। তাঁহারা যাহা লইয়াছেন, তাহাকে নিজস্ব করিয়া বাঙালী ভারতীয় প্রাচ্য দিয়াছেন। এই যে গ্রহণ করিয়া নিজের করিবার ক্ষমতা, ইহা বাঙালীর আছে। এই কারণেই দেখিতে পাই, বাঙালী অল্প ভারতীয় জাতিদের চেয়ে মানসী সৃষ্টি বেশী করিয়াছেন; যদিও উহা বিদেশী সভ্য জাতিদের সৃষ্টির তুলনায় সামান্য। বাঙালীর সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে। ইহাতে কোনই লঙ্কা নাই। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মেন, কোন্ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির উপর বিদেশী প্রভাব নাই? ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প যে বহুপরিমাণে বাঙালীর সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প—এখানেই বাঙালীর কৃতিত্ব ও গৌরব।

বাঙালীর মানসিক আতিথেয়তা আছে। নানা দেশের জাতির যুগের ভাব চিন্তা আদর্শ বাঙালী গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যেমন আমরা সকলেই পোষাকে অল্প বা বেশী বহুরূপী সাজিলেও মোটের উপর বাঙালীর চেহারার ও পরিচ্ছদের বিশেষত্ব আছে, তেমনি নানা দেশ ও কাল হইতে আহৃত ভাব চিন্তা আদর্শের ধারার মধ্যেও বাঙালীর অন্তরের চেহারা বুঝা যায়। আমরা পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকের মত, যেমন নৃতন ধাঁচের পোষাক পরা মানুষকে টিল ছুড়ি না, তেমনি

পরদেশী ভাব ও চিন্তা আদর্শ মাত্রকে বর্জন করি না; —যদিও কেহ কেহ তাহা করিতে ও করাইতে চান।

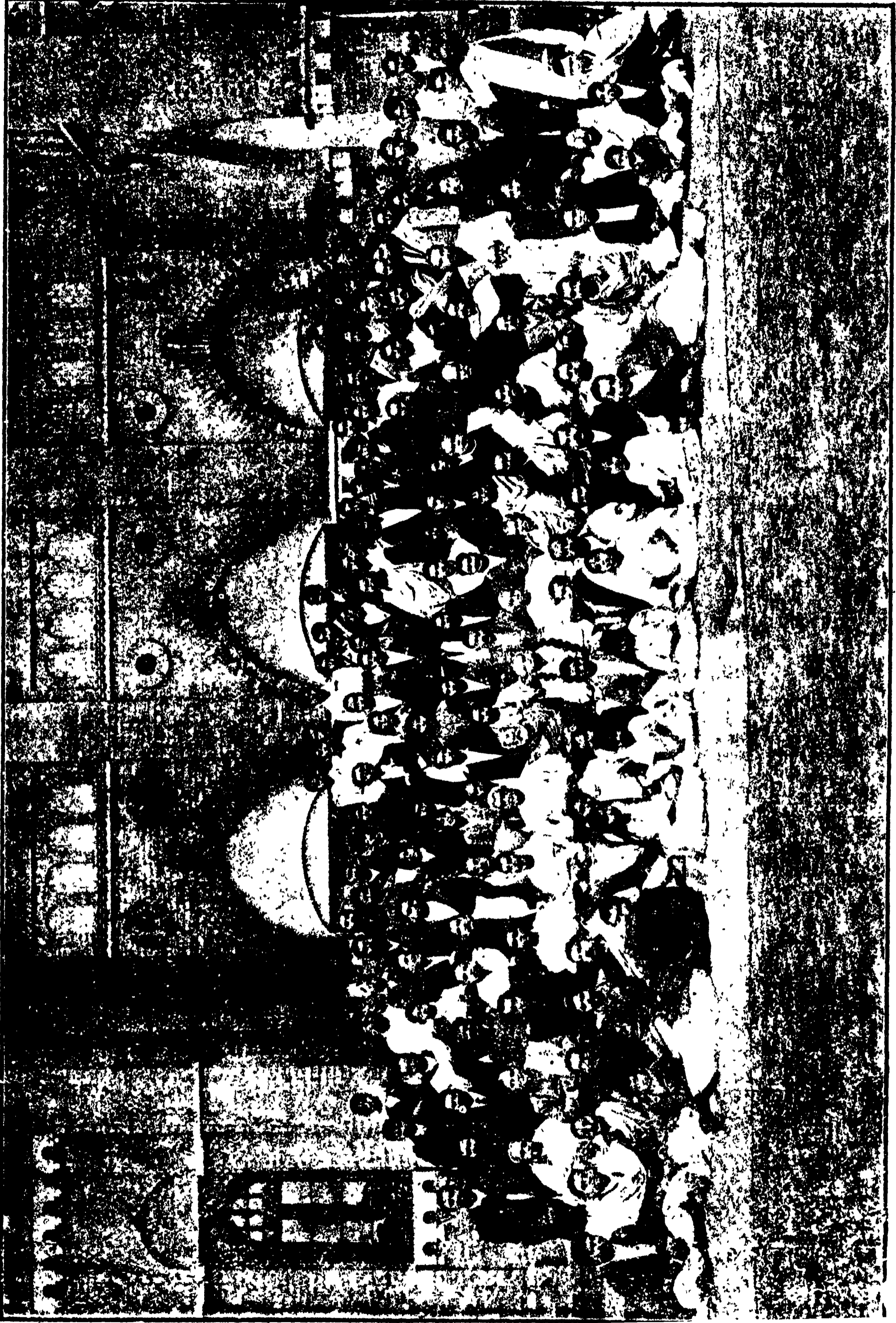
প্রথম হিড়িকে যখন বাঙালীর ছেলেরা স্কুল কলেজ ছাড়িতে চায় নাই, তখনই তখন মহাত্মা গান্ধী পরিহাস করিয়া বাঙালীদিগকে 'education-mad' 'শিক্ষা-পাগল' বলিয়াছিলেন। আমাদের স্কুল-কলেজসকলে অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত আদর্শস্থানীয় শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা ছুঃখ ও লজ্জার বিষয় বটে; কিন্তু শিক্ষালাভের জন্ত আত্যন্তিক আগ্রহ নিন্দা বা লজ্জার বিষয় নহে। জ্ঞানলাভের জন্ত বাঙালীর এই আগ্রহ ভালই। ইহার সহিত স্বরাজ্য-লাভের আগ্রহের কোন বিরোধ নাই। ব্যক্তিগত "স্ব"-রাজ্য-সিদ্ধি বা সমষ্টিগত স্বরাজ্যসিদ্ধি অজ্ঞানীর দ্বারা হইতে পারে না। শিক্ষার বিকৃতি আমাদের নকলনবীসের জাতি করিধাছে বটে; কিন্তু কেবলমাত্র দোকানদারের জাতি হইলেও তাহাও গোরবের বিষয় হইত না। বঙ্গের ধন পৃথিবীর নানা বিদেশী জাতি এবং ভারতবর্ষের নানা জাতি আহরণ করিয়া ধনী হইতেছে, অথচ আমরা ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছি, ইহা আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় বটে। কিন্তু অর্থ-করী বিস্তার দ্বারা এই লজ্জা ও ক্ষোভ দূর করিতে হইবে, অজ্ঞতা দ্বারা নহে। এখনই দেখা যাইতেছে, যে, অনেক সবুকারী ও বেসবুকারী কারখানায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিশিষ্ট দেশী কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালীদেরও সম্মানিত স্থান হইতেছে। আধুনিক পণ্যাশিল্পে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের প্রয়োজন খুব বেশী। এই দুই বিজ্ঞানে বাঙালী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙালীর এই প্রতিভা ও জ্ঞানের সহিত বাঙালীর মূল-ধনের সংযোগ হইলে বাঙালী পণ্যাশিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। এই দিকে প্রবাসী বাঙালীদিগকে তাঁহাদের সমুদয় স্রষ্ট্রোগের সম্ভাবহার করিতে হইবে।

সেই সভ্যতাই স্থায়ী এবং মানুষকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে পারে, মানুষের হিতসাধন করিতে পারে, যাহা সর্বতোমুখী ও সকাঙ্গীণ। ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প দর্শন প্রকৃতি সকল দিকে লক্ষ্য থাকিলে, যেকোন সভ্যতার

বিকাশ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। মানুষ সত্য চায়, আনন্দ চায়, মানুষ শক্তি চায়, মানুষ শিব শুভ মঙ্গল চায়, মানুষ আনন্দ শুচিতা স্ত্রী সৌন্দর্য চায়। কোন সভ্যতাতে ইহার কোনটির অভাব হইলে, তাহা অস্বাভাবিক, অস্থায়ী, মানবের কল্যাণ সাধনে অক্ষম হইবে। বাঙালীর সকল দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতীয় অল্প কোন জাতি বাঙালীর চেয়ে এবিষয়ে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন, মনে হয় না। ধর্ম বিষয়ে দেখা যায়, বঙ্গ হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন চেষ্টা হইয়াছে; খ্রীষ্টীয় ধর্মের ভারতীয়তা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে; সত্যপীর পূজাদি দ্বারা মুসলমান ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মিলন চেষ্টা হইয়াছে; বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ওআহাবী ও ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা হইয়াছে; বহু শতাব্দীর পরে নূতন করিয়া বৌদ্ধ বিহার কলিকাতাতেই নির্মিত হইয়াছে ও বৌদ্ধধর্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে; ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্ভব বঙ্গেরই হইয়াছে; পরমহংস রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর কার্য্যরঞ্জ বঙ্গেরই হইয়াছে; নব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারচেষ্টাও বঙ্গেরই হইয়াছে। নানা দিকে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ও নারীর অধিকার স্থাপনের চেষ্টা বঙ্গেরই আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ছুঃখের বিষয় পরে কার্য্যকালে বাঙালী পিছাইয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাসাদিতে বাঙালীর কৃতিত্ব জগতের সভ্য জাতিদের তুলনায় সামান্য হইলেও, অল্প ভারতীয় জাতি অপেক্ষা কম নহে। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত দেওয়া নিম্নোক্ত।

নানা সভ্য দেশে, শিক্ষিত পুরুষ ও নারী যদি চিত্রকলা ও সঙ্গীতের কিছুই না জানেন, যদি এই দুই ললিত কলার রস আনন্দনেও সমর্থ না হন, তাহা হইলে তাহা লজ্জার বিষয় বিবেচিত হয়। কারণ লেখাপড়া জানার মত এগুলিও কালচারের (cultureএর) অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন-না, সঙ্গীত এবং চিত্রকলাদি ললিতকলা-বিলাসীর ও অলসের আয়োদের জিনিষ মাত্র নহে, মানুষের বিকাশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং তাহার চিহ্নও বটে। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে এক সময়ে সঙ্গীত ভঙ্গিমাজের সম্ভোগ্য থাকিলেও উহার চর্চা ভঙ্গিমহিলা



উত্তরভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সমিতির সম্মিলিত ব্যক্তিগণ

করিতেন না, ভক্ত পুরুষদের মধ্যেও উহার বেশী প্রচলন ছিল না; অথচ বাগ্‌দেবী সরস্বতী বীণাবাদিনী। বর্তমান সময়ে পুরুষদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা ত বাড়িয়াছেই, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও গীতবাহুর চর্চা দৃষ্ট হইতেছে। আধুনিক ভারতে বিচিত্র সুরের এবং নানা ভাব-ও রস-পূর্ণ এত গান রবীন্দ্রনাথের মত কেহই রচনা করেন নাই। তিনি সুরের রাজা। চিত্রকলা সম্বন্ধেও বক্তব্য এই, যে, এখন চিত্রকরেরা আর পটুয়া বলিয়া অবজ্ঞাত হন না। সমাজে পেশাদার চিত্রকরদেরও সম্মানিত স্থান হইয়াছে। তন্নিম্ন, বহু শিক্ষিত ও ভক্ত পুরুষ ও মহিলা নিজের আন্তরিক ভাব ও আদর্শ প্রকট করিবার জন্ত কিম্বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, চিত্রকলার অনুশীলন করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রের ও মূর্তির ছুটি প্রদর্শনী কলিকাতায় হয়। “রূপম্” নামক উচ্চ অঙ্গের একটি ললিতকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মাসিকপত্রাদিকে চিত্রশোভিত করিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে,—যদিও অনেক অল্প চিত্রও মুদ্রিত হইতেছে। চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত শিখাইবার আয়োজনও একাধিক স্থানে আছে। অতি উৎকৃষ্ট ভক্ত অভিনয় দ্বারা নাট্যানন্দ দিবার উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার দ্বারা বহুবার হইয়াছে। বিশ্বভারতীর কলাভবনে দেশী নানা শিল্পের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন চেষ্টা হইতেছে। এইসকল চেষ্টা যথেষ্ট নহে, কিন্তু আরম্ভ হিসাবে আশাপ্রদ।

লালা লাজপৎ রায় বাঙালীপূজক নহেন; কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে হুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ছেলেদের প্রশস্ত কাল্‌চার (culture) নাই; তাহারা কেবল পরীক্ষা পাস করে, চিত্র সঙ্গীত অভিনয় আবৃত্তি, এসবের ধার ধারে না; বাঙালীর ছেলেরা এবং কলকটী মরাঠারা এবিষয়ে ভাল।

বাঙালী সভ্যতার ও কাল্‌চারের এই যে নানা দিকে গতি, ইহা শুভ লক্ষণ। আমি বাঙালীর স্তাবক নহি। “প্রবাসী”তে আমাদের নিজেদের দোষোদ্ঘাটন খুবই করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল দোষ দেখাইয়া

একটা অবসাদ ও নৈরাশ্য উৎপাদন করা উচিত নয়। শুভলক্ষণগুলিও মনে রাখিয়া আশাবিত ও উদ্যমশীল হওয়া আবশ্যিক। আমরা প্রবাসী বাঙালীরাও যেন বঙ্গের সভ্যতা কাল্‌চার ভাব চিন্তা ও আদর্শের ধারার সহিত যোগ রাখিতে পারি, এই চেষ্টা সর্বদা করিতে হইবে।

বাংলাদেশে যাতায়াত পূর্কোপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে। বঙ্গের সাহিত্য ঔদ্যাহিক আদান-প্রদান এবং কুটুস্থিতা স্থাপন-ও-রক্ষা সহজতর হইয়াছে। বাংলার বহি, বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলার খবরের কাগজ, এখন আমরা সহজেই (এলাহাবাদে রবিবার ও ডাকঘরের অল্প ছুটির দিন ছাড়া!) নিত্য পাইতে পারি। এইরূপ নানা উপায়ে বঙ্গের সহিত যোগ রক্ষা সহজ হইয়াছে। অবশ্য, ছাপাখানার কৃপায়, অনেক আবর্জনা ও অশুচি কুৎসিৎ জিনিষও চড়াও করিয়া আমাদের ঘরে ঘরে আসিতেছে। আট্‌কাইবার উপায় সব সময়ে করা যায় না; কিন্তু মানসিক ও বাহ্য সম্মান্জনীর ব্যবহার সকল সময়েই করা যায়, এবং করা উচিত।

বাঙালীত্ব রক্ষা-প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। বাঙালীত্ব চিরকালের জন্ত নির্দিষ্ট আ-তি-ও অবয়ব-প্রাপ্ত অপরিবর্তনীয় একটি কোন গুণ আদর্শ হাঁচ বা ধাঁচ নহে। বাঙালী যেমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত স্থিতিশীল জাতি নহে, তেমনি বাঙালীত্বও পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত অপরিবর্তনীয় আদর্শ এবং গুণাদি নহে। বাঙালীর উন্নতি-অবনতি হইতে পারে, বাঙালীত্বেরও উন্নতি-অবনতি প্রসার-সঙ্কোচ হইতে পারে। বাঙালী যেমন উন্নত মহৎ শক্তিশালী উদার হইবে, বাঙালীত্বও তেমনি জগতে বরণ্য ও অমূল্যসরগীয় হইবে। বাংলার ভিতরের ও বাহিরের আমরা সব বাঙালীই এই প্রার্থনা করি।

বাঙালীকে উদার মহৎ শক্তিশালী উন্নত করিবার পক্ষে প্রবাসী বাঙালীদেরও কর্তব্য রহিয়াছে। স্বেযোগও আছে। প্রাচীন ও নবীন সব শিক্ষাপদ্ধতিতেই দেশ-ভ্রমণের প্রয়োজন ও ফলদায়কতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থী জানার্থী নানা আশ্রমে বিদ্যা-

পীঠে ও পণ্ডিতসভায় যাইতেন। তীর্থদর্শন ত ছিলই।
 ঐশ্বর্যশীল হাজিরদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প-
 কেন্দ্রে শিল্পকেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়ানো, শিক্ষিতসমাজে
 সুপরিজ্ঞাত। বস্তুতঃ, নিজের দেশ ছাড়া অল্প আরও
 স্থান না দেখিলে মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয়
 না, মানুষ কুপমণ্ডুক থাকিয়া যায়। কথিত আছে, একবার
 মানস সরোবরের এক রাজহংস বজের এক ভোবায়
 আসিয়া পড়ে। ভোবার পাতি হাঁস মরালকে মানস-
 সরোবরে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় মরাল তথাকার নীল
 শতদল প্রভৃতির বর্ণনা করে। ভোবার পাতি হাঁস তাহার
 রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিক্রপের স্বরে জিজ্ঞাসা করে,
 সেখানে শামুক গুলি আছে? মরাল বলে, নাই।
 তাহাতে পাতিহাঁসের দল হি হি করিয়া হাসিয়া তাহার
 প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। যাহারা চিরকাল নিজের
 গ্রামের ক্ষুদ্র জিনিষ লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, তাহারা
 ভোবাকে সমুদ্র এবং উইটিবিকে হিমালয় মনে করিতে
 পারে। দেশভ্রমণ এই কুপমণ্ডুকতা দূর করিতে পারে।
 আমরা প্রবাসী বাঙালীরা কার্যগতিকে বাংলা ছাড়া
 অল্প স্থানেরও অভিজ্ঞতা লাভ করি; বরং কেহ কেহ
 বাংলাদেশকেই কম জানি চিনি।

এই হেতু, প্রবাসী বাঙালীরা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার
 সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, বিচিত্র শিল্পকলা,
 প্রভৃতির অভিজ্ঞতা বজের বাঙালী অপেক্ষা সহজে অর্জন
 করিতে পারেন। কিন্তু দেখিবার চোখ শুনিবার কান
 চাই, অনুসন্ধিৎসা চাই; সর্বোপরি চাই শ্রদ্ধা ও
 প্রীতি। আমরা যদি মনে করি, আমাদের অজ্ঞাত-
 সারে মনের কোণেও যদি এই বিশ্বাস লুক্কায়িত
 থাকে, যে, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সর্বগুণাধার, আমাদের
 কাহারও কাছে কিছুই শিখিবার নাই, তাহা হইলে সমস্ত
 পৃথিবী পর্যটন করিয়া আসিলেও আমাদের কোন উপকার
 হইবে না। কিন্তু আমরা প্রবাসী বাঙালীরা যদি অনুসন্ধিৎসা
 বিনীত শ্রদ্ধাশীল ও প্রীতিমান হই, তাহা হইলে নানা
 দেশে-প্রদেশে নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া সমগ্র
 বাঙালী জাতিকে উদারতর এবং অধিকতর জ্ঞানবানু করিয়া
 বাঙালীজাতির প্রসার ও গভীরতা বর্দ্ধন করিতে পারিব।

এমন এক সময় ছিল, শুনিয়াছি, যখন প্রবাসী
 বাঙালীরা বজের বাঙালীদের পরিহাস উপহাস ও অবজ্ঞার
 পাত্র ছিলেন। ইহা সত্য, যে, বহু পূর্বে ইংরেজ
 শাসনকালের প্রারম্ভে, যে-সব বাঙালী যুবক শিক্ষার
 অল্পতা বা অল্প কোনপ্রকার অবস্থাবৈশিষ্ট্যবশতঃ বজে
 উপার্জন করিতে পারিতেন না, প্রধানতঃ তাঁহারা
 “বিদেশে” যাইতেন। কিন্তু এইসব যুবক পণ্ডিত না
 হইলেও, একটা কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,
 যে, তাঁহাদের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর-শীলতা, পৌরুষ
 ছিল। যাহারা অনিশ্চিতকে ভয় করে না, যাহারা
 অজ্ঞাতের সম্মুখীন হইবার সাহস রাখে, তাহারা মানুষ
 হিসাবে খাটো নয়। নিজের ঘরের কোণে একটু স্থান
 পাওয়া বা করিয়া লওয়া সোজা; কিন্তু ঘরের বাহিরে
 গিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারা এবং
 প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিনতর কাজ। যে-সব ইংরেজ
 বিদেশে গিয়া প্রথমে বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা, সাম্রাজ্য
 স্থাপন দ্বারা, ইংলণ্ডের শক্তি ও সম্পদ বাড়াইয়াছে,
 তাহারাও অক্সফোর্ড্, কেম্ব্রিজের ডি-এস্ সী, পি-এইচ্ ডি
 ছিল না। তাহাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল
 না; সে-বিষয়ে তাহারা প্রশংসনীয় বা অমূল্যযোগ্য
 নহে বটে; কিন্তু তাহাদের সাহস ও পুরুষকার নিশ্চয়ই
 ছিল এবং তাহা প্রশংসার যোগ্য। বহু পূর্বের প্রবাসী
 বাঙালীদিগের সহিত এইসকল ইউরোপীয়ের তুলনা
 আমি করিতেছি না। আমি কেবল দৃষ্টান্তস্বলে তাহাদের
 উল্লেখ করিলাম। এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত দিবার
 আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই, যে, পাণ্ডিত্যের যেমন
 মূল্য আছে, তেমনি স্বাবলম্বনের, সাহসের, পুরুষকারের,
 প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তিরও
 মূল্য আছে। এবং এই শেষোক্ত গুণগুলিতে বহুপূর্বের
 প্রবাসী বাঙালীরা হীন ছিলেন না।

সেদিন বহুদিন হইল গত হইয়াছে। বহুবৎসর
 হইতে, বাঙালীদের মধ্যে বরণ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি,
 অনেক গ্রন্থকার, অনেক বিচারপতি, অনেক চিকিৎসক,
 অনেক ঐতিহাসিক, অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক
 ব্যবসায়ী, অনেক ধর্মোপদেষ্টা ও লোকহিতসাধক—

জীবনের নানা বিভাগে কৃতী অনেক ব্যক্তি, বঙ্গে যেমন আছেন, বঙ্গের বাহিরেও তেমনি আছেন। এখন আর আমরা কেবল মাত্র “মায়ে-তাড়ান, বাপে-খেদান, ভাংপিটে ছেলের” দল নহি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন যেমন বিদ্বান ও কৃতীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণে আমরা আমাদের স্বস্বনিবাসভূমিতে লোকহিতসাধনের কেন্দ্র অধিকতররূপে হইতে পারিতেছি কি না, তাহা ভাবা উচিত। কারণ, যদিও প্রথম যুগের বাঙালীরা অনেকে শিক্ষায় ও পাণ্ডিত্যে হীন ছিলেন, এবং টাংকা রোজগার করিবার জন্যই মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা নানাস্থানে দেশহিতকর কার্যে অগ্রণীদের অন্ততম ছিলেন, ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই প্রয়াগেই সবুকারী কলেজ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগীদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন; লাহোরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ও সূচনা একজন বাঙালী করিয়াছিলেন। আগেকার প্রবাসী বাঙালীদের এই বিশেষত্ব সংরক্ষিত ও বর্ধিত হওয়া প্রার্থনীয়।

আমাদের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনটি উত্তরভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের কোন ইতিহাস নাই, কিম্বা দক্ষিণ ভারত ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গক্ষেত্র কখনও কোন প্রধান স্থান অধিকার করে নাই, এমন নয়; এরূপ অপ্রকৃত কথা বলিলে অসঙ্গতাই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ইহা ঠিক, যে, বহুপ্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই—প্রধানতঃ উত্তর ভারত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং উহাকে অনেকটা গঠন করিয়াছে। উত্তর ভারতের এই পুরাকালীন ঐতিহাসিক প্রাধিকার কারণ নির্ণয়ের উপযুক্ত স্থান ও সময় ইহা নহে। এই প্রাধিকার উল্লেখমাত্র করিয়া, আমি বলিতে চাই, যে, আমরা উত্তর ভারতে থাকি বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা ও অধ্যয়ন করিবার, উগা লিখিবার আমাদের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। যাহারা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে থাকেন, তাঁহাদেরও তৎসম্পর্কীয় ভারতেতিহাস অনুশীলন ও রচনা করিবার সুযোগ

আছে। সকল অঞ্চলেরই এই সুযোগের সদ্যবহার কোন কোন প্রবাসী বাঙালী করিয়াছেন। ঐতিহাসিক স্থানসকল দেখিয়া ইতিহাস লিখিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে। বহু পারসী ও দেশভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক উপকরণ, বহু চিত্র মূর্তি, মুদ্রা, প্রভৃতি এখনও অনাবিষ্কৃত ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাংলা দেশে দেশী রাজ্য মাত্র দুটি আছে; তাহাও ক্ষুদ্র, এবং তাহাদের ঐতিহাসিক গৌরব কম। উত্তর ভারতে বহু দেশী রাজ্য আছে। তাহাদের অনেকগুলি ইতিহাসপ্রথিত। তাহাদের গ্রন্থাগারে ও দপ্তরে এখনও বহু অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান আছে—যদিও গভীর পরিতাপের বিষয় এই, যে, বহুগ্রন্থ ও অল্প কাগজপত্র কীট ও কাল ধ্বংস করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহারও উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা এবিষয়ে প্রবাসী বাঙালীর সুযোগ যেমন বেশী, দায়িত্বও তেমনি অধিক। কেহ কেহ এই কর্তব্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, স্মতরাং কর্মীও আরা অনেক চাই।

উত্তর ভারতে দেশী রাজ্য থাকায় কেবল যে ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির সুযোগই বেশী, তাহা নহে। এক-একটি রাজ্যের প্রধান প্রধান কাজ চালাইবার সুযোগও এখানে আছে। আমি প্রধানতঃ ক্ষমতালাভ, অর্থলাভ, বা প্রভুত্ব করার দিক দিয়া একথা বলিতেছি না। কার্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের এবং রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় কার্যদ্বারা দিবার সুযোগ উত্তর ভারতে আছে, ইহাই বলিতেছি। জয়পুরে, বড়োদায়, কোচীনে, মৈসুরে, এবং আরো দুই একটি রাজ্যে বাঙালী এই পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী কেরানী অবজ্ঞার পাত্র নহেন, কারণ তিনিও খুব দরকারী কাজ করেন; স্মতরাং সম্মান ও আদরের যোগ্য। বাঙালী শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, এঞ্জিনিয়ার, ব্যবহারাজীব, বিচারপতি, শিক্ষাপরিচালক, গ্রন্থকার,—ব্যবসায়ী, ধর্মোপদেষ্টা, জনসেবক,—প্রভৃতি সকলেই আমাদের গৌরবহুল। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে যে আরো রাষ্ট্রপরিচালক থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহাও স্বীকার

করিতে হইবে। কেবল বহির সাহায্যে রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া যায় না। কার্যক্ষেত্রে শিখিয়া শিখাইতে হইবে। যাহারা এইপ্রকারে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে নিবিষ্ট করিলে ভাল হইত। ভবিষ্যতেও যদি কোন কোন অভিজ্ঞ বাঙালী ইহা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

ইতিহাস ব্যতীত উত্তরভারতে নৃতত্ত্ব (anthropology), জাতিতত্ত্ব (ethnology), সমাজবিজ্ঞান (sociology), নানাবিধ শিল্প, নানাবিধ শ্রামিক ও বাণিজ্যিক সংঘ, (trade guilds and craftsmen's guilds) প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে। এদিকে একেবারেই দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন নয়; কিন্তু আরো কৰ্মী চাই, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের নানা নিদর্শন, মূদ্রা আদি প্রত্নতত্ত্বের নানা উপাদান নানাস্থানে বিস্তর রহিয়াছে। তাহার সংগ্রহও কেহ কেহ কিছু করিয়াছেন। এই সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

হিমালয় পর্বত ও পার্শ্বত অঞ্চল বনস্পতি ওষধি ভেষজ প্রাণী শিলা—নানা ঐশ্বর্যের সম্ভারে মণ্ডিত। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এইসকল উপকরণ হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারে। বিদেশী লোকেরা ক্রমশঃ তাহা করিতেছে। হিমালয়-পার্শ্বত-অঞ্চলের জলের শক্তি (water-power) আমরা কি কাজে লাগাইতে পারি না? উপযুক্ত স্থানে আমরা কি ফলের উদ্যান রচনা করিয়া লাভবান হইতে পারি না? নানা ওষধি বনস্পতি আদি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারি না? নানা বৃক্ষ হইতে কাগজ দিয়াশালাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি না? উত্তর ভারতের অনেক স্থান হইতে পাথরিয়া কয়লার খনিসকল বহুদূরে অবস্থিত, অথচ ঐসকল স্থান অরণ্যানী শোভিত পার্শ্বতদেশের নিকটবর্তী। ঐসকল স্থানে কাঠ হইতে লভনীয় নানা রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাশনের এবং কাঠের কয়লা উৎপাদনের নিমিত্ত কাঠ চোয়াইবার (wood distillation-এর) কারখানা আমরা কি স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারি না? বাঙালীর মস্তিষ্ক নিকৃষ্ট নহে, নানা পণ্য শিল্পের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও কাহারও কাহারও আছে;

খুব ধনী লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলেও যৌথ কারবার চালাইবার মত টাকা, পরস্পরের উপর বিশ্বাস, দল বাঁধিবার ক্ষমতা, এবং সততা কি আমাদের নাই? সাহিত্যসম্মিলনের কাজের সহিত এসব কথার কোন সম্পর্ক নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জাতীয় কার্যক্ষেত্র ও জাতীয় অভিজ্ঞতা যত দিকে যত বাড়িবে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সাহিত্যের বিশালতা, বৈচিত্র্য ও প্রসারও তত বাড়িবে। এই জগৎ নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন কাজে বাঙালীদের প্রবৃত্ত হওয়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর সাহিত্যের সহিত যোগ রক্ষা যে আমরা সহজেই করিতে পারি, তাহা আমি পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমরা প্রবাসী বাঙালীরা শুধু কি যোগই রাখিব? আমরাও নিশ্চয়ই কেহ কেহ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারি। মৃত ও জীবিত অনেক প্রবাসী বাঙালী তাহা করিয়াছেন। বাংলা বহি লিখিয়া অনেকে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। যাহারা ইংরেজীতে বহি লিখিয়াছেন, তাহারাও, বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট না করিলেও, বাঙালীর সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। বাঙালীর লিখিত যে-কোন ভাষার বহিকে আমি বাঙালীর সাহিত্য বলিতেছি। তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে ও হইবে—বাংলা গ্রন্থকারেরা ঐসকল ইংরেজী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন ও লইবেন।

যেসকল প্রবাসী বাঙালীর স্বতন্ত্র ভাবে বহি লিখিবার ক্ষমতা বা সুযোগ নাই, তাঁহাদের অনেকে অনুবাদ দ্বারা বঙ্গের সাহিত্যসম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইংরেজী সাহিত্য বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা বিশাল, বিস্তৃত ও মূল্যবান। তথাপি ইংরেজরা শুধু বাংলা বহি নহে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সব ভাষারই কোন-না-কোন বহির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, যে-সব ভারতীয় বা অণুদেশীয় আদিম জাতির কোন লিখিত সাহিত্য নাই, তাহাদেরও গান, গল্প, গাথা, উপকথা ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদ বিষয়ে আমাদের বোধ হয় একটা ভ্রান্ত অহংকার বা

আলস্য কিম্বা উভয়ই আছে। আমরা হয়ত ভাবি, যে, যেহেতু আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক অল্প ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা কোন কোন দিকে উৎকৃষ্ট, অতএব অল্প প্রদেশের আগেকার ভারতীয় সাহিত্য হইতেও আমাদের কিছুই লইবার নাই। কিন্তু বহুঐশ্বর্যশালী ইংরেজী সাহিত্যের জন্ম যদি হিন্দী গুজরাতি মারাঠী উর্দু পঞ্জাবী তেলুগু তামিল হইতে অনুবাদ করিবার যোগ্য জিনিষ ইংরেজ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই-সব দেশী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার যোগ্য জিনিষ নিশ্চয়ই আছে। তাহা বাছিয়া অনুবাদ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা প্রবাসী বাঙালীদের আছে। নানক কবীর দাদু তুলসীদাস রবিদাস গরীবদাস প্রভৃতি বহু-সংখ্যক মধ্যযুগের সাধুসন্তের বাণী বাংলায় অনুবাদিত হইলে বাঙালী জাতি বিশেষ উপকৃত হইবে। উত্তর ভারতের উপকথা, গাথা, বারব্রত কথা, আল্‌হা খণ্ডের মত যুদ্ধকাব্য, প্রভৃতি বাংলা ভাষায় নিবন্ধ হওয়া উচিত। অবশ্য দক্ষিণের তুকারামের অভঙ্গ, প্রভৃতি যে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা উত্তরভারতীয় এই সম্মিলনে কেবল উল্লেখ করিলেই চলিবে।

কেবল লেখকেরাই যে জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, তাহা নহে। মানবজীবনের যতপ্রকার কাজে মানুষের যতপ্রকার চেষ্টা উদ্যম অধ্যবসায় ধৈর্য্যসাহস সহিষ্ণুতা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সকলের দ্বারা জাতীয় জীবনের উদ্যম, আশা, ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য, বিশালতা, শক্তি, সাহস, স্মৃতি, আনন্দ, বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগে বণিকরা, নাবিকরা, যোদ্ধারা, ভৌগোলিক আবিষ্কারীরা, সকলে সাহিত্যিক অমর কীর্তি রাখিয়া যান নাই। কিন্তু রাণী এলিজাবেথের যুগের ইংরেজী সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি যে সেই যুগের ইংরেজ-জীবনের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য উদ্যম সাহস ও শক্তির পরোক্ষ ফল, তাহাতে সন্দেহ কি? তখনকার ইংরেজ লেখকরা ত শুধু নিরাশ প্রণয়ের হা-ছত্যাশের, শিশু নায়ক-নায়িকার প্রেমের, কাব্য লিখিয়া যান নাই। একা শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতেই কি

আশ্চর্য্য চরিত্র-ও-ঘটনা-বৈচিত্র্য। ইংরেজ জাতি তখন নানা কাজ, নানা চিন্তা, নানা উদ্যম, নানা আবিষ্কার করিয়াছিল, নানা আদর্শের কথা ভাবিয়াছিল, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য তাহাদের হইয়াছিল; এইজন্য তখনকার ইংরেজী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র। ভিক্টোরিয়ার যুগের সাহিত্যও এবম্বিধ কারণে সমৃদ্ধ।

জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জাতি বড় হইলে সাহিত্যও বড় হয়। আবার ভগবৎরূপায় প্রতিভাশালী লেখক কোন জাতির মধ্যে আবিভূত হইলে, তিনিও নিজের জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, বড় করিতে পারেন।

নানা দেশে নানা সমাজে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া যদি কোন জাতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে, যদি তাহাদের উদ্যমশীলতা বাড়ে, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে তাহাদের সাহিত্যও বড় হয়, লাভবান হয়। ইহার একটি দেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষের এক কোটি আটমটি লক্ষ লোক গুজরাতি ভাষায় কথা বলে; কোন-না-কোন রকমের হিন্দী ভাষায় আট কোটির উপর লোক কথা বলে। অথচ আধুনিক গুজরাতি সাহিত্য আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ। শুধু কি তাই; আধুনিক গুজরাতিতে এমন কোন কোন রকমের বহি আছে, যাহা বাংলা সাহিত্যেও নাই। অথচ বাংলা ভাষায় কথা বলে চারিকোটি তিরিশি লক্ষ লোক—গুজরাতির চারিগুণেরও বেশী। গুজরাতিদের এই সাহিত্যিক কৃতিত্বের একটি কারণ এই, যে, গুজরাতিভাষী পারসী ভাটিয়া বোরা প্রভৃতি বণিক ও অগ্ৰবিধ লোকেরা ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং অনেক বিদেশেও যাতায়াত ও বিষয়কর্ম করে। এই বিশেষত্বটির উল্লেখ করিয়া গুজরাতি স্নলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশয় “The Wandering Gujarati” “ভ্রমণশীল গুজরাতি”-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বাঙালীরাও যত দেশে যত রকম কাজে যাইবে, তাহাদের সাহিত্যও তত বড় হইবে। প্রবাসী বাঙালীরা এইপ্রকারে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে তাহাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন।

ধর্মভাব ধর্মাকাজ্জা সকল দেশের সাহিত্যেরই একটি মূল উৎস । বাংলা সাহিত্যেরও একটি মূল উৎস বাংলার নানা ধর্মপ্রচেষ্টা । মনসা-পূজা ও শিবপূজার স্বন্দ হইতে বেহুলার উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি । কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামপ্রসাদের পদাবলী, কালী-কীর্তন, প্রভৃতি শাক্ত প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত । বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সংখ্যা করাই কঠিন । তাহার পর আধুনিক সময়ে খৃষ্টীয় মিশনারী কেরী প্রভৃতির দ্বারা, ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা, রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর দ্বারা, নববৈষ্ণব মতাবলম্বীদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য অল্প বা অধিক পরিমাণে অনুপ্রাণিত, গঠিত, সৃষ্ট, সমৃদ্ধ হইয়াছে । রামমোহন যে আধুনিক লিখিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রবর্তক, তাহা সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে । অক্ষয়কুমার দত্ত যে তত্ত্ববোধিনী সভার সংশ্লেষে বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্ব্য-শালী করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের স্থান ধর্মোপদেশীদের মধ্যেই সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হয় । কিন্তু পরে বাংলা সাহিত্যেও তাঁহাদের সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হইবে । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য । বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক বলিয়া সুবিখ্যাত, কিন্তু তিনি শেষ জীবনে নব হিন্দুধর্ম প্রচার ইচ্ছায় উপন্যাসাদি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে, ধর্ম যে সাহিত্যের অগ্রতম প্রধান উৎস, একথার প্রমাণ পাওয়া যায় । ঙ্গরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তাঁহার সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কার চেষ্টার মূলে যে গভীর ধর্মভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সমুদয় লেখার মধ্যে ও মূলে ধর্মভাব ও লোকহিতচেষ্টা রহিয়াছে ।

এসব কথা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে । কিন্তু তাহা নহে । প্রবাসী বাঙালী আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ধর্মভাব মনকে উত্ত্বুদ্ধ আলোড়িত আলোকিত করিলে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভব হয় । অতএব ধর্মভাব দ্বারা আমাদের অনুপ্রাণিত হইতে হইবে । সংকীর্ণ অর্থে যাহাকে ধর্মসাহিত্য বলে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না । সাধারণতঃ

প্রশস্ততর অর্থে যাহাকে সাহিত্য বলে, তাহার কথাই বলিতেছি ।

আমরা যে যে অঞ্চলে বাস করি, তথাকার লোক-দের সহিত সম্ভাব রাখিতে হইবে, ইহা ত সোজা সাংসারিক অর্থেও সহজবোধ্য । রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সাধনের জন্ত যে ইহা প্রয়োজন, ইহাও সর্বদা কথিত হয় । আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে, বাংলা সাহিত্য প্রবাসী বাঙালীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে হইলে, ইহা একান্ত আবশ্যিক, যে, আমরা প্রবাসের স্থান-সকলের আদি অধিবাসীদিগকে শ্রদ্ধা ও পীতির চক্ষে দেখি । নতুবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন এংলোইণ্ডিয়ানরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্য রচনা করিতে পারেন নাই, তেমনি প্রবাসী বাঙালীরাও শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য রচনা করিতে পারিবেন না । এবিষয়ে আমি অক্টোবর মাসের এশিয়াটিক রিভিউয়ে ষ্ট্যানলী রাইস্ (Stanley Rice) সাহেবের লেখা এংলোইণ্ডিয়ান ঔপন্যাসিকদের (Anglo-Indian Novelists) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব । মিষ্টার রাইস্ বলেন :—

“To them [Anglo-Indian Novelists] India is simply Anglo-India as represented by the dances, the dinners, the polo matches, and the races of some gay place. The Plains which are the real India are just a kind of sweltering desert, where of course it is infernally hot and where thunder-storms roll up bringing a breathless air and not a drop of rain, and where men work with bloodshot eyes and a terrible weariness at uncongenial tasks, slaving, not as in real life, with an absorbing interest in the work for its own sake and without thought of reward, but for the woman of their heart who is probably having a more or less “good time” in England or in the ever blessed Hills. India to these writers is the handful of British men and women and if the men are not in the Army, why of course they are in the Civil Service, which naturally includes the Public Works Depart-

ment, Forests, and the rest. The world is divided [into soldiers and others ; so why not ? The aim of every right-minded civilian is to rise in his profession so that he may escape the fiery torment of the horrible Plains and be caught up to the delight of the Hills. The population of India is negligible ; it is simply and comprehensively "the native element," generally rather unpleasant, often malicious, and always incomprehensible. Indians flit in and out like shadows, soft-footed butlers creep about verandahs in snowy turbans and murmur that dinner is ready ; saices and dak-bungalows and ayahs are peppered over the dish to season it, and now and again a mystery with fierce eyes and a skinny arm obligingly provides the sensation. One does not go to such books as these for Indian colour. For all that it matters the scene might just as well be laid in Nigeria or Zululand ; only as it happens Simla is in India and is more attractive to the novelist in search of colour. Novelists of this kind need not detain us."

ইংরেজ লেখকেরা শুধু ইংরেজদের সম্বন্ধেই গল্প উপন্যাস কাব্য বা অন্তবিধ বহি লেখেন না ; অন্য জাতিদের সম্বন্ধেও লেখেন । যে যে স্থলে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নাই, সে-সব স্থলে তাঁহাদের বহিগুলা ভাল হয় না । আমরা যদি কেবল বাঙালীর জীবন ও বাংলা দেশ লইয়াই গল্প উপন্যাস কাব্য ও অন্তবিধ বহি লিখি, তাহা হইলে আমাদের সংকীর্ণসীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে । তাহাতে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য না বাড়িতে পারে । আমাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা বিদ্যমান থাকায় এমনিই ত আমাদের সাহিত্য কতকটা একঘেয়ে । যদি প্রবাসী বাঙালীরা প্রবাসী বাঙালী জীবন লইয়াই লেখেন, তাহা হইলে ত বিষয় আরো সংকীর্ণ হইবে, এবং লেখা একঘেয়ে হইতেও পারে । নব নব অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা, নব নব সমাজের কথা, মৃতনতর সামাজিক সমস্যার কথা, সাহিত্যে আনিতে হইলে বাঙালী-সমাজের বাহিরে যাইতে হয় । তাহার সুযোগ প্রবাসী বাঙালীদের আছে । অতীতকালের হিন্দু

ও বৌদ্ধকীর্তির, মধ্যযুগের মুসলমান মরাঠা শিখ কীর্তির স্থানগুলিতে প্রবাসী বাঙালীরা থাকেন । এইসকল স্থানের সহিত সংপৃক্ত বিষয়ে বহি তাঁহারা লিখিলে ভাল হয় । যিনি সারনাথ দেখেন নাই, বুদ্ধ-গয়া দেখেন নাই, রাজগৃহ দেখেন নাই, তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু লিখিলে, তাহা খুব ভাল না হইতে পারে । তাহা না দেখিয়া শাহজাহানের জীবনসংগ্ৰহে কিছু লিখিলে তাহা শ্রেষ্ঠ রচনা না হইবার সম্ভাবনা ।

আমরা যদি আধুনিক হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী নেপালী প্রভৃতি সমাজ সংপৃক্ত কিছু লিখিতে চাই, তাহা হইলে শ্রদ্ধাশ্রিত ও প্রীতিমান এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া লিখিতে হইবে । দোষ দেখিব না, দেখাইব না, তাহা নাহ । কিন্তু কেবল নাক সিঁটুকাইয়া ও মুখ ভ্যাংচাইয়া কখন কোন বড় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই । যে উত্তর-ভারতে ব্যাস বাঙ্গালীকি জনক বুদ্ধ অশোক জন্মিয়াছিলেন, যেখানে উত্তরকালে নানক কবীর তুলসীদাস গুরুগোবিন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথায় এখন শ্রদ্ধা করিবার, ভালবাসিবার, আনন্দ পাইবার, কিছু নাই, ইহা হইতে পারে না । নিশ্চয়ই এইসব দেশে এখনও শ্রদ্ধা করিবার ও ভালবাসিবার জিনিষ আছে । নিশ্চয়ই এখানে সাধারণ জনগণের মধ্যে মানব-হৃদয়ের সদগুণাবলী বিদ্যমান আছে । কেবল এখানকার বাহ্যপ্রকৃতিতে, কেবল এখানকার অতীতসাক্ষী ধ্বংসাবশেষ বা এখনও-বিদ্যমান মানবের কীর্তিসমূহে নহে, পরন্তু বর্তমানে-জীবিত মানব-মণ্ডলীর মধ্যেও বিধাতার গীণা প্রকট হইতেছে, তাহাদের মধ্যেও তিনি নিজ সত্য সূন্দর শিব রূপ প্রকাশ করিতেছেন ।

আমরা যত আমাদের অবাঙালী প্রতিবেশীদেরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিয়া, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া, আপনার জন মনে করিয়া, প্রবাসে আনন্দ পাইব, বাংলা সাহিত্য সাক্ষাৎ-ও পরোক্ষভাবে তত সমৃদ্ধ হইবে ।

যে ভাষায় যত লোকে কথা বলে, তাহার সাহিত্য তত বড় হইবার সম্ভাবনা । যে সাহিত্য যত লোকে পড়ে, তাহার সমৃদ্ধি বাড়িবার তত সম্ভাবনা । এখন বাংলা প্রায় পাঁচ কোটি লোকে বলে । ইহারা বাঙালী ।

কিন্তু শিক্ষিত আসামী ও ওড়িয়া মাত্রেই বাংলা বলিতে ও পড়িতে পারেন। অনেক শিক্ষিত বিহারীও পারেন। সমগ্র আসামে ও ওড়িষাতে বাংলার প্রচলন হইবার সম্ভাবনা খুবই ছিল; রাজনৈতিক কারণে তাহা হইতে পারে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতার অলঙ্কিত প্রসার ও ব্যাপ্তি দ্বারা অনেকটা কাজ হইতেছে। সমগ্র বিহারেও বাংলা সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারিত। না হওয়ার মূলে রাজনৈতিক কারণ আছে; কিন্তু ইহার জন্ত আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব, সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের অভাবও যে কিয়ৎপরিমাণে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। হিন্দী না হইয়া বাংলা কেন বিহারের সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারিত, তাহার কারণ বলিতেছি। ১৯০১ এর সেন্সস্ রিপোর্টের ৭৭শ ভল্যুমে ৩১৮ পৃষ্ঠায় আছে :—

“The face of the Bihari is ever turned towards the north-west; from Bengal he has only experienced hostile invasions. For these reasons, the language of Bihar has often been considered to be a form of the “Hindi” said to be spoken in the United Provinces, but really nothing can be farther from the fact. In spite of the hostile feeling with which Biharis regard everything connected with Bengal, their language is a sister of Bengali, and only a distant cousin of the tongue spoken to its west. Like Bengali and Oriya, it is a direct descendant of the old Magadha Apabhramsa.”

তা ছাড়া, ইহাও সকলেই জানেন, যে, মৈথিলী অক্ষর ও বাংলা অক্ষর মূলে ঠিক এক। বিদ্যাপতিক মৈথিলীর লোকেরা ও আমরা উভয়েই নিজেদের কবি মনে করি। অতএব, হয় বিহারী ভাষাই বিহারের সাহিত্যিক ভাষা হইয়া পুস্তকে সাময়িক পত্রে খবরের কাগজে শিক্ষালয়ে আদালতে ব্যবহৃত হওয়া

স্বাভাবিক ছিল; নতুবা বাংলারই ঐ স্থান পাওনা ছিল। কিন্তু হিন্দী ঐ স্থান পাইয়াছে। ইহার জন্ত রাজনৈতিক কারণ দায়ী; আমরাও কিছু দায়ী। যাহা হউক, বঙ্গীয় শিক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতার অলঙ্কিত প্রসার-ও ব্যাপ্তি-প্রযুক্ত, এখনও বাংলা সাহিত্য পাঁচ কোটি অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের দ্বারা অধীত হইতে পারে। তাহাতে উহার শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িবে। আমরা বাংলা সাহিত্যে যত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিয়া যত গভীরতা, উদারতা, গান্ধীধা, শক্তি, আনন্দ উহাতে নিহিত করিতে পারিব, উহা তত বড় সাহিত্য হইবে। তা ছাড়া, আমরা নিজ নিজ জীবন ও কার্যের দ্বারা যত বেশী অবাঙালী লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিব, আমাদের সাহিত্যও তত বেশী লোকের আদরের জিনিষ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি অপরকে না দিলে অপরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি পাওয়া যায় না। অতএব আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল চাই, প্রসার চাই, প্রতিষ্ঠা ও শক্তি ও প্রভাবের বৃদ্ধি চাই, তাহা হইলে মনে রাখিয়া চলিতে হইবে—

“অন্নং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

উদারচরিতানাঙ্ক বস্তুধৈব কুটুম্বকম্ ॥”

“লঘুচেতা লোকেরা মনে করে অমুক আমার আপনার জন, অমুক পর; কিন্তু উদারচরিত ব্যক্তিগণ পৃথিবীর সকলকেই আত্মীয় মনে করেন।”

৯ই পৌষ, ১৩৩০।

২৫শে ভিসেখর, ১৯২৩।

[এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত ফোটোগ্রাফ্ এলাহাবাদের ফোটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত ডি এন্ রায় কর্তৃক গৃহীত এবং তাঁহার সৌজন্মে প্রাপ্ত।]

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বেনো-জল

বাইশ

বিনয়-বাবুর বাড়ী ছেড়ে রতন পাগলের মতন বেরিয়ে এল।

তখন বেলা তিনটে হবে। চারিদিকে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সমুদ্রের তীরের বালি তেতে আগুন হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সেই অগ্নিকণাচূর্ণের মতন বালুকা-রাশির উপর দিয়েই রতন হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে চলল—তার মনের অবস্থা তখন এমনি আশ্চর্য যে, কোন-রকম জালা-যন্ত্রণাই সে বুকতে পারলে না, বা আমলে আনলে না!

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সামনে এসে, অভ্যাসমত সে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়ীর ভিতর থেকে একটা এস্রাজের স্বর ভেসে এল—রতন বুকলে, পূর্ণিমা বাজাচ্ছে। মিনিটখানেক সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, আবার সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল।

সমুদ্রের ধারের সর্বশেষ বাড়ীখানা যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুকভাবে রোদ পোয়াচ্ছে আর নীল জলের অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস শুনছে, রতন ক্রমে সেইখানে এসে পড়ল। বাড়ীখানার অবস্থা দেখেই ষোঝা গেল, অনেকদিন থেকেই সেখানা খালি প'ড়ে আছে। তারই পিছনে গিয়ে রতন নিজের মোট নামিয়ে, তার উপরেই ধুপ ক'রে ব'সে পড়ল।

একটা অভাবিত সত্য তার মনের ভিতরটা একেবারে ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে! অবশ্য, এর আগেও মাঝে মাঝে নানা কারণে এই সত্যটাই অস্পষ্ট আবেছায়ার মতন তার মনের কোণে কোণে উকিঝুকি মেরেছে বটে, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে সে তাকে আর কোনো দিন বুকের মাঝে অন্বেষণ করেনি! আজ এখনো বারংবার সে নিজের পায়ের কাছে সেই ধাতমা-বিকৃত অশ্র-সিক্ত মুখখানিকে দেখতে পাচ্ছে, আর সেই আর্দ্রস্বয়ং তার কানের কাছে থেকে থেকে

ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে—“আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না!”

ভালোবাসে, ভালোবাসে,—স্বমিত্রা তাকে ভালোবাসে! আর এ ভালোবাসা এমনি প্রবল যে তার সঙ্গে সে পৃথিবীর সর্বস্ব ছেড়ে চ'লে আসতে পারে।

এমন বিপুল ভালোবাসা তার ঐটুকু তরুণ প্রাণের মধ্যে কি ক'রে ধরল—সমুদ্রের উচ্ছ্বাস কি এতটুকু পাত্তের ভিতরে ধ'রে রাখা যায়? এ প্রেমকে গ্রহণ করা ত দূরের কথা—ধারণা করার শক্তিও যে তার নেই! তাই সে স্বমিত্রার স্বমুখ থেকে পাগলের মতন ছুটে পালিয়ে এসেছে!

কল্পনায় স্বমিত্রা যা সহজ ভেবেছে, বাস্তব-জীবনে তা কত অসম্ভব, কত অসঙ্গত! সবে এই তার প্রথম যৌবন, নিশ্চিত জীবনের মধ্যে সংসারের কঠোর দণ্ডের আঘাত কখনো সে স্বপ্নেও অনুভব করতে পারেনি, তাই মনের কোঁকে এত সহজে বলতে পারলে, তার সঙ্গে সে বাপ-মাকে ছেড়ে চ'লে আসবে! সমাজকে যে চেনে সেই-ই জানে—এ কত বড় ভয়ানক প্রস্তাব! এমন প্রস্তাবে সে কি রাজি হ'তে পারে? পালিয়ে আসা ছাড়া তার পক্ষে উপায় কি?

রতন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, জীবনে আর কখনো সেন-পরিবারের ছায়াও মাড়াবে না। নিজের ব্যবহারের জন্ত অল্পতপ্ত হ'য়ে বিনয়-বাবু যদি কোনদিন তাকে ফের আহ্বান করেন, তা হ'লেও সে আর ফিরে' যাবে না। কারণ স্বমিত্রার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব! স্বমিত্রা ধনী মেয়ে, আর সে পথের ভিখারী! কাঞ্চন-কৌলীচের মধ্যে প্রেম কি তার খেলাঘর বাঁধতে পারে? এতে বিনয়-বাবুও রাজি হবেন না, সেও নয়। যে নিজের পেট চালাতে মা পেয়ে আত্মহত্যাও কামনা করে, বিবাহ যে তার পক্ষে কল্পনাতেই বিলাসিতা!

বালিকা স্বমিত্রা! তার এ প্রেম প্রথম বসন্তের

উদ্যম খেয়াল মাজ—কিছুদিনের অদর্শনে তার এ খেয়াল কোথায় মিলিয়ে যাবে, তখন আজকের এই দুর্ভাগ্য হস্ত তার নিজের কাছেই হুঃস্থপ্ন ব'লে মনে হবে! পালিয়ে গিয়ে এই হুঃস্থপ্ন থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে ব'লে ভবিষ্যতে সে মনে মনে রতনকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ না দিয়ে পারবে না!

কিন্তু সেও যে স্মিটাকে ভালোবেসেছে! এ প্রেম এতদিন সে সস্তর্পণে অস্তরের অস্তরালে গোপন ক'রে রেখেছে, এক মুহূর্তের জ্ঞে চোখের ভাবেও তা প্রকাশ হ'তে দেয়নি—কারণ ভালোবেসেই সে সুখী ছিল, স্মিটাকে যে তাকে ভালোবাসে, এ ত সে জান্ত না! স্মিটাকে কখনো পাবে না বুঝেও তার মন আজ এই ভেবেই খুসী হয়ে উঠল—স্মিটাকে তো তাকে ভালোবাসে, তাই-ই যথেষ্ট—তাই-ই যথেষ্ট! সে দূরে দূরাস্তরে চ'লে যাবে, এ জন্মে আর কখনো স্মিটাকে দেখতে পাবে না, তবু সে তার স্মৃতিকেই নিরন্তর পূজা করবে—যেমন ক'রে পূজা করে অক্ষ ভক্ত, দেবীপ্রতিমাকে চোখে না দেখেও!

হঠাৎ রতনের চোখ পথের উপরে পড়ল, দূর থেকে কে একজন লোক এইদিকেই আসছে—পরনে তার সাহেবী পোষাক। রতনের মনে হ'ল, তাকে মিঃ চ্যাটার্জির মত দেখতে! সে তখন উঠে দাঁড়াল এবং মোটটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়ল!.....

যথাসময়ে স্টেশনে এসে রতন ভাবতে লাগল, এখন সে কোথায় যাবে? কলকাতায়?.....না, কি হবে আর সেখানে গিয়ে, কি টানে আবার সেই কলকাতায় যাবে? তার পক্ষে এখন সব দেশই সমান! খানিক ভেবে রতন ঠিক করলে, দিন-কতক মাসজাজের দিকেই বেড়িয়ে আসা যাক—ভাগ্য-দেবতা সেখানে আবার তার সঙ্গে নতুন কি খেলা খেলেন, পরে ক'রে দেখতে ক্ষতি কি?

রতন টিকিট-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু দু'পা এগিয়েই সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! সে স্পষ্ট দেখতে পেলে, টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিনয়-বাবু, আনন্দ-বাবু আর পূর্ণিমা! তাঁরা যে তাকেই

ধরতে এখানে এসেছেন, একথা বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল না। সে তখন একরকম দৌড়েই স্টেশন থেকে বেড়িয়ে পড়ল। তার পর পথের উপর দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তার একখানা হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠল—“রতন, রতন!”

এত ক'রেও ধরা পড়ল ভেবে রতন হতাশভাবে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু তার পরেই সবিস্ময়ে সে ব'লে উঠল—“একি তুমি, অক্ষয়!”

—“কি আশ্চর্য দেখা! এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?”

সে-কথার কোন ছবাব না দিয়ে রতন বললে, “অক্ষয়, তুমি এখানে কোথেকে?”

—“আমি যে কটকেই কাজ করি। একদিনের জ্ঞে পুরীতে এসেছি, কালকেই ফিরে যাব। কিন্তু তুমি এখানে কেন? মোট ঘাড়ে ক'রে যাচ্ছই বা কোথায়?”

—“মাসজাজে।”

—“মাসজাজে? কেন, সেখানে চাকরি-টাঁকরি কিছু কর নাকি?”

—“না। জানই ত অক্ষয়, চিরদিনই আমি বোহিমিয়ান্, দুনিয়ায় নিজের মনের খেয়ালে একলাটি ঘুরে' বেড়াবার ছুটি পেলে আমি আর কিছুই চাই না—মাসজাজে যাচ্ছি নিরদ্দেশ হ'য়ে।”

অক্ষয় বিস্মিত-স্বরে বললে, “সে কি হে রতন! তুমি কি এখনো বিবাহ করনি, তেমন একলাই আছ?”

—“বিবাহ? ভগবান্ করুন, ও প্রবৃত্তি যেন আমার কখনো না হয়, বিধাতা যখন একলাই আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা এই, আমি যেন একলাই থাকি। একলা থাকার কত আনন্দ তা কি তুমি জান, অক্ষয়?”

—“খুব জানি, তোমার চেয়ে ভালো ক'রেই জানি।”

—“কি ক'রে তুমিও কি এখনো একলা আছ?”

—“না, একলা থাকলে আমি একাকিত্বের আনন্দ এমন ক'রে বুঝতে পারতুম না। একলা থাকার আনন্দ মাতৃষ প্রথম বুঝতে পারে বিবাহ ক'রে, দোকলা হ'য়ে।”

—“আমি কিন্তু ও-সত্যটি বিবাহ না ক'রেই বুঝতে

পেরেছি। তাই ‘আমি একলা চলেছি এ’ ভবে!’
আমার জীবন কয়েদীর জীবন নয়, আমি বাতাসের মতন
স্বাধীন, আর এই বিশ্ব আমার স্বদেশ!”

—“রতন, তুমি দেখুছি ঠিক তেমনিটিই আছ,
একটুও বদলাওনি। কিন্তু ছন্নছাড়ার মত এমন দেশ-
বিদেশে ছুটে বেড়ান, সেইটেই কি বড় ভালো?”

—“বললুম ত, আমার দেশ-বিদেশ নেই—

‘সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!’”

দুঃস্বপ্নে চলতে চলতে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছিল।
অক্ষয় বললে, “বেশ, তা হ’লে আপাততঃ কটকে আমার
ওখানে গিয়ে দিনকতক ঘর বাঁধবে চলো না! কতকাল
তোমাকে দেখিনি, আজ তোমাকে পেয়ে আমার ভারি
আনন্দ হচ্ছে!”

রতন বললে, “তা হ’লে আমাকে পেয়ে খুসি হয়,
পৃথিবীতে এমন বন্ধু আমার এখনো আছে! ভাই অক্ষয়,
তোমার প্রস্তাবে আমার কোনই আপত্তি নেই।”

—“তবে আজই আমার সঙ্গে এস। তোমাকে আমি
ছাড়ব না, তুমি অনায়াসেই আবার ডুব মারতে পার।”

রতন হেসে বললে, “এ প্রস্তাব আরো ভালো।
কারণ পুরীর বাস। আমি তুলে দিয়ে এসেছি।”.....

অক্ষয় আর রতন বাল্যবন্ধু—স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে
পড়েছে। মাঝে অনেকদিন ছাড়াছাড়ির পর এই তাদের
প্রথম দেখা।

তেইশ

একটি মাহুষের অভাবে আনন্দ-বাবুর আর পুরী
ভালো লাগছে না।

এমাহুষটির ভিতরে যে কি মধু ছিল,—তার সঙ্গে যে
একবার মিশেছে আর সে তাকে ভুলতে পারেনি। গানে
গলে, আলোচনায় ও নির্ভীক স্পষ্ট মতামতে সকলকেই
সে মুগ্ধ করে রেখেছিল, প্রবাসের দীর্ঘ অবকাশকে মধুর
ক’রে তুলেছিল, হঠাৎ আজ মাঝখান থেকে অদৃশ্য হ’য়ে
সকলের মনকেই সে বিমর্ষ ক’রে দিয়েছে।

• রতন চলে’ যাওয়াতে আনন্দ-বাবুর মনে হ’ল, তিনি
যেন এক নিকট আত্মীয়ের অভাব অনুভব করছেন।

সেদিন মেয়েকে ডেকে তিনি বললেন, “পূর্ণিমা
আমার আর পুরীতে থাকতে ইচ্ছে নেই।”

পূর্ণিমা বললে, “আমারও নেই, বাবা!”

—“কেন মা?”

—“দিনগুলো ভারি একঘেয়ে লাগছে!”

—“লাগবেই ত মা, রতন নেই—এই একঘেয়ে
দিনগুলোকে বিচিত্র ক’রে তুলবে কে? ছি, ছি, এমন
অন্ডায় করে’ তাকে তাড়ালে!”

—“বিনয়-কাকা ত তাঁকে এমন কিছু বলেননি,
রতন-বাবু যে নিজেরই ভুল বুঝে’ চলে’ গেছেন, বাবা!”

—“না, এব্যাপারে বিনয়ের ততটা দোষ নেই বটে!
আমি বেশ বুঝছি, রতনের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত
ষড়যন্ত্র হয়েছে।”

—“ষড়যন্ত্র? সে কি, বাবা?”

—“হঁ, ষড়যন্ত্র। এ ঐ চ্যাটো আর কুমার বাহাদুরের
কীর্ত্তি না হ’য়ে যায় না। তারা রতনকে ছুঁচোখে দেখতে
পারত না। বিনয়ের উচিত ছিল, রতনকে কিছু বলবার
আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা। রতন অভিমানী ছেলে,
একটুতেই আহত হয়, কাজেই বিনয়ের সামান্য ইঙ্গিতও
সে সহ্য করতে পারেনি।”

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ চুপ ক’বে থেকে বললে, “কিন্তু
আমাদের সঙ্গে দেখা না ক’রে চলে’ যাওয়া কি রতন-বাবুর
উচিত হয়েছে বাবা?”

—“মা, তুমি রতনকে বুঝতে পারনি। সে যে
গরীব, আর গরীবরা যে ধনীদের আলাদা জাত ব’লে মনে
করে! সে ভেবেছিল, আমার এখানেও সে ভালো
ব্যবহার পাবে না, কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, সে
গেল কোথায়?”

—“আমার ত মনে হয় তিনি কল্কাতায় গিয়েছেন।
কিন্তু বাবা, তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুন্ছি—”

আনন্দ-বাবু বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, “সব
মিথ্যে, সব মিথ্যে! এ-সব কথা এক বণও আমি বিশ্বাস
করি না। পুলিশ নিশ্চয় তুল ক’রে তাকে ধ’রেছিল,

তাই তাকে ছেড়ে না দিয়ে পারেনি। এমন ভুল তো পুলিশ আকস্মিকই করছে!”

পূর্ণিমা বললে, “আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা বাবা, কবে আমরা কলকাতায় যাব?”

—“এই হপ্তাতেই। কিন্তু কলকাতায় গিয়েও রতনকে কি আর দেখতে পাব?”

পূর্ণিমা উদ্বিগ্নমুখে বললে, “কেন, বাবা?”

আনন্দ-বাবু বললেন, “প্রথমত, সে হয়ত কলকাতায় যায়নি। তার পর, কলকাতায় গেলেও সে যদি আর দেখা না দেয়? জানিস্ ত মা, রতনের দারিদ্র্যের জাঁক কতটা বেশী! অর্থকষ্টে প’ড়ে সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, তবু ধনী মাতুলের গলগ্রহ হ’তে রাজি হয়নি! এই দারিদ্র্যের জাঁকেই সে হয়ত আর আমাদের ছায়াও মাড়াবে না।”

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, তিনি হুঃখিতভাবে পূর্ণিমার মাথার উপর একখানি হাত রেখে বললেন, “কিন্তু রতনকে আমি ত ছাড়তে পারব না, আমি যে তাকে তার হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হ’তে চাই!”

পূর্ণিমার মুখ লজ্জায় রাঙা হ’য়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

কলকাতায় যাবার আগের দিনে পূর্ণিমা, সেন-পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সেন-গিন্নী ও সুনীতির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করলে, “কাকী-মা, স্মিত্রাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?”

সেন-গিন্নী বললেন, “আজ ক’দিন থেকেই স্মি’র শরীর ভালো নেই, দিন-রাত বিছানাতেই শুয়ে থাকে, ঘর থেকে বেরুতে চায় না। যাওনা, তার সঙ্গে দেখা ক’রে এস, পাশের ঘরেই আছে।”

পাশের ঘরে গিয়ে পূর্ণিমা দেখলে, বিছানার উপরে ব’সে স্মিত্রা জান্না দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। তার আ-বাঁধা চুলের বেণী পিঠের উপরে লুটিয়ে পড়েছে, মাথাটা উস্খুস্খ রক্ক,—মুখের ভাব বিমর্ষ।

পূর্ণিমা বললে, “স্মিত্রা, কাল আমরা কলকাতায় যাচ্ছি।”

—“কেন?”

—“পুরী আর ভালো লাগছে না।”

—“রতন-বাবু তোমাদের চিঠি লিখেছেন?”

—“না।”

স্মিত্রা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পূর্ণিমার মুখের পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

পূর্ণিমা বললে, “রতন-বাবু চিঠি লিখলে তোমাদেরও লিখতেন।”

স্মিত্রা বললে, “তোমরা থাকতে তিনি আমাদের চিঠি লিখবেন কেন?”

স্মিত্রার কথার অর্থ পূর্ণিমা কিছুই বুঝতে না পেরে চূপ ক’রে রইল।

স্মিত্রাও আর কিছু বললে না।

পূর্ণিমা বললে, “তোমার কি অসুখ হয়েছে, স্মিত্রা? কণারক থেকেই ত তোমার শরীর ভালো নেই দেখছি।”

স্মিত্রা ম্লান হাসি হেসে, অশ্রুমনস্কের মতন বললে, “হঁ, কণারক থেকেই আমার অসুখ শুরু হয়েছে।”

—“অসুখটা কি?”

—“জানি না।”

পূর্ণিমা আরো খানিকক্ষণ ব’সে রইল, কিন্তু স্মিত্রা আর কোন কথা কইলে না দেখে সে আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়াল।

স্মিত্রা বললে, “চললে?”

—“হ্যাঁ, আবার কলকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আশা করি তখন তোমাকে সুস্থ দেখব।”

স্মিত্রা আবার একটু বিষাদ-মাখা হাসি হেসে বললে, “তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা না হ’তেও পারে।”

পূর্ণিমা বললে, “আজ তুমি কি আবল-তাবল বকছ বল দেখি?”

—“আবল-তাবল বকা আমার স্বভাব, তা কি তুমি জান না?”

—“ও স্বভাব বদলে ফেল। আমি এখন আসি ভাই!”

—“এস।”

পূর্ণিমা দরজার কাছ বরাবর গেছে, স্মিত্রা হঠাৎ

তাঁকে ডেকে বললে, "হাঁ, আর একটা কথা।"

পূর্ণিমা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কি?"

—"কাছে এস।"

পূর্ণিমা আবার স্মিত্রার কাছে দাঁড়াল।

স্মিত্রা আচম্কা তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?"

পূর্ণিমা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, "একথা কেন তুমি বলছ?"

—"আমি তোমাকে বিশ্বাস করে একটা কথা বলব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, সে-কথা তুমি অন্য কারকে বলবে না?"

—"আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করছি।"

—"কলকাতায় গেলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই রতন-বাবুর দেখা হবে।"

—"হ'তে পারে।"

—"তা হ'লে রতন-বাবুকে বলবে, তিনি আমাকে যে অপমান ক'রে গেছেন, তার জন্যে এজীবনে আমি তাঁকে আর ক্ষমা করব না।"

—"রতন-বাবু তোমাকে অপমান ক'রে গেছেন? এ কি কথা!"

—"আর-কিছু জানতে চেয়ো না"—বলেই স্মিত্রা বিছানার উপরে শুয়ে প'ড়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একখানা গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে ফেললে!

পূর্ণিমা নিরীক ও স্তম্ভিত হয়ে সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

“মাহে”-নগর

(পূর্বানুবর্তি)

(৩)

চারিটার সময় যখন আমার নির্দিষ্ট পাহারার কাজ শেষ করিলাম তখন আমাদের জাহাজের সমস্ত নৌকাই চলিয়া গিয়াছে। তাই আজ ডাঙার বাইবার জন্ত একটা দেশী ডোঙ্গা ভাড়া করিতে হইল। এইসকল ডোঙ্গা, জাহাজের দড়ি-দড়া প্রভৃতি সরঞ্জামের জন্ত কতকগুলি নারিকেল লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে।

এই ডোঙ্গাটা লম্বা, পাতলা, তীরের মতো গঠিত, ও “খাম্বেয়াল”। (এইসব বৈখ্যাহীন নৌকাগুলো বাতাসের এক দম্কাতেই ভাঙিয়া যায় কিংবা উটাইয়া যায়, তাই নাবিকেরা এইরূপ নৌকাকে “খাম্বেয়াল” নৌকা বলে)। এই ডোঙ্গাটা এরই মধ্যে জলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট উল্লঙ্গী তরঙ্গ ঠেলিয়া কতকগুলো বোটীয়া-দাঁড়ের সাহায্যে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে; যাইতে সবদিক এক ঘণ্টারও বেশী লাগিবে।—

সে ত আরো খারাপ! যাই হোক আমি ত ডোঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম—বেশ যুৎ করিয়া বসিয়া লইলাম।—এই টাচাছোলা খোলটা এতটা চওড়া যে, কোনপ্রকারে বসিতে পারা যায়।

আমরা খুব চীৎকার করিয়া যাত্রা করিলাম; বায়ু-উৎক্ষিপ্ত বলকণায় আমাদের কাপড় ভিজাইয়া দিল। কিন্তু কিয়দূর গিয়াই মনে হইল—বোটীয়া-দাঁড়ীরা যেন কি ভাবিতেছে, তাহারা খামিয়া পড়িল। প্রথমে উহারা ইচ্ছা-সুখেই আমাকে আরোহীকূপে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন, আরও বেশী দূরে যাইবার পূর্বে, তাহারা জানিতে চাহিল, আমি তাহাদিগকে কত টাকা দিব।—

আমি যখন তাহাদিগকে এক টাকা দিব বলিলাম— কিংবা

আরও বেশী, যদি তাহারা শীঘ্র দাঁড় টানিয়া যায়, তখন তাহাদের উৎসাহের আর সীমা রহিল না। তাহারা আমার মাথার উপর একটা ছাতা ধরিল, আমাকে হাত-পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল—এমন-কি গান গাহিয়াও আমাকে আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যে ভারতবাসী আমাকে গান শুনাইবার ভার লইয়াছে, সে আমার মুখামুখী হইয়া উবু হইয়া বসিল,—আমার খুব কাছে—খুবই কাছে—এত কাছে যে আমার আর নড়িবার-চড়িবার জো নাই। আমরা দুজনে জলের মধ্যে বসিয়া আছি সঙ্গ ডোঙ্গার শেখপ্রান্তে—হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হইতেছে।

যে-সকল ছোট ছোট ঢেউ আমাদের চারিদিকে নৃত্য করিতেছে, আমাদের চোখ তাহাদের অপেক্ষাও নীচু; আমরা তাহাদের মধ্যে দূরপাক দিতেছি।—বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বলিলেও হয়। জলের উপর শুইয়া থাকিবার মতো, সস্তরণকারীর মতো, খুব নীচু হইতে ঐ ঢেউগুলো দেখিতেছি। এমন উজ্জল রং—মনে হয় যেন নীলবড়ির রস ঢালিয়া দিয়াছে। কখন-কখন ঢেউগুলো আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতা-কারে আসিয়া ও-দিক্কার হুম্বর হরিৎ রেখা কিয়ৎকালের জন্ত ঢাকিয়া ফেলিতেছে—ঐ হরিৎ রেখাই ভারতভূমি।

ভারতবাসীর গানগুলো বড়ই দীর্ঘ, ক্রমাগত ফিরিয়া-ফিরিয়া আরম্ভ হয়। বোটীয়া-দাঁড়ীরা জলের উপর দাঁড়ের আঘাত করিয়া, গানের সহিত সঙ্গত করিতে লাগিল। যতটা সম্ভব আমার কাছে সরিয়া আসিয়া লোকটা গান গাহিতে লাগিল, খুব মুখব্যাধান করিয়া, শুত্র দস্তর্পাতির শেষ পর্যন্ত প্রদর্শন করিয়া মে আমার মুখের সামনে

চীৎকার করিতে লাগিল। আমার গালের উপর তাহার নিঃশ্বাস অনুভব করিতে লাগিলাম—সেই নিঃশ্বাস হইতে সর্পস্নলভ এক-প্রকার মৃগনাভি-ধরণের গন্ধ বাহির হইতেছিল। গানের কোন কোন অংশ গান নহে—দ্রুত বাঁকুণীর সহিত একপ্রকার হাঁক-ডাক ; এই সময়ে খুব তাড়াতাড়ি তাহার দাঁতে দাঁতে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল—মনে হইল যেন লোকটা কাঁপিতেছে। এই সময়ে তাহার মুখের ভাবটা অতি ভীষণ হইয়া উঠে। দেখিতে স্ত্রী হইলেও, তখন তাহাকে একটা বড় বানর বলিয়া মনে হয়।

আমার চির-অভ্যাস অনুসারে ছোট নদীতে প্রবেশ না করিয়া,—সাগর-বেলাভূমিতে, তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে, ধীরদিগের যে গ্রামটি অবস্থিত, সেই গ্রামের সম্মুখে গিয়া ধীরদের সহিত দেখা করিব। কিন্তু না, আজ দেখা করা হইবে না—বোটিয়া-দাঁড়ের খুব সজোর আঘাতে আমরা বেশ দ্রুত চলিয়াছি—নীল তরঙ্গের উপর ছলিতে ছলিতে চলিয়াছি। আমাদের মাথার উপর সূর্য অলস্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে।...

তরঙ্গভঙ্গ, বেলাভূমি! ভারতবাসীরা আবার খুব হাঁক ডাক দিয়া সকলেই জলের ভিতর নামিয়া পড়িল; তাহাদের ডোঙ্গাটা ডাঙ্গার উপর আছড়াইয়া ফেলিল; সিঁড়ির গরাদের মতো উহার বাহু বাড়াইয়া দিল, তরঙ্গফেনোচ্ছ্বাসের মধ্যে আমি লাফাইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা।—সূর্য এরই মধ্যে সমুদ্রের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে—নীচ হইতে তালতরুপঞ্জিদিগকে রাখিছটায় উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহাদের দীর্ঘ ধূসর বৃন্তগুলার উপর যেন স্বলস্ত আঁপনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আলোকটা বরাবরই সোনালি রঙের হইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ে উহার রং রক্ত-রঞ্জিত সোনালি হইয়াছে; প্রভাতকালের ও দিনমানের সোনালি রং অপেক্ষা এবং আরও চমৎকার। আমাকে দেখিবার জন্ত বনভূমির নিম্নদেশ হইতে তিনজন লোক বাহির হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইল। গুল-শ্রমধারী দুইজন বৃদ্ধ, বেশ মহৎভাববিশিষ্ট মুখশ্রী, আমাদের চার্চের সেট্‌দিগের মতো পরিচ্ছদ; আর একটি তরুণী, আবক্ষ-কণ্ঠ-অনাবৃত—অপূর্ব সুন্দরী—মাথার উপর একটা ফলের টুকুরী আছে।

এই চমৎকার নাট্যদৃশ্যের ভিতর হইতে, এই স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণ-চ্ছটার মধ্যে, যখন তাহাদিগকে আসিতে দেখিলাম, তখন খুব সূদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীত কালের কোন দৃশ্য দেখিতেছি বলিয়া মনে হইল। এইরূপেই পূর্বকালে জগতের আদিমযুগের মূর্তি আমার কল্পনার চক্ষে প্রতিভাত হইত; উহা কি সুন্দর ও প্রশান্ত!—সেই সময়ে জীব ও পদার্থসমূহের একটা অপূর্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইত—যাহা এক্ষণে আর আমরা দেখিতে পাই না।

গোধূলি সময়ে, ছায়াময় বীথি-পথে, বিনা-উদ্বেগে বুরিয়া বেড়াইলাম। এইসব রাস্তা গবর্ণমেন্ট-হাউস পর্যন্ত গিয়াছে। এই রবিবারের সায়াহ্নে, এবং এই প্রায়-য়ুরোপীয় অঞ্চলে, রবিবারের পোষাক পরিয়া লোকেরা বেড়াইতেছে—হিন্দুদিগের ফরাসী পরিচ্ছদ, পুরুষেরা লম্বা-কোর্টা পরিয়াছে, রমণীরা পালক ও পুষ্পভূষিত টুপি পরিয়াছে। ইহা মনে করাইয়া দেয়—কালের সমস্ত ছোট-ছোট নগরে, সাংকালীন “ভেস্পার”-উপাসনার পর স্বেচ্ছা-ভ্রমণ। এ ভারি আশ্চর্য্য,—সময়-বিশেষে, সকল দেশের মধ্যেই একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। যেহেতু, সর্বত্রই ব্যাপারগুলো একই-রকমের, যেহেতু, মানব-জাতি এক, ও পৃথিবী স্ত্রী।

যাহারা আপন-আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া, মাছির মত আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে সেইসব বালকদের মধ্য হইতে দুই-জনকে বাছিয়া লইয়া, উহাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা অনুসারে, আমার

পথপ্রদর্শকরূপে উহাদিগকে আমার কাছে-কাছে রাখিতে স্বীকৃত হইলাম। উহার দুই ভাই—বয়স ১২ বৎসর; উহার ফরাসী ভাষায় বলিল:—“দেখুন মহাশয়, আমরা অনাথ, অত্যন্ত গরীব; আপনাদের যাহা ইচ্ছা আমাদের কিছু ভিক্ষা দিবেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হব।” ফরাসী বলে নিতাশ্র মন্দ নয়; তবে বিনা, একটা অভূতরকমের ঝোক দিয়া, টানিয়া-টানিয়া উচ্চারণ করে। উহার বেশ ভদ্র, এবং মনে হয়, বাস্তবিকই খুব দরিদ্র। পরিধানে শুধু ছেঁড়া কুটুকুটি খাটো ধুতি।—এই স্থির হইল, উহার আমার ভ্রমণ-পথে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে,—একজন আমার বাম পার্শ্বে, আর-একজন দক্ষিণ পার্শ্বে—আমার প্রধানকাল পর্যন্ত।

এইসব বড় বড় তাল গাছের তলায়, রাত্রি প্রায়ই দ্রুত আসিয়া পড়ে। এই একমাত্র রাস্তায়, এবং যে-সব পথ গবর্ণমেন্ট-হাউসের কাছাকাছি গিয়াছে—সেই রাস্তায়ও এইসব পথে, কাঠদণ্ড-প্রান্তে কতকগুলো পেট্রোল-তৈলের লণ্ঠন জ্বালান হইল। ইহাতে করিয়া ক্ষুদ্র ফরাসী নগরের এই অলীক সাদৃশ্যটা মাছে-নগরে যেন একটা পূর্ণতা লাভ করিল—কেবল হরিৎশ্যামল শোভাসম্পন্নটা বিদেশী রহিয়া গেল।

একরকমের বীথি আছে—খুব বড়; এখানে আলো জ্বালান হয় না, এখনো দিনের আলো আছে—কেননা এই জায়গাটা অন্তত ১০০ গজেরও বেশী চওড়া; যেন তালীবনের মধ্যে, ঋজুভাবে কাটির বাহির-করা একটা ফাঁকা জমি। এই রাস্তাটা ইংরেজ-অধিকৃত জমি পর্যন্ত গিয়াছে। এই বৃহৎ রাস্তার ঠিক মাঝখানে, পথ চলিতে লোক-দের জন্ত আলোর মতো একটা খুব সরু পথ। (দুই ধারের বাকি অংশে জলপূর্ণ প্রাবিত ধানের ক্ষেত।)—এবং আজ সায়াহ্নে এইখানে এই আলোর পথে, মাছের লোকেরা খোলা-হাওয়ার বেড়াইতেছে। ইহার তালীবনের নীচে অষ্টপ্রহর বাস করে; এইখানেই আসিয়া নিশ্চরই একটু তাজা হইয়া উঠে। এই গোধূলি সময়ে, এইসব ধানের ক্ষেত ফসলের পূর্বে আমাদের ফ্রান্সের ক্ষেতগুলো যেরূপ দেখিতে হয় কতকটা সেইরূপ দেখিতে। এই পদচারীদিগের মধ্যে অনেকেরই যুরোপীয় পরিচ্ছদ; তাই এইসমস্ত মিলিয়া পল্লীগ্রামের রবিবারের ভাবটা মনে আনিয়া দেয়। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে আমাদের ফরাসী গ্রামসমূহে জুনমাসের সায়াহ্নে যেরূপ লোকেরা অলসভাবে পদচারণ করে, সেইরূপ পদচারণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দেখ, স্কুলের “ভগিনী” নামধেয় “ননেরাও” চলিয়াছে—উহাদের পিছনে, ভারতীয় ছোট ছোট মেয়ে—দুইজন-দুইজন করিয়া সারি বীথিয়া কায়দাচরিত্যভাবে চলিয়াছে। আমি খুব কাছাকাছি উহাদের ভিতর দিয়া গেলাম—কেননা পাশে সরিবার পথ নাই। উহাদের ক্ষুদ্র বক্ষদেশ ইহারই মধ্যে একটু গড়িয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র শরীরের সমস্ত গঠন-ভঙ্গীও নিখুঁত সুন্দর। একে-একে সকলেই আমার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল।—সুন্দর চোখ কালো অতলস্পর্শের মতো স্বগভীর। ঐ চোখগুলি আমাকে যেন এই কথা বলিতে লাগিল:—

হাস্য বলেই আমরা বিজ্ঞ হইয়াছি, লিনেন কাপড়ের টুপি মাথায় পরেছি; হাস্য বলেই কেননা ও ত বেশীদিন টিকবে না; আমাদের শরীরে নাচওয়ালী ও অপসরার রক্ত চলুছে; অল্প সময়ের মধ্যেই একটু বড় হয়ে উঠলেই আমরা “উড়ন্ত” ভাব ধারণ করিব।

উহার বেশ প্রশস্তভাবে নিঃশব্দে চলিয়া গেল। দূর হইতে উহাদিগকেও আবার ননের মতো দেখিতে হইল। এই বেচারী “ভগিনীরা” একটা ছোটখাটো রকমের শোভা যাত্রা করিয়া চলিয়াছে—দেখিতে ভারি মজার। কিন্তু কিছুকাল পরে এই মেয়েদের লইয়া উহাদিগকে একটু ভুগিতে হইবে।

এই ফাঁকা জায়গা, যাহার ভিতরে আমরা পদচারণা করিতেছিলাম, ইহার প্রত্যেক ধারে তালীবনের সীমাপ্রান্ত একটা জম্বুকালো কালো পর্দার মতো প্রসারিত—এইখানে ইহারই মধ্যে ঘনঘোর রাত্রি আসিয়াছে; ঝিকি-পোকা ডাকিতেছে; আকাশের রং একটা অসাধারণ বেগুনী-আভা, যেন বাত্মলার রং-মশাল জ্বলান হইয়াছে। এবং যে-সকল তারা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মনে হয় যেন লাল জমির উপর ছোট ছোট সবুজ আগুন।

কাল, এইসব অঞ্চলে, আমার কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল; আমি আজ আবার তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। তালীবনের কিনারায়, দুই বৃদ্ধ ভারতবাসীর কলা ও গরম-মশলার একটা ছোট দোকান আছে। এইসকল জিনিষ তাহাদের নিকট উহার বিক্রয় করিবে। লোকবসতি হইতে বিচ্ছিন্ন উহাদের গৃহ-গৃহের সম্মুখ দিয়া কেহই যাতায়াত করে না। উহাদের গৃহ এবং যেখানে কয়েকজন পদচারী রহিয়াছে সেই আল-পথের মাঝে একটা ধানের ক্ষেত। আমার দুই নিত্যসঙ্গীর সহিত এইখানে উপনীত হইলাম; উহারা আমাকে চিনিতে পারিল, এবং তখনই আমার আহারের জন্য ভাল ভাল কলা বাছিয়া দিল। তাহার পর, দরজার সম্মুখে একটা মাদুরের উপর আমাকে বসাইল। ঝোলান ল্যাম্পটা জ্বলান হইল।

—ল্যাম্পটা তাঁবার এবং উহার আকার-গঠন প্রাচীন-ধরণের—উহা হইতে অনেকগুলো ডাল বাহির হইয়াছে; মনে হয় যেন একটা তারা জ্বলিতেছে।

বড় বড় বৃক্ষের পাদদেশে এই অতিক্রম নগর জুটীরটি ধাপে-ধাপে উথিত মন্দিরের মত ছয়টা প্রস্তর-স্তরের উপর স্থাপিত। এই-সব ধাপের উপর আমার দুই পথশ্রদর্শক আমার নীচে বসিল। এখন আর-কিছু দেখা যাইতেছে না। আলি-পথের উপর পথচলতি লোক খুব বিরল হইয়া পড়িয়াছে—কেবল কতকগুলো অল্পটুকু আকৃতি দেখা যাইতেছে—কালো কিংবা সাদা। আকাশে এখনো গোলাপী ও লোহিত রং রহিয়াছে; উপরে সমস্ত তারা জ্বলিতেছে। এবং এই আলোর উপর একসারি কালো পালকের আকারে তালীবনের সীমাপ্রান্তটা যেন কর্তৃত হইয়াছে। ধান-ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বত্রই ঝিল্লীর রব শুনা যাইতেছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। পতঙ্গ ও মশা আসিয়া ঝোলান ল্যাম্পের চারিদিকে গুঞ্জন করিতেছে। লম্বা হাতল-বিশিষ্ট একটা চামচ দিয়া, সময়ে সময়ে ল্যাম্পে একটু একটু করিয়া নারিকেল তৈল ঢালা হইতেছে। ওখান দিয়া প্রায় কেহই যাতায়াত করিতেছে না। জায়গাটা খুবই নির্জন হইয়া পড়িল। কিন্তু কতকগুলি ছেলে আমাকে দেখিতে আসিল; ইহারা কোথা হইতে বাহির হইল জানি না—নিশ্চয়ই আমাদের পিছনকার তালীবন হইতে। উহারা আমার দিকে চোখ তুলিয়া ধাপের উপর আমার পায়ের কাছে বসিল। প্রতি মুহূর্তে আরও ছেলে দলে দলে আসিতে লাগিল—নিঃশব্দে নগ্নপদে। খুব হালুকা-ভাবে ছুটিয়া আসিল। সাদা পরিচ্ছন্ন উহাদের শ্রামল অঙ্গের উপর, বাতাসে উড়িতেছে। বড় বড় নৈশ পতঙ্গের মতো, বড় বড় ফড়িংএর মতো উহারা আসিয়া বসিয়া পড়িল। এখন প্রায় ২০ জন—আমার নীচে সারি সারি বসিয়া। তালতরুর দীর্ঘ কালো কালো পাখা নৈশ আকাশকে কাটিয়া বিভক্ত করিয়াছে এবং লাল আভাটুকু মরিয়া মরিয়া শেষে একেবারেই অস্তহিত হইয়াছে। তৃণভূমির উপর যেকুণ সাদা ধোঁয়া ভাসিয়া বেড়ায়—সেইরূপ একটা ঠাণ্ডা বাষ্প ধানের ক্ষেত হইতে উঠিয়া সমস্ত বীধি-পথে প্রসারিত হইল।

সেই ছোট ছেলেগুলি, আপনাদের মধ্যে, ভারতীয় ভাষায় খুব

আগে কিস্কিস্ করিয়া কথা কহিতে লাগিল—নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়া তাহাদের যে ধারণা হইয়াছে তাহাই বলাবলি করিতেছিল। তাহার পর আমি, বেশ বুদ্ধিতে পারিলাম, আমাকে চমক লাগাইবার জন্য কি একটা ঘড়যন্ত্র করিতেছে, পরে পুরস্কারস্বরূপ কিছু পয়সা চাহিবে।—না জানি বিষয়টা কি? ..

হঠাৎ উহাদের মধ্যে একজন—দশবৎসর মাত্র বয়স—উঠিয়া দাঁড়াইল, উপরে উঠিল, একটু কাশিল, যেন কি-একটা কবিতা আবৃত্তি করিবে; তাহার পর, টিয়াপাখীর মতো মোটা কর্ণশ হাস্য-জনক স্বরে শুরু করিল :—

প্রবল যুক্তিই জেনো যুক্তির প্রধান

এখনি আমরা তাহা করিব প্রমাণ...

ওঃ! সত্যি উহারা আমাকে চমক লাগাইয়া দিয়াছে। এটা এরূপ অপ্রত্যাশিত ও মজার যে, আমি যদি একলা না থাকিতাম, তাহা হইলে পাগলের মতো হাসিয়া কুটিকুটি হইতাম, কিন্তু আমি এখন একলা—মনে-মনেই হাসিলাম।

এই আবৃত্তিটা আমার উপর কি কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য উহারা আমাকে খুব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কবিতার বাকী অংশ উহারা জানে না; তাই Black birdএর মতো একটা গানের গোড়াটা শিশু দিয়াই হঠাৎ যেন থামিয়া পড়িল; উহাদের স্থলে উহারা ঐ পর্য্যন্তই শিখিয়াছে...আমার বাচ্চা গাইড্ দুইজন আমাকে বলিল, দুই চারি আনা পয়সা উহাদিগকে বক্শিস্ দিলে ভাল হয়।

এই ছেলেগুলো আমাদের ভাষার কথা কহিতেছে, আমাদের দেশের লোক মনে করা একটা সম্মানের বিষয় মনে করিতেছে—এটা ভারি অদ্ভুত।

আমি এখন হইতে প্রধান করিলাম। লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন এই কালো জায়গাটায় একটু বিষণ্ণতা আসিতে শুরু করিয়াছে, তা ছাড়া এইসব পাথরের উপর বসিয়া, সাদা পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া, আমার একটু শীত বোধ হইতেছে। এইসব ক্ষুদ্রে “ফরাসীদের” নিকট হইতে বিদায় লইলাম। উহারা আমার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু আমি আমার সেই ক্ষুদ্রে পাণ্ডা দুইজনকেই সঙ্গে রাখিলাম। উহাদিগকে একটা-কিছু কাজে লাগাইবার জন্য, আমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছি কোথাও কোন মন্দির দেখিবার আছে কিনা; আমি ত কোথাও একটা মন্দির দেখিতে পাই নাই।

একটা মন্দির খুবই নিকটে আছে। যদিও রাত্রি, সেইখানে উহারা আমাকে এখনি লইয়া যাইবে। এটা উহাদের নিম্ন ধর্মের মন্দির, “Tiss” মন্দির (কেননা এই বালক দুইটি না খুষ্টান, না-মুসলমান)। ইহার Tissi Tissi জিনিষটা কি, তাহা না জানার ভাবটা আমার মুখে প্রকাশ পাওয়ার উহারা খুব আশ্চর্য্য হইল এবং এই শব্দটি আবার পুনরাবৃত্তি করিল।

আমাদের মাথার উপর বুকিয়া একটা কালো উচ্চ দেয়ালের মতো কাঠের তক্তা বুলিতেছিল, প্রথমে আমরা তাহারই কিনারা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এক-প্রকার টিবির গড়ানে অংশের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পা পিছলাইয়া মধ্যে মধ্যে ধানক্ষেত্রের জোলো কাদার মধ্যে বসিয়া যাইতেছিল। তাহার পর একটা সরু পথের মতো একটা-কিছুর ভিতর দিয়া, একটা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; আমরা তালতরুমতের নীচে আসিয়া পড়িলাম—যোর রাত্রির মাঝে—নিছক রাত্রির মাঝে আসিয়া পড়িলাম। ঠিক যেকুণ শান্ত ক্রমান্ব

দুইটা ছোট কুকুর কোন অঙ্কে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আমার বাচ্চা পাণ্ডায়ের প্রত্যেকেই আমার এক-একটা হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। চোক বাঁধা থাকিলে কোনো ব্যক্তি যেকোনভাবে চলে, আমি সেইরূপ—ইতস্ততোভাবে পদক্ষেপ করিতে লাগিলাম। উহারা খুব সাবধানে, দক্ষতাসহকারে পথের ঠিক মাঝখানে আমাকে রাখিয়া দিতেছিল। উহাদের নিজের পা কিনারায় বড় বড় গাছপালায় জড়াইয়া যাইতেছিল, অথবা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছিল। এই নিবিড় পত্রপল্লবের মধ্যে, যেন একটা কি আমাদের সম্মুখ দিয়া পলাইয়া গেল। গিরুগিটি কিংবা পাখী কিংবা ঘুমাইতেছিল এমন কোন পশু। আমাদের ভয় হইল। কখন কখন আমার মনে হইতেছে, ক্ষুদ্র পাণ্ডায় একটা খুব সস্ত্র তক্তার উপর দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছে, অথচ উহাদের পা জলের মধ্যে ঝপ্ ঝপ্ করিয়া পড়িতেছে। পথের উপর দিয়া একটা ক্ষুদ্র শ্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে—তাহার উপর একটা ছোট নাকো। এরূপ ঘনঘোর অন্ধকার যে, আমার চোখ লজিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ডালপালা তৃণের ফ্যাক্ড়া, আমার মুখের উপর যেন চাবুক মারিতেছে। আর সেই চিরন্তন যুগনাভিসিক্ত তপ্ত গন্ধ,—যাহা মাটি হইতে উত্থিত হয় এবং বনজঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র যাহার দরুন একটু কষ্ট পাইতে হয়।

উহারা বলিল, আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তখন আমি চাহিয়া দেখিলাম, এবং পত্রপল্লবের স্তিত্র দিয়া দেখিতে পাইলাম, অনেকটা আলো বিকসিত করিতেছে, এমনভাবে কম্পিত হইতেছে যেন এপনি নির্কাপিত হইবে।—এইসব আলোকরাশি এমন মিটমিটে শরণের, এরূপ ক্ষুদ্র যে, মনে হয় যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র অনলশিখা কীটগাত্র হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তা ছাড়া এই আলোগুলা বেশ সমানভাবে স্থাপিত; দেখিলে মনে হয় যেন একটা বড় দাবা-খেলার চক্,—যাহার প্রত্যেক কোণ জোনাকির আলোকে আলোকিত।

উহারা বলিল—এই সেই মন্দির, ইহার সম্মুখ ভাগটা এইরূপ অদ্ভুতধরণে আলোকিত হইয়াছে।

বনের ভিতরকার একটা পরিষ্কার ফাঁকা জায়গায় আমরা প্রবেশ করিলাম। উপর হইতে তারার আলো নিপতিত হইতেছে। বনের ঘনঘোর অন্ধকার ও স্বাসরোধী নিবিড়তার পর, মনে হইল, এই স্থানটা একটু যেন আরাম ভোগ করিতেছে। আমাদের সম্মুখেই মন্দিরটি রহস্যময় দীপালোকে আলোকিত, এই আলোক অননুভবনীয় নৈশ বায়ুর প্রত্যেক নিঃস্বাসে কম্পিত হইতেছে এবং অবিরত নির্কাপিত হইতেছে। এই মন্দিরটি অতি সামান্তরকমের, খুব নীচু, কীটদষ্ট পুরাতন কাঠের একটা কুটির মাত্র। তক্তার দেওয়ালের ভিতর একপ্রকার লোহার চামচ, হাতলের দ্বারা, ঢুকাইয়া দেওয়া হয়—সমান-সমান অন্তরে,—ছাদ পর্য্যন্ত। প্রত্যেক চামচে তেল ভরিয়া দেওয়া হয়, এক-একটা মোমের পল্তে এই তেলে ডোবানো থাকে—তৃণ-বৃন্তের মতো সক্ষ। শেষে এই পল্তেটা পুড়িয়া যায়।.....

চারিদিকে জনমানব নাই, ভিতরেও কোন লোক নাই, কেননা ষার অর্গল-বন্ধ। তবে কে আসিয়া, এমন কণস্থায়ী ক্ষুদ্র আলোক-গুলি জ্বলাইয়া দেয়?—এইসব আলোকের পরমাণু ত মনে হয়, করেক মিনিট মাত্র। কোন্ গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের জন্ম, এইসব ক্ষণিক আয়োজন? আমার বাচ্চা-পাণ্ডারা এসম্বন্ধে বেশী কিছু খবর দিতে পারিল না। উহারা শুধু বলিল :—“সন্ধ্যার সময় প্রায়ই এইরকম করা হ’য়ে থাকে . . . যখন কিছু চাহিবার আবশ্যক হয়...”

টুপ্ টুপ্ করিয়া দীপগুলি নিবিয়া যাইতেছে; আবার এপনি কালো রাত্রি আসিয়া পড়িবে।

তাহার আগেই আমার বাচ্চারা আমাকে মন্দিরের ভিতরটা দেখাইতে ইচ্ছা করিল, মন্দিরের পুতুলগুলো দেখাইবে বলিল। তখন উহারা পুরাতন দরজাটা ঠেলিতে লাগিল—দরজায় লোহা-লকড়ে উহাদের আঙ্গুল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। দরজাটা প্রতিরোধ করিল—কাজেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেওয়ালের মুমূর্ আলোগুলা ক্রমাগতই নিবিয়া যাইতেছে। এখন কি করা যায়? ভাল ভাল পুতুল দেখান আর হইবে না।

উহারা বলিল—উহাদের বদলে, অন্ততঃ একটা পুরাতন পুতুল আমাকে দেখাইবে। এই পুতুলটা মন্দিরের পিছনে আবর্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; এটাও উহারা আর খুঁজিয়া পাইল না...আ! এই যে,...আমি পুতুলটা দেখিতে পাইয়াছি, অন্তত এইরূপ পুতুল বলিয়াই অনুমান করিতেছি; একটা ভীষণ দৈত্যের আকৃতি—ঐখানে মাটিতে উবু হইয়া বসিয়াছে—দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়া।—একটা শেয়াবশিষ্ট ছোট পলিতা এখনো জ্বলিতেছিল, ঐ পলিতা লইয়া (হাত পুড়িবার আশঙ্কা সংগে) উহারা পুতুলটার খুতির নীচে ধরিল; ঐ আলোকে, আমি রূঢ়ধরণে গঠিত একটা ভীষণ মুখ দেখিতে পাইলাম;—সারিসারি দুই পাটি দাঁত;—একটা কপাল এবং যুন্ধরা দুইটা চোখ। উহার পাশে, খোদাই কাজের আর কতকগুলো মূর্তির টুকরা ঘাসের উপর পড়িয়া আছে—ভাবে বোধ হয় কতকগুলো রাক্ষস-মূর্তির ধংসাবশেষ—কতকগুলো জড়া, কতকগুলো চিবুক।

আর-একটা জিনিস দেখাবার আছে, শীত্র, শীত্র। বেশ দেখা গেল, উহারা এই জায়গায় অন্ধ-সন্ধি সব জানে। ইতিমধ্যে কমিষ্ঠ পাণ্ডাটি খুব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—আঙ্গুলগুলো তেলে ভরিয়া গিয়াছে। উহারা চামচগুলার মধ্য হইতে, কতকগুলো পলিতার আগা বাছিয়া লইল যাহা এখনো জ্বলাইতে পারা যাইবে। এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অক্ষুণ্ণের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইল—তাহার পর উপরে উঠিয়া ছাদের বর্গার নীচেটা হাত ড়াইতে লাগিল...অবশেষে যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহার উপর হস্ত স্থাপন করিল।—একটা কাঠের ক্ষুদ্র রাক্ষস,—রূঢ়-ধরণের, ক্ষয়প্রাপ্ত, মানুষের শরীরের উপর অস্পষ্টরকমের একটা হাতীর মাথা। উহারা দুই জনেই উহার মুখের সামনে হাসিতে লাগিল; তাহার পর, ওড়াতাড়ি আবার উহার গর্তের মধ্যে উহাকে ঢুকাইয়া দিল। ঐখানে করে কি, এই দেবতাটা? পাখীদের নীড়ের সঙ্গে, ছাদের নীচে কেন বাস করিতেছে?...

উহারা আরও কতকগুলো ছোট পলিতা খুঁজিয়া পাইয়াছে। আমাদের যাত্রা-পথে, একটার পর একটা জ্বলাইতে লাগিল; উহাদের আলোকে আমরা বনভূমি পার হইয়া সেই বড় রাস্তায় গিয়া পড়িব—যেখান হইতে আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

এই অদ্ভুত পলিতাগুলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে; এই আলোয় আমরা মধ্যে মধ্যে পাতার মতো একটা-কিছু দেখিতে পাইতেছি। একটা তাল-গাছের তলা দেখিতে পাইতেছি কিংবা অন্ধকারে সবুজের ভিতর হইতে হঠাৎ-বিচ্ছিন্ন আর্কিডের কোন ফুল দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পর, শেয়াবশিষ্ট পলিতাটা পুড়িয়া গেলে, উহা ঘাসের উপর উহারা ছুড়িয়া ফেলিল। আবার আমাদের সেই পূর্বাবস্থা—ছয়টা চোখ একত্র করিয়াও এখন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমার পাণ্ডারা “ভাবাচাকা খাইয়া” আমাকে একটা দুঃপ্রবেশ জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। এমন একটা জায়গায়—যেখানে আমার পা রহিয়াছে জলের ভিতর, আর আমার শরীর জড়াইয়া গিয়াছে ডালপালার মধ্যে।

বা হোক কোনপ্রকারে কষ্টেহুটে সেখান হইতে বাহির হইয়া সত্য-অকলের হৃন্দর সোজা গলি-পথের মধ্যে আবার আসিয়া পড়িলাম।

এইসকল বীথি-পথে বড় বড় অনল-শিখা এক-প্রকার দোলন-গতি সহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে,—দেখা যায়। এই দোলন-গতি উহাদিগকে অবিরত উস্কাইয়া দেয়। পথচলতি লোকেরা, ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে, এইসকল আলো জ্বলাইয়া থাকে, প্রজ্জ্বলিত ডালপালার গুচ্ছ হাতে লইয়া চলিতে চলিতে, লম্বাভাবে দোলাইতে থাকে; ঐ দোলনে নিবো-নিবো আগুন আবার জ্বলিয়া উঠে। এই আগুনের দীপ্তিচ্ছটা সব দিকেই ছড়াইয়া পড়ে; এবং উহাদের পশ্চাতে একটা হৃগন্ধ ধূম রাখিয়া যায়।

নদীর উপর আমার নৈশ ভ্রমণের জগু প্রতিদিন সায়াহ্নে আমার ডিক্রি নদীর মুখে আসিয়া থাকে। আসিতে এখনো অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেক বিলম্ব আছে।

আমার আর-কিছুই করিবার নাই। আমার বাচ্চা পাণ্ডাদিগের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিয়াছি—উহাদিগকে আর আমার দরকার নাই। কিন্তু উহার শেষ পয্যস্ত আমার নিকটে থাকিতে চাহিতেছে—নিঃস্বার্থভাবে, কেবল ভালবাসার টানে।

একটা বৃহৎ চতুষ্কভূমি আবিষ্কার করা গিয়াছে; তাহার মাঝখানে একটা গির্জা। এইখানকার একটা গাছের তলায় একটা পাথরের বেঞ্চি আছে। একটা অসাধারণ ব্যাপার এই যে,—এই গাছটা ভালগাছ নহে, কিন্তু রাত্রিকালে এই গাছটা আমাদের ফ্রান্সের হৃন্দর ওক-গাছের মতো দেখিতে। এইখানে ডিক্রির অপেক্ষায় আমি বসিয়া রহিলাম। আমার পাশে আমার বাচ্চা সঙ্গীরা।

আরো অশ্রান্ত গাছ কালো পর্দার মতো এই চাতালের চারিদিক ঘিরিয়া আছে। ছোটখাটো জিনিষ কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই জায়গাটার কোন একটা স্থপষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডলের নীচে, গির্জাটা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—কেমন ধবধবে সাদা, কেমন প্রশান্ত! আমার শৈশবে কোন-একটা গ্রামে যখন গ্রীষ্মকাল যাপন করিতাম, উহা সেই গ্রামটিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই ছুটি বাচ্চা যাহারা আমার কাছে রহিয়াছে ইহারাই আমার জন্মভাষায় আমার নিকট গল্প বলিতেছে। আমাদের চাষার ছেলেরা উহাদের মতো এমন ভাল করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। তৃণপুঞ্জ হইতে বেশ একটা হৃগন্ধ বাহির হইয়াছে, ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে; আমাদের জুন-রাত্রির দীপ্তমহিমার মধ্যে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ...আহা! সেই হৃন্দর ভারাময়ী রাত্রি, সেই প্রশান্ত রাত্রি, সেই মধুর আলোকোজ্জ্বল রাত্রি, সেই অতি চমৎকার রাত্রি!...আর এই পাথরের বেঞ্চি, যাহার উপর এই হৃমধুর শাস্তির মধ্যে আমি বিশ্রাম করিতেছি, ইহা একটা দুর্দশে অবস্থিত—যে-দেশে ঘটনাচক্রে আমি একদিনের জগু আসিয়াছি, এবং যে দেশে আমি আর কখনো ফিরিয়া আসিব না, তথাপি এ-বড় অদ্ভুত, ইহার মতো আর একটা বেঞ্চিতে, বহুদিন পূর্বে, হৃন্দর তারকাময়ী রজনীতে আমি বসিয়াছিলাম।

অন্ধকারের মধ্যে এই বিশ্রাম, এই কবোক্ষ বাধ, এই ঘাসের হৃগন্ধ, এইসমস্ত স্পষ্টরূপে আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আমার জীবনের সেইসব প্রথম গ্রীষ্মরজনী, বনভূমির নিকটস্থ সেইসব মাঠ ময়দান!...আমাদের সন্মুখের রাস্তা দিয়া লোকেরা ঘাস ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। আমরা উহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না; উহাদের পরিচ্ছদও নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে

উচ্চারিত উহাদের "শুভরাত্রি" অভিবাদন শুনিতে পাইতেছি। গরুর গাড়ীও চলিয়াছে। গাড়োয়ানরা পদব্রজে চলিয়া গরুদিগকে হাঁকাই-তেছে। এই উদ্ভট-ধরণের শকট, এই লম্বামুখো বিদেশী পশুবৃন্দ; বড় বড় চোখ, কাণে কাণ-বালা এইসব শ্রামাক ভারতবাসী—এইসমস্ত ছাড়া আর-কিছুই দেখা যায় না। আমাদের দেশে মাঠময়দান হইতে যে সব শকট ফিরিয়া আসে, উহাদের সহিত এই শকটের সাদৃশ্য আছে।

আরও এইরূপ বলা যাইতে পারে, আঙ্গুরের ফসল ও শস্তের ফসল কাটিয়া আমাদের দেশে যে-সব শকট ফিরিয়া আসে ইহা কতকটা সেই ধরণের...এই বিদেশী গাছ-তলায় বসিয়া—(ইহাই যেন আমার জন্মভূমির সেই ওক-গাছ) আমি একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ স্বদেশের স্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে ডুবিয়া পড়িতেছি;—আমার মাথার উপরে কালো ডালপালার ভিতর দিয়া, কতকগুলো ছোট ছোট জিনিষ বিক্রিমিক করিতেছে—উহা কতকগুলো তারা। কত পুরাতন কথা আমার স্মৃতির মধ্যে জমা হইয়াছে,—বহু দূর হইতে আমার প্রথম শৈশবের সেইসব গ্রীষ্মকালের স্মৃতি আমার নিকট সনির্ভরভাবে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে।

এই সময়ে, ইহা খুবই নিশ্চিত,—আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালগুলো ম্লানভ ছিল না, ঋণস্থায়ী ছিল না। উহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হইত, উহাদের একটা প্রশান্ত দীপ্তি ছিল,—যাহা এক্ষণে উহারাই হারায়াছে। আমার বেশ মনে পড়ে, জুনের গোধূলিগুলার একটা কবোক্ষ মদালসভাব ছিল—এবং রাত্রির একটা স্বচ্ছতা ছিল!...অন্ধকারের মধ্যে যেন একপ্রকার রহস্যময় কিরণচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িত—আজিকার এই রাত্রির মতো!...আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম এইসব কথা; কিন্তু আবার আমার চারিদিকে এইসমস্ত দেখিতে পাইতেছি।—চিনিতে পারিতেছি...কেবল, আমার জন্মভূমির জোনাকী পোকারা ঘাসপালার মধ্যে চূপ করিয়া থাকিত; কিন্তু এখানে উহারাই উন্নতভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে; উহাদের (Phosphorus) ভাস্কর-বাপ্পের ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গগুলিতে আকাশ ভরপুর; এই পার্থক্য-টাই যাহা ধরিতে পারা যায়—অবশিষ্ট আর সমস্তই একই-রকমের; কিন্তু সেকালের এইসব হৃন্দর গ্রীষ্মকাল কে নিভাইয়া দিতে সমর্থ হইল? এবং বর্ষাকালের সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বে যাহা আমাকে মুগ্ধ করিত, সেইসব জিনিষের মোহনীয়তা আমি কি করিয়া ভুলিয়া গেলাম? আমার মাথার ভিতর যাহা সমস্তই প্রায় মুছিয়া গিয়াছে, তাহার রেখা অতিকষ্টে সময়ে সময়ে আবার ফুটিয়া উঠে...আজিকার ম্লানভ, স্বপ্নস্থায়ী গ্রীষ্মরাত্রি—আর পূর্বে যে গ্রীষ্মরাত্রি আমাকে মাতাইয়া তুলিত এই উভয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ...

অতি দূরে, ঢাক-বাদের মত কি যেন একটা শব্দ শুনিতে পাইতেছি; তাহার একটু পরেই, কর্কশ কণ্ঠের গান, এক-প্রকার দ্রুতধরণের "কোরসু" সঙ্গীত। পরিশেষে, হঠাৎ তরুঞ্জির কালো পর্দার ভিতর একটা বড় রাস্তা উদ্ঘাটিত হইল, উহার পশ্চাদ্ভাগটা জলন্ত মশালের আলোর আলোকিত; মশালগুলো মানব-বাহুর দ্বারা আলোকিত হইতেছে।

গান ক্রমেই নিকটবর্তী হইল। এক-দল লোক আসিয়া পৌঁছিল। এক্ষণে, বীথির সমস্ত খিলান-মণ্ডপটা দেখা যাইতেছে—একটা ভাল গাছের খিলান-মণ্ডপ। এইসব লোক চলিতে চলিতে যাহা নাড়াইতেছে সেইসব অগ্নিশিখার দ্বারা তরুণমণ্ডপের তলদেশটা আলোকিত। আমার সেই বাচ্চারা বলিল, "মোসিএ, এটা একটা বিবাহ উৎসব—আমাদের ধর্মের একটা বিবাহ-উৎসব, "মোসিএ, T'issএর বিবাহ-উৎসব, ওখানে গিয়ে আমরা দেখতে পারি?"

ওখানে যেতে হবে? না, আমার দেখিবার তেমন উৎসুক্য নাই। এই বিবাহ-উৎসবটা আমার সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমি এখন স্বপ্ন দেখিতে চাই।

এই যে, উহারা খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে; আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে। মিশরীয় শোভাযাত্রার মতো কতকগুলো ডাঙার আগায় একপ্রকার হাত-পাখা। বড় বড় আতপত্র বিষুব-আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ভরা-রাজিকালেও বর-কন্যার মাথার উপর খুলিয়া ধরা হইয়াছে। মশালের পরিবর্তনশীল আলোকে, জ্বলন্ত ডালপালার অনলশিখায় লোকদিগকে দেখা যাইতেছে, উহাদের পরিচ্ছদ দেখা যাইতেছে। সুন্দর গ্রীবাদেশ প্রায় অনাবৃত রাখিয়া, শ্রামল কাঁধের উপরে যদুচ্ছা-ক্রমে একটা সাদা মসলিনের চাদর নিষ্কিন্ত হইয়াছে; ধনুকের মতো বাঁকা বক্ষদেশ, শীর্ণ কটি-দেশের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে; আঁটসাঁট ধূতি উরোত্তের উপরে লাগিয়া আছে। ভারতের রুচি অনুসারে পোষাক-পরিচ্ছদ দৃষ্টি-আকর্ষক বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। বর-কনে হাত ধরাধরি করিয়া কিংবা কটিবন্ধে কটিবন্ধে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে; দেখিলে মনে হয় যেন প্রেমের জ্বলন্ত বাসনা-মদে প্রমত্ত, চীৎকার কোলাহল ও বাজনা-বাদ্যে প্রমত্ত। উহারা উন্নতভাবে গান গাহিতেছে, মাথা পিছন দিকে ঝুকিয়া আছে; বড় বড় মুখের 'হাঁ' উন্মুক্ত। নিকট হইতে শুনিলে, উহাদের গানের তীব্র স্বরলহরীতে কান যেন কাটিয়া যায়...

না, বিবাহ-উৎসব দেখিবার জন্য উহাদের পিছনে পিছনে যাইতে

আমার ইচ্ছা নাই। উহাদিগকে একেবারেই যদি না দেখিতাম ত ভাল হইত। কারণ আমার স্বপ্নের যে "মোহিনী" ছিল তাহা খুবই বিরল এবং বড়ই মধুর। আমি সত্যসত্যই যেন আপনাকে ক্ষুদ্র শিশু বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম, সেই সুমধুর, অনির্বচনীয় প্রথম-গ্রীষ্মরজনীর ধারণাগুলি আবার ধরিতে পারিয়াছিলাম। এখন আমি আবার যাহা হইয়াছি—এবং পূর্বে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে,— এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

এখন এই বেকির উপর বসিয়া থাকিয়াই -সেইসব বিলুপ্ত-স্মৃতি আবার ধরিতে ইচ্ছা করিতেছি...

অসম্ভব! উহাদের শরীরের মৃগনাভিমিশ্রিত গন্ধ আকাশকে ক্ষুদ্র করিয়া তুলিয়াছে; উহাদের শব্দ কোলাহল, সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

আমার দেশের ও শৈশবের ক্ষুদ্র স্বপ্নটি অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার মাথার ভিতর তবে আর কি অবশিষ্ট রহিল? আমার জীবন-প্রভাতের যাহা-কিছু নবীন, যাহা-কিছু মধুর সমস্তই চিরকালের মতো শেষ হইল।—এখানে ইহা ত ভারতভূমি; এখন আমি আছি ভারতের মধ্যে, শ্রামল-বক্ষোবিশিষ্ট ভারতের মধ্যে, কালো সুন্দর মখমল-নেত্র ভারতের মধ্যে—উত্তপ্ত, উদ্দাম-উদ্ভিজ্জ-শালী, দীপ্তি-মহিমাম্বিত ভারতের মধ্যে। ...বেশ! তবে আমি উহাদিগকেই অনুসরণ করিব, আচ্ছা বিবাহ-উৎসবটা দেখিতে যাইব ...

(সমাপ্ত)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌদ্ধ যুগের সাজা

সে-কালে নানারকম শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। যেমন—দোষীকে হাঁটু পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ান হ'ত, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হ'ত, সাপের মুখে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে' দেওয়া ও বৃকে পাথর বা গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত।

আড়াই হাজার বছর আগে যখন বুদ্ধদেব তাঁর অহিংসা ধর্ম প্রচার করতেন, তখন আবার যে-রকম শাস্তি প্রচলিত ছিল তা অতি অদ্ভুত ও নির্দয়তার পরিচায়ক। তার বিবরণ আমরা বৌদ্ধ-গ্রন্থে (যেমন মঝ্ঝিম নিকায়ে ১৩ সূত্রে ও অঙ্গুত্তরনিকায়ে ত্রিকনিপাতে) পাই।

ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ দিতে দিতে বলেছেন—“দেখ ভিক্ষুগণ, এই যে স্নোকে সিঁদ কাটে, গ্রাম লুঠ করে, দল বেঁধে ডাকাতি করে, রাহাজানি করে, সামাজিক নানাপ্রকার উপদ্রব করে—এর মানে কি জান? এর মানে হচ্ছে, সেইসব লোক একটা বদ্-ইচ্ছা পূর্ণ করে' নিজেদের খুসি করে। কিন্তু এতে হয় কি? রাজা যখন তাদের উপদ্রব টের পেয়ে তাদের ধরে' নিয়ে যান, তখন বিচারে তাদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা

করেন। কাউকে চাবুক বা বেত, কিংবা ছোট ডাঙা (“অন্ধদণ্ড কেহি”,—আধুনিক পুলিশের ক্ল) দিয়ে তাড়না করেন, কারো বা হাত অথবা পা এবং হাত পা দুই-ই ছেদন করে' দেন, কারো কারো বা কান নাক অথবা কান নাক দুই-ই কেটে ছেড়ে দেন। রাজা আর কি করেন? “বিলম্বখালিকং” করেন, “সম্মুণ্ডিকং” করেন, “রাহুমুখং” করেন, “জ্যোতিমালিকং” করেন, “হথপঞ্জাতিকং” করেন, “এরকবত্তিকং” করেন, “চীরক-বাসিকং” করেন, “এগ্গেয়কং” করেন, “বলিসমংসিকং” করেন, “কহাপণং” করেন, “খান্নায়ত্তচ্ছিকং” করেন, “পাল্লিপরিবত্তিকং” করেন, “পলালপীঠকং” করেন; আবার কাউকে বা গরম তেলে ভাজেন, কাউকে কুকুর দিয়ে খাওয়ান, কাউকে শূলে দেন, কারো বা মাথা কেটে দেন। এইসব দণ্ডে কেউবা মরে, কেউ বা মরণ-হুঃখ পায়। এই হরেক রকম শাস্তির হরেক রকম হুঃখ লাভ করে। এই হুঃখ পাওয়ারও কারণ ঐ নিজেদের খুসি হওয়ার চেষ্টা করা।”

বলা বাহুল্য যে “বিলম্বখালিক” হ'তে “পলাল-পীঠক” পর্য্যন্ত সবগুলি একটি একটি সাজার নাম। সেগুলি কিরকম করে' দেওয়া হ'ত তার একটা বিবরণ

বুদ্ধঘোষ দিয়েছেন। তার মোটামুটি ভাব ব্যাখ্যা করা গেল।

পূর্বের “অন্ধদণ্ডক” মানে চার হাত মাপের বেশ শক্ত একটা “দণ্ড” নিয়ে তাকে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলে’ তার দুই দুই হাত ক’রে নিয়ে অপরাধীর পিঠে (জয়ঢাকের মত) পিটান।”

“বিলম্বখালিক”—বিলম্ব হালুয়ার মত একরকম খাবার। খালিক মানে খালা। এই বিলম্ব তৈরী করতে হ’লে খালার যেমন অবস্থা হয় অপরাধীর মাথার খুলি-টাকেও তেমনি অবস্থায় পরিণত করা হচ্ছে এই দণ্ডের কাজ। অপরাধীর মাথার খুলি কপালের কাছ থেকে চটিয়ে তুলে’ ফেলে’, একটা জলন্ত লোহার গোলা সাঁড়াশী (‘সঙাসেন’) দিয়ে ধরে’ মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তখন ঐ গরমের চোটে মাথার ঘিলু গলে’ গলে’ পড়তে থাকবে।

“সঙ্ঘমুণ্ডিক”—ঠোঁটের পাশ থেকে কানের নীচে দিয়ে চারি-ধারে সমান করে’ চামড়া কেটে ফেলে’ সমস্ত চুল এক জায়গায় করে’ গেরো দিয়ে তার মধ্যে একটা লাঠি চালিয়ে দিয়ে উপর দিকে টানতে টানতে চামড়া-স্বন্ধ চুল উপড়ে ফেলে, তার পর চামড়াহীন মাথাটাকে মোটা মোটা কাঁকর দিয়ে ঘসে মেজে ধুয়ে (‘ততো সীসকটাং থল স্কুথরাহি ঘংসিত্তা ধোবন্তা’) একবারে শাঁখের মত সাফ করে’ দিতে হবে। (সম্ভবতঃ বড় বড় চুলওয়াল লোকদের জন্ম এই শাস্তি বিহিত ছিল।)

“রাহ্মুখ”—অপরাধীর মুখ হাঁ করিয়ে যাতে মুখ বৃজ্জতে না পারে একজন্ম একটা লোহার ঠেকো দিয়ে পরে একটা প্রদীপ জ্বলে মুখের মধ্যে রাখা হ’ত। (রাহ্ম যখন চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করে তখন তার মুখের মধ্যে আলো হয় বলে’ এই দণ্ডের নাম রাহ্মুখ)। মতান্তরে—ঠোঁটের দুই পাশ থেকে চিরে’ কান পর্য্যন্ত মুখের হাঁ বাড়িয়ে দেওয়ার নাম “রাহ্মুখ”, কেননা রাহ্ম হাঁ ছোট হ’লে চলবে কেন?

“জ্যোতিমালিক”—জ্যোতির মালা পরান। সমস্ত শরীরে তৈলে-ভেজা ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া।

“ছথজ্জাতিক”—কেবলমাত্র হাতে তৈলে-ভেজা নেকড়া জড়িয়ে প্রদীপের মত (“দীপং বিয়”) করে’ জ্বালা। অপরাধের এটা লঘু দণ্ড, অনেক সময় প্রাণটা বেঁচে যায়।

“এরকবত্তিকং”—গলার কাছ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে পায়ের গোড়ালির কাছে ফেলতে হবে। তার পর দড়ি দিয়ে অপরাধীকে বেঁধে “রথটানা” গোছ করতে হবে,

আর অপরাধী নিজের চামড়া নিজের পায় জড়িয়ে হোঁচট খেতে থাকবে (“সো অন্তনোব বক্ষবট্টে অক্ষসিত্তা অক্ষসিত্তা পততি”)।

“চীরকবাসিক”—উপর দিক থেকে চামড়া কোমর পর্য্যন্ত আর কোমর থেকে চামড়া গোড়ালী পর্য্যন্ত ঠিক দু’খানা কাপড়ের মত করে’ ছাড়ানো।

“এল্লেক’—বাহর মাঝে আর হাঁটুতে লোহার সিক বিঁধে মাটিতে শূল পুঁতে তাতে অপরাধীকে ফেলে চারিধারে আগুন জ্বলে দেওয়া হ’ত। (এণেয়া মানে কিন্তু মেড়া, আমাদের দেশে ফাল্গুন মাসে ‘ম্যাড়া পোড়া’ বলে’ একটা আগল্লেক-উৎসব করা হয়; তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে কিনা বিবেচ্য।)

“বলিসমংসিক”—দুইমুখো বঁড়শী গায়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে চামড়া মাংস ও শিরাগুলি টেনে ছেঁড়া।

“কহাপণ”—ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোমর থেকে আরম্ভ করে’ কাঁধাপণ পয়সার মত ছোট ছোট করে’ টুকরো টুকরো মাংস ছিঁড়ে নেওয়া।

“খারায়তচ্ছিক”—অস্ত্র দিয়ে সর্কাজ ক্ষতবিক্ষত করে’ কঁচি (“কোচ্ছেহি”—with brush) দিয়ে মূন প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্য মাখান।

“পলিঘপরিবত্তিক”—অপরাধীকে কাৎ করে’ মাটিতে শুইয়ে তার কানের মধ্যে দিয়ে লোহার সিক চালিয়ে মাটিতে পুঁতে পরে অপরাধীর পা ধরে’ ঘানিগাছের মত ঘোরান।

“পলালপীঠক”—চামড়া আগে ছাড়িয়ে তার পর প্রহার করতে করতে হাড়গোড় চূর্ণ করে’ যখন দেহটা মাংসপিণ্ডরূপে পরিণত হবে তখন ঐ চামড়ায় পুরে চুল দিয়ে বেঁধে দিব্য একটা গাঁঠরী তৈরী করা হ’ত। অবশ্য চামড়া শরীর থেকে একবারে আলাদা করা হ’ত না।

এই সাজার সম্বন্ধে বলা হয়েছে দক্ষ জ্ঞান (‘ছেকো কারনিকো’—expert executioner) হ’লে এই সাজা দিতে পারত। তখন রাজাদের কাছে এইসব কাজের জন্ম অনেক ঘাতক থাকত। তারা তাদের এই কাজের দক্ষতা-অনুসারে বেশীকম বেতন পেত।

এই দণ্ডগুলি অনেকেই সজ্ঞানে ভোগ করতে পেত না; দণ্ড শেষ হওয়ার আগেই দণ্ড্য ভবলীলা শেষ করে’ ফেলত। কিন্তু তার দেহটার উপর যথাবিধান ‘দণ্ডকক্ষ’ চলতে থাকত।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বুদ্ধদেবের কল্পনাময় উপদেশ আর বীভৎস দণ্ড একই সময়ে একই দেশে বিরাজমান ছিল।

শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ত্ব

পেতবন্ধু এবং তাহার ভাষ্যে প্রেতের আলোচনা।

প্রেত সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণাকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে পেতবন্ধুর শরণাপন্ন হওয়া দরকার। কারণ এই গ্রন্থখানিতে প্রেত সম্বন্ধে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চিপুর নামক স্থানের ধর্মপাল, গ্রন্থখানির ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে মূলগ্রন্থে যে-সব গল্পের কেবলমাত্র ইঙ্গিত আছে সেই-সব গল্পের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ধর্মপাল এই-সব গল্প বৌদ্ধ ইতিকথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র শোনা গল্পই যে এই-সব ইতিকথার ভিত্তি তাহা নহে, সিংহলের মঠসমূহে যে-সমস্ত পুরাতন ভাষ্য (অট্ঠ-কথা) সংরক্ষিত আছে তাহার ভিতরেও এগুলির উল্লেখ আছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের কতকগুলি বিশেষ অংশের অট্ঠকথাকে সিংহলী ভাষা হইতে পালিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্মপালের দ্বারা বাকী অট্ঠ-কথার অনেক অনূদিত হয়। পেতবন্ধু এই-সমস্ত অনুবাদের ভিতরকার একখানি গ্রন্থ।

সুতরাং গ্রন্থখানিতে যে-সমস্ত গল্প লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা ধর্মপালের কল্পনা-প্রসূত মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তাহা প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধ ইতিকথার ভিতর দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই-সব গল্পের তিনটির সঙ্গে বুদ্ধঘোষ-প্রণীত ধর্মপদ-অট্ঠ-কথার তিনটি গল্পের আশ্চর্য্যজনক মিল আছে। সুতরাং মনে হয় ধর্মপাল এবং বুদ্ধঘোষ উভয়েই সিংহলী অট্ঠ-কথার ভিতর হইতে তাঁহাদের গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১) ধর্মপাল তাঁহার গল্পগুলি ধর্মপদ-অট্ঠ-কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মিঃ বালিংগেম্ তাঁহার “Buddhist Legends” নামক গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়েই এক স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন—এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মপালের অট্ঠ-কথা প্রেত সম্বন্ধে নানা রকমের তথ্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই বইখানি লইয়া ভাল-রকমে আলোচনা করিলে আত্মা সম্বন্ধে এবং প্রেত-লোক সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণা সহজেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। এই কারণেই ধর্মপালের পেতবন্ধু হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রেতের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ধর্মপালের এই গ্রন্থখানি ‘পালি টেক্‌স্ট্-সোসাইটি’ কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও এখন পর্যন্ত কোনো আধুনিক ভাষায় উহা ভাষান্তরিত হয় নাই।

ক্ষেত্রুপমা পেত (প্রেত)

ভাষ্যে এই প্রেতটি জনৈক শ্রেষ্ঠি-পুত্রের অশরীরী আত্মারূপে উক্ত হইয়াছে। ইহার পিতা বুদ্ধের জীবিতকালে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের একজন প্রভূত-ধনশালী বণিক ছিলেন। এই প্রভূতধনশালী বণিকের সে ছাড়া আব কোনো সন্তানসন্ততি ছিল না। পিতা-মাতা মনে করিতেন যে তাঁহাদের ধনভাণ্ডারে এই পুত্রটির জন্য অপরিমিত সম্পদ সঞ্চিত থাকিবে, দৈনিক সহস্র মুদ্রা হিসাবে ব্যয় করিলেও সে তাহা নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া তাঁহারা পুত্রটির শিক্ষা সম্পূর্ণরূপেই অবহেলা করিলেন। ফলে কোনো শিল্পই সে আয়ত্ত করিতে পারিল না। তার পর সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একটি সুন্দরী এবং সৎশ্রদ্ধাত কন্যার সহিত তাহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হইল। কন্যাটি সুন্দরী এবং সৎশ্রদ্ধাত হইলেও বুদ্ধের উপদেশের প্রতি তাহার কিছু-মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। এই পত্নীর সহিত শ্রেষ্ঠিপুত্রের দিন কেবলমাত্র অসার আমোদ-প্রমোদেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার পিতা-মাতাও পরলোকে গমন করিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে সর্বদা এমন সব দুষ্ট লোকের দ্বারা পরিবৃত থাকিত যাহারা ঠকাইয়া তাহার অর্থ অপহরণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। গায়ক, অভিনেতা বা এই জাতী

অন্যান্য বিলাস-সঙ্গীদিগকে অকাতরে দান করিয়া তাহার সমুদয় অর্থ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। অথচ কখনও সে ভ্রমবশতঃ কোনো ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করিত না। অবশেষে সে একরূপ ভাবে নিঃস্ব হইয়া পড়িল যে, উপায়ান্তর না থাকায় উক্ত নগরের এক অনাথ-শালায় আশ্রয় লইয়া সে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। সহসা একদিন একদল দস্যুর সহিত তাহার পরিচয় হইতেই দস্যুরা তাহাকে দস্যুবৃত্তি এবং চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিল। সে তাহাদের দলে যোগদান করিল বটে, কিন্তু প্রথম অভিযানের দিনই কোনো বস্তু অপহরণ করিবার পূর্বেই ধরা পড়িয়া গেল। রাজা বিচার করিয়া তাহার মস্তকটি দেহচ্যুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহাকে যখন বধ-মঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন নগরের সুন্দরী সুলসা একদা-মহাধনী এবং দানশীল এই যুবকটির অবস্থা অবলোকন করিয়া দয়ার দ্বারা বিচলিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করিবার জন্ম কর্মচারীকে অনুরোধ করিল। সে তাহাকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল প্রদান করিল। ঠিক সেই সময় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কোনো মহৎ দানের দ্বারা তাহাকে দানের পুণ্য অর্জন করিবার সুযোগ দিবার নিমিত্ত তাহার নিকট মহা-মোগগল্লান ভিক্ষা-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। বণিক-পুত্র মনে করিল জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে এই পানীয় এবং মিষ্টান্নের তাহার আর প্রয়োজন নাই, সুতরাং সে কোনোরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া সমস্ত পানীয় এবং আহাৰ্য্য মহামোগগল্লানকে উপহার প্রদান করিল। ইহার পর তাহার মুণ্ড দেহচ্যুত করা হইল। মহামোগগল্লানের মত একজন মহাত্মা খেরকে এই-রূপ দানের দ্বারা সে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে দেবতাদের বাসস্থান দেবলোকে জন্মগ্রহণ করাই তাহার উচিত ছিল। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সুলসা তাহাকে একটা দানের অবসর প্রদান করিয়াছে বলিয়া তাহার মন সুলসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। আর এই কৃতজ্ঞতার চিন্তা তাহার হৃদয় সুলসার প্রতি ভালবাসাতেও পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। এই ভালবাসার

ফলেই তাহাকে বহু নিম্নস্তরে একটি বটবৃক্ষে প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সুলসার প্রতি তাহার আসক্তির এইখানেই শেষ নহে। একদিন সুলসা তাহার আবাসস্থান বটবৃক্ষের নিম্নে আসিলে সে তাহার ভৌতিক মায়ার দ্বারা অন্ধকার এবং ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া বসিল এবং তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। এই অবস্থায় প্রেতটি এক সপ্তাহকাল তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া পরে বেলুবন-বিহারে যেখানে জনতার কাছে বুদ্ধ বক্তৃতা করিতেছিলেন সেই জনতার এক প্রান্তে রাখিয়া আসিয়াছিল।

(Petavatthu Commentary, P.T.S., pp. 1-9)

শুকরমুখ পের

কস্মপ নামে বুদ্ধের সময় একজন ভিক্ষু ছিল। সে দেহকে সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাক্ তাহার মোটেই সংযত ছিল না। সে তাহার সহধর্মী ভিক্ষুদিগকে যথেষ্টা তিরস্কার করিত এবং অযথা তাহাদের কুংসা রটনা করিত। মৃত্যুর পর নরকে সে পুনর্জন্ম লাভ করে। কিন্তু গোতম বুদ্ধের সময় রাজ-গৃহের নিকট গিজ্জাকূটে তাহার আবার নবজন্ম লাভ হয়। যে কর্মফল ভোগ করা তখনও তাহার অবশিষ্ট ছিল তাহার ভোগ পূর্ণ করিবার জন্ম ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাব তাহার বিরাম ছিল না। তাহার দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের মত উজ্জ্বল, বিস্তৃত মুখের আকৃতি ছিল শূকরের মত। মহাত্মা নারদ গিজ্জাকূট পর্ষতে বাস করিতেন। একদিন অতি প্রত্যুষে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন তখন এই শূকর-মুখ প্রেতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার দেহ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল; তাহার ভিতর হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; কিন্তু তোমার মুখ শূকরের মত। ইহার কারণ কি?” প্রেত উত্তর করিল—“দেহে আমার সংযমের অভাব ছিল না, কিন্তু বাক্ অত্যন্ত অসংযত ছিল। সুতরাং আমার দেহ উজ্জ্বল মুখ শূকরের মতন হইয়াছে। হে নারদ, তুমি আমার দুর্দশা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছ। সুতরাং বাক্যে অসংযত হইয়া

শূকরের মত মুখ প্রাপ্ত হইও না।” জাতকসমূহেও এই গল্পটির উল্লেখ আছে।

(Petavatthu Commentary, P. T. S, pp. 9—12)

পুতিমুখ প্ৰেত

কস্মপ বুদ্ধের সময় ভদ্রবংশীয় দুইজন যুবক ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি গ্রাম্য মঠে অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের ভিতর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল অতি দৃঢ়। আর-একজন ভিক্ষু অসং উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাহাদের মঠে আগমন করিল। স্থানটির সুখ সুবিধা এবং আহাৰ্য্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এই নবাগত ভিক্ষুটির মনে পূৰ্ব্বোক্ত ভিক্ষু দুইজনকে বিতাড়িত করিয়া একা সেই বিহারটি অধিকার করিয়া বসিবার অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। সে উভয়ের ভিতর এমন একটা বিরোধের সৃষ্টি করিল যে তাহারা উভয়েই বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরেই সেই মন্দবুদ্ধি ভিক্ষুটি মারা যায়। মৃত্যুর পর সে তাহার পাপের জন্ত অবিচি নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। অন্য দুইজন খের ভ্রমণ করিতে করিতে আবার একদিন পরস্পর মিলিত হইল। নিজেদের কথা ব্যক্ত করিতেই তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের মনোমালিন্য সেই ছষ্টবুদ্ধি ভিক্ষুর কাৰ্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা পুনর্বার বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইল এবং পুনরায় তাহাদের নিজেদের বিহারে প্রত্যাবর্তন করিল। পরে তাহারা ‘অরহত’ হইয়াছিল।

এক বুদ্ধের তিরোধান হইতে অন্য বুদ্ধের জন্মের মধ্যবর্তী সময়টা নরকে বাস করিবার পর প্রেতটি গৌতম বুদ্ধের সময় পৃথিবীতে পাপের বাকী অংশটুকু ভোগ করিবার জন্ত সে-নরক হইতে বাহির হইয়া আসে এবং পুতিমুখ প্রেত নাম লইয়া রাজগৃহে অবস্থান করিতে থাকে। মহাত্মা নারদ একদা গিঞ্জুকূট পৰ্ব্বত হইতে নামিয়া আসিবার সময় তাহার দেখা পান এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—“চেহাৰায় তুমি পরম রূপবান্, তোমার বাসস্থান আকাশে। কিন্তু তোমার মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ, তাহাতে কীটসমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ

করিতেছে। অতীতকালে তুমি এমন কি পাপ করিয়াছ যাহার জন্ত তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে?” প্রেত উত্তর করিল—“আমি একজন অসাধু ভিক্ষু ছিলাম, বাকু আমার মোটেই সংযত ছিল না। বাহিরের আচরণে আমি যোগী-ঋষির মত ছিলাম, সেইজন্ত আমার চেহারাটা এত সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু আমার মুখের এই দুর্গন্ধও আমার নিজেরই কৰ্মফল। বাক্যে যে আমি অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলাম এখন তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।”

(Petavatthu Commentary, P. T. S., pp. 12—16)

পিট্ঠধীতলিক প্ৰেত

শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের পৌত্রীর ধাত্রী তাহাকে একটি খেলার পুতুল উপহার প্রদান করিয়াছিল। পৌত্রীটি এই পুতুলটির সহিত খেলা করিত এবং তাহাকে কণ্ঠার মত মনে করিত। একদিন খেলিতে খেলিতে এই পুতুলটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে ‘আমার কণ্ঠা মরিয়া গেল’—বলিয়া বালিকাটি এমন ভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করিল যে তাহাকে কেহই সাহায্য দিতে পারিল না। অবশেষে ধাত্রী বালিকাটিকে অনাথ-পিণ্ডিকের নিকট লইয়া গেল। তিনি তখন বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন। অনাথপিণ্ডিক তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে মৃত কণ্ঠার উদ্দেশ্যে তাহার দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা উচিত। পরের দিন বুদ্ধ একটি মাধ্যাহ্নিক ভোজে নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি সেখানে অনাথপিণ্ডিকের দানের ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, মৃত আত্মীয়ের আত্মা গৃহ-দেবতা বা অন্য দেবতা যাহার উদ্দেশ্যেই দান করা হোকনা কেন, দাতা নিজেও তাহার দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করেন। এবং দান-গ্রহণ-কারীরও উপকার করা হয়। শোক দুঃখ এবং ক্রন্দনের দ্বারা প্রেতেরা কিছুমাত্র উপকৃত হয় না, তাহা কেবলমাত্র জীবিত আত্মীয়দেরই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। (Petavatthu Commentary, pp. 16-19.)

তিরোকুড পেত

বহু পূর্বে—প্রায় ৯২ কল্প পূর্বে কাশিপুরী নামে একটি নগর ছিল। তাহার রাজার নাম ছিল জয়সেন এবং রাণীর নাম ছিল শিরিমা। এই রাণীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব ফুসু নামে এক সন্তান হয়। পুত্রটি সম্যাসম্বোধি অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে সর্বদাই বলিতে শোনা যাইত যে “বুদ্ধ, ধর্ম, সত্য, এ-সমস্তই আমার। ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় বস্ত্র খাদ্য শয্যা এবং ঔষধ এই চারিটি বস্তুর দানের অহুমতি আমি আর কাহাকেও প্রদান করিব না।” সুতরাং রাজার অগ্ৰাণু পুত্রেরা বুদ্ধকে অর্ঘ্য দান করিবার কোনো সুযোগই পাইত না। অবশেষে এই ব্যাপারে রাজার অহুমতি লাভের জন্য তাহারা একটি কৌশলের আবিষ্কার করিল। সীমান্তের অধিবাসীদিগকে তাহারা বিদ্রোহের জন্ত উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই-সব লোকেরা যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তখন তাহারাই আবার প্রেরিত হইল তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসার পরে রাজা যখন তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন তখন বুদ্ধ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের অধিকার চাওয়া ছাড়া তাঁহারা আর কোনো পুরস্কার প্রার্থনা করিল না। রাজা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাদিগকে তিন মাসের জন্য অধিকার প্রদান করিলেন। প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা শেষ করিয়া তাহারা বুদ্ধকে তাহাদের নবনির্মিত বিহারে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে যথাবিহিত পান্য অর্ঘ্য প্রদান করিল। ইহাদের ভিতরেও আবার কেহ কেহ সময়ের অল্পতার জন্য নিজেদের নামে বুদ্ধকে উপহার প্রদান করিতে না পারিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। এই অসন্তুষ্ট লোকেরা অবশেষে ভ্রাতাদের দান-ধ্যানের ব্যাপারে বাধা জন্মাইতে সুরু করিয়া দিল। কখনো বা তাহারা অর্ঘ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, কখনো স্বেগলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিত। অবশেষে তাহারা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইল

যে একদিন দরিদ্রাশ্রমে অগ্নি সংযোগ করিতে ইতস্ততঃ করিল না। এই-সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকেরাই তাহাদের দুষ্কৃতির জন্য নরকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পর কস্মপ বুদ্ধের সময় তাহারা আবার প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও তাহাদিগকে কখনো কোনো উপহার প্রদান করিত না। অবশেষে একদিন কস্মপ বুদ্ধের নিকটে গিয়া তাহারা আত্মীয়-স্বজনের এই অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিম্বিসারের রাজত্ব-কালে তাহাদের নামে বলির অর্ঘ্য অর্পিত হইবে, আর এই বিম্বিসার পূর্বজন্মে তাহাদেরই আত্মীয় ছিল। সুতরাং রাজা বিম্বিসার যখন বেলুবন-বিহারটি বুদ্ধকে এবং তাঁহার শিষ্যগণকে উপহার দেন, এই প্রেতেরা মনে করিয়াছিল, বিম্বিসারের অর্জিত পুণ্যের কিয়দংশ তাহাদেরও ভাগে পড়িবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছিল। এইরূপে নিরাশ হইয়া তাহারা রাত্ৰিতে একরূপ ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল যে ভীত বিম্বিসার বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই কোলাহলের অর্থ কি?” বুদ্ধ তাঁহাকে উত্তর দিলেন—“তোমার পূর্বজন্মের জনকত আত্মীয় প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারাই আশা করিতেছিল তুমি যে পুণ্য অর্জন করিয়াছ তাহার ভাগ এই-সব প্রেতদিগকেও বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা তাহারই বলে হুঃখ-হৃদশার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু তুমি তাহা দাও নাই। সুতরাং তাহারা হতাশ হইয়া এই কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।” ইহার পর বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি বিম্বিসার সমস্ত সম্বন্ধে এক বিরাট ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই সংকাজের পুণ্য তিনি প্রেতগণকেই অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজার এই পুণ্যকার্যকে সমর্থন করিতে গিয়া বুদ্ধদেব তিরোকুডসুত্তম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম এই যে, মানুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে উপকার এবং অহুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহারই কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিয়া থাকে। (Petavatthu Commentary, pp. 19-31.)

পঞ্চপুত্রখাদক প্ৰেত

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে একজন গৃহস্থ বাস করিত। তাহার পত্নী ছিল বন্ধ্যা। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহাকে নিঃসন্তান দেখিয়া পুনরায় দাব-পবিগ্রহ করিবার জন্য পুঁড়াপুঁড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু এই গৃহস্থটির পত্নীর প্রতি সুগভীর প্রেম ছিল। সন্তানঃ বন্ধুবান্ধবদের এই অনুরোধ উপরোধ তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। অবশেষে বংশলোপ পায় দেখিয়া পত্নী নিজে স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে চাবিদিক্ হইতে অনুরোধ হইয়া গৃহস্থ একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া আসিল। কিছুদিন পরেই এই দ্বিতীয় পত্নীটির দেহে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার চিহ্ন পবিসঞ্চিত হইল। তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা হইতে দেখিয়া প্রথম পত্নী মনে মনে ভাবিল, ‘সন্তান প্রসব করিলেই তো সপত্নী গৃহের কত্রী হইয়া বসিবে’। এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে ঈর্ষারও অবধি রহিল না। অবশেষে তাহার ঈর্ষা মাত্রা ছাড়াইয়া এতদূর উঠিল যে সে একজন পরিব্রাজকের সাহায্যে সপত্নীর গভ নষ্ট করাইল। এই পরিব্রাজকটিকে সে খাদ্য এবং পানীয় উপহার দিয়া পূর্বেই হস্তগত করিয়াছিল। দ্বিতীয় পত্নীর পিতা-মাতা কন্যার গভ নষ্ট হওয়ার কথা শুনিয়া প্রথম পত্নীর বিরুদ্ধে ভ্রূণ-হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিল। কিন্তু সে অপরাধ অস্বীকার করিয়া শপথ করিয়া বসিল যে, সে যদি সত্যসত্যই অপরাধী হয় তবে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি করিয়া সন্তান ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য নানা রকমের দুঃখ-দুর্দশার হাত হইতেও সে যেন মুক্তি লাভ করিতে না পারে। এই স্ত্রীলোকটিই তাহার পাপের জন্য মৃত্যুর পর তাহার স্বগ্রামের অনতিদূরে কুৎসিত-দর্শন (দুষ্কল্পরূপ প্রেতী) প্রেতিনী হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিল। সে পানীয় এবং আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। প্রাতে পাঁচটি পুত্রকে এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি পুত্রকে সে প্রহার করিত এবং তাহাদের মাংস আহাৰ করিত। তথাপি তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। বস্ত্রের অভাবে

তাহার সর্ষদেহ উল্লঙ্গ থাকিত। জাব মাছি এবং ক্রমিতে পবিপর্ন সেই দেহ হইতে অস্ফুটগন্ধ নির্গত হইত। একদা বাইতন যেন শ্রাবস্তীতে ভগবান্ বুদ্ধের কাছে গমন কাবদ্যের সময় যথেষ্ট প্রেতিনীটিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে তাহার এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে তাহাদের কাছে তাহার জীবনের ইতিহাস বিবৃত করে। (Pelavatthu Commentary, pp. ৩১-৩২.) তাহার দুঃখে বিচলিত হইয়া তাহাকে সেই পত্নীর পুত্রস্বামী গৃহস্থের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহস্থ তাহারিণের খাদ্য এবং পানীয়ের দ্বারা শ্রমসাধনা বাস্তবেই তাহার এই সংসারের পুণ্য তাহার পক্ষপাতীর নামে উৎসর্গ করিতে অনুরোধ কাবলেন। সেই পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করায় অবশেষে সে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ কাবলাইল।

পঞ্চপুত্রখাদক প্ৰেত

একজন বৌদ্ধ গৃহস্থের দুইটি পুত্র ছিল। এই পুত্রেরা সর্ষদেহসম্পন্ন ছিল। পূর্বেই গভে গৃহস্থের পত্নী স্বামীকে হত্যা করিয়া অপরাধী হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থ পুনরায় বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় পত্নীটি অন্তঃসত্ত্বা হইলে প্রথম পত্নী ওয়া সন্তানস্বীকার তাহার গভ নষ্ট করাইয়াছিল। এই পত্নীটির অবাণষ্টাংশ পঞ্চপুত্রখাদক প্রেতের গল্পাংশেরই অন্তর্ভুক্ত। (Pelavatthu Commentary, pp. ৩৬-৩৭.)

গোণ প্ৰেত

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে গৃহস্থ পরলোকে গমন করিলে তাহার পুত্রাণ্ড শোকে আতপ্ত হইয়া তাহার পরিচিত অপরিচিত প্রহোবশেষে তাহার পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুই তাহাকে সাহুনা দিতে পারিল না। নোবটন এই দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ একদিন স্বয়ং তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে বুদ্ধকে ও তাহার পিতা যোগাব এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। বুদ্ধ উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করলেন—“তুমি তোমার এই ভ্রমের পিতার সম্বন্ধেই জানিতে চাও, না পুত্রজন্মসময়ে যোগাব তোমার পিতা ছিলেন তাহাদের

কথাও জানিতে চাও ?” এই উপায়ে তিনি যুবকের পিতৃ-শোকাভূত বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন ভিক্ষুরা তাঁহাদের নিজেদের ভিতর এই বিষয়কর ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—এই যুবকের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে তিনি এই প্রথম শান্ত করিতেছেন না, পূর্বেও তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন। বুদ্ধ অতঃপর নিম্নলিখিত গল্পটি বিবৃত করিলেন। অতীত কালে বারাণসীতে এক গৃহস্থের পিতা কালের আস্থানে পরলোকে গমন করেন। গৃহস্থ পিতৃশোকে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল—তাহার নাম সূজাত। সূজাতের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারতীক্ষ্ণ। শোকাচ্ছন্ন পিতার চিত্তকে শান্ত করিবার উপায় স্থির করিয়া সে সহরের বাহিরে চলিয়া আসিল। সেখানে ক্ষেত্রের ভিতর একটি বলীবর্দ্ধ মৃতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। সে কিছু বিচালী কিছু ঘাস ও খানিকটা জল সংগ্রহ করিয়া সেই মৃত বলীবর্দ্ধের মুখের কাছে সেগুলি স্থাপন করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার জন্ত আহ্বান করিতে লাগিল। পথ-যাত্রীরা ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাহার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কি জানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কাহারো প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রদান করিল না। তাহারা তখন তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক স্থির করিয়া তাহার পিতাকে গিয়া জানাইয়া আসিল যে তাহার পুত্রটির মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। পিতা পুত্রের এতাদৃশী অবস্থার কথা শুনিয়া ছুটিতে ছুটিতে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে এইরূপ পাগলের মত ব্যবহার করিতেছে কেন। পুত্র উত্তর করিল—“পাগল আমি, না আপনি, সে-সম্বন্ধে আমি এখনও কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেছি না। আমি তবু এমন একটি বলদকে ঘাস জল গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি যাহার মাথা এবং পা—যাহার সমস্ত দেহটাই আমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু আমার পূজনীয় পিতামহদেবের দেহের হাত পা বা মাথা কোমো অংশই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যাহার কিছুই পশ্চাতে পড়িয়া নাই আপনি তাহারই

জন্ত শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিব্রংশ যে আপনারই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।” পুত্রের এই যুক্তি শ্রবণ করিয়া পিতার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি বালক সূজাতকে তাহার এই জ্ঞান ফিরাইয়া দেওয়ার জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। প্রভু বুদ্ধই তখন সূজাত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (Petavatthu Commentary, pp. 38-42.)

মহাপেশকার পিত

বারোজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট হইতে কস্মট্ঠান ব্রত গ্রহণ করিয়া এমন একটি বাসস্থানের সন্ধান বাহির হইয়া পড়িলেন যেখানে বস্ত্র সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটি সুন্দর বনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বনভূমির পাশে যে গ্রামখানি অবস্থিত তাহাতে এগাবো ঘর পেশকাব অর্থাৎ তন্তুবায়ের নিবাস। পেশকারেরা যখন জানিতে পারিল যে ভিক্ষুরা নির্জনে বিনা বাধায় কস্মট্ঠান সাধনার জন্ত উপযুক্ত আবাস-স্থানের অনুসন্ধান করিতেছেন তখন তাহারা তাঁহাদিগকে সেইখানেই বাস করিবার জন্ত আহ্বান করিল এবং বনের ভিতর তাঁহাদের জন্ত কুটীরও তৈয়ার করিয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় জব্যাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইল না। পেশকারদের ভিতর যে ব্যক্তি প্রধান সে গ্রহণ করিল দুইজন ভিক্ষুর আবশ্যকীয় জব্যাদি সংগ্রহের ভার, বাকী দশজনের ভার গ্রহণ করিল বাকী পেশকারগণ। প্রধানের স্ত্রীর ভিক্ষুদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। সুতরাং ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় জব্যাদি পাইতে বিস্তর অস্ববিধা হইতে লাগিল। পত্নীর এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া পেশকার-প্রধান তাহার ছোট ভগ্নীটিকে গৃহে আনিয়া তাহার হাতেই কর্তৃত্বের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রতি এই বালিকার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। সুতরাং এবার তাঁহাদের সেবা এবং যত্ন যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বর্ষাঋতু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পেশকারেরা প্রত্যেক ভিক্ষুককেই একখানি করিয়া বস্ত্র উপহার প্রদান করিল। এই ব্যাপারে প্রধানের পত্নী কষ্ট হইয়া উপহাস করিতে করিতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—যে খাদ্য এবং

পানীয় তুমি শাক্যপুত্র সম্মাসীদিগকে উপহার দিয়াছ, পরলোকে তাহা যেন তোমার ভাগ্যে বিষ্ঠা মূত্র এবং পুঁজের আকার ধারণ করে এবং বস্ত্রখানি যেন জলস্ত লৌহে পরিণত হয় ।

কালে পেশকার-প্রধান বিজ্জাটবীতে শক্তিমান্ বৃক্ষ-দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী মৃত্যুর পর বিজ্জাটবীর নিকটবর্তী একটি স্থানেই প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল । নগ্ন-দেহে কুৎসিত-মূর্তিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উৎপীড়িত হইয়া একদিন সেই প্রেতিনী বৃক্ষ-দেবতার নিকটে আসিয়া অন্ন পানীয় এবং বস্ত্রের প্রার্থনা জানাইল । দেবতা স্বর্গ-সুলভ বস্ত্র খাদ্য এবং পানীয় সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে প্রদান করিতেই খাদ্য এবং পানীয় বিষ্ঠা মূত্র এবং পুঁজি পরিণত হইল, এবং বস্ত্র-খণ্ডকে পরিধান করিতে না করিতেই তাহা জলস্ত লৌহ খণ্ডের মত তাহার সারা দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিল । যজ্ঞায় সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিতে লাগিল ।

একজন ভিক্ষু বর্ষাঋতু প্রবাসে কাটাঁইবার পর বিজ্জাটবীর পথে বৃক্ষ-দর্শনে চলিয়াছিলেন । তাঁহার সঙ্গী ছিল একদল বণিক । এই বণিকের দল রাত্রিতে পথ চলিত এবং দিনে ছায়া-শীতল বনের নিরালায় বিশ্রাম করিত । একদিন ভিক্ষু যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন বণিকদল তাহাকে ফেলিয়া প্রস্থান করিল । বনের ভিতর ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যে গাছে দাপু তন্তুবায়ের আত্মাটি বাস করিত তিনি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বৃক্ষ-দেবতা তাঁহাকে দেখিয়াই মানুষের দেহে তাহার নিকট আগমন করিয়া শ্রদ্ধা এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন । ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পত্নী প্রেতিনীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং খাদ্য পানীয় ও বসনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল । কিন্তু জিনিষগুলি তাহার হাতে দিতে না দিতেই সেগুলির চেহারা একমূহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল । ভিক্ষু এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃক্ষদেবতা আদ্যোপাস্ত সমস্ত ঘটনাই তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন এবং প্রেতিনীকে এই দুর্কিসহ যজ্ঞগার হাত হইতে মুক্তি দানের কোনো উপায় আছে কি না তাহাও

জিজ্ঞাসা করিলেন । ভিক্ষু বলিলেন, তাহার পক্ষ হইতে যদি কোনো ভিক্ষুকে খাদ্য পানীয় এবং বসন দান করা হয় এবং সে দান যদি সে সর্বাস্তঃকরণে অমুমোদন করে, তাহা হইলে এই নির্ঘাতনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা তাহার পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব নহে । বৃক্ষ-দেবতা ভিক্ষুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন এবং দুই-খানি বস্ত্র ভিক্ষুর হাতে দিয়া প্রভু বুদ্ধের কাছেও প্রেরণ করিয়াছিলেন । এইরূপে সেই হতভাগ্য রমণীটি দুর্ভাগ্যের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল । (Petavatthu Commentary, pp. 42-46.)

খলাত্যা প়েত

একদা বারাণসীতে এক পরম রূপবতী রমণী বাস করিত । তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন সুন্দর ছিল, তাহার দেহের বর্ণও ছিল তেমন চমৎকার । কিন্তু সর্বাঙ্গের সুন্দর ছিল তাহার চুল । তাহার কটিতট বেষ্টন করিয়া যে মেথলা শোভা পাইত তাহাকেও এই গাঢ় ঘন কৃষ্ণ এবং সুদীর্ঘ কেশপাশ অতিক্রম করিয়াছিল । বহু যুবকের চিত্ত তাহার এই কেশপাশের সৌন্দর্যের বন্ধনে বাঁধা পড়িত । তাহার এই সৌভাগ্যে কয়েকজন রমণী অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িল এবং ঔষধের দ্বারা তাহার এই কেশরাশি ধ্বংস করিবার জন্ম অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়া পড়িল । তাহার একটি পরিচারিকাকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করিতেও তাহাদের বিশেষ বিলম্ব হইল না । পরিচারিকাটি তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটা তীব্র ঔষধ তাহার গঙ্গা-স্নানের সময় সে যে চূর্ণ ব্যবহার করিত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল । সেই চূর্ণ মাথিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতে সে যেমন মাথা ডুবাইয়াছে অমনি তাহার সমস্ত চুল শুষ্ক-পত্রের মত ঝরিয়া পড়িল । কেশদাম হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার মূর্ত্তি এত কুৎসিত হইয়া গেল যে ক্ষোভে লজ্জায় সে আর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না । নগরের বাহিরে তৈল এবং মদ্যের ব্যবসায় করিয়া সে তাহার জীবিকা অর্জন করিতে লাগিল । একদিন সে কতকগুলি লোককে সুরা-পানের জন্ম আমন্ত্রণ করিল এবং তাহারা সুরা পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলে তাহাদের বস্ত্রাদি অপহরণ করিল ।

একদা এক অরহত ভিক্ষার বাহির হইয়াছিলেন। তিনি এই রমণীর দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র সে তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া আনিল এবং তৈলের দ্বারা প্রস্তুত উত্তম খাদ্যসমূহ তাঁহার সম্মুখে পরিবেষণ করিল। অরহত তাহার প্রতি রূপা-পরবশ হইয়া খাদ্যসমূহ আহার করিলেন। তিনি যখন আহার করিতেছিলেন, রমণীটি তখন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে লইয়া তাঁহার মাথার উপর ছত্রদণ্ড ধারণ করিয়া রহিল। নদে নদে সে স্তম্ভর বেশবাশির জন্ত প্রার্থনা করিতেও ভুলিল না। ভাল এবং মন্দ কার্যের জন্ত পরজন্মে তাহার স্থান সমুদ্রের উপরে এক-খানি স্বানিন্দ্রিত বিমানে নিঃসৃত হইয়াছিল। প্রার্থনা অল্পস্বরে সে অপূর্ণ বেশবাশির অধিকারিণী হইয়াছিল বটে, কিন্তু বন্ধ অপহরণে। অন্যদিকে তাহার দেহে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। একদা তাহাকে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া তাহার অবস্থা ঠিক একই রূপের ছিল। তাহার পথ অবশেষে যখন বর্তমান বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতরণ হইলেন তখনও শ্রাবস্তীর এশ্বরত্মন বণিক তাহার বিমানকে বিসৃত সমুদ্রের ভিতরই সম্বলান বলিতে দেখিয়াছে। তাহার স্বর্ণভূমিতে বাসিজোব দত্ত হইয়াছিল। পথে বিপরীত বাতাসে তাহাদের ভ্রমণ রততঃ বিতাড়িত হইতে থাকে। সেই সময় বণিকের নামক বনিন্দ্রিতে এই স্বর্ণবিমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার ভিতরের অধিবাসীকে বাহির করিয়া আসিতে স্বপ্নচোদন করেন। উত্তরে বিমানচারিণী তাঁহাকে আনয়ন, তাহার সংবাদ

অনাচ্ছাদিত, স্তবরাং সে বাহির হইয়া আসিতে লজ্জিত হইতেছে। ইহার পর বণিক তাঁহার উত্তরীয়খানি উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়া সেই বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে অরোধ করিলেন। কিন্তু বিমানচারিণী উত্তর দিল একরূপ ভাবে কোনো উপহার তাহাকে অর্পণ করিলে সে উপহার তাহার নিকট কখনো পৌছবে না। উপহার তাহার নিকট পৌছাইতে হইলে জাহাজের উপর যদি কোনো সাধু এবং বিশ্বাসী উপাসক থাকেন তবে তাঁহাকেই এই উপহার প্রদান করিতে হইবে এবং সেই দানের পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করিতে হইবে। বণিক সেইরূপ দানের ব্যবস্থা করিয়া দানের পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করিতেই বিমানচারিণী স্তম্ভর বেশে স্তম্ভিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। পুণ্যকার্য এইরূপ অপরূপ ফল প্রসব করিতে দেখিয়া বিস্মিত বণিকেরা তাহাকে তাহার পূর্নজন্মের কর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তাহার পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্মের কথাই তাঁহাদের কাছে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয় প্রদান করিল এবং শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট কিছু উপহার লইয়া যাইতে অরোধ করিল। বণিকেরা শ্রাবস্তীতে যাইয়া তাহার নামে বুদ্ধের পূজা-অর্চনা করিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ প্রেতিনীর এই পুণ্যকার্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তাবতিংস স্বর্গের স্বর্ণপ্রাসাদে তাহার পুনর্জন্ম লাভ ঘটয়াছিল। (Petavatthu Commentary, P. T. S., pp. 46-53.)

শ্রী বিমলাচরণ লাহা

আধ্যাত্মিক খুড়ো

ফুল ফুটে বাবে যায় ছুনিয়া। কান্তি
 আঞ্জ যার সুর হই কান হাব ইতি।
 বিয়ে হ'ল আশ্বিনে তাহেদের মেয়ে
 বিদবা সে হ'য়ে গেছে দেহপ্লাস যেনে।
 হরিষোষ গাইতিবে দি মেশাল-খুদ,
 বাছুরটি মারা গেল হ'ল নাক ছুপ।

—এইরূপ নানা কথা আধ্যাত্মিক ভেবে ভেবে শেষে খুড়ো করলেন ঠিক,—
 "হেদ যত বাকী আছে এই বেলা হায়
 তাগাদার তাড়া দিয়ে করে' নিই আদায় !
 সোজায় না দেয় যদি আদালতে যাই,
 তাতে যদি দেখি তবু তাড়াতাড়ি পাই।
 তাড়াতাড়ি করা ভাল—নেই কিছু ঠিক
 মায়ায় ছুনিয়ায় সকলই অলীক।"

“বনফুল”

মেঘ-মল্লার

(১)

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্ত অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রহ্মায় প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশপারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকর নানারকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গড়ে' মেয়েদের কাছে বেচবার জন্ত এনেছিল; একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী দামী রেশমী শাড়ী বেচবার জন্ত এনেছিল—তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রহ্মায় শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজীয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধরে' খুঁজেও কিছু প্রহ্মায় তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠানে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয় মেয়ে জমে' গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হ'য়ে উঠল। প্রহ্মায়ও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ-বাজীয়ে ধরা পড়েন। অনেক-কণ ধরে' দেখবার পর তার চোখে পড়ল—একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্য থেকে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রহ্মায়ের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রহ্মায় লোক ঠেলে' তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উচু করে' প্রহ্মায়কে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি

অবতীর গাইয়ে স্বরদাস, তুমি আমাকেই খুঁজছিলেন না?”

প্রহ্মায় একটু আশ্চর্য হ'ল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি করে'?

প্রহ্মায় সসম্মানে জানালে, হ্যাঁ সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে। প্রৌঢ় বললেন, “তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না করে' আসতাম না। তোমাকেও ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।”

“আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?”

“নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে, জান?”

“হ্যাঁ, জানি। ওখানে একজন সরাসী পূর্বে থাকতেন না?”

“তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোনো একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করো। তুমি এখানে কোথায় থাকো?”

“এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন?”

“সে তোমাকে বল্ব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।”

প্রহ্মায় প্রণাম করে' বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই ছুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েদেরা উৎসব থেকে বাড়ী ফিরছিল। প্রহ্মায়ের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে' দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রহ্মায়ের মধ্যে অশান্ত ছাত্রদের চেয়ে বেশী চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য করে' তাকে একটু বেশী শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত করে' বিহারে ফিরলে কি আর রক্ষা থাকবে?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ে আড়ালটা সরে' গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রহ্মাঙ্গ দেখলে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপসা ঝাপসা পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। আরও দূরে একখানা শাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিগের পড়ন্ত রোদে সিঁহুরের মত রাঙা হ'য়ে আসছিল, চারিধারে তার শীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্কা করে' টানা।

হঠাৎ পেছন থেকে প্রহ্মাঙ্গের কাপড় ধরে' কে ঝঁপে' টানলে।

প্রহ্মাঙ্গ পেছন ফিরে' চাইতেই যে কাপড় ধরে' টেনে-ছিল তার চোখে কোতুকের বিদ্যুৎ খেলে' গেল। সে কিশোরী, তার দোলন-চাঁপা রংএর ছিপ্‌ছিপে দেহটি বেড়ে' শীল শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ান।

প্রহ্মাঙ্গ বিশ্বয়ের সুরে বলে' উঠল, “কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজলাম, কৈ দেখতে পেলাম না ত?”

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল, তার পর সে একটু অভিমানের সুরে বললে, “আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি? যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি?”

“সত্যি বলছি সুনন্দা তোমাকেও খুঁজেছি। নাম্বার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি; তুমি কাদের সঙ্গে এলে?”

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আসছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রহ্মাঙ্গকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অহুসরণ করা সম্ভব হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু করে' সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঝঁপে অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল হ'তে তরলতর হ'তে হ'তে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হ'য়েছে, অল্পমনস্ক প্রহ্মাঙ্গ তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাঁছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপসা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি করে' ? আচার্য্য পূর্ণবর্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে'তাকে ভৎসনা করলেই বা কি করা যাবে? এ-রকম রাত্রে যে যুগযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে' উঠে, তার অবাধ্য মন যে এইসব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে মহাকোটী বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানস-সুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে' বেড়ায়, এর জন্তে সেই কি দায়ী!

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে' উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নরনারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। প্রহ্মাঙ্গের গতি আরো দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রহ্মাঙ্গের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর-একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে ধমুকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিক্‌চিকে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে' তার সর্কান্দে আলো আঁধারের জাল বুনেছে। প্রহ্মাঙ্গ চাইতেই সুনন্দা ঘাড় হুলিয়ে বলে' উঠল, “আর-একটু হ'লেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চলে' যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না!”

সুনন্দাকে দেখে' প্রহ্মাঙ্গ মনে মনে ভারি খুসী হ'ল, মুখে বললে, “না: তা আর দেখব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে? আর না দেখতে পেলেই বা কি? আমি তোমার উপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বলছি।”

সুনন্দা বললে, “দোষ করলেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে। সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে?

তা না যত রাণ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি করে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।”

প্রহ্ম বল্লে, “তুমি বড় মাহুঘের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বল্ছিলে?”

সুনন্দা বল্লে, “যাও! আর মিথ্যে ভাণে দরকার নেই। কি কথা মনে করে’ দেখ। সেই সেদিন বল্লে না?”

প্রহ্ম একটুখানি ভেবে বলে’ উঠল, “বুঝতে পেরেছি, সেই বাঁশী?”

সুনন্দা অভিমানের স্বরে বল্লে, “ভেবে দেখ বলেছিলে কি না। আমি ছপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে বসে’ আছি। একে ত এলেন বেলা করে’ তার উপর—যাও।”

প্রহ্ম এবার হেসে উঠল। বল্লে, “আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে ত আমায় ডাকলে না কেন?”

সুনন্দা বল্লে, “আমি কি একা ছিলাম? ছপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি করে’ ডাকব?”

প্রহ্ম বল্লে “আচ্ছা ধরে’ নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বল্চ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবস্খী থেকে একজন বড় বীণ-বাজীয়ে আসবেন; তুমি ত জানো, আমার অনেকদিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে যুঝিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?”

সুনন্দা বল্লে, “বাবা ৩৪ দিন হ’ল কোঁশাঘী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।”

প্রহ্ম হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বল্লে, “ওহো তাই! নইলে আমি ভাব্চি এত রাত পর্যন্ত সুনন্দা কি—”

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রহ্মের মুখে নিজের হাতছটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বল্লে, “চূপ্ চূপ্ তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!”

প্রহ্ম হাসি খামিয়ে বল্লে, “এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে বলে’ দেব নিশ্চয়—”

সুনন্দা রাগের স্বরে বল্লে, “দিও বলে’। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।”

প্রহ্ম সুনন্দার সৃগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেঁধে নিলে তার পর বল্লে, “আচ্ছা থাক, বলে’ দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই—আমার সঙ্গেই আছে—সত্য বল্চি তোমায় শোনার জন্মেই এসেছিলাম। তবে ঠুকে খুঁজ্ছিলাম, বীণটা ভাল করে’ শিখব বলে’।”

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রহ্ম বড় নিরুৎসাহ হ’য়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজালে বটে কিন্তু সে যেন ভাসা ভাসা স্বরের সঙ্গে, তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। আরও কতবার তারা দুজনে নির্জনে কতবার বসেছে প্রহ্মের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভাল বাসত বলে’। প্রহ্ম যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রহ্মের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় স্বরের মধ্য দিয়ে কত দিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ’লে প্রহ্মের এরকম নিরুৎসাহ ভাব ত সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি।

কি জানি কেন প্রহ্মের বার বার মনে আস্ছিল সেই জীর্ণ-পরিচ্ছদ-পরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক স্বরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুত্রতের আকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুঁথির ভূজ্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্ৰীতিকর মেটে লাল রং!

(২)

তার পরদিন সকালে প্রহ্ম নদীর ধারের ভাড়া মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপ-খোপের বাস। নিকট-

বর্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড়-একটা কেউ আসত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় ৭৮ মাস হ'ল সেখানে বাস করছেন। তাঁরই ছ'চার জন অল্পগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত-যেত বলে' মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল আছে।

অর্ধ অঙ্কার মন্দিরের মধ্যে প্রহ্মায়ের সঙ্গে স্বরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। স্বরদাস প্রহ্মায়কে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তার পর বললেন, "চল বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অঙ্কার।"

বাইরে গিয়ে স্বরদাস আলোতে প্রহ্মায়ের মুখ ভাল করে' দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন, "হবে, তোমার দ্বারাই হবে। আমি তা জান্তাম।"

প্রহ্মায় স্বরদাসের মূর্তি দূর থেকে ভেবে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রহ্মায়ের সে ভাব কেটে' গেল। সে লক্ষ্য করলে স্বরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হ'লেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

স্বরদাস বললেন, "আমি ভাব্ছিলাম তুমি আজ আসবে।—হাঁ তোমার পিতা ত একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?"

প্রহ্মায় লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে, "একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।"

স্বরদাস উৎসাহের স্বরে বললেন, "পারা ত উচিত। তোমার বাবাকে জান্ত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি-উৎসবেই কৌশাঘী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণ পত্র আসত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘমল্লার আলাপ করতে পার?"

প্রহ্মায় বিনীতভাবে উত্তর দিলে, "বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মন্ত্রে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘমল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।"

স্বরদাস বললেন, "কই, দেখি তুমি কেমন শিখেছ।"

বাঁশী সব সময়েই প্রহ্মায়ের কাছে থাকত। কখন কোন্ সময় স্নান করার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা ত যায় না।

প্রহ্মায় বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন করে' রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া

সঙ্গীতে, প্রহ্মায়ের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুল-ফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্নারাতের মর্ম ফেটে যে রসাধারা বিশেষ সব সময় ঝরে' পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে রস যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল। স্বরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রহ্মায়কে আলিঙ্গন করে' বললেন, "ইন্দ্রপ্রহ্মায়ের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশী কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জান্তাম।"

নিজের প্রশংসাবাদে প্রহ্মায়ের তরুণ স্নন্দর মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল।

অশ্রান্ত ছ' এক কথার পর, প্রহ্মায় বিদায় নিতে উচ্ছত হ'লে, স্বরদাস তাকে বললেন, "শোনো প্রহ্মায়, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব বলে' পূর্বেও আমি তোমাকে খোঁজ করেছিলাম; তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে একথা তুমি কার কাছে প্রকাশ করবে না।"

প্রহ্মায় অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রোচের সঙ্গে তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন?

সে বললে, "কি কথা না শুনে' কি করে'—"

স্বরদাস বললেন, "তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হ'লে আমি তোমাকে বল্তাম না।"

কি কথা জানবার অন্তে প্রহ্মায়ের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা করলে স্বরদাসের কথা কার কাছে প্রকাশ করবে না।

স্বরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন, "নদীর ঐ বড় বাঁকে যে টিবিটা আছে জানো—তার সামনেই বড় মাঠ? ওই টিবিটায় বহু প্রাচীন কালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল। শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ করে' সকলেই ওই মন্দিরে আগে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না করে' ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেকদিনের কথা; তার পর মন্দির ভেঙে চুরে' ওই টিবিতে দাঁড়িয়েছে। ঐ টিবিতে বসে' আষাঢ়ী

পূর্ণিমার রাতে মেঘমল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবিভূর্তা হন। এসংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাঁকে আন্তে পারা যায় তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত-সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম সাম্নের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা করে' দেখ'। তুমি কি বল?'

স্বরদাসের কথা শুনে প্রহ্ম অবাক হ'য়ে গেল। তা কি করে' হয়? আচার্য্য বহুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—একি সম্ভব?

প্রহ্ম চূপ করে' রইল।

স্বরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “এতে কি তোমার অমত আছে?”

প্রহ্ম বললে, “সে জ্ঞে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এটা কি করে' সম্ভব যে—”

স্বরদাস বললেন, “সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সাম্নের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা করে' রাখি।”

স্বরদাসের কথার পর থেকেই প্রহ্ম অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলে কেমন একরকম হ'য়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, “আচ্ছা রাখবেন, আমি আস্ব।”

স্বরদাস বললেন, “বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার করে' এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে বলে' দেব।”

প্রহ্ম আর-একবার সম্মতি-স্বচক ঘাড় নাড়বার পর স্বরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তার পর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরলে।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং! খেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য্য বহুব্রত বলেন বটে...

(৩)

ভদ্রাবতী নদীর ধারের শাল-পিয়াল-নকুমাল বনে সে-বার ঘনঘোর বর্ষা নামূল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিশিষ্ট মেঘ-বরণ চুলের রাস এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃত্ত-রজনীর ঘনাকার, তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকূল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আধি-হুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারি-বর্ষণ, মেঘমেহুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমক, তার হতাশ প্রাণে কণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রহ্ম স্বরদাসের সঙ্গে নদীর মাঠে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অম্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রহ্ম স্বরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান করে' এসে বস্ত্রপরিবর্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রহ্ম বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু শে শুনেছিল। স্বরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে করে' এনেছিলেন তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রহ্মকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রহ্ম হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জ্ঞে তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে অন্ধকার রাতে একজন প্রায় অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাতে হোম শেষ হ'ল।

স্বরদাস বললেন, “প্রহ্ম, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।”

তঁার চোখের কেমন-একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রহ্মায়ের ডাল লাগল না। তার পর সে বসে' একমনে বাঁশীতে মেঘমল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনের মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শাল-বনের ডাল-পালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শাল বনের কাছে দিক্চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার-শব্দ-শব্দায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে।—শুধু বিশ্রাম ছিল না উদ্ভাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মুহু মুহুনে আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে প্রাবিত হ'য়ে গেল। প্রহ্মায় সবিস্ময়ে দেখলে মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তঁার নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিগ্নস্ত-ভাবে তঁার অপূর্ণ ব্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তঁার আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপদ্ম কোন্ স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তঁার তুসারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণ-যজ্ঞিত, তঁার ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধ-লুকায়িত মণি-মেথলায় দীপ্তিমান, তঁার রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জগ্গে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে...হাঁ এই তো দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গল ঝঞ্ঝারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য-তুষ্ণা সৃষ্টি-মুখী হ'য়ে উঠছে, এঁর আশীর্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাঙারে বিশ্বের সৌন্দর্য-সম্ভার নিত্য অফুরস্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী!

প্রহ্মায় চেয়ে থাকতে থাকতে দেবীর মূর্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার স্তান হ'য়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হ'য়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রহ্মায়ের কেমন-একটা মোহের ভাব ধূর হ'ল না। সে যা দেখলে এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে

স্বরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। স্বরদাস বললে, “আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?”

স্বরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন হ'তে লাগল, তঁার মুখের দিকে চেয়ে প্রহ্মায় দেখলে তঁার চোখ দুটো যেন অর্ধ-অন্ধকারের মধ্যে জল জল করছে।

তঁার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল, পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে তা কেমন হলদে রংএর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এরকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল। তার পর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা, নিবিড় হ'য়ে জড়াজড়ি করে' আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হ'য়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব স্রুত পদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে একস্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথমে সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভাল করে' লক্ষ্য করে' দেখে' সে বুঝলে যে সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয় বরং ...কৌতুহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে' পড়ল। যে পিপ্পল-গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রহ্মায় অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একি! এঁকেই ত সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী ত!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে সেই অপরূপচ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে' বেড়াচ্ছেন, জোনাকীপোকার হাল থেকে যেমন আলো বার হয়, তঁার সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি এক-রকম স্নিগ্ধোজ্জল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জল হ'য়ে উঠেছে, আর-একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে তঁার আয়ত চকু দুটি অর্ধ-নিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাত্ড়ে পার হবার

পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিগল-গাছ-
গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখই অত্যন্ত
বিপন্ন মত !

প্রহ্মার হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে
সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এপর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা
আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে
নইলে একি কাণ্ড ?

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে
বার হ'য়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে
এসে পৌঁছল, ম্যান চাঁদ ওখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের
পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শযায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে' সে স্বপ্ন দেখলে,
ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে
কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি যতই উপরে
উঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা
দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে
আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হ'য়ে আসছে,
নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুকুরে রক্তাক্ত
করে' দিচ্ছে... ব্যথিত দেহা, বিপন্ন; বেপখুমতী দেবীর
দুঃখ দেখে' একটা বড় মাছ দাঁত বার করে' হিংস্র হাসি
হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত।

(৪)

প্রহ্মা ভোরে উঠেই আচার্য পূর্ণবর্দ্ধনের কাছে গিয়ে
সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি
পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে' বললে। আচার্য পূর্ণবর্দ্ধন বৌদ্ধ
দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মাঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই
ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজ্ঞ সবলেই তাঁকে
শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে' বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে
তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন,
“একথা আগে জানাওনি কেন ?”

“তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে
প্রতিজ্ঞা—”

“বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন ?”

“এখন আমার মনে হচ্ছে আমি কার যেন কি অনিষ্ট
করেছি।”

পূর্ণবর্দ্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তার পর বললেন,
“এইরকম একটা-কিছু ঘটবে তা আমি জানতাম।
পদ্মসম্বল আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক
শিষ্য দেশের ধর্ম-কর্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির
জন্তে এরা না করতে পারে এমন কোনো কাজই নেই—
আর আমি বেশ দেখছি প্রহ্মা, যে তোমার এই
অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্বনাশের
মূল হবে।—তুমি কালরাত্রে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা কার্য্য করেছ,
তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করার সহায়তা করেছ।”

এবার প্রহ্মার বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে
কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্দ্ধন বললেন, “এইসব
কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্তই আমি বিহারের
কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অমুমতি দিইনে,
কিন্তু—যাক— তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি ?
আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কিরকম বল দেখি ?”

প্রহ্মা সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন—“আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস
বলচ, তার নাম সুরদাসও নয় বা তার বাড়ী অবস্থীতেও
নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্য্যসিদ্ধির
জন্তে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে।”

প্রহ্মা অধীরভাবে বলে' উঠল, “কিন্তু আপনি
যে বলছেন—”

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন, “সে ইতিহাস বলছি শোনো। নদীর
ধারে যে সরস্বতী-মন্দিরের ভগ্নস্বূপ আছে, ওটা হিন্দুদের
একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু শত বৎসর
পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত, তখন মন্দিরের
খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে সে
গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে আষাঢ়ী পূর্ণিমার
রাত্রে তার আলাপে মুগ্ধ হ'য়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার
কাজে আবিভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির
এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হ'য়ে উঠে। সে গায়ক মারা
যাওয়ায় পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাত্রে সিদ্ধ গায়কে মল্লার
আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে
পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবস্থীর প্রসিদ্ধ গায়ক
সুরদাসের সঙ্গে ওই টিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস

মেঘমল্লারে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতীদেবী তাঁর সম্মুখে আবিভূর্তা, হ'য়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। স্বরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তার পর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকেই প্রার্থনা করে' বসে। সরস্বতী দেবী বলে-
 ছিলেন, তাঁকে পাওয়া নিগুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্যতঃ তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, কিন্তু সেজন্ম অনেক জীবন ধরে' সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অস্তহিতা হওয়ার পর মূর্তি গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্মোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করার জন্মে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে' দেন। এমব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেও জানেন। আমি অনেকদিন তার পর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জান্তাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কি না, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।”

প্রহ্মা সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে' গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল :—

যে ধম্মা হেতুপ্ভবা

তেসং হেতুং তথাগতো আহ,

তেসঙ্ক যে নিরোধো

এবং বদী মহাসমনো।

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় জামগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুত্রত হরিণ-

চর্মের আসনে বসে' বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাক্ষ্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রহ্মা যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখলে সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্যন্তও নেই! হু-একটা যবাগু পানের ঘট, আগুন জালাবার জন্মে সংগৃহীত কিছু শুকনো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক-ওদিক ছড়ান পড়ে' আছে।

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রহ্মা কাউকে কিছু না বলে' চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

(৫)

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রহ্মা একবার কেবল স্নান করার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বলেছিল সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশ যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে' আসবে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশ-মত ভগবান্ তথাগতের মূর্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হ'য়ে ছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম করে' তিনি যে মূর্তি গড়ে' তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রুঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুকের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্তি, তা সে-দেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশিলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর স্মৃতির অর্থ করে' উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের স্ববস্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন।

মহাকোটী বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুত্রত “বুদ্ধ ও স্ফাতা” নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করে'ও মনের মত করে' এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হ'য়ে ওদিক একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রহ্মা সন্ধান পেলে উকবিধ গ্রামের কাছে

একটা নির্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখন সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিষ গ্রামের প্রান্তে একটা বড় বট-গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝড়ঝড়ের বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশের মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিকমিক করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মতো জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে' আছে, অনেক বনুহংস তার জলে খেলা করছে।

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মতো জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রত্যয়ের হঠাৎ চোখ পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘট কক্ষ এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে' তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার এদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে' উঠল—এই ত! এই ত তিনি! ভদ্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই ত পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নারাতে এঁকেই ত সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতিমলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে' তার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোল-মাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ করে' বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে, তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চলে' এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রত্যয় এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যায় আগে দেবী পাহাড়ের গায়ে পথ বেয়ে নেমে আসেন আবার সন্ধ্যায় সময় ঘটবন্ধে

ধাপে ধাপে উঠে' চলে' যান—সে রোজ বসে' দেখে।

(৬)

এইরকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রত্যয় মাঠের গাছতলায় চূপ করে' বসে' আছে, সেই সময়ে দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশী জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্ত খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবাব পর চোখ তুলে' অপর পারে প্রত্যয়কে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তার পর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন, “ফুলটা আমায় তুলে' দেবে?”

“দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।”

“কি বলো?”

“আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।”

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিলে। বললেন, “আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্গে ফুল!”

প্রত্যয় জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ করে' ওপারে গেল। দেবী বললেন, “তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ বসে' থাক, না?”

প্রত্যয় তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বলল, “হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যায় সময় রোজই জল আন্তে আসেন।”

দেবী হাসিমুখে বললেন, “ওই পাহাড়ের উপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।”

হঠাৎ দেবী যেন কেমন এক প্রকার বিহ্বল-চোখে চারিদিকে চাইলেন। তার পর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রত্যয় পেছনে পেছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটা ছোট কুটির বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেবী বন্ধুতার খুলে' ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রত্যয়কে বললেন, “এস”।

প্রহ্মাঙ্গ দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে,
“আপনি কি এখানে একা থাকেন?”

দেবী বললেন, “না। এক সন্ন্যাসী আমার এখানে সন্দেশ
করে’ এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে
মাঝে এখান থেকে চলে’ যান, ৫১৬ দিন পরে আসেন।
তুমি এখানে বসো।”

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ করে’ তাকে যবাগু পান করতে
দিলেন, স্বাদ অমৃতের মতো, এমন সুস্বাদু যবাগু সে পূর্বে
কখনো পান করেনি।

প্রহ্মাঙ্গের মনে হ’ল যদি আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কথা
সত্য হয় আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেচে তা ইন্দ্রজাল
না হয় তবে এই ত দেবী সরস্বতী তার সামনে। তার
জানুবার কোঁতুল হ’ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন।

সে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনারা এর আগে কোথায়
ছিলেন? আপনার দেশ কোথা?”

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সমস্ত সূপ ও অন্ন পরিবেষণে
ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে’ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রহ্মাঙ্গের
দিকে চেয়ে বললেন, “আমার কথা বলছ? আমার দেশ
কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে
এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় পড়ে’ ছিলাম, সন্ন্যাসী
আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। সেই থেকে এখানেই
আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা আমার মনে পড়ে
না।”

তিনি অন্তমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে
যেখানে উরুবিষ গ্রামের প্রান্তের বনরেখার মাথায় সূর্য্য
হলে পড়েছেন, সেই চিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে
কি মনে আনুবার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না।
হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ীর মত চোখদুটি বেয়ে
ঝরঝর করে’ জল ঝরে’ পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রহ্মাঙ্গের সামনে
অঙ্গে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন, “খাবার জিনিস
কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের
বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী
করে’ খেতে দেব। সকালে যেও।”

প্রহ্মাঙ্গের চোখে জল আসছিল।...ওগো বিশ্বের

আত্মবিশ্বাসী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর
মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক বণা
ধুলারও যোগ্য নয়, সে-দেশের পথের ধূলো এমন কি পুণ্য
করেছে, মা, যে তুমি সেখানে পড়ে’ থাকতে যাবে?

থাওয়া শেষ হ’লে প্রহ্মাঙ্গ বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে’ উঠল, বললেন,
“থাকো না কেন রাত্রে? আমি বাত্রে পায়স রেঁধে দেব।”

প্রহ্মাঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে, “আপনার এখানে একা রাত্রে
থাকতে ভয় করে না?”

“খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন
নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না,
সমস্ত রাত বসেই থাকি।”

প্রহ্মাঙ্গের হাসি পেল, ভাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয়
করে বলে’ পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সন্দেশ
রাখতে চান। সে বললে, “আচ্ছা রাত্রে থাকব।”

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ’ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায়
বসে’ কাটালে। দেবীও কাছে বসে’ রইলেন। বললেন,
“এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে
পারিনে, ঘরের মধ্যে বসে’ রাত কাটাই।”

দেবীর ব্যাপার দেখে’ প্রহ্মাঙ্গ অবাক হ’য়ে গিয়েছিল।
হ’লেই বা মন্ত্রশক্তি, কিন্তু এতটা আত্মবিশ্বাস হওয়া, এ যে
তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ’লে সে বিদায়
চাইলে।

দেবী বলে’ দিলেন, “সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার
এস।”

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে
পাহাড়ের নীচে বসে’ কুটীরের দিকে চেয়ে পাহারা
রাখত। তার তরুণ, বীর হৃদয় এক ভীষণ নারীকে
একা বনের মধ্যে ফেলে’ রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
তুলেছিল।

দশ পনের দিন কেটে গেল।

এক একদিন প্রহ্মাঙ্গ শুনত, দেবী অনেক রাত্রে একা
গান করছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে

গান প্রাণধারায় আদিম ঝরণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকা-
দেব গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন্ পথিক তারার
গান।

(৮)

একদিন ছুপুর বেলা কে তাকে বললে, “তুমি যে গো-
বৈদ্যের কথা ব'ল্ছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম,
পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।”

শুনে' ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে পুকুরের ধারে উপস্থিত
হ'ল। দেখলে সত্যই গুণাচ্য পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি
নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা
করতে লাগল।

একটু পরে গুণাচ্য বস্ত্র পরিবর্তন করে' উপরে উঠে'
প্রদ্যায়কে দেখে' কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন, “তুমি
এখানে?”

প্রদ্যায় বললে, “আমি এখানে কেন তা বুঝতে পারেন-
নি?”

গুণাচ্য বললেন, “তুমি এখন বলছ বলে' নয় প্রদ্যায়, আমি
একাজ করবার পর যথেষ্ট অস্থতপ্ত আছি। প্রতিরাত্রে
ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে তুই যে কাজ
করেছিলি এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্মেই আজ
এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর
কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি
শিক্ষা করি। এর এমন শক্তি যে ইচ্ছা করলে আমি যাকে
ইচ্ছা বাঁধতে পারি, কিন্তু আন্তে পারিনি। মন্ত্রের বন্ধনের
শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্মে আমি
তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজের সঙ্গীতের কিছুই
জানিনি যে তা নয়, কিন্তু আমি জান্তাম যে তুমি মেঘ-
মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই।
এলে তার পর মন্ত্রে বাঁধ্ব। এর আগে আমার বিশ্বাসই
ছিল না যে এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা
মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কোঁতুহলেই আমি একাজ
করি।”

প্রদ্যায় বললে, “এখন?”

গুণাচ্য বললেন, “এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই
আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন,

এটা পূর্ন মন্ত্রের বিরোধী-শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত
জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন
বটে, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।”

প্রদ্যায় জিজ্ঞাসা করলে, “উপায় নেই কেন?”

“যে ছিটিয়ে বেবে সে চির-কালের জন্ম পাষণ হয়ে
যাবে। আমার পক্ষে হৃদিকই যখন সমান, তখন তাঁকে
বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যায়,
ভেবে দেখ মৃত্যুর পর হয়ত পরজগৎ আছে কিন্তু
পাষণ হওয়ার পর? তা আমি পারব না।”

আত্মবিশ্বস্তা বন্দিনী দেবীর চোখ দুটির কল্পণ
অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যায়ের মনে এল। যদি তা না হয় তা
হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে
তরুণদের নির্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যায়ের
প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবল—
একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাজা পা-ছখানিতে একটা
কাটা ফুটলে তা তুলে' দেবার জন্মে আমি শতবার জীবন
দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাচ্যের দিকে চেয়ে সে বললে, “চলুন
আপনার সঙ্গে যাব। আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।”

গুণাচ্য বিস্ময়ে প্রদ্যায়ের দিকে চেয়ে বললেন, “বেশ
করে' ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ—”

প্রদ্যায় বললে, “চলুন আপনি।”

(৯)

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্তী হ'ল তখন গুণাচ্য
বললেন, “প্রদ্যায়, আর-একবার ভালো করে' ভেবে
দেখ, কোনো মিথ্যা আশায় ভুলো না। এ থেকে
তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুক হবে না—
দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের
জন্ম জড় হ'য়ে যাবে; বেশ-বুঝে' দেখ। মন্ত্রশক্তি
নির্মল অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবেনা।”

প্রদ্যায় বললে, “আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ
করি?—কিছু না, চলুন।”

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন
রোদ বেশ পড়ে' এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে

ঘাসের উপর অন্তমনস্কভাবে চুপ করে' বসে' ছিলেন—
প্রহ্মায়কে আসতে দেখে' তিনি অত্যন্ত আনন্দিত
হলেন, হাসিমুখে বললেন, “এস, এস। আমি তোমার
কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে
না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল।
এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।” তার পর তিনি
ছজনকে খেতে দেবার জন্তে ব্যস্ত হ'য়ে কুটারের মধ্যে
চলে' গেলেন।

প্রহ্মায় বললে, “কই, আমায় সে মন্ত্রপূত জল দিন
তবে ?”

গুণাঢ্য বললেন, “সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত ?”

প্রহ্মায় বললে, “আমায় আর কিছু বলবেন না, জল
দিন।”

দেবী কুটারের মধ্যে আহারের স্থান করে' ছজনকে
খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল, তখন
সন্ধ্যার আর বেশী দেৱী নেই। বেতস-বনে ছায়া নেমে
আসছে, রাঙা সূর্য্য আবার উরুবিষ গ্রামের উপর ঝুলে'
পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপকূপ শ্রী
ফুটে' উঠল।

তার পর তিনি ঘট-কক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের
ঝরুণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন, “আমি এখান থেকে আগে চলে'
যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে
দিও।”

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রহ্মায়কে
আলিঙ্গন করে' বললেন, “আমি কাপুরুষ, আমার সে
সাহস নেই, নইলে—”

তিনি কুটার মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে' নিলেন।
তার পর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের
অপর পারে চলে' গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে
মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবন্দী।

প্রহ্মায় চারিদিক চেয়ে বসে' বসে' ভাবলে, ঐ নীল
আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে
শনৈছিল, তার সে মা—বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে বসে'

বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়ত প্রবাসী
পুত্রের কথাই ভাবছেন,—মায়ের মুখখানি একবারটি
শেষবারের জন্ত দেখতে তার প্রাণ আকুল হ'য়ে
উঠল। ঐ পূর্ব-আকাশে নবমী চাঁদ কেন উজ্জল
হয়েছে? মগধ যাবার রাজপথের গাছের সারির মাথায়
একটা তারা ফুটে উঠল, বেতবনের বেতভাঁটাগুলো
তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রহ্মায়ের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময় সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা
বেয়ে উঠে' আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে
নামিয়ে রেখেছিল; দেবীকে আসতে দেখে' সে তা হাতে
তুলে' নিলে।

দেবী কুটারের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেক-
গুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রহ্মায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, “সন্ন্যাসী কোথায় ?”

প্রহ্মায় বললে, “তিনি আবার কোথায় চলে'
গেলেন। আজ আর আসবেন না।”

তার পর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধূলা নিয়ে তাঁকে
প্রণাম করে' বললে, ‘মা, না জেনে তোমার উপর
অত্যন্ত অগ্নায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি
আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্ত এতটুকু
দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হ'য়ে যায়, ততক্ষণ এই
ভেবে আমার স্মৃথ যে বিশ্বের সৌন্দর্যালক্ষ্মীকে অগ্নায়
বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।”

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রহ্মায়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রহ্মায় বললে, “শুমন, আপনি বেশ করে' মনে করে'
দেখুন দেখি আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?”

দেবী বললেন, “কেন, আমি ত বিদিশার পথের
ধারে—”

প্রহ্মায় এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোখিতার মত দেবী যেন চমকে উঠলেন...

প্রহ্মায় দৃঢ়হস্তে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্বাঙ্গে
ছিড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্তে তার চোখের সামনে
বাতাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ প্রসঙ্গ হিলোল ব'য়ে
গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল; সঙ্গে

সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার আকাশে বন্ধ আঁখি বাতায়নপথবর্তিনী তার মা!

(১০)

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী শ্রমস্তদাসের মেয়ে। পিতামাতার অনেক অমুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের প্রকার পাত্রী হ'য়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারু সঙ্গে সে তেমন মিশ্র না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্বদাই কেমন অল্পমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জন পাষণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন-মনে প্রায়ই কি ভাবত, মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত যেন কতদিন আগে তার প্রিয় আবার আসবে বলে' চলে' গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুনে' গুনে' এ শ্রান্ত শাস্ত ধীর পথ-চাওয়া...প্রতি-সকালে সে

কার প্রতীক্ষায় উন্মূখী হ'য়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন মাসের পর মাস এরকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল,—কেউ এস না... তবু মেয়েটি ভাবত আসবে...আসবে কাল আসবে... পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল ?

(১১)

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথা-কার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকান এক অর্ধ-ভগ্ন পাষণ মূর্তি। নিরুপম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় হুল্লে, বাঁশবনে শিরশির শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষণ মূর্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে' গেছে। সে অন্ধকার অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে' কেবলই বাজছে মেঘমল্লার!...

ভোরে উঠে' রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্তি, কিসের এসব অর্থহীন ছঃস্বপ্ন!...

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীন স্পেন

(১)

স্পেনও চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। বিগত বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্পেনের নরনারীর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পরাজিত হইবার পর স্পেন একদম কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। সেই পরাজয়ের ফলেই এসিয়ার ফিলিপিন্ দ্বীপগুলো স্পেনের হাত হইতে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও স্পেন নিরুপম মারিয়া পড়িয়া-ছিল। কিন্তু মাস-কয়েক ধরিয়া স্পেনে জাগরণ দেখা গিয়াছে। মরক্কোর মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের থাকায় স্পেনের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে বুঝিতেছি।

এই জাগরণের আন্দোলনে মাথা তুলিয়াছেন সেনাপতি দ'রিভেরা। ইহাকে ইয়োরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রিকেরা ইতালীর মুসোলিনির সঙ্গে তুলনা করিতেছে। স্পেনের যুবক-সমাজেও 'ফাসি'-পন্থী ন্যাশনালিষ্ট আন্দোলন দেখা দিয়াছে। যুবক স্পেন স্বদেশে শক্তি-কেন্দ্র-শিল্প-শক্তি এবং ধনশক্তি গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী। বিদেশে একটা "বৃহত্তর স্পেন" গড়িয়া তোলাও যুবক স্পেনের সাধনার লক্ষ্য দেখা যাইতেছে।

(২)

দ'রিভেরা স্পেনের রাজশক্তিকে প্রবল করিয়া তুলিতেছেন। কার্টাগেনা শহরে ১৮৯৮ সালের মৃত

ফৌজ নাবিবদের কবর পরিদর্শন করিবার জন্ত ইনি রাজা ও রাণীকে লইয়া যান। সেইখানে ইহাদের সবিশেষ সম্বন্ধনা করা হইয়াছে। গোটা দেশের লোক রাজ-দম্পতীকে জাতীয়তার প্রতিমূর্তিরূপে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐক্যবন্ধ হইয়া উঠিতেছে।

রাজা ও রাণী তার পর স্পেন ছাড়িয়া ইতালী পর্যটনে বাহির হন। এই ঘটনায় এক টিলে অনেক পাখী মারা হইয়াছে। দ'রিভেরার কৃতিত্ব স্পেনের কাগজে কাগজে চরম প্রশংসা পাইতেছে।

স্পেনের রাজবংশ ক্যাথলিক মতের খুঁটান। ইতালীতে রোমের ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ স্পেনের রাজদম্পতীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া গোটা খুঁটান জগতে স্পেনের ইচ্ছা বাড়াইয়া দিয়াছেন।

(৩)

ইতালীর রাজবংশও ক্যাথলিক বটে। কিন্তু পোপের সঙ্গে ইতালীর নরপতির বনিবনাও ছিল না। এই বনিবনাও কায়েম করিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য বাড়াইবার জন্ত ইতালীর ফাসিষ্টরা একজন ক্যাথলিক রাজার সাহায্য খুঁজিতেছিল। পুরাণা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর বাদশা ক্যাথলিক ছিলেন। কিন্তু সেই বংশ যুদ্ধের ফলে লোপ পাইয়াছে।

কাজেই মুসোলিনির নজর ছিল স্পেনের দিকে। দ'রিভেরার সাহায্যে ইতালীয়ানরা স্পেনের রাজা-রাণীকে স্বদেশে অতিথিরূপে পাইয়া তাঁহাদের দ্বারা “স্বাটিকান” (পোপের দরবার) ও “কিরিনাল” (রাজ-দরবার) এই দুইএর বিবাদ মিটাইয়া লইতে পারিয়াছে। এইজন্য দ'রিভেরাকে তারিফ করিয়া ইতালীয়ানরা স্পেনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। যুবক স্পেন ইতালীর প্রশংসা পাইয়া আরও জোরের সহিত জগতে “বৃহত্তর স্পেন” গড়িবার আন্দোলনে মাতিতেছে।

(৪)

স্পেন ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপদ্বীপ। আর ইতালী এই সাগরেরই মধ্য উপদ্বীপ। এই দুই উপদ্বীপের লোকেরা যদি একটা সমঝোতা করিয়া বসে তাহা হইলে ইহারা ফ্রান্সকে কোণঠাসা করিতে পারে। ইংল্যান্ডের বাণিজ্য-

তরী, রণতরী এবং ভারতপথও বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে পারে।

ইতালীতে বেড়াইবার সময় দ'রিভেরা অথবা কোনো স্প্যানিশ কর্মচারী এই ধরনের রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সম্বন্ধে টুঁ পর্যন্ত করেন নাই। ইতালীর এবং স্পেনের সকল কাগজেই কেবলমাত্র বলা হইয়াছে যে দুই জাতির ভিতর ল্যাটিন রক্তের এবং ল্যাটিন সভ্যতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধটাই পাকাইয়া তোলা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।

কিন্তু প্যারিসের “ম্যাগা” দৈনিক জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—“তাহা হইলে ম্যাড্রিডের ‘এল দেবাই’ কাগজে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের স্পেন-ইতালীয় গুপ্ত সন্ধিটার কথা আলোচনা করা হইতেছে কেন?” সেই সন্ধিটা নাকি জার্মান মন্ত্রিবর বিস্মার্ক ফ্রান্সকে রাষ্ট্রমণ্ডলে একলা কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার জন্ত ঘটাইয়াছিলেন।

(৫)

ভূমধ্যসাগর বৃটিশসাম্রাজ্যের পক্ষে ভারত-পথ। এদিকে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিতে হইলে দক্ষিণ ইয়োরোপের সকল দেশকেই এই পথের শরণ লইতে হয়। স্পেনের মরক্কো, ফ্রান্সের আলজিরিয়া ও টুনিষ্ এবং ইতালীর ত্রিপোলি সবই ভূমধ্যসাগরের রণতরীর উপর নির্ভর করে।

লণ্ডনের “টাইম্‌স্” বলিতেছেন :—“স্পেনের অল্প পূর্বদিকে বালিয়ারিক দ্বীপগুলা স্প্যানিশদেরই মল্লুক। এই দ্বীপগুলোয় যদি গণ্টনের ও জাহাজের কেন্দ্র কায়েম করা হয় তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের জলপথ বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতে পারে। আর ইতালী এবং স্পেন যদি একমত হয় তাহা হইলে এই সাগরে বিদেশী যেকোন রাষ্ট্রকে মাথা নীচু করিয়া চলিতেই হইবে।” বস্তুতঃ তাহা হইলে কম-সে-কম ফ্রান্সের পক্ষে আলজিরিয়া এবং টুনিষ্ রক্ষা করা বিশেষ কঠিনই হয়।

(৬)

স্পেন হইতে এক ব্যক্তি জুরিখের “নয়েৎসিয়ার খারৎসাইটুঙ” কাগজে একটা চিঠি লিখিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, যোগ হইতে ম্যাড্রিড পৌছিয়া দ'রিভেরা

প্রকাশ সভায় জানাইয়াছেন যে, মিনরকা স্বীপের মাহন বন্দরে একটা উড়ো জাহাজের ডিপো গড়িবার বন্দোবস্ত চলিতেছে ; এই ডিপো হইতে নিয়মিতরূপে ইতালীতে, স্পেনে এবং মরক্কোয় উড়োজাহাজ চলাকরা করিবে।”

দ’রিভেরা, রোমে থাকিবার সময় ফাসিষ্টদের বড় আফিসে কয়েকবার দেখা দিয়াছিলেন। ইতালীর আদর্শ, মুসোলিনির মহত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি ইতালীয়ান সমাজে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি “ল্যাটিন” শ্রাতির গৌরব এবং মুসোলিনির কীর্তি শতমুখে প্রচার করিতেছেন। যুবক স্পেন তাতিয়া উঠিতেছে।

মুসোলিনি এবং দ’রিভেরা দুয়ে মিলিয়া “বৃহত্তর

ল্যাটিন” জগতের কন্দি আঁটিয়াছেন। আর্টনাটিকের অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেখানে যেখানে স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত আছে সেই-সকল দেশের সঙ্গে স্পেনের বন্ধুত্ব কায়েম করিবার দিকে নজর পড়িয়াছে। শীঘ্রই স্পেনের রাজদম্পতী দ’রিভেরার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায় শফরে বাহির হইবেন শুনা যাইতেছে। এই-সকল দেশে গগতন্ত্রের স্বরাজ কায়েম হইবার পূর্বে স্পেনই তাহাদেব হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল। সেই পুরানো স্মৃতিটা যুবক স্পেনের সর্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। আজকাল অন্ততঃপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ যাহাতে ঐসকল দেশে পাকিয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করা স্পেন এবং ইতালী দুইদেশের ফাসিষ্টদেরই সমবেত স্বার্থ।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

কৈকেয়ী

(১)

[দশরথ, কুলপুরোহিত, পৌর-নর-নারীগণ প্রভৃতি সকলের কাতরতা অগ্রাহ্য করিয়া হিংস্র অটলতার সহিত কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন।]

বলে বলুক মন্দ লোকে, নেইক লজ্জা, নেইক ভয় ;
কিসের আবার মান অপমান ? লভেছি আজ কাম্য জয়,
জয় লভেছি আশুপ্রসাদ !—বহু দিনের বাঞ্ছা মোর
পূর্ণ যে আজ, তৃপ্ত এ বুক !—দুখের নিশা আজকে ভোর !
লক্ষ কথা বলবে সতীন,—বলুক, তাতে ভয় কি পাই ?—
তাই বলে’ কি টল্বে এ মন ? নেইক মনে ভয়ের ঠাই ।
খাঁড়ার মত রূপ দিলে যেই জয় করেছে রাজার মন
তার আশা বল্ কধ্বে কে বা ? মন কবে তার কেই দমন ?
আজ যা ভাবি কাল তা করি, অপূর্ণ নয় মনের সাধ ;—
কৈকেয়ীকে দাবিয়ে দেবে ? ঘটবে যে তার বিষম বাদ ।
চোদ্দ বছর ঠিক সে গোনা, একটি দিনও কৃষ্ণ নয় ;
রামকে ভালোবাস্তে পারি, তাই বলে’ কি কবুব লয়
মোর ভরতের পরম স্তনিন আশার মুখে চাপিয়ে ছাই ?
কৈকেয়ী নয় তেমন মেয়ে, লজ্জা তাহার নেইক নাই ।

নাই গানি তার, চায় না সুনাম, চায় মেটাতে প্রাণের আশ ;
রাজার বেশে ভরত !—কী সুখ !—হৃদয় ভরে কী উল্লাস !
তাই দেখে’ ত জুড়োবে প্রাণ, সুখ সে পরম অগাধ সুখ !—
সেই সুখেরি স্বপন আমার ভাসায় গানি, বাঁধ্ছে বুক—
বাঁধ্ছে বুক করতে বিলোপ সব অগবাদ, সব ঘৃণা ;
আমায় বলে স্বার্থে ভরা ?—কে রয় আপন সুখ বিনা ?
যুদ্ধক্ষত—কৈকেয়ী তা চুষুক সেবুক সারিয়ে দিক !
উপহার তার নেইক কিছুই ?—ধিক দশরথ, কথায় ধিক !
মনটা যদি এতই চপল, করলে কেনই প্রতিজ্ঞা ?
দেবো বলে’ চাও ঠকাতে ? কৃপা দিতে দেবার যা ?
কৈকেয়ী নয় তেমন নরম গলাবে তায় চোখের জল !
বল্লে, দেবো, তাই চেয়েছি ;—এতেই হলাম কপট খল ?
হই না কপট, হলাম বা খল,—ঘৃণাই যদি, যাও ছেড়ে ;
আমার ভরত রাজ্য পাবে—এ সুখ নেবে কেই কেড়ে ?
মান্বে শাসন, কবুবে সে ভয় ?—কৈকেয়ী সে পাত্র নয় !
চিরদিন যে জয় পেয়েছে আজ নেবে সে পরাজয় ?
কাণাকানি উগ্র কথা চোখের জলে টল্বে না,
যতই ছড়াও রোষের সে বিষ কৈকেয়ী তার মরবে না ।

রাজার রাণী, নইত দাসী, বলবে যে যা শুন তাই ?
রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার মাতাও হ'তেই চাই ।
সতীনের প্রেম—চাই নাক তা ; স্বামীর সোহাগ—

পেলাম ঢের ;

আখীরি ভালোবাসা ?—যাক তা চুলোয়, আসবে ফের,
সবই ফিরে' আসবে সেদিন আসবে যে-দিন সূদিন মোর,
ধুয়ে মুছে করব বিলোপ এ হিংসা ঘেষ আখির লোর ।
রামের হবে রাজ্যাভিষেক, ভরত আমার রইল দূর,
কাঁটা সে কি ?—তাড়িয়ে দিলে তাকে হ'তে রাজ্যপুর ?
কন্দী তোমার সব বুঝেছি, সব চাতুরী, দশরথ !
কাঁটা ভেবে সরাও তারে,—কাঁটায় তোমার ভরব পথ ।
মহারা ! তুই ঠিক বলেছিস, রামকে দিয়ে রাজ্য-দেশ
আমায় এরা করবে নীচ, শাসবে আখি রাঙিয়ে বেশ ;
শোধ নেবে সব হিংসা যত, করবে আমায় গর্জহীন ।
কেমন করে' হয় তা দেখি ।—কৌশল্যা আর সব সতীন—
পায়ের নীচে রাখছ যাদের আমায় তারা দল্বে পায় ?
কৈকেয়ী এ কুর নাগিনী, ছোবল দিতে সুখ সে পায় ।
না, না, আমার নেইক ত প্রেম, রামকে ভালোবাসব না,
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেলব না ।
পুত্রশোকে মরবে রাজা, কাতর হবে প্রজার দল
রাম গেলে বন ।—ভরতকে কি আনল টেনে বানের জল ?
সে যদি হয় রাজা, তাতে দুঃখ বুড়োর হয় কিসে ?
প্রজাই এত কাতর কিসে ? রাজার ছেলে নয় কি সে
ভরত আমার ? আছি য'দিন দেখব কেমন কে পারে
রুধতে তারি রাজা হওয়া !—করব আমি ঠিক তারে
অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনের একচ্ছত্র রাজার রাজ ;
কৈকেয়ী নয় কোমল মেয়ে,—ইচ্ছা যা তার হয় তা কাজ ।
কাঁছক বুড়ো, কাঁছক সতীন, কাঁদিয়ে আমায় করবে সুখ !
আমার মুখে ঢালবে কালি ?—করব কালো সবার মুখ !

(২)

[দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় কিরীয়া আসিয়া ভরত কৈকেয়ীকে
বধেট ভৎসনা করেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কৌশল্যার নিকট
পশ্চাৎ করেন ।]

স্বামী আমার !—আছেই ত তা, থাকবে ত এই অহঙ্কার ;
সাধ করেছি যখন যা তা ঠিক করেছি ; সাহস কার

রুধতে মোরে, ঠেলতে মোরে ?—মানুষ আমি বন্ধ নই !
কিন্তু ভরত ভৎসনা করে !—শুনছ তাও ? কারেই কই ?
আমায় বলে রাক্ষসী সে ! আমায় বলে স্বার্থপর !
আমায় বলে পিশাচী সে ! সাপের সমান বিষধর !
আর যে বলে বলুক এসব ; ভরত ! তুইও বলবি সেই ?
বুকের রক্তে করছ মানুষ,—তার কি কোনই মূল্য নেই ?
করব আমি তোর অশুভ ?—কেমন করে' বুঝি তাই ?—
সং-মা হ'ল আমার সেরা ? আমার মুখে ঢালি ছাই !
যাহার জন্তে সব সয়েছি সে আজ মোরে দল্ল পায় !
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছি, সতীন-সোহাগ—

ছাড়ছ তায় ;

দাসদাসীদের মৌন ঘৃণা, অযোধ্যারি রোষের বিষ
তোর তরে যে সইছ সবি ! তুই আজ মোরে এ কি দিস !—
সেই অবজ্ঞা ! সেই হলাহল ! সেই অনাদর ! অপমান !
সব পীড়া প্রাণ সহিতে পারে, তোর অপমান সয় না প্রাণ !
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজ এ কি তুই !
শুভই যা তা ভাবছি সদা ;—একটি যে-তুই, নেইক তুই !
সিংহাসনে তোরে, মাণিক, দেখব সে যে অগাধ সাধ ;
সব আশা মোর নিভিয়ে দিলি ? ঘটিয়ে দিলি কী প্রমাদ !
দুঃখ ঘৃণা সইছ সবি, ভাবছ পাবি রাজ্যধন,—
সেই সুখে মোর রইল পরাণ, হর্ষে ভরা রইল মন ।
সে ভরত আজ ত্যাগ করেছে, সে বলেছে—রাক্ষসী !
রাখছ চেপে যে-সব ব্যথা আজ উঠে সব উচ্ছসি' ।
যাক অযোধ্যা যাক রসাতল, আয় রে প্রলয় গর্জ্জ' আয় !
আমার স্বপন ভগ্ন যখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায় ?
যাক ভেসে যাক আজকে রাতে অযোধ্যাদেশ লুপ্ত হোক,
লুপ্ত হোক ও হাজার লোকের ঘৃণায়-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ !
কৈকেয়ীকে কাঁদিয়েছে আজ ভরত তারি পেটের পুত ;
যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল—শোকের দূত ।
কাঁদব আমি, নেই দুঃখ তায়, এ কান্নারি সঙ্গে আজ
যত্নে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঝ ।
আজকে হ'তে কৈকেয়ী সে ভাববে তাহার ছেলেই নেই ।
ভরত—সে ত শক্র তারি !—মরেছে সে, নেইক সেই ।
নেবে না সে রাজ্য ও ধন, আনতে রামে ছুটবে বন ;
আপন মাকে এই অপমান করলে ভরত !—কী ভীষণ !

দুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিন্নু আমি বিপুল সুখ,
বুক দিয়ে যায় করুণ মানুষ, সে এই আমার রাখছে মুখ !
যে গর্ক মোর দাঁড়িয়েছিল উচ্চশিবে আকাশ-গায়,
ভরত !— তারে হুইয়ে ধূলায় করলি গুঁড়া অবজায় !

(৩)

[যুগায় ও বিক্রমে জর্জরিতা কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গোপনে
অনুতাপে চতুর্দশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রামের অযোধ্যায় ফিরিবার
সময় তাঁহার অনুতাপ প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠে। মূল বাল্মীকির
রামায়ণে উল্লেখ না থাকিলেও কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম 'মা' বলিয়া
না ডাকিলে বিষাক্ত লাড়ু খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কৈকেয়ী এমন
প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন।]

চোদ্দ বছর রাম গেছে বন,—আস্ছে নাকি

কাল সে ফিবে,—

বাহন তারি কোন্ হনুমান জুনিয়ে গেল। কালকে কি রে
এই পোড়া মুখ তুলব আমি সেই সে রামের চোখের 'পরে,
হিংসা-বিষে জ্বলিয়ে যারে তাড়িয়ে দিহু সুখের তরে ?—
তাড়িয়ে দিহু গহন বনে,—রাজ্য-সুখ ও স্নেহের সুখ
সকল কেড়ে করুণ কাল, শাস্তি দিহু কঠোর দুখ।
চোদ্দ বছর প্রতিটি দিন রামের ব্যথা বাজল মোর
পাষণ বৃকে ; বনচারী তার নয়নের তপ্ত লোর
অগ্নিবিন্দু সমান আমার বৃকের মাঝে রাত্রিদিন
বোধ করেছি, জ্বালিয়ে দেছে, পুড়িয়ে মোরে করলে ক্ষীণ।
সেদিন আমি ভুলিনি যে—আমিই যেদিন পাঠাই বনে
সাক্ষ্য চোখে মোরই কাছে বিদায় নিলে মোর চরণে !
তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করণ ছবি,
ভরত আমায় ছাড়লে যেদিন, সেদিন হ'তে বৃক্স সবি
রামের বেদন, তার সে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে,—
সে ব্যথা মোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে।
ছাড়লে সতীন, পৌরনারী, ছাড়লে দাসী, রাখলে দূরে
ক্রুর নাগিনী কৈকেয়ীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে।
বিরাত পুরীর একটি কোণে বরুণ কঠোর নিৰ্জনতা,
দিনের পরে দিন চলে' যায়,—বক্ষে জমে বিরাত ব্যথা।
ক্রুর নাগিনীর বিষের সে দাঁত ভাঙলে ভরত—

জানবে কে তা ?

পুড়ছে গরল দুখের দাহে, বৃক্সে না কেউ, কেউ না হেথা !

রাম-বনবাস-ষষ্ঠ-দিনে দশরথ ত তাজলে দেহ,
ভরত দিলে তৎসনা মোরে, রইল কে আর করতে স্নেহ ?
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্ক রবে—
শাসিয়ে যারে ভুলিয়ে যারে কৈকেয়ী তার কাম্য লবে ?
সেদিন হ'তে নেই কেহ নেই, রইল কোণে ঘৃণ্য একা ;
লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা !
হিংসামূলে ঘৃণ ধরেছে, বোঝেনি তা কেউ দরদী ;
কেউ আসেনি জানতে কি তাপ করছে শোষণ নিরবধি।
আপন-গড়া দুঃখ আমার আপন হ'য়েই রইল নিতি,—
জানলে না কেউ,—পেলাম শুধু নিদয় ঘৃণা, নিদয় ভীতি।
বনে বনে রাম ঐ ঘোরে দুঃখে ক্রেশে,—আমার হিয়ায়
সে ব্যথা যে বাজল কী ঘোর কী পীড়াময়—

বুঝবে কে তা ?

আমায় সে যে 'মা' বলেছে—সে কথা কি ভুলতে পারি ?
পাষণ ছিহু সে এক দিনে,—তাই বলে' কি নইক নারী ?
ছয় ছটা দিন পাশের ঘরে দশরথের আর্ন্তরবে
প্রাণ গেলনি,—আশায় ছিহু প্রাণের ভরত বস্বে যবে
অযোধ্যারি সিংহাসনে, মিটবে আমার সকল গ্নানি ;
তার পরে সব উর্ণে' গেল,—ভরত দিলে বজ্র হানি' !—
সেই আঘাতে গর্ক গুঁড়া, সেই আঘাতে বৃক্স আঘাত
রামের বৃকে দিলাম যাহা—ঘটল যাহে রাজার নিপাত।
গভীর রাতে রোজ মনে হয়—দাঁড়িয়ে যেন সেই দশরথ
সামনে আমার ক্রুদ্ধ চোখে কটমটিয়ে,—করবে যে বধ !
চমকে শুনি, ঘুম ভেঙে যায়, পাজর-ভাঙা সেই সে ধনি
দশরথের সেই সে বিলাপ,—বুক কাঁপে মোর, প্রহর গণি !
মূর্ত্তিমন্ত এস রাজা জীবন লয়ে দাঁড়াও ভুঁয়ে—
সব অপরাধ করব স্বীকার, চাইব ক্ষমা চরণ ছুঁয়ে।
বসনহীনা ভিখারিণীর নগ্ন গায়ে বৃষ্টি-ধারা
যেমন বেঁধে, তেমনি যে রে রামের নিশাস তীব্র পারা
আমার বৃকের চামড়া ভেদি' মর্ষমাঝে বেদন তোলে !
অনশনে রাম যে বনে,—সে কথা কি এ মন ভোলে ?
চোদ্দ বছর 'মা' বলেনি ভরত আমায়—পাইনি কোলে,
সকল স্নেহ সব অভিমান বক্ষে জমে' উতল দোলে !
হিংসা যত উচ্চাভিলাষ বিলুপ্ত মোর, কান্না খালি
রূপ নিয়েছে অগাধ স্নেহের—সর্ব্ব কারে এ মোর ডালি ?

কী অপমান আমার হবে ভাবলে না তা, ছুটল ভরত
রামকে হেথায় ফিরিয়ে নিতে ;—কিন্তু রামের উদার দরদ
মোর অপমান রক্ষা করে' চাইলে নাকো রাজ্য পেতে,—
সে বথা যে আমার মনে জাগল কত দিনে রেতে ।
সেই ত আমার স্নেহের ভাজন, সেই ক্ষমাবান্, দুঃখে সুখী,
কাদন আমার স্নেহ আমার তারেই দেবো—দুঃখের দুখী ।
কাল সে ফিরে' আসবে ঘরে, কিন্তু যদি 'মা' না বলে'
আমায় যদি নাই ডাকে সে, ঘুণায় ছেড়ে যায় সে চলে' ?—

কোঁথানে ঠাই থাকবে আমার ? কোন্ সুখে আর
বাঁচতে চাবো ?
মরব খেয়ে—এই রেখেছি বিষের লাড়ু খাবই খাবো ।
কৈকেয়ী নাম ঘুচবে তবে, মুছবে সবার পথের কাঁটা,
তার বেদনা তারই সাথে বিলীন হবে—পাঁজর-ফাটা !
কিন্তু জানি এমন নিদয় নয় ত সে রাম—নয় ত কঠোর,
আসবে সে ঠিক আমার পাশে,—বাঁধ রে আশা,
রে চিত্ত মোর !

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত

আমরা দেখেছি গানে মাত্রার সমতা (অর্থাৎ ধ্বনির
গতি-সাম্য) এবং ধ্বনির গতিক্রম গানের লয় ও লয়ের
প্রকার-ভেদকে নিয়ন্ত্রিত করে । আবার ঐ গতিক্রম
বা লয়ের দ্রুততা ও ধীরতা ভেদে মাত্রারও স্থায়িত্বকাল
পরিবর্তিত হয় । কবিতায় এসমস্ত সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়ো-
জন হয় না । প্রথমত, কবিতায় গানের মত মাত্রার
কাল-পরিমাণ নির্দিষ্ট করে' দেওয়া অনাবশ্যক । সঙ্গীত-
শাস্ত্রে মোটামুটিভাবে এক মাত্রার একটি কাল-পরিমাণ
নির্দিষ্ট নাই বটে ; কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ গানে এক
মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা নির্দেশ করে' দিতে হয় ;
— লয় দ্রুত হ'লে মাত্রা অল্প স্থায়ী হয়, লয় মন্থর হ'লে
মাত্রার স্থিতিকাল বেড়ে যায় । একটি লঘু স্বরের উচ্চারণে
যে সময় লাগে তাই একমাত্রার পরিমাণ, এটি সাধারণ
সংজ্ঞা এবং এ সংজ্ঞা সঙ্গীতে ও কাব্যে সমভাবে খটে ।
কিন্তু গানে লয়-ভেদে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণ-কাল
বাড়তেও পারে কমেও পাবে এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রে
মাত্রা পরিমাণের বাড়তি-কমতির সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে
হয় । কিন্তু কাব্য-ছন্দে তা নয় । কবিতায় ধ্বনির গতি-
সমতা (অর্থাৎ লয়) এবং গতিক্রমে (অর্থাৎ লয়-ভেদের)
গণনা করা হয় না ; সুতরাং লয়-ভেদে কবিতা বিশেষে
মাত্রা-পরিমাণেরও বাড়তি-কমতি গণ্য হয় না । অর্থাৎ
'কবিতায় সকল প্রকার ছন্দেই মাত্রা-পরিমাণ মোটা-

মুটি স্থির থাকে বলে'ই ধরে' নেওয়া হয়, সুতরাং এক মাত্রা
বলতে যে কতটা কাল বুঝায় তার হিসাব রাখা হয় না ।
কাজেই কবিতায় মাত্রার সংজ্ঞাটা অনেকটা অস্পষ্ট ও
অনির্দিষ্টই থেকে যায় ; একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকালই
এক মাত্রা, সে কালটুকুতে কত অল্পল বা পল বুঝায়
তার হিসাব রাখা কাব্যের ছন্দে নিস্প্রয়োজন বলে'ই
গণ্য হয় ।

কিন্তু তা হ'লেও গীত-ছন্দের মাত্রা ও লয় সম্পূর্ণ
বিশেষত্বগুলোর সহিত কাব্য-ছন্দের যে কিছুমাত্র সম্বন্ধ
নেই তা নয় । কারণ উভয় ছন্দেই ধ্বনি এবং ধ্বনি-
শাস্ত্রকে অবলম্বন করে'ই আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা
করছে । কাজেই এদুয়ের মধ্যে খানিকটা সামান্য ধর্ম
আছে । কাব্য-ছন্দেও যে সঙ্গীত-ধর্ম অস্তিত্ব অতি অল্প
পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কোনো-একটি কবিতার
যথার্থীতি আবৃত্তি করলেই এতখ্যাটি পরিষ্কৃত হ'য়ে
উঠবে । কিন্তু কবিতায় সঙ্গীতের প্রকৃতি উপলব্ধি
করতে হ'লে খুব তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন । একটু
নিগূঢ়ভাবে দেখলেই কবিতায় ও সঙ্গীতের
মাত্রা ও লয়-সম্পর্কীয় লক্ষণ-গুলো লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু
কবিতায় এ লক্ষণগুলো স্পষ্ট ব্যক্ত নয় ; কারণ, পূর্বেই
বলেছি গানে ধ্বনির যত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হয়
কবিতায় তত প্রয়োজন হয় না ।

প্রথমত, লয়ের কথা। আপাতত কবিতায় লয়ের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না বটে, এবং কাব্য ছন্দ-শাস্ত্রে লয়ের কথা আলোচিতও হয় না বটে, কিন্তু তথাপি যথাযথরূপে কবিতা আবৃত্তি করতে হ'লে লয় রক্ষা করা আবশ্যিক ও র্থাৎ সমগ্র কবিতাটা সমান গতিতে আবৃত্তি করা প্রয়োজন। গানে লয় সম্বন্ধে যতটা সচেতন ও সচেষ্টি থাকতে হয় কবিতা আবৃত্তি করায় সময় ততটা প্রয়াস আবশ্যিক হয় না বটে; তবু আবৃত্তি করার সময় যদি প্রতিমাত্রার স্থিতিসাম্য অর্থাৎ লয় ঠিক না থাকে তবে আবৃত্তি সুন্দর হয় না, প্রতিপদেই শ্রুতিকটুতা-দোষ ঘটে। সেজ্ঞে কবিতার ক্ষেত্রে লয় শব্দের ব্যবহার না হ'লেও আবৃত্তিকারকের স্বাভাবিক শ্রুতির প্রথরতা ভেদে লয়ের পার্থক্য হেতু ব্যক্তি ভেদে কবিতার আবৃত্তি মধুর ও কটু হয়। শ্রুতির পুনঃ পুনঃ চর্চা দ্বারা লয় রক্ষা করার ক্ষমতা আয়ত্ত হ'য়ে গেলেই আবৃত্তি মার্জিত ও সুন্দর হয়।

দ্বিতীয়ত, ধ্বনির গতিক্রম বা লয়-ভেদের কথা। একটু লক্ষ্য করলেই—দেখা যাবে যে সব কবিতাই সমান লয়ে আবৃত্তি করলে ভালো শোনায় না, কোনো কবিতা একটু দ্রুত লয়ে এবং কোনো কবিতা একটু ধীর লয়ে আবৃত্তি করলেই শ্রুতিমধুর হয়। কাজেই দেখা যায় কবিতায়ও ধ্বনির গতিক্রম ভেদে লয়-ভেদ হয়। যদিও ছন্দ শাস্ত্রে এসমস্ত সূক্ষ্ম ভেদের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখা হয় না এবং ধ্বনির গতিক্রমের কোনো হিসাব রাখা হয় না, তথাপি কবিতায় ও ধ্বনির যে অল্প-বিস্তর লীলা-বৈচিত্র্য আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না; কারণ কানই আপনি রুচির উপর নিভর করে' এবিষয়ে সাক্ষ্য দান করে।

তৃতীয়ত, মাত্রার কথা। দেখা গেল যে কবিতা-ভেদে লয়েরও দ্রুততা মধুরতা প্রভৃতি ভেদ হ'য়ে থাকে। তাই যদি হয় তবে কবিতা-ভেদে মাত্রারও স্থিতিকাল পরিবর্তিত হয়, কারণ মাত্রার স্থিতিকালের উপরেই লয়ের গতিক্রম নির্ভর করে। সুতরাং খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে কাব্য-ছন্দ-শাস্ত্রেও মাত্রার একটা অপরিবর্তনীয় স্থিতি-পরিমাণ নিদ্রিষ্ট নেই; কবিতা-ভেদে ও আবৃত্তিকারক

ভেদে মাত্রা-পরিমাণও একটু এদিক্ ওদিক্ পরিবর্তিত হ'য়ে থাকে। দ্রুত-আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা যতক্ষণ স্থায়ী হবে ধীর-আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা তার চেয়ে বেশি স্থায়ী হবে, একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তা হ'লেও ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা গণ্য নয়, গণনা করা অনাবশ্যক। কেননা—কবিতায় লয়-ভেদ ও সেজ্ঞে মাত্রার এ পরিবর্তন অতি সামান্য এবং শ্রুতির উপর তার ক্রিয়া ফলও বেশী নয়; তা হ'লেও শ্রোতা ও পাঠকের অলক্ষ্যে এই মাত্রা ও লয়ের প্রকার-ভেদ আবৃত্তিকালে কবিতা বিশেষকৈ মধুর ও কর্কশ কবে' তোলে। কিন্তু গানে লয়ের গতিবেগ ও মাত্রার এ পরিবর্তনের উপরে গানের প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রুতি-মধুরতা খুব বেশি নির্ভর করে এবং এজ্ঞেই গানে এগুলোর খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয়।

এক্ষণে আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টাকে আর-একটু বিশদ করতে চেষ্টা করব। আশা করি দৃষ্টান্তগুলো থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, যদিও কাব্য-ছন্দের ক্ষেত্রেও ধ্বনির মাধুর্য ও সার্থকতা আসলে সুরের লয় ও মাত্রার স্থিতি-পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে তথাপি তাদের ক্রিয়াফল কার্যত এতটা অকিঞ্চিৎকর যে ছন্দশাস্ত্রে তাদের হিসাব রাখা অনাবশ্যক। প্রথমত মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তই দেখা যাক।—

যুগে যুগে অভিসার করি' লঘুপক্ষে,
নাই লীলা দেবতার অনিমেঘ চক্ষে;
আকাশের দুই তীর হ'তে নাহি দিই ধির,
টিকি নাকো পৃথিবীর সীমাঘেরা বক্ষে।

আকাশের ফুল মোরা, ছাতি মোরা ছালোকে,
স্বপনের ভুল মোরা ভুল-ভরা ভুলোকে।
চরণে হাজার হিয়া কেঁদে মরে গুমরিয়া,
খুলি হ'তে ফুল নিয়া পরি মোরা অলকে।

—সত্যেন্দ্রনাথ

এটা চতুর্মাট্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত। এ ছন্দে ঘন ঘন যতি পড়ে, এবং পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দের স্বাভাবিক লয় দ্রুত। পঞ্চমাট্রিক ছন্দের লয়ও দ্রুত বটে কিন্তু এ ছন্দের চাইতে কিছু মধুর। যথা—

জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কেন দুর্গমে,
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্ত জড়-জজমে।

অক্ষরকারে নিত্য নব পস্থা কর আবিষ্কার,
সত্য পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

—সত্যেন্দ্রনাথ

যগ্নাত্মিক ছন্দের গতি আরো মস্তুর। যথা—

সেদিন নদীর নিকটে অরণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা ;
জ্ঞানের লাগিয়া তরণ তাপস
নদী-তীরে ধীরে দিলেন দেখা।

* * * *

মনে হ'ল মোর নব জন্মের
উদয়-শৈল উজল করি'
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি'।

—রবীন্দ্রনাথ

কেবল যে ছন্দ-ভেদেই লয় দ্রুত বা মস্তুর হয় তা নয়,
রচনা-ভেদে একই ছন্দের লয়ে অনেক পার্থক্য হ'তে
পারে। আরেকটা যগ্নাত্মিকেরই নমুনা দিচ্ছি, পাঠক
দেখতে পাবেন রচনা-ভেদে এটার লয় পূর্বোক্ত পংক্তি
ক'টির চাইতে কত বেশী ধীর। যথা—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দু্যলোকে ভুলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্ত বর্ণের সাহায্যে ধ্বনি-প্রবাহ যেমন
বৈচিত্র্য লাভ করে, স্বরবর্ণের বাহুল্যে তেমতি মস্তুর
(কিন্তু একঘেয়ে) হু'য়ে ওঠে। এবার স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত
দেব। এ ছন্দ স্বভাবতই নৃত্যপরায়ণ ও দ্রুতগতি।
কিন্তু এ ছন্দেও মস্তুর ও গন্তীর কবিতা রচনা করা
যায়। যথা—

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,
পাগলা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে !
লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্চ হ'তে
চড়-চড়িয়ে পাহাড় ফে'ড়ে, নৃত্য ক'রে মত্ত শ্রোতে ;

* * * *

গুহার তলে গুম্বরে কেঁদে, আলোর হঠাৎ হেসে উঠে',
ঐরাবতের বৈবী হ'য়ে কৃষ্ণ মৃগের সঙ্গে ছুট,
সুদূর বিজন যোজন জুড়ে' ঝঞ্চা-ঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে।

পর্যায় ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন স্থখে,
ছন্দছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের ছুখে ;

• যাচ্ছি ম'রে মনের ছুখে পূর্ব স্থখে স্মরণ ক'রে ;
ঝারির মুখে ঝার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝ'রে।

—সত্যেন্দ্রনাথ

এইখানে ছন্দ যেন পাগলা ঝোরার মতোই উন্মত্ত
হ'য়ে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছে। কিন্তু এই
চতুঃস্বরের ছন্দেই কেমন ধীরগতির গন্তীর কবিতা
রচনা করা যায় তা নিম্নের ক'টি ছত্র পড়লেই বোঝা
যাবে। যথা—

ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে,
বিরাজ কর ভারত-হিয়ার ভক্ত-মালে নূতন মণি হয়ে ;
ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের—খানিক ব্যথা ভুল'ব তোমায় হেরি' ;
সত্য-সাধন নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী।

—সত্যেন্দ্রনাথ

কিন্তু ছ'স্বরের ও তিনস্বরের ছন্দের অত্যন্ত
ধরগতি,—সে ছন্দকে গাঙ্গীর্য ও মস্তুরতা দান করা
একরকম অসম্ভব বললেই হয়। এদিক থেকে দেখতে
গেলে অক্ষরবৃত্তই গন্তীর ভাবের সবচেয়ে উপযুক্ত
বাহন, একথা পূর্বেই বিশদরূপে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।
এ-স্থলে অক্ষর বৃত্তের আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ;
পাঠক পূর্বের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলোর
সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন এ ছন্দের লয়
কত ধীর-গতিতে চলে। যথা—

হে আদি জননী সিন্ধু, বহুধরা সন্তান তোমার,
এক মাত্র কণ্ঠ্য তব কোলে। তাই তল্লা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অধরে, মহেন্দ্র-মন্দির পানে
অস্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিরন্ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে'
তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি', নীলাশ্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি', সম্বর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকোশলে।

—রবীন্দ্রনাথ

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটলে উর্ধ্বশি !
আদিম বসন্ত-প্রাতে উঠেছিলে মস্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধা-পাত্র, বিষ-ভাণ্ড লয়ে' বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশাস্ত্র ভুঞ্জের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি' অবনত।

কুলশুভ্র মগ্নকান্তি হুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটোতে সমুদ্রের গভীর এবং গভীর গর্জনধ্বনি যেমনভাবে প্রতিধ্বনিত করা হয়েছে অক্ষরবৃত্ত ছাড়া অল্প ছন্দে তা সম্ভব হয় না।

যা হোক, এখন আবার আমাদের আসল কথার অবতারণা করা যাক। পূর্বোক্ত সবগুলো দৃষ্টান্ত একে একে পড়ে' গলে আপনা থেকেই এ সত্যটা মনে জেগে উঠবে যে, সব কবিতা সমান গতিতে বা সমান লয়ে পড়া যায় না বা পড়লে ভালো শোনায় না। এক-এক ছন্দের কবিতা এক-একটা বিশেষ লয়ে পড়লেই যেন তাদের ভিতরকার সমস্ত ভাব-মৌন্দয্য ভাষার ও ছন্দের ভিতর দিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠে। কবিতা-ভেদেও লয়ের পার্থক্য হয়; অর্থাৎ কোনো কবিতার যতি ও তাল যেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও দ্রুত এবং লয়ও তখন গতির আবেগে উন্নত হ'য়ে ছুটতে থাকে; আবার অল্প কবিতায় যতি ও তাল যেন এক-একটা বিশাল তরঙ্গের মত অনেকক্ষণ পরে উখিত হ'য়ে মনকে স্থপ্তিত কবে' দিতে থাকে এবং লয়ও যেন আপন গুরুগম্ভীর ও মধুর গতিতে মনকে কোন্ অকূল সমুদ্রের অতল গভীরতার মধ্যে তলিয়ে দিতে থাকে। লয়ের এই গতিবেগের পার্থক্যে মাত্রারও স্থিতিকালের পার্থক্য হয়, একথা আগেই বুঝান হয়েছে। মাত্রাবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির তুলনা করলেই টের পাওয়া যাবে যে, একটার এক-একটি বর্ণ—যতক্ষণ স্থায়ী হয় আর-একটার এক-একটি বর্ণ—তার চাইতে বেশী স্থায়ী হয় এবং একথাও টের পাওয়া যাবে যে, এপার্থক্য এত সূক্ষ্ম ও এত পরিবর্তনশীল যে তাকে হিসাবের মধ্যে কিছুতেই আনা যায় না। এজন্যেই কাব্য-ছন্দে মাত্রার স্থায়িত্ব-ভেদের কোনো গণনা করা হয় না এবং সুবিধার জন্তে সব কবিতারই মাত্রাকে সমকাল স্থায়ী বলে' গণ্য করা হয়। কিন্তু গান-ভেদে মাত্রার স্থায়িত্বভেদ খুবই প্রচুর এবং মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা কোনো নিয়ম মেনে চলে; সেজন্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়।

আশা করি এতক্ষণে আমরা কবিতায় ও গানে লয়

ও মাত্রার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য পাঠকের নিকট অনেকটা স্পষ্ট করে' তুলতে পেরেছি। এক্ষণে কাব্যে ও গানে যতি ও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে'ই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। কিন্তু সে আলোচনা করার পূর্বে কবিতার মাত্রা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলা আবশ্যিক। পূর্বে মাত্রা সম্বন্ধে যা বলেছি তা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে খাটে; সুতরাং মাত্রাবৃত্তের মাত্রা বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা-নির্ণয় ও মাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা সম্ভব। কেবল কাব্য-ছন্দের দিকেই যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তা হ'লে অক্ষর-ও স্বরবৃত্তে মাত্রা-নির্ণয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ অনাবশ্যিক, কেননা ওই দুটি ছন্দ মাত্রা-পরিমাণের উপর নির্ভর করে' রচিত হয় না,—মাত্রাই ও-দুটি ছন্দের নিয়ামক নয়। মাত্রাবৃত্তে কিন্তু মাত্রা-পরিমাণের উপরেই ছন্দের স্বরূপ ও সার্থকতা নির্ভর করে এবং এজন্যেই এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলে' অভিহিত করা হয়েছে। এসমস্ত কথাই ছন্দের নাম-করণের সময়েই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কেবল কাব্যছন্দের দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি গানের ছন্দটাও আমাদের চোখের সামনে রাখি তা হ'লে অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দেও মাত্রা নির্ণয় করা আবশ্যিক হ'য়ে উঠে। কেননা ওই দুটি ছন্দে রচিত গান যখন সুরে লয়ে গাওয়া হয় তখন এদেরও মাত্রার হিসাব রাখা প্রয়োজন; গানের কথা যে শুধু মাত্রাবৃত্তেই রচিত হয় তা ত নয়ই,—বরং অধিকাংশ গানের কথাই সচরাচর স্বরবৃত্তে বা অক্ষরবৃত্তে রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু গাইতে হ'লেই যখন মাত্রা ও লয়ের হিসাব রাখতে হয় তখন গানের তরফ থেকে এ-দুটি ছন্দেও কি করে' মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব তাই দেখাতে চেষ্টা করব। কিন্তু একথা এস্থলে বলে' রাখা উচিত যে, এ দুটি ছন্দের যে সব কবিতা সুরে লয়ে গাওয়া যায় কেবল সে-সব কবিতারই যে শুধু গানের পরিমাপে মাত্রা নির্ণয় করা যায় তা নয়; যে-সব কবিতা গাওয়া হয় না সেগুলোরও মাত্রার হিসাব গানের পরিমাপে করা যায়, এইটুকুই আমার

বক্তব্য। দৃষ্টান্ত দিলেই একথা পরিষ্কার হবে। যথা—

+ + . . .

“বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ।”

এটা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা। এ পংক্তিটিতে আঠারোটি অক্ষর আছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত-ছন্দের রীতি অনুসারে এখানে বিশটি মাত্রা পাওয়া যাবে, কেননা চিহ্নিত স্বর দুটোকে মাত্রাবৃত্তে দ্বি-মাত্রিক বলে' ধরতে হবে। কিন্তু গানের রীতি অনুসারে এখানে মাত্রাও বিশটি বলে'ই গণা করতে হবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে একমাত্রা এমন একটি আদর্শ কালপরিমাণ যা সকল কবিতাতেই সমভাবে খাটে; মোটামুটিভাবে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকালই এ ছন্দের সেই আদর্শকাল; এবং এ আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় বলে' ধরে' লওয়া হয়। কিন্তু গানে এ আদর্শকালটি গান-ভেদে পরিবর্তিত হয় এবং কোথাও দীর্ঘ-ক্ষণ-স্থায়ী, কোথাও অল্পক্ষণ-স্থায়ী হয়; সূত্রাং মোট কালপরিমাণ বেড়ে গেলেও মাত্রাসংখ্যা স্থিরই থেকে যায়। কবিতায় ও-হিসাবটা অনেকটা চালান যায়। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই,—

“কুন্দশুভ্র নগকাস্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা”

এখানে অক্ষর-সংখ্যা চোদ্দ। কিন্তু মাত্রা-সংখ্যা কত সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। প্রথমেই দেখা যায় এখানে গুরুস্বর ছটি এবং লঘুস্বর আটটি। সূত্রাং চোদ্দটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে-সময় লাগে উক্ত পংক্তিটি যথাযথ রূপে উচ্চারণ করতে তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে তা সহজেই বোঝা যায়। সূত্রাং একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে সাধারণত যে সময় লাগে সেই অপরিবর্তনীয় আদর্শকালটিকে একক ধরে', হিসাব করলে উক্ত পংক্তিতে মাত্রা-সংখ্যা চোদ্দ ত নয়ই, বরং বিশ; কেননা এখানে ছটি গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং আটটি লঘু বা একমাত্রিক স্বর আছে। এটি হ'ল কাব্য-ছন্দের হিসাব। কিন্তু গানের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রাখলে বলতে হবে এখানে মাত্রাসংখ্যাও বিশটি; কিন্তু ছন্দ এখানে ধীর লয়ে চলছে বলে' এখানে মাত্রা-পরিমাণও সাধারণ একক মাত্রার চাইতে কিছু বেশী। আরো একটু বিশদ করিছ। একটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

“হাজার হাজার | বছর কেটেছে | কেহ ত কেহনি | কথা
ভ্রমর ফিরেছে | মালতী-কুঞ্জে, | তরুরে ঘিরেছে | লতা”।

এ-দৃষ্টান্তের সঙ্গে ঠিক এক লয়ে, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তের ধরণে নিম্নের পংক্তিটি পড়ুন—

কুন্দ-শুভ্র। নগ-কাস্তি। সুরেন্দ্র-বন্দিতা।

পড়লেই বুঝতে পারবেন এর প্রথম তিন পাদে ছ'টি করে' মাত্রা আছে, এবং শেষ পাদে দু'মাত্রা। সবস্বকু বিশটি মাত্রা। পড়ার ধরণ থেকেই বোঝা যাবে উপরের তিনটি পংক্তিতেই বিশ মাত্রা করে' আছে। সূত্রাং তৃতীয় ছত্রটিতে কেমন করে' বিশ মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় তা সহজেই দেখা গেল। কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে মাত্রার একক পরিমাণ অপরিবর্তনীয় আদর্শ-স্থানীয়, অর্থাৎ এক লঘুস্বরের উচ্চারণের সমস্থায়ী। এখন আবার সেই ছত্রটিই অক্ষরবৃত্তের তালে আবৃত্তি করুন।

কুন্দ-শুভ্র নগ-কাস্তি। সুরেন্দ্র বন্দিতা।

পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দ কেমন ধীর-গম্ভীর লয়ে চলেছে; অর্থাৎ এর লয় মন্থর। এখন সমগ্র পংক্তিটা পড়তে মোট যে-পরিমাণ সময় লেগেছে তাকে চোদ্দটি অক্ষরের মধ্যে সমভাগে পরিবেষণ করে দিন; তা হ'লে প্রত্যেক অক্ষরের ভাগে যে সময়টুকু পড়েছে তাকেও এক হিসাবে অর্থাৎ গীত-ছন্দের হিসাবে একমাত্রা বলা যায়। এহিসাবে এখানে চোদ্দটি মাত্রা আছে, কিন্তু এর প্রত্যেকটি মাত্রা অপরিবর্তনীয় আদর্শ-কাল অর্থাৎ একটি লঘুস্বরের স্বাভাবিক উচ্চারণ-সময়ের চাইতে একটু বেশী হবে। অতএব দেখা গেল এক হিসাবে উক্ত ছত্রটিতে বিশ মাত্রা এবং আর-এক হিসাবে চোদ্দ মাত্রা আছে, এবং বলা বাহুল্য দ্বিতীয়প্রকারের মাত্রা প্রথমপ্রকারের মাত্রার চাইতে ওজনে কিছু বেশী হবে। যদি লেখা হ'ত—

কুমুম-ধবল-রূপ | সুরেশ-পুঞ্জিতা

তা হ'লে এখানে অক্ষর-সংখ্যা তো চোদ্দ হ'তই, মাত্রা-সংখ্যাও চোদ্দই হ'ত এবং গীত-ছন্দ ও কাব্য-ছন্দের হিসাবে এস্থলে মাত্রা-পরিমাণের কোনো পার্থক্য থাকত না। আশা করি এতক্ষণে কাব্য-রীতি ও সঙ্গীত-

রীতিতে মাত্রার আদর্শ ও পরিমাণ স্পষ্ট হয়েছে। এবার একটা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দিই। যথা—

আমরা স্থখের ক্ষীত বৃক্কের ছায়ার তলে নাহি চরি।

আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।

—রবীন্দ্রনাথ

কাব্য-ছন্দে রীতিতে হিসাব করলে এখানে ৬থম পংক্তিতে বিশ ও দ্বিতীয় পংক্তিতে বাইশ মাত্রা পাওয়া যাবে। অথচ গানের রীতিতে হিসাব করলে উভয় পংক্তিতেই ঘোলটি করে' মাত্রা গুণতে হবে। প্রত্যেকটি হলন্ত বর্ণ পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের উপরে নির্ভর করে' তাকে ওজনে একটু ভারী করে' তুলছে এবং তাতে প্রতিমাত্রার পরিমাণ একটু বেড়ে যাচ্ছে মাত্র। সুতরাং গানের হিসাবে এখানে মাত্রা- ও স্বর-সংখ্যা সমানই ধরতে হবে। এবিষয়ে অনেক বলা হয়েছে; আর বৃথা বাক্য-ব্যয় করার দরকার নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। আমরা গানের রীতিতে কোনো ছত্রের যে মাত্রার হিসাব করেছি সেটাকে যেন কেউ প্রকৃত গানের মাত্রা বলে' মনে

না করেন। তা মনে করলে তুল হবে, কেননা গানে স্বর-রচয়িতার ইচ্ছা অনুসারে এক-একটি বর্ণ তিন চার প্রভৃতি বহু মাত্রা ব্যাপী হ'য়ে স্বর অনেক প্রসারিত হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রত্যেক বর্ণের মাত্রা নির্দিষ্ট হ'য়েই আছে এবং কোনো বর্ণেই দু' মাত্রার বেশি থাকতে পারে না। সুতরাং কবিতার মাত্রা গানের মাত্রার চাইতে স্বভাবতই অনেক কম হ'য়ে থাকে। সুতরাং এ বিস্তৃত আলোচনার সার-সর্ম্ব হচ্ছে এই যে, কাব্যের ছন্দের রীতিতে হিসাব করলে মাত্রার একক বা আদর্শ-কাল-পরিমাণ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সর্বত্র সমান এবং বর্ণের গুরুত্বের উপরেই তার সংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে; কিন্তু গানের ছন্দের রীতিতে হিসাব করলে মাত্রার একক পরিমাণ—কবিতা-ভেদে বাড়ে বা কমে, এবং অক্ষরবৃত্তে অক্ষর-সংখ্যার এবং স্বরবৃত্তে স্বর-সংখ্যার পরিমাণ সমানই থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

এলোরা

অজন্তা হইতে এলোরা একশত মাইলের পথ। দাক্ষিণাত্যের উপত্যকার উপর দিয়াই পথটি চলিয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারেরা বলেন, খুব অল্প খরচে একটি মোটর-চলাচলের রাস্তা অজন্তা হইতে এলোরা পর্যন্ত অনায়াসে নির্মিত হইতে পারে।

এলোরা রোড্‌ স্টেশন হইতেই এলোরা যাওয়ার সুবিধা। ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে মন বিশ্বমে ভরিয়া উঠে—প্রাচীন শিল্পীদের আশ্চর্য্য কলাকৌশলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। একদিকে গ্রীষ্মে জলশূন্য নদীগর্ভ—অপর দিকে বিস্তৃত পর্বত-শ্রেণী। বর্ষায় যেখানে ভীষণ কল্লোলময়ী তরঙ্গিণী ছই কুল প্রাবিত করিয়া ছুটিয়া যায়—গ্রীষ্মে তার কি কঠোর শুষ্কতা!

দৌলতাবাদ হইতে পাহাড়ের গায়ে উৎরাই পথে, ৬৭ মাইল গেলে রোজা গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামেই

সম্রাট আওরঙ্গজীবের সমাধি আছে। আওরঙ্গাবাদ হইতে এলোরা যাওয়ার পথ একটু বিপদজনক; খুব কষ্টে পার্বত্য পথের নীচে নামিতে হয়, সেই স্থানেই পাহাড়ের গায়ে এলোরা গুহা। এলোরার প্রকৃত নাম বেলুর। উচ্চারণের দোষে এলোরা হইয়াছে। মোটর একেবারে কৈলাস গুহাব সম্মুখে দাঁড়ায়। কি কল্পনাতুল্য অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য ছিল এই শিল্পীদের, যাহারা নীরস পাথর কাটিয়া এমন সুশ্রী ও সুশোভন মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

একটি অর্ধচন্দ্রাকার পাহাড় তিন ভাগে ভাগ করিয়া লইয়া এইসকল গুহা নির্মিত হইয়াছে।

এলোরার দক্ষিণে বৌদ্ধ গুহাসমূহ, মাঝখানে কৈলাস ও হিন্দুদিগের দেবতাদের মন্দিরগুলি এবং বাম দিকে ইন্দ্র-সভা প্রভৃতি জৈন মন্দিরাদি।

একাধারে শিল্পী কবি ও ইঞ্জিনিয়ার না হইলে এলোরার



এলোরার বৃহৎ কক্ষের অভ্যন্তরিক দৃশ্য

গুহাবলীর সম্যক্ বর্ণনা করা যায় না।
কি চমৎকার শিল্পকলার বিকাশ!
তাহার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেও যথেষ্ট
শক্তির প্রয়োজন।

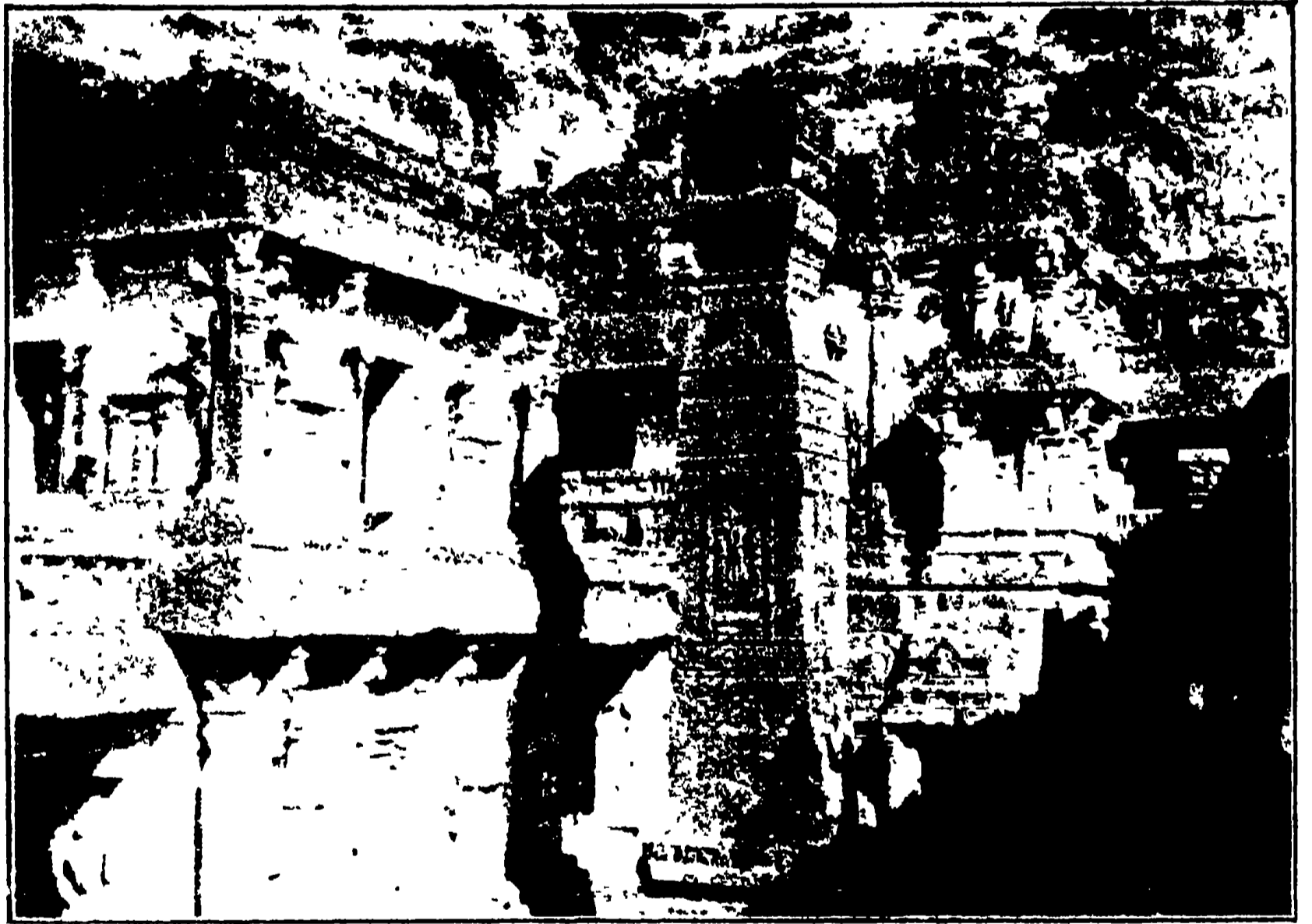
গুহাসমূহের সাজসজ্জার আড়ম্বর
অত্যন্ত অধিক। দেওয়ালে স্তম্ভগাত্রে
ছাদে সর্বত্রই বিচিত্র দেব-দেবী, পশু-
পক্ষী অথবা জীব-জন্তুর একক অথবা
সমষ্টির মূর্তি বিদ্যমান। কৈলাস ও
ইন্দ্রসভায় অজস্র আয় দেওয়াল-
চিত্র আছে। অনেক দিনের মুসলমান
অত্যাচারে সে সমৃদ্ধ ধ্বংস প্রাপ্ত
হইয়াছে। একটির পর একটি ধর্ম
যত কিভাবে কাল-ধর্ম বিলোপ
পাইয়াছে এই চিত্রগুলি দেখিলে তাহার কতকটা
আভাস পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মূর্তি,
কোথাও বা হিন্দু দেবদেবী আবার কোথাও
বা অসংখ্য জৈন বিগ্রহ।

সর্বাঙ্গে পুরাতন প্রকোষ্ঠাবলী খৃঃ পূঃ পঞ্চম
শতাব্দীতে নিৰ্মিত হইয়াছিল; সেগুলির নাম
ধেড়্‌বারা অথবা অবনত জাতির বাসস্থান।
ধেড়্‌ নামক এক শ্রেণীর

জাতি সেখানে বাস করিত। এই
কক্ষগুলিতে দর্শনীয় বিষয় বিশেষ
কিছুই নাই।

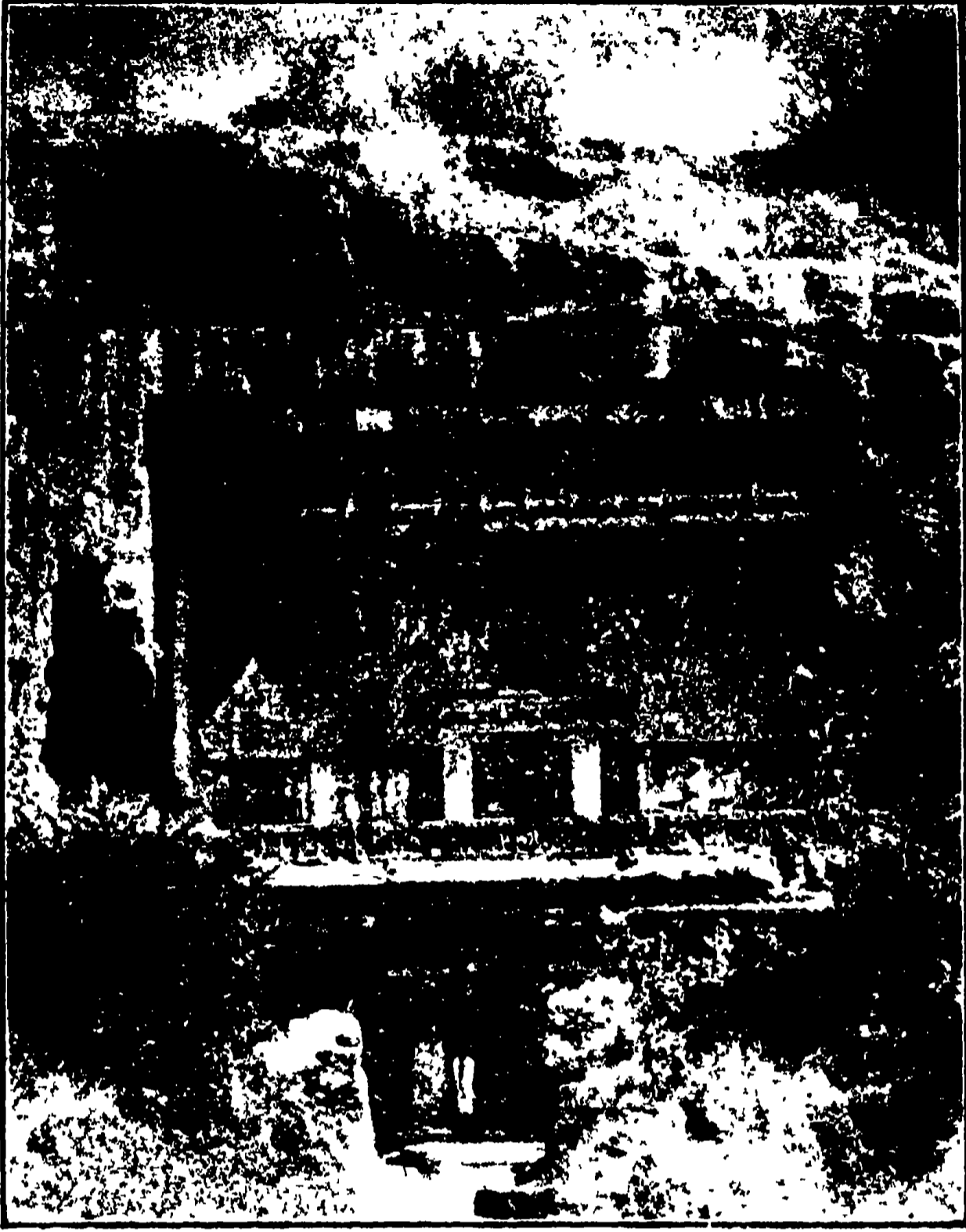
“সুতার-কা-ঝোপড়া” অথবা
সুত্রধরের গৃহ একটি বিশাল বৌদ্ধ
মন্দির। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা ইহার
নিৰ্মাতা। বিশ্বকর্মার মূর্তি এলোরায়
পূজিত হইত, আজ পর্যন্ত সুত্রধরের
মধ্যে বিশ্বকর্মার পূজা হয়।

গুহাগুলি কান্হেড়ি, ভাজা,
কাবুলা প্রভৃতি গুহার ধরণেই নিৰ্মিত।
উপরে বিস্তৃত ছাদ—প্রবেশদ্বার হইতে
আরম্ভ করিয়া বিগ্রহের আসন পর্যন্ত
বিস্তৃত স্তম্ভশ্রেণী। প্রাচীন ইতালীয়



কৈলাসগুহা—এলোরার ভিতরের এক অংশের দৃশ্য

গির্জাগুলিও এই ধরণে নিৰ্মিত। ইহা হইতেই
বোঝা যায় যে সেগুলি ভারতীয় আদর্শে নিৰ্মিত।
লোকের বিশ্বাস স্তম্ভ-গাত্রে মূর্তিগুলি বিশ্বকর্মার শ্রিয়
অক্ষরদিগের প্রতিকৃতি। দেব-শিল্পী তাঁহার অক্লান্তকর্মা
সহচরগণের কর্মকুশলতার নিদর্শনস্বরূপ এইগুলি মন্দির-
গাত্রে খোদিত করাইয়া তাঁহার সহচরদিগকে অমর করিয়া
গিয়াছেন। এই স্ববৃহৎ প্রকোষ্ঠটির অভ্যন্তর ভাগ ৪৩



সুতার-কা-ঝোঁপড়া—বহির্ভাগের দৃশ্য

ফুট প্রস্থ ৩৪ ফুট উচ্চ এবং ৮৬ ফুট গভীর। যে যুগে ডিনামাইট হয় নাই, রেলপথের কোন চিহ্ন ছিল না, সে যুগে যে কি করিয়া এই বিশাল পাথরের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল এবং পাথরে মূর্তি খোদিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

‘ডু’খাল ও ‘টিন’খাল নির্মাণে শিল্পীদের আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘ডু’খাল দ্বিতল; ‘টিন’খাল ত্রিতল। প্রতিগৃহতলই কারুকার্য-শোভিত।

কৈলাস-গুহা সর্বাপেক্ষা সুশোভন। এলোরার গুহা-সমূহের মধ্যে কৈলাস-গুহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষের গুহাগুলির মধ্যে কৈলাস-গুহাই বৃহত্তম। ইহার কলা-কৌশল অন্য সকলগুলিকে ত্রিগুণে ও নিপুণ করিয়াছে। একটি ১লক্ষ গজ পাহাড় কাটিয়া উহার মধ্যে ৩০০ শত ফুট লম্বা, ১৫০ ফুট চওড়া ও ১০৭ ফুট উচ্চ একটি গুহা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে কৈলাস-গুহা নাম প্রদান করা হইয়াছে। সেই অসমতল পাহাড়ের বুকেই কোথাও হস্তী কোথাও বা দেব-দেবী মূর্তি ফুটাইয়া তোলা



সুতার-কা-ঝোঁপড়া—আন্তরিক দৃশ্য

হইয়াছে। যদিও অধিকাংশ মূর্তিই মুসলমানেরা নষ্ট করিয়াছে তথাপি তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতেই শিল্পীদের কলা-কৌশল হৃদয়ঙ্গম হয়।

কৈলাসে ঢুকিবার পথেই তোরণ। তোরণের সম্মুখ-ভাগ পাথর দিয়া গাঁথা কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ সহ্যাদ্রি পর্বতের গাত্রদেশ হইতে খুদিয়া বাহির-করা। এই তোরণ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে একটা প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে পৌঁছান যায়। সেই চত্বরের একদিকে তোরণ, বাকী তিন দিকে সহ্যাদ্রি পর্বতের গায়ে খোদা একতলা ও দোতলা বারান্দা। সেই বারান্দার পিছনের দেওয়াল-গাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্তিতে ভরা। নিজাম নিজাম আলির সময়ে মূর্তিগুলির কতক ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। চত্বরের মাঝখানে সহ্যাদ্রি পর্বতের গা খুদিয়া দুইটি বাড়ী তোলা হইয়াছে। ইহার প্রথমটি একতলা—ইহা নন্দী অর্থাৎ শিবের বৃষভ-বাহনের মন্দির। এই মন্দিরটি দেখিলে বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অংশে



'টিংখাল'-গুহা

অর্থাৎ বেলগাঁও বা ধা-বাড় জেলার ঝিনু ও জৈন মন্দিরের কথা মনে হয়। দ্বিতীয় মন্দিরটি দ্বিতল ইং শিবের মন্দির। মন্দির মন্দির হইতে উপরে উঠিবার সোপানাবলী আছে। উপরে একটি অন্ধকার ঘরে শিব-লিঙ্গ এখনও শিবচতুর্দশী তিথিতে পূজিত হইয়া থাকেন। ইহার সম্মুখে অন্ধকার নাটমন্দির, এবং সেই নাট-মন্দিরের তিনদিকে অর্ধমণ্ডপ বা বারান্দা। এইসকল বারান্দার ছাদে অজস্র চিত্রের মত হাজার বৎসর পূর্বে আঁকা নানা রংএর চিত্র এখনও স্পষ্ট আছে, কিন্তু পায়রা ও বাড়ুড়ে এই চিত্রগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এই বিশাল মন্দির একখানি পাথর হইতে খুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহার দেওয়াল স্তম্ভ ছাদ সমস্তই একখানি পাথরের।

পাথর হইতে কাটিয়া বাহির-করা এতবড় মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। কৈলাসের শিব-মন্দিরের আসল দ্রষ্টব্য পদার্থ—ইহার তিন দিকের পাথরে খোদা চিত্রাবলী। মন্দিরটির নীচের তল নিরেট এবং ইহার তিন দিকে তিনটি চিত্র আছে। ডান দিকের চিত্রটি রাবণের কৈলাস-হারণ। নিত্য লক্ষা হইতে ইষ্ট দেবতা মহাদেবের পূজা করিতে কৈলাসে যাইতে রাবণের বষ্ট হইত বলিয়া সে শিবের অমুচরিত লইয়া কৈলাস পর্বত উঠাইয়া

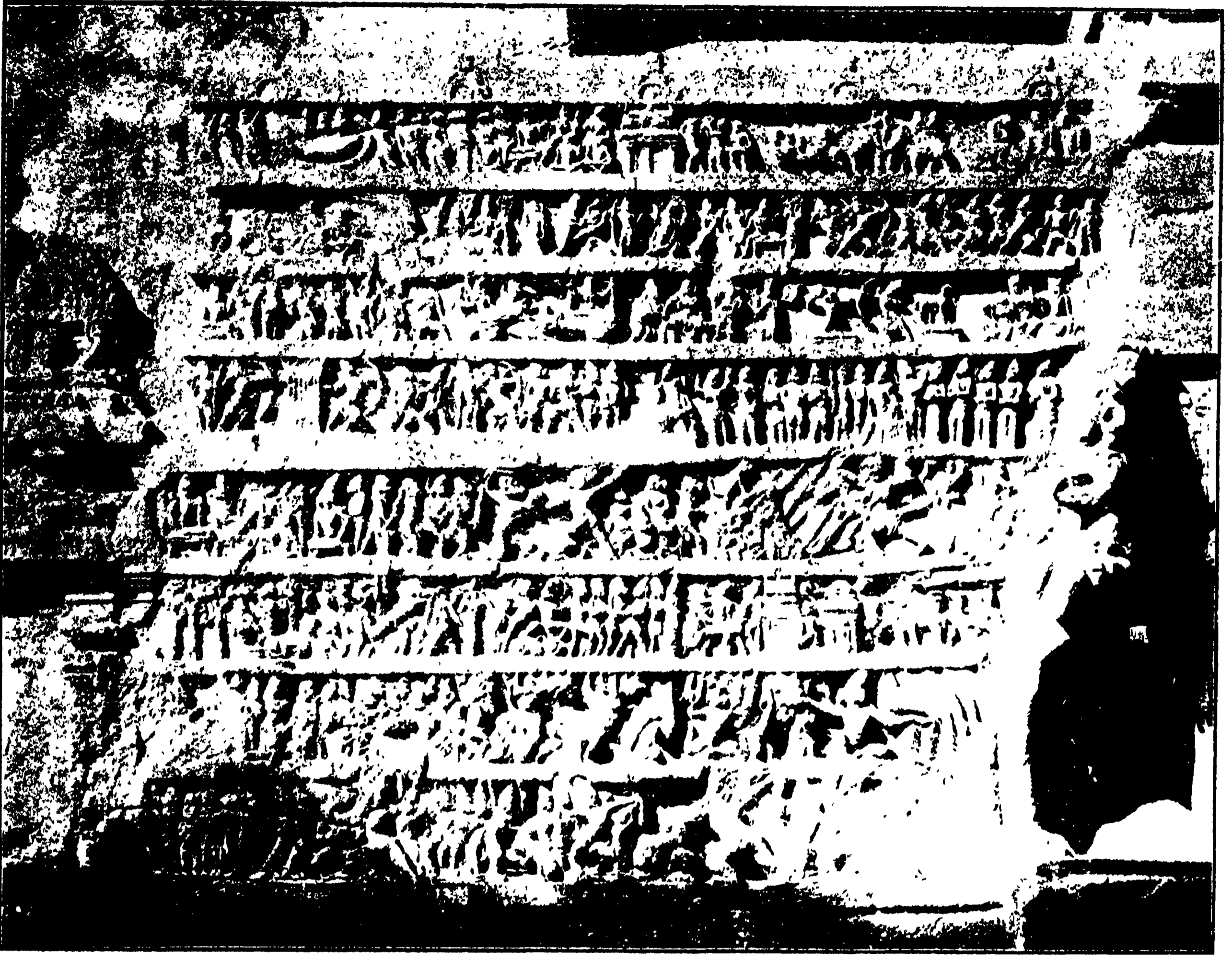
লক্ষায় আনিতে চাহিয়াছিল। এই চিত্রে রাবণ কৈলাস পর্বত জড়াইয়া ধরিয়া তুলিতেছে। কৈলাস পর্বতের পশুপক্ষী, মহাদেবের অমুচরিতা, এমন কি স্বয়ং পার্কী পর্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছেন। ভয়াবহতা পান্ডিত্য মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, তাঁহার মুখেও ভাবটি এমন সুন্দর যে তাহা ভাবতের শিল্পে অতুলনীয়। বোম্বাইয়ের কাছে এলিফ্যান্টা পর্বত গুহায় কৈলাস-ভবণের চিত্র আছে; কিন্তু তাহা কৈলাস-গুহার কৈলাসহরণের চিত্রের মত সজীব নহে।

অপর দিকে ত্রিপুরবধের চিত্র।



মহাদেবের তাওবন্ত্য

চার ঘোড়ার রথে চাড়িয়া শিব স্বয়ং ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার সারথি, চারিদিকে পৃথিবীতে, আকাশে, স্বর্গে ত্রিপুরাসুরের অসংখ্য অমুচর



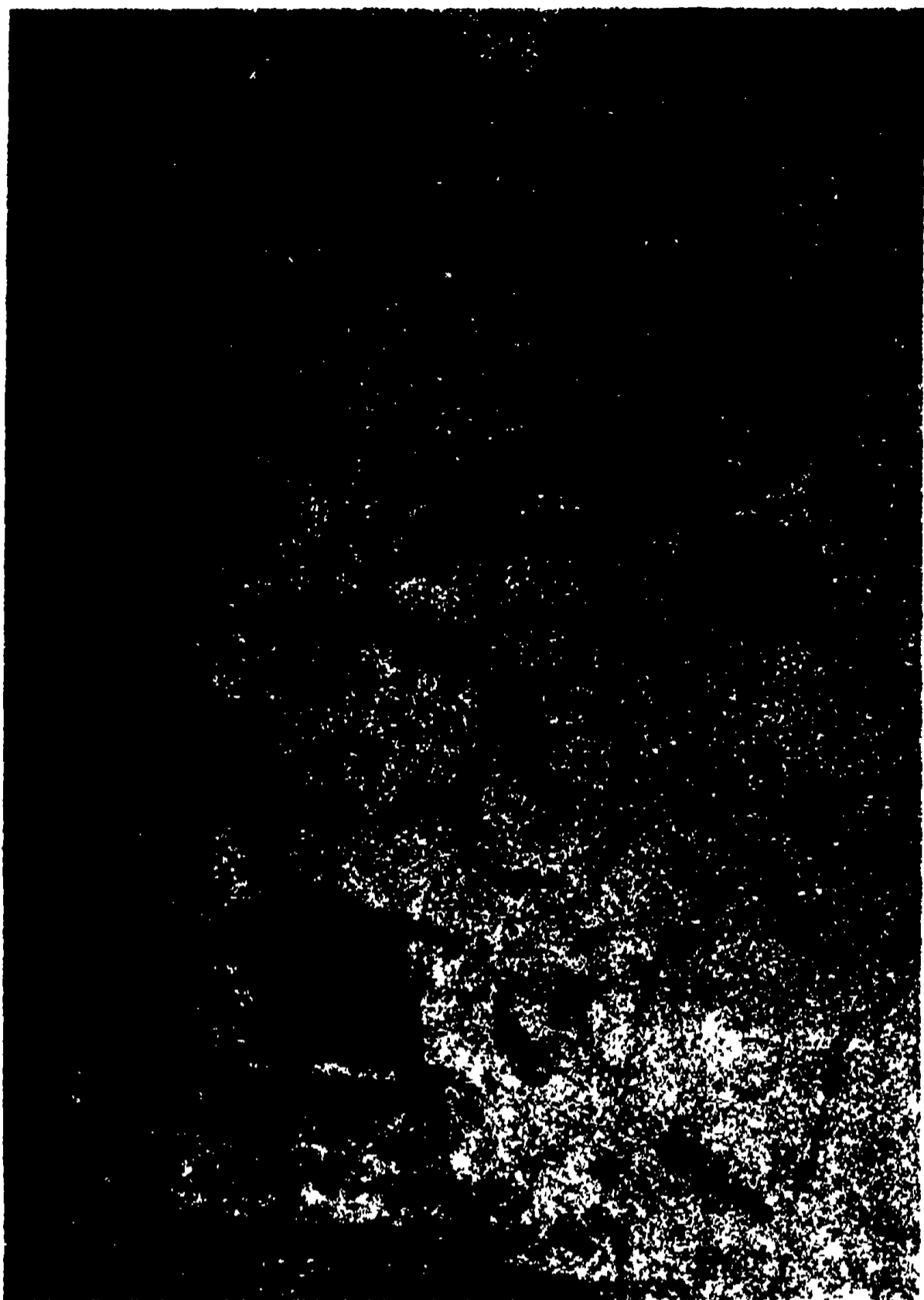
মুন্দের দৃশ্য—কৈলাস-গুহা

মহাদেবের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে। আর একদিকে শিবের অন্ধকাসুর-বধ মূর্তি। শিব প্রত্যালীচ পদে দাঁড়াইয়া দুই হাতে ত্রিশূল ধরিয়া অন্ধকাসুরকে বিদ্ধ করিতেছেন। শিবের আট হাত-কোনো হাতে অসি কোন হাতে নরকপাল। আকাশে দেব-দেবী গন্ধর্ব-কিনর, শিবের পদতলে শিবের অমুচরবৃন্দ এবং চারিদিকে দেব-সৈন্য ও অসুর-সৈন্য। অত্র এক স্থানে শিবের বিবাহ।

অপর এক স্থানে কালারি বা যমাস্তক মূর্তি। মার্কণ্ডেয় ঋষি স্বপ্নায়ু লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হইবার কথা। এই কারণে মার্কণ্ডেয় ঋষি মহাদেবের আরাধনায় রত হইলেন। এদিকে ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বয়ং যম তাঁহাকে

লইতে আসিয়াছেন। ঋষিপ্রবর ভয়ান্ত হইয়া মহাদেবের প্রতিমূর্তিকে আশ্রয় করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছেন। ভক্তের আকুল আস্থানে মহাদেব মূর্তির ভিতর হইতে বাহির হইয়া যমরাজকে পদাঘাত করিতেছেন। এই উপাখ্যানটি এই প্রস্তর মূর্তিতে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

কৈলাস-গুহার নিজ গর্ত-গুহার দক্ষিণ দিকের প্রাচীর-গাত্রে শিবের জটা হইতে গঙ্গানদীর উদ্ভব দৃশ্য। এই মূর্তিতে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের উপাখ্যান দেখান হইয়াছে। গঙ্গানদী শিবের জটা হইতে বহির্গত হইয়া ভগীরথের মস্তকে পতিত হইতেছে। তৎপরে ভগীরথের গা বাহিয়া গঙ্গা সগর পুত্রদের উদ্ধার করিয়াছেন, সগরপুত্রগণ মহাদেবের অর্চনা করিতেছেন।



কৈলাস-হরণ



কালারি মূর্তি, কৈলাস-গুহা



ত্রিপুবাঙ্গক-মূর্তি, কৈলাস গুহা



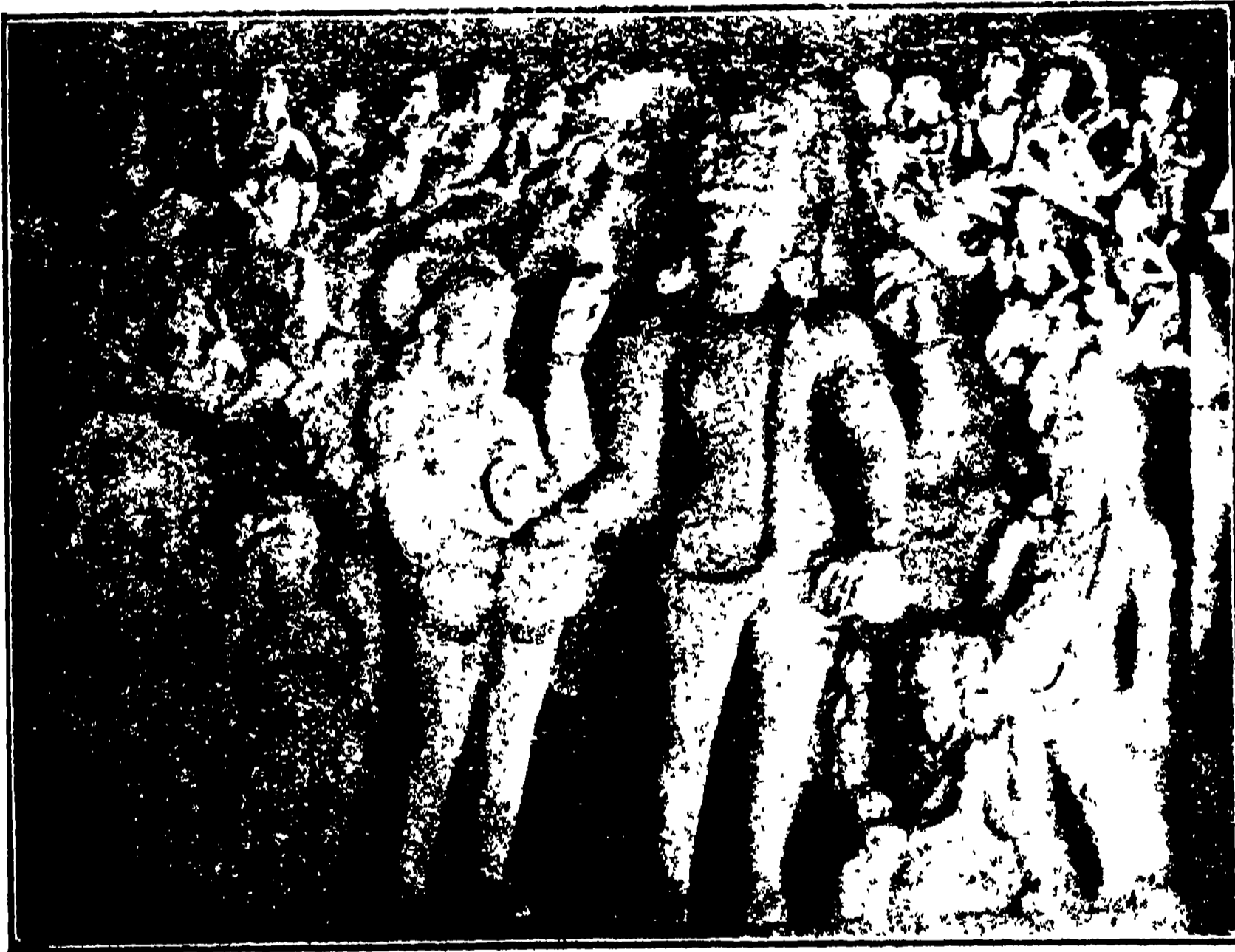
অত্রঙ্গণা, কৈলাস গুহা



সুব্রহ্মণ্য

হর-পার্বতীর বিবাহ
রামেশ্বর গুহাব পশ্চিমের দেওয়ালে খোদিত চিত্র

পার্বতীর তপস্তা



কল্যাণসুন্দর মূর্তি—কৈলাস-গুহা (হর-পার্বতীর বিবাহ)

কার্তিকেয়র জন্ম বৃত্তান্তের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান আছে। কৈলাস গুহার সুব্রহ্মণ্য মূর্তি চতুর্ভুজ। মূর্তিটির দক্ষিণ হস্তের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কার্তিকেয়র এই হস্তেই শক্তি-অস্ত্র ছিল। তাঁহার বাম হস্তের নিকট ময়ূর রহিয়াছে। মূর্তিটির উভয় পার্শ্বে দেবানুচর দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে একটি দক্ষ প্রজাপতির মূর্তি। কার্তিকেয়র বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে, কর্ণে নানাপ্রকারের কুণ্ডল ছলিতেছে। মস্তকে ভামণ্ডল-বেষ্টিত করণ্ড-মুকুট রহিয়াছে। কৈলাস-গুহা এইরূপ শিবের উপাখ্যানের চিত্রে ভরা।

ভগীরথও ক্রওজতাপ্নুতহৃদয়ে মহাদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। শিবের বাম পার্শ্বে উমা মূর্তি ও মস্তকোপরি কয়েকটি দেবতা।

এই গুহার অপর এক স্থানে সুব্রহ্মণ্য বা কার্তিকেয় মূর্তি। কার্তিকেয় দক্ষিণাত্যের দেবতা। এই দেবতার জন্ম-পরিচয় রামায়ণেব বালকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

এলোরার নির্মাণ ও নির্মাতাদিগের সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডবেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্তু ইহা নির্মাণ করেন। পাণ্ডবেরা এক রাত্রিতে এই বিরাট কাণ্ড শেষ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবানের নিকট একটি বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন কোন-এক বিশেষ রাত্রিকে সর্বাপেক্ষা



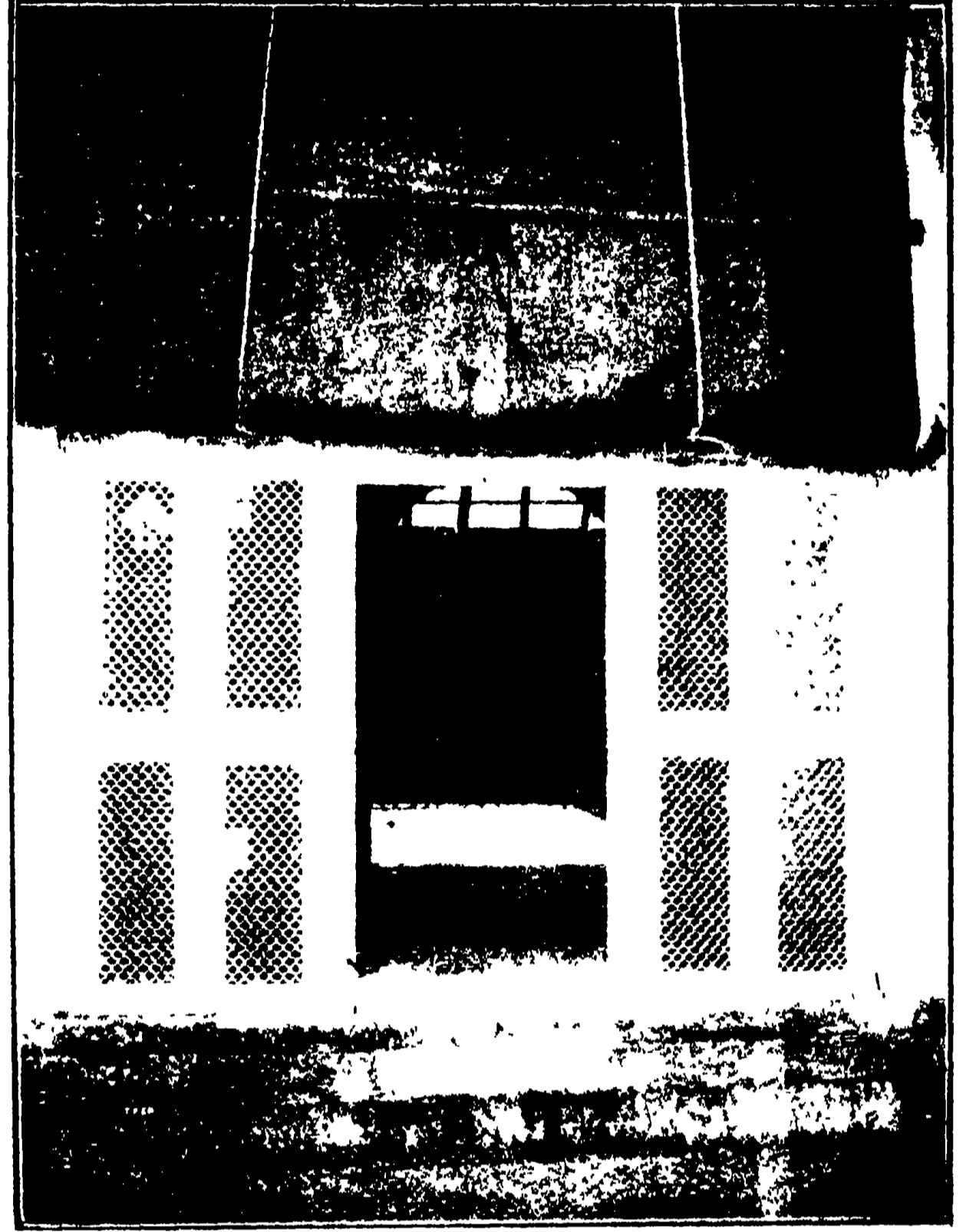
রামেশ্বর-গুহাব জৈনমূর্তি

দীর্ঘ করেন। কথিত আছে, সেই সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই এলোরার নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। বিশ্বকর্মা এই বিরাট কার্যের নক্সা করিয়া দেন। ভীম ইহা নির্মাণ করেন। কার্য-শেষে পঞ্চপাণ্ডব সমস্ত জগতে এই বিরাট কীর্তি ঘোষণা করিয়া বেড়ান।

অন্য এক প্রবাদ আছে, যে, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত এলিচপুরের রাজা এলু দীর্ঘকাল দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিয়া এলোরার সন্নিকটস্থ কোন পুকুরের জল ব্যবহার করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনিই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ঐ রাজার আদেশানুক্রমে দৌলতাবাদেও ঠিক এলোরার আদর্শে একটি মন্দির নির্মিত হয় এবং একটি প্রকাণ্ড সূড়ঙ্গ দ্বারা দৌলতাবাদ ও এলোরা যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, যে, দেওগড়ের রাজকন্যা এই সূড়ঙ্গ-পথেই দিল্লীশ্বরের অমুচরগণ কড়ক ধৃত হন। বর্তমানে সেই সূড়ঙ্গ-পথের কোন চিহ্নও বিদ্যমান নাই।

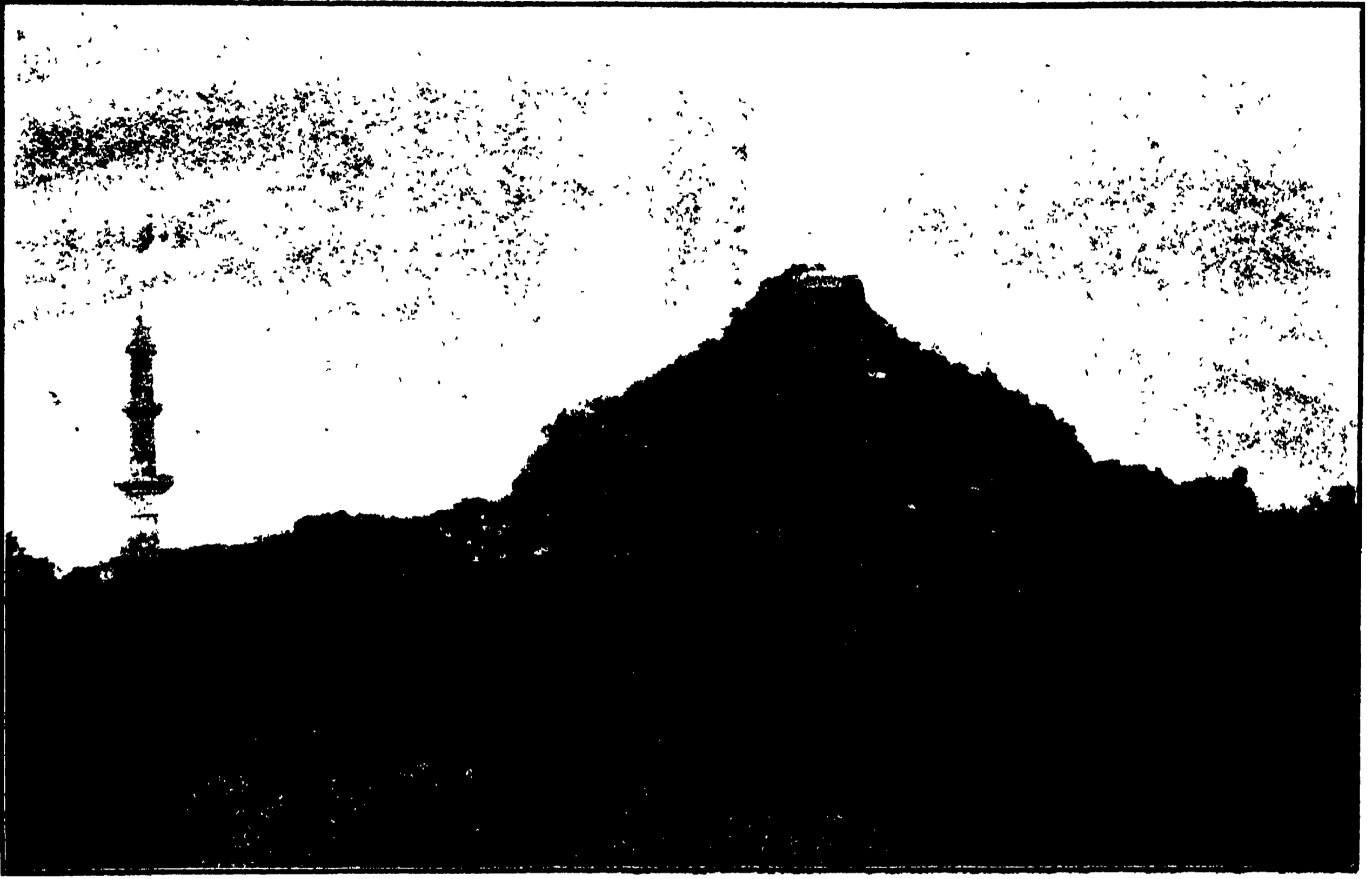
বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বধাবাস করিতে হয়। এই

বধাবাস তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) বিহার (Temple), (২) রাত্রি-স্থান (Dormitory), (৩) ভোজন-স্থান (Refectory)। অনেকে বলেন এলোরার গুহাগুলি প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বধাবাসরূপে ব্যবহৃত হইত।

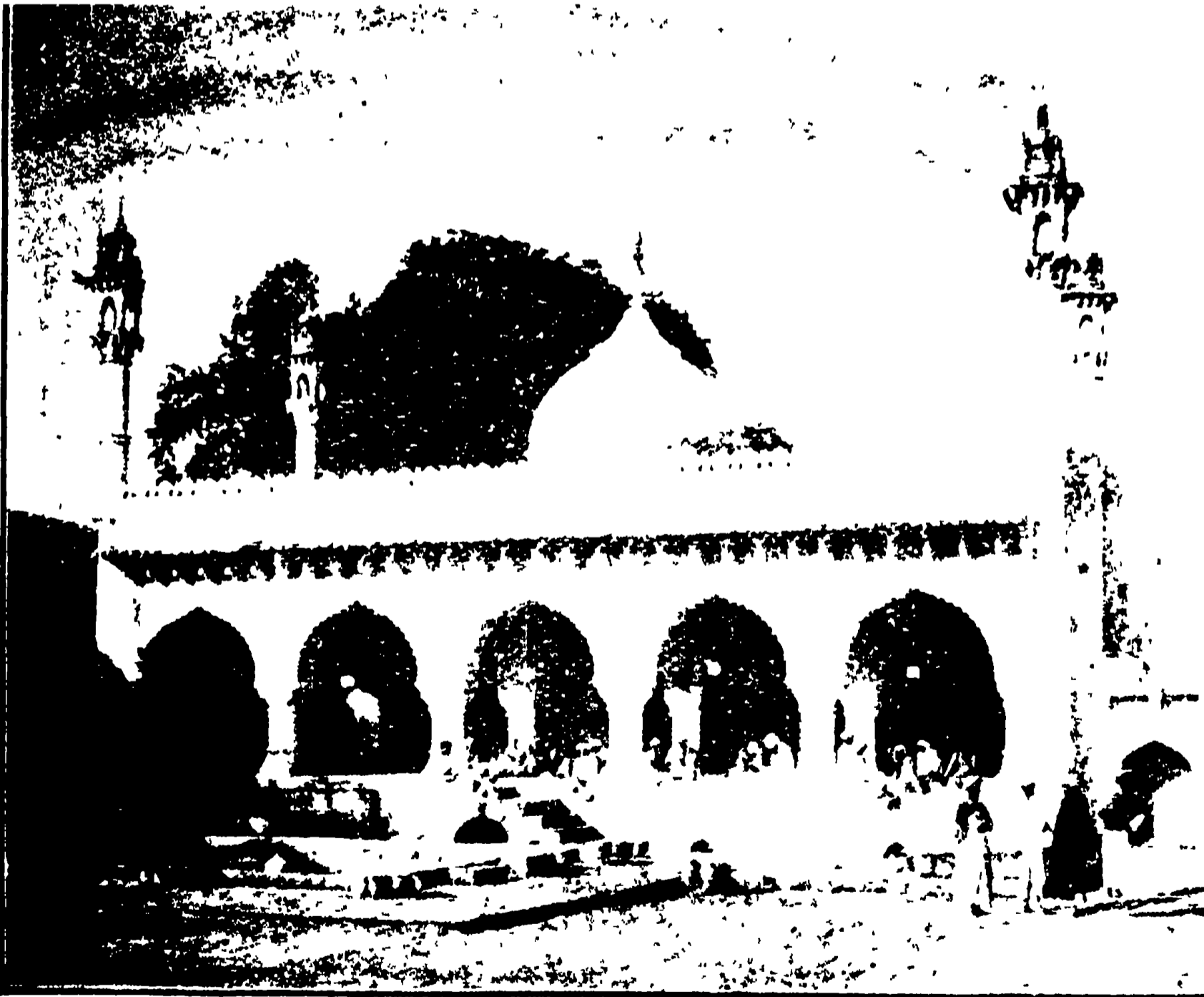


আওরঙ্গাবাদের প্রিয় পবিত্র স্থান

এলোরার অধিবৃত্তের বামদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে সমস্ত গুহাগুলি জৈনদের। এই গুহাগুলির মধ্যে ইস্র-সভাই প্রধান। ভারতবর্ষে জৈনদের গুহা-মন্দির বড়-একটা দেখা যায় না। বিজাপুর জেলায় বাদামী তালুকে একটি জৈন গুহা-মন্দির আছে। ইহা ভিন্ন কাব্লা, কান্হেরী, অজন্তা, মণ্ডপেশ্বর, ধামনার, বাগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলি হিন্দুদের অথবা বৌদ্ধদের। পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকট খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পর্বতে যতগুলি গুহা আছে সেগুলি সমস্তই জৈন। এলোরার জৈন-গুহাগুলি এক কৈলাস-গুহা ছাড়া আর সমস্ত গুহা অপেক্ষা বড়। জৈনদের ছোট ছোট দুই



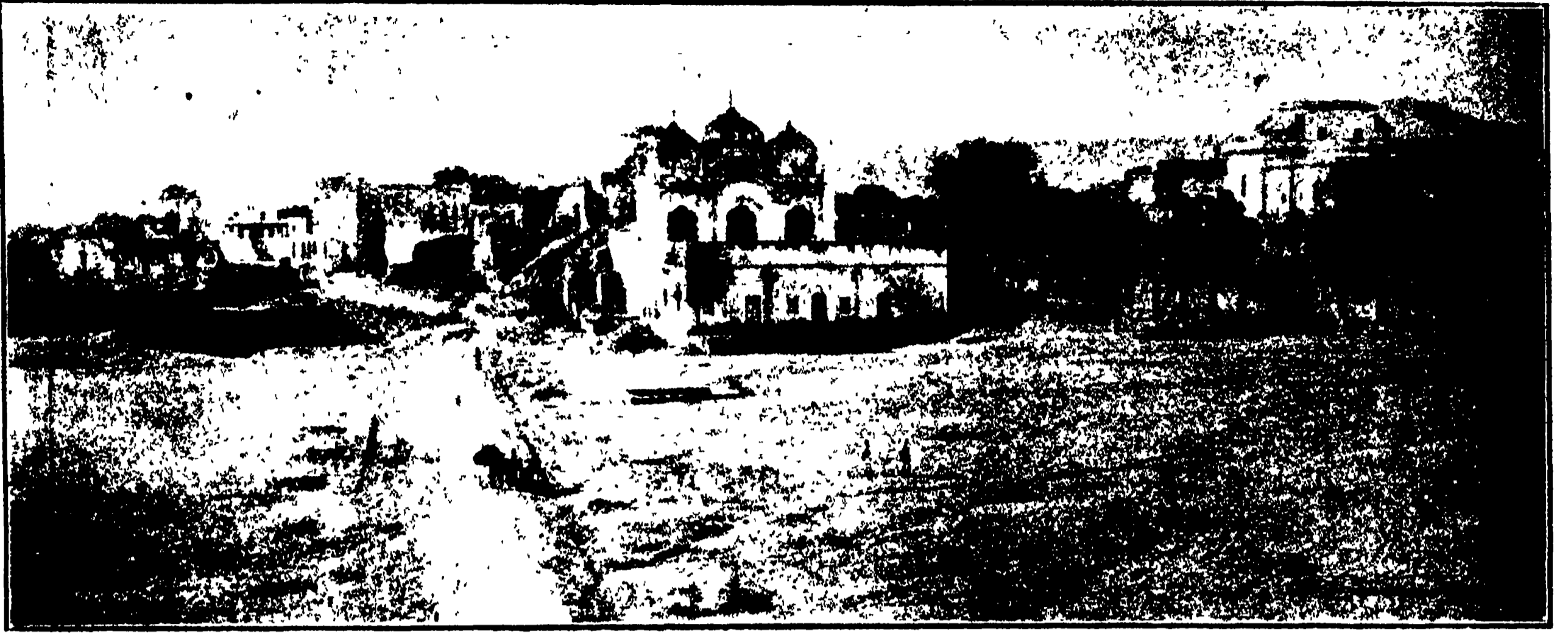
দৌলতাবাদের দুর্গ



সৈয়দ জৈনুদ্দিনের মসজিদ—আওরঙ্গাবাদ

চারিটি গুহা যে না আছে তাহা নহে। বড় জৈন গুহাগুলি এক-একটি প্রকাণ্ড মন্দির। তাহাতে গর্ভগৃহ (sanctuary), নাটমন্দির, জগমোহন, ভোগমণ্ডপ প্রভৃতি তিনটি বা চারিটি অঙ্গ আছে।

কল্পনায় ইন্দ্রসভা কৈলাসের মত বিশাল। জৈনদের মূর্তিতে কৈলাসের “বাস্-রিলিফ” বা দেওয়ালে খোদা তোলা ছবির আয় চিত্র-কারুকার্য না থাকিলেও ইহার প্রত্যেক জায়গায় এমন সূনিপুণ ও সূক্ষ্ম কাজ আছে, যে তাহা ভারতবর্ষের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নিজাম দরবার প্রত্যেক গুহায় যাইবার নিমিত্ত ছোট ছোট রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন।



আলমগিরী মসজিদ—আওরঙ্গাবাদ

নতুবা জৈন-গুহাগুলিতে যাইতে বিশেষ কষ্ট হইত, কারণ জৈন-গুহাগুলি মন্মাদ-আওরঙ্গাবাদ রোড হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। বড় বড় জৈন গুহাগুলি দ্বিতল। সেগুলির ষারান্দার রেলিংএর প্রস্তরে চমৎকার কারুকার্য আছে। তাহার নকল করিতে বর্তমানে প্রতি-বর্গফুটে হাজার টাকার বেশী খরচ হয়।

যে পথ দিয়া 'শিবচক্রকলা' পর্কতে উঠিতে হয় তাহা অত্যন্ত বন্ধুর। ঐ পর্কতে দাঁড়াইয়া রোজার দিকে তাকাইলে মনে হয় একেবারে হিন্দু যুগ হইতে মুসলমান যুগে আসিয়া পড়িয়াছি। চতুর্দিকে আওরঙ্গ-জীবের দক্ষিণবাসীর স্মৃতিচিহ্ন-বিজড়িত মসজিদ ও অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। আওরঙ্গজীবের সমাধি-মন্দির অত্যন্ত অনাড়ম্বর; তাহার পাশেই মুসলমান সাধু ও ফকিরদের সমাধি।

রোজাতে আধুনিক ধরণে নির্মিত নিজাম বাহাদুরের একটি অতিথিশালাও আছে। সেখানে থাকিবার সর্ব-প্রকার সুবিধা আছে এবং সেখান হইতে সর্বত্রই সহজে যাতায়াত করা যায়।

রোজা হইতে দৌলতাবাদের পথে পাহাড়ের গায়ে এক বিরাট দুর্গ আছে। ঐ-দুর্গ চতুর্দিকে পর্কতদ্বারা দৃঢ় প্রাকারে বেষ্টিত। কোন শত্রু তথায় সহজে প্রবেশ-লাভ করিতে পারিত না। দুর্গের চতুর্দিকে গভীর পরিখা ছিল এবং পরিখা-মুখে দুর্গদ্বারে এক অগ্নিকুণ্ড

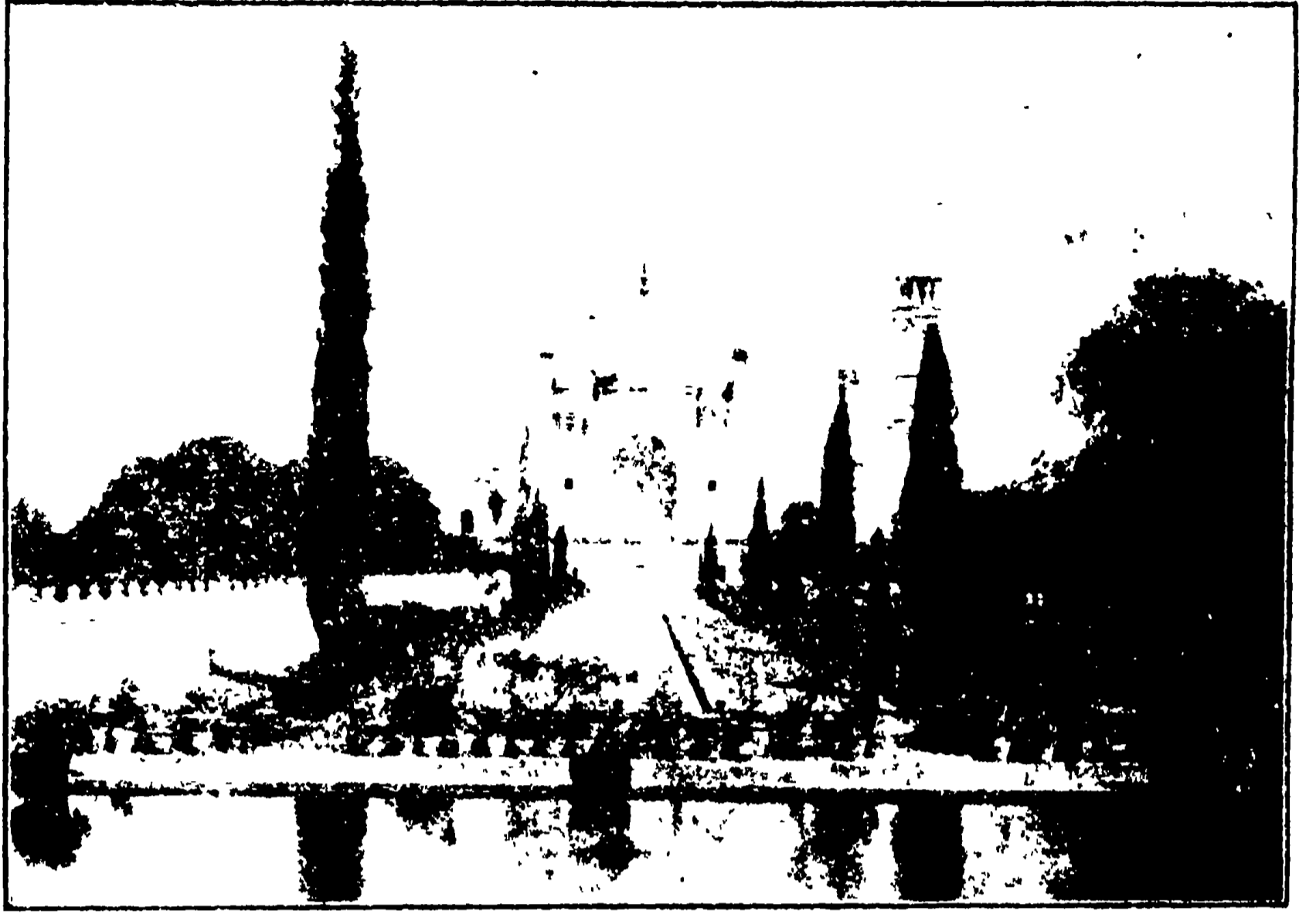


আওরঙ্গাবাদে জল রাখিবার ঘর

সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকিত। কিন্তু দৈবের এমনই গতি যে এই দুর্ভেদ্য দুর্গটি অতি সামান্য কারণে শত্রু হস্তগত হইয়াছিল। দুর্গাধিকারী হিন্দু রাজা যখন সংবাদ পাইলেন যে, দুর্ধর্ষ মুসলমানেরা দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে তখন তিনি সৈন্যদের রসদ জোগাইবার জন্য

চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।
ঐ-সকল অনুচরেরা যথাসময়ে অস্ত্র
খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দুর্গে জমা করিল।
কিন্তু যখন মুসলমানেরা দুর্গ আক্রমণ
করিল তখন দেখা গেল ঐ-সকল বস্তা
লবণে ভরা, তাহাতে অণু কোন
আহার্য্য নাই। অনাহার-ভয়ে ভীত
হইয়া সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করাতে
এই দুর্ভেদ্য দুর্গ শক্রহস্তগত হয়।

এই প্রসঙ্গে আওরঙ্গাবাদের সামান্য
একটু বৃত্তান্ত দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ
করিব। আওরঙ্গাবাদে শিল্পকলার
দিক্ হইতে দর্শনীয় বিশেষ কিছুই
নাই। এমন কি আওরঙ্গজীবের



বিবি-কা-মাক্বারা—আওরঙ্গাবাদ



আওরঙ্গাবাদের একটি তাঁতের কারখানা

রাজপ্রসাদও অত্যন্ত অনাড়ম্বর, কেবল যে মসজিদের ধারে
বসিয়া আওরঙ্গজীব স্বহস্তে কোরান্ নকল করিয়া বিক্রয়
করিতেন সে-মসজিদটি দর্শনীয়। আওরঙ্গজীবের আদর্শ
ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তি—রাজাই হোক আর ভিক্ষুকই
হোক—নিজে উপার্জন করিয়া খাইবে ; তিনি নিজ
জীবনে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।
আওরঙ্গজীবের প্রাসাদের ধারেই সহরের জল সরবরাহের
যন্ত্রাদি ছিল। মালিক অম্বার ঐ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

আওরঙ্গাবাদ প্রসবণে ভরা।
তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারেরা জল লইয়া
খেলা করিতে ভালবাসিতেন। একটি
মসজিদের সম্মুখে ১০টি প্রসবণ ছিল।
ইঞ্জিনিয়ারেরা এমন ব্যবস্থা করিয়া-
ছিলেন যে কোনটি সোজাসুজি কোনটি
বক্রভাবে আবার কোনটি বা
ধীরে ধীরে একই স্থানে জল
দিবে।

কয়েক বৎসর পূর্বে যখন জল বন্ধ
হইয়া যায় তখন নিজাম সরকারের
ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাবনানী ঐ-জলের
উৎস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু

চেষ্টার ফলে তিনি আওরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদের
মধ্যে এক পর্কতে এক বিরাট জল সরবরাহের চৌবাচ্চা
আবিষ্কার করেন। ঐ-স্থান হইতে জল-সুস্ত বাহিয়া
উপরে যাইত এবং পরে নিম্নে পড়িত। আওরঙ্গাবাদের
সর্কাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান বিবি-কা-মাক্বারা অথবা
দৌরানিয়া বেগমের সমাধি। দৌরানিয়া বেগম আওরঙ্গ-
জীবের প্রিয় মহিষী ছিলেন। যদিও সম্রাট আগ্রার তাজ-
মহলের অনুকরণে উহা নির্মাণ করান, তথাপি তাজের

সৌন্দর্যের সহিত কোন ক্রমেই ইহার তুলনা করা যাইতে পারে না।

অনেকেই আওরঙ্গাবাদের মন্দিরাদির কথা জানেন না। আওরঙ্গাবাদের মন্দিরাদি সাজসজ্জায় ভরা। এখানকার চিত্রসমূহের সহিত অজস্র চিত্রাবলীর তুলনা হইতে পারে। অধিকাংশ মন্দিরাদিতেই ঘটনামূলক বহু চিত্র আছে। কোনো ছবিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইতে কোনো ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হইতেছে, কোথাও বা সাপ অথবা হাতীর মুখ হইতে কাহাকেও উদ্ধার করা হইতেছে; ইত্যাদি চিত্রিত হইয়াছে। কোনো ছবিতে দেখান হইয়াছে দেবী কালীর হাত হইতে একটি শিশু রক্ষার জন্ত অণু এক

দেবতা মায়ের কোলে শিশুটি রক্ষা করিতেছেন। কোথাও বা পূজারত নর-নারী মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে।

এই যন্ত্রের যুগে, ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত লোপ পাইতেছে। যেখানে প্রাচীন মন্দিরাদির গম্বুজাদি দৃষ্ট হইত আজ সেখানে কলের চিম্নী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। যেখানে প্রত্যুষে আজ্ঞানের পবিত্র ধ্বনি উথিত হইত সেখানে আজ কাপড়ের কলের বাঁশীর শব্দে সজাগ হইতে হয়। কালের কি অদ্ভুত পরিবর্তন! *

শ্রী প্রভাত সান্যাল

* মডার্ন রিভিউএ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ সিংহের প্রবন্ধ-
অবলম্বনে।

গণেশ ও দনুজমর্দন

বাঙ্গালা দেশের রাজা গণেশের নাম অনেকের কাছেই সুপরিচিত, ইতিহাসের নাম শুনিলে যাহারা শিহরিয়া উঠেন অবশ্য তাঁহারা বাদে। রাজা গণেশ, Blochmann's Contributions to the History and Geography of Bengal,* Beveridgeএর রাজা কান্স প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ৮ রজনীকান্ত চক্রবর্তীর “গোড়ের ইতিহাস” ২য় খণ্ডে, ৮ দুর্গাচন্দ্র সান্যালের “বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস” প্রথম খণ্ডে ও আমার “বাঙ্গালার ইতিহাস” ২য় ভাগে রাজা গণেশের পবিচয় দেওয়া আছে। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মণপ্রতিষ্ঠ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজা গণেশ সম্বন্ধে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। গণেশের পুত্র যত্ন, যত্নমল্ল বা যত্ননারায়ণের নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি নাটকও আছে। রাজা গণেশ গোড়ের একজন মুসলমান বাদশাহকে মারিয়া গোড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন,

একথা ৮ রজনীকান্ত চক্রবর্তী ঈশান নাগরের “অদ্বৈত-প্রকাশ” হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত মহা-প্রভুর পূর্ব পুরুষ নরসিংহ, নারিয়াল-রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে গণেশ গোড়ের মুসলমান বাদশাহকে মারিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।* রাজা গণেশ যখন হিন্দু ছিলেন তখন তাঁহার নিশ্চয় একটা জাতি ছিল, কিন্তু তিনি কোন্ জাতিভুক্ত ছিলেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গণেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছিল; কারণ গণেশের নামাঙ্কিত কোন প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। গণেশকে একজন বিদ্রোহী জমিদার বলিয়াই বোধ হয়। তখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই মুসলমানের যেরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল তাহাতে গণেশ যে হিন্দু থাকিয়া প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করা কঠিন। যে-সময়ে রাজা গণেশ জন্মিয়াছিলেন সেই সময়ে আর-একজন হিন্দু বাঙ্গালা দেশে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিয়া নিজের

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1817-75, p. 1.

* ৮ রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত গোড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৬৫।

নামে বাঙ্গালা অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় টাকা ছাপাইয়া-
ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীদম্ভুজমর্দন দেব। মুসলমানের
ইতিহাসে, অর্থাৎ—“তারিখ ই-ফেরেস্তা” ও “রিয়াজ-
উস-সালাতীন”এ এই দম্ভুজমর্দনের নাম পাওয়া যায় না।
ইনি ১৩৩৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪১৬ ১৭ খৃঃ বাঙ্গালা
দেশে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন এবং পাণ্ডুগর, সূবর্ণগ্রাম
ও চাটিগ্রাম নামক তিনটি স্থানে তাঁহার টাঁকশাল ছিল।
মুসলমান বিজয়ের পরে নিজ বাঙ্গালা দেশে, অর্থাৎ—
কুচবিহার, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি অনার্য-শাসিত
প্রদেশগুলি বাদ দিলে বর্তমান বাঙ্গালার যেটুকু অবশিষ্ট
থাকে তাহাতে কোন হিন্দুরাজা নিজের নামে টাকা
ছাপাইতে ভরসা করেন নাই। প্রতাপাদিত্য রায়
নিজের নামে টাকা ছাপাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে
পাওয়া যায়, কিন্তু সেকথা সম্ভবতঃ মিথ্যা। প্রতাপা-
দিত্য সম্বন্ধে রামরাম বসু প্রভৃতি লেখকগণ অনেক
মিথ্যা কথাই বলিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহাদের
কোন কথা নূতন প্রমাণের সমর্থন না পাইলে বিশ্বাস
করা উচিত নহে। মুদ্রা ছাড়া এই দম্ভুজমর্দনের
অস্তিত্বের অপর কোন প্রমাণ নাই। ১৮০৭ খৃঃএর পূর্বে
“গোড়-বিবরণ” রচয়িতা ক্রেটনের (Creighton)
মৃত্যু হইয়াছিল এবং ১৮১৭ খৃঃ প্রকাশিত ক্রেটনের
গ্রন্থে দম্ভুজমর্দন দেবের একটি মুদ্রার চিত্র আছে।* ১৩১৭
বঙ্গাব্দের পূর্বে মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়ার আদীনা
মসজিদের উত্তর-পূর্বাংশের দুই ক্রোশের মধ্যে একজন
সাঁওতাল কৃষক হলকর্ষণকালে দম্ভুজমর্দন দেবের
আর-একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল এবং এই
মুদ্রাটি মালদহের উকিল, ৩ রাদেশচন্দ্র শেঠের হস্তগত
হইয়াছিল।† ১৯১১ খৃঃ খুলনা জেলায় বাসুদেবপুর
গ্রামে জর্নৈক মুসলমান সমাধি-খনন-কালে দম্ভুজমর্দনের
আর-একটি রজত মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল। দৌলত-
পুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র
এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন।* ১৯১৩ খৃঃ মুর্শিদা-
বাদ জেলার কোন স্থানে দম্ভুজমর্দনের আরও একটি
রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরে উত্তর ও
পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে দম্ভুজমর্দন দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত
হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রণীত
Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ
করিয়াছেন যে, দম্ভুজমর্দন রাজা গণেশের অপর নাম।
ভট্টশালী-মহাশয় দম্ভুজমর্দন বা রাজা গণেশ সম্বন্ধে নূতন
কোন প্রমাণই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি
কেমন করিয়া এত বড় একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত
হইলেন তাহা বিচার করিবাব পূর্বে অতি সংক্ষেপে
সেই সময়ের বাংলা দেশের অবস্থা পর্যালোচনা
করা উচিত।

তোগলক বংশীয় ফিরোজ শাহ ৭৫২ হিঃ (১৩৫১-৫২
খৃঃ) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই
সময়ে শামস উদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালার স্বাধীন
রাজা। কেহ কেহ বলেন যে, ইলিয়াস শাহ ৭৪০ হিঃ
অর্থাৎ ১৩৩৯ খৃঃ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন,
কিন্তু ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে তিনি ৭৪৩ হিঃ পশ্চিম
বঙ্গে রাজা হইয়াছিলেন।† শামস উদ্দীন ইলিয়াস শাহের
পরে তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ এবং পৌত্র গিয়াস-
উদ্দীন আজম শাহ বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।
আজম শাহের পরে তাঁহার পুত্র ফৈয়ুদ্দীন হুমজা শাহ
ও পৌত্র দ্বিতীয় শামস উদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ
করিয়াছিলেন। ইহার পরে শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ
শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামক বাঙ্গালা দেশের
দুইজন স্বাধীন সুলতানের অস্তিত্বের প্রমাণ তাঁহাদিগের
মুদ্রা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বায়াজীদ শাহের সহিত
ইলিয়াস শাহের বংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা
বলিতে পারা যায় না। “রিয়াজ-উস-সালাতীনে” দেখিতে
পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় শামস উদ্দীনের প্রকৃত নাম শিহাব-

* Creighton's Ruins of Gaur, p. 11.

† রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭০-৭৪।

* প্রবাসী, ১৩১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬।

† Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, p. 21.

উদ্দীন এবং তিনি সৈফউদ্দীন হুমজা শাহের পালিত বা দত্তক পুত্র.* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামক শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ শাহের এক পুত্রের নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। † শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ হইতে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ পর্যন্ত ছয় পুরুষের ছয় জন ৭৮ চন্দ্র বংশের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে রাজা হইয়াছিলেন। শেষ রাজা আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজরাদে (১৪১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। ইহার পরেই জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামক আর-একজন মুসলমান রাজার অধিকার আরম্ভ হয়। তিনি বাঙ্গালাদেশের একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং ৮৩৪ হিজরাদে (১৪৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে) চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ‡

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ-পাদে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে গণেশ ও দম্ভুজমর্দনের আবির্ভাব হইয়াছিল। গণেশ সম্বন্ধে মুসলমান-রচিত ইতিহাসে এবং হিন্দুর কিম্বদন্তীতে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ৩৬র্গাচন্দ্র সান্যাল লিখিত “বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস” নামক গ্রন্থ তাঁহার নব-প্রকাশিত পুস্তকের নানা স্থানে গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাস কতদূর দূষিত করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ রচনা-কালে (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) সান্যাল মহাশয়ের গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত বলিয়া উহার কোন অংশসত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং ইতিহাসের হিসাবে গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসার ও মিথ্যা-পরিপূর্ণ বলিয়া উহার আলোচনাও করি নাই। কিন্তু ভট্টশালী-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে বারম্বার সান্যাল মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমাকে সান্যাল মহাশয়ের

“বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের” বিশ্লেষণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ভট্টশালী-মহাশয় লিখিয়াছেন—The anecdotes of the Bhaturia Zemindars, as recorded by Mr. Sanyal, are extremely interesting and though they are likely to contain exaggerations and fables, being mainly based on tradition and social chronicles or Kula Panjikas, they are sure to possess a back-ground of truth and as such deserve a thorough investigation.* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া ৩৬র্গাচন্দ্র সান্যালের অলীককাহিনীপূর্ণ গ্রন্থখানিকে “সত্যের ভিত্তির উপরে স্থাপিত” বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। ৩৬র্গাচন্দ্র সান্যাল বাসুদেব-কুল-পঞ্জিকা অনুসারে তাঁহার “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস” রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থ-রচনা-কালে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাসগুলি যে তিনি অধ্যয়ন করেন নাই তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। Stewart's History of Bengal প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। গোলাম হোসেন সলীজের রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১২০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মালদহ-নিবাসী স্বর্গগত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর “গৌড়ের ইতিহাস” দ্বিতীয় ভাগ ১২০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে “বাঙ্গালা সামাজিক ইতিহাসের” প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে সান্যাল মহাশয় এই তিনখানি গ্রন্থের একখানিও পাঠ করেন নাই।

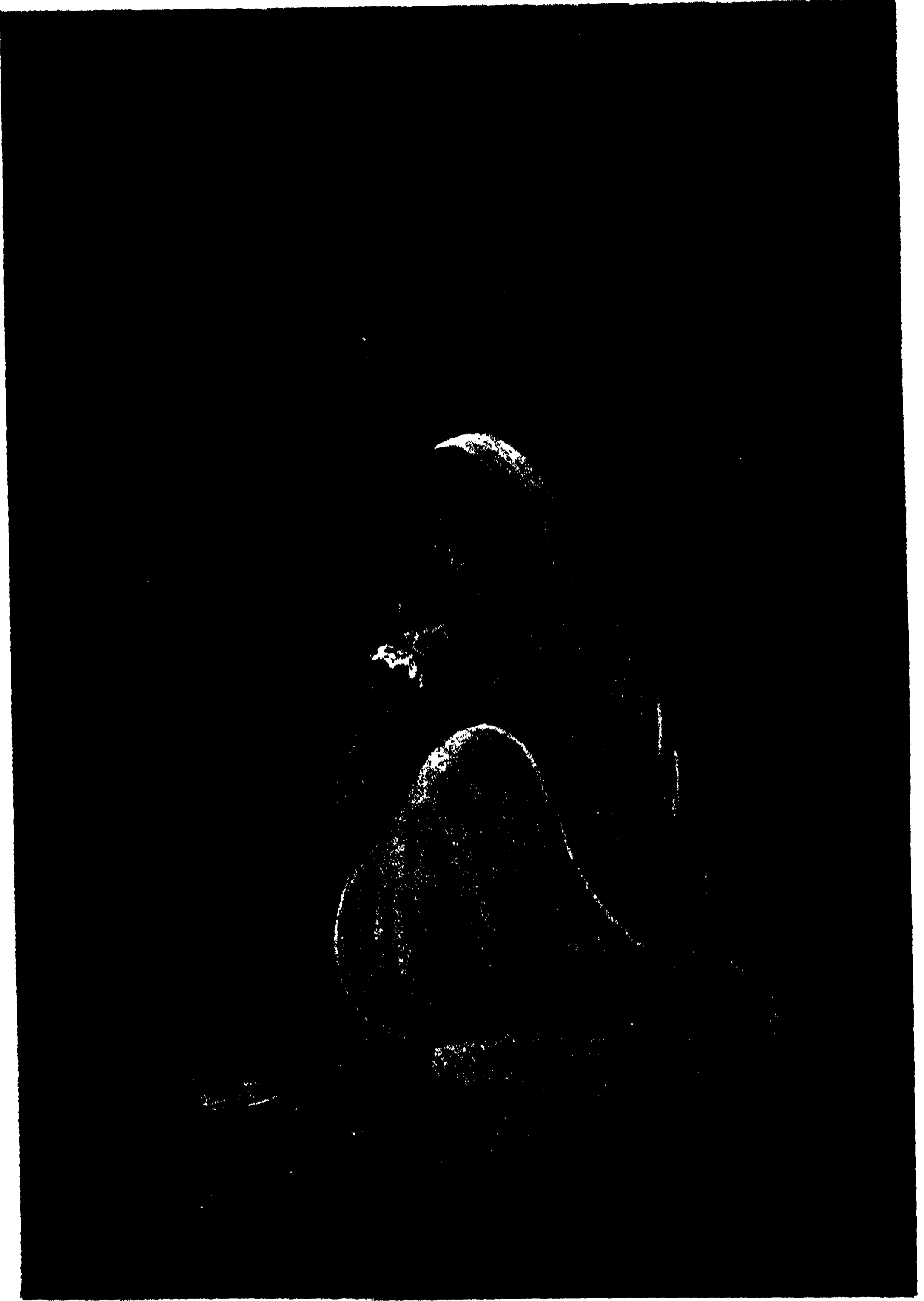
সান্যাল মহাশয়ের মতে “বাঙ্গালা দেশ মুসলমান অধিকাভুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসর কাল দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। স্ববায় স্ববায় নবাবেরা স্বাধীন হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব সম্ভূতউদ্দীন

* Riyaz-us-Saltatin, Eng. Trans. Cal. 1902, p. 112.

† Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, p. 107.

‡ Catalogue of Coins in the Indian Museum Calcutta, vol. 11, pt. 2, p. 103. no. 110.

* Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, etc p. 80.



স্মৃতি-সম্পূট
চিত্রকর শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।” সমস্-উদ্দীনের পূর্বে যে, গিয়াস্-উদ্দীন বলবনের বংশের ছয় জন স্বাধীন রাজা গোড়দেশ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, এ কথা সাগ্গাল মহাশয় জানিতেন না এবং তাঁহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে সাগ্গাল মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ঐতিহাসিক মাত্রেরই স্ফুট উপস্থিত হইবে।—

“ময়জুদ্দীনের বংশধরেরা সকলেই অলস বিলাসী এবং অকর্মণ্য ছিল। একটাকিয়ার ভাতুড়ীরাই তাহাদের রাজত্ব চালাইত। সেই অকর্মণ্য গোড় বাদশাগণ আপনাদের শবীর ও উপপত্নী-প্রকোষ্ঠ (রঙ্গমহল) রক্ষার জন্ত কতকগুলি খোজা (ক্লীব) এবং হাব্শী (কাফ্রি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শেষে সেই হাব্শীগণ সমস্-উদ্দীনের বংশ ধ্বংস করিয়া নিজেরাই বাদশা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। দূরবর্তী প্রদেশের জমীদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজস্ব দিত না। এই অরাজক অবস্থা চারি বৎসর ছিল। তাহার পর সৈয়দ হোসেন শাহ বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান প্রবল লোকদিগকে হস্তগত করিয়া গোড়ের সম্রাট হইলেন। এবং হাব্শীদিগের অধিকাংশ হত্যা করিলেন। অবশিষ্ট লোকদিগকে দক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া দিলেন।”*

সাগ্গাল মহাশয় যাহাকে বাঙ্গালার নবাব সমস্-উদ্দীন বলিয়াছেন তিনি কখনও নবাব উপাধিধারী ছিলেন না এবং কোন কালে তোঙ্গলকবংশীয় দিল্লীর বাদশাহ্-দিগেব অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই রাজার প্রকৃত নাম সমস্-উদ্দীন ইলিয়স শাহ্ এবং তিনি ৭৪০ হইতে ৭৫৯ হিজিরায় পর্য্যন্ত, † (১৩৩৯—১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সমস্-উদ্দীনের বংশ দুইবার গোড়ে রাজত্ব করিয়াছিল। ৭৪০ হিজিরায় (১৩৩৯ খৃঃ) সমস্-উদ্দীন গোড়-রাজ্য জয় করেন। তাঁহার বংশধর ৮১৭ হিজিরায় (১৪১৪ খৃঃ) জীবিত

ছিলেন। তাঁহারে হত্যা করিয়া রাজা গণেশ নিজে গোড়ের রাজা হইয়াছিলেন। গণেশের বংশ তিন পুরুষ পরে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল এবং ৮৪৬ হিঃ সমস্-উদ্দীন ইলিয়স শাহের বংশজাত দ্বিতীয় নসীরউদ্দীন মহম্মদ শাহ্ গোড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। * ইহার বংশজাত জল'সউদ্দীন ফতেশাহ্ ৮৯৩ হিজিরায় (১৪৮৭ খৃঃ) নিহত হইলে হাব্শীগণ গোড়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। †

সুলতান শাহ্-জাদা বারবগ্, সৈফউদ্দীন ফিরোজশাহ্, নসীরউদ্দীন মহম্মদ শাহ্ (তৃতীয়) ও সমস্-উদ্দীন মজ্ফর শাহ নামক চারিজন হাব্শী রাজার পরে আমুলের সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ ৮৯৯ হিজিরায় (১৪৯৩ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই হোসেন শাহ্ কেমন করিয়া সমস্-উদ্দীন ইলিয়স শাহের পৌত্রের পরবর্তী রাজা হইতে পারেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

সাগ্গাল মহাশয়ের মতে এক গোড় বাদশাহের পুত্র আজিম শাহ ও নসেরিং শাহ। এই গোড় বাদশাহ্ কে, তাহা বোধ হয় সাগ্গাল-মহাশয় নিজেই জানিতেন না। ‡ তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যখন সৈয়দ হোসেন শাহের কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে, সাগ্গাল-মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত এই আজিম শাহ ও নসেরিং শাহ এই হোসেন শাহের পুত্র। এই দুইজন রাজাকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা গণেশের সমসাময়িক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সাগ্গাল-মহাশয় যে কুট তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মীমাংসা বেতাল ব্যতীত আর কেহই করিতে পারিবেন না। রাজা গণেশের

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১।

† বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৮।

‡ সাগ্গাল মহাশয়ের গ্রন্থে “সৈয়দ হোসেন শাহের” নামের পরেই দেখিতে পাওয়া যায় “অল্প দিন মধ্যেই গোড় বাদশাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় বেগমের পুত্র আজিম শাহ বয়সে ছোট ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিং শাহ বয়সে বড় ছিলেন। উভয়েই সম্রাট উপাধি ধারণ করিলেন।” পৃঃ ৭০। অথচ ভট্টশালী-মহাশয় ধরিয়া লইয়াছেন যে, এই দুইজন সৈফউদ্দীন হমজাশাহের পুত্র। (Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal)

* বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬২।

† বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৯।

পুত্র জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ ৮১৮ হিজিরায় (১৪১৫ খঃ) স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। স্মতরাং রাজা গণেশকে ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বের লোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অথচ এই রাজা গণেশকে সাগ্নাল-মহাশয় ২২৫ হিজিরায়, অর্থাৎ—১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মৃত হোসেন শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়াছেন। গণেশের পৌত্র শমসুদ্দীন আহমদ শাহ, সাগ্নাল-মহাশয়ের মতামুসারে ফরীদউদ্দীন শের শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি। আহমদ শাহের রাজ্য ৮৪৬ হিজিরায় (১৪৪২ খৃষ্টাব্দে) শেষ হইয়াছিল। * এবং শেরশাহ এই ঘটনার একশত বৎসর পরে, ৯৩৯ হিজিরায় (১৫৩২ খঃ) রাজ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। †

“আহমেদ শাহ: সাত বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সাসারামের জায়গীরদার শের শাহ: প্রবল হইয়া গোড় আক্রমণ করিল। আহমেদ যুদ্ধে নিহত হইলেন। ভাদুড়ী বংশের বাদশাহী বায়ান্ন বৎসরে শেষ হইল।” বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৩।

হোসেন শাহ্ এবং গণেশ ও শমসুদ্দীন আহমদ শাহ্ ও ফরীদউদ্দীন শেরশাহকে সমকালীন ব্যক্তি বলিয়া সাগ্নাল-মহাশয় যে ঐতিহাসিক জানেব পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাঁহার গ্রন্থেব ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে।

গত অষ্ট-শতাব্দী ধরিয়া কতকগুলি দুষ্ট লোক ক্রমাগত কুলপঞ্জিকা ও বংশপরিচয় জাল করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ সরলচিত্ত ঐতিহাসিকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া আসিতেছে। অ-মুসলমান একজন নতন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইলেই এইসমস্ত কৃত্রিমকর তাহাকে কায়স্থ অথবা অগ্র কোন জাতি হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে এবং তদুপলক্ষে সম্প্রদায়বিশেষের আচ্য-

ব্যক্তিগণের নিকট যথোপযুক্ত অর্থলাভ করে। এই-জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক রচিত বটুভট্টের দেববংশ নামক গ্রন্থকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অকৃত্রিম বলিয়া কি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি।*

এইসকল দুষ্ট লোকের রচিত কৃত্রিম গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাজা গণেশকে কায়স্থ জাতীয় স্থির করিয়া বলেন “উত্তর বঙ্গে দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। দিনাজপুর জেলাস্থ রাইগঞ্জ থানার মধ্যে রাজা গণেশের একতম রাজধানী গণেশপুর বিদ্যমান। এই গণেশপুর হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রাজা গণেশ নির্মিত স্মপ্রাচীন রাস্তা রহিয়াছে। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইনি ‘দত্তখান’ নামে পরিচিত।” † অথচ ৮ দুর্গাচন্দ্র সাগ্নাল কাশী ‘কানস’ জাতীয় যে কয়টি লোক পাইয়াছেন তাহাদিগের সকলকেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়াছেন।

১। শিখাই সাগ্নালের পুত্র ফৌজদার কংসরাম সাগ্নাল। ‡

২। একটাকিয়ার রাজা গণেশ নারায়ণ খাঁ *

৩। কুল্লকভট্টের বংশজাত রাজা কংসনারায়ণ। †

মোগল-বিজয়ের পূর্বে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী স্বীকার করিতেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ রাজধানীর নিবট বাস করিতেন না বলিয়া প্রথমে মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী পান নাই। ইহাই ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু রাজা গণেশ উত্তর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহার প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এবং

* বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথমভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃ: ১২৮—৩১।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড, (কায়স্থ কাণ্ডের প্রথমাংশ) পৃ: ৩৬৮।

‡ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ), পৃ: ৫৩।

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ: ১৯১।

† বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ: ৩১৮।

* ঐ ঐ ঐ পৃ: ৬৯

† ঐ ঐ ঐ পৃ: ১০৯

আধুনিক কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের যে কোন মূল্যই নাই তাহা দশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা কালে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল।*

দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে কায়স্থজাতীয় নেতারা নবাবিষ্কৃত বটুভট্টের দেববংশ নামক কুলগ্রন্থ “আবিষ্কার” করিয়া এই দুই জন রাজাকে কায়স্থ জাতির অধিকার-ভুক্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। আমি দশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের অকৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এই কুলগ্রন্থের অকৃত্রিমত্ব বিষয়ক এক সুদীর্ঘ বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কুলগ্রন্থ-প্রিয়, তিনি সকল গ্রন্থকেই অকৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত এবং সাধারণতঃ প্রমাণগুলি পরীক্ষা করেন না। বটুভট্টের দেববংশে লেখা আছে যে মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দনের পিতা। যে দুই ব্যক্তি এই গ্রন্থখানি জাল করিয়াছিল সে আবারই এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিল যে, মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ ১৩৩৬ শকাব্দ এবং দনুজমর্দনের মুদ্রার তারিখ ১৩৪৯ শকাব্দ। মহেন্দ্র দেব যখন দনুজমর্দনের পূর্ববর্তী রাজা তখন তিনি দনুজমর্দনের পিতা না হইয়া আর কোথায় যান। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ পড়িতে আমি যে ভুল করিয়াছিলাম সে কথা বটুভট্টের দেববংশের ‘আসল’ গ্রন্থকার জানিতেন না, পরে H. E. Stapleton নামক পূর্ববঙ্গের একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী মহেন্দ্র দেবের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তাহার কোনটিই ১৩৪০ শকাব্দের পূর্বে মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। তখন বুঝিতে পারা গেল যে মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দনের পরবর্তী রাজা এবং ৩রাধেশচন্দ্র শেঠ মালদহে মহেন্দ্র দেবের যে মুদ্রাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দ। বটুভট্টের দেববংশের যে অংশটিতে মহেন্দ্র দেবকে দনুজমর্দনের পিতা বলা হইয়াছে সেই অংশটি

আর এখানে প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এখনও বলেন নাই যে, “পূর্বের পুথিখানি সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়াছিল,” কিন্তু একথা বলিবার সময় হইয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালার ইতিহাস, রাজা মাত্রেই কায়স্থ বংশে জন্মের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া বারেন্দ্র উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিনি কেবল বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন না, ইংরেজীতে তাঁহার অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে; স্ততরাং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু যে ভাষায় ও যে ভাবে নূতন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইলেই তাঁহাকে কায়স্থ বংশের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন সেই ভাবে ও সেই ভাষায় আত্মপ্রকাশ ভট্টশালী মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব নহে স্ততরাং তাঁহাকে ৩ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল রচিত অলীক কাহিনীসমূহের আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছে। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা করিবার সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার এই বিষয়ে কটাক্ষপাত করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ৩ দুর্গাচন্দ্র সান্যালের মতে রাজা গণেশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং ভট্টশালী মহাশয়ের মতে রাজা গণেশের অপর নাম দনুজমর্দন।

ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে,—

১। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে রাজা গণেশ বাঙ্গালা রাজ্য জয় করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

২। মুসলমান সাধু নূর কুতব-উল-আলেম সেইজন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শার্কীকে বাঙ্গালা রাজ্য আক্রমণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, পরিশিষ্ট (ঙ), পৃ: ১২৮—৩৭।

* “Our author’s critical acumen is not sufficiently awake against D. C. Sanyal’s gossip.”—Modern Review, April, 1923, p. 469.

ইব্রাহিম শাহ দ্রুতগতিতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে পৌঁছিয়াছিলেন।

৩। ইব্রাহিম শাহের আগমনে ভয় পাইয়া রাজা গণেশ শেখ নর কুতব-উল-আলমের শরণাগত হইয়া তাঁহার পুত্র যত্নকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতে দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যত্ন মুসলমান হইয়া জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে বাঙ্গালার রাজা হইয়াছিলেন।

৪। যত্ন মুসলমান হইলে নর কুতব-উল-আলম ইব্রাহিম শাহকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

৫। ইব্রাহিম শাহ প্রত্যাবর্তন করিলেই রাজা গণেশ পুনরায় বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়া, যত্নকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় হিন্দু করাইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।*

ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতই সম্পূর্ণ সত্য এবং রাজা গণেশ যখন দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আবোহণ করেন তখন দমুজমর্দন উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ :—

১। ৮১৭ হিজিরায় শিহাব উদ্দীন বায়াজীদ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল ও তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত বর্ষে মুদ্রিত তাঁহার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২। ৮১৮ হিজিরায় যত্ন জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ৮১৯ হিজিরায় তাঁহার মুদ্রিত রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।†

৩। ৮২০ হিজিরায় চট্টগ্রাম, স্বর্ণগ্রাম ও পাণ্ডু-নগর টাঁকশাল হইতে মুদ্রিত দমুজমর্দনের রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৮২১ হিজিরায় পাণ্ডু-নগরের টাঁকশালে মুদ্রিত দমুজমর্দনের রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

৪। ৮২১ হিজিরায় পাণ্ডু-নগর ও চট্টগ্রামের টাঁকশালে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, p. III.

† Coins and Chronology etc etc. p. 113.

৫। ৮২১ হিজিরা হইতে জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন যে, ৮২০ ও ৮২১ হিজিরায় দমুজমর্দনের মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। কথাটি এক হিসাবে মিথ্যা, কারণ দমুজমর্দনের যতগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিতেই হিজিরাক ব্যবহৃত হয় নাই। এপর্যন্ত দমুজমর্দন দেবের যতগুলি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিতেই শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩৩৯ শকাব্দ ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ শুক্রবারে শেষ হইয়াছিল। সুতরাং ১৩৩৯ শকাব্দ ৮১৯ হিজিরায় আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ ৮১৯ হিজিরা ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে শেষ হইয়াছিল। সুতরাং ১৩৩৯ শকাব্দের শেষ দেড় মাস মাত্র, ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ ৮২০ হিজিরায় পতিত হইয়াছিল। এইরূপে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৩৪০ শকাব্দ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ শুক্রবার আরম্ভ হইয়া ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ শেষ হইয়াছিল। অতএব ইহাও ৮২০ হিজিরার দ্বিতীয় মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। ৮২০ হিজিরা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শেষ হইয়াছিল, এবং ১৩৩৯ শকাব্দের গ্রায় ১৩৪০ শকাব্দ ও ৮২১ হিজিরার দ্বিতীয় মাসে শেষ হইয়াছিল।*

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভট্টশালী-মহাশয় ১৩৩৯ শকাব্দকে ৮২০ হিজিরা ও ১৩৪০ শকাব্দকে ৮২১ হিজিরা, কেবল নিজের সুবিধার জন্ত ধরিয়া লইয়াছেন। দমুজমর্দন দেবের ১৩৩৯ শকাব্দে যে-সকল মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল সে-সমস্তই যে ৮২০ হিজিরার অর্থাৎ—১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চের মধ্যে এবং দমুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের যেসকল

* এইসমস্ত বৎসরের আরম্ভ ও শেষ দিন গণনার জন্ত H. N. Wright রচিত Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, Pt. II. দ্রষ্টব্য।

মুদ্রা ১৩৪০ শকাদে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেগুলি যে ৮২১ হিজিরার, অর্থাৎ ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল একথা কেহই বলিতে ভরসা করিবেন না, কারণ সমস্ত বৎসর ছাড়িয়া কেবল শেষের পাঁচ সপ্তাহে টাকশালে টাকা চাপা হইত, একথা কোন ইতিহাসে বা শিলালিপিতে লেখা নাই। দমুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখ নিজের স্থবিধা করিয়া লইবার জন্য বদলাইয়া শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকের অযোগ্য। ৮১৮ ও ৮১৯ হিজিরায় মুদ্রিত জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং যে দমুজমর্দন ৮১৯ হিজিরায় মুদ্রাকন আরম্ভ করাইয়াছিলেন তিনি এই জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহের পিতা রাজা গণেশ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। স্বজাতির প্রীতি, প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর ঞায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীকেও অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেইজন্যই তিনি ৬দুর্গাচন্দ্র সান্নালের প্রেতাঙ্গার অন্তরালে থাকিয়া নবাবিকৃত রাজা দমুজমর্দনকে রাজা গণেশের সহিত এক করিয়া লইয়া তাঁহাকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলেন।

ভট্টশালী-মহাশয়ের গ্রন্থে চিত্তস্থিরতার একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একস্থানে গোলাম হোসেন সলিমকে বিক্রপ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় স্থানে সেই ব্যক্তির রচিত ইতিহাসকে সর্কাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিয়াছেন :— (১) And the Riyaz gave him a reign of only 9 years and some months.*

(2) The reader will at once perceive that the account of the Riyaz is substantially correct.†

তৃতীয় স্থানে ভট্টশালী-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 't was thus that Ganesh came to occupy the throne of Bengal and ruled wisely for seven

years.* রিয়াজ-উস-সালাতীনে দেখিতে পাওয়া যায়, The rule and tyranny of that heathen lasted seven years.† গোলাম হোসেন সলিম রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রমাণভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে-স্থলে অল্প প্রমাণ আছে সে-স্থানে রিয়াজের প্রমাণ বিচার না করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। যদি ভট্টশালী-মহাশয়ের মত ধরিয়া লওয়া যায় যে, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে মারিয়া গণেশ নিজে রাজা হইয়াছিলেন এবং জোনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহ শারকীর ভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নিজ পুত্রকে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করাইয়া রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইব্রাহীম শাহ চলিয়া গেলে যত্নে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে ১৩৩৯ শকাদে দমুজমর্দন নাম বা উপাধি গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় বার গোড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ১৩৪০ শকাদে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং যত্ন প্রথমে মহেন্দ্র দেব উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ও পরে দ্বিতীয়বার মুসলমান হইয়া জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; তাহা হইলেও রিয়াজের উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, কারণ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজিরায় (২৩শে মার্চ ১৪১৪ হইতে ১৩ই মার্চ ১৪১৫) গোড়ের বাদশাহ ছিলেন এবং ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে যত্ন দ্বিতীয় বার মুসলমান হইয়া ৮২১ হিজিরায় (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪১৮ হইতে ২৮শে জানুয়ারী ১৪১৯) নিজ নামে মুদ্রাকন করাইয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্বের কথা জানিতে হইলে রিয়াজ-উস-সালাতীনের কথা বিশ্বাস করা চলে না, কারণ এই চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে গণেশের সাত বৎসর-ব্যাপী রাজ্য কোন মতেই প্রবিষ্ট করা যায় না।

দমুজমর্দন কে ছিলেন সে-সম্বন্ধে ভট্টশালী-মহাশয় নূতন প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ৮১৭ হিজিরায় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পরে ৮১৮

* Coins and Chronology etc. etc. p. 72.

† Ibid, pp. 113—14.

* Ibid, p. 86.

† Riyaz-us-Salatin (Eng. Trans.), p. 117.

হিজিরায় জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ গোড়-রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহের ৮১৮, ৮১৯ ও ৮২১ হিজিরার মুদ্রা আছে; কেবল ৮২০ হিজিরার মুদ্রা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কেবল এক বংশের মুদ্রার অভাবে তাঁহার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ ও দ্বিতীয়বার মুসলমান ধর্মে দীক্ষা অনুমান করা বিংশতি শতাব্দীতে ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। যখন একই বংশের হিন্দু রাজা দলুজ্জমর্দন দেব ও মুসলমান রাজা জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তখন এই দুইজনকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়াই ধরিয়া লওয়া সম্ভব।

দলুজ্জমর্দন বোধ হয় কায়স্থ বংশজাত, কারণ বাঙ্গলার

ঐতিহাসিক-গগনে প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের আবির্ভাবের বহু পূর্বে চন্দ্রদ্বীপের এক কায়স্থ বংশ দলুজ্জমর্দনকে বন্ধু বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের দাবী গ্রাহ্য হইবার এবং বটুভট্টের দেববংশের দাবী অগ্রাহ্য হইবার একমাত্র কারণ এই যে, সে-সময়ে কুলশাস্ত্র এত অধিক পরিমাণে জাল হইতে আরম্ভ হয় নাই।*

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

* Dr. James Wise on The Bara-Bhuyas of Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1874, pt. i.; বোহিনীকুমার সেন প্রণীত “বাকলা”; পৃ ১৫৭।

কামনা

হে মোর দেবতা প্রভু, মম চিত্তমানে
প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে।
ব্যথা দিয়ে দুঃখ দিয়ে হিয়াবে আমার
আঘাতে আগাতে কব মহৎ উদার।
শক্তি মোরে দাও প্রভু, যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পাবি মোর ভ্রাতা সম।
শক্রমিত্র ভেদাভেদ ভুলি' যেন, নাথ,
কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ।

দারিদ্র্য? কেন সে র'বে? কেন অত্যাচার
তোমার দয়ার রাজ্যে? কেন অবিচার
সুন্দর ভুবনে তব? হে আমার প্রভু,
প্রেম-মাবো হিংসা কেন জেগে রয় তবু?

দূর কর দূর কর সর্কি আবর্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমারি মার্জনা।

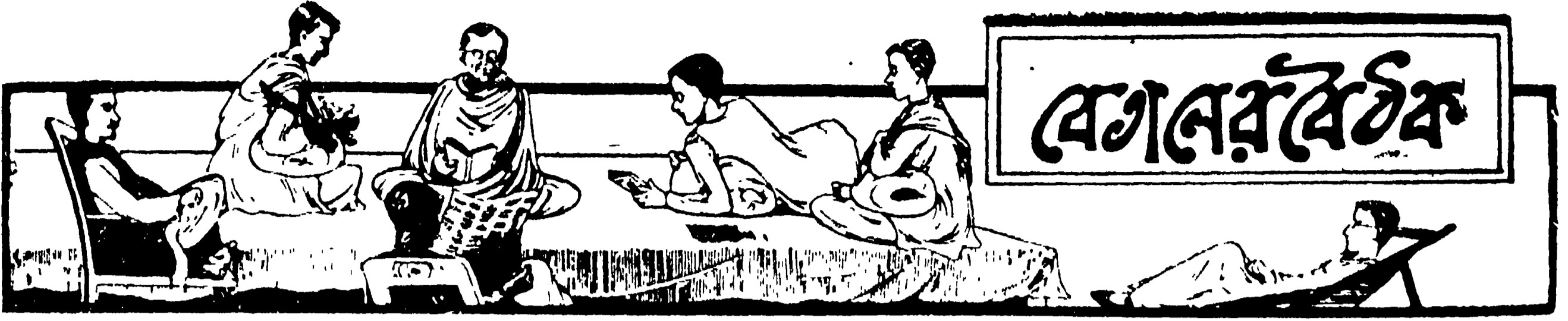
হুমায়ুন কবির

নাম

(Coleridge)

প্রিয়ারে আমার স্মৃতি'র একদা,—“ওগো মোর প্রাণ-প্রিয়া,
কাব্যে তোমায় করিব প্রকাশ বল কোন্ নাম দিয়া?—
ললিতা, কুন্দ, জ্যোৎস্না, সরলা,
নীলিমা, নমিতা, মীনা কি মুরলা,
মানসী, লতিকা, ছায়া, বীণা, লীলা,—বল বাহা চায় হিয়া।”
প্রেমে ও সোহাগে গলিয়া আমার প্রিয়া কহে শুনি'তাই,—
“যা লাগে তোমার ভাল বলি' মোর মতামত কিছু নাই।—
হোক সে ললিতা, কুন্দ কি বীণা,
মানসী, নীলিমা, ছায়া, লীলা, মীনা;
তোমারি বলিয়া ভাষ' যদি তবে আর-কিছু নাহি চাই।”

শ্রী অজিতকুমার সেন



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিসূক্ত হয় সে-বিদয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। স্মরণীয় যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহারা কোন বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৮২)

ভারতে কাপড়ের কল

ভারতের কোন্ কোন্ কাপড়ের কল ভারতীয়ের দ্বারা এবং কোন্-কোন্গুলি বিদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত? বাঙ্গালীর পরিচালিত কল কোন্-কোন্টি?

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(১৮৩)

“উর” শব্দটি কোন ভাষার?

গত মাস মাসেব প্রবাসী ২২৬ পৃষ্ঠায় আছে, ইজিপ্টের উর নামক স্থানে মাটির তলায় একটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই সহব হইতেই বাইবেলে বর্ণিত আব্রাহাম নামক এক অতি সভ্য লোকের আগমন হয়। বাইবেলের পুরাতন টেক্সটমেন্টে আছে যে উর নগর ইউফ্রাটিস নদী-তীরে বেবিলোনিয়াব রাজা নেবুকডনেজারের রাজধানী ছিল। রাক-পুরোহিতের এক পুত্রের নাম আব্রাম। পুরোহিত আপন অবসর সময়ে মাটির ঠাকুর-মূর্তি গড়িতেন ও হাটে বিক্রয় করিতেন। একদিন শিশু আব্রাম প্রশ্ন করিল—আপনি এই মূর্তি নিজে গড়িয়া তাহাকে প্রণাম করেন কেমন করিয়া? পিতা বালককে ভৎসনা করিয়া, ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু বালকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আব্রাম বাল্যাবধিই মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে সাধাবণ দেশবাসীকে উপদেশ দিত। বড় হইলে, আব্রাম একদিন মন্দির রক্ষা করিতেছিল, সে-দিন নগরের বাহিরে এক উৎসবে যোগ দিতে নগরবাসীবা গিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মন্দিরের সর্বাংশে বড় মূর্তিটির কাছে একটি কুঠাব রহিয়াছে, ও অশ্রু মূর্তিগুলি ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে। মূর্তিগুলির এই দশা দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। তাহারা আব্রামকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল—“তোমরা তখন উৎসব দেখিতে গিয়াছিলে, আমি একা মন্দির-দ্বারে বসিয়া-ছিলাম। দেখিলাম, এক বৃদ্ধা একটি সন্দেশ মন্দির-দ্বারে রাখিয়া

চলিয়া গেল। তাহার যাইবার পর মূর্তিরা সন্দেশ খাইবার জন্ত খগড়া করিতে লাগিল। তখন বড় মূর্তিটি ঐ কুঠার দিয়া সকলকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল ও স্বয়ং সন্দেশটি খাইয়া ফেলিল।” এই গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল ও বলিল—“মূর্তির কি মারিবার ক্ষমতা আছে?” আব্রাম বলিল—“তাহার যদি কোন ক্ষমতাই নাই তবে তাহার পূজা কর কেন?” এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারিল না। রাজা সংবাদ পাইয়া আব্রামকে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে আজ্ঞা করিলেন। আব্রামের হাত পা বাঁধিয়া আগুনে ফেলা হইল। আগুনে কেবলমাত্র তাহার বাঁধনের দড়ি পুড়িল আর কোনও ক্ষতি হইল না। আব্রাহামের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। তখন আব্রাম আপন পত্নী ও জাতার পুত্র লুতকে সঙ্গে লইয়া উর নগর ত্যাগ করিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে ইজিপ্টে গিয়া কিছুকাল ছিলেন। পশ্চিম এশিয়াতে আব্রাম [আব্রাহাম বা ইব্রাহীম] আদি একেশ্বর-বাদ-স্থাপক। কারণে আছে যে আন্নাতারার আজ্ঞা-মত জব্রঙ্গল আদি মানব আদমকে ঈশ্বরোপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কালে আদমের সন্তানেরা মূর্তি-পূজক হইয়া পড়িল। তখন আব্রাম আবার একেশ্বর-বাদ স্থাপন করিলেন। আবার জীব-মূর্তিপূজক হইলে, মহম্মদ একেশ্বর-বাদ স্থাপন করেন। বাইবেলে আব্রামের দুই পুত্রের উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠ ইশ্মাঈলের বংশে সমস্ত আরববাসী ও হজরৎ মহম্মদের জন্ম হইয়াছে। কনিষ্ঠ ইস্‌হাকের বংশে যিশু খৃষ্টের জন্ম হইয়াছে।

বাইবেলে উর একটি নগরের নাম হইলেও ভাষাতত্ত্ববিৎরা বলেন, উর শব্দের অর্থ “নগর”। বোধ হয় উর শব্দের পূর্বে অশ্রু-একটা শব্দ ব্যবহার করা হইত। দক্ষিণ দেশে আহমদ নগরকে লোকে কেবলমাত্র নগর বলিয়া থাকে। সেইরূপ বোধ হয় এ নগরকেও উর বলিত।

ভারতেও এশব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে যে মহিশুর নামক দেশ ও নগর আছে সে শব্দটি মহিষ+উর=মহিষ নামক অশুরের নগর। মহিশুর নগরে মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তি

আছে। দেশের লোকে বলে ঐখানেই মহিন থাকিত ও দেবী তাহাকে ঐ স্থানেই বধ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে উর শব্দটি কোন ভাষার শব্দ। যদি সংস্কৃত অথবা ড্রাবিড় কোন ভাষার শব্দ হয় তবে ইউফেটিস তীরে বা ইজিপ্টে কখন ও কেমন করিয়া গিয়াছে? যদি ইন্দীদেব ইরানী ভাষার শব্দ হয় তবে দক্ষিণ ভারতের শাক্তরা কোথায় পাইল?

শ্রী অমৃতলাল শীল

মীমাংসা

(১৩২৯ সালের ৩২ নম্বর প্রশ্ন)

প্রাগ্জ্যোতিষপুর

গত বৎসর শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রাগ্জ্যোতিষপুর কোথায়? তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই:—(১) সাহেবেরা বলেন যে আসামের গৌহাটীই প্রাগ্জ্যোতিষপুর। (২) মহাভারতের সভাপর্বে ২৬০ অধ্যায়ের ৭-৯ শ্লোকে দেখা যায় যে অর্জুন হস্তিনাপুর হইতে উত্তর দিকে গিয়া প্রথমে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করেন এবং পরে আরও উত্তরে গিয়া কাশ্মীর জয় করেন। (৩) বনপর্বের ২৫৩ অধ্যায়ে ৪।৫ শ্লোকে দেখা যায় যে কর্ণও উত্তর দিকে গিয়া প্রথমে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে এবং পরে কাশ্মীর জয় করেন। (৪) রামায়ণে কিষ্কিন্দ্যা কাণ্ডের ৪২ সর্গে ৩০।৩১ শ্লোকে দেখা যায়—সুগ্রীব বলিতেছেন যে কিষ্কিন্দ্যা হইতে ৬৪ যোজন দূরে সমুদ্র মধ্যে বরাহ পর্বতে প্রাগ্জ্যোতিষপুর অবস্থিত। সেখানকার রাজার নাম নরক।

সুতরাং তিনটি পৃথক এবং পরস্পর অতিদূরবর্তী স্থান প্রাগ্জ্যোতিষপুর বলিয়া নির্দেশিত হয়। এইজন্মই বৈকুণ্ঠ-বাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন যে প্রকৃত প্রাগ্জ্যোতিষপুর কোনটা।

বৈকুণ্ঠ-বাবুর জিজ্ঞাসার উত্তর আমি নিম্নে দিতে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কেবল যে সাহেবেরাই গৌহাটী, কামাখ্যা বা কামরূপকে প্রাগ্জ্যোতিষপুর বলিয়া মনে করেন তাহা নহে। কালিকা পুরাণে এবং কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ অধ্যায়ে রঘুর দিগ্বিজয়ে ও লৌহিত্য মদীতীরস্থ গৌহাটীকেই প্রাগ্জ্যোতিষপুর বলা হইয়াছে। মহাভারতের সময়ে অর্থাৎ আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে অথবা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে যে আর্ঘ্যেরা পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত গিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিকদিগের মত নহে। ইহা ভিন্ন আরও একটা বিবেচ্য কথা আছে। কুর পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্ত কুরুর চেষ্টা যখন বিফল হইল তাহার অল্পদিন পরেই কুরক্বেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই জঙ্গল সময়ের মধ্যে ভগদত্ত যে গৌহাটীতে থাকিয়া হস্তিনাপুর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইয়া বহু হস্তী লইয়া নানাধিক ১৬০০ মাইল দূরবর্তী হস্তিনাপুরে গিয়া কুরক্বেত্রের যুদ্ধে যোগ দিবেন, তাহাও অসম্ভব। বিশেষতঃ কালিকা পুরাণই হউক বা কালিদাসের উক্তিই হউক তাহা রামায়ণ বা মহাভারতের কথার বিরোধী হইলে কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং গৌহাটী যে প্রাগ্জ্যোতিষপুর নহে ইহা নিশ্চিত। ইহাতে কাহারও কামরূপ সন্দেহ হইতে পারে না।

এখন বিচার্য বিষয় এই যে, রামায়ণের কথা সত্য, মা মহাভারতের

কথা সত্য। রামায়ণের কথা যে প্রকৃত নহে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, প্রাগ্জ্যোতিষপুর যদি সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপ হইত তাহা হইলে ভগদত্ত সেখান হইতে তাঁহার বড় বড় হাতী সমুদ্র পার করাইয়া ভারত-বর্ষে আসিলেন কিরূপে? কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, সুগ্রীব অসভ্য বর্ষের দেশের লোক ছিলেন সুতরাং প্রাগ্জ্যোতিষপুরের ভৌগোলিক স্থানটা জানিতেন না বলিয়া রামায়ণ-কার তাঁহার মুখ দিয়া এই ভুল কথা বলাইয়াছেন। সুগ্রীবের উক্তির মধ্যে যদি নরক রাজার উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলে এই যুক্তি অতি সুন্দর বলিয়াই মানিয়া লওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি রামের সমসাময়িক লোক হইয়া রাম হইতে অন্তত দুইতিন শত বৎসরের পরবর্তী কৃষ্ণের সমসাময়িক নরক-স্বরের নাম জানিলেন কিরূপে? যদি তাঁহার কথাই সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার কয়েক শত বৎসর পরবর্তী কৃষ্ণেরই বা নরক রাজাকে বধ করিবার সম্ভাবনা কি? যাহারা ওএবর এবং হুইলরের মতানুবর্তী হইয়া বলেন যে, মহাভারতের ঘটনার বহু পরে রামায়ণের ঘটনা ঘটাইয়াছিল তাহারা অনায়াসেই এই মত দিবেন যে, রামায়ণের বৃত্তান্ত মহাভারতের অনেক পরে। যখন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছিল অথচ যখন তাহার এবং নরক রাজার সামান্য স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল তখনই রামায়ণের বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছিল সুতরাং রামায়ণের কথাই ভুল। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ওএবর এবং হুইলরের মত মানেন না। তাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে প্রচলিত রামায়ণের বহু স্থলে এই মর্মের উক্তি আছে যে, “বৃদ্ধ বায়্বীকি এইরূপ বলেন”। স্বয়ং বায়্বীকির এইরূপ লেখা অসম্ভব। ইহা হইতে অপরিহার্য সিদ্ধান্ত এই যে আদিরামায়ণ লুপ্ত হইয়াছিল। তাহারই স্মৃতি লইয়া নূতন এক ব্যক্তি বায়্বীকি নাম ধারণ করিয়া মহাভারতের বহু পরে এখনকার প্রচলিত রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, যাহাতে মূল রামায়ণের কথা ব্যতীত অপর বহু কথা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তিনি যখন লিখিয়াছিলেন তখন নরক রাজা ও প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নামের অতি ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র ছিল। অল্প পক্ষে মহাভারতে প্রাগ্জ্যোতিষপুর সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা আছে। নরক সেখানকার রাজা ছিলেন, ভগদত্ত তাঁহার পুত্র ছিলেন, তাঁহার ভগিনী ভামুসতীকে দুর্ঘোষন বিবাহ করেন। তিনি দুর্ঘোষনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কুরক্বেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে একবার অর্জুন ও একবার কর্ণ প্রাগ্জ্যোতিষে গিয়া সেই দেশ জয় করেন। এসমস্ত কথা মিথ্যা হইতে পারে না। রামায়ণে কিন্তু প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও নরক রাজার নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইসকল পর্য্যালোচনা করিয়া মহাভারতে যে প্রাগ্জ্যোতিষকে দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত বলা হইয়াছে তাহাই অবশ্যগ্রাহ্য।

কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন এবিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরা প্রশংসা করিয়াছেন এবং এপনও করিতেছেন। তিনি যে কামরূপকে প্রাগ্জ্যোতিষপুর বলিয়া মনে করিতেন ইহা তাঁহার বাঙ্গালীত্বের অন্ততম প্রশংসা। কেমনা বাঙ্গালী ও আসামীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রাগ্জ্যোতিষপুরই কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল। গৌহাটীর প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া এখনও সেখানকার লোকে বলে যে, সেখানে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এইসকল জনশ্রুতি, কালিদাসের বিশ্বাস এবং কালিকাপুরাণের উক্তি এসমস্তই কি মিথ্যা? যদি মহাভারতের কথা সত্য হয় তাহা হইলে উল্লিখিত জনশ্রুতি মিথ্যা বই আর কি হইতে পারে? বলিষীপের অধিবাসীরা সেখানকার একটা স্থান দেখাইয়া বলিয়া থাকে যে সেখানেই কুরপাণ্ডবদের যুদ্ধ হইয়াছিল। দিনাজপুরের জনশ্রুতি এই যে, দিনাজপুরেরই প্রাচীন নাম মৎস্ত দেশ ছিল। অথচ মহাভারতের মতে রাজপুতানার জয়পুরের প্রাচীন নামই মৎস্ত দেশ। মণিপুরের লোকের বিশ্বাস এই যে, উহাই মহাভারতোক্ত মণিপুর।



রিত্তা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু।

এবং মণিপুরের রাজাদেরও বিশ্বাস যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাঁহাদের পূর্বপুরুষ। অথচ মহাভারতের মণিপুর দক্ষিণাংশে। ভীষ্মক রাজা ছিলেন বিদভের রাজা এবং কৃষ্ণ তাঁহার কন্যা রুশ্বিনীকে বিবাহ করেন ; কিন্তু আসামের জনশ্রুতিতে বলে ভীষ্মক ছিলেন সদীয়ার রাজা। বাণ রাজার বাড়ী ছিল পাতান নামক এক দেশের শোণিতপুর নামক নগরে এবং সেখানেই কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গিয়া বাণের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। অথচ আসামের জনশ্রুতি অনুসারে তেজপুরেরই পূর্ব নাম ছিল শোণিতপুর এবং বাণ সেখানেই রাজত্ব করিতেন। মহাভারতে দেখিতে পাই যে জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা বারণাবত হইতে পলায়ন করিয়া দুই দিন পদব্রজে গিয়া হিড়িম্ব নামক অশ্বরকে বধ করেন। কিন্তু আসামের জনশ্রুতি বলে যে, হিড়িম্বের বাসস্থান ছিল ডিমাপুর। এইসকল জনশ্রুতির মূলে যেমন সত্যের লেশমাত্র নাই গোহাটির প্রাগ্জ্যোতিষপুর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিতেও কিছুমাত্র সত্য নাই। কোন হিন্দুই বোধ হয় মহাভারত, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া জনশ্রুতির প্রমাণ স্বীকার করিবেন না।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(৪৯)

রুদ্রাক্ষ ও তাম্রমুদ্রা

দুইটি তাম্রমুদ্রার মধ্যবর্তী হইলে রুদ্রাক্ষ ঘুরিবার কারণ বাহা দেখান হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। দুইটি রোপ্য বা স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে ধরিলেও রুদ্রাক্ষটি ঘুরিয়া থাকে। তরুণ দুইটি মন্থন প্রস্তরখণ্ড বা কাচের মধ্যেও গুরে। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে, যে-কোন মন্থন সমতলবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের মধ্যে রুদ্রাক্ষ, বাণলিঙ্গ, পাকা আমড়ার পুরষ্ট আঁটি, কুশমূল অথবা সাধারণ এক খণ্ড এবড়ো-খেবড়ো পাথর রাখিয়া একটু চাপ দিলেই কোন-মা-কোন দিকে দুই চারি পাক ঘুরিয়া যাইবে ; রুদ্রাক্ষের উন্নত অংশগুলি উজ্জলতায় সমান নহে এবং সেগুলি বাড়ী কলমের স্থায় একটু করিয়া ট্যারুচা। মন্থন পৃষ্ঠদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া একটু চাপ পাইলেই মন্থন সমতল পৃষ্ঠ সর্বোন্নত অগ্রদেশ হইতে গড়াইয়া পড়িবার কালে রুদ্রাক্ষের একটি ঘূর্ণন-গতি হয় এবং তাহাতেই ২১ পাক ঘুরিয়া যায়। ইহাতে বিদ্যুতের কোন সম্পর্কই নাই। অধিকন্তু রুদ্রাক্ষের উপর ও নীচেকার যে দুইটি দিক সমতল পৃষ্ঠে লগ্ন থাকে তাহার দুই পার্শ্বের ভার অসমান হইলে ত নিশ্চয়ই শীঘ্র শীঘ্র দুই চারি পাক ঘুরিবেই ঘুরিবে।

শ্রী মুগাকনাথ রায়

প্রথমকর্তা বলিতেছেন যে একটি রুদ্রাক্ষকে দুইটি তাম্রমুদ্রার মধ্যে ধারণ করিলে সেটি ঘুরিতে থাকে। উত্তরদাতা এই বিষয় সম্পূর্ণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উত্তর লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ঘটনা প্রকৃত ধরিয়া কল্পনার সাহায্যে এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, ঐরূপে ধারণ করিলে রুদ্রাক্ষ সব সময়ে ঘোরে না, কোন কোন সময়ে একটু ঘোরে। কেবল তা-ম-মুদ্রা কেমন, দুই খণ্ড কাচের মধ্যে ধরিলেও ঐরূপ গুরে। রুদ্রাক্ষে অনেকগুলি উঁচু উঁচু বিন্দু আছে। যদি চাপিবার সময় তাম্রমুদ্রাঘর্ষণ বা কাচখণ্ডঘর্ষণ এমন দুইটি বিন্দুতে লাগে যে তাহাদের সর্বাঙ্গিক রুদ্রাক্ষের সমান অংশ নাই, তাহা হইলে ভারী দিকটা নীচের দিকে আসিতে যে-টুকু দোরা দরকার কেবল সেইটুকুই ঘোরে, ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে না।

স

(১৪৫)

গোয়ীচন্দ্র উত্থানসী

গদাধর ভট্টের কুলঞ্জী ২২৬—২২৯, ২২৩—২৩৫ ও ৩৪৪—৩৫৯ প্রোকে 'বিদ্যাস্বর' গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি স্বয়ং দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া 'কুতুবপুর প্রদেশান্তর্গত' বৃন্দাবনপুর গ্রামে বাস করেন। মাহিম্যবঙ্গুগণের নিকট না জানিতে পারিলেও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মেদিনীপুরের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে জানা যায় কুতুবপুর উক্ত জেলার অধুনা-বিলুপ্তশ্রী প্রাচীন মাহিম্য (টেকবর্ড) রাজ্য। গোয়ীচন্দ্র শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সামবেদী এবং আদিবৈদিক শ্রেণীর সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তাঁহারাই ইহাকে 'অগ্রমামুগুপূজা' রূপ মধ্যাদা দান করেন। বেদবেদান্তপারদর্শিতার জন্ম ইনি 'ব্যাস আখ্যা' প্রাপ্ত হন। মেদিনীপুরের এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ 'ব্যাসাজু' নামে এইজন্ত অভিহিত। কাহারও কাহারও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এই যে ইনি মধ্যশ্রেণীসত্ত্ব।

ইনি এবং ইঁহার বংশোদ্ভূত 'ভট্টাচাখ্যাভিধো মহান' বংশীধন সংস্কৃতিসার ব্যাকরণের 'সুনির্মলা' টীকা-টিপ্পনী প্রস্তুত করেন। এই বংশ নান! দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ময়নার রাজা হেরম্মানন্দ বাহবলীশ্রের নেতৃত্বে তত্রত্য সেবক-সম্মিলনীর যত্নে যে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে তাহার এক সংস্কৃতি বিবরণী আমার নিকট আসিয়াছে। উহাতে দেখা যায় দ্রাবিড় হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আনয়নকারী রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই আনীত বিপ্রগণের পুলাদি উল্লেখকালে কুলঞ্জীতে গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাভিনোদ

(১৫৮)

বুদ্ধদেব যে রাজার পুত্র ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সে রাজা কোনও বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন না। তিনি কেবলমাত্র শাক্য-বংশীয়দের রাজা ছিলেন। শাক্য-বংশীয়দের রাজ্য কেবলমাত্র একটি নগর—কপিলবস্ত্র—ছিল। নগরটি প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। নগরের চারিদিকে শাক্যদের চাষের বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল। দিনমানে তাহারা আপন আপন ক্ষেত্রে চাষ করিত ও রাত্রে নগরে প্রবেশ করিত। যাহাদের ক্ষেত্র নগর হইতে দূরে, অতএব যাহারা প্রত্যহ যাতায়াত করিতে পারিত না, তাহারা চাষের সময়ে ক্ষেত্রেই কিছুদিন বাস করিত, কিন্তু তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি ও মূল্যবান বস্তু নগরের মধ্যে গৃহেই থাকিত। নগরে শাক্যবংশীয় ছাড়া অল্প বংশীয় অধিবাসী ছিল না। গ্রামবাসী জাতি-প্রজায় মত গ্রহণ না করিয়া রাজা কিছুই করিতে পারিতেন না।

কপিলবস্ত্রের পাশ্চমে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীনগর। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের অল্প কিছুকাল পরে শ্রাবস্তীরাজ প্রসেনজিৎ একটি শাক্যস্থিতা বিবাহ করিয়া শাক্যদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শাক্যরা প্রসেনজিতের বংশকে হীন ও আপনাদের বংশকে কুলীন বলিত ; সেইজন্ত শাক্যরা প্রসেনজিৎকে কস্তাদান করিতে স্বীকৃত হইল না। কিন্তু প্রসেনজিৎ প্রথমাবধি বড় রাজা ছিলেন ও দিন দিন তাঁহার রাজ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছিল দেখিয়া শাক্যরা প্রকাশ্যে অমত করিতে সাহস করিল না। তাহারা মহানমন নামক এক শাক্যের একটি দাসীর গর্ভজাতা কন্যাকে কুলীন শাক্য কন্যা বলিয়া প্রসেনজিৎকে দান করিল। এই কন্যার গর্ভে বিরুদ্ধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার কোন শাক্য

বুধরাজ বিরুদ্ধকে দাসী-পুত্র বলিয়া বিক্রম ও অপমানিত করিয়াছিল। সেই সূত্রে বিরুদ্ধক শাক্যদের পূর্ব চলনা জানিতে পারিয়াছিলেন ও সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার পর শাক্যদের নিম্মূল করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজ্য পাইয়া বিরুদ্ধক শাক্য নগর অবরোধ করিলেন। শাক্যরা নগরের দ্বার ছাড়িয়া দিলে তিনি শাক্যকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকে বধ করিলেন। তখন বুদ্ধদেবের বুদ্ধাবস্থা। বিরুদ্ধকের আক্রমণ-কালে মাত্র একজন শাক্য কুমিল্পেত্রী ছিল। সে কপিলবস্ত্র ধ্বংসের পর, আধুনিক কাবুলের কাছে স্বাত নদীর (Swat river) তীরে গিয়া বাস করিয়াছিল।

তিব্বতদেশীয় ত্রিপিটকের রকহিল (Rockhill) কৃত ইংরেজি অনুবাদ হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১৫৯)

ভারতবর্ষে সিমেন্ট কারখানা

(১) ওড়িগ্যা সিমেন্ট কোং লিঃ, মূলধন ৭৪৭ হাজার টাকা, কটক জেলায় গড়মধুপুৰ স্টেশনের নিকট কারখানা অবস্থিত। ম্যানেজিং এজেন্টস্ বার্ড কোং, কলিকাতা।

(২) বন্দী পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট লিঃ, মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। বন্দীরাজ্যে B. B. & C. I. বেলের লাখেরী স্টেশনে কারখানা অবস্থিত।

(৩) ইণ্ডিয়ান সিমেন্ট কোং লিঃ, নাভসারী ভবন, বোম্বে ফোর্ট। মূলধন ৬০ লক্ষ টাকা।

(৪) বিলাসপুর লাইম এণ্ড সিমেন্ট কোং লিঃ, বিলাসপুর জেলার আকলতারা স্টেশনে কারখানা অবস্থিত।

(৫) সি পি পোর্টল্যান্ড এণ্ড সিমেন্ট কোং লিঃ, জব্বলপুর জেলায় কিমোর রেল স্টেশনের নিকট কারখানা অবস্থিত।

(৬) জব্বলপুর পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কোং লিঃ, মধ্য প্রদেশে মেগাওনে কারখানা অবস্থিত।

(৭) পাঞ্জাব পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কোং লিঃ, মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। পাঞ্জাবের Wah (ওয়া) স্টেশনের নিকট কারখানা অবস্থিত।

(৮) লাইম এণ্ড সিমেন্ট ওয়ার্কস্, দেরাডুন।

(৯) পালামৌ জেলার জপলা স্টেশনের নিকটে মাটিন কোম্পানী ৮০ লক্ষ টাকা মূলধনে সিমেন্টের বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন।

শ্রী রামানুজ কর

(১৬০)

ভারতবর্ষে খড়িমাটির পাহাড়

বাঁকড়া সহরের ছুই মাইল দক্ষিণে ঝারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ ধায়ে খড়িমাটির খাদ আছে।

শ্রী রামানুজ কর

(১৬১)

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা

আমাদের দেশের সমুদয় তন্ত্রশাস্ত্রই শিবপ্রোক্ত। উহা অতীব প্রাচীন বলিয়াই লোকের দৃঢ় ধারণা। কিন্তু প্রভুতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সমুদয় তন্ত্রকেই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে কতকগুলি তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক (কেননা, ঐ সকল তন্ত্রে ইংরেজ জাতি ও লণ্ডন-নগরের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়)। ঐসমুদয় আধুনিক তন্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের বয়স ৩০০ বৎসরের অধিক নহে, ফলতঃ তন্ত্রশাস্ত্র মাত্রই আধুনিক

নহে। অথর্ববেদ, গোপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের কথাই উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন ভিত্তারিব পাষণ্ডশাস্ত্রে সম্রাট স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে তন্ত্রের বিবরণ খোদিত আছে। স্কন্দগুপ্ত ২০০ খৃঃ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্কন্দগুপ্তের পূর্বেই তন্ত্রশাস্ত্র বিদ্যমান ছিল। অতএব তন্ত্রশাস্ত্র যে প্রাচীন, তদ্বিময়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা আমরা তন্ত্রোক্ত উপাসনাকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলিতে পারি।

বৈদিক যুগে এই উপাসনা প্রচলিত ছিল কি না, তাহার সঠিক বিবরণ নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, বেদে যে রক্ত দেবতা ও শক্তিব কথা উল্লেখ আছে, তাঁহারাষ্ট পরবর্তী পৌরাণিক যুগে (খৃঃ পূর্বে ১০০০—৩০০০ অব্দ) মহাদেব ও কালী ও রূপভেদে দুর্গা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমাদেরও এই ধারণা।

তন্ত্রোক্ত উপাসনা কোন্ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হলপ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে এসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, তন্ত্রোক্ত উপাসনার কতকগুলি তন্ত্রমন্ত্র পাতঞ্জল দর্শনের এবং পূর্বমীমাংসার ছাপ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বাহ্যলভয়ে ঐ সমুদয় শোক এখানে উদ্ধৃত করিতে বিরত থাকিলাম।

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে ঈশ্বরানুরক্ত কবাই বোধ হয় এই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলতঃ সর্বসাধারণকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্তই উপাসনার সৃষ্টি। উহাকে শারীরিক ও মানসিক বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপানস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বেদই তন্ত্র, তন্ত্রই বেদ, বেদ যত দিনের তন্ত্রও ততদিনের— পৌর্কীপন্য নাই। বৈদিক যুগেও তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল প্রচার ছিল। বেদ ও তন্ত্র উভয়কেই শ্রুতি বলে। শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহত্তম পুরাণ, কুশ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, কল্কিপুরাণ, বাগবত, মহাভারত প্রভৃতিতে তন্ত্রের প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

অভেদপ্রত্যয়ো বস্তু জীবন্ত পরমাত্মনা।

তত্ত্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ো বেদতন্ত্রাদিভিমতঃ ॥

নমুব টীকায় হারীত বচন—

“শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকীতি চ।”

উপনিষদাদিতেও তন্ত্রের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। অথর্ববেদে তন্ত্র-শ্রুতি আছে। বৈদিক অনেক ঋষি তন্ত্রমার্গী ছিলেন।

কলিযুগেব জন্ত তন্ত্র বিশেষভাবে প্রযোজ্য, সূতবাং যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তন্ত্রমতেই নিম্পন্ন হয়।

জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য ও যোগসাধন—ইহাই তন্ত্রের দর্শন এবং মোক্ষলাভই ইহার চরম সাধন। দর্শনাদি যাহা জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় ও উপদেশ তন্ত্রে আছে।

তন্ত্রের ‘আচাৰ ও ভাব’ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে জীবের নৈতিক উন্নতিই ইহার ক্রম, সূতরাং সামাজিক উন্নতিও অবশ্যাস্তাবী।

৮ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় এসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় সংকলিত ‘সাধন-কল্পলতিকা’ নামক পুস্তকে তন্ত্রের সর্ববিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে।

শ্রী যুগাকনাথ রায়

তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের অবনতির সময়ে। এই অনুমান যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে উহা প্রায় ১৫০০ শত বৎসরের পুরাতন। পূজ্যপাদ ৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন পুস্তকে তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শোকটি দেখিয়াছি মনে পড়ে :—

'গৌড়েনোৎপাদিতাঃ বিদ্যাঃ
মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতাঃ।
কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে
• গুর্জরে প্রলয়ং গতাঃ ॥'

৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'তন্ত্রের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহে এবং Arthur Avalon-এবং তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ হইতে অশ্রুত প্রণের উত্তর পাওয়া যাইবে।

শ্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

রংপুর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "সাহিত্য-সংহিতা" নামক গ্রাসিক পত্রিকায় সন ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন তাহাতেই সন্দেহজনক মীমাংসা আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে—সুরতরাজা লক্ষ্ম বলি দিয়া মহামায়ার অচ্চনা করিয়াছিলেন—সে সত্যযুগের কথা। তার পর ত্রেতাযুগে ভগবান্ রামচন্দ্র বক্ষরাজ রাবণের নিধন-কামনায় মহামায়ার অচ্চনা করিয়া সকলকাম হইয়াছিলেন। স্বাপরে কংস মহারাজ মহামায়ার নিকট কৃষ্ণ বলবানকে বলি দিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে তান্ত্রিক উপাসনার বাস্তবতা না থাকিলেও উহা তাত্‌কালিক ধর্ম-জগতে প্রচলিত ছিল।

হিন্দুসমাজে শৈব শাক্ত শৌব গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসক শ্রেণী তন্ত্রোক্ত বিধানেই উপাসনা কবিয়া থাকেন, কাবণ উপনিষদ্ যেমন অপৌরণ্যে বেদের শীর্ষভাগ, তন্ত্রশাস্ত্রও তদ্রূপ তাঁহার মন্ত্রাংশ। তন্ত্রে উপাসনা ব্যতীত তন্ত্র কল্পাদির বিধান আছে, তাহাও অধর্ম বেদের অন্তর্গত, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদেরই অংশবিশেষ বলা যায়। একারণে বেদ ও তন্ত্র উভয়ই আগম নামে অভিহিত।

অধুনা অনেক তন্ত্র প্রকাশ অবস্থায় আছে। প্রকাশিত তন্ত্রমধ্যে কতকগুলি দুঃপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবীয় তন্ত্র, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, সনৎকুমার তন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্র বৈষ্ণবগণও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনত্ব হেতু বর্তমানকালে উহা দুঃপ্রাপ্য হইয়াছে।

শ্রী ভবকালী দত্ত

(১৬২)

ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ

হিন্দুগণ যে জাপান, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস্ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যাইবে। যথা :—

- ১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "প্রাচীন সভ্যতা"।
- ২। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"।
- ৩। ইন্দুভূষণ দে মজুমদার লিখিত "মার্কিন মূলুক"।
- ৪। ৩ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "নানা প্রবন্ধ"।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Indian Shipping and Maritime Activities of the Ancient Hindus পুস্তকে এসম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ আছে।

শ্রী প্রভাত সান্দ্যাল

(১৬৩)

অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল—“মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক ছিলেন বিক্রমপুরেব জৈলোক্যনাথ বিদ্যানিধি। বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৬৫)

সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত

প্রক্ষিপ্ত-অংশবর্জিত সংস্কৃত রামায়ণের মধ্যে “বঙ্গবাসী সংস্করণ রামায়ণ” আছে। উহাতে মূল সংস্কৃতির যথার্থ বঙ্গানুবাদও দেওয়া আছে। “হিতবাদী কাব্যালয়” হইতে মূল রামায়ণের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাভারতের মধ্যে “নীলকণ্ঠ কৃত” টীকা সমেত মহাভারত আছে। উক্ত মহাভারতও অনেকাংশে খাঁটি। এপন্যস্ত মহাভারতের যতগুলি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই মূল সংস্কৃত মহাভারতের যথার্থ অনুবাদ। ইহা অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ বাঙ্গালায় আর নাই।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৬৭)

এই প্রণের উত্তরে শ্রী মণিভূষণ মজুমদার মহাশয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাব জন্ম বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিবরণ দিয়াছেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে তথ্যাংশ (theory) এবং ব্যবহারিক (practical) অংশ উভয়ই ভালভাবে শিখান হয়।

এখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাইবার জন্ম উপযুক্ত অধ্যাপক আছেন এবং তাঁহারা যথেষ্ট যত্ন লইয়া শিক্ষা দেন। এখানে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও আছে। এখানে দুইরকমের পাঠ্যক্রম আছে; উপাধি (B. Sc) ও ডিপ্লোমা। উপাধির জন্ম I. Sc. ও ডিপ্লোমার জন্ম প্রবেশিকা পাশ হইলে চলে, তবে তাহা অপেক্ষা বেশী পড়িয়া আসিলে সুবিধা হয়।

প্রফুল্লকুমার মিত্র

(১৭৪)

সংস্কৃত ভাষায় “উদ্ভিদবিদ্যা” (Botany) এই নামে কোনও গ্রন্থ ছিল কি না এপন্যস্ত আবিষ্কৃত না হইলেও চরক প্রভৃতি আয়ুর্বেদজ্ঞদের প্রণীত গ্রন্থে ও তন্ত্রশাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থে উদ্ভিদ-বিদ্যার বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা পাওয়া যায়।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৭৫)

বোতাম তৈয়ারী

নারিকেলের মালার ও বিনুকের বোতাম পালিশ করিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর মাছের বড় আঁশ সংগ্রহ করিয়া তাহা শুকাইয়া সেই শুকনা আঁশ দ্বারা নারিকেলের মালা ও বিনুক শিরিষ-কাগজের ছায় ঘষিয়া লইলে সুন্দররূপে পালিশ হইয়া যায়।

বিনুকের বোতাম তৈয়ারী করিবার কল কিনিতে পাওয়া যায়। ঐ কলের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু বোতাম প্রস্তুত

করা যায়। নিম্নলিখিত স্থানে অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত বিবরণ এবং তৎসঙ্গে কলকাতা কিনিতে পাওয়া যাইবে। যথা—

- ১। বাসন্তী বট্‌ল এণ্ড কোং, সাহাজিয়াল নগর, ঢাকা।
- ২। ঢাকা বট্‌ল ম্যানুফ্যাকচারী কোং ৭৫ লয়াল স্ট্রিট, ঢাকা।
- ৩। জলি বট্‌ল এণ্ড কোং, দয়ানগর, ঢাকা।
- ৪। গুপ্ত এণ্ড কোং, ৪৫১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

(১৮১)

গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে নদী

কলিকাতা হইতে পেশোয়ার যাইতে হইলে, পথে যে-যে নদী

পড়িবে এবং কোন্-কোন্ নদীতে পুল আছে বা নাই, সেই সমুদয় নদীর মধ্যে যেগুলি আমার জানা আছে, সেইগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল। যথা—

- ১। ফকত-নদী—পুল নাই।
- ২। শোন-নদ—পুল আছে (বেলগুয়ে)।
- ৩। গঙ্গা-নদী—নাই।
- ৪। যমুনা-নদী—পুল আছে।
- ৫। ইরাবতী-নদী—নাই।
- ৬। সিঙ্কু-নদ—নাই।
- ৭। কাবুল-নদী—নাই।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

বিদ্রোহী কবি মধুসূদন

[কবি মধুসূদন দত্তের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে—১২ই মাঘ ১৩৩০]

হে বিদ্রোহী উচ্চ জ্বল, হে বাংলার ছরস্ত সন্তান !
মাননি শাসন কোনো, চূর্ণ করি' নিষেধ-পাষণ—
সমাজ-বান্ধন ভাঙি', করি' ভেদ ধর্মের নিগড়
উন্নত-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর !
ছুটেছ আশার পিছে,—সে আশা কভু বা মরীচিকা—
কণেকে মোহিয়া আঁধি ক্ষণ পরে যাহা বিভীষিকা !—
তারি পিছে ছুটে' গেছ উদ্যম অবোধ বাধাহীন ;
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ ।
যে আশা ছুটেছ ধরি' মেটেনিক সে তোমার আশ,
তবু চির-অভিলাষী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছ্বাস !
শান্ত বন্ধ-গৃহে স্নিগ্ধ জল নাই প্রদীপের শিখা,
বৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত তুমি বিদ্যাতের লিখা !
হে ছরস্ত দৃষ্ট কবি ! বিদ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি' দিলে নব-গতি-মান
ক্ষীণা সে কাব্যের নদী—শৈবালে জঞ্জালে হত-বল
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল ।
বিশ্ব-সাগরের বার্তা তারি গতি করি' আহরণ
শীর্ণা ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্তন !
বান্দীকি ব্যাসের সাথে মিলাইলে ভার্জিলে হোমারে,
কৃত্তিবাস কাশীদাস জেগে উঠে প্রতীচ্য-হকারে !

বন্ধের শব্দের সাথে বেজে উঠে পাশ্চিমের ভেরী,
কাব্যের চরণ হ'তে ধসে' পড়ে জড়তার বেড়ী !
নিত্য নব আশা পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ;
এক আশা বন্ধ-ভাষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান !
আজ ভাবি—সেই ভালো, নৈরাশ্রে নৈরাশ্রে বল লভি'
ব্যগ্র আশে পুরিয়াছ আমাদের আশা তুমি, কবি !
যে তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হ'য়ে যেত শেষ,
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত স্মৃতির উদ্দেশ ?
তুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে,
আজি সে পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জ্বলে ।
দেব-ক্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুসূদন,—
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন !
সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধর্মে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে ;
দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;—
মাতৃ-ভাষা-জননীরে, হে দরদী, রাখনিক দূরে—
প্রাণরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ত-পুরে ।
মুক্তি পেল বন্ধ যাহা সৃষ্টি-মাঝে গুনি' মেঘনাদ ;
নবচ্ন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ !
আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান !
নমস্কার সে বিদ্রোহে যে বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ !

শ্রী প্যারামোহন সেনগুপ্ত



অদ্ভুত বৃক্ষ—

করাসী দেশের একখানি বৈজ্ঞানিক পত্র বৃক্ষের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে একদল ভ্রমণকারী ফ্রান্স হইতে আফ্রিকায় গমন করেন। উদ্দেশ্য নানা জায়গা পর্য্যটন করিয়া নুতন কিছু আবিষ্কার করা। তাঁহারা নানা জনপদ ও পর্বত পরিদর্শন করিয়া চাড নামক হ্রদের (Lake Chad) নিকটে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পান এবং তাঁহারা এই বৃক্ষ ফ্রান্স দেশে আনয়ন করেন।

যে স্থানে এই বৃক্ষ প্রথম পাওয়া গিয়াছিল, সে স্থানের অধিবাসীগণ কোড়ী (Kauris) নামে খাত। তাহারা এই বৃক্ষকে 'আম্বাক' বলে। এই বৃক্ষ অযত্নসম্বৃত এবং কয়েকমাসের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিকস্থ ভূমিখণ্ডকে গভীর অরণ্যে পরিণত করে। এক বছরে এক বৃক্ষ প্রায় ১৬ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং এই দৈর্ঘ্যের ভিতরে বৃক্ষের শাখা মোটেই বহির্গত হয় না। মোটাও প্রায় ৪।৫ ফুট হইয়া থাকে। পাতাগুলি অনেকটা আমাদের দেশের লজ্জাবতীর (Mimosa) পাতার স্থায়। এই নিমিত্ত উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই বৃক্ষকে লজ্জাবতী শ্রেণীভুক্ত (Mimosa order) করিয়াছেন। ২।৩ বছর পূর্ব পর একপ্রকার বড় বড় পীত রংয়ের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে এত বড় দীর্ঘ ও মোটা বৃক্ষ শোলা অপেক্ষাও হাল্কা। শুষ্ক শোলার আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ০.২০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু এই 'আম্বাক' বৃক্ষের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ০.১ এবং অনেক দিন জলে থাকার পর ০.২৮ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই কাঠ এত হাল্কা হইলেও কেহ মনে ভাবিবেন না যে ইহা শোলার স্থায় নরম এবং অন্যায়সে ভাঙিয়া ফেলা যায়। ইহার তন্তুগুলি (Fibres) এত ঘন এবং শক্ত যে ইহা হইতে তন্তু প্রস্তুত হইতে পারে। স্থানীয় অধিবাসীগণ এই বৃক্ষের তন্তু দ্বারা দরজা, টেবিল, বাস ইত্যাদি প্রস্তুত করে। এই তন্তুর নোকা খুব দ্রুত চলে এবং বাতাস কিম্বা ঝড়ে ডুবিয়া গেলেও জলমগ্ন হয় না; কোড়ীগণ কখন কখন একখণ্ড তন্তু দেহের সঙ্গে বাঁধিয়া বড় বড় নদী জল ঠেলিয়া উত্তীর্ণ হয়।

এই বৃক্ষের পক্ষে দক্ষিণ ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার জল-বায়ু বেশ অনুকূল। ঐসকল স্থানে এই বৃক্ষের চাষ এখন অনেকই করিতেছে।

কাঠে সুরাসার—

করাতের গুঁড়া ও কাঠের পরিভ্যক্ত অংশ হইতে যে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা সাধারণের নিকট আশ্চর্যজনক হইলেও, বৈজ্ঞানিকের নিকট কিছুই নুতন নহে। অনেক বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তার এই গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্ত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিবার প্রণালী পর্য্যন্ত কেহই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিছুদিন হইল সুইডেনবাসী এক ডাক্তার ইহা উদ্ভাবন করিয়া চিন্তা-

শীলতার পরিচয় দিয়াছেন এবং জগতেরও মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিলেন যে, কাঠ হইতে cellulose তৈরী করিলে যে Sulphite অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কাঠের অংশ থাকে। এই Sulphite এতদিন কোন কাজেই লাগিত না, বৃথাই নষ্ট হইত। কিন্তু, ইহার ভিতরে শর্করা, গ্লুকোজ, এসেটিক নাইটোজিনাস যৌগিক পদার্থ, ট্যানিন প্রভৃতি পদার্থ থাকিত। ডাক্তার ঠিক করিলেন যে এই Sulphiteকে Calcium carbonate দ্বারা neutralise করার পরে yeast দ্বারা উহাকে অতি সহজেই সুরাসারে পরিণত করা যাইতে পারে। তার পর, distillation দ্বারা উহা সম্পূর্ণ পৃথক করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। এই নিয়মে ১০০ শত গ্যালন lye হইতে অথবা প্রতিটন Cellulose হইতে ১৪ গ্যালন সুরাসার সংগ্রহ হইয়া থাকে।

এই উপায়ে যে সুরাসার পাওয়া যাইবে তাহার মূল্য বাজার অপেক্ষা অল্প হইবে। মূল্য অল্প হইলে লাভ এই হইবে যে, ডাক্তারী ঔষধের মূল্য কমিবে। Swedish পণ্ডিত জগতের কত বড় যে একটা উপকার করিলেন, তাহা আমরা পরে বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে এইপ্রকার কত যে জিনিষ বৃথা নষ্ট হইয়া যায় কে তাহার খবর রাখে? Bye-production বলিয়া একটা জিনিষের কথা আমরা মোটেই ভাবি না।

আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যদি চাকুরার জন্ত যেখানে সেখানে ধোঁসামোদ না করিয়া দেশের জিনিষগুলিকে কিপ্রকারে অর্থাৎ-পাদন কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করেন তবে আশ্চর্যজনক বজায় থাকে, অল্পবস্ত্র সমস্তারও মীমাংসা হয় এবং দেশের ধন-সম্ভারও বৃদ্ধি হয়।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

কুকুরের নাকের ছাপ—

Alfortএ যে The French Veterinary College আছে তার জনৈক অধ্যাপক বলেন যে, কুকুরের জাতি-বিভাগ এবং কুকুর সনাক্ত করতে হলে ভবিষ্যতে Bertillon প্রথার প্রয়োগ করা দরকার। এই প্রথা অপরাধীদের প্রতি প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। Bertillon প্রথায় মানুষের বুড়ো আঙ্গুলের এবং কুকুরের বেলায় পায়ের ছাপ নেওয়া হয়। কুকুরের পায়ের ছাপ নেওয়া তিনি সমীচীন বলে মনে করেন না, কেননা কুকুরের খাবার পরিবর্তনের সম্ভাবনা যেমন খুব বেশী অনিষ্টের সম্ভাবনাও তেমনি। সেইজন্য অধ্যাপক Dechambre মহোদয় বলেন যে কুকুরের নাকের ডগার ছাপ নেওয়া হোক। কুকুরের নাকের ডগায় পুরু চামড়া থাকার দরুন রেকর্ড করার পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে অল্পদিন পরেই পারীতে একটা মোকদ্দমার বিচার হবে তাতে এই বিষয়টি সাধারণের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। একটা কুকুরের আকৃতি এমন বদলে কেলেছে যে সে যে কোন জাতের কুকুর তা এখন ঠিক করে উঠা যায়। তাই কুকুরটি সত্যি যে-জাতের কুকুর নয় তাকে সেই জাতের বলে ধরা হচ্ছে।

আজকাল নাকি পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আকৃষার এইরূপ করে থাকে।

কৃত্রিম কাঠ—

একজন নরওয়ে বিজ্ঞানবিৎ এক নয়া ধরণের কৃত্রিমকাঠ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করেছেন। করাত-গুঁড়ো ও রাসায়নিক কয়েকটি পদার্থের সংমিশ্রণে এই কাঠ তৈরী হয়। এর ৫০ পঞ্চাশ ভাগই হচ্ছে করাত-গুঁড়ো। এই সংমিশ্রণে অত্যধিক চাপ দিলে যে জিনিষ তৈরী হয় আসল কাঠের সব গুণগুলিই তার আছে। আপেক্ষিক গুরুত্ব আসল কাঠের যাই এই কৃত্রিম কাঠের তাই। ওক-কাঠের মত এ কাঠ শক্ত। একে রান্না করা, করাত করা, ছাঁদা করা, পেরেক মারা, রং করা, কিশা পালিশ করা সবই চলে। মোটের উপর আসল কাঠে যেরূপ যন্ত্রাদি দ্বারা ছুতোরের সবরকম কাজ করা যায় সেরূপ সব কাজই এতে চলে। জলে নষ্ট হয় না, আবার রাসায়নিক পদার্থ থাকার দরুন পচতে পারে না। আসল কাঠ যে-উত্তাপে পোড়ে তার চেয়েও বেশী উত্তাপে এই কাঠ পোড়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে আসল কাঠের চেয়ে কৃত্রিম কাঠ এই বিষয়ে টেক্কা মেরেছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে টাইপ—

একজন সুইস আবিষ্কারক একটা অদ্ভুত কল বের করেছেন। সে কলটি নাকি ডিক্টিফোন' অপেক্ষা সরেশ। এমনকি তিনি দাবী করেন যে আর নাকি টাইপিষ্টদের মোটেই দরকার হবে না। আগে শর্টহ্যান্ড টাইপিষ্টকে যা বল্‌বাব বলে' দিলে তিনি টুক টুক কবে' লিপে নিতেন এবং তাব পবে টাইপ করে' নিতেন।

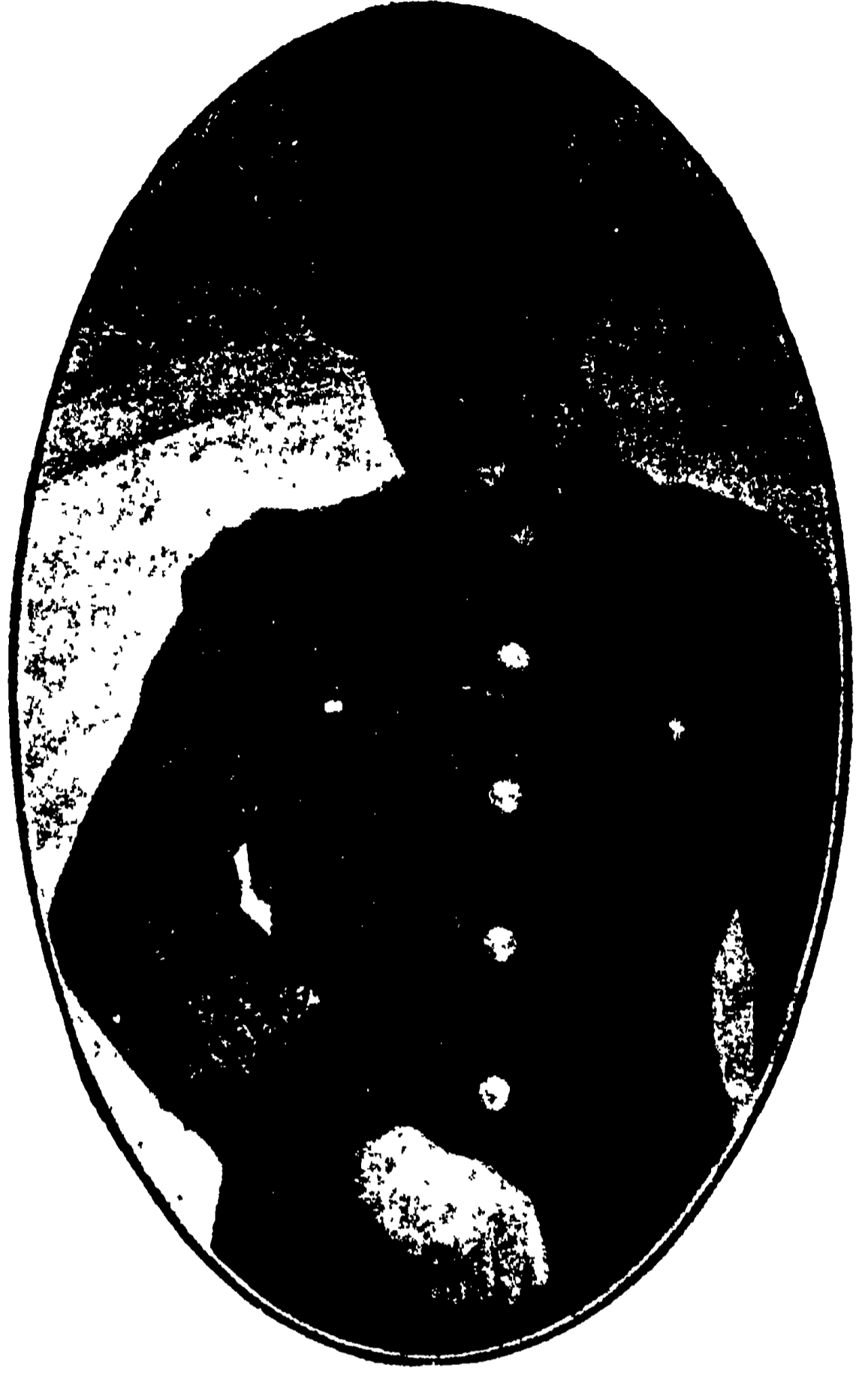
তার পর ডিক্টিফোনের আবিষ্কার হয়। এতে Shorthand এর কোনও দরকার হয় না। যা বল্‌বার তাতে বল্লে আস্তে আস্তে সবই অবিকল লেখা হ'য়ে যেতে থাকে। তাব পর সেগুলি একজন টাইপিষ্ট টাইপ করে' নিতে পারেন। এইপ্রকারের কল এখন নানা-রকমের লোক ব্যবহার ক'চ্ছেন—তিনি কি সাহিত্যিক, কি শিক্ষক এবং কি ব্যবসাদার। কিন্তু এই সুইস আবিষ্কারটি যদি সফল বলে' প্রমাণিত হয় তা হলে যুগান্তর উপস্থিত হবে এবং আর মোটেই টাইপিষ্টদের দরকার হবে না, কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গেই কথাগুলি কলে টাইপ হ'য়ে যেতে থাকে। অবিশ্বাস্য বলে' যদিও আমাদের বোধ হচ্ছে তথাপি এটি এমন যুগ যে যুগে যত সব অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কাণ্ড সত্য বলে' প্রমাণিত হচ্ছে।

শ্রী শশিভূষণ বারিক

বেতারের কথা—

আমাদের দেশে বেতার-বার্তা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেই প্রায় কিছুই জানেন না—কারণ ভারতবর্ষে বেতার টেলিগ্রাফি শিখার কোন বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। আমেরিকাতে আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে বেতার বসিয়াছে এবং এই বেতার-বার্তার সাহায্যে আমেরিকানরা যে কতপ্রকার কাজ করিতেছে, তাহার কোন সংখ্যা নাই।

রাস্তায় পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সঙ্গে বেতার-কলকজার সম্বন্ধ আছে, সহরের কোথায় কি দুর্ঘটনা ঘটিল, সে-ঘটনা ঘটিবার মুহূর্ত-কাল পরেই খবর পাইয়া সে সেইখানে হাজির হইল। অপরাধীর



পুলিসের হাতে র্যাডিও-সেট, সহরের সব খবর সে বেতার-কলে রাখিতে পারে



বাগানে চা পান করিতে করিতে বেতারের সাহায্যে ঐক্যতান বাদন শ্রবণ

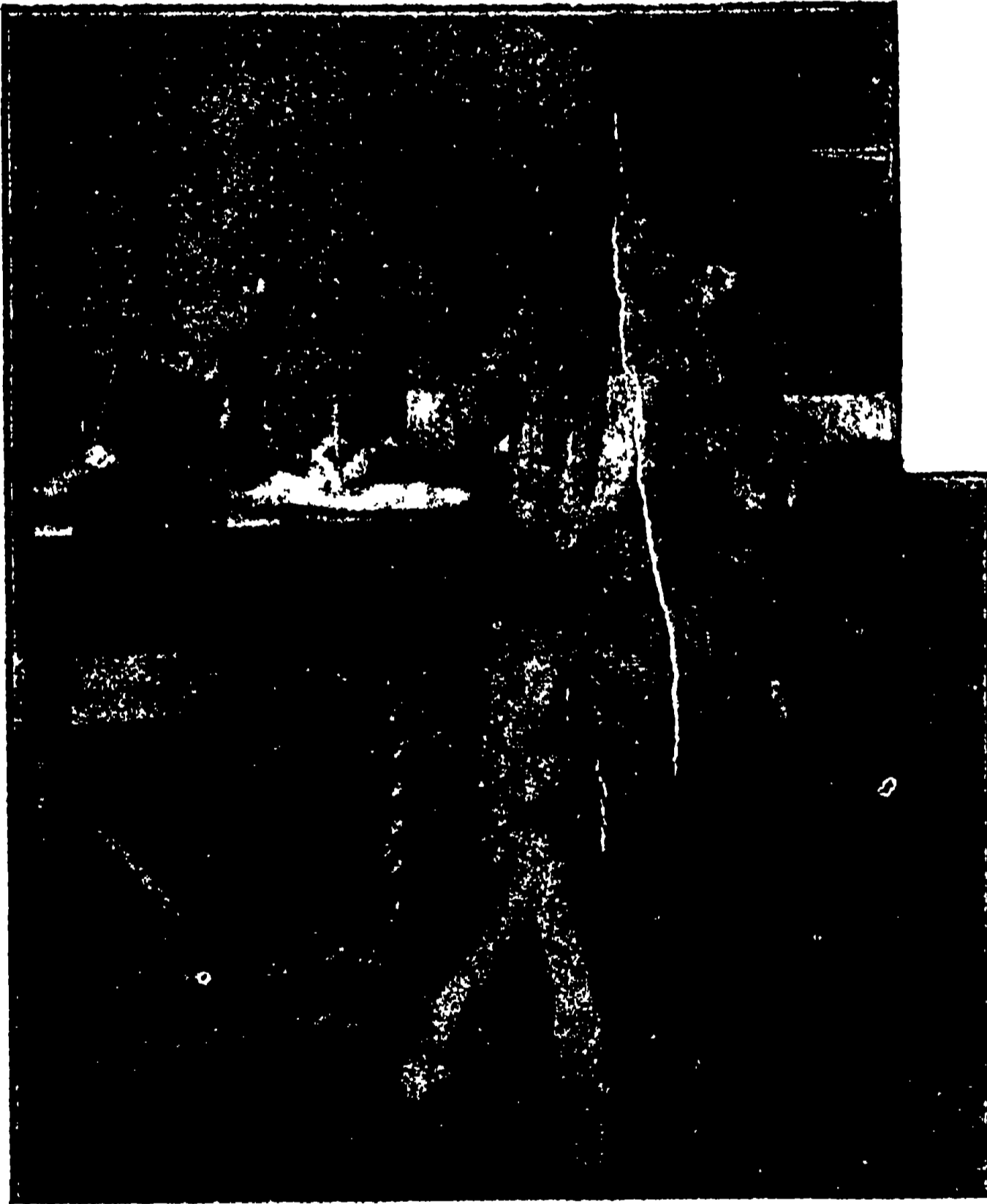
পলায়ন-সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সহরের এবং দেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া দেওয়া হইল—অপরাধীর পলায়ন অসম্ভব হইল। রোগী বিছানায় শুইয়া শুইয়া বেতারের সাহায্যে সুমধুর-মুহূর্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে—এই সঙ্গীত হয়ত বহুদূর হইতে তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। ইহাতে রোগীর রোগবন্ত্রণা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

ছোট ছেলে মেয়েরা ঘুমাইবার আগে উপকথা শুনতে ভালবাসে। বিশেষ একস্থান হইতে উপকথা র্যাডিওর সাহায্যে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া হয়—র্যাডিও-ফোনের চোলা হইতে উপকথাটি ছেলে মেয়েদের কানে আসিয়া পৌঁছায়—তাহারা নিরীক-আনন্দে তাহা উপভোগ করে। ঘরে ঘরে আর গল্প বলিবার জন্তু দিদিমা দাদামহাশয়ের প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা সেই সময়টুকু মনের আনন্দে পান-দোক্তা গড়গড়া খাইয়া কাটাইতে পারেন।



র্যাডিওর আবিষ্কারের পূর্বে নৃত্যগীত করিবার সময় গান বাজনার জন্তু টাকা দিয়া আয়োজন করিতে হইত। এখন আমেরিকাতে আর নৃত্যশালার লোক রাখিয়া বাজনা বাজাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয় না—র্যাডিওর সাহায্যে বিশেষ কোন এক স্থান হইতে গান বাজনা সৰ্বল নৃত্যশালার র্যাডিও-ফোনে পাঠান হয়। সেই বাজনার তালে তালে সকলে নৃত্য করিতে থাকে।

বহুদূরে কোথাও কনসার্ট বাজিতেছে—আপনি বন্ধুদের লইয়া



মহিলা-রিপোর্টার পায়ের পাটারে র্যাডিও রিসিভিং সেট লাগাইয়া যে কোন সময় হেড্ আপিসের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারে (ডান পা দেখুন)

চা খাইতে খাইতে বাগানে বসিয়া বেতারের সাহায্যে তাহা শ্রবণ করিতে পারেন। দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার খবর ইত্যাদিও বেখানে ইচ্ছা বসিয়া পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটি বেতার খবর ধরিবার (wireless receiving set) কল আঁকা চাই। ব্যবসায়ীরা বড় বড় সহর হইতে দূরে থাকিয়াও বাজার দর ইত্যাদি সবই সহরবাসীর



ঘুমাইবার পূর্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা র্যাডিও ফোনে উপকথা শুনিতোছে

সঙ্গে একই সময়ে জানিতে পারে, তাহাদের আর ডাকের জন্তু হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। সবরকম খবর ইচ্ছামত যখন তখন পাওয়া যাইতে পারে।

এই বেতার খবর বা গান-বাজনা শুনিবার সেটগুলি খুব সেরে প্রকাণ্ড তা নয়। ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, দু-একটি বেতার-কল কত ক্ষুদ্র। আমেরিকার অনেকে দেশলাইএর এবং ফুরের ছোট ছোট বাজে র্যাডিও খবর ধরিবার সেট তৈয়ার করিয়াছেন। একজন আবার সকলকে টেকা দিয়া তাহাব আঙুটিতে একটি র্যাডিও সেট বসাইয়াছেন।

আমেরিকাতে যখন একটা কোন হুজুগ উঠে, তখন তাহা ছেলে বুড়া সবাইকে মাতাইয়া তোলে। র্যাডিও এখন আমেরিকার হুজুগ। এখন পৃথিবীর আর কোন দেশে র্যাডিওর এত উন্নতি হয় নাই। ইংলণ্ডে সবেমাত্র বে-সরকারী লোকদের র্যাডিও সেট বসাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান সময়ে আমেরিকাতে বোধ হয় ৩০,০০০, হাজারেরও বেশী বেসরকারী লোকের বেতার সেট আছে। এই সরকারী লিষ্টের বাহিরেও, হয়ত অনেকের আছে, তাহাদের সংখ্যা এই ৩০,০০০ এর মধ্যে ধরা হয় নাই।

একটি র্যাডিও সেট সম্পূর্ণভাবে ঘরে বসাইতে বিশেষ কোন খরচ নাই—৩০ টাকা হইতে ৬০ টাকা খরচে একটি র্যাডিও সেট ঘরে বসাইতে পারা যায়।

ইহাতে অবশ্য আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই, কারণ আমাদের দেশে বেতার ইত্যাদির কোন জ্ঞান নাই। এবং

কোন ব্যক্তি যেতার শিখিতে চাহিলে তাহার চাওয়ারই সার হইবে।

সমুদ্র-জগতের কথা—

গতবারের প্রবাসীতে কতকগুলি সামুদ্রিক অদ্ভুত প্রাণীর কথা বলিয়াছি। এবার আরো একটি বিচিত্র প্রাণীর বিষয় লিখিব। জলের উপরের দিকে নানা রংএর মাছ, হাঙ্গর ইত্যাদি সমুদ্রে দেখা যায়। কিন্তু একটু গভীর জলে এইসমস্ত জন্তর সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ভীষণ এবং অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যায়। ডুবুরিরা এইসমস্ত জন্তর সামনে অনেক সময়ে বিপদে পড়ে এবং প্রাণ হারায়। হাঙর, কুমীর ইত্যাদি জন্ত এই সমুদ্র জন্তর কাছে নিরীহ বলিয়া মনে হইবে। অক্টোপাস বা অষ্টপাদের কথা অনেকে উপকথার পড়িয়াছেন, কিন্তু ইহা উপকথার মত অসত্য নয়। যাহারা এই ভীষণ অক্টোপাসের সামনে পড়িয়াছে, তাহারাই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

শিকার সুবিধামত স্থানে পাইলে অক্টোপাস তাহাকে তাহার পা বা শুঁড় দিয়া আঁতে আঁতে জড়াইয়া ধরে। তাহার এই শুঁড়গুলির শক্তি ভয়ানক, অনেক সময় ধৃত ব্যক্তির পাঞ্জরার হাড় ইহার চাপে শুঁড়া হইয়া যায়। সমুদ্রের নানারকম প্রাণী এই অক্টোপাসের হাতে মারা যায়। অক্টোপাসের ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইলে এবং অল্প কিছু না পাইলে সে দিনে এত বেশী পরিমাণ মাছ, কঁাকড়া ইত্যাদি খাইয়া ফেলে, যে, স্থানীয় বাজারে ঐসব জিনিষের দর



ছাতায় বেতের খবর ধরিয়া পথের মাঝে লোকজনকে নতুন নতুন খবর শোনান যায়



ডাক্তার বোটরকারে ষসিমা বোগীর খবর লইতেছেন



গভীর জলে অক্টোপাস যমের মত তাহার শিকারের ঘাড়ে গিয়া পড়ে



নিমগ্ন জাহাজের রক্ত উদ্ধারে নিযুক্ত ডুবুরিরা হ'জরের দ্বারা আক্রান্ত



সমুদ্রের তলায় অক্টোপাস গভীর চিন্তায় নিমগ্ন

চড়িয়া যায়। অক্টোপাসও অনেক সময় ধৃত হইয়া খাচরুপে ব্যবহৃত হয়। বেচারি যদি হঠাৎ অল্পজলে বাসিতে আসিয়া পড়ে তাহার অবস্থা বড় খারাপ হয়। শক্ত মাটি পাইলে সে এমনভাবে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে যে তাহাকে সেখান হইতে জীবন্ত অবস্থায় নড়ান যায় না।

ডুবুরিদের অক্টোপাস ছাড়া হাঙ্গরের অত্যাচারও কম পোহাইতে হয় না। আয়ারল্যান্ডের উপকূলে নিমজ্জিত লরেণ্টিক্ জাহাজের মধ্যস্থিত ১২০,০০০,০০০ টাকা মূল্যের সোনা উদ্ধার করিতে গিয়া একদল ডুবুরি কিরকম বিপদে পড়িয়াছিল, ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। জাহাজটি জলের ২০ ফুট नीচে পড়িয়াছিল। এত কষ্ট করিয়াও তাহারা মাত্র ৩০টি গোল্ড-বার উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। একটি বারের মূল্য ২০,০০০ টাকা হইতে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়।

কাচের কথা—

আজকালকার সভ্যতার দিনে কাচের প্রয়োজন নানাপ্রকারে এবং নানাভাবে হয়। কাচের জন্ম বোধ হয় ৮০০০ বছরেরও পূর্বে মিশরে প্রথম হয়। কাচের ওপর রং ফলাইয়া নানাপ্রকার চিত্র ইত্যাদি অঙ্কন বহু শতাব্দী পূর্বে চীন দেশেই প্রথম হয় বলিয়া মনে হয়।

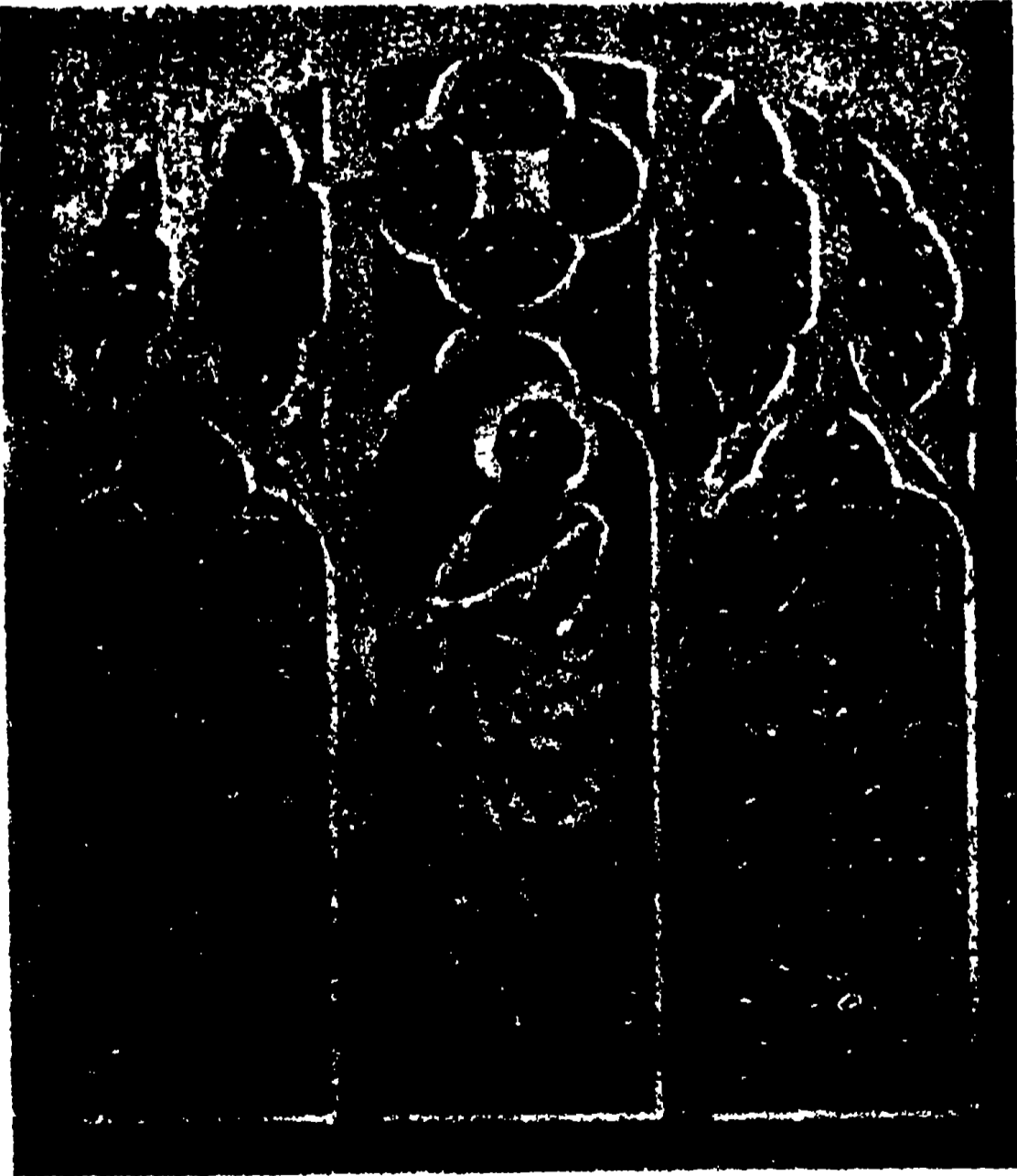
রঙীন কাচ প্রথমে দামী দামী হীরাজহরতের বদলে ব্যবহার করিবার জন্তই ব্যবহার হইত। পূর্বকালের ইয়োরোপের আমীর ওমরাহেরা তাহাদের অর্থের নানাপ্রকার কাচের অলঙ্কারে সাজাইতেন। কাচের অস্বাস্থ্য-প্রকার ব্যবহার, যেমন শাসি, গেলান, বাটী, ইহার বহুকাল পরে আরম্ভ হয়।

মধ্যযুগে আবিষ্কার হয় যে কাচের ওপর রৌপ্য-দ্রব্য দিয়া তাহা আগুনের তাপে রাখিলে কাচ হরিদ্রা বর্ণের হয়। এই সময় গির্জায়, এবং বিদ্যাপীঠে কাচের উপর নানাপ্রকার চিত্র আঁকিয়া জানালায় এবং ছুরারে লাগান হইত। সেই সময়ের এইপ্রকারের অনেক চমৎকার চমৎকার চিত্র আজও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়কার ধনীরা দেশবিদেশ হইতে শিল্পী আনিয়া এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এইসমস্ত করিতেন। প্রথম প্রথম কেবল নানা-রংএর কাচ পাশাপাশি বসাইয়া সাজান হইত, তার পর ক্রমশ নানা-প্রকার দৃশ্যাবলীর চিত্র-অঙ্কন শুরু হয়। এবং ইহার কিছু দিন পরে শিল্পী নানাপ্রকার চিত্র ফরমাস-মত কাচের উপর অঙ্কন করিতে সক্ষম হয়। ইয়োরোপে এই সময় নানাপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহের জন্ত এই শিল্প কিছুকালের জন্ত একরকম মরিয়া যায়, তার পর আবার আরম্ভ হয়।

বর্তমান সময়ে ইউরোপে যেসমস্ত কাচের উপর চিত্র ইত্যাদি দেখা যায়, তাহা কোন শিল্পীর কাজ তাহা ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহার উপর কোন নাম নাই। তবে



ইয়োরোপের একটি গির্জায় কাচের উপর ধর্মবিষয়ক ছবি—
আমল ছবিটি রঙীন



একটি জানালার ছবি

এক এক দল শিল্পীর এক এক ধরনের চিত্র-অঙ্কন-পদ্ধতি ছিল, তাহা চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

মধ্য-যুগের ধনীরা অনেক সময় তাঁহাদের গৃহের বড় বড় জানালার এবং ছরারের কাচের উপর তাঁহাদের মূর্তি অঙ্কন করিবার জন্ত শিল্পী নিযুক্ত করিতেন। এইপ্রকারে তাঁহারা তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহাদের মূর্তিগুলি আসল চেহারার সঙ্গে একটুও মিলিত না এবং সময় সময় অতি অদ্ভুত হইয়া যাইত। শিল্পীরা প্রথমে কাগজের উপর ছবি আঁকিয়া পরে তাহা কাচে ফলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এইপ্রকারে ছবির হুবহু মিল হইত না।

বর্তমান কালেও শিল্পীরা কাগজের উপর ছবি আঁকিয়া তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া কাচের উপর আঠা দিয়া লাগাইয়া দেয়। তাহার পর নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাচের উপর সেই ছবির নকল ছাপ পড়ে। ইহাতে ছবিটি বিকৃত হয় না। বর্তমান সময়ে কাচ কাটিবার জন্ত ইম্পাতের বদলে হীরা ব্যবহার হয়।

পাহাড় ধমান—

দক্ষিণ আমেরিকার সাগর-কূলে একটি সহরের অনেকখানি স্থান একটা পাহাড় দখল করিয়াছিল। সহরের লোক সংখ্যা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সহরের আয়তন বৃদ্ধি করিবার দরকার হইল। তখন একদল ঠিকাদার পাহাড়টাকে কাটিয়া ফেলিবার কথা পাড়িল। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সমস্ত পাহাড়টাকে

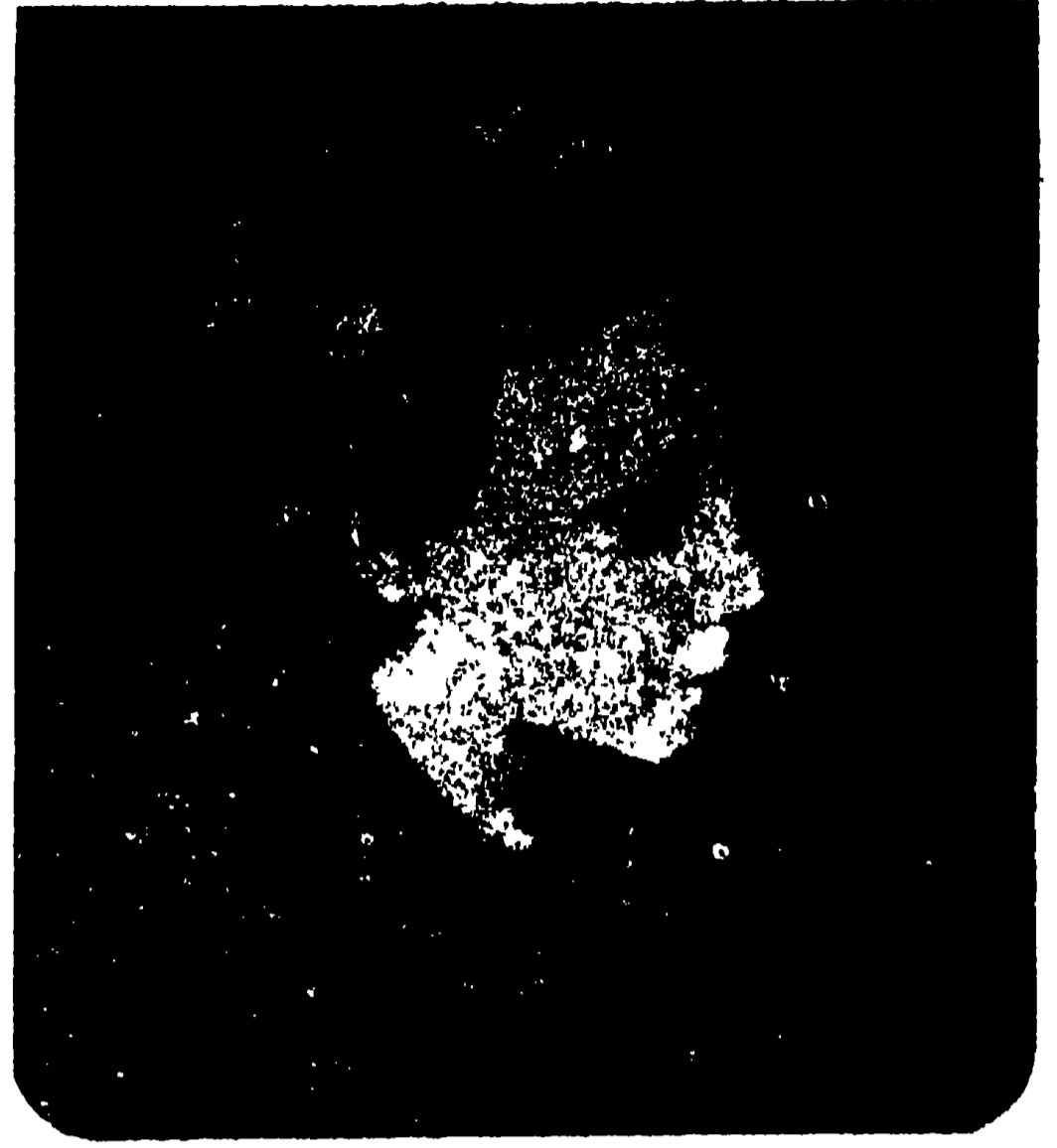


জলের তোড়ের সাহায্যে পাহাড় ধমান হইতেছে

কাটিতে আট বছর লাগিবে এবং ধরত অসম্ভবরকম বেশী হইবে। তখন একদল ইঞ্জিনিয়ার হাইড্রুলিক পাম্পের সাহায্যে পাহাড়টাকে ধসাইয়া নীচের সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া দিবেন স্থির করিলেন। পাহাড়টা এখন প্রায় সবই ধসিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের উপরে একটি প্রাচীন মঠ ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মোটর-চেয়ার—

ছবিতে দেখুন বৃদ্ধাটি কেমন আরামে একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বাগানে বেড়াইতেছেন। এই চাকাওয়ালা চেয়ার কাহাকেও ঠেলিতে হয় না—মোটরের সাহায্যে চলে। চাকা ঘুরাইবার ফিরাইবার অস্ত্র



ছোট ছেলের কৌকড়া চুলে বৃদ্ধবৃদের মুকুট

বৃদ্ধা মোটর-চেয়ারে উদ্যান বিহার করিতেছেন

একটি হাতল বৃদ্ধার কোলের কাছে দেখুন। গাড়িখানির বেগ ঘণ্টায় ৬ হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত হয়। কলকজার বিশেষ কোন হান্ধামা নাই। এই গাড়ী এখনো বাজারে উঠে নাই।

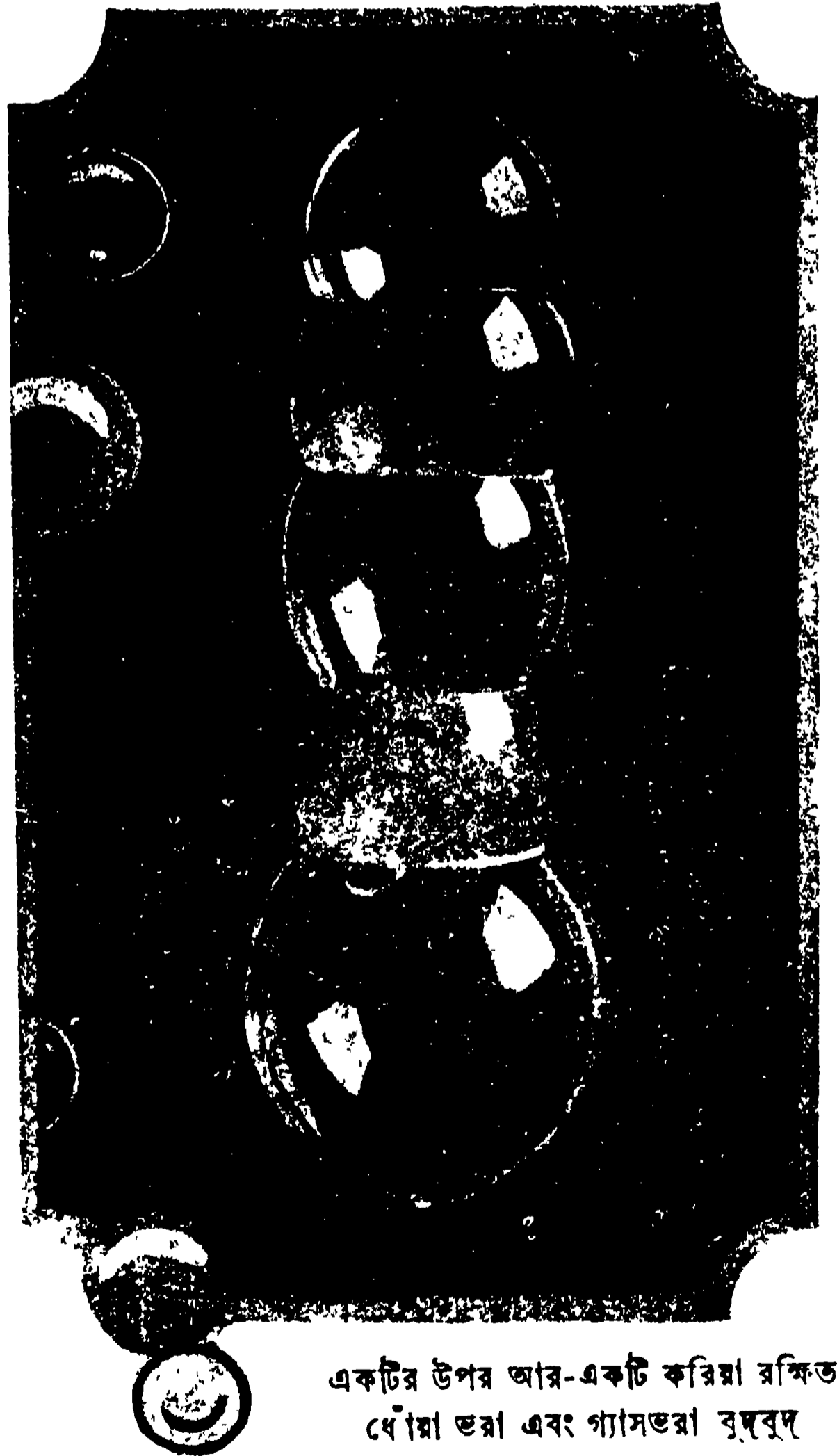
সাবানের ফেনার খেলা—

সকল চোঙার ডগা একটু সাবান-জলে ডুবাইয়া আশু আশু ফুঁ দিলে বেশ বড় বড় বৃদ্ধবৃদ্ধ করা যায়—ইহা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন। এইরকম বৃদ্ধবৃদ্ধ ছোট টেনিস্ বলের মত বড় করিতে হইলে সকল কাচের নল ব্যবহার করাই প্রশস্ত—কারণ কাচের নলে সাবানের ফেনার বৃদ্ধবৃদ্ধকে ইচ্ছানত নানা প্রকার আকারের করা যায়।

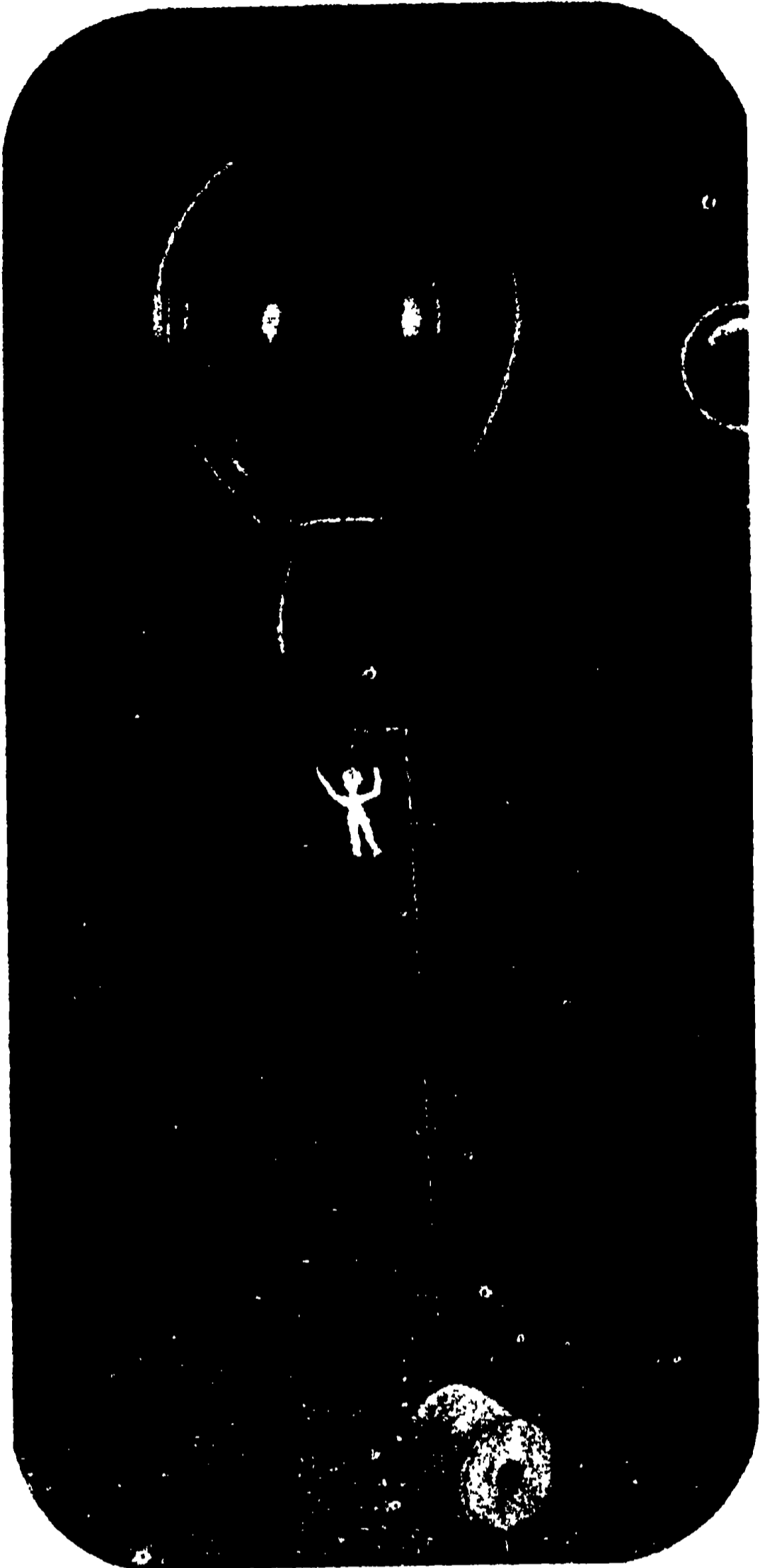


ছইটি বৃদ্ধবৃদ্ধ একত্র মিলিত অবস্থায়

ফেনা তৈয়ার করিবার একটি নিয়ম আ হ সান
ছয় দিগা চাঁচিগা চাঁচিগা একটি পেয়ালায় জমা করিতে হইবে।



একটির উপর আর-একটি করিয়া রক্ষিত
ধোঁয়া ভরা এবং গ্যাসভরা বৃদ্ধবৃদ্ধ

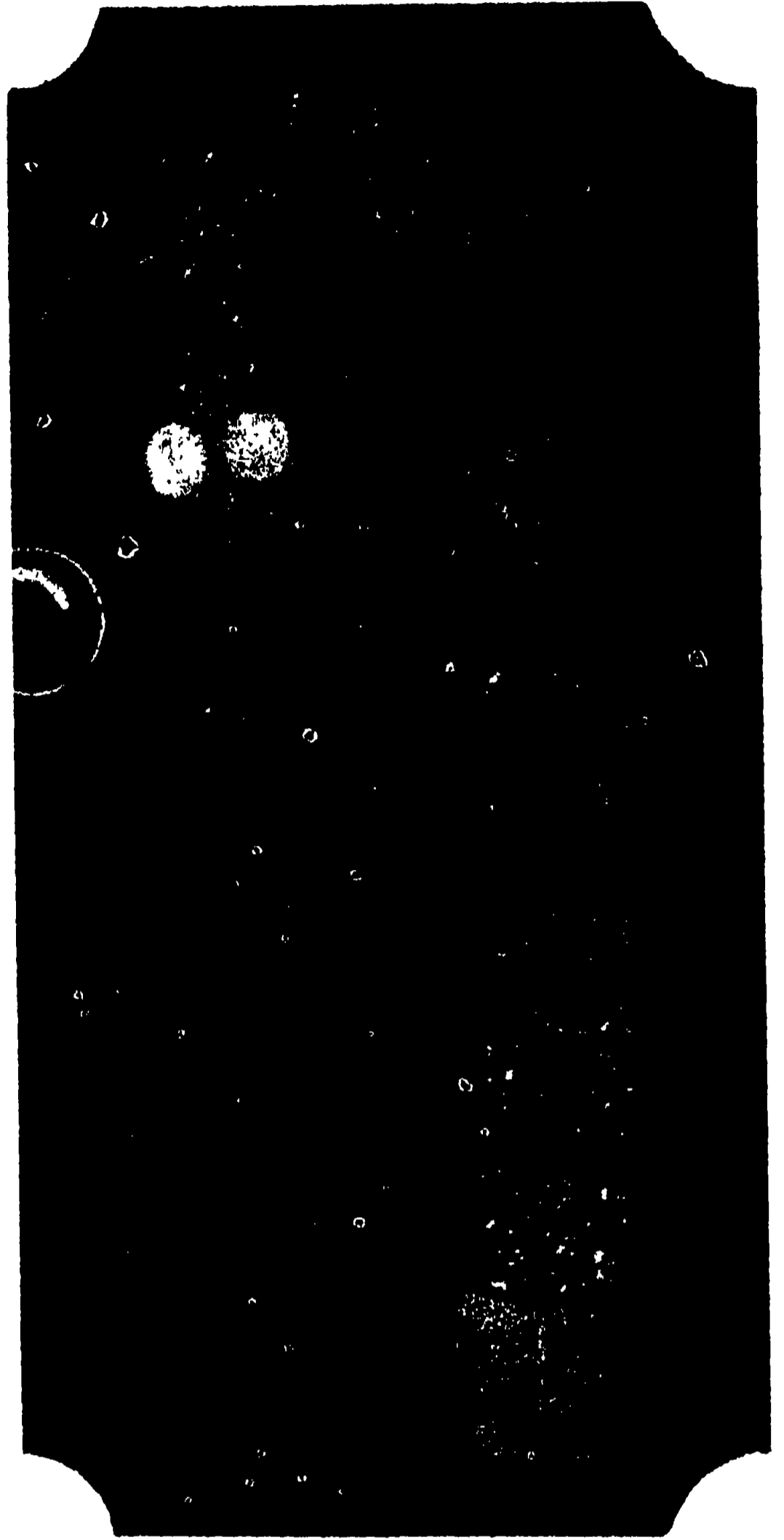


বন্দী বুদ্ধ, রীলের সূতা ছাড়িয়া উপরে উঠান যায়, এবং সূতা
টানিয়া নামান যায়

সাবানের গুঁড়া বেশ খানিকটা জমা হইলে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া কিছুক্ষণ ঘাঁটিতে হইবে। বেশ ভাল করিয়া ঘাঁটি হইলে পর ঐ সাবান-গোলা জলকে আধ ঘণ্টা স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। হয়ত সমস্ত সাবান জলে গুলিবে না, পাত্রের তলায় কিছু পড়িয়া থাকিবে—কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই।

নানারকমের নল বাজারে পাওয়া যায়—খড়ের নলেও বুদ্ধ তৈরী করার খেলা বেশ হয়। এইবার কয়েকরকম বুদ্ধ খেলার কথা বলিব।

ছুইজন দুইটি নলে দুইটি বুদ্ধ তৈরী করিয়া সাম্না-সাম্নি দাঁড়াইয়া বুদ্ধ দুটিকে গায়ে গায়ে লাগাইয়া ফুঁ দিলে দুইটি মিলিয়া গিয়া একটি বুদ্ধ হইয়া যাইবে। অনেক সময় গায়ে গায়ে লাগাইয়া একটু চাপ দিবারও দরকার হয়। একটু সাবধানতার সঙ্গে এই কাজ করিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে বুদ্ধ কাটিয়া



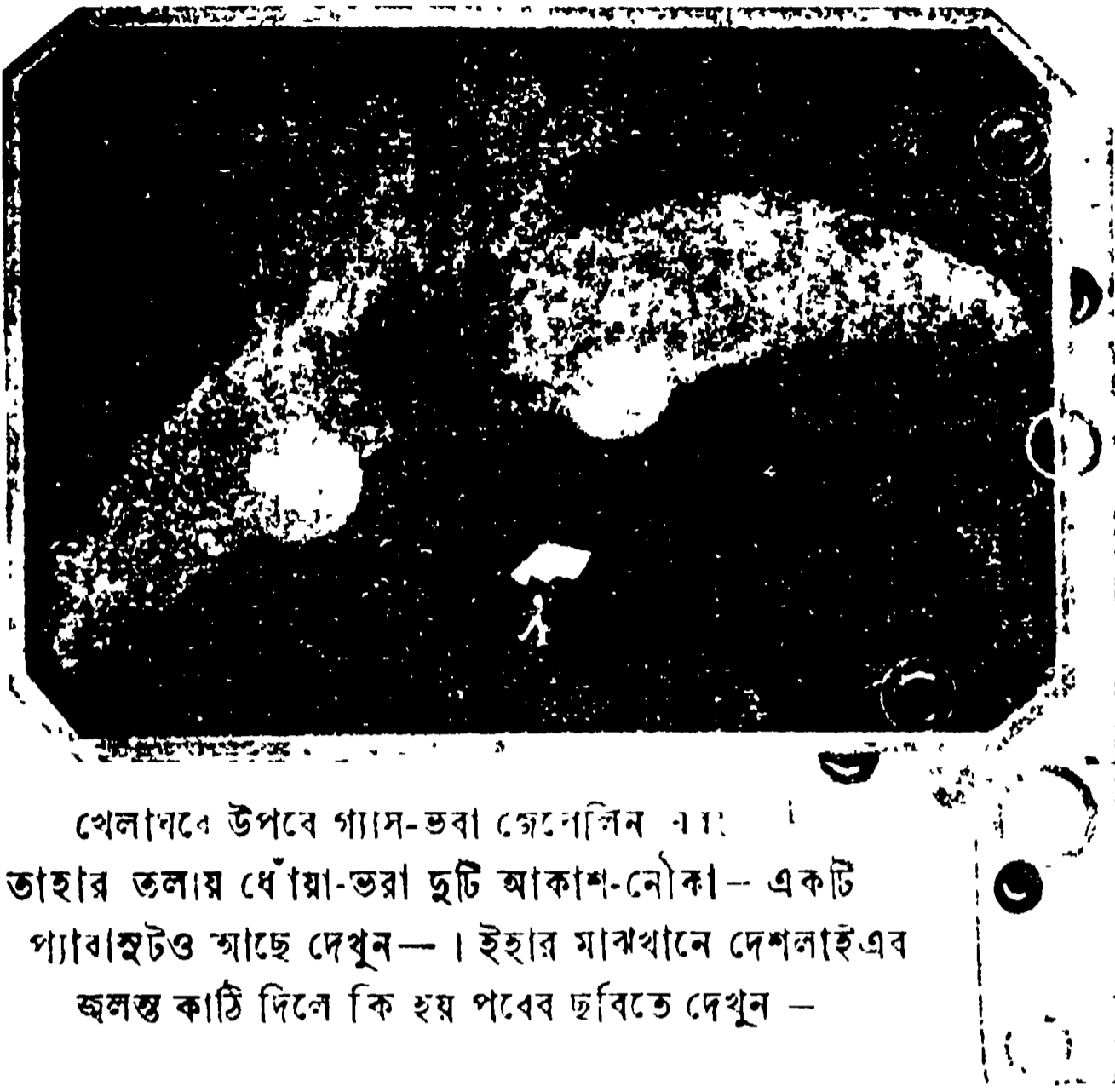
বুদ্ধদের সাপ—মাথায় ধোয়া-ভরা দুইটি বুদ্ধকে সাপের দুই
চোখ বলিয়া মনে হয়

যাইতে পারে। বুদ্ধ দুইটি মিলিয়া গেলে পর ফুঁ দিতে দিতে নল দুটিকে আশে আশে তাকাইয়া করিতে হইবে—ইহাতে মিলিত বুদ্ধ দুটি বেশ প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে।

একটা নল হইতেও এইরকম বড় বুদ্ধ তৈরী করা যায়—কিন্তু তাহা হাওয়ার উড়াইবার পক্ষে সুবিধা হয়। বুদ্ধ বধন হাওয়ার ভাসে তখন তাহাকে খুব ধারাল ছুরি দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। পাখার হাওয়া দিয়া ভাসমান বুদ্ধকে নানা-প্রকার অভূত আকারও দেওয়া যায়।

ধোয়া-ভরা বুদ্ধ তৈরী করা শক্ত হইলেও বেশ চমৎকার দেখিতে হয়। সিগারেটের ধোয়া মুখের মধ্যে লইয়া তাহাকে নলের মধ্যে দিয়া আশে আশে সাবানের কেনার বুদ্ধদের তিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়। এই বুদ্ধকে যদি কোন ছোট ছেলের কৌকড়া চুলের ওপর সাবধানে কেনিতে পারা যায় তবে তাহা দেখিতে অতীব মনোহর হয়। চুল ভিজা থাকিলে বুদ্ধ কাটিয়া যাইবে এই জন্ত খটখটে শুকনা চুলের উপর ইহা করিতে হইবে।

উলের কাপড়ের উপর বুদ্ধ অনেক রকম থাকে। এইরকম



খেলানবে উপবে গ্যাস-ভবা জেপেলিন বাঃ
তাহার তলায় ধোঁয়া-ভরা দুটি আকাশ-নৌকা—একটি
প্যাবাস্টও আছে দেখুন—। ইহার মাঝখানে দেশলাইএব
জ্বলন্ত কাঠি দিলে কি হয় পবেব ছবিতে দেখুন—



জেপেলিন পুড়িয়া গেল প্যাবাস্টও কামশ নীচে নামিয়া আসিতে ছে



উড়ো-জাহাজ ধোঁয়া-ভরা আড়ালে শত্রু জাহাজের কবল হইতে নিজের জাহাজ বঙ্গা করিতেছে

কোন কাপড়ের উপর যদি ধোঁয়া-ভরা বুদ্ধবুদ্ধ এবং এমনি বুদ্ধবুদ্ধ পাশাপাশি রাখা যায়, তবে দুইটি বুদ্ধবুদ্ধ ধাক্কা লাগিয়া এক হইয়া যাইবে এবং ধোঁয়া-ভরা বুদ্ধবুদ্ধের ধোঁয়া মিলিত বড় বুদ্ধবুদ্ধের ভিতর নানাপ্রকার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে প্রবেশ করিবে। ইহা করিতে হইলে সাবান খুব ভাল করিয়া গুলিতে হইবে এবং ঘর আতরিত্ত গরম যেন না হয়, ইহাও লক্ষ্য রাখতে হইবে।

উলের দস্তানা পরিয়া বড় বুদ্ধবুদ্ধকে লইয়া পিংপং খেলা চলিতে পারে, তবে বুদ্ধবুদ্ধকে খুব গ্রাস্তে আস্তে এবং অনাবশ্যক জোব না দিয়া আঘাত করিতে হইবে।

বুদ্ধবুদ্ধের মধ্যে গ্যাস ভরিয়াও নানাবকম চমৎকার দেখিতে বুদ্ধবুদ্ধ তৈয়ার করা যায়। ধোঁয়া-ভরা এবং গ্যাস-ভরা বুদ্ধবুদ্ধ উপরা-উপার রাখিতে পারিলে বেশ চমৎকার দেখিতে হয়।

ভিজা তারে বুদ্ধ বুদ্ধ আটকাই থাকে এইরকম তারের উপর

ছোট ছোট বুদ্ধবুদ্ধ রাখিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিষ করিতে পারা যায়। তারের সাহায্য না লইয়াও ছোট ছোট বুদ্ধবুদ্ধ কোন গোল পাত্রে উপর জমা করিতে পারিলে তাহা বেশ লম্বা হইয়া উঠে, এবং ক্রমশ নিজের ভারে মুইয়া পড়িতে থাকে, তখন তাহা দেখিতে সাপের মত হয়। সাপের মাথায় দুইটি ধোঁয়া-ভরা বুদ্ধবুদ্ধ ঠিক মত রাখিতে পারিলে তাহা সাপের চোখ হয়। এইরকম বুদ্ধবুদ্ধের সাপ বা তোরণ ইত্যাদি করিতে হইলে গ্যাস-ভরা বুদ্ধবুদ্ধই প্রকৃষ্ট, তাহাতে ফল ভাল হয়।

গ্যাস-ভরা বড় বুদ্ধবুদ্ধের মধ্যে রেশমী সূতাও লাগাইয়া দেওয়া যায়, এই রেশমী সূতায় আবার একটি ছোট কাগজকে প্যারামুটের আকারে বাঁধিয়া দিলে বুদ্ধবুদ্ধটিকে একটি আকাশ-জাহাজ বলিয়া মনে হয়।

সাবান-গোলা পেয়ালার মধ্যে গ্যাসের নল প্রবেশ করাইয়া দিলে, পেয়লা হইতে সাবানের বুদ্ধবুদ্ধ আপনা-আপনিই উপর দিকে

উঠিতে থাকিবে। দরকারমত গ্যাস ছাড়িতে এবং বন্ধ করিতে পারিলে সাবানের কেনার বুদ্ধবুদ্ধ অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠিতে পারে।

উড়ো জাহাজের নতুন কাজ—

সমুদ্রে অনেক সময় যুদ্ধ-জাহাজ শত্রু যুদ্ধ-জাহাজের সামনে পড়ে' নানারকমে বিপদগ্রস্ত হয়। এখন বিপদগ্রস্ত জাহাজকে ধোঁয়ার উপর পরদার আড়ালে রক্ষা করিবার এক নতুন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। উড়ো জাহাজ যুদ্ধ জাহাজের আগে আগে ভীষণভাবে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে যায় এই ধোঁয়া ক্রমশ এত ঘন এবং গভীর হইয়া উঠে যে শত্রু জাহাজ পরদার আড়াল ঢাকা জাহাজের কোন সন্ধানই পায় না। একটি এরোপ্লেন ১ মিনিটে ৯৫ ফুট উঁচু করিয়া ১ মাইল স্থান এইরকম ঘন ধোঁয়ায় আবৃত করিতে পারে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রীশিক্ষা

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে আহত হয়েছি। দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কেতাবের অভাব নেই। যে কেউ বাংলায় ছ' অক্ষর লিখতে পারেন, তিনিই নারীধর্ম সম্বন্ধে বই লিখে' হাতে-খড়ি দিয়ে থাকেন। তাতে আমরা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কিরূপে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী তৈরী করতে হয়, গান-বাজনা শিল্প-কলা প্রভৃতি শেখান যায়, যেন বারো বৎসরে বিয়ে হ'লেই পতি দেবতা নগদ বরণ ও কয়েকভরি সোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" বিনা ক্লেশে লাভ করতে পারেন, তার সর্কবিধ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এটা একবারও কেউ মনে করে' দেখেন না যে, প্রকৃতির নিয়ম বলে' একটা জিনিস আছে সেটাকে কিছুতে লঙ্ঘন করবার জো নেই, এবং যদিও মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিকাশলাভ করে, তথাপি দ্বাদশ বৎসর বয়সে মস্তিষ্কের পরিণতি অসম্ভব, অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ে তখনও তারা বালিকা মাত্র। তাদের মাথায় সে-সকল বিষয় তখন কিছুতে ঢুকতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা কথাটাই ছেলেখেলা হ'য়ে দাঁড়ায়, যদি বারো বৎসরের মধ্যে সেটা সমাপ্ত করতে হয়।

কোন বিখ্যাত ফরাসী লেখক সত্যই বলেছেন, স্ত্রীজাতির স্থান কোথায়—এইটি হচ্ছে প্রত্যেক দেশে সভ্যতার মাপকাঠি। আমাদের দেশে নারীদের অবস্থাটা মনুই নির্দেশ করে' দিয়ে গিয়েছেন—'ন সা স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—অর্থাৎ চিরকালই তাকে বাপ ভাই ছেলের অধীন হ'য়ে থাকতে হবে। এই সনাতন নীতিটির যাতে ব্যতিক্রম না ঘটে, এজন্য নারীজাতিকে আমরা এরূপ-ভাবেই রেখেছি যে বাস্তবিক এখন তারা স্বাধীনতার যোগ্যও নয়। ফ্রেডেরিক হ্যারিসন্ তাঁর Realities and Ideals নামক গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বলতে যদি কয়েকটি আধুনিক ভাষার মোটামুটি জ্ঞান এবং কয়েকটি ললিত কলায় দক্ষতামাত্র বুঝায়, তবে

"This truly Mahometan or Hindu view of woman's education is no longer openly avowed by cultured people of our own generation."

অর্থাৎ, সেটা হ'ল হিন্দু ও মুসলমানদের উপযুক্ত আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নয়। নারী-জাতি সম্বন্ধে আমরা আমাদের উচ্চধারণার যতই বড়াই করি না কেন, সংস্কৃত কোটেশন-কণ্টকিত রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে' সে-বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যতই চেষ্টা করি না কেন, একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ লেখক স্ত্রীজাতি-সম্পর্কে

আমাদের সভ্যতাকে কতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন দেখতে পাচ্ছেন। তবু তিনি জানতেন না যে, “a moderate knowledge of some modern languages and a few elegant accomplishments” আমাদের উচ্চশিক্ষিতা নারীদেরও অতি অল্পসংখ্যকেরই আছে, এবং তাদের পক্ষে এতটা উচ্চশিক্ষা আমাদের অধিকাংশ পুরুষের ধাতে সয় না ও কল্পনায়ও স্থান পায় না, যেহেতু পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই সেটা অবিদ্যমান।

জনষ্ট্রয়ার্ট মিল্ থেকে আরম্ভ করে’ রোমানিস, হাক্সলি, লেকি, ফ্রেডেরিক হারিসন, জন মলি প্রভৃতি লেখকগণ স্ত্রীজাতির সঙ্গে পুরুষজাতির তুলনামূলক সমালোচনা করে’ যে-সকল মন্তব্য লিখে’ গিয়েছেন, এবং আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন ভারতীয় রমণী-জাতি সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখেছেন, প্রচুর অবকাশ থাকলে সে-সব কথার অবতারণা করে’ পুরুষ ও স্ত্রী জাতির রীতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করা যেত; কিন্তু আজকাল মাগিকপত্রাদিতে ‘নারী-সমস্যা’ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিত হওয়ায়, আমার সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারিনি বলে’ আফশোসের কোনো কারণ নেই। তবে যখন কিছু বলতে প্রতিশ্রুত হয়েছি তখন খুব সংক্ষেপে দু’একটি কথা বলতে চাই।

পূর্বেই অধিকাংশ লেখকদের মতে, এক মাতৃহই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের তুলনায় জীবনযুদ্ধে কতকটা অপটু করে’ রাখবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং সর্ব-বিষয়ে স্ত্রীজাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে না এসম্বন্ধে যুক্তিতর্ক অনাবশ্যক বিবেচনা করি। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীপ্রকৃতি একে অন্দের পরিপোষক—বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ নিকৃষ্ট, একথা বলা চলে না। একদিকে মাতৃহ যেমন নারীকে দুর্বল করে’ রেখেছে, অপর পক্ষে উহাই ত আবার শিশুশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব তার স্বন্ধে চাপিয়ে দিয়েছে। মাতৃহ নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে মহীয়সী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এটা বলতে

বড়ই ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেললে সমাজে আমাদের মেয়েদের উচ্চস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে এত নিছক কল্পনা-বিজ্ঞপ্তিত কথা শুন্তে পাওয়া যায় যে, কানে তালা লেগে যায় এবং আমাদের দেশের পুরুষদের আত্মপ্রতারণা-শক্তি দেখে’ বিশ্বয়ে অভিভূত হ’তে হয়।

স্নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থতা আত্মত্যাগ ধৈর্য্যাতিক্রম ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি যে-সকল নৈতিক গুণ মানবের বিশেষত্ব, এবং তার আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধনের অমুকুল, মাতৃহের মধ্য দিয়েই সেগুলি সহজে বিকাশলাভ করে; কিন্তু সেই বিকাশের জন্মক্ষেত্র তৈরি থাকা চাই—অকালমাতৃহ নিবারণ করা চাই। স্মৃশ্রুত বলেছেন, অল্প বয়সে সন্তান হ’লে সেগুলি মারা যাবে, না মরলেও দুর্বলে প্রিয় হবে, সুতরাং অত্যন্ত বালাকে সন্তান-জননী হ’তে দেবে না; কিন্তু আমরা ঘরে ঘরেই ত এই নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে, দেখতে পাই। যে বালিকা খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তার মাতৃহের মর্যাদাই বা কোথায়, মহিমাই বা কি!

‘নাই আমার থেকে কানা মামাও ভাল’, এই নীতি অনুসরণ করে’ আমাদের পাড়ারগায়ের বালিকা বিদ্যালয়-গুলি চলছে। আমি যদিও এরূপ একটি ইস্কুলের সম্পাদকতা করেছি এবং আর-একটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তথাপি এগুলিকে আমি খুব স্নেহের চক্ষে দেখতাম বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেন দেখতাম না, তা পরে বলছি। তবে সেখানে ছোট ছোট মেয়েগুলি কি বিপুল উৎসাহভরে সেজেগুজে’ এসে গান করত, পড়পাঠ পড়মালা প্রভৃতি আবৃত্তি করত, তা’ দেখতে আমার বড়ই ভাল লাগত; আর মনে একটা গভীর বিষাদ ও দুঃখ হ’ত এই বলে’ যে, এই কচি মেয়েগুলিকে আর দুদিন পরেই অস্তঃপুরের খাচায় পুরে’ রাখবার ব্যবস্থা হবে, হয়ত অনেকের ইতিমধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব চলছে এবং সেটা পাবা হ’লেই ইস্কুল থেকে নাম তুলে’ নেওয়া হবে। অতি অল্পবয়সে অথবা বিনাব্যয়ে, উপোষ করে’, পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে বাড়ীর বালিকাদের যে-সকল ব্রত-নিয়ম উদ্‌যাপন করতে

দেখেছি, তাতে আমাবলই এই মনে হয়েছে,—এদের জীবনেও খেলাধুলা সৃষ্টি নিদ্রা আমাদের কত আবশ্যক আছে, কত অল্প এদের প্রাণের সবসত্তা সঞ্জীবিত রাখা যায়। কিন্তু প্রায় আমাদের দেশ, ততটুকু আনন্দও এদের ভাগ্যে বেশী দিন জুটে উঠে না।

ইস্কুলগুলিকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখতাম না। এজ্ঞ যে, এখানে পড়াশুনা খুব কমই হ'ত। উচ্চ শ্রেণীতে সব সময় ছাত্রী থাকত না, সূচীকার্যও সামান্যই শিক্ষা হ'ত। রাশত্ৰক উইলিয়মস্ নাহেবের বায়িক বিবরণীতে দেখতে পাই, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ভ্রূশিক্ষিত সম্প্রদায়েব মধ্যে কত অনাদব অর্থোপাজ্জনের জ্ঞান পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষা করা অভ্যাবশ্যক, মেয়েদের বোজ্জ-গার করতে হয় না সূতরাং তাদের লেখাপড়া শেখা অনাবশ্যক,—এই ভাবটি আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল। ভ্রূঘরে অধুনা মেয়েদের চিঠিপত্র লিখতে হয় বলে' বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া দরকার, বাজার-হিসাবটা রাখতে হয় বলে' যোগ-বিযোগ অঙ্কটা শেখা দরকার। বাংলা-দেশে হাজার-করা মাত্র একুশটি মেয়েব বিদ্যাশিক্ষা বড়-জোর এতদর অগ্রসব হয়েছে। এই 'বিদ্যাটুকু আয়ত্ত্ব করবার জ্ঞান বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যকতা আমি দেখতে পাই না—যে বসেই একরকম করে' একাজটা চলতে পারে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়েব সঙ্গে যোগস্থাপনের স্বেতু বলে' বিবেচিত না হয়, তবে তার বিশেষ কি প্রয়োজন?

আমি দেখেছি, বালিকা-বিদ্যালয়ের পুংস্বাব-বতবণ-সভায় কোনো বিবাহিতা কিম্বা ১৪, ১৫ বৎসর-বয়সের ভূতপূর্বা ছাত্রী—এ বয়সে কোনো মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে, এটা ত প্রায় চিন্তার অগোচর উপস্থিত থেকে সঙ্গীত কি কোন উচ্চবিষয়ে বচনা পাঠ বা আবৃত্তি করলে ত সভাস্থ সভ্যগণ তা নিয়ে বাড়ী গিয়ে অশোভন ও বিপরীত সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাত্রী একেই পাওয়া যায় না, তার পর যদি 'দৈবাৎ জুটে' যায়, তবে তাদের রীতিনীতি চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি-দের মুখে একান্তই কল্পনাপ্রসূত এমন সব কথা

শুনেছি যে, সেগুলি উক্ত মহিলাদের কানে পৌছলে তদগুণেই তাঁরা চাকরি ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতেন। মনে মনে আমরা আমাদের সীতা সাবিত্রী দয়মন্তীদের বিশ্বাস করি না—তাহ অত শীঘ্র বিয়ে দিয়ে ফেলতে চাহ, এবং বয়স্ক স্বাধীনস্বীবনী মহিলা দেখলে তার নীতি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হই। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন ইঞ্জিতে যা বলেছেন, তাতে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট করতে হয়। কমিশন বলেছেন—

“Until men learn the rudiments of respect and chivalry towards women who are not living in zenanas, anything like a service of women teachers will be impossible.”

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে আমাদের পুরুষগণ মনে মনে এই যে গভীর সন্দেহ পোষণ করেন, এটা যতদিন না দূর হবে, ততদিন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা সূদূরপর্য্যন্ত থাকবে

যৌন প্রবৃত্তিকে সংযম দ্বারা লোকহিত-ব্রতে নিয়োগ করে', প্রকৃতির নিয়ম যে সৃষ্টিরক্ষা, তা পালন করবার জ্ঞান অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ আবশ্যক। বিবাহিত না হলে কি পুরুষ কি স্ত্রী কারু চরিত্র পূণতা লাভ করে' সূগঠিত হ'য়ে উঠতে পারে না, সাধারণতঃ একথা মানি। উচ্চশিক্ষিতা অবিবাহিতা কোনো কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনায়, অল্পশিক্ষিতা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। তা' বলে' সকলকেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোনো মানে নেই, এবং উচ্চ শিক্ষা দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি মার্জ্জিত করার স্বফল বিবাহ-ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারলে সোনায় সোহাগা হয়, এটা অধীকার বরুবা জো নেই।

আমাদের পুরুষদেরই কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মেয়েদের ত কথাই নেই। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে সুবিধা ও সুযোগ আছে, বা তা শীঘ্র হওয়ার সম্ভব, সেইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রচুর অবসর দেওয়া উচিত নয়, একথা আমি মানতে প্রস্তুত নই। আমি মেয়েদের জীবিকা-অর্জনের প্রসঙ্গ তুলব না, তাদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে দু'একটি

মাত্র কথা বলে' আমার এই যৎসামান্য বক্তব্য শেষ করব।

জন মলি বলেছেন, মেয়েরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সক্ষীর্ণমণা। বিলেতেই যদি এরূপ অবস্থা, তবে আমাদের দেশের মেয়েদের কথা খুলে' বলা অনাবশ্যক। পুরুষদের মহৎ প্রয়াসগুলি অমুসরণ করবার মত যোগ্যতা পাশ্চাত্য মহিলাদের মধ্যেও অনেকেরই নেই—কিন্তু আমাদের মেয়েরা তা বুঝতে কিম্বা বুঝে' তার সঙ্গে সহায়ুভূতি করতেও অক্ষম। উইলিয়ম্ জেম্‌স্ তাঁর মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে বলেছেন যে, মেয়েরা কুড়ি বৎসরেই মানসিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ তার পর আর তাদের মনের বিকাশ হয় না। আর ঐ বয়সের পুরুষদের মনের অবস্থা জেলিবৎ তরল ও স্থিতিস্থাপক থাকে বলে' তারা তখনও অনেক নূতন নূতন তথ্য গ্রহণ করতে পারে। পাশ্চাত্য নারীদেরই যদি এই দশা, তবে আমাদের মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখুন। অথবা ভেবে দেখুবারই বা কি আবশ্যকতা, ঘরে ঘরে তাকিয়ে দেখলেই ত হয়। বিচার-বুদ্ধি বলে' যে একটা জিনিষ, ইংরেজীতে যাকে reason rationality বা judgment বলে, সেটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে একেবারে নেই বললেই চলে। সর্বদা তাঁরা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলেন, যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না, যদিও তর্কযুদ্ধে পশ্চাৎ-পদ না হ'তে পারেন। গোঁড়ামি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস বিচার-মূঢ়তা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের পুরুষরাই ত পাশ্চাত্য নারীদের পশ্চাতে পড়ে' আছেন, আবার আমাদের মেয়েরা আমাদের আরও পশ্চাতে টেনে রাখছেন। রাশ্‌ক্রক উইলিয়ম্‌ সাহেব সত্যই বলেছেন,—

“The traditional conservatism of the Indian home closes and bars the innermost sanctuary of Indian life to those new ideas which must penetrate far and wide if the political and social aspirations of the country are to be attained.”

অর্থাৎ কিনা, যে-সকল নূতন ভাবগুলি খুব একটা বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসার লাভ না করলে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি কার্যে পরিণত হ'তে পারে না, ভারতীয় অন্তঃপুরের চিরাগত রক্ষণশীলতার ফলে,

জাতীয় জীবনের নিভৃততম কক্ষে সেগুলির প্রবেশাধিকার নেই। ইস্কুল-কলেজে পড়ে' দেশ-বিদেশে ঘুরে', সভাসমিতিতে যোগদান করে' আমাদের দেশের পুরুষদের বিচার-বুদ্ধি যেটুকু খুলে' যায়, আবার বাড়ী এসে মা ভগ্নী গৃহিণীর সনাতন রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রথা-পদ্ধতির আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে', অল্পদিনের মধ্যেই তা লোপ পায়। সুতরাং জাতি হিসাবে দু'দশ পুরুষেও আমাদের সমাজ-শরীরে কোন নূতন ভাব বদ্ধমূল হ'তে পারে না। বালিকা-বিদ্যালয়ে দু'পাতা পড়ে'ই আমাদের মেয়েরা এসব বিষয়ে একেবারে উন্নত হ'য়ে উঠবেন, এরূপ আশা দু'রাশা মাত্র। কাগজে পড়ে' আমাদের দেশে কয় জন যুবকের বিচার-বুদ্ধি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকে? তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই ত সনাতন রীতি অমুসরণ করে' গতানুগতিক-ভাবে জীবন যাপন করে' থাকেন। বস্তুত বিচার-বুদ্ধির বিকাশ বড়ই কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। মেয়েরা অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করলেই আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে সনাতন রীতিনীতিগুলি অচিরাৎ অন্তর্দান করবে, এরূপ আশঙ্কা যেন কেউ না করেন। তবে পুরুষদের মধ্যেও যেমন কতক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি মার্জিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার প্রভাবে কতকটা সেরূপ হবে, সন্দেহ নেই। যতদিন তা না হয় ততদিন ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধ ও হৃদয় দাম্পত্য-জীবনকে দুর্লভ করে' রাখবে।

অতএব মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে না পারলে তাদের শিক্ষা সফল হবে না, বরঞ্চ “অল্প-বিছা ভয়ঙ্করী” হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যেহেতু কেবল নাটক নভেল পড়ে' মেয়েদের স্বাভাবিক ভাব-প্রবণতা বেড়ে যাবে, তারা আত্মঘাতী হবার নব নব রোমাণ্টিক উপায় খুঁজে' বের করবে। নাটক নভেলও আবার বেছে বেছে পড়া হয় শুনেছি, অর্থাৎ যেখানে কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথা থাকে, কেবল সেগুলিই পড়া হয়, দু'চারটি যুক্তি বা তত্ত্বকথা বা সূচিস্তিত মন্তব্য বা চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি কোথাও থাকে, তবে সেগুলি নাকি সঘণ্টে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং আমার

কথা এই যে, দেশময় ছাত্র-শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে ছাত্রী-শিক্ষারও তদ্রূপ ব্যবস্থা হোক, উচ্চশিক্ষার পথ তাদের নিকটও অবাধ ও উন্মুক্ত করে' দেওয়া হোক, দক্ষিণাত্যের স্নায় উত্তরাখণ্ডেও অবরোধ-প্রথা শিথিল করে' দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা অনেক পিছিয়ে দেওয়া হোক, যৌবন-বিবাহের দরূপ যদি 'ল্যান্ড-ম্যাচ' ও অসবর্ণ বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে বরণ করে' নেওয়া হোক'—মহর্ষি বাৎস্যায়নের মতে পরম্পরের প্রতি অমুরাগ হেতু গাঙ্কর বিবাহই সর্ব-শ্রেষ্ঠ—বিধবাদের শিক্ষা ও আবশ্যিক মত তাহাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু সেটা তাদের নিজের জন্ম যতটা আবশ্যিক, তাদের ধর্মাস্তর গ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ত নিবারণ দ্বারা জাতিক্ষয় ধামাবার জন্মও ততটা প্রয়োজন, এমন কি নিতান্ত আবশ্যিক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হোক। নারী-সমস্যা বড়ই জটিল, স্ত্রী-শিক্ষার সঙ্গে এতগুলি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এসে পড়বেই। আর বর্ণপরিচয়ই যদি স্ত্রীশিক্ষার সীমা হয়, তবে বালিকা বিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখতে পাই না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিলেই ঘরে ঘরে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী গড়ে উঠবে না, যেমন শিক্ষিত পুরুষ-

দের মধ্যে যেখানে সেখানে রাম লক্ষণ ভীষ্ম জ্ঞাণ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের উন্নতির সঙ্গে সমস্ত জাতিটার উন্নতি হবে; নতুবা আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষ হ'য়ে থেকে বাকী অঙ্গটাকে অক্ষয় ও জড় করে' রাখছে ও রাখবে। 'দেবী' বলে 'যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' বলে, মেয়েদের গৃহ-কোণে সরিয়ে কোণ-ঠাসা করে' রাখলে চলবে না। আমরা চাই

"A creature not too bright or good
For human nature's daily food"

এমন সুগৃহিণী যে আমাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার পক্ষে আবশ্যিক পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য জুগিয়ে দিতে পারে, নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ করে' আমাদের পুরুষদের মানুষ্য করে' তুলবার সাহায্য করতে পারে। দেব বা দেবী কেবল পুঁথিপত্রের সাহায্যে তৈরি হয় না, সেটা যার যার ভগবদত্ত প্রকৃতি অনুসারে হ'য়ে থাকে। আমরা চাই একরূপ স্ত্রীশিক্ষা, যা আমাদের মেয়েদের ধীশক্তি সুসম্পূর্ণ করে' বিচার-বুদ্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে' মনে মনে মহৎ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে, প্রবৃত্তিগুলিকে সংপথে চালিত করে' তাদের পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য পালনে উপযোগী করে' তুলবে।

শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

উভয় হস্তে লাঠি কিম্বা অসি

নিম্নলিখিত ক্রমগুলির মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত "দ" অক্ষরে দক্ষিণ হস্ত ও "বা" অক্ষরে বাম হস্ত বৃত্তিতে হইবে।

যে আঘাতটি-সম্পর্কিত বন্ধনীর মধ্যে "দ" প্রথমে, তাহার প্রয়োগ দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; যে আঘাতটির সম্পর্কিত বন্ধনীর মধ্যে "বা" প্রথমে, তাহার প্রয়োগ বাম হস্তে করিতে হইবে; যে স্থলে "দ" শেষে, তথায় প্রতিকার দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; এবং যে স্থলে "বা" শেষে তথায় প্রতিকার বাম হস্তে করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

ঠাট্ উত্তর গোমুখ

(আক্রমণ)

১। ভর্জা (বা, দ)

২। কোমর (বা, দ)

৩। অঙ্ক (বা, দ)

৪। কোমর (বা, দ)

৫। কন্নক (বা, দ)

(প্রত্যাক্রমণ)

১। শির (বা, দ)

২। তেওয়ার (বা, দ)

৩। শির (বা, দ)

৪। শির (বা, দ)

(বিপরীতায়ত্ত)

বর্ণনা :—

উত্তর গোমুখ = বাম পদ সম্মুখে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে করিয়া গোমুখের অক্ষরূপ ঠাট্। (অন্ত্যন্ত "উত্তর ঠাট্"-গুলি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম)।

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট্ গৌমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভর্জা (দ, বা)	১। শির (দ, বা)
২। কোমর (দ, বা)	২। তেওয়ার (দ, বা)
৩। অঙ্ক (দ, বা)	৩। শির (দ, বা)
৪। কোমর (দ, বা)	৪। শির (দ, বা)
৫। করক (দ, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

তৃতীয় ক্রম

ঠাট্ উত্তর গৌমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভুজ (বা, দ)	১। সাঙ্ (বা, দ)
২। ভাগার (বা, দ)	২। চাকি (বা, দ)
৩। উণ্টা অঙ্ক (বা, দ)	৩। সাঙ্ (বা, দ)
৪। ভাগার (বা, দ)	৪। সাঙ্ (বা, দ)
৫। পালট্ (বা, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

চতুর্থ ক্রম

ঠাট্ গে মুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভুজ (দ, বা)	১। সাঙ্ (দ, বা)
২। ভাগার (দ, বা)	২। চাকি (দ, বা)
৩। উণ্টা অঙ্ক (দ, বা)	৩। সাঙ্ (দ, বা)
৪। ভাগার (দ, বা)	৪। সাঙ্ (দ, বা)
৫। পালট্ (দ, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

পঞ্চম ক্রম

ঠাট্ উত্তর রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। পালট্ (বা, বা)	১। সাঙ্ (দ, দ)
২। গ্রীবান্ (বা, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

ষষ্ঠ ক্রম

ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। পালট্ (দ, দ)	১। সাঙ্ (বা, বা)
২। গ্রীবান্ (দ, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

সপ্তম ক্রম

উত্তর রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। করক (বা, বা)	১। শির (দ, দ)
২। হিমাএল (বা, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

অষ্টম ক্রম

ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। করক (দ, দ)	১। শির (বা, বা)
২। হিমাএল (দ, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

নবম ক্রম

ঠাট্ উত্তর পাখুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান্ (বা, বা)	১। আসর্ (দ, বা)
২। তেওয়ার (বা, দ)	২। জবেগা (দ, দ)
	(বিপরীতারম্ভ)

দশম ক্রম

ঠাট্ পাখুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান্ (দ, দ)	১। আসর্ (বা, দ)
২। তেওয়ার (দ, বা)	২। জবেগা (বা, বা)
	(বিপরীতারম্ভ)

একাদশ ক্রম

ঠাট্ উত্তর পাখুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হিমাএল (বা, বা)	১। সাকেন (বা, দ)
২। চাকি (বা, দ)	২। উণ্টা জবেগা (দ, দ)
	(বিপরীতারম্ভ)

দ্বাদশ ক্রম

ঠাট্ পাখুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হিমাএল (দ, দ)	১। সাকেন (দ, বা)
২। চাকি (দ, বা)	২। উণ্টা জবেগা (বা, বা)
	(বিপরীতারম্ভ)

ত্রয়োদশ ক্রম

ঠাট্ উত্তর রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটি পেশ (বা, দ)	১। শূজবাহী (বা, দ)
২। উণ্টা মোটা (বা, দ)	২। চাকি (বা, দ)
৩। শির (বা, দ)	৩। গ্রীবান্ (বা, দ)
৪। শূজবাহী (বা, দ)	৪। উণ্টা মোটা (বা, দ)
	আনি (বা, বা)
৫। মোটা (বা, বা)	৫। আনি (বা, বা)
{ কোমর (বা, দ)	
৬। চাকি (দ, দ)	৬। হাতকাটি অধঃ (বা, দ)
৭। হল (দ, বা)	
৮। ভুজ (চৌমুখী) (দ, বা)	
৯। পালট্ (দ, বা)	
১০। শির (চৌমুখী) (দ, বা)	
১১। হাতকাটি (দ, বা)	১১। হাতকাটি (দ, বা)
১২। ভাগার (চৌমুখী) (দ, বা)	
১৩। বাহেরা (চৌমুখী) (বা, দ)	
১৪। দিগর (বা, বা)	১৪। দিগর (দ, বা)
১৫। শির (দ, দ)	বিপরীতারম্ভ

চতুর্দশ ক্রম
ঠাট্, রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটিপেশ (দ, বা)	১। শূঙ্গবাহী (দ, বা)
২। উণ্টা মোড়া (দ, বা)	২। চাকি (দ, বা)
৩। শির (দ, বা)	৩। গ্রীবান্ (দ, বা)
৪। শূঙ্গবাহী (দ, বা)	৪। উণ্টা মোড়া (দ, বা) } আনি (দ, দ)
৫। মোড়া (দ, দ)	৫। আনি (দ, দ)
কোমর (বা, দ)	—
৬। চাকি (বা, বা)	৬। হাতকাটি অধঃ (দ, বা)
৭। ছল (বা, দ)	—
৮। ভুজ (চৌমুখী) (বা, দ)	—
৯। পালট্ (বা, দ)	—
১০। শির (চৌমুখী) (বা, দ)	—
১১। হাতকাটি (বা, দ)	১১। হাতকাটি (বা, দ)
১২। ভাণ্ডার (চৌমুখী) (বা, দ)	—
১৩। বাহেরা (চৌমুখী) (দ, বা)	—
১৪। দিগর (দ, দ)	১৪। দিগর (বা, দ)
১৫। শির (বা, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

পঞ্চদশ ক্রম

ঠাট্, উত্তর পাথুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শূঙ্গবাহী (বা, দ)	১। হাতকাটি (বা, বা)
২। মোড়া (দ, বা)	২। তেওয়ার (বা, দ)
৩। সাঙ্ (দ, বা)	৩। হিমাএল (বা, বা)
৪। হাতকাটি (দ, বা)	৪। মোড়া (দ, বা) } দক্ষিণ আনি (দ, বা)
৫। { মোড়া (দ, বা) } কোমর (বা, বা)	৫। দক্ষিণ আনি (দ, বা)
৬। তেওয়ার (দ, বা)	৬। শূঙ্গবাহী (দ, দ)
৭। চির (বা, দ)	—
৮। ভুজ (চৌমুখী) (বা, দ)	—
৯। করক (বা, দ)	—
১০। সাঙ্ (চৌমুখী) (দ, বা)	—
১১। শূঙ্গবাহী (বা, দ)	১১। শূঙ্গবাহী (বা, দ)
১২। কোমর (চৌমুখী) (বা, দ)	—
১৩। তামেচা (চৌমুখী) (দ, বা)	—
১৪। চাপ্‌নি (বা, বা)	১৪। চাপ্‌নি (দ, বা)
১৫। { সাঙ্ (বা, দ) } হাতকাটি (বা, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

ষোড়শ ক্রম

ঠাট্, পাথুরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শূঙ্গবাহী (বা, বা)	১। হাতকাটি (দ, দ)

২। মোড়া (বা, দ)	২। তেওয়ার (বা, দ)
৩। সাঙ্ (বা, দ)	৩। হিমাএল (দ, দ)
৪। হাতকাটি (বা, দ)	৪। মোড়া (বা, দ) }
৫। { মোড়া (বা, দ) } কোমর (দ, দ)	দক্ষিণ আনি (বা, দ) }
৬। তেওয়ার (বা, দ)	৫। দক্ষিণ আনি (বা, দ)
৭। চির (দ, বা)	৬। শূঙ্গবাহী (বা, বা)
৮। ভুজ (চৌমুখী) (দ, বা)	—
৯। করক (দ, দ)	—
১০। সাঙ্ (চৌমুখী) (বা, দ)	—
১১। শূঙ্গবাহী (দ, বা)	১১। শূঙ্গবাহী (দ, বা)
১২। কোমর (চৌমুখী) (দ, বা)	—
১৩। তামেচা (চৌমুখী) (বা, দ)	—
১৪। চাপ্‌নি (দ, দ)	১৪। চাপ্‌নি (বা, দ)
১৫। { সাঙ্ (বা, দ) } হাতকাটি (দ, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

নির্ঘাত

মিশ্রঘাতের অষ্টম ক্রম শেষ হইলেই ক্রমে সঙ্কে সঙ্কে নির্ঘাতের অভ্যাসও আরম্ভ করিতে পারা যায়। নির্ঘাত অভ্যাস-কালে প্রথমে দক্ষিণ হস্তে শূঙ্গ ও বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে, পরে পূর্বাহ্নুরূপ প্রচেষ্টা সহ সম ক্রান্তি অবধি বাম হস্তে শূঙ্গ ও দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে। তৎপরে পর্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও অপর হস্তে শূঙ্গ এবং অপর বাক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শূঙ্গ ধারণ করিয়া পূর্বাহ্নুরূপ সম ক্রান্তি অবধি ক্রীড়া করিতে হইবে। পরে পর্যায়ক্রমে শুধু এক-এক হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া নির্ঘাত অভ্যাস করিতে হইবে।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ান্তর্গত পাঠগুলির শিক্ষাভ্যাসের বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ঘাত-সম্পর্কে যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং অসিবিদ্যা-সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ প্রায় সম্পূর্ণ-রূপেই নির্ভর করিয়া থাকে।

নির্ঘাত-সম্পর্কে কোন বিধি-নির্দিষ্ট পাঠের স্থিরতা নাই, এবং অধিকাংশস্থলেই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিমিত্ত বিভিন্নরূপ উপদেশেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাই সদগুরুর উপদেশানুযায়ী পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, অনুশীলন, অধ্যবসায় ও নিদিধ্যাসন সহযোগে ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারাই নির্ঘাতে দক্ষতা জন্মিয়া থাকে। তবে

অভ্যাসকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে।—

১। হস্তদ্বয় সর্বদাই সুরক্ষিত রাখিতে হয়।

২। শরীর ও গতির ভঙ্গী সর্বদাই সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ রাখিতে হয়।

৩। কদাচ অন্তমনস্ক হইতে নাই।

৪। হস্তদ্বয় পরস্পরে কদাচ যেন অতি সন্নিকটে কিম্বা অতি ব্যবধানে না হইয়া পড়ে। দ্রুত চালনাকালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও প্রতিপক্ষের অসিবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তনুহুর্ন্তেই অসি-বেগের দ্বারা ক্রটি সংশোধন করিয়া লইতে হয়, এবং এবিষয়ে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়।

উভয় হস্তের ব্যবধান সাধারণতঃ দেড় হস্ত ও এক হস্তের মধ্যে রাখিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

৫। হস্তদ্বয়ের কক্ষোণি (কম্বুই) কদাচ যেন একে অঙ্কে অতিক্রম করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া না যায়।

৬। হস্তদ্বয়ের ব্যবধানের মধ্যদেশে কদাচ যেন প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা শৃঙ্গ প্রবেশ করিবার অবসর না পায়।

৭। কদাচ যেন এক হস্ত কোমরের নিম্নে ও অপর হস্ত মস্তকের উপরে অথবা এক হস্ত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে ও অপর হস্ত শরীরের বাম পার্শ্বে প্রতিহত হইয়া না থাকে।

৮। সর্বদাই উভয় হস্তের গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অসি ও শৃঙ্গ চালনা করিতে হয়, নতুবা স্বকীয় আঘাতেই স্ব হস্ত ও শরীর আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিম্বা হস্তদ্বয়ের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িতে পারে; সেই-হেতুই বিচার করিয়া কখনও শৃঙ্গ অসির সম্মুখে কখনও বা অসির পশ্চাতে ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়। সাধারণতঃ কোন হস্তই নিষ্ক্রিয় রাখিতে নাই।

৯। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইলেও তাচ্ছিল্য-সহকারে কোনরূপ সতর্কতার লাঘব করিতে নাই।

১০। কদাচ স্বকীয় যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া আন্ফালন ও স্পর্শ দেখাইতে যাইতে নাই।

১১। শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে প্রতিহত না করিয়া কদাচ “চির” “হল” “আনি” প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে নাই। অনবধানতা-বশতঃ “চির” “হল” প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে নিজ হস্ত ছিন্ন হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

১২। অসিবেগের ক্রমধারা অসুযায়ী সহজ গতির অসুসরণ-সহযোগেই প্রতিপক্ষের অরক্ষিত স্থান-সমূহে আক্রমণ হেতু আঘাতের প্রয়োগ করিতে হয়। (Proceed through shortest cuts.) বিশৃঙ্খল আক্রমণে ও আঘাতে সফল না হইয়া কুফলই অধিক হয়।

১৩। যাহাকে অল্প সময় মধ্যে অধিক আঘাতের প্রয়োগ-মাত্রার আধিক্য সম্ভবপর হইতে পারে, তদনুরূপেই হস্ত-চালনা দ্বারা অসি-বেগ সুরক্ষিত রাখিতে হয়। (Maximum strokes in minimum time.)

১৪। নিরবচ্ছিন্ন সমবেগসম্পন্ন দ্রুতগতি (swift uniform and continuous motion) হইতেই আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুরু আঘাতই কার্যকরী; লঘু আঘাতে সময়-ও শক্তি-ক্ষয় মাত্র।

১৫। আক্রমণ প্রারম্ভে “হাতকাটি” কিম্বা “চক্ষু” (প্রধানতঃ “হাতকাটি”) আক্রমণের উপক্রম কিম্বা ভাগ করিয়া পরে আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়; অথবা প্রতিপক্ষের অসির, কিম্বা অসি ও শৃঙ্গের কোনরূপ বাধা জন্মাইয়া আরম্ভ করিতে হয়।

১৬। যে হস্তে প্রতিপক্ষ অসি ধারণ করিবে, আক্রমণ-সহযোগে সেই পার্শ্বে পতিত হইতে পারিলেই যথেষ্ট সুবিধা হয়।

১৭। সর্বদাই প্রতিপক্ষের দুর্বলতা ও ছিদ্র বুঝিয়া আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়, সেই-হেতুই সুযোগমতে “ধাদার” প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকার শিষ্টতা ও উদারতা ভুলিয়া যাইতে হয়, নতুবা নিজেকেই প্রতিহত হইতে হয়।

[সর্বপ্রকার অনবধানতা ও সতর্কতার ব্যতিচারই

ছিন্ন বৃত্তিতে হইবে। সাধারণতঃ ঘে-কোনরূপ অপার-
গতার নামই দুর্বলতা।]

১৮। দ্রুত চালনায় আঘাতের পর আঘাতের
প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষকে প্রমাদগ্রস্ত করিতে পারিলেই
তাহার ছিন্ন ও দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে।

১৯। কৌশলক্রমে প্রতিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম
হস্তকে তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অপসারিত করাইয়া
হস্ত আক্রমণ পূর্বক অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে
পারিলেই আশু শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

২০। প্রতিপক্ষের আক্রমণে অস্থির হওয়ার উপক্রম
হইলেই চক্ষু আক্রমণ দ্বারা তাহাকে বিহ্বল করিতে হয়।
সময়ে সময়ে শৃঙ্গ দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া “হাতকাটি”,
“হুল”, “আনি” প্রভৃতির প্রয়োগ-সহযোগে কিম্বা
“অভিযান স্থিতির” ভঙ্গী-সহযোগে প্রতিপক্ষের বক্ষের
উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলেও সফল পাওয়া যায়।
শ্রেষ্ঠ অসিধারীগণ সাধারণতঃ “বিনোদ” ও “যুয়ুংহু”র
প্রয়োগেই নিষ্ফলি পাইয়া থাকেন।

২১। হস্ত, গ্রীবা, মস্তক, হৃদয়, বস্তু ও মর্ম্মস্থল-
সকল লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ আঘাতের চেষ্টা দেখিতে
হয়। ঐসমস্ত স্থলে নিশ্চিতরূপে গুরু আঘাত করিতে
পারিলেই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইবে।

২২। প্রতিপক্ষের আঘাত অতিক্রম করিয়া কোনও
মর্ম্মস্থলে তাহাকে নিশ্চিত গুরু আঘাত করিতে
পারিলেই সাধারণতঃ নিঃশব্দ হওয়া যায়। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন
আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রতিপক্ষ
আক্রমণের অবসর না পাইলে আর শঙ্কা কোথায়?

২৩। কদাচ পশ্চাৎপদ হইতে নাই। প্রতিপক্ষ
পশ্চাৎপদ হওয়ার উপক্রম করিলেই শরীর সুরক্ষিত রাখিয়া
আক্রমণ-সহযোগে তীব্র গতিতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া
পড়িতে হয়।

২৪। দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির
প্রতিযোগিতা হইলে সময়ে সময়ে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিকে এক
লক্ষ্যে শূন্যে উঠিয়া, “অভিযান স্থিতির” ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া,

এবং প্রতিপক্ষের অসি ও শৃঙ্গকে প্রতিহত করিতে স্থির
লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্র গতিতে প্রতিপক্ষের অতি সন্নিকটে
ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

২৫। প্রতিপক্ষ লক্ষ সহযোগে অগ্রসর হওয়ার
উপক্রম করিলে, শরীর অবনত করিয়া “অবনমন”
সহযোগে অগ্রসর হইতে হইতে, অগ্রবিন্দু পশ্চাৎ দিকে
করিয়া অসি মস্তকের উপরে ধারণ করিয়া ধারের অংশ
দ্বারা “চির” প্রয়োগ করিতে পারিলে কিম্বা পদঘষে
আঘাত করিতে পারিলে সফল পাওয়া যায়।

২৬। চক্ষু আক্রান্ত হইলেই প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে
“অবনমন” সহযোগে তীব্রগতিতে আক্রমণ সহ শত্রুর
উপরে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হয়।

২৭। দক্ষিণ হস্তের “হুল” “আনি” প্রভৃতির
আক্রমণের প্রতিকারকল্পে সাধারণতঃ “অবনমন”
সহযোগে নিজ বাম পার্শ্বে শরীর অপসারিত করাইয়া
প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ করিতে হয়; অথবা
“হাতকাটির” প্রয়োগ করিতে হয়। (বাম হস্ত সম্বন্ধেও
তদনুরূপ)।

২৮। স্বযোগ অনুসারে শৃঙ্গ দ্বারাও মর্ম্মস্থলে আঘাত
করিতে হয়।

বুদ্ধাজুলীর দিকের শৃঙ্গের বিন্দু দ্বারা “হুল” “আনি”
প্রভৃতির অনুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়, এবং
কনিষ্ঠাজুলীর দিকের বিন্দু দ্বারা “ছুরিকার” (বাকের)
অনুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

প্রকৃত সংঘর্ষকালে পূর্বোক্ত নিয়ম-প্রণালী ও
সতর্কতাগুলির বিচার করিবার অবসর পাওয়া অসম্ভব;
কিন্তু শিক্ষাভ্যাসকালে এইসমস্ত সতর্কতা-প্রভৃতি আয়ত্ত
করিয়া রাখিতে পারিলে প্রকৃত সংঘর্ষকালে আপনা
হইতেই পূর্ব শিক্ষা, অভ্যাস ও সঙ্কারের সুমষ্টিভূত
প্রভাব প্রতিভাত হইয়া কার্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া
থাকে। তবে জয়লাভ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আয়ত্তাধীন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

ব্যবসাগত লাভ ও সামাজিক লাভ

(১)

ব্যক্তি যদি নিজের সুবিধা বুঝে' কাজ করে এবং তার স্বাধীনতায় যদি হস্তক্ষেপ করা না হয় তা হ'লে সকল ব্যক্তি নিজের সুবিধা বুঝে' কাজ করলে সামাজিক উন্নতি সুবিধামত হবে, এই ধরনের একটা ভুল ধারণা অনেকের মনে আছে। * সামাজিক সুবিধা তত বেশী হবে, যত বেশী সামাজিক আয় বেড়ে চলবে ; কিন্তু ব্যক্তির আত্মসুবিধা-বোধ (self-interest) সব সময় সামাজিক আয় না বাড়াতেও পারে। ব্যক্তির ক্ষমতা সাধারণতঃ দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। ১। ভোগ্য উৎপাদনে, ২। ভোগ্য আহরণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে, যদি প্রকৃতিকে একটি আম গাছ বলে' ধরা হয় আর যদি একদল ছেলেকে মনুষ্যজাতি বলা যায়, তা হ'লে সামাজিক আয় হবে কতকগুলি আম। এখন প্রত্যেক ছেলেই যদি আমের ফসল বৃদ্ধি ও গাছ থেকে আম পাড়ায় মন দেয়, তা হ'লে সামাজিক আয় বাড়বে, কিন্তু কয়েকটি ছেলে যদি অপরের পাড়া আম কিছু কিছু সংগ্রহ করে' নিজেদের কাছে রাখে, অর্থাৎ সামাজিক আয়ের দিকে নজর না দিয়ে শুধু নিজেদের আয়ের দিকেই নজর দেয়, তা হ'লে সামাজিক আয় কমে' যাবে। উৎপাদন না করে' শুধু আহরণে (বা অপহরণে) যত বেশী সামাজিক শ্রম খরচ হয়, সমাজের ক্ষতি ততই বে হবে। কাজেই ব্যক্তির আত্মসুবিধাবোধ যে সামাজিক আয় উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সব সময় সমানে এ দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে লাগাবে, এমন কোন কথা নেই। এমন অনেক কাজ ও ব্যবসায় আছে যাতে সামাজিক লাভ খুবই বেশী অথচ তাতে কোনো ব্যক্তি নিজের জন্তু + কখনও শক্তি ব্যয় করবে না, কেননা তাতে সে ব্যক্তির লাভ নেই বা

খুব কম আছে। এসব ক্ষেত্রে সমাজই সংঘবদ্ধভাবে অনেক কাজ করে' থাকে। যেমন, সহর বা দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা, ডাক ও তারে খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত, শাস্তি রক্ষার জন্তু পুলিশ ও সৈন্য রক্ষা, সাধারণের মানসিক উন্নতির জন্তু পাঠাগার, অবৈতনিক পাঠশালা, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থাপন। এসবগুলির দিকে সামাজিক শক্তি কমই যেত, যদি সমাজ ব্যক্তির আত্মসুবিধা-বোধের উপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে' থাকত। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্তু সংঘবদ্ধভাবে অনেক কাজ করতে হয় এবং না করলে সমাজের অশেষ দুর্গতি হয়। অজ্ঞানতা, পরাধীনতা ইত্যাদি কারণে অনেক সময় সমাজ নামে থাকলেও কাজের বেলা না থাকার সামিল হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশ তার একটি উদাহরণ। এইরকম ক্ষেত্রে যে কারণে সমাজ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষির চেষ্টা করতেও অক্ষম, সেই কারণে সর্বপ্রথমে দূর করা দরকার। তা নইলে, কি করে' সমাজ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারে, তা জেনে কোন ফল নেই।

সামাজিক আয় যে-সব উপকরণের সাহায্যে উৎপাদিত হয়, সেগুলিকে তিন ভাগে আগেই বিভাগ করা হ'য়েছে ; প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন। কেউ যেন না ভাবেন, যে, উপকরণগুলির একটি ভাগের আছে এবং তার থেকে ইচ্ছামত কিছু কিছু বার করে' নিয়ে সামাজিক আয় প্রতি বৎসর সৃষ্ট হয়। উপকরণগুলি এবং আয়, দুইই অনবরত আসছে আর যাচ্ছে। এদের একটি ভাগের সঙ্গে তুলনা না করে' একটি প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করলে অনেকটা ঠিক হয়। উপকরণের প্রবাহ ক্রমাগত উপকরণ নিয়ে আসছে। নূতন জমি হচ্ছে, আবার জমি লোপ পেয়েও যাচ্ছে ; জমির উর্বরতা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, আবার বাড়ছে ; কোথাও মাছ ধরার নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, কোথাও মাছ লোপ পেয়ে যাচ্ছে ; খনি আবিষ্কৃত

* এই ধারণার বহুবর্তী লোকেরা ইয়োরোপে *Laissez Faire* অথবা *leave alone school of thinkers* নামে পরিচিত।

+ অবশ্য এখানে বেতন-ভোগী কর্মচারীদের কথা ধরা হচ্ছে না।

হচ্ছে, পুরান খনি খালি হ'য়ে যাচ্ছে ; নূতন নূতন উপায়ে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, ইত্যাদি। মানুষ মরছে জন্মাচ্ছে, তার কর্মক্ষমতা বাড়ছে কমেছে, তার সংখ্যাও বাড়ছে, কমেছে, ইত্যাদি। মূলধন নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, আবার সৃষ্ট হচ্ছে ; পুরান যন্ত্র ক্ষয়ে যাচ্ছে, নূতন যন্ত্র তৈরী হচ্ছে, পুরান বাড়ী ভাঙছে, নূতন বাড়ী হচ্ছে ; পুরান সহর, বন্দর, পথ, ঘাট, মালগুদাম সবই ভাঙছে গড়ছে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষণের জন্ত এমন বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, যাতে উপকরণের প্রবাহ অপ্রতিরূপিত থাকে। সমাজের কর্তব্য শুধু বর্তমানবংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিই নেই, ভবিষ্যৎবংশীয়দের প্রতিও তার কর্তব্য আছে। আর সামাজিক আয়ও একটি প্রবাহের মত আসছে ও ভুক্ত হচ্ছে। বাৎসরিক আয় কাজের সুবিধার জন্ত বলা হয়, তা না হ'লে এক্ষেত্রে বৎসরের কোন মূল্য নেই। সময়ের স্রোতের মধ্যে থেকে থেকে দিনের খুঁটি, মাসের বয়স ও বৎসরের বাঁধ মানুষ লাগালেও সময়ের স্রোত অবাধগতিতে চলে। সময়কে মানুষ তার সীমিত কল্পনা দিয়ে ধরতে, বুঝতে চেষ্টা করে ; তাই সে সময়ের প্রবাহে বাঁধ, বয়স, খুঁটি ইত্যাদি বসাতে চায়। কিন্তু সময়ের মধ্যে সে-সব নেই ; আছে মানুষের মনে। বৎসরের শেষে যে আবার নূতন করে' উপকরণ জোগাড় ও আয় উপার্জন শুরু হয় না, তা বলাই বাহুল্য। উপকরণপ্রবাহের নানা অংশ সতত নান্দা ভোগ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে ; এবং আমরা, কোন-একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটা ভোগ্য উৎপাদিত হচ্ছে, তাকে বাৎসরিক সামাজিক আয় বলছি।

এই উপকরণের প্রবাহ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ব্যবহারকে বিভিন্ন ব্যবসায় বলা চলে। কোন ব্যবসায় যত মাত্রা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে যে মাত্রা থেকে সবচেয়ে কম লাভ হয়, তাকে সেই ব্যবসায়ের সীমাস্থিত মাত্রা বলা চলে। এই সীমাস্থিত মাত্রা থেকে যা “নেট” লাভ (অর্থাৎ খরচ বাদে ছাঁকা লাভ যেটুকু), তাকে সীমাস্থিত “নেট” লাভ বলা চলে। কোন ব্যবসায় সীমাস্থিত মাত্রা থেকে যা নেট লাভ হয়, তা সেই ব্যবসায়ের দিক থেকে দেখলে একপ্রকার হ'তে পারে,

আবার সামাজিক দিক থেকে দেখলে আর একপ্রকার হ'তে পারে। নেট লাভ মানে হচ্ছে, সেই লাভটুকু উৎপাদন করতে গিয়ে বাস্তব জিনিষ খরচ, কষ্ট স্বীকার এবং অন্ত্যস্ত ক্ষতি যা হ'য়েছে তা মোট লাভ থেকে বাদ দিয়ে যা থাকে সেইটুকু। এখন ব্যবসায়-বিশেষের দিক থেকে বাস্তব জিনিষ (কাঠ, খড়, ইট, লোহা, ধান ইত্যাদি) ও কষ্ট স্বীকার (গরমে কাজ করা, ধূলা খাওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারখানায় বসে' থাকা ইত্যাদি) যে পরিমাণ হয়, সামাজিক দিক থেকে হয়ত সেই পরিমাণেই হয়। কিন্তু অন্ত্যস্ত ক্ষতি ব্যবসায়ের দিক থেকে যা হয়, সামাজিক দিক থেকে তার চেয়ে কম বেশী হ'তে পারে। যেমন রেল-লাইন স্থাপনের জন্ত লোহা ও মজুরী খরচ ব্যবসায়িক ও সামাজিক দুই দিক থেকেই সমান হবে ; কিন্তু সামাজিক দিক থেকে রেল-লাইনের বাঁধের জন্ত যদি ম্যালেরিয়া হয় ও লোকের বাড়ী ঘর সঁাত-সেঁতে হ'য়ে যায়, অথবা ধোঁয়ায় লোকের কষ্ট হয়, তা হ'লে সেগুলিকে ক্ষতির মধ্যে ধরতে হবে। আবার শীঘ্র চলাচল সুবিধার জন্ত যদি ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে, লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, বা দুর্ভিক্ষ নিবারণের সুবিধা হয় (রেল-লাইনগুলি দুর্ভিক্ষের কারণও হ'তে পারে) তা হ'লে সেগুলি কোম্পানীর লাভের খাতায় না দেখা পেলেও সামাজিক লাভের হিসাবে স্থান পাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়গত লাভ লোকসান ও সামাজিক লাভ লোকসানের মধ্যে তফাৎ আছে।

কোন ব্যবসায় ব্যবহৃত উপকরণের সীমাস্থিত মাত্রা থেকে সেই ব্যবসায়ের যা নেট লাভ হয়, তাকে সীমাস্থিত ব্যবসায়গত নেট লাভ বলা চলে এবং সেই নেট লাভটুকু উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সামাজিক যা ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে সেগুলি তাতে বা তা থেকে যোগ-বিয়োগ করে' সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ স্থির হবে। সীমাস্থিত নেট লাভ বা নেট উৎপাদনস্থির করতে হ'লে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, তার নেট উৎপাদনের চেয়ে অল্প একটু (বুঝবার সুবিধার জন্ত একমাত্রা বলা যাক) বেশী উপকরণের নেট উৎপাদন কত বেশী তা ঠিক করতে হবে। যেটুকু বেশী সেইটুকু হচ্ছে সীমাস্থিত নেট লাভ।

এইটুকুর দাম যা তাই হচ্ছে, সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের দাম। অবশ্য ঐটুকু বেশী উৎপাদন করতে গিয়ে উৎপাদন খরচ বা ক্রেতাদের কিন্বা ইচ্ছা বদলে যেতে পারে। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের দামের মধ্যে যা তফাৎ বা ব্যবসায়ীর লাভে যা তফাৎ তাকে সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের দাম বলে ধরা যায় না। আমরা আগেই বলেছি, যে-কোন পরিমাণ উপকরণ যদি নানা ব্যবহারে লাগান যায়, তা হ'লে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হ'লে সেই উপকরণসমষ্টি থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়। এখন সমাজের যে পরিমাণ উপকরণ আছে (প্রাকৃতিক উপকরণ, শ্রমশক্তি ও মূলধন), তা নানা ব্যবসায় লাগে। সামাজিক আয় সর্বাপেক্ষা বেশী হবে যদি সব ব্যবসায় উপকরণ ব্যবহারে সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ সমান হয়; ব্যবসায়গত নেট লাভ নয়, সামাজিক নেট লাভ। কেননা, ডাকাতিতে শ্রমশক্তি ও মূলধন (বন্দুক, ছুরি, ছোরা, লাঠি, সড়কি, নোকা, ঘোড়া, ইত্যাদি) ব্যবহার করলে ব্যবসায়গত নেট লাভ অর্থাৎ ডাকাতিদের লাভ খুবই বেশী, কিন্তু সামাজিক লাভ বা আয়বৃদ্ধি তাতে কিছুই হয় না; বরং ডাকাতিতে ধনক্ষয় হ'তে পারে এবং সম্ভোগ অনিশ্চিত হওয়ায় লোকের ধন উৎপাদনের ইচ্ছা কমে' যেতে পারে। সমাজে যদি শুধু একপ্রকারই ভোগ্য উৎপাদিত হত, অর্থাৎ সামাজিক আয় মানে যদি ভোগ্য-বিশেষের কোন পরিমাণ হত, এবং নানা উপায়ে যদি সেই একই ভোগ্যটি উৎপাদিত হ'ত, তা হ'লে যদি কোন উপায়বিশেষে উপকরণ ব্যবহৃত হলে সীমাস্থিত নেট উৎপাদন অন্ত সব উপায় অপেক্ষা দশগুণ হত, তবে অন্ত উপায়ে উপকরণ ব্যবহার না ক'রে যতক্ষণ পর্যন্ত এই উপায়ে ব্যবহার ক'রে সীমাস্থিত নেট উৎপাদন অন্ত উপায়ের সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের সমান হয় ততক্ষণ সামাজিক আয় বেড়ে চলত। কাজেই দেখা যাচ্ছে নানা ব্যবসায়ের অসমান সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ হ'লে, উপকরণ স্থান পরিবর্তন (অর্থাৎ ভিন্ন ব্যবসায় লাগলে) করলে, সামাজিক আয় বাড়বে। অবশ্য ধরে' নেওয়া হচ্ছে, যে, এই স্থান পরিবর্তন বা ব্যবসায় পরি-

বর্তনের জন্য কোন সামাজিক ক্ষতি হয় না; কিন্তু আসলে উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তন করলে তাতে ক্ষতি আছে। যেমন, শ্রমশক্তি বা শ্রমজীবীকে যদি অন্ত ব্যবসায় লাগবার জন্য আগ্রা থেকে মাদ্রাজ যেতে হয় তা হ'লে যাবার খরচ ত আছেই, যাত্রাপথে বিনা কাজে সময় নষ্ট আছে, ব্যবসায় পরিবর্তনে অভ্যাস পরিবর্তন করতে হ'লে কর্মকুশলতার হানি আছে, নিজ বাসভূমি ছেড়ে গেলে সামাজিক ও আর্থিক সম্বন্ধ (যেমন দোকান চেনা থাকার ফলে ধার পাওয়া, বা পথ ঘাট জঙ্গল জানা থাকায় বিনা পয়সায় উত্তরের কাঠ কুড়িয়ে আনা ইত্যাদি) বিচ্ছেদের ফলে ক্ষতি ইত্যাদি আছে। অথবা জমিতে নূতনরকম ফসল লাগাবার জন্য খরচ নানাপ্রকার হ'তে পারে, বা নূতন কার্যে অনভ্যাসের ফলে কার্যকরী শক্তি কমে' যেতে পারে ইত্যাদি। রেল-লাইনের লোহা খুলে' এনে' অন্ত কাজে লাগালে প্রথমতঃ রেল লাইন বসাতে যে শক্তি খরচ হয়েছিল তার অপচয় হয় এবং নূতন ব্যবহারে লাগাতে গিয়ে লোহাও কিছু নষ্ট হ'তে পারে; দ্বিতীয়তঃ লোহা ব'য়ে অন্ত নিয়ে যেতে খরচ আছে, ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে, উপকরণকে এক ব্যবসায় থেকে আর-এক ব্যবসায় লাগাতে খরচ আছে।

ক এবং খ এই দুই ব্যবসায় (বা একই ব্যবসায় ভিন্ন স্থানে) উপকরণ ব্যবহারে যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক নেট লাভ (অর্থাৎ সীমাস্থিত মাত্রা থেকে বাৎসরিক যা নেট আয় বা লাভ হয়) বিভিন্ন-রকম হয়, ক থেকে খ-এ যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক নেটলাভ গ পরিমাণ বেশী হয়, এবং যতটা উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তন করলে দুই ব্যবসাতেই (বা স্থানে) সীমাস্থিত বাৎসরিক নেট লাভ সমান হয়, ততটা উপকরণ ক থেকে খ-এ নিয়ে যেতে যদি খরচ হয় ঘ এবং ঘ কে এই কার্যে না লাগিয়ে অন্ত-ভাবে ব্যবহার করলে এর থেকে যদি বাৎসরিক আয় হয় ঙ, তা হ'লে গ, ঙ অপেক্ষা বেশী না হ'লে উপকরণকে ব্যবসা বদলি করে' লাভ নেই। গ, ঙ অপেক্ষা কম হ'লে এরকম স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তনে ক্ষতি হ'বে। কাজেই দেখছি, যে স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তনের খরচ যা হয়, তার বাৎসরিক পরিমাণ (কেননা উপকরণ ব্যবহারেরও

বাৎসরিক আয় যা হয়, তাই সামাজিক আয়ে ধরা হয় অর্থাৎ সাধারণভাবে যত টাকা খরচ হয় তার বাজার দরে যা স্ফূট হয় তাই,) এবং ব্যবসায়গুলির সীমাহিত বাৎসরিক নেট আয় বা লাভ তুলনা করে' দেখে' তবে উপকরণ নিয়ে টানাটানি করা উচিত। এবং এই খরচের অস্তিত্বের জন্য সীমাহিত নেট লাভ নানা ব্যবসায়ের সব সময় বিভিন্ন থাকে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে সকল ব্যবসায়ের সীমাহিত সামাজিক নেট লাভ সমান হ'লে বা খরচের কথা মনে করে' সমানের দিকে যতদূর সম্ভব গেলে সামাজিক আয় ও স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে বেশী হ'বে। যে-সব কারণ উৎপাদনের উপকরণগুলিকে অচল বা বহুকষ্টে সচল করে' রাখে, সেগুলি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায়। কোন ব্যবসায়ের লাভ কিরকম তা জানতে হ'লে শিক্ষার দরকার, বেশী লাভের জায়গায় উপকরণ পাঠাতে হ'লে (শ্রমজীবীর ক্ষেত্রে, নিজে যেতে হ'লে) সাহস ও আত্মনির্ভরশীলতার দরকার। সচলতার পথে বিঘ্ন আরও অনেক কিছু আছে; যেমন শীঘ্র গমনের সুবিধার অভাব, ভাষার অন্তরায়, এ খাব না, সে খাব না বলা, নূতন অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অল্প স্থান ও ব্যবসায় সম্বন্ধে বেশী মাত্রায় সন্দেহ থাকা, ভাল আইনের অভাব (যেমন জমি হাত বদলাতে পারে না ইত্যাদি) ইত্যাদি। এইসব অন্তরায় দূর করা দরকার এবং সহায়গুলি জোগাড় করা দরকার। তা ছাড়া সামাজিক সম্পত্তি ঠিকভাবে ব্যবহার করা অসম্ভব। এ-ক্ষেত্রে আবার ভুল শিক্ষার বিপদ অনেক। যেমন, মাস্কাজে বেশী মাইনে পাবে বলে' কোন শ্রমজীবী আগ্রা থেকে মাস্কাজে যেতে পারে, কিন্তু তার আসা একটা ভুল ধরনের উপর গড়া হ'তে পারে। ফলে পুনরাগমন এবং যাতায়াতের খরচ ও সময় নষ্ট। কেউ মূলধন ভুল ব্যবসায়ের ফেলে', জুয়াচোরদের লাভ বাড়িয়ে দিতে পারেন। কেউ ছদ্মবেশে মেতে মরুভূমিতে পাটের চাষ শুরু করতে পারেন; আবার কেউ জলাভূমিতে চা বাগান করার চেষ্টা করতে পারেন। এ সবই সামাজিক সম্পত্তির অপচয়। কোন্ ব্যবসায়ের কিরকম লাভ হয়

তা জানাও শক্ত। যৌথ কারবারে লাভ অবশ্য সাধারণত কতকটা বুঝতে পারে, কিন্তু আসল মূলধন যত টাকা এবং শেয়ার যত টাকার ছাপা হয়, তাতে অনেক সময়ই বিশেষ তফাৎ থাকে। যেমন কেউ ১০০ টাকার শেয়ার ছাপালে ১ লক্ষ; অর্থাৎ $১০০,০০০ \times ১০০ = ১০০০০০০০$, কোটি টাকার কাগজ বেরল। তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার গেল যারা কোম্পানী ফাঁদলেন তাঁদের পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ। ১০ লক্ষ গেল যারা শেয়ার বাজারে বিক্রি করবেন তাঁদের কমিশনরূপে ইত্যাদি। কাজেই শেষ অবধি কোম্পানীর আসল মূলধন হয়ত দাঁড়াল ৭৫ লক্ষ অথবা ৫০ লক্ষ মাত্র। এখন বাৎসরিক লভ্যাংশ হ'ল শতকরা ১০ টাকা অর্থাৎ ১ লক্ষ ১০০ টাকার শেয়ারে লাভ দেওয়া হ'ল $১০০০০০ \times ১০ = ১০,০০০০০$ টাকা। এটা আসলে ৭৫ লক্ষের অথবা ৫০ লক্ষের উপর লাভ অর্থাৎ আসলে লাভের হার এই কোম্পানীর হচ্ছে শতকরা ১৩ টাকা ৫৩ আনা কিম্বা ২০ টাকা। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য লোকে ঐ কোম্পানীর লাভের হার কমই ভাববে এবং সামাজিক মূলধনের যতটা ঐ ব্যবসায়ের যাওয়া উচিত, তা যাবে না। এ ছাড়া আরও নানা উপায়ে ঠিক লাভের হার চেপে রাখা হয়। তার উপরে সাধারণ ব্যক্তিগত কারবারের লাভ ত কেউ জানতেই পায় না। কোন্ ব্যবসায়ের লাভ কিপ্রকার, এ বিষয়ে আরও জ্ঞান বিস্তার করার সুবিধা হ'লে সামাজিক আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নানা ব্যবসায়ের সীমাহিত নেট লাভ অসমান থাকার আর-একটি কারণ উপকরণের এককের আয়তন বৃদ্ধি (Imperfect divisibility or largeness of the unit of any resource)। মূলধন দিয়ে এটা বোঝা সহজ। ধরুন মূলধনের একক যদি ১০০০ টাকা হয়, অর্থাৎ ১০০০ টাকার কম বা এক হাজারের ভগ্নাংশ কেউ যদি কিছুতে না দিতে পারে, তা হ'লে ১০০০ হাজার টাকার কম মূলধন স্থান পরিবর্তন করলে যদি সামাজিক লাভের আশা থাকে, ত সে পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। যৌথ কারবারে সামাজিক লাভ হয় এই জন্য, যে, খুব অল্পপরিমাণ

মূলধনও ইচ্ছা-মত এক ব্যবসায় থেকে অন্য বা যে-কোন ব্যবসায়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে ১০০ টাকার শেয়ারও হুলু নয়। যদি ১০০০ টাকার কম কেউ কোন ব্যবসায় ফেলতে না পারত তা হ'লে সামাজিক মূলধনের অনেকাংশ নিষ্কর্ষ্য হয়ে পড়ে' থাকত। শ্রম-শক্তির একক হচ্ছে বেশীর ভাগ স্থলে ব্যক্তি অর্থাৎ একজন লোক। আধজন লোক ত আর শ্রমশক্তি সরবরাহ করতে পারে না, কাজেই এর চেয়ে কম আয়তন শ্রমশক্তির একক হ'তে পারে না। কিন্তু যদি কোথাও একদল লোকের কম লোক কোন কাজে না লাগান যায়, লাগাবার জগ্রে পাওয়া না যায়, তা হ'লে শ্রমশক্তির একক ব্যক্তিসংঘ হ'য়ে দাঁড়ায়। যেমন, যদি শ্রমজীবী তার পরিবার ছাড়া নড়তে না চায়, তা হ'লে যে ক্ষেত্রে একজন মাত্র বেশী লোক নিয়োগ করে' উৎপাদন বাড়ান যায়, সে ক্ষেত্রে সে উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হবে না। এ ছাড়া যদি একক মিশ্র হয়, অর্থাৎ মূলধন, মানুষ ও প্রকৃতি যদি আলাদা আলাদা পাওয়া না যায়, শুধু সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায়, তা হ'লে যেখানে **শুধু**

মূলধন বাড়িয়ে লাভ হয় বা **শুধু শ্রমশক্তি** বাড়িয়ে লাভ হয়, ইত্যাদি, সে-সব স্থলে লাভের পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। যেমন, শ্রমজীবী যদি বলে, আমার টাকা খাটাবার সুযোগ না দিলে আমি কাজ করব না, বা মহাজন যদি বলে, আমার জমি চাষ না করলে টাকা ধার দেব না, বা শুধু মূলধন দিতে রাজি এমন লোককে যদি বলা হয় যে ব্যবসায় লাভ-লোকসানের দায়িত্বও তোমায় নিতে হবে, তা হ'লে কোন স্থলেই সুবিধা-মত কাজ হ'বে না। আজকাল অনেক যৌথ কারবার এমন-ভাবে অনেক শেয়ার বার করে, যে, নানা-শ্রেণীর শেয়ার-ক্রেতাকে নানা-পরিমাণ লাভ-লোকসানের দায়িত্ব নিতে হয়। এইসব স্থলে কোম্পানীর কোন শেয়ার-লভ্যাংশ সবার আগে পায়, কোন শ্রেণীর শেয়ারের শতকরা একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ ঠিক করা হয় এবং সেই সুদ না দিয়ে কোম্পানী আর কিছুতে লাভের টাকা ব্যবহার করতে পারে না, অথবা ঠিক সময় সুদ না দিলে কোম্পানী ফেল হ'য়ে যায় এবং আদালতে

সর্বাগ্রে বা অন্য শেয়ার-ক্রেতার অগ্রে প্রথমোক্ত শ্রেণীর শেয়ার-ক্রেতাদের দাবী গ্রাহ্য হয়, ইত্যাদি। গভর্নমেন্ট টাকা ধার করার সময় শুধু মূলধনই নেয়, দায়িত্ব কারুর ক্ষেত্রে চাপাতে চায় না। অনেক রেল কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট অনেক সময় নিজে দায়িত্ব নেয়। দায়িত্বভার গ্রহণ ও মূলধন সরবরাহের মধ্যে তফাৎ আছে বলে' অনেকে দায়িত্বভার গ্রহণকে সামাজিক আয় উৎপাদনের চতুর্থ উপকরণ বলেন। (uncertainty-bearing) লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে এবং ব্যাঙ্ক তাদের সুদ দেয়। এ-ক্ষেত্রে বড় বড় ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে যারা কারবার করেন, তাঁরা শুধু মূলধনই দেন। অবশ্য বেশী সুদে অনেক অজানা, কমজানা, নূতন ও খ্যাতিহীন ব্যাঙ্ক টাকা নেয় এবং সে-ক্ষেত্রে টাকা যে দেয়, সে ব্যাঙ্কের স্থিরতার ও ব্যবসায়ের দায়িত্বও কিছু নেয়। ব্যাঙ্ক আবার অনেক স্থলে টাকা অপরকে দেয় এবং অল্পকালের (অনেক ব্যাঙ্ক বেশী-কালের জগ্রেও) জগ্রে হ'লেও নানা ব্যবসায়ের দায়িত্বের অংশ ঘাড়ে করে। ব্যাঙ্ক মূলধন সচল করে, এবং শুধু মূলধন যারা সরবরাহ করতে রাজি, তাদের কাছ থেকে মূলধনই শুধু নেয়। তার পর নিজের দায়িত্বে টাকা অপরকে দেয়। এদিক থেকে ব্যাঙ্ক-এর একটা খুব বেশী সামাজিক মূল্য আছে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে, ব্যবসায় সম্বন্ধে সঠিক খবর বিস্তার করা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল করা ও অমিশ্র ও অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হবার সুবিধা দেওয়ার উপর সামাজিক আয় অনেকটা নির্ভর করে। আর দেখা যাচ্ছে, যে, চলাচল যত সহজে হয়, ততই সীমাহিত নেট লাভ সব ব্যবসায়ের সমান হওয়ার সম্ভাবনা। এবং এই সমতা যত বেশী পাওয়া যাবে, অন্ত-সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, (অর্থাৎ পরোকভাবে ও সামাজিক, আয়, আয়ের উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষত থাকলে,) সামাজিক আয় ততই বেশী হবে। সামাজিক নেট লাভ ও ব্যবসায়গত নেট লাভে তফাৎ আছে আগেই বলা হয়েছে। যে-ব্যবসায়ের বেশী লাভ, মানুষ সেই দিকেই যাবে। এই দিক থেকে বর্ণাশ্রমধর্ম সামাজিক

উপকরণের একাংশের শ্রেষ্ঠ বিভাগের পথে একটি অন্তরায়। অনেক স্থলে অল্প কাজে শ্রমশক্তি লাগালে সামাজিক আয় বাড়লেও, শ্রমজীবী নিজের জাতের কাজ ছাড়তে চায় না; কারণ তার জাতে বিশ্বাস বা সামাজিক উৎপীড়নের ভয় আছে। মূলধনের সহজ গতিবিধিও ঐ কারণে আটকাতে পারে। ব্রাহ্মণ তার মূলধন চামড়ার ব্যবসায় না লাগাতে চাইতে পারে এবং তাতে সীমাস্থিত ব্যবসায়গত নেট লাভ সব ব্যবসায় সততার দিকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে সামাজিক আয় সবচেয়ে বেশী হবার সম্ভাবনা থাকত যদি সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ, সীমাস্থিত ব্যবসায়গত নেট লাভের সমান হ'ত। ঐ দুই যতই পৃথক হবে, ব্যক্তির আত্মস্ববিধাবোধের সাহায্যে সামাজিক উপকরণগুলির নানান ব্যবসায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভাগও ততই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে।

অনেক ব্যবসায় বা কাজ আছে, যাতে ব্যবসায়গত লাভ সামাজিক লাভের চেয়ে কম। আবার অনেক কাজ বা ব্যবসায় আছে যাতে ব্যবসায়গত লাভই বেশী। যদি কেউ কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে তা হ'লে অপরে তার সাহায্যে লাভ করে' নেবে এবং ফলে সামাজিক লাভ ব্যবসায়গত লাভ অপেক্ষা বেশী হবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি কিছু না করে, তা হ'লে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে লোকে মন দেবে কম। ফেননা কাজের ফসল অল্পের ভোগে গেলেও কাজ করবে শুধু সাধু ও সন্ন্যাসীরা এবং পৃথিবীতে তাঁদের সংখ্যা দুর্ভাগ্যক্রমে বড়ই কম। রাষ্ট্রীয় আইন অহুসারে নিজের আবিষ্কারে নিজের অধিকার বজায় রাখা যায় এবং উদ্ভাবনা পেটেন্ট করা যায় অর্থাৎ অল্পে ব্যবহার বা নকল করলে সে, হয় আবিষ্কারকে একটা লাভের অংশ দিতে বাধ্য হয়, নয় শাস্তি পায়। জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্তে চেষ্টা যে করে তার প্রজ্ঞাস্বত্ব যদি অল্পকাল স্থায়ী হয়, তা হ'লে তার চেষ্টার ফলভোগ অপরে অনেকটা করবে; এ-ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি তাকে তার জ্ঞাত্য অধিকার বজায় রাখতে সাহায্য না করে তা হ'লে অনেক ক্ষেত্রে জমির উর্বরতা বাড়া দূরে থাকুক, কমে' যাবে। অনেক দেশে

প্রজ্ঞাকে তাড়াবার সময় জমিদারকে জমির প্রজ্ঞাকৃত উন্নতির জন্য প্রজ্ঞার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। এরকম বন্দোবস্ত না থাকলে ব্যবসায়গত লাভ সামাজিক লাভের চেয়ে কম হ'য়ে যায় এবং সে ব্যবসায় লোকে যেতে চায় না। আবার অল্প অনেক ব্যবসায় (যেমন মদের ব্যবসায়) সামাজিক লাভ ব্যবসায়গত লাভের চেয়ে কম হয়। কাজেই রাষ্ট্র সেইসব ব্যবসায়ের পথে বাধা-স্বরূপ কর বসাতে পারেন অথবা তাদের লাভের অংশ নিয়ে সামাজিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্র যদি সে টাকা অপব্যয় করেন অর্থাৎ এমনভাবে ব্যয় করেন যাতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয় না তা হ'লে রাষ্ট্র কর্তব্য পালন করছেন বলা যায় না। অনেকের মতে কারখানার ধোঁয়ায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য হয় বলে' একটা চিমনি-কর বসান উচিত। সে-দিক থেকে দেখলে যে-সব ব্যবসায় নানা-ভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে, তাদের সবগুলিকেই বিশেষ করে' কর দিতে বাধ্য করা উচিত। এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাতে সামাজিক লাভ খুব হ'লেও ব্যবসায়গত লাভ কম। যেমন নূতন রেল-লাইন, (যাকে অবলম্বন করে' নূতন জায়গায় লোকে বসবাস করতে যাবে, বা ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করবে) ডাকের বন্দোবস্ত, জল-সরবরাহ, সহরের ও দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি। এসব কাজ বেশীর ভাগ সময় রাষ্ট্রকে করতে হয় বা অল্পে রাষ্ট্রের সাহায্যে করে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-বর্ধনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কি কি বিষয়ে থাকা দরকার তার আলোচনা অল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সম্ভব না হ'লেও এখানে একটা বিষয়ে কিছু বলা দরকার। অনেক সময় কোন-একটা ব্যবসায় একজন বা অল্প কয়েক জন মাত্র ব্যবসাদারের হাতে এসে পড়ে, অর্থাৎ সেই ব্যবসায় দ্বারা উৎপাদিত ভোগ্য শুধু ঐ কয়েক জনই সরবরাহ করবে এমন অবস্থা দাঁড়ায়। আমরা জানি বাজারে খুব বেশী মাল ছাড়লে দর সাধারণতঃ কম পাওয়া যায়। কাজেই শুধু অল্প কয়েক জনের বা একজনের হাতে মালবিশেষ সরবরাহের ভার থাকলে, যে-পরিমাণ মাল বিক্রি করলে মাল প্রস্তুতের খরচের তুলনায় সবচেয়ে বেশী দর পাওয়া

যায় শুধু সেই-পরিমাণ মালই তারা তৈরী করবে। তাতে সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ অল্প ব্যবসায়ের চেয়ে সাধারণতঃ টের বেশী থাকবে। অর্থাৎ চেষ্টা করে' কম মাল বাজারে ছেড়ে কোন ব্যক্তির বা কয়েক ব্যক্তির লাভ হবে বটে কিন্তু সামাজিক উৎপাদন শক্তি ঠিক যে অল্পপাতে সব ব্যবসায়ের মধ্যে বিভক্ত হ'লে সামাজিক আয় সব-চেয়ে বেশী হ'ত তা হবে না। এই জাতীয় অবস্থাকে ব্যবসায়ে একাধিকার (monopoly) বলা যায়। এই একাধিকার সম্পূর্ণ হ'তে পারে অথবা অসম্পূর্ণ হ'তে পারে। কোন ভোগ্যের সরবরাহ যদি সম্পূর্ণরূপে কোন ব্যক্তি বা সংঘের উপর নির্ভর করে তা হ'লে তাকে সম্পূর্ণ একাধিকার বলা যায়; আবার যদি সেই ভোগ্যের সরবরাহের এমন একটা অংশ মাত্র কোনো ব্যক্তি বা সংঘের হাতে থাকে যে অংশ কমিয়ে বাড়িয়ে বাজার দর বাড়ান কমান যায়, তা হ'লে সে ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ একাধিকার আছে বলা যায়। যেমন, কারুর হাতে সমস্ত সরবরাহের অর্ধেক যদি থাকে তা হ'লে নিজের অংশের পরিমাণ শতকরা ২৫ পরিবর্তন করলে সমস্ত সরবরাহের শতকরা ১২।০ পরিবর্তন হবে। তার ফলে যদি একক প্রতি (per unit) নেট লাভ ১ থেকে বেড়ে ১। হ'য়ে যায়, তা হ'লে ঐরকম করে' সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে সরবরাহকারীর লাভ আছে। কেননা, আগে ১০০ খণ্ডে যদি ১০০ নেট লাভ হ'ত, এখন ৭৫ খণ্ডে ৭৫ × ১। = ১১২।০ হয়। এ গেল ব্যবসাগত লাভ; তা ছাড়া আর একটা দিক আছে। সামাজিক শক্তি ঐ ব্যবসায়ে যদি অবাধে ব্যবহৃত হ'তে না পারে তা হ'লে অল্প লাভের ব্যবসায়ে সেই শক্তি ব্যবহৃত হবে। ফলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য যতটা হওয়া উচিত তা হবে না। কি উপায়ে কোন কোন ব্যবসায়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ-বিশেষ একাধিকার স্থাপন করে, তা ভাল করে' বলবার স্থান নেই; কিন্তু মোটা-মুটি বলা যায় যে সাধারণত কারু-বারের আয়তন ক্রমশঃ বাড়িয়ে বা অপরের সঙ্গে কারুবার মিলিয়ে সমস্ত বা অধিকাংশ সরবরাহ লোকে আয়ত্বাধীন করে'। যেসব দ্রব্যের ব্যবহার মূল্যবৃদ্ধি হ'লেও বেশী কমে না, (যেমন মুন, চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাদি অবশ-

প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি) সেগুলির সরবরাহে একাধিকার হ'লে সরবরাহের পরিমাণ না কমিয়েই যথেষ্ট দাম ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করা যায়। অনেক সময় এক বা কয়েক-জন মূলধনী লোক (Capitalist) বাজারের সব মাল কিনে' ফেলে, বিক্রি করা না করা নিজের বা নিজেরদের হাতে এনে ফেলে অর্থাৎ Corner করে। তখন তারা যা খুসি দাম আদায় করে। এতে সাধারণ লোক ও ভবিষ্যৎ সরবরাহের কনট্রোলধারীরাই (যারা একটা নির্দিষ্ট দরে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন জিনিষের একটা নির্দিষ্ট-পরিমাণ সরবরাহ করার দায়িত্ব নেয়) বেশীর ভাগ ক্ষয় হয়! এইজাতীয় আরও নানাপ্রকার ক্ষতিজনক একাধিকারের (injurious monopolyর) উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু একাধিকার থাকলেই যে তা অনিষ্টজনক হবে এমন কথা নেই। অনেক ব্যবসায়ে যতই কারুবারের আয়তন বাড়ান যায় ততই উৎপাদন সহজ হ'য়ে আসে। (এইসব ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বিলীয়মান খরচের নিয়ম অথবা increasing returns কার্যকর-ভাবে দেখা যায়।) এমন ব্যবসায়ে যদি (খরচের তুলনায়) গায়া দামে জিনিষ বিক্রয় করা হয় তা হ'লে সামাজিক লাভ বই ক্ষতি হবে না।

বৃহদায়তন কারুবারের গুণ অনেক। প্রথমেই দেখছি শ্রমবিভাগ ও তার ফলে কর্মপটুতার বৃদ্ধি। একটা কারুবারে যদি বোতল তৈরী হয় এবং সব লোকই যদি কাচ গলান থেকে শুরু করে' ঝুড়িতে বোতল রাখা অবধি সব-কিছু করতে থাকে তা হ'লে যত সহজে কাজ হবে এবং ঘণ্টায় যত বোতল তৈরী হবে তার চেয়ে অনেক বেশী হবে যদি কেউ শুধু চুল্লি ঠিক রাখে এবং কেউ গলান কাচ বের করে' আনে আর কেউ ফুঁ দিয়ে বোতলকে আকৃতি দেয়, ইত্যাদি। এতে একই কাজ ক্রমাগত করার ফলে সেই কাজটুকু করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং নানা কাজ করলে যে ক্রমাগত মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়, সেটি না হওয়ায় শ্রমলাঘবও হয়।

নানা ব্যবসায়ে কার্য বা শ্রমবিভাগ নানা প্রকার হ'তে পারে। কোন কোন কাজে খুব বেশী হ'তে পারে; যেমন যেসব জিনিষ নানা জিনিষ বা খণ্ড জুড়ে'

তৈরী হয়। (বেশীর ভাগ কল, যন্ত্র ইত্যাদি) এতে খণ্ডগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ও উপকরণের তৈরী করা স্থির করে' এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈরী করে', এক জায়গায় জুড়ে' কাজ অনেক কম খরচে করা সম্ভব হয়। যেমন সস্তার ঘড়ির অংশগুলি অনেক সময় আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হ'য়ে সুইজারল্যাণ্ডে আসে এবং সেখানে সেগুলিকে একত্র সংযুক্ত করে' ঘড়ি তৈরী হয়। বৃহৎ কারখানার গুণ আলোচনা বিশদভাবে হওয়া অল্পস্থানে সম্ভব নয়, কাজেই এখন তার দুই একটি দোষ বলা যাক। প্রধান দোষ হচ্ছে ব্যবসায়বুদ্ধি বা সাধারণভাবে কার্যদক্ষতা নষ্ট হ'য়ে যাওয়া। বৃহৎ কারখানায় কাজ করা যন্ত্রের মত কাজ করা। তাতে সাধারণ ক্ষমতাগুলি নষ্ট হ'য়ে যায়। যা বলে তাই করে' নিজে ভেবে কাজ করার ক্ষমতা চলে' যায়। কাজেই এর ফলে সময়ে সামাজিক ক্ষতি হ'তে পারে। তার চেয়ে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ কম হ'লেও ছোট ছোট কারখানার সমাজের কর্মকুশল লোকের সংখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখে বলে' তার সামাজিক মূল্য বেশী।

কিন্তু ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষালয় স্থাপন করে' অনেক সময় সে অভাব দূর হয়। এটা রাষ্ট্রের কাজ। তার পর নির্দিষ্ট মাপ ও উৎকর্ষের দ্রব্য উৎপাদন করলে এবং প্রত্যেক অংশের জগ্ন যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করলে অনেক সময় দ্রব্যের ব্যবহার্যতার দিক দিয়ে উন্নতির দিকে নজর থাকে না। তবে অনেক জিনিষের একরূপ উন্নতির আশা খুবই কম (যেমন ক্রু, বোর্ট, নাট, ইত্যাদি) এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনেকটা সকলকে উন্নতির দিকে নজর রাখতে বাধ্য করে। তার পর যেমন অল্প ক্ষেত্রে কর্মবিভাগ হয় তেমনি জিনিষের উন্নতি কিসে হয় তা দেখবার জগ্নেও বিশেষজ্ঞ লোককে মাইনে দিয়ে রাখা হয় ও রাখা সম্ভব। এতে হয়ত শেষ অবধি লাভ খুবই বেশীই হয়। অতঃপর আমবা শ্রমজীবী ও মূলধনজীবী সম্বন্ধে কিছু বলে' শেষ করতে চাই। মূলধন যে সংরক্ষিত শ্রমের ফলমাত্র, তা আগেই বলা হয়েছে। মূলধন বিনা উৎপাদন যে প্রায় অসম্ভব, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

রাজপথ

: (১২)

পাঁচ মিনিট পরে সুরেশ্বর ফিরিয়া আসিল, এক হস্তে একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন এবং অপর হস্তে এক গ্লাস জল।

মিষ্টান্নের রেকাব দেখিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, “তৃষ্ণার্ক্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল! এ যে তাই হ'ল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টান্ন কোনো হিসাবেই আসতে পারে না।”

মিষ্টান্নের রেকাব ও জলের গ্লাস বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “তা আসতে পারে। ‘জল’ শব্দটা আমাদের বাংলাদেশে ততই সরল নয়, একটু জটিল। তাই জল খাচ্ছি মুখে

বললেও অনেক সময়েই আমরা সন্দেহ-রসগোল্লা খেয়ে থাকি। এমন কি কোনো কোনো জল-খাবারের দোকানে জল একেবারেই পাওয়া যায় না, শুধু খাবারই পাওয়া যায়। জলযোগ কথাটার মনো খাবার কথাটার কোনও যোগ না থাকলেও খাবারটাই তার প্রধান উপকরণ।”

বিমানবিহারী বলিল, “কিন্তু তৃষ্ণার্ক্ত হ'য়ে জল চাইলে তাড়াতাড়ি আধখানা বেল নিয়ে আসবার কোনও কারণ থাকে না। আমি গ্লাসটাই চেয়েছিলাম, রেকাবটা চাইনি। রেকাবটা ক্ষুধার আর গ্লাসটা তৃষ্ণার পরিচায়ক। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুটো পৃথক জিনিস, তা মান কিনা?”

দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা দিয়া বাঁকা-ভাবে সূর্যের কিরণ আসিয়া বিমানবিহারীর গাত্রে পড়িতে-ছিল; জানালাটা একটু ভেজাইয়া দিয়া সুরেশ্বর বলিল,

“ক্ষুধা তৃষ্ণা পৃথক জিনিস তা মানি, কিন্তু দুটো প্রযত্ন নিবিড়ভাবে পাশাপাশি বাস করে যে, অনেক সময়ে উভয়কে পৃথক করা কঠিন হয়। কিন্তু আমি তু পৃথকভাবেই দুটো জিনিসের ব্যবস্থা করেছি, তোমার যেমন প্রয়োজন হয় গ্রহণ করতে পার।”

স্বরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল; বলিল, “তুমি ত বললে যেমন প্রয়োজন হয়; কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার চেয়েও যে প্রবল আর-এক জিনিস দেহের মধ্যে রয়েছে সে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা করে না, তার হিসাব করেছ কি?”

স্বরেশ্বর হাসিয়া বলিল, “লোভের কথা বলছ ত? কিন্তু লোভ ত দেহে থাকে না, মনে থাকে।”

“যেখানেই থাক—উপস্থিত আমি তার কাছে হার মান্লাম।” বলিয়া বিমানবিহারী মিষ্টান্নের খালাস টানিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিয়া দিল। এবং সেই অবসরে স্বরেশ্বর তাহার ইংরেজী প্রবন্ধের পক্ষ ইত্যাদি বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিল।

তোমরা ত আজকাল নানারকম শক্তির সাধনা করছ স্বরেশ্বর, এই মনোবিহারী লোভের হাত থেকে কি করে’ রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বল।” বলিয়া বিমানবিহারী আহার বন্ধ করিয়া জামাটা লইতে হাত বাড়াইল।

স্বরেশ্বর বিমানবিহারীর উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, “একটা উপায় হচ্ছে লোভের বস্তক দৃষ্টির অন্তরালে নিক্ষেপ করা। ও-দুটো সন্দেশ খেতে ফেলো, ফেলে রেখো না। পড়ে’ থাকলেই লোভটাকে জগিয়ে রাখবে।”

নিরুপায় হইয়া একটা সন্দেশ তুলিয়া এই বিমানবিহারী বলিল, “কিন্তু শাস্ত বলছে লোভে পাপ।

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “কিন্তু পাপের বান শক্তি থাকলে পাপে মৃত্যু হবে না। দেখছ না আজকাল পরিপাক করবার দিন পড়েছে। পাহাড়-পর্বত নদ-নদী দেশ-প্রদেশ পরিপাক হ’য়ে যাচ্ছে, আর তুমি চিনি আর ছানার নরম দুটো সন্দেশ পরিপাক করতে পারবে না! লোভ বর্জন করবার তুমি উপায় খুঁজছ,

কিন্তু লোভটা এখনকার সভ্য সমাজে আর হয় বস্তু নয়। আজকালকার মতে লোভ হচ্ছে লাভের প্রবর্তক হেতু।”

“সবে লোভের দ্বারা লাভই করা যাক। কিন্তু অজীর্ণ হ’লে তুমি দায়ী।” বলিয়া বিমানবিহারী অবশিষ্ট সন্দেশটাও তুলিয়া লইল।

স্বরেশ্বর বলিল, “অজীর্ণের অবস্থা উপস্থিত হ’লে অপাচ্য অংশটা উদ্দিগরণ করে’ দিয়ো, তা হ’লে স্বাস্থ্যও নষ্ট হবে না, যশও অর্জন করবে। ত্যাগের মহিমায় গ্রহণের কামিমা ঢাকা পড়ে’ যাবে।”

স্বরেশ্বর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, “সভ্যসমাজকে তুমি একটু বিশেষ রকম চিনেছ, স্বরেশ্বর।”

“আমি চিনেছি বলে’ যদি তোমার বিশ্বাস হ’য়ে থাকে তা হ’লে তোমারও চিন্তে বাকি নেই।” বলিয়া স্বরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

আহার সমাপন করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিমানবিহারী স্বরেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া বসিল। জানালা দিয়া স্বরেশ্বরের অংশ দেখা যাইতেছিল। দুই বন্ধু ক্ষণকাল পরস্পর চোখ-চলচলের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া বসিল।

স্বরেশ্বর উদ্ভ্রাণ করিল বিমানবিহারী। বলিল, “একটা সন্দেশ তোমার মাঝ সমস্ত সরঞ্জাম সুমিত্রা তোমার কাছে রাখলে তুমি তার কাছে এসে শুধু চাইলেই হবে। চরকাটা তিনটা একত্রে সুভাষে চাইলেই পাওয়া যায় তা আমি ভাবতে পার না।” বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

স্বরেশ্বর সম্মুখে বলিল, “কিন্তু চাও’ জিনিসটাই যে সুলভ নয়, অর্থাৎ সহজ নয়। যতদূর যে চাওয়া, তার মতো জিনিস শক্তি আছে যে, পাওয়ারই সেটা নামান্তর। ইংরেজী Command শব্দটার মধ্যে যে কল্পনাটুকু আছে তা আমার বেশ ভাল লাগে। চাইতে জানলে খুঁজতে বন্ধু দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়।”

বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, “অজীর্ণ বস্তু দ্বারের কাছে হাজির হ’লে ভালই হ’ত, তা হ’লে আর বইন

কব্জার জন্তে আমাকে তোমার ঘারে হাজির হ'তে হ'ত না।”

স্বরেশ্বর বলিল, “অভীষ্ট বস্তু সন্তুষ্ট্য এতকণ স্থমিত্রার ঘারে হাজির হয়েছে; কিন্তু তুমি যে আমার ঘারে এসে হাজির হয়েছে, তা হয়ত তুমি আমার অভীষ্ট বস্তু বলে।” বলিয়া স্বরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, “আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু কিনা সে বিচার পরে করব; কিন্তু তুমি স্থমিত্রাকে চরকা পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি?”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ ব'ন, অর্থাৎ বহন করান। তুমি ভাগ্যবান্, তোমার বোঝা অপরে বহন করে' নিয়ে গেছে। অতএব তোমার আর কোন ভয় নেই, তোমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাকবে।”

স্বরেশ্বরের পরিহাসের প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া বিমানবিহারী সবিস্ময়ে কহিল, “কাকে দিয়ে চরকা পাঠিয়েছ?”

স্বরেশ্বর কহিল, “কাকে দিয়ে পাঠিয়েছি তা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পাঠিয়েছি তা ঠিক।”

এ-সংবাদে বিমানবিহারী বিশেষ আনন্দিত হইল না। স্থমিত্রার মনস্তপ্তির জন্ত যে-কাণ্ডের ভার সে শেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা সম্পাদন করিলে না পারায় সে মনে-মনে ঈষৎ দুঃখিত হইল। স্বরেশ্বরের আবির্ভাবের পর হইতে স্থমিত্রার চিত্তের পাতল হইয়া, ক্রমে ক্রমে একটু বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা বিমানবিহারীর অপরিজ্ঞাত হিঁসে তাহা জানা নাই। পূর্বে প্রধানতঃ যে জিনিসটা, অর্থাৎ ডেপুটিগিরি লকলকে, মায় স্থমিত্রাকে মুগ্ধ করিত, এখন তাহাই স্থমিত্রার নিকট একটা অপকর্ষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহাও বিমানবিহারী নিঃসংগে বুঝিয়াছিল। অপ্রতি-
হৃত স্পিগতির জন্ত তড়িৎ যেমন স্বল্পতম প্রতি-
রোধের রেখায় নিজেকে প্রবর্তিত করে, অভীষ্ট-
স্বার্থের অভিপ্রায়ে বিমানবিহারীও তেমনি অবিরোধের
পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্থমিত্রার মনের
গতির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, অগ্রসর

হওয়া যে কঠিন তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই চাকরী এবং চরকার সংস্কার পরস্পর বিসংবাদী হইলেও সে স্থমিত্রার অসুরোধে স্বরেশ্বরের নিকট হইতে চরকা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি যে ইতিপূর্বেই স্বরেশ্বর স্থমিত্রাকে চরকা পাঠাইয়া দিয়াছে তখন স্থমিত্রাকে সন্তুষ্ট করিবার এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে মনে-মনে ঈষৎ দুঃখিত হইল।

বিমানবিহারীর নিরুৎসাহ ভাব লক্ষ্য করিয়া স্বরেশ্বর বিস্ময়ের সহিত কহিল, “কিন্তু তুমি এত চিন্তিত হ'য়ে পড়লে কেন তা'ত বুঝতে পারছিনে! স্থমিত্রাকে চরকা পাঠান অন্ডায় হয়েছে কি?”

স্বরেশ্বরের কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বিমান তাড়াতাড়ি বলিল, “না, না, অন্ডায় হবে কেন? কখন তুমি পাঠাল তাই ভাবছি; স্থমিত্রা ত আজ সকালেই আমাকে প্রকার কথা বলেছে।”

স্বরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, কারণ আমি পাঠিয়েছি তোমার আসবার আধ ঘণ্টা আগে।”

একটা কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া লইয়া হাশ্চো-
দ্ভাসিত-মুখে বিমান কহিল, “তুমি বলছিলে স্বরেশ্বর,
আমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাকবে; কিন্তু আমি মনে
করছি কি জান? ডেপুটিগিরিতে ইস্তফা দেবো।”

স্বরেশ্বর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “ইস্তফা দেবে?
কেন বল ত?”

“এতকটা তোমারই জন্তে।”

“আমারই জন্তে? আমি ত কখন তোমাকে চাকরী
পাড়াতে অসুরোধ করিনি।”

বিমানবিহারী মাথা নাড়িয়া কহিল, “না তা কর-
নি; কিন্তু স্থমিত্রাকে তুমি যে-রকম তালিম করে'
তুলছ তাতে চাকরী রাখা আর চলবে না দেখছি।”
বলিয়া যুহু যুহু হাসিতে লাগিল।

স্বরেশ্বর ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, “আর-একটু
স্পষ্ট করে' না বললে বুঝতে পারছিনে।”

বিমানবিহারী সহাস্রমুখে কহিল, “প্রায় একবৎসর
থেকে একরকম স্থির হ'য়ে আছে যে স্থমিত্রার সঙ্গে আমার

বিয়ে হবে। কাল স্থির হয়েছে যে ফাস্তন মাসের কোনো শুভ-দিনে আমরা দু'জনে মিলিত হব। মতের মিল না হ'লে মনের মিল কি করে' হবে বল? তোমার প্রভাব স্মিত্রার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসেছে যে তাকে নড়াবার আমার ক্ষমতা নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, ইচ্ছেও নেই। তাই মনে করছি আমার মতটাই তোমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব, আর তাই আজ এসেই তোমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের দু'জনের এক জনকেও বর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

কথাটা শুনিতে শুনিতে সুরেশ্বর নিজের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বয়লার যেমন বাষ্পের প্রচণ্ড বেগ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া থাকে, তেমনি নিরুপদ্রবে সমস্ত উত্তেজনাটা চাপিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর বলিল, “এতদিন একথা আমাকে জানাওনি কেন? জানালে বোধ হয় ভাল করতে।”

বিমান স্মিতমুখে বলিল, “কেন, তা হ'লে কি হ'ত?” এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর কহিল, “তা হ'লে আমার আচরণটা তোমাদের দু'জনের মধ্যে হয় ত একটু ভিন্নরকমের হ'ত।”

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সহাস্রমুখে বিমানবিহারী বলিল, “ভিন্নরকমের না হ'য়েও কোন ক্ষতি হয়নি; তোমার স্বাক্ষর করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সত্যি কথা বল, সুরেশ্বর?”

মুহূ-স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, “বল, যদি কোনো ক্ষতি না হয়।”

“না, কোনো ক্ষতি হবে না। এক সময়ে তোমার আচরণে আমি বাস্তবিকই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। তুমি স্মিত্রার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিলে যে ভয় হ'ত দস্যুর হাত থেকে স্মিত্রাকে উদ্ধার করে' অবশেষে তুমি নিজেই না তাকে অপহরণ কর।” বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

মুখ একটু অশ্রুদিকে ফিরাইয়া লইয়া সুরেশ্বর কহিল, “তার পর এখন সে সন্ত্রাস গেছে?”

“গেছে। এখন বুঝেছি যে সন্ত্রাসের কোন কারণই ছিল না।” বলিয়া বিমান পূর্কের মত হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর গম্ভীর-স্মিতমুখে বলিল, “নিজের বুদ্ধির উপর অতটা বিশ্বাস কোরো না, ভাই। একটু সতর্ক থেকে।”

বিমানবিহারী কহিল, “না, আমি এবার বিশ্বাস করে'ই নিশ্চিত থাকব স্থির করেছি, সতর্ক হ'লেই দেখেছি ভয় ভাবনা অনেকরকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। বিশ্বাসে মিলে স্মিত্রা, তর্কে বহু দূর; তর্ক করলেই স্মিত্রা দূরে সরে' যায়। অতএব সতর্ক আর হব না।”

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রহানোদ্যত হইয়া বিমানবিহারী বলিল, “চল সুরেশ্বর, স্মিত্রাদের বাড়ী বেড়িয়ে আসবে চল। তুমি ত কয়েক দিনই সেখানে যাওনি।”

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, “বিয়ের রাত্রির আগে আর সেখানে পদার্পণ করাই হবে না।”

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, “কেন?”

সহাস্র মুখে সুরেশ্বর কহিল, “কি জানি লোকে যদি লোভী বলে' সন্দেহ করে।”

“তা কখনো করবে না। তুমি যে নির্লোভ তা সকলেই জানে।” বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিমানবিহারী প্রস্থান করিল।

(২০)

বিমলাকে লইয়া জয়ন্তী ভবানীপুরের কোনও আত্মীয়-গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার পর তথা হইতে ফিরিবেন। স্মিত্রাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ত জয়ন্তী পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু স্মিত্রা যায় নাই, ওজর-আপত্তি করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল।

বেলা তখন দুইটা। স্মিত্রা নিজ কক্ষে অলসভাবে শযায় শয়ন করিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, ‘মেজ দিদিমণি, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।’

স্মিত্রা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ঐস্বক্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোথায় যে?’

“এই যে বাইরেই।” বলিয়া দাসী হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বারাণ্ডা দেখাইয়া দিল।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মাধবীকে দেখিতে পাইল। দেখিল একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের সুন্দরী মেয়ে রেলিংএ ভর দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখা হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি কণকালের জন্ম নিবন্ধ হইয়া গেল। সুমিত্রা এই সুদর্শনা অপরিচিতা তরুণীর দিকে বিস্মিত নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং মাধবী তাহার পরম কৌতূহলের বস্তুটির অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া বাক্যহারা হইয়া গেল। তৎপরে একই সময়ে এই পরস্পর-বিমুগ্ধ দুইটি তরুণীর মুখে শ্রীতি-প্রসন্ন মুহূর্ত্ত হাশ্ব ফুটিয়া উঠিল।

মাধবীর শাস্ত্র কমনীয় মূর্ত্তি এবং খন্দরের শুভ পরিচ্ছন্ন বেশ দেখিয়া সুমিত্রার মন সম্রমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে সাগ্রহে সহাস্ত্রমুখে বলিল, “এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, আসুন, ভিতরে বসবেন চলুন!” বলিয়া মাধবীকে নিজ বক্ষে লইয়া গিয়া সযত্নে বসাইল।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে, তাই সুমিত্রা তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অবগর না দিয়া মাধবী বলিল, “আমি এসেছি চরকা বিক্রী করতে। যদি দরকার থাকে ত দেখতে পারেন, আমার সঙ্গেই গাড়ীতে চরকা আছে।”

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া সুমিত্রা পরিচয়ের জন্মই ব্যগ্র হইল। বলিল, “আপনি কোথা থেকে আসছেন?”

মাধবী মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল যে, পারতপক্ষে পরিচয় না দিয়াই চরকা দিয়া যাইবে। তাই মুহূর্ত্ত হাসিয়া উত্তর দিল, “খুব বেশী দূরে নয়; নিকটেই আমি থাকি।”

“নিকটেই? আপনার নামটি জানতে পারি কি?”

মাধবী পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল, “নাম আমার জানাবার মত কিছুই নয়। সাধারণ বাঙালী মেয়ের আর পরিচয় কি বলুন?”

মাধবীর এই আত্মগোপনের প্রয়াস দেখিয়া সুমিত্রা মনে-মনে একটু বিরক্তি বোধ করিল। বলিল, “তা হ’লেও সকলেরি একটা পরিচয় আছে ত! অবশ্য পরিচয় দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে।”

মাধবী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “দেখুন, শুধু ত ইচ্ছেই নয়; দরকার বলেও ত একটা কথা আছে। আমার পরিচয় দেবার এমন কোনও দরকার আছে কি? আমি ত এসেছি শুধু চরকা বিক্রী করতে।”

এবিষয়ে আর আগ্রহ না দেখাইয়া সুমিত্রা বলিল “না, দরকার কিছুই নেই, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। বাড়ীতে কেউ এলে পরিচয় না নেওয়াটা অভদ্রতা; আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচয় নেওয়াও সেই অভদ্রতা।” একটু চূপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “হ্যাঁ, আমার একটা চরকার দরকার আছে, কিন্তু—” বলিয়াই সুমিত্রা থামিয়া গেল।

মাধবী সুমিষ্ট হাশ্ব হাসিয়া কহিল, “তবে আর কিছু কি? আমার কাছে একটা চরকা নিন। খুব ভাল একখানা চরকা আমার কাছে আছে; বাজারে এমন একখানা চরকা সহজে পাবেন না।”

সহসা সুমিত্রা মাধবীর বামস্কন্ধের উপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “বাজারে পাওয়া যাবে না এমন চরকা আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, তবে আনান্, দেখি কিরকম সে চরকা।”

সুমিত্রা উঠিয়া বারাণ্ডায় গিয়া পূর্কোক্ত পরিচারিকাকে আহ্বান করিল, এবং সে উপস্থিত হইলে মাধবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “একে অগ্রহ করে’ বলে’ দিন কোন্ চরকাটা নিয়ে আসবে।”

মাধবী পরিচারিকার দিকে চাহিয়া বলিল, “কালো রংএর বার্ণিশ-করা একটা চরকা আছে, সেইটে নিয়ে এস। আর ছোট একটা ডালা আছে, সেটাও।”

পরিচারিকা প্রশ্ন করিলে সুমিত্রা মুহূর্ত্ত হাসিয়া কহিল, “আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়, পাছে বলেন সে কথার কোনও দরকার নেই। তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আপনাদের কি চরকার কারবার আছে?”

মাধবী মুহূর্ত্ত হাসিয়া কহিল, “না, কারবার নেই। তবে মাঝে মাঝে ভদ্র পরিবারে আমরা চরকা বিক্রী করে’ বেড়াই।”

কথাটা অসত্য নহে। সর্বপ্রথম যখন স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে চরকার প্রবর্তন হয় তখন কোনও মহিলা-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া মাধবী কখন-কখন অল্প মহিলাদের সহিত বাড়ী বাড়ী চরকা বিক্রয় করিয়া ফিরিয়াছে। সেই হাজার উপর নির্ভর করিয়া মাধবী স্মিতার প্রশ্নের এই উত্তর দিল।

স্মিতা পুনরায় মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, “দেখুন, আমি এই প্রথম চরকা কিনছি। চরকা চালাতে আমি জানিনে। আপনি আমাকে চরকা চালান শিখিয়ে দেবেন ত’?”

মাধবী আগ্রহভরে কহিল, “দেখ যাই কি! চরকা চালান শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব।”

স্মিতা স্মিতমুখে কহিল, “কিন্তু একদিনেই কি শিখে’ নিতে পারব? মাঝে মাঝে যদি দয়া করে’ আপনি আসেন তা হ’লে বড় ভাল হয়! তা নইলে বৃথা কিনে কি হবে বলুন?”

মাধবী মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, না, বৃথা হবে কেন? একদিন দেখিয়ে দিলেই আপনি বুঝে’ নিতে পারবেন; তার পর অভ্যাস করলে আপনিই আয়ত্ত হ’য়ে আসবে।”

দাসী চরকা ও ফালা লইয়া উপস্থিত হইল।

চরকাটা হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে স্মিতা বলিল, “বাঃ, বেশ চমৎকার দেখতে ত? আচ্ছা কালো রং কেন দিয়েছেন?”

মাধবী উত্তর দিল, “কালো রং পেছনে থাকলে সাদা সূতো ভাল দেখা যায় বলে’।”

চরকাটা দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকের কোণে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় স্মিতার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, “আচ্ছা, আমার নাম স্মিতা, তা আপনি জানেন?”

স্মিতার কথা শুনিয়া মাধবী প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মুছ হাসিয়া কহিল, “হ্যাঁ, আমি তা জানি।”

“জানেন? তাই বুঝি চরকার কোণে আমার নামের

প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন?” বলিয়া স্মিতা হাসিতে লাগিল।

চরকার দক্ষিণ কোণে সুরেশ্বর তাহার নামের আদ্যা-ক্ষর ‘সু’ পরিচ্ছন্নভাবে ছুরি দিয়া খুদিয়া রাখিয়াছিল। সে-কথা মাধবীর একেবারেই মনে ছিল না! স্মিতার প্রশ্নে মনে-মনে বিশেষরূপে পুলকিত হইয়া সে বলিল, “ও-টা আমি খোদাই করিয়ে আনি নি; ভগবানই খোদাই করিয়ে রেখেছেন! মিল যখন হবার হয় তখন এমনি করেই হয়!”

“কি করে’ হয়?”

মাধবী সাহাস্যে বলিল, “এমনি অক্ষরে অক্ষরে মিল হয়।”

মাধবীর কথা শুনিয়া স্মিতার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ মাধবীর প্রতি তুলিয়া সে কহিল, “আবার মাহুষে যখন ধরা পড়ে তখন এমনি কথায় কথায় ধরা পড়ে!”

সশঙ্কচিত্তে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল “কে ধরা পড়ে?”

স্মিষ্ট হাস্য সমস্ত মুখখানা লেপন করিয়া স্মিতা বলিল, “মাধবী ধরা পড়ে! নিজের পরিচয় নিজের কাঁধে বয়ে’ এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে, সে ধরা পড়ে!”

স্মিতার কথা শুনিয়া বিশ্বয়বিহ্বল-নেত্রে মাধবী ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা রহস্যের মর্মোদঘাটন করিয়া নিজের দক্ষিণ স্বস্ত্রের উপর শাড়ীতে বিদ্ধ স্বর্ণ ব্রোচের উপর হাত দিয়াই হাসিয়া ফেলিল। এই ব্রোচটিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল ‘মাধবী’। সজ্জা করিবার সময়ে অভ্যাসানুযায়ী সে যখন এই বহু-ব্যবহৃত অলঙ্কারটি পরিধান করিয়াছিল তখন একেবারেই খেয়াল হয় নাই যে, ইহার মধ্যে তাহার নাম লিখিত আছে!

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুইটি পরস্পর-প্রত্যাহী হৃদয় স্পর্শ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল। একই মাধ্যাকর্ষণ যেমন দুইটি বিঃিন্ন স্রোতস্বতীকে টানিয়া টানিয়া সংযুক্ত করিয়া দেয়, তেমনি সুরেশ্বরের আকর্ষণ মধ্যবর্তী হইয়া এই দুইটি তরল প্রাণকে ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর করিয়া অবশেষে একেবারে এক করিয়া দিল। দুইটি

ডালের দুইটি ছিন্ন স্থল একত্র মিলিত হইলে যেমন কলমের জোড় লাগিয়া যায়, তেমনি সুরেশ্বরের সদ্য-অপমান-জনিত যে ক্ষত এই দুইটি তরুণীর মর্মস্থলে ছিল তাহা একত্র হইবামাত্র দুইটি চিত্তকে যুক্ত করিয়া রস-প্রবহন আরম্ভ হইয়া গেল। তাই মাত্র অর্ধঘণ্টা কাল পরেই এই দুইটি নবানুরাগিণীর মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে কথাবার্তা হওয়া সম্ভবপর হইল।

সুমিত্রা সস্তোষপ্রফুল্ল মুখে বলিল, “তোমাকে দেখে’ই ভাই মাধবী, এমন একটা ভালবাসা পড়ে’ গিয়েছিল যে কি বলব! তাই তুমি যখন নিজের পরিচয় লুকোবার চেষ্টা করছিলে তখন ভারি রাগ হচ্ছিল! তার পর হঠাৎ তোমার ব্রোচের উপর দৃষ্টি পড়তেই সব কথা পরিষ্কার হ’য়ে গেল! কেমন! এখন জন্ম ত?”

মাধবী সুমিত্রাকে বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া স্মিত মুখে বলিল, ‘খুব জন্ম! কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশী জন্ম হব, যে-দিন তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে দাদার পাশে চেলী পরে’ দাঁড়াবে!”

সুমিত্রা আরম্ভমুখে মাধবীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “যাও ভাই, তুমি বড় ফাজিল!”

মাধবী হাসিয়া বলিল, “জমার চেয়ে খরচ বেশী করলে ফাজিল হয়। আমি ভাই কথা জমিয়ে রাখতে পারিনে, খরচই বেশী করে’ ফেলি! তা তুমি যদি পছন্দ না কর ত মুখ বন্ধ করে’ গম্ভীর হ’য়েই থাকব।” বলিয়া মাধবী কপট গাম্ভীর্যের ভাণ করিল।

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া সহাস্যমুখে কহিল, “না, না, তোমাকে মুখ বন্ধ করে’ গম্ভীর হ’তে হবে না, কিন্তু তাই বলে’ যা’ তা’ কথা বোলো না।”

মাধবী তেমনি গম্ভীরভাবে বলিল, “এসব তুমি যা’ তা’ কথা বল?—দাদা তোমাকে ভালোবাসেন, এ যা’ তা’ কথা?”

“আঃ, আবার ঐসব কথা!” বলিয়া সুমিত্রা মাধবীকে পুনরায় একটু ঠেলিয়া দিল।

“আচ্ছা, তবে থাক, আর বলব না, মুখ বন্ধ করলাম। চল, তোমাকে চরকা চালান শিখিয়ে দিই।” বলিয়া মাধবী উঠিয়া চরকা ও ডালা লইয়া ঘরের মেজ্ঞেতে এক-

খানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। সুমিত্রাও আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

চরকার বিভিন্ন অঙ্গগুলির ক্রিয়া ও কার্য মাধবী একে একে সুমিত্রাকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার পর চরকার লৌহশাল্যে একটা তুলার পাঁজ যুক্ত করিয়া লইয়া সে দ্রুতগতির রাশি রাশি সূতা কাটিতে লাগিল।

এত সহজে এরূপ সূতা প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সুমিত্রা বিস্ময়ে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল।

“কি চমৎকার মাধবী! আমাকে শিখিয়ে দাও না, ভাই! আমি পারব?”

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, “দেশকে আর দাদাকে যে ভালবাসে তার হাতে চরকা ঠেকলেই সূতো বেরাবে। তুমি দাদাকে ভালোবাস, সুমিত্রা?”

সুমিত্রা মুহূ হাসিয়া বলিল, “আবার আরম্ভ হ’ল? খুব মুখ বন্ধ করলে ত, মাধবী!”

মাধবী চরকার! উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল, “তোমাদের বাড়ীর জলের কলের প্যাচ ক্ষয়ে’ যেতে কখন দেখনি, সুমিত্রা? যতই টিপে’ দাও না কেন জল বেরোতেই থাকে? অবশেষে দড়ি না বাঁধলে আর জল বন্ধ হয় না। আমার মুখও যদি বন্ধ করতে চাও তা হ’লে দড়ি দিয়েই বেঁধে দাও। কিন্তু চরকায় হাত দিয়ে আমি কখন মিথ্যে কথাও বলিনে, ফাজিল কথাও বলিনে। এই চরকা সম্বন্ধে আমি যে কথাটা বলব সেটা মন দিয়ে শোনো।”

অলক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া মাধবী আবার বলিতে আরম্ভ করিল—“এই চরকাটি দাদার অতিশয় যত্নের জিনিস, সুমিত্রা। অনেক চরকা অনেক দিন ধরে’ বেছে বেছে এটি তিনি মনের মত করে’ নিয়েছেন। এ-চরকায় তিনি কাউকে হাত দিতে দেন না, কিন্তু তোমার হাতে এটি চিরদিনের জন্তে তিনি দান করেছেন। এ চরকাটি তুমি যত্নে রেখো, আর কাজে লাগিয়ে।”

তাহার পর পুনরায় কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া চরকা চালাইতে চালাইতে মাধবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল— “তোমার ব্যবহারের শাড়ী করাবার জন্তে এই চরকায় দাদা এই কয়েক দিনে কত সূতো কেটে রেখেছেন, সুমিত্রা!

দাদা ভারি চাপা মাথায় আমার ঠিক টুকো, কোন কথাই বলতে চান না। কিন্তু তোমাকে আর এক অভিব্যক্তির চরকাটি দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি কত গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন।

তাহার পর সহসা চরকা বন্ধ করিয়া সুমিত্রাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “এ কি সুমিত্রা! তুমি কাঁদছ কেন, ভাই? তোমার মনে এমন দুঃখ হবে আনলে আমি কখনই এর কথা তোমাকে বলতাম না।”

এ অন্ততাপ-প্রকাশে অশ্রু কিছুমাত্র বাধা না মানিয়া বাড়িয়াই গেল। তখন ব্যস্ত হইয়া মাধবী সুমিত্রাকে শাস্ত করিতে লাগিল।

সুমিত্রা প্রকৃতিস্থ হইলে মাধবী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “তোমার দুঃখ আমাকে জানাবে না ভাই, সুমিত্রা?”

সুমিত্রা অশ্রু মার্জিত করিয়া মুহূ হাসিয়া কহিল, “আজ তুমি প্রথম এসেছ, আজ তোমার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করা ঠিক হবে না, ভাই। তুমি আমাকে চরকা চালান শিখিয়ে দাও।”

মাধবী কিন্তু তেমন পাত্রীই নহে। ধীরে ধীরে সমস্ত কথাই সুমিত্রার নিকট হইতে জানিয়া লইল।

সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল ভাবিতে লাগিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, এ কিছুতেই হ’তে দেওয়া হবে না। যদি দরকার হয় বিমান-বাবুকে আমি অনুরোধ করব যাতে তিনি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি না হন। বিমান-বাবু ভদ্রলোক; কখনই তিনি এ বিষয়ে অবিবেচনার কাজ করবেন না।”

সুমিত্রা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, “না, না, মাধবী, বিমান-বাবুকে তুমি কোনো কথা বোলো না। তাতে খারাপ হবে।”

মাধবী বলিল, “বেশ তা হ’লে তুমি নিজে শক্ত হোয়ো।

তুমি যদি শক্ত হ’য়ে হাল ধরতে পার সুমিত্রা, আমি ঠিক দাঁড় বেয়ে তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।” বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া এবং চরকা চালানর কৌশল সুমিত্রাকে যথাসম্ভব শিখাইয়া দিয়া মাধবী প্রস্থান করিল।

যাইবার সময়ে দুই বাহুতে সুমিত্রার গলবেষ্টন করিয়া ধরিয়া সে বলিয়া গেল, “আমি তোমার আজীবন সুখ-দুঃখের সখী হলাম, সুমিত্রা। দরকার হ’লেই মনে কোরো।”

মাধবী প্রস্থান করিলে সুমিত্রার মনে হইল তাহার বন্ধ-জমাট ঘরের জানালা খোলা পাইয়া হঠাৎ যেন বসন্তের এক ঝলক অবাধ উদ্দাম হাওয়া বহিয়া চলিয়া গেল! শুধু বহিয়াই গেল না, তাহার মন-নিকুঞ্জের সহস্র কোরক ফুটাইয়া দিয়া গেল। তাহার চিত্তবীণায় গভীর ঝঙ্কার জাগাইয়া দিয়া গেল।

অনন্ততপূর্বক আবেশে সুমিত্রার মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল! সুরেশ্বরের নামের প্রথম অক্ষর যে তাহার নামেরও প্রথম অক্ষর, তাহা এপর্যন্ত এমনভাবে একদিনও মনে হয় নাই। চরকার সম্মুখে বসিয়া সেই সযত্ন-খোদিত অক্ষরটির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সুমিত্রার মন ছলিতে আরম্ভ করিল। মনে হইল তাহা যেন শুধু বর্ণমালার একটি অক্ষরমাত্রই নহে, যেন প্রবল শক্তিসম্পন্ন কোন্ বীজমন্ত্র!

ক্ষণকাল তন্দ্রাবিমুক্ত থাকার পর সুমিত্রা অঞ্চলে গলদেশ বেষ্টিত করিয়া চরকায় মাথা ঠেকাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল; তাহার পর তাহার পড়িবার টেবিলের একধার মুক্ত করিয়া সমস্তে চরকাটি তথায় উঠাইয়া রাখিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



“ঐতিহাসিক উপন্যাস”

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ প্রবন্ধে বঙ্কিম-বাবুর কয়েকখানি উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইতিহাসের মর্যাদার হানি করিয়াছেন। এখানে আমি শুধু ‘দুর্গেশনন্দিনী’ ও ‘রাজসিংহ’ সম্বন্ধেই ইহা বলিলাম। রাখাল-বাবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে তাঁহার ‘মত পেশাদার প্রভুত্বব্যবসায়ী’ যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন তাহারই খাতিরে, তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রেরণ করিতে স্বভাবতই আমার ভয় পাওয়া উচিত। কিন্তু ‘আমার স্বির বিশ্বাস’ স্বয়ং বঙ্কিম-বাবু, ও ‘ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।’

দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে রাখাল-বাবু বলেন, “উপন্যাস-রচনায় প্রযুক্ত হইয়া আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের...মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীর কংলু খাঁ, ওসমান খাঁ, জগৎসিংহ ও মানসিংহ এক-দিন বাস্তব জগতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের সময় ও সেই যুগের প্রধান ঘটনাবলী ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। উপন্যাস-রচনা কালে গ্রন্থকার নাম-বৈষম্য বা ঘটনা-বৈষম্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এইজন্যই “দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে কথাসাহিত্যের হিসাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না হইলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কিন্তু বঙ্কিম-বাবু নিজেই বলিতেছেন, “যে তিনি পূর্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেন নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।” বঙ্কিম-বাবুর উপন্যাসের ঐতিহাসিক তত্ত্ব গবেষণা করিবার পূর্বে রাখাল-বাবু অন্তত ‘ভূতপূর্ব এবং অধুনা সিংহাসনচ্যুত’ সাহিত্য-সম্রাটের লিখিত মূল্যবান ভূমিকা-গুলিও কি পড়া উচিত বিবেচনা করেন নাই?

বর্তমান বিশ্বসভ্যতার নানা-বিভাগে আমাদের স্বদেশবাসী যে কয়েকজন মহাত্মা স্ব স্ব সাধনা ও প্রতিভার বলে বঙ্গদেশের—তথা ভারতবর্ষের জন্ত স্থায়ী গৌরব অর্জন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্ততম। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে বা ভারতের বাহিরে ভারতীয় ষোল্ল-যুগের ইতিহাসে তাঁহার মত অধিকার আর কাহারও নাই। তিনি দুই বৎসর পূর্বে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে “বঙ্গের শেষ পাঠানবীর” প্রবন্ধে দুর্গেশনন্দিনীর মূল আখ্যানভাগের ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া বর্তমানে রাখালবাবুর যে ধারণা, তাহার প্রকৃতত্ব বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’-লেখক যে তাহা পাঠ করেন নাই, ইহাতে কি বাঙ্গালী পাঠকের দুঃখ বোধ করা অস্বাভাবিক?

‘রাজসিংহের’ বিষয়ে বঙ্কিমবাবুর অতি উচ্চ ধারণা। তিনি “অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী; হিন্দুধর্মক মুসলমান ইতিহাস-লেখকদের বাহু দিয়া ভিনিসীয় চিকিৎসক মানুচী, টড, ও অমের অহুকরণ

করিয়াছেন।” আবার বঙ্কিমবাবু বলেন যে, “এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্তত একাধা বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।”

রাখাল-বাবু এই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু তিনি নিজেই “যদিও” দিয়া (এই ‘যদিও’—অর্থ কি?) বলিতেছেন, যে, “অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের স্মার মনস্বী লেখক রাজপুতানার গিরিরক্ষপথে সপরিবারে বাদশাহ্ আওরঙ্গ-জেবকে বন্ধন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি (এই তথাপি—অর্থ কি?) রাজসিংহ আধুনিক উপন্যাসের স্মার অস্বাভাবিকতা-দোষ দুই হয় নাই।”

এ-বিষয়ে বঙ্কিম-বাবু বলেন যে তিনি “রক্তমধ্যে ঔরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ ঐরূপ লিখেন।” ইত্যাদি।

রাখাল-বাবু বঙ্কিম-বাবুর প্রতিবেদন করিয়া বলেন যে “এই যুগের মুসলমান ঐতিহাসিক এক-দেশদর্শী, সুতরাং তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে বিশ্বাসযোগ্য অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়প্রকারের প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্বত্র স্থলভ নহে। সর্বসাপেক্ষা কঠিন কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন, কারণ তাহা তুর্কী আরব্য অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত।”

রাখাল-বাবু বলেন যে “মুসলমান ঐতিহাসিক একদেশদর্শী।” বঙ্কিম-বাবুরও সেই মত। কিন্তু আবার বলেন যে “এই যুগে মুসলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।” ইহাও কি একদেশদর্শী মুসলমান ঐতিহাসিকদের কারসাজি?

রাখাল বাবু নিজেই ঐতিহাসিক, কাজেই তিনি নিশ্চয় আমাদের চেয়ে বেশী জানেন, যে আমাদের সেরা ঐতিহাসিক যদুনাথ-বাবু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিয়াছেন কিনা। তুর্কী ভাষায় ভারতের ইতিহাস আছে কিনা জানি না, কিন্তু তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানদের রাজভাষা পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন করা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে। বাঙ্গালী আজ চীনা ও জাপানী ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন। কিন্তু মেকলের পূর্বে পর্যন্ত অফিস-আদালতে যে-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-ভাষায় লিখিত ইতিহাস পাঠ বিশেষ শ্রমসাপেক্ষ নহে। যাহা হউক যদুনাথ-বাবু শুধু যে কেবল পারস্য ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার শ্রম-কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা নহে, পরন্তু পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে রক্ষিত প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানসমূহ অনেক অর্থ-ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

রাখাল-বাবু বলেন যে “রাজসিংহ অস্বাভাবিকতা-দোষে দুই হয় নাই।” কিন্তু বঙ্কিম-বাবু বলেন যে ঔরঙ্গজেব প্রভৃতির “সম্বন্ধে যে-সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে।” “বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকত রক্ষা করিবার জন্ত কল্পনা-প্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।” আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমাদের দেশে হকিন, রো, বার্নিএ,

টাভেরনিরে প্রভৃতির লেখা ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে, সুতরাং উপন্যাসও যদি ইতিহাসের স্থান অধিকার করে, তাহাতে ক্ষোভের কারণ কি ?

রাখাল-বাবু বলেন যে “ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—প্রথম উদ্দেশ্য উপন্যাসের আকারে ঐতিহাসিক সত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ঐতিহাসিক ঘটনার আবরণ দিয়া একটা নূতন গল্প রচনা।”

‘ছুর্গেশনন্দিনী’ বঙ্কিম-বাবুর নিজের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। ইহা রাখাল-বাবু যদি স্বীকার না করেন? ঠিক বটে ‘ছুর্গেশনন্দিনী’তে নাম-বৈষম্য নাই। ‘স্থান-বৈষম্য’ও নাই— থাকিলেও তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। বিশেষতঃ রাখাল-বাবু নিজেও তাহা উল্লেখ করেন নাই। ঘটনা-বৈষম্য?—আমরা কিছু বলিব না। যদুনাথ-বাবু এই প্রসঙ্গে পূর্বে লিখিত প্রবন্ধে বলেন, “ইতিহাস কাব্য নহে। ঐতিহাসিক শুদ্ধ সত্য অনেক সময়েই কাব্যে অঙ্কিত মনোহর কল্পনার চিত্রপট দূর করিয়া দেয়। কুমার জগৎসিংহ যৌবনে অতিমাত্রায় মদ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উসমান বঙ্গীয় পাঠানদের মধ্যে শেষ বীর রাজা; অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে হত হন।” এখন রাখাল-বাবু কি বলিতে চাহেন? বঙ্কিম-বাবু বার বার বলেন, “ইতিহাস, ইতিহাস; উপন্যাস, উপন্যাস।” সুতরাং কোনো উপন্যাসে কখনও কি রাখাল-বাবুর নির্দেশিত প্রথম উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে?

এমন কি রাজসিংহের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয় বঙ্কিম-বাবুর যে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাহার আজকাল কত মূল্য আছে, রাখাল-বাবু স্বীকার না করিলেও ইতিহাস কখনও অস্বীকার করে না। মাগুচি, টড্ বা অমের লেখার মূল্য কত, অনেকেই জানেন।

বঙ্কিম-বাবু রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলেন যে “এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।” ইহা শুধু তাঁহার বিনয়-বচন নহে—তাঁহার গ্রন্থাবলী ইতিহাসের অমুসঙ্গানী আলোতে ফেলিলেই রাখাল-বাবু তাহা বুঝিতে পাবিবেন। যদিও বঙ্কিম-বাবু বলেন যে “ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে,” কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক একথা কখনও স্বীকার করিবেন না। কারণ বঙ্কিম-বাবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে, “উপন্যাস-লেখক, সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।”

ইতিহাস সম্বন্ধে গ্যাটের ধারণা যাহাই হউক, এমাসনেব লিখিত যে মন্তব্যটিতে প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে কাল হইলের ধারণা বিবৃত হইয়াছে যাহারা তাঁহার সমর্থন করেন, তাঁহারা নিশ্চয় বঙ্কিম-বাবুর কথাকে একটু বদলাইয়া বলিবেন যে “কোন স্থানেই উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।”

পরিশেষে রাখাল-বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের “দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক ঘটনার আবরণ দিয়া একটা নূতন গল্প রচনা।” ইহাই সম্ভবপর এবং এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের অভাব অতি অল্প ভাষায়ই আছে।

কাজী মোহাম্মদ বক্‌স্

‘সীতারামের’ ঐতিহাসিকত্ব

গত মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’ সম্বন্ধে অনবধানতাবশতঃ ‘কাহারও কোন আপত্তি নাই’ বলিয়াছেন। ষ্টুয়ার্টস্ কৃত বহুজন-বিদিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সীতারামের ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন-কালে বাদশাহ বংশের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব আবু তোরাপ ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। বাদশাহ বংশের সহিত আত্মীয়তা হেতু তিনি নবাবকে বিশেষ আদর চক্ষে দর্শন করিতেন না। এইজন্য নবাব কোনরূপ সাহায্য দান না করিয়া তাঁহাকে মহম্মদপুরের খ্যাত দস্যু সীতারামকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ আদেশ দেন। তোরাপ অগত্যা অঙ্গ কয়েকজন বরকন্দাজ লইয়া দস্যু-দমনে গমন করেন। সীতারাম ফৌজদারের পদগোরব ও তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের ফল কি তাহা স বিশেষ জানিলেও স্বীয় অমুচরবর্গকে অতর্কিত আক্রমণের আদেশ দিয়া স্বয়ং তোরাপের মস্তক ছেদন করেন। তোরাপের প্রতি সাবধান দৃষ্টি রাপিবার জন্ত নবাবের উপর দিল্লীর আদেশ ছিল; কিন্তু তাঁহারই কোণলে ফৌজদার নিহত হইলেন। এই সংবাদ কোনরূপে দিল্লীতে পৌঁছাইলে সমূহ বিপদ বুঝিয়া যাহাতে সীতারাম পলায়ন করিতে না পারেন তজ্জন্য নবাব মহম্মদপুর পরগণার চতুর্দিকস্থ জমিদারগণের উপর অতি সত্বর কড়া হুকুম জারি করিয়া সৈন্য প্রেরণপূর্বক স্ত্রী, পরিবার ও সহচরগণ সহ সীতারামকে বন্দীকৃত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি অস্থান্য দস্যু সহ সীতারামকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শুলে আরোপণ করাইয়া এবং তদীয় স্ত্রী ও পরিবার-বর্গকে মুর্শিদাবাদের প্রকাণ্ড বাজারে বিক্রয় করেন ও আবু তোরাপের প্রতিশোধমূলক রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাইয়া অব্যাহতি পান।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ ও ‘রাজসিংহ’ সম্বন্ধে মনস্বী ঐতিহাসিক যদু-বাবুর সহিত একমত হইয়া সত্য ইঙ্গিত করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের অতিশ্রুতি মূলে কোন কিছু না বলায় এবং সকলকে বঙ্কিমমতাবলম্বী বলায় আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

“গৌড়-ব্রাহ্মণ” ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

গত মাঘ মাসের “প্রবাসীতে” শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় “গৌড়-ব্রাহ্মণ” শীর্ষক প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া কতকগুলি ইতিহাস-বিগর্হিত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। চক্রবর্তী মহাশয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দোহাই দিয়া পালবংশীয় রাজগণকে মাহিয়া বা কৈবর্ত জাতি সাব্যস্ত করিয়াছেন। দীনেশ-বাবু কিছুকাল পূর্বে ঐরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন এমন কি “প্রবাসী”তে ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন; কিন্তু ঢাকা মিউজিয়ামের একটি রহস্য উদঘাটনের পর হইতেই শুধু দীনেশবাবু কেন সমস্ত ঐতিহাসিকই ঐরূপ ভ্রান্ত মতকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা জানিয়া লজ্জিত হইলাম কেবল “ভ্রান্তি বিজয়” প্রণেতা চক্রবর্তী মহাশয়ের ভ্রান্তি এপর্যন্তও ভাঙে নাই।

সন ১৩২৮ সালের আগাট সংখ্যার “ভারতবর্ষে” হরিশবাবু এই বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিঃস্মৃতিব্যাকরণতীর্থ মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পত্র লিখেন। দীনেশ-বাবুও অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট আবেদন মাসেই (১৩৩৮) একখানি

পত্র লিখেন। পাঠকগণ সেই সুদীর্ঘ পত্রের অংশবিশেষ পাঠ করিলেই প্রকৃত ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিবেন। পত্রখানি এই-রূপ—“কয়েক বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, সাভারের হরিশচন্দ্র পালবংশীয় ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সাভারে প্রাপ্ত “হরিশচন্দ্র” নামাঙ্কিত... একখানি ইষ্টক সংগৃহীত হইয়া ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মিঃ ট্যোপলট্‌ন এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ঐ ইষ্টকখানি সম্পূর্ণরূপেই জাল এবং অবিষসনীয়। যে-সমস্ত প্রমাণে রাজা হরিশচন্দ্রকে এবং ময়নামতী গানের গোবিন্দচন্দ্রকে আমরা পাল-বংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়া-ছিলাম, নবাবিকৃত তথ্যের আলোকে সে-সকল প্রমাণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টশালী ও মিঃ ট্যোপলট্‌ন ‘ঢাকা রিভিউ’ পত্রিকায় যে প্রাচীন প্রস্তরলিপির একটি প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন তাহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সাভারের রাজা বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, যদিও তিনি হিন্দুমতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহার প্রপিতামহ ছিলেন রাজা ভীমসেন, তৎপুত্র ধীমন্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করিতে আত্মগণের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় স্বদেশ ত্যাগপূর্ব্বক সাভারে আগমন করেন। এবং কিরাতদিগকে পরাজয় করিয়া বংশাই নদীর উপকূলবর্তী সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। ধীমন্তের পুত্র রণবীর হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বহুভাঙ্গা জয় করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পুত্র হরিশচন্দ্র কুবেরের মত ধনশীল হইয়াও বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিশচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাই শিলালিপি হইতে উক্ত বিবরণ সংকলিত হইল। শিলালিপির মূল সংস্কৃতগুলি ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ট্যোপলট্‌ন সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখেন যে, কৈবর্তেরা সাভারের রাজবংশীয় বলিয়া কি সূত্রে পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের এই দাবীর কোন প্রকৃত ভিত্তি আছে কিনা। আমি দেখিলাম অনেকেই তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কাহারও কাহারও মত ‘ঢাকা রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু আমি উক্ত সাহেবকে লিখিয়াছিলাম যে, এই দাবী নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পারে যে-হেতু হরিশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা এক সময়ে বৈদ্যজাতীয় হইলেও তাঁহারা ধর্ম্মত্যাগী হওয়াতে স্বীয় সমাজে শেষে গৃহীত হন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে বাধা হইয়া অপর কোন জাতির সঙ্গে মিশিতে হইয়াছিল। সাভারের নিকটবর্তী নামার ও জয়মগুপ প্রভৃতি গ্রামে কৈবর্তগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। কৈবর্তেরা বলেন হরিশচন্দ্রের পুত্র না থাকতে রাজ্য ভাগিনেরগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু শিলালিপিতে দেখা যাইতেছে যে, হরিশচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রও সাভারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হরিশচন্দ্রের পরে কোন রাজা অপুত্রক থাকায় কৈবর্ত বংশীয় ভাগিনেরগণ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপেই হউক এই সূত্রে কৈবর্তদিগের নিজদিগকে পালবংশীয় বলিয়া ঘোষণা করার কোনও প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে না। আমি সর্ব্বতোভাবে মাহিষা জাতির উদ্ভূতি কামনা করিয়া থাকি, তাঁহারা যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমি সুখী হইব, কিন্তু অসত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করা “তাসের ঘর” নির্মাণের স্থায়। যদি তাঁহারা কোন বংশাবলী বাহির করেন তাহার উপর কোন জোর দেওয়া চলে না যেহেতু ঘরে ঘরে আমাদের যে-সব বংশাবলী আছে তাহার মধ্যেই নানা-রূপ গোলাযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ ব্রাহ্মণাদি কয়েক জাতির মধ্যে বঙ্গালী কোলীকুল স্মৃতিস্মিত হওয়াতে তাঁহাদের বংশাবলীর

কতকটা মূল্য আছে অপর সকল জাতির সেরূপ বংশাবলী রাখার সম্ভাবনা ছিল না ট্যোপলট্‌ন সাহেব দেখাইয়াছেন, অধৈত্যাচার্যের তিন জায়গা হইতে তিন রকম বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই। কুলীন ছাড়া অপর কাহারও বংশাবলীর কিছু মাত্র নিশ্চয়তা নাই। বিশেষ ৪০।৪২ পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী কৈবর্তদের ঘরে যথাযথভাবে থাকা একরূপ অসম্ভব। অন্ততঃ ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কোনও কাগজে কিংবা তালপত্রে যদি সেই বংশাবলীর কতকাংশ পাওয়া যায় তবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, অন্তর্থাৎ নহে।”

হরিশবাবু, দীনেশবাবুর উপর নির্ভর করিয়াই পালরাজগণকে মাহিষা বা কৈবর্ত বলিয়াছেন। পাঠকগণ দীনেশবাবুর পত্রখানির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। পালরাজগণ যে মাহিষা বা কৈবর্ত ছিলেন শ্রদ্ধাঙ্গদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের গৌড়লেখমালা প্রভৃতি বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাসই একধার বিরোধী। কবিরর সক্ষাকর নন্দী মহাশয়ের রামচরিতে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ত প্রজাদের কত বিদ্রোহের কাহিনীই না বর্ণিত আছে! শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের গৌড়রাজমালায়ও ঐসব কাহিনী আছে। বঙ্গালচরিতে আবার রাজাহীন পালগণকে ক্ষত্রিয়ধর্ম ও কৈবর্তগণকে নৌজীবী, হলজীবী, জালজীবী হীনশত্রু বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সারনাথের ভগ্নস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি, মুন্সেরে প্রাপ্ত তাম্র-শাসন, গৌড়লেখমালা, গৌড়রাজমালা ও রামচরিত প্রভৃতি পাঠে জানা যায় পালবংশীয় রাজাদের সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। মে-দিন আবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল কলেজ লাইব্রেরীর হাতে-লেখা পুঁথি পড়িয়া বলিলেন, “পালরাজাদের সময় কেবল কৈবর্তদের মন্ত্র দেওয়া হ’ত না; তারা মাছ ধরত, যারা মাছ মারে তাদের কেমন করে’ মন্ত্র দেবে! কৈবর্তেরা যতক্ষণ না মাছ মারা ব্যবসা ত্যাগ করে, ততক্ষণ তাদের বৌদ্ধ করতে পারবে না এই ছিল নিয়ম। এইজন্য কৈবর্তেরা হ’য়ে গেল ছোট”।—প্রবর্তক, কার্তিক ১৩৩০।

পালবংশীয় রাজগণ যে কৈবর্ত বা মাহিষা ছিলেন না প্রতি ছত্রে ছত্রে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। পালরাজগণের মন্ত্রীগণ নাকি কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন হরিশবাবু একরূপ কথাও লিখিয়াছেন। নিজ সমাজের গৌরব বাড়াইতে গিয়া ঐতিহাসিকের চক্ষে একরূপ উপহাসাঙ্গদই হইয়া পড়িয়াছেন। পালরাজ বংশের মন্ত্রিগণ যে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা গয়া জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপিতেই প্রমাণিত হইয়াছে।* মানরাজগণের সভা পণ্ডিতগণের সহিত গোড়ের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল একথা তাহাতে স্পষ্টই আছে। অন্তর্দিকে মুন্সেরে প্রাপ্ত (শকরাজাদের মুন্সেরে অনুসরণ) বিগ্রহ পালের মুন্সেরে ও রিয়াজুল + নামক এক মুসলমান ঐতিহাসিকের ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে পালরাজবংশ শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।† হরিশ-বাবুর এ-সব বিষয় অবিদিত থাকিলে আমরা

* গয়া জেলায় এমন কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই যাহাতে লেখা আছে যে পালরাজাদের সকল মন্ত্রীই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক

† রিয়াজুল বলিয়া কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই। উহার নাম রিয়াজ উস-সালাতীন এবং এই গ্রন্থের কথা হিন্দু রাজ্যের সম্বন্ধে বিশ্বাস-যোগ্য নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক

‡ পালরাজারা যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন একথা কোন ইতিহাসে বা শিলালিপিতে পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয় বংশীয় চেনী

অনুরোধ করি তিনি যেন গোড়ের প্রামাণ্য ইতিহাসগুলি একবার পাঠ করেন।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

নাম

অগ্রহারণের প্রবাসীতে (২১৪-১৫ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্তা শাস্তা দেবী বাঙ্গালী মেয়েদের (বিবাহিতা অবিবাহিতা নির্বিশেষে) নামের পিছনে ‘দেবী’ শব্দ সংযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। প্রথমেই বলিয়া রাখি, যে উদ্দেশ্য হইতে এই প্রস্তাবের উদ্ভব তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্ত্রী-স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে নারীকে সর্বাবস্থায় তাহার নাম অপরিবর্তিত রাখিবার অপিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীনাথ বসুর কন্যা দুর্গাবতী বসু হরিনাথ মল্লিককে বিবাহ করিয়া দুর্গাবতী মল্লিক হইয়া যান (বাংলা দেশে লক্ষীরামী মল্লিক হন না)। তাহাকে আশৈশব দুর্গাবতী দেবী নাম দিয়া আক্ষেপ লেখিকা এই সমস্তা মিটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা খুব উৎকৃষ্ট উপায় মনে হয় না। এদেশের প্রাচীন যুগে নাম অনেক সহজ ছিল এবং স্ত্রীলোকের নামের পিছনে পিতা কিম্বা পতির পদবী যোজন করা হইত না—যথা, সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি। বর্তমান সময়েও ভাবতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে পিতার সহিত পুত্রকন্য়ার নামের সাদৃশ্য নাই। এবং “অনেক জাতির লোকের পদবীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই বেশ চলিতেছে”। লেখিকার প্রবন্ধ হইতে জানিতে পাই, তাহা হইলে স্ত্রীলোক মাত্রেয় নামের সহিত ‘দেবী’ এই কৃত্রিম শব্দের dead uniformity সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? দুর্গাবতী বিবাহের পূর্বে এবং পরে ‘শ্রীমতী দুর্গাবতী’ থাকিলে ক্ষতি ক’ আছে? অথবা বিবাহের পরও যদি পতির পদবী গ্রহণ না করিয়া পিতার পদবী অর্থাৎ ‘বসু’ লইয়াই থাকেন তাহাতে ক্ষতি কি? ‘দেবী’ যেমন ‘মল্লিক’ নহে ‘বসু’ ও তেমনি নহে; হুতরাং হরিনাথ মল্লিকের স্ত্রী দুর্গাবতী বসু থাকিলে আপত্তির কারণ কি? ‘দেবী’ শব্দ ব্যবহারে অহিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে এবং তজ্জন্ম তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু পদবীহীন কিম্বা পিতার পদবীযুক্ত নাম (বিবাহিতা মেয়ের) ব্যবহারে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ নাই। স্বাধীনতা-ও স্বাতন্ত্র্য-প্রদানী বাঙ্গালী মহিলাগণ এই নুতনত্বের প্রবর্তন করুন; ইহাতে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রী দীনেশচন্দ্র চৌধুরী

“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই”

মাঘের প্রবাসীতে “মফঃস্বলবাসী” স্বরাজ্যদলের চুক্তিপত্রের রচয়িতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যক্তিগত মত সূচিত করিয়াছেন।

প্রভৃতি অস্ত রাজবংশের সহিত পালরাজাদের বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল বটে কিন্তু তাহারা নিজেদের কৃত্রিম বলিয়া পরিচয় দিতেন না। রাজার সহিত রাজকন্য়ার বিবাহ চিরদিনই হয়। অনাৰ্য্য কোচবিহারের রাজবংশী জাতীয় রাজা ৬জিতেজ্ঞনারায়ণ ভূপের সহিত মিশ্রিত মারাঠা জাতীয় মারাজিরাও গায়কোয়াডের কন্য়ার বিবাহ হইয়াছে, এই দুই জাতিই এখন কৃত্রিমত্বের দাবী করেন। কিন্তু ইহাদিগকে পবিত্র আৰ্য্যবংশসম্বৃত কৃত্রিম বলিতে কেহই ভরসা করেন না।

বর্তমান নিবন্ধে দাশ মহাশয়ের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক যে কিরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তাহা প্রদর্শিত হইল।

সমালোচক বলেন যে “রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার (দেশবন্ধুর) ধারণা চতুর্দশ লুইর আদর্শ হইতে ভিন্ন নহে।” ফরাসী সম্রাট্ চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, ‘আমিই ত’ রাষ্ট্র’ (L’etat c’est moi)—কিন্তু দেশবন্ধুর কোন্ কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজেকেই রাষ্ট্র বলিয়া ধারণা করেন? সমালোচকের তাহা দেখাইয়া দেওয়া দরকার। তাঁহার কোনো কার্য হইতে যে ইহার প্রমাণ আসে না তাহা পরে দেখান গেল। দেশবন্ধু বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি চান জনসাধারণের স্বরাজ। এই কথা গয়াকংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে আছে। তিনি বরাবর ব্যক্তিত্ব চাহিয়াছেন, socialism ও centralization তাঁহার কার্য-পদ্ধতির বাহিরে। তা ছাড়া নিজের দেশের পক্ষে কেহ যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে। সাধারণ ব্যক্তিরও যেমন ও-স্বাধীনতা আছে, তেমনি দাশ-মহাশয়েরও আছে। যে-সকল সদস্ত উক্ত রফানামাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাদেরও আছে। দেশকে ইহা গ্রহণ করিবার অনুরোধের অধিকারও সকলের আছে। মিঃ দাশ ও তাঁহার সহযোগীগণ তাহাই করিয়াছেন। তাহারা এই চুক্তিপত্র দেশের উপর চাপাইয়া দিতে চাহেন না। এই স্থলে এই বক্তব্য যে “must accept it” দুইপ্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে,—প্রথমতঃ নৈতিক অথবা দৈহিক বাধ্যতা অর্থে; কিন্তু must শব্দের অপর অর্থ বক্তার মতের নিশ্চিততা জ্ঞাপন করে। সমালোচকের এই দ্বিতীয় অর্থ কেন গ্রহণ করিতেছেন না, তাহা বোঝা যায় না।

কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় চুক্তিপত্র সম্বন্ধে ‘মফঃস্বলবাসী’ বলিতেছেন, “উহা সর্বোংশে দেশবন্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” কিন্তু একথা ভুলিয়া গেছেন যে ঐ চুক্তিপত্রকে মূল সূত্র বলিয়া ধরিয়া বঙ্গীয় প্যাক্ট গাঁথা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতীয় চুক্তিপত্রে লোক-সংখ্যানুসারে প্রতিনিধি-নির্বাচন এই বিধান দেওয়া হইয়াছে; আর বঙ্গীয় মীমাংসাপত্রে দাশ মহাশয় খোলাখুলিভাবে এই নীতি অনুরোধী শতকরা হার (৫৫.৫ মুসলমান ও ৪৪.৫ হিন্দু) কথিয়া দিয়াছেন।

সমালোচকের মতে “তথাকথিত মুসলমান স্বরাজ্য-সদস্যগণকে স্বীয় দলে রাখিবার জঙ্ক বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু ঈদৃশ রফানামায় সম্মত হইয়াছেন, তাহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নহে।” একথা সংক্ষেপে খণ্ডন করা যায়। হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই বোধ জন্মে যে fusion দ্বারা হিন্দু মুসলমানের একতা প্রতিষ্ঠার আশা করা বাতুলতা মাত্র। অতএব federation দ্বারা এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। চুক্তিপত্রে তাহাই করা হইয়াছে। আইন করিয়া গোবধ বন্ধ করা যাইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে আইন দ্বারা গোরক্ষার প্রস্তাব করিতে বাকুড়ার কোন গ্রামে বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। অতএব হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্থাপন করিতে গেলে উভয় দলকেই কিঞ্চিৎ লাঘব স্বীকার করিতে হইবে। দেশবন্ধু এই মত দ্বারা চালিত হইয়াছেন। “নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জঙ্ক তিনি দেশবাসীর স্বার্থ বলি দিয়াছেন।” কিন্তু মুসলমানরাও কি আমাদের দেশবাসী নহেন? মুসলমানদের communal representation দিলে কি হিন্দুর স্বার্থ নষ্ট হইয়া যায়? দেশবন্ধুর প্যাক্টে কি মুসলমানের tyranny হইতে হিন্দুর রক্ষার ব্যবস্থা নাই? পরিশেষে সমালোচক বলেন যে “দেশবন্ধু সর্বোপরি চান আপনার যা খুসী তাই করিবার

অধিকার।” ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। দেশবন্ধু চাহেন তিনি যাহা ভাল বলিয়া মনে করেন তাহা দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিবার অধিকার।

হিন্দু-মুসলমান চুক্তিপত্র নিখুঁত না হইতে পারে। ইহাকে গ্রহণ করা বা প্রত্যাহার করা জাতির হস্তে নিহিত। নিরপেক্ষ পাঠক দেখিবেন যে মিঃ দাশ কিছুমাত্র “বিচার-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া” এই খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিনা। দুই চতুর্দশের সহিত তাঁহারা তুলনা করা আরও গর্হিত।

অরুণ দত্ত

চাকরী সম্বন্ধে স্বরাজ্যচুক্তি

স্বরাজ্য-চুক্তি বা হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট লইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একটু বাড়াবাড়ি করিতেছেন। যেমন কোন মুসলমান সংবাদ-পত্রে একজন পত্র-প্রেরক হিন্দুদিগকে ‘rabid’ বা পাগল কুকুরের মত বলিয়াছেন এবং ‘তাহা হইলে তোমার স্বরাজ্যকে সেলাম’ good-bye to your swaraj এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আর যাহা? স্বরাজ্য-চুক্তিতে সম্পূর্ণ একমত নহেন তাঁহাদিগকে হিন্দুদের বেতন-ভোগী বলিয়া গালি দিয়াছেন। বঙ্গ-বিচ্ছেদের আন্দোলনের সময় পরলোকগত ভারতের সুসম্মান আবদুল রহুল সাহেবকেও অনেক মুসলমান হিন্দুদের ভাড়াটিয়া আন্দোলনকারী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। পরে কিন্তু তাঁহারা

নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রবাসীতে উভয় সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে ‘চাকরী গেল’ ‘সর্বনাশ হ’ল’ বলিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনে বাধা জন্মাইতেছেন। যখন উভয় জাতিকে ইচ্ছায় হটক অনিচ্ছায় হটক এদেশে থাকিতেই হইবে তখন অশুভ ভাষা ব্যবহার করিয়া নিজের অভদ্রতা প্রমাণ করিবার আবশ্যিকতা নাই। মুসলমান ভাইদের চাকরী সম্বন্ধে এত দূর জেদ করা ব্যক্তিগতভাবে আমি না-পছন্দ করি। ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বরং জেদ করা যায়। আমরাও কি হিন্দুর মত চাকরীসর্ব্বশ জাতি হইয়া যাইতে চাই? ব্যবসা বাণিজ্য কি আমাদের জাতিগত উন্নতির পথ হইতে পারে না? আমরাও কি “গোলামের জাতি শিখেছ গোলামী” এই শ্রেণীতে যাইতে চাই? হিন্দুর যেমন জোর করিয়া বা আইন করিয়া মুসলমানদিগকে গোবধ বন্ধ করাইতে যাওয়া অনুচিত মুসলমানদেরও একলাফে (উপযুক্ত না হইয়াই) গঙ্গা পার হইতে যাওয়ার চেষ্টা করা অশ্রায়। অবশ্য হিন্দুদেরও চাকরী সম্বন্ধে একটু বেশী স্বার্থপরতা হইতেছে বা হইতেছিল বলা খুব সত্য। সম্পাদক মহাশয়ও এই বিষয় খুব শ্রায়ভাবে বিচার করিয়া লেখেন নাই মনে হয়। আর-একটু উদারতা কি দেখাইতে পারিতেন না?

সৈয়দ মোহসেন

স্বরূপ

(কবীর)

কেমন করিয়া স্বরূপ তাঁহার
বুঝাব তোমারে আমি ;—
রূপ নাই তাঁর বলিব কেমনে,
তিনি যে আমার স্বামী !
‘বাহিরের ন’ন’— বলি যদি আমি,
জগৎ লজ্জা পাবে ;
‘ভিতরে আছেন’— এ কথা বলিলে
কেবা প্রত্যয় যাবে ?
ভিতর বাহির অচিৎ ও চিৎ—
দুই পাদপীঠ তাঁর ;

তিনি অগোচর তিনিই গোচর,
বাক্য মেনেছে হার !
জলভরা ঘট ডুবাইয়া জলে
রেখেছেন যেন তিনি ;
ভিতর বাহির জলময় তার,—
প্রভেদ কেমনে চিনি ?
শিব তিনিই সে তিনিই আবার
এ ভুবনঈশ্বর ;
নাম ধরি’ তাঁর ভিন্ন করিয়া
কে করিবে তাঁরে পর ?

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধীর কারামোচন

মহাত্মা গান্ধীর কারামোচন সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করুন।

কৌশিল্ প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি কি মত প্রকাশ বা কার্যের সূচনা করিবেন, এখন সে-বিষয়ে কোন কল্পনা জল্পনা ও অনুমান করা অনাবশ্যক মনে করি।



মহাত্মা গান্ধী

এ-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, যে, তাঁহার কারামোচনে জাতিগঠনমূলক কার্যে কেহ কেহ অধিকতর অমুরাগী হইবেন। সম্ভবতঃ এ-বিষয়ে অনেকের প্রাণে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে।

অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণকে মহাত্মা জাতিগঠনমূলক

কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারকেরা বহুবৎসর পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়াছিলেন, যে, নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকদের জাতিভেদ প্রথা অমুঘায়ী-অবজ্ঞা ও ঘৃণা দূরীভূত না হইলে আমরা কখনও একজাতি হইতে পারিব না। কিন্তু তাঁহাদের কথায় বেশী লোক কান দেন নাই;—কেন দেন নাই, তাহার আলোচনা এখন করিব না। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে সনাতনহিন্দুধর্মাবলম্বী মনে করেন ও বলিয়া থাকেন। তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে একটি রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করিয়াছেন। তদ্বিত্ত তাঁহার মহৎ চরিত্র, এবং এই বিষয়ে তাঁহার কথা অমুঘায়ী কাজ, সর্বসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এইসকল কারণে, যাহারা কোন কালে সমাজসংস্কারের সমর্থন করিতেন না, তাঁহারাও অন্ততঃ কথায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন। মহাত্মা যদি তাঁহাদের কথায় ও কাজে সঙ্গতি সাধন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হইবে; এবং ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কীর্তি হইবে।

জাতিগঠনের জন্ত এবং রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের নিমিত্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলনও কম আবশ্যক নহে। এই হেতু ইহাও গঠনমূলক কার্যাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পানদোষ নিবারণ ও সংযত ব্যবহার, কার্পাসবৃক্ষ রোপণ, চবুকা, হাতের তাঁত ও খদরের প্রচলন, গ্রামের লোকদিগকে গ্রামের ও দেশের অন্ত লোকদের হিতের জন্ত সংঘবদ্ধ করা, কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ ও কংগ্রেসের অনুমোদিত সকলরকম কাজের অনুষ্ঠান, প্রভৃতি সমুদয় গঠনমূলক কাজে, মহাত্মা গান্ধীর কারামোচনে নূতন উৎসাহ আসিবে বলিয়া আশা করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার

বাংলার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সকলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নিখুঁত ও সর্বাঙ্গীণ, এমন কথা কেহ বলেন না। কিন্তু যেমন আমাদের দৈনিক আহার্য দ্রব্য যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর এবং রন্ধন শ্রেষ্ঠ না হইলেও আমরা নিত্যা আহার করিয়া থাকি, সেইরূপ বর্তমান শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়সকল সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনীয় না হইলেও আমরা সন্তানদিগকে বর্তমান শিক্ষালয়সকলে পাঠাইয়া থাকি। যেমন খাদ্যসংস্কার ও রন্ধন-সংস্কারের প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষাসংস্কারেরও প্রয়োজন। কিন্তু যেমন খাদ্যসংস্কার ও রন্ধনসংস্কার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেহ উপবাসী থাকেন না, বা থাকিবার পরামর্শও দেন না, সেইরূপ শিক্ষাসংস্কারও সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলিতে পারে না।

ছেলেদের পক্ষে যেমন এইসব কথা সত্য, মেয়েদের পক্ষেও তেমনি ইহা সত্য। ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছেলেদের শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান নহে বলিয়া যেমন ছেলেদের শিক্ষা আমরা বন্ধ রাখি নাই; তেমনি ঐ শিক্ষায়তনগুলি মেয়েদের শিক্ষার ঠিক উপযোগী না হইলেও মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলে না। অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যাহা জ্ঞানলাভ, জীবনযাত্রা-নির্ভর এবং চরিত্রগঠনের জন্ত ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান শিক্ষণীয়। তদ্বিন্ন ছেলে বা মেয়েদের বিশেষভাবে শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ও আছে।

মেয়েদেরও যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দরকার, তাহা অল্পদিন পূর্বে পর্যন্তও দেশাচার ও লোকাচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ কাজে বা কথায় স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও চিন্তাশীল লোকেরা এখন নারীদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অস্বভব করিতেছেন।

বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে হিন্দুদেরই শিক্ষায়তন। উহার অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান ডাইন্স-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া দেশাচার ও লোকাচারনিষ্ঠ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি উহার গত

উপাধিবিতরণ সভায় বলেন, যে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীগণ একই শ্রেণীতে একই কক্ষে একই অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করেন; বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ বণিক শ্রীযুক্ত খাটাউ মাকনুজি মহাশয়ের বদান্ধতায় শীঘ্রই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস নির্মিত হইবে, এবং তাহাতে একশত ছাত্রীর স্থান হইবে। দেশের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষায় যথেষ্ট মনোযোগী নহেন বলিয়া মালবীয়া মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন।

নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আর একজন শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের মত উদ্ধৃত করিব। তাহা আরও উৎসাহজনক। কারণ মালবীয়া মহাশয় সম্বন্ধে কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন, যে, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারনিষ্ঠ হইলেও, পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত বলিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। অধিকন্তু, তিনি নারীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী বাঙালী হিন্দুসমাজেরই লোক; পূর্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। গত পৌষ মাসে প্রয়াগে উত্তরভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলেন :—

সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সূদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত ভিত্তি—জননী বঙ্গভূমিতে বিরাট ভাবের বন্যা বহিয়াছে, সেই বন্যার প্রবাহে যে বিরাট বিশ্ববিস্ময়কর বাঙ্গলা-সাহিত্য-সাগর ক্রমেই উদ্বেল ভাব ধারণ করিতেছে, সেই মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্ত উত্তরভারত-প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবভাগীরথী সৃষ্টি করিতে হইবে। উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন ভগীরথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মঙ্গল-শঙ্ক-ধ্বনি করিবার জন্ত ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করিয়াছে—এই শঙ্কর গভীর ধ্বনিতে যদি প্রবাসী বাঙ্গালীর জনয়ে সাড়া পড়ে তবে তাহাই আমাদের নব জাতীয় জীবনের জাগরণ হইবে। প্রবাসে বাঙ্গালীর এই নব জাগরণ যেন কে ল পুরুষের জাগরণেই পরিণত না হয়। জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় জীবন সংস্থাপন করিতে হইলে সর্বাঙ্গে কুলললনাগণের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন একান্ত আবশ্যিক। প্রবাসী বাঙ্গালী কবিই আমাদের প্রথমে শিক্ষাইয়াছেন, প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে তিনিই প্রথমে গাহিয়াছেন—

“না জাগিলে আর ভারত ললনা—

এ ভারত আর জাগে না জাগে না।”

আমার মনে হয় আমাদের এই সাহিত্যসম্মিলনের—এই উত্তর-ভারতের রাজধানী প্রয়াগে বাঙ্গালী মহিলাদিগের জন্ত একটি সর্বাঙ্গসম্মার উচ্চবিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপনই সর্বপ্রথম কার্য হওয়া উচিত। কেবল বৎসরান্তে মিলিত হইয়া সৃষ্টিস্থিত করেকটি প্রবন্ধ পাঠ

বা প্রবণ করিলেই যে আমরা কৃতকৃত্য্য হইতে পারিব তাহা নহে, নূতন করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিবার প্রধান উপকরণ হইতেছে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি। সেই শিক্ষার প্রসার স্ত্রীজাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে হইবে তত শীঘ্র আমরা সর্ববিধ উন্নতির দিকে অধিক বেগে অগ্রসর হইতে পারিব,—ইহাই হইল ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র, ইহা ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমরা এই হীন দশায় পীনিত হইয়াছি। সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

“কস্তাণ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিষড়তঃ”।

—এই মনুবচনে ‘অতিষড়তঃ’ এই পদটির প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করা উচিত।”

শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ এবং সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্তু শিক্ষা বর্জন করিলে বা বন্ধ রাখিলে চলিবে না।

তর্কভূষণ মহাশয় প্রয়াগে বাঙালী মহিলাদিগের জন্ম যে উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, জগৎতারণ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্যক উন্নতিসাধন করিলে তাহাই ঐরূপ শিক্ষালয়ে পরিণত হইবে। উত্তর ভারতীয় বাঙালীগণ ইহার প্রতি মনোযোগী হউন।

অন্ধু জাতীয় কলাশালা

অন্ধু জাতীয় কলাশালার চিত্রশিল্পবিভাগ দেড় বৎসর হইল খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থপের বিষয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার উন্নতি আশাপ্রদ হইয়াছে। প্রথম বৎসরে কলিকাতার প্রাচ্যচিত্রপ্রদর্শনীতে সেখান হইতে ১২খানি ছবি প্রেরিত হয়—সাতখানি ছাত্রদের, বারোখানি অধ্যক্ষের আঁকা। দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহাদের ৩৬খানি ছবি প্রদর্শিত হয়—ছাত্রদের ১২খানি, অধ্যক্ষের ১৭ খানি। দ্বিতীয় বৎসরের ছবিগুলির সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পীমণ্ডলী নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

“তোমার এবং তোমার ছাত্রবর্গের লিখিত চিত্রাবলী দেখিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমরা সকলে দিন দিন তোমার ও তোমার শিষ্যগণের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি।

“তোমার রচিত ‘মনসা,’ ‘ষষ্ঠীমাতা,’ ‘বিশ্বকর্মা,’ ও ‘শ্রীচৈতন্য’ এবারে প্রদর্শনীতে আমাদের ও সাধারণের

নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইল; ইহাতে আমরা নিজেদেরও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।

“তোমার কল্যাণ হোক। বৃদ্ধি লাভ কর। সিদ্ধিরস্ত শিবচাস্ত—মহালক্ষ্মীঃ প্রসীদতু।”

বাঙালী সংখ্যা

বাঙালীর সংখ্যা দুইরকম হইতে পারে। বাংলাদেশে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে বাঙালী বলা যায়; আবার, যাহারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের নিবাস যেখানেই হউক, তাহাদের নাম বাঙালী। কিন্তু বাংলাদেশে এমন অনেক লোক স্থায়ী-বা অস্থায়ী-ভাবে বাস করে, যাহারা জাতিতে বা ভাষায় বাঙালী নহে। অতীতকালে, ইংরেজের শাসন-কার্যের সুবিধার জন্ম যে ভূখণ্ডকে বাংলা বলিয়া চিহ্নিত ও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, প্রাকৃতিক বাংলাদেশ তাহা অপেক্ষা বড়, ও তাহার বাহিরেও বিস্তৃত; এবং বঙ্গের বাহিরেও জাতিতে ও ভাষায় বাঙালী অনেক লোক বাস করে। এইজন্য বাংলা যাহাদের ভাষা, তাহাদিগকেই বাঙালী নামে অভিহিত করা ভাল।

১৯২১ সালের গণনা অনুসারে ভারতসাম্রাজ্যে ৪২২২৪০২৯ অর্থাৎ প্রায় পাঁচকোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলিত। ১৯১১ সালের গণনায় ইহাদের সংখ্যা ৪৮৩৬৭৯১৫ ছিল। অতএব দশ বৎসরে বাঙালীর সংখ্যা ২২৬১৮৪ বাড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, বাঙালীর সংখ্যা শতকরা দুইজনও বাড়ে নাই।

ইংরেজের শাসনসৌকর্যার্থ ভারতবর্ষ যে-সকল প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন্টিতে কত বাঙালী ১৯১১ ও ১৯২১ সালের গণনা অনুসারে ছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি।

বাঙালীর সংখ্যা

প্রদেশ	১৯১১	১৯২১
এডেন	০	০
আসামের মেডোআরা	২২১	৪০২
আগামান নিকোবর	১৬৪৮	১২১৩
আসাম	৩২২৪১৩০	৩৫২৫২২০

প্রদেশ	১৯১১	১৯২১	আঙাঠানে বাঙালীর সংখ্যা হ্রাস সন্তোষের বিষয়।
বালুচীস্থান	০	০	যদি বাঙালী কখনও ঐ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে
বাংলা	৪১৮২২১০	৪৩০৭১৩৩৪	এবং উপনিবেশিক বাঙালীদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে।
বিহার-ওড়িশা	২১৮৬০২০	১৫৬৮১৩৮	তাহাও সন্তোষের বিষয় হইবে। বালুচীস্থানে একজনও
বোম্বাই	১৭৫২	৩৭২০	বাঙালী ছিল না, দেখা যাইতেছে। যে যে প্রদেশে
ব্রহ্মদেশ	২৮৪৩১০	৩০১০৩৯	বাঙালীর উল্লেখ নাই, সেখানে বাঙালী বাস্তবিকই
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৩৮৬	৩৩৯৮	ছিল না, কিম্বা থাকিলেও তাহাদিগকে “অন্যান্য ভাষা”-
কুর্গ	০	০	(other languages) ভাষীদের মধ্যে ফেলা হইয়াছে,
দিল্লী	—	২৬৭১	বলা যায় না। এখন যদি কোন বাঙালী সেখানে থাকেন,
মাদ্রাজ	১১৬৬	১২৮২	তিনি এবিষয়ে কিছু লিখিলে আহ্লাদিত হইব। উত্তর-
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত			পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯১১ সালে কোন বাঙালী
প্রদেশ	০	২১৭	ছিল না, ১৯২১এ সেখানে তাহাদের সংখ্যা ২১৭ কেমন
পঞ্জাব	২১১৬	২০৫৩	করিয়া হইল, তাহা তথাকার কোন প্রবাসী বাঙালী
আগ্রা অযোধ্যা	২২৫০০	২৩১৬০	লিখিলে বাধিত হইব।
আসাম দেশীরাজ্য			১৯১১ সালের গণনার সময় দিল্লী স্বতন্ত্র প্রদেশ
(মণিপুর)	৪৭৪	৭০৩	ছিল না, ১৯২১ সালে ছিল। এইজন্য ১৯১১ সালে
বালুচীস্থান ” ”	০	০	দিল্লীর স্বতন্ত্র উল্লেখ ছিল না। বড়োদায় এখন বাঙালী
বড়োদা ” ”	০	০	আছেন, জানি। কিন্তু ১৯১১ বা ১৯২১ কোন সালেই
বঙ্গ ” ”	৬৬৬৬১৮	৬৯৮০৬০	তাহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন, তথাকার বাঙালীরা
বিহার-ওড়িশা ” ”	১০৮২২৪	৮৮৮৫২	বলিতে পারিবেন। নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদে ১৯১১
বোম্বাই ” ”	০	০	সালে ১২৪ জন বাঙালী ছিলেন, এখনও অন্ততঃ কয়েকজন
মধ্যভারত এজেন্সী	৮২৪	৬৩৬	বাঙালী সেখানে আছেন; অথচ হঠাৎ তাহাদের সংখ্যা
মধ্যভারত দেশীরাজ্য	১৫৪	১৪৮	শূন্যে পরিণত কেমন করিয়া হইল, এ প্রশ্নের
গোয়ালিয়র	—	২৬২	উত্তর হায়দরাবাদপ্রবাসী কোন বাঙালী দিতে পারিবেন।
হায়দরাবাদ	১২৪	০	১৯১১ সালের তালিকায় গোয়ালিয়র রাজ্যের স্বতন্ত্র
কাশ্মীর	০	০	উল্লেখ ছিল না। ১৯২১এ সেখানে ২৬২ জন বাঙালী
মাদ্রাজ দেশীরাজ্যসমূহ	০	০	দেখা যাইতেছে। ১৯১১তে ত্রিবাঙ্কড়ে কোন বাঙালীর
কোচীন	০	০	উল্লেখ নাই, ১৯২১এ ১১২ জন দেখা যাইতেছে।
ত্রিবাঙ্কড়	০	১১২	পঞ্জাবের দেশীরাজ্যসমূহে ১৯১১তে বাঙালীর উল্লেখ
মৈসূর	০	০	নাই, ১৯২১এ তাহাদের সংখ্যা ১২৮।
উ-প সীমান্ত ” ”	০	০	বিহার-ওড়িশায় দশ বৎসরে ৬১৭৮৮২ জন এবং
পঞ্জাব ” ”	০	১২৮	বিহার-ওড়িশার সামিল দেশীরাজ্যসমূহে ২০০৭২ জন
রাজপুতানা এজেন্সী	৬.৯	৬০.৫	বাঙালী কেন কমিল, তাহা জানিতে কোতূহল হয়।
সিকিম	০	০	১৯২১ সালের বিহার-ওড়িশা সেন্সস্ রিপোর্টে ইহার
আগ্রা-অযোধ্যা দেশীরাজ্যসমূহ ১১২		২২৪	কারণ ঘেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য দিতেছি।

পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব-অংশে যে অপভাষা (dialect) কথিত হয়, তাহাকে কিষণগঞ্জিয়া বলে। ৬০৩৬২৩ জন লোক এই ভাষায় কথা বলে। ১৯১১ সালে এই অপভাষাকে বাংলার অপভ্রংশ বলিয়া ধরা হইয়াছিল; ১৯২২-এ উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিষণগঞ্জ মহকুমার সব-ডিবিজন্টাল অফিসারের মতে উহা হিন্দী; এইজন্য উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার মাতৃভাষা সম্ভবতঃ কোনরকমের হিন্দী বা বিহারী, কিম্বা ইংরেজী; হয়ত এই কারণে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ মহকুমার হিন্দীভাষী ও বাংলাভাষীদের দ্বারা ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, মাতৃসাহিত্য-চর্চা, এবং সামাজিক প্রতিপত্তি যত বাড়িবে, তাহাদের ভাষার প্রসারও তত বাড়িবে। এই মহকুমার কথা ছাড়িয়া দিলে, মোটের উপর বিহারে বাংলাভাষীর সংখ্যা সামান্যরকম বাড়িয়াছে। বিহার-ওড়িসায় গণিত অধিকাংশ বাঙালী প্রবাসী বাঙালী নহে। কারণ উহাদের ১৬৫৬৯৯০ জনের মধ্যে ১৫৩০১১১জন অর্থাৎ শতকরা ৯২.৩ জন বঙ্গ ও বিহার-ওড়িসার সীমান্তিত জেলাগুলিতে ও দেশী রাজ্যগুলিতে বাস করে। এইসব স্থান প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, ইংরেজের সুবিধার জন্য বিহার-ওড়িসার সামিল করা হইয়াছে। বিহার-ওড়িসার ঠিক প্রবাসী বাঙালী সওয়া লক্ষ (১২৬৮৮০) লোককে বলা যাইতে পারে। ওড়িসার দেশীরাজ্যসকলে বাংলাভাষীর সংখ্যা কমিয়াছে; ইহার অধিকাংশ হাস ময়ূরভঞ্জে হইয়াছে।

বঙ্গের অবাঙালীর সংখ্যা

বিহার-ওড়িসা এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের এবং আরো কোন কোন স্থানের লোকদের অনেকে মনে করে, যে, বাঙালী তাহাদের দেশ লুটিয়া খাইতেছে। এই ধারণা ভ্রান্ত। বঙ্গের বাহিরে কোথায় কতজন বাঙালী আছে, তাহা উপরের তালিকায় দেখাইয়াছি। এখন নীচের তালিকায় দেখুন, বাংলা ভিন্ন অল্পভাষাভাষী কত লোক বঙ্গে বাস করে। অসভ্য সাহিত্যবিহীন আদিমনিবাসীদের ভাষাগুলি প্রায় সবই বাদ দিলাম।

ভাষা।	ভাষীর সংখ্যা।
আরাকানী	৫৩০২৯
অসমিয়া	৯১৫
ভোটিয়া	১৫২৯৯
ব্রহ্মদেশীয়	১৯৭১৬
পূর্বপাহাড়ী (খাস)	৯২২৯১
মরাঠী	২৬৫১
নেওয়ারী	৮২৩৭
ওড়িয়া	২৯৩৭০০
পঞ্জাবী	৪৯০৪
পশ্চিম (কাবুলী)	১৭৩৪
রাজস্থানী	১৬৫৮৪
সিন্ধী	২৩৪
তামিল	৩৪৮৮
তেলুগু	২৪৫১৩
হিন্দী	১৭৭৫৮৯৮
আরবী	৪৬২
আর্মেনী	১২১
চীন	৪৫০০
হীক	৬২২
জাপানী	৩৭৬
ফারসী	৫৮৬
ইংরেজী	৪৬৩৭৮
ফরাসী	১৩০
গ্রীক	৭১
ইতালীয়	৪৬
পোতুগীজ	২৯৫

আসামে বাঙালী

আসামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। তাহার মধ্যে বাঙালী সওয়া ৩৫ লক্ষের উপর, এবং অসমিয়া-ভাষী সওয়া ১৭ লক্ষের উপর। বাঙালীর সবাই আগন্তুক নহে। বঙ্গের সন্নিহিত জেলাগুলি প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত। খ্রীষ্ট খ্রীষ্টোত্তমদেবের পূর্ব-পুরুষদের পিতৃভূমি ছিল। আসামের যে-সব জেলা

বঙ্গের সন্নিহিত নহে, তাহাতেও বহুসংখ্যক বাঙালী বাস করিতেছে।

ভারত সাম্রাজ্যের বাহিরে বাঙালী

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে পৃথিবীর কোণায় কত বাঙালী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কোন পুস্তক হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। দূর দূর দেশে যাহারা থাকেন, তাহারা ঠিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া বাংলাদেশের কাগজে লিখিলে বাঙালীরা জানিতে পারে।

বঙ্গে আগমন ও তথা হইতে বহির্গমন

১৯২১ সালের মাহুশগুস্তিতে দেখা গিয়াছিল, যে, বঙ্গের বাহির হইতে ১৮,৩৯,০১৬ জন মাহুশ বঙ্গে আসিয়াছে, এবং ৬,৮৬,১৯৫ জন বঙ্গের বাহিরে গিয়াছে। কোন্ প্রদেশ হইতে কত মাহুশ বাংলায় আসিয়াছে, তাহা নীচে দেখান গেল।

প্রদেশ	আগন্তকের সংখ্যা
বিহার-ওড়িশা—	২,২৭,৫৭৯
আগ্রা-অযোধ্যা—	৩,৪৩,০২৫
আসাম—	৬৮,৮০২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৫৪,৮১০
রাজপুতানা—	৪৭,৮৬৫
মাদ্রাজ—	৩২,০২৪
পঞ্জাব ও দিল্লী—	১৭,৭১৫
সিকিম—	৪,০৫৭
ব্রহ্মদেশ—	২,৩৬১
নেপাল—	৮৭,২৮৫
ইউরোপ—	১৩,৩৫৬
চীন—	৩,৮৫৬

বিহার-ওড়িশার কিম্বা আগ্রা-অযোধ্যার বা অন্য কোন প্রদেশের ভাষাভাষী যত লোক বাংলাদেশে আছে, তাহাদের সংখ্যার সহিত ঐ ঐ প্রদেশ হইতে আগত লোকদের সংখ্যা মিলিবে না। কারণ অনেক

অবাঙালীর জন্মভূমি বাংলা, সুতরাং তাহাদিগকে আগন্তক বলিয়া ধরা হয় নাই; কিন্তু ভাষা অনুসারে গণনার সময় তাহাদের ভাষা অনুসারে তাহাদের গুণিত হইয়াছে।

বাংলাদেশ হইতে মাহুশ গিয়াছে—

আসামে—	৫,৭৫,৫৭৮
ব্রহ্মে—	১,০৬,০৮৭
বিহার-ওড়িশায়—	১,১৬,৯২২
আগ্রা-অযোধ্যায়—	১৮,৬৩৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে—	৩,২৭৪
রাজপুতানায়—	৭৭৪
মাদ্রাজে—	৩,৩৪৮
পঞ্জাব ও দিল্লীতে—	৫,২৫০
বোম্বাইয়ে—	৮,৪৭০
সিকিমে—	১,৫৬৬

যাহারা বাংলাদেশ হইতে অন্তর্গত গিয়াছে, তাহাদের সকলকে বাঙালী মনে করিলে ভুল করা হইবে। উপরের তালিকা হইতে কেবল ইহাই জানা যায়, যে, বহির্বা-ত্রীদের জন্মস্থান বাংলা দেশ। তাহাদের মধ্যে কত জন বাঙালী, কতজন নহে, তাহা জানিবার উপায় নাই। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী কতজন আছে, তাহা কেবলমাত্র ভাষা অনুসারে গণনার ফল হইতেই জানা যায়। তাহা আগে এক তালিকায় দেখাইয়াছি।

যাহা হউক, সমুদয় বহির্বা-ত্রীকে বাঙালী বলিয়া ধরিলেও দেখা যায়, যে, বিহার-ওড়িশা, আগ্রা-অযোধ্যা, নেপাল, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, রাজপুতানা, মাদ্রাজ, পঞ্জাব ও দিল্লী, ইউরোপ, বোম্বাই, সিকিম এবং চীনের যত মাহুশ বাংলা দেশে অন্ন করিয়া খায়, তত বাঙালী ঐ ঐ দেশে অন্ন করিয়া খায় না।

ধর্মসম্প্রদায়-সমূহের লোকসংখ্যা

সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে ১৮৮১ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত কোন ধর্মসম্প্রদায়ের শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল।

	শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি (বৃঃ=বৃদ্ধি, হ্রাঃ=হ্রাস।)				
	১৯১১-১৯০১	১৯১১-১৯০১	১৯১১-১৯০১	১৯১১-১৯০১	১৯১১-১৯০১
হিন্দু	হ্রাঃ ১.৫	বৃঃ ৫.০	হ্রাঃ ১.৩	বৃঃ ১০.১	বৃঃ ১৪.৯
আর্যাসমাজী	বৃঃ ৯২.১	বৃঃ ১৬৩.৪	বৃঃ ১৩১.৩
ব্রাহ্ম	বৃঃ ১৬.১	বৃঃ ৩৫.৯	বৃঃ ৩২.৭	বৃঃ ১৬৫.৯	বৃঃ ৪৫৬.৯
শিখ	বৃঃ ৭.৪	বৃঃ ৩৭.৩	বৃঃ ১৫.১	বৃঃ ২.৯	বৃঃ ৭৪.৭
জৈন	হ্রাঃ ৫.৬	হ্রাঃ ৬.৪	হ্রাঃ ৫.৪	বৃঃ ১৫.৯	হ্রাঃ ৩.৫
বৌদ্ধ	বৃঃ ৭.৯	বৃঃ ১৩.১	বৃঃ ৩২.৯	বৃঃ ১০৮.৬	বৃঃ ২৩৮.৫
ইরানীয় (পার্সী)	বৃঃ ১.৭	বৃঃ ৬.৩	বৃঃ ৪.৭	বৃঃ ৫.৩	বৃঃ ১৯.২
মুসলমান	বৃঃ ৫.১	বৃঃ ৬.৭	বৃঃ ৮.৯	বৃঃ ১৪.৩	বৃঃ ৩৭.১
খৃষ্টিয়ান	বৃঃ ২২.৬	বৃঃ ৩২.৬	বৃঃ ২৮.০	বৃঃ ২২.৬	বৃঃ ১৫৫.২
ইহুদী	বৃঃ ৩.৮	বৃঃ ১৫.১	বৃঃ ৬.০	বৃঃ ৪৩.১	বৃঃ ৮১.৩
আদিমজাতীয়	হ্রাঃ ৫.১	বৃঃ ১৯.৯	হ্রাঃ ৭.৫	বৃঃ ৪১.২	বৃঃ ৪৮.৮

১৯১১-২১ দশকে সমগ্র-ভারতে হিন্দুর সংখ্যা কমি-
য়াছে। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সামান্য
বাড়িয়াছে। হিন্দুদের বৃদ্ধি জন্ম দ্বারা হয়, এবং আদিম
নিবাসীদিগকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া হয়। হিন্দুদের হ্রাস
হয়, প্রধানতঃ খৃষ্টিয় ধর্মে দীক্ষার দ্বারা, শিখ ও আর্যাসমাজে
দীক্ষার দ্বারা, এবং কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ
দ্বারা। এইরূপ একটি ধারণা চলিত আছে, যে, হিন্দুদের
জীবনী শক্তি ও উৎপাদিকা শক্তি মুসলমানদের চেয়ে কম।
তা ছাড়া, যেসব প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল, সে-
খানে ১৯১১-২১ দশকে ইন্ডুয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপ
বেশী হইয়াছিল। এইসব কারণে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে।
হিন্দুদের জীবনী শক্তি ও উৎপাদিকা শক্তি কম কিনা,
এবং কম হইলে তাহার কারণ কি, তদ্বিষয়ে হিন্দুদের
গবেষণার প্রয়োজন। বাল্যমৃত্যু এবং চিরবৈধব্য
হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি যথেষ্টরূপ না হওয়ার দুটি কারণ।
মৃত্যুর হারও মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বেশী।
নীচে তাহা দেখান হইল।

হাজারকরা মৃত্যুর হার।

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান।
১৯১১	৩৩.৪	২৯.৫
১৯১২	৩০.৪	২৭.৬
১৯১৩	২৯.০	২৮.৪
১৯১৪	৩০.১	৩০.২
১৯১৫	২৯.১	৩২.০
১৯১৬.	২৯.২	২৮.৩

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান।
১৯১৭	৩৩.৩	৩১.৯
১৯১৮	৬৪.৬	৫৬.১
১৯১৯	৩৬.৪	৩৩.৬
১৯২০	৩১.০	৩০.০

ভারতীয় মুসলমানদের একতৃতীয়াংশ বঙ্গে বাস করে,
এবং তথায় তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর পূর্ব অঞ্চলেই
বেশীর ভাগ বাস করে। তাহাদের পঞ্চমাংশ পঞ্জাবে
বাস করে। মোটের উপর উহা স্বাস্থ্যকর প্রদেশ।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচীস্থানের শতকরা
৯০ জন মুসলমান, কাশ্মীরের বরকম বারো আনা মুসলমান।
এইসব অঞ্চল স্বাস্থ্যকর। অগ্রান্ত প্রদেশে মুসলমানেরা
সংখ্যায় কম, এবং প্রায়ই সহরে বাস করে; সেইজন্য,
শহরে গ্রাম অপেক্ষা চিকিৎসার সুবিধা অধিক থাকায়,
তাহারা এইসব প্রদেশে ইন্ডুয়েঞ্জায় মরিয়াছে কম।
বিধবাবিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, হিন্দুদের
মত খুব অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ হয় না, ইত্যাদি
কারণেও তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হিন্দুদের চেয়ে অধিক
হইয়া থাকে।

জৈনরা অনেকে এখনও আপনাদিগকে হিন্দু মনে
করে, হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করে,
এবং তাহাদের উৎসব পর্বাদিতে যোগ দেয়। গত
কুড়ি বৎসরে জৈন ধর্মের পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা প্রবল
হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় জৈন-
গণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় সেন্সসে
তাহাদের সংখ্যা কম হইয়াছে কিনা, বলা যায় না।
পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের সেন্সস-সুপারিন্টেন্ডেন্টরা এইরূপ
সন্দেহ করেন বটে। হিন্দুদের মত জৈনদের মধ্যে বাল্য-
বিবাহ প্রচলিত ও বিধবাবিবাহ অপ্ৰচলিত। তা ছাড়া,
তাহারা বেশীর ভাগ যেসব প্রদেশে বাস করে, সেই-
সব প্রদেশে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। এইসকল
কারণে তাহাদের ক্রমিক হ্রাস হইতেছে।

ব্রাহ্মদের শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী হইয়াছে। কিন্তু
তাহার কারণ ইহা নহে, যে, বাস্তবিক সংখ্যায় তাহারা
খুব বাড়িয়াছে; প্রকৃত কারণ এই, যে, তাহাদের সংখ্যা

কম, স্বতরাং ২।৪ জন বাড়িলেই শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। যেমন, কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১০ হইতে বাড়িয়া ৫০ হইলে তাহার বৃদ্ধি শতকরা ৪০০ হয়; কিন্তু কোন সম্প্রদায় এক কোটি হইতে বাড়িয়া এক কোটি দশলক্ষ হইলে শতকরা বৃদ্ধি দশ মাত্র হয়। অথচ প্রথম স্থলে মোট ৪০ জন মাত্র লোক বাড়িয়াছে, দ্বিতীয় স্থলে দশ লক্ষ বাড়িয়াছে। আর্ধ্যসমাজীদের সংখ্যা ব্রাহ্মদের চেয়ে অনেক বেশী; কিন্তু হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের তুলনায় তাহাদেরও সংখ্যা খুব কম; সেই জন্ত তাহাদেরও শতকরা বৃদ্ধি ব্রাহ্মদের মত অধিক দেখাইতেছে। ভারত-সাম্রাজ্যে ১৯২১ সালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার তালিকা নীচে দিলাম।

ধর্ম।	লোক সংখ্যা।
হিন্দু	২১৬২৬০৬২০
আর্ধ্য	৪৬৭৫৭৮
ব্রাহ্ম	৬৩৮৮
শিখ	৩২৩৮৮০৩
জৈন	১১৭৮৫২৬
বৌদ্ধ	১১৫৭১২৬৮
পারসী	১০১৭৭৮
মুসলমান	৬৮৭৩৫২৩৩
খৃষ্টিয়ান	৪৭৫৪০৬৪
ইহুদী	২১৭৭৮
আদিমজাতীয়	২৭৭৪৬১১
অজ্ঞাত ধর্মাবলম্বী	১৮০০৪

“ব্রাহ্ম” ও “ব্রাহ্মণ” কথা-দুটির উচ্চারণ একরকম বলিয়া, অনেক ব্রাহ্ম আপনাদিগকে হিন্দু মনে করেন বলিয়া, এবং কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ব্রাহ্মধর্মবিরোধী গণনাকারীরা কম করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া, তাহাদের সেঙ্গসের সংখ্যা নির্ভুল নহে। তাহার কিছু প্রমাণ দিতেছি। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ব্রাহ্মের সংখ্যা মোট চারিজন দেখান হইয়াছে। ইহা হাল্কা কয় ভুল। শুধু বোম্বাই শহরেই আমাদের জানা ব্রাহ্ম ৪ জন অপেক্ষা বেশী আছে। সিন্ধু প্রদেশে অনেক ব্রাহ্ম আছে, অথচ সেঙ্গসে তাহাদের সংখ্যা শূন্য দেখান হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশী মন্তব্য

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিব।

বিলাতের ডেলী মেল বলেন, যে, মিষ্টার গান্ধীকে বিনা সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই; কোনপ্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। ডেলী মেল গান্ধী মানুষটিকে চিনেন না, তাই এমন কথা বলিয়াছেন। মুক্তির পর মহাত্মা তাহাতে উল্লসিত হন নাই—সে কথা পরে বলিতেছি; কিন্তু মুক্তির পূর্বেও যখন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত হাঁসপাতালে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন মুক্তির কথা উঠায় গান্ধী মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, যে, কারা-মোচনের জন্ত কোনপ্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ হওয়ার কথা উঠিতেই পারে না এবং তিনি খালাস পাইলেও গবর্ন-মেন্টের সহিত তাঁহার বর্তমান বিবাদ থাকিবে—অবশ্য যতদিন না স্বরাজ লব্ধ হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের টাইম্‌স্ কাগজ এই কথা তুলিয়াছেন, যে, বুঅর যুদ্ধের পর বুঅর নেতা বোথা, স্মাট্‌স্ প্রভৃতি যেমন ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন, মিষ্টার গান্ধী এখন ইংরেজদের সহিত সেইরূপ সহযোগিতা করিবেন কিনা। এমন কথাটা বিলাতী কোন কাগজ বলিলে তাহা বিশ্বয়ের বিষয় হইত না; কারণ ইংরেজরা সাধারণতঃ আমাদিগকে এরূপ অপদার্থ মনে করে, যে, আমাদিগকে অতি সামান্ত কোন অধিকার দিয়া তাহারা তাহার প্রতিদানে অনন্ত কৃতজ্ঞতা, অপরিমিত বাধ্যতা এবং কায়মনোবাক্যে সহযোগিতার আশা অনায়াসেই করিতে পারে। কিন্তু সকল মানবের সাম্যবাদী আমেরিকানদের মধ্যে কেহ একথা বলিলে আপাততঃ বিশ্বয়েরই উদ্রেক হয়। কিন্তু, কথায় বলে, কোনও ক্রশীয়ের গায়ে একটা আঁচড় দিলেই দেখিতে পাইবে, যে, সে তাতারজাতীয়। সেইরূপ, আমেরিকাবাসী ইংরেজের বংশধররা এবং অজ্ঞাতীয় আমেরিকানরাও সাধারণতঃ অশ্বেত লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। সেই জন্ত বুঅরেরা যুদ্ধের পর কি পাইয়াছিল, এবং আমরা

ভারতশাসনসংস্কার আইন দ্বারা কি পাইয়াছি, তাহা না ভাবিয়া ও তুলনা না করিয়াই নিউ ইয়র্ক্ টাইমস্ ওরূপ প্রস্তুত তুলিয়াছেন। বৃহৎ যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছে। আমরা সমগ্রভারতের সকল রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্তা হওয়া দূরে থাক, কোন একটা প্রদেশের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কর্তৃত্ব লাভ করি নাই। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিকদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সহিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের যখন তুলনাই হয় না, তখন তাহাদের নেতাদের ব্যবহারের সহিত আমাদের নেতাদের ব্যবহারের সাদৃশ্য বা ঐক্য আশা করা উচিত নয়। এরূপ আশা যে করা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, যে, শ্বেতকায়দের মতে শ্বেতকায়েরা যোল আনা অধিকার পাইয়া যেরূপ প্রতিদান করে, ভারতীয়েরা সাড়ে তিন পাই পাইয়াও সেইরূপ প্রতিদান করিতে বাধ্য।

বৃহৎ নেতাদের সহযোগিতাও চমৎকার। ভারতীয়েরা ব্রিটিশসাম্রাজ্যের স্বশাসক অংশগুলিতে গেলে কিরূপ ব্যবহার পাইবে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্ত কমিটি-নিয়োগে আর সবাই রাজী হইল, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি জেনার্যাল্ স্মার্টস্ রাজী হইলেন না—যদিও কমিটি নিযুক্ত হইলেই যে ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র শ্বেতকায়দের সমান অধিকার দেওয়া হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই।

—

মুদ্রার ক্রয়শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার

বহু পুরাকালে মানুষ বেশী ক্রয়বিক্রয় করিত না। যাহা কিছু অল্প ক্রয়বিক্রয় মানুষের প্রয়োজন হইত, তাহা সাক্ষাৎভাবে দ্রব্য বিনিময় করিয়াই চলিত। যথা, চর্মকার অস্ত্রের বিনিময়ে খাণ্ড দ্রব্য অথবা বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইত। সেই সময়ে এইরূপ দ্রব্য বিনিময় করিয়া জীবনযাপন সম্ভব ছিল; তাহার কারণ, মানুষের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সংখ্যা তখন অল্পই ছিল এবং যাহা প্রয়োজন তাহা প্রায় সকলেই নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া লইত। কিন্তু মানুষ ক্রমেই নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি

করিয়া নিজের জীবন জটিলতাময় করিয়া তুলিতে লাগিল এবং ফলে শীঘ্রই প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রস্তুত নানা দ্রব্য আহরণ না করিয়া জীবনযাপনে অক্ষম হইয়া পড়িল। এই অভাবপূরণের ব্যাপার শীঘ্রই এরূপ জটিল হইয়া উঠিল, যে, সাক্ষাৎভাবে দ্রব্য বিনিময় করিয়া তাহার সমাধান অসম্ভব হইয়া উঠিল। যথা, চর্মকার দেখিল, যে, তাহার পক্ষে নিজের সকল অভাব নিজে পূরণ করাও (যথা, চাল, ডাল, তেল, ছুন, জামা, কাপড়, বাসন, ঔষধ, অলঙ্কার, অস্ত্র, ; যন্ত্র, আস্বাব প্রভৃতি সংগ্রহ) যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ চর্মদ্রব্য লইয়া নানা স্থানে চর্মদ্রব্য-গ্রহণেচ্ছুক অপর-দ্রব্য-উৎপাদকের সন্ধান করিয়া তাহাদের নিকটই সাক্ষাৎ বিনিময়ের সাহায্যে নিজ অভাবপূরণও অসম্ভব। সাক্ষাৎ বিনিময়ের অসুবিধার ফলে বিনিময়োপায়ের, অথবা যে-সকল বস্তুর পরিবর্তে সমাজস্থিত সকলেই সকল দ্রব্য দান বা গ্রহণে প্রস্তুত হইবে সেইসকল বস্তুর, সৃষ্টি। মুদ্রা এইসকল বিনিময়োপায়ের ক্রমবিকাশের ফল। মুদ্রার সাহায্যে মানুষ বর্তমানে সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয় করে। যথা শ্রমিক তাহার শ্রম মুদ্রার পরিবর্তে বিক্রয় করে। ইহা মাহিনা নামে পরিচিত। ধনিক তাহার ধন মুদ্রার (স্বদের) পরিবর্তে অপরকে অল্প বা অধিক কালের জন্ত বিক্রয় করে, ইত্যাদি। মুদ্রার কোন যথার্থ মূল্য অথবা নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও চলে; এমন কি বর্তমান কালে বহুক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় সহজসাধ্য করা প্রভৃতি কার্য্য ব্যতীত অল্প কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। অধিক স্থলেই মুদ্রা কাগজখণ্ড মাত্র। ইহা ব্যতীত অল্প অনেক-প্রকার মুদ্রার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা ক্রয়শক্তি অধিক। যথা, একটি রূপার টাকায় যে-পরিমাণ রূপা আছে, সেই পরিমাণ রূপা ক্রয় করিতে এক টাকা অপেক্ষা কম অর্থের প্রয়োজন হয়। মুদ্রার ক্রয়শক্তি তাহার নিজস্ব মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ার কারণ তাহার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা। যদি মুদ্রার সংখ্যা অপ্রতিহতভাবে বাড়িয়া যাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে তাহার ক্রয়শক্তি তাহার যথার্থ মূল্যের সমান

হইয়া দাঁড়াইত। প্রায় সকল দেশেই মুদ্রার সংখ্যার উপর হস্তক্ষেপ করা ও তাহা সীমাবদ্ধ করা হয়। অথবা তাহা সোনার সহিত কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। যথা, মান মুদ্রা (ষ্টাণ্ডার্ড্ কয়েনে) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা থাকিবে, অথবা মান মুদ্রার পরিবর্তে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা মুদ্রক (গবর্নমেন্ট্ অথবা অপর কেহ) দিতে বাধ্য থাকিবেন।

মুদ্রার ক্রয়শক্তির উপরই বলিতে গেলে তাহার মুদ্রাত্ব নির্ভর করে; এবং এই ক্রয়শক্তি ঠিক রাখা বিশেষ শক্ত ব্যাপার। কেননা, শুধু মুদ্রার সংখ্যা ঠিক রাখিলেই তাহার ক্রয়শক্তি ঠিক থাকে না। সমাজে যত ক্রয়বিক্রয় হয়, তাহার তুলনায় মুদ্রার সংখ্যা ঠিক থাকা প্রয়োজন। যথা, অধিক ক্রয়বিক্রয় হইলে অধিক মুদ্রার প্রয়োজন; নচেৎ ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় মুদ্রা কম হইয়া যাইলে তাহার ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাইবে, অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রার মূল্য কমিয়া যাইবে। ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় মুদ্রা অধিক হইয়া গেলে মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় মূল্য বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরিবর্তিত রাখিতে হইলে প্রয়োজনমত মুদ্রার সংখ্যা কমাইতে বা বাড়াইতে পারা প্রয়োজন। মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরিবর্তিত না থাকিলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ লাঘব হয়। যথা, ৫০ টীকা বেতনের কেরানী হঠাৎ দেখিতে পারেন, যে, তাঁহার বেতনের টাকায় আর পূর্বের মত জীবনযাপন সম্ভব হইতেছে না; ব্যবসাদার দেখিতে পারেন, যে, সকল দ্রব্য অকস্মাৎ দুর্মূল্য হইয়া যাওয়ায় তাঁহার চুক্তি রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণসংশয় হইতেছে; অথবা মুদ্রার ক্রয়শক্তি বাড়িয়া গিয়া দেনাদারের সর্বনাশ ও পাওনাদারের পৌষমাস হইতে পারে। মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমিতে সুরু করিলে (অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় মূল্য বাড়িতে সুরু করিলে) বেতনভোগী ও নির্দিষ্ট আয়ের মালিকদিগের অবস্থা বিশেষ খারাপ হয়। এই জাতীয় লোকও সংসারে আছে অনেক। কাজেই মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা সকল দেশেই হয় ও হওয়া উচিত। ইহা

ব্যতীত মুদ্রার ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের সহিত বেতনের পরিমাণের পরিবর্তন চেষ্টাও প্রায় সর্বত্রই হয়। কেবল ভারতবর্ষে এ বিষয়ে চেষ্টা অল্পই হইয়াছে। এমন কি দেখা যায়, যে, সাধারণভাবে সকল দ্রব্যের মূল্য ১৮৭৮ খঃ অব্দে ১৮৭১ খঃ অব্দে অপেক্ষা শতকরা ৫০ বাড়িয়াছিল; কিন্তু বেতনের হার কিছু বরং কমিয়াছিল। ১৮৯২ খঃ অব্দেও সকল দ্রব্যের মূল্য ১৮৭১ খঃ অব্দের তুলনায় শতকরা ৪০ এর অধিক বাড়িয়াছিল। কিন্তু বেতন বাড়িয়াছিল মাত্র শতকরা ১০। যুদ্ধের সময় ও পরেও অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির সহিত বেতনবৃদ্ধির কোন সামঞ্জস্য থাকে নাই। কিন্তু বেতনভোগী প্রভৃতির কষ্টের লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে কে? এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের প্রায় সকল শক্তিই ইংলণ্ডের মুদ্রার সহিত আমাদের দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত বা যতদূর সম্ভব স্থির রাখিবার জন্ত ব্যয় করা হয়। এই আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার জন্ত একটি নির্দিষ্ট পুঁজি বা ফণ্ড আছে। টাকা মুদ্রণের লাভ হইতেই এই পুঁজির সৃষ্টি। ইহার সাহায্যে পাউণ্ডের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার ও টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাউণ্ড দিবার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয়শক্তি অপরিবর্তিত রাখিবার চেষ্টা বিশেষ আমরা দেখি না। তাহার কারণ, দেশাভ্যন্তরস্থিত বাণিজ্য অপেক্ষা ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতি গভর্নমেন্টের অধিক আসক্তি। টাকার ক্রয়শক্তি স্থির রাখিবার চেষ্টা ভাল করিয়া হইলে সম্ভবতঃ এক সঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয়, কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের তাহা হইলে বোধ হয় 'প্রেক্ষিজ্' ও 'পলিসি' বজায় থাকে না।

অ

নোটের মালিকের সম্পত্তি বিক্রয়

ভারতবর্ষে যত নোট আছে, তাহার মালিকগণ পড়িয়া দেখিবেন, যে, নোটের উপর উহার পরিবর্তে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার অঙ্গীকার লিখিত আছে। যথা, ১০ টাকার নোটের উপর লিখিত আছে, যে, ভারত গভর্নমেন্ট্ উহার পরিবর্তে দশ টাকা দিতে প্রস্তুত

আছেন। নোটের স্ববিধা এই, যে, গভর্ণমেন্ট মূল্যবান সোনা রূপা হাতে ঘুরাইয়া নষ্ট না করিয়া, তাহা কোন কেসে ধাক্কাযে একটি কেসে মজুত রাখিয়া, তাহার পরিবর্তে নোট ছাপাইয়া চালাইলে প্রথমতঃ কম ক্ষতি হইবে ও দ্বিতীয়তঃ (যুদ্ধ ইত্যাদি) আকস্মিক প্রয়োজনের সময় সামাজিক ধন-সম্পত্তি একত্র মজুত অবস্থায় পাঠানো যায়। ইহা ব্যতীত সত্যকার সোনা-রূপার পুঞ্জির তুলনায় অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইয়া গভর্ণমেন্ট গোপনে সামাজিক সম্পত্তির উপর ভাগ বসাইতে পারেন ও খুব সহজেই পারেন; কেননা, সকল নোটের মালিক কদাপি একত্রে নোট ভাঙাইতে গভর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত হন না। যথা, ১০০ টাকার নোট চালাইলে ৪০৫০ টাকার সোনা-রূপা মজুত রাখিলেই যথেষ্ট। সচরাচর গভর্ণমেন্ট নোটের টাকা দিবার জন্য রক্ষিত পুঞ্জির অনেকাংশই স্বদ পাওয়া যায় এইরূপ খতে ও কাগজে রাখেন; কিন্তু সোনার পুঞ্জি অক্ষয় রাখার প্রতিও তাঁহাদের নজর থাকে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের অল্পপ্রকার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তাঁহারা এই পুঞ্জির সোনার কতক অংশ বিক্রয় করিতেছেন। যে-পরিমাণ বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে কোন বিপদ আছে কিনা, তাহা আমরা দেখিতেছি না। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন, যে, অল্পে যাহা স্বরূপ হয়, ক্রমে তাহাই অধিক মাত্রায় হইয়া সর্বনাশ করিতে পারে। তাঁহাদের মতে বর্তমানে সোনা বিক্রয় করিলে লাভ আছে। কিন্তু এই সোনা নোটের মালিকের সম্পত্তি, গভর্ণমেন্টের নহে। তাঁহাদের ইহা লইয়া লাভের ব্যবসায় করিবার স্বাভাবিক অধিকার নাই। ইহা ব্যতীত সোনা বিক্রয় এসময়ে আমাদের জাতীয় দিক হইতে নিবৃত্তিভার কার্য। অল্প লাভের খাতিরে নোটের মূল্য বজায় রাখিবার পুঞ্জি কম করিয়া ফেলা স্ববিধা পরিচায়ক নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ড নিকটে কোন তাহার বিশাল সোনার জমাট উল্লেখ করিয়া বিক্রয় করে না? ১৯২০ খৃঃ অব্দে যুক্ত অব ইংলণ্ডের নোট-বিভাগের ১৩০,০০০,০০০ পাউণ্ডেরও অধিক সোনা পুঞ্জি ছিল। সে-সময়ে উহা বিক্রয় করিলে

৬০০,০০০,০০ পাউণ্ডেরও অধিক লাভ হইত। সমস্ত পুঞ্জি যদি স্বদওয়ালা ওয়ার লোনে রাখা যাইত তাহা হইলেও ইংলণ্ডে বাৎসরিক ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড লাভ হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের সেরূপ ইচ্ছা হইত নাই। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে হইতে ইংলণ্ডের সোনার পুঞ্জি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যথা—

১৯১৮	জানুয়ারী	৫০,০০০,০০০	পাউণ্ড
১৯১৯	"	৮০,০০০,০০০	"
১৯২০	"	৯১,০০০,০০০	"
১৯২১	"	১২৮,০০০,০০০	"

১৯২০র জানুয়ারী হইতে ১৯২১ এর জানুয়ারী অবধি সোনা ক্রয়ের খরচ সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু এই সময়েও ৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ডের সোনা ইংলণ্ডে তাহার পুঞ্জিতে যোগ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের মায়ানী নিকের প্রতি মায়ানী অপেক্ষাও অধিক। অতএব আমাদের অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিয়া ধারণা হয়।

খ

ভাড়া মিস্ত্রি লেনিন্

কৃষিয়ার রাষ্ট্রগুরু লেনিনের মৃত্যু হইয়াছে। লেনিন, কৃষিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রধান নেতা ছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে দারুণ বিপ্লবের মধ্যেও কৃষিয়ার আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। অনেককাল যাবৎ ইহা রোগ ভোগ করিতেছিলেন। মাঝে দুই এক বার ইহার ভুল মৃত্যুসংবাদও বাহির হইয়াছিল। লেনিনের মৃত্যুতে কৃষিয়ার একটি অসাধারণ শক্তিমান লোক হারাইল।

লেনিন্ ১৮৭০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তাঁহার স্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজান্ডার বিপ্লববাদী ছিলেন ও ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় তাঁহার ফাঁসী হয়।

ভাড়া মিস্ত্রি লেনিন্ কাজান ইউনিভার্সিটিতে আইন পড়িতে যান, কিন্তু বিপ্লবকারীদের সহিত কারাবাস করার জন্য তাঁহাকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে গমন করেন ও সেখান হইতে আইন পাস করেন। তিনি বেশী দিন

আইনজীবী থাকিতে পারিলেন না। আবার বিপ্লবী-দিগের দলে যোগ দিলেন এবং শীঘ্রই ধৃত হইলেন ও পলায়ন করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন।

১৯০৫ খৃঃ অব্দের বিপ্লবের সময় লেনিন্কে আবার সেন্ট পিটার্সবার্গে দেখা গেল। কিন্তু বিপ্লব সফল না হওয়ায় তিনি অদৃশ হইলেন।

১৯০৬—১৬ এই কয়েক বৎসর লেনিন্ দেশের বাহিরে বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার লিখিত কয়েকটি পুস্তিকার খুব প্রচাব হয়। লেনিন্ আধুনিক বস্তুতন্ত্রবিरोধের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহার দুইখানি পুস্তকে তিনি ভক্তি, ধর্ম ও ধ্যানরসিকদিগকে জনসাধারণের অনিষ্টকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে বাস্তব ঐশ্বর্য্য মানবের উন্নতির সহায়ক, সংহারক নহে।

লেনিনের জীবনে দুইটি জিনিষ ক্রমাগত ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। প্রথম, তাঁহার নিজের লাভ ও কৃতির দিকে দৃষ্টির অভাব ও তাঁহার স্বার্থত্যাগ; এবং দ্বিতীয়, তাঁহার সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তীক্ষ্ণবুদ্ধি। কাহারও কাহারও মতে তিনি নিজের প্রভুত্ব সর্বত্র খাটাইতে চেষ্টা করিতেন; এবং ইহাই নাকি তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল। বস্তুতঃ ইহার পরিচয় তাঁহার জীবনে খুব পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁহার মত ও আচরণের সমালোচনা সংক্ষেপে করা যায় না।

অ

খুনের জন্য দুঃখ প্রকাশ

সেদিন ইংরেজদের একটা সভায় একজন ইংরেজ বক্তৃতা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে, অমুক ভারতীয় নেতা মিঃ আর্নেস্ট ডেব হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন কি? এই লোকগুলার আস্পর্শ ও বেয়াদবির সীমা নাই। তোমাদের স্বজাতীয় কত লোকে যে কত ভারতীয়কে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত খুন করিয়াছে, তাহার জন্য তোমাদের নেতারা কখনও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে?

প্রকাশভাবে দুঃখ প্রকাশ না করিলেই যে খুনের সমর্থন করা হয়, তাহা কোন্ স্মরণশাস্ত্রে বা আইনে বলে?

মহাত্মা গান্ধীর চিঠি

কংগ্রেসের সভাপতি মোলানা মহম্মদ আলীকে মহাত্মা গান্ধী যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, “গবর্নমেন্ট অকালে, আমার পীড়ার জন্য, আমাকে মুক্তি দেওয়ায় আমি দুঃখিত। এরূপ মুক্তি আমাকে সুখী করিতে পারে না, কারণ আমি মনে করি, যে, বন্দীর পীড়া তাহার মুক্তির হেতু হইতে পারে না।”

গান্ধী মহাশয় কোনপ্রকার সর্ভে আবদ্ধ হইয়া মুক্ত হইতে রাজী হইতেন, ইহা কল্পনা করা যায় না; কিন্তু এরূপ অঘটন ঘটিলে, কেবল মাত্র তাহাই আমাদের নিরানন্দের কারণ হইত, সেইজন্য তিনি যে প্রকারে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অসুখী হই নাই, সুখী হইয়াছি। কিন্তু ইহাও বলা দরকার, যে, এই মুক্তিতে আমাদের গৌরব বোধ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি স্বরাজ লাভ করিয়া নিজের শক্তিতে তাঁহাকে কারামুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই গৌরব বোধ করিতাম, এবং তাহাতে আমাদের স্বধের মাত্রাও পূর্ণ হইত।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রমহাত্ম্য, তাঁহার প্রবর্তিত স্বাধীনতা, তাঁহার নির্দোষিতা, ও প্রচেষ্টার স্মাঘ্যতা ও মহত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং তাঁহার কার্য ও উপদেশ যে নিকপদ্রব তাহা বুঝিয়া গবর্নমেন্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও তাহা পূর্ণ আত্মাঙ্গের বিষয় হইত; যদিও এক্ষেত্রেও আমাদের কোন কৃতিত্বগৌরব থাকিত না।

হাসপাতালে এখন তাঁহাকে বেশী লোকে দেখিতে গেলে তাঁহার আরোগ্যলাভে বিলম্ব হইবে। সুতরাং ষাহারা তাঁহাকে শীঘ্র জাতীয় কার্যক্ষেত্রে পুনরবতীর্ণ দেখিতে চান, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা দমন করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছেন। “বন্ধুদের স্নেহের আদর ও উপলব্ধি আমি বেশী করিতে পারিব, যদি তাঁহারা, যিনি যে সার্বজনিক কাজে ব্যাপৃত আছেন, সেই কাজে, বিশেষতঃ চরকায় সূতা কাটিতে, অধিকতর সময় ও মনোযোগ দেন।”

“আমার মুক্তি আমাকে কোন আরাম দিতেছে না।

মুক্তির পূর্বে জেলের নিয়ম পালন এবং দেশসেবার জন্ত অধিকতর উপযুক্ত হইবার জন্ত সাধনা ব্যতীত আমার অন্ত কোন দায়িত্ব ছিল না; কিন্তু এক্ষণে আমি এমন একটি দায়িত্বের বোধে অভিভূত হইতেছি, যাহার অমুখ্যায়ী কার্যনির্বাহের যোগ্যতা আমার নাই। অভিনন্দনের অল্পশ্রু টেলিগ্রাম আসিতেছে। আমার দেশবাসীদের আমার প্রতি স্নেহের যে-সব প্রমাণ আমি পাইয়াছি, এগুলি তাহারই সমর্থক। ইহাতে আমি স্বভাবতঃ সুখ ও সান্ত্বনা লাভ করিতেছি। কিন্তু অনেক টেলিগ্রামে আমার মুক্তির পর আমার দেশসেবা হইতে একরূপ ফললাভের আশা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতেছি। আমার সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে, তাহা করিতে আমি কিরূপ অমুপযুক্ত সেই চিন্তায় আমার মাথা হেঁট হইতেছে।”

তাহার পর তিনি বলিতেছেন, যে, দেশে হিন্দু মুসলমান শিখ্, পারসী খৃষ্টিয়ান্ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মিলন ভিন্ন স্বরাজের কথা কেবল কথা মাত্র—সম্পূর্ণ-ব্যর্থ। “আমরা যদি স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাই, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধনের সৃষ্টি করিতে হইবে। আমার মুক্তিতে ভগবান্কে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন সকলের মধ্যে এক্ষণে পরিণত হইবে কি? কোন চিকিৎসা বা বিশ্রাম অপেক্ষা তাহা আমাকে অধিকতর শীঘ্র সুস্থ করিয়া তুলিবে। জেলে থাকিতে যখন আমি কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমানে মনকসাকসির সংবাদ শুনিয়াছিলাম, তখন আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছিল। যে বিশ্রাম করিবার জন্ত আমাকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, তাহা বিশ্রাম হইবে না, যদি অনৈক্যের বোঝার চাপ আমার হৃদয়ের উপর থাকে। যাহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের সকলকে আমি আমাদের সকলের বাঞ্ছিত এক্ষণে জন্ত সেই ভালবাসা প্রয়োগ করিতে অমুরোধ করি। আমি জানি এক্ষণে সম্পাদন কঠিন কাজ; কিন্তু “আমাদের ঈশ্বরের বিশ্বাস থাকিলে কোন কাজই কঠিন নয়।” আশুন, আমরা আমাদের দুর্বলতা উপলব্ধি করি এবং

তাঁহার শরণাপন্ন হই; তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করিবেন। দুর্বলতা হইতে ভয় জন্মে, ভয় হইতে পরস্পরে অবিশ্বাস জন্মে। আশুন, আমরা উভয়েই ভয় পরিহার করি। কিন্তু আমি জানি, যে, আমরা যদি একজনও ভয় হইতে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের ঝগড়াও থাকিবে। বস্তুতঃ, আমি মনে করি, যে, আপনি কংগ্রেসের সভাপতি থাকিবার সময় সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্ত যাহা করিতে সমর্থ হইবেন, সেই কৃতিত্বের দ্বারাই আপনার কার্যকালের সফলতা নিফলতার বিচার হইবে। আমি জানি আমরা পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসি। এইজন্ত আপনাকে আমার উদ্বেগের অংশী হইবার নিমিত্ত এবং রোগের সময়টা আমাকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মনে যাপন করিতে সমর্থ করিবার জন্ত আপনাকে সাহায্য করিতে অমুরোধ করিতেছি।”

গান্ধী মহাশয় বার্দোলীর গঠনমূলক অমুষ্ঠানাবলিতে অধিকতর বিশ্বাসী হইয়াছেন। চরকাকেই তিনি ক্রমশঃ-বর্ধমান জাতীয় দারিদ্র্য বিনাশের একমাত্র উপায় মনে করেন। আমরাও অন্ততম প্রধান উপায় মনে করি। তিনি বলেন, যে, চরকায় মন দিলে ঝগড়া বিবাদ করিবার অবসর থাকিবে না। “গত দুই বৎসরে কঠোর চিন্তার জন্ত যথেষ্ট সময় ও নির্জনে আমি পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি বার্দোলীর কার্য-ব্যবস্থায় দৃঢ়তর বিশ্বাসী হইয়াছি—জাতিতে জাতিতে এক্ষণে, চরকায় মনোযোগ, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, এবং স্বরাজ্যলাভের উপায় ও স্বরূপ চিন্তা, কথা ও কার্যে অহিংসা ও নিরুপদ্রবতায় বিশ্বাসী হইয়াছি। উক্ত ব্যবস্থা অমুসারে অস্তরের সহিত পূর্ণমাত্রায় কাজ করিলে নিরুপদ্রব অবাধ্যতার প্রয়োজন হইবে না, এবং আমার আশা এই, যে, ইহা কখনও দরকার হইবে না। কিন্তু ইহাও আমার বলা উচিত, যে, নির্জনে প্রার্থনার সহিত চিন্তা করার পর নিরুপদ্রব অবাধ্যতার ফলদায়কতা ও ধর্মসঙ্গততায় আমার বিশ্বাস কমে নাই। জাতীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে এইরূপ অবাধ্যতা করা প্রত্যেক মানুষের ও জাতির কর্তব্য ও

অধিকার বলিয়া আমি এখন যেরূপ বিশ্বাস করি, তদপেক্ষা অধিক বিশ্বাস রাখনও করিতাম না। আমার দৃঢ় ধারণা এই, যে, যুদ্ধ অপেক্ষা এইরূপ অবাধ্যতার অনিষ্টের আশঙ্কা কম; এই অবাধ্যতা সফল হইলে উভয় পক্ষেরই উপকার হয়, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত উভয়েরই ক্ষয়ক্ষতি হয়।

“আপনি কোঙ্গিল প্রবেশ বিষয়ে আমার কোন মত প্রকাশ করিবার আশা অবশ্য করিবেন না—যদিও আমি কোঙ্গিল, আদালত, এবং সরকারী স্কুল বর্জন বিষয়ে মত পরিবর্তন করি নাই।”

তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, যে, যাহারা দেশের মঙ্গলের জন্য কোঙ্গিল-বর্জন আন্দোলন তুলিয়া লইবার পক্ষে মত দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি মত প্রকাশ করিবেন। তিনি মডারেট বন্ধুদের নিকট হইতেও অভিনন্দন পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। “তাঁহাদের সহিত অসহযোগীদের কোন মিল থাকিতে পারে না। তাঁহারাও দেশের হিতৈষী এবং তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অমুদারে দেশের সেবা করেন। আমরা যদি তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত মনে করি, তাহা হইলে কেবল বন্ধুত্ব এবং ধৈর্য্যসহকারে যুক্তি প্রয়োগ করাই তাঁহাদিগকে নিজদলে আনিতে পারিব, গালাগালি দ্বারা মনে। বস্তুতঃ, আমরা ইংরেজদিগকেও আমাদের বন্ধু বলিয়া মনে করিতে চাই, তাঁহাদের সহিত শত্রুত্ব আচরণ করিয়া তাঁহাদিগকে তুল বুলিতে চাই না। আমরা এখন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত যে বিরোধে ব্যাপ্ত আছি, তাহা শাসনপদ্ধতি ও-প্রণালীর বিরুদ্ধে ইংরেজ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নহে। আমি জানি আমরা অনেকে ইহা বুঝিতে এবং এই প্রভেদ সর্বদা মনে রাখিতে সমর্থ হই নাই; এবং যে পরিমাণে আমরা অসমর্থ হইয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের ঈর্ষিতার কতি করিয়াছি।”

মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ

স্বরাজ্য দল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদের প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটি প্রস্তাব

উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উহার প্রেসিডেন্ট মিটার কটন উহা উপস্থিত করিতে দিতে রাজী হন নাই। মাদ্রাজের ও মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায়ও এই প্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে গবর্নমেন্টের পরাজয় হইয়াছিল। সেইজন্য এখন ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাবলীর মানে বদলিয়া গেল! যাহা হউক, যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ও তথায় বক্তৃতা করিবার কষ্ট স্বীকার সার্থক মনে করেন, কটন সাহেবের ব্যাখ্যাটা ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার উপায় থাকিলে তাহা করাও তাঁহাদের কর্তব্য।

আনন্দ-উৎসব ও কঠোর কর্তব্য

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, বড় বড় সভার অধিবেশন, নগরসংকীর্ণন, দীপমালায় নগর ও গ্রামের শোভা সম্পাদন প্রভৃতি হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু উল্লাসের উত্তেজনা ধামিয়া গেলে যে অবসাদ আসিবে, তাহার প্রতিকার কি করা হইতেছে? কলিকাতার এক সভায় বিদেশী বস্ত্র দাহও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশী বস্ত্র উৎপাদনে ও ব্যবহারে ত এরূপ কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। আনন্দ-উৎসব অনাবশ্যক কিম্বা অনিষ্টকর নহে, কিন্তু তাহা বার্দোলীর গঠনমূলক ব্যবস্থা-পালনের স্থান অধিকার করিতে পারে না।

ভূতপূর্ব রাষ্ট্রনায়ক উইলসন

মহাযুদ্ধের সময় যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, সেই প্রেসিডেন্ট উইলসনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইউরোপের মহাশক্তিপুঞ্জের মত নিজ রাজ্যবৃদ্ধির কুমতলব লইয়া আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। উইলসন জাতিতে জাতিতে সেইরূপ ব্যবহার স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, যেরূপ ব্যবহার সভ্য মানুষ কোন সভ্য রাষ্ট্রে করিয়া থাকে। সভ্য দেশে একজনের সহিত আর এক জনের বিবাদ হইলে তাহারা মারামারি না করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় লয়। জাতিতে জাতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ হইলেও যাহাতে

যুদ্ধ না হইয়া আন্তর্জাতিক আদালতে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিবাদ ভঞ্জন হয়, উইল্ফন তদনুরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষুদ্র বা অল্পমত বা অসংঘবদ্ধ জাতিদিগকে প্রবল জাতির নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহা হইতে পদানত কল্পিয়া রাখিতে না পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থাও তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীব্যাপী হউক, ইহা তাঁহার হৃদয়ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। সমুদ্রে সকল সময়ে সকল জাতি যাহাতে অবাধে বাণিজ্য-জাহাজ চালাইতে পারে, তিনি একরূপ নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তর্জাতিক আদর্শকে তিনি বাস্তবে পরিণত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, উহা এখনও স্বপ্নবৎ অবাস্তবই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বপ্নেরও মূল্য আছে; উহা মানুষকে বাস্তবের দিকে লইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রবলের সামরিক দৃষ্টির দিনে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শ্রায় ও মানবিকতার আদর্শ স্থাপন করিতে যিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, মানবজাতি তাঁহার মিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

লর্ড্ রেডিঙের ভ্রুকুটি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রাক্কালে মিঃ রাম্‌সে ম্যাকডোনােল্ডের নিকট হইতে মাস্ত্রাজের “হিন্দু” কাগজের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা এক বাণী বা সন্দেশ (মেসেজ্) আদায় করেন। তাহাতে ম্যাকডোনােল্ড মহাশয় অস্তান্ত কথার মধ্যে বলেন, যে, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া ভারতীয়েরা কোন অধিকার আদায় করিতে পারিবে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান বৎসরের অধিবেশনের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় লর্ড্ রেডিঙও বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের ইচ্ছা এবং বিচারের বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষকে শাসনসংস্কার দিতে অস্বীকার করিবে। আমরা বলি, ভয় না পাওয়াটা ব্রিটিশ জাতিরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; ভারতবর্ষের লোকেরাও মনে করিতে পারে, যে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের সঙ্কল্পিত কার্য-পদ্ধতি হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে; তাহারাও ভয়ে নিরস্ত হইতে মারাজ হইতে পারে।

আর, ব্রিটিশ জাতির মোড়লেরা যে বার বার বলিয়া থাকেন, “আমরা ভয়ানক না, আমরা ভয়ানক না,” ইহাতেই কি অন্তর্নিহিত ভয়ের আভাস পাওয়া যায় না? ব্রিটিশ জাতি ভয়ে কখন কিছু করে নাই, ইহাও সত্য মর্মে। দূর অতীতের ইতিহাস ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, এই সেদিন কেনিয়ার কয়েক হাজার শ্বেত ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা তৎকাল ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের সহকে স্ফায়া ব্যবস্থা করিতে পারিল না। অবশ্য আমরা একরূপ মনে করি না, যে, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কয়েক হাজার শ্বেত ঔপনিবেশিকের বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রীসভার এই ভয় ছিল, যে, কেনিয়ার ঐ শ্বেত ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে গোরার সৈন্য পাঠাইলে গোরারা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহৎ ও ব্রিটনেরা কেনিয়ার ঔপনিবেশিকদের সহিত যোগ দিতে পারে।

আয়ারল্যান্ডের আল্‌ষ্টার প্রদেশবাসী ইংরেজরা আই-রিশ্ স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে; তাহারা পুনঃ পুনঃ বলে, যে, তাহাদিগকে আই-রিশ্দের সহিত যুক্ত করিতে চাহিলে তাহারা বিদ্রোহ করিবে। বিদ্রোহের জন্য তাহারা কাসনের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং সৈনিকদিগকে যুদ্ধশিক্ষাদানও করিয়াছিল। ফলে, আল্‌ষ্টার এখনও আয়ারল্যান্ডের অবশিষ্ট অংশ হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে।

অতএব, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করা যায়; কিন্তু, ইহা অবশ্য স্বীকার করা যায়, যে, যাহারা ভয় দেখায়, তাহারা ইংরেজ জাতীয়, অন্ততঃ শ্বেতকায়, হইলে নিশ্চিত ফললাভের সম্ভাবনা আছে, অতএব ভয় দেখাইলে ফললাভ না হইতেও পারে।

ভারতবর্ষের লোকেরা, কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন গণনার যোগ্য দল, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই ধারণাটাই ভুল। বাংলাদেশে যে ছুঁকটা রাজনৈতিক ধুন হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে দল থাকিলেও, তাহা বঙ্গের অল্পসংখ্যক পশ্চাত্ত বিপ্লবী দলের মত প্রভাবশালী নহে। শেষোক্ত

বিপ্লবীদের মধ্যে খুব বৃদ্ধিমান ও কৰ্মিষ্ঠ লোক ছিল, এবং তখন দেশের বিস্তর লোকের তাহাদের সহিত সহায়ত্ব ছিল। এখন যদি দল থাকে, তাহার লোকসংখ্যা কম, পূৰ্বেকার দলের মত মানুষও ইহাদের মধ্যে নাই; এবং আগেকার বিপ্লবীদের কার্য-কলাপের পরিণাম দেখিয়া দেশের লোকদের মধ্যে তাহাদের বিপ্লবাত্মক মতি ছিল তাহাদেরও এ বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, যে, বোমা ও রিভলভার দ্বারা খুন করিয়া দেশ স্বাধীন হইতে বা কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারিবে। অতএব হনন বা তদ্রূপ কোন উপদ্রব দ্বারা ভারতীয়েরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করিতে চায়, ইহা ভুল ধারণা।

কিন্তু ইহা সত্য, যে, ভারতীয়দের মধ্যে মডারেটরাও এখন আর বিশ্বাস করে না, যে, ব্রিটিশ জাতির শাসন-বোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই রাষ্ট্রীয় শক্তি পাওয়া যাইবে। মডারেট নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার বাঙ্গালোরের বক্তৃতায় বলিয়াই দিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ জাতির শাসনবোধকে জাগাইতে হইলে আরও দু' একরকমের বোধও যা মারা দরকার, দেখান দরকার যে তাহারা শাসন কাজ না করিলে তাহাদের কি ক্ষতি বা অসুবিধা হইতে পারে; তাহা হইলে নানা "বোধ" মিলিত হইয়া ব্রিটিশ জাতিকে সুবুদ্ধি করিতে পারে।

ব্রিটিশ পালেমেন্টে যখন যে দল প্রবল হয়, তখন তাহারাই হয় গবর্নমেন্ট। এই দলের নিকট কাজ আদায় করিতে হইলে অবস্থান্তরে অহুসারে কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিতে হয়। একটা প্রণালী হইতেছে অবস্ট্রাকশন বা বাধা প্রদান। আইরিশ নেতা পানেল ইহার ওস্তাদ ছিলেন। ইহা একটা কনস্টিটিউশনাল বা বৈধ উপায়। ভারতবর্ষের স্বরাজ্যদল এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইহাতে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে বা নাও পারে। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড বা রেডিং ইহাকে একটা ভারি গর্হিত পদ্ধতি বলিয়া ভারতীয়দিগকে বুঝাইতে কেন বুঝা চেষ্টা করিতেছেন? কেন বুঝা ভয় দেখাইতেছেন, যে, ঐ পদ্ধতি পরিত্যক্ত না হইলে, উহা সমগ্র-ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে অহুসৃত

হইলে, শাসনসংস্কারের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিস্তার বাধা পাইবে? পৃথিবীর সর্বত্র রাষ্ট্রীয় মত যেক্রমে হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষেও আর পিছাইতে পারিবেন না, অগ্রসর হইতেই হইবে। এবং ভারতবর্ষের লোকেরা এখন আর ব্রিটিশ জাতির কৃপার, মর্জির, বা হায়বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের সংঘবদ্ধ একতা, সাহস ও শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে। এখন তাহারা ভয়ে পশ্চাৎপদ হইবে না। কিন্তু তাহারা, ধর্মবুদ্ধির প্রেরণাতেই হউক, কিম্বা সুবিচার-নির্দিষ্ট নীতির অহুসরণেই হউক, কিম্বা উভয় কারণেই হউক, উপদ্রব ও হিংসার পথে যাইবে না; অন্য উপায়ে ব্রিটিশ জাতিকে সুবুদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।

শ্রী ম্যাক্‌কম্ হেলীর বক্তৃতা

ভারতবর্ষে সত্তর পূরা দায়ী গবর্নমেন্ট বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসক অংশগুলির মত গবর্নমেন্ট স্থাপন করিবার জন্য প্রারম্ভিক কাজ করিবার নিমিত্ত অহুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রথম দিন কিছু বক্তৃতা হইয়া আলোচনা স্থগিত আছে। বুধবার ১লা ফাল্গুন আলোচনা আবার চলিবে। গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে শ্রী ম্যাক্‌কম্ হেলী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি দায়ী গবর্নমেন্ট এবং কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির মত স্বশাসক গবর্নমেন্টের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট দায়ী গবর্নমেন্ট দিতে চাহিয়াছেন, ডোমিনিয়নগুলির মত গবর্নমেন্ট নহে, যদিও তাঁহার মতে প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টিতে ক্রমে পৌছান যাইতে পারে। এই প্রভেদের বিচার না করিয়া আপাততঃ হেলী সাহেবের অন্য দু' একটা কথা উল্লেখ করি।

তিনি অনেক ভারতীয় নেতার মত উদ্ধত করিয়া বলেন, যে, তাঁহারা কেহ দশ কেহ পনের বৎসর পরে, এবং সকলেই ক্রমে ক্রমে, দায়ী গবর্নমেন্ট লাভে রাজী ছিলেন; তবে এখন কেন শীঘ্রই উহা চাওয়া হইতেছে? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। আমরা

ভারতীয় নেতাদের উক্তি এই অর্থ বুঝিয়াছিলাম, যে, “গবর্নমেন্ট্ বলুন দশ বা পনের বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী গবর্নমেন্ট্ স্থাপিত হইবে, তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।” কিন্তু গবর্নমেন্ট্ কখনও এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই, এখনও দিতেছেন না। তাঁহাদের “গবর্নমেন্ট্ অব ইণ্ডিয়া গ্যাক্ট” নামধেয় আইনেও এরূপ প্রতিশ্রুতি নাই। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কেবল এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে, যে, নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির আরম্ভ হইতে দশ বৎসর পরে পালেমেন্ট অনুমোদন করিবেন, যে, ভারতবাসীরা অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার যোগ্য হইয়াছে কিনা। যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহারা আরও কিছু পাইবে, নতুবা পাইবে না—এমন কি যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা কাড়িয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। ভূতপূর্ব অন্যতম প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্ ত বলিয়াই-ছিলেন, যে, ইংরেজপূর্ণ সিবিল্ সার্ভিস্ রূপ ইম্পাতের কাঠামো ভারতবর্ষকে চাঙ্গা রাখিবার জ্ঞা চিরকালই থাকিবে।

অতএব হেলীর যুক্তিটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে—
“তোমরা বলিয়াছ যে তোমরা, ক্রমে ক্রমে, দশ বা পনের বৎসরের অবসানে, দায়ী গবর্নমেন্ট্ পাইলে সন্তুষ্ট হইবে; অতএব তোমরা তোমাদের সেই কথার দ্বারা সত্যবদ্ধ আছ ও থাকিতে বাধ্য; কিন্তু আমরা কখনও কথা দিই নাই, এবং দিবও না যে আমরা দশ বা পনের বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী গবর্নমেন্ট্ স্থাপিত করিব।” কিন্তু চুক্তি ত কখন একতরফা হয় না। ইংরেজ যদি প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহা হইলে আমরাও চুক্তিবদ্ধ থাকিতাম। কিন্তু তাঁহারা কোন প্রতিশ্রুতিই দিবেন না, আর আমরা ১৫ বৎসর ইঁ করিয়া বসিয়া থাকিব, ইহা হইতে পারে না।

দেশের নেতারা দেখিতেছেন, যে, দেশ নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী লোকেরা বুদ্ধিমান এবং নিজেদের স্বার্থ বুঝে, এবং দেশে অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর লোকের রাষ্ট্রীয় বোধ জন্মিয়াছে। সুতরাং যদিই আমরা ১০।১৫ বৎসরের মিয়াদে আগে সন্তুষ্ট হইবার কথা বলিয়া থাকি, তাহা এখন ভ্রম বলিয়া বুঝিতেছি।

এখন আমরা তাহা অপেক্ষা শীঘ্র জাতীয়-আত্মকর্ষণ চাই।

হেলী বলেন, দায়ী গবর্নমেন্ট্ চাহিলেই ত প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। দেশী রাজ্যসমূহ, ইউরোপীয় বণিক, সামরিক ও অসামরিক চাকুরিয়া-সম্প্রদায় (অর্থাৎ সার্ভিসেজ্), সংখ্যায় কম নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়, প্রভৃতির সম্মতি লইতে হইবে। চমৎকার কথা! ইংরেজ গবর্নমেন্ট্ যত রকম আইন, নিয়ম, সন্ধি, যুদ্ধ, প্রভৃতি করেন, তাহাতে ইহাদের সকলেরই মত লইয়া থাকেন কি? দেশী রাজ্যসকল সঙ্ক্ষে যে-সব কাজ বা ব্যবস্থা করেন, তাহাতে ব্রিটিশ ভারতের লোকদের মত লওয়া হয় কি? তাহাতে হয় না। সুতরাং আমাদের সঙ্ক্ষে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার বেলায় দেশী রাজ্যগুলির অসম্মতির বাধা কেন উত্থাপন করা হইবে? দেশীরাঙ্গারা ত এরূপ বিষয়ে ইংরেজের হাতের পুতুল হইবেই; তাহাদিগকে যেমন নাচিতে বলা হইবে, তাহারা সেইরূপ নাচিবে। ইংরেজ বণিক এবং ইংরেজ চাকুরিয়ারা ত বর্তমান সামান্য অধিকার ভারতীয়রা পাওয়াতেই অসন্তুষ্ট; আমাদের আরও অধিক অধিকার পাওয়ার বিপক্ষে তাহারা হইবেই। সংখ্যায় কম সম্প্রদায়ের কতকগুলো লোককে ইংরেজের মতানুবর্তী করাও খুব সহজ। অতএব, হেলী যে-সব লোকের সম্মতিক্রমে আমাদের দায়ী গবর্নমেন্ট্ প্রাপ্তির কথা তুলিয়াছেন, তাহাদের সকলের সম্মতি কলিযুগে হইবার সম্ভাবনা নাই।

তাহার পর হেলী দেশরক্ষার কথা তুলিয়াছেন। ‘ডোমিনিয়ন্-পদবীর মানে ডোমিনিয়ন্গুলির মত সৈন্ত-দল।’ হেলী জিজ্ঞাসা করেন, ফৌজের সকল শাখার সফল শ্রেণীতে ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা চালিত ভারতীয় সৈন্তদল আছে কি? এই প্রশ্নের মধ্যে যে গুণকারণজনক ভণ্ডামি রহিয়াছে, তাহা একেবারেই অসম্ভব। কোম্পানীর আমলেও ভারতীয় সৈন্ত ও ভারতীয় অফিসার ফৌজের যে-সব শাখায় ও শ্রেণীতে ছিল, এখন তাহা নাই। দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরঞ্জ রাখা হইয়াছে। ভারতবাসীরা যে সামরিক নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেটা কি তাহাদের দোষ, যে তাহা-

দিগকে সেই ওজুহাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাও ? ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যদি শীঘ্র শীঘ্র ভারতীয়দিগকে ফোর্ডের সকল শাখার ও বিভাগের কাজ শিক্ষাইয়া ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম দলের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে-বুদ্ধিতাম, হেলীর কথাটার মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর-কিছু আছে—সারবান্ কিছু আছে।

বক্তৃতার শেষে হেলী বর্তমান শাসনপ্রণালীর দোষ-ক্রটি কিছু আছে বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, এবং গবর্ণমেন্ট তাহা সংশোধনের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণ-মেন্টগুলির মত লইতে ও তদন্ত করিতে প্রস্তুত আছেন, বলেন। এই রূপাকটাকের জন্য বহু বহু ধন্যবাদ।

রেডিং রাজবন্দীদের কাগজ দেখিবেন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় লর্ড রেডিং তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে মাহুসকে বন্দী করার সমর্থন মামুলী যুক্তি দ্বারা করিয়া এই আশ্বাস দেন, যে, তিনি নিজে সব কাগজপত্র দেখিবেন। আমরা ইচ্ছাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। তিনি ইংলণ্ডের খুব বড় একজন আইনজীবী ছিলেন, তথাকার প্রধান প্রান্ত বিবাক হইয়াছিলেন। তিনি জানেন, যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং বা উকীল দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন বা আরোপিত দোষ কালনের প্রকাশ সুযোগ না দিলে সুবিচার হয় না বলিয়াই সকল সভ্য দেশে বর্তমান বিচার-প্রণালী প্ররম্ভিত হইতেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও তাহার পক্ষের আইনজীবীর অদাক্ষাতে প্রমাণ পরীক্ষা দ্বারা ঠিক সত্যনির্ণয় হইতে পারে না। এই কারণে, আমরা মনে করি, লর্ড রেডিং গোপনে এক তবুফা কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে রাজী হইয়া নিজের অসম্মান নিজেই করিয়াছেন।

শাস্তি শৃঙ্খলা ও আইনের মর্যাদা

গবর্ণমেন্ট যখনই কোন “বেআইনী আইনের” বলে লোকদের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখনই বলেন, আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, দুর্বৃত্ত মোক-

দিগকে দণ্ড দিতে হইবে, ইত্যাদি। লর্ড রেডিং ও তাহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আমরা বলি, তথাক্ত; কিন্তু কে যে দুর্বৃত্ত, কে যে আইনের মর্যাদা, শাস্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতেছে, তাহা সত্য-রীতি অনুসারে বিচার দ্বারা স্থির করা হউক, তাহার পর যত ও যেরূপ দণ্ডকার শাস্তি দেওয়া হউক।

আর-একটা কথা এই, যে, সাধারণ আইন, বে-আইনী আইন, বিচারপূর্বক শাস্তি, বিনাবিচারে শাস্তি, ডায়ারী কাণ্ড, চরমনাইরের আত্মরিক ব্যাপার, এসব জ-বহুকাল হইতে আছে ও চলিতেছে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও শাস্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের মর্যাদা লোকে ভঙ্গ করিতেছে। এ অবস্থায় শাস্ত নীতির সমর্থকেরা অবশ্য বলিবেন, গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট শক্ত হন নাই, আরও বল-প্রয়োগ করুন, তাহা হইলেই সব খামিয়া যাইবে। তদন্তক্রে-জিজ্ঞাস্ত এই, রুশিয়ায় সাম্রাজ্যের আমলে যেরূপ শাস্ত নীতির প্রয়োগ হইয়াছিল, আয়ারল্যাণ্ডে বহু বৎসর ধরিয়া যেরূপ আত্মরিক ব্যাপার চলিয়াছিল, তাহা যথেষ্ট কিনা ? কিন্তু রুশিয়াকে সম্রাট বলপ্রয়োগে ঠাণ্ডা করিতে পারেন নাই; নিজেই সবংশে নষ্ট হইয়াছেন এবং সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে। আয়ারল্যাণ্ডকেও ইংরেজ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে বধ্য হইয়াছেন। ইতিহাসের এইসকল কাহিনী আলোচনা করিয়া আমা-দের এই ধারণা হইয়াছে, যে, আত্মরিক শাস্ত নীতির অনুসরণ জনগণ করিলে তাহা যেমন দোষ, শাসকেরা করিলেও তাহা সেইরূপ দোষ। দুর্বৃত্তের শাস্তি অবশ্য হওয়া চাই—বিচারের পরে হওয়া চাই। কিন্তু মাহুস কেন আইনভঙ্গ করে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিঘ-বৃক্ষের মূল নষ্ট করাও চাই। শাসকেরা যদি বলেন, আমরা কেবল বলের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় ব্যাধির প্রতীকার করিব, তাহা হইলে তাহাদের চেষ্টা ত ব্যর্থ হইবেই, অধিকন্তু প্রতিক্রিয়ার নিয়মে ইহা অল্প পক্ষের মনেও বলের উপাসনার চিন্তা আনিয়া দিতে পারে।

বন্দী ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক বন্দী ও রাজ-বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব এবং নিগ্রহ আইন রদ করিবার প্রস্তাব দাখ্য হওয়ার সবুকার পক্ষ ও

বেসরকারী ইংরেজ পক্ষ হইতে প্রস্তাব হইয়াছে, যে, গবর্নমেন্ট এইসকল প্রস্তাব অমুসারে কাজ করিলে প্রস্তাবক ও সমর্থকগণ কি এরূপ কথা দিতে পারেন, যে, দেশে রাজনৈতিক খুনখারাবী আর হইবে না? তাহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, ঐ-সব প্রস্তাব অমুসারে কাজ করিতে না বলিয়া যদি আমরা গবর্নমেন্টকে বলি, “আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করুন; কিন্তু তাহা হইলে আপনারাই কি দেশে রাজনৈতিক খুনখারাবী ডাকাডাকী হইবে না বলিতে পারেন?” বস্তুতঃ দেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক, এবং শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা ও ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে, পুলিশের গুপ্তচরদের প্ররোচনা থাকিবে, অথচ কোন উপদ্রব ঘটবে না, এমন প্রতিশ্রুতি কেহ দিতে পারে না। নাম করিয়া দু’দশজনের কথা বলিলে বরং বলা যায়, যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সচাচরণের জন্ত দায়ী হইলাম, কিন্তু কোটি কোটি লোকদের মধ্যে কেহই নিজের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ছবুন্ধি বা উত্তেজনার বশে কিম্বা অপরের প্ররোচনায় আইনভঙ্গ করিবে না, এরূপ কথা দিবার ক্ষমতা কোন মানুষের নাই, অতিমানব কেহ থাকিলে তাহার কথা স্বতন্ত্র।

ইহা আমরা স্বীকার করি, যে, আমাদের মত সাধারণ লোকদের এবং নেতাদের—সকলেরই দেশকে নিরুপদ্রব ও অহিংস করিবার চেষ্টা করা উচিত। মহাত্মা গান্ধী খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট তাঁহাকে দু’বৎসর জেলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন! তা ছাড়া, চর মনাইরে যেরূপ কাণ্ড ঘটাইয়াছে, সেরূপ কাণ্ডে মরা মানুষেরও রক্ত গরম হয়। সরকার পক্ষ হইতে এবিষয়ে যথেষ্ট প্রতিকার-চেষ্টা হয় নাই।

হিন্দু মহাসভা

প্রমাণে গত ২০শে মাঘ হইতে হিন্দু মহাসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অভি-ভাষণে বলেন, যে, অস্পৃশ্য জাতিদিগকে সমাজে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দিবার সময় আদিয়াছে। খবরের

কাগজে এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পড়িয়া বুঝা গেল না, যে, মালবীয়াজীর মতে এই যথাযোগ্য স্থানটি কি। “অস্পৃশ্য” জাতির লোক খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান হইলে ঠিক অস্পৃশ্য খৃষ্টিয়ান বা মুসলমানদের মত “স্পৃশ্য” ও “আচরণীয়” হয়; সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, ধর্ম্মাহুষ্ঠানে, ভগবদারাধনায় তাহাদের স্বধর্ম্মী অস্পৃশ্য লোকদের সমান অধিকার ও স্থান হয়। সুতরাং হিন্দু সমাজের নেতারা যদি মনে করেন, যে, “অস্পৃশ্য”রা তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত সামান্য কিছু পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহারা মহাত্মা পণ্ডিত হইয়া আছেন। ধর্ম্মবুদ্ধি বলে, “অস্পৃশ্য”দিগকে পূরামাত্রায় মানুষ বলিয়া গণ্য কর; সাংসারিক বুদ্ধিও বলে, তাহাদিগকে পূরামাত্রায় মানুষ বলিয়া গণ্য কর। তাহা না করিলে হিন্দু সমাজ অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

মহাসভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে বর ও কন্যার বিবাহের বয়স বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ন্যূনতম বয়স কত ধার্য হইল জানিতে পারি নাই। কন্যার বয়স অস্তুতঃ যোল হওয়া উচিত।

“অস্পৃশ্যেরা” সাধারণ সভায় স্থান পাইবে, যে-সব স্কুলে অহিন্দু বালকবালিকারাও পড়ে সেখানে স্থান পাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। কিন্তু যেখানে কেবল হিন্দু বালকবালিকারা পড়ে, সেখানে কি তাহারা পড়িতে পাইবে না? দেবমন্দিরের মালিকদিগকে এই-রূপ অমুরোধ করা হইয়াছে, যে, তাঁহারা যেন “অস্পৃশ্য”দিগকে বিগ্রহ দর্শনের যথাসম্ভব সুবিধা দেন। হিন্দুব্যতীত অস্পৃশ্য লোকেরা নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সাক্ষাৎ ভগবদারাধনার অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন; তাহার তুলনায় মহাসভার অমুরোধ অকিঞ্চিৎকর। আজকালকার দিনে অমুরোধে সন্তুষ্ট হই বা থাকিবে কে এবং কতদিন? এখন সব মানুষই মানবিক অধিকার চাহিতেছে, এবং তাহা গ্রাহ্য, স্বাভাবিক ও ধর্ম্মসঙ্গত।

মহাসভা সর্বসাধারণকে অমুরোধ করিয়াছেন, যেন “অস্পৃশ্য”গণের জল আহরণের কষ্ট দূর হয়, এবং আবশ্যিক হইলে তাহাদের জন্ত আলাদা কূপের বন্দোবস্ত যেন

করা হয়। বাতাসটাকে একচেটিয়া করিবার ক্ষমতা মানুষের না থাকায় ভালই হইয়াছে। তথাপি এবিষয়েও মানুষ যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছে। অশুভ্যুপশ্রা অস্ত্র-পুত্রিকাগণ বিশুদ্ধ বাতাস ততটা পান না, যতটা পুরুষেরা পায়। অনেক অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর স্থান-সকলে বাস করিতে বাধ্য হয়। তথাকার বাতাস ভাল নয়।

হিন্দু ধর্মের মতসকলে বিশ্বাস করিলে যে-কোন অহিন্দু হিন্দু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রচলিত ব্রাহ্মণাদি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না, স্থির হইয়াছে। ইহাও মন্দের ভাল, কিন্তু সম্ভ্রামজনক নহে। বাংলা দেশে খ্রীষ্টোত্তম এইসব লোকের স্থান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাখিয়াছিলেন।

মহাসভা “অশুভ্যুপশ্রা”দের উপবীত ধারণ, তাহাদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাহাদের সহিত একত্র ভোজনের বিরোধী। কিন্তু সবগুলিই ত চলিতেছে। বেদ ছাপা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহা হিন্দুর সব জাতি এবং নানা দেশ মহাদেশের অহিন্দুরাও উচ্চারণ করিতেছে। ব্যর্থ মত প্রকাশে ফল কি ?

লুশ্বিনী উদ্যান

লুশ্বিনী উদ্যানে বৃদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল, তাহার সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিবার কথা উঠিয়াছে। আমরা সর্কাস্ত্রকরণে এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের কর্তব্য করা হইবে, ভারতের উপকার হইবে, এবং এই দেশের সহিত সমগ্র বৌদ্ধ জগতের সংস্পর্শ বর্ধিত হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শুল্ক

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ধার্য হওয়ায় ভালই হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্নমেন্ট সাধারণ জাহাজ-ভাড়া অপেক্ষা সস্তায় তথাকার কয়লা এদেশে আনিবদের জন্য জাহাজের মালিকদিগকে রাজকোষ হইতে

সাহায্য দিয়া থাকে। এইপ্রকারে ভারতীয় কয়লার ব্যবসার ক্ষতি করা হইতেছিল। ইহার প্রতিকার অবশ্যকর্তব্য।

পতিতার উদ্ধার

আমরা অবগত হইয়াছি যে, মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে পতিতা নারীদিগকে লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। সাধারণতঃ স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক, বিদ্যালয়ের ছাত্র, অসহযোগপন্থী স্বেচ্ছাসেবকের দল, মেথর, চামার প্রভৃতি “অশুভ্যুপশ্রা” জাতি, এবং গণিকাবৃন্দ, এইসকল শোভাযাত্রার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হিন্দু জাতির পুরাণ-ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজে বারাননা-গণের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। বিজয়-অভিযান, বিবাহাদি পারিবারিক গৃহকর্ম ও মাদলিক অস্থান, উৎসব ও দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা উপস্থিত থাকিত। সুতরাং বর্তমান সমাজে এই প্রথার পুনঃপ্রচলন যে হিন্দুজাতির পক্ষে অশাস্ত্রীয়, একথা বলা যায় না। কিন্তু এই লুপ্ত প্রথাটির নূতন করিয়া প্রবর্তন কতদূর সঙ্গত ও হিতকর, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

শুনিয়াছি, পতিতাপন স্বদেশহিতকল্পে মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকে। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, ‘বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহং, অমেধ্যাদপিবাধনম্’। সুতরাং যদি কেহ স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তজ্জন্ত স্বেচ্ছায় কিছু দান করেন, তাহা হইলে দাতানির্কিংশেষে তাহা গ্রহণীয়, স্বরাজ্যপন্থীগণ একথা বলিতে পারেন। কিন্তু রাজনীতিকক্ষেত্রে অশুভ্রপ্রতিগ্রাহিতা না থাকিলেও, যাহাকে মনে মনে ঘৃণা করি অথবা ঘৃণার পাত্র বলিয়া মনে করি, অথবা যাহার অর্থ কোন প্রকাশ্য জঘন্য বৃত্তিদ্বারা অর্জিত বলিয়া জানি, তাহার নিকট প্রতিগ্রহ কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। তাহাদের দান গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ‘আচরণীয়’ বা ‘চলু’ করিয়া লইতে হইবে, যদি তাহারা এই দাবী করিয়া বসে, তখন তাহা অগ্রাহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সত্য বটে, পাপকেই ঘৃণা করা উচিত, পাপীকে নহে।

যে গভীর সমবেদনায় অল্পপ্রাপ্ত হইয়া টমাস্ হড্ তাঁহার Bridge of Sighs নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

‘Alas for the rarity
Of Christian charity
Under the sun !’

এবং রবীন্দ্রনাথ ‘পতিতা’র মুখে বলাইয়াছেন
‘দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি
নিম্নে গেল সব মাটির ঢেলা’।

তাঁহা অতি প্রকার জিনিষ। ঋষ্যশৃঙ্কে দেখিয়া পতিতা নামী বলিয়াছিল, যে, পুত ব্রহ্মচারী ঋষিকুমার তাহার অন্তরের দেবতাকেই দেখিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সে নবীন জন্ম লাভ করিয়াছিল, এবং বলিতে সক্ষম হইয়াছিল—

‘তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে,—
সেখায় ছায়ার ক্রমিষ্ণু এবার
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।’

বস্তুতঃ যিনি পতিতা নামীর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পান, সেই মহাপুরুষই পতিতোক্কার ব্রত গ্রহণ করিতে সক্ষম। বৃদ্ধ হইতে পারিলেই বারবনিতা আম্রপালীর গৃহে আতিথাগ্রহণ ও তাহাকে নারীসংঘেব নেতৃত্বপদে আসীন করিতে পারেন। যীশু এই দেক্কে ভগবানের মন্দির বলিয়া জানিতেন, এবং সাধারণ লোকের পক্ষে সর্বতোভাবে সেই মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করা কত কঠিন তাহা বুঝতেন বলিয়াই ম্যাডলীনের প্রতি তাঁহার উদার আচরণ বিশ্বচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

পতিতা রমণীর পাতিত্যের জন্য সমাজই বহুল পরিমাণে দায়ী, ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের দেশে সমাজ স্ত্রীজাতিকে শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়া, অপরিণত বয়সে তাহার ইচ্ছা বা মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, তাহার বিবাহ দেয় এবং অকালবৈধব্যের কোন বৈধ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে না। একরূপ স্থলে প্রেমের স্বপ্ন বা প্রবৃত্তির তাড়না যদি কাহাকেও কুপথে পরিচালিত করে, তাহাকে সৎপথে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ বা সুবিধা দেওয়া সমাজের অবশ্যবর্তব্য। কিন্তু এইসকল পতিতাদের উদ্ধারব্রত

গ্রহণ বড় কঠিন কাজ—সেজন্য স্বয়ং সংযমী ও পবিত্রচেতা হওয়া আবশ্যিক, সমাজশরীরের দুষ্টকতগুলি অস্ত্রোপচার দ্বারা দূর করিবার জন্য বন্ধপরিষ্কর হওয়ার সাহস, ধৈর্য, অধ্যবসায়, ত্যাগস্বীকারপ্রবৃত্তি ও আগ্রহ চাই। নতুবা আগুন লইয়া খেলাইতে চাওয়া উচিত নয়, নিবাইতে গিয়া পুড়িয়া মরিবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। কারণ, গীতাকার বলিয়াছেন—

“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদৃঢ়ং।

তস্তাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্তূক্ষরং ॥”

শোভাযাত্রায় যে পতিতাদিগকে সর্বলোকচক্ষুর গোচর করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা হয় তাহারা কেহ স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; পূর্বেও তাহাদের যে জীবিকা ছিল, পরেও তাহাই থাকে। যে আত্মবিক্রয়রূপ ব্যবসায় দ্বারা তাহারা জীবিকা-সংস্থান করে, তাহা যে অত্যন্ত পাপজনক ও গর্হিত, ইহা সর্ববাদী-সম্মত। যাহারা নীতিবিরুদ্ধ জঘন্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যতদিন তাহারা সেই বৃত্তি পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহাদের অস্পৃশ্য থাকাই সমাজের পক্ষে হিতকর। মেথর ও গণিকাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে মেথরদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। মেথরগণ যে কাজ করে, তাহা সমাজের পক্ষে অত্যাশঙ্কক, তাহাতে কোন নৈতিক দোষসংস্পর্শ নাই। মেথর বলিয়াই তাহাদিগকে অশুচি মনে করা অজ্ঞায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের বৃত্তি অন্য সর্ববিধ সাধুবৃত্তির সঙ্গে গণিত হইবার যোগ্য। যাহারা জাতিহিসাবে কোন পাপাচরণ করে না, কেবল একরূপ বৃত্তি অনুসরণ করে, যাহা লৌকিক আচারে হেয় ও অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই অস্পৃশ্যতা ন্যায়বিরুদ্ধ। বারবনিতা-বৃত্তি কেবল লোকমতানুগাবে হেয় নহে, নৈতিকহিসাবেও উহা হেয়তম। পতিতাদিগকে শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্য তাহাদের চরিত্রসংশোধন নহে। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে ‘চল্’ করিয়া লওয়া ন্যায়বিরুদ্ধ ও দুর্নীতির পরিপোষক।

ইহা খুবই সত্য যে সমাজে যাহারা সাধু বলিয়া পরিচিত এবং যাহাদের প্রকাশ্য বৃত্তি নিন্দনীয় নহে,

তাহাদের মধ্যেও অনেকে অসাধু উপায়ে জীবিকা অর্জন করে, অথবা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, তাহারা তাহাদের অসাধু চেষ্টা ও পঙ্কিল জীবন সাধারণতঃ গুপ্ত রাখিতেই যত্নপরায়ণ হয়, তাহার বহিঃপ্রকাশ নিতান্ত লজ্জাজনক মনে করে, অনেক স্থলে তাহা সাধারণো প্রচারিত হইলে তাহাদের যথেষ্ট সামাজিক গানিও ভোগ করিতে হয়, কেহ কেহ এরূপ স্থলে লজ্জায় আত্মঘাতীও হইয়া থাকে। সমাজে ধর্মের নামে বহু অধর্ম অমুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ভাক্ত ও ভণ্ডদল তাহাদের ভণ্ডামির খোলস ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত করিতে লজ্জা বোধ না করিলে সেটা কি সমাজদেহের পক্ষে অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইত? কথা আছে, Hypocrisy is the homage which vice pays to virtue। “পুণ্যের প্রতি পাপ ভণ্ডামি দ্বারা শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।” পুণ্যের প্রতি বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রকাশও আবশ্যিক, নতুবা পাপের ‘নিলাজ নিঠুর লীলা’র সমক্ষে পুণ্যের নির্মল শুভ স্থিরজ্যোতি একান্ত পরিম্লন হইতে পরিত।

রাজনীতি ও যৌননীতি পৃথক হইলেও একেবারে পৃথক নয়, কারণ মানব-মন বিভিন্ন ছিদ্রহীন কক্ষায় বিভক্ত নহে। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা রাজনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী; গণিকাসংস্পর্শ নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার পারিপোষক। সুতরাং গণিকাদের রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় যোগদান নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। বেশী বলিয়াই ইহাদের দেহমন অপবিত্র, কিন্তু মেথর বলিয়াই মেথরের দেহমন অপবিত্র নহে। সুতরাং মেথর অস্পৃশ্য নহে। কিন্তু যতদিন বেশাবৃত্তি ইহাদের অবলম্বনীয়, ততদিন ইহারা অস্পৃশ্য।

অশুভ একথা বলিয়া ইহাদিগকে দূর করিয়া রাখিলেই ইহাদের প্রতি কর্তব্য করা হইল না। সমাজ ইহাদের জন্ত সাধুপথে থাকিয়া জীবনধারণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য, এবং যে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি সমাজের এই কর্তব্য-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে পতিতাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসার্য। যে-সকল পুরুষ

পতিতা নারীদিগকে প্রথম পাপপথে লইয়া যায় এবং পরে সেই পথ ছাড়িতে না দিয়া নিজের ভোগোপকরণ করিয়া রাখে, সমাজ তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করে না, এই অভিযোগ খুবই সত্য। ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, স্ত্রীজাতি দুর্বল, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার চিরাগত প্রথা। গৌণ কারণের মধ্যে বলা যাইতে পারে, যে, ঈদৃশ দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষদিগের কলুষিত চরিত্র গণিকাদের দ্বারা কোন বৃত্তি বিশেষ দ্বারা স্পষ্ট নির্দিষ্ট হয় না। এবং সম্ভবতঃ মাতৃভ্রমসম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহাদের দুর্নীতি পুরুষদের অপেক্ষা সমাজের পক্ষে বেশী অহিতকর বিবেচিত হয়। কিন্তু পতিতা স্ত্রীলোকদিগকে এ বিষয়ে চরিত্রহীন পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার দিতে গেলে ‘উন্টা বুঝিলি রাম’ হইবে।

আসল কথা, পুরাণে তাহাদের যুগে যে-কারণে রাজ-দরবারে এবং অন্তর্বিধ উৎসবে বেশীসমাগম নিষিদ্ধ ছিল না, অধুনা সেই কারণেই রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় তাহারা আছত, এবং গুলবিশেষে আদৃত, হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সুসজ্জিত (যদিও অনেক স্থানেই দেশীয় বস্ত্রে নহে) সুকণ্ঠ সুন্দরী গায়িকাব মুখে স্বদেশী সঙ্গীত অনেকের চিত্তপ্রাণী হয়, এবং শোভাযাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ জন্মবহুলতা—ইহাদের সহায়তায় সাফল্য লাভ কবে। পাশ্চাত্য দেশে “সাক্রেজেন্ট”গণ শোভাযাত্রা বাহির করে না বটে; কিন্তু তথায় ভ্রমহিলাগণ অস্তঃপুরিকা নহেন সুতরাং তাহাদের শোভাযাত্রায় সামাজিক আদর্শের ধর্কতা হয় না কিম্বা দুর্নীতিও প্রশ্রয় পায় না। কিন্তু এই গ্রন্থপ্রধান দেশে মাত্রাজ্ঞান (moderation, sense of proportion) স্বভাবতঃই কম, আমরা সহজেই চরমপন্থী হইয়া পড়ি; গেইজন্যই দেখা যায়, ভ্রমহিলাগণ প্রায়ই অসুখ্যস্পৃশ্যা, আর পতিতা নারী রাজনৈতিক উৎসবে সমাদরে গৃহীতা—যাহা অত্যন্ত ডিমক্রাটিক পাশ্চাত্য দেশেও দেখা যায় না—অথচ পতিতাদের উদ্ধার-বিষয়ে সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ‘চাল’ ছাড়া চলে না, ইহা সত্য হইলেও, এরূপ ‘চালে’ দেশে উন্নতি অথবা অধোগতির পথ সুপ্রশস্ত হইবে, সকলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রম



আশ্রমে চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা - বালক-বালিকার সংখ্যাই অধিক

উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রমের স্বামীরা রাজসাহী জেলায় বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেবা-কার্য চালাইতেছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় নাটোর মহকুমায় একটি কালাজ্বর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ২০টি রোগী চিকিৎসাধীন আছে; প্রতিদিনই নূতন নূতন রোগীর সমাগম হয়। একমাত্র নাটোর মহকুমাতেই দুই হাজারের উপর কালাজ্বরের রোগী আছে। ইহাদের চিকিৎসার জন্ত অন্ততঃ ১৫টি গ্রাম্য-কেন্দ্র স্থাপন করা

য়োজন। এই জেলার অন্যান্য মহকুমাতেও কালাজ্বরের রোগীর সংখ্যা অল্প নহে। সাধারণের সমবেত চেষ্টা দ্যতীত এই দুর্ভাগ্যদের জীবনরক্ষার কোনই উপায় নাই। আমরা আশা করি জনসাধারণ যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া কর্মীদের উৎসাহ বর্ধন করিবেন ও লোক-সেবায় সহায় হইবেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যানন্দের নিকটে (পোঃ নওগাঁ, জেলা রাজসাহী) সাহায্য পাঠাইতে হইবে।



আজমের চিকিৎসাধীনে রোগীরা ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করি. ৩৫



আজমের চিকিৎসক সমবেত রোগীদিগকে ইন্ডোজর্কশন দিতেছেন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শতবার্ষিক জন্মোৎসব

১২৩০ সালের ১২ই মাঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এবংসর তাঁহার জন্মের শতবৎসর পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জ্ঞ কলিকাতায় দুই জায়গায় সভার আয়োজন হইয়াছিল—

প্রথমটি হিন্দুস্কুলে ও দ্বিতীয়টি সাহিত্য-পরিষদে। হিন্দুস্কুলের সভাস্থলটিকে ছাত্র এবং শিক্ষকেরা পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। বঙ্গমানের মহারাজা এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর-



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে মাইকেলকে সশরীরে দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় আরো বলেন যে গত গ্রীষ্মের সময় তিনি সাগরদাড়ীতে কবির জন্মস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে প্রকৃতিই

মাইকেলকে একজন বড় কবি হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তিনি কোন কাগজে পড়িয়াছিলেন যে পুত্ররূপেই হউক আর স্বামীরূপেই হউক আর ব্যবহারাজীবরূপেই হউক জীবিতকালে মাইকেল বড় এক-
গুঁয়ে ও বেয়াড়া ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিত্বের বেয়াড়ামিই

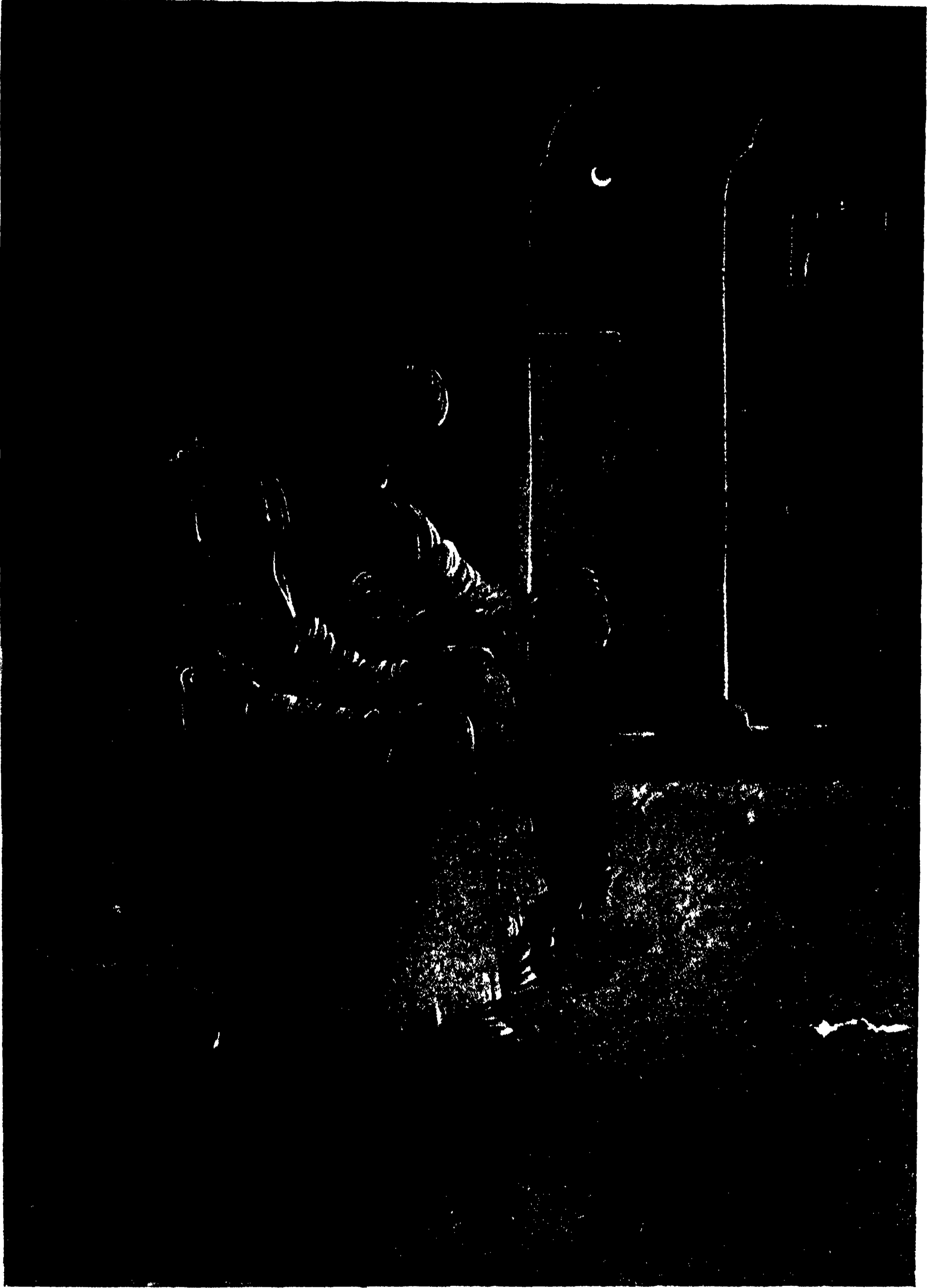
ঐহাদের সাহিত্যকে নূতন সম্পদ দিয়া গেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র-চন্দ্র মুখোয়ার সমর্থনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে হিন্দুস্কুল-মধুসূদন-স্মৃতিসমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে ও এই সমিতি মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। সভাপতি মহাশয় সভাস্থলে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পাণ্ডুলিপি দেখান। এই পাণ্ডুলিপি মাইকেল ৩য়তীন্দ্র-মোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। ৩য়তীন্দ্রমোহন উহা সম্বন্ধে বাধাইয়া পরমশ্রদ্ধার সহিত নিজের গ্রন্থাগারে রাখিয়াছিলেন। এই পাণ্ডুলিপির সবটাই মধুসূদনের স্মৃতিতে লিখিত নয়, খানিকটা ঐহার সংস্কৃত-পণ্ডিতের লেখা।

ঐ দিন সাহিত্যপরিষদে যে সভা হয় সে সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবির জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় কবির জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থলে কবির উদ্দেশে রচিত কয়েকটি কবিতাও পঠিত হয়।

আধুনিক বাংলার প্রথম বড় কবি মধুসূদনের স্মৃতির উদ্দেশে আহৃত সভার আয়োজন যে ইহা অপেক্ষা ভাল করিয়া করা উচিত ছিল তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু আয়োজনই সব নয়, এ-সব বিষয়ে লোকের আগ্রহের অভাবই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। আমাদের জাতীয় জীবনের স্রোত যে কত মন্দবেগে বহিতেছে তাহা ইহা হইতেই বোঝা যায়। অন্তর্দেশ হইলে এরূপ একটা ঘটনায় দেশব্যাপী উৎসব লাগিয়া মাইত; কবি যেখানে যে-স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে দেশের অনেকে সমবেত হইতেন। কিন্তু তাহা হইল কই! মধুসূদন এককালে হিন্দুস্কুলের ছাত্র ছিলেন তাই হিন্দুস্কুল একটু আয়োজন করিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালীর ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা আছে সেখানে নমোনম করিয়া কোনরূপে কবির মানরক্ষা করা হইল। কিন্তু হিন্দুস্কুল ছাড়াও এই

কলিকাতারই অন্যান্য স্থানের সহিত কবির স্মৃতি বিজড়িত আছে। আর ত কেহ কিছু করিল না। তিনি এখানে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেন; সেখানে কোন সাড়া শব্দ হইল কই। কবি পুলিশকোর্টে দোভাষীরূপে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন ও ব্যাঙ্কশালের স্থানান্তরিত পুলিশকোর্টের ভিতর এখনো ঐহার চিহ্ন আছে। সেখানেও কবির জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার কালে কেহ ইহা বলিয়া একবার গর্ভও প্রকাশ করিল না যে, কবি একদিন আমাদের এই আদালতে কাজ করিতেন। গ্রীক পুরাণ-কথায় লিখিত আছে যে, সঙ্গীত কবিতা প্রভৃতি কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেব অ্যাপোলো একবার নয় বৎসর কাল অন্তঃস্থ মেঘ-পালকের সঙ্গে ফেরাএ নগরে কাছে অ্যাড্‌মেটাসের মেঘ চরাইয়াছিলেন। পরে যখন অ্যাপোলো সেখান হইতে তিরোহিত হন তখন মেঘ-পালকেরা ঐহার স্মৃতি লইয়া কত গর্ভ করিত। “এইখানে এই পাথরের উপর তিনি বাসিতেন, এমনি করিয়া বাঁশী বাজাইতেন” এইসব কথা বলিয়া ও স্মরণ করিয়া তাহারা কত গর্ভ ও সুখ অনুভব করিত। আমাদের মধুসূদন একদিন বার-লাইব্রেরী ও পুলিশ আদালতরূপ মক্‌ভূমিতে মক্কেল চরাইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে এখনকার মক্কেল-চারকগণের ঐহার স্মৃতি-বিজড়িত গর্ভ ও তৎসম্পর্কিত সুখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ঐহার জন্মস্থান সাগরদাঁড়ী গ্রামে সমগ্র বঙ্গবাসীর তীর্থযাত্রা হওয়া দূরে থাকুক সামান্য একটু মেলা কিম্বা অন্তঃস্থ কোন উৎসব দ্বারা এই স্মরণীয় দিনটিকে সেখানকার পল্লীর একটানা জীবন-স্রোতে চিহ্নিত করিবার কোনরূপ আয়োজনের কথা এখন পর্যন্ত শোনা যায় নাই। কলিকাতার সংবাদপত্র মহলেও খুব বেশী আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। যে অমৃতবাজার এককালে ‘ছন্দরীবধ কাব্য’ প্রকাশ করিয়া কবির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে যোগ দিয়াছিল সেই অমৃত-বাজার কবির প্রশংসা-স্মৃতিসূচক দু’তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও বাংলা আনন্দবাজার একটি বিশেষ আলোচনা-পূর্ণ সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন এই যা সুখের বিষয়!

শ্রী অশ্বিনীকুমার ঘোষ



মুসাফের-খানায়

ভ্রমকর আয়ুত্ত আমতুমার হালদাব
আয়ুত্ত নবেশ্রনাথ ঠাঃবেব সৌঃগে

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল ?

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা

বুঝিতে পারো তুমি ?

শোননি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, “আহা, আহা,”

সকল বন-ভূমি ?

শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা,

হিমের বায়ে কাপন-ধরা

শিথিল মন্থর

“কে এল” বলি’ তরাসি’ উঠে শীতের সহচর ।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে,

পায়ের ধ্বনি নাহি ।

ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে

দখিন-হাওয়া বাহি’ ।

অশোক-বনে নবীন পাতা

আকাশ পানে তুলিল মাথা,

কহিল, “এসেছ কি ?”

মর্ম্মরিয়া খরখর কাঁপিল আমলকী ।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে

“শোন গো, শোন শোন ।”

শায়া না জানে প্রভাতী-গানে কি নামে তাবে ডাকে

আছে কি নাম কোনো ?

কোকিল শুধু মুছনুই

আপন মনে কুহরে কুহ

ব্যথায় ভরা বাণী ।

কপোত বুঝি শুধায় শুধু, “জানি কি, তারে জানি ?”

আমের বোলে কি কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি’

অসহ উচ্ছ্বাসে ।

আপন মনে মাধবী ভণে কেবলি দিবারাতি

“মোরে সে ভালোবাসে !”

অধীর হাওয়া নদীর পারে

ক্ষ্যাপার মত বহিছে কা’রে

“বল ত কি যে করি ?”

শিহরি’ উঠি’ শিরীষ বলে, “কে ডাকে মরি, মরি !”

কেন যে আজি উঠিল বাজি’ আকাশ-কাঁদা বাঁশী

জানিস্ তাহা নাকি ?

রঙীন যত মেঘের মত কি যায় মনে ভাসি’

কেন যে থাকি’ থাকি’ ?

অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূবের পানে ফিরিস্ খুঁজি' ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস্ না যে তাই ত লাগে ধাঁধা ।

পুলকে-কাঁপা কনক-চাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে ঘার নাড়া,
এমন করে' কুণ্ড ভরে' সহজে তাই ত সে
দিয়েছে তা'রে সাড়া ।
সহসা বন-মল্লিকা যে
ছুঁয়েছে তারে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
“এই যে তুমি, এই যে তুমি” আঙুল তুলে' বলে ।

পেয়েছে তা'রা, গেয়েছে তা'রা, জেনেছে তা'রা সব
আপন মাঝখানে,

তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব !
দ্বিধা-বিহীন তামে ।

ওদের সাথে জাগ্ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্ সে ছবি,

ভাঙুক মোহ-ঘোর !

বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর ।

আলোতে তোরে দিক্ না ভরে' ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা, বাজ্ !

গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে ছলে', কবি,
ফুরালো তোর কাজ !

বিদায় নিয়ে যাবার আগে

পড়ুক টান ভিতর বাগে,

বাহিরে পাস্ ছুটি ।

প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক্ টুটি' ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপনিষদের ব্রহ্ম

উপনিষৎসমূহ সমসাময়িক নহে; ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন উপনিষদে
বিভিন্ন ঋষির মত বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি একই
উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মত পাওয়া যায়। আবার
একই ঋষি যে সর্বত্র একই মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও
নহে। সাধারণ লোক এই সমুদায় বিষয় কিছুই জানে না।
পণ্ডিতগণের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন, যারা-
দের চিন্তার অন্তরালে এই ভাব লুকায়িত রহিয়াছে যে,
উপনিষদের মত একই। ভাষ্যকারগণ এবং টীকাকারগণ
এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উপনিষদের ব্যাখ্যা
করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে
ঋত্বিতে ঋত্বিতে কোন বিরোধ নাই। এইপ্রকার
হইবার প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িক-
তার উপদ্রবে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া দুর্ব্ব
হইয়াছে। “আমার সম্প্রদায়কে উপনিষদের উপরে

প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে”—যতদিন এইপ্রকার ভাব
থাকিবে, ততদিন উপনিষদের প্রকৃত ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব
হইবে না। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতামত
উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত
ব্যাখ্যা করিতে হইলে সাম্প্রদায়িকতাকে অতিক্রম করিতে
হইবে।

প্রাচীনকালে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ এই তিন-
খানা বেদকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হইত। এই-
জন্ত বেদের নাম ছিল “ত্রয়ী”। উত্তরকালে অথর্ব-
বেদকেও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এখন
আমরা বলি চতুর্বেদ। মহাভারতকার বলিয়াছেন, “বেদাঃ
বিভিন্নাঃ”। বেদসমূহের নামই যে কেবল ভিন্ন তাহা
নহে, ইহাদিগের উদ্দেশ্যও ভিন্ন এবং মতও ভিন্ন।
কেবল তাহাই নহে; এক-এক বেদেরই বহু শাখা। মত-
ভেদের জন্তই এই সমুদায় শাখার সৃষ্টি। সুতরাং সামঞ্জস্য

করিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরাও অজ্ঞায়রূপে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিব না।

আমাদিগের আলোচ্য বিষয় “উপনিষদের ব্রহ্মবাদ”। আমরা সাম্প্রদায়িকতার অতীত হইয়া এবং ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ঋষির ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

যাজ্ঞবল্ক্যের মত

অনেকে মনে করেন, উপনিষৎসমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষৎই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যাজ্ঞবল্ক্য এই উপনিষদের প্রধান ঋষি। তিনি ব্রহ্ম-বিষয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সূক্ষ্ম ও জ্ঞানগর্ভ। সর্বপ্রথমে তাঁহারই মতামত আলোচনা করা যাউক।

মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ

(বৃহঃ ৪।৫ ; ২।৪)

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের অন্ততরা পত্নী। বাণপ্রস্থাত্মম অবলম্বন করিবার সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা উপনিষদের দুইটা স্থলে (৪।৫ ; ২।৪) বর্ণিত আছে। এই দুইটা অংশেরই নাম “মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ”। উভয় ব্রাহ্মণেই ভাষা অধিকাংশ স্থলেই এক; দুই-একটি স্থলে যে পার্থক্য আছে, তাহা গুরুতর নহে।

আত্মাই ব্রহ্ম

এই ব্রাহ্মণে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। উপনিষদের যুগে ‘ব্রহ্ম’ ও ‘আত্মা’ শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত আমরা পূর্বে দুইটা প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ স্থলেই ‘ব্রহ্ম’ শব্দ গুণবাচক। যিনি সর্বমুলাধার, যাহা হইতে এই সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং যাহাতে এই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন—কোন বস্তু ব্রহ্ম? তিনি কে, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, আত্মাই সেই বস্তু; আত্মাই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ; অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম।

আত্মা এক

আমরা সচরাচর জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকি; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য একপ্রকার কোন পার্থক্য

করেন নাই। তিনি সর্বত্রই “আত্মা” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, কোন স্থলে ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ ‘জীবাত্মা’ এবং কোন স্থলে অর্থ ‘পরমাত্মা’। ইহার সামঞ্জস্য করিতে প্রিয়া ব্যাখ্যাকর্তৃগণ বিষম বিপদে পড়িয়াছেন এবং নানা মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ অতি সরল। আত্মা একই; কোন স্থলে আমরা বলি জীবাত্মা, কোন স্থলে বলি পরমাত্মা। কিন্তু উভয় স্থলেই আত্মা এক ভিন্ন দুই নহে।

আবার আমরা বলি মানব বহু, এবং এক-এক মানবে এক-এক আত্মা। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, মানব বহু হইতে পারে, কিন্তু আত্মা একই। ভিন্ন ভিন্ন মানবে যে আত্মা দেখিতে পাই তাহা বহু নহে; একই আত্মা বহু মানবে প্রকাশিত হইয়াছে। কি প্রকারে এক আত্মা বহু রূপে প্রকাশিত হইল বা প্রকাশিত হইতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার বিচার করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য বলিয়াছেন যে, আত্মা একই এবং এই আত্মাই ব্রহ্ম। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে তিনি এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে ব্যাখ্যাত হইল।

আত্ম-প্ৰীতি

যাজ্ঞবল্ক্য সর্বপ্রথমেই বলিলেন, যে, জগতে বহু বস্তু মানবের প্রিয় হয়। পতি জ্ঞানী পুত্র বিত্ত পশু ব্রাহ্মণ ক্ষত্র স্বর্গাদিলোক দেবগণ বেদসমূহ ভূতসমূহ এবং সর্ব বস্তুকেই মানুষ ভালবাসে। এস্থলে ঋষির মনে এইপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল—মানুষ এই সমুদায়কে কেন ভালবাসে? আত্মপ্ৰীতির জগুই কি এসমুদায়কে ভালবাসে? অথবা মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া, সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্ৰীতিনিরপেক্ষ হইয়া, কেবল বিশ্বপ্ৰীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই জগৎকে প্ৰীতি করে? আত্মপ্ৰীতি কি ইহার কারণ? কিংবা ইহার কারণ বিশ্বপ্ৰীতি?

ঋষি নিজেই ইহার উত্তরও দিয়াছেন। মানুষ আপনার প্রতি প্ৰীতিবশতঃ অপরকে ভালবাসে না, আত্ম-প্ৰীতির জগুই অপরকে প্ৰীতি করে।

মূলে আছে “আত্মনঃ কামায়”। ইহার অর্থ ‘আত্ম-কামের জগু অর্থাৎ আত্ম-প্ৰীতির জগু’। সচরাচর

‘আত্মপ্ৰীতি’ শব্দের দুইটি অর্থ করা হয়—(১) পরমাত্মার প্রতি প্ৰীতি; (২) নিজের প্রতি প্ৰীতি।

এস্থলে প্রথম অর্থ কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না। লোকে পরমাত্মার প্রতি প্ৰীতিবশতঃ কখন পশু ধন বা অপরাপর বস্তুকে প্ৰীতি করে না। নিজের সুখের জগ্ৰহই পশু ধন ও অপরাপর বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে। ‘কি করা উচিত’ এস্থলে সে-প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। প্রশ্ন এই—“এ জগৎ লোকের প্রিয় হয় কেন?” ইহার উত্তর—“আপনাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে বিত্তাদি ভালবাসে, আপনার সুখের জগ্ৰহই বিত্তাদি করে।”

‘আত্মা’ শব্দ অতি অদ্ভুত। ইহা পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে ইহার অর্থ ‘স্বয়ং’ ‘আপনি’ ‘নিজ’ ইত্যাদি। পূর্বেই অংশে ইহা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ এস্থলে ‘আত্ম-প্ৰীতি’ অর্থ ‘নিজের প্রতি প্ৰীতি’।

এখানে বলা আবশ্যিক যাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে পরমাত্মা বা জীবাত্মা বা ‘নিজ’ ‘আপনি’ ইত্যাদি কোন অর্থের বিষয়েই চিন্তা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ‘আত্মা’। তিনি বুঝিয়াছেন আত্মা এবং বুঝাইয়াছেন আত্মা। তিনি সর্বত্রই দেখিয়াছেন এক আত্মা। আমরাই বিচার করিয়া বুঝিতেছি এবং বলিতেছি এস্থলে ‘আত্ম-প্ৰীতি’ অর্থ ‘নিজের প্রতি প্ৰীতি’।

আত্মাই লক্ষ্য

“আত্ম-প্ৰীতির জগ্ৰহই জগৎ প্রিয় হয়”—ইহা বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিতেছেন—“অরে! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।” তাঁহার যুক্তির ক্রম এই—

- (১) আত্ম-প্ৰীতির জগ্ৰহই জগৎ প্রিয় হয়।
- (২) সুতরাং এই আত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু।
- (৩) সুতরাং এই আত্মাকেই দর্শনাদি করিতে হইবে।

প্রথম কথাই এই—“নিজেকে প্ৰীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়।” যাহাকে লোকে ‘নিজ’ বা ‘আপনি’

বা ‘আমি’ বলে, প্রকৃত পক্ষে তাহা আত্মাই। সুতরাং “নিজেকে প্ৰীতি করা” অর্থ “আত্মাকে প্ৰীতি করা”। “নিজেকে প্ৰীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়”—ইহার অর্থ “আত্মাকে প্ৰীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়”।

দ্বিতীয় কথা এই—যাহার জগ্ৰহ জগৎ প্রিয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু।

শেষ কথা এই—এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ইহাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

অর্থাৎ আত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

সমুদায়ই আত্মা

ইহার পরে ঋষি বলিলেন, যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় স্বর্গাদিলোক দেবগণ দেবসমূহ এবং ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্মণাদি সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহার পরে ঋষি বলিলেন—“এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেবতাগণ, এই বেদসমূহ, এই সমুদায় ভূত—এসমুদায়ই আত্মা!”

তিনটি উপমা

ইহার পরে তিনটি উপমা দ্বারা ঋষি বুঝাইয়াছেন যে, আত্মাকে অবগত হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবগত হওয়া যায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত এই :—

“যেমন তাড়্যমান ছন্দুভি হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কেবল ছন্দুভি গ্রহণ করিলে কিংবা ছন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়; যেমন বাজমান শব্দ হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শব্দ গ্রহণ করিলে কিংবা শব্দবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়; যেমন বাজমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গ্রহণ করিলে কিংবা বীণা-বাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়; ইহাও তেমনি (অর্থাৎ আত্মাকে গ্রহণ করিলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গৃহীত হয়)।”

যখন কোন যজ্ঞ বাজান হয়, তখন সেই যজ্ঞ হইতে পৃথক্ পৃথক্ বহু স্বর নির্গত হয়। কিন্তু এক-একটি

স্বরকে যদি পৃথক-পৃথক-ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার কোন অর্থই হয় না। যদি বাদকের মনোগত ভাব জানা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যায়, এসমুদয় স্বর পৃথক পৃথক নহে, ইহাদিগের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে; বিশেষ উদ্দেশ্যে এইসমুদয় স্বর উৎপাদিত হইয়াছে এবং এসমুদয়ের বিশেষ অর্থ আছে।

কিংবা এইসমুদয় বাণ্যবস্তুর মৌলিক তত্ত্ব যদি অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে অন্তর্ভাবে স্বর-তত্ত্ব বুঝা যাইতে পারে। অগতের বস্তুসমূহও এইপ্রকার। এক-একটি বস্তুকে পৃথক-ভাবে বিচার করিলে ইহার কোন অর্থই হয় না। যদি মনে করা যায়, প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, তাহা হইলে ইহা উদ্দেশ্যবিহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন বুঝা যায় এইসমুদায় বস্তু আত্মা হইতে উৎপন্ন, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, একসূত্রে গ্রথিত ও পরস্পর সম্পর্কিত; এবং যখন সেই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তখনই বুঝা যায় এ অগতের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এবং ইহা গভীর অর্থ-পূর্ণ। বাদককে কিংবা বাণ্যবস্তুর জ্ঞানিলে যেমন স্বর-সমূহের অর্থ জানা যায়, আত্মাকে জানিলেও তেমন এ অগতকে অবগত হওয়া যায়।

সৃষ্টি

ইহার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি বুঝাইতেছেন যে, বেদাদি শাস্ত্রও সেই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

“যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক পৃথক ধূম নির্গত হয়, তেমন, হে মৈত্রেয়ি, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্কাজিরস ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা উপনিষৎসমূহ শ্লোকসমূহ সূত্রসমূহ ব্যাখ্যানসমূহ, অল্পব্যাখ্যানসমূহ—এ সমুদায়ই সেই মহদভূত হইতে নির্গত হইয়াছে, এ সমুদায় ইহা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে।”

আত্মাই একায়ন

‘একায়ন’ শব্দের অর্থ “একগতি” অর্থাৎ গম্যস্থল বা মিলনস্থল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি বুঝাইতেছেন যে, আত্মাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একায়ন।

“সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের একায়ন, ত্বক্ যেমন

স্পর্শের একায়ন, নাসিকাঘর্ষ যেমন গন্ধের একায়ন, জিহ্বা যেমন রসের একায়ন, শ্রোত্র যেমন শব্দের একায়ন, মন যেমন সঙ্কল্পের একায়ন, হৃদয় যেমন বিদ্যার একায়ন, হস্তঘর্ষ যেমন সমুদায় কর্মেণের একায়ন, পদঘর্ষ যেমন সমুদায় গতির একায়ন, বাক্‌সমূহ যেমন সমুদায় বেদের একায়ন—তেমন আত্মাও এই সমুদায়ের একায়ন।”

সৈন্ধবের উপমা

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

“যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তর-রহিত বাহ্যরহিত এবং একমাত্র রসঘন,—তেমন এই আত্মা অন্তর রহিত বাহ্যরহিত এবং একমাত্র প্রজ্ঞানঘন।”

এই বাহ্যজগৎ ভেদযুক্ত এবং বৈচিত্র্যময়। অন্তর-জগতেও ভেদ রহিয়াছে। মনের মধ্যে কত চিন্তা, কত ভাব, কত ইচ্ছা! যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন— “আত্মা প্রকৃতভাবে এপ্রকার ভেদযুক্ত নহে। ইহা অন্তর্বাহ্য-ভেদরহিত, ইহা একাকার একরস, প্রজ্ঞানঘন।”

আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই ভাবে বিশদ করিবার জন্ত নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। বৃক্ষ বস্তুটি এক, কিন্তু এক হইলেও ইহার বিভিন্ন অঙ্গ আছে—যেমন মূল কাণ্ড ত্বক্ পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি। এই সমুদায় অঙ্গ পরস্পর পৃথক। বৃক্ষ এক হইলেও ইহাতে ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু আত্মার কোন অঙ্গও নাই—আত্মাতে কোন ভেদও নাই।

আত্মার সংজ্ঞা

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—“(এই আত্মা) এইসমুদায় ভূত হইতে (জীবাশ্ম-রূপে) উৎপিত হইয়া সেই-সমুদায়েই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ চৈতন্য) থাকে না।”

এস্থলে ঋষি জীবাশ্মার উৎপত্তির কথা বলিতেছেন। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, ঋষি এস্থলে আত্মার উৎপত্তির কথা বলিতেছেন না; আত্মা জীবাশ্মরূপে প্রকাশিত হয়—এই কথাই এখানে বলা হইতেছে। তিনি আরও বলিতেছেন যে, মৃত্যুর পরে জীবাশ্মার আর সংজ্ঞা থাকে না। ঋষি যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে,

মৃত্যুর পরেই “আত্মার নির্মাণ মুক্তি”। এখানে ক্রমমুক্তি বা ক্রমান্তরবাদ স্বীকার করা হইল না।

আত্মা অদ্বৈত

“মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা থাকে না” ইহা অনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন—“ভগবান্ আমাকে মোহের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

মৈত্রেয়ী যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও অধিকাংশ লোক সেই কথাই বলিবে। যাজ্ঞবল্ক্যের মত সত্য না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার মত অবোধ্য বা মোহকর নহে। তিনি এইভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন :—

“আমি মোহজনক কিছু বলি নাই। এই আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদবিহীন।”

ইহার পরে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে :—

“যে-স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে (যত্র দ্বৈতমিব ভবতি) সেই স্থলে একজন অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আভ্রাণ করে, এক অপরকে আশ্বাদন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ করে, এক অপরকে জ্ঞাত হয়। কিন্তু ইহার নিকট যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে? কিরূপে কাহাকে আভ্রাণ করিবে? কিরূপে কাহাকে আশ্বাদন করিবে? কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে? কিরূপে কাহাকে স্পর্শ করিবে? কিরূপে কাহাকে অবগত হইবে? মীহা দ্বারা সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে?”

এই আত্মা ‘নেতি’ ‘নেতি’ (ইহা নয়, ইহা নয়); ইনি অগৃহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না; ইনি অশীর্ষ্য, ইনি শীর্ণ হয়েন না; ইনি অসঙ্গ, কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না; ইনি অবক্ষ, ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন না এবং হিংসিত হয়েন না।”

উপদেশের শেষ কথা:—“বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিবে?” (বৃহ ৪.৫; ২।৪) এখানে যাজ্ঞবল্ক্য ঘোর অদ্বৈতবাদের কথা বলিলেন। তাঁহার মতে আত্মা হইতে পৃথক্ এবং দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। আত্মার বাহিরে যেমন কোন বস্তু নাই, আত্মার অভ্যন্তরেও কোন

প্রকার ভেদ নাই। এইপ্রকার আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি কিছুই সম্ভব নহে। যেখানে দ্বিতীয় বস্তু সেইখানেই দর্শন শ্রবণাদি সম্ভব হইতে পারে। আমরা এই পৃথিবীতে বাস করিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে। দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে বলিয়াই আমরা দর্শনের পক্ষে দর্শনাদি সম্ভব হইয়াছে। জগতে যদি দ্বিতীয় বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে আমরা দর্শনাদি কার্যই হইত না। কল্পনা কর জগতে আর-কোন বস্তুই নাই, আছে কেবল আমার দেহ। এখানে চক্ষু দ্বারা দেহের অপরাপর অঙ্গ দর্শন করা সম্ভব। দেহে ভেদ আছে, দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে; এইজন্যই চক্ষু অপরাপর অঙ্গকে দেখিতে পারে। কিন্তু দেহে যদি অপরাপর অঙ্গ না থাকিত, দেহ যদি কেবল চক্ষুময় হইত অর্থাৎ জগতে যদি কেবল একখানা চক্ষুই থাকিত—তাহা হইলে সেই চক্ষু কাহাকে দর্শন করিত? এই কল্পিত চক্ষুর বিষয়ে যাহা সত্য, আত্মার পক্ষেও ঠিক তাহাই সত্য। দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেইজন্য আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি কার্য সম্ভব হইতে পারে না।

আমরা যাহাকে “সংজ্ঞা” বা চৈতন্য বলি, তাহা দ্বৈত-মূলক। যতক্ষণ দ্বিতীয় বস্তু আছে, ততক্ষণই “সংজ্ঞা”। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবীতে আছি, ততক্ষণই আমরা দর্শনের এই ভ্রম হয় যে “দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে”। তাঁহার ভাষা এই :—

“যত্র দ্বৈতম্ ইব ভবতি”

অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় বস্তু আছে এই-প্রকার ভ্রম হয়। “ইব” শব্দ ব্যবহার করিয়া ঋষি বুঝাইতেছেন যে, দ্বৈতজ্ঞান ভ্রমাত্মক। মৃত্যুর পরে আত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; তখন আর দ্বিতীয় বস্তু আছে বলিয়া ভ্রম হয় না। ‘সংজ্ঞা’ যখন দ্বৈতমূলক এবং মৃত্যুর পরে যখন আত্মার নিকট দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, তখন আত্মার পক্ষে সংজ্ঞা থাকা অসম্ভব। এইজন্যই ঋষি বলিয়াছেন, “মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না”। এই আত্মাকে বর্ণনা করিতে হইলে কেবল বলিতে হয় ‘নেতি’ ‘নেতি’ (ইহা নয়, ইহা নয়)।

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়

‘নেতি’ ‘নেতি’ দ্বারা যাহাকে বর্ণনা করিতে হয়,

তাহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। এবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য এই-প্রকার বলিয়াছেন :—

(১) যাহা দ্বারা সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কি-প্রকারে জানিবে ?

(২) বিজ্ঞাতাকে কি-প্রকারে জানিবে ?

এই দুইটি বাক্যই একার্থ-প্রকাশক। ইহার অর্থ বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য এখানে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দর্শনশাস্ত্রের একটি গভীর তত্ত্ব। ইহা সহজ-বোধ্য নহে, এইজন্য এবিষয়ে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যিক।

যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত :—

“বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না”। ইহা যদি সত্য না হয় কল্পনা করা যাউক—“বিজ্ঞাতাকে জানা যায়”। যাহাকে জানা যায়, তাহা জ্ঞেয় বস্তু। যখন কল্পনা করিয়া লওয়া হইল যে, বিজ্ঞাতাকে জানা যায় তখন এই বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুরূপে পরিণত হইল। যাহা ছিল বিজ্ঞাতা তাহা হইল এখন জ্ঞেয় বস্তু। এখানে এই জ্ঞেয় বস্তুর এক নূতন জ্ঞাতা সৃষ্টি হইল। এইরূপে যদি এই দ্বিতীয় বিজ্ঞাতাকেও ‘জ্ঞেয়’ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তৃতীয় এক বিজ্ঞাতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা যতই অগ্রসর হই না কেন, সর্বোপরি একজন বিজ্ঞাতা থাকিবেই। এই বিজ্ঞাতাকে কখনই ‘জ্ঞেয়’ বলিয়া কল্পনা করা যায় না।

প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারেই একজন বিজ্ঞাতা আছে। এ বিজ্ঞাতাকে জানিবে কে? যে জানিবে সেই যে বিজ্ঞাতা। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে যে—“বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না”।

কিন্তু অনেকে বলেন, আমরা বুঝিতেছি “বিজ্ঞাতাকে জানা যায়”—ও যুক্তি শুনিব কেন? এপ্রকার আপত্তির মূলে যে কিছু সত্য নাই তাহা নহে। পূর্ববর্তী কোন ঘটনায় একজন বিজ্ঞাতা ছিল। তাহার কথা স্মৃতিতে রহিয়া গিয়াছে। আমরা সেই স্মৃতির ঘটনার বিজ্ঞাতা। কিন্তু কল্পনা করিয়া লই আমরা বিজ্ঞাতাকেই জানিতেছি। আমরা বিজ্ঞাতাকে জানি না, আমরা বিজ্ঞাতার শব্দ ব্যবচ্ছেদ করি।

আত্মার জাত্ব

আমরা বৈতমূলক জগতে বাস করিতেছি। এই-প্রকার জগতে দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান ইত্যাদি সমুদায় কার্যই সম্পন্ন হইতেছে। আত্মাই এখানে দ্রষ্টা শ্রোতা ও বিজ্ঞাতা।

কিন্তু ঋষি বলিয়াছেন, বৈত-জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। আত্মা যখন স্ব-রূপে বিরাজ করেন তখন দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি না—“আত্মা এই অবস্থায় দর্শন করেন, শ্রবণ করেন এবং জানেন।” সুতরাং এই আত্মাকে তখন দ্রষ্টা শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না। তবে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাকে কেন বিজ্ঞাতা বলিলেন? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, বৈতমূলক জগতে আত্মাই বিজ্ঞাতা। যাজ্ঞবল্ক্য অন্তঃ (বৃহঃ ৪.৩) ইহার দ্বিতীয় উত্তর দিয়াছেন। আত্মা স্বভাবতই দ্রষ্টা, শ্রোতা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি। দর্শনাদির বস্তু না থাকিলেও আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি জ্ঞানাদি লুপ্ত হয় না। এইজন্যই আত্মাকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতাদি বলা হইয়াছে। অন্তঃভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আত্মা অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় বস্তু নাই; সেইজন্য আত্মা দর্শন করে না, শ্রবণ করে না এবং জানে না। কিন্তু দ্বিতীয় বস্তু যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই আত্মা দর্শন করিতে পারিত, শ্রবণ করিতে পারিত, জানিতে পারিত, ইত্যাদি। যখন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, তখনও আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি ও জ্ঞানাদি বিলুপ্ত হয় না; এ-সমুদায় নিত্যই বর্তমান থাকে; ইহাই আত্মার প্রকৃতি। এই অর্থেই যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাকে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি বলিয়াছেন।

এই আত্মা বিজ্ঞাতা। কিন্তু বিজ্ঞাতাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। ইহার বিষয় কেবল বলা যায়—“নেতি”, “নেতি”।

উপসংহার

‘মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ’ আলোচনা করিয়া আমরা এই সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইতেছি।—

১। আমরা বলি বহু এবং বহু আত্মা। আবার ‘জীবাত্মা’ ও ‘পরমাত্মা’ এতদুভয়ের মধ্যেও

পার্থক্য দেখি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মা একই। মানবাত্মায় মানবাত্মার কিংবা মানবাত্মায় পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই।

২। একমাত্র আত্মাই বর্তমান; আত্মা হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই।

৩। আত্মার অভ্যন্তরে ও বাহিরে কোন ভেদ নাই। অল্প ভাষায় বলা যাইতে পারে— আত্মা যেমন বাহ্য-রহিত, তেমনি অন্তর-রহিত।

৪। ভ্রান্তিবশতই লোকে মনে করে এই জগৎ রহিয়াছে। যতক্ষণ এই জগৎ, ততক্ষণই দর্শন শ্রবণাদির কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা যখন 'স্বরূপ' প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, সুতরাং তখন দর্শন শ্রবণাদি সম্ভব হয় না।

৫। আমরা যাহাকে 'সংজ্ঞা' বা চৈতন্য বলি, তাহা দ্বৈতমূলক। যখন দ্বৈত-রূপ ভ্রম অপসারিত হয়, তখন আত্মার সংজ্ঞা থাকে না।

৬। স্ব-রূপ অবস্থাতে আত্মা অদ্বিতীয় সত্তারূপে অবস্থিতি করে। তখন বিজ্ঞান দর্শন শ্রবণাদির কোন

বিষয় থাকে না। কিন্তু তখনও আত্মার বিজ্ঞান দৃষ্টি শ্রুতি শ্রুতি বিলুপ্ত হয় না। এইজন্য বলা হইয়াছে আত্মা নিত্যই দ্রষ্টা শ্রোতা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি।

৭। এই বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না। যতক্ষণ আত্মাকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করি, ততক্ষণই আমরা বলিয়া থাকি “আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে”। যখন প্রকৃত জ্ঞান হয়, যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন আর দর্শন শ্রবণাদির উপদেশ বা কার্য সম্ভব হয় না।

৮। আত্মার [পারমার্থিক সত্তা কোনপ্রকারেই বর্ণনা করা যায় না। ইহার বিষয়ে একমাত্র উপদেশ “নেতি”, “নেতি”।

মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মশব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি ব্যবহার করিয়াছেন “আত্মা” শব্দ। এই আত্মাকেই তিনি ব্রহ্মত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

অপরূপ স্থলে তিনি যে-ব্রহ্মত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্ত্বের কথা

(ধরাসী পোল লাফাগ্ অবলম্বনে)

(১)

একএক দলে ত্রিশ-চল্লিশ জনে মিলিয়া “স্বাহ্বেজ্”রা দেশ হইতে দেশান্তরে বিচরণ করিত। যখন যেখানে ষাওয়া-দাওয়ার সুযোগ জুটিত, তখন সেখানে তাহারা কিছুকালের জন্ত ভেরা গাড়িত।

মর্গান্ বলেন :—“সাগরের কিনারায় কিনারায় স্বাহ্বেজ্জরা আহার্য্য তুঁড়িতে তুঁড়িতে ছুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দরিয়ার ছুই কুল ধরিয়াও স্বাহ্বেজ্জদের অভিযান অক্ষুণ্ণিত হইয়া থাকিবে।”

আফ্রিকার বৃশম্যান এবং সিংহলের হ্বেদাজাতি এখনও এইরূপ বিচরণের যুগেই রহিয়াছে। শিকার করিয়া ইহারা যে-সকল জানোয়ার দখল করে, এমন কি

সেইগুলি সম্বন্ধেও ইহারা “নিজস্ব” বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া যে যে জমিনের উপর ইহাদের শিকার চলে সেই সমুদয়কেও ইহারা নিজ সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করিতে শিখে নাই। বলা বাহুল্য শিকারের অমি ভূসম্পত্তির অতি প্রাথমিক রূপ মাত্র।

আদিম মানব জমি চষিতে জানে না। শিকার করিয়া এবং মাছ ধরিয়া সে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বনের ফল মূল এবং জানোয়ারের দুধ তাহার খাদ্য-দ্রব্যের তালিকায় বড় স্থান অধিকার করে। কাজেই অল্প-পরিমাণ জমিতে তাহার সকলপ্রকার অভাব মোচন হইতে পারে না। জানোয়ার চরাইবার জন্তই

বিস্তৃত ভূখণ্ডের দরকার হয়। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে এক-এক জন শ্রাহ্ণের নিজ ভরণ-পোষণের জন্য কমসে-কম তিন বর্গ মাইল জমি লাগে।

যেই লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে অম্মি জমি ভাগাভাগি করিবার দরকার উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথম জমি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ জানোয়ার চরাইবার মাঠ। দ্বিতীয়তঃ শিকারের বন। দুই প্রকার জমিই গোষ্ঠী বা জাতির সমবেত যৌথ সম্পত্তি বিবেচিত হইত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জ্ঞান অনেক পরবর্ত্তী কালে জন্মিয়াছে।

আমেরিকার ওমাহা জাতির লোকেরা বলে:— “আগুন এবং জল যেমন জমিও তেমন। এইগুলো কেনা-বেচা সম্ভব নয়।”

নিউজীল্যান্ডের মাওরিরাও বিবেচনা করে যে জমি কেনা-বেচার জিনিষ নয়। এমন কি যখন গোটা জাতি মিলিয়া একটা ভূখণ্ড বেচিবার জন্য প্রস্তুত হয় তখনও যেই একটা নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখনই মৃত্যু বৃদ্ধি দাবী করা তাহাদের দস্তুর। ইহারা বলে:— “আমরা নিজেদের অধিকার বিক্রী করিয়াছি বটে, কিন্তু অজ্ঞাত এবং ভবিষ্যতে যে-সকল লোক জন্মিবে তাহাদের অধিকার ত আমরা বেচি নাই।”

এইরূপ সম্পত্তিজ্ঞানের জটিলতা ছাড়াইয়া উঠিতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নিউজীল্যান্ড গবমেণ্টকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে। গবমেণ্ট জমি কিনিয়া থাকে বটে। কিন্তু একবারে দাম চুকাইয়া কেনা-বেচার নিষ্পত্তি হয় না। গবমেণ্ট একটা বার্ষিক খাজনার মতন কিছু কিছু দিয়া চলে। এই বার্ষিক দামে প্রত্যেক নবজাত শিশুর হিসসা রক্ষা পায়।

ইহুদি সমাজে এবং সেমিটিক্ জাতীয় নরনারীর লেন-ধেনেও ব্যক্তিগত ভূমির জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। “ওল্ড্ টেষ্টামেন্ট্” নামক বাইবেল গ্রন্থাংশের লেহিটিকুস্ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নিয়ম দেখিতে পাই:—“জমি কোনো দিনই বেচা হইবে না। জমিটা আমার, তোমরা বিদেশী এবং আমার অতিথি মাত্র।” এই গেল ভগবানের বাণী।

খৃষ্টানরা তাহাদের ভগবানের বাণী শুনে নাই। ভগবানের বিধিনিষেধকে ইহারা মুখে মুখে সম্মান করে বটে, কিন্তু ইহাদের আসল ভক্তিশ্রদ্ধার ও পূজার বস্তু হইতেছেন প্রবলপ্রতাপ “পুঁজি” বাহাদুর।

ভূমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থাৎ “স্বত্ব” এই জ্ঞান জগতে ছড়াইয়া পড়িতে এমন কি গজাইয়া উঠিতেই অনেক সময় লাগিয়াছে। মানব-জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ এক বিপুল আয়াসসাধ্য ঘটনা।

দক্ষিণ আমেরিকার কুয়গিদের যৌথ শিকার-ভূমির চারিদিকে যোজন যোজন বিস্তৃত অনধিকৃত জমি পড়িয়া থাকে। প্রাচীন রোমান্ সেনাপতি সীজাব বলেন:— “স্বয়েছি এবং ফার্মান্ সমাজে একটা বিশেষ গর্কের কথাই এই যে, তাহাদের নিজ নিজ সীমানার চারিদিকে অবিস্তৃত জনপদ অনধিকৃত থাকে।”

শ্রাহ্ণেজ এবং বার্সাব লোকেবা এই ধরণের অদি-বারীহীন ভূমিখণ্ড দিয়া নিজ যৌথ সম্পত্তিগুলো ঘেরিয়া রাখে। এই উপায়ে কোনো “বিদেশী”কে অর্থাৎ বিজাতীয় লোককে নিজ ভূমির উপর পা-মাড়ানো হইতে রক্ষা করা হয়। শ্রাহ্ণেজ বিচারে বিদেশী নিজ সীমানায় পা মাড়াইলেই শিকারযোগ্য জানোয়ার বিশেষ। “উদাসীনীকৃত” অধিকারীহীন ভূমি-মণ্ডল না থাকিলে শ্রাহ্ণেজরা অহরহ পরস্পর শিকার করিয়া পরস্পরের ধ্বংস সাধন করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই।

হেক্কেহেল্ডার বলেন যে, উত্তর আমেরিকার রেড্-স্কিনরা নিজ জমির চৌহদ্দির ভিতর কোনো বিদেশীকে পাইলে তাহার নাক কান কাটিয়া তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেয়। সন্দেহ সন্দেহ ইহারা এই ‘স্বপ্ননগা’র মারফত বলিয়া পাঠায় সে, আবার যদি কোনো লোককে তাহারা পাকড়াও করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা ইহার মাথার খুলি টাছিয়া ছাড়িয়া দিবে।

ইয়োরোপের মধ্যযুগে জমিদারতন্ত্র চলিতেছিল। সেই ফিউড্যাল-পন্থী জমিদার-মহলে বয়েৎ প্রচলিত ছিল এই:—“জমি যার লড়াই তার”। অর্থাৎ জমির উপর পা মাড়াইলেই বিদেশী লড়াইয়ের বস্তু। তখনকার

দিনে এই কারণে শিকারের জমি লইয়াই পাশাপাশি নবাব জমিদারেরা দিনরাত লাঠালাঠি করিত।

এই যে অনধিকৃত ভূমিগুণ ইহাই পরবর্তীকালে পাশাপাশি অধিবাসী জাতিদের বাজারে পরিণত হয়। আগে যে জমি দাগ দিয়া রাখা হইয়াছিল, বিদেশীদের নিরুদ্ধে চলাফেরা করিবার জন্ত, পরে সেই জমিই সওদা বিনিময় কেনাবেচা এবং বন্ধু বন্ধনের কেন্দ্র-রূপে গড়িয়া উঠে।

১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃটন জাতির এক জমিদার স্থানীয় রাজা হারল্ড ক্যাম্প্রিয়ান্দিগকে খুব উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দিয়াছিল। হারল্ড ছিল শ্রাকসন। শ্রাকসনরা অনেক-বার ক্যাম্প্রিয়ান্দের ঠেকা খাইয়াছে। হারল্ডের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প্রিয়ান্দের এই বলিয়া সন্ধি করে যে, অফারু বাঁধের পূর্বে দিকে ইহাদের কেহ সশস্ত্র দেখা দিবে না; যদি দেখ তাহা হইলে শ্রাকসনরা তাহার ডান হাত কাটিয়া ফেলিবে। শ্রাকসনরাও সেই সঙ্গে কতকগুলি বাঁধ তৈয়ারি করে। অফারু বাঁধ আর এই বাঁধের ভিতরকার জমিন উদাসীনীকৃত অনধিকৃত জমিন বলিয়া পরিগণিত হয়। এইখানে শ্রাকসন এবং ক্যাম্প্রিয়ান্ জাতীয় সওদাগরেরা আসিয়া হাট-বাজার করিত।

নৃতত্ত্ববিদেরা বিশেষ আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শ্রাহেজ-সমাজে মেয়ে-পুরুষের জীবন খুব বেশী আলাদা আলাদা। অনেকের বিশ্বাস এইরূপ ভাগাভাগি অবাধ মেলামেশা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। সাবেক কালে ভাইয়ে বোনে এই সংসর্গ চলিত। তাহা নিবারণ করার জন্ত মেয়ে পুরুষের মধ্যে অবাধ আনাগোনার নিয়ম তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব নয়।

“স্বনীতি” “শীল” ইত্যাদির প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে কাজকর্ম “নিতাকর্ম-পদ্ধতি” ষাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা ইত্যাদি কারণে সেই পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায় এবং গভীর হইয়া উঠে। সহজেই ইহা বোধগম্য যে, পুরুষের হাতে ছিল আহার্য সংগ্রহ করা এবং তাহার রক্ষণা-

বেক্ষণ ও তদ্বির করা। অপর পক্ষে স্ত্রী থাকিত রান্নাবাড়ার কাজে, কাপড়চোপড় তৈয়ারী করিবার ধান্দায়। আর গৃহস্থালী দেখা দিবার পর তাহার সকল কাজেই ছিল স্ত্রীজাতির অধিকার।

অষ্ট্রেলিয়ার কুনাই জাতীয় একজন লোক ইংরেজ পাদ্রী পর্যটক ফিজনকে বলিয়াছিল:—“পুরুষ শিকার করে, মাছ ধরে, লড়াই করে,—আর বসিয়া থাকে।” অর্থাৎ এই তিন কাজের বাহিরে যা-কিছু সবই স্ত্রীর কর্তব্য।

স্ত্রীপুরুষের এই সামাজিক ভাগাভাগি বা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে কাল মার্কস “শ্রম-বিভাগের” প্রাথমিক রূপ বিবেচনা করেন। স্ত্রী-পুরুষের শ্রমবিভাগে সম্পত্তি বা ধন-দৌলত খানিকটা স্ত্রীর অধিকাবে, খানিকটা পুরুষের অধিকারে।

পুরুষ শিকারী এবং যোদ্ধা। ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র তাহার সম্পত্তি। গৃহস্থালীর ইঁড়িকুঁড়ি এবং তাহার আনুযায়িক অন্যান্য সরঞ্জাম সবই স্ত্রীর সম্পত্তি। এই-গুলি ঘাড়ে অথবা মাথায় বহিয়া সে চলাফেরা করে, ঠিক তাহার ঘাড়ের শিশু যেমন তাহারই সম্পত্তি। শিশুর বাপ কে অনেক সময়ে তাহা অজ্ঞাত। মা-ই শিশুর মালিক। শিশুর মতন এইসব গৃহস্থালীর সরঞ্জামও স্ত্রীর সম্পত্তি এবং বোঝা।

চাষ-আবাদ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের ভাগাভাগি আরও বাড়িয়া যায়। জমি ভাগাভাগিও চাষ-আবাদের দরুনই জগতে প্রথম দেখা দেয়। পূর্বে যে জমি গোটা জাতি বা গোষ্ঠীর সমবেত সম্পত্তি ছিল, চাষ প্রবর্তিত হইবা মাত্র সেটা নানা টুকরায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

চাষবাসের আমলেও পুরুষ যোদ্ধা এবং শিকারীই থাকে। কৃষি-কার্যে মন দেয় স্ত্রী। কখনো কখনো শস্ত কাটার সময় পুরুষ আসিয়া স্ত্রীকে সাহায্য করে মাত্র।

যে-সকল সমাজে পশুপালন প্রচলিত, পুরুষ সেই-সকল সমাজে জানোয়ারের তদ্বির করে। চাষের কাজে সে ভিড়ে না। বস্তুতঃ সেই সমাজে চাষের চেয়ে পশু-পালন উচ্চতর কাজ বিবেচিত হয়। অবশ্য জানোয়ার চরানো যে চাষের চেয়ে সহজ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আফ্রিকার কাফ্রিদের বিবেচনায় জানোয়ার চরানো সম্ভ্রান্ত উচ্চাংশীয় কাজের মধ্যে পরিগণিত। গাভীকে ইহার বলে “কালো মুক্তা”।

চাষবাস “আর্য্য” জাতিপুঞ্জের সাবেক আমলে নিন্দাজনক “ছোটলোকের” কাজ বিবেচিত হইত। প্রাচীন ভারতের আইনে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের পক্ষে কৃষিকার্য্য নিষিদ্ধ ছিল। মনু বলেন (দশম অধ্যায়) :—“স্বধীগণের চিন্তায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চাষে লাগা নিন্দনীয়। কেননা হালের লোহার খোঁচায় ভূমির সঙ্গে জীবের গায়েও যা লাগে।”

একটা জিনিষ যে ব্যবহার করে সে-ই তাহার মালিক। ভূমি ব্যবহার করিত সাবেক কালে কাহার? নারীরা। এইজন্ত নারীদের অধিকার ছিল ভূমিতে। ভূমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত একুতিয়ার বা নিজস্বের জ্ঞান জগতে দেখা দিবা মাত্র নারীরা ইহার প্রথম মালিক হইয়াছিল।

জগতের যেখানে যেখানে মাতৃ-রক্তের জোরে পারিবারিক বন্ধন গড়িয়া উঠে সেখানে ভূমি নারীরই সম্পত্তি। প্রাচীন মিশরে, ভারতে নায়ার সমাজে, আফ্রিকায় তুয়ারেগ মহলে এবং পিরিনীস পাহাড়ের বাস্কু জাতির ভিতর ভূমিকে “স্ত্রীধন”-রূপে বিবেচিত হইতে দেখিতে পাই। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটলের আমলে স্পার্টা জনপদের দুই-তৃতীয়াংশ জমি “স্ত্রীধন” ছিল।

আর-একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। পরবর্তী কালে ভূমির জোরে লোকেরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং সমাজে মর্যাদা পাইয়াছে। কিন্তু সাবেক-কালে এই ভূমিই পরাধীনতার মূল ছিল। নারীরা আবার কড়া কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইত। এই কষ্টকর কাজ হইতে তাহারা মুক্তি পাইয়াছিল কখন? যখন জগতে গোলাম চাষী বা দাসত্ব-প্রথা দেখা দেয়। স্ত্রীজাতির গোলামীর জাগরণ তখন শুরু হয় চাষীদের গোলামী।

কৃষি-কার্যের প্রবর্তন মানব-সমাজে অনেক নূতন ঘটনা ঘটাইয়াছে। ইহার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। গোলামীর অভ্যাসে স্ত্রীজাতিকে কষ্টসহ

এবং নরম করিয়া ফেলা হইয়াছে। পরে দাস-মজুরি, খত-মজুরি ইত্যাদি নানাবিধ শ্রমিক গোলামি-জগতে হাজির হইয়াছে।

জমি ভাগাভাগি হইবা মাত্র সর্বত্রই একসঙ্গে নিজস্ব জ্ঞান অর্থাৎ সম্পত্তি-স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয় নাই। যৌথ সম্পত্তির ধারণা অনেক দিনই বজায় ছিল। যতদিন এই ধারণা টিকিয়াছিল ততদিন জমিগুলার চাষবাসও সমবেতরূপেই অচলিত হইত।

আংকোজাওরের সেনাপতি নেআর্কাস্ সমসাময়িক পঞ্জাব সম্বন্ধে বলেন :—“ভূমিগুলি, দলে দলে চষা হয়। দলে থাকে গোটা জাতি অথবা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বহু লোক। বৎসরের শেষে ফসলগুলি সকলের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়।” এই গেল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা।

মধ্যে আমেরিকার ইউকাটান্ দেশের চাষ সম্বন্ধে প্যাটক ষ্টিফেন্ বলেন :—“মায়া নামক ইণ্ডিয়ানরা সমবেতরূপে জমির উপর সম্পত্তি ভোগ করে। প্রায় একশ ভনে মিলিয়া জমি চষে। ফসল ভাগাভাগি করা হয়।”

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো প্রদেশের টাও নামক এক ইণ্ডিয়ান পল্লী হইতে ১৮৭৭ খৃঃ মিলার মর্গ্যান্কে লিখিয়াছিলেন :—“প্রত্যেক পুয়েবলো বা ভিহিত্তেই একটা করিয়া ভূট্টার ক্ষেত আছে। এইটা লোকেরা সকলে মিলিয়া চষে। ফসল জমা করিয়া রাখা হয় একটা যৌথ-গোলায়। দুর্ভিক্ষের সময়ে গরীবেরা এই গোলা হইতে অন্ন লাভ করে। গোলা থাকে কাশিক বা শাসনকর্তার জিম্মায়।”

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে—স্পেন বর্ত্তক ধ্বংস-সাধনের পূর্বে—চাষ ছিল এক বিপুল জাতীয় মহোৎসব বিশেষ। সকাল হইবা মাত্র দুর্গ-চূড়া হইতে নরনারী-দিগকে ডাকা হইত; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া পোষাকী কাপড় পরিয়া অলঙ্কারে সাজিয়া জমি চষিতে লাগিয়া যাইত। চাষের সঙ্গে সঙ্গে গান চলিত। চাষীদের গানের ‘মুদা’ থাকিত ‘ইঙ্কার’ রাজগণের স্তুতি-প্রশংসা। প্রেক্ষট প্রণীত ‘পেরু-বিজয়’ গ্রন্থে জানা যায় যে, চাষীরা মহা উল্লাসে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিত।

সীজার বলেন:—“স্বয়িহরা ছিল জাখানদের ভিতর সবসে সেরা লড়াইপ্রিয় ও মজবুদ জাতি, (ভারতীয় যৌথ জাতির মতন ‘ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় বিশেষ’)। ইহার ভিন্ন ভিন্ন একশ গ্রাম হইতে একশ জনকে লড়াইয়ে পাঠাইত। যাহারা গ্রামে থাকিত তাহারা এই যোদ্ধাদিগকে ভরণপোষণ করিত। পর বৎসর যোদ্ধারা দেশে ফিরিয়া চাষে লাগিত আর চাষীরা যাইত লড়িতে। এইরূপে লড়াইয়ের সঙ্গে চাষের অদল-বদল ঘটিত এবং দুই-ই চলিত এক সঙ্গে।”

স্বাণ্ডিনাফ্রিয়ানদের সমাজেও এইরূপ যৌথ লড়াই এবং যৌথ চাষের ব্যবস্থা ছিল। লড়াইয়ের মাঠ হইতে ফিরিয়াই ইহার স্ত্রীদিগকে ফসল কাটার কাজে সাহায্য করিত।

যৌথচাষের রীতি জগতে অনেক দিন পর্যন্ত চলিয়াছে। এমন কি আদিম যুগের যৌথ ধনদৌলতের প্রথা লোপ পাইবার পরও কৃষিক্ষেত্রে সমবেত প্রথা রহিয়া গিয়াছিল।

কৃষিয়ার পল্লীতে পল্লীতে খানিকটা জমি মিরের জমি নামে পরিচিত। এই জমি চষে পল্লীবাসীরা সমবেত-ভাবে। ফসল পল্লীবাসীদের ভিতর ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়। অল্প জনপদে জমিগুলা চষা হয় সমবেত-ভাবে। কিন্তু ফসল কাটবার পূর্বেই চাষ-করা জমি ভিন্ন ভিন্ন পরিষ্কারের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

কৃষিয়ার ‘ডন্’ জনপদের কোথাও কোথাও ধানের ভূমিগুলা প্রথমেই ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয় না। গোটা মাঠ একত্রে তদ্বির করা হয়। ঘাস কাটাও হয় একত্রে। ভাগবার্টোয়ারা অনুষ্ঠিত হয় সর্বশেষে। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করাও হয় সমবেত-ভাবে। চাষ-আবাদের ভূমিতেও যৌথ চষা এবং খোঁড়া প্রচলিত।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে একসঙ্গে দল বাঁধিয়া অনেকগুলা লোক জমিন তৈয়ার করে। এক-এক দলে চার পাঁচজন করিয়া কাজ করিতে মোতায়েন থাকে। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া মাটি খুঁড়িবার শিক। ইহার সকলে মিলিয়া দুই ফুট ব্যাসওয়াল পরিধির মাটি খুঁড়িতে সচেষ্ট হয়। যখন প্রত্যেক দলের প্রায়

১৮ ইঞ্চি গভীর মাটি নরম হইয়া আসে তখন শিক-গুলার জোরে গভীরতম জমিনের মাটি উপরে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করা হয়। এইরূপে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কম-কম আঠার ইঞ্চি খুঁড়িয়া সর্বত্র গভীর চাষের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

স্বটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডার সমাজেও এইধরণের মাটি খোঁড়া প্রচলিত আছে। উর-বিবৃত রীতি-অনুসারে নৃতত্ত্ববিৎ গম্ এই কথা বলেন।

সীজারের বর্ণনায় জানা গিয়াছে জাখানরা বৎসর বৎসর লুটপাটের অভিযানে বাহির হইত। লুটের ধন সম্ভবত সকলের ভিতরই বাঁটিয়া দেওয়া হইত। যাহারা চাষের জন্ত ঘরে বসিয়া থাকিত তাহারাও এই ধনে বঞ্চিত হইত না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রীকেরাও এইরূপ ডাকাইতি করিত। ইহার ছিল জলদস্যু। ভূমধ্য সাগরকে ইহার উত্তমখুত্তম করিয়া ছাড়িয়াছিল। লুটপাট করিয়া ইহার পাহাড়ের উর্গায় অবস্থিত দুর্গে পলাইয়া আসিত। স্বাণ্ডিনাফ্রিয়ানদের জল-দুর্গের মতন এই গ্রীক দুর্গাবাস-গুলাও একপ্রকার দুর্ভেদ্য ছিল।

একটা গ্রীক গানের এক টুকরা আজও সেই প্রাচীন জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। গানের বীর বলিতেছেন :— “এক বিপুল বল্লম আমার সম্পদ। তলোয়ারেও আমার জোর। তাহার উপর শরীরের দুর্গঙ্গরূপ আছে এক ঢাল। এই দিয়াই আমি জমি চষি আর ফসল তুলি আর আঙ্গুরের রস শুষি। এইগুলার প্রতাপেই লোকে আমায় স্নোয়াদের (গোলামদের) প্রভু বলিয়া মানে। যার যার এই বল্লম আর ঢাল নাই তারা আমুক আমায় কুর্নিশ করিতে। আমি তাদের মহারাজ।”

ডাকাইতি আর জলদস্যুগিরি মাক্কাতার আমলে এক বড় পেশা। হোমারের “অডিসি” গ্রন্থে নেষ্টর তাহার অতিথি তেলেমাকুসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :— “আপনি কি জলদস্যু?” ইহা একটা গৌরবের কথাই ছিল, নিন্দার নয়।

এথেমের রাষ্ট্রনায়ক সোলন্ জলদস্যুগিরি বিজ্ঞায় যুবাদিগকে পোক্ত করিয়া তুলিবার জন্ত একটা বিজ্ঞা-

পীঠই কায়েম করিয়াছিলেন। গেইয়াস ইনুষ্টিউট নামে সেটা পরিচিত। ঐতিহাসিক থুসিডিডিস্ বলেন—“সে-কালে জলডাকাইতি বেশ সম্মানজনক ব্যবসা বিবেচিত হইত।”

ডাকাইতরা ডাকায় নামিয়া হাতের কাছে যাহা পাইত তাহাই লইয়া চম্পট দিত। নরনারী জানোয়ার ফসল আস্বাব হাঁড়িকুঁড়ি কিছুই বাদ পড়িত না। পুরুষেরা গোলামে পরিণত হইত। মেয়েরা থাকিত পুরুষদের চৌকিদারস্বরূপ। গোলামরা বিজেতাদের জমি চষিত।

ক্রীট দ্বীপের নগরগুলো এই ধরণের ডাকাইত বীর-গণের উপনিবেশস্বরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অ্যারিষ্ট-টলের আমল পর্যন্ত প্রত্যেক নগরেই গোলামের দল জমির চাষে বাহাল থাকিত। জমিগুলো অবশ্য ছিল খাসমহাল। গোলামদিগকে বলিত স্লোতি। সরকারী জমিন এবং সরকারী গোলাম ছিল গ্রীকদের যৌথ বা সমবেত সম্পত্তি। সেইরূপ গ্রীক নগরের আর-এক অঙ্গ সরকারী বা যৌথ ভোজ। যৌথ খানাপিনার বিবরণ হেরাক্লিডেসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। অন্ত্যন্ত লেখকও এই বারোয়ারীতলার ভোজন-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক সমাজে দুই শ্রেণীর গোলাম ছিল :—প্রথম, সরকারী গোলাম; দ্বিতীয় ব্যক্তিগত গোলাম। সরকারী গোলামের সকল-কেই সরকারী জমি চষিতে বাহাল করা হইত না। অনেককে পেয়াদা আরদালি দফাদার ইত্যাদি শাসন-বিভাগের নিম্নতর কোঠায় নকরি দেওয়া হইত।

বিলাতী রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির ড্যান্জ্যাকস্থান্স কেতাবে ১৮৩০ সালের খণ্ডে হজসন্ মাদ্রাজ শহরের ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের এক পল্লীর কথা বিবৃত করিয়াছেন। এই পল্লীর চাষীরা তাহাদের কাজে সরকারী গোলামের সাহায্য পাইত। মাদ্রাজে যে এইরূপ ‘সরকারী গোলাম’ ছিল তাহার প্রমাণ কি? পল্লীবাসীরা নিজ পল্লীতে যে-সকল একুতিয়ার ভোগ করিত সেইগুলো বিক্রী করিবার সময় অথবা বন্দক রাখিবার সময় সহকারী

চাষীদের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইত। কাজেই এই সহকারী চাষীদিগকে পল্লীবাসীদের সাধারণ বা যৌথ সম্পত্তির এক অংশ বিশেষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। মধ্যযুগের ভারতীয় শহরে এবং পল্লীতে যৌথ গোলামি প্রচলিত ছিল।

যেদিকেই ডাকাই সর্বত্র ভূমি-সম্পত্তি অথবা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে সম্পত্তি, জানোয়ার সম্পত্তি, গোলাম সম্পত্তি,—সকলপ্রকার সম্পত্তিই গোটা জাতি গোষ্ঠী বা দেশের যৌথ সম্পত্তি ছিল। মানবজাতির শৈশব এই সমবেত ধনদৌলতের ব্যবস্থায় পরিপুষ্ট হইয়াছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম ধনসাম্য লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগে সম্পত্তি ব্যক্তিগত। জমিদার রাজরাজড়া পুঁজিজীবী ও অন্ত্যন্ত ধনবান্দের আওতা এড়াইয়া প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষী আজও কিছু কিছু খাড়া আছে। আজকালকার খাসমহালগুলো সেই মাদ্রাজের আমলের আর্থিক ব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে।

“উৎকর্ষের যুগে” সাবেক কালের ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়াছে, সত্য। কিন্তু পুরানা ভাঙিয়া ফেলাই সভ্যতার যুগের একমাত্র মানবকীর্তি নয়। একটা নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও এই যুগের এক কৃতিত্ব।

মাদ্রাজের আমলের সমবেত ধনদৌলত জগতে আর একপ্রকার দেখা যায় না বটে, কিন্তু খানিকটা জটিলতর এবং উন্নততর সরকারী বা যৌথ সম্পত্তি জগতে দেখা দিয়াছে। মানবজীবনের অন্ত্যন্ত অস্থান-প্রতিষ্ঠানের মতন সুখস্বচ্ছন্দতার যন্ত্র বা বাহনস্বরূপ এই যে ধনদৌলত তাহাও নিত্যনূতন ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া রূপে-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর্থিক সভ্যতার ইতিহাসে ভাঙন এবং গড়ন রূপ-ভেদের দুই দিকই লক্ষ্য করিতে হইবে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান গবেষণা শুরু করিলে ধনবিজ্ঞান-সেবীরা “অধাতঃ সুখ-জিজ্ঞাসা”র ইতিহাসে মানবচরিত্রের এবং মানবসমাজের অনেক গভীরতর তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

সমাজ-সেবার গাইকোয়াড়

যে-সকল উদার-হৃদয় ভারতবাসী সমাজের অবনত শ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বরোদার গাইকোয়াড় তাঁহাদের অন্ততম। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার রাজ্যের অন্ত্যজদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয়। তাঁহার সহস্র সহস্র প্রজাকে সমাজের তথাকথিত কুলীনগণ কর্তৃক নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে

এই স্বঘোণে তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রজাদের অভাব অভিযোগ অবগত হইবার ও তাহাদের সহিত সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত সফরে বহির্গত হন। এই সময় তিনি দেখিতে পান যে হতভাগ্য অন্ত্যজেরা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য করা হয়। তাহারা গ্রামেব নিকৃষ্টতম অংশে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে বারো মাস অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন-



মহারাজা সায়াজীরাও গাইকোয়াড়

নিষ্পেষিত হইতে দেখিয়া মহারাজা তাহাদের দুর্দশা মোচন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন ও তখন হইতেই তিনি তাহাদের উন্নতির জন্ত নানাদিক্ দিয়া নানা-প্রকারে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তখন তিনি সবেমাত্র সাবালক হইয়া রাজ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।



মহারানী চিমনবাই গাইকোয়াড়

যাপন করে। পচা ডোবা ভিন্ন অত্র কোন জলাশয় হইতে তাহারা পানীয় জল আনিতে পারে না। সাধারণ পাঠশালায় তাহাদের পুত্র-কন্যা পড়াশুনা করিতে পারে না।

মহারাজা গাইকোয়াড় স্থির করিলেন যে সর্বাত্মে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যিক। শিক্ষায় অগ্রসর না হইলে তাহারা তাহাদের নিজেদের দুর্দশার



পণ্ডিত আয়ারাম ও তাঁহার পবিত্রপরিবার

কথা সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু হিন্দুবা তাহাদের বিদ্যালয়ে এই অস্পৃশ্যদিগকে অধ্যয়ন করিতে দিতে নারাজ। কাজেই তাহাদের জন্ম পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইল।

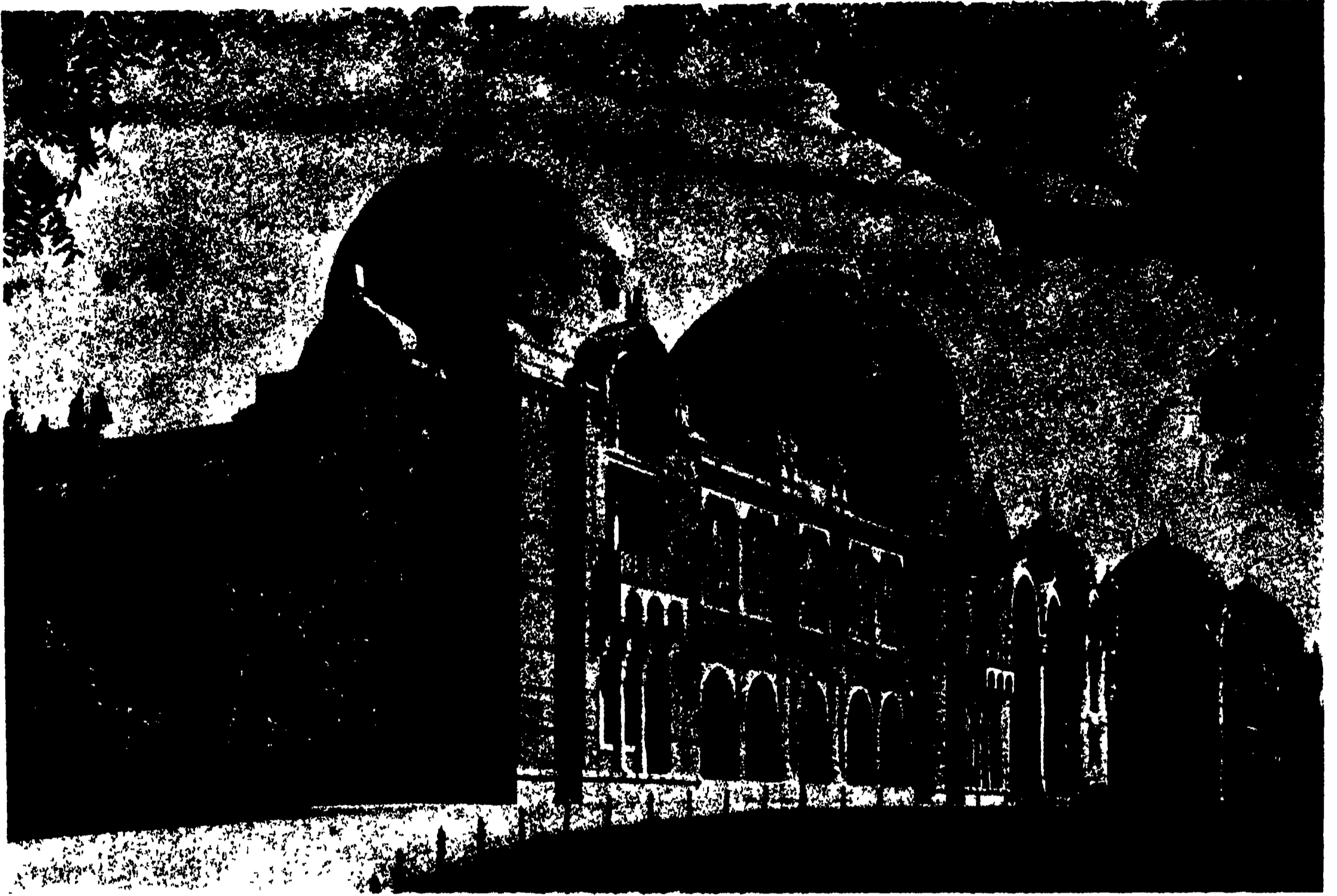
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজার উদ্যোগে অবনত শ্রেণীদের জন্ম দুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তখন বরোদা-রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু এই দুর্দশাগ্রস্ত অন্ত্যজদের নিমিত্ত সহৃদয় মহারাজা অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে পুস্তকাদিও রাজসরকার হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাহাদের জন্ম বেশী পাঠশালা স্থাপন করা সম্ভবপর হইল না। কৌলীগ্র-গর্বে-গর্বিত হিন্দুরা চিরকালই তাহাদের পূজা পাইয়া আসিতে চায়। কাজেই তাহারা শিক্ষকতা করিতে অস্বীকার করিল। স্কুলসমূহের হিন্দু পরিদর্শক-

রাও নানা উপায়ে যাহাতে এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না হয় এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু মহারাজা দমিবার পাত্র নহেন। তিনি উপযুক্ত মুসলমানদিগের হস্তে এইসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ও পরিদর্শনের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু এই উপায়েও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হইল না। শিক্ষকেরা আন্তরিকতার সহিত কার্য করিত না, কাজেই অন্ত্যজেরা আশাহ্নরূপ উন্নত হইল না।

অবশেষে মহারাজা ঘোষণা করিলেন যে, যে-সকল ব্রাহ্মণ শিক্ষক অন্ত্যজদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন তাহাদিগকে বেতন ছাড়া শতকরা ৫০ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে। পরিদর্শকদিগের উপরও নোটিশ জারি করা হইল যে তাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইবে। ইহাতেও বিশেষ ফল হইল না। বরোদা, নভসরাই, আমবেলী ও পত্নন



বরোদা কলেজ

সহরে অস্ত্যজদের নিমিত্ত চারিটি ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় খোলা হইল। এখানে তাহাদিগকে বাসস্থান ও অন্নাশ্রয় খরচা রাজসরকার হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থাও করা হইল। কিন্তু ছয়-বৎসর যত্ন সত্ত্বেও এই চেষ্টা সফল হইল না।

গাইকোয়াড়ের সঙ্কল্পও অচল। এতবার বিফলমনোরথ হইয়াও তিনি আরও কার্যটি পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে লাগিলেন। ১৯০৫ সালে মহারাজা সমগ্র বরোদা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পাবিলেন যে শিক্ষকদের শৈথিল্যেই অস্ত্যজদের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ তাহারা হৃদয়ের সহিত অস্ত্যজদিগকে উন্নীত করিবার চেষ্টা করে নাই—তাহারা কেবল কলের মতন কাজ করিয়া তাহাদের প্রাপ্যবেতন হজম করিয়াছে। মহারাজা এইবারে একজন প্রকৃত ও ত্যাগী কর্মীর সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন।

মহারাজা এই কার্যের জ্ঞান পণ্ডিত আত্মারামকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পণ্ডিতজী আর্ধ্য সমাজভুক্ত ও সে সময়ে (১৯০৭ চ) পাঠ্যাবে পারিআদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মহারাজা তাঁহার উপর অস্ত্যজদের শিক্ষার ভার প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য গাইকোয়াড় এইবার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই এই মহৎ কার্যটি স্তম্ভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত আত্মারাম অতি অল্পকাল মধ্যেই অস্ত্যজদের হৃদয় জয় করিলেন।

পণ্ডিতজী বরোদা পৌছিবার অনতিকাল পরেই সহরের নিকটবর্তী একটি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে একটি বৃহৎ বাঙ্গলো নির্মাণ করাইলেন। এই বাঙ্গলোটের চারিধারে বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল। এখানে তিনি অস্ত্যজদের নিমিত্ত বোর্ডিং ইন্স্কুল স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথমে অস্ত্যজদের পল্লী হইতে বুদ্ধিমান্ বালকবালিকাদিগকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আনিয়া ভর্তি করিলেন। এখানে তাহাদের অবগাহনের নিমিত্ত ভাল পুষ্করিণীর বন্দোবস্ত হইল,

তাহাদের পরিষ্কার পরিধেয় বস্ত্র দিবার ব্যবস্থা হইল এবং তাহাদিগের নিমিত্ত ভাল ভাল খাদ্যের আয়োজন করা হইল। তাহারা জীবনে কখনও এরূপ সুখ উপভোগ কবে নাই। ইহা ভিন্ন যখন তাহারা দেখিল যে এজন উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তোক তাহাদের মধ্যে আপনার জনের মত বাস করিতেছেন তখন তাহারা পণ্ডিতজীর একান্ত অহুগত হইয়া পড়িল। এরূপে সকলপ্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতজী তাহাদের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিলেন।

এই বিদ্যালয়ের সাফল্য দর্শনে মহারাজা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পস্তন গ্রামে ঐরূপ আর একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করাইলেন এবং শীঘ্রই নবসরাইএ আর-একটি বিদ্যালয় খোলা হইল। এইসকল বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার উৎসাহী সমাজ-সেবকদের উপর অর্পিত হইল। তাঁহারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; তাঁহারা অসত্যজদিগকে নানাভাবে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে যত্নবান হইলেন।

পণ্ডিত আশ্বারামের নেতৃত্বে এইসকল উৎসাহী সমাজ-সেবক বরোদার অহুগত জাতিদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীকে বর্তমানে বরোদার স্কুল পরিচালনার ভার হই ত নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে—বর্তমানে সে কার্য তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শান্তি-প্রিয় পরিচালনা করিতেছেন। পণ্ডিতজী এক্ষণে বরোদা রাজ্য ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কার্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যে-সমস্ত স্থানে কয়েক বৎসর পূর্বে শিক্ষকদের শৈথিল্যে অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল সে-সকল স্থানে বর্তমানে সুন্দরভাবে পাঠশালা চলিতেছে। পণ্ডিতজী ও তাঁহার অধীনস্থ অক্লান্ত কর্মীদের প্রচেষ্টাতেই যে এইবারের উত্তম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এইসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীও নূতন ধরণের। ছাত্রছাত্রীদিগকে সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত ধর্ম শিক্ষাও দেওয়া হয়। ইহাদিগকে লইয়া Boy Scout



বরোদা রাজ্যের দেওয়ান—শ্রী মানুভাই মেটা

ও Girl Guide এর দলও গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেককে সমাজ সেবায় দীক্ষিত করিয়া তোলা হইতেছে। তাহাদিগের ব্যাঘ্রামের প্রতিও শিক্ষকেরা দৃষ্টি রাখেন। বালিকারা সেলাই ও অগ্ন্যাশ্রু সূচী-কর্মের শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি করিয়া পাঠাগার ও তর্কমভা আছে।

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় এইসকল বিদ্যালয়ের কার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কারণ



লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ

অন্ত্যজদিগের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কাজেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তাহাদিগকে বেশী সহ্য করিতে হয়। আবার ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইন্ফ্লুয়েঞ্জা রোগে বরোদারাজ্যে মড়ক লাগিল তখনও এইসকল অন্ত্যজের কাজ ভালোরূপে চলে নাই কারণ দারিদ্র্য-নিবন্ধন অন্ত্যজেরাই এই মহামারীতে সর্বাধিক বেশী ভুগিয়াছিল। তবুও এই দুইবারের আক্রমণে অন্ত্যজেরা পণ্ডিতজীর শিক্ষার ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলে এই দুই মহামারীতে তাহাদিগকে যে নিশ্চল করিয়া দিত তাহার সন্দেহ নাই।

মহারাজা অন্ত্যজদের মধ্যে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়াই নিশ্চিত হন নাই। বরোদার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহে ও কলেজে অন্ত্যজ বালকদের জ্ঞান বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। মহারাজের দানের সাহায্যে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি অন্ত্যজ বালক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী উপাধি পাইয়াছে ও

সম্প্রতি সরকারী বৃত্তি লইয়া একটি অন্ত্যজ বালক আমেরিকার কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে।

অন্ত্যজদের পুরোহিতদিগের শিক্ষার (ইহারা গারোদা নামে অভিহিত) জ্ঞানও রাজ-সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় আছে।

বরোদার গাইকোয়াড় প্রতিবৎসরই অন্ত্যজ বালক-বালিকাদিগকে নিজ প্রাসাদে আহ্বান করিয়া ভোজ দেন। যাহারা এতদিন অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য ছিল রাজা তাহাদিগকে মতিবাগ প্রাসাদে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আহ্বান করিয়া আনন্দ-সহকারে তাহাদিগের আবৃত্তি-পাঠ শ্রবণ করেন। কিন্তু পূর্বে যদি কোন অন্ত্যজ এইসকল মন্ত্র শ্রবণও করিত তবে তাহাদিগের কর্ণে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত। গাইকোয়াড় ও মহারানী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অন্ত্যজ বালকদিগকে লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদে আহ্বান করেন এবাবে তাহারা বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে ও

হোম যজ্ঞ করে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গাইকোয়াড় হিন্দু বালক-বালিকা ও অন্ত্যজ বালক-বালিকাদিগকে একত্রে আহ্বান করাইয়া ভোজ্য দেন।

এইরূপে মহারাজা জাত্যভিমানী কুলীনদিগকে ক্রমে ক্রমে ইহাদিগের সহিত একতা-সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে ইহাদিগকে রাজকার্যেও নিয়োগ করা হইতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৪২ জন অন্ত্যজ সরকারী কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত স্কুল কলেজেই তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী আদালতে, পুস্তকাগারে ও হাঁসপাতালেও তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মিঃ শিবরাম নামক একজন অন্ত্যজকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আসন গ্রহণ করিবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন গাইকোয়াড় মিঃ আশ্বেদকার নামক অগ্র একজন অন্ত্যজকে ঐ পদে মনোনীত করেন। মিঃ আশ্বেদকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম অন্ত্যজ উপাধিধারী। এইরূপে অস্পৃশ্য-দিগকে আইন মজলিসে বসিবার অধিকার দিয়া গাইকোয়াড় তাহাদের অভাব-অভিযোগ মোচনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু বরোদার হিন্দুরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা অন্ত্যজদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা নানা-প্রকারে অন্ত্যজদিগকে লোক-চক্ষে হীন করিবার চেষ্টা করে। এতদিনে কেবল দুইটি অন্ত্যজের সহিত মিশ্রবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

যদিও মহারাজার আদেশে সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়েই অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার আছে—তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই এই আইন লঙ্ঘন করা হয়। যতদিন মহারাজা এইসকল বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া না দেন ততদিন এইপ্রকার কুলীন পরিচালকদের সমুচিত শিক্ষা হইবে না।

বরোদার সমবায় সমিতির ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সেবক-লাল পারেখ একজন বিশিষ্ট হিন্দু। তিনি অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পবিশ্রম করিতেছেন। কৃষি ও বয়ন

বিভাগে যাহাতে তাহারা উন্নতি করিতে পারে এবিষয়ে শ্রীযুক্ত পারেখ যথাসক্তি চেষ্টা করিতেছেন। তাহার চেষ্টায় ইহাদের মধ্যে ৩৮টি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পারেখ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অন্নসমস্যার সমাধানেব চেষ্টা করিতেছেন।



শ্রী নানাঙ্গী দেবিঙ্গী মাকওয়ানা

এক্ষণে দুই চারটি অন্ত্যজ যুবকও নিজেদের দুন্দশা মোচনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা পান-দোষ নিবারণ কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। মিঃ মুর্জা ভূধরদাস অন্ত্যজ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বর্তমানে একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। আমেদাবাদের বিখ্যাত মহিলা শ্রমিক-নেত্রী শ্রীযুক্তা অননুয়া বাই এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করেন। মিঃ ভূধরদাস একটি শ্রমজীবী সঙ্ঘও স্থাপন করিয়াছেন। পুনী কল্যাণলাদেব অত্যাধিক বিবাহিত



অসত্যজদের ধর্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও অসত্যজ বয় স্কাউট্ দল

করিয়া তাহারা এই সজ্জের সাহায্যেই জীবন ধারণ করিয়াছে। এই সজ্জের চেষ্টায় কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয়ও খোলা হইয়াছে। অসত্যজ পুরোহিত লালাজী শর্মা গারোদার সাহায্যে মিঃ ভূবরদাস “অসত্যজধারক” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

লালাজি অসত্যজদের জন্ম কয়েকটি শ্রমিক বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছেন। কিন্তু এযাবৎ তিনি ঐ টাকা তুলিতে সক্ষম হন নাই। তিনি আমেদাবাদে একটি সেবাশ্রম স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অর্থাভাবে এই আশ্রমের কাষের প্রসার হইতেছে না।

নবসরহিতে শ্রীযুক্ত তুলসীদাস মূলদাস ও তাঁহার পত্নী অসত্যজদের উন্নতির জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা একটি বালকদের স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছেন।

অসত্যজের উন্নতির জন্ম নানাজী মাকওয়ান ধেরূপ অক্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

নানাজী, বরোদা লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্র) মিঃ নিউটন দত্তের বাড়ীর ভৃত্য। সে তাহার প্রভুর উৎসাহে নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্ম একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে ও নিজেই তাহার অদ্বৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করে। এই পুস্তকাগারে সরকারী সাহায্যও প্রদত্ত হয়।

অসত্যজেরা সাধারণ হোটেলে থাকিতে পায় না। নানাজী নিজেদের এই দুর্দশা দেখিয়া দানবীর মহারাজার সাহায্যে একটি ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছে। এই ধর্মশালাটি রেল ষ্টেশনের নিকটে খোলা হইয়াছে। সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের দেওয়ান শ্রাব্ মাহুভাই মেটা এই অস্থানটির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

কিন্তু বর্তমানে বরোদারাজ্যে সকল বিভাগেই ব্যয়-সংক্ষেপের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। অসত্যজদের উন্নতির বিরোধী রাজকর্মচারীরা অসত্যজদের শিক্ষার ব্যয় কমাইবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অসত্যজদের উন্নতিকল্পে বৎসরে আনুমানিক এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। কাজেই এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়টিতে সামান্য

ব্যয়সংক্ষেপ করিলে যে রাজসরকারের বিশেষ সুবিধা হইবে না. তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথাকথিত কুলীন সরকারী কর্মচারীরা গাইকোয়া-ডের নিকট নিবেদন করিতেছে যে বর্তমানে অন্ত্যঙ্গেরা সাধারণ স্কুলেই পড়িতে পারে। কিন্তু একথা সকলেই জানে যে অবনত শ্রেণীদের বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া গেলে হিন্দুদের স্কুলে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

মহারাজা গাইকোয়াড় তাঁহার তথাকথিত কুলীন প্রজাদের কথা প্রত্যক্ষভাবেই জানেন। সুতরাং তিনি তাহাদের দুর্ভিক্ষমূলক প্রস্তাবে কণপাত করিবেন না বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। অবনত জাতির তাহা এই উদারতার জন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিবে।

শ্রী প্রভাত সাংখ্যাল

ফুল-দোল

এক

শুনিয়াছি, পূর্বে নাকি সেখানে নীলের চাষ-আবাদ চলিত। এখন সেস্থান শাল, তামাল, মহুয়া, হরিতকী, পলাশ ইত্যাদি নানা প্রকার বৃক্ষলতা-পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে, শীর্ণা সিন্ধারন নদীটি পূর্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি বনের মাঝে ধীরে-ধীরে বহিতেছে। নীল কুঠীর যে-সব প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় বল-দর্পী বড়-সাহেব বাস করিতেন, সেগুলো এখন জীর্ণ পঙ্করাস্থি-সম্বল অবস্থায় নতশিরে ধূলায় মিশিতেছে। এবং সাহেবের পরিবর্তে সম্প্রতি সেখানে বন্য শৃগালের দল, তাহাদের অপ্রতিহত রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। উৎপীড়িত এবং উৎপীড়ক, উভয় সম্প্রদায়ের পদধূলি বক্ষে ধরিয়া লাল কঁাকরের যে প্রশস্ত পথখানি তাহারই পাশে নির্ঝিকার মহাদেবের মত ধূলিশয্যা রচনা করিয়া পড়িয়াছিল,—সে যদিও আজ প্রকৃতির করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তথাপি কচিদূর্কাঘাণ-গুলি তাহার রক্ত-রাঙা বকের উপর বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। কত শত নিরীহ অমজীবীর রক্তে রাঙা এই পথরেখা,—নীলকুঠীর বহুবিধ অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী আজিও স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সবুজের গায়ে রক্ত-নিশান উড়াইয়া বাঁচিয়া আছে!

সেদিন অপরাহ্নে এক সাঁওতাল যুবক পুনকা, এবং এক সাঁওতাল-যুবতী সুখী, ফুল তুলিবার জন্য এই বনে

আসিয়া প্রবেশ করিল। নিকটস্থ একটা কয়লা-কুঠীর কুলি-ধাওড়া হইতে তাহারা আসিয়াছে। আগামী কল্য তাহাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইবে এবং সেইজন্য তাহারা আজ হইতে পুষ্প-চয়নে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখে নীল-কুঠীর ভাঙা দেওয়াল বাহিয়া নাম-না-জানা কি একটা বন-লতার গাছ উঠিয়াছে এবং ফুলে-ফুলে সারা দেওয়ালটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে,— এমন কি, গাছের পাতাগুলি পর্যাস্ত দেখা যাইতেছে না। সেদিকে সুখীর নজর পড়িতেই, সে তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়া গিয়া, হাত হইতে প্রথমে তাহার বাঁশের বুড়িটা নামাইল এবং মুগ্ধনেত্রে সেই গোলাপী রঙের ফুলগুলির পানে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এদিকে ঠিক এই সময়টায় পশ্চিমদিগন্ত হইতে সূর্যাস্তের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এই পুষ্প শোভিত ভয় প্রাচীরের উপর প্রতিফলিত হইয়া স্থানটাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। সসঙ্কোচে ফুলের একটি গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে সুখী তাহার খোঁপায় ঝুঁজিল। ভাবিল, সব ফুলগুলো তুলিয়া এখনই তাহার বুড়িটা ভর্তি করিয়া লইবে কিনা। নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে ছিড়িয়া লইয়া গাছটাকে একেবারে হতশ্রী করিয়া দিতে সে যেন একটুখানি সঙ্কোচবোধ করিতেছিল। যৌবন-বেদনাময় সুন্দরীর বকের তলায় কোথায় যেন ব্যথা বাজিতেছিল।

ডানদিকের কোঁপের ভিতর পাতার ভিড় ঠেলিয়া, পুনকা তখন অণু ফুলের সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছে। সূখী একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া দেখিল, ঘন পত্র পল্লবের ভিতর সে যে কোন্ খানে অদৃশ্য হইয়া গেছে, দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাবিল, পুনকা ফিরিতে-না-ফিরিতে এই সুন্দর ফুলগুলি দিয়া সে যদি তাহার ঝুড়িটা ভর্তি করিমা লইতে পারে, তাহা হইলে সে হয়ত অবাক হইয়া যাইবে।

সূখী একটি একটি করিয়া ফুলগুলি তুলিয়া তাহার ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিল। কিন্তু একটা মধুমক্ষিকা ফুলের খোপার ভিতর কোথায় লুকাইয়াছিল,—পটু করিয়া তাহার হাতের একটা আঙুলে ছল বিধিয়া দিতেই সূখী চমকিয়া উঠিল।

উঃ! বলিয়া হাতের আঙুলটা চাপিয়া ধরিয়া চীংকার করিয়া ডাকিল, পুনকা, ও পুনকা!...

পুনকা বেশী দূরে যায় নাই। অনতিদূরে একটা স্কুম্কা গাছে ফুল ফোটে নাই বলিয়া তাহার তলার মাটিটা খুঁড়িয়া দিয়া সেখানে জল দিবার ব্যবস্থা করিতে ছিল। ইহা তাহাদের উৎসবের একটা রীতি। আজ ফুল তুলিতে আসিয়া যদি কোনও বক্ষ্যা গাছ কাহারও নজরে পড়ে,—যদি দেখা যায় কোনও অযত্ন-বর্ধিত গাছে ফুল ফুটে নাই, ফল ধরে নাই, তাহা হইলে তাহার তলার মাটি ভালো করিয়া খুঁড়িয়া দিয়া, তাহাতে জল সেচন করিতে হয়।

হঠাৎ সূখীর ব্যাকুল আহ্বান কানে যাইতেই, হাতের কাজ ফেলিয়া পুনকা বৃক্ষ-লতাতির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অশু-সূর্যোর কনক-কিরণ পাতে সূখীর নিটোল-সুন্দর কালো মুখখানি হিঙুল-বরণ হইয়া উঠিয়াছিল। বন-ফুল-সৌরভের স্নিগ্ধ আমেজে স্থানটা একেবারে মশ-গুলু হইয়া উঠিয়াছে। পুনকা আনন্দাতিশয্যে কহিয়া উঠিল, ই রে বাপ!...ই যে মেলা ফুল সূখী!.....বাঃ!...আঁ! ই কি, তুঁই অমন করছিস্‌ যে? হাতে তোর্ কি হ'ল? বলিয়া পুনকা তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই সূখী-বলিল, মোধ্‌ মাছিতে বিধে' দিলেক্‌। —উঃ!

কই দেখি? বলিয়া পুনকা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, ডান হাতের একটা আঙুল সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া উঠিয়াছে।

পায়ের তলার একমুঠা দুর্কীঘাস ছিড়িয়া লইয়া পুনকা জোরে-জোরে সূখীর বেদানার্ত্ত অঙ্গুলির উপর ঘসিয়া দিয়া বলিল, বাস্‌! আর কিছুই করতে হবেক্‌ নাই,— এখনই ভাল হইয়ে যাবেক্‌।—লে, বোস্‌ এইখানে।

ধীরে-ধীরে সূখীর গলা জড়াইয়া একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর তাহারা পাশাপাশি বসিয়া পড়িল।

সূখী তাহার মাথাটা পুনকার বুকের উপর এলাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল,—ই, বড় জলছে যে!

সূখীর হাতখানা তখনও পুনকা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছিল। এইবার আঙুলটা নিজের ঠেঁ টের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না, না,— জলবেক্‌ নাই, ঢাখ্‌ তুঁই!

এই বনস্ত সন্ধ্যায় মনে হইতেছিল যেন সমগ্র বনানীর নব-যৌবন ফিরিয়াছে! বৃক্ষ চূড়ায় কচি কিশলয়েয় উপর সূর্য্যরশ্মি ঝিক্‌মিক করিতেছিল।

নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কয়েকটি ছোট পাখী অম্পষ্ট কলরব করিতে করিতে তাহাদের চোখের সম্মুখে উড়িয়া গেল।

পুনকা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল হ'ল!

সূখী তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তরুণের বক্ষ-স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। কহিল, ই,—আর একটুকু।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুনকা সমকোচে ডাকিল, সূখী!

সূখী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, উ।

—কাল ফুল-পরব্‌; লয়?

—ই।

—কাল আমরা খুব ফুর্ন্তি করব, কি বল্‌ সূখী? বলিয়া পুনকা ঝুঁকিয়া পড়িয়া সূখীর মুখের নিকট নিজের মুখখানা লইয়া গেল।

সূখী ঈষৎ হাসিল মাত্র।

বনের ভিতর হইতে আশ্রমুগুল এবং ঘাস-ফুলের তীব্র গন্ধ দম্কা বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

পুন্কা আর একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া সখীর হাত দুইঃ সজোরে চাপিয়া ধরিল।

ধেং। বলিয়া সখী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আড়চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ হানিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত ফুলের ঝুড়িটার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, আয়, আয়, পুন্কা, ফুল তুলি— না হ'লে রাত ইয়ে যাবেক।

—হোক কেনে। জোস্তা রাত বেটে। বলিয়া পুন্কা ধীরে-ধীরে উঠিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, তুই ভারি ছষ্টু। মাতলা হ'লে হয়ত কিছুই বল্খিস্ নাই।

মাতলা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রতিবেশী। বয়স বেশী হইলেও তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এবং সেই জন্ত সখীর বাবা তাহারই সহিত সখীর বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সখীর ইচ্ছা নিঃস্ব হইলেও পুন্কা কেই বিবাহ করে, তাই মাতলার নাম শুনিয়া সখী রাগিয়া উঠিল। একটা ফুলের থোপা পুন্কার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, হাঁরে, খাল্ভরা!—উয়ার নাম করবি ত' এই আমি চল্লম্।

সখী সত্যসত্যই অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল পুন্কা বলিল, যা কেনে, তুখে কে লেহর করছে।

সখী কিয়ৎদূর চলিয়া গেলে, পুন্কা জোরে জোরে বলিল, একা যাস্ না সখী, ভালয় ভালয় বল্ছি,—শিয়াল্ খেপেছে, কাম্ড়াই দিবেক।

সখী পিছন্ ফিরিয়া বলিল, আমাকে কাম্ড়াবেক্, বেশ করবেক্,—তুর কি ?

না, না, মিছে করে' বল্লম সখী, আয়,—রাগ করিস্ না, ছি বলিয়া পুন্কা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সখী তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া অভিমানভরে কহিল, যা, তুর তার ভার লাগে নাই। আমি যাব।

পুন্কা আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল। জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারি-

পুন্কা হাসিয়া বলিল, তুই আমার জোরকে ল. সখী, কেনে মিছে টানাটানি করছিস। চল্-চল্ অ বল্বে নাই।

সখী এইবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ই,—কিস্কে !

তাহার পর উভয়ে আসিয়া তাড়াতাড়ি ফুলে ফুলে ঝুড়িটা বোঝাই করিয়া লইল। সখীর মাথায় ঝুড়িটা দিয়া বনপথ ধরিয়া তাহারা ধাওড়ার দিকে ফিরিল।

নির্মেষ নিম্মুক্ত নীল আকাশ বাহিয়া পূর্ণিমা সন্ধ্যায় জোৎস্নার ধারা গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।.. পশ্চাতে তন্দ্রাভিভূত বনানী পড়িয়া রহিল।

বন পার হইয়া বতকগুলো বাঁশ ঝোঁপের ধারে ধারে তাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে।

পুন্কা বলিল, আমার ভয় লাগে সখী, কাল তুর বাবা হয়ত মাতলার সখে তুর বিয়ার ঠিক করবেক। উয়ার চাষ আছে, পাঁচ-ছ' বিঘা জমি আছে, পঁচিশটা মুরগী আছে। আমার ত' উ-সব কিছুই নাই। আমি যে বড় গরীব সখী, তাথেই ভয় লাগে।

সখী কিছুই বলিল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। কথটা চাপা দিবার জন্ত দূরে একটা শৃগাল দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—ই ছাখ্ একটা শিয়াল।

তাহার পর উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

নিস্তক প্রান্তরের উপর দুই জোড়া পদশব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। রহিয়া রহিয়া দূরে কুলি-ধাওড়া হইতে একটা মাদল বাজিয়া উঠিতেছিল।

একটা পথের বাঁকে আসিয়া পুন্কা বলিল, তা হ'লে আমি যাই।...

—ই, যা।

—কাল ঠিক আস

—*

দুই

পুন্কা ধাওড়ায় ফিরিয়া যে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিল, তাহা বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল না। দেখিল, তাহাদের কুটারের দরজায় তাহার বৃদ্ধ পিতা চুপ্টি করিয়া বসিয়া আছে,—তাহার ডান-পায়ের হাঁটুর উপর কি একটা গাছের কতকগুলো পাতা বাধিয়া পুরু করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুন্কার বৃদ্ধা মাতা তাহার পার্শ্বে বসিয়া আহতস্থানে ধীরে ধীরে আগুনের সেক দিতে শুরু করিয়াছে। ইহারই মধ্যে এমন কি-ব্যাপার ঘটয়া গেল, জানিবার জ্ঞান কৌতূহল জাগিতেই তাহার মা বলিয়া উঠিল,—তুর্ দায়ে বুড়া বাপ্ মার খেঁয়ে খেঁয়ে মরুক, আর তুঁই যা খুশী তাই কর।

—কেনে, কি হ'ল ?

পুন্কার বৃদ্ধ পিতা তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল,—সেই কাবুলিওয়ালার এসেছিল,—চারটি টাকা পাবেক, তাখেই—

—তাখেই তুখে ঠেঁপাই দিয়ে গেল নাকি ?

—ই কি করব বল। তুঁই ঘরে ছিল নাই।

পুন্কা বিষণ্ণবদনে চোকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া সেই নিষ্ঠুর কাবুলিওয়ালার এই নিশ্চয় ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে গর্জিতে লাগিল। সে ঘরে থাকিলে হয়ত এই শক্তিসামর্থ্যহীন বুড়ার গায়ে হাত দিতে সে পিশাচের মত হইত না।

পুন্কােকে এইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বুড়া বলিল,—ভেবে আর কি হবেক পুন্কা, যা খাগা যা।

একটা হাঁড়িতে ভাত রাখা ছিল।

বড় খালায় ঢালিয়া দুই ভাগ

মা হাঁ হাঁ করিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—তুর্না খা,—আমার আছে।

পুন্কা বৃষ্টিতে পারিল যে, সে মিথ্যা বলিতেছে; কাজেই আর দ্বিধা না করিয়া নিজের ভাগের অর্ধেক-গুলো ভাত খালায় ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিতে যাইতে-ছিল। তাহার মা বলিল,—আমার মাথার কিরা পুন্কা,—তুঁই সবগুলি খা। তুর্ পেট ভরে নাই।

—ই, ভরেছে। আমি আর খেতে লাৱব।

—খুব পাৱবি পুন্কা! আমার মাথার কিরা,—আমার রক্তে চান্ করিস্ যদি না খাস্।

পুন্কা রাগের ভাণ করিয়া জোরে জোরে বলিয়া উঠিল,—তরকারী নাই, কিছু নাই, মুন্ দিয়ে আমি অতগুলো ভাত গিলতে লাৱব-লাৱব-লাৱব। হ'ল ?—বলিয়া পুন্কা খালাটা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

মাতা পুত্রের এই দুঃখময় স্নেহের লড়াই দেখিয়া, বৃদ্ধ পিতার মুখের গ্রাম পেটে যাইতেছিল না। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ভাতগুলো গিলিতে লাগিল।

দৈন্ত-প্রপীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা ভাবিতে ভাবিতে পুন্কা সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধের বেদনা লইয়া পরদিন প্রভাত্রে সে তাহার মলিন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেই দেখিল, তাহার বৃদ্ধা মাতা শেষ রাত্রে উঠিয়া ইহারই মধ্যে কখন তাহাদের কুটার এবং তাহার অঙ্গনটুকু অতি সুন্দরভাবে কাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া, গোবরের নাতা দিয়া তাহার উপর কয়েকটি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

হাঁটুর উপর হাত দুইটা সংবদ্ধ করিয়া পুন্কা বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে উঠানে ছড়ান ফুলগুলার দিকে তাকাইয়া রহিল। আজ তাহাদের উৎসবের দিন!...কিন্তু পেটে তাহাদের দুবেলা দুমুঠা অন্ন পড়ে না, তাহাদের আবার বলিয়া স্বপ্নের? সে তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট শনি-মুখানা—তাহারা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া বনে জঙ্গলে, পাহা-স্বর্গ ধারে বাস করিত, যখন তাহাদের পাতার কুটারে অভাব-অনটন ছিল না, যখন তাহারা এতখানি তী সত্য হইতে পারে নাই, এবং যখন তাহাদিগকে

সামান্য অর্থের দ্বারা পড়িয়া পড়িয়া কাবুলিওয়ালার মার খাইতে হইত না, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া নাচিত, গাহিত, উৎসব করিত। অর্ধভুক্ত স্বার্থ পুন্কার মনে হইতে লাগিল, ফুলগুলা তাহার দিকে চাহিয়া উপহাস করিতেছে।...আজ হয়ত উৎসবে নাচিত গিয়া তাহার ক্ষীর্ণ দুর্বল পদব্য় টলিয়া টলিয়া পড়িবে,— গাহিতে গিয়া তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর কণ্ঠে বাক্ সরিবে না,—তবু আজ উৎসবের বিড়ম্বনা!...সঙ্গে সঙ্গে স্বথীকে মনে পড়িল। আজ তাহার সেখানে যাইবার কথা।...

যদি স্বথীর বাবা মাংলার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলে তাহা হইলে গায়ের জোরে স্বথীকে জয় করিতে হইবে।

ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে পা দিয়া মাড়াইয়া পুন্কা বাহির হইয়া যাইতেছিল। তাহার মা বলিল,—আজ পরবের দিনে আর খাদে যেনে কাজ নাই, পুন্কা। কার ঘরে চাল-ডাল ধার-ধোর করে' এনে আজকার দিনটা চালাই।

ঘরের ভিতর হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতা বলিয়া উঠিল,—হাঁ, আর পরবের দিনে গুটিত্ব কাবলের মার খা।

পুন্কা হন্ হন্ করিয়া সোজা খাদের দিকে চলিয়া গেল।

তিন

বেলা তখন প্রায় একটা। কিন্তু খাদের নীচে বৃষ্টিবার উপায় নাই, বেলা একটা, কি রাত্রি একটা। চারিদিকে গভীর অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে,—মাত্র যে-সব স্থানে কুলিরা কাজ করিতেছিল, সেই-সব জায়গায় এক-একটা কেরোসিনের ডিবে, মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। তাহাতে আলো হওয়া অপেক্ষা বরং পার্শ্বস্থ অন্ধকারটা বেশ ভালো করিয়া জমাট বাঁধিয়াছে।

আজ 'পরবের' দিনে অধিকাংশ সাঁওতাল কুলি-কামিনেরা কাজ করিতে আসে নাই। কাজেই খাদের নীচে গোলমাল কিছু কম। পুন্কা যেখানে কয়লা কাটিতেছিল, সেখানে গোলমাল একপ্রকার নাই বলি-

লেই হয়। তাহার সহিত আরও দুই জন বাউরী কুলি কাজ করিতেছিল।

পুন্কা দেখিল, সেই সকাল হইতে প্রাণপণে কয়লা কাটিয়াও তাহার রোজ্গার এখনও পাঁচ আনার বেশী হয় নাই। অথচ, সকাল হইতে না খাইয়া এইটুকু পরিশ্রমেই তাহার হাত দুইটা কেমন যেন অবশ হইয়া আসিতেছে,—কাজ করিতে তেমন মন সরিতেছে না। যদি কোনও রকমে বৈকাল পর্যন্ত খাটিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে হয়ত একটা টাকা রোজ্গার করিবে,— কিন্তু তাহাতেও ত তাহার কিছুই হইবে না। অতি কষ্টে তাহাদের তিনটি প্রাণীর ছ' বেলা খাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালার? কথাটা ভাবিতেই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।—কাল তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সে মারিয়া গেছে,—আজ হয়ত তাহার বৃদ্ধি মায়ের গায়েও হাত তুলিবে! এতক্ষণ হয়ত তাহার কাহারও বাড়ীতে চারিটি চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে, কিংবা হয়ত—

—আজ না উৎসবের দিন!...কথাটা ভাবিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল। হাতের কয়লা-কাটা গাঁইতি-খানা এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া, পুন্কা তাহার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর লইয়া একটা কাটা কয়লার চাপের উপর বসিয়া পড়িল। পাতাল-গহ্বরের সেই বিভী-ষিকাময় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুধু কঠিন কয়লাস্তরের গায়ে গায়ে নানা-রঙের নানা-জাতীয় ফুল যেন নিমেষেই ফুটিয়া উঠিল। বনমল্লিকা যুঁই চামেলি টাপা করবী ভূমিচম্পা বুম্কা পলাশ মহুয়া বাবলা,—আরও কত কি!...তাহার মধ্যে আর-একখানা কুসুম-সুকুমার তরুণীমুখের প্রতিচ্ছবি! সে হয়ত' এতক্ষণ চন্দ্র-মল্লিকার সাতনলী হার গলায় দোলাইয়া, চামেলী টাপায় করবী বাঁধিয়া, বুম্কা-ফুলের কর্ণভরণ এবং বাবলা-ফুলের নাকছাবি পরিয়া, তাহারই আশা-পথ প্রতীক্ষায় অধির চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর, সে কিনা আজ এই উৎসবের দিনে অন্ধকার মৃত্যু-গহ্বরে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রাণ দিতেছে। তাহার জীবনের সমস্ত স্বথ শান্তি হাসি গান উৎসব আনন্দ,—পেটের দ্বায়ে, দুর্ভিক্ষ-

রাকসীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্ দিক দিয়া যে অন্তর্হিত হইয়া গেছে, কে জানে? এ কি বেদনা,—এ কি দুর্ভোগ!...

নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্ত কয়েকটা খালায় ভাত বাধিয়া জন দুই-তিন বাউরী কুলি রমণী গান গাহিতে গাহিতে সেইদিকেই আসিতেছিল। অগ্র-বর্তিনীর হাতে একটা কেরোসিনের 'মগ' জলিতেছে। কিন্তু পুনকার জন্ত কে-ই বা আনিবে, আর কি-ই বা আনিবে? তাহার মনে হইতেছিল, এই মেঘেগুলার মাথা হইতে একটা খালা কাড়িয়া লইয়া পেট ভরিয়া খায়।

এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার আবরণহীন উন্মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একটা স-বুট পদাঘাত পড়িতেই পুনকার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হৃদয় ধাইয়া পড়িতে পড়িতে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল,—কুঠীর ভীমকায় ম্যানেজার সাহেব যমদূতের মত তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেছে। মুহূর্তেই তাহার কল্পনার স্বর্গরাজ্য বাতাসে মিলাইল। উৎসবের আলো-হাসি তাহার চোখের সম্মুখে নিমেষেই যেন 'ফস' করিয়া নিভিয়া গেল এবং সেই পাতালপুরীর আধার গুহায় কঠিন কমলার স্তরগুলো বেশ স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

পুনকা ধীরে ধীরে তাহার পরিত্যক্ত গাঁইতিটা তুলিয়া লইয়া পুনরাধি কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেব চলিয়া গেল, কিন্তু এবার তাহার গাঁইতি খামিল না। কঠিন কমলার উপর তাহার ইস্পাতের গাঁইতিখানা 'খং' 'খং' শব্দে বারে বারে তীব্র আর্ন্তাদ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল,—এই খাদের ভিতরে বহুবিধ আপদ-বিপদ, নিরীহ কুলিদিগকে গ্রাস করিবার জন্ত ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহাকে ত গ্রাস করে না! তাহার মত অনেক লোক এই পাতালপুরীতে পেটের জন্ত প্রাণ দিয়াছে,—এখন তাহাদের মৃত আত্মাগুলো আগিয়া উঠিয়া, যদি তাহাকে এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাদের সঙ্গী করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার বেদনার্ত

প্রাণের শত ধন্বাদে তাহাদিগকে অন্ধরের কৃষ্ণতা জানায়।...এক মুহূর্তে কি সমস্ত গলটপালট হইয়া যাইতে পারে না? সে চাহিতেছিল, এমন একটা কিছু, যাহাতে মুহূর্ত মধ্যে প্রলয়ের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পে সমস্ত বহুখা টলমল করিয়া উঠুক, উপরের গ্রাম নগর লইয়া সমস্ত খাদের চালটা মাথার উপর ধরিয়া পড়ুক, খাদের ভিতর আগুন ধরিয়া যাক, অগ্নি-বরণী নাগ-নাগিনীর মত অন্ধকার গুহার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকুক! খাদের উপরে,—যেখানে আগ্রত অগস্তের নর-নারীর মধ্যে সভ্যতা-অসভ্যতার ঘন-ঘন চলিতেছে, যেখানে ধনী-নিধনের, প্রবল এবং দুর্বলের, উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িতের সংঘর্ষ শুরু হইয়াছে,—যেখানে দুর্বলের রক্তে রাঙা প্রবলের বিজয়-নিশান, উৎপীড়িতের বুকের উপর প্রোথিত হইয়া আছে, সেখানে গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য সমস্ত নিভিয়া যাক,—উৎসাপাতে অগ্নি-বর্ষণ হইতে থাকুক,—তাহার মত উপবাসী গরীবের দল যেখানে তপ্ত ধূলিশযায় ছটফট করিয়া তিলে তিলে মরিতেছে, তাহারা একেবারেই মরিয়া যাক!...

পুনকার হাতের অঙ্গ ঠং ঠং খং খং করিয়া অবিপ্রাশ্চল্যাবে কমলা কাটিয়া চলিতেছিল। মুহূর্ত বিশ্রাম করিবার অবসর নাই,—কথা কহিবার সময় নাই। কান দুইটা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে,—নাক দিয়া উষ্ণ বাস বহিতেছে, সর্ব শরীর ঘর্ষাপ্রুত হইয়া উঠিয়াছে!

এদিকে ঠিক এই সময়ে খাদের উপরে উৎসব শুরু হইয়াছিল। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে এবং পুরুষরমণীর সর্বদে ফুলের ছড়াছড়ি। বর্ণে গন্ধে হাসিতে গানে আমোদে আহ্লাদে, তাহারা যেন দেহ-মনের সমস্ত গানি আজ ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্ত বহুপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। গাছে গাছে ফুলের দোলনা টাঙাইয়া পুরুষ-রমণী ছলিতেছে,—ছেলে মেয়েরা পুষ্পভরণে ভূষিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—স্ববিন্দু-কবরী সুবতীগণ ফুলের গহনা পরিয়া হেলিয়া ছলিয়া গান ধরিয়াছে। সুবকগণ কর্ণমূলে কণ্ঠে ফুলের মালা ছলাইয়া আড়-বাঁশীতে বেহাগের বেদনা সাধিতেছে। সকলের নৃত্য-সীত

আনন্দ-কলরব যেন সপ্তমে চড়িয়াছে,—আজ যেন তাহার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রস সমস্ত সৌন্দর্য্য শোষণ করিয়া লইবে, কাহারও কোনও ক্ষুধা আজ অভূত থাকিবে না।

স্বখীর বাবা আজ মাংলার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল। মাত্র স্বখীর একটুখানি সন্দেহের অপেক্ষা। সে কিন্তু ইতস্ততঃ করিতেছিল; কারণ, পুন্কা যে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে-সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় ছিল না। স্বখী জানিত পুন্কা আসিয়াই মাংলার হাত হইতে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে,—সেও আর কোন কথা না বলিয়া তাহার-সহিত উধাও হইবে। এ বিবাহ সে কখনই হইতে দিবে না। পয়সা না থাকুক, পুন্কার গায়ের জোর ত আছে! একটা আম-গাছের তলায় বসিয়া স্বখী এইসব কথাই ভাবিতেছিল। কয়েকজন যুবতী অনেকগুলি হইতে তাহাকে সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না—গালাগালি খাইয়া সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় অথচ পুন্কা আসে না। স্বখী মনে মনে উদ্বেগ হইয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া তাহাদের এত কথা হইল, এত প্রতিশ্রুতি, এত ভালোবাসা, এসব কি তবে কিছুই নয়! এতকাল ধরিয়া কি পুন্কা তাহার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু সে-কথা সে বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? ক্রমে পুন্কার উপর তাহার যেন একটু একটু রাগ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, ছুই হাত দিয়া তাহার নিজের চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলে, ফুলের গহনাগুলা টানিয়া ছিঁড়িয়া পায়ে দলিয়া এখান হইতে পলাইয়া যায়! ক্রমে ক্রমে চারিদিকে তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া স্বখী পুন্কার সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবারেই সে-দৃষ্টি মাংলার উপর পড়িয়া যেন চাবুক খাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই উৎসব-ক্ষেত্রেও মধ্যে তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলেই আছে, শুধু সে যাহাকে চায়, সে নাই!

উৎসবের উদ্দাম শ্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। পুন্কার আসিবার আর-কোন আশা-ভরসা নাই। মাংলা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল,—উৎসবের আনন্দ তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।

স্বখীর বাবা স্বখীকে একবার বধেট ভৎসনা করিয়া গেল।

পুন্কার উপর ছরস্ব অভিমানে স্বখীর আকর্ষণ বাষ্পরূপে হইয়া উঠিতেছিল। সেই উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সে আর কোনও কথা ভাবিতে পারিল না,—ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মাংলার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। এইবার স্বখীর বাবা দ্বন্দ্ব হাসিয়া তাহার মাথায় হাত ব্লাইয়া দিল এবং দশজন মাতঙ্গর ঘোপ-মাকির (দলপতি) সম্মুখে মাংলার হাতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত হইল।

স্বখীর স্বাস-প্রশ্বাস তখন অত্যন্ত ক্রান্ত বহিতেছে; রাগে উত্তেজনায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছে না।

মাংলা হাসিতে হাসিতে তাহাকে পার্শ্বস্থ গাছের তলায় বসাইয়া বলিল,—লে, মদ খাই।

মাংলার সঙ্গে বসিয়া উন্মাদিনীর মত স্বখী প্রাণপণে মদ গিলিতে শুরু করিল।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ খাদের নীচে পুন্কার নিকট না পৌঁছিলেও সে এইরূপ একটা-কিছু অহুমান করিয়া লইতেছিল, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে পারিতেছিল না। সমস্ত চিন্তার পথ তাহার নিকট আজ বন্ধ হইয়া গেছে।

বৈকালের দিকে একে-একে সকলেই খাদ হইতে উঠিয়া যাইতেছিল। পুন্কা ভাবিল, তাহার উঠিয়া কাজ নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু হিম-শীতল না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজ করিবে!

কিয়ৎক্ষণ পরে, কি একটা কথা মনে হইতেই পুন্কা আর ঝগ-বিলম্ব না করিয়া, একহাতে কেরোসিনের 'মগ' এবং অগ্ন হাতে গাঁইতিটা কাঁদের উপর তুলিয়া লইয়া, উর্দ্ধ্বাসে সেখান হইতে 'চানকের' দিকে ছুটিতে

আরম্ভ করিল। ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর গিয়া বাঁটিটা ফস্ করিয়া নিভিয়া গেল। পুন্কা কিন্তু থামিল না, সেই অন্ধকারের মধ্যেই চেনা পথ ধরিয়া আবার ছুটিল। সম্মুখে 'মেন্ গ্যালারির' লাইনের উপর একটা ফাঁকা টব-গাড়ী পড়িয়া ছিল। অন্ধকারে সেটা দেখিতে না পাইয়া পুন্কা হৃদয় খাইয়া তাহার উপর পড়িতেই, ঝড়াং করিয়া গাড়ীটা লাইনের উপর সরিয়া গেল। সেও মাথা শুঁকিয়া লাইনের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। কোন রকমে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পুন্কা আবার হাঁটিতে লাগিল। নিকটেই খাদের মুখে আলো দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। ছ' তিনজন বাউরী কুলি উপরে উঠিবার জন্য 'লিফ্ট-কেজ'র উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচের ঘণ্টাওয়ালী 'কেজ' উঠাইবার ঘণ্টা দিতে-না-দিতে পুন্কা ছুটিয়া গিয়া 'কেজ' প্রবেশ করিল, ঘণ্টা দিতেই খাদের 'চানক' বাহিয়া কেজখানা উঠিতে লাগিল।

কাঁধের গাঁইতিটা নামাইয়া, পুন্কা একপাশে একটা লোহার শিক্ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পার্শ্বস্থিত বাউরী যুবক পুন্কার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল,—এই পুন্কা! তুঝ কপালে লোহ কিসের?

পুন্কা বাঁ-হাত দিয়া কপালটা একবার মুছিয়া লইতেই দেখিল, খানিকটা কাঁচা রক্ত হাতে লাগিয়া আসিয়াছে। বলিল,—উ কিছু নয়। টব-গাড়ীতে কাটা গেল।

পুন্কা অশ্রুমনস্কভাবে গম্ভীরমুখে 'কেজ'র বাহিরে তাকাইয়া ছিল। কুপ-গহ্বরের মত চানকের চারিদিকে কয়লা পাথর ও মাটির স্তর ভেদ করিয়া বর্ষাধারার মতই ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে!

কিয়ৎকণ সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, তাহাদিগকে লইয়া 'লিফ্ট'খানা ঝড়াং করিয়া উপরের মুখে আসিয়া লাগিল। সর্বাগ্রে পুন্কা বাহির হইল। খাদ-সবুকারের নিকট 'টিপ্' করাইয়া সে খাজাফির নিকট দৌড়িল। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের রোজ-টার মাত্র একটি টাকা লইয়া পুন্কা মাতালের মত চলিতে চলিতে খাওয়ার দিকে ফিরিতেছিল। বেলা-শেষের রক্তিম আলোটুকু ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে!

রাস্তার দুইপাশে সাঁওতালদের কুলি-খাণ্ডাওয়া দেখিলে মনে হয়, 'পরবে'র জের এখনও বোধ হয় থামে নাই। ছ' এক স্থানে নাচ-গান তখনও চলিতেছিল।

অদূরে একটা বাগানের পাশে, চারিটা শাল-গাছের খুঁটি দিয়া ছান্দাতলার মত একটা উৎসব-গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। অসংখ্য ঝরাপাতা এবং শুকনো ফুল সে-স্থানটা একেবারে ভরপুর হইয়া আছে। পুন্কা চলিতে চলিতে সেইখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। নিকটেই কয়েকজন বাউরী ও কোঁড়া কুলিকামিন মদ খাইয়া হুন্না করিতেছিল।

পুন্কা তাহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ইখানে কি হইয়েছিল রে?

—বা, আজ তুদের পরবের দিনে তুঁই ছিলি কোথা?

—খাটুতে গেইছিলি নাকি?

পুন্কা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—ই।

যে-লোকটা সর্কাপেকা বেশী মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল, সে টানা-টানা স্বরে বলিয়া উঠিল,—আ, কি আকৈল রে? মাংলা আজ মদ খাওয়াই খাওয়াই ভূত করে' দিলেক।

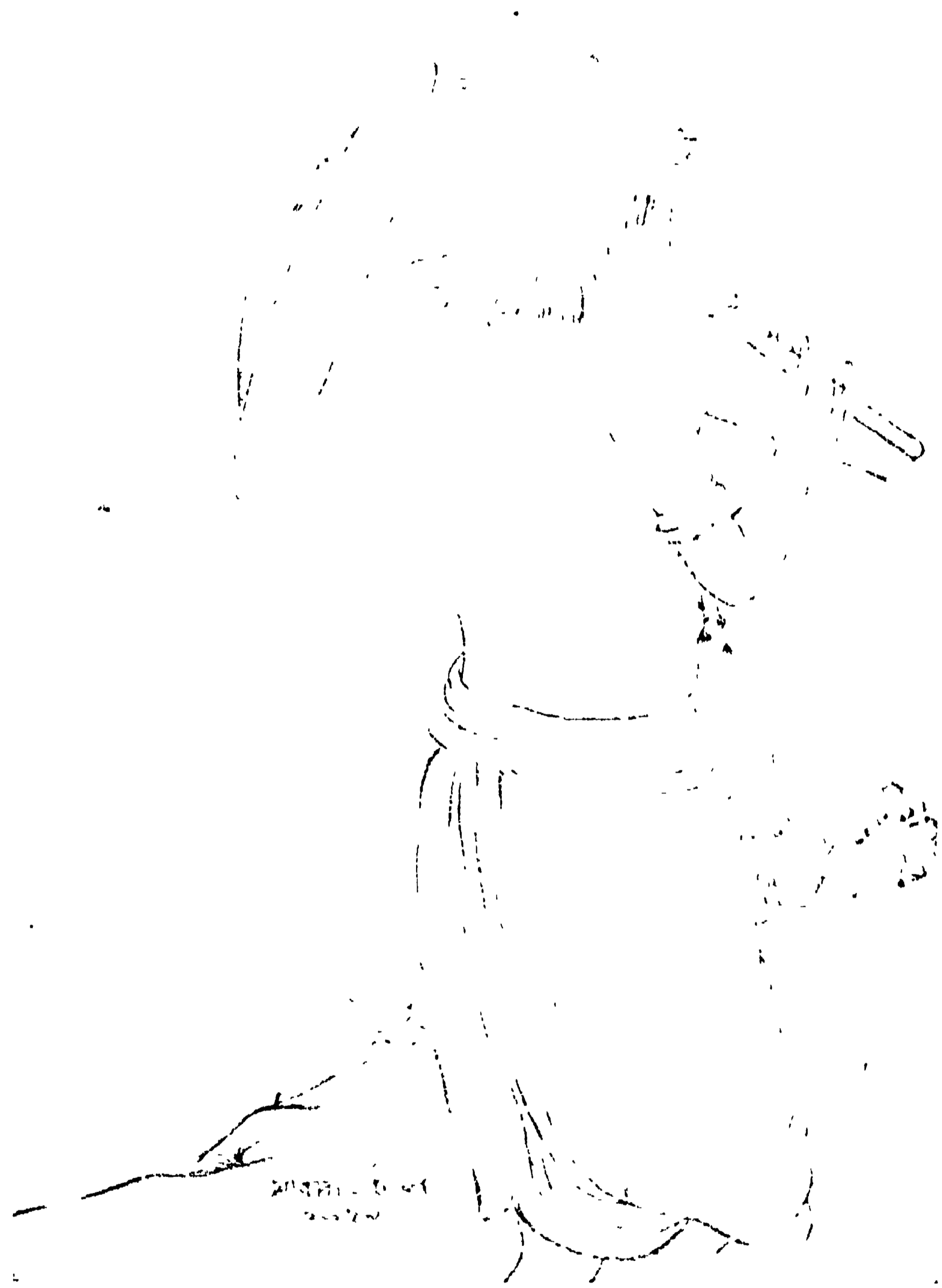
পাশের লোকটার গায়ের উপর পড়িয়া সে বলিল,—আর মদ আছে ত দে কেনে উয়াকে একটুকু।

—না, না, একদম নাই মাইরি। জ্বাখ কেনে খালি হইয়ে গেইছে।—বলিয়া মদের হাঁড়িটা সে একবার নাড়া দিয়া দেখাইয়া দিল।

মদ না খাইয়াই পুন্কা চলিতেছিল। বলিল,—না, আমি মদ খাব নাই।—মাংলা কেনে খাওয়ালেক রে?

—বা তাও জানিস্ না! স্বখীর সংখে যে উয়ার বিয়া হ'ল।—বলিয়া লোকটা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই বিকট হাসির হা হা শব্দ পুন্কার বুকে ছুরি হানিল। সে আর তাহাদের কোন কথা শুনিল না। বাগানের পথে পথে সে চলিতে লাগিল। কিয়দূর যাইতেই দেখিল, একটা গাছের তলায় আরও কতকগুলো ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। সেদিকে তাকাইতে পুন্কা হঠাৎ থামিয়া গেল। এ ফুল প্রতকল্য সন্ধ্যায় তাহারাই নীলবন হইতে ডুলিয়া আনিয়াছে!



রাখাল

চিত্রকর শ্রীযুক্ত দাদাচরণ ডাকলেব যোগেশ্বরে

পুন্কার সর্বাঙ্গ ঘর্ষাশ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চোখের সম্মুখে যেন বিরীচি অন্ধকার ধম্ ধম্ করিতেছে। পথ নাই, ভাবিবার পর্য্যন্ত কোনও পথ নাই! একবার ধমকিয়া দাঁড়াইয়া, পুন্কা ডান-হাতের তর্জনী দিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঘামের সঙ্গে তাহার কপালের খানিকটা রক্ত ইতস্ততঃ-বিক্রিপ্ত ফুল-গুলার উপর ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পুন্কা সেদিকে ক্রক্ষেপও করিল না। গোলাপী ফুলের উপর কাঁচা খন্ডমাট বাঁধিয়া গেল। কয়েকটা ফুলের উপর দিয়া সে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। কোমল ফুলগুলা পায়ের নীচে কাঁটার মত বিধিতে লাগিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গোটাকতক রুম্কা ও বাবলা ফুল পুন্কা কুড়াইয়া লইল। সে ভাবিল, এই রুম্কা-ফুলটি সে বোধ হয় কানে পরিয়াছিল, আর এই বাবলা-ফুলটি নিশ্চয়ই তার নাক-ছাবি! ফুলগুলি আপন হাতের মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পুন্কা কিয়দূর চলিয়া আসিবার পর, তাহার মনে হইতে লাগিল, হাতের মধ্যে সে যেন একমুঠা জলন্ত আগুন চাপিয়া ধরিয়া আছে। ফুলগুলা সে পথের ধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আবার পথ চলিতে চলিতে একটা মর্মভেদী ছুঃখ-নিরাশা পুন্কার বুকের তলে হাহা করিয়া উঠিতে লাগিল।

উৎসবশেষে সকলেই যেন অতিরিক্ত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া চূপ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুষ্পের সমস্ত স্নগন্ধ দক্ষিণ-বাতাসে উড়িয়া গেছে, বাশীর সঙ্গীত ধামিয়াছে,—মাদলের শব্দ নীরব হইয়াছে, হাসি গানের আনন্দ উচ্ছ্বাস আর যেন কিছুই স্মৃতিতে পাওয়া যাইতেছে না,—কাহারও মুখে কথা নাই,—নীরব বিশ্বশূন্যতা, আকাশ-বাতাস, সব যেন এ-উহার পানে চাওয়া-চাওয়ি কানাকানি করিতেছে!

ধাড়াইয়া ফিরিয়া পুন্কা কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বৃদ্ধ পিতার পায়ের নিকটে তাহার রোজ্জ্বালের টাকটা ছুড়িয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিল, একটা বিরীচি কালো মেঘে টাদটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাহুর গ্রাস হইতে যেন তাহার আর মুক্তি নাই!

অন্ধকার,—শুধু গাঢ় অন্ধকার যেন চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে! কোনও দিকে কোনও পথের সন্ধান পাওয়া যায় না,—এই অন্ধকার আবর্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রলয়ের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

খাঁচার পাখীর মত একটা অশান্ত আক্ষেপ পুন্কার বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়

রুকমারি

শ্রী স্বামীকে বললেন—“আমাদের মেয়েটির নাম রাখা যাক লীলা, কি বল?”

লীলা নামটা স্বামীর কেমন ভাল লাগল না, কিন্তু মেয়ের নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন আগ্রহ বা অবসরও তাঁর ছিল না। সোজা সে কথাটা বলে’ শ্রীর বিরাগভাজন হওয়া সুক্লিসঙ্গত মনে না করে’ তিনি হেসে বললেন—“খাসা নাম হয়েছে!—দ্যাখ, আগে যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল তারও নাম ছিল লীলা। প্রথমটা তাকে খুবই ভালবেসেছিলাম

—বেচারি কলেরায় মারা গেল কিনা, তাই শেষে তোমার সঙ্গে বিয়ে হ’ল। অবশ্য তোমাকেও খুব ভালবাসি—তার চেয়েও বেশী।”

শ্রী অনেকক্ষণ গম্ভীর হ’য়ে বসে’ থাকলেন। শেষে কঠোরস্বরে বললেন—“না, ওর নাম রাখলাম ছায়া—আজ থেকে ওকে ছায়া বলে’ ডাকতে হবে, মনে থাকে যেন।”

স্বামী “যে আজ্ঞা” বলে’ হাসতে লাগলেন।

শ্রী বীরেশ্বর বাগচী

নূরজহান ও জহাজীর

[মহবৎ খাঁ নূরজহানের শক্রতায় ভীত হইয়া সম্রাটের কাবুল-যাত্রাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি সম্রাটকে মন্ত্রণায় বশ করিয়া এবং কতকটা বাধ্য করিয়া নূরজহানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতঃপর সম্রাজ্ঞী উক্ত আদেশপত্র হস্তে লইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।]

স্থান—কাবুলের পথে বাদশাহী শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

বিস্তৃত গালিচার পুরে বাদশাহের গদি। সম্মুখে বহুল্য খাঞ্চায় নানাবিধ কাবুলি-মেওরা, স্বর্ণপাত্রের শরবৎ ও মদিরা। বাদশাহ নিভৃতে বিশ্রাম করিতেছেন। গালিচার একপ্রান্তে খোলা কানাতের কাঁক দিয়া খানিকটা রৌজ আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দূরে নীল আকাশের নীচে জ্বার-ধবল গিরি-শ্রেণী দেখা বাইতেছে। মহবৎ খাঁ এইমাত্র প্রবেশ করিয়া বাদশাহকে নূরজহানের আগমন-চেষ্টা জানাইলেন, ও নীরবে আজাবহ অমুচরের মত একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ যেমন তেজোব্যঞ্জক, তেমনি বিষম-গভীর।

জহাজীর

মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ্! হাতে দিগে পরোয়ানা—
এই বাদশাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আনা!
আমার হুকুমে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস হ'ল তারে!
বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে!
এ-কাজ করিতে ছুইকীর ভাবে!—তবেই হয়েছে সারা!
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ!—চোখ বুজে' ছুরী মারা!
বেহেশত্ চাও ত চেয়োনা সে-মুখে—নহে সে নূরজহান!
আহান্নামের নূর বটে সেই!—সুন্দর শয়তান!
আম্মার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ সিধা,
দূর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের মুসাবিদা!
এসব কি ফুল? গুল-আসুরফি?—ফুলে কাজ নাই আজ!
রোদ ঢেলে হোক লাল-গালিচায় খুন-খারাবির সাজ!
চাহি না বরফ, শরবৎ মিঠা, ধবমুজা কান্দীরী—
দিল্ করে' দাও শরাবে দরাজ—দেখাব বাদশাগিরি!...
ঠিক বটে, তার বহৎ কসুর!—মাফ কিছুতেই নয়;
থককে খুন সেই করায়েছে—তারি কাজ নিশ্চয়!

খুরম আজিও বিক্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক,
তারি কন্দীতে তুমিও নারাজ,—আমি কি আহান্নক!
আমি রাজা, যার এত কোটা প্রজা মুখ চেয়ে মরে বাঁচে,—
আমি কিনা ফিরি ঘোড়-হাতে এক রমণীর পাছে পাছে!
আর কথা নয়,—ঠিক, মহবৎ! বড় তুমি হ'শিয়ার!
এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার!...

কাল রাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজ্-প্রবি!—
আমারই কেলা লাহোর যেন সে—তারি মত এক ছবি!
মাঝখানে তার মস্ত মিনার—আকাশে ঠেকেছে মাথা!
এত উঁচু,—তবু জমিন্ হ'তে সে সমান সোনার গাঁথা!
নীচে চারিদিকে আলো-আবছায়া, আস্মানে একরাশ
কিসের আতশ?—দেখি, তার সেই মিনার-চূড়াতে বাস!
হঠাৎ একটা হাতী কোথা হ'তে ছুটে এসে দেয় ঠেলা,—
থাম ভেঙে গেল, আলো নিবে গেল! এমনি তামাসা-খেলা!
জ্বপে উঠে তবু ভয় হ'ল মনে! এ যে বড় বিপরীত!
পাঙ্গলা হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত!
না, না, ভালো নয়! খাঁ সাহেব, তুমি কি বল? কেমন লাগে?
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা ভাগে!
কথা কও না যে! বড় বেতমিজ!—

আরে, আরে!—একি! একি!
মহবৎ! ধর! সরাও পেয়লা!—সেই আসে, ওই দেখি!
এয়্ খোদা! এই পেয়লার বিষ লাল করে শুধু চোখ,—
ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন!—এত বিষ গুল-রোধ!
জোয়ানী সাবাস!—সেই কালো চোখ—কালো-জহরের ছুরী
ছেঁড়া-কলিজার খুন-মাথা সেই ঠোঁটের গোলাব-কুঁড়ি!
এতকাল পরে এ-রূপ কোথায় ফিরে পেল আরবার?
আরে, আরে!—এই জানুখানা টেনে চিরদিন জেয়বার!

* * *

মেহেফরিসা! এ যেনে এমন অসময়ে আগমন?
হুকুম ছিল না—আদব তুলেছ? ভালো নাই মোর মন!

শাহ-বেগমের ইচ্ছা কোথা? ওচুনাও গেছে ঘুচে!
খালি পাদে সেই জুতাটুই!—বুঝি শরম ফেলেছ মুছে?

নূরজহান

কার ইচ্ছা আলী-হজরত? হাসি পার শুনি' কথা!
এত অভিময় শিখিলে কোথায়? কে শিখাল চতুরতা?
সেলিম কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা—
জহান্নারের প্রেম যত বড়, ছল নয় তার আধা!
মুখে-বুকে এক!—মোগলের মান সেই রাখিয়াছে জানি,
ইরাণের মেয়ে বিদেশী মেহের তাই ছিল অসুমানি'
আজ এতদিনে এক পরিচয়!—বুকে এক, মুখে আর!
নূতন পীরের নূতন মুরিদ!—বাহবা, চমৎকার!
বাদশার সাথে বেগমের দেখা—বড় তার ইচ্ছা!—
এখনো সমুখে পাড়াইয়া তাই গোলাম মহব্বৎ!
তামাসার কথা ভালো নাহি লাগে, সে সময় আজ নাই,
বুকে যাহা ছিল, মুখ ফুটে তার কিছু কয়ে যেতে চাই।
শাহ-বেগমের নাম শুনে আজ যুগা হয় আপনারে!
ভিখারিণী কোনো প্রজার মতও আসি নাই দব্বারে!
জীবনের প্রভু ছিল যেই মোর—মৃত্যু-মুরতি তার
ভেটিবার তরে, রমণীর এই দীনহীন অভিগার।
স্বামী বটে, তবু আজ আমি তাঁর নই যে সীমস্তিনী—
ঘরে নয়, আজ মশানে চলেছি!—করণ-কিষ্কিনী
খুলিয়াছি তাই,—জীবনে আক্র,—মরণে পর্দা নাই!—
ছনিয়ার শেষে কার কাছে লাজ?—ওচুনা পরিনি তাই।
মরণের ঘাট পিছল নহে কি? জানো না কি জাহাঁপনা?
কতটুকু পথ? কি কাজ পরিয়া জুতা সে জরীতে-বোনা?
বেয়াদবি যদি হয়ে থাকে তবু, দাও তারো তরে সাজা,
মরণের বাড়া সাজা আছে জানি, তাই দাও তবে রাজা!

জহান্নার

বুধা অভিমান মেহের! তোমার স্বামী শুধু নই, নারি,
এই ছনিয়ার বাদশা যে আমি, সে কথা ভুলিতে পারি!
মোর অপরাধে অপরাধী তুমি—রাজ্যেরি হুম্বন্!
জাহানের স্বপ্ন-বিচারে জেতার বৃত্তাই নিরুপণ!
তার লাগি' বুধা বুঝিও না মোরে—

নূরজহান.

থাক থাক, বুঝিয়াছি—

ওই মুখে এই মিথ্যা শুনিয়া না মরিতে মরিয়াছি!
যে আসনে বসে' দণ্ড ধরেছে আকবর হুম্বন্,
তুর্কীর চূড়া বাবরের নামে দাম যার দশগুণ—
আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয়!
অসহায় এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয়!
এত কাপুরুষ ছিল না সেলিম—মেহেরের মনোচোর!
হায় নারী, একি জীবনের ভ্রম! এই কি পুরুষ ভোর!
অপরাধ মোর যত বড় হোক, তারো চেয়ে অপরাধী
দাঁড়িয়ে সমুখে,—রাজ-বিদ্রোহী! রাজারে রেখেছে বাধি!
জহাদ কোথা? শূল পোতে নাই? মরা-মহিবের খালে
সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতকালে!
এই ছনিয়ার বাদশা যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি—
ভুলিতে পারি না—যেজন নফর তুমি যে গোলাম তারি!

জহান্নার

কহিও না আর! চূপ কর! একি পাগলের চীৎকার!
মহব্বৎ তবু কথাটি কহেনি, বীর সে নির্ঝিকার!
জানি মিছা-কথা, বন্ধু, তোমার মনে নাই কোনো পাপ—
কোনো কথা এর লই নাই মনে, কহিও না অসুতাপ।
কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারি,—শেব করে' লও সব,
গালি দিও নাক' অকারণ-মোরে, কেন মিছা-কলরব?
এসে থাক যদি মাক চাহিবারে, বল তবে সেই কথা,
নহিলে আরো যে কঠিন হবে সে—ব্যথার উপরে ব্যথা!

নূরজহান

হা মোর কপাল! এতখনে বুঝি এই হ'ল পরিচয়!
মাক চাহিবারে আসিয়াছি আমি—এতই মরণ-ভয়!
এই পরোয়ানা পায়ে দ'লে ছিড়ে, ফিরে' দিতে আমি চাই!—
মহব্বৎ! ওই বন্দী না তুমি বাদশা—শুনিতো পাই?
তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর হুম্বানা!
তুমি হবে তার জানের মালিক!—খুন কর—নাই-মানা!
পরোয়ানা কেন? ছুরী হানো! এই বুক পেতে দিই আমি,
নারীহত্যার পাতক তোমার—মাকী তাহারি স্বামী!...

মরণের ভয় করি না যে, তাই আসিয়াছি, প্রিয়তম,
তোমারি ও-হাতে সঁপিতে এসেছি আজি এ জীবন মম ।
বল শুধু তুমি—আপনার মুখে, স্বাধীন-মনের বলে—
জীবনের বোঝা নিতেছ তুলিয়া নিজেরি হাতের তলে ।
বল, তুমি নও বাদশা এখন—এ দাসী বেগম নয়,
প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয় ।
বল, সুখী হবে—রাখো মিছা কথা, দোহাই তোমার স্বামী !
বল শুধু মোরে, 'মেহের, তোমার মরণে বাঁচিব আমি' ।
সেই আশ্বাসে আসিয়াছি ছুটে, লাইলীর মেয়ে ফেলে—
যারে কোলে নিয়ে সেদিনও লড়েছি, ঝিলামের স্রোত ঠেলে,
হাতীর উপরে—জানে মহবৎ—একদিকে তারে ঢাকি',
আর-দিকে ধমু, যতখন তুণে একটিও তীর বাকি ।
সেও তোমা লাগি'—ভেবেছিলাম, বুঝি বড় প্রয়োজন মোরে,
জানিনি তখনো, এমন বন্ধু ছুটেছে কপাল-জোরে !
আজও তাই ফের জানিতে এসেছি—তোমারি কি
প্রয়োজন ?
বল একবার ! শুনি' সেই কথা শাস্ত হউক মন ।

মনে পড়ে সেই খুশ্‌রোজ-রাত্তি ? স্বর্ষা-কেনার ছলে,
মোতি-মসলিন-অহরত্ ফেলে চাহিলে ওড়না-তলে ।
হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম,—“উহার নমুনা নাই,
রংমহলের রং নয় ওয়ে, ও-কাজল কোথা পাই ?
তবু চিনে রাখ—তুমি যে ছনরী !—দেখ দেখি ভালো

কিনা,

এর চেয়ে ভালো—মর্ঘরে ফোটে কালো-পাথরের মিনা ?
এমন নরম ছায়াখানি পড়ে 'সোজ' তরুটির মূলে—
ঘাসের আজিমে জ্যোৎস্না-চাদরে—যমুনার উপকূলে ?”
মুখ খুলে দিয়ে, ধুঁতি তুলে ধরে', চাহিলেন রাজ-মাতা,
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে, ঢুলে' স্নয়ে প'ল মাথা ।
তুমি চলে' গেলে, বিবশ-বিভল, পাণ্ডুর বেদনায় ।
শুনিছ, সেলিম শাহজাদা সেই !—হারাইছ চেতনায় ।
সেই দিন হ'তে মেহের মরেছে, সে-মরণ আজি শেষ ।
এখনো আঁধিতে দেখ আছে কিনা জীবনের মোহ-লেশ ?
চাও একবার !—মিনতি তোমায়, কোন ভয় নাই আর ।
এখনো কি হয় খুশ্‌রোজ-খেলা, বাদশাহ ছনিয়ার ?

খেয়ালি-ফাহুসে কত রঙ ধরে যৌবন-বাহুবর !—

লক্ষা কি তার ? কুৎসিতও হয় মনোহর স্বন্দর !

একদিন যারে ভালো লেগেছিল, বেসেছিলে তার ভালো,

হয়ত তারেই মনে হয়েছিল—এই 'জগতের আলো' !

আজ যদি তার রূপের প্রদীপে পলিতায় পড়ে কালি,

রংমহলের ছুখের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি—

নিবাইয়া দাও আপনার হাতে—ডেকে না চেরণ-চীরে !

যে-হাতে জ্বলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে !

আঁচ লাগিবে না, তাপ নাই তারি ! জ্বালা কোথা জুড়াবার ?

দেখ,—হাসিতেছি, এ হাসিতে নেশা এখনো কি লাগে আর ?

জহাজীর

ভয় করে, নারি, আজও ভয় করে !—চেয়ো না অমন করে' !

সেলিম মরেনি, মেহের মরিলে তবে ত যাইবে মরে' !

মেহের, তোমার অ-মলিন রূপ !—পরীরাও ফিরে চায় !

আজও মনে হয়, সেই খুশ্‌রোজ ওই চোখে চমকায় !

কোথা হ'তে এলে, মক-মঞ্জরী, আগ্রার উচ্চানে ?

ও-রূপের ছায়া পেয়ালায় পড়ে' আশুন লাগাল প্রাণে !

ছিল যে মাতাল, মদেরি নেশায় দিনরাত মশ্‌গুল—

পাগল করিয়া দিলে কেন তারে ?—একি নসীবের ভুল !

বাদশার ছেলে বিকাইয়া গেছে এক বসুরাই গুলে !

খোদার বান্দা বৃত্ত-পরন্তু—আখেরের ভয় ভুলে' !

কোথায় ইমান পৌরুষ গেল ? কি মোহিনী জানো, নারি !

মোগলের তখৎ ফুলদানী হ'ল ! কালো-চোখ তরবারি !

কটি ও পেয়ালার সার হ'ল শুধু—স্বপনে কাটাই দিবা !

রাজ্যের খোঁজ মালিক রাখে না, বাড়িছে প্রলয়-বিভা !

নকর করেছে নজরবন্দী, কাল দাঁড়াবে সে বৃকে !—

কার তরে আজ এ দশা আমার ? মজেছিছ কোন্‌ স্থখে ?

সেই সুখ আজও উখলিয়া ওঠে, ওই মুখে যদি চাই !

দোজোধ্ বেহেশত্ এক হয় দেখি, জ্ঞান-হারার হ'য়ে যাই !

আমি অপরাধী—এ কথাও ঠিক !—কি হ'ল ?

কাদিছ ! ছি !—

শুনিছ না কিছ !—ওই দিকে চেয়ে অমন ভাবিছ কি ?

নূরজহান

কিছ নয় !—শুধু ওই ফুলগুলা—গুল-আসরফি বুঝি ?

বাংলা-মুলুক মনে পড়ে' যায়, কি যেন হারিয়ে খুঁজি !

ওরি মত ঘোর সোনেলা গোলাব ফুটিত বর্ধমানে,
কি জানি কেন যে—ওই রং চোখে হহ করে' জল আনে !
তাই তুলেছিহু হঠাৎ কেমন !—তুনি নাই শেষ-কথা,
গোস্তাখী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা !

জহান্নীর

আমার ভাগ্যে এই ছিল শেষ !—মহবৎ ! মহবৎ !
ভরা-ছপুয়েই দিন ডুবে যায় !—ঝুটা তেরি শব্দবৎ !
পেয়ালার পর পেয়লা ভরেছি—বেহুঁশ করেনি দিল !
মাথাও ঘোরে না, রক্তের জোশ্ বাড়ে না যে একতিল !
যাক ! সব যাক ! লাখি মেরে ভাঙো ! কর সব চুরমার !
কাজ নাই মোর বাদশাহী তখুত—দিল্লীর দরবার !
ঘোড়া নিয়ে এস—খুরে ক্ষয় করি সারা হিন্দুস্থান !
শহর-কেল্লা জ্বলাইয়া দিয়া রাঙাইব আস্মান !
তৈমুর ! আজ তোমার বংশে খুনের পিপাসা নাই !
বিবের জ্বালায় বুক জ্বলে, তবু বসে' থাকে এক ঠাই !
যেথা যত আছে সুন্দর মুখ—কাটিয়া পাহাড় কর !
কালো-চোখ সব ছিড়িয়া ছিড়িয়া হাজার খলিতে ভর !
মসজিদ হোক ঘোড়া-ঘর, আর হারেম কসাই-খানা !
আল্লার নাম করে যদি কেউ, টুঁটি কেটে কর মানা !...
বুক ফেটে যায় ! এও কি আমার শাস্তির শেষ নয় !
ওরে হতভাগী ! নাই তোর মুখে এতটুকু বিশ্বয় !
চেয়ে আছ তবু অচপল চোখে, দয়া নাই মনে তোর !
রাকসী ! আমি সব দিয়েছি যে ! তবুও আমিই চোর !...
মহবৎ ! আমি তোমার মতন দেখিনি শিকারী-বীর—
এত বড় এই বাঘের পাজরে তুমিই বিধিলে তীর !
তবে আর কেন ? বাঘেরে ধরিয়া বাঘিনীরে ছেড়ে দাও !

নূরজহান

ছি-ছি, ছি-ছি ! এই ঠাড়াইহু আমি, নড়িব না এক পা'ও !
কেন অপমান কর আপনার ? তোমারি ছকুম ঠিক !
—মহবৎ তারে ফিরাইয়া দিবে ! দিক্ তায়, দিক্ ! দিক্ !

* *

মরিতে চাহিনি একদিন বটে—এমনি সে পরোয়ানা
পেয়েছিহু, সে যে পাঁচ-আঙুলেই রক্তের সই-টানা !
সঙ্গে তাহার দিয়েছিল ছুরী—জ্যোৎস্নায় তুলে ধরি'
দেখি সে কঠিন ইল্পাতময় অশ্রু পড়িছে ঝরি' !—

সেদিন পারিনি, বড় সাধ হ'ল বাঁচিবারে পুনরায়,
সারারাত তাই বৃকে করি' শেষে ফেলে দিহু দরিয়ায় !
পিছনে যেন কে চলে ধরি' মোর, তুলে নিয়ে গেল টানি'—
তারি বেদনায় মূরছিয়া ফের জাগিলাম রাজরাণী !
ভিখারীর মেয়ে মেহেরের ভালে তুমি দিলে রাজটাকা—
মোতিমহলের শামাদানে জলে আলেয়ার আলো-শিখা !
রূপের রূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সেরা দৌলত ?—
তোমার তাজের কোহিনূর নয়—হৃদয়ের সেলামত !
রূপের কদর জানি খুব জানি !—তস্বীরে হয় আঁকা,
রূপ সে বিকাশ কানা-কড়িতেই, তস্বীর লাখ-টাকা !
কেউ ঝরে' যায়, কেউ বা লুকায় অশ্রুর কুয়াসায় !
বাঁদী-হাটে কেউ শিকলিতে বাঁধা, হতাশ নয়নে চায় !
মেহেরের চেয়ে অনেক রূপসী রূপের পসরা নিয়া
ঘারে-ঘারে কেঁদে ফিরে গেছে এই ধরণীর পথ দিয়া !
নূরজহানের রূপ বড় নয়—বড় ওই বুকখানা !
তাই মানি নাই আর-একজনের মরণের পরোয়ানা !...

হে মোর বিধাতা ! নিয়তি আমার ! দরদী গো নির্দয় !
জনমের মত ঘুচাইয়া দাও তোমার প্রেমের ভয় !
মরিয়াও আমি মরিব কি সখা !—ঘুমাইতে পাব স্থখে ?
কবরে আমার ভালো করে' দিও পাথর চাপায় বৃকে !
যদি কোনোদিন আবার কখনো নাম ধরে' ডাকো' তায়—
মাটির মাঝারে মরা-দেহ উঠি' বসিবে যে পুনরায় !
দোহাই তোমার !—যা'-কিছু বিচার শেষ কর এই বেলা,
বল, বল, এই প্রাণটারে নিয়ে সাজ হ'ল কি খেলা ?

জহান্নীর

ভালো করে' কাঁদো !—ঢাকিও না মুখ, এত শোভা মরি
মরি !
হাহা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আঁখি ভরি' !
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দরবারে,
'রোজ-কিয়ামত'-ভেরীর আওয়াজ ধেনে যাবে একেবারে !
যত পাপ, 'গোনা'—ছনিয়ার যত বান্দার বেইমানি—
মাফ হয়ে যাবে ! শয়তান এসে ঠাড়াইবে ঘোড়পানি !...
মহবৎ, তুমি পাথর বনেছ ! কোনো কথা নাই মুখে !
এত বে-দরদ ! কলিঙ্গায় দোল দেয় নাকি ওই বৃকে ?

এখনো দাঁড়িয়ে কি দেখিছ বীর ? আরো কি বিচার চাও ?
বলিও না কিছু—আর বলিও না ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও !
আদেশ নহে সে, মিনতি আমার !—কি ভাবিছ মহবৎ ?

মহবৎ খাঁ

যেমন আদেশ বান্দার পরে—তাই হোক হজরত !

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

মেঘে রৌদ্র

সে-দিন রাস-পূর্ণিমা । কবে কোন্ শুভ-মুহুর্তে আপন
অস্তিত্বহারী গোপবধুরা মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের
করণা-কণা লাভ করিয়াছিল, তাহারই মধু স্মৃতির উৎসব ।
ভক্তি-আরুত নয়নে আনন্দের অঞ্জন মাখিয়া বহু দূর
গ্রাম হইতে অসংখ্য নরনারী মদনপুরে রাস দেখিতে
আসিয়াছিল । নানা পত্র-পুষ্প শোভিত হইয়া মদন-
গোপালজীর রাসমঞ্চখানি বনবিমোহন কুঞ্জেরই আকার
ধারণ করিয়াছিল ; তাহার উপর নহবতের করুণ রাগিনী
হৃদয়ের কোন্ কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া ব্যক্তিমাত্র-
কেই কি-এক অজানা ভাবের আবেশে উন্মাদ করিয়া
তুলিতেছিল । সে-রসে উন্মত্ত হইয়া নীলাধরে পূর্ণচন্দ্র
হাসিতেছিল । আলোকের বক্রায় স্নান করিয়া ধরিত্রীও
অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল ; বুঝি বা দিবসগুণে
স্বর্গ-মর্ত্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল ।

শিলাখণ্ডের যুবরাজ পটবন্ধ-পরিহিত চন্দন-চর্চিত
উদয়াদিত্য নগ্নপদে মন্দির-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন ।
অকস্মাৎ কোথা হইতে বীণা ঝঙ্কত হইয়া উঠিল । আর
অগ্রসর হওয়া চলিল না । সুরের মোহ তাঁহার অন্তর
স্পর্শ করিল ; তিনি তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ললিত-মধুর
কণ্ঠে কে সেই সুর-লহরীর সহিত সুর মিলাইয়া গান
ধরিল । স্বরে কি তীব্র মাদকতা ! সঙ্গীতে কি অপূর্ব
মূর্ছনা ! যুবরাজ স্বপ্নাবিষ্টের স্তায় গায়িকার অহেষণে
অগ্রসর হইলেন ।

(২)

বাপীতটে বসিয়া রাসলীলার গান গাহিতে গাহিতে
গায়িকা লগ্নাজিতা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল । উদয়া-
দিত্য ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন ।

গান শেষ হইল । শ্রোতা ও গায়িকা উভয়েই নীরব ;
বহুক্ষণ কাহারও মুখে কথা সরিল না । লগ্নাজিতা
প্রকৃতিস্থ হইয়া পিছনে চাহিতেই নয়নে নয়ন মিলিল । সে
বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল—“কে আপনি ? এখানে
কেন ?”

উদয়াদিত্য বলিলেন—“দেবী ! এ অধীনের নাম
উদয়াদিত্য ; লোকে আমায় শিলাখণ্ডের যুবরাজ বলে
জানে । মন্দিরে যাবার ইচ্ছায় বেয়েয়েছিলুম, কিন্তু
আপনার সুরকণ্ঠের আকর্ষণই আমাকে পথভ্রাস্ত করে’ এখানে
টেনে এনেছে ।”

যুবতীর মস্তকস্থিত গোলাপের আভা যেন তাহার
গণ্ডদ্বয়ে ফুটিয়া উঠিল । সে নতমস্তকে বসনাঞ্চল অঙ্গুলিতে
জড়াইতে জড়াইতে মৃদুকণ্ঠে বলিল—“অধীনার সৌভাগ্য !”

“এ স্বর্গ-মূর্ছনার কি এইখানেই শেষ করলেন ?”

“যুবরাজের অভ্যর্থনার কি এই স্থান ? যদি দয়া
করে’ এ অভাগিনীর কুটীরে পদধূলি দেন, আমি সাধ্যম
আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করুব ।”

“কিন্তু বিনা পরিচয়ে আপনার সঙ্গে ঘাই কি করে’ ?”

“পরিচয় পেলেই কি যাবেন ?”

“আপত্তির কারণ না থাকলে যেতে পারি ।”

“তবে শুনুন, আমি পতিতা ।”

অকস্মাৎ সন্মুখে সর্প দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া
উঠে, যুবরাজ তেমনই ভয়ে সরিয়া গেলেন । তাঁহার মুখ
হইতে অশ্রুটকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—“প-তি-তা !”

“হ্যাঁ, আপনাদের মত ধনীর লালসা-বহ্নিতে আপনাকে
আহুতি দিবে আজ আমি ঘৃণিতা, পতিতা ।”

যুবরাজ কথা কহিলেন না ; পশ্চাৎ ফিরিয়া গমনোত্ত
হইলেন ।

রমণী এ উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিল না; আহতা ভূজঙ্গীর মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিল—“দাঁড়ান। এতই যদি ঘৃণা, তবে এতক্ষণ পতিতার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখেছিলেন? রূপ?”

“না। যার কণ্ঠে এমন প্রাণমাতান সঙ্গীত হৃদয়-মন্দিরের গোপন কপাট খুলে দিতে পারে, আমি শুধু শ্রদ্ধামুগ্ধ নেত্রে তারই মহীয়সী মূর্তির দিকে চেয়েছিলুম। নইলে রূপ? সে ত তুচ্ছ! যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যার ধ্বংস হয়, তার মোহে ভুলে যাব আমি এত বড় পাগল নই।”

সত্যের এ তীব্র কশাঘাত লগ্নাজিতা সহ্য করিতে পারিল না। ক্ষণেক বিমূঢ়-নেত্রে বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর গুহকণ্ঠে বলিল—“মান্নুম আপনি ভালো, আপনি সাধু। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, যার কণ্ঠের নামামৃত আপনাকে বিমোহিত করেছিল, তার অন্তরের দেবতাকে পদদলিত করে যাবার আপনার কতটুকু অধিকার? আর-একটা কথা—যেচে এসে একজন মানুষকে অপমান করায় পৌকুষেয় নয়; তা সে যত বড়ই হীন হোক।”

যুবরাজের অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। একবার তিনি স্থির-দৃষ্টিতে রমণীর দিকে চাহিলেন; তার পর বলিলেন—“আর-কিছু বলবার নেই বোধ হয়; আমি যেতে পারি?”

যুবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহুকণ্ঠে সে বলিল—“যান। কিন্তু এটা অবিশ্বাস করবেন না যে, পতিতারাত্ত মাহুষ; তারাও ভালো হ'তে পারে। বাইরের আচরণটা বলুঘিত হ'লেও, ভিতরটা তাদের একেবারে কর্দমাক্ত হ'য়ে যার না। চেষ্টা করলে বিবেককে জাগিয়ে তুলে সংসার-পথে তারাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।”

যুবরাজ সে-কথার কোন উত্তর দিলেন না; দেখিতে দেখিতে বন বীথির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রমণীর হৃদয়ে ভীষণ ঝড় উঠিল। সে অপলক নেত্রে যুবরাজের গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তার অসংযত মনটাকে

গুটাইয়া আনিয়া বীণার তারের সহিত সংযোগ করিতে চেষ্টা করিল। চির-অভ্যস্ত হস্তে সুরের মূর্ছনা জাগিলেও প্রাণ কিন্তু তাহাতে সাড়া দিল না। বিরক্তিতে অস্থির হইয়া সে তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বীণাটিকে দূরে জলে নিক্ষেপ করিল। বুঝি অতীত জীবনটাও সেই-সঙ্গে বিসর্জন দিল।

(৩)

প্রভাত-বায়ু চঞ্চল গতিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। শিশির-সিক্ত দুর্বাদলের উপর সূর্য-কিরণ পতিত হইয়া, মগ্ন মখমলে রূপালী কারুকার্যের মত চক্ৰকে শোভা ধারণ করিয়াছিল।

অবস্খীপূরের বৌদ্ধ-মঠাধ্যক্ষ সিদ্ধাচার্য্য নিবিষ্টচিত্তে উগ্ঠানে পদচারণা করিতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে নারীকণ্ঠে কে ডাকিল—“প্রভু!”

সন্ন্যাসী নয়ন ফিরাইলেন। বৃক্ষ-পত্রাবলীর বক্ষ চিরিয়া ছরস্তু তপন রমণীর কুসুম-পেলব মুখের উপর তীব্রভাবে পড়িয়াছিল। অলোকসামান্য রূপবতীর প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। স্নেহভরে কহিলেন—“কি মা?”

“অভাগিনী মঠে একটু স্থান ভিক্ষা করতে এসেছে; আশা মিটবে কি?”

“কেন মা, তুমি কি আশ্রয়কারা?”

যুবতীর মুখখানি সহসা মলিন হইয়া গেল। গুহকণ্ঠে সে বলিল—“সত্যাকার আশ্রয় আমার কোন দিনই ছিল না!”

“তবে এতদিন ছিল কোথায়?”

“ছিলাম কোথায়?”—যুবতী শিহরিয়া উঠিল। কি এক অসহ যন্ত্রণায় তাহার বাকশক্তি লোপ পাইল। সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“বলতে যদি কষ্ট হয়, তবে থাক মা।”

রমণীর মুখে হাসি দেখা দিল; কিন্তু সে-হাসিতে আনন্দ উৎপাদন করে না; প্রাণ কাঁদাইয়া তুলে। সে দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিল—“বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু ভাবতে আমার অসহ যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। যদিও আজ সে পাপপুরী ছিন্ন-কন্ডার মত ত্যাগ করে এসেছি,

তবু কই সে স্বতির হাত ত এড়াতে পারলুম না। বলতে পারেন প্রভু, পাপিনীর উপায় কি? কিসে আমি শান্তি পাব?”

“অহুতাপই সত্য। অহুতাপই তোমাকে পরম শান্তির অধিকারিণী করবে মা। প্রভু অবলোকিতেশ্বর নিশ্চয়ই দয়া করবেন। কিন্তু একটা কথা—হৃদয়ের এ মর্মান্তিক বেদনা চেপে রেখে, লোকসেবায় আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারবে ত?”

“যে এতদিন চির-নিরানন্দের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও আনন্দের অভিনয়ে লোককে মুগ্ধ রাখতে পেরেছিল, আর যাই হোক, তার হৃদয়টা তত কোমল নয় প্রভু! তিনি দয়া করলে, অবশ্যই এ কাজে আমি অপারগ হব না।”

“তাঁর করুণা যে লাভ করে, সেই কেবল তোর মত উদ্ভ্রান্ত বেশে ছুটে আসতে পারে। আয় মা, আমার সাধ্য কি যে তোর স্নান অধিকার থেকে তোকে বঞ্চিত করি।”

সুবতী আচার্যের অহুসরণ করিল; প্রবেশ-দ্বারের নিকটে আসিয়াই কিন্তু সে পিছাইয়া দাঁড়াইল; দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—“ভেবে দেখলুম, আমার যাওয়া হবে না।”

“কেন?”

“পতিতার সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র হ'য়ে যাবে। না, না, আমি ফিরে যাই।”

সন্ন্যাসী হুসিয়া রমণীর মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—“তুলে যাচ্ছিস কেন মা, তিনি ব্যথাহারী। তোর আমার মত ব্যথিতের জন্মই তিনি ধরায় এসেছিলেন। তা তিন্ন যত বড় পাপই কেন কর না, এটা সর্বদা মনে রেখো, আত্মা পরম পুরুষেরই অংশ। তাকে হেয় ভাবলে, সেই পরম পুরুষকেই হেয় ভাবা হয়।”

রমণী আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না; ধীরে ধীরে আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিল।

(৪)

শত শত সুগন্ধ-তৈলের প্রদীপ গৃহখানি উজ্জ্বল করিয়াছিল; অজস্র পুষ্প ধূপ ও গুণ্ণুলের গন্ধ তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অপার্বিব ভাব জাগাইয়া

তুলিতেছিল। প্রস্তর-বেদিকার নিম্নে বসিয়া লগ্নাজিতা বুদ্ধদেবের মর্দর-মূর্তির পানে চাহিয়া তন্নয়-চিত্তে ‘পিটক’ গাথা পাঠ করিতেছিল—

“ফুটস্ লোকধর্ম্মেহি চিত্তং যদস ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং ধেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।”

“যথিন্দধীলো পঠবিংসিতো সিধা,
চতুরভি যাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি।”

“সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।

এবং নিন্দা পসংসাসু ন সমীজ্জতি পণ্ডিতা।” *

সিদ্ধাচার্য্য বাহির হইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন—

“মা!”

লগ্নাজিতা শুনিতে পাইল না; যেমন একমনে স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল, তেমনি করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ডাকিলেন—“মা লগ্নাজিতা!”

এবার তাহার কর্ণে সন্ন্যাসীর আহ্বান পৌছিল। সে কহিল—“কি প্রভু?”

“পথে বোধ হয় কা'কে সর্প-দংশন করেছে। সংবাদ পেয়েই আমি যাচ্ছিলুম; পাছে তুমি অভিমান কর, তাই খবর দিতে এসে এ-সময় বিরক্ত করলুম।”

লগ্নাজিতা অমিতান্তের পদমূলে মস্তকস্পর্শ করাইল। পরে সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া কহিল—“ও কথা বলবেন না। সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, প্রভু! আর সত্য বলতে কি, সেবায় আমি যত তৃপ্তি পাই, বোধ হয় আর কিছুতে এত আনন্দ পাই না। চলুন, বিলম্বে অনিষ্ট ঘটতে পারে।”

সন্ন্যাসী একবার প্রশংসাপূর্ণদৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার অহুসরণ করিলেন।

* * * * *

* স্তুতিনিম্না লাভালাভ প্রভৃতি লোকধর্ম্মে বাহ্যিক চিত্ত বিকম্পিত নয়, যিনি শোকহীন অহঙ্কার-হীন এবং নিম্পাপ, তিনিই সুমঙ্গল প্রাপ্ত হন।.....চতুর্দিকের বাত্যাঝিকোভে দৃঢ়প্রোথিত শৈলস্তম্ব বিচলিত হয় না। সংপুরুষও সেইরূপ কাম-ক্রোধাদির বন্ধাবাতে বিচলিত নহেন।...যনসন্ন্যাসিবিষ্ট শৈল-শ্রেণী বায়ু-প্রবাহে কখনও বিচলিত হয় না, পতিতজনকেও সেইরূপ নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে না।”

যখনই উপস্থিত হইয়া সিদ্ধার্থের পরীক্ষায় বুলিলেন, সর্প-দংশনই সত্য। তিনি শীঘ্র-হস্তে কি-একটা শিকড় রোগীর নাসিকার নিকট ধরিলেন। রোগী একবার শিহরিল; পরক্ষণে যেমন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনই রহিল। সন্ন্যাসীর মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি রোগীর অঙ্গুষ্ঠাদিগকে বলিলেন—“যদি কেউ ক্ষতস্থান শোষণ করে’ বিষ নির্গত করিতে পার, তবে বোধ হয় রোগী বাঁচ-লেও বাঁচ-তে পারে; কিন্তু বিলম্ব করলে চলবে না। তোমাদের মধ্যে কে মহাশয় আছে, এগিয়ে এস।”

কেহই অগ্রসর হইল না। সন্ন্যাসী একবার সেই মরণ-ভীত লোকগুলির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন; তার পর নিজেই অগ্রসর হইলেন। লগ্নাজিতা বাধা দিয়া কহিল—“প্রভু! সেবার্ষের পরম আনন্দ থেকে আমার বঞ্চিত করেন কেন? অনুমতি করুন,—দাসীই আপনার নিরোগ-মত কার্যে অগ্রসর হোক।”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“পাগলিনী, এ জীবন-মরণের সমস্তা! এতে আমি তোমায় কিছুতেই অনুমতি দিতে পারিব না।”

“আপনার শ্রীমুখেই ত শুনেছি প্রভু, দেহ ক্ষণভঙ্গুর। এর প্রতি আসক্তি রাখলে জীবন কখনই সার্থকতা লাভ করে না। তা ছাড়া যে শাস্ত-ধর্ম-লাভের আশায় আপনাকে সমর্পণ করেছি, আজ যখন তা লাভ করবার শুভ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছে, তখন তা থেকে আপনাকে বঞ্চিত রাখি কেন?”

সন্ন্যাসী আর প্রতিবাদ করিলেন না। উদাসত্বের কহিলেন—“তবে তাই হোক মা, তর্ক করে’ আমি তোমার মহৎ ধর্মে বাধা দিতে চাই না। তবে সাবধান, চিকিৎসা ও সেবা করিতে এসেছ, জীবন দিতে নয়, এ কথাটা মনে রেখো।”

(৫)

ছুই দিবস অতীত হইয়াছে। লগ্নাজিতা যত্ন-শয্যায়। মানবের ইচ্ছার উপর যে অদৃশ্যচারীর ইচ্ছা আছে, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে আজ সে চির-সমাধির কোলে আপনাকে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। যথেষ্ট সাবধানতা সঙ্গেও বিশ্বের হাত সে একেবারে এড়াইতে

পারে নাই। সেবা ও চিকিৎসাপ্রণে দুইদিন কাটিলেও, আজ সে আশা-নিরাশার পরপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মায়াভয়ী সিদ্ধার্থের অন্তর বিষণ্ণ, নয়ন অশ্রুপূর্ণ। তিনি গাঢ়ত্বের জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি যন্ত্রণা হচ্ছে মা?”

“কিছুই নয়, গুরুদেব!”

“তবে এখন কিরূপ অনুভব করছ?”

“আনন্দ! শান্তি!”

“তোমার অতীত-কার্য সফল হয়েছে। রোগী অনেকটা সুস্থ; আজ সে তার গন্তব্য-পথে চলে’ যাবে।”

ব্যথা-মলিন বদন আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। লগ্নাজিতা স্নিতমুখে কহিল—“ভগবান্ তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন। আজ পাঁচ বৎসর পরে কি জানি কেন আমার অতীত জীবনের কথা মনে হচ্ছে! কি মনে হচ্ছে জানেন, প্রভু?”

“কি হচ্ছে, মা?”

“মনে হচ্ছে—আমার স্মৃষ্টি-পড়া অন্তর-দেবতার ছুয়ার এমনি দিনে কে যেন এসে ধাক্কা দিয়ে ধুণে’ দিয়েছিল। তাই প্রাণে একটা দুর্জয় বেদনার তার পোষণ করে’ ছুটতে ছুটতে আপনার চরণ-প্রান্তে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। শান্তি যে পাইনি তা নয়, কিন্তু তার মধ্যেও কি-এক বেদনা বুকের মাঝে অহরহ চেপে বসেছিল, আজ আর সেটা ধুঁজে’ পাচ্ছি না। মন বলছে—‘তার সব হিসাব-নিকাশ শেষ হ’য়ে গেছে; জমাও নেই, খরচও নেই।’”

সন্ন্যাসী কোন কথা কহিলেন না। লগ্নাজিতা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—“কেবল সাধ হচ্ছে, এসময় একবার যদি তাঁর দেখা পেতুম। তা হ’লে, তা হ’লে বুঝি আর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকত না! তাঁর পায়ে ধরে’ বলতুম—‘হে আমার নমস্ত! হে আমার অন্তরের শিক্ষক! হে আমার গুরু! তুমি আমায় বিষ দাওনি, অমৃতের সন্ধান বলে’ দিয়েছ; মোহ দাওনি, ত্যাগ দিয়ে আমার জীবনের কাগিমাটাকে ধুয়ে মুছে খাটি করে’ দিয়েছ; ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা দিয়ে, আমার আজন্মের বন্ধ-সংস্কারটাকে পুড়িয়ে ছাঁই করে’ দিয়েছ। সে-দিন বুঝতে না পেরে

তোমার কত তিরস্কার করেছিলুম। এস অপরাধিনীকে ক্ষমা কর।”

সহসা ঘানের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লগ্নাজিতা শিহরিয়া উঠিল। তাহার গণ্ডময় অসম্ভবরূপ রক্তিম আভা ধারণ করিল। সে নীরব নিষ্পন্দের স্তায় পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া আগন্তুক অপলকনে লগ্নাজিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বাপকণ্ঠকণ্ঠে কহিল—“এতক্ষণ বাইরে থেকে তোমার সব কথাই শুনেছি, ভগ্নী। কিন্তু, ক্ষমা চাইবার কোন কাজ ত তুমি করনি, বরং আমিই আজ তোমার কাছে নতমস্তকে ক্ষমার ভিখারী। সে-দিন অবিশ্বাসের কাজল চোখে লেপে তোমার উপর অশ্রায় দোষারোপ করেছিলুম; তাই প্রভু আজ আমায় জীবন-মরণের সমশ্রায় ফেলে, সে ভ্রম ভেঙ্গে দিলেন। আর দিলেন—যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিনের জন্ত একটা তীব্র অনুশোচনা।”

লগ্নাজিতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া মুহূর্ত্তে কহিল—“প্রভুর কৃপায় আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে, না-চাঁওয়ার মধ্য দিঘে তিনি আমায় যে এতটা পাইয়ে দিলেন, এ করুণা শুধু তাঁতেই সাজে! অনুশোচনা কেন ভাই? আমি ত তোমার জন্ত এ জীবন উৎসর্গ করিনি; সেবাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছি। আশীর্বাদ কর, জন্মজন্মান্তরে যেন এমনি করে পুরের জন্ত জীবন ত্যাগ করতে পারি।”

যুবরাজ কথা কহিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়ন-আমার লগ্নাজিতার হস্ত ভিজাইয়া দিল। লগ্নাজিতা বলিল—“ছি ভাই, আনন্দের দিনে এমন উত্তলা হ'য়ো না। ভগ্নীর উপর যদি যথার্থই সহানুভূতি এসে থাকে, তুমিও দরিদ্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ কর; তাতেই ভায়ের উপযুক্ত কাজ করা হবে।” তার পর গুরুর দিকে কিরিয়া প্রশাস্তকণ্ঠে কহিল—“প্রভু! একটি কথা জানতে সাধ হচ্ছে; এ দীনা কি নির্কারণের অধিকারিণী?”

সন্ন্যাসী এতক্ষণ নির্কাক হইয়াছিলেন; এবার গাঢ় স্বরে বলিলেন—“ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবার আগে, নিজের মনকে প্রশ্ন করলেই পাবতে, মা। বাসনার নির্কারণ—তা ত সামনেই হ'য়ে গেল; অন্তরের নির্কারণ-

ছাতি যে তোমার গোঁথে-মুখে ফুটে রয়েছে। মারের সাধা কি যে ওই পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে।”

লগ্নাজিতার নয়নজ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছিল। গুরু-বাক্য তাহার বদনে তৃপ্তির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। বহু কষ্টে সে হস্ত উত্তোলন করিয়া সিদ্ধাচার্য্যকে প্রশ্নম করিতে গেল, কিন্তু সমর্থ হইল না। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন—“ধাক্ মা, আমি তোমার প্রশ্নম গ্রহণ করছি।”

অতি কষ্টে লগ্নাজিতা বলিল—“অন্তরে নির্কারণ-আলোক প্রজ্জ্বলিত করে' তাপসী গৌতমী প্রভু অমিতান্তের চরণে যে আত্মনিবেদন করেছিলেন, সেই পবিত্র পাখা আমার একবার শ্রবণ করান। সিদ্ধাচার্য্য উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

“বুদ্ধবীর নমোত্যখু সর্বসত্তানমুম্ম।

যো মাং দুকুখা পমোচেসি অঞংঞং চ বহুকং জনং।

সর্ব দুকুখং পরিঞংঞাতং হেতুত্থা বিসোসিতা।

অরিয়ট্টট্টিকো মগ্গো নিরোধো কুসিতো ময়া।

মাতা পুত্তো পিতা ভাতা অথিকা চ পুরে অহং।

যথা ভুচ্চং অজানন্তী সংসারিহং অনিচ্চিসং।

দিট্টোহি মে সো ভগবা অস্তিমোযং সমুসুসযো।

নিকখীনো জাতি সংসারো নথি দানি পুনর্ভবো।” *

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদূত লগ্নাজিতার জীবনের উপর মরণের যবনিকা টানিয়া দিল। সন্ন্যাসীর সে গভীর স্বরও যেন দূরে, বহুদূরে ছড়াইয়া লগ্নাজিতার আত্মাকে অমৃত-লোকের পথ দেখাইয়া চলিল। উদয়াদিত্য পরম শ্রদ্ধার সহিত মরণাহতার শয্যায় মস্তক অবনত করিল।

শ্রী বৈষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

*“হে বুদ্ধদেব! হে সর্বজীবশ্রেষ্ঠ। আপনাকে নমস্কার। কেবল আমাকে নহে, বহুজনকে আপনি দুঃখমুক্ত করিয়াছেন। এখন আমি সর্বদুঃখপরিজাত এবং দুঃখের হেতুভূত তৃকাও এখন আমার বিগুণ—বিদূরিত। এখন আমি আর্ধ্য অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বনে নির্কারণ-সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইতিপূর্বে আমি মাতা পুত্র পিতা জাতা আর্ধ্য হইয়া কতবারই সংসারে আসিয়াছি। যথাজ্ঞানের অভাবে বার বার আমার সংসারে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু এবার আমি জাননেন্ত্রে আপনাকে দর্শন করিয়াছি। হতরং এই আমার শেষ দেহ-ধারণ। এইবার আমার জন্মশেষ; আর আমার পুনরুৎপত্তি নাই। বহু জন্মান্তরের পর জন্মের হেতু তৃকাকে চিনিয়াছি, আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। হতরং আমি এখন মুক্ত—অর্হৎ।”

গৌতমের গৃহত্যাগ

স্বক আষাঢ় পূর্ণিমা রাত নিথর নিব্বয়—করুছে সাঁসা !
 কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষা !
 শাস্তি নিবিড়, শাস্তি অটল, শাস্তি কঠোর যত্ন যেন !
 কেবল ঝাঁঝির ডাঁক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন ।
 কেবল চাঁদের চোখটা জলে, তাও সে ক্ষণে পড়ছে তুলে' ।
 মস্ত মাহুষ ধরায় আছে—একথা মন যায় যে ভুলে' !
 চাঁদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোৎস্না-রাত্তি !
 শুক্কোদনের রাজপ্রাসাদে জলুছে নাকো একটি বাতি ।
 স্বক পুরী,—হাস্তধ্বনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা,
 মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্তকীদের উচ্ছলতা,
 আরতি-সাম,—সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্ গভীরে !
 ঘরে ঘরে স্থপ্ত জনের জাগুছে আরাম-নিশাস ধীরে ।
 ধরার বৃকে নেইক ধ্বনি, রাজ-প্রাসাদে নেইক সাড়া !—
 শয্যা 'পরে কে ঐ নড়ে, কে ঐ নড়ে নিদ্রাহারা !
 অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বন্ধে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে,
 তায়ই পাশে গৌতম ও যে নিদ্রাবিহীন চোখটি মেলে' !
 কি ব্যথা তার বাজুছে বৃকে ? কিসের হুখে রাত্রি জাগে ?
 কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন ? নিদ্রা কেনই তুচ্ছ লাগে ?—
 হুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্ত-ব্যথা, জরার ব্যথা
 ঐ বৃকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা ।
 বন্ধে যেন বাণ লেগেছে ছটফটিয়ে উঠছে পাখী !
 নিদ্রা নাহি নিদ্রা নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি' থাকি' ।
 উঠল যুবা, প্রাণ যে জলে, বসল উদাস শয্যা 'পরে,
 গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে !
 জান্না দিয়ে দেখল যুবা আকাশ-গায়ে জলুছে তারা,—
 অসীম দেশের আভাস দিয়ে ভাঙতে কি রে বলুছে কারা ?
 ঘুমায় শিশু দেখল যুবা, আঁকড়ে তারে যশোধরা,—
 একটি শিশু হেথায় স্থখে, লক্ষ শিশু হোথায় ধরা
 হুখে ক্লেমে পিষুছে নিতি, তাদের হোথা দেখবে কেবা ?
 এই শিশুরি সমান মুচ রইল ধরায় অজ্ঞ য়েবা,
 পথ দেখাবে কে রে তারে, হাতটি ধরে' তুলবে তারে,
 হুখ-ভরা জগৎ হ'তে লবে তারে হুখের পারে ?

ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর' ছলুছে ঝড়ে,
 মাহুষ-তরী ডোবে ডোবে,—রাখবে কে তায় হালটি ধরে' ?
 বেদন-নত ভূতলশায়ী লক্ষ জনার ক্ষুধা কানে
 মুক্তি-অভয়কে দেবে রে ?—উঠবে সবাই সবল শ্রীণে !
 বাজে বাজে বিষম বাজে বন্ধে ব্যথায় ডাঙশ হানে ;
 দাঁড়ায় যুবা শয্যা-পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে ।
 পুরীর পাষণ প্রাচীর ভেদি' ডিঙিয়ে এসে স্থখ-নিগড়ে,
 জায়ার প্রীতি ছাপিয়ে ঢেকে, নর্তকী-গান চূর্ণ করে'
 কেমন করে' সকল ব্যথা ঐ বৃকেতে লাগল এসে ?—
 গোপন ব্যথা গোপন কাঁদন এল কি হায় হাওয়ায় ভেসে ?
 পায়নি কি ঠাই, পায়নি রে বাস এই এ যুবার বন্ধ বিনে ?
 হাজার হাজার বরষ ধরে' খুঁজুছিল কি রাত্রে দিনে
 এই বৃকেরি শীতল আবাস ?—বৃকটি আজি কেন্দ্র সম
 সব বেদনা আঁকড়ে ধরে,—নমনীয় পরম কম ।
 চোখ ছেপে তার অশ্রু আসে, বৃক ছেপে তার কাঁদন দোলে,
 বেদন-উতল দাঁড়িয়ে যুবা নিথর নিশার শাস্ত কোলে !
 যৌবন এই, প্রেমের লীলা, যশোধরার মধুর হাসি,
 এই যে দোঁহার অটুট বাঁধন - জরায় সব ফেলবে গ্রাসি' ;
 যশোধরার দীপ্ত রূপে জরার আঁধার ফেলবে ছায়া,
 এই যে সবল শক্ত আমি হুইয়ে যাব কুজ-কায়ী !
 যত্ন শেষে আসবে কঠোর টানবে ধরে' সবার কেশে ;
 কেউ রবে না, কেউ পারে না জিন্তে তারে সর্বনেশে !
 হাসে মাহুষ হর্ষ করে, জানে না সে হাসির পিছে
 লুকিয়ে আছে বিষম কাঁদন, স্থখ যা বলে সে যে মিছে !
 সেই কাঁদনের বেদন পিয়ে বেদন-জয়ী মুক্তি-গাথা
 কে দেবে রে ক্লিষ্ট ধরায়, কে হবে রে ক্লেশের জাতা ?
 জাগল যুবার ক্লিষ্ট মনে শায়ক-বেঁধা সেই সে পাখী,
 জীর্ণ বুড়ার হুইয়ে চলা, বন্ধে শবে নে যায় ঢাকি' !—
 গিরগিটি ধায় পিপড়ে ফড়িং, গিরগিটিরে সাপ সে গিলে,
 সেই সাপেরে কামুড়ে খেল দৌড়ে এসে একটা চিলে ;
 মাহুষ মারে ছাগ ও মাছে,—এই ত ধরা !—হিংসা-নীতি
 চলুছে কঠোর ; নেইক দয়া, নেইক কক্ষণা, নেইক প্রীতি !

এই ত জগৎ মিথ্যা বিপুল—জগৎ বিরীচ মিথ্যা ঘেরা,
চাই আলো চাই, চাই রে আলো, আঁধার বড়, আঁধার
ডেরা !
কে ঘোচাবে এ হিংসা-ঘেব, কে তাড়াবে নির্দয়তা ?
ব্যাকুল যুবা কক্ষে ঘোরে, বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা ।

এই ত রাত্রি, এই অবসর, তারায় চাঁদে বলছে মোরে—
বেরিয়ে পড়ো বেরিয়ে পড়ো, আর কি স্থযোগ পাবি
ওরে ?
হয় মিশে থাক মিথ্যা মায়ায়, প্রিয়ার প্রেমে থাক রে
মিশি' ;
নয় চলে' আর জগৎ-বুকে, এই ত স্থযোগ—নীরব নিশি !
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন—হোথায় ধূলি কঁকর-ভরা ;
হেথায় বিলাস, নর্ভকী-গান—হোথায় রোদে পুড়ছে ধরা ;
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ—হোথায় মানুষ জলছে তাপে ;
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ—হোথায় দুখে দলছে দাপে ;—
কোনটা নিবি কোনটা নিবি ? তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে—
হবি রাজা না ভিখারী ?—দাঁড়াব ভাই সবার পাশে !
ছুর্কলেরি বন্ধ দলে' ঘুরবে না মোর রথের চাকা,
শোণিত-আশী রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা ।
ছুর্কলেরে বল দেবো রে, ছুধীর হব স্থখের কামী,
মুছিয়ে শোণিত দানুব অভয় আমি আমি এই এ আমি ।
রাজ-আভরণ নয়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গ-ভূষণ ;
শয্যা কোমল বিধছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন ;
রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে ;
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে ।
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত—
মুছব আমি সকল শাসন, মুছব আমি সকল কত ।
ঐ আসে রে ঐ আসে রে, ঐ যে শুনি কাতর ধনি,—
পুত্রহারা কঁাদছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মনি ।

নিজ্জাবিধুর যলোধরা দীর্ঘখাসে ফিরুল পাশে,
ধমকে দাঁড়ায় ব্যাকুল যুবা, বন্ধ তাহার কাঁপল আসে ।—
হার রে নারী, হার মোহিনী ! আমার তুমি বাঁধলে ডোরে,
অঝোর দিলে প্রণয় প্রীতি, কিন্তু তবু বুক যে পোড়ে !

পুত্র দিলে খেঁচ বা স্থখ, তবুও ব্যথা ঘুল না যে
সব স্নেহ প্রেম ছাপিয়ে, প্রিয়া, এ কোন্ ব্যথা বক্ষে বাজে !
একলা তোমার থাকব শুধু ?—কর কর আমার কমা,
বিপথ মাঝে কঁাদছে যে নয়—বুঝবে নাকি অল্পমা ?
সবায় আমি চাইছি প্রিয়া, তোমায় আমি ছাড়ছি নাকো,
সবায় পেয়ে তোমায় পাবো, ঘুমাও প্রিয়া, শান্ত থাকো ;
জগৎ-জনে করছে যে ভিড়—এই এ বুকে আসছে সবে,
সবায় সেথা দেবো নিবাস, সবার সাথে তুমিও রবে ।
একটি চুমা তোমার মুখে, একটি চুমা শিশুর মুখে,—
এই নিয়ে আজ দাও গো বিদায়, বেরিয়ে পড়ি দুখের বুকে
দুখের মাঝে দুঃখে বুকে দুঃখ হ'তে নিঙড়ে স্থখ,
হুব আমি সবার দুখে, মিটিয়ে দেবো সবার ক্ষুধা ।

মোন দাঁড়ায় কুক যুবা, জায়ায় হেরে পুত্রে হেরে,—
যায় বড় সাধ আঁকড়ে ধরে দুইটি জনে বাহর বেড়ে ।
হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,—না, না, একি ! আবার
মায়া !
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দক্ষ কায়া !
যাই চলে' যাই, যাই চলে' যাই, যাচ্ছি আমি, শোনো
শোনো,
দুঃখী ঙগো ব্যথিত ঙগো, আর ভাবনা নাইক কোনো ।
পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়া ? আমি সবায় প্রেম বিলাব,
প্রেমের আলোয় প্রেমের স্থখায় দুখ মুছাবো শোক
তাড়াব ।
রাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাসব সবার ঘুরিয়ে আঁধি,—
এই কি রে স্থখ !—হায় অভাগা !—প্রেম দিয়ে যে
রাধ্ব ঢাকি' ;
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আনুব পথে,
মুক্তিবাণী শুনিবে দেবো,—বাঁচবে মানুষ শকা হ'তে ।
স্থপ্ত থাকো, তৃপ্ত থাকো, যশোধরা আমার প্রিয়া,
কিনলে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া ।

শুক আবার দাঁড়ায় যুবা,—আকাশ পানে আবার দ্যাখে,
দিক-ভোলান চাঁদের আলো ডাকে যেন ঐ যে ডাকে !
অবাধ অঝোর দিকে দিকে চাঁদের আলো কেবল হাসে,—
মুক্তি আছে, মুক্তি পাব, হারয় ভরে কী উল্লাসে !

যাই অসামে, যাই অশেষে. নেইক রে আর বাঁধা-ধরা,
বক্ষে তুফান ছুকুল ছাপে,—এ যে বাঁধন-চূর্ণ-করা!

দ্বার খুলে' যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ার:ভরে
ডাকুল যেন। দাঁড়ায় যুবা। আবার সে যে ফিবুল ঘরে।
ঐ না নড়ে-যশোধরী!—ঐ যে শিশু, আহা!—আহা!

ছাড়ুব এদের? চির জনম? কেমন করে' সেই তাহা?
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগল গায়ে নিশার হাওয়া,
ডাকুল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নেই? হয় না

যাওয়া!

ছাদের 'পরে বেরিয়ে যুবা, হেরুল আকাশ—নেইক সীমা.
মৌনা নিশীথিনী'ব বুকে শব্দ নাহি—অচল ভীমা!

অসীম আলোর প্রাবন চলে—অশেষ আলো, উদার

আলো।

এত আনোয় তুখ ঘোচে না? কেমন করে' মুছব কালো?

বিশ্ব অসাম এহ বি টে ক অ 'ম ক ঠ ব ত পারি?

আমাব হিয়াব ক্ষুদ্র নামে তই খা. প্রেমের বারি?

ফিবুল যুবা, ফিবুল ঘরে, বসুল ধীরে শয্যা-শেষে;

পারুব নাকি? পারুব নাকি? অশ্রুতে গাল যায়

• রে ভেসে!

আবার এল উতল হাওয়া—তুলল ব্যথার সাগর জোরে;
কে রাখে রে? কিসে মায়া? প্রাণ যে আবার উঠলু ভরে'

যুক্ত করে দাঁড়ায় যুবা যশোধবার চরণ-মূলে,

শেষ দেখা সে দেখল প্রিয়ায় দেখল ছেলেয় দেখল ভুলে'!

যশোধরার শয্যা ধরে' ঘুরুল সে ধীর তিনটি বারে।—

কেদো নাকো, ফিবুব আঁমি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে।

যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রিয়া যাই, বিদায় বিদায়, আসি

আসি,

তোমা'য় আঁমি ভালো'বাসি, জগৎ-জনে ভালোবাসি!

ঘর হ' ত সে বরিয়ে .ল, চাইল আবার আকাশ পানে;

জগৎ থাকে ডাক দিয়ে চ ব্যা'র টানে প্রেমের টানে।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আইন্-ই-আক্বরীর এক পৃষ্ঠা

আবুল ফজল অকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি
আইন্-ই-আক্বরীর লেখক। আইন্-ই-আক্বরীতে
জিনিসের মণ বা সরের মূল্য দামে ধরা আছে।
দাম সেকালের তাম্রমুদ্রা পদ্ধতির মত। এক দামের
ওজন ১ তোলা ৮ মাসা; ৪০ দামে এক টাকা হয়।
টাকার হিসাবে জিনিসের দর দেওয়া গেল।

গম ১ মণের দাম ৮ আনা

যব " " ৮/৪ "

অনেকপ্রকার চাউলের উল্লেখ আছে, মুখমৌন, মুখ
বাস প্রভৃতি।

সর্বোৎকৃষ্ট চাউলের মণ ২৫০ টাকা,

ময়দা একমণের দাম ১১/০

আটা " " ১০/০

ঘি " " ২১১/০

ভাল পরিষ্কৃত চিনি " " ৬

মিছবী " " ৫১০

মধ্যম চিনি " " ২৫০

নিকৃষ্ট চাউলের মূল্য প্রতিমণ ৮/৪ আনা

হরিদ্রা একমণের দাম ১০ টাকা

গোলমরিচ " " ১২ "

লবণ একমণের দাম ১০/১০

তৈল " " ২

হিজবী ২৮০ অর্কে আবুল ফজল অকবরের রাজ-
সভায় আসেন। ১৩৩০ অর্কে দরের সহিত ঐ সময়ের
দরের তুলনা করিলে মনে হয় "হায়রে সে কাল!"

বর্তমান দর :—

গম একমণের দাম ৫ টাকা

যব " " ২১ "

চাউল (উৎকৃষ্ট) " ১০১ "

" (মধ্যম) " ৮৮/০ "

ময়দা " " ৮/০ "

আটা " " ৭৫/০ "

ঘি " " ৮৮-২৮ "

তৈল " " ২১৫/০ "

চিনি (সাদা শুভা) " ১৫ "

" (পরিষ্কৃত ভাল) " ২৫১০ "

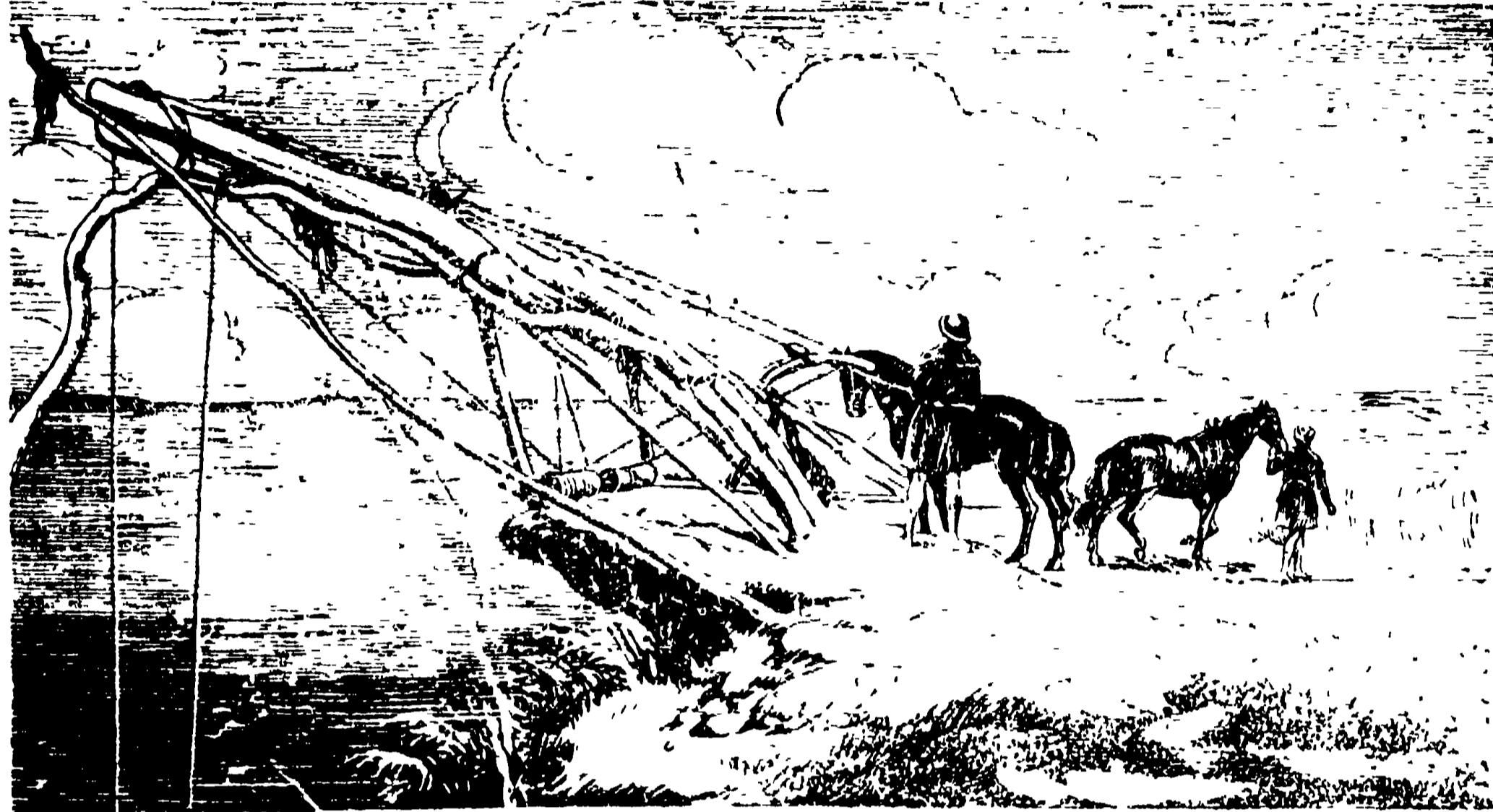
মিছবী " " ২৪ "

লবণ একমণের দাম ৩১০ টাকা

হরিদ্রা " " ৪২ "

গোলমরিচ " " ২১ "

শ্রী কুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়



উচ্চ তীর হইতে, এশিয়ার অনেক স্থানে, এইপ্রকারে ঘোড়ার সাহায্যে সমুদ্র হইতে জল তোলা হয়

এশিয়ার পণেবিপণে (৩)—

ভেন হেডিনের কথা প্রবাসীতে দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। এইবার তাঁহার আবেগ কতকগুলি ভ্রমণ-কাহিনীর কথা বলিব। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী তাঁহার কথাতাই বলিব।

“১৯০৬ সালে আমি যে বার ভিক্টর অতিক্রম করি, সেইবার এক সময় লেক লাইটেনের তীরে বাসা বাঁধিয়াছিলাম। এত হৃদয় পূর্ব প্রকাশ, ইহা কাপ্তান ওয়েল্‌বি ১৮৯৬ সালে আবিষ্কার করেন এবং নামকরণ করেন। আমবা যেখানে বাসা বাঁধিয়াছিলাম সে স্থানটি ভয়ানক। লোকজন নাই—গরুঘোড়ার খাইবার ঘাসও সেখানে পাওয়া দুষ্কর। একদিন সকালে দেখিলম আমাদের দলের আটটি ঘোড়া এবং পচন ঘনিয়া গিয়াছে।

“আমি এই হৃদয় এতটী নজা তৈয়ারী করিব স্থির করিয়াছিলাম সেইজন্ত নজে একটা collapsible boat সঙ্গে লইয়াছিলাম। ১৯০৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, ভূত্যা রহিম

আলিকে লইয়া নৌকায় করিয়া হৃদের মাঝখানের দিকে চলিতে লাগিলাম। সমস্ত হৃদকে একটা আয়নার মত স্বচ্ছ মনে হইতেছিল। হৃদের একদিকে লাল পাহাড়ের শ্রেণী; তাহার ছায়া জলে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল—এই ইটের মত লাল পাহাড়ের মাথায় যেন শুভ্র বরফের মুকুট। হৃদের জলে ইহার ছায়া বড়ই স্থম্বর দেখাইতেছিল।

“নৌকায় চড়িবার পূর্বে আমার দলের অন্ত সব লোককে ভারবাহী পশুদের

লইয়া হৃদের পূর্বদিকে যাইয়া বাসা বাঁধিতে বলিয়া দিলাম। স্থির করিলাম, অক্ষর হইবার পূর্বেই আমরা পূর্ব উপকূলে পৌঁছিয়া বিশ্রাম লাভ করিব

“আমার জল মাপিবার দড়ি ২১০ ফুট লম্বা ছিল। কিন্তু হৃদের মাঝখানে এই দড়ি সাহায্যে তল পাওয়া গেল না। রহিম আলি বলিল—এই হৃদের তল নাই—। তীর হইতে হৃদের স্বচ্ছ জল দেখিয়া আমরা হৃদের পরিমাণ সম্বন্ধে আন্দাজ ভুল করিয়াছিলাম। আমরা দক্ষিণ তীরে আসিয়া অবতরণ করিলাম দ্বিপ্রহরে। সেখানে তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু আহাব করিয়া আবার নৌকায় আরোহণ করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব কূলের দিকে নৌকা টানিতে লাগিলাম। আমি নজা করিতে বাস্তব—এমন সময় রহিম আলি ভীতকণ্ঠে বলিল—পশ্চিমে ঝড় দেখা যাইতেছে, একটু পরেই বোধ হয় আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে।

“আমি পশ্চিম দিকে চাহিলাম—সে দৃশ্য ভয়ানক! হৃদের রংয়ের মেঘ ধূলা মাথিয়া যেন আমাদের গ্রেস করিবার জন্ত ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে দূর হইতে মনে হইতেছিল যেন বড় বড় পাশ বালির তীরের মত বেগে গড়াইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। রহিম বলিল—এখন তাই নামিলে কেমন হয়? আমি বলিলাম—না, তুমি পাল খাটাও, আমবা হাওয়ার বেগে আগাইয়া যাইব।

“রহিমের ছোট পালাখানা খাটান হইত না হইতে ঝড় আমাদের উপর আনিয়া পড়িল। আয়নার মত স্বচ্ছ হৃদ তখন অশুররূপ ধরিয়াছে। জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন সকলে মিলিয়া আমাদের গ্রেস করিবার আয়োজন করিতেছে। ক্রমশঃ ঝড় বাড়িয়া চলিল। নৌকাও তখন ঝড়ের মুখে তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। রহিম হঠাৎ সব





গোল্জ প্যাশা তুর্কী এবং সৈয়দলের সেনাপতি ছিলেন। এইবার ইউক্রৈটিশ নদতে তীর স্রোতের মুখে আমি একবার ভেলার উপর চড়িয়া বিহাব করিয়াছিলাম।

“বেশ হইতে আস্ত-গ করিয়া দুইটি নৌকা ক্রয় করিলাম। এই দেশে দুইটি নৌকাকে এক সহজে বাধিয়া লওয়া হয়—তাহাতে নৌকা সমান থাকে এবং সহজে ওলটপালট হয় না। নৌকার উপর ছোট একটি কেবিন মত করিয়া লইলাম। চারজন মান্নি মাল্লা এবং একজন



তল-বিহীন হৃদে স্তভেন হেডিনের নৌকা ঝড়েব মুখে চুটিয়া চণি যাছে

ছাড়িয়া দিয়া ‘আল্লা আল্লা’ বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিল। মাঝে মাঝে চড়া দেখিতেছিলাম—এই চড়ায় যদি নৌকা একবার লাগে তবে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যাইবে। আমি বহিমকে চাঁৎকাব করিয়া বলিলাম—“চারিদিকে চোখ রাখ যেন চড়ায় নৌকা না লাগে ” রহিম তখন মড়ার মতন পড়িয়া আছে।

“ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে দুবে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম। আরও একটু পরে দেখিলাম তীবে হৃদের চেউ লাগিয়া এই শব্দ আসিতেছে। আমি দেখিলাম আব একটু বিলম্ব করিলে নৌকা তীরে লাগিয়া চূর্ণ হইবে, আমবাও তাহার সঙ্গী হইব। রহিমকে বলিলাম—লাফ দিয়া জলে পড়, নৌকা ধর—সে তখন মড়ার মত। আমি তাহাকে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিলাম, তখন তাহার জ্ঞান হইল। আমরা দুইজনে তখন কোমর জলে দাঁড়াইয়া নৌকাকে চেউএর হাত হইতে বাঁচাইলাম। এইখানে হৃদের জল জমাট না হইলেও আমাদের গায়ে যে জল লাগিতেছিল তাহা তৎক্ষণাৎ জমিয়া যাইতেছিল।

“আমাদের ফিরিতে দেবী হইতেছে দেখিয়া মশাল লইয়া আমাদের সন্ধানে লোক বাহির হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে একজন আমাদের কাছে আসিয়া পড়িল। তাহার মশালের আলোক আমাদের প্রাণে আশার আলোক দান করিল।

১৯১৬ সালে যুদ্ধের সময় আমার বন্ধু ফন্ ডার গোল্জ প্যাশা (von der Goltz Pasha) আমাকে বাণদাদে নিমন্ত্রণ করেন।

স্তভেন হেডিন্ অথবোহণে হৃদ পাব হইতেছেন। দূরের পাহাড় লাল রংএব, উহাব মাথায় বরফের মুকুট



তুর্কী-নৌকা, দুইটি নৌকাকে বাধিয়া একখানি ভেলার মত করা হয় পুলিন লইয়া যাত্রা শুরু করিলাম। এইখানেও আমি নঙ্গা করিতে-ছিলাম। হঠাৎ আবার ঝড় উঠিল—আমাদের নৌকাও তীরের মত চুটিয়া চলিল। আসাব কেবিন কোথায় যে উড়িয়া গেল জানি না।—সব চূপ চাপ। একটু নিশ্চিত হইব মনে করিতেছি এমন সময় আবার ঝড় গুড় করিয়া সমস্ত আকাশ যেন আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। কামানের মত শব্দ করিয়া বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল। মনে হইল এবার আমার সকল সমাপ্ত হইল। কিন্তু বাঁচিয়া গেলাম। ঝড় থামিয়া গেল। সমস্ত জিনিষপত্র ত্যাগ করিয়া আর্দ্রবসে কেবল মাত্র

প্রাণটুকু ইহা ডাকায় উঠিলাস। ঝড় মাত্র ১৭ মিনিট ধরিয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক মিনিট সময়কেই যেন বহু যুগ, বলিয়া মনে হইতেছিল এবং বোধ হয় আর ৩ মিনিট ঝড় থাকিলে আমরা এবং নৌকা সবই চূর্ণ হইয়া যাইত।”

হস্তী-সীল—

গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপে (Guadalupe Islands) শুঁড়ওয়াল একপ্রকার জীব বাস করে হংরেজিতে ইহাদের elephant seal বলা হয়। ইহাদের শুঁড়গুলি জলে ভেজে না অর্থাৎ অতিরিক্ত তেলতেলে, জল লাগিলেও গড়াইয়া ঝরিয়া যায়। শুঁড়টি ইহারা যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। এই শুঁড়টি না থাকিলে ইহাদের সহিত সাধারণ সালের কোন তফাৎ থাকিত না এবং এতদিনে বোধ হয় মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ লোপ পাইত। এই হস্তী সীল খেয়ালমত এই শুঁড়টিকে মুখে মধ্যে ভরিয়া দিয়া হাওয়া ভরিয়া শিঙার শব্দের মত একপ্রকার শব্দ করিতে পারে।

গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও এই হস্তী-সীলের দেখা পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এই দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বীপটি ২০ মাইল লম্বা এবং ৬ মাইল চওড়া। দ্বীপটির জঙ্গল সামুদ্রিক ভূমিকম্পের ফলে হয়। দ্বীপটিতে নানাপ্রকার অদ্ভুত জীবজন্তু বাস করে, তবে তাহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

হস্তী সীলের দল এক সময় উত্তর মেরু প্রদেশের নিকট বহু পরিমাণে বাস করিত, কিন্তু তিমি শিকারীদের হাতে ইহারা অল্পকাল মধ্যেই প্রায় লোপ পাইবার অন্তিম পৌছায়। হস্তী-সীল হত্যা করিয়া তাহারা একপ্রকার তেল বাহির করিত। শিকারীদের জ্বালায় অস্থির হইয়া বোধ হয় কতকগুলি হস্তী-সীল এই জন মনুষ্যহীন দ্বীপে আসিয়া আশ্রয় লয়। বর্তমান সময়ে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ওব্রেগন আইন করিয়া দিয়াছেন যে কেহ গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপে অনুমতি বিনা যাইতে পারিবে না এবং এই দ্বীপের তীর হইতে সমুদ্রের তিন মাইলের ভিতর কেহ হস্তী-সীল হত্যা করিতেও পারিবে না। কেহ এই নিয়ম ভাঙিলে তার ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা আছে।



হস্তী-সীলের দল সমুদ্র উপকূল বশ্রামলাভ করিতেছে, মানুষকে তাহাদের কোন ভয়ডর নাই



মুখের মধ্যে শুঁড় ভরিয়া হস্তী-সীল শিঙার মত শব্দ করিতেছে

হস্তী-সীলদের দেখিলে মনে হয়, সারা জীবন ধরিয়া অথও শ্রম লভ্য ইহাদের বাঁচবার একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষকে তাহাদের কোনপ্রকার ভয়ডর নাই। তীরে যখন তাহারা দল বসিয়া রোদ পোহায়, তখন তাহাদের মাঝখানে যদি একদল মানুষ লক্ষ্য হইত বা দৌড়াতে থাকে তাহাদের আশঙ্ক-বিশ্রামের কোনপ্রকার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা অতি নির্বিচলিত চিত্তে রোদ পোহাইতে থাকে। তাহাদিগকে এই সময় দেখিলে মরা বালিয়া মনে হয়। কেহ যদি তাহাদের পিঠে ছুই চারিটা চড় চাপড় দেয়, তাহাও তাহারা গ্রাহ্য করে না।

ইহাদের এই শুঁড়টির যে কি প্রয়োজন তাহা কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ এখনও বলিতে পারেন নাই। বড় মদা হস্তী-সীলের শুঁড়টি ষোল ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। শিকার-বাজানর মত শব্দ করা ছাড়া এই শুঁড়টির আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

মদা হস্তী-সীলগুলির সংখ্যার অনুপাতে মনে হয় যে সর্বসমেত ইহাদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় হাজার হইবে। শিকারীদের হাত হইতে



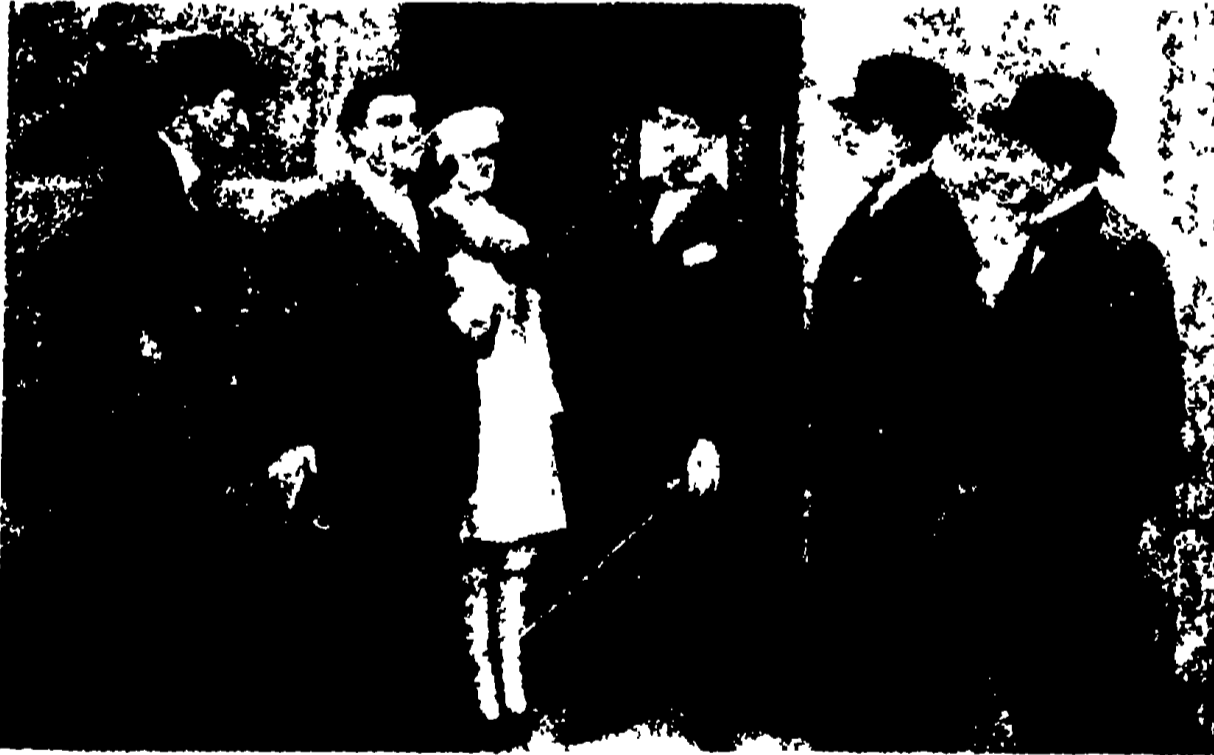
কেন তাড়াতাড়ি মিছে গেলমাল—

হস্তী-সীলের মুখ দেখিয়া যেন তাই মনে হয়

ইহাদের বাঁচাইতে পারিলে এই অভূত জন্তুগুলিকে চিরকাল বাঁচাইতে
পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

মোমের মানুষ—

আমরা পাথরের তরী মানুষের প্রতিমূর্তি অনেক দেখিয়াছি—
ইহারা ছবছ মানুষের মতন দেখিতে না হইলেও বহু পরিমাণে
একরকম দেখিতে হয়। একজন খেতাজ শিল্পী কতকগুলি মোমের
মানুষ তৈয়ার করিয়াছেন—তাহারা দেখিতে হইয়াছে অবিকল মানুষের
মতন। তাহারা যে ভীষন্ত মানুষ নয়—ইহা কোনরকমেই বুঝিবার
উপায় নাই। তাহাদের পাশে যদি অল্প কতকগুলি লোককে দাঁড়

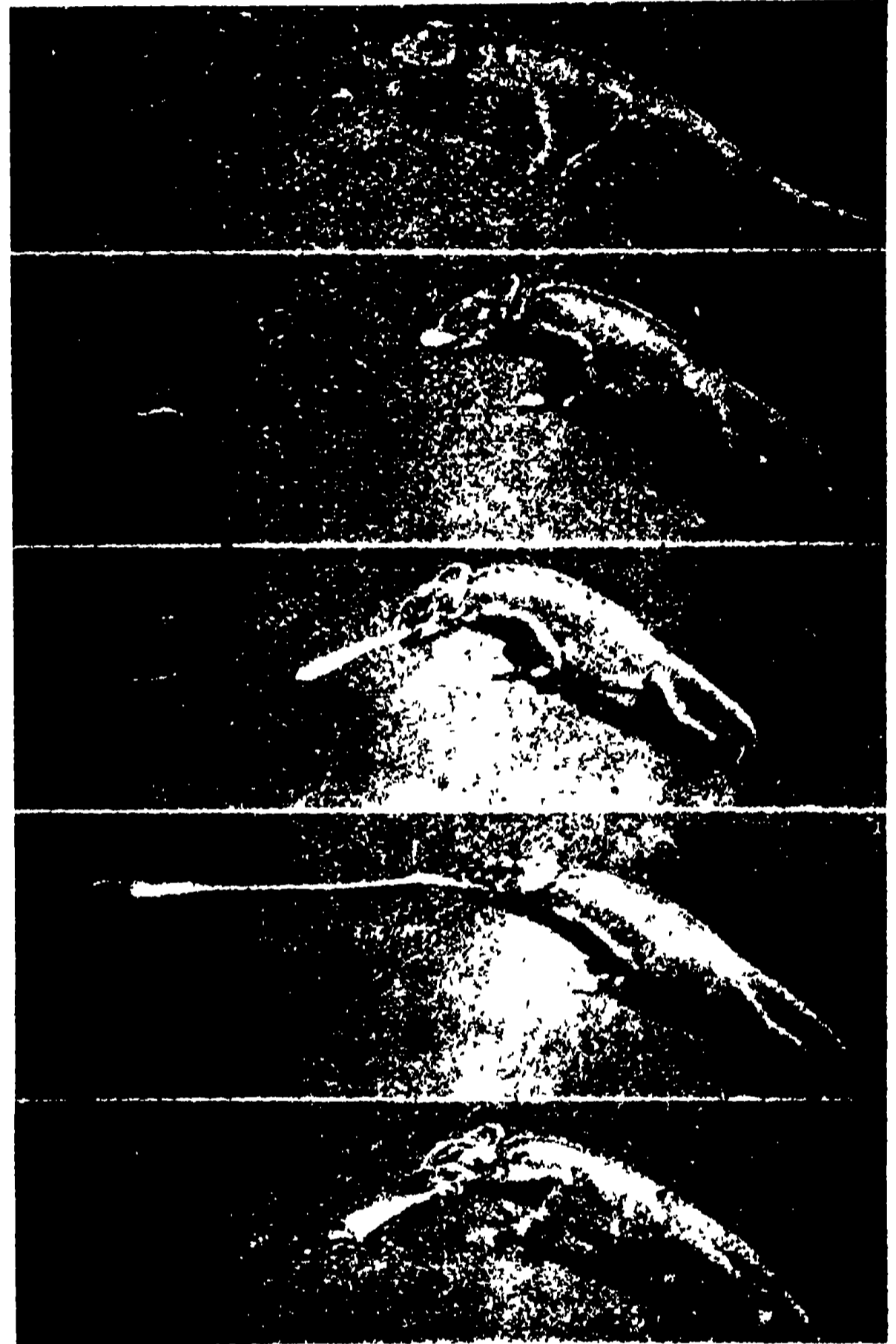


আসল নকল চিনিবার যো নাই—বাঁদিকের প্রথম এবং ডানদিকের
শেষ দুঃজন জীবন্ত মানুষ, বাকী সব মোমের তৈরী

করাইয়া দেওয়া যায়, তবে কে মানুষ এবং কে মানুষ নয়,
তাহা আমরা কেহই বলিতে পারিব না। এইসমস্ত পুতুল-
গুলিকে কোটপ্যাট টাই ইত্যাদি পরাওয়া ছুরারের সামনে
দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চক্ৰবুজি কোন লোক যদি
যরের কাছে আসে, না বলিয়া কোন জব্য লইবার জন্ত, তাহারা ভয়
পাইয়া পলাইয়া যাইবে।

“বহুরূপী”

আমাদের দেশের অনেকেই ঝোপঝাড়ে বহুরূপী দেখিয়াছেন।
কিন্তু এই বহুরূপী কেমন করিয়া তাহার আছায়া সংগ্রহ করে তাহা
অনেকেই বোধ হয় জানেন না। বহুরূপীর ডিঙিটিই তাহার শিকার
ধরিবার একমাত্র অস্ত্র এবং সহায়। এই ডিঙিটি বেশ লম্বা এবং
ইচ্ছামত মুখ হঠতে বাহির করিয়া নানাদিকে ছোড়া যাইতে পারে।
দরকার মত ডিঙিটিকে ৬ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়াইতে পারা যায়।



বহুরূপীর পোকা শিকার করিবার পদ্ধতি—

জিহ্বার ক্রম-বিস্তারণ দেখিবার জিনিষ

গাছের এক ডালে বসিয়া আর এক ডালে কোন পোকা ধরিতে
হইলে, বহুরূপী এত তাড়াতাড়ি তাহার ডিঙি বাড়াইয়া পোকাটিকে
ধরিয়া ফেলে যে খালি চেখে তাহা দেখিবার কোন উপায়
নাই। Slow speed cameraর ছবিতে এই বহুরূপীর শিকার
ধরা ব্যাপারটি সহজেই বুঝিতে পারিবে।

ফার্ন-গাছের কেয়ারী

মোজাকো সঙ্গের কাছে এক উদ্ভানের একদল মালী কতকগুলি
ফার্নগাছকে এমনভাবে কাঁয়া ছুটিয়া এবং তারের বেড়ায়
বাঁধিয়া সাঁচাইয়াছে যে তাহাদের সমস্ত মর্শ্বর বলিয়া মনে হয়।
কতকগুলি গাছকে সেতু আকারে সাজান হইয়াছে, কতকগুলিকে
আবার সারি সারি ধামের মত করিয়া সাজান হইয়াছে। সমস্ত



ফার-ব্রিজ—দেখিলে একটা সেতু বলিয়া মনে হয়



ফার-গাছের সারি দেখিলে মন্থব-সুস্ত বলিয়া মনে হয়

গাছগুলিকে দূর হইতে দেখিলে পাথরের তৈরী বলিয়া মনে হয় ; আকারে-প্রকারেও গাছগুলি অসমান নয়। মালীদেব অসামান্য কৃতিত্বের পবিচয়।

স্পুক প্রাসাদ —

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সহরে স্পুক প্রাসাদ নামে এক প্রাসাদতুল্য চারতলা বাড়ী আছে। বাড়ীখানির মালিক একজন মহিলা - আজ হইতে ৩৯ বৎসর পূর্বে এই প্রাসাদখানি নির্মাণ আরম্ভ হয়, এবং এত



কতকগুলি ফার-গাছের দৃশ্য



কাল পরে তাহা শেষ হইয়াছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে মিস্ত্রীর এবং ছুতোরের কাজের বিবান ছিল না—প্রত্যেকদিনই কাজ চলিত।

স্পুক প্রাসাদের একটি দৃশ্য—এই প্রাসাদখানিকে দেখিলে একটা গ্রাম বলিয়া মনে হয়

পৃথিবীর মধ্যে এত প্রকাণ্ড এবং গোলমেলে সাধারণ লোকের বসতবাড়ী নাই বলিলেই হয়। বাড়ীটি নির্মাণ করিতে খরচ পড়িয়াছে মোট ২০,০০০,০০০ টাকা। বাড়ীখানিতে ১৪৪ টি কামরা আছে, ছুয়ারের সংখ্যা ২০০০, জানালা ১০,০০০, সমস্ত জানালাগুলিতে ১০০,০০০ খণ্ড সাদির প্রয়োজন হইয়াছে। বাড়ীখানি তৈরী হইয়াছে সর্বোৎকৃষ্ট মালমশলাতে। কোন বাজে বা রদী জিনিস বাড়ীখানির কোন অংশেই ব্যবহার করা হয় নাই।

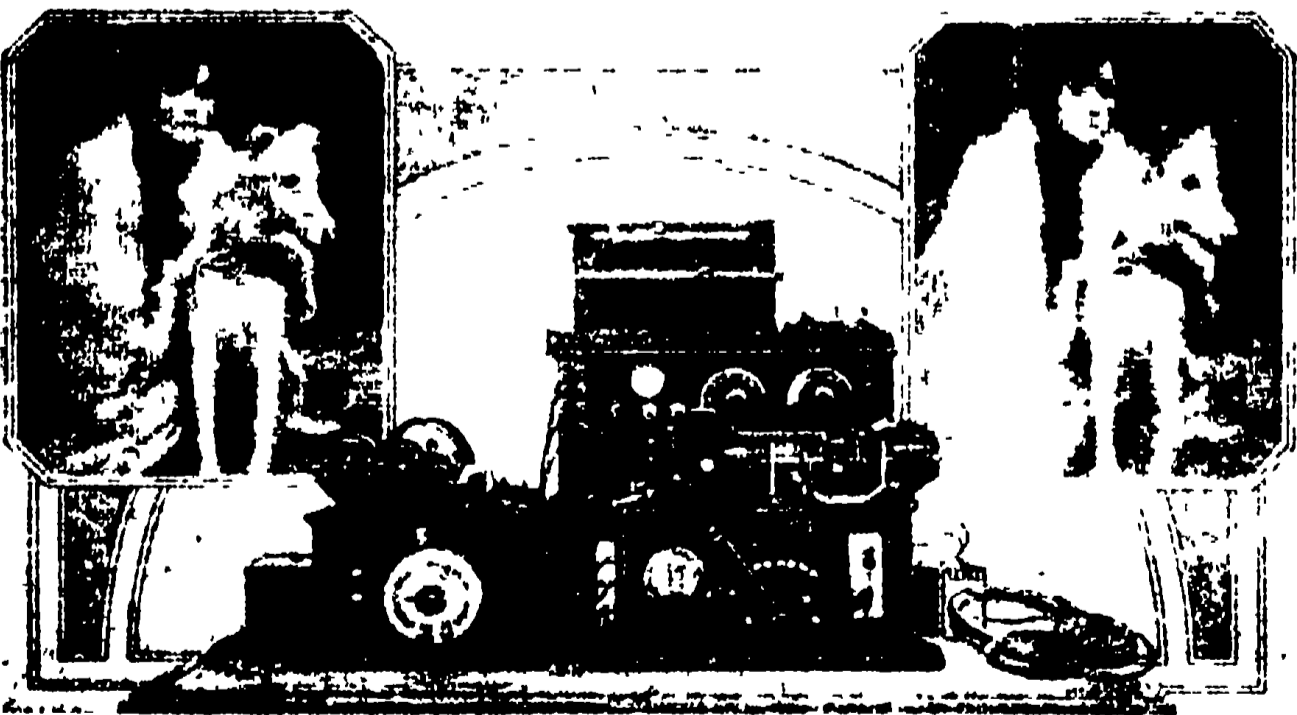


স্পুক-প্রাসাদের আব-একটি দৃশ্য

যে ভদ্রমহিলা এই প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া গিয়াছেন—(কিছুদিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে) তিনি জানিতেন যে তাঁহার জীবিত কাল মধ্যে এই কাজ সমাপ্ত হইবে না। বাড়ীটিতে লোকজন থাকিত—কিন্তু নিদ্রিষ্ট কামরা এবং উঠান ছাড়া তাহারা বাড়ীর অশ্রু কোন অংশে যাইতে পারিত না। এ-সম্বন্ধে সকল সময় কড়া পাহারা থাকিত। সমস্ত বাড়ীখানির বিভিন্ন অংশে ওঠানামা করিবার জন্য অগণ্য সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলির এক-একটি ধাপ ২। ইঞ্চি কবিয়া উচ্চ এবং ১৮ ইঞ্চি করিয়া চওড়া। সিঁড়িগুলি সোজাভাবে কোথাও নাই, এঁকিয়া বোঁকিয়া নানা-ভাবে আছে। খুব বিশেষভাবে পরিচিত না হইলে যে কোন লোক বাড়ীখানির মধ্যে পদ হারাইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে পারে।

সমস্ত প্রাসাদ বহু মূল্যবান চিত্রে এবং দ্রব্যে সাজান আছে। বাড়ীতে বিদ্যুতের তারের সংখ্যা এত বেশী এবং তাহা এত গোলমলে যে কোন তারটির যোগ কোন বাতি বা পাখার সঙ্গে, তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ স্থির করিতে পারে নাই। বাড়ীর কোন লোকে জানে না, এত বড় বাড়ী কোন প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়। বাড়ীখানি নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্য একমাত্র গৃহস্থামিনী জানিতেন। প্রাসাদের অনেক অংশ নির্মাণ শেষ না করিয়াই রাখা হইয়াছে—এবং এই অসমাপ্ত কাজগুলি ইচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হয়। বাড়ীখানিকে আগুনের হাত হইতে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। চোবডাকাতের কবল হইতে সোনারূপার জিনিষ রক্ষা করিবার জন্য অনেক গুপ্ত কক্ষ এবং সিন্দুক আছে।

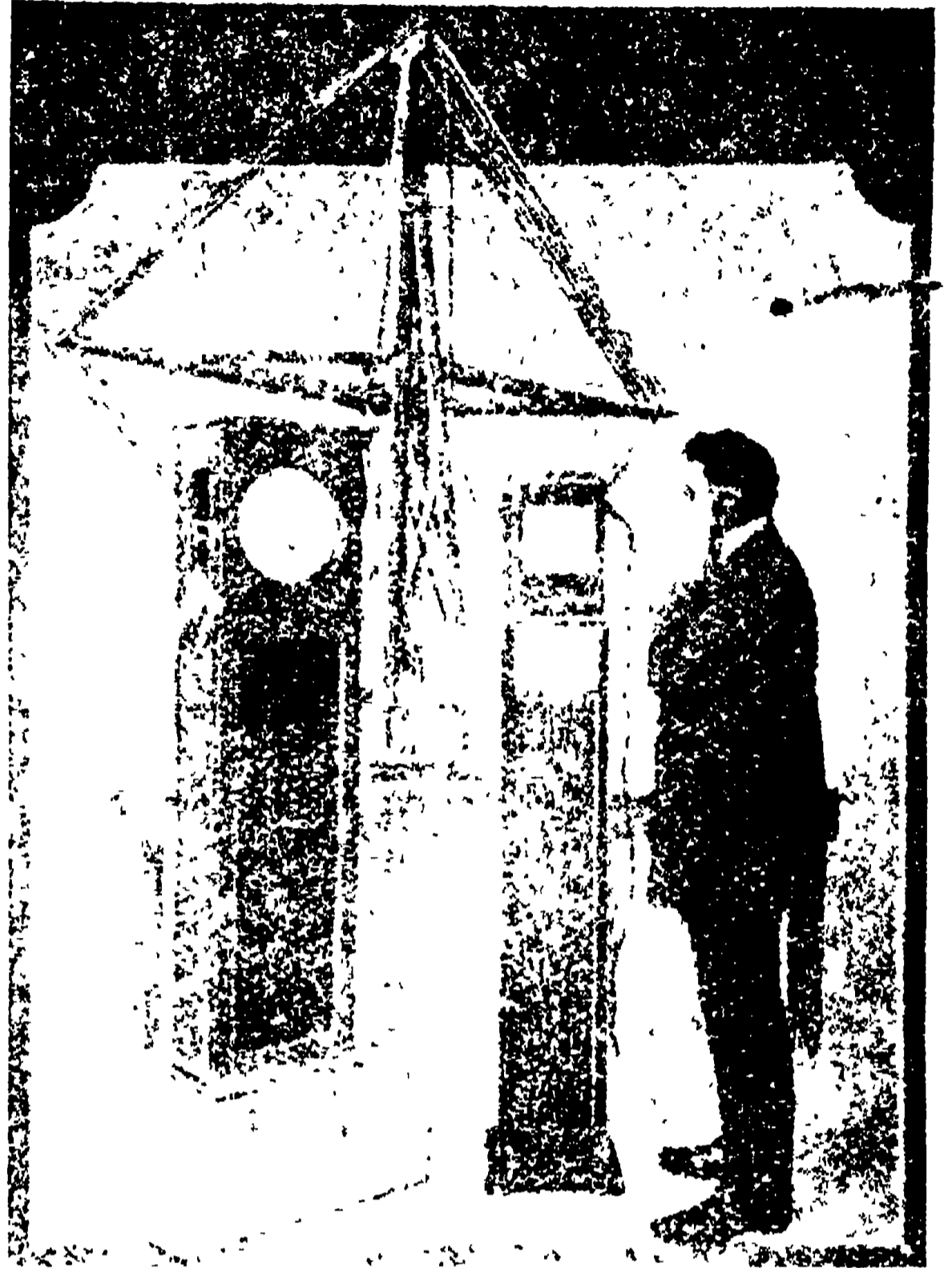
প্রাসাদের প্রধান তোরণদ্বার গৃহস্থামিনীর বাসকালে নাকি মাত্র তিনবার খোলা হয়। বাড়ীর মধ্যে সমস্ত আয়োজন ছিল, কাজেই সাধারণ কাজে কাহাকেও বাহিরে যাইতে হইত না।



র্যাডিও ফোটোর নমুনা, বাঁদিকে আসল ফোটো এবং ডানদিকে র্যাডিওর সাহায্যে যে ছবি উঠিয়াছে

র্যাডিওর কথা --

পাশ্চাত্য ভগতে র্যাডিও সাহায্যে অতিকাল অনেক কাজই হইতেছে



বেতাবের সাহায্যে ঠিক সময় ধরিয়া খড়ি ঠিক করা হইতেছে



জাৰ্মান পুন্ডিবেৰ মাখায় বেতার-সেট—এই বেতারের সাহায্যে সে সৰ্ব সময় হেড আপিসের সঙ্গে যোগ রাখে



মাকের বরফ কাটায় যে খাল কাটা হয়,

তাহা দূর হইতে কেমন দেখায় দেখুন

র্যাডিও ফোটোর চলনও আজকাল খুব বেশী হইয়াছে। র্যাডিও ফটো তুলবার জন্ত দুইটি কীল থাকে একটি কলে ফোটো পাঠান হয় এবং আর একটিতে সেই ফোটো ধরা হয়। কলগুলি বেশ মাঝারী-ধরণের এবং প্রয়োজন-মত যে কোন স্থানে বহন করা যাইতে পারে। এই কলের সাহায্যে হাজার মাইল ব্যবধানেও ফোটো তোলা যায়। ছবি দেখিলে ব্যাপারটি একটু বোঝা যায়।

জার্মানিতে বর্তমান সময়ে র্যাডিও সাহায্যে দেশের সমস্ত সরকারি অফিস রেলওয়ে স্কুল কলেজ ইত্যাদির সময় ঠিক করা হয়। এই কাজের জন্ত দুইটি সেন্ট্রাল স্টেশন আছে। একটি পার্লিনের কাছে এবং আর একটি দূর একটা পাহাড়ের চূড়ার উপর। নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে সময় চারদিকে ঠিক-সময়ের খবর ছড়ান হইবে সেই সময় সাত মিনিট জন্ত সমস্ত র্যাডিও অফিস বা খবর ছড়ান কল বন্ধ থাকিবে। র্যাডিওর কেন্দ্র খবর ধরিয়া 'ক' করিয়া সময় ঠিক করিতে হয়। সময় ধরবার এবং চারদিকে ছড়াইবার (broadcasting) কল কলম্ব'ব গঠন ইত্যাদি বিষয়ে চারদিকের শিক্ষা দিবার জন্ত বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই একটি সেন্ট্রাল স্টেশন হইতে বেলা ১টা এবং রাত একটার সময় চারদিক টাইম সিগন্যাল দেওয়া হয়।

জার্মানির কয়েক জায়গায় পলিসম্যানের পিঠি বেতার-সেট বহন-নিয়া লইয়া বেড়ায়। এই বেতার খবর ধরবার কলটি দেখিতে

জবড়জব্ব হইলেও ভাবী নয় এবং ইহা বহন করিতে কোন কোন কষ্ট বা অসুবিধা নাই। সমস্তই কনেট্রবলের পিঠে এবং বুক বেষণ শক্ত করিয়া চামড়ার পেটি দ্বারা বাঁধা থাকে। হেড অফিস বা অফিস কোন স্থান হইতে যে কোন সময় এবং যে কোন স্থান হইতে সহরের সকল খবর পুলিশম্যান এই কলের সাহায্যে পাইতে পারে।

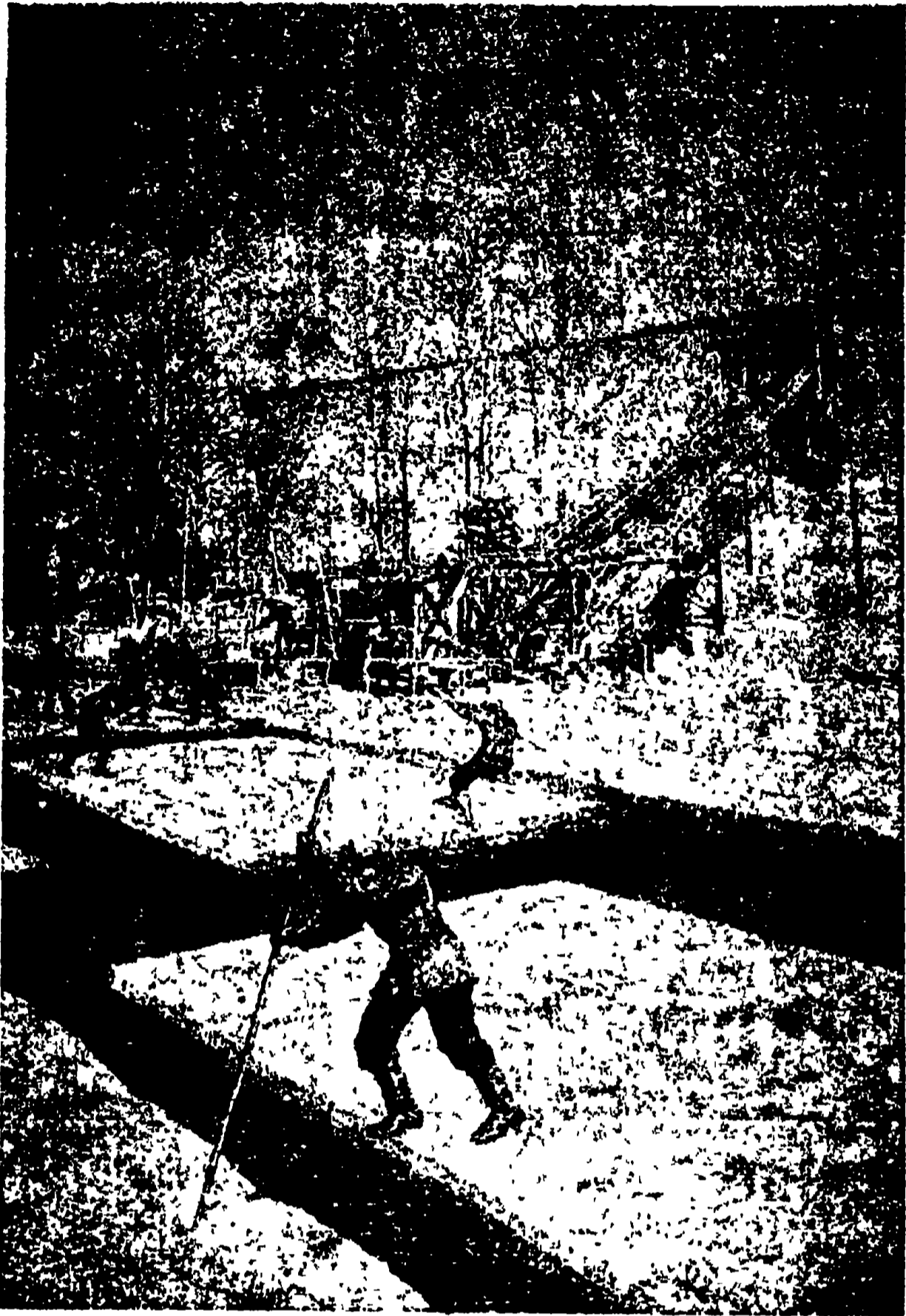
বরফের চাষ—

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২,০০০,০০০, টন বরফ জমাট পুরুর হ্রদ ইত্যাদি হইতে কলের করাতের সাহায্যে কাটিয়া ব্যবহার জন্ত চালান দেওয়া হইয়া থাকে। এই বরফ লোকেদের খাইবার জন্ত বিশেষ ব্যবহার হয় না, রেল গাড়ী, জাহাজ কলকারখানা ইত্যাদিতে নানারকম কাজেই বেশী ব্যবহার হয়। পুরুর হ্রদ ইত্যাদি হইতে বরফ কাটিয়া আনিয়া গুদাম ঘরে তাহাদের বোঝাই করা হয় এবং দরকার-মত বিশেষ বিশেষ স্থানে চালান দেওয়া হয়।



ঘোড়ার-টানা করাতের সাহায্যে হ্রদের বরফ চাকলা করিয়া কাটা হইতেছে

হ্রদ বা পুরুর জল যখন মানুষ এবং কলের ভার সহিবার মত শক্ত হয় তখন তাহার উপর হ্রদে তুষার কাটা ফেলা হয় এক একটা বড় হইয়া গোলই বরফের উপর হইতে তুষার চাটিয়া ফেলা হয়, কারণ বরফের উপর এক পর্দা তুষার পাত হইলে নীচের বরফ উপযুক্ত পরিমাণ পুর হইতে পারে না।



হুদের মাপের খাল দিয়া চাব্বা-বরফ তেলার মত ঠেলিয়া লইয়া
যাওয়া হইতেছে

পুকুর বা হুদের মাঝখানে যে বরফ জমে তাহা সবচেয়ে পুরু, পবিষ্কার এবং ভাল হয়, কারণ পুকুরের মাঝখানে আগাছা বা অন্য কোনপ্রকার আবর্জনা প্রায়ই থাকে না। অর্থাৎ হুদের মাঝে বরফ, কল বা হাতের সাহায্যে কাটিয়া, একটি সরুখাল মত করিয়া লওয়া হয়। তার পর কলের করাতের সাহায্যে বরফকে চোড়া চোড়া কালি করিয়া কাটা হয়।

বড় বড় হুদে একটা একটা কালিকে ১০০ ফুট লম্বাও করা হয় এবং মাঝখানের খালের উভয় ওপর দিয়া ঐসমস্ত বরফের কালিকে তেলার মত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তার পর কলের সাহায্যে ঐসমস্ত বরফের টুকরাকে নির্দিষ্ট মাপে টুকরা করিয়া কাটিয়া গুদাম ঘরে তোলা হয়। আরস্ত হইতে শেষ কাঁচাটি পর্যন্ত সবই কলেই হয়। অনেক সময় বরফগুলির দুইটি টুকরার মাঝখানে একটি করিয়া করকোটর পাত রাখা হয়, ইহাতে দুইখণ্ড বরফ জোড়া লাগিয়া যায় না। এইসমস্ত গুদাম ঘরে করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা হয় না, কারণ করাতের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া দেগা গিয়াছে যে তাহা আট নয় বছরের ভিতর গুদামঘরের দেওয়াল নষ্ট করিয়া দেয় এবং গুদাম ঘর অকেজো করিয়া দেয়। বরফের গাঙ্গার উপর কিছু খড় কিংবা building paper বিছাইয়া দিয়া বরফ বেশ ভাল করিয়া রক্ষা করা হয়।

এই বরফ কাটিয়া চালানু দেওয়ার ব্যবসা সব বছর সমান লাভজনক হয় না, কারণ কোন বছর কি পরিমাণে শীত পড়িবে-না-পড়িবে, তাহাও জানা থাকে না। কিন্তু হুদের খুব নিকট হইতে যদি বরফ কাটিয়া রেলগাড়ীতে বোকাই দেওয়া যায়, তবে লোকসান হইবার আশঙ্কা কম। কোন বছর শীত বেশী পড়িলে এবং বরফ যদি খুব বেশী পুরু হয় তবে দরকার মত বরফ কাটিয়া লইয়া আগামী বছরের উষ্ণ বরফ সংরক্ষণ করিয়া রাখা বাইতে পারে। বড় বড় হুদে সেখানে বরফ অতিরিক্ত পুরু হয় সেইসব ক্ষেত্রে মজুর না লাগাইয়া কলের সাহায্যে বরফ কাটা তোলা ইত্যাদি করিতে পারিলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অভিন্ন

(কবীর)

মস্জিদই যদি খোদার ডেরা, ত
অল্ল মুলুক কার ?
রাম যদি শুধু তীর্থে মূর্ত,—
কে রাখে বাহির আর ?
পূর্ব দিকটা হরির ত ?—আর,
পশ্চিম আস্থার ?
আর সব দিক—সে সব কাহার ?
এ বুঝা বড়ই ভার ।
মস্জিদই যদি খোদার ডেরা, ত
অল্ল মুলুক কার ?

হিম্মার ভিতর, গুরে, খুঁজে দেখে,
বুঝে দেখ একবার,
এখানে কবীর, এখানেই রাম,—
এই কথাটাই সার !
যত নর-নারী, হে মোর দেবতা,
তুমিই সে-সব—তোমারি রূপ তা ;
কবীর কে ?—সে যে আলা-রামের
সন্তান !...এটা স্থির,
তিনিই আমার গুরুজী এবং
তিনিই আমার পীর !

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী

কণ্ঠ পাথর



গান

মন চেয়ে রয়, মনে মনে
হেরে' মাধুরী ।
চোখ দুটো তাই কাঙাল হয়ে
মরে না যুরি ॥
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে
বাজল বাঁশুরি ;
রূপের কোলে ঐ যে দোল
অরূপ মাধুরী ॥
কুলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের' পরে ।
হাতের ধরা ধরতে গেলে
চেউ দিলে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই
করিনে চুরি ;
ধরা-দেওয়া ধন সে ত নয়—
অরূপ মাধুরী ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

পৌষ ভাঁদের ডাক দিয়েচে—
আর রে চলে' ।

ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্ধুরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে ॥
মাঠের বাঁশি শুনে' শুনে'
আকাশ খুসি হ'ল ।
ঘরেতে আজ কে রবে গো,
খোলো ছরার খোলো ।
আলোর হাসি উঠল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসী ধরে নাগো, ঐ যে উথলে ॥

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে রাখিও

বাজলা শঙ্করাচার্যের বিধান মানে না ; বাজলা মিতাকর মানে
না ; বাজলা যে জাত মানে ভারতের কোন হিন্দুসমাজ তা' মানে না ;
বাজলার ঐচ্ছিকভাৱে জন্ম, বাজলার-পরিমহৎস দেবের জন্ম ; কর্তাভজা,
ভজ, ব্রাহ্মধর্ম এইমত বাজলারই সামগ্রী । বাজলার সাহিত্য

জগৎ-বরণ্য হইয়াছে ; বাজলার সর্বতোমুখী মেধা দুদিনার ঈর্ষার
বস্ত হইয়াছে । বেদান্তের গৌরব যে আজ জগতের সমক্ষে প্রচারিত
হইয়াছে, তাহা বাজলারই কীর্তি ।

বাজলার ধর্ম বলিতে যা-কিছু তাহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি,
সে তাহা কাহারও কাছে ধার করে নাই ; যেখানে ধার করিয়াছে, সে
নিজের মতো করিয়া অদল বদল করিয়া তবে প্ররোগ করিয়াছে ।

চিরদিন বাজলী তাহার এই বিশেষত্ব রাখিয়া চলিবে, তাহাতে
কেহ সন্তুষ্টই হউক আর অসন্তুষ্টই হউক, কেননা সে ত আপনায়
হারাইতে পারে না তাহার বিশেষত্ব হারাইলে সে মরিবে ।

বাজলার হিন্দু, ভারতীয় হিন্দু হইতে ভিন্ন ; ভারতীয় হিন্দু বহুকাল
হইতে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, বাজলীও ভারতের হিন্দুকে
বুঝাছুঠ দেখাইয়াছে । বাজলী এই পার্থক্যের চিহ্নরূপ বহুদিন
হইল তাহার টিকি কাটিয়া ফেলিয়াছে । শুধু চীনে নহে ভারতবর্ষেও
টিকি দাসত্বের চিহ্ন ; চীনে হয়ত টিকি মাদ্ধারিনের দাসত্বের পরিচায়ক—
ভারতবর্ষে টিকি শঙ্করমঠের দাসত্বের পরিচায়ক—সে চিহ্ন বর্জন করিয়া
বাজলার হিন্দুচিরদিন স্বাধীন ।

এই কথা বাজলী অবাজলী সকলকেই মনে রাখিতে বলি ।
ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্দুব ধর্মনেতৃত্ব বাজলী মানিবে না, ভূঁইয়ার
ব্রাহ্মণ জমিদারের কথা দূর ।

(প্রবর্তক, পৌষ)

শ্রী চারুচন্দ্র রায়

বর্ণমালার অব্যবস্থা

বর্ণমালী ভাষাধের বিদ্যা গো অগাধ !
আবর্জনা জড়া'বার প্রধান গুস্তাদ ॥
কর্ম কার্যটিকে করি' কর্মকার্য মস্ত ।
বিদ্যা ফলাবার পথ করেন প্রশস্ত ॥
“বর্জন” বেরোলে মুখে (মারা নাই মোটে !)
বর্জন করেন তা'কে চাবুকের গোটে ॥
“কোনো জন” লিখিতে হইলে প্রয়োজন,
“কোন জন” লেখেন, বর্জেন “কোনো জন” ॥
হাত ভাঁদের ব্যুধা করে লিখতে যেন “কোনো” ।
এসেছেন গুরুদেব, কী বলেন শোনো ॥
গৃহে বান্ধি ছলি সবাই স্ব স্ব ।
গাধাকে গিটিলে হবে না অস্ব ॥
“অবশ্য হবে” বলিয়া গুরু
সেরা উপদেশ করিলা হুরু ॥

নেপথ্যে ॥

ভাষাচার্যের উপদেশ ।

লিখেছ তো চের পুঁথি—প'ড়েছ বিস্তর ।
তেলা শিরে দিচ্ তেল—এ কোন্ শাস্তর ॥
কমের ম-রে মকলা অকর্মের শেষ ।
কার্যের ব-রে বকলা অকার্য বিশেষ ॥

আর্ষের পৈতা ভো জানি—শুভ মন প্রাণ ।
 ব-কলা পৈতার তাঁর (J), কী বাড়িবে মান ।
 আর "ত" দিলে, আত এ, ছাড়িবে আর্ষরব ।
 আর "দ" চাপাইলে পিঠে স্নিবে গদ'ভ ।
 আহাির কমানো ভাল কুখা হ'লে হুই ।
 অর্কে দিয়া অর্কচন্দ্র অধে' থাকো তুই ।
 কর্কশ নিনাদে অ্যাকে কান ঝালাপালা ।
 দ্বিগুণ কর্কশ করি, বাড়ায়ো না জ্বালা ॥
 অর্চনার ষটা এ যে বডড জম্‌কালো ।
 শুভমতি ভকতের অর্চনা-ই ভাল ॥
 অর্জনের পেট ফুলি' হইয়াছে ঢাক ।
 কাজ নাই তাহাতে, "অর্জন" বেঁচে থাক !
 গর্ব গর্ভ চলন সবা'রই কিছু কিছু ।
 এ গর্বগর্ভে মাথা হ'ল বোলে নীচু !
 তিন শ'র তিন তরো উচ্চারণ খাটি ।
 আনাড়ি'র হাতে পড়ি' সব হৈল মাটি ।
 মুখোষের জনক পষ্টই মুখকোষ ।
 বাংলা অভিধানে ঢুকি' হইয়াছে মুখোশ ॥
 খোলোষের জনক স্থলিত কোষ পষ্ট ।
 অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট ।
 লেশা আছে খোলশ, ওকারও নাই ল-য়ে ।
 দেখিয়া ভাষাবিদে'র সর্কাজ জ্বলে ॥
 আশ্রম-বেচারী পড়ি' এ'দের কবজে,
 আশ্রম (Ashram) বনিয়া যায় ইংবাজি কাগজে ॥
 ভাষাবিদ বৃধ-মাঝে যাঁহার উত্তম
 ইংবাজি সি-যোগে তাঁরা লেখেন আশ্রম (Acram)
 আশ্রমের শ-এর যে করে শব্দ লোপ,
 কেমনে এড়া'বে সে গো শব্দরের কোপ ॥
 অ্যাতো শাস্ত্র জানেন জানেন না এটা কী ?
 আশ্রমের শ-দেবতা স্বয়ং পিনাকী !
 ভাষাতত্ত্বে স্থপণ্ডিত যে-সব বাঙ্গালী
 জানেন সকলই তাঁরা ! জানেন না খালি—
 কা'কে বলে তালব্য মূর্ক্ষন্য কা'কে বলে ।
 খো'ব'কে খোশা'ন তাই ব'কে দিয়া জলে ॥
 য ভাসে চক্ষের জলে—এই হয় লভ্য ।
 "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলে শ তালব্য ॥
 জ্যেষ্ঠ শ মেঝোর মতো মূরখ্য না ত ।
 ছ যেমন শ তেমনি, দুই-ই তালু-জাত ॥
 মূর্ক্ষন্য য কোলে করি' স্থখে থাক' যষ্ট
 শ্রীনাথের শ'র গায়ে ছ'র ছায়া পষ্ট ॥
 শ্রীনাথকে বোল্যে ছিরু শুনায় না মন্দ ।
 শিরু (Shiru) বলে মুখে যার বাকুণীর গন্ধ ॥
 শ-য়েদ্যের উচ্চারণ কিরূপ কাহার—
 শুনিবারে চাও যদি বলি শুন সার :—
 দস্ত আর মূর্ক এই দুদিক্‌ সামলি,
 উচ্চারিবে তালব্য শ মধ্যপথে চলি' ॥
 "শুশিষ্য", বোল'ব শুন'বে, বলি আসি কারে ?
 "শুশিষ্য" যে বিধিমতো উচ্চারিতে পারে ॥
 আমার যা বলিবার বলিলাম তাহা ।
 তোমরা না যদি বোঝো নাহি তবে রাহা !

বলিল মহাদিগ্‌গজ "সমস্তই বুঝি ।"
 উঠি দাঁড়াইয়া তবে বলিলা গুরুজি :—
 না বুঝে "বুঝেছি" বলা মন্ত বীর রোগ,
 যাচিয়া বুঝানো তাকে মিছে কর্ণভোগ
 না যদি বোঝেন তিনি ক-খ শিখুন কাঁচি ।
 না যদি উণ্টা বোঝেন, তা হ'লেই বাঁচি ॥
 শুভ হোক । ফুরাইল বক্তব্য আমার ।
 আবার আসিব যবে ইচ্ছা হবে মা'র ॥

হিত বাক্যের তিতো ফল

বর্ণমালি-ভিন্নমূলের বর্ণমালা-চাকে,
 যা দিয়া একেলাচার্য্য বিধির বিপাকে,
 ভুলিলা দ্বাদশ মাস যে যোর যাতনা—
 আর কেহ হ'লে তাঁকে বাঁচিতে হ'ত না ॥
 একদা শিষ্যেরা আসি কৈলা নিবেদন :—
 "বলিছে সভা'র মাঝে বর্ণমালি গণ
 'অর্থ নাই ছাই ও কেবলি শব্দ-জাল ।
 পোছে না কেউ ঠ'কে তাই ঝাড়িলেন ঝা'ল' ॥"
 এত শুনি' গুরুদেব বলিলা "বলুক তা !
 ছড়ায়ো করোছি দোষ ব্যানাধনে মুক্তা ॥"

(শাস্তিনিকেতন পাত্রিকা, পৌষ) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগ

আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্মসাধনার একটি বিশেষ প্রণালী ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটি বিশেষ দিক্‌ আমাদের পিতামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব সে একটি বিশেষ সম্পদ, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের পক্ষেই।

বিজ্ঞানে সত্যসাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন করে' মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধি লাভ করচে, সন্দেহ নেই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পশ্চিমদেশবাসীরা নিজের অধ্য-বসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করছেন তাঁরা কেবল নিজেদের নয় সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ শক্তি দান করছেন।

ভারতের যে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্টি হ'য়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব ভারতবাসীর আছে। যে-সাধনার দ্বারা ভারতের চিন্ত-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহবশত লুপ্ত হ'তে দিই, তা হ'লে আমরা নিজে বঞ্চিত হ'ব, অন্তকে বঞ্চিত কর'ব।

সাধারণত পশ্চিমের মানুষ বলে' থাকে—চলাটাই লক্ষ্য, পাওরাটা লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিষ কিছু আছে কিনা সে-সবকে সেখানে সন্দেহ হয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে যেওয়া, চলতে চলতে টুকুরো টুকুরো জিনিষ জমিয়ে তোলা, এইটে হচ্ছে সেখানকার কথা। সেখানকার প্রধান বন্দোবস্ত রাস্তার বাতি জালিয়ে চলা, ঘরের অদীপ জ্বালান নয়।

ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে' এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম

কণ্ঠ পাথর



গান

মন চেয়ে রয়, মনে মনে
হেরে' মাধুরী ।
চোখ দুটো তাই কাঁড়াল হয়ে
মরে না ঘুরি ॥
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে
বাজল বাঁশুরি ;
রাপের কোলে ঐ যে দোলে
অরূপ মাধুরী ॥
কুলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের' পরে ।
হাতের ধরা ধরতে গেলে
চেউ দিলে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই
করিনে চুরি ;
ধরা-দেওয়া ধন সে ত নয়—
অরূপ মাধুরী ॥

* শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

পৌষ ভোদের ডাক দিয়েচে—
আয় রে চলে' ।

ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্ধধুরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে ॥
মাঠের বাঁশি শুনে' শুনে'
আকাশ খুসি হ'ল ।
ঘরেতে আজ কে হবে গো,
খোলো ছয়র খোলো ।
আলোর হাসি উঠল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসী ধরে নাগো, ঐ যে উথলে ॥

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে রাখিও

বাজলা শঙ্করাচার্যের বিধান মানে না ; বাজলা মিতাকর মানে
না ; বাজলা যে জাত মানে ভারতের কোন হিন্দুসমাজ তা' মানে না ;
বাজলার ঐচৈতন্যের জন্ম, বাজলার পূর্বমহৎস দেবের জন্ম ; কর্তৃত্বজ্ঞা,
তত্ত্ব, ব্রাহ্মধর্ম এইসব বাজলারই সামগ্ৰী । বাজলার সাহিত্য

জগৎ-বরণ্য হইয়াছে ; বাজলার সর্বতোমুখী মেধা ছন্দিরার ঈর্ষার
বস্ত্র হইয়াছে । বেদান্তের গৌরব যে আজ জগতের সমক্ষে প্রচারিত
হইয়াছে, তাহা বাজলারই কীর্তি ।

বাজলার ধর্ম বলিতে যা-কিছু তাহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি,
সে তাহা কাহারও কাছে ধার করে নাই ; যেখানে ধার করিয়াছে, সে
নিজের মতো করিয়া অদল বদল করিয়া তবে প্রয়োগ করিয়াছে ।

চিরদিন বাজলারই তাহার এই বিশেষত্ব রাখিয়া চলিবে, তাহাতে
কেহ সন্তুষ্টই হউক আর অসন্তুষ্টই হউক, কেমনা সে তা আপনার
হারাইতে পারে না তাহার বিশেষত্ব হারাইলে সে মরিবে ।

বাজলার হিন্দু, ভারতীয় হিন্দু হইতে ভিন্ন ; ভারতীয় হিন্দু বহুকাল
হইতে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, বাজলারও ভারতের হিন্দুকে
বৃদ্ধাজুঠ দেখাইয়াছে । বাজলার এই পার্থক্যের চিহ্নরূপ বহুদিন
হইল তাহার টিকি কাটিয়া ফেলিয়াছে । শুধু চীনে লুই ভারতবর্ষেও
টিকি দাসত্বের চিহ্ন ; চীনে হরত টিকি মান্দারিনের দাসত্বের পরিচায়ক --
ভারতবর্ষে টিকি শঙ্করমঠের দাসত্বের পরিচায়ক—সে চিহ্ন বর্জন করিয়া
বাজলার হিন্দুচিরদিন স্বাধীন ।

এই কথা বাজলারই অবজালার সকলকেই মনে রাখিতে বলি ।
ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্দুব ধর্মানেতৃত্ব বাজলার মানিবে না, ভূঁইয়ার
ব্রাহ্মণ জমিদারের কথা দূরে ।

(প্রবর্তক, পৌষ)

শ্রী চাকচক্র রায়

বর্ণমালার অব্যবস্থা

বর্ণমালার ভাষার বিদ্যা গো অগাধ !
আবর্জনা জড়া'বার প্রধান গুস্তাদ ॥
কম কার্যটিকে করি' কর্মকার্য মস্ত ।
বিদ্যা ফলাবার পথ করেন প্রশস্ত ॥
“বর্ধন” বেরোলে মুখে (মায়ী নাই সোটে !)
বর্ধন করেন তা'কে চাবুকের গোটে ॥
“কোনো জন” লিখিতে হইলে প্রয়োজন,
“কোন জন” লেখেন, বর্জন “কোনো জন” ॥
হাত ভাদের বাধা করে লিখতে যেন “কোনো” ।
এসেছেন গুরুদেব, কী বলেন শোনো ॥
গৃহে যানি ছলি সবাই ব ব ।
গাধাকে পিটিলে হবে না অ ব ॥
“অবস্ত হবে” বলিয়া গুরু
সেরা উপদেশ করিলা গুরু ॥

নেপথ্যে ॥

ভাবাচার্যের উপদেশ ।

লিখেছ ভো চেয় পুঁথি—পা'ড়েছ বিস্তর ।
তেলা শিরে দিচ্ছ তেল—এ কোন্ শাস্তর ॥
কমের ম-রে মকলা অকর্ণের শেব ।
কার্যের ব-রে বকলা অকার্য বিশেষ ॥

আর্ষের পৈতা তো জানি—শুদ্ধ মন প্রাণ ।
 ব-কলা পৈতার তাঁর (১), কী বাড়িবে মান ।
 আর "ত" দিলে, আত এ, ছাড়িবে আর্ষরব ।
 আর "দ" চাপাইলে পিঠে স্নিবে গদ'ত ।
 আহা! কমানো ভাল মুখা হ'লে ছুটে ।
 অর্ধে দিয়া অর্ধচন্দ্র অর্ধে থাকো তুটে ।
 করুণ নিনায়ে অ্যাকে কান ঝালাপালা ।
 ষিগুণ করুণ করি, বাড়ায়ো না আলা ।
 অর্চনার ষটা এ যে বডড জমুকালো ।
 শুদ্ধমতি ভকতের অর্চনা-ই ভাল ॥
 অর্জনের পেট ফুলি' হইয়াছে ঢাক ।
 কাজ নাই তাহাতে, "অর্জন" বেঁচে থাক ।
 গর্ব গর্ত চলন সব'রই কিছু কিছু ।
 এ গর্বগর্তের মাথা হ'ল বোলো নীচু !
 তিন শ'র তিন তরো উচ্চারণ খাঁটি ।
 আনাড়ি'র হাতে পড়ি' সব হৈল মাটি ।
 মুখোষের জনক পষ্টই মুখকোষ ।
 বাংলা অভিধানে ঢুকি' হইয়াছে মুখোশ ॥
 খোলোষের জনক মলিত কোষ পষ্ট ।
 অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট ।
 লেখা আছে খোলশ, ওকারও নাই ল-য়ে ।
 দেখিয়া ভাবাবিদের সর্বীজ অলয়ে ॥
 আশ্রম-বেচারী পড়ি' এ'দের কবণে,
 আশ্রম (Ashram) বনিয়া ধার ইংরাজি কাগজে ॥
 ভাবাবিদ্য বৃধ-মাঝে যাঁহার উত্তম
 ইংরাজি সি-যোগে তাঁরা লেখেন আশ্রম (Agram)
 আশ্রমের শ-এর যৈ করে শঙ্ক লোপ,
 কেমনে এড়া'বে সে গো শঙ্করের কোপ ॥
 অ্যাতো শাস্ত্র জানেন জানেন না এটা কী ?
 আশ্রমের শ-দেবতা স্বয়ং পিনাকী !
 ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত যে-সব বাঙ্গালী
 জানেন সকলই তাঁরা ! জানেন না খালি—
 কা'কে বলে তালব্য মূর্খন্য কা'কে বলে ।
 খো'স'কে খো'শা'ন' তাই ব'কে দিয়া জলে ॥
 য ভাসে চক্ষুর জলে—এই হয় লভ্য ।
 "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলে শ তালব্য ॥
 জ্যেষ্ঠ শ মেঝোর মতো মূর্খন্য না ত ।
 ছ যেমন শ তেমনি, দুই-ই তালু-জাত ॥
 মূর্খন্য ব কোলে করি' স্থখে থাক' ষষ্ঠ
 শ্রীনাথের শ'র গায়ে ছ'র ছায়া পষ্ট ॥
 শ্রীনাথকে বোল্যে ছির শুনায় না মন্দ ।
 ষিরু (Shiru) বলে মুখে যার বাকুণীর গন্ধ ॥
 শ-য়েদ্যের উচ্চারণ কিরূপ কাহার—
 শুনিলারে চাও যদি বলি শুন সার :—
 স্বস্ত আর মূর্খ এই দুটুকু সামলি,
 উচ্চারিবে তালব্য শ মধ্যপথে চলি' ॥
 "স্বশিষ্য", বোল'ব শুন'বে, বলি আসি কারে ?
 "স্বশিষ্য" যে বিধিমতো উচ্চারিতে পারে ॥
 আমার যা বলিবার বলিলাম তাহা ।
 তোমরা না যদি বোঝো নাহি তবে রাহা !

বলিল মহাদিগুঞ্জ "সমস্তই বুঝি ।"
 উঠি দাঁড়াইয়া তবে বলিলা গুরুমুনি :—
 না বুঝে "বুঝেছি" বলা মস্ত ষাঁর রোগ,
 যাচিয়া বুঝানো তাকে মিছে কর্ত্তব্যগ
 না যদি বোঝেন তিনি ক-খ শিখুন কাঁচি ।
 না যদি উঠা বোঝেন, তা হ'লেই বাঁচি ॥
 শুভ হোক । ফুরাইল বক্তব্য আমার ।
 আবার আসিব যবে ইচ্ছা হবে মা'র ॥

হিত বাক্যের তিতো ফল

বর্ণমালি-ভিন্নকালের বর্ণমালা-চাকে,
 যা দিয়া একেলাচার্য্য বিধির বিপাকে,
 ভুলিয়া ষাটশ মাস যে যোর যাতনা—
 আর কেহ হ'লে তাঁকে বাঁচিতে হ'ত না ॥
 একদা শিষ্যেরা আসি কৈলা নিবেদন :—
 "বলিছে সস্তা'র মাঝে বর্ণমালি গণ
 'অর্ধ' নাই ছাই ও কেবলি শব্দ-জাল !
 পোছে না কেউ ঠ'কে তাই ঝাড়িলেন ঝা'ল' ॥"
 এত শুনি' গুরুদেব বলিলা "বলুক তা ।
 ছড়ায়ো করোছি দোষ ব্যানাবনে মুক্তা ॥"

(শাস্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগ

আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্মসাধনার একটি বিশেষ প্রণালী ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটি বিশেষ দিক আমাদের পিতামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব সে একটি বিশেষ সম্পদ, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের পক্ষেই।

বিজ্ঞানে সত্যসাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন করে' মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধি লাভ করচে, সন্দেহ নেই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পশ্চিমদেশবাসীরা নিজের অধ্য-বসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধ্যমুক্ত করচেন তাঁরা কেবল নিজদের নয় সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ শক্তি দান করচেন।

ভারতের যে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্টি হ'য়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব ভারতবাসীর আছে। যে-সাধনার দ্বারা ভারতের চিন্তা-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহবশত লুপ্ত হ'তে দিই, তা হ'লে আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্তকে বঞ্চিত করুব।

সাধারণত পশ্চিমের মানুষ বলে থাকে—চলাটাই লক্ষ্য, পাওরাটা লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিষ কিছু আছে কিনা সে-সবকে সেখানে সন্দেহ হয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে মেওয়া, চলতে চলতে টুকুরো টুকুরো জিনিষ জমিয়ে তোলা, এইটে হচ্ছে সেখানকার কথা। সেখানকার প্রধান বন্দোবস্ত রাত্তার বাতি জ্বালিয়ে চলা, বরের শ্রদীপ আলান নয়।

ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওরাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে' এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম

সত্যে পৌছবার যে প্রণালীটি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল সেই কি? এক কথায় তাকে নাম দেওয়া হয়েছে যোগ।

ধর্মসম্বন্ধে ভারতচিন্তে বিশেষ অভিমুখিতা যে কি তা এই যোগ শব্দের দ্বারাই জানা যায়; সেই কথাটাকে একটু স্পষ্ট করে 'বুকে' নেওয়া চাই।

যে-সত্যকে মানুষ সাধারণত ঈশ্বর নাম দিয়ে থাকে সেই সত্যের সঙ্গে সখস্বাগনের বিধিকেই আমরা ধর্ম বলি।

কোনো কোনো ধর্মে বলে এই সখস্বাগনের বিধিকেই অনুসারে আমরা বিশেষ পুণ্ডর পেরে থাকি। সেই পুণ্ডরকে কখনো পুণ্য বলি, বর্ষ বলি, কখনো পরিত্রাণ বলি। বাই বলি না কেন, এর একটা বাস্তব মূল্য আছে।

ঈশ্বর বিধাতা, তাঁর বিধান পালন করার দ্বারা আমরা তাঁর প্রসন্নতা পাই, সেই প্রসন্নতার আমাদের কল্যাণ। অতএব বিধাতার বিধানপালনে যে ধর্ম সেই ধর্মকে আশ্রয় করবার একটা হিসাব পাওয়া গেল।

এই পন্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের পন্থার এক জায়গার মিল আছে। বিজ্ঞানের নির্দেশ এই যে, বিশ্বের অমোঘ নিয়মগুলিকে যদি আমরা জানি এবং তাদের যদি মানি তা হলে আমরা শক্তিশালী করি, ঐশ্বর্য লাভ করি। নিয়মের জগতে নিয়ন্তার সঙ্গে আমাদের সখস্বাগন হচ্চে দণ্ড-পুণ্ডরকরের ভয়ে ও লোভে দেওরা ও পাওয়ার সখস্বাগন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দেওরা-পাওয়া হচ্চে বস্তুনিতিগত, আর ধর্ম-ক্ষেত্রে সেটা কর্তব্যনীতিগত। ধর্মবিহিত এই কর্তব্যনীতি কোথাও বা শাস্ত সত্যের অনুরূপ কোথাও বা কৃত্রিম আচারগত। যেখানে তা শাস্ত সত্যের বিরোধী নয় সেখানে মানুষ তা পালন করে কল্যাণ লাভ করে; যেখানে তা কৃত্রিম আচারমাত্র সেখানে তাকে আশ্রয় করে মানুষ দুর্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে; আমাদের দেশে পদে পদে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তার প্রমাণ পেয়ে আসছে। এই আচারকে ধর্ম বলা, আর জাদুবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা একই কথা।

কিন্তু ভারতবর্ষ যাকে পরম সত্য বলতে, যাতে উত্তীর্ণ হবার প্রণালী হচ্চে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সখস্বাগন নেই হওয়ার সখস্বাগন। বস্তুত সত্য হওয়া ছাড়া সত্যকে পূর্ণভাবে পাওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

বিধাতাকে প্রসন্ন করার সাধনার একটি কর্তব্যনীতির পদ্ধতি আছে। কিন্তু যোগের মধ্যে সেই কর্তব্যনীতির কাজ কোথায়?

কাজ আছে; যোগ মানে বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেওয়া। কোন্ ব্যাবধান বিচ্ছেদ আনে? রিপূর ব্যাবধান। কাম ক্রোধ মোহ-মোহকে ঘুচিয়ে ফেলতে পারলে তবেই সত্যের পূর্ণতাকে নিজের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। পাপ যে পপ তাহার প্রধান কারণ হচ্চে মানুষের সত্য হওয়ার পক্ষে পাপের প্রধান বাধা। পাপ হচ্চে সেই স্বরোধ বাঃ দ্বারা আমার আমি শ্রোত্র আঁকা পড়ে' বিশ্বের পথে ঘনীর অভিমুখে যেতে পারে না, মানুষ যোগ থেকে স্রষ্ট হয়। যেহেতু পরম সত্যের মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ সত্য হ'তে হবে এই-জন্ত মানুষের পাপমুক্ত হওয়া চাই।

মানুষের দুটা দিক। একদিকে সে স্বভাব, আর একদিকে সে বিশ্বভাব। আহাৎ-বাহাহারে-নকরে কর্তব্যের এই স্বভাব আমাকে ঝিয়ে চলতে হবে। একে বাঁচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে মানা চাই। নহলে চারিদিকের টানে ধূলসান হ'তে হবে। এই নিয়মকে আপনার আশ্রয় করে স্বভাবকে বালিষ্ট করে তোলা যুরোপের স্বভাবগত। এতে বিশ্বনিয়মের সঙ্গে ক্রমাগত তাকে বোঝাপড়া করতে হয়।

ভারতবর্ষ সত্যের সেই দিকে কোঁক দিয়েচে যে-দিকে মানুষ বিরাট। এই যে বিশ্বের মধ্যে আমি বিরাট করছি এঁকে যে পরিমাণে আপনি না করব সেই পরিমাণেই আমি অগত্য থাকব। সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করে তবে আমার পূর্ণতা হবে।

সেই প্রবেশের মানে এই নয় যে, আরতনের দ্বারা বিশ্বকে অধিকার করা। সেই আরতনের দিকে সীমার কোথাও শেব নেই। বস্তুত অফুরান সীমা অসীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ।

একখানা গ্রন্থকে তার বস্তুপরিমাণ আর শব্দ-পরিমাণের দ্বারা পরিমাপ করতে গেলে সেই বোঝা দুঃসাধ্য বৃহৎ হ'য়ে পড়ে। তার মূল-ত্বটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়া যায়।

যা-কিছু সমস্তের মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস ও প্রণালী হচ্চে যোগ। কিন্তু পূর্বেই আশাস দিয়েছি সমস্ত মানে সমস্ত নয়। তাকে ওতপ্রোত করে এবং অতিক্রম করে যে সত্য বিরাট করে সেই ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশই যোগের লক্ষ্য।

প্রণবো ধনুঃ শরোহাস্তা ব্রহ্ম তলক্ষ্যমুচ্যতে।

এই যে যোগ এ মনের কর্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের ভেদ ঘটিয়ে সংসার-বাত্মের কাজ চালায়। যোগসাধনার প্রধান অঙ্গই হচ্চে মনকে ভোলা। আরই সঙ্গে যোগে মনের স্বাধীন ঘুচে' যায় তারই সখস্বাগন আশ্রয় গভীর আনন্দ ঘটে। কারণ আত্মা বাধামুক্তরূপে সেখানে আপনাকে প্রসারিত করে।

নিজেরই সামান্য অভিজ্ঞতা দ্বারা এটা দেখা গেছে যে, সম্পূর্ণভাবে কোন একটি গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে এক-এক সময়ে গাছের সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তার ভেদ ঘেন লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেই অবস্থা অচেতনের অবস্থা নয়, কিন্তু নিবিড় চৈতন্তের আনন্দময় অবস্থা। গাছের তথ্যটিত বিচার তখন প্রবল থাকে না। তখন আমার মধ্যে যে একটি "আত্মি" আছে, সেই "আত্মি" গাছের মধ্যে সমতান হয়ে বাজে। তার আনন্দ হচ্চে সত্যকে আপনি করার আনন্দ।

আশ্রয় এই যোগের পথে মনকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। কোনো কিছু অর্জনে মন কঠিন নয়; উপলক্ষিতে মন কঠিন। যাকে আমরা বাইরে রাখি তাই অর্জন, যা অন্তরের জিনিস তাই উপলক্ষি। এই অর্জনের রাজ্য হচ্চে অক্ষয়ানের রাজ্য। এখানে সংখ্যা এবং আয়তন এবং ওজন। এখানে সংগ্রহ এবং সঞ্চয় কেবলি পরিমাণের পথে এগোতে থাকে। কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। সেখানে শত যে সে দশনতের এবং দশনত লক্ষের দিকে অঙ্কের মত চলতে থাকে।

উপলক্ষি রাজ্য হচ্চে পরিমিতের অতীত রাজ্য। এইজন্ত সেখানে পৌঁছনর মধ্যে সমাপ্তি আছে, অখণ্ড সমাধা নেই। সেখানে আত্মা আপন পূর্ণতার স্বাদ পায়। এই পূর্ণতার অব্যবহিত অনুরূপতাই আনন্দ। তাই কথা উপনিষদের বলেচে—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

আনন্দং এক্রপো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুৎসন।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামায়ণে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান

রোগের সহিত চিকিৎসার সম্বন্ধ। রোগের প্রকার আধুনিক কালে বত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন কালে তত ছিল না। প্রাচীন সাহিত্যে অকাল মৃত্যুর কথা খুব অল্প পাওয়া যায়। রামায়ণে মাত্র একটি স্থানে অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তাহা রাজা দশরথের বাণে অক্ষয় মূনির পুত্রের ঘটনাছিল।



কবীর (প্রাচীন চিত্র)

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সৌজন্যে

M. RAY & SONS CALCUTTA.

“রাজার বোবেই অকাল মৃত্যু ঘটে” দশরথের এই কৃত ঘটনাটি হইতেই—এই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি কিনা তাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

সে-কালে বে লোক দীর্ঘজীবী হইত এবং সমাজ বে রোগ-শোক-প্রদীর্ণিত ছিল না, তাহা রামায়ণের নানা বিষয়ের বর্ণনাতেই অবগত হওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে মানুষের পরমাণুর পরিমাণ সঙ্ক্ষে অনেক আশ্চর্য্যবী কথা জনশ্রুতিতে যেমন আছে ঋতুগ্রন্থাদিতেও তেমন প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত আছে।

আমাদের পঞ্জিকাসমূহে লিখিত আছে, ত্রেতা যুগে মানব-দেহের আকার ছিল—চতুর্দশ হস্ত পরিমিত, আর সেই দেহের আয়ুর পরিমাণ ছিল—দশ সহস্র বর্ষ। রামায়ণেরও বহু স্থলেই এরূপই সহস্র সহস্র বর্ষের উল্লেখ আছে। বাইবেলের আদিপুস্তকেও এইরূপ আছে। আমাদের পুরাণসমূহেও আছে।

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় এবং রামায়ণের আদিত্যের আলোচনায় কিন্তু সাধারণ মানব বে এক দেহে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

চতুর্দশ হস্ত দীর্ঘও বে মানব-দেহ থাকিতে পারে, তাহাও শোনা যায় না। রাম খুব দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, তাহার বাহ ‘আজানুলখিত’ ছিল এবং পরিমিত হস্তে তিনি চার হাত দীর্ঘ ছিলেন। হনুমান অশোক-বনে সীতার নিকট তাহার শরীর-বিভাগের যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—“চতুল্লশচতুল্লৈর্ধ-শচতুল্লশচতুল্লৈঃ সমঃ”।—১৮।৫।৩৫।

বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে শত বৎসরই দীর্ঘ জীবনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ঋগ্বেদে হিম শরৎ বসন্ত প্রভৃতিকে বর্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবং মনুস্যের দীর্ঘ জীবনের আভাস এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

তোকম্ পুষ্যস তনয়ং শতং হিমাঃ—১।৬৪।১৪।

আমরা বেন শতবর্ষজীবী পুত্র পোষণ করি।

ধনেশতাংকরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ।

জীবমঃ শরদঃ শতম্।

“দাতা শতং জীবতু”। ইত্যাদি।

এইরূপ শতবর্ষ পরমাণু নির্দেশের আভাস আছে। রামকে দশরথ রাজ্যাভিষেক কারবেন, এই সংবাদ মনুষ্য নিতান্ত ভয়-হৃদয়ে কৈকেয়ীকে প্রদান করিলে কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন :—

সম্বর্পাসে কথং কুলে ভ্রদ্ধা রামাভিষেচনম্। ১৫

ভরতশ্চাপি রামস্ত ফ্রবম্ বর্ষং তং পরম।

পিতৃ পৈতামহং রাজ্যমবাস্তাতি নরর্ষভঃ ॥ ১৬

সি ভ্রমন্তাদয়ে প্রাপ্তে দহমানিব মনুষ্যে।

ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপাসে ॥ ১৭।২।৮

কুলে তুমি দুঃখিত কেন? ভরতও যে শত বর্ষ পরে পিতৃ-পিতামহ-গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, তাবী কল্যাণের নিদানস্বরূপ এই সুখকর ব্যাপার উপস্থিত; তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন?

অন্ততঃ, সীতা রামের সংবাদ অবগত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে বলিয়াছিলেন :—

“এতি আনন্দো নরং বর্ষশতানপি” ৷ ৬। হৃ ৩৪

মানুষ ব্যাচিয়া থাকিলে শত বর্ষের পরেও আনন্দ অনুভব করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দেখিতে পাওয়া যায়—ইতরার পুত্র মহিদাস মৃত্যুকে বিক্রয় দিয়া ১০৬ বৎসরকেই খুব দীর্ঘায়ু বলিয়া মনে করিতেছেন। ৩।১৬।৭

রামায়ণে বে দশসহস্র বর্ষকাল রাম জীবিত থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক যুগের প্রকৃষ্ট। শত বর্ষে মৃত্যু হওয়াই তখন কাল-মৃত্যু ছিল।

সাধনা দ্বারা এখনও যেমন লোক দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তখনও তাহা পারিত। সাধক জীবনের সঠিত সাধারণ জীবনের পার্থক্য সকল কালেই আছে, সকল দেশেই আছে।

শত বৎসরের পূর্বে মৃত্যুকে সেকালে অকাল মৃত্যু বলিত। যুদ্ধাদি ব্যতীত বা দৈব ঘটনা ব্যতীত তখন অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বোধ হুয়ু খুব অল্প ছিল।

সেকালে যে ব্যাধি ছিল না, তাহা নহে; সামান্য সামান্য ব্যাধিও ছিল, সামান্য সামান্য বৈদ্যাও ছিল। আর একটি এমন সাধারণ শরীর উপদর্গ যাহা শরীর ধ্বংসের ব্যত্যয় হইলেই প্রকাশ পাইতে পারে। এই শব্দটির উল্লেখ রামায়ণে আছে। যদিও যে স্থানে আছে, তাহা মানুষের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বাবস্তত হয় নাই। যথা :—

‘অরাতুরো নাগইব ব্যাথাতুর ॥’

“কামম্বর” উল্লেখও রামায়ণে আছে।

ব্যাধি ও বৈদ্যের উল্লেখ রামায়ণে এইরূপভাবে আছে। কৈকেয়ী ক্রোধাগারে আশ্রয় লইলে রাজা দশরথ তাহাকে ক্রোধের কারণ-জিজ্ঞাস্য হইয়া বলিতেছেন—

ভূমৌশেষে কিমর্থঃ স্ম মন্যকল্যাণ-চেতসা।

ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাধিনী ॥ ২২

সাস্তুনে কুশলা বৈজ্ঞান্যুভিতুষ্টিশ্চ সর্বশঃ।

স্থথিতাঃ স্মঃ করিষান্তি ব্যাধিমাচক্ষু ভামিনি ॥ ৩০।২।১০

অর্থ :—কেন তুমি ভূতাবিষ্টের স্থায় ভূমিতে পড়িয়া আছ? যদি তোমার কোন ব্যাধি হইয়া থাকে, বল, আমিই গৃহে অনেক মনুষ্য বৈদ্য আছে, তাহারা তোমাকে আরোগ্য করিবেন।

ভূতাবেশের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন, রাজা দশরথের এই উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লঙ্কানারীও সক্ষার পর একটা পিঙ্গলবর্ণ বিকটাকার পুরুষের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইত। (৩।৩৫)

রামায়ণে অস্ত-চিকিৎসা প্রচলনের যে সামান্য আভাস আছে তাহা এইরূপ : সীতা অশোক বন বন্দিনী অবস্থায় বলিতেছেন—

তাম্রগ্রনাম গচ্ছতি লোকনাথ গর্ভস্থকৃত্যস্বাধিন শল্যকৃত্যঃ।

নুনঃ মমাক্রান্ত চিবাধান যঃ নৈবঃশিতৈছেৎস্ত তি রক্ষয়েন্স্ম ॥ ৬।৫।২৮

রাবণ অনাথক য সময় দিরাছেন, যদি এই সময় মধ্যে লোকনাথ রাম আসিয়া অমকে উদ্ধার না করেন, তবে প্রসূতিকে রক্ষা করার জন্য শাণিত অস্ত্র দ্বারা যেকোন গর্ভস্থ ক্রমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করা হয়, রাবণ স জীবিতাবস্থায় আমর সেই শব্দা করিবেন।

সীতার এই উক্তি হইতে গর্ভস্থ শল্যকৃত্য অস্ত্র-সাহায্যে ঋগ্বেদে করিধা বাচিতর কন্যা যে প্রসূতিকে রক্ষা করিয়া বিবান অতি প্রাচীন সমাজে ও প্রচলিত ছিল, তাহা স্পষ্ট উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ প্রাচীন অস্ত্র চিকিৎসার উল্লেখ আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখিতে পাই। মৃত্যুত গ্রীক অঙ্গপ্রাণের পূর্বে বচিত হইয়াছিল। মৃত্যুত অপেক্ষা চরক প্রাণীনা। কিন্তু এই দুইখানা গ্রন্থের কোন খানারই আভাস রামায়ণে নাই।

যাহারা মনে করেন, মৃত্যুতের শল্যশাস্ত্রের আলোচনা গ্রীক প্রভাবের কল, তাহারা রামায়ণের এই উল্লেখটির বিষয়েও একটু লক্ষ্য করিবেন।

শরীর বিজ্ঞান সঙ্ক্ষেও যে সেকালে কোন আলোচনা হইত না তাহা মনে হয় না।

বকুৎসীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ক সবন্ধনম্ । ৪০।৫।২৪, ইত্যাদি উক্তি দ্বারা দেহাত্ম্যস্তরে কোথায় কোনটির স্থান তাহা নির্দেশ করা তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অসীমত্ব ছিল বলিয়াই মনে হয়।

কোন ব্যাধির নাম ও তাহার কোন ঔষধের উল্লেখ রামায়ণে বিশেষ নাই। ঔষধির মধ্যে মৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী অমৃত ইত্যাদি কয়েকটি ঔষধের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমৃত পানে মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিত। বিশল্যকরণী দ্বারা বোধ হয় রক্তস্রাব বন্ধ করা ও ঘা শুষ্ক করান হইত। লক্ষণের শক্তিশৈল্যবশত এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মড়কের কথা উপমাতে এক স্থানে রামায়ণের আছে। (অ ৪৮) রামায়ণে ধাতু কহিতে কোন ঔষধ ব্যবহারের উল্লেখ একেবারেই নাই।

রামায়ণে সৌপর্ণ বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই সৌপর্ণ সাধনায় চক্ষুর দিব্য জ্যোতি লাভ হইত। সম্প্রতি এই সাধনা-প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। (কি ৫২)

আত্মহত্যার চিন্তা তখনও সমাজে ছিল। শোক-দুঃখে ইহা স্বাভাবিক চিন্তা এবং অতি প্রাচীন চিন্তা।

স্বর্ণসুপের পশ্চাদ্ধাবনকারী রামের আর্তস্বর শুনিয়া সীতা লক্ষণকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন :—

গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষণ ।

অবধিব্যোহখবা তস্যে বিষমেদেহমাত্মনঃ । ৩৭

পিবাসি বা বিৎ ভীক প্রবেক্ষ্যামি হতাশনম্ । অ।—৪৫

অল অনল উদ্ভবন ও বিষ এই কয়টিই আত্মহত্যা সাধনের উপায় বলিয়া সীতার মুখে কবি দেখাইয়াছেন।

হনুমান ও সীতা অধেবনে নিরাশ হইয়া এইরূপ চিন্তাই করিয়া-ছিল। যথা—

বিষমুদকনং বাপি প্রবেশং জলনস্ত বা ।

উপবাসমখো শত্রুং প্রচরিত্যস্তি বানরাঃ । ৩৬।৫।১৩

এখানে উপবাস এবং শত্রু প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়।

জল অগ্নি ও অনশন আশ্রয়ে ধরিয়াও যে বেহ ত্যাগ করিতেন, তাহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। উহাকে শাস্ত্রে আত্মহত্যা বলা হয় নাই; ইচ্ছা-মৃত্যু বলা হইয়াছে। শরভঙ্গ ও মাতঙ্গশিষ্যগণের অগ্নিতে প্রবেশের কথা রামায়ণে আছে। তাহা এইরূপ ইচ্ছা-মৃত্যু। এইরূপ ইচ্ছা মৃত্যুর উপদেশ এক বিধবা গৃহস্থ বধুকেও পদ্মপুরাণকারী দিয়াছেন। (পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৬৫।৬৯ শ্লোক।)

রামায়ণে “আয়ুর্বেদ” শব্দের উল্লেখ আদিকাণ্ডের ৪৫ সর্গে আছে। ইহা পৌরাণিক সাগর মন্বনসম্বন্ধীয় একটি পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়। ইহার আলোচনা প্রক্ষিপ্ত-নির্দেশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

(মৌরভ, পৌষ)

শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত

যতি ও তাল

এক্ষণে আমরা যতি ও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। কবিতায় বা গানে সুরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকেই যতি বা বিরাম বলে,—জিহ্বা যেখানে স্বভাবতই একটু বিশ্রাম করে তা'কে যতি বলে। “যতি জিহ্বেষ্টবিশ্রাম-স্থানম্” (ছন্দোমঞ্জরী)। প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ধ্বনির বা সুরের বিরাম হ'লেও কালের বিরাম হয় না, কাল চলতেই থাকে। সুররাং বর্ণকে আশ্রয় করে' যে ধ্বনি প্রবাহিত হ'তে থাকে শুধু তারই যে মাত্রা বা কাল-পরিমাণ আছে তা নয়, যতির ও মাত্রা বা কাল-পরিমাণ আছে। কিন্তু কাবাছন্দে এ যতি বা বিরামকালের হিসাব রাখা নিশ্চয়োজন; কাজেই কাব্যে যতির মাত্রা-পরিমাণ গণ্য করা হয় না। কিন্তু ধারা নূতন নূতন ছন্দ রচনা করেন তাঁদের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের এসব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন; তাতে নব নব ছন্দ উদ্ভাবনার সহায়তা হয়। সাধারণভাবে ছন্দের আলোচনার ক্ষেত্রে এসব সূক্ষ্ম হিসাব বাঞ্ছিত হয় না বটে; নূতন

নূতন সৃষ্টি করতে গেলেই এসব সূক্ষ্মতত্ত্বের সংবাদ রাখা প্রয়োজন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যথা—

নামে সক্ষ্যা তল্লালসা,

সোনার আঁচলখসা

হাতে দীপশিখা,

দিনের কল্লোল পর

টানি দিল বিলীখন

খন ঘবনিকা।

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত শ্লোকটি পড়লেই বোঝা যায় যে একটি পাদেব আবৃত্তি শেষ হ'য়ে গেলে আরেকটি পাদ সুরু করা পর্যন্ত খানিকক্ষণ ধেমে থাকতে হয়, এ সময়টুকুই ধ্বনি-বিরতি বা যতির মাত্রা-পরিমাণ। কিন্তু কবিতায় এ সময়টুকুর হিসাব রাখার বিশেষ প্রয়োজন নেই, যদিও গানে তার স্বার্থকতা যথেষ্ট আছে। অবশ্য কবিতায়ও এই যতি-টুকু ধ্বনির চাইতে এতটুকু কম প্রয়োজনীয় নয়, এই যতি ও গতিকে নিয়েই সমগ্র কবিতার সার্থকতা। কারণ প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তবে কবিতায় যতি-কালটুকুর হিসাব না রাখলেও চলে, ধ্বনির গতির হিসাব

রাখলেই—বিরতি আপনি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যায়। কিন্তু গানে সুরের স্তায় সুরের বিরামের দিকেও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়, এইটুকু আমার বক্তব্য। দ্বিতীয়ত উপরের কবিতাটি থেকেই বোঝা যাবে যে কবিতায়ও যতি সর্বত্র সমান নয়, কোথাও তার স্থিতি-কাল কিছু বেশী; কোথাও কিছু কম। উপরের কবিতাটিতেই প্রত্যেক পংক্তিতে প্রথম দুটো যতিতে যতকণ খামুতে হয় তৃতীয় যতিতে তার চেয়ে বেশী খামুতে হয়। এরূপ সর্বত্রই দেখা যাবে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই। যথা—

সংসারে সবাই যবে | সারাক্ষণ শত কর্ণে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা | পলাতক বালকের মত—
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে | একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ | মন্দগতি ক্লাস্ত তপ্তবাসে
সারাদিন বাজাইলি বাশি।। —ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? | কার শব্দ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎজনে? | কোথা-হ'তে ধনিছে ক্রন্দনে
শুভ্রতল? | কোন অন্ধ কারা-মাঝে। জর্জর বন্ধনে
অনাধিনী মাগিছে সহায়? , ক্ষীণকার অপমান
অক্ষয়ের বন্ধ হ'তে | রক্ত শুধি' করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া।

—রবীন্দ্রনাথ

এ পংক্তিগুলি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এখানে কোথাও চার, কোথাও ছ', কোথাও আট এবং কোথাও দশ অক্ষরের, পরে যতি পড়েছে। এরকম যুগ্মসংখ্যক বর্ণের পরে যতি পড়াই এ ছন্দের প্রকৃতি। আরো দেখা যায় প্রত্যেক পংক্তির অন্তেই যতি বা বিরাম আছে; শুধু অক্ষরবৃত্ত কেন প্রত্যেক ছন্দেই পংক্তিশেষে যতিপড়া অনিবার্য, নতুবা ছন্দ রচনাই হয় না। পংক্তি শেষের যতি কোনো চিহ্নে চিহ্নিত করিনি, কিন্তু পংক্তি-মধ্যস্থ যতি একে একটি দণ্ড-চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রথমতই এ যতিগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, কতকগুলো ভাবগত যতি আর কতকগুলো ছন্দগত যতি। যেখানে কবিতার অর্থের মধ্যেই একটি ছন্দ রয়েছে স্বভাবতই সেখানে একটি যতি পড়েছে; আবার যেখানে অর্থের বা কবিতার ভাবের বিরতি নেই এমন অনেক স্থলেও যতি হয়েছে ছন্দের দাবীতে। প্রথম প্রকারের যতিকে ভাবগত যতি এবং দ্বিতীয় প্রকারের যতিকে ছন্দগত যতি বলেছি। (এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরো কয়েকটি কথা

বলতে হবে) দ্বিতীয়ত, আরেক দিক থেকেও যতিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেখানে ভাবগত যতির স্তাবনা আছে সেখানে ছন্দগত যতিও অবশ্যই থাকি চাই। সেজন্য যেখানে ভাবগত যতি থাকে সেখানে ধ্বনির পূর্ণ বিরতি হয়, এরকম যতিকে পূর্ণ যতি বলব। আর যেখানে শুধু ছন্দগত ধ্বনিবিরতিমাত্রই আছে ভাবের বিরতি নেই সেখানে বিরামকাল বেশি স্থায়ী নয়; এপ্রকার যতিকে অর্ধযতি বলব। তা ছাড়াও আর-এক প্রকার যতি আছে তাকে ঈষদ্-যতি নামে অভিহিত করা যায়। এ যতির কথা পরে যথাস্থলে বলব।

গানেই হোক বা কবিতায়ই হোক এই যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই তালের সৃষ্টি করে। পূর্বেই বলেছি ধ্বনির গতি এবং বিরতিই ছন্দকে সার্থক করেছে; গতি এবং যতি যত নব নব উপায়ে পরস্পরকে অভিব্যক্ত করে' তুলতে পারে ততই নূতন নূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়। গতি ও যতির বিভিন্ন সন্নিবেশের ফলেই ধ্বনির তরঙ্গলীলার উদ্ভব হয়। গানে বা কবিতায় ধ্বনির এই তরঙ্গ লীলা-টাকেই তাল বলা যায়। কাব্যে এবং সঙ্গীতে উভয়ত্রই এই তালের নানারকম হিসাব রাখতে হয়, এবং এই হিসাবের উপরেই উভয় ছন্দশাস্ত্র বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাল জিনিষটা কিন্তু আসলে সুর বা ধ্বনি মোটেই নয়; সুর বা ধ্বনির গতিভঙ্গীটাকেই তাল বলা হয়। কত বিচিত্র উপায়ে ধ্বনির উত্থান পতন বা গতি বিরতি সাধিত হয় তা নির্ণয় করে' তাকে হিসাবের মধ্যে ধরে' রাখাই তালের কাজ। ধ্বনির একবার উত্থান বা গতি থেকে পরবর্তী পতন বা বিরতি পর্যন্ত যে মাত্রা-পরিমাণ বা কাল, তাকেই গানে এক-একটি তাল বিভাগ বলা যায়; এবং গানে যা তালবিভাগ, কবিতায় তাকেই পদ বা পাদ বলেছি। বলা বাহুল্য যদিও একই প্রকার হিসাব থেকে গানের তালবিভাগ ও কবিতার পাদের উৎপত্তি হয়েছে তথাপি এ দুটো জিনিষ কখনই এক নয়। এ ছন্দের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এবং ঐ পার্থক্যের হেতু গানে ও কবিতায় মাত্রা-আদর্শের অনৈক্য। - এ

অনেকের কথা পূর্বেই বলেছি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে
কথাটা বিশদ করছি। যথা—

(আমার) নিশীথ-রাতের | বাদল ধারা।
এসহে গোপনে।

—রবীন্দ্রনাথ

এটা স্বরবৃত্ত ছন্দ। এক যতি থেকে আর-এক যতি
পর্যন্ত যে অংশ তাকে পাদ বলা হয় এবং এখানে প্রতি-
পাদে চারটি স্বর আছে। সবস্বত্ব এখানে চোদ্দটি স্বর
আছে, সুতরাং এক হিসাবে চোদ্দ মাত্রা আছে বলতে
পারি। প্রতিপাদে চার মাত্রা। কিন্তু গানের সুরের
ধারায় যখন এ কথাগুলো বয়ে' চলবে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ
বদলে যাবে; অনেক জায়গায় মাত্রা বেড়ে যাবে,
সুতরাং পাদগুলোও নূতন আকার ধারণ করবে। যথা—

আমার | নি . শীথ | রা . তের | বা . দল |
ধা . রা . | . . এস | হে . . . | . . গোপ |
নে . . . | . .

এখানে বিন্দু চিহ্নগুলো অতিরিক্ত মাত্রা জ্ঞাপক।
দেখা যাচ্ছে কবিতার একমাত্রিক বর্ণ গানে দ্বিমাত্রিক,
চতুর্মাত্রিক এবং ষণ্মাত্রিকও হয়েছে এবং পাদ সংখ্যাও
অনেক বেড়ে গেছে। কবিতায় ছিল চোদ্দ মাত্রা, গানে
হয়েছে চৌত্রিশ মাত্রা। কবিতায় ছিল চার পাদ, গানে
আট পাদেরও বেশি হয়েছে। কবিতায় ও গানে উভয়েই
প্রতিপাদে চার মাত্রা আছে বটে, কিন্তু উপরের বিভাগ-
গুলোর দিকে চোখ বুলোলেই টের পাওয়া যাবে প্রতি-
পাদে বর্ণগুলোর বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কি বিপর্যয় উপস্থিত
হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এর চাইতে
আরো অনেক বেশি বিপর্যয় উপস্থিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু
সব জায়গায়ই যে এমনটি হয়ে থাকে তা নয়। কোনো
কোনো জায়গায়—কবিতার ও গানের পাদসংখ্যা ও
মাত্রা-সংখ্যা ঠিক সমানই থেকে যায়। যথা—

কাপিছে দেহলতা ধর ধর,
চোখের জলে আঁধি ভর ভর।
ঝোঁঝল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি বর বর
তোমার আঁধি পরে ভর ভর।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিছন্দে তিনটি করে পাদ আছে; প্রথম পাদে
তিন মাত্রা এবং বাকি দুই পাদে চার মাত্রা করে' আছে।

গানেও তাই, এখানে গানেও কবিতার তফাৎ নেই।
যা হোক, আমাদের কথা হচ্ছিল এই যে ধনির এক যতি
থেকে আর-এক যতি পর্যন্ত যে অংশ, তাকে যেমন,
কবিতায় পাদ বলা হয় এবং তার গঠনের উপরেই যেমন
কবিতার গঠনটি নির্ভর করে; তেমনি সুরের এক ভঙ্গী
থেকে আর-এক ভঙ্গী পর্যন্ত অংশকে তালবিভাগ বলা
হয় এবং এ তালবিভাগের উপরেই গানের গঠনপ্রণালী
নির্ভর করে। একটি পাদ বা তালবিভাগের মধ্যে ক'টি
মাত্রা থাকে তার হিসাব থেকেই গানের বা কবিতার
তালের বহুপ্রকার ভেদ হ'য়ে থাকে। প্রথম গানের
কথাই ধরা যাক। গানে প্রথমতই তালের তিনপ্রকার
রূপ দেখা যায়। কোনো গানে চার মাত্রার পরেই
তাল দিতে হয়; এরকম তালকে চতুর্মাত্রিক বা সমপদী-
তাল বলা যায়। আবার কোনো গানে তিন মাত্রার
পরেই তাল দিতে হয়; এ তালকে ত্রিমাত্রিক তাল
বা অসমপদী তাল নামে অভিহিত করা যায়। আবার
কোনো কোনো গানে তালবিভাগের মাত্রা সংখ্যার
সমতা নেই; একবার তিন মাত্রার পরে আর-এক
বার দু মাত্রার পরে তাল দিতে হয়, অথবা
একবার তিন মাত্রার আবার চার মাত্রার পরে তাল
দিতে হয়। এরকম তালকে বিষমপদী তাল বলা যায়।
পূর্বের সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত-ছটোর মধ্যে প্রথমটি চতুর্মাত্রিক
বা সমপদী এবং দ্বিতীয়টি বিষমমাত্রিক বা বিষমপদী
তালের দৃষ্টান্ত। আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা

(১)

জা . গর | পে . বার . | বি . ভাব | রী . . . |
এটা চতুর্মাত্রিক তাল।

(২)

দে . শ | দে . শ | ন . নি | ত ক রি | ম . জি | ত ত ব |
ভে . . | রী . . |
এটা অসমপদী বা ত্রিমাত্রিক তাল।

(৩)

মা . ভ | মন . | দি র | পু . গা | অ গ . | গ ম | ক র
ম | হো . | জল | আ . জ | হে . |

এখানে যথাক্রমে তিন, দুই এবং দুই-এর পরে তাল
হবে। সুতরাং তাল বিষমপদী। গানের এ তিন-
প্রকার তালের আবার বহুপ্রকার উপবিভাগ ও বহু নাম
আছে। আমাদের ও-সমস্ত কথার আলোচনার বিশেষ

কোন প্রয়োজনই নেই। আমরা এখন কবিতার তালের সঙ্গে উক্ত তিনপ্রকার তালের কি সাদৃশ্য আছে তাই আলোচনা করব। কাব্যছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের উপর তালের এইপ্রকার ভেদের খুব বেশি প্রভাব আছে। তালের দিকেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখলে ছন্দের সম্পূর্ণ নতন আর-একরকম শ্রেণীভাগ ও নামকরণ করতে হয়। এই নতন শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ কেমন হবে তাই এখন দেখতে চেষ্টা করব। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে গানের রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্রার যে আদর্শ পূর্বেই নির্ণয় করেছি তাকেই কাব্যেও মাত্রার একমাত্র আদর্শ বলে ধরলে ছন্দের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি প্রধান ধারাই থাকে না। এবং সঙ্গীত-আদর্শের এই মাত্রার উপরে নির্ভর করেই যদি কবিতার পাদের প্রকারভেদ নির্ণয় করা যায় তবে সম্পূর্ণ নতন ধরণে ছন্দের তিনটি প্রধান শ্রেণী পাওয়া যাবে, যথা সমপদী ছন্দ, অসমপদী ছন্দ এবং বিষমপদী ছন্দ। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা বুঝতে সোজা হবে। যথা—

(১)

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি' জীর্ণজরা,
বহি' বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবন্ধনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর হৃদয়দুটি তোমার নরনে।

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এ'কে অক্ষরবৃত্ত দ্বিপদী ছন্দ বলব; কারণ সাধারণ ক্ষতিতে এখানে প্রতিপংক্তি-তেই আট অক্ষরের পরে একটি ও ছয় অক্ষরের পরে একটি যতি পড়েছে। কিন্তু পূর্বেও তালের হিসাবে এটার অন্য নাম হবে। প্রথমত সঙ্গীত আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখলে এখানে প্রতিছন্দ্রে চোদ্দ অক্ষর না বলে' চোদ্দ মাত্রা বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, খুব প্রথমে তাল-ক্ষতির উপর নির্ভর করলে এখানে প্রত্যেক চার মাত্রার পরেই একটি ছন্দ রেখা টানতে হবে এবং ফলে এটার আকৃতি-অন্তরকম হ'য়ে যাবে। এটা দাঁড়াবে এরকম—

হা রে নিরা | নন্দ দেশ, | পরি' জীর্ণ | জরা,
বহি' বিজ্ঞ | তার বোঝা, | ভাবিতেছ | মনে
ঈশ্বরের | প্রবন্ধনা | পড়িয়াছে | ধরা
সুচতুর | হৃদয় দুটি | তোমার ন- | মনে।

২২—৮

সুতরাং এ ছন্দটা হ'ল সমমাত্রিক অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ। এ ছন্দের এরকম বিশ্লেষণের মধ্যে একটা খুব সার্থকতা আছে; কারণ এর দ্বারা এই ছন্দের (যাকে সাধারণত পয়ার বলেই অভিহিত করা হয়) উৎপত্তির ইতিহাসের দিকে একটা গভীর ইঙ্গিত ফুটে' ওঠে। পূর্বেই আমি বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকেই অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হয়েছে এবং চোদ্দ অক্ষরের পয়ার চোদ্দ স্বরের স্বরবৃত্তের বিকার মাত্র। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চার স্বরের পরেই একটি করে যতি থাকে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ও গানের সুরের প্রভাবে ওই যতির সংখ্যা কমে' গিয়ে অর্থাৎ স্বর-বৃত্তের পাদগুলো আরো ঠেসে গিয়ে এই পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণেই ওই চতুঃস্বরপাদ ও পরবর্তী গানের প্রভাবের ইঙ্গিতটা টের পাওয়া যায়। পয়ার শব্দটি পদচার শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, রবিবাবুর একপাটি মত্যা হ'লে পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার যুক্তি-গুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করে। যা হোক, অক্ষরবৃত্তের প্রায় সর্বত্রই গোড়ায় এই চতুর্মাত্রিক তালের সন্ধান পাওয়া যাবে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

(২)

আজিকে চ | রেছে শান্তি—
লীবনেব | তুল আশি
সব গেছে! চুকে।
রাত্রিদিন | দুক্ দুক্
তরঙ্গিত | হৃদয়
খামিয়াছে | বুকে।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানেও ওই চতুর্মাত্রিক তাল অনায়াসেই ধরা পড়ে। এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে এই চতুর্মাত্রিক তালের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

(৩)

লুকিয়ে ছিল | যে মর্দাদা | নারীর হৃদয়- | ভলে,
উঠল জাপি দিগ্বিরী বীরের অটট বলে।
বুজুকরে অশ্রমাণ দিব্য হাসি হেসে,
কয়ল বরণ অগ্নিদেবে নব বধুর বেশে।

—করণানিধান

এছন্দের কবিতায় চতুর্মাত্রিক তালের স্বচ্ছন্দগান্ধি। পূর্বে পুয়ারের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যায় সেটা কতখানি আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। অবশ্য অক্ষরবৃত্তের যে অভিজ্ঞতা আছে সে সম্বন্ধে আগেই

অনেক কথা বলেছি। এখন মাত্রাবৃত্তের একটা চতুর্মা-
ত্রিক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

- (৪) এস তু-।।কর দেশে। এস কল। হাশ্বে,
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাশ্বে,
ধূসরের উবরের কর তুমি অস্ত
খামলিয়া ও-পরশে করগো শ্রীমন্ত,
ভরা ঘট নিয়ে এস ভরসার ভর্ণা;
বর্ণা।

—সত্যেন্দ্রনাথ

চতুর্মাত্রিক তালের যে ক'টা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তার থেকে এ কথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে-গানের রীতিতে কাব্য-ছন্দের এরকম শ্রেণী বিভাগ করলেও আমাদের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ অব্যাহতই থেকে যায়। কারণ সমপদী, অসমপদী বা বিষমপদী, যেরকম তালই হোক না কেন প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটে প্রকারভেদ হবেই। পূর্বোক্ত প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্তগুলো পরীক্ষা করলেই এর যথার্থ্য উপলব্ধি হবে। সুতরাং কাব্যছন্দের শ্রেণীভাগ করার সময় কাব্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও তালের প্রকারভেদ এ-ছোটো বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখা দরকার। আমরা শ্রেণী ভাগ করার সময় তাই করেছি, কিন্তু কাব্যের ভাষা বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য দিয়েছি। কারণ গানে শুধু তালের উপর লক্ষ্য রেখেই শ্রেণীবিভাগ করা হয়, ভাষার রচনা-প্রণালীর দিকে দৃষ্টি থাকে না বললেই হয়। কিন্তু কাব্যে রচনা-বৈচিত্র্যই সর্বোচ্চ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ জন্যই ভাষার রচনা-বিধিকেই প্রাধান্য দিয়ে ছন্দকে প্রধানত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছি; তালকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্বপ্রথমেই ছন্দকে সম, অসম ও বিষম এই তিন ভাগে বিভক্ত করিনি, রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরেই তাল বা তালবিভাগের প্রাধান্য। গানের ক্ষেত্রে যা তালবিভাগ, কাব্য ছন্দের ক্ষেত্রে তাই পাদবিভাগ। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীর পরেই পাদ রচনার বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য স্বীকার করে' চতুরঙ্গর পাদ, অষ্টাঙ্গর পাদ, চতুর্মাত্র পাদ, পঞ্চমাত্র পাদ, চতুঃস্বরপাদ প্রভৃতি উপবিভাগ করেছি। ছন্দের শ্রেণী ভাগ করার সময়েই

একথা বলেছি। সুতরাং এখানে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা নিম্নয়োজন। এখন অসমমাত্রিক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

- (১) আজি কি তোমার মধুর মুখতি—
হেরিমু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, খামল অঙ্গ
বলিছে অমল শোভাতে।
পাবে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, পাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে জননী—
শরৎকালের প্রভাতে।

—রবীন্দ্রনাথ

এটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'অম্নি পড়ে' গেলে প্রত্যেক ছ' মাত্রার পরে একটা করে' যতি পাওয়া যায়। কিন্তু আরো একটু লক্ষ্য করলে এই ছ' মাত্রার প্রত্যেকটি পাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা করে' সূক্ষ্ম ছেদ-চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়; প্রত্যেক তিন মাত্রার পরেই একটা ঈষদ্-যতি বা একটু খানি সুরের বিরতি যেন স্রুতিশক্তির কাছে ধরা দেয়। বস্তুত খুব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির সাহায্যেই এ ছন্দ রচিত হয়; এরকম ছোটো মাপ কাঠিতেই এর একপাদ হয়। সে জন্যই এই ষণ্মাত্রিক ছন্দের কবিতায় প্রতিপাদে তিন মাত্রার পরেই একটা ঈষদ্-যতির অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় এবং এটাই এছন্দের স্বরূপ। তবে কোথাও কোথাও কোনো পাদের মধ্যবর্তী এই ঈষদ্ যতিটি প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। পূর্বের দৃষ্টান্তটিতেই এর নমুনা আছে—
যথা—

+ + +

“মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর” এবং “মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে জননী”; এখানে চিহ্নিত তিনটি জায়গায় পাদমধ্যবর্তী ছেদ বা ঈষদ্ যতিটি কানে ধরা দেয় না, ছোটো ক্ষুদ্র ভাগ একত্র জোড়া লেগে গিয়ে ওই যতি-ছেদটি বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু তবু ওই ঈষদ্ যতি থাকারটা এর যথার্থ প্রকৃতি এবং তিন মাত্রার মাপ কাঠিটাই এর ভিতরের গঠনের আসল আদর্শ। এই ঈষদ্ যতির

সাহায্যেই এছন্দের তাল রক্ষা হ'য়ে থাকে। এজন্যই এছন্দকে ত্রিমাত্রিক বা অসমপদী তালের ছন্দ বলেছি। উক্ত দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসমপদী তালের নমুনা। এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে অসমপদী তালের একটা উদাহরণ দেব। যথা—

ওই সিংহল দ্বীপ | স্কন্দর, শ্রাম |—নির্মল তার | রূপ
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কপূর কেশধূপ;
আর কাকন তার গোঁধব, আর মৌক্তিক তার শ্রাণ,
আর সম্বল তার বুকের নাম, সম্পদ নির্ঝাণ।
—সত্যেন্দ্রনাথ

গানের রীতিতে এখানে প্রতিপদে তিনটি করে মাত্রা পাওয়া যাবে, যদিও বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের ভাষায় একে মাত্রাবৃত্ত না বলে স্বরবৃত্ত বলেছি। তিন মাত্রার মাপকাঠিতে রচিত হয়েছে বলেই একে ত্রিমাত্রিক বা অসমপদী তালের ছন্দ বলব। অক্ষরবৃত্তে এতালের দৃষ্টান্ত এই,—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাত্রি-পাষণ কেঁদে গলে' যাক,
যুথ তুলে' আজি চাহ রে।
—রবীন্দ্রনাথ।

এছন্দে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেক বিখ্যাত কবিতা লিখে' গেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথমত অক্ষরবৃত্তে এই অসমপদী তালের অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে এতাল ভাল শোনায় না, যেখানে যুক্তবর্ণ উপস্থিত হয় সেখানেই পদগদে তালভঙ্গ হয়, শ্রুতিকটুতা দোষ হয়। এই তথ্যটি লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় মাত্রাবৃত্তের প্রবর্তন করেছেন; মানসীতে তিনি সর্বপ্রথম যুক্ত বর্ণের পূর্বস্বরকে ত্রিমাত্রিক বলে' ধরে' এ নতুন ছন্দ ব্যবহার করতে শুরু করেন। এখন অসমতালের ছন্দ সর্বদাই মাত্রাবৃত্তে রচিত হ'য়ে থাকে; অক্ষরবৃত্তে অসমতাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে। আর-একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের “প্রভাত সঙ্গীত” থেকে। পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন এরচনাটা মার্জিত শ্রুতি-রুচির উপর কতখানি অত্যাচার করে।

বায়ুর হিল্লোলে ধরে পল্লব
মর মর যুহু তান,
চারি দিক্ হ'তে কিসের উল্লাসে
পাখীতে গাহিবে গান।

এখানে যুক্তবর্ণগুলো যেন গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের মত সুর-প্রবাহের গতি রোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে; আমাদের ছন্দ-চেতনাও যেন সে গুরুভারে নিপীড়িত হচ্ছে। সুতরাং এভারটাকে যদি একটু লম্বু করে' দেওয়া যায় তবেই ছন্দের শ্রোত আবার অবাধগতিতে বয়ে চলবে,—

বায়ু-হিল্লোলে ধরে পল্লব
মর মর যুহু তান,
চারি দিক্ হতে কি যে উল্লাসে
পাখীরা গাহিছে গান।

কাব্যে বিষম তালটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই শোভা লাভ করে। সেজন্যে অক্ষরবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে এতালের ছন্দ সচরাচর রচিত হয় না। বিষম তাল অনেকরকম হ'তে পারে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি; যথা—

(১) বিপদে মোরে | রক্ষা কর, | এ নহে মোর | আর্ধমা,
বিপদে আমি | না যেন করি | ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সাধনা,
দুঃখে যেম করিতে পারি জয়।
সহায় মোর মা যদি জুটে নিজে'র বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বক্ষনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পাঁচ মাত্রার পরেই যতি আছে। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম শ্রুতির নিকট প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পরেই একটা যতির আভাস ধরা পড়বেই। সুতরাং আসলে এখানে তিন মাত্রার অসমপদের সঙ্গে দু' মাত্রার একটা সমপদের যে'গেই পাঁচ মাত্রার এক-একটি পদ রচিত হয়েছে। এই অসম ও সম তালের মিশ্র তালকেই বিষম তাল বলা হয়েছে।

(২) জড়ায় আছে বাধা, | ছাড়ায় যেতে চাই, |
ছাড়তে গেলে ব্যথা | বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে বাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
—রবীন্দ্রনাথ

এটা সপ্তমাত্রিক ছন্দ অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ; কারণ প্রথম তিন পদে সাতটি করে' মাত্রা ও শেষ পদে দুটো মাত্রা মাত্রা আছে। কিন্তু এর তাল বিষম, কারণ প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পরে একটা দ্বিধা যতি আছে। এ যতি প্রত্যেক পাদকে একটি তিনমাত্রার অসমভাগ এবং

আর-একটি চার মাত্রার সমভাগে বিভক্ত করেছে। সে-
জন্যই তাল বিষমপদী।

- (৩) জীৎনে বত পূজা | হল না সারা,
জানি-হে জানি তাও | হরনি হারা।

—রবীন্দ্রনাথ

এটা সপ্তমাত্রিক অপূর্ণ ছন্দ; কারণ প্রথম
পাদে 'সাত ও দ্বিতীয় পাদে পাঁচ মাত্রা আছে। কিন্তু
প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পর একটি ঈষৎ যতি দুটো
অসমান ভাগ সৃষ্টি করেছে। অতএব বিষম তাল।

- (৪) গাহিছে কাশীনাথ নবীন বুঝা, ধ্বনিত্তে সন্তগৃহ ঢাকি';
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্বর সাতটি যেন পোষা পাখী।

—রবীন্দ্রনাথ

এছন্দের তাল অতি বিচিত্র। প্রত্যেক পংক্তিতে
যথাক্রমে তিন বার পাঁচ, তিন বার ছ' মাত্রা রয়েছে।
কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এছন্দটা এর
অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দৃষ্টান্তটির সম্প্রসারণ
মাত্র। তৃতীয় দৃষ্টান্তের সাত পাঁচের অপূর্ণ ছিপদীর
সঙ্গে সাত ছ'য়ের আর-একটা ছিপদ যোগ করলেই এ
ছন্দ পাওয়া যায়। সুতরাং এছন্দের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে
এ রকম—

গাহিছে কাশীনাথ | নবীন বুঝা,
ধ্বনিত্তে সন্তগৃহ | ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি স্বর
সাতটি যেন পোষা | পাখী।

এ স্বরূপটি একটি অতিরিক্ত মিলের সাহায্যে বিশেষ-
ভাবে ফুটে উঠেছে নীচের দৃষ্টান্তটিতে।—

কোশল-স্থপতির ভুসনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশোগাথা ;
কীণের তিনি সদা শরণঠাই,
দীনের তিনি পিতামাতা।

—রবীন্দ্রনাথ

বলা বাহুল্য এখানেও বিষম তাল। আর-একটি বিষম
তালের দৃষ্টান্ত দাঁড়।

- (৫) হিলাম নিশিনিন আশাহীন প্রবাসী
ধ্বংস-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত ;
অটবী-বানু-বশে উঠিত সে উদাসি'।
কখনো ফুল ছুট' আঁধিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে' পড়িত রে নিশাসি'।

—রবীন্দ্রনাথ

এটা বিপর্যয় সপ্তমাত্রিক ছিপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত।
রবি-বাবুর কবিতায় এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত ছাড়া এছন্দ
আর কোথাও দেখিনি। প্রতিপংক্তিতে সাত মাত্রার
দুটো পাদ আছে। প্রত্যেক পাদ আবার ঈষৎ যতির
দ্বারা দু-ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এ বিভাগের মধ্যে সন্নিবেশ-
বিপর্যয়ের দ্বারা বেশ একটু বৈচিত্র্য হয়েছে; প্রত্যেক
পংক্তিতেই প্রথম পাদ তিন-চার ও দ্বিতীয় পাদ চার তিন
মাত্রায় ছিন্ন হয়েছে।

এতক্ষণে আমরা তালের দিক থেকে ছন্দের প্রধান
তিন ভাগ,—সম, অসম এবং বিষম ছন্দের আলোচনা
করেছি। পূর্বেই বলেছি গানে তাল-বিভাগের অন্তর্গত
কথার লঘুত্ব-গুরুত্ব-ভেদে লয়-ভেদে তালের অনেক
প্রকার ভেদ আছে। তার আলোচনা করা আমাদের
ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কবিতায়ও পাদের অন্তর্গত স্বরবর্ণ-
গুলোর লঘুত্ব-গুরুত্ব ভেদে তালের নানারকম উপ-
বিভাগ হ'য়ে থাকে। তাতে কোনো তাল আদিগুরু,
মধ্যগুরু, অন্তগুরু প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে
থাকে। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করার সময় এ বিষয়ে
বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং এস্থলে আর কিছু
বলা নিস্প্রয়োজন। তবে একথা স্মরণ রাখা দরকার
যে তালের এরকম উপবিভাগ স্বরবৃত্ত ছন্দেই
হ'তে পারে। অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম
বৈচিত্র্যের অবসর নেই। স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরের লঘুত্ব-
গুরুত্ব-ভেদে তালের যে বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকেই
কাব্যের ভাষায় ছন্দস্পন্দন নামে অভিহিত করেছি।
কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের এ স্পন্দন বা নৃত্য-লীলাটার
একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। সবাই জানেন যে বিশ্ব-
জগতের ভিতরকার মূল প্রণালী নির্গম করতে গিয়ে
জড়বিজ্ঞান সর্বত্র কতকগুলো বিচিত্র স্পন্দন বা আণবিক
চঞ্চল নৃত্যপরায়ণতাই আবিষ্কার করেছে। ধ্বনি-তত্ত্বেও
একথা যেমন খাটে মানুষের মানস ক্ষেত্রেও একথা তেমনি-
খাটে বলতে পারি। তাই কবিতার ভিতরকার যা মূল
সত্য অর্থাৎ রস, কবিতার ছন্দ সেই রসকে ধ্বনির
স্পন্দনের ভিতর দিয়েই আমাদের চিত্তস্পন্দনের সঙ্গে
সমান তালে ফুটিয়ে তুলতে চায় এবং এই চিত্তস্পন্দনের

ভিতর দিয়েই আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে' রসকে আমাদের মানস লোকে সার্থক করে' তুলতে চায়। কিন্তু ধ্বনির স্পন্দনের এই বিচিত্র সূক্ষ্ম লীলা ব্যাকরণ অর্থাৎ বিশ্লেষণের সূত্রে বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। সূত্রাং সে প্রয়াস আমরা করব না। তবে বাংলা কবিতায় ছন্দ-স্পন্দনের রীতি বৈশিষ্ট্য এবং কোন্ কোন্ বিশেষ উপায়ে তা আমাদের চিত্তকে দোলা দেয় সে-সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায় এবং বলা দরকারও বটে। আমরা পরে সে-বিষয়ের আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

স্বর

ছন্দ ও সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে আমরা মাত্রা লয় যতি ও তাল, উভয় শাস্ত্রের একঘটা সামান্য পরিভাষা এবং দু শাস্ত্রেই এদের সার্থকতা ও পার্থক্য কি, তাই বিশদ করতে চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য উভয়শাস্ত্রেই এমন কতকগুলো বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্ম আছে যা এক পক্ষে খাটে অল্প পক্ষে খাটে না। কাব্যছন্দের আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এক্ষেত্রে বিশেষ ধর্মগুলোর আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যছন্দের খানিকটা সাদৃশ্য আছে বলে' উভয়ের মধ্যে একটা তুলনা করার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতের অবতারণা করা হয়েছে। সঙ্গীতের আলোচনা গৌণ এবং কাব্যছন্দের আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্যই কাব্যছন্দের কথাই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে' সঙ্গীতের কথা সংক্ষেপেই সমাপ্ত করেছি। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে লয় ও তাল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন এগুলোই সঙ্গীতের মূল-তত্ত্ব নয়, সঙ্গীতের অন্তরতম মূল-তত্ত্ব হচ্ছে স্বর। মাত্রা লয় প্রভৃতি স্বরের বাহনমাত্র, স্বরের গতি-প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা। সঙ্গীতে স্বরই অনির্কচনীয় আনন্দ-রসকে মানুষের মনের স্পর্শ-সীমার মধ্যে এনে পৌঁছিয়ে দেয়। সঙ্গীতে যেমন স্বর, কাব্যে তেমনি ভাব। ভাব বলতে শুধু শব্দের অর্থকেই বুঝিনে। ভাব বলতে বুঝি এমন একটা ইচ্ছিত, এমন একটা সৌরভ, এমন একটা সূক্ষ্ম বা চকিতের মধ্যেই আমাদের মানস লোকে অদ্ভুত

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মায়াআল বিস্তার করে। কাব্যেও তাল লয় মাত্রা প্রভৃতি গৌণ, এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা। যা হোক, কাব্য এবং সঙ্গীত উভয়ের চরম লক্ষ্য এবং পরম সার্থকতা হচ্ছে সৌন্দর্য্য বা আনন্দ-রসের সৃষ্টি। সঙ্গীতে এই সৌন্দর্য্য প্রকাশ লাভ করে স্বরের উপর নির্ভর করে' এবং স্বর প্রবাহিত হয় লয় তাল প্রভৃতির আশ্রয়ে। কাব্যেও তেমনি সৌন্দর্য্য ফুটে' ওঠে ভাবের ভিতর দিয়ে এবং ভাব বিকাশিত হয় ছন্দের সাহায্যে। কিন্তু তা বলেও' যে এ ছয়ের মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো যোগ নেই তা নয়। সঙ্গীতে স্বর যদিও প্রধানত ধ্বনিকে অবলম্বন করে'ই সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করে, তবু স্বরের মধ্যেও কাব্যের ভাব-ব্যঞ্জনার আভাস রয়ে গেছে। আবার, কাব্যের ভাবও সম্পূর্ণ স্বরনিরপেক্ষ নয়; কেননা কাব্যের ছন্দেরও ত ধ্বনি-নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু গানের স্বর ও কাব্যের স্বরের মধ্যে গুরুতর প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়ে গেছে। সঙ্গীতে ভাব স্বরের অঙ্গবর্জন করে; কিন্তু কাব্যের স্বরই ভাবের অঙ্গসরণ করে। সেজন্যই কাব্য আবৃত্তি করার সময় আমাদের রসনা বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গসরণ করে' কথার অর্থকে অব্যাহত রেখে কোথাও চলে; কোথাও ধামে। কবিতায় ছন্দধ্বনি স্বরকেই প্রাধান্য দিয়ে কথার অর্থকে সহজে গৌণ আসন দেয় না; কাব্যে অর্থের অঙ্গঘাঙ্গী হ'য়েই স্বর কখনো তীব্র কখনো মৃদু, কখনো গম্ভীর, কখনো তরল, কখনো মন্থর, কখনো দ্রুত হ'য়ে থাকে। সকলেই লক্ষ্য করে' থাকবেন কবিতা আবৃত্তি করার সময় আমরা শুধু যে ছন্দ তাল বাঁচিয়েই কাণুলোকে আওড়াতে যাই তা নয়; যদি শুধু তাই হ'ত তবে কবিতার প্রাণটাই জড় শব্দপুঞ্জের নীচে চাপা পড়ে' মারা যেত। তবে ছন্দ কবিতার ভাবকে গতি দান না করে' বরং পাষাণ প্রাচীরের মতো তার গতিরোধ করে'ই দাঁড়াত। কিন্তু প্রকৃত তথ্য ত তা নয়, ছন্দ কাব্যের বাধা না হয়ে তার সহায় হয়েছে। তার কারণ কাব্যের ভাবকে বহন করে বলে'ই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা। ভাবের উপর প্রভূত্ব করাই ছন্দের কাজ নয়, বরং ছন্দের উপরেও

ভাবের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেজন্যেই শুধু যতি তাল লয় মাত্রা রক্ষা করে' যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করে' গেলেই কবিতার যথার্থ আবৃত্তি হয় না। তাতে কবিতার যথার্থ ভাবটিই ছাড়া যায় না; ছন্দের খাঁচাটাই তখন কাব্যের মুক্তির প্রধান বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। এজন্যেই কবিতা আবৃত্তি করার সময় ছন্দের তাল লয়কেও অতিক্রম করে' গিয়ে কবিতার ভাবকে মুটিয়ে তুলতে হয়; এখানটাতেই ছন্দ হাজার চেষ্টা করে'ও কাব্যের যথার্থ স্বরূপটির নাগাল পায় না, তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং নিজেকে নিজে অতিক্রম করে' যাওয়ার মধ্যেই ছন্দের সার্থকতা। কিন্তু এ অতিক্রম ছন্দের রাজ্য ছাড়িয়ে ভাবের ও সুরের রাজ্যে প্রবেশের উপক্রম। কাজেই আবৃত্তি করার সময় শুধু ছন্দ বাঁচালেই চলে না; তার সঙ্গে একটু ভাবের আভাস, একটু সুরের স্পর্শও যোগ করে' দিতে হয়। এজন্যেই দেখা যায় আবৃত্তি করার সময় আমাদের কণ্ঠ জড়যন্ত্রের মন্ত্রের মতো শব্দগুলোকে শুধু উচ্চারণ করে'ই যায় না, ভাবের গভীরতা, তীব্রতা, ও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কণ্ঠস্বরও কোথাও তীব্র, কোথাও গম্ভীর, কোথাও দৃষ্ট হ'য়ে ওঠে। এখানেই আমাদের চিত্ত কবিতার ভাবে অল্পপ্রাণিত হ'য়ে উঠে' আমাদের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সেজন্যেই ত কবিতার আবৃত্তি সঙ্গীত সচেতন ও প্রাণের স্পন্দনে এমন স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। আর এখানেই কাব্যের ভাব বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীতের সুরের স্পর্শভেদে জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এখানেই শেষ, সঙ্গীত-সুরের আভাস লাভ ও তার মধ্যে আত্মপ্রসারের এই ব্যাকুলতার মধ্যেই কাব্যছন্দের চরম তৃপ্তি। কিন্তু গানের সুরের প্রক্রিয়া অন্তরকম, তার অভিব্যক্তির পন্থা স্বতন্ত্র। গানের সুর ধ্বনিকে আশ্রয় করে'ই আনন্দকে রূপ দান করে, কথার ভাবকে আশ্রয় করে' নয়। সেজন্যেই গানের সুর স্বচ্ছন্দগতিতে বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রবাহিত হ'য়ে চলে, গানের কথাকে সে গ্রাস করে না। গানের সুরের কাছে কথা ও তাহার অর্থের কোনো মর্যাদা নেই বললেই হয়; কথার অর্থ

হয়ত যেখানে থেমেছে সুর সেখানেও চলেছে; কথার অর্থে যেখানে গতি রয়েছে সুর হয়ত সেখানেই মোড় ফিরে' যায় এমন সর্বদাই দেখা যায়। গানের সুরের ধারায় পড়ে' শ্রোতের বেগে গানের কথাগুলো নিজ নিজ স্বতন্ত্র রূপকে পর্যাঙ্ক বজায় রাখতে পারে না, সুরের বেগে শব্দগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়; কোনো শব্দের বর্ণগুলো পরস্পরসংশ্লিষ্ট থাকতে না পেরে বিস্মিষ্ট হয়ে এশব্দের বর্ণ ও শব্দের গায়ে গিয়ে পড়ে। শব্দগুলো নিজেই যখন এমন ছাড়া-ছাড়া বিস্মিষ্ট হয়ে যায় তখন তারা অর্থের সমতা রক্ষা করবে কেমন করে' ? তাই বলছিলাম গানের সুর বাক্ ও অর্থকে অগ্রাঙ্ক করে' ধ্বনির সাহায্যেই সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে সৃজন করতে চায়। তাই গানে ধ্বনিকে এত বিশ্লেষণ করেছে; তাই গানে বড়জ, ঋষভ প্রভৃতি সুরের সাতটি গ্রাম, উচু নীচু মাঝারি প্রভৃতি সপ্তকের বিভাগ, কড়ি কোমল প্রভৃতি সুরের সূক্ষ্ম ভেদ, এসমস্ত বহু-বৈচিত্র্য দেখতে পাই। গানে সুরের এ-সমস্ত ভেদকে মাত্রা লয় প্রভৃতি থেকে পৃথক করে' দেখা দরকার। কালের দিক্ থেকে ধ্বনির আদর্শ মাপকাঠিকে মাত্রা বলা হয়; কাল ব্যোপে সুরের স্থিতিপরিমাণই হচ্ছে মাত্রাপরিমাণ। এদিক্ থেকে এক-একটি বর্ণ সিকি মাত্রা থেকে শুরু করে' চার পাঁচ প্রভৃতি বহুমাত্রাব্যাপী স্থায়ী হ'তে পারে, সুতরাং কালের স্থিতির দিক্ থেকেও বহুমাত্রাপরিমাণ হ'তে পারে। ঠিক্ তেমনি ধ্বনির তীব্রতা বা মৃদুতার দিক্ থেকেও বহু বিভাগ হ'তে পারে ধ্বনির এই উচ্চতা নীচতা ভেদ অসংখ্যরকম হ'তে পারে; বড়জ ঋষভ প্রভৃতি এরই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু এসমস্ত প্রকারভেদ সম্পূর্ণরূপে মাত্রা-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন্ মাত্রার বর্ণ তীব্রতার কোন্ গ্রামে থাকবে বা কোন্ গ্রামে মাত্রা-পরিমাণ কত তার কোনো স্থিরতা নেই। ধ্বনির স্থিতি যেমন মাত্রা-ভেদ নিয়মিত করে, তার তীব্রতাও তেমনি সুরের ভেদ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ধ্বনির গতির সমতাকেই লয় বলে এবং এই গতির ক্রম-ভেদে লয়-ভেদ হয়। আবার ধ্বনির গতি-ভঙ্গীতেই তালের সৃষ্টি। মাত্রা লয় যতি তাল ও সুর গানের ক্ষেত্রে যে অপরূপ অরূপ সৌন্দর্য্যের তাজমহল গড়ে'

তুলেছে, কাব্যের ক্ষেত্রে তা গড়ে' উঠেছে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির মানসী মূর্তির মাধুরীতে। কিন্তু কাব্যেও মাত্রা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে; এরা সেই সৌন্দর্য-ইমারতের স্থূল উপাদানই মাত্র জোগায়। সেজন্যই এগুলোকে হিসাবের বিচারে অল্পবিস্তর পরিমাপ করা যায়। কিন্তু কাব্যে সুরের যে আভাস পাই তার কোনো বিশ্লেষণ নেই, ভাবের আবেগে চিন্তে যে গতির সঞ্চার হয় তার থেকেই কাব্যে ওই সুরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সে সুর গানের সুরের মতো আপন গতিতেই আপনি বয়ে চলে না, ভাবের আবেগের অনুসরণ করে'ই কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সঙ্গীত ও ছন্দ সম্বন্ধে আমরা যে বিষয়গুলোর আলো-

চনা করবলুম আশা করি তার থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোনো কোনো বিষয়ে সদৃশধর্ম্য বটে, কিন্তু সমানধর্ম্য নয়। যে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেখানেও তাদের গতি 'একদিকে নয়, এ সাদৃশ্যটাও বিভিন্নমুখ। এ দুয়েরই যা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বা স্বতন্ত্র সার্থকতা তা সম্পূর্ণ পৃথক্ কক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়েই এ দুয়ের ভিতরকার স্বরূপ বা সৌন্দর্য্যমূর্তিকে আকৃতি দান করে। অতএব কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দের ষথার্থ পরিচয় লাভ করতে হ'লে এই দু' শাস্ত্রেরই স্বতন্ত্র আলোচনা করা আবশ্যিক।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

রাজপথ

[২১]

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে সুরেশ্বর কণকাল শুরু হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর পুনরায় ইংরেজী প্রবন্ধের প্রফটা বাহির করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইতস্ততঃ বিচরণ-শীল বিক্ষিপ্ত মনকে চেষ্টা করিয়াও কার্যের মধ্যে কোনো-মতে নিযুক্ত করিতে না পারিয়া বিরক্তিভরে কাগজপত্রগুলোকে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। ভুল সংশোধন করিতে গিয়া অজ্ঞমনস্কতাবশতঃ ছুই চারিটা নূতন ভুলই হইয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধের একটা অংশ পাঠ করিতে করিতে রচনাটা এমন নীরস ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হইল যে সুরেশ্বরের একবার ইচ্ছা হইল প্রবন্ধটা ছিড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু দুইদিন পরের সংবাদপত্রের জন্ত প্রবন্ধটা নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ছিড়িতে পারিল না।

মাধবী ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই সুরেশ্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সংবাদপত্রের কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রবন্ধ ও প্রফ ফেরৎ দিল।

সম্পাদক সম্মানে সুরেশ্বরকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সবটা দেখা হ'য়ে গিয়েছে?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সবটা দেখতে পারিনি; খানিকটা বাকি আছে। সেটা আপনি দেখে দেবেন।"

"কিছু বদলাবার আছে কি?"

"না, তা কিছু নেই।" তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "দেখুন, আমার এ প্রবন্ধটা তেমন ভাল হয়নি। এটা না ছাপলে কি চলবে না?"

সম্পাদক ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "না। তা কি করে' চলবে? এ প্রবন্ধের জন্তে পরস্তর কাগজে দু' কলাম জায়গা রাখা আছে। তা ছাড়া প্রবন্ধ ত বেশ ভালই হয়েছে; খারাপ কিছুই ত হয়নি।"

মনে মনে বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "বেশ, তা হ'লে ছাপুন।"

সংবাদপত্র-কার্যালয় হইতে নির্গত হইয়া সুরেশ্বর মানিকতলা স্ট্রীটে তাহার তাঁতঘরে উপস্থিত হইল। একটা ভিন্ন সব তাঁতগুলোই তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুরেশ্বর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁতগুলো দেখিতে লাগিল।

অধিকাংশ তাঁতেই শাটী একত হইতেছে দেখিয়া সুরেশ্বর মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, "সব তাঁতেই

শাড়ী চড়িয়েছে কেন? বাংলা দেশের পুরুষমানুষেরা কি ধূতি পরা ছেড়ে দিয়েছে?”

স্বরেশ্বরের ভৎসনা শুনিয়া অতুল অগ্রসর হইয়া আসিয়া নত্রকণ্ঠে কহিল, “এ সব শাড়ীই ত আপনার ছকুমে চড়ান হয়েছে বাবু? মথুরের নকশা আর উপদেশ-মত এগুলোতে পাড় তোলা হচ্ছে।”

মথুর ঢাকা হইতে আনীত নূতন তাঁতী।

এই মত প্রতিবাদে প্রকৃত কথা স্মরণ হওয়ায় স্বরেশ্বর মনে মনে অপ্রতিভ হইল। কয়েকদিন পূর্বে, আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় নবসূর্য্যারক্তিমা-প্রবেশের মত, তাহার স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার মধ্যে স্মিত্রা-জনিত নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়ার পর কেমন করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ অহুত্বের অগোচরে একে একে অধিকাংশ তাঁতে ধূতির স্থান শাটী অধিকার করিয়াছে তাহা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল বিগত তিন-চার দিবসের মধ্যে যখনই কোন একটা তাঁত মুক্ত হইয়াছে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের হিসাব না করিয়া নূতন নকশার পাড় করাইবার আগ্রহে সে তাহাতে শাটী চড়াইবার আদেশ দিয়াছে।

সে-সকল কথা স্মরণ হওয়ায় এই বিপরীত তিরস্কারের জন্ত মনে মনে অপ্রতিভ এবং বিরক্ত হইয়া স্বরেশ্বর বলিল, “আচ্ছ, যা হয়েছে তা হয়েছে; এখন থেকে আগেকার হিসাবে ধূতি আর শাড়ী করবে।”

এ আদেশে অতুল মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “যে আজ্ঞে।” ধূতি উপেক্ষা করিয়া শাটী প্রস্তুত করিবার বিষয়ে এই অপরিমিত উৎসাহ তাহার মনঃপুত ছিল না।

মথুর অগ্রসর হইয়া বলিল, “বাবু, মিহি সূতো অনেকটা জমা হ'য়ে গিয়েছে। আপনি বলেছিলেন শাড়ীর পাড়ের প্যাটার্ণ পছন্দ করে' দেবেন।”

বিরক্ত হইয়া স্বরেশ্বর ক্রুদ্ধভাবে বলিল, “আমিই যদি পছন্দ করে' দোবো তা হ'লে তোমাকে এত মাইনে দিয়ে ঢাকা থেকে আনলাম কেন?”

স্বরেশ্বরের কথা শুনিয়া মথুর সবিস্ময়ে কহিল, “কিন্তু বাবু, আপনিই ত আদেশ করেছিলেন যে আপনি

প্যাটার্ণ পছন্দ করে' দিলে তবে মিহি সূতো তাঁতে চড়বে।”

স্বরেশ্বর নরম হইয়া বলিল, “সে আমার আর সময় হবে না মথুর। তুমি নিজেই বাজার-পছন্দ কয়েকরকম প্যাটার্ণের পাড় করে' নিয়ো।”

মথুর বলিল, “যে আজ্ঞে, তাই করে' নেব।” তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মত্কণ্ঠে বলিল, “আর একজোড়া যে ফরাসী ছিল স্মিত্রা দেবীর নামলেখা? সেটা হবে কি?”

স্বরেশ্বর প্রহানোদ্যত হইয়াছিল, মথুরের প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “একজোড়ার দরকার নেই, তবে একখানা দরকার হ'তে পারে। একখানা বেশ ভাল-করে' করে' রেখো।”

“যে আজ্ঞে।”

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া, ও কয়েকটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে উপদেশ দিয়া স্বরেশ্বর গৃহে প্রত্যা-বর্তন করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

মাধবী ফিরিয়া আসিয়া পর্যন্ত স্বরেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের জন্ত ব্যগ্র হইয়া ছিল। স্মিত্রাকে চরকা দিয়া আসিয়াছে স্বরেশ্বরকে সে-সংবাদ দিবার অধীরতা ত ছিলই, তাহা ছাড়া স্মিত্রার সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা জানাইবার আগ্রহও কম ছিল না।

কিন্তু স্বরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে যখন তাহার সে দিনের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে উদ্যত হইল তখন স্বরেশ্বর তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, আজ নয় মাধবী, কাল বলিস, সব শুন্ব। আজ একটু ব্যস্ত আছি।”

এ সংবাদের জন্ত স্বরেশ্বরের এরূপ অনাগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, “কিসে ব্যস্ত দাদা?”

স্বরেশ্বর মত হাসিয়া বলিল, “কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত নই,—এমনি মনে-মনে একটু ব্যস্ত আছি। কাল সব শুন্ব। চরকাটা দিয়ে এসেছি ত?”

সমস্ত কাহিনীটা বাদ দিয়া শুধু সংবাদটুকু দিতে মাধবী ব্যথিত হইল। ক্রুদ্ধভাবে বলিল, “তা ত দিয়ে এসেছি, কিন্তু কথা যে অনেক ছিল।”

“সে-সব কাল শুনব, মাধবী” বলিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

[২২] .

রাত্রে বহুকণ জাগিয়া সুরেশ্বর নানাপ্রকার কার্যে ব্যাপ্ত রহিল। কয়েকখানা প্রয়োজনীয় চিঠি লিখিবার ছিল, সেগুলি লিখিয়া শেষ করিল; তাঁতশালা এবং অপর দুই-একটা বিক্রেতার হিসাব দেখিবার ছিল, সেগুলি একে একে মিলাইয়া দেখিয়া রাখিল; এবং একটা প্রবন্ধের শেষাংশ লিখিতে বাকি ছিল, তাহাও লিখিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরেশ্বর কোন কার্যেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু রাত্রে একাধ্যগুলি সে নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিল। অতর্কিতে দমকা-ঝড়-খাওয়া নৌকার মতো নিরুপায় তাহার যে মন ভাসিয়াই চলিয়াছিল কণকালের জন্ত তাহা বোধ হয় হালের ও পালের অধীনতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দীপ নিভাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবা মাত্র পুনরায় তাহা আবর্তের মধ্যে পড়িয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিল।

মনে হইতেছিল যেন মস্ত একটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ দিক দিয়া, কেমন করিয়া যে তাহা হইয়া গেল, তাহা কিছুতেই নির্ণীত হইতেছিল না! যে বস্তু কখনও অধিকারের অন্তর্গত হয় নাই তাহা হইতে অধিকারচ্যুতির কোন কথা উঠিতে পারে না, কিন্তু তথাপি অধিকারচ্যুতির এ বেদনা কেমন করিয়া হৃদয় জুড়িয়া জাগিল তাহা সুরেশ্বরের নিকট অভেদ্য রহস্যের মত মনে হইতেছিল। যুক্তি কারণ বিচার ও বিতর্ক বর্জিত ক্ষতি-বোধের এই অর্থবিহীন পীড়া তাহার জায়নিষ্ঠ মূল চিন্তাকে একই মাত্রায় বিক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত করিতে লাগিল। সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়া এই অসঙ্গত কোণ্ডের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসিয়া উঠিবার জন্ত যতই চেষ্টা করিতে থাকে ততই ডুবিতে থাকে, তেমনি সুরেশ্বর তাহার ছরপনের মানসিক সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্ত যতই নিজেকে সর্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই যেন ক্রমশঃ বল হারাইতে লাগিল।

প্রত্যুষে সুরেশ্বরের নিজাভঙ্গ হইল। ঘরের একটা জানালা উন্মুক্ত ছিল; দেখিল—সেখান দিয়া উবার নিছো-জ্বল আলোকধারা প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাকি জানালাগুলো খুলিয়া দিয়া বসিল।

নিজাভঙ্গের পর সুরেশ্বর অনেকটা স্তম্ভ বোধ করিতে-ছিল; তৎপরে প্রভাতের স্থনির্মল শীতলতায় কিছুক্ষণ ধরিয়া স্নাত হওয়ার পর সে তাহার হৃদয়ের অপস্থত শক্তিগুলি একে একে ফিরিয়া পাইতে লাগিল। কাল যাহা জলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহারই ভস্ম লেপন করিয়া তাহার বৈরাগ্য-বিকল মন এই হিম-স্নাত প্রভাত-আলোকের উপর ভর দিয়া সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িবার জন্ত উচ্চত হইয়া উঠিল! যে বিফলতা ধূমের আকার ধারণ করিয়া কাল সমস্ত চিত্ত নিবিড় কালিমায় লেপন করিয়াছিল আজ তাহা সফলতার মেঘরূপে বৃষ্টি ধারায় নামিবার উপক্রম করিল।

কণপরে নিত্য নিয়ম-অনুসারে সূতা কাটিবার জন্ত সুরেশ্বর চরকা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাধবী তাহার পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া মাধবী বলিল, “আজ শুনবে ত, দাদা?”

সুরেশ্বর মূঢ় হাসিয়া বলিল, “কাল রাত্রে তোমার ঘুম হইয়াছিল, মাধবী?”

সুরেশ্বরের বথায় হাসিমা ফেলিয়া মাধবী কহিল, “ভাল হয়নি।” তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ সুরেশ্বরের প্রতি উখিত করিয়া কহিল, “তোমারই কি হইয়াছিল?”

সুরেশ্বরের যে ঘুম হয় নাই, তাহা অবিসংবাদী সত্য, কিন্তু কি কারণে হয় নাই তাহা প্রকাশ না করিয়া সে স্মিতমুখে বলিল, “স্বমিত্রাদের বাড়ী তুই কি কাণ্ড করে’ এসেছিল, সে ভাবনায় আমার কাল রাত্রে ঘুম না হবার কথাই ছিল।”

মাধবী স্মিতমুখে কহিল, “কিন্তু যে কাণ্ড করে’ এসেছি

তা শুনে আজ রাত্রেও তোমার ঘুম হবে না;—তবে ভাবনার নয়, নির্ভাবনার।”

মাধবীর এম্বাখাসে সুরেশ্বর কিছুমাত্র আশ্রয় হইল না। সশঙ্কিত হইয়া শুক্রমুখে সে কহিল, ‘কি করে এসেছি, মাধবী?’

মাধবী হাসিয়া বলিল, “ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার মতো কিছু করিনি। যা করেছি ভালই করেছি।”

তাহার পর, স্মিত্রাদেব বাড়ী যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, আত্মপূর্কিক সমস্ত কথা মাধবী সুরেশ্বরকে শুনাইল।

সকল কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর ব্যথিত গভীর-কণ্ঠে কহিল, “যা হবার, তা দেখছি কেউ আটকাতে পারে না! কাল যদি তোকে পাঠাতে আধঘণ্টা দেবী করি মাধবী, তা হ’লে আর কোন অনিষ্ট হয় না।”

মাধবী সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, “অনিষ্ট আবার কা’র কি হ’ল, দাদা?”

সুরেশ্বর বিরক্তি-বিরূপকণ্ঠে কহিল, “কতকগুলো অশ্রায় কথা বলে’ স্মিত্রার অনিষ্ট করে’ এসেছি ত!”

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, “ও এই কথা? আচ্ছা, কখন যদি স্মিত্রার সঙ্গে দেখা হয় তা হ’লে তাকেই জিজ্ঞাসা কোরো যে তার অনিষ্ট করেছি কি ইষ্ট করেছি। কিন্তু এখনও তার কোন ইষ্টই করতে পারিনি। যেদিন তোমার সঙ্গে—”

মাধবীকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর অপ্রসন্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “অশ্রায়! ভারি অশ্রায়, মাধবী! তুই একেবারে ছেলেমানুষ! কোন কথা কখন বলা যায়, আর কখন বলা যায় না, তাও কি বুঝিসনে?”

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, “তা বুঝি কি বুঝিনে, বলতে পারিনে। কিন্তু অশ্রায় যদি হয় ত’ সে কার অশ্রায় দাদা? আমার?—না, স্মিত্রার? সে যদি নিজ মনে তোমাকে—” বাকি কথা মাধবীর মুখ হইতে নির্গত হইল না; কতকটা লজ্জায় এবং কতকটা কৌতুকে সে হাসিয়া ফেলিল।

সুরেশ্বর উৎকণ্ঠা গভীরভাবে কহিল, “কাল

এইরকম যা’-তা’ সব কথা বলে’ স্মিত্রার অনিষ্ট করে’ এসেছি; আজ আবার সেইরকম করে’ অ. ‘র অনিষ্ট করার ফন্দিতে আছি? এ বাস্তবিকই ঠিক নয়, মাধবী!”

এবার মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টকণ্ঠে বলিল, “অনিষ্ট, অনিষ্ট তুমি যে কি বলছ আমি তা কিছুই বুঝতে পারছি, দাদা! স্মিত্রার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিমান-বাবুর সঙ্গে স্মিত্রার বিয়ে হ’লে স্মিত্রারই ইষ্ট হবে, না তোমারই ইষ্ট হবে?”

মাধবীর এই কঠিন প্রশ্নে সুরেশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার পর দ্বিধা-বিনয় অদৃঢ়-কণ্ঠে কহিল, “ইষ্ট যে হবে না, তা কি করে’ বলছি, মাধবী? কিসে ইষ্ট হবে আর কিসে অনিষ্ট হবে তা চট করে’ ঠিক করে’ ফেলা কি সহজ কথা রে?”

সুরেশ্বরের এই অতর্কিত শিথিল তর্কে সুবিধা পাইয়া মাধবী দৃঢ়ভাবে বলিল, “তা-ই যদি, তবে তুমি এতক্ষণ ইষ্ট আর অনিষ্টের কথা তুলেছিলে কেন? কি করে’ তুমি বলছিলে যে কাল আমি স্মিত্রার অনিষ্ট করে’ এসেছি, আর আজ তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা করছি?”

মাধবীকে সুরেশ্বর নিরস্ত করিতেই চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তর্কের সুযোগে মাধবী এমন একটা সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিল যে তাহাকে প্রতিরোধ করা স্কটিন হইয়া দাঁড়াইল। ইষ্ট অনিষ্টের রহস্য ভেদ করা যে কঠিন তাহা সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে স্বীকার করিবার পর আর সে কথা দিয়া মাধবীকে শাসন করিবার উপায় রহিল না। তাই এই দুঃশ্চন্দ্য সঙ্কটজাল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত সুরেশ্বর তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া, অহুরোধের দ্বারা মাধবীকে শাস্ত করিতে উদ্যত হইল। বলিল, “মানুষের সুখদুঃখ এমন জটিল বিধি-নিয়মে চলে যে তার উপর কোনোরকম জোরজবরদস্তি করা’ত নেই, মাধবী! সহজে, আপনা-আপনি, যা গড়ে’ ওঠে সেইটেই আদৎ জিনিস, আর তাই থেকেই শুভ ফল পাওয়া যায়।”

একথায় মাধবী কিছুমাত্র বিরুদ্ধসাহিত্য না হইয়া বলিল, “তাই যদি, তা হ’লে স্মিত্রার মা’র জবরদস্তিতে কি শুভ ফল পাওয়া যাবে বল দেখি?”

সুরেশ্বর বলিল, “শুধু স্মিত্রার মার জ্বরদস্তির কথাই ভাবছিষ্ কেন, মাধবী? এর মধ্যে বিমান তার সুখচুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বিমানকে একেবারে ভুলিসনে!”

মাধবী সজোরে বলিল, “বিমান-বাবুকে ভুলব না, কিন্তু স্মিত্রাকে ভুলে’ যাব? তার বুঝি কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখচুঃখ নেই? তার পর তোমার কথাও ভুলে যাব, মনে রাখব শুধু বিমান-বাবুর সুখচুঃখের আর স্মিত্রার মার সাধ-আহ্লাদের কথা!”

স্মিত্রার কথায় চকিত হইয়া উঠিয়া সুরেশ্বর বলিল, “তোমার বড় আশ্চর্য হইছে, মাধবী! তুই আমাকেও এর মধ্যে এমন করে’ জড়িয়েছিষ্ কেন বল দেখি?”

সুরেশ্বরের তিরস্কারে সামান্য প্রশমিত হইয়া মাধবী কহিল, “রাগ কোরোনা দাদা, কিন্তু এব্যাপার থেকে তুমি দূরে সরে’ দাঁড়ালে চলবে না। স্মিত্রা আমার কাছ থেকে কাল যে আশ্বাস পেয়েছে তা যেন একেবারেই মিথ্যা না হয়। আমার কথায় বিশ্বাস কর, বিমান-বাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হ’লে তুমি যে শুভ ফল বল্ছিলে তা

ফলবে না। জুলুম জ্বরদস্তি যদি বাস্তবিকই অন্তায় হয় তা হ’লে জ্বরদস্তি থেকে স্মিত্রাকে তুমি রক্ষা কর! একবার তাকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, এবার তাকে তার মার হাত থেকে বাঁচাও!”

মাধবীর এই গনির্কল্প সকাতির প্রার্থনায় সুরেশ্বর মনে মনে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, “না মাধবী, আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াব না। তুইও একেবারে এ ব্যাপার থেকে তফাৎ হ’য়ে থাকিস। সাপ নিয়ে খেলানর চেয়ে মানুষ নিয়ে খেলা করা অনেক বিপজ্জনক। জয়ন্তী, স্মিত্রা আর বিমান এ তিনজন মানুষকে খেলান আমারও কাজ নয় তোমারও কাজ নয়। এ অকাজের চর্চায় আর সময় নষ্ট না করে’ আয় আমাদের যা কাজ তা একটু করি।”

তাহার পর উপস্থিতের মতো এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখিয়া ভ্রাতাভগিনী দুইজনে দুইখানি চরকা লইয়া সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষা

(পূর্নামুত্তি)

মর্ষস্থল

শরীরের মধ্যে “মর্ষস্থল” নামক এমন কতকগুলি স্থান আছে যাহাতে সামান্য আঘাত করিতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত আশু ও অধিক ফল পাওয়া যায়; সেই হেতুই মর্ষস্থল সম্পর্কেও সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্তই আবশ্যিক। মর্ষস্থলগুলি সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকিলেই প্রকৃত সংঘর্ষকালে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপযুক্ত “ছিদ্র” সন্ধান সম্বন্ধে এবং আশ্চিহ্ন সংগোপন ও সংরক্ষণ-সম্পর্কে যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। তাই নিয়ে সূত্রতন্ত্রমোদিত কতিপয় মর্ষস্থলের উল্লেখ করা গেল।

মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধিদিগের বিশেষ বিশেষ সন্নিপাত ও সংযোগস্থল মারাত্মক হেতু “মর্ষ” নামে

অভিহিত হয়; ঐ-সকল স্থানে স্বভাবতই বিশেষভাবে চেতনা ও প্রাণসমূহ নিবদ্ধ থাকে, সেই হেতুই মর্ষসমূহ আহত হইলে বিভিন্নরূপে প্রাণ-সকট উপস্থিত হয়। মর্ষ ক্ষত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হওয়াতে মর্ষবিদ্ধ ব্যক্তির সর্ব-শরীর বেদনাভিভূত হইয়া প্রলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শরীর-মস্ত-সকল বিকল হইয়া যায়, এবং তাহার সংজ্ঞাও বিনষ্ট হয়। শরীরে সাধারণতঃ একশত সাতটি মর্ষ আছে, তন্মধ্যে হস্তপদাশ্রিত মর্ষ অপেক্ষা স্বক্কাশ্রিত মর্ষ-সকল গুরুতর, কারণ হস্তপদাশ্রিত মর্ষ স্বক্কাশ্রিত মর্ষেরই আশ্রিত; আবার স্বক্কাশ্রিত মর্ষাপেক্ষা হৃদয়, বস্তি ও শিরোগত মর্ষসমূহ প্রধান, কারণ ইহারা ই শরীরের মূল।

মর্শ-সকল সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

১। সত্ত্বঃপ্রাণহর; যাহারা বিদ্ধ হইলে সত্ত্ব (সাত ঘাত্তি মধ্যে) প্রাণনাশ হয়।

২। কালান্তর-প্রাণহর—যাহারা আহত হইলে এক পক্ষ বা এক মাস মধ্যে প্রাণনাশ হয়।

৩। বৈকল্যকর; যাহারা আহত হইলে অঙ্গের বিকলতা সম্পাদন করে।

৪। রুজাকর; যাহারা আহত হইলে তীব্র যাতনা উদ্ধৃত হয়।

৫। বিশল্যয়; যাহা হইতে শস্ত্র দ্বারা কিম্বা বল-পূর্বক শল্য উদ্ধৃত হইলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

বিশল্যয় ও বৈকল্যকর মর্শ-সকল অতিশয় আহত হইলেও কদাচিত্ মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রাণহর মর্শ-সকলের মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে মৃত্যু ঘটে; আবার কালান্তর-প্রাণহর মর্শ-সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে বৈকল্য সম্পাদন করে; রুজাকর মর্শ সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে অতীব্র (অল্প) বেদনা উৎপাদন করে; বিশল্যয় মর্শ-সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে ক্লেশ ও রুজা উৎপাদন করে।

ছেদ, ভেদ, অভিঘাত, দহন, বিদারণ প্রভৃতি দ্বারা মর্শ-সকল অতীব্রাহত ও উপাহত (অর্থাৎ সমীপে আহত) হইলেও তুল্য লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন মর্শাভিঘাতই একেবারে আপৎশূন্য নহে। মর্শ-স্থানসমূহে অভিহত হইলে মানবগণ স্মৃতিকিৎসিত হইলেও প্রায়ই অলবৈকল্য প্রাপ্ত হয় কিম্বা প্রাণ হারাইয়া থাকে।

মর্শে অভিহত না হইয়া, কোষ্ঠ, শির, কপাল প্রভৃতি সংভিন্ন ও অক্ষরিত হইলেও এবং শরীরের নানা স্থান শল্যাহত হইলেও প্রাণ বিনষ্ট হয় না; এমন কি সমগ্র হস্ত পদ কর চরণ নিঃশেষে ছিন্ন হইলেও (রক্তবাহিনী শিরা-সকল সঙ্কুচিত হওয়া নিবন্ধন রক্ত-নির্গমন-পথ বহল পরিমাণে অবরুদ্ধ হওয়াতে অল্পই রক্ত নির্গত হয় বলিয়া) ছিন্নশাখ বৃক্ষের গ্ৰায় মানব একেবারে মরিয়া

যায় না। কিন্তু ই-সমস্ত অবয়বাপ্রিত “কিপ্র” “তলকদয়” প্রভৃতি মর্শ আহত হইলে, প্রভূত রক্ত নির্গত হইতে থাকে বলিয়া রক্তক্ষয়-হেতু বায়ু কুপিত হওয়াতে অত্যন্ত পীড়া উৎপাদন করে, এবং শস্ত্রাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের গ্ৰায় মানব প্রাণ হারাইয়া থাকে। অতি সুদক্ষ শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকিৎসকগণই কেবল কোন কোন স্থলে ঐরূপ অবস্থায় সুফল দেখাইতে পারেন।

সদ্যঃপ্রাণহর মর্শে অভিহত হইলে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে জ্ঞান-নাশ, মন ও বুদ্ধির বিপর্যয় এবং নানাপ্রকার তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। কালান্তরপ্রাণহর মর্শে অভিহত হইলে নিশ্চয়ই মানবগণের ধাতুক্কয় হয় এবং ধাতুক্কয়-হেতু নানারূপ বেদনা উপস্থিত হইয়া মানবের প্রাণ নাশ হয়। বৈকল্যকর মর্শে অভিহত হইলে স্মৃতিকিৎসকের নৈপুণ্যে শরীর ক্রিয়াযুক্ত থাকিলেও বিকলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। রুজাকর মর্শ-সকল অভিহত হইলে বিবিধ বেদনা উপস্থিত হয়, কিন্তু কুবেত্তা চিকিৎসা করিলে অঙ্গের বৈকল্যও হইতে পারে।

সত্ত্বঃপ্রাণহর মর্শতালিকা।

১—৪। শৃঙ্গাটক মর্শ চারিটি :—

যে সকল শিরা ভ্রাণ শ্রবণ দর্শন ও আস্থাদন নির্বাহ করে, তাহাদের এক-এক শ্রেণীর মুখ-সবল মস্তক-মধ্যে চারি স্থানে সংযুক্ত আছে; সেই-সকল সংযোগ-স্থান শৃঙ্গাটক নামে অভিহিত হয়, উহাদের কোন একটি ছিন্ন হইলে সত্ত্বোমৃত্যু হয়।

“শির” “সাণ্ড” “উন্টা সাণ্ড” “উন্টাশির” উভয় “চক্রিকা” প্রভৃতি এই-সমস্ত মর্শ ভেদ করিয়া যায়।

শৃঙ্গাটক মর্শগুলি সম্পূর্ণ মস্তকের অভ্যন্তরে অবস্থিত; কিন্তু একরূপে ঘটিতে পারে যে মস্তকের উপরি যে-কোনও স্থানে যে-কোনও আঘাত সংক্রামিত হইয়া উপস্থিত মর্শ কিম্বা অস্থি অভয় অবস্থায় থাকিলেও অভ্যন্তরস্থিত মর্শগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। তাই মস্তক রক্ষা-হেতু স্মৃতিকিৎসক সর্বরূপেই বিধেয় ও কল্যাণকর।

৫। অধিপতি মর্শ একটি :—

মস্তকের অভ্যন্তরে শিরাসকলের সন্ধিস্থলে, যাহার উপরিভাগে বাহ্য লক্ষণ রোমাবর্ত, তথায় অর্ধ-অঙ্গুলী-

প্রমাণ "অধিপতি" নামক একটি সন্ধি-মর্ষ আছে; ইহা আহত হইলে সন্তোমৃত্যু হয়।

"শির" "উন্টা শির" "সাণ্ড" "উন্টা সাণ্ড" প্রভৃতি এই মর্ষভেদ করিয়া যায়।

৬-৭। শঙ্খমর্ষ দুইটি :—

ললাটের উভয়পার্শ্বে, কর্ণ ও ললাটের মধ্যে ক্রপুচ্ছ-ঘয়ের প্রান্তের উপরি সার্ধ্ব এক অঙ্গুলি প্রমাণ "শঙ্খ" নামক দুইটি অস্থিমর্ষ আছে, উহারা বিদ্ধ হইলে সন্তো-মৃত্যু হয়।

"তেওয়ার" দক্ষিণ শঙ্খ এবং "চাকি" বাম শঙ্খ ভেদ করিয়া যায়।

৮-১৫। "কণ্ঠশিরা" মর্ষ বা "শিরামাতৃকা" আটটি :—

গ্রীবার এক এক পার্শ্বে চতুরঙ্গুল-পরিমিত চারি চারিটি "কণ্ঠশিরা" বা "শিরামাতৃকা" নামক আটটি শিরা-মর্ষ আছে। উহারা বিদ্ধ হইলে সন্তোমৃত্যু হয়।

"জবেগার" প্রয়োগে দক্ষিণদিকস্থ এবং "উন্টা জবেগার" প্রয়োগে বামদিকস্থ এই-সকল মর্ষ ছিন্ন হইয়া যায়।

১৬। হৃদয়মর্ষ একটি :—

বক্ষের মধ্যে স্তনঘয়ের মধ্যস্থল হৃদয় নামে অভিহিত। উহার অধোভাগে আমাশয়ের দ্বার; ইহা সব রক্ত ও; তমোগুণের অধিষ্ঠান; তথায় কমল-মুকুলাকার অধোমুখ এবং চতুরঙ্গুল-পরিমিত "হৃদয়" নামক শিরামর্ষ অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সন্তোমৃত্যু হয়। "সাণ্ড" "উন্টা সাণ্ড" প্রভৃতির প্রয়োগে হৃদয়মর্ষ বিদ্ধ হইয়া যায়।

১৭। নাভিমর্ষ একটি :—

পকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে চতুরঙ্গুল-পরিমিত শিরাপ্রভব "নাভি"-মর্ষ অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সন্তোমৃত্যু হয়।

"চির" "হুল" "উদর" "সাণ্ড" "উন্টা সাণ্ড" প্রভৃতির প্রয়োগে নাভিমর্ষ ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হয়।

১৮। বস্তিমর্ষ একটি :—

মূত্রাশয়ের অধোদেশে একটি মূষ আছে; তথায় অন্ন-মাংস-শোণিত-বিশিষ্ট চতুরঙ্গুল-পরিমিত "বস্তি"

নামক স্নায়ু-মর্ষ অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সন্তোমৃত্যু হয়; কিন্তু উভয় দিক ভেদ না হইলে অক্ষরী রোগ হেতু ক্ষতে মৃত্যু হয় না। একদিকে ক্ষত হইলে তাহা দ্বারা মূত্রস্রাব হইয়া থাকে এবং যত্নপূর্বক সূচিকিৎসিত হইলে ক্ষত বন্ধ হইয়া যায়।

"কোমরকাট" "ভাগুর কাট" "সাণ্ড" "উন্টা সাণ্ড" "চির" প্রভৃতির প্রয়োগে বস্তিমর্ষ ছিন্ন হইয়া থাকে।

১৯। পায়ুমর্ষ একটি :—

স্থলান্তের (উদরস্থিত প্রধান নাড়ীর) শেষভাগে নিবদ্ধ, বায়ু ও পুরীষের নিঃসারক, চতুরঙ্গুল-পরিমিত পায়ু নামক মাংসমর্ষ অবস্থিত; ইহা বিদ্ধ হইলে সন্তোমৃত্যু হয়।

"চির" "কোমরকাট" "ভাগুরকাট" "সাণ্ড" "উন্টা সাণ্ড" প্রভৃতির প্রয়োগে "পায়ুমর্ষ" ছিন্ন হইয়া যায়। অধিকস্ত বাম বক্ষের অভ্যন্তরে তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত (অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ) যে স্থানের স্পন্দন বাহ্যতঃ অল্পভূত হয়, তথায় বিদ্ধ হইলেও সন্তোমৃত্যু হয়।

"আনি" "মন" "কলপ" "হিমাএল" "মোঢ়া" প্রভৃতির প্রয়োগে ঐ স্থান বিদ্ধ কিম্বা ছিন্ন হইয়া থাকে।

কালান্তরপ্রাণের মর্ষতালিকা :—

১-৫। সীমস্ত মর্ষ পাঁচটি :—

মস্তকাস্থির যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহা "সীমস্ত-মর্ষ" নামে অভিহিত। উহারা প্রত্যেকটি চারি-অঙ্গুলী-পরিমিত। উহাদের কোন-একটি অভিহিত হইলে উন্মাদ-ভয় বা চিন্তনাশ হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

"শির" "সাণ্ড" "চক্রিকা" "উন্টা শির" "উন্টা সাণ্ড" "উন্টা চক্রিকা" প্রভৃতির প্রয়োগে এই-সমস্ত মর্ষগুলি পৃথক পৃথক আহত হয়।

৬-৭। অপলাপ মর্ষ দুইটি :—

অংসকূটঘয়ের (স্বক্ষসীমান্তের উচ্চ অংশঘদের) নিম্নে এবং পার্শ্বঘয়ের উপরিভাগে অর্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অপলাপ" নামক এক-একটি শিরামর্ষ আছে। উহারা অভিহিত হইলে রক্ত পুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে।

“মোটর” প্রয়োগে দক্ষিণ অপলাপ ও উন্টা মোটার প্রয়োগে বাম অপলাপ অভিহিত হইয়া থাকে।

৮—৯। অপসৃত্ত মর্ষ দুইটি :—

বকের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত বাতবহা ‘অপসৃত্ত’ নামক দুইটি শিরামর্ষ অবস্থিত। উহারা অভিহিত হইলে কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হইয়া শ্বাস-কালে কালাস্তরে প্রাণহরণ করে।

“জিগরের” প্রয়োগে দক্ষিণ ও ‘কলপেদ্র’ প্রয়োগে বাম অপসৃত্ত বিদ্ধ হইয়া থাকে।

১০—১১। স্তনরোহিত মর্ষ দুইটি :—

প্রত্যেক স্তন-চূচকের দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “স্তনরোহিত” নামক একএকটি মাংসমর্ষ অবস্থিত, উহারা অভিহিত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া কাশ ও শ্বাসে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

“মোটর” প্রয়োগে দক্ষিণ ও “উন্টা মোটার” প্রয়োগে বাম স্তনরোহিত ছিন্ন হইয়া থাকে।

১২—১৩। স্তনমূল-মর্ষ দুইটি—

প্রত্যেক স্তনের নিম্নে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত “স্তন-মূল” নামক এক-একটি শিরামর্ষ অবস্থিত। উহারা অভিহিত হইলে কোষ্ঠ কফে পূর্ণ হইয়া কাশ ও শ্বাসে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

“মোটর” “মন” ও “আনির” প্রয়োগে বামস্তনমূল এবং “উন্টা মোটার” “দে” ও “দক্ষিণ আনির” প্রয়োগে দক্ষিণস্তনমূল ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হইয়া থাকে।

১৪—১৫। বৃহতী-মর্ষ দুইটি :—

স্তনমূলের সহিত সমস্ত্রে স্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “বৃহতী” নামক দুইটি শিরামর্ষ অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে অধিক রক্তস্রাব-হেতু রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রবসমূহ উপস্থিত হইয়া কালাস্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

“আনি,” “পৃষ্ঠ-উত্তর” প্রভৃতির প্রয়োগে “বাম বৃহতী” এবং “দক্ষিণ আনি” “পৃষ্ঠ-দক্ষিণ” প্রভৃতির প্রয়োগে দক্ষিণ বৃহতী-মর্ষ অভিহিত হইয়া থাকে।

১৬—১৭। পার্শ্বসন্ধি-মর্ষ দুইটি—

জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধ এবং জঘন-

পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যে তিষ্ঠ্যগ্ভাবে উর্দ্ধদিকে জঘনকে আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “পার্শ্বসন্ধি” নামক দুইটি শিরামর্ষ অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়াতে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

“অকের” প্রয়োগে দক্ষিণ পার্শ্বসন্ধি এবং “উন্টা-অকের” প্রয়োগে বাম পার্শ্বসন্ধি অভিহিত হইতে পারে।

১৮—১৯। নিতম্বমর্ষ দুইটি :—

শ্রোণিকাণ্ডের উপর উভয় পার্শ্ব-মধ্যে প্রতিবন্ধ মলাশয়াদ্ধাদক অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত “নিতম্ব” নামক দুইটি অস্থিমর্ষ অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে অধঃশরীরে শুষ্কতা ও দৌর্বল্য হওয়াতে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

“অকের” প্রয়োগে দক্ষিণ নিতম্ব এবং “উন্টা অকের” প্রয়োগে বাম নিতম্ব ছিন্ন হইতে পারে।

২০—২৩। ক্ষিপ্ৰমর্ষ চারিটি :—

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তাহার নিকটস্থ অঙ্গুলী, এই উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ-অঙ্গুলী-পরিমিত “ক্ষিপ্ৰ” নামক শিরামর্ষ অবস্থিত। এইরূপ অপর হস্তে একটি এবং পদদ্বয়ে দুইটি ‘ক্ষিপ্ৰ’ মর্ষ আছে। ইহারা বিদ্ধ হইলে কালাস্তরে প্রাণবিয়োগ হয়। ক্ষিপ্ৰমর্ষ অভিহিত হইলে কদাচিৎ সজোমৃত্যুও ঘটয়া থাকে।

“ঠোক্-এর” প্রয়োগে হস্তস্থিত ক্ষিপ্ৰ মর্ষ অভিহিত হইয়া থাকে।

২৪—২৭। তলমর্ষ চারিটি :—

মধ্যমাঙ্গুলীর সমস্ত্রপাতে হস্ততলের ‘মধ্যস্থলে’ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “তল” (তলহৃদয়) নামক মাংসমর্ষ অবস্থিত। এইপ্রকার অপর হস্তে একটি এবং দুই পদে দুইটি “তলমর্ষ” আছে। ইহারা অভিহিত হইলে যাতনা সহ কালাস্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

“ছাপ্কার” প্রয়োগে হস্তস্থিত এবং “পাগ” “উন্টা পাগ” “পোস্ৎপা” “উন্টা পোস্ৎপা” প্রভৃতির প্রয়োগে পাদস্থিত তলমর্ষ ছিন্ন হইয়া থাকে।

২৮—৩১। ইন্দ্রবস্তিমর্ষ চারিটি :—

প্রকোষ্ঠের [মণিবন্ধ ও কফোণির (কহুইর) মধ্যস্থ বাহু-ভাগের] মধ্যদেশে করতলের দিকে উভয় হস্তে এক

একটি করিয়া অর্ধাঙ্গুল-পরিমিত ‘ইন্দ্রবস্তি’ নামক মাংসমর্ষ অবস্থিত। এইরূপ পার্শ্বের (পাদের পশ্চাদিকৃষ্ণ সর্বনিম্ন অংশের) দিকে ১৩ অঙ্গুলীর মধ্যে অবস্থিত জজ্বা-মধ্যে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত এক-একটি করিয়া উভয় পদে দুইটি ইন্দ্রবস্তি মর্ষ আছে। ইহারা অভিহত হইলে শোণিত ক্ষয় হইয়া কাণাস্তরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

‘হাতকাটি’ ও ‘শূন্যবাহী’ প্রয়োগে পরস্পর পৃথক পৃথক দক্ষিণ ও বাম হস্তের এবং ‘জজ্বা’ ও ‘পিণ্ডির’ প্রয়োগে পদের ‘ইন্দ্রবস্তি’ মর্ষ অভিহত হইয়া থাকে।

বৈকল্যকর মর্ষতালিকা

১—৪। কূর্চমর্ষ চারিটি :—

উভয় পদের ক্ষিপ্ৰমর্ষের তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধে নিম্ন ও উপর উভয় ভাগেই চতুরঙ্গুল-পরিমিত ‘কূর্চ’ নামক এক-একটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ষ অবস্থিত। এইরূপ উভয় হস্তের ক্ষিপ্ৰমর্ষেরও দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে এক-একটি কূর্চমর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে পদ অথবা হস্ত ঘুরিয়া যায় এবং কাঁপিতে থাকে।

‘ধুনিয়া করক’ ও ‘পালট’ দ্বারা পদের এবং ‘ঠোক’ ‘হাতকাটি পূর্ক’ প্রভৃতি দ্বারা হস্তের কূর্চ-মর্ষ অভিহত হয়।

৫—৬। জাহ্নুমর্ষ দুইটি :—

উভয় জজ্বা ও উরুর সন্ধিস্থলে তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত ‘জাহ্নু’ নামক এক-একটি বৈকল্যকর সন্ধি-মর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে খঞ্জতা হয়।

‘দিগর’ এবং ‘চাপনির’ প্রয়োগে জাহ্নু-মর্ষ অভিহত হয়।

৭—৮। কূর্পর-মর্ষ দুইটি :—

উভয় প্রকোষ্ঠ এবং প্রসণ্ডের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ কনুইঘয়ে একাঙ্গুলি-পরিমিত ‘কূর্পর’ নামে এক-একটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে সঙ্কচিত-বাহ্যমধ্যে (কুণি, হুলো) হইয়া থাকে।

অবস্থা-বিশেষে ‘হাতকাটি’ ও ‘ভর্জার’ প্রয়োগে দক্ষিণ এবং ‘শূন্যবাহী’ ও ‘ভূজের’ প্রয়োগে বাম কূর্পর-মর্ষ অভিহত হয়।

৯—১২। আনি-মর্ষ চারিটি :—

জাহ্নুর তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধে উপরিভাগে ও নিম্নভাগে অর্ধাঙ্গুল-পরিমিত ‘আনি’-নামক বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ষ অবস্থিত। এইরূপ উভয় বাহ্যতে ও কক্ষোণির উর্দ্ধে এক-একটি করিয়া আনি-মর্ষ আছে। ইহারা অভিহত হইলে শোণের অতিবৃদ্ধি এবং সন্ধির (সমগ্র পদের) অথবা হস্তের স্কন্ধতা হয়।

‘উর্টা সাকেনের’ প্রয়োগে দক্ষিণ পদের ও ‘সাকেনের’ প্রয়োগে বাম পদের এবং অবস্থা-বিশেষে ‘ভর্জা’ কিম্বা ‘ভূজের’ প্রয়োগে হস্তের আনি-মর্ষ অভিহত হয়।

১৩—১৬। উর্বা-মর্ষ চারিটি :—

উরুদ্বয়ের মধ্যে দুইটি এবং প্রগণ্ড-কক্ষোণি (কনুই) অবধি কক্ষপুট (বগল) পর্যন্ত বাহ্যভাগ] দ্বয়ের মধ্যে দুইটি,—এই চারিটি, এক-অঙ্গুলী-পরিমিত ‘উর্বা’ নামক বৈকল্যকর শিরা-মর্ষ আছে। ইহারা অভিহত হইলে সন্ধি (সমগ্র পদ) অথবা বাহ্য স্কন্ধ হইতে থাকে।

‘আসর’ এবং ‘উর্টা সাকেনের’ প্রয়োগে দক্ষিণ পদস্থ এবং ‘উর্টা আসর’ ও ‘সাকেনের’ প্রয়োগে বাম পদস্থ, আবার ‘ভর্জার’ প্রয়োগে দক্ষিণ হস্তের ও ‘ভূজের’ প্রয়োগে বাম হস্তের উর্বা-মর্ষ অভিহত হইতে পারে।

১৭—২০। লোহিতাক্ষ-মর্ষ চারিটি :—

উর্বা-মর্ষের উর্দ্ধে ও বক্ষণ সন্ধির (কঁচকির) নিম্নে উরুমূলে একাঙ্গুল-পরিমিত ‘লোহিতাক্ষ’ নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ষ আছে। এইরূপ হস্তদ্বয়ের মূল ভাগে ও কক্ষপুট-সন্ধির নিম্নে দুইটি লোহিতাক্ষ মর্ষ আছে। ইহারা অভিহত হইলে রক্তক্ষয় দ্বারা পক্ষাঘাত ও উরুদেশের অথবা বাহ্য অবসন্নতা হয়।

‘অঙ্কর’ প্রয়োগে দক্ষিণ উরুসন্ধির এবং ‘উর্টা অঙ্কর’ প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষসন্ধির এবং ‘ফাঁকর’ প্রয়োগে বাম কক্ষসন্ধির লোহিতাক্ষ-মর্ষ অভিহত হইয়া থাকে।

২১—২২। বিটপ মর্ষ দুইটি :—

উভয় বক্ষণ (কুঁচকি) ও বৃষণের মধ্যে এক-অঙ্গুল-পরিমিত “বিটপ” নামক এক একটি বৈকল্যকর স্নায়ু-মর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহিত হইলে বৈকল্যবিশেষ জন্মে।

“অঙ্কর” প্রয়োগে দক্ষিণ এবং “উন্টা অঙ্কর” প্রয়োগে বাম বিটপ মর্ষ অভিহিত হয়।

২৩—২৪। কক্ষধর-মর্ষ দুইটি :—

উভয় কক্ষ (বগল) এবং বক্ষের মধ্যস্থলে একাঙ্গুল-পরিমিত “কক্ষধর” নামক এক-একটি বৈকল্যকর স্নায়ু-মর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহিত হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

অবস্থা বিশেষে “মোটী” ও “উন্টা ফাঁকের” প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষধর এবং “উন্টা মোটী” ও “ফাঁকের” প্রয়োগে বাম কক্ষধর অভিহিত হইয়া থাকে।

২৫—২৬। কুকুন্দর-মর্ষ দুইটি :—

বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে জঘনের বহির্ভাগে অর্থাৎ পৃষ্ঠ-বংশের উভয় পার্শ্বে কটির পশ্চাৎভাগের নাতিনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত ঈষন্মিলাকার (গঠাকৃতি) “কুকুন্দর” নামক বৈকল্যকর দুইটি সন্ধিমর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহিত হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শশক্তি হানি এবং কর্শ্চেষ্টা লোপ হইয়া থাকে।

২৭—২৮। অংসফলক-মর্ষ দুইটি :—

পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে “ত্রিক” সঙ্ঘ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “অংসফলক” নামক বৈকল্যকর দুইটি অস্থিমর্ষ অবস্থিত। (গ্রীবা এবং অংশদ্বয়ের সংযোগস্থল অর্থে “ত্রিক”)। উহারা অভিহিত হইলে হস্তদ্বয় নিম্পন্দ অথবা শুষ্ক হইয়া থাকে।

“পৃষ্ঠ দক্ষিণের” প্রয়োগে দক্ষিণ এবং “পৃষ্ঠ উত্তরের” প্রয়োগে বাম অংসফলক-মর্ষ আহত হইতে পারে।

২৯—৩০। অংস-মর্ষ দুইটি :—

বাহুগর্ধ ও গ্রীবার মধ্যে (স্কন্ধদ্বয়ে) অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “অংস” নামক বৈকল্যকর দুইটি স্নায়ু-মর্ষ অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে রাহুস্তম্ভ অর্থাৎ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়া লোপ হয়।

“ইয়ক্কার” প্রয়োগে বাম এবং “উন্টা ইয়ক্কার” প্রয়োগে দক্ষিণ অংসমর্ষ বিদ্ধ হইয়া থাকে।

৩১—৩৪। নীলা-মর্ষ দুইটি ও মত্তা-মর্ষ দুইটি :—

কর্ণনালীর উভয়পার্শ্বে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত চারিটি ধমনী আছে; তন্মধ্যে এক-এক পার্শ্বে এক-এক নীলা ও এক-এক মত্তা। উহারা বৈকল্যকর শিরামর্ষ। ইহারা অভিহিত হইলে মুকতা, স্বরবৈকৃতি এবং রস-জ্ঞানের অভাব জন্মিয়া থাকে।

“অস্তুর” ও “উন্টা কণ্ঠার” প্রয়োগে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এবং “উন্টা অস্তুর” ও “কণ্ঠার” প্রয়োগে বাম পার্শ্বস্থ নীলা মত্তা অভিহিত হয়।

৩৫—৩৬। ফণ-মর্ষ দুইটি :—

ব্রাণ-মার্গের উভয় পার্শ্বে, অভ্যস্তুর বিবরণারের সহিত সঙ্ঘ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “ফণ” নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহিত হইলে ব্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

৩৭—৩৮। বিধুর-মর্ষ দুইটি :—

কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদিকের নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত ঈষন্মিলাকৃতি “বিধুর” নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ু-মর্ষ অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে বধিরতা হইয়া থাকে।

“তামেচার” প্রয়োগে বাম এবং “বাহেরাব” প্রয়োগে দক্ষিণ বিধুর-মর্ষ অভিহিত হইয়া থাকে।

৩৯—৪০। কুকাটিকা-মর্ষ দুইটি :—

মস্তক এবং গ্রীবার দুইটি সন্ধিতে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “কুকাটিকা” নামক দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ষ অবস্থিত। উহারা অভিহিত হইলে চলমূর্চ্ছতা (শিরঃকম্পন) হইয়া থাকে।

অবস্থাবিশেষে “হাল্কুম” এবং “উন্টা হাল্কুমের” প্রয়োগে দক্ষিণ কিংবা বাম কুকাটিকা-মর্ষ অভিহিত হইতে পারে।

৪১—৪২। অপাজ মর্ষ দুইটি :—

ক্রপুচ্ছাস্তদ্বয়ের নিম্নে, চক্ষুর বহির্ভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “অপাজ” নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহিত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে।

“ক্রকুটি” ও “উল্টা ক্রকুটির” প্রয়োগে এই মর্ষ দুইটি অভিহিত হইতে পারে।

৪৩—৪৪। আবর্ত-মর্ষ দুইটি :—

উভয় ক্রম উর্দ্ধদেশের নিম্নাংশ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “আবর্ত” নামক বৈকল্যকর এক-একটি সন্ধিমর্ষ অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে অক্ষতা বা দৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

“ক্রকুটি” এবং “উল্টা ক্রকুটির” প্রয়োগে এই মর্ষ দুইটি অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্ৰজাকর (কষ্টদায়ক ও পীড়াকর) মর্ষতালিকা।

১—২। গুল্ফ-মর্ষ দুইটি—

পদের যুক্তিকাঘরে অর্থাৎ পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত “গুল্ফ” নামক দুইটি পীড়াকর সন্ধিমর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহিত হইলে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে এবং কখন কখন স্তম্ভপাদতা, এমন কি ধ্বংসও হইতে পারে।

“পালট” “করক” “কুচ্” প্রভৃতির প্রয়োগে গুল্ফ-মর্ষ অভিহিত হইয়া থাকে।

৩—৪। মণিবন্ধ-মর্ষ দুইটি :—

উভয় করপল্লব ও প্রকোষ্ঠের [কফোপি (বহুই) হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগের] সন্ধিস্থলে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত এক-একটি পীড়াকর সন্ধিমর্ষ অবস্থিত। ইহারা অভিহিত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয় এবং কখন কখন হস্তের স্তম্ভতাও হইতে পারে।

“হাতকাটি অধঃ” “হাতকাটি পেশ” “হাতকাটি পোস্ত” ও “হাতকাটি পূর্ব” প্রভৃতির প্রয়োগে মণিবন্ধ-মর্ষ বিভিন্ন পার্শ্বে অভিহিত হইতে পারে।

৫—৮। কুর্চশিরা-মর্ষ চারিটি—

গুল্ফসন্ধির (পাদসন্ধির) অধোভাগে, উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক পদে দুইটি করিয়া এক-এক-অঙ্গুলী-পরিমিত কুর্চশিরা নামক চারিটি পীড়াকর “স্নায়ুমর্ষ” আছে। ইহারা অভিহিত হইলে যাতনা ও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

“করক” “পালট”, “ধুনিয়াপালট” “ধুমিয়াকরক” ‘কুচ্’ প্রভৃতির প্রয়োগে বিভিন্ন পার্শ্বে এই মর্ষগুলি অভিহিত হইতে পারে।

বিশল্যন্ন মর্ষ-তালিকা।

১—২। উৎক্ষেপ-মর্ষ দুইটি :—

শঙ্খঘরের উপরিভাগে কেশপ্রান্তে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত “উৎক্ষেপ” নামক দুইটি বিশল্যন্ন স্নায়ুমর্ষ অবস্থিত। উহারা শল্যাভিহিত হইলে, যতক্ষণ শল্য উদ্ধৃত না হয় ততক্ষণ রোগী জীবিত থাকে, ক্ষত পাকিয়া শল্য পতিত হইলেও রোগী জীবিত থাকে, কিন্তু *জ্বাদি দ্বারা কিম্বা বলপূর্বক শল্য উদ্ধৃত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

৩। স্থাপনী-মর্ষ একটি :—

ক্রমঘের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত স্থাপনী নামক একটি বিশল্যন্ন শিরামর্ষ অবস্থিত। উহা বিদ্ধ হইলে পূর্বোক্ত “উৎক্ষেপ”-মর্ষ-বিচ্ছেদে ত্রায় ফল হইয়া থাকে।

“ক্রকুটি” ও “উল্টা ক্রকুটির” প্রয়োগে স্থাপনী-মর্ষ অভিহিত হইয়া থাকে।

মর্ষস্থলসম্পর্কে যে-সমস্ত সাস্থ্যিক আঘাতের উল্লেখ হইল তাহা সমস্তই অসির আঘাত বৃত্তিতে হইবে। লাঠির আঘাতে অধিকাংশ মর্ষস্থলই ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

সামাজিক শ্রমশক্তি ও তাহার ব্যবহার

কোনো কারখানায় যে-সকল লোক কাজ করে তাদের মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক হচ্ছে যারা অল্প সকলকে মাইনে দিয়ে রাখে অর্থাৎ নিযোজ্য বা কর্তা, ও আর-এক হচ্ছে যারা মাইনে নিয়ে কাজ করে

অর্থাৎ নিযুক্ত বা কর্মী। কর্তা যে মাইনে দেয় তা আসলে উৎপাদিত ভোগ্যের অংশ মাত্র। তার মানে এই নয় যে কাপড় তৈরী হ’লে প্রত্যেক কর্মী এক কি দুই বা পাঁচ গজ কাপড় মাইনে হিসাবে পায়; কাপড় সবই টাকায় বিক্রি

হয় এবং টাকাতাই মাইনে দেওয়া হয়। এমন উদাহরণ অবশ্য দেওয়া যায় যেখানে মাইনে সম্পূর্ণ বা অংশত দ্রব্য দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণত মাইনে টাকাতাই দেওয়া হয়। দ্রব্য মাইনে দেওয়া অনেক দেশে আইন অনুসারে নিষিদ্ধ এবং তাতে শ্রমজীবী বা কর্মীর স্বেচ্ছাই হয়; কেননা প্রথমতঃ শ্রমজীবী বা কর্মী, কর্তা বা নিযোক্তার চেয়ে অল্পবুद्धি লোক বলে' গ্রায্য মাইনে তাকে না দেওয়ার চেষ্টা নিযোক্তা করে' থাকে এবং দেয়ও না। তার উপর যদি মাইনে নানাধকার দ্রব্য দেওয়া যায় তা হ'লে কর্তার ঠকাবার আরও অনেক স্বেচ্ছাই হয়ে যায়। উৎপন্ন দ্রব্য যদি কাপড় হয় এবং মাইনে যদি চাল ও ডালে দেওয়া যায়, তা হ'লে কোনো সময় সমাজে কাপড়ের দাম বেড়ে গেলে ও চাল-ডালের দাম কমে' গেলে এবং মাইনে (অর্থাৎ চাল-ডাল) আগের সমান থাকলে শ্রমজীবীর প্রাপ্যের কম পাওয়ার আশঙ্কা আছে। মাইনে টাকায় পেলে অন্ততঃ এক টাকার মূল্যের (অর্থাৎ কিন্বার ক্ষমতার) কম-বেশীর ফলে যা ঠকাবার সম্ভাবনা তাই থাকে। সাধারণভাবে টাকার কিন্বার ক্ষমতা কমে' গেলে যে দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমজীবীরা সাহায্য করে তার বদলেও বেশী টাকা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শ্রমজীবীর আসল মাইনে (অর্থাৎ উৎপন্নের অংশ) সমানই রাখতে হ'লে টাকায় মাইনে বাড়া দরকার। এইজন্য অনেক দেশে শ্রমজীবী সমাজগুলি (trade unions) বিশেষ করে' টাকার কিন্বার ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নজর রাখে এবং অনেক স্থলেই মাইনে এমনভাবে দেওয়া হয় যে টাকার কিন্বার ক্ষমতা কমে' গেলে সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে যায়। শ্রমজীবীরাই বা কর্মীরাই সাধারণত সমাজের দরিদ্র অংশের অঙ্গ; কাজেই তাদের আয় যদি অস্থির হয় তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, ধনীরা আয় অস্থির হ'লে যত কমে তার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় কমে' যায়।

তার পর আর-একটি কথা হচ্ছে এই যে, যদি কোনো ব্যবসায় উৎপন্ন দ্রব্যের দাম অল্প-সব দ্রব্যের তুলনায় বেড়ে যায় তা হ'লে সে ব্যবসায়ের কারুবার-কর্মীদের কর্তাদের লাভ হয় আগের চেয়ে বেশী।

এখন এই উপরি-লাভের অংশ কর্মীরা পাবে কিনা? পেলে সবটাই পাবে, না কিয়দংশ পাবে? এবং কি পরিমাণে পাবে? কর্তারা অবশ্য বলবেন যে, ক্ষতি যদি হঠাৎ হয় তা হ'লে আমরাই সেটা ঘাড়ে করি—সুতরাং লাভ হ'লেও আমরাই সেটা নেব। অর্থাৎ থেকে থেকে যে বেশী লাভ হবে সেটা থেকে থেকে কম লাভ হওয়ার ক্ষতিপূরণ মাত্র। কথাটা বিস্তৃত ঠিক খাটি সত্য নয়। কারণ কম লাভ বা ক্ষতি যখন কোনো ব্যবসায় হয় তখন শ্রমজীবীদের অনেকেরই কাজ যায় বা অনেকেই অল্প কাজ পায়। এক কথায় কাপড়ের বাজার খারাপ হ'লে কাপড়ের মহাজনদের আয় কমে মাত্র (আয় একদম বন্ধ কম মহাজনেরই হয়, কারণ অনেকেরই আয়ের অল্প উপায় থাকে), কিন্তু শ্রমজীবীর বা কর্মীর আয় অনেক স্থলে একদমই বন্ধ হ'য়ে যায়, এবং অনেক স্থলেই কমে' যায়। তার উপর স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে দেখলে দেখি যে ২০ টাকার রোজগার ১০ টাকা হ'য়ে গেলে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য-হানি হয় ১০,০০০ টাকার রোজগার ২০০০ হ'য়ে গেলে তার চেয়ে কম হয়। কাজেই লাভের অংশ কর্মীদেরও প্রাপ্য। সমস্তটা তারা পেতে পারে না, কেননা যে-ভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসার লাভ বাড়ে সেটা আসে কর্তাদের কাছ থেকেই এবং কর্তাদের লাভের আশা বন্ধ হ'য়ে গেলে লাভের চেষ্টাও কমে' যাবে। লাভের ভাগ কি-ভাবে করা হবে তা ব্যবসায়ের ও অন্যান্য নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে-সব ব্যবসায়ের উন্নতি করতে কর্মীরাও বিশেষভাবে সক্ষম সেইসব ব্যবসাতেই তাদের লভ্যাংশ বেশী হয়।

টাকার মাইনে ও আসল মাইনেতে যে তফাৎ আছে তা কতকটা বোঝা গেছে, কিন্তু আরও অনেক কথা আছে। আসল মাইনে নির্ধারণ শুধু টাকার কিন্বার ক্ষমতা দেখেই হয় না। কাজ করতে গিয়ে কষ্টের কম-বেশীও এর মধ্যে পড়বে। অর্থাৎ কাজ করতে গিয়ে কর্মীর স্বাচ্ছন্দ্যের যা ক্ষতি হয় তার সঙ্গে মাইনের দ্বারা যে-পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার তুলনা করে' তবে আসল মাইনে ঠিক হবে। মাইনের টাকায় যদি কম ভোগ্য কিন্তে পাওয়া যায়

তা হ'লে অল্প অবস্থা সব অপরিবর্তিত থাকলে আসল মাইনে কমেছে, ধ্বংস হ'বে। তেমনি যদি মাইনে সমানই থাকে আর কাজ আগের চেয়ে বেশী সময় বা অসময়ে করতে হয় তা হ'লেও আসল মাইনে কমল, ধ্বংস হ'বে; কেননা বেশী কষ্টজনক কাজ করে' সমান মাইনে পাওয়া ক্ষতির চিহ্ন। আগে যদি শ্রমজীবীকে জোর পাঁচটার উঠতে হ'ত আর এখন যদি ৪টার উঠতে হয়, আগে যদি কারখানায় পাখা, খাবার জল, পরিচ্ছন্নতা দুর্গন্ধনাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকত আর এখন যদি না থাকে তা হ'লে সে-সব ক্ষেত্রে মাইনের টাকা এবং তার কিন্বার ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকলেও শ্রমজীবীর অবস্থা খারাপ হয়েছে বা আসল মাইনে কমেছে, ধ্বংস হ'বে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, টাকার মাইনে বা সামাজিক আয়ের অংশ দরিদ্রের সমান থাকলেও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য অল্প দিক দিয়ে কমেতে পারে এবং দরিদ্রের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বলেই এদিকে বেশী নজর দেওয়া দরকার। সামাজিক শ্রমশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে বা বাড়াতে হ'লে শ্রমজীবীদের জীবন-যাত্রার (standard of living) দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। অধিক সময় কাজ করা, শিশু বয়সে কাজ করা, সন্তান-পালনে অবহেলা করে' স্ত্রীলোকের কাজ করা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কাজ করা ইত্যাদি নানা কারণে সমাজের শ্রমশক্তি কমে' যায় এবং তার উপর স্বাচ্ছন্দ্য সাক্ষাৎভাবেও ক'মে যায়।

শ্রম করলে বিশ্রামের প্রয়োজন। যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম না করলে শ্রমশক্তি কমে' যায়। ৮ ঘণ্টা শ্রম করে' যদি ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম যথেষ্ট হয় তা হ'লে ১০ ঘণ্টা কাজ করলে ১০ ঘণ্টার চেয়ে বেশী বিশ্রাম দরকার হয়। অর্থাৎ শ্রমের সময়ের তুলনায় বিশ্রামের প্রয়োজন বেশী হারে বেড়ে চলে। এবং ফলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাজ করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রাম-পাওয়া বলে না। যেমন ১০ ঘণ্টা কাজ করলে যদি ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার হয় এবং ১২ ঘণ্টা কাজ করলে যদি ১৫ ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার হয়, তা হ'লে যে, শ্রমজীবীরা ১২ ঘণ্টা কাজ করে'

তাদের পক্ষে যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ এই গ্রহেতে সম্ভব নয়; ২৭ ঘণ্টায় দিন হয় এমন গ্রহ একটি তাদের জন্তু খুঁজে' বের করা দরকার।

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শ্রমজীবীই অত্যধিক সময় কাজ করে। ফলে তাদের শ্রমশক্তি ও জীবন শক্তি ক্রমশঃ কমে' যায় এবং শেষে হয় অকালমৃত্যু। বেশী সময় কাজ করলে যে কাজ বেশী হয় তা নয়। ৮ ঘণ্টা ভাল করে' ও ক্ষুর্তির সঙ্গে কাজ করলে যা কাজ হয়, ১২ ঘণ্টা অসাড়াভাবে ও কপাল চাপড়ে অদৃষ্টকে গাল দিয়ে কাজ করলে তার চেয়ে কাজ কম হওয়ারই সম্ভাবনা। মানুষ শুধু দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নয়, দ্রব্য উৎপাদনও মানুষের জন্য, এই কথাটা মনে রাখা সব সময় দরকার। অর্থাৎ মানুষ দ্রব্য বা ভোগ্য উৎপাদনের উপায় ও উদ্দেশ্য দুই-ই। কাজেই যে-ভাবে কাজ করলে তার শরীর মন অসাড়া হ'য়ে যায় এবং ভোগে সুখ থাকে না ও অকালমৃত্যু ঘটে সে-ভাবে কাজ করে' উৎপাদন বেশী হ'লেও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে দেখলে তা করা উচিত নয়, এবং বৈজ্ঞানিক-ভাবে যখন প্রমাণ করা যায় যে বেশী সময় কাজ করলে কাজ কম হয়, তখন ত আরও উচিত নয়। তা ছাড়া শ্রমজীবীকে যদি যন্ত্র হিসাবেই ধরা যায় তা হ'লে দেখি যে যে-যন্ত্র মাত্র কুড়ি বছর কাজ দেয় তার চেয়ে যে-যন্ত্র তিরিশ বছর কাজ দেয় তার মূল্য বেশী, যদি না প্রথম যন্ত্র দ্বিতীয়ের দেড়গুণের বেশী কাজ দেয়। দিন ৮ ঘণ্টা কাজ করলে যা কাজ হয় ১২ ঘণ্টা করলে বিজ্ঞান বলছে তার চেয়ে কমই হয়। কাজেই দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করে' কেউ ৮ ঘণ্টা কাজ করার দেড় গুণ কাজ দেবে এ-আশা বাতুলের আশা। কেউ বলবেন, আমরা দেখি ৮ ঘণ্টায় যা কাজ পাই ১২ ঘণ্টায় তার চেয়ে বেশী পাই। কিন্তু তা তাঁরা পান সচরাচর ১২ ঘণ্টা কাজ করিয়ে এইপ্রকার শ্রমজীবীর কাছ থেকে। কম সময় কাজ করিয়ে বেশী বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে কেউ দেখেছেন কি? কম সময় কাজ করান শুরু করলে গোড়ার দিকে কিছু দিন কম কাজ পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু সেটা শীঘ্রই কেটে যায়।

তা ছাড়া মাইনে দেবার বন্দোবস্ত এমনভাবে করা উচিত যে যথেষ্ট কাজ না দিলে মাইনে কমে' যায়। ফলে কম সময়ে বেশী কাজ করার চেষ্টা বাড়ে এবং বিশ্রাম ও আগে ছুটি পাবার আশায় শ্রমশক্তি বেড়ে মাইনে সে-চেষ্টা সফলও হয়।

অবশ্য শুধু সময়ের দিকটা দেখলেই হয়না। যা মাইনে দেওয়া হয় তাতে স্বাচ্ছন্দ্য থাকা যায় কি না তাও দেখতে হবে। অল্লাহার ও নিকুঠে বাসস্থান ইত্যাদির জন্তে শ্রমশক্তি কমে' থাকে। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। তা হ'লে সে-সব দোষ দূর করতে হবে। জীবন-যাত্রা একটা নির্দিষ্ট ভাবের চেয়ে নিকুঠে হ'লে শ্রমশক্তি ও উৎসাহ কমে' যায়। সেইপ্রকার জীবন-যাত্রার মধ্যে কি কি পড়ে তা বলতে গেলে মোটামুটি বলা যায়—যথেষ্ট খাবার, পরিষ্কার ও মাহুষের বাসের পক্ষে যথেষ্ট বড় বাসস্থান এবং শীত ও লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত কাপড়-চোপড়। মাইনে অল্প অল্প করে' বাড়তে শুরু করলে কাজও অল্প অল্প করে' বেশী পাওয়া যাবে। অবশ্য অনেক কাল জানোয়ারের মত থাকার ফলে, বেশী মাইনের টাকা কন্সীরা মদ খেতে লাগতে পারে সেইজন্য বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা যথাসম্ভব কর্তাদের করে' দেওয়া উচিত এবং মাইনে বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বন্দোবস্ত করাও উচিত। এতে শ্রমশক্তিও বাড়ে আর মনের উৎকর্ষও হয়। ফলে সামাজিক আয়ও বাড়ে এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়ে।

কর্তা ও কর্মীতে ঝগড়া ও প্রসন্নতা
এই ব্যাপারটা আজকাল খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে' দাঁড়িয়েছে। আজ এখানে ধর্মঘট কাল ওখানে কারখানার কর্মীদের তাড়িয়ে দেওয়া। সব সময়ই প্রায় জগতের কোন-না-কোন জায়গায় কর্তা ও কর্মীতে ঝগড়া লেগে আছে। শ্রমশক্তি জিনিসটি এমনই যে অল্প উপকরণের মত এ স্বাধীন নয়। শ্রমশক্তি সময়ের অধীন। অর্থাৎ কিছু কয়লা বা তুলা বা চাল, আজ না কাজে লাগুক কাল কাজে লাগান যায়। আজ দরে না পোষালে' কাল রেখে বেচা যায়। কিন্তু শ্রমশক্তি আজ ব্যবহার না করে' কাল ছ'দিনের শ্রমশক্তি একদিনে কাজে লাগান

যায় না। আজ বা এই মাসে মাইনেতে না পোষালে কাল বা আগামী মাসে সব শক্তি জমিয়ে রেখে কর্তাকে (মাইনের) সুবিধা দরে দেওয়া যায় না। মূলধনও যতদূর কার্যশক্তির জন্তে ব্যবহৃত হয় ততদূর শ্রমশক্তির সঙ্গে তার স্বভাব একই অর্থাৎ মূলধন যতরূপে যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে তার মূল্য বা কার্যকারিতা সময়ের অধীন। অর্থাৎ ছাপাখানার কল এক মাস বন্ধ রেখে দ্বিতীয় মাসে একসঙ্গে ছ' মাসের কাজ তার কাছ থেকে আদায় হয় না। কাজেই ধর্মঘট বা শ্রমজীবী-বিতাড়ন (প্রথমটির অর্থ শ্রমজীবীদের বেরিয়ে আসা আর দ্বিতীয়টির অর্থ তাদের বের করে' দেওয়া) যে কারণেই হোক, উৎপাদন বন্ধ হ'য়ে গেলে সামাজিক আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এর দরুন অনেক শ্রমশক্তি ও কার্যশক্তির অপব্যয় হয়। তা ছাড়া অনেক কাল অলস-ভাবে কাটালে শ্রমজীবীদের কর্মকুশলতা কমে' যায় এবং অশ্রান্ত কু-অভ্যাসও তাদের মধ্যে ঢুকতে পারে। নানা কারণে ধর্মঘট ও শ্রমজীবী বিতাড়ন অনেক সময় অনিবার্য হ'য়ে পড়ে' কিন্তু নিজের কথা রাখার জেদই বহু-ক্ষেত্রে এর কারণ। কাজেই সমাজের কর্তব্য ঐ জাতীয় গোলমালের নিষ্পত্তির বন্দোবস্ত করা। দেশের গণ্যমান্য লোকদের দ্বারা গঠিত বিবাদ-নিষ্পত্তি-সভা, কি সরকারী বিবাদ-নিষ্পত্তি আদালত, কি কর্তা ও কর্মীদের মনোনীত সভ্যের দ্বারা গঠিত কমিটি ইত্যাদি যাই হোক, বিবাদ-নিষ্পত্তির বন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিরূপে বিবাদ-নিষ্পত্তি বা-নিবারণ হ'তে পারে তার আলোচনা করার স্থান নেই; কাজেই এখানে এর বেশী কিছু বলা যায় না।

আমরা দেখলাম যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য এমন একটি ব্যাপার নয় যাতে মাহুষের কোনো হাত নেই। মাহুষের কোনো হাত নেই এমন কারণে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়তে কমে'তে পারে বটে, কিন্তু তা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে মাহুষ নিজের চেষ্টায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়তে কমাতে পারে না! এমন কি সত্য বলতে গেলে, মাহুষের চেষ্টাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শক্তি। "কি করব, ভগবান্ আমাদের

গরম দেশের লোক করেছেন, কাজেই আমরা কাজ করতে পারি কম ;” এই জাতীয় কথাই কোনো মূল্য নেই। দক্ষিণ আমেরিকাও গরম দেশ এবং সেখানে লোকে ঠাণ্ডা দেশের লোকের চেয়ে কম কাজ করে না। সমবেত চেষ্টা ও শিক্ষার গুণে এই ভারতবর্ষের এমন অবস্থা হ’তে পারে যে, অল্প অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা দেশের লোকের চেয়ে আমাদের দেশের লোকের কর্মশক্তি বেশী হ’তে পারে। দেশটা গরম বলে’ আমাদের দেশের লোক কাজ করতে বা কষ্ট সহ করতে পারে না ; এ-কথাটা একটা বিরাট মিথ্যা। আমাদের অক্ষমতা আছে, এইরকম একটা ধারণা আমাদের থাকলে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য কমে’ যায় ; কাজেই, আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ভয়ের কারণ আছে এই মিথ্যা কথা বলে’ ও লিখে’ আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে দেবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা অনেকের আছে। এ মিথ্যার হাত থেকে বাঁচার উপায় সজাগ অবস্থায় চোখ খুলে’ থাকা ও নিজেকে না দেখে’ ও না বুঝে’ পরের কথা বিশ্বাস করব না এই ভাব পোষণ করা।

এই ভারতবর্ষে অর্ধসাহসী রোগ-রিলিষ্ট লোককে দিচ্ছে- বাতেরা অণ্টা কাজ করে। ইংলণ্ডে রেসের ঘোড়ার মত যত্নে-পালিত শ্রম-জীবী প্রাসাদতুল্য আরামদায়ক কারখানায় দিনে ১৫ ঘণ্টা কাজ করে, তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। গরম দেশে কাঁচ-কমতা কমে-বটে, কিন্তু সবচেয়ে কমে চরিত্র-দোষে, পারিতোষ ও শিক্ষার দোষে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের এমন কিছুই কি দেয়নি, যার জোরে আমরা গরমের বন্ধনকে ছিড়ে’ ফেলে’ শ্রমশক্তির অতুল উদাহরণ জগৎকে দেখাতে পারি? সামাজিক শক্তির অপব্যয় নিবারণ ও সদ্যবহার করতে হ’লে সমাজের নিজের কাজ নিজে করার অধিকার দরকার ; সমাজের সকলের চিন্তাশক্তি প্রথর করে’ তোলা দরকার ; তার উপায় শিক্ষা। বর্তমান ভারতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষণ।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

বেনো-জল

চকিষণ

আনন্দ-বাবু যা ভয় করেছিলেন, তাই-ই হ’ল। কলকাতায় এসেও রতনের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষটা হতাশ হ’য়ে আনন্দ-বাবু বললেন, “রতন নিজে না ধরা দিলে আমরা তাকে আর ধরতে পারব না।”

পূর্ণিমা অভিমান-ভরা গলায় বললে, “রতন-বাবুকে আর খুঁজতে হবে না, বাবা ! আমরা কোন দোষে দোষী নই, তাঁকে আত্মীয়ের মত ভালোবাসতুম, তবুও এত সহজে তিনি আমাদের ত্যাগ করলেন ! যাবার সময়ে একবার দেখাও ক’রে গেলেন না ! বেশ, আমরাও আর তাঁর কথা ভাবব না—এতই বা গরজ কিসের আমাদের ?”

আনন্দ-বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “পূর্ণিমা, এই কি তোমার মনের কথা ?”

—“হ্যাঁ, এই আমার মনের কথা !”

—“না, তোমার মনের কথা আমি জানি, তুমি অভিমান ক’রে এ কথা বলছ—নইলে রতনকে ফিরে’ পাবার জন্তে আমার চেয়ে তুমি কিছু কম ব্যাকুল নও।”

পূর্ণিমা বাপের দিকে পিছন ফিরে, দাঁড়িয়ে অকারণে টেবিলের উপরটা ঝাড়তে লাগল।...

আনন্দ-বাবু যেন নিজের মনে-মনেই বললেন, “মায়া জানে—সে মায়াবী ! আজ কী মায়ার ফাঁদে আমাদের বেঁধে’ রেখে চ’লে গেল, এখন আর মুক্তি পাবার কোন উপায়ও ত দেখছি না !”

দিন-পনেরো পরে বিনয়-বাবুও সপরিবারে কলকাতায়

কিরে' এলেন। আনন্দ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবার মাত্র বিনয়-বাবু তাড়াতাড়ি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "রতনের কোন খবর পেয়েছ'?"

আনন্দ-বাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না।

বিনয়-বাবু একটু চিন্তিত্বেরে বললেন, "আনন্দ, আমি কি কন্ব-বুঝতে পারছি না ভাই! রতন চ'লে যাওয়ার পর থেকেই স্মিত্রা যেন কেমন এক-রকম হ'য়ে গেছে। সর্বদা মুখ বিষম্ব ক'রে থাকে, ঘরের কোণ ছেড়ে' বেরতে চায় না, কারুর সঙ্গে কথা কয় না,—আমার বড় ভাবনা হচ্ছে, শেষটা কোন শক্ত অস্থে না পড়ে! রতনের অভাবটা যে সে এমনভাবে অস্থতব করবে, এ সন্দেহ ত আমি কোনদিনই করি-নি! এখন উপায় কি?"

আনন্দ-বাবু অনেককণ স্তর হ'য়েইলেন, তাঁর বুঝতে দেরি লাগল না যে, স্মিত্রা রতনকে ভালোবাসে!..... একবার এদিকে-ওদিকে পাইচারি ক'রে শেষটা তিনি বললেন, "কোন উপায়ই নেই! এখন যদি রতনকে পাওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকত না বটে, কিন্তু রতন এমন অস্থতবাসে গেছে, যে, কিছুতেই আমি তার সস্থান ক'রে উঠতে পারলুম না!"

মিঃ চ্যাটো ঘরের এক কোণে এতক্ষণ চূপ ক'রে ব'সে ছিলেন। এখন তিনি মুখ টিপে একটুখানি হেসে বললেন, "মিঃ সেন যখনি বেনো-জল ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, তখনি আমি বুঝেছিলাম, যে, তিনি এমনি বিপদে পড়বেন।"

কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গপূর্ণ কৌতূকের উত্তরে বিনয়-বাবু বা আনন্দ-বাবু কিছুই বললেন না।

একটু পরে বিনয়-বাবু বললেন, "আনন্দ, আর-একটা কথা তুমি শোন-নি বোধ হয়। আমি স্থির করেছি, এই মাসেই স্থনীতির বিবাহ দেব।"

আনন্দ-বাবু বললেন, "কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে?"

—"হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা ছিল বিবাহটা আরো কিছুদিন পরে হয়। কিন্তু কুমার-বাহাদুর আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।"

—"কেন, তাঁর এতটা তাড়াতাড়ি কিসের?"

মিঃ চ্যাটো বললেন, "কুমার-বাহাদুর পরের মাসে বিলাত যাবেন।"

আনন্দ-বাবু কেবলমাত্র বললেন, "বটে!".. ..

দিন-পাঁচেক পরে একদিন সকালে আনন্দ-বাবু সমাগত রোগীদের পরীক্ষা করছেন, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোকটি বললেন, "এখানে কি বাবু রতনকুমার রায় ব'লে কেউ থাকেন?"

আনন্দ-বাবু একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, "হ্যাঁ, রতন-বাবু আমার বন্ধু বটে, কিন্তু এ বাড়ী ত তাঁর নয়, এখানে তিনি কোন কালেই থাকেন না।"

—"এটা যে তাঁর বাড়ী নয়, আমিও তা জানি। কিন্তু যে মেসে তিনি থাকতেন, সেখানকার লোকেরা বলে, এখানে এলেই আমি রতন-বাবুর খবর পাব।"

—"রতন-বাবুর সঙ্গে আপনার কি দ্বন্দ্ব?"

—"বিশেষ দ্বন্দ্ব, মশাই! আর এ দ্বন্দ্ব আমার চেয়ে রতনবাবুর নিজেরই বেশী। আমি তাঁর অ্যাটর্নির বাড়ী থেকে আসছি!"

অত্যন্ত বিস্ময়ত্বেরে আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "রতনের কোন অ্যাটর্নি আছেন নাকি? কৈ, এ কথা ত আমি শুনি-নি!"

—"কুমারপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তি রতন-বাবু পেয়েছেন। সেই সুরেন্দ্রই সুরেন্দ্র-বাবুর অ্যাটর্নির কাছ থেকে আমি এসেছি। রতন-বাবু বোধ হয় সুরেন্দ্র-বাবুর মৃত্যুসংবাদ এখনো শোনেন-নি।"

আনন্দ-বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুরেন্দ্র-বাবু কি রতনের মাতুল ছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কিন্তু আমি ত জানতুম, রতনের এক মামাতো ভাই আছে।"

—"হ্যাঁ। কিন্তু সুরেন্দ্র-বাবুর মৃত্যুর পরে এক হস্তার মধ্যেই তাঁর নাবালক পুত্র কলেরা রোগে হঠাৎ মারা পড়েছেন। সুরেন্দ্র-বাবুর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে এখন কেবল রতন-বাবুই বর্তমান।"

অভিভূতকণে আনন্দ-বাবু বললেন, "অভাবনীর

ব্যাপার!.....কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এমন খবর শোনার সঙ্গে রতন এখানে হাজির নেই।”

—“রতন-বাবু কোথায় আছেন?”

—“কেউ তা জানে না! আমাদের সঙ্গে তিনি পুরী গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকেই একেবারে নিরুদ্দেশ হয়েছেন!”

লোকটি হতাশভাবে বললেন, “মশাই, আজ ক’দিন ধরে চারিদিকেই রতন-বাবুকে খুঁজছি। এত ক’রে যদিও বা তাঁর সম্বন্ধ পেলাম, তবু তাঁকে পেলাম না। এ বড় মুন্সিলের কথা! এখন উপায়?”

—“উপায় আর কি, আপনাদের ঠিকানা রেখে যান, রতনের দেখা পেলেই সব কথা তাঁকে জানাব।”

অগত্যা ভদ্রলোক আনন্দ-বাবুর কথামত কাজ ক’রেই বিদায় হ’লেন।

আনন্দ-বাবু নিজের মনে-মনে বললেন, “তা হ’লে আর তো রতনের অজান্তবাসে থাকবার কোন দরকার নেই। নিজের দারিদ্র্যের গর্কেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার বিশ্বাস, আমরা ধনী ব’লেই তাকে অবহেলা করি। কিন্তু এখন তো আর সে গরীব নয়, এখন সে হয়তো আমাদের চেয়েও ঢের বেশী টাকার মালিক। অদ্ভুত সৌভাগ্য! এ খবরটা জানতে পারলে তার মনের ভাব কি-রকম হ’বে তা কে জানে? সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে, না দেশে গিয়ে নূতন পথে নূতন ভাবে জীবন শুরু করবে?”

এমন সময়ে পূর্ণিমা ভিতর-দিক্কার দরজা দিয়ে উকি মেরে বললে, “বাবা, তোমার কুগীরা চ’লে গেছেন তো একলাটি ওখানে ব’সে আছ কেন? বাইরের ডাক থাকে তো এইবেলা যাও, নইলে কিব্বতে দেরি হয়ে যাবে যে!”

আনন্দ-বাবু ব’লে উঠলেন, “পূর্ণিমা, পূর্ণিমা’, আজ এক মস্ত সুখের পেয়েছি! চল, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে সব কথা বলছি, শুনে তুই অবাক হ’বি!” বলতে বলতে তিনি বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন।

এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে আবার এক অভাবিত ব্যাপার! আনন্দ-বাবু বৈকালে রোগীদের দেখতে যাবার সঙ্গে পোষাক পরছেন, এমন সময়ে পূর্ণিমা একখানা চিঠি হাতে ক’রে ঘরে ঢুকে বললে, “বাবা, চিঠিখানা

এইমাত্র এল—উপরের ঠিকানাটা যেন রতন-বাবুর হাতের লেখা ব’লে মনে হচ্ছে, ছাপ রয়েছে কটকের ডাকঘরের।”

আনন্দ-বাবু ব্যগ্রভাবে চিঠিখানা নিয়ে, খুলে ফেলেই উচ্ছ্বসিত স্বরে ব’লে উঠলেন, “হ্যাঁ রে পূর্ণিমা, রতনই চিঠি লিখেছে বটে—দেখি, দেখি, কি লিখেছে!”

চিঠিখানি এই :—

সম্মাননীয়েষু—

অনেক দিন পরে আবার আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। একটি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি লিখছি, নইলে আজও আপনাকে প্রণাম করবার সুযোগ পেতুম না। এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই কলকাতায় ফিরে গেছেন ভেবে, কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখলাম। এ চিঠি আমার বিনয়-বাবুকে লেখাই উচিত ছিল। কিন্তু পাছে তিনি ভাবেন, যে, আমি যেচে তাঁর সঙ্গে আবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করছি, সেইজন্যে আপনাকেই সকল কথা জানানো ছাড়া উপায় নেই।

বিনয়-বাবুর কাছে আমি নানা বিষয়ে উপকৃত আছি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের ভাব অবশ্য খুব প্রীতিকর নয়; তা হ’লেও তাঁর উপকার ভুলে’ গেলে আমার পক্ষে ঠিক মনুষ্যোচিত কাজ হ’বে না। এইজন্যেই একটি বিষয়ে আমি তাঁকে সাবধান ক’রে দিতে চাই। আমার হয়ে আপনি তাঁকে আমার কথা জানাবেন।

কটকে আমি আমার এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয়ে আছি। এই বন্ধুরই চেষ্টায় আমি এখানকার এক প্রবাসী বাঙালী পরিবারে গৃহ-শিক্ষকের পদ পেয়েছি। এঁরা পাঁচদীঘি গ্রামের জমিদার—বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে কটকে আছেন।

এঁদের পরিবারে একটি আশ্রিত লোককে দেখলাম, তাঁর চেহারা প্রায় নরেন-বাবুর মত—যাকে আপনারা ‘কুমার-বাহাদুর’ ব’লে জানেন। আমি এই চেহারার সাদৃশ্যের কথা তোলাতে জানতে পারলাম যে, নরেন-বাবু এঁর সহোদর হন। এঁর কাছে নরেন-বাবুর স্বহস্তে নাম লেখা ফোটা পর্যন্ত আমি দেখেছি। কথা-প্রসঙ্গে আরো শুনলাম যে, নরেন-বাবুরা পাঁচদীঘির জমিদারের খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, আর গরীব ব’লে এঁদেরই আশ্রিত। তাঁর ‘কুমার-বাহাদুর উপাধিটা একেবারেই

কল্পিত। এই কল্পিত উপাধির জোরে নরেন-বাবু নাকি কোথায় একবার লোক ঠকিয়ে টাকা জোগাড় করেছিলেন, আর সেইজন্মেই নাকি এই জমিদার-পরিবার থেকে বিভাড়িত হয়েছেন।

ব্যাপারটা সত্য কি না বিনয়-বাবুকে খোঁজ নিতে বলবেন। নইলে তাঁর হাতে কল্পাসম্প্রদান করলে, একটি নিষ্পাপ বালিকার সর্বনাশ করা তো হ'বেই, তা ছাড়া তাঁকে নিজেকেও চিরদিন অন্নতপ্ত হ'তে হ'বে। তাঁকে সাবধান করা কর্তব্য ব'লেই আপনাকে সব কথা জানালুম।

আপনাদের সঙ্গে আসবার সময় দেখা ক'রে আসি-নি ব'লে আপনারা নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু কি জন্মে আমি বিদায় নিয়েছি, তার কারণ আপনি অবশ্যই শুনেছেন। আমার মত কল্পিত লোককে আশ্রয় দিয়ে বিনয়-বাবু নিজেকেই শেষে ভীত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক, যে, আপনিও হয়ত আমার সংসর্গ পছন্দ করবেন না। এই সঙ্কোচেই আপনার সঙ্গে দেখা করি-নি। যদি অস্তায় হয়ে থাকে কমা করবেন।

অথচ আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই। আমি যে-মেসে থাকতুম, সেখানকার চারজন যুবক ডাকাতীর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যদিও তাদের চরিত্রের কথা আমি কিছুই জানতুম না। তবু পুলিশ মিথ্যা সন্দেহে আমাকেও গ্রেপ্তার করে। পরে প্রমাণ অভাবে আমি মুক্তি পেলেও পুলিশের শুভদৃষ্টি এখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

এ পৃথিবীতে আমার মতন হতভাগ্য খুব কমই আছে। আমি নিজেকে মানসিক ও দৈহিক হিসাবে সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে উন্নত ব'লে মনে করি। প্রতিভা না থাক, আমার শক্তি আছে—কিন্তু সে শক্তি নিয়ে কোনোদিকেই আমার জীবনকে আমি সফল করতে পারি-নি এবং তার একমাত্র কারণ দারিদ্র্য। গরীব ব'লেই আমি এত অসহায় হয়ে সকলের পিছনে প'ড়ে আছি।

অথচ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে,

একেবারেই যে নিগূর্ণ সেও দেশের মধ্যে সকল বিভাগেই নাম কিন্ছে, কেবলমাত্র টাকার জোরে। অমুক বাবু মস্তবড় 'এডিটর',—কারণ তাঁর টাকা আছে; অতএব খবরের কাগজ প্রকাশ ক'রে নিজেকেই তার সম্পাদক হয়ে বসেছেন—যদিও এক লাইনও লিখতে পারেন না। অমুক বাবু রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা শাসন-পরিষদে একজন মাথাওয়ালা লোক—যে-হেতু তিনি ধনী সন্তান, অতএব মাহিনা দিয়ে শিক্ষিত গরীব কর্মচারী রেখে নিজের বক্তৃতাগুলি লিখিয়ে নেওয়া খুবই সহজ। বলব কি, আজ মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য-রূপে যারা দেশের নেতা হ'য়ে উঠেছে এবং ত্যাগের বুলি আউড়ে সকলের চোখেই তাক লাগিয়ে দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকই কেবলমাত্র টাকার জোরেই নেতা। আমি এদের অনেককেই ভালো ক'রেই চিনি,—বাইরে এরা খদ্দের ছদ্মবেশ পরলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। কাগজে পড়বেন এদের কেউ কেউ দেশের কাজে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার টাকা দান করেছে। অথচ খোঁজ নিলে জানবেন, এরা এক পয়সাও না দিয়ে দাতা ব'লে বিখ্যাত! এরা নাকি মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগী শিষ্য! হ্যাঁ, খদ্দের পরলেই যদি সব দোষ মাপ হয়, তা হ'লে এরা গান্ধীজীর শিষ্যই বটে! কিন্তু এদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেই দেখবেন, মদ ও সিগারেট থেকে শুরু ক'রে সব জিনিষই বিলাতী। সামান্য বিলাতী সিগারেট ছাড়বার শক্তিও যার নেই, সেও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গান্ধীজীর নাম নিয়ে নেতা হয়ে সারা দেশের উপরে হুকুম চালাচ্ছে! আমি মিথ্যা বলছি না বা অত্যাক্তি করছি না। একে একে এদের অনেকেরই নাম আমি প্রকাশে বলতে পারি। তবু দেশের লোক অঙ্ক কেন? ভোটযুদ্ধে এই ভগুরাই জয়মালা পায় কেন? কারণ এরা ধনী সন্তান! এদের ট'য়াক থেকে একটা কাণা কড়িও দেশের লোকের ভোগে লাগবে না, তবু এদের পকেটের ঝন্ঝমানি শুনেই সকলে মোহিত হ'য়ে থাকে—টাকার এমনি মহিমা! টাকার আওয়াজ শুনে লোকে গাধার ডাককেও তান-সেনের গান ব'লে মেনে নিতে আপত্তি করবে না। ধনী হাজার দোষ থাকলেও কেউ তা আমোলে আনবে না।

আমি গরীব। ধনীকে আমি ঘৃণা করি। কারণ আমাদের যা প্রাপ্য, নিঃশর্ত হ'য়েও কেবলমাত্র টাকার জোরে তারা আমাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়। অথচ এই কাঞ্চন-কৌলীণ্যের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ ঘোষণা ক'রেও ধনীদেব সিংহাসন আমরা একটুও টলাতে পারছি না। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র—যে তন্ত্রই হোক, সর্বত্রই কোন না কোন আকারে কাঞ্চন-কৌলীণ্য বিরাজ করবেই কবুবে—এসিয়া, যুরোপ ও আমেরিকা—সব দেশেই এ ব্যাপার আছে।

বিফলতার পর বিফলতার ধাক্কা মন আমার ভেঙে গেছে। আর আমার দেশে ফিরতে সাধ নেই, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি বিসর্জন করেছি। স্থির করেছি, বাকি জীবনটা লক্ষ্যহীনের মত দেশ-বিদেশে ঘুরে' ঘুরে' কাটিয়ে দেব। আপনারা আমাকে যতই স্নেহ করুন, আমি কিন্তু নিজেকে কিছুতেই আপনাদের সমকক্ষ ব'লে ভাবতে পারব না—সমাজও আমাদের মিলনকে সদয়চক্ষে দেখবে না। অতএব আমার পক্ষে তফাতে থাকাই ভালো।

আশা করি, আপনি আর পূর্ণিমা দেবী ভালো আছেন। পূর্ণিমা দেবীকে বলবেন যে, তিনি আমাকে চা খেতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে শিক্ষা আমি ভুলে' গেছি। তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন।

ইতি

ভবদীয়

রতনকুমার রায়।

আনন্দে অধীর হ'য়ে আনন্দ-বাবু পত্রখানা ছ-তিন বার পাঠ করলেন।

পূর্ণিমা বললে, “বাবা, রতন-বাবুকে এখনি লিখে' দাও যে, কি-ক'রে চা খেতে হয়, আমি আবার নতুন ক'ঙ্গে তাঁকে শেখাতে রাজি আছি।”

আনন্দ-বাবু বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ,—এখনি লিখে' দিচ্ছি। পূর্ণিমা, নিয়ে আয় কাগজ,—নিয়ে আয় কলম।”

আনন্দ-বাবু লিখলেন—

“স্নেহাস্পদ রতন,

আমার একান্ত ইচ্ছা, এই পত্র পাবা-মাত্র তুমি

মোটমার্ট বেঁধে যেন কলকাতার টিকিট কিনতে দেরি না কর। অন্তর্ধান মহম্মদই পর্কতের কাছে যেতে বাধ্য;— এই বুড়ো বয়সে আমাকে আর কটকে' টেনে নিয়ে ফেঁপে না।

দেখছি ধনীদেব উপরে তোমার রাগ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এবারে নিশ্চয়ই তোমাকে জোখ-সংবরণ করতে হবে—অন্ততঃ চক্ষুলাঙ্কার অমুরোধে। কারণ, তুমি এখন নিজেকে ধনী-সমাজের অন্তর্গত এবং এ খবর জানলে তুমি নিশ্চয়ই ও-রকম চিঠি লিখতে পারতে না।

কুমারপুরে তোমার যে মামা থাকতেন, তিনি পরলোকে গেছেন। তোমার মাতুলের একমাত্র সন্তানও ইহলোকে নেই। কাজেই তুমিই সমস্ত অমিলারির মালিক হয়েছ।

অতএব নিজের দারিদ্র্যের জন্ত তোমাকে কল্পনায় আর সঙ্কচিত হ'তে হবে না। সাক্ষাতে সব কথা বলব, শীঘ্র চলে' এস।

তোমার অপেক্ষায় রইলুম। ইতি।”

পঁচিশ

সেদিনের ছপুর-বেলাটা কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। স্মিত্রার মনে হ'ল, গ্রীষ্মের অসহ উত্তাপে-সময় যেন আজ মূচ্ছিত হ'য়ে পড়েছে! চুপ ক'রে শুয়ে থাকতেও তার ভালো লাগছিল না, বই পড়তেও ভালো লাগছিল না।

শেষটা নাচার হ'য়ে অনেক দিন পরে সে আবার তুলি রং, পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে বসল। কিন্তু কাগজের উপরে গোটাকতক রেখা টেনেই স্মিত্রা বুঝলে যে, তার হাতের সে-নিপুণতা আর নেই। পেন্সিল ও কাগজ টেনে ফেলে' দিয়ে সে আবার ইন্ডি-চেয়ারের উপরে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

স্মিত্রার চেহারা আশ্চর্য-রকম বদলে গেছে। ব্যর্থপ্রমে মাহুষের চেহারা যে খারাপ হ'য়ে যায়, এ-কথা যারা কবি-কল্পনা ব'লে ভাবেন, তাঁরা স্মিত্রাকে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, কথাটা খুবই সত্য। স্মিত্রা

আগেকার চেয়ে রোগা হ'য়ে ত গেছেই—বিশেষ ক'রে মলিন হ'য়ে গেছে তার সেই জ্যোৎস্নার মতন স্নিগ্ধমধুর তাজা লাবণ্যটুকু ।- চোখের তলায় কালো কালো দাগ স্পষ্ট ক'য়ে উঠেছে এবং কপোলের গোলাপী আভাও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে । তার যে-মুখ আগে হাসি-খুসিতে উজ্জল হ'য়ে থাকত, সে-মুখে এখন সর্বদাই কেমন-একটা শ্রান্ত বিরক্তির ভাব মাধান থাকে ।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকেই স্মিত্রা আবার উঠে দাঁড়াল । তার পর ঘরের যে একটিমাত্র জানুলা খোলা ছিল, সেটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল ।

একটু পরেই দরজা খুলে সন্তোষ এসে ঘরে ঢুকে' ব্যস্তভাবে বললে, “স্মি, ওঠ, ওঠ !”

স্মিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, “কেন ?”

—“রতন-বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন !”

স্মিত্রা কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখিয়ে আস্তে আস্তে উঠে' বসল । রতন যে কাল কলকাতায় ফিরেছে আর সে যে এখন মস্ত বড় জমিদারির মালিক, এ-খবর স্মিত্রা আগেই শুনেছে । কিন্তু রতন যে আবার তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, এটা সে মোটেই ভাবে-নি । সন্তোষের দিকে তাকিয়ে স্মিত্রা সন্দেহপূর্ণ স্বরে বললে, “দাদা, রতন-বাবু কি নিজেই আমাদের বাড়ীতে এসেছেন ?”

—“না, আমি আর বাবা আনন্দ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে' এনেছি ।”

—“রতন-বাবু তা হ'লে পূর্ণিমাদের বাড়ীতে এসেই উঠেছেন ?”

“হ্যাঁ ।.....আমি ঘাই, রতন-বাবুকে এখানে পাঠিয়ে দিই । ততক্ষণে ঘরের জানুলা তুই খুলে দে, ভারি অন্ধকার”—বলতে বলতে সন্তোষ বেরিয়ে গেল ।

কিন্তু স্মিত্রা উঠলও না, ঘরের জানুলাও খুলে' দিলে না । স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল ।

খানিক পরেই রতন এল । ঘরের ভিতরে ঢুকে'ই সহজ স্বরে সে বললে, “একি স্মিত্রা ! অন্ধকারে ব'সে আছ কেন ?”

—“আলো ভালো লাগছে

—“তুমি ভালো আছ ত ?”

—“হ্যাঁ ।”

এত দিন পরে দেখা, অথচ স্মিত্রার এই চাঞ্চল্য-হীন উদাসীন ভাব-ভঙ্গী, এই নীরস সংক্ষিপ্ত উত্তর রতনের কাছে কেমন অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল । রতন ভেবেছিল, সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই স্মিত্রা প্রশ্নের পর প্রশ্নে ও চটুল বাচালতার ঠিক আগেকার মতোই তাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুলবে ।.....একটু বিস্মিত হ'য়ে রতন একখানা চেয়ার টেনে এনে স্মিত্রার সামনে গিয়ে বসল । তার পর ভালো ক'রে তাকে দেখে'ই সে ব'লে উঠল, “স্মিত্রা ! তোমার এ কী চেহারা হ'য়ে গেছে !”

স্মিত্রা মাথা নামিয়ে নিরস্তর হ'য়ে রইল ।

—“নিশ্চয় তোমার অস্থখ করেছে !”

—“না ।”

—“অস্থখ করে-নি ত তুমি এমন শুকিয়ে গেছ কেন ?”

—“জানি না”—ব'লে স্মিত্রা শ্রান্তভাবে চোখ মুদলে ।

রতন বুঝলে, তার সঙ্গে কথা কইতে স্মিত্রার ভালো লাগছে না । এর কারণ কি ?.....তার মনে পড়ল সেই শেষ-দিনের দৃশ্য ! তার পায়ের তলায় মাটির উপরে লুটিয়ে প'ড়ে স্মিত্রা সেদিন অশ্রুসিক্ত মুখে কী করণ আবেদনই জানিয়েছিল ! কিন্তু সে আবেদনে কর্ণপাত না ক'রে সে নিষ্ঠুর মত চ'লে এসেছিল ।.....স্মিত্রা কি তাই তার উপরে অভিমান ক'রে আছে ? কিন্তু স্মিত্রার বালিকামূল্য ভরল মনের উপরে অভিমান যে এমন স্থায়ী রেখাপাত করবে, এটা সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলে না ।

স্মিত্রা তখনো ইঞ্জিচেয়ারে হেলে প'ড়ে ছই চোখ মুদে' আছে । তার মুখের পানে খানিকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে রতন যত্নস্বরে ডাকলে, “স্মিত্রা !”

স্মিত্রার সাড়া নেই ।

—“স্মিত্রা, তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?”

স্মিত্রা ঘাড় নেড়ে জানালে, না ।

—“তবে ?”

—“আমার ভালো লাগছে না।”

—“কাকে, আমাকে ?”

সুমিত্রা ধীরে ধীরে চোখ খুললে। একটু চূপ করে থেকে বললে, “স্মদি তাই বলি, তা হ’লে ?”

রতন গভীরকণ্ঠে বললে, “তা হ’লে আমার দুর্ভাগ্য ব’লে মনে করব।”

—“কেন ?”

—“আমাকে ভালো না লাগার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাবি না। আমি তোমাকে আত্মীয়ের মতোই দেখি।”

সুমিত্রা তিক্তস্বরে বললে, “আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতন দেখেন, না পূর্ণিমাকে ?”

—“সুমিত্রা, কথাবার্তার মধ্যে পূর্ণিমাকে তুমি কি কখনো ভুলতে পারবে না ?”

—“কখনো না, কখনো না! আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতোই দেখেন বটে! তাই কটক থেকে চিঠি লিখেছেন পূর্ণিমাদের বাড়ীতে, এখানে এসে উঠেছেন পূর্ণিমাদের বাড়ীতে। বাবা নিজেকে যেচে ডাকতে না গেলে হয়ত আমাদের বাড়ীতে আজ আপনার পায়ের ধুলোও পড়ত না। রতন-বাবু, এ চমৎকার আত্মীয়তা! এখন আপনি জমিদার হয়েছেন, আমাদের আর মনে থাকবে কেন ?”

রতনের মুখ আরক্ত হ’য়ে উঠল। কোনোরকমে রাগ সামলে সে বললে, “সুমিত্রা, অবুঝ হোয়ো না। মনে করে দেখ, কি-ভাবে তোমাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম! তার পরও নিজেকে থেকে যেচে তোমাদের চিঠি লেখা বা তোমাদের বাড়ীতে আসা কি আমার পক্ষে শোভন হ’ত ?”

রতনের কথায় কর্ণপাতও না করে সুমিত্রা আবেগভরে বললে, “কিন্তু মনে রাখবেন, যে-দিন আপনি গরীব ছিলেন, সেইদিনই আমি ভিখারীর মত আপনার পায়ের তলায়—”

রতন বাধা দিয়ে বললে, “সুমিত্রা, সুমিত্রা! আগে গরীব ছিলাম ব’লে অনেকের কাছে অনেক অপমান সয়েছি। আবার, এখন ধনী হয়েছি ব’লেও কি সকলের কাছে আমাকে অপমান সহ্যেতে হবে ?”

সুমিত্রা সিধা হ’য়ে উঠে বসল। তীব্রস্বরে বললে, “কিন্তু আমাকেও আপনি কি অপমানটা করে গেছেন, তা কি আপনার মনে আছে ?”

রতন সবিস্ময়ে বললে, “আমি তোমাকে অপমান করেছি, সুমিত্রা ?”

—“হ্যাঁ, আপনি আমাকে অপমান করেছেন! আপনার পায়ের তলায় আমি পড়েছি, তবু আপনি মুখ ফিরিয়ে চ’লে গেছেন। নারীর এর চেয়ে বড় অপমান আর কি আছে, বলতে পারেন ? সেই দীনতার লাঞ্ছনার কথা মনে করলে লজ্জায় ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়! ২০, আজ দু-মাস ধ’রে যে কি যন্ত্রণাই আমি সহ্য করছি, আপনি তা বুঝতে পারবেন না, রতনবাবু!”

রতন স্তব্ধ হ’য়ে ব’সে রইল। তার পরে দুঃখিত্বস্বরে বললে, “সুমিত্রা, তোমার নারীত্বের উপরে আমার ঐশ্বর্য আছে ব’লেই সেদিন আমি তোমার কথা শুনি-নি,— তোমাকে অপমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশ, আমি না-জেনে যদি তোমাকে ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।”

সুমিত্রা আবার চেয়ারের উপর হেলে প’ড়ে দুই চোখ মুদে বললে, “এর জবাব আমি পূর্ণিমার কাছে আগেই দিয়েছি!”

—“পূর্ণিমার কাছে ?”

—“হ্যাঁ, আপনি কি শোনেন-নি ?”

—“না”।

—“এজীবনে আপনাকে আর আমি ক্ষমা করব না। আজ ধনী হয়েছেন ব’লে আবার আপনি এখানে এসেছেন, ভেবেছেন আপনার টাকা দেখে আমি অপমান ভুলে যাব ? তা নয় রতন-বাবু, অপমান আমি ভুলি না!..... আপনাকে ক্ষমা করব না।”

—“এই তোমার শেষ কথা ?”

—“হ্যাঁ”.....

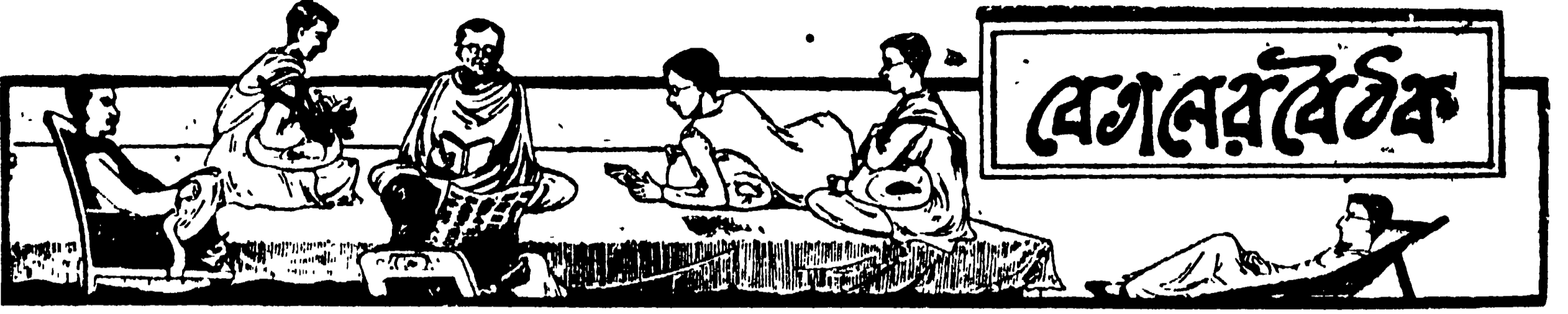
খানিকক্ষণ পরে সুমিত্রা চোখ খুলে দেখলে, ঘরের ভিতরে রতন নেই—নিঃশব্দে কখন উঠে গেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়



প্রায়ত্ত্বকা—মানাৎ



[এই বিভাগে চিকিৎসা-ও আইন-সংক্রান্ত প্রয়োত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজন দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনার সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সম্পদ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা একরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসার বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিবদ্ধ হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাহ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। স্মরণে যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৮৪)

বাংলা ভাষায় হসস্ত উচ্চারণ

বাংলা ভাষায় হসস্ত উচ্চারণের মূল কারণ কি? এ বিষয়ে করানী ভাষার প্রভাব কতদূর সাহায্য করিয়াছে?

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের হসস্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে হিন্দী ভাষার নিয়মগুলি একটু আলাদা। ইহার যথার্থ কারণ কি?

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মীমাংসা দেওয়া হয় নাই।

কোনো ভাষাতত্ত্ববিৎ মীমাংসা করিলে বাধিত হইব।

এলু-ভি রামস্বামী আয়ার

(১৮৫)

নব-আবিষ্কৃত অন্তর-মূর্তি

মানভূম জেলার বাগদা পরগণার অন্তর্গত নাগবিড়িয়া নামক গ্রামে বহু পুরাতন অন্তর-নির্মিত চারটি তথ্য মন্দির এবং একটি ৭ ফুট লম্বা উল্লম্ব অন্তর-মূর্তি সম্পূর্ণ অবিষ্কৃত অবস্থায় বর্তমান আছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ তাহাকে ভৈরব মূর্তি বলিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ছাগ বলি দিয়া পূজাদি করিয়া থাকে। প্রতিবৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সেখানে একটি মেলাতে বহু লোক-সমাগম হয়। মাড়োয়ারী সম্প্রদায় সেটিকে মহাবীরের মূর্তি বলিয়া ধারণা করিতেছেন। মূর্তিটির বহনমণ্ডল ও রক্ষঃহল অধিকল বুদ্ধদেবের অমুরূপ। স্থানীয় অধিবাসীগণ ইহার কোনো সঠিক ইতিবৃত্ত বলিতে পারে না।

এই মন্দির ও মূর্তিটি কাহার? কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী স্বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

(১৮৬)

মাস খাটান

এদেশে একটি খনার বচন প্রচলিত আছে :—

“আগে পাছে চাপ ধরু মীন অবধি তুলা।

মকর কুম্ভ বিচ্ছাদিয়া মাস খাটাইয়ে গেলা ॥”

প্রতিবৎসর পৌষ মাসের মধ্যেই ষড়্ ঋতুর ক্রীড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পৌষ মাসকে নির্ঘণ্ট (Index) করিয়া কৃষিবিদেরা আগামী বর্ষের ঋতু-পর্যায়ের কमी বেশী স্থির করিয়া থাকেন। উপরিউক্ত বচনটির অর্থ এই :—পৌষ মাসের প্রথম ১০ সওয়া দিন ও শেষ ১০ সওয়া দিন নিম্ন পৌষ মাসের লক্ষণ এবং চৈত্র হইতে কার্তিক পর্যন্ত প্রতিমাসে ২০ আড়াই দিন হিসাবে ২০ দিন, তৎপর মায় ২০ দিন ফাল্গুন ২০ দিন ও অগ্রহারণ ২০ দিন মোট ৩০ দিন ভোগ করিয়া গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত ছয়টি ঋতুই তাহাদের আগামী বর্ষের কার্যক্রম স্থিরা যায়। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহা প্রত্যেকেই বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিনা?

শ্রী মোহিনীমোহন দাস

(১৮৭)

ভরত ও লক্ষণ

ভরত ও লক্ষণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কে? আদি কবি বাণ্মীকি ভরতকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

ভরতো নাম কৈকেয়াং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ ।

সাক্ষাদ্বিষোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বেষঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥

অথ লক্ষণশত্রুয়ো স্মিত্রাহ্ননয়ৎ স্ততো ।

বীরো সর্বপ্রকুশলৌ বিকো রর্কসমস্থিতৌ ।

পুৰ্বো জাতস্ত ভরতো মীনলয়ে প্রসন্নধীঃ ।

সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রৌ কুলীরেছ্ছ্যাতিতে রবৌ ॥

রামায়ণ, আদি, ১৮ সর্গ, ১৩—১৫।

আবার কালিদাস লক্ষণকেই জ্যেষ্ঠের পদ দিয়াছেন—

পার্বিবীমুদবহু রঘুসহো লক্ষণস্তদমুজামধোর্দ্রিলাম্ ।

যৌ তন্নোরবরজৌ বরৌজসৌ তৌ কুশধ্বজস্তুতে স্তমধ্যমে ॥

রঘু, ১১সর্গ, ৫৪।

সৌমিত্রিণা তদনুসংসংজে স চৈনম্
উখাপ্য নত্র শিবসং ভূশমালিনত্র ।
স্বপ্নেপ্রজিতং প্রহরণত্রণকর্কশেন
ক্লিন্নক্লিকস্য ভূজমধ্যসুরঃস্থলেন ॥ রঘু, ১৩শ সর্গ। ৭৩ ।
ইহার মীমাংসা কি ?

শ্রী

(:৮৮)

মকর

আমাদের পুরাণ মতে গঙ্গার বাহন "মকর"। পঞ্জিকাতে গঙ্গার ছবিতে ও রাশিচক্রের ছবিতে এই মকর একটি শুঁড়ধারী বৃহৎ মৎস্য । কিন্তু একরূপ জীব কোনও দেশে বোধ হয় নাই। পূর্বে ছিল—এখন লোপ পাইয়াছে কি? গঙ্গার বাহন কি কাল্পনিক? মকরের প্রকৃত অর্থ ও রূপ কি?

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১৮৯)

গোবিন্দভাষ্য

বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বেদান্তদর্শনের ভাষ্য গোবিন্দভাষ্য নামে পরিচিত। উক্ত গোবিন্দভাষ্য কখনও ছাপা হইয়াছিল কিনা? ছাপা হইয়া থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়? যদি কাহারও নিকট এই গ্রন্থ থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া তিনি তাহার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিবেন।

শ্রী মাণিকলাল মণ্ডল

মীমাংসা

(১৫৪)

"দাস-ব্যবসায় বা ক্রীত-দাসপ্রথা"

শ্রী বলেন Slavery শব্দ Slava = glory শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইহা মূলতঃ একটি জাতিবাচক শব্দ মাত্র। একটি Greek verb (যাহার সহিত Latin Sero শব্দ সমার্থবোধক,) হইতে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। গিবনের মতে জাতিগত কর্তৃত্ব ধৃত এবং দাসত্বে নিয়োজিত স্রেষ্ঠ জাতিকে প্রথমতঃ Slaves বলা হইত এবং ঐ Slave শব্দ হইতেই বর্তমানকালের Slave শব্দ হইয়াছে।

দাসত্ব-প্রথার সর্বপ্রথম প্রচলন আমরা গ্রীসে ও রোমে দেখিতে পাই। হোমারের সময়ে গ্রীসে দাসত্ব প্রথা সুস্পষ্টভাবেই প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে ধৃত বন্দী ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত হইত। সময়ে সময়ে বলপূর্বক লোক ধরিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইত। গ্রোট বলেন হোমারের সময়ে ক্রীতদাসের অবস্থা তাদৃশ শোচনীয় ছিল না। গ্রীস দেশে নিম্নলিখিতভাবে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত।

(১) জয়গত—যথা ক্রীতদাসের সম্ভানসম্পত্তি।

(২) অ্যাটিকা ব্যতীত অন্যান্য স্থলে স্বাধীন পিতামাতাও সম্ভান বিক্রয় করিতে পারিত এবং ঐরূপে বিক্রীত সম্ভান ক্রীতদাস পর্যায়-ভুক্ত হইত। দরিদ্রতা হেতু অনেক ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীনতা অগ্নয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহার ক্রীত দাস হইত। এথেন্স নগরে সলোনের সময় পর্যন্তও নিঃস্ব অধর্মণ উত্তমর্ঘের দাস হইত।

যুদ্ধে ধৃত বন্দী বিক্রয়তার দাস হইত। জল-দহা কিংবা অগ্নির কেহ লোক ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। পণ্যভাবে অগ্নির দেশ হইতে দাস আমদানি করা হইত। ডিমস্‌থিনিস্ বলেন, গ্রীস দেশে ক্রীতদাসের অবস্থা তাদৃশ শোচনীয় ছিল না। বরং তাহার যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইত সেই পরিবারের প্রাণ্য সম্ভানের কিছুটার অধিকারী হইত। হোমারের মতে সাধারণ স্বাধীন দরিদ্র ব্যক্তি (যাহারা wretched class নামে বর্ণিত হইয়াছে) হইতে তাহাদের অবস্থা প্রায়তর ছিল। এরিষ্টোকেনিস্ ও প্রটাসের মতে ক্রীতদাসগণকে প্রায়ই বেত্রাঘাতে নির্যাতন করা হইত। এথেন্স নগরে অগ্নির কেহ ক্রীতদাসের প্রতি অন্ত্রায় করিলে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ছিল। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রভুর প্রতিকূলেও প্রতিকার পাইত। আগনার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিলে ক্রীতদাস স্বাধীনতা কিরিয়া পাইত। সময় সময় স্বেচ্ছাক্রমে প্রভুও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন। সর্বসাধারণের কোন বিশিষ্ট কার্য করিলে তাহারা স্বতঃ স্বাধীনতা লাভ করিত।

এরিষ্টটল্ বলেন, ক্রীতদাস প্রথা সমাজের পক্ষে দরকারী। জেনোকোনও এই মতের পোষকতা করেন। কেবল মাত্র ইউরিপিডিসের এই বিষয়ে একটু মতান্তর দেখা যায়।

রোমের বলেন, রোমে দাসত্ব প্রথা বহুবিস্তৃত-এবং সুগঠিত-ভাবেই ছিল। বর্তমান সাধারণ শ্রেণীও বোধ হয় রোমের এই দাসত্ব-প্রথা হইতে উপজাত হইয়াছে।

মসেনের মতে পূর্ব সময়ে রোমে দাসত্ব প্রথা তাদৃশ কঠোর ছিল না। প্রথমতঃ কেবল মাত্র যুদ্ধে ধৃত বন্দীই ক্রীতদাসরূপে নিয়োজিত হইত। হিউম বলেন, অতঃপর যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণ মাত্র দাসত্ব-প্রথা সীমাবদ্ধ না করিয়া পণ্যভাবে দাস বিক্রয় আরম্ভ হয়। এমন কি এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর একটা শুষ্ক পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। রোমের আইনে কোনো কোনো অপরাধে লোক স্বাধীনতা হারাইত। পিতা আপনার সম্ভানকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। উত্তমর্ঘ অধমর্ঘকে আপনার দাসরূপে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, কিংবা নগরের বাহিরে বিক্রয় করিতে পারিতেন। সেনেকা ক্রীতদাসের প্রতি কুব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ডাইয়োক্রিসিয়ান্ নানাভাবে ক্রীতদাস প্রথা নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন। দুর্ক্যবহার করিলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার ক্ষমতা নীরোর সময়ে ক্রীতদাসকে দেওয়া হয়। মার্কাস্ অরেলিয়ানসের সময় প্রভুর ক্রীতদাসকে শাস্তি দিবার ক্ষমতার ধর্মতা সাধন করা হয়। কন্সটেন্টাইনের সময়ে পুনরায় পিতাকে সম্ভান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। জাটিনিয়ানের সময়ে পুনরায় ক্রীতদাসকে নানা ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বর্তমান দাসত্ব প্রথা সর্বপ্রথম স্পেনদেশীয় উপনিবেশ হইতেই সংক্রমিত হয় এবং এণ্টামগনস্‌স্কে ইহার সর্বপ্রথম পঞ্চ-প্রদর্শক নামে অভিহিত করা বাইতে পারে। তাহার পর অর্থ-লোভে বশীভূত হইয়া স্পেনবাসীগণ আফ্রিকার "পোর্টুগিজিগের অধিকৃত স্থান হইতে স্বদেশে বহু নিখোঁকে আনয়ন করিত। হিস্পেনিয়োলার শাসকরূপে বখন ভেনডোকে প্রেরণ করা হয় তখন এইরূপ নিখোর বহু সম্ভানকে তথায় পাঠান হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে খনিতে কাজের জন্ত এইরূপ বহু নিখোঁ সম্ভানকে তথায় পুনরায় পাঠান হয়। রবার্টসন বলেন, রাজা চার্লস্ ক্রীতদাস সন্তুর্ভরাহ করিবার জন্ত অনুমতি প্রদান করেন। ইহার পূর্বে কলম্বাস দাসত্ব-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করিলে রাজা ইসাবেলা তাহা

নিবারণ করেন। এই প্রথা প্রচলনের জন্য Las basasও কিছুটা দায়ী। স্পেন দেশ হইতেই এই প্রথা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ব্যাপ্ত হয়।

ইংলণ্ডে জন হকিন্স ইহা সর্বপ্রথমে প্রচলন করেন। প্রথমতঃ ইংরেজ বণিকগণ স্পেনদেশীয় উপনিবেশসমূহে ক্রীতদাস সরবরাহ করিত। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে সর্বপ্রথম দাস বিক্রয় হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথার বিপক্ষে লোক-মত সূচিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই প্রথার বিপক্ষে মত প্রচার করেন :—বার্ণটার, স্মার্ট রিচার্ড টীল, সাদার্ন, পোপ, টমসন্, শেন্টোন, ডায়ার, স্ভাভেজ, কাউপার, টমাস ডে, টার্ন, ওয়ারবার্টন্, ইচিসন্, বীটি, জন ওয়েসলী, হোয়াইটফিল্ড, অ্যাডাম স্মিথ, মিলার, রবার্টসন্, ডাঃ জনসন্, পেলী, গ্রেগরী, গিলবার্ট ওয়েকফিল্ড; বিশপ প্রোটেস, ডিন টাকার। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জুন তারিখে লর্ড ম্যান্ডলিন্ড, সোমারসেট্, নামক নিগ্রোর বিচার করিয়া নির্ধারিত করেন যে ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্জ পদার্পণ মাত্রই ক্রীতদাসের দাসত্ব লোপ পাইবে।

ডেভিড হার্টলী কমন্স সভায় দাসত্বপ্রথা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পান।

সর্বপ্রথম কোয়েকরগণ এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। এই প্রথার সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদায় ব্যক্তিকে তাঁহারা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের দল হইতে বিতাড়িত করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রথার প্রতিরোধার্থে তাঁহাদের মধ্যে এক সংঘ গঠিত হয়। আমেরিকাতে জন উলম্যান ও অ্যাটর্নী বেনজেট্ ইহার বিপক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তথায় জেমস্ পেয়ার্টন্ ও ডাঃ বেঞ্জামিন্ রস্ এক সমিতি গঠন করেন। ঐ সমিতি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাঙ্কলিন্ এর নামকদমে অধিকতর বিস্তৃত হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পেকার্ড দাসত্ব প্রথার প্রতিকূলে লিখিত একটি রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। টমাস্ ক্রার্কসন্ এই রচনা লিখেন। এই রচনা লিখিবার পর কাঁথাক্ষেত্রে তিনি গেনভীল্ শার্প, উইলিয়াম ডিলন্ ও জেমস্ রায়সে-এর সহযোগিতা লাভ করেন। এই রচনাই পার্লামেন্টে দাসত্ব-প্রথার বিপক্ষে আন্দোলনের মূল কারণ। অতঃপর ক্রার্কসন্ উইলিয়াম্ উইলবারফোর্স্, ওয়েজুড্, বেনেট্ ল্যাংটন, মেকলে, ক্রহান্, জেমস্ স্কিফেন প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী লোকের সহায়তা লাভ করেন। মিঃ গিট্ পার্লামেন্টে এই বিষয় পেশ করেন। আমেরিকাতে দাসত্ব প্রথা নিবারণ-আন্দোলনের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পথপ্রদর্শক :—বেঞ্জামিন্ লাভি, গ্যারিসন্, লাভলস্, কিলিপ্, স্যামাস ও ব্রাউন।

১৯২৩ ইং ২৫শে অক্টোবর তারিখের ক্লিক্সার্ড পত্রিকায় প্রকাশ যে যদিও দাসত্বপ্রথা আর প্রচলিত নাই বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তথাপি পৃথিবীর কোন কোন অংশে এখনও দাস ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তর আফ্রিকার ক্যাসাবান্সা সহরে এইরূপ ক্রয়বিক্রয় এখনও হইয়া থাকে বলিয়া করাচী পুলিশ খবর পাইয়াছেন। সন্তানসহ একটি স্ত্রীলোক ৩৫০ ক্রাঙ্ক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ম্যাডাগাস্কার উপকূলে নৌকা করিয়া ৩০০ শত লোক বিক্রয়ার্থে লওয়া হইয়াছিল এবং করাচী গভর্নমেন্ট এই খবর পাইয়া ইহার প্রতিরোধার্থে সশস্ত্র নৌকা প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল মাত্র নাইগিরিয়াতে দাস-ব্যবসায়ের খবর পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানেও অ্যাভিসিনিয়াতে যে-ভাবে দাস-ক্রয়বিক্রয়-প্রথা প্রচলিত আছে তাহার তুলনার্থে ইহা অকিঞ্চিৎকর। সাধারণত নীলামে ক্রীতদাসগণের নিম্নলিখিতরূপ মূল্য

নির্ধারিত হয় ও তাহারা সর্বোচ্চ ডাকে বিক্রীত হইয়া থাকে :—১ হইতে ৩ বৎসর বয়স্ক কোন মূল্য নাই। ৩ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক ১৭ হইতে ৪৩ শিলিং। ১০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক ৪৩ হইতে ১৭০ শিলিং।

League of Nationsএর সহায়তায় ইহা সম্বন্ধে একেবারে উঠিয়া বাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

হারিয়েট বিচার টো প্রণীত "টম্-কাকার কুটির" ও "ডেড্" নামক পুস্তকে ক্রীতদাস-প্রথার জলন্ত দৃশ্য পাওয়া যায়।

শ্রী শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

(১৬৬)

মাঘ সংখ্যায় প্রবাসীতে "চৈত্রচরিতামৃত্তে একাদশী প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে হইজন নীমাংসাকারী স্তম্বর নীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা না জানিয়া—হয়ত নিছক্ কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়াই—শ্রীহট্টের মন্ত একটা দোষারোপ করিয়াছেন।

নীমাংসাকারী আচার্য বন্ধুদয় লিখিয়াছেন, পাবনা, রংপুর, টাঙ্গাইল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জায়গায় রগা শুষ্ককঠা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বিধবাকেও—হোক সে বালবিধবা অথবা অশীতিপর বৃদ্ধা—একাদশীতে নিরশু উপবাস করিতে হয়। কিন্তু সকল জায়গায় প্রকৃতপক্ষে তাই নয়। একাদশীতে কলমুল খাওয়ার বিধান শ্রীহট্টের সর্বত্র প্রচলিত। কেবল 'শয়ন' 'উখান' 'পার্ব' ও 'শৈমী' এই চারিটি একাদশীতে যাহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিরশু উপবাস করেন। কিন্তু যাহারা রোগগ্রস্তা তাঁহাদের জন্য দুধকলার ব্যবস্থাও আছে। আবার পীড়িতাদের উপবাস না করার রীতিও প্রচলিত আছে।

আচার্যবন্ধুদয় আবার লিখিয়াছেন "পূর্বকালে শ্রীহটেও শাস্ত্রীয় উপদেশের সম্মান রক্ষিত ছিল।" আজকাল শ্রীহটে আর শাস্ত্রীয় উপদেশের সম্মান বড় একটা নাই। স্মার্ত রঘুনন্দনের মত শ্রীহটে সম্পূর্ণরূপে মাথা উঁচু করিয়া বিজ্ঞান আছে।

শ্রী যোগেন্দ্রভূষণ পাল

(১৬৭)

বরোদা কলাভবনেও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিতে পারা যায়। এখানের পাঠক্রম (course) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিম্ন। তিন বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু এখানে হাতে-কলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত বেশ ভাল। ইহা বরোদা গায়কোন্ডারের নিজস্ব শিক্ষালয়। বরোদা রাজ্যের ছাত্রগণকেই প্রধান সুবিধা দেওয়া হয়, পরে অন্য ছাত্রের স্থান হয়।

পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বাঙ্গালার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই শিক্ষার বন্দোবস্ত সর্বাপেক্ষা স্তম্বর। এখানে ৫ বৎসর পড়িতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের I. Sc. পরীক্ষা কিম্বা ঐপ্রকার অন্য কোনো বিশ্ব বিদ্যালয়ের I. Sc.র স্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এখানে পড়িতে পারা যায়। এইটি মহীপুররাজের নিজস্ব কলেজ (State College)। থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্যাল উভয়বিধ শিক্ষারই খুব স্তম্বর বন্দোবস্ত আছে। হাতে-কলমে শিক্ষার প্রধান সুবিধা যে Tata Hydro-Electric Powerhouseও এই স্থানে আছে।

Tata Research Instituteও এই স্থানে অবস্থিত। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উপাধিদারী কোনো ছাত্র এখানে গবেষণা করিতে পারেন।

শ্রী সরলকুমার অধিকারী



পুস্তক পরিচয়

বিচার—শ্রী হরিদাস দে প্রণীত। প্রকাশক শ্রী দুর্গাচরণ দে, শান্তিনগর ৭৬ নং লুকারগঞ্জ, এলাহাবাদ (গ্রন্থকার ও সোহেং স্বামীর চিত্র-সম্বলিত) পৃ: ১+৩+৪+৫+৬৪; মূল্য ১।

এই 'বিচার' "একান্নবিজ্ঞান বা অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়"।

পুস্তিকাতে ৪২টি কবিতা আছে; কবিতাসমূহ অদ্বৈতবাদ সমর্থক।

দার্শনিকের রসিকতা—শ্রী গঙ্গাচরণ কর, এম-এ প্রণীত।

প্রকাশক শ্রীকুলেশচন্দ্র কর, এম-এসসি, ৪৭ নং কর্পোরেশন স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ: ৮০; মূল্য ১।

পুস্তকের ৫টি অধ্যায়—১। দার্শনিকের রসিকতা; ২। রসিকেষু দার্শনিক—Novalis; ৩। দার্শনিকেষু রসিক—Guyau; ৪। অধ্যাপক Gagnerএর একখানা চিঠি; ৫। Rabindranath and his Gitanjali.

বলা বাহুল্য প্রথম চারটি বাঙ্গলায় এবং শেষটা ইংরেজীতে লিখিত।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন "এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিদেশী রস-তাত্ত্বিকগণের মধ্যে বড় বড় চার জনের—মার্কিন দার্শনিক Santayana, ফরাসী দার্শনিক Guyau, ইটালীর দার্শনিক Croce, এবং জার্মান দার্শনিক Diltheyএর—রসতত্ত্ব সংক্ষেপে হ'লেও নিশ্চয়ভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে।"

এই পুস্তিকা সাধারণের অবোধ্য; ইহাতে অনেক কঠিন ইংরেজী ও অল্প ভাষার দার্শনিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সে-সমুদায়ের বাঙ্গলাও দেওয়া হয় নাই এবং ব্যাখ্যাও করা হয় নাই। অনেক স্থলে গ্রন্থকারের বাঙ্গলা ভাষাও দুর্বোধ্য।

ইউরোপে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনোর পর 'জানা-শুনা' অনেক বিষয়ে আলাপ করেন। এই-প্রকার আলাপের নান Post-Prandial Talk। বিষয়গুলি সকলেরই জানা আছে, সকলেই কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। আমরাদিগের গ্রন্থকারের মন্তব্যও এই শ্রেণীর।

(১) **সামবেদ সংহিতা**—আগ্নেয় পর্ক (সংস্কৃত ভাষায়, দেবনাগর অক্ষরে) পৃ: ১৭৭; মূল্য ১।০।

(২) **সামবেদ সংহিতা**—আগ্নেয় পর্ক (সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গলা অক্ষরে)। পৃ: ৭৫; মূল্য ৮০।

(৩) **সামবেদ সংহিতা**—আরণ্য পর্ক (সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায়; বাঙ্গলা অক্ষরে)। পৃ: ৩২; মূল্য ১।০। এই-সমুদায় গ্রন্থের প্রণেতা—শ্রী সত্যচরণ রায় সাংখ্য-বেদান্ত-বেদ-তীর্থ। প্রকাশক শ্রী ব্রজেশ্বর রায় (১৩ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন, রামবাগান, কলিকাতা)।

প্রথম গ্রন্থের ব্যাখ্যাতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাতে এই-সমুদায় বিষয় দেওয়া হইয়াছে—

স্বর-সংবলিত মন্ত্র, ইহার ছন্দ, দেবতা ও , পদ-পাঠ, অঘর,

আধিযাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিকন্তু-প্রমাণ, পাণিনি-শব্দ দ্বারা প্রত্যেক শব্দের সিদ্ধি, ইত্যাদি।

অকারাদিক্রমে মন্ত্রসমূহের গুণী ও দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ এইভাবে সম্পাদিত হইলে, একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইবে। এইগ্রন্থেব সাহায্যে শিক্ষার্থীগণ অতি সহজে সামবেদ আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

অপর দুইখানি পুস্তিকাতে স্বর সহ মন্ত্র, ঋষি, ছন্দ, বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার; প্রত্যেক মন্ত্রেরই দুইপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন ১ম—আধিযাজিক অর্থাৎ যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা; ২য়—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ঈশ্বর-পক্ষে ব্যাখ্যা। নিম্নে আগ্রহ পক্ষের প্রথম মন্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল—

'অগ্নে' হে পূজনীয় পবমান্ন! আপনি 'নীতয়ে' বিদ্যাতি শুভশুভ আমাদিগের বিশেষভাবে প্রাপ্তির জন্ত এবং 'হব্য-দাতয়ে' আনানিগকে শুভ কর্ণফল প্রদান করিবাব জন্ত আমরাদিগ-কর্তৃক 'পূগানঃ' শ্রুত হইয়া এই যজ্ঞেতে 'আরাহি' আসুন, ইত্যাদি।

আধিযাজিক ব্যাখ্যার প্রণালীও এই-প্রকার, উভয় ব্যাখ্যাতেই কোন উপায়ে সংস্কৃত শব্দ রাখিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ করা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থ সাধারণত এইভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

যাঁহারা মূলগ্রন্থ পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারা আধিযাজিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি। মনের কি ভাব প্রকাশ কারবার জন্ত ঋষি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই প্রকৃত অনুবাদ। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের সংকল্প এহ যে মন্ত্রটিকে উচ্চ আদর্শের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এ-প্রকার ব্যাখ্যার কোন কোন স্থলে দুই-একজন সাধকের উপকার হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যিক। ঋষির সময়ে লোকের মতামত ও আচার-ব্যবহার কি-প্রকার ছিল প্রথমে তাহা জানিতে হইবে। তাহার পরে নিকপণ করিতে হইবে ঋষি সেই সময়ের কতটুকু প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং কতটুকুই বা বর্জন করিয়াছিলেন এবং কেনই বা এ-প্রকার করিয়াছিলেন। এই-সমুদায় অবগত হইবার পরে দেখিতে হইবে ঋষির সময়ে ঐ মন্ত্রের কি-প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারিত। ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

অগ্নি-বীণা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। আর্থ্য পাবলিশিং হাউস, কালেক্স স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা। ১৩৩০।

এক বৎসরের মধ্যেই কাব্যগ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, বইটি পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানির স্মরণ কবিতাগুলিই অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাময়, যে বৃগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ আজ্ঞ আপনার ভাগ্য পড়িয়া

তুলিতে চাহিতেছে সেই যুগনির্মাতা রঙ্গ-নবতার আগমনধনি
প্রস্থানিতে শুনিতে পাওয়া যায়
এ সংস্করণে ছাপা ও বাঁধাই আরো ভালো হইয়াছে।

দোলন-চাঁপা—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। অর্থাৎ পাব-
লিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচ
সিকা। ১৩৩০।

ইহাতে, কবির আধুনিক কবিতাগুলি একত্র করা হইয়াছে।
কবিতাগুলির ভিতরকার কথা—প্রিয়ের জন্ম বেদনা উচ্ছ্বাস।
“পূজারিণী” কবিতা তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কবিতাটি বই-
খানির শ্রেষ্ঠ কবিতা—প্রেম-পিপাসার অপূর্ণ প্রকাশ। কাব্যানুভবী
পাঠক সমাজে বইটি আদর লাভ করিবে, আশা করি। ছাপা ও বাঁধাই
সুন্দর।

ছেলেদের বুদ্ধদেব—শ্রী আদ্যনাথ বায় প্রণীত। প্রকাশক
শ্রী বিজয়কুমার চক্রবর্তী, মডেল লাইব্রেরী লিমিটেড, ১ কর্ণওয়ালিস
স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা। ১৩৩০।

ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের জীবন কথা ছেলেদের উপযোগী কবিতা
লিখিবার চেষ্টা আকাল কিছু কিছু হইতেছে। কিন্তু কয়েকখানি
ছাড়া দে রকম বই অধিকাংশই কেমন আড়ষ্ট ও অসবল হইয়া
পড়িয়াছে। সুতরাং ছেলেদের পক্ষে তাহা বেশ আনন্দদায়ক হয় না।
আমাদের আলোচ্য পুস্তকখানি কিন্তু এ বিষয়ে অভিনব। বুদ্ধদেবের
জীবন কথা ইহাতে অতি সুন্দর ও সমলভাবে বিবৃত হইয়াছে। বড়
বড় আধুনিক বুদ্ধচরিত্রে যে-সব নূতন কথা সম্মিলিত হইয়াছে এই
গ্রন্থখানিতে তাহার অধিকাংশই গ্রন্থকার সরলভাবে ছেলেদের
মনোরঞ্জক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ছেলেদের প্রচলিত
বুদ্ধচরিত্রে হইতে এ চরিত্র-কথাটি স্বতন্ত্র। আমরা বইটি পড়িয়া
বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। বইখানি ইস্কুলের পাঠ, হওয়া একান্ত
উচিত। আশা করি গ্রন্থকার এই জাতীয় আরো পুস্তক লিখিয়া
ছেলেদের আনন্দ বর্ধন করিবেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

সখা—শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রী মন্থনাথ
পাল, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, দক্ষিণেশ্বর। দাম বারো আনা। ১৩৩০।

ভক্তিবিশয়ক গানের বই ৯ কয়েকটি গান ভক্তির সার্থক আবেগ
দেখিতে পাওয়া যায়। গানগুলির রচনা মন্দ নয়।

বজ্রবীণা—শ্রী বেলা গুহ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী সত্যপ্রিয় গুহ,
দেওভোগ গুহ-পরিবার, মুলীগঞ্জ, ঢাকা। দাম চার আনা।

কবিতার বই। বিশেষ কবিতা না থাকিলেও বইটি কবিতা বর্ধিত
নয়। কয়েকটি কবিতা মন্দ লাগে নাই।

অঞ্জলি—শ্রী সিদ্ধেশ্বর রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী তারাপদ রায়,
ধনস্ক্রি আয়ুর্কোম-ভবন, ৮৫ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট
আনা।

কবিতা-পুস্তক। কয়েকটি কবিতা মন্দ নয়। কিন্তু ছন্দের দোষ
প্রচুর।

বিশ্বপ্রেম—শ্রী তারিণীশঙ্কর সিংহ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম
চার আনা।

ফুল-রেণু—শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রণীত। ময়মনসিংহ কালীবাড়ী
রোড হইতে শ্রী বিজয়নারায়ণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।
ছাপানি পান্যর বই। উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

মহর্ষি মনুস্মৃতি মোজাম্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক মোহম্মদ
আক্কাব-উল হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩ কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা। দাম এক টাকা। ১৩৩০।

এই পুস্তকে যাহার জীবন-কথা বিবৃত হইয়াছে তিনি বাস্তবিকই
মহর্ষি নামের উপযুক্ত। মহর্ষি মনুস্মৃতি জগতের ধর্মবীর্যের অশ্রুতম।
তাহার জীবন-চরিত সম্প্রদায়-নির্বিণেশে পঠিত হওয়া উচিত।
আলোচ্য পুস্তকখানি ছেলেদের জন্য লেখা। বইটির পঞ্চম সংস্করণ
বাহির হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের নিকট বইটি যে আদর লাভ
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আমরা
বইটির প্রচার কামনা করি।

ফেরদৌলী-চরিত—মোজাম্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক
মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম
বারো আনা। ৩৩০।

মোজাম্মেল হক মহাশয় সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান কবি ও লেখক।
তাহার এই পুস্তকটিও তাহার যশ বর্ধন করিবে। বইটির চতুর্থ সংস্করণ
হওয়ায় ইহার মূল্য আপনা হইতেই নির্ধারিত হইয়াছে। বইখানি
শুলিখিত। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

পুষ্প-পরাগ—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। প্রকা-
শক শ্রীতিমোহনদাস দাস গুপ্ত, ১০ বি গৌর ঘোষের লেন, ভবানীপুর
কলিকাতা। দাম এক টাকা।

প্রফুল্লময়ী বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরচিতা নন। বর্তমান পুস্তক-
খানিতে তাহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবিধ বিষয়ের কবিতা
একত্র করা হইয়াছে। কবিতা-পুস্তকটি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ
আনন্দিত হইয়াছি। কবিতাগুলিতে লেখিকার কবিতা-শক্তি স্বচ্ছন্দ
ও সম্পূর্ণাঙ্গী ভাষায় প্রস্ফুট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতার মধ্যে
এমন একটি সহজ শিক্ষতার ধারা বহিয়া গিয়াছে যে পড়িতে
পড়িতে মন অভিযুক্ত হইয়া উঠে। কয়েকটি দুর্বল কবিতাও
আছে; কিন্তু সেইগুলি আছে বলিয়াই তাহাদের পাশে ভালো
কবিতাগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বইখানিতে ছাপার ভুল প্রচুর।

গুপ্ত

পূণ্যবতী নারী—শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। ইউরায় এণ্ড
সন্স (১০০ নং গড়পার) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা।

ইংরেজী সাহিত্যে পূণ্যবতী নারীদের বহু জীবনচরিত দেখিতে
পাওয়া যায়। কোনটি চিরকৌমাধ্যব্রতধারিণী তপস্বিনীদের, কোনটি
লোকসেবাপরায়ণা নারীদের, কোনটি বা গার্হস্থ্যধর্মে মহীয়সী
মহিলাদের। কিন্তু বাংলাভাষায় এরূপ জীবনচরিতের বড়ই অভাব।
অথচ এ দেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক নারী জন্মিয়াছেন
যাহাদের জীবনকথা গ্রন্থাকারে রচিত হইলে পাঠক-সমাজের বিশেষ
কল্যাণ হইতে পারে। অমৃত-বাবুর “পূণ্যবতী নারী”কে অন্যায়সেই
সেইরূপ পুস্তকের পর্যাযভুক্ত করা যাইতে পারে। তিনি এই
বইটিতে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি নারীর জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন।
তাহাদের একজন উচ্চশিক্ষিতা ও অপর দুইজন সাধারণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত
মহিলার। কিন্তু তিন জনেরই জীবন ধর্মপ্রাণতার ও মানবসেবার
অনাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত ছিল। অমৃত-বাবু হলেখক, তাহার ভাষা
সরল, মার্জিত ও সুন্দর। সর্বোপরি তাহার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির
অভাব এই পুস্তকখানিকে বড়ই সুখপাঠ্য করিয়াছে। তিনি যে-
সমাজের ধর্মপ্রচারক, যদিও তিনি সেই সমাজেরই তিনটি নারীর জীবনী

রচনা করিয়াছেন, তবুও কোন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাঠক ও পাঠিকার তাহা পাঠে বিন্দুমাত্র বিরক্তি জন্মিবাব সম্ভাবনা নাই। ইহার একমাত্র কারণ তিনি কোন বিশেষ ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠতার আসনে বসাইবার চেষ্টা করেন নাই—জীবনের মূলে ধর্মকে রাখিলে সে জীবন যে সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয় সেই সৌন্দর্য্যকেই তাঁহার লিপিকুণ্ডলতায় মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাই এই পুস্তকখানি সকল সমাজের পাঠকের শুধু যে ভাল লাগিবে এমন নহে, সকলেই পড়িয়া উপকৃত হইবেন। মহিলাদের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক বহুদিন দেখা যায় নাই।

শ্রী গমলচন্দ্র হোম

পিয়ামস্ন-স্মৃতি—মূল্য ১০। আন্তঃস্থান বিশ্বভারতী কার্যালয়, ১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।

এই পুস্তিকায় পরলোকগত পিয়ামস্ন নাহেবের কয়েকজন ছাত্র ও একজন পরিচিতা মহিলা তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে অঙ্কার পুষ্পাজলি দিয়াছেন। রচনাগুলি বেশ সরস ও পিয়ামস্ন-সাহেব সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা পরিপূর্ণ। ষাঁহার এগুলি লিখিয়াছেন তাঁহাদের নাম—শ্রী হেমসু চট্টোপাধ্যায়, শ্রী গুণীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, শ্রীমুস্তা উর্মিলা দেবী, শ্রী সত্যব্রত রায় ও শ্রী চারুদত্ত রায়। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও গ্যাণ্ড জি সাহেবের নহিও পিয়ামস্ন নাহেবের তিন খানি ফোটো আছে। এহ পুস্তক বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া উৎস

অর্থ পিয়ামস্ন-স্মৃতি ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে। ছাপা, কাগজ ইত্যাদি সবই ভাল।

বিপ্লবপথে রুশয়ার রূপান্তর—অধ্যাপক শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রণীত। দেশবন্ধু চিন্তাশ্রম দাসের ভূমিকা সংশ্লিষ্ট। অকাশক সরস্বতা লাইব্রেরী কলিকাতা ও ঢাকা।

এই পুস্তকে লেনিনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত আধুনিক রুশীয় বিপ্লবের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বইখানিতে বিপ্লব বর্ণনা ও ভাষার স্থানে স্থানে প্রাদেশিকতা-দোষ থাকিলেও বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাঙালী পাঠক এই পুস্তক হইতে অনেক কথাই জানিতে পাবিবেন। লেনিনের একখান চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে দুর্ভিক্ষ—শ্রীকুলদাসের বন্দোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১০ আনা। পৃঃ ১১৭ (১৩৩০)

এই পুস্তকে গ্রন্থকার সরল ভাষায় ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সরকারী কাগজ-পত্র হইতে হিসাবাদি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার ভারতের দুর্ভিক্ষের অর্থনীতিক কারণগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

প্রভাঃ

শুধু কেরাণী

তখন পাখীদের নীড় বান্ধার সময়। চঞ্চল পাখী-গুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল, মুখে করে' উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ফিরছে।

তাদের বিধে হ'ল।—তুটি নেহাৎ সাদাসিধে ভেলে মেয়ের।

ছেলেটি মার্চেন্ট্ আফিসের কেরাণী— বছরের পর বছর ধরে' বড় বড় বাঁধান খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্রামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী।

আফ্রিকা জুড়ে' কালো কার্ফী জাতের উদ্বোধন-ছহ্বকারে শাদা বরফের দেশের আকাশ কেমন করে' শিউরে উঠছে সে খবর তারা রাখে না। হলুদ-বরণ বিপুল মৃত-প্রতিম জাতি একটা কোথায় কবরের চাদর ছুঁড়ে ফেলে' খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাহা রক্তের প্রমাণ দিতে, সে খোঁজ রাখবার তাদের দরকার হয় না।

তারা বাংলার নগণ্য একটি কেরাণী আর কেরাণীর বিশোরী-বধু।

আগমন-যৌবনা মেয়েটি স্বজন-হীন স্বামীর ঘরে এসে গৃহিনী হ'ল।

প্রেমের কবিতা তারা লেখে না, পড়বার ফুরান বা সুবিধাও বড় নেই। তুজনে তু-জনকে সম্বোধন করতে নব-নব বঙ্গনা-লোকের সম্ভাসন চয়ন করে না। শুধু এ শুকে বলে—“ওগো”।

সকাল বেলা স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে হাতে পানের ভিবেটি দিখে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি দরজার আড়াল থেকে ঈষৎ মুখ বার করে' সলজ্জ একটু করুণ হাসি হাসে;—ছেলেটিও ফিরে' চেয়ে হাসে। কোন দিন বা মেয়েটি বলে মুহু-মধুরস্বরে—“ওগো তাড়াভাড়ি এসে, কালকের মতো দেরী কোরো না!” ছেলেটি হস্ত অক্ষুযোগের স্বরে বলে—“বাস! কাল ত মোতে আধঘণ্টা দেরী হয়েছিল; বললুম ত রাতায় ট্রানের তার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল বলেই একটু

দেবী হ'লেই বুঝি অম্নি অস্থির হ'য়ে উঠতে হয়?.....” মেয়েটি লজ্জিত হ'য়ে বলে—“হ্যাঁ আমি বুঝি অস্থির হই!”

সন্ধ্যায় দরজায় একটি টোকা পড়তে না পড়তেই ছুটি উৎসুক হাতে দরজাটি খুলে' যায়; সারাদিনের পরিশ্রম; শ্রান্ত ছেলেটি ধীরে ধীরে গিয়ে পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটু বসে, আপত্তি করে' বলে—“না 'গো' তোমায় জুতোর ফিতে খুলে' দিতে হ'বে না।” মেয়েটি প্রতিবাদ করে' বলে—“তা দিলেই বা, তাতে দোষ কি?” ছেলেটি একটু রাগ দেখিয়ে বলে—“ওটা কি আমি নিজে পারি-নে?.....” মেয়েটি খুলতে খুলতে বলে—“তা হোক—তুমি চূপ করো দেখি।”

ছুটির দিন তাদের আসে। সে-দিন একটু ভালো খাবার-দাবারের আয়োজন হয়, কোন দিন ছুটি একটি বন্ধু আসে নিমন্ত্রিত হ'য়ে। মেয়েটি সজ্জ-সঙ্কোচে আপাদ-মস্তক অবগুষ্ঠিতা হ'য়ে পরিবেষণ করে। সে-দিন বিছানায় আলশ্রে হেলান দিয়ে গল্প করবার ছপুর। জ্ঞানাভিমানহীন কেরাণী আর কেরাণী-প্রিয়র সাধারণ আনন্দ-আলাপ। জটিল তর্কের দুর্ভাগ্য সমস্তার গোলক-ধাঁধায় তারা ঘুরে' ঘুরে' হায়রান্ হয় না, সহজেই সে-সব মীমাংসা করে' ফেলে। মেয়েটি হয়ত জিজ্ঞাসা করে—“আচ্ছা, মণা মারলে পাপ হয় ত?” ছেলেটি হয়ত বলে—“নিশ্চয়ই; আর মেরো না।” মেয়েটি বলে—“বেশ! কিন্তু রোজ যে মাছগুলো মেরে খাও, পাঠার মাংস খাও, তার বেলা?” ছেলেটি একটু বিব্রত হ'য়ে বলে—“বাঃ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের আহারের তা খেলে কি পাপ হয়?—তা হ'লে ভগবান্ আমাদের আহার দেবেন কেন?” মেয়েটি বলে—“ও—।” মেয়েটি হয়ত বলে—“ওদের বাড়ীর বোরা কাল বেড়াতে এসেছিল, ওরা বল্ছিল কোন্ গগৎকার নাকি গুনে' বলেছে আর দশ দিন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হ'য়ে যাবে একটা ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে,—সত্যি?” ছেলেটি হেসে বলে—“মেয়েদের যেমন সব আজগুবী কথা। চুরমার হ'য়ে গেলেই হ'ল কিনা!” মেয়েটি গম্ভীর হ'য়ে বলে—“আমিও বিশ্বাস করিনি—আর-একবারও ক

অম্নি গুজব উঠেছিল, তখন আমাদের বিয়ে হয়নি।” এমনিতর তাদের ছুটির আনন্দ-গুঞ্জন।

একদিন ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে এল। সেই পয়সায় রাস্তার মোড়ে একটি গোড়ের মালা কিনলে। ঘরে এসে হঠাৎ মেয়েটির খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বললে—“বল দেখি কেমন গন্ধ?” মেয়েটি বিস্মিত আনন্দে মালাটি দেখতে দেখতে একটু ক্ষুধার বলে—“কেন আবার তুমি বাজে পয়সা খরচ করতে গেলে বল ত?” ছেলেটি বললে—“বাজে পয়সা খরচ বুঝি! ট্রামের পয়সা আজ বাঁচিয়ে তাইতে কিনেছি।” এবার মেয়েটি সত্যি রেগে বললে—“এই ছাই ফুলের মালা কেন-বার জন্তে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে? যাও, চাইনে আমি তোমার ফুলের মালা!” ছেলেটি ক্ষুধার বলে—“বাঃ—অম্নি রাগ হ'য়ে গেল, সব কথা আগে শুনলে না কিছু না, অম্নি রাগ! আজ আফিসে বড্ড মাথাটা ধরে-ছিল, ভাবলুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে ছেড়ে যাবে,—তার উপর সকাল-সকাল ছুটি হ'ল; একি এতই অগ্রায় হ'য়ে গেছে? বেশ যা হোক!” মেয়েটি একটু কাতর হ'য়ে বললে—“আমি রাগ করলুম কোথায়? তুমি মিছি-মিছি ফুলের মালা কেনবার জন্তে হেঁটে এসেছ ভেবে—”। ছেলেটি বললে—“দাও, ফুলের মালাটা ফেলে দাও, তা হ'লে”—এবার হেসে মেয়েটি পরম আনন্দে ফুলের মালাটি খোঁপায় জড়াতে জড়াতে বললে—“হ্যাঁ—ফেলে দিচ্ছি এই যে! বাবা! একটা ভাল কথা যদি তোমায় বলবার যো আছে।”

একদিন একটু বেশী জ্বর হ'ল মেয়েটির। তার পর দিন আরো বাড়ল। তার পর দিনও কমল না। আফিস যাবার সময় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছেলেটি বললে—“এখানে এমন করে' কি করে' চলবে। দেখবার একটা লোক নেই,—এই বেলা তোমার বাপের বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করি।” মেয়েটি বললে—“না না, ও কালকেই সেরে যাবে...তুমি আফিস যাও, ভাবতে হবে না।” ছেলেটি উদ্বিগ্নহৃদয়ে কাজে গেল উপায় ভাবতে ভাবতে। তার পর দিনও জ্বর বাড়ল দেখে' বললে—“না, আমার আর সাহস হচ্ছে না। আমি সমস্ত দিন আফিসে থাকি, জ্বর বাড়লে কে তোমায়

দেখে! তোমায় রেখে আসি চল ওখানে।” মেয়েটি করণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, তার পর মুখ ফিরিয়ে বললে—“আমার সেখানে ভাল লাগে না।”

ভাগ্যে সেখানে “আজকালকার মেয়েগুলো কি বেহায়া”—বলবার লোক ছিল না।

জরের মধ্যে রাঁধার রাঁধি নিয়ে দু’জনের রাগারাগি হয়। মেয়েটি বললে “আমি খুব পারুব—তোমার না খেয়ে আফিস যাওয়া হবে না।” ছেলেটি বলে—“তুমি পারলেও আমি রাঁধতে দেব না। আমি না হয় হোটেল খাব।” মেয়েটি বলে—“হ্যাঁ, ভদ্রলোকে বুঝি হোটেল খেতে পারে!” ছেলেটি বলে—“দরকার হ’লে সব পারে।” মেয়েটি তবু বলে—“তোমার এখনো ত দরকার হয়নি।”

তার পর জোর করে’ মেয়েটি রাঁধতে যায়। ছেলেটি এবার খুব রাগ করে’ ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বললে “যে আজ রাঁধবে সে আমার মরা মুখ দেখবে।” মেয়েটি দিব্যি শুনে গুণ্ডিত হ’য়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগল। ছেলেটি অল্পতপ্ত হ’য়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টায় বলতে লাগল—“তুমি অব্বোর মত জেদ করলে তাই না আমি দিব্যি দিলুম; লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না। আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি আঙুন-তাতে রেঁধে যদি তোমার জর বেশী বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড়বে। এখন ত একদিন রান্না পাচ্ছিনে তখন ত কতদিন পাব না...সে ত আমারই কষ্ট...তুমি ভালো হ’য়ে যত খুসি রেঁধো না, আমি কি বারণ করছি...” মেয়েটি বললে—“বেশ ত খুব হয়েছে, দিব্যি দিয়েছ—আমি ত আর রাঁধতে যাচ্ছিনে...” ছেলেটি আরো অল্পতপ্ত হ’য়ে বোঝাতে লাগল।

সেবারে জর আপনা থেকেই ধীরে ধীরে সেরে’ গেল।

তাদের রাগারাগির পালাও এমনি করে’ সমাপ্ত হ’ল।

নূতন নীড়ে তখন অচেনা কচি অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি খোকা।

কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ী থেকে আসা হ’য়ে উঠছে না। অস্থখ অর্ধ সারুতে চায় না, বাপ-মাও অস্থখ-স্থক মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। ডাক্তার-ধাত্রী বলে—‘সুতিকা’।

ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকণ্ঠিত হ’য়ে জিজ্ঞাসা করে’ বেড়ায়—“হ্যাঁ ভাই, সুতিকা হ’লে কি রাঁচে না?”

মেয়েটি দিন দিন আরো কাহিল হ’য়ে যেতে লাগল—বিছানা থেকে আর ওঠবার ক্ষমতা রইল না ক্রমে।

ছেলেটি রোজ আফিসে দেড়ি হবার জন্তে বকুনি খায়। হিসাব-ভুলের জন্তে তাড়া খায়।

কিন্তু তারা সৃষ্টির বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে এই অকারণ উৎপীড়নের জন্তে বিদ্রোহী হ’য়ে উঠতে জানে না। নিদোষের উপর এই অত্যাচারে, বিধাতার পক্ষ-পাতিত্বে ক্ষিপ্ত হ’য়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে। মানুষের কাছে তারা মাথা নীচু করে’ চলে,—বিধাতার কাছেও।

মেয়েটি কোনো দিন স্বামীকে একলা কাছে পেয়ে, করণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে—“হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না?”

ছেলেটি জোর করে’ বুক-ফাটা হাসি হেসে বলে—“কি যে পাগলের মত বল তার ঠিক নেই। বাঁচবে না কেন, কি হয়েছে তোমার?”

মেয়েটি চোখ নামিয়ে মূহূষরে বলে—“আমি মরতে চাইনে কিছুতেই।”

ছেলেটি আবার হেসে বলে—“ওসব আজগুবি কথা কোথায় পাও বল ত?”

একটা হাসি আছে—কান্নার চেয়ে নিদারুণ, কান্নার চেয়ে জ্বলপুণ্ড-নেংড়ান।

রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বেড়েই চলল। মেয়েটি আর স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করে না—“হ্যাঁ, গা আমি বাঁচব না?” বরঞ্চ তার সামনে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হাসতে চেষ্টা করে’ বলে—“তুমি ভাবছ কেন, আমি; ত শীগ্গিরই সেরে’ উঠছি।” তার পর ঘরকন্না পাতবার নব-নব কল্পনার গল্প করে, কেমন করে’ ছেলে মানুষ করবে তার নাম কি রাখবে এইসব। ছেলেটিও তার শিধরে’ বসে’ করণ হেসে তার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ’য়ে শোনে। মেয়েটি বলে—“তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ কোরো না, আমি ঠিক সেরে উঠব।” ছেলেটি বলে—“কই আমি ভাবিনে ত! সেরে’ উঠবে না ত কি, নিশ্চয়ই উঠবে।” কিন্তু তারা বুঝতে পারে এছলনা দু’জনের

কাকরই বুঝতে বাকী নেই। তবু তারা পরস্পরকে সাস্বনা দিতে এই কক্কণ ছলনার নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অভিনয় করে। তার পর লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

তবু ছেলোটিকে নিত্যনিয়মিত অফিস যেতে হয়। ঝড় বড় বাঁধান খাতাগুলোর নিতুল গোটী-গোটী অক্ষর-গুলো নির্দীকারভাবে চেয়ে থাকে। তেমনি হিসাবের পর হিসাব নকল করতে হয়।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরবার জন্তে প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠলেও ছেলোটি হেঁটে আসে ট্রায়ের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেনবার জন্তে নয়, অস্থখের খরচ জোগাতে।

কোনো সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদি সে এমন

গরীব না হ'ত, আরো ভালো করে' ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে' দেখত।

শুধু সেদিন জান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের জন্তে এতদিনকার মিথ্যা কক্কণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বলে—“আমি মরতে চাইনি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু—”

সব ফুরিয়ে গেল।

তখন কাল-বোশেখীর উন্নত মসীবরণ আকাশে নীড়-ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র



১৯৩৫

হারিণ-শাবক

শ্রী সারদাচরণ চক্রিয়



বিদেশ

শ্রমিক মন্ত্রী সভা :—

ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার শ্রমিক অনাগ্রা জ্ঞাপন করিয়া শ্রমিক নেতা ক্লাইনেস এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং উদারনৈতিক দলের দলপতি ম্যাস্কুইথ সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। শ্রমিক দলের পক্ষে ৩২৮ জন ও বিপক্ষে ২৫৬ জন ভোট দিয়াছিল। শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলের মিলিত আক্রমণে পবাস্ত হইয়াই ইংলণ্ডের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে প্রধান মন্ত্রী বন্ড্‌উইন্ পদত্যাগ করেন এবং সংস্কারম্পন্ন বিকল্প দল বলিয়া গণ্য শ্রমিক দলের দলপতি রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে নুতন মন্ত্রী সভা গঠনের জন্য রাজ্য পক্ষম গর্জ্জ আহ্বান করেন। ম্যাক্‌ডোনাল্ড রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করিবার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রীর পদ ব্যতীত পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত-সচিবের পদে মনোনীত হইয়াছেন ম্যার (এখন লর্ড) মিড্‌লি অলিভিয়ার। অর্থসচিব হইয়াছেন কিলিপ ব্লোডেন। উপনিবেশ-সমূহের ভার পাইয়াছেন জে এইচ্‌ টমাস। নৌ-বিভাগের কর্তা হইয়াছেন লর্ড চেম্‌সফোর্ড। লর্ড-সভার নেতৃত্বের ভার পাইয়াছেন ভাইকাউন্ট হল্ডেন। যুদ্ধবিভাগের ভার পাইয়াছেন টিকেন ওয়াল্‌স্‌ ও এটর্নাল-কেনারেল হইয়াছেন স্চার প্যাট্রিক চেষ্টিংস্‌। শ্রমিক বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছেন কুমারী মার্গারেট বনকিন্ড্‌। শাসন-কার্যে কোনও দিনের ভার ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভায় এই প্রথমবার একজন মহিলার উপর অর্পিত হইল। স্বাস্থ্য-সচিব হইলেন মিঃ হুইটলে। শিক্ষা-সচিব হইলেন মিঃ টেভেলিয়েন ; কৃষিসচিব হইলেন মিঃ নোয়েল বাস্‌টন্‌।

প্রধানমন্ত্রী রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পিতা কৃষি-ক্ষেত্রে মজুরের কাজ করিতেন। সামান্য শ্রমিকের সন্তান হইয়াও ইনি অধ্যবসায়-বলে লেখা-পড়া শিখিয়া শ্রমিকদের একজন নেতা হইয়া পড়েন। ইনি জাতিতে স্কচ। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চাকরী কমিশনের সভ্য হইয়া ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এই-সূত্রে এদেশ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। নুতন ভারত-সচিব লর্ড মিড্‌লি অলিভিয়ার পূর্বে জামাইক-দ্বীপে শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেখানকার শ্রমিকদের বখেটে উন্নতিসাধন করেন। স্থানীয় বলিয়া ইঁতার বখেটে খ্যাতি আছে। বহুদিন কৃষিবিভাগের স্থায়ী সেক্রেটারীর পদে বাহাল থাকিয়া কৃষি ও মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে ইনি বহুদূরিতা অর্জন করিয়াছেন। রাজস্ব ও বাস্তা-শাস্ত্রেও ইঁতার গভীর জ্ঞান রাষ্ট্রসংগঠনে ইঁতার পসারপ্রতিপত্তির বখেটে সহায়তা করিবে। যৌবনেই ইনি সামান্য দীক্ষিত হইয়া ফেব্রুয়ারি সমিতির একজন প্রধানরূপে পরিগণিত হন।

শ্রমিকদেরকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ সমর্থন করে বলা যায়। বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র-মতলে যে গুজব রটরাছিল তাহা যে ভিত্তিহীন তাহা ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। দলের খাতির জাতির অমঙ্গল করিতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ নাবাদ। সেজন্য ইংলণ্ডের বণিকসভা ও ব্যাঙ্কের কর্তাদিগের সভা শাসনকার্যে শ্রমিকদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া যাহাতে শ্রমিক দল আপনায় দায়িত্বজ্ঞান স্থালা না যায় তাহার জন্য প্রধান মন্ত্রী খুব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কর্ম গ্রহণ করিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে যাহাতে কম্বিনেশনের পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রমিক দল শাসনবশের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, সে দায়িত্ব আমাদের। এমন দায়িত্ব জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকশিত হওয়া দৃষ্টির যাহা হাতপক্ষে কোনও মন্ত্রীসভায় ফুটিয়া উঠে নাই। আমি আশা করি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে সফলতা লাভ করিতে শ্রমিকদের সকলে আমায় সাহায্য করিবেন।

শ্রমিক মন্ত্রীসভা কম্বিনেশন কার্যই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ক্রমের সহিত বাবসায়ের সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টায় সোভিয়েট সরকারকে বাধিসম্মত রাষ্ট্র বলিয়া শ্রমিক মন্ত্রীসভা স্বীকার করিয়া গইয়াছেন এবং সোভিয়েট সরকারের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কস্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। জার্মান স্বাভাবিকমন্ত্রীরও একটি কিনারা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। রাজস্বনাট্য কিলিপ ব্লোডেন আনুমানিক আয়ব্যয়ের যে খসড়া করিতেছেন তাহাতে নৌবিভাগের খরচ আর সাড়ে আট কোটি টাকা কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চারিদিকেই খরচ কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপে ব্যয় নকোচ ঘটাইয়া আয়ের অঙ্ক খসড়া হিসাবে বেশী হইতেছে দেখিয়া কর্তার লক্ষ্য করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যুদ্ধের সময় পাদ্যস্রবোর উপর কর ধার্য হওয়াতে খাদ্যাদির দাম অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। এখন নিত্য-প্রয়োজনীয় কতকগুলি খাদ্যস্রবোর উপর কর হয় তুলিয়া দিবার না হয় কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। খুব সম্ভব চা ও চিনির উপর যে কর্তার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা কমাইয়া দেওয়া হইবে। ভাড়া বাড়ী এত দুর্খল্য যে শ্রমিকদিগের পক্ষে স্থায়িকর বাড়ীতে বাস একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হুইটলে দুই লক্ষ নুতন বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই বাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত শুল্ক ভাড়ায় পাওয়া যাইবে এবং বাড়ীগুলিও স্থায়িকর হইবে। এইরূপ নানা জনশ্রিয় অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিয়া নুতন গভর্নমেন্ট লোকপ্রিয় হইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

সামান্যদের প্রভাবে সম্প্রতিসকল প্রথা ও ধনপ্রাধান্য যদি নষ্ট হইয়া যায় সেই ভয়ে সামান্যদের প্রভাব হইতে ইংলণ্ডকে মুক্ত বাপিবার চেষ্টায় ইংরেজ-সরকার ক্রমের সোভিয়েট-সরকারকে

একঘরে করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাউরাছিলেন। কিন্তু খাদ্য-জব্য ও কাঁচামালের এক বৃহৎ একটি আড়ৎ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এক দিকে ইংরেজের ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, অপর দিকে খাদ্যক্রমের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়াতে জনসাধারণের কষ্ট অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই বহুদিন হইতেই সোভিয়েট-সরকারকে বিধিসম্মত রূপে পরিগণিত করিয়া তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইংরেজের ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু নিজেরাই যাহাকে অসম্ভব বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে সাধিয়া বিশ্বের দরবারে স্থান করিয়া দিলে ইংরেজের ইচ্ছা নষ্ট হইবার ভয়ে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা সাহস করিয়া সোভিয়েট-সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। শ্রমিক মন্ত্রিসভা শাসনভার গ্রহণ করিয়াই সোভিয়েট-সরকারকে বিধি-সম্মত রূপে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা

বঙ্গের লোক-সংখ্যা—

জেলা	লোক-সংখ্যা
ময়মনসিংহ	৪৮,৩৭,৭৩০
ঢাকা	৩১,২৫,৯৬৭
ত্রিপুরা	২৭,৪৩,০৭৩
মেদিনীপুর	২৬,৬৬,৬৬০
২৪ পরগণা	২৬,২৮,২০৫
বাখরগঞ্জ	২৬,২৩,৭৫৬
রঙ্গপুর	২৫,০৭,৮৫৪
ফরিদপুর	২২,৪২,৮৫৭
বশোহর	১২,২২,২১৯
দিনাজপুর	১৭,০৫,৩৫৩
চট্টগ্রাম	১৬,১১,৪২২
রাজশাহী	১৪,৮৯,৬৭৫
নদীয়া	১৪,৮৭,৫৭২
নোয়াখালী	১৪,৭২,৭৮৬
খুলনা	১৪,৫৩,০৩৪
বর্ধমান	১৪,৩৮,৯২৬
পাবনা	১৩,৮৯,৪৯৪
মুর্শিদাবাদ	১২,৬২,৫১৪
হুগলী	১০,৮০,২৪২
বগুড়া	১০,৪৮,৬০৬
হাবড়া	৯,২৭,৪০৩
মালদহ	৬,৮৫,৬৬৫
বাঁকুড়া	১০,১৯,৯৪১
জলপাইগুড়ী	৯,৩৬,২৬৯
কলিকাতা	৯,০৭,৮৫১
বীরভূম	৮,৪৭,৫৭০
দার্জিলিং	২,৮২,৭৪৮
চট্টগ্রাম (পার্বত্য)	২,৭৩,২৪৩
কুচবিহার রাজ্য	৫,৯২,৪৮৯

ত্রিপুরা রাজ্য
সিকিম রাজ্য

৪,৫৪,৪৩৭

৮২,৭২১

—প্রচার

বঙ্গালীর জীবনী-শক্তি—

বঙ্গালী গর্ভমেটের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বেস্টলী, ১৯২৩ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্যবিবরণীর সারসংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বঙ্গদেশের গত কয়েক বৎসরের শিশু-মৃত্যু, কৌমার মৃত্যু ও প্রসূতি-মৃত্যু সম্বন্ধে যে-সমস্ত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি নানা দিক দিয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুতে যিগিয়া বঙ্গালী জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। বোধ হয়, অনেকেই শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, বঙ্গালী বালকবালিকাদের শতকরা ৫০ জন আট বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে মারা যায় এবং মাত্র শতকরা ২৫ জন ৪০ বৎসরও বয়স পর্য্যন্ত পৌঁছায়। ১৯১৮—২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহার ফলে বঙ্গালী জাতির মধ্যে বালক-বালিকাদের সংখ্যা কমিষ্টা গিয়াছে। জীবনীশক্তি ক্ষয়ের ফলে, জাতির জন্মের হারও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই দুই কারণে দশবৎসর পূর্বে বঙ্গালাদেশে বালকবালিকাদের সংখ্যা গত ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক হ্রাস হইয়াছে :—

বয়স	১৯১১	১৯২১ শতকরা হ্রাস
১ বৎসরের কম	১৫২৬৪১৬	১৩৭.০৬৬—৩.৯৫
১—৫	৫.১২২.০৬	৪৬.৬৪৬—৮.৫৫

বঙ্গালাদেশের বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মৃত্যুর হারের তুলনা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে—হাজারকরা মৃত্যুর হার

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
১ বৎসরের নীচে	২১১.৪	২০০.৫
১—৫	৪০.৪	৩৬.৯
৫—১০	১৭.০	১৪.৫
১০—১৫	১২.৬	১১.৯
১৫—২০	১.৭	২.০
২০—৩০	১.	২.১
৩০—৪০	২২.৭	২৩.২
৪০—৫০	২৮.৮	২৬.৬
৫০—৬০	৪৩.৮	৩৯.৭
৬০ এর উপরে	৮৪.৬	৭৪.৮

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সকল বয়সের পুরুষের মৃত্যুর হার স্ত্রীলোকের হারের তুলনায় বেশী—কেবল ১৫—৪০ এই বয়সের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে বেশী। বহা বাহলা, এই ধরমেই স্ত্রীলোকেরা সন্তানের জননী হইয়া থাকেন।

প্রসূতির মৃত্যু

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, বঙ্গালী দেশে প্রসূতি-মৃত্যুর সংখ্যাও অসম্ভব। মোটের উপর সন্তানপ্রসবকমা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৮ হইতে ১০ জনের মৃত্যু সন্তান প্রসবের ফলেই ঘটয়া থাকে। মৃত-প্রসূতির মধ্যে, শতকরা ৫০ জনের বয়স ১৫ বৎসরের নীচে, শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জনের বয়স ১৫ হইতে ২৬ এর মধ্যে, শতকরা ৩৩ জনের বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে এবং শতকরা ৩ হইতে ৪ জনের বয়স ৪০ এর উপর। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের হিসাব ধরিলে মোটের উপর প্রায় ৬০ হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই ঘটিয়াছে। যাহাকে সাধারণ ভাষায় স্মৃতিকারোগ বলে তার ফলে এইরূপে বহু বালিকা ও

যুবতীর যে অকালমৃত্যু হইতেছে, তাহা ভাবিলে মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। অকালমৃত্যু ও ধাত্রীবিদ্যায় অনভিজ্ঞতা, চিকিৎসা ও শুক্রস্রাব অভাব দারিদ্র্য তথা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে এই-সকল শোচনীয় অকাল-মৃত্যুর কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিশুমৃত্যু

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে মোট ২৬৮১৬২ জন শিশু মৃত্যু হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের শিশুমৃত্যু-হারের তুলনামূলক একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল :—

	জন্মসংখ্যা	হাজারকবা মৃত্যুর হার
১৯১৭	১৬২৭৮৬৩	১৮৫
১৯১৮	১৪৮৯১৩৫	২২৮
১৯১৯	১২৪৫৩৯২	২০৮
১৯২০	১৩৫৯৯১৩	২০
১৯২১	১৩০১০০১	২০

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পূর্বে তিন বৎসর অপেক্ষা শিশুমৃত্যুর হার একটু কম হইয়াছে। ডাঃ বেটলী বলিতেছেন যে, ইহা প্রধানতঃ জন্মসংখ্যাস্রাসের ফলেই ঘটিয়াছে। কেননা, যদিও ১৯১৯ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অপেক্ষা শিশুমৃত্যুর হার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৯ ভাগ কমিয়াছে, তবুও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার এখনও শতকরা ১২ ভাগ বেশী। ডাঃ বেটলী আরও বলেন যে তালিকায় শিশুমৃত্যুর যে হার ধরা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার শিশুমৃত্যুর হার তার চেয়ে বেশী—বোধ হয় হাজারকরা ১৯০ হইতে ২০০ এর মধ্যে। স্থলবিশেষে এই হার ৭০০ পর্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। জন্ম-সময়ের বিকলতা-দোষে প্রায় শতকরা ৫০ জন শিশুর মৃত্যু হয় এবং এক ধনুষ্টকারেই শতকরা ১১৪ জন শিশু মরে। এই হিসাব অনুসারে ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই ধনুষ্টকার বোনে প্রায় ৩০ হাজার শিশু বাঙলা দেশে মরিয়াছে! বাঙলা দেশের সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার তুলনায় শিশুমৃত্যুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ।

বাঙলাব কোন বিভাগে শিশুমৃত্যুর হার কত, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

শিশুমৃত্যুর হার	শিশুমৃত্যুর হার	
	মৃত্যুর হার	সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শতকরা শিশুমৃত্যুর অনুপাত
বর্ধমান	২২০	১৮ ৪
প্রেসিডেন্সী	২১৮	১৭ ৬
রাজসাহী	২১০	২০ ৩
ঢাকা	২০৬	১৯ ৮
চট্টগ্রাম	১৪৯	১৯ ১

বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ সর্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও অস্বাস্থ্য-কর, সুতরাং এই দুই বিভাগের শিশু-মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু বাঙলার সমগ্র মৃত্যুর হারের তুলনায় শতকরা শিশু-মৃত্যুর অনুপাত ঐ দুই বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম। ডাঃ বেটলী বলেন, ইহার দুইটি কারণ আছে—প্রথম, ঐ দুই বিভাগে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস; দ্বিতীয়, বঙ্গের বাহির হইতে এই অঞ্চলে বৎসর বৎসর নূতন লোকের আমদানী।

বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা কত, তাহারও একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

বিভাগ	এক মাসের কম বয়সের	ছয় মাসের কম বয়সের	৬ হইতে ১২ মাস বয়সের
বর্ধমান	৫১ ৮	৩৬ ৯	২১ ২
প্রেসিডেন্সী	৪০ ০	৩৭ ৮	২২ ১
রাজসাহী	৩৯ ৪	৩৬ ৫	২৪ ১
ঢাকা	৩৫ ৮	৪৫ ৮	১৯ ০
চট্টগ্রাম	৩৫ ২	৪২ ৯	২১ ৯

উপরেব তালিকায় দেখা যায় যে, বর্ধমান প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগে এক মাসের কম বয়সের শিশুদের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা বেশী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগেই সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার কারণ নির্ণয় করতে যাইয়া ডাঃ বেটলী বলেন,— প্রেসিডেন্সী বর্ধমান ও রাজসাহী বিভাগেব অস্বাস্থ্যকর স্থানে রুগ্ন প্রসুতীদের দোষে অধিকাংশ শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রেরই পঞ্চদশ প্রাপ্ত হয়, সেইজন্যই ঐ অঞ্চলে ১ মাসের অধিক শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী।

বাঙ্গালার সহবর্তনিক মধ্যে বাঙ্গালানী কলিকাতাতেই শিশু-মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা বেশী—হাজারকরা ৩৩১। অষ্টাশ্রম সহরেব নমুনা এই ;—নদীয়া—২৫৫, বীবভূম—২৫৬, বাঙ্গসাহী—২৪৫, বর্ধমান—২৩৭, বাঁকুড়া—২২৩, দিনাজপুর—২২৭, ফরিদপুর—২২৭, বগুড়া—২২৪।

কৌমার মৃত্যু—

১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কৌমারকাল ধরা যাইতে পারে (বালক-বালিকা উভয়েব)। বাঙ্গালাদেশে এই কৌমার মৃত্যুর হারও অত্যধিক, এমন কি এক হিসাবে শিশুমৃত্যু অপেক্ষাও উৎসর্গের কারণ। সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ বালকদের ও শতকরা ২৫ ১ ভাগ হইয়াছে বালিকাদের মৃত্যু। নীচে বাঙ্গালার কৌমার মৃত্যুর একটা তালিকা দিলাম :—

শতকরা কৌমার মৃত্যুর অনুপাত ১—১৫ বৎসর বয়স

বিভাগ	বালক	বালিকা
বর্ধমান	১৯ ৪	১৯ ২
প্রেসিডেন্সী	২৪ ৩	২৪ ০
রাজসাহী	২৭ ৫	২৬ ৫
ঢাকা	৩ ৩	২৮ ৪
চট্টগ্রাম	২৮ ৩	২৮ ৪

বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর হইলেও এখানে বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাত কম, তাহার কারণ এই অঞ্চলে জন্মসংখ্যার হ্রাস ও অ-বাঙ্গালীদের আমদানী। ঢাকা ও চট্টগ্রামে লোকদের উৎপাদিকা শক্তি বেশী; সুতরাং লোকসংখ্যার তুলনায় বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাতও বেশী হইয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রদত্ত হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কি শিশুমৃত্যু, কি কৌমার মৃত্যু, কি প্রসুতি মৃত্যু—সব দিক দিয়াই বাঙ্গালী জাতির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাদের কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি আছে এবং স্বজাতির কল্যাণের কথা এক মুহূর্তের জন্যও যাহাদের মনে উদয় হয়, তাহাবাই বুঝিবেন, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি কিরূপে ক্ষয় পাইতেছে। এই মৃত্যুর আক্রমণ রোধ করিতে না পারিলে ধাপুটে আমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। শিশু ও কুমারেরাই ভবিষ্যৎ জাতির বীজ, প্রসুতিবাই জাতির জন্মাত্রী। বাঙ্গালী জাতির ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে সকলের পক্ষে শিশুমৃত্যু ও প্রসুতিমৃত্যু

রোধের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই শক্তিহীন উৎসাহ-হীন জীবন-বৎ জ্ঞানকে বা কাছাকাছি এই চেষ্টা কবিবে ?

—আনন্দবাজার পত্রিকা

কলিকাতায় যক্ষ্মা—

যক্ষ্মাবোগে কলিকাতায় গড়ে প্রতিবৎসর দুই হাজারেরও উপরে লোক মারা যায়। এই ভয়ানক ব্যাধির হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্ত কলিকাতার স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান মে স্মীম তৈয়ার করিয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছেন যে, উহাকে অবিলম্বে কাণ্ডে পরিণত করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমান বৎসরের বজেটে ২০০০০ হাজার টাকা মূল্য করিয়াছেন। কলিকাতার মেডিক্যাল অফিসার বলিয়াছেন যে, এই-জন্ত প্রতি বৎসর ঐ পরিমাণ খরচ পড়িবে।

এই স্মীম অনুসাবে যক্ষ্মা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্ত একটি বিভাগ নিযুক্ত হইবে এবং ঐ বিভাগের সঙ্গে সাহায্যের যক্ষ্মা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহাদিগকে তদুপস্থিত করিবার জন্ত একটি উষধালয় স্থাপন করা হইবে।

এই সাংঘাতিক ব্যাধি কিরূপ ভাড়াভাড়া প্রসার লাভ করিতেছে তাহা নিম্নোক্ত মৃত্যুর হার দেখিলেই বোঝা যাইবে। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে এই রোগে কলিকাতায় মরে ১৭৩৮ জন, ১৯২১ খৃঃ অব্দে মৃত্যুসংখ্যা ২২০৮তে উঠে ; শেষোক্ত বৎসরে এই বোগে সহরে হাজার-করা ১৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুর হার সাময়িকভাবে একটু কমিয়াছিল বটে, কিন্তু মোটামুটি গত দশ বৎসরে সহরে এই রোগ কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ইন্ডুয়েঞ্জা মহামারীতে অধিবাসীদের জীবনীশক্তির হ্রাস করিলে এই রোগ বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পাইয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে পর হইতে ইহার প্রকোপ বড়ই ভয়ের কাবণ হইয়াছে।

স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমান যে, কলিকাতাতে অন্যান্য দশ হাজার লোক অল্পবিস্তর এই কাল ব্যাধিতে ভুগিতেছে। তাহাদের স্মীম অনুসাবে প্রস্তাবিত প্রতিদিনে ১০১২ জন লোক তদুপ ও উপদেশ পাইতে পাবিবে।

শ্রীলোকের মৃত্যুর হার

পুষ্ক অর্থাৎ মেয়েদের বিশেষতঃ মুসলমান মেয়েদের মধ্যেই এই রোগের বেশী প্রকোপ দেখা যায়। ১৯২১ খৃঃ অব্দে হাজারকরা ৩৮ শ্রীলোক মরিয়াছিল।

কোন বয়সে শ্রীলোক যক্ষ্মায় অধিক মরে, তাহা নিম্নোক্ত তালিকায় দেখান যাইতেছে :—

বয়স	হাজারকরা মৃত্যুর হার
১০ হইতে ১৫ বৎসর	১৯
১৫ " ২০ "	৬৫
২০ " ৩০ "	৬৭
৩০ " ৪৫ "	৫২

যেখানে এই রোগে একজন বালক বা যুবক মরে, সে জায়গায় চারিজন হইতে পাঁচজন বালিকা ও যুবতীর মৃত্যু হয়।

বিশেষজ্ঞদিগের মতে ছোট বাসগৃহ, আলো বাতাসের অভাব, ও পর্দাই মেয়েদের মৃত্যুর কারণ।

কলিকাতায় যক্ষ্মা সম্বন্ধীয় যক্ষ্মাই অত্যধিক; ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যেখানে-সেখানে খুঁতু ফেলা।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সঙ্গত; যেহেতু পীড়িত গরুর দুগ্ধ হইতেই এই বোগ জন্মিয়া থাকে।

১৯২১ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় কোন ওয়ার্ডে কিরূপ মৃত্যু হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওয়ার্ড	হাজারকরা মৃত্যুর হার
২০	৪৫
৮	৩৭
১১	১৩
৫	২৯
১২	১১
৬	২৬
১৯	৩৪

১৯১৯ খৃঃ অব্দে মৃত্যুর হারের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই ব্যাধি মাঝামাঝিভাবে বৃদ্ধি-পাইয়াছে। চার বৎসর আগে ২০নং ওয়ার্ডে যক্ষ্মায় হাজারকরা মৃত্যুর হার ছিল ২৫; ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ১৯ নং ওয়ার্ডে ছিল ২৩ এবং ২২ নং ওয়ার্ডে ছিল ১৯।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বঙ্গে গিন্‌কোনার চাষ—

কুইনাইন অপেক্ষা গিন্‌কোনার গুণ অধিক কিনা তৎসম্বন্ধে চিকিৎসকগণ গত বৎসর অনুসন্ধান করিয়া অনেকের মতে ইহা স্থির হইয়াছে যে, গিন্‌কোনার গুণ কুইনাইন অপেক্ষা অধিক। সেই-জন্ত গিন্‌কোনা-গাছ (লাল রঙের ছালের গাছ) অধিক পরিমাণে ১৯২১-২২ সালে রোপণ করা হইয়াছে।

১৯২২-২৩ সালে বীজ বপন করিয়া ৬০,০০০ ইপিকাকের গাছ হইয়াছে। উহা হইতে ২০০ সেবমূল পাওয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে তদুপস্থিত জন্ত কাঠখানায় গাঠান হইয়াছে। ইহার চাষ ও পরীক্ষায় ৪৭৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ডিজিটালিনের চাষও হইতেছে, তাহা মৎস্যকরা ও বে-সংসারী কাণ্ডের জন্ত পড়ত পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

—সমীক্ষী

বিদেশে চরকার আদর—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিতেছেন :—“জার্মানীর শিল্পজগতে নূতন পরিবর্তন হইল—বস্ত্র হইতে আবার মানুষের দিকে ফিরিয়া আসিবার প্রচেষ্টা। এনিময়ে আমি আমার দেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে জাতটা যন্ত্রের উন্নতি ও যন্ত্রের শক্তি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, উহাই এখন উপলব্ধি করিতেছে, শিল্পকে আবার বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। এক বৎসর পূর্বেও সেখানে হাতে মুতা কাটিবার কোন প্রথা ছিল না, কিন্তু একটা স্বাধীন জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বর্তমানে একমাত্র ব্যাভেরিয়াতেই ৫ লক্ষ চরকা চলিতেছে। “ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্নাল” নামক পত্রিকা হইতে উক্ত নিম্নলিখিত বিষয়টা সকলেরই বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। উহা ঘাণা আমাদের দরিদ্র ও হতাশ খন্দরপ্রস্তুতকারকদিগের অন্তরে আশার সঞ্চার হইতে পারে :—“দেশে কাপড়ের দাম অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়াতে জার্মানীর অনেক স্থানে আবার চরকার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত জার্মানীতে শণের চাষ এইবার শতকরা ৪০ ভাগে বেশী হইয়াছে বলিয়া ওল্ডেনবার্গ ব্রেমান লুক্সেমবার্গ প্রভৃতি স্থানে প্রায় ২৪০টি ক্ষুদ্র হস্তচালিত কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাভেরিয়ার হস্তচালিত টাকুর সংখ্যা প্রায় ৫০০০০।

—ত্রিপুরাহিতৈষী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—

বঙ্গ-সাহিত্যের অশ্রুতম যুগপ্রবর্তক স্বর্গীয় মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে [খানাকুল কৃষ্ণনগর, ছেলা হুগলী] আগামী ইষ্টাব্দের অবকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে।

—স্বর্গ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আজীবন দান ধ্যান করিয়া তাঁহার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই খন্দর প্রচারের জন্ত দান করিয়াছেন। প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ আনুমানিক ৫০ সহস্র টাকা হইবে। এই অর্থের বাহাতে সদ্যয় হয়, তজ্জন্ত অভিজ্ঞ তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি ট্রাস্টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এখন হইতেই উক্ত অর্থসাহায্যে খন্দর প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

শিক্ষার কথা—

১৯১৭-২২ অব্দের যে পঞ্চবাসিকী শিক্ষা-বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টেকনিক্যাল শিক্ষা-লাভেচ্ছাগণের সংখ্যা দেশে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে যেমন অধিকাংশ ছাত্রই—“সাধারণ বিভাগে” শিক্ষালাভ করিতে চাহিত, এখন আব সে ভাব নাই। এখন বেশীর ভাগ ছাত্রই ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী, অথবা অথ কোনও রকম শিল্পশিক্ষার জন্ত উদ্গীৰ্ব হইয়াছে। আইন কলেজেব ছাত্র-সংখ্যা কমিয়াও কমে নাই। ১৯১৭ অব্দে আইন-শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০১২ এবং ১৯২২ অব্দেব ছাত্রসংখ্যা ২৪৩৯। মেডিক্যাল কলেজগুলিব ছাত্রসংখ্যা গত পাঁচ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে। অথ্যায় বিভাগীয় শিক্ষালয়গুলিতেও খুব ছাত্র আসিতেছে। দেশেব পক্ষে সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই।

—এডুকেশন গেজেট

ত্রিপুরা বাজ্যেব শিক্ষার অবস্থা।—ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯২২-২৩ সনে ১৭৩টি বিদ্যালয় শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী ছিল। পূর্বে বৎসর বিদ্যালয়েব সংখ্যা ছিল ১৬৪, আলোচ্য বয়ে ছাত্রসংখ্যা ৫১২০। স্ট্রেট-পরিচালিত বিদ্যালয় বাতীত ২০টি বেসরকারী পাঠশালা আছে, তাহাতে ৬৯১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। সমগ্র রাজ্যে ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, তাহার ছাত্রসংখ্যা ৭৮৭। এষ্ট রাজ্যে বালকদিগের শিক্ষার জন্ত ১১টি পাঠশালা আছে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষার জন্ত ১০টি বিদ্যালয় আছে। সংস্কৃত বিদ্যালয়, মন্ডব, মাদ্রাসা ও শিল্পবিদ্যালয় এই শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরা-রাজ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ২৬৫২৭, টাকা, মধ্য শিক্ষাব জন্ত ৩৩২৭, টাকা ও বিশেষ শিক্ষাব জন্ত ৪৪৮৬, টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

—সম্মিলনী

অশ্বিনীকুমার দত্ত স্মৃতি ভাণ্ডার—

মহাপ্রাণ জননায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের পূণ্যস্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষাকল্পে কতিপয় লোকহিতকর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্ত বঙ্গের কর্মী ও প্রধানগণকে লইয়া একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আবণ্ডক ও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইলে (১) কালীঘাটে তাঁহার চিতাস্থানের উপরে একটি বিশ্রামস্থানের (২) তাঁহার জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্র বরিশালে একটি টাউন-হল (৩) বঙ্গের দুঃস্থ ছাত্রগণের সাহায্যে একটি ছাত্র-ভাণ্ডার এবং (৪) একটি গ্রন্থ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

এই মহাদুঃখে সাধনার্থ আমরা সাগ্রহে দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীগণেব নিকটে তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, শকাপূর্বক যিনি যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত ও যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। পত্রাদি সম্পাদকের নামে ৪ স্কিকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেবিতব্য।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সভাপতি, অশ্বিনীকুমার-স্মৃতি-সমিতি, ১২, গপার সারকুলাব বোড, কলিকাতা।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

উমেশচন্দ্র বিজয়ার পদক পূর্বকার—

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ মীরাট শাখা হইতে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যাবহ মহাশয়েব সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্র-ব্যাক্ষ্য সংক্ষেপে এবং প্রভৃতির আলোচনায় ও বর্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয় বিষয়ক সর্বশেষ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য পদক প্রদান করা হইবে। প্রবন্ধটি আগামী ১লা আষাঢ় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে শাখা-পরিষদেব নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

শ্রীরাজকিশোর রায়

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ—মীরাট শাখা

৩২ নং ওয়েস্ট স্ট্রীট,—মীরাট কেণ্ট।

বাঙালী যুবকের মহাপ্রাণতা—

পত্রাস্তবে প্রকাশ, বেঙ্গল মেডিক্যাল স্কুলেব তৃতীয় বাম্বিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত অমবেন্দনাথ চৌধুরী সম্প্রতি একটি মুনলমান স্ত্রীলোককে নিজেব বক্তৃতা দান করিয়া বাঁচাইয়াছেন। স্ত্রীলোকটি রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালে রক্তাক্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিল। জঠনক ডাক্তার ব্যবস্থা করেন যে, যদি কোন লোকের রক্ত বোগিণীব শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে বোগিণী বাঁচিতে পারে। ডাক্তারের কথা শুনিয়া উক্ত মহাপ্রাণ যুবক স্বীয় বক্তৃতা দান করিতে সম্মত হইলেন। ডাক্তার আবণ্ডক অপোপচার করিয়া প্রায় চল্লিশ গাউন্স রক্ত যুবকর শরীর হইতে লক্ষ্য বোগিণীর শরীরে প্রবেশ করিয়া দিয়াছেন।

—ঢাকাপ্রকাশ

পদব্রজে দূবদেশে যাত্রা—

কুড়িজন বাঙালী যুবক শ্রীভূতনাথ বায়ের নেতৃত্বে গত ১২ই ডিসেম্বর কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করেন। এই দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বাবকের নাম শ্রীধরগোপাল চট্টোপাধ্যায়। সে চন্দননগর ডুপ্পে কলেজের ছাত্র। দলের সর্বশ্রেষ্ঠের নাম জ্ঞানচন্দ্র সোম কলিকাতা খৃষ্টীয় যুবকসম্মিলনীব ব্যায়াম শিক্ষক। তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর। দলের মধ্যে ২২ জন মধ্য পণ হইতে কবিয়া আসেন, বাকী ৮ জন মাত্র ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ২৩ দিনে তাঁহারা কাশী পৌঁছিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫ দিন পথে বিশ্রাম করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট

বাঙালীর সম্মান লাভ—

আগামী মে মাসে নেপল্য় সহবে যে আন্তর্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসেব অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভাষাতত্ত্ব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রতিনিধিকল্পে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ও সুধাপক মর্মে ১৯২১ খ্র অব্দে প্যারিসে গত আন্তর্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসে কেথি ডু বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রতিনিধি নির্ধারিত হইয়াছিলেন।

—বন্দেমা তরঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রা—

চীনের রাজধানী পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগামী ১৫ই মার্চ তারিখে সদলবলে চীন যাত্রা করিবেন। কবিবরের অনেক পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ চীন দেশে খুব আদরের সহিত পঠিত হইতেছে। এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাঁহাকে খুব বড় রকমের অভ্যর্থনা দিবার আয়োজন চলিতেছে। ইতিমধ্যে চীন দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ সংস্করণ বাহির করিয়া কবিবরের খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কবিবরের পুস্তক পড়িয়া চীন দেশীয় যুবকবৃন্দের প্রাণে যে নুতন ভাবেন্দনা ও কর্ত্ত্বপ্ৰেরণার সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের কোনও গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে তেমন হয় নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে রবীন্দ্রনাথের চীন গমনে চীনবাসীর প্রাণে আবার নুতন আশা ও নুতন বলের সঞ্চার হইবে।

—ছোলতান

আবেদন—

সর্বসাধারণের নিকট নিবেদন :—একটি ১২ বৎসর বয়স্কাতীয়া শ্রেণীস্থ বন্দোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ কন্যা নিকম কুলীন রুদ্দরাম চক্রবর্তীর সন্তান, ফুলিয়ামেল অবিবাহিতা আছে। তাঁহার একটি ১৪ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ সহোদর আছে, এজন্য বালিকার স্বঘরে বিবাহ হওয়া প্রয়োজন। বালকবালিকা অতি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন। তাঁহারা এখন অনাথ, গৃহহীন ও অর্থহীন—সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিয়া থাকে। বালিকার বিবাহের বয়স হইয়াছে। যদি কোন মহাত্মা মাত্র বালিকাটিকে গ্রহণ করিয়া স্বঘরে বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমায় পত্র লিখুন। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল কবিবেন। শীবাখালদাস পালদি, প্রবাসী অফিস, ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

দান—

রামকৃষ্ণমন্ডল অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়—উত্তরপাড়া সন্নিকটস্থ ভক্তকালী নামক গ্রামে রামকৃষ্ণমন্ডলের অধীনে এতটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি রামকৃষ্ণমন্ডলের উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মন্থথনাথ পাল মহাশয় তাঁহার বিশ হাজার টাকা মূল্যের গুহুং বসতবাটী এই বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বোর্ডিং এর জন্য দান করিয়া এই মহৎকর্ম্মের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্বারা ঐ স্থানে নেপাল মহাবাজের ভূতপুত্র ডাক্তার গামধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য চিকিৎসা-সালয়েব কাণ্ড নিয়ামত ভাবে চলিতেছে; তাঁহারও সমস্ত ব্যয়ভার উক্ত পাল মহাশয় সানন্দে বহন করিয়া রামকৃষ্ণমন্ডলের বিশেষ সহায়তা কবিতেছেন। এজন্য রামকৃষ্ণমন্ডল তাঁহাকে অমৃতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে ৩৫টি বালিকা হিন্দু আদর্শে নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। পূজাপাঠ, সংস্কৃত অধ্যয়ন, এবং নানা গৃহশিল্প শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা যাতে বালিকারা আদর্শ নারী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনী হইয়া উঠিতে পারে উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্ত্বপক্ষ তাহারই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি সর্ব্বের দুইজন ব্রহ্মচারিণী শিক্ষয়িত্রী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য একজন পণ্ডিত শিক্ষা কাণ্ডে নিযুক্ত আছেন।

যদি কোন প্রালোক সংস্কৃত শিক্ষা এবং স্কুলে পরিচালনের

ভার নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করিতে অগ্রনর হইলে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণমন্ডল বিশেষ উপকৃত হয়। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সম্প্রতি মাসিক ৬০০ টাকা, যদি কেহ কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সর্ব্বের সম্পাদক ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাল এম. এ ; বি, এল ; পি, আর, এস ; পি, এইচ, ডি, ৯৬নং আর্মর্স্ট্রেট কলিকাতার টিকানায় পাঠাইতে পারেন। নিবেদন ইতি।

ডাঃ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, এম-বি, সহঃ সম্পাদক,

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙালীর সম্মান—

সোমেশের কৃতিত্ব।—অনেকে অগত আছেন যে ঢাকা বঙ্গযোগিনী নিবাসী বাবু সোমেশচন্দ্র বসু মানসিক গণনায় বিলাতে এমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন যে তাহাতে সেখানকার বড় বড় গণিতজ্ঞগণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। সোমেশ বাবু কুড়ি একশটি অঙ্কের বর্গ ও ঘন মূল্য মুখে মুখে পাঁচ মিনিটে বলিয়া দিতে পারেন! বিলাতে কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি আমেরিকায় গমন করিয়াছেন! সেখানকার গণিতবিদগণ তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানসিক গণিতবেত্তা বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

—সম্মিলন

সেবক

ভারতবর্ষ

কাকিনাড়া কংগ্রেসে আত্মজাতিক ভোজ—

কংগ্রেস অধিবেশনের শেষ দিনে কাকিনাড়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি জাতিতন্ত্র-নির্বির্শেষে সমুদায় কংগ্রেস প্রতিনিধি, মাণ্ডগণ্য অতিথি, অভ্যর্থনা-সমিতির সমুদায় সভ্য, পুরুষ- ও নারী-নির্বির্শেষে সমুদায় স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতিকে একটি আত্মজাতিক ভোজে নিমন্ত্রণ কবেন। সন্ধ্যা আটটার সময় এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। যাহারা ইতিপূর্বেই কাকিনাড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যতীত প্রায় সকলেই এই ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় বলিতেছি এইজন্য যে প্রায় দুই শত লোক সর্ব্বসাধারণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে সম্মত না থাকায় তাঁহাদের জন্য অল্প ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। অপর দিকে কয়েক সহস্র নবনারী হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন-নির্বির্শেষে পাশাপাশি ও অতি ঘেঁসাঘেসি বসিয়া নিরামিষ আহার সানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। প্রথম দুই পংক্তি মহিলাদেব জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তৃতীয় পংক্তিতেই বাঙালীরা বসিয়া ছিলেন ও পরে অন্যান্য দেশের লোকেবা আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস-নেতাদের আসন কয়েক পংক্তি পরে সকলের মানামানি জায়গায় ছিল। শ্রীমতী মহম্মদ আলী-পত্নী বাঈ-আম্মা প্রভৃতিও আসিয়া অপর হিন্দু নারীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মহম্মদ-আলী-পত্নী, সভা-সমিতিতে বোর্কা পরিয়া আসেন। ভোজন কালে কিছুক্ষণ তিনি বোর্কার মুখাবরণের ভিতর দিয়াই আহার করিতেছিলেন, পরে অস্থবিধা হওয়ায় মুখের ঢাকা সরাইয়া ফেলিয়া খাইতে লাগিলেন। খাওয়া চলিতে লাগিলে লোকের আনন্দও বাড়িতে লাগিল। অন্ধদেশের মেয়েরা খাইতে খাইতে নানারকম গান গাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সচ্ছন্দ সাবলীল গতিভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতে লাগিল তাঁহারা যেন নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে কোন উৎসবক্রিয়ার ব্যাপ্ত আছেন।

এইরূপে একত্র পানাহার-ক্রিয়া কংগ্রেসের নবা দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। অনেকের বলিতে শুনিয়াছি যে এবারকার কাকিনাড়া-কংগ্রেসে এই আনুষ্ঠানিক ভোজই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।

জাইটোর হত্যা-উৎসব—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী জাইটোতে অকালী জাঠাদের উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সর্বকারী ইস্তাহাব এবং বেসর্বকারী ইস্তাহাবেও ভিতর ঢেব প্রভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই প্রভেদটা অবশ্য কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। কাবণ, এরূপ প্রভেদ ইতিপূর্বে এইধরনের প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখা গিয়াছে।

জাইটো হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ব্যবস্থা-পরিষদের অন্তঃস্থ কাব্য স্থগিত রাখিয়া উক্ত হত্যা কাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। হোম-মেন্ডের শ্রাব্ ন্যালুকম্ হেলী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন—দেশীয় রাজ্যের কার্যাবলী ব্যবস্থা-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইতে পাবে না। প্রসিডেণ্ট হোম মেন্ডের আপত্তিই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া পণ্ডিত মদনমোহনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইহার পরেও গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সর্দার গোলাব সিং অকালীদের সম্পর্কে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম এই যে শিখদের অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্ত এবং অকালী আন্দোলন সম্বন্ধে বিগোর্ট করিবার জন্ত ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ বেসর্বকারী নির্বাচিত সদস্য এবং এক তৃতীয়াংশ সদস্যী সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক। এ ব্যাপারেও সর্বকারী সদস্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অবশেষে নানা ভাষা বিতর্কের পর এ সম্পর্কে ডাঃ গোবের সংশোধিত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ডাঃ গোবের প্রস্তাব—যে কমিটি গঠিত হইবে, তাঁহার সদস্য নির্বাচন এবং সর্বকারী ও বেসর্বকারী সদস্যের সংখ্যা নির্ণয়ের ভার থাকিবে গবর্নমেন্টের হাতে।

লালা হংসরাজ ও সঙ্গগম্ চেটা ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। তাঁহারা জাইটোর ঘটনা-প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত ঘটনাস্থলে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জাইটোয় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রকৃত চেহারা এই সব ঘটনার স্খিতব দিয়াই চমৎকাবে যুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ব্যবস্থা-পরিষদের দ্বাৰা আমাদেব দুঃখ যে কতটা ঘুচিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মহাত্মা গান্ধী অকালী শিখগণকে অনুবোধ করিয়াছেন :—শিখনেতা ছাড়াও দেশের অন্যান্য নেতাদের উপদেশ লইয়া তবে ভবিষ্যতে অকালী জাঠা প্রেরণ করা সম্ভব। এখন জাঠা প্রেরণ বন্ধ করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের কি ফল হয় তাহাই দেখা কর্তব্য।

লালা লজপত রায়ও এ সম্পর্কে মহাত্মারই মত সমর্থন করিয়াছেন।

একদল অকালী জাঠা-প্রেরণ-সম্পর্কে মহাত্মার মত আলোচনার জন্ত অকাল তখতের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন। মহাত্মার সঙ্গে একমত হইতে না পারায় তাঁহারা জাঠা প্রেরণ করাই স্থির করিয়াছেন এবং সেই দিনই একদল অকালী চিকিৎসক গ্রন্থ-সাহেব প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া অমৃতসর হইতে জাইটো অভিমুখে প্রারিত হইয়াছে।

অকালীদের দুইজন নেতা মহাত্মাজীব সঙ্গে পরামর্শ করিতে পুণায় চলিয়া গিয়াছেন। নেতাগণ মনে করেন মহাত্মা ভুল সংবাদ পাইয়া এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এখন জাঠা

পাঠানো বন্ধ করিলে বারদৌলী প্রস্তাবের পর দেশের যে অবস্থা হইয়াছিল আবার ঠিক সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। চতুর্দিক হইতে জাঠাতে যোগদান করিবার জন্ত অমৃতসরে বহু শিখ আসিয়া হাজির হইতেছে।

রেলের সুব্যবস্থা—

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

মপাবিধ বড়লাট যাত্রীদের সুবিধার জন্ত রেল-কর্তৃপক্ষদিগকে আদেশ করুন—

(১) ভিড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত যে স্থানে প্রয়োজন সেখানে যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

(২) যে-সব ট্রেনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী দেওয়া হয় না সে-সব ট্রেনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী দিতে হইবে।

(৩) ছোট ছোট স্টেশনেও হিন্দু-মুসলমানদিগের জন্ত পানীয় জল সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(৪) যে-সব বড় স্টেশনে হিন্দু-মুসলমান যাত্রীদের জন্ত খাবারের ঘর নাই সে-সব স্টেশনে খাবারের ঘরের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) যে-সব বড় স্টেশনে মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ এবং রমণীদের জন্ত বিশ্রাম ঘর নাই সে-সব স্টেশনে বিশ্রাম-ঘর তৈরী করিতে হইবে।

প্রস্তাব শু পাশ হইল, কিন্তু এ প্রস্তাব কাজে কতটা পাটানো হইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর বেল-যাত্রীদের অসুবিধার আন্দোলন ৬০ দিন হইতেই করা হইতেছে, কিন্তু রেল-কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গে নাই।

সিংহলে শাসন-সংস্কার—

সিংহলের শাসন-সংস্কারে এবার ভারতবাসীর পক্ষ হইতে দুইজন প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হইবেন স্থির হইয়াছে। পূর্বে একজন প্রতিনিধি মনোনীত হইতেন। কর্তৃপক্ষ বলেন, এখন কিছুকালের জন্ত মনোনয়ন অথবা অনুমাবে কাজ হইবে। পরে ভারত-প্রবাসী আপনাদের প্রতিনিধি আপনাই নির্বাচিত করিতে পারিবেন। সেখানকার প্রবাসী ভারতসন্তানেরা বলেন, এখন হইতেই প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। মনোনীত দুইজন সদস্যের একজন সঙ্গের প্রতিনিধি স্বরূপ থাকিবেন; আর-একজন সিংহলের পল্লীবাসী ভারতসন্তানের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য করিবেন।

পঞ্জাবের আব্গারী হিসাব—

১৯২২-২৩ সালের পঞ্জাবের আব্গারী বিবরণে প্রকাশ, দেশী মদের ব্যবহার প্রায় সওয়ালক্ষ গ্যালন কমিয়াছে। ফলে সরকারী রাজস্বও প্রায় ১২ লক্ষ টাকা কম আদায় হইয়াছে। গোপনে মদ তৈরী ১৯১৯-২০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী। কর্তৃপক্ষের মতে মদের মূল্যাধিক্যই নাকি এই হ্রাসের কারণ।

ব্যবস্থা-পরিষদে শাসন-সংস্কার—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ত্রীযুক্ত রঙ্গচরিত্রার ভারতের জন্ত স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব ছিল পররাষ্ট্র-ব্যাপারে ভারতে উপনিবেশিক শাসনপ্রণালী এবং আভ্যন্তরিক সকল বিষয়ে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রদান করা হউক।

এলা বাহলা সর্বকারের তরফ হইতে এ প্রস্তাবের খুব জব্দদস্ত

অতিবাদ হইয়াছে। শ্রাব ম্যালকম্ হেনী বলিয়াছেন, ভারতীয় রানস্ববর্গ যতদিন নূতন ব্যবস্থা সঙ্ঘে তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ না করিবেন, যতদিন ভারতের সীমান্ত রক্ষার সমস্তার সমাধান না হইবে, সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান যতদিন দূরীভূত না হইতেছে, হীনবল সম্প্রদায়গুলির স্বার্থসংরক্ষণের সুব্যবস্থা যতদিন না হইবে, ততদিন ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু শ্রীযুক্ত বঙ্গচরিত্রাবের প্রস্তাবের একটি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন, ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বড়লাট

(১) সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি পৰামর্শ-পরিষদ গঠিত করুন। সেই পরিষদ সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের জম্ম শাসনপদ্ধতি রচনার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) বর্তমান ব্যবস্থাপক সভা ভারিয়া দিয়া তাহার স্থলে নূতন সভা গঠিত হইবার পূর্বে তাহার সমক্ষে সমিতির রচিত শাসন-পদ্ধতির সম্ভা উপস্থিত করিতে হইবে এবং তাহাকেই আইনে পরিণত করিবার জম্ম ব্রিটিশ প্যালেমেণ্টের দ্বাৰা পেশ করা হইবে।

কয়েক দিন ধরিয়। এই ব্যাপার লইয়া তর্কবিতর্ক চলে। অবশেষে ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবটি সঙ্ঘে ব্যবস্থা-পরিষদে ৮৬ম সীমান্সা হইয়া গিয়াছে। ভোটের জোবে পণ্ডিত মতিলালের সংশোধিত প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার Round Table Conference বসাইবার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ৭৬ জন এবং বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ৪৮ জন।

চৌরীচৌরার স্মৃতিস্তম্ভ—

গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরীচৌরা গ্রামে গত ১৯২২ সনেই ৫ই ফেব্রুয়ারী এক জনতা কতকগুলি পুলিশ পোজকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিয়াছিল। সেই পুলিশগণের স্মৃতিস্মারক জম্ম এক স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার যুক্তপ্রদেশের গবর্নর উক্ত স্তম্ভের আবিষ্কার উন্মোচন করিয়াছেন।

চৌরীচৌরার অনির্দিষ্ট ক্ষিপ্ত জন-সঙ্ঘ যে অশ্রায় কবিয়াছিল তাহার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল। আর জালিয়ানওয়ালাবাগে শিক্ষিত উচ্চপদস্থ সাদা কর্মচারীরা অক্ষুণ্ণ চিত্তে পাণ্ডিত্যের অভিনয় করিয়াছিল এখনও তাহার সমর্থনের চেষ্টায় আমূলতন্ত্রের তরফ হইতে অজস্র তর্কজালের সৃষ্টি হইতেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে, মলঙ্গার

হাটে, জাইটোতে চৌরীচৌরারই অভিনয় হইয়াছে ও হইতেছে। তবে সে অভিনয় করিতেছেন "রাজার নন্দিনী প্যারী" স্মরণে 'যা করেন তাই শোভা পায়।'

আয়ুর্বেদীয় কনফারেন্স—

আগামী এপ্রিল মাসে কলকাতাতে সর্বভারত আয়ুর্বেদীয় কনফারেন্সের বৈঠক বসিবে। কলিকাতার কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেনকে এই কনফারেন্সে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জম্ম আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তিনি ১৯১২ সালে কানপুর আয়ুর্বেদীয় কনফারেন্সেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই কনফারেন্সের সংশ্রবে প্রদর্শনীও খোলা হইবে।

মেথরদের সমাজ সংস্কার—

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত শেঠ রঘুমলের সভাপতিত্বে দিল্লীতে বাঙ্গালী আধ্যাত্মিক প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লাল। লাজপত রায়, স্বামী সত্যানন্দ প্রমুখ আধ্যাত্মিক নেতাগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় লালাজী বলিয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের পাশে, তাঁহাদের সমান আসনে আজ মেথরদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার ভাবি আনন্দ হইতেছে। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের উন্নয়ন বাতীত হিন্দুজাতির উন্নতি কখনো সম্ভবপূর্ণ নহে। মেথরদের ভিতর অনেক দুর্নীতি আছে। এইসব দুর্নীতি দূর করিতে হইবে। দীর্ঘকাল সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়াতে তাহাদের সমাজে এই-সব দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। এইসমস্ত দূর্ব হইলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যাহারা এখন তাহাদের সহিত মেলামেশা করেন না তাঁহারাও আর মিশিতে আপত্তি করিবেন না। মেথরদের সমাজ-সংস্কার-মূলক কতকগুলি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। এইসব প্রস্তাবের বক্তারা সকলেই মেথর। সহস্রাধিক মেথর এই সভায় যোগদান করিয়াছিল।

সামন্ত-রাজ্যশাসন-সংস্কার—

পুন্য ২০শে ফেব্রুয়ারী খবরে প্রকাশ, আউকরাজ্যের রাজা শ্রীমন্ত বালা সাহেব তাঁহার প্রজাবৃন্দকে প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতি অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আপাততঃ স্থির হইয়াছে, রাজ্যের শাসন-পরিষদের ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জন প্রজা-সাধারণ কর্তৃক নিঃস্বাচিত ও বাকী ১৭ জন গবর্নমেন্টের দ্বারা মনোনীত হইবেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়



কাশ্মীরের ডাল হ্রদ—সন্ধ্যাকালে
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন কর্তৃক কাঠের খোদাই

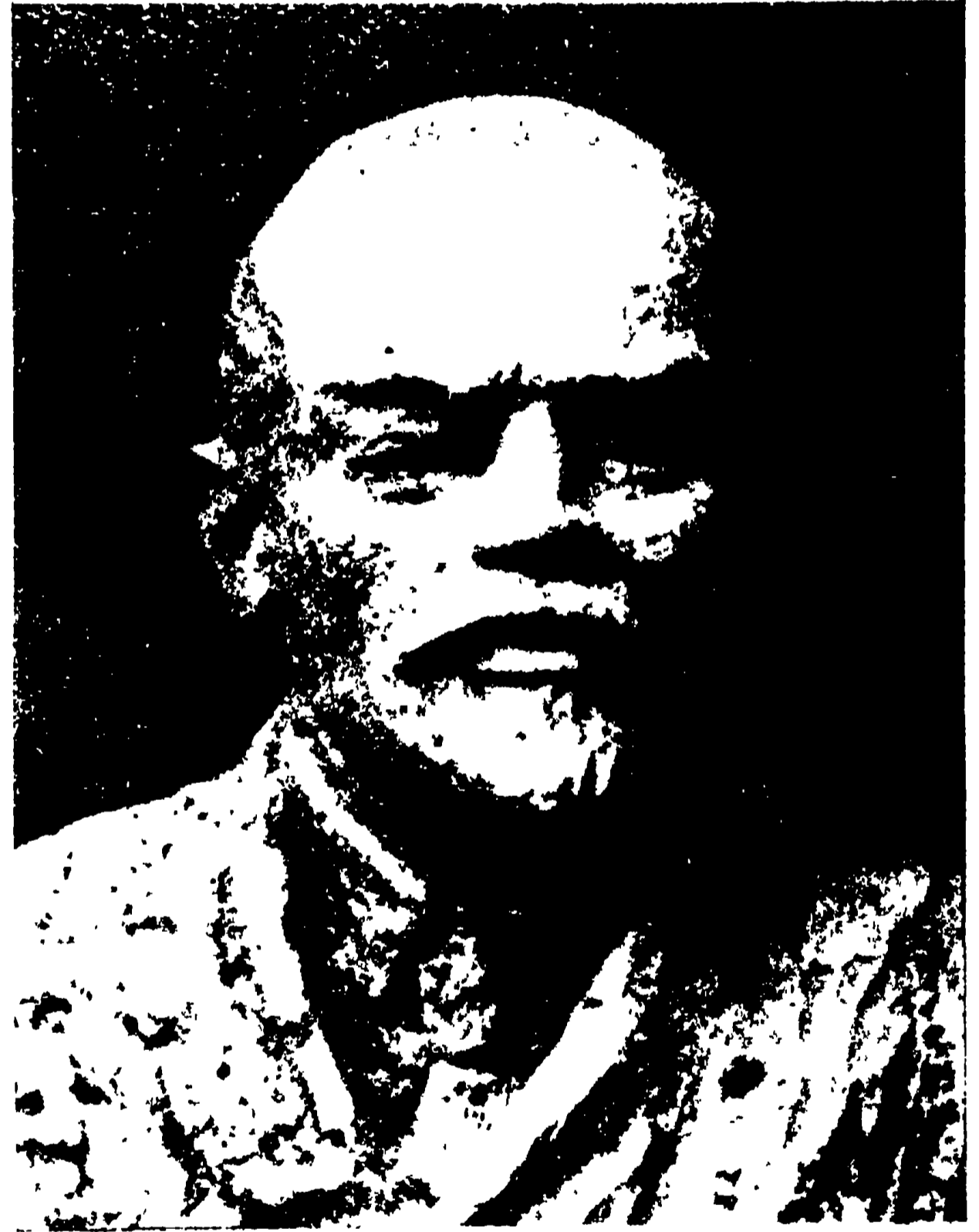


লেনিন

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের স্রষ্টা, ভাবুক দার্শনিক ও কর্মসৌগী লেনিনের দেহাবসান ঘটিয়াছে। যেমন একদিকে তাঁহাকে রক্ত পিপাসু নর-রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা কবিবার চেষ্টা হইয়াছে, অপন দিকে তেমনই বর্তমান-যুগে শ্রেষ্ঠ মানবরূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাকে মানব অথবা দানব যাহাই বলা হউক না কেন, তিনি যে একজন শক্তিশ্বর পুরুষ ছিলেন, রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনায় যে তাঁহাব অদ্ভুত দক্ষতা ছিল, উত্তেজিত জনসাধারণকে বশে রাখিবার কৌশল যে তিনি সম্পূর্ণরূপে অধিগত কবিয়াছিলেন, ইহা শকমিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। একধাৰে যেমন রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁহার বজ্রের স্থায় কঠোর মন ছিল, অপরদিকে রুশিয়ার কৃষাণ-কুলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার কুমুমকোমল ভরস্তু প্রাণের সহানুভূতি ছিল। রুশিয়ার নিপীড়িত কৃষাণকুলের অশ্রু মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া রুশ জাতিকে নূতন যুগের প্রবর্তক ও চালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার জীবনের ব্রত ছিল। লেনিন বিগ্রহেব পুঞ্জক ছিলেন; নরের আশ্রয় মধ্যেই তিনি নারায়ণের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত মার্কিন পাদ্রী হোমস বর্তমান যুগের তিনটি শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে লেনিনের স্থান স্বীকার করিয়া লেনিনের সঞ্চিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের তুলনা কবিয়াছেন। লেনিনকে বিশেষভাবে জানিবাব শ্রয়োগ পাঠিয়াছিলেন রুশ-তপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কি। গোর্কি বলেন যে “বর্তমান যুগে লেনিনের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক মাদ্রায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়াছে। সমস্ত মনুষ্যত্ব তাঁহার মধ্যে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে এমনটি আর পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের চাপে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া লেনিনকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইলেও তাঁহাব মনে মহামানবের যে পরিকল্পনাটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা যাহাতে ভবিষ্যতে সত্য হইয়া উঠিতে পারে তাহার চিন্তায় তিনি তাহার অবসর-সময়টুকু ক্ষেপণ করেন। লেনিনের জীবনের মূলমন্ত্র মানবের মঙ্গল সাধন, এবং অদৃব ভবিষ্যতে মানবের অকল্যাণকর যাহা কিছু তাহা যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেই চেষ্টাতেই ত্যাগী সন্ন্যাসী অমিততেজে ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সর্বোত্তম বলিতে যাহা বুঝেন তাহার জন্ত আপনার দেহমন তিলে তিলে ক্ষয় করিতে এই বীর-সন্ন্যাসী কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।”

তিনি যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন সে আদর্শ জগতের পক্ষে হিতকর কি না তাহা মহাকাল ভবিষ্যতে সাক্ষ্য দিবেন। তিনি যেরূপ ঐকান্তিক আগ্রহে জগতের দুঃখ-দুর্দশার জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার জন্ত শত সহস্র রুশ নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে তিনি এমন আসন দখল করিয়া বসিয়া-ছেন যে তাঁহার আদর্শকে রক্ষা করিতে তাহারা হাশুমুখে মরণকে বরণ করিতে পারে। বিখ্যাত শ্রমিকনেতা জর্জ ল্যান্স্বেরি রুশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিতেছেন যে সমগ্র রুশ জাতির নিকট লেনিন নব জীবনের প্রতীক। যে নতন আদর্শ সমগ্র সোভিয়েট

রুশিয়াকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহার মূর্তি বিগ্রহ লেনিন। সহস্র সহস্র নবনারী তাঁহাব জন্ত অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত। তাহারা তাঁহাকে মগাকপে ভালোবাসে ও জীবনের পথ-প্রদর্শকরূপে ভক্তি করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির তিনিই যে মস্তদ্রষ্টা রুশি। রুশিয়ার এই প্রাণের ঠাকুরটিকে কিন্তু ইংরেজ রাষ্ট্র নীতিবিদেবা অমানুষ-রূপে পরিকীর্ষিত করিয়াছেন। ভূতপূর্ব পর-রাষ্ট্র-সচিব মিঃ চাচ্চিল বলেন যে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ও সর্বাপেক্ষা কুৎসিত লোক হইতেছে এই লেনিন।



মহামানব লেনিন

গুরুতর পরিশ্রমে লেনিন সাংঘাতিক রূপে পীড়িত হইয়া পড়েন। তথাপি রুশিয়ার সেবা করিতে বিরত না হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্কের শিরা-গুলি শুকাইয়া যায়। তাহার ফলে যুগমানব লেনিনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার দেহাবশেষ বহন করিয়া রক্তবসন-পরিহিত, রক্তপতাকাধারী লাল পশ্টনের এক বিবাহ মিছিল বাহির হইয়াছিল এবং ইহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত রুশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডেব নাম পরিবর্তিত কবিয়া লেলিনগ্রাড দেওয়া হইয়াছে।

অনেকে আশা করিয়াছিলেন লেনিনের মৃত্যুর পর টুটুস্কি, জিনো-

বাধিবে এবং তাহার ফলে সোভিয়েট সরকার ধংস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে রুশনেতৃবর্গ রাইকফকে নায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সাহচর্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। লেনিনের সাধনা ধংস হইবে না।

লেনিনের জন্ম হয় ১০ই এপ্রিল ১৮৭০ খৃঃ অব্দে, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন গত ২১ জানুয়ারী ১৯২৪ খৃঃ অব্দে। রুশিয়ার ভল্গা নদীর উপরে সিমবাবস্ক সহরে তাঁহার জন্ম হয়। লেনিনের আসল নাম ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানফ (Vladimir Ilich Ulianov)।

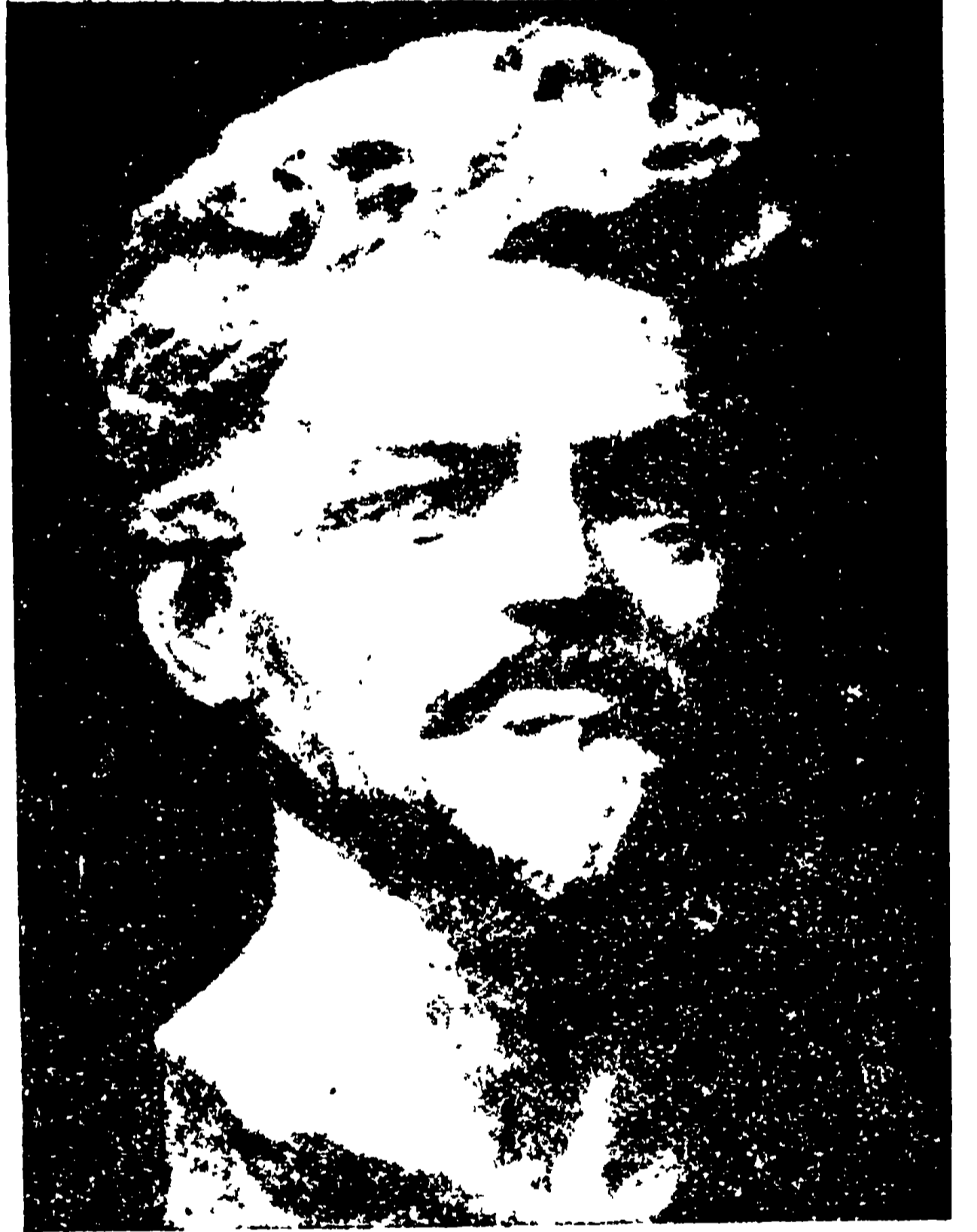
লেনিনের পিতা একজন স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি সন্তান ছিল। তাঁহার গৃহকে তিনি একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং সন্তানদের নিকট হইতে প্রতিদানেও যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। লেনিনের প্রথম শিক্ষা তাঁহার গৃহে পিতার নিকট শুরুর হয়। বাল্যকাল হইতেই লেনিন্ এবং তাঁহার পাঁচ ভাই বোন দেশের শ্রমিক এবং গবীব লোকদের দু'খ কষ্ট নিজেদের অন্তরে পূর্ণভাবে অনুভব করিতেন। সমস্ত দেশের লোককে তাঁহারা নিজেদের পবিবারের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহারা দেশের দুঃখীদের উন্নতিব জন্ম আশ্বনিয়োগ করিলেন।

২০শে মে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে লেনিনের ভ্রাতা আলাক্জাণ্ডারের শলু-শেলবার্গ জেলখানায় ফাঁসি হইল। লেনিনের এই ভ্রাতাটি পড়াশুনায় এবং অশাস্ত মানসিক বৃত্তিতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন। সেণ্টপিটার্ভার্গ সহবে অবস্থান কালে আলাক্জাণ্ডার “জন-মত” নামক বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়া জারের গোয়েন্দা-পুলিস কর্তৃক ধৃত হন। বিচারের সময় তিনি আশ্র-পক্ষ সমর্থন করেন নাই এবং তাঁহার বিরাগে যে যে অভিযোগ আনা হয় তাহার কিছুটা অস্বীকার করেন নাই। বিচারকালে অভিযোগ স্বীকার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু তিনি বলেন নাই। সহকর্মীদের বাঁচাইবার জন্মই এই আশ্বত্যাগ। তবে বিচারকালে দণ্ড প্রাপ্তির পূর্বে তিনি এই কয়েকটি কথা বলেন— দেশের বর্তমান অবস্থায় গোপনে বিদ্রোহের আয়োজন করা ছাড়া আর কোন সহজ পথ নাই, বর্তমান জারের এবং শাসক-সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে দেশকে বাঁচাইবার এই একমাত্র পথ।—ফাঁসির পূর্বে তাঁহার মাতা তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করেন এবং পুত্রকে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু আলাক্জাণ্ডার তাহা কবিত্তে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। লেনিনের বয়স এই সময় মাত্র সতের বৎসর। ভ্রাতার মৃত্যু তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “Socialism” প্রচার করার অভিযোগে লেনিনকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পব তিনি নেভা সহরে আসেন (১৮৯১)। সেণ্টপিটার্ভার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং অর্থনীতি পাঠ্য করিবার সময় লেনিন্ Marxism সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রুশীয় সোসিয়ালিজমের পিতা প্লেখানফ বলেন “একদিন এই যুবা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে”। ভবিষ্যতে এই বাক্য সার্থক হইয়াছিল। ইহার পনের বৎসর পরে লেনিন্ প্লেখানফের হাত হইতে Social-Democratic Partyর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পাঁচিশ বছর প্লেখানফকে Great Soviet Congress হইতে একেবারে দূর করেন। কিন্তু এই সময় হইতে শাসক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে। এই সময় তিনি শ্রমিক সম্প্রদায়ের উন্নতিব জন্ম প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। দেশের শ্রমিক দলও তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইল।

২৭শে জানুয়ারী ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে লেনিন্ ধৃত হইয়া পূর্ব সাই-বেরিয়াতে নির্বাসিত হইলেন। এই নির্বাসনকে তিনি দুঃখের সঙ্গে বরণ না করিয়া আনন্দের সঙ্গে বরণ করিয়া পাঠ এবং চিন্তায় নিয়োগ করিলেন। এই সময় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করেন। সবগুলি অণ্ড নামে প্রকাশ করা হয়।

লেনিনের নির্বাসন-দণ্ড সমাপ্তির পর তাঁহাকে রুশিয়ার কোন বড় সহরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করিতে দেওয়া হইত না। এই সময় আরো কয়েকজন সোসিয়ালিস্ট নেতার সহিত একযোগে লেনিন্ ইস্করা নামে এক কাগজ বাহির করেন এবং এই কাগজের সাহায্যে সমগ্র রুশিয়াতে সোসিয়ালিস্ট মতবাদ প্রচার হইতে



বলুসেভিক্ নেতা ট্রুটস্কি—মহামতি লেনিনের সঙ্গে একযোগে রুশিয়ার স্থায়ী উন্নতির জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং কবিত্তেছেন

লাগিল। এইবার তাঁহাকে কিছু কালের জন্ম রুশিয়া ত্যাগ করিতে হইল—শাসকদলের অত্যাচারে। সকল সময় তাঁহার পিছনে রুশীয় গোয়েন্দা-পুলিস ঘুরিত। লণ্ডন, ম্যানিক, ক্রেসেল্‌স্, প্যারিস, ইত্যাদি সকল মহা-সহর ভ্রমণ করিয়া লেনিন্ অবশেষে জেনেভা সহবে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিলেন। এই দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যে তাঁহার পত্নী নাদ্‌জ্‌ডা ক্রুপ্‌স্কায়া (Nadezhda Krupskaya) কখনও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। জেনেভা সহরে বাস কালে লেনিন্-পত্নী স্বামীব সকল কার্যে প্রাণপণে এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে তাঁহার প্রায় প্রাণসংশয় হইল।

১৯০৩ খৃঃ অব্দে Russian Social Democratic Partyর ক্রেসেল্‌স্ সহরে দ্বিতীয় কনগ্রেস হয়। এই মহাসভাতে দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। মেনসেভিক্ এবং বলসেভিক্। এই দুইটি

কথার অর্থ, কম-সংখ্যার দল এবং বৃহৎ-সংখ্যার দল। আমরা বংশৈতিক কথার অর্থে যে এক দল বৃহৎ-দাড়িওয়ালা ভীষণ-দর্শন দস্যুর কথা মনে করি তাহা ভুল। লেনিন্ বংশৈতিকির নেতা হইলেন।

১৯০৫ খৃঃঅন্দে লেনিন্ রাজ-কস্মা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন কিন্তু পর বৎসর আবার তাঁহাকে ফিনল্যাণ্ডে পলায়ন করিতে হইল। ইহার পর তিনি কিছুকাল সুইট্জারল্যাণ্ড এবং প্যারিতে বাস করেন এবং The Social Democrat এবং The Proletariat নামে দুই খানি কাগজ বাহির করেন। এই সময় হইতে মহাবুদ্ধের সময় পর্যন্ত লেনিন্ নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্বসম্মত তাঁহার প্রায় বিশখানি গ্রন্থ আছে। কতকগুলির নাম—Development of Capitalism in Russia : Twelve years : The Agrarian Problem : The State and Revolution : What is to be Done : Imperialism as the Last Stage of Capitalism : ইত্যাদি।

যুদ্ধের সময়ে তিনি অষ্ট্রিয়ার অমিকদলকে বিজ্রোহ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং এই অপরাধে তাঁহার কারাদণ্ড হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে করাসী সোসিয়ালিস্ট্ দলের চেষ্টার তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং শান্তি এবং মানব-ঐক্যের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৯১৭ সালে যখন রুশিয়ার জারতন্ত্রের অবসান হইল লেনিন্ দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু মিত্রশক্তি বিধম আপত্তি করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি অবশেষে জার্মেনির ভিতর দিয়া একশত অনূচর লইয়া স্বদেশে প্রবেশ করিলেন। জার্মেনির ভিতর দিয়া প্রবেশ করার জন্য অনেকে বলেন লেনিন্ জার্মেনির চর ছিলেন। এই অভিযোগের কোন প্রমাণ নাই।

লেনিন্ যখন পেটোগ্রাড্ সহরে প্রবেশ করি —বিপুল সৈন্যদল এবং জনসজ্জ তাঁহাকে রাজার প্রাণ্য সম্মানের সঙ্গে বরণ করিল। এই সময় হইতে লেনিন্ রুশিয়ার ভাগ্য-বিধাতা হইলেন। ইহাই লেনিন্দের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মিত্র-শক্তি বরাবর বংশৈতিক্ এবং ইহার নেতার কলঙ্ক রটনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। লোকের চক্ষে লেনিন্কে রক্ত-পিপাসু নররাক্ষস বলিয়া প্রমাণ কবিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই। ইহার লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে লেনিন্ মানব-শত্রু এবং মিত্র-শক্তিই একমাত্র মানব-মিত্র। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই মহা-মানবের অনিষ্ট এই মিত্র-শক্তি করিতে পারে নাই। লেনিন্দের চরিত্রশুণে এবং প্রতিষ্ঠাশিখার সকল কলঙ্ক-কথা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে। লেনিন্ ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের দুঃখ তিনি নিজের অন্তরে নিজের দুঃখের মত অনুভব করিতেন। একজন মানুষ দুঃখী থাকিবে এবং আর-একজন সেই সময়ে সুখী হইবে, মহাপ্রাণ লেনিন্ ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। পৃথিবীর দুঃখের এবং সুখের বোঝার ভার সকল মানুষকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে এই ছিল লেনিন্দের মত।

লেনিন্কে দেখিলে সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে হইত—কিন্তু তাঁহার চোখদুটিতে এক অসাধারণ জ্যোতি ছিল। তাঁহার বুদ্ধি ছিল অসামান্য এবং তিনি দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতেন কলের মতো। রুশিয়ার জনগণ লেনিন্কে প্রথমে অনেক জার লেনিন্ বলিত, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিত, জার লেনিন্ আমাদের সকলের সঙ্গে

পারেন—জয় জার লেনিন্দের জয়। রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সকল লোক লেনিন্কে কেন এত ভক্তি করিত, তাঁহার কথার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারিত কেন? তিনি নররাক্ষস বলিয়া না মানবপ্রেমিক বলিয়া? দেশের স্বার্থই লেনিন্দের স্বার্থ ছিল—তাঁহার স্বত্তর কোন স্বার্থ ছিল না। পরিশ্রম করিতে করিতে একবার তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এবং অন্য কেহই অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তাঁহার প্রাণ্য খাওয়া সুখের বেশী খাওয়াইতে পারেন নাই। বেশী বা ভালো খাবার দিলে তিনি বলিতেন, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে খাবার খায়—আমাকেও তাই খাইতে হইবে, তাহাদিগকে যখন ভালো বা পরিমাণে বেশী খাবার দিতে পারিব, আমিও তখন তাহা খাইতে পারিব, তাহার পূর্বে নয়। সাধারণ কৃষকের বেশী তাঁহার পরিধান ছিল। আমাদের দেশের ত অনেক শ্রমিক নেতা আছেন, তাঁহার বড় বড় বক্তৃতা করেন—সভাহলে শ্রমিক এবং গরীবদের ছুঃখে তাহাদের প্রাণ একেবারে বেদনার গলিয়া যায়, চোখে হয়ত জলও পড়ে, কিন্তু তার পর? সভাহলে এইসব নেতা সতাই শ্রমিকবন্ধু, কিন্তু সভার বাইরে বড়লোকী এবং বনিয়াদি নীল-রক্তের চাল পুরাতার বজায় রাখেন।

তর্ক-বুদ্ধে লেনিন্ বেশী কথা বলিতেন না এবং সকল সময় প্রতিশ্রুতির সকল কথার জবাব দিতেন না, কিন্তু তাহাকে এমন কতকগুলি কথা ধীরে ধীরে বলিতেন যে সে পরাজয় স্বীকার না করিয়া পারিত না। বিপদের সময়ও তিনি আত্মহারা হইতেন না। শাস্ত-ভাবে কঠোর করিয়া বাইতেন। অশিক্ষিত জনগণকে শাসন করা কতবড় কাজ তাহা সকলেই জানেন। বিজ্রোহের প্রথম জয়োত্তমসে রুশিয়ার এই যুগযুগ ধরিয়া অত্যাচারিত জনগণ যখন প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল তখন তাহাদিগকে লেনিন্ অসাধারণ ক্ষমতাবলে শাসন করিয়াছিলেন। রুশিয়ার নূতন লাল-পণ্টন জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইল—লেনিন্ তাহাদের করেজন নেতাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলেন যুদ্ধে পরাজয় এবং সৃত্মা হিব নিশ্চয়, তাহা অপেক্ষা এখন জার্মেনির সহিত সন্ধি স্থাপন করা ভাল নয়? অনেকের ইহা ভাল লাগে নাই, তাহারা বলিল এখন শান্তি করিলে আমাদের হীন হইতে হইবে। লেনিন্ বলিলেন, এ কথা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধ করিয়া পরাজয়ের পর সন্ধি করিতে হইলে হীনতর হইতে হইবে। অনেক আলোচনা এবং তর্কের পর সকলকে লেনিন্দের কথার সাহায্যে হইল। মাঝে মাঝে লোক যখন একটা কিছু করিবার জন্য ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিত তখন তিনি তাহাদিগকে সামান্ত টিল দিতেন কিন্তু তাহার পূর্বে কার্যের ফলাফল কি হইবে বলিয়া দিতেন। পরে হইতও ঠিক তাই। অনেকবার লেনিন্দের ভবিষ্যৎবাণী সকল হইতে দেখিয়া শেষের দিকে লোকে আর তাঁহার কথার উপর কথা বলিত না, কারণ তাহারা জানিত যে লেনিন্ কখনও ভুল করিবেন না বা দেশের অনিষ্ট করিবেন না।

রুশীর বিজ্রোহ সফল হইল লেনিন্ বলিতেন যে, আমরা বিদেশী শত্রু বা অন্য কাহারও দ্বারা পরাজিত হইতে পারি। কিন্তু এই যে আমাদের নূতন চিন্তা এবং কার্যের ধারা ইহা আর বিনষ্ট হইবার নয়। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে ইহাকে হত্যা করিতে পারে। ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীতে ইহা প্রকাশ পাইবে এবং সকল দেশের লোকে ইহাকে গ্রহণ করিবে।

লেনিন্ বিশ্বাস করিতেন যে দেশের সকল ব্যবসা বাণিজ্য এবং কল-কারখানা মজুররাই শাসন করিবে, কিন্তু তাহা একদিনে হইবার নয়, তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা চাই। একবার একদল লোক লেনিন্কে

এবং শ্রমিকদিগের হাতে উহার পরিচালন-ভার দেওয়া হোক। লেনিন বলিলেন “বেশ কথা, তাই হোক কিন্তু একটা কথা, তোমরা কারখানার হিসাব রাখতে জান? তাহারা বলিল, না। তোমরা আমুক কাজ জান? না।—তবে কেমন করে হবে? তবে তোমরা এক কাজ কর, তাড়াতাড়ি সব শিখে নাও, যেদিন সব শিখতে পারবে, সেইদিনই সব তোমাদের হাতে আপনাপনি আসবে। এইজন্য লেনিন প্রথমে দেশের সকল লোককে শিক্ষিত করিবার বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি অনেক বিদেশী কোম্পানিকে রুশিয়ার অনেক কলকারখানা এবং খনিতে কার্য পরিচালন করিবার ভার দান করিয়াছিলেন। ইহাতে দেশের অনেকে ঠাহাকে সন্দেহ করিত এবং নানাক্রমে দোষারোপ করিত, কিন্তু লেনিনের কানে এইসব কথা ঠাট্টিলে তিনি তাহাদের ডাকিয়া সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিতেন।

লেনিনের প্রাণহত্যা করিবার চেষ্টাও বহুবার হইয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি প্রায় প্রত্যেক দিনই খোলা জায়গায় সকলপ্রকার সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন। অনেকবার পিস্তলের গুলি তাঁহার টুপি ভেদ করিয়াও গিয়াছে।

সোভিয়েট সম্বন্ধে লেনিন বলেন, আমার ধারণা ছিল ইহা কেবল রুশিয়াতেই আবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু এখন ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় ইহা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। রুশিয়ার শ্রমিক জাগরণ জগতে সকল দেশের শ্রমিকদের জাগাইয়া তুলিবে—মহাজন শ্রেণীর অত্যাচার এবং দুঃশাসন বেশী দিন চলিবে না।

লেনিনকে দেখিলে দুঃখী বলিয়া মনে হইত না—এত বিষম বোঝা মাথায় লইয়া স্থখে থাকা যে সে লোকের কাজ নয়। তিনি হাসিবার মতো কিছু পাইলেই হাসিতেন এবং দরকারমতো গভীর হইয়া শাসন-কার্যনির্বাহ করিতেন। লেনিন সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিতে গেলে একখানা মস্ত পুস্তক হইয়া পড়ে, কাজেই স্থানান্তরিতঃ, এ-সময়ের প্রধান একজন মহামানবের এই সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম।

কতকগুলি ইংরেজ এবং আমেরিকান কাগজ লেনিনের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু কুৎসা বটনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না।

তাহাদের কাজই ছিল কিসে বলশেভিজমকে পৃথিবীর কাছে হের করা যায়—কিন্তু এত করিয়াও তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

New York Times লেনিন সম্বন্ধে বলেন “Lenin was one of the most remarkable personalities brought by the world-war into prominence from obscurity.....the greatest living statesman in Europe.” General Hoffman, ইনি সেভিয়েট গভর্নমেন্টকে Brest-Litovskএর সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন, লেনিন সম্বন্ধে বলেন “It was a little upstart named Lenin that defeated Germany. Germany did not play with Bolshevism. Bolshevism played with Germany.” London “Times” বলেন—The almost fanatical respect with which he is regarded by the men who are his colleagues.....is due to other qualities than mere intellectual capacity.....chief of these are his iron courage, his grim, relentless determination and his complete lack of self-interest.....” John Spargo তাঁহার “How Lenin Intrigued with Germany” নামক পুস্তকে বলেন “Coldly cynical, grossly materialistic, utterly unscrupulous, repudiating moral codes and sanctions.....Lenin was deliberately conniving at the betrayal of his comrades.” Princess Radziwill “The Fire Brand of Bolshevism” পুস্তকে বলেন “Lenin is neither an idealist nor an honest man. He is only an opportunist and an ambitious creature.” কলিকাতার “Statesman—The Friend of India” কাগজ ও এই দলের। লেনিনের মৃত্যুর সংবাদ দিবার সময় ঐ খেতাব কাগজখানা লেখে “End of a notorious career.”

লেনিনের বিরুদ্ধদের সকলেই ধনী অথবা মহাজনশ্রেণীর, শ্রমিকজাগরণে তাহাদের সর্বনাশ, কাজেই তাহাদের দায়ে পড়িয়া বলশেভিজম-বিরুদ্ধদলভুক্ত হইতে হইয়াছে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়



গান

দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগ্‌ল চিতে ।

সন্ধ্যাপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে ।

মন্দবায়ৈ অঙ্ককারে ছল্বে তোমার পথের ধারে,

গন্ধ তাহার লাগ্বে তোমার

আগমনীতে—

ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের

মঞ্জরীতে ।

রাত যেন না বুখা কাটে শ্রিয়তম হে,

এস এস প্রাণে মম গানে মম হে ।

এস নিবিড় মিলন-ক্ষেত্রে

রজনীগন্ধার কাননে,

স্বপন হয়ে এস আমার

নিশীথিনীতে

ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের

মঞ্জরীতে ॥

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা খা II গা -পা পা -া | পা -ক্কা ধপা -গ্কা | গ্গা -মা গা -া | -া -া -া -খা I
দি ন শে • মে ব রা • ঙা • মু • কু • • • ল

I ঝগা -া গা খা | সা -া -া -া II গা -া গা গা | গ্গা -া খা -না I সা -া -া -া |
জা গ্‌ ল চি তে • • • স ঙ্‌ গো প নে • ফু ট্‌ বে • • •

| পা -ক্কা পা -া I পা -ক্কা না না বধা | ক্কাধপা -ক্কাপা সা খা II
প্রে • মে ব্‌ ম ন্‌ জ রী তে • • "দি ন"

II ক্কাপা -া গা গা | গপা -ক্কা -ধা -পা I ধা -সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ -া সাঁ -না I রসাঁ -া -া -া |
ম ন্‌ দ বা য়ে • • • অ ন্‌ ধ কা রে • ছ ল্‌ বে • • •

| পা -সাঁ সাঁ -না I বধা না রসাঁ -না | ধপা -া -া -া I সা -খা খা গা |

| গা -১ গা -ঋ I ঋসা -১ -১ - (পা | পক্রা -ধপা -গক্রা -গা) I -১ | পা ক্রা পা -১
হা ব্ লা ঋ বে . . . গো তো . মা ব

I ক্রা পা ধা না | ধনা -১ -ঋ -পা I পা -না না ঋ | ঋপা -ক্রা গা -মা I
আ . গ ম নী তে হু টে বে ব ধ ন্ মু .

I ঋগা -১ -১ -১ | গা -মা গা -ক্রা I পা -ক্রা ধা না ঋ | ক্রাধপা -ক্রপা সা ঋ
হু . . . ল্ প্রে . মে ব্ য ন্ জ রী তে . . "দি ন"

II পা -সী সী সী | সী -১ সী -না I ঋধা -না সী -১ | ঋনা -১ -১ -সী I ঋধা না সী ঋনা |
রা ত্, যে ন না . ব্ . ধা . কা . টে প্রি য ত য

| ধপা -১ -১ -১ I ধা -রী -ঋসী -১ | -না -ধা -পা -ক্রা I গপা পা পা পা | পা -ক্রা ধপা -১
হে না এ স এ স প্রা . গে .

I -১ -১ ক্রা গা | গা -ঋ গা -১ I -১ -১ ঋ ঋ | সা -১ -১ -১ I (ধা -রী -ঋগী -১ |
. . . ম ম গা . নে য ম হে না

| -না -ধা -পা -ক্রা) I পা -ক্রপা গা গা | পা ক্রা ধা পা I ধা -সী সী -না |
. এ স নি বি ড মি ল ন . ক .

| রসী -১ -১ -১ I সী সী সী -১ | -১ -১ -১ -না I ঋধা -না না -১ | -১ -১ -১ সী
গে র জ নী গ ন্ ধা র

I ঋধা -না -সী ঋনা | ধপা -১ -১ -১ I সা ঋ গা গা | গা -১ গা -ঋ I ঋসা . ১ -১ (-পা |
কা ন নে ব প ন হ ষে . এ স

| পক্রা -ধপা -গক্রা -গা) I -১ | পা -ক্রা পা -১ I ক্রা পা ধা না | ধনা -১ -ঋ -পা I
গো আ . মা ব্ নি শী ধি নী তে

I পা -না না ঋ | ঋপা -ক্রা গা -মা I ঋগা -১ -১ -১ | গা -মা গা -ক্রা I
হু টে বে ব ধ ন্ মু হু ল্ প্রে . মে ব্

I পা -ক্রা না না ঋ | ক্রাধপা -ক্রপা সা ঋ II II
য . ন্ জ রী তে . . "দি ন"

আলোচনা



“বাকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্‌বোধন-পত্র”

শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের “বাকুড়া সারস্বত-সমাজের উদ্‌বোধন-পত্রের” লিখিত সামস্ত জাতির বিবরণের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মাইতি মহাশয় এবং উহার উত্তরে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় উত্তরেই জন্মে পতিত হইয়াছেন। বাকুড়া জেলায় বাহাদের উপাধি সামস্ত, তাহার জাতিতে সামস্ত নয়, উহার জাতিতে উগ্রকক্রিয়। বাহারা জাতিতে সামস্ত, তাহাদের সকলেরই উপাধি রায়। ছাতনা-পুর্গপুর ছাতনা শুশুনিয়া গুরালডাং আলিঝাড়া পাটনা বীজপুর আদেখা শালডিহা আগয়া মাকা হেত্যাডা শুভদা শুড়িবেদ্যা লড়ি শাতামী বাহিয়া ঠীকপুর প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস। ইহার নিজদিগকে ছত্রী বলিয়া পরিচয় দেয়। পঞ্চকোটের রাজবংশ ছাতনার জমিদার-পরিবারের সহিত বৈবাহিক সংসর্গে আবদ্ধ। এই সামস্তদের পৈতা নাই। ইহার হাল চালান করে, গাড়ী চালায়, অনেকে ছুতায়ের কাজ করে। যখন পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই তখন ইহার ঘাটোয়া ও দীগরের কাজ করিত। এজমল জমিদারের নিকট হইতে একাধিক গ্রাম বা মৌজা নিষ্কর পাইয়াছিল। তখন ইহারাই পুলিশের কাজ করিত এবং ঘাটীতে ঘাটীতে পাহারা দিত। কেকুড়া শুশুনিয়া আলিঝাড়া শালডিহা ঘাট ইহাদের তত্বাবধানে ছিল। গভর্নমেন্ট এইসকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া জমিদারকে মধ্যস্থ রাখিয়া ইহা-দিগকে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকের এখন দরিদ্রাবস্থা। এজমল কেহ কেহ উল্লোকে বাসার চাকরের কাজ করে। ইহার তেলি তাহুগী প্রভৃতি নবশাধ জাতির গৃহে অন্ন গ্রহণ করে। দ্বাদশ দিনে অশৌচান্ত হয়। মাহিম্য জাতির সহিত ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। মাহিম্য জাতির তন্ন খাওয়া ত দুরের কথা ইহার উহাদের জল পর্যন্ত পান করে না।

পূর্বে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট উভয় রাজ্যই বিস্তৃত ছিল ও তাহাতে প্রতাপশালী রাজা ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে সামস্ত-ভূম রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্য কোনো সময়ে মল্লরাজকে, কোনো সময়ে পঞ্চকোট-রাজকে কর দিত। সুবিধা পাইলে স্বাধীনও হইত।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন রায় প্রায় জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছে। ছাতনা খাতড়া মানডুম প্রভৃতি অঞ্চলে ধরয়া জাতির বাস, ইহাদেরও উপাধি রায়।

এ জেলার বাগদীরা মৎসজীবী নহে। তাহার রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, অনেকে কাঠ কাড়ে, মেয়েরা চিড়া কুটে। ইহার গো-খাদক নহে। হুগলী জেলার বাগদীরা আপনাদিগকে বর্গকক্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এজমল সভা করিয়া তাহার ব্রাহ্মণের জাতির গৃহে অন্নভোজন বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অস্ত্র জাতির গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা ও অস্ত্রাস্ত্র কাজ বন্ধ করিয়াছে। এবিষয়ে তাহাদের মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। মেটারী মৎসজীবী।

মেটাকলা গ্রামে বহুপনারায়ণ ঠাকুর আছেন। ইহার সেবাইতরা আপনাদিগকে আহিরগোয়ালী বলিয়া পরিচয় দেয়। এজমল ইহাদের ভেত ভেত কেকাঢাটে চক্ষু বিতরণ করিতে আসে। কাকী

লোক ইহাদিগকে “অাকুড়া ডোম” বলে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও ঠাকুরের পূজা করে। ছাতনার জমিদারের নিকট হইতে ইহার দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছে। ব্রাহ্মণেরাও এই ঠাকুরের নিকট পূজা দিতে আসে, সেবাইতরা ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজা করে। প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার ঠাকুরের দোলযাত্রা উৎসব হয়। এজমল এ সময়ের গাজন হয়।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, ‘যখন শুনিলাম বিলাতি আলুরও সেই দর—তখন বুঝিলাম বাকুড়া অজ্ঞানও বটে।’ বাংলাদেশে সজ্ঞান করজন আছেন?

রায় মহাশয় ঝিঙাকে বন্য গাছ বলিয়াছেন, কিন্তু বাকুড়া জেলায় কোনো বনে ঝিঙা জন্মে না। গৃহের উঠানে উদ্বাস্ত জমিতে জলাশয়ের পাড়ে খাম্বার-বাড়ীতে আবাদী জমিতে অথবা বাগানে ঝিঙার চাষ হয়। চারা গাছগুলি একটু বড় হইলে নিকটে গাছের ডাল গাড়িয়া দিতে হয়। কোন দেশের জঙ্গলে ঝিঙা জন্মে, তাহা জানান উচিত।

শ্রী রামানুজ কর

উত্তর

মুক্তাকরের অত্যাচার অনেক ভুগিয়াছেন, আমিও অনেকবার ভুগিয়াছি। গতমাসের প্রবাসীতে সামস্ত জাতি সংক্ষেপে লিখিয়াছিলাম, “বাকুড়ায় বাহারা সামস্ত নামে আখ্যাত তাহার নিজদিগকে মাহিম্য বলে না।” মুক্তাকর “বলে না” হলে “বলে” করিয়া অনর্থ “ঘটাইয়া-ছেন। বাকের শেষের “না” লোপের বহু উদাহরণ আমার মনে আছে। মুক্তাকরের পাঠকও এই লোপ-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহা কোন প্রচ্ছন্ন কামনার বাহ্য প্রকাশ, তাহা মনোবিদের অনুসন্ধান।

আমি উদ্‌বোধন পত্রে লিখিয়াছিলাম, “বাকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। ইহার সামস্ত ও রায় নামে খ্যাত।...কেহ কেহ বলেন, সামস্তেরা ছত্রী।” শ্রী রামানুজ কর মহাশয় একথা সমর্থন করিয়াছেন। গতমাসের উত্তর একটু সাবধানে পড়িলে মুক্তাকরের অত্যাচার সত্ত্বেও আমার অভিপ্রায় বৃদ্ধিতে গোল হইত না।

সামস্ত ও রায়, দুই-ই উপাধি। পূর্বেকালে এই জাতির মধ্যে কেহ সামস্ত বা রায় হইয়াছিলেন। তাহার ক্রিয়া হইতে উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। “জাতিতে কি? সামস্ত। জাতিতে কি?—রায়।” এই উত্তর পাওয়া যায়। অর্থাৎ সে-কালে বাহা উপাধি ছিল, একালে তাহা জাতির সংজ্ঞা হইয়াছে। ইহার অনুরূপ, বৈদ্য নামে পাই। যিনি আয়ুর্বেদ জানেন, তিনি বৈদ্য। এখন বঙ্গদেশের বৈদ্য এক জাতির নাম হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌধুরী প্রভৃতিও উপাধি। কিন্তু কেহ বলেন না, আমি জাতিতে বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি জাতিতে চৌধুরী।

আমি জাতিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে চাই, না। কিন্তু প্রায়ই দেখি, বিজ্ঞাপনের লেখাতেও পাই, যেহেতু অমুক রাজার নামের শেষে পাল

সিদ্ধান্তের প্রধান আপত্তি, তর্কবিদ্যার ভাষার ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞানের অভাব। এই অভাবের জুরি জুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেহেতু অসূকের উপাধি, সামন্ত্র; অতএব তিনি মাহিয়া, তিনি উগ্রকত্রিয়, তিনি ছত্রী; এইরূপ অসূমানের গোড়ার গলদ। আশ্চর্য এই, সকলের চোখে এই গলদ পড়ে না।

আদ্বিতে গণ ও কর্ম দেখিয়া চারিবর্ণের বিভাগ হইয়াছিল। পরে শর্মা বর্মা গুপ্ত ও দাস, চারিবর্ণের সংজ্ঞা হইয়াছিল। শর্মা ও বর্মা এখনও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অধিকারে আছে, গুপ্ত ও দাস যথাক্রমে কেবল বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের অধিকারে নাই। ওড়িয়ার দাস সংজ্ঞা ব্রাহ্মণেরও আছে, যদিও ইদানী কেহ কেহ দা-স পরিবর্তে দা-শ বানান করিতেছেন। এতকাল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংজ্ঞা কেবল ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল; ইদানী জাতিতে খ্রিষ্টানের নামেও এই এই সংজ্ঞা পাওয়া যাইতেছে।

আমরা সংজ্ঞা না বলিয়া পদ্ধতি বলি। গ্রাম্যজন বলে, পদ্ধতি। সংজ্ঞা না বলিয়া পদ্ধতি বলাই ঠিক পদ্ধতি শব্দের অর্থ, পঙ্ক্তি। এক এক জাতির মধ্যে নানা পঙ্ক্তি আছে। যেমন ব্রাহ্মণের মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় লাহিড়ী ঘোষাল মৈত্র ইত্যাদি। পদ্ধতি গুলিয়া ব্রাহ্মণ কি না বুঝিতে পারা যায়। অন্ত জাতির মধ্যেও দুই-একটা পদ্ধতি সে-সে জাতির সংজ্ঞাস্বরূপ হইয়াছে। যেমন, সেন গুপ্ত, বহু মিত্র। কিন্তু দাস দস্ত দে সেন পাল ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতি একাধিক জাতির মধ্যে আছে। সুতরাং এতদ্বারা জাতি নির্দেশ করিতে পারা যায় না। চৌধুরী মজুমদার বক্সী রায় মল্লিক সামন্ত প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আদৌ পারা যায় না। নরহরি দস্ত, এই নাম হইতে বৃষ্টি, দস্ত বংশের নরহরি নামক ব্যক্তি; কিন্তু, দস্ত বংশ জন্মে অর্থাৎ জাতিতে কি, তাহা বলিতে পারিব না।

দেখিতেছি, আলুবিজ্ঞার ধন্দ এখনও মেটে নাই। কলিকাতায় আলুর সের চারি আনা, আর বিজ্ঞার সের আট আনা হইলেও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না, কারণ, কলিকাতা ধনের দেশ, ভোগীর দেশ। বাঁকুড়া সের প নয়। বাঁকুড়ার বিজ্ঞা ভাল বটে, কিন্তু আলুর তুলনায় অল্প-সার। এই জ্ঞানের নিমিত্ত কৈমিতিক বিশ্লেষণ আবশ্যক হয় না। স্বাদে কিংবা ভ্রাণে এত উত্তম নয় যে অল্প বস্তুর অধিক মূল্যে কেনা যাইতে পারে। পটোলও অল্প-সার, কিন্তু স্বাদে উত্তম। আয়ুর্বেদ-মতে, পত্রফল-শাকের মধ্যে পটোল শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বেশী দাম দিয়া পটোল কিনিতে ইচ্ছা হইতে পারে। গুণে বিজ্ঞা অধম, অধিক খাইলে নাকি উদরাময় হয়। কটকে দেখিয়াছি বর্ষাকালে যখন কলেরার প্রকোপ হয়, তখন মুন্সিপালিটি বিজ্ঞা খাইতে নিষেধ করেন। ওড়িয়াও বাঁকুড়ার তুল্য দরিদ্র, কিন্তু বিজ্ঞা কখনও চারি আনা সের বিক্রি হইতে দেখি নাই।

উষ্ণিবার সময় দুই দশ দিন নয়, বর্ষাকালে অন্ততঃ দুই মাসকাল চারি আনা সের কেন থাকে, তাহার একটা কারণ দেখিলাম। সুখাদ্য বলিয়া হটুক, ধে কারণে হটুক লোকে চায়। অপর কারণ, উৎপাদন কম হয়। একদিন এক বিজ্ঞা-বেপারীকে ধরিয়ছিলাম। সে নিজের

চানের বিজ্ঞা বাজারে বেচিতে যাইতেছি। “বাপু, বিজ্ঞার সের চারি আনা কেন বলিতেছ? চাষে খাটনি বেশী কি?” সে উত্তর করিয়া-ছিল, “বিজ্ঞা-চাষে খাটনি কিছুই নাই, বর্ষার আগে গাছ জন্মাইবার সময় যা খাটনি। তার পর আর কিছুই করিতে হয় না।” “কল্পে কেমন?” “ঢের। একটা গাছ থাকিলে এক গৃহস্থের চলিয়া যায়।” “খাটনি নাই, ফলে ঢের। বেশী চাষ কর না কেন? দুই আনা সের বেচিলেও অনেক লাভ পাইতে।” “তা বটে, করা হয় না।”

স্বচ্ছন্দ-জাত, প্রায় অবহু-সমুত্ত বলিয়া বিজ্ঞা বস্তুর বলিয়াছি। কিছু চাষ অবশ্য করিতে হয়। বেড়ার গাছ করিতে গেলেও, মাটি খুঁড়িতে হয়, গ্রীষ্মকালে জল দিতে হয়। চাষ পাইলে বিজ্ঞা উত্তম ফল-শাক হইতে পারিত। এবিষয় প্রশ্নের বাহ্য হইলেও একটু লিখি।

বিজ্ঞার নিকট জাতি খুন্দুল। কোথাও বলে পরোল। গাছে, তরুতে চড়ে বলিয়া বিজ্ঞা ও পরোলকে কোথাও তরুই বলে। পরোলের চাষ আরও সোজা। তরমুজ, খরমুজ, গমক, কঁকুড়, ফুটী, শসা, লাউ, ছাঁচি কুমড়া, গুড় কুমড়া (বা ডিজলী), পটোল, চিচিঙ্গা (বা হোঁপা), উচ্ছা, করলা, কাঁকরোল, বিজ্ঞা, পরোল,—সব এক বর্ণের,—কুম্ভাণ্ডাদি বর্ণের। সকলের গুণ সমান নয়। তথাপি, সকলেই অল্পাধিক রেচক। মাকাল, তিতা পরোল, তিতা লাউ প্রভৃতি গাছও এই বর্ণের। এই-সকলের রেচকতা প্রসিদ্ধ। কখন কখনও বিজ্ঞাও তিতা হয়, বস্তুর অবস্থায় ঘুরিয়া যায়, বিঘাস্ত হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞা এখনও পোষ মানো নাই। পাকিলে বিজ্ঞা কাঠ হইয়া দাঁড়ায়, ফলের মুখে রস্কু হয়, সে পক্ষে বীজ বাহির হয়। সে সময় ইহার অংশুজাল সকলের প্রত্যক্ষ হয়। অংশু ছুপচ। কচি অবস্থায় কোমল থাকে, একটু বাড়িলে কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু বাজারে যে বিজ্ঞা বিক্রি হয়, সে-সব কচি নয়। কচি বেচিতে গেলে ওজনে বাড়ে না। যত্নপূর্বক চাষ করিলে বিজ্ঞার দোম কমাইয়া গুণ বাড়াইতে পারা যাইবে। তখন চারি আনা সের কিনিতে কাহারও আপত্তি হইবে না।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

“মন্ত্রীদেব প্রতি অবিধান প্রকাশ”

ফাঙ্কন সংখ্যা প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় উপরি-উক্ত মন্তব্যটির একস্থলে লিখিয়াছেন, মাল্লাজের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভাষয়ে ঐ-প্রকার প্রস্তাব (অর্থাৎ মন্ত্রীদেব প্রতি অনাঙ্গ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব) উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে গবর্নমেন্টের পরাজয় হইয়াছিল।” ইহাতে, অসাবধানতাবশতঃ একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। মাল্লাজের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভাষয়ে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ছইস্থানেই গবর্নমেন্টের পরাজয় হয় নাই। মাল্লাজ ব্যবস্থাপক-সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। ভোট লওয়া হইলে দেখা যায় যে প্রস্তাবটির সপক্ষে ৪৩টি ভোট ও বিপক্ষে ৬২টি ভোট দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

দনুজমর্দনের ব্যক্তিনির্ণয়

কাল্পনের প্রবাসীতে প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ, মহাশয় রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন সম্বন্ধে আমার মতামত আলোচনা করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার নবপ্রকাশিত Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal নামক পুস্তকে আমি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে দনুজমর্দন রাজা গণেশেরই অপরাধ নাম, বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানবংশকে সরাইয়া তিনি দনুজমর্দন নাম ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং ঐ নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু রাজা গণেশ ও দনুজমর্দনের অভিন্নত্ব-প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাখাল বাবুর মত প্রখ্যাত-নামা ঐতিহাসিক যদি আমার এই সিদ্ধান্ত বিগতসন্দেহ হইয়া গ্রহণ না করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমার বক্তব্য আমি ভাল করিয়া বলিতে পারি নাই। কারণ রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন যে অভিন্নব্যক্তি এই সত্য আমার কাছে এখন এতই স্পষ্ট যে, এই বিষয়ে যে দ্বিধাও উঠিতে পারে তাহা মনেও করি নাই। আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে নিম্নে বলিতেছি।

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি মুদ্রার প্রমাণে অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে।

৭৯২—৭৯৫ হিজরির মধ্যে কোন সময়ে সুলতান সেকন্দর সাহের মৃত্যু ও গিয়াসুদ্দিন আজাম সাহেবের সিংহাসনারোহণ।

৮১৩ হিজরিতে গিয়াসুদ্দিন আজাম সাহের তিরোভাব এবং সৈফুদ্দিন হামজা সাহের আবির্ভাব।

৮১৫ হিজরিতে সৈফুদ্দিনের তিরোভাব এবং শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ সাহের আবির্ভাব।

৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিনের তিরোভাব এবং আলাউদ্দিন ফিরোজ-সাহের আবির্ভাব।

এস্থলে মনে রাখা দরকার যে আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহের নাম (অর্থাৎ তিনি যে বাঙ্গালা দেশে কোন দিন রাজত্ব করিয়াছেন এই কথা) এ যাবৎ জানা ছিল না। আমিই প্রথম এই রাজার মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছি। বিশেষ স্মরণীয় এই যে তাঁহার মাত্র পাঁচটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহাদের তিনটি সাতগাঁয়ে মুদ্রিত, একটি মুয়াজ্জমাবাদ নামক টাঁকশালে মুদ্রিত এবং আর-একটির টাঁকশাল বা তারিখ পড়া যায় না।

পরবর্তী রাজা জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ যে রাজা গণেশের পুত্র যত্নরই মুসলমান নাম এ-বিষয়ে এপর্যন্ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। জালালুদ্দিনের ৮১৮ হিজরার মুদ্রিত বহুতর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আমার পুস্তকে জালালুদ্দিনের ১২২টি মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছি। কলিকাতা চিত্রশালার মুদ্রা তালিকার দ্বিতীয় ভাগে জালালুদ্দিনের ১৯টি মুদ্রা বর্ণিত আছে। বিশেষ স্মরণীয় এই যে এই ১২২+১৯=১৪১টি মুদ্রার মধ্যে মাত্র একটি মুদ্রার তারিখ ৮১৯ হিঃ। কলিকাতা চিত্রশালার প্রকৃত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমাশ্রমচন্দ্র ও সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হাফিজ নাজির আহম্মদ মহাশয়দের কৃপায় সম্প্রতি এই মুদ্রাটির একটি প্রাচীরের ছাপ আমার হস্তগত হইয়াছে। তারিখটি খুব স্পষ্ট নহে, তবে ৮১৯ হিঃ বলিয়াই অবধারণিত হইতে পারে। অধিকাংশেরই সনাক্ষ ৮১৮ এবং ৮২৩ হিজরি। ৮২০ হিজরির মুদ্রা একটিও নাই।

আমি দনুজমর্দনের ১০টি মুদ্রার বর্ণনা আমার পুস্তকে দিয়াছি। মহেন্দ্র দেবের একটি মাত্র মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছি, রাধেশ বাবু আর একটির দিয়াছিলেন। এইখানে উল্লেখ করিতে পারি যে শ্রীযুক্ত টেপলটন সাহেবের নিকট দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রের আরও ৩টি পনের মুদ্রা আছে। আমি তাহাদের সবগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এইসমস্ত পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে দনুজমর্দনের ১৩৩৯ শকাব্দার মুদ্রাই সংখ্যার সর্বাপেক্ষা বেশী। ঐ বৎসরই তিনি পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুরা, মালদহ) সুবর্ণগ্রাম এবং চট্টগ্রাম হইতে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালার একহস্ত রাজা ছিলেন। দনুজমর্দনের দুই একটি মুদ্রার ১৩৪০ শকাব্দও পাওয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র দেবের ষত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে উহাদের সমস্ত-গুলিই ১৩৪০ শকাব্দের।+ গণনার সুবিধার জন্ত এই ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ শকাব্দ দুইটিকে হিজরার পরিণত করা আবশ্যিক। কিন্তু এই কাজটি সহজ নহে। নানা সমস্তা মীমাংসা করিয়া তবে এই সমীকরণ সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম সমস্তা, শকাব্দ সৌর এবং চান্দ্র-সৌর উভয়রূপেই গণিত হয়। বাঙ্গলাদেশে ব্যবহৃত শকাব্দ সৌর না চান্দ্র-সৌর? বলা বাহুল্য যে এই বিভিন্নরূপ গণনায় বৎসরের আরম্ভ দিনও ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালার বর্তমানে শকাব্দ সৌর বৎসর বলিয়া গণিত। দনুজমর্দনের সময় ঐরূপই গণিত হইত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইতেছে।

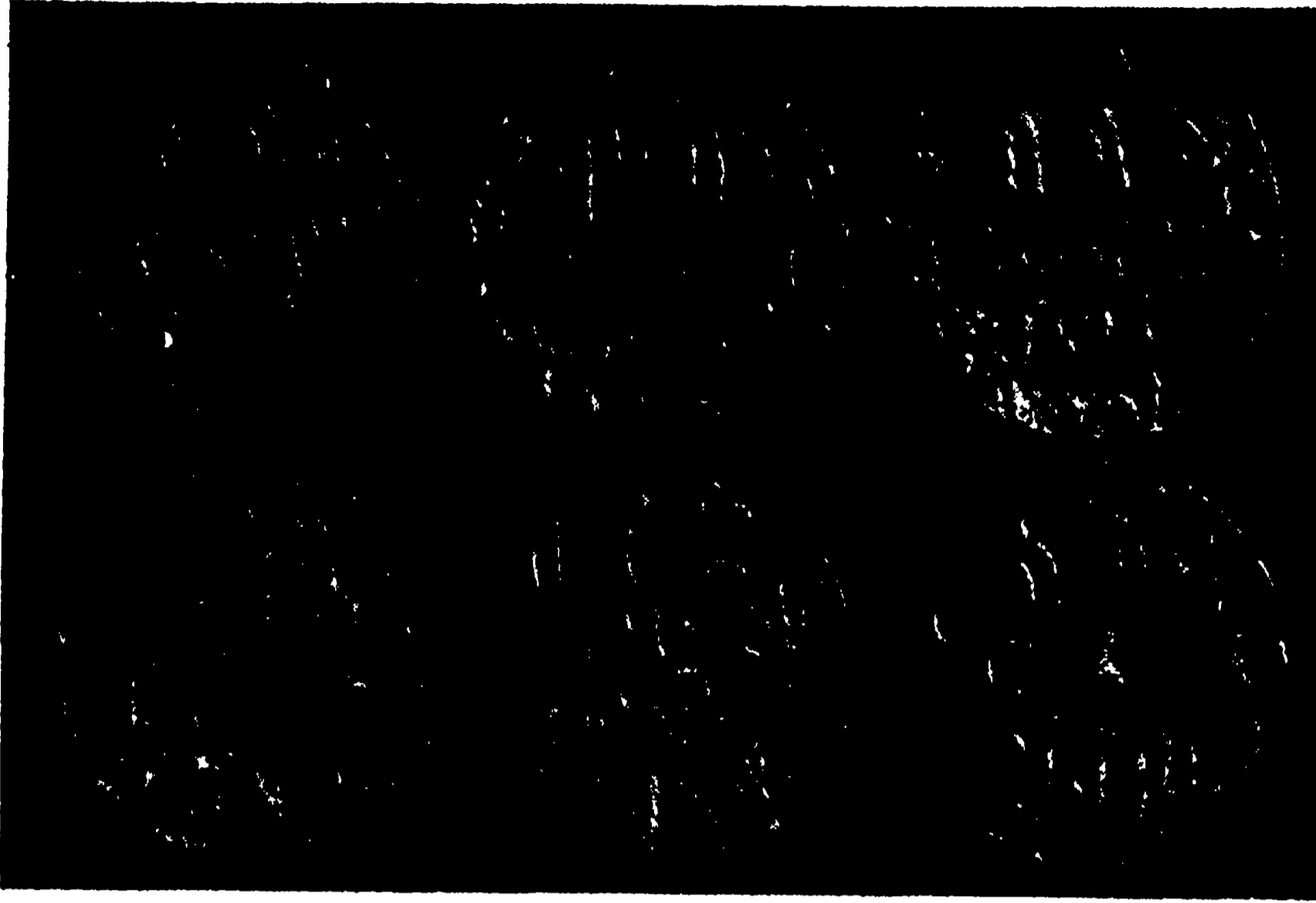
দ্বিতীয় সমস্তা—শকাব্দ সাধারণতঃ অতীতাক্রমে গণিত হইয়া থাকে। দনুজমর্দনের মুদ্রার ব্যবহৃত শকাব্দ কি অতীতাক্রম না বর্তমানাক্রম? একজন মানুষের বয়স ৩৫ বৎসর ৫ মাস ৭ দিনও বলা যায় বা ৩৬ বৎসর চলিতেছে ইহাও বলা যায়। এই কালক্রম মাস নির্দেশ করিতে ১৩৩০ সালের ফাল্গুন বলা যায়। অথবা অতীত বৎসর ১৩২৯ মাস ৯ দিন ১০ ও বলা যায়। জ্যোতিষীগণ সর্বদা

+ মালদহে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার সনাক্ষ ১৩৩৯ বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভুল ধারণা আছে। আমি প্রবাসীতে দনুজমর্দন সম্বন্ধে ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহাতে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে রাখাল বাবু রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৭ সনের ২য় সংখ্যায় দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রের মুদ্রা দুইটির যে ছবি ছাপিয়াছিলেন তাহাতে দনুজমর্দনের মুদ্রার উঁটা পিঠ ও মহেন্দ্রের মুদ্রার সোজা পিঠ ১ম চিত্রে এবং দনুজমর্দনের মুদ্রার সোজা পিঠ ও মহেন্দ্রের মুদ্রার উঁটা পিঠ ২য় চিত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মুদ্রা দুইটি শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন আমি স্বচক্ষে ঐ দুইটি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং পরীক্ষা করিয়া নোট রাখিয়াছিলাম। দনুজমর্দনের মুদ্রার উঁটা পিঠের সনাক্ষ দশক ও শতকে ৩ এবং ৯ পরিষ্কার ছিল। রাখাল-বাবু ইহাকেই মহেন্দ্রের মুদ্রার উঁটা পিঠ ভাবিয়া তদনুসারে ১৯১১—১২ খৃষ্টাব্দের প্রকৃত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে চিত্র আঁকাইয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের মুদ্রার উঁটা পিঠে সহস্র ও শতকের অঙ্ক যথাক্রমে ১ এবং ৩ ছিল। দশকের অঙ্ক অস্পষ্ট এবং এককের অঙ্ক মোটেই ছিল না। মহেন্দ্রদেবের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত স্পষ্ট সনাক্ষ মুদ্রা সমস্ত মুদ্রাই ১৩৪০ শকাব্দের সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

দ-১

দ-২

দ-৩



দ-৪

দ-৫

ম-১

১ম চিত্র—দলুজমর্দন ও মহোত্তর মুজার সোজা পিঠ

দ্বিতীয়প্রকারেই কাল নির্দেশ করিয়া থাকেন। জ্যোতিষীগণই শকাব্দের প্রধান ব্যবহার কর্তা।

এই সময়ের মীমাংসা এইভাবেই করিতে হইবে যে যখন কোন মাসের কোন দিন নির্দেশ করা আবশ্যিক তখন জ্যোতিষীগণের অতীতকাল ব্যবহারই বেশী সুবিধাজনক। কিন্তু যখন গোটা বৎসরই নির্দেশ করিতে হইবে—যেমন দলুজমর্দনের মুজার হইয়াছে—তখন বর্তমানকাল ব্যবহারই ঋতাবিক। বন্যোপাখ্যায় মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন যে ১৩৩৯ শকাব্দ ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ শুক্রবার শেষ হইয়াছে। প্রচলিত তালিকার বহিঃখলি খুলিয়া মিলাইলেই দেখা যাইবে যে এই নির্দেশ ঠিক নহে। Cunninghamএর Book of Indian Eras-এর ১৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন। তথায় দেখিবেন—১৩৩৯ সৌর শকাব্দ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ শেষ হইয়াছে। সকলেই জানেন শকাব্দের সহিত ৭৮ বোগ দিলেই খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই সোজা হিসাবেও ১৩৩৯+৭৮=১৪১৭ খৃঃ ১৩৩৯ শকাব্দের সমান হয়। কিন্তু Cunningham এবং স্বামী কাল্পিন্দাই ইত্যাদি সকলেই শকাব্দকে অতীতকাল ধরিয়া হিসাব করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের অতীতকাল ১৩৩৯ই আমাদের ১৩৩৯এর সমান। এই হিসাবে রাখাল-বাবুর নির্দেশ ঠিকই হইয়াছে—তবে বৎসরটি ২৬শে মার্চ শেষ হয় নাই, হইয়াছে ২৫শে মার্চ।

কাজেই দলুজমর্দনের মুজার ব্যবহৃত শকাব্দ সম্বন্ধে দুইটি তথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া সমীকরণে অগ্রসর হইতে হইবে। ১ম, উহা সৌরমান। ২য়, উহা বর্তমানকাল।

৮১৯ হিজরা ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই হিজরা ও শকাব্দের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নিম্নলিখিত চিত্রে স্থাপিত হইবে।

২৬শে মার্চ ১৩৩৯ শকাব্দের আরম্ভ

1416 A. D. 1st. Jan. ————— Dec. 31.

১লা মার্চ, ৮১৯ হিজরার আরম্ভ

কাজেই মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে—

১৩৩৯ শক=৮১৯ হিঃ+৮২০ হিজরার মাসেক।

১৩৪০ শক=৮২০ হিঃ+৮২১ হিজরার মাসেক।

ইহা হইতে স্পষ্টতর গণনার এখানে আর প্রয়োজন নাই।

এখন ইতিহাসে এই সময়কার ঘটনাবলী যেভাবে বিবৃত আছে তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক। এই সময়ের ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের প্রধান অবলম্বন রিয়াজ-উস-সালতিন। বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়া যাহারা নাড়াচাড়া করেন, তাহারাষ্ট জানেন যে রিয়াজ আধুনিক গ্রন্থ, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্বলিত। উহার ঘটনার বিবরণ এবং পারস্পর্য্য মোটামুটি ঠিক হইলেও উহার সন তারিখগুলি ভুলে ভরা। রাজাদের রাজত্বের কালগুলিও রিয়াজ ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করিতে পারে নাই। যথা, রিয়াজ লিখিয়াছে সেকন্দর সাহের রাজত্ব মোটে নয় বৎসর কয়েক মাস; কিন্তু মুজা ও শিলালিপির প্রমাণে দেখা যায় তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন ৩৭ বৎসর! সকলেই জানেন, মোটামুটি ঘটনার

শ্রুতি জনসমাজে থাকিয়া যায়, কিন্তু সন তারিখে গোলমাল হইয়া পড়ে। তাই রিয়াজের ঘটনাবলীর বিবরণ অক্ষুণ্ণ নিরাকৃত না হইলে গ্রন্থ, কিন্তু সন তারিখ ঠিক করিতে মুজার বা শিলালিপির সাহায্য দরকার।

রিয়াজ এই সময়ের নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে—

শামসুদ্দিন (প্রকৃত নাম রিয়াজের মতে সিহাবুদ্দিন। মুজার সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহের সহিত অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়) যখন রাজত্ব করিতেছেন তখন ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং শামসুদ্দিনকে মারিয়া বাঙ্গালা দেশে রাজা হন। তিনি রাজা হইয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং বিখ্যাত ককীর নূর কুতব আলম গণেশের অত্যাচার দমনের জন্ত জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহকে আহ্বান করেন। ইব্রাহিম শাহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজা গণেশ এইবার ভয় পাইলেন এবং নূর কুতব আলমের শরণাগত হইলেন। নূর কুতব বলিলেন যে গণেশ যদি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন না করেন তবে তিনি গণেশের জন্ত কিছুই করিতে পারেন না। গণেশ মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু রাণী বাধা দিলেন। গণেশ তখন তাহার পুত্র বহুকে নূর কুতবের নিকট লইয়া আসিলেন। বহুকে মুসলমান করা হইল এবং গণেশ সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন, যত্ন জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। নূর কুতব আলমের অনুরোধে ইব্রাহিম শাহ কিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু চক্রিয়া নূর কুতবের কিকিং অপমান করিলেন এবং নূর কুতবের শাপে শীঘ্রই পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন।

সুলতান ইব্রাহিমের সূতাসংবাদ শুনিয়া গণেশ জালালুদ্দিনকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া নিজে রাজা হইয়া বসিলেন এবং স্বর্ণ-ধনু ব্রত করাইয়া বহুকে পুনরায় হিন্দু করিয়া লইলেন। তিনি আবার মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন এবং নূর কুতব আলমের পুত্র পেশ আনোয়ারকে এবং তাহার ভ্রাতৃপুত্র জাহিদকে সোনার-গাঁতে নির্কাসিত করিলেন। তাহাদের পিতৃপিতামহের গুণধন বাহির করিয়া দিবার জন্ত তাহাদের উপর নির্ধ্যাতন চলিতে লাগিল।

পড়িলেন। তিনি মোট সাতবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যহু রাজা হইয়া অনেককে মুসলমান করিলেন এবং জাহিদকে সোনারগাঁ হইতে কিরাইয়া আনিলেন। তারিখ-ই-ফেরিস্তার মতে যহু (জিতমল) হিন্দুরূপেই পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, পরে মুসলমান হইয়া তাহার পূর্ব নাম (জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ) গ্রহণ করেন।

এইখেল ঐসময়কার ঐতিহাসিক বিবরণ। এইখানে নিম্নলিখিত বিসয়-কয়টি অধিধান করা দরকার।

১। ৮১৭ হিঃ পর্যন্ত বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানদের ধারা অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, মুদ্রার প্রমাণে এই অবধারণ অকাটা। কাজেই গণেশের রাজত্ব ৮১৭ হিঃ-র আগে হইতে পারে না, পরে হইবে। ৮২১ হিঃ হইতে আবার জালালুদ্দিনের মুদ্রার ধারা অব্যাহত চলিল, কাজেই গণেশকে ইহার পূর্বে কেহিলে হইবে।

২। সুলতান ইব্রাহিম ৮৪৫ হিঃ পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে সাহসী হইয়া গণেশ আবার রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, রিয়াজের এই উক্তি মিথ্যা। নূর কুতব আলমের পুত্র সেখ আনোয়ার ও তাহার জাতুপুত্র জাহিদের উপর যেভাবে রাজা গণেশ নির্ধ্যাতন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে সত্যই সন্দেহ হয় যে নূর কুতব আলম বোধ হয় তখন বাঁচিয়া নাই। নূর কুতব আলমের মৃত্যুর তারিখ লইয়া যথেষ্ট গোলমাল ছিল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে নূর কুতব আলমের মৃত্যুর তারিখ ৮১৮ হিজরির ৭ই জুলকদ। নূর কুতব আলমের মৃত্যুর পরেই যে তাহার পুত্র-পৌত্রের উপর নির্ধ্যাতন সম্ভব হইয়াছিল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

৩। রাজা গণেশ বাঙ্গালা দেশের অবিসংবাদিত রাজা হইলেও এই পর্যন্ত গণেশের নামাক্তিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার প্রতিবেশী কুচবিশার এবং ত্রিপুরার হিন্দু রাজারা ঝুড়ি ঝুড়ি মুদ্রা ছাপিয়া প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু সমকালেই বাঙ্গালার অপ্রতিদ্বন্দী রাজা

মুদ্রার সাক্ষ্য।

- ৭৯৫ হিঃ হইতে—৮১৩ হিঃ—গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহ।
- ৮১৩ হিঃ—৮১৫ হিঃ সৈফুদ্দিন হামজা শাহ।
- ৮১৫ হিঃ—৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ।
- ৮১৭ হিঃ—সাতগাঁয়ে ও মুন্সাজ্জমাবাদে (সোনারগাঁয়ে) শিহাবুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।
- ৮১৮ হিঃ—জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের বহুতর মুদ্রা, অধিকাংশই ফিরোজাবাদের (পাণ্ডুয়া, মালদহ), কয়েকটি সোনারগাঁর।
- ৮১৯ হিঃ—জালালুদ্দিনের (অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ১৪১ বা ততোধিক মুদ্রার মধ্যে) একটি মাত্র মুদ্রা।
- ৮১৯ হিঃ—৮২০ হিঃ (১৩৩৯ শকাব্দ) দনুজমর্দনের অনেকগুলি মুদ্রা।
- ৮২০—৮২১ হিঃ (১৩৪০ শকাব্দ) দনুজমর্দনের কয়েকটি এবং মহেন্দ্রের কয়েকটি মুদ্রা।
- ৮২১—হিঃ জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রার পুনরাবির্ভাব এবং ৮৩৫ হিঃ পর্যন্ত অব্যাহতগতি।

দ-১
পাণ্ডুনগর—১৩৩৯

দ-২
পাণ্ডুনগর—১৩২৯

দ-৩
পাণ্ডুনগর—১৩৪৯



দ-৪
সুর্বাগ্রাম—১৩৩৯

দ-৫
চাঁটিগ্রাম—১৩৩৯

দ-৬
পাণ্ডুনগর—১৩৪০

২য় চিত্র—দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রের মুদ্রার উল্টা পিঠ

রাজা গণেশ বাঙ্গালা গ্রন্থ 'অধৈতপ্রকাশে' সংস্কৃত গ্রন্থ 'বাল্যলীলাসূত্রে' পারসী ইতিহাস তারিখ-ই-ফেরিস্তা, আইন-ই-আকবরী তবকত-ই-আকবরী রিয়াজ-উস-সালাতিন ইত্যাদিতে উল্লিখিত রাজা গণেশ হিন্দু বলিয়া নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতে ভরসা করেন নাই, অথচ একটা অজ্ঞাতকলশীল হিন্দু দনুজমর্দন সহসা যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া ঠিক রাজা গণেশের সমকালেই বাঙ্গালা দেশটাকে বালকের হস্তের মোদকের মতো কাড়িয়া লইয়া চাঁটিগাঁ, সোনারগাঁ পাণ্ডুয়া হইতে টাকা ছাপিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, পরবর্তী মহেন্দ্রের হাতেও নির্ধিকরোধে সে রাজ্য দিয়া বাইতে পারিলেন ইহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি বিশ্বাস করিয়া খুসী হইতে চাহেন ত হউন।

এখন একবার ইতিহাসের বিবরণ এবং মুদ্রার সাক্ষ্য পাশাপাশি সাজান যাইক।

ইতিহাসের বিবরণ।

শামসুদ্দিন (শিহাবুদ্দিন) মরিলে রাজা গণেশ রাজা হইলেন ইব্রাহিম শাহের বাঙ্গালা আক্রমণ।

যহুর মুসলমান হওয়া এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনারোহণ।

৮১৮ হিঃ, ৭ই জুলকদ—নূর কুতব আলমের মৃত্যু।

নূর কুতব আলমের মৃত্যুর পরে রাজা গণেশের পুনরায় সিংহাসনারোহণ এবং যহুকে হিন্দুধর্মে পুনরানয়ন।

গণেশের মৃত্যু ও যহুর হিন্দুরূপে সিংহাসনারোহণ কিন্তু শীঘ্রই মুসলমান ধর্মগ্রহণ।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মুদ্রার প্রমাণে গণেশের বাঙ্গালার ইতিহাসে ৮১৭ হিজরার আগে এবং ৮২১ হিজরার পরে স্থান নাই, এই দুই অঙ্কের মধ্যে তাহার স্থান। নূর কুতব আলমের মুদ্রার তারিখ ৮১৮ হিঃ নির্দিষ্ট হইয়া আরও সুবিধা হইল। এই ৮১৮ হিজরার এখানে ও ওখানে গণেশের কার্যাবলী ফেলিতে হইবে। উপরে যে মুদ্রার সাক্ষ্য এবং ইতিহাসের বিবরণ পাশাপাশি দেখাইলাম তাহাতে রাজা গণেশ ও দমুজমর্দনের অভিন্নত্ব সম্প্রদায়ের অবসর অল্প বলিয়াই ত আমার স্মৃতিতে প্রতীয়মান হইতেছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে গণেশের রাজত্বের সময় যে বৎসর কয়টিতে নির্ধারিত হয়, দমুজমর্দনের নামে ঠিক সেই সময়টুকুতেই মুদ্রা প্রচারিত দেখিতে পাই। দমুজমর্দন যে সর্ব্ববলের অধীশ্বর ছিলেন তাহা তাহার চাটগাঁ এবং সোনার গাঁ এবং পাণ্ডুরা হইতে একই বৎসরে মুদ্রার প্রচার দেখিয়া বুঝা যায়। ঐ নামধারী চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্র জমিদারের সহিত এই সর্ব্ব-বজ্রাধিপতির কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি না।

প্রাসঙ্গিক করেকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। দমুজমর্দন ও গণেশের অভিন্নত্ব আগে ধরা পড়ে নাই কেন ?

১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে আমি দমুজমর্দন সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তখনও গণেশের সহিত তাহার অভিন্নত্ব ধরিতে পারি নাই। ইহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালার সুলতানদের রাজত্বকাল, রাজ্যারম্ভ ও রাজ্যাবসানের তারিখ এতদিন গোল পাকাইরা ছিল। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গোল ছাড়াইতে কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রা-তালিকায় বাঙ্গালার সুলতানদের মুদ্রার বর্ণনা যিনি করিয়াছেন তিনি তাহার কর্তব্য ভাল করিয়া করেন নাই। পূর্বে ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস ছিল যে গিয়াসুদ্দিন আকাম শাহ ৭৯৯ হিজরাতে মরিয়া গিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের তালিকায় বাঙ্গালার সুলতানদের মুদ্রার বর্ণনাকারী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া সেই মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। আমার পুস্তক রচনা করিবার সময় আমি আকাম শাহের ৭৯৯ হিজরা হইতে ৮১৩ হিজরার অনেক মুদ্রা পাই। তখন আমার সন্দেহ হয় যে ঐরূপ মুদ্রা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও থাকা সম্ভব। স্বয়ং গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সত্যই অনেক আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রা-তালিকায় সাহেব সম্পাদক তাহাদের সবগুলি ভুল পড়িয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিবার সময় এই মুদ্রাগুলি একবার পড়িয়া দেখিবার আবশ্যিকতা বোধ করেন নাই, যদিও তিনিই তখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এবং হাত বাড়াইলেই তিনি মুদ্রাগুলি উন্টাইয়া দেখিতে পারিতেন। ফলে তিনি সাহেবের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং আকাম শাহ ৭৯৯ হিজরাতেই মরিয়া রহিয়াছে। এখন তাহার রাজ্যকাল ৮১৩ হিঃ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। এখন তাই গণেশকে তাহার ঠিক স্থানে বসান সম্ভবপর হইয়াছে, আগে তাহার রাজ্যকাল বহু বৎসর পিছনে নির্ধারিত ছিল। এই ভুল নির্ধারণের জন্তই বেভার্লি সাহেব যে নূর কুতব আলমের মুদ্রার সন তারিখ ৮১৮ হিজরার ৭ই জুলকদ্ব বলিয়া সঠিক নির্ধারিত করিলেন, তাহার মূল্য পূর্বে উপলব্ধ হয় নাই।

২। রাজা গণেশের জাতি।

“রাজা গণেশ বখন হিন্দু ছিলেন তখন তাহার নিশ্চয় একটা জাতি ছিল।” ঠিক কথা। তিনি কোন্ জাতি ছিলেন সম্ভব হইলে ঐতিহাসিকের তাহা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করা উচিত। তিনি যে জাতি বলিয়াই সমপ্রাণ বা অপপ্রাণ হইল না কেন, প্রকৃত ইতিহাসতত্ত্বের তাহাতে কিছুই আসে যায় না। প্রকৃত ইতিহাসতত্ত্ব দেশের ইতিহাসকে অপরিণীত প্রচার চক্ষে দেখিয়া থাকে, স্বর্ণ অথবা স্বর্ণের তথাকথিত উন্নয়নের জন্ত তাহাতে কৃত্রিমতা প্রবেশ করান সকল পাপের উপরে পাপ মনে করে। এই ক্ষুদ্র লেখক ঐকল মহাপ্রাণ ইতিহাসতত্ত্বগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছে। গালি দিলে গালি যে দেয় তাহার মুখ বন্ধ করা কঠিন। গালি যে খায় সে সবিনয়ে এইমাত্র বলিতে পারে যে তাহার উপর অন্তায় করা হইতেছে, বুঝা তাহাকে গালি দেওয়া হইতেছে। খোঁচা দেওয়ার বিদ্যা বড় বিদ্যা নহে। বিতর্কে বিশেষতঃ সত্যনির্ণয়ের জন্ত বিতর্কে প্রতিপক্ষের মন উক হইতে পারে এমন কোন বাক্য ব্যবহার করা উচিত নহে। উকীলে উকীলে অথবা কবির দলে অবশ্য এই নিয়ম লঙ্ঘন করাই রীতি।

রাজা গণেশ ভাটুড়িয়ার জমিদার ছিলেন, এই কথা রিয়াজ-প্রণেতা গোলাম হোসেন আলি, রাখাল-বাবু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বা ৩ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল স্মৃতিবার বহু পূর্বে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাটুড়িয়ার জমিদার ছিলেন কাহার? ৩ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল বলেন—ভাটুড়ীরা। তাহাদেরই নাম অনুসারে পরগণার নাম হইয়াছে ভাটুরিয়া বা ভাটুরিয়া। তাহার নামসম্মত এক টাকা রাজস্ব দিতেন বলিয়া তাহাদের জমিদারীর নাম একটাকিয়া ভাটুড়িয়া। দুর্গাচন্দ্র বাবু ভাটুড়িয়ার জমিদারদের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাখাল-বাবু বলেন—“বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যেসমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ সত্য হইলেও হইতে পারে কারণ সাতোড়, একটাকিয়া নামগুলি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক।” (বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ—১৮৬ পৃষ্ঠা) আমি রাখাল-বাবুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছি—“The anecdotes of the Bhatuarah Zamindars, as recorded by Mr. Sanyal, are extremely interesting and though they are likely to contain exaggerations and fables, being mainly based on traditions and social chronicles or Kulapanjikas, they are sure to possess a background of truth and as such deserve a thorough investigation.” রাখাল-বাবু লিখিলেন—“কিয়দংশ সত্য হইলেও হইতে পারে,”—আমি লিখিলাম—“Sure to possess a background of truth.” এই দুইটা কথার বড় বেশী বিভিন্নতা নাই; তবু যদি শ্রেণী তুলিয়া গাল দিয়া (“বারেন্দ্র উপদ্রব”) তৃপ্ত হইতে চাহেন, হউন। দুর্গাচন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত বিবরণ সমস্তটাই সত্য, ইহা পাগলেও বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এই সুদীর্ঘ বিবরণ তিনি আগাগোড়া কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন এতটা কল্পনা-কুশলতার গৌরব আমি বেচারী দুর্গাচন্দ্রকে দিতে রাজি নই। আর কুলশাস্ত্রের প্রমাণের উপর চিহ্নিনই আমার সন্দেহ দৃষ্টি থাকিলেও রাখাল-বাবুর মত কুলশাস্ত্রফোবিয়া বা জনপ্রবাদফোবিয়া আমার নাই, ইহাও সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি। জনপ্রবাদগর্ভে সময় সময় ইতিহাস কিরূপ তাজা থাকে ওসমানের ইতিহাস উদ্ধারে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার মহাশয় এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। (প্রবাসী ওসমান বিবরণ প্রথম প্রবন্ধ)। সাতোড় ও ভাটুড়িয়ার জমিদারী নাটোররাজ রামজীবন



দমুজমর্দন—পাণ্ডুর—১৩৪০ শক

কিৰূপে গ্রাস করিয়া নিজের বিস্তৃত জমিদারী গঠন করেন তাহার সমসাময়িক দলিলের প্রমাণ কালীপ্রসন্ন বাবুর “নবাবী আমলে” আংশিকভাবে আছে। গ্রাণ্ট সাহেবের ১৭৮৬—৮৮ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত বাঙ্গালার রাজস্ববিচারে বহুবার ভাতুরিয়া ও সাতোড়ের নাম আছে। আমার পুস্তক যখন বাহিব হয় তখন দুর্গাচন্দ্র বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না, পরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহার সহিত পরিচিত হই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমার নিকট অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ভাতুরীদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বাৎসরিকী দলিলের খবর তিনি আমাকে জানাইয়া গিয়াছেন। যথাসময়ে এই বিষয়ে আমার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবে। এইখানে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে ভাতুরিয়া পরগণা স্বপ্নও নহে, মায়াও নহে, উহা এখনও পাবনা জেলার একটা বিখ্যাত পরগণা, ভাতুরীদের এক বংশধর চৌগাঁর রাজা এখনও সেখানে বেণ নামজাদা জমিদার। হরিপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা ভাতুরিয়া ও সাতোড়ের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। অনুসন্ধানের যথেষ্ট ক্ষেত্র ও প্রয়োজন রহিয়াছে।

৬দুর্গাচন্দ্র সান্যালের সামাজিক ইতিহাসেব সিদ্ধান্ত আমার পুস্তকে কোথাও আমি “গ্রহণ” করি নাই। ইতিহাসে যে তাঁহার সমাক্ জ্ঞান ছিল না, তাহা প্রমাণ করা এতই সহজ যে তাহার জন্ম রাখাল বাবু অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি ভাতুরিয়া ও সাতোড়ের জমিদারদের যে কাহিনী সঙ্কলিত করিয়া

গিয়াছেন তাহা উপেক্ষার যোগ্য মনে হয় নাই। উহার ‘ছাই’ উপেক্ষা করিয়া উহাতে কোন ‘রত্ন’ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যোগ্য মনে করিয়াছি, এখনও করি।

৩। “যদি ভট্টশালী মহাশয়ের মৃত.....প্রবিষ্ট করা যায় না।” (প্রবাসী কাল্পন—৬৫৭ পৃঃ—২য় কলাম।)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রিয়ার্জের ইতিহাসাংশ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু রাজাদের রাজ্যকাল বা সন তারিখ নির্ভরযোগ্য নুহে। গণেশ সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, রিয়ার্জের এই উক্তি সত্য, ইহা রাখাল বাবু ধরিয়া লইতেছেন কেন? গণেশ বাঙ্গালারাজ্যের সর্বসর্কা হয়ত সাত বৎসরই ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য করিয়াছিলেন ৮১৮ হিঃতে নূর কুতবের মৃত্যুর পরে এবং ৮২১ হিঃতে জালালুদ্দিনের মৃত্যুর অব্যাহত প্রবাহ আরম্ভের পূর্বে।

৪। “দমুজমর্দন কে ছিলেন সে সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় নূতন প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই”—ইত্যাদি ঐ পৃষ্ঠা, ঐ কলাম।

এই স্মৃতিচানী আমল সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য এই ক্ষুদ্র লেখক আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই দমুজমর্দন ও গণেশের অভিন্নত্ব প্রমাণ সম্ভব হইয়াছে। রাখাল বাবু দমুজমর্দনের মৃত্যুর ‘চ’ দেখিয়াই উহা প্রলম্বীপে মুদ্রিত বলিয়া অবধারণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমি দেখাইয়াছি উহা, স্পষ্ট চাটিগ্রাম। এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত দমুজমর্দনের মৃত্যুর ছবিতেও চাটিগ্রাম পড়িতে পারা যাইবে আশা করি। রাখাল বাবুর মৃত্যু-তত্ত্ব আলোচনার এইরূপ কত পাগ যে আমার ধূইতে হইয়াছে তাহা রাখাল বাবু ভালই জানেন। দেশ-বিখ্যাত মৃত্যু তাত্ত্বিককে দেশের লোকের নিকট খাটো করিবার অভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই সেগুলির আর নম্বর দিয়া উল্লেখ করিলাম না। যাহার দেখিতে কোঁতহল থাকে, আমার ইংরেজী পুস্তকখানা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা

১৯২১ সালের মার্চমাসে অল্পসংখ্যক দেখা যায়, বঙ্গের দশটি জেলার লোকসংখ্যা কমিয়াছে; যথা—বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, পাবনা, ও মালদহ। যে জেলায় হাজারকরা যত জন লোক কমিয়াছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

জেলা।	হাজারে কতজন কমিয়াছে।
বাঁকুড়া	১০৪
বীরভূম	৯৪

জেলা।	হাজারে কতজন কমিয়াছে
মুর্শিদাবাদ	৮০
নদিয়া	৮০
বর্ধমান	৬৫
মেদিনীপুর	৫৫
পাবনা	২৭
মালদহ	১৮
যশোর	১২
হুগলী	৯

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাঁকুড়াতেই সর্বা-
পেক্ষা বেশী হারে লোকসংখ্যা কমিয়াছে। অতএব
বাঁকুড়া বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা।

দেশের উন্নতি করিতে হইলে, যে-সকল জেলার ও
স্থানের সর্বাপেক্ষা অধিক অবনতি হইয়াছে, তাহাদের
অবনতি নিবারণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা সর্বাগ্রে
কর্তব্য। বাঁকুড়া জেলার অবনতি সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায়
এবং উহার সহিত আমি অল্প জেলা অপেক্ষা অধিক
পরিচিত বলিয়া উহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।

বাংলা দেশের ২৮টি জেলার মধ্যে মৈমনসিংহের
লোকসংখ্যা (৪৮,৩৭,৭:৩) সকলের চেয়ে বেশী। ইহার
লোকসংখ্যা ভারতবর্ষেরও অল্প যে-কোন জেলা অপেক্ষা
অধিক। লোকসংখ্যা অনুসারে বঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে
বাঁকুড়ার স্থান একবিংশতম। ১৯২১ সালের মানুসগুণ্ডিত্তি
অনুসারে উহা ১০,১৯,৯৪১ জন লোকের বাসভূমি।
১৮৭২ সাল হইতে এপর্যন্ত ছয়বার মানুসগুণ্ডিত্তি হইয়াছে।
কোন সালে এ জেলায় কত লোক ছিল, দেখাইতেছি।

সাল।	লোকসংখ্যা।
১৮৭২	৯,৬৮,৫২৭
১৮৮১	১০,৪১,৭৫২
১৮৯১	১০,৬৯,৬৬৮
১৯০১	১১,১৬,৪১১
১৯১১	১১,৩৮,৬৭০
১৯২১	১০,১৯,৯৪১

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, এই জেলার লোকসংখ্যা
৪৩ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও কম হইয়া
গিয়াছে। দশ বৎসরে ১,১৮,৭২৯ জন লোক কমি-
য়াছে। সাধারণতঃ মনে হইতে পারে, যে, যে-সব
জেলায় বসতি ঘন, সেখানে লোক না বাড়িয়া, যে-সব
জেলা বিরল-বসতি, সেখানেই লোক বাড়া উচিত।
কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব-বঙ্গে বসতি ঘন ;
অথচ পশ্চিম-বঙ্গে লোক কমিয়াছে, পূর্ব-বঙ্গে বাড়ি-
য়াছে। দৃষ্টান্ত—বাঁকুড়ায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৮ জন
লোক বাস করে, সেখানে লোক কমিয়াছে ; ঢাকায়

প্রতি বর্গ-মাইলে ১১৪৮ জনের বাস ; সেখানে লোক
বাড়িয়াছে।

বাঁকুড়ার সকল অঞ্চলে লোক সমান হারে কমে
নাই। সদর সব্‌ডিভিঞ্জে হাজারে ৭০ জন, বিষ্ণুপুর
সব্‌ডিভিঞ্জে হাজারে ১৬৯ জন কমিয়াছে। সদর
সব্‌ডিভিঞ্জে ৬৯৪৪২ এবং বিষ্ণুপুর সব্‌ডিভিঞ্জে
৩২৫৪৯৯ জনের বসতি। কোন থানার এলাকায়
হাজারে কত লোক কমিয়াছে, তাহা হইতে মোটামুটি
বুঝা যাইবে, কোন অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও অবস্থা কিরূপ।
থানা।

থানা।	হাজারে হ্রাস।
বাঁকুড়া, ছাতনা	২৮
ওন্দা, তালুতাংরা	১২৫
গঙ্গাজলঘাটি, সালুতাড়া, বড়জোড়া, মেঝা	৮৩
খাতড়া, ইন্দুপুর, রাণীবাঁধ, রাইপুর	৬১
শিমলাপাল	৭১
বিষ্ণুপুর, জয়পুর, পাত্ৰশায়ের, রাধানগর, ইন্দাস,	সোণামুখী ১৭১
শিরোমণিপুর, কোতুলপুর	১৬৩

এখন, বাঁকুড়া জেলার লোকক্ষয়ের কারণ অনু-
সন্ধান করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ
দেখিতে হইবে, কোন জেলায় কৃষিযোগ্য জমীর অংশ
কত, সেই অংশের কত অংশে চাষ হয়, বার্ষিক গড়
বৃষ্টিপাত কত, জমীর উৎপাদিকা শক্তি কিরূপ, ইত্যাদি।

বাঁকুড়া জেলায় মোট যত জমী আছে, তাহার শত-
করা ৩৩.৬ অর্থাৎ মোটামুটি রকম সাড়ে পাঁচ আনা
চাষ করা হইয়া থাকে। আরো শতকরা ৫৬.৪
ভাগে চাষ চলিতে পারে, কিন্তু তাহা অকর্ষিত
অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অর্থাৎ জল সেচনের বন্দো-
বস্ত করিতে পারিলে, এখন যত জমীতে চাষ হয়, তাহার
উপর আরও প্রায় তাহার দ্বিগুণ জমীতে চাষ হইতে
পারে। সমগ্র বাংলা দেশে, চক্ৰিণ-পরগণা, খুলনা
দাঙ্গিলিং ও পার্শ্বত্যা-চট্টগ্রাম বাদ দিলে, বাঁকুড়াতেই
কর্ষিত জমীর অনুপাত সর্বাপেক্ষা কম। ইহার মধ্যে
দাঙ্গিলিং ও পার্শ্বত্যা-চট্টগ্রাম পাহাড়িয়া জায়গা, এবং
উভয়ই বিরল-বসতি ; সুতরাং কর্ষিত জমীর অংশ কম

হওয়া স্বাভাবিক এবং হইলেও ক্ষতি নাই। চক্ষি-পর্বগণার অর্ধেকের অধিকাংশ অরণ্য ও জঙ্গল, তাহার অনেক অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যায়। জেলার অনেক অংশ টিটাগড় বারাকপুর দয়দমা খড়দহ প্রভৃতি কারখানা-প্রধান স্থান আছে। অতএব এই জেলাতেও কর্ষিত জমির অংশ কম হওয়ার কারণ, এবং তাহার জন্ত যে লোকসংখ্যা হ্রাস হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। খুলনার অর্ধেকটা সুন্দরবন। অনেক অংশ জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া যায়। এই জেলাতেও চাষের জমীর পরিমাণ কম হওয়া স্বাভাবিক। তাহার জন্ত লোকসংখ্যা কম হইবার কথা নয়।

বাকুড়ার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৩.১১ ইঞ্চি মাত্র। ইহার মানে এই, যে, এই জেলায় যত বৃষ্টির জল পড়ে, তাহা সমুদ্র জেলার উপর সমান গভীর ভাবে ঢালিয়া রাখিলে, তাহার গভীরতা ৫৩.১১ ইঞ্চি হইবে। এরূপ কম বৃষ্টি আর কোন জেলায় হয় না। বাংলাদেশের অন্য সব জেলার মত বাকুড়ার লোকদেরও প্রধান নির্ভর চাষের উপর। জল বিনা চাষ হয় না। বৃষ্টি বাড়াইবার কোন নিশ্চিত উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বাকুড়ায় যত জল আকাশ হইতে পড়ে, তাহাই নানা প্রকার জলাশয়ে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়া তথায় চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে হইবে। ইহার কথা ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে বলিব।

কোন জেলার জমীর উৎপাদিকা শক্তি কত, তাহা স্থির করা, এবং তাহার পর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কিন্তু মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন জেলার জমীর উৎপাদিকা-শক্তি পরস্পরের সহিত তুলনায় কিরূপ, তাহা বলা যাইতে পারে। বঙ্গের সেন্সস্ রিপোর্টের লেখক ডব্লিউ এইচ্ টম্‌সন্ সাহেব এগারটি জেলার গড় বৃষ্টিপাত, চাষ-করা জমী, ফসলের পরিমাণ, এবং বসতির ঘনতা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখা হইতে কতকগুলি অঙ্ক সংকলন করিয়া দিতেছি। তাঁহার এই এগারটি জেলা সঙ্কীর্ণ তালিকা-গুলিতে বাকুড়ার কেবল সদর সর্বভিবিজ্ঞান্টিই ধরা

হইয়াছে। সমগ্র ভূমির প্রতি বর্গ-মাইলে ফসলের পরিমাণ মেদিনীপুরে ৫০০ ধরিয়া তাহার তুলনায় অষ্টান্ন জেলার পরিমাণ দেখান হইয়াছে।

জেলা	কত ইঞ্চি বার্ষিক বৃষ্টি	প্রতি বর্গ-মাইলে ফসল	প্রতি বর্গ-মাইলে লোকসংখ্যা
বাকুড়া (সদর সর্ব-ভিবিঃ)	৫৫.২৬	৪৫৪	৩৬১
মেদিনীপুর	৫২.৪৫	৫০০	৫২৮
নদিয়া	৫৭.২০	৫২৯	৫৩৫
রাজশাহী	৫২.৭৯	৫৫৮	৫৬৯
যশোহর	৬০.৭২	৬৭০	৫৯৩
ফরিদপুর	৬৫.৫৯	৭৬৬	৬৪৯
মৈমনসিং	৮৩.৮১	৬৮৭	৭৭৬
ঢাকা	৬৯.২২	৬৮৩	১১৪৮
ত্রিপুরা জেলা	১১১.২২	৯০৯	১০২৭
নোয়াপালী (দ্বীপ বাদে)	১২৬.৮৩	১০৯৯	১২০২
বাকরগঞ্জ	৮৪.২৯	৮১৩	৭৫২

এই তালিকা দেখা যাইতেছে, যে, বাকুড়ায় বৃষ্টিপাত সর্বাপেক্ষা কম, ফসলও জন্মে প্রতি বর্গ-মাইলে সর্বাপেক্ষা কম, এবং প্রতি বর্গ-মাইলে লোক-সংখ্যাও সর্বাপেক্ষা কম। ইহা স্বাভাবিকও বটে। যেখানে জল কম, সেখানে ফসল কম ত হইবেই। এবং যদি তথাকার লোকদের জীবিকা প্রধানতঃ চাষই হয়, তাহা হইলে লোকসংখ্যাও কম হইবে। মোটামুটি ইহাও দেখা যাইতেছে, যে, যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক, সেখানকার ফসলের পরিমাণ এবং বসতির ঘনতাও অধিক। অতএব, বাকুড়ার লোকসংখ্যা বাড়াইবার প্রধান উপায় ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি; ফসল বাড়াইতে হইলে জল বেশী পাইতে হইবে; বৃষ্টি বাড়াইবার উপায় নাই বলিয়া, বৃষ্টির জল যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

এপর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সকলেই সহজে অনুমান করিবেন, যে, এ জেলায় অল্পকষ্ট প্রায়ই হইয়া থাকে, এবং তাহা মধ্য মধ্য দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। ইহার ইতিহাসেও তাহাই দেখা যায়। আগেকার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, গত দশ বৎসর মধ্যেই পাবর্নমেন্ট দ্বারা স্বীকৃত দুর্ভিক্ষ দুইবার হইয়াছে; ১৯১৫-১৬ অর্কে একবার, ১৯১৮-১৯ অর্কে আর-একবার। কেবলমাত্র অনশনে ঠিক কত

লোক মরিয়াছিল, তাহাঁ বলা কঠিন। কিন্তু খাইতে না পাইলে দুর্বলতাবশতঃ মানুষের নানা-প্রকার পীড়া হয়, যা-তা খাইয়াওঁ ব্যারাম হয়। ১৯১৮-১৯ সালে ইন্ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে বাংলার সব জেলায় অনেক লোক মারা পড়ে। যে-সব জেলায় সর্বাধিক লোক মরিয়াছিল, বাঁকুড়া তাহার মধ্যে অগ্রতম। এ জেলায় সাধারণতঃ হাজারে যত লোক মরে, সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ১৯১৮ সালে ইন্ফ্লুয়েঞ্জার দরুন তাহার উপর হাজারে আরো দশজন মরিয়াছিল। কোন কোন শহরে ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত মৃত্যু অধিক হইয়াছিল; যথা সোনামুখীতে হাজারে ২০'৮। স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট অনুসারে, ইহার কারণ এই, যে, অনশনক্রিষ্ট লোকদের দুর্বল দেহ রোগের আক্রমণ নিরস্ত বা সহ্য করিতে পারে নাই। ১৯১৯ সালেও ইন্ফ্লুয়েঞ্জা ছিল। স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়, জরে সাধারণতঃ যত লোক মরে, ঐ সালে তাহার অতিরিক্ত হাজারকরা ৭'১ জন লোক বাঁকুড়ায় মরিয়াছিল। এই জর সম্ভবতঃ অনেক স্থলে ইন্ফ্লুয়েঞ্জা। যাহা হউক, জরের নামটা যাহাই হউক, উহার অতিরিক্ত প্রকোপের কারণ যে অল্পকষ্টজনিত ক্ষীণ শরীর, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯১৯ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ১৯১৮-১৯এর ইন্ফ্লুয়েঞ্জায় বাঁকুড়ার হাজারকরা ২৫ জন লোক মারা পড়িয়াছিল।

সুপুষ্ট ও সবল অনেক লোক ইন্ফ্লুয়েঞ্জায় মারা পড়িয়াছিল; কিন্তু ক্ষীণজীবীদের মৃত্যুই বেশী হইয়াছিল। তা ছাড়া, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না থাকায় শহর অপেক্ষা গ্রামে মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছিল। অতএব, মানুষের যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য চাই, চিকিৎসার ব্যবস্থাও গ্রামে গ্রামে চাই।

ম্যালেরিয়ায় মানুষ মরে ইহা সত্য কথা; কিন্তু যাহারা খাইতে পায় না, তাহাদের বেশী ম্যালেরিয়া হয়, কিম্বা যে বৎসর লোকে খাইতে পায় না, সেই বৎসর বেশী ম্যালেরিয়া হয়, একথা সরকারী কর্ম-চারীরা ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাহারা মশার উপর ম্যালেরিয়ার সব দোষটা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত

হইতে চান। কিন্তু এলাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় এ কথাটা খুব নরম ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।* উহা ইংরেজদের প্রধান বিশ্বকোষ। স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার বেণ্টলীর সত্য কথা বলিবার অভ্যাস থাকায় তিনিও একথা একটু প্যাচাইয়া স্বীকার করিয়াছেন।† অতএব বাঁকুড়ায় ম্যালেরিয়া কমাইতে হইলে যেমন চিকিৎসা ও ঔষধের এবং মশা মারিবার বন্দোবস্ত চাই, অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন রক্ষা ও সংগ্রহের ব্যবস্থাও সেইরূপ চাই।

বাঁকুড়া জেলার কতকটা অপেক্ষাকৃত নীচু ও সমতল এবং কতকটা উঁচু ডাঙ্গা জমী। মোটামুটি সদর সব-ভিবিজন উঁচু এবং বিষ্ণুপুর সব-ভিবিজন সমতল, এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই কারণে সদর সব-ভিবিজনে প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৬১ জন, কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রতি বর্গ-মাইলে ৪৬৫ জন লোকের বাস।

দিনাজপুরের বালুঘাট মহকুমা, এবং জলপাইগুড়ি ও পার্কাত্য-চট্টগ্রাম জেলায় ব্যতীত, বাঁকুড়ায় শতকরা যত লোক আদিম-জাতীয়, সাঁওতাল প্রভৃতি, অল্প কোথাও তত নহে। এইজন্য আদিম-জাতীয় লোকদের শিক্ষাদির বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে বাঁকুড়ার সমাক্ উন্নতি হইবে না।

পার্কাত্য-চট্টগ্রাম ও দাজিলিং ছাড়া আর সব জেলা অপেক্ষা এ জেলায় শতকরা মুসলমান কম।

জেলার মোট ভূমির শতকরা সাত অংশের উপর বনজঙ্গল আছে। ইহা বেশী নহে। ইহা রক্ষা করা দরকার, কেবল গৃহনির্মাণের ও জালানী কাঠের জঞ্জাই যে ইহা দরকার, তা নয়; জমী ও বাতাস সরস রাখিবার জঞ্জও আবশ্যিক।

জেলার উচ্চ ডাঙ্গা অংশ হইতে জল নিঃসারণ

* "... malnutrition is also believed to increase susceptibility: both should therefore be avoided." Encyclopaedia Britannica, vol. xvii, p. 464.

+ 'He holds that in a large measure malaria is not a root cause of depopulation, but appears in localities which suffer adverse economic conditions,..." Bengal Census Report, 1921, p. 37.

সহজেই হয়, উহা অপেক্ষাকৃত ম্যালেরিয়াশূন্যও বটে। কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমাকে সরকারী সেন্সস্ রিপোর্টে বঙ্গের সর্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অংশ বলা হইয়াছে। তাহার কারণ বলা হইয়াছে তিনটি—দুটি প্রধান, একটি অপ্রধান। এই অঞ্চলের জল নিঃসারণের স্বাভাবিক উপায় ভাল নয়; এবং ইহা নদীর বন্যাত্যেও বিপর্যয় হয়। অপ্রধান কারণ এই, যে, জমীতে জল সেচনের নিমিত্ত নদী ও খালে যে-সব বাঁধ দেওয়া আছে, তাহাতে বন্যার কুফল বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাঁধগুলি সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করা এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধির অসাধ্য নহে, যাহা দ্বারা এই কুফল নিবারণিত হইতে পারে। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিষ্ণুপুর মহকুমায় উৎকৃষ্ট জল নিঃসারণের বন্দোবস্ত হওয়া সরকারী।

মৃত্যুই বাঁকুড়ার লোকসংখ্যা হ্রাসের একমাত্র কারণ নহে। জীবিকানির্ভারের জন্ত এ জেলার বিস্তর লোক জেলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৯১১ হইতে ১৯২১ দশ বৎসরে বাহির হইতে এ জেলায় ১০,৭৯০ জন লোক আসিয়াছিল, কিন্তু এ জেলা হইতে বাহিরে গিয়াছিল ৭২,৬০৭। নিজের জেলাতেই অন্নসংস্থান হইলে এত বেশী লোক বাহিরে যাইবে না। অবশ্য কোন জেলা খুব ধনী হইলও তাহা হইতে অনেক লোক নানা কারণে বাহিরে যাইবে; কিন্তু উহার ধনশালিতা-হেতু বাহিরের লোকও তেমনি বেশী আসিবে।

১৫ বৎসর বয়সের পূর্বে এবং ৪০ বৎসর বয়সের পরেও অনেক বাঙালী স্ত্রীলোকের সস্তান হইয়া থাকে; কিন্তু মোটামুটি, ১৫ হইতে ৪০ বৎসর, এই সময়টিকে সস্তান হইবার বয়স বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৯২১ সালে এই বয়সের প্রতি একশত জন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কতগুলি সস্তান ছিল, তাহার দ্বারা বাঙালী জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধির শক্তি বাড়িতেছে কিম্বা কমিতেছে বুঝা যাইতে পারে। ১৯২১ সালে উক্তরূপ বয়সের প্রতি একশত জন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সস্তানসংখ্যা সমুদয় বাংলা দেশে ১৭২টি ছিল; ১৯০১ সালে ছিল ১৮২টি, ১৯১১ সালে ছিল ১৮১টি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্রমশঃ বাঙালী স্ত্রী-লোকদের সস্তানসংখ্যা কমিতেছে। বাঁকুড়া জেলায়

একশত বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সস্তানসংখ্যা বাংলা দেশের গড় অপেক্ষা কম। এখানে ১৯২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৫৭; ১৯১১ সালে ১৬৭; ১৯০১ সালে ১৮২। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র বঙ্গে কুড়ি বৎসরে সস্তানসংখ্যা শতকরা ১০ কমিয়াছে; কিন্তু বাঁকুড়ায় ঐ কুড়ি বৎসরে কমিয়াছে পঁচিশ, অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশী। অতএব এ জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিবাহিতা নারীদের সস্তানসংখ্যা কেন কমিতেছে, বিশেষ বিবেচনা ও অনুসন্ধান না করিয়া বলিতে পারিলাম না।

লেখা পড়া না জানিলে কোন বিষয়েই কোন উন্নতি হয় না, এমন বলা যায় না; কিন্তু লেখাপড়া জানিলে এবং শিক্ষা পাইলে সকল বিষয়েই উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাঁকুড়ায় শিক্ষার অবস্থা কিরূপ, দেখা যাক। যাহারা চিঠি লিখিতে ও পড়িতে পারে, তাহাদিগকে লিখনপঠনক্রম বলিয়া সেন্সাসে ধরা হইয়াছে। সুতরাং লিখনপঠনক্রম বলিলে খুব সামান্য শিক্ষাই বুঝায়। পঁচ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে হাজারে কয়জন ১৯২১, ১৯১১, ও ১৯০১ সালে লিখনপঠনক্রম ছিল, তাহার তালিকা:—

	পুরুষ			স্ত্রী		
প্রদেশ	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
ব্রহ্মদেশ	৫১০	৪৩১	৪৩৭	১১২	৭০	৫২
বাংলা	১৮১	১৬১	১৪৭	২১	১৩	৯
মাদ্রাজ	১৭৩	১৭১	১৩৭	২৪	২০	১১
বোম্বাই	১৩৮	১৩৯	১৩১	২৪	১৬	১০
বিহার-ওড়িষা	২৬	৮৮	৮৭	৬	৫	৩
পঞ্জাব	৭৪	৭২	৭৪	৯	৭	৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৭৪	৬৯	৬৬	৭	৬	৩

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ মঠসকলে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া এবং তথায় নারীদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা অর্থাৎ পর্দা না থাকায়, সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী—যদিও উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক হয় নাই। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়েও পর্দা না থাকায় ঐ দুই প্রদেশেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অধিক।

১৯২১ সালে বাঁকুড়ায় ৫ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হাজারে ২৩৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। ইহা অপেক্ষা হাজারে অধিকসংখ্যক লিখনপঠনক্ষম লোক বাংলায় চারিটি জেলায় ছিল; যথা—কলিকাতা ৫৩০, হাবড়া ২৮১, চব্বিশ-পরগণা ২৫২, হুগলী ২৪৮। পাশ্চাত্য অনেক সভ্য দেশে এবং আপানে নিত্যস্ত শিশু ভিন্ন একেবারে নিরক্ষর পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখা যায় না। কিন্তু সে-সব দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, বাঁকুড়া অপেক্ষা শিক্ষিত জেলা বঙ্গেই রহিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষায় বাঁকুড়ার অবস্থা অত্যন্ত হীন; হাজারে এগারটি মাত্র স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে। বঙ্গের কুড়িটি জেলার অবস্থা এবিষয়ে বাঁকুড়া অপেক্ষা ভাল; যথা—কলিকাতা ২৭১, হাবড়া ৩৫, হুগলী ৩২, ঢাকা ২২, বাকরগঞ্জ ২৬, দার্জিলিং ২৫, চব্বিশ-পরগণা ২৪, নদিয়া ২৩, ফরিদপুর ২২, বর্ধমান ২০, খুলনা ১৯, ত্রিপুরা ১৮, মুর্শিদাবাদ ১৮, যশোর ১৬, পাবনা ১৫, মেদিনীপুর ১৩, বগুড়া ১৩, চট্টগ্রাম ১৩, বীরভূম ১২, মৈমনসিং ১২। রাজশাহী, কুচবেহার, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা-রাজ্য স্ত্রীশিক্ষায় বাঁকুড়ার সমান হীন।

অনেক দেশী রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হইবে। যথা—ত্রিবাকুড়ে হাজারে ৩৮০ পুরুষ ও ৭৩ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে।

বাংলা দেশে মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, আদিমনিবাসীরা ছাড়া অল্প সকলের চেয়ে কম। বঙ্গে কোন্ ধর্মাবলম্বী কত লোক হাজারে লিখনপঠনক্ষম দেখুন।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	১৫৮	২৬৮	৩৬
মুসলমান	৫৯	১০৯	৬
খৃষ্টিয়ান	৪৬৮	৫৩৯	৪২৫
অভারতীয় খৃষ্টিয়ান	২৭৯	২৮৪	২৭২
ভারতীয় খৃষ্টিয়ান	২৩৬	৩১৭	১৬৪
ব্রাহ্ম	৮২১	৮৪০	৭৯৯
বৌদ্ধ	২৬	১৬৯	১৯
আদিম নিবাসী	৭	১৪	১

বাঁকুড়ায় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম বলিয়া জেলাগুলির মধ্যে শিক্ষায় ইহার স্থান উঁচু দেখাইতেছে। কিন্তু যদি অল্প সব জেলাতেও কেবল হিন্দুদের শিক্ষাই ধরা যায়, তাহা হইলে এই জেলা অনেক নীচে পড়িবে। হিন্দু পুরুষদের শিক্ষায় ইহা ১২টি জেলার নীচে, হিন্দু স্ত্রীলোকদের শিক্ষায় ইহা ২৫টি জেলার নীচে পড়িবে। কেবল মুসলমান পুরুষদের শিক্ষা ধরিলে বাঁকুড়া চতুর্থ-স্থানীয় হয়। এ জেলার হাজারে ২০৪ জন মুসলমান পুরুষ লিখনপঠনক্ষম। এবিষয়ে কেবল কলিকাতা (৩১০) দার্জিলিং (২৬৬) এবং হুগলী (২১১) এ জেলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমান স্ত্রীলোকদের শিক্ষায় এ জেলা বঙ্গে নবম-স্থানীয়; যদিও ইহাতে গোরব নাই, কারণ তাঁহাদের মধ্যে হাজারে আটজন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানেন। যাহা হউক, ইহা বাঁকুড়া জেলার মুসলমানদের কিছু প্রশংসার বিষয়, যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষায় তাঁহাদের স্থান বঙ্গের অন্যান্য জেলার মুসলমানদের তুলনায় যেরূপ উচ্ছে, বাঁকুড়ায় হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষার স্থান অন্যান্য জেলার হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের তুলনায় সেরূপ উচ্ছে নহে।

এই জেলার দশমাংশ লোক সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম-জাতীয়। ইহার শিক্ষায় হীন। পুরুষদের মধ্যে হাজারে ১৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে, স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজারে এক জনও নহে।

১৯২১ সালে এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা।

ধর্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক
হিন্দু	৮৮০৪৩৯	৪৩৯৬৬৮	৪৪১০৭১
ব্রাহ্ম	৩	২	১
মুসলমান	৪৬৬১১	২৪০৬৪	২২৫৩৭
খৃষ্টিয়ান	১৪২১	৭৪৮	৬৭৩
আদিম জাতি	৯১৪৭৭	৪৫১৯২	৪৬৩২৫

এখানে খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়িয়াছে। ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ও ১৯১১ সালে তাহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬, ১৩২, ৩৬৩, ১০১২ ও ১৪২১ ছিল।

এই জেলায় কোন্ জাতির লোক ১৯২১ সালে কত ছিল, তাহার তালিকা :—

জাত	পুরুষ	স্ত্রীলোক	জাত	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বাগ্দী	২৭৬২৪	২৭৩৮৩	নাপিত	৫৪৭২	৫৭০৬
বৈদ্য	২০০৬	২০৬২	হুনিয়া	১	০
বৈষ্ণব (বৈরাগী)	৮২৪৬	২৪৬৫	ওরাওঁ	২০	০
বাক্‌ই	১২৫৪	১২৪২	পাটনী	৫	০
বাউরী	৪৬৭৮২	৪২০৬২	পোদ	২	০
ভূইয়া	১৬২৭	১৪৫৭	রাজপুত (ছত্রী)	১২২২৪	১৩০৮৭
ভূমিজ	৭৮৩২	৮৪৩১	সঙ্গোপ	২২০৭৭	২০২৩২
ব্রাহ্মণ	৪৭০৬৫	৪৭৫৫৭	সাঁওতাল (হিন্দু)	৬৭১৬	৭১৬৪
চামার	৭০	২	সাঁওতাল (আদিম)	৪৪২৫৭	৪৬০৭৫
চাষাধোবা	২১	৩২	শাহা	১৫৭	৭৬
ধোবা	১২৫৪	১৮২২	শ্বর্গকার	১২৬	১০২
ডোম	৬২৬৫	৬৭১১	স্বর্ণবণিক	৪৩৪১	৪৫৬৫
দোসাধ	১১	২	শুঁড়ি	১৩২২৩	১২৮২৬
গন্ধবণিক	৬৩০৪	৬৫৩৪	সুন্দর	২৩৬২	২৪৪১
গোয়লা	৩২৪২১	৩০৪৩৭	তাম্বুলী	২৫০৬	২৩৬৫
হাড়ি	৩১২৪	৩২০১	তাতি ও তাতোয়া	১২৬৮৮	১১৫২৫
জুগী ও জোগী	২৮৩	২০৫	তেলী ও তিনী	৩২৪৪৮	৩২১২৭
কাহার	২১	১২	অগ্রান্ত	২৮৬৩৩	২৮৮২৪
চাষী কৈবর্ত	২৫৫০	২০২৮			
জালিয়া কৈবর্ত	৬২৫৩	৭৩৫৩			
কলু	২৭৫৮	২৬২৮			
কর্মকার	২২২৭	২৫১০			
কেওরা	৩	১			
কায়স্থ	৮৮৫১	২৮১২			
কুমার	৪২৫২	৪২৩০			
কুড়মি	২৬২৫	২২৬৭			
লোহার	২০০৮১	২১৪০৫			
মাল	৫৪৬০	৫৭৫২			
মালাকর	২১২	২২৮			
ময়রা	২৮৮৭	৩২৪০			
মুচি	৫৬৩৬	৫৩৪৪			
মুণ্ডা (হিন্দু)	৩	২			
মুণ্ডা (আদিম)	৭৩	২৫			
নমঃশুভ্র	২৩৩	২৬৪			

অগ্রান্তের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী আশুরী ৪১৬৮ ও ৪০২০, কোড়া স্ত্রী ও পুরুষ ২২২২ ও ২২৭৭, নাইক স্ত্রী ও পুরুষ ১৫ ও ১৫ এবং সামন্ত স্ত্রী ও পুরুষ ৮৭ ও ৩৫।

মুসলমানদের মধ্যে—

	পুরুষ	স্ত্রী
বেহারা	০	১
জোলাহা	৩০৫	৩০৪
পাঠান	১৭৬৬	১৫২১
সৈয়দ	৭৫০	৭৫২
শেখ	২১১৪২	১২৮৭৫
অগ্রান্ত	২৪	৭৭

এই জেলায় বাউরীদের সংখ্যা সর্বাধিক বেশী, তার নিচে ব্রাহ্মণ। বাউরীদের উন্নতি করা সকলের আগে দরকার। সাঁওতালদিগকে হিন্দু সাঁওতাল ও ভূত-প্রোত-পূজক সাঁওতাল এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

মোট সংখ্যা ১,০৪,২১২ ধরিলে তাহারাই বাঁকুড়ার প্রধান অধিবাসী।

বাঁকুড়ার সর্বাঙ্গীণে ছুঃখের বিষয় এই, যে, এই জেলায় প্রতি লক্ষ ২৭০ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। ভারতবর্ষের আর কোন জেলায় কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব এত বেশী নহে। বঙ্গ ইহার নীচে বীরভূম (১৪৮) বর্ধমান (১১২)। ইহার কারণ কি, বলিতে পারি না। বাঁকুড়ার কোন খানার এলাকায় লাখে কত কুষ্ঠী, লিখিতেছি:—বাঁকুড়া ৬৩৬, ছাতনা ২৩১, ওন্দা ৩৪৫, তালডাংরা ২৯৭, গঙ্গাজলঘাটা ৫৪০, শালতড়া ৪৬৬, বড়জোড়া ৩৫৪, মেঝা ৪৫২, খাতড়া ১৮৬, ইন্দপুর ৪২৩, রাণীবাধ ৭৬, রাইপুর ১৩১, শিমলাপাল ২২৭, বিষ্ণুপুর ১৭০, জয়পুর ৯৪, পাত্তশায়ের ৮২, রাধানগর ১১৪, ইন্দাস ৫৪, সোনামুখী ৩০৮, শিরোমণিপুর ৩২, কোতুলপুর ৭৪। প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ, নিজেকে কুষ্ঠরোগী বলিয়া প্রকাশ করিতে লোকে চাহে না, এবং কেহ কেহ জানেও না, যে, তাহার এই ব্যাধি হইয়াছে।

এই জেলার শতকরা ৭৭ জন লোকের নির্ভর চাষের উপর; অথচ নানা কারণে এখানে চাষের অবস্থা ভাল নহে। পূর্বে সেই-সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি। বাকী শতকরা ২৩ জনের নির্ভর অগ্রাণ্ড কাজের উপর।

বঙ্গ গড়ে প্রতি কৃষিকর্মীর ভাগে ২'২'১৫ একার চাষের জমী পড়ে (এই জেলায় কত বলিতে পারি না)। ইংলণ্ডে প্রতি কৃষিকর্মীর ভাগে ২১ একার পড়ে। চাষী শ্রেণী সকলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে যদি উৎপন্ন শস্য সমান ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যদি মেদিনীপুরে প্রত্যেকের ভাগের শস্যের দাম একশত টাকা ধরা হয়, তাহা হইলে সরকারী রিপোর্ট অনুসারে বাঁকুড়া সর্বভিবিজনে প্রত্যেক ভাগের দাম হইবে ১৩৫'৪ টাকা, নোয়াখালীতে ১৩৯'৫, ত্রিপুরাজেলায় ১৪০'২, মৈমনসিংহে ১৪২'৩, ফরিদপুরে ১৪২'৬, রাজশাহীতে ১৪৮'১, ঢাকায় ১৪৮'৮, বাকরগঞ্জে ১৫৩'৩, নদিয়ায় ১৭১'২, এবং যশোরে ১৭৪'৬। এ জেলায় যে চাষে ফসল কম হয়, তাহা এই তালিকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে।

এ জেলায় কত লোকের কোন ভাষা মাতৃভাষা, তাহার তালিকা দিতেছি। মোট লোকসংখ্যা ১০,১২,২৪১।

মাতৃ ভাষা।	লোকসংখ্যা।
বাংলা	২,১৪,২৫৬
হিন্দী ও উর্দু	৩৩০৪
পূর্ব পাহাড়িয়া	৬
খের্ণারী *	১০১১০০
কুরুখ্	৯
ওড়িয়া	২৭২
গুজরাতি	৪৩
মরাঠী	৪
পঞ্জাবী	৮
রাজস্থানী	১০৭
তামিল	৫
তেলুগু	২৭
ইংরেজী	৩১
পোর্্তুগীজ	১

রাজস্থানী ভাষা মাড়োয়ারীদের মাতৃভাষা।

বাঁকুড়া জেলায় যাহাদের জন্ম এরূপ লোকের সংখ্যা ১৯২১ সালে ১১,১২,২২২ ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে গণনার সময় ৯,৯০,৩৫৩ জন এই জেলায় ছিল; বাকী অগ্রাণ্ড বাস করিতেছিল।

বাঁকুড়া জেলায় যাহার জন্ম বা নিবাস, এই প্রবন্ধটি এরূপ কাহারো চোখে পড়িলে তিনি ইহা তাহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পড়িতে বলিলে অমুগৃহীত হইব।

এই জেলার দুঃবস্থা দূর করিবার জন্ত কি করা উচিত, ও কি করা হইতেছে, অতঃপর তাহার আলোচনা যথাসাধ্য করিব।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩০।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

* সাওতালী, হো, কোড়া, মুণ্ডারী, প্রভৃতি ভাষা ইহার অন্তর্গত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের আয়ব্যয়

প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে ভারতবর্ষের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়ব্যয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধিরা প্রতিবৎসরই বলেন, সামরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী করা হয়, ও প্রধানতঃ তৎকাল স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিবার টাকা থাকে না। তা ছাড়া, ইহাও বার বার বলা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ, অথচ ইহার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন খুব ধনী দেশসকলের সেইরূপ পদস্থ কর্মচারীদের বেতন অপেক্ষা অধিক, এবং অশ্রান্ত বন্দোবস্তও ঐরূপ বহুব্যয়সাধ্য। সুতরাং যাহাতে দেশ স্বাস্থ্যকর হয়, সর্বত্র সুগম হয়, বাণিজ্যের সুবিধা বাড়ে, দেশের লোকদের জাহাজ কারখানা প্রভৃতি বাড়ে, শিক্ষা স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহার জন্য যথেষ্ট টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

যাহারা স্বরাজ চান, তাঁহাদের মধ্যে দুটি দল আছে। কেহ কেহ চান, যে, আভ্যন্তরীণ সামরিক, বাণিজ্যিক ও পররাষ্ট্রবিষয়ক সমগ্রভারতীয় সব কাজের উপর দেশের লোকদের কর্তৃত্ব হউক। অগ্নোরা চান, যে, বাণিজ্যকল্যাণ-বিভাগ যুদ্ধবিভাগ ও পররাষ্ট্রবিভাগ ছাড়া আর সব বিভাগ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ আর সব ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভাসকলের ও তদ্বারা নিরূপিত মন্ত্রীদের অধীন হউক। “প্রকাশ থাকে, যে,” দেশী রাজস্বগুলির সহিত আমাদের যে যে বিষয়ে সম্পর্ক, তাহাও পররাষ্ট্র-বিভাগের অন্তর্গত। শেষোক্ত দল যাহা চান, তাহা পাইলেও কোনই লাভ নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তাহাতে

বিশেষ কিছু লাভ নাই। কারণ, ঐরূপ ব্যবস্থায়, এখন প্রদেশগুলিতে দেশের লোকদের যতটুকু কর্তৃত্ব হইয়াছে, সমগ্রভারতে তার চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত লউন। এখন প্রদেশগুলিতে যেমন পুলিশের উপর কর্তৃত্ব ও তাহার জন্য ব্যয় করিবার ক্ষমতা বিদেশী প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের আছে, তখন তেমনি সমগ্র-ভারতে সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব ও তাহার জন্য ব্যয় করিবার ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্টের থাকিবে। এখন যেমন পুলিশের জন্য ব্যয় খুব বেশী করা হয়, তখন তেমনি যুদ্ধবিভাগের ব্যয় (এখনকারই মত) বেশীরকম করিবার ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্টের থাকিবে। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য আবশ্যক কাজের নিমিত্ত টাকা এখন যেমন পাওয়া যায় না, পরেও সেই অবস্থা থাকিবে। হয়ত সামান্য কিছু সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহা গণনার মধ্যে ধরিবার যোগ্য নহে।

সৈনিক বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্টের হাতে রাখিয়া দেওয়ার মানেটা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যিক। বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্ট বলিবেন, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য এত সৈন্য চাই, এবং তাহাদের খরচ এত চাই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্ট বলিবেন, পরদেশীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য এত সৈন্য ও এত টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ চাই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে।

সৈনিক-বিভাগ ছাড়া পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্টের হাতে রাখার মানেটাও প্রণিধানযোগ্য। মানে এই, যে, পরদেশের সহিত ঝগড়া বাধান, না-বাধান ঐ গবর্নমেন্টের ইচ্ছা-ও ক্ষমতা-সাপেক্ষ থাকিবে। পরদেশের সহিত বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্টে অপরাধ যত যুদ্ধ ও সন্ধি করিয়াছেন, তাহা কেবল ভারতবর্ষের মঙ্গলক্ষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করেন নাই, ভারতবর্ষ

যে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও স্বাধীন, তাহার স্বার্থের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছেন। তাহাতে অনেক সময় ভারতবর্ষের অনিষ্টই হইয়াছে। পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিলে ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বলিবেন, অমুক জাতি দেশ বা রাজ্য ভারতের অনিষ্ট করিয়াছে বা করিতে ইচ্ছা করে, অতএব যুদ্ধ বা যুদ্ধের আয়োজন হউক; টাকা দাও।

সাক্ষাৎ-ও পরোক্ষ-ভাবে যেসকল ব্যাপারকে বাণিজ্যিক বলা যাইতে পারে, তাহার উপর কর্তৃত্ব বিদেশী ভারত-গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিলে, এখন ভারতীয়দের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা বেশী ভাল হইতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য সব জাতিই দরকার-মত পরদেশ হইতে আমদানী ও পরদেশে রপ্তানী জিনিষের উপর শুল্ক বসায়, উঠায়, বাড়ায়, কমায়। ইহা আমরা এপর্যন্ত কেবল নিজেদের দরকার-মত করিতে পারি নাই। দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রেলওয়ে লাইন ও রেলভাড়া সম্বন্ধে সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আবশ্যিক। ইহা আমরা এপর্যন্ত করিতে পারি নাই। বরং উল্টা ব্যবস্থাই এপর্যন্ত বলবৎ আছে; বিলাতী ও অন্তর পরদেশী পণ্যের আমদানী এবং পরদেশে তাহাদের দরকারী ভারতীয় কাঁচামালের রপ্তানী যাহাতে সহজে ও সস্তায় হয়, ভারতবর্ষের রেলওয়েগুলির সেদিকে বেশ দৃষ্টি আছে। দেশী লোকদের দ্বারা দেশী কারখানায় প্রস্তুত জিনিষের কাটুতি বাড়াইবার জন্য সুবিধাজনক রেলভাড়া নাই।

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্ত আভ্যন্তরীণ জলপথসকল ভাল অবস্থায় থাকা আবশ্যিক। জলপথে মাল ও যাত্রী বহন স্থলপথে রেল বা অন্তর্গাড়ীতে বহন অপেক্ষা সস্তায় হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী লৌহ-ইম্পাতের কারবারীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত বিদেশী ভারত-গবর্ণমেন্ট রেলপথের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, জলপথ রক্ষা বিস্তার বা তাহার উন্নতির প্রতি নজর দেন নাই; বরং অবহেলায় ও রেলের প্রতিযোগিতায জলপথের অবনতিই হইয়াছে।

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত ব্যাঙ্কের বিশেষ দরকার। সকল ব্যবসায়ীর ও চাষীরই কখন কখন হাতে টাকা থাকে, কখন কখন থাকে না। অনটনের সময় হুদে দিয়া টাকা পাইলে অর্থাগমের সময় তাহা শোধ করিতে অনেকই পারে। এইরূপে টাকা জোগান ব্যাঙ্কের একটি কাজ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক বিদেশীদের। তাহারা যেরূপ হুদে ও জামিনে নিজেদের স্বদেশীদিগকে টাকা ধার দেয়, আমাদিগকে সেরূপ হুদে ও জামিনে টাকা ত দেয়ই না, অনেক সময় তদপেক্ষা ভাল জামিনেও কিছা মোটেই দেয় না। গবর্ণমেন্টের আমুকুল্যে শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন ও পরিচালিত ইম্পীরিয়াল্ ব্যাঙ্কের কার্যনীতিও এইরূপ। জাপানে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত তথাকার গবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ সেটা জাপানী গবর্ণমেন্টের স্বদেশ।

সাক্ষাৎভাবে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা দিয়া, তদ্বিষয়ে নানা অনুসন্ধান গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া, জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা সব স্বাধীন দেশেই হইয়া থাকে। ভারতে “পিত্তিরক্ষা”র জন্ত কিছু হয়; যথেষ্ট কিছু হয় না।

এইসমুদয় বিষয়ে যতদিন পর্যন্ত বিদেশী গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব থাকিবে, ততদিন আবশ্যিক-মত টাকা খরচ হইবে না, উন্নতিও হইবে না।

গবর্ণমেন্টের তরফের যুক্তি

এইসকল বিষয়ে বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্ত সরকার-পক্ষের লোকেরা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা শুনিতে মন্দ নয়। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

যুদ্ধবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—যুদ্ধবিভাগের কাজকর্ম বুঝিবার ও চালাইবার মত ভারতীয় লোক নাই; প্রধান সেনাপতি হইবার মত লোকের কথা দূরে থাক, লেফটেন্যান্ট, কাপ্তেন, মেজর, কর্নেল হইবার মত লোকও নাই; ইত্যাদি। কিন্তু চিরকাল দেশের এই দুর্দশা ছিল না। এই দুর্দশা ইংরেজের কৃত। খুব প্রাচীনকালের কথা বলিবার দরকার নাই। শিবাজী,

হায়দর আলী, টিপু সুলতান, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষের লোক। বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যদলে যে-সব ইংরেজ অফিসার কাজ করেন, তাঁহারা এইসকল ভারতীয় নেতাদের চেয়ে বড় ঘোড়া নহেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও ভারতবর্ষে দেশী নেতার অধীনে ইংরেজ সৈন্য কাজ করিত। কে ও ম্যালিসনের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে। অনেক বিষয়ে ইংরেজ শাসন মুসলমানী শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মুসলমানশাসনও শ্রেষ্ঠ ছিল। উচ্চ রাজকাৰ্য্যে হিন্দুদেরও নিয়োগ তন্মধ্যে একটি। সেকালে ভারতীয় মুসলমান নৃপতিদের এক একটা অভিযানে হিন্দু প্রধান সেনাপতি ছিলেন; অপ্রধান নেতার ত কথাই নাই। হিন্দুরা রাজস্ব-মন্ত্রী, ও অন্তরকম মন্ত্রী ত হইতেনই, প্রাদেশিক শাসনকর্তা পর্য্যন্ত হইতেন। যথা—মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন।

ইংরেজের নীতি ও মুসলমান নীতির এবিষয়ে পার্থক্যের কারণ অনেক। একটা কারণ, মুসলমান নৃপতিরা, প্রথম ২।১ জন ছাড়া, সবাই দেশের লোক ছিলেন; এইজন্য, ইংরেজ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই যেরূপ পর ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করেন, ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদিগকে ততটা পর ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতেন না। আর একটা কারণ, পাশ্চাত্য খৃষ্টিয়ানরা, বিশেষতঃ টিউটনিক্জাতীয় ইংরেজ প্রভৃতিরা, এখন পর্য্যন্ত অশ্বতকায় অখৃষ্টিয়ান খৃষ্টিয়ান সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করেন; কিন্তু মুসলমানরা গায়ের রং অনুসারে মানুষকে কখন উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট মনে করেন নাই।

ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র “পিত্তিরক্ষা করিও”,* অথবা, “পূরা সত্য বা পূরা মিথ্যা বলিও না, ৫৮/১৭১০ মিথ্যার সঙ্গে আধ পাই সত্য মিথাইয়া দিও।” ছই একটা দৃষ্টান্ত লউন। সৈন্যদলে যে-সব ইংরেজ অফিসার কাজ করে, তাহাদের নিয়োগপত্র বা

* আহারের নির্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট খাদ্য না জুটিলে কিবা যথেষ্ট বাইবার সুবিধা না হইলে, সামান্য কিছু খাওয়াকে গ্রাম্য ভাষায় “পিত্তিরক্ষা করা” বলে।

সনন্দ ইংলণ্ডের রাজা দিয়া থাকেন; ইহাকে কমিশন বলে। আগে এই কমিশন কোন ভারতীয় পাইত না। কয়েক বৎসর হইল, অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয়কে সৈন্যদলের নেতৃত্বের নিম্নতম শ্রেণীগুলিতে রাজ-কমিশন দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে আকুলে গোনা যায়। এখন কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ভারতীয়দিগকে যুদ্ধবিভাগে উচ্চ কাজ দেওয়া হয় কি না, তাহার উত্তর ইংরেজ সরকার দিবেন, “হয় বৈ কি?” ইহাকে বলে ‘পিত্তিরক্ষা’। কারণ, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়; খুব অল্প পরিমাণে সত্য, খুব বেশী মাত্রায় মিথ্যা।

ইউরোপ বা আমেরিকার কোন অসুস্থ লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, ভারতবর্ষের মুসলমান রাজারা যেমন হিন্দুদিগকেও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিতেন, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ও তাহা করেন কি না; উত্তরে বলা হইবে, “নিশ্চয়ই করেন;—লর্ড সিংহকে বিহার-ওড়িশার গবর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছিল।” ইহাও পিত্তিরক্ষা নীতির দৃষ্টান্ত।

পানামায় আমেরিকার গবর্ণমেন্ট, ইটালীতে ইটালীয় গবর্ণমেন্ট, ম্যালেরিয়া বিনাশ করিবার জন্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ভারতে ইংবেজ গবর্ণমেন্ট সেরূপ কিছু করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে, “অবশ্যই করেন। এই দেখুন না, বঙ্গ আগামী বৎসরের জন্ত ম্যালেরিয়া বিনাশের জন্ত টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে।” কিন্তু টাকার পরিমাণটা কত জানিতে চাহিলেই পিত্তিরক্ষা নীতি ধরা পড়িবে। বাংলার মত বিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার নিমিত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা (কিবা দু দশ লাখ টাকাও) কিছুই নয়; মানুষে যাহাতে বলিতে না পারে, যে, গবর্ণমেন্ট কিছুই করিতেছেন না, সেইজন্য এই সামান্ত টাকা বজেটে ধরা হইয়াছে।

যদি প্রশ্ন হয়, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট পান্ন স্নান প্রভৃতির জন্ত অল্প সবুসবাহ করিবার নিমিত্ত কিছু করেন কি না, উত্তর পাওয়া যাইবে, “নিশ্চয়ই করেন; দেখুন না আগামী বৎসরে কেবল বাংলা দেশের জন্তই, এক আধ পয়সা নয়, পঞ্চাশটি হাজার টাকা এইজন্য খরচ

করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।” অথচ এই ইংরেজ গবর্ন-মেণ্টেরই কর্মচারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বলিতেছেন,

“Now, if you want to give a sufficient water-supply to each village, I am sure you will require at least Rs. 50 crores, if not Rs. 100 crores.” “যদি আপনারা প্রত্যেক গ্রামকে যথেষ্ট জল দিতে চান, তাহা হইলে, একশত কোটি টাকা না হউক, পঞ্চাশ কোটি টাকার দরকার হইবে।”

যেখানে একশ কোটি টাকা দরকার, সেখানে পঞ্চাশ হাজারের বরাদ্দ পিত্তিরক্ষা বই আর কি ?

আমরা যে কথাটা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার তাহার অনুসরণ করা যাক।

ইহা সত্য, যে, মাহুকের দৃষ্টিতে বর্তমানে ভারতবর্ষে এমন কোন ভারতীয় নাই যিনি আজ কিঞ্চিৎ কাল প্রধান সেনাপতির বা তাঁহার নীচের পদের কাজ করিতে পারেন। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে কি আছে, কেহ জানে না। হায়দার আলি বা শিবাজী অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যে অত বড় নেতা হইবেন, কে ভাবিয়াছিল ? যাহা হউক, ইংরেজ গবর্নমেণ্টের পিত্তিরক্ষা নীতি বলবৎ থাকিলে একশত বৎসর পরেও উক্ত গবর্নমেণ্ট ঠিক বলিতে পারিবেন, “ঠিক তোমাদের মধ্যে যোগ্য লোক ত দেখিতেছি না ?” অতএব, এই নীতিটা এখনই, এই বৎসরটুকু পরিবর্তন করা দরকার। ইহাতে ভাবিবার কিছু নাই, রয়্যাল কমিশান বসাইবারও কোন দরকার নাই। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, আপাততঃ সামরিক বিভাগ বাদে অন্তর্গত সব বিভাগে দেশের লোকদিগকে কর্তৃত্ব দেওয়া হউক, এবং দশ বৎসর পরে সামরিক বিভাগেও কর্তৃত্ব দেওয়া হউক ও তজ্জগৎ এখন হইতে আয়োজন করা হউক, তাহা সমীচীন। ইংরেজ প্রধান সেনাপতি বলিতে পারেন, “আমার প্রধান সেনাপতি হইতে পঁচিশ বৎসর লাগিয়াছে; অতএব তোমরা হঠাৎ কালই প্রধান-সেনাপতি হইতে পার না”; কিন্তু তিনি পঁচিশ বৎসর আগে যে সামরিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং শিক্ষান্তে যে কাজ ও উন্নতির আশা পাইয়াছিলেন, সেই ২৫ বৎসর আগে কোন ভারতীয়কে সেই শিক্ষার, সেই

কাজ প্রাপ্তির ও সেই ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার সুযোগ দেওয়া হয় নাই; এখনও হইতেছে না। সুতরাং তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অনভিপ্রেত বা অভিপ্রেত উপহাস ও বিক্রম বলিয়াই আমরা ধরিব। আমরা এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থায় দুর্বল আছি। সুতরাং আমাদের উপহাস করা সোজা। কিন্তু আমরা কখনও সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান হইতে পারিবই না, এমন বলা যায় না। এবং তাহা হইতে কত অল্প বা দীর্ঘ কাল লাগিবে, তাহাও জানা নাই। অন্ততঃ ভারতের বন্ধু কিঞ্চিৎ ভারতগ্রাসেচ্ছ, অল্প কোন জাতিও শক্তিমান হইতে পারে। সুতরাং ইংরেজই বরাবর ভারতের ভাগ্যবিধাতা থাকিবে, তাঁহাদের এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু নাই।

অতএব, ধর্মের অনুগত হইতে হইলে সকল বিষয়ে পিত্তিরক্ষার নীতি ত্যাগ করা ত উচিত বটেই, সাংসারিক লাভালাভ বিবেচনার দিক দিয়াও উহা কর্তব্য। কেননা, ভারতবর্ষ স্বাধীন বা স্বশাসক হইবেই। স্বাধীন বা স্বশাসক ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও মন্ত্র্যবের মূল্য আছে, ইহা ইংরেজের বুঝা উচিত।

আমেরিকায় উচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে

উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি একটি গুরুতর গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রের নৌবহর দেশরক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ; এবং অনেক যুদ্ধজাহাজ পেট্রোলের সাহায্যে চালিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রের কর্তারা ১৯১৫ খৃঃ অব্দে ওয়াশিংটন প্রদেশের অন্তর্গত টিপট ডোম নামক তৈলক্ষেত্র বিশেষ করিয়া ভবিষ্যতে নৌবিভাগের প্রয়োজনের জন্য আলাদা করিয়া রাখেন। টিপট ডোম ব্যতীত অন্য দুইটি তৈলক্ষেত্রও ১৯১২ খৃঃ অব্দে এইপ্রকারে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। দেশপতি উইলসনের দেশপতিত্বের সময় যুক্তরাষ্ট্রে এইপ্রকারে তৈলক্ষেত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হয়। ১৯২০ খৃঃ অব্দে আইন করিয়া এইসকল তৈলক্ষেত্রগুলিকে নৌ-বিভাগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে

সমর্পণ করা হয়। নৌ-বিভাগ বেরূপে উচিত মনে করেন, সেইরূপে সংরক্ষণ কার্য সম্পাদন করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। অপরকে তৈলক্ষেত্র ভাড়া দেওয়া, তৈল উত্তোলন বিনিময় ইত্যাদির অধিকারও নৌবিভাগের হস্তে আইসে। কিন্তু ১৯২১ খৃঃ অর্ধে দেশপতি হার্ডিং এই-সকল তৈলক্ষেত্রের ভার অভ্যন্তর-বিভাগের (Department of the Interior) হস্তে সমর্পণ করেন। এই সময় অভ্যন্তর বিভাগের কর্তা ছিলেন এলবার্ট বি ফল (Albert B. Fall)। ১৯২২ খৃঃ অর্ধে এই বিভাগের কর্তারা টিপট্ ডোম্ তৈলক্ষেত্রটি রয়াল্টির সঙ্গে হারী এফ্ সিনক্রোর নামক ব্যক্তির গঠিত একটি কোম্পানীকে ইজারা দেন। এই ঘটনার সমালোচনার উত্তরে বিভাগের কর্তারা উত্তর দেন, যে, ঐ তৈলক্ষেত্রের তৈল পার্শ্ববর্তী সল্টক্রীক্ নামক তৈলক্ষেত্রের (Salt Creek Oil Fields) ভিতর দিয়া অপরে লইয়া যাইতেছে; সুতরাং ইজারা দিয়া তৈল উত্তোলনই সুবুদ্ধির কার্য। নৌবিভাগের ক্যালিফোর্নিয়াস্থ দুইটি তৈলক্ষেত্রও এইরূপেই এল ডোহেনির গঠিত একটি কোম্পানীর হস্তে ১৯২১ ও ১৯২২ খৃঃ অর্ধে গিয়া পড়ে। কিছু কাল পূর্বে এইসকল ঘটনার সমালোচনার এই কারণ ছিল, যে, এইরূপ করিয়া তৈল উত্তোলন অপেক্ষা তৈল ভূগর্ভে থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু গত বৎসর কোন কোন গুজবের ফলে ব্যাপারটি নূতন মূর্তি ধারণ করে। শুনা গেল, যে, টিপট্ ডোমের ইজারার খবর গবর্নমেন্টের পূর্বে বাহিরে লোকেরা জানিতে পায়। এবং মিস্টার ফলের নিউ মেক্সিকোর জমিদারীতেও নাকি সেই সময় খুব ঐশ্বর্য্যাদিক্য দৃষ্ট হয়। মিস্টার ফল্ ইহার উত্তরে বলেন, যে, তিনি ওয়াশিংটন পোষ্টের সম্পাদক এডওয়ার্ড বি ম্যাকলিন নামক বন্ধুর নিকট হইতে ১০০,০০০ ডলার ধার করিয়া জমিদারীর চেহারা ফিরাইতেছিলেন। ম্যাকলিন কিন্তু বলেন, যে, তাঁহার দস্ত চেকগুলি ফল্ না ভাজাইয়াই ফেরৎ দিয়াছেন। ফল্ বলিলেন, তিনি ডোহেনি বা সিনক্রোরের নিকট এক পরসাগ গ্রহণ করেন নাই।

গত জানুয়ারী মাসের শেষে যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব দেশপতি রোজেভেণ্টের পুত্র আর্চিবল্ড্ ডি রোজেভেণ্ট্ নিজ হইতে সাক্ষ্য দেন, যে, সিনক্রোর ফলের জনৈক কর্মচারীকে টাকা দিয়াছেন। কর্নেল জে ডব্লিউ জেভ্‌লি [সিনক্রোরের টুর্নী] সাক্ষ্য দেন, যে, ১৯২৩ সালে সিনক্রোর ফল্কে ২৫,০০০ ডলার ধার দেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে 'রুশিয়া যাইবার জন্ত' সিনক্রোর আরও ১০,০০০ ডলার নগদ দেন। এক গবর্নমেন্টের কমিটি এইসকল সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ই এল্ ডোহেনি কমিটিকে বলেন, যে, তিনিই ১৯২২ খৃঃ অর্ধে ফল্কে ১০০,০০০ ডলার ধার দেন।

এইসকল ঘটনা লইয়া খুব কলেঙ্কারী হইতেছে। উচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ খুবই চিন্তার বিষয় বলিয়া যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ত এক লক্ষ ডলার ধাৰ্য্য করিয়াছেন। ভূতপূর্ব এটর্নী জেনারেল্ গ্রেগরী এবং সাইলাস্ এইচ্‌ ট্রিন দুই জনকে এই অনুসন্ধানের জন্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহারা সব-কিছু তলাইয়া দেখিবেন। আগামী দেশপতি নির্বাচনের সময় টিপট্ ডোমের ব্যাপার লইয়া খুব গোলযোগ হইবে। বর্তমান দেশপতি কুলিঙ্ক ফলের সময়ে হার্ডিংয়ের মন্ত্রীসভায় ছিলেন। এইজন্য কোন কোন স্থলে তাঁহার নামেও দুর্গাম দিবার উদ্যোগ হইতেছে। অবশ্য কুলিঙ্কের এতটা সুনাম আছে, যে, এসকল অপবাদে অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যবসাদারী আমেরিকার বহুকালের অপযশের কথা। কিন্তু এরূপ ব্যাপার সে দেশেও বিরল।

দেশপতি কুলিঙ্ক বলিয়াছেন, "যদি কেহ অপরাধ করিয়া থাকে, তাহার বিচার হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন সম্পত্তি যদি অবৈধ উপায়ে পরহস্তগত হইয়া থাকে তাহার পুনরুদ্ধার হইবে।"

দেখা যাক্ কি হয়।

দোষে সমান হইলেই গুণে সমান হওয়া যায় না, তা আমরা জানি ও বুঝি। স্বাধীন আমেরিকান্দের যে-সব দোষ আছে, আমাদেরও সেইসব দোষ থাকিলে,

তাঁদের সব গুণও আমাদের আছে, এমন চমৎকার যুক্তি প্রয়োগ আমরা করি না। কিন্তু যারা প্রকারান্তরে আমাদেরকে জানাইতে চান, যে, যেহেতু তাঁহারা স্বাধীন অভাব তাঁরা নির্দোষ ও সকল সম্ভবের আধার, তাঁদের জানা উচিত যে ছনিয়ার খবর আমরাও কিছু কিছু রাখি।

অ

ওলিম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ

গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে প্যারিস ওলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে-সকল খেলোয়াড়দিগকে পাঠান হইবে, তাঁহাদের নির্বাচন কার্য শেষ হইয়াছে। সর্বমুদ্র আট জনকে পাঠান হইবে স্থির হইয়াছে। এই আটজননের নাম, প্রদেশ ও তাঁহারা যে যে বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিবেন, তাহা আমরা নিম্নে দিতেছি।

১। দলীপ সিং	পাটয়ালা	লম্বা লাফান
২। লক্ষন	মাল্লাজ	১২০ গজ হার্ড্‌ল্‌স্‌ দৌড়
৩। হিন্দে	বোম্বাই	ম্যারাথন্‌ বহুদূরব্যাপী দৌড়
৪। হল্‌	বাংলা (এংলো-ইণ্ডিয়ান)	২২০ গজ দৌড়
৫। পাল সিং	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	তিন মাইল দৌড়
৬। হীকোট	মাল্লাজ (এংলো-ইণ্ডিয়ান)	উচ্চ উল্লঙ্গন
৭। পিট্‌	বাংলা (এংলো-ইণ্ডিয়ান)	১০০ গজ দৌড়
৮। ডেক্টরমণসারী	মৈসূর	১ মাইল দৌড়

দলীপ সিংহ শিখ্‌ । তিনি লম্বা লাফান কার্যে সুশিক্ষিত নছেন। তথাপি ইনি স্বাভাবিকভাবেই লাফ দেওয়ায় সুদক্ষ। সকলে আশা করেন, যে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে ইনি প্যারিসে ভারতবর্ষের সুনাম রক্ষণে সমর্থ হইবেন। হিন্দে নিরামিষভোজী ব্রাহ্মণ। ইহার ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে অনেক কিছু আশা করিতেছেন। পাল সিং সৈনিক এবং শক্তিশালী পুরুষ। ইনিও আমাদের আশার স্থল। বাংলার দুই জন প্রতিনিধিই অবাঙ্গালী। শ্রীযুক্ত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় *

* "Chatterjee, who had been winning this event consistently in all the big Calcutta meets, was probably the best all-round athlete on the field; for although he won no first place he took three."--A. G. Noehren in *The Young Men of India*.

দিল্লীতে যতগুলি খেলোয়াড় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্কাপেক্ষা চৌকস ও সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় হইলেও কোন বিষয়েই প্রথম হন নাই। আশা করি, ইনি ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া শক্তিসাধন কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ইহার বয়স অল্প এবং দেশের লোক ইহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে অনেক আশা করেন।

আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা স্বাভাবিক শক্তি-সম্পন্ন হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা শিক্ষার ও যথারীতি অভ্যাসের অভাবে অপরের নিকট পরাস্ত হন। গতবারের ওলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধিগণ অত্যন্তই খারাপ ফল দেখাইয়াছিলেন। কারণ, অভ্যাস ও শিক্ষার অবহেলা। আশা করি এই বারে আমাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

অ

শ্রমজীবী মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ

জনৈক রাজনীতিবিদ বলিয়াছেন, যে, ইংলণ্ডের বর্তমান মন্ত্রিসভা শ্রমিক দলের দ্বারা চালিত হইলেও তাহা ধনিকের কার্যসিদ্ধি করিতেছে ঠিক পূর্বেরই মত। অর্থাৎ কিনা ধনিকতন্ত্র পূর্বের মতই রাজত্ব করিতেছে, যদিও রাজকর্মচারীগণ শ্রমিক সংঘের সভ্য। ইহারা নিজেদের মতামত অনুসারে কিছু করিতে পারিতেছে না, করিতেছে পরের (ধনিকের) মতামতে। কথাটি সর্ব্বৈব সত্য না হইলেও প্রায় সত্য। শ্রমিক গবর্নমেন্টের রাজত্ব সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না। তাহারা বিশেষরূপে অপর দলের অধীন হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ নিজেদের মতামত অনুসারে কাজ করিবার অধিক চেষ্টা করিলে বিশেষ সম্ভাবনা এই, যে, শ্রমিকদিগকে শাসকত্ব ত্যাগ করিয়া অপর ক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, যে, প্রথম প্রথম চূপ করিয়া থাকিয়া কিছুকাল পরে নিজেদের ইচ্ছামত কার্য করাই রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডের মতলব; আপাতত চূপ করিয়া পূর্বকালীন প্রথমত কার্য করিয়া যাওয়া শুধু একটা

চালু রাজ। কিছুকাল পরে না কি শ্রমিকগণ বিশ্ব-
প্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর রাজত্ব স্বরূপ করিবেন।

আমাদের কি বিশ্বাস, তা আপাতত বলিয়া লাভ
নাই। শুধু দুই একটি কথা বলা চলে।

প্রথমত, আজন্ম যাহা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়াছি,
“বর্তমানে তাহা”র সহায়তা করিয়া চলিব, কেননা পরে
ইহাতে পুণা করিবার সুবিধা হইবে”, এই প্রকারের
নীতিশাস্ত্র কতটা উৎকৃষ্ট, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যিক।
অনেকে এই-প্রকার ব্যবহারকে কাপুরুষতা বলিয়া
থাকেন। অনেকে আবার ইহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও
পাইতে পারেন। এ বিষয়ে কচিভেদ আছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকগণ ইংলণ্ডের বাসিন্দা এবং ইংলণ্ডের
অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সহিত শ্রমিকের ভূত
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে জড়িত। ইংলণ্ডের
আয়ব্যয়ের বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিলে, আঙ্গুলের
দাগ লাগিবে সর্বত্র শ্রমিকের জীবনে। যথা, ল্যান্চ-
শাওয়ারের কাপড়ের কল বন্ধ হইলে অথবা অপর কোথাও
ইম্পাতের কারখানা কিম্বা জাহাজ তৈরী বন্ধ হইলে
সর্বত্র এবং সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইবে ইংলণ্ডের
শ্রমজীবী। শ্রমিক গবর্নমেন্ট যদি উত্তমরূপে সাম্য
মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রচার করিতে যান, তাহা
হইলে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যে গোলযোগের সুত্রপাত
হইবে। ধনিক যে-প্রকারে ও যে যে উপায় অবলম্বনে
বহুদেশে ইংলণ্ডীয় ব্যবসার প্রভাব বিস্তার করিয়া
রাখিয়াছে, শ্রমিক তাহা ভাবিয়া গড়িতে গেলে ইংলণ্ডের
(সুতরাং শ্রমিকেরও) বিশেষ আর্থিক লোকসানের
সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক তা করিবে কি?

যথা, ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে শ্রমিকের
কাপড়ের কলে কাজ পাওয়া, জাহাজে স্থান পাওয়া,
ইত্যাদি শক্ত হইয়া উঠিবে। ভারতপ্রীতি আগে, না
স্বার্থ আগে? ইংলণ্ডের শ্রমজীবী-সম্প্রদায় যে সামাজিক
পুনর্গঠন ও নানাপ্রকার আমূল পরিবর্তনের চিত্র
এতকাল ধরিয়া জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছিল, তাহা
বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে যে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট-
স্বীকার প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত মনের ও আদর্শের

জোর ইংলণ্ডের সফীর্ণমনা শ্রমজীবীর মধ্যে আছে
কি?

রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডের রাষ্ট্রনীতি

ম্যাকডোনাল্ড, জগৎকে জানাইয়াছেন যে, কৃষিয়ার
সহিত ইংলণ্ডের আর শক্ততা রহিল না। “উদ্দেশ্য—
কৃষিয়ার উপকার নহে। উদ্দেশ্য—ইংলণ্ডের ব্যবসা বিস্তার,
কৃষিয়ার ভারতে বোলশেভিক আন্দোলনের চেষ্টা করিতেছে,
এই ভ্রান্তবিশ্বাসজনিত ভীতির নিবৃত্তি ও কৃষিয়ার নিকট
পুরাতন প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ। ম্যাকডোনাল্ড, অসাধারণ
ঔদার্য দেখাইয়াছেন, বলা যায় না। লয়েড্‌ জর্জ্
প্রধান মন্ত্রী হইলেও এইপ্রকার ভালবাসার বাণীই
জগৎ শুনিত।

ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষকে বিপ্লববাদের নিরুদ্ধিতা
সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একটি বার্তা পাঠাইয়াছেন। সেই
বার্তাতে আরও অনেক গভীর তথ্য কথাও আছে।
কয়েকটি কথা ম্যাকডোনাল্ড বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন;
যথা, সদা সত্য কথা কহিবে; পরের ভ্রব্য না বলিয়া
লওয়াকে চুরি করা বলে; ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ লোকের আয়ু

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম
সপ্তাহের মধ্যে যে-সকল প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইয়াছে,
তাহাদের একটি ক্ষুদ্র তালিকা আমরা পাইয়াছি। ইহার
মধ্যে সকলেই খেতাব। ইহাদের বয়স যথাক্রমে ৮০,
৫৫, ৬৭, ৭২, ৮১, ৯১, ৭০, ৮০, ৬৫, ৬৭, ৮১, ৫৬, ৫২,
৪৫, ৬৪, ১০৩, ৬৪, এবং ৮৭।

গড়ে এইসকল লোক ৭১ বৎসরেরও অধিক
বাঁচিয়া ছিলেন। ১৮ জনের মধ্যে একজন ১০০ বৎসরের
অধিক বাঁচিয়া ছিলেন, ২ জন ৯০এর অধিক, ৭ জন
৮০ ও ততোধিক এবং ৮ জন ৭৫এর অধিক। ইহাদের
মধ্যে লেখক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরোহিত, অধ্যাপক, সৈনিক,
ব্যবসাদার ইত্যাদি নানান প্রকার লোক ছিলেন।

হাতিতে কেহ বৃষ্টি, কেহ ফরাসী, কেহ রশীর, কেহ পশুপিস্থ ছিলেন। ইহারা সকলেই কেবল গাছের মত ধাচিয়া ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত অক্লান্তকর্মী ও শ্রমিষ্ঠ লোক ছিলেন। এইরূপ কর্মঠ ও দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ খুঁজিলে দেখা যাইবে, ইহারা কেহই বালকবালিকার গন্তান নহেন এবং সকলেই উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ও সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক নিয়ম পালন করিয়া ছিলেন। আমাদের দেশ অন্নায়ুর দেশ। অন্নায়ুর হওয়ার কারণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কুরীতির প্রদর্শন ও উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ইত্যাদি সঙ্ঘে প্রবাসীন্য।

সোনার ভারতের অজ্ঞ । ঐশ্বর্য্য

ছোট ছোট গ্রামে যাইলেও আমরা দুই একটি দোকান দেখিতে পাই। অতিশয় ছোট গ্রামে দোকান দি নাও থাকে, তাহা হইলেও গ্রামবাসীরা হাটে যথবা নিকটবর্তী বড় গ্রামে বা সহরে যাইয়া নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু গ্রামবাসী কখনও ভাবিয়া দেখে না, কি করিয়া দূরদেশবর্তী আয়না- বা চিক্রনী-নৈশ্বাতার প্রস্তুত জিনিস তাহার হস্তে আসিয়া পড়িল। স কখনও স্বপ্নেও ভাবে না, যে, ধান বিক্রয় করা অর্থে আয়না আয়না বা ম্যানুচেষ্টারের কাপড় ক্রয় করার মধ্যে কোনো জটিলতা আছে। কি বিরূঢ় বাণিজ্যযন্ত্রের সাহায্যে তাহার ধানপাটের পরিবর্তে সে শত শত পণ্ডের অধিকারী হইতে সক্ষম হয়, তাহা গ্রামবাসী আবার জ্ঞানের অতীত। জানে, টাকা পাই ও টাকা খরচা কি নি।

অতি পুরাকালে গ্রামের বাহিরে প্রস্তুত দ্রব্য গ্রামবাসীর হস্তে প্রায় কখনও আসিত না। গ্রামের অন্তর্গত ব্যক্তিগণই সকল দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরস্পরের সকল অভাব মোচন করিত—যথা, কেহ চাষ করিত, কেহ কাপড় বুনিত, কেহ ব্যাধবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইত, কেহ বা মৎস্যজীবী ছিল। আবার অপর কেহ শিক্ষা বা পারোহিত্য সর্বস্বরূহ করিত। এইরূপেই গ্রামের জন-গণের জীবন কাটিত।

তখন জীবনে অভাব ছিল অল্প, কেননা মানুষের আকাঙ্ক্ষা আজ-কালকার মত সে-যুগে এত শত শত হাত বাড়ায় নাই। আধুনিক মানুষের অভাব তাহার জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতির সহিত ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। তখন গ্রামের মধ্যেই শ্রমবিভাগ করিয়া মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করিয়া সমবায়ের পথ বাহিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত; কিন্তু আজ হৃদুর আপানে তাহার জন্ত আয়না ও চিক্রনী তৈয়ার হয়; জাখানীতে তাহার আলোয়ান বোনা হয়, ও ইংলণ্ড তাহার বস্ত্র সর্বস্বরূহ করে। এ এক বিরূঢ়তার সমবায় ও শ্রমবিভাগের চিত্র। কিন্তু এ চিত্র কয়জন নিরক্ষর গ্রামবাসী বুঝিয়াছে?

বিরূঢ়তার ও জটিলতার হইলেই যে ইহা পূর্বের বন্দোবস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত তাহার প্রমাণ কি? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রেল জাহাজে মাল আসার মধ্যেই কি মানুষের জীবনে সুখ আনয়ন করার কোনো প্রকৃতিগত ক্ষমতা আছে? না এ এক বিরূঢ় ও জটিলতা-ময় বে-বন্দোবস্তের চিত্র মাত্র? আরও অল্পস্থল ব্যাপিয়া দেশের মধ্যেই কি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করা যায় না? অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমাইয়া ও আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বাড়াইয়া অবস্থার উন্নতি হয় না কি?

কে এসকল প্রশ্নের উত্তর দিবে? কেই বা শুনিবে? গ্রামবাসীর—দেশবাসীর—সঙ্ঘে জ্ঞানী মুক, দেশবাসী জ্ঞানীর নিকট বধির। দেশবাসী প্রাচীন কালের গুহার বাসিন্দার মতই সংকীর্ণভাবে জীবন কাটাইতেছে। অজ্ঞানতা তাহাকে অদৃষ্টবাদের মোহে ফেলিয়া রাখিয়াছে। সোনার ভারতের সোনা ভারতবাসীর চক্ষে অবাস্তব—কেননা ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে ও কুশিক্ষায় অন্ধ।

সহরের মধ্যে সহর

আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের মধ্যে আর-একটি সহর আছে। এই সহরের লোকদের নিজেদের দোকান-পাট থিয়েটার বায়োকোপ গির্জা পাঠশালা ইত্যাদি আলাদা করিয়া আছে। ইহারা নিউইয়র্কে

বাস করে অখচ করে না। ইহাদের জীবনযাত্রা নিউইয়র্কের জীবনযাত্রা নহে। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, আনন্দ ও আর্ন্তনাদ, সবই ইহাদের নিউইয়র্কের মধ্যে থাকিলেও বাহিরে।

আড়াই লক্ষ নিগ্রো তাহাদের কালো চামড়ায় ঢাকা হৃৎ হৃৎ ভালবাসা হিংসা স্ব ও কু ভরা জীবন এই সহরে কাটায়। তাহার সহরের ভিতরের সহরে কবি শিল্পী সাহিত্যিক নট মহাজন উত্তমর্গ কিছুই অভাব নাই। শুধু নাই সেখানে সাদা চামড়া। সভ্য বিশ্ব-প্রেমিক আমেরিকান তাহার কালো সহরে সহকর্মী ও সহনাগরিক নিগ্রোকে একঘরো করিয়া রাখিয়া নিজ 'উৎকৃষ্টতা' বজায় রাখিতেছে।

আমেরিকার আরও পাঁচটি সহরে এইরূপ সহরের ভিতর একটি করিয়া বড় কালো-সহর আছে। এই পাঁচটি স্থলেই এক লক্ষের বেশী নিগ্রো কোণঠাসা হইয়া দিন কাটায়। জাতির উৎকৃষ্টতা ও অধমতার মাপকাঠিতে যাহারা নীচে পড়ে, তাহাদের উপরওয়ালার উচ্চ জীবননির্কাহ-প্রণালীতে ছায়া ফেলিবারও অধিকার নাই।

একঘরো করিয়া রাখাই একমাত্র অত্যাচার নহে। ব্যবস্থাপক সভাদিতে প্রতিনিধি নির্কাচনে ভোট দিবার অধিকার না পাওয়া, লঙ্ঘিত হওয়া, বিনা বিচারে ফাঁসি যাওয়া, ভিন্ন রেলগাড়ীতে যাতায়াত করা, সাদা হোটেলে ও রেস্টুরায় আহাৰ না পাওয়া ইত্যাদি বহু সভ্যতার ধাক্কা আমেরিকার নিগ্রোকে সামলাইতে হয়। এই-সব অত্যাচারের ফলে আমেরিকার নিগ্রোগণ সংঘবদ্ধ হইয়াছে। এক কোটি নিগ্রো আজ সম্বরে এই অত্যাচারের শেষ দেখিতে চাহিতেছে। ইহারি অনশনক্রিষ্ট দুর্বলকায় অজ্ঞ ভারতবাসীর মত নহে। ইহাদের শরীরে শক্তি ও মস্তকে শিক্ষাজনিত চিন্তা আছে। অনেকেই যুদ্ধের সময় সৈনিকের কার্য করিয়াছে। কাজেই আমেরিকার উচ্চ শ্রেণীমহলে আজকাল লুকাইয়া মদ্যপান করিবার চিন্তা ছাড়া আরও একটি গভীরতর হুস্কিন্ডার বোকা বাড়িয়াছে। নিগ্রোগণ শাস্ত বলিয়া খ্যাত নহে। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বেই প্রায়

পঁচিশবার নানা স্থলে নিগ্রো-বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্রেণীসমূহ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার পূর্বে এবং ১৮৬১ খঃ অব্দের অস্তবিগ্রহের পূর্বে আরও বারোটি নিগ্রো-বিদ্রোহ ঘটয়াছিল। অস্তবিগ্রহের একটি কারণ ছিল, নিগ্রো দাসদিগকে মুক্তি দান। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে দাসত্বপ্রথা খুব প্রচলিত ছিল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণের সহিত শত্রুতা করিয়া দাস-প্রথা দূর করিতে মনস্থ করে। লিন্কলনের মুক্তির পরোয়ানা (Emancipation Proclamation) কত দূর নিগ্রোর প্রতি ভালবাসার ফল ও কত দূর দক্ষিণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা, তাহা বলা শক্ত। দাসত্বপ্রথা দূর করিয়া উত্তর রাষ্ট্রসমূহের মালিকগণ দক্ষিণের প্রায় ১,৫০০,০০০,০০০ ডলার ক্ষতি করেন। এই মুক্তির পরে “১,৫০০,০০০,০০০ ডলারের কৃষ্ণ হস্তিদন্ত” নিগ্রোর খুব লাভ হইয়াছিল বলা যায় না। “গৃহপালিত পশু” হইতে নিগ্রো “গৃহ হইতে বহিষ্কৃত পশু” হইয়া দাঁড়াইল মাত্র।

আজ নিগ্রোগণ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এসকল অত্যাচার দূর করিবে। পূর্বে অপরাধী অথবা নিরপরাধী নিগ্রোকে অবাধে তাহার শ্রেণীসমূহের প্রভু প্রহার ও অনেক সময় হত্যাও করিত। বিনাবিচারে যথেষ্ট প্রহার হইয়া ইচ্ছা শাস্তি দান বা লিঙ্কিং সচরাচর ঘটিত। কিন্তু আজকাল লিঙ্কিং প্রায় আর হয় না, হয় হইলে পশুশব্দে লড়াই। আমেরিকার শ্রেণীসমূহ নিগ্রোকে প্রহার করিয়া নিজেও প্রকৃত হইতেছে। সম্ভব, ইহাতে উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে।

অ

ফ্রান্স ও বুঝি মার্কে'র দশা পাইল

জার্ম্যান মার্কে'র দুর্বলতার কথা পুরাতন কথা। জার্ম্যানরা ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া যাওয়ায় মার্কে'-নোট পুরানো কাগজের অপেক্ষাও বোধ হয় সস্তা দরে বিক্রয় হইতেছে। নোট ছাপাইবার কারণ জার্ম্যান গভর্নমেন্টের আয়ের অভাব ও ব্যয়ের বাহুল্য।

ফ্রান্স ও আজ বহুকাল ধরিয়া অযথা ও অত্যাচারে

মর্ষ ব্যয় করিতেছে। ফ্রান্স নিজের খরচ ধার করিয়া চালাইয়াও চেকো-স্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, ইউগোস্লাভিয়া, রুমেনিয়া প্রভৃতিকে অজস্র অর্থ সাহায্য করিয়াছে। উদ্দেশ্য, ইয়োরোপে আপনার একাধিপত্য স্থাপন। ফলে যুদ্ধের অন্ত ফ্রান্স বা ধার করিয়াছিল, শাস্তির পরে তাহা অপেক্ষা অধিক ধার করিয়াছে। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের ১৪৪'৮ বিলিয়ন ফ্রান্স ধার ছিল। ১৯২৩ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের ১৩০ বিলিয়ন ফ্রান্স ধার হইয়াছে। এত ধার করিয়া ফ্রান্সের টাকার বাজারে দুর্গম হইয়াছে। আজ বেশী হ্রদেও ফ্রান্স টাকা পাইতে অসুবিধা হইতেছে। কাজেই হাণ্ডাধানায় নোট ছাপা থামিতেছে না। ফ্রান্সের মূল্যও গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শাস্তিপূজা ছাড়িয়া শক্তিপূজা করিলেই এই দশা হয়। রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড ও জার্মেনী একপ্রকার দেউলিয়া। এবার বুঝি ফ্রান্সের পালা।

অ

ভারতের দারিদ্র্য

স্যার মোক্ষগুণ্ডম্ব বিশ্বেশ্বরায়ী বলেন—

“যুদ্ধের পূর্বে ভারতের সম্পত্তির মোট পরিমাণ পাঁচ হাজার চারি শত কোটি টাকার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল। ইহাতে জন প্রতি ১৮০ টাকার সম্পত্তি হয়। ক্যানাডায় জন প্রতি সম্পত্তি ৪,৪০০ টাকার বিহু বেশী; ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে (বিলাতে) জন প্রতি ৬০০০ টকা। বর্তমান সম্ভা টাকার দিনেও ভারতের জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৪৫ টকা হইতে ৬০ টাকার ভিতর। উর্ধ্বতম ৬০ টকা ধরিয়া হিসাব করিলেও জন প্রতি মাসিক আয় দাঁড়ায় পাঁচ টাকা করিয়া। ক্যানাডায় জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৫৫০ টকা, বিলাতে ৭২০ টকা। সমগ্র ভারতের বাণিজ্য জন প্রতি ২০ টকা হইতে ২৫ টকা; ক্যানাডায় ৫১০ ও বিলাতে ৬৪০। আমাদের অধিকাংশ মানুষ দীন ভাবে জীবন নির্বাহ করে বলিয়া মৃত্যুর হার ভারত-বর্ষে ভয়ানক উচ্চ। ভারতবর্ষে যেখানে হাজারে ৩০

জনেরও বেশী মৃত্যু হয় সেখানে পূর্বেকার দুই দেশে মৃত্যুর হার হাজারকরা ১৫ জনেরও কম। ভারতে মানুষের বাঁচিবার আশা গড়ে ২৪ বৎসর, ইউরোপে প্রায় ৪৫ বৎসর। শিক্ষার অবস্থাও এদেশে অতি হীন। শতকরা ছয় জনেরও কম লিখিতে পড়িতে জানে। যে কোনো মাপকাঠির দ্বারা পরীক্ষা হইবে ভারতের এই দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়।”

—

স্বাধীন মুসলমান

স্যার টমাস্ আর্নল্ড্ বলেন, পৃথিবীর ২২ কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র তিন কোটি চম্বল লক্ষ মুসলমান স্বাধীন ও ইউরোপীয় শাসন হইতে মুক্ত। এই অল্প-সংখ্যক স্বাধীন মানুষগুলিও যে জগদব্যাপারে নিতান্ত নগণ্য নহে ইহা মুসলমানদের পৌকষ ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

জগতে হিন্দুর সংখ্যা আনুমানিক ২২ কোটি ২৪ লক্ষ; ইহার মধ্যে নেপালের আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ ও বিদেশীয় দুই চার জন হিন্দু নাগরিককে বাদ দিলে প্রায় সকলেই পরাধীন।

—

তুরকের রেড্ ক্রেসেন্ট্ মিশন

তুরকের রেড্ ক্রেসেন্ট্ মিশনের চারিজন প্রতিনিধি আনাটোলিয়ার স্বদেশপ্রত্যাগত তুর্ক্ বন্দীদের দুর্গতি মোচনের উদ্দেশ্যে ভারতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন। মিঃ মেহিউদ্দিন জামাল নামক মাস্ট্রাজের এক ধনী বণিক এক লক্ষ টাকা ইহাদের হাতে দান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার তুর্ক্-প্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এরকম বদাশ্রুতাও প্রশংসনীয়। যাহা হউক, উত্তর-বঙ্গের বস্ত্রাণীড়িত লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দুঃখ মোচনের জন্ত ইনি কত টাকা দান করিয়াছিলেন, লোকে হয়ত তাহাও জানিতে চাহিতে পারে। আমাদের কথায় অনেকের ভুল বিশ্বাসের আশঙ্কা ও ফলে আমাদের উপর কষ্ট হইয়া উঠিবার ভয় থাকিলেও, আমরা মুসলমান ভাইদের কয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। দুর্ভিক্ষ বস্ত্রা ঝড় মহামারী

ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা বিপন্ন ভারতীয় মুসলমানদের সেবার কার্যটা প্রায় সর্বাংশে হিন্দু ও অন্যান্য অ-মুসলমানদের হাতে না ফেলিয়া দিয়া, ইহারা যেন তুর্ক্ মুসলমানদের ব্যপার সমান সমান করিয়াও স্বদেশী মুসলমানদের ব্যথায় ব্যথিত হন। চাকরী, প্রতি-নিধি নির্বাচনের অধিকার, প্রভৃতির ভাগ-বাটোয়ারার কথা উঠিলে স্বদেশীর সুবিধামত গীমাংসা করিবার বেলাই কেবল আজকাল তাঁহারা আপনাদিগকে একটি ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন; নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের সময় সে কথা মনে থাকে না।

তুর্ক্ রেড্ ক্রেসেন্ট্ মিশন্ ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে নব্বই হাজার টাকা স্বদেশে পাঠাইয়াছেন। দান অবশ্য বাঞ্ছনীয় নহে; তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয়, তুর্ক্ হইতে কখনও এক টাকারও দান ভারতের বিপন্ন মুসলমানদের জন্য আসিয়াছিল কি না।

কয়লার খনিতে বেকারদের জন্য কাজ

‘ক্যাথলিক হেরাল্ড অব ইণ্ডিয়া’ পত্র বলেন ‘কলিকাতা হইতে যে আশী জন অ্যাংলোইণ্ডিয়ানকে কয়লার খনিতে কাজ করিতে পাঠানো হয়, তাহার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ জন পুরুষের মত শেষ পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়া ছিলেন এবং এখন তাঁহারা তাঁহাদের অধ্যবসায়ের ফল ভোগ করিতেছেন। কাজটি শক্ত, কিন্তু ইহাতে পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, সুতরাং বলিষ্ঠদেহ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কাছে লোভনীয় হইবার কথা। আসান-সোলের খনি হইতে কয়লার বালতি বোঝাই করিয়া সত্য সত্যই পঞ্জাবীরা মাসে দুই শত হইতে তিন শত টাকা এবং ইংরেজেরা পাঁচ শত টাকা করিয়া রোজ্গার করিতেছে। প্রথমবারে বাছাই ভাল হয় নাষ্ট বলিয়া রোজ্গারের এই পথটি বন্ধ করিয়া দিলে দুঃখের বিষয় হইবে।’

ভুললোক শ্রেণীর এমন সাহসী সহিষ্ণু ও শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাসী বালালী যুবক কি নাই যাহারা এই-রূপ সংকারণ্য দ্বারা অর্থ উপার্জনের কথা ভাবিতে পারেন?

ভারতের আয়ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষের মোট সরকারী আয়ের অধিকাংশ যুদ্ধ-বিভাগের জন্য ব্যয় করা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা পূর্বে পূর্বে গবর্নমেন্টকে এক গৃহস্থের সহিত তুলনা করিতাম। গৃহস্থের আয় ১০০ টাকা। কিন্তু তিনি চোরডাকাতের ভয়ে অথবা কল্লিত ভয়ে কিম্বা ভয়ের ভাণে চোঁকিদার লাঠিয়াল রাখেন ৬২ টাকা বেতনে। বাকী আটত্রিশ টাকায় খাজানা আদায়, সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা, নিম্নের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি করিতে হয়। ইহাতে সেই গৃহস্থের অবস্থা কিরূপ হইবে, সহজেই অনুমেয়। বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্টের অবস্থা এই গৃহস্থের মত। প্রভেদ এই, যে, এই কল্লিত গৃহস্থটি সত্য সত্যই তাহার সন্তানদের পিতা; কিন্তু বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্ট ভারতীয় প্রজাদের ম-বাপ নহেন।

আমরা উপরে যে চোরডাকাতের ভয়ের কথা লিখিয়াছি, তাহার মধ্যে উহা তুলনাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিদেশী ভারত-গবর্নমেন্ট বাস্তবিক কেবল পরদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্যই সৈন্য পোষণ করেন না, পাছে আমরা নিজেই নিজের দেশ ‘আক্রমণ’ করিয়া স্বদেশের মালিক হইয়া বসি, বর্তমানে-প্রভু ইংরেজের এই ভয়টাও কম প্রবল নহে। যাহা হউক, ইহাও অবাস্তুর কথা। আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি।

ভারতের সরকারী আয় এখন যাহা, তাহার অধিকাংশ যদি যুদ্ধবিভাগের জন্য ব্যয়িত না হইয়া অল্প অংশ সামরিক উদ্দেশ্যে খরচ হইত, এবং বাকী সমস্ত জাতীয় উন্নতির জন্য খরচ করা হইত, তাহা হইলে তাহাও ভারতবর্ষকে অন্য সব সভ্য দেশের সমতুল্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত না। ঐসব দেশ শিক্ষার স্বাস্থ্যের কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য জনপ্রতি যত খরচ করে, আমাদেরকে তদপেক্ষা বেশী খরচ প্রথম প্রথম করিতে হইবে; কারণ আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। কিন্তু আমাদের আয় না বাড়িলে আমরা খরচ বাড়াইতে পারি না, এবং আমাদের নিকট হইতে অধিকতর ট্যাক্স পাইয়া গবর্নমেন্টও খরচ বাড়াইতে পারেন না।

কানাড়ার লোকদের আয় আমাদের অন্ততঃ দশ গুণ ; বিলাতের লোকদের আয় আমাদের অন্তত বারো গুণ। সুতরাং তাহারা নিজেরাও জাতীয় উন্নতির জন্ত বেশী খরচ করিতে পারে, তাহাদের গবর্নমেন্টকে বেশী ট্যাক্স দিয়া জাতীয় উন্নতির জন্ত উহাকে বেশী খরচ করিতে সমর্থ করিতেও পারে।

অল্প দিকে আবার, স্বাস্থ্য রক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, কৃষিশিল্পবাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতিতে খরচ বেশী না করিলে আমাদের উপার্জন-ক্ষমতা ও আয় বাড়িতে পারে না। আয় বাড়িলে শিক্ষাদির জন্ত ব্যয় বাড়াইব, না, শিক্ষা দিবার জন্ত ব্যয় বাড়াইলে তবে আয় বাড়িবে, এই উভয়সঙ্কেটের মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া, ছই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রায় কোন দেশই সাধারণ বাৎসরিক আয় হইতে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে না ; উহার গবর্নমেন্টকে ঋণ করিতে হয়। ঐ ঋণ ক্রমে ক্রমে অনেক বৎসর ধরিয়া শোধ হয়। তাহাতে বর্তমানের দেনার বোঝা কতকটা ভবিষ্যৎ বংশের উপরও পড়ে। ইহা স্মারকসঙ্গত। কারণ, যুদ্ধ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষিত হইলে ভবিষ্যৎ-বংশীয় লোকেরাও তাহার ফল ভোগ করে। দেশের উন্নতির জন্ত অল্প যে-কোন স্থায়ী কাজের ফল ভবিষ্যতেও লোকে ভোগ করিবে, তাহা নির্বাহের নিমিত্ত ঋণ করিয়া ক্রমে ক্রমে শোধ করা কর্তব্য। যেমন, বড় বড় সহরে জল সরবরাহের কারখানা বখন কখন ঋণ করিয়া করা হয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় উহার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষার বিস্তৃতিও উন্নতির জন্ত ঋণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা দরকার। ইহার জন্ত দুই-তিন শত কোটি টাকা আবশ্যিক হইতে পারে। কিন্তু সামান্য একটা ওয়াশিংটন অভিয়ানে যদি ৩৫ কোটি টাকা গবর্নমেন্ট খরচ করিয়া থাকিতে পারেন, যদি গত মহাযুদ্ধের সময় ধনী ইংলণ্ডকে গরীব ভারতবর্ষ দেড়শত কোটি টাকা ঋণ করিয়া “স্বৈচ্ছাকৃত দান” করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতি-

বিস্তৃতির জন্ত দুই-তিন শত কোটি টাকা কেন খরচ করিতে পারিবেন না ? সামর্থ্যের অভাব মোটেই নাই, ইচ্ছার অভাব যথেষ্ট আছে।

ভারতীয়দের আয় এবং তদ্ব্যতীত ভারত-গবর্নমেন্টের আয় বাড়িলেই যে জাতীয় উন্নতির কাজে ব্যয় বাড়িবে, ইহা বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। বরং ইহাই বিশ্বাস করা সঙ্গত, যে, যত দিন ভারত-গবর্নমেন্ট বিদেশী গবর্নমেন্ট থাকিবে, ততদিন উহার আয় বাড়িলে ইংরেজদের লাভ সুবিধা ও শক্তি বাড়াইবার জন্তই ইহার বেশী ভাগ ব্যয়িত হইবে। সেই জন্ত, আমাদের সম্বন্ধে জাতীয়-আত্মকর্তৃত্ব লাভ একান্ত আবশ্যিক।

—

জাতীয় কাজে ব্যয় বাড়াইবার ক্ষমতা আছে।

এদেশের গবর্নমেন্টকে বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশী গবর্নমেন্টে পরিণত করিতে পারিলেই যে আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের সুব্যবহার হইবে ও অপব্যবহার নিবারিত হইবে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। স্বাধীন দেশ-সকলেও, কেবল রাজা সম্রাটেরা নয়, দেশের লোকদের নির্বাচিত লোকেরাও কখন কখন সরকারী টাকা দেশের কল্যাণার্থ খরচ না করিয়া অল্প উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অনেক মিউনিসিপালিটিতে ও সরকারী বিভাগে যেভাবে টাকা খরচ হয়, তাহাকে সো দা ভাষায় চুরি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। মিউনিসিপালিটিগুলার সঙ্গে তবু বিদেশী গবর্নমেন্টের সম্পর্ক আছে। কিন্তু অসহযোগ-আন্দোলনকারীরা বিদেশী গবর্নমেন্টের বেতন-ভোগী বা অশেষতনিক ভূত্য নহেন। তাহারা দেশের কাজের জন্ত বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। থিলাফৎ আন্দোলনকারীরাও বিস্তর টাকা দেশের লোকদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এইসব টাকার সমস্তটি বা অধিকাংশের সদায় হইয়াছে, বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ আমরা পাই নাই। আগেকার মডারেট আমলের কংগ্রেসের টাকারও সমস্তটির সদায়ের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কখন কখন পাওয়া যাইত না। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্নমেন্ট যাহাকে রাজনৈতিক ভাষাতে বলেন, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির

মধ্যে তদ্রূপ ডাকাতি না হইলেও, অন্তর্বিধ রাষ্ট্রনৈতিক ডাকাত যে আমাদের মধ্যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা কেহ বা দেশের কল্যাণার্থ সংগৃহীত টাকা আত্মসাৎ করে, কেহ বা যে-কাজের জন্য টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে ব্যয় না করিয়া নিজের বা নিজের দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তাহা ব্যয় করে।

সংস্কারী কর্মী বা বেসংস্কারী কর্মী দেশী হইলেই বিশ্বাসযোগ্য হইবে, মনে করা ভুল। অবশ্য, গোড়াতেই বিশ্বাসযোগ্য কর্মী নিযুক্ত বা নির্বাচিত করা চাই। তাহাবু পরেও কিন্তু সর্বদা তাহার উপর চোখ রাখা চাই। কেননা, কেহ বা প্রলোভনে অসাধু হয়, কেহ বা কুমন্ত্রণে অসাধু হয়, আবার কেহ বা অক্ষমতা-ও বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ অপরের অসাধুতা নিবারণে অসমর্থ হইয়া সর্বসাধারণের নিকট নিজেই অসাধু কলিয়া গণিত হয়।

জাতীয় কাজের জন্য টাকা মানুষ চিনিয়া ভাল লোকের হাতে দিতে হয়, এবং দেখিতে হয়, যে, তাহার সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে কি না। বরাবর দৃষ্টি রাখিতে হয়, যে, সাহায্য হইতেছে কি না, হিসাব পাওয়া যাইতেছে কি না।

এইরূপ সতর্কতা ও সতর্ক থাকিলে, বর্তমানে জাতীয় উন্নতির জন্য যত টাকা বাস্তবিক খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী খরচ নিশ্চয়ই হইতে পারে।

তা ছাড়া, আমাদের যে-সব মঠ মন্দির আখুড়া আদি আছে, তাহার আয় কখনও কতকগুলি মহাস্ত্র পাণ্ডা প্রভৃতির ভোগবিলাসের জন্য অভিপ্রেত ছিল না। ঐগুলি যে যে ধর্মসম্প্রদায়ের, তাহাদের কল্যাণার্থ তাহাদের আয় ব্যয়িত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যসাধন যদি আমরা স্বয়ং করিতে না পারি, তাহা হইলে রাজশক্তির সাহায্য লইয়া আইন প্রণয়ন অবশ্যকর্তব্য। “ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ” করা হইতেছে, ইত্যাদি চীৎকার জুড়িয়া দিলে, মহাস্ত্র পাণ্ডা প্রভৃতিদের মধ্যে যাহারা দুর্বৃত্ত তাহাদের সুবিধাই করিয়া দেওয়া হয়।

আমাদের অনেক সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিস্তর অপচয় হয়। অনেকে ঋণ করিয়াও অপচয় করে। ইহা নিবারণ হইলে লোকহিত সাধনে আরো বেশী টাকা প্রযুক্ত হইতে পারে।

বহুকাল হইতে বহু দেশহিতৈষী বলিয়া আসিতেছেন এবং ইহা সহজে বুদ্ধিগম্যও বটে, যে, আমরা পরস্পর ঋগড়া বিবাদ না করিলে, এবং ঋগড়া বিবাদ ঘটিলে আপোসে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, যোকদ্দমার খরচটা বাঁচিয়া যায়। ইহাতে সাহায্যের ক্ষমতা বাড়ে। অবশ্য টাকা হাতে থাকিলেই যে মানুষ সব সময় সাহায্য করিবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু যদি স্ববুদ্ধি-বশতঃ মানুষ ঋগড়া বিবাদ না করে বা আপোসে মিটাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই স্ববুদ্ধি তাহাকে উদ্ধৃত্ত টাকার কিয়দংশ লোকহিতার্থ ব্যয় করিতেও প্রবৃত্ত করিতে পারে।

সমগ্র ভারতবর্ষের আদালতের আয় কম নয়। ১৯২০ সালে উহা সাত কোটি বারো লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচ শত পঁয়তাল্লিশ টাকা হইয়াছিল। তা ছাড়া, পক্ষদিগকে উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার খরচ, খোরাকী ও তদ্বীরের খরচ প্রভৃতি করিতে হইয়াছিল। মোট খরচ পনের ষোল কোটি টাকা ধরিলে বেশী ধরা হইবে না। ইহার সিকি চারি কোটি টাকাও লোকহিতার্থ ব্যয়িত হইলে কত না মঙ্গল হয়! শুধু বাংলাদেশেই আদালতের আয় ১৯২০ সালে এক কোটি সাতাশি লক্ষ ছিয়াত্তর টাকা হইয়াছিল। এত আয় আর কোন প্রদেশে হয় নাই। বঙ্গে পক্ষদের মোট মোকদ্দমা খরচ চারি কোটি টাকা হইয়া থাকিবে। ইহার সিকি এক কোটি টাকাও লোকহিতার্থ বঙ্গে ব্যয়িত হইলে কত উপকার হয়। মহাত্মা গান্ধির দলের লোকেরা যদি তাঁহার উপদেশ অনুসারে দেশের লোককে ঋগড়া বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন, কিম্বা ঋগড়া বিবাদ আপোসে মিটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হইত।

সমগ্র ভারতের ষ্ট্যাম্প-রাজস্ব ১৯২০-২১ সালে ১০,৯৫,৬৮,৪৮৩ টাকা—প্রায় এগার কোটি টাকা— হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা অধিক বঙ্গে ২,৮২,২২,১৭৪ টাকা। ইহারও অনেক অংশ অপচয় মাত্র; তাহা বাঁচাইয়া সংকার্যে লাগাইতে পারা যায়। সমগ্র ভারতে কোর্ট-ফী ষ্ট্যাম্পেরই পরিমাণ ঐ সালে ৬,৭৮,৬১, ৩৭৩ টাকা।

তাহার পর খুব বড় একটা অপব্যয় ধরুন। ইহা মদ গাঁজা প্রভৃতির জন্য ব্যয়। সমগ্র ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্টের

আব্কারী রাজস্ব ১৯২০-২১ সালে ২০,৪৩,৬৫,৫৫২ টাকা হইয়াছিল। তাহার পরবর্তী বৎসরগুলিতে নিশ্চয় আরও বেশী হইয়াছে; সম্ভবতঃ পঁচিশ কোটি টাকা হইয়াছে। ইহা গবর্ণমেন্ট ট্রান্সফরমে পাইয়াছেন। যাহারা নেশা করিয়াছে, তাহারা ইহার চেয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ করিয়াছে। হয়ত একশত কোটি টাকা তাহাদের পকেট বা ট্যাঙ্ক হইতে নেশার জন্য খরচ হইয়াছে। পঞ্চাশ কোটি ত নিশ্চয়ই হইয়াছে। এই পঞ্চাশ কোটি টাকায় নেশাখোররা যদি নিজে পুষ্টি কর খাওয়া যথেষ্ট খাইত ও পরিবারবর্গকে খাইতে দিত, এবং সন্তানদের শিক্ষাদির জন্য কিছু ব্যয় করিত, তাহা হইলে প্রভূত জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইত। অধিকন্তু তাহারা ইহার কিয়দংশ পরহিতের জন্য ব্যয় করিলে ও সোনার সোহাগা হইত।

আব্কারী সম্বন্ধে বাংলাদেশের অবস্থা খুব খারাপ হইলেও উহা সকলের চেয়ে অধম নহে। ১৯২০-২১ সালে উহার আব্কারী আয় ১,৯৬,৬৭,৫৮৮ টাকা হইয়াছিল; মাস্তাজের ৫,৪৩,৫৬,৯০৪, বোম্বাইয়ের ৪,৬০,৬৭,৮৪৩।

নেশাখোরী অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা বহু বৎসর হইতে হইতেছে; মহাত্মা গান্ধীও ইহার উপর খুব জোর দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্যতঃ চেষ্টাটা খুব ক্ষীণ ভাবেই হইতেছে।

নেশায় কেবল যে টাকাগুলাই নষ্ট হয়, তাহা নহে; মানুষের স্বাস্থ্য যার, চরিত্র খারাপ হয়, ধর্ম যায়, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে ও বুদ্ধির মন্দতা জন্মে।

গবর্ণমেন্ট যে সাড়ে কুড়ি কোটি টাকা পান, তাহার মধ্যে খরচ হয় মাত্র সওয়া এককোটি টাকা; বাকী সওয়া উনিশ কোটি টাকা মুন্ফা সরকার বাহাদুর মানুষের অধোগতি হইতে লাভ করেন।

আমরা নেশার জিনিসের দোকান বন্ধ করিতে সমর্থ না হইতে পারি; কিন্তু মুখ বন্ধ করিতে ও করাইতে পারি। মানুষকে বলপূর্বক ইহা করাইয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা এপর্যন্ত কোন গবর্ণমেন্ট করে নাই।

বাংলা দেশের আয় ব্যয়

সমগ্র ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যেমন দেশের

লোকদের এই একটি মস্তব্য বরাবর চলিয়া আসিতেছে, যে, সৈন্যদের জন্য অত্যন্ত বেশী খরচ করা হয়, তেমনি বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রতি বৎসর বলা হইয়া থাকে, যে, পুলিশের জন্য অত্যন্ত বেশী ব্যয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমালোচনায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ, আমাদের বিদেশী গবর্ণমেন্ট বিশ্বাস করেন, যে, বহিঃশক্তি ও অন্তঃশক্তি হইতে দেশ রক্ষা করিবার উপায় দুটি; (১) সেনাদল, (২) পুলিশ। ইংরেজ সরকারকে যেমন দেখিতে হয়, যে, ভারতবর্ষ যেন পরদেশী অস্ত্র কাহারও হাতে গিয়া না পড়ে, তেমনি ইহাও দেখিতে হয়, যে, দেশটা যেন দেশের লোকদের হাতে গিয়াও না পড়ে। এই-জন্ম শাদা ও কালা সৈনিক এবং শাদা ও কালা পুলিশের এত আদর। এইজন্য, পুলিশের বেতন ও উপরিপাওনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের মশারির জন্য এক লাখ টাকা দেওয়া আবশ্যিক; কিন্তু দেশের লোকদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকাই যথেষ্ট। “প্রকাশ থাকে, যে,” বাংলার লোকসংখ্যা চারিকোটি সাত্বষ্টি লক্ষ এবং অধস্তন পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা ২৫৯৯৩ ও উপরওয়াল পুলিশের সংখ্যা ২৪০০; আরও “প্রকাশ থাকে, যে,” দেশের লোকের গড় মাসিক আয় সরকারী সর্বোচ্চ আন্দাজ অনুসারে জনপ্রতি পাঁচ টাকা এবং পুলিশের নিম্নতম কর্মচারীর আয় তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং প্রমাণ হইল, যে, পুলিশের জন্য এক লাখ ও দেশের লোকের জন্য আধ লাখ ঠিক ন্যায়সঙ্গত। দেশের লোকেরা ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মশারি ব্যবহার করুক, ইহা অবশ্য সরকার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহারা নিজ ব্যয়ে মশারি সংগ্রহ করিয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করুক, ইহাও সরকারের অভিপ্রায়। দরিদ্রতর জনসাধারণের সম্বন্ধে সরকারের এই শুভ ইচ্ছা সম্পন্নতর পুলিশ কর্মচারীদের সম্বন্ধে কেন পোষিত হয় না, তাহা জিজ্ঞাসা করা বেয়াদবি মাত্র। পাঠশালার গুরু মহাশয়, ভাকঘরের হরকরা ও পোষ্টম্যান, আদালতের চাপরাশী ও

পিয়াদা প্রভৃতি অল্প বেতনের লোকদের অল্প কেন সরকারী ব্যয়ে মশারির ব্যবস্থা হইল না, তাহাও জিজ্ঞাস্য বটে। কিন্তু উত্তর সহজেই অনুমেয়।

ব্রিটিশ শাস্তি

ব্রিটিশ জাতি কেন গায়সঙ্গত ভাবে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে অধিকারী, তাহার এই একটা প্রধান কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারতে শাস্তি স্থাপন করিয়াছে। এই শাস্তির নাম লাটিন ভাষায় প্যাক্স ব্রিটানিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মানে ব্রিটানিক শাস্তি। সাধারণ শাস্তি হইতে ইহার পার্থক্য আছে। তাহা বুঝিতে পারিলেই, যে-সৈন্যদল ও পুলিশের সাহায্যে এই শাস্তি রক্ষিত হয়, তাহাদের আদর কেন সর্বাপেক্ষা বেশী বুঝা যাইবে। শাস্তি মানে আমরা বুঝি এই, যে, মানুষ নিরুদ্বেগে আরামে থাকিবে। মানুষের উদ্বেগ ও দুঃখ নানা কারণে হয়। ম্যালেরিয়াতে, ইন্ফুয়েঞ্জায় ও অগ্নাণ্ড রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে; যাহারা ব্যাধি আক্রমণের পর বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও আরোগ্যালাভের পূর্বে অনেক কষ্ট পায়, এবং পরেও দুর্বল হইয়া থাকে। মানুষ মরিয়া যাওয়ায় উপার্জনের পথ বন্ধ হয়, চিকিৎসাতে অনেক টাকা খরচ হয়, দুর্বল মানুষ তেমন রোজগার করিতে পারে না যেমন সে সবল অবস্থায় পারে। সুতরাং দেশে নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে আর্থিক ক্ষতিও হয়। এইসব কারণে, লোকে, দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, অশান্তিতে কাল যাপন করে। কিন্তু এই অশান্তি দূর করিয়া শাস্তি স্থাপন, অর্থাৎ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ভাল করিয়া অকালমৃত্যু ও আর্থিক ক্ষতি নিবারণ দ্বারা মানুষকে শান্তি দেওয়ার নাম প্যাক্স ব্রিটানিকা বা ব্রিটিশ শাস্তি নহে। রোগে দু দশ লাখ লোকের মৃত্যু ও কোটি লোকের দুর্বলতা এবং বহু কোটি টাকার ক্ষতি দ্বারা যে অশান্তি হয়, তাহা দূর করা ব্রিটানিক শাস্তি নয়। দেশে যে কয়েক শত খুন-জখম হয় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাহা কিছু খুন-জখম হয়, তাহা হইয়া যাইবার পর পুলিশ গিয়া যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহার নাম ব্রিটানিক শাস্তি স্থাপন। চুরি ডাকাতিতে যে কয়েক লক্ষ টাকা অপহৃত হয়, তাহা হইয়া যাইবার পর চোর দস্য বা চোর দস্য বলিয়া ধৃত লোকদিগকে শাস্তি দেওয়ার নাম ব্রিটানিক শাস্তি স্থাপন। দেশে ব্রিটিশ শাস্তি স্থাপিত হইবার পূর্বে ভারতে অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যত লোক মরিয়াছে, এবং যত টাকার সম্পত্তি

লুট হইয়াছে, প্রোগ্রাম ম্যালেরিয়া; ইন্ফুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে ও দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে, এবং আর্থিক ক্ষতিও তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। তাহাতে মানুষের খুব অশান্তিও হইয়াছে। কিন্তু যে-সব ইংরেজ ও ভারতীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ এই অধিকতর জীবননাশ ও অধিকতর অর্থনাশ নিবারণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহারা ব্রিটিশ শাস্তিস্থাপক নহেন। ব্রিটিশ শাস্তির প্রতিষ্ঠাতা তাহারা যাহাদের সম্পর্ক অল্পতর জীবননাশ ও অর্থনাশের সহিত। এই লোক-গুলিরই আদর বেশী। কারণ, তাহারা দেশটিকে ঠাণ্ডা রাখিয়া ব্রিটিশ অর্থাৎ ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত রাখে। যে-দেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত, তথাকার শাস্তিই ব্রিটিশ শাস্তি। কোনো স্বাধীন দেশে খুব বেশী শাস্তি থাকিতে পারে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ অপেক্ষাও বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ব্রিটিশ শাস্তি নহে, কারণ সে দেশটাই যে ব্রিটিশ নহে অর্থাৎ ইংরেজের অধিকারভুক্ত নহে।

বঙ্গে জল সরবরাহ

সরকার পক্ষ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যে, দেশে দেশে জল সরবরাহ করা গবর্নমেন্টের কাজ নহে। কোন্টা উহার কাজ, কোন্টা নয়, সে-বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নাই। সেকালের ভারতীয় রাজারা বহু জলাশয় কূপ আদি খনন করাইয়া-ছিলেন। আধুনিক কালেও কোন কোন দেশী রাজ্যে বহু জলাশয় খনিত হইয়াছে। সাধারণতঃ যাহা রাজশক্তির কাজ নয়, বিশেষ কারণে ও অবস্থায় তাহা রাজকর্তব্য হইয়া উঠে। সাধারণতঃ মানুষকে খাইতে দেওয়া রাজশক্তির কর্তব্য নহে; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় কর্তব্য। তেমনি সাধারণতঃ জল জোগান সরকারী কাজ না হইলেও, অবস্থা বিশেষে উহা সরকারী কর্তব্য। বঙ্গে সেই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, ইহা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। আমাদের মনে হয়, যে, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে, যতটুকু সরকার, তার চেয়ে বেশী প্রমাণ করা হইয়াছে। যদি জল সরবরাহ করা রাজশক্তির কাজই নয়, তাহা হইলে ৫০,০০০ টাকাই বা কেন দেওয়া হয়? আরও বেশী নাকি দেওয়া হইত, অর্থকৃচ্ছতা বশতঃ নাকি দেওয়া হয় নাই। এই সাধু ইচ্ছা পোষণ করিবারই বা কি সরকার ছিল? যাহা সরকারের কর্তব্য নহে, তাহার নিমিত্ত ৫০০০০ টাকার মত সামান্য টাকাও অপব্যয় করা উচিত নয়। এই টাকায় লার্টসাহেব ও তাহার পারিষদবর্গের মশারি কিনিয়া দিলে কেহ টু শর্কটি করিতে পারিত না।

দত্তমহাশয় দেশহিতৈষী, তাহা আমরা জানি। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই সচিত্র আঙ্গুর একমত। দেশে যত পুরাতন পুকুর আছে, তাহার পক্ষোদ্ধার করাইয়া জল বিক্রম রাখিবার ব্যবস্থা করিলে চলে জানি; এবং ইহাও লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, অকথ্যভাবে জল দূষিত করে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানাভাববশতঃ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, যে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও গ্রাম্য ইউনিয়নগুলি যে জল সরবরাহের জন্ত নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করে নাই বা করিতে পারে নাই, তাহার কারণ কি? তাহারা কি অল্প রকমে টাকা অপব্যয় করিয়াছে? নান্যাহাদের উপর অর্পিত সমুদয় কাজ করিবার মত টাকা তাহাদের না থাকায় তাহারা কোনটাই ভাল করিয়া করিতে পারে নাই? আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের অনুমান এই, যে, দেশটাই গরীব হইয়া গিয়াছে; এই কারণে ইহার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির আয় যথেষ্ট নাই। দত্তমহাশয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির হাতের যে কয় লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সমস্তই জল সরবরাহের জন্ত খরচ করিলেও যথেষ্ট হইত না। কারণ তাহার ন্যূনতম আনুমানিক ব্যয় ৮ কোটি এবং অধিকতম একশত কোটি।

কে অপব্যয় করে?

যখন গ্রাম্য ইউনিয়ন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট, কাহারও হাতে যথেষ্ট টাকা নাই, তখন দেখা উচিত, কে সর্কাপেক্ষা বেশী অপব্যয় করে। ভারত-গবর্নমেন্ট এবিষয়ে সর্কাপেক্ষা কৃতী, তাহার পর প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট। ইহাদের অপব্যয় নিবারণ করিতে পারিলে জলের জন্ত একশত কোটি টাকা খরচ করাও অসাধ্য হয় না। যুদ্ধের সময় যে ১৫০ কোটি “স্বৈচ্ছাকৃত দান” ভারতের নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছিল, উহা অপব্যয়। ইংলণ্ড অনেক হাজার কোটি টাকা যুদ্ধে ব্যয় করিয়াছেন নিজের স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষা এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্ত; গরীব ভারতের তুচ্ছ ১৫০ কোটি টাকা না লইলেও তাহার চলিত। উহা কেবল জগদ্বাসীর নিকট ভারতের ব্রিটিশরাজ-ভক্তি প্রমাণ করিবার জন্ত লওয়া হইয়াছিল। রিভাস্ কৌন্সিল্ বিল্ দ্বারা যে ভারতবর্ষের ৩০১৩৫ কোটি টাকা লওয়া হইয়াছে, তাহারই বা গ্ৰাহ্যতা কি? এইরকম আরো নানা অপব্যয় যদি ভারত-গবর্নমেন্ট না করিয়া এক-একটা প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্ত বিশ পঞ্চাশ কোটি টাকা মঞ্জুর

করিতেন তাহা সদায় হইত, এবং তাহা সাধ্যাতীত হইত না।

বাংলা দেশের দাবী

বাংলা দেশের লোকদিগকে বাধ্য হইয়া ভিখারী সাজিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা যা চাই, উহা আমাদের গ্ৰাহ্য পাওনা। দু একটা দৃষ্টান্ত দি।

পাট বাংলার একটা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উহা প্রস্তুত করিবার জন্ত বাংলার বহু জেলার জল পাট পচাইয়া মানুষের অব্যবহার্য করা হয়। অথচ উহা হইতে সরকারী যে আয় হয়, তাহা বাংলা পায় না, ভারত-গবর্নমেন্ট গ্রাস করেন। বাংলা দেশ যদি বলে, আমাদের জল নষ্ট করিয়া আমরা পাট তৈয়ার করি, অতএব ভাল জলের জন্ত আমাদের একটা টাকা দাও, তাহা কি অগ্রায়?

টাকাটাও বড় কম নয়। শুধু ১৯২০-২১ সালেই পাটের রপ্তানী-শুল্ক হইতে ৩,২১,১২,৬২৮ টাকা সরকারী আয় হইয়াছিল। এইরকম তিন বৎসরের টাকা দিলেই ত গ্রামে গ্রামে একটা কূপ বা পুষ্করিণী হইতে পারিত। ইহার উপর চাল ও চায়ের রপ্তানী-শুল্ক আছে। তাহারও কিছু অংশ বাংলার পাওনা।

বাংলা দেশ হইতে ইনকম্ ট্যাক্স ১৯২০-২১ সালেই ৮,৩৯,৭৫,২৯১ টাকা আদায় হইয়াছিল। তাহার আগের বৎসর সাড়ে নয় কোটি টাকার উপর আদায় হইয়াছিল। এই প্রভূত আয়ের কোন অংশ বাংলা পায় না। ইহা কি গ্ৰাহ্যসঙ্গত?

প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের কোন্ কোন্ ট্যাক্সের আয় ভারত-গবর্নমেন্ট লইবেন, তাহার ব্যবস্থা লর্ড মেস্টন্ করেন। ইহার নাম মেস্টন্ সেট্লেমেন্ট। ইহা এমন ভাবে করা হইয়াছে, যে, যদিও বঙ্গে সব প্রদেশের চেয়ে বেশী রাজস্ব আদায় হয়, তথাপি এখানেই প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের জনপ্রতি খরচ করিবার ক্ষমতা সকলের চেয়ে কম। এইজন্ত বাংলা-গবর্নমেন্ট পর্যন্ত মেস্টন্ সেট্লেমেন্টকে বেবমানী ব্যবস্থা বা ইনিকুইটাস্ সেট্লেমেন্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অবশ্য একথা সত্য, যে, বাংলা দেশে ইংরেজেরই কৃত ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায়, এই প্রদেশে ভূমির রাজস্ব অল্প বড় বড় প্রদেশ অপেক্ষা কম। তজ্জন্ত, আদায়াদি খরচ বাদে কোন্ কোন্ প্রদেশ হইতে তাহার বর্গফল ও লোকসংখ্যা অনুসারে ভারত-গবর্নমেন্ট কত পান, তাহা স্থির করিয়া, বাংলা হইতে যে পরিমাণ কম পান, তাহা বাংলার জন্ত আয় হইতে লইতে পারেন।

কিন্তু বাংলার প্রধান আয়গুলি গ্রাস করা ভারতসবুকারের জ্বরদন্তি মাত্র। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মোট আদায়ের শতকরা নির্দিষ্ট অংশ ভারত-গবর্ণেন্ট লইলে ন্যায় বিচার হয়। গরীব প্রদেশগুলিকে না হয় কিছু মাফ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার রক্ত যেভাবে শোষণ করা হইতেছে, তাহা অতীব গহিত।

—

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেক্ট রামন্

বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো অর্থাৎ সদস্য নির্বাচিত হইবার মত উচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর নাই। ইতিপূর্বে প্রথমে মাদ্রাজের স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ রামানুজন্ উহার ফেলো হইয়াছিলেন। তাহার পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নির্বাচিত হন। এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের তারকনাথ পালিত অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেক্ট রামন্ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহা ভারতীয়দের পক্ষে আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। অধ্যাপক রামন্ মাদ্রাজে শিক্ষা লাভ করেন। তথাকার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে সহজেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বি-এ পাস করেন, এবং তাহার দুই বৎসর পরে আগেকার সব এম্ এ অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়া এম্ এ পাস করেন। প্রায় তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতীয় হিসাব-বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সহকারী একাউন্ট্যান্ট জেনারেল হন। তিনি ৩৫ বৎসর বয়সেই রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হইয়াছেন, ইহা খুব প্রশংসার কথা। তিনি ভারত-গবর্ণমেন্টের হিসাব-বিভাগের চাকরীতে থাকিলে কালে খুব নোটী বেতন পাইতে পারিতেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে তাহার অর্ধেকও শেষ পর্যন্ত পাইবেন কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি যে অর্থের মায়া কাটাইয়াছেন, রয়্যাল সোসাইটির ফেলো



অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেক্ট রামন্, এফ্. আরএস্

নির্বাচিত হওয়ায় এই স্বার্থত্যাগেব উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যই এই ফেলোশিপ্ দেওয়া হয়। ১৭ বৎসর বয়সে ছাত্র থাকিতেই তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বয়সে তাঁহার প্রথম গবেষণা ইংরেজী ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে মুদ্রিত হয়। গবেষণায় তাঁহার কৃতিত্বের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি কেবল ভারতবর্ষেই, শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কোনও প্রসিদ্ধ গবেষকের নিকট গবেষণা শিখিবার সুযোগ পান

নাই, এবং কলিকাতায় যে দুই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামন্দিরে গবেষণা-কার্য করিয়া থাকেন, তাহার কোনটিতেই যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম যথেষ্ট নাই।

বাধাপ্রদান নীতি

বিলাতী পালেমেন্টে এবং অন্যান্য দেশের ব্যবস্থাপক সভায় যখন কোন দলের রাজনৈতিকগণ নিজেদের প্রস্তাব আদর্শ মত বা বাহ্য অনুসারে গবর্ণমেন্টকে কোন আইন প্রণয়ন বা কাজ করাইতে কিম্বা ঈপ্সিত কোন অধিকার লাভ করিতে পারেন না, তখন তাঁহারা গবর্ণমেন্টের সমুদয় প্রস্তাবে আইনে কাজে অমত প্রকাশ করিয়া বাধা দিগ্গাহ্য করেন। ইহা ইতিহাসে সুপরিচিত নীতি—যে দেশে আমরা আমাদের কথা শুনিব না, আমরাও তোমাদের কথা শুনিব না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধিগণ এবং অন্ত কোন কোন প্রতিনিধি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণমেন্ট, ইতিমধ্যে অনেকবার ভোটে পরাজিত হইয়াছেন।

বাধাদান-নীতি সভ্যদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহের ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও কিন্তু এংলোইণ্ডিয়ান এবং কোন কোন দেশী কাগজ এমন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, যেন এটা একটা অশ্রুতপূর্ব গর্হিত কাজ। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইবে—ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতশাসনপ্রণালীর যে সংস্কার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহত হইবে। আমাদের সে আশঙ্কা নাই। ইংরেজ জাতি পৃথিবীর লোককে দেখাইতে চায়, যে, তাহারা ভারতবর্ষকে তাহার অধিবাসীদের সম্মতি অনুসারে শাসন করিতেছে, শাস্ত শাসন জবরদস্তী দ্বারা চালাইতেছে না। এইজন্ত স্বাধীন দেশে যেমন ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহার নকল মেকি ব্যবস্থাপক সভা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে। বাধাদান-নীতি অনুসৃত হওয়ায় ইংরেজ চটিয়া-মটিয়া হঠাৎ নিজের মুখোস খুলিয়া জগতের সম্মুখে স্ব-ইচ্ছাচারী শাসক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাজনৈতিক কপটাচরণে অভ্যস্ত লোকদের অত সহজে চটিয়া কাজ করিলে চলে না।

সরকারী কাজও অচল হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণর জেনারেল ও প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে ভারতশাসন আইনে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাহারা সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া বজেটের যে-সব বরাদ্দ ব্যবস্থাপক সভায় নামঞ্জুর হইতেছে, তাহা মঞ্জুর করিয়া দিবেন। এই প্রকারে কিছু দিন কাজ চলিবে।

শেষ ফল কি হইবে, সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব নহে: কিন্তু কখন সেই শেষ ফল ফলিবে, বলা সম্ভব নহে। আমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবই, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কখন করিব, তাহার তারিখ ফেলিবার সাধ্য কাহারও নাই।

আপাতত: শাসনকর্তারা আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার দ্বারা কাজ চালাইবেন। ইতিমধ্যে বিলাতী মন্ত্রীসভা অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবত: কোন কোন দিকে ভারতশাসনসংস্কার আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করিবেন। যদি সেই প্রস্তাবগুলি ভারতীয়দের ইচ্ছানুরূপ হয় এবং তদনুসারে আইন পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে ভালই। নতুবা জাতীয় আত্মকর্তৃত্বলিপ্সু প্রতিনিধিদিগকে বাধাদান নীতি অনুসারে কাজ করিতে থাকিতে হইবে। তাহার উত্তরে শাসনকর্তারা আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে টাকা মঞ্জুর করিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন। তখন বাধাপ্রদাতাদিগকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ট্যাঙ্ক না দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রবর্তিত করিতে হইবে। যদি দেশের লোক তাঁহাদের নেতৃত্বে ট্যাঙ্ক দেওয়া বন্ধ করে, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট, সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম প্রভৃতি নানা উপায়ে ট্যাঙ্ক আদায়ের চেষ্টা করিবেন। এই প্রকারে সর্বস্বান্ত হইলেও, প্রাণ গেলেও, ট্যাঙ্ক দিব না, শাস্তভাবে দৃঢ়তার সহিত এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে দেশের জিত অবশ্যস্বাবী।

ইহার পর আমরা লিখিতে যাইতেছিলাম, যে ট্যাঙ্ক আদায় উপলক্ষে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা শাস্তিভঙ্গ খুন-জখম হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহার ফলে “সামরিক আইন” প্রবর্তন ও কিছুকাল ভীষণ শাস্ত শাসনের প্রচলনের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু দেশের লোক সে অবস্থাতেও দৃঢ় থাকিলে লোকমত জয়ী হইবেই হইবে,.....

এমন সময় কাগজে দেখিলাম, স্বরাজ্য দল ও স্বাভাটিক (nationalist) দল বাধাদান-নীতি ত্যাগ করিয়া, আগেকার স্বাধীনচেতা মডারেট প্রতিনিধিদের মত, বজেটের প্রত্যেক বরাদ্দ সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিয়া অনুকূল বা প্রতিকূল ভোট দিবেন। কি কারণে তাঁহাদের এই নীতি ও মতি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বলিতে পারি না। পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না।

অপব্যয়ের জন্ত বরাদ্দে ত সম্মত হইবই না, ভাল কাজের জন্ত টাকার বরাদ্দেও মতি দিব না, এইপ্রকার উভয়মুখী বাধায় ধর্মবুদ্ধি সাধারণতঃ সায় দেয় না। কিন্তু যদি কাহারও ধারণা এইরূপ হয়, যে, গবর্ণমেন্ট কতকগুলো দেশহিতকর কাজে কিছু টাকা খরচ করেন কেবল নিজেদের

আসল মংলবটা টাকা দিবার জন্ত ও তাহা সিদ্ধ করিবার জন্ত, তাহা হইলে ভাল কাজের বরাদ্দেও বাধা দেওয়া চলে। কিন্তু সেস্থলে বাধাদাতাদের বেসরকারী ব্যবস্থা দ্বারা সেই ভাল কাজ করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, জলাভাবে লোকের প্রাণ যাইতে বসিলে তাহা রক্ষার জন্ত সরকারী টাকার বরাদ্দ এইজাতীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েকটি প্রশ্নপত্রে একরূপ ছাপার ভুল আছে, যে, প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। একরূপ ভুল নূতন নয়। প্রশ্নপত্র বিলাতে ছাপা হয় বলিয়া এইরকম ভুল হয়। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ভুলের জন্য পরীক্ষিত ছাত্রদের ক্ষতি হওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই তা পাস হয়; সব ক'টাকেই পাস করিয়া দিলে আর দুঃখ থাকে না। ভবিষ্যতে যদি একরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, যে, পরীক্ষার ফী জমা দিলেই পাস, তাহা হইলে প্রশ্নপত্র ছাপান, পরীক্ষকদিগকে টাকা দেওয়া, নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদির খরচটা বাঁচিয়া যায়, এবং ছেলেমেয়েগুলাও অনেক ঝঞ্জাট ও উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

প্রশ্নপত্রসকল বিদেশে মুদ্রণের বন্দোবস্তের মধ্যে যে গভীর জাতীয় অপমান ও কলঙ্ক উহা রহিয়াছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার হুমকিরকারীদেরও ভাবিঘা দেখিবার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহারা এবিষয়ে স্বাধীন করিতে পারেন নাই। এদেশে প্রশ্ন না ছাপাইবার কারণ এই, যে, প্রশ্ন চুরি যাইতে পারে। চুরির সুবিধার জন্ত ঘুসু দিবার ও ঘুসু লইবার লোক অনেক আছে। অতঃ সব দেশের লোকেরা আমাদের চেয়ে সাধু কি অসাধু, তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যিকতা নাই। অতঃ সভ্য দেশের লোকেরা কিন্তু নিজেদের প্রশ্ন নিজেরাই ছাপে; হয় ত তাহাতে কখন কখন পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন বাহির হইয়াও যায়। কিন্তু তথাপি তাহারা অতঃ দেশে ছাপিবার স্বাধীনতা স্বীকার করে না।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অতঃ কোন কোন স্থানে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের পাহারা দিবার বন্দোবস্ত নাই; তাহাদের আত্মসম্মানবোধের (sense of honour এর) উপর নির্ভর করা হয়। শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের নিয়মও এইরূপ।

খলিফার পদ লোপ

মৌলানা শৌকৎ আলি মুস্তাফা কামাল পাশা মহাশয়ের

খিলাফৎ সম্বন্ধীয় টেলিগ্রামের উত্তরে ঠিকই লিখিয়াছেন, যে, উহা বিশদ নহে। যাহা হউক, উহা হইতে একটা কথা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, যে, তুরস্ক গবর্নমেন্ট কেবল ভূতপূর্ব তুরস্ক-সুলতানকে খলিফার পদ হইতে বরখাস্ত করেন নাই, খলিফার পদটাই উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় ও অন্যান্যদেশীয় মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হইবারই কথা। কারণ, খলিফা মুসলমানদের ধর্মনেতা, এবং তাহাদের তীর্থস্থানসকল রক্ষা করা ও তথায় নিরাপদে তীর্থদর্শনাদি অর্থাৎ হজ্জ করিতে মুসলমানদিগকে সমর্থ করা তাহার কাজ ছিল।

ভূতপূর্ব খলিফাকে পদচ্যুত করিয়া তাহাকে তুরস্ক হইতে বহিস্কৃত করিবার কারণ বুঝা কঠিন নহে। তুরস্কে সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা আগেকার সুলতান-খলিফা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব লোপে তাহার ও তাহার বংশের ও দলের সকল লোকের আনন্দ হইয়াছে, মনে করিবার কারণ নাই; বরং দুঃখ ও ক্রোধ হইবারই কথা। সেই কারণে, তিনি বা তাহার বংশের বা দলের কেহ কখন ষড়যন্ত্র করিয়া রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; অস্ততঃ তিনি ও তাহার পরিবারবর্গ দেশে থাকিতে এ বিষয়ে সর্বদাই সাধারণতন্ত্রের কর্মীদের মনে সন্দেহ থাকিবে। একরূপ সন্দেহ যে অমূলক নহে, তাহা প্রমাণ এই, যে, ভূতপূর্ব সুলতান-খলিফাকে সুইস্ গবর্নমেন্ট তাহাদের দেশে থাকিতে এই সর্বোত্তম অমুমতি দিয়াছেন, যে, তিনি কোনপ্রকার রাজনীতির সহিত জড়িত থাকিবেন না; তা ছাড়া, তিনি যে হোটলে আছেন, তাহাতে তুর্ক রাজকীয় পতাকা উড়ান হইয়াছে (এবং তুরস্ক সাধারণতন্ত্র তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন)। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে, যে, তিনি এখনও আনানাকে সুলতান ও খলিফা মনে করেন। অতএব বুঝা-গেল, নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা লোপ করিবার জন্য এবং সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ভূতপূর্ব সুলতান-খলিফাকে পদচ্যুত ও বহিস্কৃত করা হইয়াছে।

অনেক দেশে রাজতন্ত্র লুপ্ত ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাজবংশের অনেকে নিহত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও ক্রিশিয়ায় এইরূপ ঘটয়াছিল। চীনদেশে তাহা হয় নাই, তুরস্কেও তাহা হয় নাই। এ বিষয়ে অখৃষ্টিয়ান ও "অসভ্য" তুর্কেরা খৃষ্টিয়ান ও সভ্য অনেক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছে; তাহারা তাহাদের ভূতপূর্ব রাজাকে কেবল পদচ্যুত ও বহিস্কৃত করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে, ভূতপূর্ব সুলতান-

খলিফাকে, তিনি আগে রাজা ছিলেন বলিয়া, পদচ্যুত করিবার কারণ বুঝা গেল, কিন্তু রাজবংশের নহেন এমন কোন ধার্মিক মুসলমানকে তুর্কেরা কেন খলিফা নির্বাচন করিলেন না। ইহার কারণ আমরা অমুসলমান হইলেও কতকটা অনুমান করিতে পারি। খিলাফৎ সম্বন্ধে মুসলমানেরা আগে আগে যাহা বলিয়াছেন ও এখনও বলিতেছেন, তাহাতে এই ধারণা হয়, যে, খলিফা কেবল ধর্মনেতা হইলে চলিবে না, মুসলমান তীর্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন জগৎ তাঁহার পার্থিব ক্ষমতা সৈন্যদল ধনসম্পত্তিও থাকিবে কার। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের এলাকায় এইরূপ পার্থিবশক্তিশালী কাহারও অস্তিত্বের সহিত গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না। এইরূপে শক্তিশালী ব্যক্তির শক্তির সীমা নির্দেশও কঠিন, তদুপরি তিনি যে ঐ শক্তি বাড়াইয়া সাধারণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করিতে চাহিবেন না ও পারিবেন না, সে বিষয়েই বা কেমন করিয়া নিশ্চিত হওয়া যায়? মানুষের মনের উপর ধর্মের প্রভাব খুব বেশী। ধর্মনেতা খলিফা পার্থিব উদ্দেশ্যে বহু অশুচর পাইবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহা গেল আমাদের অনুমান।

তুর্ক দেশপতি মুস্তাফা কামাল পাশা যে টেলিগ্রাম ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইহা অপেক্ষা গভীর ও নিগূঢ় কথা বলিয়াছেন। তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি না জানি না, কিন্তু যাহা বুঝিয়াছি বলিতেছি। তিনি বলেন, খিলাফৎ মানেই গবর্নমেন্ট বা রাষ্ট্র: তুর্কের গবর্নমেন্ট ও রাষ্ট্র এখন সাধারণতন্ত্র। স্মৃতিরাত্ত তদ্বিন্ন আবার একটি খিলাফৎ পদের প্রয়োজন কি? তুর্ক-সাধারণতন্ত্রের মধ্যে আলাদা একটি খিলাফৎ পদ থাকায় তাহা তুর্কের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লক্ষ্য বিষয় জর্জরিত হইয়াছিল। এই কারণে খলিফার পদই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া তিনি আরো বলিয়াছেন, যে, মুসলমানেরা খলিফাকে জগদ্ব্যাপী একটি মুসলমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা নেতা মনে করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই জগদ্ব্যাপী মস্লেম রাষ্ট্র বা গবর্নমেন্ট কখন বাস্তবে পরিণত হয় নাই; বরং ইহা মুসলমানদের মধ্যে অনেক কাগড়া ছন্দ ও কপটাচরণের কারণ হইয়াছে। অন্তর্দিকে, এই নীতিই কার্যতঃ গৃহীত ও অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, যে, প্রকৃত লোকহিতার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক লোকসংঘ বা লোকসমষ্টি আপনাদিগকে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও গবর্নমেন্টে পরিণত করিতে অধিকারী। তিনি আরও বলেন, ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান দেশের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও প্রকৃত বন্ধনরাজ্য

কোরান শরিফের "ইয়া মুল মোমিনুন্ ইখা" এই বচনের অর্থে উহা রক্ষিত হইবে।

তুর্কে খিলাফৎ উঠাইয়া দেওয়ার মৌলানা শৌকৎ আলী যে কুফলের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে দেখা দিয়াছে। হেজাজ, ইরাক ও ট্রান্সজোর্দানিয়ার মুসলমানেরা হেজাজের রাজা হোসেনকে খলিফার পদ প্রদান করিতে চাওয়ায় তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। রয়টারের তাহা দেখা গেল, যে, প্যালেষ্টাইনের এক শত জন প্রতিনিধি ঐ দেশের মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাঁহাকেই খিলাফৎ প্রদানেচ্ছু। এইসকলের মধ্যে কতটা ব্রিটিশ চ'ল আছে, বলা যায় না। কারণ, রাজা হোসেন ব্রিটিশ প্রভাবাধীন। মিশরের লোকেরা তাহাদের দেশে খিলাফতের অধিষ্ঠানভূমি হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কাগজে দেখা গেল। এমন কথাও বাহির হইয়াছে, যে, মরক্কো তুর্ক-খিলাফতের প্রভাবাধীন কখন ছিল না। কেহ কেহ হায়দরাবাদের নিজামকে খলিফা করিবার অসঙ্গত প্রস্তাব তুলিয়াছেন। মুসলমান বক্তা ও লেখকদের কথা হইতে আমরা এই বুঝিয়াছি, যে, যে স্বাধীন রাজা বা ব্যক্তির মস্লেম তীর্থস্থানগুলি রক্ষার শক্তি নাই, তিনি খলিফা হইতে পারেন না। ভারতবর্ষের কোন মুসলমান নৃপতি স্বাধীন নহেন, এবং আরব প্যালেষ্টাইন্ বা অন্তর্বিদেশে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই।

ভারতীয় মুসলমানেরা তুর্কের মুসলমানদের প্রতি সর্বদাই দরদ দেখাইয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহাদের অনেক টাকাও তুর্কে গিয়াছে। কিন্তু তুর্ক টাকা লওয়া ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের কোন খাতির করিয়াছেন, বা তাঁহাদের মতের ও মনের ভাবের প্রতি কায্যতঃ কোন শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার একটা কারণ, নব্য তুর্কেরা গোড়া মুসলমান নহেন, এবং তাঁহারা অনেকে নিখিল-তুরানীয় প্রচেষ্টার (Pan-Turanian Movement এর) সমর্থক। এই প্রচেষ্টার মূলভূত একটি নীতি এই, যে, তুর্কেরা তুরানীয়, অতএব তাহাদের সভ্যতার বিকাশ আরবীয় ও পারসীক সভ্যতার প্রভাব হইতে নিমুক্তভাবে হওয়া উচিত।

সমগ্র মুসলমান জগৎ যাহাকে খলিফা বলিয়া মানিবেন, ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তি খলিফা হইবেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু সেরূপ খলিফা নির্বাচন করিতে হইলে সকল মুসলমানপ্রধান দেশ ও প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া একটি কংগ্রেসে বিষয়টির আলোচনা ও মীমাংসা করিতে হইবে।

মুসলমানদের জন্ম স্বতন্ত্র কলেজ

মুসলমানদের জন্ম স্বতন্ত্র কলেজ করিবার নিমিত্ত এবার বাংলা-গবর্ণমেন্ট এক লাখ টাকা খরচ করিবেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্ম বিশেষ করিয়া টাকা খরচ হয়, ইহা আমরা চাই। কিন্তু কিভাবে খরচ হইলে সফল হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, আমরা স্বতন্ত্র কলেজের সমর্থন করি না। তাহার কারণ অনেক।

একটা প্রধান কথা এই, যে, যে সব ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে এক দেশে বাস করিয়া একত্র কাজ করিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষা একত্র হওয়া দরকার। তাহা হইলে ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের বালক ও যুবকদের মধ্যে পরস্পরের সদ্গুণ দেখিয়া ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মিবে এবং তাহা জীবনব্যাপী হইবে। তাহা ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় মিলন ও ঐক্য অসম্ভব। আমরা নিজে মুসলমান বন্ধুর অভাব খুব অনুভব করি।

মানুষ কেবল নিজের দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে সংকীর্ণমনা ও কুপমণ্ডক হয়। তাহা নিবারণের জন্ম অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানিকেতন প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষানিকেতনে শিক্ষা পাইলে মানুষের স্বভাবের কোণা-খোঁচা-গুলি মোলায়েম হইয়া মানুষ সামাজিক সভ্য জীব হইতে সমর্থ হয়।

যেসব শিক্ষালয়ে সর্বসম্প্রদায়ের ছাত্র পড়ে, তাহাতে যত প্রতিভাশালী ছাত্র আসে, কেবল এক সম্প্রদায়ের ছাত্র পড়িলে তত আসে না। প্রতিভাশালী ছাত্রদের সংসর্গ ও প্রতিযোগিতা অল্প ছাত্রদের পক্ষে উপকারী। ব্যায়াম ক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সকল সম্প্রদায়ের মিলন ও প্রতিযোগিতা এইপ্রকারে হিতকর।

২১ লাখ টাকা খরচ করিয়া ভাল কলেজ হইতে পারে না। উহার লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, অধ্যাপকগণ, ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রভৃতি অল্প সব উৎকৃষ্ট কলেজের সমান হইতেই পারে না; বরং নিকৃষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

যদি এরূপ হইত, যে বর্তমান কলেজগুলিতে মুসলমান ছাত্র ধরিতেছে না, তাহা হইলে নূতন কলেজের প্রয়োজন বুঝা যায়। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক কোন কোন কলেজে যতগুলি মুসলমান ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে, সব বৎসর তাহাও পাওয়া যায় না। অনেক কলেজে আরবী ফারসী পড়াইবার বন্দোবস্তও আছে।

এইরূপ নানা কারণে আমরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক কলেজের বিরোধী। কলিকাতা মাদ্রাসা ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নূতন আর-একটি সাম্প্রদায়িক কলেজের উবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হওয়া যায় না।

তার চেয়ে যদি মুসলমান ছাত্রদিগকে বর্তমান কলেজগুলিতেই পড়িবার জন্য দুই এক লাখ টাকার বৃত্তি দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাতে ফল ভাল হইত।

মুসলমান ছাত্রেরা অবশ্য মুসলমান অধ্যাপকের নিকট পড়িতে চান। কিন্তু বিদ্বান মুসলমানরা চেষ্টা করিলে বর্তমান কলেজসকলেও অধ্যাপক হইতে পারেন। পক্ষান্তরে, নূতন মুসলমান কলেজ যেসকল বিষয়ে যথেষ্ট-সংখ্যক মুসলমান অধ্যাপক পাইবেন বা নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া দরকার।

--

মাৎস্য়ন্যায়

দেশে অরাজকতা অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে গ্রামে ২১ জন অর্থশালী লোক বাস কবে, সেখানেই চুরি কিম্বা ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ডাকাতি করা এত সহজ হইয়া উঠিয়াছে, যে, দুই-এক স্থলে দিনে-দ্বিপ্রহরেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। একই দল একরাতে কখন কখন একগ্রামে একাধিক বাড়ীতে, অথবা ভিন্ন-ভিন্ন নিকটবর্তী গ্রামে, ডাকাতি করিতেছে। নিরস্ত্র পল্লীবাসীগণ মুহূর্তমান মেঘঘুণের ঞায় বিনিস্ত্র নিশি-যাপন করিতেছে।

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের অনেক লোক জীবিকা অর্জনের জন্ম বিদেশে বাস করে, বাড়ীতে কয়েকটি জীলোক থাকে মাত্র। বলা বাহুল্য, তাহাদের রক্ষক থাকে না। সাহা, বণিক, গোপ, বাকুজীবী প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ অপুনা পল্লীজীবনের মেরুদণ্ড, কারণ তাহারা বিদেশে যায় না ও নগরে বাস করে না। ইহারা অতি নিরীহ, মাইল্ হিন্দুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধনী মুসলমানগণ প্রায়ই গ্রামে বাস করে না। স্তত্রাং বেশীর ভাগ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভজলোক ও ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ সহ্য করিতে হয়। গ্রামে ও নিকটবর্তী মহকুমায় প্রায়ই টাকা আদান-প্রদানের এবং অলঙ্কারপত্র গচ্ছিত রাখার জন্ম কোন ব্যাক্ নাই। থাকিলেও দেশের লোক ঐদৃশ উপায়ে তাহাদের টাকা ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি জমা রাখিতে অভ্যস্ত নহে। শিক্ষার অভাবে, এজন্ম যে হিসাবপত্র রাখিতে ও লেখা-পড়া করিতে হয়, গ্রাম্য ধনী মহাজন ও ব্যবসায়িকগণের পক্ষে তাহা কষ্টসাধ্য।

উচ্চ পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা বলেন, অধিকাংশ ডাকাতিদলের নেতা শিক্ষিত ভদ্র যুবক। অবশ্য নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য লোক, চুরিডাকাতি তাহাদের পেশা, এইসব দলে আছে। এই

যুবকগণই তাহাদিগকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়, আধুনিক অস্ত্র 'জোয়ায়, নিয়মপ্রণালী গঠন করে, দলবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সহিত নিজেদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করিতে শিখায়। মোর্টের উপর ভদ্র যুবকগণই ইহাদের মস্তিষ্করূপ, তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা কার্যকুশলতা ও সংবাদ-সংগ্রহপটুতার গুণে নিরক্ষর পেশাদার গ্রাম্য ডাকাতগণ দুর্দ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বলেব মুষ্টিমেয় পুলিশ কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। গ্রামের লোকের নিষ্কট, ভীকৃত্য প্রযুক্তই হউক আর অস্ত্রভাবশতঃই হউক, আশাহুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। এইসকল "ভদ্র" ডাকাতদের অধিকাংশই পুলিশের সুপরিচিত, কিন্তু আদালতগ্রাহ্য প্রমাণাভাবে তাহাদিগকে চালান দেওয়া যায় না। সন্দেহমূল হাজতে রাখিয়া হয়রানু করা ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া চলে না, কারণ তাহা আইনের নীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে পুলিশ একরকম নিরুপায় বলিলেই হয়। ইহাই পুলিশ পক্ষের ওজুহাত।

যদিও ডাকাতির নেতাগণ কেহ কেহ পূর্বে 'স্বদেশী' দলভুক্ত ছিল, এখন তাহারা অধিকাংশ পেশাদার ডাকাত। ধোপা] নাপিত প্রভৃতি গ্রাম্য লোক, তাহাদের সর্বত্র অন্দরে বাহিরে গতিবিধি আছে, তাহারা নাকি গোয়েন্দা ও গুপ্তচর। দারিদ্র্যই এসকল ডাকাতির প্রধান কারণ। বি-এ পাশ যুবকও যখন দশ টাকা বেতনে চাকরী পায় না, তখন একরাত্রির লুণ্ঠনলব্ধ উপার্জনে বৎসরের খোরাকী সংগ্রহ করার প্রলোভন সহরণ করা সময় সময় তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রামে চোরাই মালের রক্ষক অনেকেই ভদ্রলোক। অন্ততঃ অনেক পুলিশ কর্মচারীর এইরূপ ধারণা।

অর্থশালী ভদ্রলোকগণ ম্যালেরিয়া জলকষ্ট প্রভৃতির "হাত এড়াইবার জন্ত পূর্ক হইতেই শহরবাসী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে ছচারিজন পল্লীগ্রামের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া পাড়ারগায়ে থাকিতেন, তাঁহারাও অতঃপর গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ভদ্রলোক অভাবে গ্রামগুলি অরণ্যে পরিণত হওয়ার বেশী খিঃস্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার গ্রামে চল (Back to the villages), আবার আমাদিগকে শহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে, স্বদেশপ্রেমিকদিগের মুখে একথা অনেক সময় শুনা যায়। কিন্তু দুর্বলতা দুঃখের হেতু (to be weak is miserable); দুর্বলের কোথাও শাস্তি নাই। গ্রামে তাহার স্থান নাই, শহরের কঠোর জীবনসংগ্রামে তাহার আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকাও কঠিন। অতিষ্ঠ হইয়া লোকে কি করিবে ঠিক নিয়া উঠিতে পারিতেছে না, অসন্তোষের মাত্রা ক্রমেই

বৃদ্ধি পাইতেছে, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিরীহ গ্রামবাসীগণ ভাবিতেছে, উপায় কি?

বস্তুতঃ বর্গীর হান্দামায়, অথবা 'আনন্দমঠে' বর্ণিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোকক্ষয়ের পর, দেশে যেরূপ অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, এখন সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গবর্নমেন্ট ডাকাতির সাপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশ করেন, এবং রাজনৈতিকগন্ধবিশিষ্ট ডাকাতিগুলির আঙ্কারা করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। কিন্তু ঐরূপ ডাকাতি সংখ্যায় অত্যন্ত, এবং সাধারণ ডাকাতির গ্ৰায় এতটা নৈতিক অবনতির পরিচায়ক নহে। অথচ যে মাৎস্তগ্ৰায়ে গ্রামগুলি ভদ্রলোকশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেবল দেশের লোকের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না। গ্রামালোকে ডাকাত ধরা সম্পর্কে পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করে না, একথা বলা সহজ কিন্তু লোকের ধারণা এই যে গ্রাম্য যুবকগণ আত্মরক্ষার জন্ত স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়া লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন করিলে তাহাদিগকে পুলিশের নজরবন্দী হইতে হয়।

দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত না হইলে পল্লীসমাজ বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ভদ্র যুবকদের অল্পকষ্ট (economic distress) কথকিং প্রশমিত না হইলে, বর্তমান স্কুলকলেজের শিক্ষা তাহাদের সকলকে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি রাতারাতি বড়মানুষ হওয়ার প্রায়শঃ নিরাপন্ন সুযোগ হইতে দীর্ঘকাল নিবৃত্ত রাখিতে পারিবে না। কথা আছে, 'বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং, ক্ষীণা জনাঃ নিষ্করণাঃ ভবন্তি'। অবশ্য অল্পসংখ্যক ভদ্র যুবকই সম্ভবতঃ ঐদৃশ জঘন্য নৃশংস পাপে লিপ্ত, কিন্তু ইহাদের এই নৈতিক অধোগতির বিষ সমাজশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া গড়িতে বেশীদিন লাগে না। কারণ ইহাদেরই আত্মীয়স্বজন দ্বারা পল্লীর ভদ্রসমাজ গঠিত। গ্রাম্য লোকের যেরূপ ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যে, সর্ববিধ বৈধ উপায়ে অরাজকতা দমনের জন্ত তাহাদিগকে রাজশক্তির সহায়তা করা কর্তব্য, কর্তৃপক্ষেরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, আইন ও শৃঙ্খলার (Law and Orderএর) যে দোহাই দিয়া সর্ববিধ অত্যাচার-উৎপীড়নের সমর্থন করা হয়, তাহার আসল উদ্দেশ্য কয়েকটি রাজনৈতিক অপরাধীর দণ্ড নয়, দেশের চুরি ডাকাতি ও অন্ত্রাশ্রি সাধারণ অপরাধ নিবারণ, এবং দারিদ্র্যানিবারণের উপায় উদ্ভাবন দ্বারা প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, যেন তাহারা অন্নচিন্তার কবল হইতে মুক্ত হইয়া সর্ববিধ জাতীয় হিতের অমুঠানে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

